'রেক্সোর' অনুপম অঙ্গরাগ
সুরভিত ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত নারিকেল তৈল
প্রিকলিহীট পাউডার
কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই

মিষ্টির জগতের শেষ কথা!
দেশবাসীর এই অনাবিল প্রশংসা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা—কারিগরগণের অননুকরণীয় নৈপুণ্য ও তদুপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ। দেশবাসীর পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা গৌরবান্বিত ও এই দুর্দ্দিনেও আমরা সক্ষম হইয়াছি আমাদের দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ অটুট রাখতে।
LAST WORD IN INDIAN CONFECTIONERIES
BN
ভীমনাগ
BHIM NAG

লক্ষ্মী ঘি'

জেলে

[শিল্পী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
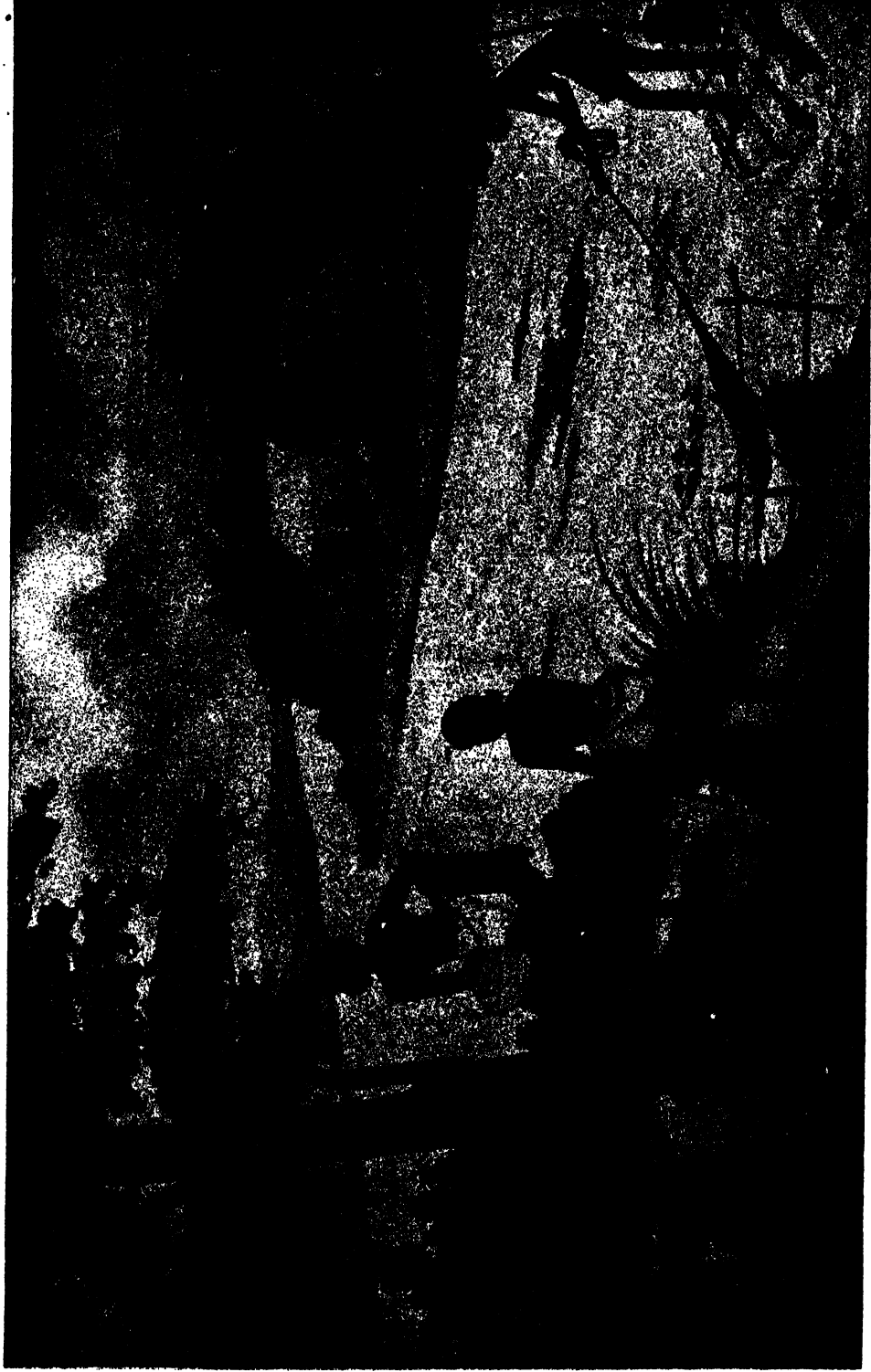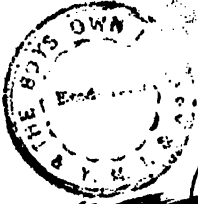
ত্রয়োদশ বর্ষ } আষাঢ়—১৩৫২ { ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

বহুরূপী শিব

শ্রীজনরঞ্জন রায়

শিব-রূপ যেন ভারতীয় পৌরুষের পরিপূর্ণ কল্পনার মানুষী-রূপ। ইহা যেন মহান্ হইতে মহত্তর—উচ্চ হইতে সুউচ্চ—যাহার রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারে নাই—সেই চিরকুহেলিকায় আচ্ছন্ন—অনাদিকাল হইতে তুষারে ঢাকা—কুবেরের ধনপূর্ণ—দুর্লঙ্ঘ্য হিমাচলের দুর্জ্জয় শিখরবাসী দেবতার রূপ। মানুষ তাকে কত রূপরূপান্তর দিয়াই না আঁকিয়াছে। তাই বহুরূপী শিব।

স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যম্। ২।৩৩।৯ ঋক্

বেদ বলিতেছেন—এই দেবতা দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র, পিঙ্গলবর্ণ, দীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কার-শোভিত, শক্তির আধার ও সমস্ত ভুবনের অধিপতি।

এই শিবের রহস্য জানিতে হইলে, একেবারে পাতালে প্রবেশ করিতে হইবে। কারণ, তিনি যে অনাদি লিঙ্গ—জগতের হেতু(১)। পাতাল ভেদ করিয়া সে লিঙ্গ উঠিয়াছে। তাহা দেখিতে তাই আমাদেরও আজ পাতালে প্রবেশ করিতে হইবে। তিনিই যুগ যুগান্তের বুড়োরাজ। অগ্রগমন-পথে আমরা প্রথমেই শুনিব সেই আদি চাষার গান(২), অর্য্য বা আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশমুখে তাঁর পরিচয় পান কি ভাবে তাহা আমরা দেখিয়া যাইব। এই আর্য্যগণ যেখান হইতেই আসিয়া থাকুন (৩), তাঁহাদের কথা

"তদানীন্তন কালে সমগ্র জগৎ অর্থে "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" অর্থাৎ দেবগণের আদি পিতৃভূমি 'স্বর্গলোক', প্রথম উপনিবেশভূমি "ভূলোক" অর্থাৎ এই ভারতবর্ষ এবং দ্বিতীয় উপনিবেশভূমি "ভুবলোক" অর্থাৎ অন্তরীক্ষ—আফগানিস্থান, পারস্য ও তুরস্ক (ত্রিরন্তরীক্ষ) অঞ্চলকেই বোঝাত। এবং পৃথিবী বলতে ঋষিগণ শুধু এই ত্রিকোণাকৃতি ভারতবর্ষকেই বুঝতেন। (পৃথিবী তাবৎ ত্রিকোণা)। কারণ বর্ত্তমান ভারতবর্ষের আকৃতি যেমন ত্রিকোণ, সেদিনও ঠিক তাই ছিল। এবং স্বর্গচ্যুত জনৈক দেবতা বেনরাজার পুত্র পৃথুর (পৃথুল) নাম থেকেই (মতান্তরে তার স্ত্রী পৃথিবীর নাম থেকেই) এদেশের নাম হয়েছিল পৃথিবী। যেমন পরবর্ত্তী কালে ভরতের নাম থেকেই এ দেশের নাম হয়েছিল "ভারতী" এবং "ভারতবর্ষ। × × × বৈদিক সভ্যতা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার বহুপরে—প্রায় তিন চার যুগ ধরে বেদচতুষ্টয় সমাহৃত হয়ে-

(১) লিঙ্গ হেতু (অমরকোষ)। অনুমায়াং জ্ঞায়মানং লিঙ্গং তু করণং নহি (ভাষাপরিচ্ছেদ)।

(২) ঋ ধাতুর অর্থ চাষ করা। অর্য্য বা আর্য্য অর্থে কৃষি-ব্যবসায়ী। ইন্দ্র সম্বন্ধে আর্য্যশব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে (১।৩৩.৩ঋক) ১ম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের ঋকগুলি প্রমাণ করে যে, আর্য্যগণ মেষ-পালনাদিও করিতেন। তজ্জন্য নূতন তৃণ অন্বেষণে দূর-দূরান্তে যাইতেন। পূষা দেবতার কাছে তাঁহারা ভ্রমণের সময় পথ-প্রদর্শকের কাজ করিতে অনুরোধ করিতেন।

(৩) "During the last one hundred years the cradle has been shifted by generations of Oriental Scholers from one country to another, from Kashmir and Bactria to Central Asia, from Central Asia to Mesopotamia, from Mesopotamia to the Arctic regions, from the Arctic regions to the Northern and Central Europe and from there to a region said to have been lost in the Mediterranean sea.

I have tried to shift it back again to ancient Sapta-Sindhu or the Punjab, which included Kashmir, Gandhara and Bactria in Ṛgvedic times."—Preface, Ṛgvedic Culture—A. C. Dey.

আমরা যতটা বুঝিতে পারি বা না পারি (৪), এ কথা সত্য যে তাঁহারা এদেশে আসিয়া শিবকে রুদ্ররূপেই দেখিলেন (৫), আর এই বিবরণ আছে সেই গ্রন্থে, যাহার অধিক প্রাচীন কোনো গ্রন্থ আজও মানুষ জানে না, কল্পনার সীমারেখা টানিয়া নিয়া যাহার বিবরণকে প্রায় সাতাশ হাজার বৎসরের প্রাচীন বলা হইতেছে (৬), আর্য্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সেই অশেষ গুণশালী বহুরূপী দেবতাকে সসম্ভ্রমে অর্চ্চনা করিলেন (৭)। অসুরদের (৮)

ছিল। প্রথম 'ব্যোম' 'দ্যো'—অর্থাৎ ইলাস্থায়ী মেরুপর্ব্বতবাসী সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা যখন তৃতীয় উপনিবেশভূমি পরম ব্যোম 'দিবে' অর্থাৎ সত্যলোক, তপোলোক অঞ্চলে গিয়ে 'পরমেষ্ঠী' হয়েছেন—সেই আমলে তাঁর আদেশে 'অগ্নি' ভারতবর্ষ বা পৃথিবী থেকে ঋকের মন্ত্র (অগ্নেঋচঃ), 'বায়ু' অন্তরীক্ষ বা আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান থেকে যজুর মন্ত্র (বায়োর্যজূংষি) ও 'সূর্য্য' আদি স্বর্গ দ্যো থেকে সামের-মন্ত্র (সাম আদিত্যাৎ) সমাহার করেন। অর্থাৎ মানবের আদিজন্মস্থান দ্যো বা ইলাবৃতস্থান দ্বিতীয় প্রত্নোক: পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, তৃতীয় প্রত্নোক: অন্তরীক্ষ বা আফগানিস্থান (অপোগস্থান) ইরাণ ও তুরস্ক প্রভৃতিস্থান আর্য্যগণকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও জনপদে পরিণত হওয়ার পর ব্রহ্মা যখন তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত তৃতীয়তম 'দিবে' বা উত্তরকুরু অঞ্চলে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছেন সেই সময়ই সর্ব্বপ্রথম বেদ সমাদৃত হয় × ×। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষিগণের মধ্যে অষ্টাবিংশতিতম ব্যক্তি। × × যুগে যুগে বেদ যতবারই সমাহৃত হয়ে থাকুক, বেদের ঋষিদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁদের আদি পিতৃভূমি 'বিত্তা' থেকে যখন সর্ব্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা সামগান গাইতে গাইতে এসেছিলেন। "ভারতীয় সঙ্গীত" 'সংহতি'—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০—শ্রীশচীন্দ্র নাথ মিত্র।

প্রাচীন আর্য্যগণ, হিন্দু, ইরানীয়, টিউটন, কেল্ট, ল্যাটীন, গ্রীক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যান। সর্ব্ব প্রথমে সকলেই আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। আর্য্যগণের প্রতিবাসীরা মেষপালক ছিলেন। তাঁদের তড়াতাড়ি এক স্থান হইতে ভিন্ন স্থানে যাইতে হইত। এইজন্য 'তুরানীয়' নাম ধারণ করেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেলেও আর্য্য বলিয়া পরিচয়-সূত্র রাখিয়াছিলেন। ইরাণ, আর্মেনীয়, আলবেনীয়, আইরণ (ককেসস্ উপত্যকায়), আরীয় (গ্রীসের উত্তরে) এবং এরিন (বা আয়রল্যাণ্ড) আর্য্য নামেরই পরিচয় দিতেছে।—Science of Language: Max Muller.

(৪) বেদের সব কথার মানে করা যায় না। সায়ন, যাস্ক, দুর্গাচার্য্য, মক্ষমূলর, উইলসন, বেন্‌ফে, বলেন্‌সন্, কক্স, বর্ণফু প্রভৃতিও তাঁদের অনুসরণ করিয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমানাথ সরস্বতী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনুমানমতো যে সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন, তাহাই প্রচলিত।

(৫) বেদ-সংহিতায় যিনি রুদ্র বলিয়া পরিচিত, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণসমূহে সেই রুদ্রই শিবনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ব্রাহ্মণসমূহে এবং উপনিষদে আমরা রুদ্রদেবতার বহু স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই রুদ্রই পরবর্ত্তী সময়ে শিব এবং মহাদেব প্রভৃতি নামে এদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ঋগ্বেদে ইঁহাকে মরুদগণের পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থানবিশেষে অগ্নি ও ইন্দ্র অর্থে রুদ্র শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।—বিশ্বকোষ।

(৬) "In the light of the opinions of some modern geologists, I have consistently brought down the age of a different distribution of land and water (evidences of which are revealed in the Ṛgveda) and hence of the real beginnings of the Ṛgvedic culture itself, to about 20,000 or 15,0 ,0 B.C., a date which, following the method adopted by Prof. Flinders Petric in calculating the earliest age of the ancient Egyptian culture, can be reached back approximately by assigning 1,500 years to the duration to each of the ten different periods of Vedic culture, that I have pointed out in this book." Preface, Ṛgvedic Culture—A. C. Dey.

(৭) রুদ্র পশুপতি (পাশুপত দর্শনে জীবাত্মাকে 'পশু' এবং শিব হইতেছেন বদ্ধ জীবের 'পতি'—এই অর্থে)—১।৪৩।৬ ঋক, যজু শত রুদ্রীয় স্তব। রুদ্র বীরেশ্বর—১।১১৪।১ ও ১০।৯২।৯ ঋক। রুদ্র জ্ঞানদ—১।২৯।৩ ঋক। রুদ্র সঙ্গীতাচার্য্য, তাণ্ডবনর্ত্তক ও বিষাণবাদক—১।৪৩।৪ ঋক। রুদ্র মঙ্গলময় আশুতোষ—১।১১৪।৯, ২।৩৩।৫ ও ৭ ঋক। রুদ্র সুখসৌভাগ্যকর্ত্তা—১।১১৪।২ ঋক্। রুদ্র বৈদ্যের বৈদ্য (বৈদ্যনাথ) ১।৪৩।৪, ১।১১৪।৫, ২।৩৩।২,৪,৭১২,১৩; ৫।৪২।১১, ৬।৭৪।৩, ৭।৩৫।৬, ৭।৪৬।৩, ৮।২৯।৫ ঋক ও ৩।৫৯ যজু। রুদ্রই অগ্নি (ত্বমাগ্নি রুদ্র অসুর) ১।২৭।১০, ২।১।৬, ৬।১৬।৩৯ ঋক; ১।১৫ সামবেদ। রুদ্র শুভ্র-সুন্দর দেহ—২।৩৩।৮ ঋক। রুদ্র সংহারী ২।৩৩।১২ ঋক। রুদ্র কপর্দ্দী (সকল কষ্টনিবারক) ১।১১৪।৫ ও শুক্ল যজুঃ ৩য় অধ্যায় শেষ মন্ত্র (শিবো নামাসি নমস্তে মা মা হিংসীঃ—আপনি যে শিব, নমস্কার লউন, সকল কষ্ট নিবারণ করুন)। রুদ্র বৃষ্য—২।৩৩।১৫ ঋক। রুদ্র বজ্রহস্ত—২।৩৩।৩ ঋক। রুদ্রশক্তি বিদ্যুৎ—৭।৪৬।৩ ঋক। রুদ্রধনুর্ব্বাণধারী—৫।১৪।১, ১০।১২৫।৬ ,ঋক্। রুদ্র স্বয়ম্ভু—৭।৪৬।১ ঋক্। রুদ্র বিভূতিভূষণ বাঘাম্বর—৩,৬১ যজু। রুদ্র শিব=১। যাঁহাতে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান, ২। যিনি সমস্ত অশুভ খণ্ডন করেন ও যাঁহাতে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য অবস্থিত।

(৮) ঋগ্বেদে ১ম মণ্ডলে বারোটি স্থানে দেবতা ও পুরোহিতদের 'অসুর' বলা হইয়াছে। যথা—বরুণকে (১।২৫।১৪), সূর্য্যরশ্মিকে (১।৩৫।৭), সবিতাকে (১।৩৫।১০), ইন্দ্রকে (১।৫৪।৩), মরুদগণকে (১।৬৪।২), ঋত্বিকগণকে (১।১০৮।৬), ত্বষ্টাকে (১।১১০।৩), রুদ্রকে (১।১২২।১), ভাবয়ব্য রাজাকে (১।১২৬।২), স্বর্গলোককে (১।১৩১।১)

হাত হইতে রক্ষা পাইতে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাইলেন। গো, মেষ প্রভৃতি পশুদিগের মঙ্গলের জন্ম তাঁর কৃপা চাহিলেন। রোগ-মুক্তি কামনায় ঔষধ চাহিলেন।

শক্তিতে তিনি অপরাজেয় অথচ পরম মঙ্গলময়। জীবের পুঞ্জীভূত পাপের হলাহল পান করিয়া তিনি সংসারকে রক্ষা করেন। সেই বিষপানেও তিনি অমর। অমৃতপানে তিনি অমর ন'ন। দেবতারা তাঁকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

তিনি কামজয়ী। অথচ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই তিনি সঙ্গিনী করিয়াছেন। অবিদ্যাকে ঘৃণা করেন নাই—মাথায় রাখিয়াছেন। তাঁর জটাস্থিত অবিদ্যারূপিণী গঙ্গা করুণা-বিগলিত হইয়া বাঙলার মরুক্ষেত্রে অবতরণ না করিলে ভগীরথের বংশ রক্ষা পাইত না। পাপ ও পাপীকে কখনো তিনি দূরে ঠেলিয়া রাখেন নাই। আর্ত্ত, লাঞ্ছিত, ইতর বুঝি তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিল। জাতির বিচার তিনি করেন নাই। উদারতায় সকলকে জয় করিয়াছেন। ভালবাসায় জয় করিয়াছেন। সেই কৃতজ্ঞ সমাজ এখনো তাঁকে মাথায় করিয়া নাচিতেছে। গাজনের সরল অর্থ ইহাই। স্বাধীন ভারতের আদ্যন্ত বসন্তোৎসব রূপান্তরিত হইয়াছে এই গাজনে (৯)।

মিত্র ও বরুণকে (১।১৫১।৪) ও পুনরায় ইন্দ্রকে (১।১৭৪।১)। অথচ ঋগ্বেদের মধ্য ও শেষভাগে 'অসুর' বলিতে দেববিরোধীদের বুঝাইতেছে। এরূপভাবে একই গ্রন্থে একই শব্দের বিপরীত অর্থ হয় কেন? দেখা যাইতেছে—ইহা প্রাচীন আর্য্যদের গৃহ-বিবাদের ফল। ভারতপ্রবেশমুখে তাঁহাদের বিবাদ হয়। বিবাদের ফলে তাঁরা দুই দলে বিভক্ত হন। একদল ভারতে আসেন, অন্য দল ইরাণের দিকে যান। বিবাদফলে দেবতার নামও পৃথক্ হয়। ইরাণীরা নিজ দেবতার পূর্ব্ব নাম অসুর শব্দটি পরিবর্ত্তন করেন না। এখনো তাঁহাদের দেবতার নাম—'অহুর' (অসুর)। যে আর্য্যগণ ভারতে আসিলেন, তাঁরা নিজ দেবতাদের 'অসুর' না বলিয়া 'দেব' বলিতে লাগিলেন। আর হিন্দু আর্য্যগণ অসুর-দেবতা ও অসুর-দেবতার অনুগামী ইরাণী আর্য্যদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইরাণীরাও দেবগণের ও দেবতাদের অনুগামী হিন্দু ভ্রাতাদের নিন্দা করিতে লাগিল। প্রতিবেশী দলে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে, পুরাণে তাহাই দেবাসুরের যুদ্ধ।

সায়নাচার্য্য ঋকের প্রথম ভাগে 'অসুর' শব্দের অর্থ করিলেন, প্রাণদায়ী, তৎপরে ঋকের মধ্য ও শেষভাগে তাহার অর্থ করিলেন, অনিষ্টকারী। কারণ ঋকের প্রথম মণ্ডলে অসুর শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ঋকের পঞ্চম হইতে দশম মণ্ডলে তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা যে আর্য্যদের মধ্যে বিরোধের ফল আমরা তাহার প্রমাণ পাইলাম।

(৯) "পুণ্ড্রগৌড় যে সময়ে বৌদ্ধ প্রভাবে উজ্জ্বল ছিল, তখন তথায় বুদ্ধ রথোৎসব হইত। মণ্ডপের মধ্যে রাত্রে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে বিবিধ অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি দ্বারা যে সর্ব্বজনের উৎসবা-মোদ হইত, উহাই হিন্দুপ্রভাবকালে গম্ভীরা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইত। কেবল দেবতার পরিবর্ত্তন ও উৎসবের অঙ্গবিশেষের

তিনি ছিলেন ভক্তাধীন। ভক্ত যাহা চায় আগে তাহা দিতেন। তারপর মুক্তি তো আছেই (১০)।

তাঁর রূপের তুলনা ছিল না। শুভ্রকান্তি, সুনাসিক, অপূর্ব্ব, স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, কণ্ঠদেশে নিষ্ক ধারণ করিতেন। কোমলোদর। যুদ্ধে তিনি দুর্ব্বার—ক্রূর! রথারোহণে সেনাগণ লইয়া প্রতিপক্ষকে উৎখাত করিতেন। আদিম আর্য্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তাঁকে সম্মান করিয়াছেন। তাঁরা এই রুদ্ররূপী মহান্ দেবতার উদ্দেশে তাঁদের উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় উৎসর্গ করিয়াছেন। যজ্ঞস্থলে অগ্নিকুণ্ডের কাছে কুশ পাতিয়া অলক্ষ্যবিহারী এই দেবতাকে তথায় উপবেশন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁর ভোগার্থে ভৃষ্ট যব ও সোমরস নিবেদন করিয়াছেন (১১)।

পরম সঙ্গীতজ্ঞ তিনি (১২)। ডমরু-ধ্বনিত তাঁর গম্ভীর ব-ব-বম্

পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। বুদ্ধপূজা, ধর্ম্মপূজা, আদ্যাপূজা ও আদ্যাপতি শিবকে দেবতা করিয়া যে গম্ভীরা বা গাজন গৌড়বঙ্গে আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার মূল এই বিক্রমাদিত্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে গুপ্তরাজগণ শিবাদি দেবতার ও বৌদ্ধ রথোৎসবের ন্যায় উৎসবামোদের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দু প্রজার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন...। চৈত্র ও বৈশাখী মহোৎসব ক্রমশঃ গম্ভীরা মহোৎসবের উপাদান বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান গাজন বা গম্ভীরা-উৎসবের অধিকাংশই এই কারণে বৌদ্ধ-ভাবময় দেখা যাইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার মধ্যে এতাদৃশ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, অতি নিপুণ চক্ষুও তাহা সহজে পৃথক্ করিতে পারে না।"—আদ্যের গম্ভীরা, পৃঃ ২০৫—শ্রীহরিদাস পালিত।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসেন (৪০১ খ্রী)। পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর থাকেন অনুমান করা হয়। তাঁহার লিখিত বর্ণনা শিবের গাজন প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান উপজীব্য। বর্ণনা মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই তারিখে অষ্টমী তিথিতে সর্ব্বজনীন বৌদ্ধ মহোৎসব হইত। ইংরাজ ঐতিহাসিক তাহা পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—

"He described with great admiration the splendid provision of images, carried on some 20 huge cars richly decorated, which annually paraded through the city on the 8th day on the 2nd month attended by singers and noted that similar provisions were common in other parts of the country—"Early History of India, p. 259—V. A. Smith.

(১০) "দর্শয়িত্বা তথাভীষ্টং পূর্ব্বং দেবো মহেশ্বরঃ।
পশ্চাৎ পাকানুগুণ্যেন দদাতি জ্ঞানমুত্তমম্॥"
—সূত সংহিতা।

(১১) ১০।২৮।১ ঋক।

(১২)। মহাদেবের অঘোর মুখ হইতে (১) ভৈরব রাগ, ইহা যেন মানুষের অন্তরের ভয়ঙ্কর ভাবের বিরাট গাম্ভীর্য্যময় নিনাদের

নিনাদ, ঠিক যেন আর্য্যদের ওম্-ধ্বনি—প্রণব। ঈশ্বরবাচক ওঁকার-শব্দ আর্য্যগণ কখনই অনার্য্যদের উচ্চারণ করিতে দেন নাই। অথচ এই ব-ব-বম্ শব্দ চতুর্দ্দশ ব্যোমে নিনাদিত হইত শৈব অনার্য্যদের শতসহস্র মুখে। অপূর্ব্ব নৃত্যকুশল—নটনাথ তিনি।

তিনি আবার নিজহস্তে অমৃতোপম ঔষধ প্রস্তুত করেন। তিনি দেহরোগের মুক্তিদাতা।

কখন তিনি পরমযোগী, ত্যাগীশ্বর, বিভূতিভূষণ, বাঘাম্বর।

আর্য্যগণ তাঁহাকে বলিলেন তমঃ—অজ্ঞান। আবার তাঁহাকেই বলিলেন তমোঘ্ন—জ্ঞানরশ্মি দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তি। অমঙ্গলের মধ্যে শুভ ও মঙ্গলের সমাবেশ। অপূর্ব্ব কল্পনা। ইহা কি সত্য ?

শিব যেন আর্য্যপূর্ব্বযুগের দেবতা—অনার্য্যদের দেবতা। অনার্য্যরা ছিল অসভ্য। তাই কি তাদের দেবতাও ছিলেন অসভ্য—রুদ্র—তমোগুণাশ্রিত ? ক্রমে যেন রুদ্র সভ্য হইলেন আর্য্যদের সংস্পর্শে আসিয়া। সভ্যসমাজে মিশিয়া। সভ্য-সমাজে বিবাহ করিয়া যেন তিনি সভ্য-সংযত-শিব হইলেন। রুদ্রের এই বিভিন্ন রূপ কল্পনার কি সার্থকতা নাই ? (১৩)

রুদ্র সর্ব্বত্রই আভিজাত্যের বিরোধী। আর্য্য অভিজাতদের তিনি ও তাঁর অনুগামিগণ দারুণ ত্রাসের আধার ছিলেন। রুদ্রের মাথা নত করিতে পারে নাই কোনো অভিজাত। ইহা কি বাস্তব সত্য নয়।

আর্য্যগণ অনার্য্য শৈবদের নির্য্যাতন করিয়াছেন। তাদের ঘর-দ্বার শস্যক্ষেত্র দখল করিয়া নিয়াছেন। বনমধ্যে তাদের বিতাড়িত করিয়াছেন। শৈবদের অনার্য্য, দস্যু, রাক্ষস, বানর, যবন প্রভৃতি অপমানকর আখ্যা দিয়াছেন আর্য্যগণ (১৪)।

শক্তিপরীক্ষায় আর্য্যগণ অনার্য্যের কাছে পরাভূত হইয়াছেন। তখন রুদ্রের ও রুদ্রশক্তির আশ্রয় নিতে আর্য্যগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই। অত্যাচারী শৈব রুদ্ররোষে ধ্বংস হইয়াছে। শিবচরিত্রে ইহাও সুস্পষ্ট।

বিজেতা যদি বিজিতের ইতিহাস লেখে তাহা কতদূর গ্লানিপূর্ণ হইতে পারে, আর্য্যদের লেখা অনার্য্যদের ইতিহাস হইতে তাহা বুঝা যায়।

শৈব ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে একটা জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে। ঋগ্বেদে শিবস্ত্রীর কোনো উল্লেখ নাই। অথচ বলা হইয়াছে শিব মরুদ্গণের পিতা (১৫)। ঋগ্বেদে মরুদ্গণের মাতার পরিচয় একটি রূপক-কল্পনা (১৬)। ঋগ্বেদে

ঠাট। (২) সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রীরাগ, ইহা যেন প্রকৃতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের আনন্দে আত্মহারা মানুষের স্বরের ঠাট। (৩) বামদেব মুখ হইতে বসন্ত রাগ, ইহা যেন বসন্তঋতুতে শিহরণ-শীল মানুষের কণ্ঠের অনুভূতির লহরী। (৪) তৎপুরুষ মুখ হইতে পঞ্চম-রাগ, ইহাকে ষষ্ঠরাগ বলিলে অর্থসঙ্গতি হয়। অর্থাৎ ভৈরবরাগের গাম্ভীর্য্য, নটনারায়ণের রোষদীপ্তি, বসন্তরাগের পুলক, হিন্দোলরাগের গভীরতা, শ্রীরাগের মাধুর্য্য—ঐ পাঁচটির ভাব মিশ্রণে 'পঞ্চভির্গীয়তে যঃ সঃ'। (৫) ঈশান মুখ হইতে মেঘরাগ, ইহা যেন—গ্রীষ্ম-জর্জ্জর বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে আকুল মানব বর্ষণের স্নিগ্ধতা কামনা করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে যে আহ্বান জানাইত—সেই রাগ। (৬) শিবপত্নী পার্ব্বতীর মুখ হইতে নটনারায়ণ—ইহা যেন প্রকৃতির বীভৎস ও রুদ্ররসের অভিব্যক্তি।

(১৩)। ১।২৭।১০ ঋকে রুদ্রকে অগ্নির রূপ বলা হইয়াছে। যাস্ক নিরুক্তে তাহার টীকায় বলিয়াছেন—'অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।' সায়ন তাহার টীকায় বলিয়াছেন—'রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে।' আবার ১।৩৯।৪ ঋকে মরুৎগণকে 'রুদ্রাসঃ' বলা হইয়াছে। সায়ন 'রুদ্রাসঃ' অর্থে 'রুদ্রপুত্রা মারুতঃ' করিয়াছেন। সায়নের টীকা অনুসারে রুদ্র মরুৎগণের পিতা। রুদ্ ধাতুর একটি অর্থ গর্জ্জন বা রোদন করা। এইরূপে রুদ্র যেন অগ্নিরূপী রুদ্রের পিতা শব্দায়মান দেবতা। তাহা হইতে রুদ্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ।

ঋগ্বেদে ব্রহ্মণস্পতি অর্থে 'স্তুতিদেব' (১।১৮ সূক্ত), বিষ্ণু অর্থে সূর্য্যদেব (১।২২ সূক্ত)। বিষ্ণুর ত্রিপাদ অর্থে তাই সূর্য্যের উদয়-গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি ও অস্তাচলে গমন (দুর্গা-চার্য্য যাস্ক-নিরুক্তের টীকায়)। অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, ও সন্ধ্যাকাল।

সকল ঐশ্বরিক কার্য্যের যে এক ঈশ্বরকে ঋগ্বেদ, বিশ্বকর্ম্মা বা হিরণ্যগর্ভ নাম দিয়াছিলেন, (১।১০।৮২ ও ১২১ ঋক্) ঋগ্বেদ রচনার বহুপরে সেই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ—এই তিন কার্য্যের তিনটি পৃথক্ দেবতা কল্পিত হ'ন।

এই তিন দেবতার নাম দিতে গিয়া প্রাচীন বৈদিক নামই গৃহীত হয়। স্তুতিদেব ব্রহ্মণস্পতিকে 'ব্রহ্মা' নাম দেওয়া হইল, তিনি সৃষ্টি কার্য্য করেন। সূর্য্যদেবকে 'বিষ্ণু' বলিয়া তিনি পালন কার্য্য করেন—কল্পনা করা হইল। রুদ্র (শিব) বজ্রের দেবতা, সুতরাং তিনি বিনাশ করেন স্থির করা হইল।

(১৪) ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্রের লোভে আর্য্যদিগের সহিত আদিম অধিবাসীদের বহু বিবাদাদি ও যুদ্ধ হইয়াছে। ১।৩৩।১৫ ও ১।৬৩।৩ ঋকগুলিতে কুৎসের বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। সেই সব যুদ্ধে কুৎস, দশদ্যু ও শ্বৈত্রের প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"The Dasyus are described as the enemies of Kutsa, Agreeably to apparent sense of Dāsyu—barbarian or one not Hindu—Kutsa would be a a prince who bore an active part in the sub-jugation of the original tribes of India."—Wilson.

সায়ন বলেন, কুৎস একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

(১৫) ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে রুদ্র মরুৎগণের পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—১ম মণ্ডলের ৬৪।২, ৮৫।১, ১১৪।৬ ও ৯ ঋকে ; ২য় মণ্ডলের ৬।১ ও ৩৪।২ ঋকে ; ৫ম মণ্ডলের ৫২।১৬ ও ৬০।৫ ঋকে ; ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৫০।৪ ও ৬৬।৩ ঋকে ; ৭ম মণ্ডলের ৫৬।১ ঋকে ও ৮ম মণ্ডলের ২০।১৭ ঋকে।

(১৬) ঋগ্বেদে রুদ্রপরিবারের এইরূপ বর্ণনা আছে—রুদ্রের স্ত্রী মহতী দেবী। তিনি মরুৎগণকে গর্ভে ধারণ করেন (৬।৬৬।৩ ঋক)

উমা, দুর্গা, অম্বিকা, কালী বা করালীর পরিচয় অন্যরূপ। তাঁরা শিবস্ত্রী নন। উপনিষদ্ বা সংহিতাতেও কালী, করালী প্রভৃতি শিবস্ত্রী ন'ন (১৭)। তাঁরা অগ্নির লেলিহান জিহ্বার নামান্তর। পুরাণযুগে শিব তাঁর বামে স্ত্রীকে নিয়া পূজা পাইয়াছেন। শিবের বিবাহের বর্ণনা একটি রূপক সাহিত্য (১৮)।

পুরাণকার শিবস্ত্রীকে প্রায়ই শিবভক্ত অনার্যদের বিরোধী রূপে সাজাইয়াছেন। শিবস্ত্রী যেন অতিমাত্রায় দেবতাদের পক্ষ। পুরাণের সব কাহিনীতেই আর্য্যদের সাধু ও সত্যাশ্রয়ী এবং অনার্যদের অসাধু ও মিথ্যাশ্রয়ী বলা হইয়াছে। রামচন্দ্র দুর্গার বর লাভ করিলেন—শৈব রাবণকে পরাজয় করিবার জন্য (১৯)। কালী শৈব-বাণরাজার পরাজয়ের

এই মরুদ্গণ দীপ্তিমান্ খড়্গ (৬.৬৬।১১ ঋক), দীপ্তধনু ও তীক্ষ্ণ শরধারী (৬।৭৪।৪ ঋক)। ইঁহাদেরই একজন যেন পুরাণে শিব-পুত্র কার্ত্তিক।

মরুৎ—বায়ু, ঝড়। তাহাদের মাতা মহতী (মারুতি ?)।

সায়ন উষাকে রুদ্রকন্যারূপে কল্পনা করিয়াছেন। কল্পনামুখে তিনি বলিয়াছেন যে, রুদ্র তাঁহার যুবতী কন্যা উষার প্রতি কামনা করেন, তাহাতে ব্রহ্মার (সূর্য্যের ?) জন্ম হয়। আমাদের মনে হয়, ইহা সূর্য্যোদয়কালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কাল্পনিক বর্ণনা মাত্র। কিন্তু এই রূপক-বর্ণনা অবলম্বনে শিবের বিবাহের আর একটী কাহিনী কিছুদিন হইতে ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে (১৮ সংখ্যক পাদটীকায় তাহা উল্লিখিত হইল)।

(১৭) মুণ্ডক উপনিষদে অগ্নির সাতটি চঞ্চল জিহ্বার নাম আছে। তাহা কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরূপা। দুর্গাও অগ্নিজিহ্বার একটি নাম। এইগুলি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার কালো, লাল, পাটল, হরিদ্রা প্রভৃতি বর্ণের এক একটী দ্যোতক প্রতিশব্দ।

বাজসেনয়ি-সংহিতায় অম্বিকাকে রুদ্রের ভগ্নী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কেনোপনিষদে উমা ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যাতা। সেখানেও উমা রুদ্রপত্নী নন্। দেবীপুরাণে আবার ব্রহ্মা ইন্দ্রকে দেবীপ্রতিমা আরাধনার উপদেষ্টা। সেখানে শিব অক্ষমালা নিয়া মন্ত্রময়ী দেবীকে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র শিলাময়ী, বিশ্বদেবগণ রৌপ্যময়ী, বায়ু পিত্তলময়ী, বসুগণ কাংস্যময়ী, অশ্বিদ্বয় পার্থিবদেবী পূজা করিয়াছেন।

(১৮) মঙ্গল সাহিত্য বলিতে আমরা মাণিকদত্তের চণ্ডী, গম্ভীরার বন্দনা, জগন্নাথবিজয় নাটক, বিষহরী প্রভৃতির উপাখ্যানকেও সমপর্য্যায়ে ফেলিতেছি। সেগুলি হইতে যে শৈব কাহিনী জানা যায় তাহা এইরূপ—মহাশূন্য হইতে ধর্ম্মনিরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁহার উর্দ্ধনিঃশ্বাস হইতে উলুক জন্মিল। এই উলুক ধর্ম্মনিরঞ্জনের বাহন হইল। উলুক হইতে হাস ও কূর্ম্ম জন্মিল। কূর্ম্ম ধর্ম্মকে বহন করিতে অসমর্থ হইলে ধর্ম্ম কনক পৈতা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দেন। তাহা হইতে বাসুকি নাগ জন্মিল। ধর্ম্ম তাঁর গায়ের ময়লা বাসুকির মাথায় রাখিয়া দেন। তাহা হইতে বসুমতী (পৃথিবী) জন্মাইলেন। বসুমতীতে বেড়াইতে বেড়াইতে ধর্ম্ম তাঁর অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া দেন। তাহা হইতে আদ্যাশক্তি জন্মাইলেন। আদ্যা কামদেব ঠাকুরকে সৃষ্টি করিলেন। কামদেবপ্রভাবে ধর্ম্মঠাকুরের তপস্যা ভঙ্গ হইল। আদ্যার কাছে ধর্ম্মঠাকুর নিজ বীর্য্য রাখিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন তাহা বিষ। আদ্যা সেই বিষ পানে গর্ভবতী হন। ক্রমে বিষ্ণু আদ্যার নাভিচ্ছেদ করিয়া বাহির হন। ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া ব্রহ্মা বাহির হন। যোনিদ্বার দিয়া শিব বাহির হন। ধর্ম্ম শিবকে ত্রিনেত্রবিশিষ্ট করেন।—সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৮

বেদে শূন্য হইতে বিশ্বসৃষ্টির এইরূপ বিবরণ আছে—হে বিদ্বান গণ, তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ, তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন ? সে কোন্ বন, কোন্ বৃক্ষের কাঠ যাহা দ্বারা ভূলোক ও দ্যুলোক গঠন করা হইয়াছে ? (১০।৮১।৪ ঋক)। ইহার অর্থ—সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে নির্ম্মাণের কোনো উপকরণ ছিল না। শূন্য হইতে তিনি বিশ্বসৃষ্টি করেন। উপরে ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যে বিশ্বসৃষ্টির যে বর্ণনা আছে, তাহা বেদের এই উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া একটি কাল্পনিক চিত্র। তাহাতে শক্তিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্মদাত্রী বলা হইয়াছে। তবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অযোনিসম্ভূত, কিন্তু শিব যোনি সম্ভূত। তাহাতে তিন দেবতার মধ্যে শিবের স্থান নীচে—ইহা বলা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (চণ্ডী—মধুকৈটভ বধ প্রকরণ ৮০-৮৪ শ্লোকে) ও কাশীখণ্ডেও এইরূপভাবে ভগবতী দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপাদন কাহিনী আছে। যে পুরাণ যে দেবতার প্রসঙ্গ বলিয়াছেন, তিনি সেই দেবতাকেই অন্য সব দেবতা অপেক্ষা বড় করিয়াছেন। দেবীপুরাণগুলিতে সেই জন্য দেবীকে বিশ্বপ্রসবিনী বলা হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য বৌদ্ধতান্ত্রিক। সেখানেও শক্তিকে বড় করা হইয়াছে। যাহা হউক শেষে ধর্ম্মঠাকুর বলিলেন—

"এহিরূপে কর ছিসৃটি কহি যে তুমারে।
মহেশ করিবে বিভা জন্ম জন্মান্তরে॥"—শূন্যপুরাণ।

রামাই পণ্ডিত এই শূন্যপুরাণের রচয়িতা। তিনি দেবপাল দেবের সময় (নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে) গৌড়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই ভাবে মাণিক দত্তও শিবের সহিত আদ্যার বিবাহ দিয়াছেন। ব্রহ্ম হরিদাস তাহারই পুনরুক্তি করেন। ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতেও ঐ কথা আছে। এইগুলিও নবম শতাব্দীর সাহিত্য। মহিপালের গীত নামে ইহাই বুঝি সেকালে প্রচলিত ছিল! আমাদের মেয়েরা ধান ভানিতে ভানিতে যাহা গাহিতেন। মহিপাল ৯৮০ হইতে ১০৩৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

(১৮) শিবের বিবাহ হিন্দুসমাজে উৎসব রূপে অনুষ্ঠিত হয় একমাত্র নবদ্বীপে। সুপ্রাচীন গম্ভীরা বা গাজনের অঙ্গস্বরূপ ইহা তথায় অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপে শিবের সহিত বাসন্তী দশমী রাত্রে নিরঞ্জনের পূর্ব্বে সাতপাক দিয়া, মালাবদল করিয়া বাসন্তী প্রতিমার বিবাহ হয়। নবদ্বীপের ইহা নিজস্ব উৎসব। কাশীতেও এরূপ উৎসব নাই। সেখানে চৈত্র শুক্ল তৃতীয়ায় শিবের বার্ষিকী যাত্রা হয়। তখন মঙ্গলাগৌরীর পূজা হয়। চৈত্রপূর্ণিমাতে সেখানে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবার বিধি আছে (কাশীখণ্ডে)।

(১৯) বাল্মীকির রামায়ণে নাই। পুরাণে আছে।

কারণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের কারাকপাট মুক্ত করিয়া দিয়া (২০)। যেন শৈবদের অপমান করাই শিবপন্থীর উদ্দেশ্য।

পুরাণকার শিবস্ত্রীকে বিশ্বপ্রসবিনী বলিলেন—মহাশক্তি বলিলেন। এই মহাশক্তি আর্য্যকন্যা, পুরাণকারও আর্য্য। তিনি নিজেদের মেয়ের প্রতিভা বাড়াইতে অযথা জামাতার লাঞ্ছনা করিয়াছেন বহুস্থানে।

দক্ষযজ্ঞ এইরূপ শিবলাঞ্ছনার একটী গল্প।

অনার্য্য শিবের সহিত আর্য্য দক্ষের কন্যা সতীর বিবাহ দেন দেবতারা। ২১ সুতরাং শিব তখন আর্য্যদের জামাতা। মনে হয়, প্রধান প্রধান আর্য্য জমিদারদের নাম ছিল 'প্রজাপতি'। তাঁরা মাঝে মাঝে সমবেত হইয়া সমাজশাসন, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সেখানে উৎসব-আনন্দ, পান-ভোজন হইত। তাহার নাম ছিল যজ্ঞ। ব্রহ্মা এইরূপ একটী যজ্ঞে দেবতাদের নিমন্ত্রণ করেন। উহার নাম ছিল বিশ্বসৃষ্টি যজ্ঞ। শিবও এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দক্ষ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা ও শিব ছাড়া সকলেই দক্ষকে নমস্কার করিলেন। ব্রহ্মা প্রধান দেবতা। বোধ হয় সেই হিসাবে তিনি কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। কিন্তু শিব প্রণাম করিলেন না কেন? দক্ষ শিবের শ্বশুর। শ্বশুরকে প্রণাম করিতে হয়, এটুকু সভ্যতা শিবের অবশ্যই জানা ছিল। স্ত্রীর সহিতও শিবের প্রণয় ছিল যথেষ্ট। রহস্যটা কি? তবে কি শিব ভাবিয়াছিলেন, তিনি কোনো বিভিন্ন সভ্যতার মুখপাত্র—বিভিন্ন জাতির রাজা তাই মাথা নত করিতে পারেন না? কিন্তু আমরা তো বুঝি এক স্থানে সমবেত ভদ্রব্যক্তিরা পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখান—ইহাই সদাচার। পুরাণকার এখানে স্তব্ধ। তিনি এইভাবে একটি নাটকীয় ঘটনার সূচনা করিয়া পরবর্ত্তী অন্যতম একটি বিয়োগান্ত পুরাণের ভবিষ্যৎ কল্পনা করিলেন। পৌরাণিক শিবচরিত্রের একটি বিশেষ অংশ সেই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক পৌরাণিক প্রসঙ্গের মতো এই প্রসঙ্গটিও আমরা তেমন ভালভাবে জানি না। সংক্ষেপ উহার মর্ম্মকথাগুলি আলোচনা করা যা'ক।

নমস্কার না পাইয়া দক্ষ শিবকে কটূক্তি করিলেন। তিনি সভা মধ্যেই যেন স্পষ্ট বলিলেন—অসভ্য তোকে জাতিতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, যজ্ঞবাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু বর্ব্বর আবার তোকে অপাংক্তেয় করা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় শিব কিন্তু গালি খাইয়া অবিচলিত থাকিলেন। উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন তাঁহার সেনাপতি নন্দী। খুব ঝাঁঝালো কথায় তিনি শুনাইয়া দিলেন—যত বড় মুখ নয় ততো বড় কথা। ঐ মুখ বিগড়াইয়া দিব। (২২) যুদ্ধ বাধে আর কি যজ্ঞ পণ্ড হয়। বিষ্ণু ছুটিয়া আসিলেন। উপস্থিত বুদ্ধি যেন তাঁহারই বেশি। তিনি উভয়ের মধ্যে পড়িয়া মীমাংসা করিলেন। বলিলেন—'আপনারা দু'জনের কেহই কম নন, তবে হাতাহাতিটা এখন থাক, পরে ইহার বিহিত হইবেই হইবে, কাহারো কথা ফেলা যাইবে না। সাধে কি বিষ্ণুকে চক্রী বলে? যুদ্ধ বিগ্রহ আর হইল না, ব্রহ্মার যজ্ঞ সুশৃঙ্খলেই সমাধা হইল। তাহার পরেই দক্ষকে দিয়া যজ্ঞ করান হইল। তাহাতে অপাংক্তেয় শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। দক্ষ নিজের কন্যাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। স্বামী বাধা দেন। বৃদ্ধস্বামীকে ভয় দেখাইয়া সতী বাপের বাড়ী যান। ফল ভাল হয় নাই। যজ্ঞিবাড়ী ভরা দেবতাদের মুখে শিবের কুলকুল নিন্দা। মনের কষ্টে সতী মারা গেলেন। তাহা শুনিয়া শিবসৈন্য দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিল। দক্ষের সেই পাপমুখ ক্ষতবিক্ষত করিল, দেবতাদের নাজেহাল নবেজান করিল।

সতীর মৃত্যুর পর যে আর্য্যকন্যার সহিত শিবের বিবাহ হয়, তিনি স্বামীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিনা বুঝা দায়! কারণ তিনি স্বামীর চেয়ে নিজেকে জাহির করিতে লাগিলেন খুব বেশি।

এই সব কাল্পনিক ও রূপক কথার উপর ভিত্তি করিয়া সাম্প্রদায়িক 'বাদ', বাদাবাদী ও বিবাদ পুরাণগুলির মধ্যে যেন উলঙ্গ হইয়া দেখা দিয়াছে। আর্য্যদের প্রধান দেবতা বিষ্ণু (২৩)। বৈষ্ণব ও শৈবে অবিরত বিরোধ হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য শিব ও শৈবদের ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বাণ-উপাখ্যানের প্রধান উদ্দেশ্য শিব ও শৈবকে ছোট করিয়া কৃষ্ণকে বড় করা। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার (২৪)। ভাগবত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—শৈবরা অসভ্য, মাতাল, নষ্টলোক (২৫)। অবশ্য দক্ষের মুখ দিয়া ইহা বলানো হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতিতে শক্তি শিবকে চাপিয়া রাখিয়া নিজের প্রাধান্য প্রচার করিতে আদেশ করিতেছেন।

হিন্দু ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম জৈন ও বৌদ্ধ। ভাগবত বৌদ্ধ জৈনদেরও কটুভাষায় নিন্দা করিয়াছেন (২৬)।

---

(২০) হরিবংশ।

(২১) নারদ পঞ্চরাত্র।

(২২) দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী সাতটি অভিশাপ দেন, তন্মধ্যে দক্ষকে তিনটি ও দক্ষের অনুমোদনকারী দেবতাদের চারিটি।

দক্ষের প্রতি তিনটি অভিশাপ যথা—১। সর্ব্বদা অন্যায়কারী এই দক্ষের প্রতি যিনি কোনরূপ হিংসা করেন নাই, সেই ভগবান শিবের প্রতি যে মূর্খ ও ভেদদর্শী দ্রোহ করে, সে তত্ত্ববস্তু হইতে বিমুখ হইবে; ২। দেহাদিকে আত্মা বলিয়া প্রচারকারী পশুতুল্য হয়, এজন্য সে স্ত্রীকামী হইবে ও ৩। তাহার মুখ ছাগবৎ হইবে।

দক্ষের দ্বারা শিবের অপমান অনুমোদনকারীদের প্রতি চারিটি অভিশাপ যথা—১। যে সব কর্ম্মদ্বারা বারবার সংসারে জন্ম হয় এই ব্রাহ্মণগুলি সেই কর্ম্মে আশক্ত হোন; তাঁহারা ২। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশূন্য, ৩। জীবিকার জন্য বিদ্যাতপস্যা ও ৪। ব্রতাদির আচরণ করুন—অর্থাৎ যাজকব্রাহ্মণ হোন।—ভাগবত।

(২৩) ভাগবত, বিষ্ণু, নারদীয় প্রভৃতি পুরাণে।

(২৪) ভাগবতে। হরিবংশে নয়, হরিবংশে বাসুদেব পুত্রকামনায় বদরিকাশ্রমে গিয়া শিব আরাধনা করেন।

(২৫) "নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবং॥"—ভাগবত।

(২৬) গীতা, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদি যখন লেখা হয়, তখন ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এজন্য ঐ সকল বৌদ্ধ-

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম শৈবতান্ত্রিক ধর্ম্মে সমাধি লাভ করে। ভারতে তান্ত্রিকবাদ আগমনের পথের সন্ধানে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। এখানে এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অশ্বঘোষ শৈবতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন। ইহাকে বৌদ্ধ মহাযান মাধ্যমিক বলা হয়। ইহাতে বুদ্ধ বা ধর্ম্ম বা নিরঞ্জন, মহেশ্বর মূর্ত্তিতে পূজা পান। তাঁহার বামে শক্তি।

বেদে দেবদেবীর সংখ্যা ছিল তেত্রিশটি। এখন তাহা হইল তেত্রিশ কোটি (২৭)। অর্থাৎ এত বাড়িল যে সংখ্যা করা যায় না।

জৈনধর্ম্মের ভিতরে যাহাই থাক, বাহিরের রূপ শৈব। আদি জৈন ঋষভ-দেব শিবরাজ্য কৈলাসে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। জৈন পার্শ্বনাথ একেবারে ভৈরব বেশে জন্মিলেন। তাঁর দেহে সাপের চিহ্ন, গায়ের রং নীল। যেন মহাকালের নীল রং। পার্শ্বনাথ কাশীতে 'অনন্ত বৈভব কেবল জ্ঞান' লাভ করেন চৈত্র-কৃষ্ণা চতুর্থীতে।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগের ত্রিরত্ন মূর্ত্তি—মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকাল (২৮)। বোধিবৃক্ষতলে লোকেশ্বরের চারিহাত, ত্রিনয়ন, তিনি জটাধারী। ঠিক যেন বেলগাছতলায় মহাদেব (২৯)।

ভারতের ক্ষত্রিয় যুগের দুইটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে, শিবকে স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত পরিণতবয়সের গৃহস্থমূর্ত্তিতে দেখি। রাবণ রাজপ্রাসাদে তিনি দ্বারী। কুরুক্ষেত্রেও তিনি দ্বারী। বাল্মীকি ও ব্যাস শিবকে দ্বারপাল সাজাইলেন কি হিসাবে?

বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের শিব গৃহী।

ধর্ম্মসংহিতার মতে শিব দারুণ কামুক—মুনিপত্নীগণরত। মুনিদের অভিশাপে শিবের লিঙ্গ খসিয়া পড়ে। তাহাকে 'বিজয়' লিঙ্গ বলা হয় (৩০)। সে লিঙ্গটি ছিল বহু যোজন বিস্তীর্ণ। শিবের লিঙ্গ কি-না! শিব-লিঙ্গ নিয়া বহুরহস্যপূর্ণ গল্প আছে। ভৃগু ও তাঁর সঙ্গে কয়েকজন ঋষি তত্ত্বকথা জানিতে কৈলাসে শিবের কাছে যান। তাঁহারা জানিতে পারেন, শিব তখন পার্ব্বতীর সঙ্গে কামব্যাপারে লিপ্ত। তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠেন। চলিয়া যাইবার সময় ভৃগু শিবকে শাপ দিয়া যান—আজ হইতে তোমার লিঙ্গ পার্ব্বতীর যোনিতে আবদ্ধ হইয়া থাক (৩১)। ভৃগুর শাপ বিফল হইবার নয়। শিবের যে দ্বাদশ লিঙ্গ (৩২) ভারতময় আছে, তার সবগুলিই গৌরীপট্টযুক্ত। শিব বলেন, লিঙ্গে পূজা পাইলে তিনি বেশি খুশি হন, মূর্ত্তিতে পূজা পাইলে ততো হন না (৩৩)।

শিবপুরাণের মতে মৃত্তিকা হইতে স্ফটিক, প্রায় সব কিছু দিয়াই শিবলিঙ্গ গড়া যায় (৩৪)। চন্দ্র সূর্য্যকে পর্য্যন্ত অষ্ট লিঙ্গের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে (৩৫)।

বিদ্বেষযুক্ত শ্লোক আছে। মনুসংহিতায় ও রামায়ণেও বৌদ্ধ-বিদ্বেষযুক্ত শ্লোক আছে। বিজ্ঞব্যক্তিরা বলেন এ সব পরে প্রক্ষিপ্ত। তাই পুরাণযুগে যে ধর্ম্মভাব ঠিক কিরূপ ছিল তাহা বুঝা শক্ত। অবশ্য পুরাণ রচনার কাল পৌরাণিক যুগ নয়। পুরাণ রচনার অনেক আগে বৈদিক যুগের শেষ হইতে বৌদ্ধ যুগের শেষ পর্য্যন্ত পৌরাণিক যুগ। তারপর হাজার বৎসর বৌদ্ধযুগ। এই বৌদ্ধযুগে পুরাণ লেখা হয়। সেই জন্য বৌদ্ধ ও বৈদিকদের সংঘর্ষকাহিনী পুরাণের প্রধান উপজীব্য। শৈব যুগ বৈদিক যুগের আগের হইলেও তাহা পৌরাণিক যুগের ভিতর দিয়া আত্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। শেষে বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে আসিয়া মেশে। এই মিশ্রণ মুখে অন্যান্য তান্ত্রিক ধারার সংমিশ্রণে যে অভিনব ধর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই বাঙলার তান্ত্রিক ধর্ম্ম।

(২৭) ঋগ্বেদে আছে—হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, ত্রিগুণ একাদশ দেবগণের সহিত মধুপানার্থ এখানে এস···ইত্যাদি (১।৩৪।১১ ঋক)

এখানে ও বেদের অন্য কয়েক জায়গায় তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। ইহারা কে?

তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হইয়াছে আকাশে ১১ জন, পৃথিবীতে ১১ জন ও অন্তরীক্ষে ১১ জন দেবতা আছেন (১।৪।১০। ১ তৈঃ সং)। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, আকাশ (দ্যুত) এবং পৃথিবী, এইরূপে ৩৩ জন দেবতা (৭।৫।৭।২ শঃ ব্রাঃ)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—প্রযাজদেব ১১, অনুযাজ দেব ১১ ও উপযাজ দেব ১১, এইরূপে ৩৩ দেবতা (২।১৮ ঐঃ ব্রাঃ) বিষ্ণুপুরাণে আছে ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮ বসু প্রজাপতি ও বষট্কার, এইরূপে ৩৩ দেবতা। যাস্কের মতে দেবতা তিনজন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য (৭।৫ নিরুক্ত)। পরে পুরাণাদিতে তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। তাঁহারা যেন বিভিন্ন ঐশ্বরিক কার্য্যের বা দৃশ্যের বিভিন্ন নাম।

(২৮) Mahabodhi—Cunningham.

(২৯) A. S. of Maurbhanja.

(৩০) মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্॥ ধর্ম্মসংহিতা

(৩১) উত্তরখণ্ড, ১৮ অধ্যায়—পদ্মপুরাণ।

(৩২) শিবের ১২শ জ্যোতির্লিঙ্গ—১। সোমনাথ, (সোরাষ্ট্রে) ২। বিশ্বনাথ (কাশীতে), ৩। মল্লিকার্জ্জুন (শ্রীপর্ব্বতে), ৪। মহাকাল (উজ্জয়িনীতে)' ৫।• ওঁকারনাথ (কাবেরী ও নর্ম্মদা সঙ্গমে), ৬। বৈদ্যনাথ (প্রজ্জ্বলিকাতে), ৭। নাগেশ্বর (দারুক বনে), ৮। কেদারনাথ (সহ্যপর্ব্বতে), ৯। ঘৃষ্ণীশ্বর (ইলাপুরে) ১০। রামেশ্বর (সেতুবন্ধে), ১১। ভীমনাথ (রাক্ষসবাক্ষে), ও ১২। ত্র্যম্বকনাথ (গৌতমী তটে)।—শিবপুরাণ।

(৩৩) "ন তুষ্যাম্যর্চ্চিতো হ্যর্চ্চায়াঃ পুষ্পধূপনিবেদনৈঃ।
লিঙ্গেঽর্চ্চিতে যথাত্যর্থং পরং তুষ্যামি পার্ব্বতি॥" স্কন্দপুরাণ।

(৩৪) মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময়, তাম্র, কাংস্য, কাষ্ঠ বা স্ফটিক দিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা চলে। ইহা ছাড়া বাণাসুর পূজিত লিঙ্গ অথবা নর্ম্মদা পাহাড়ে পাওয়া যায় যে (নর্ম্মদ) লিঙ্গ তাহা পূজার যোগ্য। তবে মাটির তৈয়ারি লিঙ্গই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। নন্দিপুরাণ।

(৩৫) শিবের অষ্ট লিঙ্গে ১। ক্ষিতি, ২। জল, ৩। অগ্নি, বায়ু, ৫। আকাশ, ৬। চন্দ্র, ৭। সূর্য্য ও ৮। যজমান।

রূপক অর্থে লিঙ্গ ও যোনি বলিলে পুরুষ ও প্রকৃতিকে বুঝায় (৩৬)। যোনিসংযুক্ত লিঙ্গ, সৃষ্টির দ্যোতক। তাহার দ্বারা শিব-পার্ব্বতীকে বিশ্বস্রষ্টা কল্পনা করা হইয়াছে। হিন্দুরা এখন ইহা ছাড়া শিব-পার্ব্বতীকে অন্য কিছু কল্পনা করে না। মানুষের প্রাণ আবেগভরে অগ্রসর হয় রুদ্র ও রুদ্রশক্তিতে এই শান্ত সংযতরূপে পাইতে।

হিমাচলকে কি বৃষভরূপে কল্পনা করা হইয়াছে? ইহা যেন একটি বিরাট বৃষভ কৈলাশপুরী পিঠে নিয়া শুইয়া আছে। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেতুবন্ধে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও কৃত্তীর শিবলিঙ্গ পূজার কথা অতি প্রাচীন। পাশ্চাত্যগণের মতে ভারতে লিঙ্গপূজা আরম্ভ হয় খৃঃ পূর্ব্ব এক হাজার বৎসর হইতে। কিন্তু খৃঃ পূর্ব্ব চারি হাজার বৎসরের পুরাতন হারাপ্পা নগর খনন কালে এখন বহু শিবলিঙ্গ পাওয়া যাইতেছে (৩৭)। চীন, যবদ্বীপ, রোম এমন কি মক্কায় (মক্কেশ্বর) শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে।

মহাভারত রামায়ণাদিতে শিবের অনেকগুলি নাম পাওয়া যায় (৩৮)। লোকে অসাধ্যরোগ মুক্তির জন্য শিবস্বস্ত্যয়ন করে। যে লোক মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা করা হয় শিবশুক্র-উপাসিত মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে।

সেই 'ধর্ম্মঠাকুর' যমকে (৩৯) লোকে বাবা বুড়োরাজ বলিয়া পূজা করিতেছে। শিব না-কি নিজে এই ধর্ম্মঠাকুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া নিজে তাঁর স্থান দখল করিলেন (৪০)।

(৩৬) লিঙ্গ শব্দে আকাশ এবং যোনি শব্দে পৃথিবীও বুঝায়। (৩৭) "হারাপ্পার পথে", 'ভারতবর্ষ' বৈশাখ, ১৩৫১—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।
(৩৮) মহাভারতে শিবের এক হাজার নাম আছে (অনুশাসন পর্ব্ব ১৭ শ অধ্যায়)। রামায়ণে শিবের অনেকগুলি নাম আছে (বালকাণ্ড)। কবিকল্পলতায় শিবের ১২০টি নাম আছে।

(৩৯) ইন্দ্র ও অগ্নি একত্রে উৎপন্ন, এ জন্য যমজ। সায়ন যমকে অগ্নি বলিয়াছেন। বেদে আছে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয় এবং যম ও তাঁহার ভগ্নী যমীরও জন্ম হয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে বিবস্বান অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে ঊষা। তাহাদের যমজ সন্তান যম ও যমী। এরূপে যম ও যমী অর্থে দিবা ও রাত্রি। যম অর্থাৎ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিয়া, জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়া পশ্চিমে বা পরলোকে যান। এইভাবে পুরাণে যম পরলোকের কর্ত্তা। Science of Language.—Max-Muller.

(৪০) ঋগ্বেদে উলূক (পেঁচা) যমের দূত; ধর্ম্মপুরাণে উলূক ধর্ম্মনিরঞ্জনের বাহন। এই ধর্ম্মনিরঞ্জনের দাহন ব্যাপার এইভাবে একখানি 'মঙ্গল' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

"আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেব নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবতা তিনজন॥
মড়া কান্ধে করিয়া বুলয়ে অবনীতে।
কহেন উলূক মুনি ত্রিদেব সাক্ষাতে॥
তিল মাত্র আপোড়া পৃথিবী ঠাঁই নাই।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি গোসাঞী॥
উলূকের কথা শুনি দেব ত্রিলোচন।
বাম ঊরুভাগে কৈল ধর্ম্মের শাসন॥
বিষ্ণু হইল কাষ্ঠ তাতে ব্রহ্মা হুতাশন।
বাম ঊরুভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন॥"—শীতলা-মঙ্গল, ৩৮ পৃঃ—দৈবকীনন্দন। ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—বাঙলা দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম শৈব ধর্ম্মের দ্বারা ভস্মসাৎ হইল। অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপভাবে এদেশে শৈব ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গেল যে, তাহাকে আর চেনা যায় না। ধর্ম্মনিরঞ্জনের এই দাহন ব্যাপারে কাঠ যোগাইলেন বিষ্ণু আর অগ্নি যোগাইলেন ব্রহ্মা। ইহার দ্বারা সম্ভব বুঝায় যে, দারুমূর্ত্তি হইয়া বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বৌদ্ধ দেবতা জগন্নাথের স্থান অধিকার করিলেন এবং বৌদ্ধগণ বর্ণাশ্রমী হিন্দুর সংসারে ব্রাহ্মণ শাসনে আসিয়া পড়িলেন।

শৈবতেজের অগ্নিকণা সেদিনও আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম রাণা প্রতাপ ও ছত্রপতি শিবাজীতে। বাজারে রুদ্রমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতীয়দের জন্মগত অধিকার লাভের আশায়। তাই বলিতেছিলাম শিব যেন বহুরূপী—

শৈবধর্ম্ম প্রচার যুগে আমাদের চোখে পড়ে শশাঙ্ক গুপ্তের দ্বারা গয়ায় বোধিবৃক্ষ কাটিয়া সেখানে শিব প্রতিষ্ঠা, পালরাজগণ দ্বারা গয়ায় চতুর্ম্মুখ শিবমূর্ত্তি স্থাপন। সুধন্বা রাজার বৌদ্ধ-বিদ্বেষ এবং কুমারিল ভট্টের দ্বারা বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাথা উদূখলে কুটন ও সারনাথ বিহার পুড়ানো। শঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তীগণের দ্বারা শৈব মহাত্ম্য বিস্তার। বাণ রাজার উপাখ্যান দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জকে শিবকৃপার পথ দেখানো। উজ্জয়িনীর বিরাট মহাকাল মূর্ত্তি। কাঙড়া চিত্রে রাজরাজেশ্বরীর নিকট মহাদেবের নৃত্য, সমস্ত দেবগণ তথায় গীতবাদ্যরত। অমর কবি কালিদাসের শিব পার্ব্বতীর বন্দনা।

সংহিতা ও পুরাণ কত রূপেই না দেখিলেন এই রুদ্রকে। দেখিলেন যে, রুদ্র কখনই মাথা নত করিলেন না কাহারো কাছে।—তা' তুমি তাঁকে সভ্যই বলো বা অসভ্য বলো···তাঁকে জামাতাই বলো আর অনার্য্যই বলো—তাঁকে প্রীতিভোজেই ডাক বা অপাংক্তেয় করো···তাঁকে মহাযোগী বলো বা অনাচারী বলো—এ-সব ছোট জিনিষ তাঁকে আঘাত করে না। কারণ তিনি রুদ্র। মানব-মনের প্রধান হলাহল 'কাম'কে তিনিই ভস্ম করিয়া আকাশে উড়াইয়া দেন। মানব দেহের প্রধান হলাহল 'পাপ'কে তিনি কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন। এই মহাশক্তিধরকে মানুষ বলিল মৃত্যুঞ্জয়। এই মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতার মধ্যে মানুষ দেখিল তাঁর শিবরূপ। বহুরূপের পর মানুষ তাঁর শিবরূপ দেখিল। বহু জীবনের বহু অগ্নিপরীক্ষার পর মানুষ শিব হয়। অশিবকে অতিক্রম করিতে ক্ষতবিক্ষত হইতে হয়—বহু বহু মরণ আসে। সেই মরণ পার হইতে সে শক্তি চায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। সে নব-জীবন চায়—সত্যকার জীবন চায়। বড় করিয়া, নূতন করিয়া

'ধর্ম্মের গাজন' এখন শিবের-গাজনে পরিণত হইয়াছে। যদিও ধর্ম্মের পূজা-পার্ব্বণে বৌদ্ধ তান্ত্রিক রূপটি বেশ চোখে পড়ে।

জীবনকে পাইতে চায় সংসারের লোভ-পাপ-ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করিয়া—মৃত্যুকে ভেদ করিয়া। সে শিবকে দেখিতে চায়।

আমরা যেন জীবনে রুদ্রকে দেখিয়া ভয় না পাই। কারণ রুদ্রতাই রুদ্রের চরম পরিচয় নয়। তাঁর প্রসন্নমুখ আছে। এই রুদ্রকে পার হইতে হইবে। এই বিপরীত বিরোধ পার হইলে শিবকে পাওয়া যায়। বিশ্বকবি সত্যই বলিয়াছেন—"রুদ্রকে বাদ দিয়া যে প্রসন্নতা সে সত্য নয়; যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে, সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে (৪১)।

রুদ্রের প্রসন্নরূপই শিবরূপ। যখন তিনি শিব তখন তিনি রুদ্র ন'ন। তখন তিনি মহেশ্বর। তখন শক্তি-শূল-বজ্র কিছুই তাঁর নাই—অথচ পরম শক্তির আধার তিনি। তখন তাঁর পাঁচটি মুখ নাই, তিনটি করিয়া নয়ন নাই অথচ তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি নির্ব্বেদ-নিরবয়ব-নিরুপাধি-নির্গুণ···শান্তং শিবমদ্বৈতম পুরুষংমহান্তম—

"অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

১৯ শ্বেতাশ্ব।—তখন তিনি মহেশ্বর···ইহাই তাঁর চরম এবং পরম রূপ।

ভারত কতভাবে এই বহুরূপী রুদ্রের রূপরূপান্তর দেখিয়াছে।

কিন্তু আমরা কি জীবন-সায়াহ্নে আজ সেই রুদ্রের রুদ্ররূপ দেখিতে দেখিতেই মরিব? নিশ্চিত মৃত্যু নিয়া তো রুদ্র শিয়রে। কে—? আমি···আমরা যে বাঁচিতে চাই, কেমন করিয়া বাঁচিব? উপায় আছে—উপায় আছে···রুদ্রশক্তি আমাদের অভয় দিতেছেন যে শঙ্কর—মঙ্গলময়—আশুতোষ। ইহাও রুদ্রের রূপ।

[৪১] রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হ'তো তা' হ'লে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তা' হ'লে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরমসত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছুতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার ক'রে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।···যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে, সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে।···যে বোধে আমাদের মুক্তি,···দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে।—তার সঙ্গে লড়াই ক'রে তাকে স্বীকার করতে হয়। কেননা 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

—আমার ধর্ম্মের বিকাশ—রবীন্দ্রনাথ।

তাই রুদ্রকবচ ধারণ করিতে হয়—রুদ্রযজ্ঞ করিতে হয়—রুদ্র-কৃপা লাভ করিতে হয়। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রে ত্যাগ তিতিক্ষা আত্ম শক্তি লাভ। ইহার দ্বারা পাপকে, কামকে অতিক্রম করা যায়, রুদ্রকে জয় করা যায়। ইহাই যে সত্যকার পাশুপত-অস্ত্র লাভ। রুদ্রকে জয় করিয়া এই অস্ত্র লাভ করিতে হয়।

মানুষের অন্তরে আছেন রুদ্র। কাম ও পাপ সেই রুদ্র। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাইতে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে চির দিন। বেদের যুগ হইতে কলির শেষ পর্য্যন্ত মানুষের মুখে সেই ত্রাহি রব—ত্রাহি মাম্। কতরূপে কত কাকুতি মিনতি করিয়া ডাকিতেছে—পূজা করিতেছে—তাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে করিয়াছে। যোনি আবদ্ধ লিঙ্গের বিভৎস রূপটি পর্য্যন্ত সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতেছে—ওগো রক্ষা করো, রক্ষা করো··· এই কামের মোহ থেকে বাঁচাও···তুমি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারে না···রুদ্র তুমি আমার কামকে ভস্ম করো।

মানুষের বাহিরে আছেন রুদ্র। প্রকৃতির মাঝে যাহা কিছু অতি ভয়ঙ্কর তাহাই রুদ্র। বৈদিক মানুষ তাই বজ্রঝঞ্ঝাকে রুদ্র বলিয়াছেন—অগ্নিকে রুদ্র বলিয়াছেন। অগ্নির শিখাগুলি রুদ্রের স্ত্রী হইয়াছেন। ঝড়কে বলা হইয়াছে রুদ্রপুত্র। এই রুদ্রপরিবার মানুষকে চিরদিন আতঙ্কিত করিতেছে।

কাম ও পাপকে বাদ দিয়া মানুষের প্রকৃতি গড়া হয় নাই। সব জীবের দেহে তারা আছে। যেমন শিবের সঙ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছেন। দুই সতিনী। এক আছেন বলিয়াই অন্যে সতিনী। দুইজন থাকিবেনই, একজন নয়।

দেহধারী মানুষ মরিবেই মরিবে। ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই। দেহধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহ মরে কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। এই আত্মাকে চেনার নাম অমরতা লাভ। বলহীন ইহা পারে না—"নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্য"! এই বল লাভ হয় সাধনা দ্বারা। কিসের সাধনা? কামাদি চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনা। নিরোধের মানে যেন আমরা ভুল না করি। নিরোধ মানে বাদ দেওয়া নয়। বাদ দেওয়া যায় না। মানুষের প্রকৃতিতে পাপ পুণ্য থাকিবেই। পাপ না থাকিলে পুণ্যের অস্তিত্ব থাকে না। ইহারাই বিদ্যা ও অবিদ্যা। এখানে 'তুমি' কে? তুমি যেন একজন আলাদা লোক। তুমি যেন 'বল্'—মনের বল···রুদ্র। তোমার মনের ঊর্দ্ধে তোমার মধ্যে আর একজন আছেন। তিনি আত্মা—তিনি মহেশ্বর। পাপ পুণ্যকে রসাতলে ফেলিয়া দিয়া উপরে ওঠো! এই মহেশ্বরকে দেখাই অমরতা লাভ। দেখা, অর্থাৎ 'দর্শন'। এই আত্মাকে লাভ করাই অমরতা লাভ—অমর হওয়া। শিব সাক্ষাৎ করাই অমরতা লাভ—শিবত্ব লাভ।

আমরা কি সেই রূপটি আজ দেখিতে পাইলাম?

কি পাইনি! (গল্প)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

শ্রাবণের প্রথম।

ভাদুই ধান এখনও মাঠ থেকে ওঠেনি, তাই চারিদিকের মাঠ ভরা ধানের ওপর সজল হাওয়ার ঢেউ বইবার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে এক একটা কালো ফিঙে। দু'পাশে বর্ষার জল, আর ধানভরা মাঠ, আর ওরই মাঝখানে কাদায়, জলে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়ে—মাথায় গামছার পাগড়ী আর হাতে মোটা বাঁশের লাঠিটা নিয়ে যে লোকটি সজল সন্ধ্যার আবছা আলো-অন্ধকারের মধ্যে অসঙ্কোচে "ছিনাথপুরের" পথ ধরেছিল, চারিদিকের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলছিল ওরই কণ্ঠের মূর্চ্ছনা:

বঁধুর আমার বরণ কালো,
বাজিয়ে বাঁশী কুল মজালো রে···

ছিনাথপুরের মধ্যে ঢুকে সে থমকে দাঁড়ালো সেইখানটায়, যেখানটায় তিনচারটা গ্রামের বিভিন্ন পথ এক জায়গায় মিলে মিশে হাটখোলার খানিকটা জায়গা বেশ প্রশস্ত করে তুলেছে। মাঝখানে ওর বাঁধা বটতলা।

সেইখানে দাঁড়িয়ে প্রাণকেষ্ট হাঁক দিলে—"কে ও? ওখানে মাছ ধরে কে?"

কেউ উত্তর দিল না সে কথার, কেবল মৃদু বাতাসে পুকুর পাড়ের হেলা বাঁশঝাড়টার কঞ্চিগুলো নড়বার সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলোও শিরশিরিয়ে উঠলো যেন। সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যেও তাকিয়ে তাকিয়ে প্রাণকেষ্টর মনে হল, পুকুরপাড়ের ঘেঁটু আর আশ্‌শ্যাওড়ার ঝোপঝাপগুলো যেন নড়ছে আস্তে আস্তে, একবার কোন গাছটা দুলেও উঠলো যেন একটু জোরে!

প্রাণকেষ্ট এবার জোর গলায় প্রশ্ন করলে:

"কে ওখানে, এখনও পষ্ট করে বলে ফেল বলছি, নইলে জান ত এ গাঁয়ের নাম করা প্যানা ডাকাত আমি···এমন কোনও অকাজ নেই, যা না করতে পারে এই প্যানা, ফ্যালারামের নাতি, ···হুঁ"

প্রাণকেষ্টর কথার উত্তরেই যেন একটা সাথীহারা গাংশালিক একটানা চীৎকারে সন্ধ্যাকাশ মুখর করে উড়ে গেল।

সেই সঙ্গে ঘেঁটু আর আশ্‌শ্যাওড়া ঝোপ ঠেলে বার হয়ে এল একটি নারীমূর্ত্তি; সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে তার যৌবনের পরিপূর্ণতা উপছে পড়ছে! ঠোঁটে হাসি, মুখে পান। প্রাণকেষ্টর দিকে তাকিয়ে পাতলা পানের ছোপে লাল ঠোঁট দু'খানা অবহেলায় একটু উল্টে প্রশ্ন করলে—"বলি চিনতে কি কষ্ট হয়?"

প্রাণকেষ্ট ওর দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠলো, অপ্রস্তুত কণ্ঠে জবাব দিলে: "ও—তুই সখি! তা কে জানে বল—যে এমন অসময়, এমন জায়গায় তুই আবার!" কথাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু বুঝতে বোধ হয় সখীর কষ্ট হলো না; সকৌতুকে মুখ বিকৃত করে বললে—"মরণ আর কি! চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করলে মিন্সে, সাধে বলি চোখ থাকতে কাণা!"

প্রাণকেষ্ট হাসি দিয়ে আবার নিজের ত্রুটী ঢাকবার চেষ্টা করলে।

"তা, কে জানে বল্ যে···য্যামন জায়গায় আবার···!"

"বাছুর হারিয়েছে গো, বাছুর হারিয়েছে, কমলে বাছুর। গাই হামলাচ্ছে, দুধ দুইতে পারছি না।"

প্রাণকেষ্ট কথা হারিয়ে ফেললে সখী গোয়ালিনীর সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। মনে পড়ে গেল ওর অনেক দিন আগের কথা!···

যেদিন সখী শুধু দুধ যোগান দিতে দরজায় আসত না, আর সেও বেড়াত না পয়সা উপায়ের নানা ফন্দী-ফিকির উদ্ভাবন করে।—মনে পড়ে কথাগুলি।

কিন্তু সে অনেক দিন, অনেকদিন আগের পরিচয়। আর তার সঙ্গে বিন্দু বিসর্গও সংস্রব নাই তাদের কারোও।

দু'জনের মধ্যে সখী বেড়ায় সারাদিন গরু, বাছুর টেনে, এবাড়ী ওবাড়ী দুধ যুগিয়ে, আর তার সঙ্গে চিররুগ্ন স্বামী পেল্লাদের সেবা করে; আর একজন ঐ প্রাণকেষ্ট বেড়ায় লোকের নানাভাবে অনিষ্ট করে ও নিজের স্বার্থ বজায়ের চেষ্টায়।

তবু রক্ষে যে, তার বৌ নাই! যে কয়দিন বেঁচেছিল, সখীর সোয়ামীর মত বিছানায় পড়ে থাকত না, খেটেই খেত, আর সোয়ামীকেও খাওয়াত। কিন্তু তাতেও তার ওপর প্রাণকেষ্টর কথায় কথায় হুমকীর অন্ত ছিল না। কিন্তু সে অনেকদিন, বোধ হয় চারপাঁচটা সন্ তার ওপর দিয়ে চলে গেছে!

বেশীক্ষণ নয়, বোধ হয় কয়েক মিনিট!

প্রাণকেষ্ট যেন শিউরে উঠলো। চমকে চোখ নামিয়ে বললে, "নে, নে, পথ ছাড়, আমি যাই।"

আঁচল থেকে গুলের কৌটো খুলে, মুখে দিয়ে সখী এবার মুখ টিপে হাসলো, "কেন, কথাটা বিশ্বাস হলো না বুঝি?

"না।"

"কেন শুনি, বলি ঠাকুর মশায় বুঝি একাই জগতের সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির, আর কেউ নয়?"

প্রাণকেষ্ট জবাব দিল, "সবার কথা জানিনে বটে, তবে তোর কথা জানি! তুই মিথ্যেবাদী। মিথ্যে কথা বলা তোর স্বভাব, ওতে তোর জিভে আটকায় না, সত্যি বলতে বরং বাধে তোর! কর, স্বীকার করদিনি দেখি! বল্‌দিনি, "মাইরি!"

সখী বললে, "ও কিরে কাটতে নেই, আমরা মেয়েছেলে!"

"উঁ—মেয়েছেলে! বড্ড মেয়েছেলে! আমার মত দশটা ব্যাটাছেলের কান কাটতে পারেন উনি, আর মেয়েছেলে! কেমন বলেছিলাম কি না যে···"মুখের কথা কেড়ে নিয়েই যেন সখী এগিয়ে এলো আরও দু'এক পা। মাজায় হাত রেখে, অন্য হাত মুখের কাছে রেখে বললে, "সম্পকে নোন্দাই হও, দু'একটা মিথ্যে কথা যদি বলেই থাকি তো ব'লেছি, দোষটা কিসের? তবে যখন হাতে নাতে ধ'রেই ফেলেছ নেহাৎ, তখন সত্যি কথাটাই বলি শোন—ওষুধ খুঁজতে গিইছিলাম; বুঝলে?"

"কিসের ওষুধ?"

"তোমাকে বশ করবার।"

কথাটা ব'লে ফেলেই সখী হেসে উঠলো; যেন এতবড় ঠাট্টা সে আর কোনও দিন কাউকে করেই এমন আনন্দ পায়নি, এমন

অপ্রস্তুতও ক'রতে পারে নি কাউকে। কিন্তু হাসি থামলে সে সবিস্ময়ে দেখলে, যাকে উদ্দেশ্য করে তার এই পরিহাস, সে নির্ব্বিকার।

পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণকেষ্ট কেবল তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে মুখে ঠাট্টার চিহ্নও নাই।

সখীর ঠোঁটে তখনও হাসির যে রেশটুকু লেগে ছিল, সেটা মিলিয়ে এলো আস্তে আস্তে; ভূত দেখার মত আড়ষ্ট স্বরে ডাকলে অস্ফুটে, "ঠাকুর মশাই।"

প্রাণকেষ্ট উত্তর দিলে, "পথ ছাড়, আমি যাই।"

সখী সরে দাঁড়ালো পায়ে পায়ে, কোনও প্রশ্ন করলে না আর। কেবল একটু পরে চোখ চেয়ে দেখলে প্রাণকেষ্টর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ পথের বাঁক ঘুরে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

খানাখন্দের অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরবের সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দও মিশিয়া গেল সখীর বুক থেকে।

গ্রামের পথ তখন জনহীন, পাখীরাও বাসায় ফিরে গেছে বোধ হয়।

কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব নিয়ে সখী বাড়ী ঢুকলো নিঃশব্দে। দেখলে, বারান্দার একধারে উবু হ'য়ে বসে পেল্লাদ হাঁপাচ্ছে আর থেকে থেকে কাশছে। সখীর দিকে নজর পড়তেই মন আগুনের মত জ্বলে উঠলো। জিভে বিষ ছড়িয়ে ব'ললে, ইয়ারকি সেরে ফেরা হলো এতক্ষণে? ফিরলি কেন? বলি বাড়ীই বা ফিরলি কেন? না ফিরলেই পারতিস!"

সখীকে যেন ভূতে পেয়েছে; কথা কইলে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে পেল্লাদ আবার প্রশ্ন করলে, "কথা কইছিস না যে বড়?"

শান্ত স্বরে সখী ব'ললে, "কি কইব?"

উত্তরে দেওয়াল ধরে উঠতে চেষ্টা ক'রলো পেল্লাদ, কিন্তু পারলো না; হাত বাড়িয়ে তামাকসাজা কলকেটা ছুড়লে সখীকে লক্ষ্য ক'রে, লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না পেল্লাদের।

মুহূর্ত্তে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল, সখীর কপালের এপাশ থেকে ওপাশ পর্য্যন্ত ফেঁড়ে গেল সেই কলকের ঘায়ে। সে দুই হাতে রক্তাক্ত কপালটা ধ'রে বসে পড়লো মাটিতে। একটা কথাও মুখ থেকে বার হ'লো না।

পেল্লাদের সঙ্গে সখীর এ বিবাহের একটু ইতিবৃত্ত আছে।

সখীর বাপ ত্যানা ঘোষের পেল্লাদের কাছে দেনা ছিল কিছু। দেনাটা সুদে আসলে যেদিন ওর ভদ্রাসনটুকুর দামেরও ওপরে উঠে গেল, সেইদিনই পেল্লাদ দাবী ক'রে বসলো ওর দেনা শোধের, ত্যানা কাৎরে উঠলো—"কিছুই নেই দাদা আমার দেখছো তো! কিন্তু দোহাই তোমার—আমার বাপ-পিতেমোর ভিটে-ছাড়া ক'র না আমায়, দোহাই তোমার।"

পেল্লাদের শুকনো বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর বাঁকা হাসি খেলা ক'রে গেল। বললে, "বেশ তো, কিন্তু ব্যবস্থা করতে হবে তো একটা হোক কিছু, ফেলে রাখলে তো চলবে না! আর আমার এই শরীর, কখন আছি কখন নাই। কে যে দেখে, কে যে মুখে এক ফোঁটা জল ঢেলে দেয় তার যখন হদিশ নেই…"

ত্যানা তখনও গলায় গামছা জড়িয়ে কাঁপছে বলিদানের পাঁঠার মত, কারণ সে জানে পেল্লাদের প্রকৃতি।

সে কতবড় নৃশংস—কতবড় শয়তান—ত্যানা তা জানে।

একটু থেমে থেকে পেল্লাদ বললে, "তবে একটা কথা—পারিস্ তো বল, তোর সব দেনা শোধের ব্যবস্থা ক'রে দি। করবি ত্যানা, কথা দে—"

আগ্রহে আনন্দে ত্যানার চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো।

হাতের হুঁকোটা ত্যানার দিকে এগিয়ে দিয়ে পেল্লাদ বললে, "বল্‌ছিলাম কি, তোর মেয়েটাও তো বড় হয়েছে—তাই! আর আমারও দেখাশোনা করবার একটা লোকের দরকার—তাই।"

ত্যানা এ প্রস্তাব শুনলে নিঃশব্দে, নিঃশব্দেই সে সম্মতিও দিয়ে এলো চৌদ্দ পুরুষের ভিটের জন্যে, কিন্তু ভোগ করতে পারলে না সে—ভিটের মায়াও পৃথিবীতে আটকে রাখতে পারলে না তাকে, মেয়েকে পেল্লাদের হাতে সম্প্রদান করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে সে জ্ঞান হারালে—আর সে জ্ঞান ফিরে পেল না।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে বসে ছিল, সামনে ওর হাটের জিনিষ জড়ো করা। আকাশভরা নক্ষত্র, সন্ধ্যার পরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে আস্তে আস্তে গাছের পাতা কাঁপিয়ে।

একখানা মাত্র ঘর, তারও একধারের চাল খসছে। লোকে বলে—একা মানুষ প্যানা, ডাকাতিই করুক, আর মিথ্যে মোকদ্দমা বাধিয়ে মানুষকে সর্ব্বস্বান্তই করুক, পয়সা জমিয়েছে ও ঢের, তবু ও প্রাণ ধরে ঘর সারায় না পয়সা নষ্ট হবার ভয়ে, আর কিছু নয়। সেই ঘরের হাতনেয় বসে প্যানা একবার সামনের রাস্তার দিকে তাকালো, কারা যেন পথ বয়ে হেঁটে আসছে না, পদক্ষেপ একটু তাড়াতাড়ি! হাতের লণ্ঠনটা সেই পদক্ষেপের তালে তালে দুলছে।

কাছাকাছি হতেই প্রাণকেষ্ট হাঁক দিলে, "কে যায়?"

যে যাচ্ছিল সে উত্তর দিল, "আমি, নিবারণ।—বলি পেল্লাদ বুড়োর কাণ্ডটা শুনেছ খুড়ো, বৌটাকে এমন মার মেরেছে যে কপাল ফেটে একেবারে—"

বাকী কথাটা আর কানে এলো না প্রাণকেষ্টর।

"পেল্লাদ মেরেছে সখীকে! মারুক। ব্যাপারটা এমন কিছু নতুন নয় এবং এমন কিছু বিশেষ স্থানও অধিকার ক'রলো না প্রাণকেষ্টর মনে রাখার পর্য্যায়ে। তবে কেমন একটু অস্বস্তি, তা সে অমন মাঝে মাঝে হয়ই।

মার খেতে হয় না মেয়েছেলের ব্যাটাছেলের কাছে! ইস্, ভারী একেবারে গুরুঠাকুরের জাত কি না,তাই মাথায় তুলে রাখতে হবে রাত্তির দিন! ইস্! মনের মধ্যে একটা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে প্রাণকেষ্ট উঠলো। হাটের জিনিষগুলো ঘরে তুলে—একটা মাটির হাঁড়িতে জল চড়ালে উনুন জ্বেলে; চা হবে! বড় ক্লান্ত সে। এখন একটু গরম চা না খেতে পেলে পা হাত এমনকি

মনটাও ঠিক খেলছে না। চা চড়িয়ে গুণ্ গুণ্ ক'রে আবার সুর ধ'রলো—

বঁধুর আমার বরণ কালো,—
বাজিয়ে বাঁশী কুল্ মজালো রে···এ

সখীকে কে যেন এনে দাওয়ার একপাশে শুইয়ে দিয়েছিল মাদুর পেতে। অন্যপাশে ব'সে পেল্লাদ তখনও হাঁপাচ্ছে আর গালাগাল দিচ্ছে অকথ্য ভাষায়, "হারামজাদি! ইয়ারকি মারতে যাওয়া হ'য়েছিল!—ইয়ারকি।"

বাইরে থেকে নিবারণ ডাকলে: "পেল্লাদ ঠাকুর্দা, বলি জ্ঞান এয়েছে ঠাক্‌মার? ও পেল্লাদ দা!"—পেল্লাদ কি উত্তর দিল, ভালো বোঝা গেল না। কেবল উঠে ঘরে যেতে যেতে দেখে গেল—নিবারণ এগিয়ে আসছে। একহাতে ওর লণ্ঠন, অন্যহাতে ওষুদের ব্যাগ। নিবারণ গ্রামের ডাক্তার, পাশ না করুক, তবু, হাতযশ আছে।

ঘরে থেকেই পেল্লাদ গর্জ্জন করে উঠলো: "গ্যা—গ্যাখ, ওষুধের দাম টাম আমি দিতে পারবো না বল'ছি, তা বুঝে দান ক'রো নিবারণ! হ্যাঃ···"

"আচ্ছা সে আপনাকে ভাবতে হবেনা।"

স্মিত হাসির সঙ্গে কথা কয়টা উচ্চারণ ক'রে নিবারণ এসে বসলো সখীর মাথার কাছে। সখী চোখ বুজে শুয়ে আছে, ওর কপালে বাঁধা জলপটী ভিজিয়ে তখনও ঝ'রছে টাট্‌কা রক্তের ধারা।

নিবারণ নীচু হ'য়ে ডাক্‌লে, "ঠাক্‌মা।"

সহানুভূতিও সমদুঃখে ওর কণ্ঠস্বর কাঁপছে। পাঞ্জাবীর হাতায় চোখ মুছে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কেমন আছ এখন?"

সখী চোখ চেয়েছিল; ব'ললে "ভালো।"

নিবারণ ক্ষিপ্রহাতে সখীর কপালের কাটায় ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে; তারপরে মুখখানা খুব কাছে এনে ফিস্‌ফিসিয়ে প্রশ্ন ক'রলে—"কলকেতায় যাবে ঠাক্‌মা!"

সখী অত কষ্টেও নিবারণের এই কথায় বিস্ময় বোধ ক'রলে—"ক'লকাতায়? কেন?"

"এখানে থাকলে তুমি এইভাবে কোন্ দিন ম'রে প'ড়ে থাকবে, কেউ জানবে না।"

"ও"—কথাটা সখী এতক্ষণে বুঝলো, ব'ললে, বেশ! "তবে সেরে উঠি আগে!"

নিবারণ উঠে গেলে সে আজ সত্যি সত্যিই ভাবতে আরম্ভ ক'রলো তার এখানে জায়গা আছে কি নেই! এই এতদিনের মানুষ হওয়ার মাটি, এই গ্রাম, ঐ নিস্তব্ধ আকাশ, এই ঘর উঠোন, সব ফেলে তাকে কেবল মাত্র ঐ পেল্লাদের অত্যাচারের জ'ন্যে চ'লে যেতে হবে? সত্যিই চ'লে যেতে হবে?

সখী শয্যাগত। সেই কপাল-কাটা ঘা তার শুকোয়নি, গতি ওর যেন অন্যদিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ওষুধের ব্যাগ হাতে হন্‌হনিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো নিবারণ। সামনেই প্রাণকেষ্টকে দেখে—সরোষে ব'লে উঠলো—

"এ হ'তেই পারে না খুড়ো—তাতে দু' দশটাকা আমার খরচ-খরচা হয় সেও বি আচ্ছা, তবু আমি সহর থেকে পাশকরা ডাক্তার আনাব, তবে আমার নাম—! মুখের কথা, এতবড় একটা সিরিয়াস্ কেস্, বিশেষ যখন আমারই হাতে র'য়েছে! লোকেই বা বলবে কি?"

"সিরিয়াস্ কেস্?"

প্রাণকেষ্ট সচকিত হ'য়ে উঠলো—"কার্ রে? বলি ও নিবারণ!"

"ও-ই পেল্লাদ ঠাকুর্দার স্ত্রীর।"

কথাটা উচ্চারণ ক'রেই নিবারণ আবার বার হ'লো হন্‌হনিয়ে—মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রাণকেষ্টও নিজের বাড়ী ছেড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চ'ললো সখীর বাড়ীর দিকে, কিন্তু সে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রতে সে পারলে না, আবার তেমনি নিঃশব্দে, তেমনি ধীরে ধীরেই ফিরে এসে ব'সলো নিজের ঘরের হাতনেয়! পরদিন সে শুনলো নিবারণ সহর থেকে পাশ করা ডাক্তার এনেছিল বটে, কিন্তু সখী তার সে উপকার নেয়নি, পেল্লাদকে ডেকে দরোজাটা বন্ধ করিয়ে দিয়েছে ওদের সামনেই, আর ব'লেছে, গরু বেচে সে এ ঋণ শোধ ক'রবে নিবারণের!

কিছুদিন পরে, ছই ঢাকা একখানা গরুর গাড়ী পথ চ'লতে চ'লতে থামলো, ভেতর থেকে ধীরে ধীরে কঙ্কালসার যে নারী-মূর্ত্তিটি নেমে প্রাণকেষ্টর ঘরের দরোজায় দাঁড়ালো, তার দিকে তাকিয়ে প্রাণকেষ্টর মুখে কথা বার হ'লো না; কেবল সবিস্ময়ে উচ্চারণ ক'রলে—"সখি! তুই?"

সখি হাসলো। পা দু'টো ওর দাঁড়িয়ে থাকতে কাঁপছে, তবু আঁকড়ে ধ'রেছে দরোজার কপাট দু'খানা!

হাসিমুখে জবাব দিলে, "হ্যাঁ ঠাকুরমশাই আমি! মরিনি, বেঁচে উঠেছি আবার, তাই একবার পায়ের ধূলোটা নিতে এলাম তোমার, হাজার হোক অনেক মিথ্যে কথা ব'লেছি, ক্ষেমা দিও। নইলে আবার ভুগবো!"

হেঁট হ'য়ে পায়ের ধূলো নিয়ে সে উঠে গেল; মন্ত্রমুগ্ধের মত পেছনে পেছনে গাড়ীর কাছে এসে প্রাণকেষ্ট প্রশ্ন ক'রলে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছিস তা-তো ব'ললি নে সখি!

সখী এবার ফিরে তাকালো পূর্ণ দৃষ্টিতে! প্রাণকেষ্টর মাথা থেকে পা' পর্য্যন্ত দেখে নিল যেন অবজ্ঞায়, ঘৃণায়। তারপরে একটু হাসলে; বিকৃত সে হাসি। ব'ললে, "উপস্থিত অন্য গাঁয়ে ঘর কিনে, তারপরে যাব এমন জায়গায়, যেখানে নিবারণ নেই, তুমিও নেই; বুঝলে?"

গাড়ীর মধ্যে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে পেল্লাদ গর্জ্জে উঠলো, "ইয়ারকি মারা হ'চ্ছে! কেবল ইয়ারকি।"

প্রাণকেষ্টর বুকের ভেতরটায় কে গুমরে উঠলো—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। তাকিয়ে দেখলে—সামনের ধূলোয় ভরা পথের বুকে চাকার রেখা এঁকে সখীর গাড়ী চ'লে যাচ্ছে, বোধহয় চিরদিনের মতই,—আর তাকে ডেকে ফেরানো যাবে না, ডাকলেও সে ফিরবে না ছিনাথপুরে।···

নদীপারের তালবনের মাথায় মাথায় তখনও সূর্য্যাস্তের শেষ আলো চক্ চক্ ক'রছে।

যুদ্ধোত্তর ভারত

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য য়ুরোপখণ্ডে যে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠে, আজ প্রায় ছয় বৎসর পরে তাহার অনেকটা অবসান হইল। দানববলে বলীয়ান দৃপ্ত জার্ম্মানী আজ ক্ষত-বিক্ষত দেহে ধরাশয়ন করিয়াছে। ধরাবাসী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। এখন এই দুর্জ্জয় দানবের নিশ্চেষ্ট মৃতদেহের উপর বিজয়োৎফুল্ল বীরবৃন্দ কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার জন্য ধরাবাসী উচ্চক্ষু হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছে কিনা এইবার তাহা বুঝা যাইবে।

এই ছয় বৎসরব্যাপী যুদ্ধে ভারতের ক্ষতি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। একমাত্র বাঙ্গালা দেশে মানবসৃষ্ট অভাবের ফলে ত্রিশ পয়ত্রিশ লক্ষ লোক কেবল মাত্র অনাহারে দেহত্যাগ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন রোগের সময় ঔষধ এবং পথ্যের অভাবে কত লোক যে মরিয়াছে এবং এখনও মরিতেছে তাহার বিশ্বাসযোগ্য হিসাব প্রকাশ নাই। তাহা হইলেও স্বজনবিয়োগ-ব্যথাকাতর ভারতবাসী এই দানব-নিপাতে আনন্দিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যাহার যেখানে ব্যথা তাহার সেইখানে হাত। তাই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বিধ্বস্ত ভারতের তথা বাঙ্গালা প্রদেশের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহাই দেখিবার জন্য আমরা ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত। এদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই দৃঢ়বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে শ্রমশিল্পজ পণ্যের উন্নতি সাধন ব্যতিরেকে কোন মানবসমাজই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। যে দেশে উদগ্র সাম্রাজ্যবাদীরা লোভে দিশাহারা হইয়া শোষণনীতি চালাইবে, সে দেশ দারিদ্র্যের গভীর গর্ত্তে পড়িয়া পরিণামে প্রাণ হারাইবেই। ভারতের ন্যায় প্রাচীন জনবহুল দেশ যদি বাধ্য হইয়া অথবা বিহ্বল বুদ্ধিতে বিবশ হইয়া কেবল কাঁচামাল উৎপাদনের বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয় তাহা হইলে তাহার পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, সে বিষয় ভাবিবার মত দূরদৃষ্টি অতি অল্প লোকেরই আছে। তাই আজ এই যুদ্ধবিরতির কালে ভারতীয় শ্রমশিল্পকে সবল করিবার জন্য কি করা হইবে, তাহা জানিবার জন্য ভারতবাসীর এই বিপুল ব্যাকুলতা।

ব্যাঘ্র যতদিন নরমাংসের আস্বাদন না পায়, ততদিন সে নরহিংসা করে না। কিন্তু যেমন সে একবার নরমাংসের স্বাদ পায়, তেমনই সে মানুষ খাইতে পাইলে আর কিছু খাইতে চায় না। প্রবল-পরাক্রান্ত জাতিদিগের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের নেশাটা অনেকটা ঐ প্রকার ব্যাঘ্রের নৃমাংসভক্ষণের নেশার মত। যতই খাইবে ততই খাইবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়িবে। পররাষ্ট্র হরণের পর হইতেই গ্রেটবৃটেনের সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালার যে অর্থ লুণ্ঠিত হইয়া বিলাতে গিয়াছিল, তাহাতেই বিলাতের শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ইংরাজ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের কথা।(১) এখন গ্রেটবৃটেনের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে রাজ্যের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারে না। নীতিজ্ঞান বা ধর্ম্মবুদ্ধি আর তাহাকে সাম্রাজ্যবাদে বিরত করিতে পারিবে না। যতই তাহার হাতে অধিক মূলধন জমিবে, ততই সে বুভুক্ষু গাভীর ন্যায় নূতন নূতন তৃণক্ষেত্র পাইবার চেষ্টা করিবেই।

বিগত মহাযুদ্ধের পর গ্রেটবৃটেনের বহির্ব্বাণিজ্য কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। বহুদেশ শুল্ক-প্রাকার রচিয়া বিদেশী পণ্যের প্রবেশপথে বাধা দিয়াছিল। ভারতেও শ্রমশিল্প ঐ সময়ে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংরাজ ইহা সুনজরে দেখে নাই। তাহারা কখনই ভারতীয় জনগণের শিল্পপ্রসারিণী চেষ্টায় উৎসাহ দেয় নাই। সেই জন্য এবার যুদ্ধের প্রথম হইতেই বণিকবৃত্ত ধনিক ইংরাজেরা যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় বাজারে যাহাতে বিবিধ বৃটিশপণ্য বিকায় তাহার জন্য আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বৃটিশ অর্থনীতিবিশারদবর্গ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ বৃটিশপণ্য বিদেশে বিকাইত, বর্ত্তমান যুদ্ধের পরে যদি তার দেড়া পণ্য ইংরাজ বণিকেরা বিদেশে বেচিতে না পারে, তাহা হইলে বৃটেনের নিস্তার পাইবার উপায় নাই। সেই জন্য গ্রেটবৃটেনের শক্তিশালী বণিকগণ প্রায় সকলেই সাম্রাজ্যবাদী। এরূপ অবস্থায় প্রভাবশালী বৃটিশদিগের নিকট হইতে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে ভারতবাসীর সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প।

কিন্তু 'একা রামে রক্ষা নাই সহায় সুগ্রীব।' বৃটেন ত ভারতের স্কন্ধের উপর চাপিয়া বসিয়া আছেন, তাহার উপর মার্কিণ এই যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে নিজ শিল্প-বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। মার্কিণ ইদানীং যেন সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহা কেবল আমাদের ধারণা নহে, বিখ্যাত লেখক অধ্যাপক লাস্কিরও সেই ধারণা। মার্কিণের ইজারা ও ঋণ দান ব্যবস্থা দেখিলে সে সন্দেহ মনের মধ্যে উদিত হওয়া অসঙ্গত নহে। হইতে পারে যে, অগ্নিদাহভীত গাভীর মত আমরা সিঁদুরে মেঘ দেখিয়াই ডরাইতেছি। বার বার প্রতারিত হইলে মানুষের মনে অকারণ সন্দেহের উদয় স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সন্দেহ যখন ইংরাজ-মহলেও উঠিতেছে তখন উহা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সুতরাং বৃটিশ বাণিজ্যের ন্যায় মার্কিণী বাণিজ্য যদি ভারতের স্কন্ধে চাপিয়া বসে, তাহা হইলে ভারতীয় শিল্প আর কতদিন টিকিতে পারিবে—তাহাই হইতেছে বিশেষ চিন্তার কথা। বিস্তীর্ণ তৃণভূমিশোভিত মার্কিণ রাজ্য ক্রমশঃ কৃষিসম্পদশালী জনবহুল রাজ্যে পরিণত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিয়া তাহার যে সম্পদ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা তাহার স্বদেশের ও প্রতিবেশী দেশের লোকের অভাব মিটাইয়া আরও উদ্বৃত্ত হয়। তাহারা এখন শ্রমশিল্প-প্রধান হইতে চায়। হইয়াছেও অনেকটা। এখন সেখানে কলকব্জা, মোটরগাড়ী রবারের জিনিষ, লৌহ এবং ইস্পাতের জিনিষ, বস্ত্রশিল্প, পশমী শিল্প,

(১) Law of Civilisation and Decay by Brooks Adams p. 263—64.

Treasure flowed to England in oceans × × The influx of Indian treasure added considerably to England's cash capital.—Macaulay

কাগজ ও কাগজের মণ্ড, ঔষধ প্রভৃতি দ্রুতবেগে উৎপন্ন করা হইতেছে। দক্ষিণ-আমেরিকার উহা কাটাইবার আর স্থান নাই—সুবিধাও নাই। তাই মার্কিণ চীনের দিকে পণ্য-বীথিকা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সুবিধা হয় নাই। এখন ভারতের দিকে সে যে নেক-নজর দিবে না এমন কথা বলা যায় না। গরজকী নাহি লাজ। মার্কিণের সহিত ভারতের বাণিজ্য এই যুদ্ধের সময় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মার্কিণ হইতে যত পণ্য আসিত, এই যুদ্ধের সময় তাহা অপেক্ষা এখন অনেক বেশী আসিতেছে। মার্কিণে রপ্তানী বাণিজ্যও ঐরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৮—৩৯ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত পণ্য আমদানী হয়েছিল, তার হাজার ভাগের মধ্যে কেবলমাত্র ৬৪ ভাগ মার্কিণ হইতে আসিয়াছিল। তাহার পর বৎসর আসিয়াছিল ৯০ ভাগ আর তাহারও পরবৎসর অর্থাৎ ১৯৪০—৪১ অব্দে আসে ১ শত ৭২ ভাগ। এদিকে ভারত হইতে মার্কিণে কি পরিমাণ মাল চালান গিয়াছিল তাহার হিসাব দেখুন। ভারত হইতে যত মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার হাজার করা ৮৪ ভাগ ১৯৩৮-৩৯ অব্দে মার্কিণ লইয়াছিল। তৎপরে পর পর দুই বৎসরের হিসাব এইরূপ—

১৯৩৯—৪০ খৃঃ অব্দে	১৯৪০—৪১ খৃঃ অব্দে
১২৭ ভাগ	১৬৪ ভাগ

তাহার পর টাকার অঙ্কে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, এই যুদ্ধ বাধিবার পর মার্কিণদেশ এবং ভারতের বাণিজ্য কিরূপ বাড়িয়াছে।

খৃষ্টাব্দ	আমদানীর পরিমাণ টাকায়	রপ্তানীর পরিমাণ টাকায়
১৯৩৯	১১,৭৮,৩৩,২০১	২০,৬৬৮৩,৫২১
১৯৪০	২৪,৫২,৯৩০৬১	২৬,৬০,১০,৯৬৪
১৯৪১	৩৭,২২,৪৬,১১১	৪১,১২,৬৭,৯৬০

ইহাতে দেখা যায় যে, মার্কিণ দেশ হইতে আমদানী এবং রপ্তানী পণ্যেরই উভয় দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মার্কিণ হইতে আমদানী পণ্য মূল্য হিসাবে ৩ গুণেরও অধিক এবং ভারত হইতে মার্কিণ দেশে রপ্তানী পণ্য, মূল্য হিসাবে (টাকায়) দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আমদানী বৃদ্ধির কারণ—যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী এবং জাপান হইতে ভারতে জিনিষ আমদানী অধিক হয় নাই। জার্ম্মান, ফরাসী, ইটালীয় ও জাপানী মাল ভারতে আসা একেবারে বন্ধ, সুতরাং এ বৃদ্ধি স্বাভাবিক। মার্কিণকে যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকিতে না হইলে ইহা অপেক্ষা তাহারা ভারতে অধিক মাল যোগাইতে পারিত, তাহা হইলে ভারতে এই দুঃসময়ে কৃষিজ ও শিল্পজ পণ্যাভাবে এই হাহা-রব উঠিত না।

এখন কথা হইতেছে যে, যুদ্ধ ত মিটিয়া গেল। জাপান আর কতদিন লড়িবে? যোশী মঠের শঙ্করাচার্য্যের গণনা যে সকল বারই ঠিক হইবে তাহা মনে হয় না। সম্ভবতঃ জাপান শীঘ্রই পরাজিত হইবে। বিগত যুদ্ধের পর হইতে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় আপনার বাণিজ্য অনেক বিস্তার করিয়াছিল, এবার তাহা শেষ হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগ দিবার পূর্ব্বে জাপান হইতে যে ১৮—১৯ কোটী টাকার জিনিষ ভারতে আসিত, উহা আর আসিবে না। যদি তাহা না আসে তাহা হইলে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদে অভিনব প্রবিষ্ট মার্কিণ সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবে। জাপান শত্রু হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে জাপান হইতে কাপাস পণ্য, কৃত্রিম রেশম, রেশমজাত বস্ত্রাদি, পশমী জিনিষ, কাচের জিনিষ, খেলনা, রবারের জিনিষ প্রভৃতি অনেক ভারতে আমদানী হইত। ইহার সমস্ত না হউক অনেকখানি মার্কিণ লইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভারত হইতে যে জিনিষ জাপানে চালান যাইত, তাহা সবই যে মার্কিন লইবে তাহা নহে। তাহারা পাট এবং পাটজাত পণ্য, কাঁচা চামড়া, লাক্ষা, পশুলোম প্রভৃতি লইত। এ দেশ হইতে মার্কিণের বিশেষ পণ্য, বিশেষতঃ শ্রমশিল্পজাত পণ্য, লইবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মার্কিণের সহিত আমাদের বাণিজ্য প্রতিকূল হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। বিশেষতঃ কোন দেশ যদি দেশান্তরে কাঁচা মাল চালান দিয়া তদ্দেশ হইতে পাকা বা ব্যবহারোপযোগী মাল আমদানী করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সেই কাঁচা মাল রপ্তানীকারক দেশকে দুর্গতি ভোগ করিতেই হয়। এরূপ অবস্থায় মার্কিণ যদি আর্থিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী হইয়া এ দেশে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভারতের দশা কি হইবে তাহা সকলে নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখুন। আজ দুই শত বৎসর কাল ভারতবাসীরা তাহাদের শিল্প রক্ষার জন্য রাজশক্তির নিকট হইতে কোনরূপ উৎসাহ বা সাহায্য পায় নাই। বরং বিরক্তি, ভ্রূকুটিরাশি ও ঘৃণার হাসিই পাইয়াছে। আজ সেই রাজশক্তি স্বীয় স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রভূত পরিমাণে শ্রমশিল্পজ পণ্য কাটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছেন।

একে ভারতবাসীরা শিল্পোন্নতি বিষয়ে রাজসাহায্য হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন কি রাজার বা রাজশক্তির ঔদাসীন্যে ও তাচ্ছিল্যে শিল্পোন্নতি বিষয়ে নিরুৎসাহ, তাহার উপর যদি মার্কিণের ন্যায় শিল্পী এবং বাণিজ্যিক জাতি ভারতে শিল্পজ পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহসম্পন্ন হইয়া উঠেন, তাহা হইলে এই দুইটি জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় শ্রমশিল্প কতদূর টিকিতে পারিবে তাহা সুধীগণের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। আমরা সর্ব্বদেশীয় সুধীজনকে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। অতীতের অভিজ্ঞতায় আতঙ্কিত আমরা আমাদের এই অবস্থার কথা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সম্প্রতি ভারত-সরকার ভারতীয় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। উহা দেখিয়া আমাদের দেশীয় অনেক শিল্পজীব এবং শিল্পপতি বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। উহার ফল যে পুতনার হাতে পুত্রসমর্পণের ন্যায় হইবে বলিয়া তাঁহাদের নিকট ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে! সরকার এইবারকার এই যুদ্ধের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত

ভারতে প্রস্তুত করিবার কোনরূপ আগ্রহই দেখান নাই। পরন্তু তাঁহাদের শত অসুবিধা ঘটিলেও তাঁহারা এ দেশে ট্যাঙ্ক, মোটর-এঞ্জিন, রেলওয়ে এঞ্জিন, জাহাজ প্রভৃতি ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিমুখতা প্রকটিত করিয়া আসিয়াছেন। এখন তাঁহাদের মন হঠাৎ এই বিষয়ে এত সচেতন হইয়া উঠিল কেন, তাহা ভাবিয়াই অনেকে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা যে পরিকল্পনা আঁটিয়াছেন, তাহার ফলে আদি শিল্পগুলির (Key Industry) উপর সর্ব্বোতোভাবে পরিচালনা ক্ষমতা লাভ করিয়া অন্য সকল শিল্পগুলির উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত করা সহজ হইবে, ইহাই প্রায় সকলেরই বিশ্বাস। একথা বিদিত ভুবনে যে—যুদ্ধাদির ফলে সাম্রাজ্যবাদী ধনিকদিগের হস্তে যত টাকা আসিবে ততই নির্ম্মমভাবে তাঁহারা তাঁহাদের বর্দ্ধিত মূলধন এবং বর্দ্ধিতশক্তি যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপন্ন অধিকতর পণ্য কাটাইবার জন্য নূতন নূতন বাজারের সন্ধান করিতে বাধ্য হইবেন। এ কথা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়ের সমকাল হইতেই তাঁহাদের দেশের অর্থনীতিবিশারদগণ তারস্বরে বলিয়া আসিতেছেন।(২) যদি কোন দেশ সত্যসত্যই জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই সেই সরকারকর্ত্তৃক মূল শিল্প জাতীয় ভাবে পরিচালিত করিতে সুবিধা হয়। নতুবা কখনই তাহা হইতে পারে না। মার্কিণ বা গ্রেট বৃটেন গণতান্ত্রিক দেশ নহে, ঐ দুই দেশে কার্য্যতঃ গণশাসন নাই। ঐ দুই দেশের শাসন-পদ্ধতিই সম্পূর্ণ ধনিতান্ত্রিক।(৩) সুতরাং ঐ দুই দেশের সরকার স্বীয় দেশেই সম্পূর্ণ জাতীয়তার বনিয়াদে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাদের অধীন দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা একটা বিরাট ধাপ্পাবাজী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধনিকতন্ত্রের দিনকাল ফুরাইয়া গিয়াছে একথা শুনিতে ভাল কিন্তু ধনের প্রভাব যে প্রজাসাধারণের উপর ক্ষুণ্ণ এবং খিন্ন হইতেছে তাহা ত মনে হয় না। নতুবা ঐ দুই দেশে প্রজাসাধারণের ভোটে যাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা মোটের উপর ধনিকদিগেরই স্বার্থসাধন করেন কেন? আজ বিলাতের ধনিকই হউন, আর শ্রমিকই হউন আর শৈল্পিকই হউন সকলেরই মনে সাম্রাজ্য রক্ষা কর্ত্তব্য এ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে। সাম্রাজ্য রক্ষার্থ শ্রমিকদলভুক্ত মিষ্টার এট্‌লিই হউন আর মুখে সমাজতন্ত্রবাদী স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ই হউন, মনের অন্তঃস্থলে তাঁহারা কেহই উৎকট সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল-আমেরী কোম্পানী হইতে সাম্রাজ্যরক্ষা নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন নহেন। Scratch a Rusaian and you will find a Tartar. সেই জন্য এই দুর্দ্দিনে জাতীয়তাকরণের ভাঁওতায় ভুলিয়া শ্রমশিল্পের অযথা নিয়ন্ত্রণভার সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। ভারতবাসীর পক্ষে শিল্পরক্ষা ব্যাপারে বড়ই সঙ্কটসঙ্কুল সময় আসিতেছে। শিল্পোন্নতি না না করিতে পারিলে কোন জাতিরই মুক্তি নাই। কাজেই প্রত্যেক ভারতবাসীরই উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া শিল্পোন্নয়নে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অথচ আমরা বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের বিরোধী নহি। বৈদেশিক বাণিজ্য না থাকিলে দেশের ঋদ্ধি বৃদ্ধি পায় না। আমরা কাঁচামালের যোগানদার মাটি-কাটা ও জল-তোলা মজুরে যাহাতে পরিণত না হই তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই এই সময়ে সকলে স্বদেশী শিল্প রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। যুদ্ধোত্তর ভারত যেন শিল্প বিষয়ে পিছাইয়া না পড়ে তাহার জন্য সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা করুন।

(২) রিকার্ডো একখানি পত্রে ম্যালথাসকে লিখিয়াছিলেন,—If with every accumulation of Capital we could take a piece of fresh fertile land to our island profits will never fall.

(৩) Bernard Shaw সম্প্রতি এক প্রশ্নের উত্তরে There are no such things as British and American democracies. The United States and the British Commonwealth are plutocracies etc. and there is no future permanence for plutocracy.

প্রিয়ংবদা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

কোথা সখি প্রিয়ংবদা মালিনীর তীরে
লুকাইয়া আপনারে বিস্মৃতি তিমিরে?
আজো কি বাঞ্ছিত তব দেয় নাই দেখা?
সীমান্তে কি পড়ে নাই সিন্দূরের রেখা?

আসে নি কি কোন নৃপ অতিথির বেশে
হরিতে তোমার মন কৌতুক আবেশে?
দু'টি শিশু নীপ তরু, সবৎসা হরিণী.
আজো কি হইয়া আছে নয়নের মণি?

আশ্রম পাণ্ডুর তব কামনার শ্বাসে।
বক্ষের কাঁচলি খসে বসন্ত বাতাসে।
সংযম শিথিল এবে, কোথা হিতাহিত,
দেহে জাগে কামনার প্রদীপ্ত ইঙ্গিত।

যৌবনে যাহনা বাঁধা কঠিন বন্ধলে,
নিত্য মনে সুন্দরের আরাধনা চলে

সাহিত্যের দায়িত্ব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

দায়িত্বহীন অধিকার দাম্ভিক স্বৈরাচার। সমাজে সাহিত্যের অধিকার পর্য্যাপ্ত তাই তার দায়িত্ব প্রচুর। সে দায়ী কৃষ্টি ও সমাজের কাছে। তার প্রত্যক্ষ কর্ম্মভূমি শিক্ষিতের চিত্ত। কিন্তু আপাততঃ মানুষের সঙ্ঘ যে বিধিতে গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত, তার ফলে অ-শিক্ষিতের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, উদ্দীপনা ও নিরাশার জন্য সবিশেষ দায়ী শিক্ষিত সমাজের কৃষ্টি। তাই সাহিত্যের অধিকারক্ষেত্রের সীমানা সমগ্র সমাজ জুড়ে। তার দায়িত্বের ভারও সেই পরিমাণে গুরু।

মানুষের দলবাঁধার প্রথম দিন হ'তে সঙ্ঘের প্রধান যা' ভাবে, দলের সকল জীবনে তার প্রভাব প্রসার লাভ করে। সাহিত্য শ্রেষ্ঠ মনের লিপিবদ্ধ সুষ্ঠু ভাবধারা। কৃষ্টি ও আদর্শের পার্থক্যের পরিণাম জাতীয় বা সঙ্ঘসাহিত্য। কিন্তু তার উৎকর্ষতা শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। চিন্তাধারা মাত্র সৃষ্টির মূল-তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু হ'লে, সে সাহিত্যের গণ্ডী ছেড়ে দর্শনের উচ্চভূমিতে পৌঁছে। সে ক্ষেত্রে বিশ্ব-মানুষ কোনোদিন একমত নয়। দর্শনকে সাহিত্যের এক উচ্চশাখা বিবেচনা করলেও সহজেই উপলব্ধি করা যায় তার প্রভাবসুতরাং দায়িত্ব। আজ বিশ্বচেতনা এ কথা মানে যে, আর্য্যাবর্ত্তের দর্শন আকাশ-চাওয়া, পরপার-ঘেঁষা না হ'লে তার বক্ষ চিরদিন বিদেশী তাণ্ডবের লীলা-ভূমি হ'ত না। ভলটেয়ার, হেল্‌ভেসিয়স, ও জিন্‌জ্যাক রোঁসোর দার্শনিকসাহিত্য এককালে যেমন য়ুরোপীয় ও মার্কিনি জীবনের রঙ্ বদলে দিয়েছিল তেমনি নবীন পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী মার্কস, টলষ্টয়, পুস্কিন, তুর্গিনেভ, দষ্টিয়ভেস্কি প্রভৃতি সাহিত্যস্রষ্টার প্রবল লিপি-ভঙ্গী। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতির অমোঘ লেখনী দেশ-প্রেমিকের সুপ্ত দেশাত্মবোধের কুম্ভ-কর্ণ-নিদ্রার অবসানে প্রথমে সহায়তা করেছে। বঙ্কিমের অখণ্ড প্রতাপের অধিকার হতে একশ্রেণীর সুবিধাবাদীকে মুক্ত করবার জন্য বঙ্কিম-সাহিত্যের অর্থ-বিকৃতির প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে তারা যাদের স্বার্থ চাহে না সহজ দেশাত্মবোধের জাগৃতি। আমি জানি রাজনীতি এ বাসরে নিষিদ্ধ। মাত্র আমার সিদ্ধান্ত প্রতি-পাদনের দৃষ্টান্ত হিসাবে এ প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করছি।

সাহিত্যের বাহন ভাষা। ভাষা শব্দের মালা। কিন্তু প্রত্যেক শব্দ অন্তরের ভাব বা বাহিরের বস্তুর নির্দ্দেশ। অর্থহীন বাক্য-প্রলাপ। ভাষা ভাবের স্মরণ। লিখিত ভাষা ভাবকে স্থায়ীরূপ দেবার ব্যবস্থা।

মাত্র কথার উদ্গার সাহিত্য নয়। লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত, প্রবচন, সূত্র বা আদেশ কিন্তু তাকে সার্থক করতে পারে মাত্র—সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক ইংরাজীতে তেমন ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন, যেমন—বেকন, গ্রীসে ডেমস্‌থিনিস, ভারতে চাণক্য এবং এ কালে কবি-তায় রবীন্দ্রনাথ। সকল দেশে সকল কালে এমন অনেক সাহিত্যিক জন্মেছেন। তেমন সব্যসাচীদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের পাঠক কম তাই কর্ম্মক্ষেত্র অপ্রসস্ত। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যে থাকে রূপ, মনের পটের রূপ, যা' জমাট বেঁধে পরের চিত্তপটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের সিদ্ধান্তকে প্রাণবন্ত করতে চায়। সুকোমল ভাব সুললিত ভাষায় ব্যক্ত হয়, উচ্চভাব ফোটাতে গেলে নমনীয় ভাষাকে কমনীয়তা দান না করতে পারলে রচনা ব্যর্থ হয়। পাখীর গানের মত সাহিত্যের লক্ষ্য অন্যের মন—যার মাঝে সে ফুটিয়ে তুলতে চায় ভয়, ভক্তি, প্রেম, বিরোধ, শান্তি বা অশান্তির চিত্র। তাই মাত্র সূত্রাকারে কথা গেঁথে গেলে সাহিত্য ব্যর্থ হয়। তার অঙ্গে থাকা চাই যুক্তি বা যুক্তির মুখোস-পরা কুযুক্তি, মনোহর রস বা তার ভান। মোট কথা সাহিত্য প্রলাপ নয়, বৃথা কথার মালা নয়, নিজের আত্মতৃপ্তির প্রয়াসে নিজের মর্ম্মকথার গুঞ্জন নয়। সাহিত্য-স্রষ্টার লক্ষ্য অন্যের মন। আলোক-চিত্র বিক্ষেপের মন্ত্রের মত সাহিত্য এক জনের আঁকা ছবি বহু মনের পটে প্রক্ষেপ করে।

পরের মনে ছবি আঁকবার গুরু অধিকার যার, তার দায়িত্ব দারুণ। সুষ্ঠু-সমাজের বিধিনিয়ম চায় না, নিজের ঘরের জঞ্জাল পরের আঙ্গিনায় নিক্ষেপ।—নিজের অসাবধান মনেই এমন ভাব জাগে, পরে মোহ কেটে গেলে, যার স্মৃতি লজ্জা দেয়। সুতরাং আমার মনের গভীরে যে ভাব মুক্তি চায়, সে ভাবমাত্রকে রূপ দিলে, সাহিত্য-সেবীর রুদ্ধভাবকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু অবি-মৃষ্যকারিতাকে মাপজোপ বা ওজন না ক'রে প্রক্ষেপ করলে নিজেরই প্রতি অবিচার করা হয়। এবং পরে যে ভাব নিজের মনকে অনুতপ্ত করে, সেভাবে অন্যকে অনুপ্রাণিত করবার প্রয়াস অসাধু। এ কথা একান্ত সত্য যে, বহু লোক ছাপার অক্ষরে তৈরী অভিমত পেলে নিজের মানসিক শক্তির অপচয় করতে নারাজ। বিচার-বিতর্কের হাঙ্গামা এড়িয়ে তারা পরের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ব'লে মেনে নেয়।

প্রবচন রূপে যে সব সিদ্ধান্ত সভ্য সমাজে বহুদিন মানুষের মতিগতি নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে, পরবর্ত্তীকাল সুযুক্তির দ্বারা তাকে খণ্ডন ক'রে পাঠকের মনকে মুক্ত ক'রবার অবকাশ লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের চাণক্য ম্যাকিয়াভিলির প্রবচন যে দুষ্ট, সে কথা বেকন প্রমাণ ক'রেছিলেন, তাঁর নিজের সূত্রাকার উক্তিগুলা সম্বন্ধেও তিনি পাঠককে সতর্ক ক'রেছিলেন, সকল রচনা সম্বন্ধে দার্শনিক সোপেনহেয়ারের অভিমত—যে বিনা বিচারে কোনো মত নিজস্ব করা অবিধেয়। কিন্তু সাধারণ কয়জন পাঠক সেক্সপীয়ার, কালিদাস, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ প'ড়বার সময় ঐ সব দার্শনিকদের সতর্ক-বাণী জানে বা ভাবে। ধরুন—বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ—বহুদিন ভারতের চিন্তাধারা এবং কর্ম্মের গতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে। কিন্তু মাতৃ-জাতি সম্বন্ধে অত বড় গ্লানিকর মিথ্যা কথা সু-সাহিত্যের রাঙ্‌তা মুড়ে অপর প্রখ্যাত লোক সূত্রাকারে ব'লেছেন, এ-কথা আমার স্মরণ হয় না। কারণ স্ত্রীষু বিশ্বাসম্ সৃষ্টি ও কৃষ্টির মূল। যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ—এ মনুর মত। যুক্তিতর্কে যে প্রত্যক্ষ কথা বিচার ক'রে নিজস্ব করে, তার পক্ষে প্রত্যেক লোকের রচনা, মাত্র একজনের অভিমতরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু জীবিকা-রণের দৈনন্দিন ত্রাহি ত্রাহি ব্যাপারে ক'জনের মেধা সজাগ প্রহরীর কাজ কর্ত্তে পারে, প্রতি ছত্র প'ড়বার সময়। পণ্ডিত বহু পুস্তক পাঠ করে। কাজেই

পরস্পর বিরোধী মত শোনে। বিচার না ক'রলে তারও সংশয় আসে। হয়তো তার কথা স্বতন্ত্র। বুদ্ধি মার্জ্জিত ক'রলে, ন্যায় অন্যায় বোধ সংস্কৃতি লাভ করে। স্ত্রীলোকে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। আবার অন্য দর্শন বলে—জগতের সকল বিদ্যা, সকল স্ত্রী, সকল কলা, মহাদেবী—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়াঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন কৃষ্ণকান্তের উইলে—"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী,—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ; দেবতার ছায়া পুরুষেরা দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া। বিশ্বান এক শ্লোকে পড়ে—বিধিরহো! বলবান্ ইতি মে মতিঃ— অন্যত্র পড়ে— দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি। কিন্তু পণ্ডিতের মধ্যে মূর্খের অভাব নাই। আর গড্ডালিকা-প্রবাহের মত জনগণ-মন শ্রেষ্ঠমনের অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠমন আত্মপ্রকাশ করে সাহিত্যে। তাই সাহিত্য-স্রষ্টার দায়িত্ব প্রগাঢ়।

ভাষার প্রসঙ্গে আমরা নিত্য শুনি যে, সে যেমন মনোভাবের ব্যঞ্জক, তেমনি প্রকৃত মনোভাব গোপনের সহায়ক। হাটে-বাজারে বৈঠকে ও সভাগৃহে বিশেষ আদালতের ধর্ম্মগৃহে এ-কথার আমরা নিত্য প্রমাণ পাই। বিদ্যাবাণী, বাক্যব্রহ্ম—এ সত্য লেখক ভুলে যায় ছন্দের মোহে, ভাষার প্রাচুর্য্যে তথা দীনতায়। আন্তরিকতা ক'জনের লেখনী হ'তে প্রসূত হয়! শব্দের ঝঙ্কার, ভাষার দ্যোতনা, মার্জ্জিত কথার চাকচিক্য সাবলীল ছন্দের ঘূর্ণীপাক নদীর বিরোধী স্রোতের মত অকূলী পাটনীকে আঘাটায় পৌঁছে দেয়। সূক্ষ্ম মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে ভাষার বেড়াজালে কাতর হয় এবং শব্দদীনতায় অস্পষ্ট হয়। কবির ভাষায়—

গীত অবশেষে নিঃশ্বসিল কবি
বল কি গাহিব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে
বাজিল না হৃদি তার।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মান কবি সিলার ব'লেছিলেন—বরং সে যা বাদ দেয় তা থেকে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি সাহিত্য শব্দের ধাতুগত বা মজ্জাগত অর্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় নানা দেশের, নানা যুগের রচনা শাস্ত্রের গোলোক-ধাঁধায় ঘুরব না। কারণ শব্দের ঊর্ণনাভে জড়িয়ে গেলে, স্পষ্ট ধারণাও ঝাপসা হয়। চুলচেরা তর্কের স্বভাব নূতন বিতর্কের আবাহন, যার অনিবার্য্য পরিণাম কুহেলিকার নিবিড়তা। মনোরম, হিতকর কথায় গাঁথা সুষ্ঠু ভাবই সাহিত্য। বলেছি অপরের চিত্ত তার লক্ষ্য। নিজের মূর্ত্ত অনুভূতিকে পাঠকের হৃদয়ে প্রতিফলিত ক'রে, তার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তোলা সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সে নিজের অনাবিল সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বসিত লীলায় উল্লসিত করে মানুষের অন্তর। তাই নিজের অন্তরে সুন্দরের উপলব্ধি না হ'লে পরের মনে রস পরিবেশনের আশা, ব্যর্থতার মনঃপীড়া বাড়ায়।

সাহিত্যের কর্ম্মক্ষেত্র সারা সংসার। সাহিত্যিক নির্জ্জন বিরলে অবকাশ পায় আত্ম-দানের। দার্শনিক উপলব্ধির কথা স্বতন্ত্র। দৈনন্দিন জীবনকে যে সাহিত্য আঁকতে চায় বা নিয়ন্ত্রিত করতে চায়, তার স্রষ্টার একান্ত প্রয়োজন মনুষ্য চরিত্রের অভিজ্ঞতা। সামাজিক জীবনের স্পর্শে সে অভিজ্ঞতা সম্ভবপর। পরিবেশের হর্ষ, হাসি অশ্রু ক্রন্দনের ঘাত-প্রতিঘাত তার দরদী প্রাণে প্রতিফলিত না হ'লে, সাহিত্যিক মাত্র উদ্গার করতে পারে, মাজা-ঘষা অভিধান ও ব্যাকরণ শুদ্ধ কথার লহর। অবাস্তব ছেঁদো কথা লেখকের আত্মতৃপ্তির অবকাশ দিতে পারে, পরের প্রাণে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আমরা সমাজের অঙ্গ। বহুর চেতনার উজ্জ্বল বা মলিন ছায়া দিয়ে ব্যক্তিত্ব রচিত। সে ব্যক্তিত্বর দূর-দৃষ্টি থাকলে, সে চেতনা প্রীতি-চঞ্চল হ'লে, তবেই মাইকেলের প্রমীলার মত দুর্দ্ধর্ষ আবেগে বাহিরিতে পারে। তখন তার পক্ষে সমাজ-সেবা, দশের সেবা, দেশের সেবা সম্ভবপর। জাতীয় সাহিত্য একদিকে যেমন জাতীয় জীবনের ছায়া, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় আদর্শের নিয়ন্ত্রক। সাহিত্যিকের দায়িত্ব বর্ত্তমানের স্পষ্ট দর্শনের। ততোধিক নির্ভীক অথচ যথাসম্ভব অভ্রান্ত উপলব্ধি আগন্তুক দিনের প্রয়োজনের। লোক-শিক্ষার সেই প্রয়োজনের আয়োজন সাহিত্যের অধিকার এবং দায়িত্ব।

আমার মনে হয় সাহিত্যের সকল শাখা হ'তে, দৈনিক বা সাময়িক সংবাদ সাহিত্যের দায়িত্ব অত্যধিক। মাত্র সংবাদ সরবরাহ সাংবাদিকের ধর্ম্ম নয়! সম্পাদকের মন্তব্য বহু দেশ-বাসীর মতামত সৃষ্টি করে। সংবাদ-পত্রের ছাপার অক্ষরের তৈরী অভিমত প্রভাতের চায়ের সঙ্গে মরমে প্রবেশ করে। তাই এক্ষেত্রে অসাধুতার অবকাশ প্রচুর। এখন প্রপাগাণ্ডার বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্ব জুড়ে। যার ঢাক যত শব্দ করে, তারই জয় জয়কার। কিন্তু আমরা জেনে শুনেও ভুলে যাই যে অর্থ, খেতাব বা আত্মীয়ের চাকুরী জয়ঢাকের সুর ও তালের নিয়ন্ত্রক। বাণী-মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব এমন ভাবে যে অপবিত্র করতে পারে, তার বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষা ও সাধনা নিজের ও পরের সর্ব্বনাশের নিছক হেতু। সংবাদপত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে জানা যায় যে, বিলাতের টাইম্‌স পত্রিকা বহু মন্ত্রিমণ্ডল গড়েছে এবং ভেঙ্গেছে। লর্ড নর্থক্লিফের প্রভাব ছিল অতুলনীয়। আর এক শ্রেণীর বিলাতী সাংবাদিকের ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী প্রভাব এ-দেশের ন্যায্য অধিকার হ'তে ভারতবর্ষকে মাত্র বঞ্চিত করে নি। মিস্ মেয়ো, বেভারলী নিকলস্ প্রভৃতি ভাড়াটিয়া নিন্দুকের মারফত ভারতের নরনারীর চরিত্রে অযথা কলঙ্কের কালি মাখিয়েছে। ও জাতের সম্বন্ধে সাধক কবির কথায় বলা যায়—কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিকালি, এমনি মন তোর কপাল পোড়া।

বাংলার কৃষ্টির অভিব্যক্তির ইতিহাসে সংবাদ ও মাসিক পত্রের সহকারিতা আমাদের সকলের স্মরণ আছে। তারা আমাদের এ যুগের মতামতের ধীরে ধীরে নব নব স্রোত বহিয়েছে। ১২৭৯ সালে ১লা বৈশাখ (১০ই এপ্রিল ১৮৭২) বঙ্গদর্শনের প্রথম আবির্ভাব হতেই এক নবীন যুগ প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। অবশ্য তার পূর্ব্বে ১৮৫৪ সালে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। পরবৎসর ৫৫ খৃঃ অব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী এবং তার পরবৎসর সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা ভূমি তৈরি করেছিল। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের প্রভাব সেকালে প্রবল ছিল।

ইংরাজি আচার পদ্ধতির নির্ব্বোধ অনুকরণ দীনতার কবল হ'তে বাঙালীকে মুক্ত করবার দায়িত্ব যে সাহিত্যিকের, সে কথা উপলব্ধি ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন—

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

ইংরাজি সভ্যতার প্রবাহ তিনি সেকালে প্রতিরোধ করিতে পারেন নি। কিন্তু সে বাঁধের ভিত্ গাড়া হয়েছিল বলেই বাঙালীর ঘাড়ের ভূত নামতে আরম্ভ করেছিল। হটাং চক্ষু মেলে সাহেব মধুসূদন উপলব্ধি করেছিলেন—

পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন

আমরা যত ইংরেজি পড়ি বা যতই ইংরেজি লিখিনা কেন, ইংরাজি কেবল আমাদের মৃতসিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র।

দায়িত্ব শিশু-সাহিত্যের বড় বেশী। বিষ্ণু শর্ম্মার 'যন্নবে ভাজনে লগ্ন সংসারোনান্যথা ভবেত্'—এ বিভাগের সাহিত্য-সৃষ্টির সার নীতি। সুকুমার বয়সে একটা ভুল-তত্ত্ব বা দুষ্ট-নীতি আয়ত্ত করলে চিরদিন তার বিষ চরিত্রকে হীন করে। রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ—সাম্রাজ্যজয়ী ব্রিটেনের মনোভাব গড়েছে, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। পাল্লা দিয়ে রাবিশ সরবরাহ করতে গিয়ে, আমরা উত্তরকালের কী শত্রুতা কর্ত্তে পারি, এ কথা নিজের মনের পটভূমিতে এঁকে না রেখে, শিশু-মনে চিত্র আঁকবার প্রচেষ্টা সমাজদ্রোহিতা।

আজকাল সকল দেশে কথাসাহিত্যের পাঠক সর্ব্বাধিক, প্রাচীন দিনে রামায়ণ, মহাভারত, ওডেসী, ইলিয়ডের পাঠক সংখ্যা ছিল অগণিত, কারণ তারা গল্পের মত ললিত ভাষায়, মানুষের সুখদুঃখ, আচার অত্যাচার, কোমল ও কঠোর বৃত্তি ঘিরে রচিত। জাতীয় জীবনে এদের প্রভাব কত শতকব্যাপী তা গণিতের সংখ্যায় বলা কঠিন, কারণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব কোন্ বংসরে তা'রা রচিত হ'য়েছিল তার নির্দ্ধারিত সংবাদ ইতিহাস রাখে নি। তবে তাদের রচনার দিন থেকে যে তা'রা আবাল বৃদ্ধকে কাব্যরস বিতরণ ক'রেছে, এ-কথা নিঃসন্দেহ। ব'লছিলাম কথা-সাহিত্যের কথা। আমরা অবসরের সহচর ভাবি নাটক ও উপন্যাসকে। কিন্তু সমাজে তাদের প্রভাব যে উপলব্ধি না করে সে অন্ধ। এ প্রসঙ্গ এক বড় প্রবন্ধের বিষয়। আজ এর আলোচনা অসম্ভব। কেবল এই কথা বলতে চাই যে আমাদের চিরদিন স্মরণ রাখতে হবে যে গল্পের ভিতর দিয়ে আমরা সমাজ-দেহে শ্রো পয়জন সঞ্চার করতে পারি এবং নিত্য করি। বিশেষ যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধে। যৌন-মিলন-পিপাসা মাত্র মানুষের কণ্ঠে নয় তার অন্তস্থলে চির বিদ্যমান। মানুষ আদিকাল হ'তে সমাজ গড়েছে, তাকে সংযত করে। সে ছাই-চাপা আগুন জ্বালিয়ে তোলা সহজ, তাতে আর্টের কোনো বালাই নাই। উত্তেজক ময়লা ছবি আঁকতে শিল্প-নিপুণের প্রয়োজন হয় না। এমন পুস্তকের চাহিদাও চৈতন্য-লীলার চাহিদা হ'তে বহু সহস্র গুণ। সুতরাং এখন পুস্তকের আশীর্ব্বাদে লেখক ও প্রকাশকের অর্থাগমের পথ হয় সরল। কিন্তু আপনার ও পরের ঘরের প্রতি দায়িত্ব স্মরণ ক'রে যদি আমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারিত না করি, সমাজ দেহ বিষে জর্জ্জরিত হবে।

একটা বিষয়ের আভাস মাত্র এস্থলে দেওয়া যায়। ব্যঙ্গ কাব্যের প্রভাব সমাজে সামান্য নয়। নাটক লোকমত গড়তে পারে, যদি সঙ্ঘের মেজাজ বুঝে নাট্যকার ট্র্যাজেডি বা প্রহসন লেখেন। কিন্তু যখন সাগর উদ্দেশে শাখা বাহিরায় নদীর ভঙ্গীতে লোকমত একটানা স্রোতে বয়, নাটকের অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় হতে পারে, কিন্তু সমাজের মত-প্রবাহে তার বিরোধ ভেসে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুখানি নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে—নীলদর্পণ ও কালাপানি। নীলদর্পণ নীলকরের মাত্র অত্যাচার কেন ব্যবসার অস্ত করেছিল। কিন্তু রসরাজ অমৃতলালের কালাপানি প্রকাশের পর ঝাঁকে ঝাঁকে নরনারী সমুদ্রযাত্রা করেছে, নিন্দনীয় প্রথার অন্তঃসলিল স্রোতও নাটক বা সাহিত্য বন্ধ করতে পারে না। তারা চক্ষুলজ্জা বাড়াতে পারে। চোখে-আঙুল দিয়ে দেখানো দোস লোকে স্বীকার করে, কিন্তু কু-লোকে তাকে বর্জ্জন করে না। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বলিদান এই শ্রেণীর নাটক। গিরিশচন্দ্র সমাজ শোধরাবার দায়িত্ব বুঝেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন! কিন্তু হা মোর অভাগা দেশ পণ-কু-প্রথার আজিও উচ্ছেদ করতে পারলে না। মিঃ অমিট রে ও তার সঙ্গিনীদের সাহেবীয়ানা কিন্তু কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যে রকম দরদের তুলিকায় এঁকেছেন, তার পরিণামে লাবণ্যর শ্রেণীর শিক্ষিতাদের পরিবর্ত্তন সম্ভব। কারণ সেটা বাহিরের রোগ মাত্র; অন্তরের ব্যাধি নয়। পোপের রেপ অফ্ দি লকে বর্ণিত—প্রত্যেক নূতন শোভার পোষাক এক একটা নূতন রোগ, পাশ্চাত্য মহিলাদের কতটুকু রুচি পরিবর্ত্তন করেছিল, তা জানি না! কিন্তু পোপ-সাহিত্য যে সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিল, তা বিফল হ'য়েছে একথা বলা যায় না। বার্ণার্ডশ'র সাহিত্যের ফলাফল যুদ্ধের ঝঞ্ঝাটে বোঝা কঠিন।

শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর উপর কাব্যসাহিত্যের প্রভাব অসীম, বিশেষ আমাদের দেশে, ধর্ম্ম জগতে কবিতার প্রচার-শক্তি বাঙ্গালী জানে। বিশ্বের সকল সভ্যজাতির সুকোমল ভাবের উদ্দীপনার মূল কবিতা। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম্মের বাহন কাব্য। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষের চিত্তে সুরের আগুন লাগিয়ে রেখে ছিলেন বৈষ্ণব কবিরা। প্রেমের উন্মাদনার চিত্র বাঙলার কাব্যসাহিত্যে একদিন যেমন সোনার ফসল ফলিয়েছিল, এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন কবিওয়ালা তেমনি মলিন নিষ্প্রভ এবং অপবিত্র করেছিল কাব্য-সুন্দরীকে। পূর্ব্বে যা বলেছিলাম এ বিষয়েও সে কথা বলা যায়—আদিম বৃত্তির কুৎসিৎ উত্তেজনা অবিবেচকের নীচ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু সু-সাহিত্য তার প্রবৃত্তিকে মার্জ্জিত করে কৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল করে। সুখ দুঃখ দুটি ভাই। সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি, দুঃখ যায় তার ঠাঁই—প্রেম-সাধনার শেষ কথা। কিন্তু অকৃতী হাতে এ বিকৃতি কদাকার মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে।

আধুনিক যুগের কিছুপূর্ব্বে সাধক রামপ্রসাদ গীতিকবিতায় বাঙলা দেশ মাতিয়েছিলেন। তারপর এ যুগের নাট্যকার ও কবিরা যে তানের লহরে সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছেন, তার সুর না নামে, সে বিষয়ে দায়িত্ব উদীয়মান কবিদের। ধনীর বংশধর উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পত্তির অধিকারী হয়। কিন্তু যে তার অপচয় করে, কিম্বা অকাজ কুকাজে আত্ম-নিয়োগ কোরে বংশের যশ মলিন করে, সে কর্ত্তব্য-বিমুখ। তেমনি দায়িত্ব আজিকার নাট্যকার ও কবির।

সময় অল্প। বিষয় বিশাল। আর একটা গুরু দায়িত্বের উল্লেখ করব। আমাদি! বাঙলা ভাষা—বাঙলার হিন্দু মোস্লেম ও খৃষ্টানের যৌথ সম্পদ। তিনের মিলে এর পুষ্টি। প্রথম কথা, যে সব শব্দ সহজ অভিব্যক্তির কিম্বা আবশ্যক নির্ব্বাচনের ফলে বিদেশী শব্দকোষ হ'তে ভাষায় গৃহীত হয়, তারা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু জিদ্ ক'রে বিদেশী শব্দ আমদানী করলে ভাষা-জননী পীড়িতা হ'ন এবং বিদেশী বাক্যও নিজ অর্থচ্যুত হয়। উপন্যাসে বাস্তবের রূপ দেবার জন্য অনেক সময় নায়ক নায়িকার মুখে অনাবশ্যক ইংরাজি বুকনী দেওয়া হয়, তাতে বর্ণনা কাতর হয়। একশ্রেণীর মুস্লিম লেখক ফারসী ও আরবী কথার দ্বারা বাংলা ভাষাকে আড়ষ্ট করেন। বহু ফারসী এবং অনেক আরবী কথা রূপ এবং উচ্চারণ বদলে সহজে বাঙলার মধ্যে মিলে গেছে। মুসলমানী ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল শব্দই আরবী এবং হওয়াও উচিত আরবী আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে। কিন্তু যে কথা দেশের লোক বোঝে না, সে শব্দ ভাষার মধ্যে আনা অন্যায়। বলছিলাম সাবধান হওয়ার কথা। কোন লেখক যদি অন্য মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে কোনো হাল্কা রসিকতা বা অন্যায় মন্তব্য করেন, তিনি দেশের ও দশের প্রভূত ক্ষতি করেন, বিশেষ এসময়। সাম্প্রদায়িক একতা বাড়াবে মাতৃভাষা। সেই ভাষার মারফত বিষ ছড়ালে, মানুষের ব্যবহার হবে নিষ্ঠুর এবং হিংস্রক। যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধেও অভিমত বা বর্ণনা আদর্শমূলক না হলে সমাজের মূলে অনিষ্ট ঘটে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে আদিম প্রবৃত্তিকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করা সভ্যতার উদ্দেশ্য। উদ্দামতা বা স্বৈরাচার বন্ধ না করলে মানুষ মানুষের সঙ্গে একত্র বাস করতে পারে না। সংযমে মানব জাতি বড় হয়েছে। সেই সংযম হারিয়ে তার পক্ষে পশুত্বে প্রত্যাবর্ত্তন নিত্য সম্ভব। ব্যক্তি এবং সমষ্টি মানবে এ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ দেখি।

সাহিত্যসেবীর স্থান সমাজে অতি উচ্চ। ধনীর মৃত্যুর সাথে তার স্মৃতি যায়। রাজপুরুষের কর্ম্মচ্যুতির পর তার সত্তা লোপ পায়। কিন্তু জ্ঞানী লেখক অমর। লেখক মাত্রেই আশা করেন যশের এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের স্থায়িত্বের। তার অনিবার্য্য দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হ'লে, সাহিত্যসেবী কর্ত্তব্যচ্যুত হবেন।

দায়রার গল্প (৩)

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

নারীর মনে যতগুলি বৃত্তি পরিস্ফুরণ লাভ করে, তার মধ্যে বাৎসল্যই বোধ হয় সব চেয়ে বলশালী। একদিকে পৃথিবীর যা কিছু সুখসম্পদ সংগ্রহ করে রেখে, অপর দিকে সন্তানের স্বার্থ যদি স্থাপন করা যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিশ্চিত মেয়েরা দ্বিতীয় বস্তুটির প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করবে।

আমাদের বর্ত্তমান গল্পের নায়ক শোভানি এই স্থূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেনি বলেই বোধ হয়, আমরা যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডটির বর্ণনা দিতে চলেছি, তাতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এবং সেই কারণেই এই অপরাধের শাস্তি হতে অব্যাহতি পাওয়া দূরের কথা, প্রাণদণ্ড গ্রহণ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

শোভানি গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ। অবস্থা ভালই। সেই গ্রামের অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়ে কাজু বিবিকে যখন সে নিকা করে, সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার চার বছরের ছেলে কালুর ভরণ-পোষণের ভার সে গ্রহণ করবে। এইটুকু শিশুর অন্ন-বসনের বোঝা এমন গুরুতর নয় যে, তার মত সমর্থ ও সমৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তা শক্ত হয়ে উঠবে। কাজু বিবিরও অবস্থা এমন ছিল না যে, শিশু সন্তান ও নিজের অন্ন সংস্থান সহজে হবে। সে সমস্যার এই সহজ সমাধানের প্রলোভনই ত তাকে এই নূতন দাম্পত্য জীবনে আকৃষ্ট করেছিল।

কিন্তু শোভানি তার সৎ ছেলে কালুকে কি চোখে দেখেছিল কে জানে? অল্পদিনের মধ্যেই অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, এই ক্ষীণদেহ নিঃসহায় বালকটি হয়ে উঠল তার চক্ষুশূল। তার দর্শনই শোভানির অসহ্য, নিতান্ত অকারণেই যখন তখন তার দেহের উপর প্রচুর প্রহার বর্ষণ হত। সে অবস্থায় বেচারী কালুর একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল তার স্নেহময়ী মায়ের বক্ষ। সেখানে মুখ ঢেকে নিতান্ত দুঃখেই সেই শিশুর দিনাতিপাত হত।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহের সূত্রপাত হল। সেই কলহ ক্রমশ ঘোরতর বিবাদে পরিণত হল। এমন কি শোভানি এক দিন প্রস্তাব করে বসল যে, এই ছেলেকে তার ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু শোভানি কাজু বিবিকে ঠিক চেনে নি। সে প্রস্তাব সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল এবং জানিয়ে দিল—ছেলেকে ছাড়তে হলে তাকেও তার ছাড়তে হবে।

কিছুদিন যায়। শোভানির আচরণে কিছু যেন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হল। সৎ ছেলের কথা সে আর তোলে না। স্ত্রীর সহিত ব্যবহারও তার নরম হয়ে এসেছে। এত ঝঞ্ঝাটের পরে এই আচরণ কাজু বিবির মনে হয় ত আশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে থাকবে। কিন্তু, আসলে, কোন্ নরক হতে উদ্ভূত কোন্ বীভৎস

পাপের বীজ যে শোভানির উর্বর মাথায় অঙ্কুরিত হতে চলেছিল, তার আভাসও সে পায়নি।

এই নূতন স্বস্তির আবহাওয়ার মাঝখানে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় শোভানি প্রস্তাব করে বসল—চল না, কাল মামার বাড়ী বেড়িয়ে আসি, তিন জনে। দুদিন থাকা যাবে।

একঘেয়ে জীবনে এমন চিত্তাকর্ষক ব্যতিক্রমের আমন্ত্রণে কাজু বিবি সহজেই সাড়া দিল। সে তখনি সম্মতি দিল। গন্তব্য-স্থল ৯।১০ মাইল দূরে, পায়ে হাঁটা পথ। প্রখর জ্যৈষ্ঠের দিন। কাজেই উভয়ের সম্মতিক্রমে ঠিক হল যে পরের দিন প্রাতে সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বেই তারা রওনা হবে ব্যবস্থা তাদের পথের কষ্ট কমিয়ে দেবে।

যথাসময়ে তারা রওনা হল রাত তিনটার সময়। শোভানির হাতখালি, কাজুবিবি কালুকে কোলে নিয়ে তার অনুসরণ করছে। সময় শেষ রাত্রি। পথে জনমানব নাই।

দীর্ঘপথ চলে গিয়েছে নির্জ্জন মাঠের মধ্য দিয়ে। তারা প্রায় মাইল দুয়েক অতিক্রম করে গিয়েছে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পূবের দিকে আকাশ ফিকে হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের গাঢ়তা এমন ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে দৃষ্টি-শক্তিকে আর বিশেষ বাধা দেয় না।

দেখতে দেখতে তারা এসে হাজির হল এক পুরাণো মজা দীঘির ধারে। দীঘি যে এককালে বড় ছিল, তার আয়তনই তা নির্দ্দেশ করে। তবে তার গভীরতা বহুদিনের সংস্কারের অভাবে কমে গিয়েছে। এখন গ্রীষ্মের দিনে জল প্রায় ছিলই না, বড় জোর হাটু অবধি। জলের তলদেশে পাঁক প্রচুর।

সেইখানে এসে শোভানি প্রস্তাব করল—ছেলেকে এবার আমায় দাও, তুমি ত অনেকক্ষণ বয়েছ।

এ প্রস্তাব আপাতদৃষ্টিতে এমনি যুক্তিসঙ্গত ঠেকবে যে, তাতে আপত্তি উত্থাপন না হবার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু কাজু বিবি তাতে সম্মতি দিল না। সে বলল—ছেলে যে তোমায় বড় ভয় করে। দরকার নেই, আমিই বইতে পারব।

কিন্তু স্ত্রীর এই প্রত্যাখ্যানে শোভানিকে যেন অসঙ্গত রকমেই রুষ্ট করল। সে ধৈর্য্য হারাল, এবং বল প্রয়োগ করেই তার কোল হতে কালুকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চেষ্টা করল।

সন্তানের বিপদ যখন ঘনিয়ে ওঠে, মার মন বোধ হয় নৈসর্গিক শক্তিবলে সে কথা এমনিই জানতে পারে। কাজুবিবি শোভানির এই অসঙ্গত আচরণে সন্তানের আশু বিপদ আশঙ্কা করল। সে প্রাণপণ বলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরল। সন্তানকে বুক হতে বিচ্ছিন্ন করতে সে দেবে না, কিছুতেই দেবে না।

তখন বোধ হয় শোভানি তার অন্তরের নিষ্ঠুর অভিসন্ধিকে গোপন রাখবার আর প্রয়োজন বোধ করল না। সে অসুরের বলে স্ত্রীকে আক্রমণ করল। পুরুষের দৈহিক শক্তির সহিত নারীর দৈহিক শক্তির তুলনাই হয় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই শোভানি তাকে ভূপাতিত করল ও তার নিরুপায় হাত দুটির আবেষ্টনী হতে তার সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করে নিল।

তার পর যা ঘটল তা আরও মর্ম্মন্তুদ। হতভাগ্য কালু এতই ছেলে মানুষ যে, তার সংবাপ ও মায়ের এই সংঘর্ষের তাৎপর্য্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। সেই কারণেই শোভানি যখন তাকে তার শেষ যাত্রায়, কোলে তুলে না নিয়ে পায়ে হাঁটিয়েই নিয়ে গিয়েছিল, সে বাধা দেয় নি। হাতে ধরে শোভানি যখন তাকে পুকুরের ঢালু পাড় দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেও পায়ে হেঁটেই তার পাশাপাশি নেমে গিয়েছিল।

দীঘির বুকে নেমে গিয়ে, শোভানি তাকে তার সেই পঙ্কিল জলে ফেলে দিয়ে চেপে ধরল এবং সেই পাঁকের মধ্যেই সমাধি দেবার উদ্দেশ্যে বোধ হয়, দুপায়ে তার দেহকে দলতে লাগল।

ও দিকে দীঘির উপর স্বামীর আক্রমণের আঘাতে কাজুবিবি একটু যেন মুহ্যমান অবস্থায় পড়েছিল। নিজেকে একটু সামলে নেবার মত শক্তি সঞ্চয় করে, সে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন উপরে বর্ণিত শেষ ঘটনাটি ঘটেছে। হতভাগ্য মায়ের হৃদয়বিদারক বিলাপধ্বনি তখন ভোরের আকাশের তলে নিস্তব্ধ মাঠের বুকে ব্যাহত হয়ে ফিরে এল। কেইবা আছে যে সাড়া দেবে, এই নিষ্ঠুর হত্যা নিবারণ করবে?

তখন কাজুবিবি যা করল, সাধারণ মানুষ তা পারে না। সে এক দৌড়ে, সেই দীর্ঘ ছয় মাইল পথ এক নিঃশ্বাসে ছুটে গিয়ে, হাজির হল তার নিজের গ্রামে, যে গ্রাম হতে তারা সেদিন শেষ রাত্রে রওনা হয়েছিল। এই পথ অতিক্রম করতে সময়ও তার বেশী লাগেনি, কারণ সেখানে গিয়ে যখন সে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তখন প্রতিবেশীরা সবে বিছানা ত্যাগ করে, ঘুমের আমেজ লাগা চোখ নিয়ে বাহিরে আসতে সুরু করেছে।

পরিশ্রমে তখন তার শ্বাসরুদ্ধপ্রায়, উত্তেজনায় চোখ মুখ লাল, তবু ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করেই সে সংক্ষেপে যা জানাল তার মর্ম্মার্থ এই যে তার ছেলেকে তার সংবাপ পুকুরের পাঁকে ডুবিয়ে হত্যা করেছে এখনি তার সাহায্যের প্রয়োজন। হায় রে মায়ের মন! তার খেয়ালই হল না যে, নতজানু পদেই সে আসুক, এই দীর্ঘ ছয় মাইল পথ অতিক্রম করতে তার যে সময় লেগেছে, তা সেই নিরীহ শিশুর ক্ষীণ প্রাণ প্রদীপকে নির্ব্বাপিত করবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সময়।

যাই হক; তার সে আবেদন ব্যর্থ হল না। গ্রামের দুইজন যুবক প্রতিবেশী, তাকে আশ্বাস দিল, তার সঙ্গে তারা সেখানে যাবে এবং সম্ভব হলে তার ছেলেকে বাঁচাবে।

আবার সুরু হল সেই দীর্ঘ পথ ধরে রুদ্ধশ্বাসে নিষ্ফল দৌড়। মা ও সেই দুই যুবক। সেই পুকুরের কোনে এসে মা দেখাল সেই পচা দীঘির বুক, যার পাঁকে তার ছেলের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে।

নির্জ্জন মাঠের মাঝখানে সেই দীঘি। জনমানব চোখে পড়ে না। শোভানি সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। কালুরও কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু বিধির বিধান এমনি, যে তবু নজরে পড়ে গেল দুটি নীরব সাক্ষ্যের ইঙ্গিত।

সেই দীঘি এমনি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত যে তা ব্যবহার

করবারই কারও বড় একটা সুযোগ ঘটেনা। ঘটলেই বা কি; তা এমনি জরাজীর্ণ যে হেজে মজে গিয়ে তার ব্যবহারের উপযুক্ততার কিছুই বাকি ছিল না। এহেন দীঘির ঢালু পাড়ের এক স্থানে দেখা গেল দু জোড়া পায়ের চিহ্ন,—এক জোড়া বয়স্ক মানুষের ও অপর জোড়া শিশুর। তারা পাশাপাশি বা কাছাকাছি সমান্তরাল ভাবে নেমে গিয়েছে সেই ঢালু ভূমি বেয়ে। উপরের অংশে যেখানে ভূমি কঠিন, সেখানে দাগ পড়ে নি। নিচের অংশে যেখান হতে ভূমি নরম হতে সুরু করেছে, সেখান হতে সেই চিহ্নগুলির সূত্রপাত এবং যতই তা দীঘির বুকে জলের নিকটে নেমে গিয়েছে, ততই তা গভীর হতে গভীরতর হয়েছে, কারণ মাটি সেখানে তুলনায় আরও বেশী রসযুক্ত।

জলরেখার প্রান্তে যেখানে সেই দাগগুলি শেষ হয়েছে, তার বেশ কয়েক হাত দূরে দীঘির বুকে এক জায়গায় জল বেশী ঘোলাটে। উপরে তখনও বুদ্বুদ ভাসমান।

এই নীরব সাক্ষ্যের ইঙ্গিত অনুসরণ করে তারা নেমে গেল দীঘির বুকে যেখানটিতে জল বেশী পঙ্কিল। বেশী অনুসন্ধান করতে হল না। হাত পা নেড়ে পাঁকে কিছু পরিমাণ ভূমি অন্বেষণ করতেই এক মানবশিশুর দেহ তাদের সংস্পর্শে এল। তারা তাকে তুলে আনল দীঘির পাড়ে। বলা বাহুল্য, সেটি ছিল হতভাগ্য কাসুর শব।

তাকে বাঁচানর চেষ্টা তখন নিরর্থক।

স্থানীয় চৌকিদারের তত্ত্বাবধানে সন্তানের শবদেহকোলে ক্রন্দমানা মাকে রেখে তারা থানায় খবর দিতে গেল।

তদন্তের বিবরণ লম্বা করে দেবার কোন প্রয়োজন নাই। শোভানি ধরা পড়ল। দায়রায় তার বিচার হল।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা শোভানি যখন করেছিল, তখন সে বোধ হয় ভাবতেও পারে নি যে, ভাগ্য তার বিরুদ্ধে এমন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। যেখানে মানুষ ভেবে, চিন্তা করে, একটি বিশেষ হত্যাকার্য্য সম্পাদনের সংকল্প করে, সেখানে সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায়শ্চিত্ত হতে অব্যাহতি পাবার জন্য সে ব্যবস্থাও কিছু কিছু করেছে। সে ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে হত্যাকারীর বুদ্ধিশক্তি ও সাবধানতার উপর। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধির যে দৈন্য ছিল, সে কথা তার আচরণ সমর্থন করে।

এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিকল্পনা অনুসারে, এমন হত্যার স্থান নির্ব্বাচিত হয়েছিল, যেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। কাজেই মায়ের আচরণ যতই প্রতিকূল হক না কেন, কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বা প্রতিকূল সাক্ষ্য দেবার মত লোক জুটে যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অপর পক্ষে মামার বাড়ী নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখিয়ে কাজু বিবিকে এমনি প্রতারণা করা হয়েছে যে, অজানিত ভাবে তার সন্তানের হত্যাস্থলেই সে নিজেই তাকে বহন করে নিয়ে এসেছিল।

এ পরিকল্পনা অনুসারে হত্যাকার্য্য সম্পাদন যে সুসাধ্য হবে তাতে সন্দেহ নাই। প্রতিকূল সাক্ষ্যের হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়াও খানিক পরিমাণ সম্ভব। কিন্তু বিচারের হাত এড়াতে হলে, তার সাফল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণ তার স্ত্রীর আচরণের উপর। সেইখানেই শোভানি করেছিল ভুল। সে হয় ত ভেবেছিল—স্ত্রী আপত্তি করবে, বাধা দেবে, কান্নাকাটি করবে, কিন্তু সে বোধ হয় কল্পনা করতেও পারে নি যে, কাজু বিবির মাতৃহৃদয় এই ঘৃণিত কার্য্যের পর, এমন করে তার স্বামীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ন্যায়ের দরবারে আত্মোৎসর্গ করবে। রমণীর মনে সব থেকে শক্তিশালী বৃত্তি বাৎসল্য বৃত্তি। হতভাগা শোভানি সে খবর রাখে নি।

তাই দেখি যে, বিচারে সাক্ষ্য দেবার সময়, কাজু বিবির আচরণে ফুটে উঠেছিল এক অপরূপ ভঙ্গিমা, যা দর্শকের মনকে তার প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধায় অবনত করে। সে সাধারণ গ্রামের মেয়ে, শিক্ষা বিশেষ ছিল না। সাক্ষ্য দিচ্ছে মৃত সন্তানের পক্ষে, জীবিত স্বামীর বিরুদ্ধে। অথচ দেখি, তার চোখে-মুখে দুঃখ শোক বা বিদ্বেষ কোন হৃদয়বৃত্তিরই ছাপ প্রকাশ পায় নি। তার মৃত সন্তানের শোচনীয় অবস্থায় হত্যার বর্ণনা দিতে তার চোখের কোণে জল দেখা দেয় নি; অপর পক্ষে বিদ্বেষ বহ্নির উত্তাপের আভাস মাত্র তার আচরণে প্রকাশ পায় নি। তার আচরণ ধীর, সংযত, শান্ত, মুখ তেজোদীপ্ত। সে যেন ন্যায়ের বিচারালয়ে একটি দৃপ্ত আলোক-বর্ত্তিকা। সত্য উদ্ঘাটন করাই তার একমাত্র কাজ।

এই ঘটনার অপর পক্ষে আরেকটি দিক আছে, যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, চিন্তা করে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে হত্যাকার্য্য সংঘটিত হয়, সেখানেও সত সতর্কতা সত্ত্বেও হত্যাকারী অজানিতে নিজের বিপক্ষে অনেক সাক্ষ্য সৃষ্টি করে যায়। হাজারই বুদ্ধিমান জীব সে হক, সব দিক সামলান তার পক্ষে খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়। বর্ত্তমান ঘটনাটিতে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণের অনুকূল একটি অবস্থা পাওয়া যায়। তা এমনি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও এমনি চিত্তাকর্ষক যে, তার উল্লেখে ঘটনার সরসতা হানির কোন সম্ভাবনা নাই।

যে দু'জোড়া পদচিহ্ন দীঘির ঢালু পাড় বেয়ে, সমান্তরালভাবে দীঘির বুকে নেমে গিয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে, এই সামান্য অবস্থাটিকে দিয়ে আরও কত যে কথা বলান যেতে পারে এবং এই বিচারে কি বিপুল পরিমাণে তা আলোকপাত করেছিল, সেইটাই বিস্ময়ের বিষয়।

ছোট পদচিহ্নকে ছাঁচরূপে ব্যবহার করে এ ক্ষেত্রে এক বিশেষজ্ঞ কতকগুলি পা গড়েছিলেন। সেইরূপ মৃত দেহের পায়ের মাপেও এক জোড়া পা গড়া হয়েছিল। অপর পক্ষে আসামীর পায়ের মাপে এক জোড়া পাও বড় পদচিহ্নের ছাঁকে আর এক জোড়া পাও গড়া হয়েছিল। তুলনা করে দেখা গিয়েছিল যে উভয়ের দেহের মাপে গড়া পা ও পদচিহ্নের মাপে গড়া পা আকৃতিতে, আয়তনে পরস্পরের সহজ সম্পূর্ণ এক। এই অবস্থাকে ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছিলেন যে, দীঘির পাড়ে ছোট দু' জোড়া পা সেই শবের ও বড় দু' জোড়া পা আসামীর। এই আবিষ্কার একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অপর দিকে অবস্থাঘটিত প্রমাণ হিসাবে তেমনি নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য।

গাল ও গল্প (১)

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

মহাজন-পন্থা

এক

ধর্ম্মরাজ প্রশ্ন করিলেন : কঃ পন্থাঃ ?

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন : মহাজনো যেন গতঃ। বকরূপী ধর্ম্ম পুত্রের উপর প্রসন্ন হইয়া ফুলমার্ক দিয়া দিলেন। "জল পানি" হইতেও বঞ্চিত করিলেন না, কিন্তু একপ্রকার নব্য অবতারবাদী বকধার্ম্মিক ছাড়া আজকালকার কোন পরীক্ষক এত সহজে নিষ্কৃতি দিতেন না। মানিলাম বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, মতভেদহেতু মুনিরাও না হয় বাদ গেলেন। তবে মহাজন কাহাকে বলিতেছ? আর তাঁহারাই বা কোন ঐক্যতান ধরিয়াছেন? এখন ত মহাজন মানে মৎকুণ জাতীয় মনুষ্য। নাড়িটেপা বদ্যির নাম কবিরাজ, হাতাবেড়ী ধারী পাচক মহারাজ, সুদখোর সাইলক মহাজন! একি বিশুদ্ধ ইয়ার্কি, না গুরু গম্ভীর শব্দের এই বিচিত্র লৌকিক পরিণতির পিছনে ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে? অবশ্য মহাজন শব্দে আর এক অর্থ হয়—মহতীজনতা বা Mob. তবে কি বহুলোক যে পথে যায়, যুধিষ্ঠির তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন? জনতা ত চিরকাল মধ্যপন্থী, কারণ অনুবর্ত্তনই সাধারণের স্বভাব; এবং তিনিই মধ্যম যিনি চলেন পশ্চাতে। যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। অধম অনেক সময় নিশ্চিন্তে উত্তমের সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া যায় বটে, কিন্তু সশঙ্ক মধ্যম চারিভিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পাত করিতে করিতে, মৃদুমন্দগমনে বহুপদাঙ্কিত পথে অগ্রসর হন। সাবধানী পথিকের পথ ভুলিয়া মরিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না, কারণ he always brings up the rear.

মধ্য পন্থা বা the path of least resistance; যে পথে পদে পদে প্রত্যহ কুশাঙ্কুর বিঁধিবে না। একেবারে নিষ্কণ্টক পথ পাওয়া যায় না। বাধাবিরোধ ত শুধু বাইরে নয়। যে পথে পা বাড়াও, পিছু টান আছেই। দ্বিধা সংশয় শেষ পর্য্যন্ত আর ঘুচে না। Conscience makes cowards of us all. একেবারে নির্বিরোধ পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। অধিকাংশ লোক চলে বহুব্যবহারে প্রশস্তীকৃত পথে যদিচ তাহা অনেক সময়ে আঁকা বাঁকা অসরল। আদর্শবাদীরা প্রথম পথিকৃৎ কিন্তু নিঃসঙ্গ। তাহাদিগকে একেলাই চলিতে হয়। ডাক কেউ শোনে না, শুনিলেও আসে না। কণ্টকপথে পদতল রক্তিম করিয়া, আদর্শের তুষানলে তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়া তাঁহারা নূতন পথ প্রস্তুত করেন। পরে পদচিহ্নানুসারীদের ভিড় তাহাকে বিস্তীর্ণ সুগম রাজপথে পরিণত করে। মহাজনের একক বন্ধুর পন্থা ক্রমে মহতী জনতার ব্যবহারে লাগে। যাহা ছিল একদা বহু আয়াস-সাধ্য দুঃসাহসিকতাপূর্ণ, তাহাই হইয়া দাঁড়ায় গতানুগতিক পরম সহজ। কিন্তু বহুব্যবহার মানেই বিনাশ। ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথ ক্রমে ভোঁতা হইয়া আসে। লোকের ভীড়ে পথ পঙ্কিল হইয়া উঠিতে দেরী লাগে না। তখন আবার নূতন পথের সন্ধান। এই ভাবে old order changeth, পাছে one good custom should corrupt the world. আবার সেই নূতন পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। বিশ্ববিধানে লুকোচুরী খেলার অন্ত নাই।

দুই

এই ত গেল সাধারণের অনুসৃত মধ্য পন্থা। সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে ইহারই সগোত্র আর একপ্রকার মধ্য পন্থাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার নাম doctrine of the golden mean, অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে আতিশয্য পরিহার। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়—সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্। অন্ততঃ হাস্যকর ত বটেই। নির্দ্দোষ জিনিষের বাড়াবাড়িই বেশী হাস্যোদ্রেক করে। মন্দ জিনিষের আধিক্য আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলিয়া হাসিবার ফুরসৎ পাওয়া যায় না। বয়স জিজ্ঞাসা করিলে যদি ঘণ্টা মিনিটের হিসাব দিই, যে মুহূর্ত্তে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যদি পুত্রের হাফ টিকিটের স্থলে পুরাটিকিট লইবার জন্য চেন টানিয়া গাড়ী থামাই, বাড়ীতে পাঁচটায় ফিরিব বলিয়া রাস্তায় নামিতেই যদি দেখি যে মনিব্যাগ ফেলিয়া আসিয়াছি কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া না গিয়া আক্ষরিক সত্যরক্ষার অনুরোধে এগারোটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ফুটপাতে টহল দিয়া কাটাই, তবে অত্যধিক সত্যনিষ্ঠার জন্যই লোকের হাসির খোরাক জোগাইব। আর অন্যের হাসিরূপ সামাজিক শাস্তিই শুধু নয়। ঐকান্তিকতা যার প্রকৃতিকটু—অন্য নাম একগুঁয়েমী বা গোঁড়ামি, শীঘ্র হৌক বিলম্বে হৌক বিপরীত প্রতিক্রিয়া আনিতে পারে। পেণ্ডুলাম একপ্রান্ত হইতে একেবারে অপরপ্রান্তে পৌঁছিয়া যায়। র‍্যাডিক্যাল যখন রাজভক্ত হন, তখন loyalist জো-হুকুমের এক ডিগ্রী উপরে যান। এ সব ত নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার কথা, কিন্তু জানা জিনিসই আমাদের চমক লাগায় বেশী। নূতন আবেষ্টনীতে পুরাতন যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন পরম প্রত্যাশিতকেও ক্ষণকালের তরে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় মনে হয়। আমার শিক্ষক-বন্ধুর কাছে তাঁহার এক ছাত্রের গল্প শুনিয়াছি। ক্লাস সুরু হইয়া যাওয়ার মাস দুই পরে সে আসিয়াছিল। একদিন তিনি ক্লাসে পড়াইতেছেন, এমন সময়ে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তেজোদৃপ্ত-মুখশ্রী হ্যাটকোট পরা এক যুবক অনুমতি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিবার পূর্ব্বেই শিক্ষক মহাশয়ের সবুট পদের ধূলি মস্তকে ধারণ করিল। বন্ধু ত ভিরমী যাওয়ার যোগাড়! বিষম খাইয়া চেয়ার উল্টাইয়া পড়িয়া যান আর কি! একে ত পশ্চিমাঞ্চলে পাদবন্দনার রীতিই একরকম অচল, তার উপর ধূলি-ধারী প্রায় সমবয়সী হবু ম্যাজিষ্ট্রেট! উদ্দতপক্ষ কুঞ্চিতনাসা সূক্ষ্মাকাশবিহারী olympian-দের বাংলা শিখাইতে গিয়া বন্ধুবর এমনিতেই সর্ব্বদা ভয়ে তটস্থ থাকিতেন। তাঁহাদের শ্বাসরোধকর সান্নিধ্যে কোনরকমে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া প্রাণ লইয়া মানে মানে ফিরিয়া আসা ক্রমে এক উৎকট সমস্যায় পরিণত হইতেছিল। ইংরেজ-নন্দনেরা নিজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের camaraderie ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিতে যদি বা কিছু সময় লয়, আমাদের স্বদেশীয় শ্বেতহস্তীদের আর তর সয় না। রাতারাতি নবাব হইয়া উঠিবার এমন বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত বুঝি বিশ্বসংসারে নাই। এ হেন সপ্তম স্বর্গে একি সর্ব্বনাশ! ভাষা-শিক্ষক 'মুন্সীর' পাদ-

বন্দনা! নবাগত ছোকরাটি শিক্ষকের মৃদু প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করিল না। দেখা গেল শিক্ষক মাত্রেরই সে পদধূলি সংগ্রহ করিতেছে। ইংরেজ শিক্ষকেরও পা ছোঁয়; আবার যে ঘোড়া চড়া শেখায়, তারও। এ দিকে মুখে লাগাম নাই। সমালোচককে সকরুণ অবজ্ঞায় ক্ষমা করিয়া যাইবে, এমন পাত্র নয়। কেহ এক কথা বলিলে নিমিষ ফেলিতে তিন খানা শোনাইয়া দেয়; বিবাদরদের cad, snob, pack of imbeciles ইত্যাদি সুমধুর সংজ্ঞায় অভিহিত করে; যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে মালা জপ করে; কোন কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াই কাগজের শীর্ষদেশে ছয়টি ভাষায় ইষ্টনাম লেখে। প্রথম মাসে মাইনে পাইয়া আদ্ধেকের বেশী বিলাইয়া দিল। প্রতি সন্ধ্যায় টুকরী ভরিয়া রুটি লইয়া রাস্তার কোণে দাঁড়াইয়া থাকিত। অসাধারণ তেজবীর্যের সঙ্গে ঐকান্তিক সরলতা সত্যনিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল তাহার মধ্যে। একবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম। অন্তরটা যাহার সদাসর্ব্বদা মারমুখো হইয়া আছে, তাহার চেহারায় উদ্যত-প্রহরণ ভাবটাই প্রথমে চোখে পড়িবে এই আশাই করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার লেশ মাত্র দেখিলাম না। এক নিষ্কলুষ পবিত্রতা চোখ দুটি হইতে যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। বন্ধু বলিলেন, তাহাকে না ঘাঁটাইলে যুযুৎসু প্রকৃতি ধরা পড়িবে না। তার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। Paul Brunton-এর বই পড়িয়া গুরুর সন্ধানে সে সমস্ত পশ্চিম ভারত একেবারে চষিয়া ফেলিয়াছিল। শেষকালে নিজের সহরের, নিজের চেয়ে কম বয়সের এক ছোকরার কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নেয়। দেহের রক্ত দিয়া আনুগত্যের শপথ স্বাক্ষর করিয়াছিল। গুরুর আদেশেই সে নানারকম দৃষ্টিকটু আচরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বন্ধুবর একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ভাল জিনিসেরও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। প্রতিকথায় সে my master বলিয়া গুরুর উল্লেখ করে দেখিয়া বলিলেন, কোন মানুষের উপরই এমন একান্ত নির্ভর করিতে নাই। মানুষমাত্রেই দেহ-ধর্ম্মের অধীন। কোনকালে যদি একবার গুরুর উপর শ্রদ্ধা হারাও, তবে ত্রিভুবন শূন্য হইয়া যাইবে। তখন কোথাও কিছু ভাল আছে, এই বিশ্বাসই থাকিবে না।—পায়ের ধূলা লইলেও ছেলেটি উপদেশ লইতে নারাজ দেখা গেল! বাক্য-সংযম শিখে নাই। সুতরাং গুরুমহাশয়ের মুখের উপরই কটুকাটব্য শোনাইয়া দিয়া শেষ কালে এমন পরম মূল্যবান্ দার্শনিক উপদেশটিকে rotten trash আখ্যায় অভিহিত করিল! এইভাবে মাস দুই কাটিয়া গিয়া, যখন তাহার উৎকট আতিশয্য সকলের চোখে কাণে ও গায়ে সহিয়া আসিয়াছে, তখন অল্পদিনের ছুটিতে গেল দেশে। ফিরিল যখন, সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। পায়ের ধূলা লওয়া ত দূরের কথা, সাধারণ বিনয় সম্ভাষণও বন্ধ। শিক্ষককে সম্বোধনের বেলায় Sir ছাড়িয়া Mr. ধরিল, পরে তাহাও ছাড়িয়া "Look here" বলিয়া বাক্যালাপ সুরু করিতে লাগিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে কি যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে বোঝা গেল না, তবে পেণ্ডুলাম যে এবার একেবারে অন্যপ্রান্তে পৌঁছাইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

বলিতেছিলাম যে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কোন কিছুই ত্যাজ্য নহে; সব কিছুই চাখিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু জোর টান সহিবে না—সংযম শুধু ভোগের বেলায় নয়, ত্যাগের বেলায়ও। সাধারণ মানুষের কথাই অবশ্য বলা হইতেছে কিন্তু অসাধারণরাও আজকাল এই দিকে ঝুঁকিতেছেন দেখা যায়। C. E. M. Goad তাঁহার যে দু'খানি যুদ্ধং দেহি গোছ আত্মজীবনী (Belligerent autobiography) লিখিয়াছেন, তাহাতে নিজেকে আরিষ্টটল ও কনফুসিয়স্ শিষ্য বলিয়া প্রচার করিয়া মধ্য-পন্থার এবম্প্রকার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।—

"মধ্যপন্থাবলে, আর যাহাই কর না কেন, অতিশয় আধ্যাত্মিক হইবার চেষ্টা করিও না। যদি সকলেই ঈশ্বরগ্রস্ত হইয়া (awhoring after God) মর্ত্যমুখো দৌড় লাগায়, তবে মনুষ্য জাতি টিকিবে কদিন? আবার, অত্যন্ত ভোগাসক্তও হইও না কারণ ভোগ-তৃষ্ণার বিরতি নাই। একদিকে ইহা তৃপ্তির অতীত পরিমাণে বাড়িয়া চলে, অপর দিকে গ্লানিকর প্রতিক্রিয়া (the morning after) আনে। সুতরাং জীবন যদি ভোগ করিতে চাও, তবে ভরাভোগের মাঝখানেই দুয়ার আঁটিবার, ভোগ্যবস্তু হারাইবার জন্য প্রস্তুত থাক, অত্যন্তবেশী যুক্তিনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিও না। জীবনের সকল ব্যাপার যুক্তির নিক্তিতে ওজন করা যায় না। ন্যায়শাস্ত্রে আছে শুধু শাদা আর কালো; এদিকে জীবনের অনন্ত বর্ণসম্ভার। শাদায় কালোয় মেশানো রঙের অন্ত নাই। কোন বিষয়েই উৎসাহোন্মত্ত হইয়া উঠিও না। সত্য যখন জানিবার উপায় নাই, তখন মরীয়া হইয়া উঠিয়া কোন কিছুর জন্য প্রাণপাত করা বৃথা। ঠিক পথে চলিতেছি—এ বিষয়ে যখন নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না, তখন ভুল হইতে পারে, এই সম্ভাবনার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই সুবুদ্ধি। জীবনে পরিপূর্ণ ন্যায়-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আশা করিও না। শেষকথা, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইও না। কনফুসিয়সকে, মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি জবাব দেন: জীবনকেই জানিতে পারিলাম না, মৃত্যুকে জানিব কি প্রকারে?"

'কোন কিছু লইয়া মাতিয়া উঠিও না'। Aldous Huxley ও এই মর্ম্মে একটি কথা কোথাও, (বোধ হয় Point Counter Point এ) বলিয়াছেন: Nothing in life is worth making much fuss about। জীবনে এমন কিছু নাই যাহার জন্য একেবারে মাতিয়া উঠা যায়। এসব ত অতি সাধারণ বুদ্ধির কথা—লম্বা-চওড়া নজীরের অপেক্ষা রাখে না। একবার এক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ওমর খৈয়মের এক কবিতার উপর প্রশ্ন দেখিয়াছিলাম: কবিতা পাঠে ওমরের দর্শন সম্বন্ধে কি ধারণা হইল লিখ। পড়িয়াই এক অবজ্ঞাসূচক সংস্কৃত বাক্যাংশ মনে পড়িল: রঘুরপি কাব্যং তস্যাপি টীকা, সাপি সংস্কৃতময়ী! ওমরের আবার দর্শন! সুরাসাকী নগদ বিদায় (Take the Cash and waive the rest)—এসব যদি দর্শন হয়, তবে হাইতোলা, তাসপেটা, হাঁচিটিকটিকি সবই ঘোরতর ফিলসফী। অধিকাংশ লোক যাহা অনবরত দর্শন স্পর্শন করে, তাহা কি দর্শন নামের যোগ্য হইতে পারে?

তবে দর্শন না হইলেও জীবন বটে। যেদিকে মহাজনের (mob অর্থে) স্বাভাবিক প্রবণতা, সেদিকে বর্ত্তমান যুগের বহু চিন্তাশীল মহাজন (great man অর্থে) ঝুঁকিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে সরবে অথবা নীরবে ভাবিতে দোষ নাই। যদি আপত্তি উঠে যে এসব অতি-পুরাতন কথা, তবে জবাব দিব: পৃথিবীতে সবই অতিশয় পুরাতন। নূতন বলিয়া যাহা চমক লাগায়, তাহাও আসলে বস্তাপচা মাল, হয়ত একটু বার্ণিশ করা।

পুরাকালে কোন সংক্ষেপভক্ত ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন: অর্দ্ধেক শ্লোকে এমন কথা বলিয়া দিতে পারি, যাহা কীর্ত্তন করিতে কোটি কোটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

তিনি প্রতিশ্রুতি পালনও করিয়াছেন, কিন্তু কোটি কোটি গ্রন্থের সারভূত সেই শ্লোকার্দ্ধ বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও গ্রন্থ রচনার বিন্দুমাত্র বিরাম নাই।

তিন

এমন কোন কিছু কোথাও নাই, যাহা নিছক ভাল অথবা মন্দ। বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম্ম সর্ব্বত্র এই দ্বৈতের মিশ্রণ। জল জীবন-রক্ষক, আবার ভক্ষক। আগুনও তাই। যেখানে যত কিছু বস্তু আছে সবই এই রকম মিশ্রিত। বস্তুর বেলায় যদি বা কোথাও সংশয়ের আড়াল আবড়াল থাকে, কর্ম্ম ও ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহাও নাই। প্রথমে কর্ম্মের কথাই ধরা যাক্। ধূম যেমন অগ্নির অচ্ছেদ্য সঙ্গী, দোষদুর্ব্বলতা তেমনই সর্ব্ববিধকর্ম্মের নিত্য সহচর। সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। নিজের জন্য পরের জন্য যে উদ্দেশ্যেই যাহা কিছু করনা কেন, শেষ পর্য্যন্ত আর কর্ম্মস্পৃহা থাকে না। হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। হে পার্থ, জ্ঞানই কর্ম্মের পরিণাম এবং জ্ঞান মানে disillusionment. দুনিয়া উল্টাইয়া দিব, এই করিব, সেই করিব, এই রকম "অনেকচিত্তবিভ্রান্ত" হইয়া বিষম উত্তেজনায় কিছুকাল দাপাদাপি করা যায়। ক্রমে উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসে। বুঝিতে পারা যায়, পৃথিবীর কোন ব্যাপারের একচুল এদিক ওদিক করা অসম্ভব। যতই নাচানাচি করিয়া বেড়াও না কেন, শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে, যা ছিল, তাই আছে; যেমন আছে তেমনই থাকে। যতকিছু চেষ্টা চরিত্র, সব যেন বিশাল বারিধিতে বিন্দুবর্ষণ। আপূর্য্যমানম্-অচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। বিন্দু বিন্দু যোগবিয়োগে মহাসিন্ধুর আর কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে। তাই নিয়া আবার জাঁক কত!

শৈবাল দিঘীরে বলে উচ্চ করি শির;
লিখে রাখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

বিবেকানন্দ যে বলিয়াছেন: The world is the curly tail of a dog—দুনিয়া ত নয়, যেন কুকুরের কুণ্ডলীকৃত পুচ্ছ। টানিয়া টুনিয়া সোজা করিয়া ছাড়িয়া দিলেই আবার যেই সেই। কৃষ্ণ, বুদ্ধই কি করিতে পারিলেন! কত হাতী ঘোড়া তলাইয়া গেল, এ অতলে ভেড়া করিবে কি? ইতিহাসে দেখি মানুষ নিজের নিজের যুগসমস্যাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি গোছ greatest problem মনে করিয়া ক্ষিপ্তবৎ দাপাদাপি করিয়া বেড়ায়। superlative ব্যবহার করা আমাদের ধাতুগত রোগ। এমন কোন যুগ জানি না যখন মানুষ বলিয়াছে: আমাদের কোন সমস্যা নাই, অন্ততঃ পরিমাণে কম আছে। প্রত্যেক মাঘেই শীত সবচেয়ে অধিক। লোকে যেমন বুদ্ধির কমতি স্বীকার করে না, তেমনি দুঃখের কমতি স্বীকার করে না। সমস্যাগুলিও আবার সব বাতের ব্যথার মত। সেঁক তাপ দিয়া এক জায়গা হইতে খেদাইয়া দিলে অন্য অঙ্গ আশ্রয় করে। এদিকে সভ্যতার উন্নতি অর্থাৎ sensitiveness-এর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন উৎপাত সৃষ্টি হয়। লাঠি মারিলে যেখানে লাগিত না, একটি বক্র দৃষ্টি এখন সেখানে শেল বিদ্ধ করে। আগে হাতুড়ীর আঘাত গ্রাহ্য করিতাম না, এখন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই। যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়;

লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্ম্মর মূরতি তা কি সয়?

অদ্ভুত এই গোলক ধাঁধা। আমাদের শাস্ত্রকারগণও সব মহাশঙ্কব্যক্তি। দয়া করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন: মনে করিওনা, মরিলেই নিস্তার যেখানে ছেদ পড়িল, কিছুকাল হাওয়া খাওয়ার পর, আবার ঠিক সেই জায়গাটি হইতে সুরু করিতে হইবে। অনন্তকাল ধরিয়া খোড়বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড়ের ডন বৈঠক করিয়া যাও।

পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।

অতি অদ্ভুত এই গোলক ধাঁধা। স্রষ্টা যদি কেউ থাকে, তবে সে রসিকচূড়ামণি। রসিকতার সমস্ত জেরটুকু আমাদের উপর দিয়া যায় বলিয়া হাসির বদলে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আয়েস করিয়া দু'দণ্ড যে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইবে, তার অবসর কোথায়? নাই নাই নাই যে সময়। মরি বাঁচি করিয়া ছুটিতে হইতেছে। নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকা ত দূরের কথা, দু'দণ্ড জিরাইবার অবকাশ মিলে না। ভাল মন্দ প্রতি কর্ম্মের সহস্র দোষ কিন্তু তবু না করিয়া গত্যন্তর নাই। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ। আর, বোধ হয় সেই ভাল। মদ খাইলে যেমন ক্ষণকালের নিমিত্ত আত্মবিস্মৃতি আসে, কর্ম্মোন্মাদেও তেমনি জীবনের বিষম ট্র্যাজেডী বিস্মৃত হওয়া যায়। বোধ করি সেই অর্থেই কর্ম্ম জ্যায় হ্যকর্ম্মণঃ। চর্কীতে ঘুরিতে ঘুরিতে নেশা ধরে; বুঁদ হইয়া কিছুকাল বেশ কাটে। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, পরার্থে কর্ম্ম করিবে। উদ্দেশ্য: আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। তবে প্রথমটিই আসল কথা। না হ'লে, জগতের হিত? কীটানুকীট তুমি কি করিবে? পরার্থে নিষ্কাম কর্ম্ম এক উপলক্ষ্য মাত্র। মূল উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। সেই ছুতায় ফাঁকতালে যদি নিজের কিছু কায়দা হইয়া যায়! কিন্তু নিজেরই কিছু হয় কি—এক disillusionment ছাড়া? বিবেকানন্দ আগুনের হল্কা ছুটাইয়া সারা পৃথিবী তোলপাড় করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই বীর সন্ন্যাসীর বজ্রকণ্ঠ হইতে ক্রীড়া-শ্রান্ত বালকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে। খেলনায়, খেলাধুলায় মন আর নাই; এরই মধ্যে কি ঘরের পানে মায়ের অঙ্কাশ্রয়ে ফিরিবার সময় আসিয়া গেল? "অব শিব পার করো মেরা নেইয়া!" বিবেকানন্দের

অশ্রু গদগদ গদ্যকাব্য "যাই প্রভু যাই" এর প্রতি শব্দে কি কর্ম্ম-বৈরাগ্যই না ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ম্মের কথা ছাড়িয়া ব্যক্তির কথা ভাবিলে ভাবালুতার বাষ্পাচ্ছন্ন, বৈরাগ্য-ভারাতুর আবহাওয়া কাটিয়া যায়। এখানে করুণ হইয়া উঠিবার অবকাশ কম। এখানকার বিসদৃশ ব্যাপারগুলির মূলে মানুষের ব্যবহার; সুতরাং অপরাধীর সন্ধানে স্বর্গ মর্ত্ত্য হাতড়াইয়া ফিরিতে হয় না। হাতের কাছেই আছে। তাই করুণ রসের পরিবর্ত্তে বীররস এবং হাস্যরস। হাসিও পায় রাগও ধরে।

রাগের কারণ এই যে, প্রতি পদে প্রমাণ পাইয়াও আমরা পৃথিবীর প্রাচীনতম রহস্য বিস্মৃত হই। বুঝি যে-কোন মানুষই এক ধাতুতে গড়া নয়; তবু নিজের কোলে ঝোল টানিয়া, দল বাঁধিয়া ঘোঁট পাকাইয়া ফিরি। কিছু পরিমাণ অন্ধতা না থাকিলে দল পাকানোই যায় না। পরমহংস রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদের দলপ্রিয়তার জন্য ব্যঙ্গ করিয়াছেন; এদিকে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তাঁহার নিজেরই দিব্যি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রিয় অপ্রিয় অভেদে নিরপেক্ষ দোষগুণদৃষ্টি গোঁড়ামির একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ লাগায়। বড়াই করিবে কাকে নিয়া? যাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছ, সে কি পূর্ণভাবে দোষমুক্ত? যাঁহার দিকে অবহেলার অঙ্গুলি হেলন করিতেছ, সে কি গুণ-বর্জ্জিত? আমাদের কেমন স্বভাব! নির্বৈক্তিক নিয়ম হিসাবে (as abstract principle) যাহা স্বীকার করি, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, ব্যবহারিক জীবনে তাহা প্রয়োগ করিতে পারি না। কোন কারণে যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছি, তাহার কোন অপূর্ণতা স্বীকার করিতে প্রাণ চায় না। হৃদয় যেখানে দিয়াছি সন্দিগ্ধ বুদ্ধির সেখানে গলাধাক্কার ব্যবস্থা। তাই ত আমাদের দেশের জীবনচরিতসমূহে এত মিথ্যাচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। মহাপুরুষই হোন অথবা চণোপুঁটি, সকলেই অল্পাধিক দেহধর্ম্মের অধীন। খাদ না থাকিলে গড়ন হয় না। এই কথা ভুলিয়া গিয়া আমারটিকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র বানাইতে যাই!

পাশ্চাত্ত্য জীবনীকারগণ কিছু পরিমাণে এই মিথ্যাচার হইতে মুক্ত। তাঁহাদের sense of humour, তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ 'অতি' হইতে রক্ষা করে। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমরাও আজকাল এই ধারণায় অভ্যস্ত হইতেছি যে, একই ব্যক্তিতে একই কালে এক বিষয়ে শক্তি ও অন্য বিষয়ে শৈথিল্যের সমাবেশ শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক,—একরূপ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যুগান্তপুষ্ট মনোভাব এত সহজে যায় না। তাই আজ দেখিতে পাই, যুগপ্রবর্ত্তক সুস্থ সবল সংসারী মানুষ রাজা রামমোহনকে ধর্ম্মসংস্থাপক ঋষি বানাইবার প্রাণান্তকর প্রয়াস। স্রোতের মুখে খড়কুটা দিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে! এদিকে যে সব দলিল দস্তাবেজ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে পরমহংস ত দূরের কথা, ধর্ম্মব্যাপারে সামান্য পাতিহাস—সাধারণ ধর্ম্মভীরু মানুষ (scrupulous moral man) বলাও দুষ্কর। অথচ চুণ কামের বিরাম নাই! রোমাঁ রোলাঁ যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনী লিখিয়াছেন তাহার বহু পৃষ্ঠা সজারুর মত পাদটীকার কাঁটা উঁচাইয়া আছে! মুক্তবুদ্ধি পাশ্চাত্ত্য মনীষী যেখানেই পান হইতে চুণ খসাইবার উপক্রম করিয়াছেন, সেখানেই পাদটীকা প্রহরণ হস্তে প্রহ্লাদ উপস্থিত। "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"— এই কথা মুখে আওড়াইলেও নিজের ব্রহ্মটিকে কিছুতেই ফাঁদে পড়িতে দিবেন না, কিন্তু রামকৃষ্ণ অথবা ব্রাহ্মদের প্রতি অনেক বক্রোক্তি কটূক্তি করিয়াছেন, তাহা কে না জানে? স্বর্গতঃ মহেশ ঘোষ মহাশয় রামকৃষ্ণ-কথামৃত সমালোচনাব্যপদেশে যে সব অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহার একটিরও সদুত্তর কেহ দিতে পারেন নাই! রাজর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সের ধ্যানধারণা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ যে দাঁত পড়িয়া যাওয়ার পাঠা খাওয়া ছাড়ার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা দস্তুরমত ঈর্ষ্যাবিশিষ্ট! রোলাঁ সে স্থলে যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত হইয়াছে!

সাধে কি আর রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীবন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের মত যুগান্তকারী সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে নীরব ছিলেন! কেশববাবু সম্বন্ধেও রামকৃষ্ণের একাধিক বিষাক্ত হুল ফুটানো কথা (malicious) "কথামৃতে" আছে। পরমহংসের শিষ্যগণও অতিশয় মুখ-আলগা ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামী জগন্ত মুখখিস্তির জন্য কম বিখ্যাত ছিলেন না। এক নিঃশ্বাসে বেদান্ত ব্যাখ্যা ও সকার বকার উচ্চারণ ভারতীয় সাধু সম্প্রদায়ের সনাতন প্রথা বটে, কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান ইহার যে ব্যাখ্যা করে তাহাতে পেহ্লাদগণের অস্বস্তিই বাড়িবে। রামকৃষ্ণ-বিরোধী কিছু পুস্তক-পুস্তিকা—পদ্মনাথ সরস্বতী ও নববিধানীদের লেখা—দেখিবার সুযোগ হইয়াছে; তাহাতে অন্যদিকে আবার এমন সব মূঢ়তা ও মিথ্যাচার আছে যে, চিন্তার বদলে হাস্যোদ্রেক করে। কোন দলের নয়, এমন মুক্তবুদ্ধি কেহ লিখিলেই তবে ঠিক ঠিক ব্যাপার ধরিবার সুযোগ হইবে। নববিধানীদের কথায় মনে পড়িল, শুধু রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গেই নহে, অন্যত্রও ইঁহাদের চমকপ্রদ কৃতিত্ব আছে। ধামাচাপা দিবার চেষ্টা ইঁহাদের মধ্যেও প্রবল ও প্রচুর; কেশবচন্দ্রের কুচবিহার বিবাহ সমর্থনে এখনও ভক্তগণ নানা উদ্ভট যুক্তি দেন। শেষ পর্য্যন্ত দৈবী প্রেরণার শরণ নিতে হয়; হইবেও বা দৈবীপ্রেরণা; শুধু প্রেরণাটির পার্থিব প্রকৃতি দেখিয়া (erring on the right side!) মনে 'সন্দ' হয়, there is method behind this madness! বেচারা ঈশ্বর কাহারও সাতেও নাই পাঁচেও নাই। সুতরাং মহানন্দে যত দোষ নন্দ ঘোষের উপর চাপাইয়া আপনাপন দায়িত্ব এড়ানো চলে; ঈশ্বর ত আর প্রতিবাদ করিতে আসিতেছেন না। তবে পার্থিব ব্যাপারে "যথা নিযুক্তোঽস্মি"র সাফাই গ্রাহ্য করিলে আইন-আদালত সব তুলিয়া দিতে হয়—এই যা অসুবিধা!

কেন এই সব শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার প্রয়াস? ভয় বোধ হয় এই যে, দোষদর্শনে' ভক্তি উবিয়া যাইবে। কিন্তু ভক্তি ত কর্পূর নয়। ভালবাসাত শুধু গুণাবলম্বিত নয়। এ এক রকম আদত বা habit; আর স্বভাব যায় না মলে, habit is second nature. প্রথম যৌবনে, প্রথম জীবনপথে জগতে বাহির হইয়া জানি না কি কারণে নয়নে নয়ন বাঁধিয়া যায়; কোন একটা উপলক্ষ্যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে বারবার ভাবিতে থাকিলে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূ

পঙ্ক্তিতে"। অভ্যাস একরকম স্বভাবই বটে; দীর্ঘকাল প্রবল প্রয়াস না করিলে কোন অভ্যাসের হাত হইতে মুক্তি নাই। বড় হইয়া যদি বাপ-মার কুৎসা শুনি তবে কি ভক্তি ভালবাসা কমিয়া যায়? হিন্দুর ছেলে সাধারণতঃ হিন্দু থাকে, মুসলমান খৃষ্টানের সন্তানসন্ততি নিজ নিজ জাতি ধর্ম্ম সচরাচর আঁকড়াইয়া থাকে; সে কি স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাবোধের জন্য? মোটেই নয়, যে সময় চরিত্র গঠিত হয়, জীবনের সেই "নির্ম্মীয়মান" কালে (formative period) শিক্ষা, সংস্কার, প্রতিবেশ হইতে যে প্রভাব রক্তধারায় মিশিয়া যায়, তাহাই স্থায়ী বাসা বাঁধে। বুদ্ধির উন্মেষের পূর্ব্বে সমগ্র চৈতন্য দিয়া যাহা শুষিয়া লইয়াছিলাম (assimilated) বিচারশক্তি জাগরণের পর, প্রেয়কে শ্রেয়োরূপে দেখিবার সহজাত প্রবৃত্তিবশে, সেই স্বভাবের অঙ্গীভূত বস্তুকে বিচারসহ প্রতিপন্ন করিতে যাই; হয় ত তাহা যুক্তিসিদ্ধ, হয়ত তাহা নয়, কিন্তু আসল কথা নাড়ীর টান। Aldous Huxley "Brave New World" এ বলিয়াছেন :—Philosophy is finding bad reasons for what one believes by instinct. স্বভাববশে, সহজাত সংস্কারবশে আমরা এমন অনেক কিছু করিয়া থাকি, যাহা কোন যুক্তি দিয়া সমর্থন করা যায় না; যাহা Necessity মাত্র, তাহাকে Virute রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা মূঢ় মিথ্যাচার।

সহজাত ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার আঁকড়াইয়া থাকাই উচিত বটে। "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি"। কিন্তু তাহার কারণ অন্য। তুলনায় আমার বস্তুটিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। আবার সেই কথা: প্রত্যেক মাঘেই শীত সবচেয়ে অধিক। কোন কিছুই দোষমুক্ত নয় মানিলে এবং নিজের জিনিষটির প্রতি নিষ্ঠাকে শুধু যুক্তি দিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা না করিলে অনেক গোল এমনি চুকিয়া যায়।

চার

আমরা যেভাবে নিজজনকে বাড়াই ও শত্রুস্থানীয়ের নরক ব্যবস্থা করি, তাহাতে মনে হয় কোন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলে বিজিত-দেশের লোকেদের মধ্যে কোন ভাল গুণ দেখিতে পাইতাম না। লোভের অন্ধতার সঙ্গে বুদ্ধির একদেশদর্শিতা যোগ দিলে ব্যাপার অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে। ইংরেজের লোভ আছে অপরিমিত, কিন্তু শিক্ষার গুণে তাহারা অল্লাধিক মুক্তবুদ্ধির অধিকারী। কোন দেশের বা জাতির ভাল করিতে চাওয়া না চাওয়া হৃদয়ের ব্যাপার। ইংরেজরা হয়ত নিজের ছাড়া অন্য কাহারও ভাল চায় না। স্বভাবগত লোভ ও স্বার্থবুদ্ধি ন্যায়-ধর্ম্মের কণ্ঠরোধ করিয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু আবাল্য এক আশ্চর্য্য হিউমার (humour) বোধের মধ্যে বাড়িয়া উঠাতে তাহারা শত্রুর মধ্যেও গুণ দেখিতে পায়। মানিতেছি যে, কর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বুদ্ধিগত বিশ্বাস (intellectual conviction divorced from practice) অতিশয় মূল্যবান্ কিছু নয়; বরং অনেক সময় বাক্যরূপী ছিব্ড়া দিয়া ঋণ চুকাইয়া সবটুকু শাঁস নিজের জন্য রাখিবার সুবিধাই ইহাতে হয়। তবু চিন্তাই কর্ম্মের বীজরূপ। বীজ একেবারে ব্যর্থ হইবার নয়। হৃদয় ও বুদ্ধি দু'য়েরই দুয়ার আঁটিয়া অন্ধকার থাকারে চেয়ে একটি খুলিয়া রাখা মন্দের ভাল। পরশুরামের উলটপুরাণে ভারতের ইংলণ্ড-শাসনের কৌতুককর কল্পনা আছে।

কল্পনার রাশ একেবারে আলগা করিয়া দিলেও এ-কথা ভাবিতে পারা যাইবে না যে, বিজিত ইংরেজের গুণদর্শী অনেক লোক শাসক ভারতীয়দের মধ্যে মিলিবে! অথচ বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহরুর ইংরেজ গুণগ্রাহীর অভাব হয় নাই। আমরা ত পৃথিবীকে সাদা আর কালো, এই দুইভাগে বাঁটিয়া রাখিয়াছি। যারে দেখতে নারি, তাঁর চলন বাঁকা! যাকে ভালবাসি, তিনি সর্ব্বগুণাধার। মান্য লোকের কোন প্রকার প্রকাশ্য দোষখ্যাপন, এমন কি সাধারণ অসঙ্গতি-নির্দ্দেশও নিষিদ্ধ। যে তাহা করে, সে আর ভক্তিভাজনের ভক্তমণ্ডলীতে স্থান পাইবে না। সেদিন "শনিবারের চিঠি"তে এক মহীয়সী মহিলার কথা পড়িলাম! লেখক অকপটে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার উদরের বিপুল ব্যাসের কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। পড়িয়াই সংস্কারে কেমন আঘাত লাগিল! মনে হ'ল বিসদৃশ বিপরীতের সমাবেশ করিয়া লেখক শ্রদ্ধাস্পদকে খেলো করিয়াছেন। কিন্তু পরের অংশ পড়িলে তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। জন্মগত সংস্কার যাহাই বলুক, ইহাতে আপত্তির আছে কি? হাসিবার মত অনেক কিছু ত প্রতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আছে। আমরা অনভ্যস্ত বলিয়াই সহিতে পারি না। ইংরেজী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হিউমার-বোধ জাগ্রত করা। Humour is kindly contemplation of the incongruities of life—জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে যে খাপছাড়া অসংলগ্নতা বিদ্যমান, তাহা দেখিতে পাওয়া এবং কুপিত না হইয়া আমোদ বোধ করা, এরই নাম হিউমার। তবে প্রধান কথা এই যে, দ্রষ্টার নিজের ও নিজজনের চরিত্র ও ব্যবহারের অসঙ্গতি লক্ষ্য করিবার শক্তিটি আগে থাকা চাই। He laughs not only at them, but with them; not only at them but also at himself. 'এ বলে ওরে পাগল, নিজের বেলায় সব কাণা'—এ হইলে চলিবে না। ইংরেজী চরিতগ্রন্থে এ রকম হিউমারের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। জীবনীকারের ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই, অথচ লেখক ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে হাসির হরির লুট দিয়া চলিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম যে পুস্তকে আমি এইটি পাই, তাহা বস্ওয়েলের লেখা জনসন-জীবনী। মনে পড়ে বাল্যে রামকৃষ্ণ-কথামৃতকে জনসন-জীবনীর সঙ্গে তুলিত হইতে দেখিয়া উহা পাঠের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। একখণ্ড কথামৃতে উদ্ধৃত কতকগুলি সপ্রশংস কথামৃত-সমালোচনার মধ্যে একটিতে এই মর্ম্মের কথা ছিল যে, বস্ওয়েলের পর আর কেহ এমন সশ্রদ্ধ যথাযথ চরিত্র-চিত্র আঁকেন নাই। বোধ হয় এন, ঘোষের ইণ্ডিয়ান মিরারের সমালোচনা সেইটি। অজ্ঞাতসারেই মনের গহনে জনসন-জীবনীর স্থান কথামৃতের পাশে পড়িয়া গেল। পরে এই ভুল ভাঙ্গিয়াছে। সন্দেহ নাই যে, বস্ওয়েলের কল্যাণে জনসন অমর হইয়াছেন। কিন্তু দেবতারূপে নহে। এই অমরত্বের মধ্যে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের মিশ্রণ। কোন মানুষকেই এককালে এত জানোয়ারের সঙ্গে হীনার্থে তুলিত হইতে দেখা যায়

না। ভোজনে ব্যাঘ্র ও নেকড়ে, হাস্যে গণ্ডার ও হায়না; ভব্যতা ব্যাপারে ভল্লুক এবং নির্ঘোষে ষণ্ড ও কেশরী—এই ত দেব-চরিত্র জনসনের বর্ণনা। এবং এ সবই বসওয়েল-প্রসাদাৎ। পরবর্ত্তী কালে এই ধরণের জীবনী-রচনা বহুধা অনুকৃত ও ফলপুষ্প-শোভিত হইয়াছে। Lytton Stracheyও তাঁহার ফরাসী শিষ্য Andre' Maurois লিখিত জীবনীসমূহে এইভাবে নর-বানরের বিচিত্র মিশ্রণ। শেষোক্ত লেখকের বায়রণজীবনী ত এককালে বাজেয়াপ্ত ছিল। পরে যে ইংরেজী অনুবাদ বাহির হয়, তাহা নাকি বহুল পরিমাণে শুদ্ধীকৃত (expurgated) তবু সেই পুস্তকখানিতেই যে সব গুরুপাক মালমশলা আছে, তাহা সাধারণ হজমশক্তির পক্ষে নেহাত সহজপাচ্য নহে।

হিউমার অসামঞ্জস্যবোধ হইতে উৎপন্ন। রসিকের দোষ দর্শন হিংস্রকের ছিদ্রান্বেষণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা হাস্য বটে, তবে ক্রূর হাস্য নয়; নির্দ্দোষ আমোদ। এতে ভুল নাই। কারণ, যাহা দেখিয়া হাসিতেছি, তাহা বা তদনুরূপ কিছু যে আমাতেও বিদ্যমান। দোষগুণ দেখিতে দেখিতে ব্যক্তির উপর বস্তুর উপর একই কালে আস্থা ও অবিশ্বাস কমিয়া আসে। কোন বিষয়েই আর আঁট বা ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকে না। আবার সেই disillusionment! তবে এবার disillusionment with a difference. এই রকম যুগপৎ গুণদোষদর্শী ব্যক্তি কি তবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন? না, সে অসম্ভব। ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই। 'প্রকৃতি স্থাং নিয়োক্ষ্যমি। শরীরযাত্রাপি হতে ইত্যাদি।" যদিও প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি ও কর্ম্ম দোষাশ্রিত, তবু অন্যকে অবলম্বন না করিয়া, জীবনে চলিবার একটা পথ না ধরিয়া নিস্তার নাই। বুদ্ধিযোগে আমরা সমদর্শী হইতে পারি কিন্তু কর্ম্মের বেলায় এমন বিশ্বপ্রেম সম্ভব নয়। সেদিন খবরের কাগজে পড়িলাম, হিন্দু নামধারী উড়িষ্যাবাসী কে এক ভদ্রলোক সারা জীবন এমন নিখুঁতভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান-গুলি পালন করিয়াছিলেন যে, দেহান্তে তাঁহার দেহটির অধিকার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হয়; ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আমার এই মধ্যপন্থা সম্বন্ধীয় বাকবিস্তার যদিও অবগত হন নাই, তবু বুদ্ধি খাটাইয়া মন্দির-মসজিদের মধ্যস্থলে দেহ প্রোথিত করাইয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ না জানিয়াও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সমন্বয়ভক্ত. ভদ্রলোকটি নিজগৃহে হিন্দু-মুসলমানের এমন সব অনুষ্ঠান পালন করিতেন, যাহা পরস্পরবিরোধী নয়; একই কালে একই গৃহে গরু ও শূকর বধ করিয়া তিনি যে পার পাইয়া যাইবেন এমন ত মনে হয় না। সুতরাং ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে, বুদ্ধিকেই শুধু উদার করা যায়, কর্ম্মের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ; বুদ্ধি-যোগে বিপরীত ব্যাপারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারি ও করা উচিত; অনুষ্ঠানের বেলায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠা স্বাভাবিক ও সুপ্রশস্ত।

যে-পথ ধরিয়া চলি, তাহা নির্দ্দিষ্ট করে কে? উত্তর: স্বভাব, শিক্ষা, সংস্কার, মানসিক পরিণতিকালীন প্রতিবেশ। এই সবের সম্মিলিত প্রভাবে যাহা আশ্রয় করি, তাহার নাম স্বধর্ম্ম। তদনু-সারে যাহা করি, তাহার নাম সহজকর্ম্ম। সদোষ হইলেও সহজ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না: "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।" পৃথিবীতে এমন কোন নিকৃষ্ট ধর্ম্ম নাই, যাহা ছাড়া দরকার; এমন কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নাই, যাহা গ্রহণ করিয়া লওয়া যায়। ভয়াবহ, যদি কিছু থাকে, পরধর্ম্ম। কারণ একে ত নির্দ্দোষ কোথাও কিছু নাই, তার উপর পথ অনভ্যস্ত। তবে আমার অবলম্বিত পন্থাও অন্যের পক্ষে সমান ভয়াবহ। ফলকথা, স্বনিষ্ঠা ও পরমত-সহিষ্ণুতাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। নিজেরটিকে ছাড়িব না—অথচ পরনিন্দা করিব না; আমার জিনিষটিকে অন্যকে আঘাত করিবার প্রহরণরূপে ব্যবহার করিব না।

গত্যন্তর নাই বলিয়া, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও হিউমারবোধ আছে বলিয়া সমদৃষ্টি—এও ত একরকম মধ্যপন্থাই বটে। তবে কোন অর্থেই এই সমন্বয় মহাজন পন্থা নহে। যিনি যত বড় মহাপুরুষ, তিনি ততবেশী হিউমার-বর্জ্জিত। আদর্শবাদের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা উদ্ধতায়ুধ, খড়্গহস্ত-ভাব যেন আছে। আদর্শবাদী ভাবের আবেগে অন্ধ এবং জনসাধারণের মধ্যে হিউমারবোধের উপযোগী বুদ্ধির অভাব। সমদর্শন ইত্যাদি গালভরা কথায় মনে হইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের কথাই বুঝি বলিতেছি। মোটেই নয়। আসলে ইহা সর্ব্বভূতে সত্যিকার ভূতদর্শন!

স্বনিষ্ঠা ও পরমতসহিষ্ণুতা সাহিত্যসমালোচনারও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্ততঃ এই রকম মনোভাব দোষের নয়। গোঁড়ামি না থাকা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। যাহারা অনেক কিছু দেখিয়াছেন, প্রতিবিষয়ের দু'দিক বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দোটানায় পড়া স্বাভাবিক। এই দ্বিধা ত চিন্তার সততার পরিচায়ক। সন্দেহ হইতে পারে, যে-লোকটি সকলকে খুসী রাখিতে চেষ্টা করে, আসলে সে ভণ্ড। ভণ্ড যে না হইতে পারে, এমন নয়, কিন্তু লোকটি সদ্ভাব ও সততার দ্বারা প্রণোদিত হইতেও পারে। দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য পরিষ্কার হইবে।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলা উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে পুস্তক বাহির হইয়াছে, 'শনিবারের চিঠি'তে অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় তাহার তিক্ত সমালোচনা করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন অন্তেও আমরা সম্পাদক-প্রতিশ্রুত গ্রন্থকর্ত্তার প্রত্যুত্তর পড়িতে পাইলাম না। সাহিত্যবিচারের মূলনীতি ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অবশ্য অপণ্ডিতের কোন মতামত থাকিতে পারে না। আমরা ত শুধু ভারবাহী গর্দ্দভ, অন্ত্যজের মত সসম্ভ্রমে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিবার এবং মহা-রথীদের রথ টানিয়া লইয়া যাইবার অধিকারী। কিন্তু রথ টানিতে টানিতে আরোহীদের যে সব বচসা কাণে আসে, তাহা লইয়া আমাদের নিজস্ব নগণ্য-মণ্ডলীতে অবসরকালে গাল-গল্প করি বই কি! আমেরিকায় আজকাল আনাচে-কানাচের অতর্কিত কাণা-ঘুষা সংগ্রহ করিয়া প্রতি বিষয়ে 'জনমত' নির্দ্ধারণের প্রয়াস হয়। সাহিত্যের 'নগরান্ত'বাসীদের কাণাঘুষার আর কিছু না হোক, কৌতূহল-মূল্য ত আছে। সাহিত্যিক ডিক্টেটরও আর পাঠক-প্রজাসাধারণকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

আমার এত সাধের compromise-তরুর মূলোৎখাত করিয়াছেন বলিয়াই মোহিত বাবুর উপর ক্ষুব্ধ আছি। সসঙ্কোচ সত্রাস ক্ষোভ অবশ্য। লক্ষ্য করিলাম যে, পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় পক্ষের মান রাখিয়া চলাকে মোহিতবাবু একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু যে পুস্তক এক কারণে নিকৃষ্ট, অন্য কারণে তাহা উৎকৃষ্ট হইবার বাধা কোনখানটায়? বিধাতার বিশ্ববিধানে যে দ্বৈত; মনুষ্যসৃষ্ট বস্তুতেও তাহা প্রতিফলিত হইবে—এ ত স্বাভাবিক। "গ্রন্থকার জানেন সবই" এ কি একটা নালিশের হেতু হইতে পারে? "প্রায় কোন কথাই তিনি বলিতে বাকী রাখেন নাই; সকল যুক্তি সকল আপত্তিই এমনভাবে স্বীকার করিয়াছেন, যে কোন একটা দিক ধরিয়া তাঁহাকে জবাবদিহী করা দুরূহ হইয়া পড়ে।" দুরূহ হইলে, না হয়, নাই করিলেন! প্রিয় অপ্রিয় অভেদে সর্ব্ব বস্তুর দোষোদ্ঘাটন ও গুণকীর্ত্তন—এ ত জ্ঞানীরই কর্ম্ম। গাছ-কোমর বাঁধিয়া কোন একপক্ষের ওকালতী করিতে করিতে অপর পক্ষকে অন্ধভাবে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া—এ কি না হইলেই নয়? যদি প্রতিবস্তু সত্যসত্যই ভালমন্দ "নরম-গরমের" সংমিশ্রণ হয়, তবে তাহা বলা ত তেমন বড় দুষ্কর্ম্ম মনে হইতেছে না! অবশ্য মোহিতবাবু যেমন বলিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে পূর্ব্ব উত্তর উভয় পক্ষের মান রাখিয়া অগ্রসর হইলেও শ্রীকুমারবাবুর কোন্ দিকে টান বেশী, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই বিষয়ে তর্ক চলিতে পারে বটে এবং ঐ সমালোচনার অধিকাংশই যে ঐ রকম মূলনীতি সম্বন্ধীয় বিচার-বিতর্ক, তাহা স্বীকার করিতেছি। এ বিষয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ হউক, আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখি। যুদ্ধান্তে আবার নিজ নিজ প্রভুর রথ টানিয়া কোর্টে পৌঁছাইয়া দিব এখন। বেশী রক্তারক্তি হইয়া গেলে ক্ষতস্থানে চাটুবাক্যের প্রলেপ লাগাইতেও পেছ-পা' হইব না। কিন্তু যে যে স্থলে, মোহিতবাবু শ্রীকুমারবাবুর নিরপেক্ষ মনোভাবের উপর আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা ভাল লাগে নাই, জানাইয়া রাখিলাম। আর একটি কথা। যেমন শ্রীকুমারবাবুর, তেমনি মোহিতবাবুরও একটি নিজস্ব টান আছে। উভয় ক্ষেত্রেই টানের উৎপত্তি এক, প্রকৃতি এক। শিক্ষা, সংস্কার, প্রতিবেশের প্রভাবে রুই-কাতলা হইতে চুনো পুঁটি পর্য্যন্ত সকলেই এক দিকে ঝুঁকিয়া, ঘাড় কাত করিয়া আছেন এবং সেই ঝোঁক যুক্তি-নির্ভর নয়। আমার ঝোঁকের জন্য অবশ্য যথাসাধ্য যুক্তি আমি দিব, কিন্তু ইহা যে মূলতঃ Necessity মাত্র, Virtue নয়—যুক্তি-প্রসূত নয়, তাহা স্বীকার করিব। এই সব ব্যক্তিগত ঝোঁক-সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কোন কালেই চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইবে না; কারণ প্রতি-বেশমুক্ত বিচারক পাওয়া অসম্ভব।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার 'কঃ পন্থাঃ?' শোপেনহাওয়ার না কে একজন এই সব ভাবিতে ভাবিতে এমন ঘুলাইয়া গিয়াছিলেন যে, আত্মহত্যাই প্রশস্ত বলিয়াছেন। খুব যে প্রশস্ত তাহা ত মনে হইতেছে না। তা ছাড়া আমাদের সদাসতর্ক শাস্ত্রকারগণ জন্মান্তর নামক আয়ুধ উঁচাইয়া ভয় দেখাইতেছেন। সুতরাং আমরা মুক্তসঙ্গ হইয়া, কামসঙ্কল্পবর্জিত হইয়া, জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া পথ চলিব। নিষ্কাম কর্ম্মকে নেহাত ইয়ার্কি মনে করিবার কারণ ছিল, যদি বিশ্ববিধাতার ইয়ার্কি আমাদের জীবনটিকে এমন অদ্ভুত ট্রাজেডীতে পরিণত না করিত। নিষ্কাম কর্ম্মই উপায়—কারণ, "যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না।" নিষ্কাম কর্ম্মের সোদ্ধা কথা, বিশেষ কোন আশা না রাখিয়া কাজ করিয়া যাওয়া। আশা করিবার কোন হেতুই নাই এবং কাজ না করিয়া নিস্তার নাই।

অর্থাৎ মধ্যপন্থা।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

বি

কী ব্যথা তুই চাস হানিতে
বল্ বিছুটি! আমার 'পরে,
তোর কাহিনী লিখতে গেলেই
চোখ ফেটে মোর অশ্রু ঝরে।
প্রথম তোরে দেখেই আকুল,
ভাবনু হবি মল্লিকা ফুল;
তাই রোপিণু অঙ্গনে মোর
সিঞ্চি বারি রোজ বিহানে,
প্রকাশ করি ফল কিরে আজ
সে কথা মোর মনই জানে।
ভেবেছিলাম বাড়ীর পাশেই
ফুটবে গোলাপ নিতুই কত,
বুল্‌বুলীদের প্রেমের বুলী
শুনতে পাবই অবিরত।
লিখব প্রজাপতির পাখায়,
প্রণয়-লিপি সুদূর প্রিয়ায়,

অলির সনেই চ'লব চলি'
খেয়ে পরাগ-পিচকারী রোজ,
পাপড়ি-ঘেরা সিংহাসনের
মিলবে এবার মিলবে যে খোঁজ।
মিলিয়ে গেল আশার স্বপন,
আজকে দেখি নয়ন মেলি,
ন'স যে রে তুই গোলাপ টগর,
মল্লিকা যূঁই কিম্বা বেলি।
ব্যথাতে বুক যায় যে টুটি,
শেষে হ'লি তুই বিছুটি?
পরশে যার অঙ্গ জ্বলে,
মাধুরীকে নেয় উজাড়ি,
শোন্ বিছুটি! তোর কাছে আজ
হার মেনেছে ফুল পূজারী।

কাদের নওয়াজ

চৌকো চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

(ডিটেক্‌টিভ্‌)

এক

দু'দিন পূর্ব্বে একটা জটিল মামলার বিচার-নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। সাধুর ছদ্মবেশ পরা জনকতক মহাদুষ্কৃতকারী বদমাইসকে বহুকষ্টে ধারালো-প্রমাণ সংগ্রহ করে, যথাশাস্ত্র সাজা দেওয়া হয়েছে। তৃপ্তিপূর্ণ চিত্তে ডিটেক্‌টিভ ইনেস্‌পেক্টার মিঃ সোম, তাঁর সহকারী নবীন গোয়েন্দা তরুণ সিংহকে সে মামলার বিভিন্ন বিষয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছিলেন।

তরুণ সিংহ অল্পদিন পূর্ব্বে এম, এস্‌-সি পাশ করে ইন্টেলিজেন্স বিভাগে ঢুকেছে! তার দেহ বলিষ্ঠ, ব্যায়াম-পুষ্ট। শ্রম-সহিষ্ণুতা-শক্তি অসাধারণ, অধ্যবসায় ক্লান্তিহীন। তার তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব দেখে গোয়েন্দা-বিভাগের কর্ত্তা-ব্যক্তিরা অল্প দিনেই তার প্রতি বিশেষ স্নেহশীল হয়ে উঠেছেন।

কলিকাতার কোনও বিখ্যাত থানার অফিস-কক্ষে বসে তাঁদের আলোচনা চলছিল। বেলা প্রায় চারটে বাজে,—এমন সময় শশব্যস্ত ভাবে বিরাট-বপু পাঞ্জাবী পুলিশ-ইনেস্‌পেক্টার মিঃ পূরণ সিংহ এসে আবির্ভূত হলেন। টুপি খুলে কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করে ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসলেন। হতাশা-ব্যঞ্জক স্বরে বললেন, "আর তো পারি না স্যর, এবার যা করতে হয় আপনারা করুন।"

নিজের সিগারেট কেসটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে মিঃ সোম বললেন, "খুব ক্লান্ত হয়েছেন দেখছি। এক কাপ চা আনিয়ে দিই?"

মিঃ পূরণ সিংহ আক্ষেপের সুরে বললেন "না, ধন্যবাদ। আজ সারাদিনে দশ কাপ চা খেয়েছি, আর সাতাশটা সিগারেট পুড়িয়েছি, কিন্তু ভোঁতা বুদ্ধির বিন্দুমাত্র উন্নতি হোল না। শয়তানদের ধাপ্পাবাজির গোলোকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে পড়েছি। এবার ধাক্কা সামলাবার ভার আপনাদের উপর।"

মিঃ পূরণ সিংহের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে দিয়ে নিজের সিগারেট ধরাতে ধরাতে মৃদু হাস্যে মিঃ সোম বললেন, "কি হয়েছে বলুন। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমরা তো আছিই।"

মিঃ পূরণ সিংহ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, "ছাই নয় স্যর, ছাই নয়। এ সব জল-জ্যান্ত দত্যি-দানা! এরা ফোঁটা-তিলক কাটে, গলায় তুলসীর মালা পরে, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা চাপায়, তন্ত্র-মন্ত্র হোম-যাগ করে—অনুষ্ঠানের ত্রুটি কোথাও নাই! সেই সঙ্গে ভবানীপুরের সদর রাস্তা থেকে দিন-দুপুরে, তাজা উকিলকে জাল চিঠি দেখিয়ে ধাপ্পা দিয়ে ধরে নিয়ে যায়। তারপর বিষ খাইয়ে অজ্ঞান করে তাঁর দামী হীরের আংটি, সোনার রিষ্ট-ওয়াচ, টাকা-কড়ি লুণ্ঠন করে দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে সট্‌কান্‌ দেয়! এ সব সাক্ষাৎ শয়তানদের গোষ্ঠীশুদ্ধ সবাইকে ঝাড়ে-বংশে জবাই করলে তবে সমাজের মঙ্গল!"

মিঃ সোম বললেন, "খুন-জখম কিছু করে নি তো?"

"খুনের খুড়তুতো-ভাই করেছে। এই ডিসেম্বরের শীতে শেষ রাত্রে তাঁকে হাওড়ার ময়দানে ফেলে দিয়ে গেছে। ঠাণ্ডার চোটে বেচারার গালগলা ফুলে উঠেছে। বিষের চোটে চৈতন্য তো ছিলই না। ভাগ্যে একটা ভদ্রলোক মোটরে কাল ভোরে ঐ দিক্‌ দিয়ে মোটরে আমি আসছিলুম, তাই নজরে পড়ল। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে তুলে এনে হাওড়ার হাসপাতালে দিয়েছিলাম, বহু কষ্টে তারা বাঁচিয়ে তুলেছে। নইলে মারা যেতেন, তার সন্দেহ নাই।"

সহকারী গোয়েন্দা তরুণ সিংহ এতক্ষণ নীরব ছিল। এবার চিন্তিতভাবে বললে, "তাহলে এ কেসটাও সাধুর ছদ্মবেশধারী গুণ্ডার উপদ্রব? তাদের গতিবিধির সন্ধান কোথাও পেলেন?"

মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "কালীঘাটের যাত্রী-নিবাস থেকে, ভবানীপুরের মাতৃসদন হোটেলের মোড় ঘেঁসে, সটান হাওড়ার ময়দান পর্য্যন্ত! কিন্তু ব্যাটারা একটাও হাতের ছাপ, কি পায়ের ছাপ রেখে যেতে ভুলে গেছে।"

সহাস্যে তরুণ বললে, "তাদের বোঝা উচিত ছিল, পুলিশের তদন্তের সুবিধার জন্য সেটা রেখে যাওয়া কর্ত্তব্য।"

সখেদে মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "ভাগ্যবান্‌ গোয়েন্দা-উপন্যাস-লেখকদের জন্যই সেটা তারা সযত্নে রেখে যায়। আমাদের মত দুর্ভাগা জীবদের তারা অত সুযোগ দেয় না।"

মৃদু হাস্যে মিঃ সোম বললেন, "দিনের চোখ চেয়ে আপনারা দেখেন না,—বা দেখতে সময় পান না। আপনাদের বাঁধা গতের কাযের চাপ যে বেশী, তা আমার জানা আছে। সে জন্যে দোষ দিই না। তবে আমার বিশ্বাস, যত বড় জবরদস্ত অপরাধীই হোক,—সে রকম উঠে পড়ে লাগলে, একদিন না একদিন তাদের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায়ই।"

তরুণ সিংহ বললে, "যতই গয়না কাপড় জমকালো পোষাক পরানো যাক, সত্যকে কেউ চিরদিন ঢেকে রাখতে পারে না। সে একদিন না একদিন নিজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। গা ঢিলে দিয়ে বসে থাকলে দু'শো পাঁচশো বছর পরেও প্রকাশ হবে—ইতিহাস তার সাক্ষী! লাগুন্‌ উঠে পড়ে,—হাতে হাতে ফল পাবেন।"

মিঃ পূরণ সিংহ সদর্পে বললেন "আরে! সেই জন্যই তো বিশেষজ্ঞদের দ্বারে এসে পৌঁছেছি। কাল সকাল থেকে হাওড়ার হাসপাতাল, ভবানীপুর, কালীঘাট, ট্যাক্সির আড্ডা, ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা তুলো ধোনা করেছি। শেষে ফরিয়াদী সহ দু'জন সাক্ষীকে এখানে ধরে এনেছি। এবার বাহান্ন বছরের পূরণ সিংহকে ছুটি দিয়ে আটাশ বছরের ইয়ং লায়ন উঠে পড়ে লাগ। যার খুশী ঘাড় মটকাও,—আমি দায়ে খালাস!"

নোট-বুক খুলে পেন্সিল তুলে নিয়ে তরুণ বললে, "উত্তম। তা'হলে আগে ওল্ড-লায়নের ঘাড় মটকানো যাক। এ মামলায়

আপনিই প্রথম সাক্ষী। কারণ আপনিই হাওড়ার ময়দানে অচৈতন্য অবস্থায় ফরিয়াদীকে প্রথমে আবিষ্কার করেছেন।"

নোট-বুকে পেন্সিল চালাতে চালাতে সুগম্ভীর মুখে পুনশ্চ বললে, "কিন্তু মনে রাখবেন,—আমাদের সন্দেহের পথ খোলা রইল—যে, ফরিয়াদীর হয় ত সে দুর্দ্দশা ঘটানোর জন্য আপনিই দায়ী। দোষ ঢাকবার জন্য এখন সাধু সেজে নালিশ করতে এসেছেন। এমন নালিশ অনেকেই করে, তার বিস্তর প্রমাণ আছে।"

মুচকে হেসে মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "আহা! এ যেন বাংলা দেশের কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তনের আসরে বসে বৃন্দা দূতীর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ইয়ার্কি শুনছি! মিঃ সোম যে সামনে রয়েছেন, নইলে দেখাতুম মজা! সাধে দেশের লোক ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের ছোকরাদের ইয়ার্কিতে চটে?"

তরুণ বললে, "অর্থাৎ আপনি চটলেন না? তা হলে হার মানছি। অগত্যা ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলুম। এবার প্রথম সাক্ষী মশাই বলুন,—কবে, কোথায়, কোন্ অবস্থায়, তাঁকে প্রথমে পেয়েছেন?"

মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "শহরতলিতে একটা চুরির তদন্ত সেরে মোটরে ফিরছিলাম। সঙ্গে চার জন কনেষ্টবল ছিল। কাল তেসরা ডিসেম্বর, ভোরের সময় আমরা হাওড়া ময়দানের কাছে পৌঁছে দেখলাম অদূরে ঘাসের মধ্যে খানিক—কালো, খানিক—শাদা, কি একটা বস্তু পড়ে আছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দূর থেকে ভাল ঠাহর হোল না। গাড়ী থামিয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম এক ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। চেহারা বেশ স্বাস্থ্যবানের মত, পায়ে দামী জুতো, পরণে কাঁচি ধুতি, গায়ে সার্ট, সোয়েটার, চকচকে নতুন সার্জ্জের কোট। পকেট হাংড়ে পেলাম এক রুমাল,—আর এক পোষ্টকার্ডে লেখা চিঠি। চিঠিতে ঠিকানা রয়েছে—"শান্তিময় চক্রবর্ত্তী। উকিল। মাতৃসদন হোটেল।—নং ভবানীপুর, কলিকাতা।"

"চিঠিটা আসছে কোথা থেকে?"

"পুরুলিয়া থেকে। ভদ্রলোকের মা লিখেছেন। এই দেখুন সে চিঠি।"—মিঃ পূরণ সিংহ পকেট থেকে একখানা পোষ্ট কার্ড বের করে মিঃ সোমের হাতে দিলেন।

চিঠিটা প্রথমে মিঃ সোম,—তারপর তরুণ পরীক্ষা করলে। ডাক ঘরের ছাপ দেখে বোঝা গেল, ২৮শে নবেম্বর সেটা পুরুলিয়ায় পোষ্ট করা হয়েছে, ৩০শে নবেম্বর ভবানীপুরে ডাক বিলি করা হয়েছে! চিঠিতে মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা ছিল :—

"পুরুলিয়া, শান্তি-কটেজ, ২৮,১১,৩৪,

কল্যাণবরেষু

শান্তি, তোমার চিঠি পেয়েছি। নিরাপদে সেখানে পৌঁছেছ এবং ভাল হোটেলে বাসা পেয়েছ জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। তোমাদের মামলার কায শেষ হলে, ফেরবার পথে,—পার তো বর্দ্ধমানে নেমে তোমার ছোট দিদিমার সঙ্গে দেখা করে এস। এখানে সব কুশল। আশীর্ব্বাদ নাও। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা—তোমার মা।"

তরুণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, "তারা সব লুট করে নিয়ে গেল, শুধু চিঠিখানি রেখে গেল কেন? এটাও তো কুচিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে পারত। ওঁকে ফেলে দিয়ে গেল, প্রকাশ্য ময়দানে, ওঁর পরিচয়-পত্র রেখে গেল পুলিশের হাতের কাছে! ওঁকে সনাক্ত করানোয় পুলিশকে সাহায্য করার দিকে তাদের কার্পণ্য নেই দেখছি।"

মিঃ সোম বললেন, "কিম্বা হয় ত তুচ্ছ বস্তু ভেবে অবহেলাভরে ওটা ত্যাগ করে গেছে। অথবা হয় ত, পুলিশের কাছে ওঁর পরিচয় প্রকাশ করাই তাদের উদ্দেশ্য,—সেই জন্যেই চিঠিটা রেখে গেছে। যাই হোক, কথাটা নোট করে রাখ।"

তার পর মিঃ পূরণ সিংহের উদ্দেশে বললেন, "ভদ্রলোকের বয়স কত?"

"সাতাশ, আটাশ।"

"এই বয়সে উনি এত উপার্জ্জন করেছেন যে, এর মধ্যে নিজের নামে বাড়ী তৈরী করেছেন! বাড়ীর নামের সঙ্গে ওঁর নামের মিল দেখছি যে! ওঁর পিতার নাম?"

নিজের নোট বুক দেখে মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "৺আনন্দ চক্রবর্ত্তী। তিনিও পুরুলিয়ার একজন বড় উকিল ছিলেন। ওঁরা সেখানকার তিন পুরুষ বাসিন্দা। ওঁর বাবাই ওঁর নামে বাড়ী তৈরী করে গেছেন।"

মিঃ সোম সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, "আনন্দ চক্রবর্ত্তী? মনে পড়েছে। নামজাদা উকিল। সৎ কাজে বেশ দান করতেন। পারফেক্ট জেণ্টল্ম্যান!"

"দাত যতদূর বুঝলাম, ইনিও তাই। অতিশয় ভদ্র এবং নিরীহ।"

তরুণ বললে, "তাই নিজে উকিল হয়েও গুণ্ডাদের খপ্পরে পড়েছেন। কি বলে ওঁকে জালে ফেলেছিল?"

"ওঁর সিনিয়ার উকিলের মিথ্যা মোটর-দুর্ঘটনার সংবাদ! নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কর্ম্মী! উনি তাতেই"—

তরুণ খাড়া হয়ে বসে বললে, "বটে! রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পবিত্র নামের দোহাই দিয়ে গুণ্ডামি সুরু হয়েছে! তা হলে যেমন করেই হোক, খুঁজে পেতে তাদের আবিষ্কার করতেই হবে। ঐ পুণ্যময় প্রতিষ্ঠানটির নামে ধাপ্পা দিয়ে জাল জুয়াচুরি গুণ্ডামি চলতে দিলে দেশের সর্ব্বনাশ হবে। উহুঁ! কঠোর হস্তে এদের গলা টিপে ধরে জিহ্বা উৎপাটন করা চাই-ই!"

মিঃ সোম বললেন, "তরুণ তেতেছে! এইবার ঠিক কায পাওয়া যাবে। বলুন মিঃ সিংহ, তারপর? অজ্ঞান অবস্থায় ওঁকে পেয়ে কি করলেন?"

"তুলে নিয়ে গিয়ে হাওড়ার হাসপাতালে দিলাম। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন—কোনও তীব্র শক্তিশালী মাদক দ্রব্য প্রয়োগে ওঁকে দীর্ঘকাল অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিল। ডাক্তারদের প্রচুর চেষ্টা-চরিত্রে পাঁচ ঘণ্টা পরে ওঁর জ্ঞান ফিরে এল। হাসপাতালে প'ড়ে আছেন দেখে উনি হতভম্ব। কাল তেসরা ডিসেম্বর শুনে চক্ষুঃ স্থির! বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে কেবল বলতে লাগলেন,

সে কি? তাহলে ১লা ডিসেম্বর বিকাল থেকে আমি কোথায় ছিলুম? ২রা ডিসেম্বর কোথা রইলাম? সাধুরা কই? শ্রীকান্তদার পা ভেঙে গেছে, তাঁর খবর কি?"

"তার পর?"

"জেরায় জানা গেল, মানভূম জেলার কোনও রাজ-এষ্টেটের মামলার জন্যে তিনি এবং আর একজন সিনিয়ার উকিল, এষ্টেটের লিগাল ম্যানেজারের সঙ্গে কলকাতা এসেছিলেন। কদিন ওঁরা ভবানীপুরের মাতৃসদন হোটেলে ছিলেন। ওইখান থেকেই ব্যারিষ্টার, এ্যাটর্নি-মহলে আনাগোনা করতেন। কায শেষ করে ১লা ডিসেম্বর ওঁদের একসঙ্গে দেশে ফেরবার কথা ছিল। কিন্তু সিনিয়ার উকিল তাঁর এক আত্মীয়ের গুরুতর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে ১লা ডিসেম্বর ১২॥০ টা নাগাদ চলে যান।"

"কখন সে টেলিগ্রাম এসেছিল?"

"আগের দিন। তদন্ত করে জেনেছি, সত্যই মগরা জংসন থেকে সে টেলিগ্রাম এসেছিল। শান্তিবাবুও বললেন—ওঁর আত্মীয় গুরুতর অসুখে ভুগছে—সে খবর ওঁরাও অর্থাৎ শান্তি বাবু ও লিগাল ম্যানেজার আগে থেকেই জানতেন। সুতরাং সে টেলিগ্রামে গুণ্ডাদের কোনও কারসাজি নাই বলেই মনে হয়।"

"তা'হলে সিনিয়ার উকিল হোটেল ত্যাগ করে গেলেন মগরায়?"

"সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বেরিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্তা জাম থাকায় তাঁর গাড়ী ঠিক সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছে নাই। ট্রেণ ফেল করে পরের ট্রেণ ধরবার জন্য তিনি হাওড়া ষ্টেশনে বসে থাকেন। শান্তিবাবু সে ঘটনার কথা জানেন না। উনি সন্ধ্যার এক্সপ্রেসে বুড়ো ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন স্থির ছিল। ইতিমধ্যে বেলা ২টার সময় কিছু জিনিস কিনতে তিনি রাস্তায় বের হন। মোড় ঘুরতেই এক ট্যাক্সি এসে পাশে দাঁড়াল। একজন গৈরিক আলখাল্লাধারী সাধু ট্যাক্সি থেকে নেমে ওঁকে এক চিঠি দিলে, আর জানালে তিনি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কর্ম্মী। সিনিয়ার উকিল শ্রীকান্ত বাবু মোটর-দুর্ঘটনায় পা ভেঙে পড়ে আছেন। শীঘ্র চলুন।"

"চিঠিতে কি লেখা ছিল?"

"আমি আহত। শীঘ্র এস—শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জি।" "মজার কথা এই—শান্তিবাবু বলছেন তাঁর যতদূর মনে পড়ছে, সে চিঠির লেখা অবিকল শ্রীকান্তবাবুর মত। এমন কি নাম স্বাক্ষরের বিশেষত্ব পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা গেছল। খুব পাকা জালিয়াতের কায, সন্দেহ নাই।"

তরুণ বললে, "কিন্তু শান্তিবাবুর কথা যে ঠিক, তার প্রমাণ কই? সে চিঠি তো এখন অদৃশ্য হয়েছে। সুতরাং ও-কথার কোনও মূল্য নাই। যাক, তারপর?"

"উনি বিনা দ্বিধায় তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে চললেন। কালীঘাটের এক যাত্রী-নিবাসে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছাতেই আর এক গৈরিক আলখাল্লাধারী আবির্ভূত হন, এবং ওঁকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসান। বলেন, "আহতকে এই মাত্র হাসপাতালে দিয়ে এলেন। চা প্রস্তুত করেছেন,—খেয়েই তাঁরা দু'জনে শান্তিবাবুকে নিয়ে হাসপাতালে যাবেন।"

"তারপর?"

"তাঁদের চা-পান-পর্ব্ব। শান্তি বাবুকেও পীড়াপীড়ি করে এক কাপ খেতে বাধ্য করেন। দু'চার চুমুক খেয়েই শান্তি বাবুর চৈতন্যলোপ! হাতে ছিল সাড়ে পাঁচ শো টাকা দামের সোনার ব্যাণ্ড দেওয়া রিষ্টওয়াচ, সাড়ে তিন শো টাকা দামের হীরের আংটী, পকেটে নগদ ছিল ১৮৫৲ টাকা ক' আনা, কিছু জরুরি কাগজ-পত্র,—সব অন্তর্হিত হয়েছে। পাওয়া গেছে শুধু এই পোষ্টকার্ড আর রুমাল।"

"তারপর? মাতৃসদন হোটেলে হানা দিলেন?"

হাঁ স্যর। ম্যানেজার হাসপাতালে এসে শান্তি বাবুকে সনাক্ত করলেন। বললেন, এঁরা তিনজন মানভূম থেকে এসে পনের দিন তাঁর হোটেলে রয়েছেন। উকিল, ব্যারিষ্টার, এ্যাটর্নিদের বাড়ী যাতায়াত করেছেন, সবসত্য। কিন্তু তিনি আবার আর এক অদ্ভুত রহস্যজনক খবর দিলেন, যার মানে কি, কতদূর দাঁড়াবে—ঠাওর পাচ্ছি না।"

"কি খবর?"

"বলছি পরে। শান্তিবাবু জিনিষ কিনতে বেলা ২টার সময় বেরিয়ে গিয়ে আর হোটেলে ফেরেন নি,—হোটেলের ম্যানেজারও সে কথা স্বীকার করলেন। তিনি বললেন—ওঁর ফেরার বিলম্ব দেখে লিগাল ম্যানেজার বৃদ্ধ ক্ষিতীশ গোস্বামী ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তাঁর অনুরোধে হোটেলের ম্যানেজার নিকটস্থ দোকানগুলায় খোঁজ নেবার জন্য চাকর পাঠান। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিশে খবর দেবার প্রস্তাব উঠল,—এমন সময় শ্রীকান্ত বাবু হোটেলে ফিরে এসে বললেন, "ট্রেন ফেল করে তিনি মেন লাইনের পরবর্ত্তী ট্রেন ধরবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনের তিন নম্বর প্লাটফরমে বসেছিলেন। বেলা সাড়ে চারটার সময় একজন চেনা লোক—যে মোটরে তাঁরা এতদিন উকিল-ব্যারিষ্টারদের বাড়ী ঘোরাঘুরি করতেন, সেই মোটরের ক্লিনার গিয়ে শান্তিবাবুর এক চিঠি দিয়ে শ্রীকান্ত বাবুকে বলে—শান্তিবাবু তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিউ কর্ড লাইনের গাড়ী ধরে এই মাত্র বর্দ্ধমান চলে গেলেন। তিনি পাঁচ নম্বর প্লাটফরম থেকে ট্রেনে উঠলেন! সময় ছিল না বলে এ প্লাট-ফরমে এসে দেখা করে যেতে পারলেন না। চিঠি লিখে পাঠালেন। আপনি হোটেলে ফিরে যান। ম্যানেজার বাবুকে সন্ধ্যার এক্স-প্রেসে তুলে দিয়ে, তার পর মগরা যাবেন।"

তরুণ বললে, "বা', শান্তিবাবুর কাছে এল শ্রীকান্ত বাবুর নামে জাল চিঠি—আর কোথায় হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীকান্ত বাবু ট্রেণ ফেল করে বসে আছেন, তাঁর কাছে গেল—শান্তি বাবুর নামে জাল চিঠি! এ যে পাকা খেলোয়াড়ের হাত দেখছি। এ ত সাধারণ গুণ্ডার কায নয়।"

মিঃ সোম ভ্রূ কুঞ্চিত করে চিন্তিত ভাবে বললেন, "শান্তি বাবুর সঙ্গে তাদের রসিকতার অর্থটা বোঝা গেল,—হীরের আংটি, সোনার ঘড়ির উপর দিয়ে তাঁর ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু শ্রীকান্ত বাবুর উপর এ অনুগ্রহের অর্থ? তাঁর দ্বারা বৃদ্ধ

ম্যানেজারকে ট্রেনে চড়িয়ে দেবার জন্য গুণ্ডাদের এত ব্যগ্রতা কেন? তাঁদের কোনও বিপদ ঘটল না তো?"

মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "আমারও তাই আশঙ্কা হয়েছিল। কিন্তু রেলওয়ে পুলিশ-ষ্টেশনে খবর নিয়ে জানলাম—সেরাত্রে হাওড়া থেকে অসানসোলের মধ্যে কোনও ট্রেনযাত্রীর কোনরূপ বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটে নি। প্রকৃত পক্ষে শত্রুপক্ষ যদি সত্যই তাঁদের জন্য কোনও ফাঁদ পেতে থাকে, বোধ হয় তাদের মতলব হাসিল হয় নি। ওঁরা সম্ভবতঃ নিরাপদে স্ব স্ব স্থানে পৌঁছেছেন।"

মিঃ সোম বললেন, "পৌঁছালেই মঙ্গল। কিন্তু—আচ্ছা থাক এখন সে কথা। তারপর বলুন,—শ্রীকান্ত বাবু যে সে চিঠি হাওড়া ষ্টেশনে পেয়েছিলেন এ খবর আপনি কার কাছে পেলেন?"

"মাতৃসদন হোটেলের ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার বললেন—হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করে শ্রীকান্ত বাবু সে চিরকুটটা রাজ-এষ্টেটের লিগাল ম্যানেজারকে দেখালেন। উনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, উনিও দেখেছেন।"

"উনিও দেখেছেন? ভাল। সে চিঠিতে কি লেখা ছিল?"

"পেন্সিল দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল, 'শ্রীকান্ত দা, আপনি ট্রেন মিস্ করেছেন জানলাম। এইমাত্র বর্দ্ধমান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে, সেই লোকের সঙ্গে আমি চললাম। দিদিমার খুব অসুখ। সময় নাই, সে জন্য ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলাম না। আপনি তাঁকে সব বলবেন। আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে লগেজ-পত্র সহ হোটেল থেকে নিয়ে এসে দিল্লী এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে পরের প্যাসেঞ্জারে মগরা যাবেন। আমি বর্দ্ধমান থেকে দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠব। ইতি নিঃ— শান্তি।"

নিকটস্থ বইয়ের শেলফ্ থেকে একখানা টাইম টেবল টেনে নিয়ে তার পাতা উল্টাতে উল্টাতে মিঃ সোম বললেন, "দিল্লী এক্সপ্রেস আগে নিউ কর্ড লাইন দিয়ে যেত। আজকাল মেন্ লাইন দিয়ে যাচ্ছে। শ্রীকান্ত বাবুও তাহলে ঐ সঙ্গে—ওঃ, না। আমার ভুল হয়েছে, দিল্লী এক্সপ্রেস মগরা ষ্টেশনে দাঁড়ায় না। তা হলে আধ ঘণ্টা পরে যে হাওড়া-বর্দ্ধমান লোকালটা ছাড়ে, তাতেই শ্রীকান্ত বাবুকে যেতে হয়েছে। কিন্তু ক্ষিতীশ বাবুকে ট্রেনে চাপিয়ে দেবার জন্য শান্তি বাবুর এত মাথা ব্যথা কেন? ক্ষিতীশ বাবু কি একা ট্রেণে যাওয়া-আসা করতে পারেন না?"

মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "না। হোটেলের ম্যানেজার বললেন, তিনি অত্যন্ত ডিস্‌পেপ্‌টিক রুগ্ন বৃদ্ধ। অত্যন্ত ক্ষীণজীবী, কাহিল মানুষ। শ্রীকান্ত বাবু, শান্তি বাবু তাঁকে ধরে ধরে মোটর থেকে নামাতেন, উঠাতেন। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠবার সময় তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হোত।"

মিঃ সোমের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "হাওড়া ষ্টেশনে শান্তি বাবুর নামের সে চিঠি শ্রীকান্ত বাবুকে কে দিয়েছিল? একজন মোটরের ক্লিনার? কে সে?"

"উকিল-ব্যারিষ্টারদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করবার জন্য এঁরা একটা ভাড়াটে ট্যাক্সির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। এঁরা যে ক'দিন যাওয়া-আসা করেছিলেন, সেই ট্যাক্সিই এঁদের ভাড়া খাটত। কাজেই সেই ট্যাক্সির সোফার আর ক্লিনারকে এঁরা চিনতেন। হোটেলের ম্যানেজারও তাদের চেনেন। তাঁর সাহায্যে সে ট্যাক্সির সোফারকে ধরেছিলাম, কিন্তু সে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে বলে থানায় আনতে পারলুম না। সে বললে—ব্যারিষ্টারদের বাড়ীর কাজ চুকে যাওয়ায় ঘটনার পূর্ব্বদিন থেকে তাদের জবাব হয়। ঘটনার দিন সে অন্যত্র ভাড়া খেটেছে। এদের খবর কিছু জানে না।"

"আর সেই পত্রবাহক ক্লিনার?"

"সে ব্যাটা গা-ঢাকা দিয়েছে। সন্ধান নিয়ে নিয়ে তাদের বস্তি পর্য্যন্ত খুঁজে এলাম। তার ভাই-বেরাদার গোষ্ঠীকে যথেষ্ট ধমক চমক করলাম, কিন্তু সকলেই একবাক্যে বললে,—সে আর তিনজন লোক ৩০শে নবেম্বর দেশে চলে গেছে। অথচ ১লা ডিসেম্বর সে হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীকান্ত বাবুকে চিঠি দিয়েছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ৩০শে নবেম্বর সে যায় নি, এবং সে অবশ্যই এই শয়তানি চক্রান্তকারীদের দলে যোগ দিয়েছে।"

"হুঁ, তাকে আগে চাই। তার দেশ কোথা?"

"বালিয়া জেলা। নাম ঠিকানা সব যোগাড় করে, সেখানকার পুলিশকে টেলিগ্রাম করেছি।"

মিঃ সোম বললেন, "বেশ করেছেন, ধন্যবাদ। কিন্তু ওখান থেকে সঠিক খবর পাবেন কি না সন্দেহ। ওদেশের অধিকাংশ স্থানে পুলিশের সঙ্গে ডাকাতদলের বৈবাহিক সম্বন্ধ। এক বৈবাহিক পুলিশ ইনেস্‌পেক্টারী করেন, আর এক বৈবাহিক পরম নিরাপদে প্রচণ্ড বিক্রমে দস্যুবৃত্তি করেন। এমন কি, দস্যু-সর্দ্দারের পুত্র ওখানে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগেও সসম্মানে স্থান পায়, তাও জানি।"

"বলেন কি স্যর! অরাজক পুরী?"

"প্রায়। তবে আশ্বাসের কথা এই ক্লিনারটা যদি নিরপরাধ হয়, পুলিশ তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে, আর বাহাদুরী দেখাবার জন্য যথেষ্ট উৎপীড়ন করবে। কিন্তু অপরাধী হলে,—পাত্তা পাওয়া ভার হবে।"

[ক্রমশঃ]
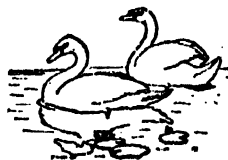
নেপালের সৌধকলা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

উত্তর ভারতের নেপাল রাজ্য ভারতীয় সভ্যতা ও শীলতার বাহনরূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভারত, নেপাল ও তিব্বতের ভিতর চিরকালই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের প্রভাব ছিল এ-ক্ষেত্রে অসামান্য। ঐতিহাসিকরা বাঙ্গালা দেশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বলে নেপালের প্রশংসাই করেন।

নেপাল দৈর্ঘ্যে পাঁচশত মাইল ও প্রস্থে দেড়শত মাইল। হিমালয়ের সমুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী নেপালের দ্বারপালের মত দাঁড়িয়ে আছে। এদের উচ্চতা সামান্য নয়; নন্দাদেবী ২৬০০০ ফুট, ধবলগিরি ২৬৮২৬ ফুট, গোসাইস্থান ২৪০০০ ফুট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮১৫৬ ফুট। এভাবে পর্ব্বতশৃঙ্গ ও গৌরীশঙ্করের অংশবিশেষ নেপালের ভিতরই অবস্থিত।

নেপালের তিনটি প্রধান সহর। কাঠমাণ্ডু—(বর্ত্তমান রাজধানী) ললিত পত্তন বা পাটন এবং ভাটগাঁও বা ভট্টগ্রাম। কথিত আছে মহারাজ অশোক নেপালে আসেন এবং তাঁর কন্যাই পাটন সহর স্থাপন করেন। এ-সমস্ত সহর একটা ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ সভ্যতার বিচিত্র উপাদানে ভরপুর হয়ে আছে।

নেপাল যাওয়ার পথের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়, শীতগ্রীষ্মের বৈচিত্র্যও অসাধারণ। Kirpatrik বলেন: "In three or four days one may actually exchango a heat of equal to that of Bengal for the cold of Russia by barely moving from Noakote to Kheroo or even Ramko." বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের Rummindei অঞ্চলে। কাজেই নেপাল শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছে সকলের।

মহারাজাধিরাজের প্রাসাদ (নেপাল)

নেপালের বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতা ভারতের সমস্ত আন্দোলনগুলির সহিত যোগরক্ষা করে' এসেছে। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশেরই অনুক্রম। Sir Char'es Eliot বলেন: "Buddhism in Nepal reflected the phase it underwent in Bengal." তিনি আরও বলেন: "Nepal being intellectually the pupil of India, has continued to receive such new ideas as appeared in the plains of Bengal," কাজেই ভাব ও তত্ত্বের দিক হ'তে নেপালকে স্বতন্ত্র মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এখানে বৌদ্ধ, হিন্দু ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম এক সঙ্গেই বর্দ্ধিত হয়েছে। ধর্ম্মপ্রাণ বলে' এর ভিতর জনগণের কোন সঙ্ঘর্ষ হয় নি।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির

প্রাচীনকালে এখানে মল্লরাজগণের কীর্ত্তির বহু অধ্যায় শিল্পকলায় প্রকাশ পেয়েছিল। যারা বর্ত্তমানে নেপালের প্রভু তাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপাল জয় করেন।

নেপালের সব চেয়ে বিস্ময়জনক ব্যাপার হচ্ছে নেপালের স্থাপত্য। এখানকার মন্দিরের সংখ্যা প্রচুর এবং দেবদেবীর সংখ্যাও সামান্য নয়। মহাযানবাদ নেপালে আদিবুদ্ধ কল্পনা দ্বারা সমর্থিত হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম আদিবুদ্ধের সহিত যুক্ত

করে বুদ্ধশক্তিকে শুধু তা' নয় এক বুদ্ধকে পঞ্চবুদ্ধ ব'লে' কল্পনা করবার প্রেরণাও এ-অঞ্চল থেকে সুরু হয়। এই পঞ্চবুদ্ধের নাম হচ্ছে : বিরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ ; এদের সহিত আবার শক্তিও যুক্ত করা হয়েছে। তাদের নামও যথাক্রমে বজ্রধাত্বেশ্বরী, লোচনী, মামুখী, পাণ্ডরা ও তারা।

তন্ত্রের দেববাদ বহু দেবতায় পরিপূর্ণ। সাধনমালায় এক দেবতারও অসংখ্য রূপ বিবৃত আছে। এরূপ অবস্থায় চিত্র ও
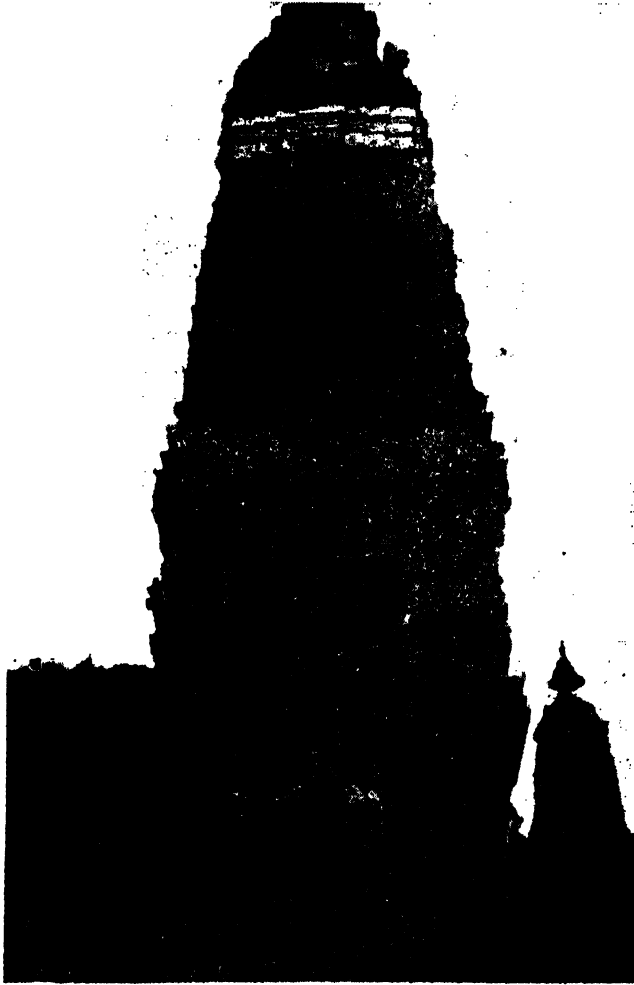
মহাবোধি মন্দির (পাটন)

ভাস্কর্য্যকে এই বিরাট দেবসংগ্রহ রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে।

এ-রাজ্যের পটভূমিই একটা বিরাট ব্যাপার। এজন্য এখানে অসামান্য আয়োজন হয়েছে সকল শিল্পের। নেওয়ারী শিল্পীরা এখানে বিখ্যাত। এ-সব শিল্পীরাই তিব্বতে গিয়ে তিব্বতীয় সৌধনির্ম্মাণে নিজেদের প্রতিভা প্রমাণ করে। জাপানী পরিব্রাজক Kawaguchi বলেন :

"The Nepalese were the architects of the temple and the sculpture of the Buddha statues and paintings of Nepal." এদের ভিতর নেওয়ারীরাই শিল্প বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেছে। Sylvain Levi বলেন : "Newar artisans were widely employed in Tibet, Tartary and many parts of China and this continued upto modern times." নেপালী শিল্পী আনিকো চীন সম্রাটের শিল্পদপ্তরের প্রধান শিল্পী রূপে নিযুক্ত হয় কাবলা খাঁর আমলে। এতেই বোধ হবে যে নেপালের বিশিষ্ট প্রতিভা রম্যশিল্পের অনুকূল ছিল এবং তা' বহুদিকে নিজের শক্তিকে প্রকট ক'রে ধন্য হ'য়েছিল।

সচরাচর শিল্পরচনার বিরাট অধ্যায়ের ভিতর মন্দির রচনা একটা প্রধান স্থান গ্রহণ ক'রে থাকে নেপালেও তা' হয়েছে। নেপালে মন্দিরের সংখ্যা প্রচুর। কোন লেখক মন্দিরের সংখ্যা দু' হাজার ব'লে মনে করেন। তার ভিতর কাঠমাণ্ডুতে আছে ৬০০, পাটনে আছে ৬০০ এবং ভাটগাঁয়ে আছে ২৫০। নেপাল ভ্রমণের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছে। সেখানে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা নেই—নেপাল গভর্ণমেণ্ট সব সময় সতর্ক, সচেতন ও সন্দিহান। অথচ এ কথা বলা দরকার—নেপালের সৌধকলা সম্বন্ধে ধারণা না হ'লে ভারতীয় স্থাপত্যের একটা বিরাট অধ্যায়ই জানা হয় না।

কাঠমাণ্ডুতে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির এক রমণীয় স্বপ্নকে যেন জাগ্রত রেখেছে। একটা উচ্চ ভূমিতে এ মন্দির রচিত, পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় অনেকটা। তারপর হঠাৎ মন্দিরের সম্মুখীন হ'তে হয়। মন্দিরের স্বর্ণখচিত উচ্চভাগ বহু দূর হ'তে একটা অনির্ব্বচনীয় মায়াজাল বিস্তার করে। বস্তুত সমগ্র রাজধানীতে এই মন্দিরখানির ছবি একটি সৌন্দর্য্যের মহার্ঘ্য প্রতিমা বলে মনে হয়। মন্দিরটিতে উপর ভাগে চোখ এঁকে এঁকে দেওয়া হয়েছে চারদিকে। তা'তে মনে হয় অহর্নিশ জীব ও মানুষের মত মন্দিরটি বহুদূর পর্য্যন্ত অনিমেষ চোখে চেয়ে আছে। এই মন্দির রাজা গোরাদাস কর্ত্তৃক দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়, এরূপ কিংবদন্তী আছে। পরে রাজা সিংহমল্ল ১৫৯৩ সালে তা' সংস্কার করেন। এই মন্দির আদি বুদ্ধের। এর ভিতর পঞ্চ বুদ্ধের প্রতিমা আছে।

নেপালে মন্দিরগুলির বৈচিত্র্যই লক্ষ্য করবার ব্যাপার। ভারতবর্ষে যত রকমের মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, এখানে তার সকল রকমের নমুনা আছে। বস্তুতঃ, চারিদিকের আন্দোলনের চিহ্ন

এখানে ছায়াপাত ক'রে গেছে সুস্পষ্ট ভাবে মহাযান বৌদ্ধবাদের আন্দোলন প্রচুরভাবে নেপালে বিস্তৃত হয় এই মন্দির প্যাগোদা-রীতিতে তৈরী হয়েছে। এই রকমের মন্দির ভারতীয় না চৈনিক—এ বিষয়ে নানা বাদানুবাদ

পশুপতিনাথের মন্দির

পাটনের মহাবোধি মন্দির কতকটা বুদ্ধগয়া মন্দিরের অনুকরণে রচিত। ইষ্টকনির্ম্মিত এই মন্দিরের জটিল সমারোহ দেখে বিস্ময় জন্মে। এর কোন 'শিখর' নেই—'কলস' 'ছত্র' ইত্যাদিও নেই। চার কোণে ছোট চারটি চূড়া আছে। উচ্চতায় ইহা ৭৫ ফুট। এরূপ নিপুণভাবে খোদাই করা আর কোন মন্দিরই নেপালে নেই। ১৫৮৫ সালে এই মন্দিরনির্ম্মাণ-কার্য্য সুরু হয় এবং প্রায় একশত বৎসরে এ মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। নয় হাজার বুদ্ধমূর্ত্তি এ মন্দিরে খোদিত আছে। মন্দিরে প্রবেশ করবার দ্বার মাত্র একটি, পাথরের তৈরী। মন্দিরটি পাঁচতলা। শাক্যসিংহের মূর্ত্তি প্রথম তলায়, অমিতাভ দ্বিতীয়, তৃতীয়তলে একটি ছোট পাথরের চৈত্য আছে; চতুর্থ তলে আছে একটি ধর্ম্মধাতু মণ্ডল এবং সর্ব্বোচ্চে আছে বজ্রধাতুমণ্ডল।*

মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের জনপ্রিয় দেবতা। পাটনে এই দেবতার চমৎকার তিনতলা মন্দির আছে।

কৃষ্ণমন্দির (পাটন)

হয়েছে। ডক্টর Sylvain মতে এই রীতি ভারতীয়। এই রীতিতে তৈরী বহু মন্দির নেপালে আছে। ইদানীং পাহাড়পুরে যে মন্দির ভগ্নাবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে তাও এই আদর্শে তৈরী। চীনদেশে এ আদর্শ ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। মন্দিরটি ত্রিতল, প্রবেশ করতেই সামনে দুটি পাথরের সিংহমূর্ত্তি আছে, প্রাচীন প্রথায় তৈরী। এগুলি হুবহু সিংহমূর্ত্তি নয়। মন্দিরটির আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্য প্রচুর। মঞ্জুশ্রীই নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই দেবতাকেই নেপালে আদিবুদ্ধ মনে করা হয়।

ভাটগাঁতে অন্য ধরণের মন্দির আমাদের পুলকিত করে। কোন কোন মন্দির অনেকটা পুরী অঞ্চলের মন্দিরের মত। আদ্যোপান্ত সুগঠিত রেখা দ্বারা

(ribbed) মন্দিরে আচ্ছন্ন—সম্মুখভাগে ক্ষুদ্র একটি আতপত্রের মত খানিকটা অংশকে বারান্দার মত করা হয়েছে। এ মন্দিরের পাশেই কৎপোল দেউল।

প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের পুরোভাগের প্রবেশদ্বার বিশেষভাবে খচিত হয়ে থাকে। তাতে বহু দেবতার মূর্ত্তি, নানা রূপক, তিলক ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন ক্ষোদিত থাকে। কোথাও বা গঙ্গা-যমুনার দুটি মূর্ত্তি দু' ধারে থাকে। ভাটগাঁওয়ের স্বর্ণদ্বার বিখ্যাত রচনা।

পাটনের কৃষ্ণমন্দির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নূতন নূতন আদর্শ নেপালের প্রিয়। একঘেয়ে একরকমের মন্দিরে এখানে কারও তৃপ্তি হয় না। পাটনের কৃষ্ণমন্দিরটি দেখতে মনে হয়—যেন একটি রথ। ভিতরে সমগ্র মহাভারতের আখ্যান পাথরে খোদাই করা আছে। এই খোদাই কাজের বিচিত্র গমক অন্যত্র দুর্লভ। বস্তুতঃ নেপালের শিল্পীরা ভারতের গৌরবের ব্যাপার। অতি দুঃসাধ্য কাজও এরা অবলীলাক্রমে করে থাকে। এখানকার নেওয়ারী কারিগরেরা এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাদের কেউ শিবমার্গী কেউ বা বুদ্ধমার্গী—নৈপুণ্যে সকলেই অপরাজেয়। কৃষ্ণমন্দিরটি চারতলা, সারি সারি স্তম্ভ ও খিলান এর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। উপরের দিকটা সাধারণ উর্দ্ধ শির মন্দিরকে অনুসরণ করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে স্তম্ভের উপর বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্ত্তি আছে।

মৎস্যেন্দ্রনাথ মন্দির (নেপাল—পাটন)

এই মন্দিরের পাশেই একটি শিবমন্দির আছে, তা প্যাগোদা প্রণালীতে নির্ম্মিত। এর সামনে একটি বৃষভের মূর্ত্তি আছে—চমৎকার।

নেপালের পশুপতিনাথের মন্দির ভারতবিখ্যাত। প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থান হ'তে বহু যাত্রী উপস্থিত হয় দেব-দর্শনের জন্য। এ মন্দিরটি রচনা-হিসাবে বিশেষ ঐশ্বর্য্যবান নয়। নির্ম্মাণের আদর্শ প্যাগোদা রীতিকে অনুসরণ করেছে। পশুপতিনাথের মন্দিরের চারদিকে বহু ছোট-খাটো মন্দির ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। চঙ্গুনারায়ণের মন্দির সব চেয়ে ঐশ্বর্য্যবান।

কারও মতে সমগ্র এসিয়ায় এরূপ সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ আছে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান মহারাজা ও মহারাজ-মন্ত্রী উভয়ের অট্টালিকাই ইউরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত। নেপালের হর্ত্তা-কর্ত্তা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মহারাজ যোধ সমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা। যাঁকে king বা ধিরাজ বলা হয় তাঁর ক্ষমতা কিছুই নেই।

এই বিচিত্র ভূভাগকে জঙ্গ বাহাদুর রাণার বংশধরেরাই শাসন করছেন এবং হিমাদ্রিবক্ষের এই সৌন্দর্য্যস্বপ্নের রক্ষার ভার এঁদেরই উপর অর্পিত হয়েছে। হিন্দুর গৌরব এই স্বাধীন নেপালে অক্ষত আছে সভ্যতার নানা আয়োজন ও সম্ভার। মহারাজারা তান্ত্রিক হিন্দু, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ

অতীত দিনের স্মৃতি (গল্প

শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী

পিতৃপুরুষের ভিটে—

পল্লীর সেই আম জাম কাঁঠাল বাগানের মধ্যে চূণবালি-খসা ইটের ইমারত—তার এ পাশে পানায় ভরা পুকুর, ও পাশের বাঁশ বন নাবাল জায়গায় ঝুঁকে পড়ে ডালপালা নাড়া দিয়ে সন সন্ শব্দ করছে দিনরাত, তার সঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙের গোঙানী চলছে রাত্রি দিন।

এরই মধ্যে স্বামী ও সন্তানসহ এসে উঠলো মিসেস সেন অর্থাৎ অরুন্ধতী। মোট-ঘাটগুলো ব্যবস্থা করে রেখে ঘর-দোর বাসের উপযোগী করাতে সে কোমর বেঁধে লেগে গেল।

বাড়ীতে জন-মজুর লাগানো হয়েছে—তাদের সে উপদেশ দেয়।

"উঠোনটার সব ঘাস চেচে আগে সমান করে ফেল, তারপর দুরমুস পিটে দে বাপু। ঘরগুলোর দরজা-জানালায় আলকাতরা মাখাতে হবে কিন্তু, সব ঘুঁই ধরে গেছে। বালি সিমেণ্ট মাখিয়ে ফুটো-ফাটাগুলো বুজিয়ে দে,—সাপ-টাপ না ঢোকে ঘরের মধ্যে, যা বন চারদিকে, তাকালে ভয় লাগে। কতকাল যে দেশছাড়া—মনেই পড়ে না—কেই বা জানতো বাংলা দেশের এই গাঁয়ে আবার ফিরে আসতে হবে—কপাল আর কাকে বলে!"

দরজার বাইরে সেন সাহেবকে দেখা যায়—বাংলায় তিনি অঘোর বাবু—মিঃ সেন নন। পরণে তাঁর একটা ঢিলে পায়জামা, গায়ে হাফসার্ট, পায়ে বার্মিজ স্যাণ্ডেল।

স্ত্রীর কর্মতৎপরতায় তিনি গম্ভীর ভাবে কেবল একটু হাসলেন মাত্র।

মাথার কাঁচাপাকা—ছোট করে ছাঁটা চুলগুলোর মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করতে করতে বললেন—"বিদেশে থাকার জন্যে বাড়ী যে একটা আছে, সে কথা আর মনেই হয় নি অরু—কি বল?"

উত্তরে অরুন্ধতী হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে—"কথাটা মিথ্যে নয়। তুমিই বল দেখি এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধের লঙ্কাকাণ্ডটা যদি না বাধতো তা হলে তুমিই কি তোমার বর্ম্মার অতবড় কারবার ফেলে বাংলায় ফিরতে চাইতে কোনদিন? তা ছাড়া বল দেখি—ছেলে মেয়ে, স্কুল-কলেজ, নিজেদের স্বাস্থ্য—এ সবও তো দেখা চাই। সব ভাসিয়ে বিদেশে গিয়ে থাকতে গেলে তো চলে না।"

চাবিবাঁধা আঁচলটা কাঁধে ফেলে অরুন্ধতী রান্নাঘরের দিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালো—

"তবু যে প্রাণগুলো নিয়েও পৌঁছাতে পেরেছি এই আমার যথেষ্ট লাভ। মনে কর দেখি, কি ভাবে আমরা এসেছি—উঃ, সে কি পথ, জীবনে যার কল্পনাও কোনদিন করি নি। পায়ের কি আর পদার্থ আছে গো—ব্যথায় আজও পা নাড়তে পারছিনে। পায়ের এই ব্যথা সারতে এখন কতকাল লাগবে তাই বা কে জানে। যাই হোক, তোমাদের নিয়ে যে ফিরতে পেরেছি, এই আমার সৌভাগ্য।"

কালো সিমেণ্টের উপর অরুন্ধতীর পা দু'খানা বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য জাগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাশের ঘরে তখন অরুন্ধতীর মেয়ে ঝর্ণা ছোট্ট খোকনকে গল্প শোনাচ্ছে—

"ওই যে বাঁশঝাড় দেখছো খোকন, ওইখানে একটা প্রকাণ্ড বড় পেত্নী থাকে—তার এত বড় বড় দাঁত, এত বড় বড় ঝাঁকড়া চুল—আবার নাকিস্বরে কথা বলে। যে ছেলেপুলে কথা না শোনে, সে তাদের ধরে আর ঝোলার মধ্যে ভরে।

খোকন সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তারপর কি করে?"

ঝর্ণা বলে, "তারপর মারে আর খায়—"

"ও—"

খোকন চুপ ক'রে যায়।

পাশের বাঁশবাগানে শব্দ ওঠে—সন সন সন—

বর্ষণমুখর রাত্রি—

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের শুভ্র আলোয় দেখা যাচ্ছে বাতাসে দোদুল্যমান গাছগুলো। মাঝে মাঝে ছুটে আসছে বাদল হাওয়া।

অদূরে কি নিকষ-কালো অন্ধকার,—আর সে অন্ধকারের নিবিড়তা ভীষণ দেখাচ্ছে। সেই পৃথিবীজোড়া অন্ধকারের কূল-কিনারা নাই, ঘরে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন, তার আলোয় দেখা যাচ্ছে বিছানায় নিদ্রিত খোকন, ঝর্ণা ও মিঃ সেনকে। নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ওরা সমস্ত চেতনাকে নিদ্রার কোলে সমর্পণ করেছে, পারেনি একা অরুন্ধতী। একা সে খোলা জানালার কাছে বসে আছে বাইরের সেই ঘনীভূত অন্ধকারের পানে তাকিয়ে।

বাইরের সজল হাওয়া আর অন্ধকার আজ তার মনে অনেক দিন আগের হারানো স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছে। বাইরের সজল হাওয়ার চেয়েও তার মনে বেশী জোরে ঝড় বইছে; তারই আঘাতে দোলা খাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড, থেকে থেকে তাই ধড়ফড় ক'রে উঠছে, অরুন্ধতী বুকটা চেপে ধরছে। তার চোখের সম্মুখে এক হ'য়ে যাচ্ছে অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ—।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলেন মিষ্টার সেন—

"এখনও শোওনি তুমি, রাত তো বড় কম হয়নি অরু,—দেড়টা বাজে যে।"

ঘুমের ঘোরে খোকনও একবার আঁৎকে কেঁদে উঠলো।

অরুন্ধতী তার কাছে বসলো, শান্ত কণ্ঠে স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বললে, "আমার ঘুম আসছে না, এলেই শোব এখন, তোমরা ঘুমোও।"

তন্দ্রা জড়িত কণ্ঠে মিষ্টার সেন বললেন, "একে পাড়াগাঁ, তাতে ডাক্তার-বদ্যির অভাব, ম্যালেরিয়া একবার ধরলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না আর, তা বলে দিচ্ছি। এসব দেশ ম্যালেরিয়াতেই তো উজাড় হল। চারদিকে দেখতে পাচ্ছো বড় বড় বাড়ী পড়ে আছে, খুঁজলে লোক পাবে না। সব গেছে এই ম্যালেরিয়ায়—সব—"

অরুন্ধতী উত্তর দিল না, নির্ব্বাক্ ভাবে শূন্য নয়নে চেয়ে রইলো বাইরের অন্ধকারের পানে—যেখানে অজস্র বৃষ্টিধারা নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। সে তার হারিয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো স্মৃতি এক করে মালা গাঁথছে তখন—

বাইরের আকাশে-বাতাসে তার সেই স্মৃতিগুলোই খণ্ড রূপে ভেসে বেড়াচ্ছে—

পনের বৎসর আগের এমনই একটা বর্ষণমুখর রাত্রি।

পাহাড়তলীর ছোট একটা ষ্টেশন কোয়ার্টারে বাস করেন প্রৌঢ় ষ্টেশনমাষ্টার মুকুন্দবাবু। স্ত্রী চির-রুগ্না, সমস্ত দিক দিয়ে নির্ভর করতে হয় একমাত্র কন্যা স্বপ্নার 'পরে। স্বপ্না বুদ্ধিমতী, সে জানে পিতার অল্প আয়েও কি ভাবে সংসার চালাতে হয়—মুকুন্দবাবুর ভরসা শুধু সেইটুকু—গর্ব্বও সেইটুকু এবং সেই জন্যই মেয়েকে পরের হাতে সমর্পণ করে অন্যত্র পাঠাবার কল্পনাও তাঁহার কাছে আতঙ্কজনক। তিনি শয্যাশায়িনী স্ত্রীকে বুঝাতে লাগলেন, "তুমি ভেব না, বিয়ে না দিয়ে ঘরে মেয়ে রাখবার কল্পনাও আমি করিনে। তবে চোখ বুজে যার তার হাতে মেয়েটাকে দেওয়াও তো চলে না, একটু দেখে শুনে দেওয়া দরকার।"

শয্যাশায়িনী স্ত্রীর দুটি চোখে মৃত্যুর ম্লানিমা ঘনিয়ে আসে, ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলেন, "কিন্তু যদি আমি দেখে যেতে পারতুম।"

অতৃপ্তির একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসকে ভারি করে তোলে।

মুকুন্দবাবু উঠে পড়ে লাগেন মেয়ের উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে, কিন্তু কোথায় তাঁর মনোনীত পাত্র? তাই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একদিন চির বিদায় দিতে হলো শয্যাশায়িনী স্ত্রীকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজে জবাব দিয়ে ভগ্ন দেহ-মন নিয়ে বক্সাসহ ফিরে আসতে হল বাংলার এমনই একটা গণ্ডগ্রামে; এবং সেই গ্রামের পাশের গ্রামে সমর্পণ করতে হল স্বপ্নাকে একজন মূর্খ ছেলের হাতে।

এরই দিন কুড়ি বাদে—

একদিন একটা বর্ষণক্লান্ত প্রভাতে দেখা গেল—স্বপ্না ঘরে নাই। ছোট একখানা পত্র লিখে সে জানিয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেনি, জীবনের খাদ্য অন্বেষণ করতে গেল।

হতভাগ্য পিতা মুকুন্দবাবু বিছানায় পড়ে লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলেন না; জনে জনে এসে তাঁকে শুনিয়ে গেল—নববধূ স্বামীর আলয় হতে উনিশ কুড়ি দিনের মাথায় চলে গেছে! জামাতা একবার জানাতে এলো—

সেই মূর্খ জামাতার হাত দুখানা নির্ব্বাকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুকুন্দবাবু অনেকক্ষণ পড়ে রইলেন।

জামাতাও চুপ করে বসে রইলো, সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা সে খুঁজে পেলে না, দিতেও পারলে না।

অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধকণ্ঠে মুকুন্দবাবু বললেন—"সে মরেছে, কিন্তু তুমি আছো। আমায় কোন হাসপাতালে দিয়ে এসো বাবা, আমি জানব আমার কেউ ছিল না—কেউ নেই পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছি একা—আবার একাই চলে যাব!"

যার হাত দু'খানা মুকুন্দবাবু হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন, সে হাত সরিয়ে নিলে না, চোখের জলও দেখা গেল না তার চোখে, তার বদলে একটু হাসির রেখা তার মুখে ফুটে উঠলো, দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনার হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নেই। আমি আপনাকে দেখব, আপনার জামাই হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে। তবে যদি আপনার আগে আমার কিছু হয়..."

একটা উষ্ণ শ্বাস সে চাপবার চেষ্টা করলে, মুকুন্দবাবুর বর্ণহীন শুষ্ক ঠোঁট দু'খানা কান্নার বেগে কেঁপে উঠলো থর্ থর্ করে।

কেটে গেছে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ মাস, দীর্ঘ বৎসর।

তারপর বাঙ্গালার সীমা, বাঙ্গালীর সমাজের আবেষ্টনী ছাড়িয়ে বহুদূরে বর্ম্মামুল্লুকে, রেঙ্গুন সহরে দেখা যায় একটী বাঙ্গালীর সুখের সংসার স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে। অর্থের অভাব তাদের নাই। গার্হস্থ্য শান্তিও তাদের অটুট। কিন্তু ভগবানের বিধানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি কারও অদৃষ্টে লেখা নাই বলেই জাপানীরা করলে রেঙ্গুন আক্রমণ,—দিকে দিকে জ্বলে উঠলো সর্ব্বনাশের আগুন, সেই সর্ব্বনেশে আগুনের শিখার সঙ্গে মানুষের মরণ-আর্ত্তনাদ আকাশের দিকে শত শত বাহু বিস্তার করে। শান্তিনীড় গেল ভেঙ্গে এবং যে যে দিকে পারলো, ছুটে বার হয়ে পড়লো। ফিরতে হলো আবার সেই বাঙ্গালায়, সেই চিরদিনের অবহেলিত, পতিত মাতৃভূমির বুকে।

সকাল হয়েছে—

বর্ষণক্লান্ত সকাল। মেঘের রাজ্য ডিঙ্গিয়ে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাচলে দেখা দিয়ে ভাসাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশ সজীব হয়ে উঠলো।

চা খাওয়া শেষ করে মিঃ সেন বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অরুন্ধতী ভোরে উঠে সামনের জায়গাটা পরিষ্কার করিয়ে ফুল বাগানে পরিণত করার চেষ্টা করছে।

পাশে দাঁড়িয়ে মিঃ সেন অভ্যাসমত সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন, সকালের রৌদ্র-ঝলমল গাছ-লতা-পাতার পানে তাকিয়ে তাঁর মনের আগল পর্য্যন্ত খুলে গিয়েছিল; মুগ্ধকণ্ঠে তিনি ডাকলেন, "স্বপ্না—"

অরুন্ধতী চমকে উঠলো,—সামনে সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকায় তেমনই; এক নিমেষে সে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। মিঃ সেন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বললেন, "দেখ অরু, সামনের দিকে একটীবার তাকিয়ে দেখ, আজ আবার মনে হচ্ছে যেন সেই পুরানো জীবনে ফিরে এসেছি। এই সময় পুরানো দিনের সেই গানখানা তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে—সেই

আজি বর্ষারাতের শেষে—

অরুন্ধতী ভ্রূকুটী করলে—

"জানো, কবির কল্পনা সব সময়েই মাধুর্য্য রস পরিবেশন করে কিন্তু সেটাকে পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করবার মত মনের অবস্থারও তো দরকার। আমার মনের অবস্থা গান গাইবার মত নয়। খোকনের গা-টা কাল রাত্রে বড্ড গরম হয়ে উঠেছে, এখনও জ্বরটা ছাড়ে নি দেখেছি!"

মিঃ সেনের চোখের সৌন্দর্য্যনেশা নিমেষে টুটে গেল—

"কি সর্ব্বনাশ, ম্যালেরিয়া ধরলো নাকি? এ-সব দেশে একবার জ্বর বললেই ম্যালেরিয়া—এখন উপায়?"

অরুন্ধতী একটু হাসবার চেষ্টা করলে—

"উপায় নেই বলে চুপ করে থাকলে তো চলবে না। এখানে ডাক্তার থাকে ত কল দাও, এসে দেখে ওষুধ দেবেন।"

মাথার পাকা-কাঁচা চুলের মধ্যে মিঃ সেন অঙ্গুলী চালনা করতে লাগলেন নিশ্চিন্ত মুখে—"তাই তো! এখনও গ্রামের কারও সঙ্গে ভাব আলাপ হয়নি, ডাক্তার আছেন কি না তাও জানি নে। তবে পাশের গ্রামে একজন কবিরাজ আছেন শুনেছি, তিনিই নাকি সকলের চিকিৎসা করেন।"

অরুন্ধতীর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, সে বললে, "অবশেষে কবিরাজের হাতে চিকিৎসার ভার দিতে হবে? লোকে বলে—মাতে যদি হয় জাতবদ্যির হাতে মরা ভালো তবু গো-বদ্যিকে দেখানো কিছু নয়। ওদের পরে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই, কেমন যেন অশ্রদ্ধা জাগে!"

মিঃ সেন বললেন, "অশ্রদ্ধা হলেও উপায় যখন নেই, কবিরাজকেই এখন ডাকতে হবে, পরে দেখা যাক, যদি ডাক্তারকে আনতে পারি।"

মুখ ফিরিয়ে অরুন্ধতী বললে, "যেমন করেই হোক্, যত তাড়াতাড়ি পারো ডাক্তার আনতে পাঠিয়ো—উপস্থিত আজ কবিরাজ দেখুক—আমি একেবারে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখতে পারব না।"

বেলা বেড়ে চললো—

ভিতর বাড়ীতে রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে অরুন্ধতী মহাব্যস্ত হয়েছিলেন, কবিরাজকে খবর দিবেন কি না সে সিদ্ধান্ত এখনও ঠিক করতে পারা যায় নি,—মিঃ সেন বাহিরের বারাণ্ডায় কেবল পাদচারণা করছিলেন অস্থির ভাবে।

সামনের উঁচু সিঁড়িতে ফাটলে ফাটলে জন্মেছে আগাছা, আর নীচে রেলিংঘেরা ফুলবাগানে বড় কাঁটাঝোপ অসঙ্কোচে মাথা তুলেছে। তার ও-পাশে লাল সুরকিঢালা পথসকল সারারাতের বারিবর্ষণে বিপর্যস্ত—কোথায় গিয়ে মিশিয়ে গেছে দেখা যায় না।

মিঃ সেন অন্যমনস্ক ভাবে চেয়েছিলেন। হয় তো তাঁহার বর্তমান জীবনের সঙ্গে এই বর্তমান অবস্থার মিল নাই, ভবিষ্যতেও এর সঙ্গে মিল থাকবে কি না কে জানে। অতীত কোথায় হারিয়ে গেছে, তার স্মৃতিটা একেবারে হারায় না—এই যা দুঃখ।

পা দুখানা ক্ষণেকের জন্য চলৎশক্তি হারিয়ে থেমে পড়েছিল, হঠাৎ পিছন হতে অরুন্ধতীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"ওগো শুনছো—?"

পিছন ফিরতেই চোখে পড়লো অরুন্ধতীর চোখের জল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, "তুমি ওই কবিরাজকে আনতেই কাউকে পাঠাও, খোকন কি রকম করছে যেন—"

মিঃ সেন অরুন্ধতীর পিছনে পিছনে ভিতরবাড়ীতে এসে, যে ঘরে খোকন ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

কবিরাজকে ডাকতে লোক ছুটলো—খানিক পরে মিঃ সেনের প্রেরিত লোক এই গ্রাম এবং আশে-পাশে যেমন হোক ত্রিশ চল্লিশখানা গ্রামে যিনি চিকিৎসক নামে পরিচিত সেই কবিরাজকে নিয়ে ফিরলো।

বয়স নিতান্ত কম নয়—পঞ্চাশের উপরে চলে গেছে। গায়ে তাঁর গলাবন্ধ কোট, তার উপর শতভালিযুক্ত আধময়লা একখানা চাদর, পরণের কাপড়খানাও প্রায় তেমনই, পায়ে একজোড়া সেকেলে ধরণের চটি।

সেন সাহেবের সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ীতে সে একটা বিভীষিকা।

তবু উপায় নাই—সে চিকিৎসক এবং সেনসাহেবের একমাত্র পুত্র পীড়িত।

রোগী দেখে সে তার স্বল্পাবশিষ্ট দাঁত কয়টা বার করে একটু হাসলে, বললে, "ম্যালেরিয়া—যা এখানকার লোকদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাথী, ভাববার কারণ কিছু নাই।"

অরুন্ধতী বিশ্বাস করলে না, পিছনে পিছনে বাইরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল, সকাতরে বললে, "সত্যি ম্যালেরিয়া কবিরাজ মশাই, ঠিক করে বলুন—"

কবিরাজ ফিরে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখখানা সোজা চোখে পড়তেই অরুন্ধতী চমকে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল।

কবিরাজের কঠিন কণ্ঠে ধ্বনিত হল—"তুমি—তুমি স্বপ্না নও—?"

সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে অরুন্ধতী প্রতিবাদ করতে গেল, "না না না—"

কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটী কথাও ফুটল না, কেবল তার বড় বড় চোখ দুইটী বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, কবিরাজ সোজা চলে গেলেন, আর অরুন্ধতী কাঁপতে কাঁপতে সেখানে বসে পড়লো দুই হাতে মাথা চেপে ধরে।

দিন তিনেক পরে—

সেন সাহেবের খোলা মোটঘাট আবার বাঁধা শুরু হল। আবার সেই বাড়ী-ঘরের দরজায় চাবি তালা বন্ধ করে সপরিবারে মিঃ সেন গ্রামের চিরপরিচিত গোযানে উঠে বসলেন। আবার সেই আম-কাঁঠালের বাগানের মধ্য দিয়ে পানাপুকুরের পাশ কাটিয়ে, বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে গাড়ী চললো ষ্টেশনের দিকে।

গাড়ীর মধ্যে স্থাণুর মত বসে মিসেস সেন, তাঁহার ছেলে মেয়ে, মিঃ সেন।

চলতে চলতে পথের বাঁকে দেখা গেল একটা লোককে—সেই চিরপরিচিত কোট, গায়ে চাদর জড়ানো, মুখে সেই চিরপ্রশান্ত ভাব। কোন গ্রাম হতে রোগী দেখে সে ফিরছে, বেলা তিনটে বাজলেও এখনও তাঁর স্নানাহার হয় নি দেখে বুঝা যায়।

সামনে গাড়ী দেখে সে সরে গেল, মিঃ সেনকে সামনেই দেখলে, একটি প্রশ্নও করলে না।

মিঃ সেনের মুখ পাংশে হয়ে উঠেছিল, তবু সাধারণ ভদ্রতাটুকু রক্ষা করতে ভুললেন না, মৃদু হেসে হাত দুখানি কপালে ঠেকালেন, বললেন, "শরীর এখানে টিকল না কবরেজ মশাই, বাধ্য হয়ে সকলকে নিয়ে কলকাতায় যেতে হচ্ছে; নইলে পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ কি আর—"

তাঁর কণ্ঠস্বর গাড়ী চলার শব্দে ডুবে গেল—পিছন হতে কেউ সে কথা শেষ করবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে না, দাঁড়ালও না।

উঁচু নীচু শুকনো পথে মানুষটীকে দেখা গেল চলতে—অরুন্ধতী পিছন দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরালে।

বাঁশের পাতা দুলিয়ে এক ঝলক বাতাস ছুটে এলো গাড়ীর মধ্যে।

কবিতা

নব বর্ষে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

এ নব বর্ষে নবীন হর্ষে এ ধরণী হোক্ শান্তিময়
ক্ষয় ক্ষতি লাভ জয় পরাজয় সকলের হোক্ সমন্বয়।
মানবেরে ভাল বাসুক মানব,
চির বিদূরীত হউক দানব ;
শুভ কল্যাণ পরশনে হোক্ নবভাবেতের অমিত জয়

বহু দুঃখের বিনিময়ে পুনঃ আসুক সুচির শান্তি ফিরে,
গৃহ ছাড়া যত ফিরিয়া আবার দাঁড়াক্ মায়ের চরণ ঘিরে।
শুদ্ধ বুদ্ধি হৃদয়ে জাগুক,
নূতন কর্ম্মে আবার লাগুক্,
দুঃখ দৈন্য গ্লানিমা ক্লান্তি ঘুচুক্ চরম মরণ-ভয়।

আসুক ফিরিয়া ঋদ্ধি বৃদ্ধি শ্রী ও কান্তি অচিরে বঙ্গে,
শস্যশালিনী সুজন পালিনী ফিরিয়া আসুন লক্ষ্মী সঙ্গে।
ছুটুক্ তটিনী দুকূল বহিয়া,
ঝলিছে পত্র সবুজে নাচিয়া,
হাসুক্ উষার নিখিল অবনী অদূরে মধুর সূর্য্যোদয়।

তারাহারা স্তব্ধ রাত্রে ভাবি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ঘৃণামুগ্ধ পাশবিক সভ্যতার জয়
ধূম্র আর বহ্নিশিখা বৈমানিক শব্দ নীলাকাশে
যন্ত্রের চাতুর্য্য নিয়া আশা-সাধ আয়োজন রয়
মরণের রণভেরী বাজে আর মৃত্যু অট্টহাসে।
তবু যেন দূরে কার বাঁশীর মিনতি
দেহে মনে চপলতা আনিছেছে দু'দণ্ডের লাগি,
সেথায় কাঁদিতেছে একা সন্ধ্যাসতী
সব শুনি রাত্রে হেথা জাগি !

পৃথিবীর অনাগত দিবসের কথা
শীতের দুঃস্বপ্ন সম জাগে চিত্তে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে ;
পরিচিত সৌন্দর্য্যের প্রতি মোর মুহূর্ত্ত-মমতা
কে যেন হরিল এসে রুদ্র আঁখিপাতে !
মিলের ধোঁয়ায় ঢাকা ভিড়াক্রান্ত সহরের তীরে
রক্তমাখা জনস্রোতে ভাগ্যলক্ষ্মী করে আর্ত্তনাদ।
জীবিকার পথে পান্থ চলে অশ্রুনীরে
আশা নাই,—স্বাপ্নিকের মিটিল না সাধ।
কামনার অরণ্যের দাবানলে দগ্ধ চারিদিক,
প্রেমের মহুয়াগন্ধ বৃথা আশা করি
জীবনের যুদ্ধে যারা পদে পদে অকৃতি সৈনিক,
তাদের চোখের পরে দুরন্ত শর্ব্বরী—
বৈদ্যুতিক ইসারায় ধারালো প্রশ্নের স্বরে করে চমকিত ;
তারা যে পেয়েছে ভয় ! ক্লান্ত নাগরিক দল হোলো সচকিত।
সে জন কহিয়া গেছে—'ধরণীতে স্বর্গ নিয়ে একদা আসবো—'
সে কই ! তবে কি বুদ্ধ আসিবে না ! আগামী দিবস র'বে
শুধু আর্ত্তস্বরে !

বিষবাষ্প !
জলে স্থলে নভে।
পলাশের লাস্যসম যে শোভা দেখেছি আমি মানব-আননে,
মিলন বাসর ক্ষণে একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনে
নাহি তাহা। লাজুক উৎসুক যত নাহি রমণীর ;
লাম্পট্য ক্ষয়িষ্ণু দেহে রমণীর দিনগুলি গেছে ভেঙে লাবণ্যের নীড়।
সভ্যতার পরিণাম এই যদি আজ,
আসিবেনা কেন তবে রুদ্ররূপে বিশ্ব-অধিরাজ !

বিপ্লবের শরাঘাতে শ্যামশষ্পতৃণে
শান্তি তপোবনে আজ মৃত মোর মায়ার হরিণ।
সে কোন্ বিস্মৃত বিশ্বে শুভদিনে,
তপস্যার অগ্নিবীণ-
শুনায়েছে তারে কত গান,
লভিলনা ত্রাণ। মুক্তিকার আশা আছে কিবা !
রহিল নীরব হয়ে তারি অভিমান,
বিভাহীন রাত্রি দিবা।

আগামী দিনের সূর্য্য অভয় ভৈরব রবে প্রভাতের দ্বারে
আসিবে কি ! তারাহারা স্তব্ধরাত্রে ভাবি।
ধরণীর অকল্যাণ চিরদিন চক্রমণ করে যদি ঘন অন্ধকারে
দুঃখে শোকে দিন মোরা যাপি
একমুষ্টি অন্নতরে পথ-কুক্কুরের সম সৃষ্টি করি আপনারে মোরা
পথগুলি হেরি ভাঙাচোরা,
অমৃতের পুত্র হ'য়ে বৃথা তার আত্মপ্রসাদের স্রোতে ভাসি,
জন্ম হতে জন্মান্তরে পথিক-জীবন নিয়ে পৃথিবীতে বারে বারে আসি।

পাতাল প্রবেশ

শ্রীমমতা ঘোষ

এখনো সময় আছে,—ওঠ মহারাজ
স্বর্ণ সিংহাসন ছাড়ি'। ছাড়ি' লোকলাজ
আত্মপ্রত্যয়ের বলে জানকীরে লহ,
দুঃখের হউক অন্ত, ঘুচুক বিরহ।

প্রজাও হ'ল না সুখী, তব চিত্ত ঘেরি'
নিশীথের অন্ধকার—তীব্র বিরহেরি
ফল্গু বহি' গিয়াছে যে সীতার অন্তরে
অন্তঃশীলা।

আজি এই সভার ভিতরে
চাহিয়া তোমার পানে আঁখি নির্নিমেষ
দাঁড়ায়ে রয়েছে সীতা। হবে নাকি শেষ
আজিও পরীক্ষা তার? দেখে সর্ব্ব লোক
উঠেছে উজ্জ্বল হয়ে অগ্নির আলোক
সীতার পরশ পেয়ে। দিব্য দৃষ্টি লভি'
দেখে সবে লঙ্কাপুরে সে-দিনের ছবি
শঙ্কায় সম্ভ্রমে। উদ্যোগী পুরুষ লভে
লক্ষ্মীর প্রসাদ। তুমি পেলে সুদুর্ল্লভে
আত্মক্ষমতার বলে। কল্যাণী কমলা
অন্তরে বাহিরে তব জায়া অচঞ্চলা।

ভুলেছ কি রাজভোগ রাজৈশ্বর্য্য ফেলি'
প্রণয় বিশ্বাস ভরা নেত্র দু টি মেলি'
তব পিছু পিছু সীতা করেছে গমন
অরণ্যের পথে? চারু পঞ্চবটী বন
শুধু কি কানন ছিল? বিমুগ্ধ হৃদয়
পেয়েছে স্বর্গের সুখ, স্নিগ্ধ সুধাময়
হয়েছে জীবন তব সেই বনবাসে।
তোমার অন্তরলক্ষ্মী ছিল ব'লে পাশে
স্বর্গ নেমেছিল সেথা।

সমস্ত জীবন
মেঘ রৌদ্র লীলাভূমি। দু'ধারে দু'জন
গেলে চলি'। মাঝখানে রাবণ দুর্জ্জয়
দেখা দিয়া আনিল কী ঘোর দুঃসময়!

দু'জনার বিচ্ছেদের অশ্রু দীর্ঘশ্বাস
আজিও মন্থর করি' রেখেছে বাতাস।

এখনো আকাশে শুনি রথের ঘর্ঘর
রাবণ রাজার। ব্যাকুল সীতার স্বর
এখনো মর্ম্মের মাঝে যায় যেন শোনা,—
ফেলেছে হীরক হার মুক্তা মণি সোনা
সেই চিহ্ন চিনে চিনে করেছ সন্ধান
প্রাণলক্ষ্মী জানকীর। তোমার সমান
কে করেছে দুঃখভোগ? তব অশ্রুজল
নিয়াছে এ পৃথিবীর বিরহী সকল,
রাখিয়াছে চিত্ত মাঝে চিরন্তন করি'।

সেই তব বিচ্ছেদের কৃষ্ণা বিভাবরী
পোহালো লঙ্কায় দীর্ঘ যুদ্ধ অবসানে।
তবুও সংশয় মেঘ জমেছে পরাণে।
মর্ম্মান্তিক পরীক্ষার অন্ত হ'ল যবে
চিনিলে আপন জনে। প্রেমের সৌরভে
মাতিল বীরের চিত্ত। এলে দেশে ফিরে,
আনন্দে কেটেছে দিন লয়ে জানকীরে।

দুরন্ত বিচ্ছেদ শেষে মধুর মিলন,
লাগিল দোঁহার চোখে স্বপন-অঞ্জন
প্রেমের মদিরা পাশে। মত্ত রসাবেশে
উত্তরিলে দোঁহে চির বসন্তের দেশে।
কে কোথায় কী বলেছে—করিয়া শ্রবণ
কেন হ'লে বিচলিত? দিলে নির্ব্বাসন
মহিষীরে বিনা দোষে। নিন্দুক রসনা
চিরকাল করে মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা।

অযোধ্যাবাসীর মনে সন্তোষ বিধান
করেছ পৃথিবীপতি, সীতার সম্মান
ধূলায় লুটায়ে দিয়ে। বেদনার ফুল
এখনো ফুটিয়া আছে,—সে গন্ধে আকুল
আজিও হৃদয় মন! লাগে প্রাণে ব্যথা
কত যুগ আগেকার স্মরিয়া সে কথা!
তমসা নদীর তীরে রম্য তপোবন,
বাল্মীকি-আশ্রম যেথা—সেথায় লক্ষ্মণ
রাণীরে রাখিয়া চলে রাজার আদেশে
ফিরে এল অযোধ্যায়, যেন রাত্রি শেষে
উষালোকে শশিকলা বিশীর্ণ মলিন
তেমনি বিধুরা সীতা বিপদে বিলীন
হীনপ্রভ। হে রাঘব, আজ কেন তারে
স্মরণ করিলে ফিরে; হৃদয়ের দ্বারে
পাবে কি প্রবেশ-পথ? সূর্য্যবংশোদ্ভব,
কুসুম ঝরিয়া যায় রাখিয়া সৌরভ,
তেমনি হৃদয়খানি নিবেদন করি'
তোমার কমল পায়ে—সীতা যায় সরি'?
রাজকন্যা রাজবধূ নাহি স্থান পায়
কোনোখানে। মনে মনে মাগিছে বিদায়
সরম ব্যাকুল সীতা। তুমি মহীপতি
রহিলে নিষ্ঠুর হয়ে জানকীর প্রতি
নিষ্ফল বিরাগে।

সপ্ত পাতালের তলে
কন্যার বেদনা বুঝে সারা মন টলে
বসুন্ধরা জননীর। লইতে কন্যার
ধরণী হ'ল যে দ্বিধা। জানকী লুকায়
তার মাঝে। এত দিনে জননীর কোল
পায় বুঝি মাতৃহারা।

কী ভাবে বিভোল
রহিলে মূর্ত্তির মত গতিলেশহীন
রঘুনাথ ? যে মহান্ প্রেম একদিন
দিয়াছিলে জানকীরে সে কি ফিরে লবে ?
আজি এই মহালগ্নে নয়ন-পল্লবে
ঘনাবে না অশ্রুরাশি, হৃদয়লক্ষ্মীরে
মাতৃবক্ষ হতে তুমি লইবে না ফিরে
রাজ-সিংহাসন পরে ? অপমান মাঝে
প্রেম আজি অবনত সুগভীর লাজে।
ঘুচাও প্রেমের দৈন্য। রাজহস্ত তব
লাঞ্ছিত প্রেমেরে দিক নবীন গৌরব।

গান

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আঁখি মেলে মুখে চেয়ে
দাঁড়াল এসে ;
এল যে স্বপনময়ী
মোহন হেসে।
চিনি না চিনি না তারে,
সে যেন চিনিতে পারে,
চেয়ে চেয়ে নিল কিনে
হৃদয় শেষে।
এমনে যে পাব তারে ছিল না আশা ;
মুখে নাহি কথা খালি নয়নে ভাষা।
চোখে চোখে শুধু দেখা,
সেও একা আমি একা,
পথে যেতে পেনু মণি
ধূলির দেশে॥

আমি আছি আর কিছু নাই

শ্রীঅশোককুমার বসু

আরক্ত সন্ধ্যার ঘাটে শেষ বনচ্ছায়,
গিয়েছিনু ক্লান্তপদে স্রোতের ভেলায়
ভাসাইতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিলাষ
খেলাচ্ছলে। জগতের তীব্র পরিহাস
তখন বিদায় মাগে। কাননে কাননে
বিহঙ্গের শ্রমশ্রান্ত মৃদু গুঞ্জরণে
ভেসে আসে ধীরে ধীরে সুপ্তির সঙ্গীত
আঁধারে ম্লানরূপে স্তব্ধ চারিভিত।
একে একে ভাসাইনু সকল সঞ্চয়,
বলেছিল যারা মোরে করিবে অক্ষয় ;
সহসা চাহিয়া দেখি বাহি ক্ষুদ্র তরী,
সে আসিছে যার আমি আবাহন করি।
'কি এনেছ', কাছে এলে যখনি শুধাই—
সে কহিল, 'আমি আছি আর কিছু নাই॥'

কাব্যসখী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

চিন্‌তে পারো, কাব্যসখি ! না হয় দুদিন ছিলেম দূরে,
আজকে দুখের রাত পোহালো উদয় হ'লেম তোমার পুরে।
মুখ ফিরালে আঁখির আড়ে আঁধার বাসি মুহূর্ত্তেকে,
তাই তোমারে দেখতে এলেম চোখের চাওয়া বক্ষে এঁকে।
দিবে যদি আঁচল হতে কাঞ্চনেরি কুঞ্চিকাটি,
আমার হাতে পড়ল এসে শঙ্কা সরম গেল কাটি।
ছন্দে সুরে কথায় গানে ছড়িয়ে দেশে দেশান্তরে
উৎসবেরি জয়ন্তিকা বাজিয়ে দেবো বাঁশীর স্বরে।
আমার সুরে তোমার বাণী ফুটবে না তো কোন কালে,
তবু তোমার কুঞ্জবনে, বকুল-ঝরা পাতার থালে,
সাজিয়ে দেবো অর্ঘ্যডালা বিশ্ব যেথা বরণ করে—
প্রভাত যেথা রঙীণ সাড়ী পূর্ব্বমুখে নিত্য পরে।
সেই গগনে আমার ব্যথা আমার প্রেমের রক্তরাগে
উঠবে ফুটে রক্তকমল প্রথম আলোর অনুরাগে।
আমার চোখে দেখবে চেয়ে নির্ণিমিখে সবার আঁখি,
আমার সুরে উঠবে গেয়ে প্রথম গাওয়া ভোরের পাখী।
যে ফুল ফোটে যে ফুল লোটে ধরার বুকে বিষাদ ভরে
তাহার সুখে তাহার দুখে তাহার মনে পড়বে ঝরে,
আমার অশ্রু মেঘের মত শ্যামল-স্নেহে ভরবে ধরা
বৈশাখেরি তপ্ত বুকে সান্ত্বনাতে সিক্ত করা।
কিন্তু সখি চোখের কোণে তোমার শুভ দৃষ্টিখানি
আমার মনের স্বয়ম্বরে জাগিয়ে দিল সেই তো জানি।
লীলাচ্ছলে মধুর হাসি যূথীর মত পড়লো ঝরে
মুগ্ধমনে শুভক্ষণে মধুর নেশা উঠলো ভ'রে।
চিত্তাকাশে দৈববাণী সেই সুযোগে উঠলো বেজে,
অজয় হবো তিন ভুবনে, অমর হবো তপস্তেজে ;
সিদ্ধি দিলে তুমিই প্রিয়ে তুমিই দেবে হে রাজরাণী
কাব্য নহে সত্য কথা ভয় করিনে কানাকানি।

স্মৃতির সুখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রসাল তরু কিন্তু আমার হয়নি কভু ফল,
নামেই আমি ফলের তরু জীবনটা নিষ্ফল।
শীর্ণ তনু ছিন্ন ছায়া সবই অনিত্য,
সাধ্য নাহি করি আমি কারও আতিথ্য।

ঊষর ভূমি আছি আমিই গুঁইটা আগুলি,
দুঃখে আমার বক্ষ উঠে নিত্য ব্যাকুলি,
বালকদলে আসে না কো আম কুড়াতে।
বসেনাকো আমার তলে যুবক-বুড়াতে।

কোকিল এসে কচিৎ করে ঝঙ্কৃত এ বুক
ক্ষণেক তরে ভুলায় যেন জীবনব্যাপী দুখ।
দাঁড়িয়ে আছি একটা শুধু সুখের স্মৃতি নিয়ে
বালিকা এক ঘট পাতিল আমার শাখা দিয়ে;

মরু-জীবন সার্থক মোর ভাবি বারম্বার,
একটী শাখা করলে শোভা ঘট যে দেবতার।

আমাদের স্বর্গ

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের আছেন রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী,
জহরলাল আর সুভাষ বোস, কথায় কথায় জান্ দিই,
সি, ভি, রমণ আর শরৎচন্দ্র—জগদীশ আর প্রফুল্ল রায়,
আর মদনমোহনের কল্পকায়;
স্বল্প আয়ে মোটামুটি সস্তা আয়ুর্ব্বেদ,
চাক্‌রী রাখা, বংশবৃদ্ধি, এ ছাড়া নেই বিশেষ কোন খেদ!

ভুঁড়ির মাপে স্বাস্থ্য মাপি,
উত্তেজনায় হাঁপিয়ে কাঁপি,
শৌর্য্য যাহা ফোটাই অভিনয়ে,—
রংমহালের দিগ্বিজয়ী,
মঞ্চপরে ভুবন জয়ী
শের শা না হয় নাদির শা,
রক্তে আছে আর্য্য-শোণিত তাইতে মস্ত শাহান শা!
এক কলমের খোঁচায় পারি লিখিতে দরখাস্ত
ইংরাজীতে আস্ত;
বক্তৃতা চাও? অঢেল আছে, বিপিন পাল আর সুরেন্দ্রনাথ
গায়ের জোরে টিট্ করেছে ঢাকার Riot পার্শ্বনাথ।
আর আছেন সব আলোকপ্রাপ্তা নারী
দেশতরণীর হালে যাদের অনায়াসেই বসিয়ে দিতে পারি।
মুক্ত মনের মেয়ে আছেন অগুন্তি
যারা অনায়াসে ছেড়ে এলেন হাতা, বেড়ী, খুন্তি,
—তুচ্ছ চাল আর ডাল,
গর্ভকেও যারা কন্‌ট্রোল করেছেন আজকাল

এমন সব মহিয়সী রমণী,
যারা সত্যই সোনার খনি,
সোনা ফলাবেন দেশে!
পুরুষ নারী সবাই পারি হেসে এবং কেসে
গরম ভাবের আবেগ ঠেসে ঠেসে
ইনিয়ে বিনিয়ে করতে অনেক গল্প,
মনস্তত্ত্ব আর দেহতত্ত্বের বোঝাও ত নয় অল্প!
মুখে জ্বলন্ত বিস্যুভিয়সের তুবড়ী,
উড়ে যায় পাকা দালান, খোলার চাল আর খুপড়ী
সাম্যবাদের ভাঁওতায়,
আর স্বার্থবাদের আওতায়,
বিশ্বমনের সকল খবর রাখি,
হাল আমলের জৌলুষে ভাই সাবেককালের হাড়েতে রং মাখি।
"সব পেয়েছি"র দেশ আমাদের, আর কিছু নেই বাকি,
—চোস্ত চালে করতে পারি অল্পে বাজী মাৎ
কেবল হাতে নেইক অস্ত্র
তনুতে নেই একটু বস্ত্র
শরীরে নেই শক্তি আর উদরে নেই ভাত।

নারী

শ্রীমতী উৎপলাসনা দেবী

মহাভারতে আছে, একদিন স্বয়ং 'ধর্ম্ম' মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি দুরূহ প্রশ্ন করেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, পৃথিবীর অপেক্ষা ভারি কে? সুপণ্ডিত যুধিষ্ঠির সদুত্তর দেন—'মাতা'।

আমাদের দেশের জ্ঞানী বেদজ্ঞ মুনি-ঋষিরা মাতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু-পদে অভিষিক্তা করিয়া তাঁর বন্দনা করিয়াছেন—

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
যদ্গর্ভে জায়তে লোকে যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি
সা করুণাময়ী মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী।

এই মাতাকেই আমরা নানাভাবে পূজো ক'রে আসছি। ৺কালী, তারা, প্রভৃতি শ্রীদুর্গার দশমহাবিদ্যার রূপ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষষ্ঠী, জগদ্ধাত্রী, দেশমাতৃকাকে একই মন্ত্রে বন্দনা করি,—'বন্দে মাতরম্'। 'মা' পরিচয়েই বিশ্ব-জননীর পূজো। 'জেঠিমা' 'কাকীমা' 'পিসিমা' প্রভৃতি প্রত্যেক গুরুজনদের সম্বোধনের সঙ্গে 'মা' শব্দ যোগ দিয়া তাঁদের মাতৃসমা করিয়া মা নামের গৌরব-পতাকা তুলি। এইরূপ ধ্যানে, জ্ঞানে, বাক্যে, মায়ের আরাধনায় ফুঠে উঠে মায়ের প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা। এই গভীর ভালবাসা কেন? মায়ের মাতৃমূর্ত্তি ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্ম-জ্যোতির অংশে প্রকাশ। এই মাতৃ-স্নেহ, আমাদের দেহ-মন উৎকণ্ঠিত ক'রে, প্রাণময় জগতে জাগ্রত ক'রে। সেই জন্যই মাকে আমাদের বড় প্রয়োজন। এজন্যই তিনি আমাদের এত প্রিয়।

এ জগতে কাহারা তাঁদের মাতৃত্ব-গৌরবে বিশ্ব মোহিত ক'রে জগৎসমীপে দাঁড়িয়ে আছেন, কাদের বক্ষ-নিংড়ান স্বর্গীয় সুধায় জগৎ জীবন্ত হইয়া আছে? তাঁরা 'নারী'। এই নারীকে কেন্দ্র ক'রে জগৎ গ'ড়ে উঠেছে। আমাদের পুরাণে বলিতেছে, 'নারী' শক্তি, নর 'শিব'।

ভৈরব প্রলয় দুর্গা দুর্গতিনাশিনী শান্তি। মহাকাল শিব, মহাকালী শক্তিময়ীর প্রকাশ।

নারীকে শক্তিময়ীর নানারূপে পূজো করার রীতি একমাত্র আমাদের দেশেই আছে। অপরিচিত স্ত্রীলোককে মধুর মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত ক'রে তাঁর নারীত্বকে সম্মান করার সুন্দর নিয়ম এদেশে ছাড়া আর কোন দেশে নাই। যদিও আমাদের আধুনিকারা বিলিতি ঢংয়ে,' মিসেস্ বা মিস্ কিংবা ম্যাডাম, নিদেন পক্ষে স্পষ্টাস্পষ্টি মেম্ সাব্ সম্বোধনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। কিন্তু যে দেশটার অনুকরণের বশবর্ত্তী হ'য়ে এই প্রকরণ, সেই পাশ্চাত্য সভ্যদেশের অত্যন্ত সভ্যব্যক্তিগণ, ভারতীয় পণ্ডিতদের মুখে, ভারতীয়দের এই 'মা' 'ভগ্নী' সম্বোধন করার রীতি শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা সত্যিই পণ্ডিত, যাদের বিচার-শক্তি আছে, তাঁদের কাছে এই প্রথার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অতি সুন্দর লাগিবে।

তবু কেন এই দেশে নারী-সমস্যা, নারী-নিগ্রহ, নারীর স্বাতন্ত্র্যবাদ সম্বন্ধে নানা বিতর্ক উঠে।

নারীকে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন সন্তানের জননী হওয়ার জন্য। এ জন্য নারী ও পুরুষের জীবনের গতি একপ্রকার হইবার নহে। অন্তঃপুর-রাজধানীতে নারীই একচ্ছত্র রাণী। অন্তঃপুর-জগৎটি একমাত্র তাঁদের উপরই নির্ভর করিয়া আছে। যে গৃহে গৃহিণী নাই, সে গৃহ শ্মশান।

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ,
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

নারীর সকল দেবীমূর্ত্তি এই অন্তঃপুরের মধ্যে প্রকাশ। জগতের এক ধারে সারা পৃথিবী, অন্য ধারে এই অন্তঃপুর।

দিনের কঠোরতার পর রাত্রি যেমন স্নিগ্ধ শান্ত মূর্ত্তি ধরে নেমে আসে, তেমনি বাহিরের কঠিন পরিশ্রমের পর, নর শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে ফিরে আসে নারীর কল্যাণ-আশ্রমে। নারী কল্যাণময়ী, শান্তিরূপা। জাহ্নবী যেমন জগতের ময়লা নিজের বুকে তুলিয়া নিয়া বিশ্ববাসীকে পবিত্র গঙ্গাবারি দান করেন, ধূপ যেমন নিজেকে পুড়িয়ে দুর্গন্ধকে হরণ ক'রে জগতের মঙ্গল করে, তেমনি নারী করেন এই অন্তঃপুরে নিজের আত্মোৎসর্গ। স্বার্থ, লোভ, ক্রোধ এবং সর্ববিধ আয়াসকে সংসারযজ্ঞে আহুতি দিয়ে সংসারকে করেন শান্তিধাম। সেজন্য মানুষের বড় প্রিয়, বড়ই মধুর এই গৃহকোণটি।

নারীর মাতৃ-ভাবের সহিত সুস্পষ্ট ভাবে মিশে আছে তাঁদের সেবাধর্ম্ম। নিজেকে প্রিয়জনের মধ্যে বিলিয়ে তাঁদের আত্ম-তৃপ্তি, ইহার মধ্যেই ওঁদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা" স্ত্রীজাতির এই স্বভাব-ধর্ম্ম, তাঁহাদের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় মিশান আছে। অন্ন-সংস্থানের চিন্তা তাঁহাদের নহে। অন্নের জন্য অর্থ উপার্জ্জন এক মাত্র পুরুষের ধর্ম্ম, ইহার মধ্যেই তাঁদের পুরুষকারের প্রকাশ। জগৎটা যদি এই নিয়মে আবহমানকাল চলিত, তবে আর মিথ্যা লেখনী ধরিয়া বহুমূল্য সময়ের অপচয় করিতে হইত না। জগৎ বিচিত্র। স্বর্গের মত এক স্রোতে প্রবহমাণ নহে। কাজেই নারীরা অন্তঃপুরকে অন্তঃশূন্য করিয়া দলে দলে আসিতেছেন বহির্জগতে এই বিপ্লবের মাঝখানে অধুনা নারী-জাগরণ, নারী-স্বাতন্ত্র্য, স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা নারীরা বুঝিতে চাহিতেছেন, স্বোপার্জ্জিত অর্থে নিজের জীবন ধারণ করাকে। ইহার কারণ, এদেশের পুরুষেরা, তাঁদের স্ব-ধর্ম পালন করিতে পারিতেছেন না। বহু বর্ষ যে জাতি পরাধীন থাকে

সে জাতি ক্রমশঃ ক্লীবে পরিণত হয়। নির্জ্জীব দাসত্বে মনের তেজ, পুরুষকার, ভালমন্দ বিচারশক্তি, দূর-দৃষ্টি হারিয়ে সেই জাতি নিজেদের কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম হয়। এই অক্ষমতার বিকৃত রূপকে ব্যঙ্গ করিয়া একটা গ্রাম্য-ছড়া আছে—"দরবারে না পেয়ে ঠাঁই, ঘরে এসে বৌ ঠেঙ্গাই।"

পূর্ব্বে নারীরা গৃহের মধ্যে এইরূপ লাঞ্ছিত হওয়ায়, নারী-নিগ্রহ বলিয়া একটা শব্দ উঠে। এক মুঠা অন্নের জন্য স্বামী, বা ভ্রাতার কাছে নির্য্যাতিত হইয়া উপায়বিহীনা স্ত্রীগণের আত্মা-ভিমান জাগিয়া উঠে। পরবর্ত্তী কালের নারীরা সে জন্যে বহু পরিশ্রম করিয়া অর্থকরী শিক্ষাকে গ্রহণ করিতেছেন—সম্ভ্রমের সহিত ক্ষুধার অন্নের সংস্থান করিবার জন্য। আজ যে দেশের সুশিক্ষিতা কুমারী এবং বিবাহিতা যুবতীগণ সরকারী দপ্তরে কেরাণীগিরি করিয়া নিজের ও মায়ের, ভায়ের সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, ইহাতে তাঁদের গৌরব বটে কিন্তু ইহা কি জাতির নিন্দা, পুরুষের মুখে কালির প্রলেপ নহে? মা, বহিনকে যে দেশের পুরুষেরা তাঁদের স্ব-ধর্ম্মপালন হ'তে বিরত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই দেশের কাপুরুষের দল কেন বাঁচিয়া থাকেন?

বিদেশের নারীরা তাঁদের স্বদেশ রক্ষার জন্য আরুণীর মত যুদ্ধের আক্রমণের বন্যাকে সমস্ত দেহ-মন দিয়া ঠেলিতেছে পুরুষের সঙ্গে। নারীরা যখন দেশের জন্য প্রাণ দান ক'রে তখনই বুঝিতে হইবে দেশের অতি সঙ্কটময় দুর্গতি আসিয়াছে। তাঁদের কার্য্য-কলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বটে, তবে ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। পুরাকালে আমাদের দেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন শত্রুর দ্বারা দেশ আক্রান্ত হইলে, দেশের বীরগণ হত হইবার পরে বীরাঙ্গনারা যুদ্ধ করিতে আসিতেন। তাঁদের স্বহস্তে শত্রুদলন আজও সোনার অক্ষরে ভারত-ইতিহাসে গাথা আছে। জহরব্রত করিয়া প্রাণ দান করিয়াছেন, কিন্তু শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই। কিন্তু আজ এই পরাধীন দেশের অধিবাসীদের বীরত্ব দেখানর বালাই নাই। আছে একমাত্র চিন্তা—অন্ন-বস্ত্রের। এই অন্ন-বস্ত্রের অভাবে আমাদের দেশের সুন্দরী যুবতীরা তাঁদের শ্লীলতাকে ঘরে তুলিয়া রাখিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। আমাদের সভ্য ভদ্রসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, বহু সংসারে অসহায় বিধবা আছেন। তাঁদের জীবিকা উপার্জ্জন আত্ম-সম্মানের দিকে শ্রেয়ঃ। তবে সরকারী দপ্তরে কলম পেষা অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রী হওয়া, কিংবা ডাক্তার হওয়া অনেক সম্মানের। শিক্ষাব্রতী থাকিলে মানুষকে মানবতায় রাখে এবং দেশের পরম উপকার হয়। কিন্তু যাঁরা সমাজে মা হইয়া দেশের সুসন্তান বৃদ্ধি করিয়া দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারিবেন, তাঁরা আজ এই পথে আসিয়াছেন তাঁদের নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিতে! য়ুনিভারসিটির বড় বড় ডিগ্রিধারী সুশিক্ষিতা মেয়েরা পথে-ঘাটে ঘুরিতেছেন এক মুঠো ভাতের জন্য! এর চেয়ে পরিতাপের, ইহার অপেক্ষা লজ্জার আর কি আমাদের আছে?

আজ যদি পনের হ'তে আঠার বছরের মধ্যে সমস্ত মেয়েদের ও পঁচিশ হ'তে ত্রিশের মধ্যে ছেলেদের বিবাহ হইত এবং ছেলেরা যদি কর্ম্মের উদ্দীপনায় আনন্দের সঙ্গে পরিশ্রম করিত, কখনো কল্পনা করিত না—শ্বশুরের যৌতুকের উপর নির্ভর ক'রে জীবন কাটাব, স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থে ঘরে আরামে ঘুমাইব, তবে আজ দেশের এত অধোগতি হইত না।

আমাদের দেশের মেয়েদের মতবাদ কতকগুলো নির্জ্জীবতা, অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার কারণ যে পথে তাঁহারা নিজেকে পরিচালিত করিতেছেন, সে পথ দাসের। এই পথে ক্রমশঃ চলিলে, আশী কিংবা নব্বই বছর পরে আর আমরা নিজেদের আর্য্য বলিয়া কোন রকমেই দাবী করিতে পারিব না। একেই আমরা আর্য্যধর্ম্ম হারাইতেছি, তাহার উপর এই ভাবে চলিলে পরবর্ত্তী কালে, দাস আর দাসী, এই পরিচয় হইবে। মেয়েদের মুখে আসিয়াছে কাঠিন্য, বচনে, চলনে আসিয়াছে শ্লীলতাহীন অসংযমী ব্যবহার। লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিলে লজ্জা আসিবে কোথা হইতে? সেকালে সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারীরা গাড়ী ছাড়া বাহিরে আসিতেন না, কিন্তু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইতেন বটে, তবে সুন্দর সংযত ভাবে, মাথায় তাঁরা কাপড় দিতেন, বাহুলম্বিত জামা পরিতেন, মুখে থাকিত তাঁদের স্ত্রী-জাতির আভিজাত্যের গরিমা। কিন্তু অধুনা সুশিক্ষিতা নারীরা মাথায় কাপড় দিয়া গাত্র-আবরণে দেহ সুরক্ষিত করিয়া রাস্তায় চলাকে অসভ্যতা বলিয়া মনে করেন। সাড়ীর অঞ্চল বাঁ কাঁধের কাছে গিয়া জবাব দেয়, অনাবৃত বাহু এবং কণ্ঠ প্রদর্শন করিয়া চলাই হইল সভ্যতা। এর পর ভদ্র শিক্ষিত বলিয়া গৌরব করার আর কি থাকে! রমণীদেহ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের শ্রী। এই শ্রীকে সংযত রাখিলেই, সেই 'শ্রী' হয় পূজ্য।

বর্ত্তমান ভারত মধ্যযুগের ভারতের অপেক্ষা শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু পাণ্ডিত্য আহরণ করিয়াছে যত পরিমাণে, তাহার সদ্ব্যয় করিতে সে পরিমাণে ইচ্ছাব্রতী নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব মনীষীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন; পরে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল কুমার, দেশবন্ধু—তাঁরা সকলেই, দেশের কল্যাণে এক একটী পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিয়া পরাধীনতা সত্ত্বেও সমাজের বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, রামমোহনের প্রচেষ্টায় এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার সর্ব্ব-প্রথম প্রসার হয়। এঁদের কাছে বাংলার সমস্ত নারী চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবেন। কিন্তু তাঁরা তখন স্বপ্নেও ভাবেননি, যে স্ত্রী-জাতিকে জগতে আদর্শ মাতা হওয়ার জন্য তাঁদের বিবেক গড়িতেছি, তাঁরা ভবিষ্যৎকালে পুরুষের দপ্তরে কলম পিষিয়া তাঁদের স্ত্রী-সুলভ মাধুর্য্যকে নষ্ট করিবেন। আজ যুদ্ধের তাড়নায় দেশ উন্মত্ত। কেরাণীর শূন্য চেয়ারগুলি মেয়েরা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কেরাণীরা গেছে অস্থায়ী কর্ম্মে, কিন্তু যুদ্ধান্তে চেয়ারের মালিকরা স্বস্থানে ফিরিলে যে দেশে আর এক নূতন বিপ্লব সুরু হইবে। নহিলে অসভ্য পর্ব্বতবাসী পুরুষদের মত, স্ত্রীর উপার্জ্জনে দেহ রক্ষা করিয়া আলস্যে দিন কাটাবে। তিব্বত এবং মণিপুর অঞ্চলে নারীরা সন্তানের জননী হয়, আবার খাদ্য-সংগ্রহ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য পরিশ্রমের গুরুভার

বহন করিতে না পারায়, সংখ্যায় তাঁরা কম। এজন্য একটা নারীকে তিনটী, চারিটী পুরুষ বিবাহ করে।

ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, নর অপেক্ষা নারী শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর পুরাণ, ইতিহাস ও বর্ত্তমান জগৎ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। নারীর মত পুরুষের পালন করার ক্ষমতা নাই, কিন্তু নারী পুরুষের সকল কাজই আয়ত্ত করিতে পারেন। তাঁহারা প্রয়োজনে অসি ধারণ করিতে পারেন। সাধারণতঃ তাঁহারা কমলারূপিনী, অন্নপূর্ণা, বরাভয়দায়িনী মাতা, সখীরূপিণী স্নেহে নিমগ্না জননী। মহাকালীর পদতলে প্রলয়ঙ্কর দেবাদিদেব সমাধিস্থ।

যে পথে দেশ চলিতেছে, সেটা ধ্বংসের পথ। এই পথের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। বিবাহ দ্বারা, এবং উচ্চাভিলাষী যুবকের কর্ম্ম-উদ্দামতার শক্তি দিয়া এই জগতকে বাঁচাইতে হইবে। দেশ যতই শিক্ষায় এবং ঐশ্বর্য্যে উন্নত হইতেছে, বিবাহ হইতেছে ততই ভয়াবহ। বিবাহ করিয়া নিজের জীবনকে একটা কৃচ্ছ্রতা কঠোরতার মধ্যে আনিতে, স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই অনিচ্ছুক। সহজ বিলাসিতায় দেহ, মন ভাসাইতে চাহেন। আমি অনেক সুশিক্ষিতা নারীর মুখে, বিবাহ ও সন্তানের জননী হওয়ার বিরুদ্ধে ঘোষণা শুনিয়াছি। "এত লেখাপড়া শিখে, যাবো কি না হাতা, বেড়ি ও খুন্তি ধরতে।" তাঁদের জননীরা আক্ষেপ করে বলেন, "এত লেখাপড়া মেয়েকে শেখালাম, তাতে কি ফল হ'লো দিদি! সেই বিয়ে-আর ভাত রাঁধা, বছর বছর ছেলের মা হওয়া।" যে সব সুপণ্ডিত মেয়েরা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁদের কোলে শিশু আসিয়া কেন উপস্থিত হয়নি, প্রশ্ন করিলে কেহ কেহ ঘৃণাভরে বলেন, "ওসব ন্যাষ্টি, ছেলে, মেয়ে, আমি সহ্য করতে পারিনে, আমি একজন সুশিক্ষিতা নারী, আমি হবো, ছেলের মা? ওসব কামনা অশিক্ষিতা মেয়েরা করে। আমরা করবো দেশ-উদ্ধার, বড় বড় চাকুরী ইত্যাদি।" কেহ বলেন, "আমি অত কষ্ট সহ্য করতে পারবো না।" যদি তাঁরা সন্তানের জননী হওয়ার কামনা করেন না, তবে ওঁরা কেন বিবাহ করিয়াছেন? তাঁদের প্রবৃত্তি, স্বৈরিণীর মনোবৃত্তি হ'তে কিছু বেশী তো তফাৎ নহে। এই সব সুশিক্ষিতা মেয়েদের কাছে সমাজ কত না আশা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! জাতির সংশোধনের জন্য জাতির প্রাণশক্তির বৃদ্ধির জন্য যে শিক্ষা, বিশেষ স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত দরকার—ইহা বুঝিতে এখন যাঁরা পারিতেছেন না, তাঁরা যে মুখস্থ বুলি আয়ত্ত করিয়া এক অন্ধকার জগৎ হ'তে আর এক অন্ধকার জগতে আসিতেছেন, ইহাও জানিতে পারিতেছেন না—ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

নারীরা সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াও জগতে অনেক বড় কাজে যোগ দিতে পারেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে বিবাহিতা নারী গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিয়া জগতে তাদের প্রতিভা বহু প্রকারে বিতরণ করিয়াছেন। তার দৃষ্টান্ত মাদাম কুরি। সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া তিনি স্বামীর সঙ্গে বিজ্ঞান-সাধনা করিয়া একজন আবিষ্কারিণী। সারা জগৎ তাঁর জ্ঞান-গরিমায় আকৃষ্ট। আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের খনা, লীলাবতী, গার্গীর কথা তো সকলেরই জানা আছে। এযুগে আমাদের দেশে, সুগৃহিণী হইয়া কস্তুরীবাই গান্ধি, বাসন্তী দেবী প্রভৃতি আদর্শ রমণীরা রাষ্ট্রের নেত্রী হইয় কত কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন। লেডি অবলা বসু তাঁর অত বড় বৈজ্ঞানিক স্বামীর বিজ্ঞান-মন্দিরের সহচরী থাকিয়াও সুচার ভাবে সংসার চালাইয়াছেন। তিনি দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার করার জন্যও বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী গৃহের মধ্যে বাস করিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া গেলেন। তাঁদের লেখা বই, কলেজে পাঠ্য এবং তাঁদের পাণ্ডিত্যের কাছে আজকালকার য়ুনিভারসিটির বড় বড় ডিগ্রিধারী মেয়েরা হার মানিতে পারে। কাজেই সুশিক্ষিতা নারী অন্তঃপুরে বসিয়া সুসন্তান পালন করিয়া নিজের প্রতিভা দিকে দিকে উদ্‌ভাসিত করিবেন, এই কামনা করি।

মাতা বলিষ্ঠ হইলে তার সন্তানও বলবান হইবে। এজন্য মেয়েদের ব্যায়াম করা আবশ্যক। কিছুদিন পূর্ব্বে বালিকা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার প্রত্যেক পার্কে ব্যায়ামাগার খোল হইয়াছিল। তাহার উদ্যোগে বহু মেয়ে ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় মোহন বাগান স্পোর্ট প্রভৃতি বড় বড় স্পোর্টে নামিয়া প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহার মধ্যে আমি একটি মেয়েকে জানি, সে যখন পরবর্ত্তী কালে সন্তানের জননী হওয়ার সময় দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় পড়ে, তখন সে অতি সহজ অবস্থায় থাকিয়া সেই বিপদ হ'তে মুক্ত হয়। বড় বড় সু চিকিৎসকেরা ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া একবাক্যে বলেন বাঙ্গালী মেয়ের মধ্যে এত শক্তি দেখেন নাই। তখন তাঁর সেই মেয়েটির বাল্য-জীবন শুনিয়া বলেন, তার ব্যায়াম-সাধনার জন্যই তার দেহ এত সুগঠিত, এজন্যই সে সকল বিপদ হ'তে সহজে মুক্তি পাইল।

কালা আদমী বলিয়া আমরা জগতে পরিচিত। কাজেই দু' পোঁচ রং ফর্সা বেশী কমে এ দুর্নাম আমাদের ঘুচিবে না। নিছক রূপের জন্য বিবাহ নয়; জাতির বৃদ্ধি, জাতির শক্তির বৃদ্ধির জন্য বিবাহ। কালো কুৎসিৎ অশিক্ষিত হাবসীরাও স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করে, জগতের রাষ্ট্রসভায় তাঁরাও একটি আসন পায়। আর আমরা তাদের অপেক্ষা শিক্ষায়, জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে সংখ্যায় কত বড়, আমরা যদি মন প্রাণ দিয়া সমাজের উন্নতি কামনা করি, তাহ হইলে আমরাও জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে নিশ্চয় সম্মান পাবো। যে দেশের মায়েদের কোলে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জগদীশচন্দ্র রামমোহন, অরবিন্দ প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত গগন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, সেই দেশের মায়েদের কাছে আমরা কি না আশা করিতে পারি? জগৎকে শক্তিশালী করা জন্য নরনারীর মিলন। বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাণের শক্তি প্রাণ-বিনিময় হয়। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে স্বামী-স্ত্রী অভেদ আত্মা। সে জন্য বৈদিক বিবাহের মন্ত্রে বলিতেছে—

যদেতৎ হৃদয়ং মম
তদেতৎ হৃদয়ং তব

স্বামি-স্ত্রীর মধুর মিলনের মধ্যে শক্তিময় পরম ব্রহ্মের আনন্দময় রূপ ফুটে উঠে।

বৈষ্ণব সাহিত্য হইতেছে প্রেমের রূপক। নর-নারীর বন্ধন হইল প্রেম। প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমময়ী রাধা ভক্তি, ভালবাসায় আপ্লুত হইয়া বলিতেছেন,—

বঁধু তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব তেয়াগিয়া, নিশ্চল হইয়া, নিশ্চয় হইনু দাসী।

আবার আছে, মানময়ী শ্রীরাধা দুর্জ্জয় মান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন রাধাঠাকুরাণীর সুন্দর পা-দুখানি নিজের বক্ষে তুলিয়া নিয়া বলিলেন,—

"দেহি পদপল্লবমুদারম্—"

এই মিলন হইল—আকাশের সঙ্গে যেমন বাতাসের, আলোর সঙ্গে যেমন প্রাণের, মুক্তির সঙ্গে যেমন আনন্দের, হরের সঙ্গে হরির, শিবের সঙ্গে গৌরীর, নারায়ণের সঙ্গে নারায়ণীর। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের একান্ত সান্নিধ্যে প্রেম; দাস ও দাসীর মত উভয়ে উভয়ের কাছে ক্রীত, অবনত। এই প্রেমের বন্ধনে আসে জাতির বন্ধন। পরস্পরের মধ্যে নিবিড় আকর্ষণ না থাকিলে জাতি বড় হইতে পারে না। ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, সমষ্টি থেকে সমাজ, সমাজ হতে জাতিগত। আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। বাসনা করি—জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে খ্যাতি। কিন্তু যদি মা যশোদার পীযূষধারাকে রুদ্ধ করিয়া দেশের অনাগত শিশুদের বঞ্চিত করিয়া রাখিতে চাহি, তবে কোথা হতে পাব দেশ? বাল-গোপালের পূজো আমরা সনাতন কাল হইতে করিয়া আসিতেছি; সে কি শুধু মৃন্ময় মূর্তি নিয়া খেলা?

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্॥

কি জন্য ধ্যান করি? কাদের মধ্যে তাঁর এই ভুবনজয়ী রূপ আমরা দেখিতে পাই?

আমরা চাই অন্তঃপুরের মধ্যে সুশিক্ষিতা বধূ। যাঁরা ভবিষ্যৎ কালের জন্য দেশকে দিবেন সুসন্তান গঠন করিয়া। তারাই গড়ে তুলবে বলিষ্ঠ নির্ভীক কর্ম্মবীর ভারতীয় জাতি। তাদের শক্তিতে, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, প্রতিভাতে, দেশ হবে মহান। তাদের কর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা সমস্ত জগতের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তখনই সার্থক হবে কবির আকাঙ্ক্ষা—

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।

ধর্ম্ম

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

আজিকার যুগে প্রতি পদে বৃহত্তর জীবনের সম্মুখীন হইয়া কঠোর জীবনসংগ্রাম করিতে নারীর জীবনেও বিদ্যার প্রয়োজন বশেষ রহিয়াছে। আজিকার দিনে নারী শুধু গৃহ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে নাই, বাহিরের আহ্বানে তাহাকে যোগ দিতে হইয়াছে। তাহারই গৌরবময় প্রতিভূ হইতেছেন রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীমতী নাইডু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। এইরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর দর্শন পাই জীবন-সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে। মানব বলিয়া পরিচয় দিতে নারীর বহির্জীবনের প্রধান অবলম্বন হইতেছে বিদ্যা।

তবে বিদ্যার সহিত নৈতিক শিক্ষার ও ধর্ম্মবিশ্বাস-শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। যেমন ভিত্তিমূল দৃঢ় না হইলে সেই গৃহনির্ম্মাণ অসার্থক, সে গৃহের বিনাশ যে কোন মুহূর্ত্তে সম্ভব; তেমনি ধর্ম্মবিশ্বাস দ্বারা শিক্ষার মূল দৃঢ় না হইলে নারীর বিদ্যাশিক্ষাও অসার্থক। তাই হিন্দুগৃহের বালিকাগণের শিক্ষার ধারা আরম্ভ হয় ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা হইতে। এবং তাহাই উচিত।

ধর্ম্মশিক্ষা আমাদের জীবনে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় শিক্ষা। ইহা আমাদের সামাজিক জীবনকে সহস্র সংঘাতের মধ্যে আশ্রয়রূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি যে, বহু অশিক্ষিত নরনারী তাহাদের ধর্ম্মপালন-প্রবৃত্তি, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মভয় তাহাদের বহু প্রলোভন বহু হীনতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়া দুঃখ-ক্লেশকে হাসিমুখে সহ্য করিবার চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

পল্লীগ্রামের নিরক্ষর পল্লীবধূগণের নারীধর্ম্ম রক্ষা করিতে, জননী ও জায়া-জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে নারীর দায়িত্বভার গ্রহণে যে দৃঢ়তা দেখিয়াছি, আধুনিক যুগের তথাকথিত শিক্ষিত নারীগণের মধ্যে সে বস্তু দুর্লভ।

বহু তথাকথিত বিকৃত শিক্ষাপ্রাপ্তা নারীর পরিচয় পাইয়াছি, যাঁহারা 'ধর্ম্ম কি' জিজ্ঞাসা করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; সতীধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। সন্তানের জন্ম-দায়িত্বও উপেক্ষাভরে দেখেন। তাঁহাদের সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আবর্ত্তের মূলে দেখা যায় ধর্ম্মহীন শিক্ষা। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুর ন্যায় না গিয়াছেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে, না হইয়াছেন হিন্দুর প্রাচ্যশিক্ষায় শিক্ষিত। তাহারই জন্য তাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের উপর অবিদ্যা, অহং ও উগ্রতা প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাই আজ অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্ম্মাহতচিত্তে দেখিতে হয়---সম্ভ্রান্ত খ্যাতিসম্পন্ন হিন্দু পরিবারের নারী বিবাহবিচ্ছেদ বা সেপারেশন স্যুট আনিতেছেন।

সংযম, ক্ষমা, সহনশীলতা যে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে, তাহার অভাব ইঁহাদের শিক্ষায়, জ্ঞানানুশীলনে রহিয়াছে। তাই বিদ্যা তাঁহাদের জীবনে অসার্থক হইয়া অশান্তি লইয়া আসিয়াছে।

আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বত্র। হিন্দুর

তেরো পার্ব্বণ ধর্ম্ম দিয়া গঠিত। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া কত কাহিনী, কত কাব্য, কত উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। আদি গ্রন্থদ্বয় রামায়ণ ও মহাভারত। ইহার ভিতরকার নারীচরিত্রগুলি ধর্ম্ম-সমুজ্জ্বল চিত্র। ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মহীয়সী নারীগণ কেহ সুখী কেহ দুঃখী। তাই বলিয়া নৈতিক জীবনের সুস্থ মেরুদণ্ড ধর্ম্মকে কেহ দোষী করে নাই। মহাভারতে তেমনি একটি ধর্ম্মসমুজ্জ্বল অসুখী নারীচরিত্র রহিয়াছে—ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী।

কৈশোর কাল হইতে আমরা তাঁহার দর্শন পাই। অন্ধ স্বামী হইবেন জানিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত ফলরূপে গ্রহণ করিয়া আপন নয়ন বন্ধন করিয়া স্বেচ্ছায় অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার জীবন সংসার-ধর্ম্মের প্রারম্ভ হইতেই অসুখী। স্বামী ও পুত্রের অধর্ম্মাচরণ তাঁহার প্রতিদিনের জীবনকে বিষাক্ত করিয়াছে, প্রাণাধিক পুত্রগণ তাঁহার অবিচল ধর্ম্মনিষ্ঠায় বারংবার আঘাত করিয়াছে। তবু তিনি তাঁহার ধর্ম্মপালনের মূলমন্ত্র বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার কর্ম্মে প্রকাশ হইয়াছে—"ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ।"

তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন—"ধর্ম্ম নহে সম্পদের হেতু।" ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, ধর্ম্ম সুখ আনিবেই—সম্পদ আনিবেই—ইহার কোন বাধ্যতা নাই; জীবনকে বার বার দুঃখসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া তোমার আত্মার শক্তিকে হয়ত পরীক্ষা করিবে। তাই তিনি দুঃখের মাঝে এই বিশ্বাস রাখিয়াছেন যে, ধর্ম্ম মানবকে ধারণ করিয়া এমন স্থলে উত্তীর্ণ করিবে, যে-স্থলে স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত পরাভূত হইবেন। তাঁহার সেই অবিচল বিশ্বাস তাই বনপথযাত্রী ক্ষুব্ধ পাণ্ডবগণকে আশ্বাস দিয়াছে, আশীর্ব্বাদ করিয়াছে—

"সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্ম্মরাজ বিধি, যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।"

মানবের ক্ষুদ্র নশ্বর জীবনে ধর্ম্ম অক্ষয় সম্পদ্। দুঃখের নিকষে বারংবার তাহার নিষ্ঠা যাচাই হইয়া আপন মনের পরম শান্তি তাহার অন্তর্নিহিত তেজে তাহাকে অসীম শক্তিমান করিয়া তোলে।

তাই গান্ধারীর পুণ্যদৃষ্টির সম্মুখীন হইতে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও ভীত হইয়াছিলেন কুরুক্ষেত্র-রণের অবসানে। তাই স্বয়ং ভগবান্ মাথা পাতিয়া ধার্ম্মিকা নারীর ক্ষুব্ধ অভিশাপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গান্ধারী-চরিত্র তাই নারীচরিত্রের আদর্শ। এই নারীর জীবনের প্রথম প্রধান অবলম্বন ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম তাঁহাকে দুঃখে সুখে সকল কর্ম্মে অবিচল রাখিয়াছে। তাঁহার দিব্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। পুত্রদিগের যুদ্ধযাত্রায় তাঁহার সংশয়পীড়িত অন্তর হইতে যে আশীর্ব্বাণী নির্গত হইয়াছে—তাহা তাঁহার বলিষ্ঠ চিত্তের অমূল্যবাণী—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" তিনি অধার্ম্মিক পুত্রগণের আচরণে ব্যথিত। মাতৃস্নেহের প্রাবল্য তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নাই। তাই আজীবন সত্যাশ্রয়ী ধর্ম্মাশ্রয়ী নারী নিরপেক্ষ আশীর্ব্বাদে তাঁহার ব্যথিত চিত্তকে সান্ত্বনা দিয়াছেন—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পুত্রশোকে আকুলা গান্ধারী ক্রন্দন করিয়াছেন। তথাপি হস্তিনাপ্রত্যাগত বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"কি কারণে দুঃখ কর ধর্ম্মের নন্দন
তোমা হতে বসুমতী হইবে শোভন।
নিজদোষে হত হইল মোর পুত্রগণ।
ক্রন্দন করি যে আমি আমার কারণ॥"

আপন অন্তর্নিহিত এই যে অগ্নিস্বরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি, ইহাই মানবকে আপনি উন্নত করে, তাহার সকল হীনতা ক্ষুদ্রতাকে দগ্ধ করিয়া দেয়। ইহারই নাম আদর্শ। ধর্ম্ম বলিয়াই হ'ক আর আদর্শ বলিয়াই হ'ক, আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলে পথভ্রান্ত হইতে হয় না।

আমাদের জাতীয় জীবনে আজ ধর্ম্মহীনতা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাহীনতা ও নৈতিক অবনতি মনকে বড়ই পীড়িত করে।

তাই মনে হয়—শিক্ষার সোপান যদি ধর্ম্মদ্বারা রচিত হয়, জ্ঞানার্জ্জন যদি সাধনা বলিয়া বিবেচিত হয়, শিক্ষার কাল যদি সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়, তবে সেই নরনারী আদর্শ শিক্ষার মধ্য দিয়া মানুষ হইয়া আদর্শ নরনারী বলিয়া পূজিত হইবে।

জাগতিক সর্ব্বকল্যাণের মূলই হইল ধর্ম্ম। বেদ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

"ধর্ম্মই জগতের প্রধান অবলম্বন, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই লোকে বিশ্বাসপূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে। ধর্ম্মদ্বারা পাপ দূরীভূত হয়, জাগতিক কল্যাণ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

আজিকার দিনে এই বাক্য অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

আধুনিক যুগের নারী সাম্যবাদপ্রার্থিনী। ইহা তাহার ন্যায়-সঙ্গত দাবী। বহুদিন অত্যাচারিত হইয়া আজ সে যদি তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাবী করিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে তাহার সেই চেতনার লক্ষণ নারীজগতের আশার কথা। তবে সেই দাবী যদি কেবল পুরুষের সমকক্ষতা ও অনুকরণের দাবী হয়, তবে আশঙ্কার কথা যে, তাহাদের যে চেতনা জাগিয়াছে তাহা বিকৃত।

সমকক্ষতার দাবী কর্ম্মে চলিতে পারে, উচ্ছৃঙ্খলতায় নহে। প্রকৃতির সৃজনে নারী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকারে গঠিত। সভ্য-জগতের নিয়মে থাকিতে হইলে নারীর দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা অধিক। জননীর দায়িত্ব, ভবিষ্যত জাতির গঠনের দায়িত্ব। ভবিষ্যত জাতির যে মাতা হইবে তাহাকে অবশ্যই পবিত্র বিধি ও নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে। অপবিত্র বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে পবিত্র বস্তু প্রার্থনা করা হাস্যকর। তাই নারীর স্বভাবতঃ দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা বেশী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বিশেষ কারণ বশতঃ পুরুষের উদ্দামতা সমাজস্থিতির পক্ষে তত পীড়াজনক নহে, মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতা যতটা। স্ত্রী-পুরুষের সমাজবন্ধনে পুরুষের দিকে সকল দেশেই যথেষ্ট শৈথিল্য ও মেয়েদের দিকে যথেষ্ট কঠিনতা চলে আসছে।"

সত্যই নারী যদি উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকৃতিতে পুরুষের সমকক্ষ হইতে চাহে, তবে সমাজ-ব্যবস্থা। বিধি-শৃঙ্খলা একেবারেই নিরাস্ত হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশের পরাধীন জড় পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবনের একটা দিকে রাশিয়ার experiment সম্ভবপর নহে। সেই সকল স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ তাহাদের জাগ্রত চিত্ত ও বলিষ্ঠ চেতনা লইয়া রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায় নূতন নূতন বিপ্লব তুলিয়া নূতন পরীক্ষায় ব্যস্ত। তাহাদের দেখিয়া যদি আমরা অনুকরণ করিতে চাহি, তবে তাহা বিকারগ্রস্তের আক্ষেপ বলিয়া অনুমিত হইবে।

তবে নারী যদি শিক্ষায়, জ্ঞানে, বিদ্যায়, ধর্ম্মে পুরুষের সমান অধিকার দাবী করিয়া তাহাদের সমকক্ষ হয় কিম্বা আরো উর্দ্ধে ওঠে, তবে সমগ্র জাতির মঙ্গল আপনা হইতে আসিবে।

সহজিয়া সাহিত্য ও পরকীয়াবাদ

শ্রীকালিদাস রায়

সহজিয়া সাধকগণ যে প্রেমের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন—সেই প্রেমের স্বরূপ এইভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন—

সখিহে, পীরিতি বিষম বড়
যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে তবে সে পীরিতি দড়।
ভ্রমরা সমান আছে কতজন মধুলোভে করে প্রীত।
মধুপান করি উড়িয়া পলায় এমতি তাহার রীত।
বিধুর সহিত কুমুদ পীরিতি বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে এমতি পরাণ ঝুরে।

চণ্ডীদাস।

কবি উপমার দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন এ প্রেম যৌন-সম্পর্কহীন—নিষ্কাম ও গভীর। বিধু ও কুমুদের উপমায় বলা হইয়াছে প্রেমই সাধনার ধন—সাহচর্য্যটা বড় নয়। ইহাকে platonic love বলে।

যেজন যুবতী কুলবতী সতী সুশীল সুমতি যার
হৃদয় মাঝারে নায়ক লুকায়ে ভবনদী হয় পার।

প্রকৃত যে মনের মানুষ—সে যদি মনে বসতি করে—তাহা হইলেই প্রেম সাধনা সিদ্ধ হইল।

১। আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা
নিসাড়ি হইয়া চলো লো সজনি আঁধার করিয়া আলা॥
২। চণ্ডীদাস কহে লোকের বচনে কিবা সে করিতে পারে।
আপনা হৃদয়ে মনের মানসে নিরবধি ভজ তারে॥

কুল ত্যাগ না করিয়া মনে মনে যদি আপন প্রিয়তম সম্পর্কে কোন নারী [illegible]টা (?) হয়—সহজিয়ারা তাহাকে সতীই বলিবে। লৌকিক সংস্কারটা বেদবিধিমূলক—উহার আবার মূল্য কি?

আর যদি প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সঙ্গ লাভই হয়—তাহাতেই বা কি?

রজনী দিবসে হব পরবশে স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব ভাবিনী ভাবের দেহা।

যে মনের মানুষ তাহার সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা ও তন্ময়তাই সতীত্ব।

অঙ্গের পরশে সিনান করিব তবে সে এ রীতি সাজে।

আয়ানের সম্বন্ধে রাধার যে মনোভাব—নিজপতির সম্বন্ধে সহজিয়া নারীর সেই মনোভাব। মোট কথা আসল সহজিয়া মতে নারীপ্রেম, ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগের জন্য নয়—ইহা মহাপ্রেমের অনুশীলনের জন্য। সহজিয়া সাধকগণ এমন কথাও বলিয়াছেন—

১। রাগের সন্ধান জানে কামী কি কখন
মদনাবিষ্টে আত্ম হারায় তখন। (রাগময়ী কণা)
যদি বাহ্য সুখে সদা মজে মোর মন
তবে ত না পাবে তাই সে আনন্দ ধন।

(প্রেমানন্দ লহরী)

দেহ রতি সম্বন্ধে যে সাধক নারীদেহ স্পর্শ করে—সে জন্মে জন্মে নিস্তার পায় না। বাশুলী রামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে নরকে যাইবে হবে।
রতি স্থির মনে ভাব বাড়ি দিনে সহজ পাইবে তবে।

প্রেম মানুষের সহজ ধর্ম্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহার সম্যক অনুশীলনও তপস্যার ন্যায়। জ্ঞানতৃষ্ণা মানুষের সহজ ধর্ম্ম কিন্তু জ্ঞানের জন্য তপস্যা না করিলে সম্যক্ জ্ঞান লাভও হয় না। তেমনি যে মহাপ্রেমে আত্মার মুক্তি সে মহাপ্রেম বহু দিনের সাধনা সাপেক্ষ। এই প্রেমের যথাযথ অনুশীলনের জন্য নারী সংসর্গের প্রয়োজন। প্রকৃত প্রেম সাধনা গ্রন্থাদি অধ্যয়নে, শাস্ত্রবিধি-পালনে, সাংসারিক জীবনযাপনে, স্বার্থগত সকাম হৃদয়াবেগ বিস্তারণে সম্ভব নয়। নারীর সহিত আত্মহারা প্রণয়ের দ্বারাই প্রকৃত প্রেমের অনুশীলন সম্ভব—কিন্তু ইহাতেই পর্য্যবসান লাভ করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে—ইহা শুধু পরমার্থে পৌঁছিবার জন্য পথ মাত্র। হৃদয়ে মহাপ্রেমের উন্মেষ সাধিত হইলে আর নারী প্রেমের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। মধুচক্র রচিত হইলে আর পুষ্পের কি প্রয়োজন? 'চিন্তামণি'র প্রয়োজন ততক্ষণই যতক্ষণ না পরম চিন্তামণি লাভ না হইয়াছে।

সংস্কার মুক্তিই সহজিয়াদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। বারবারই তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের সাধনা, আচরণ ও প্রেম সম্পর্ক সমাজশাসনের বাহিরে, বেদবিধির বিরুদ্ধ।

১। যুগল ভজন তাহার যাজন বেদ বিধি অগোচর।
২। মরম কহিতে মরম না রহে বেদবিধি নয় বশ।

৩। বেদবিধিপর সব অগোচর ইথে কি জানিবে আনে।
রসে গরগর রসের অন্তর সেই সে মরম জানে।

৪। দক্ষিণ দিকেতে কদাচ না যাবে যাইলে প্রমাদ হবে।
(অর্থাৎ দক্ষিণাচার বা বেদবিধিসম্মত আচার গ্রহণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।)

৫। ত্রিসন্ধ্যা যাজন ও গায়ত্রী জপের অসারতা বুঝাইবার জন্যই চণ্ডীদাস রজকিনীর উদ্দেশে বলিয়াছেন—"ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী" একথা কোন বর্ণাশ্রমী সমাজগুরু সহ্য করিবেন না।

বৈদিক শাসনে জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন করিবার কথা—যাগযজ্ঞাদি নানা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিবার কথা, সহজিয়ারা এ সমস্ত কিছুই মানে না। বৈদিক শাসনে পূজা উপাসনা ব্রত তপজপের সাহায্যে দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিতে হয়। শাস্ত্রের আজ্ঞায় এই যে দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন, ইহাই বৈধী ভক্তি। সহজিয়ারা এই বৈধী ভক্তির পক্ষ ত্যাগ করিয়া রাগানুগা ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাদের 'প্রেমানন্দ লহরী'তে আছে।

বিধিপক্ষ পরিত্যজ রাগানুগা হয়ে ভজ
রাগ নৈলে মিলে না সে ধন।

আবার প্রেমভক্তি চন্দ্রিকাতে আছে,—

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতও ইহাই। তবে সহজিয়ারা বৈদিক সংস্কার ও বৈধী ভক্তির পথ কেবল ত্যাগ করিতে বলেন নাই—তাহাকে নারকীয় মহাপাপ বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন।

ইহা কেবল বিরোধিতা মাত্র নয়—ইহা সশস্ত্র বিদ্রোহেরই মত।

রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলিতে সহজিয়ারা বুঝেন,—একেবারে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের বিলোপ করিয়া নিত্য বা ব্রহ্মকে মানুষ কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি প্রেমানুরাগ। এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সঙ্গে মূলতঃ পার্থক্য নাই।

সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান এতদূর বেদবিরোধী যে, অনায়াসে মুসলমান সাঁই, দরবেশরা এই সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আকর্ষণে কোন কোন মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ ও ইসলামী আচরণ ত্যাগ না করিয়াই বহু মুসলমান এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন।

সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকদের দ্বারা অনুসৃত এই ধর্ম্মমত। বৈষ্ণব সাধকদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলেও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এই ধর্ম্মমতের পোষকতা করে নাই। তাহারা সহজে জাতিকুল বংশ ও বর্ণাশ্রমীর সমাজের গৌরব ত্যাগ করিতে পারে নাই, সংস্কারের বন্ধনও তাহাদের সুদৃঢ়। অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সমাজের লোক সাধারণতঃ বর্ণাশ্রম সমাজে উপেক্ষিত, তাহাদের সংস্কারের বন্ধনও অনেকটা শিথিল। সহজেই তাহারা এই সহজিয়া ধর্ম্ম মত গ্রহণ করিয়া সংস্কারমুক্তির স্বস্তি লাভ করিয়াছিল। নিত্যানন্দের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সমাজেও নবনব সংস্কারের বন্ধন আসিয়া জুটিয়াছিল এবং নব আভিজাত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সহজিয়ারা সে সমাজের গণ্ডীও ভাঙ্গিয়া স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সর্ব্বসংস্কারমুক্ত এই উদার সমাজের সমস্ত দ্বারই উন্মুক্ত। যে কোন ধর্ম্মমত বা সমাজের লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

সহজিয়াদের সংস্কারমুক্তির ব্যাপারে সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। বর্ণাশ্রমী সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য নাই—পত্নীকে মুখে সহধর্ম্মিণী বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পত্নী ধর্ম্মানুষ্ঠানে পতির সহযোগিনী নয়—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য—এই আশ্বাস দিয়া নারীদের নিরস্ত রাখা হয়। সামাজিক জীবনেও নারীর স্বাধীনতা নাই।

সহজিয়া সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী—তাঁহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হইয়াছে। এসমাজে নারীর দাসীত্ব নাই—নারীকে পুরুষ অপেক্ষা হীন মনে করা হয় না—ধর্ম্মাচরণে সমান অধিকারই দেওয়া হয়। ভালবাসিবার শক্তি যখন নারীর পুরুষ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়—তখন রাগাত্মক ধর্ম্মে তাহার সমান না হইবে কেন? ইহা সম্পূর্ণ বেদবিরোধী ব্যাপার। কেবল বৈদিক সমাজে কেন জগতের বহু ধর্ম্মসমাজেই নারীর এইরূপ অধিকার নাই। বর্ত্তমান সভ্যতা বহু দ্বন্দ্বসংঘর্ষের ও ঘাত-প্রতিঘাতের পর নারীর অধিকার সম্বন্ধে যে সত্যে উপনীত হইয়াছে—অর্দ্ধসভ্য সহজিয়ারা তাহা সহজ ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল। সহজিয়া সমাজে নারীর স্থান হীন ত নহেই—বরং নারীই প্রেমগুরু বলিয়া দেবীর মর্য্যাদায় পূজিতা—নারীদেহেই সহজিয়া পুরুষরা ভাগবতী সত্তার আরোপ করিয়া তাহাকে একাধারে দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগে অর্থাৎ chivalric age-এ নারীকে যে মর্য্যাদা দান করা হইত—সহজিয়ারা নারীকে তাহার চেয়েও বেশি মর্য্যাদাই দিয়াছে। সহজিয়া পুরুষরা বাংলার ধর্ম্ম জগতে যেন Knights.

নাইটরা নারী বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, নারীবিশেষের প্রেমকণা লাভ করিয়া অথবা নারীর দৃষ্টি হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করিয়া অসমসাহসে সংগ্রাম করিত আততায়ীদের সঙ্গে। আমাদের দেশে গ্রাম্য Knight-গণকেও সংগ্রাম কম করিতে হইত না। তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইত সর্ব্ববিধ বৈদিক সংস্কার ও সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে। সর্ব্ববিধ সামাজিক উৎপীড়ন, লোকনিন্দা, কলঙ্ক ইত্যাদি বরণ করিতে হইত। ইহাতে কম শৌর্য্যের প্রয়োজন না। ইহার উপর নারী সংসর্গে থাকিয়া ইন্দ্রিয়দমনের শৌর্য্যও আছেই।

পরকীয়াবাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সহিত জড়িত। এক এক ধর্ম্মমতে পরকীয়াকে এক এক ভাবে ধরা হইয়াছে। বৌদ্ধ-সাধকগণ সর্ব্ববিধ সংস্কারের বিরোধী। বিবাহ একটা বৈধ

সামাজিক সংস্কার। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে যাইতে হইলে স্বকীয়া ত্যাগ করিয়া পরকীয়া গ্রহণ করিতে হয়। পরকীয়া নারীতে প্রীতি যখন সমাজবিরুদ্ধ, তখন তাহাদের মতে তাহাই বৈধ। জাতি-কুল-গোত্র মানিয়া চলা একটা সামাজিক সংস্কার—বিশেষতঃ নীচ জাতিকে অস্পৃশ্য মনে করা একটা সংস্কার। তাহার বিরুদ্ধে যাইতে হইলে বাছিয়া বাছিয়া অতি নিম্নশ্রেণীর জাতির পরকীয়া রমণীর সংসর্গই সংস্কারমুক্তির চরম। বৌদ্ধসাধকদের তাই ডোম্‌নী সংসর্গের কথা দেখা যায়। সাধন ভজনের সহায়তা এই চণ্ডালী শ্রেণীর নারীদের সংসর্গে কতটা হইত বলা যায় না।

অর্ব্বাচীন বৌদ্ধযুগে সংঘারামে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রবেশ করিল। এই ব্যভিচারের স্রোত রুদ্ধ করিতে না পারিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই ব্যভিচারকে কতকগুলি সাধন-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধর্ম্ম-সাধনার অন্তর্গত করিয়া লইলেন। ইহা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মসাধনার একটা সন্ধিস্থাপন মাত্র।

তান্ত্রিকগণও বেদাচার বা দক্ষিণাচারবিরোধী—তাহারা বামাচারী। তাহারাও প্রাজাপত্য বিবাহকে একটা কুসংস্কার মনে করিয়া বৌদ্ধদের মতই যে কোন নারীর সহিত শৈববিবাহে আবদ্ধ হইত। এস্থলে পরকীয়ার সহিত প্রেমসংসর্গের কথা নাই, সে শক্তি-সাধনার সহায়তা করিবে মাত্র। কি ভাবে তাহার সাহায্যে শক্তি-সাধনা হইতে পারে—তাহা আমরা বুঝি না। তান্ত্রিক মতে কোন একটি বিশিষ্ট নারীই চির দিনের সাধন-সঙ্গিনী নয়। একই সাধকের বহু নারীর সহিত চক্রে চক্রে সংসর্গ ঘটিতে পারে। কারণ প্রেমের বালাই ত নাই। ভিন্ন ভিন্ন নারীর সংসর্গে আসিয়া ইন্দ্রিয়-দমনের দ্বারা শক্তিসঞ্চয়—ইহাই তান্ত্রিক সাধকদের লক্ষ্য, এমন কথাও কেহ কেহ বলেন। আবার প্রবৃত্তির পরিপাকের ফলে—চরম ভোগের অনিবার্য্য পরিণতির ফলে নিবৃত্তিলাভের দ্বারা শক্তি সঞ্চারই তাহাদের লক্ষ্য এমন কথাও কেহ কেহ বলেন।

সর্ব্ববিষয়ে বামাচারী হইতে হইলে নারীর সহিত যৌন সম্পর্ক বাদ যাইবার কথা নয়।

আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়া নারীকে মহাশক্তির অংশীভূতা শক্তিসঞ্চারিণীরূপে পরিকল্পিত দেখিতে পাই। নারী তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী বীরের বাহুতে শক্তি সঞ্চার করিতেছে—প্রেমাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মীকে কর্ম্মে প্রেরণা দান করিতেছে—প্রেমাকাঙ্ক্ষী কবির লেখনীতে রসের সঞ্চার করিতেছে—জ্ঞান-সাধকের চিত্তে উদ্দীপনা দান করিতেছে—ব্রতী পুরুষের ব্রত উদ্‌যাপনে উৎসাহিত করিতেছে—এইরূপ নারীর শক্তিসঞ্চারণের কথা কেবল ভারতে নয় সর্ব্বদেশের সর্ব্বসাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যযুগের Knight-দের বীরধর্ম্মের মূলে এইরূপ বরেণ্যা নারীর শক্তিসঞ্চার দেখা যায়। ইহার সহিত যৌন সম্পর্কের কথা নাই। তান্ত্রিক সাধকদের শক্তি সাধনা এই শ্রেণীর বলিয়া মনে হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরকীয়াবাদ অন্যরূপ। অনায়াসলভ্যা স্বকীয়ার প্রতি যে অনুরাগ অথবা বিবাহসংস্কারের সাহায্যে অনায়াসে প্রাপ্ত পতির প্রতি তাহার স্বকীয়ার যে অনুরাগ তাহা এমন নিবিড় বা গভীর নয় যে, ভাগবতী প্রীতির সহিত তাহা উপমিত হইতে পারে—অথবা তাহার ভাষায় ভাগবতী প্রীতির গভীরতা অভিব্যক্ত হইতে পারে।

দুর্লভা হৃদয়হারিণী পরকীয়া নারীর প্রতি পুরুষের অথবা দুর্লভ প্রেমার্থী পুরুষের প্রতি নারীর যে দুর্দ্দম গভীর অনুরাগ সেই অনুরাগের ভাষায় ভূষায় ও উপমাই গভীর ভাগবতী প্রীতির অভিব্যক্তি হইতে পারে।*

এই পরকীয়া বাদ কেবল ব্রজের পক্ষেই বৈধ। পরকীয়া নারীর সহিত প্রণয়ের দ্বারা সাধনা করিতে হইবে এমন কথা চৈতন্য দেব কিম্বা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোথাও বলেন নাই। বৈষ্ণব সাধকগণও পরকীয়া নারীর সাহচর্য্যে প্রেম সাধনা করেন নাই। তাঁহারা নিজেরাই নারীভাবে পরমপুরুষের প্রেমার্থী হইয়াছেন—নারীর সহায়তা তাঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই। গদাধর, জগদানন্দ, নরহরি ইত্যাদি সাধকগণ মধুর রসের সাধনায় নিজেদের পৌরুষশক্তির কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

সহজিয়ারা বলিলেন নারীভাবে ভজনা বা শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেম-লীলার মধ্যে সখীভাবে প্রেমরস সম্ভোগ প্রকৃত প্রেমসাধনা নয়। রমণীর প্রেম নিজের হৃদয় দিয়া সম্ভোগ করিতে হইবে স্বকীয়ার সাহায্যে তাহা সম্ভব নয়—পরকীয়া নারী চাই। পরকীয়া চিরদিনই পরকীয়াই থাকিবে—কোন দিন স্বকীয়া বা কামনায় উপভুক্তা হইবে না। যে কোন পরকীয়াই সাধকের সাধনাসঙ্গিনী হইতে পারে না। যে নায়িকার প্রতি সাধকের দুর্জ্জয় দুর্দ্দম আকর্ষণ যাহাতে তাহার চিত্ত স্থির হইবে, যাহার জন্য সে সর্ব্বস্ব এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত—সে দূরেই থাকুক আর নিকটেই থাকুক—সেই নায়িকাই তাহার ইষ্টজন, সেই তাহার উপাস্যা। কারণ, সাধক তাহাতে নারীত্বের চরম মহিমা—এবং পরম ঈপ্‌সিত বস্তুর আরোপ করিবে। আধা সে বিধাতার সৃষ্টি—আধা সে সাধকের সৃষ্টি—অর্দ্ধেক মানবী সে অর্দ্ধেক কল্পনা।

নারী সম্পর্কে এই নিষ্কাম মনোভাব-পোষণ এক প্রকারের তপস্যা-বরণ।†

*স্কন্দ পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকে বৈষ্ণব সাধনার সূত্র নিহিত আছে। যুবতীনাং যূনিনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি।

† সহজিয়ারা বলেন অনায়াসলভ্যা নারীর মধ্যে এমন আকর্ষণ নাই যে, আত্মবিলোপমূলক গভীর প্রেমকে অধিগম্য করিতে পারে। যে দুর্ল্লভা যে পরকীয়া তাহার প্রতি অনুরাগই হয় দুর্দ্দম ও গভীর। এই নারীর সহিত দেহসম্পর্ক ঘটিলেই সে আর দুর্ল্লভাও থাকিল না, পরকীয়াও থাকিল না। তাহার ফলে প্রণয়ের নিবিড়তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রখরতা নষ্ট হইয়া গেল। যে নারীর মধ্যে ভাগবতী শক্তি বা পরমেষ্ট মহিমা আরোপ করা হইয়াছে তাহাকে ইন্দ্রিয় ভোগের নিম্নতলে নামাইয়া আনিলেই সে সামান্যা প্রাকৃতা নারী হইয়া গেল। সে যেমনই ভোগের সহায়িকা হইল অমনি সে সাধনার সহায়িকা আর থাকিল না। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর মহাপ্রেমের সাধনা সম্ভবপর হইবে না। এ যেন হৃদয়-বেদীতে দেবী প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা না করিয়া তাহাকে

সাধনার কথা বাদ দিলে ইহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে—সমাজ তাহা স্বীকার না করিলেও সাহিত্য তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

যুবক-যুবতীর মধ্যে সহজ স্বাভাবিক একনিষ্ঠ ও একাগ্র আকর্ষণ বৈবাহিক সংস্কার ও সমাজশাসনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে প্রেমের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়—সত্যের অবমাননা হয়—মনুষ্যত্বের গৌরবহানি হয়—তাহা সকল দেশের সাহিত্য একবাক্যে বলে। সংস্কার যত বড়ই হউক—যত প্রাচীনই হউক—তাহার চেয়ে যে সত্যই বড় এবং ধর্ম্মসঙ্গত তাহা সর্ব্বদেশের সাহিত্য একবাক্যে ঘোষণা করে এবং সংস্কারের যূপকাষ্ঠে স্বাধীন প্রেমের বলিদানে যে ঘরে ঘরে ট্র্যাজেডি ঘটিতেছে—তাহাই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বস্তু। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন অকপট স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রণয়ের প্রতি সাহিত্যের গভীর সহানুভূতি।

সহজিয়া সাহিত্যের সহিত এ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্যের কোন তফাৎ নাই। কথাসাহিত্যও প্রেম সম্পর্কে পরকীয়াবাদকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে। ধর্ম্ম সাধনার জন্য সহজিয়া সাহিত্য যাহার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে—আর্ট সৃষ্টির জন্য কথাসাহিত্য তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রেমের বৈচিত্র্য, সংস্কারের সহিত সত্যের দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন মনোবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষ দেখাইবার জন্য, প্রেমের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কথাসাহিত্যে পরকীয়ার অবতারণা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য স্বকীয়াকেও পরকীয়া রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন কোন কোন উপন্যাসে।

কথাসাহিত্যে প্রেমস্বরূপ সত্যের আহ্বানে যে পরকীয়া রতি তাহাই চরম কথা—মনের মানুষের জন্য আত্মবিলোপেই তাহার পর্য্যবসান। সহজিয়া সাহিত্যে আমরা দেখি পরকীয়া রতি পারমার্থিক ও পরমেষ্ট ধনলাভের একটা উপায় মাত্র, পরমানন্দ বিগ্রহের মন্দিরে আরোহণ-সোপান মাত্র।

এই যে পরমানন্দ ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নয়—ইহা চতুর্ব্বর্গের অতীত। ইহাকে সহজিয়ারা নাম দিয়াছেন পঞ্চম।

চতুর্ব্বর্গ লব্ধ হয় বেদাচারে ক্রমে,
রসময় সেবা ভিন্ন মিলে না পঞ্চমে।

...

পুতুল নাচে ব্যবহার করা। তাই সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাস যদি বলিয়া থাকেন—

রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

তবে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাই সহজিয়া সাধকরা বলেন—

নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ যেরূপে সাধিত হয়,
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয়।

রজকিনীর সঙ্গে ঐন্দ্রিয়িক সম্পর্ক থাকিলে চণ্ডীদাস রজকিনীকে মাতা পিতা, বাগ্‌বাদিনী, হরের ঘরণী, বেদমাতা গায়ত্রী ইত্যাদি বলিতে পারিতেন না।

মানুষ* [গল্প]

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্, কে, আই, সুইডেন

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে তিনি রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন ও রাস্তার দু'ধারে সার হ'য়ে দাঁড়ান বাড়ীগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। নভেম্বর মাস ও সন্ধ্যার সময়, তাই কন্‌কনে ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এমন অস্বস্তিকর সন্ধ্যা যে জগতে এ সময় যা কিছু জীবিত বা যা কিছু মৃত ছিল সবই যেন এক যোড়ে মিলে শৈত্য ও আর্দ্রতা চারদিকে ছড়াচ্ছিল। যতদূর দৃষ্টি যায় রাস্তা এ সময় দু'ধারেই জনহীন। সাধারণতঃ এরূপ সন্ধ্যায় লোকে কেউ বাড়ীর বাহির হয় না, কিন্তু হেম্বর হাইকিনেনের কথা পৃথক্; বাহিরে আবহাওয়ার অবস্থা যতই খারাপ হ'ত ততই তাঁর মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেত ও সে জন্যই বৃষ্টি বা জোর তুষারপাতের সময় তাঁর নিজেকে বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ ক'রে রাখা একেবারে অসম্ভব হ'ত। তাঁর বুড়ী পিসীমা এ জন্য একবার ভবিষ্যৎ বাণী ক'রেছিলেন যে, এই অভ্যাসই একদিন হাইকিনেনের দুঃখের কারণ হ'বে। যা হোক এখনও পর্য্যন্ত এ রকম কিছু হ'তে শুনা যায় নি ও তিনি নিজে এ ভবিষ্যৎ বাণীকে খুব হাল্‌কা ভাবেই নিয়েছিলেন ও মনে করতেন যে তাঁর দেহ ভগবান এমন উপাদানে গড়েছেন যে তড়িৎআকর্ষণী যেমন বিদ্যুৎকে টেনে নেয়, ঠিক সেই রকম ভাবে তাঁর এই অদ্ভুত দেহটাই খারাপ আবহাওয়াকে ডেকে আনত। এই গুণটীর গর্ব্ব ক'রে ভাল লোকদের মাঝখানে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ ক'রতেন। কারণ প্রাকৃতিক শক্তির সহিত এই আশ্চর্য্যকর মিতালী তাঁর এক বড় মজার জিনিষ ব'লে মনে হ'ত এবং বোধ হয় তাঁর অন্যান্য গুণের মধ্যে শুধু এই গুণটার বিষয় এ কথা বলা যেতে পারে।

রেস্তোরাঁতে তিনি এইমাত্র খুব সাধারণ রকমের নৈশ ভোজন শেষ ক'রলেন। ভাল করে খাবার তাঁর সংস্থান ছিল না; যা হোক্ এ খাওয়াটায় তাঁর খালি পেটটা বেশ ভরে গেল ও ঠাণ্ডা শরীরটা গরম হ'য়ে উঠল। খাবার পর কিন্তু তাঁর শু'বার ইচ্ছা হ'ল না, কারণ তিনি মনে ভাবলেন যে মাত্র ১০টা বেজেছে এত তাড়াতাড়ি শু'তে যেয়ে কি হবে; না শুয়ে বরং একটু ঘুরাফিরা ক'রলে হজমটা ভাল হবে। এই না ভেবে যখন তিনি চলতে আরম্ভ ক'রলেন, তখন তাঁর মনে হ'ল যেন ঠাণ্ডা আর্দ্র বাতাস তাঁর মুখে বিঁধে আঘাত করছে—উঃ এত ঠাণ্ডা!—ও যেন এই বাতাসে তার ওভারকোটের নিম্ন ভাগটা পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এইভাবে বাতাসের বিরুদ্ধে কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে চলতে বাধ্য হওয়ায় তাঁর স্বাভাবিক ঘাড় উঁচু করে সম্ভ্রমের সহিত চলা সম্ভব

* টাইভো পেকাননের "Mieset" গল্পের বঙ্গানুবাদ।

হ'ল না। জনহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তায় এ-ভাবে চলায় পুলিশের তাঁর প্রতি সন্দেহ হ'ল ও সেজন্য সে তাঁরদিকে দু' চার বার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল। হাইকিনেন কিন্তু কোন ভয় না পেয়ে ও পুলিশের প্রতি আর দৃক্‌পাত না ক'রে এগিয়ে চলায় পুলিশ কিছু করতে সাহস পেল না। এইভাবে যেতে যেতে তিনি যখন আধঘণ্টা পথ অতিক্রম ক'রলেন তখন এই প্রথমবার তিনি একটি লোকের সম্মুখীন হ'লেন যে পুলিশ ছিল না ও যেহেতু এই দেখাটা দু'জনের মধ্যে একটা খুব ছোট সহরে, যার জনসংখ্যা পুরা ১৫ হাজারও ছিল না, হয় এটা একেবারেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে তাঁরা পরস্পরকে সহজে চিন্তে পারলেন। এক হেমন্তের রাত্রে দুই বন্ধুতে এই দেখা হ'ল ও হ'বামাত্রেই দু'জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা সুরু হ'য়ে গেল।

রাস্তায় শোঁ শোঁ শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে ব'লে তাঁরা একটা বাড়ীর নীচে আশ্রয় নিয়ে দাঁড়ালেন। পার্শ্বেই একটা ছোট রেস্তোরাঁ। এটা কোনও এক অজানা সমিতির সভ্যদের আড্ডা দেবার জায়গা ছিল। এখান থেকে বন্ধজানালার মধ্য দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তাঁরা শুনতে পেলেন। এই বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ছাড়া এ স্থান নিস্তব্ধতায় একেবারে মগ্ন; মনে হ'ল বেশীভাগ লোকই এ সময় শুয়ে পড়েছে ও তাই ভেবে তাঁরা দু'জনে গলার স্বরটা খুব দাবিয়ে কথা কহিতে লাগলেন যাহাতে কাহারও ঘুম না ভাঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকটী লোক রেস্তোরাঁ থেকে বাহিরে এল ও হাসতে হাসতে ও উত্তেজনা ভরে কথা বলতে বলতে চলে গেল। মনে হ'ল তারা অল্প বিস্তর পান করেছিল। তারা চলে যাবার পর আবার সব যেন গভীর নিস্তব্ধতার ও কাল রাত্রের কবলে ফিরে এল। বন্ধু দুটী তাঁদের কথাবার্ত্তা পুনরায় আরম্ভ করলেন। কথা আরম্ভ করা মাত্রেই অল্পদূরে অন্ধকারে দেখতে পেলেন কি যেন একটা মানুষের আকৃতির মত সঙ্কোচভরে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। এই আকৃতি যখন কাছে এসে দাঁড়াল তখন স্পষ্ট দেখা গেল যে সত্যই এ একটা মানুষ ও এই মানুষটা তাঁদের কাছ থেকে তার অর্দ্ধেক জ্বলে যাওয়া সিগারেটের জন্য আগুন চাইলে।

হাইকিনেন তার সিগারেটটা যখন ধরিয়ে দিলেন তখন তিনি ও তাঁর বন্ধু দু'জনে আগন্তুককে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন ও তাকে দেখে তাঁদের মনে হল সে লোকটা জীর্ণ শীর্ণ—একেবারে অস্থিচর্ম্মসার ও তার পোষাক একেবারে দারিদ্র্যের শেষ সীমার পরিচয় দিল। এই দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষীণ আলোতে আরও দেখলেন যে তার মুখের রঙ কাল ও তার গালের চামড়া গুটিয়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে।

আগুন পাবার পর লোকটা সিগারেটটা জোরে টানতে আরম্ভ করল।

—তাম্রকূট স্নায়বিক উত্তেজনা খুব ভাল রকম কমিয়ে দেয়; কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সে বলল।

—দুঃখের বিষয় এটাই আমার শেষ সিগারেট।

যখন সিগারেটের টুকরাটা একেবারে জ্বলে শেষ হবার মত হল তখন সে সেটাকে নর্দ্দমায় ফেলে দিল ও ছেঁড়া কোটের পকেটে দু'টী হাত পুরে দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক দু'টী তার সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা চালাবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ না করলেও সে তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে গেল না; যেন সেখানে তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে তার একটু বেশী উত্তাপ ও আরাম বোধ হচ্ছিল। একটু পরেই সে রেস্তোরাঁর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—আপনারা কি ঐ দলের লোক?—বিরক্ত হয়ে হাইকিনেন উত্তর দিলেন—না

—যাক্ তা হলে ভাল কথাই—আমি তাদের বিশেষ পছন্দ করি না

—আপনারা তা হ'লে কি ঐ ক্লাবের লোক?—এই জিজ্ঞাসা করে সে হাত বাড়িয়ে পশ্চিমে একটা অন্য বাড়ীর দিকে দেখাল। না—উত্তর দিলেন হাইকিনেন-এর বন্ধু।

—বেশ, তাহলে আপনারা কি ঐ·····মাথা নেড়ে ও তাঁদের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে পূর্ব্বদিকে হাত তুলে জিজ্ঞাসা করল।

—না! না! আমরা রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। হাইকিনেন বিরক্ত হয়ে বললেন।

—কি, রাজনীতি আপনাদের ভাল লাগে না?—উত্তেজিত হয়ে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

—অবশ্য আমরা ভোট দিয়ে থাকি—হাইকিনেন্-এর বন্ধু ঈষৎ ইতস্তত: করে বললেন।

দরিদ্রলোকটী মুখভার করে অন্ধকারে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল ও এবার তার উৎসাহ আস্তে আস্তে কমতে লাগল। একটু কি যেন ভেবে আবার সে কৌতূহলভরে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল:

—আপনারা কি মুক্তি-সেনাবাহিনীর (Salvation Army) লোক নন?

—না।

—আচ্ছা তা হলে কি আপনারা বাইবেল সমিতির বা ইষ্টার বন্ধুদের (Easter Friends) কেউ?

—না।

—আপনারা তা হলে কি কোনও ভাল কাজ করেন না? আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে শেষে সে জিজ্ঞাসা করল।

—না।

—হায় ভগবান, তা হলে আপনারা কি রকম অদ্ভুত জীব?

—হাইকিনেন ও তাঁর বন্ধু পরস্পর নিজেদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ও ভাবলেন এটা অত্যন্ত অহঙ্কারের পরিচয় হবে যদি তাঁরা এই বৃদ্ধ দরিদ্রের এসব কোনও প্রশ্নে উৎসাহ না দেখান।

—দুঃখের বিষয় আমরা এ সব কিছু নয়, আমরা শুধু সাধারণ মানুষ।—শেষে একটু ইতস্তত: করে হাইকিনেন বললেন।

—মানুষ? মানুষ, সে আবার কি? যেন কি একটা ভেবে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বুড়া জিজ্ঞাসা করল

এ প্রশ্ন শুনে হাইকিনেনের বন্ধু বিস্ময়ভরে বললেন, আপনি বোধ হয় একটু পান করেছেন ও তাই মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছেন না।—

—না, তা কেন, আমার মাথা ঠিকই আছে। ব্যাপারটা

হোচ্ছে আমি অনেক দেশ বিদেশ ঘুরে অনেক কিছু নূতন শিখেছি ও তা শিখে অনেক কিছু পুরাতন ভুলে গেছি; তবে আমার এখনও একটা জিনিষ মনে পড়ে যে আমি ঐ "মানুষের" কথা পূর্ব্বে মাঝে মিশেলে শুনেছি।

—আপনি তা হলে কে? হাইক্কিনেন প্রশ্ন করলেন। আপনি কি আপনার নামটী বলবেন না? নামটী জানতে পারলে বোধ হয় বোঝা যেতো ব্যাপারটা কি—

—আমার নাম! হায়—হায় আমার নাম জেনে কি হবে, আমার নাম কেই কখনও শুনে নি; একেবারে অজানা আমি। তবে আমার মনে হয় আমার জীবনের কয়েকটা বিষয় আপনারা শুনলে বুঝতে পা'রবেন আমি কে: আমি হচ্ছি একজন হতভাগ্য লোক যে জীবনে কখনও সাফল্য লাভ করেনি ও যার অপরের কাছ থেকে পাওয়া দান কখনও মনের মত হয় নি। দুঃখের বিষয় এমন কি আমি কখনও একটা কায শিখ্‌তে পারিনি যাতে আমি নিজেকে ভরণ-পোষণ ক'রতে পারতাম ও খ্রীষ্টের জন্মাবার বহু পূর্ব্ব হ'তে আমি পৃথিবীতে একলা ঘুরে বেড়িয়েছি, আর পরণে ছিল আমার ধনীলোকদের ফেলে দেওয়া জীর্ণ বস্ত্র। শুধু তাই নয়—ইতিহাসের সকল সময়ে সকল লোকের মধ্যে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি ও কালপ্রবাহে আমার পরণের জীর্ণ বস্ত্রের মাপ, কাটটাই বদলাল; কিন্তু আস্ত জামা কি তা এ পর্য্যন্ত জান্‌তে পারলাম না।

—কদাচিৎ যদি আমি পেট ভরে খেতে পেয়ে থাকি আর গরম বিছানায় শোয়া কদাচিৎ ও হয়েছে কি না সন্দেহ। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আমার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে, আর আমি ভাগ্যবিধাতার ভিন্ন ভিন্ন রূপও দেখেছি, কিন্তু আমি বদলাই নি। আমি সব সময়েই লোকের কাছে সেই ঘৃণিত, নীচতম ও পদানত। কখনও আমাকে ভিখারী, কখনও বা ভবঘুরে, কখনও জুয়াচোর কখনও আবার বড় সহরের ময়লা ঘাঁটা বলা হয়েছে। খারাপ সময়ে আমি অন্যান্য ক্ষুধার্ত্ত কর্ম্মহীন লোকেদের সাথে যোগ দিয়ে দাঁড়িয়েছি তবে দুঃখের বিষয় এই যে এমন কি ভাল সময়েও যখন কর্ম্মহীনেরা কায পেয়ে আনন্দে কারখানা অভিমুখে যাত্রা করেছে আমি শুধু বাহিরেই দাঁড়িয়ে থেকেছি। কখনও সহরের অস্বাস্থ্যকর অপরিষ্কার ভগ্নপ্রায় বাড়ীতে, কখনও স্যাঁতসেতে অন্ধকার সেলার (cellar) এ, কখনও মুক্তিদান সেনাবাহিনীদের রাত কাটাবার পান্থশালায়—আবার কখনও দরিদ্রদের হাঁসপাতালে বা এমন কি হয়ত কখনও গোরস্থানে মৃতদের সঙ্গে বাস করেছি। আমার বিষয় কত বই না লেখা হয়েছে যা পড়ে কত কোমল-অন্তঃকরণা নারী কেঁদেছেন, আমার দুঃখ মোচনের জন্য কত মনীষীরা কতই না মাথা ঘামিয়েছেন ও জগৎকে কত অভিসম্পাত ও ধিক্কার না দিয়েছেন, আমাকে রক্ষা করবার জন্য কতই না আইন জারি হয়েছে আর কতই না নূতন নূতন চিন্তার ধারা বহে গেছে, আমার স্বস্তির জন্য কত দেশে কতরাজাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ও কত বিপ্লব না আমার জন্য সৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু সবই বৃথা হয়েছে, কারণ আমি এসব চেষ্টা সত্ত্বেও যেমনকার তেমনই রইলুম হায়—হতভাগ্য আমি!

লেখকরা আমার হয়ে বই লিখে কত অর্থ উপার্জ্জন করেছেন ও খ্যাতি লাভ করেছেন; আমার সমর্থন করায় কত নূতন নূতন চিন্তার ধারা জগতে কত প্রসিদ্ধ হয়েছে ও কত বিপ্লবকারীরা আমার জন্য বিপ্লব করে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন ও নিজেদের সুনাম ইতিহাসে অমর করেছেন, কিন্তু হায়—আমি সেই ক্ষুধার্ত্ত ও অজানা রইলুম।

মহাশয়গণ! আমি কত দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কত ধর্ম্মমতে প্রবেশ ক'রবার চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় অবরুদ্ধদ্বার আমার জন্য কোথাও উন্মুক্ত হয় নি ও তাই আজ আমার অবস্থা যেমন দেখছেন ঠিক তেমনি রয়ে গেল—হায় হতভাগ্য নিরুপায় আমি!

এ রাস্তা বড় আর্দ্র ও ঠাণ্ডা, এখন আমি আপনাদের মুখপানে—যাঁরা নিজেকে ভাল বলে পরিচয় দিয়েছেন—সাহায্যের জন্য চেয়ে আছি। আমাকে রাতটা কাটাবার জায়গা কি দিতে পারেন না?

ক্লান্ত ভাবে ও ঈষৎ বিরক্ত হয়ে হাইক্কিনেনের বন্ধু বললেন'—এবার আমায় যেতে হবে—Hyva Yo! (হিভে ইয়—Good Night)—এই বলে টুপীটা একটু তুলে তিনি অন্ধকারে প্রস্থান ক'রলেন।

হের হাইক্কিনেনেরও ইচ্ছা হ'ল যে বাড়ী ফিরে যান, কারণ অন্ধকার রাত্রে এরকম এক অজ্ঞাতকুলশীল, যার চালচলন সন্দেহজনক তার সঙ্গে একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কথা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। কিন্তু এ রকম ভাবা সত্ত্বেও তাঁর বন্ধুর মত তিনি একে ঠাণ্ডাভাবে অগ্রাহ্য করে ছেড়ে যেতে পা'রলেন না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা খুঁজতে লাগলেন। দেখুন,—হাত বাড়িয়ে পয়সাটা আগন্তুককে দিয়ে তিনি বললেন—এটা আপনি গ্রহণ করুন। রাস্তায় এগিয়ে গেলে নিশ্চয় আপনি কোনও না কোন দ্বার পাবেন যেটা এই পয়সা হাতে নিয়ে টোকা দিলে খুলে যাবে।

Kittaan (কিতেন—ধন্যবাদ)! বলে লোকটী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি জগতে ভাল লোকও আছেন যদিও বোধ তাঁদের সংখ্যা খুবই কম।

হ্যাঁ, সে কথা খুবই ঠিক—হাইক্কিনেন্ উত্তরে ব'ললেন—Hyvasti! (হিভেস্তি Farewell) আচ্ছা এখন তবে আসি!

বিদ্যাপতি

মার বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়

এই বার গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ৮২টী পদের আলোচনা করিব। এই পদগুলি মৈথিল ব্যাকরণপ্রণেতা বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রীয়ারসন সাহেব মিথিলার গ্রামাঞ্চলে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে প্রাচীন মৈথিল ভাষার কতকগুলি বৈয়াকরণিক রূপ ও ভাষাপ্রয়োগরীতির (idiom) উদাহরণ রক্ষিত আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব তাঁহার মৈথিল ব্যাকরণে ব্যাকরণের সূত্র প্রমাণ করিবার জন্য এই পদগুলি হইতে অনেকগুলি পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর এই পদগুলির ভাষা বিদ্যাপতির অন্যান্য পদাবলীর ভাষার সহিত তুলনায় স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ যে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বা রক্ষিত হইয়াছে ইহাদের ভাষা তাহা হইতে অভিন্ন। এই পদগুলিতে আদিম মৈথিলের অবিকৃত রূপ অক্ষুন্ন আছে এরূপ দাবী করা চলে না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, সংগৃহীত হইবার সময় ইহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে অনেকাংশে খাঁটি মৈথিলের লক্ষণভ্রষ্ট হইয়াছিল। মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতির পর অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত আর কোনও রচনা না থাকার জন্য ইহার সূক্ষ্ম রূপান্তরগুলি আকৃতির বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক লক্ষণসমূহ তাহাদের বিশুদ্ধি হারাইয়া একদিকে হিন্দী ও অপর দিকে ব্রজবুলির সহিত প্রায় নিশ্চিহ্ন ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। আমাদের বাংলা ভাষায় লিখিত সাহিত্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও মধ্যযুগের খাঁটি রূপটী একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ দেশবাসীর চিত্তের গভীরতম স্তরে অবিস্মরণীয় প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে ঠিক কিরূপ ভাষায় তাঁহাদের অমর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা আজ আর নিশ্চয় করিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না। আমরা তাঁহাদের ভক্তিরসাত্মক, চিত্তদ্রবকারী ভাবগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের বাহ্যরূপটী, শব্দ ও ব্যাকরণঘটিত বহিরবয়বটী কালের পরিবর্ত্তনস্রোতের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করি নাই। যখন বাংলা সাহিত্যেই এই অবস্থা, তখন লিখিত নিদর্শনশূন্য, কথ্য ভাষার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, মৈথিলে প্রাচীন বিশুদ্ধরূপের সংরক্ষণ কেমন করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? সেই জন্য যদিও গ্রীয়ারসন-সংগৃহীত পদগুলিতে স্থানে স্থানে প্রাচীন মৈথিলের নিদর্শন মিলে ও আধুনিক আবেষ্টনের মধ্যে গ্রথিত কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দ ভাষাতত্ত্ববিদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে, তথাপি মোটের উপর ইহাদের যে বিশেষ ভাষা-তাত্ত্বিক মূল্য আছে তাহা মনে হয় না।

কিন্তু এই পদগুলির আর এক দিক্ দিয়া বিশেষ মূল্য আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যাপতির কাব্য-বিচারে প্রধান সমস্যা পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব ভাবের প্রক্ষেপ। বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালা দেশেই প্রথম সংগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল—কাজেই ইহাদের সহিত হরিবল্লভ, কবিবল্লভ, ভূপতি সিংহ, রায় শেখর, কবিরঞ্জনপ্রমুখ অনেক চৈতন্যোত্তর বাঙ্গালী কবির রচনা মিশিয়া গিয়াছে। অনেক সময় এই উভয়বিধ রচনার পার্থক্য নির্দ্ধারণ একটু দুরূহ হইয়া পড়ে। আর হয় ত একটু সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে ব্রজবুলির ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ প্রয়োগরীতি ও ভাবসৌকুমার্য্য ও চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ছাপে বাঙ্গালী কবির রচনাকে চিনিতে পারা যায়। তথাপি সন্দেহ জাগে যে, হয়ত বিদ্যাপতির খাঁটি পদগুলিও বাঙ্গালী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিবেশে ও বাঙ্গালী অনুকারকের প্রভাবে অনেকটা রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীয়ারসনের পদগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই জন্য যে, এগুলি সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী প্রভাবমুক্ত। ইহারা বাঙ্গালী সংগ্রাহকের তালিকায় স্থান পায় নাই, পরবর্ত্তী যুগের ভাবধারা ইহাদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। কাজেই এগুলি আলোচনা করিলে বিদ্যাপতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্বন্ধে একটা যথার্থ ধারণা সম্ভব হইবে। এই প্রবন্ধের পূর্ব্বতন অংশে আমি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে, প্রাক্-চৈতন্যযুগের তিনজন মহাকবি—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম্মসম্পর্কহীন প্রেম-কবিতার ধারার সহিত ভাগবতকার কর্ত্তৃক প্রথমপ্রচারিত আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সংযোগ সাধন করিয়াছেন। প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের সহিত ভক্তিরসের মিলন ঘটাইয়াছেন। জয়দেবে দৈহিক সম্ভোগবর্ণনার অসংযত আতিশয্যের মধ্যে বিরল স্থলে অধ্যাত্ম অনুভূতির গভীরতার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে, কিন্তু সংস্কৃতের অতিপল্লবিত মুখরতার জন্য এই উচ্চতর ব্যঞ্জনা বিশেষ প্রকট হইবার অবকাশ পায় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থে এই আকর্ষণ নির্ল্লজ্জ ভোগলিপ্সা ও ইতর কলহের স্তরে নামিয়া বিরহের বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহার চিরন্তন মর্য্যাদা ও বিশুদ্ধিকে ফিরিয়া পাইয়াছে ও এই চিরুদ্দম-কারী নব অনুভূতির সোপানপথ বাহিয়া আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইবার লক্ষণ দেখাইয়াছে। কিন্তু না জয়দেব, না বড়ু চণ্ডীদাস—কেহই পরবর্ত্তী বৈষ্ণবপদাবলীর মূল উৎস ও আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন নাই। জয়দেবে সৌন্দর্য্যমত্ততার প্রবল বাস্পপ্রবাহে আধ্যাত্মিকতার ক্ষীণ ধ্বনি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে—দশাবতারের মহিমাদ্যোতক স্তোত্রগানে ও পুণ্যলোভাতুর শ্রোতার পারমার্থিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতির দ্বারা তিনি অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে আধ্যাত্মিকতার আবহাওয়াকে বজায় রাখিয়াছেন। অর্থাৎ প্রেমবর্ণনায় আধ্যাত্মিকতার অভাব তিনি দেবতার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নিজগ্রন্থের ধর্ম্মভাবমূলক উদ্দেশ্য উচ্চকণ্ঠে প্রচারের দ্বারা মিটাইতে চেষ্টা করিতেছেন। 'গীতগোবিন্দে' শৃঙ্গার ও ভক্তিরসের সমন্বয় হয় নাই—জয়দেব ভক্তির উচ্চবাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার আশ্রয়ে শৃঙ্গার-রসের গভীর হ্রদ খনন করিয়াছেন ও উহার লহরীলীলার বিচিত্র সৌন্দর্য্য ফুটাইতে তাঁহার সমস্ত কবি-প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসে রাধিকার পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, বাধ্যতামূলক আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া গভীর আধ্যাত্মিক প্রেমের স্ফুরণ—মনস্তত্ত্বজ্ঞান, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরুচি ও বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্র এই তিনের কাহারও পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের (?) পদ আস্বাদন করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবজগতে এক অভূতপূর্ব্ব গৌরবের স্থান দিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ যুগের পদকর্ত্তারা তাঁহাকে বা তাঁহার নামের অন্তরালে

যে একাধিক কবি আত্মপরিচয় বিলুপ্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-কাব্যমহিমার প্রতীকরূপে মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন। বিরহে কোথাও কোথাও মানের স্পর্শ আছে। তথাপি মনে হয় যে, তাঁহার প্রেমের পরিকল্পনা হইতে পূর্ব্বরাগ, অভিসার ও মান এই তিন অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় বাদ পড়াতে বড়ু চণ্ডীদাস পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম স্রষ্টা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

এক বিদ্যাপতির রচনাতেই পদাবলী-সাহিত্যের আদর্শ ছাঁচ পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে সৌন্দর্য্যোপভোগ ও আধ্যাত্মিকতা মধুর ও ভক্তিরসের প্রকৃত সমন্বয় হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত উপাদান ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যাপতিতে বর্ত্তমান। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের যে বিভিন্ন স্তর-পরিণতি বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিদ্যাপতিতে সেই সমস্ত স্তরই উদাহৃত হইয়াছে। এই প্রেমের যে উদার পরিকল্পনা ও অপরূপ রসমাধুর্য্য পূর্ব্বরাগ ও অভিসারের অবলম্বনে বিকশিত হইয়াছে, তাহা প্রথম বিদ্যাপতির কল্পনায় প্রতিভাত হইয়াছে। এমন কি, যাহা চৈতন্যোত্তর ধর্ম্মের বিশেষত্ব সেই 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' নিবিড় প্রেমের আবেশে নায়িকার আত্মবিস্মৃতি ও ভাবতন্ময়তা ও 'ভাবসম্মিলন'—রূঢ় বাস্তব বাধার বিরুদ্ধে স্বপ্ন-বিভোর প্রেমের আত্মসার্থকতার করুণ অভিনয়—এই দুইটী স্তরেরও পূর্ব্ব সূচনা বিদ্যাপতিতে মিলে। বিদ্যাপতির সহিত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবির পার্থক্য বিদ্যাপতির রচনায় ভক্তিরসের আপেক্ষিক অগভীরতায়। বিদ্যাপতি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী; কাজেই চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরা চৈতন্যদেবের জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে যে অলৌকিক প্রেমের মূর্ত্ত, রসঘন বিকাশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির সে অপরূপ অভিজ্ঞতা হয় নাই। তিনি সুদূর ভাগবতকার ও অদূরবর্ত্তী জয়দেবের যুগ হইতে, সংস্কৃত শৃঙ্গার-রস-সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায়, তাহারই আলঙ্কারিক প্রথা ও সনাতন ভাবধারার অনুসরণে, প্রেরণা আহরণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরাও তাহাই করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তাঁহাদের গতানুগতিক প্রথানুসরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিব্য জ্যোতিঃ ও কূলপ্লাবী আবেগের সঞ্চার করিয়াছে। বিদ্যাপতির কাব্যে সুদূর নক্ষত্রলোকের চিত্র-সৌন্দর্য্য ও ম্লান ঝিকিমিকি; বৈষ্ণব কবিদের রচনা চৈতন্য-চন্দ্রের পূর্ণিমা-কৌমুদীপ্লাবিত। বিদ্যাপতি প্রধানতঃ কুশল, আত্মসচেতন শিল্পী; তাঁহার শিল্পজ্ঞান কদাচিৎ ভক্তি-বিহ্বলতার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা শিশুর ন্যায়, বাহ্যজ্ঞানহীন ভক্তের ন্যায় এক অলৌকিক নাট্যাভিনয়ের মুগ্ধ দ্রষ্টার ন্যায়, ভাবগভীরতার স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সচেতন প্রয়াস নহে, গভীর আন্তরিক অনুভূতির অনিবার্য্য বহিঃপ্রকাশ। এইজন্য বিদ্যাপতির প্রেম-বৈচিত্ত্য-বিষয়ক পদগুলি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই—তাঁহার রাধিকার প্রেমাবিষ্টতা আত্মবিভ্রমের উচ্চতম পর্য্যায়ে পৌঁছায় নাই। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও ভাবোচ্ছ্বাস—এই উভয় উপাদানের আপেক্ষিক তারতম্যই বিদ্যাপতির সহিত পরবর্ত্তী যুগের কবিদের প্রধান পার্থক্য। বিদ্যাপতির ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত; কোন মহাপুরুষের দৃষ্টান্তে বা কোন আধ্যাত্মিক সাধনার পুঞ্জীভূত প্রভাবে, পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রস্রোতের ন্যায়, ইহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। কাজেই তাঁহার ভক্তিরস অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ধারায়, সৌন্দর্য্যের তটভূমি আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ

তোমার স্বরূপখানি অফুরন্ত

লতিকা ঘোষ

তোমার স্বরূপখানি ব্যাপ্ত চরাচরে
চন্দ্রে, সূর্য্যে, তারকায় লোকলোকান্তরে;
আমি আজি ভাবি দেব কেমনে বিরাজ
সঙ্কীর্ণ এ ক্ষুদ্র মম অন্তরের মাঝ।

দ্রৌপদী দেবীর বস্ত্র কুরু সভাতলে,
যতই কাড়িয়া লয় তত বেড়ে চলে;
অন্তর মাঝারে প্রেম শাশ্বত, অক্ষয়,
সবারে করিলে দান অফুরন্ত হয়।

———
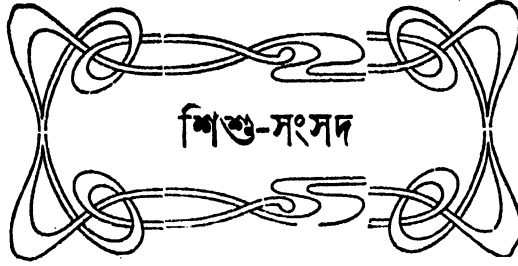
উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

বাসবদত্তার স্বপ্ন

দশ

একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর আলাপের দৃশ্য দেখতে দেখতে যৌগন্ধরায়ণ আপন মনে ভাবছিলেন—'তা হলে ইনিই মগধের রাজকন্যা পদ্মাবতী। পুষ্পকভদ্র প্রভৃতি জ্যোতিষীরা, আর অনেক সিদ্ধ পুরুষ বলেছেন যে, এঁরই সঙ্গে আমাদের মহারাজের নিশ্চয় বিয়ে হবে! এঁর আকৃতিও যেমন সুন্দর, প্রকৃতির পরিচয়ও বার বার দু'বার পেলুম—তেমনই মধুর! যাক! এঁর হাতে মহারাণীর ভার দিয়ে আমার মনের ভার প্রায় অর্দ্ধেকটা নেমে গেল!'

এই সময় একজন ব্রহ্মচারী সেই তপোবনে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল—তিনি যেন বহু দূর দেশ থেকে হেঁটে এসে খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সামনে তপোবন দেখে বিশ্রামের আশায় তিনি সেখানে ঢুকেছিলেন। কিন্তু সামনে অনেক মেয়েছেলে দেখে তিনি ভিতরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

তাই দেখে পদ্মাবতী তাঁর কঞ্চুকীকে ইসারা করলেন। কঞ্চুকী এগিয়ে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে জানালেন—'আপনি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে ভিতরে আসতে পারেন। তপোবনে সকল লোকের ঢোকবার সমান অধিকার।'

ব্রহ্মচারীকে দেখে বাসবদত্তা একটু লজ্জার ভাব দেখাতে লাগলেন। তাই দেখে পদ্মাবতী ভাবলেন—'আবন্তিকা নিশ্চয়ই খুব ভাল মেয়ে—কারণ পুরুষমানুষের সামনে বেরুতে তিনি মোটেই রাজি নন দেখছি। যাক্, ভালই হল। আবন্তিকাকে সামলাতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হবে না—এটা বেশ বোঝা গেল।'

কঞ্চুকী ব্রহ্মচারীকে হাত-পা-মুখ ধোয়ার জল দিলেন। একটু বিশ্রাম করবার পর তাঁকে যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—'মশায়ের নিবাস কোথা? এখন আসছেনই বা কোথা হতে? আর যাবেনইবা কোন দিকে?'

ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন,—'আমি থাকতুম বৎসরাজ উদয়নেরই রাজ্যে—লাবাণক গ্রামে। আপাততঃ মগধরাজের রাজধানী রাজগৃহে।'

যৌগন্ধরায়ণ—'তা হঠাৎ লাবাণক ছেড়ে এলেন যে? আপনার বেদ পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে না কি?'

বাসবদত্তা লাবাণক গ্রামের নাম শুনে কাণ খাড়া করেছিলেন—লাবাণকের কোন খবর যদি পাওয়া যায়।

যৌগন্ধরায়ণের কথায় ব্রহ্মচারী বললেন, 'আজ্ঞে না, পড়া এখনও শেষ হয় নি।'

যৌগন্ধরায়ণ—'তবে হঠাৎ লাবাণক থেকে রাজগৃহে চললেন কেন?'

ব্রহ্মচারী হুস্ করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন—'আর মশাই! লাবাণকে যে মস্ত বড় সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!'

যৌগন্ধরায়ণ—'কি ব্যাপার? বলুন, বলুন, শুনি।'

পদ্মাবতী, আবন্তিকা (বাসবদত্তা), তাপসী এঁরাও একটু এগিয়ে এলেন ব্যাপার কি শুনতে। কঞ্চুকী আর যৌগন্ধরায়ণ মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে। খালি বিদূষক কানা ছেলে—বোকার মত মুখ করে একপাশে সরে রইলেন।

ব্রহ্মচারী বলে যেতে লাগলেন—'জানেন ত বৎসরাজ উদয়ন তাঁর পাটরাণী বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে লাবাণক গ্রামে এসেছিলেন শিকার করতে।'

যৌগন্ধরায়ণ—'শুনেছিলাম বটে, তাতে কি?'

ব্রহ্মচারী—'মহারাজ একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে গিয়েছেন—তাঁর শালা অবন্তির রাজকুমার গোপালকের জ্বর—তিনি আছেন শিবিরে শুয়ে—তাঁর সেবা-টেবা করে মহারাণী বাসবদত্তা একটু জিরিয়ে নিতে গেছেন নিজের শিবিরে—এমন সময় হঠাৎ মহারাজ-মহারাণীর শিবিরে লেগে গেল আগুন। শোনা যাচ্ছে যে, প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজবৈদ্য নিয়ে গোপালকের চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন—তিনিই প্রথম আগুনের ঠিকানা পেয়ে মহারাণীকে উদ্ধার করতে জ্বলন্ত শিবিরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু কি মহারাণী, কি যৌগন্ধরায়ণ, কেউই আর সে বেড়া আগুন থেকে বেরুতে পারেন নি। দু'জনেই পুড়ে মরেছেন এমন ভাবে যে, খান কয়েক হাড় ছাড়া আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় নি।'

বাসবদত্তা আপন মনে ভাবতে লাগলেন—'হায়! হায়! হতভাগিনী আমি বেঁচে। তবু আমি মরেছি ভেবে মহারাজ না জানি কত কষ্ট পাচ্ছেন। হয়ত আমিই তাঁর মরণের কারণ হয়ে দাঁড়াব।'

ওদিকে যৌগন্ধরায়ণ ভাবতে লেগেছিলেন—'এত মজা হল মন্দ নয়! এ গোপালকের কাজ! আমি শুদ্ধ পুড়ে মরেছি এ খবরটা চাউর করে বড় কুমার আমার ওপরেও এক হাত নিয়েছেন। ফলে হল এই যে, আপাততঃ কিছু দিন আমাকেও

আত্মগোপন করে থাকতে হবে। তা হোক, তাতে আমার ফন্দী ফেঁসে যাবে না। রাজকুমারী পদ্মাবতী যখন এ খবরটা পেয়ে গেলেন, তখন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেরী হবে না।'

কঞ্চুকী আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললেন—'হাঁ মশাই, তারপর কি হল বলুন।'

ব্রহ্মচারী—'মহারাজ খবর পেয়ে বন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলেন। তিনিও আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন—'

ব্রহ্মচারীর কথা শুনে আবন্তিকার মুখ থেকে একটা অস্ফুট কাতরানির শব্দ বেরিয়ে এল। তাই শুনে পদ্মাবতী বললেন—'দিদি! তোমার দেখছি বড় কোমল মন। এ খবরে তোমার মুখখানা যেন কেমন পাঙাশ হয়ে গেছে। তুমি আর এ সব দুঃখের কাহিনী শুনো না—একটু স'রে গিয়ে ঐদিকে পুকুরধারে না হয় একটু বোসো গে।'

বাসবদত্তা আস্তে আস্তে পদ্মাবতীর কাণে কাণে বললেন 'না বোন্, তার দরকার হবে না। তবে বৎসরাজ উদয়নের রাণী বাসবদত্তা আর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মত বড় দু'জন লোক এ ভাবে আগুনে পুড়ে মরেছেন এ কথা শুনে আমি মনের ভাব চাপতে পারি নি। আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না ত।' তার পর তিনি আপন মনে বললেন 'মন্ত্রিবর! কেমন, এবার আপনার মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে ত?' তখন তাঁর চোখের জল আর বাধা মানতে চাইছিল না।

পদ্মাবতীর এক চেড়ী তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি! আপনার হল কি! আপনি যে কাঁদতে সুরু করে দিলেন।'

পদ্মাবতী বললেন, 'থাক থাক! ওঁকে কিছু বোলো না—ওঁর মনটা বড় নরম—পরের দুঃখের কথা শুনলেও উনি কষ্ট পান।'

যৌগন্ধরায়ণ এই ব্যাপারে একটু প্রমাদ গণলেন কে জানে বাসবদত্তা যদি বেশী আবেগের ফলে নিজের সত্যি পরিচয় দিয়ে ফেলেন! তাই তিনি কথা চাপবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ঠিক বলেছেন মা লক্ষ্মী! আমার এ মেয়েটির বড্ড কোমল মন। নিজের মনে সুখ নেই কি না, তাই পরের দুঃখের কথা শুনলেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।'

এমন সময় কঞ্চুকী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

ব্রহ্মচারী—'তারপর প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান্ রাজাকে জড়িয়ে ধরে আগুন থেকে বাঁচালেন—আগুনও তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। রাজা রুমণ্বানের কোলের উপরই মূর্চ্ছা গেলেন।'

বাসবদত্তা আবার অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। পদ্মাবতীরও মুখখানি এবার যেন শুকিয়ে উঠল।

যৌগন্ধরায়ণ (ব্যস্তভাবে)—'কি সর্বনাশ! তারপর—।'

ব্রহ্মচারী—'তারপর সেনাপতি, কুমার গোপালক ও অন্য সকলের সেবা-যত্নে তাঁহার চৈতন্য ফিরে এল। তখন তিনি মহারাণীর বিছানা যেখানে ছিল শিবিরের মধ্যে সেইখানে গিয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ছাইএর মধ্যে মহারাণীর গায়ের গয়না কয়েকখানা পুড়ে গ'লে বিকৃত হ'য়ে পড়েছিল—আর আধ-পোড়া খানকয়েক হাড় বাকী ছিল। সেইগুলি জড়িয়ে ধ'রে সেই ছাইএর গাদায় গড়াগড়ি দিতে দিতে মহারাজ বালকের মত কাঁদতে লাগলেন—'হা প্রিয়ে বাসবদত্তে! হা অবন্তিরাজপুত্রি! হা দেবি! তোমার এই দশা দেখে আমি কি ক'রে বাঁচব। আর যিনি এ দারুণ শোকেও আমায় বাঁচাতে পারতেন—সেই প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও তোমারই সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেলেন। তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবার কর্ত্তাও ছিলেন তিনি—তাই বুঝি আজ তোমাকে পরলোকে যেতে দেখে তিনিও আর ইহলোকে থাকতে চাইলেন না।'

যৌগন্ধরায়ণ (মনে মনে)—'ধন্য আমি! যে মন্ত্রীর মরণে রাজা এরকম শোক করেন, তাঁর প্রভুসেবা সার্থক'!

বাসবদত্তা মনে মনে—'ধন্য আমি। যে স্ত্রীর জন্য স্বামীর এত শোক—তার মত ভাগ্যবতী আর কে'?

পদ্মাবতী—'ধন্য বাসবদত্তা! যে স্ত্রীকে স্বামী এত ভালবাসেন—তাঁর মত সৌভাগ্য কার। পুড়ে মরলেও স্বামীর অন্তর-বেদীতে তিনি যে অমর হয়ে থাকবেন চিরদিন'!

কঞ্চুকী—'তারপর? মহারাজ একটু শান্ত হ'তে পেরেছেন ত'?

ব্রহ্মচারী—'হাঁ। রুমণ্বানের চেষ্টায় তিনি একটু সামলেছেন। প্রথমে তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছিলেন—তারপর শেষে প্রায় ঘণ্টা চার পাঁচ ঘুমিয়েছেন—শুনে ভোর রাতে আমি লাবাণক থেকে রওনা হয়েছি। শোনা যাচ্ছে—রুমণ্বানের মত সেবা না কি কেউ কখনও কারুর করতে পারে নি—কাল সারারাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে মহারাজের পায়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন—নিজের হাতে বাতাস করেছেন। মহারাজের দুঃখে কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে। মহারাজের যদি এদিক ওদিক হয়, তা হলে রুমণ্বান্ও আর বাঁচবেন না'।

বাসবদত্তা (মনে মনে)—'যাক্, প্রভু আমার ভাল লোকের হাতেই পড়েছেন—তা হ'লে তাঁর জীবনের আশা এখন করা যায়।'

যৌগন্ধরায়ণ—'ধন্য রুমণ্বান্! তুমি আজ প্রভুসেবার যে আদর্শ দেখালে—তাতে তোমার নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হ'য়ে থাকবে। আর হতভাগা আমি! আমিই ত' যত নষ্টের মূল! তবে যদি শেষ রক্ষা করতে পারি, তা হ'লে হয়ত সব অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাবে'।

কঞ্চুকী—'যাক্, মহারাজ একটু সুস্থ হয়েছেন তা হলে'!

ব্রহ্মচারী—'হাঁ, একটু শান্ত যে হয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই'।

পদ্মাবতী (মনে মনে)—'যাক্, বাঁচলুম! বৎসরাজ মূর্চ্ছা গিয়েছেন শুনে অবধি আমার বুকটা খালি খালি ঠেক্‌ছিল—এখন একটু দম ফেলা যাবে তা হ'লে'!

[ক্রমশঃ

পরশুরামের প্রতিজ্ঞা

শ্রীযামিনীমোহন মতিলাল

মহাত্মা পরশুরামের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছো। পরশুরাম হিন্দুর দশ অবতারের ষষ্ঠ অবতার বলে হিন্দু মাত্রেরই পূজনীয়। ছেলেবেলার দারুণ দুরন্ত আর একগুঁয়ে উগ্রস্বভাব পরশুরাম বাপ মার প্রতি অসীম ভক্তিমান ছিলেন। ভগবান শঙ্করের পূজায় তাঁর একদিনও অবহেলা ছিল না। মহাদেবের পূজা করে পরশুরাম এক কুঠার বা পরশু লাভ করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয়েছিল পরশুরাম।

গাধিরাজার কন্যা মহর্ষি বিশ্বামিত্রভগিনী সত্যবতীর সঙ্গে পরশুরামের পিতামহ ঋচীক মুনির বিবাহ হয়। পরশুরামের পিতা জমদগ্নী এঁদের ছেলে। মুনি জমদগ্নি সমস্ত বেদ ও সমগ্র ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী হয়ে প্রসেনজিত রাজার মেয়ে রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার পাঁচটি ছেলে পরশুরাম সবার ছোট।

পরশুরাম তখন ছোট। রেণুকার একটা দারুণ অপরাধের জন্য মহামুনি জমদগ্নি মহাক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেদের বলেন তাঁকে কেটে ফেলতে। বড় চারটি ছেলের কেউই রাজী হলেন না। ছোট ছেলে রামের হাতে ছিল কুঠার—বাপের কথায় দ্বিরুক্তি না করে দিলেন মায়ের গলায় বসিয়ে। জমদগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। পরশুরাম বললেন, "বর আর কি দিবেন, মাকে বাঁচিয়ে দিন।" জমদগ্নি ছেলের কথায় তপঃপ্রভাবে রেণুকাকে পুনর্জ্জীবিতা করলেন।

মুনি জমদগ্নি, রেণুকাদেবী আর তাঁদের পাঁচটি ছেলে মহাসুখে হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে বাস করেন। ছেলেরা সারাদিন বনে বনে কন্দ মূল আর ফল আহরণ করে আনেন মুনি জমদগ্নি আর রেণুকা দেবপূজা ও অতিথিসেবা করে দিন কাটান। এই রকম একদিন ছেলেরা বেরিয়ে গিয়েছেন আশ্রম থেকে বহু দূরে, আশ্রমে আছেন জমদগ্নি আর রেণুকা। মুনি স্নানান্তে পূজায় বসেছেন আশ্রমের অদূরে এক মহাকলরব শোনা গেল। দারুণ সমুদ্রকল্লোলের মত এই কলরব দূর হ'তে শুনাতে লাগলো।

তপোবনবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন, এদিক ওদিক সন্ধান ক'রে জানতে পারা গেল, হৈহয় নৃপতি মহারাজ সহস্রার্জ্জুন মৃগয়া করতে বেরিয়ে ছিলেন—তাঁর চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে। শিকারের পাছে পাছে ছুটাছুটি করতে করতে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে জমদগ্নি-বনে এসে পড়েছেন। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা প্রায় দুপুর। প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে সহস্রার্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্য আর তাঁর চতুরঙ্গ সেনাদল তৃষ্ণায় কাতর। কোথাও জল পাওয়া যায় নি—বনের মধ্যে এই মনোরম আশ্রম দেখে তাঁদের ধড়ে প্রাণ এল। তাড়াতাড়ি আনন্দ কলরবে সকলে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। মুনি রাজাকে দেখে শীঘ্র শীঘ্র পূজা সমাধা ক'রে যথারীতি পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে, রাজাকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজাও জমদগ্নির চরণে প্রণত হ'য়ে প্রীতি সম্ভাষণ ক'রে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন, "আপনাকে দর্শন ক'রে আমি ধন্য হ'লাম, আজ আমার বহু ভাগ্য।"

তৃষ্ণাকাতর রাজা মহর্ষি প্রদত্ত সুশীতল জল পান ক'রে, তৃপ্ত হ'য়ে বিনম্র সহকারে জমদগ্নিকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় প্রার্থনা ক'রে বললেন, "আমি তা' হ'লে আসি এইবার। আপনার এখনও আহারাদি হয় নি—আমি এসে বিরক্ত ক'রে গেলাম—ক্ষমা করবেন। আমাকে দিয়ে আপনার যদি কোন কাজ হয়, দয়া ক'রে জানাবেন—আমি নিশ্চয় আমার যথাসাধ্য সে কাজ সাধন করব।"

জমদগ্নি বললেন, "সে কি মহারাজ—এই বেলা দ্বিপ্রহর—রোদ্দুরে কাঠ ফাটছে। এখনি যাবেন কোথা? সে কি হয়? আজ আমার আশ্রমে এসেছেন—আপনি আমার অতিথি। অতিথি সর্ব্বদেবতার আগে—আজ আপনাকে আমার আতিথ্য গ্রহণ ক'রে যা হয় কিছু আহারাদি ক'রে যেতেই হবে।"

রাজা বললেন, "তা কি ক'রে হবে ব্রাহ্মণ—আপনার আতিথ্য গ্রহণ অবশ্য ভাগ্যের কথা। আমি একা হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে যে, হাজার হাজার সেনা রয়েছে, তা'রা সব অভুক্ত থাকবে আর আমি আহার করব—এ কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি যাই।"

মুনি বললেন, "না, না, তা হবে না----আপনারা সকলেই আমার অতিথি—আজ আমার এখানেই আহারাদি করবেন।"

রাজা অবাক হ'য়ে বললেন. "এত সৈন্য, সবাই আপনার অতিথি হ'লে—জমদগ্নি হেসে উত্তর করলেন, "সে আপনি ভাববেন না। আমি অকিঞ্চন মুনি হ'লেও আপনার এই চতুরঙ্গ সেনাগণকে উত্তমরূপে আহার করাব। ঈশ্বরকৃপায় আমার সম্মুখে ঐ যে ধেনু দেখছেন, এঁর প্রসাদে আমি সর্ব্বদা সকল অভীষ্ট পেয়ে থাকি। ইনি কামধেনু।" কার্ত্তবীর্য্য আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে মহর্ষি জমদগ্নির আতিথ্য স্বীকার করলেন।

তারপর রাজার চতুরঙ্গ সেনা যথাবিধি স্নান, দেব ও পিতৃ-তর্পণ, পূজা পাঠ শেষ ক'রে ভোজনের জন্য আসন গ্রহণ করলেন। সে কি বিরাট আয়োজন—এমন ভোজ্য রাজপ্রাসাদেও দুর্লভ। ধপধপে সাদা ভাত—নানারকমের ব্যঞ্জন—মিষ্টি, কষা, ঝাল, টক—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—পক্কান্ন, পিষ্টক—মোদক কোন ক্রটি নাই। হাজার হাজার সৈন্য পরম পরিতোষে আহার সমাধা করল। ভোজন শেষ ক'রে আচমন ক'রে, সুবাসিত তাম্বুল চিবুতে চিবুতে রাজা জমদগ্নিকে হাত যোড় ক'রে বললেন, "আমরা পরম পরিতৃপ্ত হয়েছি। আপনার আতিথেয়তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।" জমদগ্নি বললেন, "আপনার বিনয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লাম। কিন্তু এই অতিথি সংকারের সকল প্রশংসা আমার এই কামধেনুরই প্রাপ্য, সকলই এই দেবীর প্রভাবে।"

কামধেনুর প্রভাব দেখে রাজা বহু পূর্ব্বেই মনে মনে লুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন, এইবার বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম—কি আশ্চর্য্য প্রভাব আপনার এই কামধেনুর----দয়া ক'রে ঐ ধেনুটি আমাকে দান করুন: এই ধেনু আপনার মত শান্তচিত্ত অরণ্য-বাসী মুনি-ঋষির যোগ্য নয়----আপনার কাছে এই ধেনুর যোগ্য মর্য্যাদা হয় না। আমি পেলে আমার রাজ্যে মঙ্গল হবে—দেশে

দৈন্য থাকবে না—শত্রু নিপাত যবে—আরও কত শুভ কাজে যে লাগবে তা একমুখে বলা যায় না। আপনি প্রসন্নমনে ধেনুটি আমাকে দিন।"

রাজার প্রার্থনা শুনে জমদগ্নি উত্তর করলেন, "সে কি কথা মহারাজ—এ আপনার অন্যায় প্রার্থনা। আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না। আপনি জানেন না এই ধেনু আমার যজ্ঞসম্ভূত—আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। সতত আমার পূজ্যা, আমার আরাধ্যা দেবী, তাঁকে আপনার হাতে কি ক'রে দিই বলুন? আপনি অতিথি, আপনাকে বিমুখ করা আমার ধর্ম্ম নয়—তবু এ ধেনু আপনাকে দেওয়া যায় না।"

রাজার তখন কামধেনুটি লাভের প্রবল ইচ্ছা। এমন চমৎকার ধেনু—এ লোভ কি সামলানো যায়। রাজা বললেন, "এই ধেনুর বদলে আপনাকে হাজার ধেনু আর প্রচুর অর্থ দিব। আপনার প্রয়োজন সামান্য কিন্তু আমার দরকার অনেক—এ ধেনু আমিই রাখবার যোগ্য—আপনি এই ধেনু আমাকে দিন, দয়া করুন।"

জমদগ্নি বললেন, "তা হয় না মহারাজ, এই ধেনু কোন কারণেই আপনাকে দিতে পারবো না। এর পরিবর্ত্তে আপনি আমাকে আপনার রাজ্য সম্পদ্ সর্ব্বস্ব দিন, তাতেও না। তা ছাড়া সামান্য গোধনও কেনাবেচার সামগ্রী নয়—তা ইনি তো মহাপ্রভাবশালী কামধেনু। এ সংসারে যে মূর্খ ধনলোভে গরু বিক্রয় করে, তার আপনার জননীকেই বিক্রয় করা হয়। সব পাপের পরিত্রাণ আছে কিন্তু ধেনু বিক্রয়ে ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ বা প্রায়শ্চিত্ত নাই। ক্ষমা করবেন মহারাজ, এ ধেনু আপনাকে দিতে পারবো না।"

এত বিনয় ক'রে ব'লেও রাজা দেখলেন, মুনি অটল সুতরাং উপায় কি! জোর ক'রেই ধেনু গ্রহণ করতে হবে।

রাজা রেগে বললেন, "কি! আমি দেশের রাজা—আমাকে দেবেন না আপনি? আমি ভাল কথায় আপনার কাছে চাচ্ছি, আপনি যদি না দেন, আমাকে জোর ক'রেই দিতে হবে।"

জমদগ্নি উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন, "কি জোর ক'রে নেবেন? দেশের রাজা ব'লে আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন? আচ্ছা দেখি। রেণুকা আমার অস্ত্র আনো—রাজা বলে কামধেনু হরণ করবেন।"

কিন্তু রেণুকা অস্ত্র নিয়ে আসবার আগেই রাজার আদেশে তাঁর সেনাগণ জমদগ্নিকে আক্রমণ ক'রে নিশিত শরদ্বারা তাঁর প্রাণ সংহার করলে।

রেণুকা অস্ত্র নিয়ে ছুটে এসে দেখেন। জমদগ্নি নিহত—চীৎকার ক'রে স্বামীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়লেন—রাজসৈন্য তাঁকেও অস্ত্রাঘাত ক'রে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত ক'রে ফেললো। নিতান্তই আয়ু ছিল ব'লে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও মুমূর্ষু অবস্থায় স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন ক'রে ছটফট করতে লাগলেন।

নিষ্ঠুর রাজা সহস্রার্জ্জুন এইবার ধেনু গ্রহণ ক'রে তাঁর রাজধানী মাহিষ্মতীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ধেনু কিন্তু যেতে চাইলো না সকলে সবলে আকর্ষণ ক'রেও তাকে এক পাও নড়াতে পারে না। শেষে লাঠি মেরেও তাকে সরাতে পারা গেল না। কামধেনু জমদগ্নিকে নিহত দেখে ঝর ঝর ক'রে কাঁদতে লাগলেন। রাজসৈন্য যত জোর করে ধেনু ততই রেগে ওঠেন। অবশেষে তার মুখ থেকে শত সহস্র অস্ত্রধারী দ্বিতীয় যমদূতের মত নিদারুণ পুলিন্দ আর মোদক সেনা নির্গত হ'তে লাগলো। এইবার আরম্ভ হলো মহাযুদ্ধ। হৈহয় সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পালাতে লাগলো। রাজা মহাসমস্যায় পড়লেন। মন্ত্রিবর্গ পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ ধেনুর আশা ছেড়ে দিয়ে রাজ্যে ফিরে চলুন—আপনার সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়েছে—ধেনু আপনি নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পারবেন না। তার উপর শুনেছি মহর্ষির পরশুরাম নামে একটি ভীষণ গোঁয়ার, মহাতেজস্বী এক ছেলে আছে—তিনি আসবার আগেই এখান থেকে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য—এক অনর্থ হয়ে গেল—আর এক অনর্থ না হয়—চলুন এই বেলা পালান যাক।"

রাজা মন্ত্রীদের কথা শুনে স্থান ত্যাগ করাই সুবিবেচনার কাজ মনে করে ধেনুর আশা জলাঞ্জলি দিয়ে রাজধানীতে প্রস্থান করলেন।

দেখতে দেখতে সূর্য্য পাটে নামলেন—বেলা প'ড়ে এলো। মুনি জমদগ্নির ছেলেরা এ-বন ও-বন ঘুরে প্রচুর ফলমূল সংগ্রহ ক'রে আশ্রমে ফিরে এলেন। কিছুদূর থেকে তাঁরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন এ কি কাণ্ড। চারিদিকের গাছপালা ভাঙ্গা। বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। এখনও বহু পুলিন্দ সেনা ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। এই সকালে সবাই দেখে গেছেন কোথাও কিছু নেই—আর এক বেলার মধ্যেই এই ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা। তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। পরশুরাম ভায়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হোল দাদা—একি কাণ্ড বলত—চারিদিকে দেখছি পুলিন্দ সেনা। তাইতো? আরে আরে একি আমাদের কামধেনু না—হ্যাঁ তাইতো পিঠে কিসের দাগ বলতো—কারা যেন প্রহার করেছে।—ওকি আশ্রমবাসী তাপস তাপসীরা যে কাঁদছেন—বাবা মা কোথায়? তাঁদের তো দেখছি না।" ছেলেরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। একজন তাপসীকে পরশুরাম জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার বলুন তো----আপনারা কাঁদছেন----আশ্রমের এই অবস্থা----কি হয়েছে?" আশ্রমবাসীরা একে একে এসে চোখের জলে ভেসে তাঁদের কাছে মহারাজা সহস্রার্জ্জুনের অপকীর্ত্তির কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করলেন। ছেলেদের মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়লো। ছুটে গিয়ে অস্ত্রাঘাতে নিহত পিতা আর ক্ষতসর্ব্বাঙ্গী মৃতপ্রায়া জননীকে দেখতে পেয়ে হায় হায় ক'রে উঠলেন। পরশুরাম ব্যতীত আর সকলে চোখের জল রাখতে পারলেন না। হায় হায়—একি দারুণ অত্যাচার দেশের রাজা যিনি তাঁর এই কাজ। কাঁদতে কাঁদতে সবাই অধীর হয়ে পড়লেন। পরশুরাম কিন্তু একবারে গুম হয়ে গেছেন—কথা নেই বার্ত্তা নেই—স্থির পাথরের মত নিথর নিশ্চল। ভায়েদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাপস তাপসীরা তাঁদের ঠাণ্ডা করলেন। তাঁরা শোকাবেগ সংবরণ করে বেদবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করলেন।

পরশুরামের চোখে জল নেই, গম্ভীর মলিন। একটী একটী ক'রে রেণুকার অঙ্গে কতগুলি অস্ত্রাঘাত চিহ্ন ছিল তাই গণনা করতে লাগলেন। ভায়েরা পিতার মৃতদেহ চিতায় শয়ন করিয়ে দিলেন, মাতার সহমরণ সম্পাদনের জন্য তাঁকেও ধীরে ধীরে চিতায় তুলে জমদগ্নির পাশে শুইয়ে দেওয়া হলো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো—যথাবিধি দাহকার্য্য সম্পন্ন হলো। সকলে মিলে নিয়মমত এক গর্ত্ত করে সতিল জলদান করলেন। পরশুরাম তখনও সেই কুঠার হাতে স্থির হয়ে বসে রইলেন। তাপসরা জিজ্ঞাসা করলেন, "রাম তুমিতো কৈ জলদান করলে না ?

এইবার রাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি তর্পণ করবো না। ক্ষত্রিয় মহারাজ আমার নিরপরাধ পিতাকে হত্যা করেছেন—আমার জননীর শরীরে একবিংশটি অস্ত্রাঘাত চিহ্ন আমি একে একে গণনা করেছি—আমাকে জল দিয়ে তর্পণ করতে বলছেন, রক্ত দিয়ে তর্পণ করলে তবেই আমার বাপ মা তৃপ্ত হবেন।

আমার প্রতিজ্ঞা জননীর শরীরে যতগুলি অস্ত্রাঘাত চিহ্ন ততবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে তাদের রক্তে তর্পণ করবো। যদি না পারি পিতৃমাতৃহত্যার পাপে আমার যেন অনন্ত নরকবাস হয়।"

সকলে চমকে উঠলেন। পরশুরামের ভীষণ মূর্ত্তি দেখে কেউ তাঁকে কিছু বলতে সাহস করলেন না।

কুঠার হাতে পরশুরাম বেরিয়ে পড়লেন সেই পুলিন্দ আর মোদক সেনা নিয়ে পিতৃমাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে। সহস্রার্জ্জুন সংবাদ পেয়ে বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধার্থে পরশুরামের সম্মুখীন হলেন। দারুণ সংগ্রাম অস্ত্রের ঝনৎকার আহতের আর্ত্তনাদ আর কোন শব্দ নেই। একটির পর একটি করে হৈহেয় সৈন্য নিহত হতে লাগলো—অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তারা পালাতে লাগল। রাজা ব্রহ্মহত্যা করেছেন—তাঁহার সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্রচালনা ভুলে গেলেন। পরশুরাম নৃশংসভাবে রাজাকে হত্যা করবার পূর্ব্বে চীৎকার করে উঠলেম, "এইবার তোর শেষ। যে হাতে তুই আমার পিতাকে মেরেছিস সেই হাতগুলো একে একে কাটবো, ব্রহ্মহত্যার ফল দেখ।

সহস্রার্জ্জুন ব্রহ্মতেজাহত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরশুরাম একে একে তার সহস্রবাহু ছিন্ন করলেন, তারপর কুঠার দিয়া তাঁর মাথা কেটে সযত্নে তাঁর রক্ত কুম্ভে পূর্ণ করে সৈন্যদের আদেশ দিলেন সকল ক্ষত্রিয়কে হত্যা করতে। পরশুরামের দয়া মায়া নেই। ছেলে বুড়ো এমন কি গর্ভস্থ শিশুটিও বাদ দিলেন না। হত্যার অবাধ লীলা চলতে লাগল। ক্ষত্রিয় দেখলেই তাকে কেটে কলসে করে তার রক্ত ধরা হয়। ভারে ভারে ক্ষত্রিয় রক্ত জমদগ্নি আশ্রমে জমা হতে লাগল। এইরূপে যখন একটিও ক্ষত্রিয় জীবিত রইল না তখন পরশুরাম আশ্রমে ফিরে গেলেন।

এইবার তর্পণ। রাশি রাশি তিল সংগ্রহ করে সেই রক্তে স্নান করে পরশুরাম পিতামাতার তর্পণ করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পরশুরাম এত ক্ষত্রিয় হত্যা করেছেন প্রায়শ্চিত্ত দরকার। জামদগ্নি রাম এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। যজ্ঞের দান ও দক্ষিণা স্বরূপ তাঁর অধিকৃত নিখিল ধরা ব্রাহ্মণদের হাতে সমর্পণ করলেন। ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে পরশুরামকে বললেন, "আপনার দান গ্রহণ করে ধন্য হলাম। আমরাই ধরণীর একমাত্র রাজা, যে ভূমি আপনি দান করেছেন তাতে আপনার আর কোন অধিকার নেই। সুতরাং আপনি অন্যত্র যান।" পরশুরাম তাঁদের কথায় আনন্দিত মনে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে মহাসমুদ্রকে ডেকে বললেন, "হে সমুদ্র আমি নিঃক্ষত্রিয় করে পৃথিবী জয় করেছি। অশ্বমেধ যজ্ঞের দানস্বরূপ এই পৃথিবী ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ করেছি, তুমি একটু সরে গিয়ে আমায় একটু স্থান দান কর নতুবা আমাকে দস্যুপহারী হতে হয়। যদি আমার কথামত কাজ না কর তাহলে আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে তোমার জলময় কলেবর স্থলরূপে পরিণত করব।"

পরশুরামের তখনও উগ্রমূর্ত্তি—ভীষণদর্শন—হাতে ধনুর্ব্বাণ আর কুঠার সমুদ্র ভয় পেয়ে খানিক সরে গিয়ে পরশুরামকে স্থান দান করলেন। রাম খুসী হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। তপস্যাই তাঁর একমাত্র কর্ম্ম। কিন্তু রাম শান্ত হয়ে মনস্থির করে তপ করতে পারেন না। যখনই তপে বসেন, পিতার হত্যা আর মাতার দেহে একবিংশতিটি অস্ত্রাঘাত চিহ্ন মনে উদিত হয়। কিছুতেই মনস্থির হয় না।

এদিকে ব্রাহ্মণগণ রাজ্যশাসন করেন। ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল আর একটিও পুরুষ জীবিত নেই। ক্ষত্রিয় রমণীরা পরশুরামের ভয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়েছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয় নি। নারী চিরকালই পূজ্য ও অবধ্য। এইবার একে একে তাঁদের পুত্র জন্মাতে লাগল। বহুকাল পরে এই সব ছেলেরা বড় হয়ে শক্তিমান হল। ব্রাহ্মণেরা পরাজিত বিতাড়িত হয়ে রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করে যেখানে পরশুরাম তপস্যা করছিলেন সেইখানে উপস্থিত হলেন। পরশুরামের পায়ে পড়ে সকলে কেঁদে জানালেন —"হে রাম আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ধরণী আমাদের দান করেছিলেন। ক্ষত্রিয়তনয়গণ বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেছে —আমরা রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত। রাম পিতৃহত্যা জননীর শরীরের অস্ত্রচিহ্ন ভুলতে পারেননি। প্রতিনিয়ত তার অন্তর্দাহ এই কথায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আবার যুদ্ধ আবার তর্পণ আবার হত্যা আবার অশ্বমেধ আবার ধরণী দান। এইভাবে একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হল। জননীর শরীরের একুশটি অস্ত্রচিহ্নের প্রতিশোধের আগুন নিবল। একবিংশতিবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করে পরশু রামের দারুণ ক্রোধ শান্ত হল।

শেষবার তর্পণ করবার ও ক্ষত্রিয় রুধিরে স্নান শেষ করবার সময় অশরীরী জমদগ্নি আকাশ থেকে বললেন, "রাম তুমি এমন গর্হিত কাজ আর কর না—আমরা তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে প্রীত হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।" রাম বললেন, "এই শোণিতময় পিতৃগর্ভ যেন পবিত্র সলিল পরিপূর্ণ হয়, আর আপনাদের কৃপায় আমায় এই ক্ষত্রিয়-বধের পাতক যেন দূর হয়। আর মনে যেন শান্তি পাই।" অশরীরী জমদগ্নি বললেন, "তথাস্তু।"

এইবার পরশুরাম মহাদেবকে স্মরণ করে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত পরশুখানি ভেঙ্গে তালপাকিয়ে একপাশে ফেলে দিলেন। পরশুর কাজ—তাঁর জীবনের কাজ শেষ হল।

ঐ হ্রদ রামহ্রদ আর ঐ পরশুপিণ্ড লৌহযষ্টিতীর্থ বলে জগতে তাঁর নাম চির অক্ষয় করে রাখল।

বিজ্ঞান-জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দশ

ডিব্রগ্‌লি এবং শ্রোডিনজার তবু পুরানো গতিবিজ্ঞানকে অনেকটা আমল দিয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে প্লাঙ্ক প্রবর্ত্তিত কণাবাদের সঙ্গে যথাসম্ভব ওর সামঞ্জস্য বিধান। তাই রাদারফোর্ডের পরমাণুর মডেলকে তাঁরা নিছক কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেননি, পরন্তু ঐ চিত্রকে স্বীকার করে নিয়েই ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের বোর-বর্ণিত কক্ষপথের বিশেষত্বগুলির ব্যাখ্যাদানে তাঁদের গবেষণা নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু হাইসেনবার্গ পুরানো গতিবিজ্ঞানকে ক্ষুদ্রের স্বরূপ বর্ণনায় সম্পূর্ণ অক্ষম বলে প্রচার করলেন এবং অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন ও ফটোন জাতীয় পদার্থ-সমূহের ব্যবহার নির্দ্দেশের জন্য 'New Quantum theory' নামে অনিশ্চয়তাবাদমূলক এক নূতন গতিবিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নূতন মতবাদ আত্মপ্রকাশ করলো হাইসেনবার্গ-প্রচারিত সাঙ্কেতিক গতিবিজ্ঞানের (Matrix Mechanics-এর) এবং গড়-কষা ব্যাপারের নিছক গাণিতিক মূর্ত্তি নিয়ে। ফলে, অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনাবাদ এসে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতার ভেতর একটা ওলটপালটের সৃষ্টি করলো এবং প্রাকৃতঘটনা সম্পর্কে কারণবাদের ওপর বৈজ্ঞানিকগণের আস্থা বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হলো। এখানে হাইসেনবার্গের মতবাদ ও গবেষণা প্রণালীর আভাষ মাত্র দিতে আমরা চেষ্টা করবো।

হাইসেনবার্গ বললেন নূতন ও পুরানো জড়বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা নিরর্থক। বোর-বর্ণিত পরমাণুর চিত্রকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে হলে, এদিকে যেমন ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের গতিতে কারণবাদের ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে হয়, ওদিকে আবার ওর লম্ফন ঝম্পন ব্যাপারগুলিতে অনিশ্চয়তার খাপছাড়া ভাব আরোপ না করলেও চলে না। কিন্তু উভয় চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অগত্যা পরমাণুদের ব্যাপারে পুরানো চিন্তাপ্রণালী একেবারে ত্যাগ করতে হয়। বস্তুতঃ জড়ের গতিবিধিতে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার প্রভাব সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকে একথা জোর ক'রে বলার অধিকার আমাদের আর নেই—অন্ততঃ অণু পরমাণুদের ক্ষুদ্র সংসার সম্বন্ধে ও কথা খাটে না। সত্য কথা এই যে, ইলেকট্রন কিম্বা প্রোটনের স্বরূপ জানার আমাদের কোন উপায়ই নেই। পরমাণুর ভেতরকার ঘূর্ণন বিঘূর্ণন এবং লাফালাফির ভিত্তিহীন কল্পনাকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে, এবং শুধু প্রত্যক্ষগোচর বিষয়-সমূহকে কল্পনার আশ্রয় রূপে মেনে নিয়ে নূতন গতিবিজ্ঞান রচনা করতে হবে।

এখন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় যা' কিছুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, সে হচ্ছে আলো পদার্থ, আর তার পরিমাপযোগ্য ধর্ম্ম হচ্ছে ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণ (বা কম্পনের প্রসার ও কম্পন-সংখ্যা)। সুতরাং ইলেকট্রন কিম্বা ফটোন কণা-ধর্ম্মী না তরঙ্গধর্ম্মী এ সকল প্রশ্ন না তুলে ঐ সকল পরিমাপযোগ্য ধর্মসমূহের প্রতীকরূপী কতগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্নই হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন এবং ঐ সকল চিহ্নের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণই হবে ক্ষুদ্রের ব্যবহার নির্দ্দেশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রণালী।

তুলনার উদ্দেশ্যে বোর-কল্পিত পরমাণুর চিত্র আবার স্মরণ করা যাক। আলোর বিকিরণ এবং শোষণ ব্যাপারের ব্যাখ্যা দানের জন্য বোর পরমাণুর ভেতর একটি (বা একাধিক) ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের এবং তার ঘোরবার জন্য বহু সংখ্যক এক-কেন্দ্রিক ও টেকসই কক্ষের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন, যাদের ১, ২, ৩ করে পরপর গণতে পারা যায় কিন্তু গণে শেষ করা যায় না। আমরা এও জানি যে বোরের মতে আলোর বিকিরণ ঘটে যখন ঘূর্ণমান ইলেকট্রনটা বাইরের কোন কক্ষ থেকে ভেতরের কোন কক্ষে এবং শোষণ ঘটে যখন ভেতরে কোন কক্ষ থেকে বাইরের কোন কক্ষে লম্ফদান করে। আর নির্গত (বা শোষিত) আলো-কণার কম্পনসংখ্যা ও ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে কত নম্বর কক্ষ থেকে কত নম্বর কক্ষে লম্ফনটা ঘটলো শুধু তারি ওপর। কিন্তু এর থেকে কেবল এইটুকুই মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, পরমাণু মাত্রেরই কতগুলি বিশেষ অবস্থা রয়েছে যাদের বোর-বর্ণিত টেকসই কক্ষগুলির মত ১, ২, ৩, প্রভৃতি পূর্ণসংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে; এবং পরমাণুটা যখন এর কোন একটা অবস্থা থেকে অপর কোন একটা অবস্থায় উপনীত হয় তখন, এবং কেবল তখনি, একটা বিশিষ্ট রঙের ও বিশিষ্ট ঔজ্জ্বল্যের আলোর বিকিরণ ঘটে। এই অবস্থা-গুলিকে পরমাণুর স্থিতিশীল অবস্থা (stationary state) বলা যেতে পারে। ১নং স্থিতিশীল অবস্থা থেকে ২নং ৩নং প্রভৃতি অবস্থায় যেতে পরমাণুটা যে যে রঙের (বা যে যে কম্পন-সংখ্যার) আলো বিকিরণ বা শোষণ করে তাদের ন১২, ন১৩ প্রভৃতি অঙ্ক-সমন্বিত অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেইরূপ ২নং অবস্থা ছেড়ে অন্যান্য অবস্থায় যেতে পরমাণু থেকে যে যে কম্পন-সংখ্যা নির্গত হয় তাদের চিহ্ন হবে ন২১, ন২৩ ইত্যাদি। ন১১, ন২২ প্রভৃতি চিহ্নের অর্থ হবে ক্রমাগত ১নং বা ২নং অবস্থায় থেকে যাওয়া বা শূন্য কম্পন-সংখ্যার আলো বিকিরণ করা।

এখন কম্পন মূর্ত্তির সঙ্গে অবশ্য খানিকটা এপাশে-ওপাশে সরনের কল্পনা এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বেগের ধারণাও জড়িয়ে রয়েছে। যাই কাঁপুক, আমাদের কল্পনা করতে হয়, তা' একবার

এদিকে একবার ওদিকে সরে সরে যাচ্ছে এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটছে। ফলে কম্পন ব্যাপারে অবস্থান এবং বেগের (বা বস্তু বেগের) কল্পনা আপনি এসে পড়ে। সুতরাং এদের জন্যও সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োজন। অবস্থান জ্ঞাপক চিহ্নরূপে গ্রহণ করা যাক্ 'ব' এবং বেগের (বা বস্তু বেগের) প্রতীকরূপে নেওয়া যাক্ 'গ' অক্ষরকে। ফলে পরমাণুটা ১নং অবস্থা থেকে ১, ২, ৩ প্রভৃতি অবস্থায় যেতে নির্গত কম্পনগুলি সম্পর্কে অবস্থানের যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে তাদের চিহ্ন হবে ব$_{১১}$, ব$_{১২}$, ব$_{১৩}$ প্রভৃতি; এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন উল্টো দিকে ঘটতে থাকলে ঐ সকল অঙ্কের চিহ্ন হবে যথাক্রমে ব$_{১১}$, ব$_{২১}$, ব$_{৩১}$ প্রভৃতি। আবার পরমাণুটার ২নং কিম্বা ৩নং অবস্থাকে মূল অবস্থা রূপে গ্রহণ করলে অবস্থানের পরিবর্ত্তন সূচক ঠিক ঐ ধরনের দু' শ্রেণীর চিহ্ন পাওয়া যাবে। এখন এই শ্রেণীগুলিকে জোড়ায় জোড়ায় নিয়ে একটা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের বাহুদ্বয় বরাবর নিম্নোক্তরূপে সাজিয়ে লেখা যেতে পারে :

—>

ব$_{১১}$, ব$_{১২}$, ব$_{১৩}$
V ব$_{২১}$, ব$_{২২}$, ব$_{২৩}$
ব$_{৩১}$, ব$_{৩২}$, ব$_{৩৩}$

এখানে শর চিহ্ন দু'টার ইঙ্গিত এই যে, উক্ত দ্বিপাদ শ্রেণীর উভয় দিকই বহুদূর বিস্তৃত। দাবা খেলার ছকের মত এইরূপ চতুষ্কোণ অঙ্কের শ্রেণীকে বলা যায় ম্যাট্রিকস্ (Matrix) ; আমরা বলবো "মাতৃক"। অবস্থান নির্দ্দেশক ওপরের ছকটাকে বলা যায় অবস্থান-মাতৃক ; সেইরূপ ঐ ছকের অন্তর্গত 'ব' অক্ষরের বদলে 'গ' লিখলে যে ছকটা পাওয়া যায় তাকে বলা যায় বেগ-মাতৃক। অনুরূপভাবে কম্পন-শক্তি নির্দ্দেশক শক্তি-মাতৃক এবং অন্যান্য মাতৃক রচনা করা যেতে পারে।

এই মাতৃক চিহ্নগুলি অর্থহীন নয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর ভেতর যে সকল ব্যাপার ঘটে, অর্থাৎ যে বর্ণের ও যে তীব্রতায় আলো ওর থেকে নির্গত হয় তার ইতিহাস নিহিত রয়েছে এই চিহ্নগুলির ভেতর। এক একটা চিহ্ন যেন এক একখানা রেলের টিকেট, যার ছাপগুলি দেখে বুঝতে পারা যায় কোন ষ্টেশন থেকে কোন্ ষ্টেশনে যেতে হবে, কত তাদের দূরত্ব, কত ভাড়া ইত্যাদি। আর মাতৃকের কর্ণরেখা (diagonal) বরাবর যে চিহ্নগুলি (ব$_{১১}$, ব$_{২২}$, ব$_{৩৩}$, প্রভৃতি) রয়েছে তাদের কল্পনা করতে হবে প্লাটফরম-টিকেটরূপে। এরা যেন যাত্রীর টিকেট নয়, অযাত্রীর টিকেট। এই সকল স্থিতিশীল যাত্রার ফলে যে আলোর বিকিরণ ঘটে তাদের কম্পন সংখ্যা আমরা বলেছি শূন্য পরিমিত। এমন মাতৃকও থাকতে পারে যার শুধু কর্ণরেখার অন্তর্গত চিহ্নগুলিই বিদ্যমান এবং আর সকল চিহ্নই অন্তর্হিত হয়েছে। এইরূপ মাতৃককে বলা যায় কর্ণ-মাতৃক (Diagonal-Matrix) ; যদি কর্ণ-মাতৃকের প্রত্যেক চিহ্নের মূল্য ১ পরিমিত হয় তবে তাকে বলা যায় এক-মাতৃক।

হাইসেনবার্গ দু'টা বিভিন্ন মাতৃকের—যেমন অবস্থান ও বেগ মাতৃকের—যোগ বিয়োগ ও পূরণের নিয়ম লিপিবদ্ধ করলেন। পূরণের নিয়ম থেকে একটা বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো এই যে, অবস্থান-মাতৃককে বেগ-মাতৃক দিয়ে পূরণ করলে যা হয় বেগ-মাতৃককে অবস্থান-মাতৃক দিয়ে পূরণ করলে তার থেকে একটু ভিন্ন ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ (ব × গ) এবং (গ × ব) এই পূরণ ফল দু'টা পরস্পরের ঠিক সমান নয়, পরন্তু উভয়ের বিয়োগ ফলটা একটি ক্ষুদ্র অথচ সসীম রাশি হয়ে থাকে, যথা :—

ব × গ — গ × ব = প L-১ ....(১০)

এই সমীকরণে 'প' কে গ্রহণ করতে হবে একটি অতি ক্ষুদ্র ও সসীম রাশির—প্লাঙ্কের ধ্রুবকের—প্রতীকরূপে। বোরের মূল নিয়মের (৮নং সমীকরণের) আলোচনা প্রসঙ্গে প্লাঙ্কের ধ্রুবকের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। L-১ অঙ্কটা নির্দ্দেশ করে, আমরা জানি, একটা কাল্পনিক সংখ্যা, এবং বহুক্ষেত্রেই এই অঙ্কটা একটা তরঙ্গ জাতীয় বা কম্পন জাতীয় ব্যাপারের আভাস দান করে। 'ব' ও 'গ' এর গুণ ফল সম্পর্কে উক্ত বৈষম্যের নিয়মটাকে (১০নং সমীকরণকে) 'Com utation law' বলা হয়। আমরা একে "বৈগুণ্যের নিয়ম" বলবো।

এই গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণের সমর্থনে প্রধান যুক্তি এই যে, বর্ণালির চিত্রগুলি সম্বন্ধে বোর যে ব্যাখ্যা দান করেছিলেন তার চেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ঐ সকল চিত্র সম্পর্কে, এই সমীকরণের সাহায্যে, দেওয়া যেতে পারে এবং তার জন্য বোরের মতবাদের মত কোন উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখেছি, ডিব্রগ্লি ও শ্রোডিঙ্গারের গবেষণার লক্ষ্যও ছিল ঠিক তাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই গবেষণাত্রয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে অগ্রসর হলেও মোটের ওপর সিদ্ধান্তটা দাঁড়ালো সকল ক্ষেত্রেই সম্ভাবনাবাদের অনুকূলে! সুতরাং ঐ সকল গবেষণা প্রণালীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে মতই পোষণ করা যাক ওদের সাধারণ সিদ্ধান্তকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তফাৎ এই যে, হাইসেনবার্গের গবেষণার সিদ্ধান্ত দেখা দিল অধিকতর সাধারণ ও ব্যাপক মূর্ত্তি নিয়ে ; কারণ বৈজ্ঞানিকগণ দেখতে পেলেন যে, ১০নং সমীকরণটা কেবল বর্ণালির চিত্রের ব্যাখ্যা দান সম্পর্কেই নয়, যাবতীয় জাগতিক ঘটনা সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য।

উক্ত সমীকরণের অন্তর্গত 'প' অক্ষরটা আমরা বলেছি, প্লাঙ্কের ধ্রুবকের প্রতীক। পরীক্ষার ফল এই যে, 'প' এর মূল্য অতি সামান্য। আমরা এও জানি যে, এই রাশিটা কম্পন-শক্তি ও কম্পন-সংখ্যার অনুপাত নির্দ্দেশ করে, সুতরাং কম্পন-শক্তি ও কম্পন-কালের পূরণ ফল নির্দ্দেশ করে। শক্তি ও কালের পূরণ ফলকে ইংরাজীতে Action আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা একে ক্রিয়া বলবো। সুতরাং উক্ত সমীকরণের বাঁ দিককার পূরণ ফল দু'টাকেও কোন না কোন ক্রিয়ার প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে।

এখন দু'টা পরিমাপযোগ্য রাশি সম্বন্ধে বলতে পারা যায় যে, ওদের প্রত্যেককেই যদি নিভুর্লরূপে পরিমাপ করা সম্ভব হয় তবে

প্রথমটাকে দ্বিতীয়টা দিয়ে পূরণ করলে যা হবে দ্বিতীয়কে প্রথমটা দিয়ে পূরণ করলেও সেই ফলই পাওয়া যাবে। কিন্তু ১০নং সমীকরণ জানিয়ে দিচ্ছে যে, (ব×গ) এবং (গ×ব) এই রাশিদ্বয় প্রায় সমান হলেও পূর্ণমাত্রায় সমান নয়। বুঝতে হবে, কোন ক্ষুদ্র পদার্থের অবস্থান (বা 'ব') যদি নির্ভুল রূপে পরিমাপ করা সম্ভবও হয় তবে তার বেগটা (গ) কোন ক্রমেই নির্ভুলরূপে পরিমিত হতে পারে না; অথবা বেগ নিরূপণ নির্ভুল হলে ওর অবস্থানের নিরূপণ সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে না।

১০নং সমীকরণ থেকে আরো দেখা যায় যে (ব×গ) এবং (গ×ব) যে ক্রিয়া নির্দ্দেশ করে তাদের প্রত্যেকের মাত্রা যদি খুব বড় হয় বা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়ার সমষ্টি হয় তবে এই পূরণ-ফলদ্বয়কে আমরা অনায়াসেই পরস্পরের সমান ব'লে গ্রহণ করতে পারি। কারণ, তখন ওদের প্রত্যেকের তুলনায় উভয়ের বিয়োগ-ফলটা (অর্থাৎ ঐ সমীকরণের ডান দিক্‌কার ক্ষুদ্র রাশিটা) নিতান্ত নগণ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ ক্রিয়াদ্বয়ের প্রত্যেকেই যদি প্লাঙ্কের ধ্রুবকের (বা 'প'-এর) মত খুব ক্ষুদ্র হয় তবে আর ওদেরকে পরস্পরের সমান ব'লে গ্রহণ করা যায় না। কারণ একটা ক্ষুদ্র সংখ্যা অপর একটার দশগুণ বা বিশগুণ হলেও ওদের বিয়োগ ফলটা ক্ষুদ্রই থেকে যায়। বুঝতে হবে, অণু পরমাণু বা ইলেকট্রন প্রোটনদের বেলায় 'ব' এবং 'গ' (অবস্থান এবং গতিবেগ) এই উভয় রাশির যুগপৎ পরিমাপ ব্যাপারে উভয়কেই নির্ভুলরূপে পরিমাপযোগ্য রাশি ব'লে গ্রহণ করা যায় না; এবং কেবল বড়দের বেলাতেই প্রত্যেকেই ওরা একটা মোটামুটি নির্ভুলতার দাবি জানাতে পারে। মোটের ওপর দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রের চালচলনে সমষ্টির নিয়ম আদৌ প্রয়োগ করা যায় না।

হাইসেনবার্গ এও প্রতিপন্ন করলেন যে, অবস্থানের পরিমাপে অনিশ্চয়তা কমাতে গেলে বেগের পরিমাপে অনিশ্চয়তার মাত্রা (কিম্বা বেগের পরিমাপে অনিশ্চয়তা কমাতে গেলে অবস্থানের পরিমাপে অনিশ্চয়তার মাত্রা) ঠিক সেই অনুপাতে বেড়ে যায়, অর্থাৎ উভয় অনিশ্চয়তার পূরণ ফল একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি হ'য়ে থাকে, এবং এই নির্দ্দিষ্ট রাশিটা প্লাঙ্কের ধ্রুবকের ('প'-এর) সমান। সুতরাং অবস্থান এবং বেগের পরিমাপে ভুলের মাত্রাকে যথাক্রমে ব-ভু এবং গ-ভু দ্বারা নির্দ্দেশ করলে এই নিয়মটাকে সূত্রাকারে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যায়:

ব-ভু × গ-ভু = প···(১১)

ফলে হাইসেনবার্গের গবেষণা থেকে এই কথাটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, ইলেকট্রনের সত্যকার মূর্ত্তি যদি কণামূর্ত্তিও হয় তবু ওর চালচলনগুলি—পরমাণুর ভেতর ওর ঘূর্ণন বিঘূর্ণনই হোক বা বাইরের ছুটাছুটি ব্যাপারই হোক—আমাদের কাছে চিরদিন অজ্ঞেয় ব্যাপার রূপেই উপস্থিত হবে। কারণ ১১নং সমীকরণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইলেকট্রনটা তার গতি পথের ঠিক কোনখানটায় এখন উপস্থিত হয়েছে এবং ঠিক কতটা বেগে এখন ছুটে চলেছে এই উভয় প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষমতা থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। একটার পরিমাপে ভুল এড়াতে গেলে অপরটার পরিমাপে আপনা থেকে সেই অনুপাতে ভুল এসে দাঁড়াবে; কারণ, অন্যথায় উভয় ভুলের পূরণ ফলটা একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি (বা 'প'-এর সমান) হ'তে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তকে (১১নং সমীকরণকে) "Principle of Indeterminacy" বা অনিশ্চয়তাবাদ আখ্যা দেওয়া হ'য়ে থাকে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং প্লাঙ্কের কণাবাদের মতই হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ বিজ্ঞান জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং এই ত্রিবিধ মতবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে অকল্পিত-পূর্ব্ব তাত্ত্বিকরূপ গ্রহণে অগ্রসর হয়েছে পুরানো জড়বিজ্ঞানের যান্ত্রিকরূপ তার প্রভাবে শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হ'য়ে ক্রমেই দূরে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে!

প্রকৃতির বিধানই এই যে, যথেচ্ছ শক্তিশালী যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রেও ইলেকট্রনের বা জড়কণা বিশেষের সঠিক অবস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর সঠিক গতিবেগের পরিমাপ আমাদের দ্বারা আদৌ সম্ভব হয় না। ১১নং সমীকরণ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অবস্থানের নিরূপণ সম্পূর্ণ নির্ভুল করতে গেলে বেগ নিরূপণে আপনি একটা প্রকাণ্ড ভুল বা অনিশ্চয়তা এসে পড়বে; আবার ঠিক ঠিক মত বেগ নিরূপণ করতে গেলে অবস্থানের নিরূপণ বেজায় বেঠিক হ'য়ে পড়বে—যেমন আম আর পেয়ারা, কোনমতে দু'টোকেই হাতে রাখা চলে, কিন্তু একটাকে খুব আঁকড়ে ধরতে গেলে অপরটা আপনি ফসকে যায়।

ব্যবহারিক সত্যের দিক থেকে এই সমীকরণের বিশিষ্ট অর্থ এই যে, আমাদের প্রত্যেক কারবারের হিসাব নিকাশ নিয়ে এবং যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দেশ নিয়ে কিছু না কিছু ভুল আমাদের করতেই হবে। এই ভুলের ক্ষুদ্রতম মাত্রা হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবকের সমান, যা' খুব ক্ষুদ্র হ'লেও, একটা অবিভাজ্য ক্রিয়ার মাত্রা নির্দ্দেশ করে, সুতরাং ব্যবহারিক জগতে যার চেয়ে ছোট ভুল, বর্ত্তমান কালের পাই পয়সার মত, বা পূর্ব্ব কথিত হরি ঘোষের কাল্পনিক কারবারের কড়া ক্রান্তির মত, একান্ত অচল।

আমরা দেখলাম, জাগতিক পরিবর্ত্তনের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতি ব্যাপারে আমাদের একটু না একটু ভুল নিয়ে কারবার করতেই হবে; যেন ব্যবহারিক জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা অনিশ্চয়তা ও ক্রমভঙ্গের ভাব বিদ্যমান। সুতরাং বলতে হয় কারণবাদের ধারাবাহিকতা ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা (uniformity of nature) শুধু স্থূল পদার্থসমূহ সম্পর্কেই কতকটা খাটতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্রের ওপর বা ব্যষ্টির ওপর ওর কোন প্রভাবই নেই।

উক্ত গাণিতিক সিদ্ধান্তের সত্যতা উপলব্ধির জন্য একটা কাল্পনিক পরীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র পদার্থ আমরা চোখে দেখবো ব'লে কখনো আশা করতে পারিনে। তবু ধ'রে নেওয়া যাক একটা নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আমরা একটি ইলেকট্রনের—মনে করা যাক্ পরমাণু বিশেষের অন্তর্গত একটি ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের—অবস্থান ও গতিবেগ সোজা-সুজি পরিমাপ করতে যাচ্ছি। এজন্য কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই নয়, অমিত শক্তিশালী

একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের এবং অতি সূক্ষ্মভাবে সময় ও দূরত্ব নির্দ্দেশ করতে পারে এইরূপ একটি ঘড়ি ও মাপকাঠিরও প্রয়োজন হবে। এ ভিন্ন ইলেকট্রনটাকে দেখবার জন্য একটা আলোক-রশ্মিরও দরকার হবে। আমরা কল্পনা কর্চ্ছি যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ইলেকট্রনটা ওর গতিপথের একটা বিশিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েছে এবং একটা বিশিষ্ট বেগে ছুটে চলেছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, ইলেকট্রনটাকে চক্ষুগোচর করার জন্য এই মুহূর্ত্তে যে আলোকরশ্মি ব্যবহার কর্চ্ছি তার সাহায্যে ওর অবস্থানের (বা 'ব' রাশিটার) নিরূপণ ঠিকমত সম্পন্ন হতে পারলেও ঐ আলোর ফটোন-কণাগুলির আঘাতের ফলে ইলেকট্রনটার সত্যকার বেগ (বা 'গ' রাশিটা) বদ্‌লে যাচ্ছে ; সুতরাং আমার পরিমাপলব্ধ বেগটাকে আমি আর 'গ'-এর সমান বা ওর সত্যকার বেগ বলে নির্দ্দেশ দিতে পারিনে। ওকে বলতে হবে একটা ভুল বেগ বা 'গু' যা' নির্দ্দেশ করছে ওর ফটোন-কণার-আঘাত-সাপেক্ষ বেগ, সুতরাং যা 'গ' থেকে ভিন্ন এবং কতটা ভিন্ন তা' আমার জানার উপায় নেই। ফলে আমাদের অবস্থাটা হলো এই যে, পরিমাপ ক্রিয়া দ্বারাই, যা' মাপতে যাচ্ছি তা'র পরিমাণটাকে আমরা বদলে দিতে বাধ্য হচ্ছি। ওঝাকে ভূতে পেলে যেমন ভূত ছাড়ানো যায়না প্রত্যেক পরিমাপ ব্যাপারেই আমাদের অবস্থাও হলো কতকটা তারি মত।

ফটোনের আঘাতে ইলেকট্রনের বেগ যে বদলে যায় তা কম্পটন-ফলের প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এখন এখানে আমাদের দেখবার বিষয় এই যে, এই আঘাতের মাত্রা কমাতে হলে, আমাদের যে আলো ব্যবহার করতে হবে তার ফটোনগুলির শক্তির মাত্রা (কিম্বা কম্পন-সংখ্যা) হওয়া উচিত অতি সামান্য। কিন্তু তা'তে অসুবিধা এই যে, তা'র ফলে বেগ নিরূপণে ভুলের মাত্রা যথেষ্ট কমে গেলেও, ইলেকট্রনটার অবস্থান নিরূপণে ভুলের মাত্রা ঐ অনুপাতে বেড়ে যায়, কারণ—হাইসেন-বার্গ প্রতিপন্ন করলেন যে, নির্ভুলরূপে অবস্থান নির্ণয় করতে হলে যে আলো ব্যবহারের প্রয়োজন তার ফটোন-কণার শক্তির মাত্রা (বা কম্পন-সংখ্যা) খুব বেশী না হলে চলেনা। একটা ভুল কমাবার জন্য চাই কম কম্পন সংখ্যার এবং অপর ভুলটা কমাবার জন্য চাই বেশী কম্পন-সংখ্যার আলোর সাহায্য গ্রহণ। ফলে, ভুল দু'টার যুগপৎ অন্তর্দ্ধান আদৌ সম্ভব হয় না।

এই অবশ্যম্ভাবী ভুলের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির চাল-চলনকে ব্যবহারিক সত্যের দিক থেকে আর সম মর্য্যাদার সত্য বলে গ্রহণ করা যায়না। ইলেকট্রন অতি ক্ষুদ্র বস্তু, তাই একটি মাত্র ফটোনের আঘাতও ওর নিজস্ব বেগটাকে অতিমাত্র বদলে দেয় কিন্তু বহু কোটি ফটোনের আঘাতও ধাবমান ট্রেনের গতিবেগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম হয়না। ফলে ট্রেনের অবস্থান ও গতিবেগ পরিমাপ ক'রে পরিমাপ কার্য্য নির্ভুল হলো ব'লে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারলেও ওর অন্তর্গত ইলেকট্রন কিম্বা পরমাণু বিশেষের চালচলনের কথা তুললেই পরিমাপ ক্রিয়াকে, কেবল দুঃসাধ্য ব'লে নয়, অর্থহীন বলেই ত্যাগ করতে হয়। বলতে পারা যায়, আপেক্ষিকতাবাদের মতে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ (বা ইথর-সম্পর্কীয় বেগ) যেমন অর্থহীন এবং ইথরের চালচলন পরিমাপের অযোগ্য ব'লেই অর্থহীন, সেইরূপ হাইসেন-বার্গের মতে, ক্ষুদ্র পদার্থের অবস্থান এবং গতিবেগের যুগপত্তার ধারণাও অর্থহীন এবং ঐ রাশিদ্বয় যুগপৎ সঠিকভাবে পরিমাপের অযোগ্য বলেই অর্থহীন! ফলে অণুপরমাণুর সমষ্টিরূপে কল্পিত এই জড় বিশ্বের কেবল অর্দ্ধেকটাই—হয় ওদের অবস্থান অথবা ওদের গতিবেগ ঠিকমত জানার আমাদের অধিকার রয়েছে, কোন মুহূর্ত্তেই ওদের চালচলনের সমগ্র রূপটা আমরা আয়ত্ত করতে পারিনে। এইরূপে অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনাবাদ এসে কারণবাদের চিরন্তন অধিকারের ভেতর ব্যাপকভাবে আসন পেতে বসলো। [ক্রমশঃ

ভাববার কথা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানুষের কল্যাণ হয়েছে নিশ্চয়ই। যক্ষ্মার দৌরাত্ম্যকে মানুষ অনেকটা বশে এনেছে। ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ থেকে যে সব মৃত্যু হয় তাদের প্রাদুর্ভাব কমে আসছে। বাইরের দূষিত বীজাণু শরীরের মধ্যে ঢুকে যে সকল ব্যাধির জন্ম দেয় তাদের শাসনে আনা অনেকটা সম্ভব হয়েছে। সে গুলিকে আমরা infectious অথবা microbian disease বলি তারা শক্তি দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে যেগুলিকে degenerative disease বলা হ'য়ে থাকে তাদের আক্রমণ বেড়েই চলেছে। হৃদ্‌রোগ, ডায়াবিটিস্, স্নায়ুঘটিত ব্যাধিতে আগে যতলোক ভুগতো এখন তার চেয়ে অনেক বেশী লোক ভোগে। আধুনিক হাইজিনের চেষ্টায় মানুষের পরমায়ু বেড়েছে এবং অস্তিত্ব আগের চেয়ে নিরাপদ হয়েছে কিন্তু রোগের অভিযানকে ঠেকানো সম্ভব হয়নি। কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েও গিয়েছে। যে-সকল রোগ ক্ষয়ের দিকে শরীরকে এগিয়ে দেয় তারা বেড়ে যাচ্ছে নানা কারণে। স্নায়ুগুলি ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছে, মনে দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা, আহার্য্যে পুষ্টিকর সামগ্রীর অভাব। দুধে জল, ভেজিটেবল্ ঘি, কলের চাল—তাও কেন বাদ যায়, সব কিছুতে ভেজাল, শরীর যে ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে, রোগের পর রোগ দেহে বাসা বাঁধছে, এতে কিছুমাত্র বিস্মিত হবার নেই। মানসিক ব্যাধির প্রকোপ তো হু হু ক'রে বেড়ে চলেছে। ক্যারেল্ (Alexis Carrel) বলছেন, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে প্রত্যেক বাইশ-জনের মধ্যে একজনকে কখনো না কখনো পাগলা গারদে রাখতে হয়। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে হাসপাতালগুলি যত ক্ষয়রোগীর পরিচর্য্যা করে তার আটগুণ পাগলের পরিচর্য্যা করতে হয় তাদের। আধুনিক সভ্যতার একটা প্রকাণ্ড কলঙ্ক হচ্ছে, এই সভ্যতার

চাপে প'ড়ে মানুষের মনের রোগ দ্রুততালে বেড়ে চলেছে। ক্যারেল বলছেন---The new habits of existence have certainly not improved our mental health. সহরের জনাকীর্ণ উদরে বিরাট হৈ চৈ সর্ব্বক্ষণের জন্য লেগে আছে। কতরকমের লোক, কতরকমের ঘটনা। কোন তাল পাওয়া যায় না। সিনেমায় কি সব ছাই ভস্ম। রাস্তায় গণ্ডগোল। ইস্কুলে মনকে এক জায়গায় বসানোর উপায় নেই। এই রকমের সহরে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেদের বুদ্ধি বিকশিত হবার কোন সুযোগ পায় না, এই হচ্ছে ক্যারেলের মত। মানুষের মনের চরম বিকাশের জন্য প্রয়োজন কতকগুলি অবস্থার একীকরণের। খুব খাওয়ালে এবং ব্যায়াম করালে বুদ্ধি অনেক সময়ে ভোঁতা হ'য়ে যায়। ক্যারেলের মতে Athletes are not, in general, very intelligent. আমরা মনে করি ছেলেকে দিয়ে এক গাদা বই মুখস্থ করালেই তার বুদ্ধি বেড়ে যাবে। কি পাগলামি! ক্যারেলের লেখা প'ড়ে আমার বারে বারে এই কথাই মনে হচ্ছে—যন্ত্র-সভ্যতার তিনি পক্ষপাতী নন। তিনি বলছেন: Feeble-mindedness and insanity are perhaps the price of industrial civilisation, and of the resulting changes in our ways of life. যন্ত্রসভ্যতা আমাদের জীবনে যে-সব পরিবর্ত্তন এনেছে—খুব সম্ভব তাদেরই ফলে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের মন তাদের সুস্থতা হারিয়ে ফেলছে। ক্যারেল বলছেন, Despite the marvels of scientific civilisation, human personality tends to dissolve, বিজ্ঞান তার অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার দিয়ে আমাদের মনে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে বটে কিন্তু তবুও অস্বীকার করবার উপায় নেই—বৈজ্ঞানিক সভ্যতার জটিলতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আলডুস্ হাক্সলীর মতেও মানুষের চরিত্র অধোগতির দিকেই চলেছে। সত্য এবং অহিংসার আদর্শ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। জগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে চেতনাকে যেখানে ছড়িয়ে দেবার শক্তি লোপ পাচ্ছে সেখানে মানুষের অধোগতি নিশ্চয়ই হয়েছে। মানুষ রাষ্ট্রকে দিচ্ছে তার প্রাণের সমস্ত অর্ঘ্য—ডিক্টেটরের ছায়া হ'য়ে অন্যদেশের মানুষগুলিকে মারতে চলেছে। দেশ ভালোই করুক অথবা মন্দই করুক তার দাবী মানতেই হবে, এই হচ্ছে আজকালকার ধর্ম্ম। বিশ্বকে ছাপিয়ে জাতি হ'য়ে উঠ্‌ছে বড়ো আর সেই জাতির জন্য সত্য এবং অহিংসাকে বাতায়ন-পথে সুদূরে নিক্ষেপ করতে মানুষের মনে আজ কোন লজ্জা নেই। হাক্সলির ও ক্যারেলের চিন্তাধারায় মিল আছে।

* * *

ঐক্যই পরম সত্য। ব্যষ্টি যেখানে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা বাঁচতে গিয়েছে সেখানে তার বাঁচা পূর্ণ হয়ে উঠে নি। আমরা কেউ কেউ মনে করি ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ উন্মেষের জন্য আয়োজন বাহিরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে ফিরে আসা। যেমন করে পেঁয়াজের খোসার পর খোসা ছাড়িয়ে ফেলে তেমনি করে আমাদের সত্ত্বার উপরে যে সব আবরণ চেপে আছে তাদের অস্বীকার করলেই, বুঝি নিজের আসলরূপকে ফিরে পাওয়া যায়। দেশ, সহর, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, খেলা-ধূলা এরা যেন ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা। আসলে এমনি করে সবাইকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আমরা কোনখানে গিয়ে পৌঁছাবো না। যদি কোথাও পৌঁছাই সে হচ্ছে অহঙ্কারের উচ্চ অচলে। সকলকে অস্বীকার করে, সকলের থেকে আপনাকে একান্তে ছিনিয়ে এনে তবেই নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা কেবল ক্ষতিকর নয়, হাস্যকরও বটে; যদি কোন পরমাণু বলতো নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে একা একা থাকবো, অন্য পরমাণুদের সঙ্গে মিলবো না, বিশ্বের অঙ্গীভূত হওয়া মানে মৃত্যু, তবে সেটা পাগলামির মতোই লাগতো। যদি কোন সুর নিজের স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করতো বেঠোফেনের মহাসঙ্গীতের সুররাজ্যে প্রবেশ করতে—তার সেই উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য কি আত্মঘাতী বলে পরিগণিত হোতো না? শরীরের কোন রক্তকণা যদি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বলতো, দেহের মধ্যে বাঁধা থাকবো না, শরীরের মধ্যে নিজেকে বাঁধা পড়তে দিলে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবো তার তরে কান ধরে' শুধু এই কথাই বলা যেতে পারতো—শরীরই তোমার আসল সত্ত্বা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। শরীর থেকে তোমার মুক্তির অর্থ তোমার মৃত্যু। বিশ্বের এমনই বিধান যে একা একা উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এক নিমেষের জন্যও কেউ বাঁচবে না।

সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানে নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্ত করে দেওয়া নয়। নিজের ব্যক্তিত্ব যেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে' গেল সেখানে ঐক্যের কোন মানেই হয় না। ঐক্য সেখানে একটা বস্তুহীন ছায়া মাত্র। কনসার্টের মধ্যে এস্রাজের সঙ্গে যখন ক্লারিওনেট বাজে—বাঁশির সুর বাঁশির সুরই থাকে। একটা বৃহত্তর সমগ্রের মধ্যে সেই সুর আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে আরও সার্থক করে তোলে। আমাকে যদি বন্ধু-বান্ধবদের সেবা করতে হয়, পরিবারের অথবা দেশের সেবায় লাগতে হয় আমার অতিপ্রিয় ছোট্ট আমির গণ্ডী থেকে আমাকে বাহিরে আসতে হবেই, আমার স্বাতন্ত্র্যে খানিকটা আঘাত লাগবেই। এর মানে যদি ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি হয় তবে আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে আগাতে হোলে এই আত্মলোপ অপরিহার্য্য।

* * *

মানুষের মধ্যে রয়েছে দুটো এমন জিনিষ যারা পরস্পরবিরোধী। মানুষ একই সঙ্গে সসীম এবং অসীম। একদিকে সে ক্ষুধাতৃষ্ণার দাস, অসংখ্য বীজাণুর লড়াই-ক্ষেত্র এবং মরণশীল। তাকে বস্তুর পর্য্যায়ে ফেললে কোন অন্যায় হয় না। কিন্তু আর একদিকে সে বস্তু একেবারেই নয়। অনন্ত তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে মনরূপে, আত্মরূপে। রক্তমাংসের পিণ্ডের মধ্যে এই আত্মা জ্বলছে দীপশিখার মত। 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী বলছে "আসল মানুষটা যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।" আমরা জন্তু এবং আলোর শিখা দুই। যেখানে আমরা জন্তু সেখানে আমরা সান্ত, যেখানে আমরা আলোর শিখা সেখানে আমরা অনন্ত

যেখানে আমরা নিজেদের জানি আলোর শিখা বলে, অনন্ত বলে সেখানে কোন ভয়ই আমাদিগকে বিচলিত করতে পারে না। ভয় সেখানেই যেখানে আমরা মনে করি রক্তমাংসের পিণ্ড ছাড়া আমরা আর কিছু নেই। দেহকে নিজের আসল সত্ত্বা বলে মনে করা—এই মনে করার মধ্যেই রয়েছে ভয়ের মূল। আমরা যেখানে অনন্ত সেখানে আমরা সব কিছু জানতে চাই, সকলের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হতে চাই। যেখানে এই বৃহত্তর জীবনের জন্য আমাদের মনে কোন দুঃখ বোধ নেই সেখানে বুঝতে হবে আমরা পশু হয়ে আছি। 'রক্তকরবী'তে আছে "এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই।" "দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের।" রবীন্দ্রনাথ এই দুঃখের ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দিয়েছেন। রক্তকরবীর নায়িকা নন্দিনী "দুখ-জাগানিয়া।" সে মানুষের মধ্যে অনন্তকে জাগিয়ে দিচ্ছে। রক্ত-করবীতে বিশু বলছে "একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে কাজ করো। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে ছুটি, ছুটি।" এখানে মানুষের মধ্যে সান্তের এবং অনন্তের দ্বন্দ্বের কথাই বলা হয়েছে। এই দ্বন্দ্বকে আমরা সবাই অল্পবিস্তর নিজেদের মধ্যে অনুভব করি। পৃথিবীর নামজাদা সাহিত্যে, আর্টে ফুটে উঠেছে এই দ্বন্দ্বের ছবি। আসলে মানুষ শেষ হয়ে যায় নি—সে আপনাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে। সে সান্তও নয়, অনন্তও নয়। সান্ত থেকে অনন্তের পানে তার নিরবচ্ছিন্ন গতি। সে নিজের পূর্ণতাকে কেবলই সন্ধান করে চলেছে। এই পূর্ণতা তাকে ছাড়িয়ে আছে। তার মধ্যে এই পূর্ণতাই হচ্ছে ভগবান।

বিচিত্র (গল্প)

শ্রীবীণা সেন, এম-এ

শতাব্দীর ঘুমন্ত রাজপ্রাসাদকে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে গেল। মহানন্দার তরঙ্গচুম্বিত অথচ মূর্চ্ছাগত মালদহর ছোট্ট সহরটীর বক্ষ অকস্মাৎ আন্দোলিত হয়ে উঠলো। আর্ট এগ্‌জিবিসন্। এ যেন পাতালপুরীতে সূর্য্যালোক-প্রবেশের মতো আশ্চর্য্য। সহরের আবালবৃদ্ধবণিতা আনন্দে ও বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে, কারণে অকারণে ছুটোছুটি করতে লাগলো। রবাহুত, অনাহুত স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম্ম-প্রবাহ উঠলো উদ্বেল হয়ে।

চঞ্চল হলো না শুধু—প্রণব। পুঁথির ঘন সন্নিবেশের ভেতর নিমগ্ন হয়ে গিয়ে, তখন সে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সৃষ্টির তত্ত্ব এবং তথ্য সংগ্রহে মন দিয়েছে।

বসন্ত বাতাসের মতো অপর্ণা ঘরে এসে ঢুকলো। প্রণবের হাত থেকে 'রক্তকরবী' ছিনিয়ে নিয়ে সে ক্ষিপ্র কণ্ঠে ব'লে চললো বারে প্রণবদা! সবাই কখন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, আর তুমি এখনো সেই বই-এর আড়ালেই পড়ে রয়েছ? এই প্রতি-বেশিনী চঞ্চলা মেয়েটীর সাহচর্য্যে আজকাল প্রায়ই প্রণব অনুভব করে, কার অদৃশ্য আকর্ষণ; প্রাণের তন্ত্রী যেন মুখরিত হ'তে চায় রাগিণী ও ঝঙ্কারে। কিন্তু শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আবদার ও কৌতুকের উপদ্রব সহ্য ক'রে ক'রে এই নৃত্যশীলা মেয়েটির কাছে মনের এ নতুন বিপর্য্যয় জানানোর মতো ভাষা সে কিছুতেই খুঁজে পায় না; তাই এবারও অপর্ণার প্রশ্নের উত্তরে তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মৃদু হেসে প্রণব শুধু বললো, 'কেন? সবাই যার জন্যে বেরিয়েছে তারজন্যে আমারও যে বেরুতে হবে, এমন কোন কারণইতো আমি খুঁজে পাচ্ছি না!'

'তুমি কিছুই জান না নাকি?' অপর্ণা সামনে এগিয়ে এলো।

সোজা উঠে বসে প্রণব একটু অধীরকণ্ঠে বললো, 'হেঁয়ালি রেখে কথাটা স্পষ্ট করেই বলো না ছাই।'

অপর্ণা পিছিয়ে গিয়ে বক্রকণ্ঠে বলে উঠলো, 'ঘরে বসে বসে বাইরের খবর কিছু জানবে না আবার জানাতে এলেও রাগ! এদিকেতো সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আমাদের প্রণব যেন শিব-ভোলানাথ। সবাইকে বলে দেবো'—

'দিও। কিন্তু ভূমিকাটা শেষ করছ কখন?' অকস্মাৎ অনর্গল হেসে উঠে অপর্ণা বললো, 'আমার ভূমিকা সেইখানেই শেষ যেখানে তোমার জবাব সুরু—'

'কিসের জবাব?' প্রণব বিস্মিত দৃষ্টিতে অপর্ণার দিকে তাকালো।

'প্রশ্ন শোনার মতো ধৈর্য্য আছে নাকি তোমার?"

'ধৈর্য্য থাকলেও সময় তো নেই।' প্রণব চোখ ফিরিয়ে টেবিল থেকে বইটা নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অপর্ণা লঘুপদে সামনে এসে বইটাকে আড়াল ক'রে হাসিমুখে ব'লে উঠলো, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলছি। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য পড়েছ নিশ্চয়ই, কিন্তু, এবার মালদার প্রথম আশ্চর্য্যের কথা শুনেছ?'

'আমি তো আর গণকঠাকুর নই যে না বলতেই শুনে ফেলবো, আর ভণিতা শুনেই বুঝে নেবো!'

মনে মনে রীতিমতো রাগ ক'রে প্রণব গম্ভীরমুখে বইটাকে চোখের সামনে তুলে ধরলো। অপর্ণা প্রমাদ গণলো। বরাবর প্রণবের এই নীরব ভঙ্গীমাকেই সে সবচেয়ে ভয় করে। অতএব যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তার চেয়ারটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে ব'লে উঠলো, 'আর্ট এগ্‌জিবিসন্ গো আর্ট এগ্‌জিবিসন্।'

'তাতে হোল কী!' চোখ তুলে প্রণব বলে।

প্রণবের হাত থেকে অপর্ণা বইটাকে কেড়ে নিয়ে টেবিলের একপ্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'হোল কী মানে? আমাদের এখানে এক হপ্তা অর্থাৎ সাত দিন ধ'রে এত বড় একটা বৃহৎ কাণ্ড ঘটছে—'

'একেবারে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বোধ হয়!' প্রণব হতাশ দৃষ্টিতে একবার রক্তকরবীর দিকে তাকিয়ে কলমটাই হাতে তুলে নিলো।

তার অবিচলিত কণ্ঠের বাণী শুনে অপর্ণার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। সে অসহিষ্ণু গলায় বল্লো, 'সপ্ত ছেড়ে সপ্তদশ হোক না কেন? এর জন্যে তুমি তো আর কোন কাজে নেমে যাচ্ছ না! ঘরের ভেতর কুনো হয়ে বসে অমন কথার কাকলী আমাদেরও বেরুতে পারে।'

অপর্ণা ছিটকে দূরে স'রে গেলো।

তার অনর্গল অনুযোগে রাগ হওয়াতো দূরে থাক, প্রণব মনে মনে কৌতুক অনুভব করে মৃদু হেসেই বল্লো, 'আমি কিন্তু এক-জনের কথা জানি, যার নাকি সত্যিই কোন কাজ নেই, অথচ ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র সে বাক্যের চাতুরী আর কথার কাকলী ছড়িয়ে বেড়ায়।'

শাণিত চোখ নিয়ে অপর্ণা এক মুহূর্ত্ত প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর জানালার পাশে স'রে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বল্লো, ওমন তৃতীয় পুরুষে কথা বলা কেন? সোজা ক'রেই বল্লে হয়। পরক্ষণেই পেছন ফিরে প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললো, আর আমাকেই বা এসব বলার মানে কী? সত্যটা অপ্রিয় হ'লে বুঝি সবারই গায়ে লাগে?'

'যেমন তোমার লেগেছে'—লিখতে স্বরু ক'রে শান্তস্বরে প্রণব বলে। তখনও তার ঠোঁটের কোণে কৌতুকের মৃদু হাসি।

'লেগেছেই তো—কোন একটা কথা বলতে এলেই এমনি ধারা করবে তুমি—যাও তোমার সঙ্গে আর কথাই বলবো না'—অপর্ণা দ্রুতপদে বাইরে বেড়িয়ে পড়লো। অভিমানে তখন তার চোখে জল এসে পড়েছে। দরজার বাইরে গিয়ে তার চলা গেছে বন্ধ হয়ে। যতই রাগ হোক না কেন—আসল দরকারী কথাটাই তো প্রণবকে জানানো হয়নি। তা জানাবার আগে সে যাবে কী ক'রে? অথচ প্রণব না ডাক্‌লে সেই বা এখন ঢোকে কী ব'লে? প্রণব তো লিখেই চলেছে—যেন অপর্ণার অস্তিত্বই ভুলে গেছে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে নিরুপায় হয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো। কয়েকটি মুহূর্ত্ত কেটে যায় নিঃশব্দে। হঠাৎ প্রণব কলম রেখে বললো, 'ঝর্ণা'—কোন উত্তর নেই। সে এবার সচকিত হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, ঘরে অপর্ণার চিহ্নমাত্র নেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লো—পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে সবুজ পাড়ের আঁচলটা হাওয়ায় দুলছে। প্রণব সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লো—'ঝর্ণা ভেতরে এস।'

'না—কিছুতেই আসব না—তোমার সঙ্গে আমি কোন কথাই বলতে চাই না।'—অপর্ণার দেহ সচল হয়ে উঠলো।

মনে মনে হেসে প্রণব দ্রুতপদে বারান্দায় বেরিয়ে এসে অপর্ণার হাত ধ'রে টেনে একেবারে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল। অপর্ণা হাত ছাড়িয়ে নেবার বৃথা চেষ্টা করে কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'কেন নিয়ে এলে? ছেড়ে দাও'—অপ্রতিভ হয়ে প্রণব তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, 'কই কথা তো বন্ধ করলে না।'

'বন্ধ করতে দিলে তো করবো!' জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে অপর্ণা বলে। তার অভিমানে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রণব হো হো করে হেসে উঠল। অপর্ণা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকিয়ে বল্লো, 'হোলো কী?'

প্রণব হাসি থামিয়ে অপলক দৃষ্টিতে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার কথা বন্ধ করিয়ে আমার কি কিছু লাভ আছে? বরং ক্ষতি, তাই বলছিলাম বন্ধ আর নাই করলে ঝর্ণা!'

পলকে রাঙা হয়ে প্রণবের কথা কেড়ে নিয়ে অপর্ণা বলে, 'আমার নাম অপর্ণা, ঝর্ণা নয়।'

'তোমার নামটা দিয়েছি স্বভাবের গুণে।'

'অর্থাৎ'? রাগ ভুলে উৎসুক গলায় অপর্ণা বলে।

'তপস্যারতা গৌরী তো নও! বরং মহানন্দার ছোট সংস্করণ।'

অপর্ণা মিনিট দুই প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো। অবিশ্রান্ত হাস্যরতা মেয়েটীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অকস্মাৎ প্রণব নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললো, 'তুমি হেসে নাও, ততক্ষণে আমার লেখাটা শেষ করি।' সে বসে পড়ে কলম হাতে নিতেই অপর্ণা রীতিমতো ভয় পেয়ে হাসি বন্ধ করে বললো, 'ভাবছি স্বভাবের গুণই যদি ধর তাহলে তো মানুষের নামকরণ করতে হয় ঠিক মরণের আগে।' প্রণব অপর্ণার বুদ্ধির তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। অথচ তার কথা বলার ভঙ্গীমায় নিজেও হেসে বললো, 'ঠিক বলেছ দার্শনিক! জীবনের আরম্ভে তো নয়ই, জীবনের শেষেই যে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বভাবের হিসেব মেলে। কিন্তু মানুষের নামতো তৈরী হয় শুধু চিহ্নিত করবারই জন্যে, স্বভাবের গুণে নয়।'

'তা'হলে বলতে চাও আমি মানুষই নই?' অপর্ণা বলে। এর উত্তরে প্রণবের মুখের ডগায় অনেক কথাই ভিড় করে এল। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাকে দমন করতে গিয়েও সে গভীর কণ্ঠেই বলে উঠলো, 'ভেতরকার মানুষটাকে ঘিরে তোমার স্বভাবই আমার চোখে বড় হয়ে উঠেছে, তাই তুমি অপর্ণা নও, তুমি ঝর্ণা।'

প্রণবের ভাবউদ্বেলিত মুখের দিকে দৃষ্টি মেলে অপর্ণার বক্ষ যেন কী একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দে দুলে উঠলো। বিস্মিত হয়ে উঠলো চোখের দৃষ্টি! সরলা মেয়েটীর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে প্রণব মুহূর্ত্তের ভেতর নিজেকে সম্বরণ করে সহজ গলায় বললো, 'কিন্তু অনবরত বাজে কথা বলে কই কাজের কথাতো কিছুই বলছ না? আর্ট এগজিবিসনের মতো আশ্চর্য্য ঘটনা এ দেশে আর হয় নি, এটাই তোমার প্রথম ও শেষ কথা—না আর কিছু আছে?' তার সহজ স্বর শুনে অপর্ণা যেন আবার সেই সহজ মানুষটীকেই হাতের কাছে পেলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বললো—'নিশ্চয়ই। আরম্ভে তো তুমিই মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব খুলে বসেছ!'

'আচ্ছা আচ্ছা অপরাধ স্বীকার করছি—আমার পর্ব্ব শেষ হয়েছে, এবার তোমার কাণ্ড আরম্ভ করতো!' প্রণবের অনুতপ্ত গলার কথা কেড়ে নিয়ে অপর্ণা তর্জ্জনী তুলে বলে, 'আবার' তারপর সহসা গম্ভীর হয়ে বলে, 'না না, সত্যিই আর তামাসা নয়। এইটুকু বলেই সে থেমে গেল।

'ওকি থামলে কেন?' প্রণব বলে।

উত্তরে অপর্ণা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে আদুরে গলায় বললো, 'প্রণবদা, তোমার ওই ছবিটা আমায় দেবে ?'

বলা বাহুল্য লেখার সঙ্গে রেখাটাও প্রণবের হাতে রূপায়িত হয়ে উঠেছিলো। অঙ্কন শিল্পের নিয়ম না জানায় কলাবিদের চোখে তার ছবিগুলি হয়তো ছিল না নিখুঁত; তবুও তার মনের মাধুরী রঙ ও তুলি নিয়ে যাদের রূপদান করতো, তারা বাস্তবিকই হয়ে উঠতো প্রাণের আবেগে স্পন্দমান। সে ছবির ওপরই অপর্ণার লোভ।

প্রণব অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বললো, 'কোনটা ?'

'ঐ যে দুটো পাখী একই ডালে বসে ঝগড়া করছে। দাও না !'

বন্ধু মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত তার ঐ অপটু হস্তের আঁকা ছবিটার দিকে এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে প্রণব শুধু স্নিগ্ধ হেসে বললো, 'আর্ট এগজিবিসন ছেড়ে হঠাৎ তোমার ওই নগণ্য তুচ্ছ ছবিটার দিকে নজর পড়লো কেন ?'

'আর্ট এগজিবিসন্ আর ছবি—এ দুইয়ের মাঝে যদি তুমি কোন সঙ্গতিই খুঁজে না পাও, তবে বৃথাই তোমার কাব্য রচনা।'

'সর্ব্বনাশ ! ও ছবি তুমি আর্ট এগজিবিসনে দিতে চাও নাকি ?'

'না হলে শুধু শুধু তোমার ছবি আমার নেওয়ার দরকারটাই বা কী ?'

অপর্ণার কথায় প্রণব অকারণেই বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই মুখে হাসি টেনে সে বললো, তুমি চাইলে তবুতো বাঁচতাম। কিন্তু ঐ অপটু হাতের আঁকা, বিশেষতঃ ঝগড়া করা পাখী দুটোর ছবি এগজিবিসনের রথী, মহারথীদের শিল্পকলার পাশে বসিয়ে আমাকে মার খাওয়াতে চাও নাকি ?'

'মার খেতে যাবে কেন, বরং মান পাবে। কারণ এর গুণই হচ্ছে যে ও জীবন্ত। দেখো এ ছবিতে তুমি নাম কিনবে।'

'নাম কেনার দিকে মোটেই আমার লোভ নেই। মিছেমিছি আমায় এ হাঙ্গামায় না টেনে তোমার যদি কিছু পুঁজি থাকে, তাকেই প্রচার করে দাও না !'

'নিজের পুঁজি না বের করেই বুঝি তোমার কাছে এসেছি ! অনেকগুলি সেলাই আমার নামে এগজিবিসনে যাচ্ছে। তোমাকেই বা রেহাই দেবো কেন ? তাই ছবি নিতে এলাম।'

দেয়াল থেকে ছবিটা খুলে দিতে দিতে প্রণব বললো, 'তোমার সীবনশিল্পের নৈপুণ্য তুমি যতই দেখাও না কেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে দেখালেই আমি খুসী হতাম।'

ছবিটাকে হাতে তুলে নিয়ে তীর্য্যক ভঙ্গিতে প্রণবের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা বললো, 'তোমার ওই একটুখানি খুসির জন্যে আমাদের এ আয়োজনটারই অঙ্গহানি হোক আর কী !'

'অঙ্গহানি তো দূরে থাক। ওই মূল্যহীন ছবিটা তোমাদের এগজিবিসনের এতটুকু অঙ্গসৌষ্ঠবও বাড়াতে পারবে না।'

'না পারে তো নাই পারলো, আমার খুসী আমি নিয়ে যাব।' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে অপর্ণা।

প্রণব নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারে না। তাই সে অপর্ণার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললো, 'নিয়ে তো যাচ্ছ, কিন্তু এর দাম কী দেবে ?'

প্রণব ঠিক কী ইঙ্গিত করছে তা বুঝতে না পেরে ক্ষণকাল অপর্ণা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বলে উঠলো, 'তোমাকে আবার দাম দেবো কী ?'

'কিছুই কী দেওয়ার নেই ? বলে প্রণব ব্যগ্র দৃষ্টিতে অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার ভেতরটা পর্য্যন্ত দেখতে চেষ্টা করলো। ওই চঞ্চলা মেয়েটার অন্তরে বাহিরে কী কেবল স্বচ্ছতারই প্রবাহ ? কোথাও কী এতটুকু রঙ ধরেনি ?

অপর্ণা তখন ভাবছে—প্রণবদার আজ হলো কী ? অকস্মাৎ প্রণবের মনের চেহারাটা যেন অপর্ণার চোখের ওপর উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তার বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত অকারণে রাঙিয়ে দিয়ে গেল। নিদারুণ লজ্জায় যেন সে মরে যেতে লাগলো। তথাপি মুহূর্ত্তের মাঝে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো, তাকে উড়িয়ে দেওয়ার মতো সহজ আচরণ ও কথা খুঁজে নেবার চেষ্টা করেও অপর্ণার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তোমাকে অদেয় অথবা দেওয়ার মতো আমার কিছু আছে কি না জানি না—কিন্তু সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে, তবে হিসেব তো পরে করলেও চলবে প্রণবদা !'—এইটুকু বলেই অপর্ণা মনে মনে চমকে উঠলো। এ-সে কী বলছে ?—সে থেমে পড়ে প্রণবের মুখের দিকে মুহূর্ত্তকাল তাকিয়ে সহসা রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কী ?—মিছে সময় নষ্ট করো না—পথ ছাড়ো'—

প্রণব ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলে নীরবে সরে দাঁড়ালো। অপর্ণা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

প্রণবের সমস্ত অন্তর পূর্ণ করে তখন ধ্বনিত হচ্ছে অপর্ণার সেই দু'টী কথা, 'তোমাকে অদেয় অথবা দেওয়ার মতো সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে, তার হিসেব তো পরে করলেও চলবে প্রণবদা'—তার মনে হলো—এ-দুটী কথার কাছে অপর্ণার শেষের রুক্ষ কথাগুলি নিছক কৃত্রিমতায় ভরা। সোনার কাঠির পরশে ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে উঠলো কী ?—

গতকাল এগজিবিসন্ শেষ হয়ে গেছে। আশ্চর্য্য ! এই সাতদিন অপর্ণার দেখা নেই। কী এমন উৎসবের মাদকতা যে প্রণবকে তার একবারো মনে পড়ে না !—অপর্ণার প্রতি মনে মনে রাগ করে বন্ধু-বান্ধবের শত অনুরোধ সত্বেও অসুস্থতার দোহাই দিয়ে, এ-সাতদিন সে ঘর ছেড়ে বেরই হলো না। উৎসব শেষের পরের দিন অতিষ্ঠ হয়ে সে বিকেলবেলা নদীর দিকে বেরিয়ে পড়লো। পথে অনিলের সঙ্গে দেখা। প্রণবকে পেয়ে অনিল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো, 'মহানগরীর চাল বজায় রেখে ঘরে বসে থেকে এগজিবিসনের কোন খবরই তো রাখলি না। তোদের পাড়ার ঐ অপর্ণা তো ছবি আঁকার জন্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে একটা মেডেলই লাভ করলো।'—

যেন বিনামেঘে বজ্রপাত ! প্রণবের বুকের ভেতর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো। সে শুষ্ককণ্ঠে বললো, 'তার মানে ?'—

'মানে কিছুই কঠিন নয়!—ঐ ছবিটা একজিবিসনে প্রথম স্থান লাভ করেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ওটা ঠিক তোর আঁকা সেই দুটো পাখীর ছবি। ওই মেয়ের গুরুগিরি তুই-ই করেছিলি না কি?'—

প্রণবের মনে হলো ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলার বাতাসও পৃথিবীতে এক নিমেষে ফুরিয়ে গেছে। কম্পিত অধরে হাসি টেনে সে বল্‌লো, 'নিশ্চয়ই! আমার ছবি দেখে আমারই কাছ থেকে অপর্ণা এটা আঁকতে শিখেছিলো।'

অনিল ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লো, 'তোরই আঁকা ছবি নকল করে মেয়েটা প্রাইজ পেয়ে গেল, অথচ বলে বলেও তোকে দিয়ে কিছু করানো গেল না!'

অনিলের কথায় কান না দিয়ে প্রণব হঠাৎ অনুতপ্ত ভঙ্গিতে বলে উঠলো, 'কী অন্যায়! এ-খবরটাতো সবচেয়ে প্রথম আমারই জানা উচিত ছিল।' তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বল্‌লো, 'অনিল, মাপ করিস্ ভাই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—চল্লুম অপর্ণাকে অভিনন্দন জানাতে। ওর সফলতায় যে আমারই সাধনা সার্থক।'

অনিলের বিস্মিত চোখকে আমল না দিয়ে প্রণব দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেল। বাড়ীর দোরগোড়ায় সেই ছবি হাতে অপর্ণার ছোট্ট ভাইটীর সঙ্গেই হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল। প্রণবের হাতে ছবিটা দিয়ে সে বল্‌লো, 'দিদি এটা পাঠিয়ে দিলে।'—

ছবিটা দেখেই প্রণবের বুকের ভেতরটা জ্বালা করে উঠলো। সে ক্ষিপ্রকণ্ঠে বল্‌লো, 'খোকন, তোমার দিদিকে একবার পাঠিয়ে দেবে?'

খোকন উৎসাহ চঞ্চল চোখে বল্‌লো, 'দিদি আস্‌বে কী করে? ওকে যে দেখতে এসেছে।'

পলকে প্রণবের সর্ব্বাঙ্গ বেদনায় অসাড় হয়ে গেল! মনের বেদনা পাছে ঐ ছোট্ট ছেলেটির চোখে পড়ে যায়—এই ভয়ে সে পেছন ফিরে বল্‌লো, 'খোকন একটু দাঁড়াও—আমি এক্ষুণি আস্‌ছি।'

প্রণব দ্রুতপদে ঘরের ভেতর যেতে যেতে শুনলো খোকন বলছে, 'প্রণবদা বেশী দেরী কোরো না—তারা সব এসে পড়েছে।'

ঘরে ঢুকে প্রণব ক্ষিপ্রহস্তে ছবিটায় অতি নিপুণভাবে অথচ কৌশলে আঁকা তার নামের আদি অক্ষরটার জায়গায় অপর্ণার প্রথম অক্ষরটীকে নিভুর্ল বসিয়ে দিলো। পরে কলহরত পাখী দুটোর দিকে তাকিয়ে নির্ম্মম হেসে আপন মনেই বলে উঠলো, 'বিপদ তো নয়—বিচ্ছেদ। বিপদ হওয়ার আগেই তার শেষ ফলটা জীবনে ফলে উঠলো। চমৎকার!'

তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে খোকনের হাতে ছবিটাকে দিয়ে সে বল্‌লো, 'দিদিকে বলো, প্রণবদা অভিনন্দন জানিয়ে তাকে এই ছবিটাই দিয়ে দিলো। বলো, এর জন্যে তাকে আর কিছু দিতে হবে না।' বিস্মিত খোকনকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে প্রণব হন্ হন্ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

অপর্ণাদের বাইরের ঘরে তখন মেয়ে দেখার পর্ব্ব চলেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্রণব শুনলো, বোধ হয় কন্যারই অভিভাবক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বরপক্ষীয়দের কাছে মেয়ের গুণপনার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। প্রণব কল্পনা করলো, গতকল্যকার পদক প্রাপ্তির এমন টাটকা চমৎকার নিদর্শনটীও নিশ্চয়ই বরপক্ষীয়দের কাছে অবাধে উন্মুক্ত হয়েছে। প্রণবের আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পথ চলতে চলতে মনে মনে বক্রহাসি হেসে সে ভাবলো, যাক ছবিটাতো দেয়ালে পড়ে পড়ে পোকারই কাটতো. না হয় অপর্ণার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা মস্ত উপকারেই সেটা লেগে গেল। প্রণবের তো এতে আনন্দিত হওয়ারই কথা! কিন্তু কী ছলনাময়ী এই মেয়েদের জাতটা! বিচিত্র তার মন! বিচিত্র তার মনের গতি!

মুহূর্ত্তের জন্যে প্রণবের দুই কান ভরে গুঞ্জন করে উঠলো অপর্ণার সেই দুটী কথা, 'তোমাকে অদেয় অথবা দেওয়ার মতো সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে, তার হিসেব তো পরে করলেও চলবে প্রণবদা!' পরক্ষণেই তার চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। জ্বলন্ত সিগারেটটা পথের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে নির্ম্মম হেসে প্রণব নতুন করে চিন্তা করলো, তিন দিন বাদেই কলেজ খুলবে। কাল তার কোলকাতা ফিরে যাওয়া চাই-ই চাই।
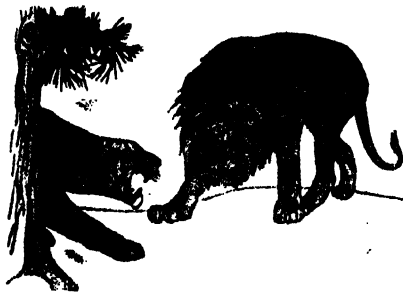
দ্বিতীয় মোঙ্গল যুগে পারস্যের চিত্র-শিল্প

শ্রীগুরুদাস সরকার

(তৈমুরীয় যুগ)

প্রকৃত পারসীক শিল্পের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য যে সকল প্রাচীনতম ক্ষুদ্রক চিত্র এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহার কোনটিই খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ অতিক্রম করিয়া যায় না। এ সকল চিত্রের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত ও প্রণয়মূলক কাব্য হইতেই গৃহীত এবং এগুলিতে চৈনিক ও পূর্ব্বতুর্কীস্থানের মৌলিক শিল্প-প্রণালী বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই ছাপ রাখিয়া গিয়াছে(১)। মোঙ্গল-দিগের ইতিহাসগ্রন্থে অঙ্কিত একখানি চিত্র ইউয়ান যুগের(২) "মাকি মোনো" চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রেশম বস্ত্রের উপর অঙ্কিত অপর একখানি সমকালীন আলেখ্য একবারে যেন চীনা চিত্রেরই প্রতিলিপি। এ চিত্রে একটি নীলপাখী পুষ্পিত ক্যামেলিয়া বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট। এ চিত্রখানি এক্ষণে বোষ্টন নগরের চারুশিল্পশালায় রক্ষিত আছে।

তৈমুর বংশের রাজত্বকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত। বস্তুতঃ ইহার প্রাধান্যের অবসান ঘটে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে। এই একনবতি বর্ষকাল চীনের সহিত পারস্যের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবেই বিদ্যমান ছিল। তৈমুরের বংশধরদিগের নিকট হইতেই পারসীক চিত্রশিল্প প্রকৃত প্রেরণা লাভ করে। কিন্তু এ শিল্পের গতি ও প্রকৃতির সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রারম্ভ হইতে এ যুগের ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের পরিচয় প্রয়োজন।

মোঙ্গলদিগের দ্বিতীয় পারস্য অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল খৃঃ অঃ ১৩৮১ হইতে ১৩৯২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। আমরা ঐতিহাসিক পীঠভূমির অল্পকিছু বর্ণনা করিয়া এই তৈমুরীয় যুগের চিত্রশৈলীরই আলোচনা করিব। এবারও পারস্যে খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল এবং নরহত্যার অন্ত ছিল না।

তৈমুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন চেঙ্গিজের অনুগামী জনৈক যোদ্ধ পুরুষের বংশে। উত্তরাধিকার-সূত্রে, ১৩৬১ খৃঃ অব্দে, বের্লাস্ (Berlas) তুর্কদিগের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সমগ্র তুর্কীস্থান, পারস্য ও সিরিয়া প্রদেশ জয় করেন এবং ১৩৯৩ খৃঃ অব্দের মধ্যেই উত্তর-পারস্য, আর্ম্মেনিয়া; বোগদাদ, মেসোপটে-মিয়া, ভান (Van) ও দিয়র বেকর আপনার আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। তৈমুরের বিশাল চমূ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া জেলেরীয় সুলতান আহম্মদ (খৃঃ অঃ ১৩৮২-১৪১০) নিজ রাজধানী বোগ্দাদ হইতে পলায়ন করিয়া মিশরের মেমেলুক সুলতান, বার্কুকের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তৈমুর সমরকন্দে ফিরিয়া গেলে বার্কুকের সাহায্যে বোগ্দাদের সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু নিরাপত্তার সহিত নিরবচ্ছিন্ন রাজ্যভোগ তাঁহার অদৃষ্টে আর লিখিত ছিল না। কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে দূতগণ সর্ব্বত্রই অবধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বার্কুক কোনও কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া তৈমুর প্রেরিত দূতবৃন্দকে হত্যা করিয়াছিলেন। তৈমুরের প্রতিহিংসাবৃত্তি যেন সমগ্রভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল সুলতান আহম্মদেরই উপর। তিনি পুনঃ পুনঃ জেলেরীয় রাজ্য আক্রমণ করিয়া শত্রুতা সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ফলে কেবল মাঝে মাঝে সিংহাসন অধিকার করিয়া সাময়িকভাবে রাজ্য শাসন ব্যতীত সুলতান আহম্মদ কার্য্যতঃ আর অপর কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

তৈমুরের মৃত্যুর পর বৎসর, অর্থাৎ ১৪০৬ খৃঃ অব্দে, আহম্মদ শেষবার নিরাপদে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বল্পকাল পরেই কৃষ্ণমেষ কৌমের (clan-এর) তুর্কমান নেতা কারা ইউসুফের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ১৪১০ খৃঃ অব্দে তিনি তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই তুর্কমান গোষ্ঠীর পতাকার লাঞ্ছন ছিল একটি কৃষ্ণ মেষ। ইঁহারা প্রথমে জেলেরীয়-দিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আর্ম্মেনিয়া ও অজর বৈজানে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তথায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা আশ্রয়দাতাদিগের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করিলেন এবং এই সংঘাতের শেষ পর্য্যায়ে সুলতান আহম্মদকে হত্যা করিয়া জেলেরীয় বংশের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইলেন। ইল খাঁ রাজান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া জেলেরীয় (Jeleraid) আহম্মদ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু বাগ্দেবীর প্রসাদ হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁহার স্বরচিত কবিতাবলীর(১) একখানি চিত্রিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এফ, আর, মার্টিন (F. R. Martin) "তৈমুরের যুগ হইতে ক্ষুদ্রক চিত্র" (Miniatures from the time of Timur) নামক একখানি গ্রন্থে এই পুঁথি-সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্রক চিত্রগুলির মধ্যে চতুর্দ্দশখানির প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চারিখানি বর্ণসমন্বিত। পুঁথিখানি তৈমুরের রাজত্বকালে রচিত বা লিখিত হইলেও তাঁহার পরম শত্রুর এই কাব্যগ্রন্থ যে তাঁহার সহায়তায় প্রচারিত হয় নাই তাহা সহজেই অনুমেয়।

তারিখ-ই-জাহানগুশায় চেঙ্গিজের অভিযান সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, দেশবাসীদিগের হাজার ভাগের এক ভাগও রক্ষা পায় নাই। ইতিবৃত্তকার লিখিয়াছেন যে, যদি এখন হইতে শেষ বিচারের দিন (day of judgment) পর্য্যন্ত প্রজাবৃদ্ধির কোনও অন্তরায় উপস্থিত না হয় তাহা হইলে মোঙ্গল বিজয়ের পূর্ব্বে জনসংখ্যা যত ছিল তাহার দশমাংশও পূর্ণ হইবে না। তৈমুরের অভিযানের ইতিহাস ইহা অপেক্ষা কম নৃশংস নয়। তৈমুর যে পারস্য রাজ্যে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুধু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য নয়, তাঁহার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার জন্যও বটে। তাই তৈমুরের ন্যায় উদ্ধত ও জিঘাংসাপরায়ণ যোদ্ধার শাসনাধীনে পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতি যে বিশেষরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল—

(১) Sir Denison Ross, The Persians, p. 117.

(২) ইউয়ান যুগ ১২০৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৩৩৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(১) কোনও কবির স্বরচিত কবিতা সমষ্টি তাঁহারই 'দিবান' বা দিওয়ান নামে অভিহিত করা হয় যেমন হাফিজের দিওয়ান। এরূপ সংগ্রহে কবিতাগুলি প্রায়শঃ প্রথম পংক্তির আদ্যাক্ষর ধরিয়া বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত হইয়া থাকে।

তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তৈমুরের আদেশে বিখ্যাত সুলতানিয়া নগরের ভিত্তি পর্য্যন্ত উৎখাত হইয়াছিল। ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদের কথা। ১৩৮৭ খৃঃ অব্দে তেহেরণ নগর উজাড় করিয়া তৈমুর নরমুণ্ডের এক পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিজিতদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য ইস্পাহানে সপ্ততি সহস্র নরমুণ্ডের যে বিভিন্ন স্তূপসমূহ রচিত হইয়াছিল(১) পর্য্যুদস্ত পারস্যবাসীর স্মৃতি হইতে তাহা সহজে মুছিয়া যায় নাই। হুণ অধিনায়ক অ্যাটিলা পাশ্চাত্য ইতিহাসে Scourge of the Gods বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—তিনি দেবগণের দণ্ড প্রদানের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আর তৈমুর আখ্যাত হইয়াছেন Scourge of the East নামে—যেন প্রাচ্যখণ্ড অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব।

অনেকের মতে চেঙ্গিজের রক্ত-লোলুপতা উন্মেষিত হইয়াছিল অসভ্য বর্ব্বরের সংজাতপ্রবৃত্তি হইতে। পণ্ডিতপ্রবর সৈয়দ আমীর আলি বলিয়াছেন যে, তৈমুরের বেলায় এ যুক্তি প্রযোজ্য নয়। তৈমুরের ক্রূরতা তাঁহার নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেশ বুঝিয়া-সুঝিয়াই অনুষ্ঠিত হইত। আরব সাহ নামক আরবীয় ঐতিহাসিক তৈমুরকে শয়তানের অবতার বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।(২) অথচ এই তৈমুরই যে বিদ্বজ্জনের সংসর্গ-প্রিয় শিল্পীদিগের উৎসাহদাতা, এবং বহু বিভবসমৃদ্ধ মসজেদ, উচ্চশিক্ষার নানা প্রতিষ্ঠান এবং বিশাল পুস্তকাগারসমূহের সংস্থাপয়িতা বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন—ইহাও ধ্রুব সত্য। যুগ-যুগান্তর হইতে ইরাণ ও তুরাণে যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল তাহা তাঁহার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগমাত্রেই দূরীভূত হয়(৩)। তৈমুরের সহধর্ম্মিণী বিবি খানুম উচ্চতম শিক্ষার জন্য যে বিশাল শিক্ষাগার (college) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা সারাসেনীয় (Saracenic) স্থাপত্যের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত। তৈমুর সুলেখক ও ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। যে নিষ্ঠুরতার সহিত তিনি বিভিন্ন দেশ হইতে বহু কর্ম্মক্ষম শ্রমিক ও কারুশিল্পী সম্প্রদায়ের লোক বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব-এসিয়ার বিভিন্ন নগরীর, বিশেষ করিয়া সমরকন্দের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, আধুনিক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে অক্ষশক্তি-নায়ক নাৎসীগণের কোনও কোনও বিজিত দেশবাসীদিগের প্রতি এইরূপ দয়ামমত্বহীন আচরণে তাহার অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। অত্যধিক লোকবল ছিল বলিয়াই কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহার আদেশে অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইত। সপ্তদিবসের মধ্যে তিনি একটি মসজেদ ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

স্বর্গত আমীর আলি সাহেব তৈমুরের রাজত্বকালে প্রথিতযশাঃ কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের মধ্যে, জামি (খৃঃ অঃ ১৪১৪—১৪৯২), সুহেলি (১) ও আলিশীর আমীর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু যথার্থ পক্ষে ইঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন সুলতান হোসেন বাইকারার নিকট হইতে তাঁহারই রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ১৪৬৮-৬৯ হইতে ১৫০৬)। সুলতান হোসেন প্রথমে আস্ত্রাবাদের শাসনকর্তৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন পরে হীরাটের সিংহাসন তিনিই অধিকার করেন (২)। ঐতিহাসিক মীর খন্দ ইঁহারই রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, চিত্রী বিহ্‌জাদও ইঁহার সভারত্নের অন্যতম। যাউক সে কথা।

তৈমুর রণতাণ্ডবে মত্ত থাকিলেও নানা বিজিত প্রদেশ হইতে শিল্পী ও স্থপতী আনয়ন করিয়া শিল্পধারায় সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

একই ব্যক্তিতে বিরুদ্ধধর্ম্মী চিত্তবৃত্তির সমাবেশ যে একবারেই দুর্ল্লভ, তাহা বলা যায় না। প্রাকৃত জগতেও দ্বৈত ব্যক্তিত্বের (double personality'র) দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দেখা গিয়া থাকে (৩)।

তৈমুর বাঁচিয়াছিলেন দীর্ঘ দিন—খৃঃ অঃ ১৩৩৫ হইতে ১৪০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। তাঁহার রাজত্বকালে কারুশিল্পের উন্নতিও বড় কম হয় নাই। সমরকন্দে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাগজ ও বিখ্যাত ঘনারুণ (crimson) মখমল, ইংরাজী গাথার cramoisy, তৈয়ারী হইত। কাগজের উৎকর্ষের সহিত চিত্রশিল্পের, তথা ক্ষুদ্রক চিত্র সাহায্যে পুঁথি-চিত্রণের প্রসারের যে কিরূপ নিকট সম্পর্ক, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তৈমুর যে স্বয়ং কখনও জীবজন্তুর অথবা নরনারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের সমর্থন করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সাহরুখ নামক পুত্র (খৃঃ অঃ ১৪০৫-১৪৪৭) এবং তাঁহার পৌত্রগণ যে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট সমাদর করিতেন—তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। [ক্রমশ

(১) Syke's History of Persia, vol II,
(২) Ameer Ali's Perslan Culture, p. 18
(৩) Ameer Ali op. cit. p 17

(১) সুহেলি পঞ্চতন্ত্রের আখ্যায়িকামূলক বিদপাই কাহিনীর যে অনুবাদ রচনা করেন তাহা আনওয়ার-ই-সুহেলি নামে বিখ্যাত। ইহার মূল শব্দানুযায়ী অর্থ অগস্ত্য নক্ষত্রের আলোক (Light of Canopus)।

(২) Sultan Husseyn, the patron of Jami, Mirkhond, or of Bihzad the painter, was prince of Astrabad, and later of Herat. Syke's History of Persia, Vol II., p 139,

(৩) এ প্রসঙ্গে R. L. Stevenson প্রণীত Dr. Hyde and Mr. Jekyll নামক বিখ্যাত কথাগ্রন্থের নায়কের চরিত্র স্বতঃই মনে পড়ে। একই ব্যক্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিত্ব সমাবেশের উহা এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত।

মাটি ও মানুষ

তিন

যমুনা—পনের বছর আগেকার ছোট্ট দুরন্ত সেই মেয়েটা!

বিপিন সর্দারের পোড়ো ঘরে বসে অমূল্য ঢোল পিটছে, দুপুর গড়িয়ে গেছে, খাওয়া হয় নি—খাওয়ার কথা মনেই নেই তার। মুখ শুকনো। অন্যমনস্ক যেন; আঙুলের গতি থেমে যাচ্ছে মাঝে মাঝে—আওয়াজ বন্ধ হচ্ছে, সচকিত হয়ে দ্বিগুণ জোরে বাজাচ্ছে আবার। হঠাৎ কাদা এসে পড়ল অমূল্যর মুখ ও ঢোলকের উপর।

ভাঁটা সরে গেছে অষ্টবেকিতে। নোনাকাদা রোদে চিকচিক করছে; গৃহস্থ-বাড়ির শুদ্ধ অঙ্গনের মতো কে যেন যত্ন করে নিকিয়ে পুঁছে রেখেছে নদীর দুইকূল।

ছাতের উপর মেঘম্লান আকাশের নিচে বসে আজকের শান্ত-ধারা অষ্টবেঁকি ও নদী-পারের নূতন চরের উদ্দেশে অলক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে চেয়ে সেদিনের ছবিটা স্পষ্ট যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে অমূল্য। রঙ-বেরঙের জামা-কাপড়-পরা ক'টি বউ ও একদল পুরুষ পারঘাটে এসে ডাকাডাকি করছে ওপারের খেয়ার উদ্দেশে। একটু দূরে খালের মুখে বেড়জাল পেতেছে জেলেরা। বাদামি পাল তুলে সারি সারি পুবদেশি নৌকা চলেছে। চরের উপর ছেলেমেয়েরা কাঁকড়া ধরে বেড়াচ্ছে দলে দলে—তার মধ্যে যমুনা আছে, অমূল্য আগে টের পায় নি। টের পেল যখন কাদা পড়ল এসে একতাল। ঢোলক আর মুখের উপর লেপটে গেল। আর খিল-খিল-খিল—উচ্ছলিত জলধারার মতো হাসি। হাসতে হাসতে দ্রুত পিছিয়ে যায় যমুনা। অর্থাৎ ঢোল ফেলে অমূল্য ঐ উঠল বলে। অষ্টবেঁকির ভিজে তট দিয়ে তীরবেগে ছুটবে এখুনি—চুলের মুঠি ধরে তাকে পিটুনি দেবার জন্য। তাই যথাসম্ভব নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যমুনা। এক দৌড়ে পাড়ার ভিতর উঠে দরজায় সে খিল দিতে পারে হয় তো। কিন্তু তা করছে না—মুখে-কাদা ঐ বিব্রত অবস্থায় অমূল্য কি করে, সেটা দেখবার জন্য দুরন্ত লোভ। বিপদ স্বীকার করেও তাই দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু বিচিত্র ব্যবহার অমূল্যর। হাত দিয়ে কাদা খানিকটা ফেলে দিয়ে ডাকে, শোন্—

যমুনা এল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। হাসির আভা চোখে মুখে। খুব তাক করেছে কিন্তু। কেমন দেখতে হয়েছে অমূল্যকে, গাজনের ভস্ম-মাখা শিব ঠাকুরের মতো।

শোন, শুনে যা বলছি—

উঁহু—বলে অবহেলায় ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াল যমুনা। চলে যায় আর কি!

অমূল্য মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল, বটে! বড্ড ইয়ে হয়েছে তোমার—

যমুনা বলে, তুমি মারবে—

ভারি ভয় করো কিনা মারের! মারব না, মেরে হবে কি, পিঠে তো হাড়-মাংস নেই তোমার, লোহা। নিজেরই কেবল হাত ব্যথা—

তারপর বলে, আজকে চলে যাচ্ছি। কাজের কথা আছে। আয়—

কাছে এল যমুনা। বলে, চলে যাচ্ছ—কোথায় যাবে?

কলকাতা—

যাঃ, মিছে কথা—

মিছে কি সত্যি দেখিস বিকেলবেলা। বাবু-কর্তারা যাচ্ছে, বাবা যাচ্ছে, আমিও যাব।…যাবি তুই?

কলকাতা! কলকাতা! যমুনার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একবার। ওদের স্বপ্নের কলকাতা! কল টিপলে আলো জ্বলে, তেল-সলতে লাগে না; জল আনতে হয় না পুকুরের ঘাট থেকে বয়ে, কল খুললেই অফুরন্ত জল পড়ে; কেল্লা, গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, বাড়ি গাড়ি আর বড়-রাস্তায় ভরা আজব কলকাতা!

কিন্তু যমুনা জবাব দিল, যেন কতবড় গিন্নি—যেন কত বয়স হয়েছে তার! বলে, তবেই হয়েছে। পরশু আমার ছেলের বিয়ে, গোছগাছ হল না তার এখনো।…আর তুমিও আচ্ছা মানুষ অমূল্যদা। সুপারি-খোলা কেটে আনলে, বাখারি চেঁচে রেখেছ, পালকি করে দেবে। না—না, যাওয়া-টাওয়া হবে না ছেলের বিয়ের আগে—

অবজ্ঞার হাসি হেসে অমূল্য বলে, যাব না—তোর সঙ্গে বসে বসে পুতুল খেলব বলে? তুই না যাস, না-ই গেলি—

আদেশের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, শোন্ না বলি। ঢোলকটা নে, নতুন বেঁধে এনেছি আজকেই—সামাল করে রাখিস। দল ছিঁড়লে তোরও মুণ্ডু ছিঁড়ব। আর চল্ দিকি ও-পারে। গুয়োল-বাঁশ, দোর-ঘুড়ি খেপলা জাল সমস্ত দিয়ে দিচ্ছি—জুত করে রেখে দিবি।

যমুনা নড়ে না, গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আয়, হাঁ করে থাকিস নে। জোয়ারে নৌকো ছাড়বে। একলা বইতে হবে না তোর—দু'জনে হাতে হাতে নিয়ে আসব। আয়—

অমূল্য হাত ধরল তো হেঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিল যমুনা।

যাবি নে?

না—

দেখবি?

যমুনা বোমার মতো ফেটে পড়ল।

মারো, খুন করে ফেল, আমি যাবো না। কক্ষণো যাবো না, কিছুতে যাবো না। তোমার কোন কথা শুনব না আমি!

অমূল্য অবাক হয়ে যায়। এমন ভাব যমুনার কোনদিন দেখে নি। নরম হয়ে বলল, নৌকো আজ চলে যাচ্ছে—তোর ছেলের বিয়ের পর তখন আমি উড়ে যাব না কি? বয়ে গেল না রাখিস। ঢোল রাখবার ঢের ঢের জায়গা আছে আমার।

চরের কাদা পার হয়ে অমূল্য ঝপ্‌ ঝাপ্‌ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে পার হবে নদী। সজল চোখে তখন যমুনা বলছে, বুঝলে অমূল্য দা, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি—জন্মের মতো আড়ি। আড়ি, আড়ি, আড়ি। যাও কলকাতা—এজন্মে আর দেখা হবে না। এসে দেখবে মরে আছি আমি।

হাতে পায়ে জল কাটতে কাটতে অমূল্য ফিরে তাকাল, কিছু বলল না।

ঘাটের বাবলা গাছে কাছি দিয়ে ভাউলে বাঁধা। সবাই উঠেছেন। জোয়ারের জল ছল-ছল করে পড়ছে কূলের উপর। দুলছে নৌকা, কাছিতে টান পড়েছে। অমূল্য গলুয়ের উপর দাঁড়িদের পাশে চুপচাপ বসে, কাউকে কিছু বলছে না।

মাঝি তাগিদ দেয়, জোয়ার একপো হয়ে গেল। দেরি হলে চাপান দিয়ে থাকতে হবে কিন্তু।

বনমালী বলে, নেমে যা অমূল্য! ত্রিলোচন যা বলে কথাবার্তা শুনিস—বজ্জাতি করিস নে।

অমূল্য হাঁ-না কিছু বলে না, নড়ে চড়ে আরও চেপে বসল।

ঈশ্বর রায় হেসে বলেন, যাবি তুই?

দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ল অমূল্য।

নৌকা ছেড়ে দাও, মাঝি। ও নামবে না।

ইন্দ্রলাল একবার তাকালেন অমূল্যর দিকে, দৃষ্টির দুটো অগ্নি-শলাকা দিয়ে খোঁচা মারলেন। বাপ না থাকলে কান ধরে নামিয়ে দিতেন ছেলেটাকে।

খরস্রোতে ভাউলে চলেছে। দেখা গেল, ওপারে ছুটে আসছে যমুনা। মুক্ত বাতাসে এলোচুল উড়ছে, দু'হাত উঁচু করে অধীর হয়ে সে ছুটছে, আর ডাকছে, অমূল্য-দা যেও না, নেমে এসো—ফেরো এদিকে—আমি, আমি যমুনা—

ট্রেনে বনমালী-অমূল্যর আলাদা ব্যবস্থা। থার্ডক্লাসের কামরায় উঠে বেঁচে গেল বনমালী। ইন্দ্রলালের সামনে সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে—রায়কর্তা জোর ক'রে টানলে হবে কি—ওতে সে শান্তি পায় না, অস্বস্তি বেড়ে যায়। এই যদি ভগবানের বিধান হবে, হাতের পাঁচটা আঙুল তবে তিনি ছোট-বড় করেছেন কেন? এক জলেই ফোটে বটে, তা বলে কলমিফুল ও পদ্মফুল এক নয়।

সন্ধ্যার পরেই গাড়ি শিয়ালদহ পৌঁছবে। দমদমায় যখন এল, রাস্তায় গ্যাস জ্বলতে শুরু হয়েছে। জানলায় ঝুঁকে পড়ে, মাঝে মাঝে কয়লার গুঁড়া পড়ার দরুন চোখ রগড়াতে রগড়াতে—এতক্ষণ যা-সব দেখছিল অমূল্য, এখনকার এই দৃশ্য-বৈচিত্র একেবারে পৃথক তা থেকে—একান্ত অভিনব। এতক্ষণের এই পথের মধ্যে প্যাসেঞ্জার ও মালগাড়ি পাঁচখানা তাদের পাশ দিয়ে বিপরীত মুখো দৌড়েছে, প্রতিবারই বিস্ময়ে অমূল্য অবাক হয়েছে, কি কল বানিয়েছে সাহেব-কোম্পানি! একদিন শুনেছিল, ঈশ্বর রায় গল্প করছিলেন, ইংরেজদের রাজ্যে সূর্য নাকি অস্ত যেতে পারে না। সে আর বেশি কি, সারাদিনে সূর্য আকাশের ঐটুকু মাত্র চলে, তার চেয়ে কত জোরে ছোটে ইংরেজের বানানো রেলগাড়ি! আকাশের দেবতাও হার মানে ইংরেজের কাছে, এ কথা মিছা নয়।

রায়গ্রামের উত্তরে উলুক্ষেতে একবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছিল। অমূল্য সাহেব-মেম চাক্ষুস দেখেছিল সেই সময়। অনেক দিনের কথা, সে তখন অনেক ছোট—তাঁদের চেহারাও স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু ভাবতে গেলে মন সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। রাজার জাত—ইচ্ছা করলেই মার্-ধর্ কাট্ করতে পারেন, কিন্তু কি দরদ! অমূল্যরা তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে। চাপরাস পরা আরদালি আসছে দেখে ভয়ে ভয়ে তারা পিছু হটছিল। হাস্যমুখ মেম সাহেব বেরিয়ে এলেন এমনি সময়। ইসারা করতে আরদালি এক টিনের কৌটা নিয়ে এল। মেম সাহেব ওর থেকে দু'খানা করে সকলের হাতে দিলেন—জিনিসটার নাম পরে জেনেছে, বিস্কুট।

ছেলেপেলে ছিল না সেই সাহেব-মেমের। শিয়ালদহে নেমে সর্বপ্রথম অমূল্য দেখল, সাহেবদের কয়েকটা ছেলেমেয়ে—যেন মোম দিয়ে গড়া। আদর করে গায়ে হাত বুলাতে ইচ্ছা করে, যেন দেবশিশু।

ট্যাক্সি ডেকে বাবুদের দল চলে গেল। প্রভাবতীর বাপের বাড়ির সরকার গোবিন্দ ও একটা চাকর এসেছিল ষ্টেশনে; জিনিষপত্র ও বনমালী-অমূল্যকে পৌঁছে দেবার ভার তাদের উপর। ছ্যাকড়া গাড়ির গদির উপর উবু হয়ে বসে উৎফুল্ল অমূল্য হাজার রকম প্রশ্ন করে।

ওটা কি—উই যে উঁচু-মাথা উঠেছে, বাবুর বাড়ির মতন দাড়ি?...ধর্মতলা এটা, ধর্মগাছটা কোন্‌দিকে দেখা যাচ্ছে না তো! উঃ কত দোকান, কত লোক—কোথায় যাচ্ছে সব? রথের বাজার নাকি আজকে?

এ বিষয়ে বনমালীর জ্ঞান প্রায় ছেলেরই মতো; সে বড়-একটা জবাব দেয় না। গোবিন্দ হেসে বলে, নিত্যি রথের বাজার এ শহরে। কত দেখতে পাবে, সবুর করো, ছোকরা—

এদের পৌঁছে দিয়ে ইন্দ্রলাল রায় গ্রামে ফিরে গেলেন। বাড়িঘরও গুছিয়ে এটা-সেটা কিনে স্থির হ'য়ে বসতে লাগল আরও দিন কয়েক। জ্যোৎস্না ইস্কুলে ভর্তি হ'ল, বেণী দুলিয়ে বই হাতে সে ইস্কুলে যায়। গ্রামে ছেলেরাই ইস্কুল পাঠশালা এড়িয়ে বেড়ায়, মেয়েদের সম্পর্কে লেখাপড়ার কথা উঠতেই পারে না। সেই আওতা কাটিয়ে জ্যোৎস্নাকে অবশেষে বাইরে আনা সম্ভব হয়েছে, আনন্দে তৃপ্তিতে প্রভাবতীর মুখ ঝলমল করে।

একদিন প্রভাবতী বলে, সর্দার শ্বশুর, একটা কাজের ভার তোমার উপর।

বনমালী বিষম উল্লসিত হল। কাজ? দাও দিকি মা, যা হোক কিছু। কাজ না করে যে কাঠ হ'য়ে গেলাম একেবারে।

রোজ তোমার সঙ্গে জ্যোৎস্না ইস্কুলে যাবে। হাঁটতে হবে না, গাড়িতে যাবে। দুধ নিয়ে যেও, আর টাকা দেবো—সন্দেশ কিনে কিনে খাইও। মেয়েটাকে কেউ আঁটতে পারে না—বড় দুষ্টু—তুমি যদি পারো—

খুব পারব মা লক্ষ্মী। দুষ্টু হলে আমার সঙ্গে বনবে।

অমূল্যকে কাজ কেউ দেয় নি, নিজেই একটা বেছে নিল। গোবিন্দ ইদানীং এ বাড়ি চালান হয়ে এসেছে, এখানে সে কাজকর্ম করছে। সকালে গোবিন্দ বাজার করতে যায়, অমূল্য ঝুড়ি নিয়ে তার পিছু ছোটে। বিবেচনা আছে গোবিন্দর, অমূল্যকে দু'-একটা বিড়ি দেয়, আখ ও শাঁক আলু কিনে দেয় মাঝে মাঝে, একদিন দু'পয়সা দিয়ে লাল রঙের এক গেলাস সরবৎ পর্যন্ত খাইয়ে দিয়েছে।

একটা জিনিষ রোজ অমূল্য লক্ষ্য করছে। বাজার সেরে ফেরবার সময় ফঠকের ধারে একটি ছেলে এসে দাঁড়ায়, একটা থলে তার হাতে। অমূল্যকে গোবিন্দ ঝুড় নামাতে বলে; সে সব জিনিষ কেনা হয়েছে, ঝুড় থেকে তার একটা দুটো নিয়ে ঐ থলায় ফেলে দেয়। অমূল্যকে বুঝিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। অত্যন্ত গরিব একঘর বাসিন্দা তার বাসার ধারে বস্তিতে বাস করে। গোবিন্দর বড় করুণা তাদের দশা দেখে। এদের বড়-লোকি ব্যাপার, দু' একটা আলু কি ছটাকখানেক ডাল-মসলা কিম্বা এক আধ টুকরা মাছ কমবেশি হলে ধর্তব্যের মধ্যে আসে না, অথচ একটা পরিবার বেঁচে যাচ্ছে এই সামান্য কারচুপিতে। মন্দ কাজ একে কোনক্রমে বলা চলে না, মহৎ কাজ। কিন্তু গরিব বাঁচাবার জন্য সব চেয়ে ভাল তরকারি ও সকলের সেরা মাছটার আবশ্যক হয় কেন, মাঝে মাঝে অমূল্য বুঝে উঠতে পারে না! বিড়ি-সরবৎ ইত্যাদির আবশ্যক হয় বোঝাবার জন্য।

সকালটা কাটে গোবিন্দর সঙ্গে এই রকম গরিব বস্তিবাসীর উপকার এবং আনুষঙ্গিক কাজকর্মের মধ্যে। দুপুরে খাওয়ার পর সে বেরিয়ে পড়ে। চৈত্র মাস, আগুনের হল্কা বয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় মানুষ-জন গাড়ি-ঘোড়া বড় একটা নেই। বড়বাজারের দোকান-গুলায় পর্যন্ত কবাটের এক ফালি আলগা করে বেহুঁশ হয়ে দোকানদার ঘুমায়। সেই সময়ে শহর দেখে দেখে অমূল্য ঘুরে বেড়ায়। নিশি-পাওয়া মানুষ শুনেছি এই রকম ঘোরে। শহরে দ্রষ্টব্য কতকগুলা নাম গ্রামে থাকতে শুনেছিল, ঐ নামগুলাই সে জানে, কোনটি কোথায়—তাকে দেখিয়ে দেবে কে? তা ছাড়া শহরে এসে সবাই যা যা দেখে যায়, বিশেষ সেই ক'টা জিনিসের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য নেই তার। দু' ধারে সামনে-পিছনে এবং উপর-নিচে দেখবার এত সব জিনিষ রয়েছে—বড় বড় বাড়ি, জাল-বোনা ট্রাম-টেলিফোনের তার, নিচের রাস্তা, নানা দেশের বিচিত্র-বেশ নরনারী—এদের মধ্য থেকে খুঁজে খুঁজে কয়েকটা জিনিষ বেছে লোকে দেখে যায় কেন, এটা অমূল্য বুঝতে পারে না।

শহর তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধেছে, গ্রাস করে ফেলছে অত্যন্ত দ্রুত। বায়গ্রাম অতীত কালের ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। ঢোল আর দোর-ঘুঁড়ি যমুনার কাছে দিচ্ছিল, যমুনা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল, আড়ি—আড়ি—আড়ি। কত বড় হাসির ব্যাপার এ সব! যেন আবার ঐ পচা গাঁয়ে গিয়ে খেলা করতে যাচ্ছে সে যমুনার সঙ্গে! দুঃখও হয়, পুতুলের বিয়ে বড় হল যমুনার কাছে; আলোয় উজ্জ্বল এই শহরের রাত্রি, গাড়িঘোড়া ও মানুষে মুখরিত এই শহরের দিনমান—এ সকলের অস্তিত্ব নেই ওদের কাছে।

• •

মোটর কেনা হয় নি, গ্যারেজ আছে বাড়িতে। বনমালী ও অমূল্যর থাকবার জায়গা সেখানে। আর ঈশ্বর রায় থাকেন তেতলার চিলে-কুঠরিতে। ইন্দ্রলাল ব্যবস্থা করে গেছেন। সন্ধ্যার সময় লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে ঈশ্বর বেড়াতে বেরোন, যাবার বেলা বনমালীকে ইসারায় ডাকেন তিনি। কিন্তু কথাবার্তা জমে না আগেকার দিনের মতো। পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চির উপর ঈশ্বর গা এলিয়ে বসে পড়েন, বনমালী বসে ঘাসের উপর। সে উসখুস করে, বিড়ি কিনবার নাম করে খানিক বা আড্ডা দিয়ে আসে রাস্তার ওপারে পান-বিড়ির দোকানে। নিঃশব্দে খানিকক্ষণ কাটিয়ে ঈশ্বর রায় উঠে দাঁড়ান, বনমালীও ওঠে। পুরাণো কালের এই মানুষ দু'টি নিষ্প্রাণ দুটো কঙ্কালের মতো শহরের কর্মব্যস্ত পথ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরে। শেষে এমন দাঁড়াল, বনমালী আর যেতেই চায় না ঈশ্বরের সঙ্গে—নানা অজুহাত দেখায়; মাথা ধরেছে বলে পড়ে থাকে এক একদিন। খানিকটা পরে উঠে চুপি-চুপি সে চলে যায় জ্যোৎস্নার ইস্কুলের দরোয়ান মথুরা সিং-এর আড্ডায়। মথুরা সিং তার নূতন বন্ধু হয়েছে।

জ্যোৎস্নার সঙ্গে ইতিমধ্যে খুব জমে গেছে বনমালীর। টিফিনের মিষ্টান্ন দেখে জ্যোৎস্না মুখ বাঁকায়।

দুটো সন্দেশ আর একটা পানতুয়া—অত আমি খাব না, অত খেতে পারি নে। তুমি দুটো খাও, আমি একটা—

না—তুমি দুটো, আমি একটা—

উঁহু, তুমি দুটো—

বনমালী বলে, সন্দেশ আমি খাই নে দিদি। হেসে হাঁ করে সে দেখায়। দেখ, দাঁতে ফাঁক হয়ে গেছে বড় বড়। সন্দেশ খেয়ে করব কি, ফাঁকের মধ্যে সেঁদিয়ে থাকবে, পেট অবধি পৌঁছবে না।

জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করে, কি খাও তুমি?

কলের জল আর ফুঁয়ে উড়ে যায় তোমাদের ভাত চাট্টি চাট্টি। না খেয়ে খেয়ে মরে গেলাম, দিদি—

বনমালী টেনে টেনে হাসতে থাকে। দু-হাতে আয়তন দেখিয়ে বলে, ভাঁড় ভাঁড় রস খেতাম, মুঠো মুঠো ছোলা। বোলতার ডিমের মতো বীরপালা চাল-সিদ্ধ, লাল লাল কামরাঙা লঙ্কা, আর গুড় মস্ত এই রকম বাটি বাটি—

আহারের বর্ণনায় জ্যোৎস্না খিল-খিল করে হাসে। গ্রামে থাকতে ছোলা-ভাজা খেয়েছে দু'একবার। প্রলুব্ধ হয়ে বলে, শোন সর্দার-দাদু, সন্দেশ কিনো না কালকে আর। ছোলা এনো, —তুমি আমি ভাগ করে খাব দু'জনে—

সে কপাল করে এসেছ নাকি ?

এদের দশা দেখে বনমালীর মনে সত্যি ব্যথা বাজে। ঐ কয়েদখানার মধ্যে সমস্তটা দিন কাটায় বেচারিরা। হোক না মেয়ে —এই কচি বয়সে তবু এ রকম বন্দিত্বের অবস্থা—আর তার যখন এই বয়স, বাপ তামাক খেয়ে তার হাতে কল্কে তুলে দিত, বাপ গরব করে তার হাতে লাঠি তুলে দিত, পালট মেরে আশ্চর্য কায়দায় সেই লাঠি সে বাপের বুকে মারত দমাদম, হা-হা করে হেসে সমস্ত চালিপাড়া কাঁপিয়ে তুলত তার বাবা—

বনমালী বলে, বাপরে বাপরে বাপ ! এ কোন রাজ্যে এসে পড়েছ তোমরা দিদি। তোমাদের কপালে কেবল আগড়ুম-বাগ-ডুম বকা আর ঐ দুধ-সন্দেশ—

জ্যোৎস্না জেদ ধরেছে, ছোলাভাজা চাই-ই। সন্দেশ আর মুখে রোচে না। পরদিন মিষ্টান্ন সে ধুলায় ফেলে দিল।

বনমালী বিবেচনা করে বলে, ছোলা জিনিষ অবিশ্যি খারাপ নয়। বল-শক্তি বাড়ে। বাড়িতে বলবে না তো ?

না—

যদি জিজ্ঞাসা করে ?

ঘাড় নেড়ে উজ্জ্বল মুখে জ্যোৎস্না বলে, আমি বানিয়ে বলে দেবো। কেউ টের পাবে না।

সেই ব্যবস্থা হল। জ্যোৎস্না খুশি, বনমালীও খুশি। এই জায়গা থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে রেল-ষ্টেশন, লাইনের ওপারে খোলার ঘরের দাওয়ায় তাড়ি নিয়ে বসে, মথুরা সিং-এর কাছে খোঁজ পেয়েছে, নিজে গিয়ে দেখেও এসেছে একদিন। ছোলা কিনে দিয়ে বাকি পয়সা নিয়ে প্রায়ই সে দৌড় দেয় ষ্টেশনমুখো। শরীর বড় হালকা ঠেকে, যেন হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। ফিরে এসে মথুরা সিং-এর বারান্দায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভাজা-ছোলা নিয়ে হুড়াহুড়ি পড়ে গেল ইস্কুলে। জ্যোৎস্নার এই অপরূপ খাবারের প্রতি লোভ সকল ছাত্রীর। মস্ত বড় সরকারি ইস্কুল—সর্বনিম্ন ক্লাস থেকে সর্বোচ্চ ক্লাস অবধি এক মাহিনা—পনের টাকা। মাহিনার কাঁটা-বেড়া দিয়ে ঠেকানো হয়েছে, গরিবের মেয়েরা যাতে না ঢুকতে পারে এখানে। অগণিত মানুষের সুখ-দুঃখময় জগতে এরা ক'জনে দুর্গম এক আনন্দ-দ্বীপ রচনা করেছে। ভাল খাবার, ভাল পোষাক, ভাল ভাল কথা-বার্তার জায়গা। বৃহদাকার থামের উপর সুবিশাল ছাত—তার নিচে ছোলাভাজা বোধ করি এই প্রথম এল। দামি খাবার ছুঁড়ে ফেলে অনেকেই ঐ জিনিষ খেতে চায়। বিস্তর খরিদ্দার জুটেছে, মজা বেড়েছে বনমালীর। [ক্রমশঃ

বাঙলার নদ-নদী

বৈ—না—ভ

পাঁচ

পশ্চিমবঙ্গের নদী-প্রকৃতি—বাঁধ

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি খরস্রোতা-প্রকৃতির। এই সকল নদীর প্রকৃতি দ্রুতগামী পার্ব্বত্য নির্ঝরের মত, সে-জন্য পশ্চিম শ্রেণীর নদীগুলি খরবেগযুক্ত ধারাবতী অর্থাৎ 'পাহাড়ে নদী' নামেই আখ্যাত। অন্যান্য শ্রেণীর যে-সমস্ত নদী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে—তাদের অপেক্ষা পশ্চিম শ্রেণী-ভুক্ত নদীগুলির সমস্যা ভিন্ন প্রকারের। এই নদীসকল এমন অববাহিকা-অঞ্চলসমূহ থেকে প্রবাহিত হ'চ্ছে—যে-স্থানে জঙ্গল বিরল-সন্নিবিষ্ট এবং সেখানে আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী অতি প্রবল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হ'য়ে থাকে। এর ফলে এই সকল নদীর স্রোতোবেগে মোটা বালি প্রচুর পরিমাণে বাহিত হ'য়ে আসে ঠিক ঊর্দ্ধ বাঁক পর্য্যন্ত, কারণ এখানের তলভূমি ঢালু ও খাড়া, কিন্তু নিম্নবাঁকে তলদেশ সমতল, সে-জন্য আনীত মোটা উপাদানগুলি নীচে তলিয়ে পড়ে। দামোদর নদ এই প্রকার নদীর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রাচীন কাল থেকেই দামোদর ধ্বংসকারী বন্যার জন্য দুর্নাম অর্জ্জন করেছিল, তাই বহু পূর্ব্বেই তা'র দু'ধারে বাঁধ বেঁধে দেওয়া হ'য়েছিল। তথাপি এই দুর্দ্দম নদ বারংবার বাঁধ ভেঙ্গে গতির পরিবর্ত্তন করেছে। যে সকল মৃত বা মৃতপ্রায় নদী হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে হুগলী নদীতে এসে পড়ছে—সেগুলি একদিন ছিল দামোদরের সক্রিয় গতি-পথ। এরূপ এক একটি পরিবর্ত্তনের ফলে পল্লী-অঞ্চল বন্যায় বিধ্বংস হ'য়ে অকথিত দৈন্য-ব্যাধির কবলে নিপতিত হয়েছে।

দামোদর, অজয়, দারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, ময়ূর ও কাঁসাই প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলি জলপ্রণালীদ্বারা ক্ষেত্রে কৃত্রিম জল-সরবরাহ করার একমাত্র উৎস ও ভরা-জোয়ার বা বন্যার আবেগ-সঞ্চারে জল-স্রোত প্রবাহিত ক'রে দুষ্ট জল বা জঞ্জাল পরিষ্কার করার উপায়। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই দু'টি বিষয়ই নিতান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় নৈসর্গিক নিয়ম-অনুসারে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হ'য়ে থাকে—তা' পর্য্যাপ্ত হ'লেও ফসল-ফলার সময়টিতে বর্ষণ হয় অনিয়মিত। বিশেষতঃ ভাদ্রের শেষে ও প্রথম আশ্বিনে ধান্য-শস্যের প্রয়োজন অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় না। এই কারণে নিয়মিত ফসল ফলাবার জন্য স্বাভাবিক বর্ষণ-কালেও ক্ষেত্রে কৃত্রিম জল-সরবরাহ করা পশ্চিমবঙ্গে আবশ্যক হ'য়ে ওঠে। কিন্তু অস্বাভাবিক স্বল্প-বর্ষণের বৎসরে দুর্ভিক্ষ-রোধের চেষ্টা-স্বরূপ কৃত্রিম জল-সেচন অপরিহার্য্য, অবশ্য এরূপ স্বল্প-বর্ষণকাল প্রায় পাঁচ থেকে সাত বৎসরের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। তাই বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ব দিক লক্ষ্য ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—কৃত্রিম জল-সরবরাহ-প্রণালী এই প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের একটি মাত্র পন্থা। প্রকৃতপক্ষে পল্লীর জনগণ সমষ্টি হিসাবে জীবিকা অর্জ্জনে নির্ভর ক'রে কৃষি ও তৎসম্পর্কিত শ্রমশিল্প বা ব্যবসায়ের উপর।

বাঙলার নদনদীর রেখাচিত্র
সিকিম
নেপাল
দার্জিলিং
ভুটান
আসাম
জলপাইগুড়ি
দিনাজপুর
রাজসাহী
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
ঢাকা
কুমিল্লা
নোয়াখালী
চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
কলিকাতা
নবদ্বীপ
বঙ্গোপসাগর
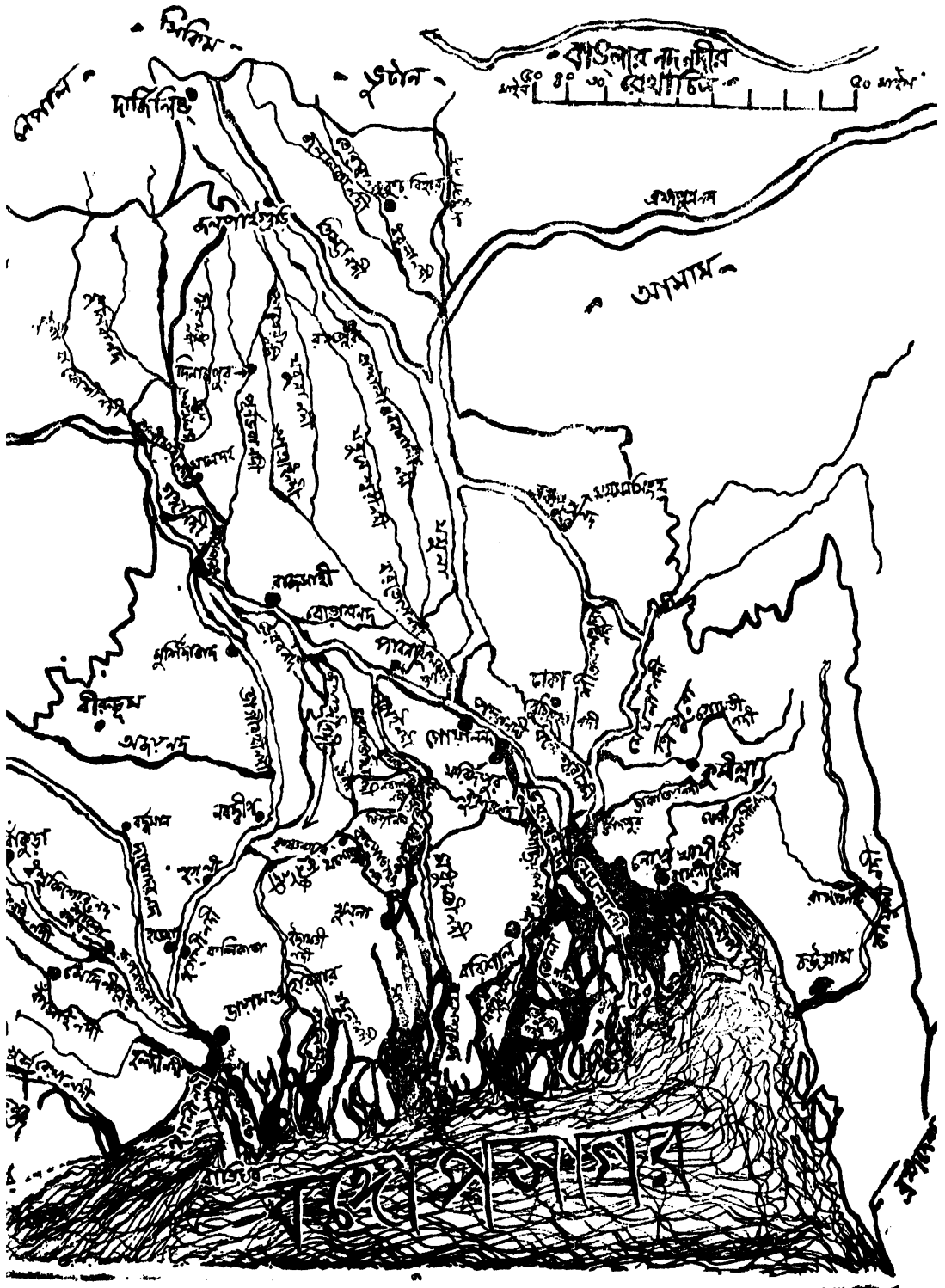
আর কৃত্রিম সার দেবার ও খাল বা পয়ঃপ্রণালী কেটে জল-সরবরাহ করবার অর্থ-সামর্থ্য দুঃস্থ গরীব রায়তদের নাই। খাল বা পয়ঃ-প্রণালীর জলে বাহিত যে পঙ্ক—তা' অতিরিক্ত উর্ব্বরতা-সাধক। আর জমির এই হোলো স্বভাবজ সার। শেষোক্ত প্রকারে এই সারের যোগান পাওয়া যেতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করলে জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে ফসল হয় অপর্য্যাপ্ত, সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হ'তে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-সংস্কারও পরিপূর্ত্তি বিষয়ের এইটি একটি অত্যাবশ্যকীয় অবয়ব এই সমস্যা ও তা'র সমাধানের রূপ ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে অল্পবিস্তর সমতুল। তাই এ-সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা এ-স্থলে বাহুল্য ব'লেই মনে হয়। নদী-সমস্যার অন্য যে-সকল দিক—যা কেবল বাংলারই নিজস্ব—সেই সম্বন্ধে প্রণিধান করা দরকার।

প্রথমতঃ, আমাদের আলোচ্য বিষয়ঃ পশ্চিমবঙ্গের বাঁধ-বদ্ধ নদীগুলি অনন্যসাধারণ সমস্যাসমূহের উদ্ভব করেছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বাংশ ব-দ্বীপাকৃতি,—এই বিভাগে যে সকল নদ নদী প্রবাহিত—তাদের জনহিতকর ক্রিয়াশীলতা মানুষের হস্তক্ষেপে ব্যাহত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে—যা'র সমুচিত মীমাংসার সন্ধান পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। অঞ্চলটি সমতল, গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নদী-বাহিত পলি-পঙ্ক দ্বারা। এই নদীগুলির মধ্যে উক্ত গঠনকার্য্যের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই নদী আর বর্দ্ধমানে দামোদর ও অজয় নদ। কিন্তু ওরূপ প্রকৃতি-দত্ত সঞ্চয়-উপাদানে ভূমি যথোপযুক্ত উন্নীত হবার পূর্ব্বে বন্যা-রোধী বাঁধ খাড়া ক'রে পতিত জমির আবাদ সুরু হ'য়ে গেল। এই পতিত-শোধন কাজ ইংরেজ অধিকারের অনেক আগে থেকেই আরম্ভ। সেকালে সুদৃঢ়রূপে এই সমস্ত বাঁধ-রক্ষণে জমিদাররা সচেতন ছিলেন না। এই অমনোযোগের ফলে প্রায়ই বাঁধ ভাঙতো আর প্রতিনিয়তই বাঁধে ফাটল ধরতো। এর জন্য জনগণকে ক্ষণস্থায়ী অসুবিধা ও ক্ষতি ভোগ করতে হোতো বটে—কিন্তু পলিবাহী বন্যার জলে ভূমি মাঝে মাঝে প্লাবিত হওয়ায় ক্লেদমুক্ত ও উর্ব্বর হ'য়ে উঠতো। সেদিন এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও জমির উৎপাদন-শক্তি বর্ত্তমানের মত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। অবশ্য আগেকার দিনে নদীর ধারে বাঁধ বাঁধার কুফল সম্যক্ উপলব্ধি করবার অবকাশ আসে নাই। এই সকল বাঁধের সুযোগ্য রক্ষণের ভার সরকারকর্ত্তৃক ক্রমশঃ গৃহীত হোলো, আর যথাসম্ভব ভাঙন ও ফাটল নিবারণের নিমিত্ত বাঁধ-গুলির উৎকর্ষসাধন করা হোলো। এর ফলও ফলেছে হাতে হাতে,—আজকাল ফাটল বা ভাঙন বিরল; যদি বা কখনো তা'র সাক্ষাৎ মেলে, অবিলম্বে তার সংস্কার করা হয়। পরিণামে দাঁড়িয়েছে এই যে, পলি-বাহী বন্যা-জলের সাময়িক প্লাবন থেকে ডাঙ্গা-ভূমি বঞ্চিত হয়েছে; পূর্ব্বে কিন্তু জমিদারের অনুপযুক্ত বাঁধ-রক্ষণের সময়ে ভূমি এই প্রাকৃতিক প্রসাদ-লাভে পুষ্ট হোতো। সুরক্ষিত বাঁধ-বন্ধন শুধু যে স্বাস্থ্য ও জমির ফলপ্রসব-ক্ষমতার ক্রমাবনতির কারণ হ'য়ে উঠেছে—তা' নয়, উপরন্তু উপচে পড়া নদীর জল—যা জমির খাদ্য-সংস্থান, সেই দান থেকে জমিকে বিরহিত করা হয়েছে। বাঁধ-সুরক্ষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রকৃতি-জাত সরিৎগুলি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, তাই সেখানকার জল নির্গমের দুরবস্থা উত্তরোত্তর তীব্র হ'য়ে উঠছে।

বন্যা-প্লাবন-জনিত পলি-সঞ্চারে ভূমির ক্রমোন্নয়নে বাধা-স্বরূপ হয়েছে বাঁধ, এ ছাড়াও বৃষ্টির জলে মাটির উপরের স্তর ধুয়ে যাওয়াতে ডাঙ্গা-ভূমি ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে অতি অল্পে নিম্নতর হ'য়ে যাচ্ছে। তদুপরি অবস্থা আরো মন্দ হ'য়ে উঠছে এইভাবে যে—বাঁধের মধ্যে বন্দী বন্যার স্রোত প্রাকৃতিক নিয়মে নদীর দুই তীরে উপচে প'ড়ে ভূমিতে পলি-মাটির তল-ছাট দেবার পরিবর্ত্তে পলির কিয়দংশ নদী-গর্ভে ঢেলে দিচ্ছে—নদীগর্ভও ক্রমশঃ ভরাট হ'য়ে উঠছে। এই কারণে জল-নিকাশের ব্যবস্থা-করা একপ্রকার অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। মাটির বাঁধ বেঁধে নদী-স্রোতকে সঙ্কীর্ণ সরিৎগুলির মধ্যে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা দিনের পর দিন সঙ্কটজনক অবস্থারই উদ্ভব ক'রে তুলছে। এই সকল নদীর ধারে বাঁধ-নির্ম্মাণের অব্যবহিত পরেই বন্যার উচ্চতা সবিশেষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, আর তলছাটে নদী-গর্ভ উচ্চতর হওয়ার জন্য উচ্চতার সীমা ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকেই চলেছে। এই হেতু বন্যা-রোধ করবার জন্য দরকার হ'য়ে পড়ছে বাঁধকে সমুন্নত করা। বাঁধ লঙ্ঘন ক'রে যদি আকস্মিক বন্যাধারার স্রোত বইতে থাকে, তা' হ'লে সে প্রবল স্রোত এমনি দুর্দ্দম ও অনিষ্টকারী হ'য়ে ওঠে যে—প্রাণ ও সম্পত্তি বাঁচানো মানুষের আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায়। এই প্রকার বন্যা অপেক্ষা ক্রমবর্দ্ধমান জল-প্লাবন বেশী ক্ষতি আনতে পারে না।

১৯৩৫-এ দামোদরের বন্যার সময়ে লক্ষ্য করা গিয়েছিল—স্থানে স্থানে ভূমিতল থেকে বিশ ফিট উঁচু থাকা সত্ত্বেও বন্যার জল সেই উচ্চতাকে প্রায় ছাপিয়ে যাবার উপক্রম হয়। আর তা' রোধ করার জন্য বন্যার স্ফীতি সময়েই বাঁধকে আরো ঊর্দ্ধে বাড়িয়ে দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনো গতি থাকে না। এই রকম স্থলে ভাঙন হ'লে পল্লী-অঞ্চলকে যে ভয়ঙ্কর বিপদ্ ও ধ্বংসের মুখে গিয়ে দাঁড়াতে হয়—তা'র ইয়ত্তা নাই। কারণ, সহজেই অনুমিত হ'তে পারে যে—প্রবল জলের তোড় বিশ ফিট উঁচু থেকে বইতে থাকলে—সেই দুর্জ্জয় স্রোতোবেগের টানে সমস্তই ভেসে যায়—ঘর-বাড়ী, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশু, এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত। এই রকম ভীষণ প্লাবন দেশে এনে দেয় অবিমিশ্র ধ্বংস। এ-কথা কঠিন সত্য, বাঁধের সাময়িক ভাঙ্গন বা ফাটল এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেখানে বাঁধ যত উঁচু সেখানে তা'র ফাটল বা ভাঙ্গন তত বেশী ঘটতে দেখা যায়।

বস্তুতঃ, জল-বেধের একটা সীমারেখা আছে—যে পর্য্যন্ত অরক্ষিত মাটির বাঁধদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে প্রতিরোধ করা যেতে পারে, কিন্তু দামোদর-বাঁধের স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট সীমায় জলভার এসে পৌঁচেছে, যদি বন্যা-পৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায়—তখন হয়তো ঐ সকল বাঁধের ব্যয়বহুল পৃষ্ঠদেশ-রক্ষাকার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য হ'য়ে পড়বে। তথাপি এই সমস্ত মাটির বাধকে অভেদ্য ক'রে তোলা সম্ভব হয় না, কারণ শত শত যোজন-বিস্তৃত বাঁধের তত্ত্বাবধান যেখানে অত্যাবশ্যক—সে-ক্ষেত্রে বাঁধের মধ্যে মধ্যে ইঁদুরের ছোট ছোট গর্ত্ত অতি বড় সন্ধানী দৃষ্টিকেও এড়িয়ে যায়। বাঁধের মধ্যে একটি

ছোট ইঁদুরের গর্ত্তও উপেক্ষার নয়, কেবল ঐ একটি গর্ত্তদ্বারাই অনর্থপাতের সৃষ্টি হতে পারে।' এই রকম গর্ত্ত সকল সাধারণতঃ ছোট ছোট গুল্ম-বৃক্ষের আচ্ছাদনে লুকিয়ে থাকে ব'লে চোখে ধরা পড়ে না, যখন বন্যাপৃষ্ঠ নদী-তীরের প্রান্ত-সীমায় গিয়ে পৌঁছায়—কেবল তখনি বাঁধ-দীর্ণ ছিদ্রগুলি দৃষ্টিগোচর হ'য়ে থাকে, আর যদি প্রান্ত-ভাগ ঢালু ভূমির উর্দ্ধদিকে অবস্থিত হয়—তা হ'লে বন্যার চাপ খুব উঁচু না হলে, গর্ত্তগুলি দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়, যখন লক্ষ্যে আসে, তখন কোনো প্রতিকার করার সময় থাকে না।

এই সকল অসুবিধার হেতু অরক্ষিত মাটির বাঁধে নৈমিত্তিক ভাঙ্গন বা ফাটল নিবারণ করা দুষ্কর, এর আনুষঙ্গিক-রূপে সম্মিলিত জল-স্রাব ছুটে বেরিয়ে প'ড়ে প্রাণ ও সম্পত্তি বিনাশ করে। এই বিপদ্ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থার গতি দাঁড়িয়ে গেছে—তদপেক্ষা এই সংঘটনের বারাধিক্য ঘটে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়: এই সকল নদ-নদী স্বাভাবিক অবস্থার অধীন থাকলে কিরূপ পরিস্থিতির উৎপত্তি হোতো। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—যে অঞ্চলে সুদৃঢ় বাঁধের বাঁধন নাই—সে-স্থানে বান ঢাকতো, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পল্লী-প্রদেশের উপর বন্যাধারা নির্বাধে ছাপিয়ে যেতে পারলে বন্যা-জলের গভীরতা অল্পপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হোলে আর পলিমাটির সঞ্চয়ে ভূমি ক্রমশঃ সমুন্নত হ'তে থাক্‌লে, বন্যার প্রকোপও ক্রমে ক্রমে নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়ে উঠতো। আর একটা মস্ত বড় কথা এই যে—এখন বাঁধের ভাঙ্গন বা ফাটলের মধ্য দিয়ে সম্মিলিত বেগে নিঃসারিত বন্যা-স্রোতে যে-রকম লোকের জীবন বা সম্পত্তি বিনষ্ট হয়—পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় এই বিপর্য্যয় বিশেষভাবে ঘটতো না। উপরন্তু বন্যাঞ্চলবাসীদের কোনোরূপ দুর্দ্দশার কবলে পড়তে হোতো না। এ'র কারণ আর কিছুই নয়—বৎসরে-বৎসরে বন্যায় অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে—লোকেরা বন্যা-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর টিলা বা মাটির স্তূপের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করতো। পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রণালীতেই ঘর বাঁধা হয়।

বাস্তবিকপক্ষে এই অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নতিসাধনের কোনো সবল সঙ্কল্প আর সুস্পষ্ট ও সজীব কর্ম্ম-পরিকল্পনা ব্যতিরেকে বাঙলার এ অঞ্চল বাঁচতে পারে না। অন্যথায় এই প্রদেশ অতীতে যে পতিত অবস্থা থেকে অকালে শোধিত হয়েছিল—কালক্রমে সেই পূর্ব্বাবস্থায় জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিণত হবে। নদীর বাঁধই অবনতির কারণ, তার মূলোচ্ছেদ করাই এই সঙ্কট থেকে মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। আর এর প্রকৃষ্ট সমাধান হবে এই যে—বন্যার জল ছাপিয়ে পড়তে দিয়ে জমিতে উৎকৃষ্ট সার পলি-মাটি গচ্ছিত ক'রে নিয়ে ভূমির উচ্চতা সাধন ও তা'র উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা। যে-স্থলে সম্ভব—সেখানেই এই কার্য্য-রীতি অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এদিকে ভূমি রয়েছে উপবাসী, সেই ক্ষুধিত ভূমির বাঁচবার পুষ্টিকর খাদ্য নদীর স্রোতে অপহৃত হ'য়ে সমুদ্রে ভেসে গিয়ে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ মণ এই মূল্যবান্ পলি প্রকৃতির নিয়মে পল্লী-প্রদেশেরই ন্যায্য প্রাপ্য, কিন্তু ক্ষণেকের ক্ষুদ্র দুর্ভোগ এড়িয়ে যাবার জন্য বৃহৎ ও চিরস্থায়ী দুরবস্থা ডেকে এনেছে মানুষ নিজের মধ্যস্থতার দ্বারা। আজ তারই কর্ম্মফলে জমি তা'র স্বাভাবিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ভুল-ঠিকানায় পৌঁছে দেবে ব'লে ছুটে চলেছে বাঁধ-শৃঙ্খলিত বিদ্রোহী নদ-নদীর বেগবান্ তরঙ্গ-ভঙ্গ। জোয়ার-ভাটার সীমার বাইরে, যেখানে জল মিষ্ট—সেস্থলে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত বন্যা-প্লাবন শস্যের যে সব সময়েই ক্ষতি করে, তা নয়, বরঞ্চ অধুনা-অভিজ্ঞাত বাঁধ ভাঙ্গা ভীষণ বন্যার অভিযানে যে মর্ম্মান্তিক দুর্গতি—তার হাত থেকে অনেকখানি নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। বাঁধ সরিয়ে দিলে—বর্ত্তমানের তুলনায় বন্যা-পৃষ্ঠ আপেক্ষিকভাবে বহুগুণে নেমে পড়বে, আর এই সমস্ত অঞ্চলে বন্যা ক্ষণস্থায়ী—বারেকে দুই বা তিন দিনের বেশী জেগে থাকে না, সেই জন্য এরূপ বন্যাধারা শস্যের পক্ষে হিতকর ও লাভজনক হ'য়ে উঠতেও পারে। অবশ্য প্লাবন খুব প্রবল হ'লে, সে বৎসর ফসল নষ্ট হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু বন্যাপ্লাবিত জমি পলি-সংস্থানে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। যে ক্ষয়-ক্ষতি হ'য়ে থাকে তা স্বভাবী বৎসরে পলিঘটিত সারের গুণে বহুবর্দ্ধিত উৎপন্ন শস্য ও স্বাস্থ্যোন্নতির দ্বারা পূরণ তো হয়ই, তদুপরি বিশেষ লাভের অঙ্ক ক্ষতির পরিমাণ ভুলিয়ে দিয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও সুখ এনে দেয়। আর একটা কথা এই যে—বন্যায় ঘর পড়ে যাওয়ায় যে সমস্ত লোক কষ্ট পায়, সে কষ্ট এড়িয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। এই দুর্গতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হ'লে উঁচু মাটির ঢিপিতে মাটির দেওয়াল না তুলে অন্য কোনো উপাদানে ঘর তৈরী করতে হবে। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ ক্ষেত্রে যে প্রণালীতে ঘর তৈরী করা হয়—সেই প্রণালী অনুসরণ করলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না, যদি বা থাকে তা' কচিৎ ও খুব অল্প।*　　ক্রমশঃ

* গত বৈশাখ সংখ্যার পর।
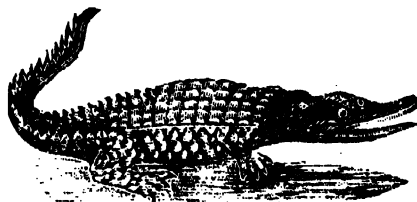
পুণ্ড্র রাজ্য

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্

ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্র পুণ্ড্র যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নাম 'পুণ্ড্ররাজ্য।'

আমার মতে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা, মানভূম জেলা, হাজারিবাগ জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ এবং মুঙ্গের জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া পুণ্ড্ররাজ্য বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন পুণ্ড্রের উত্তরে অঙ্গরাজ্য, পূর্ব্বে বঙ্গ ও সুহ্ম, পশ্চিমে কলিঙ্গরাজ্য এবং দক্ষিণে পাদদেশ বিধৌত করিয়া অনন্ত নীলসমুদ্র মৃদুমন্দ নিনাদ করিতেছিল। আজও পুণ্ড্ররাজ্যের স্মৃতিস্বরূপ বর্ত্তমান মানভূম জেলার অন্তর্গত বরাকর নদতীরস্থ পাণ্ড্রা (পুণ্ড্রের অপভ্রংশ) নামক এক পরগণা বিদ্যমান রহিয়াছে। পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ও প্রধান বন্দর ছিল 'তাম্রলিপ্ত'। রাজা পুণ্ড্রের পরবর্ত্তী কালে পুণ্ড্ররাজ্য সাধারণতঃ তাম্রলিপ্ত জনপদ নামে অভিহিত হইত।

প্রাচীন সীমা সম্বন্ধে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে বর্ণিত আছে :—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।"

অর্থাৎ কলিঙ্গ দেশের পার্শ্ববর্ত্তী তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল।

জৈনগ্রন্থ 'হরিবংশে' লিখিত আছে :—

"অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।"

অর্থাৎ অঙ্গরাজ্য তাম্রলিপ্তের পারবর্ত্তী ছিল।

"পাণ্ডববিজয়" নামক ভৌগোলিক গ্রন্থে বর্ণিত আছে :—

"তাম্রলিপ্তদেশবঙ্কে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।
ত্রিযোজনপরিমিতো প্রাবো যত্র চ ভূবিশঃ।"

অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর তীরস্থ ত্রিযোজনপরিমিত ভূমি লইয়া তাম্রলিপ্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইল—তাম্রলিপ্তের পার্শ্বে-ই ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গ অবস্থিত ছিল।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে লিখিত আছে—তাম্রলিপ্ত ময়ূর ধ্বজের রাজধানী ছিল। তিনি নগরবক্ষে এক সুবৃহৎ সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই কৃষ্ণার্জ্জুন মূর্ত্তিই "জিষ্ণুনারায়ণ" নামে প্রখ্যাত। সেই প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মূর্ত্তিটী পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। এই মন্দিরটি প্রায় ৫০০ বৎসরের প্রাচীন।

সুপ্রাচীন কালের কাহিনী-বিজড়িত "বর্গভীমা" নামক আর একটি নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্গভীমা এক সুপ্রাচীন কালীমূর্ত্তি। তাম্রলিপ্তের ময়ূরবংশীয় নৃপতি গরুড়ধ্বজ এক প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বর্গভীমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। আজিও মন্দিরটি সমতল ভূমি হইতে উচ্চতায় প্রায় ৬০ ফুট এবং নিম্নদেশ প্রস্থে প্রায় ৯ ফুট। মন্দিরের চূড়ায় "বিষ্ণুচক্র" রহিয়াছে।

মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের এক বিশিষ্ট অবদান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মন্দির দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া স্বনামধন্য হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন :—

"Some say it was built by Visvakarma, the engineer of gods, etc., etc. Stones of enormous size were used in its construction which excite the spectators' wonder as to how they were lifted into their places."

বর্গভীমা সম্বন্ধে "দিগ্বিজয়প্রকাশের" প্রণেতা লিখিয়াছেন :—

'কলেবর্ষসহস্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ।
যদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ॥
তব বংশা হি নির্ব্বংশা ভবিষ্যন্তি তদা খলু।
ভীমাদেবী চ দেবাপি নিজধামে গমিষ্যতি॥"

অর্থাৎ তাম্রলিপ্তের রাজা পরশুরামকে জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডি অভিশাপ দিয়াছিলেন,—"তুমি নির্ব্বংশ হও। কলির ৪৫০০ ব এই স্থান ম্লেচ্ছের অধীনস্থ হইবে এবং বর্গভীমা নিজধামে গম করিবেন।"

সুপ্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্যে চন্দ্রকেতু নামে একজন রাজা রাজ করিতেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় সদর মহকুমার অন্তর্গ "চন্দ্রকেতুগড়" তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গ হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে 'দেউলবেড়' নামক স্থানে গম্বুজবিশি রামেশ্বরনাথের মন্দির অবস্থিত। এইরূপ কিংবদন্তী আছে,- শ্রীরামচন্দ্রের স্বপ্নাদেশে চন্দ্রকেতু মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন আজিও প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে বারুণী উপলক্ষে মহতী মে হইয়া থাকে। এই মন্দিরের অনতিদূরেই একটি প্রাচ তপোবন রহিয়াছে। সুপ্রাচীন কালে এই তপোবনে ঋষি তপস্যা করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পুণ্যভূমি দর্শন অভিলাষে বহু যাত্রীর সমাগম দেখা যায়।

পুণ্ড্রের ঐতিহ্য সম্বন্ধে 'মহাবংশ' পাঠে অবগত হওয়া যা —অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বোধিদ্রুমের একটি শাখা স লইয়া সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী সমভিব্যাহ কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে অর্ণবপোতে প্রে করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সমুদ্রবেলায় দণ্ডায়মান থাকি বিলাপ করিয়াছিলেন(১)।

(১) "When they came to the shore of t ocean, Asoka disembarked the great Bo-bran and made herewith devotion and offering of his empire. Then having placed with his atte dants in the royal ship prepared for it, he sto on the shore with uplifted hands, and gazing

প্রখ্যাত বিল লিখিয়াছেন,—মৌর্য্য সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্ত বক্ষে একটি বৌদ্ধ স্তূপ স্থাপন করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে আমার অভিমত সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তাম্রলিপ্ত কেবল একটি প্রসিদ্ধ নগর ও বন্দর ছিল না। তাম্রলিপ্ত এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল। তৎকালে তাম্রলিপ্তের বিভিন্নাঞ্চলে স্তূপ, বিহারাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল।•

তদ্ভিন্ন প্রিয়দর্শী অশোকের প্রচেষ্টায় পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানগুলিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ভবানীপুর—বর্ত্তমান মানভূম জেলায় পুরুলিয়া হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ভবানীপুরের অপর নাম "কুন্দ্ধড়কা" এখানে আজিও বৌদ্ধ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তীকালীন কতিপয় জৈন মূর্ত্তি ও দেউল বিদ্যমান রহিয়াছে।

ছড়রা—মানভূম জেলায় পুরুলিয়ার সন্নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এই স্থানে কতিপয় প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

বুধপুর—মানভূম জেলার এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে বৌদ্ধমূর্ত্তি ব্যতীত জৈনমূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। এখানকার গাজনের মেলা প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তাম্রলিপ্ত সুসমৃদ্ধ ছিল। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তে পরিভ্রমণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎকালে তাম্রলিপ্তে ২৪টি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং এই বন্দর হইতে অর্ণবপোতে যাতায়াতের বিশেষরূপ সুবিধা ছিল। তিনি স্বয়ং এই বন্দর হইতে অর্ণবপোতে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পুণ্ড্রের অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

দিয়াপুরদলমি—মানভূম জেলার অন্তর্গত সুবর্ণরেখানদীর তীরস্থ এই স্থানে বহু ভগ্ন দেউল দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন একটি 'ভগ্ন দুর্গ' 'বিক্রমাদিত্যের দুর্গ' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বহু জৈন মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়।

তেলকূপি—মানভূম জেলার অন্তর্গত চেলিয়ামা পরগণায়, চেলিয়ামা পল্লী হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। কিংবদন্তী আছে,—মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই স্থানে তৈল মর্দ্দন করিয়া দলমির ছাতা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইহার নাম তেল কূপি হইয়াছে। তেলকূপিতে কতিপয় শিব ও পার্ব্বতীর মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। কালক্রমে মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে রাজা মানসিংহ রাজমহলে অবস্থানকালে সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

পবনপুর—মানভূম জেলার অন্তর্গত বরাভূমে পবনপুর নামক স্থানে কতিপয় প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দিরগুলি বিক্রমাদিত্যের সমাধি মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়; তৎকালীন তাম্রলিপ্ত ১,৫০০ 'লী' অর্থাৎ ২৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল। তৎকালে এতদঞ্চলে ১০টি বৌদ্ধ বিহার এবং ৫০টি দেবালয় বিদ্যমান ছিল। এই বন্দর হইতে সুদূর বাণিজ্যব্যপদেশে বহুবিধ উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি হইত।

পরবর্ত্তীকালে গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক তাম্রলিপ্ত অঞ্চল শাসিত হইয়াছিল। পরিশেষে বলভদ্রসিংহ নামে একজন রাজা এতদঞ্চলে রাজত্ব করেন। মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সুবর্ণরেখানদীতীরস্থ নয়াগ্রাম নামক স্থানে 'খেলার গড়' নামক প্রাচীন গড়টি তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বলভদ্রসিংহের পর হইতে তাম্রলিপ্তের পতন আরম্ভ হয়।

পরিশেষে তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

খ্রীষ্টীয় ১৮৮১ অব্দে রূপনারায়ণ নদের প্লাবনের ফলে তাম্রলিপ্তের তীরভূমি ভাঙ্গিয়া যায় এবং বহু সংখ্যক মুদ্রা ও মৃন্ময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। কতিপয় মুদ্রা ও মূর্ত্তি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে সংরক্ষিত হইয়াছে(২)। অধিকাংশ মুদ্রাগুলি ছিদ্রযুক্ত। এতদ্ভিন্ন মুদ্রাগুলি লিপিহীন কিন্তু সেইগুলিতে সিংহ, হস্তী, মৃগ, পদ্ম, চক্র ও চৈত্য অঙ্কিত আছে। একটি স্বর্ণ মুদ্রাতে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এইগুলি গুপ্তযুগের নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। মোগল আমলেরও কতিপয় রোপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মায়াদেবীর মূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ-শয়তান 'মার' এবং কতিপয় লাস্যময়ী নারীমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে আমার অভিমত—প্রাচীন পুণ্ড্রের অন্তর্গত প্রাচীন স্তূপ, দেউল, গড় ইত্যাদি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলি খনন করিলে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক গৌরব সমুজ্জ্বল হইবে।

the departing Bo-branch, shed tears in the bitterness of his grief. In the agony of parting with the Bo branch...weeping and prepared for his own capital. But his daughter, the pious princess Sanghamitta came with a happy and prosperous voyage to Simhal, the Island of gems."

—Adopted from the Pali Chronical "Mahavansa" by Mr. Pierre de Maillot.

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, August, 1882.

অতি লোভি গয়লানী* (গল্প)

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, এম, এ

আমার পরিচিত একজন বিধবা মহিলা মনে মনে স্থির করেন যে, তিনি আবার পরিণয়পাশে আবদ্ধ হবেন। তিনি ছিলেন দন্ত-চিকিৎসক—পয়সাকড়ির তাঁর অভাব ছিল না।

আজকালকার দিনে বিবাহ করাটা খুব সোজা কথা নয়। তা' ছাড়া এ ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে বুদ্ধিজীবী স্ত্রীলোকদের পক্ষে—যদি তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা এই থাকে যে তাঁর স্বামীও হবেন তাঁরই মত। অতটা না হোক অন্ততঃ তাঁর কাছাকাছি—জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ যার সাথে মনের অবাধ মিল অসম্ভব হয় না।

জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন বিবাহ করবার মত পুরুষ কয়টাই বা আছে! কিছু যে না আছে তা নয়—তবে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিবাহিত। হয় তো তাদের দুই তিনটি পরিবার প্রতি-পালন করতে হয়। আর তা ছাড়া যারা অবশিষ্ট আছে, তারা বেশীর ভাগই ভগ্নস্বাস্থ্য। তাদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীদের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রার্থনীয় নয়।

এমনি যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তখন আমার বন্ধু বিধবা মহিলা সঙ্কল্প করলেন যে, তিনি আবার বিবাহিতা হবেন। বছর দুই আগে তাঁর স্বামী যক্ষ্মারোগে মারা যান।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শোকের ধাক্কা সামলিয়ে নিয়ে মনটা হাল্কা করলেন। হয় তো তিনি ভেবেছিলেন, এ আর বেশী ব্যাপার কি! এতে আর তাঁর বিশেষ কি ক্ষতি হলো। কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁর ধারণা হলো, স্বামীর মৃত্যু ব্যাপারটি কিছু গুরুতরই বটে। সমাজে বিবাহেচ্ছু পুরুষ দলে দলে ঘুরে বেড়ায় না যে বাছাই করে একজনের গলায় বরমাল্য দিলেই হলো। বেগতিক দেখে তিনি স্বামীর অভাব মনে মনে অনুভব করে ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন।

মনের এমনি যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা নিয়ে আরও একবছর তাঁর কেটে গেল। অবশেষে তাঁর মনের দুঃখের কথা গোপনে বল্লেন তাঁর দুধওয়ালীর কাছে—যে তাঁকে দুধের যোগান দিত। যক্ষ্মা রোগে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন বলে স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বাধ্য হয়েই দৃষ্টি দিতে হয়েছিল বেশী। সুতরাং দুধ খাওয়ার অভ্যেসটা তিনি বেশ কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সের দুই দুধ তিনি প্রত্যহ খেতেন। যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নিটোল হয়ে উঠেছিল। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনের রঙ্গিন কল্পনা বেড়ে যায় বৈকি। তাঁরও হলো সেই অবস্থা। দেহ তাঁর যত সুস্থ হয়ে উঠলো—বিবাহ সম্বন্ধে হাল্কা আর রঙ্গিন কল্পনা ততই তাঁর মনে জোরে ঢেউ তুলতে লাগলো।

বছরখানেক দুধ খাওয়ার ফলে স্বাস্থ্যও যত তাঁর ভাল হয়ে উঠলো—গয়লানীর সঙ্গে আলাপে আলোচনাও তাঁর ততই বেড়ে উঠলো। এই ভদ্রমহিলা মনের গোপন কথা আর একটি মেয়ে-মানুষ ছাড়া আর কাকেই বা বলতে পারেন!

ঠিক বলা যায় না তাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা শুরু হলো কি ভাবে। হয় তো একদিন রান্নাঘরে এসে নিজেই কথা আরম্ভ করেছিলেন গয়লানীর সঙ্গে। হয় তো প্রথম বক্তব্যের বিষয় ছিল জিনিসের দুর্মূল্যতা নিয়ে, হয় তো বা বলেছিলেন, গয়লানীর দুধটা তেমন ঘন নয়। তারপর হয় তো কথায় কথায় ক্রমশঃ বলেছিলেন, আজকালকার দিনে বিবাহযোগ্য পুরুষ পাওয়াই দুষ্কর। গয়লানী হয় তো তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলেছিল যে, আমাদের আর কোন জিনিষের অভাব না থাকলেও মনের মত স্বামী সংগ্রহ করাই দুরূহ হয়ে উঠেছে।

কথায় কথায় একদিন ভদ্রমহিলাটি বল্লেন, আমি উপার্জ্জন কম করি না। আমার সবই আছে, বাড়ী, আসবাবপত্র, অর্থ; তা ছাড়া আমি এমন কিছু বুড়িও হয়ে পড়িনি যে পুরুষরা আমাকে দেখে পিছিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দুঃখ এই যে, এতদিন বৈধব্য জীবন যাপন করলাম, তবু আবার বিবাহের ব্যবস্থা করে উঠতে পারলাম না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, হয়ত স্বামী সংগ্রহের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে হতে পারে।

গয়লানী মাথা নেড়ে বল্লে, আমি মূর্খ মানুষ, কাগজ টাগজে বিজ্ঞাপনের কথা বুঝিনে। তবে এইটুকু বুঝি যে আমাদের একটা কিছু ভেবে স্থির করতে হবে।

আর একটি চাপা নিশ্বাস ফেলে বিধবা বল্লেন, শেষ পর্য্যন্ত আমি এই ব্যাপারে ভাল রকমের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতেও রাজি আছি। ঘটকালি করে যে উপযুক্ত পুরুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারবে, তাকে আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব!

গয়লানীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—বল্লে, কত খরচ করতে চান আপনি?

সেটা নির্ভর করবে পুরুষটির গুণবত্তার উপর। যদি তিনি বুদ্ধিজীবী হন—আর রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তা' হলে আমি নিঃসঙ্কোচে ত্রিশটি রুবল খরচ করতে পারি।

গয়লানীর লোভে চোখদুটি চক্‌চক্ করে উঠলো আবার। সে বল্লে, উঁহু ত্রিশ রুবল বড় কম মনে হচ্ছে। যদি পঞ্চাশটি রুবল পাই তা হলে একবার চেষ্টা দেখতে পারি। আমার জানা একজন পুরুষ আছেন, তিনি ঠিক আপনার মনের মত হবেন।

বিধবা বল্লেন—কিন্তু সে নিশ্চয়ই জ্ঞানী নয়, হয়তো নোংরা কাজই তার পেশা।

—নোংরা কাজ কেন করবেন তিনি? আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি বিদ্বান্—তিনি একজন বিদ্যুৎশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত।

—ও, তা হলে আর দেরী করো না বাপু, আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দাও। এই নাও ঘটকালির জন্য দশ রুবল আগাম।

* সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখক—মাইকেল জশচেংকো (Michael Zoschenco)র গল্পের ভাবানুবাদ। গল্পটি, রাশিয়া যখন মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে লেখা।

দু'জনেই সেদিন খুসী মনে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

এখানে স্পষ্ট করে বলা ভাল যে, গয়লানীর নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোনও মনের মত পুরুষের সঙ্গে জানাশোনা ছিল না। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে মোটারকমের অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সর্ব্বক্ষণ মনে মনে আলোচনা করতে লাগলো কি করে বিধবা দন্তচিকিৎসকের কাছ থেকে এই অর্থটা আদায় করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

সে বাড়ীতে ফিরে তার স্বামীকে জানালো কেমন বিনা পরিশ্রমে, বিনা অসুবিধায় এবং কোনও ঝুঁকি ঘাড়ে না নিয়েও পঞ্চাশটি রুবল তারা হস্তগত করতে পারে।

সে এইবার তার মনের কথা স্বামীর কাছে খুলে বলল। সে তার স্বামীকেই পরিচয় করিয়ে দেবে ঐ ধনী বিধবার সঙ্গে এবং তাকে একেবারে বোকা বানিয়ে ঐ টাকাটা হস্তগত করবে।

বললে---দেখ, যদি ব্যাপার এমনি গুরুতরও হয় যে বিয়ে না করে আর তোমার উপায় না থাকে, তা হ'লে নিঃসঙ্কোচে তাকে নিয়ে সোজা চলে যেও রেজিষ্ট্রারের অফিসে স্বামী-স্ত্রী ভাবে। আজকালকার দিনে এ ব্যাপারে তো কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। আজ রেজেষ্টারি করে বিয়ে করবে, কাল কিংবা পরশু সেটা বাতিল করে বেরিয়ে এলে।

গয়লানীর স্বামী—সুশ্রী দেখতে সে---তার ছোট্ট গোঁফের ফাঁকে হেসে বল্লে---বাঃ ভাবী সুন্দর বুদ্ধি তো তোমার। এমনি বিনা পরিশ্রমে পঁচাশটি রুবল রোজগার, একি হাতছাড়া করতে পারি! সে টাকা একমাস হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও পাওয়া যায় না---তাই পাওয়া যাবে শুধু একবার রেজিষ্ট্রারের অফিসে যাওয়ার জন্য? এতো একেবারে ছেলে খেলার সামিল।

দুই একদিন পরেই গয়লানী তার স্বামীর সঙ্গে বিধবা মহিলার পরিচয় করিয়ে দিল। বিধবা ভারী খুসী! বিনা প্রতিবাদে তাঁর অঙ্গীকৃত পঞ্চাশটি রুবল গয়লানীকে তিনি দিয়া দিলেন। তারপর গয়লানীর সুশ্রী স্বামী রেজিষ্ট্রারের আফিসে গিয়ে বিধবার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'লো এবং তার বাড়ীতে যেয়ে উঠলো।

একদিন, দুইদিন করে দিন দশেক পার হয়ে গেল। গয়লানী ব্যাপার দেখে একদিন স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, তার মতলবটা কি।

তার বিদ্যুৎশাস্ত্রবিদ স্বামী বিদ্যুৎচমকের মতই হেসে বল্লে---বাড়ী ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আমার মত বদ্‌লে ফেলেছি। আপাততঃ আমার নব পরিণীতার সঙ্গেই বাস করতে চাই। মনে হচ্ছে আমার মনের মত জায়গা পেয়েছি এখানে।

গয়লানী তার স্বামীর এই ঘৃণিত ব্যবহার দেখে রাগান্বিত হয়ে তার গালে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিল, কিন্তু তাতে তার স্বামীর মতের কোনও পরিবর্ত্তন হ'লো না। সে বিনা দ্বিধায় তার নব পরিণীতা ধনী মহিলার বাড়ীতে বাস করতে লাগলো। সেই মহিলা যখন সব কথা শুনলেন, তখন তিনি হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না, বললেন, যতদিন বিবাহ ব্যাপারে কোনও জোর জুলুম চলবে না এবং স্বামী-নির্ব্বাচনে বেপরোয়া স্বাধীনতা থাকবে, ততদিন আর এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই।—এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি তিনি এই বলেই করলেন।

দুধওয়ালী অবশ্য তারপরও এই বাড়ীতে দুই একদিন এসে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে দাবী জানালো যে তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হলো না। মাঝ থেকে তার এই লাভ হ'লো যে, সে তো স্বামী হারালেই, উপরন্তু তার একজন ধনী খরিদদারও হাতছাড়া হয়ে গেল। মহিলাটির দরজা তার কাছে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল।

ললিত কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

আঠার

৪৯। নিমিত্তজ্ঞান—টীকা অশুদ্ধ থাকার নিমিত্ত টীকাকারের ভাষা এ স্থলে বিশেষ স্পষ্ট নহে। তাঁহার মতে—ধর্ম্মাক্ষবর্গের অন্তর্গত শুভাশুভাদেশ-পরিজ্ঞান ইহার ফল। যেমন ধরুন, প্রশ্নকর্ত্তার বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত নিম্নোক্তরূপ আদেশ—'এই প্রকার নারীর সহিত তোমার মিলন'--ইহা যেন কামোপহাসপ্রায় টীকাকার বলেন—এ স্থলে নিমিত্তজ্ঞান নামটি সাধারণ ভাবেই আদেশ। শুভাশুভাদেশবিজ্ঞানের সূচকরূপে কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা সাধারণ শুভাশুভের নিমিত্ত—কামকেলির নিমিত্তমাত্র[১] নহে।'

ভাল-মন্দ চিহ্ন দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলিতে পারাই এই কলার বিষয়। যেমন, ধরুন—হাঁচি-টিকটিকির শুভাশুভ ফল, চক্ষুঃস্পন্দন, অঙ্গস্পন্দন-সূচিত শুভাশুভ ফল, কাকাদির ডাক শুনিয়া শুভাশুভ ফল বলিতে পারা—ইহাকে 'শাকুন বিদ্যা' নামেও অভিহিত করা হয়। যাত্রাকালে নানারূপ শুভাশুভ দ্রব্য দর্শনে যাত্রার ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান—এই কলারই অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত স্বরোদয় গণনা, রমণ-পাক্ষিগণনা—এ সকলই একলার অন্তর্গত।

৺তর্করত্ন মহাশয় সংক্ষেপে সারিয়াছেন—"শুভাশুভনিমিত্ত-পরিজ্ঞান, হাঁচি-টিক্‌টিকি—ইহা প্রসিদ্ধ; আরও অনেক আছে, তাহার পরিজ্ঞান।"

১। "নিমিত্তং ধর্ম্মক্ষমাবর্গেঽন্তর্গতং (? ধর্ম্মাক্ষবর্গে) শুভাশুভাদেশপরিজ্ঞানফলম্। তত্রচ প্রষ্টুরভিজ্ঞানার্থম্ এবংরূপরা ত্বয়া ত্বব সম্প্রয়োগ ইতি কামোপহসিতপ্রায় আদেশ ইতি। নিমিত্তজ্ঞানমিতি সামান্যেনোক্তম্।" 'ধর্ম্মক্ষমাবর্গ' পাঠ নিশ্চিত বিকৃত। 'ধর্ম্মাক্ষবর্গ' পাঠ হইতে পারে—অর্থ রমণপাক্ষি ইত্যাদি।

৺ বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুষ্পাশাকটিকানিমিত্তজ্ঞান—একটি কলা ধরিয়া বলিয়াছেন—"পুষ্পাশাকটিকা নামক বিদ্যার মূল উপকরণ জানা। পুষ্পশাকটিকা বিদ্যা কি, তাহা আমরা জানি না।"

৺ সমাজপতি মহাশয় আরও একধাপ উপরে উঠিয়া বলিয়াছেন "এই বিদ্যার বিষয় বা অর্থ এখন বিদিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ইঁহারা উভয়েই 'পুষ্পাশাকটিকা'র (পুষ্পশাকটিকার ?) নিমিত্তের জ্ঞান—এইরূপভাবে শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় ফাঁকি দিয়া বলিয়াছেন "ইহা ফলিত জ্যোতিষের অঙ্গ।"

ডক্টর আচার্য্যের মতে 'পুষ্পশকটিকানিৰ্ম্মিত জ্ঞান'—এই পাঠ। "ফুলের গাড়ী তৈরী করা। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পুষ্পশকটিকা ও নির্ম্মিতজ্ঞান বলিয়া দুই বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার যশোধর দ্বিতীয় ভাগের কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। জীব গোস্বামী পুষ্পশকটিকা ও নিমিত্তজ্ঞান পাঠ দিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ ব্যাখ্যা দেন নাই। শ্রীধর স্বামী পুষ্পশকটিকা ও নির্ম্মাতিজ্ঞান এরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই।"

এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ যশোধর দ্বিতীয় ভাগের কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেন নাই—ইহা ঠিক নহে। দ্বিতীয়তঃ কামসূত্রে নাম—নির্ম্মিতজ্ঞান নহে—নিমিত্তজ্ঞান। তৃতীয়তঃ, শ্রীধরের পাঠ—'নির্ম্মিতি জ্ঞান' বা 'নির্ম্মাতিজ্ঞান'।

ডক্টর আচার্য্য—'নিমিত্তজ্ঞান'কে আর একটি পৃথক্‌কলা ধরিয়াছেন—"বল্লভ আচার্য্য সাধারণ অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাকাদির ডাক শুনিয়া শুভাশুভ নির্দ্দেশ করা। কিন্তু কামসূত্রের টীকাকার যশোধর সর্ব্বত্র কামের লীলা দেখাইতে গিয়া ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন।"

এ প্রসঙ্গেও বক্তব্য—যশোধর ঠিক এ কথা বলেন নাই। তিনি কামনিমিত্তজ্ঞানের একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন—এ কলাটি সাধারণভাবেই উক্ত হইয়াছে, কামের বিশেষ ইঙ্গিত ইহাতে নাই—"সামান্যেনোক্তম্।" তবে কামনিমিত্তজ্ঞান ইহার অন্তর্গত হইতে পারে—এইমাত্র। যথা মিলনেচ্ছু প্রণয়ী প্রণয়িনী কর্ত্তৃক রমণপাঞ্চি খেলা দ্বারা নিজ নিজ কামপূরণ হইবে কিনা তাহার বিচার।

৺মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সংস্করণে 'ধর্ম্মাক্ষ' শব্দটির অর্থ করা হইয়াছে—"ধর্ম্মাখ্য পাশকক্রীড়া—রমণখেলা।" এই রমণপাঞ্চি গণনা দ্বারা সাধারণভাবে শুভাশুভ ভাগ্যবিচার করা যায়।

৫০। যন্ত্রমাতৃকা—সজীব ও নির্জ্জীব যন্ত্রসমূহের সংঘটনা-শাস্ত্র—বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক উক্ত; যান-উদকাহরণ-সংগ্রাম ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার।

প্রাচীন ভারতে কোনদিন যান্ত্রিক-সভ্যতার বিস্তার হয় নাই—ইহা যাঁহারা বলেন, এই কলার বিবরণপাঠে তাঁহারা সে মত পরিবর্ত্তিত করিবেন। যশোধরের মতে যন্ত্র দুই শ্রেণীর—সজীব ও নির্জ্জীব। রথ, যান, ঘানি, আখমাড়া কল ইত্যাদি যে সকল যন্ত্র অশ্ব, মহিষ, বলদাদি প্রাণিদ্বারা চালিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নাম 'সজীব' যন্ত্র। আর যাহা জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, বাষ্প বা বিদ্যুতের বেগে চালিত হয়, তাহাই পুরাপুরি 'নির্জ্জীব' যন্ত্র। বর্ত্তমানে নির্জ্জীব যন্ত্রেরই বাহুল্য। তাহা বলিয়া প্রাচীন ভারতে যে নির্জ্জীব যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না—এমন কথা বলা দুঃসাহসের কার্য্য। সে যুগেও ব্যোমযান, নালিকাস্ত্র (বন্দুক, কামান ইত্যাদি), সক্রিয় মূর্ত্তি প্রভৃতি এদেশে নির্ম্মিত হইত—ইহার প্রমাণ নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ত্রিবান্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার' নামক গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে যে—পারদবাষ্পচালিত ব্যোমযান প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত হইত। কি ভাবে উহা চালিত হইত, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণও গ্রন্থখানিতে দৃষ্ট হয়।

৺তর্করত্ন মহাশয় বিশেষ কিছু বলেন নাই—"যন্ত্র-পরিচালন বিশ্বকর্ম্ম-শাস্ত্র"।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার উপযোগিতা পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন—"অল্প আয়াসে কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।"

৺সমাজপতি—"কল-কব্জার নির্ম্মাণ-বিদ্যা"।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ এ প্রসঙ্গে বহু কথা বলিয়াছেন—"এইটি এক প্রকার শাস্ত্র, ইহা বিশ্বকর্ম্ম-কথিত।—এই গ্রন্থের নাম "বিশ্বকর্ম্ম-প্রকাশ"। সজীব যন্ত্র—রথ, শকট, তৈলযন্ত্র, ইক্ষুযন্ত্র প্রভৃতি—অর্থাৎ যে সমস্ত যন্ত্র গো, মহিষ, অশ্বাদি দ্বারা চালিত হয়; এবং নির্জ্জীব যন্ত্র—যাহা অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি জড়শক্তির সাহায্যে ক্রিয়া করে। বিশ্বকর্ম্ম-প্রকাশে রণতরী, রক্ষিতরী, ব্যোমযান, পুষ্পকরথ, আগ্নেয় রথ, বাণধ্বজ রথ, গর্দ্দভযান, পুষ্করযান, বিদ্যুৎগামিনী তরণী প্রভৃতি বহুপ্রকার নির্জ্জীব যানের নির্ম্মাণ-কৌশল কথিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে বোধ হয় প্রাচীন ভারতের অনেক অদ্ভুত তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের যে, বহুল চর্চ্চা পুরাকালে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহাও প্রমাণিত হইবে। অনেকে হয়ত এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে পারেন যে, বিশ্বকর্ম্ম-প্রকাশে কথিত নির্জ্জীব যানাদির কোনও পরিচয় আমরা পাই না কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বহু বিপ্লবে ভারতের অনেক রত্নই নষ্ট হইয়াছে। আজ যাহা নয়নগোচর হইতেছে না, তাহারই যে অস্তিত্ব ছিল না—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। কালে অনেক বিষয়ই অনুসন্ধান দ্বারা প্রকটিত হইবে আশা হয়।"

আমরা 'বিশ্বকর্ম্ম-প্রকাশ' দেখি নাই—তবে 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার' দেখিয়াছি। সিংহ মহাশয় ৺মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সংস্করণের বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়—অন্ততঃ রণতরী রক্ষিতরী প্রভৃতি অংশ ত বটেই। কেবল 'বানর-ধ্বজ রথ'কে ইনি 'বাণধ্বজরথ' বলিয়াছেন—সম্ভবতঃ মুদ্রাকর-প্রমাদ।

৺পাল মহাশয়ের সংস্করণে আরও বলা হইয়াছে—"বায়ুবেগে, স্রোতোবেগে, বাষ্পবেগে ও তড়িদ্বেগে যে সকল যন্ত্র পরিচালিত হয়। যেমন, জলযুদ্ধার্থ কেবল বায়ুবেগে, কেবল বাষ্পবেগে, কেবল তড়িদ্বেগে এবং বায়ু ও বাষ্পের মিশ্রবেগে, বায়ু ও

তড়িতের মিশ্রবেগে এবং স্রোত ও তড়িতের মিশ্রবেগে বেগে পরিচালিত করিবার যন্ত্রযুক্ত তরণী"। এ সকল কথা অনুবাদকার কোথায় পাইলেন—টীকায় এত কথা নাই—এগুলি কি নিজ কল্পনা মাত্র? টীকায় ত কেবল আছে—"সজীবানাং নির্জ্জীবানাং যন্ত্রাণাং যানোদকসংগ্রামার্থং ঘটনাশাস্ত্রং বিশ্বকর্ম্মপ্রোক্তম্।"

ডক্টর আচার্য্য এই পঙ্‌ক্তিটিরই অনুবাদমাত্র করিয়াছেন—"যশোধরের মতে ইহার অর্থ সজীব ও নির্জীব যন্ত্রসমূহের যানোদক-সংগ্রামের জন্য বিশ্বকর্ম্মাপ্রোক্ত ঘটনা-শাস্ত্র।"

৫১। ধারণমাতৃকা—যে গ্রন্থ শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহার ধারণার্থ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের বিবরণপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—কোষ, দ্রব্য, লক্ষণ ও কেতু—এইগুলি ধারণাদেশ—পঞ্চাঙ্গরুচির বপু। শ্লোকটি পারিভাষিক—অতএব দুর্বোধ্য।২ কোন কথা একবার শুনিলে বা কোন গ্রন্থ একবার মাত্র পড়িলে তাহা চিরদিন মনে করিয়া রাখিবার কৌশল। 'ধারণ' শব্দের অর্থ—পূর্ব্বে জ্ঞাত বা অধীত বিষয়ের চিত্তমধ্যে সংরক্ষণ বা অবিস্মরণ (retention)। এই বিষয়ের কোন গ্রন্থ বর্ত্তমানে আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। টীকাকার এই গ্রন্থ পঞ্চাঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে টীকার অনুবাদে এই পঞ্চাঙ্গ কি কি তাহা বলা হয় নাই। কেবল বলা হইয়াছে—"যাহাতে এমন পাঁচপ্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে, যাহা জানিলে একবার যে কোনও গ্রন্থ শুনিতে পাওয়া যাইবে, তাহার আর বিস্মরণ হইতে পারিবে না। ইহার সাহায্যে শ্রুতিধর হইতে পারা যায়"।

৺তর্করত্ন মতে—অধীত গ্রন্থের ধারণা যে উপায়ে হয় তাহার নির্দ্দেশ।

৺বেদান্তবাগীশ সম্পূর্ণ নূতন অর্থ করিয়াছেন—"পূজার নিমিত্ত, ধারণের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত রেখাময় যন্ত্র রচনা করিতে জানা"।

৺সমাজপতি মহাশয়ও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—"কবচ, পূজার উপকরণ, কবচের ন্যায় যন্ত্র ও তন্ত্রোক্ত যন্ত্র প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী"।

তান্ত্রিক যন্ত্র ধারণ—এ অর্থ ইঁহারা কোথা হইতে পাইলেন, তাহার কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ—"শ্রুত গ্রন্থাদি মনে রাখিবার সঙ্কেত-বিশেষ। ইহাদ্বারা শ্রুতিধর হওয়া যায়"।

ডক্টর আচার্য্য নূতন অর্থ করিয়াছেন—"সাধারণতঃ ইহার অর্থ সংক্ষেপার্থ কবিতা রচনা। যশোধর ইহার অর্থ করিয়াছেন,—শ্রুত গ্রন্থের ধারণ বা স্মরণ রাখিবার জন্য শাস্ত্রবিশেষ। আপাততঃ এরূপ কোন শাস্ত্রের কথা কোথাও পাওয়া যায় না"।

সংক্ষেপার্থ কবিতা রচনা—এ অর্থটিই বা কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ?

শ্রীধর ও শুকদেবের মতে যন্ত্রমাতৃকা ও ধারণমাতৃকা একই কলা—তবে কোন ব্যাখ্যা তাঁহারা দেন নাই।

৫২। সংপাঠ্য—এই কলাটিরও দুইটি উদ্দেশ্য—ক্রীড়া ও বাদ (প্রতিযোগিতা)। পূর্ব্বে পঠিত ও চিত্তে অবিস্মৃতভাবে ধারিত গ্রন্থ একজন পড়িয়া যাইবেন; আর অপর জন সেই গ্রন্থ পূর্ব্বে পাঠ বা শ্রবণ না করিলেও পূর্ব্ব ব্যক্তির সহিত সমস্বরে সমভাবে পাঠ করিবেন৩।

এইটি অতি কৌতুককর কলা। খেলার ছলে অথবা বাজি রাখিয়া বা তর্কের খাতিরে একসঙ্গে মিলিয়া পুস্তকপাঠ—ইহার বিষয়। একজন হয়ত একখানি পুস্তক পূর্ব্ব হইতেই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সে পুস্তকখানির অংশবিশেষ মন হইতে আওড়াইতে লাগিলেন। আর একজন (যাহার পুস্তকখানি পূর্ব্বে পড়া বা শোনা নাই) তিনিও পূর্ব্ব ব্যক্তির সহিত একযোগে মিলিয়া পুস্তকখানির আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অনুমানশক্তির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থের কিয়দংশ দর্শনে অবশিষ্ট পাঠ্যাংশ কি হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া পাঠ করা—এই কলার বিষয়। ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশিষ্ট প্রতিভা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। মতান্তরে বাজি রাখিয়া বই না দেখিয়া কে কতদূর মুখস্থ বই আওড়াইতে পারে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত সকলের একসঙ্গে পুস্তক পাঠ—এই কলাটির বিষয়। আবার কেহ কেহ পাঠান্তর ধরিয়াছেন—'সংপাটা'। বল্লভাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন—যে সকল দ্রব্য অনায়াসে কাটা বা ফুটা করা যায় না (যথা হীরক ইত্যাদি) তাহা কাটিবার ও ছিদ্র করিবার কৌশল।

৺তর্করত্ন মতে "বিনা পুস্তকে পাঠ কে কতদূর করিতে পারে, ইহার নির্ণয়ার্থ একযোগে গ্রন্থ আবৃত্তি।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় পাঠ ধরিয়াছেন—"সম্পাদ্য-কর্ম্ম—মণি-মুক্তাদি রত্নের কৃত্রিম নির্ণয় করা এবং কৃত্রিম রত্ন প্রস্তুত করা"।

৺সমাজপতি মহাশয়ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন—"কৃত্রিম মণিরত্ন-নির্ম্মাণ ও তাহাদের কৃত্রিমতার নির্ণয়"।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ—যশোধরেরই ভাবানুবাদ করিয়াছেন—"ক্রীড়ার্থ মিলিত হইয়া গ্রন্থপাঠ। একজন গ্রন্থ পাঠ করিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এই অশ্রুতপূর্ব্ব গ্রন্থ পূর্ব্বব্যক্তির সহিত একযোগে পাঠ করিবে। ইহা কি তাহা বুঝা যাইতেছে না"।

বুঝা কেন যাইতেছে না—তাহাই বরং বুঝা যায় না।

ডক্টর আচার্য্যের মতে—"খেলা ও তর্কবিতর্কের জন্য একরূপ গ্রন্থপাঠ। যশোধরের ব্যাখ্যানুসারে একজন পূর্ব্ব-ধারিত কোন

২ "শ্রুতস্য গ্রন্থস্য ধারণার্থং শাস্ত্রম্। যচ্চোক্তম্—'যস্ত কোষস্তথা দ্রব্যং লক্ষণং কেতুরেব চ। ইত্যেতে ধারণাদেশাঃ পঞ্চাঙ্গরুচিরং বপুঃ' ॥ ইতি"। ইহাতে পাঁচটি অঙ্গই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে 'যস্ত' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বস্তু' পাঠ ধরিলে—পঞ্চাঙ্গ হয় বটে। বস্তু প্রভৃতির অর্থ স্পষ্ট নহে। বস্তু—ইতিবৃত্ত। কোষ—আভিধানিক অর্থ। দ্রব্য—পদার্থ। লক্ষণ—সংজ্ঞা (definition)। কেতু—বিশিষ্ট চিহ্ন (characteristic mark)."

৩ "সম্ভূয় ক্রীড়ার্থং বাদার্থঞ্চ। তত্র পূর্ব্বধারিতমেকো গ্রন্থং পঠতি দ্বিতীয়স্তমেবাশ্রুতপূর্ব্বস্তেন সহ তথৈব পঠতি"।

গ্রন্থ পাঠ করে, দ্বিতীয় জন না শুনিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করে"।

৫৩। মানসী—মনে উৎপন্ন চিন্তা মানসী। দ্বিধা ভেদ উহার—দৃশ্যবিষয়া ও অদৃশ্যবিষয়া। কেহ পদ্ম-উৎপল ইত্যাদির আকৃতিসহ যথাস্থানে অবস্থিত অনুস্বার-বিসর্গ যোগ করিয়া তদ্দ্বারা সূচ্যমান অক্ষরের সাহায্যে একটি শ্লোক লিখিলেন। আর অপর ব্যক্তি তাহার মাত্রা-সন্ধি-সংযোগ-অসংযোগ -ছন্দোবিন্যাসাদি করিয়া অভ্যাসবশতঃ তাহা সুস্পষ্ট-লিখিতাক্ষর শ্লোকের ন্যায় পাঠ করিলেন। ইহাই 'দৃশ্যবিষয়া' মানসী। পক্ষান্তরে যখন ঐ বস্তুগুলি যথাক্রমে অপরকর্তৃক উক্ত হয়, আর সেই বিবরণ শুনিয়া পূর্ব্ববৎ শ্লোকের অনুমান করিয়া কেহ পাঠ করেন, তখন উহা আর দৃশ্যবিষয়া হয় না। উহা 'আকাশমানসী' নামে কথিত হয়। উভয়েরই প্রয়োজন—বাদ অথবা ক্রীড়ন।

ব্যাপারটি একটু ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন। ধরুন, কেহ পদ্মফুল ও ঐরূপ কোন কোন পদার্থ সাজাইয়া বা তাহাদিগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগের পার্শ্বে প্রয়োজনমত অনুস্বার-বিসর্গাদি যোগ করিয়া দিল। যিনি কলাবিৎ, তিনি তাহার মাত্রা-সন্ধি ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত করিয়া পূর্ব্বপঠিত কবিতার মতই অনায়াসে পড়িয়া গেলেন। এই সকল বাহ্য সঙ্কেত দেখিয়া মানসী চিন্তার সাহায্যে কবিতার আকার পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়া শ্লোকপাঠের নাম—দৃশ্যবিষয়া মানসী। আর এই পদ্মাদি সঙ্কেত স্বয়ং না দেখিয়াও তাহাদিগের যথাক্রম অবস্থানের বর্ণনামাত্র অপরের মুখে একবার মাত্র শুনিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কবিতার আকারে পাঠ করার নাম অদৃশ্যবিষয়া মানসী বা আকাশ-মানসী। বল্লভের মতে ইহা সমস্যাপূরণ। কিন্তু সমস্যাপূরণ পৃথক্ কলা—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (৩৩ নং)। মতান্তরে—মৌখিক কাব্য-রচনা, ছড়া দ্বারা ছড়ার জবাব, কবিগান, পাঁচালী, তরজা, হাফ্-আখড়াই, এ সকলই ইহার অন্তর্গত।

৺তর্করত্ন মহাশয় এ সম্বন্ধে বহু বিচার করিয়াছেন—"এক ব্যক্তি মনে মনে একটি পদ বা পদার্থ চিন্তা করিয়া কোন কলা-বিদ্‌কে বলিয়াছিল—আমার মানসিক পদ বা ভাব লইয়া আপনি কবিতা রচনা করুন। কলাবিৎ তাহা করিয়া থাকেন, ইহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। টীকাকারমতে 'সংপাঠ্য' ৫১ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট থাকায় মানসী ৫২ সংখ্যায় হইবে। মানসী দ্বিবিধ—দৃশ্যবিষয়া ও অদৃশ্যবিষয়া। পদ্মোৎপলাদি সঙ্কেত দ্বারা লিখিত শ্লোক দেখিয়া যথাযথ তাহার পাঠোদ্ধার দৃশ্যবিষয়া; শ্রুত মাত্রই কবিতার যে যথাযথ পাঠ তাহা অদৃশ্যবিষয়া; ইহা আকাশ-মানসী নামেও খ্যাত। কাব্যক্রিয়া ৫৩ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট; কাব্য-ক্রিয়া অর্থে কাব্য রচনা। বাঁকুড়া পাত্রসাএর নিবাসী কবি ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের মানসী কাব্যক্রিয়া-কলা আমার পরিদৃষ্ট বলিয়া সেই কলার অনুল্লেখে ন্যূনতা হয়, এই কারণে আমি মানসী কাব্যক্রিয়াকে একটি পৃথক্ কলা বলিয়া ধরিয়াছি। বিশেষতঃ বিশেষণ-বিশেষ্যবৎ অবস্থিত পদদ্বয়ের অর্থে ভেদজ্ঞান শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-বিরুদ্ধ; যথা—'সুন্দরঃ পুরুষঃ' বলিলে একজন সুন্দর আর একজন পুরুষ এরূপ অর্থবোধ হয় না"।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে—"অন্যের মনের ভাব ছন্দের দ্বারা প্রকাশ করা, এরূপ কৌতুক আর নাই"।

৺সমাজপতি মহাশয়ের মতে—"মনের ভাব আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার বিদ্যা"।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"মনে মনে চিন্তা। তাহা দৃশ্য ও অদৃশ্যভেদে দ্বিবিধ। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কামসূত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য।"

ডক্টর আচার্য্যের মতে 'মানসী কাব্যক্রিয়া' একই কলা। "বলিবা মাত্র মনে মনে কাব্যরচনা করা, কবিতার পংক্তি বলিয়া দিলে পংক্তি মুখে মুখে রচনা করা। যাহা আজকাল কবির পাঁচালী নামে পরিচিত। অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রথম অক্ষর লইয়া কবিতা রচনা করা, অথবা অপরের মনের ভাব অনুমান করিয়া কবিতার আকারে প্রকাশ করা।"

৫৪। কাব্যক্রিয়া—যশোধর মানসী ও কাব্যক্রিয়াকে পৃথক্ ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্যক্রিয়া সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশাদি কাব্য করণ। উহার প্রয়োজনও সকলেরই জানা।"

৺তর্করত্ন মহাশয়, ৺ বেদান্তবাগীশ মহাশয়, ৺ সমাজপতি মহাশয় ও ডক্টর আচার্য্যের মতে—মানসী কাব্যক্রিয়া একটিই কলা, দুইটি পৃথক্ কলা নহে।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মত যশোধরের অনুগামী—"সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ কাব্যাদিরচনাকৌশল। ইহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের অংশবিশেষ।"

[ক্রমশঃ

৪"মনসি ভবা চিন্তা। দৃশ্যাদৃশ্যভেদবিষয়া দ্বিধা। তত্র কশ্চিদ্ব্যঞ্জনাক্ষরৈঃ পদ্মোৎপলাদ্যাকৃতিভির্যথাস্থিতানুস্বারবিসর্জ্জনীয়-যুক্তৈঃ শ্লোকমনুক্তার্থং লিখতি। অন্যশ্চ মাত্রাসন্ধিসংযোগাসং-যোগচ্ছন্দোবিন্যাসাদিভিরভ্যাসাদতীবাক্ষরং পঠতি। ইতি দৃশ্য-বিষয়া। যদা তু তথৈব তানি যথাক্রমমাখ্যাতানি শ্রুত্বা পূর্ব্ব-বত্তুল্যীয় পঠতি, তদা দৃশ্যবিষয়া ন ভবতি। সা চাকাশ-মানসীত্যুচ্যতে"।

৫। "সংস্কৃতপ্রাকৃতাপভ্রংশকাব্যস্য করণং প্রতীত-প্রয়োজনম্।"
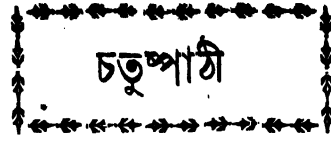
বাঙ্গালার ঘরোয়া প্রবাদ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

মুখ যা চায়, পেট তা চায় না ;
পেট যা চায়, মুখ তা চায় না।

যে-সব জিনিষ বেশ মুখরোচক, প্রায় সে-সব জিনিষ পেটের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে ; যেমন ছোলা-মটর ভাজা, চাল-ভাজা, চিনাবাদাম, ইলিশ মাছ, পাঁপড় প্রভৃতি। অপর পক্ষে, উচ্ছে-করলা, হেলঞ্চা, কাঁচাকলা, শুধু সিদ্ধতরকারী, মশলাবিহীন ব্যঞ্জনাদি—এ-সমস্ত পেটের পক্ষে বিশেষ হিতকর, পেট এই ধরণের খাদ্য চায়, কিন্তু খাইতে এ-গুলি বিকট লাগে। অবশ্য মোটামুটি ভাবে বাক্যটি খাটে ; এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা মুখ ও পেট—উভয়েই চায়।

ময়রা সন্দেশ খায় না।

সন্দেশের প্রতি ময়রার খুবই মমতা ; তা' হইতেই তা'র পয়সা আসিবে। সন্দেশই তার উপার্জ্জনের বস্তু ; সুতরাং অন্য সব দ্রব্য সে খাইতে পারে, কিন্তু তার নিজ হাতে-গড়া সন্দেশ যে কিছুতেই খাইয়া নষ্ট করিতে পারে না। অবশ্য 'সন্দেশ' বলিলে এখানে কেবলমাত্র সন্দেশকেই বুঝাইতেছে না ; ময়রার প্রস্তুত সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকেই বুঝায়।

মরা হাতী লাখ টাকা।

মহৎ যা', তা'র আদর সর্ব্বকালেই থাকে। বনিয়াদী বংশ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে দুরবস্থায় পড়িলেও তাহাদের মহত্ত্ব নষ্ট হয় না। হাতী মরিয়া গেলেও, তাহার সেই মৃতদেহ হইতেও, তাহার দাঁত ইত্যাদি বহুমূল্যে বিক্রীত হয়।

মরণকালে হরিনাম।

জীবনভোর কোন ধর্ম্ম কাজ বা ভগবানের নাম না করিয়া, মৃত্যু-কালে হরিনাম করিতে লাগিল। এইরূপ হরিনামের অর্থ—অনুশোচনা।

মাতঙ্গ পড়িলে দলে,
পতঙ্গেতে কি না বলে।

হাতী যদি ভাগ্যদোষে কখনো বিপদে পড়ে, তখন সামান্য একটা ফড়িংও তাহাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া যায়। শক্তিশালী লোক বিপদে পড়িলে, সামান্য দুর্ব্বল লোকও তাহাকে অপমান করিতে সাহস পায়।

মা'র চেয়ে দরদ বেশী—
সে হ'ল ডা'ন।

জগতের মধ্যে সন্তানের উপর মায়ের স্নেহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নিজের মা'র চেয়েও যদি কারো স্নেহ কাহারও উপর পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই স্নেহের মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি আছে ; সেই মিথ্যা দরদ দেখিয়া কেহ না মুগ্ধ হয়।

মা'র কাছে মামার বাড়ীর গল্প !

যে যে-বিষয়ে রীতিমত অভিজ্ঞ, তাহাকে সেই বিষয়ের উপদেশ দেওয়া বা সেই সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া, বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে যেখানে মায়ের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হইয়াছে, যেখানকার প্রতি দ্রব্যের সহিত তাঁহার সহস্র স্মৃতি বিজড়িত, সেই পিত্রালয়ের সম্পর্কে পরিচয়াদি যদি কোন সন্তান তাহার মাতাকে দেয়, তবে তাহা নিছক হাসির ব্যাপারই হয়।

মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার।

বহুল প্রচলিত, সরল বাক্য ; সুতরাং ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

মা'র পেটের ভাই,
কোথায় গেলে পাই !

অর্থাৎ মা'র পেটের ভাইয়ের মত এত আপনার আর কেহ নাই ইহাই ত স্বাভাবিক ; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই প্রবাদ খাটে না ; বরঞ্চ এখন ঠিক বিপরীত ভাব। এখনকার হাওয়া অনুসারে বলা যাইতে পারে—'মা'র পেটের ভাই, এমন শত্রু নাই'। এখনকার সময়ে কোন দুই জনের মধ্যে যদি ঘোর শত্রুতা দেখা যায়, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় যে, দুইজন বোধ হয় সহোদর ভাই।

মাথা নেই, তার মাথাব্যথা !

ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। সুপরিস্ফুট ভাব।

মাছের মা'র পুত্রশোক !

অনেক মাছ, তাহাদের ডিম খাইয়া ফেলে ; আবার অনেক মাছ আছে, যাহারা ডিম ছাড়িয়াই অন্যত্র চলিয়া যায়, ডিম ফুটিয়া যে সব বাচ্চা হয় তাহাদের সহিত আর দেখা শুনাই হয় না। সুতরাং মাছের মধ্যে সন্তান-বাৎসল্য নাই।

মিষ্টি হ'লেই হয়না মধু ;
গেরুয়া পরলেই হয়না সাধু !

ব্যাখ্যা সুপরিস্ফুট।

মোটে মা রাঁধে না, তা—তপ্ত আর পান্তা !

যেস্থলে রন্ধনই হয় না, সেস্থলে তপ্ত কিম্বা পান্তার প্রশ্নই উঠে না।

ভাঙ্গা চাল, চাঁদের আলো ;
যদ্দিন যায়—তদ্দিনই ভালো।

ঘরের চাল ভাঙ্গা-ফুটো ; মেরামত করিবার শক্তি নাই। ফুটো দিয়া ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসে। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য এই চাঁদের আলোকেই আঁকড়াইয়া ধরা হইয়াছে।

ভয়ও নেই, ভরসাও নেই

ভক্তের ভগবান।

ভবী ভোলবার নয়।

বহুল প্রচলিত এই তিনটী বাক্যের ব্যাখ্যার আবশ্যক করে না।

ভয়ে ভক্তি আর ভাবে ভক্তি।

ভয় হেতু যে ভক্তি, তাহার মধ্যে সত্যকার ভক্তি থাকিতে পারে না; ভাবে ভক্তিই আসল ভক্তি, উহাই আন্তরিকতাপূর্ণ।

ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই।

বর্ত্তমান যুগে এবাক্যের অর্থ আর বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

এই বাক্যকে ভিত্তি করিয়া আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বহু গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ খুব পরিষ্কার।

ভাঁড়েতে নেই কো ঘি,
ঠক্-ঠকালে হবে কি?

যে দ্রব্যের অস্তিত্বই নাই, তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা এবং শক্তি প্রয়োগ, মূর্খতার পরিচায়ক।

ভাজে উচ্ছে, ত—বলে পটল।

অর্থাৎ চলিত কথায় যাকে বলে—চালবাজী। ইহা একটি মানসিক হীন ব্যাধি, যাহা বর্ত্তমানে খুবই সম্প্রসারিত হইতেছে।

ভাদ্দর মাসের রোদ্দুর,
পিত্তি বাড়ে হুড়্-হুড়্!

আয়ুর্ব্বেদের মতে ভাদ্র মাসের রৌদ্র অত্যন্ত পিত্তবৃদ্ধিকর; সুতরাং স্বাস্থ্যপ্রিয় ব্যক্তিদের উচিত, ভাদ্রমাসের রৌদ্র সেবন না করা।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

যে দ্রব্যে অনেকের অংশ, তাহার উপর কাহারো আন্তরিক টান থাকে না, সুতরাং তাহার উন্নতিও হয় না, সদ্গতিও হয় না। আমাদের হতভাগ্য বাংলা দেশেই বাক্যটি খাটে। বাক্যটীর বহু ভাবেই অর্থ হয়; স্থানাভাবে ইহার বিষদ ব্যাখ্যা করিতে পারা গেল না।

ভাত রোচে না, রোচে মোয়া;
চিঁড়ে রোচে আড়াই পোয়া।

ভাত হইল বাঙ্গালী-গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য এবং প্রধান খাদ্য, তাহাতে রুচি নাই; রুচি আছে—অপ্রধান খাদ্য 'মোয়া' এবং 'চিড়াতে'। কিন্তু ইহাতে দোষের কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এক ঘেয়ে খাদ্য বা নিত্য এক ঘেয়ে কাজ কি কাহারো ভাল লাগে।

ভিক্ষা দাওগো ব্রজবাসী—
হরি হরি বল মন!
বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী,
এসেছি শ্রীবৃন্দাবন।

—ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!

একাকার কাণ্ড। যে কাজে কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই; কোন শৃঙ্খলা নাই, তেমন কোন কার্য্যকে 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' বলা হয়।

ভূতের মুখে রাম নাম!

রাম নামে ভূত পালায়। সুতরাং ভূতের কাছে রাম নাম খুবই অপ্রিয়। কিন্তু সেই ভূতের মুখেই যদি রামনাম শোনা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি আশ্চর্য্যের ব্যাপার। কোন অসম্ভব ব্যাপারে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

ভেক্ না ধরলে ভিখ মিলে না।

সাজ গোজে কিম্বা আচারে বিচারে একটু অসাধারণ এবং অদ্ভুত ভাব না থাকিলে সাধারণের মন আকৃষ্ট হয় না; সুতরাং ভিক্ষাও মিলে না।

যত মত, তত পথ।

বিখ্যাত বাক্য; ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

যদি হয় সুজন, ত তেঁতুলপাতায় ন'জন।

অর্থাৎ লোক ভাল হইলে একটুখানি স্থানের মধ্যে তাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহা পারে না। রেলে, ট্রামে, বাস্-এ ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

যত দোষ নন্দ ঘোষ!

নন্দঘোষের এমনই দুর্ভাগ্য যে, অপরের কৃতকার্য্যের অপবাদ তাহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। বোধ হয়, এই শ্রেণীর নন্দঘোষের উপর দোষ চালানো সংসার ও সমাজের পক্ষে খুব সহজ; কিম্বা ইতঃপূর্ব্বে নন্দঘোষ যে সব দোষের কাজ করিয়াছে, এখন সে কোন দোষ না করিলেও, পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য তাহারই উপর সকল দোষ আসিয়া পড়ে।

যত সব নাড়া-বুনে,
সব হ'ল কীর্ত্তুনে।

যারা সে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, সময়ের ফেরে এবং ভাগ্যগুণে তাহারাই সেই সব বিষয়ে ধুরন্ধর বলিয়া নিজেদের জাহির করিতে লাগিল।

যত হাসি, তত কান্না,
বলে গেছেন রাম শর্ম্মা!

মহাজ্ঞানী কোনও রামশর্ম্মা বলিয়া গিয়াছেন—'সংসারে সুখও যত, দুঃখও তত। সুতরাং আনন্দে অধীর হওয়া বিজ্ঞজনোচিত নহে; যেহেতু নিরানন্দের অন্ধকারও শীঘ্রই আসিতে পারে।' অতএব আনন্দে অধীর হইয়া বেশী হাসা ভাল নয়, যেহেতু পরে হয়ত কাঁদিতে হইবে।

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

ব্যাখ্যার বিশেষ কিছু নাই; সরল বাক্য।

যার নেই উত্তর পূব,
তার মনে সদাই সুখ।

বাক্যটির দুই রকম অর্থ করা যাইতে পারে; এক:—যাহার উত্তর-পূব জ্ঞান নাই, অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে ঘোর অজ্ঞান এবং নিরক্ষর, তাহাকে কিছুই দুঃখ দিতে পারে না; যেহেতু জ্ঞান হইতেই সর্ব্ববিধ দুঃখের উৎপত্তি। দ্বিতীয় অর্থ এই হইতে পারে যে, যে লোক পঞ্জিকার নানাবিধ বিধি-নিষেধের গণ্ডী এড়াইয়া চলে,

তাহার মনে কখনো কোন খটকা বা দুঃখ আসিয়া আঘাত করে না। সংশয়হীন চিত্তে তিনি অবাধ পথের পথিক; তিনি সর্ব্বদাই সুখী।

যার ধন তার ধন নয়, নেপোয়-মারে দই!

প্রকৃত মালিক তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পায় না, ভোগ করে অন্য লোকে।

যার নুন খাই, তার গুণ গাই।

যাহার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাহার গুণগান করাই সকলের কর্ত্তব্য।

যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্য লোকে লাঠি বাজে।

যে যে-কাজে অভিজ্ঞ, তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করাই বিধি; অনভিজ্ঞকে সেই কাজে নিযুক্ত করিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

যার ছেলে যত খায়,
তার ছেলে তত চায়।

বেশী পাইলেই পাইবার লোভ আরও বাড়িয়া যায়; সুতরাং আরও পাইতে চায়; সে-লোক অল্পে সন্তুষ্ট হয় না।

যার শেষ ভাল, তার সব ভাল।

ব্যাখ্যার আবশ্যক করে না।

যার দুধ খাব, তার চাট্ স'ব।

যাহার দ্বারা আমি উপকৃত হই, তাহার একটু আধটু তিরস্কার প্রভৃতিও আমার সহ্য করা উচিত।

যার-তার লাগবে জোড়া,
হেয়ো-চেয়োর মুখ পোড়া।

কাহারো উচিত নয় যে, বিবাদমান দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করা। কারণ উক্ত দুই পক্ষের বিবাদ হয়ত মিটিয়া যাইতে পারে; তখন ঐ উভয় পক্ষই তাহার শত্রু হইয়া থাকিবে।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,
মশা মারতে গালে চড়।

যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।

যে সয়, সে-ই রয়।

উপরোক্ত তিনটি প্রবাদের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণের মধ্যে ইহা খুবই প্রচলিত।

যে খায় চিনি,
তারে জোগান চিন্তামণি।

ন্যায়সঙ্গত আবশ্যকের জিনিষ, ভগবানই যোগাইয়া দেন। তাঁর উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিলে, সকলের সকল আবশ্যক তিনিই মিটাইয়া থাকেন।

যেমন দাদা ভজহরি;
তেমনি দিদি মন্দোদরী।

অর্থাৎ যথাযোগ্য মিলন। এই ধরণের সংস্কৃত বাক্য—'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।'

যেমন দেবা; তেমনি দেবী।

এই বাক্য উপরোক্ত বাক্যেরই অনুরূপ। [ক্রমশঃ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং যুদ্ধোত্তর বঙ্গের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

মানুষ মাত্রেই কোন একটা কাজ করিবার পূর্ব্বে কিছু ভাবিয়া লয়, চিন্তা করিয়া লয় কেমন করিয়া তাহার আরব্ধ কাজটী সুনিয়ন্ত্রিত পথে চলিয়া সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইবে—সাধারণ মানুষ চিন্তা করিয়া লয় কেমন করিয়া অর্জ্জিত অর্থকে ব্যয় করিবে; গৃহস্থের প্রবীণ, ভাবিয়া লয় কোন কোন জিনিষ কিনিলে সংসারের প্রয়োজন মিটিবে, এবং কেমন করিয়াই বা সেই জিনিষগুলিকে ব্যয়িত করা হইবে; উৎপাদক ভাবিয়া লয় কোন উপায়ে তাহার পণ্যদ্রব্যের বহুল উৎপাদন হইবে এবং অর্থ-বিনিয়োগকারী ভাবিয়া লয় কোন সুনির্দ্দিষ্ট পথে তাহার অর্থকে নিয়োগ করিয়া বেশী মুনাফা আদায় করিবে, এই চিন্তা বা পরিকল্পনা প্রত্যেক সমাজের মাঝে অজ্ঞাতে অনবধানে 'অলখ নিরঞ্জনের' ন্যায় প্রতিনিয়ত কাজ করিয়া চলিতেছে অথচ কেহ তাহার দিকে লক্ষ্য করে না কিন্তু যখন এই পরিকল্পনা ব্যক্তিগত বা সমাজ-জীবনের একটী বিশেষ অংশকে সুনিয়ন্ত্রিত করে তখনই মানুষ ইহার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে মানুষ কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে শীর্ষে থাকিয়া উৎপাদন, খাদন এবং বিতরণ-ব্যবস্থাকে এমন সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিবে যে, উহাদ্বারা সমাজের উপকারিতা প্রচুর ভাবে হইবে। এই সুনিয়ন্ত্রিত পথের মানদণ্ডরূপে পরিচালক হইবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য—এই মূল্যই সমাজের সমস্ত অর্থব্যবস্থার বিশৃঙ্খলতা দূর করিয়া সমাজের মধ্যে উপকারিতার প্রাচুর্য্য আনিয়া সমাজকে একটী বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গগত করিবে। ইহার ফলে ভোগ বা খাদন অংশ যতটুকু সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে তাহা করিবে; ইহা বিতরণ-ব্যবস্থায়, উৎকৃষ্ট বস্তু বহুলভাবে বিতরণের চেষ্টা করিবে এবং উৎপাদনব্যবস্থায়, উৎপাদনের প্রধানতম অংশগুলিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে যে, তাহার দ্বারা সমাজের সর্ব্ব অংশ প্রান্তীয় উপকারিতা লাভে সক্ষম হয়। মোটের উপর সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষ করিয়া তিনটী প্রধান ব্যবস্থা আছে; যথা—উৎপাদনের উৎকর্ষ, বিতরণের

সমতা এবং মানুষের অর্থ-নৈতিক জীবনের স্থায়িত্ব। সাধারণতঃ অপরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার ফলে—উৎপন্ন ঐশ্বর্য্যের বিনাশ এবং বহু ঐশ্বর্য্যে একেবারেই অনুৎপাদন হইয়া থাকে। সেইজন্য সুপরিকল্পিত সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহায়তায় কোন্ বিশেষ দ্রব্য, কোন্ বিশেষ পরিমাণে উৎপাদিত হইবে এবং কোন্ নির্দ্ধারিত মূল্যে সেই উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বিক্রীত হইবে এবং কেমন ভাবে সেই দ্রব্যগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হইবে—তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন কিছুরই স্থায়িত্ব থাকে না—কি অর্থ ব্যবস্থায়, কি বিনিয়োগ বা উৎপাদন, খাদন ও মূল্যনির্দ্ধারণ ব্যবস্থায় সর্ব্বত্রই একটা চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীলতা আছেই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এইরূপ নমনীয়তাকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌গণ অপকৃষ্ট অর্থব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুনিয়ন্ত্রিত বা সর্ব্বসাধারণের উপকারের উপযুক্ত অর্থব্যবস্থা না থাকিলে ধনী উৎপাদকগণ কোন কোন পণ্যের প্রচুর উৎপাদন করিয়া চরম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতে পারেন। সেই জন্য শিল্প বা ব্যবসা প্রসারের সময় যদি একটী সুপরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার দ্বারা সঞ্চয়প্রবৃত্তি ও বিনিয়োগ-প্রবৃত্তিকে না পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে চরম বিশৃঙ্খলতার মধ্যে বাণিজ্যচক্র পুনরাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকিবে।

আমরা সাধারণতঃ ধারণা করিয়া থাকি যে রাষ্ট্রই দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারের দায়িত্ব লইবে তাহা—রাজনৈতিকই হউক, কিম্বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে কোন প্রকারেরই হউক না। এই নির্ব্বিরোধ নীতির ফলে পুঁজীবাদীরা সমস্ত শিল্পকে একচেটিয়া করিয়া দেশের সাধারণ স্তরের ভোগীদিগের (consumers) মধ্যে বিরাট ক্লেশকর অবস্থা আনিয়া দেয়। পরে শিল্পযুগের প্রসারণের ফলে পুঁজীবাদীদিগের মধ্যেও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতা যখন লাগে তখন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মিলিত হইয়া কাজ করিতে থাকে কিন্তু তাহাতেও যখন ভোগীদিগের ক্লেশ নিবারণ হইল না তখনই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইল ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা। সেইজন্যই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সকলের সহায়তায় একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়া দেশের উৎপাদন, খাদন ও বিতরণের পন্থা নির্দ্দেশ করিবার ইঙ্গিত নিহিত আছে বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের ফলে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ ও বাংলায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদেশেই অর্থ ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। এই সমস্ত অর্থ ব্যবস্থা পরিকল্পনার মূলে রহিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ব্রিটেনের 'বেভারিজ প্ল্যান' ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশেও জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দ্বারা রচিত 'ন্যাশন্যাল প্ল্যান' এবং শিল্পপতিদিগের 'বোম্বে প্ল্যান' (দুই-খণ্ড) গান্ধীপন্থীদিগের "গান্ধীয়ান প্ল্যান" এবং মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিদিগের "পিপলস প্লান" বাংলা সরকারের "গভর্ণমেণ্ট প্ল্যান" এবং মিঃ চক্রবর্ত্তীর "বেঙ্গল প্ল্যান" প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যুদ্ধোত্তর ভারতে কেমন করিয়া দেশের শিল্পের ও দেশবাসীর অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা হইবে তাহা প্রত্যেক পন্থীরা স্বকীয় অভিমত দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় মারাত্মক ভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছে। সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের কুক্ষিগত কয় বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের উপর দিয়া দারুণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ এবং শোকের তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে তাহা দেখিয়া বাংলার ভবিষ্যত দেখিলে ভয় আসে যে এ জাতি ভবিষ্যতে বাঁচিবে কিনা? প্রায় ৫০ লক্ষের কাছাকাছি লোক বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করিয়াছে—যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদেরও অবস্থা সঙ্গীন—তাহাদের আহার্য্য, বস্ত্র, ও প্রাণধারণের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা তাহাদিগকে বহু জিনিষ হইতে বিরত করিয়া রাখিয়াছে—সেইজন্য এই অনাহার, অর্দ্ধাহার ও অপুষ্টি তাহাদিগকে জীবনীশক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্য্যতা অপহরণ করিয়া মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে; বাংলায় যতলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সাধারণতঃ অত্যন্ত হীন বলিয়া লক্ষ্য করা যায়।

জনপ্রতি বার্ষিক আয়

দেশ	সাল	জনপ্রতি আয়
বাংলা	১৯২৯	৬৫
ব্রিটিশ ভারত	১৯২৯	৭৮
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৩০	২০৫৩
ক্যানাডা	১৯৩১	১২৬৮
জাপান	১৯৩২	২৭১
ফ্রান্স	১৯৩৩	৬৩৬
গ্রেটব্রিটেন	১৯৩৩	১০৯২

বাংলাদেশের জন্মহার খুব বেশী নহে তবুও ইহার অবস্থা এরূপ কেন ইহার উত্তরে The cause of poverty is not the rate of population growth but the fact that she is a case of arrested economic development সহজেই বলা যাইতে পারে। আর এই জন্যই বাংলাদেশের দুর্গত দিগের দুর্গতির পরিমাণ এত বেশী। সাধারণ লোকের সাধারণ ভাবে বাঁচিতে হইলেও জনপ্রতি ৭০৲।৮০৲ টাকা বার্ষিক ব্যয় হইবে, কিন্তু বাঙালীর আয় তাহা হইতে অনেক কম, সেই জন্যই তাহাদিগকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এরূপ সে দেশে যে অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ শিথিল হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই জন্য সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কাগজী-মুদ্রার সম্প্রসারণের প্রথম অবস্থায় বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসিয়াছিল আবার যুদ্ধ বিরতির পর কাগজী-মুদ্রার সঙ্কোচনে দেশে যাহাতে ১৩৫০ এবং ১৩৫১ সালের পুনরাবির্ভাব না হয় সে জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, দেশের অর্থ-নৈতিক বনিয়াদকে কি

উপায়ে সুদৃঢ় করা যাইতে পারে তাহার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা করিতেছেন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠন করা নহে একেবারে ইহাকে আমূল গঠন করিতে হইবে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা সুদৃঢ়ভাবে গঠন করিয়া ইউ, এস, এস, আর (U. S. S. R.) এর দৃষ্টান্ত সম্মুখে লইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু এই জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে নিজ নিজ প্রদেশের উপযোগী গঠনমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজন, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে একটী নির্দিষ্ট পরিকল্পনাই যে সর্ব্বপ্রদেশোপযোগী হইবে তাহা কে বলিতে পারে ?

আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'বোম্বে প্ল্যানে'র আটজন শিল্পপতি সমস্ত দেশে শিল্পজাগরণ আনিয়া পনেরো বৎসরের মধ্যেই দেশের আয় দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি করিতে চাহেন। কারণ তাঁহাদের মত এই যে—বাৎসরিক ৭০৲৮০৲ টাকাতে একজনের আহার চলিতে পারে, কিন্তু বাঁচার মত বাঁচিতে হইলে ১৩০৲ টাকার মত প্রয়োজন, এই প্রয়োজন মিটাইতে হইলে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিল্প বিস্তার করিয়া দেশকে শিল্পময় করিয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশের উৎপন্ন আয়ের পরিমাণ কৃষিতে ১৩০% করিয়া, শিল্প হইতেই ৫০০% আয় করিতে হইবে।

আবার গান্ধীপন্থিগণ ভারতের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি কৃষি কর্ম্মের উপরেই বেশী করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং 'পিপলস্‌ প্লানেও "An attempt to increase the purchasing power of the people will have to start by concentrating on agriculture which affords the main channel of employment to a majority of people. Agriculture thus constitutes the proper foundation of a planned economy for the country. "দৃষ্টিকে বেশী করিয়া কৃষি পুনর্জাগরণের দিকেই আকর্ষণ আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এবিষয়ে মিঃ এ, সি, চক্রবর্ত্তী রচিত, 'বেঙ্গল-প্ল্যান' সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছে বলিতে পারা যায়। তিনি বর্ত্তমান বাংলার মুমূর্ষু অবস্থাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর বাংলায় যন্ত্রযুগের সহিত কৃষির সমন্বয় সাধন করিয়া তাঁহার পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙালী যাহাতে যন্ত্র বা মেসিনের সহায়তায় নূতন করিয়া কৃষিশিল্পের উন্নতি করিয়া বাঁচিতে পারে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি ১৯২০ একর জমি লইয়া ৩,০০০ লোক ৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ভদ্র-কৃষকের সহর গড়িয়া কি করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছলতার দিকে যাইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'রিকনস্ট্রাকসন কমিটীর' কার্য্যাবলী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারা যুদ্ধোত্তর ভারতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন :— শিল্প ও বিশেষ শিল্পে নিযুক্ত এবং সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের পূর্ণনিয়োগ, জমির পুনর্গঠন—চুক্তি ও সর্ত্তাবলীর সংস্কার সাধন—যান বাহন ও পথ-ঘাটের উন্নতি কর শিল্প-বাণিজ্য কৃষি, বনবিভাগ, মৎস্য বিভাগ এবং সামাজিক উন্নতি, যথা—শিক্ষা, সাধারণ স্বাস্থ্য, শ্রমিক ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি, বাংলা সরকারও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন-কমিটি স্থাপন করিয়া যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিশনারের অধীনে শিল্প উন্নয়ন, কৃষি, যান-বাহন, শিক্ষা, সাধারণের স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ পরিচালন, যুদ্ধোত্তর কার্য্যে ব্যক্তি নিয়োগ, শ্রমিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং সমবায় আন্দোলনকে পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান দুর্গত ভারত ও দুর্ভাগ্য বাংলা দেশের উন্নতির জন্য অনেক পরিকল্পনা দেখিতেছি। এই যে সমস্ত পরিকল্পনা হইতেছে, তাহা যেন 'must not be wooden, it must proceed on the methods of 'trial and error' হয়। যেন ভারতের এবং বাংলার কৃষিকার্য্য এবং কৃষকের উন্নতি সাধিত হয়। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে কুটীর-শিল্পগুলি আবার প্রাণশক্তি ফিরিয়া পায়। স্থলপথে ও জলপথে যান-বাহনের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে বাংলার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে তাহাও যেন বিদূরিত হয়। এক মুষ্টি অন্নের জন্যে যে কৃষক তাহার জমি বিক্রয় করিয়াছে, তাহা যেন সে ফিরিয়া পায়, একমুষ্টি অন্নের জন্য যে সমস্ত শিশু ও নারীরা গৃহহীন ও অভিভাবকহীন হইয়া গিয়াছে তাহারা যেন আবার সমাজে স্থান পায়, যুদ্ধোত্তর কালে ভাবী বেকারগণ পুনরায় যেন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে—এই ভাবে দেশে শিল্প-কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যান-বাহন প্রভৃতির উন্নতি বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উৎপাদন, খাদন এবং বণ্টন-ব্যবস্থার, বিশেষ করিয়া বণ্টন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনের একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্য ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি বণ্টন ব্যবস্থার উপর বিশেষ করিয়া চাপ দিয়াছেন :—

"Distribution is the vital corner stone of any planned economy and evils of industrialisation can and should be avoided if there is any equitable system of distribution. In the national plan for India, a proper scheme of distribution must, therefore, be considered as essential." সেই জন্য আজ আমরা পিপাসায় উৎকণ্ঠিত চাতকের ন্যায় চাহিয়া রহিয়াছি—দেশে আবার কবে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়া আসিবে, বাংলায় লক্ষ্মীশ্রী ফুটিবে—সেই দিনই সমস্ত পরিকল্পনা সার্থক পরিকল্পনায় পর্য্যবসিত হইবে।

পুস্তক ও আলোচনা

সীতা ঃ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

সমালোচক হিসাবে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংলাসাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মৌলিক রচনাও তাঁহার বিভিন্ন পত্রে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে কবি ও কথাসাহিত্যিক হিসাবেও তিনি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া নিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে জনকদুহিতা সীতাকে কেন্দ্র করিয়া বন্দিনী বাংলা তথা ভারতের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সীতা এখানে ভারতবর্ষের প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া রাবণের অত্যাচারে লাবণ্যময়ী সীতা নির্য্যাতিতা। বীর ব্যঞ্জনা ও করুণার রসে রচনা পাঠক-চিত্তকে মুগ্ধ করে। পৌরাণিক কাহিনীকে নূতন সজ্জায় প্রকাশ করিয়াই মাত্র কবি এখানে বিশিষ্ট শিল্পী-মনের পরিচয় দেন নাই, তাহার সঙ্গে স্বদেশলক্ষ্মীকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তিনি যে বীর-মাধুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব্ব, এবং এই কারণেই গ্রন্থখানি সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

বিপ্লব ঃ শ্রীরণজিৎ কুমার সেন প্রণীত। ঊষা পাব্লিশিং হাউস। ৩৪, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৸৹ আনা মাত্র।

পুস্তকে দশটি ছোট গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পের বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনে বৈশিষ্ট্য আছে। কুলীর জীবনে মহাযুদ্ধের সংঘাত, দুর্ভিক্ষের আক্রমণে দরিদ্র নিপীড়িতের দুর্দ্দশা, কেরাণী জীবনের দুর্ব্বহ অভিশাপ হতে আরম্ভ করে, সমাজ-জীবনে লোকচক্ষুর অগোচরে সমানই মর্ম্মান্তিক মানসিক দুঃখ-দুর্দ্দশার ছবি এ গল্প-গুলিতে স্থান পেয়েছে। প্রেমে হতাশা, এমন কি পুত্রবধূর নির্য্যাতনে বৃদ্ধ শ্বশুরের দুরবস্থার কাহিনী বাদ পড়ে নি।

লেখকের বর্ণনাভঙ্গী মনোহর, লেখনী প্রচুর শক্তি ধরে। আপাতদৃষ্টিতে যা সামান্ত বিষয় মনে হবে, বর্ণনা-চাতুর্য্যে তা অতি মনোহর বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্পগুলি খেয়াল বশে গ্রথিত বিক্ষিপ্ত রচনা নয়। লেখকের চিন্তাশীল মন তাদের মধ্যে একটি মূল ভাবধারা ফুটাতে চেষ্টা করেছে সেইটিই তাদের সংযোগসূত্র। 'শেষ কথায়' লেখক নিজেই তার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের মন প্রাচীরবেষ্টিত সংরক্ষিত বস্তু নয়। তার পারিপার্শ্বিক অহরহ তাকে দোলা দিচ্ছে। সেই পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে তার মনে যে আবর্ত্ত বা আলোড়ন সৃষ্টি হয়—তাই হল মনের বিপ্লব। এই বিপ্লবের নানা মূর্ত্তি তাঁর গল্পগুলির বিষয়-বস্তু।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস

উপনিষদ্-দর্শন ঃ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১২, বিপিন পাল রোড, কালিঘাট, কলিকাতা। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

কবি ও কথাসাহিত্যিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে হিরণ্ময়বাবু সুপরিচিত। কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক পরিচিত তিনি পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে। উপনিষদ্-দর্শনে তাঁহার যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারশীল চিন্তাধারা ও পাণ্ডিত্যের বহুমুখিতা প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা বাংলা সমাজে আজ বিরল। নানা-ভাগে বিভক্ত উপনিষদ, সেইগুলির মধ্যে সংযোগসূত্র রক্ষা করিয়া সর্ব্বজন-বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। বিষয়-নির্দ্দেশ, উপনিষদ্ নির্ব্বাচন, উপনিষদের আলোচ্য বিষয়, সৃষ্টির উৎপত্তি, সৃষ্টির রূপ, জ্ঞান, নীতি ও উপসংহার—এই অষ্টম অধ্যায়ে গ্রন্থালোচনা সম্পূর্ণ। প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে, ইহাতে লেখক যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। চিন্তাশীলতার অভাব আজ সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। এতদ্ব্যতীত জনসমাজ আজ কঠিন চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পর্য্যন্ত নারাজ। এই সময়ে এমন গ্রন্থের প্রকাশ হওয়ায় সমাজের যে মহতী উপকার সাধিত হইল, তাহা নিঃসন্দেহ। আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই শাস্ত্র-পিপাসুবৃন্দ মূল গ্রন্থাবলীর যথার্থ আভাষ পাইবেন। স্থানকালনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক লোকেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। —র

লঘুছন্দা ঃ মণীন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। বেঙ্গল পাবলিসার্স। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—এক টাকা মাত্র।

তরুণ কবি মণীন্দ্র গুপ্ত, কিন্তু ভাষা তরুণত্বকে ছাড়াইয়াও বহুদূর অগ্রগামী। যে বয়সে কাব্যরচনায় প্রথম উন্মাদনা জাগে, মণীন্দ্র গুপ্ত তাহা হইতে অনেকখানি উর্দ্ধপথে আসিয়াছেন। ভাষার দৃঢ়তায় ভাবের গুরুত্ব লক্ষ্যে পড়ে। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। লঘুছন্দার কোনো কোনো কবিতা ভাব ও ছন্দের দিক দিয়া মধুরতর। 'দ্বন্দ্ব', 'যাত্রী', 'সরম', 'মিনতি', 'প্রাত্যহিক' প্রভৃতি কবিতাগুলি এইশ্রেণীর। এতৎসত্ত্বেও কয়েকটি কবিতা অত্যাধুনিকতাদোষে বিভ্রান্ত। দুর্ব্বোধ্য শব্দচয়নকেই এক শ্রেণীর কবিরা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্যের প্রাণপ্রতিভূ বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছেন। তাঁহাদের কালো ছায়ায় ঢাকা না পড়িলে মণীন্দ্র গুপ্ত আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মরা গাঙে বান ডাকাইতে পারিবেন—এ কথা আশা করা যায়। তাঁহার ক্রমোন্নতি কামনা করি।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

শালবন ঃ শ্রীঅপরাজিতা দেবী প্রণীত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা মাত্র।

কর্ম্মের অবকাশে কিছুদিনের জন্ত শালবনের স্নিগ্ধ আবেষ্টনীতে

আসিয়া লেখিকা নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত্তগুলির মধ্য দিয়া বনপ্রকৃতিকে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, ডায়ারীর আকারে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কোথাও বা গল্পচ্ছলে তাহা মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। লেখিকা বলিতেছেন: বিজ্ঞানালোক-অন্ধ অহঙ্কারী মানব—কি তোমার জ্ঞান? কতটুকু সীমা? বিশ্বের দুর্জ্ঞেয় রহস্য তুমি একবিন্দু জানিতে পারিয়াছ কি? বার বার তোমার প্রাণান্ত অভিযান ব্যর্থ হয় নাই কি? সপ্তসাগরশালিনী সপ্তদ্বীপভূষণা মাতা বসুন্ধরার একটি কণিকাও চিনিতে পারো নাই। পারিবে, সে আশা রাখিও না। কেন আর গৃহবাস? চল বনে যাই। যে বনে বনালী আসিয়া আপনি ধরা দেয়। বন-প্রকৃতির আকর্ষণ লেখিকার জীবনে প্রবল, মানব-সমাজের কাছে তাই এই অন্তর-উৎসারিত আবেদন প্রেরণামূলক। পশ্চিম বাংলার বন-প্রকৃতির সঙ্গে যাহাদের পরিচয় নাই, গ্রন্থখানি তাহাদিগকে আনন্দ দিবে। —র,

এলোমেলো: কবিতা। শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাউদার্ন পাব্লিসার্স, ৭ বসন্ত বসু রোড, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা মাত্র।

ছোট বড় ছাব্বিশটি কবিতার সমষ্টি। 'সিম্‌প্লি সে-শুধু খুকী' শিরোনামায় কবিতা আরম্ভ। স্থানবিশেষে নিকৃষ্টতর পদ্ধতিতে রচনা ও বর্ণনার প্রকাশ প্রকটিত। রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতা লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আধুনিক কবি-সমাজে পূর্ণ আত্মসমাহিত ভাব ও সংযম আসিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই আধুনিকতার তরঙ্গ-উচ্ছ্বলিত কাব্যসাহিত্যের উন্নতি নাই। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের যথেষ্ট কাব্যশক্তির পরিচয় আছে। অনেকস্থলেই লেখক নিজের অজ্ঞাতে ও সজ্ঞানে স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কাব্যকুঞ্জে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছেন। কয়েকটি কবিতায় যেখানেই তিনি ইংরেজি শব্দ ও উদ্ভট বাক্যরীতির প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কবিতার সেইখানেই মৃত্যু হইয়াছে। মিল বা অমিলে যথেচ্ছ শব্দের ব্যবহারেই রচনা কবিতা হয় না—এ কথা লেখক উপলব্ধি করিলে ভবিষ্যতে তিনি ভাল কবিতা লিখিবেন—বলা যায়।

—অ, ক, ভ

হাজার বছর পরে আমাদের কবি: রবীন্দ্রালোচনামূলক প্রচার-নাটিকা। শ্রীসতীকুমার নাগ। চয়নিকা পাব্লিসিং হাউস, ৪২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—পাঁচ আনা মাত্র।

আজ হইতে এক হাজার বৎসর পরে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, আলোচ্য-গ্রন্থে লেখক তাহারই কিছুটা আভাষ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখক শিশু-নাটক রচনায় কুশলী। ক্ষীণকায় পুস্তক হইলেও ইহাতেও সেই নাটকীয় উপাদানের অভাব অনুভূত হয় না। তবে ভাব সম্পদের দিক হইতে পুস্তকটি যথেষ্ট সার্থক নয়।

(ক) **শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত**: পঞ্চম খণ্ড। ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস। ৪১-সি, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—পাঁচ সিকা (গ্রাহক পক্ষে) ১৲ টাকা মাত্র।

(খ) **শ্রীশ্রীত্রয়োদশ দশা-মাধুরী**: কবিতা। শ্রীপাদ শিশুরাজ মহেন্দ্রজী। দাম ১৲ টাকা মাত্র।

(ক) কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভূমিকা-সম্বলিত কবিতায় শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর জীবনী। পূর্ব্বে আমরা ইহার চারি-খণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। পরিমলবন্ধু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর শিষ্য। গুরুর জীবনী সঙ্কলনে তাঁহার এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

(খ) শিশুরাজ মহেন্দ্রজী সারা জীবন শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর সান্নিধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুর মন্ত্রদীক্ষিত শিষ্য মহেন্দ্রজী। আজীবন ব্রহ্মচর্য্যপালনের মধ্য দিয়া সংযমিচিত্তে গুরুর পূজা করিয়া ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া সম্প্রতি মহেন্দ্রজী দেহরক্ষা করিয়াছেন। কাব্যসাহিত্যে তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতায় তাঁর একনিষ্ঠ গুরু-বন্দনা প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"জাতির জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জাতীয় অবস্থার কিরূপ তারতম্য হয়, তাহা দেখাইয়া দেওয়াই ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব। যে ইতিহাস ঐ সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয় সেই ইতিহাস মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়, উন্নতি-সাধক এবং অবশ্য-পাঠ্য। মানুষের জ্ঞানের, কর্ম্মশক্তির এবং কর্ম্মের কোন্ অবস্থা হইতে তাহার সাংসারিক ও রাষ্ট্রীয় কোন্ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বিচার না করিয়া যে ইতিহাস লিখিত হয়, সে ইতিহাস কখনও ভ্রান্তিহীন ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।"

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর শান্তি-সমস্যা ও উহার সমাধান

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান আবশ্যক, যথা :—

১। বর্ত্তমান যুদ্ধের নিরাপদ অবসান ; ২। সর্ব্বশ্রেণীর যুদ্ধ নিবারণ ; এবং ৩। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীকরণ ও নিবারণ। এবং ইহাও বলিয়াছি যে ঐ তিনটী সমস্যার সমাধান করিতে হইলে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীর কার্য্য সাধন করিতে হইবে, যথা :

১। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ও নিবারণ করিবার পরিকল্পনা স্থির করিবার কার্য্য ;

২। উপরোক্ত পরিকল্পনানুসারে ভারতবর্ষের সংগঠন করিবার এবং প্রত্যেক দেশের আহার ও বিহারের সামগ্রীর অভাব (deficit) পূরণ করিবার পরিকল্পনা স্থির করিবার কার্য্য ;

৩। উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণের, বিশেষতঃ বিপক্ষের, জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার কার্য্য ;

৪। সমগ্র মানবসমাজের, বিশেষতঃ বিপক্ষের, জনসাধারণ যদ্যপি প্রথম পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তাহাদিগের সর্ব্ববিধ আহার-বিহারের সামগ্রীর অভাব পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার কার্য্য ; এবং

৫। ভারতবর্ষের সংগঠনের উপরোক্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রত্যেক দেশের, বিশেষতঃ বিপক্ষীয় দেশসমূহের প্রতিনিধি আহ্বান করিবার কার্য্য।

আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যের মূলগত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ঐ দুইটী কার্য্য সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর কার্য্য সাধন করা আবশ্যক। এইবারে আমরা তদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এই কথা স্বীকৃত যে, যুদ্ধ করা সহজ কিন্তু শান্তি স্থাপন ও রক্ষা করা কঠিন। বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ চলিতে থাকাবস্থায় শান্তি স্থাপন করা অধিকতর কঠিন। অথচ, যুদ্ধজর্জ্জরিত সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। শান্তি স্থাপন করা আর নেতৃবর্গের খেয়ালের বিষয় নাই ; শান্তি স্থাপন করিতেই হইবে এবং অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; অন্যথায় মানবসমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে! নেতাগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং শান্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে বৈঠকের পর বৈঠক আহ্বান করিতেছেন ; নানা বিষয়ের আলোচনাও হইতেছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহারা চিরাচরিত সেই ভুল পথেই শান্তির সন্ধান করিতেছেন। সমর-বলে বিশ্বাসী যুদ্ধসারথিগণ সমর-বলের সাহায্যে তথাকথিত শান্তিসর্ত্ত নির্দ্দেশ করিতে চাহেন ও করিতেছেন। তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না যে, সমর-বল দ্বারা যুদ্ধে সাময়িক জয়লাভ করা যায়, কিন্তু তাহার সাহায্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করা যায় না। গত আড়াই হাজার বৎসরের যুদ্ধের ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

শান্তি স্থাপন করিতে হইলে শান্তিসাধনোপযোগী কতকগুলি ব্যবস্থার আবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধের মত যুদ্ধ চলিতে থাকাবস্থায় ঐ সকল ব্যবস্থার নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমতঃ, কি কি ব্যবস্থা করিলে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত ও রক্ষিত হইতে পারে, তাহা নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হয় ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল ব্যবস্থা সাধন করিতে কিরূপ সঙ্ঘগত সংগঠনের প্রয়োজন, তাহাও নির্ভুল ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হয় ; তৃতীয়তঃ, ঐরূপ সংগঠন সাধন করিবার জন্য একটী পরিকল্পনা স্থির করিতে হয়, এবং চতুর্থতঃ, মানুষের মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যেরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইলে ঐ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত করা যায় সেইরূপ আবহাওয়া সৃজন করিতে হয়। সেইরূপ আবহাওয়া সৃজন করিতে হইলে প্রথমতঃ, পৃথিবীর জনসাধারণের মনে এমন বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে, প্রস্তাবিত শান্তির ব্যবস্থাগুলি সাধিত হইলে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য ও অভাব নিবারিত ও দূরীভূত হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, যে সঙ্ঘগত সংগঠন দ্বারা ঐ ব্যবস্থাগুলি সাধিত হইবে সেই সংগঠনের প্রতি প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জন্মাইতে হইবে ; এবং তৃতীয়তঃ, ঐরূপ সংগঠনের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যাহাতে সমস্ত দেশের সমস্ত জাতি আন্তরিকভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ মনোভাব জাগরিত করিতে হইবে।

পূর্ব্বকথিত পাঁচ শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ ও তদ্‌সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা-বিষয়ক এবং অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর কার্য্য উপরোক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি-বিষয়ক।

শান্তি স্থাপনের কার্য্যে উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ ও পরিকল্পনা যেমন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, উপরোক্ত আবহাওয়াও তেমনিই প্রয়োজনীয়। এইরূপ আবহাওয়া সৃজন করিতে না পারিলে শান্তি স্থাপনের কোন ব্যবস্থা বা সংগঠন কার্য্যে পরিণত হইবে না ও হইতে পারে না। নেতাগণ মনে করিতেছেন যে তাঁহাদের স্বপক্ষীয় জাতিসমূহ তাঁহাদের সহিত মিলিত থাকিলেই তাঁহারা শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, বিপক্ষীয় জাতিসমূহের সহিত মিলনের কোন আবশ্যকতা নাই। অথচ ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, যুদ্ধে বিধ্বস্ত জাতি সমর-বলের পেষণে আত্মসমর্পণ করিলেও তাহাদের মনে যুদ্ধপ্রবৃত্তি জাগরূক থাকে এবং সুযোগ সুবিধা পাইলেই ঐ প্রবৃত্তি তীব্রতর হইয়া পুনরায় যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। নেতাগণ যে এই সত্য জানেন না, তাহা আমরা মনে করিতে পারি না। কারণ, গতবারের মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মান জাতি আত্মসমর্পণ করিয়াও যে পুনরায় সুযোগ পাইয়া এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজন করিয়াছে, ইহা নেতাগণ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই জন্যই এইবার জার্ম্মানীকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া সামরিক বলের

শাসনাধীনে রাখার ব্যবস্থা চলিতেছে। সুতরাং আমরা বলি না যে, নেতাগণ উপরোক্ত সত্য জানেন না। তবে আমাদের মনে হয় যে নেতাগণ ইহা জানেন না যে, বিপক্ষকে সমরবলে পরাভূত না করিয়াও যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করা যায় এবং সেইরূপ জয়লাভে বিজেতা ও পরাজিত জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে মিলন সংগঠিত হইতে পারে। বিপক্ষ যদি স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, তবে যে অপর পক্ষ সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে পারে এবং বিজেতা ও পরাজিত সকল জাতি আন্তরিক ভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পাবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এইক্ষণ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে যে কি কি কার্য্য করিলে বিপক্ষ ঐরূপ আন্তরিক-ভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, জয়াভিলাষী পক্ষ যদি অনুসন্ধান করে যে, বিপক্ষ কেন নিজেদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং যে সমস্ত অভিযোগবশতঃ তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত অভিযোগ দূর ও নিবারণ করিবার প্রতিশ্রুতি বিপক্ষের বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রদান করে এবং ঐ সমস্ত অভিযোগ দূর ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সাধন করে, তবে বিপক্ষ আন্তরিক ভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে ও মিত্রভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান যুদ্ধের মূলে হিটলারের অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছা বিদ্যমান থাকিলেও জার্ম্মান জাতির ধনগত অভাব যদি না থাকিত, তবে হিটলার জার্ম্মানীর জনসাধারণকে এই মহাধ্বংসকারী যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ বা নিয়োজিত করিতে পারিত না, ইহা শুধু আমাদের অভিমত নহে, বহু দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিও এই অভিমত পোষণ করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, অ্যাক্সিস্ পক্ষের জনসাধারণ তাহাদের ধনগত অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তাহাদের সাম্রাজ্যের প্রসার সাধন করিবার জন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং মিত্রপক্ষও তাঁহাদের ধনগত অভাব যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, পক্ষান্তরে উহা পূরণের নূতন সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হয়, তদুদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং যদি কোন পক্ষ বিপক্ষের জন-সাধারণের ধনগত অভাব সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি ঐ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রদান করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির, বিশেষতঃ বিপক্ষের জনসাধারণের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব মোচনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সমূহ এবং ঐ সকল ব্যবস্থার সাধনোপযোগী সংগঠনের পরিকল্পনা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন, তবে বিপক্ষ স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করিবেন এবং অপর পক্ষ সর্ব্বতোভাবে জয়লাভে সমর্থ হইবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে ইহা সত্য যে, মিত্রপক্ষের নেতাগণ উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি দিতে সাহসী হইবেন না; কারণ বিপক্ষের ধনগত অভাব পূরণের ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, এবং যদিইবা ঐরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তবে তাহা বিপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। এবং ইহাও সত্য যে, মানুষের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব মোচনের উপযুক্ত ব্যবস্থা কি হইতে পারে তাহাও ঐ নেতাগণের জানা নাই; যদি জানা থাকিত, তবে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র ভারতবর্ষের আছে; এবং মানুষের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব মোচনের ব্যবস্থা কি হইতে পারে, তদ্‌সম্বন্ধে জ্ঞানও একমাত্র ভারতবর্ষেরই আছে। ভারতবর্ষের ঐরূপ বৈশিষ্ট্যের কারণ কি; তাহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইবে যে, ভারতবর্ষের পক্ষে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সুযোগ কোথায়? এবং মিত্রপক্ষই বা ভারতবর্ষের ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন কি প্রকারে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সুযোগ নাই বটে এবং মিত্র-পক্ষকে বিপক্ষ বিশ্বাস করিবে না ইহাও সত্য; তবে যদি মিত্রপক্ষ আমাদের পূর্ব্বকথিত পরিকল্পনা দুইটি সমস্ত জাতির, বিশেষতঃ বিপক্ষের, জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করেন এবং ঐ পরি-কল্পনানুসারে ভারতবর্ষের নূতন সংগঠন করিয়া তথায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মস্থল স্থাপন করেন এবং ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক দেশের, বিশেষতঃ বিপক্ষের, প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করেন এবং ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে উপরোক্ত রূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা যায়, তবে বিপক্ষীয় সাধারণ সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করিবেন এবং স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করিবেন।

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর কার্য্য সাধন করিতে পারিলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির জনসাধারণ তাহাদের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও অভাব মোচন বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে এবং আন্তরিক ভাবে মিলিত হইয়া পূর্ব্বকথিত পরিকল্পনাসমূহ সহজে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে। তবেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত ও রক্ষিত হইবে।

শান্তি স্থাপনের অন্য পন্থা নাই। স্যানফ্রান্সিস্কো সহরে মিলিত প্রতিনিধিগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা শান্তির পথ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে তথায় সম্মিলিত বড় জাতি সমূহের (big nations এর) প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতেছে কেন? ছোট জাতিসমূহ (Small nations)-ই বা বড় জাতি সমূহের প্রতি বিশ্বাস হারাইতেছেন কেন? ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, শান্তি স্থাপনের পক্ষে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি ছোট জাতিসমূহের জনসাধারণের হিতকারী নহে এবং বড় জাতিসমূহের মধ্যেও কেহই স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পৃথক পৃথক মতবাদী ও আদর্শবাদী জাতিসমূহের মধ্যে তৎসংক্রান্ত কোন প্রস্তাবে একমত হওয়া সম্ভব নহে। যদিইবা অধিকাংশের ভোটের দ্বারা কোন প্রস্তাব বা ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তাহা আন্তরিকভাবে মিলিত কার্য্যের অভাবে কার্য্যে পরিণত হইবে না। শান্তিও স্থাপিত হইবে না।

যাহা হউক, প্রতিনিধিগণের চূড়ান্তরূপে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ প্রকাশিত হইলে পর আমরা তদ্‌সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। তবে, দ্বিরুক্তিদুষ্ট হইলেও, আমরা আবার বলিব যে,

মানুষকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য ও অভাব দূর ও নিবারণ করিবার ব্যবস্থা না হইলে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইবে না এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার বড় বড় কথা শুধু বাক্যেই পর্য্যবসিত হইবে।

আমাদের কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ ইউরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতি। ইউরোপের যুদ্ধের অবসান ঘোষিত হইয়াছে; জয়োল্লাসও যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ জয়ের সঙ্গেই বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলকে কোয়ালিসন মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া দলগত মন্ত্রীসভা গড়িতে হইয়াছে। অর্থাৎ যে চার্চ্চিল বৃটিশ জাতির একচ্ছত্র নেতা ছিলেন, তিনি আর একচ্ছত্র নেতা নাই; তিনি আজ দলগত নেতা। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার উপর আর বৃটিশ জাতির সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আস্থা নাই। অর্থাৎ, জনসাধারণের মনে এই ধারণা জাগরিত হইয়াছে যে, মিঃ চার্চ্চিল তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব-অভিযোগ মিটাইবেন না বা মিটাইতে সক্ষম নহেন। দুই দলের হস্তেই অস্ত্র আছে এবং তাহাদের মনে যুদ্ধপ্রবৃত্তিও বর্ত্তমান আছে। অভাবগ্রস্ত জনসাধারণের যুদ্ধপ্রবৃত্তি অভাবের তাড়নায় অন্তর্বিপ্লবে পরিণত হইবে কিনা কে জানে? যাহাই হউক না কেন, বিজেতা জাতির মনেও যে আজ শান্তি নাই তাহা সত্য এবং জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার অভাব ও অভিযোগ না মিটিলে যে তাহাদের দেশে শান্তি আসিবে না, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

রাশিয়া ভিন্ন ইউরোপের অপর দেশসমূহের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক। যুদ্ধের অবসান হইয়া থাকিলেও স্থানে স্থানে এখনও গোলাবর্ষণ চলিতেছে। কোন্ দেশ বা কোন্ দেশাংশ কোন্ শক্তির অধীনে থাকিবে, তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই। তদুপরি, সর্ব্বত্রই খাদ্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষের দারুণ অভাব; ঐ সকল অভাব পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও জনসাধারণের সম্মুখে নাই। এই অবস্থা আরও কিছুদিন চলিলে তথায় যে পুনরায় যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

মানুষ চাহিতেছে শান্তি, কিন্তু যাহারা সেই শান্তির বিধান করিবে, তাহারা করিতেছে রাষ্ট্রশক্তি নিয়া কাড়াকাড়ি। মানুষের অদৃষ্টের কি পরিহাস।

কলিকাতার বস্তি-উন্নয়ন

দীর্ঘকাল পরে কলিকাতার বস্তি-উন্নয়নে উদ্যোগ দেখা গিয়াছে। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বাংলার গভর্ণর মিঃ আর, জি, কেসীর সভাপতিত্বে এক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তাহাতে বস্তি-উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়: এই উন্নয়নের প্রথম উদ্দেশ্যে—বর্ত্তমান বস্তিসমূহে উন্নত ধরণের আলো, স্বাস্থ্য-রক্ষা, গৃহ-বিন্যাস, জল সরবরাহ এবং আবর্জ্জনাদি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণর একটি আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণর একটি আইন প্রণয়নের নির্দ্দেশ করিয়াছেন! কোনো একটি অঞ্চল ঠিক করিয়া তাহার উন্নয়নের নির্দ্দেশ দানের জন্য এই আইনে গভর্ণরকে ক্ষমতা দানের ব্যবস্থা করা হইবে। আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন এবং ইমপ্রুভ্মেণ্ট্ ট্রাষ্টকে কোনো একটি বস্তি মনোনীত করিতে এবং প্রস্তাবিত আইনানুসারে উহার উন্নয়নের জন্য আবর্জ্জনা পরিষ্কারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে ও খোলা ড্রেন নির্ম্মাণ ইত্যাদির পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে বলা হইয়াছে। পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে বস্তিবাসীদের গৃহাদির পুনর্গঠন এবং পরিষ্কার বস্তি অঞ্চলের ব্যবস্থা করা। ইহার ফলে বস্তিবাসীদের জন্য অস্বাস্থ্যকর আবাসস্থলগুলির স্থলে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিকল্পিত এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদি সম্মত গৃহাদি সহরের মধ্যে অথবা সহরের বাহিরে নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে কর্পোরেশনকে ১০,০০০ হাজার বস্তিবাসীর জন্য ছোট ছোট কামরাসহ গৃহ নির্ম্মাণের এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে ১২,৫০০ বস্তিবাসীর জন্য উপনিবেশ নির্ম্মাণের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুরোধ করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টের ... বস্তি অঞ্চলসমূহের অবস্থা যথেষ্ট উন্নততর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, বস্তি-উন্নয়নের জন্য এত আগ্রহ কি বস্তিবাসীদের উপকারের জন্য, না, নোংরা বস্তিতে পরিপূর্ণ কলিকাতা নগরীর কলঙ্ক অপসারণ অথবা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য, গভর্ণর বাহাদুর এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি? যদি বস্তিবাসীদের প্রতি দরদ থাকিত, তবে আজও যে তাহারা গভর্ণমেণ্টকৃত দুর্ভিক্ষাবস্থার ভিতর পড়িয়া মরিয়া বাঁচিয়া বা বাঁচিয়া মরিয়া দিন কাটাইতেছে, সেই দিকেও গভর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি থাকিত। বস্তিবাসীদের উপার্জ্জনের পরিমাণ অতিশয় কম, তাহা গভর্ণর বাহাদুর নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু তাহারা যে আজও ১৬৷০ আনা মন দরে কন্ট্রোলের দোকান হইতে চাউল (এবং অধিকাংশ সময়েই মানুষের অখাদ্য চাউল) কিনিতে বাধ্য হইতেছে এবং অনেকেই খরিদ-শক্তির অভাবে আধপেটা থাকিয়া দিন দিন শক্তিহীন হইতেছে, সেই দিকে গভর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি নাই কেন? কলিকাতার বাহির হইতে ৮৲।১০৲ টাকা মন দরে চাউল কিনিতে পারিলেও তাহারা ঐরূপ সস্তাদরে চাউল কিনিয়া আনিলে তাহাদিগকে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের কবলে পড়িয়া শাস্তি পাইতে হয়, এই দিকেই বা গভর্ণরবাহাদুরের দৃষ্টি নাই কেন? তাহারা এপিডেমিকে মরিয়াছে ও মরিতেছে বলিয়া তাহাদের বস্তি-উন্নয়নের জন্য গভর্ণমেণ্ট খুব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, অথচ উপযুক্ত খাদ্যাভাবে যে তাহারা সহজে এপিডেমিকের করাল কবলে পড়িতেছে, সেই কারণ দূরীভূত না করিয়া তাহাদের বাসস্থল উন্নয়ন করিলে তাহাদের কতখানি উপকার হইবে, তাহা গভর্ণরবাহাদুরকে বিবেচনা করিতে আমরা অনুরোধ করি।

হাওড়া-বৰ্দ্ধমান কর্ড লাইনে ট্রেণ-দুর্ঘটনা

গত ২১শে মে সোমবার রাত্রি ১০।০ ঘটিকার সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া-বৰ্দ্ধমান কর্ড লাইনে হাওড়া হইতে ১৭ মাইল দূরে মণিরামপুর ষ্টেশনের নিকটে এক গুরুতর ট্রেণ সংঘর্ষ হয়। হাওড়া হইতে সাহারানপুরগামী ৮৩নং আপ্ পার্শেল এক্সপ্রেস ট্রেণখানি এক মালগাড়ীর পিছনে যাইয়া ধাক্কা দেওয়ার ফলেই এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকাশ, উক্ত ষ্টেশনের নিকটে কর্ড লাইনের উপর দিয়া একখানা মালগাড়ী চলিতেছিল। ঐ লাইনের এক্সপ্রেস ট্রেণখানির পথ মুক্ত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ঐ চলতি মালগাড়ীখানিকে সান্টিং করিয়া কর্ড লাইন হইতে এক লুপ লাইনে লইয়া যাওয়া হইতেছিল; ইত্যবসরে উক্ত এক্সপ্রেস ট্রেণখানি কর্ড লাইনে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং উহার সহিত মালগাড়ীটির পিছন দিকের প্রবল সংঘর্ষ হয়।

এইরূপ দুর্ঘটনার ইতিহাস এই নতুন নয়। বি, এণ্ড এ, আর, ও ই, আই, আর, লাইনে এইরূপ ট্রেণ দুর্ঘটনা লাগিয়াই আছে। ইহা যে রেলকর্তৃপক্ষের অযোগ্যতার পরিচয়, তাহা নূতন করিয়া উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। বার বার এই অসাবধানতার জন্য এতদ্দেশীয় শত শত লোক প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন—তাহা গভর্ণমেণ্ট জানেন। কোন স্বাধীন দেশে পুনঃ পুনঃ এইরূপ দুর্ঘটনা হইলে গভর্ণমেণ্টের বিচার হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। এইসব দুর্ঘটনার ফলে শুধু লোকক্ষয়ই নয়, আর্থিক দুর্গতিও যাহা ঘটে, তাহা বক্তব্যের বাহিরে। ফল যাহাই হউক, জনসাধারণের পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ চাহিলে হয়ত ভুল করা হইবে না যে, এইরূপ অপমৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কাহারা? তাঁহাদের পরিচালনা-কার্য্য কেন পরিবর্ত্তিত হইবে না!

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চাউলের ব্যবসা ও তাহার প্রতিক্রিয়া

১৯৪৩ সনে যখন চাউলের অভাবে এবং দুর্ম্মূল্যতানিবন্ধন ক্রয় শক্তির অভাবে চাউল না পাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছিল, তখন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ঠিক করিলেন যে তাঁহারা ধান চাউল কিনিয়া তাহা অভাবগ্রস্ত স্থানসমূহে সরবরাহ করিবেন এবং কম মূল্যে বিক্রয় করিবেন! মেসার্স ইস্পাহানী কোং প্রভৃতির নিকট হইতে তাঁহাদের খরিদা খুবই কম মূল্যের চাউল গভর্ণমেণ্ট ৩১৲ টাকা মণ দরে খরিদ করিয়া চাউলের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ধান চাউলের দরও বাঁধিয়া দিলেন। সেই অবধি গভর্ণমেণ্ট ধান, চাউলের ব্যবসা করিতেছেন। যে সমস্ত মহকুমার বা জিলায় অতিরিক্ত (surplus) ধান জন্মে, গভর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত মহকুমা ও জিলার ধানের ও চাউলের একচেটিয়া খরিদ্দার হইলেন। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত অপর কোন ব্যবসায়ী ধান বা চাউল খরিদ করিতে পারিবে না, এইরূপ আদেশ জারী হইল।

গভর্ণমেণ্ট ধান কিনিয়া তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করাইয়া ঐ চাউল নানা জিলায় ও মহকুমায় মজুত করিতে থাকিলেন এবং তথা হইতে গভর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত বা মনোনীত দোকানদার ঐ চাউল কিনিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। গভর্ণমেণ্ট ধান ও চাউলের উচ্চতম দর বাঁধিয়া দিলেন। আমাদের দেশে কনট্রোলের উচ্চতম দরই যে নিম্নতম হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সকলেই জানেন। ধান ও চাউলের ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের প্রতিক্রিয়া কি প্রকার হইয়াছে, তাহা আমরা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি:—

১। গভর্ণমেণ্ট একচেটিয়া খরিদ্দার থাকার দরুণ, অতিরিক্ত উৎপন্নকারী (surplus) জিলা বা মহকুমায় ধানের ও চাউলের দর খুব কম হইয়া গিয়াছে; কারণ চাষীরা গভর্ণমেণ্টের লোক ভিন্ন অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টগণ যে দরে গভর্ণমেণ্টকে চাউল কিনিয়া দিবার চুক্তি আছে (সেই দর গভর্ণমেণ্ট এসেম্ব্লীতে বা কুত্রাপি প্রকাশ করেন না), এজেণ্টগণ সেই দর অপেক্ষা কম দরে ঐ চাউল কিনিয়া গভর্ণমেণ্টকে দিয়া থাকে। এই যে লাভ—তাহা এজেণ্টগণের উপরি লাভ, কারণ এজেণ্টগণ চাউল কিনিয়া দেওয়ার জন্য কমিশন পাইয়া থাকেন।

ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, তথাকার চাষীরা খুব কম দর পাইতেছে, অন্য পক্ষে গভর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের প্রিয়তম পোষ্য ঐ এজেণ্টগণ অতিরিক্ত লাভ করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট নিজে ঐ খরিদমুখে কি লাভ করেন, তাহা বাজেটে বা কুত্রাপি দেখান না। আমাদের মনে হয় যে হিসাবে তাহা দেখান হয় না। গভর্ণমেণ্ট যদি বলিতে পারেন যে, তাহা হিসাবে দেখাইয়া থাকেন, তবে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

২। যে সমস্ত জিলায় বা মহকুমায় ধান-চাউলের চাহিদা অপেক্ষা উৎপন্ন কম, সেই সমস্ত (deficit) জিলায় ও মহকুমার আমদানী না থাকায় ধান ও চাউলের দাম অত্যন্ত বেশী এবং তাহা গভর্ণমেণ্টের বাঁধা উপরোক্ত উচ্চতম দর অপেক্ষাও বেশী দরে বিক্রয় হইতেছে। এই অবস্থার প্রতি বহুবার এসেম্ব্লীতে ও খবরের কাগজের মারফতে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেইদিকে দৃষ্টি দেন নাই, কারণ বাজার-দর বেশী হইলে ব্যবসায়ী গবর্ণমেণ্টের লোকসান নাই, পক্ষান্তরে বাজার-দর উচ্চে রাখাই গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ।

৩। গবর্ণমেণ্টের চাউল সরবরাহের পদ্ধতি অনুসারে মফঃস্বলের সহর ও ইউনিয়নের নিযুক্ত বা মনোনীত দোকানদার নগদ টাকা দিয়া খুসীমত পরিমাণ চাউল গবর্ণমেণ্টের ষ্টক হইতে কিনিয়া নিয়া বিক্রয় করেন। ঐ সমস্ত দোকানদার প্রায়শঃই সামান্য মূলধন নিয়া কারবার করেন, তজ্জন্য তাঁহারা স্ব স্ব এলাকার চাহিদা অনুসারে চাউল খরিদ করেন না। একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একটি ইউনিয়নে প্রতি মাসে চাউলের দরকার যেমন ১৫০০/ মণ, তথাকার দোকানদারগণ খরিদ করিয়া নেয় উর্দ্ধপক্ষে ২৫০/ মণ। সুতরাং ঐ সকল (deficit) এলাকায় সর্ব্বদাই ধান-চাউলের অভাব বর্ত্তমান থাকে ও আছে; তজ্জন্য মূল্যও খুব বেশী।

৪। এক মহকুমায় চাষী ধানের দাম কম বলিয়া চীৎকার করিতেছে, অন্য এক মহকুমায় জনসাধারণ ধান ও চাউলের দাম

বেশী বলিয়া চীৎকার করিতেছে। যেমন—দিনাজপুর (surplus) জিলার কাটাবাড়ী মোকামে ধানের দাম উর্দ্ধপক্ষে ৬৲ টাকা মণ, অল্পপক্ষে মাদারীপুর থানায় ধানের দাম প্রতি মণ ১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা এবং চাউলের দাম ১৬৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা।

৫। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত (deficit) মহকুমায় ও বন্দরে চাউল মজুত রাখিয়াছেন। ঐ চাউল খারাপ থাকায় জনসাধারণ তাহা স্বেচ্ছায় খরিদ করিতে চাহে না। জনসাধারণকে গবর্ণমেণ্টের চাউল কিনিতে বাধ্য করার জন্যই গবর্ণমেণ্ট তাহাদের চাউল (অল্পমূল্যে খরিদ করা চাউলও) পূর্ব্বোক্ত বাঁধা দর অপেক্ষা কম দরে বিক্রয় করিবেন না—এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে জনসাধারণ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃখ-কষ্ট পাইতেছে।

৬। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মফঃস্বলে তাহাদের মজুত করা খারাপ চাউল প্রতিমণ ৮৲ টাকা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তজ্জন্য মহকুমার হাকিমগণ এজেণ্ট বা ব্যবসায়ী মনোনীত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঐ সকল এজেণ্ট ও ব্যবসায়ী গবর্ণমেণ্টের চাউল ৮৲ টাকা দরে কিনিতেছেন কিন্তু বাজার-দর পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। মহকুমার হাকিমগণ তাহা নিশ্চয়ই দেখিতেছেন বা জানিতেছেন, কিন্তু প্রতিকার করিতেছেন না।

৭। উপরোক্ত কারণে কলিকাতার বাহিরে অভাবগ্রস্ত (deficit) জিলা ও মহকুমাসমূহের দরিদ্র চাষী ও জমিহীন জনসাধারণ বিশেষতঃ দরিদ্র মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী ও মজুর শ্রেণীর লোকসমূহ উপযুক্ত পরিমাণ ধান-চাউলের আমদানীর অভাবে এবং তাহাদের ক্রয়শক্তির অতীত মূল্যে ধান-চাউল খরিদ করিতে বাধ্য হওয়ায় সমাজের এই বৃহৎ অংশ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে চলিতেছে।

৮। কলিকাতা সহরের রেশনের অবস্থা যেমন দুঃখজনক তেমনই হাস্যকর। ঐ অবস্থার কথা দফাওয়ারী করিয়া বলিতে হয়, যথা :—

(ক) যত কম দরেই চাউল কিনিতেছেন না কেন গবর্ণমেণ্ট আজ দেড় বৎসর যাবত সেই ১৬৷০ টাকা মণ দরেই তাহা বিক্রয় করিতেছেন।

(খ) ঐ চাউল ভাল হউক, মন্দ হউক বা অখাদ্য হউক (প্রায়শঃই মন্দ ও অখাদ্য হইতেছে) তাহাই কিনিতে হইবে এবং ঐ একই দরে কিনিতে হইবে।

(গ) কলিকাতার বাহিরেই ১০৲।১২৲ টাকা মণ দরে চাউল কেনা যায়। কারণ, নিকটস্থ ডায়মণ্ড হারবার ও ক্যানিং এলাকা (surplus area) তথায় ধান চাউলের আমদানী বেশী। কিন্তু কেহ ঐ চাউল কলিকাতায় বিক্রয় করিতে আসিলে অথবা কেহ নিজের ও পরিবারস্থ লোকের শরীর রক্ষার জন্য খরিদ করিয়া আনিলে বা খরিদ করিলে, তাহাকে ভারত রক্ষা আইনের কবলে পড়িয়া শাস্তি পাইতে হয়। কত অনাথা ও দরিদ্র লোক যে শাস্তি পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এইরূপ অবস্থার কারণ এই যে—ব্যবসাদার হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবসার দিকেই লক্ষ্য করিতেছেন। জনসাধারণের দিকে নয়। সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের ও তাহাদের পোষ্য ও খাতিরওয়ালা লোকদের অবশ্য তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই, কারণ তাহাদিগকে অখাদ্য চাউল খাইতেও হয় না এবং টাকারও অভাব নাই। গবর্ণমেণ্টের উপরিতন কর্ম্মচারীদেরও কোন বালাই নাই; তাহাদের জন্য বড় বড় হোটেলের ইংরাজীখানা সাজান থাকে এবং আবশ্যক মত পেশওয়ারী চাউল ও টেবিল রাইস পাইতেও তাহাদের কোন অসুবিধা নাই।

গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত ব্যবসা চালাইবার পদ্ধতির ফলে দেশে যে কতবড় অত্যাচার ও অনাচার চলিতেছে, তাহার কোন প্রতিকারের আশা নাই। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত চাউল কিনিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের প্রত্যেককে সমান ভাবে (equitably) সরবরাহ করিবেন, এই নীতিতে আপত্তির কারণ ছিল না ও নাই; কিন্তু ঐ নীতি কার্য্যে পরিণত করার মত উপযুক্ত কর্ম্মচারী বা সংগঠন নাই, তাহা গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের জানা উচিত ছিল। মস্তিষ্কহীন ও হৃদয়হীন কতকগুলি কর্ম্মচারীর হাতে ঐ নীতি কার্য্যে পরিণত করার ভার পড়ায় বাঙ্গালার জনসাধারণের উপর এতবড় অত্যাচার চলিতেছে, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেও প্রতিকার হইতেছে না। উডহেড কমিটি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে অনেক তিরস্কার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের নিকট আমাদের সম্পাদক উপরোক্ত অবস্থাগুলি লিখিয়া জানানো সত্ত্বেও ঐ কমিটি তদ্‌প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। গবর্ণরবাহাদুরের নিকটও ঐ সকল বিষয় লিখিয়া জানান হইয়াছিল, তিনি তাহা সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন। যাহাদের অযোগ্যতা ও অসাধুতার জন্য এত বড় অত্যাচার চলিতেছে, তাহাদের নিকট প্রতিকারের আশা কোথায়?

লণ্ডন হইতে ওয়াভেল্ সাহেব কি আনিলেন?

লর্ড ওয়াভেল লণ্ডনে থাকা কালে মার্কিণ সাময়িক পত্রিকা 'টাইম্'-এ ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে—অবিলম্বে ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে; দেশরক্ষা ও অর্থবিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত দপ্তর ভারতীয়দের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অথবা ঔপনিবেশিক মর্য্যাদা পাইতেছে, সেই পর্য্যন্ত অস্থায়ী কাজ চালাইবার জন্য ক্রীপস্ প্রস্তাবের সামান্য অদলবদল করিয়া এই নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সম্প্রতি লর্ড ওয়াভেল ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি যে কি নিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখনও তিনি বলেন নাই। তবে শুনা যায় যে, যে পরিকল্পনা লইয়া লর্ড ওয়াভেল ও ভারত সচিব মিঃ আমেরীর মধ্যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে তিনটী প্রধান বিষয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ, শাসন পরিষদে সমান প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগকে সম্মত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে এবং তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সমস্ত ব্যাপার ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। ব্যবস্থা পরিষদের হাতে গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা থাকিবে এবং অনাস্থা প্রস্তাব আনিয়া শাসনপরিষদ উহা বদল করিতে পারিবে।

এ বিষয়ে খবরের কাগজে নানা প্রকার আলোচনা হইতেছে। ঐ সকল আলোচনা হইতে দেখা যায়, লর্ড ওয়াভেলের নূতন পরিকল্পনার কয়েকটী বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, যথা :—(ক) ভারত শাসন আইনে ৯ম সিডিউলের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে। (খ) বড় লাটের ভিটোর ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে। (গ) কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের পক্ষ হইতে শাসন পরিষদে নিযুক্তির জন্য কতকগুলি নামের তালিকা পেস করা হইবে; ঐ সকল নামের মধ্য হইতে বড়লাট তাঁহার ইচ্ছামত কয়েক জনকে শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করিবেন।

ইতিমধ্যেই এই নয়া ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বিগত ৬ই জুন 'হিন্দুস্থান টাইমস্'-এর এক সংবাদে প্রকাশ, লর্ড ওয়াভেল যে প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন, শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যরা উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন।

বড় লাট যখন ভারতের দাবী লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন, তখন হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক নেতাগণের চিত্ত এক নূতন আশায় দোল খাইতেছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বড় লাটের প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন। ভারতের জনসাধারণ কিন্তু কিছুই আশাও করে নাই, নিরাশও হয় নাই। ভারতের জনসাধারণ মৃতপ্রায় হইয়া আছে। তাহারা চায় মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে। সেইরূপ বাঁচার উপায় তাহারা বড় লাটের নিকট প্রত্যাশা করে না। বড় লাট যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, সেই গবর্ণমেণ্টই জানে না মানুষ কেমন করিয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। স্নতরাং বড় লাট তাঁহাদের নিকট হইতে ভারতের জন্য কি আনিতে পারেন?

ব্রহ্মের শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশনীতি

সম্প্রতি সিম্‌লা হইতে বিগত ১৭ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ: ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি বিশ্লেষণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে হোয়াইট পেপার রচনা করিয়াছেন, ব্রহ্মের গভর্ণর স্যার রেজিন্যাল্ড ডরম্যান স্মিথ তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার ডরম্যান স্মিথের বিবৃতি হইতে দেখিতে পাই—

জাপ আক্রমণের ফলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভের পথে ব্রহ্মের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশ জাপানী শাসনে ছিল। খাস ব্রহ্মের বুকের উপর যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিবার ফলে শুধু যে আর্থিক দিক দিয়াই উহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে তাহা নয়, তাহার সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই বনিয়াদের ভিত্তির উপরেই দেশের রাজনৈতিক সংগঠন শক্তিশালী হইয়া ওঠে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না আবার এই বনিয়াদ সুদৃঢ় হইবে, ততদিন প্রাক্ যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অধিবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করার জন্য এবং জাপানীদের শাসনাধীনে থাকাকালে সাধারণ জীবনযাত্রায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ফলে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকার আমূল সংশোধন প্রয়োজন হইতে পারে। এমন কি সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করার পূর্ব্বে ভোটাধিকার হয় তো নূতনভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কর্ত্তব্য হইতেছে—যুদ্ধপূর্ব্ব স্থিতাবস্থা পুনরানয়ন, ইমারতাদির সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অন্যান্য অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান এবং দেশের প্রাণস্বরূপ কৃষিকার্য্য ও শ্রমশিল্পের পুনর্গঠন। এই সকল কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে না। ব্রহ্মের শাসন ক্ষমতা সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তান্তরিত হওয়ার পরমুহূর্ত্ত হইতেই সামরিক গবর্ণমেণ্টকে এই সকল অত্যাবশ্যক কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বনিয়াদসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে যতদিন না ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে ব্রহ্মদেশ শাসন সম্ভবপর হইবে, ততদিন ১৩৯ ধারার বিধানের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই বিধানবলে গভর্ণর স্ব-হস্তে শাসনভার গ্রহণ করিবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। তবে, গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব একমাত্র গভর্ণরের হাতে থাকিলে তাঁহার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সব কিছু নির্ব্বাহ করা অসুবিধাজনক হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, সাময়িক শাসন ব্যবস্থায় ব্রহ্মবাসীদের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা গভর্ণরের উচিত। কাজেই এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ১৩৯ ধারার শাসন পদ্ধতির প্রসার বৃদ্ধির জন্য উহা সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। নূতন যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তদনুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারী ব্যক্তিদের লইয়া একটী ক্ষুদ্র শাসন পরিষদ গঠন করিতে হইবে। তবে সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র বেসরকারী ব্রহ্মীদিগকে লইয়া ইহা সম্প্রসারিত করিতে হইবে। স্বাভাবিক শাসনতন্ত্র চালু না হওয়া পর্য্যন্ত এই পরিষদের ভিতর দিয়া ব্রহ্মবাসীরা দেশের পুনর্গঠন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। সাধারণ নির্ব্বাচনের উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়া মাত্র ১৩৯ ধারা প্রত্যাহার করিয়া স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্মশাসন আইন পুনঃ প্রবর্ত্তন করাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। তখন সাধারণ নির্ব্বাচনের পর আইন সভা গঠিত হইবে এবং জাপ অভিযানের পূর্ব্বে যেরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাই পুনরায় চালু হইবে। এবং তৎপর আসিবে পূর্ণ স্বশাসনাধিকারের প্রস্তুতি। সেই সঙ্গে ব্রহ্ম যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, সে জন্য তাহার আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করিতে হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত লক্ষ্য এই যে, ব্রহ্মবাসীরা নিজেদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেরাই ব্রহ্মদেশের উপযোগী শাসনতন্ত্র রচনা করিবে।—ইত্যাদি

উদারতাশীল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহু দিন পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন যে "ব্রহ্ম পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইবে।" আজও সেই কথা বলিতেছেন। ভবিষ্যতে কোন কালেও ঐ কথাটীর নড়চড় হইবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের এক কথা!

ভারতে মার্কিন স্বার্থ

সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টাইমস্' "ভারতে মার্কিন স্বার্থ" শীর্ষক এক

প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : "ভারতবর্ষ পৃথিবীর রণক্ষেত্রগুলি হইতে অনেক দূরে অবস্থিত; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ যুদ্ধের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং যুদ্ধের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ভারতবর্ষের ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৪৩—৪৪ সালে ভারতে যে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, উহা যুদ্ধেরই সৃষ্টি! এই দুর্ব্বিপাকের দরুণ ভারতের অনন্তঃ দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। সম্ভবতঃ গত তিন বৎসরে ত্রিশ লক্ষ লোক অনশনে মারা গিয়াছে। যেখানে একজন লোক প্রাণ হারাইয়াছে, সেখানে আর দশজন লোক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে।" কথাগুলির সার্থকতা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাংশ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' লিখিয়াছেন : "ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বাজার হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ভারতে এমন এক শিল্পোন্নতির আভাস দেখা যাইতেছে—যাহাতে পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের শক্তি নিয়োজিত হইবে। কলকারখানা ও শস্য ক্ষেত্রের জন্য ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতির চাহিদা দেখা যাইবে। হাজার রকমের উৎপন্ন মাল ভারতবর্ষ চাহিবে। ...ভারতে আমাদের স্বার্থ রহিয়াছে। অন্য কোন কারণে না হইলেও স্বীয় মঙ্গলের জন্যই আমরা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বহির্ভূত মনে করিতে পারি না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না এবং ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীকরণের ভারও অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

লেখনীর ভাবাবেগ এমন বস্তু যে, ইচ্ছা করিলেই তাহার রাশ টানা যায় না; মনের কথা এক সময় সত্যকার রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়। ভারতে আজ মার্কিণের বিরাট স্বার্থ রহিয়াছে এবং নিজের 'লেণ্ড্ লিজের' ফলে বৃটেন আজ মার্কিণের কাছে বাঁধা। বৃটেনের স্বার্থ তন্নিমিত্ত যে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই! দুই পক্ষের পারস্পরিক স্বার্থের সজ্ঘাতে যে খণ্ডযুদ্ধেরও অবতারণা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? ভারতবর্ষকে দোহন করিয়া সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর বৃটেন পুষ্ট হইয়াছে, সেই সম্পদশালিনী স্বর্ণপ্রসূ ভারত প্রত্যেক বৈদেশিকেরই লোভের বস্তু। মার্কিণ সুযোগ পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি? ইংরেজ রাজত্বের এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় মার্কিণ কর্ত্তৃক ভারতপ্রীতি কোনো দিন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাগজপত্র সাক্ষ্য দেয় না; আজ হয়ত সুযোগের মধ্য দিয়া স্বার্থসিদ্ধির উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাই ভারতের দুঃখ-অনশন-দুর্দ্দশা সম্পর্কে মার্কিন এমন সবাক হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু পাকা মাথা বৃটেনের। তাহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত মার্কিন টিকিয়া উঠিতে পারিবে কি? আমরা তো রীতিমত 'শালগ্রাম' হইয়াই বসিয়া আছি! শোওয়া-বসায় আমাদের আর পৃথক অনুভূতি নাই। বৃটেনও যথেষ্ট দুঃখ ঘুচাইয়াছে, মার্কিনও ঘুচাইবে! সে দিকে বড় একটা গুরুত্ব দিবার কিছু নাই। তবে দেখিতেছি, আকাশে মেঘ জমিয়া আসিতেছে।

ষ্টার্লিং মাহাত্ম্য

বৃটেনের জাতীয় ব্যয় সংক্রান্ত পার্লামেণ্টারী কমিটি ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধব্যয় বিষয়ে সম্প্রতি এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহার সারাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। রিপোর্টে ভারতের ষ্টার্লিং সম্পদের ক্রমবৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি উহার পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার অধিক হইয়াছে। এবং ক্রমান্বয়ে তাহা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার মূল কারণ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বেও ইঙ্গিত করিয়াছি।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের যুদ্ধ ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষে যুদ্ধের নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদের জন্য যে ব্যয় হইতেছে, সেই ব্যয়ের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দেয় অংশ তাঁহারা ভারতকে ষ্টার্লিং বা বৃটিশ মুদ্রা দিতেছেন। ভারতের নামে উক্ত ষ্টার্লিং লণ্ডনে জমা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বৃটেনে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য রপ্তানী হইতেছে, তাহার মূল্য বাবদও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে ষ্টার্লিং দিতেছেন। অধিকন্তু ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে আমদানী হইতে রপ্তানী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল কারণে ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ এই ষ্টার্লিং ভারত তাহার নিজের কাজে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা বা সুযোগ পাইতেছে না। যুদ্ধোত্তর কালেও তাহার পুনর্গঠন কার্য্যে ভারত ঐ ষ্টার্লিং ব্যবহারের সুযোগ পাইবে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ আছে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, খাদ্যের ও অন্যান্য দ্রব্যের নিদারুণ অভাবের মধ্যেও ভারত নানাবিধ কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। এত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও ভারত যে ষ্টার্লিং-এর অধিকারী হইয়াছে, সেই ষ্টার্লিং যদি ভারতের কাজে না লাগে, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ইতিমধ্যেই বৃটিশ পক্ষ হইতে ধ্বনিত হইয়াছে যে, ষ্টার্লিং সম্পদ সঞ্চয়ের দরুণ বৃটেনের নিকট ভারতের যে পাওনা হইয়াছে, তাহা সাধারণ ব্যবসায় সংক্রান্ত পাওনা বলিয়া ভারতের মনে করা উচিত নয়। ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য বৃটেনকে ভারতের কোনোরূপ চাপ দেওয়াও নাকি সঙ্গত হইবে না। চমৎকার কথাই বটে!

সম্প্রতি পার্লামেণ্টারী কমিটি তাঁহাদের ষ্টার্লিং ঋণ সম্পর্কে আর একটী নূতন অভিযোগ তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, 'বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যুচ্চ মূল্যে ভারতের নিকট হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়াছেন। এবং তাহার ফলে ভারতের ষ্টার্লিং সম্পদ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে।' ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোনো প্রতিবাদ উত্থিত হয় নাই। ভারতগবর্ণমেণ্ট যে অতি কঠোরভাবে যথাসময়ে উক্ত দ্রব্যাদির মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং বাজারদর অপেক্ষা কম মূল্যে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়াছেন, অন্ততঃ সেই সত্য কথাটুকু ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা উচিত ছিল, তাঁহারা ঐ কথা না বলিলেও তদ্দ্বারা পার্লামেণ্টারী কমিটির অভিযোগ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

ষ্টার্লিং-এর দেনা পরিশোধ না করার অনুকূলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত নানা প্রকার অজুহাত ভারতের উপর বৃটেনের প্রত্যক্ষ অত্যাচারের প্রচেষ্টা নয় কি?

সিরিয়া-লেবানন সমস্যা

লেভাঁয় নূতন করিয়া বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দামাস্কাসের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে দুমায়ের নামক স্থানে ফরাসী সৈন্যরা বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের এই বিদ্রোহের কারণ স্বরূপ দেখা যায় যে, সিরিয়ায় ফরাসী আধিপত্যের দিন অবসান হইয়া আসিয়াছে। সিরিয়ার ভূতপূর্ব্ব ফরাসী জেনারেল বোজের সাম্প্রতিক এক বিক্ষুব্ধ বিবৃতি হইতে দেখা যায়, গত ৩১শে মে তারিখে সিরিয়ানরা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত দিন সকালেই বৃটিশ সৈন্যের পোষকতায় হয়ত সন্ধি হইবার উদ্যোগ দেখা দিত, শুধু বৃটিশ ও সিরিয়ান আন্দোলনকারীদের জন্যই সিরিয়ানরা আপোষের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল। ফ্রান্সের পক্ষে ইহা অবশ্যই পরিতাপের বিষয়। ফ্রান্স এখনও জার্ম্মানীর কাছে পরাধীনতার গ্লানিতে কাতরাচ্ছন্ন। ওয়াকিবহাল মহল এখনও এ সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ নয় যে, বৃটেন ন্যায়ধর্ম্মের প্রেরণায় সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার জন্য আগ্রহী হইয়াছে। ক্ষমতাচ্যুত লেভাঁয় নিজেদের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ফ্রান্স এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট যুক্তি দর্শাইয়াছে, বৃটেনও নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তদনুরূপ কম যুক্তি খাড়া করে নাই। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? সিরিয়ায় শাসন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের যদি মীমাংসা না হইয়া থাকে, অথবা তথায় নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বরূপ ও সীমানা সম্পর্কে ফরাসীর যদি কোন মোহ থাকিয়া থাকে, তাহা একমাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তি-গুলির মধ্যস্থতায়ই মীমাংসা-নিষ্পত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার আদৌ উদ্যোগ দেখা যায় নাই। ফরাসী বর্ত্তমানে সমর শক্তিতে দুর্ব্বল হইলেও সিরিয়া-লেবাননের শক্তি অপেক্ষা যথেষ্ট প্রবল। এই শক্তি প্রয়োগের বশবর্ত্তী হইয়াই ফরাসী 'হামা' সহরে বোমা বর্ষণ করিল। দামাস্কাসও সেই আক্রমণ হইতে রেহাই পাইল না! অবস্থা দেখিয়া বৃটিশ ও মার্কিন গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে আপোষ-মীমাংসায় আসিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন কেন, বাধাই করিয়াছেন বলা চলে। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা যে শান্তিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা নয়। বস্তুতঃ বৃটিশ ও মার্কিন গভর্ণমেণ্টের সম্মিলিত প্রতিবন্ধের সম্মুখে ফরাসী তাহার এই বিজয় আক্রমণে আর যে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু সিরিয়ার ব্যাপারে এইরূপ ঘটিলেও লেবানন সম্পর্কে ফরাসী এখনও আশাশূন্য হয় নাই। লেবাননের খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়কে হস্তগত করিতে সে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গে যদি ফ্রান্স রাশিয়ার সাহচর্য্য লাভ করে, তবে তাহার পক্ষে লেবানন অধিকারে আনা সুদূর ভবিষ্যতের কাজ কিছু নয়, কিন্তু সে সম্পর্কে বর্ত্তমান আবহাওয়ার দিক হইতে যথেষ্ট সন্দেহেরও অবকাশ রহিয়াছে। বৃটেন যে সহজে এবং স্বেচ্ছায় প্রভাব তথা প্রভুত্ব প্রসার করিতে চাহিবে না—এমন মনে করা ভুল। পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা লইয়া ফ্রান্সের টানাটানি কম চলিতেছে না; কিন্তু বৃটেন কাজ গুছাইয়া লইতে জানে। এদিকে প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডন ও ইরাক বৃটিশের অধিকারে আসিয়াছে: ওদিকে মিশরের উপরেও তাহার প্রভাব বর্ত্তমানে যথেষ্ট। সুতরাং ধীরে ধীরে গভীর জলে বঁড়শিতে মাছ খেলাইবার মতো সিরিয়া ও লেবাননকেও ক্রীড়া-কুশলতায় বৃটিশ যে নিজেদের ভাগে টানিয়া লইবে না, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না।

একদিকে বিশ্বশান্তি পরিকল্পনায় ধর্ম্মানুকরণ, আর একদিকে ঠিক একই সময়ে যুদ্ধ ও জমি ভাগাভাগির নিকৃষ্ট পৈশাচিকতা, ইহা যদি আধুনিক প্রচলিত খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের আদর্শ হইয়া থাকে, তবে ইউরোপের এই বহুরূপী সংস্কার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। কিন্তু সত্যি কি তাহাই?

মিঃ চার্চ্চিল সম্পর্কে মিঃ ডি. ভ্যালেরা

গত ইংরেজি মাসের মাঝামাঝি আয়ার রেডিও তাহাদের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি. ভ্যালেরার এক বক্তৃতা প্রচার করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল সম্পর্কেই ডি. ভ্যালেরার এই বক্তৃতার অবতারণা। তিনি বলেন: মিঃ চার্চ্চিল পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, কোনো বিশেষ অবস্থায় তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের নিরপেক্ষতা বলপ্রয়োগে অমান্য করিতেন এবং এই বলিয়া সে কাজের সমর্থন করিতেন যে উহা বৃটেনের প্রয়োজন। মিঃ চার্চ্চিল ইহা হয়ত লক্ষ্য করিতেছেন না যে, এই প্রয়োজনের নীতিই যদি গ্রাহ্য হয়, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বৃটেনের প্রয়োজনই একমাত্র নৈতিক বিধান এবং এই প্রয়োজনই যেখানে বড়, সেখানে অপর কাহারও অধিকার গণ্য করার কথা ওঠে না। একথা সত্য যে, অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্র স্ব স্ব স্বার্থখাতিরে এই নীতিতেই বিশ্বাস করিয়াছে এবং তদনুরূপ আচরণ দেখাইয়াছে। ঠিক এই কারণেই পর পর সর্ব্বনাশা যুদ্ধ দেখা দিতেছে: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে এবং তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধও আসিতেছে। মিঃ চার্চ্চিল নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের ক্ষেত্রে যদি এই যুক্তি স্বীকৃত হয়, তবে অন্যত্রও অনুরূপ আক্রমণের জন্য এই ধরণের যুক্তি দেখা দিতে পারে এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পাশে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র কোনো ক্রমেই শান্তিতে বসবাসের ভরসা করিতে পারে না।—বাস্তবিক প্রবলের পক্ষে দুর্ব্বলের প্রতি ন্যায়ানুগ হওয়া শক্ত; কিন্তু হইতে পারিলে তাহার সুফলও পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই যে শোণিত কলঙ্কিত সম্পর্কের ইতিহাস রচিত হইয়া আছে, তাহাতে আর একটি ভবাবহ অধ্যায় লিখিবার পরিবর্ত্তে তাহার প্রয়োজন আক্রমণের প্রবৃত্তি সংযত করিয়া মিঃ চার্চ্চিল শান্তির সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যপথে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ আন্তর্জ্জাতিক নীতিবোধের আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফ্রান্সের পতনের পর এবং আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে বৃটেন একা দাঁড়াইয়াছিল, মিঃ চার্চ্চিল এই গৌরবে গর্ব্ব বোধ করেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এই কথাটুকু স্বীকারের ঔদার্য্য কি ছিল না যে, এমন একটা 'ক্ষুদ্র' জাতিও আছে, যে জাতি এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, কয়েক শতাব্দীব্যাপী একা আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে; অশেষ ক্ষতি, দুর্ভিক্ষ ও হত্যাকাণ্ড সহিয়াছে, লগুড়পীড়নে বহুবার তাহাকে হতবুদ্ধি করা হইয়াছে,—কিন্তু সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া প্রতিবারেই সে আবার সংগ্রামে মাতিয়াছে! শুধু তাই নয়, সে জাতিকে কখনও নতি স্বীকার করান যায় নাই এবং তাহার মন কখনও আত্মসমর্পণ করে নাই?

মিঃ ডি. ভ্যালেরার নির্ভিক চিত্ত লক্ষ্য করিবার বিষয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার চিন্তাশীল অভিব্যক্তি শান্তিপ্রিয় প্রত্যেক জাতিকেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইবেন কি না কে বলিবে?

উপসংহারে মিঃ ডি, ভ্যালেরা বলিয়াছেন : পরিণত বয়সে মহত্তর ও উৎকৃষ্টতর পরিসমাপ্তির কল্পনা আমার মধ্যে জাগিয়াছে; তাহাতে আমাদের উভয় দেশের ও ভবিষ্যৎ মনুষ্যজাতির কল্যাণের কথা আছে। আমি এখন নিজেকে সেই কাজেই নিয়োগ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মহত্তর উদ্দেশ্যে মাথা না ঘামাইয়া মিঃ চার্চ্চিল বরং অপর একটা দেশের কুৎসা-নিন্দাতেই মাতিয়া উঠিয়াছেন; অথচ সে দেশ তাঁহার কোনো ক্ষতি করে নাই। তিনি এই সঙ্কটকালেও আমাদের দেশের প্রতি অবিচার ও অবমাননা অক্ষুণ্ণ রাখার একটা ছল খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। আমার গভীর বিশ্বাস, মিঃ চার্চ্চিল ইচ্ছা করিয়া সে পথ বাছিয়া লন নাই; যদি লইয়া থাকেন, দুঃখের সহিত আমাদের বলিতে হয়, তাহাই হউক। আমরা দ্বিধাবিভক্ত ক্ষুদ্র জাতি হইয়াও প্রকৃত স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং জাতিসমূহের মধ্যে প্রীতি সঞ্চারের চেষ্টায় অবিচলিত চিত্তে আমাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইব। বিরাট দুর্গতি ও বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্ধ বিদ্বেষ ও কোলাহল আমাদের জড়াইতে হয় নাই বলিয়া আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে থাকিব এবং ক্লিষ্ট মনুষ্যত্বের ক্ষত নিরাময়ে খৃষ্টানের মতো সেবা করিয়া যাইব।"

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি ডি, ভ্যালেরার এই বক্তৃতা হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে কি না সন্দেহ আছে।

চার্চ্চিল মন্ত্রিসভা

লণ্ডন হইতে গত ২৩শে মে'র সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল পদত্যাগ করিয়া বিলাতের কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলের অস্তিত্ব লোপ পাওয়ায় এখন মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বেই একটি নূতন সাময়িক মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। এই মন্ত্রিসভাই পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আয়োজন করিয়াছেন।

ইউরোপের যুদ্ধে যে অসাধারণ সাফল্য লাভ হইয়াছে, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী বৃটিশ রক্ষণশীল দল তাহা সম্পূর্ণরূপেই নিজেদের দলগত স্বার্থসাধনে লাগাইতে চাহিতেছেন—মনে করিয়া শ্রমিকদল মিঃ চার্চ্চিলের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করার ফলে ন্যাশন্যাল গভর্ণমেণ্টের পতন হইয়াছে। আগামী ১৫ই জুন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের অবসান ঘটিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। বর্ত্তমান চার্চ্চিল মন্ত্রিসভায় বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে রহিয়াছেন :

মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল (প্রধান মন্ত্রী, দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী); মিঃ সি, আর, এটলি (সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড প্রেসিডেণ্ট অফ্ কাউন্সিল); মিঃ এণ্টনী ইডেন (পররাষ্ট্র সচিব); স্যার জেম্‌স্ গ্রীগ (সমর সচিব); স্যার জন এণ্ডার্সন (অর্থসচিব); মিঃ হারবার্ট মরিসন (স্বরাষ্ট্র সচিব); মিঃ আর্ণষ্ট বেভিন (শ্রম সচিব); স্যার জন সাইমন (লর্ডচ্যান্সেলার); মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার (নৌসচিব); স্যার আর্চ্চিবল্ড সিনক্লেয়ার (বিমান সচিব); লর্ড বিভারব্রুক (লর্ড প্রিভিসিল); লর্ড ক্র্যাণবোর্ণ (ডোমিনিয়ন সেক্রেটারী); মিঃ এল্, এস, আমেরী (ভারত ও ব্রহ্মসচিব); স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ স্ (বিমান উৎপাদন সচিব); কর্ণেল অলিভার ষ্ট্যান্‌লী (ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী); স্যার এণ্ড্রু ডানকান (সরবরাহ সচিব); লর্ড স্যুইণ্টন (অসামরিক বিমান বিভাগের মন্ত্রী); ক্যাপ্টেন অলিভার লিটনটন (প্রেসিডেণ্ট বোর্ড অফ্ ট্রেড); স্যার ডবলিউ জোর্ডইট (ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স সচিব); মিঃ ডানকান স্যান্ডিজ (পূর্ত্ত সচিব); স্যার এডোয়ার্ড গ্রীগ (মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ সচিব); লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (ওয়াশিংটনে বৃটিশ দূত)। সমর মন্ত্রিসভায় আছেন : মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ এটলী, মিঃ ইডেন, স্যার জন্ এণ্ডারসন, মিঃ হার্বার্ট মরিসন, মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন, মিঃ অলিভার লিটনটন।

ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক

বৃটেনের শ্রমিকদলের সহিত বলশেভিকতন্ত্রের সহানুভূতি ও আত্মিক যোগ আছে। কিন্তু রক্ষণশীল দল সম্প্রতি নির্ব্বাচন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রমিকদলকে ঘায়েল করিবার উপায় খুঁজিতেছেন। সম্প্রতি ব্রেডফোর্ডের এক সভায় রক্ষণশীল দলের অন্যতম প্রধান নেতা লর্ড বিভারব্রুক্ বলিয়াছেন: 'রাশিয়ার সহিত মিত্রতাই আমাদের ইউরোপীয় পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবীর অনিষ্টসাধন এবং পৃথিবীর শান্তির বিঘ্ন উৎপাদন ছাড়া আর কিছুই নহে।' এইরূপ রুশপ্রীতির কথা তিনি কি কারণে বলিলেন? কিছুদিন পূর্ব্বে ব্ল্যাকপুলে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদলের বার্ষিক সম্মেলনে (উক্ত দলে প্রত্যাগত) স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: 'রাশিয়ার ন্যায় সাহসী ও শক্তিশালী মিত্রের সঙ্গে শ্রমিকদল অনাবশ্যক বিরোধ বাঁধাইবেন না।' শ্রমিকদলের এই নীতি-ঘোষণার প্রত্যুত্তরেই যে লর্ড বিভারব্রুক উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বৃটেনের ভোটারগণকে তিনি এই বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষায় শ্রমিকদল যতটা আগ্রহশীল, রক্ষণশীল দলের দৃঢ়তা এবং আগ্রহ তাহার চাইতেও বেশী। উভয় দলই দেখিতেছি রুশ-প্রীতির কথা বলিতেছেন। তবে কি বৃটেনের জনসাধারণ রুশের ন্যায় সোস্যালিষ্ট হইয়া গিয়াছে বা হইতে চাহে?

যাহাই হউক, রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-কলাপে কিন্তু রুশ-প্রেমের বিশেষ কোন পরিচয় নাই। জার্ম্মানীর আত্মসমর্পণের পর আজ জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও পোলাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব এবং বিধিব্যবস্থা লইয়া একপক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন এবং অপরপক্ষে রাশিয়ার মধ্যে মতভেদ প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিনের সাহায্যে বৃটেন ইউরোপের যে সকল অঞ্চল জার্ম্মান-কবলমুক্ত করিয়াছে, তাহার উপর বৃটেনের প্রভাব-বিস্তারের উদ্যম যেমন সুস্পষ্ট, লালফৌজ কর্ত্তৃক অধিকৃত এলাকায়ও

তেমনি সোভিয়েটের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার আয়োজন বিপুল। পূর্ব্বে চুক্তি ছিল—অধিকৃত জার্ম্মানী প্রধান চারিটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগাভাগি হইবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে: লালফৌজ যতগুলি অঞ্চল দখল করিয়াছে, ততটাই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নিজেদের অধিকারে রাখিয়া নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এমন কি, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে বার্লিনে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু বৃহত্তর জার্ম্মানীরই অংশবিশেষ অষ্ট্রিয়া অধিকারে আসিবার পরেই রুশ-কর্তৃপক্ষ তথায় নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে পরামর্শ করা পর্য্যন্ত রুশ আদৌ আবশ্যক মনে করেন নাই। এই মন-কষাকষির ফলে একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন এবং অপর দিকে রাশিয়া—যে যাহার অধিকৃত রাজ্যখণ্ডে যদৃচ্ছ-শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও কায়েম নীতি অনুসরণ করিতেছেন।

এই দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্যের মূলগত অবস্থার, ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত এই যে, হিটলার-মুসোলিনী রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে সম্প্রতি অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপের উপদ্রব দূর হইয়াছে বলিয়া বৃটেনের কর্তৃপক্ষ মনে করেন না। তাঁহাদের সম্মুখে এইক্ষণ দাঁড়াইয়াছেন মার্শাল ষ্ট্যালিন, অদূর ভবিষ্যতে যাঁহার একচ্ছত্র নেতৃত্ব অস্বীকার করা হয়ত সম্ভব হইয়া উঠিবে না। বস্তুতঃ রুশনায়কগণের প্রতি মিঃ চার্চ্চিলের অবিশ্বাস নূতন নহে। তাঁহার পূর্ব্বকালের বক্তৃতা ও বিবৃতিগুলিতে বহুবারই একথা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ১৯২০ সালে রাশিয়াকে তিনি যেমন ইউরোপ ও এশিয়ার সভ্যতার শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, বর্ত্তমান যুদ্ধ বাঁধিবার কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্তও তাঁহার মনোধারা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতেও এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ চার্চ্চিল বলেন: 'সাম্যবাদ একটা জাতিকে কিরূপ জীর্ণ করে, শান্তির সময়ে ইহা লোককে কিরূপ হীন ও লুব্ধ করে এবং যুদ্ধের সময়ে ইহা কিরূপ নিন্দনীয় ও জঘন্য হইয়া ওঠে, তাহাই আজ প্রত্যেকে দেখিতে পাইতেছেন। তাহার পরে অবশ্য তিনি রুশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন। যুদ্ধ-পলিটিক্সে শত্রুও মিত্র হয়, কিন্তু তাহা শুধু কার্য্যোদ্ধারের জন্য ও ক্ষণস্থায়ী। বস্তুতঃ রুশসম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের মতবাদ আজও যে বড় একটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। পরস্পরের মনের এইরূপ বিরুদ্ধভাব ও গলদ লইয়া বৃহত্তর তিনটি রাষ্ট্র এক সহযোগে শুধু ইউরোপ নয়, সমগ্র পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন—ইহা হাস্যকর ভিন্ন আর কি?

স্বর্গতঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কি বলিয়াছিলেন: 'যুদ্ধের মধ্যেই বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট বোঝাপড়ার চেষ্টা করা উচিত। যুদ্ধান্তে তাহা সহজসাধ্য হইবে না।' দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ওয়েণ্ডেল উইল্কি যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ তাহাই প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ এই হারজিতের মহড়ায় ইঙ্গ-মার্কিনের তাই খেদ করিবার কিছু নাই। শ্রমিকসঙ্ঘ দুই দিন পরে কিরূপ আকার-পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইবে—আপাততঃ তাহাই দেখিবার বিষয়। কারণ বলশেভিক প্রভাব আজ সর্ব্বত্র প্রবল। এমন কি ভারত সম্পর্কে বিগত ১লা জুনের সংবাদে দেখা যায়, কালেকটিকটের রিপাব্লিকান প্রতিনিধি মিসেস ক্লেয়ার বুথ লুস্ খোলাখুলি বলিয়াছেন যে, বৃটেন ও আমেরিকা যদি একযোগে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঠিক না করে, তবে আগামী দশবৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ইহার পিছনে সত্য কতখানি রহিয়াছে তাহা সম্প্রতি সন্দিগ্ধভাবের মধ্যে নিহিত থাকিলেও রুশ-প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা স্পষ্টই বলা যায় যে, চাতুষ্পার্শ্বিক একনায়কত্ব তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। ইঙ্গ-মার্কিন অতঃপর কি ব্রত গ্রহণ করিবেন?

পরলোকে ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ১১ই মে শুক্রবার বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি কেবল আজীবন কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষকতাই করেন নাই, তিনি নিজে ভবানীপুর মডেল হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। এতদ্ব্যতীত আমোদ-ক্রীড়ায়ও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। টালিগঞ্জ ইউনাইটেড্ ক্লাব-এর খেলোয়াড় ও রিকর্ম্মড থিয়েটার সিণ্ডিকেট্-এর প্রধান উদ্যোক্তারূপে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহার রচিত 'পাপের দংশন', 'মিলনের পথে,' 'ত্রিমূর্ত্তি,' 'ইস্কাবনের টেক্কা,' 'নিশীথের ডাক', 'ঝড়ের রাতে', 'আবার ইস্কাবনের টেক্কা', 'রাতের বিভীষিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। তাঁহার এই অকালে পরলোকগমনে বাংলাদেশ একজন সত্যকার পণ্ডিত ব্যক্তিকে হারাইল।

পল্লীশ্রী

[শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ বর্ষ } শ্রাবণ—১৩৫২ ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও কু-শাসনতন্ত্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার নিদারুণ দুর্ভিক্ষ কু-শাসনের ফলে ঘটিয়াছিল। এই কু-শাসনের নিমিত্ত প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রত্যক্ষ ভাবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষ ভাবে দায়ী। সর্ব্ববাদিসম্মত এই জনমত আজ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। স্যার জন্ উড্‌হেডের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে "কমিশন" অর্থাৎ তদন্ত-সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা বহুদিন বহুবার বলিয়াছি যে, এই দুর্ভিক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে কিছু খাদ্যাভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু সে অভাব দূর করা অসম্ভব ছিল না। চেষ্টা করিলে এই সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ রোধ করা যাইত।

উড্‌হেড কমিশন বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "এই দুর্ভিক্ষের গতি ও কারণ অনুসন্ধান তাঁহাদের পক্ষে অতি বিষাদময় কর্ত্তব্য হইয়াছিল। তাঁহারা একটি বিরাট শোকাবহ দুর্ঘটনার অভিঘাতে অভিভূত হইয়াছিলেন। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালায় অন্যূন পনের লক্ষ দীন-দরিদ্র প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যেরূপ ঘটনাচক্রে তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার সংঘাতের নিমিত্ত তাহারা বিন্দুমাত্র দায়ী ছিল না। সমাজ তাহার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া তাহার দরিদ্র ভ্রাতৃগণকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। বস্তুতঃ, যেমন একটি বিরাট সামাজিক এবং নৈতিক, তদ্রূপ শাসন-সম্পর্কীয় বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছিল।"

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এরূপ নিদারুণ দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালায় ঘটে নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনের অবসান এবং ইংরেজশাসনের আরম্ভের সন্ধি-কালে অর্থাৎ ১১৭৬ সালে, এই মন্বন্তর ঘটিয়াছিল। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার বহু জনবহুল স্থানে এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই ভীষণ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের যথার্থ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, "দুর্ভিক্ষের কুড়ি বৎসর পরে বাঙ্গালার অবশিষ্ট লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি নির্ণীত হয়। সুতরাং আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এক বৎসর অন্নকষ্টের পর এক বৎসর শস্যহানিতে নয় মাসে এক কোটি লোকের মৃত্যু হয়।" "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের দ্রষ্টা মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর গ্রন্থ "আনন্দমঠে" এই দুর্ভিক্ষের একটি যথাযথ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরখানায়ও তিনি কিছুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সুতরাং সরকারী দপ্তরখানার পুরাতন নথিপত্র দেখিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই; সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল। কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। * * * অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না। মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে-কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ

রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল। বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপরে ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই; সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর বা বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল; যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল!

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকেও দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না; অতি রমণীয় বহু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।"

দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের দুর্ভিক্ষের এই বর্ণনা, গত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে হুবহু প্রযোজ্য; একটু অতিরঞ্জিত নহে; বরং বাস্তবের যথার্থ বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ন্যূন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা হইতে আর একটু উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন অবস্থার স্বরূপ বুঝাইব।

"'১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লয়েন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণা-বেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ-সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লিখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

তদবধি, প্রায় দুই শত বৎসর সুসভ্য ইংরেজ-শাসনের ফলে, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা ১১৭৬ সালের দায়িত্বহীন অরাজক পরিস্থিতি হইতে প্রচুর উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে দুইটি প্রধান কারণে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটিয়াছিল, দুই শত বৎসরের সুসভ্য ইংরেজ শাসনের পরেও সেই দ্বৈত শাসন ও একশ্রেণীর লোকের অনাচার-অত্যাচারের ফলে বাঙ্গালী রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অনশনে ও তদানুষঙ্গিক মহামারীতে লাখে লাখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তথাপি ১১৭৬ সালের মন্বন্তরে কঠোর শাসন ও শোষণের সহিত দৈবের কিছু প্রতিকূলতা ছিল; কিন্তু গত পূর্ব্ব বৎসরের নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যকৃত। সীমান্তে দ্রুত আক্রমণকারী বিদ্যুদ্‌গতিশীল দুরন্ত শত্রুর উপস্থিতির আতঙ্ক পরোক্ষ কারণ মাত্র; প্রত্যক্ষ কারণ, শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের অযোগ্যতা, অবিমৃষ্যকারিতা এবং অদূরদর্শিতা। অতি অশুভ ক্ষণে স্যার জন হার্বার্ট বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ন্যায় প্রকৃষ্ট ও সাম্প্রদায়িক বিষদুষ্ট প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পক্ষে যেরূপ ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ এবং রাজনীতিজ্ঞতা প্রয়োজন, তাঁহাতে তাহার প্রচুর অভাব ছিল। চিরপ্রতিপত্তিশালী প্রধান ও প্রাচীনতম স্থায়ী শেতাঙ্গ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীদের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ফলে, শাসনকর্ত্তা ও মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বৈত শাসনকে তিনি অধিকতর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার চরম প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের বিদ্বিষ্ট বলিয়া তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সঙ্ঘের নেতা মৌলভী ফজলুল হককে কূট কৌশলে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসৃত করেন; এবং বিধিবিরুদ্ধ উপায়ে শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায়ের অনুগ্রহভাজন স্যার নাজিমুদ্দিনকে কয়েকজন উগ্র মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যক্তিকে লইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের সাহায্য করেন। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ লইয়া তাঁহাদিগকে যুক্তি ও তর্কবলে স্বমতে আনয়ন করিয়া, ঐক্যবদ্ধ হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন নাই। জাপানকর্ত্তৃক ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত আক্রমণের আতঙ্কে অতিমাত্র অভিভূত হইয়া তিনি যেরূপ নির্ম্মমভাবে জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া "অস্বীকার নীতি (Denial policy)" প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করিয়াছিলেন, এবং সামরিক প্রয়োজনে যথাসম্ভব প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য সংগ্রহপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তাহারই বিষময় ফলে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে খাদ্যশস্যের স্বল্পাভাব নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পরিণত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি করিয়াছিল। জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাকুক, তাহাদের অত্যাবশ্যকীয় অপরিহার্য্য নিত্যপ্রয়োজনীয় যৎকিঞ্চিৎ অন্নবস্ত্রের সংস্থান রাখাও তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে উন্মুক্ত রাজপথে পড়িয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল, তখন বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে আশু সামরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুত ছিল। এই সঞ্চয় হইতে যৎকিঞ্চিৎ বুভুক্ষু ও মুমূর্ষু নরনারী ও শিশু সন্তানকে দিলে তাহারা বাঁচিতে পারিত। অদূর ভবিষ্যতে এই সকল সঞ্চয়ের অধিকাংশ মনুষ্যব্যবহারের বহির্ভূত হইয়া পূতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনায় পরিণত হইয়াছিল। জনবহুল বাঙ্গালা শ্মশানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই শোকাবহ সংঘটনের গুরু দায়িত্ব মুখ্যতঃ বাঙ্গলার অযোগ্য শাসনকর্ত্তার। হক্ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত দুর্ব্ব্যবহার এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডলীর অসমীচীন প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালা সরকার জনসাধারণের সহযোগ ও সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন। উড্‌হেড কমিশন এই সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কমিশন বলেন,—"প্রাতিষ্ঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবং বৎসরের প্রারম্ভে শাসন-

কর্ত্তা ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে এবং সরকারের শাসনযন্ত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার অভাবই দুর্ভিক্ষ নিবারণের এবং দুর্গতদিগের দুঃখপ্রশমনের সমবেত ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন রাজনৈতিক ঐক্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। একটি সর্ব্বদলসমন্বিত মন্ত্রিমণ্ডলী জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে এবং অধিকতর কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইত ; কিন্তু এরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী সংগঠন করা হয় নাই। অধিকন্তু, দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে এবং পরে খাদ্য শাসন বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর অযথা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল ; এবং এমন কি, অসামরিক সরবরাহ বিভাগের অধ্যক্ষেরও তিনবার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।" উড্‌হেড কমিশন বলিয়াছেন,—"১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন বিভিন্ন জেলার কালেক্টর এবং বিভিন্ন বিভাগের কমিশনারগণের নিকট হইতে দুরবস্থার সংবাদ আসিতেছিল, তখন প্রাদেশিক সরকার তৎপরতার সহিত যথার্থ অবস্থার বিবরণ তলপ করেন নাই এবং আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে কোন প্রকার সাহায্যেরও উপদেশ প্রদান করেন নাই। দুর্ভিক্ষ ঘোষণাও করা হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, যথাসময়ে উপযুক্ত সাহায্য প্রদানে বিলম্ব এবং প্রকাশ্যে দুর্ভিক্ষ স্বীকার না করার সঙ্গে সঙ্গে, কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার সহিত "খাদ্যশস্যের অভাব-অনটন ঘটে নাই"—এই মিথ্যা প্রাদেশিক সরকার তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরে আগষ্ট মাসে যখন সাহায্যপ্রদানের ব্যবস্থা হয়, তাহাও অত্যন্ত অনপযুক্ত হইয়াছিল। কারণ, তখন সরবরাহের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। যখন দুর্ভিক্ষ প্রকট হইয়াছিল তখন তাহাকে গোপন করা এবং দুর্ভিক্ষ সাহায্যার্থ একজন কমিশনার নিযুক্ত না করা অতীব গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছিল।"

যথাসময়ে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করা, দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভেই যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদান না করা এবং সরকারের আয়ত্তাধীন খাদ্যশস্যের চলাচলের নিমিত্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু-সন্তান অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই শোচনীয় সংঘটনের নিমিত্ত প্রাদেশিক সরকার প্রধানতঃ দায়ী ; কিন্তু ইহার চরম দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রাদেশিক সরকার যখন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—জনসাধারণের জীবনরক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্য ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহার সমীচীন ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন ভারতের বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো পাঁচ বৎসরের নিয়মিত শাসন এবং এক বৎসরের অতিরিক্ত শাসনের পরে, আরও এক বৎসর শাসনের অযাচিত অধিকার লাভ করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছিলেন "ফেডারেশন" অর্থাৎ নিখিল ভারতে সমবায়-শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার গুরু উদ্দেশ্য লইয়া। পার্লিয়ামেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সভাপতিরূপে তিনি "ফেডারেশন" শাসনতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং সাম্প্রদায়িকতার ত্রিধা বিভক্ত উগ্র রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসী "বিদ্রোহী" দলকে পুঞ্জে পুঞ্জে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, যুদ্ধ-পরিচালনার সর্ব্বপ্রকার কল্পিত বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ কার্য্যে এরূপ নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষের পূর্ণ-প্রচণ্ডতার সময়েও তিনি একবার দয়া করিয়া এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া স্বচক্ষে বুভুক্ষু ও মুমূর্ষু আর্ত্ত নরনারী ও শিশু-সন্তানের দুরবস্থা অবলোকন করিবার অবকাশ করিতে পারেন নাই। উড্‌হেড্ কমিশন যথার্থই লিখিয়াছেন,—"দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভেই, কেন্দ্রীয় সরকার একটি নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, চাউল ও গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। অবশেষে যে মৌলিক পরিকল্পনা অনুসারে তাঁহারা প্রতি মাসে বাঙ্গালায় গম এবং ভুট্টা ব্যতীত সাড়ে তিন লক্ষ টন চাউল পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা আরও অগ্রে কার্য্যকরী করা কর্ত্তব্য ছিল। পাঞ্জাবের সহিত ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালায় যথাসম্ভব পরিমাণে গম ঐ সময়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলে, চাউলের অভাববৃদ্ধির সহিত অযথা মূল্যবৃদ্ধি ঘটিত না। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাদেশিক সরকার যে মূল্য-শাসন-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাহার পরিহার সরকারের অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল ; এবং তাহার কুফলের গুরু দায়িত্বের প্রকৃষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের ; কারণ, এই অনুচিত পরিহারনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন সম্মতি ও অনুমোদন অনুযায়ী হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তখনই মাসে মাসে উপযুক্ত পরিমাণে গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাঞ্চলে 'সংযত অবাধ বাণিজ্যে'র পরিবর্ত্তে 'অসংযত অবাধ বাণিজ্যে'র বিধান দিয়া গুরুতর ভ্রম করিয়াছিলেন। তৎপরে ভারতের অধিকাংশ অংশে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল। অনেকগুলি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য এবং বিশেষতঃ বোম্বাই ও মাদ্রাজ সাফল্যের সহিত এই নীতিপ্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করার ফলে, ভারতের বহুস্থানে গুরুতর বিপদ্ ঘটিতে পারিত।"

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ পাঁচ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষ চরমে উঠিয়াছে। অক্টোবর মাসে নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড ওয়েভেল শাসনভার গ্রহণ করিয়া, প্রথমেই বাঙ্গালায় আসিয়া, দুর্ভিক্ষের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। লর্ড লিন্‌লিথগোর ন্যায় অনুপযুক্ত শাসনকর্ত্তা তাঁহার পূর্ব্বে ভারতে কেহ আসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বড়লাট হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি কৃষি-কমিশনের সভাপতিরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন। ঐ কৃষি-কমিশনের সুপারিশগুলি তাঁহার পূর্ব্বে কার্য্যকরী হয় নাই; তিনিও বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, উড্‌হেড কমিশন গত পূর্ব্ববৎসরের নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও লোকক্ষয়ের এই কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—(১) বাঙ্গালায় স্বভাবতঃ যে পরিমাণ চাউল থাকে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তদপেক্ষা কম ছিল। ইহার দুইটি কারণ, প্রথম ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আমন ধানের উৎপাদন কম হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয়, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের উদ্বৃত্ত মজুত জমাও অন্যান্য বৎসরের তুলনায়

কম পড়িয়াছিল। (২) মোটের উপর বাঙ্গালায় যে চাউল ছিল, তাহাও বাজার হইতে যাহারা এক সময়ে অথবা সমস্ত বৎসর ধরিয়া ক্রয় করে—তাহাদের সাধ্যায়ত্ত মূল্যে তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হয় নাই। ইহারও দুইটি কারণ, প্রথম, তৎকালীন অবস্থায় চাউলব্যবসায়ীরা, চাহিদা ও যোগানের প্রয়োজন অনুযায়ী, স্বাধীনভাবে বিতরণ করিতে অপারগ হইয়াছিল; এবং দ্বিতীয়, এইরূপ বিতরণের নিমিত্ত উৎপাদক, ব্যবসায়ী ক্রেতাগণের উপর বাঙ্গালা সরকারের যে পরিমাণ শাসনক্ষমতা থাকা উচিত ছিল, তাহার অভাব। (৩) স্বাভাবিক অবস্থায় বাঙ্গালার বাহির হইতে যে-পরিমাণ চাউল ও গম আমদানী হয়, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সেরূপ পরিমাণে চাউল পাওয়া যায় নাই। ইহারও দুইটি কারণ, প্রথম, বর্ম্মা হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয়, উদ্‌বৃত্ত-শস্য-সম্পন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য হইতে অভাবগ্রস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহে একটি নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশস্য চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বিলম্ব। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, খাদ্যশস্যের স্বল্পতাই দুর্ভিক্ষের একটি মৌলিক কারণ এবং অযথা মূল্যবৃদ্ধি দ্বিতীয় কারণ। তবে এ-কথাও সত্য যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে যদি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কিছু লোকক্ষয় নিবারিত হইতে পারিত। সুতরাং বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা স্যার জন হার্বার্ট এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন রাজপ্রতিনিধি, ভারতের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এবং তাঁহার সাদায়-কালোয় মিশ্রিত অকর্ম্মণ্য মন্ত্রিমণ্ডলী এবং ভারতসচিব মিঃ আমেরী,—ইহারা সকলেই এই নিদারুণ শোচনীয় বহুজনক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত তুল্যভাবে দায়ী।

প্রত্যক্ষ কারণের সহিত এই শোকাবহ দুর্ভিক্ষের বিশেষ পরোক্ষ কারণও বিদ্যমান ছিল। এই লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে, ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায়, বাঙ্গালা দেশেও, জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংস্থান ও সামর্থ্য ছিল অত্যন্ত অবনত। দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিমাণ কৃষি বা উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। ভূমির উপর অর্থাৎ কৃষিবৃত্তির উপর অধিকাংশ অধিবাসীর জীবিকা নির্ভর করিত। শ্রমশিল্পের প্রসারদ্বারা কৃষির উপর জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত এই অত্যধিক চাপের যথোপযুক্ত প্রশমন ঘটে নাই। জনসমষ্টির বহুলাংশ কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিত। কোনপ্রকার অর্থনৈতিক বিপ্লব সহ্য করিবার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। যেমন খাদ্য সম্পর্কে, তেমনি স্বাস্থ্য বিষয়েও জনসাধারণের শক্তি ও সামর্থ্য ছিল অত্যন্ত কম। তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত অল্প। ফলে, যে-সকল মহামারী দুর্ভিক্ষের সময় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে, দুর্ভাগ্য, দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাদের প্রাদুর্ভাব ছিল প্রবল। স্বাস্থ্য বা সম্পদ্ সম্পর্কে তাহাদের আত্মরক্ষার্থ কোন সঞ্চয় বা সংস্থান ছিল না। ভারতের অন্যান্য বহু স্থানের ন্যায়, বাঙ্গালায়ও জনসাধারণের এইরূপ কায়িক ও আর্থিক দুরবস্থা দুর্ভিক্ষ ও তাহার নিত্য সহচর মহামারী সংঘটনের অনুকূল ছিল। কিন্তু ইহার নিমিত্ত দায়ী কে? প্রায় দুই শত বৎসরের সুসভ্য বৃটিশ শাসনই কি ইহার 'নিমিত্ত' নহে?

এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষে এবং তাহার চিরসহচর মহামারীতে যে কত লোক অকালে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংখ্যা-সংগ্রহ এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপাদন সংখ্যার ন্যায় জন্ম-মৃত্যু সংখ্যা-সঙ্কলনও নির্ভরযোগ্য নহে। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের হেতু মৃত্যু লিপিবদ্ধ করিবার কোন বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা বা নির্দ্দেশ নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, পঞ্চাশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উড্‌হেড্ কমিশনের নির্দ্ধারণ—পনের লক্ষ। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের সঙ্কলিত সংখ্যা অনুযায়ী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মৃত্যুসংখ্যা ১৮,৭৩,৭৪৯। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে যে মৃত্যুসংখ্যা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে গড়ে প্রতি বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৮৪,৯০৩। সুতরাং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গড় অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইয়াছিল ৬,৮৮,৮৪৬। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে প্রতি সহস্রে মৃত্যুসংখ্যার ক্রম ছিল ১৯·৬ হইতে ২৫·০ অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ২১·২। দুর্ভিক্ষের জন্য ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এই গড় বৃদ্ধি পাইয়াছিল—প্রতি সহস্রে ৩০·৯। দুর্ভিক্ষ হেতু অধিকাংশ মৃত্যু ঘটিয়াছিল বৎসরের শেষ অর্দ্ধে। প্রথম ছয় মাসে, প্রতি সহস্রে মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চবার্ষিক গড় অপেক্ষা, ১·৯ অংশ অধিক ছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই, হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চবার্ষিক গড় ৬,২৬,০৪৮ সমষ্টির তুলনায় দাঁড়াইয়াছিল,—১৩,০৪,৩২৩, অর্থাৎ মৃত্যুহারে শতকরা ১০৮·৩ অংশ বৃদ্ধি। পরবর্ত্তী ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দেও অনশন-মৃত্যুর জের চলিয়াছিল; এবং প্রথম ছয় মাসে মৃত্যুসংখ্যা-সমষ্টি হইয়াছিল ৯,৮১,২২৮ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চবার্ষিক গড় অপেক্ষা ৪,২২,৩৭১ অধিক। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জুনের শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসরে মৃত্যু-হার দাঁড়াইয়াছিল প্রতি সহস্রে ৩৭·৬। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষ অর্দ্ধের মৃত্যুসংখ্যা, বিবৃতিপ্রকাশের পূর্ব্বে, কমিশনের গোচরে আসে নাই। তথাপি তাঁহারা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু-সংখ্যা-বৃদ্ধি, পূর্ব্বগামী দুর্ভিক্ষবৎসরের ন্যায়, শোকাবহ হইবে। যদিও জনসাধারণের অনুমিত মৃত্যু সংখ্যা-সমষ্টি উড্‌হেড্ কমিশন গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তথাপি, সরকারী সংখ্যা সঙ্কলন যে বহুল পরিমাণে যথার্থ-সংখ্যা সমষ্টি হইতে কম, সে বিষয়ে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এই ভীষণ লোকক্ষয়ের ফলে বাঙ্গালার পল্লীঅঞ্চল শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কৃষক ও শ্রমজীবী বংশের এক-পুরুষ লোকক্ষয় হইয়াছে। এই ক্ষয় পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষি ও পল্লী-শিল্প বিশেষ ব্যাহত হইবে।

এই দুর্ভিক্ষে অভাব-অনটনের নিদারুণ পীড়ন অপেক্ষা সমাজদ্রোহী অর্থগৃধ্নু অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের অনাচার ও অত্যাচারের পীড়ন কোন অংশে কম প্রচণ্ড ছিল না। যখন লক্ষ লক্ষ দুর্গত নরনারী ও বালবৃদ্ধ অনাহারে মৃত্যুকবলিত হইতেছিল, তখন এক-

শ্রেণীর অর্থ-পিশাচ দরিদ্রের মুখের গ্রাসকে ধনীর নিকট হইতে অসম্ভব অতিরিক্ত মূল্য লইয়া তাহাদের ভুরিভোজনের ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রসদ যোগাইতেছিল। উডহেড্‌ কমিশন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অসম্ভব অতিরিক্ত মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা দাঁড়াইয়াছিল ১৫০ কোটি টাকা! অর্থাৎ পনের লক্ষ লোকের প্রত্যেকের মৃত্যুর বিনিময়ে তাহাদের লাভ হইয়াছিল হাজার টাকা। প্রতি বৎসরে সাধারণতঃ ৪৫ লক্ষ টন চাউল বাজারে বিক্রীত হয়। অন্ততঃ ইহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ চাউল ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাজারে বিক্রীত হইয়াছিল অর্থাৎ মোট সাড়ে সাইত্রিশ লক্ষ টন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের চাউলের মূল্যের সহিত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের চাউলের মূল্যের পার্থক্য এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্তব্য মূল্যসংখ্যা অনুযায়ী মণ প্রতি গড় পার্থক্য ছিল অন্যূন পনের টাকা অর্থাৎ টন প্রতি প্রায় চারি শত টাকা! সুতারং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সাড়ে সাইত্রিশ লক্ষ টন চাউল বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছিল ১৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ পনের লক্ষ মৃত্যুর প্রত্যেক মৃত্যুর জন্য সহস্র মুদ্রা অতিরিক্ত লাভ! সুতরাং এই শোচনীয় ও শোকাবহ দুর্ভিক্ষের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে যে, সহৃদয় উডহেড্‌ কমিশন গভীর দুঃখে অভিভূত হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়! কিন্তু আমাদের হৃদয়হীন ভারতসচিব আমেরী সাহেব দুর্ভিক্ষ সহজে স্বীকার করেন নাই এবং ইহাকে "বিধিনির্ব্বন্ধ" (An act of God, আখ্যা দিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন!

দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালার দুর্গতি এখনও শেষ হয় নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের নিদারুণ দুর্ভিক্ষের পরে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় সমুপস্থিত হইয়াছে নিদারুণ বস্ত্রের অভাব! অন্নের অনটন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মহামারীর প্রকোপ এখনও কমে নাই। উপযুক্ত অন্ন-বস্ত্রের অভাবে বাঙ্গালার দীন-দরিদ্রের নিত্যনৈমিত্তিক দুঃখ এখনও বিদূরিত হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে হইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। পর পর দুইজন শাসনকর্ত্তার মৃত্যু এবং শোচনীয় ও শোকাবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রচণ্ড অভিঘাতের পর চার্চ্চিল মন্ত্রিমণ্ডলী সাম্রাজ্যিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে অভিজ্ঞ অষ্ট্রেলিয়ানিবাসী মিঃ কেসিকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, মিঃ কেসি শাসনভার গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালায় সর্ব্বদলসমন্বিত মন্ত্রিমণ্ডলী সংস্থাপনপূর্ব্বক সুশাসন আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তিনি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, অর্থাৎ য়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এবং সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী ঝুনা শেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, বরং তাহাদের অনাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক ঐ মন্ত্রিমণ্ডলী বিতাড়িত হইলে, নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী সংস্থাপন না করিয়া তিনি স্বয়ং শাসনভার গ্রহণপূর্ব্বক বাঙ্গালা শাসন করিতেছেন। স্বাস্থ্য ও সামাজিকতায় তাঁহার কিঞ্চিৎ তৎপরতা প্রকটিত হইলেও এ পর্য্যন্ত মিঃ কেসি সৎসাহস, চিন্তাশীলতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কোন বিশিষ্ট পরিচয় আজিও দিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্যিক রাজনীতির উদার স্বাধীনতা বাঙ্গালার পঙ্কিল সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্রতা ও অনুদারতার উগ্র বিষবাষ্পে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। গতানুগতিকের পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অতিক্রম করা মনীষীর পক্ষেও দুঃসাধ্য। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য ও দুর্গতি, বোধ হয়, "বিধি-নির্ব্বন্ধ"!

ওয়াল্‌টার স্নাফ্‌সের এড্‌ভেঞ্চার* (অনুবাদ গল্প

শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে যে-দিন ওয়াল্‌টার স্নাফ্‌স্ ফরাসীদেশে প্রবেশ করিয়াছেন সে-দিন থেকেই তাঁর মনে হইতেছে তাঁর মত ভাগ্যহীন আর কেহ নাই। লোকটি তিনি মোটাসোটা, সহজেই হাঁপাইয়া পড়েন, আর পা নিয়াও যে ভোগেন, সে-কথা তাঁর বন্ধুদের কাছে বলিয়া থাকেন। স্বভাবতঃ তিনি প্রসন্নচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, ভালমানুষ আর আশাবাদী। চারি সন্তানের জনক, তিনি তাঁর সন্তানদের একেবারে মাথায় করিয়া রাখিতে চান, এতই ভালবাসেন।

তাঁর স্ত্রী সুন্দরী যুবতী, সে স্ত্রীর আদর যত্ন আর সোহাগের অভাববোধটা তাঁর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সকাল-সকাল শুইতে যাওয়া আর দেরী করিয়া ঘুম থেকে উঠা—এই ছিল তাঁর প্রিয় আর তা' ছাড়া 'খা-না-পি-না' আর ফূর্ত্তি ত বটেই। জীবনের ভাল দিক্‌টাই তিনি উপভোগ করিয়াছিলেন, তাই তিনি বন্দুক কামান তরবারী সঙ্গীন এই মারণাস্ত্রগুলিকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না! বিশেষতঃ সঙ্গীনগুলিকে! তিনি ওগুলি চটপট সামলাইয়া উঠিতে পারিতেন না, সব সময়েই সন্ত্রস্ত থাকিতেন, কোন্ দিন তাঁর 'ভুঁড়ে' পেটখানি সঙ্গীনের খোঁচায় ফুটা হইয়া যায়!

কিন্তু নিজের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁর স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের জন্যও তাঁর পৈতৃক প্রাণটা অব্যাহত থাকা দরকার, তাই তিনি চাহিতেন যেন নিহত না হন! তিনি ত' ধনী নন, তিনি যদি গতাসু হ'ন তবে তাদের দশা কি হইবে?

আর শুধু সেই জন্যই যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর মেরুদণ্ড বাহিয়া একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগিত আর গুলির শব্দে তাঁর চুল খাড়া হইয়া উঠিত। প্রকৃতপক্ষে, গত কয় মাস তার কাটিয়াছে ভীষণ আতঙ্ক ও বিভীষিকার মধ্যে।

একবার তাঁকে এক 'স্কাউটিং' দলের সঙ্গে পাঠান হইল, আদেশ হইল—সঙ্গীদের নিয়া গিয়া শত্রু-এলাকায় প্রবেশ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

* (গী ছ মপাসাঁ লিখিত)

স্থানটি এমন নীরব ও শান্তিপূর্ণ যে শত্রুপক্ষ হইতে বাধাদানের কোনওরূপ আয়োজন আছে বলিয়া মনেই হইল না। তাই ক্রুসসৈনিকেরা আদেশানুযায়ী যখন নিঃশব্দে পাহাড়ের খাত বাহিয়া নামিতেছিল, তখন হঠাৎ এক ঝলক গুলীবর্ষণে তারা একেবারে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং দলের মধ্যে কুড়িজন ধরাশায়ী হইল। সঙ্গে সঙ্গে একদল ফরাসী-সৈন্য সঙ্গীন উঁচাইয়া তাদের গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল।

প্রথমটায় ওয়াল্টার স্নাফস্ এতটা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন যে একেবারে চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া এক জায়গায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সে ভাবটা কাটিতেই তাঁর মনে ঘুরিয়া দৌড়াইয়া পলাইবার ইচ্ছা সঞ্চারিত হইল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল, দৌড়াইলে তাঁকে দেখাইবে ঠিক কচ্ছপের মত,—যেন একটা কচ্ছপ কতকগুলা লম্ফমান ছাগলের কাছ হইতে দৌড়াইয়া পলাইতেছে!

দৈবাৎ সম্মুখে ঝরা পাতায় ভরা এক খাদ চোখে পড়িল। আর অমনি, মানুষে যেমন নদীর গভীরতার কথা না জানিয়া-শুনিয়াই সেতুর উপর হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ওয়াল্টার স্নাফস্ও তেমনি সেই খাদে লাফাইয়া পড়িলেন।

ঝরা ফুলপাতা ও আল্গা কাঁটার গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, মুখ হাত ছড়িয়া গেল। ঐ গাদা ভেদ করিয়া পড়িলেন গিয়া আর এক স্তর নীচে, এক গর্ত্তে, পাথরের উপর। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নীল আকাশ দেখা যাইতেছে। তখনই ভয় হইল, ফরাসীরা তাঁকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাই তিনি গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সতর্কদৃষ্টি রাখিলেন উপরকার পাতাগুলি যেন না নড়ে। যতক্ষণ-না সেই সংঘর্ষস্থল হইতে বেশ কিছুটা দূরে গিয়া পৌঁছিলেন, ততক্ষণ এইভাবে চলিলেন। তখনও গুলির শব্দ ও আহতদের চীৎকার শোনা যাইতেছিল। তারপর একে একে, কোলাহল থামিয়া গেল, আবার সমস্ত জায়গাটা পূর্ব্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

হঠাৎ নিকটে কি নড়িয়া উঠিল। স্নাফস্ ভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন, কিন্তু ও কিছু না, একটা পাতা পড়িল মাত্র। কি করা যায় এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ভীষণ উদ্বেগ ও ত্রাসের মধ্যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন। নিজেদের সৈন্যদলে ফিরিয়া যাইবেন?…হাঁ…ফিরিয়া আবার সেই ভয়াবহ আতঙ্ক ও বিভীষিকার জীবন যাপন করিবেন, নিত্য প্রত্যক্ষ করিবেন খুনোখুনি অত্যাচার ব্যভিচারের লীলা।…না, পারিবেন না। আবার ও দুর্ভোগ উদ্‌যাপন তাঁর পক্ষে অসাধ্য।…কিন্তু যেখানে আছেন, সেখানে থাকাও ত' চলে না; তাঁকে আহার করিতে হইবে ত'।…তা' বটে, ওয়াল্টার স্নাফস্ বিনা আহারে বেশীক্ষণ থাকিবার পাত্র ন'ন।

শত্রুর দেশে সৈনিকের বেশে অস্ত্রহস্তে একাকী তিনি। যারা তাঁকে রক্ষা করিতে পারিত, তাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ভাবিতেই আতঙ্কে তাঁর কম্প উপস্থিত হইল।

এমন সময় সহসা তাঁর মনে পড়িয়া গেল, "আরে, ঠিক্ ত', আমি ত' বন্দী হ'তে পারি! তা' হ'লে আমি খাওয়া পাবো, পরা পাবো আর ঐ জঘন্য গুলিগোলা তলোয়ারের হাঙ্গামা থেকে আমায় ওরা দূরে সরিয়েও রেখে দেবে! তাই ঠিক্ আত্মসমর্পণ করবো।"

কিন্তু একা এই সৈনিকবেশে শত্রুশিবিরের দিকে যাওয়া যায় না, হয়ত' তাঁকে দেখিবামাত্র গুলি চালাইতে সুরু করিবে।… দূর ছাই!…ফরাসী চাষাভুষারাও ত' ছাড়িবে না! সঙ্গীহীন কোনও 'ক্রুস'কে পাইলে তারা কুকুরকে যেমন ভাবে মারে তেমনি ভাবে হত্যা করিবে। বিজেতার প্রতি তাদের যে আক্রোশ তার প্রতিশোধ তারা তাঁর উপর লইবে। তাদের হাতের সড়কি ও ঠ্যাঙ্গার প্রহারেই তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে।…

মাত্র এক-পা বাড়াইলেই হয়ত' ঐ ঘাসের ভেতর লুক্কায়িত সৈনিকেরা তাঁর উপর গুলিবর্ষণ করিবে।…আর তখন তাঁর ঐ সাধের সুন্দরী বধূটি যে তাঁকে প্রতি সন্ধ্যায় আদরসোহাগে আপ্যায়িত করে, তার কি অবস্থা দাঁড়াইবে! নাঃ, প্রথম দৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হইয়াছিল, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। তিনি আবার বিবেচনা করিতে বসিলেন।

রাত্রি আসিয়া পড়িল, যেমন অন্ধকার তেমনি নিঝুম। তাঁর নড়া-চড়া করিতে সাহস হইল না। আর রাত্রিতে কত ও রকম যে ছোট ছোট শব্দ হয়!…একবার ত' এক খরগোস তাঁকে 'ভোঁ-দৌড়' করাইয়াছিল আর কি!…একটা বাদুড় তাঁর মুখে ঝাপটা মারিয়া আসিয়া পড়িল, আতঙ্কে তিনি ত্রাহি ডাক ছাড়েন প্রায়!… অন্ধকারে কেহ যাইতেছে কিনা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা ঠাহর করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন।

তারপর যেন অনন্তকাল অপেক্ষার পর গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে আলো উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। স্নাফস্ স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।…তাঁর সমস্ত অঙ্গ যেন শিথিল হইয়া আসিল, মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল আর অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন খরসূর্য্য মধ্যগগনে, অর্থাৎ তখন দ্বিপ্রহর। তখনও মাঠে ঘাটে নীরবতার অখণ্ড প্রতিষ্ঠা।… ওয়াল্টার দেখিলেন ভীষণ ক্ষুধাবোধ হইতেছে। সৈনিকদের মেসের মাংস ও আলুর কথা মনে জাগিতেই পেটটা হাহাকার করিয়া উঠিল।

স্থির করিলেন, যাকেই ওদিক দিয়া যাইতে দেখিবেন তার কাছেই আত্মসমর্পণ করিবেন, তার আগে মাথার সূক্ষ্মাগ্র শিরস্ত্রাণটি খুলিয়া লইতে হইবে।…এই স্থির করিয়া তিনি সাবধানে গর্ত্ত হইতে মাথা বাহির করিলেন ও চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

কোথাও জনপ্রাণী নাই, অতিদূরেও না। বামপাশে ছোট্ট গ্রামের কুটীরগুলি দেখা যাইতেছে, চিমনি দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে।…

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষায় কাটাইলেন। রাত্রিও সেখানে কাটিল। যে সব স্বপ্ন দেখিলেন তা' ক্ষুধা-ক্লিষ্টের দুঃস্বপ্ন।

পরের দিনও সেইভাবে গেল। তার পরের রাত্রিও।…একটা

সাংঘাতিক আশঙ্কা ওয়ালটার স্নাফস্কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—সেটা অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা।···কল্পনায় দেখিলেন তিনি খাদের মধ্যে মড়িয়া পড়িয়া আছেন, মাছি তাঁর দেহের উপর আনাগোনা করিতেছে, কাক ঠোক্রাইতেছে, কীট নাড়িভুঁড়ি খাইতেছে। মৃত বীরসৈনিকের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহাও তাঁর ভাগ্যে জুটিবে না, কারণ তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছেন।···

স্নাফসের ভয় হইল, তিনি ভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।···আর, একবার এলাইয়া পড়িলে আর তাঁর উঠিবার ক্ষমতা হইবে না। স্থির করিলেন সকল বিপদ তুচ্ছ করিবেন, সাহসে বুক বাঁধিয়া গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইবেন।

কিন্তু সহসা কাঁটা-কোদাল ঘাড়ে তিনজন কৃষক দেখিয়াই তিনি আবার গর্ত্তে ফিরিলেন!

অবশেষে রাত্রি হইলে পর তিনি অতি সন্তর্পণে ও ভয়ে ভয়ে "ক্যাস্ল'এর দিকে রওয়ানা হইলেন। গ্রামে যাওয়ার বিপদ অপেক্ষা 'ক্যাস্ল'এ যাওয়ার বিপদটা তবু গ্রাহ্য বোধ হইল।

'ক্যাস্ল্'-এর কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জানালায় আলো দেখা যাইতেছে। একটা জানালা খোলা আছে, এবং উহা দিয়া রাঁধা-মাংসের সুতীব্র ঘ্রাণ নির্গত হইতেছে; ক্ষুধার তাড়নায় তিনি 'মরিয়া' হইয়া উঠিলেন, ভুলিয়া গেলেন যে মাথায় শিরস্ত্রাণ আছে; জানালা বাহিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।···

একটা বড় টেবিলের চারিদিকে বসিয়া আটজন দাস-দাসী আহার করিতেছিল।···

সহসা একজন দাসীর হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গেল। চক্ষু গোল গোল করিয়া ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ দেখ, ঐ দেখ! প্রুসেরা ক্যাস্ল আক্রমণ করছে!"

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেই ঐরূপ চেঁচাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সব একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। এলোমেলোভাবে পুরুষেরা মেয়েদের আগে, মেয়েরা শিশুদের আগে সব দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। পলক না পড়িতেই ঘর একেবারে শূন্য হইয়া গেল আর টেবিলের উপরের খাদ্যসামগ্রী সব ওয়াল্টার স্নাফ্সের 'রাক্ষুসে' ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য পড়িয়া রহিল।

ছোঁ মারিয়া খাবার লইবার আগ্রহে তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তবু 'সাবধানের মার নাই' ভাবিয়া, গতিরোধ করিয়া কাণ খাড়া করিলেন।···

সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম, যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আছে। 'করিডরে' দু' চারিটা চাপা পদশব্দ হইল। তয়খানায় লোকের চলাচল শোনা গেল। অবশেষে ঐ মস্ত 'ক্যাস্ল্'-এ মৃত্যুর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

ওয়াল্টার স্নাফস্ বসিয়া খাওয়া সুরু করিলেন, 'খাওয়া' ঠিক নয়, 'গেলা' সুরু করিলেন। তাঁর যেন ভয় মাঝপথেই বাধাপ্রাপ্ত হইতে না হয়। ফাঁদের দ্বারের মত তাঁর মুখ একবার খুলিতে ও আবার বন্ধ হইতে লাগিল। আর উভয় হস্তই পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া চলিল।···মাঝে মাঝে বাধ্য হইয়া থামিতে হইতেছিল। তখন খাবার তল করিবার জন্য মদের পাত্র নিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া মদ খাইয়া লইতেছিলেন।

বোতল, প্লেট, ডিশ সব নিঃশেষে সাফ করিয়া ফেলিলেন। তখন মদের প্রভাবে লাল হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়াছে। কাসিতে কাসিতে প্রায় ফাটিয়া-পড়া সৈনিক-বেশের বোতাম খুলিয়া লইলেন। এক পাও আর নড়িবার ক্ষমতা নাই। ···চক্ষু বুজিয়া আসিল, চিন্তাধারা অসংলগ্ন হইল, মাথা সামনের দিকে টেবিলের উপর রাখা হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল আর দেখিতে দেখিতে তিনি ঘুমে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

* * *

ভোর হইবার কিছু পূর্ব্বে, 'ক্যাস্ল্'-এর বাহিরে আঙ্গিনায় বহু ছায়া-মূর্ত্তির ইতস্ততঃ নিঃশব্দ সঞ্চরণ লক্ষিত হইল, মাঝে মাঝে লৌহাস্ত্রের সূচ্যগ্রফলকে চাঁদের ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হইয়া চক্ চক্ করিয়া উঠিল।·········ছায়া-ঘেরা ঐ বিশাল 'ক্যাস্ল্'-এর দুইটি জানালা দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল।

সহসা বজ্রকণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল—

"আগে কদম! চড়াই!"

আর সমস্ত দরজা জানালা যেন জনস্রোতের তোড়ের মুখে খুলিয়া গেল। তারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।···পঞ্চাশজন লাফাইয়া রান্নাঘরে উপস্থিত হইল এবং সেখানে পরম শান্তিতে নিদ্রিত ওয়াল্টার স্নাফ্সের বুকের উপর পঞ্চাশটা গুলিভরা বন্দুক উঁচাইয়া ধরিল!

ভীত স্নাফস্ তাঁর কম্পমান হাত দুটি মাথার উপর তুলিলেন। ···তাঁকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তারা তাঁর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। একজন অফিসার তাকে বলিলেন,—"তুমি এখন আমাদের বন্দী!"

"বন্দী" এই কথাটুকুর যাদুতে এই প্রুসকুলাবতংসের চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল। তারপর তাঁর মুখে নীরব হাসি ফুটিল, তাঁর স্বপ্নসাধ—আহার ও সঙ্গীনভয়মুক্তি—বাস্তবে পরিণত হইল এবার!

শুনিলেন, একজন অফিসার সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিতেছে, "হুজুর, শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য করেছি, একজন যে রয়ে গেছে তাকে এইমাত্র বন্দী করেছি!"

স্থূলকায় সৈন্যাধ্যক্ষ কপালের ঘাম মুছিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, —"আমাদের জয়!"

তারপর ছোট নোটবুক বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিলেন—

"তুমুল যুদ্ধের পর আমরা প্রুস-সেনাকে তাদের আহত ও নিহতদের নিয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছি। শত্রুপক্ষের ক্ষতি অনুমান পঞ্চাশজন। অনেকেই আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় একজনই মাত্র বাঁচিবে।"

তারপর তিনি তাঁর সহকারীকে বলিলেন, "এখন আমরা আমাদের মূলশিবিরে ফিরে যাব, কিন্তু শত্রু আক্রমণের চেষ্টা করতে পারে, আমাদের ব্যূহ রচনা ক'রে মার্চ্চ করতে হ'বে। অর্দ্ধেক সামনে অর্দ্ধেক পেছনে, সাজো!"

তাদের সঙ্গে ওয়াল্টার স্নাফস্‌ও ছয়জন রিভল্‌ভারধারী সৈনিক বেষ্টিত হইয়া চলিলেন।…তারা অতি বিজ্ঞের মত সাবধানে স্থানে স্থানে থামিয়া থামিয়া দেখিয়া-শুনিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভোরবেলায় তারা তাদের গ্রামের মূলশিবিরে পৌঁছিল।

বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হইবামাত্র এবং সৈন্যদলের মধ্যে বন্দীকে আসিতে দেখিয়াই, তুমুল হর্ষধ্বনি উঠিল। কর্ণেল হাঁকিলেন—"সাবধান, বন্দী পালায় না যেন!"

ওয়াল্টার স্নাফস্ বন্দীশিবিরে ঢুকিতেই, দুইশত সৈনিক তাঁর পাহারায় নিযুক্ত হইল। সেখানে অজীর্ণতার পীড়াভোগসত্ত্বেও তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া মনের সুখে পত্নী ও সন্তানদের চিন্তায় বিভোর হইলেন।

তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন!

* * *

এবং এইরূপে 'সাঁপিক্র ক্যাসল্' মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে শত্রুর হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করা হইল এবং 'লা-রশ অয়্জেল'এর ফরাসীবাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল রাতিয়ের সম্মানসূচক ক্রুশ-চিহ্ন লাভ করিলেন।

ভারতবর্ষের রাজস্ব ও জমির মালিকানা স্বত্ব ও বঙ্গদেশের বিশেষত্ব

শ্রীবিশ্বনাথ সেন, এ্যাটর্নি-এ্যাট-ল

বর্ত্তমান যুগে Mr. Floud এর Land Revenue Commission-এর Report অনুযায়ী বঙ্গদেশের জমিদারি প্রথা নাকচ হইবার প্রস্তাব আছে। তাহাতে এ দেশের বহু লোক আনন্দিত, কারণ তাহাদের ধারণা যে বহুপূর্ব্বে জমির মালিক রাজসরকার (state) ছিল; মধ্যে অর্থাৎ মুসলমানদিগের রাজত্ব-কালে রাজসরকারের দুর্ব্বলতার দরুণ জমিদারগণ হঠাৎ প্রাধান্য লাভ করিয়া জমির মালিক বলিয়া পরিচিত হইলেন কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ কি হিন্দু কি মুসলমান রাজত্বে এদেশের জমিতে রাজসরকারের কোন দিন মালিকানা স্বত্ব ছিল না। Sir Beadon Powl বলিয়াছেন যে, proprietory right in the soil is vested in the subjects and not in the sovereign authority.

সুতরাং subject বলিতে কি বুঝায়—প্রজাবৃন্দ না জমিদার-শ্রেণী ইহা গভীর আলোচনার বিষয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, বহুপুরাকালে এ দেশে অনার্য্য জাতির বাস ছিল(১)। তাহাদের মধ্যে রাজ্যের কথা দূরে থাকুক কোনপ্রকার সমাজ বা সমষ্টি কোন কালে ছিল না। দৈনিক জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের অন্বেষণে তাহাদিগকে নূতন নূতন স্থানের অন্বেষণ করিতে হইত, সুতরাং জমিতে যে কোন স্বত্ব থাকিতে পারে এ ধারণা তাহাদের জন্মায় নাই। তাহার পর খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন এ দেশীয় অনার্য্যগণ তাহাদিগকে প্রচণ্ড বেগে বাধা দেয়, তাহার ফলে ভীষণ যুদ্ধের সৃষ্টি হয় ও তাহার ফলে অনার্য্যগণ পরাজিত হইয়া বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতের গুহা প্রভৃতি নিভৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঋগ্‌বেদে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আছে (২)। অনার্য্যগণকে দূরীভূত করিয়া আর্য্যগণ ক্রমশঃ সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে নিজদিগের আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং পরে তাঁহাদের নাম হইতে আর্য্যাবর্ত্ত নামের উৎপত্তি হইল। সে সময়েই এ দেশে জমির কোন মালিকানা স্বত্বের উৎপত্তি হয় নাই। তখন কোন রাজাও ছিল না বা রাজত্ব ছিল না। ধরণীর সকল ঐশ্বর্য্যের মালিক ছিল প্রকৃতি এবং বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব মানব ছিল তাহার ভোগদখলকারী (৩)। Economics-এ এই যুগকে বলে Res Nullis। তাহার পর আর্য্যগণ যখন স্থানে স্থানে কায়েমীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে বহু বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমিকে মনুষ্যের বসবাস ও কৃষি-কার্য্যের উপযুক্ত করিলেন। এই ভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করার ফলে তাঁহারা জমিতে দখলের অধিকার পাইলেন; এই প্রথাকে theory of land as property of the first cleaner বলে। ইহা মনু প্রভৃতি ঋষিকর্ত্তৃক অনুমোদিত(৪); এ কথা ইংলণ্ডের jurist, Austin সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন—"Land belongs to him who first tills it(৫)। বাস্তবিক এই যুগে যিনি যে পরিমাণে জমি দখল করিতেন তাহার উৎপন্ন ফসলের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিত এবং বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ ব্যতীত তাঁহাকে উক্ত জমি বা উহার উৎপন্ন ফসলের অধিকার হইতে বিচ্যুত করা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ ছিল। Economics এ এই যুগকে age of natural justice বলে এবং এই সময়ে Law of nature ব্যতীত অন্য কোন আইন কানুনের প্রচলন ছিল না (৩)। তাহার পর ক্রমে আর্য্যদিগের মধ্যে সমষ্টি (union) পরে গ্রাম্য সমাজ (village republic) ও তৎপরে রাজ্যের (state) উদ্ভব হইল, অর্থাৎ কয়েকটি পরিবার লইয়া হইল একটি সমষ্টি—কয়েকটি সমষ্টি লইয়া গ্রাম—কয়েকটি

(১) History of Indian People—A. T. Mukherjee

(২) Rig Veda (VII, 49, 2)

(৩) Early History of Property—Maine, pages 202 to 252

(৪) Manu—Chapter IX, I, 52—55

(৫) Austin's Jurisprudence

গ্রাম লইয়া রাজ্য(৬) প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ তিনিই ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং তাঁহার আজ্ঞাই ছিল তৎকালীন আইন(৭)। এ স্থলে এ কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না Eaonomics এ যে Petriarchal Theory of state এর বিষয় জানিতে পারা যায় হিন্দুরাজ অর্থাৎ হিন্দু stato-এর উৎপত্তি সেইভাবে হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে হয়ত এই ধারণা জন্মায় যে হিন্দুরাজ্যের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বহু পূর্ব্ব হইতে এ দেশের জমির মালিক ছিলেন রাজসরকার অর্থাৎ তৎকালীন রাজা এবং সেই কারণে জমির মালিকানা স্বত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যক্তিগত। বেদে অনেক স্থলে হিন্দু রাজকে Lord paramount of the soil বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে(৮) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল(৯)। প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ ছিল ইংরাজিতে যাহাকে বলে little common-wealth ; এ কথা Sir Henry তাহার Village Communities of the East নামক পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন(১০)। তখনকার গ্রাম্য সমাজ ছিল এক একটি administrative body এবং উহার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র republic state এর কাজ করিত। গ্রামের সকল জমির মালিক ছিল সেখানকার সর্ব্বসাধারণ জনমানব অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে communal ownership—কেহ রাজা বা জমিদার আবার কেহ প্রজা ছিল না। গ্রামের সকল ভিতরের ব্যাপারের (internal affairs) ভার থাকিত গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি বিশেষের হস্তে। তাহারা "মণ্ডল," "প্রধান" "জোত রাইয়ত" প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। তাহারা নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে সভা স্থাপন করিয়া গ্রামের ভিতরের কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিতেন—এই প্রথাকে ইংরাজিতে বলে administration by Council of elders. প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ সম্পর্কে Lord Metcalfe যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতিশয় শ্রুতিমধুর। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সভ্য হইতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা নির্ব্বাচন করা হইত। রাজার পদ পরে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য হয়। এই সকল দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে যে এ-দেশীয় জমির মালিকানাস্বত্ব—প্রথমে ব্যক্তিগত থাকিতে পারে কিন্তু পরে মালিক ছিলেন রাজা—এ-ধারণা যে ভুল তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে রাজার কাজ ছিল প্রধানত দুই প্রকার—(১) দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা—(২) দেশের সকল foreign ও international affairs-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা। এজন্য তিনি উৎপন্ন ফসলের সাধারণতঃ ১/৬ অংশ পাইতেন। জমির মালিকানা সত্বের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না, কারণ তাঁহারা centralisation of political authority বা overgovernment of the people আদৌ পছন্দ করিতেন না। জমি ছিল জনসাধারণের সম্পত্তি অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে national property এবং একটি বিরাট এজমালী সম্পত্তি, আর রাজা ছিলেন উহার trustee—এস্থলে এ-কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে Economics-এ যাহাকে National state বলে প্রাচীন ভারতের হিন্দুরাজ সেই প্রকার রাষ্ট্র ছিল। কৃষিজমির ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যিনি যে পরিমাণে জমির জঙ্গল সাফ করিয়া আবাদের উপযুক্ত করিতেন তাহার উৎপন্ন ফসলের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিত। এই ভাবে উক্ত জমিতে তাঁহার দখল অধিকার ও পরে দখলি স্বত্ব হইতে মালিকানা স্বত্ব জন্মায়। সুতরাং এই প্রকার জমির মালিকানা স্বত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতেই ব্যক্তিগত (৮)। সাময়িক গ্রন্থে অর্থাৎ বেদ, পুরাণ প্রভৃতি কাব্যে আমরা যে "ক্ষেত্রপতি" "ক্ষেত্রজয়" "উর্ব্বরজিত" প্রভৃতি বাক্যরীতির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই উহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে কৃষিজমির ব্যক্তিগত (৯) মালিকানা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে কৃষিজমি হস্তান্তর করা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাধাবিঘ্ন ছিল(১০), কিন্তু ক্রমে উহা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় দান বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারা হস্তান্তরের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইল(১১) ও মালিকের মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশগণ তাঁহার ত্যক্ত অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় কৃষিজমির স্বত্ব পাইতেন(১২)। বৈদিকযুগের আরও বিশেষত্ব এই যে

(৬) Rig Veda (VII 49, 2)

(৭) History of Indian Peoplo—A. T. Mukherjee

(৮) Rig Veda (VIII, 39)

History of India Elphinston, page 23

(৯) Rig Veda (IV, 37, 1, 2)

(১০) Land Laws of Bengal, S. C. Mitra, pago 3.

"Little communities were little republics having everything they wanted—an association of kinsman and a collection of families united by assumption of a common lineage. The idea of rent and of landlord were dorment—the village lands were held in common by the families composing the community—Lord Metcalfe,

(৮) Agricultural land was never common property—Land Laws, S. C. Mitter—p. 18.

(৯) (i) Rig Veda IV, 37, 12, VII, 35 10 X. (ii) Land system in India—R. K. Mukherjee—p. 35.

(iii) Report of Land Revenue Commission (Flond) Vol, II pages 129 to 152.

(১০) "The right was not extended to the soil but to the usufruct"—Kiratarjunyam, Canto XIV 13.

(১১) "Private Property in land led to its purchase and sale as an object of commercial transaction" Rig Veda (IV, 31, 1) and (VI 29, 1)

(১২) "Land as private property was the subject of ordinary inheritance" Rig Veda (VI 41 ; 6.)

কোন রাজা যখন কোন নূতন স্থান জয় করিতেন তখন পরাজিত স্থানের অধিবাসীদিগের গৃহ, জমি প্রভৃতির মালিকানা স্বত্ব কস্মিনকালে নষ্ট হইত না(১৩)। নূতন রাজা কেবল মাত্র কর আদায় করিবার অধিকার পাইতেন। বৈদিক যুগের জমির মালিকানা স্বত্বের এই বিশেষত্ব আদালত কর্ত্তৃক অনুমোদিত(১৪)।

বৈদিক যুগের পর মহাকাব্যের (epic) যুগ। অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা প্রভৃতি প্রাচীন বহুমূল্য কাব্য সমূদয়ের যুগ। বৈদিকযুগে আর্য্যগণ পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ, দর্শন প্রভৃতি নৈতিক বিষয়ের চর্চ্চায় ব্যস্ত ছিল, সুতরাং হিন্দুরাজ (Hindu state) বলিতে যাহা প্রকৃত বুঝায় তাহার উৎপত্তি ও পূর্ণ বিকাশ এই সময়েই হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে আমরা চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ প্রভৃতি রাজবংশ ও অযোধ্যা, মগধ, হস্তিনা, কর্ণাট, মণিপুর, মিথিলা, প্রভৃতি রাজ্যের পরিচয় পাইয়া থাকি। কিন্তু জমির মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে ঐ যুগের কাব্যের মধ্যে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং ঐ বিষয় জানিতে হইলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রথা ও রীতির আলোচনা করিতে হয়। এই যুগের কাব্যসমুদয়ের মধ্যে "ব্রজ" "পল্লি" "দুর্গ" প্রভৃতি বাক্যরীতির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; উহা এক একটি unit of settlement ছিল। দুর্গের কাজ ছিল ঐ সকল unitকে রক্ষা করিবার। দুর্গকে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া ছিল গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের উপর একজন প্রধান বা অধিপতি থাকিতেন তাহাকে "গ্রামনী" বলা হইত। উহার উপরে দশ, বিশ, শত প্রভৃতি গ্রাম হইয়া ক্রমশঃ উপর দিকে (ascending series) এক একটি unit বা centre (কেন্দ্র) ছিল এবং প্রত্যেকটির উপর একজন করিয়া অধিপতি, প্রধান শাসনকর্ত্তা কিংবা নেতা থাকিতেন আর সবার উপরে ছিলেন রাজা। এই কারণে ঐ যুগের কাব্যে "দশগ্রামী" "বিশগ্রামী" "শতগ্রামী" প্রভৃতি বাক্যরীতির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় প্রাচীন গ্রাম্যসমাজ ও Hindu National State তখনও বহাল ছিল (১৫)।

তাহার পর ভারতবর্ষে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বের ন্যায় দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা ও তাহার foreign ও international affairs লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রাপ্য উৎপন্ন ফসলের অংশ পাইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন(১৬)। একথা এস্থলে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যদিও প্রাচীন গ্রাম্য শাসনপদ্ধতি হিন্দু রাজাদিগের আমলে পূর্ণমাত্রায় বহাল ছিল, মৌর্য্যবংশের রাজত্বকালে উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য ওরফে কৌটিল্য যে অর্থশাস্ত্র (Hindu Economics) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তৎকালীন জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজসরকার কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন policy of aggressiveness কিছুমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। রাজ্যের সকল জমি রাজসরকারের আয়ত্তে থাকিত, তিনি তাহার উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইলে প্রজার সহিত বিলি বন্দোবস্ত করিতেন ঐ সকল জমিতে প্রজার মাত্র জীবনস্বত্ব থাকিত। তবে যাহারা বহু পূর্ব্ব হইতে জমি দখল করিয়া আসিতেছে অথবা জমিকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবাদের উপযুক্ত করিয়াছিল, বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ ব্যতীত তাহাদিগকে জমির দখল হইতে বিচ্যুত করা হইত না(১৭)। এতদ্‌ব্যতীত রাজসরকারের খাসদখলে বহু জমি থাকিত এবং ক্রীতদাসগণ উহাতে শস্য রোপণ করিত। সামরিক কার্য্যের জন্য অনেক জমি বিনা রাজস্বে বিলি বন্দোবস্ত হইত, ইহা ব্যতীত ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্ত বহু রাজকর্ম্মচারী (আচার্য্য, পুরোহিত, সৈন্যাধ্যক্ষ) অনেক জমি বিনা রাজস্বে উপহার পাইয়াছিল। ঐ সকল দেখিয়া গ্রীকদূত Megasthenes তাঁহার চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ভ্রমণকাহিনীতে বলিয়াছেন—আবাদী জমির মালিক ছিলেন রাজা(১৮)। কিন্তু ঐ ধারণা ভুল(১৯); তবে ঐ কথা সত্য যে এই সময় হইতে ভারতবর্ষে state landlordism ও feudalismএর কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া গিয়াছিল(২০)। একথা এখানে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে হিন্দুদিগের রাজত্বকালে রাজসরকার হইতে মধ্যে মধ্যে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ হইয়া ছিল বটে কিন্তু প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

(১৩) পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন—যমিনী—২য় অধ্যায় ৩১৭ পৃষ্ঠা।

(১৪) According to what is called Hindu Common Law the right to land is acquired by the first person who made a beneficial use of the soil. The crown was entitled to assess revenue only.

(i) Thakurani Dasi vs. Biseswar Sing B. L. R. Sup. 202.

(ii) Secretary vs. Vira
I. L. R. 9 Mad. 175.

(১৫) (i) Manu—Chapter VII, page 439.

(ii) Land System (India)
—R. K. Mukherjee, 50.

(১৬) Philip's Land Tenures—pages 4.

(১৭) Land System in Bengal, M. N. Gupta page 50.

(১৮) Agricultural lands were looked upon as property of the crown—History of Indian People —A. C. Mukherjee—page 53.

(১৯) Early History of Bengal—Mon Mohon —page 153.

(২০) Hindu Civilization—Longmans—pages 296 to 229.

ইহা ত সব গেল আর্য্যাবর্ত্তের বিষয়। বাংলা দেশের ব্যাপার সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। স্মৃতিযুগের কাব্যসমূহে বঙ্গদেশের যাহা পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আদৌ শ্রুতিমধুর নহে—ইহাদের মতে বঙ্গদেশ অসভ্য ও অনার্য্যদিগের বাসস্থান। মনু বঙ্গদেশকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন যে, বঙ্গদেশ তাঁহার মতে ম্লেচ্ছের রাজত্ব ছিল এবং আর্য্যদিগের পক্ষে ঐ দেশে পদার্পণ করা গর্হিত কার্য্য ছিল(২১)। অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের তুলনায় বঙ্গদেশ তখনও অনেক বিষয়ে পশ্চাদপদ ছিল। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নহে—প্রথমতঃ বঙ্গদেশ নদীপ্রধান স্থান, উহার নিম্নঅংশ "ব"দ্বীপের ন্যায় ছিল এবং উহা গভীর জঙ্গলপূর্ণ ছিল। মনুসংহিতায় যে গ্রাম্য সমাজ ও শাসনতন্ত্রের বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহার সহিত বঙ্গদেশের কোন সংস্রব ছিল না। তাহার পর ভারতবর্ষে যে সকল হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকের রাজত্ব বঙ্গদেশেও স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু বঙ্গের সহিত তাহাদের feudal alliance ব্যতীত আর বিশেষ কোন অধিক সম্পর্ক ছিল না(২২)। ঐ সকল কারণে এ দেশীয় আইন কানন, সামাজিক প্রথাসমূহ পূজা পার্ব্বণাদি ও অন্যান্য রীতিনীতি আজিও অনেক অংশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। বঙ্গদেশ জঙ্গলপূর্ণ থাকা সত্ত্বে তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে জঙ্গল সাফ করিয়া অনেক মনুষ্যের বসবাস ছিল এবং তাহাদের মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ সমাজ ছিল ও পরে রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল(২৩)। রামায়ণে বঙ্গদেশের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশ তখন বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল(২৪)। মহাভারতে এ কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে পাণ্ডবগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ব্বে যখন দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন দিয়াছিল। তবে এ কথা সত্য যে আর্য্যদিগের সংস্পর্শে বঙ্গদেশের অনেক নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল এবং ক্রমে যখন বহুসংখ্যক আর্য্য আসিয়া এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন, অনেক বিষয়ে আধিপত্য লাভ করিলেন ও তাঁহাদের প্রভাবে স্থানীয় ব্যক্তিগণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে রাজা নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ আর্য্যদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিল বটে, কিন্তু অন্তর্দ্দেশীয় ব্যাপারগুলি সম্পর্কে প্রাচীন প্রথাসমূহ বহাল রহিল(২৫)।

জমির মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে কোন কাব্যে এমন কি চাণক্যের অর্থশাস্ত্রমধ্যেও কিছু উল্লেখ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বতন্ত্র ছিল এবং হিন্দুরাজাদিগের সহিত ইহার feudal alliance ব্যতীত আর কোন অধিক সম্পর্ক ছিল না(২২)। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ তখনও স্বাধীন ছিল(২৬)। এই স্বাধীন দেশের জমির মালিকানা স্বত্বের সিদ্ধান্ত বিচার করিতে হইলে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, প্রথা, কার্য্যকলাপ প্রভৃতি গভীর-ভাবে আলোচনা করা দরকার। Mr. Floud তাহার Land Revenue Commission সম্বন্ধে যে Report দিয়াছেন তাহার মতে এদেশের জমির মালিক আদিম প্রজা (original cultivator)(২৭)। একথা আদালতের বিচারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে(২৮) যে বহুপূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে দুই শ্রেণীর প্রজা ছিল—কুদখস্ত ও পাইখস্ত। "কুদ" শব্দের অর্থ নিজ জমির আবাদকারী অর্থাৎ মালিকানি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা(২৯)। মনুর theory of land as property of the first cleaner এ স্থলে সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে। বাংলাদেশ এক সময়ে জঙ্গলপূর্ণ ছিল। ঐ জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া যে সকল জমিতে আবাদ হইত, তাহাদের মালিক আবাদকারী (cultivator) ব্যতীত আর কে হইবে? Vincent

(২১) Manu, Chap. X—44, 45

"Manu treated Bangadesh as forbidden land where the language of the people was barbarous and where it was a sin for the pious Hindu to travel"—Land System in Bengal—M. N. Gupta pages 44—49.

(২২) Ashoke's empire extended upto the mouth of the Ganges. Professor Rapon's History of India—(Cambridge) Vol. chapter XXI.

'Samudra Guptas dominions extended to the Hughli and beyond this the frontier kingdoms of the Gangetic delta and the southern slopes of Himalayas were only attached to the Empire by bond of allegiance'—Vincent Smith—History of India—pages 245—250.

(২৩) Land system in British India—Beadon Powl, Vol. Page 110 to 120.

(২৪) রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড—১০ম অধ্যায়।

(২৫) The gradual establishment of the Aryan supremacy was effected by replacement of the native rulers by the Kings from the Aryan stock or by simple recognition—the internal arrangement of the country was never disturbed—Land System in Bengal—M. N. Gupta—page 34.

Manu—Chap VII (201—03)

(২৬) History of Bengal—F. J. Monaham. page 31.

(২৭) Report of Land Revenue Commission Floud—page 8

(২৮) Thakoorani Dasi vs. Bireswar Singh 3 W. R. 29.

(২৯) (i) Wilson's Glossary (287)—Cultivator of own land Kood(self) + khast(saw) = koodkhast (proprietor raiyat).

(ii) Ballie—Land Tax of India. Chapter 6 page 42.

Smith-এরও মত সেইরূপ(৩০)। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীও সেই কথা বলে। ইতিহাস হিসাবে ইহার মূল্য বিশেষ কিছু নহে কিন্তু উহাতে যে ভাবে কালকেতুর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম স্থাপনের বর্ণনা আছে উহা ঐ যুগের রীতি ছিল; সেই কারণে উহা অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে আদিম আবাদকারিগণ সকলেই প্রজা ছিলেন, এ মত কোন প্রকারে সমর্থন করা যায় না।

জিমুতবাহনের দায়ভাগ স্কুলের মূলমন্ত্র অনুযায়ী এদেশে সম্পত্তি অর্থাৎ জমির মালিক কস্মিনকালে রাষ্ট্র (state) বা জনসমাজ (community) ছিল না; ইহা চিরকাল ব্যক্তিগত। Sir Henry Main তাঁহার Village Communities of the East নামক পুস্তকে যে গ্রাম্যসমাজের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার ছায়াও কোনদিন বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনুসংহিতায় যে Village republic-এর উল্লেখ আছে, তাহার সহিত বঙ্গ দেশের কোন সম্পর্ক ছিল না(৩১)। এদেশে জমির মালিক আদিম আবাদকারী (original cultivator); এখন কথা হইতেছে যে এই tillers of the soil কি সব ক্ষেত্রে প্রজাবৃন্দ ছিল না, ইহাদের মধ্যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ জমিদারও ছিলেন। এ বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের রায় সর্ব্বপ্রকারে সমর্থন করা চলে না(১৪) কারণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশ এইরূপ গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল যে সাধারণ লোকের পক্ষে উহা পরিষ্কার করিয়া আবাদের উপযোগী করা সম্ভব ছিল না—উহাতে অর্থবল ও লোকবল উভয়ই দরকার ছিল—সেই কারণে ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে উহা সম্ভব ছিল না। ইহারা কি প্রাচীন কালের জমির মালিক নহে? "জমিদার" শব্দের উৎপত্তি অনেক পরে মুসলমান রাজত্বের সময় হইয়াছিল, কিন্তু জমিদারী পদ্ধতি বাংলা দেশে আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহা এ দেশের অন্যতম বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশে সেনবংশ পালবংশ প্রভৃতি যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহারা তৎকালীন বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সংজাতির সহিত বহু জমি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবাদের নিমিত্ত বিলিবন্দোবস্ত করেন(৩২), পরে উক্ত জমিসমূহ উন্নত হইলে উক্ত ব্যক্তিগণের তাহাতে যথেষ্ট আধিপত্য জন্মায়। বঙ্গদেশে এখনও যে সকল "কাটানি" "নয়াবাদ" "জঙ্গলবাড়ী" প্রভৃতি মহলের নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের উৎপত্তি যে ঐ ভাবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত প্রাচীন রাজাগণ অনেক ব্রহ্মোত্তর, মহত্রাণ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা হইতেও অনেক জমিদারের উৎপত্তি হইয়াছিল(৩৩)। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে কুদখাস্ত রাইয়তগণ কেবলই প্রাচীন বঙ্গে জমির মালিক ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে জমিদারগণও ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেও first clearer of the soil. এই জমিদার শব্দের উৎপত্তি মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হইতে পারে কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই জমিদারি প্রথা বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষত্ব।

হিন্দুদিগের রাজত্বের অবসানে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন—প্রথমে পাঠান ও পরে মোগল। ইহার মধ্যে রাজপুতগণ কিছুকালের জন্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মৌর্য্যবংশের রাজত্বকালে বিশেষতঃ মহারাজ অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে যে feudalism-এর আভাস পাওয়া গিয়াছিল, রাজপুতগণের রাজত্বকালে তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়—ইহা রাজপুত রাজত্বের অন্যতম বিশেষত্ব। এ স্থলে একথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে Law of Real Propertyতে ইংলণ্ডের যে feudalism-এর পরিচয় পাওয়া যায়, রাজপুতদের সামন্ত প্রথা উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল(৩৪)। তাহাদের মধ্যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ৎ পরিমাণ জমি নিজের খাস দখলে রাখিয়া বাকি সমস্তই নিজ আত্মীয় ও প্রিয়জনের মধ্যে সামরিক কার্য্য বিনিময়ে বা উদ্দেশ্যে বিলিবন্দোবস্ত করিতেন। ইহার মধ্যে হিন্দু দায়ভাগ স্কুলের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আইনগুলির (Law of Inheritance) প্রচলন ছিল।

তাহার পর ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইহা state landlordism-এর যুগ। প্রথমে পাঠানগণ জমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কেবল জায়গীর নামক একপ্রকার নূতন স্বত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিন দিল্লী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জমির জরিপ করিয়া রাজস্বের মাত্রা বৃদ্ধি করেন(৩৫); ইহাও state landlordism-এর সূত্রপাত ও জমিসম্পর্কীয় ব্যাপারে রাজসরকারের প্রথম হস্তক্ষেপ (state interference)(৩৬)। তাহার পর মহম্মদ তগলক(৩৭) হঠাৎ খেয়াল বশতঃ তৎকালীন রাজস্বের হার দশগুণ বৃদ্ধি করেন। তাহার ফলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার ছোটে এবং অনেক গরীব প্রজা নিজ বাস্ত জমিজমা পরিত্যাগ করিয়া বনেজঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। তাহার পর ভারতবর্ষে

(৩০) Early History of India—Smith Vol. 1 page 8.

(৩১) Report of Land Revenue Commission Flond—page 8.

(৩২) They were not all revenue-free grants but many of the nature of permits for reclamation—S. C. Mitra—History of Jessore & Khulna, Vol. 1 page 225.

(৩৩) বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—২য় ভাগ ১১ অধ্যায়।

(৩৪) (i) Elphinston—History of India—page 83. 'The plan deffers from the feudal system in Europe being founded on the principle of family partition and not that of securing the services of military leaders."

(ii) আকবরের রাষ্ট্রসাধনা—বঙ্গশ্রী, মাঘ, ১৩৫১।

(৩৫) ১২৯৬—১৩১৬ খৃষ্টাব্দ।

(৩৬) Elliot—History of India Vol. III, page 182—88.

(৩৭) Elliot—History of India, Vol. IV, page 413 to 16.

মুসলমানরাজত্বের প্রায় সকল জমি একের পর এক জরিপ হয় এবং রাজস্বের হারও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার মধ্যে সেরসাহের কথা উল্লেখযোগ্য।—তাহার সময় হইতে জমি জরিপ করিয়া তাহার রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইত এবং পাট্টা ও কবুলতি আদান প্রদানের প্রথা বহাল হইল(৩৭) কিন্তু বঙ্গদেশ সে যাত্রায় রক্ষা পাইয়াছিল—এখানে তখন বার ভুঁইয়ার প্রবল প্রতাপ। তাহাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পাঠানদিগের সাহস হয় নাই(৩৮); পাঠানদিগের সময়ে যে পরিমাণে state interference হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

তাহার পর ভারতবর্ষে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মোগল সম্রাট আকবরের নাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতবর্ষের যে যে স্থান জয় করিয়া আপন সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বঙ্গদেশ অন্যতম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দুদিগের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মাত্র feudal alliance ব্যতীত বিশেষ আর কোন সম্পর্ক ছিল না, এবং পাঠানদিগের সময়ে জমিদারদিগের আধিপত্যের দরুণ বিশেষতঃ বার ভুঁইয়ার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের জন্য বাংলা দেশের ভিতরের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ হয় নাই। কিন্তু মহারাজ আকবর দমিবার পাত্র ছিলেন না, আর তাঁহার মন্ত্রী মানসিংহ ছিলেন অসীম সাহসী ও সুদক্ষ যোদ্ধা। তখনও বঙ্গদেশে বার ভুঁইয়ার প্রতাপ চলিতেছে, তাঁহারা প্রবলভাবে বাধা দেন; তাহার ফলে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেকেই পরাজিত এবং কেহ কেহ নিহত হইলেন। মহারাজ আকবরের এই বঙ্গবিজয় কাহিনী তাঁহার অসীম সাহস ও ক্ষমতার প্রধান সাক্ষ্য(৩৯)। যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ পারিতোষিক হিসাবে অল্প রাজস্বে বা বিনা রাজস্বে "আয়মা" "আলতামগা" প্রভৃতি বহু জমিদারীর বিলি বন্দোবস্ত পাইলেন(৪০)। ইহা ব্যতীত অনেক নূতন নূতন জায়গীরের উৎপত্তি হইয়াছিল। বিদ্রোহী ও পরাজিত জমিদারদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া নূতন নূতন বহু ব্যক্তির সহিত বিলি বন্দোবস্ত হইল, ইহার ফলে বহুসংখ্যক নূতন জমিদারের উৎপত্তি হইল(৩৯)। আকবরের সময়ে তাঁহার রেভিনিউ মিনিষ্টর সমগ্র মোগল সাম্রাজ্য জরিপ করিয়া ভারতবর্ষের এক বিরাট মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও তাঁহার অপর একজন উজির আবুল ফাজেল যে "আইনী আকবরি" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, উহা তৎকালীন ও এ দেশীয় সর্ব্বপ্রাচীন রাজস্ব প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ও জমিজমা সংক্রান্ত পুস্তক(৪১)। রাজা টোডরমলের সাহেব ফলে বঙ্গদেশ ১৮টি সরকারে(৪২) ও ৬৮২টি মহালে বিভক্ত হয়, বিহার ৭টি সরকারে ও ২০০ পরগণা ও উড়িষ্যা ৫টি সরকারে ও ৯৯টি পরগণায় বিভক্ত হয়। শেরসাহের সময়ে যে জমি পরিমাপ করিয়া রাজস্ব নির্দ্ধারণের প্রথা প্রচলিত হয় মহারাজ আকবরের সময় উহার পূর্ণ বিকাশ হয়। তাহার সময়ে জমিকে ভালভাবে পরিমাপ করিয়া তবে দেশের রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইত। সেই উদ্দেশ্যে গজের (chain) ব্যবহার এদেশে প্রথম আরম্ভ হয় এবং উর্ব্বরাশক্তি হিসাবে জমি শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথমে প্রতি বৎসর নূতন বন্দোবস্ত হইত; পরে উহা দশ বৎসর অন্তর পরিবর্ত্তন হইত। আকবরের সময় এইভাবে অত্যধিক state interference হয়, তাহার ফলে state landlordism এর পূর্ণ বিকাশ হয় এবং প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ (village republic) ও গ্রাম্যশাসনপদ্ধতি (administration by council of elders) এই দুইটির এইখানে সমাপ্তি হয়(৪৩)। যাহারা কোন মতে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহারা মাত্র রাজস্ব আদায় করিবার অধিকার পাইলেন, এইরূপ পুরাকালের গ্রামাধিপতি, গ্রামাধ্যক্ষ হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে তালুকদার চৌধুরী প্রভৃতি জমিজমার উপস্বত্বভোগী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের অনেকেরই উৎপত্তি ঐ সময়ে হইয়াছিল(৪৪)। আকবরের পূর্ব্বে চন্দ্রমান অনুযায়ী বৎসর গণনা হইত। এই জন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রচলিত করিয়াছিলেন, এখন হইতে সৌরমান অনুযায়ী বৎসর গণনা আরম্ভ হইল এবং উহাই আজিও "ফসলি" নামে প্রচলিত।

মুসলমান রাজত্বে প্রজাপুঞ্জের অবস্থা সম্বন্ধে Mr. Floud বলিয়াছেন যে তাহাদের অবস্থা হিন্দুদিগের সময়ের ন্যায় উন্নত ছিল। প্রজারা যে সুখী ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদিও রাজস্বের ভাগ উৎপন্ন ফসলের ১ ভাগের ৬ অংশ হইতে ১ ভাগের ৩ অংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, তাহা স্বত্বেও প্রজাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। তাহারা বর্ত্তমান যুগের ন্যায় ঋণগ্রস্ত ছিল না, খাজনার ভাগ শস্যে না দিয়া মুদ্রায় অর্থাৎ গিনি মোহরে দিত। কিন্তু ঐ সকল স্বত্বেও তাহাদের অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বের সময় তাহাদের যে সকল ক্ষমতা ছিল সেই সমস্তই অটুট ছিল এ বিষয় বলা যায় না। হিন্দু রাজত্বের সময় কুদখস্ত রাইয়তদিগের জমিতে মালিকানা স্বত্ব ছিল এ বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে(২৯)। কিন্তু মুসলমানদিগের রাজত্বের সময় তাহাদের আর সে ক্ষমতা ছিল না, এমন কি অনেক সময়ে জমিদারের বিনা অনুমতিতে জমিতে ইচ্ছামত বিভিন্ন শস্য রোপণ করিতে পারিত না, জমি ইস্তফা দিতে পারিত না সুতরাং যখন কোন কারণে তাহারা জমি রাখিতে অক্ষম হইত তখন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লওয়া ব্যতীত

---

(৩৮) যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরাম চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণ, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণ মাণিক, বিক্রমপুরে কেদার রায়, খিজিরপুরে ইশাখাঁ। ইত্যাদি—জমিদারি দর্পণ, শশিশেখর ঘোষ ৬ পৃষ্ঠা।

(৩৯) বিরাট বঙ্গ—দীনেশ সেন—২য় অধ্যায়

(৪০) Land System in Bengal—M. N. Gupta. page 69.

(৪১) 1011 A. N. = 1611 A. D.

(৪২) Circar (Persian) = head = grand devise on.

(৪৩) Land System in India—R. K. Mukherjee page 43.

(৪৪) Land System in Bengal—M. N. Gupta, page 71.

আর কোন উপায় ছিল না(৪৫)। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে Mr. Floudএর মত সমর্থন করা যায় না(৪৬)। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে আর এক শ্রেণীর প্রজার উৎপত্তি হয়—ইহারা পাইখস্ত রাইয়ত অর্থাৎ ভিন্ন গ্রামের প্রজা। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে রাজস্বের হার অতি মাত্রায় বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক গরীব প্রজা বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই সুযোগে অনেক ভিন্ন গ্রামের প্রজা আসিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত জমি আবাদ করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত বাদসাহদিগের প্রিয়পাত্র অনেক ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী বহু জমিজমার বিলি বন্দোবস্ত পাইয়াছিল। এই শ্রেণীর প্রজার জমিতে কোন স্বত্ব ছিল না। বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইন মূলে (৪৭) তাহাদের যে সকল ক্ষমতা আছে তাহাদের কোনটি তাহাদের ছিল না; অল্প কথায় তাহাদের tenant-at-will বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মুসলমানদিগের রাজত্বের সময় প্রজা খাজনা না দিলে কি উপায় অবলম্বন করা হইত তাহা কোথাও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ নাই। তবে এ কথা ঠিক যে জমিদার ইচ্ছা করিলে প্রজার ফসল আটক করিতে পারিতেন, বলপ্রয়োগে তাহার সকল অস্থাবর সম্পত্তির দখল লইতেন ও কখনও কখনও প্রজাকে নিজ বাটীতে বন্দী করিয়া রাখিতেন (৪৮)। দুষ্ট প্রজাদিগের শাস্তির বিষয় Mr. Floud-ও সমর্থন করিয়াছেন (৪৯)।

বাদসাহগণ মধ্যে মধ্যে জমিদারদিগের উপর আবুয়াব বসাইতেন; জমিদারগণ সেই মত প্রজাদিগের নিকট হইতে ন্যায্য খাজনা ব্যতীত অন্য প্রকারে "ডাক খরচা" "পার্ব্বণী" "বাট্টা" "জরিমানা" "তাঁতকর" "হালভাঙ্গান" প্রভৃতি অজুহাতে অনেক টাকা আদায় করিতেন (৫০)।

মহারাজ আকবরের রাজস্ব নির্দ্ধারণ-প্রণালী বঙ্গদেশে কি পরিমাণে কার্য্যকর হইয়াছিল বা আদৌই হয় নাই উহা যথেষ্ট আলোচনার বিষয়। তাহার কারণ এ দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রজাগণ ফসলের ভাগের পরিবর্ত্তে নগদ মুদ্রায় খাজনা দিত—দ্বিতীয়তঃ ইহা জমিদারপ্রধান দেশ এবং আসল জমিদার ও রাইয়তের মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বের মালিক ছিল। আকবরের প্রথা অনুযায়ী প্রজার নিকট হইতে স্বয়ং রাজস্ব আদায় হইত; সুতরাং তাহার measure and value পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত হওয়া সম্ভব হয় নাই; আইনি-আকবরিতে বোধ হয় সেই কারণে বঙ্গদেশের জমি- সংক্রান্ত ব্যাপারের কোন উল্লেখ নাই(৫১)। কাজেই জমিদার দিগের সহিত চুক্তি compromise বন্দোবস্ত হইয়াছিল—এ কথা মানিয়া লইতে হইবে।

তাহার পর ভারতবর্ষের রাজস্বের ইতিহাস· ইংরাজদিগের আমলের কথা। ইংরাজগণ ইং সন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি তৎকালীন দিল্লীর অধীশ্বর শাহাআলমের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের (commercial) সম্পর্ক ছিল। আকবরের সময় ইহার ছায়ামাত্রও ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইহার সূত্রপাত হয় এবং পরে পুণাদস্তরে চলে। বিদেশীয় বণিক্‌দিগকে এ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য বাদসাহদিগের নিকট হইতে permit লইতে হইত এবং সেই উপলক্ষে তাঁহারা প্রচুর রাজস্ব আদায় করিতেন। মধ্যে মধ্যে এই রাজস্বের মাত্রা লইয়া অনেক গোলযোগ সৃষ্টি হইত (৫২)। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট Charnock সাহেব কৌশলে তখনকার বাংলা দেশের নবাব প্রিন্স আজিমের সহায়তায় কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি মৌজার জমিদারি স্বত্ব, তৎকালীন মালিকদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন(৫৩)। তাহার পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের দেওয়ানি লাভ। এই দেওয়ানি লাভের ফলে ইংরাজগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের সকল জমিদার তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের অধিকার পাইলেন কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে দিল্লীর রাজসরকারে প্রতিবৎসর

---

(৪৫) Land Laws of Bengal. M. N. Gupta 107.

(৪৬) The old resident raiyats had the right to remain in undisturbed possession of their holdings so long as they paid rent regularly. In effect they had the right which the subsequent tenancy legislation called a right of occupancy.
Land Revenue Commission Vol. page 11.

(৪৭) Bengal Tenancy Act (Act VIII of 1885)

(৪৮) Preamble to Regulation XVII of 1793. Minutes of Lord Cornwallis dated the 18th June 1789 and 2nd April 1788.

(৪৯) "There is evidence that defaulters were treated with great severity."
—Land Revenue Commission Vol. 1 page 11.

(৫০) জমিদারী দর্পণ—শশিশেখর ঘোষ—পৃষ্ঠা—১১-১৩।

(৫১) Fuminger's Fifth Report Vol. page 272 "The rules in Akbar's code were applicable where rent was payable in kind but rents in Bengal were before the advent of the Moghuls payable in coin. So it is a matter of conjecture how far the rates were affected by the theory of a third of the produce"
Gladwin's Translation of Ayeen-i-Akbari. page 189

(৫২) Constitutional Law—Sarbadhicary. Chap. XXIV

(৫৩) (i) নদিয়ার রাজা ভবানন্দ, সাবর্ণ চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ও বংশবেড়িয়ার রাজা জয়ানন্দ—প্রাচীন কলিকাতা বিশেষত্ব—বঙ্গশ্রী অগ্রহায়ণ ১৩৪১-৪০৮ পৃষ্ঠা।

(ii) Mayor of Lyons-vs-East India Co (1836) 1 M. I. App. Case 173

(iii) Land System in Bengal—M. N. Gupta 110

১৬ লক্ষ টাকা দিতে হইত এবং তাহাদের রীতিমত সৈন্য-সামন্ত রাখিতে হইত। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছিল, কিন্তু এ দেশীয় রাজস্ব ব্যাপারাদি আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে. এই দেওয়ানি প্রাপ্তিই ইহার সূত্রপাত। ঐ বিষয় পরবর্ত্তী বহু রাজকীয় কার্য্যকলাপ হইতেও প্রমাণ হয় ; যথা :—

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইংরাজগণ প্রত্যেক আবাদী জমির উর্ব্বরাশক্তি লক্ষ্য ও বিচার করিয়া জমিদারদিগের সহিত রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন ; কিন্তু যে সকল জমি সম্পর্কে "খামার," "নিজজোত" "নিজ" প্রভৃতি দাবি হইয়াছিল, তাহার উপর কোনরূপ রাজস্ব ধার্য্য হয় নাই। যদি তাহার দখলকারগণ এই মর্ম্মে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারিত যে, তিনি বা তাহার পূর্ব্বপুরুষ উক্ত জমি, ইং সন, ১৭৬৫ তাং ১২ই আগষ্ট ঐ দিবসের পূর্ব্বে অন্ততঃ বার বৎসর আইনসঙ্গতভাবে দখল করিয়া আসিতেছেন(৫৪) ;

(২) ইংরাজ রাজত্বের বহুপূর্ব্ব হইতে এ দেশের অধিবাসী অর্থাৎ জনসাধারণ বহু জমি নিষ্কর হিসাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল। পরে লাখরাজ জমির বাজেয়াপ্তি সম্বন্ধে যে রেগুলেশন(৫৫) প্রচার হয় তাহার মূলে শত বিঘার অনধিক জমি যাহা এ দেশীয় জনসাধারণ নিষ্কর হিসাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল, তৎসমুদ সরকার বাজেয়াপ্তি হইতে মুক্তি পাইয়াছিল—মাত্র যে ক্ষেত্রে উহার দখলকারিগণ প্রমাণ দিতে সমর্থ ছিল যে, তিনি বা তাহার পূর্ব্বপুরুষ ইং ১৬ই আগষ্ট ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অন্তত বারবৎসর ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগদখল করিতেছে।—

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইংরাজগণ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখটিকে তাহাদের রাজত্বের ভিত্তিস্থাপনের দিন মনে করিত ! সেই কারণে ঐ দিনের পূর্ব্বের প্রচলিত রীতি-নীতির উপর বিশেষ হস্তক্ষেপ করে নাই। দেওয়ানি প্রাপ্তির ফলে ইংরাজদিগের দেওয়ানি ও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল, কিন্তু ফৌজদারি বিষয়গুলি তখনও নবাবের হস্তে ছিল এবং নূতন আইন পাশ করিবার ক্ষমতা তাহাদের বহুকাল যাবৎ ছিল না (৫৬)।

তাহার পর যখন পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরাজগণ সমগ্র বঙ্গদেশের মালিক হইলেন, তখন হইতে বা তাহার অল্পদিন পরে এ দেশীয় জমি ও রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপার সমুদয়ে রীতিমত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রথমে এ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের বদলে বহুসংখ্যক ইংরাজকে নিযুক্ত করা হইল। জমিদারদিগের সহিত প্রতি বৎসর নূতন বিলি-বন্দোবস্ত হইত এবং জমিদারির রীতিমত নিলাম হইত। Warren Hastings যখন গবর্ণর ছিলেন তখন এই প্রথার সুরু হয় ; ইহার ফলে বহুসংখ্যক প্রাচীন জমিদার লোপ পায় এবং নূতন জমিদারগণ প্রজার নিকট হইতে বৃদ্ধি খাজনা আদায়ের জন্য নানারূপ জোর জুলুম করিত। গভর্ণমেণ্টের আয়ও প্রতিবৎসর পরিবর্ত্তন হইত(৫৭)। তাহার পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রচলিত আইন(৫৮) মূলে একটি অনুসন্ধান সভা(৫৯) বসে—যাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী দশশালা বন্দোবস্ত (Decennial Settlement আইন(৬০) প্রচার হয় এবং তাহার ফলে জমিদারদিগের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত হয় এবং পরে উহাই চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়(৬১)। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এ দেশের গভর্ণর ছিলেন। তিনি এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জমিতে যে সকল ব্যক্তির কোন না কোন স্বত্ব আছে, তন্মধ্যে জমিদারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কারণে তিনি জমিদারদিগকে মালিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ স্থলে এ কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, তিনি feudalism-এর পরে ইংলণ্ডে landowner দের states অনুকরণে এ দেশীয় জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ও সেই সঙ্গে তাহাদের দেয় রাজস্ব চিরকালের মত নির্দ্ধারিত হইল ; এই স্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে জমিদারি আধিপত্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা রাজসরকারের বিনা অনুমতিতেও নিজ নিজ জমিদারি দান-বিক্রয়-বন্ধক প্রভৃতি হস্তান্তরের ক্ষমতা পাইলেন, সমস্ত খনিজ পদার্থের মালিক হইলেন(৬২) ও সমস্ত জঙ্গল, জলাশয়, পতিত ও শিকস্তি ও পয়স্তি প্রভৃতি জমিতে তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইল(৬৩)। অল্প কথায় বলিতে তাহারা নিজ নিজ জমিদারির মালিক হইলেন। এই সকল কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে Magna Char'ar of landed aristrocracy in Bengal বলা হয় ; Mr. Field-এর মত অনেকটা এইরূপ—a Zemindary since permanent settlement is an absolute right of proprietorship. কিন্তু ঐ সকল ক্ষমতা থাকা সত্বেও জমিদারগণ জমির সম্পূর্ণ মালিক হইতে পারেন নাই ; তাহার অন্যতম কারণ এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সে সময়ে এত প্রয়োজন বলিয়া কর্তৃপক্ষদিগের ধারণা হইয়াছিল যে, উহার কি কুফল হইতে পারে এ বিষয় চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ ইহার অভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দারুণ ক্ষতি হইত(৬৪)। Mr. Field-এর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলে

(৫৪) Regulation 1 of 1793

(৫৫) Badshahi Lakhraj Regulations XXXVII of 1793

(৫৬) Regulating Act.

(৫৭) History of the Indian People—A. Mukherjee

(৫৮) Pitt's India Act

(৫৯) Enquiry Committee

(৬০) Regulation VIII of 1793.

(৬১) Regulation 1 of 1793.

(৬২) Soshi Bhusan vs. Jyoti Prosad (1916) P. C. 44. I A. 46 = 21 C. W. N, 377.

(৬৩) Lopez vs. Madan Mohon Tagore 13 M, I. A. 467 = 5 B. L. R. 521.

(৬৪) The policy of Cornwallis in fixing the landtax was a matter of necessity. The East India Company would have been reduced to bankcucpty if they had not adopted the principles of Permanent Settlement. S. C. Mitter's Tagore Law Lectures.

এদেশের জমিদারগণ জমিতে সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথমতঃ জমিতে কোন সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব হইতে পারে না, মাত্র estate থাকিতে পারে, এমন কি ইংলণ্ডে landownerদিগেরও ছিল না; একথা Williamও স্বীকার করিয়াছেন(৬৫)। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের land ownerদিগের Status আমাদের এদেশীয় জমিদারবর্গের অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। তাঁহারা নিজ নিজ জমিদারির (estate) ভিতরের সকল ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। প্রজা পত্তন, উচ্ছেদ, খাজনা কমি বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এদেশের ব্যাপার ছিল স্বতন্ত্র। কুদখস্ত প্রজারা বহুকাল হইতে proprietor raiyat বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। সেই কারণে তাহাদের ইচ্ছামত উচ্ছেদ করা কোনকালে সম্ভব ছিল না(৬৬)। তৃতীয়তঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা-পত্রের মধ্যেও ইংরাজগণ বহু ক্ষমতা ভবিষ্যতে, প্রয়োগের জন্য নিজ হস্তে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন(৬৭); ইহা ব্যতীত জমিদারদিগের উপর এইরূপ আজ্ঞা জারির করা হয় যে, তাঁহারা তালুকদার রাইয়ত প্রভৃতি অন্যান্য স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত যেন কোন প্রকার অসঙ্গত ব্যবহার না করেন এবং তাহাদের দেয় খাজনা যেন বেকসুর সন-সন প্রতি কিস্তিমত আদায় দেয়(৬৮)। সুতরাং জমিদারদিগকে জমির সম্পূর্ণ মালিক বলা চলে না। এ বিষয় Privy Council কর্ত্তৃক অনুমোদিত(৬৯)। আমাদের মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির প্রকৃত মালিক (actual Proprietor) হইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ মালিক অর্থাৎ absolute Proprietor নহে(৭০)। এস্থলে একথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ইংরাজগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণার মূলে এ দেশীয় জমিদার-দিগকে মালিকানা স্বত্ব প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ দেন নাই। আর এ বিষয় আরও আশ্চর্য্যজনক যে, তাহাদের উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা জমিদার-দিগকে যে যৎকিঞ্চিত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী আইন বলে তাহার অধিকাংশই নাকচ করিয়াছেন(৭১)। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রজার জমিতে কোন হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল না। বর্ত্তমান আইনমূলে কোন প্রজা যদি কোন প্রকারে একবার দখলী স্বত্ব লাভ করিতে পারে তাহারা ত জমির সম্পূর্ণ মালিক। জমিদার ইচ্ছা করিলে এমন কি প্রকৃত খাজনা বাকি ফেলার অপরাধেও তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারে না। প্রজা ইচ্ছামত দান, বিক্রয়, বন্ধক, বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ-চ্ছেদন, গৃহনির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির দ্বারা জমি ভোগদখল করিতে পারে। বলবার কেহ নাই, যেহেতু আইন তাহার স্বপক্ষে। পত্তনি খাজানা না দেওয়ার দরুণ অষ্টমে বা রাজস্বদায়ে 'রেভিনিউ সেলে' যদি মহল বিক্রয় হইয়া যায়, প্রজার দখলী স্বত্ব লোপ পাইবে না(৭২)। বর্ত্তমানে যে গ্রামে গ্রামে Debt Settlement Board কার্য্য করিতেছে তদ্দারা প্রজা জমিদারকে তাহার ন্যায্য খাজানা আদায় করিতে রীতিমত বাধাবিঘ্ন দিয়া থাকে। এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, চিরস্থায়ী প্রথা থাকা সত্ত্বেও এদেশের অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের জমির প্রকৃত মালিক প্রজা(৭৩)।

ভারতবর্ষে যে সকল স্থান ইংরাজ-অধিকৃত, তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) গবর্ণমেন্টের খাস-মহল (২) জমিদারি ও (৩) রায়তিরি। খাসমহলের মালিক বা জমিদার গবর্ণমেন্ট নিজে। প্রত্যেক খাসমহলের পৃথক পৃথক নম্বর গবর্ণমেন্টের সেরেস্তায় আছে, প্রত্যেক খাসমহল ব্লক ও হোল্ডিঙ্গে বিভক্ত। ভারতবর্ষে বহু খাসমহল আছে(৭৪)। চর, পতিত জঙ্গল প্রভৃতিকে গবর্ণমেন্টের খাসমহল বলিয়া গণ্য করা হয়। জমির শ্রেণীর প্রাচুর্য্য সাধারণতঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা—এই

(৬৫) No man can ever did nor can own land in any country in the sense of absolute ownership. He can hold an estate—William on Real Property.

(৬৬) Guha's Land System. pages 35 to 50.

(৬৭) Right to enact legislation for the protts ection and welfare of dependent talukders raiya and other cultivators of the soil (ii) to re-establish sayer collections or any other internal duties (iii) to impose assessment on revenuefree lands Clause (7). (8) of Reg 1 of 1793.

(৬৮) Clause 4, 5& 6 of Regulation 1 of 1793.

(৬৯) After all they (Zeminders) were nothing but annnal contractors of revenue, Raja Lila Nanda vs. Government of Bengal 6 M. I. A. 201

(৭০) Sm. Thakoorani Devi vs. Bireswar Sing 3 W. R. 34.

(৭১) (1) Rent Legislation of 1812 (Act V of 1812).

(2) Rent Recovery Act (Act X of 1859).

(3) Landlord and Tenant Procedure Act (Act VIII of 1885).

(4) Bengal Tenance Act as amended by Act IV of 1928 aud ActVI of 1938.

(5) Bengal Agriculture Debto'rs Relief Act.

(6) Orissa Settlement Report, Vol, 1,

(7) Chotonagpore Tenance Act (Act of 1908).

(৭২) Bengal Tenancy Act (Act VI of 1938 Sec. 160.

(৭৩) বাংলাদেশের জমির প্রকৃত মালিক কে—রাজা না প্রজা? বঙ্গশ্রী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০—৫৮৩ পৃষ্ঠা।

(৭৪) কলিকাতা, ২৪ পরগণা, সুন্দরবনের কিয়দংশ, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অংশ (Hill tracts) পালামৌ, সাঁওতাল পরগণা, দার্জ্জিলিঙ, ভূটান, আসাম ইত্যাদি—

তিন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে রায়তিরি প্রথা, উহাকে peasant proprietorship বলে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের কিয়দংশে জমিদারি প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও যেরূপ আইন-কানুনের পরিবর্তন হইতেছে তাহাতে জমির মালিক প্রজারা হইতেছে অর্থাৎ রায়তিরি প্রথার বেশ আভাস পাওয়া যাইতেছে। বর্তমানে Floud Committeeর Report হইতে যে আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কিন্তু অন্যরূপ। অনেকের হয়ত ধারণা যে, উক্ত Report কার্যে পরিণত হইলে আমাদের পূর্বে গ্রাম্যসমাজের আমলের natalisation of land আবার ফিরিয়া আসিবে কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভুল। এই Report-এর মূলমন্ত্র সমস্ত জমিদারশ্রেণীর ধ্বংস ও রাজসরকারকে জমির মালিক করা অর্থাৎ state acquisition of private property. ইহার দ্বারা এদেশের জনসম্প্রদায় কতদূর উপকৃত হইবে তাহা বহু গবেষণার বিষয়। তবে এ বিষয় বেশ জোর সমেত বলা যায় যে, আমাদের বঙ্গদেশে উহা মঙ্গল প্রদান করিবে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ-দেশের যে অনেক পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। উক্ত প্রথার পরিবর্তন হইলে হয়ত কিছু সুবিধা হইতে পারে কিন্তু জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ দেশের কল্যাণ নহে। বঙ্গদেশের বিশেষত্ব এই যে এখানে রায়তিরি বন্দোবস্ত আদৌ সুবিধাজনক নহে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে এখানে কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপার সমুদয়ে অনেক কিছুর অভাব আছে। যথা (১) এদেশে economic holding বলিতে কি বুঝায় তাহা অতি অল্প লোকের ধারণা আছে, (২) এখানকার জমিতে fragmentation ও subdivision of holding অতিরিক্ত বেশী, সেই কারণে অনেক পরিশ্রম অযথা ব্যয় হয় এবং মধ্যস্বত্বের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জমির উন্নতি বা প্রজার মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। সকলেই খাজনা আদায় লইয়া ব্যস্ত (৪) এদেশে কৃষকদিগের মূলধনের যথেষ্ট অভাব। পল্লীতে যে Co-operative Society বা Land Mortgage Bank আছে উহার কার্যপ্রণালী তেমন সুবিধাজনক নহে, সংখ্যাও অল্প। বর্তমানে Bengal Agricultural Debtors' Relief Act হওয়ার ফলে মহাজনগণ নিজ নিজ কারবার প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রজাগণের মধ্যেও একতা নাই। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র, অন্যের মঙ্গলে বা উন্নতিতে হিংসা করে। এই সকল কারণ থাকায় এদেশে রায়তিরি প্রথা সুবিধাজনক নহে। অপর দিকে state acquisitionও এদেশের মঙ্গলকর নহে। ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণ স্থান কৃষিপ্রধান। কৃষির সহিত state-এর সম্পর্ক অতি অল্প(১৫)। বহুদিন যাবৎ এদেশে গভর্ণমেন্টের অন্যান্য Department-এর মত কোন Agricultural Department ছিল না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Manchester Supply Association-এর নির্দেশ অনুসারে প্রথম প্রত্যেক প্রদেশে কৃষিবিভাগ (department of agriculture) স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন হইয়াছিল। কিন্তু বহুকাল যাবৎ উহা কার্য্যকারী হয় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Famine Commission-এর Report-এর ফলে প্রত্যেক প্রদেশে কৃষিবিভাগ সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল(১৬)। কিন্তু কৃষিসম্পর্কে গবেষণা (agricultural research) প্রদর্শনী (exhibition) প্রভৃতি না থাকার দরুণ উহার বিশেষ কোন ফল হয় নাই। Floud Committeeর Report অনুযায়ী দেশের জমির মালিক রাজসরকার হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে না বরং অসুবিধা হইবে; যথা

সুবিধা	অসুবিধা
(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির রাজস্ব চিরকালের মত নির্দ্দিষ্ট; জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি বা উৎপন্ন ফসলের উন্নতি বা দর বৃদ্ধি হইলে প্রজা বা জমিদার তাহার উপকারিতা ভোগ করে; সুতরাং উক্ত বন্দোবস্ত নাকচ করিতে পারিলে গভর্ণমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে।	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গভর্ণমেন্ট যে বিনাক্লেশে ও অতি অল্প সরঞ্জামী খরচে বহু টাকা আদায় করেন—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, অজন্মা প্রভৃতি কোন অজুহাতে বা কারণে রাজস্বের কোন মকুব হয় না—এ-সুবিধা ত' আর থাকিবে না; অধিকন্তু প্রজাবর্গের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক পৃথক আদায় করিতে গভর্ণমেন্টের সেরেস্তায় বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী, পাইক, প্রভৃতি লোকের প্রয়োজন হইবে, তাহাতে গভর্ণমেন্টের বহু অর্থ ব্যয় হইবে। প্রজা ও জমিদার মধ্যে বহু সংখ্যক দাবী, আপত্তি প্রতিদিন আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইতেছে; তাহাতে বহু টাকার কোর্ট ফি বিক্রয় হয়; এই বিক্রয় বন্ধ হইলে গভর্ণমেন্টের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, কাজেই অনেক নূতন নূতন করের(tax) উদ্ভব হইবে।
(২) চিরস্থায়ী প্রথার ফলে জমিতে মধ্য-স্বত্বের শ্রেণী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানে স্থানে ১৫ হইতে ২০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহার ফলে আসল জমিদার হইতে প্রকৃত আবাদকারী প্রজা অনেক দূরে। মাঠের জমি যেন "ভাগের	মধ্য-স্বত্বের জোতগুলি বহুক্ষেত্রে এত ক্ষুদ্র ও তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদিগকে সংযুক্ত করা কতদূর সম্ভব তাহা বলা কঠিন। এই শ্রেণীর প্রথা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির

(১৫) Indian Economic Problems—Brijnarayan. Part I page 50.

(১৬) Report of Agricultural Commission 1928 page 15.

মা" হইয়া পড়িয়াছে ; কাজেই প্রজার মঙ্গল বা জমির উন্নতির দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। চিরস্থায়ী প্রথা নাকচ হইলে ইহারও সমাপ্তি হইবে।

(৩) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ অনুসারে যে সার্ভে সেটেলমেণ্ট কার্য্যফলে প্রজাস্বত্ব খতিয়ান (Record of rights) প্রচলিত হইয়াছে তাহার দ্বারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে বহু বিবাদ ও আপত্তির নিষ্পত্তি হইয়াছে ; এই সেটেলমেণ্ট কার্য্যের দরুণ প্রজার ও জমিদারের বহু অর্থ ব্যয় হয় এবং ভবিষ্যতেও হইবে। চিরস্থায়ী প্রথা নাকচ হইয়া সকল জমিদারী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক acquired হইলে এই কার্য্যের আর দরকার হইবে না।

নিজ নিজ আইন দায়ী। উহাতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ একসঙ্গে বা ক্রমান্বয়ে বহু ব্যক্তি হইয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে জোত জমির সম্পর্কহীন—কাজেই তাহারা জমিজমা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া একতাসহ ভোগ দখল করিবে ইহা আশা করা যায় না। বর্ত্তমান হিন্দু আইনের যে পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতজমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।

জমিদারী প্রথা নাকচ হইলে বহু কষ্টে ও যত্নে প্রস্তুত record of rights অনাবশ্যক কাগজের তুল্য গণ্য হইবে। প্রজা ও জমিদারের অর্থ নষ্ট হইবে। গভর্ণমেণ্টের খাস মহলে নূতন করিয়া জরিপ করিতে হইবে। তাহার বেশী ভাগ ব্যয় প্রজার নিকট হইতে আদায় হইবে।

(৪) এদেশে জমিদারী প্রথা থাকার দরুণ বোধ হয় ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে লোকের তেমন লক্ষ্য নাই। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের সহিত বঙ্গদেশের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ও দেশের বণিক শ্রেণীই বেশী ভাগ ধনী, অর্থের সঞ্চালন তাহারা ভালরূপ বুঝে আর এদেশে জমিদারদিগের সিন্দুকে কোটি কোটি টাকা আবদ্ধ রহিয়াছে। জমিদারী প্রথা নাকচ হইলে, দেশের লোকের ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

গত census-এর report অনুযায়ী বঙ্গদেশে ২৫ লক্ষের অধিক ব্যক্তি কৃষিজীবী। তাহাদের অনাদিকাল হইতে প্রচলিত প্রথার সহসা রূপান্তর আশা করা যায় না। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা ও তাহাদের সঞ্চিত অর্থ পুনরায় জমি জায়গার জন্য ব্যয় হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই প্রকারান্তরে নূতন একশ্রেণীর জমিদারবর্গের অভ্যুদয় হইবে।

ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায় যে, ক্ষতিপূরণ ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের দেয় অর্থ বহুক্ষেত্রে অতি সামান্য। যাঁহারা বহু দিনের জমিদার তাঁহাদের মধ্যে হয়ত অনেকে জমিদারী হইতে বহু টাকা আদায় করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা অল্প কয়েক বৎসর মাত্র বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন, তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

জমিদার শ্রেণীর লোপের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় আইন সভায় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা প্রচণ্ড হইবে। প্রজার তরফ হইতে কোন সুবিধাজনক নূতন আইন পাশ বা পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব হইবে।

সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব—বঙ্গদেশে জমিদারী প্রথা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহার নাকচ করা দেশের মঙ্গলজনক হইতে পারে না।

নতুন সন্ধান

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

সবহারা তোর ভয় কিরে আর চল্‌না আপন গানে,
কাঁটায় কাঁটায় চরণ যে তোর পথের সৃজন জানে।
যায় যদি যাক্ সব কিছু যাক্,
মানব-ধরম তাই শুধু থাক্,
তাই নিয়ে তুই সবার আপন সাজ্‌বে আকুল প্রাণে।

সব হারানোর ব্যথার সাথেই
সব নতুনের পাস্‌নি কি খেই ?
আর কি সবুর মান্‌ছেরে প্রাণ চল্‌না সমান টানে !
নিকষ পাথর কোন্ প্রয়োজন—
পরশমাণিক যার চির ধন,
তাই দিয়ে তুই সোণার মানুষ গড়্‌না সকলখানে।

ভাল ছবি (গল্প)

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে দক্ষিণের বারান্দায় আসতে দেখলাম মাদুরের ওপরে খবরের কাগজখানা পড়ে রয়েচে। সেখানা হাতে করে নিয়ে বসতে না বসতে পেছনের দিক থেকে বিমলা এসে জিজ্ঞাসা করল, আজ সিনেমায় গেলে হয় না বাবা?

তার দিকে ফিরে আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, কেন সিনেমায় যাবার কি বিশেষ কারণ ঘটল আজ?

কাল দাদার এগজামিন শেষ হয়েচে। কি খাটুনিটাই না খাটল দাদা গেল ছ'তিন মাস ধরে! এখন একবার বায়স্কোপ দেখবে না?

তৈরি চা হাতে গৃহিণী দেখা দিলেন। তাঁর হাত থেকে চা নিতে নিতে বললাম, শুনচ, মেয়ের তোমার বায়স্কোপ দেখবার সখ হয়েচে।

মা তাঁর মেয়ের দিকে চাইলেন কিন্তু কোন কথা তিনি তাকে বলবার আগে তাঁকেই মধ্যস্থ মেনে বিমলা আবার বলল, আচ্ছা তুমিই বল মা, দাদা যে এতদিন ধরে দিন নেই রাত নেই সকাল নেই দুপুর নেই এগজামিনের পড়াটা পড়ল, এখন সেই তার এগজামিন শেষ হয়ে গেলে কি একবার বায়স্কোপ দেখবার ইচ্ছা হয় না তার?

বেশ ত—বায়স্কোপ দেখবার ইচ্ছা হয় দেখুক। বারণ করচি কি আমরা?

না বারণ করচ না। কিন্তু তোমরা যদি সঙ্গে করে তাকে সিনেমায় নিয়ে যাও সে কি আরো ভাল হয় না?

কোন জবাব করলেন না গৃহিণী মেয়ের তাঁর ঐ কথার।

আমাকেও ভাবিয়ে দিল কথাটা।

দুজনেই আমরা চুপ করে আছি দেখে বিমলা যেন কথা না বলে থাকতে পারল না এবং আমরা শুনলাম সে বলচে, সকলে একসঙ্গে গিয়ে বায়স্কোপ দেখতে বড় ইচ্ছা হয় আমার। শুনে মনে হল যেন মনের তার কথাটা বেরিয়ে গিয়েচে তার মুখ দিয়ে। কিন্তু সেই গিয়েচে বলেই না বুঝতে পারলাম আমরা তার মনের কথাটা। মনঃক্ষুন্ন করতে সাহস পেলাম না তাই ছেলেমানুষকে—গৃহিণীকে উদ্দেশ করে বললাম, তা বলেচে মন্দ নয় বিমলা। সকলে মিলে একদিন সিনেমায় যাওয়াই যাক না? কি বল?

প্রস্তাবটা সম্ভবত মনোমত হল না তাঁর, কারণ একবারে ঝাঁজিয়ে উঠলেন তিনি, বললেন, বায়স্কোপ ত দেখবে কিন্তু মাসের শেষে বলতে পারবে না যে টাকা নেই।

না গো না বলব না ওকথা। অন্য কোন অসুবিধে হবে কি না তাই বল।

কোন জবাব করলেন না তিনি আমার ঐ কথার। তাঁর সেই চুপ করে থাকাকে তার প্রস্তাবের অনুকূল ধরে নিয়ে মহানন্দে বিমলা হাততালি দিয়ে উঠল—বলল—জানি আমি যে তুমি রাজি হবে বাবা—'হাঁ' বলবে। আর মাও 'না' বলবে না। দাদার সঙ্গে ঐ নিয়ে বাজি হয়েচে আমার। দাদা বলচে—'না' বলবে তুমি। আমি বলেচি—'হাঁ' বলবে। আমার কথাই ত হল।

ঠিক ভাল লাগল না খবরটা, কারণ বোঝা গেল যে, ভেতরের ঐ কথাটা গোপন করছিল বিমলা। ভাবার্থ যার এই, বোঝা গেল যে দুষ্টবুদ্ধি একটু ছিল তার ভাল কথাটার পেছনে। কিন্তু আবার মনে হল যে, বয়স যাদের কম—হাসি ঠাট্টা করবে না তারা নিজেদের মধ্যে? ছেলে মানুষী থাকবে না তাদের কথায় কাজে? আর সেই ছেলেমানুষীর জন্যে ছেলেমানুষকে দোষ দেব আমরা? না চলবে না তা করলে। বয়সের যা ধর্ম্ম তাকে উল্টে দেবার মতলব করলে চলবে না। ধীরে ধীরে অতঃপর মনের আমার খুঁৎখুঁতুনি কেটে গেল—বললাম আমি—হারিয়ে ত দিলি দাদাকে। কি করবি এখন ঐ বাজির টাকা নিয়ে?

সন্দেশ খাব সকলে মিলে।

ছোট ছেলে বিনয় তার মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে। চুপে চুপে সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল—কখন সন্দেশ আসবে মা?

তার মা ছেলেকে তাঁর ধমক দিয়ে উঠলেন—অমন হ্যাংলামি কেন হচ্ছে তোর বল দেখি? সন্দেশ যখনই দেখতে পাবি খেতে পাবি, কিন্তু হ্যাংলামি করলে পাবিনে বলে দিলাম।

মুখে তার যেন অন্ধকার নেমে এল দেখতে দেখতে। মনটা খারাপ হয়ে গেল দেখে। তাকে ভরসা দেবার জন্য তাই বললাম—সিনেমা দেখে ফিরে আসবার সময় সন্দেশ নিয়ে আসব, বুঝলে?

সে কি বুঝল ভগবান জানেন, কিন্তু বিমলা ঠিকই বুঝল এবং জিজ্ঞাসা করল, সে আজই ত যাবে তা হলে বাবা?

আগে দেখি ভাল ছবি আছে কি না।

গৃহিণী চুপ করেই ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, ছবির আবার ভাল মন্দ কি? আমার ত মনে হয় সব ছবিই সমান আর ছবি দেখা মানে টাকার শ্রাদ্ধ।

না মা, তা নয়। কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছ তুমি দিনে দিনে, ছবির ভালমন্দ নেই, বল কি? এমন ছবি আছে যা দেখলে ভাল লাগবেই লাগবে।

চুপ কর, রেখেদে তোর বক্তৃতা। কি যে তোদের স্বভাব হয়েচে একটা ছুতা পেলেই বক্তৃতা আরম্ভ করে দিবি।

অবস্থাটা গোলমেলে হয়ে আসচে মনে হওয়ায় আমি বলে উঠলাম—তা বিমলা মন্দ বলেনি, ছবির ভাল মন্দ আছে। কিন্তু আজ যা আমরা দেখব সে ভাল হবে কি না কে জানে?

দাদাকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাওয়া যাবে। বন্ধুরা তার অনেকেই কাল সিনেমায় গিয়েচে আর বাজার করে আসতে যে এত দেরি হচ্ছে দাদার, তার কারণ ঐ সব বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমার গল্প করচে সে।

ঠিক বলেচিস বিমলা, বড্ড দেরি করচে বিনোদ।

বিমলা ঝাঁ করে গিয়ে ঘড়ি দেখে এল; এসে বলল, না মা তেমন দেরি হয়নি, আর ঐ ত দাদা এসে পড়েচে।

ছেলের হাত থেকে বাজারের ঝোলাটা নিয়ে গৃহিণী রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। বিমলা বলল, সকলে মিলে আজ আমরা সিনেমায় যাচ্ছি, শুনেচ দাদা?

আমি বিনোদকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাল বই কাছাকাছি কোথাও হচ্চে জানিস?

ছায়াছবিতে ভাল বই হচ্ছে শুনেচি। আর এখন কদিন ত সব জায়গাতেই ভাল বই দেবে। নইলে এগজামিন দিল যারা তারা দেখবে কেন?

ছায়াছবিতে ভাল বই হচ্ছে শুনে অনেকটা নির্ভাবনা হলাম কারণ বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয় ওটা। বিমলাকে বললাম, যা ত তোর মাকে জিজ্ঞেস করে আয় 'ছায়াছবিতে' হলে আজই যাওয়া হবে কি না?

একটু পরেই বিমলা ফিরে এল, বলল, মা কিছু বললেন না—কোন কথাই না।

তাহলে?

তাহলে আর কি? 'না' বলবার হলে মা চুপ করে থাকতেন না। কিছু যে তিনি বলেন নি তাতেই বোঝা যাচ্ছে অমত নেই মার। আর আমি বলচি তোমায় বাবা, ভেতরে ভেতরে সিনেমায় যাবার ইচ্ছা হয়েছে মার।

হঠাৎ গৃহিণী এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনি এসে পৌঁছবার আগেই তাঁর কথা শোনা গেল—সিনেমায় যাবে যাও। আমি কিন্তু রান্না করতে পারব না দুপুর রাত্রে এসে বলে রাখলাম। হাসি পেয়ে গেল তাঁর ঐ কথা শুনে; সে কথাটা বলবার তাঁর কোন কারণই ছিল না সেই কথাটা বলতেই রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছিলেন তিনি। হাসি পেয়ে গেল কিন্তু হাসতে ভরসা পেলেম না, কি জানি কি ভাববেন তিনি। সেই অবস্থায় বিমলা কথাটা পরিষ্কার করে দিল—কি বলচ তুমি মা? রাত দুপুর হবে কেন ফিরতে? বড় জোর সাড়ে আটটা, না হয় ন'টা। সে আর এমন কি রাত?

না ন'টা হলে আর বেশী রাত নয় কিন্তু যদি চোর আসে তবে খালি বাড়ী পেয়ে সর্ব্বস্ব নিয়ে যাবে—বেরিয়ে যাবে বায়স্কোপ দেখা। বলে যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন তিনি।

ঠিক ত, ন'টার মধ্যে বাড়ী ফিরতে পারব ত, কি বলিস বিনোদ?

হাঁ বাবা ন'টার আগেই বাড়ী ফিরব আমরা।

তাহলে যা এখনি গিয়ে টিকিট কিনে নিয়ে আয়। বিকেলের দিকে যদি আবার না পাওয়া যায় টিকিট? মনে যখন হয়েচে তখন আজই দেখতে হবে।

... ...

ছবি দেখে বাড়ী ফিরলাম। পথ বেশী নয়। তার ওপরে অনেকক্ষণ ধরে একভাবে বসে থাকার পরে হাঁটতে বরং ভালই লাগল। আরো ভাল লাগল যখন বাড়ীর সামনে এসে দেখা গেল যে সদর দরজার তালাটা ঠিকই আছে। যদিও তেমন আশঙ্কা করিনি তবুও বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে যে চোরে সর্ব্বস্ব নিয়ে যায় নি আমাদের, তা বুঝে মনটা আমারও স্বস্তি বোধ করল।

মুখ হাত ধুয়ে তারপর লম্বা হয়ে বারান্দায় এসে শুয়ে পড়লাম। বেশ একটু ঝিরঝিরে বাতাস আসছিল দক্ষিণদিক থেকে এবং পশ্চিমাকাশে এক ফালি চাঁদও দেখা যাচ্ছিল। যে ছবি দেখে এলাম তার কথাতেই মন আমার ভরে ছিল। গল্পটা বিলিতি সমাজের কিন্তু তার ভেতরের কথাটা আমাদেরই মত মানুষের। বারান্দায় শুয়ে শুয়ে সেইসব কথাই মনে আসছিল—ছোট সহরের উপকণ্ঠের সেই ছোট বাড়ীটি এবং আরো ছোট বাপ মা এবং ছোট একটি তাদের ছেলের সংসারটি। বাড়ীর কর্ত্তা সহরে কাজ করেন—গিন্নী সংসারের কাজ করেন এবং ছেলেটি পড়াশুনা নিয়েই থাকে সারাদিন। পড়াশুনায় সে ভালই এবং শিক্ষকরা তার সম্বন্ধে অনেকখানিই আশা করেন। ছেলের বাপকেও সেকথা তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন এবং বাপেরও ইচ্ছা অনেক দূর পড়াবেন যত দূর সে পড়তে চায়।

ছেলে ম্যাট্রিক দেবে যে বছর সেই বছরের গোড়ার দিকে নিউমোনিয়া হয়ে বাপ তার মারা গেলেন। অন্ধকার ছেয়ে এল মা ও ছেলের জীবনে। বাপ সারাদিনই পরিশ্রম করতেন কিন্তু রোজগার তাঁর বেশী ছিল না, কোন রকমে সংসার চলছিল মাত্র, জমছিল না কোথাও কিছু। লাইফ ইনসিওরের সামান্য পাওনা থেকে সংসার বেশিদিন চলবে না বুঝে ছেলে আর পড়তে চাইল না—বলল চাকরি করব।

কাজ সে একটা জুটিয়েও নিল, কিন্তু সেই তার উপার্জ্জনও দু'জনের তাদের সংসারের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং বীমার টাকা কিছু কিছু খরচ হয়ে যেতে লাগল।

প্রায় বছর দশেক সেই ভাবে দুঃখে কষ্টে কাটাবার পরে হঠাৎ চাকরিতে জনের বেশ একটু সুবিধা হয়ে গেল এবং সেও হল অভাবিত ভাবে। কারণ, বলা নেই কওয়া নেই কারখানার মালিক হঠাৎ একদিন এসে পড়লেন কারখানায় এবং সামনেই জনকে দেখে তার কাজের সব খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ খুসি হয়ে গেলেন জনের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে গেল জনের এবং মর্য্যাদাও বেড়ে গেল তার কারখানার ভেতরে বাইরে।

মাইনে বাড়ার খবর বাড়ী এসে মাকে দিতে দু'চোখ দিয়ে তাঁর ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি। জন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল—তার মনে হচ্ছিল তার বাপের কথা—আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন।

প্রথম কথা মা বললেন—এইবার তোমরা বিয়ে কর—আমি একটু নির্ভাবনা হই।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তারপর মা তার আর কোন কথা বললেন না। জন আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল।

একটু পরে মার্থা সামনে এসে দাঁড়াল তার—জিজ্ঞাসা করল—তোমার না মাইনে বেড়েচে জন?

হাঁ বেড়েচে, কিন্তু—

কিন্তু কি আছে ওর মধ্যে?

আছে, কারণ মা আমাদের বিয়ে করতে বললেন এইবার।

ঠিকই বলেচেন, অন্যায় কিছু বলেন নি।

কিন্তু বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছিনে আমি—

বল কি? পুরুষ মানুষ বিয়ে করবার কথায় ভয় পাচ্ছ?

ভয় পাচ্ছি, কারণ আমার মাকে তুমি জান না—মার্থা।

তোমার মাকে আমি জানিনে? কি হয়েচে তোমার যে, এমন আবোল-তাবোল বকচ?

অবস্থাটা তুমি ঠিক বুঝতে পারচ না মার্থা—তাই ভুল বুঝচ আমাকেও। আমার মাকে তুমি জান কিন্তু সে তাঁর পোষাকী চেহারা—তাঁর আটপৌরে চেহারা চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে থেকে আমি যা দেখেচি, তুমি দেখনি তাঁর সে চেহারা।

কিন্তু তাতে হয়েচে কি?

হয়েচে এই যে তাঁর সঙ্গে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেচে। এমনি অবুঝ হয়েচেন মা যে সে আর কি বলব। একবার যদি বকতে আরম্ভ করলেন, তাহলে আর রক্ষা নেই।

কিন্তু ঐসব জন্যও মাকে তোমার দোষ দেওয়া উচিত নয়। তুমি কি জাননা কত কষ্ট সহ্য করেচেন তিনি জীবনে?

জানি এবং দোষও দিচ্চি নে আমি মা যা হয়েচেন তার জন্য। আমি শুধু ভাবচি তুমি সহ্য করতে পারবে না আমার মাকে এবং একটা মুস্কিল বেঁধে যাবে—

তাকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে মার্থা বলল—কি ছেলে মানুষের মত কথা বলচ জন? তোমার মায়ের সঙ্গে আমি বনিয়ে চলতে পারব না? কি বলচ তুমি?

তুমি জান না মার্থা, কিরকম ভীষণ অবুঝ হয়ে উঠেচেন মা।

কিন্তু যে দুঃখ সারাটা জীবন ধরে তিনি বয়ে এসেচেন তাতে এই বুড়ো বয়সে একটু অবুঝ হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের কিছু নয় তাঁর পক্ষে।

নয় তা জানি। কিন্তু সব জেনেও ঐ অবুঝ মানুষের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করা অসহ্য হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে! তবু আমি তাঁর ছেলে। তুমি আমার মাকে কেমন করে সহ্য করবে মার্থা?

সে আমি ঠিক পারবো দেখে নিও। যা করতে হবে তা করতেই হবে। কোন ছুতো করব না তা না করবার জন্য, যদি দুঃখ সহ্য করতে হয় তাও করব। ভয় নেই তোমার।

ভয় আমার কিন্তু হচ্ছে কারণ আমি চাইনে যে মা আমার তোমাকে একটা অন্যায় কথা বলবেন বা কোন অসঙ্গত আচরণ তুমি করবে তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু কেন তুমি ভয় করচ যে অমন হবে?

এতদিন এক সঙ্গে বাস করে এই ধারণা হয়েচে আমার যে—

মানি তোমার কথা—মা তোমার বেশ একটু কিরকম হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু সে হবার কি কারণ আমার মনে হয় জান? এ বয়সে তাঁর যথেষ্ট বিশ্রাম দরকার—সেই বিশ্রাম তিনি পাচ্ছেন না। সেই হয়েছে আসল গোল।

তাই মনে কর তুমি?

হাঁ আমি তাই মনে করি। আমি ওরকম দেখেচি যে। যথেষ্ট বিশ্রামের সুযোগ পেলে মা তোমার আলাদা মানুষ হয়ে উঠবেন এই আমি বলে দিলাম তোমাকে।

ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে মার্থা। যা তুমি বলচ তাই যেন হয়। কিন্তু বড্ড ভয় হয় আমার মার্থা, হয়ত তুমি বনিয়ে চলতে পারবে না মায়ের সঙ্গে আমার। কি হবে তা হলে?

মিথ্যা ভয় তোমার। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েচেন তোমার মা—সহ্য করবার তাঁর শক্তি শেষ হয়ে এসেচে এতদিনে।

হয়ত তাই—আমি বুঝতে পারিনে সব। তবে মা যে আমার অনেক দুঃখ পেয়েছেন জীবনে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সেই জন্যইত নূতন করে দুঃখ দিতে চাই নে আমি তাঁকে।

আমি তোমার মায়ের দুঃখের কারণ হব—সেই ভয় করচ বুঝি? সে ভয় করো না। বরং আমার মনে হয় সংসারে তোমাদের নূতনের হাওয়া এলে খুসীই হবেন তাতে তোমার মা।

মার্থার কথার কোন জবাব না ক'রে জন শুধু তার দিকে চাইল। মার্থাও চেয়েছিল জনের দিকে। দেখতে দেখতে দু'-জনেই হেসে উঠল তা'রা এবং মুখের কথায় নয়, মনের তাদের খুসির মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে তা'রা আশ্বাস দিল। অনেকক্ষণ পরে জন বলল—তুমি বলচ ঠিক মার্থা, কিন্তু ভাবনা যাচ্ছে না তবু মন থেকে।

ভাবনা যে একবারে নেই—তা বলতে চাইনে আমি, কিন্তু আমার মনে হয় ভরসাও আছে। তার ওপরে তোমার মাকে তুমি ফেলতে পারবে না—আমিও পারব না। আর এ কি ঠিক নয় যে দু'জনে হ'লে আমরা বেশী সহ্য করতে পারব—বেশী ভরসা করতে পারব?

ঠিক বলেচ মার্থা—দু'জনে হ'লে অনেক বেশী সহ্য করতে পারব আমরা। তার পরে মা'র সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে, পছন্দ করেন মা তোমাকে—না?

হাঁ, আর সেইখানেই ত আমার জোর—আমার ভরসা।

ঠিক হয়েচে—তা হ'লে আর ভয় করব না—জীবন আরম্ভ করব ভরসা ক'রে। এখন চল তা হ'লে—মায়ের কাছে চল—দেখি তিনি কি বলেন, দু'জনকে আমাদের একসঙ্গে দেখে।

আর কোন কথা না ব'লে মার্থা তারপর জনের সঙ্গে তার মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জন বলল—মার্থা এসেচে মা।

কি একটা সেলাই করছিলেন তিনি। চোখ তুলে জনের পাশে মার্থাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তিনি এবং গভীরভাবে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—এই তোমারই আসায় অপেক্ষা করছিলাম মার্থা।

কেন আমাকে কি কিছু বলবে?

ব'লবই ত—বিয়ে কর তোমরা এইবার। মাইনে বেড়েচে জনের—শুনেচ নিশ্চয়।

জন ও মার্থা চুপ ক'রে শুনল—কোন কথা বলল না কেউ। মা আবার বললেন—আমার বয়স হচ্চে মার্থা। আমি আর ক'দিন বাঁচব? তোমার হাতে জনকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।

কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ করতে চাই আমি—চা করি একটু?

ঐ দেখ—ঠিক ধরেচ মার্থা। তেষ্টা আমার পেয়েচে অনেকক্ষণ থেকেই, কিন্তু চা করবার জন্যও উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না—যদিও বুঝচি জনেরও তেষ্টা পেয়েচে এতক্ষণে। অতঃপর বাড়ীর সামনের খোলা জায়গাটিতে টেবিল নিয়ে এসে তিনজনে তা'রা চা তৈরী করতে যেতে ব'সে গেল। কেটলি ক'রে মার্থা গরম জল নিয়ে

এল। কাপ ডিস প্রভৃতি নিয়ে এল জন। আরও অনেক কিছু সে এনে রাখল টেবিলের ওপরে। দেখে মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এইসব বুঝি কিনে আনলি? তা' বেশ ক'রেছিস—মাইনে বেড়েচে—বিয়ে করবি—একটু বাড়তি খরচ করতে ইচ্ছা হবে বৈ কি। বেশ করেছিস—

তিনজনে তা'রা তারপরে চা খেতে বসে গেল এবং তাদের সেই হাসি-গল্পের মধ্যে গল্প শেষ হ'য়ে গেল।

পর্দ্দায় যা দেখলাম তার শেষই দেখে এলাম কিন্তু নিজের ঘরের বারান্দায় শুয়ে থাকতে থাকতে বুঝলাম যে—শেষ হয়নি তার—যা দেখে এসেচি। ঘুরে ফিরে বারে বারে সেই ছবিই মনের সামনে ভাসছিল—বিমলা এসে বলল—উঠে বস বাবা—চা খাব আমরা এখানে সকলে বসে। মাও খাবেন চা—জান?

আমি চুপ করে ছিলাম—চুপ ক'রেই থাকলাম—কোন কথা বলতে পারলাম না।

জায়গাটা পরিষ্কার ক'রে সব গোছগাছ করতে করতে বিমলা বলল—খুব পাতলা ক'রে চা করব—মা খাবেন বলেচেন। তোমাকেও ঐ পাতলা চা খেতে হবে কিন্তু।

তা খাব কিন্তু এত সব বিস্কুট মাখন—এ-সব কেন? এর ওপরে আবার সন্দেশ রয়েচে—না?

হাঁ, সন্দেশ আনতে গিয়েচে দাদা। আমি আনলাম এ-সব কারণ দাদাকে আমি মনে করতে দেব না যে ফাঁকি দিচ্চি আমি। কিন্তু বাবা—ওদের মত কিছুই হল না—

নিমকীর থালা হাতে গৃহিণী দেখা দিলেন এবং থালা নামিয়েই তম্বি আরম্ভ ক'রে দিলেন মেয়ের ওপরে—বলিসনি তুই আমাকে যে, পাঁপড় ফুরিয়ে গিয়েচে?

আঃ পাঁপড় আবার কি হবে—এর ওপরে?

গৃহিণী কি বলতে যাচ্ছিলেন—বলা হ'ল না তাঁর, কারণ সন্দেশের চ্যাঙাড়ি নিয়ে বিনোদ এসে দাড়াল—বলল—এক টাকার সন্দেশ বড্ড কম হ'ল মা।

আর এক টাকার আনলি নে কেন? বায়স্কোপ দেখতে অত টাকা খরচ হল আর সন্দেশ দু'টাকার আনতে পারলি নে?

এনেচি মা দু'টাকারই সন্দেশ এনেচি।

বেশ করেচিস। আর দু'টাকার আনলিনে কেন? খাবার জিনিস কেনবার সময়ে টাকা থাকে না—টাকা আসে বায়স্কোপ দেখবার বেলায়।

শুধু আমি নই বিমলা এমন কি বিনোদ পর্য্যন্ত হেসে উঠল তাদের মায়ের সেই কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে—তার সুর তালের অপূর্ব্ব সঙ্গতির সুষমায়।

বিমলা বলল—তুমি এসব বেশ করে সাজিয়ে দাও মা—আমি চায়ের জল গরম করে নিয়ে আসি।

আমি চড়িয়ে এসেচি চায়ের জল, আনচি—তুই সব রেকাব সাজিয়ে দে ততক্ষণে।

কিন্তু তুমি মা চা ক'রো না—তুমি করলেই কড়া হয়ে যাবে চা। বাবার চা করে ঐ হয়ে গিয়েচে তোমার—পাতলা করে চা করতে পার না আর।

তা না পারি না পারব—তোর সে ভাবনায় দরকার কি? তোকে যা বললাম তুই কর—বলে গৃহিণী চলে গেলেন।

বিমলা বলল—মা চা করবে, আর কড়া চা খেয়ে ঘুমুতে পারব না সমস্ত রাত।

আমি ভাবচি ঠিক উল্টা—তোর মায়ের নাকের ডাকে আমরা ঘুমুতে পারব না হয়ত। কিন্তু কই বিনয়, কৈ তাকে দেখচি নে যে?

ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

রাত হয়েছিল—ছেলেমানুষ বিনয়ের পক্ষে ঘুমিয়ে পড়া আশ্চর্য্য নয় এবং আশ্চর্য্য হলামও না কথাটা শুনে, তবু মনটা খারাপ হয়ে গেল অকারণে।

নাটক ও সাহিত্য

শ্রীনলিনীকুমার নাগ চৌধুরী

ভাল লাগার দু'টী আকর্ষণ আছে, একটী সাময়িক, অন্যটী চিরকালের। যা শাশ্বত, তার দিকেই মন টলে, মনের মণিপীঠে তার জয়ধ্বনি বাজে।—সূর্য্য কি শুধু আলো দেয়? তার আলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে কত পদার্থের বীজ;—যা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে মাটীর অণুপরমাণুতে, তাই তার দান চিরকালের। কল্লনাদী লবণাম্বুর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হলেও তার শীকরকণায় পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে উর্ব্বরতাশক্তি। তাই তার দান অনন্তকালের। সে পৃথিবীকে প্লাবিতই করুক আর ধ্বংসই করুক, তার সত্য চিরকালের বাণী।

ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে যা সৃষ্টি হবে, তা যদি অনন্তকালের কথা কয়, তবে তা' সাহিত্য। ক্রমোন্নতিশীল জগতের বুকে লক্ষ যুগের ব্যবধান-পথে তার দান অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে গেলেও, সে সৃষ্টির মূল্য অখণ্ডনীয়।—সব জিনিস যেমন খাদ্য হতে' পারে না, তেমনি সব লেখাও সাহিত্য হতে' পারে না। বাঙালী ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে; কিন্তু সব জাতি তা করে না; তা হোক, তবু তার দান চিরকালের।

সাহিত্য এই অনন্তকালের ভাষা; অনন্তকালের অনন্ত প্রহরী। তার দেশ নেই, জাতি নেই, ধর্ম্ম নেই। তার মহাকালের মহাভেরী বাজতে থাকে, পৃথিবীর দিগন্ত-রেখায় যেখানে সূর্য্যের আলো নত হয়, সকল জাতির সকল ধর্ম্মের মেরুমজ্জার প্রতিধ্বনি তুলে—শ্মশানের বিমলিন ধূলিশয্যায় যেখানে এই নশ্বর দেহটা কেবল মাত্র ভস্মরেখায় পরিণত হয়, সেখানে তারই পাশে ভালবাসা তার নিত্যকালের আসন প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষ মরে যায়, তবু তার ভালবাসা মরে না, সে লক্ষ যুগের প্রহরী হয়ে থাকে মানুষের চিত্তদ্বার-পথে।

সেই জন্য, যাইই লিখবো, তাইই সাহিত্য হতে' পারে না।

একটা হিত, একটা আদর্শ, একটা সৃষ্টি চাই। তবে সেই সাহিত্য আর্ট; সেই আর্ট চিরসুন্দর, চিরসত্য। ভাবের তুলিতে যিনি সাধারণকে অসাধারণ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত আর্টিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন,—"অতি পরিচয়ের ম্লানতার মধ্যেই চির-বিশেষের উজ্জ্বল রূপ দেখাতে পারে যে গুণী, সেই তো গুণী। যেখানটা সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাইনে, সেই খানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টিষ্ট-এর কাজ। সেই জন্যই বড়ো বড়ো আর্টিষ্ট-এর রচনার বিষয় চিরকালের আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে।"

কণ্বদুহিতা শকুন্তলা সায়াহ্নের রবি-অস্তমাঝে পতিগৃহাভিমুখী। সকলের কাছে বিদায় নেওয়া হয়েছে; কিন্তু সেই হরিণশিশু, বাইরের সেই প্রতিদিনের পরিচিত অরুণোজ্জ্বল মূক প্রকৃতি—সব চেয়ে তার মনকে বেদনায় ভারাতুর করে' তুললে। তাপসদুহিতা স্বপ্নেও ভাবেনি এই স্মৃতি একদিন তার বিদায়কে মলিন করে তুলবে। তার বুঝি আর যাওয়া হয় না।—আর্টিষ্ট কিন্তু জানে, প্রতিদিনের ঘর-সংসারের মাঝখানে একটা তুচ্ছ জিনিসের আকর্ষণ কত; সে মানুষের সব চেয়ে অবহেলার বস্তু হলেও, মানুষের মন কিন্তু তার সাথী, সেই উপেক্ষিত বস্তু তার স্মৃতির পাথেয়!

হাজার হাজার বছর আগে এক নির্লজ্জ ভামিনী নিজের কুমারী-লজ্জাকে প্রচ্ছন্ন করবার প্রয়াসে নিজের সন্তানকে এক পেটিকায় আবদ্ধ ক'রে তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল তরঙ্গময় সাগরে। আকণ্ঠ লজ্জা তার আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে থাকলেও, মায়ের মমতা কিন্তু মায়ের বুক হতে' মোছেনি। আকাশের নক্ষত্রলোককে কম্পিত ক'রে কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে যখন রণদামামা ফেটে পড়বার উপক্রম করছে, সেই সময় একদিন সকলের অসাক্ষাতে সেই অবহেলিত সন্তানের শিবির ঘরে মায়ের মাতৃত্ব-বেদনা মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়ালো! ভায়ে ভায়ে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে যুদ্ধ; সমর-শয্যা কি ভায়ের রক্তে কলুষিত হবে? সন্তানের মৃত্যু মা কেমন ক'রে দেখবে?

পেটিকায় বদ্ধ করে' মা যখন ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখনও সান্ত্বনা ছিল, তাকে আর পাবো না বটে, কিন্তু সে বাঁচবে। কিংবা হয়ত বাঁচতে পারে। যখন তাকে আবার পাওয়া গেছে, তখন তার ভয়াল পরিমাণ জননী-মনকে ক্লিষ্ট ক'রে তুলসে। কোথায় ভেসে গেল বিশ্বব্যাপিনী ব্রীড়া, আপাদমস্তক রণিত হ'য়ে উঠলো ভালবাসার জয়গানে

'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখীতে ভালবাসার যে অভিব্যক্তি, তা' সুন্দর; কিন্তু 'দেবদাসে'র পার্ব্বতীতে যে ভালবাসা তা' আর্ট। তা' চিরকালের বস্তু।—সূর্য্যমুখীর প্রেম শুধু তার স্বামীকে বেষ্টন ক'রে। তা'তে আনন্দ আছে, কিন্তু বিস্ময় নেই, কেন না, রমণীর পাতিব্রত্য স্বাভাবিক। বিবাহিত পার্ব্বতী স্বামীর ভালবাসা পেলে; কিন্তু বাল্য ও কৈশোরের যে কয়েকটা বছর দেবদাসের সঙ্গে সে কাটিয়েছিল, সেই অনুপম স্মৃতি কিছুতেই তার মন হতে' মুছলো না! দেবদাসের মৃত্যু-বাসরে তাই তো সে ক্ষণিকের জন্যে তার উপস্থিতি দিয়েছিল! সূর্য্যমুখী যখন সাময়িক আকর্ষণের সামগ্রী হয়ে রইলো, পার্ব্বতী তখন ভালবাসার অনন্ত ভাষা নিয়ে মানুষের চিত্তপটে ছায়াবিস্তার করলে!

কি কাব্য, কি গল্প, আর কি উপন্যাস,—এর যে কোন একটাকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য গড়ে' উঠতে পারে, কিন্তু অনেকের নাটকই নাকি খাঁটী সাহিত্য। এতে কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ—সব কিছুরই সংমিশ্রণ আছে। নাটক-লেখক নাকি শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট। যাই হোক, নাটকের মধ্য হতে' আমরা সাহিত্য-রস আহরণ করবার চেষ্টা করবো। জগতে অসংখ্য নাটক, সুতরাং এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তার আর আলোচনা সম্ভব নয়। দু'একজন নামজাদা লেখকের রচনা নিয়ে আলোচনা করলেই যথেষ্ট হবে।

নাটকের সঙ্গে অভিনয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলে' নাটকের কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন বিষয়-বস্তু বা রসকে ভর ক'রে থাকুক না কেন নাটক, একটা ইঙ্গিত তার মধ্যে থাকা চাই-ই। বলা বাহুল্য, এ ইঙ্গিত সে চিরসত্যেরই প্রতীক। তা' নইলে সাহিত্য-পদবাচ্য হবে না।

নাট্যকার হিসেবে সেক্সপীয়ার অতুল যশ অর্জ্জন ক'রে গেছেন। এখনো তাঁর যশরশ্মি অমলিন। শুধু নাট্য লেখক হিসেবে বিচার করলে, তার মতন এতটা সুখ্যাতি আর কারুর ভাগ্যে ঘটেছে কি না জানি না।—তাঁর যে সময়ে নাম হওয়া উচিত ছিল, সে সময় নাম হয়নি; তার ঢের পরে—প্রায় দু'শো বছর পরে তাঁর প্রতিভা লোক বুঝতে পারে।—জগৎ-প্রসিদ্ধ নট হেনরি আরভিং,—যিনি 'স্যর' উপাধি পেয়েছিলেন, সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বলেন—

"He had no great scholarship. But without great scholarship and with absolutely careless notions about law and geography and historical accuracy Shakespeare had an immeasurable receptivity of all that concerned human character."

[Irving's Essay on Shakespeare and Bacon]

তা' ছাড়া সেক্সপীয়ার এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেন নি বা তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু এমন কিছু অসাধারণ নয়, যা চিরকালের সামগ্রী হয়ে থাকবে। ডেস্‌ডিমোনার সতীত্ব, লীয়ারের উন্মাদনা, পোর্শিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ম্যাকবেথের গগনবিচুম্বী আকাঙ্ক্ষা—সব কিছু সুন্দর হলেও কবির প্রতিভা-সৌন্দর্য্য সেখানে বিকশিত হয় নি। তাঁর অমরত্ব ওখানে নয়।—ওরকম চরিত্রের সঙ্গে আবহমানকাল হ'তে আমরা কমবেশী সকলেই পরিচিত।—সীতা ও দময়ন্তীর সতীত্ব, রাবণের বিশ্বগ্রাসী তৃষা, রামের মহত্ত্ব, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি চরিত্র আমরা আগে হতেই পেয়েছি।

তবে? চিরকালের বাণী আছে তাঁর নাটকের পাতায় পাতায়। সে বাণীর আকর্ষণ এমনি, যা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের কাছে স্বীকৃত হবে, যা মানব-মনের রসবিশ্লেষণে ভরপুর।—তাই বলে, ডেস্‌ডিমনার সতীত্ব, লীয়ারের শোক-বিহ্বলতা প্রভৃতি উপেক্ষার জিনিস নয়, কিন্তু তাদের মূল্য পরে।

আসল কথা, মনের খোরাক জোগাতে পেরেছেন যে লেখক যত, তাঁর সাহিত্য তত উঁচু। ঘটনা, চরিত্র—সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠবে তত্ত্ব,—যার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে অমরত্বের বীজ। লীয়ার কি কেবল হা-হুতাশ করেই কাটালেন?—না, তা তো নয়।
[illegible]

রাজ্য, মেয়েদের অকৃতজ্ঞতা, সংসারের অনিয়ম, নিজের হতশ্রী জীবনের ভার বইতে না পেরে উন্মাদ হবার কামনা করলেন! উন্মাদ হবার সাধ কার মনে জাগে? কিন্তু ভূপতির কাছে সেইটাই সবার অপেক্ষা কাম্য হ'য়ে উঠলো।—এক এক সময় এক একটা জীবনের ধাক্কা মানুষকে এমন বিপর্যস্ত ক'রে তোলে, যা বর্ণনাতীত, অর্থের প্রাচুর্য্য, প্রিয়জনের স্নেহ সিঞ্চনেও তার ধাক্কা সামলানো দায় হ'য়ে ওঠে। সেই সময় উন্মাদ হওয়াই মনে হয় একমাত্র পরম ঔষধ। সেই অবস্থায় মানুষের মন সব কিছুর হাত হ'তে নিষ্কৃতি পায়। এই সঙ্গে তাই স্বতঃই মনে জাগে, যে মায়ের সামনে ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে, সে মা হয় মরুক নয় উন্মাদিনী হোক, কিন্তু মরণ সহজে আসে না; তবে উন্মাদিনী হোক।

নিরীহ পশুর রক্তে সুরঞ্জিত হয় দেবীর যুপকাষ্ঠ, কিন্তু সন্তানের জীবন রক্ষায় সে দেবী অক্ষমা—বিসর্জ্জনের লেখক তাই বড় দুঃখেই লিখলেন—

'সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্ত্তি সত্য নহে,
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে!
সেই সত্য কোটী মিথ্যারূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়েছে; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা!'

চিরকাল প্রশ্ন হয়ে থাকবে ওপরের ওই কথাগুলো।

শকুন্তলায় পেয়েছি—

'রম্যানি বীক্ষ মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি॥

গানে শুনি নৃমণির মন যুগপৎ পুলকিত ও বিমর্ষ; শুধু নৃমণির নয়, অনেকেরই হয়। আবার অনেক গান কানের পাশে গাইলেও মোটেই হৃদয়স্পর্শী হয় না। কিন্তু হৃদয়স্পর্শী হলে' মন তখনই আনন্দ ও ব্যাকুলতায় ভরপুর হয়ে ওঠে। কেন? সেই গায়কের সঙ্গে শ্রোতার নিশ্চয়ই কোন জন্মান্তর-সৌহার্দ্দ ছিল। আত্মা যদি অবিনশ্বর হয়, তা' হলে' কত যুগ পরে এই সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে মিলন সার্থক হয়েছে! তা' নইলে প্রাণের জগতে এমনি ভাবে সাড়া পড়ে কেন?

বার্নার্ডশ'র Man and Superman নাটকে কি তত্ত্ব মাথা ঠেলে উঠেছে? পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই যে যৌন-বোধ, সে কি পুরুষের, সে কি রমণীর?—না। পুরুষ ও নারীর ভেতরে বিশ্বপ্রকৃতির যে প্রতিবিম্ব পড়েছে, এ তারই আহ্বান। তার দুর্নিবার মাদকবেষ্টনে ধরা দিয়ে রাবণের রাজ্য রসাতলে গেল, নিজের সন্তানকে চিরকালের মতন আহুতি দিলে মা—সিন্ধুর শীকরশয্যায়। পদস্খলনের রোমাঞ্চিত কাহিনী জগতের বুক ভরিয়ে ফেললে। তাই নাট্যকার লিখছেন—

Tanner....yes. of her purpose; and that purpose is neither her happiness nor yours, but Nature's.

এই যৌনবোধ moral passion এরই পরিচায়ক। তাই বলেছেন—"It is the birth of that passion that turns a child into a man."

কি শাশ্বত সত্য পাই মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird' এ? সুখের জন্যে মানুষ জগতে কি না করছে! কিন্তু সুখকে কেউ চিরকালের মতন পাবে না। জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও বিলাস যতই বেড়ে যাক্, তখনও মনের বাসনা হবে, আরো চাই। এই চাওয়ার আর নিবৃত্তি হবে না। পার্থিব পদার্থের মধ্যে মানুষ সব কিছুকেই সুখের উপাদানে ফলদায়ক করতে চায়; চিনি, জল, পাথর, অরণ্যের আগাছা, অরণ্যের বন্য পশু—সমস্ত চেতন, অচেতনকে নিয়ে সে সুখের হাট সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু তবুও তার আকাঙ্ক্ষার সমাধি হয়নি। কখনও হবে না।

কারুকে ভূতে ধরলে, তার যেমন আর নিজের সত্বা থাকে না, সে যেমন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়, মানুষের অভ্যাস ও সংস্কারগুলোও তেমনি মানুষের ভেতর ভূতের মতন কাজ করতে থাকে। ইবসেনের 'গোষ্ট' নাটকখানা এই ইঙ্গিত দেয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটকে দেখি ভীল-নায়ক রঘুবীর ব্রাহ্মণ প্রতিপালিত। তার শিক্ষায় ও দীক্ষায় বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট। কঠোরতা ও বর্ব্বরতা তার জন্মগত সংস্কার। ব্রাহ্মণের জন্মগত সংস্কার ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। এই দুই ভাবের উপাদানে গঠিত হল রঘুবীর। কিন্তু ব্রাহ্মণের শিক্ষা তার জন্মগত বিশিষ্টতাকে একেবারে মুছে ফেলতে পারলে না। রঘুবীর জাফরকে হত্যা করলে; তাই বড় দুঃখেই রঘুবীর বললে—

"দস্যু গৃহে
জন্ম মোর,—কঠোরতা—জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপনা হারায়ে
কবে কার সর্ব্বনাশ করি। জন্ম সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা—জন্ম সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—দ্বিজদত্ত
জ্ঞান আচরণে, অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত পড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ ত হ'ল না তাহার!...

শিক্ষা ও রুচির বিশেষত্ব জীবনের ওপর একটা চাকচিক্য এনে দেয়, কিন্তু রক্তের যা বিশেষত্ব, তা' একেবারে নষ্ট হয় না।

কতকগুলো নাটক আছে, যা' অভিনয়ের সময় দর্শককে মন্ত্র-মুগ্ধ করে রেখে দেয়, কিন্তু বস্তু খুঁজতে গেলে হতাশ হ'তে হয়। এই ধরণের নাটক প্রথম প্রথম খুব নাম করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। অনেক খাদ্য আছে, যা পেটকে ভার করিয়ে রেখে দেয়, কিন্তু দেহের পুষ্টি আনে না! এই নাটকগুলো সেই ধরণের। যাঁরা নাটক ও অভিনয়ের একটু আধটু খোঁজ রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, যে নাটক অভিনয়ে জমে নি অথচ ভাবরসে ভরপুর; সেই নাটক অভিনয়ে জমেছে, যে নাটক অথচ তার মধ্যে কিছুই বস্তু নেই সেই নাটককে কালের কষ্টি-পাথরে

অনেক পেছনে ফেলে রেখে গেছে। সেক্সপীয়ারের নাট্যাবলী, বার্নার্ডশ'র 'Man and Superman,' ইবসেনের 'Ghost', মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird,' রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জ্জন' প্রভৃতি তার দৃষ্টান্তস্থল।—সাহিত্যের মূলে আছে সৃষ্টি, ব্যবসা নয়।

একখানা ভাল নাটকের এই এই বিশেষত্ব থাকা একান্ত অপরিহার্য্য :

(ক) তার বিষয়বস্তু—যার মধ্যে থাকবে সর্ব্বজনীন ভাবধারা।

(খ) তার ভাষা।

(গ) তার চরিত্র।

(ঘ) তার ঘটনার স্বাভাবিকত্ব।

(ঙ) তার বহির্দ্বন্দ্বের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রাবল্য।

(চ) ঘটনা বা চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত।

(ছ) কথা প্রসঙ্গে মানব-মনের অপর দিক উদ্ঘাটনা।

আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এক একটা উদাহরণ দিয়ে এই সবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

(ক) তার বিষয়বস্তু—যার মধ্যে থাকবে সর্ব্বজনীন ভাবধারা। এর বিষয় আগেই বলা হয়েছে।

(খ) তার ভাষা : সুরল, সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবপূর্ণ হওয়া চাল। সরল বা সংক্ষিপ্ত হোক বা না হোক, কিছু thought যেন তাতে থাকে। উদাহরণ—

১। বুদ্ধ। মোহাচ্ছন্ন হয়ো না আনন্দ—তথাগতের পিতৃকুল বৃদ্ধ—শাক্য নয়। রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতা, বুদ্ধের নয়।

[ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বিদুরথ'।]

২। বিক্রমদেব। '* * শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অশ্রুতরু হতে'
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাবো ?'

[রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'।]

৩। Octavius. Don't be ungenerous, Jack. They take tenderest care of us.

Tanner. Yes, as a soldier takes care of his rifle or a musician of his violin. * *

[বার্নার্ডশ'র 'Man & Superman']

৪। Lear. * * Anatomise Regan, * *

[সেক্সপীয়ারের 'King Lear'.]

৫। কালসেন। রাখিব তোমারে বন্দী করিয়া বালিকা!
কুবেণী। আমারে করিবে বন্দী! [হাস্য] শুনিয়াছ কভু
কেহ বাঁধিয়াছে সিন্ধু-তরঙ্গ-নর্ত্তনে,
কেহ করিয়াছে বন্দী দীপ্তি দামিনীর,
প্রলয় মেঘের রোল—ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে ?

[ডি, এল, রায়ের 'সিংহল বিজয়'।]

(গ) চরিত্রটী যতই ছোট হোক্, সে যেন নাটকে 'সম্পূর্ণ' হয়ে থাকে। তার একটা বিশেষত্ব থাকা দরকার,—চিরকালের বাণী না থাকুক। যেমন 'প্রফুল্ল' নাটকের মদন ঘোষ। নাটকে চরিত্রটা এক রকম অনাবশ্যক বললেই হয়। কিন্তু হয়ত্মরূপ নাটকের একটা অঙ্গ। গিরিশবাবু মদনকে কেন্দ্র ক'রে সে অভাব ত মেটালেনই, উপরন্তু মূল ঘটনার সঙ্গে দিলেন তাকে খাপ খাইয়ে।—তার বংশরক্ষা সার্থক হল।

'ওথেলো'র রড্‌রিগো আর একটী অনাবশ্যক চরিত্র; কিন্তু সেই প্রেমিক বিলাসীই শেষে একটা চরিত্র হয়ে উঠলো। তার মৃত্যুতে নাটকের মোড় এমনি ঘুরলো, যা চমকপ্রদ অথচ স্বাভাবিক।

'রাজা ও রাণী'তে ত্রিবেদীও তেমনি একটী অপ্রয়োজনীয় চরিত্র। কিন্তু তার বিদ্বেষের প্রশ্রয় নিয়ে নাট্যকার গল্পের ভিত গাড়লেন। জালন্ধরের সেই ওলোট-পালোটের মূলে ঐ ত্রিবেদীই।

(ঘ) তার ঘটনার স্বাভাবিকত্ব—'রাজা ও রাণী'তে রাণীর কাশ্মীরী কুটুম্বগণের অত্যাচারে জালন্ধরের প্রজা খেতে পায় না—নিত্য অভিযোগ। রাণী নানাদিক ভেবে শেষে তাদের ডেকে পাঠালেন। তারা কিন্তু এল বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিয়ে—যেখানে আসা উচিত ছিল ভয়ে ভয়ে। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি তাদের সেই অত্যাচার হঠ্‌ ক'রে এমন মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়াবে; যখন ডাক পড়লো তখন চমক ভাঙ্গলো। ভেবে দেখলে নিজেদের সমর্থন করবার কোন কিছু অস্ত্র নেই, এক লৌহ অস্ত্র ছাড়া! জাগলো তাই প্রাণের ভয়।

ডানকানকে হত্যা করবার সময় ম্যাকবেথের স্মরণ ছিল না, ডান্‌কানের মৃত্যুর পর ব্যাঙ্কোর বংশধরগণ রাজা হবে। ব্যাঙ্কো ম্যাকবেথের পরম মিত্র। রাজাকে নিহত ক'রে সেনাপতি দেখলেন সিংহাসনের পথ পরিষ্কার হয়েছে বটে, কিন্তু তা' তাঁর জন্যে নয়, তারই সুহৃদের জন্যে! নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় অনুতপ্ত হলেন। তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে বন্ধুর প্রাণনাশেও বদ্ধ-পরিকর হতে হল, তা নইলে তাঁর সিংহাসন লাভ হয় না।

(ঙ) তার বহির্দ্বন্দ্বের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রাবল্য :—ইবসেনের Doll's House এর Nora স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল। স্বামীর সঙ্গে সে দীর্ঘকাল বাস করলেও আসল ভালবাসা পায়নি। সে স্বামী তার কাছে বিদেশী। তাকে ত্যাগ করতে তার যেমন দ্বিধা হয়েছিল, তেমনি ত্যাগ করা ছাড়াও তার উপায় ছিল না। প্রথম অঙ্ক হতে শেষ অঙ্কটী পর্য্যন্ত নোরার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে।

রঘুবীরের মতন বীরের পক্ষে জাফরকে খুন করা মোটেই শক্ত নয়, খুন করার কল্পনাটাই সমস্যা। রঘুবীরের প্রতিটি পাতায় রঘুবীরের যে চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, সে চিন্তা নিরক্ষর ভীলযুবকের মনেও আসতো না—যদি না সে অনন্তরাও-পালিত হতো।

(চ) ঘটনা বা চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত :—'জুলিয়াস সিজারের' ব্রুটাস ও সিজার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই ব্রুটাসের হাতে সিজারের যে অকাল-মৃত্যু হবে, এ কেউ ভাবতেও পারে না! দু'জনেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু সিজারের বাসনা-রবি অত্যধিক কিরণ বিস্তার করায় ব্রুটাসের মনে আশঙ্কা তার ছায়া বিস্তার করলে। ভাবলে এ পতনেরই পরিণাম। তাই ব্রুটাস্ বললে—

Brutus. * * As Cæsar loved me, I weep for

him ; as he was fortunate, I rejoice at it ; as he was valiant, I honour him ; but, as he was ambitious, I slew him. * *

তাই অগণ্য জনতার মাঝখানে Brutus বল্‌লে—

'I come to bury Cæsar, not to praise him.'

'রাজা ও রাণী'তে কাশ্মীরী আত্মীয়েরা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে এল, এই এক বিদ্রোহ মাথা তুল্‌তে জালন্ধরে কত কি পরিবর্ত্তন হল। রাণী দেশ রক্ষা করার জন্মে কাশ্মীরে গেলেন ছদ্মবেশে। প্রেমিক নরপতি ভাবলেন, তাঁর ভালবাসার আওতায় ধরা দেবেন না বলেই রাণী পালালেন কাশ্মীরে তাঁর ভাইয়ের কাছে। জালন্ধরেও তাই যুদ্ধের রব উঠলো। স্বদেশপ্রেমিক কুমারকে আত্মবলি দিতে হল বাধ্য হয়ে। কুমারের মৃত্যুতে তরুণী ইলার জীবন হল ব্যর্থ।

(ছ) কথাপ্রসঙ্গে মানব-মনের অপর দিক উদ্‌ঘাটন : প্রসিদ্ধ নাট্যকাররা মূল বক্তব্য বলার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো নায়ক নায়িকার মুখে অনেক দামী দামী কথা যোগ ক'রে দেন, যা চিরকালের বাণী হয়ে থাকে। কিছু উদাহরণ দিলুম—

১। Cæsar. * * Then a man has anything to tell in this world, the difficulty is not to make him tell it, but to prevent him from telling it too often.

[বার্নার্ডশ'র 'Cæsar & Cleopatra']

২। রঘুবীর। * * * ক্ষুধিত শার্দ্দূল,
সে কি হরিণীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত চোখে
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল
নিশ্চল বসিয়া রবে? * *

[ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর'।]

৩। ভীম। মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে!

[গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'।]

৪। দেবদত্ত। ত্রিবেদী সরল? নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি তা'র,
সরল বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

[রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'।]

সঞ্জীব

৫। মহাপঞ্চক কোন কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কখনই শুনি নি।

জয়োত্তম

কোন কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তারাই জবাব দেয় ; আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

[রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'।]

৬। Macbeth. Thou marvell'st at my words ;
but hold thee still :
Things bad begun make strong
themselves by ill.

[সেক্সপীয়ারের 'Macbeth']

Tyltyl,

৭। * * Are they not happy?

Light

It is not when one laughs that one is really happy.

[মরিস্ মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird']

নাটক সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে, কিন্তু আজ এইখানেই শেষ করতে বাধ্য হলুম।

রাত্রি শেষে

শ্রীপ্রশান্তি দেবী

রাত্রি শেষে নিদ্রা আসে, তন্দ্রাতুর কাতর নয়নে,
এলায়ে অলসতনু প্রেমক্লান্ত শিথিল শয়নে।
প্রেয়সীরে বাঁধি বক্ষে। দূরে আকাশের কোলে,
নক্ষত্রের দীপশিখা ধীরে ধীরে পড়িতেছে ঢ'লে।
অস্তমান রজনী মলিন তিমিরে। রাত্রি হ'ল শেষ,
যে সুরে ভরিছে মন কিছু তার ক্ষীণ অবশেষ।
রহিবেনা প্রভাতের বেলা। যেন ছায়া ছবিখানি,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যাবে ধীরে পূর্ণচ্ছেদ টানি।
চৈত্র যথা ফাল্গুনের শেষে। আসি অকস্মাৎ,
শূন্য করি দিয়া যায় মধুময়ী ফাল্গুনের রাত।

ধীরে ধীরে নামে তন্দ্রা বধূসম আনত-নয়না,
প্রথম মিলন ভীরু লজ্জাতুরা কম্পিত চরণা।
চলিছে বঁধূর পাশে প্রেমরাগে রঞ্জিত অধর,
আসে তন্দ্রা অবশেষে, অবসান স্বপনের ঘোর

চৌকো চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

দুই

চুরুট ধরিয়ে মিঃ সোম বললেন, "তারপর বলুন। শ্রীকান্ত বাবু হোটেলে এসে সেই দিনই বৃদ্ধ লিগাল ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন? শান্তিবাবুর বিপদের খবর তাহলে তাঁরা জানেন না। আচ্ছা, কালীঘাটের যে যাত্রী-নিবাসে শান্তিবাবুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে বাড়ীটা পেয়েছেন?"

মিঃ পূরণ সিংহ বললেন, "বাড়ী পেয়েছি, বাড়ীওলা কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তীকেও পেয়েছি।"

"কি করে পেলেন?"

"কাল শান্তিবাবুর উত্থান-শক্তি ছিল না। আজ অনেক কষ্টে উঠেছেন। মোটরে করে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খুঁজে খুঁজে সে বাড়ী বের করেছি। বাড়ীওলা কাশী চক্রবর্ত্তী সেই বাড়ীর ভিতর মহলে স্ত্রী কন্যা নিয়ে বাস করে। বাড়ীর বার-মহলে দুটো ঘর যাত্রীদের জন্য ভাড়া খাটায়। বাড়ীওলা বললে,—আমাকেও তার চেক বই দেখালে, ২৫শে নবেম্বর গৈরিক আলখাল্লাধারী দু'জন বাঙ্গালী সাধু এসে ১৫ দিনের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে তার ঘর দুটো ভাড়া নিয়েছিল। ১০ই ডিসেম্বর তাদের ঘর ছেড়ে দেবার কথা। কিন্তু ৩রা ডিসেম্বর সকালে উঠে চক্রবর্ত্তী দেখেছে, সাধুরা কাউকে কিছু না বলে,—ঝোলাঝুলি লোটা কম্বল নিয়ে রাতারাতি নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করেছে। চক্রবর্ত্তীর ঘটি-বাটি কিছু চুরি যায় নি, এবং সাধুরা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে গেলেও বাকী কয়দিনের ভাড়া ফেরৎ চায় নি,—সে জন্য চক্রবর্ত্তী কৃতজ্ঞ। ওর বিশ্বাস সাধুরা অতি সজ্জন ব্যক্তি!"

মিঃ সোম বললেন, "শান্তিবাবুকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেই সজ্জন ব্যক্তিরা যে অজ্ঞান করে তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে, এবং সম্ভবতঃ সেইখানেই যে তাঁকে গুম করে রেখেছিল, এ সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী ন্যাকা-চৈতন সাজছে?"

মুখ কাঁচুমাচু করে পূরণ সিংহ বললেন, "সাজতে হলে যতটুকু বুদ্ধির দরকার, চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ঘটে তার একান্ত অভাব। ওঁর পাড়া-প্রতিবেশী মহলে খবর নিয়ে জানলাম,—হাঁপানির ব্যামোয় ভোগা, শুয়ে শুয়ে তামাক খাওয়া, আর স্ত্রী কন্যাকে এবং বাড়ীর দাসীটাকে খিট খিট করা ছাড়া আর তিনি এ পৃথিবীর কোন কাজই পারেন না। এক কথায় তিনি নিষ্কর্ম্মা, অপদার্থ, মেয়েলি-পুরুষ!"

"শান্তিবাবুর খবর সে টের পায় নি?"

"কালী মন্দিরে গিয়ে মা-কালীর ফুল বিল্বপত্র হাতে নিয়ে দিব্য-দিলেশা করে বললে, সে শান্তিবাবুর খবর বিন্দুবিসর্গ জানে না।"

"মা কালীর ফুল বিল্বপত্র অনেক শয়তানের শয়তানি-ব্যবসার মূলধন। আচ্ছা, চক্রবর্ত্তীকে পরে দেখছি। ঘর দুটা খানাতল্লাসী করেছেন?"

"করেছি। কিন্তু তার আগেই চক্রবর্ত্তী ঘর দুটো ধুইয়ে মুছিয়ে সাফ করে ফেলেছেন। সুতরাং কিছুই পাই নি। চক্রবর্ত্তী বললে, ইটের উনুনে চাট্টি কাগজ পোড়া ছাই ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দাসীকে দিয়ে সেগুলো তিনি ডাষ্টবিন্‌জাত করেছেন।"

"অর্থাৎ—প্রমাণ লোপ করেছেন? ছাড়বেন না। ওর দিকে কড়া-চোখ রাখবেন। যান আগে শান্তিবাবুকে নিয়ে আসুন।"

মিঃ পূরণ সিংহ বাইরে গিয়ে শান্তিবাবুকে নিয়ে এলেন। তাঁর বেশ পূর্ব্বের মত। চেহারা দোহারা, ভদ্রবংশসুলভ সুশ্রী-কমনীয় মূর্ত্তি। মুখে উদ্বেগ-বিবর্ণতা। দৌর্ব্বল্য ও যন্ত্রণা ক্লান্তিতে চোখের কোলে কালি পড়েছে। গাল গলা ফুলে রয়েছে, তার উপর উগ্র গন্ধ এ্যালোপ্যাথি ঔষধের গাঢ় প্রলেপ। মাঝে মাঝে তিনি খুব কাশছেন। দেখলেই বোঝা যায় তিনি এখনো খুব অসুস্থ হয়ে রয়েছেন।

তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার পরিচয়-জ্ঞাপক প্রশস্ত পরিপুষ্ট ললাটের দিকে ক্ষণেকের জন্য বিচারকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করে, তরুণ সমাদরে চেয়ার টেনে দিয়ে তাঁকে সামনে বসালে। মিঃ সোম সহানুভূতিপূর্ণস্বরে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু'চারটা প্রশ্ন করে বললেন, "অসুস্থ অবস্থায় আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি, সে জন্য আমি দুঃখিত। যথাসাধ্য সংক্ষেপে গোটাকতক প্রশ্ন করব, অনুগ্রহ করে সরলভাবে উত্তর দেন। ১লা ডিসেম্বর কোন সময় আপনি হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন।"

"দুটোর সময়।"

"কি দরকার ছিল?"

"আমার ফাউনটেন্ পেনটা খারাপ হয়ে গেছল। তাই একটা ফাউনটেন পেন,—আর বাড়ীর জন্য ২।১টা জিনিস কিনব বলে বেরিয়েছিলাম।"

"হোটেল থেকে কতদূরে এসে সেই সাধু বেশধারী লোকটির সঙ্গে আপনার দেখা হোল?"

একটু ভেবে শান্তিবাবু বললেন, "বোধহয় ৪।৫ ফালং দূরে।"

"আপনি যে সে সময় জিনিস কিনতে বেরুবেন, সে কথা আর কেউ জানত?"

"ক্ষিতীশ বাবু জানতেন। হোটেলের ম্যানেজার জানতেন। শ্রীকান্ত বাবুকেও বোধ হয় বলেছি, ঠিক মনে নাই।"

"হোটেলের চাকর-বাকরদের? কিম্বা আপনাদের সেই ট্যাক্সি চালকদের?

"না না, তারা সে কথা জানত না।"

"তাদের সামনে আপনারা এ বিষয়ের কোনও কথা কেউ আলোচনা করেন নি?"

"না।"

"আপনার পেনটি কি বরাবরই খারাপ ছিল? না হঠাৎ খারাপ হোল?"

"দুদিন আগে আমার হাত থেকে পড়ে ফুটো হয়ে গেছল।"

"সে সময় সেখানে কে কে ছিল?"

"দু'জন ব্যারিষ্টার, একজন এ্যাটর্নি, আমি, ক্ষিতীশ বাবু, শ্রীকান্তবাবু।"

"কোথায় এ ব্যাপার ঘটেছিল ?"

"ব্যারিষ্টারের চেম্বারে।"

"সেইখানেই কি নতুন পেন কেনার প্রস্তাব উঠেছিল ?"

"না। তখন ব্রিফ নিয়ে নোট লেখায় ব্যস্ত। ও সব তুচ্ছ কথা ওঠার সময় ছিল না।"

"কে নোট লিখছিল ? আপনি ?"

"হাঁ। লেখালেখি সব আমাকেই করতে হয়।"

"কেন ? শ্রীকান্ত বাবু ?"

একটু ইতস্ততঃ করে শান্তিবাবু সসঙ্কোচে বললেন, "তাঁর হস্তাক্ষর বড় বেয়াড়া। সবাই পড়তে পারে না।"

তার পর একটু হেসে ক্লেশভরে গালের ব্যথাযুক্ত স্থানে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "ওঁর একটু হবিও আছে, কাউকে হাতের লেখা দিতে চান না। ওঁর সদাই শঙ্কা—তাতে না কি ফ্যাসাদে পড়তে হয়। এমন কি আত্মীয় স্বজনকে পর্য্যন্ত সেই ভয়ে স্বহস্তে চিঠি লেখেন না।"

"হু।"—ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে মিঃ সোম তরুণের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। তরুণ ক্ষিপ্রহস্তে নিজের নোটবুকে কি লিখে নিলে।

মিঃ সোম একটু চুপ করে থেকে বললেন, "অথচ তত বড় সন্দিগ্ধ স্বভাবের সাবধানী লোকের লেখা জাল হোল ? সেই সাধু বেশধারী লোকটাকে এর আগে কখনো দেখেছিলেন ?"

"যতদুর মনে পড়ে—দেখি নি।"

"সে হঠাৎ এসে পরিচিতের মত আপনাকে সম্ভাষণ করলে ? আপনার একটুও সন্দেহ হোল না ?"

"না। আমি মনে করলুম শ্রীকান্ত বাবু হয়ত আমার চেহারার বর্ণনা তাকে বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছেন, তাই রাস্তার মাঝে হঠাৎ দেখেই সে আমায় চিনে নিয়েছে।"

"সে কি কি বললে আদ্যোপান্ত বলুন।"

পূরণ সিংহের বর্ণনামত বিবৃতি দিয়ে শান্তিবাবু বললেন, "শ্রীকান্ত বাবু তাঁর ফাউনটেন পেনে সবুজ রঙের কালি ব্যবহার করেন। সে চিঠিও সবুজ কালিতে লেখা। ঠিক শ্রীকান্ত বাবুর মত উদ্দাম গতির ত্যাড়াং-ম্যাড়াং ধরণের লেখার টান। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তখন কি ?—আমি এখনো হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছি শ্রীকান্তদার লেখা তারা পেলে কোথায় ?"

"শ্রীকান্ত বাবু কি ফৌজদারী মামলাও করেন ?"

"অবিশ্রাম ! অবিশ্রাম ! ওঁর প্রধান উপার্জ্জন তাতেই। ওদেশের লোকেরা বড় গোঁয়ার—কথায় কথায় খুন জখম করে। শ্রীকান্তবাবুর প্রচুর উপার্জ্জন হয় ফৌজদারী কেসে।"

মিঃ পূরণসিংহ মন্তব্য করলেন, "তা হলে হয়েছে ! হয়ত কোনও জালিয়াৎকে ধরে সাজা দিয়ে রেখেছেন। সে হয় ত প্রতিহিংসা সাধনের জন্য পিছু নিয়েছে। বোধ হয় তার ভয়েই কাউকে হাতের লেখা দিতে চান না। তবু সে এক হাত খেলে নিলে ?"

মিঃ সোম বললে, "শ্রীকান্তবাবুর বয়স কত ?"

"চল্লিশ, বিয়াল্লিশ।"

"বেশ বড় উকিল ?"

"ও-অঞ্চলে সুবিখ্যাত। আসানসোলে উনি প্র্যাকটিস করেন, কিন্তু পুরুলিয়া, রাঁচি, হাজারিবাগ, পাটনা, এলাহাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী সর্ব্বত্রই বড় বড় কেস নিয়ে ছুটোছুটি করেন। ক'টা খুনী মামলায় আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্যভাবে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। অসাধারণ পরিশ্রমী, আর অসামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি !"

"তা হলে ত খুব জবরদস্ত উকিল ! যাক এখন সেই সাধু বাবাজীর কথা বলুন। তাঁর চেহারা কেমন ?"

"শুক্নো কাঠের মত। ময়লা, লম্বা, সাধারণ গাঁজাখোর সাধুর মতই চেহারা। চোখ মুখের কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি বলে মনে পড়ে না। প্রচুর কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে তার সারা মুখটাই ঢাকা ছিল। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। গলায় ত্রিকণ্ঠী মালা। নাক থেকে কপাল পর্য্যন্ত তিলক।"

"অন্য সাধুটির ? যেটিকে কালীঘাটের যাত্রী-নিবাসে দেখেছিলেন।"

"ওই এক পোষাক। এক রকম দাড়ি-গোঁফ। তবে সে লোকটা একটু বেঁটে। দুজনেই বুড়ো। দাড়ি-গোঁফের বেশীর ভাগ চুলই পাকা।"

"দাড়ি-গোঁফ কি পাৎলা না ঘন ?"

"বেজায় ঘন। তাদের কথাও যেন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের ঝোঁপে আটকে আটকে বেরুচ্ছিল।"

মুচকে হেসে তরুণ বললে, "তাহলে ঝুটা দাড়ি-গোঁফ। মুখের প্রকৃত গঠন ঢাকবার জন্যেই তারা সেগুলা ব্যবহার করেছিল। হয়ত তারা আপনার পরিচিত ব্যক্তি। আপনাকেও তারা ভাল করে জানে।"

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ক্ষণেকের জন্য তরুণের দিকে চেয়ে থেকে শান্তিবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি ? আমি কি এতই বেকুব ? পরচুল চিন্‌তে পারব না ?"

তরুণ বললে, "যোগী সেজে রাবণ যখন সীতা হরণ করেছিল, সীতাদেবীও তাকে চিনতে পারেন নি। ঐ সাজের বাহার এবং আকস্মিক উত্তেজনাকর মিথ্যা বচনের ধাপ্পা, এ-সব ওই মায়াবী যাদুকরদের Old Tricks। 'শঠে শাঠ্যং' নীতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গুণ্ডাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার সময় আমাদেরও ওই সকল কৌশল অবলম্বন করতে হয়। আমিও একদা বাবা গম্ভীরানাথের শিষ্য সেজে দস্যুর আড্ডায় ঢুকেছিলাম। দলকে দল থ' মেরে গেছল,—কেউ সন্দেহ করে নি। নির্ব্বিঘ্নে তাদের ধরে এনে শ্রীঘরে পুরেছিলাম। আপনি সে-সময় শ্রীকান্তবাবুর জন্য উদ্বেগ-বিহ্বল না হয়ে, সাধুটির চালচলনের দিকে যদি নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টি রাখতেন, তাহ'লে শ্রাদ্ধ এতদুর গড়াত না—ফ্যাসাদেও পড়তেন না।"

ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থেকে শান্তিবাবু বললেন, "এটা ঠিক, আমি তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। সাধুর চালচলনের দিকে

আমার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। সে যখন ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বসে অদ্ভুত প্রখর দৃষ্টিতে কেবলই আমার মুখপানে চেয়ে থেমে থেমে বিড়্ বিড়্ করে বলতে লাগল—'আমরা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের লোক, বিহারের মধ্যে সেবাশ্রমে কায করি। কলকাতায় দু'চার দিন মাত্র এসেছি। এখানকার রাস্তাঘাটের নাম জানি না—! একটা রাস্তার মোড়ে মোটর এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেটা কোন্ রাস্তা তা জানি না। কাজেই একটা বাড়ীতে তুলে তাঁকে আমার সঙ্গী সাধুর কাছে রেখেছি। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হবার পর তিনি ঐ চিঠি লিখে দিলেন, আর আপনাকে আনতে বললেন—' ইত্যাদি! তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল শ্রীকান্তদা তো লেখালেখির মধ্যে যাবার পাত্র নন! দৈবাৎ কোনও মক্কেলকে ওকালতনামা বা মামলার কাগজ ফেরৎ দিতে হলে, নিজের নাম স্বাক্ষরের স্থানের কাগজটুকু ছিঁড়ে নিয়ে তবে ফেরৎ দেন, তা' পর্য্যন্ত দেখেছি—"

মিঃ সোমের চক্ষে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল! কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মদমন করে তিনি শান্তস্বরে বললেন, "এমন ভয়ঙ্কর হুঁসিয়ার ব্যক্তি হয়েও আপনার নামের জাল চিঠি—যার লেখা পর্য্যন্ত স্পষ্ট ছিল না,—সে চিঠিতে তিনি প্রতারিত হলেন অতি স্বচ্ছন্দে। এ কি সবই ম্যাজিক?"

নতশিরে মুহূর্ত্তকাল চুপ করে থেকে শান্তিবাবু সহসা মাথা তুলে উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, "আপনারা হিপনটিজম্ মেসমেরিজম্ বিশ্বাস করেন?

মিঃ সোম বললেন. "অবশ্য করি। আর আপনি অতিভদ্র অতিসরল হলেও কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলচেতা বলেই মনে হচ্ছে। অতএব সহজ-বশ্য ব্যক্তি। সৎলোকেরাও আপনার উপর যেমন সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে—অসৎলোকদের পাল্লায় পড়লেও আপনি তেম্নি সহজে অভিভূত হয়ে পড়েন, এ-কথা কি সত্য নয়?"

ক্ষুব্ধভাবে শান্তিবাবু বললেন, "লোক-চরিত্রে আপনাদের অসাধারণ জ্ঞান। নিজের মূঢ়তা স্বীকারে আমার আপত্তি নাই,—ভদ্রজ্ঞানে অসৎলোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে আমি এর আগেও একাধিকবার ঠকেছি! এখন আমার মাথা যতই পরিষ্কার হয়ে আসছে, ততই বুঝতে পারছি আমি এ ব্যাপারে—একটা ভয়ানক ভেল্কিবাজীর পাল্লায় পড়েছিলাম। আমার নিজস্ব ইচ্ছা-শক্তি, বিচার-বুদ্ধি সব যেন বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছল! আমি কি করে সে-রকম বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম তা' উপলব্ধি করতে পারছি না। হয়ত সে, প্রথম দৃষ্টিতেই হিপনটিক সাজেস্‌সানের চোটে আমাকে বশীভূত করে ফেলেছিল!"

"যাক্। তারপর কালীঘাটের সেই বাড়ীতে পৌঁছে কি দেখলেন?"

"সেখানে দ্বিতীয় আলখাল্লাধারী বোধ হয় প্রস্তুত হয়েছিল। যাওয়া মাত্র সে এসে আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কম্বলে বসালে।"

"ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র কি দেখলেন?"

"ছুটো কম্বলের শয্যা। ছুটো গেরুয়া রঙের ঝোলা। একটা প্রাইমাস ষ্টোভ, গোটাকতক মাটীর গেলাস। আর একটা এলুমিনিয়ামের ঘটিতে সদ্য তৈরী করা এক ঘটি চা! আর কিছু সে ঘরে দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না।"

"তারপর?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, "আহত উকিল বাবুকে এইমাত্র হাস-পাতালে রেখে এলাম। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য জোর তাগাদা দিয়ে তিনি আমাকে ফেরৎ পাঠালেন। চা প্রস্তুত, খেয়েই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদেরও তাঁকে দেখাশুনা করার ভার নিতে হবে। কারণ, আর্ত্তসেবা আর পরোপকার-সাধনই আমাদের জীবনের ব্রত!...ইত্যাদি, ইত্যাদি বড় বড় কথা! তারপর মাটীর গেলাসে চা ঢেলে, আমাকে একটা গেলাস দিলে! নিজেরা একটা একটা নিলে।"

"আপনি খুব চা-খোর?"

ঈষৎ উত্তেজিতভাবে শান্তিবাবু বললেন, "মোটেই না। সকাল বিকালে দু' কাপ মাত্র খাই। বরঞ্চ সেই অপরিচ্ছন্ন মাটীর গেলাসে চা দেখেই আমার ঘৃণা হচ্ছিল। কিন্তু ওই যে বললুম—লোকটার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি! অসময়ে চা খাব না বলে আপত্তি করা মাত্রই লোকটা এমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চাইলে যে—মনে হোল, না-খেলে আমার কি যেন রাজত্ব রসাতলে যাবে! নিজের অজ্ঞাতসারে মোহাচ্ছন্নের মত চা নিয়ে মুখে তুললাম। দু' চুমুক খেতেই মাথা ঘুরে উঠল। তারপর সব অন্ধকার! তারপর চল্লিশ ঘণ্টা কোথা দিয়ে কি অবস্থায় কেটেছে, কিছু জানি না। মনে হয়, বিকারের ঘোরে কি কতকগুলি খাপছাড়া অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখেছি।"

মিঃ সোম বললেন, "স্বপ্নগুলা যতটুকু মনে পড়ে, বলুন।"

চিন্তিতভাবে কপালে হাত বুলাতে বুলাতে শান্তিবাবু বললেন, "এক এক সময় মনে হোত,—কা'রা যেন জোর ক'রে আমায় কিছু কিছু তরল দ্রব্য খাইয়ে দিচ্ছে। সেটা অতি বিস্বাদ। আর একবার টের পেয়েছিলাম,—অন্ধকারে কা'রা যেন আমায় ধরা-ধরি ক'রে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন চোখ চাইতে পারছিলাম না, কথা বলতে পারছিলাম না,—জিভ গলা সব অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কি হচ্ছে কিছু বুঝতে পারিনি, কিন্তু যেন স্বপ্নের ঘোরে হেঁটে যাচ্ছিলাম। একবার বোধ হয় ঘোড়ার গাড়ীতেও উঠেছিলাম। কিন্তু কখন নেমেছিলাম, মনে নাই। মোট কথা—সে সময়ের কোনও ঘটনাই আমার সঠিকভাবে মনে নাই। যখন জ্ঞান হোল, তখন দেখলাম আমি হাসপাতালে!"

মিঃ সোম বললেন, "আচ্ছা, সেই যাত্রী-নিবাসে, সেই দু'জন লোক ছাড়া, আর কোনও লোককে দেখেছিলেন বলে মনে পড়ে?

"না।"

"ধরুন পাশের ঘরটাও তা'রা ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে কেউ লুকিয়ে আছে বা আড়াল থেকে কথাবার্ত্তা কইছে, এমন কিছু টের পেয়েছিলেন?"

"কিছু না।"

"বাড়ীওলা কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তীকে সেদিন ইতস্ততঃ কোথাও দেখতে পেয়েছিলেন?"

"কোথাও না। আজ প্রথম তাঁকে দেখলাম।"

"আপনার হাত-ঘড়ির নম্বর কত? মেকার কে?"

শান্তিবাবু উত্তর দিলেন, "নম্বর আমার পুরাণো নোটবুকে লেখা আছে! পুরুলিয়ায় গিয়ে পাঠিয়ে দেব। মেকার ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানী!"

মিঃ সোম চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "আপনারা রাজ-এষ্টেটের যে মামলার সম্পর্কে এখানে এসেছেন, সে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণটা জানতে পারি?"

একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে সবিনয়ে শান্তিবাবু বললেন, "ক্ষমা করবেন। ব্যবসায়িক সততার অনুরোধে তাঁদের বিনানুমতিতে সেটা প্রকাশ করা আমার উচিত নয়।"

হেসে মিঃ সোম বললেন, "আপনার সততা-নিষ্ঠা দেখে প্রীত হ'লাম। কিন্তু প্রকাশ্য কোর্টের ব্যাপার,—সেটা অন্য উপায়ে জেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়, তা মনে রাখবেন। মামলাটা কি ফৌজদারী?"

"না দেওয়ানী। সাধারণ বৈষয়িক সত্ত্ব-সাব্যস্তের মামলা।"

"অপর পক্ষ কে?"

"স্থানীয় এক কোল-কোম্পানী।"

তরুণ এতক্ষণ নতশিরে নোটবুকে লিখছিল। এবার মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললে, "কোল-কোম্পানী? মানভূম কোল-কোম্পানী ত? সে মামলায় নীচের কোর্টে আপনাদের তো জিত হয়েছে। সাহেব কোম্পানী হাইকোর্টে আপীল করেছেন। সেই মামলা?"

অপ্রতিভ হাস্যে শান্তিবাবু বললেন, "বাঃ, কোন সংবাদই আপনাদের অবিদিত নাই! তা হ'লে স্বীকার করায় বাধা নাই,—সেই আপীলের বিরুদ্ধে ব্যারিষ্টার এ্যাটর্নি নিযুক্ত করবার জন্য লিগাল ম্যানেজারের সঙ্গে আমাদের আসতে হয়েছে।"

"আপনাদের নিয়োজিত ব্যারিষ্টারদের নাম?"

শান্তিবাবু দু'জন বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের নাম করলেন।

মিঃ সোম বললেন, "আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। আপনার বর্ত্তমান ঠিকানা?"

"মাতৃসদন হোটেলেই ফের আড্ডা নেব। ওখানে খুঁজলেই পাবেন।"

"ক'দিন থাকবেন?"

"বাড়ী থেকে টাকা না আসা পর্য্যন্ত। হোটেলের ম্যানেজার ম'শায়ের কাছে ধার করে বাড়ীতে আর ক্ষিতীশ বাবুকে টেলিগ্রাম করেছি। কিন্তু রাজ-এষ্টেটের ব্যাপার, স্যাংসন হ'তে দেরী হবে। বাড়ীর টাকার জন্যই অপেক্ষা করছি। সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, একটা পয়সা নাই, মহা ফ্যাসাদ!"

"আচ্ছা, বাইরে গিয়ে বসুন। মিঃ সিংহ, মাতৃসদনের ম্যানেজারকে নিয়ে আসুন এবার। শান্তিবাবু, আমি কয়েকটা প্রশ্ন ক'রে ম্যানেজারকে এখুনি ছেড়ে দেব। আপনি তাঁর সঙ্গে হোটেলে যাবেন। একা অসুস্থ শরীরে যাবেন না।"

"ধন্যবাদ। আমি বাইরে বসছি।"

শান্তিবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

মাতৃসদন হোটেলের ম্যানেজার মিঃ শম্ভুনাথ দাস এসে মিঃ সোমের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে তাঁর নির্দ্দেশমত সামনের চেয়ারে বসলেন। তাঁর বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বৎসর। তিনি কলিকাতার কোনও বিখ্যাত বংশের শিক্ষিত ছেলে। চেহারা দোহারা, সুশ্রী, সুন্দর। সাহেবী পোষাক, সাহেবী কায়দা-দুরস্ত চাল-চলন। চটপটে কর্ম্মঠ ব্যক্তি। ইণ্টেলিজেন্সি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ-মহলের সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই তাঁর আলাপ ছিল। ভদ্র ও সৎপ্রকৃতির মানুষ বলে সবাই তাঁকে সুনজরে দেখত।

মিঃ পূরণ সিংহের বর্ণনামত তিনি যথারীতি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "ট্রেন ফেল করে শ্রীকান্ত বাবু বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এসে ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শান্তিবাবুর নামে লেখা সেই চিঠিটা তিনি ক্ষিতীশ বাবুকে পড়ে শোনালেন। ক্ষিতীশ বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দ্যাখো দেখি ছোকরার আক্কেল! আমি অপটু, পরমুখাপেক্ষী বুড়ো মানুষ,—ভিড়ের মধ্যে টিকিট কাটা, মাল তোলা ছুটোছুটি করার হ্যাপা পোয়াতে পারব না বলে তার ভরসায় বসে আছি, আর সে কিনা, বলা কওয়া নেই, বে-ওজর নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল? শান্তি যে এত বড় ডেঞ্জারাস্ ম্যান, তাতো জানতুম না। আর কখনো ওর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি না। ভাগ্যিস্ তুমি ফিরে এলে, নইলে আমার যাওয়া বন্ধ হোত!' শ্রীকান্ত বাবুও খুব চটেছেন দেখা গেল। শান্তিবাবু সুবিধাবাদী, দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর, মহা ধড়িবাজ, মহা ফিচেল,—ইত্যাদি বলে নানা রকম শ্লেষবাক্য বর্ষণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চটপট ক্ষিতীশ বাবুর এবং শান্তি বাবুর স্যুটকেশ ইত্যাদি সব গোছ-গাছ করে নিয়ে মোটরে চড়ালেন। তিনি শুধু বচন-বাগীশ অকর্ম্মণ্য উকিল নন। চার-চোখো, চৌকোশ, কার্য্যদক্ষ মানুষ। ইংরেজিতে যাকে বলে A Jack of all trades, তিনি তাই। ডিস্‌পেপটিক ক্ষিতীশ বাবুর সব তত্ত্বাবধান প্রধানতঃ তিনিই করতেন। কোনটে তাঁর খাওয়া উচিত, কোনটে নয়—আমাদের রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরে নিজে গিয়ে উটকে-পাটকে তার ব্যবস্থা করতেন। বামুন চাকরদের আলাদা বখশিস্ দিয়ে আলাদা করে রাঁধাতেন। নিজে বাজারে গিয়ে খুঁজে পেতে কই মাগুর মাছ, হাঁড়ি হাঁড়ি কিনে আলাদা জিইয়ে রাখতেন। ক্ষিতীশ বাবুকে উনি আন্তরিক যত্ন করতেন।"

মিঃ সোম বললেন, "আর শান্তিবাবু?"

"উনি আলা-ভোলা মানুষ। নিজের জিনিসপত্রও গুছিয়ে রাখতে জানেন না, তা পরের খবরদারি করবেন! নিজের দু'খানা কাপড়ই হারিয়ে ফেললেন—হুঁস নাই। তবে ক্ষিতীশ বাবুকে খুব যত্ন-শ্রদ্ধা করতেন বই কি। হাজার হোক, ওপরওলা! তবে শ্রীকান্ত বাবুর কাছে কেউ নয়!"

"শ্রীকান্তবাবু উকিল তো খুব বড় শুনলাম। মানুষ হিসাবে কেমন দেখলেন?"

'দরাজ হাত, দরাজ বুক! খুব খরুচে লোক! ভোজন-বিলাসিতায় প্রবল অনুরাগ। পাঁচজনকে খাওয়াতেও খুব ভাল-

বাসেন। প্রায়ই বাজারে বেরিয়ে গিয়ে এটা ওটা ভাল জিনিষ কিনে এনে আমাদের শুদ্ধ খাওয়াতেন। ভদ্রলোকের মনটা খুব বড়! দেখুন-না, মুমূর্ষু ভাগ্নেকে দেখতে যাচ্ছিলেন, যেই খবর পেয়েছেন শান্তিবাবু চলে গেছেন—অমনি তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। ক্ষিতীশবাবু রাত্রে ভর্ভলিকস্ খান, যাবার সময় সেটুকু পর্য্যন্ত ভোলেন নি। ঠাকুরকে ডেকে সেটুকু পর্যান্ত তৈরী করিয়ে ফ্ল্যাস্কে পুরে নিলেন। সাধে কি ক্ষিতীশবাবু ওঁকে অত ভালবাসতেন!"

"খুব ভালবাসতেন বুঝি!"

"অন্ধ মমতায়! সবাই ব্যারিষ্টারের বাড়ী যাবেন,—ট্যাক্সি এসে এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে। পোষাক পরে দলিল দপ্তর নিয়ে তৈরী হয়ে এঁরা দু'জন বেরুবার জন্য ছটফট করছেন,—ইতিমধ্যে 'এখনি আস্ছি' বলে শ্রীকান্তবাবু উধাও! ক্ষিতীশবাবু একে দারুণ খিটখিটে মেজাজের মানুষ, তায় অতিশয় কৃপণ, অযথা অপব্যয় মোটে সইতে পারেন না। ট্যাক্সির ওয়েটিং চার্জ বাড়ছে, সময় নষ্ট হচ্ছে, দেখে রেগে টং। অনেকক্ষণ পরে উনি এক চ্যাঙারি খাবার নিয়ে এসে হাজির। গম্ভীর মুখে বুঝিয়ে দিলেন—দুর্ব্বল শরীরে খাটতে হবে, ক্ষিতীশবাবুর পুষ্টিকর খাদ্য চাই। তাই খাবার আনতে ছুটেছিলেন নিজের পয়সায়!—ক্ষিতীশবাবু একটু খুঁৎ খুঁৎ করে জল হয়ে গেলেন! একটি কথাও কইলেন না, চুপচাপ খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু শান্তিবাবু সে-রকম দেরী করলে ক্ষিতীশবাবু তাঁর মাথা নিতেন।"

"তাহ'লে শান্তিবাবুর উপর ক্ষিতীশবাবু তেমন প্রসন্ন ছিলেন না?"

"তিনি কারুর উপরই প্রসন্ন ছিলেন না। ডিস্পেপটিক রোগী, সর্ব্বদা চটা-মেজাজ! তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আমাদেরও সর্ব্বদা তটস্থ হ'য়ে থাকতে হ'ত। ভাগ্যে শ্রীকান্তবাবু ছিলেন, তাই মাঝে-পড়ে সব সামলে নিতেন।"

"ক্ষিতীশবাবু তাহ'লে খুব বদমেজাজি মানুষ? আপনাদের হোটেলের প্রাপ্য সব মিটিয়ে দিয়ে গেছেন তো? না বাকী আছে?"

ঈষৎ হেসে মিঃ দাস বললেন, "না, সেটা রাজ-এষ্টেটের খরচ। খুব সাবধানে হিসেব করেই সেটা মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। একটি পয়সাও যাতে আমরা ফাঁকি দিয়ে না নিতে পারি, সে-দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।"

"আর্থিক ব্যাপারে তিনি তাহ'লে খুব সাবধানী ছিলেন!"

"অতিশয়। কৃপণতার আতিশয্যটা এতই বেশী যে, অসুস্থ শরীরে বিদেশে বেরিয়েছেন কিন্তু খরচ বাড়বার ভয়ে একটা চাকর পর্য্যন্ত সঙ্গে আনেন নি? অথচ তিনি এক রিটায়ার্ড সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট! এখন রাজ-এষ্টেটের লিগাল ম্যানেজার! শ্রীকান্ত-বাবুর মুখে শুনেছি, তিনি যথেষ্ট সঞ্চয় করেছেন।"

"গম্ভীর হয়ে মিঃ সোম বললেন, "সঞ্চয়শীলতা অপরাধ নয়। অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহের লালসাটাই অপরাধ। সে-দিক দিয়ে ক্ষিতীশবাবুর কোনও দুর্ব্বলতা আছে কি না শুনেছেন?"

মিঃ দাস বললেন, "থাকলেও এঁরা কি তা' বাইরের লোকের কাছে শোনাবেন?"

"তা' বটে। আচ্ছা দেখা যাক্,—সে-সম্বন্ধে পরে তদন্ত হবে। এখন বলুন হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীকান্ত বাবু যে চিঠিটা পেয়েছিলেন, সে চিঠিটা আপনি দেখেছেন?"

মিঃ দাস বললেন, "দেখেছি। ময়লা—চিরকুট কাগজে খুব অস্পষ্ট অক্ষরে সেটা লেখা ছিল। ভোঁতা পেন্সিলে তাড়াতাড়ি লিখলে যেমন হয়, তেমনি।"

"সেটা কি শান্তিবাবুর হস্তাক্ষর ব'লেই আপনার মনে হয়?"

"ওঁদের কারুর হস্তাক্ষরই আমি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি নি। তা ছাড়া, সে রকম তেল-চিটে-ধরা ময়লা কাগজে ভোঁতা পেন্সিলে তাড়াতাড়ি লিখলে, আমি নিজের হস্তাক্ষরই চিন্‌তে পারব কি না সন্দেহ!"

"ওঁরা কেউ সে হস্তাক্ষর সম্বন্ধে সন্দেহ করেন নি?"

"না।—ট্রেন ধর্‌বার তাড়াহুড়ায় তখন দু'জনেই ব্যতিব্যস্ত।"

"যে ট্যাক্সির ক্লিনার ওঁকে সে চিঠি দিয়েছিল, সে ট্যাক্সির নম্বর কত?"

"৩৭৫৬৯।"

"ধন্যবাদ। সে ট্যাক্সির ড্রাইভার, ক্লিনার, লোক কেমন? গুণ্ডা মহলের সঙ্গে তাদের দহরম-মহরম আছে?"

"কখনো শুনি নি। ক্লিনারটা অল্পদিন এসেছে, তার কথা বল্‌তে পারব না। কিন্তু ড্রাইভার জান সিংকে অনেকবার দেখেছি—সে ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। নেশাখোর বা গোঁয়ার নয়।"

"আচ্ছা, গুড্‌বাই। শান্তিবাবুকে নিয়ে এবার যেতে পারেন। মিঃ সিংহ, এবার কাশী চক্রবর্ত্তীকে আনুন।"

মিঃ দাস প্রস্থান করলেন। কাশী চক্রবর্ত্তী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরণে আধ-ময়লা খাটো ধুতি, গায়ে আধ-ময়লা জিনের কোট, কাঁধে পাঁশুটে রংয়ের মলিদা। তাঁর আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে, মিঃ সোম তাঁকে সাম্‌নের চেয়ারে বস্‌তে ইঙ্গিত করলেন। তারপর তাঁর নাম, ধাম, পেশা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, "সম্প্রতি যে সাধু দু'টি এসে আপনার ঘর ভাড়া নিয়েছিল, তাদের নাম কি?"

"একজনের নাম ভূতানন্দ স্বামী। তার সঙ্গীর নাম বলে নি।"

"কি ক'রে জানলেন তার নাম ভূতানন্দ?"

"অগ্রিম পনের দিনের ভাড়া দিয়ে ঐ নামে চেক কাটিয়ে নিলে।"

"কতদিন থেকে ঘর ভাড়া খাটাচ্ছেন?"

"প্রায় বিশ বছর।"

"এর আগে তা'রা ক'বার এসেছিল?"

"এই প্রথম।"

"তা'রা কোথা থেকে, কি উদ্দেশ্যে, এসেছিল?"

ছল ছল চক্ষে চক্রবর্ত্তী বললেন, "কি ক'রে জানব হুজুর? আমাকে ত ব'লেছিল—তা'রা কামরূপ কামাখ্যা থেকে এসেছে।

পৌষ মাসে পৌষ-কালী দর্শন করবে, আর কি সব হোম-যজ্ঞ করবে। নিরালায় সাধন ভজন করবার জন্ম তাদের দু'খানা ঘর চাই।"

"হুঁ। আপনার সঙ্গে তাদের কেমন আলাপ হয়েছিল ?"

"আলাপ ঐ প্রথম দিনই যা। তারপর ত তা'রা সারাদিনই ঘরে দুয়ার বন্ধ ক'রে ধূপ-ধুনা পুড়িয়ে কি সব যাগযজ্ঞ করত। সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, সাধন ভজন নিয়ে আছে,—তাদের কাজে ব্যাঘাত করা উচিত নয় বলে, আমিও ওদের দিক মাড়াতুম না। পাকা দাড়িওলা প্রাচীন সাধু,—তা'রা যে ভাল ভাল লোকের সর্ব্বনাশ করছে—তা কি জানি ?"

"জানলে কি করতেন ? মোটা ঘুস আদায় করে, গুম-খুন সব হজম করে নিতেন ?"

আর্ত্তনাদ করে চক্রবর্ত্তী বললেন, "হুজুর। আমি গরীব মানুষ, কিন্তু পাপের পয়সা কখনো ছুঁই নি। মা কালীর দিব্যি, ভাড়ার টাকা ছাড়া তাদের কাছে এক পয়সা নিই নি, তারা কি করেছে, না করেছে কিছুই জানি নে।"

"দেখুন, ন্যাকামি করবেন না। সরল ভাবে সত্য কথা বলুন, নইলে আপনার নিষ্কৃতি নাই। একজন ভদ্রলোককে দিন দু'পুরে ট্যাক্সি করে আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান করা হোল—প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা গুম্ করে রাখা হোল,—অথচ সর্ব্বদা বাড়ীতে বসে থেকেও আপনি তার বিন্দু-বিসর্গ টের পেলেন না—? এ কথা কে বিশ্বাস করবে ?"

সজল নয়নে কাশী চক্রবর্ত্তী বললেন, "হুজুর, দেখতেই পাচ্ছেন আমি হাঁপানি রুগী। নিজের যন্ত্রণায় মরে রয়েছি। এক ঘর-ভাড়া আদায়ের জন্যে আর হাট বাজার করবার জন্যে ছাড়া আমি বাড়ী থেকে বেরুই না। পাড়ার লোকদের জিজ্ঞেস করুন। তা ছাড়া আমার বার বাড়ীর সঙ্গে ভিতর-বাড়ীর কোন সম্পর্ক নাই। বাইরে কি হচ্ছে, না-হচ্ছে ভিতর থেকে তা টের পাবার কোনও উপায় নাই। ঐ দারোগা বাবু বাড়ী দেখে এসেছেন, উনি বলুন।"

মিঃ পূরণ সিংহ সহাস্যে বললেন, "দেখে এসেছি—তা নেই সত্যই। পাড়ার লোকের কাছে শুনেও এসেছি, আপনি অতিশয় কুঁড়ে মানুষ। দিনরাত অন্দর মহলে পড়ে পড়ে তামাক খান।"

"শরীরে ক্ষমতা নাই, করি কি ?"

"অতএব চোর-ডাকাতরা আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাক! ঠিক বলছেন, কিছু জানেন না ? এই ৭।৮ দিন সর্ব্বদাই সাধুরা দুয়ার বন্ধ করে থাকত ? একবারও বেরুত না ?"

"তারা হয় ত বেরুত, কিন্তু আমি ত বেরুতাম না, জানব কি করে ?"

"সাধুরা আপনাকে কিছু না জানিয়েই নিঃশব্দে চলে গেল ?"

"হাঁ মশাই। আমার প্রথমে খটকা লাগল তাতেই! তারপরই হুড়মুড় করে পুলিশ গেল !"

"সাধুরা চলে যাবার পর সে ঘরে কোনও জিনিস পেয়েছেন ?"

"কিছু না। একটা ইঁটের উনুন ছিল, তাতে ছিল শুধু চাট্টি কাগজ পোড়া ছাই। আবার ভাড়াটে এলে ভাড়া দিতে হবে বলে সে সব ফেলে ঘর ধুয়ে চাবি বন্ধ করেছি। মশাই, ওই ঘর-ভাড়াই আমার জীবিকা। ভাড়া না দিলে খাব কি ?"

"বেশ, ভাড়া দেবেন। এমন কি ঐ ভুতানন্দ প্রেতানন্দের দল যদি ফের আসে, সমাদরে স্থান দেবেন—"

"আবার ?"

"হাঁ। সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ থানায় আর আমাকে খবর দেবেন। যান এখন।"

চক্রবর্ত্তী হাঁফ ছেড়ে প্রস্থান করলেন।

মিঃ পূরণ সিংহ উঠে বললেন, "আমার কর্ত্তব্য শেষ। এবার আপনারা বোঝাপড়া করুন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বিদায়।"

করমর্দ্দন করে তাঁকে বিদায় দিয়ে মিঃ সোম ও তরুণ মুখোমুখি হয়ে বসলেন। কলিকাতার রাজপথ তখন বিজলী বাতির আলোয় ঝলমল করছে। [ক্রমশঃ

দ্বিতীয় মোঙ্গল যুগে পারস্যের চিত্র-শিল্প

শ্রীগুরুদাস সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাহরুখের অধীনে শিল্প ও সাহিত্য যে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা সমসাময়িক ইতিবৃত্তে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনে, তাঁহাদের উৎসাহ বড় কম ছিল না। সাহরুখ সমরকন্দ হইতে শাসনকেন্দ্র হীরাটে স্থানান্তরিত করেন। সমরকন্দের শাসনভার ন্যস্ত হয় তাঁহার পুত্র উলুঘ বেগের উপর। ইহাতে সমরকন্দের গৌরব কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা সেখানে পূর্ব্বেরই ন্যায় চলিতে থাকে। উলুঘ বেগ (Ulugh Beg) জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তাঁহার অবদান (১) স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মোঙ্গল অভিযানফলে পারসীক শিল্পে চৈনিক প্রভাবের পুনরাবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড় কথা এই যে, পারসীক চিত্রশিল্পের যে বিশেষত্ব বিশ্বের অন্যান্য শিল্পশৈলী হইতে ইহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা এ যুগের শিল্পেই পরিস্ফুট। ইহা প্রধানতঃ দৃষ্ট হয় প্রথামূলক (Conventional) সূক্ষ্মাংশ সমূহের অপূর্ব্ব প্রাচুর্য্য ও মনোহারিতায় এবং সেগুলির শোভাসাধক সন্নিবেশ বা সংস্থাপন পদ্ধতিতে। এই রীতিরই পরাকাষ্ঠায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পারসীক চিত্রসমূহ অলঙ্কৃত। পারসীক চারুশিল্পের পারসীকত্বের ইহাই বিশিষ্ট উপাদান। এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ব্বাভাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাংশ হইতেই বিদ্যমান বটে, কিন্তু ইহার সর্ব্বোত্তম বিকাশ ঘটিয়াছিল তৈমুরীয় যুগে এবং তৈমুরবংশীয় দিগেরই সহায়তায়।

(১) কতকগুলি astronomical tables তাঁহারই নামে প্রচলিত

হয় যে ক্ষুদ্রক চিত্রে প্রসাধকগুণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং সূক্ষ্মাংশের অঙ্কণ বিষয়ে বাস্তবানুগামিতা ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে পারস্যের ক্ষুদ্রক চিত্রে সজ্জার সুশৃঙ্খল পারিপাট্য চীনা প্রভাবেরই পরোক্ষ ফল। লিখন বিদ্যায় চীনা ও পারসীক এই উভয় জাতিই ছিল সমান দক্ষ। চীনা হরফের স্থূল রেখাগুলি সুং (Sung) যুগের (১) চিত্রশিল্পীর নৈসর্গিক চিত্রের প্রধান অবলম্বন। কি পারসীক, কি চীনা শিল্পী উভয়েই, শিল্পোদ্যমের সুষ্ঠু বিকাশ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, শুধু এই একই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত। বিষয়বস্তু চিত্র সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টায় প্রধান চরিত্র কি প্রধান ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপণ, এ প্রথা, চীনা বা পারসীক এই দুইয়ের কোন শৈলীতেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। চীনা শিল্পী সাধারণতঃ নিজের শিল্পশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন আধ্যাত্মিকতা কিম্বা ভাবাবেগ প্রকাশের জন্য, আর পারসীকদিগের শিল্প প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে প্রসাধন কলার পরিপূর্ণতা সাধনে, চিত্রীর যা কিছু আনন্দ তাহা ইহা হইতেই যেন উৎসারিত হইয়াছে। দুই শিল্পের ব্যবধান এই খানেই বিশেষ করিয়া দৃষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বেসিল গ্রে (Basil Gray) তাঁহার পারস্যশিল্প বিষয়ক গ্রন্থে (২) ১৩৯৭ খৃঃ অব্দে লিখিত দুই খানি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন—একখানি খোয়াজু নামক কিরমান্‌বাসীর কাব্যগ্রন্থ হুমাই-ই-হুমায়ুন, অপরটি চেঙ্গিজখাঁর অভিযান বিষয়ক পদ্যে রচিত ইতিহাস —'সাহেন সা নামা'। তৈমুর বংশীয়দিগের রাজত্বকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত (খৃঃ অঃ ১৩৬৯—১৪৯৪)। ইহার প্রথমাংশে রচিত যে সকল ক্ষুদ্রক চিত্র অদ্যাপি বিদ্যমান তাহার প্রধান লক্ষণ বিন্যাস-পদ্ধতির প্রশস্ততা (spaciousness)। শূন্যমার্গ হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ভূতলের বিস্তৃতি যে আকারে দৃষ্টি সীমার মধ্যে আসিয়া থাকে এ সকল চিত্রের পরিপ্রেক্ষণা ঠিক সেই ভাবেই সুবিন্যস্ত। এ জাতীয় পরিপ্রেক্ষণার এরূপ সুসঙ্গত প্রয়োগ পরে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। এ সকল চিত্রের পটভূমিতে প্রেক্ষা-গৃহের যবনিকা অথবা খাড়া প্রাচীরের ন্যায় কোনও কিছু দর্শকের দৃষ্টি রোধ করে না। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের পারিপাট্য যে এ যুগের চিত্রে যথেষ্ট ভাবেই বিদ্যমান এ কথার উল্লেখ না করিলে এ শিল্পের কলা-কৌশলের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইবে না। শুধু সমতল ক্ষেত্র অথবা উচ্চাবচ ভূপৃষ্ঠ বলিয়া নয়, এরূপ পরিপ্রেক্ষণা বজায় রাখিয়া গৃহাদি চিত্রণও আর পরবর্ত্তী কালে দৃষ্ট হয় না। কোন কোন চিত্রের চারিদিকই বিটপিবেষ্টিত। সকল চিত্রই সুসম্পূর্ণ, এ গুলিকে পূর্ণতাপ্রদান করিতে কোনদিক দিয়াই ত্রুটি করা হয় নাই। মানব মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন 'তলে' (planeএ) যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

খোয়াজুর পুঁথিতে (হুমাই-ই-হুমায়ুনে) চিত্রকরের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় কেমন যেন বিরাম ও প্রত্যাবর্ত্তনের ভাবে। দ্রষ্টার চক্ষু চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া নিবদ্ধ হয় ঠিক কেন্দ্রস্থলেই—একবারে চিত্রনিহিত প্রধান ঘটনাটির উপরে। সাহেনসানামার একটি চিত্রে খুব সংক্ষেপেই বড় রকমের একটি যুদ্ধব্যাপার বুঝান হইয়াছে। চিত্রপটে উভয়পক্ষের মাত্র ছয় সাতজন যোদ্ধার প্রতিকৃতি অঙ্কিত, ইহার মধ্যে চারিজন অশ্বারোহী। চিত্রের উপরিভাগে যে শৈলাংশ বিদ্যমান, তাহারই পিছন দিকে, প্রায়

সাহেনসানামার একটি চিত্র।

আকাশসীমার সান্নিধ্যেই, চিত্রার্পিত দুইটি পতাকা হইতে বুঝা যায় যে আপন আপন পতাকা লইয়া উভয়পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছে, এখনও গিরিসঙ্কটে অবস্থিত যুদ্ধস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই।

খোয়াজুর পুঁথিতে নীল ও লাল রঙের প্রাচুর্য্য প্রথম দৃষ্টিতে কতকটা চমক লাগাইয়া দিলেও মোটের উপর এ-চিত্রগুলিতে বর্ণসমাবেশ সেরূপ সন্তোষজনক নয়। লক্ষ্য করিলেই ধরা পড়ে যে প্রয়োগপরিমাণে পীত ও হরিত লাল নীলকে অনেকটা ছাড়াইয়া গিয়াছে। সাহেনসানামা পুঁথিতে পাহাড় চিত্রণে রঙের দিক দিয়া বেশ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে (সম্মুখাংশে ফিকা নীল ও লোহিতের বেশ সুন্দর সংমিশ্রণ, আর দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা কতকটা বা সবুজ কতকটা বা ময়ূরকণ্ঠী রঙের।

(১) সুং যুগ দুই অংশে বিভক্ত; প্রথমাংশ ৯৬০ হইতে ১১২৬ খৃঃ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়াংশ ১১২৭ হইতে ১২২৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(২) Persian Painting by Basil Gray

চিত্রে লিখিত মানুষগুলির মধ্যে কয়েক জনের অঙ্গ সোনার সাঁজোয়ায় আবৃত; অশ্বারোহিগণের কাহারও কাহারও অশ্বের দেহাংশও সুবর্ণমণ্ডিত সাঁজোয়ায় সুরক্ষিত। সাঁজোয়ার

মজনুন্ দূর হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

উপর লাল ও সবুজ রঙের বাঁধাছাঁদের যে সকল অলঙ্করণ অঙ্কিত রহিয়াছে সেই নক্সাগুলি রসিদুদ্দিনের ইতিহাসের কোনও কোনও চিত্রে যে-সকল নক্সা দৃষ্ট হয় তাহারই অবিকল অনুরূপ। আকাশ অঙ্কনে নীলের পরিবর্তে সোনালী রং নির্ব্বাচিত হইয়াছে। চিত্রের সম্মুখভাগটিতে অনুজ্জ্বল নূতন বর্ণের সন্নিবেশ বেশ মানাইয়াছে ভাল। জাঁকজমক ও আড়ম্বরের দিক দিয়া এ-পুঁথির চিত্রগুলি রসিদুদ্দিনের সচিত্র ইতিহাস গ্রন্থের যুগ (খৃঃ অঃ ১৩০৮—১৩১২) হইতে যে অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তৈমুরলঙ্গের বংশধরগণ প্রায় এক শতাব্দ কাল পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাহিত্যপ্রেমিক ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। প্রাচ্যদেশে রাজার প্রভাব সকল বিষয়েই সমভাবে শক্তিশালী। ইউরোপের মধ্য-যুগের কোন রাজাই শিল্প ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনায় তৈমুরীয় (Timurides)-দিগের ন্যায় উৎসাহ প্রদান করেন নাই। এই রাজকুলের প্রভাবেই এ-যুগে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বহু ক্ষুদ্রক চিত্রের উদ্ভব ঘটে। পুস্তক লিখন, চিত্রাঙ্কন, গালিচা বয়ন, সাঁজোয়া নির্ম্মাণ প্রভৃতি চারু ও কারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায় এরূপ উন্নতি আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ইঁহাদের মার্জ্জিত রুচি ও বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া বহু গুণী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইঁহাদের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সমরকন্দ ও বোখারা এই দুই নগরীর নামোচ্চারণ করিতেই তৈমুরবংশীয়দের যে অমর কীর্ত্তি-কাহিনী স্মরণপথে জাগরূক হয় তত্রত্য বিরাট স্থাপত্য নিদর্শনগুলি যেন উহার সমর্থনকল্পেই এ-যাবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে (১)।

১৪১০ খৃঃ অব্দে তৈমুরের পৌত্র সুলতান ইস্কান্দারের আদেশে লিখিত একখানি পুঁথিতে বিভিন্ন চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত নানা চিত্র ও প্রসাধক অলঙ্কারের সন্নিবেশ দেখা যায়। এ-পুঁথিখানি সম্ভবতঃ সিরাজনগরে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি চিত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি ১৩৫০ খৃঃ অব্দে প্রচলিত শৈলীর আবার কোন কোনটি মোঙ্গলদিগের ইতিহাস পুঁথির চিত্রণভঙ্গীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্য কতকগুলিতে আবার যে রীতি খৃঃ ১৫০০ অব্দে প্রচলিত ছিল তাহাই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইস্কান্দার সুলতানের পুঁথির চিত্রগুলি এবং তৎসমূহের বিভিন্ন রচনারীতি ও সম্পাদনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহার মধ্যে কয়েকটি যে কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজশক্তিমত্তায় পরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ইস্কান্দার মির্জ্জার পুঁথিতে লয়লামজনুন্ আখ্যায়িকার একখানি চিত্র ১৫০০ খৃঃ অব্দে প্রচলিত রীতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ-চিত্রে মজনুন্ তাঁহার ও লায়লীর আত্মীয়-গণের প্রচণ্ড রণোন্মত্ততা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া এবং এই নিরর্থক নরহত্যা নিবারণের কোনও উপায় না দেখিয়া বৃথা তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ (২) করিতে করিতে মর্ম্মন্তুদ আক্ষেপে একটি হস্ত উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন।

ক্ষুদ্রক চিত্রের সম্যক রসোপলব্ধি করিতে হইলে উহার বিষয়-বস্তুর তথা কাব্যকথার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। লয়লা ও মজনুন্ নামীয় একখানি কাব্য বিখ্যাত পারসিক কবি নিজামীর কাব্যপঞ্চকের অন্তর্গত। বঙ্গভাষায় এ-বিষয়ে এক সময়ে নাটকাদি রচিত হইলেও আধুনিক শিক্ষিত সমাজে লয়লা মজনুনের আখ্যায়িকা প্রায় বিস্মৃতির গর্ভেই বিলীন। মজনুন্ শব্দের অর্থ উন্মাদ। তাঁহার প্রকৃত নাম কায়েস্। প্রেমোন্মাদ বলিয়া তাঁহার মজনুন্ এই নামকরণ হইয়াছিল। লায়লা ও মজনুন আরবজাতির দুইটি বিভিন্ন ও বিবদমান কৌমে (tribe-এ) জন্মগ্রহণ করিলেও বাল্যকালে একই বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেন। এই সময়েই উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হয়। ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে লিখিত একখানি নিজামী পুঁথিতে এই পাঠশালার যে চিত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বৃক্ষতলে পাঠাভ্যাসরত বালক-বালিকাদিগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে, এক বিস্তৃতশাখ বৃহৎকায় চেনার বৃক্ষের নিম্নভাগে, ছাত্র-ছাত্রীগুলি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে উপবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ পাঠে নিরত রহিয়াছে (৩)।

(১) Sykes' History of Persia, Vol. II, p. 143.

(২) Lawrence Binyon রচিত Poems of Nizami গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় এই গল্পাংশ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) L. Binyon Op. cit, p. 21.

বালক-বালিকার এ-প্রণয় পরিণয়ে পর্য্যবসিত হইল না—উভয় পরিবারের বংশগত বৈরীভাব মিলনের পথে অন্তরায় ঘটাইল। ইহাতে ক্রমশঃ যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইল এ-যুদ্ধ তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর যখন মজনুনের সহিত লায়লার পুনরায় সাক্ষাৎকার ঘটিল তখন নায়িকার দেহ শুকাইয়াছে, গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছে। মজনুনের তখন আর এ-সব কিছু লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা ছিল না, প্রণয়াতিরেকে মত্তপ্রায় প্রণয়ী পুনরায় মরুমধ্যে পলায়ন করিল, এ-মরজগতে তাহাদের আর মিলন হইল না। এ আখ্যায়িকাটি পারসীক জনসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। পারসীক বয়নশিল্পের বাঁধাছাঁদের নক্সায় লায়লা মজনুনের মরুপথে মিলনের চিত্রও যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীর একখণ্ড কিংখাব বস্ত্রের নমুনায় পাওয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ এ-কথার উল্লেখ করিয়া আমরা আলোচনার মূলসূত্র পরিগ্রহণ করিব। ইস্কান্দার মির্জ্জার পুঁথির ন্যায় ক্ষুদ্রক চিত্রের আর একখানি 'পাঁচফুলের সাজি' পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্রিত পুঁথিখানির নাম "তোয়ারিখ-ই-গুজিদা" অর্থাৎ নির্ব্বাচিত ঐতিহাসিক নিবন্ধনিচয়। ইহাতে কটিতটে বৃক্ষপত্রের আবরণ যুক্ত আদম ও ইবার (Adam ও Eve এর) এবং বলির জন্য দেবদূত কর্ত্তৃক আনীত ইসাহাকের (Isaac এর) চিত্র বাইবেলের পুরাতন পুস্তক সম্পর্কিত চিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারিপার্শ্বিকের দিক দিয়া সাহনামার চিত্রাবলীর অনুরূপ হইলেও এ পুঁথির চিত্র নিহিত মূর্ত্তিগুলির আপেক্ষিক পরিমাপ এতবড় যে কাহারও কাহারও মতে নেষ্টোরীয় খৃষ্টিয় সম্প্রদায়ের শিল্প প্রভাব না মানিয়া লইলে চলে না। খৃষ্টিয়ান প্রভাব সম্পর্কে এ ধারণা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের একদেশদর্শিতা হইতেও জন্মিতে পারে এ কথাও অনুধাবন যোগ্য বলিয়া মনে হয়। দুই শৈলীর মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কোনও পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিতে চাহেন যে মুখাবয়বের এরূপ আর্য্য জাতিসুলভ ছাঁদে সমকালীন ইউরোপীয়দিগের সংস্পর্শ সূচিত হইয়াছে অর্থাৎ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই একই কথা—খৃষ্টিয় সমাজই মূল আদর্শ যোগাইয়াছে। পারসীকেরাও আর্য্যবংশ সম্ভূত। কোনও শিল্পী যদি মুখ চেহারা আঁকিতে গিয়া বাস্তবতার দিকে একটু বেশী রকম জোর দিয়া থাকেন তাহা হইলে এই ধারার মুখাঙ্কন কি একেবারেই অসম্ভব? ১৪২০ খৃঃ অব্দের একখানি পুঁথিতেও মানবমূর্ত্তির পরিমাপে এইরূপ কতকটা আপেক্ষিক দীর্ঘতা লক্ষিত হয়, তবে এ চিত্রগুলিতে দেহযষ্টি অনেকটা কোমল ও নমনীয় এবং অঙ্গচ্ছদের ভাঁজও হালকা রকমের। চিত্রের ঘোড়া গুলিও বেশ জোরালো ভঙ্গীতে, বেশ সজীবতার সহিত অঙ্কিত। মোটের উপর এ পুঁথির ক্ষুদ্রক চিত্রের রচনা রীতি আসলে দেশীয় ভাবেই অনুপ্রাণিত এবং প্রকটন ভঙ্গীটিও (treatment ও) উদার ও কার্পণ্যবিহীন। তৈমুরীয় পূর্ব্বাংশে যে দুইটি বিভিন্ন ধারার ক্ষুদ্রকচিত্র পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার মধ্যে ইস্কান্দারনামার ছোট ছাঁদের মূর্ত্তিযুক্ত চিত্রণপ্রথাটিকে পরবর্ত্তীযুগ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে দেখা যায়। এ ছাঁদের ছবিতে ছোট আকারের মূর্ত্তিগুলি বেশ মানানসই করিয়া আঁকা হইত। এ পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল সুলতান ইস্কান্দারের ভ্রাতা বাইসাঙ্কার মির্জ্জার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁহার উন্নত রুচি যে এ শৈলীর উৎকর্ষলাভে সহায়তা করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইস্কান্দার মির্জ্জার পর তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম মির্জ্জা ফারস প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইস্কান্দার তদীয় পিতা সুলতান সাহরুখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় ইব্রাহিম ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়া দেন।

ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে পারস্যের রাজধানীর পরিবর্ত্তনের সহিত, রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র, মোঙ্গলযুগে প্রথমে বোগদাদে ও পরে তাব্রিজে, তৈমুরীয় বংশের রাজত্বকালে হিরাটে, এবং সাফাবীয় রাজ্যাধিকারে যথাক্রমে তাব্রিজে ও ইস্পাহানে পর পর পরিবর্ত্তিত হয়। রাজা ও ধনী ওমরাহের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত শিল্পের ও শিল্পীর বাঁচিবার উপায় ছিল না, তাই স্বেচ্ছায় হউক কিম্বা রাজাদেশেই হউক, শিল্পীকেও যে বাসস্থান পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল, এ ধারণা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। প্রতীতি হয় যে ইহারই ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রে পারসীক শিল্পের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল (১)।

বককুলীরক আখ্যায়িকার পারসিক চিত্র (খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দী)

(১) A. B. Sakisian, La Miniature Parsane du XIIe au XVIIe siecle, p. 2.

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সকলে মিলিয়া সমরকন্দে, কিম্বা, সাহরুখ রাজধানী সমরকন্দ হইতে হিরাটে স্থানান্তরিত করিলে, তাঁহার সহিত হিরাটে চলিয়া যায় নাই, এ কথা হয়তো মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাহারা রাজার কিম্বা অমাত্যগণের বৃত্তিভোগী ছিলেন তাঁহাদিগকে, এক কথায় শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের মধ্যে অনেককেই যে রাজা ও শিল্প-প্রেমিক রাজসভাসদদিগের সহগামী হইতে হইয়াছিল, ইহা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়।

[বাইসাঙ্কার (Baisunqur) মির্জা (খৃঃ অঃ ১৩৯৭-১৪৩৩] শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এ যুগে সিরাজ ও হিরাট এই দুই স্থানেই প্রধান দুইটি

বাইসাঙ্কার মির্জ্জা সকাসে আনীত হইয়াছে।

শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সিরাজ নগরী পূর্ব্ব হইতেই শিল্প-সমৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কাহারও কাহারও মতে সিরাজ ও হিরাট কেন্দ্রের ঢঙে অথবা চিত্রসমাবেশ-পদ্ধতিতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সিরাজ শৈলীর বৈশিষ্ট্য পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় (১)। শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, উভয়ের যাহা কিছু প্রভেদ তাহা ছিল শুধু সূক্ষ্ম বর্ণ-বৈষম্যেই (nuance-এ) আবদ্ধ। সিরাজ পদ্ধতিতে (technique এ) সম্পাদিত আলেখ্যমালায় যে সুবিমল স্বচ্ছতা বিরাজমান তাহাই যে এ জাতীয় চিত্রকলার প্রধান সম্পদ্ এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সিরাজ শৈলীর মাধুর্য্যগুণই (suavity) হিরাট শৈলীর পরুষ কর্কশতা বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

হিরাটের চারুশিল্পে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, নগরাদির অবরোধ, সাদি সৈন্যের সংঘর্ষ এই সকলেরই ছিল প্রধান স্থান। আরাম, বিরাম, সামাজিক সম্মেলনের আনন্দ, দম্পতির প্রণয়লীলা, হিরাটীয় চিত্রীর তুলিকায় এই সকল শান্ত মধুরাদি বিভিন্ন ভাবোন্মেষ সুষ্ঠুরূপে স্ফুর্ত্ত হইতে পারে নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে তাব্রিজে ১৩২০ খৃঃ অব্দে যে শিল্পধারা প্রবর্ত্তিত ছিল তাহারই সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধিমূলক পরিণতি হিরাট শৈলীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বাইসাঙ্কার সাহনামা গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করেন। উহাতে সংযোজিত নূতন একটি ভূমিকায় মূলগ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদান কোন্ কোন্ পূর্ব্বাচার্য্যের রচনা হইতে বা কোন্ কোন্ পুঁথি হইতে আহৃত তাহার উল্লেখ আছে। বড্‌লিয়ান (Bodleian) গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৪৯৪ খৃঃ অব্দের একখানি সাহনামা পুঁথিতে যে সকল ক্ষুদ্রক চিত্র সন্নিবিষ্ট আছে তাহার একখানিতে নবসংস্করণের একখণ্ড সাহনামা পুঁথি বাইসাঙ্কার মির্জ্জার সকাশে আনীত হইয়াছে, তাহাই চিত্রিত রহিয়াছে। সিংহাসনের ডানদিকে একব্যক্তি নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। হয়তো ইঁহারই উপর এই নব সংস্করণের সম্পাদন ভার ন্যস্ত ছিল। ইঁহার পশ্চাদ্ভাগে একজন পরিচারক বৃহদায়তন পুস্তকখানি হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান।

পুঁথি-চিত্রণের জন্য চিত্রকর নিয়োজিত হইয়াছিল মৌলানা জাফরের তত্ত্বাবধায়কতায়। এই সকল চিত্রকরেরা বোগদাদ ও তাব্রিজ হইতে আনীত হইয়াছিলেন এইরূপই অনুমিত হইয়াছে।

তৈমুরবংশীয়দিগের পৃষ্ঠপোষকতায় ললিতকলার অনুশীলন পারস্যের পূর্ব্বাংশে অবাধে বিস্তার লাভ করে এবং হিরাটেই হউক বা আস্ত্রাবাদেই হউক বহুসংখ্যক পুঁথি লিখিত ও চিত্রিত হয়। তখন কারকালে আমির, ওমরাহ ও সাহজাদাদিগের মধ্যে পরস্পরকে পুঁথি উপহার দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। হিরাটেই যে অধিকসংখ্যক প্রতিভাবান শিল্পী সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় তাঁহাদিগের দ্বারা চিত্রিত পুঁথিসমূহের প্রমাণ হইতে।

তৈমুর বংশীয়দিগের মধ্যে আর একজন গুণী ও সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন সুলতান হোসেন বাইকারা (Baiquara)। ইনি ছিলেন তৈমুরের পুত্র ওমর সেখের প্রপৌত্র। বিংশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ১৪৮৭—১৫০৬) কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি ললিতকলার চর্চ্চায়, কি সাহিত্যের বৈঠকে সুলতান হোসেন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মাত্র উনচত্বারিংশৎ বৎসরকাল (খৃঃ ১৪৬৮—১৫০৬) জীবিত থাকিলেও অনেক কিছুই তাঁহার উৎসাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সুলতান হোসেনের জন্মকালে দুই এক দশক পূর্ব্বেই রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৈমুরের আর এক প্রপৌত্র, তাঁহার তৃতীয় পুত্র মিরণ সাহের পুত্র আবু সৈয়দ, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে 'কৃষ্ণমেষ' বংশীয় উজুন হাসানের হস্তে নিপতিত হইয়া ১৪৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

সাহরুখের পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে সুলতান আবু সৈয়দ ও হোসেন বাইকারা সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় সহায়ক বলিয়া বিশেষ

(১) Sakisian, op. cit., p, 44.

খ্যাতি লাভ করেন। আবু সৈয়দের রাজত্বকালে যে সকল বিদ্বজ্জন বিদ্যমান ছিলেন, আখন্দ আমীর হবিব্-উস্-সিয়ার্ (১) গ্রন্থে সংখ্যা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছেন। সুলতান হোসেন সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবিত্বশক্তির নিদর্শন স্বরূপ স্বরচিত একখানি "দিবান" গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। ইস্লামিয়া মাদ্রাসা নামক পারস্য ও মধ্য-এসিয়ার তাৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান হোসেন কেবল কাব্যচর্চ্চা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন না। হবিব-উস্-সিয়ার রচয়িতা তাঁহাকে "সমর বিজয়ী খাকান" ('খাকান্ অল্ মনসুর্ আবুল গাজী') বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২)। খাকান্ আখ্যা সাধারণতঃ চীন সম্রাটকেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এস্থলে উহা মোঙ্গলবংশোদ্ভব নরপতি এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। চেঙ্গিজ বংশীয়েরাই যে চীনের 'ইউয়ান্' অঞ্চলের সম্রাট্, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

কি শিল্পে, কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, সুলতান হোসেনের নিকট গুণীর সমাদর যথেষ্টই ছিল, তবুও সমসাময়িক কবিতায় উক্ত হইয়াছে (৩) 'বোঝা বহিয়া তেজস্বী আরব অশ্বের পৃষ্ঠের আস্তরণ-তলে ক্ষত জন্মিল, আর গর্দ্দভের গলায় দেখি স্বর্ণময় কণ্ঠ-বেষ্টনী।"

(আস্প-ই-তাজী শুদা মজ্রু বাজের-ই-পালান্।

তাউকে জররিন্ হামা বর্ গর্দ্দন-ই-খর্ মিবিনম্ ॥)

এ আক্ষেপ চিরকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে।

সুলতান হোসেনের বন্ধু ও অমাত্য মীর আলি শীরের ন্যায় যোদ্ধা ও রসবেত্তা ব্যক্তির ঐতিহাসিক চিত্রপটে কদাচিৎ আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। এ স্থলে বস্তুতঃই যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন ঘটিয়াছিল। বিহ্জাদ, মিরেক, ও সুলতান মহম্মদ ইরাণের এই তিনজন শ্রেষ্ঠ চিত্রী প্রথমে হিরাট শিল্প-কেন্দ্রেই চিত্রকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পুঁথি-চিত্রণ বিষয়ে মীর আলি শীরের স্বকীয় অভিজ্ঞতাও বড় কম ছিল না। ইঁহারই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিহ্জাদ তাঁহার শিল্পি-জীবনের প্রারম্ভেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর অপর একজন খ্যাতনামা শিল্পী হাজি মহম্মদ নক্কাস প্রথমে মীর আলি শীরের গ্রন্থাগারিক রূপে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু প্রভুর সহিত মনান্তর ঘটায়—তিনি পলায়ন করিয়া সুলতান হোসেন বাইকারার পুত্র বদিউজ্জমানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে, সমুদ্রপথে, ইস্তাম্বুল গমন করিয়া ঐশ্বর্য্য ও বদান্যতার আধার বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুলতান সুলেমানের অধীনে, দৈনিক শতমুদ্রা বেতনে (৪) রাজকীয় চিত্রকর রূপে নিয়োজিত হন। এই হাজি মহম্মদই মীর আলি শীরের গ্রন্থশালার জন্য একটি যন্ত্রচালিত মূর্ত্তি বিশিষ্ট ঘটিকা নির্ম্মাণ করেন এবং চীনা মাটির কারুশিল্পে কৃতিত্ব সম্বন্ধে ইঁহারই উচ্চ প্রশংসার কথা শুনা যায়। আলি শীরের নিজের গুণ না থাকিলে গুণীলোক তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইতেন না। বলিতে কি, শুধু বিনয়ে, সৌজন্যে, বিশ্বস্ততায়, ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতায় নয়, তাৎকালিক রাজনীতিজ্ঞগণের মধ্যে কাব্যরচনায় ও শিল্পানুশীলনেও উজির মীর আলি শীরের সমকক্ষ অপর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

বাহরাম্ গোর ও সপ্তরাজ কন্যার কাহিনী লইয়া যে মীর আলি শীরনুয়োয়া, একখানি 'দিবান' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি ও উজীর মির আলী শির—অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মীর আলি শীর—তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ নিজেই চিত্রিত করিতেন এরূপ জানা গিয়াছে। আনুমানিক ১৫২৬ খৃ অব্দে উজবেক সুলতান কেঁচকেঁচি খাঁর রাজত্বকালে উক্ত দিবান গ্রন্থের একখানি ক্ষুদ্র চিত্রসম্বলিত অনুলিপি প্রস্তুত করান হইয়াছিল। ইহাতে বাহ্রাম কর্ত্তৃক বন্য গর্দ্দভ শিকারের চিত্র এরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে যে মাধুর্য্যে ও গতিভঙ্গীর শক্তিমত্তায় উহা যেন সজীব বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এ চিত্রখানি মীর আলি শীরের নিজ হস্তে অঙ্কিত চিত্রের নকল বা অনুকৃতি হইলে চিত্রশিল্পী হিসাবেও যে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুলতান হোসেনেরও শিল্পীদের প্রতি দাক্ষিণ্য বড় কম ছিল না। তাঁহার গ্রন্থশালায় নিযুক্ত মির্জ্জা মহম্মদ নামক একজন দক্ষ কারু ও চিত্রশিল্পীকে তিনি হজরৎ আবু আবদাল্লার পবিত্র সমাধিমন্দির অলঙ্করণে নিযুক্ত করেন। গিলিটির কাজে ও প্রসাধক পরিকল্পনায় এ ব্যক্তি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার অলঙ্করণ কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মির্জ্জা মহম্মদ সুলতানের দস্তখৎ জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত হন, কিন্তু ন্যস্ত কার্য্যটি তাঁহার দ্বারাই সুসম্পাদিত হইবে বলিয়া পারস্যাধিপ (সুলতান হোসেন বাইকারা) অল্পেই তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন। এরূপ ব্যবহার কঠোর বা নির্দ্দয়চিত্ত ব্যক্তির নিকট কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। সুলতান হোসেন পানাসক্ত হইলেও তাঁহার সরল প্রকৃতির জন্য সকলের নিকট সমভাবে আদৃত হইতেন। ভারত-সম্রাট্ বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে সুলতান হোসেনের যে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে আকৃতিতে প্রীতিপ্রদ ও প্রকৃতিতে স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও প্রাণবান্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ইহাতেই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বাবর সুলতান হোসেন কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন সৈবানী খাঁর বিরুদ্ধে সমরাভিযানে সাহায্য করার জন্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্রকর যে কম পারদর্শী ছিলেন না তাহা বুঝা যায় দুইখানি চিত্রের প্রতিলিপি হইতে। একখানি বক-কুলীরক উপাখ্যানের এবং অপরখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত এক বনস্থলীর চিত্র। প্রথমোক্ত চিত্রখানি (১) সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার বিষয়বস্তুও সুপরিচিত। চিত্রকর সরসীর একাংশ মাত্র চিত্রিত করিয়াছেন। নল খাগড়া, জলজ পুষ্প, সরোবর তীরবর্ত্তী পক্ষী-

(১) Syed Ameer Ali, op. cit., p. 20.

(২) Ibid, p. 21, হবিব্-উস্-সিয়ার্ প্রামাণিক ইতিবৃত্ত। ইহার কতকাংশ সুলতান হোসেনের রাজত্বকালে, আর কতকাংশ সাফাবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাহ ইসমাইলের সিংহাসন লাভের পর লিখিত হয়।

(৩) Syed Ameer Ali, loc. cit.

(৪) তাঁহার দৈনিক বেতন ছিল একশত aspre (আসরফী ?)।

(১) ইহার একখানি প্রতিলিপি Basil Gray'র গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

নীড়সমাকুল বৃক্ষ, সমস্তই সযত্নে অঙ্কিত হইয়াছে। চঞ্চল মাছের দল সরসী বক্ষে সানন্দে সন্তরণ করিতেছে। বকটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তীরে বিচরণশীল কুলীবককে আক্রমণ করিতে উদ্যত, কাঁকড়াটিও দাঁড়া উঁচাইয়া দীর্ঘগ্রীব বকের অন্তকরূপে দণ্ডায়মান। মৎস্যগুলি যেন দর্শকরূপে সকৌতুকে এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছে। বৃক্ষটির পার্শ্বেই উন্নত প্রস্তরস্তূপ প্রমোদ উদ্যানের ক্রীড়াশৈলের অনুরূপ, বুঝিবা ইহাই বধ্যশিলা যাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া ধূর্ত্ত বক 'প্রভূতজলসনাথ' সরোবরে আশ্রয়কামী, অসহায় মীনগণকে ভক্ষণ করিত। আনোয়ার-ই-সুহেলি নামক পারসীক অনুবাদে মূল পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের বককুলীরক আখ্যায়িকাই মোটামুটি অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাই (১)। বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত কুলীরকেরই সাহায্যে মৎস্যদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিল যে সে দৈবজ্ঞমুখে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টির কথা শ্রবণ করিয়াছে—তাই তাহারা যে জলাশয়ে বাস করে তাহা ত্যাগ করার আশু প্রয়োজন। আনোয়ার-ই-সুহেলিতে সংস্কৃত হিতোপদেশের "প্রিয়বাদী শত্রু" নামক উপাখ্যানের অনুযায়ী 'কৈবর্ত্ত (ধীবর)গণ আসিয়া বিনাশ করিবে' এই কথারই উল্লেখ রহিয়াছে। চিত্রী 'পদ্মগর্ভাভিধান' এই সরোবরটির চিত্র ভালই আঁকিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনায় মৎস্য-কণ্টকাকীর্ণ বধ্যভূমি স্থান পায় নাই—কুলীরক তাহার আবাসস্থান সেই সরসীর তীরেই বিশ্বাসহন্তা শত্রুকে নিধন করিতে সমুদ্যত।

বনপ্রদেশের চিত্রখানিতে সিংহ, ভল্লুক, তরক্ষু, হরিণ, বন্যমার্জ্জার, উড্ডীয়মান হংস প্রভৃতি নানা জীব বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সাহরুখের নামাঙ্কিত কবি আত্তরের কাব্যগ্রন্থের মলাটের উপরকার এক দৃশ্যচিত্রে মৃগ, শাখামৃগ, বন্য হংস প্রভৃতির সহিত যেরূপ ড্রাগনাদির চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে (২) ইহাতে সেরূপ কোনও কাল্পনিক জন্তু সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এ চিত্রে তরক্ষুতাড়িত ধাবমান দুইটি মৃগ খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পিত। বনবিড়াল দুইটি কলহে নিরত, একটির পিঠ উচান, সম্মুখের থাবা উঁচু করিয়া তোলা, অপরটি যেন চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধার সহিত প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। বানরটি র হাতে একটি গাছের পাতা সে ঝিঁঝিঁ (Dragon fly) পোকার মত উড়ন্ত একটি পতঙ্গকে বৃক্ষপত্র সাহায্যে কাছ হইতে সরাইয়া দিতেছে। ভয়লেশশূন্য পশুরাজ পরম আরামে ঘুমাইতেছে আর সিংহিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একান্ত নির্ভরতার সহিত নিকটেই বসিয়া আছে। চিত্রে অর্পিত অপর দুইটি বানরের মানবীয় ভঙ্গী দর্শকের মনে কৌতুকের সঞ্চার করে। একটির প্রসারিত হস্তদ্বয়ের ভঙ্গীতে ও অসূয়াবিকৃত মুখমণ্ডলে প্রবল মানসিক উদ্বেগ প্রকাশিত হইতেছে, অপরটি সাধারণ বানরেরই ন্যায় উপবিষ্ট কিন্তু তাহার ভাব ধীর, সংযত, ও বিক্ষোভবিহীন। একহাত তুলিয়া, সে যেন তাহার ক্ষান্তিবিমুখ সহচরটিকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। চিত্রের আর একদিকে দুইটি ভল্লুক। একটি কতকটা মুখ আড়াল করিয়া বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট, অপরটি বামদিকের সম্মুখের পায়ের থাবায় কি যেন আহার্য্য সামগ্রী ধারণ করিয়া তাহার অলস ও নিশ্চেষ্ট সাথীটির দিকে অগ্রসর হইতেছে। শেষোক্তটির হিংস্রকুটিল স্বভাব তাহার বিকট দংষ্ট্রা ও অন্ধব্যাধিত মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। এ চিত্রে পরিপ্রেক্ষণার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। লতাগুল্মগুলি যেন সমতল ভূপৃষ্ঠে অঙ্কিত, দেখিতে কতকটা মেঝের পাতা কার্পেটের নক্সার মত। ইহারই কতকটা উপর দিকে, যেন একই সমতল ক্ষেত্রে, চৈনিকভঙ্গীতে আঁকা মেঘমালা, মুণ্ডবিহীন ড্রাগনদেহের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। এ চিত্রে বাঁধা ছাঁচ ও স্বাভাবিকতা একসঙ্গে মিলিয়াছে বটে, কিন্তু কোনও বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে নাই (১)।

১৪৪৭ খৃঃ অব্দে সাহরুখের দেহান্ত ঘটিলে ইহার একশতাব্দী পূর্ব্বেকার মাৎস্যন্যায়ের (অরাজকতার) পুনরাবর্ত্তন ঘটে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একাধিক রাজকুমার কিয়ৎকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া নিজ নিজ ভূমিকার অংশ শেষ না হইতেই যবনিকান্তরালে অদৃশ্য হইলেন। বৈজ্ঞানিক উলুঘবেগকে হত্যা করিলেন তাঁহারই পুত্র আব্দুল লতিফ। ছয় মাস যাইতে না যাইতে ইনি ইহার অধীনস্থ সৈনিকদিগের হস্তেই নিহত হইলেন। আব্দুল লতিফের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে পারস্যের ইতিহাসে যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার যথাযথ সন তারিখ নির্ণয় করা যে সুকঠিন তাহা প্রামাণিক গ্রন্থেও স্বীকৃত হইয়াছে। এই অন্তর্বিপ্লবে বিভিন্ন পক্ষাবলম্বী সামরিক নেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুচরবর্গের যত ক্ষতিই হউক না কেন, সাধারণ প্রজাগণের যে বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় নাই তাহা বুঝা যায় বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসার হইতে। ১৪৪৪ খৃঃ অব্দে সমকালীন লোকেরা পৃথিবীর যেটুকু অংশের সহিত পরিচিত ছিল, তাহার সবটুকুরই সহিত হরমুজের বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। মিল্টনের মহাকাব্যেও আমরা হরমুজ ও ভারতের ঐশ্বর্য্যের (wealth of Ormuz or of Ind) উল্লেখ দেখিতে পাই। তুর্কী ও চীনের সহিত পারস্যের কূটনৈতিক সম্পর্ক যথারীতি অব্যাহতভাবেই চলিতেছিল।

পারসীক জাতি স্বভাবতঃই বড় রক্ষণশীল, তাহার পর শিল্পরীতিও একবার দানা বাঁধিয়া গেলে তাহার আর নড়চড়ের বড় উপায় থাকে না। রাজা ও রাজস্থানীয় নেতৃবৃন্দের উৎসাহে শিল্পী ধনিকের কেন্দ্রে অবশেষে তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন বটে কিন্তু শিল্প হইয়া গেল প্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ, অভিনব পদ্ধতিতে প্রকাশ পাইবার বড় উপায় রহিল না। বাঁধা ছাঁদ এড়াইয়া ঢঙের ও রীতির যেটুকু স্বাধীনতা, তাহা নির্ভর করিতে লাগিল নিতান্তই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের উপর। খৃঃ অঃ ১৪৪০ হইতে ১৫২০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই একাধিক অশীতি বৎসর কাল পারসীক শিল্প-ধারায় মোটের উপর স্বল্পমাত্র পরিবর্ত্তনও

(১) নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের সংস্করণ, বককুলীরক কথা ১০১।

(২) Sakisian, Op cit., p. 42.

(১) এ চিত্রের একখানি প্রতিলিপি Illustrated Souvenir of the Burlington House Exhibition of Persian Arts London 1931, পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

লক্ষিত হয় না। হিরাটের 'কলম' কৌলিন্য গৌরব অর্জ্জন করিলেও সেখানে বা সমকালীন অপর কোনও শিল্পকেন্দ্রে যে নূতনত্বের বিকাশ ঘটে নাই তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের চিত্রিত পুঁথি-গুলির সহিত এই সময়ের যে কোনও সাধারণ সচিত্র পুঁথির তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। বিহ্জাদ, আগা মিরেক, ও সুলতান মহম্মদের ন্যায় দুই চারিজন প্রতিভাবান্ শিল্পী অপর সকলকে ছাড়াইয়া নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের বলে সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক শিল্পোদ্যমের, এক কথায় সমকালীন আবহাওয়ার, সহিত তাঁর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেও চলে।

দায়রার গল্প (৪) [গল্প]

শ্রীহিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়, আই, সি, এস্

"তোমাকে খুশী করতে আমি এমন পাপ নাই যা না করতে পারি, খুন পর্য্যন্ত করতে পারি।" এ ধরণের কথা প্রণয়ীযুগলের মধ্যে প্রয়োগ হওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয় যে বিস্ময় জাগাবে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে এমন হয়ে থাকে যেখানে তা শুধু আবেগের উত্তেজনায় মুখের কথা মাত্র থাকে না, কার্য্যে রূপান্তরিত হয়। আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না যখন দেখা যায়, নারী হয়ে, নারী-হৃদয়ের সকল কোমল বৃত্তিকে উপেক্ষা করে প্রেমাস্পদের সামান্য তৃপ্তি সম্পাদনের জন্য এক অতি নির্ম্মম হত্যা-কাণ্ড করতে নারী বিশেষ দ্বিধা বোধ করে নি।

আমাদের বর্ত্তমান গল্পের নায়িকা একটি অপরিণত-বয়স্কা যুবতী, নাম রাণীবালা। কিছু দিন হল তার বিয়ে হয়েছে এক যুবকের সঙ্গে। সে এক নিঃসন্তান পিতার দত্তক-পুত্র। পিতা সঙ্গতিসম্পন্ন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তেমনটি ঘটেছে। পিতার বাৎসল্য রসের পরিতৃপ্তিই যখন তাকে গ্রহণ করবার প্রধান কারণ, সে দত্তক পিতার নিকট যে পরিমাণ পেয়েছে আদর আপ্যায়ন, সে পরিমাণ পায় নি শিক্ষা। বয়স হলেও স্বভাবটি তাই তার রয়ে গিয়েছে আদুরে ছেলের মত। উপার্জ্জন করবার সামর্থ্য তার না থাক, খরচ করবার আগ্রহ তার ছিল যথেষ্ট। এ দিকে সৌখীন হতে শিখেছে সে রীতিমত। ভাল কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবীর প্রতি তার নিগূঢ় আকর্ষণ।

ফলে বাবুয়ানির খোরাক জোগাতে তার বাপের রীতিমত বেগ পেতে হত। স্ত্রীর শুভাগমনের পরে তার গহনাগুলির প্রতি তার যে লোলুপ দৃষ্টি পড়ে নি, তাও নয়। এবং পিতার নিকট লব্ধ মুনাফায় যখন তার খরচ সঙ্কুলান হত না, স্ত্রীর গহনার মূল্যের বিনিময়ে তখন তার সে অভাবের পূরণও হত মাঝে মাঝে। কিন্তু এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘর্ষের কোন আভাস আমরা পাই না। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এ হেন গুণবান্ স্বামীর ভাগ্যে জুটেছে এমন স্ত্রী যে নির্ব্বিবাদে, নিজের সর্ব্বস্ব দিতে পারে, স্বামীকে শুধু খুসী রাখবার জন্য। সুতরাং স্ত্রীর সম্পত্তির সামান্য পুঁজি এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিঃশেষ হতে বিশেষ সময় বোধ হয় লাগে নি।

সেবার পূজোয় দম্পতীর নিমন্ত্রণ হয়েছিল রাণীবালার বাপের বাড়ীতে। বাপের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, তবু মেয়ে জামাইকে পূজা উপলক্ষ্যে কাছে পেতে কার না ইচ্ছা হয়?

মেয়ে-জামাই বাড়ী এসেছে। আদর আপ্যায়নে উভয়ে সুখেই আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে জামাইএর বাপ হাতখরচের যে পরিমাণ টাকা তাকে সঙ্গে দিয়েছিলেন, তার খরচের মাত্রার সঙ্গে তাল রেখে তা বেশী দিন চলতে পারে নি। অষ্টমীর দিনে তহবিল প্রায় শূন্য, নবমীর দিনে বাস্তবিকই তা শূন্য হয়ে গেল।

সুতরাং চলিত প্রথা অনুসারে স্ত্রীর উপর চাপ পড়তে লাগল, তাকে অর্থ সংগ্রহ করে দেবার জন্য। কিন্তু স্ত্রী টাকা কোথায় পাবে? সে ত অর্থ উপার্জ্জন করে না। গহনার সঞ্চয়ও ত তার নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সোজা উপায় মনে আসে, মায়ের কাছ হতে চেয়ে আদায় করে দিতে পারে। কিন্তু রাণীবালা ত জানে তার মায়ের দুরবস্থার পরিমাণ কতখানি। মাকে উত্যক্ত সে করবে কোন মুখে? আর করলেই বা মায়ের সামর্থ্য কোথায় যে জামাইয়ের হাতখরচের টাকা জোগান? সুতরাং রাণীবালা নিশ্চিত ঠিক করে নেয় যে সে পথ রুদ্ধ।

অথচ স্বামীর সখ মাটি হয়ে যাচ্ছে, স্বামীর মুখে হাসি নাই, এইবা তার কি করে সহ্য হয়? উপায় একটা তার করতেই হবে, না করলেই নয়। সারাদিন সে ভাবছিল, হয়ত সারারাতও সে ভেবেছিল। উপায় একটা বার করেছিলও ঠিক; কারণ দেখা গেল বিজয়ার দিন সকালবেলা এক জোড়া সোণার বালা সে এনে স্বামীর হাতে দিয়েছিল। এরূপ উপহারে স্বামী অভ্যস্ত, কাজেই কি উপায়ে কোথা হতে যে তা সংগ্রহ হল, তা জানবার কৌতূহল হয়ত তার হয়নি।

কিন্তু কি উপায়ে যে তা সংগৃহীত হয়েছিল সেই কাহিনীর যে ইতিহাস সেদিন নানা ব্যক্তির মিলিত চেষ্টায় ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছিল তা যেমন অভাবনীয় তেমনি মর্ম্মন্তুদ। যে পরিমাণ পাপের মূল্য দিয়ে সেই উপহার ক্রয় হয়েছিল, তাতে কি স্বামীর অনুমোদন ছিল? তার উত্তর আমরা সঠিক পাই নি।

রাণীবালাদের বাড়ীর অতিনিকট প্রতিবেশী ছিল কেষ্ট। তার এক আট বছরের মেয়ে ছিল, নাম তার মেনকা। এই পরিবারের সঙ্গে রাণীবালাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সুতরাং সেই বিজয়ার দিন প্রাতে মেনকা যখন রাণীবালার সঙ্গে মজুমদারদের বাড়ীর ঠাকুর দেখতে যায়, সেটা এমন কিছু কৌতূ-হলোদ্দীপক ব্যাপার ঠেকেনি, যে দশজনে সে ঘটনাকে বিশেষ নজর করবে।

সেই ঘটনার প্রতি দশজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ভিন্ন কারণে এবং অনেক পরে।

সেদিন বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু মেনকা বাড়ী ফিরল না। দশটা বেজে গেল যখন মার মনটা উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। কি জানি, পূজার দিন, নানা আকর্ষণের বস্তু আছে বাহিরে, মা ধৈর্য্য ধরে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। আরও বেলা বাড়ে, তবু মেনকার দেখা নাই। মা ধৈর্য্য হারান খবর নিতে পাঠান, তবু কোন খবর মেলে না।

পাঁচ মাইল দূরে ট্যাবনা গ্রামে মেয়ের মাসী থাকেন। উভয় স্থানের মধ্যে মটরবাস চলে। মেয়ে সে পথে অভ্যস্ত। মা ভাবেন কি জানি সেখানে হয়ত গিয়ে থাকতে পারে। পাড়ার ছেলেদের অনুরোধ করলেন দেখে আসতে। একজন রাজী হল এবং তখনি সাইকেলে চলে গেল। যেতে আসতে মাত্র দশ মাইল পথ, ভাল রাস্তা। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে এল কিন্তু কোন খবর আনতে পারল না। মেনকার সেখানে কোন সন্ধানই মিলল না।

এবার মায়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। পাড়ার সব বাড়ীই ত ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গিয়েছে। তবে কি কোন বিপদ ঘটেছে? মায়ের পাপশঙ্কী মন নানা আপদ আশঙ্কা করে।

পাড়ার মানুষদের মন গলে। তাঁরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েন, পরামর্শ দেন। মেনকাকে শেষ কোথায় দেখা গিয়েছিল, শেষ কার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল—নানা প্রশ্ন ওঠে।

সহসা মায়ের মনে পড়ে যায়, সত্যই ত সকালে রাণীবালার সহিত মেনকা মজুমদারদের বাড়ী গিয়েছিল। আরও খবর পাওয়া যায় তাদের দুজনকে এক সঙ্গে সকাল বেলা দেখা গিয়েছিল। খোকা বলে, তার বাড়ীতেও তারা দুজন সকালে গিয়েছিল।

মা গিয়ে কেঁদে পড়েন রাণীবালার কাছে। বলেন, মেয়ের কি হয়েছে তাকে বলতেই হবে। সে কিছুই স্বীকার করে না, কিছুই বলে না। সে বলে সে মেনকার কোন খবরই রাখে না।

পাড়ার ছেলেরা ভাবে, বর্ষা না থাকলেও ত শরতের দিনে পুকুরে, নদীতে জলের অভাব নাই। এমনও ত হতে পারে যে সে জলে ডুবে গিয়েছে। তারা দল বেঁধে পাড়ার পুকুরে নামে, ডুব দেয়, জল তোলপাড় করে, কোন ফলই হয় না।

পাড়ার কোল বেয়ে এক সঙ্কীর্ণ নদী চলে গিয়েছে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এইটুকু মেয়েকে গ্রাস করবার শক্তি তার যথেষ্ট আছে। সুতরাং তার প্রতিও ছেলেদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। মাইলের পর মাইল ধরে তার বিস্তার, কতইবা খোঁজা যায়। তবু ছেলেদের উৎসাহ বাড়ে বৈ কমে না। তারা তার বিভিন্ন অংশ খুঁজতে আরম্ভ করে দিল।

এদিকে পাড়ার প্রবীণ লোকেরাও বসেছিলেন না। তাঁরাও এই রহস্যের সমাধানে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন। তাঁরা দেখছিলেন চিন্তাশক্তির পরিচালনার দ্বারা কোন দিশা পাওয়া যায় কিনা।

এক্ষেত্রে পাড়ার নূতন জামাইটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তার সেদিনকার গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁরা খবর নিতে আরম্ভ করলেন।

এই চেষ্টার সুফল ফলতে বেশী দেরী হল না। শীঘ্রই দুটি বিস্ময়কর খবর তাঁদের করতলগত হল। প্রথম খবর মিলল এই যে সেদিনই সকালে রাণীবালার স্বামী একটি স্বর্ণকারের নিকট দুটি বালা বিক্রয় করেছে। অলঙ্কার দুটি এমন কিছু মূল্যবান্‌ নয়, ছোট মেয়ের হাতের গহনা, সোণার পাত দেওয়া। বিনিময়ে সে বুঝি ১৪ টাকা পেয়েছে।

দ্বিতীয় মূল্যবান খবরটি হল এই। আমাদের সৌখীন জামাই বাবু তার অনতিবিলম্বেই এক দরজির দোকানে গিয়েছিলেন এবং সিল্কের কাপড় পছন্দ করে তা দিয়ে এক পাঞ্জাবী বানাবার ফরমাজ দিয়ে এসেছেন! মূল্যের আগাম স্বরূপ তিন টাকা সেখানে জমাও পড়েছে।

বলাবাহুল্য, তখনি আরও খবর মিলল যে সেই বালা দুটি ছিল মেনকার হাতের গহনা। পাড়ার প্রবীণমহল তখন জামাইকে ডাকিয়া এবিষয় প্রশ্ন করলেন, তার এ বিষয় আলোক পাত করতেই হবে, তা না হলে তাঁরা তাকে নিষ্কৃতি দেবেন না।

এতগুলি খবর তার বিরুদ্ধে সংগৃহীত হয়েছে এবং তাকে এই সম্পর্কে বিশেষ রকম জড়িত করেছে। অগত্যা তার মুখ খুলতেই হয়। কিছু তার বলতেই হয়। সে কিছু বলল, কিন্তু মেনকা সম্বন্ধে সে কোন খবরই দিল না। যেটুকু বলল, তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়:

মেনকার খবর সে কিছু রাখে না। তবে এক জোড়া বালা সে বিক্রয় করেছে ঠিক এবং সেইটাকায় পাঞ্জাবী করতে দিয়েছে, সে কথাও ঠিক। গহনা সে পেয়েছে তার স্ত্রীর নিকট হতে সেদিন সকালে। তার স্ত্রী যে কোথা হতে তা সংগ্রহ করেছে সে বিষয় সে কোন খবরই রাখে না।

সুতরাং ঘুরে ফিরে আবার সন্দেহ এসে কেন্দ্রীভূত হয় সেই রাণীবালার উপর। স্বামীকে বিশ্বাস করলে সোণার বালা তা হলে সেইত মেনকার হস্তচ্যুত করেছে, অপর পক্ষে সেদিন সকালে একাধিক ব্যক্তি তাকে মেনকার সঙ্গে দেখেছে। সুতরাং পাড়ার লোকের দৃষ্টি এবং চাপ এবার পড়ল রাণীবালার উপরেই। এ রহস্যের সমাধান তাকেই করতে হবে।

ও দিকে পাড়ার ছেলেদের নদীর বুকে জল তোলপাড় করে খোঁজার কাজ তখনও পূর্ণ উদ্যমে চলেছে। বেলা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। দুপুর শেষ হয়ে বিকাল হতে চলেছে।

এক সরু পথ যেখানে নদীর তীরে এসে মিশে গেছে, সেখানে হঠাৎ কার পায়ে শক্ত মত কি ঠেকল। হাত দিয়ে ধরে জলের উপর তুলে এনে দেখা গেল মানুষের শব। তীরে এনে স্থাপন করার পর আর কোন সন্দেহই রইল না যে সেটি হতভাগ্য মেনকার শবদেহ। এই মর্মন্তুদ আবেষ্টনীর মাঝখানে এইরূপেই সে দিন বিকালে মেনকার খবর অবশেষে মিলে গেল।

মেনকার দেহ নদীর তলদেশ হতে উদ্ধার হয়েছিল সত্য, কিন্তু জলে ডুবে সে মরে নি। তার একটা প্রমাণ এই যে ডাক্তার শব পরীক্ষা করে ডুবে মরে যাওয়া মানুষের কোন চিহ্নই সে দেহে খুঁজে পায় নি। অপর পক্ষে শ্বাসরুদ্ধ করে গলা টিপে সেই নিরীহ

বালিকাকে যে হত্যা করা হয়েছিল তার প্রমাণ সেই দেহে বিলক্ষণ বর্ত্তমান ছিল।

সেদিন বিকালে রাণীবালা প্রতিবেশীদের নিকট একটি উক্তিও শেষে করেছিল। সে যা বলেছিল তা সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই রকম : তার স্বামীর অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় ও অন্য সুযোগ না মেলায়, সে নিজেই সেদিন মেনকাকে ঠাকুর দেখার পর নদীর তীরে নির্জ্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে এবং দেহ নদীতে নিক্ষেপ করে। হত্যার পর তার হাতের বালা নিয়ে সে স্বামীকে এনে দেয়।

অবশ্য বিচারের সময় সে এই উক্তি প্রত্যাহার করেছিল।

বিদ্যাপতি

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি

দশ

এইবার গ্রীয়ারসনের পদগুলির আলোচনার দ্বারা উপরি উক্ত মন্তব্যসমূহের যাথার্থ্য যাচাই করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে নায়িকার রূপবর্ণনা, নায়ক-নায়িকার প্রথম প্রেমসঞ্চার, প্রথম মিলনে নায়িকার অনিচ্ছা ও বিমুখতা ও এই বিমুখতার অন্তরালে ছদ্মবেশী আগ্রহের ক্রমবিকাশ, অভিসার, মিলনের আনন্দ, সন্দেহ-পরায়ণা ননদীর নিকট দোষক্ষালন-চেষ্টা, মান, নায়কের প্রতি শ্লেষবাক্যপ্রয়োগ ও খেদোক্তি, সখির অনুযোগ ও আত্মনির্ব্বেদ, প্রেম-বৈচিত্র্য, বিরহ, ভাবসম্মিলন—প্রভৃতি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সমস্ত শ্রেণীবিভাগগুলিই উদাহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুইটী হরগৌরীবিষয়ক, দুইটী প্রাকৃত শিষ্টরুচিবিরোধী ভালবাসার পদ ও কয়েকটী প্রহেলিকামূলক রচনা এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। হরগৌরীবিষয়ক পদ দুইটীর (৯৪৬, ৯৪৭ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সংস্করণ) ও এতৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কয়টী পদেরই ভাষা বৈষ্ণব পদের সহিত তুলনায়, বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য, অপরিচিত শব্দ ও রচনারীতিতে আকীর্ণ। মনে হয়, যেন রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লইয়া বাঙ্গালীর সহিত যে ভাববিনিময় ও সাংস্কৃতিক মিলন ঘটিয়াছিল তাহার ফলে ইহাদের ভাষা অনেকটা মার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীরচিত পদের ভাষার সাদৃশ্য অর্জ্জন করিয়াছে। শৈব পদগুলি মিথিলার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালীর মানস রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই বলিয়া তাহাদের আদিম মৈথিল রূপটী প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ছন্নছাড়া, বিবাহ-প্রয়াসী শিবের অবস্থাবর্ণনায় উদ্ভট পরিকল্পনার সহিত অদ্ভুত অখ্যাত শব্দগুলির বেশ সুন্দর মিল হইয়াছে। প্রবহমাণ স্রোতে বাহিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ঘর্ষণে মসৃণ হয়; কিন্তু তাহারা বদ্ধ জলাশয়ে কর্দ্দমপ্রোথিত অবস্থায় থাকিলে তাহাদের অসম কর্কশতার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ভাষা সম্বন্ধেও অনুরূপ নিয়ম ক্রিয়াশীল। 'পজিয়ার' (ঘটক), 'পলানল' (পৃষ্ঠে জিন কবিল), 'তঙ্গ' (ফিতা), 'ভকোসথি' (খায়), 'মনাইনি' (মেনকা) ইত্যাদি খাপছাড়া শব্দের মধ্যবর্ত্তিতায় শিবের বীভৎস মহান রূপটী চমৎকার ফুটিয়াছে।

১০২২ ও ১০২৩ পদে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের উদাত্ত আধ্যাত্মিকতা যে স্থূল, গ্রাম্যসমাজ-সুলভ লালসার প্রচ্ছন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কৌতুকাবহ রূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদে এক পথিক আতিথ্যভিক্ষার ব্যপদেশে এক গ্রামবধূকে প্রণয় নিবেদন ও তরুণীর নিকট হইতে সোৎসাহ সম্মতি লাভ করিতেছে। দ্বিতীয় পদে বয়ঃকনিষ্ঠ বরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ যুবতী নিজ অবস্থার লজ্জাকর অসঙ্গতি অনুভব করিয়া পথিকের মারফৎ পিত্রালয়ে সংবাদ পাঠাইতেছে—পিতা যেন এই দুগ্ধপোষ্য জামাতার প্রতিপালনের জন্য গাভীদুগ্ধের ব্যবস্থা করেন। এই দুইটি পদে প্রাচীন যুগে বিহারের গ্রামাঞ্চলের সামাজিক জীবনের এক স্তরের এক উজ্জ্বল, বাস্তব ছবি ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মজার কথা এই যে, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জক ভণিতা সংযোগের দ্বারা এই অতি সাধারণ স্তরের কামনার পদ দুইটিকে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া ঐশী প্রেমের পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার একটা হাস্যকর চেষ্টা হইয়াছে। কেমন করিয়া সাধারণ নরনারীর আদিম অসংস্কৃত মিলনেপ্সা আধ্যাত্মিক প্রতিবেশের মধ্যে গৃহীত হইয়া নিজে উন্নত হইয়াছে ও রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে বাস্তব আবেগ ও সার্ব্বভৌম আবেদনের সঞ্চার করিয়াছে, কেমন করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রিয় দেবতায় ও দেবতা প্রিয়ে পরিণত হইয়াছে, আপামর সাধারণের জৈব আকাঙ্ক্ষার ভিতর বৈষ্ণব-প্রেমের মহামন্ত্র কি করিয়া গুঞ্জরিত হইয়াছে, এই পদ দুইটীতে তাহার রহস্যময় ইঙ্গিত নিহিত আছে। ভণিতাগুলি হয় ত পরবর্ত্তী যুগে কোন নকল-কারকের দ্বারা আরোপিত হইয়া থাকিবে। প্রথম পদের ভণিতা—

> "ভণহি বিদ্যাপতি অপরুপ নেহ।
> যেহন বিরহ তো তেহন সিনেহ॥"

৬৯৪নং পদ হইতে অবিকল গৃহীত। দ্বিতীয় পদের ভণিতা বৈষ্ণব-পদাবলীর খুব সাধারণ উপসংহার।

বিদ্যাপতির প্রহেলিকা-ধর্ম্মী পদগুলি চর্য্যাপদ ও চণ্ডীদাসের অনুরূপ পদ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন। চর্য্যাপদ ও চণ্ডীদাসে হেঁয়ালির ভিতর দিয়া এক গভীর অধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিত মিলে। কবিরা সাধনার এই গুহ্যতত্ত্ব অর্দ্ধাবৃত রাখিবার জন্যই যেন এক দুর্ব্বোধ্য ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। ইংরেজীতে যাহাকে বলে Symbolism, এক পর্য্যায়ের ঘটনাবিবৃতির দ্বারা উচ্চতর পর্য্যায়ের অনুভূতির আভাসে পরিচয় দান, এই রচনাগুলি তাহারই স্পষ্ট উদাহরণ। কবির ভাষাপ্রয়োগে যে নিঃসঙ্কোচ সাহস, ভাষার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা, যে রহস্যময় উপলব্ধির অনুরণন, উপমা ও চিত্রনির্ব্বাচনে যে অবিচলিত উদ্দেশ্যের সক্রিয়তা—তাহারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, পদগুলি অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি

হ, পরন্তু পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা উপলব্ধ এক পরম তিক্ততার তির্য্যক্ অভিব্যক্তি। ইহাদের সহিত তুলনায় দ্যাপতির প্রহেলিকাগুলি নিম্নস্তরের, নিছক বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের রপ্যাচ মাত্র। লেখক অর্থকে সহজ কথায় প্রকাশ না করিয়া হাকে পৌরাণিক allusion (পরোক্ষ উল্লেখ)-এর জটিল ব্যূহে বন্দী করিয়াছেন—পাকে পাকে এই জাল ছাড়াইয়া শী অর্থের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। রাধিকার গতির লনা স্বরূপ ঐরাবতকে 'গরুড়াসন-সখ-তাতক বাহন' (১৫০) াখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে; তাহার ষোড়শ সজ্জা বুঝাইতে

'সাগর গরহ (৭+৯) সাজি বর কামিনী
চললি ভবন পতি তাহী। (১৫২)'

ইরূপ বর্ণনা-প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। 'ধরম' বুঝাইতে

লিখব উনৈশ সতাইক সঙ্গ
সে পুনি লিখব পচীসক সঙ্গ (৮৭১)

বর্ণমালায় 'ধ' 'র' ও 'ম' এই তিনটী বর্ণের অবস্থিতির সংখ্যা-টিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; ও 'কট' বা প্রতিশ্রুতি বুঝাইতে থম (ক) একাদস (ট) দই পহু গেল' এইরূপ উক্তির সাহায্য ওয়া হইয়াছে। এইরূপ রচনাভঙ্গীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যা-মান ও পাঠকের বুদ্ধিপরীক্ষার দ্বারা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার লোভাব প্রকটিত হইতে পারে; কিন্তু কবিত্বের সঙ্গে ইহার শেষ কোন সম্পর্ক নাই।

(এগার)

নায়িকার রূপবর্ণনা হইতে পদাবলী-সাহিত্যের আসল বিষয়ের রম্ভ। ৬২, ৭০, ও ১৫০, ১৫১ ১৫২, এই তিনটি প্রহেলিকা-ক পদ এই বিষয়ে রচিত। হয় ত এই রূপবর্ণনার মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই—সংস্কৃত সাহিত্যের চিরপ্রথাবদ্ধ প্রণালীই এখানে অনুসৃত হইয়াছে। উপমা নির্ব্বাচনেও আধুনিক রুচি অনুসারে বচিত্র্যের অভাব ও কষ্টকল্পনা লক্ষিত হয়। কিন্তু তথাপি যথা-থ ছন্দোবিন্যাস ও শব্দসমূহের ভিতর দিয়া প্রবহমান ধ্বনি-মাধুর্য্যের মধ্যে কবির সৌন্দর্য্যপিপাসু, রূপ-বিকল চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতের, জীবন হইতে বহুদূরে অপসারিত প্রকাশ-ভঙ্গী হইতে জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত হৃদয়াবেগে স্পন্দ-মান প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তর সাধনেই কবিকল্পনা আত্মানু-শীলনের যথেষ্ট অবসর খুঁজিয়া পাইয়াছে। নূতন ভাষাই এই রূপবর্ণনামূলক পদগুলিকে গতানুগতিকতার অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছে।

নীল বসন তন ঘেরল সজনি গে
সির লেল চিকুর সঁভারি।
তা পর ভমরা পিবত রস সজনি গে
বইসল পাখি পসারি। (৭০)

এই পংক্তিগুলিতে মৌলিক কবিপ্রতিভা হয় ত নাই, কিন্তু ইহাদের ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের পুলকিত উপলব্ধি যে হিল্লোলিত ...াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

তার পর নায়ক-নায়িকার পরিচয় ও মিলনের পালা। ১২৬ ও ১২৭ সংখ্যক পদে নায়কের অনুসরণে নায়িকার কপট প্রতিবাদ ও কাতর অনুনয়ের অভিনয় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতা হিসাবে এই দুইটী পদ বিশেষ উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে না—বিশেষতঃ দ্বিতীয় পদে ইতর সাধারণের মধ্যে প্রচলিত গ্রাম্যসুরের রেশ শোনা যায়। কিন্তু ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, কবি এখানে কৃষ্ণের ভগবত্ত্ব ঘোষণা করিয়া রাধিকার মূঢ়তাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। এইখানে ইহারা চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদের সহিত এক সুরে বাঁধা। দ্বিতীয় পদে ভাগবত-বহির্ভূত নৌকাখণ্ডের পালা গীতি-কবিতার বিষয়রূপে বিদ্যাপতিকে প্রভাবিত করিয়াছে—তাহার প্রমাণ মিলে। যদি সনাতন গোস্বামী দ্বারা মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে উল্লিখিত চণ্ডীদাসকে নৌকাখণ্ডের আদি কবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এখানে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসপ্রবর্ত্তিত আখ্যায়িকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন স্বীকার করিতে হয় এবং উভয়ের কালগত পারম্পর্য্য বিষয়ে কিছু আলোকপাত হয়।

ভণহি বিদ্যাপতি গাওল রে
সুনু গুণমতি নারী।
হরিক সঙ্গ কিছু ডর নহি হে
তোঁহ পরম গমারী। (১২৮)

ও

বিদ্যাপতি এহো ভানে।
পূজরি ভজু ভগবানে, কহৈয়া॥

এই দুইটী ভণিতা পরবর্ত্তী যুগের ভক্তিরসের কিছু পূর্ব্বাভাস দেয়।

অতঃপর অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্তরের প্রথম মিলনে, কিশোরী নায়িকার ভয়বিহ্বল অনিচ্ছুকতা বিষয়ে কয়েকটী পদ আছে। পূর্ব্বতন সাহিত্যে নায়িকার এই দৈহিক মিলন-পরাঙ্মুখতার কিছু উল্লেখ থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি মনে হয় যে, বয়ঃসন্ধি-বিষয়ক ও এই জাতীয় পদের প্রাচুর্য্য বাস্তব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও নায়িকার প্রতি বাস্তব গুণের ক্রমপ্রসারশীল আরোপের ফল। রাধিকা যখন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে ভাষা-সাহিত্যের উদার বিস্তৃতির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধর্ম্মের প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে রস-অনুভূতিপূর্ণ জীবনের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন জীবন তাহার অফুরন্ত বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার লইয়া তাঁহার দেহ ও মনের প্রসাধনে লাগিয়া গেল!

এতদিন কোকিল, গজ, সিংহ, চন্দ্র, বিম্ব, দাড়িম্ব প্রভৃতি কয়েকটী পুরাতন আমলের পরিচারকের উপর যে প্রসাধনের ভার ন্যস্ত ছিল, নূতন ব্যবস্থায় তাহারা কর্ম্মচ্যুত না হইলেও গৌণ পর্য্যায়-ভুক্ত হইয়া রহিল। সত্যিকার সমাজ-জীবনে কিশোরীর স্ফুট-নোন্মুখ সৌন্দর্য্য, তাহার দেহ ও মনে নিগূঢ় পরিবর্ত্তনের আভাস, প্রথম প্রিয়-সমাগমে তরুণীর সলজ্জ মধুর চলচিত্ততা—এই সমস্ত সুকুমার বিকাশসমূহ বাস্তব হইতে কল্পনায়, মানুষ হইতে দেবতায় সংক্রামিত হইয়া রাধিকাকে 'বিকসিত বিশ্ববাসনার' পরিপূর্ণ শতদলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৯৬, ২০২ ও ২১৩ এই সাতটি পদে নায়িকার মিলনে অনিচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পদটী মিথিলা-গীতসংগ্রহে নন্দীপতি নামক কবিকে আরোপিত হইয়াছে। ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়াও ইহা অন্য কবির রচনা

বলিয়া মনে হয়। ১৫৪ ও ২০২ নং পদে কবির তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, রচনার কৌশল, রাজসভাসুলভ বক্রোক্তি-নৈপুণ্য উদাহৃত হইয়াছে।

ভণ বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজ (তেজ ভয় লাজ)।
আগি জারিয়ে পুনু আগিক কাজ ॥

অর্থাৎ আগুনে পুড়িলে পুনরায় আগুনেই তাহার প্রতিকার হয়—প্রথম মিলনের ক্লেশ উপশমের প্রকৃষ্ট উপায় সেই অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি। পদগুলি সমগ্রতঃ খুব উচ্চ অঙ্গের নহে, তবে মাঝে মধ্যে এক একটা যুগ্মপংক্তিতে কাব্যসৌন্দর্য্য ও মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

জইসে ডগমগ নলনিক নীর।
তইসে ডগমগ ধনিক সরীর ॥ (১৫৪)
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ ॥ (মেঘরূপ নীল বস্ত্রের অন্তরালে মুখচন্দ্র ব্যক্ত হয় না)
লগ নাহি সরএ, করএ কসি কোর।
করে কর বারি করতি কর জোর ॥

(জোর করিয়া কোলে করিলেও কাছে আসে না। হাত দ্বারা হাত ঠেকাইয়া হাত জোড় করিয়া অনুনয় করে।)

মোহর মুদল অছি মদন ভঁড়ার। (১৫৬)

(মদনের ভাণ্ডার শীল-মোহর করা আছে—সৌন্দর্য্য উপভুক্ত হয় নাই—পদাবলী-সাহিত্যে বহু-প্রযুক্ত উপমা)

কর না মিঝায় দূর জরু দীপ।
লাজে না মরএ নারি কঠজীব ॥ (১৬৭)

(শয়নগৃহের প্রদীপ শয্যা হইতে দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া তাহা নিবান যায় না। লজ্জাতে মৃতপ্রায় হইয়াও কঠিনপ্রাণ নারীর জীবন বাহির হয় না।)

অধর দসন (দংশন) দেখি জিউ মোরা কাঁপে।
চাঁদমণ্ডল জনি রাহুক ঝাঁপে ॥
সমুদ্র ঐসন নিশি ন পারি এ উর।
কখন উগত মোর হিত ভএ দূর ॥ (২০২)

(সমুদ্রের ন্যায় রাত্রি, তাহার সীমা পাই না। কখন আমার হিতকারী সূর্য্য উঠিবে ?)

খন পরিতেজ মন আবএ পাশ।
ন মিলএ মন ভরি ন হোয় উদাস ॥
নয়নক গোচর থির নাহি হোয়।
কর ধরইত ধনি সুখ ধরু গোয় ॥ (২১৩)

(তখনই ছাড়িয়া যাইতেছে, তখনই নিকটে আসিতেছে; পূর্ণভাবে মিলিতও হয় না, আবার একেবারে উদাসীনও নহে। চক্ষুর সামনে স্থির হইয়া থাকে না, হাত ধরিয়া মুখকে গোপন করিয়া রাখে।—তরুণীর দ্বিধাকম্পিত মনের সুন্দর ছবি)।

পদগুলিতে 'ঝিক-ঝোর' (টানাটানি করা), কিবার (কবাট) 'বালমু বেসনি' (তরুণ বল্লভ), 'কঠজীব' (কঠিনপ্রাণ), 'অরুঝা এল' জড়াইয়া গেল) প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার অজ্ঞাত শব্দ ও প্রয়োগরীতির প্রাচুর্য্য পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালী কবির হস্তমার্জ্জনার অভাবই সূচিত করে।

বার

বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে অভিসার রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার এক অভিনব পরিকল্পনা। প্রাচীন সমাজে কামকেলি-বিলাসের মধ্যে অভিসারের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং প্রাচীন সাহিত্যে সমাজব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে সাধারণতঃ উচ্চকুলোদ্ভবা রাজমহিষী বা সাধারণ বারনারী প্রণয়ী উদ্দেশ্যে অভিসার-যাত্রা করিত। রাজমহিষীর অভিসার হয় ত সুবিস্তৃত রাজান্তঃপুরের অবরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—প্রকাশ্য রাজপথ বাহিয়া বারনারীরাই অভিসারিকা হইত। "নগরীর নারী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।" এই অভিসারপ্রবণতার মধ্যে হয় ত পুরাকালের নারীর স্বাধীনতা ও সাহসিকতার কি[illegible] নিদর্শন আছে—কিন্তু মোটের উপর ইহা একটা কৃত্রিম বিলাস ব্যসনের রীতিরই অনুসরণ, ইহার মধ্যে দুর্ব্বার হৃদয়াবেগের স্পন্দন অনুভূত হইত না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে গো[illegible] হইতেই এক দুর্জ্জয়, সর্ব্বত্যাগী আকর্ষণের ইঙ্গিত নিহিত আছে। রাধার অভিসার কেবল মাত্র গতানুগতিক প্রণয়রীতির প্র[illegible] আনুগত্য নহে ; ইহা সাংসারিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, লৌকি[illegible] পাপ-পুণ্যের আদর্শকে অস্বীকার করিয়া, এক প্রচ[illegible] দুরতিক্রম্য আহ্বানের নিকট আত্মসমর্পণ। রাধা[illegible] অভিসারের মধ্যে প্রথম হইতেই আধ্যাত্মিক অভীপ্সা[illegible] দুরন্ত গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা ভগবানের প্র[illegible] ভক্ত মানবাত্মার বাধাবন্ধহীন উর্দ্ধাভিযানের ব্যাকুল আগ্র[illegible] এই অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা ছাড়া প্রতিবেশ-সৌন্দর্য্যের নিগূঢ়, বৈদ্যুতী[illegible] আকর্ষণ এই যাত্রাকে কাম্যতম, শ্লাঘ্যতম রমণীয়তায় ম[illegible] করিয়াছে। যমুনাতীরের তমাল-শ্যাম বনভূমি, কখনও বা পূর্ণি[illegible] কৌমুদীপ্লাবিত—কখনও বা মেঘান্ধকারে দুর্নিরীক্ষ্য যাত্রাপথ[illegible] রহস্যময় পরিবর্ত্তনশীলতা ও বাধাবিঘ্নভূয়িষ্ঠতা, নিরুদ্দেশ যা[illegible] ভয়-শিহরণ, সম্মুখের আকর্ষণ ও পিছনে ফেলিয়া আসা জীব[illegible] বিপরীত টানের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব,—এই সমস্ত মিলিয়া অধ্যা[illegible] জগতের এক অরূপ কামনাকে অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য্যে অভিষি[illegible] নাটকীয় আবেগ ও ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণরস-সমৃদ্ধ করিয়াছে।

অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ও প্রতিবেশ-প্রভাব ভাগবতকার ও জ[illegible] উভয়েই বর্ত্তমান। ভাগবতে রাসলীলা-বর্ণনায় ও জয়দেবের [illegible] সর্গে প্রকৃতির যাদুময় প্রেমের আবেশকে নিবিড়তর করিয়া[illegible] কিন্তু ইহাদের মধ্যে দুরূহ অধ্যাত্ম সাধনার সুরটী সেরূপ পরি[illegible] হয় নাই। ভাগবতকারের মনে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ঐশী ম[illegible] অত্যন্ত সবল ও প্রত্যক্ষভাবে জাগ্রত—সেইজন্য তিনি স[illegible] তিকতার তির্য্যক্ পথ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন অনুভব [illegible] নাই। জয়দেবের কবিতায় বৃক্ষ-লতা-পল্লবের ঘন সন্নি[illegible] লুপ্তপ্রায় সঙ্কীর্ণ আরণ্য পথটীর ন্যায় অতিপল্লবিত সৌন্দর্য্যের অন্তরায়িত আধ্যাত্মিক সুরটী সহজে অনুভূতিগ্রাহ্য হয় [illegible] বিদ্যাপতির পদাবলীতেই সর্ব্বপ্রথম অভিসারের সাঙ্কেতিক [illegible] ইহার মধ্যে নিগূঢ় কৃচ্ছ্র সাধনের ইঙ্গিতটী, সুপ্রকট হইয়া

কর্দ্দম-পিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথ, ভুজঙ্গ-সমাকুল বনস্থলী, বর্ষাস্ফীত দুস্তর নদী, মেঘাবৃত রজনীর সূচিভেদ্য অন্ধকার, সর্ব্বোপরি অনায়ত্ত কামনার ব্যাকুল মর্ম্মবেদনা প্রভৃতি দুর্গম যাত্রাপথের অন্তর-বাহিরের বাধাবিঘ্নসমূহ রূপক-প্রতিভাসের অর্থগৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই সাঙ্কেতিকতার বহুগুদ্যোতনায় তিনি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-কবি-গোষ্ঠীর পথিপ্রদর্শক; এবং বোধ হয় গোবিন্দদাস ও রায় শেখর ছাড়া এইজাতীয় পদে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই।

কোন কোন পদে বিদ্যাপতির ভাব পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কবিতা হইতে গৃহীত, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকতায় ইহাদের অনুকারকত্ব একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের শব্দাড়ম্বর পেষণে কুণ্ঠিতপ্রায় ভাবপ্রকাশের সহিত বিদ্যাপতির মর্ম্মস্পর্শী আবেদনের পার্থক্য নিম্নলিখিত দুইটী পদের তুলনামূলক আলোচনায় পরিষ্কার হইবে।

চিত্রোৎকীর্ণাদপি বিষধরাদ্ভীতিভাজো রজন্যাঃ
কিং বা ক্রমঃ ত্বদভিসরণে সাহসং মাধবাস্যাঃ
ধ্বান্তে যান্ত্যা যদভিনিভৃতং রাধয়াত্মপ্রকাশ-
ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণিকণারত্নরোধো ব্যধায়ি॥

(কস্যচিৎ—রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত পদ্যাবলী ১৯৬ নং পদ্য)

বিদ্যাপতি, ৫৩৫ নং পদ

মাধব, করিঅ সুমুখি সমধানে (মনস্কামনা পূর্ণ করিও)
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনি করএ কে আনে॥
বরিস পয়োধর ধরণি বারি ভর
রয়নি মহাভয় ভীমা।
এইঅও চললি ধনি তুঅ গুণ মনে গুনি
তসু সাহস নহি সীমা॥

দেখি ভবনভিতি নিখিল ভুজগপতি
(ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত ভুজঙ্গম দেখিয়া)
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফণি-মণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে॥

নিজ পহু পরিহরি সঁতারি বিখম নরি (বিষম নদী)
অঁগিরি মহাকুল গারী। (শ্রেষ্ঠকুলের গঞ্জনা স্বীকার করিয়া)
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী॥
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক (জ্ঞাতা)
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।
কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু কখনে কী ন করাবে॥

(কাম ও প্রেম এক হইয়া থাকিলে, কি না করাইতে পারে?) সংস্কৃত শ্লোকটী যেন নিশ্চল, জমাট তুষার-স্তূপ—বিদ্যাপতির পদ উষ্ণ-আবেগ-বিগলিতা কলপ্রবাহিণী স্রোতস্বতী। পদটীর মধ্যে 'অনুরাগ' শব্দটীর প্রয়োগ লক্ষিতব্য। 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' এক বিশেষ প্রকার প্রেমকে অনুরাগ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া শব্দটী যে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল এই ধারণা বিপরীত প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে।

অভিসার বিষয়ক পদগুলির সংখ্যা দশটী—২৩৭, ২৭০, ২৭১, ২৯৩, ২৯৬ (৮৬৮), ৩০০, ৩০৪, ৩০৮, ৩২০ ও ৫৩৫। ইহাদের মধ্যে ২৭১ পদ মিথিলাগীতসংগ্রহে চন্দ্রনাথ নামক কবিকে আরোপিত হইয়াছে। কয়েকটী (২৭০, ২৯৬) ঠিক অভিসার নহে, অভিসারের আয়োজনে সজ্জা ও মানসিক অস্থিরতা বিষয়ে রচিত। ২৯৩ পদে অভিসারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর নায়কের অদর্শনে নায়িকার খেদ বর্ণিত হইয়াছে। ৩০০ পদে দিবা অভিসার বর্ণনীয় বস্তু। ৩০৪ ও ৩২০ অভিসারের পরে সম্ভোগ-বর্ণনার পদ। ৩০৮ নং পদে প্রভাতে বিলাসের অযৌক্তিকতা লইয়া নায়ককে অনুযোগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত পদে প্রকৃতপক্ষে অভিসারের পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—অভিসারের দুঃসাহসিকতা ও নিবিড় প্রেমাবেশ ইহাদের মধ্যে সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। 'ততমত' (ইতস্ততঃ), 'ফেরা' (ডাকাডাকি) ও 'ডগরকই' (পথে)—ইত্যাদি কয়েকটী শব্দ পদগুলির মৈথিল প্রতিবেশের সাক্ষ্য দেয়। অভিসার সম্বন্ধীয় পদে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতির উপর বেশী উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই, কাজেই এগুলির মধ্যে বৈষ্ণবভাবধারা সুপ্রকট। [ক্রমশ

ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে 'সাহিত্য' বলিতে বুঝিতে হয় সেই বস্তু, যাহা মানুষের নিকট হইতে প্রকাশ পায় তখন, যখন মানুষ তাহার 'নিত্যসঙ্গী'র ক্রিয়ায় প্রভান্বিত হয়। অথবা মানুষের যাহা 'নিত্যসঙ্গী' তাহার ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তরে প্রকট (predominant) হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় মানুষ যাহা প্রকাশ করে, তাহার নাম 'সাহিত্য'।

'নিত্যসঙ্গী' বলিতে বুঝিতে হয় সেই বস্তু, যাহা মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।—শ্রাবণ ১৩৪২

অভিজাত (গল্প)

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভৌমিক

আমাদের তিনতলা বাড়ীটার পাশেই ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। এমন বিসদৃশ দেখায় যে কি বলবো! মনে হয় সুন্দর পরিপুষ্ট দেহের এক অংশবিশেষে দুষ্ট একটা ক্ষত। অনেক সময়ে ইচ্ছে হয়েছে ঐ জমিটুকু কিনে নিতে, কুঁড়েটা ভেঙ্গে তা'হলে আর একখানা গ্যারাজ বানিয়ে নেওয়া যেতো।

কিন্তু ঐ ভিটেটুকুর মায়া কত। কিছুতেই কি বিক্রী করতে রাজী হোলো? দুইগুণ দাম দিতে চাইলাম, তা বললো, "ভিটেই যদি গেল তবে টাকা দিয়ে কি হবে, বাবু?"

অবসর সময়ে প্রায়ই ওদের জীবন-যাত্রার কিছুটা নজরে পড়ে। স্বামী স্ত্রী এবং ছোট একটা মেয়ে, বয়স প্রায় দশ এগারো হবে। ক্ষীণ দেহ, রুক্ষ মুখ-চোখ, দেখলেই মনে হয় যথেষ্ট খেতে পায় না। এই দুর্মূল্যে এবং দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে হয়ত আধপেটা অথবা একেবারে না খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে। পরণের বস্ত্র শতচ্ছিন্ন, সেলাই করবারও সঙ্গতি নেই। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হয় বর্ষাবাদলে চালের ফাঁক দিয়ে জল পড়ে, শীতের রাতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মাঝে মাঝে দয়া হলেও অবজ্ঞার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারি না। গরীব যারা, যারা সংসার এবং অদৃষ্টের চাপে নুয়ে পড়ে আছে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার সামান্য চেষ্টাও নেই, অদৃষ্টকে কাটিয়ে ওঠাকে যারা অসম্ভব বলে মনে করে, তাদের প্রতি মাঝে মাঝে অনুকম্পা হলেও মনে মনে তাদের ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যই করি। আর ঐ যে মেয়েটা, আমার বোনেরই সমবয়সী হবে, অথচ কি চেহারা আর কি বিশ্রী নোংরা ভাবেই না থাকে!

সেদিন রবিবার। ছুটীর দিন বলে খাওয়াটা একটু ভালোও হয় এবং খেতে বেশ একটু দেরীও হয়ে যায়। আমাদের আমেরির জন্যে কিছু ভাত আর মাংস আলাদা করে রেখে উঠে পড়তে বেলা হয়ে গেল প্রায় দু'টো।

আমেরি হোলো আমার বোনের আদরের কুকুর। বিলিতি কুকুর, চমৎকার গোলগাল নাদুস্‌নুদুস্ দেখতে। যখন একেবারে বাচ্চা অবস্থায় তাকে নিয়ে আসি তখন আমার বোন্ প্রথমেই বলে ওঠে, "আ-মরি, কি ছিরিই না তোমার বিলিতি কুকুরের!" ওর সেই আ-মরি এখন আমেরিতে পরিণত হয়েছে। নিয়ম করে তার জন্যে আমাদের প্রত্যেককেই কিছু ভাত মাংস ইত্যাদি রাখতে হয়, না হলে আমার বোনটির বিরক্তির সীমা থাকে না। আমাদের প্রত্যেকের আলাদা করে রাখা খাবার খেয়ে খেয়ে আমেরির চেহারা হয়েছে যেন সেই পেটুক দামুর মতো। কোন কাজের নয়, শুধু শুয়ে বসে আর সময় বুঝে লেজ নেড়ে সময় কাটায়। মাঝে মাঝে নিরাপদ দূরত্ব থেকে একটু আধটু চীৎকারও করে বাইরের কোন শত্রুর উদ্দেশে।

যাই হোক্, সবে খেয়ে উঠেছি, এমন সময়ে বাইরে থেকে করুণ প্রার্থনা কানে এলো, "বাবুগো, চাট্টি ভাত।"

যতই করুণ সুরে আবেদন জানাক না কেন, মনে আর কোন সাড়া জাগে না, শুনতে শুনতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। ভ্রূক্ষেপ না করে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম, কিন্তু সেই একঘেয়ে আবেদন তো থামলোই না, বরং করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠতে থাকলো। কি বিরক্তিকর বলো তো? সময় নেই, অসময় নেই, শুধু এটা দাও ওটা দাও! মেজাজটা খুবই চড়ে গেল। দরজা খুলে ছেলেটাকে কাছে ডাকলাম।

রোগা লিক্‌লিকে দেহ, হলদে চোখ দুটো একেবারে গর্ত্তে ঢুকে গেছে, দেখলেই মনে হয় মৃত্যু যেন হাত বাড়িয়ে রয়েছে তার দিকে। কাছে ডাকতেই ছেলেটার নিষ্প্রভ চোখ দু'টো যেন কিসের আশায় দপ করে আবার জ্বলে উঠলো।

দেখে দয়া হোলো, বললাম, "সব সময়ে তোরা এমন চীৎকার করে মরিস কেন, বল তো? পথ চলতে দিস না, ঘুমোতে দিস না, খেতেও দিস না, তোদের নিয়ে তো এক মহা জ্বালা হোলো দেখছি।"

ছেলেটার উদ্দীপিত আশা এক ফুৎকারে একেবারে নিভে গেল। মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বলতে পারলো, "বড্ড ভুখ্ বাবু!"

কুকুরটার জন্যে অনেকখানি ভাত মাংস আছে বটে, কিন্তু ও যে তার নিত্য বরাদ্দ! ওটুকু না হলে সেই বা বাঁচবে কী করে? একটু ভেবে বললাম, "দাঁড়া, দুটো পয়সা দিচ্ছি, নিয়ে যা।"

কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে হাহাকার করে উঠলো— "খেতে দাও বাবু, পয়সা নিয়ে কী করবো?"

পয়সা নিয়ে কী করবো! কি আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা এদের, পয়সা উপার্জ্জন করবার ক্ষমতা নেই, অথচ দিতে চাইলে নেবে না!

বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "যা তবে মর গিয়ে, বেকুব কোথাকার। বেলা চারটের সময় এসেছেন, খেতে দাও!"

দরজাটা ওর মুখের ওপর বন্ধ করতে যাবো—এমন সময়ে একটি ছোট্ট মেয়ে একটি ছোট্ট থালায় করে কিছু মোটা চালের ভাত, কিছু ডাল আর ডাঁটা তরকারি মিশিয়ে এনে সামনে দাঁড়ালো। তারপর ভিখিরি ছেলেটাকে মিষ্টি করে ডাকলো, "এইদিকে এসো, খাও।" দেখেই চিনতে পারলাম, কুঁড়ে ঘরের সেই নোংরা মেয়েটা।

ছেলেটি যে-রকম দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো, দেখে ঐ একরত্তি মেয়েটার ওপর অত্যন্ত রাগ হোলো। ইচ্ছে করেই যে আমাকে অপমান করতে এসেছে, হয়ত নিজের আহার্য্যের সবটাই এনে দিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ রইলো না। ইচ্ছে করলো, খুব কড়া করে দু'চারটে কথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু কী এমন কথা শুনাবো?

ধড়াম করে তাদের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে নিজের আভিজাত্যের গৌরব বজায় রেখে উপরে উঠে এলাম।

বিচিত্র-জগৎ

মালাবার (ভ্রমণ-স্মৃতি)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

'মলয়' শব্দ হইতে 'মালাবার' শব্দের উৎপত্তি, সন্দেহ নাই। তামিল ভাষায় পর্ব্বতকে মলয় বলা হয়। দক্ষিণ হইতে চন্দন-গন্ধামোদিত মন্দ-মন্থর মলয়-মারুত সঞ্চারিত হওয়ার কথা প্রাচীন কবিরা কহিয়াছেন। উত্তর-ভারতের অধিবাসিবৃন্দের বিশ্বাস ছিল, সুদূর দক্ষিণে দণ্ডায়মান চন্দনতরুমণ্ডিততনু মলয়-শৈলমালা হইতে এই বাতাস আসে বলিয়াই ইহা এত সুস্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ। কেবল কবিকুলের কল্পনা এই বিশ্বাসের উদ্ভবভূমি নয়—সত্যই ইহার ভিত্তি। মলয় শব্দ 'মালাই' শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তাহাতে আরবী 'বার' শব্দ সংযুক্ত হইয়া 'মালাবার' শব্দটিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। বার শব্দের অর্থ উপকূল বা উপকূলস্থ রাজ্য। যেমন জাঞ্জিবার, যাহার অর্থ জাঙ্গি বা কৃষ্ণকায়দিগের সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশ। এই মালয় দেশ বা মালাবারবাসীরা যে-ভাষায় কথা কহিয়া থাকে তাহা 'মালয়ালাম' নামে অভিহিত। এই ভাষা বড়ই নীরস ও কর্কশ। পরস্পর কথোপকথনের সময় মালাবার-বাসীর মুখ হইতে যখন এই ভাষা সবেগে নির্গত হয় তখন তাহার বালুকাপূর্ণ কটাহে খই ফোটার ন্যায় যখন ইহা পূর্ণ তেজে প্রকটিত হইয়া উঠে, তখন প্রদেশান্তরবাসী শ্রোতা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, সন্দেহ নাই। সেই শ্রুতিরসায়ন কথামৃতলহরীর স্মৃতি বিস্মৃতির তিমিরে বিলুপ্ত হইবার নহে।

কোচিন হইতে এর্ণাকুলাম পর্য্যন্ত নিয়মিত মোটরবোট যাতায়াত করে। এর্ণাকুলাম হইতে আলেপ্পি এবং তথা হইতে কুইলন যাওয়া যায়। পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত কোটায়াম নামক স্থানটিতেও মোটরবোটে যাওয়া চলে। এখান হইতে সাধারণ মোটরগাড়ী চলার উপযোগী একটি রাস্তা স্বভাবশোভায় সমৃদ্ধ চা-বাগানগুলির ভিতর দিয়া আগাইয়া গিয়াছে। পেরিয়ার হ্রদের চতুর্দ্দিকে যে নেত্রাভিরাম চিরশ্যাম বনরাজি বিরাজিত, এই পথে তাহাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মোটর ভাড়া করিয়া এর্ণাকুলাম হইতেও এই শ্যামল সুষমার দেশে আসা যায়।

মোটরবোটে চড়িয়া আমরা যখন মালাবার উপকূলের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইলাম তখন পট্টিমার নামক প্রাচীন প্রণালীর জলযানগুলি আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই জলযানগুলি যুগের পর যুগ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তপ্রবাহী এই বিরাট বারিরাশির বক্ষে বাহিত হইয়া আসিতেছে। আমরা দেখিলাম, উপকূলের উপরে ওলন্দাজদের দ্বারা নির্ম্মিত একটি পুরাতন ভবন দাঁড়াইয়া আছে। বিষণ্ণ-গম্ভীর গৃহটি যেন অতীত গৌরবের কথা নীরবে চিন্তা করিতেছে। এই বাড়ীটি ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হইয়াছিল। এখন ইহাতে পলিটিক্যাল এজেণ্ট বাস করেন।

আমরা ঘাটের কাছে পৌঁছিয়া সম্মুখে কোচিন কলেজ দেখিতে পাইলাম। নারিকেলকুঞ্জ ও তালীবনের তলে তলে নিভৃত ধীবরদিগের কুটিরগুলি অঙ্কিত আলেখ্যবৎ দেখা যাইতেছিল। এই উপকূল সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারী ধীবরদিগের আবাসস্থল ও কর্ম্মক্ষেত্র রূপেই বিশেষ বিখ্যাত। মৎস্য ধরিবার নানা প্রকার সরঞ্জাম আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ধীবররা সাধারণতঃ রাত্রিতে জাল ফেলিয়া থাকে। তাহাদের পুঁতিয়া রাখা দণ্ডের দ্বারা বুঝা যায়—কোথায় তাহারা জাল ফেলে। কোচিন অঞ্চলে চীনা আদর্শের জালই বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়। নানা প্রকার মৎস্যপরিপূর্ণ বলিয়া এখানকার সমুদ্র হইতে প্রচুর মাছ ধরা হইয়া থাকে।

ভাইকাম এবং তানির মুখম্ অতিক্রম করিয়া বেম্বানাদ নামক হ্রদে আসিয়া পড়িলাম। আমরা তালীবনশ্যাম মনরো দ্বীপের পাশ দিয়া আগাইয়া চলিলাম। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে মনরো এই অঞ্চলের রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া দ্বীপটি এই নাম পাইয়াছে। হ্রদটির দক্ষিণ প্রান্তে একটি আলোকগৃহ বা সতর্কীকরণের স্থান রহিয়াছে। এখান হইতে বহু জলপ্রণালী আঁকিয়া বাঁকিয়া আলেপ্পির দিকে বহিয়া গিয়াছে বলিয়া এইরূপ সতর্কীকরণ প্রয়োজন হইয়াছে। অবশ্য এই প্রণালীগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া আরও দূরে গমন করিয়াছে। নানা প্রকার বিচিত্রদর্শন

কোচিন সহরের প্রণালী—পথ।

দিয়া মৃদুমন্দ গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ বা দাঁড়ের সাহায্যে বাহিত হইতেছে। তীরে তীরে তালীবন বা নারিকেল-

বন্দর পূর্ব্বকালেও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। আরবগণ ইহাকে কাওলাম আখ্যায় অভিহিত করিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের

বিষ্ণু-মন্দির—কুইলন (চীনা প্রণালীর ছাউনি লক্ষ্য করিবার বিষয়)

বৃক্ষের ছায়ায় খড় বা তৃণ পত্রাদির ছাউনিবিশিষ্ট কুটিরগুলি ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে একটি করিয়া ডিঙ্গি বাঁধা। ক্রীড়া-কুতূহলী বালকবৃন্দ ও হাস্যমুখী বালিকার দল এই দৃশ্যকে শতগুণ সুন্দরতর করিয়াছে বলা চলে।

এক একটি উলঙ্গপ্রায় লোক তাড়ি নামক মত্ততাকারক রসের আশায় তপঃশীর্ণশরীর দীর্ঘকায় সন্ন্যাসীর মত তীরদেশে দণ্ডায়মান তালতরুশিরে আরোহণ করিতেছে। আরোহণের সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়—এই শাখাপত্রশূন্য দীর্ঘদেহ বৃক্ষের উপর উঠিতে ইহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র শঙ্কার সঞ্চার হয় না। হ্যাটের সহিত সাদৃশ্যশালী তালপত্ররচিত মাথালি মাথায় দিয়া স্ত্রীলোকেরা ধান্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে। কেহ গাছ পুঁতিতেছে, কেহ আগাছা তুলিয়া ফেলিতেছে।

কয়েকদিন পরে আমরা কুইলনে পৌঁছিলাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও অন্যান্য উন্নতির সহিত এই উপকূলবর্ত্তী স্থানের লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ২২ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই

চৈনিক জলপথযাত্রীদের সহিতও এই প্রাচীন পোতাশ্রয়ের পরিচয় ছিল। এখানকার একটা অসুবিধা—দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমের সময় জাহাজ নঙ্গর করিবার উপযুক্ত জায়গার অভাব।

একশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে সুবৃহৎ সেনানিবাসরূপে বড় বড় ব্যারাক বিদ্যমান ছিল। প্রায় এক হাজার ইউরোপীয় সৈন্য এই সকল ব্যারাকে থাকিত। তদ্ভিন্ন তিনটি দলে বিভক্ত দেশীয় সৈন্য বা সিপাহীও ছিল। দক্ষিণাপথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়াতে সেনানিবাস তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সহরের এক মাইল উত্তরে টাঙ্গাসারি নামক একটি পার্ব্বত্য অন্তরীপের উপর পর্ত্তুগীজদের দ্বারা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত সেন্ট টমাস্ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কালস্রোত ও সমুদ্রের জলস্রোতের অবিশ্রান্ত আঘাতে সেই প্রাচীন দুর্গের বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। শুধু তাহার মধ্যভাগের যৎসামান্য অংশ অতীত গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মহাকালের

রসহচর সর্ব্বগ্রাসী রুদ্র সমুদ্র গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনগীতি গাহিয়া চিবাহু বিস্তারপূর্ব্বক এই ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিমূলে অবিশ্রাম াঘাত করিতেছে।

এই স্থানটি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরেজদের হাতে আসে। আমরা দুইটি প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র দেখিতে পাইলাম। কুইলন সেনা-বাসের উচ্চতন কর্ম্মচারী অর্থাৎ সেনানায়কগণের শব এখানে াহিত রহিয়াছে। শৈলসমাকীর্ণ বলিয়া এই উপকূলের পার্শ্ববর্ত্তী দ্র জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক। এই জন্যই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে দ্রযাত্রীদিগকে সতর্ক করিবার জন্য লাইট হাউস বা আলোক-হ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

আমরা মোটরে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী আঞ্জেঙ্গো নামক স্থানে পস্থিত হইলাম। রাস্তা সমুদ্রতীর পরিত্যাগ করিয়া তালতরু-

মালাবারী ধীবরগণ মাছ ধরিতেছে

ধ ও নারিকেলকুঞ্জের ভিতর দিয়া পর্ব্বতপুঞ্জের পদতলে নীত হইয়াছে। তথা হইতে ভিন্নমুখী হইয়া আবার এ পথ দ্রের দিকে আগাইয়া গিয়াছে এবং সমুদ্র হইতে সমাগত একটি লের ধারে সমাপ্ত হইয়াছে। খালের জলে প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত য়া ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষার্ত্ত নরনারীর পরম মিত্র নারিকেলতরু সারি র দাঁড়াইয়া আছে।

এইবার আমরা প্রাচীন প্রণালীতে প্রস্তুত একটি ডিঙ্গিতে য়া এই খালের উপর দিয়া আগাইয়া চলিলাম এবং সমুদ্র ও লের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বৃটিশ-অধিকৃত আঞ্জেঙ্গোতে ছিলাম। এই আঞ্জেঙ্গোতেই ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এক প্রতিভা-লিনী নারী জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ষ্টার্ণ এলিরা নামে প্রসিদ্ধ। ১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্ট অর্ম্ম ষ্ঠ হন। ওরিয়েণ্টাল মেময়ার্স রচয়িতা জেমস ফরবেস ানে অনেকদিন বাস করেন।

এখানে নারিকেলতরুর প্রাধান্য ও প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহাদের রূপে আম, কাঁঠাল ও তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষও দণ্ডায়মান লাম। কাঁঠাল গাছে কাঠাল ধরিয়াছে এবং পক্ষীদের আক্রমণ হইতে কাঁঠালগুলিকে বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে ঝুড়ির দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। বালুকাচ্ছাদিত পথের দুই ধারে প্রায় আধ মাইল ব্যাপিয়া বৃটিশ-আঞ্জেঙ্গোবাসীদের গৃহগুলি দণ্ডায়মান। উত্তর প্রান্তে প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র ও পর্ত্তুগীজদের প্রস্তুত গীর্জ্জাগৃহ। দক্ষিণ প্রান্তে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত চতুর্ভুজাকার দুর্গ দাঁড়াইয়া।

প্রথমে পর্ত্তুগীজরা পরে ওলন্দাজগণ এই স্থান অধিকার করিয়াছিল। কোন্ সালে ইহা ইংরেজের অধিকারে আসে তাহা সঠিক বলা সহজ নয়। এখানকার প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে স্যাম ওয়াকারের পত্নী মেরি ওয়াকারের স্মৃতিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়।

আঞ্জেঙ্গো নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া মনে হয়, তামিল ভাষার 'আঞ্জি তেঙ্গিনকুল' শব্দ হইতে আঞ্জেঙ্গো নামটি উৎপন্ন। এই তামিল শব্দের অর্থ পাঁচটি নারিকেল বৃক্ষ। মালয়ালাম ভাষায় পুকুরকে কোল্লাম বলা হয়। হইতে পারে কোল্লাম হইতে কুইলন নাম জন্মগ্রহণ করে।

কুইলনে অবস্থিত পথিকদিগের থাকিবার স্থানটি কয়েকদিন অবস্থানের বিশেষ উপযোগী। দোতলার ঘরগুলিতে প্রচুর বাতাস চলাচল করে। অনেক সময় মনে হয়, এটা যে মলয়-মারুতের দেশ সে কথাটা খুবই সত্য। অঙ্কিত আলেখ্যের মত সুন্দর কয়েকটি জলপ্রণালীর দ্বারা শহরটি স্থানে স্থানে খণ্ডিত হওয়ায় দেখিতে আরও মনোহর হইয়াছে। নানাপ্রকার পণ্যপূর্ণ নৌকা যখন এই সকল খালের উপর দিয়া আগাইয়া যায়, তখন অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত ক'রে বলা চলে। এই সময় ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত ভেনিস নগরের স্মৃতি জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। ভেনিসের গণ্ডোলা-মণ্ডিত পয়ঃপূর্ণ পথগুলি অধিকতর প্রীতিকর হইলেও সাদৃশ্য স্বীকার্য্য। এই সকল জলপ্রবাহকে কেন্দ্র করিয়া এখানকার অধিবাসীদের জীবনপ্রবাহ বহিয়া যায় বলিলে সত্যই বলা হয়।

অনেক সময় আমরা মনে করি, বাঙ্গালীর ছেলেরাই দলে দলে ওকালতি পাশ করিয়া শুধু বারের সভ্যসংখ্যা বাড়াইয়া তুলে; কিন্তু এখানে আসিয়া আমরা আমাদের ভুল বুঝিতে পারিলাম। কুইলনের প্রতি দুইটি বাড়ীর একটিতে বি-এল উপাধিধারী ব্যবহারা-জীবের সাইনবোর্ড দেখা যায়। স্থানীয় কলেজের ৭ শত ছাত্রের মধ্যে ৫ শতেরও অধিক আইন অধ্যয়নকারী। এখানকার চিত্র-গৃহগুলি প্রত্যেক রাত্রিতে যেরূপ দর্শনোৎসুক নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে সবাক্ চিত্রের ভারতব্যাপী প্রবল প্রভাবের কথা ভাবিয়া সত্য সত্যই অবাক্ হইতে হয়।

এখান হইতে আলেপ্পি ৫৩ মাইল দূরে। সমতল ভূমির উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর রাস্তাটিতে যানযোগে যাইতে যাইতে ত্রিবাঙ্কুরের পল্লীজীবনের চিত্তাকর্ষক বিচিত্র চিত্রগুলি দৃষ্টি-

গোচর হয়। নারিকেলকুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহগুলিকে সুদক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবি বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বাংশের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে নির্গত কয়েকটি নদী পথে দেখা যায়। এই সকল স্রোতস্বিনীই ত্রিবাঙ্কুরের শস্যক্ষেত্রগুলিকে শ্যামল শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া থাকে।

একদিকে অসীম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য, অন্যদিকে তুঙ্গশৃঙ্গ অচলশ্রেণীর ভাষাহীন ভঙ্গীতে ঊর্দ্ধমুখী ইঙ্গিত। দক্ষিণাপথের সিন্ধু-সৈকতকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। নিবিড় অরণ্যানীতে আবৃত এই সকল পর্ব্বত কোথাও কোথাও ৫ হাজার কোথাও বা ৬ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। কন্যাকুমারিকার ১২ মাইল এ-দিকে এই গিরিশ্রেণী ৩ হাজার ফিট উচ্চ একটি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে পরিণতি পাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

আলেপ্পি বা আলফুজা একটি ছোট-খাটো বন্দর। এখানকার জলপ্রণালীগুলিতে প্রশস্তকায় পাম্পিয়ার নদী জল যোগাইতেছে বলিয়াই তার নাম আলফুজা বা প্রশস্ত প্রবাহিণী। এই বন্দরের সুবিধা—এখানে বর্ষাকালেও ষ্টিমার নোঙ্গর করিবার ও মাল নামাইবার উপযুক্ত স্থান আছে। মোটর চলিবার উপযোগী একটি রাস্তার দ্বারা ইহা কোচিনের সহিত সংযুক্ত। মোটরবোটেও কোচিন যাওয়া চলে। মোটরবোটে চড়িয়া দুই ধারের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পরিভ্রমণ অধিক উপভোগ্য বলিয়া আমরা তাহাই আশ্রয় করিয়া কোচিনের দিকে অগ্রসর হইলাম। এর্ণাকুলামের কাছাকাছি পৌঁছিলে দেখিতে পাইলাম—২৩ পণ্যপূর্ণ নৌকা মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে ক্লান্তকায় নাবিকদের পক্ষে দিনান্তের শান্ত সমীরণের মত বন্ধু আর কেহই নহে। রক্তিম রশ্মিরাশিতে পশ্চিমাকাশকে বিচিত্ররূপে চিত্রিত করিয়া সবিতৃদেব যখন অস্তসাগরে ডুবিতে ছিলেন, তখন আমরা কোচিনের মাতাল বেরি অবতরণমঞ্চে পৌঁছিলাম। এই অবতরণমঞ্চের সম্মুখে কোচিনের রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদ এবং পশ্চাতে শ্বেত ইহুদী সম্প্রদায়ের সিনাগগ বা উপাসনাগৃহ।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কোচিন বন্দর দিন দিন দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কোচিন অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। মালয়ালাম্ ভাষার কচ্চি শব্দ হইতে কোচিন শব্দের সমুৎপত্তি। কচ্চি শব্দের অর্থ ছোট জায়গা। জুদিয়াধিপতি সলোমনের শাসন সময়ে চিক্ বা ইহুদীদের সহিত কোচিনের পরিচয় ছিল। তবে তখন উহা তেমন

খাল এবং আলোকগৃহ

প্রসিদ্ধি পায় নাই। রোমান আধিপত্যের সময় মৌসুমী বাতাসের গুরুত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোচিন ক্রমশঃ প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয়ে পরিণতি পায়। সমুদ্রের সহিত

সংযুক্ত এবং সমুদ্রোপকূলের সহিত সমরেখায় প্রবাহিত খালগুলি এখানকার বাণিজ্য-ব্যবসায় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। ক্রাহানোর হইতে ত্রিবান্দ্রম পর্য্যন্ত প্রসারিত এই সকল প্রণালীর দৈর্ঘ্য ১ শত ৩০ মাইলের কম নহে।

সমুদ্র-যাত্রী জাহাজ হইতে নামিবার সময় কোচিনের দিকে চাহিলে দক্ষিণ দিকে প্রথমেই দৃষ্টিপথে পতিত হইবে একটি পতাকা-যষ্টি ও সঙ্কেত বা সতর্কীকরণের স্থান। ইহার পর সে একটি বাংলো দেখিতে পাইবে। প্রসিদ্ধনামা এলফন্সো ড আলবুকার্ক কর্তৃক ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দুর্গের অবস্থানস্থানে এই বাংলোটি দণ্ডায়মান। বামে দেখা যায় মৎস্যজীবী ধীবর কুলের বাসস্থলী নারিকেল কুঞ্জমণ্ডল ভাইপিন দ্বীপ। বৃক্ষবীথির বক্ষে বিরাজিত একটি রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জ্জাগৃহ এই দ্বীপে দেখা যায়। সমগ্র সমুদ্রসৈকত ব্যাপিয়া চীনা প্রণালীতে প্রস্তুত মাছ ধরিবার জালগুলিকে প্রসারিত রাখা হইয়াছে। এই জালগুলি এবং চীনা প্রণালীর নৌকা ও গৃহসমূহ প্রাচীনকালে চীনের সহিত মালাবারের সম্পর্কের কথা প্রচার করিতেছে সন্দেহ নাই।

কোচিন বন্দরের প্রধান বৈশিষ্ট্য নানা আকার ও প্রকারের দেশীয় জলযানগুলি। যাঁহারা এই অঞ্চলে নূতন আসেন তাঁহাদের পক্ষে নৌকাপূর্ণ খালের দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এ বিষয়ে সংশয় নাই। শুধু প্রাচীন প্রণালীর নৌকাই নয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জলযানেরও অভাব দেখিলাম না। মোটরবোট, ষ্টিমার, জাহাজ কোচিন বন্দরে সবই আছে। নানা দেশের লোক ব্যবসা করিবার জন্য এখানে বাস করিতেছে বলিয়া নানা বেশধারী নানা ভাষাভাষী অধিবাসী এখানে দেখা যায়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পণ্যাগার পোতাশ্রয়ের পুরোভাগেই দণ্ডায়মান।

অন্যান্য বিষয়ে যতই চিত্তাকর্ষক হউক, কোচিনের জনবহুল রাস্তাগুলির অপরিচ্ছন্নতা সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই অপরিচ্ছন্নতার জন্যই এখানকার জল-বাতাস তেমন ভাল নয়। এখানকার জলের একটা দুষ্ট বৈশিষ্ট্য—বেশী দিন বাস করিলে পায়ে গোদ হইবার আশঙ্কা থাকে। জলের দোষ এবং অপরিচ্ছন্নতা দুইই এই কদর্য্য ব্যাধির কারণ।

কোচিন শহরের প্রধান দ্রষ্টব্যের মধ্যে (পূর্ব্বে উল্লিখিত) সিনাগগ বা ইহুদী উপাসনাগৃহ এবং প্রাচীর বেষ্টিত প্রাচীনতম চার্চ্চ সেণ্ট ফ্রান্সিস গীর্জ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গীর্জ্জার প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভে যুদ্ধে জীবনোৎসর্গকারী ইংরেজদের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। গীর্জ্জার প্রাচীরগুলি প্রস্তরে প্রস্তুত। এই গৃহের মুখপ্রদেশে "রেণোভেটান ১৭৯৯" এই বাক্য উৎকীর্ণ আছে। ভিতরের দিকে প্রাচীরের গায়ে লিখিত রহিয়াছে—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ সরকারকর্তৃক এই গীর্জ্জার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। ছাদের কাঠগুলি জীর্ণ হইয়া যাওয়াতে এখন তৎপরিবর্ত্তে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করোগেটেড লৌহ-শীট সংলগ্ন করা হইয়াছে।

রোম্যান-ক্যাথলিক গীর্জ্জাগৃহ

পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ উভয়জাতীয় নরনারীর সমাধিস্তম্ভ ও স্মৃতিফলক এখানে দেখা যায়। প্রবেশ করিবার সময় ওলন্দাজদের স্মৃতিফলকগুলি দক্ষিণে এবং পর্ত্তুগীজদের স্মৃতিফলকসমূহ বামে থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্মৃতিফলকটি ১৫২৪ খৃষ্টাব্দের। এই গীর্জ্জাটি ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ভাস্কো-ডা-গামা ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে কোচিনেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার শব প্রথমে এই গীর্জ্জা-প্রাঙ্গণেই প্রোথিত করা হইয়াছিল, পরে তাঁহার পঞ্চম পুত্র পিতার দেহাবশেষ এখান হইতে তুলিয়া জাহাজযোগে পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে লইয়া যান এবং তথায় সমাহিত করেন। এই গীর্জ্জার নিকটেই বর্ত্তমান সেণ্ট ক্রুজ রোমান ক্যাথলিক ক্যাথেড্রাল অবস্থিত। এই উপাসনাগৃহটি আমাদের দর্শনসময়ের বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা রিক্সায় চড়িয়া সিনাগগ দেখিবার জন্য ইহুদীপাড়া বা জুটাউনে গমন করিলাম। এখানকার অধিকাংশ বাড়ী ওলন্দাজ প্রণালীতে প্রস্তুত। বর্ণবিভেদে ইহুদী সম্প্রদায় শ্বেত ইহুদী ও কৃষ্ণ ইহুদী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বর্ত্তমানে শ্বেত ইহুদীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ১ শতের অধিক শ্বেত ইহুদী কোচিনে ছিল না। কৃষ্ণ ইহুদীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার।

কোচিনের জনবহুল পল্লীর সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলির উপর দিয়া যাইবার সময় বাধ্য হইয়া নাকের উপর রুমাল বা করতল সংলগ্ন করিতে হয়। আমরা অপরিচ্ছন্নতার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গরু, ছাগল, কুকুর, মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টির বিভিন্ন প্রাণী ঠেলাঠেলি করিয়া পথে চলিতেছে। যেন প্রত্যেকেই আগে যাইতে চায়। মধুমক্ষিকার চাকে আঘাত করিলে মক্ষিকাকুল চক্রকে বেষ্টন করিয়া উড়িতে উড়িতে যেমন শব্দ করে, সেইরূপ বিচিত্র শব্দে এই জনবহুল রাস্তাগুলি সর্ব্বদা মুখরিত। কত রকম গন্ধ নাসারন্ধ্রে এবং কত রকম শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাহা উপলব্ধি বা নির্ণয় করা কঠিন।

ওলন্দাজদের পর পর্ত্তুগীজরা এই অঞ্চল অধিকার করে। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে কালিকাটের জামোরিণ কোচিন আক্রমণ করিলে ডুয়ার্ট পাচকোর দ্বারা উহা অপূর্ব্ব শৌর্য্যের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। কে, এন, পালিকার তাঁহার 'মালাবার এণ্ড দি পর্ত্তুগীজ' নামক গ্রন্থে ডুয়ার্টে পাচকোর বীরত্বকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বীরত্ব এবং কৌশলে ক্লাইভ ও ওয়েলিংটন প্রভৃতি সেনানায়কগণের সহিত ডুয়ার্টে পাচকোর তুলনা করা হইয়াছে। মালাবারের মধ্যে কালিকাটের জামোরিণ বিশেষ প্রভাবশালী নৃপতি। জামোরিণ নাম নহে, উপাধি। এই উপাধির অর্থ 'গিরি ও সাগরের অধিকারী'।

কোচিন হইতে ২০ মাইল উত্তরে ক্রাঙ্গানোর। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটি পর্ত্তুগীজ দুর্গ এখানে বিদ্যমান। প্রাচীন ভৌগোলিক টোলেমি যাহাকে 'মুজিরিস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহাই ক্রাঙ্গানোর, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাই প্লিনি কথিত "মুজিরিস প্রাইমাস এম্পোরিয়াম ইণ্ডী"। বহু রোম্যান মুদ্রা এই অঞ্চলের উপকূলভাগে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, এক সময়ে রোম্যান জাহাজ পণ্যবিনিময়ের জন্য এখানকার বন্দরে আসিত। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ভারতের মধ্যে ইহাই ইহুদী এবং খৃষ্টানদের প্রাচীনতম উপনিবেশ। কোচিন প্রভৃতি স্থানে চীনা প্রভাবের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই অঞ্চলের গৃহগুলি চৈনিক রচনা প্রণালীর পরিচয় প্রদান করে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি চৈনিক প্রভাবে পূর্ণ দেশসমূহে যেরূপ ছাউনিবিশিষ্ট গৃহ দেখিতে পাই, মালাবারের বহু গৃহ সেই প্রকারের। এই অঞ্চলে চীনা ধরণের নৌকা ও মাছ ধরিবার জাল অনেক দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয়, এক সময় চীন দেশের লোক এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

নবযুগ আসে বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চল্‌চে, এখনও তার শেষ হয়নি। কোন বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা ক'রে আমরা স্বাধীনতা পাব না, কোন সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্য বস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বল্‌চেন যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সঙ্কোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ ব'লে দেখতে না পারার মতো এত বড় সর্ব্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে-মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না, সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক্, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য ক'রে গ্রহণ করতে পারি।

—রবীন্দ্রনাথ

সন ১৩৪১, অগ্রহায়ণ।

কবিতা

মায়ের মমতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গঙ্গাসাগরের মেলা লোকে লোকাকীর্ণ বেলা,
মেশামিশি তরী আর তীরে।
যাত্রী বক্ষে ক্ষণে ক্ষণ কি আনন্দ আন্দোলন!
কি উচ্ছ্বাস নীল সিন্ধু-নীরে!
দূর বঙ্গ-পল্লী হতে আসিয়াছে কোনোমতে
কগ্ন বৃদ্ধা ভিখারিণী একা,
এসেছে বুঝি অভাগী কাম্য পুণ্য মৃত্যু লাগি
সর্ব্ব অঙ্গে দুর্গতির রেখা।

হইয়াছে সাঙ্গ মেলা ত্যজিবে সৈকত ভূমি
মধ্য রাত্রে যাত্রীদল আজি,
ভাঙিতেছে পর্ণাবাস মুক্ত ত্যক্ত চারি পাশ
ফিরিতে উন্মুখ তরীরাজি।
ভিখারিণী মৃতপ্রায় হতাশ নয়নে চায়
বাঁচিবার আশা নাহি আর,
জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া
কাঁপিতেছে প্রাণটুকু তার।

যামিনী প্রভাত হলে কে কোথা যাইবে চলে
শূণ্যময় ভয়াল সৈকত,
হিংস্র জন্তুর বাস কে র'বে তাহার পাশ
হেন ভাবে আহ্বানি বিপদ?
সবল যুবক এক কর্কশ কঠিন দেহ
দীর্ঘ দ্বীপান্তর বাস শেষে
সদ্য মুক্তি লাভ করি' করি' হেথা মুক্তি স্নান
ফিরিয়া যাইবে নিজ দেশে।

অকরুণ কারাগৃহে বিনিদ্র রজনী কত
হতভাগ্য কাটায়েছে মরি,
ঝঞ্ঝাহত তনুতরী বহিয়া এনেছে কূলে
জননীর স্নেহ মুখ স্মরি'।
যখন শুনিল যুবা বৃদ্ধা ভিখারিণী এক
মুমূর্ষু একাকী আছে পড়ি,
তার রুক্ষ বক্ষ আহা কি করুণা মমতায়
সহসা উঠিল যেন ভরি!

হেরিয়া বৃদ্ধার দশা নিজ জননীর কথা
বারবার পড়ে তার মনে,
বলিল নাহিক ভয় আমি র'ব পুত্র হয়ে
ভীতিময় এই নিরজনে।
মা আমার নবরূপে আগাইয়া এসে বুঝি
অধমের সেবা নিতে হেথা,
ইহারে অবজ্ঞা করে কেমনে যাইব ঘরে
আমার কামনা হবে বৃথা।

এই সাগরের জলে বারবার দেহ ঢালে
মাতারা সুতের লাগি হায়,
সেথা হোক অনাথিনী তবু জননীর জাতি
মরিতে দিব না অসহায়!
তাহার মানস নেত্রে উদিল কি এক মূর্ত্তি
অপরূপ জ্যোতিঃ পরকাশি
বুকে এলো নব বল দেহ মন সমুজ্জ্বল
দু' নয়ন জলে গেল ভাসি।

করিতে সাগর স্নান এসেছেন পুণ্যময়ি
কাশিম বাজার মহারাণী,
শুনি' বলিলেন ধীরে তরণী ভিড়াও তীরে
আমার কর্ত্তব্য আমি জানি।
লবণাক্ত সিন্ধুজলে ধৌত করি চিতা যবে
আছে যুবা দাঁড়ায়ে কাতর,
বজরা লাগালো আনি আজ্ঞা দেন মহারাণী
ডাকো তারে তরণী উপর।

দাও শীতবস্ত্র দাও দাও অন্ন দাও জল
কেমনে যাইব ওরে ফেলে,
দোষী হোক দুষ্ট হোক জননীর সুসন্তান
ওযে মোর বাঙলার ছেলে।
তখন অসংখ্য পোত চলে শ্বেত পক্ষ তুলি
আদরে আনন্দে যুবা কাঁদে,
তখন উদার ঊর্দ্ধে নীলিমা মুছায়ে মুখ
কোলে তুলে নিতেছিল চাঁদে।

প্রীতির ঋণ

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ স্যান্যাল, এম্-এ

কৃতজ্ঞতার অনেক দেনা
জ'ম্‌ছে আমার ভবের পথে,
হায়রে, সে ঋণ শুধ্‌বো কিসে
না পাই ভেবে কোনই মতে !
বিত্ত দিয়ে কিন্‌লে যারা—
ভৃত্য ক'রে রাখলে তারা ;
চিত্ত দিয়ে ডিক্রিজারী
ক'রবে কে ভাই, আদালতে ?

কেউ কেঁদেছে আমার দুখে
গভীর সমবেদনাতে,
আঁধার পথের দোসর কেহ
চ'লেছে মোর সাথে সাথে ।
শোকের রাতে বুকের 'পরে
কেউবা মোরে রাখলে ধ'রে,
অনুরাগের রঙিন রাখী
কেউ বেঁধেছে আমার হাতে !

দরদী কেউ দিয়েছে হায়,
দরদমাখা হাসির ছিটা,
অকিঞ্চনের নেইকো কিছু—
সেও দিয়েছে বচন মিঠা !
মোর মরমের অস্ফুট আশা,
দিয়েছে তায় কেউবা ভাষা,
শ্যামল ক'রে তুল্‌লে কেহ
ঊষর আমার প্রাণের ভিটা !

জানি—আমার এই জীবনে
অনেক কিছুই পাইনি আমি,
নেইকো খেয়াল—চিন্তা নাহি,
নেইকো তাহার সালতামামি !
দয়াল, তোমার নিদেশ বহি'
দুঃখ-ব্যথা অনেক সহি'—
প্রীতির এ ঋণ শুধবো কিসে
ভাবছি শুধু দিবসযামী ।

খড়দহে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

তুমি এত কাছে শ্যামসুন্দর, তবু তুমি এত দূরে,
খড়দহে হরি, না তুমি রয়েছ লুকায়ে মানস-পুরে ?
তৃণ হ'তে নীচ যাঁহারা তাঁদের তুমি আপনার জন,
তাই কি এসেছ খড়দহে প্রভু বৈষ্ণব প্রাণধন ?

হেথায় কদা নিত্যানন্দ কহিল ভূস্বামীরে—
চাহি সস্ত্রীক বসবাস হেতু কিছু ঠাঁই নদীতীরে ।
বিদ্রূপ করি' ভূস্বামী দিল গঙ্গায় তৃণ ছুঁড়ে,
সেথা হ'ল চর, সেই চরে প্রভু বাঁধিলেন ছোট কুঁড়ে ।
এই খড়দহ, সন্ন্যাসী হেথা সংসারী সেজে রয়,
গৌরপ্রেমের প্রধান প্রতিভূ সদা হরিনাম লয় ।
এই খড়দহ ভাসাল বঙ্গ একদা প্রেম-তরঙ্গে,
নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দে মাতি' মৃদঙ্গ সঙ্গে ।

এই গঙ্গার পশ্চিম তীরে বল্লভপুর গ্রামে,
ভক্ত ব্রহ্মচারী একজন ছিলেন রুদ্র নামে ।
স্বপ্নে ঠাকুর দিলেন আদেশ গৌড় প্রাসাদ হ'তে,—
প্রস্তর এনে গড়' বিগ্রহ, পাষাণ নদীর স্রোতে—
বল্লভপুর ঘাটেতে লাগিল, দৈবে বিধির বরে,
সে পাষাণ আজ শ্যামসুন্দর মনোহর রূপ ধরে ।
হ'ল নির্ম্মিত বিগ্রহত্রয় রাধাবল্লভ আর
শ্যামসুন্দর নন্দ-দুলাল মূর্ত্তি চমৎকার !

বীরভদ্রের অন্তরে আশা শ্যামসুন্দরে আনি'
নিত্যানন্দ-ভবনে বসাব উজলি' আঙ্গিনাখানি ।

রুদ্র পিতৃশ্রাদ্ধ-বাসরে বীরভদ্রের বরে,
একদা থামিল ঝঞ্ঝা বৃষ্টি—হরষিত অন্তরে
রুদ্র করিল বীরভদ্রেরে শ্যামসুন্দর দান,
তদবধি প্রভু খড়দহে এসে করেন অধিষ্ঠান ।

বল্লভপুরে রাধাবল্লভ, হেথা খড়দহে শ্যাম,
সাঁইবনা প্রভু নন্দদুলাল রাজে নয়নাভিরাম ।
একই পাষাণের তিন বিগ্রহ ভক্ত বাঞ্ছাতরু,
ভক্তি ও প্রীতি ত্রিবেণীধারায় জুড়ায় জীবন-মরু ।

বীরভদ্রের আঙ্গিনায় তোমা নেহারিয়া শ্যামরায়,
আমার নয়নে পলক না ছিল, মুখে কথা না জুয়ায় !
তুমি এত কাছে শ্যামসুন্দর, ওগো সুন্দর শ্যাম,
তোমার চরণে জীবনমরণ সকলি যে সঁপিলাম ।
একদিন কবে দেখেছিনু তোমা মদনমোহন বেশে,
আজ তোমা হেরি শ্যামসুন্দর হেথা খড়দহে এসে ।
কেন তুমি মোরে টানো নাই কাছে কি তব নিঠুর খেলা,
কেন তুমি মোরে করিতেছ প্রভু বারেবারে অবহেলা ?
তৃণ হ'তে যেন আমি নীচু হই, ভালবাসি মানুষেরে,
ওরে ও পাষাণ, এক ফোঁটা জল আমার নয়নে দে রে !

মিউজিয়াম দর্শনে

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

মহানগরীর বক্ষে বিরাজে লক্ষ সৌধমালা,
একদা সেথায় ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরিনু প্রত্নশালা।
দেখিনু নূতন ভাবের রাজ্য রম্য স্বপ্নলোক,
ইলোরার সাথে মিশিয়াছে যেন অজন্তা কোনারক!
পাষাণফলকে রূপ দিল যা'রা অন্তর দেবতার,
সে রূপদক্ষ শিল্পিগণেরে করিনু নমস্কার।
পাষাণ পুরীর মৌন দেবতা হেথা বাঁধিয়াছে বাসা,
তা'রা সবে হায় জানা'লো আমায় প্রাণের নারীব ভাষা।

সম্মুখে মোর কালের কৃষ্ণ যবনিকা গেল খুলি,—
মনশ্চক্ষে হেরিনু অতীত যুগের দৃশ্য-গুলি :
মন্দির মাঝে বন্দী যেদিন ছিল এ দেবতাগণ,
নিত্য পূজার অর্ঘ্য দিয়াছে কত না ভক্তজন!
পূজারী তা'দের পাষাণ প্রতিমা স্বর্ণবেদীর 'পরে
বিবিধ গন্ধে সাজাতো যত্নে কত না ভক্তি ভরে!

গন্ধমদির হ'তো মন্দির চন্দন-ফুলবাসে,
ভক্তহৃদয় মিলিত সেথায় মুক্তি লাভের আশে।
সন্ধ্যায় কত বন্দনা রত দেবদাসী পূজারিণী,
নৃত্য চপল চরণে তা'দের বাজিত যে কিঙ্কিণী।
পুণ্যতীর্থে রূপায়িত হ'লো দেবতাঙ্গন তল,
ছুটিল সেথায় দেশ-বিদেশের পুণ্যলোভীর দল।

কালের প্রবাহে ভেঙে গেল যবে দেব-দেউলের চূড়া,
মৃত্তিকাতলে দেবতা লুকালো, বিগ্রহ হ'লো গুঁড়া!
যুগ যুগ ধরি সন্ধান করি' বিদারি' শিলাস্তূপ
উদ্ধার করি' যা'রা দেবতার এ সব বিকৃতরূপ
রচিল নূতন ভাবের রাজ্য নিপুণ শিল্পীসম,—
তা'দের চরণে জানাই মুগ্ধ প্রাণের শ্রদ্ধা মম।
মহানগরীর প্রাসাদপুরীতে এ নব তীর্থধাম,
হেথায় শিল্পী ধ্যানী পূজারীর পূরিবে মনস্কাম।

নিতি দেখা দুই জনে—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ট্রামে বসে থাকো আর দেখি মুখখানি,
ভিড়ের চাপেও তবু লাগে ভালো।
দুই জনে দেখা নিতি, মহিলা কেরাণী!
প্রকৃত পেয়েছ প্রগতির আলো।
চশমার ফাঁক দিয়ে চাহ মোর পানে,
মাঝে মাঝে চাহি আমি সোজাসুজি;
দশটার ট্রামে মোরা চাকুরির টানে—
চলেছি তবুও রোমান্স খুঁজি।

অতি উন্নত বুক, বাঁধা কুন্তল,
গৌরবরণা উর্ব্বশী সম;
নয়নের দুটি তারা মধু-পিঙ্গল
দেহের বাঁধুনি সুন্দরতম।
নিতি নব শাড়ী পরে আচল ঘুরায়ে,
কয় গাছি চুড়ি শুধু হাতে দিয়ে,
ভ্যানিটি ব্যাগটি সাথে স্যাণ্ডাল পায়ে,
মরালের মত মৃদু গতি নিয়ে,—
পুরুষের ভিড় ঠেলে চল চঞ্চলা!
সিটে এসে বসো যেন ফোটাফুল,
আমার মনের কথা হয় নাক' বলা,
প্রেমের তৃষায় রহি যে আকুল!
ট্রাম হোতে নেমে শেষে চলো মোর সাথে,
যেন মোরা দুটি অতি আপনার;

তারপর দুই জনে দুই ফুটপাথে…
মোদের সমুখে ঘনায় আঁধার।
তুমি মোর বাম পাশে রাখি আপনারে
মরমে এনেছ মোর শিহরণ;
মন-দেয়া-নেয়া কথা চাহি শুনিবারে
প্রাণের তুলিতে দিয়ে আল্পিণ।
ভাবের সহজ খেলা ইঙ্গিতে চলে,
ভালো বাসাবাসি রহস্যময়;
পথ চলিবার দিনে মোরা নানা ছলে
পরস্পরের নেবো পরিচয়।
আদিম বাসনা রয় মোদের দু' চোখে
জনতার ঢেউ হতে এসো ফিরে,
যৌবন বাণ দিয়ে—যা বলুক না লোকে
বিদ্ধ করিব প্রণয়ের তীরে।

শিক্ষা-সমস্যা

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

ভারতের শিক্ষা-সমস্যা বর্ত্তমান যুগের মতো আর কোনো কালে এত প্রবল হয় নাই। দেশ, কাল, পাত্র, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বহু বস্তুর সাক্ষাৎ ও গৌণ প্রভাব, আদর্শগত বহু বাদ ও বহু মত প্রভৃতি নানা বিষয়-বস্তুর সম্পর্কের জন্য এই সমস্যা ক্রমশঃই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। এখন এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে, এই অতিপ্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য্য বিষয়টি আর সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ না রহিয়া প্রায় সার্ব্বজনিক হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা-সমস্যা এখন জাতির জীবন-মরণ সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে।

জীবন-মরণ সমস্যাই বটে। সুশিক্ষার অভাবে মানুষ দেহ থাকিতেও পশু হইয়া যায়। মনুষ্যত্বের মৃত্যু, আর পশুত্বের জন্মই আজ ভারতীয় সমাজে আসন্ন। এই অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দিনে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া, প্রাণপাত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য—তাহাদিগকে মানুষ করার জন্য—স্কুল-কলেজে পাঠাইতেছেন। কিন্তু ফল দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার এমন নৈরাশ্যপূর্ণ ফল কেহ কখনো কল্পনা করিতে পারে নাই। 'ভগবানের রাজ্যে অবিমিশ্র অমঙ্গল বলিয়া কিছু নাই'—যদি এই নীতি মানিতে হয়, তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে সহস্র অমঙ্গল থাকিলেও মঙ্গলের স্পর্শ কিছু না কিছু আছে। কিন্তু ব্যাবহারিক জগতের তৌল বিচারে দেখা যায়, অমঙ্গলের আধিক্য অতি সুস্পষ্ট, এবং তাহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। বর্ত্তমান শিক্ষার ফল যে আদৌ শুভ নয়, তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। সে জন্য দেশের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়া থাকে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে শিক্ষা-সমস্যার সমালোচনা চলে, এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উল্লিখিত হয় যে, শিক্ষার অভীপ্সিত ফল ফলিতেছে না! সুতরাং ব্যর্থ শিক্ষার প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিবার সময় হইয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাবহারিক বিফলতা নির্দ্ধারণ করিতে গেলেই শিক্ষায় আদর্শ-বিচ্যুতির আলোচনা আবশ্যক।

প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা করিলে জানা যায়, শিক্ষা তাহাকেই বলে—যাহা দ্বারা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়। সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ বলিতে বুঝায়—দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নীতিধর্ম্মিক, ও জড়দ্রব্যিক উন্নতি। এই উন্নতি নিরপেক্ষ নয়; ইহা এরূপ ভাবে সাধিত হওয়া চাই, যাহার পরিণতি হইবে আধ্যাত্মিক সম্পৎ বা পরাশান্তি লাভ। এই অভিপ্রায়ে শাস্ত্রকার বলেন,—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে,আধ্যাত্ম-বিদ্যা বিদ্যা নাম'। ঐ আধ্যাত্মিক সম্পৎ আবার কেবল একজনের ভোগ্য হইবে না, সর্ব্বজীবের কল্যাণের সহিত তাহা যুক্ত হইবে।

ব্যষ্টি মানবের যে কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে,—কোন ব্যষ্টি মানবই বিচ্ছিন্ন নয়। সকল দেশের সকল মানুষ, সকল জাতি, বর্ণ, সঙ্ঘ, শ্রেণী ও পরিবারের সহিত, মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তুর সহিত, যাবতীয় জড় পদার্থের সহিত প্রত্যেক ব্যষ্টিমানবের যোগ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই বিশ্বচরাচর আত্মসাৎ করিয়া জাগিয়া উঠিবে এক সার্ব্বজনীন বিশাল মানবাত্মা—A universal man,—ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য; ইহাকেই বলে Complete living বা পরিপূর্ণ জীবন।

আবার, ঐ বিশ্বব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলা ও যোগসম্বন্ধের অন্তরালে রহিয়াছে—যৌক্তিকতা ও জ্ঞান। অর্থাৎ এক বিরাট জ্ঞান ও যৌক্তিকতা সমগ্র বিশ্বায়তন ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। ঐ সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানের ধর্ম্ম বা স্বরূপ হইতেছে জ্যোতি। যে-হেতু উপনিষৎ বলেন,—'তত্তেজসা অসৃজৎ'। এক মহাজ্যোতি সর্ব্বত্র সঞ্চারিত। বিজ্ঞান আজ আবিষ্কার করিয়াছে যে,—আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতি-হীন, তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে জ্যোতির ক্রিয়া চলিয়াছে। এই মহাজ্যোতির বিকাশ সর্ব্বত্র,—অর্থাৎ চৈতন্যে, মনে ও জড়পদার্থে। যে-হেতু জড়প্রকৃতির মধ্যেও ইহার সমান বিকাশ, সে-জন্য বিজ্ঞান-ই যে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, জড়পদার্থের নিরীক্ষণ পরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্যাবিষ্কারই বিজ্ঞানের কার্য্য। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই,—বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হ'ক,—বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।'

বিশ্বব্যাপী মহাজ্যোতির উপলব্ধি না হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব এবং প্রকৃতি ব্যাপ্ত করিয়া যে যোগ-সম্বন্ধ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বর্ত্তমান,—তাহা উপলব্ধি হইবে না। এবং সেই প্রকার অনুভূতি ভিন্ন কোনো ব্যষ্টি-মানবে যথার্থ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশই যখন শিক্ষার লক্ষ্য, তখন শিক্ষার মূলে থাকা চাই সর্ব্বব্যাপী ঐক্যের অনুভূতি। এই ঐক্যানুভূতিকেই যথার্থ ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম বলা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম্মের স্থান অপরিহার্য্য,—কিন্তু তাহা এই ঐক্যবোধের ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া ধর্ম্ম বলিতে যে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান বুঝায়,—যাহা দেশে দেশে বিভিন্ন,—সেই আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম সমাজ-সাধনার অঙ্গ হইলেও,—শিক্ষায়তনে তাহার স্থান নাই। অর্থাৎ—গীর্জ্জা-ধর্ম্ম, মন্দির-ধর্ম্ম, মসজিদ-ধর্ম্ম বা বিহার-ধর্ম্মের স্থান বিদ্যালয়ে নাই। তাহার কারণ বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি!

বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় যোগসম্বন্ধ—প্রকৃতির সহিত মানুষের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—ইহার অনুভূতিই যখন শিক্ষার তাৎপর্য্য, তখন সেই তাৎপর্য্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়,—সেই আদর্শ হইতে যাহাতে বিচ্যুতি না ঘটে,—সে-দিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ ঐক্যানুভূতি লাভ করিবার একমাত্র উপায় আত্মত্যাগ। স্বার্থানুসন্ধান বর্জ্জন করিয়া আত্মবিলোপ-সাধন-পূর্ব্বক পরার্থে চিন্তা এবং পরসেবা না হইলে ঐক্যানুভূতি ঘটিতে পারে না। আর্য্যকৃষ্টির মধ্যে প্রাচীন কালের যে বর্ণাশ্রমবিভাগ, তাহার মূলমন্ত্রও ঐ আত্মত্যাগ। এমন কি, যাহা আজকাল বিদ্রূপের বিষয়—অর্থাৎ প্রাচীনকালের যজ্ঞানুষ্ঠান, তাহার মধ্যেও ঐ আত্মত্যাগের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। 'ঘৃতমায়ুঃ'—এই ঋষি-বচন হইতে বুঝা যায়—আমাদের জীবনধারণের পক্ষে ঘৃত এত বেশি প্রয়োজনীয় যে, বলা হইয়াছে—ইহা কেবলমাত্র আয়ুলাভের উপায় নয়,—ইহাই আয়ু। এই

আয়ুই হবণীয়। যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা আয়ু-স্বরূপ,—তাহার প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিয়া ঋষিগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে অগ্নিসাৎ করিতেন,—ইহাই তাৎপর্য্য। ঘৃতাহুতি নয়,—আত্মাহুতি!

আত্মত্যাগ ও জীবসেবার মূলনীতি হইতে আনুষঙ্গিকভাবে আসে অন্যান্য সদ্‌গুণ—মৈত্রী, দয়া, দাক্ষিণ্য, সংযম, তিতিক্ষা, সন্তোষ, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি। এক কথায়—চরিত্র-গঠনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এবং ঐক্যানুভূতি ও আত্মত্যাগ হইতেই চরিত্রের যাবতীয় উপাদান উৎসারিত হইবে।

এই সর্ব্বমহান ও সর্ব্বাতিশায়ী আদর্শ হইতে মানুষ বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান সমাজের এত অধঃপতন। আদর্শ-চ্যুতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ—অসংখ্য অমঙ্গলের অধিষ্ঠানভূমি হইয়াছে আমাদের বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রী সমাজ। এই সব অমঙ্গল লিপিবদ্ধ করিতে গেলে প্রকাণ্ড একটা তালিকা হইয়া পড়ে। অতএব কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) পরতত্ত্বে অর্থাৎ ধর্ম্মে অবিশ্বাস, (২) আত্মসংযমের অভাব, (৩) শিক্ষক, মাতাপিতা, ও অন্যান্য পূজ্যজন বা বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির অভাব, (৪) ভারতের যাহা কিছু প্রাচীন, তাহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব, (৫) বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা, (৬) কৃষি, পশু-পালন, বাণিজ্য প্রভৃতি গার্হস্থ্য কর্ম্মে এবং বংশগত পেশায় অসম্মান-বোধ ও লজ্জাবোধ, (৭) স্বাধীন চিন্তার অভাব, (৮) মনের কথা বাহিরে প্রকাশ করায় ভীরুতা, (৯) ঐ সমস্তের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবনতি।

এই সব অমঙ্গলের সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে—দুর্নীতি। শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে এই সব দুর্নীতি সমানভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। পবিত্রতম বস্তু মাতৃত্বের আশ্রয়রূপিণী যে নারীজাতি কোমল হৃদয়বৃত্তিনিচয়ের জন্য সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, যাহাদের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি মানবজীবনের যাবতীয় সদ্‌বৃত্তির উৎসস্বরূপ, আজ তাহাদের মধ্যেও দুর্নীতির প্রসার দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ বিভীষিকার চিন্তায় সকলেই আকুল হইয়া উঠিতেছে। এদেশে স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জীবন হইতে ব্রহ্মচর্য্যের নির্ব্বাসন যে কবে হইতে শুরু হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আত্মসংযমের অভাব এখন তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীগণের মধ্যে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। যে সমস্ত কথার কল্পনা পর্য্যন্ত প্রাচীনাদের মধ্যে জুগুপ্সার উদ্রেক করে, আজ বহু শিক্ষিত মহিলা অবাধে তাহার আলোচনায় আনন্দ পাইতেছে। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার দাবী লইয়া এখন আর কেহ তর্ক তুলে না, কারণ উহা ঝড়-বৃষ্টির মতো সমাজপ্রকৃতির স্বাভাবিক অংশ। কিন্তু যে সীমারেখাটী অতিক্রম করিলে স্বাধীনতা আত্মবিনাশের গহ্বরে আছাড় খায়—সেই রেখাটি যেন আজ নারীসমাজের বিলাসবন্যায় ধুইয়া মুছিয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দ্বারা পরিচালিত ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ফলে যাহা দেখা যায়, তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্বনাশের ছায়া,—আত্মসংযমের অভাবের বীভৎস কাহিনী জীর্ণশীর্ণ দেহগুলির পঞ্জরে পঞ্জরে লিপিবদ্ধ।

যাহা হউক,—শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি যেরূপ অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই ব্যাধির প্রতীকার অতি দুরূহ। চেষ্টা করা উচিত, এবং সমবেত চেষ্টায় সুফল ফলাই সম্ভব। প্রথমে দেখিতে হইবে—আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মের দুইটি প্রধান গুণ—সর্ব্বভূতপ্রীতি ও সহানুভূতি, অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। সমাজের ঐক্য-বন্ধনের যতই চেষ্টা চলিতেছে, ততই যেন আরো বেশী দলের সৃষ্টি হইতেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তথাপি 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু'—এই নীতি শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে গাঁথিয়া দিবার সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, শুধু বিদ্যালয়ে নয়,—গৃহে, গ্রামে, মঠে, মন্দিরে, সভায়, সমিতিতে—সর্ব্বত্র। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলেও কিছু ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে—

১। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলনীতি অবলম্বনে পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিতে হইবে। পুরাকালে যাহারা নানা বিভাগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, এমন সব বড় লোকের জীবনী পাঠ্যতালিকায় সন্নিবেশিত করা উচিত। যে সমস্ত সংস্কার যুক্তিসহ বা বিজ্ঞান-সম্মত নয়, অর্থাৎ যাহা কুসংস্কার—তাহার আলোচনা বর্জ্জনীয়।

২। গীতার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মনীতি যাহাতে শিক্ষার্থীরা শিখিতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা আবশ্যক। মানুষের দৈবী সম্পৎ, অর্থাৎ উন্নত ধরণের ভাব-ধারণা যাহাতে শিক্ষার্থী অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থে যে সব মহৎ আদর্শের উপাখ্যান আছে সেগুলির প্রত্যেকটির চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। আধুনিক ধরণের study circle গঠন করিয়া পুরাতন ধরণের কথকতার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। একটি পাঠ্যপুস্তক-লেখক-সমিতির সাহায্যে নূতন ধরণের যুগোপযোগী যাত্রা ও কবিগানের গ্রন্থরচনাও কর্ত্তব্য।

৩। ঈশ্বরে ভক্তি, পিতামাতা ও গুরুজনে ভক্তি, প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশ-প্রীতি, সত্য, মৈত্রী, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, নির্ভীকতা, সৎসাহস, 'মাতৃবৎ পরদারেষু', পরীবাদ-শূন্যতা, ধর্ম্মান্তরের প্রতি অশ্রদ্ধা বর্জ্জন, জীবিকার্জ্জনে মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বর্জ্জন, শারীরিক শ্রম করিতে অকুণ্ঠা, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম,—এই সকল গুণ ছাত্রদের হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে হইবে। শুধু গ্রন্থপাঠে কিছু হইবে না, গুণানুশীলনের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান ছাত্র-আন্দোলনের কর্ম্ম-সূচী বা প্রোগ্রাম আত্মসাৎ করিয়া একটি নূতন প্রোগ্রাম নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

৪। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মূলতত্ত্বাবলম্বনে যে সমস্ত প্রার্থনাপদ আছে—স্কুল-কলেজে তাহার নিয়মিত আবৃত্তি আবশ্যক। বিভিন্ন ভাষা হইতেও এই ধরণের প্রার্থনাপদ সংকলন করা যাইতে পারে।

৫। খাদ্য ও পানীয় ব্যাপারে পবিত্রতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা

চাই। যে কোনো নোংরা দোকান, যে কোনো বাসি-পচা খাবারের দোকান বন্ধ করিতে হইবে। খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার জন্য গুরুতর শাস্তি বিধান আবশ্যক।

৬। যৌন সম্বন্ধ ও যৌনপ্রীতির কোনো প্রকার উল্লেখ না থাকে, এমন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। যৌন-প্রীতি-বিষয়ক কোনো চলচ্চিত্র যেন ছাত্র-ছাত্রীদের দেখিতে দেওয়া না হয়। এ সম্বন্ধে বিদ্যালয়পরিদর্শকের হাতে সিনেমা-গৃহ পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। দরকার হইলে ২১ বৎসরের কম বয়সের প্রত্যেক বালক-বালিকার বা তরুণ-তরুণীর একটি identity card রাখিতে হইবে।

৭। সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত করে, এমন পাঠ্য পুস্তক বন্ধ করিতে হইবে।

৮। বিলাসিতা বর্জ্জন ও মিতব্যয়িতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে হষ্টেলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনযাত্রার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। সেখানে ধনী ও দরিদ্রের অশনে বসনে কোনো প্রকার তারতম্য রাখা চলিবে না। সে জন্য সাম্যবাদের নীতি মানিতে হইবে, নতুবা গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী জাতি গঠন হইবে না। প্রত্যেক হষ্টেলে একজন চরিত্রবান ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করিতে হইবে।

৯। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংস্কৃত বা অপর প্রাচীন ভাষার মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবার সময় সে-গুলিকে মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেব-দেবীর পূজার মন্ত্রে এবং উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সংস্কার কার্য্যের মন্ত্রে যে মহৎ ভাবধারা ও উচ্চ আদর্শ কল্পনা নিহিত আছে, তাহার অর্থ যেন আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে। স্তব, প্রার্থনা প্রভৃতি সমস্তই মাতৃভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত।

১০। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বাড়াইতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও যুক্তিনিষ্ঠা সঞ্চারিত করা আবশ্যক। নতুবা অতীত প্রাচীন পন্থার প্রতি অত্যধিক আসক্তি জন্মিবার আশঙ্কা আছে। জাতির দৃষ্টি যেন কোনো কালেই পিছনের দিকে না যায়, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে।

তালিকার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না করিয়া সংক্ষেপে বলিতে চাই,—শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ভাবে জীবনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। জীবনের বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রসারই মানুষের মুক্তি,—কুঁড়ির মুক্তি যেমন পুষ্পরূপে, পুষ্পের মুক্তি ফলরূপে। এই আত্মপ্রসার মানুষকে স্তর হইতে স্তরান্তরে উন্নীত করিয়া অবশেষে একটি অনির্ব্বচনীয় সামা-সুসমায় স্থাপিত করে—উহাই আধ্যাত্মিক মুক্তি। 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'—এ কথার অর্থ বুঝিতে তখন আর বিলম্ব হয় না। আধুনিক পরিভাষায় বিদ্যার উদ্দেশ্য a free man গড়িয়া তোলা। জাতির রাষ্ট্রীয় মুক্তি বা freedom শিক্ষার এই সার্থকতার সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত রহিয়াছে।

এই মুক্তিপ্রদায়িনী শিক্ষার মধ্যে সকল বিদ্যাই আয়ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু পরাধীন ভারতে বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মাত্মপ্রয়োগিক শিক্ষার দাবী কিছু বেশী। সে জন্য, অর্থাৎ সকল প্রকার শ্রমের অভ্যাস গঠন করিবার জন্য, শিক্ষাকে মস্তিষ্কের সর্ব্বগ্রাসী 'গ্রহণ' হইতে উদ্ধার করিয়া অন্যান্য স্থূল ইন্দ্রিয়ের অধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ব্যায়াম, ক্রীড়া, দ্রব্য-নির্ম্মাণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্যের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীকে অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত রাখিতে হইবে,—গ্রন্থপাঠে প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া উচিত নয়। কলাবিদ্যার সহিত বলবিদ্যার একটা নূতন সন্ধি স্থাপন আবশ্যক, একটা নূতন রাজ্য বণ্টনের ব্যবস্থা চাই—নতুবা শিক্ষাজগতে শান্তি আসিবে না।

সব শেষে বলিতে চাই—বিদ্যালয়গুলিকে নগর হইতে দূরে লইয়া যাইতে হইবে। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে, নদীর অভাব নাই। নদীতীরগুলিই এককালে শিক্ষার কেন্দ্র ছিল,—ঋষির আশ্রম, তপোবন, বিহার, সঙ্ঘারাম—সমস্তই একদা নদীতীর-গুলির শোভা বর্দ্ধন করিত। আবার প্রত্যেক বিদ্যালয়টি নদী-তীরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। ধূমধূল-বিমলিন কর্কশ-কোলাহল-মুখর নগরের মধ্যে শিশুগণের সুশিক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু নূতন ব্যবস্থা করিবে কে? ইহাতে অজস্র অর্থব্যয় আবশ্যক, সে ব্যয় গভর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কেহ করিতে পারেন না। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে কোন্ কালে কাহাদের গভর্ণমেণ্ট জাতির শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয় করিবে—তাহাই ভাবি।

স্পর্শমণি [গল্প]

শ্রীবীণা গুহ, এম্.এ

এক

আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল চিত্রিতা। এমনই উদ্দামতার ভিতর দিয়া জীবন কাটাইতে খুবই ভাল লাগিত তার। তাকে বাধা দিতে মাথার উপরও বিশেষ কেউ ছিলেন না। তাই নির্ব্বিবাদেই সে পাইয়াছিল যা খুশী করার পথে অবাধ স্বাধীনতা।

বছর পাঁচেক যখন তার বয়স তেমনি সময় মা তার মারা যান্। পিতা আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন না। শিশুকন্যাকে বুকে তুলিয়া একাধারে পিতামাতার স্নেহে তাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। তাঁর অবসর সময়ের সবটুকুই তিনি কন্যার মনোরঞ্জনে অতিবাহিত করিতেন। কখনো দেখা যাইত চারপায়ে ঘোড়া হইয়া তিনি ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, আরোহীর এখনো দেখা নাই। কখনো বা দেখা যাইত চিত্রিতার খেলাঘরের সামনে তিনি দারোয়ানরূপে দণ্ডায়মান। চিত্রিতা অবিশ্রান্ত হুকুম করিতেছে আর তিনি অনবরত তা তামিল করিয়া যাইতেছেন। পত্নীহীন নিরানন্দ দিনগুলি তাঁর শিশুকন্যার সান্নিধ্যে সুখময় হইয়া উঠিত। চিত্রিতাকে কোলে বসাইয়া, তার সঙ্গে আবোল-তাবোল বকিয়া, তার খুঁটিনাটি অতি তুচ্ছ আবদার সহিয়া, তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন। অপরিমিত আদর, অজস্র আবদারের ভিতর দিয়া চিত্রিতার শৈশব জীবন অতিবাহিত হইল।

ধীরে ধীরে সে বড় হইয়া উঠিল। বাহিরের জগতকে সে

দেখিতে শিখিল। ঘরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর, একমাত্র প্রৌঢ় পিতার সাহচর্য্য তার কাছে একঘেয়ে হইয়া উঠিল। বাহিরের রঙ্গীণ জীবন তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। তারই মোহে সে আত্মহারা হইল। সঙ্গী সাথীর গৃহে যে কোন উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ সে সাগ্রহে গ্রহণ করিত। কলেজ হইতে কোথাও বেড়াইতে নিয়া গেলে প্রধান উদ্যোগীই ছিল সে। আজ সিনেমা, কাল পিক্‌নিক্, তার পরের দিন বা গানের জলসা—যে কোন প্রকারেই হোক্, খানিকটা হৈ চৈ—এই হইয়া উঠিল চিত্রিতার একমাত্র কাম্য। যা কিছু আমোদের আসরে নেত্রীর স্থান অধিকার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই চিত্রিতা আধুনিক সমাজে নাম করিয়া ফেলিল। প্রগতিশীল সমাজের তরুণদের বুকে সুন্দরী চিত্রিতা আলোড়ন তুলিল। জগদীশবাবু অতশত জানিলেন না। অবসর সময় তিনি পুস্তকরাশির ভিতর ডুবিয়া থাকিতেন, আধুনিক সমাজের বিচিত্র খবরাখবর তাঁর কানে আসিয়া পৌঁছিত না। আদরিণী মেয়ের হাসিমুখ দেখিয়াই স্নেহমুগ্ধ পিতা খুসী হইতেন।

তবে মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া বুকের ভিতরটা যে তাঁর তীব্র বেদনায় টন্ টন্ করিয়া না উঠিত এমন নয়। মনে পড়িয়া যাইত তাঁর চিত্রিতার শৈশবের দিনগুলি—যখন শিশু চিত্রিতার পিতা ভিন্ন আর কোন সাথী ছিল না। সে আরো জানিত যে তার একমাত্র সমঝদারই তার পিতা। তাই সে সামনে বসিয়া তার খেলাঘরের বিচিত্র রান্না দিয়া পিতার তৃপ্তি সাধন করিত। অম্লানবদনে, অতি উপাদেয় জ্ঞানে জগদীশবাবুকে কাদার পায়েস, কাগজের লুচি, কাঁকড়ের আলুর দম খাইতে হইত, না হইলে ক্ষুদ্র রাঁধুনীর রাঙা ঠোঁট দু'খানি অমনি নিরতিশয় অভিমানে ফুলিয়া উঠিত। চিত্রিতার পুতুল পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইলে জগদীশবাবুর আর কাজের অন্ত থাকিত না। চোখে চশমা আঁটিয়া তাঁকে পুঁতির গহনা, রাংতার মুকুট, পিজ্ বোর্ডের পিঁড়ি কুলা তৈরী করিতে হইত। কারিগর হিসাবে পিতার দক্ষতায় চিত্রিতার অত্যন্ত আস্থা ছিল! আর কাহাকেও এ সব কাজ দিয়া সে ভরসা পাইত না।

তারপর চিত্রিতা একটু বড় হইল। বেণী দুলাইয়া, এ্যাটাচি-কেশে বই খাতা গুছাইয়া সে স্কুলে যাইতে সুরু করিল। খেলা ঘরের হাঁড়িকুড়ি, সাধের পুতুলগুলি একে-তাকে ডাকিয়া বিলাইয়া দিল। জগদীশবাবু বলিলেন, "পুতুলটুতুলগুলো যে সবই দিয়ে দিলে মা, আর কি খেলাধুলো করবে না?" ভারিক্কী চালে কন্যা জবাব দিল, "খেলব বই কি বাবা। তবে পুতুল খেলব না। তাহোলে যে লোকে আমাকে ছেলেমানুষ বলবে, আমি এখন স্কুলে পড়ছি না?" বিজ্ঞভাবে জগদীশ বাবু বলিলেন, "তাওত বটে। তা এখন কি খেলা খেলবে মা?" "কেন লুডো, ওয়ার্ডমেকিং, ক্যারাম এই সব। তুমি বুঝি এসব খেলা জাননা বাবা? জানবেই বা কোত্থেকে? আমিই কি জানতাম, সব স্কুলে গিয়ে শিখেছি। তুমি কিছু ভেব না বাবা, আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব।"

পরের দিনই বাজার হইতে সব রকম খেলা জগদীশবাবু আনাইয়া দিলেন। চিত্রিতার কিশোরী জীবনেও একমাত্র সাথী রহিলেন পিতা। স্কুল হইতে ফিরিয়া চিত্রিতার প্রধান কাজই ছিল সারাদিনের খুঁটিনাটি ঘটনা পিতাকে শোনান। জগদীশবাবু সাগ্রহে সে সব শুনিতেন, সমপাঠিনীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। নিজে কন্যাকে পাঠাভ্যাস করাইতেন, অবসর সময় কন্যার অভিরুচিমত খেলা খেলিতেন বা তার সহিত মিলিয়া লোম-হর্ষক ভূতের গল্প, এ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়িতেন।

ক্রমে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া চিত্রিতা কলেজে পড়িতে গেল। তখন হইতে দেখা গেল তার পরিবর্ত্তন। জগদীশবাবু বুঝিলেন স্ফুটনোন্মুখ চিত্রিতাকে আর ঘরের ছোট্ট সীমার ভিতর ধরিয়া রাখা যাইবে না। বাহিরের বিচিত্র জীবনস্রোতে নিজেকে বিলাইয়া দিতে মনে তার আকুলতা জাগিয়াছে। জগদীশবাবু খুসীই হইলেন। পাঁচটা সঙ্গীসাথীর সংস্পর্শে আসিয়া, পাঁচটা জায়গায় যাতায়াত করিয়া কন্যার কমনীয় মনোবৃত্তিগুলি আরো সুচারুরূপে পরিস্ফুট হইবে। কন্যাকে তিনি উৎসাহ দিলেন।

কোন উৎসবে চিত্রিতা নিমন্ত্রিত হইলে তথায় যাইবার বেশভূষা জগদীশবাবু পছন্দ করিয়া দিতেন। উৎসবান্তে ফিরিয়া সেথাকার প্রতিটী খুঁটিনাটি পিতাকে কর্ণগোচর করাইতে সে উদ্‌গ্রীব হইত। ছোট বেলা হইতেই পিতাকে এতটুকু সঙ্কোচ করিতে সে শেখে নাই, খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া সে বলিত, "সোনার তারের সাড়ীটা পরে আমায় এমন মানিয়েছিল, জান বাবা, সকলেই বলেছে পার্টিতে যত মেয়ে এসেছিল সব চাইতে সুন্দরী আমি।" মেয়ের হাসি মুখ দেখিয়া পিতা তৃপ্তি পাইতেন; বলিতেন, "দেখলি ত আমার পছন্দ, তুইত ও সাড়ীখানা পরতেই চাস্‌নি।" আচ্ছা, এবার আরেকখানা চমৎকার সাড়ী কবে দেব, তাতে তোকে আরো মানাবে।" "কেমন সাড়ী বাবা?" সাগ্রহে চিত্রিতা জিজ্ঞাসা করিল। "চাঁপা ফুল রংয়ের ওপর সাচ্চা রূপোলী জরীর বড় বড় ফুল তোলা, তোর গায়ের রংয়ের সঙ্গে একেবারে মিলে যাবে।" পিতার বুকে মাথা রাখিয়া কন্যা খুসীর হাসি হাসিল।

দুই

হাল্কা আমোদের নেশায় গা ভাসাইয়া দিবার অনিবার্য্য যা পরিণাম তাহাই ঘটিল চিত্রিতার। কোন গুরুতর বিষয়ে মন দিতে গেলে মাথা তার ধরিয়া ওঠে, কোন চিন্তনীয় বিষয় চিন্তা করিতে বোধ করে সে অপরিসীম ক্লান্তি। নিশ্চিন্ত আরামে সস্তা ফূর্ত্তি করিতে সে পাইত অফুরন্ত উৎসাহ। অতি কষ্টে থার্ড ইয়ারের গণ্ডী পার হইয়াছিল চিত্রিতা, পড়াশুনার কঠোর চাপ তার ধাতে সহিল না, পড়া ছাড়িয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। তাঁর বড় আদরের বড় গর্ব্বের চিত্রিতার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া অতি সঙ্গোপনে নিঃশ্বাস ফেলিলেন জগদীশ বাবু। আজ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন সন্তানের জীবনে জনক অপেক্ষা জননীর প্রয়োজনীয়তা কত বেশী। একাধারে পিতামাতার স্নেহে তিনি চিত্রিতাকে পালন করিয়াছেন! মাতৃস্নেহের অভাব চিত্রিতা কোন দিন অনুভব করে নাই সত্য, কিন্তু অনাবিল স্নেহের সহিত জননীর নিকট হইতে সন্তান যে সুকঠিন শাসন পায়, পিতা হইয়া সে শাসন ত তিনি কন্যাকে করিতে পারেন নাই। আদরের প্রাচুর্য্যে

চিত্রিতার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেয়াল তিনি মিটাইয়াছেন, অসঙ্গত বুঝিয়াও একটুকু কাজে তার বাধা দিতে মনে তার ব্যথা বাজিয়াছে—এই তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। স্বর্গীয়া পত্নীর তৈলচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ বহুদিন বাদে জগদীশ বাবুর চোখ সজল হইল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অত্যধিক আদর দিয়ে আমিই বোধ হয় তোমার মেয়েকে নষ্ট করে ফেললাম নিরু, তুমি বেঁচে থাকলে চিত্রা হয়ত আমাদের এমন হোয়ে যেত না। মা হোয়ে তুমি ওকে যা বলতে পার, বাপ হোয়ে সেকথা বলতে আমার বাধে। আজ আবার নতুন করে তোমার অভাব আমাকে ব্যথা দিচ্ছে নিরু, তুমি আমাকে শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও যেন চিত্রাকে আবার শান্ত পথে ফিরিয়ে আনতে পারি।"

অবাধ স্বাধীনতা দিয়া যাকে মানুষ করিয়াছেন, তার আচরণে আজ এতটুকু প্রতিবাদ তুলিতেও কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকে। তবু জগদীশ বাবু বহু জল্পনা কল্পনার পর খাবার টেবিলে সেদিন কথাটা তুলিলেন। একটা চীনামাটীর পাত্রে হাত ডুবাইয়া চিত্রিতা তখন তার কিউটেক্স করা নখগুলি নিবিষ্টচিত্তে পরিষ্কার করিতেছিল। জগদীশ বাবু ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলতে চাই চিত্রা।"

পিতার এরূপ কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অপরিচিত, সচকিতে চিত্রিতা মুখ তুলিল।

জগদীশ বাবু বলিলেন, "এতটুকু কাজে তোমার কোনদিন বাধা দিই নি মা, কিন্তু আজ আর চুপ করে থাকতে পারছি না। ভুলভ্রান্তি ছেলেমানুষের হোয়েই থাকে, কিন্তু সময়ে যদি তা সংশোধন না করে দেই, পিতার কর্ত্তব্যে তাহোলে যে আমার হানি হয় চিত্রা।" ক্ষণকাল থামিয়া জগদীশ বাবু পুনরায় বলিলেন, "এতখানি বুদ্ধিমতী মেয়ে তুমি, সে বুদ্ধি তোমার সার্থক হোয়ে উঠল না—একি আমার কম দুঃখ? ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত পড়ে, পড়া ছেড়ে দিলে অথচ তোমাকে দিয়ে কত আশাই না আমি করেছিলাম, কত স্বপ্নই না আমি দেখেছিলাম। তবু মনকে আমি এই বলে প্রবোধ দিয়েছিলাম—যা ভাল বুঝেছে চিত্রা তাই সে করেছে! কিন্তু মা—।" জগদীশবাবু কন্যার মুখপানে চাহিলেন। চিত্রার্পিতের ন্যায় চিত্রিতা বসিয়া আছে। এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন জগদীশবাবু তারপর স্থির কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ছেলেদের সঙ্গে এই যে এতখানি অবাধ মেলামেশা—এর পরিণাম কখনো ভাল হবে না। মনে কোর না আমি কনজারভেটিভ, কনজারভেটিস্‌মের কোন লক্ষণই আমার আচরণে আজ পর্য্যন্ত তুমি পাওনি। স্কুলে, কলেজে, বন্ধুমহলে সর্ব্বত্র—মেয়েছেলে নির্ব্বিচারে অবাধ মেলামেশাতে পূর্ণ সম্মতিই আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু সব কিছুরই ত একটা সীমা আছে।" চিত্রিতার শুভ্র ললাটে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া ঘনাইয়া আসিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নিরুত্তরে সে বসিয়া রহিল।

জগদীশ বাবু বলিয়া চলিলেন, "তোমার বাড়ীতে প্রতিদিন বান্ধবীদের তুমি আমন্ত্রণ কর, কোন আপত্তিই আমার ছিল না। কিন্তু এই যে তোমার সান্ধ্য চায়ের আসরে নিত্যি এতগুলি ছেলের সমাবেশ হয়—তাদের সঙ্গে মেলামেশা, অন্তরঙ্গতা, মধ্যে মধ্যে এদেরি সঙ্গে বেরোন—এর আমি বিরোধী। ছেলেমানুষ তুমি মনে করছ—এ বেশ এক মজা। কিন্তু তা নয় মা, জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক আমার কাছ থেকে জেনে রাখ চিত্রা, এরা সকলেই প্রত্যাশা নিয়ে তোমার কাছে আসে, প্রত্যাখ্যাত হোয়ে এরা নীরবে ফিরে যাবে না—এদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব তোমার সুনাম নষ্ট করে যাবে। আমার শেষ কথা চিত্রা—এ সংসর্গ তুমি ত্যাগ কর।"

জগদীশ বাবু থামিলেন। কঠিন মুখে কঠিনতর একটুকরা হাসিল চিত্রা। পিতার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরকণ্ঠে সে বলিল, "তোমার সব কথাই শুনলাম বাবা, কিন্তু তুমি জেনে রেখ, তোমার ও সেকেলে মত আজকের দিনে একেবারেই অচল। আর তোমার যদি অভিপ্রায়ই ছিল—তোমার ও প্রাচীনমতবাদ আমার জীবনে সার্থক করে তোলার, তবে গোড়াতেই তার ব্যবস্থা করলে না কেন? সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করে তুলেছ আজ আচমকা সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইলেই কি মনে করেছ আমি ছেড়ে দেব? অসম্ভব। যা আমি ভাল বুঝেছি, যা আমার ভাল লাগে, নিশ্চয় তা আমি করে যাব। কারু সাধ্য নেই তা থেকে আমাকে এতটুকু টলায়।" উত্তেজনায় রক্তিম হইয়া উঠিল চিত্রিতার মুখ। অধর দংশন করিয়া সে বলিল, "আমার আচরণ তোমার যদি বড়ই বিসদৃশ মনে হয় বাবা, তবে তোমার চক্ষুশূল হোয়ে তোমার বাড়ীতে আমি থাকতে চাইনে। যেটুকু লেখাপড়া তোমার দয়াতে শিখেছি, তাতে জীবনের সংস্থান আমি করে নিতে পারব আশা করি।"

স্তম্ভিত হইলেন জগদীশ বাবু। বড় আদরের কন্যার মুখে এমন কটু কথা শুনিবেন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই।

শিশু চিত্রিতাকে তাঁর হাতে সঁপিয়া নিরুপমা যেদিন চোখ বুজিলেন, তখন বয়স তাঁর মাত্র বত্রিশ। হিতৈষী পাঁচজন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মত করাইতে। কাহারো কথায় কান দিলেন না জগদীশবাবু। কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, শিশু কন্যাকে বুকে তুলিয়া তিনি গৃহীসন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন। বুকের সবটুকু স্নেহ নিংড়াইয়া তিলে তিলে চিত্রিতাকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। তাঁর এতখানি ত্যাগ স্বীকারের এই প্রতিদান দিল চিত্রিতা! বুক তাঁর অভিমানে পূর্ণ হইয়া গেল। আজন্ম সংযমে অভ্যস্ত জগদীশবাবু সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিকই বলেছ মা। সন্তানকে এতটুকু শাসন করবার ক্ষমতা যে বাপের নেই, অন্যায় বুঝেও যে বাপ সন্তানের সব কিছু খেয়ালকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, আজ হঠাৎ তাঁর কর্ত্তব্য জ্ঞান জেগে উঠলে চলবে কেন? অমন অপদার্থ বাপকে তোমার উপযুক্ত জবাবই দিয়েছ।" একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "কিন্তু চলে যাবার কথা কেন যে তোমার মনে আসল, এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তোমাকে ঘর ছাড়া করে, আমার আর কে আছে—কাকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধব? তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি চিত্রা, বুড়ো বয়সে তোমার কাছ থেকে এত বড় শাস্তি যেন আমাকে পেতে না হয়।" জগদীশবাবুর স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, চেয়ার ছাড়িয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চলিতে গিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "অনেক রাত হোয়েছে মা, শোও গে। এ ধরণের কথা আমার মুখে আর কোন দিন তুমি শুনবে না।" জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন। স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল চিত্রিতা।

সেইদিন হইতে পিতাপুত্রী অনেকখানি তফাতে সরিয়া গেলেন। বাহিরের কাজের অবসরে তিনি বইতে ডুবিয়া থাকিতেন। পূর্ব্বে খাবার টেবিলে দিনে অন্ততঃ একবার দেখা হইত। এখন তিনি খাবার টেবিলে প্রায়ই যান না। নিজের ঘরে আহার সমাধা করেন। কন্যাকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলেন। পিতার ঔদাসীন্য কাঁটার মত বেধে চিত্রিতাকে—কিন্তু এযে সেই আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। পিতার ঔদাসীন্য ভুলিতে ফূর্ত্তির স্রোতে আরো গা ভাসাইয়া দিল চিত্রিতা।

তিন

চিত্রিতার সান্ধ্য চায়ের আসরে নিত্যি যাহারা হাজিরা দিত, রঞ্জিৎ ছিল তাহাদের অন্যতম। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হইলেও স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি এবং পরিশ্রমের ফলে সে আজ একটা মস্ত বড় কারবারের একমাত্র মালিক। কাজ ছাড়া জগতে আর কিছু সে জানিত না, কাঠখোট্টা বলিয়া বন্ধুমহলে ছিল তার নাম, এ হেন রঞ্জিতেরও চিত্তবিভ্রম ঘটিল, এক পার্টিতে রূপসী চিত্রিতাকে দেখিয়া তার পদপ্রান্তে সে মন হারাইল। সবকাজে নিষ্ঠা ছিল তার চরিত্রের বিশেষত্ব, তাই একান্তভাবে সে চিত্রিতাকে ভাল বাসিল। প্রতিদিন সে চিত্রিতার কাছে আসিত। প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ দামী দামী উপহার ধনী রঞ্জিৎ চিত্রিতাকে অর্ঘ্য দিত। চিত্রিতার তরফ হইতে কিন্তু তার প্রতি ব্যবহারে বিশেষ কিছু তারতম্য লক্ষিত হইত না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা রঞ্জিৎকে ঈর্ষ্যা করিত, বলিত, "বড় লোকের চাল দেখিয়েই লোকটা শেষ পর্য্যন্ত মেরে দেবে।" মনে মনে হাসিত রঞ্জিৎ, আজন্ম ঐশ্বর্য্যে লালিতা চিত্রিতাকে ঐশ্বর্য্যের মোহে ভুলান যাইবে না তাহা সে বুঝিয়াছিল। কিন্তু কিসে যে এই গর্ব্বিত মেয়েটীকে বশ করা যাইবে—তাহাই তার মাথায় আসিতে ছিল না। সকলকেই চিত্রিতা বাড়ীতে ডাকিত, সকলকেই সে আমোল দিত, কিন্তু চারিপাশে তার এমনি একটা দুর্ভেদ্য গণ্ডী ছিল, যে পর্য্যন্ত আসিয়া, তার ওপাশে পা বাড়াইতে কাহারোই সাধ্যে কুলাইত না। এই দুর্ব্বোধ্য মেয়েটাকে জয় করিবার নেশা রঞ্জিতকে পাইয়া বসিল। কিন্তু তার সমস্ত অধ্যবসায় বিফল হইয়া গেল। যতই হৈ চৈ করুক চিত্রিতা—সকলের প্রতিই তার ছিল একটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্য। শিশুকালে পিতার অত্যধিক আদর এবং তারপর সকলের একান্ত মনোযোগেরই ইহা ফল বুঝিত রঞ্জিৎ।

চিত্রিতার বাড়ী হইতে নয়টায় বাহির হইয়া কোনদিনই সোজা গৃহে ফিরিত না রঞ্জিৎ, দেশপ্রিয় পার্কে ঘণ্টা দুই কাটাইয়া যাইত। পার্কের নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চিটা তার এই আবোল তাবোল চিন্তার বিশ্বস্ত সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়িত তার চম্পার কথা, ছোট বোন শুক্তির বন্ধু হিসাবে সে আসিত—সেই সূত্রেই পরিচয়। কুমারী হৃদয়ের সবটুকু প্রেম উজাড় করিয়া চম্পা ভালবাসিয়াছিল রঞ্জিৎকে। বন্ধুর হইয়া শুক্তিও কম সুপারিশ করে নাই। কিন্তু কাজের নেশায় পাগল রঞ্জিতের মনে সেদিন কোন কমনীয় বৃত্তির স্থান ছিল না। কাঁদিয়া বলিয়াছিল চম্পা, "তোর দাদা পাথরের দেবতা শুক্তি, তাই আমার পূজো নিলেন না।" চোখের জল শুকাইলে দীপ্তকণ্ঠে আবার সে বলিয়াছিল, "যদি সত্যি তাঁকে আমি ভালবেসে থাকি তাহোলে যে ব্যথা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়ে গেলাম, তিলে তিলে এ ব্যথা তাঁর বুকে ফিরে আসবে। এ আমার অভিসম্পাৎ নয় শুক্তি, মন বলছে।" আজ বার বার করিয়া চম্পারই কথা মনে আসে রঞ্জিতের। রঞ্জিতের নিষ্করুণ ব্যবহারে সমগ্র পুরুষ জাতির উপরই বিদ্বিষ্ট হইয়া, মফঃস্বলের একটা স্কুলে কাজ নিয়া ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিতেছে চম্পা।

চার

এই নির্ম্মম মেয়েটীর চিত্তে সোনার কাঠির স্পর্শ দিতে পারে—এই রকমই একটা দাম্ভিক লোক। হঠাৎ রঞ্জিতের মনে হইয়া গেল ব্রতীনের কথা—অপূর্ব্ব প্রতিভাবান শিল্পী। প্রচণ্ড অহঙ্কারী, সমগ্র জগতের প্রতি তার নিষ্ঠুর উপেক্ষা। উপার্জ্জন করে প্রচুর। কিন্তু আয়ের অধিকাংশই দুঃস্থ দীনকে বিলাইয়া, নিজে দারিদ্রের মত থাকে। দারিদ্র্য যেন তার বিলাসিতা।

বহু সাধ্য সাধনা করিয়া ব্রতীনকে একদিন রঞ্জিত চিত্রিতার বাড়ীতে লইয়া গেল। চিত্রিতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, এতদিন যত ছেলে সে দেখিয়াছে তাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দীর্ঘ ছিপ্ ছিপে চেহারা, গায়ের রং উগ্র ফরসা, নাকটা একটু বেশী উঁচু—প্রথমেই নজরে পড়ে, বুদ্ধির আভায় চোখদুটী উজ্জ্বল, মাথার চুলগুলি অযত্নবিন্যাসিত। মুখে স্নিগ্ধশ্রীর একান্ত অভাব, কঠোর রুক্ষ সৌন্দর্য্য। পরিধানে খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবী, হাতীর দাতের শুভ্র বোতাম, পায়ে সাদা শুঁড়তোলা চটি। চেহারাতে, বেশভূষায় কোথাও এতটুকু মালিন্য নাই। চিত্রিতা আকৃষ্ট হইল।

পরিচয় হইবার পর খুবই কদাচিৎ আসিত ব্রতীন। যেদিন আসিত আধঘণ্টা কখনো একঘণ্টা বসিয়া চলিয়া যাইত। কথা সে খুবই কম বলিত। চিত্রিতার স্তাবকদের চাল-চালিয়াতির কথা শুনিয়া কখনো বা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিত কখনো বা একটা বাঁকা জবাব দিত। তার আগমন কারুর কাছেই খুব প্রীতিপ্রদ ছিল না। যেদিনই সে আসিত সকলেই মনে করিত দিনটা আজ ব্যর্থ হইয়া গেল। একমাত্র চিত্রিতাই খুসীতে উচ্ছল হইয়া উঠিত। যেদিন ব্রতীন আসে চিত্রিতার মনে হয় সার্থক দিন।

এই নির্লিপ্ত, রুক্ষ লোকটী বিশেষ ভাবেই চিত্রিতার চিত্তকে নাড়া দিল। মিথ্যা স্তুতিবাদ সে জানেনা, বাজে কথা সে বলেনা। যতই সে মনকে বুঝাইত—এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটীর সহিত কিছুতেই তার খাপ খাইবে না ততই অবাধ্য মন তার আকুল হইয়া উঠিত। ব্রতীনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের ঘরে একান্তে সে রাঙিয়া উঠিত। যে রাজপুত্রের আশায় তার এই কুমারী জীবন যাপন করা, সে রাজপুত্র এতদিনে বাদে তার জীবনে দেখা দিয়াছেন।

চিত্রিতার শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না। সকলকেই সে ফিরাইয়া দিয়াছে। বসিবার ঘরে সোফাটাতে গা এলাইয়া চুপচাপ কি যে সে ভাবিতেছিল সেই জানে। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া ব্রতীনের কার্ড দিল। লাফাইয়া উঠিল চিত্রিতা। ব্রতীনকে ডাকিয়া পাঠাইয়া, চুলটা একটু টিপিয়া, সাড়ীটা একটু পাট করিয়া সে ঠিক হইয়া বসিল। হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া ব্রতীন বলিল, "আপনার স্তাবক দল যে এখনো অনুপস্থিত।"

প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া চিত্রিতা বলিল, "শরীরটা আজ ভাল নেই বলে আমি কারুর সঙ্গে দেখা করিনি।"

"তা হোলে ত আমি বড় অন্যায় করে ফেললাম এসে।"

"নাঃ, শরীর বিশেষ কিছু খারাপ নয়। রোজ রোজ আর হৈ চৈ ভাল লাগে না।"

একটু হাসিল ব্রতীন, "কিন্তু আমিও ত চুপ করে বসে থাকব না। আজ বরং আমি উঠি।"

ব্যস্তকণ্ঠে চিত্রিতা বলিল, "আপনি বসুন ব্রতীন বাবু, এভাবে ফিরে গেলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।" বেয়ারা চায়ের ট্রে দিয়া গেল, চা পান করিতে করিতে ব্রতীন বলিল, "একটা কথা বলব চিত্রাদেবী, কিছু মনে করবেন না?"

জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল চিত্রিতা। "ভগবান আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, প্রচুর অর্থ দিয়েছেন—জগতে আপনার কত কাজ করবার ছিল। এভাবে আপনি সময় অপচয় করছেন কেন?"

স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্বে চিত্রিতার মাথা নাড়া দিয়া উঠিল, ভ্রূভঙ্গী করিয়া সে বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, যে জীবন আপনার সার্থক হোয়ে উঠত, সে জীবন আপনি ব্যর্থ করে ফেলছেন। প্রত্যেকটা সুন্দর সন্ধ্যা—স্নিগ্ধ সময় সে সময় মানুষ কত কি করতে পারে, কত কি ভাবতে পারে—সেই সময়টা আপনি বাজে চাটু কথা শুনে অসার আমোদে নষ্ট করছেন। জীবনের এই মূল্যবান্ দিনগুলি আর কি ফিরে আসবে?" সোজা হইয়া বসিয়া চিত্রিতা বলিল, "কিন্তু এই যদি আমার ভাল লাগে।" "অসম্ভব! এ ভাল লাগতে পারে না, এ ভাল লাগলে চলবে না। চারিদিকে হাহাকার, আর্ত্তনাদ, মায়ের জাত আপনারা, আপনার বুকে এতটুকু আঘাত লাগে না? না চিত্রাদেবী, আর সময় নষ্ট করবেন না, কাজ করবার ক্ষমতা ভগবান্ আপনাকে হাত ভ'রে দিয়েছেন।" বাঁকা হাসি হাসিয়া চিত্রিতা বলিল, "আপনি কি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন?" "উপদেশ যদি হিতকর হয়, দিলেই বা ক্ষতি কি?" "কারুর উপদেশ শুনে চলা আমার স্বভাব নয় ব্রতীনবাবু।" ক্ষণকাল থামিয়া চিত্রিতা আবার বলিল, "আমার বাবা, যার স্নেহে মায়ের অভাব কোনদিন আমি বুঝতে পারিনি, তাঁর সঙ্গে গত ছয় মাস যাবৎ দিনান্তে একবারও আমার দেখা হয় না—কেন জানেন, আমার আচরণ তাঁর মনোমত নয়, তিনি আমাকে ফেরাতে চেয়ে ছিলেন বলে।" মুখ গম্ভীর হইল ব্রতীনের, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এত কথা জানতাম না, আমাকে মাপ করবেন। আপনাকে চটান আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আচ্ছা, চললাম।" ব্রতীন চলিয়া গেল। সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল চিত্রিতা—এ কি করিল সে? ক্ষণিকের অহঙ্কারের ঝোঁকে এ কি ভুল করিয়া বসিল।

পাঁচ

মাস চার পাঁচ কাটিয়া গেল, ব্রতীন আর আসিল না। আগেরই মত বন্ধুমহলে যোগ দেয় চিত্রিতা, বাহির হইতে কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয় না কিন্তু নিতান্ত যারা অন্তরঙ্গ—তারাই শুধু বোঝে, সে চিত্রিতা আর নাই, কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে।

স্নেহশীল পিতার বুক ভরা স্নেহ সেখানে বিফল হইল, প্রেমের যাদুতে অবশেষে তাহাই সম্ভব হইল—চিত্রিতার ঘুম ভাঙ্গিল। মনের সঙ্গে যুদ্ধে হার মানিয়া, চিত্রিতা একদিন ব্রতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি ব্রতীনবাবু।" স্নিগ্ধকণ্ঠে ব্রতীন বলিল, "ভুল যে একদিন আপনার ভাঙ্গবেই চিত্রাদেবী তা' আমি জানতাম। রঞ্জিত আপনার কাছে এত এসেছে, এত মিশেছে কিন্তু কেন যে আপনাকে চিনতে পারে নি—এই ভেবেই আমি অবাক হই। শিল্পীর চোখকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া চলে না। এখানে দু'চার দিন এসেই বুঝেছিলাম যে বাইরের রূপটাই আপনার আসল রূপ নয়, ভিতরটা আপনার বাইরে থেকে একেবারে আলাদা।" চিত্রিতার চোখ সজল হইল, নতমুখে সে বলিল, "কিন্তু আর আমার সবুর সইছে না ব্রতীনবাবু, আমাকে কাজ দিন।" স্মিতমুখে ব্রতীন বলিল, "শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী আপনি, নিজের কর্ম্মক্ষেত্র নিজেই বেছে নেবেন, আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।" "তা হোক, তবু আমাকে একটু পথ দেখিয়ে দিতেই হবে।" "পথ দেখাবার কতটুকু ক্ষমতা আছে আমার?" একটু ভাবিয়া ব্রতীন আবার বলিল, "আচ্ছা, এক কাজ করবেন, কাল বিকেলে প্রস্তুত হোয়ে থাকবেন। আপনার আপত্তি যদি না থাকে, আমার ষ্টুডিয়োতে আপনাকে নিয়ে যাব। ১৩৫০ সালের নগ্নরূপ কতগুলো ছবির ভিতর দিয়ে আমি দিতে চেষ্টা করেছি, হয়ত সেগুলো আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারে।"

সমস্ত বিকাল ধরিয়া ব্রতীনের ষ্টুডিয়োতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চিত্রিতা ছবিগুলি দেখিল। ব্রতীনের প্রতিভা যে কি অসামান্য এই ছবিগুলি দেখার পূর্ব্বে সে ধারণা তার ছিল না। অসীম শ্রদ্ধায় তার মাথা এই প্রতিভাবান্ শিল্পীর পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িল।

ষ্টুডিয়ো দেখা শেষ হইলে, সেই ঘরেরই একান্তে একটী ছোট টেবিলের ধারে চেয়ার টানিয়া বসিল তাহারা। ব্রতীন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগল চিত্রাদেবী?" সপ্রশংস নেত্রে চাহিল চিত্রিতা, "শিল্প সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত কম ব্রতীনবাবু; আর এইটুকুই শুধু বলতে পারি—অপূর্ব্ব, এমন আর কখনো দেখিনি। এ ত তুলিতে আঁকা ছবি নয়, সব যেন সজীব।" একটু হাসিল ব্রতীন। "আচ্ছা ব্রতীনবাবু, ১৩৫০ এর এই যে রূপ দিয়েছেন, একি আপনার কল্পনা না সত্য?" ব্যথাভরা কণ্ঠে ব্রতীন বলিল, "কল্পনা হোলেই ছিল ভাল চিত্রাদেবী, কিন্তু এ রূঢ় বাস্তব। এখন আর বড় একটা চোখে পড়ে না, কিন্তু কিছুদিন আগে পথে ঘাটে

যেখানে সেখানে নিষ্করুণ দারিদ্র্যের বীভৎস ছবি অনবরতই দেখা যেত। কিন্তু আজ পথে ঘাটে দারিদ্র্যের এই নির্লজ্জ নগ্নতা চোখে না পড়লেই মনে করবেন না মানুষের জীবনযাত্রা আজ সহজ হোয়ে গেছে। প্রায় চোদ্দ আনি সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রসংসারে দেখুন। তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়, তারা না পারে কারুর কাছে হাত পাততে, না পারে নিজেদের দৈন্যদশা কারুকে বলতে, তিলে তিলে তারা মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিকে এই-ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে কে?" উত্তেজিত কণ্ঠে চিত্রিতা বলিল, "কি মহাপাপ আমরা করছি! সবলেই ভগবানের সন্তান, মানুষ সকলেই। এতগুলি লোক যখন অনাহারে পশুর মত জীবন যাপন করেছে তখন কি অধিকার আছে আমাদের, তাদের চোখের উপর বিলাসিতা করবার?" "অথচ এই সাধারণ কথাটা তথাকথিত বড় লোকেরা বোঝে না, তারা মনে করে বড়লোকি করাটা তাদের জন্মগত দাবী।" সকরুণ নেত্রে একবার চাহিল ব্রতীন।

ছয়

মাস খানেক কাটিয়া গেল—অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে চিত্রিতার বাহিরে এবং মনে। বন্ধুমহলে যাতায়াত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে, বন্ধুরা তাকে ডাকিয়া এবং আসিয়া হার মানিয়াছে। বেশভূষা করে অতি সাদাসিধা। কবে যেন ব্রতীন বলিয়াছিল "বাজারের কেনা খাস্তা মেকআপ নিয়ে ভগবানের দান সৌন্দর্য্য যারা ম্লান করে দেয়, তারা সত্যিই কৃপার পাত্র।" সেদিন হইতে বেশভূষায় চাকচিক্য করিতে চিত্রিতার সঙ্কোচ বোধ হয়।

প্রায়ই আসে ব্রতীন, প্রায়ই চিত্রিতা ব্রতীনের ষ্টুডিয়োতে যায়। একদিন চিত্রিতা বলিল, "কত কাজ আমার করতে ইচ্ছে করে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। একা বোধ হয় আমি পারব না, আমাকে আপনার সাথী করে নিন্ ব্রতীন বাবু।" স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চিত্রিতার পানে চাহিয়া, ধীরে ধীরে ব্রতীন বলিল, "আপনাকে পাশে সাথী পাওয়া আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু আমার মত খেয়ালী, খাপছাড়া লোকের সঙ্গে জীবন মেলানের দুঃখটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন চিত্রাদেবী?" উত্তেজনায় রক্তিম হইয়া উঠিল চিত্রিতা, "সব ভেবেছি ব্রতীনবাবু। অজ্ঞানতার ঘুম ভাঙ্গিয়ে যখন আমাকে জাগিয়েছেন, তখন আর একা ফেলে চলে যাবেন না। জীবন আমার কর্ম্মময় করে তুলুন, সার্থক করে তুলুন।" "কিন্তু আমার পাসে এসে দাঁড়াবার যে একটা মস্ত বড় সর্ত্ত আছে।" আগ্রহব্যাকুল নেত্রে চাহিল চিত্রিতা। "আমার জীবনলক্ষ্মীকে আমার দারিদ্র্য বরণ করেই আমার পথে চলতে হবে।" নীরবে চাহিয়া রহিল চিত্রিতা। "পিতৃগৃহের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পিছনে ফেলে আসতে হবে চিত্রাদেবী।" "তা হোক্।" ব্রতীন স্নিগ্ধ হাসিল, "ঝোঁকের মাথায় কাজ করবেন না। আজন্ম প্রাচুর্য্যের মধ্যে লালিতা আপনি, আমার সংসারে অভাবের বেদনা যখন পদে পদে বাজবে তখন আজকের দিনটাকে আপনি অভিসম্পাৎ দেবেন।" উঠিয়া দাঁড়াইল ব্রতীন, "আপনি বেশ করে দু'দিন ভেবে দেখুন চিত্রাদেবী, দু'দিন বাদে আমি আসব।"

কথামত আসিল ব্রতীন। তারই পথ চাহিয়া সাদাসিধা বেশে বসিয়াছিল চিত্রিতা। ব্রতীন চেয়ার টানিয়া বসিতেই দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল, "আমি প্রস্তুত ব্রতীনবাবু।" "ভাল করে ভেবে দেখেছেন?" "খুব ভাল করে ভেবেছি, এ দু'দিন শুধুই ভেবেছি, এ-ছাড়া আমার পথ নেই।" টেবিলের উপর রাখা চিত্রিতার ডান হাতখানি নিজের হাতের ভিতর আলগোছে তুলিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে ব্রতীন বলিল, "তবে তাই হোক্ চিত্রা।" ব্রতীনের হাতধরা চিত্রিতার হাতখানি অজানা পুলকে কাঁপিয়া উঠিল। চিত্রিতার মুখের পানে চাহিয়া ব্রতীন বলিল, "কিন্তু তোমার বাবা, তাঁর মত নিয়েছ, তিনি রাজী হবেন তোমার এই ত্যাগস্বীকারে?" স্নিগ্ধ হাসিল চিত্রিতা: "আমার বাবাকে আপনি চেনেন না, তিনি দেবতা, কত যে সুখী হবেন তিনি এ-কথা শুনে।" "তবে চল, আমরা আগে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসি।"

সব শুনিলেন জগদীশবাবু, অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন তিনি। তাঁর বুকভরা স্নেহে যা সম্ভব হয় নাই, প্রেমের স্পর্শমণিতে চিত্রিতার জীবনে তাহাই সম্ভব হইয়াছে—কল্যাণের পথে ফিরিয়াছে সে। দুই জনকে দুই পাশে বসাইয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ভাল করে বিবেচনা করে এই মহৎ ত্যাগকে যদি জীবনে বরণ করে নিতে চাও চিত্রা, আমার এতটুকু আপত্তি নেই মা। তবে তুমি আমার একমাত্র সন্তান, আমার মৃত্যুর পর যথাসর্ব্বস্ব তোমারই হবে, গ্রহণ করতে ইচ্ছা না হয় জগতের মঙ্গলের জন্য দান কোর," তাতে আমি দুঃখিত হব না। যে-পথ দুটিতে তোমরা বেছে নিয়েছ, আশীর্ব্বাদ করি, পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা রেখে, পরস্পরের সহায় হোয়ে, সেই পথে তোমরা এগিয়ে চল। চলার পথে তোমাদের যেন শক্তির অভাব না হয়, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই আমি করব।"
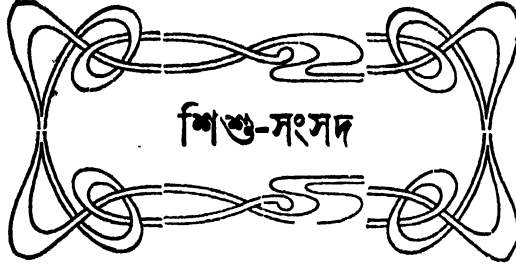
উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

বাসবদত্তার স্বপ্ন

এগার

ব্রহ্মচারী আবার বল্‌তে লাগলেন "তবে এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে পারেন নি। ঘুমের ঘোরেও তিনি খালি বিড়বিড়্ ক'রে প্রলাপ বকেচেন—'এইখানে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলুম—এইখানে হেসেছিলুম এইখানে দু'জনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপেছিলুম—এইখানে তার সঙ্গে মিছামিছি রাগের ভাণ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। তাই শুনে গোপালক বলেছেন '—মহারাজকে সকাল হ'লেই লাবাণক থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—নয় ত লাবাণকের চারদিকে মহারাণীর টাটকা স্মৃতি সব যেভাবে ছড়ান রয়েছে—তাতে মহারাজ কিছুতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে পারবেন না।' সকাল হ'লেই তাঁকে রাজধানী কৌশাম্বীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে—শুনে আমি তার আগেই ভোর থাকতে থাকতে রওনা হয়েছি।'

তাপসি এতক্ষণ অবধি একটিও কথা কন নি—সব ঘটনা চুপ-চাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এইবার তিনি মুখ খুল্‌লেন—'বৎসরাজকে ত' বেশ গুণবান্ ব'লে মনে হচ্ছে—আ' নইলে জানা-অচেনা লোকেও কি আর তাঁর এতটা প্রশংসা করে।'

রাজকুমারীর চেড়ী তাঁকে চুপি চুপি বল্‌লেন—'এ রাজা কি এর পর আর বিয়ে করবেন ?"

পদ্মাবতী কোন উত্তর দিলেন না। শুধু মনে মনে ভাবলেন—'আমার মনের ভাবনাটি এ মুখে প্রকাশ ক'রে বলেছে।'

এর পর ব্রহ্মচারী সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। যৌগন্ধরায়ণও কঞ্চুকীর মারফৎ রাজকন্যাকে জানালেন যে তিনি এবার বিদায় নিচ্ছেন।

পদ্মাবতী কঞ্চুকীর মুখেই উত্তর জানালেন—'ঠাকুর! আপনার মেয়ে আপনাকে না দেখে একটু মনমরা হয়ে থাকবেনই।'

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলেন—'আমি যাঁর হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে গেলুম, তাঁর কাছে কোন দুঃখই থাকবে না।'

তারপর বিদায় নিয়ে বসন্তক আর যৌগন্ধরায়ণ দু'জনেই সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

কঞ্চুকী তখন রাজকুমারীকে বল্‌লেন—'এবার চলুন, আপনার মার সঙ্গে দেখা করা যাক্।'

পদ্মাবতী তাপসীকে প্রণাম ক'রে যাবার অনুমতি চাইলেন। বাসবদত্তাও নীরবে প্রণাম করলেন। তাপসী পদ্মাবতীকে আশীর্ব্বাদ করলেন—'তোমার যোগ্য পতি লাভ কর মা।' আর বাসবদত্তার মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—'মা! তোমার স্বামীর সঙ্গে অচিরে মিলন হোক্।'

বাসবদত্তা ছল্-ছল্ চোখে মুখ নীচু ক'রে ধরা গলায় বল্‌লেন,—'ভগবতী! আপনার কথা সত্য হোক্!'

এর পর কঞ্চুকীর সঙ্গে রাজকুমারী আর বাসবদত্তা দলবল নিয়ে রওনা হ'লেন—মার কুটীরের দিকে।

*

তপোবন থেকে রাজকুমারী পদ্মাবতী ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন। রাজগৃহ (এখনকার রাজগির) ছিল তখন মগধের রাজধানী। রাজধানীতে বাসবদত্তা ফিরে এসে নতুন নাম নিয়েছেন—আবন্তিকা। রাজপ্রাসাদে তিনি সবাইকার দিদি—কেন না রাজকুমারী তাঁকে 'দিদি' ব'লে ডাকেন। পদ্মাবতী সত্যিই তাঁকে বড় বোনের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাই তার এ অমায়িক ব্যবহারে বাসবদত্তাও আর তাঁকে দুব্-সতীন ব'লে দূরে ঠেলে রাখতে পারছিলেন না। মার পেটের ছোট বোনের মতই ভালবাসা পদ্মার ওপর জেগে উঠছিল তাঁর ধীরে ধীরে।

একদিন প্রায় বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে। আবন্তিকা আর পদ্মা ফুলবাগানে মাধবীলতা-মণ্ডপের ধারে বল ছোড়াছুড়ি খেলা খেলছিলেন। বাসবদত্তা ছেলেবেলা থেকেই খেলা-ধূলো ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদিতে খুব মজবুত। কিন্তু পদ্মাবতী বরাবরই একটু শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। দৌড় ঝাঁপ, বল খেলা এ-সবে তাঁর মোটেই অভ্যাস নেই। ঘোড়ায় চড়া'ত তাঁর দু'চোখের বিষ! তবু বিকেল হ'লে একটু-আধটু খেলাধূলো করতে হবে—এ তাঁর দাদা মগধের মহারাজ দর্শকের আদেশ—নইলে শরীর টিকবে কি ক'রে! তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেলতে হয়। এ কদিন আবন্তিকাকে সাথী পেয়ে বরং তাঁর একটু ঝোঁক চেপেছিল খেলার দিকে। তবু খেলায় তিনি মোটেই সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারছিলেন না। কোঁকড়া চুলগুলি মুখের চারদিকে ফুর ফুর ক'রে উড়ছিল। ক্রমাগত ছোটাছুটির ফলে কপালে ফুটে উঠেছিল—ছোট ছোট মুক্তোর মত ঘামের বিন্দু—তাইতে ঐ কোঁকড়া চুলগুলি জড়িয়ে গিয়ে তাঁর স্বভাবসুন্দর মুখখানিকে ক'রে তুলেছিল আরও রমণীয়—যেন ভ্রমর-ঘেরা একটি পদ্ম ফুল!

আবন্তিকার ছদ্মবেশে বাসবদত্তা দেখলেন—পদ্মাবতী তাঁর সঙ্গে তাল রেখে খেলতে পারছেন না—বল্‌লেন—'বোন্, তুমি

হাঁফিয়ে পড়েছ—মুখখানি ঘামে ভিজে গেছে। আজ না হয় এই অবধি থাক। এস, এইখানে ব'সে একটু জিরুই।'

'হাঁ' দিদি! আমি ত তোমার সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছি না। তার চেয়ে তুমি অবান্তর গল্প বল—এই গাছতলায় পাথরের বেদীতে ব'সে ব'সে শুনি।'

যে চেড়ীটা কাছে ছিল, সে বলে উঠল—'না-না—দিদিমণিরা! খেলুন না, আর একটু খেলুন না! আর ক'দিনই বা খেলবেন? যে ক'দিন আইবুড়ো আছেন—দৌড়-ঝাঁপ খেলে নিন। কন্যা-কাল কেটে গেলে আর এ সব খেলার সুবিধে পাবেন?'

এই কথায় আবন্তিকা (বাসবদত্তা) পদ্মাবতীর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। আর কোথা যাবেন! পদ্মাবতীর হল অভিমান। বলে উঠলেন তিনি, 'দিদি! বুঝি আমায় দেখে হাসছেন—তা জানেনই ত, আমি আপনার মত খেলাধূলোয় অত মজবুত নই।'

আবন্তিকা—'আরে না-না বোন্! আজ তোমার মুখখানি এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যে ভাবী বিয়ের আনন্দ আর ধরছে না!'

পদ্মাবতী (একটু রাগের সঙ্গে)—'যান—সরে যান—আপনি! আর ঠাট্টা করবেন না।'

আবন্তিকা 'মহাসেনের ভাবী বৌমা! এই চুপই রইলুম।'

এই কথায় পদ্মাবতী একটু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাসেন আবার কে, দিদি?'

আবন্তিকা—'কেন? মহাসেনের নাম আগে কখনও শোনো নি নাকি! উজ্জয়িনীর রাজা তিনি—আসল নাম তাঁর প্রদ্যোত। তবে তাঁর অনেক সেনা বলে লোকে ডাকে 'মহাসেন' নামে। শুনলুম ত যে তাঁরই ছোট ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধের ঠিক ঠাক হচ্ছে।'

পদ্মাবতীর চেড়ী এবার জবাব দিলে—'না, দিদি ঠাকরুণ আপনি ঠিক শোনেন নি। কথা বার্ত্তা হয়েছিল বটে, তবে আমাদের দিদিরাণী ও সম্বন্ধ চান না।'

আবন্তিকার মুখে ফুটে উঠলো বিস্ময়ের আভাষ; প্রশ্ন করলেন, 'তবে কাকে চান?'

চেড়ী—'বৎসরাজের রূপ গুণের কথা শুনে তাঁকেই বিয়ে করতে চান দিদিরাণী।'

আবন্তিকা (আপন মনে)—পদ্মাও তা হলে প্রভুকেই চায়। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ তা হলে আছেই দেখি।' মুখ ফুটে বলে ফেললেন—'হঠাৎ তাঁকেই পছন্দ করলেন কেন?'

চেড়ীটা বড় মুখফোঁড়—হাসতে হাসতে জবাব দিল—'সেদিন তপোবনে তাঁর পাটরাণী পুড়ে মড়ার খবর শুনে অবধি দিদিরাণীর ঝোঁক চেপেছে বৎসরাজকেই বিয়ে করতে হবে। যিনি তার আগের রাণীকে অত ভালবাসতেন—যাঁকে তাঁর মন্ত্রী-সেনাপতির এত ভালবাসে—তাঁর মন নিশ্চয়ই দয়ায় ভরা, নিশ্চয়ই তাঁর গুণের সীমা নেই—এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই ত দিদিরাণী মত করেছেন—উদয়নকে বিয়ে করবেন।'

আবন্তিকা (মনে মনে)—'হতভাগীও যে একদিন এই রকমই ক্ষেপে উঠেছিল!'

এই সময় চেড়ীটা রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করলে—'আচ্ছা দিদিরাণী! তুমি ত জেদ ধরেছ যে বৎসরাজকে বিয়ে করবে! এখনও তাঁকে চোখে দেখনি—তাঁর ছবিও তোমার হাতে পড়েনি কখনও যদি তিনি দেখতে খারাপ হন!'

আবন্তিকা হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে বলে ফেললেন—'না—না—তিনি দেখতে খুবই সুন্দর।'

আর যায় কোথা! পদ্মাবতী তাঁকে চেপে ধরলেন—'দিদি! তুমি জানলে কি করে? দেখেছ না কি?'

আবন্তিকা বুঝলেন হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে বড় ভুল কাজ করেছেন। কিন্তু কথাটা যখন বেরিয়ে পড়েছে তখন আর গতি কি! তাই তাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে আমি যে অবন্তি দেশের মেয়ে। উদয়ন যে আমাদের রাজা প্রদ্যোতের জামাই। তিনি বীণা বাজাতেন। সে সময় রাজধানীর সব লোকই যে তাঁকে কত দিন দেখেছে। আমিও দেখেছি। শুধু আমি বলছি না, খোঁজ নিয়ে জানতে পার—উজ্জয়িনীর প্রত্যেক প্রজাই তাঁর রূপগুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

পদ্মাবতী—ঠিক কথা। উজ্জয়িনীতে তিনি যে সকলেরই জানা।

এমন সময় পদ্মাবতীর ধাই-মা এসে ঢুকলেন বাগানে—হাসি হাসি মুখ তার। রাজকুমারীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, এইবার তোমার জিত খুকুরাণী মা! তোমার বাগ্‌দান যে এই মাত্র হয়ে গেল।'

আবন্তিকা—'ধাই-মা, কার সঙ্গে?'

ধাই—'কেন মা, শোনো নি না কি কিছুই? বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে।'

আবন্তিকা—'তা হ'লে তিনি শরীরগতিক ভালই আছেন?'

ধাই—'হাঁ, ভালই ত দেখলুম। তিনি এসেছেন এখানে—পদ্মাকে নিতে রাজীও হয়েছেন।'

আবন্তিকা মনের আবেগ চাপতে না পেরে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, 'কি সর্ব্বনাশ।'

বুড়ী ধাই একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—'কেন মা ঠাকুরাণ? এতে আবার সর্ব্বনাশের কি দেখলে তুমি। শুভকাজে কেন ব্যাগ্‌ড়া তুলছ বল ত?'

আবন্তিকার কথায় পদ্মাবতীও একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল। তাই দেখে কথাটা চাপা দেবার জন্যে আবন্তিকা বল্লেন—'না আমি এত সব ভেবে বলি নি। আমি ভাবছিলুম এই ক'দিন আগে যার অমন স্ত্রী মারা গেল, তাঁর মন কি এর মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়েছে যে, বিয়ের আনন্দে সায় দিতে পারবে! আমাদের পদ্মাকে তিনি যদি এতটুকু হেনস্থা করেন তাঁর শোকের জন্যে পদ্মার যে মনে তা হলে বড় লাগবে। তাই ওকথা বলেছিলুম।'

ধাই—'না—মা! সে ভয় নেই। বৎসরাজ ত আর যে-সে লোক নন, তিনি বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত, মহাপুরুষ। মহাপুরুষেরা শাস্ত্র

পড়েন—তাই তাঁদের বুকে শোক বেশী দিন বাসা বাঁধতে পারে না।'

আবন্তিকা—'তিনি কি নিজেই যেচে এ বিয়েতে মত দিলেন ?'

ধাই একটু হেসে বললেন—'তাও কি সম্ভব, মা! অনেক দিন থেকেই আমাদের মহারাজের ইচ্ছে ছিল তাঁর আদরের ছোট বোনটিকে উদয়নের হাতে তুলে দেন। তবে বাসবদত্তা ছিলেন তাঁর পাটরাণী। তাই সতীনের ওপর বোনের বিয়ে দিতে ভাইএর মন সরছিল না। সম্প্রতি বাসবদত্তা পুড়ে মরেছেন শুনেই রাজা আমাদের ঘটক লাগিয়ে ছিলেন! থুকুরাণীরও মত ছিল—একথা আমার মুখেই তিনি শুনেছিলেন! আজ বৎসরাজ এসে উপস্থিত —বাগ্‌দান এইমাত্র হ'য়ে গেল। আর এমন পাত্র এখন ভূ-ভারতে মিল্‌বেই বা কোথা ?'

আবন্তিকা (আপন মনে)—'যাক্! তা হ'লে প্রভু আমার নিজেই যেচে আসেন নি। ঘটক পাঠিয়ে তাঁকে আন্‌তে হয়েছে।

এই সময় আর একটী চেড়ী ছুটতে ছুটতে এসে জানালে, 'ধাই-মা! মহারাজ জানালেন—আপনি দিদিরাণীকে নিয়ে শীগগির আসুন। আজকের নক্ষত্র খুব ভাল। আজই আমাদের 'মঙ্গলা' করতে হবে। কাল গায়ে-হলুদ।'

আবন্তিকা মনে মনে ভাবছিলেন—'এরা যতই বিয়ের তাড়াতাড়ি করছে—আমার মন ততই আঁধারে ভ'রে উঠছে। তবু যাই এদের সঙ্গে। মন মুখ ভার করা ত ভাল দেখাবে না। বিশেষ যখন—'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা—শিশিরে কি ভয়' ?

রাজকুমারী পদ্মাবতীকে নিয়ে তাঁর ধাই-মা, আবন্তিকা, চেড়ীরা—সব রাজ-অন্তঃপুরে গিয়ে বিয়ের আমোদে মেতে উঠলেন।

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞানসম্মত ফুটবলের ইতিহাস

শ্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

সৃষ্টির কবে কোন্ আবহমানকাল থেকে ফুটবল খেলার প্রচলন হয় তা আমাদের কাছে রহস্যাবৃত থাকলেও এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, বর্ত্তমান বৃটেনে এখনো কয়েকজন লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন। গত এপ্রিল (১৯৪০) মাসের কোন একদিন অতর্কিতে ভেসে আসে মিঃ ফ্রেড্ স্যাণ্ডারসন নামে ৯৩ বৎসর বয়স্ক একটি বৃদ্ধের মৃত্যু-সংবাদ। 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' নামক সংবাদপত্রে এই সম্বন্ধে শোক-সংবাদে জানান হয় যে, মিঃ ফ্রেড্ স্যাণ্ডারসন ছিলেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ফুটবল খেলার প্রচলনের অগ্রণী। তাঁকে বৃটেনের বর্ত্তমান এফ্-এ কাপের জন্মদাতা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মিঃ ফ্রেড স্যাণ্ডারসনের পুস্তিকায় বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলার ক্রম-বিবর্দ্ধন সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার পৃষ্ঠা সংযুক্ত আছে। এ-ছাড়া 'Sheffield—The Home of Modern Soccer' নামে পুস্তকটী থেকে আমাদের জানবার সুযোগ হয় যে ১১৭৫ সালে লণ্ডনের স্কুলের ছাত্রেরা প্রথম প্রথম সপ্তাহে মাত্র একদিন, প্রতি মঙ্গলবারে, ডিনারের পর ফুটবল খেলতেন। ডারবী কাউন্‌টির ইতিহাসে জানা যায় যে ১২১৭ সালেও সেখানে ফুটবল খেলা হ'ত। তবে তাঁরা যে কি পদ্ধতিতে ফুটবল খেলতেন তার কোন হদিস্ পাওয়া যায় না। এই ফুটবল খেলার গোড়ার কথা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ইংলণ্ডের একটি সহরে কিংবদন্তী আছে প্রাচীনকালে বিজিত জাতির মস্তকে প্রকাশ্যে পদাঘাত করার প্রথা থেকেই নাকি ফুটবল খেলার জন্ম। উপন্যাসের মত অসত্য বলে মনে হলেও এ-কথা সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোনই কারণ নেই যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ফুটবল খেলা নাকি আইন-গর্হিত কাজ বলে এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের বিধি-নিষেধ ছিল। [বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলার 'প্রথম আরম্ভ' হয় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে। স্যাণ্ডারসন বলেন যে, ফুটবলকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য এবং একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য দলে দলে ঘোড়ার গাড়ীতে লোক যেতে দেখেছেন। জনসাধারণকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে বলা হ'ত যে ফুটবল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকল্পে চ্যারিটী উপলক্ষে এত ঘোড়ার গাড়ীর দৌড় হচ্ছে। মিঃ স্যাণ্ডারসনের মতে ইটন্ স্কুলের ছেলেরাই Sheffield-এ ফুটবল খেলার প্রচলন করেন, এবং ১৮৫৬ সালে এই বৃটেনের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রচেষ্টায় Sheffield Club প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ফুটবল প্রতি-প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল খেলার ব্যাপক প্রচার হয়। Sheffield ক্লাবের পর দেখতে দেখতে Pitsmoor, Brahmhall Exchange নামে ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যুদয় হয়। এগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও এ-ছাড়া আরও বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। কেবলমাত্র Sheffield Club-এর সভ্যরা ছাড়া অন্যান্য ক্লাবের খেলোয়াড়রা বড় বড় "ট্রাউজার" পরে খেলায় যোগদান করতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় "ফুটবল বুটের"র কোন প্রয়োজনই তখন ছিল না। অর্থাৎ তখন তাঁরা ব্যবহার করতেন না। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তখন "cross bar" বা মধ্যের কাঠটী যেটি ২টী পোষ্টকে সংযুক্ত করছে সেটির কোন বালাই ছিল না। ঐ bar-এর পরিবর্ত্তে একটি সাদা দড়ি দিয়ে ২টি প্রোথিত পোষ্টকে যোগ করা হ'ত। বলটি এই দড়ির উপর দিয়েই যাক্ আর নীচের দিক্ দিয়েই গোলে প্রবেশ করুক, তা গোল বলে ধরে নেবার নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ত। তখনকার দিনে ফুটবল খেলতে খেলতে হাতে করে ধরবার প্রথা প্রচলিত ছিল। আরো দশ বৎসর পরে "The fair catch" নামে হাতে করে বল ধরলে একটি সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতি ছিল। এতে খেলোয়াড়টি 'free kick" পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করতেন। কিন্তু গোল করা অতি সহজসাধ্য হ'ত বলে এই নির্দ্দেশ পরে বাতিল

করা হ'লো। এই সময় লণ্ডনে প্রথম "Off-side" নিয়মের প্রচলন করা হ'লো। Sheffield Club এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লণ্ডন বনাম সেফিল্ডের খেলাটি যদিও প্রথমার্দ্ধে "off-side rule"-এ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিনা "off side rule"-এ অনুষ্ঠিত হয়, তা হলেও ফল হ'ল ঠিক বিপরীত; London দল বিনা off-side rule-এর অর্দ্ধে এবং Sheffield off side rule-এর অর্দ্ধে জয়লাভ করে। আরো একটা মজার ব্যাপার ছিল এই যে, গোলরক্ষক ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড়ের তখন কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে খেলার বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। সুতরাং খেলোয়াড় হিসাবে শারীরিক শক্তিসম্পন্ন লোকেরা দলভুক্ত হতেন এবং তাঁদের প্রধান কাজ ছিল গোলরক্ষকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। সুতরাং প্রায়ই দেখা যেত যে, 'বেচারা' গোলরক্ষক থাকতেন নীচে, আর মোটা মোটা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা তাঁর পিঠের উপর চড়ে নৃত্য করছেন।

গোল-কিক্ বলে তখন কিছু ছিল না। বল গোল-লাইন অতিক্রম করলেই দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দৌড় আরম্ভ হত। যে দলের খেলোয়াড় আগে বলটি স্পর্শ করতেন তাঁদের একটি পয়েণ্ট প্রাপ্য হত।

Sheffield Association সর্ব্বপ্রথম আম্পায়ার এবং রেফারীর ব্যবস্থা করে। এখন যেমন একটি খেলায় একটি রেফারীর দ্বারাই পরিচালিত হয় তখন কিন্তু ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। একটি খেলায় ২টী আম্পায়ার ও একটী রেফারী থাকতেন। মাঠে উভয়ার্দ্ধে ১টী করে আম্পায়ার খেলার বিচার করে রেফারীর মতামত গ্রহণ করে সমস্ত ব্যাপারে নির্দ্দেশ দিতেন। এইরূপ সুষ্ঠু এবং সহজ পরিচালনায় ফুটবল খেলা উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হতে লাগলো। এবং Sheffield Association-এর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা এত বেড়ে গেল যে ১৮৬৩ সালের ২৬শে অক্টোবরে এই প্রতিষ্ঠান ফুটবল খেলার আইন প্রণয়নের দিকে নজর দিলো এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি সঙ্ঘের পরিচালনার মধ্যে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'লো। Bransley Forest Club' Blackheath, Crystal Palace, The Crusades. The N. N's (Kilburn), War Office এবং কতকগুলো স্কুল এই একটি বৃহৎ এ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় ফুটবল খেলার ব্যাপক প্রচার হলো। পর পর তিনটি মিটিং-এ কিভাবে আইন প্রণয়ন করলে সুবিধা হবে এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা তা ঠিক করলেন। ১৮৬৩ সালে সর্ব্বপ্রথম 'রাগবী' খেলার আইন এবং পদ্ধতির সঙ্গে ফুটবল খেলার স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করা হলো। তারপর ১৮৬৭ সালে Offside rule-এর পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন হওয়ায় উল্লেখযোগ্য Charter House এবং Westminster নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই সঙ্ঘের বাধ্য হয়ে উঠলো; এই সুবৃহৎ এসোসিয়েশনটিকে F. A. of England নামকরণ করা হলো। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কর্ম্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন মিঃ সি. ডাব্লিউ. এলকক্। এঁর আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮৭০ সালে Sheffield ক্লাব, Lincoln, Newark, Nottingham এবং অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান এফ, এ'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

জুন মাসের ২০শে তারিখে ১৮৭১ সালে এই এফ, এ, সর্ব্বপ্রথম এফ, এ কাপ নামে এক প্রতিযোগিতার প্রস্তাব পেশ করেন। অক্টোবর মাসের ১৬ই তারিখে ২৫ পাউণ্ড দিয়ে এর জন্য একটি কাপ খরিদ করা হলো। ১৮৭৩ সালে সর্ব্বপ্রথম একটি সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হ'লো এবং এই প্রতিযোগিতার প্রথম খেলা হলো England বনাম Scotland. ১৮৮১ সালে আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এফ, এ-তে যোগদান করে। এইরূপে সভ্য-সংখ্যা দাঁড়ালো ১২৮। ১৮৮২ সালে মজুরদের দল ফুটবল খেলায় যখন প্রথম যোগ দেয় তখন হতেই পেশাদারী ফুটবলের উদ্ভব হয়। কিন্তু পেশাদারী ফুটবল খেলাকে এসোসিয়েশন উৎসাহ না দেওয়ার জন্য আইনগর্হিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই বৎসরে আন্তর্জ্জাতিক বা International Board গঠিত হলো। এই বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল United Kingdom-এ একই আইনের দ্বারা ফুটবল খেলার প্রচার করা। Scotland-এ ফুটবল খেলার প্রচলন England-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। জুলাই মাসের ৩০শে তারিখে ১৮৮৫ সালে পেশাদারী খেলোয়াড়দের সুযোগ দেবার সুব্যবস্থা হয়। ১৮৮৭ সালে পুরাতন আইনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হলো। ১৮৮০ সালে সর্ব্বপ্রথম 'পেনাল্টি কিক্'-এর প্রচলন হলো। এই সালেই সৌখিনদের কাপ বা Amateur Cup সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সঙ্গে F. A. এর মত বিরোধ হওয়ায় ১৯০৭ সালে Amateur Football Association নামক নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

১৯১০-১৪ সালে Oxford, Cambridge বিশ্ববিদ্যালয় এবং Corinthians দলের মধ্যস্থতায় এফ, এ, এসোসিয়েশনের সঙ্গে এ, এফ, এর অপ্রীতিকর মনোভাবের অবসান ঘটে।

১৯১৩ সালে F, A. প্রতিষ্ঠানের ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় Halbourn ভোজনাগারে এক নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা হয় এবং আমোদ প্রমোদের জন্য ৫০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়। স্বর্গীয় ৫ম জর্জ্জ কাপের ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৪ সালে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জন্য এফ, এ, কাপের প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে। ১৯১৯-২০ সালে নব উদ্যম এবং আনন্দের মধ্যে আবার দ্বিগুণ উত্তেজনা ও উদ্দীপনায় প্রতিযোগিতাটি আরম্ভ হয়। কিন্তু পৃথিবীর বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহ প্রতিযোগিতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেও ঘন ঘন বিমান আক্রমণের মধ্যেও এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মাটি ও মানুষ

শ্রীমনোজ বসু

ইস্কুল থেকে ফিরে এসে জ্যোৎস্না বই হাতে ধুপধাপ উপরে উঠে যায়। বই ছুঁড়ে ফেলে টেবিলের একধারে। খেয়ে দেয়ে তখুনি নেমে আসে। গ্যারেজের পাশে ছোট্ট এককালি ফাঁকা জমি। সেখানে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। তার বয়সি দু-চারটে ছেলে-মেয়ে আসে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে। সন্ধ্যা অবধি খেলা চলে। মাষ্টার দেখা দেয় এই সময়। মাষ্টারকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না জ্যোৎস্না। সেই সন্ধ্যাবেলাতেই সে বেচারা ঝিমোয় চেয়ারে বসে। জ্যোৎস্নাদের উল্লাসধ্বনি নিচে থেকে কানে আসে; কিন্তু গরজ নেই ছাত্রীকে ডাকাডাকি করবার। দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে পারলে হল, তার মধ্যে যতক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কাটে।

নানা কাজে প্রভাবতীরও খেয়াল থাকে না। এক একদিন হঠাৎ নজর পড়ে যায়। ঝি-চাকর পাঠিয়ে ডাকাডাকি করেন, তর্জ্জন-গর্জ্জন করেন, কিন্তু জ্যোৎস্না কানে নেয় না। শেষে বনমালীকে একদিন অনুযোগ করে বললেন, নাতনী বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে সর্দ্দার-শ্বশুর, কথা শোনে না, তোমার সে দিকে মোটে নজর নেই। মাষ্টার এলেই তাঁর পিছু পিছু অমনি পাঠিয়ে দিতে পার না উপরে?

নজর আছে বই কি বনমালীর! তবে তাড়ির নেশায় সে সময়টা মনে থাকে মন ও চোখ দুটো। চমৎকার লাগে পৃথিবীটাকে। সব মানুষ ভাল থাক, আনন্দে থাক—এমনি একটা উদার চিন্তা অন্তরে জাগে। ইস্কুলের-বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে নাচানাচি করছে খানিকটা, আবার এক্ষুণি খাঁচায় তাড়িয়ে তুলতে বনমালীর কেমন যেন মায়া লাগে। ডাকতে গিয়েও গড়িমসি করে, পড়াশুনো তো আছেই—দু-মিনিটে কি এমন দুনিয়া রসাতলে যাবে।

শহর-প্রদক্ষিণ সারা করে অমূল্য ফিরে আসে সন্ধ্যার আগেই। চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নাদের খেলা দেখে। একটুখানি ঐ রকম মাতামাতি করবার জন্য দৃষ্টিতে তার ব্যগ্র লোলুপতা। একদিন সুযোগ ঘটে গেল। জ্যোৎস্না হঠাৎ এগিয়ে এসে একখানা র‍্যাকেট তার হাতে গুঁজে দিল, হাত ধরে তাকে টেনে আনল সকলের মধ্যে। লোক কম হয়ে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না বলল, এইদিকে এসে দাঁড়াও তুমি। আমার পার্টনার হয়ে খেলবে। পারবে না? খেলা দেখেছ তো আগে কতদিন।

দু-চার দিনেই চমৎকার হাত খুলে গেল অমূল্যর। চিক্কণ সুপুষ্ট অতি নমনীয় দেহখানি ছুটোছুটির মধ্যে আন্দোলিত হয়, পেশীবহুল বাহুর ওঠা-নামার মধ্যে শক্তির তরঙ্গ যেন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে—বিমুগ্ধ হয়ে দেখবার বস্তু বটে! এখন আর লোকাভাবে ডাক পড়ে না অমূল্যর। লোক বাড়তি থাকলেও তাদের বসিয়ে দিয়ে অমূল্যকে খেলতে হয়। বড় ভাল খেলছে, খুব আস্থা করা যায় তার উপর; তাকে বাদ দিয়ে এখন কোনক্রমে জ্যোৎস্নার চলে না।

বিকালবেলা একদিন অমূল্য বড়বাজারের দিক থেকে বেড়িয়ে ফিরছে। আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটল। গলির ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে এক ছোকরা তার হাতের মুঠোয় একটা জিনিষ গুঁজে দিয়ে বলে, পালাও। হাঁ করে থেকো না, সরে পড়ো শিগ্‌গির।

ছোকরাটাকে চিনেছে। রোজই সে বাজারে ডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গোবিন্দর নির্দ্দেশ মতো মাছ-তরকারি দিতে হয় যার ঝুড়িতে। অজানা আতঙ্কে অমূল্যর সর্ব্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল, কিছু না বুঝেই সে পালাতে লাগল।

একটু গিয়ে গণ্ডগোল শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। ছোকরাটাকে জাপটে ধরেছে অনেকগুলা লোক। ভিড় জমেছে, বিষম চেঁচা-মেচি হচ্ছে।

পাড়াগেঁয়ে ছেলে—সহানুভূতিতে মন টলমল করে ওঠে, পালাতে পারে না। পায়ে পায়ে ফিরে চলল আবার জনতার দিকে। খুব মারধর করছে ছেলেটাকে। ছেলেটা বলছে, দেখ—খুঁজে দেখ তোমরা। জিনিষটা উড়ে যেতে পারে না তো! এইটুকু মাত্র তো এসেছি। দেখ।

সরিয়ে দিয়েছিস তা হলে দলের লোকের কাছে।

লোক কোথা পেলাম? মিছামিছি ধরেছ আমাকে। অমূল্যর দু-হাঁটু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে। সে কি এই চোর জুয়াচোরের দলের লোক? কেউ যদি দেখে থাকে যখন ছোকরা দিচ্ছিল জিনিষটা। উঁহু, এর মধ্যে থাকা ঠিক নয় আর এক মুহূর্ত্তও।

জনতার আড়াল হয়েই অমূল্য দ্রুতপদে ছুটল। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে পৌঁছল। এসে দেখে বিষম বিপদ। বড় দেরি হয়ে গেছে এই সব হাঙ্গামায়। ইস্কুল থেকে ফিরে জ্যোৎস্না অনেকবার অমূল্যর খোঁজ করেছে। তাকে না পেয়ে উপরে উঠে গেছে, আর নামে নি। খেলা আজ বন্ধ। পাড়ার যারা এসেছিল, অনেক ডাকাডাকি করে তারা ফিরে গেছে।

অমূল্য খুব শব্দ-সাড়া করে উঠানের এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু জ্যোৎস্না উঁকি দিয়েও দেখল না একটিবার। উপরে যাবার অধিকার অমূল্যর নেই, এমন কি বনমালীরও নেই। প্রভাবতী যত ভালই হোন, আর কর্ত্তার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতাই থাক বনমালীর—হামেশাই এখানে প্রভাবতীর বাপ-ভাই ও ও-বাড়ির মেয়েরা আসছে, পাড়া-প্রতিবেশীরও আনাগোনা হচ্ছে, তাই চাকর-মনিবের ব্যবধান একটা রাখতেই হয়।

গায়ের ফতুয়া খুলতে গিয়ে অমূল্যর মনে পড়ল, পকেটে সেই জিনিষটা রয়েছে তো। এখনো দেখি নি, কি ওটা। ফুরসৎ পেল কখন? বনমালী যথারীতি বসে বসে ঝিমোচ্ছে। সলজ্জে সে জিনিষটা বের করল। সোনালি রঙে চিত্রিত চামড়ার কেস, তার মধ্যে ঝক ঝকে আংটি একটা।

দিন তিনেক পরে এক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অমূল্য শুতে যাচ্ছে, দোরের বাইরে অন্ধকারে সেদিনকার সেই ছেলেটা।

ইসারা করে অমূল্যকে সে বাইরে ডাকল। ফিস ফিস করে বলে, সেই জিনিষটা দাও দিকি। দেখেছ খুলে?

অমূল্য বলে, তুমি কে, আগে সেইটে জানতে চাই। গরীব বলে সাহায্য করা হয়, কিন্তু তুমি তার মোটেই যোগ্য নও।

অবাক্ হয়ে ছেলেটি বলে, কে কোথায় সাহায্য করে আমাদের? বলছ কি তুমি?

বাজার করতে গিয়ে তোমার ডালা ভরতি করে দেন সরকার মশাই। কতদিন আমিই তো দিয়েছি। তোমার কীর্ত্তির কথা সরকার মশাইকে এখনো বলি নি, কিন্তু বলে দেব।

ছেলেটি বলে, ওটা বুঝি হল গরিবের সাহায্য! তাই বুঝিয়েছেন নাকি? ওতো উপরি পাওনা বাবার। বাড়ি থেকে যাবার সময় আমাকে বলে যান—আমি তাই দাঁড়িয়ে থাকি বাজারে গিয়ে। যাই হোক ভাই, বাবাকে এ ব্যাপারের কিছু তুমি বোল না। পিটিয়ে সেদিন ওরা আধ-মরা করেছিল, তার উপর হাজতে পুরে রেখেছিল একদিন। বাবা জানলে আবার ঠেঙাবে এর উপর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হ'ল। ছেলেটার পোষাকি দুরূহ নাম একটা তো আছেই, ডাকে সবাই জহ্লাদ বলে। বাপের ইচ্ছা নয়, কিন্তু তার বড় ইচ্ছা লেখাপড়া করবার। এক পণ্ডিতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বন্দোবস্ত করে নিয়েছে, একবেলা মাত্র যাবে তাঁর পাঠশালায়। দু-বেলায় সুবিধা হবে না। বাড়ির কেউ—বাবা অবধিও জানে না এ খবর। পণ্ডিতের মাইনে জোগাতে হবে, তার উপর বই কেনা আছে—এত খরচ সে জোটায় কোথা থেকে? তাই সে এই পথে নেমেছে বাধ্য হয়ে, সখ করে আসেনি।

চামড়ার কেসটা অমূল্য এনে দিল। জহ্লাদ অবাক। এ কি, শুধুই বাক্স? কিছু ছিল না এর ভিতরে?

থাকলে দিতাম না বুঝি?

জহ্লাদ ঘাড় নেড়ে বলে, কখনো হতে পারে না। সরিয়ে ফেলেছ তুমি। শো-কেশে খালি একটা বাক্স রেখে দিয়েছে, এ কখনো হতে পারে না।

অমূল্য সংক্ষেপে বলল, চলে যাও তুমি। এবার আমি শোব।

ব্যাকুল হয়ে জহ্লাদ তার হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরল। কেঁদে ফেলে আর কি!

দোহাই ভাই, বখরা দেবো তোমায় আধাআধি। বের করো। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে অমূল্য দরজায় খিল এঁটে দিল।

বনমালী অসাড় হয়ে পড়ে আছে মাদুরের এক কোণে। হঠাৎ কি হয়েছে অমূল্যর— রাতটুকুও সবুর সয় না, বাপের গায়ে নাড়া দেয়।

?

আমি পাঠশালে যাব বাবা।

তা যাস—বলে মনোরম নেশাটুকু না ভেঙে যায়, সেই আশঙ্কায় বনমালী পাশ ফিরে শুল। অমূল্য বলতে লাগল', নিশ্চয় যাব। মেয়েছেলে অবধি লেখাপড়া করে, তুমি গিন্নি-মাকে বলে কালই ঠিকঠাক করে দাও পড়াশুনা করবার।

ইন্দ্রলাল পরদিন হঠাৎ এসে পড়লো কি একটা মামলার ব্যাপারে কলকাতার কোন বড় উকিলের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। ট্যাক্সি এসে গেটে পৌছল; রাগে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে উঠল। মহোল্লাসে এদের তখন খেলা চলেছে। নাঃ, প্রভাবতীর দুর্ব্বলতাই মাটি করে দেবে সমস্ত। তা হলে এত খরচ করে অত বড় ইস্কুলে মেয়ে পাঠাবার দরকার কি ছিল? ঈশ্বর রায়? বুড়া মানুষ—অতীতের শেষ নিদর্শন স্বরূপ যথাসম্ভব নিরুপদ্রবে থাকুন তিনি, যে ভাবে যার সঙ্গে খুশি মেলামেশা করুন। ধুলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সময় তো হয়ে গেছে, তাঁকে নিয়ে উদ্বেগের হেতু নেই। কিন্তু জ্যোৎস্না—তার যে অফুরন্ত ভবিষ্যৎ সামনে। মেয়ে আর মেয়ের মাকে খুব বকে দিলেন ইন্দ্রলাল চালির ছেলে অমূল্যর সঙ্গে এই রকম ভাবে মেলামেশার জন্য। ক'দিন পরে এক কাণ্ড ঘটল। কোর্ট থেকে ইন্দ্রলাল বাসায় ফিরছিলেন বিকালবেলা। জ্যোৎস্নাদের ইস্কুলের সামনে দিয়ে আসছিলেন, ছুটি হয়ে যাচ্ছে দেখে গাড়ি দাঁড় করালেন। বইয়ের বোঝা নিয়ে মনের আহ্লাদে জ্যোৎস্না যেন নাচতে নাচতে গিয়ে বাপের পাশে উঠে বসল।

হাতের মুঠোয় কি রে খুকী?

ঠোঙায় মহামূল্য ছোলাভাজার কিছু অবশিষ্ট আছে তখনও। বাড়ি ফিরবার পথে রোজই খেতে খেতে যায়, আজও রয়েছে। বাপকে দেখে ফেলে দেবার খেয়াল হয় নি, প্রাণপণে এখন জ্যোৎস্না লুকোতে চাচ্ছে।

ছোলাভাজা কোথায় পেলি খুকী? কে দিয়েছে?

বনমালী অনেকক্ষণ পরে একলা শ্লথপায়ে বাড়ি পৌছল। নেশার মাত্রা আজ কিছু বেশি হয়েছে, চোখ জবাফুলের মতো রাঙা। একেবারে সামনে পড়ে গেল ইন্দ্রলালের। ছোলার ঠোঙা মুঠোয় নিয়ে খাঁচার বাঘের মতো ইন্দ্রলাল উঠানে পায়চারি করছিলেন, বনমালীরই অপেক্ষায় ছিলেন। ঠোঙা ছুঁড়ে মারলেন তিনি তার পায়ের ওপর।

এ সব কি ব্যাপার, বলো!—

বনমালী জবাব দিল না।

বলো—বলে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ইন্দ্রলাল। খুকীর খাবার থেকেও চুরি?

যেন ধ্বক করে আগুন দেখা দিল বনমালীর আচ্ছন্ন চোখ দুটোয়।

চাকর হয়ে গেছি আর চোর হব না?

কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রলাল চমকে গেলেন। ক্ষণকাল কথা ফুটল না। যেন বনমালীকে নয়—আর যে দু-চার জন আশে পাশে এসে জমেছিল, তাদেরই উদ্দেশে ইন্দ্রলাল বলতে লাগলেন, সকলে জানে—বাবাই কেবল চিনলেন না, এরা কি চিজ। কতদিক দিয়ে কত চুরি ছ্যাঁচড়ামি করে নিচ্ছে আমাদের—

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল বনমালী। হাসি আর থামতেই

চায় না। বলে, ছোটবাবু, চাকরি কবি তোমাদের আর চুরি করতে যাব কি আগরহাটি ঘোষেদের বাড়ী?

হাসতে হাসতে খোঁড়া ডান-পা নাচিয়ে আরও এগিয়ে আসে বনমালী। মনে মনে ইন্দ্রলাল কেঁপে ওঠেন। আর একটি কথাও না বলে ঈশ্বর রায়ের চিলে কুঠরীতে গেলেন।

কেমন আছেন এ বেলাটা?

ঈশ্বর বললেন, বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। ব্যস্ত হয়ো না বাবা, দু-চার দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

বেড়াতে গিয়ে রায়কর্ত্তা একদিন বৃষ্টিতে খুব ভিজে এসেছিলেন। জ্বর হয়েছে, সে জ্বর মোটে যাচ্ছে না। কাশিও দেখা দিয়েছে। ক্রমশঃ যেন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছেন।

বেড়াবার জায়গা সঙ্কীর্ণ হ'তে হ'তে এখন এই ছাদটুকু মাত্র রয়েছে। সন্ধ্যার সময় একা একা পায়চারি করেন, আর এক এক সময় প্রশান্ত দৃষ্টিতে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকেন ধূমাচ্ছন্ন নিম্নবর্ত্তী বস্তিগুলোর দিকে। অবস্থা দেখে ইন্দ্রলাল ক্রমশঃ ভাবিত হয়ে পড়েছেন; বড় ডাক্তার দেখিয়ে তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

ম্লানমুখে ইন্দ্রলাল বলতে লাগলেন, তোমার জন্য মনে শান্তি নেই বাবা, আবার এর উপর জ্যোৎস্নাকে নিয়ে কাণ্ড না বাধে আর একখানা—

বিষম উদ্বেগে ঈশ্বর বলেন, কেন—কেন, কি হ'ল ছোড়দি'র?

যা হয়েছে, ইন্দ্রলাল আনুপূর্ব্বিক বললেন। যা না হয়েছে, তা-ও বললেন। বললেন, বিশ্বাস ক'রে আমরা খুকীকে ওর হাতে ফেলে রেখেছি। তাড়ির লোভে সমস্ত দিন খুকীকে ও উপোস করিয়ে রাখে। ক্ষিধের সময় যা ইচ্ছে কিনে খাওয়ায়। খুকীকে মানা ক'রে গিয়েছে, মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছে তাকে। সহজে কি বলতে চায়—অনেক জেরার পর তবে বেরুল।

ঈশ্বর বনমালীকে ডেকে পাঠালেন। প্রথম সে এই তেতলায় এল। ইন্দ্রলাল আছেন, প্রভাবতীও আছে।

ভ্রূকুটি ক'রে ঈশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি?

বনমালী দমল না এখানেও। রায়-কর্ত্তার মুখোমুখি তাকিয়ে সদম্ভে তার আগের কথাই বলল, ঢালির সর্দ্দার ছিলাম—গোলাম বানিয়েছ, চুরি করব না?

ঈশ্বর বললেন, তোমায় বরখাস্ত করা হ'ল। পোঁটলা-পুটলি যা আছে, নিয়ে বিদায় হ'য়ে যাও এ বাড়ী থেকে। আজ-ই।

হাঁ—না—কিছুই না ব'লে বনমালী দুম দুম ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল। প্রভাবতীও চলল পিছু পিছু। দোতলায় এসে ডেকে বলে, কাজটা সত্যিই অন্যায় করেছ সর্দ্দার-শ্বশুর। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। তা হ'লে রাগ কমে যাবে।

বনমালী আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে, রাগ? রাগ আমি মা কার উপর করলাম?

নইলে—বরখাস্ত করলেন কর্ত্তা বাবা, একটা কথাও কি বলতে না তুমি? এমন আর হবে না, শুধু এই ক'টি কথা বললেই তো চুকে বুকে যেত।

বনমালী হেসে উঠল।

কে কাকে বরখাস্ত করল মা, কাকে কি বলতে যাব আবার? রায় কর্ত্তা নিজেই তো বরখাস্ত হয়ে আছেন। ছোটবাবু তো বলেন নি—বয়ে গেছে ওঁর হুকুম মতো চাকরি ছেড়ে চ'লে যেতে।

সত্যিই ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে মাদুর বিছিয়ে বনমালী শুয়ে পড়ল।

কর্ত্তার অসুখ বেড়েই চলল। অবস্থা শঙ্কাজনক হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। আত্মীয়-স্বজন অনেকে দেখতে আসছে। পথ দেখিয়ে দেবার অজুহাতে অমূল্য এক আত্মীয় দলের সঙ্গে উঠে এল একদিন তেতলায়। পাহাড়ের মতো দেহখানা এখন অস্থিসার হয়েছে। বিছানার সঙ্গে যেন লেপটে গেছেন। দেখলে ভয় করে।

বনমালী সম্পর্কে ইতিমধ্যে যা ঘটেছে, কোন খবর অমূল্য রাখে না। জ্যোৎস্নার সঙ্গে খেলাধূলা বন্ধ, হঠাৎ যেন জাতিচ্যুত হয়েছে, অহরহ এই রকমটা মনে হচ্ছে তার। কলকাতাও ক্রমশঃ পুরাণো হয়ে গেছে, পথে পথে ঘুরে নিরর্থক শহর দেখে বেড়াতে ইচ্ছে করে না। বাপকে বলে বলে হয়রান হয়েছে, বাপকে দিয়ে হবে না। বাইরের লোকজন বিদায় হয়ে গেল। অমূল্য তখন নিজে তার প্রার্থনা পেশ করল, আমি পড়ব, পাঠশালে যাব কর্ত্তা মশায়—

প্রভাবতী বলে, সে কি রে! তোর বাবা যে কিছুতেই তোকে থাকতে দেবে না এখানে, গাঁয়ে পাঠাবে, বৈশাখ মাসে গিয়ে সেখানে ক্ষেতে আউশের চাষ ধরবি—

ইন্দ্রলাল বললেন, তারই জন্য তো ত্রিলোচন সেদিন নতুন এক জোড়া বলদ কিনল। আমার কাছ থেকে টাকা কর্জ্জ নিয়ে গেল ধান দিয়ে শোধ করবে সেই কড়ারে—

অমূল্য বলে, তা যেতে হয় যাব। বোশেখের তো মাস তিনেক বাকি এখনো—

সকৌতুকে ইন্দ্রলাল বললেন, তিনমাস পড়ে দিগ্‌গজ হয়ে যাবি নাকি?

ঈশ্বর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, পড়ে পড়ুক না। বিদ্যে দু-এক কলম শিখে রাখা ভালো হে! কাজে লেগে যাবে। রায় বাবুরা এই যে কলকাতায় এলেন, সহজে আর নড়বেন না দেখো। ক-খ-ঠ শিখে রাখুক—কত লোকজন লাগবে মহাল শাসনে রাখতে—তুমিই তাকে ডেকে চাকরি দেবে, ইন্দ্রলাল।

প্রভাবতী বলে, পড়াশুনো সাধনার জিনিষ। তিনমাস অনর্থক অর্থদণ্ডই হবে, আর কিছু নয়।

ঈশ্বর একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সাধনার কোনটা নয় শুনি? এক সঙ্গে লাঠি ধরে বেড়িয়েছি আমি আর বনমালী, সেটা কি কম সাধনার? কত দাগ কেটে রয়েছে চামড়ার উপর; কতবার হাত-পা ভেঙেছে। পড়া বলো, চাষ বলো, লাঠিবাজি বলো, সবতাতে চাই সাধনা। তা কোন পথ ধরবি ছোকরা, আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ—

শ্রান্ত হয়ে ঈশ্বর চুপ করলেন। চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শুলেন তিনি।

ক'দিন অসুখটা বড় বেড়েছে। সর্ব্বাঙ্গে অসহ যন্ত্রণা। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছেন তিনি। সমস্ত রাতের মধ্যে চোখে একটু ঘুম নেই; বিছানায় এ পাশ-ওপাশ করছেন। জেলের কথা বলতে লাগলেন, তিনি আর বনমালী এক সঙ্গে ঢুকলেন জেলে, প্রকাণ্ড ফটক বন্ধ হয়ে গেল পিছনে। অনেক রাতে একদিন ঘুম ভেঙে গেল জেলের মধ্যে, চাঁদ উঠেছিল, জ্যোৎস্নায় লোহার গরাদগুলোর ছায়া পড়েছিল ঘরের মেঝেয়—তাঁর গায়ের উপর। ভয়ে জেগে উঠলেন তিনি, ঘুম-ভাঙা শান্ত মুহূর্ত্তে বন্দিত্বের বেদনা মুহ্যমান করল তাকে। সেই ভয় আজকেও যেন নূতন করে এসে জুটেছে তাঁর মনে। শিউরে শিউরে উঠছেন।

জেলের ফটক খুলে দেয় নি যেন এখনো। মুক্তির জন্য রায়কর্ত্তা দাপাদাপি করছেন; গরাদে মাথা ঠুকছেন, এমনি ভাবে আছাড়ি পিছাড়ি খেতে লাগলেন শয্যার উপর। বিষম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছেন তিনি হঠাৎ। উঠবেন, ছুটবেন, শহরের সীমান্ত পার হয়ে ছুটাছুটি করবেন দূর-দূরান্তরে। ধরে রেখো না তোমরা ছেড়ে দাও, শয্যার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকো না এমন ভাবে। মুক্তি দাও, কোন কথা শুনবেন না, কিছুতে নয়—তোমাদের বাধা ছিনিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। গায়ের জোরে পেরে উঠছেন না বলে এত অত্যাচার করবে তোমরা?

মুখের প্রলাপ, অঙ্গবিক্ষেপ শান্ত হয়ে আসছে ক্রমশঃ। দৃষ্টি ধীরে স্তিমিত হচ্ছে। কি শান্ত নিস্তব্ধ ধরিত্রী! ক-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল চোখের কোণ দিয়ে। রায়কর্ত্তাকে কাঁদতে দেখে নি কেউ, প্রথম এই বোধ করি তাঁর চোখে জল পড়ল।

দুপুর বেলা। জ্যোৎস্নাকে যেতে দেওয়া হয় নি, অমূল্য কিন্তু পাঠশালায় গেছে। সারা বাড়ি আর্ত্তনাদ উঠেছে, বনমালী সেই সময় গ্যারেজের কোণে পা মেলে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছে। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকবার আগেই কাউকে কিছু না বলে একদিন কোথায় সে সড়ে পড়ল। [ক্রমশঃ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(এগার)

কারণবাদকে ভিত্তি ক'রে সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই তথাকথিত জড়বিশ্বকে যান্ত্রিকরূপ দানে অগ্রসর হয়েছিল। কারণ খোঁজার প্রবৃত্তি মানবচিত্তে চিরদিনই জাগরূক ছিল ও থাকবে এবং বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষাও মানবেতিহাসে নূতন কথা নয়, কিন্তু কারণবাদ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিল প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে,—যখন গ্যালিলিও এবং নিউটন বিশ্বরচনার মূল নীতি আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণমূলক গবেষণাকে একমাত্র উপায় ব'লে নির্দ্দেশ দান ও পথ প্রদর্শন করলেন।

তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল, বলতে পারা যায়, কল্পনার যুগ ও বিস্ময়ের যুগ। অকস্মাৎ ঝড় উঠলো, গাছপালা, বাড়ী ঘর সব ভেঙ্গে গেল; কড়কড় নাদে বজ্রপাত হলো; ভূকম্পে জল স্থল কেঁপে উঠলো; আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গিরণ করলো। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছু বোঝা গেল না। ভয়ে বিস্ময়ে আদি যুগের মানব অভিভূত হয়ে রইলো। বৃন্তচ্যুত আম জাম মাটিতে পড়ে, চন্দ্র সূর্য্য ত পড়ে না! একদিন পড়বে কি না কে জানে? বসুন্ধরা স্বয়ং পড়ে যাচ্ছেন কিনা তাই বা কে বলতে পারে? শিলা জলে ডুবে যায়, কিন্তু বরফ ত ভাসতে থাকে! এও কি কম আশ্চর্য্য? কিন্তু ও কি ও! ঝাঁটার মত দীর্ঘ পুচ্ছ বিস্তার ক'রে আকাশে কী ঐ উজ্জ্বল পদার্থ দেখা দিল? কি বিপদ! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকে কে আবার গ্রাস করতে সুরু করলো? উঃ বাঁচা গেল, এতক্ষণে তপনদেব ঐ মুণ্ডসর্ব্বস্ব কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যটার কবল থেকে মুক্ত হলেন। এইরূপ সকল দিক থেকে কেবল ভয় ও বিস্ময়। ক্ষণিক আনন্দ কিন্তু আনন্দেও স্বস্তি নেই, কারণ কখন কি হবে ঠিক নেই। বিশ্বপ্রকৃতি যেন চিররহস্যাবৃত;—ঘটনায় ঘটনায় কোন সম্বন্ধ নেই; কিসের থেকে কি হবে, কেন হবে, কখন হবে, তা বোঝবার কোনই উপায় নেই।

এইরূপে আদি মানবের নয়ন সমক্ষে সবই উপস্থিত হতে লাগলো যেন প্রহেলিকা বা অলৌকিক ব্যাপার রূপে। এরি মধ্যে মনকে কোন মতে প্রবোধ দিয়ে টিকে থাকার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতারূপে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন স্বকপোলকল্পিত বহু দেব দানব ভূত প্রেত ও গন্ধর্ব্বের অশরীরী আত্মাকে, এবং এদের তুষ্টি সাধন ও রোষ প্রশমনের জন্য বাধ্য হয়েছিলেন নানা প্রকার তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্য গ্রহণে। ইন্দ্রের পূজা কর, অনাবৃষ্টি দূর হবে; কবচ ধারণ কর, শনির কোপ প্রশমিত হবে; ঘণ্টাবাদন কর, রাহু ভয়ে অন্তর্হিত হবে। এই ছিল তাঁদের চিন্তাধারা এবং আদেশ ও নির্দ্দেশের প্রণালী।

তারপর এলো নিউটনীয় বিজ্ঞানের যুগ—মাভৈঃ বাণী উচ্চারণ করে। এই যুগের ইতিহাস রচনায় পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন কেপলার ও গ্যালিলিও এবং রচনা করেছিলেন নিউটন,—জড়ের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ নিয়মত্রয় প্রণয়ন এবং মহাকর্ষের

নিয়ম আবিষ্কার ক'রে। বিজ্ঞানের সেই নবোন্মেষের যুগে, যেন নিবিড় জঙ্গলের ঘনান্ধকার মথিত ক'রে গম্ভীর স্বর উচ্চারিত হয়েছিল—"পথিক পথ হারিয়েছ? এস আমার সঙ্গে এস।" অন্ধকার তরল হলো, বিশ্বারণ্যে পথ আবিষ্কৃত হলো। পরীক্ষামূলক যুক্তিসমূহকে আঁকড়ে ধরার সুযোগ পেয়ে অনুসন্ধিৎসু মানবচিত্তে আশার আলো ফুটে উঠলো। তখন দেখা গেল, তরু গুল্ম লতাপাতাগুলি কেমন সারি দিয়ে পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের ঘটনা পুঞ্জ বিশৃঙ্খল নয়। আঁধারে হাতড়াবার প্রয়োজন নেই, হোঁচট খাবার আশঙ্কা নেই, সকলি ত একসূত্রে গাঁথা। বোঝা গেল, এই সূত্র কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার সূত্র এবং সমগ্র জড়জগতের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এরি বজ্র-কঠিন বাঁধনধারার অন্তর্নিহিত প্রাণপ্রবাহ ধ'রে, যা'র সুনির্দিষ্ট পথ-চিহ্ন থেকে এক পা স'রে দাঁড়াবার ক্ষমতা ধূলিকণা থেকে আরম্ভ ক'রে কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী ঐ সকল নক্ষত্র নীহারিকানিচয়ের কারুরই নেই।

গতির নিয়মত্রয়ের ভেতর দিয়ে নিউটন শিক্ষা দিলেন, জড়-বিশ্বের চিত্র প্রগতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল এবং সকল পরিবর্ত্তনের মূলে রয়েছে গতির পরিবর্ত্তন। স্পন্দনহীন মৃতজগৎ এ নয়। জড়দ্রব্য মাত্রেরই, হয় গতির দিক, অথবা গতিবেগের পরিমাণ অথবা উভয়ই ক্রমে বদলে যাচ্ছে এবং এই পরিবর্ত্তনে কোনরূপ ক্রমভঙ্গ নেই। আর এই সকল গতি পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজলে সর্ব্বত্রই দেখা যাবে যে, যেদিকে পদার্থবিশেষের বেগ বদলে যাচ্ছে ঐদিকে এবং ওর সমানুপাতে বাইরের থেকে অপর কোন পদার্থ ওর ওপর একটা Force বা 'বল' প্রয়োগ কর্চ্ছে। প্রযুক্ত 'বল'টা হলো কারণ এবং গতির পরিবর্ত্তন হলো তার ফল স্বরূপ, এবং উভয়ের মধ্যে সমানুপাতের সম্বন্ধ বিদ্যমান। বলটা প্রযুক্ত হয়ে থাকে সাধারণতঃ চাপ, টান, ধাক্কা ইত্যাদির আকারে। আবার যেখানে টানাটানি ঘটাবার মত কোন দড়াদড়ির সন্ধান আমরা পাইনে কিম্বা কে টান দিচ্ছে তা'ও বুঝতে পারিনে, সেক্ষেত্রেও যদি কোন পদার্থের গতির পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তবে ওর ওপর একটা টানের বা ধাক্কার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।

এখন আমরা দেখতে পাই যে, বৃন্তচ্যুত আম জাম প্রভৃতি ক্রমবর্দ্ধমান বেগে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়, আবার বহুদূর থেকে আকাশের চাঁদও ভূ-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে বর্দ্ধিত বেগে—যদিও অপেক্ষাকৃত কম হারে বেগ বাড়িয়ে—ভূ-কেন্দ্রাভিমুখে নেমে আসছে। বুঝতে হবে, উভয় ক্ষেত্রেই—যেমন আম জামের ওপর সেইরূপ চন্দ্রের ওপরও—পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে কেউ একটা 'বল' প্রয়োগ কর্চ্ছে, যদিও চন্দ্রের ওপর এই বলের প্রভাব কিছুটা কম মাত্রার। কে এই বল প্রয়োগ কর্চ্ছে? নিউটন অনুমান করলেন আমাদের পৃথিবীই (বা ওর অণু পরমাণুগুলি) ঐ সকল পদার্থের ওপর একটা বিশিষ্ট ধরনের আকর্ষণ-বল প্রয়োগ করে থাকে, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ফল-বলটা (Resultant force) প্রযুক্ত হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে। একে বলা যায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বল। বোঝা গেল, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলের প্রভাবে ঐ সকল পদার্থের গতির পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এই বলের প্রভাব কেবল ভূ-পৃষ্ঠেই নয়, অন্ততঃ চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব্যাপারটাকে আরো ব্যাপকতা দান ক'রে নিউটন অনুমান করলেন যে, জগতের প্রতি জোড়া জড় পদার্থ (বা জড়কণা) দূর থেকে পরস্পরের প্রতি একটা বিশিষ্ট ধরনের আকর্ষণ বল প্রয়োগ ক'রে থাকে এবং এই বল—যা' এখন মহাকর্ষ-বল (Force of Gravitation) আখ্যা প্রাপ্ত হলো—উভয়ের অন্তর্গত দূরত্বের বর্গের অনুপাতে হ্রাস পেতে থাকে। এই হলো নিউটন প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ মহাকর্ষের নিয়ম। দেখা যায়, নিয়মটা যেমন সংক্ষিপ্ত, ওর প্রয়োগ-ক্ষেত্র তেমনি ব্যাপক।

এই নিয়মের সত্যতার সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভূ-কেন্দ্র থেকে আম-জামের দূরত্ব যত * চন্দ্রের দূরত্ব তার প্রায় ৬০ গুণ, আর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফল এই যে, ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে আমজামের যে হারে বেগ বাড়ে চন্দ্রের বাড়ে তার ৬০-এর বর্গ বা ৩৬০০ ভাগের একভাগ মাত্র—অর্থাৎ মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে যে হারে বেগ বাড়বার কথা ঠিক সেই হারে। এইরূপে ভূ-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে পৃথিবীর অভিমুখে আমজামের গতির সঙ্গে চন্দ্রের গতির, সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে সূর্য্যাভিমুখে পৃথিবীর গতির সঙ্গে অন্যান্য গ্রহের গতির এবং নক্ষত্র প্রদক্ষিণ ব্যাপারে নক্ষত্র সমূহের পরস্পরাভিমুখী গতির তুলনা করে নিউটন প্রতিপন্ন করলেন যে, মহাকর্ষের নিয়মের প্রভাব জড়জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। মহাকর্ষ-বলরূপ একটা বলের অস্তিত্ব নিউটনের অনুমান মাত্র, কিন্তু জগতের প্রতি জোড়া জড়দ্রব্যের মধ্যে এইরূপ একটা বলের বিদ্যমানতা স্বীকার ক'রে, এই বলকে বিভিন্ন জড় জগতের গতিপরিবর্ত্তনের সাধারণ কারণ রূপে কল্পনা করে এবং এর প্রভাব দূরত্বের বর্গের অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এই নিয়মকে সত্য বলে অঙ্গীকার করে ঐ সকল জড়দ্রব্যের প্রত্যক্ষগোচর গতি-বিধির ব্যাখ্যাদান সহজেই সম্ভব হলো। ফলে সমগ্র জড়জগৎ এক-সূত্রে গ্রথিত হলো। মোটের এপর অকল্পিতপূর্ব্ব এক মহাকর্ষ-বলকে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা নিচয়ের গতি পরিবর্ত্তনের কারণ রূপে কল্পনা করার সুযোগ পেয়ে এবং নিউটন প্রবর্ত্তিত গতির নিয়ম এবং মহাকর্ষের নিয়মানুযায়ী এই কার্য্য ও কারণের মধ্যে দিক্-গত ও পরিমাণগত সম্বন্ধ নির্দ্দেশের সূত্র ধরে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজ কারণবাদকে একটা সুস্পষ্ট রূপ প্রদানে সক্ষম হলেন।

ক্রমে জনসাধারণেরও কারণবাদের ওপর বিশ্বাস দৃঢ় হলো। সবাই মেনে নিল ধূমকেতুর আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নয়, রাজার মৃত্যুর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রয়েছে শুধু বিশ্বব্যাপী এক মহাকর্ষ-বলের। ঐ ভবঘুরে পদার্থটি বহুসংখ্যক প্রদীপ্ত উল্কাপিণ্ডের সমষ্টিমাত্র। সূর্য্যের আকর্ষণে বদ্ধ হয়ে ঐ জ্যোতির্ম্ময় বস্তুপিণ্ড অধিবৃত্ত কিম্বা উপবৃত্তের বক্রাকার পথে সূর্য্যকে বেষ্টন করে আবার দূরে সরে যাবে। সূর্য্যগ্রহণে বিপদের আশঙ্কা নেই। মহাকর্ষের নিয়ম মেনে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে

* ভূ-কেন্দ্র থেকে আম-জামের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের সমান বা প্রায় চার হাজার মাইল আর চন্দ্রের দূরত্ব হলো তার প্রায় ৬০ গুণ অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল।

চন্দ্রের অস্বচ্ছ বস্তুপিণ্ড পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানটায় এসে পড়েছে, তাই সাময়িক ভাবে সূর্য্যের অবয়ব ঢাকা পড়েছে। এইটুকু বাদেই চন্দ্ররূপ মেঘের আড়ালে সরে যাবে, রাহুগ্রাসের কল্পিত বিপদ্ থেকে সূর্য্য মুক্ত হবে। মহাকর্ষের নিয়ম আমাদের জানা আছে, গ্রহ-উপগ্রহদের বর্ত্তমান অবস্থান ও গতিবেগও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা জানতে পারি। সুতরাং সুদূর অতীতে ওরা কে কোথায় ছিল এবং দূর ভবিষ্যতে কে কোথায় থাকবে কিম্বা কোন্ কোন্ সালের কোন্ কোন্ তারিখে ঠিক ক'টা বেজে কত মিনিটের সময় সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল ও ভবিষ্যতে হবে এবং পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থান থেকে তা' স্পষ্টরূপে দেখা গিয়েছিল বা যাবে তা' নির্ভুল রূপে হিসাব ক'রে বলবার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। জনগণ মেনে নিল, জগৎ-যন্ত্র যন্ত্র মাত্র, জাগতিক ঘটনাসমূহ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার কঠিন নিগড়ে পরস্পরের সাথে বদ্ধ, প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনা-পুঞ্জ পর মুহূর্ত্তের জনক, খণ্ডজগৎসমূহ পরস্পরের অধীন এবং এই অধীনতা ওদের নিয়তি, আকস্মিকতা কিম্বা খেয়াল খুশির প্রভাব জড়জগতের কোথাও নেই। অজ্ঞতা দূর কর, ভয় ও বিস্ময় আপনা থেকে অন্তর্হিত হবে। মানবচিত্তে এইরূপ সবল মনোভাব জাগিয়ে তুলে নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হলো।

এই ধরণের চিন্তার ফলে কারণবাদ বিজ্ঞানজগতে একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করলো এবং এর মূলকথা হলো এইরূপ :—জড়দ্রব্যসমূহের গতিপথ বাঁধাধরা নিয়মের অধীন, যার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হবার জো নেই। যদি বিশ্বের প্রতিটি জড়-কণার বর্ত্তমান অবস্থান ও গতিবেগ কেউ—পর্য্যবেক্ষণের ফলেই হোক বা যে-প্রকারেই হোক—ঠিকমত জানতে পারেন, তবে ঐ সকল জড়কণা অতীতের কোন্ মুহূর্ত্তে কে কোথায় ছিল এবং ভবিষ্যতের কোন্ মুহূর্ত্তে কে কোথায় থাকবে, তা' তিনি ঐ সকল নিয়ম অবলম্বনে, নির্ভুলরূপে গণে ব'লে দিতে পারবেন। জড়-বিশ্বের বর্ত্তমান চিত্র অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের চিত্রের ফলস্বরূপ এবং অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তের চিত্রের জন্মদাতা। এইরূপ অসংখ্য চিত্রের পর পর সজ্জা। এই পারম্পর্য্যের ভেতর কোথাও ফাঁক বা ক্রমভঙ্গ নেই। একে বলা যায় কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার সাজ, এবং এগিয়ে চলেছে এই সাজটা 'কাল' নামক এক অতীন্দ্রিয় একটানা পথ অবলম্বন ক'রে। এই সীমাহীন সাজের ঘটা, আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত, এক সুরে বাঁধা ; আকস্মিক বা খাপছাড়া ঘটনার স্থান এ-সাজের ভেতর নেই। বিশ্বগ্রন্থের পাতাগুলি পর পর উল্টে যাও, দেখবে প্রতি পত্রের শিরোদেশে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—'হতেই হবে'। 'হলেও হতে পারে' ব'লে কোন কথা এখানে নেই ; অথবা ওমর খৈয়ামের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলতে পারা যায় :

"Yea, the first morning of Creation wrote
What the last dawn of reckoning shall read."

এই হলো কারণবাদের সুস্পষ্ট উক্তি, বা প্রাণীজগৎ সম্পর্কে যাই হোক, জড়জগতের ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকল পদার্থ সম্পর্কেই সমভাবে খাটবে ব'লে প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ক'রে এসেছেন। আর আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, বিশেষ ক'রে হাইসেন-বার্গের অনিশ্চয়তাবাদ নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের সঙ্গে এই চির-নির্ভরতাভরা কারণবাদকেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হতে দূরে সরিয়ে দিতে অকম্পিত পদে অগ্রসর হয়েছে। এই নূতন মতবাদ স্পষ্টরূপেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, কেবল প্রাণীজগৎ সম্পর্কেই নয়, জড়জগতেও, ছোটদের গতিবিধি সম্বন্ধে, আমরা কোনক্রমেই একটা নিশ্চিত মত প্রকাশ করতে পারিনে এবং আমাদের এই অক্ষমতা প্রকৃতিরই অলঙ্ঘ্য বিধান।

আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, ইলেক্‌ট্রণের অবস্থান নিরূপণ করতে হোলে ওর গতিবেগ, কিম্বা গতিবেগটা ঠিকমত মাপতে গেলে ওর অবস্থান নিরূপণ একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেন অবস্থান এবং গতিবেগের যুগপত্তার ধারণাটাই অর্থহীন। আর এখন দেখছি, কারণবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই রাশিদ্বয়ের কোন একটা সম্পর্কে একটু মাত্র জ্ঞানের অভাব হলেও ইলেক্‌ট্রনটা সম্বন্ধে কোনরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না ; —হাজার বছর দূরের কথা, দু'দিন বাদেই ও কোথায় উপস্থিত হবে কিম্বা কি বেগে ছুটতে থাকবে তা কোন গণনাই ঠিকমত বলে দিতে পারে না। ফলে, অনিশ্চয়তাবাদ গ্রহণ করলে কারণ-বাদ মেনে নেওয়া সম্ভব বা সহজ হয় না। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বড়দের সম্বন্ধে যাই হোক ছোটদের সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বা সম্ভাবনা-বাদ এড়াবার উপায় আমাদের একেবারেই নেই। কারণ, আমরা দেখেছি, কেবল হাইসেনবার্গের মতবাদই নয়, ডি ব্রগ্‌লি ও স্রোডিনজারের তরঙ্গবাদ অনুসরণ করলেও আমাদের একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়। আমরা এও দেখেছি ঘোর-পরমাণুর অন্তর্গত ইলেক্‌ট্রনের লাফালাফিতে আর কোন সত্য না থাকলেও ওদের ব্যবহারে আমরা খেয়াল-খুসির স্পষ্ট পরিচয় পাই। আবার রেডিয়ম-পরমাণুর স্বতঃচূর্ণন ব্যাপারকেও আমরা কোনক্রমেই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতার অন্তর্গত করতে পারিনে। কোন্ কোন্ পরমাণু আজ ধ্বংস হবে এবং কোন্‌টা কোন্‌টা টিকে থাকবে বা কেন থাকবে তা কোনরূপেই আমাদের জানবার উপায় নেই,—অথচ বহুকোটি পরমাণুর সমষ্টির মধ্যে বছরে কতগুলি ক'রে ক্ষয় হবে, পরিমাপের ফলে তা' বেশ নির্ভুলরূপেই বলতে পারা যায়।

সুতরাং অনুমান করতে হয়, জড়জগতের খাঁটি নিয়মগুলির ভিত্তি সংস্থাপিত অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনাবাদের ওপর, এবং এর বিশেষ পরিচয় পাই আমরা ব্যষ্টির বা ক্ষুদ্রের ব্যবহারে ; আর সমষ্টির ব্যবহারে আমরা যে কারণবাদের নিশ্চয়তা ও ধারাবাহিক-তার পরিচয় পাই তা'ও আত্মপ্রকাশ করে, আমাদের অনুমান করতে হবে, সম্ভাবনাবাদকে গোড়ায় স্বীকার ক'রে নিয়ে এবং গড়-কষা গণিতের সূত্রগুলির মুখ তাকিয়ে। মোটের ওপর আধুনিক বিজ্ঞানের মত এই যে, কারণবাদের নিয়মগুলি সম্ভাবনা-বাদের নিয়মসমূহের বিশিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্র (limiting case) মাত্র ;—যেমন নিউটনীয় গতির নিয়ম ও মহাকর্ষের নিয়ম, আজ-

কের দিনে প্রতিপন্ন হচ্ছে, আইনষ্টাইনের মহাকর্ষের নিয়মের বিশিষ্ট প্রয়োগস্থলরূপে।

এর একটা সহজ উদাহরণ এইরূপ। চোখ বুঁজে একটা টাকা নিয়ে উর্দ্ধমুখে ছুঁড়ে দিলে টাকাটা চিত হয়ে কি উবুড় হয়ে মাটিতে পড়বে তা' আমি নিশ্চয় ক'রে কোন মতেই বলতে পারিনে। বড় জোর বলতে পারি ওর চিত এবং উবুড় হয়ে পড়ার সম্ভাবনা এবং প্রত্যেকটা সম্ভাবনাই অর্দ্ধ পরিমিত। কিন্তু এ-হিসাব আমার বিশেষ কোন কাজে লাগে না, এজন্য যে এ-নিয়ে কারু সঙ্গে বাজি রাখলে আমাকে একটা স্পষ্ট মত প্রকাশ করতে হবে। সহজেই দেখা যায়, উক্ত সম্ভাবনার হিসাবটা এ-বিষয়ে, এ-ক্ষেত্রে—একটা মাত্র টাকার বেলায়—কোন সাহায্যই করে না। কারণ, যদি বলি টাকাটা চিত হয়ে (কিম্বা উবুড় হয়ে) মাটিতে পড়বে তবে সত্য সত্য উবুড় হয়ে (কিম্বা চিত হয়ে) প'ড়ে টাকাটা আমাকে পূর্ণমাত্রায় অপ্রস্তুত করে দিতে পারে।

অন্যপক্ষে, যদি এককোটি টাকা নিয়ে ঐ ভাবে ছুঁড়তে থাকি তবে সম্ভাবনার নিয়ম আমাকে জানিয়ে দেয়, এ-ক্ষেত্রে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার পড়ার কথা চিত হয়ে এবং বাকি পঞ্চাশ লক্ষের উবুড় হয়ে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই সম্ভাবনা দু'টার যেটার অনুকূলেই মত দিই না কেন, তা'তে ক'রে বাজিতে আমার হারবার কথা নয়। আর হারলেও বড় জোর দু'চারটা টাকা সম্বন্ধেই গরমিল হতে পারে; সুতরাং তার জন্য একটুও অপ্রস্তুত না হ'লেও আমার চলতে পারে। এর অর্থ এই যে সম্ভাবনার নিয়ম থেকে ব্যষ্টির বেলায় না হ'লেও, সমষ্টির বেলায় আমরা যে একটা নির্ভুল বা প্রায় নির্ভুল মত প্রকাশ করতে পারি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করলেও একই ফল পাওয়া যাবে, কারণ গণ্তি করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিবারই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চিত হয়ে এবং প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উবুড় হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। আর একথাও অতি স্পষ্ট যে, টাকার সংখ্যা যতই বেশী হবে মত প্রকাশে ভুলের মাত্রাও ততই কমতে থাকবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সম্ভাবনার হিসাবটা একটা পুরাপুরি নিশ্চয়তার আকার ধারণ করবে। এইরূপে শত শত উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি, জীবনবীমার কারবারগুলি নিশ্চিন্ত মনে চলতে পারছে শুধু সম্ভাবনার নিয়মকে আশ্রয় করে। হঠাৎ মনে হতে পারে, এই নিশ্চয়তা কারণবাদের অলঙ্ঘ্য নিয়মের অভিব্যক্তি মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে সম্ভাবনাবাদের বিশিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছু মনে করা যায় না। ফলে, আজকের দিনে অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, কারণবাদের সত্যকার কোন ভিত্তি নেই, এবং প্রকৃতিতে আমরা যে নিয়মানুবর্ত্তিতা (Uniformity of nature) বা নিয়তির শাসন (Determinism) দেখতে পাই তা' বহুসংখ্যক খেয়াল-খুশির গড়ফল ভিন্ন আর কিছু নয়।

এতদিন আমাদের বিশ্বাস ছিল খামখেয়াল এবং অনিশ্চয়তার প্রভাব একমাত্র প্রাণী জগতেই বর্ত্তমান। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিল যে, খেয়ালখুশি জড়জগতেও বিদ্যমান এবং বিশেষভাবে বিদ্যমান অণু-পরমাণুদের ঘর-সংসারগুলির ভেতর। এই খেয়ালখুশিগুলি জগৎ-যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আত্মগোপন ক'রে ওর চাকাগুলিকে যেন দুমড়ে মুচড়ে বিকল ক'রে দিচ্ছে, এবং কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বাঁধনগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে জড়জগতের তথাকথিত যান্ত্রিক রূপকে পরিহাস কর্চ্ছে। জগৎ-যন্ত্রকে কতটা ওরা বিকল করতে সমর্থ হয় তা'র হিসাব পাই আমরা হাইসেন্‌বার্গের বৈগুণ্যের নিয়ম (১১নং সূত্র) থেকে। এই সূত্র আমাদের ব'লে দিচ্ছে যে, এই বিকলতা বা অনিশ্চয়তার মাত্রা বিশ্ব-যন্ত্রের সবগুলি চাকার পক্ষে সমান এবং সর্ব্বত্রই ওর মূল্য প্লাঙ্কের ধ্রুবক বা 'প'-এর সমান; যা'র পরিমাণ, পার্থিব কোন ব্যাপার সম্পর্কেই হোক কিম্বা সৌরমণ্ডল বা দূরবর্ত্তী কোন নক্ষত্র-জগতের ঘটনা সম্পর্কেই হোক—একটুও নড়চড় হবার উপায় নেই।

ক্ষুদ্রের অনুসন্ধানে অগ্রসর হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে জড়জগতের ওপর প্রভুত্ব নিয়ে আমরা গর্ব্ব ক'রে আসছি তা'র সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে সত্য নিরূপণের ক্ষমতা থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, এবং জড়ের ব্যবহার সম্পর্কে সত্য নির্ণয়ের ক্ষুদ্রতম মাপকাঠি হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক (বা 'প'), যা'র ওপারে যাবার ক্ষমতা আমাদের আদৌ নেই। আরো দেখতে পাচ্ছি যে, ব্যবহারিক সত্য সত্যের মর্য্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় শুধু গাণিতিক সত্যকে ভিত্তিরূপে অবলম্বনের অবসর পেয়ে—যে সত্যের কোন রূপ নেই, রস নেই বা বাস্তবতা বলতে আমরা যা বুঝি তার কিছুই নেই এবং যা' কারবার করে শুধু বস্তুতন্ত্রহীন কতগুলি সম্বন্ধ—কতগুলি সম্ভাবনার সূত্র বা অঙ্ক কিম্বা বাস্তবতার মুখোশ পরা কতগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন নিয়ে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিশ্বের পরমাণুপুঞ্জকে তরঙ্গরূপ দান ক'রে এবং এই তরঙ্গগুলিকে সম্ভাবনা-তরঙ্গরূপে কল্পনা ক'রে জড়বিশ্বের যান্ত্রিক-রূপকে মায়ার খেলা ব'লে উপহাস কর্চ্ছে, এবং ওর গাণিতিক রূপকেই একমাত্র সত্যকার রূপ ব'লে গর্ব্ব অনুভব কর্চ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোকের নব নব উন্মেষের দ্বারা সম্ভাবনার অনিশ্চয়তাকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দিয়ে, যেমন অন্তর্জ্জগতে সেইরূপ বহির্জ্জগতেও বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চিৎশক্তির জয় ঘোষণা করতে অগ্রসর হয়েছে।

মোটের ওপর আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, বাইরের জগৎটার সত্যকার রূপ গাণিতিক রূপ। গাণিতিক সত্যই খাঁটি সত্য, ব্যবহারিক সত্যের বস্তুতঃ কোন বাস্তব সত্তা নেই। এই গাণিতিক সত্য জাগতিক ঘটনাসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে কিন্তু ওদের বাস্তব রূপ সম্পর্কে কোন খবর দেয় না,—ইলেকট্রন্ কিম্বা অণুপরমাণুদের কণারূপে অথবা তরঙ্গরূপে কল্পনা করতে হবে, ইথর সত্যই আছে কি নেই, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ওদের সম্পর্কে যে মূর্ত্তিই আমরা কল্পনা করি না কেন, তা' করি শুধু কল্পনাকে একটা অবলম্বন দেবার জন্য এবং করি তা' সম্পূর্ণই নিজেদের দায়িত্বে। তা'তে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট এবং রয়েছে বলেই বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগে যুগে মত পরিবর্ত্তন ঘটছে। মাটির প্রতিমাকে বিশ্ববিধাতারূপে কল্পনা করলে যে ধরণের দোষ হয় তাঁর বিশ্ব-রচনার ফরমূলাগুলিতে বস্তুতান্ত্রিক ছাপ দিতে গেলেও সেই ধরণের দোষ ঘটে। জগতের যান্ত্রিকরূপ খাঁটি সত্যের সন্ধান দিতে নিজেকে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে প্রতিপন্ন

হয়েছে। বিশ্বগ্রন্থের রচয়িতাকে—যদি রচয়িতা কেউ থাকেন—কল্পনা করতে হবে বিশুদ্ধ গাণিতিক ঈশ্বর রূপে। তিনি স্বর্ণকার নন, কর্ম্মকার নন, ছুতোর, মিস্ত্রী, ইঞ্জিনিয়ার, এ সকলের কিছুই নন। তিনি কারবার করেন শুধু ১, ২, ৩, প্রভৃতি গণনার যোগ্য অঙ্ক এবং কতগুলি কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে। বিশুদ্ধ চিৎসত্তার ওপর সংখ্যা ফলিয়ে যেন "এক আমি বহু হব" এইরূপ একটা সংকল্প হয়ে রচিত হয়েছে এই বিশ্ব। ফলে, কেবল প্রাণী-জগৎ সম্পর্কেই নয়, জড়জগৎ সম্পর্কেও স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব ও প্রভাবকে—তা' ব্যক্তিগতই হোক বা সমষ্টিগতই হোক—কারণবাদের প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মিথ্যা কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু সত্যই কি কারণবাদ ও অনিশ্চয়তাবাদ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী? উভয় মতবাদকে কি কোন ক্রমেই একাসনে স্থান দেওয়া যায় না? কারণবাদ অস্বীকার করার অর্থ আবার সেই সংশয়-সমাকুল বিস্ময়-বিমূঢ়তার যুগে ফিরে যাওয়া এবং "যা খুশি হোক্ গে" বলে অদৃষ্টের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে চুপ করে বসে থাকা,—যা বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক কারুর ধাতের সঙ্গেই খাপ খায় ব'লে স্বীকার করা যায় না। প্লাঙ্ক ও আইনষ্টাইন্ এবং পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ কারণবাদকে অস্বীকার করেন না; পরন্তু অণুপরমাণুদের সংসারেও ওর প্রভাব কি ভাবে খাটতে পারে তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ দানে সক্ষম না হলেও পূর্ণমাত্রায় খাটছে ব'লে বিশ্বাস করেন। ফলে বিদ্বৎসমাজকে আজ এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে—ক্ষুদ্রের চালচলনের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিগুলোকে কি কারণবাদের নিয়মশৃঙ্খলার অন্তর্গত করা অসম্ভব? মানবচিত্তের খেয়ালখুশি সম্পর্কে এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কান্তকবি রজনীকান্ত ঊর্দ্ধদিকে তাকাবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন:—

> "লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
> জানি না কখন্ ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে;
> বিশ্ববিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
> (তব) শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।"

মত্তবাসনাগুলিকে গুছিয়ে নেবার জন্য আমাদের তাকাতে হবে ওপরের দিকে। বর্ত্তমান যুগের বহু বৈজ্ঞানিক জড় বিশ্বের একজন নিয়ন্তা স্বীকার করেন এবং তাঁকে কল্পনা করেন, আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, নিছক গাণিতিক ঈশ্বররূপে। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জীন্সের কয়েক বৎসর আগেকার একটা উক্তি এই:

"We discover that the universe shows evidence of a designing or controlling power that has something in common with our own individual minds—not, so far as we have discovered, emotion, morality or aesthetic appreciation, but the tendency to think in the way which for want of a better word, we describe as mathematical. And while much in it may be hostile to the material appendages of life, much also is akin to the fundamental activities of life; we are not so much strangers or intruders in the universe as we at first thought." (Jeans—'The Mysterious Universe)"

বোর ও জিনস্‌প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের অনুমান এই যে, মানব-সমাজের ওপর যাই হোক, কারণবাদের প্রভাব জড়জগতের সর্ব্বত্র এমন কি অণু-পরমাণুদের চালচলনেও, পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু সর্ব্বত্রই কারণ খুঁজতে হবে ওপরের দিকে তাকিয়ে। এঁদের মত এই যে, ক্ষুদ্রের ব্যবহারে আমরা যে অনিশ্চয়তা বা খাম-খেয়ালের পরিচয় পাই তা আমাদের দৃষ্টির ভুল মাত্র। ওদের ব্যবহার খাপছাড়া মনে হয় এ জন্য যে, ওদের চালচলনগুলিকে আমরা সম্পূর্ণ রূপেই আমাদের দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভেতর টেনে এনে কেবল অবস্থান ও গতি-বেগের বর্ণনা দ্বারা ওদের ব্যবহার নির্দ্দেশ করতে চাই। প্রাকৃত ঘটনা সমূহকে আমরা মূল কারণ থেকে এইরূপ বিচ্ছিন্ন করে দেখছি বলেই ওদের ব্যবহারে অনিশ্চয়তা এসে পড়েছে। দেশ কালের বাইরে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে, তবেই ওদের খাপছাড়া চাল-চলনগুলিকে আদি কারণের সঙ্গে যুক্ত করে গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে; অর্থাৎ রজনীকান্তের ভাষায়—"যাও নিখিল 'কেন'র মূল কারণে, (সে) "রেখেছে কালের খাতায় লিখে।"

এই ধরণের ভুল সম্বন্ধে জীনসের একটা উদাহরণ এইরূপ। এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। মাটির কোন কোন জায়গা ভিজলো কোন কোন জায়গা ভিজলো না। ওপরের দিকে কেউ তাকালাম না। বৃষ্টি কি, কোত্থেকে আসে, কেন, কি ভাবে আসে, কেউ তার খোঁজ নিলাম না; শুধু মাটির দিকে তাকিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেম। মেপে জুখে বললেম, এইখানটায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলি বেশ ঘনসন্নিবিষ্ট- প্রতিবর্গ ফুটে বিশটা ক'রে; ওখানে ওরা খুব ফাঁক ফাঁক—প্রতিবর্গ ফুটে পাঁচটা ক'রে; আর খুব দূরে গেলে কোথাও এক ফোঁটা জল দেখা যায় না। কি যে ব্যাপার ঠিক বোঝা যায় না। এইমাত্র বোঝা যায় যে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলির সাজের ভেতর একটাকে অপরটার কারণ ব'লে স্বীকার করা যায় না। ওদের পরস্পরের ভেতর কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা রূপে কোন যোগসূত্র নেই। সুতরাং কোন স্থান ভিজবে কি ভিজবে না বা কি মাত্রায় ভিজবে তা' নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় হচ্ছে, উক্ত পরিমাপের ফলগুলিকে একত্র ক'রে সম্ভাবনার সূত্র প্রয়োগ করা বা গড়-কষা ব্যাপারে মন দেওয়া। কিন্তু কেউ যদি সাহস ক'রে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবেই মূল কারণের আবিষ্কার দ্বারা—সূর্য্যোদয়ে রাত্রির অন্ধকারের মত----অনিশ্চয়তার অন্ধকার দূর হ'তে পারে।

কিন্তু সে সাহস হবে কার? পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজকে তাই আজ আবার কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। পুনঃ পুনঃ এই সমস্যা। বিস্ময়ের যুগের পর এলো কারণবাদের যুগ। তার বার্ত্তা বহন ক'রে এলেন গ্যালিলিও ও নিউটন। তারপর রুমফোর্ড, জুল, ফ্যারাডে, ম্যাকস্‌ওয়েল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের কারবারের ক্ষেত্র জড়বিজ্ঞান থেকে তাপ আলোক ও তাড়িত বিজ্ঞানে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করলো। ফলে,

আবার সমস্যা দেখা দিল—এই সকল বিভিন্ন ব্যাপারের নিয়ম-কানুনের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের প্রশ্ন নিয়ে। দেখা গেল, নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের ছাঁচে সমগ্র জাগতিক ব্যাপারকে রূপ দেওয়া যায় না,—নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রয়োজন। এলেন আইনষ্টাইন—ভূমার পরিকল্পনায় নূতন রঙ ফলাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, এলেন প্লাঙ্ক—ক্ষুদ্রের মাহাত্ম্যের বিশ্বব্যাপিতার বার্ত্তা নিয়ে। কিন্তু সমস্যা তাতেও দূর হ'ল না। ক্ষুদ্রের ব্যবহারে নানা দিক্ থেকেই খেয়ালখুশির পরিচয় পাওয়া গেল। এলেন ডিব্রগলি, শ্রোডিন্‌জার ও হাইসেন্‌বার্গ। ফলে বিস্ময় এবং অনিশ্চয়তার যুগের চিন্তাধারা আবার ফিরে এলো। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে চিরদিনের জন্য ডুবে থেকে গড়-কষা কার্য্যকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বনরূপে মেনে নিতে রাজী হচ্ছেন না, অথচ এ অবস্থা থেকে আশু মুক্তির উপায়ও খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা স্পষ্ট অনুভব কর্চ্ছেন বিশ্বারণ্যের গভীর অন্ধকার আজও তরল হয়নি, তাই আবার ঐ ডাক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা কর্চ্ছেন—"পথিক, পথ হারিয়েছ?—এস আমার সঙ্গে এস"। (সমাপ্ত)

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(উনিশ)

৫৫। অভিধান-কোশ—টীকাকার কেবল দৃষ্টান্তরূপে একটি কোশের নামোল্লেখ করিয়াছেন—উৎপলমালা ইত্যাদি। আদি বলিতে বুঝায়—অমরকোষ, মেদিনী, বৈজয়ন্তী ইত্যাদি। 'অভিধান-কোশ' শব্দটি রাজশেখরও ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্য-মীমাংসার 'কবিচর্য্যা'-'রাজচর্য্যা'-প্রকরণে তিনি বলিয়াছেন—'নাম-ধাতু-পারায়ণ, অভিধান-কোশ, ছন্দোবিচিতি ও অলঙ্কারতন্ত্র—এই চারিটি কাব্যের বিদ্যা; আর চতুঃষষ্টি কলা কাব্যের উপবিদ্যা'।[১] পক্ষান্তরে, মহর্ষি বাৎস্যায়নের মতে—অভিধান-কোশ, ছন্দোজ্ঞান ও অলঙ্কারক্রিয়া কাব্যের উপকারিণী বিদ্যা নহে—চতুঃষষ্টি ললিত-কলারই তালিকাভুক্ত। এমন কি, কাব্যক্রিয়া স্বয়ংও অন্যতম কলাবিশেষ। (অবশ্য যাঁহাদিগের মতে 'কাব্যক্রিয়া' স্বতন্ত্র কলা নহে 'মানসী কাব্যক্রিয়া' একটি কলা, তাঁহাদিগের মত ভিন্ন।) অভিধান যাহার দ্বারা উচ্চারণ করা যায়—বলা যায়—তাহাই অভিধান বা নাম। 'কোশ' অর্থে সংগ্রহ। অতএব অভিধান-কোশ অর্থে নাম-মালা—lexicon.

৺তর্করত্ন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—"বিবিধ অভিধান-গ্রন্থ-জ্ঞান, প্রচলিত অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থজ্ঞান"। 'গ্রন্থ-জ্ঞান', 'অর্থ-জ্ঞান' ইত্যাদিরূপ অর্থ পাওয়া যায় কিরূপে। অভিধান অর্থে নাম, কোশ অর্থে সমষ্টি বা সংগ্রহ।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই কলা ও পরবর্ত্তী কলাটিকে মিলাইয়া এক করিয়া নাম ধরিয়াছেন—"কোষচ্ছন্দোবিজ্ঞান—শব্দ-শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া"। দুইটি কিন্তু ভিন্ন বিষয়। কোষ ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ, ছন্দঃ অন্য শ্রেণীর গ্রন্থ—এক সূত্রে গাঁথা যায় কোন্ প্রমাণে?

৺সমাজপতি মহাশয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুনরুক্তি করিয়াছেন—"শব্দশাস্ত্রবিদ্যা"।

৺সিংহ মহাশয়ের মতে—"অমর, হেম (হেম নহে—হৈম), বিশ্ব প্রভৃতি অভিধান অভ্যাস করা"।

অভ্যাস করা—এ অংশটুকু আসে কোথা হইতে?

ম-মঃ ডক্টর আচার্য্য মহাশয়ের মতে "শব্দের প্রতিশব্দসমূহ সংগ্রহ করিয়া বলা"। কেবল প্রতি-শব্দ-সংগ্রহ বলিলেই চলিত।

বল্লভাচার্য্য একটু নূতন রকমের অর্থ করিয়াছেন। কেহ কোন বিষয় যে ভাষায় যে ভাবে বলেন, ঠিক সেই ভাষায় সেই ভাবে সেই বিষয়ের পুনরুক্তি। যিনি ইহা পারেন—তিনিই 'শ্রুতিধর'।

৫৬। ছন্দোজ্ঞান—টীকাকারের মতে পিঙ্গলাদি-প্রণীত ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান। পিঙ্গলমুনির রচনা—'পিঙ্গলছন্দঃ-সূত্র' বৈদিক ও লৌকিক ছন্দঃসম্বন্ধীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ। প্রাকৃত ছন্দঃসমূহের প্রামাণিক বিবরণ-গ্রন্থ 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'। সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের জ্ঞান—এই কলাটির বিষয়। বৈদিক মন্ত্রের ছন্দঃ না জানিলেও ততদূর ক্ষতি হয় না; কিন্তু লৌকিক শ্লোকের ছন্দোজ্ঞান না থাকিলে রসিক-সমাজে স্থান হওয়াই দুষ্কর। ছন্দঃ ও যতি না জানা থাকিলে কাব্য ঠিক তাল রাখিয়া পড়া যায় না, লোক-সমাজে লজ্জা পাইতে হয়। রাজশেখরের 'ছন্দোবিচিতি' এই কলাটিরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে "বিবিধ ছন্দে শব্দ-যোজনা-সামর্থ্য। টীকাকার বলেন, পিঙ্গলাদি-প্রণীত ছন্দঃশাস্ত্রজ্ঞান, কিন্তু সেই ছন্দঃ বেদের অঙ্গবিদ্যা, তাহাকে কামসূত্রের অঙ্গবিদ্যা মধ্যে নিবিষ্ট করা আমার উচিত বোধ হয় না।"

তর্করত্ন মহাশয়ের বোধ হয় হুঁস্ ছিল না যে—পিঙ্গলছন্দঃ-সূত্রে কেবলই বৈদিক ছন্দঃসমূহের বিবরণ নাই, লৌকিক ছন্দঃ সম্বন্ধেও লক্ষণ-বিবরণাদি প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর আর এক কথা—এই চতুঃষষ্টি ললিত-কলাকে কেবল 'কামসূত্রের অঙ্গবিদ্যা' বলিয়াই তর্করত্ন মহাশয় ধরিতেছেন কেন? বাৎস্যায়ন ইহা-দিগকে কামসূত্রের অঙ্গবিদ্যা বলিলেও এই চতুঃষষ্টি কলা (ঈষৎ পরিবর্ত্তিতাকারে) ত শ্রীমদ্ভাগবতে ও শৈবতন্ত্রাদি গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি ললিত-কলা ত সাধারণ শিক্ষারই অঙ্গ। গণিকা-গোষ্ঠীতে উহার বিশেষ সমাদর ছিল বলিয়াই কি উহা অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়িবে? এ কিরূপ যুক্তি? তাহা ছাড়া—যদি গোষ্ঠীতেও কেহ বৈদিক ও লৌকিক ছন্দঃ সম্বন্ধে নিপুণতা প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা কি কলা-নৈপুণ্যের নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইবে না?

---

১ কাব্যমীমাংসা, কবিরহস্য, দশম অধ্যায়।

৺সিংহ মহাশয়ের মতে—"শিক্ষা প্রভৃতি ছন্দঃশাস্ত্র অভ্যাস করা।"

শিক্ষা ছন্দঃশাস্ত্র নহে। উহা শব্দতত্ত্ব (phonetics)।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর আচার্য্যের মতে—"সাধারণ অর্থে ছন্দঃ জানা ও ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করা। কিন্তু যশোধরের মতে ইহার অর্থ কোন যুবা পুরুষকে দেখিবামাত্রই তাহার ছন্দোজ্ঞান ও চিত্তবৃত্তি যুবতীর অনুমান করিয়া লওয়া।"

আমরা যশোধরের যে যে সংস্করণ দেখিয়াছি তাহাতে উক্তরূপ অর্থ পাই নাই; পাইয়াছি মাত্র এইটুকু—"পিঙ্গলাদি-প্রণীতস্য ছন্দসো জ্ঞানম্" উহার অর্থও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বল্লভ বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ—কোন লোককে দেখিলে তাহার ছন্দ (ছন্দঃ নহে) অর্থাৎ মনের ভাব বুঝিতে পারা—ইনি এই প্রকৃতির লোক। 'ছন্দ' শব্দের অর্থ মনের অভিপ্রায়। কামশাস্ত্রে এ কলার বিশেষ উপযোগিতা। অনুরাগী হইবার পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার পরস্পর মনোভাব বুঝিতে শিক্ষা করা প্রয়োজন।

এই কারণে আমাদের মনে হয় যে, বল্লভের অর্থ যশোধরের নামে চালাইয়া ম-মঃ ডক্টর আচার্য্য 'উদোর পিণ্ডি' 'বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন।

৫৭। ক্রিয়াকল্প—টীকাকারের মতে—"কাব্য-করণ-বিধি—কাব্যালঙ্কার—ইহাই তাৎপর্য্য। অভিধানকোশ, ছন্দোজ্ঞান ও ক্রিয়াকল্প—এই তিনটিই কাব্যক্রিয়ার অঙ্গ ও পরকীয়-কাব্য-বোধের উপযোগী"।২

ক্রিয়া-কল্প অর্থে—কার্য্য করিবার পদ্ধতি। এখন প্রশ্ন—এ কার্য্যটি কিরূপ কার্য্য? উত্তর—কাব্য-রচনা-রূপ ক্রিয়া বা কার্য্য। পুনরায় প্রশ্ন—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ৫৪নং কলাটি ত 'কাব্য-ক্রিয়া'—ইহার সহিত পুনরুক্তি ঘটে। (অবশ্য যাঁহারা 'মানসী কাব্যক্রিয়া'—একই কলা বলিয়া ধরেন, তাঁহাদিগের মতে এ দোষ হয় না)। এই কারণেই টীকাকার উভয় কলার মধ্যে পার্থক্য দেখাইলেন—'কাব্যক্রিয়া'র অর্থ কাব্য রচনা, আর 'ক্রিয়া-কল্প'—কাব্যক্রিয়ার বিধি—কিরূপে কাব্য রচনা করিতে হয়—তাহার জ্ঞান, অর্থাৎ—অলঙ্কার-শাস্ত্রের জ্ঞান। স্বয়ং কবিতা রচনা করিতে যাইলে অথবা পরকীয় কাব্যের রস উপলব্ধি করিতে হইলে—এই কলার জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। এদিক্ হইতে—রাজশেখরের অলঙ্কার-তন্ত্র নামক কাব্যবিদ্যার সহিত এই কলাটির অভিন্নতা ধরা যাইতে পারে।

৺তর্করত্ন মহাশয় টীকাকারকে দোষ দিয়াছেন—"কাব্য-রচনায় সামর্থ্য। টীকাকার বলেন—কাব্যালঙ্কার। আমি বলি—কাব্যরচনাসামর্থ্য হইতেই অলঙ্কারাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়; নতুবা কাব্যালঙ্কার বলিলেও রস-ভাব ইত্যাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না—তাহা যদি ঐ পদদ্বারাই প্রাপ্ত বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে কাব্য-রচনা-সামর্থ্য হইতেই অলঙ্কারাদিজ্ঞানের গ্রহণে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। দৃশ্য ও শ্রব্য—দ্বিবিধ কাব্যরচনাই 'ক্রিয়া-কল্প' কলার অন্তর্গত।"

'কাব্য-রচনায় সামর্থ্য' ত আর একটি কলা হইতে পারে না। 'সামর্থ্য'—জন্মান্তর কৃত কর্ম্মের ফল। উহা যাহার আছে, তাহারও পক্ষে কবিতা-রচনার অনুশীলন প্রয়োজন। এই অনুশীলনই কলা। অনুশীলনের সহায়, উপায় বা অঙ্গ হিসাবে—অভিধান-কোশ ও ছন্দোজ্ঞানের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে; অবশিষ্ট—অলঙ্কার শাস্ত্র,—উহাই এই কলাটির বিষয়। এ বিষয়ে রাজশেখরের মতের সহিত এ মত মিলিয়া যাইতেছে—তবে রাজ-শেখর অভিধান, ছন্দঃ, অলঙ্কারকে 'কাব্যবিদ্যা' বলিয়াছেন—আর কামসূত্রমতে উহারা কলার অন্তর্গত—ইহাই প্রভেদ। তাহার পর, আর একটি কথা। তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—'কাব্যালঙ্কার বলিলেও রসভাব ইত্যাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না'। খুব কড়াকড়ি করিলে পাওয়া না যাইতে পারে, কিন্তু একটু শিথিল দৃষ্টিতে দেখিলে—অলঙ্কারের পুস্তকমাত্রেই রস-ভাব বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্যই পাওয়া যায়।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পাঠ—'ক্রিয়া-বিকল্প'। অর্থ করিয়াছেন—"একটি কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করা"। এ বিষয়ে ইনি বল্লভের অনুগামী বলিয়া বোধ হয়—বল্লভও ঐ পাঠ ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন—বস্তুসমূহ নির্ম্মাণের পূর্ব্ব-সিদ্ধ প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া নূতন নানা প্রকারে উহাদিগের নির্ম্মাণপ্রণালী শিক্ষা।

৺সমাজপতি-মতে—ঐ পাঠ, অর্থ—"নানাবিধ উপায়ে কাজ করিতে শেখা"।

৺সিংহ মহাশয়ের মতে—"অলঙ্কার ও কাব্যশাস্ত্রের অভ্যাস ও জ্ঞান"।

ম-মঃ ডক্টর আচার্য্যের মতে—"ধাতুরূপ প্রভৃতি ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র শিক্ষা"।

'ক্রিয়া' অর্থে সম্ভবতঃ 'ধাতু' বুঝিয়া এই ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে।

৫৮। ছলিতক-যোগ—টীকাকারের মতে ইহা পরবঞ্চনার্থক। এ সম্বন্ধে তিনি দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—তদ্রূপ অন্যরূপ দ্বারা সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত করিয়া যে বঞ্চনা—দেবতা বা দেবভিন্ন-রূপে ইহার প্রয়োগ দ্বিবিধ—ইহার নাম 'ছলিত'। ইহার দৃষ্টান্ত—শূর্পণখা দিব্য রূপধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছিল; আর ছলিতের বিষয় শুনা না থাকা সত্ত্বেও বায়ুনন্দন (হনুমান্ অদিব্য ব্রাহ্মণ-রূপে) রামকে ও বায়ুনন্দন (ভীম অদিব্য নারীমূর্ত্তিতে) কীচককে (ব্যামোহিত করিয়াছিলেন)।

নিজ রূপের গোপনপূর্ব্বক অন্যরূপে আত্মপ্রকাশ দ্বারা যে বঞ্চনা তাহাই 'ছলিতক'। উহা দ্বিবিধ—(১) দিব্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করা যায়—উহাতে প্রয়োজন মায়ার; মায়াবী মায়াবলে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া অপরকে বঞ্চিত করে, যেমন শূর্পণখা মায়া-বলে দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের ব্যামোহ উৎপাদন করিয়াছিল। (২) দ্বিতীয়তঃ অদিব্য রূপেও আত্মপ্রকাশ করা যায়—উহাতে বেশ-ভূষাদি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। বায়ুপুত্র

২ "কাব্যকরণবিধিঃ। কাব্যালঙ্কার ইত্যর্থঃ। ত্রিতয়মপি কাব্যক্রিয়াঙ্গং পরকাব্যাববোধার্থক"—জয়ম।

হনুমান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে প্রথম শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর দৃষ্টান্ত—বায়ুরই আর এক তনয় ভীমসেন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া কীচককে প্রতারিত করিতে পারিয়াছিলেন। যোগ—উপায়। পরবঞ্চনার উপায়ই ছলিত।

কিছুদিন পূর্ব্বেও এদেশে এ কলাটির বহু প্রচলন ছিল। ইহাকে বলা হইত 'বহুরূপী' সাজা। এখনও অনেকে পোষাক রঙ, পরচুলা ইত্যাদির সাহায্যে নানাবিধ রূপান্তর বা ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইয়া থাকেন। অভিনয়ের রূপসজ্জাও ইহারই অন্তর্গত।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"পর-বঞ্চনার্থ রূপান্তর গ্রহণাদি কৌশল, বহুরূপী সাজা"।

৺বেদান্তবাগীশ—"পরপ্রতারণার কৌশল"।

৺সমাজপতি—বেদান্তবাগীশের পুনরুক্তি মাত্র।

৺সিংহ—"ছলনা করিয়া রূপান্তর ধারণ করত অন্যকে প্রতারিত করা (বোধ হয় সং দেওয়া)।"

মমঃ ডক্‌টর আচার্য্য—"প্রবঞ্চনা ও ছলনা প্রভৃতি শিক্ষা করা। যশোধরের মতে—ইহাও একরূপ সংক্ষেপার্থ কবিতা-বিশেষ এবং ইহার উদ্দেশ্য প্রবঞ্চনা করা"।

যশোধর কোথায় বলিলেন যে—ইহা "সংক্ষেপার্থ কবিতা বিশেষ"? যশোধরের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল৩।

৫৯। বস্ত্র-গোপন—টীকাকার গোপনের তিনটি প্রক্রিয়া বলিয়াছেন—(১) বস্ত্র-দ্বারা অপ্রকাশ্য দেশের এরূপ ভাবে আবরণ (সংবরণ) যেন তাহা কম্পিত (বা চালিত) হইলেও সেই স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়; (২) ছিন্ন বস্ত্রের অচ্ছিন্নের ন্যায় পরিধান; ও (৩) বৃহৎ বস্ত্রের সংবরণ (সঙ্কোচনাদি) দ্বারা অল্পীকরণ।—এই সকল গোপনের প্রকারভেদ।৪

৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—"বস্ত্রদ্বারা অপ্রকাশ্য দেশের এরূপ ভাবে সংবরণ করিতে পারা যায় যে, সে বস্ত্র বারংবার পরিচালিত, উৎক্ষিপ্ত, অবক্ষিপ্ত ও আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইলেও সে স্থান হইতে স্খলিত না হয়"।

৺তর্করত্ন মহাশয়ও সংক্ষেপে বলিয়াছেন—"(১) এমন ভাবে বস্ত্র পরিধান করা হইত—যাহাতে লজ্জাস্থান সংবৃতই থাকিত। বিবস্ত্র না হইলে লজ্জাস্থান প্রকাশিত হইত না। (২) ছিন্ন বস্ত্রের অচ্ছিন্নবৎ (৩) দীর্ঘবস্ত্রকে ক্ষুদ্রবস্ত্রবৎ সঙ্কুচিতভাবে রক্ষা। ইত্যাদি"।

৺বেদান্তবাগীশ—"এক বস্ত্র লইয়া অন্য প্রকার বস্ত্র দেখান। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্র করিয়া দেখান। এ শিল্পটির মর্ম্ম আমরা বুঝিতে অক্ষম"।

৺সমাজপতি মহাশয় এইবার কেবল ৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের হুবহু নকল না করিয়া বলিয়াছেন—

"ইহার অর্থ জানা যায় না।"

৺সিংহ—ইনি মহেশ চন্দ্র পালের অনুসরণ করিয়াছেন— বস্ত্র দ্বারা অপ্রকাশ্য দেশ এরূপ ভাবে বৃত করা যায় যে, সেই বস্ত্র বারংবার উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা আকুঞ্চিত প্রসারিত করিলেও সেই স্থান হইতে বস্ত্র স্খলিত হইবে না। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডকে অচ্ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় প্রদর্শন। বিশাল বস্ত্রকে অল্পীকরণ প্রভৃতির কৌশল।"

ছিন্ন বস্ত্রকে অচ্ছিন্ন দেখাইবার কৌশল—ইহার দুইরূপ অর্থ হয়—(১) এরূপ ভাবে ঘুরাইয়া চাপাচুপি দিয়া ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করা যায় যে, উহা যে ছিন্ন তাহা কেহ বুঝিতে পারে না,—টীকাকারের এই মত; (২) সকলের সম্মুখে বস্ত্র ছিন্ন করিয়া পুনশ্চ উহাকে অচ্ছিন্নরূপে প্রদর্শন—ইহা এক প্রকার ভোজবাজি।

মমঃ ডক্‌টর আচার্য্য—"সাধারণতঃ ইহার অর্থ সূতার কাপড়কে রেশমী কাপড়ের মত প্রদর্শন করান। কিন্তু যশোধর এখানেও কামের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। ত্রুটিত বস্ত্রকে অত্রুটিতরূপে দেখান, বড় কাপড় হইলেও এরূপ ছোট করিয়া পরিধান করা—যেন যুবতীর লোভনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশেষ অপরের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।

ডক্‌টর আচার্য্যের প্রথম অর্থটি ত ৺বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রসাদ-লব্ধ। যশোধরের উপর যে দোষারোপ তিনি করিয়াছেন, যশোধর তাহার ভাগী হইতেই পারেন না—কারণ তিনি এ প্রসঙ্গে কামবিলাস মোটেই দেখান নাই। ত্রুটিত বস্ত্রকে অত্রুটিতরূপে দেখাইয়া পরিধান করিলে কি 'লোভনীয় অঙ্গ' দৃষ্টিগোচর হয়—না চাপা পড়ে? তাহার পর বৃহৎ বস্ত্রকে অল্পবৎ প্রদর্শন—ইহাতেও 'যুবতীর লোভনীয় অঙ্গ' দৃষ্টিতে পতিত করাইবার অল্প একটু ইঙ্গিতও যশোধর করেন নাই। তাঁহার উপর এ দোষ দিলে দোষটি (দৃষ্টিভঙ্গীটি) দোষদাতার নিজের বলিয়াও অনুমিত হইতে পারে!

৬০। দ্যূতবিশেষ—টিকাকার বলিয়াছেন—প্রাপ্তি প্রভৃতি পঞ্চদশ-অঙ্গ-বিশিষ্ট মুষ্টিক্ষুল্লকাদি দ্যূতবিশেষ—এগুলি নির্জ্জীব দ্যূতের দৃষ্টান্ত।" *

দ্যূত বা জুয়াখেলা নানারূপ হইলেও উহাদিগের মোট শ্রেণী-বিভাগ দুইটি মাত্র—সজীব ও নির্জ্জীব। সজীব দ্যূতের একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে—মেষ-কুক্কুটশাবক যুদ্ধ-বিধি (৪২ নং কলা)।৬ এখানে নির্জ্জীব দ্যূত-বিধান বলা হইয়াছে।

---

৩ "পরব্যামোহনার্থাঃ। যথোক্তম্—তদ্রূপমন্যরূপেণ সম্প্রকাশ্য হি বঞ্চনম্। দেবেতর-প্রয়োগাভ্যাং জ্ঞেয়ং তচ্ছলিতং যথা। দিব্যং শূর্পণখা রূপং ব্যচরদ্ বায়ুনন্দনঃ। ছলিতং চানভিজ্ঞত্য শ্রুত্বা রামঞ্চ কীচকম্"।

—এই কারিকার কোন্ স্থলে 'সংক্ষেপার্থ কবিতা' রচনার কথা রহিয়াছে—বুঝা গেল না।

৪ "বস্ত্রেণাপ্রকাশ্যদেশস্য সংবরণং যথা তদ্ভ্রমানমপি তস্মান্নাপৈতি। ত্রুটিতস্যাত্রুটিতস্যেব পরিধানম্। মহতো বস্ত্রস্য সংবরণাদিনাল্পীকরণম্। ইতি গোপনানি"। —জয়মঃ

৫। নির্জ্জীবদ্যূতবিধানমেতৎ। তত্র যে প্রাপ্ত্যাদিভিঃ পঞ্চদশভিরঙ্গৈর্মুষ্টিক্ষুল্লকাদয়ো দ্যূতবিশেষাঃ প্রতীতার্থাঃ।" জয়ম।

৬। বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন, ১৩৫১—ললিতকলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* এ যুগের সজীব দ্যূতের সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—ঘোড়দৌড়।

সজীব পদার্থকে কোন পশু, পক্ষী এমন কি মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া যে জুয়াখেলা চলে, তাহাই সজীব দ্যূত। আর নির্জীব পদার্থ (যেমন তাস, পাশা ইত্যাদি) আশ্রয় করিয়া যে দ্যূত চলে, তাহাই নির্জীব দ্যূত। মুষ্টি-ক্ষুল্লকাদি দ্যূত বা প্রাপ্তি ইত্যাদি তাহাদিগের অর্থ যে কি পদার্থ—তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা বর্ত্তমানে একরূপ অসম্ভব।৭

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"তাহা বিবিধ, 'পরমুঠ' 'প্রেম্নারা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে রাজকীয় দ্যূতবিভাগ ছিল, তাহার পারিপাট্য অল্প ছিল না"।

পূর্ব্বে কেন—এখনও আছে, ঘোড়দৌড় তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

৺বেদান্ত বাগীশ ও ৺সমাজপতি—"নানাপ্রকার জুয়াখেলা"।

৺সিংহ—"নানাপ্রকার খেলা—পাশা দাবা ইত্যাদি"।

শুধু 'খেলা' বলিলে ত চলিবে না—জুয়াখেলা বলিতে হইবে। 'পাশ'—পরবর্ত্তী কলার অন্তর্গত।

মমঃ ডঃ আচার্য্য—"জুয়াখেলা"।

৬১। আকর্ষক্রীড়া—টীকাকার বলেন—"ইহা পাশা খেলা। উহা দ্যূতবিশেষ হইলেও উহার বিশিষ্টভাবে পুনরুক্তি করা হইয়াছে—উহার প্রতি আদর দেখাইবার উদ্দেশ্যে। অথবা, এ কথাও বলা চলে যে—পাশাখেলার সহিত শৃঙ্গারের সম্বন্ধও আছে—আর উহার সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান হওয়াও অতি কঠিন। অর্থাৎ পাশার স্বরূপ দুর্ব্বিজ্ঞেয়। পাশার অন্তর্গূঢ় স্বরূপ না জানায় নল-যুধিষ্ঠিরাদিরও পরাজয় হইয়াছিল—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে পাশার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়"।৮

কিছুদিন ভালকুত্তার দৌড়ও বেশ চলিয়াছিল। ঘোড়দৌড় রাজকীয় দ্যূত।

৭ "মুষ্টি 'পরমুট' খেলা ইত্যাদি"—৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ, পৃঃ ১০৬।

৮ "পাশকক্রীড়া। দ্যূতবিশেষত্বেঽপি পুনর্বচনমত্রাদরার্থম্। সশৃঙ্গারত্বাদ্দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্ বা। অক্ষহৃদয়াপরিজ্ঞানে হি নল-পরাজয়াৎ"। জয়ম।

পাশা জুয়া হইলেও নির্জীব দ্যূতের রাজা—এই কারণে সমাদর দেখাইতে ইহার পৃথক্ উল্লেখ। পাশার চাল ও দান বুঝা বড় শক্ত। উহা বুঝিতেন পুষ্কর ও শকুনি। নল ও যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ নরপতি হওয়া সত্ত্বেও পাশার ভাবগতিক ও দান ঠিক বুঝিতেন না। এ কারণে তাঁহাদিগের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল—তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

৺তর্করত্ন মতে—"দাবা-বড়ে ও পাশা খেলা"।

দাবা-বড়ে—আকর্ষ নহে—চতুরঙ্গ।

৺বেদান্তবাগীশ মতে—ইহার নাম 'আকর্ষণ-ক্রীড়া'—"ইহাও একপ্রকার খেলা বটে, কিন্তু ইহা যে পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না"।

৺সমাজপতি—"ইহার বিষয় বিদিত হইবার উপায় নাই"।

৺সিংহ—"পাশা খেলা; ইহা দ্যূতের অন্তর্গত হইলেও পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে"।

মমঃ ডঃ আচার্য্য—"যশোধরের মতে পাশাখেলা। কিন্তু জীব গোস্বামীর মতে কোন দূরবর্ত্তী জিনিষকে কৌশলে আকর্ষণ করা রূপ কোন অনির্দ্দিষ্ট খেলা"।

৬২। বালক্রীড়নক—গৃহকন্দুক, (কৃত্রিম) পুত্রিকা ইত্যাদি—যাহা দ্বারা বালক-বালিকাদিগের ক্রীড়া চলিতে পারে, তাহাদিগের নির্ম্মাণ-কৌশল। বালক-বালিকাদিগের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই এই কলাটির প্রচার।

টীকাকারের মতে এই পর্য্যন্ত একষট্টি কলা।৯

এ কলাটির বিষয় ছেলে-খেলার উপাদান নির্ম্মাণ। কন্দুক—গোলা বা ভাঁটা। পুত্রিকা—পুতুল। এই সকল খেলিবার উপকরণ বা খেলনা—নির্ম্মাণ করাই এই কলাটির বিষয়। এক কথায় ইহাকে 'খেলনা-শিল্প' বলা চলে। বর্ত্তমান যুগে ইহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে—অবশ্য বিদেশে।

৺তর্করত্ন মতে—"কন্দুকক্রীড়া পুত্তলিকা-ক্রীড়া (ঘুঁটিখেলা পুতুলখেলা ইত্যাদি)"।

৺বেদান্তবাগীশ—"বালকদিগের জন্য নানাপ্রকার খেলনা প্রস্তুত করা"।

৺সমাজপতি—"শিশুদিগের জন্য খেলনা প্রস্তুতের প্রণালী"।

৺কুমুদ চন্দ্র সিংহ—"কন্দুক (বল প্রভৃতি) খেলা ও বালকদিগের খেলার জন্য নানা প্রকার পুত্তলিকা প্রস্তুত করার কৌশল"।

মমঃ ডঃ আচার্য্য—"ছেলেদের খেলিবার পুতুল তৈয়ার করা"।

---

৯ "গৃহকন্দুকপুত্রিকাদিভির্যানি বালানাং ক্রীড়নানি তানি বালোপক্রমর্থানি। এতা একষষ্টিকলা উক্তাঃ"। জয়ম।

যশোধর বলিলেন যে—এই পর্য্যন্ত একষট্টি কলা। আমাদের গণনায় বাষট্টি হইয়াছে। কারণ, টীকাকারের মতে—২৩ সংখ্যক কলা 'বিচিত্র-শাক-যূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া' ও ২৪ সংখ্যক কলা 'পানক-রস-রাগাসব যোজন—দুইটি পৃথক্ কলা নহে—মোট একটি মাত্র কলা।

[আগামী বারে সমাপ্য

দোসর [গল্প]

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
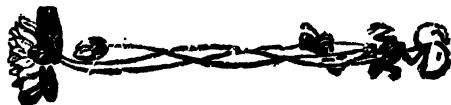
ফেলুকে চেনে না, এ অঞ্চলে এমন কেউ নেই। আট হাতি কাচা পরা ফাড়া চুলকামান মাথাটায় হাত বুলিয়ে হাসে দাঁত বার করে, পিটুলী মাখা লালচে দাঁতপাটি আকর্ণ বিস্তার করে মুখের রূপ বদলে নেয়, বুক কুমড়োর মত ভাব, পেটটা গড়িয়ে পানের ছোপ বার হয়, গালের চামড়াটা কুচকে হাসে বিজাতীয় শব্দে—হিঃ হিঃ হিঃ।

মুখুজ্যেদের টুনি বলে ওঠে, "আহা রূপ দেখনা, দিতে হয় এক চড় কসে।"

"মারবি তুই, এঁ্যা বলে কি গো"—আবার সেই হাসি ফেলুর।

বামুন পাড়ার ছেলেছোকরার দল আড্ডা দিচ্ছে, ফেলুকে যেতে দেখেই পাকড়াও করে বসিয়েছে। ছোট ভাই কানু তাগাদা দেয়: "চলরে ফ্যালা।"

দাবড়ে দেয় ফেলু: "চুপ মুরুখ কোথাকার।" ছোটভাই দাদা বলে না তাকে, দুঃখটা ফেলুর মরলেও যাবে না। লোকে বললে হাসে, "ওটার একেবারে ভসগম্যি কিছুই নাই।"

ফেলু তখন থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত। তাকেও নামান হবে। সুতরাং রিহার্সেলটা দিতেই হবে। ভিড় করে দাঁড়ায় চারিদিকে ছেলেরা, ফেলু হুকুম করে পার্ট শুরু করবার আগেই, "রাস্তা থেকে ইটগুলো সরা, কেলো।"

কেলো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, অগত্যা ফেলুই সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে। চীৎকারে পাড়ার বৌঝিরা বার হয়ে আসে। চোখ মুখ কপালে তুলে চীৎকার করে চলেছে ফেলু; শেষকালে পতন ও মূর্চ্ছা! সশব্দে আছড়ে পড়ে।

ইট সরান সত্বেও শক্ত মাটিতে লেগে ফেলুর হাত পা ছড়ে যায়, কিন্তু প্রশংসা শুনেই সে যন্ত্রণা কোন্‌দিকে চলে যায় তার! কেলো বিরক্ত হয়ে ওঠে: "চলরে?"

এককালে রামশঙ্করের অবস্থা গ্রামের মধ্যে ভাল ছিল, সেকালের হাতুড়ে ডাক্তার, চালটা কলাটা মূলোটা টাকাটা সিকেটাতে রোজগার বেশই করত, গিন্নীর হাতে নাকি কনুই অবধি সোনার চুড়ি—আর বড় ছেলে গোবিন্দ পড়ত কলেজে। গাঁয়ের কেউ তেমন ছিল না। তাই গোবিন্দর মা কথাটা বড়াই করে বলে বেড়াত, "আমি কি যে সে, সিভিলসার্জ্জেনের বৌ, আর ডেপুটির মা।"

গোবিন্দ যে ডেপুটি হবে, আর রামশঙ্কর যে সিভিলসার্জ্জন এ কথাটা সে মেনে নিয়েছিল; ফেলু কানু ছিল তখন ছোট। সব চেয়ে আদরের ছিল ফেলু! ঝিয়ের কাঁধে চেপে পাঠশালে আসত। নিজেদের থালা আগলে বসে আর সবাইকে মুখ ভ্যাংচাত, কেউ কিছু বকলেই অমনি কান্না, না হয় অশ্লীল ভাষায় গাল! মায়ের কণ্ঠস্বর পণ্ডিত মশায় আঁৎকে উঠতেন···"বাবা আমার, সোনা আমার, ফেলু কি আমার ফেলনা—বলি ও পণ্ডিত—ডেঙ্গো তুমি ছেলের মর্ম্ম বুঝবে কি।"

পণ্ডিত থতমত খেয়ে যেত।

সে আজ ৮।১০ বছর আগেকার কথা। রামবাবু এখন আর নাই, সংসারের অবস্থাও হয়ে এসেছে খারাপ, দিন চলা ভার, গোবিন্দ ম্যাট্রিক পাশ করে বছরখানেক পড়েছিল কলেজে; কিন্তু বাবা মারা যাবার পর থেকেই সারা সংসারের ভার চাপল তারই উপর, একে নিজের স্ত্রী তার উপর আবার বিধবা মা, আর ফেলু কানুর মত দুই ভাই।"

সারাদিন মাঠে মাঠে ঘোরার পর গোবিন্দ বাড়ী ফিরছে, মুড়ি নিয়ে যাবার কথা ছিল ফেলুর, কিন্তু বেলা হয়ে যায়, তার দেখাই নাই, গোবিন্দ চটে' মটে' নিজেই বাড়ীর দিকে রওনা হয়, মুনিষ কামাই! ফেলু এদিকে কোমরের কাপড় সামলে ডোবার জলে নেমে শালুক ফুল তুলতে ব্যস্ত। কানু মুড়ির পুটুলিটা বগলদাবা করে বলে ওঠে—ওই ফ্যালা চলরে! বোকাটা কোথাকার।"

বোকা না হলে কেউ পাড়ার ওই মেয়েগুলোর কথায় জলে নেমে কাঁড়ি কাঁড়ি শালুকফুল তোলে; পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছোট বড় মেয়ে। পটল আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখায় "ওই টা রে—"

মানি বলে চলে, "তোর ডানদিকে ওই যে থোপা হয়ে ফুটে রয়েছে, দে না একটা!"

ফেলু দাঁত বার করে হাসে, "একটা কেনে, সবগুলো লিবি ত বল না, বেনেপুকুর, ভটচাযদের ডোবা! কত লিবি!"

দু'হাতে পায়ের হালুশ চুলকোতে থাকে, কুট্‌ কুট্‌ করে পা দুটো পচা জলে নেমে, মুখের হাসি তবুও যায় না!

হঠাৎ কোনদিকে কি ঘটে যায় বুঝতে পারে না ফেলু। চোখের সামনে অনেকগুলো সাদাকালো ফুটকি ঘুরপাক খেয়ে বলে, "মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করে, পিছনের থাপ্পড়টা কাঁধে জমে বসেছে।

পিছন ফিরেই দেখে দাদা, হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলে তাকে।—"হতভাগা কোথাকার আজ তোরই একদিন কি আমার একদিন!"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, "মা রকে—।"

"খালি খালি ওকে মারছিস কেনরে গোবিন্দ, তোরা কেউ ওকে দেখতে পারিস না, ওরই অদেষ্ট মন্দ—না হলে এমন হয়?"

গোবিন্দ গজরায়।—"দূর করে দোব বাড়ী থেকে, অকাল-কুষ্মাণ্ড কোথাকার; গতর আছে মোষের মত, কাযের বেলায় নাই! খোরাক জোটাব কোত্থেকে।"

ফেলু খেতে বসে না, ছোট ছেলের মত ফোস ফোস করে, মা হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে, "নে বাছা বস! আমি কলা নিয়ে আসছি, চিনি দোব!"

ফেলুর আদরটা মা-ই করে বেশী। বৌদি হাসে দূরে মজা দেখে!

মুখুজ্যেদের বাড়ীতে পাড়ার নববিবাহিতা, আইবুড়ো মেয়েদের তাসের আড্ডাটা দিনকার মত দুপুরে বসেছে। দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের শেষে শালবন সীমায় আসে শুষ্ক বাতাস। বঙ্কিমান ধরণীর ছোঁয়া দিনান্তের ক্লান্ত গোধূলির ম্লান আভাকেও রক্তাক্ত করে তোলে। তারই প্রারম্ভে বিদায়ী বসন্তের কারুণ্য! আকাশকোলে দূরযানী শুভ্র মেঘের শীর্ণ ভেলা ভেসে যায় নীল সায়রে পাড়ি জমিয়ে অলস মন্থর গতিতে। জলহীন ডোবার

ধারে উর্দ্ধমুখে গরুর পাল জাবর কাটে, তেঁতুল গাছের বিবর্ণ পাতার ফাঁকে ঘুঘুর ক্লান্ত ডাক দুপুরের আকাশ উদাস ক'রে তোলে, ঐ রৌদ্রতপ্ত ধরণীকেও! মানি হেঁসে ফেলে খিলখিল করে! লক্ষী বলে, "আ মরণ, হাসছিস কেনরে! আচ্ছা বাঁদর মেয়ে ত! নে হাতের তাক দেখ!"

সকলেই হেসে ফেলে মানির কথায়। অদূরে মরাই-এর নীচে দাঁড়িয়ে ফেলু; হাঁটুর উপর কাপড়টা কসে বাঁধা, ন্যাড়া মাথা দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ে, পানের লাল কস লাগান দাঁতে সেই অপূর্ব্ব হাসি "হিঃ—খেলকেন্নে তোরা!"

লক্ষী মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, "তুই কি করবি? যা যা এখান থেকে; আবার হাসে দেখ, যা বলছি! এত হ্যাংলা কেনে রে তুই!"

হেসে এ ওর গায়ে পড়ে, মানিই বাধা দেয়, "আচ্ছা বস ওই খানেই; চেঁচাস না। একবার প'টটা করতে হবে কিন্তু।"

ফেলুর চোখে হাসির আভা খেলে যায়—ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দেওয়ার এক কোণে বসে থাকে! খেলার কিছুই বোঝে না, তবুও চেয়ে থাকে ওদের দিকে,—কেমন কালো চুলগুলো ঘাড়ের উপর রাশ করে জমান! কি নিটোল পুরুষ্ট হাত, মুখের হাসি, কথাগুলো! হঠাৎ চমকে ওঠে ওদের হাসিতে, লক্ষী বলে চলেছে, "ওলো—ছোঁড়া যে রাক্ষসের মত ড্যাবড্যাব করে তাকায় গো, গিলেই ফেলাবে নাকিরে মানি?"

মানিও হাসতে থাকে!

কথাটা শুনে ফেলু তড়াক করে বার হয়ে যায়, "ভরি ত, থাম, আবার কথা! এলাম বলে, তুমি ন্যুন ত্যাল লিয়ে এস, চাটুয্যেদের বাগানের আমই লিয়ে এলাম বলে।

বার হয়ে যায় ফেলু। মিনু সান্তী সব্বাই হাসে। খেলা আবার চলতে থাকে।

ফিরেও আসে শীঘ্রি, কোঁচড়ে এক কোঁচড় আম। ঢেলে দিয়ে হাসতে থাকে, "খাও আম, যত লবা, রোজ থানা চেক করে আসব, শালা নালে বলে কিনা ধরে লিয়ে যাব বাবুদের কাছে, পারবি কেনে আমার সাথে জোরে, পালিয়ে এলাম। এইবার রাতে যাব, সাবাড় করে দোব বাগান।"

হাঁফাতে থাকে। সকলেই চেয়ে থাকে তার দিকে, পিঠে হাতে কনুই-এর কাছে সাট সাট দাগ। ফুলে রয়েছে, কপালের কাছে কালশিরের দাগ। মানি চেয়ে থাকে তার দকে, "এ কিরে!"

হাসে ফেলু, "ও কিছু নয়, কই ছেঁচ আন! টুকচেল দিবি কিন্তুক।"

পৌষ সংক্রান্তির মেলা এবার জমে বসেছে, দামোদরের বালিবাড়ির পারে চকুমডাঙ্গার প্রান্তরে! বিশাল বালুকাময় বুকের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণা বিশীর্ণ ধারায় কালো জলরাশি! পারে শীতের সোনালী রোদে ছায়াময় আসড়ার জঙ্গল কাছিমের পিঠের মত উঠে গেছে। সবুজ বনভূমির মাঝে নোতুন শালপাতার ফাঁকে উঁকি মারে সোনালী শাল ফুলের হাসি। নদীর চরে বিন্নাঘাসের বনে লাগে দিকহারা বাতাসের স্পর্শ। দূরদূরান্তর থেকে গরুর গাড়ী ক'রে যাত্রী আসে মকর স্নানে।

এক পয়সায় তিনটা করে সিগারেট। কানু নবীশ, প্রাণপণে কাশে; ফেলু চোখ দুটো বুজে দীর্ঘ টান দিয়ে শেখায়, "এমনি করে।" গাঁয়ের আরও সকলে গেছে। লক্ষী, টুনি, বাসন্তী সকলেই; কিন্তু আর একজনকে দেখতে পায় না সারা মেলা খুঁজে!

হঠাৎ নদীর দিকে মানিকে দেখে এগিয়ে যায়। "আমি ভাবলাম তুমি আসবাই না, এই দেখ! কেমন বল দেখি! হারবেনে নগদ সাত আনার কমে দিলেই! নাও নাও ওটা! তোমাদের খাবার তাস, একেবারে বস্তাপচা! নাও—"

মানির হাতে সদ্যকেনা তাসের প্যাকেটটা ধরিয়ে দেয়।

"কোথা পেলি তুই?"

"সে খোঁজে দরকার কি! কিনেছি!"

পাড়ার মজলিসে সকলেই জমায়েত, গাঁয়ের মধ্যে ওইটুকুই বসবার জায়গা, জীর্ণ ঘরের চালাটা গ্রামের সাধারণের অবস্থার পরিচয়ই দেয়; জিলজিলে হাড় কঠা বার করে আকাশের দিকে চেয়ে চিরমুক্তির আশায় চেয়ে রয়েছে। গণেশ ধোবা কাকে ধরে টানতে টানতে আনে। তার চীৎকারে পাড়ার লোকেও বার হয়ে আসে। গামছাটা পাকান'। কানু ফেলুর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

"বামুন বলে ক্ষতির কবর নাই, যাহ: আমার কপালে, রোজ রোজ ঠাকুর লুঠে লিয়ে যাবে সার: ভুই-এর ধান!"

"আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন, না হোক দশ টাকার ধান তুমিই বিচেছ: মেলা করেছে লায়েক!"

ফেলুর চোখের কোণে জল দেখা দেয়, চাটুয্যে মশায় বলে চলেন, "ডাক ওর দাদাকে, ভাই দুটো দিন দিন যণ্ডা হয়ে উঠছে, আজ এর হাঁস, কাল ওর জমির ধান, থানায় নিয়ে যা'—"

ভিড়ের মধ্যে কাকে দেখে ফেলু মাথাটা নামিয়ে ফেলে; চোখ তোলবার ক্ষমতা তার নাই; মানি চেয়ে থাকে তাদের দিকে। লক্ষী হাসে: আজকাল আবার সিগ্রেট টানে—যতো বাবু কোথাকার!"

কে যেন বলে, "বিয়ে ও করবে কি না!"

কানু সান্ত্বনা দেয়, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, বিয়ে তোর হবে!"

ফেলুর মন মানে না, বলে চলে, "ওরা কেন যা তা বলে!"

"বুঝিস না রাগায় তোকে, দাদাই বলছিল তোর বিয়ের কথা।"

ফেলু ছেঁড়া জামাটার পকেটে হাত দিয়ে একটা আধপোড়া সিগ্রেটই বের করে দেয় কানুকে।

বিয়ে! বিয়ে হবে তার। মাকে বলতে লজ্জা করে। দাদাকে? দাদাটা বোকা একেবারে; নিজের বিয়ে হয়ে গেছে কিনা, আর কারুর বিয়ে দিতে হয় না যেন! পাড়ার ছেলেরা ঘিরে ধরে তাকে, ফেলুই সাব্যস্ত করে, "বল ত করুদা, দাদাটা যেন কি গো!"

করু বলে, "দাদাটা তোর বোকা গর্দ্দভ, না হলে কেউ দুটো পাশ দিয়ে চাকরী করতে যায় না, দাদা তোর চাকরী করতে না গেলে বিয়ে হবে কি করে! এই দেখ ললিত, মহাদেব পিওনী করে, তারও বিয়ে হ'ল।"

ফেলুর সান্ত্বনা এখনও আছে, কেন—রমেন কেমন ভাল চাকরী

করে, আমার চেয়ে অনেক বড়, তার ত বিয়ে হয় নি, রজনীদা বাকী—তারপর ত আমার, না কি গো ?"

পাড়ায় একটা হৈ চৈ, বরযাত্রীর দল···লোকজন নিমন্ত্রিত, চারিদিকে হৈ চৈ ! বড় বড় কড়াই, লুচি ভাজা হচ্ছে, ফেলু কি কাপড়খানা সামলে লুচি বেলছিল, ডে-লাইটের আলোয় এক উঠান লোকের মাঝে ছাঁতনাতলার দিকে চেয়ে থাকে, দেখলে আর চেনা যায় না, কনে-চন্দন চেলীর কাপড় পরে ! মানি ! পাশে আর একজন কোন দিন তাকে দেখেনি, ফেলু কঠিন নয়নে তার দিকে চেয়ে থাকে, লোকজনের ভিড়—বিরাট সামিয়ানার নীচে লোকজন খাওয়ান হচ্ছে। সকলেই খেতে বসেছে—কানু আরও সকলে। ফেলুকে দেখাই যায় না। সকলের অজ্ঞাতসারে সে কখন সরে পড়েছে !

গোবিন্দ মাথায় হাত দিয়ে ভাবে, রোজগার করবার কেউ নাই, এতগুলো পোষ্য। বাপুতি জমি যা ছিল তাও সব চলে গেছে একটার পর একটা। মা বকে চলেন : "জানি তোকে দিয়ে কিছুই হবে না, আমারই বরাত মন্দ, নইলে এমন হয়।"

"ধার আর বেনেদের দোকানে দেবে না। পারিস তুই যা না হয় নূন আর ভাতই খা—যতদিন জোটে। বাইরে বার হবি না ত।"

ওদিকে ফেলু একখানা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে কোন রকমে পরবার মত করে তোলবার চেষ্টা করছিল, সে-ই উত্তরটা দেয়। "ঘরে বউ আছে কি জান না বুঝি।" প্রচণ্ড বেগে চড়টা ফেলুর মাথা ঘুরিয়ে দেয়, মা চীৎকার করে ওঠে—"ওকে মারবি না ত মারবি কাকে, তোর মুখে ঝাটা, তোর পাশের মুখে ঝাটা ! ওরাই হয়েছে তোর শত্তুর।"

পাক্কীর পিছু পিছু ভদ্দি দুপুর রোদে ফেলু ঘুরে বেড়ায়, চন্দন-নগরের বৌ, বেশ ভালই বৌ হয়েছে, "কিরে সুখন—হিঃ।"

অদ্ভুৎভাবে হাসে ফেলু ! শেষ সম্বল রজনীদা, তারও বিয়ে হয়ে গেল। সুখময় তার চেয়ে ছোট, অনেক ছোট, তারও বিয়ে হ'ল। মাধব—বাকী রইল সে।

কচি শালপাতায় গরম ভাত, বড়ীকলাই-এর ডাল, মাছের তেল দিয়ে লাউ-এর ঝাল খায়নি অনেক দিন, ভাল ক'রে ভাতই জোটেনি, অত লোকের মাঝে ফেলু খেতে বসে, শতছিন্ন কাপড়খানা কোন রকমে সামলে খেয়ে চলে, কথা কয় না ; সুখময় নিজে তদারক করে দাঁড়িয়ে থেকে। করুণা বলে ওঠে, "দেখলি সুখময়ের বিয়ে হয়ে গেল, তোর হবে না, দাদাটা চাকরী করতে যাবে না, এইবার তোকে খাটাবে আর নিজেই বসে বসে খাবে।"

কথাগুলো শুনে বসে ফেলু। আনমনে পানতোয়া দুটোকে মুখে পুরতে থাকে।

কদিন থেকেই মায়ের অসুখ। ফেলু মায়ের পাশ থেকে ওঠে না। রমণ ডাক্তার কোনদিন শিশি ধোওয়া জল দয়া করে দেয়, কোনদিন বা তাড়িয়ে দেয়, শূন্য হাতে ফিরে আসে ফেলু, মা কথা কইতে পারে না। ব্যাকুল নয়নে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে, দাদার কথায় চমকে ওঠে, দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে : "না আমি যাব না কোথাও।"

"যা বল্‌ছি বাঁদর কোথাকার, যাবি ত এক ছিলিম তামাক আর তেল নিয়ে বলে আসবি, যা—"শিশিটা এগিয়ে দেয়।

ফেলুর এক কথা, "নিজে বসে বসে খ্যাট লেগে, যাওনা। আমি লারব।"

গোবিন্দ সামলাতে পারে না অত বড় সত্য কথাটা। চুলের মুঠি ধ'রে বসিয়ে দেয় ঘা' কতক, ফেলু দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে যায় ! মা চোখ মেলে চায় না। দাদার সবল হাত থেকে ছাড়াবার কোন উপায় দেখে না ফেলু। গলাটা বন্ধ হ'য়ে যায়। দু' হাত দিয়ে চেষ্টা করেও মুক্ত হ'তে পারে না। চীৎকার ক'রে ওঠে ! কোন দিকে কি হয়ে যায় বুঝতে পারে না, হাতের শিশিটা কোনদিকে ছিটকে প'ড়ে। বৌদি চীৎকার ক'রে ওঠে ! মা যেন স্বপ্নের ঘোরে চাইবার চেষ্টা করে ! ফেলু মাকে জড়িয়ে ধরে ! রাগে গোবিন্দ ফুলছে। ফেলুর কপালের পাশ দিয়ে বার হয় খানিকটা তাজা রক্ত !

সারা রাত্রি কোনদিকে সে যায়, ফেলু জানে না ! বার বার ডেকেও সাড়া পায় না মায়ের ! পাড়ার সবাই এসেছে, মাকে ওরা নিয়ে চলে গেল। চীৎকার করে কেঁদে ওঠে ফেলু !—"আর দাদাকে কিছু বলবো না মা ; তুমি শোন ! শোন ?"

মা শোনে না, কেউ কোনদিন শোনে নি, কারুর ডাক ওদের কানে পৌঁছায় না।

অনেক দিন যাইনি ওদিকে। প্রায় বছর ছয়েক হবে।

ডোবাটা যেন আরও বেড়ে গেছে, আমড়া গাছটা পত্রহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাশের তাল গাছটা বাজ প'ড়ে জ্বলে গেছে, এখন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ছে। ফেলুদের বাড়ীখানাও ধ্বসে পড়েছে ছাউনির অভাবে। বাঁশের বাখারিগুলো দাঁত বের ক'রে রয়েছে। ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়—ভেঙ্গে পড়া বাড়ীর রকে একটু পরিষ্কার ক'রে কে যেন রান্না করছে ! বড় হয়েছে ফেলু ! চেনাই যায় না তাকে গালে এক গাল দাড়ি, পরণে বিবর্ণ একটা চাদর, গোবিন্দ নাকি চলে গেছে এখান থেকে, কানুও। তারা কোন এক কারখানায় চাকরী করে ! ফেলুর মুখে সেই হাসি, বলে বলে চলে :

"কানু আজকাল পেন্টুল পরে গো, মেলাই টাকা মাইনে, বিয়েও করেছে খাসা বেই বুঝলা।"

"তুইও চল চাকরী করবি।"

হাসে ফেলু, সেই অপূর্ব্ব হাসি : "উ লারব গো, বেশ ত আছি।"

কালিমাখা ভাতের হাড়িটা থেকে ফেন সমেত ভাত কলার পাতায় ঢালতে থাকে, খানিকটা নূন ভাতে মাখিয়ে বাকী নূনটা কুলুঙ্গীতে সাবধানে তুলে রাখে। ভাতগুলো মাখতে মাখতে বলে, "নূন ত্যাল জিরে যা লেবা, আজকাল বিজায় দাম গো, ঘর সংসার করা দায়।"

ফেলুও আজকাল পুরোদস্তুর সংসারী !

নারী-স্বাতন্ত্র্য

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

মনু বলেছেন, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

যে শ্রুতি-স্মৃতির বিধান হিন্দুসমাজ মেনে এসেছেন হাজার হাজার বছর ধরে, আজ এসেছে তার বিচারের দিন। যুগের পরিস্থিতিতে আইন হয়। দেশ শিক্ষায়, ঐশ্বর্য্যে, শৌর্য্যে বর্দ্ধমান, এখন ওই ছোট কয়েক কথাতে তাহাকে ধরে রাখতে পারছে না, সনাতনপন্থী হিন্দুজাতি ভালমন্দ বিচার করে নূতনের জাগরণ চায়।

নারী-স্বাতন্ত্র্য মানে কেহ যদি বোঝেন, পুরুষের সকল রকম সংস্পর্শ এড়িয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার ক'রে জীবন কাটাবেন, তা হ'লে তিনি ভুল বুঝবেন। কিংবা যদি কোন মহিলা বলেন, আমি স্বামীর রোজগারের অর্থ কামনা করিনে, আমি স্বোপার্জ্জিত অর্থে নিজের ও আমার সন্তানদের ভরণ-পোষণ চালাব, তা হ'লে আমি বলবো, তাঁর মতন নির্বোধ স্ত্রীলোক আর নেই।

স্বাভাবিকভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যায়, নারী সামাজিক মতে পরাধীন নয়। তবে তাঁরা কতকগুলি বিষয়ে আইন-সঙ্গত ভাবে অধিকার চান। প্রকৃতির বিধানে নারীকে সন্তান ধারণ ও পালন করার বিধায়, নারী অন্তঃপুরে আবদ্ধ। এই দারুণ কঠিন ক্লেশপূর্ণ ভোগ বইবার ভার ভগবান্ তাঁদের দিয়েছেন। এর তো কোন প্রতিকার নেই, কিন্তু আইন, দেশাচারের অন্যায় বিচারের প্রতিকার করা যেতে পারে।

রাও কমিটি প্রণীত হিন্দু কোড বর্ত্তমান সমাজে আলোড়ন এনেছে। তার মধ্যে নারীদের জন্য অনেক বিষয়ে অধিকার দাবী জানান হচ্ছে। আমার আলোচ্য বিষয়—নারী উত্তরাধিকারী বিধানে বর্ত্তমান আইনে কি দুর্গতি হয়, তার দৃষ্টান্ত দেখান'।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিত্তশালী শ্বশুর বর্ত্তমান থাকতে দুইটী অনূঢ়া কন্যা নিয়ে পুত্রবধূ বিধবা হয়। শ্বশুর বললেন, আমার অন্যান্য ছেলেদের কাছে আনুগত্য স্বীকার ক'রে থাকলে, তোমার একবেলা আতপ তণ্ডুল দেওয়া যেতে পারে। এর বেশী ব্যবস্থা তিনি পুত্রবধূর জন্য করতে পারলেন না। বিধবাটি পিত্রালয়ে ফিরে গেলেন। তাঁর মাতা-পিতার যত্নে তাঁর দিন কাটলো মন্দ নয়, কিন্তু তাঁদের অবর্ত্তমানে বিধবা অতি দীনহীন বেশে, তার লক্ষপতি ভাইদের সঙ্গে লক্ষপতির কন্যারূপে বাস করতে লাগলেন। ভ্রাতারা তবু তাদের ভগিনীকে গৃহে রাখতে নানা আপত্তি জানিয়ে তাঁকে অপমান করতে লাগলেন। মেয়ে দুটি বড় হয়েছে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা, পড়াশোনার বন্দোবস্ত কেউই করলেন না। তাঁর দাবী তিনি কোথায় জানাবেন!

আবার দেখা যাচ্ছে—বিধবার একটিমাত্র ছেলে মারা গেল, বিধবা স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হ'লো, সন্তানহীনা সদ্য-বিধবা পুত্রবধূ। বালিকা বধূর পিতা তাহাকে নিজালয়ে নিয়ে গেলেন এবং যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশোনার অছিলায় তিনি সব ভোগ করতে লাগলেন। বৃদ্ধা আদালতে তাঁর দাবী জানালেন। আদালত আইনদ্বারা সব নাকচ করলেন। বহু সম্পত্তির মালিক হয়েও বৃদ্ধা অশ্রুজলে ভেসে ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন কাটাতে লাগলেন। এইরূপ বহু বহু অবিচারের করুণ কাহিনী আছে। এজন্য আমরা দাবী করছি—আইনমতে বিধবার সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়ার একান্ত আবশ্যক। এদিকে জনসাধারণের সুবিচারপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

ধনীর কন্যারাও বিবাহে যৌতুক ছাড়া আইনমতে কিছুই পায় না—ইহা বড়ই দুঃখের। স্বল্প রোজগারী পিতার যৎসামান্য সম্পত্তিতে ভ্রাতা ও ভগিনী দুইদল ভাগ বসালে কিছুই পাবে না সত্য, কিন্তু লক্ষপতি কোটিপতির কন্যাদের একটী অংশের উপর অধিকার হোক্। সম্পত্তি কেনা-বেচার অধিকার হওয়ার অত্যন্ত দরকার। তবে ইহা একটা ন্যায়সঙ্গত কথা যে, কন্যা যদি পিতৃসম্পত্তির এক অংশ পায়, তার তেমনি সেই পরিমাণে পিতৃ-ঋণের দায়িত্বও বহন করতে হবে।

এমন দেখা গেছে, যে অর্থবান্ পিতার একটিমাত্র সন্তান, সন্তানহীনা বিধবা কন্যা পিতৃগৃহে আশ্রয় নিয়ে তাঁর অসহায় বৈধব্য জীবন যাপন করতেন। পিতা মৃত্যুকালে পিণ্ড-লাভের ভয়েই হোক্ কিংবা সুযোগ না পাওয়ার দরুণই হোক্, কন্যাকে নিজে কিছু লিখে দিয়ে যেতে পারেন নি। সেই সম্পত্তির অধিকারী হ'লো বিধবা কন্যার দূর সম্পর্কের আত্মীয়-পুত্র। ধনবান্ পিতার কন্যা হয়েও বিধবাটি পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হলেন, এইরূপ অবিচারপূর্ণ আইন, তার কি প্রতিকার অবিলম্বে প্রয়োজন নয়? গঙ্গাসাগরে ছেলে ভাসান, জোর করে সতীদাহ প্রভৃতির মতই হিন্দুনারীকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করাও একটা কু-প্রথা।

আশা করি, অচিরে এই আইনের বিকৃতির উচ্ছেদ সাধন করে দেশের জনসাধারণ হিন্দু-নারীদের পিতার ও স্বামীর সম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যবস্থা ক'রে তাঁদের মা, স্ত্রী ও কন্যার প্রতি সুবিচার করতে পরাঙ্মুখ হবেন না।

পুণ্ড্র রাজ্য

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

বঙ্গশ্রী (আষাঢ় ১৩৫২ বিচিত্র জগৎ) পত্রে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাশয় পুণ্ড্ররাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পাল মহাশয় বলিতেছেন—"আমার মতে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা, মানভূম জেলা, হাজারিবাগ জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ এবং মুঙ্গের জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া পুণ্ড্ররাজ্য বিস্তৃত ছিল।··· পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ও প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, পাল মহাশয়ের মত ঐতিহাসিকগ্রাহ্য নহে। বর্ত্তমান বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর প্রাচীনকালে সুহ্ম পরিচিত ছিল। তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক সুহ্মের রাজধানী ছিল। এসব কথা পুরানো হইয়া গিয়াছে। এই সর্ব্বসম্মত ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করিয়া "আমার মতে" বলিয়া পাল মহাশয়ের নূতন কিছু করার উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না। পাল মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের মেদিনীপুরের ইতিহাসখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। স্বর্গগত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "গৌড়ের ইতিহাস" হইতে পুণ্ড্র-পরিচয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে। করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন স্থানের নাম পুণ্ড্র। পুণ্ড্ররাজ্যের প্রাচীন অধিবাসিগণ অদ্যাপি এদেশে পুণ্ড্র নামে বাস করিতেছে। মনুসংহিতায় আছে (১০।৪৪) ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণদিগের অদর্শন জন্য কতকগুলি ক্ষত্রিয়জাতি 'আচারভ্রষ্ট' হইয়া যায়। আচারভ্রষ্ট হওয়াতে পুণ্ড্ররা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতের নানাস্থানে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। শান্তিপর্ব্বের ৬৫তম অধ্যায়ে পুণ্ড্রদিগকে দস্যুজীবী বলা হইয়াছে।

*

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের ২৯তম অধ্যায়ে লিখিত আছে পুণ্ড্রগণ জামদগ্ন্যের ভয়ে গিরিকন্দরে লুক্কায়িত ছিল। ব্রাহ্মণদিগের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়।

*

শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে আছে ভরতরাজা পুণ্ড্রদেশের অব্রহ্মণ্য নরপতিকে জয় করিয়াছিলেন।···মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে আছে, অর্জ্জুন পুণ্ড্রদিগকে জয় করিয়াছিলেন।

*

উত্তর-বঙ্গে পুণ্ড্র একটী প্রধান জাতি। খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট পুণ্ডরীক নামক বণিক্-শাখার সন্ধান জৈনদিগের কল্পসূত্রে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস মিশ্র রচিত "মগব্যক্তি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—পুণ্ড্রদ্বীপে উপনিবিষ্ট শকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুণ্ডরীক নামে খ্যাত হয়। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত স্থানে এক সময়ে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হইত। বোধ হয় পুণ্ডরীক বা পুণ্ড্র শব্দ হইতে "পলু" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। রেশমকীট পালন ও রেশম উৎপাদন পুণ্ডরীকদিগের ব্যবসায়। ইহাদিগের অধিকাংশ এখন বৈষ্ণবপন্থী। ইহারা তেজস্বিতায় পার্শ্ববর্ত্তী জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান রাজত্বকালে বহু লোক মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হওয়ায় ইহাদিগের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পূর্ব্বসংখ্যা বজায় থাকিলে এই বীরপ্রকৃতিক জাতি কর্ত্তৃক হিন্দু-সমাজের বল বর্দ্ধিত হইত। মহানন্দা নদী এই জাতির বাসস্থানের পশ্চিম সীমা ছিল। দশকুমারচরিতে মিথিলারাজের পুণ্ড্ররাজ্য আক্রমণ-সংকল্প ও তদ্দেশের দুর্ভিক্ষের কথা লিখিত আছে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পুণ্ড্ররাজ্যের লোক মিথিলায় গিয়া উৎপাত করিত।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরের বর্ত্তমান নাম পাণ্ডুয়া বা স্থানীয় ভাষায় পাঁড়ুয়া। মালদহ জেলায় ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে কেহ কেহ বগুড়া জেলার মহাস্থান গড় বলিয়া নির্ণয় করেন। মহাস্থান গড় করতোয়ার তীরবর্ত্তী। মহাস্থান গড়ে পুণ্ড্ররাজগণের নির্ম্মিত একটী দুর্গ ছিল। কেহ কেহ বর্দ্ধনকুটীকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন মনে করেন। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়া স্থাপন করে নাই। তাহারা পাণ্ডুয়া ভাঙ্গিয়া আপনার উপযোগী করিয়া লয়। এখন পাণ্ডুয়ার মসজিদসমূহ হইতে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বাহির হইতেছে। হিন্দু দেবমন্দিরসমূহ ভাঙ্গিয়া যে মসজিদ করা হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুসলমানেরা আসিয়া পাণ্ডুয়াকে একটী বড় হিন্দুনগর পাইয়াছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত এইরূপ নগর দেশে ছিল না, থাকিলে কোন না কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত।

ইহার ইতস্ততঃ বৌদ্ধচিহ্নের অভাব নাই। অতএব পাণ্ডুয়া নগরই প্রাচীন পুণ্ড্র বা "পুণ্ড্রবর্দ্ধন"। বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধার করিলাম না। গৌড়ের ইতিহাস ২য় ও ৩য় অধ্যায় ৩৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিলে "প্রত্নতত্ত্ববিদ্" পাল মহাশয় উপকৃত হইবেন। পাল মহাশয় প্রাচীন মত খণ্ডন না করিয়াই "আমার মতে" বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, আপ্তবাক্য বলিয়া কেহ তাহা মানিয়া লইবে না। অকারণ এরূপ ভ্রমাত্মক বিরক্তিকর আলোচনার লাভ কি বুঝিতে পারিলাম না।

পুস্তক ও আলোচনা

সৈনিক : শ্রীমনোজ বসু প্রণীত উপন্যাস। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা আট আনা মাত্র।

বিপ্লবী বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসাবে মনোজ বাবুকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বৈদেশিক মননশীলতায় নিরিবিল্ আত্মনিমজ্জনের মধ্যে যাঁহারা স্বপ্নময় স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান করেন, মনোজ বাবুর স্বাতন্ত্র্য সেখানে একেবারেই শিকড়ের অংশে। খাঁটি বাংলার নিবিড়তম পল্লী-প্রাণতার সঙ্গে তাঁর চিরকালের অন্তরের যোগ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন্ হইতে তিনি পল্লীকে দেখিয়াছেন, পল্লীর সঙ্গে জীবনকে মিশাইয়া দিয়া পল্লীর দুঃখ-দারিদ্র্য-আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হইয়া উঠিয়াছেন। সেই পল্লীপ্রাণতাই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মনোজবাবুর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উৎস। তাঁহার বনমর্ম্মর, নরবাঁধ, পৃথিবী কাদের, প্লাবন প্রভৃতি গ্রন্থগুলির প্রতি পংক্তিতে সেই শস্যশ্যামলা পল্লী-প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গীক ভাবে মিশিয়া আছে।

আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের ঢেউ যখনই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, নাগরিক জীবনই শুধু তখন আলোড়িত হয় নাই, পল্লীর বন-প্রকৃতিও বিশেষভাবে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিয়াছে। শান্ত পল্লীর বুকেও জাগিয়া উঠিয়াছে ঝড়, প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে তার সর্ব্ব চিত্ত। মনোজবাবুর রচনায়ও এই দুই বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ দেখা যায়। শান্ত ও রুদ্র (Romance and Revolt)। টুর্গেনিভের 'অন্ দি ইভ' এক সময় জন্ম দিল 'ফাদার এণ্ড সান'এর, 'ভারজিন সয়েল'-এর। ভাব-মন যুগ-বিবর্ত্তিত বিপ্লবে বজ্রকঠিন হইয়া উঠিল। মনোজবাবুর দৃশ্য পল্লীর স্বাভাবিক বিবর্ত্তনও তাঁহার লেখনিতে জাগাইল অগ্নিচঞ্চলতা। জন্ম নিল 'নূতন প্রভাত', 'ভুলি নাই' আর আলোচ্য 'সৈনিক'। '৪১ সাল হইতে '৪৪ সাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসোন্মত্ততা, বন্যা, মহামারী, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, মহামন্বন্তর, প্রভৃতি যে বিক্ষুব্ধ পরি-বেশের মধ্যে বাংলার স্বাভাবিক চিত্ত অসংবৃত আলোড়নে দুলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই পটভূমিকায় রচিত সৈনিক। প্রকাণ্ড কটকটা খুলিয়া আবার বন্ধ হইয়া গেল। জেল হইতে বাহির হইল পান্নালাল। সত্যাগ্রহ করিয়া গিয়াছিল সে জেলে।—দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এমনিতর শতসহস্র সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছে। লাঞ্ছিত ভারত পরাধীনতার নাগপাশ হইতে আজও তবু মুক্তি পাইল না, জঠরে পাইল না ক্ষুধার অন্ন। কিন্তু কেন? সৈনিকের নায়ক নায়িকার বলিষ্ঠপ্রাণতা ও আবহ কাহিনী-বর্ণনায় তাহাই সতেজ ও সুস্পষ্ট ভাবায় অভিব্যক্তি পাইয়াছে। বাংলাদেশে বিপ্লবী সাহিত্যের জন্ম বেশী দিনের নয়। মনোজবাবু সেই বিপ্লবী সাহিত্যের নতুন পথ প্রদর্শক ও সার্থক কথাশিল্পী। তাঁহার 'সৈনিক' বাংলার জাতীয় জীবনের নির্ভীক বাহন। মনোজবাবুকে অবলম্বন করিয়া বাংলার যে বিপ্লবী সাহিত্য আজ ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহা একদিন শাখাপল্লবে দৃঢ় বনস্পতির রূপ পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইবে, এ কথা আশা করা আজ ভুল নয়।

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

ভাঙ্গা বাঁশী : এস্, ওয়াজেদ আলী, বি-এ (কেণ্টাব), বার-এ্যাট-ল' প্রণীত গল্পগ্রন্থ। ডি. এম্. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা মাত্র।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গল্প লেখক হিসাবে এস্, ওয়াজেদ আলী সাহেব বাংলা সাহিত্যে শুধু সুপরিচিত নন, সুপ্রতিষ্ঠিত। বহু লেখকের মতো বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দ্বিধাবিজড়িত অপটু লেখনী লইয়া আবির্ভাব নয়। সুরু হইতেই তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও ভাষার দৃঢ়তা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'জীবনের শিল্প', 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', 'ভবিষ্যতের বাঙালী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শুধু তাঁহার সেই পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করে না, তাঁহার মরমী শিল্পী-হৃদয়কেও বিশেষভাবে সুপ্রকট করিয়া তোলে। সেই মরমী শিল্পীহৃদয়ই তাঁহাকে সার্থক গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্পে জীবন ও জগৎ নানাদিক হইতে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। 'ভাঙ্গা বাঁশী'র রায় সাহেব চরিত্রটি বহু বিভক্ত মানব-জীবনের একটি 'টাইপ'। জীবনের দিক হইতে রায় সাহেব ব্যর্থ, বিভ্রান্ত অথচ নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ পরিবৃত। যখনই কোনো বুদ্ধিপ্রবণ কৃতী ব্যবহারজীবীর আমরা দেখা পাই, সেইখানেই রায় সাহেব যেন সুস্পষ্ট হইয়া ওঠেন। এই কারণেই লেখকের মতে রায় সাহেবকে ভুলিবার নয়। স্মরণের আবরণে তিনি সর্ব্বক্ষণের জন্যে মনে সযত্নে ঢাকা থাকেন। ভাঙ্গা বাঁশীর বিভিন্ন চরিত্র-সৃজনে লেখক যে শিল্পী-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনবদ্য; এবং এই কারণেই 'ভাঙ্গা বাঁশী' বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

অগ্রুত : শ্রীশক্তিপদ কোঙার প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম—পাঁচ সিকা মাত্র।

লেখক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও রচনা তাঁহার দৃঢ়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অত্যাধুনিক কবিদের সান্নিধ্য হইতে বহু দূরে থাকিয়াও লেখক আধুনিক সমস্যামূলক ভাব ও বস্তু-সংঘাতের পটভূমিকায় যে কবিতাগুলি আলোচ্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। 'মৃত সৈনিক', 'বৃদ্ধ ভিখারী', 'ক্ষুধা', 'মর্ম্মর মূর্তি', 'বুদ্ধ', 'মানব', 'আত্মহত্যা'—প্রতিটি কবিতাই মাইকেলী রীতিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। পাঠ ও আবৃত্তির পক্ষে ধ্বনি ও সোমের বিচ্ছেদ উল্লেখ করিবার বিষয়। আমরা লেখকের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

ওয়াভেল প্রস্তাব

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিমতে লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজনৈতিক অচল পরিস্থিতির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক নেতাগণের নিকট এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ :—

১। ভারত গবর্ণমেণ্ট (Viceroy's Executive Council) পুনর্গঠিত হইবে এবং নূতন গবর্ণমেণ্টের বড়লাট ও কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ ব্যতীত আর সকল সভ্যই ভারতীয় হইবেন। তবে এই নূতন গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান কনষ্টিটিউসনাধীন গঠিত হইবে বলিয়া বড়লাটের নাকোচ (veto) ক্ষমতা থাকিবে।

২। ভারতীয় সভ্যগণের মধ্যে বর্ণ-হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা সমান হইবে; অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সভ্যও থাকিবে, যথা :—তপশিলভুক্ত, পার্শি, শিখ ও খৃষ্টান।

৩। বড়লাট নেতাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ সকল সভ্য মনোনীত করিবেন, কিন্তু নিয়োগ করিবেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

৪। ভারতরক্ষা (defence) ভিন্ন অপর সকল কার্য্য-বিভাগের শাসন-ভার ভারতীয় সভ্যগণের হাতে থাকিবে।

৫। নূতন গবর্ণমেণ্টের উপর প্রধানত: তিনটি কর্ত্তব্যভার থাকিবে, যথা :—

(ক) জাপান পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে খুব জোর যুদ্ধ পরিচালনা ও তজ্জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদন;

(খ) যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন;

(গ) ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষে সর্ব্বদলের সম্মতি-যুক্ত একটি সংগঠন-পাণ্ডুলিপি (constitution) স্থিরীকরণ;

৬। এই প্রস্তাব সর্ব্বদল সমর্থন না করিলে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বলবৎ থাকিবে।

ওয়াভেল সাহেব উপরোক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য সিমলাতে নেতাগণের বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মিঃ জিন্না, কেন্দ্রীয় পরিষদের ও কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের বিভিন্ন দলের নেতাগণ, প্রদেশসমূহের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এবং শিখ ও তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের একটি করিয়া প্রতিনিধি ঐ বৈঠকে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গত ২৫শে জুন ঐ বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী সিমলা যাইয়া ওয়াভেল সাহেবের সহিত সাক্ষাতের সময় বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত নূতন গবর্ণমেণ্টের সভ্য মনোনয়নের নীতি তাঁহার মতবিরুদ্ধ, সুতরাং ঐ নীতি পরিবর্ত্তিত না হইলে তিনি বৈঠকের কার্য্যে যোগদান করিবেন না। পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৈঠকে যোগদান না করিয়াও তিনি কংগ্রেসের ও ওয়াভেল সাহেবের উপদেষ্টা হিসাবে সিমলাতে উপস্থিত থাকিবেন। তদনুসারে তিনি তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও মুস্লিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটিও সিমলাতে উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বদলই ওয়াভেল সাহেবের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য মানিয়া লইয়াছেন এবং নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনে ও প্রস্তাবিত তিনটি কার্য্যভার গ্রহণে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বড়লাটও তাঁহার নাকোচ (veto) ক্ষমতা অযৌক্তিকভাবে ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

অতঃপর ওয়াভেল সাহেব প্রত্যেক দলের নেতাগণকে স্বীয় স্বীয় মনোনীত সভ্যগণের নামের তালিকা দিতে অনুরোধ করেন। কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দলের নেতাগণ তাঁহাদের মনোনীত নামের তালিকা দিয়াছেন, দেন নাই শুধু মুস্লিম লিগ। লিগ-নেতা মিঃ জিন্না অনেক দাবী উত্থাপন করিয়া ওয়াভেল সাহেবকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ঐ সকল দাবী না মিটা পর্য্যন্ত তিনি নামের তালিকা দিবেন না। তাঁহার দাবী মধ্যে দুইটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা :—১। মুসলমানের নাম শুধু মুস্লিম লিগ দিতে পারিবে, কংগ্রেস কি অন্য কেহ নহে। ২। নূতন গবর্ণমেণ্টে মুসলমান সভ্যের সংখ্যা অপর সভ্যগণের মোট সংখ্যার কম থাকাবশতঃ যদি মুসলমান সভ্যগণের মতের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে বড়লাট ঐ প্রস্তাব নাকোচ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। তাঁহার সন্দেহ, ভারতবর্ষের ভবিষ্যত রাজনৈতিক সংগঠন (constitution) স্থির করা কালে অপর সভ্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া লিগের পাকিস্থানের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

লিগ তাঁহাদের নাম না দেওয়ায় বৈঠকের কার্য্য স্থগিত থাকে। ওয়াভেল সাহেব মহাত্মা গান্ধীকে, মিঃ জিন্নাকে ও অপরাপর দলের নেতাগণকে আহ্বান করিয়া ঐ বিষয়ে মীমাংসার জন্য কথা-বার্ত্তা চালাইয়াছেন, কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই। কারণ, মিঃ জিন্না তাঁহার দাবী ছাড়িবেন না এবং কংগ্রেস বা অপর দলসমূহ

তাঁহার দাবী মানিয়া লইবেন না। লিগ ভিন্ন সকল দলেরই আশা ও ইচ্ছা ছিল যে, ওয়াভেল সাহেব লিগের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। কিন্তু ওয়াভেল সাহেব তাহা করেন নাই। তিনি যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি সর্ত্ত এই ছিল যে, সর্ব্বদল সমর্থন না করিলে, নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে না, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বহাল থাকিবে। এই সর্ত্তটি কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় মূল প্রস্তাব বাতিল হইয়া গিয়াছে। ঐ সর্ত্তটি ওয়াভেল সাহেবের নিজের কথা নহে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কথা। যদি ঐ সর্ত্তটি না থাকিত, তবে বোধ হয় তিনি একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। যে ব্রিটিশ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট ওয়াভেল সাহেবকে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে অনুমতি দিয়াছিল, সেই গবর্ণমেণ্ট এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া শুধু কেয়ারটেকার গবর্ণমেণ্টে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার নাই ঐ সর্ত্তটির পরিবর্ত্তন করিতে। সুতরাং নূতন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়া ঐ সর্ত্তটি পুনর্বিবেচনা না করা পর্য্যন্ত ওয়াভেল সাহেবের নিজে কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না।

কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, ওয়াভেল সাহেবের প্রস্তাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা ছিল না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জানিতেন যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মিঃ জিন্না জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের সহিত কোন দিন এক মত হইতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমান বিষয়েও এক মত হইবেন না; এবং কংগ্রেস ও মিঃ জিন্না একমত হইয়া গবর্ণমেণ্ট গঠন করে ইহাও তাঁহারা চাহেন না। তবে সানফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতকে স্বাধীন জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় এবং ভারতে ব্রিটিশ নীতি সম্বন্ধে আমেরিকা ও রুশিয়ার নেতাগণের তীব্র সমালোচনার ফলে ভারতবর্ষকে আরও কিছু অধিকার দিতে না চাহিলে ভাল দেখা যায় না বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ওয়াভেল সাহেবের মারফতে কথিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথমতঃ, পৃথিবীর সমক্ষে প্রচার করা যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার অধিকার ও ভার মাত্র হাতে রাখিয়া অপর সকল অধিকার ও ভার ভারতীয়-দের হাতে প্রদান করিতে ব্রিটিশ প্রস্তুত আছেন, সুতরাং কেহ বলিতে পারিবে না যে ওয়ার্ল্ড চার্টার অনুসারে ভারতীয় জাতিকে স্বাধীন বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে সেই ঘোষণা ব্রিটিশ জাতি মানিয়া লন নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণ করা যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দিতে চাহেন, কিন্তু ভারতবাসী একমত হইয়া তাহা নিতে পারিতেছে না। যদিও গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠদলের মতানুসারে সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু ভারত সম্পর্কে ঐ নীতি প্রযোজ্য নহে; কারণ, ব্রিটেন ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অভিভাবক এবং অভিভাবকের কর্ত্তব্য সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে দেখা। লিগের নেতা মিঃ জিন্নার বর্ত্তমান স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পাকিস্তান। মিঃ জিন্না সেই দাবী ছাড়িতে ইচ্ছা না করিলে অভিভাবক ব্রিটিশ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনরূপ শাসন-সংস্কার আনিতে পারেন না। মিঃ জিন্না যখন আশঙ্কা করিতেছেন যে ওয়াভেল সাহেবের প্রস্তাবিত নূতন ভারত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের পাকিস্তানের দাবীর গুরুতর ক্ষতি হইবে এবং সেই কারণে পাকিস্তান অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নূতন গবর্ণমেণ্ট তিনি মানিয়া লইবেন না, তখন জোর করিয়া লিগের ঘাড়ে নূতন গবর্ণমেণ্ট চাপাইয়া দেওয়া অভিভাবক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইত না। আর কেহ তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক সাহেব তাহা সৎসাহসের সহিতই প্রকাশ করিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর সমালোচকের কথাও আমরা শুনিতেছি। তাঁহারা লিগের মনোভাবের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, নূতন গবর্ণমেণ্ট দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলে হয় ত সর্ব্বব্যাপী অনাচার ও অত্যাচার-জর্জ্জরিত, খাদ্য ও বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বজনসাধারণের দুঃখকষ্টের কিছু লাঘব হইত। কিন্তু তৎপ্রতি মিঃ জিন্নার দৃষ্টি যায় নাই। গবর্ণমেণ্টের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মজুত থাকিতেও লক্ষ লক্ষ মুসলমান এক মুঠা অন্নের অভাবে মরিয়াছে এবং দেশের মধ্যে হাজার হাজার বেল কাপড় ও সূতা বর্ত্তমান থাকিতেও লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মুসলমান কৃষক,মজুর ও তাঁতি বস্ত্রাভাবে ও ব্যবসাভাবে ক্লিষ্ট বা বৃত্তিহীন হইয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি যায় নাই। তিনি চান পাকিস্তান —অর্থাৎ ভারতবর্ষকে তথা ভারতবাসিগণকে পৃথক্ পৃথক্ অংশে বিভক্ত করিয়া কয়েকটি অংশের উপর মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিতে। ইহা হইলে যে ভারতবাসিগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও স্থায়ী অমিলন ঘটিবে, তাহার ফলে যে ভারতবাসী মাত্রেরই ঘোর অকল্যাণ হইবে, তৎপ্রতিও তাঁহার দৃষ্টি যায় নাই। তিনি যদি অকল্যাণকারী পাকিস্তানের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া মুসলমান জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর দৃষ্টি দিতেন, তবে ওয়াভেল সাহেবের প্রস্তাবিত নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপনে বাধা পড়িত না এবং তবেই মুসলমানগণের প্রকৃত হিত সাধিত হইত।

লিগ-নেতা মিঃ জিন্নার উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা উভয়ই আমাদিগকে ব্যথিত করে। আমরা চাই মানুষে মানুষে মিলন। আমরা শুধু ভারতবর্ষের মনুষ্য-সমাজের মিলনে সন্তুষ্ট নহি, আমরা চাই সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যসমাজের মিলন। কারণ আমরা বিশ্বাস করি না যে, ভারতের মনুষ্য সমাজের পূর্ণ-মিলন না হইলে ভারতের রাষ্ট্র বা সমাজ বা অর্থনীতি কোন ক্ষেত্রেই ভারতের কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং ইহাও বিশ্বাস করি না যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজের মিলন না ঘটিলে শুধু ভারতবাসী মিলিত হইলেই ভারতের সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমরা ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজের যে মিলন কামনা করি, সেই মিলন মানব-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা ঘটিতে পারে না। হিংসাদ্বেষ-জর্জ্জরিত ও শান্তি-হারা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে মানবধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত মিলনের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, কি রাষ্ট্রীয়, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানই মানুষকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত না হইলে কোন দেশে বা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না;

এবং মানুষকে কেন্দ্র করিয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে মানবধর্ম্মের উপর ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মানুষের শান্তি ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত একসঙ্গে চলিতে পারে না।

মানবধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কথাও সত্য যে যতদিন তাহার প্রতিষ্ঠা না হইবে, ততদিন কোন দেশেরই মানুষের সমস্যাসমূহের সমাধান হইবে না, শান্তিও আসিবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যে, পৃথিবীর নেতাগণ মুখে মানুষের অধিকার মানিয়া লইলেও কার্য্যতঃ ঐ অধিকার মানিয়া লইবে না এবং মানব-ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। যদি তাহা না হয়, তবে পুনরায় যুদ্ধাদি ঘটিবে, শান্তিও স্থাপিত হইবে না। কিন্তু ইহা সত্য, কেহ বিশ্বাস না করিলেও আমরা বলিব ইহা সত্য যে, পৃথিবীতে পুনরায় মানবধর্ম্ম স্থাপিত হইবে, মানুষকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিবে। নিকট ভবিষ্যতে তাহা হইবে না বলিয়া আমরা সেই আদর্শ ত্যাগ করিব না।

সুতরাং, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার উপর ওয়াভেল সাহেবের প্রস্তাবিত নূতন গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপন আমরা সমর্থন করি নাই; যদি উহা সংস্থাপিত হইত তবে সর্ব্বক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রভাব থাকিত এবং বর্ত্তমানের অমিলন আরও দৃঢ় হইত। যে ক্ষেত্রে মিলন না থাকায় অধিকাংশ মানুষেরই জীবন-যাত্রা দুঃসহ হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে যদি অমিলন আরও দৃঢ় হয়, তবে এতদ্দেশের সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে।

পৃথিবীর শান্তি-সমস্যা ও উহার সমাধান

পৃথিবীর শান্তি-সমস্যার সমাধানকল্পে সান্‌ফ্রান্সিস্কো সহরে সম্মিলিত পঞ্চাশটি জাতির প্রতিনিধিগণ নয় সপ্তাহকাল বহু গবেষণা করিয়া ওয়ার্ল্ড চার্টার নামে একটি শান্তি-পত্র রচনা করিয়াছেন এবং তাহা সকলেই সাক্ষর করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ বলিয়াছেন যে, ঐ শান্তি-পত্র কার্য্যে পরিণত হইলে পৃথিবীতে মানুষের আর যুদ্ধভয় থাকিবে না, মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। প্রশ্ন হইতেছে—ঐ শান্তি-পত্র শান্তিস্থাপন ও রক্ষা বিষয়ে পর্য্যাপ্ত কি না এবং তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে কি না!

ঐ শান্তি-পত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মিলিত জাতি-সমূহ পরবর্ত্তী পুরুষের মানবমণ্ডলীকে ধ্বংসকারী যুদ্ধের হাত হইতে রক্ষা করিতে এবং মনুষ্য সমাজের মৌলিক অধিকার ও নরনারী এবং ছোট বড় সকল জাতির সম মর্য্যাদা ও সমান অধিকার মানিয়া লইতে, আন্তর্জ্জাতিক আইনসম্মত চুক্তি ও সন্ধি-পত্রের বাধ্যবাধকতার প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে, সামাজিক অবস্থা ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করিতে এবং তদুদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার ব্যবহারক্রমে সৎ-প্রতিবেশী ভাবে শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করিতে এবং সাধারণের স্বার্থে ভিন্ন অন্য কোন কারণে সামরিক বল ব্যবহার না করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আর ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং তাহা নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত হইবে, যথা:—

১। মিলিত জাতিসমূহের প্রতিনিধি লইয়া জেনারেল এসেমব্লী নামে একটি পরিষদ থাকিবে; ঐ পরিষদের ক্ষমতা থাকিবে উহার নিকট উপস্থিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা এবং কোন বিষয়ে কি করা না করা তদসম্বন্ধে সুপারিশ করা।

২। সিকিউরিটি কাউন্সিল নামে একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে এবং তাহার সভ্য-সংখ্যা ১১ জন হইবে। ঐ ১১ জন মধ্যে স্থায়ী সভ্য থাকিবেন প্রধান পাঁচটি রাষ্ট্র, যথা: গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, রুশিয়া, চীন ও ফ্রান্স। বাকী ৬টি সভ্য অস্থায়ী হইবে এবং জেনারেল এসেমব্লী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। উক্ত কাউন্সিলের হাতে নিরাপত্তা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা থাকিবে এবং কার্য্যপন্থা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা উপরোক্ত পাঁচটি স্থায়ী সভ্যের প্রত্যেকের নাকোচ করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৩। ইকনমিক ও সোস্যাল কাউন্সিল নামে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে এবং তাহাতে ১৮ জন সভ্য থাকিবে এবং তাহারা উপরোক্ত জেনারেল এসেমব্লী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। এই সভা আন্তর্জ্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং কৃষ্টিবিষয়ক, শিক্ষা-বিষয়ক ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেনারেল এসেমব্লীর সমীপে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবে।

৪। ট্রাষ্টিসীপ কাউন্সিল নামে একটি ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। যে সমস্ত দেশ বিদেশী রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের অধীন আছে, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধানের দায়িত্ব এই সভার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৫। ইণ্টারনেশন্যাল কোর্ট অব জাষ্টিস্ নামে একটি আন্তর্জ্জাতিক বিচারাদালত থাকিবে।

৬। সেক্রেটারিয়েট নামে একটি সরকারী দপ্তরখানা থাকিবে। এই দপ্তরখানা কোন রাষ্ট্র বিশেষের হুকুম মত কাজ করিতে পারিবে না।

উপরোক্ত শান্তি-পত্র উহার স্বাক্ষরকারী প্রতিনিধিগণের স্বীয় স্বীয় রাষ্ট্র অনুমোদন করিলে পরে, তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

সানফ্রান্সিস্কো সহরে শান্তিবৈঠক আহুত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে ৺সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পত্রিকায় পৃথিবীর শান্তিসমস্যার সমাধান বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতে আমরাও তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ঐ শান্তি বৈঠকের আলোচনাসমূহ খবরের কাগজের মারফতে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা শান্তিস্থাপন বা রক্ষা বিষয়ে

আশান্বিত হইতে পারি নাই। এইক্ষণ ঐ শান্তি-পত্র দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।—

প্রথমতঃ, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীন সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া তদ্বারা শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। যে সকল জাতি মিত্রপক্ষে যোগদান করে নাই, তাহাদিগের যোগদান করিবার বাধা নাই বটে, কিন্তু তাহারা যাহাতে স্বেচ্ছায় যোগদান করে, সেইরূপ কোন ব্যবস্থা শান্তি-পত্রে নাই। যাহারা শান্তিপত্র মানিবে না, তাহাদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। সামরিক বলে তাহাদিগকে শাসন করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও যুদ্ধাশঙ্কা বিদূরিত হয় নাই বা হইতে পারে না। সুতরাং শান্তিপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মানব-সমাজকে যুদ্ধ-ভীতি হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শান্তি-পত্রানুসারে কোন দেশের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাত থাকিবে না। পক্ষান্তরে ঐ সকল ব্যবস্থা বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বতন্ত্র মতবাদ পোষণ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অধিকারী থাকিবে। তাহার ফলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রমধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য ও প্রতিযোগিতা নিবন্ধন সংঘর্ষ ঘটিবার এবং ঐ সংঘর্ষ যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে। আমাদের এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান যুদ্ধ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীয় স্বীয় জাতীয় অর্থনীতি অনুসারে বিভিন্ন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ার ফলে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্যতম কারণ। সমগ্র মানবসমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি একই রূপ না হইলে এইরূপ সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া থাকে, ইতিহাস তাহার প্রমাণ। তারপর রাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন থাকিলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক মতানৈক্য বশতঃ যে যুদ্ধ ঘটিয়াথাকে, তাহাও বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং ঐ শান্তি-পত্র মানব-সমাজকে যুদ্ধ-ভীতি বা যুদ্ধ হইতে মুক্ত করিতে পর্য্যাপ্ত নহে।

তৃতীয়তঃ, ঐ শান্তিপত্রানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রধান পাঁচটি জাতিবা রাষ্ট্র একমত না হইলে নিরাপত্তা পরিষদ (security council) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং, ঐ পাঁচটি রাষ্ট্রমধ্যে কোন রাষ্ট্র শান্তিভঙ্গ করিলে বা অন্য কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিলে, উপরোক্ত এক মতের অভাব হেতু ঐ পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী বা অন্যায়কারী রাষ্ট্র বা জাতিকে শাসন করিতে পারিবে না। তদবস্থায় ঐ শান্তি-পত্র মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর স্থাপিত লিগ অব নেসন্‌স্‌ যেমন শান্তি রক্ষা করিতে পারে নাই, উক্ত নিরাপত্তা পরিষদও সেইরূপ শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে না।

চতুর্থতঃ, যুদ্ধ কেন হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধ ও বর্ত্তমান যুদ্ধ কেন উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা সাধনের পরিচয় শান্তি-পত্রে নাই। আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ আপোষ মীমাংসার এবং আপোষে মীমাংসা না হইলে সামরিক বল প্রয়োগে মীমাংসার ব্যবস্থাই শুধু হইয়াছে, কিন্তু বিবাদ যাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা নাই। বিবাদ যাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা না থাকায় সামরিক বল প্রয়োগের অর্থাৎ যুদ্ধ ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই কারণেও শান্তি-পত্র মানব সমাজকে যুদ্ধ-ভীতি হইতে মুক্ত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

ইউরোপের যুদ্ধাবসানের পর তথায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে মনে হয় যে তথাকার জাতিসমূহ মধ্যে আন্তরিক মিলন নাই, পক্ষান্তরে বিবাদের কারণ ও প্রবৃত্তি বলবৎ রহিয়াছে। এখনও এক দেশ বা রাষ্ট্র অপর এক দেশ বা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করিতে বা বলপূর্ব্বক স্বার্থ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছে অথবা চেষ্টার উদ্যোগ করিতেছে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে সন্দেহ আছে যে, ঐ শান্তি-পত্র আদৌ কার্য্যে পরিণত হইবে কি না!

মানব সমাজকে যুদ্ধ-ভীতি হইতে মুক্ত করিতে হইলে, কোন কারণেও আর যুদ্ধ ঘটিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রবলতর সামরিক বলে শান্তিভঙ্গকারীকে শাসন করার ব্যবস্থা যুদ্ধ নিবারণের ব্যবস্থা নহে। আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি যে, পৃথিবীতে আর যুদ্ধ ঘটিতে না পারে তাহা করিতে হইলে মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও ঐ যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল কারণ মানুষের নানাবিধ অভাব ও দারিদ্র্য দূর ও নিবারণ করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য যে প্রকারের কেন্দ্রীয় দেশীয়, ও গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক তাহা আমরা গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কর্ত্তব্য কি কি তাহাও আমরা ঐ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা তাহা আরও বিষদভাবে আলোচনা করিব।

বাঙ্গালায় অন্নদুর্ভিক্ষাবস্থা

বিগত ৪ঠা জুলাই তারিখে বেতারবার্ত্তায় বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গালার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেই তিনটি কথার মর্ম্ম এইরূপ, যথা :—

১। গবর্ণমেণ্টের মজুত চাউল দ্রুত বিক্রয় হইতেছে না।

২। ধান চাউলের বিষয় গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের অবস্থা অনেক উন্নত এবং বর্ত্তমানে ঐ বিষয়ে বাঙ্গালার অবস্থা নিরাপদ।

৩। বর্ত্তমানের অবস্থা এত নিরাপদ যে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার বাহিরের লোকদিগকে চাউল দিয়া সাহায্য করিতে পারেন ও সাহায্য করা কর্ত্তব্য মনে করেন ; এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অপর দেশের সাহায্য নিমিত্ত এক লক্ষ টন চাউল প্রদান করিতেছেন।

বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য—চাউলের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র গবর্ণর বাহাদুর যাহা অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহা মনে করা অসঙ্গত হয় না যে বাঙ্গালার অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিদূরিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালার দরিদ্র জনসাধারণের আর কোন দুঃখ কষ্ট নাই ও হইতে পারে না। কোন দেশে চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্য মজুত ও আমদানী থাকিলে সেই দেশের

জনসাধারণের খাদ্য বিষয়ে দুঃখ কষ্ট থাকিতে পারে না, ইহা অতীব সত্য কথা। কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালাদেশে চাহিদার অতিরিক্ত ধান-চাউল মজুত ও আমদানী থাকা সত্ত্বেও ইহার অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঘুচিল না।

বাঙ্গালার ঘাটতি এলাকা (deficit area) সমূহে আজও ন্যূনপক্ষে ১৫৲ টাকার কমে একমণ চাউল পাওয়া যায় না; কোন কোন স্থানে প্রতি মণের দর ১৮৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং আরও উঠিবার সম্ভাবনা আছে। ঐ সকল এলাকার দরিদ্র জনসাধারণ এত উচ্চ মূল্যে আবশ্যকীয় পরিমাণ চাউল কিনিতে পারিতেছে না এবং তাহার ফলে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটাইতেছে। এইরূপ দরিদ্র লোকের সংখ্যা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনের কম নহে; এবং ঘাটতি এলাকাও সমগ্র বাঙ্গালার অর্দ্ধাংশের কম নহে। সমগ্র বাংলায় চাহিদার অতিরিক্ত বা চাহিদানুরূপ ধান চাউল মজুত ও আমদানী থাকা সত্ত্বেও অর্দ্ধ বাঙ্গালার জনসাধারণের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক মূল্যের উচ্চতা হেতু আবশ্যকীয় পরিমাণ চাউল কিনিতে পারিতেছে না, ইহা যে অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থা—তাহা গবর্ণর বাহাদুর অস্বীকার করিতে পারেন না; অথচ সেই অবস্থার বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে, এইরূপ অবস্থা যাহারা ঘটাইয়াছে, তাঁহার সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের সেই কর্ম্মচারিবৃন্দকে তিনি প্রশংসা করিয়াছেন।

ঘাটতি এলাকাসমূহে ধান চাউলের আমদানী না থাকার জন্যই যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, ইহা বুঝা কি খুব কঠিন? যাহারা আবহমানকাল হইতে গ্রাম্য হাট বাজারে ধান চাউল আমদানী করিয়া গ্রাম্য লোকের আবশ্যকীয় পরিমাণ ধান চাউলের সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের স্বাধীন ব্যবসা বন্ধ করিয়া, অর্থাৎ ঐরূপ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজে সরবরাহের দায়িত্ব নিলেন, অথচ সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন না। সহরে ও বড় বড় বন্দরে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মজুত হইল, কিন্তু কোন ইউনিয়নে ধান বা চাউল মজুত হইল না। গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন যে, গ্রাম্য ফুড কমিটির মনোনীত দোকানদারগণ সহর বা বন্দর হইতে গবর্ণমেণ্টের মজুত করা চাউল নগদ মূল্যে কিনিয়া আনিয়া গ্রামে তাহা সরবরাহ করিবে। ঐ সকল দোকানদার ইউনিয়নের আবশ্যকীয় পরিমাণের দশ ভাগের এক ভাগ চাউলও কিনিয়া নিল না এবং অনেক ইউনিয়নের দোকানদারগণ এক মণ চাউলও কিনিয়া নিল না, সেই খবর গবর্ণমেণ্ট জানিলেন অথচ গ্রামে গ্রামে চাউলের আমদানীর অন্য কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। ঐ সকল দোকানদার যে চাউল কিনিল না, তাহার প্রমাণ ত গবর্ণর বাহাদুর নিজেই দিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের মজুত করা চাউল দ্রুত বিক্রয় হয় নাই ও হইতেছে না। কেন বিক্রয় হয় নাই, তাহা অনুসন্ধান করিলেই তিনি জানিতে পারিতেন যে যাহাদের জন্য চাউল মজুত করা হইয়াছে তাহাদিগের আবশ্যকীয় চাউল সরবরাহের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের ষ্টকে চাউল রহিয়াছে, অথচ গ্রাম অঞ্চলে তাহা সরবরাহ হইল না; এদিকে চাউল পচিয়া গেল, অপর দিকে গ্রাম্য লোক ব্লাক মার্কেটের ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে উচ্চ দরে ধান চাউল কিনিতে বাধ্য হইল—এই অবস্থা যাহারা ঘটাইল তাহারা শাস্তির পরিবর্ত্তে প্রশংসা পাইল! হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশেই ইহা সম্ভব হইল!

সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টের কর্ণধারগণ নিশ্চয়ই গবর্ণর বাহাদুরকে বুঝাইয়াছেন যে ইউনিয়নে চাউল বা ধান মজুত (stock) করা সম্ভব নহে। যদি তাহা অসম্ভবই ছিল, তবে সহরের গুদাম হইতে গবর্ণমেণ্টের চাউল গ্রামে গ্রামে সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল না কেন? যদি তাহাও অসম্ভব হইয়াছিল তবে যে সকল গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা গ্রাম অঞ্চলে ধান চাউল সরবরাহ করিত তাহাদের ব্যবসার পথ বন্ধ করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজের স্কন্ধে চাউল সরবরাহের দায়িত্ব নিলেন কেন? গ্রাম অঞ্চলে কি উপায়ে ধান চাউল সরবরাহ করা সম্ভব হয় তাহা না জানিয়া এইরূপ গুরুতর দায়িত্ব যাহারা নিল—অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও হৃদয়হীন সেই সকল কর্ম্মচারিবৃন্দকে আজও গবর্ণর বাহাদুর জনসাধারণের অর্থে পোষণ করিতেছেন এবং শাস্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রশংসা করিতেছেন—ইহা বাঙ্গালীর অদৃষ্টের পরিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টের কর্ণধারগণ হয়ত গবর্ণর বাহাদুরকে ইহাও বুঝাইয়াছেন যে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের মজুত করা চাউলের কতকাংশ (খুব সম্ভব যাহা বিক্রয় না করিলে পচিয়া যাইবে সেইরূপ চাউল) গ্রামাঞ্চলে সরবরাহের জন্য প্রতিমণ ৮৲ টাকা দরে পাইকারগণের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকল পাইকার ৮৲ টাকা দরে চাউল কিনিয়া নিয়া গ্রামাঞ্চলে উহা বিক্রয় করিয়াছে কিনা এবং বিক্রয় করিয়া থাকিলে কি দরে বিক্রয় করিয়াছে, সেই খবর তাঁহারা নিয়াছেন কি? আমরা কিন্তু খবর পাই যে ঐ সকল পাইকার ৮৲ টাকা দরে চাউল কিনিয়া নিয়া খুসীমত স্থানান্তর করিতেছে এবং ১৫৲ টাকার কম দরে বিক্রয় করিতেছে না। যদি গ্রামাঞ্চলে ঐ চাউল কম দরে বিক্রয় হইত, তবে তথায় ১৮৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে কেন? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে রহস্য আছে! যে সময়ে প্রকাশ্য ঘুষ দেওয়া নেওয়া চলিতেছে, সেই সময়ে ইহার অভ্যন্তরে ঘুষের ব্যাপার নাই, ইহা কেমন করিয়া বলিব? যাহাই হউক না কেন, ইহা সত্য যে পাইকারগণের নিকট সস্তা দরে চাউল বিক্রয় দ্বারা গ্রাম অঞ্চলে চাউল সরবরাহ সরল বা সহজ হয় নাই। তথাকার অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থার কিছুমাত্র উপশম হয় নাই।

এই ত' গেল ঘাটতি এলাকার গ্রাম অঞ্চলের কথা। কলিকাতার দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থাও কম শোচনীয় নহে। কলিকাতার বাহিরের নিকটবর্ত্তী উদ্বৃত্ত এলাকায় ১০৲ টাকা মণ দরে ভাল চাউল পাওয়া যায়, অথচ তাহারা কলিকাতায় ১৬।০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে বাধ্য হইতেছে। গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে ১৬ই জুলাই হইতে কলিকাতায় মোটা চাউল

১০৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইবে। সেই মোটা চাউল খাদ্য কি অখাদ্য হইবে তাহা না দেখা পর্য্যন্ত বুঝা যাইবে না।

সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মকর্ত্তাদের দোষক্রটির জন্য লক্ষ লক্ষ মণ অখাদ্য ও ভেজাল চাউল গবর্ণমেণ্ট কিনিয়াছেন এবং তাহা বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণ বিক্রয় হয় নাই। ঐ ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে আমাদের মনে হয়, ঐ শ্রেণীর চাউল-ই ১০৲ টাকা মণ দরে কলিকাতায় বিক্রয় হইবে। যদি আমাদের সন্দেহ অমূলক হয় তাহা হইলেও আমরা বলিতে চাহি যে যাহারা মোটা চাউল খাইতে অভ্যস্ত নহে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ৫৲ টাকা মণ দরে সরু চাউল কিনিয়া খাইতে অভ্যস্ত ছিল, তাহাদিগকে ত' বাধ্য হইয়াই ১৬।০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হইবে। যে-সকল পরিবারের মাসিক আয় একশত টাকা কি দেড়শত টাকার বেশী নহে, এইরূপ গৃহস্থের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সকল জিনিষের চড়্‌তি বাজারে এত দীর্ঘ কাল ১৬।০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাওয়া কি কঠিন ব্যাপার, তাহা গবর্ণর বাহাদুরের হৃদয়ঙ্গম করা উচিৎ। এবং সেইরূপ গৃহস্থের সংখ্যা কলিকাতার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনের বেশী বই কম হইবে না, তাহাও তাঁহার জানা উচিৎ। যদি তিনি উপরোক্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে বা জানিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, দীর্ঘকাল ১৬।০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাওয়ার অবস্থাকে ঐ সকল গৃহস্থের পক্ষে অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থা বলা অসঙ্গত হইবে না।

এই যে অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থা, ইহার প্রতিকার কি? আমরা বলিব যে, ইহার প্রতিকার বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় ধান চাউলের কন্‌ট্রোল তুলিয়া দেওয়া। গবর্ণর বাহাদুর নিজেই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ধান চাউল বিষয়ে অবস্থা নিরাপদ। এইরূপ নিরাপদ অবস্থায় কন্‌ট্রোল বহাল রাখার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। কন্‌ট্রোল তুলিয়া দিলে গ্রাম অঞ্চলে যাহারা পূর্ব্বকাল হইতে ধান চাউলের আমদানী করিত, তাহারাই তাহা আমদানী করিবে এবং কলিকাতা অঞ্চলেও নানাস্থান হইতে পূর্ব্বের ন্যায় ধান চাউলের আমদানী হইবে এবং মূল্যও জনসাধারণের আয়ত্তে আসিবে। যখন চাহিদানুরূপ ধান চাউলের সংস্থান আছে, তখন গবর্ণমেণ্ট যদি পূর্ব্বোক্ত এক লক্ষ টনের বেশী চাউল রপ্তানী না করেন, তবে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে অবাধ বাণিজ্যের ফলে ধান চাউলের সরবরাহ সরল ও সহজ হইবে এবং মূল্যও উপযুক্ত দরে পরিণত হইবে। তাহার প্রমাণ যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা। গত বৎসরের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসেও যখন বড় বড় চাষীরা গোলা খালাস করিবার জন্য তাহাদের মজুত রাখা (hoarded) ধান বাজারে ছাড়িয়াছিল, তখন ঘাটতি অঞ্চলে উপযুক্ত আমদানীর নিমিত্ত ব্লাক মার্কেটেও ধানের দর প্রতি মণ ৬৲ টাকা ও চাউলের দর প্রতি মণ ১০৲ টাকা হইয়াছিল। দেশের লোক মনে করিয়াছিল যে, সুদিন বুঝি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায়ী ডিপার্টমেণ্ট ঐরূপ দর সহ্য করিতে পারেন নাই! তাঁহারা দেখিলেন যে, ঐ দর বহাল থাকিলে গবর্ণমেণ্টের চাউল ১৫৲ টাকা দরে কেহ কিনিবে না; সুতরাং তাঁহারা ধান চাউলের উপরোক্ত নিষিদ্ধ বাণিজ্য কঠোরতার সহিত বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্যবসা-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ডিপার্টমেণ্ট জনসাধারণের সুবিধা না দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ-লোকসানই দেখিলেন। যেন তাঁহাদের হাতে গবর্ণমেণ্টের লোকসান হয় নাই। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি যে, বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে চাউলের ব্যবসায় যে কোটি কোটি টাকা লোকসান দেখান হইয়াছে, ঐ লোকসান ঘটাইয়াছে কাহারা? আর যদি ধান চাউলের দাম ন্যায্য পরিমাণে পড়িয়াই যাইত, তবে তজ্জনিত গবর্ণমেণ্টের লোকসান বহন করিত কাহারা? যাহাদের লক্ষ লক্ষ আপন জন ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে এবং যাহারা আজও অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থার ভিতর দিয়া কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহারাই ত' পূর্ব্বের লোকসান বহন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের লোকসানও বহন করিবে। লোকসান গবর্ণমেণ্টের হইবেই, তবে মানুষও মরিবে এবং লোকসানও হইবে। গবর্ণর বাহাদুর নূতন করিয়া সুন্দর সুন্দর গুদাম প্রস্তুত করাইয়াছেন —বলিয়াছেন। ঐ সকল গুদামে মজুত চাউল আগেও যেমন দ্রুত বিক্রয় হয় নাই পরেও তেমনই দ্রুত বিক্রয় হইবে না। ফলে, অধিকাংশ চাউলই পচিয়া যাইবে। সুতরাং ঐ চাউল এখনই সস্তাদরে বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং কন্‌ট্রোল উঠাইয়া দেওয়া হউক। ঐ চাউল বাজারে থাকিলে ব্যবসায়ীরা চাউলের দর বাড়াইতে পারিবে না। 'ইহা করিলে যে লোকসান হইবে, তাহা বাঙ্গালী হাসিমুখেই বহন করিবে। পূর্ব্বে মরিতে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোকসান বহন করিয়াছে বাঁচিবার অবস্থায় হাসিমুখেই তাহা বহন করিবে।

আমরা প্রাণের বড় ব্যথা লইয়া এবং নিজেদের উপায়হীন মনে করিয়া এই আলোচনা করিতেছি। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের রাহুগ্রাসে পতিত হইয়া মরিতে মরিতে যাহারা বাঁচিয়া উঠিল, তাহারা যে এখনও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হইয়া কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিতেছে, সেই দিকে আমরা গবর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে-বাঙ্গালী মজুর দেড়মণী বস্তা লইয়া ৮।১০ মাইল পথ অনায়াসে চলিতে পারিত, সে যে আজ আধমণ লইয়াও চলিতে পারিতেছে না এবং যে কৃষক পূর্ব্বে তিন বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত, সে যে আজ প্রতিদিন দুই বেলা দূরে থাকুক এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। দরিদ্র চাষী এবং জমিহীন মজুর, মধ্যবিত্ত, তাঁতি, মৎসজীবী, কামার, কুমার প্রভৃতি সমাজের বৃহৎ অংশই যে আজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে! আমরা সেই অবস্থার প্রতি গবর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কন্‌ট্রোল তুলিয়া দেওয়া ভিন্ন তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার অন্য উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট যে সকল গুদাম প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু ধান চাউল মজুত থাকুক এবং বর্ত্তমান অবস্থায় থাকাও দরকার।

গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে আবশ্যকমত রিলিফ দেওয়ার ধান চাউল মজুত রাখিতে হইবে। তাহা অতিশয় ভাল কথা। এজন্য যে ধান চাউলের দরকার তাহা অন্য ব্যবসায়ীর ন্যায় গবর্ণমেণ্ট কিনিবেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। ১৯৪২ সালে অন্য ব্যব-

ব্যবসায়ীর ন্যায় গবর্ণমেণ্ট ধান চাউল কিনিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষতি হয় নাই। যখন চাউল রপ্তানী হইতে লাগিল এবং কলিকাতার বড় বড় বৃটিশ ফারমগুলি ভয়ে ভয়ে হাজার-হাজার মণ চাউল কিনিয়া গুদামজাত (hoard) করিতে আরম্ভ করিল, তখনই ক্ষতি আরম্ভ হইয়াছিল। রপ্তানী যদি বন্ধ থাকে এবং আমদানীও যদি পর্য্যাপ্ত হয় (যেমন বর্ত্তমানে আছে বলিয়া গবর্ণর বাহাদুর বলিতেছেন) তবে অবাধ বাণিজ্যে কোন ক্ষতি ত হয়-ই না, অন্যথায় গুরুতর ক্ষতি হইয়া থাকে, যেমন হইতেছে।

স্বার্থবিশিষ্ট লোক হয়ত গবর্ণর বাহাদুরকে বলিবে যে কন্‌ট্রোল না থাকিলে ধানের দাম কমিয়া যাইবে এবং তাহাতে চাষীর ক্ষতি হইবে। এই কথার কোনই মূল্য নাই। বরং কন্‌ট্রোলের অবস্থায় চাষীরা গবর্ণমেণ্টের খরিদ্দার এজেণ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ী ভিন্ন অপরের নিকট অবাধে ধান্য বিক্রয় করিতে না পাবায় ধানের দর উদ্বৃত্ত অঞ্চলে পড়িয়া গিয়াছে; তজ্জন্য চাষীরা চীৎকারও করিতেছে। ঘাটতি এলাকায় ধানের দর যে বেশী হইতেছে, তজ্জন্য চাষীরা উপকৃত হইতেছে না। ঘাটতি অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য যাহারা চাষীদের নিকট হইতে ধান কিনিয়া আনে, তাহারা কেহ কেহ লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং অধিকাংশই ব্লাক মারকেটের ব্যবসায়ী। ব্লাক মারকেটের ব্যবসায়িগণের ঐ ব্যবসা করিতে বহু লোককে ঘুষ দিতে হয়। নৌকা পথে স্থানে স্থানে যে সকল পুলিশ মোতায়ান থাকে, তাহাদিগকে ত উপযুক্ত সেলামী দিতেই হয়, নূতন আর একদল জুটিয়াছে গ্রাম্য ভোমগাড, তাহাদিগকেও ঘুষ দিতে হয়। এত ঘুষ দিতে হয় বলিয়াই ঐ সকল ব্যবসায়ীরা অল্প মূল্যে খরিদ করা ধান উচ্চদরে বিক্রয় করিয়া থাকে। উপযুক্ত আমদানীর অভাবে বাজারে সকল জিনিষের দরই উঠিয়া থাকে, ঘাটতি অঞ্চলে ধানের বেলাও তাহাই হইতেছে। ইহাই হইল ঘাটতি অঞ্চলে ধানচাউলের উচ্চ দরের কারণ। এই উচ্চ দরের উপকার চাষীরা পাইতেছে না, পাইতেছে গবর্ণমেণ্টের খরিদ্দার এজেণ্টগণ ও পেটোয়া ব্যবসায়িগণ, আর পাইতেছে পূর্ব্বোক্ত ঘুষখোরের দল। সুতরাং কন্‌ট্রোল উঠিয়া গেলে চাষীর ক্ষতি হইবে, এই কথার কোনই মূল্য নাই।

গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টাগণ ইহাও বলিতে পারেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি কন্‌ট্রোল তুলিয়া দেন এবং খরিদ বন্ধ করেন, তবে আবার ধান চাউলের অভাব হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধান চাউল যদি রপ্তানী না হয় এবং আমদানীর প্রাচুর্য্য থাকে, তবে অভাব হইতে পারে না। তারপর গবর্ণমেণ্ট খরিদ বন্ধ করিবেন, এমন কথা আমরা বলি না। আবশ্যক মত রিলিফের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট কিছু ধান চাউল খরিদ করিয়া নানাস্থানে রাখিবেন, এবং অন্য ব্যবসায়ীর ন্যায় খরিদের কার্য্য করিবেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। স্থূল কথা, সমগ্র বাঙ্গালার ধান চাউল সরবরাহের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐ দায়িত্ব বহন করিবার উপযুক্ত সংগঠন বা উপযুক্ত ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের নাই। সুতরাং আর ঐ দায়িত্ব না রাখিয়া সাধারণ ব্যবসায়ীদের উপরই সরবরাহের ভার দেওয়া হউক, আমরা ইহাই বলিয়াছি। তাহাতে আমদানীর অভাবজনিত অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিদূরিত হইবে এবং হাজার হাজার গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করিয়া বাঁচিবে। তাহাদের টাকায় ও তাহাদের নৌকায় যাহারা আবহমান কাল হইতে ঐ ব্যবসা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহাদের নৌকা ঘাটে বাঁধা। কন্‌ট্রোল উঠিয়া গেলে তাহারা আবার সরবরাহের কার্য্য আরম্ভ করিবে। তারপর গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আসাম হইতে চল্লিশ হাজার টন চাউল শীঘ্রই বাঙ্গালায় আসিতেছে, বার্ম্মার চাউলও আসিবার সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্টের গুদামেও যথেষ্ট ধান চাউল মজুত আছে ও পরেও থাকিবে। ইহা সত্ত্বেও যদি ঘাটতির আশঙ্কা থাকে, তবে একলক্ষ টন চাউলের রপ্তানীর ব্যবস্থা হইতেছে কেন? গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, উহা রপ্তানী করিলেও বাঙ্গালার ক্ষতি হইবে না। তাই যদি সত্য হয়, তবে কন্‌ট্রোল বহাল রাখিবার কোন মানেই হয় না। চাহিদানুরূপ ধান চাউল মজুত ও আমদানীর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কলিকাতায় ১৬৷৹ টাকা ও মফঃস্বলে তদপেক্ষাও উচ্চ দরে দরিদ্র জনসাধারণকে চাউল কিনিয়া খাইতে বাধ্য করা অত্যাচার নহে কি?

আমরা গবর্ণর বাহাদুরকে সকল দিক বিবেচনা করিয়া কন্‌ট্রোল তুলিয়া দিয়া বাঙ্গালার অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিদূরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করি। তিনি দরিদ্রের সেবা করিতে চাহেন, সেবার ইহাই উত্তম সুযোগ।

বাঙ্গালার বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ

বিগত ৪ঠা জুলাইর বেতারবার্ত্তায় গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গালার বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণকে প্রবোধ প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বস্ত্রের অনটন ঘটিয়াছে, এমন কি ব্রিটেনে এবং আরও অনেক দেশে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, ইহাও বলা যায়। বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ আরও বহু দেশে ঘটিয়াছে বলিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণকে প্রবোধ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ, বাঙ্গালা দেশের বস্ত্র দুর্ভিক্ষ যেরূপ ভীষণ হইয়াছে, যাহার ফলে কেহ কেহ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে, এইরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা আর কোনও দেশের খবরে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালায় বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ যেমন মানুষে ঘটাইয়াছে, অপর কোনও দেশে মানুষে তাহা ঘটাইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না।

১৯৪৩ সালে গবর্ণমেণ্টের খরিদ করা লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউল মজুত থাকা সত্ত্বেও এবং উদ্বৃত্ত (surplus) এলাকার বহু চাষীর ঘরে হাজার হাজার মণ ধান সঞ্চিত (বা hoarded) থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালায় যেরূপ অন্ন-দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল, বস্ত্র-ব্যবসায়ীর ঘরে হাজার হাজার বেল কাপড় ও সূতা মজুত থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালায় বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, ইহা গবর্ণর বাহাদুর নিশ্চয়ই জানেন। বাঙ্গালী জনসাধারণও তাহা জানে। মনুষ্যকৃত পর পর অন্ন-দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাঙ্গালীকে আজ অপর দেশের দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করাইয়া প্রবোধ দিলে বাঙ্গালী প্রবোধ পাইতে পারে না। তবে বাঙ্গালী অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অন্ন-দুর্ভিক্ষ সহ্য করিয়াছে, বস্ত্র দুর্ভিক্ষও সহ্য করিতেছে ও করিবে।

গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে কয়লার সরবরাহের কমতি, উপযুক্ত সংখ্যক মজুরের অভাব এবং মাল চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ যান-বাহনের অভাব, এই তিন কারণে বস্ত্রের উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহাও ইচ্ছামত একস্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়ার সুবিধা ঘটিতেছে না; এবং এই সকল কারণ বশতঃই বাঙ্গালার বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। সত্যই কি তাই? তাহা যদি সত্য হইত তবে ঐ সকল কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১, ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে বস্ত্রের অভাব ঘটে নাই কেন? এবং ১৯৪৪ সালের প্রথম নয় মাসের মধ্যেই বা বস্ত্রের অনটন দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে নাই কেন? তিনি কি তাহা অনুসন্ধান করিয়াছেন? যদি করিতেন, তবে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার কথিত কারণে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই। তিনি আরও জানিতে পারিতেন যে ১৯৪১, ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের মিলসমূহের যত তাঁত সামরিক বস্ত্র উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত ছিল, ১৯৪৪ সালে তাহা অপেক্ষা কম তাঁত তজ্জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ১৯৪৪ সালে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্র পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীই উৎপন্ন হইয়াছে, কম হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও যে বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, তাহার কারণ গবর্ণর বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন তাহা নহে।

গবর্ণর বাহাদুরের জানা আবশ্যক যে কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার জন্যই বাঙ্গালায় বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই। ১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত কাপড়ের চাহিদার পরিমাণের অনেক কমই আমদানী হইয়াছে। তবে যুদ্ধারম্ভের পর কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য কাপড়ের পরিমাণও অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাপড়ের আমদানী পূর্ব্ব পরিমাণের অর্দ্ধেক হইলেও যে অনটন হয়, সেই অনটন বাঙ্গালার জনসাধারণ ব্যবহারের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া মিটাইয়া লইয়াছে। সুতরাং কাপড়ের আমদানী কমিয়া যাওয়ায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলা চলে না। দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, কাপড়ের বাজারে অনাচারের ফলে এবং ঐ অনাচার সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট না বুঝিয়া যে সকল বাধা নিষেধ প্রবর্ত্তন করিলেন তাহার ফলে; তদুপরি যাহাদের হাতে অনাচার সংশোধনের ভার পড়িল, তাহাদের অবিবেচনার ও অনাচারের ফলে। ইহাই হইল বর্ত্তমান বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ। যদি উহার উপশম করিতে হয়, তবে তাহার উপায় কাপড়ের বাজার ভাঙ্গিয়া দেওয়া নহে; তাহার উপায় কাপড়ের বাজারের অনাচার বন্ধ করা। অবশ্য তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও উপযুক্ত লোক চাই।

আমরা, ঐ সকল অনাচার কেমন করিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহা বন্ধ করিতে হইলে যে ব্যবস্থার দরকার, তাহার কথাই নিম্নে বলিতেছি।

প্রথমতঃ, ১৯৪৩ সালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল কমিশনার হুকুম জারী করিলেন যে ১৯৪০—৪১—৪২ এই তিন বৎসর যে সকল বস্ত্র-ব্যবসায়ী (dealers) বাঙ্গালার মিল হইতে কাপড় খরিদ করিয়াছিল এবং বাঙ্গালার বাহির হইতে কাপড় আমদানি করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ী তাহা করিতে পারিবে না। ঐ সকল ব্যবসায়ী অধিকাংশই মাড়োয়ারী ও অন্য প্রদেশীয় লোক। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের বোমা-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যবসায়ীদের প্রায় সকলেই ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে পলাইয়া যায়। তাহারা পলাইয়া গেলে পর যাহারা ঐ ব্যবসা করিতে লাগিল তাহারা টেক্সটাইল কমিশনারের হুকুমে ব্যবসা হইতে বঞ্চিত হইল। তাহার ফলে মিলের গুদামে কাপড় মজুত হইতে লাগিল এবং বাজারে কাপড়ের আমদানীর মন্দা ঘটিল। খুচরা ব্যবসায়ীদের কাপড়ের ষ্টকও ঐ কারণে কমিয়া গেল।

দ্বিতীয়তঃ, টেক্সটাইল কমিশনার কাপড়ের দর খুব উচ্চ করিয়া বাধিয়া দিয়া মিলের দর অপেক্ষা খুচরা বিক্রয়ের দর শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ উচ্চে রাখিলেন এবং হুকুম করিলেন যে পাইকারী ব্যবসায়িগণ (dealers) বাঙ্গালার মিলের দরের উপর উক্ত ২০ ভাগের মধ্যে ৪ ভাগ এবং বাহিরের মিলের দরের উপর ১০ ভাগ পাইবে, বাকী যথাক্রমে ১৬ ভাগ ও ১০ ভাগ খুচরা বিক্রেতাগণ পাইবে। পাইকারী ব্যবসায়িগণের ভাগের অঙ্ক কম হইয়াছে বলিয়া তাহারা হাজার হাজার বেল কাপড় গুদামজাত করিয়া ফেলিল এবং যেসকল খুচরা বিক্রেতা তাহাদের ভাগ হইতে কতক ভাগ এবং অনেকক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ ভাগই পাইকারগণকে দিতে স্বীকার করিল, তাহারাই শুধু কাপড় পাইল; যাহারা তাহা দিতে স্বীকার করিল না অথবা চাহিদাপেক্ষা কিছু কম দিতে স্বীকার করিল, তাহারা কাপড় পাইল না। ফলে সকল খুচরা ব্যবসায়ীর দোকানেই বস্ত্রের অনটন ঘটিল। জনসাধারণ দোকানে যাইয়া চাহিদানুরূপ কাপড় পাইল না, সামান্য মাত্র পাইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইল।

তৃতীয়তঃ, এই অবস্থায় বাঙ্গালার টেক্সটাইল কন্ট্রোলার হুকুম দিলেন যে তাঁহার পারমিট ব্যতীত কোন পাইকার কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং কোন খুচরা বিক্রেতা কাপড় কিনিতে পারিবে না। শুধু তাহাই নহে, সকল খুচরা বিক্রেতার ঐ পারমিট পাওয়ার অধিকার থাকিল না। টেক্সটাইল ডিপার্টমেণ্টকে যাহারা সন্তুষ্ট করিতে পারিল, তাহারাই পারমিট পাইল, কিন্তু সেই পারমিটও সীমাবদ্ধ সংখ্যা কাপড়ের জন্য। ফলে, গবর্ণমেণ্টের মনোনীত দোকানসমূহে যাহারা 'কিউ' দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল তাহারাই একখানা করিয়া কাপড় পাইল, যাহারা শারীরিক বলের অপ্রাচুর্য্যের জন্য বা সময়ের অভাবের জন্য 'কিউ' দিতে পারিল না, তাহারা কাপড় পাইল না।

চতুর্থতঃ, এ দিকে উপযুক্ত সংখ্যক পারমিট 'ইস্যু' না হওয়ায় পাইকারগণের গুদামে হাজার হাজার বেল কাপড় ও সূতা জমিতে লাগিল। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের লোক ভিন্ন অপর কেহই কাপড় কিনিতে বা বেচিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট নিজ হাতে কাপড় সরবরাহের ভার নিলেন। গবর্ণমেণ্ট নিজ হাতে কাপড় সরবরাহের ভার নিতে যাইয়া সমগ্র বাঙ্গালার জন্য চারিজন (বর্ত্তমানে শুনা যায় পাঁচ জন) হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট

নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা কলিকাতায় ও মফঃস্বলে গবর্ণমেণ্টের মনোনীত দোকানদার বা ব্যক্তিকে কাপড় সরবরাহ করিবে এবং ঐ সকল দোকানদার ও ব্যক্তি জনসাধারণকে কাপড় বিক্রয় করিবে। মধ্যস্থলে কমিটি বসিয়াছে, তাহাদের পারমিট ভিন্ন কেহ কাপড় কিনিতে পারিবে না। পারমিটের জন্য দরখাস্ত করিতে, পারমিট পাইতে ও দোকানে কাপড় কিনিতে 'কিউ' দিয়া দাঁড়াইতে হয়। বহুদিন ঘুরিয়াও কেহ কেহ দরখাস্ত পেশ করিতে বা পারমিট পাইতে পারে না। আবার, পারমিট পাইলেও অনেক সময় গবর্ণমেণ্ট-পোষিত বিক্রেতা বলিয়া থাকে, কাপড় ফুরাইয়া গিয়াছে, অথবা মোটা কাপড় বা ছোট কাপড় ভিন্ন কাপড় নাই।

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে, যাহারা দরিদ্র ও যাহাদের প্রয়োজন বেশী তাহারাই সর্ব্বাগ্রে কাপড় পাইবে। এখন শুনিতেছি যে যাহারা খাতিরের লোক, বেশীর ভাগ তাহারাই সর্ব্বাগ্রে কাপড় পাইয়া থাকে। মফঃস্বলের সহরের কথা শুনিতে পাই যে, সেখানে দরিদ্র জনসাধারণের প্রয়োজন ও অপরের বেশী প্রয়োজন বিবেচনা করার বালাই নাই। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের দাবীই সর্ব্বাগ্রে এবং যৎসামান্য কাপড় যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের দাবী মিটাইতেই ফুরাইয়া যায়। মফঃস্বলের গ্রামের কথা শুনিতে পাই যে, প্রত্যেক ইউনিয়নে লোক-সংখ্যার শতকরা তিনজনের উপযোগী কাপড়ের বেশী যায় না এবং যাহা যায় তাহা ফুড কমিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তাগণই নিজেদের ও খাতিরালা লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন।

কলিকাতার কথা না বলাই ভাল, বলিতে গেলে বেসরকারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কলঙ্কের কথাই বলিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালার নৈতিক অবনতি শুধু সুযোগপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে। এইক্ষণ সব দিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালাদেশে শুধু অন্ন-বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ হয় নাই, মনুষ্যত্বেরও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বর্ত্তমান ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের অস্ত্রাঘাতে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কোটী কোটী মানুষ, কোটী কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশে পশুত্বের আঘাতে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে ধ্বংস হইয়াছে, বস্ত্রাভাবে অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করিতেছে এবং তদপেক্ষা অধিক লক্ষ শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের মনুষ্যত্বেরও ধ্বংস হইয়াছে। এত বড় নৈতিক অবনতি বোধ হয় পৃথিবীর আর কুত্রাপিও ঘটে নাই।

পরপর উদ্ভূত অনাচার ও অবিবেচনার ফলে এই যে দারুণ বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনসাধারণ কিরূপ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে তাহা প্রতিদিনের খবরের কাগজে, পাব্লিক মিটিংএ, কর্পোরেশনের মিটিংএ এবং প্রকাশ্য রাস্তায় প্রকাশিত হইতেছে। জীবিত মনুষ্যের আত্মসম্মান রক্ষা করা যতদূর কঠিন হইয়াছে, ততোধিক কঠিন হইয়াছে মৃত ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করা। শ্মশানঘাটে দিনরাত্রি শব যাইতেছে, ঐ ঘাটেই আবশ্যকীয় কাপড় মিলিবার ব্যবস্থা ছিল; কনট্রোলের ফলে শ্মশানঘাটে আর কাপড় পাওয়া যায় না। মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ বা আত্মীয়গণ কমিটির মেম্বরগণকে অতিকষ্টে ধরিতে পারিলেও পারমিট পাইতে বহু ঘণ্টা অতীত হইয়া থাকে; পরে পারমিট পাইলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দোকান বন্ধ অথবা দোকানে কাপড় নাই।

এই যে নিদারুণ অবস্থা, ইহার প্রতিকার কি? প্রতিকারের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় যে এমন ব্যবস্থা দরকার যাহাতে জনসাধারণ ১৯৪২।১৯৪৩ সালে যেভাবে কাপড় পাইতেছিল, সেইভাবে কাপড় সরবরাহ করা। সেইরূপ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার উপায় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাপড়ের বাজার ভাঙ্গিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতে কাপড় সরবরাহের ভার নেওয়া নহে। ঐ বাজারের অনাচার বন্ধ করিয়া উহার সংশোধনক্রমে উহার হাতেই সরবরাহের ভার পুনরায় সমর্পণ করা। তাহা করা যে বড় কঠিন, তাহা নহে। পাইকারগণ (dealers) কোন্ দিন কত কাপড় বাঙ্গালার মিল হইতে পাইতেছে, কত কাপড় অপর প্রদেশ হইতে আমদানী করিতেছে, সেই খবর গবর্ণমেণ্ট প্রতিদিনই পাইতে পারেন। এই প্রকারে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকের হাতে থাকা কাপড়ের ঠিক অবগত থাকিবেন। ঐ সকল পাইকারগণের নিকট হইতে যে সকল খুচরা বিক্রেতা বরাবর কাপড় কিনিয়া ব্যবসা করিত সেই সকল খুচরা বিক্রেতাগণ যাহাতে সেই সেই পাইকার বিক্রেতাগণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের বাঁধা দরে কাপড় পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক। কোন পাইকার যাহাতে বেশী দর দাবী করিতে না পারে এবং কাপড় থাকিতে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা হউক। ইহার জন্য প্রত্যেক পাইকারের দোকানে ও গুদামে একটি করিয়া পুলিশের লোক বসাইয়া রাখা বেশী কথা নহে। পাইকারগণকে প্রতিদিনের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব গবর্ণমেণ্টকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে গবর্ণমেণ্টের কাপড়ের ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ আফিসে বসিয়া প্রতিদিন কোন পাইকার কত কাপড় আমদানী করিল, কত কাপড় বিক্রয় করিল, কত কাপড় মজুত রহিল এবং কোন্ কোন্ খুচরা বিক্রেতা কত কাপড় কিনিয়া নিল তাহা সহজেই জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক খুচরা দোকানেও একজন করিয়া পুলিশের লোক বসিয়া থাকিবে। তাহা হইলে খুচরা দোকানদার কাপড় থাকিতে কাপড় দিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না ও ছাপান দরের অতিরিক্ত দর দাবী করিতে পারিবে না। খুচরা দোকানদারগণকেও প্রত্যেক দিনের কাপড়ের মোট ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব দিতে বাধ্য করা হউক। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবেন যে খুচরা দোকানদার প্রতিদিন কত কাপড় কিনিতেছে এবং কত কাপড় বিক্রয় করিতেছে। স্থূল-কথা, যাহারা পূর্ব্বাপর কাপড়ের ব্যবসায়ী তাহাদিগকে নিয়মের অধীন রাখিয়া ব্যবসা করিতে দেওয়া হউক। ইহা করিতে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক, তাহা প্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হউক।

ইহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে কাপড় সরবরাহের ভার রাখিলে ধান চাউল সরবরাহের ন্যায়ই অথবা ততোধিক নিন্দনীয়ভাবে কাপড় সরবরাহের কার্য্য চলিবে। কাপড় সরবরাহের উপযুক্ত সংগঠন গবর্ণমেণ্টের নাই; যে সংগঠন তাড়াতাড়ি খাড়া

করা হইয়াছে, উহার কার্য্যতৎপরতার যথেষ্ট পরিচয় বাঙ্গালা দেশ পাইয়াছে। খাঁটি ব্যবসায়ীর হাত হইতে কাপড়ের কারবার তুলিয়া নিয়া হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট ও অন্যান্য অব্যবসায়ীর হাতে ঐ কারবার সমর্পণ করিলে ফল ভাল হইবে না ও হইতে পারে না। শুধু তাহাদিগকে অযথা ও অতিরিক্ত অর্থ লাভে সহায়তা করা হইবে, কারবার চলিবে না। শুনা যায়, গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে শুধু চারি (বা পাঁচ) জন হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টই প্রতি বৎসর ৭২,০০,০০০ লক্ষ টাকা লাভ করিবে, বাজে আয় বাদ দিয়াও। লক্ষ লক্ষ কাপড়ের ব্যবসায়ীর অন্ন মারিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোককে লাভবান করিলে ভগবানও তাহা সহ্য করিবেন না। যদি ফল ভাল হইত, আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী অনাচার ও অত্যাচারের প্রাদুর্ভাবকালে পুরাতন চলিত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিয়া লোভপরায়ণ লোক দিয়া নূতন কাজের নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িতে যাওয়ার ফল ভাল হইতে পারে না।

পুরাতন প্রতিষ্ঠানের গলদ সংশোধন করিয়া তাহাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গবর্ণর বাহাদুর যদি তাহা না করিয়া বর্ত্তমান সংগঠনই বহাল রাখেন, তবে বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের উপশম হইবে না, পক্ষান্তরে তিনি নিন্দিত হইবেন। লোকে বলিবে যে, ভূত-পূর্ব্ব মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব সকল ব্যবসাক্ষেত্রই সাম্প্রদায়িক বেশিও অনুসারে গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, গবর্ণর বাহাদুর সেই সঙ্কল্পকেই কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। গবর্ণর বাহাদুরের মনে হয় ত সেইরূপ সঙ্কল্প নাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঐ সঙ্কল্পের পরিণতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতায় এই যে কাপড়ের দোকান মনোনীত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহারা কোন-দিন কাপড়ের কারবার করে নাই, বড় জোড় খলিফার কাজ করিয়াছে, তাহারাও রাতারাতি দোকানদার সাজিয়া গিয়াছে। তারপর, গবর্ণমেণ্টের নিয়মে ঐ সকল দোকানদারগণ তাহাদের 'কোটা' অনুসারে নগদ মূল্যে হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টগণের গুদাম হইতে কাপড় কিনিয়া দোকানে মজুত রাখার যে-ব্যবস্থা হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থামত কাজ করিতে ঐ দোকানদারগণের মধ্যে অনেকেরই অর্থ-সঙ্গতি নাই। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তাহাদের অনেকেই উপযুক্ত পরিমাণে কাপড় কিনিয়া দোকানে মজুত করিতেছে না। তাই, অনেক সময় দোকানদার বলিতেছে যে—কাপড় নাই।

গবর্ণর বাহাদুরের অবগতির জন্য আমরা উপরে অনেক বিষয় আলোচনা করিলাম। ঐ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি যদি প্রচলিত বস্ত্র-ব্যবসাকে সংশোধন করিয়া পুনঃস্থাপন করিতে পারেন, তবেই বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের উপশম হইবে। তিনি যেন তাহা করিয়া জনসাধারণের সেবার আর একটি সুযোগ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

গত ৯ই আষাঢ় শনিবার সিনেটের এক বিশেষ সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। বাজেটে আগামী ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৯,৩৬,৫২৪৲ টাকা আয় এবং মোট ৪৭,৫৯,৯৪০৲ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। মোট যে ৮,২৩,৪১৬ টাকা ঘাট্‌তি হইবে, তাহা চল্‌তি (১৯৪৪-৪৫) বৎসরের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বৃত্ত ২,০১,৩৯১৲ টাকা দিয়া আংশিকভাবে পূরণ করিয়া বৎসরশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ৬,২২,০২৫৲ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাজেট উত্থাপন করিয়া বলেন, উক্তরূপ অনুরূপ ঘাট্‌তি ৬,২২,০২৫৲ টাকার মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষকদের খাতা পরীক্ষা ফী শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি নূতন ধরণের অত্যাবশ্যক ব্যয় বাবদ ৪,৬৬,১৭৮৲ টাকা ধরা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টেরই এই অর্থ দেওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সুতরাং এই অর্থ বাদ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে দেড় লক্ষ টাকার কাছাকাছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই ঘাট্‌তি অত্যন্ত বেশী নয় বলিয়াই ডাঃ রায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁহার মতে, চল্‌তি বৎসরের শেষে বাজেটে যাহা বরাদ্দ হইয়াছে, তদপেক্ষা কিছু বেশী টাকা উদ্বৃত্ত হইবে মাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ধরণের অত্যাবশ্যক ব্যয়গুলির যৌক্তিকতা বিবৃত করিয়া ডাঃ রায় বলেন, বাজেট হইতে দেখা যাইবে যে, ম্যাট্রিক হইতে ডিগ্রী পরীক্ষা পর্য্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ফী বাবদ প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হইতেছে। ইহার মধ্য হইতে পরীক্ষার জন্য ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া আরও ৮ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত অর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণেই ন্যায়তঃ ব্যয় হওয়া উচিত এই অর্থ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার কারণে ব্যয় করার কি অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে? অথচ গত্যন্তর না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহাই করিতে হইতেছে।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অতি সামান্য পরিমাণে অর্থসাহায্য করেন, তাহার বিরুদ্ধে গত ২০ বৎসর কাল ক্রমাগত প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোট আয়ের মাত্র ছয় ভাগের একভাগ অথবা মোট ব্যয়ের বারো ভাগের একভাগের বেশী সাহায্য করেন না। গভর্ণমেণ্ট এককালীন বার্ষিক মাত্র সওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বহু ভালো ভালো পরিকল্পনাই গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অর্থসাহায্যে অনিচ্ছা বা কৃপণতার জন্য পরিত্যাগ করিতে হয়। ডাঃ রায় সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ইংলণ্ডে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মোট আয়ের শত করা ৩৩ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকেন। এদেশে তাহার ব্যত্যয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইদানীং বহু শিক্ষানুরাগী দাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দান করিতেছেন বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টও যদি পূর্ণভাবে সাহায্যে না আসে, তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আঙ্গিক উন্নতি সর্ব্বতোভাবে সম্ভব নয়।

ডাঃ রায় কর্ত্তৃক উত্থাপিত বাজেট সিনেটে গৃহীত হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে আজ জনসাধারণেরও বিশেষ ভাবে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। সেই দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য

ভারতীয় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মুক্তি

বড়লাটের আদেশানুযায়ী বিগত ১৫ই জুন শুক্রবার সমস্ত বন্দী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। উক্ত দিন সকাল ৮টায় আলমোড়া ডিষ্ট্রিক্ট জেল হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও আচার্য্য নরেন্দ্রদেব, ৭-৩০ মিনিটে পুনার যারবেদা জেল হইতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও, বাঁকীপুর জেল হইতে আচার্য্য কৃপালানী, ভেলোর জেল হইতে ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া এবং বাঁকুড়া জেল হইতে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের ফলে মহাত্মা গান্ধী সহ তাঁহারা প্রত্যেকে গ্রেপ্তার হন। এবং সেই কারাগারেই কস্তুরবা গান্ধী ও মহাদেব দেশাই প্রাণত্যাগ করেন। আকস্মিক স্বাস্থ্যহানির ফলে গত ১৯৪৪ সালের ৬ই মে সকাল ৮টায় গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যাঁহারা এই দীর্ঘকাল কারাগারের অন্তরালে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদেরও কেহই সুস্থ দেহ লইয়া বাহির হন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেইদিকে গভর্ণমেণ্ট আদৌ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্প্রতি বড়লাট সমস্ত নেতাকে তাঁহার সিমলা-বৈঠকে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর সহযোগিতায় ভারতীয় সভ্য-দ্বারা নূতন ভারত গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন, যদিও তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যে হাজার হাজার কংগ্রেস-কর্ম্মী কারাগারে জীবন যাপন করিতেছেন, সেইদিকে ওয়াভেল সাহেবের দৃষ্টি নাই। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার পরিকল্পিত নূতন ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতীয় নেতারাই তখন বন্দী কংগ্রেসকর্ম্মীদের মুক্তিদান সম্পর্কে যাহা ভাল মনে করেন করিবেন; ওয়াভেল সাহেব যখন ভারতবাসিগণের সহযোগিতা চাহিতেছেন, তখন তিনি নিজেই তাহা ভালো মনে করিয়া মুক্তি দিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী

বিগত ৯ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। প্রফুল্ল চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা, দেশ-প্রেম ও ছাত্র এবং প্রকৃত কর্ম্মী গড়িয়া তুলিবার অদম্য সাধনা ও কৃতিত্ব অতুলনীয়। আজীবন চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করিয়া নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার দ্বারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ এবং তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই। বাংলার আজ প্রকৃত কৃতী সন্তানের অভাব; বাংলার মাটি হইতে একে একে সকলে মহাকালের কালো যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতির সঙ্গে আজ বাংলার সেই অবিনশ্বর সন্তানদের স্মরণেও দেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি দুই করপুটে ভরিয়া আছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন জাতীয় প্রেরণারই প্রতীক ছিল। সাহচর্য্য, শিক্ষা, মনের উৎকর্ষসাধন ও আদর্শ-নিষ্ঠার দ্বারা তিনি ছাত্রদিগকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহার সারা জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র সমসাময়িক ব্যক্তি হইলেও রবীন্দ্রনাথের—"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করোনি" কবিতার ভাবাদর্শ যে প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁহার সারাজীবনের কর্ম্মে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা বলা যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে যুবক ও ছাত্র সমাজ ছিলেন সন্তানের মতো; মুক্তহস্ত ছিলেন তিনি দরিদ্রদের কাছে। তাঁহার আদর্শ আজ দেশের জনসাধারণের জীবনে প্রতিফলিত হইলে বাংলা তথা ভারতের কল্যাণ বুঝিতে হইবে। তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

গত ২৪শে আষাঢ় রবিবার কাঁটালপাড়া গ্রামে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের ঋষি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাট্যকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিক, কবি বা প্রাবন্ধিকই ছিলেন না, বিচারশীল পাণ্ডিত্য ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি লইয়া তিনি স্বদেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বলেন: 'বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে কুমারীকা অন্তরীপ হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে গ্রহণ করিয়াছে। এত বড় সম্মান ভারতবর্ষ আর কাহাকেও দেয় নাই।' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হ'য়ে এলেন এবং শ্রেষ্ঠ হ'য়ে এলেন।" বস্তুতঃ প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্য চলিয়াছিল বিশেষ করিয়া পদাবলী-কীর্ত্তনের স্রোত বাহিয়া। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা ও প্রথম পথপ্রদর্শক। এবং তাঁহার সমাজসচেতন মনই তাঁহাকে সেই শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে অভিষিক্ত করিয়াছিল। নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন: 'বর্ত্তমানে রেজা খাঁ জীবিত নাই, কিন্তু বহু শোষক তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্ভব করিয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া ঋষি বঙ্কিম দেশের সন্তানদের আহ্বান করিয়াছিলেন দেশের দুঃখ মোচনের জন্য। যেদিন আভীঃ নরনারী সত্যাগ্রহী সত্যানন্দের আদর্শ গ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির বন্ধন মোচন কার্য্যে ব্রতী হইবে, সেইদিনই বঙ্কিমের স্বপ্ন সার্থক হইবে।'—বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মী চাহিয়াছিলেন, যাঁহারা অনন্যমনা হইয়া দেশমাতৃকার সেবা করিবে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জনের দুষ্কৃতিপরায়ণ বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার উদ্যোগে বিদ্রোহী বাংলা সারা ভারতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বাংলার সম্মুখে তখন আনন্দমঠের আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ আজও ভাস্বর শক্তিতে

বাংলা তথা ভারতের চিত্তে জাগ্রত। অমর ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়া আমরাও আজ বলি—'বন্দেমাতরম্।'

বঙ্কিমকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাল্যে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের। সেই আশীর্ব্বাদ বহন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে সারা পৃথিবীর সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন। শিল্পে, সঙ্গীতে, জাতীয়তায় নানাভাবে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া বিশ্ব-সাহিত্যে আসন পাইল। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্বকে বাংলায় ও বাংলাকে সমস্ত বিশ্বে বিকশিত করিয়া দিলেন। ১৩৪৮ সালের এমনই এক বর্ষণমুখর শ্রাবণে বিশ্বকবির লোকান্তর গমন সমগ্র পৃথিবীকেই মর্ম্মাহত করিয়া দিয়া গিয়াছে। তাঁহার শূন্য স্থানের অধিকারী হইবার মতো আজ আর স্পর্দ্ধাশীল লেখক ও চিন্তানায়কের নিদর্শন মাত্র নাই। তাঁহার অমরস্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবার জন্য স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সম্প্রতি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা সার্থক হউক, এই কামনা করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর-স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন-সমস্যা

ভারতের শিল্পোন্নতিতে বৃটিশের ও মার্কিনের যাহাতে সমভাবে সাহায্য পাওয়া যায়—এই উদ্দেশ্য লইয়াই কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পপতিগণ প্রথমে বৃটেনে ও তথা হইতে সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়াছেন। ভারতগভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার আর্দ্দেশির দালালও উক্ত উদ্দেশে তাঁহাদের সহিত সহযাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক এক সংবাদ হইতে জানা যায় যে, বৃটিশ পক্ষ হইতে ভারতের বিশেষ কিছু পাইবার আশা নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই বৃটিশ-শিল্পনায়কগণের ভারতের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের শিল্পসমূহের উপর যে শুধু ভারতের লোকই কর্ত্তৃত্বের অধিকার পাইবে—তাহা বৃটিশ ধনিকগণের আদৌ মনঃপূত নয়। তাঁহারা মনে করেন—ভারতে যদি তাঁহারা শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্য অথবা শিল্প-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রেরণ করেন, তাহা হইলে ভারতের শিল্পের উপর তাঁহারা অনায়াসে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন।

তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের সহায়তায় ভারতে যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার অর্দ্ধেক কর্ত্তৃত্ব বৃটিশ শিল্পপতিদের দিতে হইবে।—এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই এই দেশের লোকের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, বৃটিশের সহিত আর্থিক সহযোগিতা করিবার চেষ্টায় ভারতের গুরুতর ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতকে শিল্পোন্নতির বিষয়ে সাহায্য করার জন্য বৃটিশ শিল্পপতিগণ ন্যায্য মূল্যের দাবী করিতে পারেন। তাঁহারা ভারতে যে দ্রব্য পাঠাইবেন, তাহার দাম ভারতকে অবশ্যই দিতে হইবে। তবে এ বিষয়ে পাওনা মিটানোর সমস্যা ভারতের খুব কঠিন নয়। বৃটেনে ভারতের নামে যে ষ্টার্লিং সম্পদ্ জমিয়াছে, তাহা দ্বারা ভারত বৃটেনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য অনায়াসে ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু তাহার অন্তরায়ও বৃটিশ শিল্পপতিবৃন্দের অনিচ্ছাকৃতির মধ্যেই স্পষ্ট রহিয়াছে।

মিঃ টাটা বৃটেনে গিয়া বলেন যে, বৃটিশ-শিল্পপতিদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহারা শিল্পোন্নতির বিষয়ে ভারতের প্রতি অন্যায় করিবেন না, কেন না তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া যাউক বা না যাউক, ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেই।—কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা এক সাম্প্রতিক সংবাদ হইতে দেখিয়াছি যে, উক্ত শিল্পপতিগণ এ দেশের শিল্পের উপর কর্ত্তৃত্বলাভের অভিপ্রায় আদৌ ত্যাগ করেন নাই। জানা যায়, ভারতীয় শিল্পপতিগণ বৃটিশ শিল্পপতিদিগকে নাকি পনের বৎসর কাল যাবৎ ভারতের শিল্প হইতে লাভের অংশ দিতে চাহেন; কিন্তু এ সর্ত্তেও তাঁহারা ভারতের শিল্প-গঠনে সাহায্য করিতে রাজি হন নাই। কায়েমী কর্ত্তৃত্বের অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যে এদিকে আদৌ দৃষ্টি ফিরাইবেন না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

ভারতীয় শিল্পপতিদের অন্যতম মিঃ জি, ডি, বিড়লা সম্প্রতি তাঁহার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, বৃটিশ শিল্পপতিগণ ভারতে যন্ত্রপাতি রপ্তানী বিষয়ে অথবা বিশেষজ্ঞ প্রেরণের ব্যাপারে ন্যায্য ব্যবস্থা করিতে রাজি না হইলে ভারত অন্য দেশের নিকট হইতে সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।

এই সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্যই সম্ভবতঃ ভারতীয় শিল্পপতিগণ কিছুকাল হইল বৃটেন হইতে মার্কিনে গিয়াছেন।

আমরা কিন্তু বৃটেন বা আমেরিকার অনুকরণে ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষপাতী নহি। ঐরূপ শিল্পোন্নতির উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। পক্ষান্তরে, আমাদের মতে ইউরোপের ও আমেরিকার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির প্রচেষ্টা ও তন্নিমিত্ত প্রতিযোগিতাই পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ। আমরা ভারতের শিল্পোন্নতি চাই, কিন্তু তাহা কুটির-শিল্পের। যে শিল্প কুটিরে করা যায় না, অথচ মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে আবশ্যকীয়, তাহা যন্ত্রচালিত হইতে পারে, কিন্তু যে সকল শিল্প-জাত দ্রব্য কুটির-শিল্পের সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়—তাহা সম্পূর্ণই কুটীর-শিল্প দ্বারা হউক, ইহাই আমাদের অভিমত। কারণ, তাহা না হইলে ভারতের জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না। সুতরাং আমরা ভারতীয় শিল্প-নেতাদিগকে বলি যে, তাঁহারা পরের অনুকরণে ও সাহায্যে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা না করিয়া কুটির-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হউন। তবেই দেশের মঙ্গল হইবে।

ব্রহ্ম শাসন পরিকল্পনা

ব্রহ্মের নতুন শাসন ব্যবস্থা পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের গভর্ণর স্যার রেজিন্যাল্ড ডরম্যান স্মিথ রেঙ্গুনে আসিয়া যুদ্ধজাহাজের অভ্যন্তরে এক বৈঠক আহ্বান করেন। ব্রহ্মের বিভিন্ন দলের কয়েকজন প্রতিনিধি উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। স্যার রেজিন্যাল্ড তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মের ভাবী শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে

এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন : এই সঙ্কটকালে তিনি একাকী দেশ শাসনের গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে ইচ্ছুক নহেন। ব্রহ্মের নেতৃবৃন্দের সহিত মিলিত-ভাবে দেশের শাসনভার পরিচালনা করাই তাঁহার অভিপ্রায়। প্রসঙ্গতঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া স্যার রেজিন্যাল্ড বলিয়াছেন—স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটেন তাঁহাকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইতেছেন না, ব্রহ্মবাসীরা যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে পারে, তাহার পথ রচনার জন্যই বৃটেন তাহাকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইতেছেন। প্রতিনিধিবৃন্দের মুগ্ধদৃষ্টির সামনে স্যার রেজিন্যাল্ড এইরূপ আরও অনেক মনোজ্ঞ কথার অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতে এইরূপই বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে—যেন বৃটিশ শাসকশ্রেণীর মনোভাব হালে আসিয়া একেবারেই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু স্মরণ থাকিতে পারে, গত মাসের গোড়ার দিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের ভাবী শাসনব্যবস্থার পরিকল্পনা স্বরূপ একখানি বিশেষ 'হোয়াইট পেপার' বাহির করেন। এ সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। দেখিবার বিষয়, উক্ত 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক হইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হয়। বৃটেন সমগ্র বিশ্বমানবের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছে বলিয়া বৃটিশ রাষ্ট্র-নায়কগণ বার বার ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষে যাহা হউক, বৃটেন তাহার শাসনাধীন দেশগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবে। অন্ততঃ ততখানি উদারনৈতিকতার পরিচয় না দিলেও হয়ত সে উক্ত অধীন দেশগুলিকে পূর্ব্বপ্রদত্ত অধিকার দেওয়া হইতে বঞ্চিত করিবেনা। কিন্তু ব্রহ্মের ভাবী শাসন ব্যবস্থার জন্য যে 'হোয়াইট পেপার' রচিত হয়, তাহাতে দেখা যায়, বৃটেন তাহার ১৯৩৫ সালের ব্রহ্মশাসন আইনে প্রদত্ত স্বায়ত্ত শাসনাধিকারও আগামী তিন বৎসরের জন্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে। এই নিকৃষ্ট নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় আজ কি কাহারও কাছে ঢাকা আছে?

সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে বিশ্বের ভাবী নিরাপত্তার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য যখন সম্মিলিত জাতিবৃন্দ আলোচনায় ব্যাপৃত, তখন ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপরোক্তরূপ নীতিধর্ম্ম প্রতিনিধিগণের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা যদিও বাহিরে প্রকাশ পায় নাই, তবু সম্মেলনের সাম্প্রতিক আদর্শের ভিত্তিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্রহ্মসংক্রান্ত এইরূপ নীতি যে সেই আদর্শের আদৌ সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নাই।—তাহার বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে বৃটেন যে সম্প্রতি একেবারে বিব্রত না হইয়াছে, তাহা নয়; এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার গুরুত্বও বৃটিশ শাসকশ্রেণী ক্রমে উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ইউরোপে জয়োল্লাসের ঢেউ বহিলেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া বৃটেনের ভীত হইবার কারণ আছে; জাপানকে পরাজিত করিবার জন্য যে বিপুল সমর-প্রচেষ্টার প্রয়োজন, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভব নয়—এ কথা বৃটেনের মনে গভীর ভাবে নাড়া দিয়াছে বলিয়াই ভারতের সহিত একটা কিছু মীমাংসায় আসিতে আজ সে আগ্রহী হইয়াছে। স্যার রেজিন্যাল্ড ডরম্যান স্মিথও সুললিত ভাষায় ব্রহ্মবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু বাহিরের প্রলেপ দ্বারা যে ভিতরের ক্ষত নিরাময় হয় না, এ কথা কি বৃটেন জানে না?

স্যার রেজিন্যাল্ড শুধু মিষ্ট কথা দিয়াই ব্রহ্মবাসীকে ভুলাইতে চাহিতেছেন। পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের পথ-রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াও ব্রহ্মবাসী যে কবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে, তাহার কোনো সময়ের নির্দ্দেশ তিনি দিতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মবাসীর কি সহযোগিতা তিনি আশা করিতে পারেন? বৃটিশ নীতিতে যতক্ষণ না, শুধু ব্রহ্ম নয়, সমস্ত পরাধীন দেশ সুখী হইতে পারিতেছে, ততক্ষণ সহৃদয়তা পাওয়ার আশা করা বৃটেনের শূন্যে গৃহ নির্ম্মাণের মতই অলীক হইবে। সেইদিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কিম্বা তাহার 'তাঁবেদার' কর্ম্মচারী স্যার রেজিন্যাল্ড ডরম্যান স্মিথের দৃষ্টি ফিরিবে কবে?

সিরিয়া ও লেবানন

বিগত ২২শে জুনের রয়টারের এক সংবাদে জানা গিয়াছে: বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক ঘোষণা প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সিরিয়া ও লেবাননে বৃটিশ সৈন্যদের হস্তক্ষেপের অন্তরালে ফরাসীদের উৎখাত করিয়া তথায় বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম করার কোনো মতলব নাই। ঐ ঘোষণায় আরও বলা হয়: ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কই সমস্যার গোড়ার কথা নয়, মূল কথা হইতেছে লেভাঁ রাষ্ট্রসমূহের সহিত ফরাসীদের সম্পর্ক। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সিরিয়া ও লেবাননের প্রতি প্রদত্ত জেনারেল দ্য গলের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি সমর্থন করিতেছেন। স্থানীয় ঘটনাবলী সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থায় গোলযোগ ঘটাইয়া মিত্রপক্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাইতে উদ্যত হয় বলিয়াই বৃটিশ সৈন্যদের হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তাহার ফলে কিছুটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে কতকগুলি সহরে সক্রিয়ভাবে হাঙ্গামায় জড়িত ফরাসী ইউনিটগুলিতে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রধান বিশৃঙ্খলা এখন দমিত হইয়াছে— কাজেই যথাসম্ভব শীঘ্র আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব এখন অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। নিজেদের এলাকার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সিরিয়া ও লেবানিজ গভর্ণমেণ্টের, এই দায়িত্ব তাঁহারা কিভাবে পালন করেন, তাহার বিচার বিশ্বের জনমতই করিবে।—ঘোষণায় পুনরায় বলা হইয়াছে: লেভাঁ রাষ্ট্রসমূহের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবার মতলব বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নাই। হাঙ্গামা নিবারণের জন্য আরও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইলে নিরপেক্ষভাবেই তাহা করা হইবে; যে কেহই হাঙ্গামা সৃষ্টি করুক না কেন, বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাহার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

গত দীর্ঘকাল যাবৎ সিরিয়া ও লেবানন সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল—উপরোক্ত ঘোষণা দ্বারা তাহা সমাধানের কিছু

নূতন রূপ দর্শিত হইতেছে। কিন্তু সংবাদের যথেষ্ট কৃতিত্বের উপরও আশঙ্কা যে একেবারে না রহিয়াছে, এমন বলা যায় না। সিরিয়া ও লেবানন সম্পর্কে পাকা ব্যবস্থা এখনও দীর্ঘকালসাপেক্ষ, এবং সেই অনাগত দিনের শুভ সংবাদের প্রতীক্ষায়ই আমরা অপেক্ষা করিব।

সম্প্রতি জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে রয়টার পুনরায় এই মর্মে এক সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে যে, অকস্মাৎ একটি ব্যবস্থা দ্বারা ফরাসী গভর্ণমেণ্ট লেভাঁ সঙ্কটের একটি প্রধান বিরোধের বিষয় মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা 'ক্রপ স্পেসিয়াল' নামে পরিচিত ২০ হাজার হইতে ৩০ হাজার স্থানীয় সৈন্যের পরিচালনা ভার সিরিয়ান ও লেবানিজ গভর্ণমেণ্টের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। প্যারিসে ফরাসী পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন, 'ইহা আপোষ ও তোষণের ইঙ্গিত।' লেভাঁয় ফরাসী ডেলিগেট জেনারেল, বেনে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হওয়ায় 'সিরিয়া ও লেবাননের জাতীয় সৈন্য বাহিনী' সৃষ্টি করিবার সঙ্গত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবার আর কোনো কারণ নাই। সিরিয়া ও লেবানন রাজ-ক্ষমতার সমস্ত অধিকার ভোগ করিতেছে এবং সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের মধ্যে তাহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতেছে, ইহা ফ্রান্স সানন্দে দেখিতে চায়।

কিন্তু দেখিতেছি, সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মর্দাম বে ও লেবাননের প্রধান মন্ত্রী আবদুল কারাস বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বড় বেশী সবাক নহেন। স্বভাবতঃই তাই এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বলিয়া বিষয়টা মানিয়া লওয়া ঠিক উচিত হইবে কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়। 'যুদ্ধ-পলিটিকসের' মারপ্যাচে 'আজিকার হ্যাঁ' যেমন 'কালকের না' হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে আরও কিছুকাল দেখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই অনুমান করা মিথ্যা নয়।

পোল-সমস্যা

বিগত জুনের শেষ সপ্তাহের রয়টারের এক সংবাদ হইতে জানা যায় যে,মস্কো হইতে সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে : জাতীয় ঐক্যমূলক অস্থায়ী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট গঠনে পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভা শীঘ্রই ওয়ারশ'তে ঘোষণা করা হইবে। মস্কো রেডিওর ঘোষণায় প্রকাশ, লণ্ডনস্থ পোলিশ গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ষ্টেনিসল মিকোলা জাইজিক নূতন পোলিশ গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিবেন। নূতন গবর্ণমেণ্টে তিনজন মন্ত্রী প্রবাসী পোল হইতে গ্রহণ করা হইবে।

যে পোল্যাণ্ড সমস্যা দীর্ঘকাল ধরিয়া মিত্রশক্তির পরস্পরের ঐক্যের অন্তরায়রূপে ছিল, ইহা দ্বারা তাহা যে অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। পূর্ব্ব ইউরোপে অতঃপর আর কোনো গোলমাল সৃষ্টির আশঙ্কা থাকিবে না। সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভ মস্কোস্থিত বৃটিশ দূত স্যার আর্চিবল্ড কার এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মার্কিণ দূত মঃ এভারিল হ্যারিম্যান কর্ত্তৃক গঠিত ক্রিমিয়ান কমিশনের অন্তরঙ্গ কোনো সূত্রে জানা যায় যে, কমিশনের মতে স্বেচ্ছায় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুসংবাদ, সন্দেহ নাই।

গত ইয়াল্টা বৈঠকের আলোচনায় বৃটিশ পক্ষ হইতে মিঃ চার্চ্চিল এবং মার্কিনের পক্ষ হইতে পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পোল্যাণ্ডকে রুশিয়ার হাতেই সমর্পণ করেন। এবং এইরূপই তখন বুঝা গিয়াছিল যে, পোল্যাণ্ডের সীমানা এবং অন্যান্য ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকা রুশিয়ার স্বত্বই মানিয়া লইয়াছে। বৃটিশ এবং মার্কিন গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন, লণ্ডনস্থ পোল-গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। কিন্তু লণ্ডনস্থ পোল-গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই। এই কারণে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে পোলাণ্ডের সর্ব্বদলীয় সম্মেলন আহূত হয়, এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সম্পর্কে মস্কো রেডিও আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন : দীর্ঘকাল যাবৎ যে পোল সমস্যা মিত্রপক্ষের মধ্যে একটা অনৈক্যের কারণ স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল, এখন তাহার সমাধান ঘটিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব্ব ইউরোপে এক শান্তিপূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হইবে। উপসংহারে মস্কো রেডিও বলেন : অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন পর্ব্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন এবং আমেরিকা এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইবে। আর লণ্ডনস্থ যে পোল গভর্ণমেণ্ট এতদিন বৃটিশ আর মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিলেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগকে লণ্ডন প্রবাসী বে-সরকারী পোলরূপে ঘোষণা করা হইবে।

রয়টারের এক বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, সম্মিলিত পোলিশ গভর্ণমেণ্ট গঠনের সংবাদ ঘোষিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন ও আমেরিকা উহাকে স্বীকার করিয়া লইবে। সেইসঙ্গে লণ্ডনের পোলগণকে আর তাহারা গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করে না বলিয়া জানাইয়া দিবে। এই সম্পর্কে প্রবাসী পোলগণের নিকট কি প্রস্তাব করা হইবে, তাহা জানা যায় নাই; তবে তাহাদের অধিকাংশই যে স্বদেশে ফিরিতে চাহিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অস্থায়ী মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ গ্রু বলেন যে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনের পোলিশ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া ওয়ারশর নূতন অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পোলাণ্ড সমস্যা অংশত মিটিবার পথে আসিলেও এখনও উহার সম্পূর্ণ রহস্যের যবনিকা অপসারিত হয় নাই। 'কিছু' ব্যবস্থার মধ্যে আরও 'অধিক কিছু' বাকী রহিয়া গিয়াছে। তাহা ভাবি-প্রকাশের গর্ভে।

আসন্ন বৃটিশ পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচন

বৃটিশ পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন আসন্নপ্রায়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের উৎসাহ ও উদ্দীপনার বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ১৯৩১ সালের নির্ব্বাচন এবং ১৯৩৫ সালের নির্ব্বাচন অপেক্ষা বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালের পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনে অধিকতর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে। কোনো কোনো পরিবার হইতে একাধিক ব্যক্তি নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর

একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাচনে মহিলাপ্রার্থীর সংখ্যাও ন্যূন নয়। বিগত ১৯৩৫ সালের পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনে মোট ৬৬ জন মহিলা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে মহিলাপ্রার্থীর সংখ্যা ৮০ জন। তন্মধ্যে এক শ্রমিকদল হইতেই ৪০ জন মহিলাপ্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রক্ষণশীল দল হইতে মনোনীত মহিলা-প্রার্থীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা কম।

জানা যায়, কমন্স সভায় মোট ৬৪২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে এক শ্রমিকদলই ৬১০ জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন। খাঁটি রক্ষণশীল প্রার্থীর সংখ্যা ৫৫৫। এই দল বর্ত্তমানে 'জাতীয় দল' আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। রয়টারের বিশেষ এক সংবাদে জানা যায়, এই জাতীয় দলের সমর্থকপ্রার্থীর সংখ্যা ৬২৪ জনের কাছাকাছি। এতদ্ব্যতীত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে উদার নৈতিক দল। এই দল হইতে ৩০০ জনেরও অধিক প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছে। তাঁহারা আশা করেন যে, শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে কোনো দলই অন্যদল-নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিবেন না। এবং এইরূপ হইলে নূতন নির্ব্বাচনের পর সম্ভবতঃ কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রয়োজন হইবে।

উপরোক্ত দলসমূহ ভিন্ন কমন্‌ওয়েল্‌থ দল্ ও কম্যুনিষ্ট দলও যথাক্রমে ২৫ জন ও ২১ জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন। অদলীয় প্রার্থীর মধ্যে দাঁড়াইয়াছেন স্যার জন্ এ্যাণ্ডারসন এবং স্যার জেম্‌স্ গ্রীগ্।

পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে মিঃ চার্চ্চিল প্রস্তাব করিয়াছিলেন—পাকা শাসন-কর্ত্তাদের লইয়া একটি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা পুনরায় গঠন করিতে তাঁহার আগ্রহ আছে। কিন্তু এই প্রস্তাবে শ্রমিক দল সম্মত হন নাই। ফলে তাহা ফাঁসিয়া গিয়াছে।...ইতিপূর্ব্বে মিঃ চার্চ্চিলের ভরসা ছিল যে, তিনি বিনা বাধায়ই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এইরূপ ভরসা করা যে তাঁহার পক্ষে অশোভন ছিল, তাহা নয়। জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর তিনি অবিসংবাদিতরূপে ইউরোপীয় সমর-নায়কগণের অন্যতমরূপে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। জনগণের এই অভিব্যক্তির উপরে তাঁহার দলের যথেষ্ট আশ্বস্ত হইবারই কারণ আছে। কিন্তু দেখা গেল, এক শ্রেণীর ভোটারগণ মিঃ চার্চ্চিলকে যুদ্ধোত্তর কালের বৃটিশ নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী ন'ন। এবং সাম্প্রতিক নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতাও এই কারণের উপরে ভিত্তিশীল। প্রকাশ যে, নর্দ্দাম্পটনের এক ফার্ম্মের মালিক মিঃ আলেকজাণ্ডার হ্যান্‌কক্ মিঃ চার্চ্চিলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন। জানা কর্ত্তব্য যে, ইনি রক্ষণশীল নীতি ও কার্য্যবিরোধী এবং শ্রমিক কল্যাণই তাঁহার (বিজ্ঞাপিত) সধনার প্রাণস্বরূপ।

আসলে দেখিবার বিষয়, আসন্ন নির্ব্বাচনে মূল দুইটি বিরুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়াছেন রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল। ইহার উপরে ভিত্তি করিয়া মিঃ চার্চ্চিল ও অধ্যাপক লাস্কির বিরাট বিতর্ক জমিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে আজ শ্রমিকদল বিপুল বিক্ষুব্ধতায় নড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা গভীর আবেগে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ অঙ্ক দেখিবার প্রত্যাশায় রহিয়াছি।

মহাযুদ্ধের গতিপথে

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ডেভিড ব্রাউন ঘোষিত এক সংবাদে প্রকাশ: টোকিওর অভ্যন্তরে মিত্রশক্তি প্রচণ্ড বিমানআক্রমণ চালাইয়া জাপানীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। গত ১০ই জুলাই মারিয়ানা ঘাঁটি হইতে প্রায় ৫৫০ খানি মার্কিন বিমান খাস জাপানের হনস্থ দ্বীপের চারিটি নগর ও একটি তৈল শোধনাগারে হানা দেয়। মার্কিন বোমাক বিমানগুলি কর্ত্তৃক প্রায় ৩৫০০ টন আগুনে ও উগ্র বিস্ফোরক বোমা বর্ষিত হয়। আক্রমণের একটি লক্ষ্য ছিল—টোকিওর ১৯০ মাইল উত্তরে সেণ্ডাই নগর। উত্তর-পূর্ব্ব জাপানে সেণ্ডাই সুবৃহৎ সহর এবং সমগ্র উত্তর হনস্থর শাসনকেন্দ্র। অন্যান্য লক্ষ্যস্থল ছিল নাগোয়ার ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বিমানের কারখানার শ্রমিকদের বসবাসের সহর গিফু, ওসাকা বন্দরের শিল্প প্রধান উপকণ্ঠে শাকাই এবং ওসাকা-কোবের ৬০ মাইল দক্ষিণে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের কেন্দ্র ওয়াকামা।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়: ওকিনাওয়ার ঘাঁটি হইতে মিত্র বিমানসমূহ গত সপ্তাহের পর ১১টি জাপানী জাহাজ বোমা-বিধ্বস্ত করিয়াছে।

এডমিরাল চেষ্টার নিমিৎসের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ওকিনাওয়ার ঘাঁটির বিমানসমূহ জাপানী-দের ১৩টি উপকূলবর্ত্তী জাহাজ খাস জাপানের সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে। জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারের ইস্তাহারে প্রকাশ: নেদার ইষ্টইণ্ডিজের সৈন্যরা বোর্ণিওর বালিকপাপানের উত্তরে দুইটি স্থানে অবতরণ করিয়াছে।

"নিউ-ইয়র্ক টাইম্‌স্' পত্রিকায় সুদূরপ্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মিঃ হ্যান্‌লি ওয়াস্‌বার্ণ এক প্রবন্ধে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন: "মিত্রপক্ষ জাপানের নিকট ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রস্তাব করিলে খুব সম্ভব অদূর ভবিষ্যতেই সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের অবসান হইবে।" কিন্তু দেখিবার বিষয়, যে-জাতি মরণপণ করিয়া সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাকে শান্তিপ্রস্তাবে প্রভাবান্বিত করা খুব সহজ নয়, বিশেষতঃ জাপানের মত দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে। নতুবা ইতিপূর্ব্বে পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জাপানের আত্মসমর্পণের দাবীতে অগ্রণী হইয়াও ব্যর্থ হইয়াছিলেন কেন? তবে ইহা সুনিশ্চিত যে জাপানের আজ প্রধান সহায় জার্ম্মাণী অবদমিত হইয়াছে। মিত্র-পক্ষ সম্প্রতি খাস জাপানে যেরূপ উপর্য্যুপরি বিমান আক্রামণ চালাইয়াছে, তাহাতে একা জাপান এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে কতকাল লড়িতে পারিবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। এতদ্‌সত্ত্বেও শান্তিপ্রস্তাবে কিম্বা রুজভেল্ট-অভিব্যক্ত বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে জাপানী যে আদৌ সম্মত হইবে না, তাহা তাহার সংগ্রাম-গতি হইতেই বুঝা যায়। ওয়াশিংটনস্থ চীনাদূত ডাঃ ওয়াই তেও মিং চীন-জাপান যুদ্ধের অষ্টম বার্ষিকী সমাবেশ উপলক্ষে বলেন, "মিত্রপক্ষ যেন সন্ধি করিতে সম্মত না হয়। কারণ ইহা দ্বারা

শান্তি প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। জাপানীরা একশত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের চিন্তা করিতেছে। জাপান বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিবে, একথা যদি কেহ মনে করেন, তবে তিনি অতিরিক্ত আশা করিয়াছেন।" অতএব দেখা যাইতেছে, যুদ্ধের দ্বারা পরাভূত না হইলে জাপানকে সম্পূর্ণ রোধ করা মিত্রশক্তির পক্ষে সহজে সম্ভব হইবে না। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ হোতো দখল করিয়াছে। হোতোতে ব্রহ্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমানক্ষেত্র অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে ইহা জাপানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। ইংরেজেরা এই বিমান-ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত ইরাবতী উপত্যকায় তীব্র টহলদারী কর্ম্মতৎপরতা চলিতেছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের সমর-সংবাদদাতা জানাইয়াছেন: পেগুর ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সীতাং নদীর বাঁকে অবস্থিত নিয়াউংকাসে জাপানীদের অবিরাম আক্রমণের মুখে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ: পেগু-ইয়ামো অঞ্চলের স্থানে স্থানে বহু জাপসৈন্য বিরাজ করিতেছে। উক্ত অঞ্চলসমূহ বাদ দিলে ব্রহ্মের বৃহত্তর যে অঞ্চল থাকে, তাহা সম্পূর্ণ-ই জাপকবলমুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, মিত্র শক্তিকে এখনও নিশ্চিন্ত হইতে দীর্ঘদিন সময় লাগিবে। যে অবস্থায় জাপানীরা ব্রহ্মের চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্নাকারে ছড়াইয়া রহিয়াছে,তাহাদিগকে ঘায়েল করা শীঘ্র সম্ভব নয়। এবং তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিন ব্রহ্মে স্থায়ীভাবে পুনরায় শাসন মসনদ আঁটিয়া বসা বৃটিশের পক্ষে কঠিন হইবে।

লণ্ডনের একটি সংবাদে প্রকাশ: বার্লিনবাসীরা সম্প্রতি "বার্লিনের পুনরায় অভ্যুত্থান হইবে" এই মর্ম্মে সঙ্গীত রচনা করিয়া সমুচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছে। বার্লিনে দখলকারী বৃটিশ সেনাদলের সহিত অবস্থানকারী ইংরেজ সংবাদদাতা এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সঙ্গীতটি জার্ম্মান-জাতীয়তা বোধের পুনরভ্যুদয়ের ইঙ্গিত হইতে পারে। বার্লিনে "ডেলি স্কেচের" বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, যদিও এই জাতীয় সঙ্গীতের কোনো রাজনীতিক পটভূমিকা নাই, তথাপি ইহা জার্ম্মানদের মধ্যে জাতীয়তা উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। রুশরা এই সঙ্গীত অনুমোদন করিয়াছে বলিয়া আমরাও তাহা অনুমোদন না করিয়া পারি না। ইহা জার্ম্মানীর পক্ষে উৎসাহের কারণ হইবে।

কিন্তু এই উৎসাহ যে অচিরেই আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের ইন্ধন জোগাইবে না, এই কথা কি "ডেলি স্কেচের" উক্ত সংবাদদাতা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন? জার্ম্মানী অবদমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই যে আবার যে কোনো মুহূর্ত্তে মাথা চাড়া দিয়া দাঁড়াইতে পারে, ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য সেই সম্বন্ধে রুশিয়ার দায়িত্ব আজ বেশী।

চীন-জাপান যুদ্ধের নবম বর্ষ

চীন-জাপান যুদ্ধ অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিয়া নবম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল যে অসাধারণ দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ ও বীরত্বে চীন তাহার দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে লড়িয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা বিস্ময়ের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া থাকিবে।

সম্প্রতি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এক বাণী প্রচার করিয়া বলিয়াছেন: সুদূর প্রাচ্যে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য বৃটেন এখন তাহার মিত্ররাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে।—সাথে সাথে তিনি এই আশাও পোষণ করিয়াছেন যে, আক্রমণকারী জাপবাহিনী যেদিন চীনের রাজ্যখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইবে, সে-দিন আর অধিক দূরে নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ ট্রুম্যানও অনুরূপ বাণী প্রচার করিয়া বলিয়াছেন: জাপানী জঙ্গীবাদ বিচূর্ণ করিবার উদ্যম চরম পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের সমবেত আয়োজন আজ জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছে।

এইরূপ সহানুভূতিসূচক বাণী ইঙ্গ-আমেরিকা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই যুক্তভাবে দিয়া আসিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত চীনের প্রকাশ্য সাহায্যে আসিয়া অন্যান্য মিত্রশক্তি কোনোদিন দাঁড়ায় নাই। মার্শাল চিয়াং কাইশেক একাধিক বার একথা উল্লেখ করিয়া ইতিপূর্ব্বে বিবৃতি দিয়াছেন, কিন্তু তাহা শুধু অরণ্যেই রোদন হইয়াছিল, প্রকৃত সাহায্য লাভ চীনের ভাগ্যে ঘটে নাই। মিঃ চার্চ্চিল ও ট্রুম্যানের সাম্প্রতিক বাণীর প্রত্যুত্তরে আজ অবশ্য আর মার্শাল চিয়াংকাইশেক অতীত দুঃখের কথা তোলেন নাই, লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশে মনে প্রাণে তিনি বরঞ্চ চীনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য মিত্রপক্ষকে অভিনন্দনই জানাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক উদারতা ও বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

চীনের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ জাপান শুধু চীনের বুকে ধ্বংসের অগ্নিকুণ্ডই প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোলে নাই, তাহার নির্ম্মম অত্যাচারের দ্বারা চীনের সমাজ ও নৈতিক জীবনেও জাপান বিপুল বিপর্য্যয় ঘটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত চীন বার বার আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পশু-শক্তি বিরুদ্ধে নিঃশঙ্ক চিত্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া আজও তাহার দীপ্ত অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। চীনের এই ধৈর্য্য ও সহনশীলতা পৃথিবীতে যে আদর্শের সৃষ্টি করিল, সর্ব্বজাতির কাছে সেই আদর্শ পরম শ্রদ্ধার বস্তু।—যে লোকক্ষয় আজ পর্য্যন্ত চীনের হইয়াছে, তাহার হিসাব এখনও বাহির হয় নাই। বাহির হইলে দেখা যাইতো কত রক্তপাতের মধ্য দিয়াও চীন অবিচল হিমাদ্রী শিখরের মতই আজও দাঁড়াইয়া আছে। সুখের বিষয়, জাপানী যুদ্ধের আজ মোড় ঘুরিয়াছে। মিত্রশক্তির প্রবল আক্রমণের মুখে জাপান আজ বিভ্রান্ত। চার্চ্চিল তাঁহার বাণীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আশা করা অন্ততঃ আজ অলীক নয়; যথার্থই সামনে এমন সময় আসিতেছে, যখন সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া গভীর কলঙ্কের দাগ লইয়া জাপান চীন ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।

'লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী'

ত্রয়োদশ বর্ষ } ভাদ্র—১৩৫২ { ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র

শ্রীমতিলাল দাশ

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার কেন্দ্রশক্তি ভাগবত জীবনের অনুশীলন। অতি প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই একই ভাবধারা নানারূপে নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসকে ভাস্বর করিয়া অব্যাহত বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এই ভাবধারা কখনও সমৃদ্ধ ও পুষ্ট, কখনও ক্ষীণ ও মৃতকল্প। আমরা এক বিপ্লবের যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। নবযুগ সংগঠনের ও নব অভ্যুদয় সাধনের পথে আমাদিগকে প্রাচীনকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীনের সম্পৎকে ও অবদানকে আধুনিকতার আলোকে প্রদীপ্ত করিয়া লইতে হইবে।

শ্রুতি ও স্মৃতি—ইহাই আমাদের প্রগতির দুই সহায়। বেদবিদ্যা অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, অনির্ব্বচনীয়, তাহা সাধনায় লভ্য। সেই সাধনা ও প্রকরণের পথ দেখায় স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতির নানা গ্রন্থ আছে, কিন্তু স্মৃতিকারেরা মনুকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। কি রাষ্ট্রনীতি, কি সমাজনীতি, কি আচার, কি ব্যবহার, কি ধর্ম্ম-সাধন—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মনুর অবাধ অধিকার। বৃহস্পতি বলেন :

> মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।
> বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মহাভারত বলেন :

> পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
> আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।

মনুর স্মৃতি আজ্ঞাসিদ্ধ, তাঁহার মতের যাহা বিপরীত, তাহা প্রশস্ত নহে। স্মার্ত্তশিরোমণি মনুকে তাই পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন বলা হইয়াছে। শ্রুতি পর্য্যন্ত মনুর প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

> মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদত্তদ্ ভেষজম্।

দুঃখতাপতপ্ত মানুষকে সেই অমৃতময় ভেষজ পরিবেশন করিব। মনু বেদশাসনের প্রতিষ্ঠাতা—তিনি বৈদিক কৃষ্টির উদ্গাতা, তিনি বেদবিদ্যার পূজারী, তিনি বেদানুশাসনের আচার্য্য। এই সুকঠিন কাজের ভার একা তিনিই নিতে পারেন, কারণ তিনিই কার্য্য-তত্ত্বার্থবিৎ পণ্ডিত।

মনুর শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র—মানুষের আচার ও আচরণের পদ্ধতি। কিন্তু ইহা কেবল বার্ত্তা, দণ্ড ও অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিতেই কথিত নয়। মনু অধ্যাত্মজীবনের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন—তাই মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যাত্মবিদ্যারও শাস্ত্র। মানুষ নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে যে ভাবে, মনু তাহাই বিধান করিয়াছেন। তাই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র ভাগবত জীবনের শাস্ত্র। বেদ অখিল ধর্ম্মের মূল। মনু বলেন :

> সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
> সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি। ১২।১০০

কেবল আধ্যাত্মিক নয়, সাংসারিক সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের মূল বেদ। বেদ বলিলে ঋক্‌ যজুঃ সাম অথর্ব্ব বুঝায় বটে, কিন্তু তাদের এই সংকীর্ণ অর্থই মনু দেখেন নাই—বেদ বলিতে তিনি অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বুঝিয়াছেন। সৃষ্টিপ্রকরণ বলিতে গিয়া মনু বলিতেছেন যে, হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা কল্পে কল্পে যে নূতন

সৃষ্টি করেন, তাহাতে বেদদ্বারা তিনি সকলের নাম ও কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট করেন।

সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

এখানে বেদ বলিতে অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত জ্ঞানশক্তি বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সংহিতা আমরা পাই, তাহা ভার্গব সংহিতা। মনুশিষ্য ভৃগু তাহার বক্তা—ভৃগু বলিয়াছেন—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

সর্ব্বজ্ঞানময় মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞানে প্রদীপ্ত—তাহা বেদে পরিকীর্ত্তিত।

যে কথা বলিতেছিলাম—মনু পরমাত্মজ্ঞানের প্রদর্শক। মানুষ যে-ভাবে চলিলে, যে-কর্ম্ম করিলে পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে, মানুষের দিব্যজন্ম লাভের জন্য যে সংস্কার ও কৃত্য প্রয়োজন, মনু তাহারই বিধান করিয়াছেন।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।

জন্মমাত্রই মানুষ মহৎ হয় না। অভিজাত হইবার জন্য চাই সাধনা ও অনুশীলন, তপস্যা ও অধ্যবসায়। মনু মানুষকে দ্বিজ করিবার জন্য, ভাগবত করিবার জন্য, তাহার প্রাত্যহিক জীবনকে পরিমার্জ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মনু কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন :

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥
সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥
অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥
তেষু সম্যগ্ বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।
যথাসংকল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥

স্বর্গাদি ফললাভের আশায় কর্ম্মানুষ্ঠান গর্হিত, কারণ তাহা বন্ধন ও পুনর্জ্জন্মের কারণ। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বেদবোধিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত, হোম প্রভৃতি পালন করিলেই মানুষ ইহলোকে সর্ব্বকামনার পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং পরলোকে অমরত্ব লাভ করে। মনুতে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—গীতার অনাসক্তিযোগ বীজরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। মনু প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া নিবৃত্তির পথে যাইবার উপদেশ দিয়াছেন। কেবল মনু নহেন, গীতা, উপনিষৎ, পুরাণ, দর্শন সর্ব্বত্রই ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বকে স্বীকার করিয়া ভাগবত-পথযাত্রীকে ত্যাগের ও বৈরাগ্যের পথে চলিবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। আসক্তি ও অনাসক্তির এই বিরোধের কথা আমাদের ঋষি ও কবিগণ বলিয়া ক্লান্ত হন নাই। দুঃখকে ত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের পথে তাঁহারা যে পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাকে যজ্ঞপন্থা বলিতে পারি।

এই যজ্ঞ কথাটি ও যজ্ঞকল্পনাটি আমাদের পিতামহদের মহত্তম দান। সাংখ্যকার কপিল ভারতের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক—তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন সংসার পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, প্রকৃতি সক্রিয় ও প্রসবধর্ম্মী। পুরুষ ও প্রকৃতির যে অনাদি অনন্ত ক্রীড়া তাহাই জগৎলীলা। সেই লীলার ছন্দ বারংবার আবর্ত্তন করে—তাহার গতি সরল নহে—সে-গতি বৃত্তাকার। পুনঃ পুনঃ সেই চক্রদোলার দোলে জীবনের ছন্দ বাজিতেছে! এই ছন্দকে ঋষিরা যজ্ঞচক্র বলিয়াছেন! এই যজ্ঞ-চক্রে যোগ দিবার জন্য, যাজ্ঞিক হইবার জন্য তাঁহারা বারংবার আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন!

কালের সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সে বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান আজিও আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। আসুন হে ধর্ম্মবন্ধুগণ, আমরা পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ করি।

মনুর শাস্ত্র কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা নহে—তাহা লোক-বিদ্যাও বটে। মনু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—দুইকেই স্বীকার করিয়া পথযাত্রার কথা বলিয়াছেন! তিনি অমৃতত্ব লাভের কথা যেমন বলিয়াছেন তেমনই সর্ব্বকাম প্রাপ্তির কথাও বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন—

ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥

কেহ ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়কে কামের হেতু বলিয়া পুরুষার্থ নিশ্চয় করিয়াছেন! অন্যে অর্থ ও কামকে সুখের হেতু বলিয়া শ্রেয় বলিয়া থাকেন, কেহ ধর্ম্মকেই অর্থ ও কামের হেতু বলিয়া অভীষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ অর্থকে শ্রেয় বলেন, কিন্তু মনু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলিয়া স্থিতি করিয়াছেন। প্রবৃত্তিমার্গে এই ত্রিবর্গ, নিবৃত্তিমার্গে কেবল মোক্ষ। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রেরণাকেও সংযত ও সাধু করিবার জন্য ঋষিদের কি সুগভীর ভাবনা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন :

ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥

আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিতেছি যে, ধর্ম্মই অর্থ ও ভোগের কারণ, অতএব তোমরা কেন ধর্ম্মকে সেবা করিতেছ না, কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিতেছে না। আজিকার নব কুরুক্ষেত্রের দিনে ব্যাসের এই বচন স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া প্রচারের প্রয়োজন। পৃথিবীর রাষ্ট্রযাত্রা আজি ধর্ম্মকে হারাইয়াছে, তাই তাহার অর্থ ও সুখ এমন ভাবে হারাইয়া গিয়াছে। যদি সুখ চাই, যদি অর্থ চাই, যদি তৃপ্তি চাই, তবে ধর্ম্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

মনু নিজে দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্ম্ম সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥

প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য　দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু　ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ ॥

বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্ম স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তিকারক, কিন্তু সংসারপ্রবৃত্তির হেতু বলিয়া ইহা প্রবৃত্ত কর্ম্ম, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত যে সাধন তাহা নিবৃত্ত কর্ম্ম। প্রবৃত্ত কর্ম্মের অভ্যাসে দেবতাসমান গতি হয়, কিন্তু নিবৃত্ত কর্ম্ম সাধনের ফলে মানুষ পঞ্চভূতের প্রভাব অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করে। ইহলোকে বা পরলোকে কাম্য প্রাপ্তির বাসনায় যে কর্ম্ম তাহাই প্রবৃত্ত কর্ম্ম, আর, ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস কর্ম্ম সংসারনিবৃত্তির হেতু বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে।

এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের পরিসমাপ্তি যে কাম, কর্ম্মপন্থায় নিম্ন শ্লোকে তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন :

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।

স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর মাঝেই পরমাত্মাকে দেখিবে—আমি নিজেই পরমাত্মা এই জ্ঞানে সকল ভূতকে আপন আত্মায় অবস্থিত দেখিবে এবং আত্মাকে উৎসর্গ করিয়া, আত্ম সমর্পণ করিয়া যজ্ঞ করিবে, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিবে।

আত্ম নিবেদন সর্ব্বোত্তম যোগ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞচক্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত যজ্ঞচক্র যাহারা পালন করে না, কেবল নিজের অন্ধ স্বার্থের প্রেরণায় যাহারা চলে, তাহারা ইন্দ্রিয়ারাম, তাহাদের জীবন ব্যর্থ, তাহারা বাঁচিয়াই মরিয়া থাকে।

পরোপকারের জন্য, ঈশ্বরার্থে, ত্যাগার্থে যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মই যজ্ঞকর্ম্ম। অনাসক্ত হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করাই সংসারার্ণব তরণের নৌকাস্বরূপ। পৃথিবীতে যে অন্নে জীবন ধারণ করি, সে অন্ন যজ্ঞচক্রের ফলে জাত। অতএব ত্যাগ না করিয়া কেবল আত্ম-ভোগের জন্য যে জীবনধারণ করে সে যজ্ঞচক্র অনুবর্ত্তন করে না, ইন্দ্রিয়-সুখে ডুবিয়া থাকে, তাহার জীবন বৃথা।

গীতাকার বলিলেন :

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।

যে কেবল নিজে খায়, সে পাপ ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি যজ্ঞাব-শেষ ভক্ষণ করে, সে অমৃত ভক্ষণ করে এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বিশ্বের মহৎ কাল্যাণের জন্য আপনাকে এবং আপনার সমস্ত দ্রব্যকে উৎসর্গ করিয়া যখন আমরা স্বার্থের দিকে চাহি, তখন ত্যাগসঞ্জাত মহৎ-শক্তি আমাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখাইয়া দেয়। আমাদিগের জীবনকে পূর্ণ করিয়া দেয়।

গীতা ও মনু একই কথা বলিয়াছেন—অনাসক্ত হইয়া পুরুষো-ত্তমের আশ্রিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানে নিবেদন করিয়া আচরণ করিলেই মানুষ পরমা শান্তি লাভ করে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় চতুরাশ্রম ধর্ম্মে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি—এই চারি আশ্রম। চতুরাশ্রমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত চতুর্ব্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বিভাগ সর্ব্বত্রই প্রয়োজ্য—পৃথিবীর সর্ব্ব মানুষকে বৃত্তি ও গুণ অনুসারে এই চারিভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাগ কাল্পনিক—একই বিভিন্ন মানুষে গুণ ও বৃত্তির সংমিশ্রণ অনেক স্থলে হয়। এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বহু দোষের আকর বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কিন্তু ইহার দোষ দেখিতে গিয়া ইহার গুণকে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। মনু ব্রাহ্মণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন :

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিৎ জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি।

ব্রাহ্মণ জাত মাত্রেই অভিজাত। ধর্ম্মপালক, সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রাহ্মণ জগতে যাহা কিছু ধন আছে তাহাকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ কে—মনু তাহা বিশদভাবে বলিয়াছেন :—যাহার ব্রহ্মণ্য নাই, সে ব্রাহ্মণ নহে—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।

যে বেদজ্ঞ নহে, যে ভাগবত জীবন যাপন করে না, সে ব্রাহ্মণ নহে। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র শ্রম করে, সে কুলের সহিত শীঘ্রই শূদ্রতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মনুসংহিতার মতে ভারতবর্ষে আজ ব্রাহ্মণের একান্ত অসদ্ভাব হইয়াছে, সকলেই শূদ্রতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আজ ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

মানুষের জীবনের চতুষ্পাৎ বিভাগ তাহার দৈহিক ও আত্মিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রথম আশ্রম তাহার শিক্ষার কাল—পিতামাতা ও আচার্য্যের স্নেহ-পক্ষপুটে সে বর্দ্ধিত হয়, বিকশিত হয়। এই আশ্রম তাহার ভাবী জীবনের কর্ত্তব্যের আয়োজনে নিয়োজিত। শরীর, মানস ও আত্মিক অনুশীলনে পরিপুষ্ট হইয়া সে জীবনের মহৎ ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় আশ্রমে সে গৃহী—তখন সে কেবল আপনাকে নিয়া ব্যাপৃত নহে। মনু নিজেই বলিয়াছেন :

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা।

পুরুষ একলা নহে—ভার্য্যা, আপনি ও অপত্য এই তিনে মিলিয়া পুরুষ। পুরুষ একাকী অর্দ্ধেক, ভার্য্যা সহ সে সম্পূর্ণ হয়। কারণ, যে ভর্ত্তা সে অঙ্গনা ভিন্ন নহে। বাজসনেয় ব্রাহ্মণও এই কথা বলিয়াছেন—

অর্দ্ধো হ বা এষ আত্মনো যজ্জায়া, তস্মাৎ যাবজ্জায়াং ন বিন্দতে, নৈতাবৎ প্রজায়তে অসর্ব্বো হি তাবদ্ভবতি, অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেঽথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি, তথা চৈতদ্বেদ বিদো বিপ্রা বদন্তি যো ভর্ত্তা সৈব ভার্য্যা স্মৃতা।

জায়া আত্মার অর্দ্ধ—তাই যতক্ষণ জায়া গ্রহণ না করা হয়, প্রজা উৎপন্ন করা না হয়, ততক্ষণ মানুষ অপূর্ণ থাকে। যখন জায়া গ্রহণ করিয়া অপত্য উৎপাদন করে, তখনই পূর্ণ হয় এই জন্যই বেদবিদ্‌গণ বলিয়াছেন—যিনি ভর্ত্তা তিনিই ভার্য্যা

ব্রহ্মচর্য্যে যে শক্তি ও বীর্য্য সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা লইয়া গৃহী পৃথিবীর যজ্ঞচক্র পালন করিয়া জীবনকে সমৃদ্ধ ও মধুর করেন। তাঁহার আমিত্বের প্রসার হয়—দৃষ্টি বিশাল হয়। তখন মানুষ বোঝে সে একক নহে—সে একটী বৃহৎ পরিবার—যে পরিবার তুল্য নানা পরিবারের সমবায়ে দেশ, রাষ্ট্র ও জাতি সংগঠন করে।

তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ—তখন আমিত্বের অধিকতর প্রসার—দৃষ্টির বিশালতা দূরগামী। স্বার্থ এবং প্রয়োজন আপন নীচতা ভুলিয়া মহত্বের দিকে প্রধাবিত হয়।

চতুর্থ আশ্রম যতির আশ্রম।

পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া পঞ্চাশের পর গৃহী বনে গমন করিবেন। সেখানে—

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ॥

হইয়া তিনি বাস করিবেন।

সেই উদারচরিত্র বানপ্রস্থী সমস্ত জগৎকে আপন মনে করেন—এ আমার, ও অপর এই ভাবনা লঘুচিত্ত ব্যক্তিরাই করেন, উদার হৃদয় যাঁদের তাঁরা বসুধাকে আপন বলিয়া জানেন।

বানপ্রস্থের শেষে জীবনের তৃতীয় ভাগ গত হইলে চতুর্থে পরিব্রাজক যতি হইবেন। যতির চিত্তে বিশ্বাত্মার মহামহিমা প্রস্ফুটিত হয়। তিনি ভূমার সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করেন। বৃহৎ পরিপূর্ণতার মাঝে আত্মার যোগ সাধন করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। তখন তিনি :

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥

আত্মার দ্বারা সকল প্রাণীতে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বসমতা লাভ করেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

এই চারি আশ্রম পরস্পর নানা পরম্পরায় যুক্ত। প্রথম আশ্রমের যে সাধনা তাহা শিক্ষার ও আত্মবিকাশের। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি ব্রহ্মেতে বিচরণ করেন—যিনি ভাগবত জীবন যাপন করেন—যিনি আপন কর্ম্মকে ঈশ্বরোদ্দেশে সমর্পণ করেন। আমাদের সেই অতীতের গুরুকুল, তাহার নিরাড়ম্বর মাধুর্য্য, তাহার তপস্যাদৃপ্ত গরিমা হয়ত আর কোনও দিন ফিরিবে না, তথাপি নব শিক্ষা-প্রণালীর জন্য আমরা যাহারা চিন্তা করি, তাহারা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিধানে অনেক আলোক ও ইঙ্গিত পাইতে পারি।

ব্রহ্মচারী জ্ঞানের পথিক—তাই তিনি বেদের পাঠক। মনু বলিতেছেন :

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতির্গুণকর্ম্মতঃ॥
বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্॥

চতুর্ব্বর্ণ্য, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই বেদজাত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বেদ হইতেই জাত—তাহারা গুণ ও কর্ম্ম হইতে প্রসূত হয়। বেদশাস্ত্র সর্ব্বভূতকে পালন করে, অতএব বেদই পরম পুরুষার্থ!

ব্রহ্মচারী তাই বেদপাঠে আত্মনিয়োগ করিবেন। তখনকার দিনে বৃত্তি বিভাগ করিয়া শিক্ষার একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি দেওয়া হইয়াছিল। সকলকে একই শিক্ষা দেওয়ায় দোষও আছে, গুণও আছে। ঋষিরা পূর্ব্ব হইতে মানুষের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন, শিক্ষারও পদ্ধতিবিভাগ সহজ ছিল। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য কামনা করেন, সেই সব শিশুকে ৪ বৎসর তিন মাসেই উপনয়ন দেওয়া হইত। উপনীত বালক দ্বিজ, তাহার জীবনকে তখন হইতেই মহত্তম কল্যাণ ও বিরাট আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত বিধি ও নিষেধ, সমস্ত প্রণালী বর্ণনা এখানে সম্ভবপর নহে।

শিক্ষার প্রথম অঙ্গ ছিল শৌচ :—
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥

গুরু শিষ্যকে প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন, পরে আচার, অগ্নি-কার্য্য ও সন্ধ্যা ও উপাসনা শিখাইবেন। শৌচ স্বাস্থ্যের মূল, স্নান, আচমন, যোগ সন্ধ্যাবন্দনা সকলই শিষ্যের বিবর্দ্ধনের সহায়, তাহার ভাগবত জন্মের পরিপোষক। বর্ত্তমানের শিক্ষায় কেবল গর্দ্দভের ভার বাড়িতেছে—যে কোনও বিদ্যায়তনগামী ছাত্র বা ছাত্রীর পুস্তকের বোঝা দেখিলে যে কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি দুঃখ না করিয়া পারিবেন না। অথচ এই সব শিক্ষামন্দিরে শুক পাখীর মত কেবল ভাষাশিক্ষা ও নানা বিষয়ে অসম্পৃক্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের হযবরল গলাধঃকরণ করিয়া আমাদের বংশধরেরা, আমাদের কুমারীরা গতস্বাস্থ্য, অসদাচারী, অভক্ত, অকর্ম্মা, ভাববিলাসী, স্বকৃষ্টিদ্রোহী ভাবিদ্রোহী হইয়া ফিরিতেছে। এই সমস্ত ক্ষতিকারক অপ্রয়োজনীয় বিদ্যার অনুশীলন বন্ধ করিয়া যদি আমরা ছাত্র-দিগকে কেবলমাত্র শৌচ, আচার, অগ্নি-চর্য্যা ও সন্ধ্যাবন্দনা শিখাইতাম, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইত।

কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ইহা একান্ত বহিরাঙ্গ জিনিষ—
ব্রহ্মচারী কেমন করিয়া আহার করিবেন—তাহার সম্বন্ধে মনু বলেন :

পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥
পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্॥

অন্নকে পূজা করিতে হইবে—অভিনন্দন করিতে হইবে। অন্নকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচারীর দ্বিতীয় শিক্ষা বিনয়। আপনারা চাণক্যের শ্লোক জানেন—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥

নম্রতা, শোভন শালীনতা, ভদ্রতা ও সৌজন্য শিক্ষিতের ও

সংস্কৃতিমানের ভূষণ। যে জাতি যত সভ্য, যত উন্নত, যত সমৃদ্ধ, তাহার ভব্যতা তত সুন্দর, তত মনোহর। মনুর দৃষ্টি এ বিষয়ে সর্ব্বব্যাপক। তাঁহার ভব্যতার বিধানগুলি সৌজন্যহীন ভব্যতাহীন আমাদের বারংবার পাঠ করিবার প্রয়োজন আছে। জ্যেষ্ঠ ও গুণীর বরণীয় ও মাননীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে মনু বারংবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাধিকার সম্মান ও পূজা, কিন্তু সে পূজা গভীর দায়িত্বের সূচক।

জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্দ্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পূজ্যতমো লোকে জ্যেষ্ঠঃ সদ্ভিরগর্হিতঃ॥

জ্যেষ্ঠ কুলপাবন, তাহার পুণ্যকর্ম্মে কনিষ্ঠেরা অনুবর্ত্তন করেন, তাহার পাপে বংশ বিনষ্ট হয়। তাই জ্যেষ্ঠ পূজনীয়—সাধুরা তাহাকে নিন্দা করেন না। জ্যেষ্ঠ ও পূজ্যের জন্য তাই অভিবাদন।

মনু বলেন:

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্॥

যে তরুণ বৃদ্ধকে প্রণাম ও অভিবাদন করে, নিত্য তাহার পরমায়ু, বিদ্যা, যশ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মনুর এই বিনয় ও শীলের বিধানগুলি সমস্ত পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে, অতিশয় আনন্দ হইত কিন্তু আমার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে। আমি তাহার অনুপম ভাবসুন্দর ভাষা-সুন্দর শ্লোকগুলির কয়েকটি তুলিয়া তাহাদিগের মাধুর্য্য, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

সত্য বলিবে, তাহা প্রিয়ভাষায় বলিবে, কখনও তাহা অপ্রিয় রূঢ় ভাষায় বলিবে না। অনৃত ও মিথ্যাকে প্রিয় করিয়া কখনও বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥

যিনি পরস্ত্রী, যিনি রক্তের সম্বন্ধে সম্পর্কিত নহেন, তাঁহাকে ভবতি বা সুভগে বা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করিবে।

যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্‌ গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥

যাহার বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ হইয়াছে, যাহার মন ও বাক্য নিষিদ্ধ বিষয় হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত, সেই ব্যক্তি বেদান্তপ্রতিপাদ্য সমস্ত মোক্ষফল লাভ করেন।

নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াঽস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥
সম্মানাদ্‌ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥

কোনও ব্যক্তি একান্ত পীড়িত হইলেও কাহারও মর্ম্মপীড়াদায়ক কোনও দোষ উল্লেখ করিবে না, যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কর্ম্ম বা চিন্তা করিবে না, যে কথা বলিলে অন্যে মনে ব্যথা পায়—এমন অস্বর্গকর মর্ম্মপীড়াকর কথা বলিবে না। ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় মনে করিবেন এবং অবমাননাকে অমৃতের ন্যায় মনে করিয়া আকাঙ্ক্ষা করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ছিল—জিতেন্দ্রিয়তা, এই জন্যই প্রচলিত কথায় ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সমার্থ বলিয়া পরিচিত।

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্‌ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥
নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥

ব্রহ্মচারী তপোবৃদ্ধির জন্য গুরুকুলে নিয়ম পালন করিবেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিবেন। প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন, দেবতার অর্চ্চনা করিবেন এবং সমিধ দ্বারা সায়ং প্রাতে হোম করিবেন। ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য ব্রহ্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহার কয়েকটী শ্লোক তুলিতেছি—

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধং চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্‌ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী অভ্যঙ্গ তৈলমর্দ্দন করিবে না, নয়নে অঞ্জন প্রদান করিবে না, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না; কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, পরনিন্দা, মিথ্যা ভাষণ, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টাচরণ করিবে না। ব্রহ্মচারী একা শুইবে, কখনও রেতঃপাত করিবে না, কারণ রেতঃ-পাতে ব্রত নষ্ট হয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায় বীর্য্যলাভ। শরীরের কান্তি, মাসৃণ্য, দৃঢ়তা ও শক্তি সমস্তই ব্রহ্মচর্য্যসাপেক্ষ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না দিয়া শরীরচর্চ্চা শিখাইয়া তাহাদিগকে বলবান্‌ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহা ভস্মে ঘৃত ঢালিবার মত বৃথা হইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য দেশে নাই, তাই দেশ আজ ব্যাধির কবলে কবলিত, মৃত্যুর শাপে অভিশপ্ত। মৃত্যু কেন হয়, তাহার উত্তরে মনু বলিয়াছেন:

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্‌ জিঘাংসতি॥

বেদাভ্যাস না করায়, আচার বর্জ্জনের জন্য, আলস্য, অন্নদোষ প্রভৃতির জন্য মৃত্যু মানুষের হিংসা করে।

কিন্তু কেবল দৈহিক ব্রহ্মচর্য্য হইলেই শক্তিলাভ হয় না,—মানস ব্রহ্মচর্য্য চাই। মনু শরীরচর্চ্চার বিধান দেন নাই, কারণ শিষ্যেরা গুরুগৃহে নানাবিধ গৃহকর্ম্ম করিতেন। তাহা ছাড়া, প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা তাঁহারা সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও পীড়া দূরে রাখিতেন।

মনু বলেন :—

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ।
প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্।

ধাতু যেমন দগ্ধ হইলে মালিন্য ত্যাগ করে, তেমনই প্রাণায়ামে প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়।

প্রাণায়ামের দ্বারা দোষাদি দূর করিবে, ধারণাদির দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে, প্রত্যাহারের দ্বারা সংসর্গ ত্যাগ করিবে, ধ্যানের দ্বারা ক্রোধাদি রিপু নিবারণ করিবে।

আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি ধ্রুব হয়, তাই মনু ব্রহ্মচারীর আহারের শুচিতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। মনুর অন্যান্য বিধানের আলোচনা করিবার স্থান নাই। যাঁহারা মনুসংহিতা পড়িবেন, তাঁহারা দেখিবেন—সেই মহাত্মা মানুষ গড়িবার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান দিয়াছেন। এই সুমনোহর ব্রহ্মচর্য্যবিধি আমরা যদি পুনরায় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে দেশে এক নব জাগরণ ও নব উদ্বোধন হইবে।

বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গৃহী হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। স্বামী ও স্ত্রীর যে আসন ও অধিকার দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার বস্তু। মনু বলিতেছেন :

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ।

স্বামী ও স্ত্রী আমরণ ধর্ম্মার্থকাম বিষয়ে পরস্পর একত্র থাকিবে। ইহাই স্ত্রী ও পুরুষের পরমধর্ম্ম।

মনু সতীত্বধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন :

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।

যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে স্বামীতে অনুগত থাকেন, তিনি মৃত্যুর পর ভর্ত্তলোক প্রাপ্ত হন এবং সাধুলোকেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন। আমাদের দেশে মেয়েদের আমরা সম্মান করি না, এমন কথা শোনা যায়; কিন্তু মনু বলিতেছেন :—পতি ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া নব জন্ম গ্রহণ করেন, তাই জায়াকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন।

মনু নারীকে বলিয়াছেন :

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

স্ত্রীরা প্রজাপ্রসূতি, তাই তাহারা মহাভাগ, তাহারা বস্ত্রালঙ্কারাদি দানে প্রতিপূজ্য। তাহারা গৃহের দীপ্তিকারণ—এমন কি, স্ত্রী ও শ্রী উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই—শ্রীহীন গৃহ যেমন শোভা পায় না, স্ত্রীহীন গৃহ তেমনই শোভা পায় না।

গৃহধর্ম্মের ভিত্তি স্বামী ও স্ত্রী—তাহাদের প্রেম ও প্রীতিতে গৃহ সমুজ্জল ও সুন্দর হইবে।

কিন্তু মনুর গৃহধর্ম্ম কেবল স্বামী ও স্ত্রীর সংসার নহে, সে বৃহৎ একান্নবর্ত্তী সংসার—সেখানে নানাবিধ কর্ত্তব্য—নানাবিধ দায়, সেখানে গৃহীকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করিতে হইবে।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ এক অতুলনীয় কল্পনা—এক মহিমময় আদর্শ—

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।
এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি।

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ সর্ব্বদা যথাশক্তি পালন করিবে। কখনও তাহা পরিত্যাগ করিবে না।

কোনও কোনও যজ্ঞশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিরা এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া বুদ্ধিরূপ ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানাদির সংযমন করিয়া যজ্ঞসম্পাদন করেন। চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, উদূখল, মুষল ও জলকলস দ্বারা প্রতিদিন যে জীবহিংসা হয় সেই পঞ্চপ্রকার নাশের জন্য ঋষিরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ। ঋষিরা আমাদিগকে যে জ্ঞানসম্পদ্ দিয়া ঋণী করিয়াছেন, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞের দ্বারা আমাদের সেই ঋণ পরিশোধিত হয়। অন্নাদি দ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, অতিথিসেবাই নৃযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ। দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা এই পাঁচকে যে ব্যক্তি অন্ন না দেয়, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করেন বলিয়া মনু গৃহস্থকে শ্রেষ্ঠাশ্রমী বলিয়াছেন। গৃহী স্বাধ্যায় করিয়া ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবেন, হোমদ্বারা দেবতাদিগকে যথাবিধি অভিনন্দন করিবেন, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবেন, অন্ন দ্বারা মনুষ্যদিগকে এবং বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতদিগকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিবেন।

আমরা বর্ত্তমানে যাহা কিছুর অধিকারী, তাহার জন্য আমরা পিতৃপিতামহগণের নিকট ঋণী, তাই—

কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্।

হবির্দ্বারা হোম করিয়া স্বাহা মন্ত্রে নানা দেবতাগণের উদ্দেশে দেবযজ্ঞ করা হইত। ভূত-যজ্ঞ সমস্ত বিশ্বভূতের কল্যাণ-স্মরণ। চরাচরের সমস্ত ভূতগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশে ফল প্রদত্ত হইত। বিশ্বদেবতার জন্য "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে বলি দেওয়া হইত। 'সর্ব্বাত্মভূতায় নমঃ' মন্ত্রটী পড়িয়া সকল জীবগণকে আমন্ত্রণ করা হইত। বলিক্রিয়ার মধ্যে হৃদয়ের প্রসারতা বাড়িবার ব্যবস্থা ছিল। গৃহী বলিশেষ ভূমিতে কুকুর, কুকুরোপজীবী পাপরোগী, কাক ও কৃমিগণকে দিবেন। মনু বলেন—

এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিঃ পথর্জুনা।

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অন্নদানাদির দ্বারা সর্ব্বভূতের পূজা করেন, সকল প্রাণীকে বলিপ্রদান করেন, তিনি অতি সরল আলোকময় পথে ব্রহ্মধামে গমন করেন।

বলিকর্ম্মের শেষে পরিবারবর্গের ভোজনের পূর্ব্বে গৃহস্থ অতিথিগণকে ভোজন করাইবেন এবং ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীকে বিধিবৎ ভিক্ষা প্রদান করিবেন। একদিন ভারতবর্ষে মানুষ বিনা সম্বলে

এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিত কারণ, গৃহীর নিকট সর্ব্বদেবময় অতিথি পূজা পাইতেন। তাই ভারতবর্ষে পান্থশালা বা হোটেলের প্রয়োজন হয় নাই। কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে, আজ কোথাও একমুষ্টি অন্ন মেলে না।

স্বয়ং গৃহাগত গৃহীকে বিধানানুসারে সংকার করিয়া আসন, পাদপ্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন দিবে।

মনু বলেন—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জল ও প্রিয়বচন এই চারিটি জিনিষ কখনও সজ্জনের গৃহে অভাব হয় না। কিন্তু অতিথি হইতে—অকারণে পরান্ন ভোজন করিতে মনু বারংবার বারণ করিয়াছেন। অতিথি যখনই আসুন, তখনই তাহাকে ভোজন করাইতে হইবে।

ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্॥

ঘৃত, দধি, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথিকে না দিয়া আপনি ভোজন করিবে না। কারণ অতিথি-সেবা দ্বারা বিপুল সম্পত্তি, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ হয়। শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক তৃপ্ত হন। প্রতি অমাবস্যায় তাই শ্রাদ্ধবিধি করিয়াছেন এবং অন্ততঃ একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে বলিয়াছেন। দৈবকর্ম্ম অপেক্ষা পিতৃকর্ম্ম প্রশস্ত।

মনু যে বিস্তৃত শ্রাদ্ধবিধি বলিয়াছেন এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। পিতৃলোকের নিকট তিনি যে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন, কেবল সেই আশীর্ব্বাদের কথা বলিয়াই শ্রাদ্ধকথা উপসংহার করিব:

দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥

আমাদের বংশে দানশক্তিসম্পন্ন পুরুষ সকল বর্দ্ধিত হউক, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা বেদশাস্ত্রের আলোচনা বাড়ুক, পুত্রপৌত্রাদি সন্ততিসকল পরিবর্দ্ধিত হউক, বেদার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা যেন আমার কুলে না হয় এবং দান করিবার জন্য যেন যথেষ্ট সম্পৎ হয়।

মনু গৃহীকে জীবন ধারণের জন্য পঞ্চ বৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বকালে শ্ববৃত্তিকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥

এক একটি করিয়া পরিত্যক্ত শস্যসংগ্রহের নাম উঞ্ছ, মঞ্জরীরূপ ধান্য সংগ্রহের নাম 'শিল'---এইরূপে উঞ্ছশীল বৃত্তিকে বলা হয় ঋত। যাচ্ঞা না করিতে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার নাম অমৃত, যাচিত ভিক্ষাসমূহকে মরণসমান বলিয়া মৃত বলা যায়, কৃষিকর্ম্মে অনেক প্রাণীর হত্যা হয় বলিয়া তাহাকে প্রমৃত বলা হয়। এই পাঁচ উপায়ে বেদবিদ্ ভাগবতপথযাত্রী জীবন ধারণ করিবেন।

বাণিজ্য ও কুসীদে সত্যাবৃত ব্যবহার করিতে হয়, বিপৎপাত হইলে তাহাদ্বারা জীবন ধারণ করিবে, কিন্তু সেবা কুকুরের কাজ, সেই শ্ববৃত্তি কখনও অবলম্বন করিবে না।

গৃহী যদি অসঞ্চয়ী হন, তবে তিনি লোকজিৎ হন। গৃহী সন্তোষের সাধনা করিবেন, কারণ---

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

সন্তোষই সুখের কারণ, অসন্তোষ দুঃখের আকর, অতএব সুখার্থী সন্তোষ অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ ও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক ধন ভিন্ন অধিক ধনোপার্জ্জনে বিরত হইয়া কালযাপন করিবেন।

মনু গৃহীকে শেষ উপদেশ দিতেছেন:

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥

প্রতিদিন অনলস হইয়া আপন আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, যেহেতু যথাশক্তি সেই সমুদয় কর্ম্ম করিলে আন্তরিক পবিত্রতা দ্বারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয় এবং গৃহী পরমাগতি লাভ করেন।

মনুর কথিত রাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক নীতিপ্রকরণ প্রভৃতি আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। বারান্তরে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের কেবল দিগ্‌দর্শন করানো হইয়াছে, তাহার সমস্ত গৌরব ও গরিমা বুঝাইবার ও প্রকাশ করিবার শক্তি ও স্থান হইল না, কিন্তু যাহা বলিলাম তাহাতেই আপনারা ভারতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরুর উদারতা, দৃষ্টির বিশালতা, তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, তাহার অসামান্য মেধা ও মনীষার পরিচয় পাইবেন।

মনুর লেখাকে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথায় বলিতে পারি—

Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of heaven and home

খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, সসীমের সঙ্গে অসীমের, সান্তর সঙ্গে অমৃতের, গৃহপরিবেশের সঙ্গে ভাগবত জীবনের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, এমন সুমহান্ সামঞ্জস্য আর কোনও ধর্ম্মবেত্তা করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানের যাঁহারা রাষ্ট্রচালক, যাঁহারা দণ্ডকর্ত্তা, যাঁহারা বিধিপ্রণেতা, তাঁহাদিগের সকলকে মনুর এই আজ্ঞাসিদ্ধ ধর্ম্মবেদকে শ্রদ্ধা ও পূজা সহকারে অধ্যয়ন, অনুধাবন করিতে বলি। এই বিরাট মনীষা ও তপস্যা-সমৃদ্ধ অবদানকে ধ্যান, মনন ও সিদ্ধি ধ্যানন করিয়া আমরা হয়ত পুনরায় চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে সক্ষম হইব। সেই মহাভবিষ্যতের মহা অভ্যুদয় কামনা করিয়া শ্রীমৎ মহর্ষি মনুকে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

রামলীলা* (গল্প)

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

এক যুগ হইয়া গিয়াছে, ইদানীং আর রামলীলা দেখিতে যাই না। সেই বয়স নাই, সেই চোখ নাই। বীভৎস মুখোস, কালো রঙের খাটো কোর্ত্তা, হাঁটু অবধি লম্বা পায়জামা—এই পরিয়া ছ ছ ফিট লম্বা জোয়ান মর্দ্দ সব লাফাইতেছে,ঝাঁপাইতেছে, হুস হাস উপ আপ করিতেছে। দেখিয়া এখন হাসি পায়, অভিভূত হই না। কাশীর রামলীলা দেশবিখ্যাত। দূর দূরান্ত হইতে কত লোক ভিড় করিয়া আসে। অনেকদিন হইল একবার কৌতূহলবশে আমিও গিয়া জুটিয়াছিলাম। কিন্তু আমার চোখে কাশীর রামলীলা ও আমাদের অজ পাড়াগাঁর রামলীলায় তেমন কোন ইতর-বিশেষ ধরা পড়িল না। রামনগরে সাজ পোষাক একটু জমকালো সন্দেহ নাই। রাক্ষস ও বানরের মুখোস সব পিতলের তৈরী; বনগমনোদ্যত ভ্রাতৃযুগলের মাথার মুকুটও বেশ দামী ও ভাল কাজ করা মনে হইল। এই মাত্রই। বাকী সব সেই হুঁস হাস, লাফ ঝাপ, তীর ধনুক লইয়া নকল লড়াইয়ের মারপ্যাচ। হাতে গোঁফ† ঢাকিয়া একজন স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করিয়াও গেল।

তবু শত শত সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভিড়। তেল-নুন-লকড়ীর চাপে, গৃহিণীর প্রতাপে, সাম্প্রতিক সাহিত্যের উত্তাপে যাহাদের অন্তরের অন্তঃশীলা রসধারা নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই, কল্পনাশক্তি একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে নাই, তাহারা এখনও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অভিনেতারা তাহাদের কাছে উদ্দীপক উপলক্ষ্য মাত্র। আসরে পা রাখিতে না রাখিতে ইহারা সত্যযুগে, কল্পান্তপূর্ব্বের অযোধ্যা-দণ্ডক-লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ হনুমান্ তাহাদের হৃদয় রাজ্যে সজীব মূর্ত্তি ধরিয়া সঞ্চরণ করিতে থাকেন। তাই ত, নৈশ গগন মথিত করিয়া শত সহস্র ভক্তিগদগদ আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠ হইতে মুহুর্মুহুঃ বন্দনা ধ্বনি উঠে:—জয় সীয়াবর রামচন্দ্র কী জয়।

সীতারাম-জয়-ধ্বনিতে সেদিনও যোগ দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা যেন ক্ষণিকের আবেশ মাত্র। হায় রে, কোথায় গেল বাল্যের সেই পুলকবিহ্বলতা, সেই তন্ময় আত্মবিস্মৃতি! একদিন আমিও কি সমগ্র মন-প্রাণ-চৈতন্য এককেন্দ্রীভূত করিয়া রামলীলা দেখি নাই, শুনি নাই, প্রাণের পরতে পরতে স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ-সঞ্চারের মত অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করি নাই! বাস্তবে কল্পনায় মিশামিশি—স্বপ্ন-জাগরণে একাকার সেই দিনগুলি কি আর একবার ফিরিয়া পাই না?

আমাদের বাড়ী হইতে রামলীলার মাঠ বেশী দূরে ছিল না। যে ঘরে অভিনেতাদের সাজানো রঙ্ পরানো হইত, তাহা ত আমাদের বাড়ীর একেবারে লাগাও ছিল। বেলা দুইটার সময় হইতেই রঙ করা আরম্ভ হইয়া যাইত। তার অনেক আগেই আমি নাকে-মুখে কিছু গুঁজিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে সেখানে পৌঁছিয়া হাজিরা দিতাম। তাহাদের টুকিটাকি ফরমাশ খাটিতে পাইলে আর কিছু চাহিতাম না। তাহারাও খুব খাটাইয়া লইত। আমার শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই, অনবরত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিতেই লাগিয়া আছি। সে উৎসাহ-আনন্দ-উত্তেজনার কি তুলনা হয়! এখন ত টাকা ধর্ম্ম টাকা স্বর্গ অবস্থা, কিন্তু পেন্সন আনিতে যাইতেও সেই বাল্য-উৎসাহের কণামাত্র আর অনুভব করি না।

কোণের এক ছোট কামরায় রাজকুমারদের 'শিঙ্গার' হইত। 'রামরজ' চূর্ণ করিয়া অঙ্গে লাগান হইত, মুখে পাউডার, তার উপর লাল সবুজ নীল রঙের বিন্দু দেওয়া—কপাল ভুরু গাল চিত্র-বিচিত্র বিন্দুতে ভরিয়া যাইত। দলের মধ্যে একটি মাত্র লোক অঙ্গসজ্জায় নিপুণ ছিল। সেই ক্রমান্বয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে সাজাইত। রঙের পেয়ালায় জল লইয়া আসা, রামরজ চূর্ণ করা, পাখায় বাতাস করা—এই সব ছিল আমার কাজ। সাজসজ্জার পর যখন রামচন্দ্রের রথ বাহির হইত, তখন তাহাদের পিছনে এক আসন অধিকার করিয়া আমার সে কি উল্লাস! ভিক্ষুক যেন অকস্মাৎ রাজ্যখণ্ড পাইয়া গিয়াছে। আজ লাট সাহেবের দরবারে খানা-পিনায় নিমন্ত্রিত হই; ঈর্ষ্যাকাতর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া চলিবার কালে অন্তরে গর্ব্বোৎফুল্ল ভাবের আমেজও যে অনুভব করি না তাহা নহে, কিন্তু বাল্যের সেই দিব্য অনুভূতির আস্বাদ আর পাই না। জীবনপথে চলিতে চলিতে দুঃখ বিপদের ফাঁকে ফাঁকে কত রকমের সাফল্য, সৌভাগ্য সুদিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছি—বিবাহ, পুত্র-পৌত্রের মুখ দর্শন, নিজের ও সন্তানদের বড় চাকুরী প্রাপ্তি, দেশী ও সরকারী নানা রকম খেতাব ও সম্মান, কিন্তু আর একবারও কি ক্ষণেকের তরেও বাল্য-কৈশোরের সেই আনন্দ-সমাহিত শান্তরসাস্পদ অপরোক্ষানুভূতির দর্শন পাইতে নাই! সেই দিন নাই, সেই বয়স নাই, সেই চোখ নাই, সর্ব্বোপরি যাহা নয়কে হয়, হয়কে নয় করে, সেই অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াবিনী কল্পনা নাই।

বুঝিতে পারিতেছি, প্রাণপণে কতকগুলি বিশেষণ একত্র করিয়া সেই আনন্দ-সমাধির আভাস দেওয়ার চেষ্টা কি নিষ্ফল বিড়ম্বনা। তাহার চেয়ে সেই কাহিনী শোনাই, কি করিয়া স্বপ্নভঙ্গ হইল। বয়ঃসন্ধিকালে—যখন সব কিছু বয়সের ধর্ম্মেই ভারী হইয়া আসিয়া মনকে নিম্নগামী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এক রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন টুটিয়া গেল। প্রতিমার পিছনের খড় বাহির হইয়া পড়িল। সেও এক অশ্রুজলাভিষিক্ত করুণ কাহিনী, কিন্তু তাহা পূর্ব্বাস্বাদিত দিব্যানুভূতি নহে। বড় পার্থিব ধরণের আঁখিজল, পার্থিব কারণেই ঝরিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আবার ক্রোধ ও লজ্জাবোধ মিলিয়া আছে। এই বয়সের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল আছে বলিয়াই এতকাল পরেও সব খুঁটিনাটি স্মরণে পড়ে।

* * *

রামলীলা সেই বছরের মত শেষ হইয়া গিয়াছিল; শুধু রামের সিংহাসনারোহণ বাকী। অন্যবার তাহা তাড়াতাড়ি হইয়া যায়।

* প্রেমচন্দের হিন্দী হইতে রূপান্তরিত।

† কাহারও কাহারও কাছে গোঁফ এমন প্রিয় বস্তু যে অভিনয়ের প্রয়োজনেও দু'চারি দিনের জন্য তাহার বিরহ সয় না। তাহাদিগকে স্ত্রীলোক সাজাইতেই হয়, তবে গোঁফশুদ্ধ চালাইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এইবার বিলম্ব হইতেছিল। আমি ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম। নিত্য খোঁজখবর লইতাম। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, খোঁজ-খবর আমিই শুধু লই, আর কেহ দুইদিন আগের শত সহস্র লোকের নয়ন-পুত্তলি রামচন্দ্রের সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই পোষণ করে না। রোজ যাই আর দেখি আমার রামচন্দ্রের মুখ ম্লান। বেচারাকে বাড়ী যাইতেও দেয় না, অথচ এদিকে অনাদর অবহেলার অবধি নাই। চৌধুরীর ওখান হইতে সিধা আসিতে আসিতে রোজ বেলা তিনটা বাজিয়া যায়। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ তখন রান্না করিতে বসেন। সকাল হইতেই কিছু পেটে পড়ে নাই। তাঁহাদের করুণ ক্ষুৎপিপাসাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইত। সাজ পোষাক, রঙ না থাকিলে কি হইবে। আমার চোখে যে তাঁহারা তখনও অযোধ্যার রাজকুমার, রাজকুলবধূ। মাসাধিক কালের একাগ্র চিন্তার মোড় কিশোর মনে এত সহজে কি ঘুরিয়া যাইতে পারে ?

মা আমাকে সকালে যা কিছু খাইতে দিতেন, আমি তাহার অর্দ্ধেক রাম-লক্ষ্মণদের জন্য লইয়া যাইতাম। মা কোনদিন নিষেধ করেন নাই, বরং খাবার বরাদ্দ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তবে বাবাকে জানাইয়া নহে। সে আর এক কাহিনী।

দুঃখীর দিনও কাটে। অবশেষে রামচন্দ্রের ক্লেশ অবসানের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আবার রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে অপরূপ প্রাণ-মনোহারী সাজে সাজানো হইল। আজ সন্ধ্যায় রাজা রাম রাজ্যারোহণ করিবেন। রামলীলার মাঠে বিরাট সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। লোকের ভিড়ও খুব। সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রতিগৃহের পত্রপুষ্পসজ্জিত দ্বারে শোভাযাত্রা থামাইয়া রামচন্দ্রের আরতি হইতে লাগিল। সকলে সাধ্যমত ভেট দিল। আমার পিতা ছিলেন পুলিশের দারোগা। ইহলোকে যেমন সব জিনিষ বিনামূল্যে পান, কলা-মূলা হইতে কাপড়-চোপড় বাসনপত্র কোন কিছুর জন্য নগদ নারায়ণ বাহির করিতে হয় না, পরলোকেও সেই রকম সস্তায় সওদা করিবার পূর্ণ ভরসা রাখিতেন। প্রথা মত আমাদের বাড়ীর দ্বারেও আরতি হইল, কিন্তু দারোগাজী কিছু দিলেন না। আমার দুঃখ-নিরাশার যেন অবধি নাই। এত দুঃখ সহিয়া দ্বাদশবর্ষ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আনন্দামৃতবর্ষক রাজাধিরাজ রামচন্দ্র ঘরে ফিরিতেছেন, তাহাকে কিনা আমাদের দরজা হইতে এক রকম ফিরাইয়া দিলে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দশহরার সময় মামা আমাদের ওখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় আমাকে একটি টাকা দিয়াছিলেন। আমি উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ছুটিয়া গেলাম; নেকড়ায় বাঁধা টাকাটি টিনের বাক্স হইতে বাহির করিয়া, আরতির থালায় রাখিয়া দিলাম। পুত্রের দানশীলতা ও পিতার কার্পণ্য দেখিয়া সকলের মুখে চকিতে অদৃশ্য রকমের হাসির আভাস খেলিয়া গেল। বাবা আমার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু আমি তখন যেন হাওয়ায় উড়িয়া চলিয়াছি। "দারোগাই" দৃষ্টির তেমন কোন প্রভাব অনুভব করিবার মত অবস্থা নহে। কাবু হওয়া ত দূরের কথা।

রাত্রি দশটায় পরিক্রমা শেষ হইল। আরতির থালি টাকা পয়সায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলে অনুমান করিল পাঁচশ টাকার কম হইবে না। কিন্তু চৌধুরীর মুখ ভার। তিনি কিছু বেশীই খরচ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ' দুই টাকা গচ্ছা যাইবে দেখিয়া তিনি বিমনা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে এক উপায় বাহির করিলেন।

রাজ্যাভিষেকের রাত্রে প্রতি বৎসর "মেয়েদের" দ্বারা নাচগান করানো হইত। রাজসভায় নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্যে নৃপতির সন্তোষ বিধান করিবে—ইহা ত অভিষেকের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। পুঁথি-পত্রেই লেখা আছে। তবে এই সব ছলাকলার কারবারীরা যে নেহাৎ দেবকন্যা নয়, সেই বোধ ক্রমে জাগ্রত হইতেছিল। এবার হঠাৎ আমার জ্ঞাননেত্র খুব ভাল করিয়াই খুলিয়া গেল।

কি কারণে মনে পড়ে না, আমি এক কোণে আঁধারে দাঁড়াইয়া-ছিলাম। আর একটু দূরে আলোতে চৌধুরী দাঁড়াইয়া কাহার সঙ্গে যেন কথা বলিতেছিলেন। আমি দু' পা আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, অযোধ্যার রাজসভার সেই নটী। আমার বয়স কম বলিয়া তাহারা আমাকে গ্রাহ্যই করিল না। নিজেদের সলা-পরামর্শ তেমনি করিয়া যাইতে লাগিল। চৌধুরী বলিতেছেন: দেখ আবাদীজান, এ তোমার ভারী অন্যায়। এ কি আমাদের নূতন জানাশোনা যে, এত দরকষাকষির দরকার পড়ছে। এত কাল ধরে প্রতি বৎসর আসছ যাচ্ছ; ভবিষ্যতেও তোমার পুরোপুরি আশা রয়েছে। দেখছ ত এ বছর টাকাকড়ি আর বছরের চেয়ে কম এসেছে। নইলে কি আমি সামান্য টাকার জন্য কিপ্টেমো করেছি কোন দিন ?—আবাদীজান নাক-মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল, আমি তোমার খাস তালুকেও বসত করিনে যে তোমায় ভয় করব; তোমার ঘরের বউ নই যে বুক ফাটবে ত মুখ ফুটবে না। জমীদারী চাল-চালাকি তোমার খাতক-প্রজা, চাকর-বাকরের জন্য তুলে রাখ। আমার চোখে ধূলো দেওয়া তোমার কর্ম্ম নয় চৌধুরী সাহেব। টাকা আদায় করব আমি, আর গোঁফে তা দিয়ে পকেটে পুরবে তুমি। ভ্যালা টাকা রোজগারের ফন্দী ঠাউরেছ যা হোক। দাও না বাইজীদের একটা চাকলা বসিয়ে। দু'দিনে লালা মোহরী লাল হয়ে যাবে।

চৌধুরী কাতর হইয়া কহিলেন: আবাদীজান, এই কি ঠাট্টা-তামাসার সময়। এদিকে আমার বলে ধড়ে প্রাণ নেই। দু' দুশো টাকা যদি আমার ঘর থেকে যায়, তবে আমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখ।

আবাদী তেমনি অবিচলিতভাবে জবাব দিল: আমার সঙ্গে চালাকি না করলেই পার। তোমার মত এমন অনেক চৌধুরীকে রোজ আমি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাই—বলিয়া চৌধুরীর নাকের ডগা হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত আঙ্গুলের সাহায্যে এক দড়ির আকার আঁকিয়া দিল।

চৌধুরী হতাশ ভাবে বলিলেন: তুমি কি চাও খুলেই বল।

আবাদী—তবে শোন। আমি যা উশুল করব, তার অর্দ্ধেক আমার।

ইতস্ততঃ করিয়া চৌধুরী শেষকালে বলিলেন:

—আচ্ছা, আমি রাজী।

—তা হ'লে আগে আমার ফুরণের একশো টাকা দাও।

চৌধুরী বিস্ময়ে ছোট চোখ দু'টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গাছের খাবে, তলারও কুড়োবে? আদায়ী টাকার অর্দ্ধেক যদি নাও, তবে আবার ঐ একশো কেন?

আবাদীজান বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচাইয়া বলিল: আমার সঙ্গে ত' টাকা আদায় করবার কোন কথা নয়। ফি বছর আসি, নাচি গাই চলে যাই, এবারও তাই করে যাব। কারো পকেটে হাত চালাতে যাব কেন? তা' যদি করাতে চাও, অর্দ্ধেক বখরা।

মুখ ভার করিয়া চৌধুরী অগত্যা রাজী হইলেন।

নাচ শুরু হইল। আবাদীজানের চেহারা বেশ ভালই ছিল। বয়সও কম। যার সামনেই একবার বসিল, তাহারই পকেটের ভার কিছু না কিছু লাঘব করিয়া তবে উঠিল। এক রকমের নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। পাঁচটাকার কম কেহ আর বাহির করিতে পারে না। আবাদীজান এর ওর কাছে টাকা আদায় করিয়া শেষ কালে আমার পিতৃদেবতার সামনে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তাঁহার হাত ধরিয়া গানের কলি বার বার গাহিয়া চলিল। আমার কি জানি কেন মুখ লজ্জায় একেবারে রাঙা হইয়া আসিয়াছে। সব লোক বাবাকে ভয় করিয়া চলে। চেহারাও খুব রাশভারী। যাহারা দেখা করিতে আসে সকলেরই কাঁচুমাচু মুখ, সশঙ্ক দৃষ্টি। বাবা কথা বলেন ত ধমক দিয়া। আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই, কেহ তাঁহার হাত ধরিতে পারে। তাও আবার শত শত লোকের সাক্ষাতে। বাবার কিন্তু সেই স্বাভাবিক রাগত ভাব কোথায় উবিয়া গিয়াছে। তিনি হাত ছাড়াইয়া লইলেন বটে, কিন্তু অপ্রসন্ন ভাবে নহে। কে একজন পিছন হইতে বলিল: এখানে তোমার কারসাজি চলবে না আবাদীজান, বৃথাই হয়রাণ হচ্ছ। কিন্তু আবাদী এবার দু'হাতে বাবার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি প্রাণপণে কামনা করিতেছিলাম, বাবা যেন মেয়েটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু ঠেলিবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না। বরং তিনি এমন ভাব ধরিলেন—যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছেন। চোখ-মুখ হইতে তৃপ্তি উছলিয়া পড়িতেছিল। পিছন হইতে যে তাঁহার কার্পণ্যসূচক টিপ্পনি কাটিয়াছিল, তাহার দিকে এক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি পকেট হইতে এক মোহর বাহির করিলেন। দেখিয়া আমার যে কি হইল বলিতে পারি না। আমি সভা ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিলাম। একবার ভাবিলাম—মায়ের কাছে গিয়া সব বলিয়া দিই। কিন্তু তাহা আর করিলাম না। মা যে আমার সুখী নহেন, তাহা সেই বয়সেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বৃথা তাঁহার দুঃখ বাড়াইয়া কি লাভ।

পরদিন প্রাতে রামচন্দ্র বিদায় হইবেন। আমি ভোরে শয্যা ত্যাগ করিয়াই চোখ কচলাইতে কচলাইতে উহাদের ঘরে গিয়া হাজির। ভয় ছিল, পাছে আমার সঙ্গে আর একবার দেখা হইবার আগেই উঁহারা চলিয়া যান। গিয়া দেখি, আবাদীজানের যাত্রার জন্য গাড়ী আসিয়াছে। জিনিষপত্র সব বাঁধাছাদা হইতেছে। এত ভোরেই বিশ পঁচিশ জন ভক্ত রসিক সেখানে জুটিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই সোজা রাম-লক্ষ্মণের ঘরে পৌছিলাম। সীতা ও লক্ষ্মণ নিজেদের চারপাইয়ের উপর বসিয়া কাঁদিতেছেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন। রামও বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত। কাঁধ হইতে দড়িতে বাঁধা এক লোটা পিঠের উপর ঝুলিতেছিল। বগলে গামছায় বাঁধা মলিন এক পুটুলী। আমি ছাড়া ওখানে আর কেউ নাই। আমি কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের 'বিদায়' হয়ে গেছে?

—হাঁ হয়ে গেছে। আমাদের আর বিদায় কি ভাই। চৌধুরী সাহেব বললেন, "চলে যাও", তাই যাচ্ছি।

—টাকা-কড়ি কাপড়চোপড় পেয়ে গেছ?

—আর ভাই টাকাকড়ি। কিছুই ত দিলেন না চৌধুরী সাহেব, বললেন এবার কিছু বাঁচেনি। পরে একদিন এসে নিয়ে যেয়ো।

—একেবারে কিচ্ছু পাওনি?

—এক পয়সাও না, বলেন কিছু বাঁচে নি। আমি ভেবে-ছিলাম—কিছু পেলে পড়বার বই কিনব। গত বছর অন্যদের বই নিয়ে নিয়ে পড়েছি। পরীক্ষার সময় কেউ দেয় না। তখন ভারি অসুবিধে হয়।

কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন: পথের খরচও কিছু দিলে না ভাই। বলে; কতই বা দূর, হেঁটে চলে যাও।

আমার মনে এমন ক্রোধ হইল যে, সব কিছু তছনছ করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাইজীর জন্য শত শত টাকা, গাড়ী-ঘোড়ার বন্দোবস্ত! আর এদের জন্য দু' চার আনাও কেহ ব্যবস্থা করে নাই। কাল রাত্রে যাহারা বেশ্যার দৃষ্টিতে মোহিত হইয়া পাঁচ পাঁচ দশ দশ টাকা ভেট চড়াইয়াছিল, তাহারা দু'দুটি পয়সা এদের দিতে পারে না? বাবাও ত কাল এক মোহর দিয়াছেন। দেখি এবার এদের জন্য কি দেন। বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

কিন্তু আমি গিয়া মুখ খুলিবার অবসর পাইলাম না। আমাকে দেখিয়াই বাবা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন: ঘুম থেকে উঠেই কোথায় গিয়েছিলেন বাবু সাহেব? পড়াশোনার নাম নেই, সকাল থেকেই উধাও! কোথায় ছিলি?

আমি দম লইবার অবকাশ পাইতেই বলিয়া ফেলিলাম, রাম-লক্ষ্মণকে বিদায় করতে গিয়েছিলাম। চৌধুরী ওদের কিছু দেন নাই বাবা।

—তাতে তোর কি? ভক্ত হনুমান্ সেজেছেন। খেয়ে দেয়ে কম্ম নেই, পাজী কোথাকার।

আমি মরিয়া হইয়া বলিলাম, ওরা যাবে কি করে? রাস্তা খরচও কিছু পায় নি।

বাবা যেন একটু নরম হইলেন। বলিলেন—এ চৌধুরীর ভারী অন্যায়। কিছু দেয় নি?

আমি সাহস পাইয়া বলিলাম, না বাবা, এক পয়সাও না। ওরা কাঁদছিল। আপনি যদি দুটো টাকা—

বাক্য আর শেষ করিতে হইল না। বাবা এমন বিকট হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন যে, আমি তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করাই সুবুদ্ধি বিবেচনা করিলাম।

পিতার উপর ক্রোধ ছিল, কিন্তু ভয় ছিল তারও বেশী। কথায় কথায় তিনি চড়-চাপড় চালাইতেন। আমি আর কি করি; উদ্দীপ্ত ক্রোধ শান্ত করিয়া মায়ের নিকট হইতে দুই আনা পয়সা সংগ্রহ করিয়া ওঁদের দিয়া আসিলাম। দুই আনা মাত্র পয়সা, কিন্তু তাঁহাদের আনন্দ ধরে না। তিনজন ঐ দুই আনা সম্বল করিয়াই বাড়ী চলিলেন। যতক্ষণ না তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন, ততক্ষণ আমি সেই শূন্য কক্ষের দ্বারে মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিলাম।

সেইবারের রামলীলার প্রভাব আমার সমগ্র জীবনে বিস্তৃত হইয়াছিল। আমাদের পিতাপুত্রের প্রকাশ্য তিক্ততা সেই দিনই সুরু হইল, তাহা আর থামে নাই। আমি আর কোনদিন পিতাকে মান্য করি নাই, কোন কথা শুনি নাই। দারুণ প্রহার করিয়াও তিনি আমার জেদ ভাঙ্গাইতে পারেন নাই। শেষকালে আমাদের বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

রস-চর্চ্চা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রস কথাটির ঠিক অর্থ বাক্যে প্রকাশ করা বোধ হয় সম্ভব নয়, তার সমার্থবোধক প্রতিশব্দও খুঁজে মেলে না। তবে এই টুকু বলা যায় যে, এ হল তাই যা জীবনকে আমাদের নিকট উপভোগ্য করে, যা না হলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। এ হল তাই যা জীবনকে সরসতা দেয়।

ভাইটামিনের সঙ্গে খাদ্যের যা সম্পর্ক, এ যেন অনেক খানি তাই। খাদ্যের কোথায় তা আছে তা খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তা না হলে খাদ্য আমাদের পুষ্টি দিতে অক্ষম,—এইটুকু জানি। কারণ, তা হল খাদ্যের প্রাণ।

সুতরাং এটা দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই যে আদি কাল হতে মানুষের মন রসের সন্ধানে ফিরে ফিরে ঘুরেছে। যুগ যুগ ধরে এই সন্ধানের সাধনায় সে রসের উৎস আবিষ্কারও করেছে। কিন্তু সেইখানেই সে বিরাম দেয় নি। ভগীরথের মত তাকে সে স্বরচিত খাদে প্রবাহিত করে এনেছে একেবারে নিজের জীবনের মাঝখানটিতে। ফলে তার জীবনের ভূমি রসসিক্ত হয়েছে, উর্ব্বর হয়েছে, শস্যমণ্ডিত হয়েছে।

কথাটা একটু হেয়ালির মত শোনায়। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না এই কথা বুঝতে যে, মানুষ যাকে তার কৃষ্টি বলে তা হল সেই ফসল যা এই রস-সেচনে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

কৃষ্টির ভিত্তি মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি; কিন্তু সেই বৃত্তিকে ভিত্তি করে যে মনোরম সৌধ রচিত হয়েছে তা মানুষের নিজস্ব রচনা। মানুষের রস-পিপাসাই তাকে এই অমূল্য সম্পদের অধিকারী করেছে।

প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছিল যৌন-আকর্ষণ। রসপিপাসু মানুষের মন কেবল তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। সে তাকে ঘষে মেজে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত করে যে জিনিষটি পেল তা হল ভালবাসা যার বিশেষ বিশেষ রূপ হল—ভক্তি, প্রণয়, স্নেহ। এ জিনিষ দেবতার পায়ে উৎসর্গ করতেও আপত্তি হয় না, এমনি নির্ম্মল।

প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছিল শীকার-বৃত্তি। আদিযুগে তার অন্নসংস্থানের উপায় স্বরূপ, তা ছিল তার একমাত্র পেশা। ক্রমে অবস্থার আনুকূল্যে যখন তার অন্নসংস্থানের নানা উপায় উদ্ভাবিত হল, মানুষ সেই আদিম বৃত্তিটিকে সংস্কৃত করে নিয়ে তাকে তার কৃষ্টির অঙ্গ করে নিলে। তখন তার নামকরণ হল খেলা। খেলা তার আদিম যুগের শীকার বৃত্তির পরিমার্জ্জিত আকার।

আদিযুগে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের ভাবের আদান প্রদানের তাগিদে প্রয়োজন ছিল শব্দ উচ্চারণের। প্রকৃতি তাকে সে শক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু তার বেশী নয়। কিন্তু মানুষ তাতে সন্তুষ্ট হয় নি। তার মনের ভাবের আকারে জটিলতা, রূপে বিভিন্নতা, তাকে নানা পদ ও বাক্য রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। সেটা তার প্রয়োজনের চাপে। কিন্তু মানুষ সেখানে নিবৃত্ত হয় নি। সেই পদগুলিকে সাংকেতিক রূপ দিয়ে, চোখে গ্রহণ করবার যোগ্য করতে, সে আবিষ্কার করল অক্ষরের। সে দিন সে তার ভাবকে অক্ষয় রূপ দেবার যাদুমন্ত্র আয়ত্ত করলে। ফলে আমরা যা পেয়েছি, তাকে বলে থাকি সাহিত্য, যা প্রতিনিয়তই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। তা আমাদের কৃষ্টির একটি প্রধানতম অঙ্গ।

বিশ্ব যাঁর রচনা তাঁর পরিকল্পনায় যেন এইরূপ রসের উৎসের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণেই হয়েছিল। প্রকৃতির চারপাশে বিনা প্রয়োজনে কত না আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা। তাই দেখেই ত ঋষি কবির মুগ্ধ হৃদয় একদিন প্রকৃতিকে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে বর্ণনা দিয়েছিল।

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমাদের অহরহ এই যে আমন্ত্রণ চলেছে তা রক্ষা করা কি আমাদের ধর্ম্ম নয়? আর সেই ধর্ম্ম আচরণে লাভ বৈ লোকসান ত' কণামাত্র নাই। তার জন্য চাই কৃষ্টির ব্যাপকতর চর্চ্চা, তার জন্য চাই অহরহ এই যে আমন্ত্রণ-লিপি আমাদের নিকট প্রেরিত হচ্ছে, তাকে পাঠ করতে, আমাদের ইন্দ্রিয়কে সচেতন রাখা।

এ-কালের সঙ্গে তুলনায়, সে-কালে এই রসচর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল অনেক পরিমাণে বেশী। শিক্ষিত সভ্য মানুষ সে-কালে রস সংগ্রহ করত নানা কলা অভ্যাস করে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে

পাই যে, সভ্যপদবাচ্য হ'তে হ'লে সে-কালের নাগরিকের প্রয়োজন হ'ত চতুঃষষ্ঠি কলায় ব্যুৎপত্তি। তবেই তিনি বিদগ্ধ জন বলে পরিগণিত হতেন এবং সমাজে আদর পেতেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য, আলেখ্য ত' এর অন্তর্ভুক্ত ছিলই, আরও কত কি ছিল; নানা ধরণের সাহিত্যিক আলোচনাও বাদ পড়ে নি। এ হ'তে অনুমান করা যেতে পারে, সে কালের সভ্য মানুষের সমাজে কৃষ্টির বিস্তার কত ব্যাপক ছিল এবং তার চর্চ্চার ব্যবস্থাও কি বিপুল ছিল।

আধুনিক জীবনে এই কৃষ্টিচর্চ্চার অন্তরায়, আমাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক জীবন। সে-কালে জীবনতরী বাস্তবিকই চলত মন্দাক্রান্তা ছন্দে, অবসর ছিল তখন প্রচুর, কাজেই রস পরিবেশনের আমন্ত্রণ রক্ষার সুযোগও ছিল প্রচুর। কিন্তু আজকাল অন্নসমস্যা আমাদের এমনি পেয়ে বসেছে যে, সকাল হতে সন্ধ্যে আমাদের সমস্ত সামর্থ্য এবং শক্তি ব্যয়িত হয় অন্নসংস্থানের চেষ্টায়। এটা চলচ্চিত্রের যুগ, তড়িৎযুদ্ধের যুগ, অবিরাম গতির যুগ। অবসরের দিশাই মেলে না এ যুগে। ফলে সময় যেটুকু পাওয়া যায়, তখন মন হয়ে থাকে এমন নিস্তেজ যে, রসচর্চ্চার সুযোগ থাকলেও স্পৃহা থাকে না! বাস্তবিকই জীবনকে রস সেচনের দ্বারা মাধুর্য্যমণ্ডিত করতে হলে, চাই এই অবসরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা! অর্থনীতিজ্ঞের সেই ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি।

তাই বলে অবসরের অভাবের অজুহাতে আমরা কি আনন্দময়ের এই আমন্ত্রণ-লিপি প্রত্যাখানই করে যাব? তা' যিনি করবেন তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় দেবেন না। মনের মত করে না পারি, যার যতটুকু সাধ্য রসচর্চ্চা আমাদের করে যেতেই হবে। যতটুকু পারব, ততটুকুই লাভ। পেশার চাপে আমরা আজকাল বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকি সত্য, কিন্তু তাই বলে আমাদের অন্য সকল বৃত্তিকে নিষ্পেষিত করা ঠিক হবে না। আমাদের কৃষ্টির নানা শাখার যতগুলি শাখাকে করায়ত্ত করতে পারি, তা' করতে হবে। যতরূপে রসচর্চ্চা সম্ভব, তা' যদি করে যাই, আমাদের জীবন অনেক বেশী পরিমাণে সরস হবে এবং জীবন তখন তিক্ত এবং অসহ্য বোধ না হয়ে সত্যই মধুর হয়ে উঠবে।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম (কথিকা)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি, না করি তা নয়। কবে থেকে করি...কি করি, তাই বলিতেছি। এ যেন আমার আত্মচরিতের দু'দিনের রোজনামচা।

রোজ গঙ্গা স্নান করি। বাড়ি ফিরিয়া গৃহদেবতা রাধামাধবকে প্রণাম করি, বাপ মায়ের ছবির কাছে মাথা নত করি। তারপর প্রায় দুই প্রহরে আহার করি। বিশ বছর থেকে নিত্যনৈমিত্তিক ইহা করিতেছি, কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মের সিঁড়ির এক ধাপও যে উঠিতে পারি নাই তা এখন বেশ বুঝিতেছি।

জগন্নাথ দর্শনে গেলাম, রথের সময় কি ভীড়। পাণ্ডা বলিল প্রভুর চাঁদমুখ দেখ, কিন্তু দেখিলাম একটি গোল চাকা! স্ত্রী শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। রথযাত্রীদের ভক্তির কি উচ্ছাস। সকলে যেন আত্মহারা। রথের রজ্জু টানিয়া উদ্ধার পাইতে জীবনপণ করিয়াছে। কিন্তু আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই! স্ত্রী হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেছেন।

হিন্দোল উৎসবে বৃন্দাবনে আসিয়াছি, স্ত্রী রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছেন। ব্রজবাসী বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রব শোনো। কিন্তু যাত্রীদের কলরব ছাড়া আমি কোন রবই শুনিতেছি না। স্ত্রী পর্ণপুটে করিয়া আবির আনিয়া দিলেন, আমার পায়ে পায়ে আবির মাখাইয়া দিলেন। কিন্তু আমার হাতের আবির হাতেই থাকিয়া গেল, আমি তাঁহার পায়েও উহা প্রক্ষেপ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন—কি ভাবছো, আনন্দ পাচ্ছ না? গোপীরা আজ কি অপূর্ব্ব লীলা করছেন চেয়ে দেখ। আমি বলিলাম—কৈ কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না! স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—পুরীতে জগন্নাথকে দেখতে পেলে না, বৃন্দাবনে এসে বাঁশীর শব্দ শুনতে পেলে না, কি হবে গো তোমার কি হবে, কেন তোমার এমন হ'ল! আমারও চোখ দিয়া ধারা বহিতেছে, কেন আমার এমন হইল, আমার ধর্ম্মকর্ম্মের কোথায় ত্রুটি আছে ভাবিয়া পাইতেছিনা—কোথায় ত্রুটি আছে।

বিলাত গিয়াছিলাম, ঠাকুরদেবতা কিছুই মানিতাম না। তারপর চাকরি জীবন! অসবর্ণ বিবাহ করিলাম, অবশ্য উচ্চ বর্ণে! স্ত্রী শিক্ষিতা। পেন্সন লইবার কিছু আগেই মা মারা গেলেন, মা'র মারা যাওয়ার তিন মাস মধ্যেই বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুকালে বাবা বারে বারে গৃহ-দেবতার দিকে তাকাইয়া নমস্কার করিলেন। শেষে আমার দিকে তাকাইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, চক্ষু-তারকা স্থির হইয়া গেল। আমার স্ত্রী, বাবার পায়ে মাথা রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—দেবসেবার কোনো ত্রুটি হবে না বাবা, আপনি স্বর্গ থেকে দেখবেন। তারপর থেকে আমি বাবার নিত্য-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহ দেবতার দুয়ারে আসিয়া তিনি প্রণাম করিতেন, আমিও সংস্কার বশে তাই করিয়া যাইতেছি। ইহার বেশি আরও যে কিছু করিবার আছে তাহা জানিতাম না। তবুও ভাবিতেছি, এ সব কি ধর্ম্ম...না আবেগ?

আমাদের চোখের জল তখনও শুকায় নাই—এমন সময় আমার খুড়তোতো ভাই ও তার স্ত্রী আসিয়া পৌঁছিলেন। ভাইটি আমার সমবয়সী ও পেন্সনভোগী। কয়দিন হইল আমার কাছে তাঁরা বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাঁদেরও চোখে জল। তারা বলিতে লাগিল—বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস যেন কল্পনার রোমাঞ্চে ভরপুর...কিন্তু এর সবটাই মনগড়া...সবটাই সেন্টিমেন্ট; ধর্ম্ম নয়?

আমার স্ত্রী শুধু বলিলেন—শ্রদ্ধা-ভক্তির কোনো খোঁজ রাখ না তোমরা ঠাকুরপো...তাই এ-সব কিছুরই রস পেলে না দুই ভাইয়ে।

চৌকো চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

চার

পুনশ্চ চুরুট ধরিয়ে চিন্তাকুল মুখে কিছুক্ষণ ধূমপান ক'রে মিঃ সোম বললেন, "তরুণ এখন কি চাও ?"

তরুণ চিন্তিত মনে বললে, "পত্র-বাহক ক্লিনারকে ত চাওয়া হয়েছে। এবার চাই সেই তথাকথিত সাধু মহাত্মার ট্যাক্সির সেই ড্রাইভারকে। আর চাই—২রা ডিসেম্বর শেষ রাত্রের দিকে কালীঘাট থেকে হাওড়া ময়দান পর্য্যন্ত ভাড়া খেটেছে, এমন একটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে। সে রাত্রে ও-পাড়ায় যে সব কনেষ্টবলের ডিউটি ছিল,—তাদেরও চাই। শান্তিবাবু যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তবে তাদের কারুর না কারুর চোখে সেই সাধুদের—তা তাঁরা তখন সাধু সেজেই থাকুন বা সাহেব সেজেই থাকুন, এক অচৈতন্য ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে যাওয়া কনেষ্টবলদের চোখে পড়বেই।

"হুঁ। শেষ রাত্রের দিকে ভাড়া খেটেছে এমন গাড়ী ? শেষ রাত্রি কিসে বুঝলে ?"

"এখন শুক্লপক্ষ চলছে। শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না থাকে না। অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় অন্ধকারে পথ হাঁটার ব্যাপার উপলব্ধি করতে হলে শেষ রাত্রিই চাই। অবশ্য গলি ঘুঁজিও চাই।"

হঠাৎ বেয়ারা ছুটে এসে মিঃ সোমের হাতে একখানা কার্ড দিলে। সশঙ্কিত ভাবে বললে, "এ-সাহেব ফের ট্যাক্সি করে ছুটে এসেছেন। খবর খারাপ। এখনি সাক্ষাৎ চান।"

মিঃ সোম দেখলেন কার্ডে লেখা রয়েছে—"মিঃ এস, এন দাস। ম্যানেজার মাতৃসদন হোটেল।"

মিঃ সোম বললেন, "সেলাম দাও।"

বেয়ারা ছুটে চলে গেল। পরমুহূর্ত্তে ব্যস্ত উত্তেজিত ভাবে মিঃ দাস একখানা টেলিগ্রাম হাতে করে ঘরে ঢুকে বললেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে মিঃ সোম। হোটেলে পৌঁছেই টেলিগ্রাম পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি। লোহাগড় রাজ এষ্টেটের প্রধান ম্যানেজার আমার নামে তার করেছেন দেখুন। শান্তিবাবু যে টেলিগ্রাম ক্ষিতীশ বাবুর নামে পাঠিয়েছেন, সেটা পৌঁছাবার আগেই ইনি তার করেছেন।"

মিঃ সোম টেলিগ্রাম নিয়ে পড়লেন :

"মাতৃসদন হোটেলের ম্যানেজার—সমীপে—

রহস্যজনকভাবে ক্ষিতীশ গোস্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। স্থানীয় পুকুরে মৃতদেহ পাওয়া গেছে। রাজ এষ্টেটের বহু মূল্যবান দলিল ও প্রচুর টাকা তাঁর সঙ্গে ছিল,—সব নিরুদ্দেশ! শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জী তাঁকে দিল্লী এক্সপ্রেসে চড়িয়ে দিয়ে পরবর্ত্তী ট্রেণে মগরা গিয়েছিলেন। তিনি এই মাত্র ফিরলেন। শান্তি চক্রবর্ত্তীর কোনও খবর যদি পান, অবিলম্বে জানান।

—প্রধান ম্যানেজার,
লোহাগড় রাজ এষ্টেট, মানভূম।"

তরুণও টেলিগ্রামটা পড়লে। কয়েক মুহূর্ত্ত সবাই স্তব্ধ!

দু' হাতে মাথা চেপে ধরে, স্খলিত চরণে শান্তিবাবু ঘরে ঢুকে রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন, "স্যর—"

তাঁর গলা দিয়ে আর ভাষা বেরুল না। সঙ্গে সঙ্গে লাটুর মত ঘুরপাক খেয়ে তিনি ঠিকরে পড়বার উপক্রম হলেন! তরুণ ও মিঃ সোম ক্ষিপ্র তৎপরতায় তাঁকে ধরে নিকটস্থ ইজি চেয়ারে শুইয়ে দিলেন। মুহূর্ত্তে শান্তিবাবু সংজ্ঞাশূন্য হয়ে ঢলে পড়লেন। আভ্যন্তরিক প্রচণ্ড উত্তেজনার পীড়নে তাঁর দু'পাটি দাঁত দৃঢ়-সংবদ্ধ হয়ে গেল!

কিছুক্ষণ যথোচিত শুশ্রূষা চলল। ধীরে ধীরে তাঁর চৈতন্য সঞ্চার হোল।

চোখ মেলে ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন, "আপনাদের অযথা বিব্রত করেছি। ক্ষমা করুণ। আমার স্নায়ু মণ্ডলী—জীবনে কখনো—এমন অস্বাভাবিক মাত্রায় বিশৃঙ্খল হয় নি। ওরা কি আমায় পাগল করে দেবে ?"

গম্ভীর হয়ে মিঃ সোম বললেন, "অত উদ্বিগ্ন হবেন না। এ টেলিগ্রাম যে জাল নয়, তাই বা কে বলতে পারে? আপনাদের চারদিকেই ত দেখছি জাল-জালিয়াতির ফাঁদ পাতা!"

আশ্বস্ত ও উৎসাহচঞ্চল হয়ে শান্তিবাবু বললেন, "কি বললেন ? জাল ? এটাও জাল ?"

"আমার অনুমান মাত্র। সত্য মিথ্যা শীঘ্রই জানা যাবে। ধৈর্য্য রক্ষা করুন।"

"উঃ, আমার অবস্থা যদি জানতেন! স্যুটকেসটা পর্য্যন্ত নাই! কি দারুণ দুঃসময় পড়েছে আমার। পকেটে আজ একটা পয়সা নেই যে ট্রেণ ভাড়াটা—"

"চাই আপনার টাকা ?—" তরুণ তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে প্রশান্ত স্বরে বললে, "কত চাই বলুন ?"

অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি তুলে শান্তিবাবু বললেন, "বিশ্বাস করতে পারবেন আমায়? বুঝতে পারছেন না? আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ, খুনের অভিযোগ উদ্যত হয়েছে! তাঁরা সন্দেহ করছেন আমি অপরাধী, তাই ফেরার হয়ে রয়েছি! উঃ ভগবান! …পারেন পনেরটা টাকা ধার দিতে? দয়া করে—এখুনি?"

মিঃ সোম ও মিঃ দাস নিজ নিজ পকেটে হাত দিলেন। তরুণ ইঙ্গিতে তাঁদের নিরস্ত করে দু' খানা দশটাকার নোট বের করে শান্তি বাবুর হাতে দিল। ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত স্বরে শান্তি বাবু বললেন, "মিঃ দাস, দয়া করে আপনার ফাউন্‌টেন্ পেনটা আর এক টুকরো কাগজ দেন।"

মিঃ দাস কাগজ ও কলম দিলেন। ক্ষিপ্র হস্তে টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সনিশ্বাসে শান্তিবাবু বললেন, "নিজের আয়ুকে আমি বিশ্বাস করি না। যদি হঠাৎ আমার মৃত্যু হয়, আমার ছোট ভাই কান্তির কাছ থেকে দয়া করে টাকা আদায় করে নেবেন। আমায় ঋণী রাখবেন না। এই নিন মিঃ দাস টেলিগ্রাম, মোটর ভাড়া ইত্যাদির দশ টাকা। নমস্কার, আমি এইখান থেকেই চললুম।"

মিঃ সোম বললেন, "কোথা যাবেন এখন ?"

"লোহাগড়।"

শান্ত স্বরে মিঃ সোম বললেন, "এত ব্যস্ত হবার দরকার কি ?"

অধৈর্য্য ভাবে শান্তিবাবু বললেন, "আমার স্যুটকেস্ ! রাজ এষ্টেটের ত্রিশ পঁচিশ হাজার টাকা আমার হাত দিয়ে ব্যারিষ্টার এ্যাটর্নিদের মামলার জন্য দেওয়া হয়েছে। তার সব রসিদ যে আমার ঐ স্যুটকেসের মধ্যে! মিঃ দাস বল্‌ছেন উনি স্বচক্ষে দেখেন ক্ষিতীশ বাবুর জিনিষ পত্রের সঙ্গে আমার স্যুটকেসও নিয়ে যাওয়া হয়েছে—"

বাধা দিয়ে মিঃ দাস বললেন, "হাঁ তাঁরা নিশ্চয় নিয়ে গেছেন। শ্রীকান্ত বাবুর এক রাশ লগেজ, উনিও বিস্তর জিনিষ কিনেছিলেন—। তার উপর ক্ষিতীশবাবুর এক গাদা মাল! তার উপর আপনার স্যুটকেস ! দু'খানা ট্যাক্সি ভরতি হ'য়ে গেল।—আর এ কথা তো পড়েই রয়েছে,—ওরা জেনেছিলেন আপনি বর্দ্ধমান থেকে উঠবেন, কাজেই আপনার জিনিষ নিয়ে গেলেন। আপনি যে ফের হোটেলে ফিরে আসবেন তাতো তাঁরা জানতেন না। আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লে দিচ্ছি তাঁরা আপনাদের তিনজনের সব জিনিষ গুটিয়ে নিয়ে গেছেন—তার কোন ভুল নাই।"

উত্তেজনাকম্পিত কণ্ঠে শান্তিবাবু বললেন, "এখন সত্যই যদি ক্ষিতীশ বাবুর মৃত্যু হয়ে থাকে, যদি সেই সঙ্গে রাজ এষ্টেটের টাকা-কড়ি দলিল-পত্র অদৃশ্য হয়ে থাকে, তা হ'লে আমার স্যুটকেসও হয়ত সেই সঙ্গে গেছে ! তা' হ'লে আমিও ডুবে গেলাম !"

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মিঃ সোম বললেন, "আমি পূর্ব্বেই আশঙ্কা ক'রেছিলাম,—এই রকম আরও কিছু বিপদ ঘটবে। দেখা যাচ্ছে আততায়ীদের কর্ম্মক্ষেত্র সুদূরবিস্তৃত ! তা হ'লে—"

সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। মিঃ সোম রিসিভার ধরলেন। দু' একটা কথা শুনেই তিনি প্রস্থানোদ্যত শান্তিবাবুর দিকে চেয়ে ত্রস্তে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন।"

কয়েক মিনিট উভয় পক্ষের মধ্যে অতি নিম্নস্বরে বাক্য-বিনিময় হোল। তার এক বর্ণও গৃহের অপর কেউ শুনতে পেলে না।

রিসিভার রেখে মিঃ সোম সাম্‌নের চেয়ার নির্দ্দেশ ক'রে বললেন, "বসুন মিঃ চক্রবর্ত্তী, খবর আছে।"

শান্তিবাবু উদ্বেগ-বিবর্ণ মুখে বসলেন।

মিঃ সোম বললেন, "বিপদে ধৈর্য্য ধারণই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। মনকে দৃঢ় করুন। শুনুন খবর। আসানসোল-পুলিশ টেলিফোঁ করেছে—ক্ষিতীশ বাবুর মৃত্যু সংবাদ সত্য। কিন্তু কবে যে তিনি আসানসোলে ফিরে গেছেন, কি ক'রে পুকুরে ডুবে গেছেন, কেউ জানে না। মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম হচ্ছে। রাজ এষ্টেটের দলিল-পত্র টাকা কড়ি যে ট্রাঙ্কে থাকত, সে ট্রাঙ্ক একটা পুকুরের ধারে ঝোঁপের মধ্যে খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কোনও জিনিষ নাই। ক্ষিতীশ বাবুর নিজস্ব মাল-পত্র, বেডিং, স্যুটকেস, ইত্যাদিও সব অদৃশ্য !"

ব্যাকুল ভাবে শান্তিবাবু বললেন, "আমার স্যুটকেস ?"

"পাত্তা নাই। শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জি উকিল আজ সেখানে পৌঁছেচেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন শান্তিবাবুর পত্রানুযায়ী ১লা ডিসেম্বর হাওড়া ষ্টেশন থেকে ক্ষিতীশ বাবুকে দিল্লী এক্সপ্রেসে চাপিয়ে দিয়ে তিনি পরের লোকালে মগরা গেছেন। সেখানে তাঁর আত্মীয়ের মৃত্যু হয়। পরদিন শব সৎকারের সময় তাঁকে শববাহকদের সঙ্গে স্থানীয় শ্মশানে দেখা গিয়েছিল—এ কথা বিশেষ তদন্তের পর সেখানকার পুলিশ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ পেয়েছে। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্তভাবে সন্দেহের অতীত।—এখন আপনার আকস্মিক নিরুদ্দেশে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

নৈরাশ্য-ভগ্ন স্বরে শান্তিবাবু বললেন, "তা হ'লে আমার উপায় ?"

"যদি প্রকৃতই নির্দ্দোষী হন, তা হ'লে নিশ্চিন্ত থাকবেন। তবে প্রমাণ করার জন্য খানিক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে,—সাত ঘাটের জল এক করতে হবে, এই যা। পুলিশ হলেও আমরা মানুষ। একশোটা দোষী খালাস পাক কিন্তু একজন নির্দ্দোষী যেন দণ্ডিত না হয়—এ বিধান আমরাও মানি। উপস্থিত পূরণ সিংহের সাক্ষ্য এবং হাসপাতালের রিপোর্ট আপনার কাজে লাগবে। তারপর সেই গাড়োয়ান আর ড্রাইভারকে খুঁজে বের করবার জন্য আমি গুপ্তচর নিযুক্ত করছি,—পাবই তাদের। হাঁ, যে ট্যাক্সিতে সাধু আপনাকে নিয়ে গেছল, সে ট্যাক্সির ড্রাইভার বাঙালী ? না পাঞ্জাবী ?"

"পাঞ্জাবী।"

"চেহারা ? পোষাক ?"

"মনে নাই।—হাঁ হাঁ, চাপদাড়ী আছে। গোল গাল, চাকা-মত মুখ। খাকির কোট, খাকির হাফ প্যাণ্ট পরা।"

"আচ্ছা। দেখছি খুঁজে।" তারপর তরুণের দিকে চেয়ে মিঃ সোম বললেন, "শোন তরুণ, লোহাগড় রাজ এষ্টেট একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা চান। তোমাকেই সেই কাযে নিযুক্ত করা হোল। প্রস্তুত হও। শান্তিবাবুর সঙ্গে আজই যেতে হবে।"

তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,"জয় ভগবন্! light! more light! আপনার লাইব্রেরী থেকে খান কয়েক শাস্ত্র গ্রন্থ দিন স্যার!"

"শাস্ত্র গ্রন্থ ? কেন ?"

"শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে সাধু মিলিয়ে নেব। আমি সাধু সন্দর্শনে চলেছি। নিজে যাতে সাধু চিন্‌তে ভুল না করি, আগে সেটা দেখা চাই।"

গম্ভীর মুখে মিঃ সোম বললেন, "আমিও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের এ বিভাগে—এই ক্ষুর-ধারব্রত সাধনার পথে, প্রত্যেকে যেন নিজের অন্যায়কে ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে সর্ব্বাগ্রে বিচার করতে শেখে!"

পাঁচ

যথাসময়ে আসানসোলে পৌঁছে তরুণ শান্তিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। হাসপাতালের সার্টিফিকেট এবং কলিকাতা ও হাওড়া পুলিশের রিপোর্ট দেখে, পুলিশ অফিসার মাথা চুলকে বললেন, "সবই তো মানলুম।

কিন্তু ১লা ডিসেম্বর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে শান্তি বাবু যে সাধুদের কবলে বন্দী হয়েছিলেন,—অন্যত্র ছিলেন না, তার সন্তোষজনক প্রমাণ কই ?"

গম্ভীর হয়ে তরুণ বললে, "গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছে। যথাসময়ে সে সমস্যার মীমাংসা হবে।"

কিছুক্ষণ ধরে আইন-ঘটিত অনেক কুট প্রশ্ন ও তর্কের পর শান্তি বাবুকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দেওয়া উচিত সাব্যস্ত হোল। তরুণ বললে,"এখন এখানে কি ভাবে কোথায় লাস পাওয়া গেছে বলুন।"

পুলিশ অফিসার বললেন, "ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ী আসানসোল সহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে লক্ষ্মীপুর নামে একটা পল্লীগ্রামে। স্থানটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে। লোহাগড় ওখান থেকে আরও পাঁচ সাত মাইল দূরে। ক্ষিতীশ বাবু প্রত্যহ নিজের মোটরে রাজ কাছারীতে যাতায়াত করতেন। রাজ এষ্টেটের মামলার ব্যাপারে ঐ দু'জন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে ১৮ই নবেম্বর ক্ষিতীশ বাবু কলকাতা গিয়েছিলেন। ১লা ডিসেম্বর ওঁদের ফিরে আসবার কথা ছিল। ক্ষিতীশ বাবুর পুত্র মোটর নিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসানসোল ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। কিন্তু ওঁরা কেউ আসেন নি দেখে ফিরে যায়। মনে করেছিল কার্য্যগতিকে সেদিন তাঁদের আসা হয় নি, পরে আসবেন।"

"তার পর ?"

"২রা ডিসেম্বর বিকালের দিকে কতকগুলা রাখাল ছেলে গরু চরিয়ে ফেরবার সময়, একটা গরু, দল ছেড়ে ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ীর পিছনের পুকুর ধারে ঝোঁপ জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। তাকে তাড়িয়ে আনতে গিয়ে ছেলেগুলো দেখে, সেখানে একটা ভাল ট্রাঙ্ক খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। তারা হৈ চৈ করে। সোরগোল শুনে ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ীর লোকেরা গিয়ে দেখে সেটা লোহাগড় রাজ এষ্টেটের নাম লেখা ট্রাঙ্ক। সেই ট্রাঙ্কে রাজ এষ্টেটের মামলা সংক্রান্ত দলিল পত্র নিয়ে ক্ষিতীশ বাবু কলকাতা গিয়েছিলেন, তারা জানত। তৎক্ষণাৎ তারা রাজ-বাড়ীতে এবং আমাদের থানায় খবর দেয়। সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে আমাদের সন্ধ্যা উৎরে গেল। সেদিন অন্য কিছু তদন্ত করার সুবিধা হোল না। শুধু ট্রাঙ্কটা নিয়ে এলাম। সেটা কি এখন পরীক্ষা করবেন ?"

"পরে। তারপর ?"

"ক্ষিতীশ বাবুর নামে কলকাতায় টেলিগ্রাম করা হোল। মালিক সেখানে নাই বলে সেটা ফেরৎ এল। চারিদিকে "খোঁজ খোঁজ" পড়ল। আমরা ৩রা ডিসেম্বর গিয়ে ঝোঁপ জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিছু পেলাম না। শেষে সন্ধ্যার দিকে পুকুরে জাল ফেলা হোল। তখন মৃতদেহ পাওয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ তখন ফুলে উঠেছিল। পচতে আরম্ভ হয়েছিল।"

"কোথাও আঘাত চিহ্ন ছিল ?"

"কোথাও না। পায়ে জুতো মোজা, গায়ে গরম কোট, ফুল প্যাণ্ট, তার উপর মোটা পট্টুর অলেষ্টার। গলায় পশমী গলা-বন্ধটি পর্য্যন্ত ঠিক জড়ানো ছিল। কাউকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করবার সময় আমরা যে ভাবে হাত পা গুটিয়ে মাথা হেঁট করি, মৃতদেহ ঠিক সেই অবস্থায় জালে উঠল। আমার মনে হয়, পুকুরের পাড় দিয়ে বাড়ীতে যাবার যে মাটীর রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দৈবাৎ জলে প'ড়ে গেছেন। তলিয়ে গিয়ে মাটী ধরে উঠবার জন্য হাঁকু পাঁকু করতে করতে প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, তাই হাত পা-গুলা গুটানোই থেকে গিয়েছিল।"

তরুণ চিন্তিত ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "তা হলে ট্রাঙ্কটা শূন্যগর্ভ হয়ে ওখানে পড়ে রইল কেন ? তাঁর মালপত্রগুলা গেল কোথা ?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "সেই তো সমস্যা। নইলে এ তো স্পষ্টই মনে হচ্ছে সাধারণ জলে ডুবে মৃত্যু! অবশ্য পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট এখনো পাই নি। তবে ব্যাপার দেখে আশঙ্কা হচ্ছে পরে হয়ত চোর ডাকাতরা এসে মালিকশূন্য ট্রাঙ্কটি খুলে কাগজ পত্র নিয়ে সরে পড়েছে। অন্য জিনিসও তারা সরিয়েছে সন্দেহ নাই। ট্রাঙ্কে রাজ এষ্টেটের নাম লেখা রয়েছে দেখে ভয়ে হয়ত ফেলে গেছে।"

তরুণ চিন্তাকুল মুখে বললে, "১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যার ট্রেণে শ্রীকান্ত বাবু তাঁকে হাওড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন, রাত্রে সে ট্রেণ যখন আসানসোলে পৌঁছাল তখন দেখা গেল সে ট্রেণে তিনি নাই। দিল্লী এক্সপ্রেস ব্যাণ্ডেল আর বর্দ্ধমান ছাড়া কোথাও থামে না। তা হলে মাঝপথে নিশ্চয় তিনি ব্যাণ্ডেলে বা বর্দ্ধমানে নেমেছিলেন, বা কেউ তাঁকে নামিয়েছিল। ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে, নয় ?"

নত শিরে নিশ্চুপ শান্তি বাবুর দিকে বক্র কটাক্ষ ক্ষেপ করে, উৎসাহের সঙ্গে পুলিশ অফিসার বললেন,"রাজ এষ্টেটের লোকেরাও তাই সন্দেহ করছেন যে শান্তি বাবুই হয়ত কোন কারণে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে তাঁকে নামিয়েছিলেন। কিম্বা শান্তি বাবু যদি সত্যই সে সময় বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে ছিলেন না—এটা ঠিক হয়, তবে ক্ষিতীশ বাবু হয়ত অমন গভীর রাতে অত টাকা-কড়ি, মামলার দলিল পত্র নিয়ে একা ট্রেণে আসতে ভরসা করেন নি, তাই বর্দ্ধমানে নেমেছিলেন। পরে হয়ত সকালের কোনও ট্রেণে একা আসছিলেন এবং পুকুর পাড় দিয়ে যাবার সময় পা পিছলে জলে পড়ে গেছলেন।"

তরুণ বললে,"তাহলে ২রা ডিসেম্বর জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ? ৩রা লাস জল থেকে তুলে দেখা গেছে—মৃতদেহ পচতে আরম্ভ হয়েছে। যারা দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে মরে, তাদের মৃতদেহ শীঘ্র পচে বটে, কিন্তু আকস্মিক-মৃত্যুর মৃতদেহ এত শীঘ্র পচে না। বিশেষতঃ এই দারুণ শীতে! আর এই বা কি ক'রে যুক্তিসঙ্গত কথা হয় যে, অত জিনিস নিয়ে তিনি একা ষ্টেশন থেকে এসেছিলেন ? সঙ্গে নিশ্চয় ট্যাক্সি ছিল, নিদেন জনকতক কুলি ছিল! উনি জলে পড়ে গেলেন, আর তারা চুপচাপ রইল ? কেউ ওঁকে সাহায্য করলে না, বা ওঁর বাড়ীর লোকদের ডাকলে না ? নিঃশব্দে তারা হাওয়ায় মিশে গেল! এ কি সম্ভব ?

হতবুদ্ধি শান্তি বাবু ভগ্ন কণ্ঠে বললেন, "সবই যে দেখছি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা!"

[ক্রমশঃ

কাশ্মীরের স্মৃতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

সিমলা ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি গিরিনগরগুলি আজকাল যেমন শাসক সম্প্রদায়ের গ্রীষ্মাবাস তেমনই মোগলযুগে দিল্লীর বাদশাহেরা গ্রীষ্মের সময় সপরিবারে ও সানুচর ভূস্বর্গ কাশ্মীরে যাইতেন। এই জন্যই ঐ যুগের অনেক স্মৃতিচিহ্ন কাশ্মীরে দেখা যায়। যাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা সেই অপ্রতিমপ্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যশালী মোগল-বাদশাহদিগের কাশ্মীর অভিযান ছিল এক অতি বিচিত্র ব্যাপার।

তালিন নদের তটদেশ

এই অপূর্ব্ব অভিযানে যানরূপে যাইত শতাধিক বিপুলবপু হস্তী, সহস্রাধিক তেজস্বী অশ্ব, সারি সারি শত সুদৃশ্য শিবিকা। রক্ষীরূপে সঙ্গে যাইত সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। হস্তীদের হাওদায় শোভা পাইত সোনার ঝালর ও নানাবর্ণবিভায় সমুজ্জ্বল আচ্ছাদনী; অশ্বগণের পৃষ্ঠেও থাকিত বিচিত্র কারুকার্য্য কমনীয় আবরণ। বিভিন্ন বর্ণবিমণ্ডিত যবনিকা জালে জড়িত শিবিকাশ্রেণী এবং তাহাদের বিচিত্রবেশী বাহকরাও অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত করিয়া তুলিত সন্দেহ নাই। সেই সব দৃশ্য আজ অতীতের স্বপ্নময়ী স্মৃতিতে পর্য্যবসিত। মোগল বাদশাহদের অতুল ঐশ্বর্য্য—বিপুল সমারোহ আজ ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। কিন্তু স্বভাবশোভার লীলাভূমি কমনীয়কান্তি কাশ্মীর তেমনই মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তিতে আজিও বিরাজিত রহিয়াছে। মহাকালের প্রচণ্ড ফুৎকারে আত্মাভিমানী মানুষের ঐশ্বর্য্যরাশি শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত উড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বভাবশোভার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে একটি রত্নও অপহৃত হয় নাই।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নিরুপম নিসর্গ যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন 'ভূস্বর্গ' শব্দটি এই দেশের পক্ষে কিরূপ উপযোগী—কি সুন্দর ভাবে প্রযোজ্য। যাহারা বাঙ্গালার শস্যশ্যামল সমতল প্রান্তর হইতে সহসা শৈলসম্রাটের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে উপস্থিত হ'ন, তাঁহারা এই শব্দের উপযোগিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও উপলব্ধি হয় যে স্বভাবশোভার বৈচিত্র্যে ভারতের সহিত কোন দেশের তুলনা চলে না। সুন্দর ও মহানের—শান্ত ও রুদ্রের এমন অপূর্ব্ব সম্মেলন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

মোটরের বহুল প্রচলনের পর হইতে কাশ্মীর গমন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের রাওলপিণ্ডি বা জম্মুষ্টেশনে নামিয়া মোটরযোগে দুইদিন ভ্রমণ করিলেই এই সৌন্দর্য্যময় রাজ্যের মধ্যস্থলে উপনীত হওয়া যায়। অপরূপ রূপরাজ্যস্বরূপ খাস কাশ্মীর উপত্যকা ৮০ মাইল দীর্ঘ এবং ২০ মাইল প্রশস্ত। ইহা দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক হইতে উত্তর পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহার চতুর্দ্দিকে তুঙ্গ-শৃঙ্গ গিরিশ্রেণী অতন্দ্র প্রহরী-বৃন্দের মত দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশই ইউরোপের মণ্টব্ল্যাঙ্ক অপেক্ষা উচ্চতর। এই অপার শোভার ভাণ্ডারের এক একটি অপরূপ রত্ন এক একটি বিচিত্র বৃক্ষলতাবিমণ্ডিত তুষারশুভ্র-শীর্ষ সমুন্নত শৈল। পর্ব্বতগাত্রস্থ ঢালু বা ক্রমনিম্নস্থানগুলি এবং পর্ব্বতের উপরে ও নীচে বিস্তৃত মাঠগুলিও অপূর্ব্ব আরণ্য সুষমার লীলাক্ষেত্র। বসন্তাগমে নানাবর্ণাভ পুষ্পরাজি যখন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তখন কাশ্মীর উপত্যকায় যে চিত্তলোভা বিচিত্র শোভা বিকশিত হইয়া উঠে তাহার সহিত উপমা দিবার মত পদার্থ সৃষ্টিতে আর নাই বলিলে মিথ্যা বলা হয় না।

কাশ্মীর উপত্যকায় ভ্রমণ কালে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে পার্ব্বত্য বৃক্ষ ব্রততীর বর্ণ-বৈচিত্র্য। সেই অপরূপ রূপ-রাজ্যে রামধনুর ন্যায় রঙের খেলা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই আমাদের

উক্তির মর্ম্ম পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবেন। গ্রীষ্মপ্রধান সমতল প্রান্তরে বা কান্তারে যে সকল গাছ জন্মেনা বা ফুল ফুটে না এই সব পার্ব্বত্য প্রদেশে ইউরোপসুলভ সেই সকল বিচিত্র বৃক্ষাবলী জন্মায় বা পুষ্পপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হয়। এই চিত্তচমৎকারী বর্ণ-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠে শীতান্তে ঋতুরাজ বসন্তের মৃতসঞ্জীবন হরষভরা সরস পরশটিতে। এই সময় পর্ব্বতগাত্রে সর্ষপপুষ্প উজ্জ্বল পীতবর্ণের লাবণ্যলহরী হিল্লোলিত করিয়া তুলে এবং নবোদ্গত গোধূমের শ্যামল শীর্ষসমূহ মৃদুমন্দ মারুত স্পর্শে আন্দোলিত হইয়া এক অভুতপূর্ব্ব হর্ষানুভূতি অন্তরে সঞ্চারিত করে। উপবনের বক্ষে বাদাম, আখরোট, পীচ প্রভৃতি পাদপ পুষ্পিত হইয়া অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে। দেখিলে মনে হয় যেন কে অলক্ষ্যে রহিয়া আরণ্যপ্রকৃতির বুকে সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল বয়ন করিতেছে। পীচের পাটল পুষ্পপুঞ্জের উপর রবিরশ্মি পতিত হইয়া নির্ম্মেঘ নভোনীলিমার নিম্নে এক অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা রচিয়া তোলে বলা চলে। অরেণ্ববর্ণ রঞ্জিত শাখাবলী সমন্বিত পীতাভ পত্রপুঞ্জপরিশোভিত অসংখ্য উইলোবৃক্ষ সারি সারি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সৌন্দর্য্য ও আনন্দের রাজ্যে ব্যথাবিমলিন বিরহ বা সকরুণ শোকের চিরন্তন চিহ্ন উইলোবৃক্ষের প্রাচুর্য্য অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবধারা সঞ্চারিত করে।

শুধু বৃক্ষবল্লরী বা পত্রপুষ্প নয় বিশ্ববিধাতার নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের নিরবদ্য নিদর্শন নানাপ্রকার বিচিত্রকায় বিহঙ্গমও এই পার্ব্বত্য উপত্যকায় বসন্তাগমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতীব্র শীতের সময় তাহারা উষ্ণতর স্থানে উড়িয়া যায় এবং যেমন বসন্তের মৃদুমধুর বাতাস বহিতে আরম্ভ করে তেমনই তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কাশ্মীরে ফিরিয়া আসে এবং স্বভাবসৌন্দর্য্যের এই অনুপম অভিনয়-মঞ্চে সুললিত সঙ্গীতধারা তরঙ্গিত করিয়া তোলে। কতকগুলি পক্ষী স্থানান্তরে যায় না, শীতের তুহিন ও কুহেলিকা মৌনভাবে সহ্য করিয়া স্বদেশেই বাস করে। বসন্তের প্রাণময় পরশ এই মৌনকে ভাঙ্গিয়া দেয় এবং তাহাদের কণ্ঠবীণায় আবার মন্দ্রিত হইয়া উঠে চিরসুন্দরের, আনন্দময় বন্দনাগীতি। যখন অগণিত বিহঙ্গমের বিচিত্রছন্দ আকাশ ও কাননকে স্পন্দিত করিয়া তোলে এবং বসন্তের মন্দ-বাতাস পুষ্পগন্ধসহ বহিয়া যায়, তখন চতুর্দ্দিকের চিত্তচমৎকারী দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে হয় আমরা মলিন মর্ত্ত্য-ভূমি অতিক্রম করিয়া কোন অপার্থিব আনন্দ-রাজ্যের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে আসিয়াছি। বসন্তের আবির্ভাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নিসর্গবক্ষে যে সর্ব্বেন্দ্রিয়তর্পণ সুষমা প্রকটিত হইয়া উঠে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু অনুভব-শক্তির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

যখন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে কাশ্মীর উপত্যকা উষ্ণ হইয়া উঠে, তখন ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীনগরে গমন করিলে বিশেষ সুস্নিগ্ধ আবহাওয়া পাওয়া যায়। আবার শ্রীনগর হইতেও উচ্চতর পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ করিলে শীতলতর আবহাওয়া লাভ করা যায়। সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি শীতপ্রধান পর্ব্বতাকীর্ণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের আকৃতি ও প্রকৃতির সহিত কাশ্মীরের উচ্চতর অঞ্চলগুলির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আল্পস পর্ব্বত-সুলভ পশুপক্ষী ও ফুল-ফল এই সকল স্থানে দেখা যায়। এই সকল উচ্চতর অঞ্চলের অন্যতম গুলমার্গ নামক জায়গাটির জল-বাতাস ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া এবং বাজার, হাট, হোটেল ও মাঠ সমস্তই আছে বলিয়া পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ এখানে কিছুদিন ধরিয়া অবস্থান করেন। দিগন্ত-

কাশ্মীরে অবস্থিত পরমপুণ্যতীর্থসমূহের অন্যতম অমরনাথ গুহা

প্রসারিত তৃণশ্যাম প্রান্তর এখানকার নিসর্গের স্বর্গোপম সৌন্দর্য্যকে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতি-মাতার স্বহস্ত-বিস্তৃত প্রস্ফুটিত পুষ্পপূর্ণ সেই শ্যামল ও কোমল পুষ্পশয্যার উপর বসিয়া তুষারমুকুটমণ্ডিতমস্তক দূরাম্বরচুম্বী শৈলসমূহের শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি এবং দিগ্বলয়ব্যাপ্ত দেবদারুবনের বিচিত্র চিত্র দেখিতে দেখিতে মনে হয় সুপ্তিঘোরে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতেছি।

কাশ্মীরের বিস্ময়কর দৃশ্যসমূহের অন্যতম ঝেলাম নদের নৌকা-গৃহগুলি।—বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রান্তরপ্রধান প্রদেশের অধিবাসীদের নিকট ইহা অতি বিচিত্র বস্তু। নদীগর্ভে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত নানা আকার ও প্রকারের নৌকাগুলি মনের মধ্যে অভূতপূর্ব্বভাব জাগাইয়া তোলে। এই বিচিত্র গৃহে বসিয়া ঝেলামের তরঙ্গ রঙ্গ

শ্রীনগরের বাজারে শিল্পীরা কাজ করিতেছে

দেখিতে দেখিতে, জলকলতান শুনিতে শুনিতে, অদূরে অবস্থিত গিরিশ্রেণীর এবং দূরে দিকচক্ররেখায় দণ্ডায়মান তুষারশুভ্রশীর্ষ পর্ব্বতপুঞ্জের দিকে চাহিয়া সমতলা এবং শ্যামলা ও কোমলা বঙ্গমাতার মূর্ত্তিখানি ভাবিতে ভাবিতে ভারতবর্ষের বিস্ময়কর দৃশ্য-বৈচিত্র্যের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। ভগবান্ ভারতভূমিকে যেন সমগ্র পৃথিবীর প্রতীকরূপে রচনা করিয়াছেন। রাজপুতানায় দিগন্তচুম্বী মরুপ্রান্তরের সহিত কাশ্মীরের শান্ত-মহান অপরূপ রূপের তুলনা করিলে এই আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য সহজেই ধরা পড়ে।

কাশ্মীরের আর একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য হ্রদবক্ষে ভাসমান পুষ্পপুঞ্জ-মঞ্জুল উদ্যানগুলি। প্রতীচীর পুষ্পতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা যাহাকে 'ইউরেল্স্ ফেরক্স' আখ্যায় অভিহিত করেন এই সকল উদ্যানে সেই শ্রেণীর পুষ্প প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এই পুষ্পপাদপের পত্রপুঞ্জ অতিশয় বিচিত্রদর্শন। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ফুট। বর্ণ শ্যামল ও সমুজ্জ্বল। আকার বর্ত্তুল। ফুলগুলি কতকটা ওয়াটার লিলির অনুরূপ। শুভ্রকান্তি জলজাত লিলিও এই সকল উদ্যানে যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। জলজ লিলির অপরূপ সুষমা এই সকল ভাসমান উদ্যানের শোভাকে আরও মনোলোভা করিয়া তোলে। ছয় হইতে আট ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ নলখাগড়া ও বুলরাশ বৃক্ষ ও হ্রদ বক্ষে জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দ্দিকের চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যকে বিশেষ ভাবে বাড়াইয়া তোলে। ভাসমান উদ্যানগুলিতে সুনীল-পুষ্পপূর্ণ 'ফরগেট মি নট'ও দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং জলজ মিণ্ট ও উইলো বৃক্ষও দেখা যায়। পক্ষীর মধ্যে অনেক বর্ণরঞ্জিত বহু মাছরাঙাই এখানে বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শূন্য হইতে ঝুপ করিয়া হ্রদের সুনির্ম্মল হৃদয়ে অবতরণ করে এবং নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করিতে করিতে অকস্মাৎ পক্ষ প্রসারিত করিয়া পুনরায় উড়িয়া যায়। হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া মাছরাঙা বা মৎস্যরঙ্গের এই রঙ্গ দেখিবার সময় বাবুই পাখীকে মাথার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে দেখা যায়।

এই সকল উদ্যানের সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে বাড়াইয়া দেয় পূর্ণপ্রস্ফুটিত শ্বেতপুষ্পশালী গোলাপের গাছগুলি। দুগ্ধ-শুভ্র ফুটন্ত ফুলগুলি দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। রক্তবর্ণ পুষ্পমণ্ডিতকায় দাড়িম্ববৃক্ষ এবং সুদৃশ্যপত্রপুঞ্জপূর্ণ চেষ্টনাট এই সকল উদ্যানের রূপকে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। হ্রদের দর্পণবৎ স্বচ্ছ নির্ম্মল জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভ্যন্তরেও নানাপ্রকার বিচিত্র বৃক্ষ-ব্রততীর বিদ্যমানতা বুঝা যায়।

মোগলযুগের স্মৃতিচিহ্ন সমূহের মধ্যে নিশৎবাগ নামক হ্রদতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ উদ্যানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয়। এই বাগানটিতে মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিকের স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে জলের ফোয়ারা। শালিমারের পশ্চাতে দাছগান উপত্যকা। নানা-প্রকার পশুপক্ষীপূর্ণ এই জায়গাটি শিকারীদের পক্ষে অতিশয় প্রিয়। এই খানেই একটি বিরাট জলাধার আছে যাহা হইতে সমগ্র শ্রীনগরে জল সরবরাহ হয়। যে স্রোতঃস্বিনী হইতে এই জলাশয়টি পুষ্টিলাভ করে তাহাতে ট্রাউট প্রভৃতি নানা-প্রকার বিলাতী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশসুলভ মৎস্য রক্ষিত আছে। লাইসেন্স না লইলে এই সকল মৎস্য ধরিবার অধিকার কেহ পায় না।

দাল হ্রদের পশ্চিম পার্শ্বে সুদর্শন নাসিমবাগ। এই সুন্দর বাগানটি মহামতি আকবরের আদেশে রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পার্কের অনুকরণে ইহা প্রস্তুত। এই উদ্যানের বক্ষস্থিত ছায়া-শীতল বৃক্ষবীথি অতিশয় নেত্রতর্পণ। ভেলভেটের ন্যায় শ্যামল ও কোমল শষ্পরাজি শ্বেত ও লোহিত আইরিশ পুষ্পের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া একান্ত কান্তদর্শন হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্যান হইতে হ্রদের দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। উদ্যানে দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত জলরাশি ও পূর্ব্বদিকে দণ্ডায়মান

অম্বরচুম্বী মহাদেও পর্ব্বতের শান্ত-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে দর্শকের অন্তরে নানাপ্রকার বিচিত্র ভাবলহরী জাগ্রত হইয়া উঠে।

শ্রীনগর হইতে ষোল মাইল দূরবর্ত্তী অবন্তীপুরের অনন্তনাগ মন্দির ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় দ্রব্যগুলির অন্যতম। এই প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কিছুকাল পূর্ব্বে খননের সাহায্যে ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে। এই মন্দিরের সুন্দর শরীরের উপর কতযুগের কত ঘটনা-স্রোত বহিয়া গিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? এই কাল-জীর্ণ মন্দিরের বক্ষে অতীতের অতুলনীয় স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন আজিও বিরাজিত রহিয়াছে। এখন যেখানে সোপানাবলী-মণ্ডিত মধ্যস্তূপটি দণ্ডায়মান সেই খানেই আদি অনন্তনাগ-মন্দির ছিল বলিয়া পুরাতত্ত্ববেত্তারা মনে করেন। এই ধ্বংসস্তূপটি দেখিলে ঐ মন্দিরের অতীত সৌন্দর্য্য-সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। শিল্প-শোভা-সম্পন্ন স্তম্ভরাজি, সুগম্ভীর নাটমন্দিরটি এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকের মনে অতীতের প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতেছে! যাঁহারা দুর্গম পর্ব্বতমালার বন্ধুর বক্ষে এমন সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও দেবভক্তি অবশ্যই প্রবল ছিল। অনন্তনাগ-মন্দিরের [illegible] স্থাপত্য শিল্পের যে পরিচয় পাওয়া [illegible] তাহার সহিত প্রাচীন গ্রীক শিল্পের কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য [illegible]ক্ষিত হয়। বিশেষ করিয়া ধনুকাকৃতি খলানের সহিত

অনন্তনাগ হইতে মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন প্রত্যেক কাশ্মীর ভ্রমণ-কারীর কর্ত্তব্য। ইহা অনন্তনাগ অপেক্ষাও দর্শনের যোগ্যতর জিনিষ। কেন্দ্রস্থিত আসল মন্দিরটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু ঘটনাবর্ত্তের প্রচণ্ড আঘাতে ছাদটি অদৃশ্য হইয়াছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যস্থলে নীরবে দণ্ডায়মান এই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত প্রকাণ্ড মন্দিরটি দেখিতে দেখিতে স্বপ্নময় কল্পনাবলে মন সুদূর নীলনদের তটদেশে চলিয়া যায় এবং সেখানকার সুমহান সমাধি-ভবন ও দিব্যদর্শন দেবায়তনগুলি মানসনয়নে প্রকটিত হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া স্মৃতিপথে জাগ্রত হয় সৌরবাদের কেন্দ্র-স্বরূপ হেলিওপলিস নগরের সৌর দেবতা 'রা'র উন্নত অর্চ্চনা-গৃহগুলি। মার্ত্তণ্ড বা সূর্য্যের পূজা মিশর ভারতের নিকট হইতে শিখিয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে এক সময় সৌরবাদ ভারত অপেক্ষাও মিশরে অধিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভারতের সূর্য্যার্চ্চনা শেষে ব্রহ্মোপাসনায় পরিণতি পাইয়াছিল। অবশেষে আদিত্য হইতে ঋষিরা তমসার পরপারে বিরাজিত আদিত্যবর্ণ পরমপুরুষের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, যাঁহার জ্যোতিতে সূর্য্যতেজোময় ভারত-সূর্য্যের মধ্যে সেই সর্ব্বজ্যোতিমূলাধার পরম পুরুষকে দর্শন করিয়াছিল। মিশরে গিয়া এই সমুন্নত সূর্য্যবাদ 'এটনবাদ' আখ্যা লাভ করিয়াছিল। মিশর-সম্রাট্ আখেনেটন এই অধ্যাত্মপ্রধান সৌরবাদের প্রধান প্রচারক; মিশরের তেল-এল-আমেণা নামক স্থানে এই সৌরবাদী সম্রাটের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক জগতের এক বিচিত্র ও বিশিষ্ট ঘটনা। কেহ কেহ কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের মধ্যে মিশরের পিরামিডের সাদৃশ্য দেখিতে পান। আমাদের মনে হয় মন্দিরের বিচিত্র রচনাভঙ্গীই এই ধারণার কারণ।

অতীতের সুনিপুণ সৌধশিল্পিগণ যে পরিকল্পনানুসারে এই শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান মহান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পিরামিড প্রস্তুতকারক স্থপতিদিগের পরিকল্পনার সহিত তাহার কতকটা সাদৃশ্য অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। ছাদটি ভাঙ্গিয়া পড়াতে মন্দিরের উচ্চতা সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়।

পহলগাঁও

প্রধান মন্দিরটির চূড়া ৭৫ ফুট উচ্চ ছিল। ইহা কাহারও কাহারও অনুমান। এই অনুমান সত্য হওয়াই সম্ভব।

কাশ্মীরের রাজন্যবর্গের বিবরণে পরিপূর্ণ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি মধ্যবর্ত্তী প্রধান মন্দিরটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমাংশে রণাদিত্য নামক রাজার শাসনকালে নির্ম্মিত। চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভশ্রেণী অষ্টম শতকে প্রসিদ্ধনামা ললিতাদিত্যের আদেশে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে এই মন্দির প্রাচীন বটে কিন্তু অতি প্রাচীন নয়।

দিনান্তের শান্ত রবি-রশ্মিতে উদ্ভাসিত মার্ত্তণ্ডমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে দেখিতে নানাপ্রকার চিন্তাতরঙ্গ আমাদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিকের বনানীবিমণ্ডিত মহান গম্ভীর পার্ব্বত্যপ্রকৃতি তেমনই দাঁড়াইয়া আছে—নির্ম্মেঘ নীলাকাশ তেমনই হাসিতেছে—কাশ্মীরের স্বর্গসদৃশ বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের কণা-মাত্রও কমে নাই, কিন্তু সকল শোভাকে যাহা সার্থক করিয়াছিল—অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই আর্য্য স্বাধীনতা-সূর্য্য কৈ? সেই অনার্য্যবিজয়ী দুর্জ্জয় বলবীর্য্য কৈ?

সেই ভগ্ন ও পরিত্যক্ত শীর্ষশূন্য মন্দিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিচিত্র কল্পনাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ভাবিয়াছিলাম—ইহাই বুঝি ভারতের মুক্তিমন্দির। জ্যোতির্ম্ময় দেবতা বিদায় লইয়াছেন—অম্বরচুম্বী উচ্চ চূড়া ধূলিতল চুম্বন করিয়াছে—চারিদিকে বিজন শ্মশানের বা বিষাদকরুণ সমাধিভবনের নিস্তব্ধতা। দেখিতে দেখিতে বিশাল বিশ্ব-শ্মশানের সকল সকরুণ ধ্বংসাবশেষের স্মৃতি একে একে পর্দ্দার গায়ে ছায়াছবির মত ফুটিয়া উঠিয়া বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল; সন্ধ্যার রক্তিম রবিচ্ছবির কনক কিরণে কান্ত-করুণ কান্তার-কুন্তলা আরণ্য ও পার্ব্বত্যপ্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে সেদিন এক অপূর্ব্ব স্বপ্নকল্পনায় নিমগ্ন হইলাম। ধ্বংসের সকল চিহ্ন সহসা মুছিয়া গিয়া আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইল অপূর্ব্ব শিল্প সমূহে সুসজ্জিত এক দিব্যদর্শন দেবমন্দির। দেখিলাম সেই বন্দনাছন্দমন্ত্রিত ধূপ-চন্দন-গন্ধামোদিত মন্দিরতলে

অবন্তীপুরের অনন্তনাগ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

দাঁড়াইয়া আছে শত শত আনন্দমূর্ত্তি পূজার্থী ও পূজার্থিনী। তাহাদের মুখ-মণ্ডল মুক্তির মহিমায় মণ্ডিত স্বাধীনতার মাধুর্য্যধারায় অভিষিক্ত। তাহাদের নেত্রদ্বয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বিবেকের বিচিত্র বিভায় ভাস্বর—গণ্ডদ্বয়ে শক্তি ও স্বাস্থ্যজনিত রক্তাভা···সর্ব্বশরীরে স্বতন্ত্রজাতিসুলভ স্বচ্ছন্দভাবের অভিব্যক্তি!

সঙ্গীর সুকঠোর আহ্বানে সেই সুমধুর সুখস্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। অনন্তবেদনার বার্ত্তা বক্ষে বহিয়া বর্ত্তমান যেন আবার তাহার নির্ম্মম মর্ম্মদ্বার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত করিল। সার্দ্ধ সহস্র বৎসরের নিবিড় তিমির যবনিকা অতীতের আনন্দোৎসব হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল!

গ্রীষ্ম ঋতু যতই অগ্রসর হয় নৌকাগৃহে বাস করা আর তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না। তখন তুষারশুভ্র-শীর্ষ উচ্চতম শৈলমালার উদার আহ্বান গীতিভাবপ্রবণ ভ্রমণকারীর কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠে। গুলমার্গ, পহলগাঁও প্রভৃতি গিরিনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রাজকগণ এই সময় পার্ব্বত্যপ্রকৃতির দুর্গমতর—বন্ধুরতর বক্ষের ভীমকান্ত রূপ দেখিবার জন্য লাডকের দিকে গমন করেন। শ্রীনগরে মাসিক বন্দোবস্তে বস্ত্রাবাস বা তাঁবু এবং তাহার সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। মাসিক পঞ্চাশ টাকা দিলে কতকগুলি লোক থাকিবার মত একটি বস্ত্রাবাস মিলিয়া থাকে। এই সকল সরঞ্জাম বহিয়া লইয়া যাইবার কুলী ও যান প্রভৃতির জন্য খরচ পড়ে দৈনিক আট টাকা। কাশ্মীরে বস্ত্রাবাসে বাস বড়ই প্রীতিপ্রদ।

সেই সুমহান সৌন্দর্য্য রাজ্যে মুক্ত প্রকৃতির উদারবক্ষে যাযাবর জাতির ন্যায় বস্ত্রাবাসে বাস প্রাণে এক প্রকার অপূর্ব্ব উদ্দীপনা ও আনন্দ আনিয়া দেয়। চারিদিকে অপরূপ শোভার অফুরন্ত ভাণ্ডার—কবিকল্পনা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। স্বভাবশোভা দুই প্রকারের—কতকগুলি সুন্দর, কতকগুলি সুমহান্। সুন্দর ও সুমহান উভয়ের সম্মেলনভূমি এই নগনদীকান্তারমণ্ডিতকায় হ্রদাবলী-শোভিত-হৃদয় বিচিত্রদর্শন বৃক্ষব্রততী ও বিহঙ্গমের বাসস্থলী স্বর্গসদৃশ নিসর্গশালী ভূস্বর্গ কাশ্মীর। তুঙ্গতম গিরিশৃঙ্গগুলিতে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিলে স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্যে মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে। হরমুখ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ওয়াহাৎ উপত্যকা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ ভাবুক ভ্রমণকারী মাত্রেরই মনে অপূর্ব্ব আনন্দধারা সঞ্চারিত করিয়া তুলিবে। শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া এক সপ্তাহ বা দশ দিনেই এই সৌন্দর্য্যরাজ্য পরিভ্রমণ শেষ করা যায়। এইরূপে লিদার উপত্যকার অন্তর্গত পহলগাঁও হইতে কোলাহোই শৃঙ্গের চারিদিকে পরিভ্রমণ করা চলে। কত বিচিত্রকায় বন্য বৃক্ষ ও ব্রততী, কত কমনীয় কান্তি কানন-কুসুম এই পথে দেখা যায়। স্থানে স্থানে, বিশেষ করিয়া নিম্নতর সমতল ভূমিতে শ্যামসুন্দর শস্যক্ষেত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পহলগাঁও হইতে অগ্রসর হইয়া উত্তর দিকে কিছুদূর গেলে তিনটি উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। এই তিনটির মধ্যে যেটি ডান দিকে অবস্থিত এবং ফাটলযুক্ত সেইটিই কোলাহোই পর্ব্বতের দক্ষিণ শিখর। মধ্যস্থলের শিখরটিকে ভৌগোলিকগণ বাট্রেস পীক নামে অভিহিত করেন এবং বামদিকের শৃঙ্গটির নাম রুফপীক। বাট্রেস পীকের উত্তরে এবং উহার দ্বারা প্রায়ই প্রচ্ছন্ন হইয়া যে তুঙ্গতম শৃঙ্গটি আকাশ ভেদ করিয়া সুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে তাহার নাম নর্থ পীক বা উত্তর শিখর। এই চিরতুষারমণ্ডিত সমুন্নত শৈলশিখরের উচ্চতা প্রায় ১৮ হাজার ফুট। পহলগাঁও-এর উচ্চতা ৭ হাজার ২ শত ফুট।

পহলগাঁও হইতে কোলাহোই যাইবার অনেকগুলি রাস্তা আছে। তাননী নদীর বামতীরবর্ত্তী পথটি দিয়াই আমরা উঠিয়াছিলাম। সেই তুঙ্গ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক দশ মাইল উঠিবার পর

।ামরা পিস্থ গিরিশৃঙ্গ ও গিরিপথে উপনীত হইয়াছিলাম। উরোপীয় পর্য্যটকগণ এই পথটির বক্ষে আল্পস্ পর্ব্বতস্থলভ ভাবশোভা দেখিতে পাইয়া আনন্দ অনুভব করেন। আল্পস র্ব্বতে যে জাতীয় পুষ্পপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এখানেও াহাদের অনেকগুলি দেখা যায়।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে শেষনাগ হ্রদের জলরাশি সম্মুখে ্রসারিত দেখা যায়। এই হ্রদের সুনির্ম্মল জলরাশির বিচিত্র বর্ণ মণকারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই র্ণকে অপ্রগাঢ় বা ফিকে নীল বলা চলে। ্যার নদীর শুভ্র তুষারকণাসমূহের ্ত্যমানতাই এইরূপ বর্ণের কারণ বলিয়া ্দেশিত হইয়া থাকে। সুইটজারল্যাণ্ডের ্বিখ্যাত লুসার্ণ হ্রদের বারিরাশির বর্ণের ্হিত শেষ-নাগ হ্রদের বর্ণ-সাদৃশ্যের কথা ্যাহারা উভয়কেই দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা ীকার করিয়া থাকেন। অত্যুন্নত ার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত এই হ্রদদ্বয়ের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ না করিলে শুধু পরের বর্ণনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় ।। সুমহান সৌন্দর্য্য-রাশিতে সজ্জিতা ্রকৃতি দেবী যুগের পর যুগ নিজের অপরূপ পের প্রতিচ্ছবি হ্রদরূপ দর্পণে দর্শন রিতেছেন। হ্রদের দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান ানা অদ্ভুত আকৃতির সমুন্নতশীর্ষ শৃঙ্গ-্রণী। তুষার-মুকুট-মণ্ডিত-মস্তক এই কল শৈল-শিখর হইতে তুষারনদী ক্রমনিম্ন গিরিগাত্র বাহিয়া দবক্ষে নামিয়া আসে এবং জলরাশির নীল বর্ণের নিবিড়তাকে ্মাইয়া দেয়।

হ্রদের নির্ম্মল নীল নীরতরঙ্গে শুভ্র তুষারখণ্ড যখন ভাসিয়া বেড়ায় তখন সেই দৃশ্য দর্শক মাত্রেরই মনকে মুগ্ধ করিয়া তোলে। এই হ্রদ হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই ১৩ হাজার ৫ শত ফিট উচ্চ এক উপত্যকায় প্রসিদ্ধনামা পুণ্যতীর্থ অমরনাথ গুহা। প্রত্যেক বৎসর গ্রীষ্মঋতুতে হাজার হাজার হিন্দু নরনারী দুর্গম বন্ধুর পথের দুঃখ-কষ্ট অম্লানবদনে সহিয়া এই দুরারোহ গিরিগুহারূপী মহাতীর্থে আগমনপূর্ব্বক অতুলনীয় ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধনামা পর্ব্বত কোলাহোই

করেন। আবহাওয়া মন্দ হইলে তুষারপাত এই দুঃখসঙ্কুল দুর্গমতীর্থের শঙ্কাশূন্য যাত্রীদের পক্ষে সঙ্কটের কারণ হইতে পারে। সময়ে সময়ে বহু যাত্রী তুষারপাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শেষ-নাগ হ্রদ

তানীন নদী পার না হইয়া তাহার তীরে তীরে শেষনাগ হ্রদ পর্য্যন্ত গিয়া বা বাঁদিক দিয়া কয়েক শত ফিট অগ্রসর হইলে একটি চড়াই পাওয়া যায়। উহাতে চড়িলে অস্তানমার্গ নামক অতি সুন্দর তৃণ-শ্যাম পার্ব্বত্য প্রান্তরে পৌঁছান যায়। এই প্রান্তরের প্রান্তভাগে প্রায় তিন মাইল অন্তরে অস্তানমার্গ গিরিবর্ত্ম বিরাজিত। এই গিরিপথ দিয়াও অমরনাথ পাওয়া যায়। অস্তানমার্গ হইতে তিন মাইল দূরে একটি তিন হাজার ফুট উচ্চ চড়াই আছে। এই চড়াই অতিক্রম করিলেই রাজদাই গিরিপথ। এই অংশে একটি স্থান আছে যাহা মেরুর মত চির-তুষারের বাসস্থলী। ইহার বামে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হ্রদের পার্শ্বে সহসা মাথা তুলিয়াছে ১৫

হাজার ৫ শত ফিট উচ্চ রাজ-দাঁই গিরিশৃঙ্গ। ইহার উত্তরাংশ পরিভ্রমণ করিলে কোলাহোই শৈলশিখরের মহিমময় দৃশ্য স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চমৎকৃত দর্শক ও সেই চির তুহিনাবৃততনু অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের মধ্যস্থলে ব্যবধানরূপে বিরাজমান থাকে হরনাগ উপত্যকা। এই স্থান হইতে দুই হাজার ফুট উৎরাই-এর পর হরনাগ হ্রদ পাওয়া যায়। এই হ্রদ হইতে চিরতুষার রাশির উপর দিয়া আমরা সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হইতে পারি। ডান দিক দিয়া যাইলে হরনাগ গিরিবর্ত্মে পৌঁছান যায়। শাশ্বত সুখ-স্বপ্নসম সৌন্দর্য্যের এই সুমহান সাম্রাজ্যে—স্বভাব শোভায় এই মহত্তম তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে কবিবর হেমচন্দ্রের সেই উদাত্ত উক্তি মনে পড়ে, যাহার মর্ম্ম—তুষারাবৃততনু ভূধর-শিখরের ন্যায় ভগবদ্ভজনের উপযুক্ত স্থান দ্বিতীয় কোথায়। এই সীমাশূন্য গুরুগম্ভীর শোভার ভিতর ভূমার অনুভূতি আমাদের মনে সহজেই জাগ্রত হয় সন্দেহ নাই।

ঘূর্ণিবায়ু (গল্প)

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

আফিসের কাজ শেষ ক'রে বিষণ্ণ মনে রামনাথ বাড়ী ফিরেছে। একে ব্ল্যাক আউট, তার ওপরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হ'য়ে এসেছে। এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে রামনাথ আফিসের পোষাক ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে গৃহিণীর ঘর তালাবন্ধ দেখে বাহিরের ঘরে এসে ব'স্‌লো।

চাকর এসে এক কাপ চা দিতেই রামনাথ চ'টে বললে, "শুধু চা—খাবার টাবার কিছু নেই—সে সব ব্যবস্থা না করেই বেরিয়েছেন বুঝি"—। চাকর বললে, "মা পরেশ বাবুর সঙ্গে ধর্ম্মতলায় নাচ দেখতে গিয়েছেন—ব'লে গিয়েছেন আস্‌তে রাত হবে।"

রামনাথ বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "বাঁচিয়েছেন—তুই এখন যা"—চাকর থতমত খেয়ে প্রস্থান করলে।

মাস কাবারের আর দু' দিন বাকী আছে—মাসিক বাজেট করতে বস্‌লো রামনাথ—

জমা—১২০+(৩০—যুদ্ধের জন্য)—১৫০৲

খরচ—বাড়ীভাড়া—৪০৲; ট্রামের টিকিট—৫।০; চাকর—৮৲; ঠিকে ঝি—৫৲; ইলেক্‌ট্রিক বিল—৪।০; মা—১০৲; রেশন, ডাল, মশলা, ঘি, তৈল ইত্যাদি—৩০৲; দুগ্ধ—১২৲; কেরোসিন তৈল ও ঘুঁটে—৩৲; কয়লা—৬৲; এক মাসের বাজারখরচ—৩০৲; মোট খরচ ১৫৪৲। এর মধ্যে কাপড়চোপড় বা অসুখ-বিসুখের কোন খরচ নেই।

বিষণ্ণ মনে খরচের তালিকা মুড়ে ব্লটারের তলায় রেখে রামনাথ চুপ ক'রে ব'সে আছে। তা'রা দু'জন প্রাণী—দেড়শো টাকা খরচ। বাজারখরচ মাসে দু'জনের ত্রিশ টাকা—আশ্চর্য্য হয়ে যায় রামনাথ—তার মা ছিলেন, তাঁর আত্মীয়েরাও কেউ কেউ ছিলেন,তখন সে একশো টাকা মাইনে পেয়েছে, তার মধ্যেই তার স্ত্রী ছায়ার বায়োস্কোপ দেখা, শাড়ী-টয়লেটের খরচ জুটতো এমন কি দু-এক খানা গহনাও হয়েছে; আর এই দু'বছর ক্রমাগত ধারের ওপরে চ'ল্‌ছে।

সে অনেক বুদ্ধি ক'রে বি-এ পাশ সুন্দরী মেয়ে বিয়ে ক'রেছিল। স্ত্রী কম টাকাতে ফ্ল্যাটে থাকতে চেয়েছিলেন, সে তাতে সম্মত হ'তে পারে নি—ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে চেয়েছিলেন তাও রামনাথ সেকার্য্য স্ত্রীকে গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছিল। কারণ ফ্ল্যাটে থাকা বা স্ত্রীকে মাষ্টারী করতে দিতে তার আভিজাত্যে বাধে। কিন্তু আভিজাত্য রক্ষা করা যে কঠিন হয়ে পড়েছে তার চতুর্দ্দিক থেকে।

আভিজাত্য? কোথায় আভিজাত্য—সে কি লক্ষ্য করছে না যে, তার বাপ-জ্যাঠা-খুড়োর আমলে তাদের বিরাট পরিবারের মধ্যে কোন ভাই বড়লোক, কোন্ ভাই গরীব—সে বিচার ছিল না তাঁদের মধ্যে।

আর তাদের আমলে একই পরিবারের মধ্যে সে কি দেখছে না যে ধনী ও দরিদ্র আত্মীয়দের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য এসে উপস্থিত হয়েছে।

সমাজের ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে যখন অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে রক্তের আভিজাত্য বজায় রাখা সম্ভব নয়, তখন রামনাথ নিজের স্ত্রীকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করতে না দিয়ে বা ফ্ল্যাট বাড়ীতে না থেকে একটা পুরো বাড়ীতে মাসে চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়ে তার আভিজাত্য বজায় রাখবে? রামনাথ আভিজাত্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছে বটে কিন্তু মনে মনে প্রায়ই সে চিন্তা করে কেন সে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় না? কেন সে আভিজাত্য রক্ষা করবার ব্যর্থ চেষ্টা থেকে বিরত হয় না? সে কি করবে, স্ত্রীকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে বলবে শেষে?

এই রকম নানান কথা তার মনে হচ্ছিল—সে একলা ব'সে ব'সে এই সব কথাই চিন্তা করছিল। এই সময় হঠাৎ চাকর এসে খবর দিলে, "এক বাবু আপনাকে ডাকছেন"। রামনাথের কাছে এই সময়ে "বাবুর" আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। সে তাড়াতাড়ি চটী পরে ও গায়ে একটা ফতুয়া দিয়ে নীচে নেবে এলো। সে লক্ষ্য করলে ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করছেন। সে তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে চেয়ারটা এগিয়ে বললে, "আসুন, ভিতরে আসুন"। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ঘরে প্রবেশ করতেই রামনাথ থতমত খেয়ে বললে, "এ কী মহারাজকুমার যে, গরীবের কুটীরে আজ—ব্যাপার কী?" মহারাজকুমার তাকে জড়িয়ে বললেন, "রাম দা, তুমি তো আচ্ছা লোক—তুমি এ পাড়াতে আছ—এতো দিন তা আমি জানি না ব'লেই কি এতটা শাস্তি দিতে হয়? এতো কাছে অথচ এতো দূরে" রামনাথ বললে, "ভাই মিথ্যা কথা বলবো কেন তোমার কাছে। ঐ বিরাট বাড়ী যে তোমার তা জানি—ঐ বাড়ী তৈরী করতে যে

একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, সে খবরও, যে ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী করেছেন, তাঁর কাছে শুনেছি, কিন্তু আজ অবস্থার বৈগুণ্যে সমাজের ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে—আমি বড় দীন—-তাই। মহারাজ-কুমার সস্নেহে রামনাথকে কাছে টেনে নিয়ে চেয়ারে ব'সে বললেন "রামদা, সত্যি বলছি ভাই—আজকেই আমি খবর পেয়েছি যে তুমি এখানে থাকো----যেই শুনেছি থাকতে পারি নি, ছুটে এসেছি তোমার কাছে।" রামনাথ বললে, "ভাই----তোমার বাড়ীর ব্যাপার জানি তো—সাহেব সেক্রেটারী—দারোয়ান সঙ্গীন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—গেটে লোক প্রবেশ করলে ঘণ্টা বাজে—একবার বেলা আটটায় বিউগল বাজে, একবার বেলা ১২টায়—এই সব তো—কি ক'রে সাহস করি ব'লো—।" মহারাজ-কুমার সস্নেহে রামনাথের হাত চেপে ব'ললেন, "সব সত্যি—বিউগল বাজে, ঘণ্টা বাজে, সাহেব সেক্রেটারী বিরাট রাজপ্রাসাদ—সবই ঠিক, তবু—তবু এ ক্ষুধিত পরাণ কেন মেঘলা রাতে ছুটে আসে রামদার কাছে—কেন—কেন বলো ভাই—সেই কলেজে একসঙ্গে পাঠ, এক সঙ্গে এম·এ পাশ। সেই ক্রিকেট খেলা, এক সঙ্গে বাঘ শিকার----সেই তোমার সরল অমায়িক সহৃদয় ব্যবহার, অথচ তার মধ্যে খোসামোদ একেবারে নাই----কৈ আজও তো সে রকম লোক পেলাম না।" রামনাথ বললে, "মহারাজ-কুমার বাড়ীতে এসেছেন, হায় নজরানা দেবার জন্য এক কাপ চা'রও যোগাড় নেই, গৃহিণীও নেই।" মহারাজ-কুমার বললেন, "গৃহিনীর জন্য ভাবনা নেই----কারণ, যখন আমি আমার স্ত্রীকে তোমার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিতে পারব না, তখন তুমি যে স্ত্রীকে পরিচিত ক'রে দেবে আমার সঙ্গে—শুদ্ধ এই কারণে যে, আমি শুধু তোমার বন্ধু নয়, বিশেষ ক'রে মহারাজ-কুমার বন্ধু—এটা আমি পছন্দ করিনে। আর সে ইচ্ছাও আমার নাই।" রামনাথ বললে, "বসো, একটু চা আনতে বলি----কি ব'লো?" মহারাজ-কুমার বললেন, "চা খাওয়াবার দরকার নেই----চ'লো আমার ওখানে, চা-খাবার আমিই খাওয়াবো। এমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন?" রামনাথ বললে, "আমার যে ভাই এখন একবার বাজারে বেরোতে হবে—তা চলো তোমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দি, রবিবারে নিশ্চয়ই যাবো -

মহারাজ-কুমার ব'ললেন, "অবিশ্যি এসো ভাই।"

রামনাথ সার্ট আর জুতো পরে টর্চ্চ নিয়ে মহারাজ-কুমারের সঙ্গে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"এ কি সুরেশ, তোমার গাড়ী কোথায়? হেঁটে এসেছো, বল কি!"

মহারাজ-কুমার ব'ললেন, "যখন রামদার গাড়ী হবে সেদিন আসবো গাড়ী ক'রে, নইলে হেঁটেই।" রামনাথ বললে, "তুমি আজ কাল কবিতা লেখো না?" মহারাজ-কুমার বললেন, "তা' একটু আধটু লিখি বৈ কী?" রামনাথ মহারাজকুমারকে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল বাজারে, হঠাৎ মনে হ'ল পাঁউরুটী কেনার কথা—তখনই মনে হ'ল—পাঁউরুটী মাখমের খরচাটা বাজেটে ধরা হয় নি—যাই হোক্, দু'আনা দিয়ে পাঁউরুটী আর দু'আনার মাখম কিনে দেখলে ঘড়িতে মোটে সাড়ে সাতটা—সে ট্রামের মাসকাবারী খদ্দের, ট্রামে চেপে ব'সলো—এসপ্লানেড ঘুরে ঐ ট্রামেই ফিরে আসবে ব'লে।

ট্রামে চড়ে মহারাজ-কুমারের কথা মনে হোল—মহারাজ-কুমার তো জানেন যে, সত্যই সে একদিন এতো গরীব ছিল না, সংসারের চাপে, জগতে সমরানলের ঘূর্ণিবায়ুতে রামনাথের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে, সে ইস্কুলে মাষ্টারী করত—এ-সব তিনি জানেন। তার গ্যারেজে পাঁচখানা গাড়ী সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে—সাহেব সেক্রেটারী আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কাগজপত্র সই করিয়ে নেয়—সেই লোক চটী জুতা প'রে ফটর্ ফটর্ কর্ত্তে কর্ত্তে তার এই কবুতরখানায় হেঁটে এসে "রামদা" ব'লে তাকে অম্লান বদনে জড়িয়ে ধরলে—আর তার আত্মীয়েরা—যাক্, সে-সব কথা মন থেকে দূর কর্ত্তে চেষ্টা ক'রলে।

এক একবার তার মনে হয়—সে কেন যেন তেন প্রকারেণ একটা মোটর গাড়ী রাখলো না—রামা, শ্যামা, যদু, হরি সকলেরই মোটর গাড়ী আছে কিন্তু এই অবস্থায় কি মোটর গাড়ীর আভিজাত্য আছে? আভিজাত্য আছে বৈ কী! তবে আভিজাত্য সস্তা হয়ে যাওয়ার দরুণ মোটরগাড়ী না থাকলে যে ভদ্রস্থ থাকে না, তা রামনাথ অতোটা বুঝতে পারে নি। তখন তো পেট্রোলের অভাব হয় নি। তার দুঃখ হয়—কেন সে স্ত্রীর বুদ্ধিতে আফিসের ছোট সাহেবের বাচ্চা অষ্টিন গাড়ী ৯০০৲ টাকায় কিনলো না ও স্ত্রীর কথামত ব্যারিষ্টারকে মাসকাবারী ভাড়া'তে হাইকোর্টে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ক'রে মোটরগাড়ী রাখার খরচ তুলে নিয়ে লোকসমাজে তার পদগৌরব বৃদ্ধি ক'রে নি। স্ত্রীর কথা না শুনে সে ভুল করেছে না ঠিক করেছে তা সে বুঝতে পারলো না।

বাড়ীতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মহারাজকুমারের আবির্ভাব তার চিন্তার স্রোতকে একটু এলোমেলো করে দিয়েছিল। কিন্তু ট্রাম থেকে নাব্‌বার সময় যতই কমে আসছে—তার চিন্তার স্রোত হাজারই এলোমেলো হোক্, খরচের বিভীষিকা তার মনের মধ্যে এসে উপস্থিত হল।

সে ধীরে ধীরে ট্রাম থেকে নেবে বাড়ীর কাছেই আসতেই দেখে ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে—বাড়ী বেশ সজাগ—চাকর ছুটোছুটি করছে ওপরে-নীচে। তার মনে হোল ছায়াদেবীর শুভাগমন হয়েছে।

রামনাথ ওপরে এসে নিজের ঘরেতে কাপড় চোপড় ছেড়ে চেয়ারে শুয়েছে। চেয়ারের পাশ থেকে ছায়া এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে, "আজ বড্ড ভুল হয়েছে, তোমার খাবার রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি চ'টেছ আমার ওপরে"—

রামনাথ বললে, "খুব খুসী হই নি নিশ্চয়ই—তবে এ-রকম ভুল হওয়া স্বাভাবিক মনে করে রাগ অভিমান দূর করেছি"—ছায়া ব'ললে, "কিন্তু অভিমান রাগ দু'টোর মধ্যে যে একটাও দূর হয় নি, তা' যে কথাতেই প্রমাণ হচ্ছে"—রামনাথ হেসে বললে, "কথার প্যাঁচ নিয়েই জীবন কাটাবে?" ছায়া কিছু না ব'লে তাড়াতাড়ি আহারের ব্যবস্থা করতে গেল। আহারের পরে রামনাথ ব'ললে, "তুমি তো স্বর্গরাজ্যেই বাস করো, কঠিন মর্ত্ত্য-ভূমিতে নাব না"—ছায়া হেসে বললে, "হেঁয়ালী ছাড়ো তো, কী কথাটা তাই ব'লো"—। রামনাথ বললে, "জীবনটাই

হেঁয়ালী হয়েছে ছায়া, দেড়শো টাকায় দু'জনের চলে না—হেঁয়ালী নয়"—ছায়া স্বামীর কাছে এসে তার হাত নিজের হাতের ওপর রেখে ব'ললে, "তোমাকে তো ব'ললে শুনবে না. পরেশদা তো বলছে যে সে আর তার ছেলে আর চাকর নিয়ে বড় বাড়ীতে রয়েছে, আমাদের দু'টো বড় ঘর দিতে পারে, কুড়ি টাকা ভাড়া দিলেই হবে, রান্নাঘর কল সবই পৃথক্ আছে—"। রামনাথ বল্লে, 'বড়ো বাড়ীতে যখন দরকার নেই, তখন সে তো ছোট বাড়ীতে যেতে পারে"। ছায়া বললে, "কেবল স্বর্গরাজ্যে বিচরণ কর্ব্বে, মর্ত্ত্যভূমির কিছু তো খবর রাখো না—বাড়ী ছাড়া সোজা কিন্তু বাড়ী পাওয়া অসম্ভব—দেখো, এখনও আমার কথা শোন—চলো। তা ছাড়া পরেশদা'র ছেলে রবিকে পড়ানোর জন্য লোকের দরকার —সে তো আমিই পড়াতে পারি—আসছে মাসেই ব্যবস্থা করি, কি বলো—পরেশদার বড় কষ্ট—রবির বয়স বছর দশ এগার হবে, তাকে দেখবার কোন লোক নেই, স্ত্রী মারা গেলে যে কী বিপদ্ তা তো জানো না।"

রামনাথ কোন উত্তর দিল না—ছায়ার কথা চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে শোবার ঘরে প্রবেশ করলে।

ছায়ার পরামর্শে রামনাথ তার স্ত্রী-বন্ধু পরেশের বাড়ীর নীচের দু'টো ঘর রান্নাঘর মাসিক কুড়ি টাকায় ভাড়া নিল। ছায়া বা রামনাথ যেই তার ছেলেকে পড়াক ৪০৲ টাকা মাসে পড়ানোর জন্য পরেশ দেবে—বেশ ভালো ব্যবস্থা।

রামনাথের নিজের ইচ্ছা না থাকলেও মাসের পর মাস কী করে সংসার চালাবে—এই দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এই ব্যবস্থাতে সম্মত হয়েছিল।

আজ প্রায় ৬ মাস হোল রামনাথ ছায়াকে নিয়ে পরেশের সঙ্গে এক বাড়ীতে আছে। পরেশের একমাত্র ছেলে রবি রামনাথের কাছে পড়ে রাত্তিরে, ছায়ার কাছে পড়ে সকালে। যদিও ছায়া খুব কমই পড়ায়, রামনাথই রবিকে পড়ায়, রবি রামনাথকে বিশেষ ভালবাসে ও তার সঙ্গীও বটে। রামনাথ এম-এ ভাল ভাবেই পাশ করেছিল ও ইস্কুলে খুব ভাল শিক্ষক হয়েছিল। এতোদিন থাকলে হেড্ মাষ্টার তো হোতই ও—যখন সেই ইস্কুল কলেজ হোল অধ্যাপক হয়ে মাসে দেড়শো দুশো রোজগার কর্ত্তে পার্ত্ত। কিন্তু ঐ কলকাতায় থাকার প্রবল বাসনার ঘূর্ণিবায়ুতে সদাগরী আফিসে সে কাজ নিল।

রবি যে পড়াশুনোয় অসাধারণ উন্নতি কর্ব্বে এ খুবই স্বাভাবিক। পরেশও ছেলের অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে বিশেষ প্রীত তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রামনাথের অর্থের অভাব আর নাই—ছায়ার খরচ আর রামনাথকে বহন করতে হয় না। পরেশ ছায়াকে খুবই স্নেহ করে, আজ গ্রামোফোন, কাল রেডিও, প্রায় প্রত্যেক মাসেই নানান রং বেরং-এর শাড়ী, নূতন প্যাটার্ণের স্যাণ্ডাল দিয়ে থাকে।

রামনাথ দেখে সবই, কিছু বলে না—তার সুন্দরী স্ত্রী তেইশ চব্বিশ বছর বয়স হবে,ভাসা ভাসা চোখ, গৌরাঙ্গী,দোহারা চেহারা —তার সম্মুখ দিয়ে বেশ প্রফুল্ল মনে রকমারি স্যাণ্ডেল শাড়ী পরে ঘুড়ে বেড়ায়—তা দেখে রামনাথ মনে মনে হাসে, কখনও বা বাসনার ঘূর্ণিবায়ুতে দেখতে ভালও লাগে।

কিছুদিন হোল পরেশ একটা টু-সিটার গাড়ী কিনেছে, নিজেই ড্রাইভ করে। ছায়াকে নিয়ে প্রায়ই বেড়ায়, রবিকে নিয়ে রামনাথ প্রায়ই বেড়াতে যায়।

পরেশের বাটিতে টু-সিটারের আবির্ভাব হওয়ার পর ছায়ার বাড়ীতে আসতে ইদানীং রাত্রি হলে রামনাথ বিরক্ত হয়, কিন্তু গভীর রাত্রে যখন স্ত্রী এসে স্বামীর নিকটে অনুনয় করে, রামনাথের রাগ স্থায়ী হতে পারে না।

আর স্থায়ী ভাবে রাগ সে কর্ব্বেই বা কি করে? যে রামনাথের দেড় শো টাকা মাইনে মাসের কুড়ী তারিখে ফুরিয়ে যেতো, যে রামনাথকে দশ টাকা পাঁচ টাকা ধার কর্ব্বার জন্য প্রত্যেক মাসে হয় এ বন্ধু না হয় ও বন্ধুর কাছে হাত পাততে হোত, সেই রামনাথ এই ৬ মাসে সেভিংস্ ব্যাংকে বেশ কিছু জমিয়েছে। ডিফেন্স সার্টিফিকেট কিনেছে।

যে রামনাথ অর্থাভাবে ঘি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, দালদা কিনে তার পরোটা আর বেগুন ভাজা আর কড়া এক কাপ চা খেয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতো, যে বায়োস্কোপে যেতে ভালবাসলেও পয়সায় কুলোতে পারে না ব'লে এই দীর্ঘ দু' বছর বায়োস্কোপে যেতো না, সেই রামনাথ আজ প্রায় চার মাস-এর ওপর আফিসের পর রেঁস্তোরাতে দস্তুরমতন চা অ্যামলেট টোষ্ট কেক্ পুডিং সন্দেশ খাচ্ছে, মেট্রো, লাইট হাউসে যাচ্ছে, ছায়ার ওপর রাগ স্থায়ী হ'তে পারে? ছায়াও খুসী আছে—আর স্বামীর এই রকম মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পেয়ে সে সত্যিই আনন্দে আছে।

রামনাথের রাগ স্থায়ী হয় না সত্য—কিন্তু সে লক্ষ্য কর্চ্ছে যে, তার স্ত্রী যেন ক্রমশঃ দূরে চ'লে যাচ্ছে ও পরেশের ছেলে রবি যেন তার সমগ্র হৃদয় জুড়ে ব'সে আছে। রবি রামনাথের সাথী হয়েছে—সে রামনাথের কাছে বেশী থাকে। মাংস রান্না হ'লে, ঘন দুধ, সন্দেশ—এ সব রবি রামনাথকে এনে দেয়।

পরেশের চা খাওয়া হোল কি না, পরেশের গাড়ী ধোয়া হোল কি না, পরেশের জুতো ভাল ভাবে পালিশ হচ্ছে কি না—এই সব তত্ত্বাবধান করতেই ছায়ার সময় কেটে যায়—তার স্বামী যে কী আহার করে আফিসে যান্ তা লক্ষ্য কর্ব্বার সে সময় পায় না।

রামনাথের নিজের বাড়ীতে দেড় শত টাকা খরচ হয়ে যে মানসিক দুশ্চিন্তায় সময় কাটিয়েছে, সে দুশ্চিন্তা হয় তো এই অর্থের প্রাচুর্য্য অপেক্ষা বরণীয় ছিল—এ কথা মাঝে মাঝে তার মনে হয়—কিন্তু এ চিন্তা কেন তার আজও? সে এখনও বিগত যুগের কথা ভাবে—যে ঘূর্ণিবায়ু আজ সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে সামাজিক আর্থিক নৈতিক ভিত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, সেই ঘূর্ণিবায়ু থেকে যে বাঙ্গালী আজ মুক্তি পাবে সে কথা চিন্তা করা ঘোর উন্মত্ততা নয় কি? সবই সে বোঝে কিন্তু তবু মনে ব্যথা পায়—ব্যথা পায়, সেই কারণে নানান চিন্তা এসে উপস্থিত হয়। রবির সান্নিধ্যে সে নিজের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর কথা বিস্মৃত হ'তে চায়—কিন্তু পারে কৈ? যে সন্ধ্যায় রামনাথ একাকী বসে বারান্দায় এই সব চিন্তা কর্চ্ছিল, হঠাৎ রবি

তার সুন্দর সরল মুখ নিয়ে এসে "জ্যাঠামণি" বলে কাছে দাঁড়াল—ভারী সুন্দর দেখতে রবি, রামনাথ তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললে—"খোকা, তুই আমায় বড্ড ঘন দুধ আর মাংস খাওয়াচ্ছিস। খোকা হেসে বললে, "বাঃ আমরা খাব, আর তুমি খাবে না, জ্যেঠামণি এ কী রকম।" এই সময় ছায়া এসে উপস্থিত হলো। ছায়া এসে রামনাথ ও রবির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। রামনাথ জিজ্ঞাসা করলো, "পরেশ কোথায়?" রবি বললে, "বাবা কাকাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন।" ছায়া জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বাবার কয় ভাই রবি? রবি বললে, "বাবা আর কাকা।" ছায়া জিজ্ঞাসা করলো, "কাকীমা কোথায় থাকেন?" রবি বললে, "তাতো আমি জানি না, তুমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।" রামনাথ বললে, "চলো খোকা, চলো পড়তে বসো।" ছায়াও আজ বিশেষ করে নিজের গৃহস্থালী দেখতে বসেছে—বোধ হয় পরেশের ভ্রাতার সম্মুখে পরেশের গৃহস্থালীর ব্যবস্থা করা শোভনীয় হবে না, এই চিন্তায়—

রামনাথের কোন অভাব নেই, বরং অর্থের প্রাচুর্য্যই হয়েছে; কিন্তু তবুও সে অনেক সময়ে সন্ধ্যার ম্লান আলোকে কেল্লার পাশে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকে একলা চুপ করে। কখন কখন জাহাজের বাঁশী শুনে উদাস ভাব তার মনে আসে; সেই বাঁশীর মধ্যে তার হৃদয়ের করুণ স্বর ধ্বনিত হয় তাহার মনে হয়, যে, সে সামান্য মাহিনা পায় বলে পরেশ তাকে তাচ্ছিল্য করে, স্ত্রীও কী তাচ্ছিল্য করে না? হ্যাঁ স্ত্রীও তাচ্ছিল্য করে, নেহাৎ সে স্বামী, তাই বোধ হয় ছায়া থাকে তার কাছে—এ থাকার মধ্যে হয় তো রামনাথের কোন দাবী-দাওয়া নেই—ছায়ারই বিশেষ অনুকম্পা।

সে সন্ধ্যায়ও এই রকম মনোভাব নিয়ে রামনাথ বসেছিল কেল্লার মাঠের কাছে—সন্ধ্যার আলো ম্লান হয়ে এসেছে—বৃষ্টির আবির্ভাবে সে তাড়াতাড়ি ট্রামে না চড়ে বাস্ ধ'রলে। রামনাথ যখন বাড়ী ফিরেছে তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। ঘর অন্ধকার, ঘরে প্রবেশ ক'রে আলো জ্বাল্‌তেই দেখলে ছায়া বিছানায় শুয়ে আছে, আর পরেশ তার বিছানায় ব'সে ছায়ার মাথা টিপছে। রামনাথ এই দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়াতে এতোই বিরক্ত হয়েছে যে, রেগে বল্‌লে, "পরেশ, ঘর অন্ধকার রেখে এ রকম ভাবে তোমার ছায়ার কাছে ব'সে থাকা মোটেই উচিত ছিল না—আলো জ্বেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছিলো?"

ছায়া বিছানায় ব'সে ব'ললে, "আলোতে কষ্ট হয় ব'লে"—রামনাথ কথা না শেষ করতে দিয়ে চ'টে আবার বল্‌লে, "ঘরে ক্ষীণ আলোক বাল্‌বও তো ছিল।"

পরেশ বল্‌লে, "এই hopeless conservatism-এর কী কিছু মানে আছে?" রামনাথ ব'ললে, "মানে যে সত্যিকারের আছে,তা আগে এতো বুঝিনি—আজ ভালভাবেই বুঝেছি যে খুবই মানে আছে—আগে বুঝলে অনেক উপকার হোত—যাক্ আমি এখানে থাক্‌বো না।"

ছায়া বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ল্‌লে, "এতো সন্দেহ তোমার! ছিঃ ছিঃ, এত নীচ মন—apology চাও"—

রামনাথ ব'ললে, "apology? কেন? আমি দেড়শো' টাকার কেরাণী আর পরেশ ছয়শো টাকার অফিসার, টু-সিটার গাড়ী রাখে ব'লে? বিদ্যা-বুদ্ধি তোমাদের চেয়ে আমার কিছু কম নয়—আমি মুখ্যু না? তোমাদের কাছে আজ সবই নতুন ক'রে শিখতে হবে—না?" সে আর কোন কথা না ব'লে সশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—পরেশও বিরক্ত হ'য়ে "Positive nuisance" ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু বেশী রাত্তিরে রামনাথ বাড়ী ফিরে এলো—স্বামী-স্ত্রীর সে রাত্রে আহার হ'লো না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কথা-বার্ত্তাও হ'লো না।

ছায়া চিন্তা করলে যে, হয়তো পরেশ রামনাথকে এ বাড়ীতে থাক্‌তে অনুরোধ কর্বে এবং এ বাদ-বিসম্বাদ মিটে যাবে! কিন্তু পরের দিন যখন ছায়া পরেশের নিকটে উপস্থিত হ'লো পরেশ কোন রকম বাক্যালাপ না ক'রে অন্য ঘরে প্রস্থান ক'রলে। পরেশের ছেলে রবি যখন সকালে রামনাথের চা-ডিম-টোষ্ট নিয়ে আসছিলো, পরেশ এক ধমকে তাকে সে কার্য্যে বাধা দিল। রামনাথ নিয়মিত আহার ক'রে আফিসে গেল। পরেশ পুত্রকে গাড়ীতে নিয়ে আফিসে রওনা হলো।

ছায়া একাকী দ্বিপ্রহরে বসে চিন্তা করছে—এই কী তার পরেশদার ভালবাসা? সে যেন আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলে যে, সে নিতান্ত অনুকম্পার পাত্রী হিসাবে পরেশের স্নেহ পেয়েছে, বড়লোকে সে রকম গভর্ণেস রাখে, পরেশ তাকে সেই রকম রেখেছে। তার মধ্যে নারীত্বের যে সম্মান আত্মমর্য্যাদা এত দিন লুপ্ত ছিল, তা যেন আজ আত্মপ্রকাশ ক'রলে। তার মনে হোল যে, রামনাথকে তার ক্ষমা চাইতে বলা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। রামনাথ ঠিক কথাই ব'লেছে, বিদ্যা-বুদ্ধি রূপে গুণে পরেশের চেয়ে রামনাথ ঢের উর্দ্ধে। এক অর্থ—সুযোগ-সুবিধার অভাবে একজন নিম্নে, আর একজন সুযোগ-সুবিধার সহায়ে উর্দ্ধে—এই তো। তার সমগ্র শরীর যেন ঘৃণায় লজ্জায় কাঁটা দিয়ে উঠলো।

সে উত্তেজিত হ'য়ে পরেশের প্রদত্ত যা কিছু সব গুছিয়ে আলাদা ক'রে ঘরের এক পার্শ্বে রাখলো।

রামনাথ সে সন্ধ্যায় একটু দেরী ক'রে আফিস থেকে এলো। সে চা খেতে খেতে ব'ললে, "কাল সকালে এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে হবে, বাড়ী ঠিক করে এলাম।"

ছায়া আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "বাড়ী ঠিক করে এলে, ব'লো কী, কোথায়"!

রামনাথ বল্‌লে, "ভাল বাড়ী, সুরেশ ঠিক করে দিয়েছে—"

ছায়া আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "সুরেশ কে?"

রামনাথ ব'ললে, "অতো কথা বলবার সময় নেই—আজ রাত্তিরের মধ্যেই সব গুছিয়ে ফেলো"।

ছায়া ব'ললে, "নিশ্চয়ই"।

রামনাথ চাদর রাখতে আনলার দিকে যাচ্ছিল, ছায়া পিছন থেকে এসে তাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। রামনাথ স্ত্রীকে নিজের বক্ষে টেনে নিলে—সে যেন বহুদিন পরে স্ত্রীকে ফিরে পেল।

প্রভাতে ছায়া পরেশকে ব'ললে, "আজ আমরা আপনার বাড়ী থেকে চল্‌লাম, আপনি যে সব জিনিস আমায় দিয়েছিলেন, তা সব সাজিয়ে ঘরে রেখে গেলাম, এই জিনিষের লিষ্ট, আর এই ঘরের চাবি নিন"।

পরেশ ব'ললে, "ও সব আমি কী করব—তোমায় দিয়েছি"।

ছায়া ব'ললে, "কৃপাদত্ত জিনিষ না নেওয়াই ভাল, না নেন্ ম্যাকেনজী লায়াল্ না হয় অন্য কোথাও সেলের জন্য পাঠিয়ে দেবেন, সব নতুনই আছে—বেশী টাকা নষ্ট হবে না।" সে চাবী ও জিনিষের লিষ্ট পরেশের ঘরে রেখে বেরিয়ে লক্ষ্য ক'রলে যে, রামনাথকে জড়িয়ে রবি কাঁদছে। রবিকে রামনাথ আশ্বাস দেবার পূর্ব্বেই পরেশ এসে জোর করে রবিকে টেনে নিয়ে গেল।

এই সময়ে দুটো মোটর-গাড়ী একটা বড় ও একটা ছোট—দুটোই প্রাইভেট গাড়ী—এসে উপস্থিত হ'লো পরেশের বাড়ীর সামনে। ছোট গাড়ী থেকে এক সাহেব রামনাথকে দেখে টুপী খুলে নেবে একটা চিঠি দিল। রামনাথ হেসে বললে, 'Many thanks please inform Maharaj-kumar" সাহেব গাড়ী করে চলে গেলেন। বড় গাড়ীতে যা জিনিষ-পত্র ওঠে, উঠিয়ে দিল চাকর। একটা ছোট বাস এসেছিল তাতে বাকী সব জিনিষপত্র উঠিয়ে রামনাথ একবার রবিকে খুঁজলে, না পেয়ে ছায়াকে বললে, "এসো"—। গাড়ীতে উঠতে পরেশ ওপরের জানালা দিয়ে দেখছে অবাক হয়ে। ছায়া গাড়ীতে উঠে বললে, "এ গাড়ী কার"? রামনাথ বললে, "সুরেশের"। ছায়া বললে "তোমার বন্ধু?" রামনাথ বললে—"হ্যাঁ, ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পড়ে কেবল শয়তানই দেখি আমরা ছায়া, সত্যিকারের মানুষ দু'চার জন এখনও আছে—তার মধ্যে একজন ঐ সুরেশ।"

বঙ্গে বস্ত্রাভাব

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আজকাল এই বাঙ্গলা প্রদেশে দারুণ বস্ত্রাভাব উপস্থিত হইয়াছে। বস্ত্রের অভাবে নির্লজ্জভাবে জীবনভার বহন করা অসম্ভব মনে করিয়া স্থানে স্থানে দুই একটি নারী আত্মহত্যা করিয়াছে বা করিতেছে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খুলনা জেলার শোভনা ইউনিয়নের দুইটি হিন্দু বিধবা গলায় দড়ি দিয়া মরিবার চেষ্টা করিয়াছিল সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। সকল স্থানের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় না। অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই সংবাদপত্রে জানাইবার বিশ্বস্ত সংবাদদাতা নাই। সেই জন্য সব সংবাদ লোক পায় না। শোভনায় যে দুইটি হিন্দু বিধবা বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণে অসমর্থ হওয়াতে গলায় দড়ি দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটি মরিয়াছে আর একটিকে লোকে বাঁচাইয়াছে। বাঁকুড়ায় ওন্দা থানায় ইটাগাড়া গ্রামের জনৈক সূত্রধরের স্ত্রী বস্ত্রের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। পূর্ণিয়ার আদালতে একটি কনেষ্টবল একখানা বস্ত্রের জন্যই গুলি করিয়া আত্মনাশ করিয়াছে। এ সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ জনরবে এইরূপ নিদারুণ সংবাদ আরও শুনা যাইতেছে, কিন্তু তাহার সত্যাসত্য সব সময় ঠিক করা হয় না। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কলাপাতা জড়াইয়া কোন কোন স্থানে হিন্দু নারীদিগের সংকার করা হইতেছে এ সংবাদ সংবাদপত্র-পাঠক অনেকেই পড়িয়াছেন। এ দিকে কয়লার অভাবে বাঙ্গলার ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্, সার রাধাকৃষ্ণ কটন মিলস্ এবং চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ কাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। ২৩শে জুন হইতে ২৫শে জুন পর্য্যন্ত তিন দিন কয়লার অভাবে আমেদাবাদের কলগুলি বন্ধ রাখা হইয়াছিল। এ বস্ত্রাভাব যে অতি দারুণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্ত্রাভাবে লোক অন্নাভাবের ন্যায় ঘরের বাহির হইয়া মরে না। যাহাদের বস্ত্রাভাব ঘটে, তাহারা ঘরের কোনেই লুকাইয়া থাকে, আর এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসহ্য হইলে লোক আত্মহত্যা করে। কাজেই বস্ত্রাভাবে মৃতের সংখ্যা বুঝা কঠিন।

কেন এবার বাঙ্গালায় এই উৎকট বস্ত্রাভাব ঘটিল? কিছুকাল পূর্ব্বে যে বাঙ্গালার প্রস্তুত বস্ত্রে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে সুদূর চীনভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত নরনারী আপাদ মস্তক মণ্ডিত করিতে আজ আচম্বিত সেই বাঙ্গালায় এমন বিভৎস বস্ত্রাভাব ঘটিল কেন? যে ভারতের বস্ত্রবাহুল্যের কথা পাইরার্ড বলিয়াছেন এবং মিষ্টার মোরল্যাণ্ড সে কথা তুলিয়াছেন (১)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও এই ভারত হইতে বিদেশে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার কাপড় বিদেশে চালান গিয়াছে। আমি এই প্রবন্ধে ভারতীয় কার্পাস শিল্পের প্রাচীন কাহিনীর কথা আর আলোচনা করিব না। বলা হইতেছে যে যুদ্ধজনিত অপরিহার্য্য কারণে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। উহা ঠিক নহে। গত ২৩শে এপ্রিল কলিকাতার প্রেস এসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে ভারত সরকারের বয়ন কমিশনার মিষ্টার ভেলোডি খুব চড়া গলায় বলিয়াছিলেন, ছোঃ ছোঃ, বাঙ্গলায় বস্ত্রের বড় অভাবের কথা নিতান্তই বাজে শব্দ; উহা একেবারে তিলকে তাল করা (a gross exaggeration)। এত বড় মোটা মাহিয়ানায় এমন জাঁকাল মানুষটার কথা একেবারেই মিথ্যা কথায় পরিণত হইল? তিনি এসময়ে জমিনে আসিয়া আপন চোখে দেখিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। যে চোখে তিনি উহা দেখিয়াছিলেন সে চোখ না জানি কেমন, যে বুদ্ধিতে তিনি উহা বুঝিয়াছিলেন সে বুদ্ধি না জানি কত ভোঁতা। অথবা লঙ্কায় যে যায় সেই রাক্ষস হয়। কারণ আমরা ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মেজর জেনারাল উডহেড বাঙ্গালায় আসিয়া এ প্রদেশের খাদ্য সঞ্চয়ের তদন্ত করিয়া-

(১) Morelands "India at the death of Akbar"

ছিলেন। তদন্ত শেষ করিয়া তিনি ফতোয়া দিয়াছিলেন—"বাঙ্গলায় খাদ্য সংস্থান যেরূপ তাহাতে এ দেশে দুর্ভিক্ষ হইতেই পারে না।" সে আশ্বাসবাক্য যেমন কিছুদিন যাইতে না যাইতে মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছিল, ভারত সরকারের বয়ন বিদ্যা-বিশারদের আশ্বাসও সেইরূপ দিগ্‌ভ্রান্তিজনক আলেয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। দুইটি বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে দুইজন হোমরা চোমরা রাজপুরুষের উক্তি অদৃষ্টদেবী কর্ত্তৃক এমন মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল কেন? উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বণিকদিগের পৃষ্ঠ-পোষিত অযোগ্য লীগপন্থী মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে একই ভাবে ভ্রান্তি-প্রকটন অদৃষ্টদেবীর অপূর্ব্ব উপহাস বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে বস্ত্রের আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা মিষ্টার ভেলোডি নিশ্চয়ই জানিতেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় কলওয়ালাদিগকে অনেক বস্ত্র সরকার বাহাদুরকে যোগাইতে হইয়াছে ও হইতেছে তাহাও সকলে জানেন। বিদেশ হইতে কাপড়ের আমদানি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ১৯৩৮—৩৯ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ৬৪ কোটি ৭১ লক্ষ গজ কাপড় এই ভারতে আসিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিল ১ কোটি ৩১ লক্ষ গজ মাত্র। অর্থাৎ নিখিল ভারতের জন পিছু প্রায় তিন হাত করিয়া কাপড় কমিয়াছিল। সাধারণতঃ ভারতীয় কলগুলিতে ইদানীং প্রায় ৪ শত কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছিল; উহার বৃদ্ধি করিয়া কার্পাসকলজাত পণ্যের পরিমাণ প্রায় ৮০ কোটি গজ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে সরকার ভারতীয় কল হইতে ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ১ শত ১০ কোটি গজ কার্পাস কাপড় লইয়াছিলেন। উহার পর বৎসর উহা হইতে কম কাপড় সামরিক প্রয়োজনে দিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভারতবাসীর যে দারুণ বস্ত্রাভাব হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। কিন্তু তাহার উপর আবার ভারত সরকার চীনদেশে এদেশের অনেক কলজাত বস্ত্র চালান দিতে থাকেন। প্রথম এ ব্যাপারটা ধামা চাপাই ছিল। পরে মিষ্টার কে, সি, নিয়োগীর এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব বলেন যে, বয়ন নিয়ন্ত্রণ সমিতির (Textile Control Board) সম্মতি লইয়াই তাঁহারা ভারত হইতে চীনে কাপড় চালান দিতে থাকেন। কিন্তু মিষ্টার নিয়োগী সহজে ছাড়েন্ নাই। পরে জানা যায় যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সম্বন্ধে সরকার যে পরামর্শপরিষদ ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে সার শ্রীরাম, সার নেস ওয়াডিয়া এবং মিষ্টার কস্তুরিভাই লালুভাই উক্ত বস্ত্র চালান দিবার ব্যবস্থায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এখন অপর পক্ষ হইতে সার আজিজল হক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলেন যে. তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কোন বে-সরকারী ভারতবাসীর মত লইয়াই চীনে বস্ত্র চালান দিবার এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই, ইহা গৃহীত হইয়াছিল মার্কিণের ওয়াশিংটন সহরে, মার্কিনী এবং ইংরাজদিগের মধ্যে। ভারতবাসীকে প্রথমে ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। বৃটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তে সম্মত হইলে পর ওয়াশিংটন সহরে Combined Production and Resources Board-কে এ-বিষয়ে বিবেচনার্থ প্রদান করা হইয়াছিল। অর্থাৎ "যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই" এই হিসাবেই ব্যাপারটা স্থির হয়।

এই রপ্তানী কার্পাস পণ্যের পরিমাণ অনেক অধিক। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে এই রপ্তানী কার্পাস পণ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮১ কোটি ৯০ লক্ষ গজ। যুদ্ধের পূর্ব্বে এত কাপড় আর কখনও ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপড় ভারত হইতে ভিন্ন দেশে চালান গিয়াছিল। সুতরাং দেখা গেল যে পাঁচ বৎসরে যুদ্ধের জন্য ভারত হইতে এই কাপড় রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় পৌণে পাঁচগুণ বাড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে এই কয় বৎসর বিদেশ হইতে আমদানী কাপড়ের পরিমাণ নামিয়াছিল ১৪ কোটি গজ হইতে ১ কোটী গজে। ইহা না জানিয়া শুনিয়াই কি মিষ্টার ভেলোডি বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালায় বস্ত্রাভাবের সম্ভাবনা নাই। ইহার পর বৎসর ভারতে বিদেশ হইতে কাপড় অতি অল্প মাত্র আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু রপ্তানী হইয়াছিল ৪৬ কোটি ১৫ লক্ষ গজ। এই ব্যাপারটা যেরূপ ভাবে ধামা চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাতে সাধারণ লোকের মনে নানা সন্দেহের উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই বস্ত্র-সঙ্কট কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রমের ফলে ঘটিয়াছে, কিম্বা ভারতবাসীর দুর্গতিতে অনবধানতার বা তাচ্ছল্যতার জন্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে? যদি অনবধানতার বা ভ্রান্তির ফলে ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বর্ত্তমান সময়ের বৃটিশ ব্যুরোক্রেসী ঘোর অযোগ্যতা এবং দায়িত্বহীনতা প্রকটিত করিতেছেন। যদি দুর্ব্বল অসহায় ভারতবাসীদিগের দুর্গতিকে ঘটিবার সম্ভাবনায় তাঁহাদের মন বিচলিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে।

যখন বাহির হইতে বস্ত্র আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, তখন সরকারের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য ছিল! যথাসম্ভব বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিয়াছেন কি? বয়ন নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (Textile Control Board) সভাপতি মিষ্টার কৃষ্ণরাজ থ্যাকার্সে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যেরূপ কল আছে, তাহা অবিশ্রান্ত চালাইলে বৎসরে ৬ শত কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন। সে সাহায্য চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই,—বরং প্রতিকূলতাই পাওয়া গিয়াছে। সরকারকয়লার কমতির সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া কার্পাস কলগুলি চালাইবার সময় কমাইয়া দিবার কথাই বলিয়াছিলেন। কল চালাইবার সময় কমাইয়া দিলে বস্ত্রের উৎপাদন যে কমিবে ইহা কি সরকার পক্ষের লোক

বুঝেন নাই ? বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিষ্টার নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের খোদ বাণিজ্য সচিব সে-কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর অন্য সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্যার রামেশ্বর মুদেলিয়ার বলিয়াছিলেন যে কয়লা পাট কলে, কাগজের কলে আর অন্য এক বাবদ দিতে হইবে,—অতএব একটু কম সময়ের জন্য কাপড়ের কলগুলি (প্রতি সপ্তাহে) বন্ধ রাখা হউক ; আর একটা কি বাবদ কয়লা প্রদান আবশ্যক সে-কথা ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী দেওয়ান ব্যহাদুর সার রামেশ্বর মুদেলিয়ারের মনেই পড়ে নাই। যাহার কাজ না চলিলে নয় এত বড় একটা বিষয়ের কথা তাঁহার মনে পড়িল না ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। যাহা হউক এই প্রকার কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ রাখায় কার্পাস বস্ত্রাদির উৎপাদন যে কমিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্যের কার্পাস কলওয়ালারা বলিয়াছেন যে তাঁহারা তিন দফা মজুরী দিয়া দিবারাত্রি কল চালাইতে সম্মত আছেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সরকারকে খেসারৎ (depreciation) বাবদ বরাদ্দ বাড়াইয়া দিতে হইবে। ঐ অঞ্চলের কলগুলি হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক্ শক্তি বলে চলে। সুতরাং সেখানে কয়লার কোন বালাই ছিল না। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে সরকার তাঁহাদের সেই সমীচীন প্রস্তাবে কোন সাড়া দেন নাই। কিন্তু যেখানে য়ুরোপীয়দিগের এইরূপ স্বার্থ নিহিত আছে, সেখানে সরকারের এইরূপ খেসারতির বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি করিবার কোন কুণ্ঠা প্রকাশ পায় নাই ; কয়লার খনির মালিকদিগকে তাহারা ঐরূপ খেসারতের হার বাড়াইয়া সুতরাং সাধারণ লোকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছে তবে কি কোন গুহ্য কারণে কর্ত্তৃপক্ষ কার্পাস পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদাসীন। এ-দেশে কার্পাসশিল্পের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যের প্রমাণ সর্ব্বজনবিদিত। এ-দেশে উৎপন্ন কার্পাস পণ্যের উপর স্বদেশী শুল্ক (excise duty) স্থাপন তাহার উত্তম নিদর্শন। সরকারের নিযুক্ত ফিস্‌ক্যাল কমিশনও সে-কথা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। সে-সব কথা আর এক্ষণে বলিব না।

তাহার পর বস্ত্রবণ্টনের ব্যবস্থা দেখিয়াও মনে নানা সন্দেহের উদ্ভব হয়। সরকার তাঁহাদের অযোগ্যতার ফল চোরাবাজারের স্কন্ধে চাপাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র এবং কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির ৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায়চৌধুরী স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, বহুদিনের প্রসিদ্ধ বস্ত্রবিক্রেতাদিগের দোকান সরকার বন্ধ করিয়া কতকগুলি মুসলমানকে বস্ত্রবিক্রয়ের ভার দিতেছেন। কথাটা কি মিথ্যা ? যাহাদিগকে সরকার এই ভার দিতেছেন, তাহারা কতকাল ধরিয়া বস্ত্রবিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন ? ইহাদের মধ্যে শতকরা কতজন চোরা বাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকার তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি ? যে-সময়ে কাপড়ের অভাবে লোক হাহাকার করিয়া মরিতেছে, সে-সময়ে কাপড়ের দোকানে শীল করিয়া কিছুদিনের জন্য কাপড় আটকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যই বা কি ? ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার সণ্ডার্স যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, যে-সময়ে রাজশক্তি বণিকবৃত্তি ধরে অথবা কোন বণিক শাসনকার্য্য পরিচালিত করে সে-সময়ে যে কেহই শাসনযন্ত্র পরিচালিত করুন না কেন উহার অপব্যবহার এবং উহা অত্যন্ত ক্ষতিকর উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইবে। ভারতীয় বাজার হইতে ভারতীয় যন্ত্রজাত বস্ত্রকে নির্ব্বাসিত করাই কি উহার উদ্দেশ্য ? কিন্তু তাহা নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। কারণ তাহা সম্ভব হইবে না। তবে ?

বণিকবৃত্ত ব্যুরোক্রেসীর মনোভাব কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাঁহাদের চিন্তার ধারা আমরা বুঝি না। এইরূপ ব্যাপারে যে অসন্তোষের বৃদ্ধি হয়, শাসিত প্রজা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, ইহা তাঁহারা বুঝেন না ? প্রজা যতই দুর্ব্বল হউক না কেন তাহারা বিক্ষুব্ধ এবং মনস্তপ্ত হইলে যে তাহার ফল পরিণামে শাসকদিগের পক্ষে অনিষ্টকরই হইয়া থাকে, ইহা ইতিহাস পাঠ করিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা এরূপ ব্যাপার হইতে দেন কেন ? কুমন্ত্রীর কথায় ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা যদি এরূপ করেন তাহা হইলে সেরূপ কুমন্ত্রীদের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় তথ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। উদাহরণ :—অধুনা অবসরপ্রাপ্ত ভারত সরকারের অর্থ-সচিব সার জিরেমী রেইস্‌ম্যান বিলাতে যাইয়া রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন যে, "ভারতের লোকসংখ্যা বৎসরে ১ কোটি করিয়া বাড়িতেছে। এ-দিকে আদমসুমারী হিসাবে দেখা যায় যে গত ৫০ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে মোট ১০ কোটি। অর্থাৎ বৎসর ২০ লক্ষ করিয়া। প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গ মাইল ভূখণ্ডে বৎসরে ২০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি কি অধিক ? এইরূপ হিসাব দেখিয়াই কি সরকারী কর্ম্মচারী ভ্রান্তপথে চালিত হয় ? তাই এই কাণ্ড ঘটে ?

মরু পথিক (গল্প)

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

জনাকীর্ণ রাজপথ ধরে অভিভূতের মত নির্ম্মল হেঁটে চলেছে। কত কর্ম্মব্যস্ত পথিক এই বিমনা যুবকটীকে ধাক্কা মেরে গেল, কত কৌতূহলী দৃষ্টি বিস্ময়ভরে নিক্ষিপ্ত হল তার পানে, নির্ম্মলের খেয়াল এ সব দিকে নেই, সে চলেছে তো চলেছেই। চলাটা যেন তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে।

নির্ম্মলের মনের মাঝে এক বিরাট আলোড়ন চলছে; সব যেন সেখানে ওলট পালট হয়ে গেল। জীবনকে উপভোগ করার মাঝে আনন্দ আছে, কিন্তু তাকে অনুভব করার মাঝে আছে বেদনা। নির্ম্মল এম, এ, ক্লাসের-ছাত্র। ছাত্র-জীবনকে সে এতদিন উপভোগ করেই এসেছে, তাই প্রকৃতি ছিল তার চপল আনন্দে ভরা। কিন্তু আজ সে সহসা জীবনকে একটা অপ্রত্যাশিত নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছে, তাকে সে আজ অনুভব করছে। এই অনুভূতি এত অকস্মাৎ তার মাঝে আত্ম-প্রকাশ করেছে যে এর বেদনাকে সে কোন মতেই সহ্য করতে পারছে না। এই অসহ্য দুর্ব্বার বেদনার তাড়নায়ই পথের বুকে নেমে এসেছে সে, চলার গতির মাঝে নিমজ্জিত করতে চাইছে এই বেদনার তীক্ষ্ণতাকে।

মুহূর্ত্তের একটি ঘটনা তার সমগ্র জীবনকে এমনি একটা নূতনরূপে রূপায়িত করে তুলেছে, কী গভীর হতাশা নিবিড় বেদনা সে রূপের মাঝে। অথচ কত সামান্য ঘটনাটি।

বাংলা একখানা সস্তা ডিটেক্‌টিভ নভেল। কদিন ধরেই নির্ম্মল টেবিলের উপর লক্ষ্য করছিল বইখানাকে। সে দিন ছোট বোন সুধাকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করলে—"এ বইখানা এখানে এলো কোত্থেকে সুধা? কদিন ধরেই দেখছি।"

সুধা একটা বিশেষ ভঙ্গীতে ভ্রূদুটীকে কুঞ্চিত করে বললে—"বারে! সবে তো আজ সকালে নিয়ে এলুম।"

"তার মানে? পাঁচ-ছ দিন ধরে দেখছি একটা ডিটেক্‌টিভ বই পড়ে আছে এখানে।"

সুধা ভ্রূযুগলকে সরল করে এনে অল্প হেসে বললে "সে এখানা নয়। এর আগেও দু'তিন খানা ডিটেক্‌টিভ বই এনেছিলুম কিনা।"

"আজকাল এ সবই পড়া চলছে বুঝি! কোথায় জোটে এ গুচ্ছির বাজে বই? এ আবার ভদ্রলোকে পড়ে।"

অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠে সুধা বললে—"তা বৈ কি! তপতীর বাবা তো আর ভদ্রলোক নন, কারণ তাঁর আলমারী ভরা শুধু এই ডিটেকটিভ নভেল।"

"কে তপতী?" নির্ম্মল প্রশ্ন করলে।

"ওই যে আমাদের পাশের বাড়ীতে নূতন ভাড়াটে এসেছে।"

নির্ম্মল বুঝতে পারলে। কিছুদিন হয় সরকারী অফিসের একটি কেরাণী তাদের বাসার পাশে উঠে এসেছেন। ভদ্রলোককে দেখেছেও নির্ম্মল কয়েকদিন ছাতা বগলে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বাস ধরবার জন্যে ছুটে যেতে। সেদিন সকালে চা খেতে খেতে দেখেছে তিনি বাজার করে মস্ত একটা পোঁটলা হাতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী ঢুকছেন। মুখে বিড়বিড় করে কী বলে প্রকাশ করছেন মনের চাপা বিরক্তি। নির্ম্মল প্রশ্ন করলে—তপতীর বাবার নাম কী রে সুধা?"

"কী জানি! অবনী চাটুয্যে না বাড়ুয্যে।"

"বিদ্যে কদ্দূর?"

"তপতী তো বললে নাকি এম, এ পাশ।"

নির্ম্মল হেসে উঠলো—"হ্যাঁ, এম, এ পাশ করে আলমারী ঠেসেছে ডিটেকটিভ বই দিয়ে। যাঃ যাঃ!"

সুধার ভ্রূ আবার তেমনি কুঞ্চিত হয়ে উঠল—"আহা, আমি কী জানি! তপতী-ই তো বললে।"

চুল বাঁধার সরঞ্জাম নিয়ে সুধা দিদির উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল।

কী মনে হল—হাতে নিয়ে বই খানাকে নির্ম্মল খুলে ফেললে। 'গুপ্ত হত্যা', নাম শুনলেই মনে বিতৃষ্ণা জাগে। নীচে অধিকারীর নাম লেখা—শ্রীযুক্ত বাবু অবনীকুমার চাটার্জ্জি, এম, এ।

তপতী মিথ্যে কথা বলেনি, সত্যই তার বাবা এম, এ পাশ। অবনী বাবুর অসহায় মূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে নির্ম্মলের চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই কি শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চাটার্জ্জি এম এ? বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় ইনিই কি উত্তীর্ণ হয়েছেন? নির্ম্মলের মন ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার অবদান একদিন যাঁর মনের খোরাক জুগিয়েছে, আজ তাঁর অবসর কাটে ওই সব হাল্কা আর সস্তা চটকে ভরা ডিটেকটিভ নভেল পাঠ করে? একজন উচ্চশিক্ষিতের সংস্কৃত মন আজ কেমন করে বরদাস্ত করছে ওই রোমাঞ্চ সিরিজের বইগুলোকে? ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও কারণটা নির্ম্মল ধারণা করতে পারছে। অবনীবাবুকে যদি প্রশ্ন করা যায় তাহলে তিনি কী উত্তর দেবেন নির্ম্মল তা জানে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি কলম পেশার পর অবসন্ন দেহমন যে এ ধরণের খানিকটা সুলভ স্থূল আনন্দ ছাড়া আর বেশী কিছুই আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না—এ কথাটাই তিনি জানিয়ে দেবেন। আর নির্ম্মল নিজে? সেও কি একদিন এমনি স্থূল মনের অধিকারী হবে না?

কিন্তু একদিন তো অবনীবাবু তাদেরই মত কোন এক সুন্দর সুকুমার আশাকে মনে মনে পোষণ করেছিলেন। সে দিন তাঁর হৃদয়ে কোন্ রঙ্গীন কল্পনা মায়া জাল বুনেছিল—কোন আদর্শকে সে দিন অনুসরণ করে চলেছিলেন তিনি? নির্ম্মল স্মরণ করতে চেষ্টা করলে অবনীবাবুকে কোন্ দিন কিরূপে দেখেছে। মনে পড়ল সেদিন পার্কের কথা। দু'তিনটি ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। একটি তাঁর কোলে ছিল, আর একটিকে বুঝি ধরেছিলেন হাতে। অন্য দুটি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পেছনে আসছিল কোলে উঠবার বায়না নিয়ে। কি এক বিপন্ন অসহায়রূপ! মুখে কি তাঁর অনিবার্য্য বেদনার ছায়া অঙ্কিত ছিল না? সেদিন নির্ম্মল ভালভাবে লক্ষ্য করে নি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ও ছাড়া আর কিছুই সেখানে থাকতে পারে না। দুঃখ, বিষাদ, বিরক্তি—এই তাঁর অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র প্রাপ্য।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কথা ভেবে মনের মাঝে শিউরে ওঠে নির্ম্মল। তাদের যত আশা যত আকাঙ্ক্ষা সে সবেরও কি এমনি

করেই পরিসমাপ্তি ঘটবে? দু'দিন আগেকার কথা ঝিলিক মেরে ওঠে মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কক্ষে বসে তারা ক'বন্ধুতে কী উৎসাহের সঙ্গেই না সেদিন নিজেদের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বলাবলি করছিল—

নানা কথার পর পড়াশুনোর কথা ওঠে পড়েছিল। নির্ম্মল বিকাশকে লক্ষ্য করে বললে—"তারপর, তোমার একটা নূতন article দেখলুম 'সাহানা'তে। খুব লিখছ বুঝি আজকাল।"

বিকাশ সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লে, প্রচ্ছন্ন গর্ব্বের স্বরে বললে,—"তা লিখছি। আমাকে এ লাইনে তো থাকতে হবে। Journalism হচ্ছে আমার aim of life, এ জন্যে লেখার চেয়ে আমায় পড়াশুনো করতে হচ্ছে বেশী। প্রত্যেক দিন সমস্ত গুলো Newspaper খুঁটিয়ে পড়া—নানা ধরণের rare books আর foreign magazine ঘাঁটা, এমন কি, science সম্বন্ধেও আমায় কিছু কিছু পড়াশুনো করতে হচ্ছে। Journalist দের যে আবার সব বিষয়েই general knowledge দরকার। এ নিয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রম করছি, জানি মানুষের পরিশ্রম কখনো ব্যর্থ হয় না।" ভাবী সার্থকতার আশায় বিকাশের চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিনয় বললে—"ওঃ, সে জন্যেই দেখেছি মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে এসে তুমি নানারকমের অদ্ভুত বই নিয়ে নাড়া চাড়া কর। শ্রীপতি কিন্তু class cowse নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। ও ফাষ্টক্লাস পেয়ে যাবে।"

শ্রীপতি সেখানেই উপস্থিত ছিল, বললে—"ফার্ষ্ট ক্লাস পাব কিনা জানিনে, তবে সে জন্যে চেষ্টা করছি। আমার ঝোঁকটা আবার প্রফেসরীর দিকে। কিন্তু ফার্ষ্টক্লাস না হলে আজকাল প্রফেসরীর আশা করা বৃথা।"

"প্রফেসরী এত পছন্দ কেন তোমার?" বিনয় জিজ্ঞাসা করলে।

"প্রফেসরী হলে education line-এই থাকা যায়, নিজে আজীবন পড়াশুনো করবার সুযোগ পাওয়া যায়।"

নির্ম্মল একটু হেসে বললে—"তোমার আদর্শ বোধ হয় আমাদের শশাঙ্কবাবু? সর্ব্বদা পড়াশুনো নিয়েই আছেন। যখনই তাঁর সাথে দেখা হবে, দেখবে হাতে দু'এক খানা বই আছেই। জীবনকে তিনি কতটুকু উপভোগ করছেন? কেবল পড়া আর পড়া, যেন একটি moving Dictionary।"

"তুমি কী করবে বলে ভেবেছ?" শ্রীপতি প্রশ্ন করলে।

"আমি এম, এ-টা পাশ করে বি, টি পড়ব। আমার ইচ্ছে নূতন আদর্শ নিয়ে একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা, ছেলেদের সত্যি-কারের মানুষ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করা।"

"শেষকালে ইস্কুল-মাষ্টারী?" আশ্চর্য্য হয়ে বিনয় প্রশ্ন করলে।

"হাঁ। কিন্তু ইস্কুল মাষ্টারী বলতে তোমরা যা বোঝ; তা নয়। আমি চাই দেশকে একটা নূতন কিছু দিয়ে যেতে; একটা নূতন আদর্শ, নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করতে।"

নির্ম্মল ভাবে কী বিরাট আদর্শকেই না তারা মনে মনে পোষণ করে এসেছে। আজ মনে হয় সেদিন তারা যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলেছিল। নিজেদের ভবিষ্যৎকে তাদের রঙ্গীন কল্পনা দিয়ে তারা নিজেরাই যেন উপহাস করেছিল শুধু।

আজ নির্ম্মল বুঝতে পারছে তাদের সকলের আদর্শই একদিন ব্যর্থতার ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে যাবে। স্বপ্নরাত্রির তারকা তো বাস্তবদিনের আকাশে মিলিয়েই গিয়ে থাকে। তাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ জীবনের গর্ভে এক একটি অবনী চ্যাটার্জ্জি অপেক্ষা করছে। এর হাত থেকে কোনমতেই অব্যাহতি নেই—কোন নিষ্কৃতি নেই।

নির্ম্মলের ভাবাতুর মনটা কল্পনার আবেশে পাঁচ বছর অতি-ক্রম করে এগিয়ে গেল। পাঁচ বছর পরে তাদের জীবনে আজকের আকাঙ্ক্ষার কোন পরিচয়ই মিলবে না। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে লাগল ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী ছবি:—

পথ চলতে চলতে হঠাৎ যেন নির্ম্মলের দেখা হয়ে গেল বিকাশের সঙ্গে। পরনে আধ-ময়লা একখানা কাপড়, গায়ের পাঞ্জাবীটা ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া, পায়ে একজোড়া চটী। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই নির্ম্মল চেঁচিয়ে উঠল—"আরে, বিকাশ যে! ওঃ, কতদিন পরে দেখা, তারপর কী করছ আজকাল? তুমি না Journalism নিয়ে--"

—"সে-সব আর হ'ল না।"—বিকাশ যেন একটা চাপা নিঃশ্বাস ছাড়লে।

—"কেন, হ'ল না কেন?"

—"চল ওই পার্কের ভেতরে বসি গিয়ে। অনেক কথা জমা হয়ে আছে।" পার্কের কোণের দিকে গাছের ছায়ায় একখানা বেঞ্চ অধিকার করে বসলে দু'জনে। নির্ম্মল বললে—"হ্যাঁ এবারে বল তোমার কথা।"

—"কথা আর কী! এম-এ পাশ করার পরেই বাবা মারা গেলেন, সংসার এসে পড়ল আমারই ঘাড়ে। সে যে কী দুঃসময়—তুমি ধারণা করতে পারবে না নির্ম্মল। হাতের কাছে আর কোন অবলম্বন না পেয়ে ৬০৲ টাকা বেতনে একটা কেরাণীর কাজেই ঢুকে পড়তে হ'ল। ছাত্রজীবনের সেই রঙ্গীন কল্পনা—তা যেন আজ আরব্য উপন্যাসের কাহিনী বলে মনে হয়!"—বিকাশ হাসলে। তার ব্যর্থতার ইতিহাসের চেয়েও করুণ সে হাসি। মুহূর্ত্তমাত্র মৌন থেকে সে বললে—"তারপর তোমার খবর কী বল। তুমি তো বলেছিলে বি-টি পড়বে।"

নির্ম্মল বললে—"এম, এ পাশ করার পর ওসব আর ভাল লাগল না। নিজেদের মনকে বুঝতেই আমরা এত ভুল করি বিকাশ! তারপর কিছুদিন এখানে ওখানে দু'একটা প্রফেসরীর জন্যেও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই হল না। এখন কিছুদিন একটা কেরাণীগিরীই খুঁজছি, কিন্তু তাও হয়ে উঠছে কই!"

কিছুক্ষণ দুইজনেই নির্ব্বাক, তারপর নির্ম্মল জিজ্ঞেস করলে—"শ্রীপতি, বিনয়—ওদের কারুর খবর রাখো?"

বিকাশ একটু ভেবে নিয়ে বললে—"হ্যাঁ, গতবছরে চোরা-বাজারে বিনয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিল একদিন, কোন্ একটা গ্রামে নাকি ইস্কুল-মাষ্টারী করছে—যা সে সবচেয়ে ঘৃণা করত।"

নির্ম্মলের মনে বয়ে চলল অবিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা। এই তো তাদের ভবিষ্যৎ জীবন! বর্ত্তমানের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার এইখানেই তো পরিসমাপ্তি। পাঁচবছর পরে ভগ্নহৃদয়ে আশাহীন মনে যখন সে কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ দিয়ে হেঁটে যাবে, তখন দেখতে পাবে যৌবনের দীপ্তিভরা নূতন ছাত্রদলকে—যারা তাদেরই মত আনন্দ নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে—বিরাট আদর্শ আর সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে ভবিষ্যতের মায়াস্বপন দেখছে। তারপর··· তারপর একদিন প্রখর দিনের আলোতে তাদেরও সব স্বপ্ন আকাশের শূন্যতায় মিলিয়ে যাবে। আবার আসবে নূতন আশার বাণী বুকে বয়ে নিয়ে নূতন ছাত্রদল···! এমনি করেই বয়ে চলবে একটানা স্রোত, চিরদিন—চিরযুগ।

ভাবাতুর মনে চলতে চলতে শহরের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে এসেছে নির্ম্মল। একবার সে চারধারে তাকিয়ে নিলে। সামনে প্রসারিত একটা উদাস মাঠ—শূন্য, শুষ্ক। নির্ম্মল ভাবে বাংলার প্রতিটি ছাত্রই যেন এমনি অন্যমনস্কভাবে জীবন-পথে চলতে চলতে উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে বহুদূরে এসে দাঁড়ায়। সামনে তাকিয়ে দেখে পৃথিবীর শূন্য, শুষ্ক প্রান্তর।

বহুদূরে গির্জ্জার চূড়োটা শীতের কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। বোবা আকাশের বুকে নীড়-পিয়াসী পাখীর ডানায় অসীম ক্লান্তি। দিগন্তের করুণ আবছায়ায় যেন ভবিষ্যৎ জীবনেরই অভিব্যক্তি। দিনশেষের প্রকৃতির মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি।

মাঠের মাঝেই নেমে পড়ে নির্ম্মল। পথ ছেড়ে সে বিপথে এসে পড়েছে, তবু যেন তার ফিরে যাবার শক্তি নেই—নেই উৎসাহ। জীবনের কী এক গভীর বেদনাদায়ী সত্যের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখী হয়ে গিয়েছে নির্ম্মল। জীবনকে উপভোগ করার দিন তার শেষ হয়ে গিয়েছে, আজ সে প্রথম করছে তাকে অনুভব। অনুভূতির বেদনা তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, অন্তর তুলছে বেহাগ সুরের করুণ মূর্চ্ছনা।

কথাসাহিত্যের কথা

শ্রীকালিদাস রায়

(এক)

ঠাকুর দাদা অনেক কিছু জানেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা সামান্য নয়, অনেক পড়াশুনাও তাঁহার আছে, কিন্তু যখন তিনি নাতিদের কাছে গল্প বানাইয়া বলেন তখন সে সমস্তের কথা ভুলিয়া যান; গল্পের মধ্যে সে সমস্ত ভরিয়া দেন না, গল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষা ও উপদেশ চালান না। তাঁহার লক্ষ্য থাকে,—কৌতূহলী শিশুমনের অনুরঞ্জন। আমরাও যখন নিশ্চিন্ত মনে কথাসাহিত্য পড়িতে যাই তখন আমরা একটা কৌতূহলী শিশুমন লইয়াই অগ্রসর হই এবং প্রত্যাশা করি অনায়াসে অবলীলায় কল্প-মাধুর্য্য কতকটা অনুভব করিব। যদি কথাসাহিত্য পড়িতে গিয়া আমরা নানা তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়া পড়ি, নানা সমস্যার সহিত লড়াই করিতে বাধ্য হই—নানা প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে বাধ্য হই, তাহা হইলে আমাদের গল্পপিপাসু চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট হয়। তাহাতে কথা সাহিত্যে পাঠের আনন্দও পাই না, একটা সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত প্রবন্ধপাঠের লভ্য যাহা তাহাও পাই না।

ইদানীং সকল দেশেই এক শ্রেণীর সাহিত্যিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রাজ্ঞ ও চিন্তাশীল, কিন্তু খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট নহেন। তাঁহারা দেখিতেছেন তাঁহাদের বক্তৃতার শ্রোতার অভাব, তাঁহাদের অধ্যাপনায় ছাত্রসংখ্যা বেশি নয়, তাঁহাদের নিবন্ধের পাঠকসংখ্যা বড়ই অল্প। অথচ তাঁহাদের বক্তব্য তাঁহারা বহুসংখ্যক লোককে শুনাইতে চাহেন। সকল দেশেই অধিকাংশ লোক কথাসাহিত্যের পাঠক। তাই তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান, গবেষণার কথা গল্প উপন্যাস ও নাটকের কাঠামো ও গঠনের মধ্যে ভরিয়া চালাইতে চাহেন. খাঁটি নাটক, উপন্যাস বা গল্প রচনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহারা ঐ গুলির আকৃতি ও পরিবর্ত্তনীটি গ্রহণ করেন, কয়েকটা চরিত্রেরও সৃষ্টি করেন, দুই চারিটা ঘটনারও অবতারণা করেন। কিন্তু মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে তাঁহাদের নিজস্ব বক্তব্যগুলিকে প্রচার করা, সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য করা। ইঁহারা যদি বড় আর্টিষ্ট হইতেন তাহা হইলে আর্টিষ্টের গৌরব লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, চিন্তাশীল প্রাজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না! এ প্রথায় ব্যাপক অর্থে কোন সাহিত্যের বই সৃষ্টি হয় না, তাহা বলিতেছি না; তবে তাহা যে অবিমিশ্র কথা-সাহিত্য হয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঐ শ্রেণীর সাহিত্যকে কথাসাহিত্য বলিয়া যাঁহারা প্রচার করিতে চান তাঁহারা প্রকারান্তরে প্রকৃত কথাসাহিত্যিকদের ক্ষতি করেন। আর প্রকৃত কথাসাহিত্যিক, প্রকৃত আর্টিষ্ট যখন প্রাজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইবার লোভে ঐ শ্রেণীর রচনার অনুকরণ করেন, তখন বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইয়া পড়ে।

আর্টিষ্ট ও থিঙ্কার (Thinker) দুই-ই একাধারে এমন লোক জগতে দুই চারিজন জন্মিয়াছেন। স্বভাবতই তাঁহারা অত্যুচ্চ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। তাই দেখিয়া কোন কোন আর্টিষ্ট উচ্চদরের থিঙ্কার বা প্রাজ্ঞ না হইয়াও প্রাজ্ঞতার বা থিঙ্কারের মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের রসরচনার মধ্যে অনেক প্রকারের তত্ত্ব, সমস্যা ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয়া পুস্তক রচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে রসসাহিত্যও হয় না, তত্ত্বালোচনাও হয় না। দুই দিক হইতে পুস্তকখানি ব্যর্থ হইয়া যায়। যে সকল তত্ত্বসমস্যা, জ্ঞান-গবেষণার কথা ঐ শ্রেণীর আর্টিষ্টগণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করেন সেইগুলি লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিলেই পারেন। বলা সহজ, কিন্তু তাহা রীতিমত কঠিন। যে বিদ্যা অখণ্ডভাবে কঠোর সাধনা ও অনুশীলনের দ্বারা মার্জ্জিত নয়, তাহা লইয়া সম্পূর্ণাঙ্গ সুপরিণত প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করা চলে না। জীবন-পথে চলিতে চলিতে যে সকল তথ্যের ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়—এটা ওটা পড়িয়া যে সকল

খণ্ড বিদ্যা আহৃত হয়, সেগুলি লইয়া কোন তত্ত্বমূলক গ্রন্থ লেখা চলে না. কথাসাহিত্যের মধ্যে পাত্রপাত্রীর মুখে সে গুলিকে বসাইয়া দেওয়া চলে। তাহাতে দায়িত্ব বিশেষ কিছু নাই, তাহাদের জন্ম জবাবদিহিও দিতে হয় না সুশৃঙ্খল যুক্তির মর্য্যাদাও রাখিতে হয় না, নানা বাদবিসম্বাদ বা বিরোধী মতামতের সম্মুখীন হইতে হয় না। ফলে, সাধারণ পাঠকের কাছে খুব বড় থিঙ্কার বা প্রাজ্ঞ বলিয়া গণ্য হওয়া চলে। সুক্ষ্মদর্শী ক্রিটিকের কাছে কিন্তু ফাঁকি ধরা পড়ে।

কথাসাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কেহ কেহ বিদ্বান, জ্ঞানী বা ভাবুক থাকিতে পারিবেন না এমনটা ত হইতে পারে না। সেরূপ চরিত্রকে ফুটাইতে হইলে তাহার মুখে তাহার উপযুক্ত কথাই বসাইতে হয় অর্থাৎ প্রাজ্ঞজনোচিত কথাবার্ত্তাই তাহার জবানী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক নিজে যে বিষয়ে প্রাজ্ঞ—সেরূপ চরিত্রকে সেই বিষয়েই প্রাজ্ঞ করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা তাহার মুখের কথা স্বাভাবিক বা সুসঙ্গত হইবে না। যদি কোন আর্টিষ্টের কোন বিষয়েই অগাধ প্রাজ্ঞতা না থাকে তবে তাঁহার সেরূপ চরিত্র সৃষ্টি না করাই উচিত। তাহা ছাড়া, প্রাজ্ঞচরিত্রের বক্তব্য গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করিলে গ্রন্থের কথা-সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইয়া যাইবে। প্রাজ্ঞচরিত্র যতই স্বাভাবিক হউক, আহৃত জ্ঞান বিদ্যা যদি তাহার রক্তমাংসের জীবনকে ছাড়াইয়া উঠে, তাহা হইলে তত্ত্ব কথাসাহিত্যকেও ছাড়াইয়া উঠিবে।

আর্টিষ্টের গৌরব থিঙ্কারের গৌরব হইতে ঢের বেশী—এই কথাটি আর্টিষ্ট মনে রাখিলে অনেক গোলই চুকিয়া যায়। থিঙ্কারের গৌরব লাভ করিতে হইলে স্বতন্ত্রভাবেই করা উচিত—রসসাহিত্যের মারফতে একাধারে দুই গৌরব—লাভ করিবার চেষ্টা না করাই ভালো।

এ-দেশে এখনও আর্টিষ্টের গৌরব থিঙ্কারের গৌরবকে ছাড়াইয়া উঠে নাই—লোকে এখনও একজন কবি বা কথা-সাহিত্যিককে একজন অধ্যাপকের চেয়ে উঁচু আসন দিতে চায় না। ফলে অনেক সময় আর্টিষ্টরা তাঁহাদের রচনার রসবোধের জন্ম—এমন কি উদরান্নের জন্মও থিঙ্কারদের মুখাপেক্ষী। সেজন্ম অনেক সুলেখক নিজকে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত করিবার জন্ম আপনাদের রচনার মধ্যে অধীত বিদ্যাকে ভরিয়া দিবার জন্ম ব্যগ্র। এমন কি কেহ কেহ ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের যে যথেষ্ট জ্ঞান আছে—বিদেশী সাহিত্য যে তাঁহাদের পড়া আছে—মানব-সভ্যতার নানা শাখার বিবর্ত্তনের যে তাঁহারা খোঁজ রাখেন—তাহা পাঠক সাধারণকে জানাইবার জন্ম অনেক কিছু ভেজাল রস-সাহিত্যের পুস্তকে ভরিয়া দিতেছেন। ইঁহারা থিঙ্কার বলিয়া পরিচিত হইবার আগে বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন।

যে-সকল আর্টিষ্ট বিদ্বান্ নহেন—তাঁহারা অবিদ্বান্ পাত্র-পাত্রীর সৃষ্টি করিয়া কেবল তাহাদের মুখের জবানীর দ্বারা অনায়াসে চমৎকার রসসাহিত্য রচনা করিতে পারেন—তাহাতে সাহিত্য অনেকটা নাট্যাকার ধারণ করে। উপন্যাসে আবহাওয়া সৃষ্টির জন্ম ঘটনাদির পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ম, মাঝে মাঝে একটু, আধটু Reflection-এর জন্ম নিজের মুখের জবানীও বসাইতে হয়। এই জবানীতে কিছু বিদ্যার প্রয়োজন। অচতুর আর্টিষ্ট এইখানেই ধরা পড়েন—আর্টিষ্ট বলিয়া লোকে স্বীকার করিলেও পাঠক বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ করে। বুদ্ধিমান্ আর্টিষ্ট ঐ সকল স্থানে কৌশলে কাজ সারেন—তিনি আপনার ক্ষমতার বাহিরে যাইবার চেষ্টাও করেন না।

আমাদের বাংলাদেশে ঐ ধরণের আর্টিষ্ট কতকগুলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর আর্টিষ্ট যতদূর সম্ভব নিজের জবানী কলা বর্জ্জন করিয়া চলেন—আর এক শ্রেণীর আর্টিষ্ট এ-বিষয়ে বে-পরোয়া।

দুই

এ-দেশে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র, Scott' Dickens, Thackeray, George Elliot ইত্যাদি তাঁহার বিদেশী গুরুগণের মত উপন্যাসই রচনা করিয়াছিলেন। ছোট গল্প রচনার দিকে মন দিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষেই ছোট গল্প লেখা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে কাব্যরসেরই আতিশয্য দৃষ্ট হয়—এক একটি গদ্যে লেখা আখ্যানময়ী কবিতারই মত।

এ-দেশে যে-সকল উপকথা প্রচলিত ছিল অথবা উপকথার পুস্তক বাহির হইয়াছিল তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের গল্পের কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ, এই দুই শ্রেণীর কথাসাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন গোষ্ঠীর। উপকথার মধ্যে কোন সত্য নাই—উহা সম্পূর্ণ অলীক কল্পনার খেলা, শিশুজন-মনোরঞ্জনের জন্ম রচিত। সাহিত্যের অতি নিম্নস্তরেই উহার স্থান! রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পের প্রবর্ত্তন করেন—তাহা এক একটি গূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আখ্যানবস্তুকে সত্য বলিতেছি না। আখ্যান-বস্তু যাহাকে মেরুদণ্ডস্বরূপ আশ্রয় করিয়াছে—তাহা মানব-জীবনের এক একটি গভীর সত্য—মানবমনের একটি নিগূঢ় তথ্য। এই সত্য বা তথ্য চিরন্তন, গল্পটি কবির কল্পনা-প্রসূত—কোথাও হইতে ধার করা নয়, সম্পূর্ণ কবিরই সৃষ্টি। এমন কলাকৌশলের সহিত ঐ সত্য ও স্বপ্ন, তথ্য ও কল্পনা উপস্থাপিত যে উহা শিশু-মতির নয়—পরিণত মতিরই উপভোগ্য এবং সাহিত্যের অতি উচ্চস্তরের সামগ্রী। গল্পের বৈচিত্র্যই ইহার প্রধান সম্পদ্ নয়—উপস্থাপনের কলাকৌশলেই ইহার প্রধান মর্য্যাদা। উপন্যাসের সহিত ইহার একটা পার্থক্য এই—ছোট গল্পে উপন্যাসের মত চরিত্র-সৃষ্টি বা ঘটনা-বৈচিত্র্যের প্রাবল্য নাই, মনের কথাই একটি চিত্র বা দৃশ্য অবলম্বনে সরস করিয়া বলাই প্রধান ধর্ম্ম। উপন্যাসের নিজের একটা প্রকৃতি ও গতিবেগ আছে—উহা তদনুসরণ করিয়া চলে। আখ্যানবস্তুর নিজস্ব স্বাভাবিক গতি অনেক সময় লেখকের লেখনীর স্বাধীনতা হরণ করিয়া লয়। কবিতার মত ছোট গল্পকে মনে মনে আগেই রচনা করিয়া পরে লিখিয়া ফেলিতে হয়—উহা সম্পূর্ণ মনেরই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছোট গল্প রচনায় ইউরোপ হইতেই দীক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যিনি ইউরোপে ছোট গল্পের রাজা—সেই মোপাসাঁর প্রভাব তাঁহার গল্পে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পর দেশে যে বিবিধ প্রকারের ছোটগল্প রচিত হইয়াছে তাহার উপর একদিকে রবীন্দ্রনাথের, অন্যদিকে মোপাসাঁর প্রভাব লক্ষিত হয়। এখন ছোট গল্পে বঙ্গদেশ রীতিমত সমৃদ্ধ। এখন ছোটগল্পে ফরাসী, ইংরাজী ও রুশ সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়। ছোট গল্পের আকৃতি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যও বাড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পর প্রভাতকুমার, চারুচন্দ্র, কেদারনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রেমেন্দ্র, জগদীশ, অসমঞ্জ, মাণিক বন্দ্যোঃ, অন্নদাশঙ্কর, মনোজ বসু, সরোজ রায় চৌধুরী, প্রবোধ সান্যাল, বনফুল ইত্যাদি বহু সুলেখক সাহিত্যের এই অঙ্গের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ইহাদের পর গজেন্দ্র মিত্র, সুমথ ঘোষ, সুবোধ ঘোষ ইত্যাদি আর একদল শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে প্রবর্ত্তিত এই সাহিত্য-শাখাটি যেরূপ ফলাঢ্য ও পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে অন্য সাহিত্য শাখাগুলি তেমন হয় নাই।

ছোট গল্প এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান বাণীরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, সাহিত্যের যে কোন অঙ্গ, প্রবন্ধ পর্য্যন্ত এখন ছোট গল্পের আকারে রূপ লাভ করিতেছে। কবিতাকেও ছোট গল্পে রূপকরূপ দেওয়া হইতেছে, উপন্যাসকেও ছোটগল্পের মধ্যে সংহত করা হইতেছে—কোন প্রতিপাদ্য সত্য-বিশেষকে ছোট গল্পের লীলা বৈচিত্র্যে সরস বাণীরূপ দান হইতেছে। ছোটগল্পের আকারে নিছক চিত্রাঙ্কনও হইতেছে—ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইতেছে—কৌতুকনাট্যকে অপরোক্ষরূপ দেওয়া হইতেছে, নক্সাও আঁকা হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনন্যসাধারণ রসঘন বাণীরূপ আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি নাই—তাই কবিতার দিক হইতে আমরা একটুও আগাইতে পারি নাই। কিন্তু ছোট গল্পের তরলায়িত দৃষ্টান্তমূলক রূপটিকে আমরা সহজেই অনুসরণ করিতে পারিয়াছি তাই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আশাতীত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

তিন

বিদ্যালয়ের শিক্ষা শ্রমক্লেশ ও কঠোরতার সহিত চিরদিন বিজড়িত ছিল, শত চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও সাবলীল ও অনায়াস হইয়া উঠে নাই। কিন্তু লোকশিক্ষা চিরকালই সকল দেশে আনন্দের পুটেই বিতীর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে যাত্রাগান, ছড়া, পাঁচালি, কথকতা ইত্যাদির মধ্য দিয়া উহা প্রচারিত হইত। কথক ঠাকুর তাঁহার কথকতা রসালো করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেন! প্রত্যেক উপাখ্যানকে তাঁহারা উপকথায় পরিণত করিতেন।

আজকাল প্রমোদের সাহায্যে লোকশিক্ষার নানা উপায়ই আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সভাসমিতি একটি লোকশিক্ষার উপায়, সংবাদপত্র একটি। এই দুইটিকে প্রমোদবর্জ্জিত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রদর্শনী, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, সবাক চিত্র ইত্যাদিতে প্রমোদই যেন মুখ্য, লোকশিক্ষা গৌণ। লোকে শিক্ষাকে এইরূপ গৌণভাবেই চায়।

ইদানীং লোক-শিক্ষার আর একটি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেটি হইতেছে কথাসাহিত্য। প্রাচীন কালের কথকতাই কথাসাহিত্যের রূপ ধরিয়াছে বলা যাইতে পারে।

রাজার ছেলেকে কৌশলে লেখা পড়া শিখানোর জন্য বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্র লিখিয়াছিলেন এইরূপ কথিত আছে। পঞ্চতন্ত্রজাতীয় কাহিনী মালার ঐ ভাবে জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক। পণ্ডিতেরা বলেন—বেদ উপনিষদ ষড়্‌দর্শনের কথা জনসাধারণ বুঝিতনা বলিয়া ঋষিগণ পুরাণসাহিত্য রচনা করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বাণী জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ছিল বলিয়া মহাস্থবিরগণ জাতক কথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম কিন্তু এই ভাবে নয়। উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল অবিমিশ্র সাহিত্যের আনন্দ দান করিবার জন্য আর কোন অবান্তর উদ্দেশ্য ইহার ছিল না। ক্রমে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে উপন্যাস সাহিত্যের অত্যন্ত আদর বাড়িয়া গেল। বহু লোকই উপন্যাস পাঠে আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। তখন লোকশিক্ষকগণ দেখিলেন—লোকশিক্ষাপ্রচারের চমৎকার একটি উপায় পাওয়া গিয়াছে। উপন্যাস পাঠের একটা নেশা আছে—এই নেশা যখন লোকের মনে প্রবল হইয়া উঠে, তখন সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিয়া উপন্যাসনির্ব্বাচনের আর প্রবৃত্তি থাকে না। কথাসাহিত্য বলিয়া যাহা কিছু চলিতে থাকে—তাহাই পাঠ করিবার জন্য একটা আগ্রহ জন্মে। লোকশিক্ষকগণ লোকের এই দুর্ব্বলতাটুকু লক্ষ্য করিলেন।

ইউরোপে তাই আজকাল সর্ব্বশাস্ত্রই উপন্যাসের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতেছে। ইউরোপে এখন অনেক লোকগুরুশ্রেণীর প্রাজ্ঞব্যক্তি তাঁহাদের বক্তব্য বা মন্তব্য, অভিজ্ঞতা ও আহৃত বিদ্যাকে নিবন্ধের আকারে বিবৃত না করিয়া উপন্যাসের আকারে বিবৃত করিয়া থাকেন। তাহার ফলে এক শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে—যাহা পুরা উপন্যাস নয়—কিন্তু অন্য নামের অভাবে উপন্যাস নামেই চলে। অবশ্য উপন্যাসের ভঙ্গিতে লিখিতে গিয়া লেখকগণ কোন কোন রচনাকে খাঁটি উপন্যাসে পরিণত করিতে পারিয়াছেন—এ কথা স্বীকার করি। অধিকাংশ স্থলে ঐ শ্রেণীর পুস্তকগুলি উপন্যাস ও নিবন্ধ সাহিত্যের সন্ধিস্থলেই বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল পুস্তক যদি খাঁটি উপন্যাস হইয়া নাই উঠে—তাহাতে ক্ষতি কি? লোকশিক্ষারও ত প্রয়োজন—ঐ ভাবে যদি লোকশিক্ষা হয়ত মন্দ কি? ফাঁকি দিয়া পাঠক সাধারণকে উপন্যাসের নামে নানা বিদ্যা শিখান হইতেছে—ইহাই কি একটা আপত্তি? ফাঁকি হইলেও ইহা জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণকর।

ইউরোপে লোকশিক্ষার বহুবিধ ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে লোকশিক্ষার ব্যবস্থার বড়ই অভাব। আমাদের দেশে

ঐ শ্রেণীর পুস্তক যত রচিত হয় ততই ভাল। কথাসাহিত্য নামটা কিন্তু থাকা চাই—ঐ নামটা না থাকিলে কেহ পড়িবে না।

ঐ শ্রেণীর পুস্তক কেহ লিখিলে খাঁটি উপন্যাস হইল না বলিয়া সমালোচকগণ নিন্দা করেন—কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না—উপন্যাস না হইলেও তাহার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী। কোন সাহিত্য উপন্যাস না হইলেই একেবারে ব্যর্থ হয় না—অন্য একটা কিছু হয়, তাহার দামও কম নয়। মনে রাখিতে হইবে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃত কাব্য না হইলেও সাহিত্য হিসাবে ব্যর্থ নয়।

আমাদের দেশে আসল উপন্যাস সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লোকশিক্ষামূলক উপন্যাসও প্রথম লিখিয়াছিলেন। তার পর হইতে মাঝে মাঝে ঐ শ্রেণীর উপন্যাস এদেশে রচিত হইয়াছে।

বকুলতলার ঘাট (গল্প)

শ্রীরমেন মৈত্র

অনেক গবেষণার পর স্থির হইল বকুলতলার ঘাটের দিকের বাংলোটাই নূতন "একসাইজ ইন্‌স্‌পেক্টারকে" দেওয়া হোক্। এ-দিকটায় গোলমাল নাই, আলো বাতাস প্রচুর, ধুলা আবর্জ্জনার চিহ্ন মাত্র নাই, আর নাই লোকের ভিড়। জায়গাটা ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের লাগিবে ভাল। তা'ছাড়া ওপরওয়ালার হুকুম, ঐ খালি বাংলোটাই সংস্কার করাইয়া কাজে লাগাইয়া দেওয়া হোক্। জয়নারাণবাবু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন বাংলোর সংস্কার করিবার জন্য। লোক ডাকাইয়া চারা গাছপালা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করাইলেন, কূপের সংস্কার করাইলেন, বাংলোর রাস্তাটা ভালো করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখিয়া যাইবার সময় উড়ে মালী জনার্দ্দনকে জানাইয়া গেলেন যে, কাল ইন্‌স্‌পেক্টার সায়েব আসিয়া পড়িবে, আসিলে আগেই তাঁহাকে যেন খবর দেওয়া হয়। আর সে যেন লক্ষ্য রাখে বাগানে কেহ না ঢুকিয়া সৌখীন গাছপালা নষ্ট করে। জনার্দ্দন ঘাড় নাড়িয়া কথাগুলো বুঝিয়া লইল। পরে কহিল—"এ-বাড়ীতে থাকতে তিনি রাজী হবেন তো?"

জয়নারাণ কহিলেন—"রাজী না হবার মানে?"

"না, মানে কেউ থাকতে চায় না কি না তাই বলেছিলুম। তা'ছাড়া এ্যাদ্দিন তো খালিই পড়েছিলো। অনেকে বলে—"

"তোর মাথা। খুব রাজী হবে, খুব রাজী হবে। এমন বাড়ী—সঙ্গে বাগান, বিজলী আলো, পাশেই গঙ্গা। এ-সব পাবে কোথায়! তোকে ও-সব ভাবতে হবে না। বিকেলের দিকে একটা ঠাকুর আর একটা চাকরের ব্যবস্থা করে আসবি, বুঝলি।"

"আচ্ছা।"

যথারীতি উপদেশ দিয়া জয়নারাণবাবু চলিয়া গেলেন। জনার্দ্দন বাগানের দরজা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বাংলোর আসবাবপত্র গুছাইবার কাজে লাগিয়া গেল।

ইন্‌স্‌পেক্টার আসিয়া গেলেন। প্রৌঢ় সুদর্শন, অমায়িক। নূতন সায়েবকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইল। দেখিয়া সকলে খুসী হইল। সায়েবকে লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইল যে ইতিপূর্ব্বে এরূপ সৎ লোক আর এ-অঞ্চলে আসে নাই। ইন্‌স্‌পেক্টার চৌধুরী নমস্কার করিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া লইলেন। খুসী হইয়া সকলে চলিয়া গেল।

প্রত্যেককেই মাঝে মাঝে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্নান করিয়া লইবার জন্য চৌধুরী ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। সকলে যাইবার পর বাংলোর বারান্দা যখন নীরব হইয়া গেল জয়নারাণবাবু তখন আসিয়া পড়িলেন। জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি চেয়ার আগাইয়া দিয়া জানাইল যে সায়েব আসিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি সম্প্রতি স্নানের ঘরে। জয়নারাণবাবু বসিলেন। বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। বাংলোর রূপ যেন ইতিমধ্যে খানিকটা বদলাইয়া গিয়াছে। জানালা দরজা পূর্ব্বে পর্দ্দা দেওয়া ছিল না। এখন কোথা হইতে নীল রং-এর পর্দ্দা আনিয়া লাগানো হইয়াছে। দু'একখানা বেতের চেয়ারও কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। কাজের ত্রুটি নাই। টেবিলের উপর খবরের কাগজটি পর্য্যন্ত রাখিতে ভুল হয় নাই। এইবার নেমপ্লেটটা লাগাইলেই হয়।

স্নান সারিয়া ঢিলা পাতলুন পড়িয়া খবরের কাগজ হাতে চৌধুরী বাহির হইয়া আসিলেন। জয়নারাণবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন—"আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম।"

চৌধুরী হাসিয়া কহিলেন—"বসুন"

জয়নারানবাবু বসিতে বসিতে কহিলেন—"সকালে এসে উড়ে মালীটাকে দিয়ে আমি আপনার সব ব্যবস্থাই করে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সন্ধ্যে নাগাদ এসে পড়বেন। তা পথে কোন রকম অসুবিধে হয় নি তো?"

"না, না, অসুবিধে আর কি।"

"বাংলো খুঁজে নিতে কষ্ট হয় নি?"

"না। সাত বছর আগে এই বাংলোতেই একদিন আমি ছিলাম। সবই তো আমার চেনা। ভুল হবার যো কি। বলিয়া চৌধুরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জয়নারাণবাবু অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সাত বছর আগে আপনি এখানে ছিলেন?"

চৌধুরী দূরে দৃষ্টি মেলিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, নাম শুনলে চিনতে পারবেন বোধ হয়। আমার নাম জে, চৌধুরী।"

"খুব, খুব। আপনার নামের সঙ্গে আমি বিলক্ষণ পরিচিত। তবে চাক্ষুষ দেখা এই প্রথম। আমি হচ্ছি এখানকার ওয়াইন্ মার্চেন্ট জয়নারাণ দে।"

চৌধুরী পুলকিত হইয়া কহিলেন—"আই সি। একই রাস্তায় আমরা তা'হলে।"

জয়নারাণবাবু হাসিয়া কহিলেন—"তা' এক রকম বটে।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চৌধুরী কহিলেন, প্রথমে কাজে ঢুকেই এখানে আসি। পুরো একটি বছর ছিলাম। এখন তো অনেক বদলে গেছে দেখছি।"

"তা অবশ্য অনেক বদলানো সম্ভব। ওদিকটা একেবারে আঁস্তাকুড় ছিলো বল্লেই হয়। হ্যাঁ, ভুলে গেছি জিজ্ঞেস করতে, আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো। মানে, কি ব্যবস্থা করেছেন।

"ব্যবস্থা আর করবো কি। গাড়ীতেই সেরে এসেছি। রাত্তিরের জন্যে

মালীটাকে বলে দিয়েছি আজকের জন্যে কোন দোকান বা হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসবে।"

"কিছু দরকার নেই, কিছু দরকার নেই। আমার ওখানেই চলুন। আমি বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধ্যে বেলা কোথাও বেরুবার তাগিদ নেই তো?"

"না তা অবশ্য নেই, কিন্তু আপনি অনর্থক আমার জন্যে"—

"থামুন থামুন। Formality রাখুন। কোথাও বেরুবেন না। সন্ধ্যের আগেই আমি নিজে গাড়ী নিয়ে আসবো। এখান থেকেই নিয়ে যাবো। বাড়ীতে একটা উৎসব কিনা। একটু আগেই যেতে হবে। ছেলে-মেয়েদের নাচ গান।"

"আমাকে আর ও দলে টানবেন না।"

"টানবো না মানে? আপনাদের মত অতিথি পাওয়া ভাগ্যের কথা। যাবার সময় জনার্দ্দনকে আমি বলে যাচ্ছি আপনার জন্যে যাতে সে আবার হোটেলে না ছোটে। স্ত্রী এসেছেন তো?"

চৌধুরী হাসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন,—"স্ত্রী-ই নেই। আসবে কোত্থেকে।"

"বলেন কি। এত বড় বাড়ীটায় একলা থাকবার অসুবিধে হবে না?"

"কিছুমাত্র না। ঠাকুর চাকর আমি। এই তিনজনই বাংলোতে যথেষ্ট।" জয়নারাণবাবু হাসিলেন। পরে কহিলেন,—

"অসুবিধে হলে জানাবেন কিন্তু। আমিই আপনার জন্যে এই বাংলো ঠিক করেছিলাম। আপনার অসুবিধে হলে আমিই দায়ী। তবে আমার মনে হয় এ বাড়ী আপনার পছন্দ হবে। সামনে গঙ্গা, ভেতরে বাগান, মানুষের ভিড় নেই, গোলমাল নেই। আমার তো এই রকম জায়গা ভালই লাগে।"

"আমারও বেশ লাগছে।"

জয়নারাণবাবু চুপ করিয়া জানালার ভিতর দিয়া দূরে গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। নদীর কি রূপ! বর্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। পুবের বাতাস তবুও থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া আসে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের তলায় সাদা সাদা বকগুলো কোথায় উড়িয়া চলে কে জানে। নদীর জল স্থির। নৌকার ভিড় নাই। মানুষের কোলাহল নাই। চমৎকার। সহসা নিরবতা ভাঙ্গিয়া তিনি কহিলেন। "দেখুন না কত লোক আপনার কাছে আসবে।"

"এরই মধ্যে অনেকে এসে চলে গিয়েছেন।

"তাই নাকি! উৎসাহ তো খুব দেখছি। এই তিন দিন ধরে লোককে আপনার কথা শোনাতে শোনাতে মশাই হায়রাণ। বলে, কবে তিনি আসছেন, কেমন দেখতে, কেমন লোক এই সব অদ্ভুত প্রশ্ন। বিরক্ত হয়ে শেষে বললাম তিনি এলে গিয়ে দেখে এসো।"

চৌধুরী কহিলেন,—"সেই জন্যেই বোধ হয় ভিড় হয়েছিলো। দেখলুম ছেলে ছোকরাই বেশী।"

"হবেই তো। সামনেই পুজো। বাবুরা সব থিয়েটার করবেন। তাই বোধ হয় দেখতে এসেছিলেন আপনাকেও দলে টানা যায় কিনা।"

"এসবও এখানে আছে নাকি?"

"প্রচুর প্রচুর। গান, বাজনা, নাচ, charity এ সব তো এখানে লেগেই আছে। তা ছাড়া Public Library, Debating Society এ সবও।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। তবুও মাঝে মাঝে libraryতে যাওয়া যাবে।"

"নিশ্চয়ই যাবেন। আপনাকে আজই সন্ধ্যার পথ ঘাট, ইস্কুল, দোকান বাজার সব চিনিয়ে দোব। এখন তবে উঠি। এ সময়টা আবার দোকানে না থাকলে—মানে যত সব ছোটলোক নিয়েই তো কারবার।" বলিতে বলিতে জয়নারাণবাবু উঠিলেন। যাইবার সময় চৌধুরীকে বিশ্রাম লইতে বলিয়া গেলেন।

ইনস্পেক্টারকে লইয়া যে সমালোচনাটা হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, হঠাৎ তাহা একদিন বন্ধ হইয়া গেল, এবং সামনের দুর্গা পূজা লইয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বকুলতলায় এই একটিমাত্র পূজা। তাহাও বছরে একবার। সুতরাং সকলেরই উল্লসিত হইয়া উঠিবার কথা। দোকানে বাজারে পথে ঘাটে পূজা আসিতেছে রব পড়িয়া গেল। আবাল-বৃদ্ধ বণিতার মধ্যে নূতন সাড়া জাগিয়া উঠিল পূজা আসিতেছে। একদল লাগিয়া গেল পূজামণ্ডপ পরিষ্কার করিতে, একদল তদ্বির করিতে ছুটিল। রাশি রাশি বাঁশ কাটিয়া বোঝাই করা হইতে লাগিল। ছোকরা মহলে থিয়েটারের রিহার্সাল বসিয়া গেল। প্রতি পূজায় তাহারা সখের অভিনয় করিবেই।

চৌধুরীর কাজ এখন কম। সন্ধ্যার দিকে বাহির হইয়া একবার Library-তে যান। সেখানে খানিকক্ষণ থাকিয়া হাসি গল্প করিয়া রেডিও শুনিয়া সময়টা কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়েন, তারপর মন্থর গতিতে গঙ্গার ধার দিয়া বহু দূর বেড়াইয়া খানিকটা রাতে বাংলোয় ফিরিয়া আসেন। বাংলোয় আসিয়া আহার শেষ করিয়া বারান্দায় চেয়ার লইয়া দূরপ্রসারিণী গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসেন। জ্যোৎস্নায় বকুলতলার ঘাটের উপরের বটগাছের পাতা বাতাসে কাঁপিতে থাকে। ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলো ঢেউএর তালে তালে দোল খাইতে থাকে। দূর হইতে ষ্টীমারের সঙ্কেতধ্বনি হাওয়ায় ভাসিয়া আসে। জ্যোৎস্নায় ছেঁড়া ছেঁড়া পুঞ্জীভূত সাদা মেঘ নাচিয়া নাচিয়া কোথায় চলিয়া যায়। তাহারা সকলে মিলিয়া যেন জানাইয়া যায়...পূজা আসিতেছে। চৌধুরী আলো নিভাইয়া উঠিয়া যান।

সকালে উঠিয়া আবার বাহির হইয়া যান, ফেরেন অনেক বেলায়। খানিকটা বিশ্রাম করিয়া আবার বাহির হইয়া যান। ফিরিয়া আসেন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই। করিবার মত কাজ যখন থাকে না, তখন সিনেমায় গিয়া ঘুরিয়া আসেন। কখনও জয়নারাণবাবুর দোকানে গিয়া বসেন, গল্প হাসি ঠাট্টা চলে। কখনও তাস খেলিতে বসেন। এক কথায় সময়টা তাঁহার ভালোই কাটিতেছে। জয়নারাণবাবু মাঝে মাঝে তাগিদ দেন—"সময় তো ভালোই আপনার, বয়সও এখন বেশী কিছু হয় নি। সংসার ধর্ম্ম এবার করুন না।"

"কি হবে জয়নারাণবাবু, এই বেশ আছি।"

"বেশ আছেন বলেই তো বলছি আপনাকে। হবে, পরাণেকে কি আর বলবো। বয়েস, গুণ দুটোই আছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে চাকরীটাও ভালো। দেখুন রাজী থাকেন তো দেখি একটি মেয়ে। একবার দেখলে আপনার আর রাজী না হয়ে উপায় নেই।"

"সেই জন্যেই তো দেখতে চাই না। শাস্ত্রে বলেছে পড়েন নি, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

"সত্যি ঠাট্টার কথা নয় মিঃ চৌধুরী।"

"এখন ওটা তবে মুলতুবী থাক জয়নারাণবাবু।"

তারপর উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জয়নারাণবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "জায়গাটা কেমন লাগছে?"

"খুব ভাল।"

"বাংলোতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"না। বড় ফাঁকা বাড়ীই আমি পছন্দ করি। আমার বেশ ভাল লাগে।"

"সেকি মশাই? আমাদের যে হরিঘোষের গোয়াল ছেড়ে বেরুবার উপায় নেই।"

"সংসারী মানুষ কিনা।" চৌধুরী ঈষৎ হাসেন। জয়নারাণবাবুর ভাল লাগে এই কর্মব্যস্ত, চঞ্চল প্রকৃতির আপনভোলা লোকটিকে।

কিন্তু দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জয়নারাণবাবুর এ মত বদলাইয়া গেল। চৌধুরী অল্পকাল নিয়মিত আসিতেছেন না। মাসখানেক পরে জনার্দ্দনের সহিত জয়নারাণবাবুর দেখা হওয়াতে তিনি জানিতে পারিলেন, সায়েব বোধ হয় শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন। জয়নারাণবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ চলে যাওয়ার মানে?"

জনার্দ্দন কহিল—"জানি না।"

কি যেন ভাবিতে ভাবিতে জয়নারাণবাবু কহিলেন, "বুঝেছি।"

জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি কহিল—"আমি তো আপনাকে তখনই বলেছিলাম এ বাড়ী ভাল নয়। অন্য বাড়ী দেখুন। পোড়ো বাড়ীতে কি ভদ্দরলোক থাকতে পারে?"

"না রে সে সবের জন্যে নয়।"

"নয়?" বলিয়া জনার্দ্দন খানিকটা থামিয়া আবার কহিল—"কি জানি বাপু! তবে রোজই দেখি সমস্ত রাত ধরেই ওঁর ঘরে আলো জ্বলে। আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ।"

"বলিস্ কি, সমস্ত রাত আলো জ্বলে?"

"বাঃ আমি নিজের চোখে দেখেছি যে।"

জয়নারাণবাবু খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ রে বাবু বাড়ী ফেরেন কটায় জানিস্।"

"রাত দশটা, কোনদিন এগারোটা।"

"হুঁ। সঙ্গে আর কেউ থাকে?"

"কই তেমন কাউকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।"

"আজ ফিরবেন কখন বলে গেছেন কিছু?"

"আজ তো ফিরবেন না। দু'দিন হোল তিনি বাইরে গেছেন।" বলিয়া জনার্দ্দন খানিকটা থামিয়া আবার কহিল—"আপনি একটা ভালো বাড়ী দেখতে পারেন না। শেষে বাড়ীর জন্যে আমার সায়েব চলে যাবেন। সায়েব বড় ভালো লোক। চলে গেলে আমার যে বড় মুস্কিল হবে।"

"জনার্দ্দন, তুমি বোধহয় জানো না, তোমার সায়েব মাতাল।"

"মাতাল!"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয় অসচ্চরিত্রও।"

জনার্দ্দন শঙ্কিত হইয়া কহিল, "কিন্তু তাঁকে তো তেমন অবস্থায় কোনদিন দেখিনি।"

"আর দু'দিন যাক্ তারপর দেখবে। দেখেছ তোমার সায়েবের চোখ দুটো কি রকম লাল, চোখের কোণে কালি, চুলগুলো রুক্ষ। এসব যার থাকে, সমস্ত রাত যার ঘরে আলো জ্বলে, তাকে মাতাল ছাড়া অন্য কি বলা যেতে পারে?"

"উনি সিগারেটই তো বেশী খান। অন্য কোন নেশা আছে বলে তো শুনিনি।"

"অন্য নেশাও আছে জেনে রাখো। আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখাও করেন না। আগে আগে তবু আমার ওখানে যেতেন, এখন বাইরে ছোটেন। বাড়ীও আসেন না। আমরা সব বুঝি জনার্দ্দন। তোমার সায়েব যদি চলে যায় তার জন্যে দুঃখ কোরো না। আবার একজন সায়েব আসবে! এটা ভদ্রলোকের পাড়া, নেশাখোরদের নয়।"

জনার্দ্দন কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। জয়নারাণবাবু ধীরে ধীরে উঠিলেন, পরে কহিলেন, "দিন চারেক পরে আর একবার এসে খবর নেব। আমার মনে হয় তোমার সায়েব এর ভেতরেই এসে পড়বেন।"

"কি জানি আসতেও পারেন।"

"এলে ব'লে দিও আমি আসবো দেখা করতে অনেক দরকারী কথা আছে। পুজোর আর দেরী নেই। তাঁর হাতে মস্তবড় একটা কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি উধাও। এমন হ'লে চলবে না। ব'লে দিও, বুঝলে।"

জনার্দ্দন মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কয়েকদিন ধরিয়াই জয়নারাণবাবুর মনে হইতে লাগিল চৌধুরীকে তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক সে রকম ধরণের লোক তিনি নন। তার প্রধান কারণ তিনি অবিবাহিত; এবং অবিবাহিত হইলেই অসংযত হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ করা আদৌ ভাল হয় নাই। সংসারে লোক চেনা বড় কঠিন। প্রথম দর্শনেই তাঁহার মনে হইয়াছিল লোকটা উচ্ছৃঙ্খল। তা বলিয়া চোখের উপর ও পাড়ার ভিতর যে এমন করিয়া হল্লা করিবে তাহা তাঁহার মনে হয় নাই। ঠাকুর, চাকর পর্য্যন্ত মনিবের কীর্ত্তি জানিয়া গেল। এমন লোকের হাতে কোন কাজের ভার না দিলেই ভাল হইত। জয়নারাণবাবুর মনে হইল তিনি ভুল করিয়াছেন। লোকে এ-সব কথা শুনিলে কি মনে করিবে। জনার্দ্দন বোকা তাই মনে করিয়াছে বাড়ী ভাল নয় বলিয়া চৌধুরী চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আসলে তা নয়। লোকটা বেহেড মাতাল। ভদ্র পাড়ায় থাকিয়া মাতলামি করিবার যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে না বলিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য তাহার এত আগ্রহ। আশ্চর্য্য…!

কথাটা কি সালকারে ছোকরা মহলে, লাইব্রেরীতে এবং বন্ধু মহলে পরিবেশন করিয়া দিলেন জয়নারাণবাবু। ইন্সপেক্টার সম্বন্ধে যে ধারণাটা লোকের প্রথম হইতেই ছিল, এইবার তাহার রূপ বদলাইয়া গেল। চারিদিকেই চৌধুরীকে লইয়া গুরুতর আলোচনা চলিতে লাগিল। জয়নারাণবাবু বুক ফুলাইয়া প্রচার করিলেন যে নূতন ইন্সপেক্টারকে আনিবার জন্য লেখালেখি হইতেছে। চৌধুরীর মত অসৎ ব্যক্তির এখানকার চাকরীর মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। মুখে এই সব বলিয়া বেড়াইলেও, জয়নারাণবাবুর ভাবনা হইতে লাগিল। চৌধুরী না আসিলে তাঁহার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা করিবে কে! সমস্ত পুজা মণ্ডপের জন্য ইলেক্ট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা বড় সহজ কথা নহে। চৌধুরী ছাড়া এ সমস্ত কাজ ভালভাবে কাহারও দ্বারা হইবে না। ফলে আলোর অভাবে বিভ্রাট ঘটিবে। তাছাড়া থিয়েটার শেষ পর্য্যন্ত হইবে কি না কে জানে! জয়নারাণবাবুর রাগ হইতে লাগিল, এই সব অর্ব্বাচীনদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাঁহার ইচ্ছা হইল লোকটাকে একবার ধরিতে পারিলে মনের মতন গোটা কতক কথা শুনাইয়া দেন। কিন্তু ইচ্ছাটা মনেই আপাততঃ চাপিয়া তিনি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিয়া চলিলেন।

যে সুযোগটার জন্য তিনি এতদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহা অকস্মাৎ একদিন মিলিল। জনার্দ্দনের কাছে খবর পাওয়া গেল যে চৌধুরী ফিরিয়াছেন। জয়নারাণবাবু আরও দুইদিন ঘরে বসিয়া রহিলেন, চৌধুরীর সহিত দেখা করিলেন না। আশা ছিল চৌধুরী নিজেই আসিয়া দেখা করিবেন। কিন্তু তিনিও আসিলেন না। জয়নারাণবাবু স্থির করিয়া ফেলিলেন একটা বিহিত করিতেই হইবে। রুদ্ধ আক্রোশ মনের ভিতর চাপিয়া চৌধুরীর বাংলোয় আসিয়া যখন পৌছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় একটা। নিস্তব্ধ চারিদিক, ঘুমন্ত বকুলতলার ঘাট। অল্প জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। আশ্বিনের রাত্রির মৃদু চন্দ্রালোক নূতন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। পথে কোলাহল নাই। গৃহে কলরব নাই। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষে শ্রান্ত জনসাধারণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল জাগিয়া ছিল জনার্দ্দন। জয়নারাণবাবু একেবারে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন চৌধুরীর ঘরে এখনও ম্লান আলো জ্বলিতেছে। জনার্দ্দনের কথা সত্য। মনের সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত ভয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি চৌধুরীর ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাণ পাতিলেন দরজায়। কিছুই শোনা গেল না। কেবল

ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের শব্দ, মাঝে মাঝে সিগারেটের উগ্র গন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে। দরজায় মৃদু চাপ দিয়া বুঝিলেন দরজাও ভিতর হইতে বন্ধ।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে ধাক্কা দিলেন। এক, দুই, তিন...। কর্কশ কণ্ঠে ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল—"কে?"

সঙ্গে সঙ্গে দরজাও খুলিয়া গেল। দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন চৌধুরী। মলিন বেশভূষা, চুল রুক্ষ, কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরণে ঢিলা পাঞ্জাবী ও পাৎলুন, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ দুটা যেন ভিতরে বসিয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালিমা। জয়নারায়ণ এ মূর্ত্তি তাঁহার কোনদিন দেখেন নাই। তাই প্রথমটা তাঁহার সন্দেহ হইল চৌধুরী প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি ভাবিবার অবসর পাইলেন না; দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া চারিদিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান মিলিল না।

চৌধুরী কহিলেন, "এত রাত্তিরে কি মনে করে জয়নারাণবাবু?"

জয়নারাণ কহিলেন, "এখনও জেগে কি করছেন?"

চৌধুরী হাসিলেন, কহিলেন "নাঃ করবার আর কি আছে? এমনি জেগে থাকি। জেগে থাকতে ভাল লাগে আমার।"

"আপনার এই ধরণের জেগে থাকাকে বাইরের লোকে কি ধরে নেয় জানেন তা আপনি?"

"বাইরের লোক বলতে আপনিই তো ধরে নিয়েছেন দেখছি। বসুন। আমার নামে যে সব অপবাদ রটেছে তা' আমার কাণে এসেছে জয়নারাণবাবু।"

"তা সত্ত্বেও এমন করছেন কেন?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন, খারাপ কিছু করছি না। আর করলেও আমার Private life নিয়ে টানাটানি করাটা অন্যের পক্ষে ভদ্রতা নয়।"

"লোকের কটূক্তি তাহলে আপনি ভয় করেন না, মানে অগ্রাহ্য করেন'।

"অন্ততঃ তাই যদি করি। তাছাড়া ও সব মিথ্যে অপবাদের উত্তাপ বেশীদিন থাকে না। আমি জানি আপনারা আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছেন।"

"নিতে বাধ্য হয়েছি আপনার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে।"

উচ্ছৃঙ্খলতার মিথ্যা কতকগুলো প্রমাণ হয়ত আপনাদের আছে কিন্তু তার আগে আমি যদি জিজ্ঞেস করি উচ্ছৃঙ্খলতা বলতে আপনি কি বোঝেন। আর আপনি যা বোঝেন, তা তো ঘরে ঘরেই দেখতে পাবেন। সংযম ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা তো চোখের উপর অহরহই দেখছি। অনেকে ধরা পড়ে না, আবার অনেকে ধরা পড়ে তখন যখন রোগগ্রস্ত আধ ডজন ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে পারে না। যেহেতু আমাদের মত লোকের স্ত্রী নেই সেইজন্য আমরা হলাম উচ্ছৃঙ্খল, দুশ্চরিত্র। স্ত্রী থাকলে সংসার ধর্ম্ম করছি বলে বোধ হয় কিছু বলতেন না। আপনি যা ভেবেছেন আর যা প্রচার করেছেন, তা ভুল জয়নারাণবাবু।" বলিয়া চৌধুরী উঠিয়া গেলেন। নিজের টেবিলের কাছে গিয়া ড্রয়ার খুলিলেন, তারপর কাগজে মোড়া কি একটা বাহির করিয়া জয়নারাণবাবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জয়নারাণবাবু এইবার কাজের কথাটা পাড়িলেন—"আপনার ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিলো তা মনে আছে আপনার?"

"খুব আছে। যাবার আগে সে কাজ আপনাদের যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায় তা আমি অবশ্য করে দিয়ে যাবো।"

"কিন্তু এমনি করে রাত জাগলে—শুনেছি রোজই আপনি জেগেই রাত কাটিয়ে দেন। ঘুম না হয় তো আলোটা নিভিয়ে বসে থাকলে পারেন।"

"আলো জেলে রাখলে বদনাম রটবে এ কথা জানলে সাবধান হতাম। ব্যাচিলারের অনেক বিপদ দেখছি।"

চৌধুরী কাগজের প্যাকেটটা এইবার খুলিয়া ফেলিলেন। বাহির হইয়া আসিল এক কিশোরীর প্রতিকৃতি। দু'জনেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন তাহার উপর।

"জানেন এ কে!"

"না।"

"আমার স্ত্রী। জেনে রাখুন আমি অবিবাহিত নই, মৃতদার। সাত বছর আগে এই বাংলোতেই থাকবার সময় সে মারা যায়, আর নিজের হাতে তাকে দাহ করে আসি ঐ বকুলতলার ঘাটে। সাত বছরের সে পুঞ্জীভূত জ্বালার কথা আপনি কেমন করে জানবেন?"

জয়নারাণবাবু মাথায় হাত দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। চৌধুরী খানিকটা থামিয়া আবার বলিয়া চলিলেন:

"আপনাদের সঙ্গে মিশে হাসি, গান, আমোদ উল্লাস কাজ কর্ম্ম করে যাই। আপনারা ভাবেন সুখে আছি—নির্ভাবনায় আর নিশ্চিন্তে। কিন্তু জানেন কি তার পেছনে কত বড় ইতিহাস আছে। এই বাংলোয় থাকবার সময় মাধবীর সঙ্গে বিয়ে হয় আমার। এইখানেই তার ভয়ানক অসুখ করে, এই ঘরেই সে মারা যায়। ঐ ঘাট দেখছেন...ঐ যে শ্মশান-ঘাট, যেখানে লাল আলো জ্বলছে, ওখানেই তাকে দাহ করি। গঙ্গার জল এ্যাদ্দিনে সে সব কোথায় ধুইয়ে নিয়ে গেছে।"

জয়নারাণবাবু এইবার মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমার ভুল হয়েছিল মিঃ চৌধুরী।" আর কোন কথা তাঁহার মুখে জোগাইল না। চৌধুরী থামিলেন না। বলিয়া চলিলেন:

"শুনুন আরও খানিকটা আমার বলবার আছে; সবটুকু না বললে মন আমার হালকা হবে না। মৃতদারের জীবন কাহিনীর খানিকটা না শুনলে চলবে কি কোরে। না শুনলে কি ক'রে বুঝবেন, কেন চোখের কোণে কালি পড়ে।"

"আমি যাই মিঃ চৌধুরী। অনেক রাত হোল, আপনি ঘুমোতে চেষ্টা করুন। এমন ক'রে না ঘুমিয়ে রাত কাটাবেন না।"

"তাইতো এখানে থাকতে আর আমার মন চাইছে না।" চৌধুরী আস্তে আস্তে মৃতা পত্নীর ছবিখানি কাগজে আবার মুড়িয়া ফেলিলেন। তারপর আবার কহিলেন "সমস্ত দিন বেশ থাকি। এই অভিশপ্ত ঘরে ফিরে এলেই আমি আর থাকতে পারি না। কেবল মনে হয় মাধবী কাঁদছে। ঐ দূর ঘাট থেকে ভেসে আসছে তার কান্নার সুর। তাই আমি দাঁড়িয়ে থাকি জানালার সামনে। যদি তাকে একবার দেখতে পাই। সমস্ত রাত আমি দাঁড়িয়ে থাকি জয়নারাণবাবু। রাতের পর রাত এমনি ক'রে কাটিয়ে দিই। ঘুম এলেই মনে হয় মাধবী যেন ঘরে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কিংবা শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গার ঢেউ তীরে তীরে আছাড় খেয়ে পড়ছে, বর্ষার আকাশে কালো মেঘ জমে আসছে। উঃ কি ঠাণ্ডা বাতাস। ঘাটে লোক নেই কেউ। শুধু আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর পাশেই জ্বলছে মাধবীর চিতা ধু ধু করে। ঘুম আমার নেই। শুধু এই চিন্তা আমার। সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারি না। চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ভিতর হইতে কে যেন চাপিয়া ধরিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি মুখে চাপা দিয়া তিনি ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। টেবিল ফ্যানটা তেমনই ঘুরিতে লাগিল, আর জয়নারাণবাবু মাথায় হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন কে জানে!

জনার্দ্দন সবই শুনিয়াছিল, কেবল শুনে নাই সারা রাত ধরিয়া ঘরে আলো জ্বালিবার সঠিক কারণটা কি। কাজেই যে ধারণাটা তাহার গোড়া হইতেই ছিল, সেই ধারণাটাই রহিয়া গেল। মন তাহার বার বার বলিতে লাগিল, সায়েব একেবারে চলিয়া না গিয়া বরং অন্য বাড়ীতে যাইলে, তাহার নিজের খুব ভালো হইত। ইতিপূর্ব্বে চৌধুরী সায়েবের মত এমন সুন্দর লোক সে আর দেখে নাই। তাই সায়েবের যাইবার দিন সমস্ত গুছাইয়া

দিয়া যখন সে ফটকের বাহিরে আসিয়া সায়েবকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া চৌধুরী ক্ষণকালে কি যেন ভাবিলেন। মোটরে উঠিয়া তিনি কহিলেন, 'আমি চললুম জনার্দ্দন।''

জনার্দ্দনের মুখে ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। চৌধুরী কহিলেন—' এবারে যে সায়েব আস্‌ছেন, খুব ভাল লোক তিনি। ভাল করে কাজ কর্ম্ম করিস্।" বলিতে বলিতে ব্যাগ খুলিয়া হাতে যে দুই একটা টাকা তাহাই তিনি তাহার হাতের উপর ফেলিয়া দিলেন। জনার্দ্দন স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। মোটর চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ তেমনিভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কাঁধের উপরের গামছাখানা দিয়া ধীরে ধীরে চোখ দুটা মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেরাণী

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

কবি, কি লিখিলে আজি রজনীতে ভাই ?
কোথায় ভাসিল কল্পনা-তরী, কোন্ কূলে মিলে ঠাঁই ?
প্রেয়সী-কাব্য রচিয়াছ ঢের, আজি বিস্বাদ লাগে ?
স্তিমিত স্মরণে নিভৃত নীড়ের কোন মুখ নাহি জাগে ?
আপন ভার্য্যা তিরিশের পারে পাতিল গৃহস্থালী ?
শিশুদল কাঁদি' কাব্য-ভাণ্ডে নোনা জল দেয় ঢালি' ?
প্রেমের কবিতা ভালো জমে নাকো আর—
শ্রবণে পশিল তাই এ বিশাল স্বদেশের হাহাকার !
কৃষক-মজুর-কুলী-জমাদার মগজে করিল ভিড়,
এ মহাজাতির শক্তি-প্রতিমা সহসা তুলিল শির,
তাহারি পূজার বন্দনা-গানে মুখরিত করি' দিক্,
রাতারাতি, কবি, চারণ হয়েছ তেজস্বী নির্ভীক।

চোখে পড়িলনা গরিব কেরাণী-কুল,
দীন হীন এই বেচারী কেরাণী যেন জীবনের ভুল!
জাতি-কলঙ্ক এই সে কেরাণী, নিষ্কর্ম্মার ধাড়ী
দশটা পাঁচটা খাটিয়া সটান শুধু ফিরে আসে বাড়ী।
সভা-সমিতিতে যায় নাই কভু, বক্তৃতা শোনে নাই,
চাকরি ছাড়িয়া পথে বা হাজতে মাখেনি ত্যাগের ছাই !
স্বদেশী খাতায় চাঁদা দিতে ভয় পায়—
দেশের শত্রু কেরাণী কেবল দাসের অন্ন খায়।

হে কবি চারণ, গণ জাগরণ মন্ত্রের উদ্গাতা
এই বাংলার কাম-কাব্যের নবীন পরিত্রাতা,
তোমারে ধন্যবাদ,—
কেরাণীর গৃহ বর্জ্জন করি পূরাও'ন তব সাধ।
কাব্য জমে না তারে নিয়া, আহা! না জমুক সেই ভালো
কালো মুখে তার তুমি কেন আর কলমের কালী ঢালো!
দেশ জাগিয়াছে, এখনো সে ঘুমে—ঘুমাইতে দাও তারে
বড় ব্যথাতুর, বড় যে ক্লান্ত নিষিক্ত স্বেদ-ধারে।
বাতায়ন-পথে করুণ জ্যোৎস্না মলিন কপোলে লোটে—
ঘুমায় সে আর স্বপন দেখিয়া চমকি' চমকি' ওঠে।

কিসের স্বপ্ন হায়!
বহু দূরে কোথা সর্পিল পথে কী যেন হারায়ে যায়।
ঐ সেই তার কিশোর-কালের কোমল মুখের পরে
অভাগা দেশের শিক্ষা-যন্ত্র কঠোর আঘাত করে—
মনে ছিল বুঝি ডেপুটি হইবে, অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট
কিংবা দারোগা, মর্য্যাদা-সাথে মিলিবে হাজার ভেট—
আত্মীয়জন কহেনিক তা'রে, হবে সে যোদ্ধাবীর,
আরও মহীয়ান্ স্বদেশ-ভক্ত, ধর্ম্মাদর্শে ধীর—
বলে নাই, হবে—কৃষক, কর্ম্মী, শিল্পী, বণিক বড়—
ঘরে ও বাহিরে মিলে নাই কোন প্রেরণা মহত্তর।
বাঁধা পথ দিয়া চলিয়া কখন পশে সংসার ভূমে,—
পুত্র-কন্যা, ঘরণী আসিয়া বরি' লয় স্নেহ-চুমে।
সে চুমার মায়া জঠর-জ্বালায় কাঁদে—
নিঃস্ব কেরাণী মাস-মাহিনায় কোন মতে ঘর বাঁধে!

তারপরে বাজে বক্ষে বেদনা, চক্ষে চাল্‌সে ধরে,
জীর্ণ আলয় কাঁপে ঝড়ে-জলে, দেহ টলমল করে।
কিশোর-বুকের কিসলয়গুলি শুকানো লতার শাখে—
যৌবন কবে এলো আর গেলো, কে তার নিশানা রাখে?
নগরীর কোলে—মানুষের বনে অন্ধ কোটর-তলে
ক্ষীণ জীবনের দীন প্রাণখানি ধীরে ধিকি ধিকি জ্বলে।

সপ্তাহ শেষে গৃহের খবর আসে
বেঁচে আছে বউ, ছেলেমেয়ে গুলো এখনো কাঁদে ও হাসে।
এই কাঁদা হাসা, এযে বড় সুখ! বাঁচিবার সাধ হয়,
ঐ বুঝি ফোটে সোনার কমল, বর্ণগন্ধময়!
না-না ওকি! মরীচিকা!
প্রলয়ের ঝড় ধেয়ে এলো ওকি! নির্ব্বাণমুখী শিখা।
একি গো স্বপ্ন নির্ম্মম নিষ্ঠুর!

হা-হা রবে কাঁদে তুচ্ছ কেরাণী শুনিয়াছ তার সুর?
হে চারণ কবি, আজি রজনীতে রচিলে কাহার গান?
কেরাণী মরুক, বৃহত্তরের চলিয়াছে অভিযান।

ছয়

পশ্চিমবঙ্গের প্রবাহিনী-সমস্যা

বাঙলার নদী-প্রবাহ অত্যন্ত হ্রাস-বৃদ্ধিশীল ও অনিশ্চিত, এই কারণে জমির পুষ্টির জন্য জল-সঞ্চয় দ্বারা এই অভাবটুকু প্রপূরণ করা দরকার। প্রতিরোপণ-কালে ফসল-শস্যাদির বৃদ্ধি-হেতু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে জলের আবশ্যক হয়, তা' উপযুক্ত বৃষ্টিপাতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলার এই অনুকূল অবস্থা প্রকৃতির প্রসন্ন দান। প্রকৃতপ্রস্তাবে—স্বভাবী-বৎসরগুলিতে ভাদ্রের শেষ থেকে কার্ত্তিকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমীর অভাব বা ন্যূনতা প্রতিরোধ-কল্পে কৃত্রিম জলসেচন প্রায়ই অবশ্যকর্ত্তব্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু কার্য্যকালে এর অসুবিধার মাত্রাটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে, কারণ—নদীগুলির পরিবাহ-ক্ষেত্র থেকে জল-সরবরাহ-যোগ্য অঞ্চলসমূহের দূরত্ব খুব বেশী নয়, আর এই দুই অঞ্চলেই অল্প-বিস্তর সমান পরিমাণে বৃষ্টি-পতন হ'য়ে থাকে, তা' ছাড়া ঠিক এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গের নদীসকল স্বল্প-সঙ্কীর্ণ জল-ধারা বহন ক'রে নিয়ে চলে। অথচ এর প্রথম দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি-প্রবাহের সময়ে সাধারণতঃ নদীগুলি অতিরিক্ত বন্যা-তরঙ্গে স্ফীত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে জলাভাবের প্রয়োজন যখন জাগে, তখন তা' ক্ষীণ হ'য়ে যায়। এইজন্য নদী থেকে খাল বা প্রণালী কেটে জল-ধারা বহাবার চেষ্টা খুব কার্য্যকরী হয়ে ওঠে না, উপরন্তু এর ব্যয়-বাহুল্য উপযুক্ত প্রতিদান এনে দিতে পারে না। সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে এইটুকু বলা যায় যে, জল-সঞ্চয় ব্যতিরেকে কোনো সরিতের জল-সরবরাহ কর্‌বার যোগ্যতা নাই। বস্তুতঃ—পশ্চিমবঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে জল-সরবরাহের দৈন্য মেটাতে হ'লে জল-সঞ্চয়-কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন, আর এই জল-সঞ্চয় কর্‌তে হবে প্রাকৃতিক নিয়মে;—এই প্রদেশের খরস্রোতা নদীসমূহের উৎস-সন্নিহিত সানুদেশে জল-ভাণ্ডার গঠিত ক'রে বন্যাকালে জল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, তবেই এই সঞ্চিত জল স্বল্পতার দিনে অশেষ উপকার এনে দেবে। যে অঞ্চলে জল-সরবরাহের কাজ ক্ষুদ্র তটিনীর নিত্য-প্রবাহ দ্বারা সম্ভব, সেখানকার এই কাজের ধারা বহুগুণে উন্নত করা যেতে পারে, কিন্তু তা'র উপায় হ'চ্চে এই যে, সেই অঞ্চলবাহিনী তটিনীর বন্যাজলের কিয়দংশ বন্দী ক'রে রেখে দিতে হবে, তা'র সুফল ফলবে অসময়ে জলাভাবের দিনে—আর প্রতিদিনকার অপরিমিত প্রবাহের অক্ষমতা পূরণ ক'রে তুলবে ঐ সঞ্চিত জল-ভাণ্ডার।

বিশেষজ্ঞের মত এই: "দশলক্ষ ঘনফুট পরিমিত সঞ্চিত জল থেকে মাদ্রাজে যে-ক্ষেত্রে মাত্র পোনেরো-বোলো বিঘা জমিতে জল-সরবরাহ করা সম্ভব, সেখানে বাঙলায় ঐ পরিমাণ জলের দ্বারা প্রায় পঁচানব্বই থেকে একশো বিঘা জমির সেচন বা সরবরাহ-কাজ পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে। আর একটি কথা—পশ্চিম বঙ্গে কার্ত্তিকের শেষ-পক্ষ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় বৈশাখের প্রথম-পক্ষ পর্য্যন্ত সচরাচর অনাবৃষ্টিই লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আক ও রবিশস্য চাষের জন্য এ-স্থলে জল-সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য্য ব'লেই বিবেচিত হয়।...পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কৃত্রিম উপায়ে জল-সরবরাহ-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে জল-সঞ্চয়ের আয়োজন করা অপরিহার্য্য। প্রকৃতপক্ষে—এই কার্য্যের মূলে অনেকখানি অসুবিধা রয়েছে। এই প্রদেশের ডাঙ্গাভূমি সমতল, সেই কারণে এর চতুঃসীমার মধ্যে এমন কোনো উপযুক্ত অবস্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না—যে-স্থলে সঞ্চিত জল বাঁধবার জন্য জাঙ্গাল তোলা যেতে পারে। অবশ্য—এই প্রদেশের নদীগুলির ঊর্দ্ধ-উপত্যকা-ভাগে সঞ্চিত জলাধার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উপযোগী ভূমির সন্ধান পাওয়া যায়—আর এই প্রকার স্থান অন্বেষণ করতে হয় বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার পার্ব্বত্য-অঞ্চলে। এ-সম্পর্কে একটি আশার সংবাদ হ'চ্চে এই: ময় ও দারকেশ্বর নদের উন্নতি-কল্পে অনুসন্ধান করার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে পূর্ব্বোক্ত দু'টি জল-সঞ্চয় কর্‌বার উপযোগী ভূমি। প্রতীয়মান হয় যে—যথোপযুক্ত সঞ্চিত-জল-ভাণ্ডার নির্ম্মাণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ করলে প্রায় ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বিঘা জমিতে জল-সরবরাহ করতে সমর্থ হবে। দ্বারকেশ্বর, আর ময় নদ প্রায় তা'র আড়াইগুণ বেশী জমির ক্ষুধা নিবারণ কর্‌তে পার্‌বে।

এখানে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান প্রধান নদ-নদীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ভাগীরথী বা হুগলী নদী: এই নদীকে তিন ভাগে ভাগ করলে, উত্তরভাগ—মুর্শিদাবাদের নিকট সুতি থেকে নদীয়ার জলাঙ্গী নদীর সঙ্গে সংযোগ পর্য্যন্ত, মধ্যভাগ—নদীয়া থেকে হুগলী পয়েণ্টে রূপনারায়ণের সঙ্গে সংযোগ পর্য্যন্ত, আর দক্ষিণভাগ—হুগলী পয়েণ্ট থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত ধ'রে নিতে হয়। হুগলী নদীর মধ্যাংশ ১২০ মাইল, তন্মধ্যে ৫০ মাইল হুগলী জেলার পূর্ব্বসীমা দিয়ে প্রবাহিত। গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, জিরেট, ব্যাণ্ডেল, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী ও মাহেশ প্রভৃতি স্থানের কাছে হুগলী নদীর দুই কূলে চড়া পড়েছে।

দামোদর নদ—বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ-সীমা ধৌত ক'রে কিছুদূর প্রবহমাণ হ'য়ে এই জেলা-মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই নদ শ্রীরামপুর সাবডিভিসানকে আরামবাগ থেকে পৃথক করেছে। সাপুর ও হরিপুর নামে দুই গ্রামের কাছে হুগলীজেলায় প্রবেশ ক'রে দামোদর ২৮ মাইল প্রবাহিত হ'য়ে হাওড়া জেলায় মধ্য দিয়ে গিয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বীরভূম জেলার দক্ষিণ প্রান্ত-বাহী **অজয়নদ** বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়ে অল্প কয়েক মাইল অগ্রসর হ'য়ে কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে।

দ্বারকেশ্বর বা ধলকিশোর নদ—বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ ক'রে—গন্ধেশ্বরী নদীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে এই জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত, তারপরে গোঘাট ও আরামবাগের মধ্য দিয়ে গমন ক'রে রূপনারায়ণ নাম নিয়ে হুগলীর দক্ষিণ দিক দিয়ে হাওড়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁসে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। মণ্ডলঘাট ও মাহিয়াড়ির কাছে হুগলী জেলায় এই নদ

বাঙলার নদনদীর রেখাচিত্র
সিকিম
ভুটান
আসাম
দার্জিলিং
রংপুর
রাজসাহী
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
ঢাকা
গোয়ালন্দ
ফরিদপুর
কুমিল্লা
নোয়াখালী
চট্টগ্রাম
বর্দ্ধমান
নবদ্বীপ
খুলনা
বরিশাল
ময়ূরভঞ্জ
বালেশ্বর
বঙ্গোপসাগর

প্রবেশ ক'রে ১৪ মাইল প্রবাহিত হবার পরে বালিদেওয়ানগঞ্জের প্রায় এক মাইল নিম্নে দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিমশাখা ঝুমঝুমি—মেদিনীপুরে শিলাই বা শীলাবতী নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আর পূর্ব্বশাখা শাঁক্‌রা বন্দরে শিলাই নদীর মিলনে রূপনারায়ণ নামে পরিচিত। এই আখ্যায় এই নদ মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার সীমা দিয়ে গমন ক'রে হুগলী নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। রূপনারায়ণের মোহনার কাছে জেমস্ ও মেরী নামে দু'টি ভীষণ চড়া বর্ত্তমান।

কাঁশাই বা কংশাবতী নদী বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবেশ করেছে, তৎপরে এই জেলা পার হ'য়ে তমলুক মহকুমার কালিয়াঘাই নদীর সঙ্গে মিশে' হলদে আখ্যায় ভাগীরথীতে গিয়ে পড়েছে।···এই তালো এই প্রদেশের বৃহৎ নদ-নদীর মোটামুটি সংস্থান ও পরিচয়, তা' ছাড়া এই সকল প্রবাহিণীর প্রায়ই স্বল্পকায়া উপনদী কিংবা শাখানদী অনেকগুলি বর্ত্তমান, কয়েকটি মৃতপ্রায়, আবার কয়েকটি সময়ে সময়ে শুষ্ক খাতে পরিণত। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সাহায্যেই সম্পর্কিত জেলা-সমূহের জল-নিকাশ হ'য়ে থাকে। বহু সরিৎ ও খাল উক্ত নদ-নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র নদীগুলিতে সাধারণতঃ জোয়ার-ভাটা খেলে থাকে, এ সম্পর্কে আলোচনা বারান্তরে করা হবে।

এ-স্থলে প্রধান বক্তব্য—এই : বৎসরের পর বৎসর চ'লে যাচ্ছে, কালের এই গতির সঙ্গে উল্লিখিত নদীগুলির জীবন-মরণের সমস্যাও ক্রমাধিক গুরুতর হ'য়ে উঠছে। শরতের পর থেকে এই সকল নদী ক্ষীণ-তোয়া হ'তে হ'তে গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় হ'য়ে যায়। দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়, কাঁশাই প্রভৃতি ভাগীরথীর উপনদী-গুলির উৎস-স্থল ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চল। প্রবলধারায় একবারমাত্র বৃষ্টি হ'লেই ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে জলস্রোত দ্রুতগতিতে নেমে এসে এই সকল নদ-নদীর কায়া অতি-স্ফীত ক'রে তোলে আর অতিরিক্ত জলভার-বহনে অক্ষম নদীগুলি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বন্যা-প্লাবনে চারদিক ভাসিয়ে দেয়।

দামোদর-নদ সমস্যা

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে—কি উপায় অবলম্বন করলে পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলিকে ম'জে-যাওয়ার হাত থেকে অর্থাৎ ক্ষীয়মাণ নদ-নদীকে স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষা করা যেতে পারে। এই সকল নদীকে জীবন্ত ক'রে তুলে দেশের মঙ্গলের জন্য বশে আনা দরকার। খরস্রোতঃপ্রকৃতির নদী-শ্রেণীর মধ্যে দামোদরকেই প্রধান ব'লে মেনে নিতে হবে। দামোদর বর্ত্তমান অবস্থায় বর্দ্ধমানের কাছাকাছি স্থান থেকে যে পরিমাণ জল-ভার বহন ক'রে থাকে—তা' এই নদের স্বাভাবিক বন্যাধারা বলা যায়। কিন্তু এই জল-ভার-বহন-ক্ষমতা অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কারণ তীর-প্রান্তদেশে বাঁধ-বন্ধনের ফলে নদী-গর্ভ ক্রমোন্নত হ'য়ে উঠেছে। সারা বৎসর ধ'রে দৈনিক দু'বার জোয়ার-ভাটার স্রোতে আনীত অতিরিক্ত পরিমাণ পলিপঙ্কে ভরাট হ'তে থাকে নদের নিম্ন-বাঁকগুলি, এমন কি বর্ষা-যোগে সাময়িক বন্যার উচ্ছ্বাসও এই পঙ্কোদ্ধার করতে সমর্থ হয় না, সে-জন্য দামোদর নিম্নবাঁকে যে পরিমাণ জল বহন করতে পারে—তা' পূর্ব্বাপেক্ষা পাঁচ ভাগ কম। এ-ক্ষেত্রে জলোচ্ছ্বাস যদি তেরো গুণ বৃদ্ধি পায়, তা' হ'লে অবশ্যম্ভাবী বন্যার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও তা'র বিপদের বিষয় সহজেই বোধগম্য হ'তে পারে। এই কারণেই ১৯১৩ ও ১৯৩৫-এর ভীষণ বন্যা দামোদরকে বিভীষিকা-স্থল ক'রে তুলেছে। ১৯৪২-এর বন্যাও অল্প বিভীষিকা এনে দেয় নাই।

পূর্ব্বে দামোদরের উভয় তীরেই বাঁধ ছিল, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা দেখে—বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ তীরের বাঁধ অপসৃত করা হয়। অবশ্য এ-কাজে কিছুকালের জন্য বামদিকের বাঁধের উপর অনেকটা জলের চাপ কমে যায়। তবু দামোদরের বন্যা থেকে নিষ্কৃতি পাবার চূড়ান্ত উপায় ব'লে এ-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা যায় না। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে : দক্ষিণ-তীরভূমি পলি-সঞ্চয়ে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হ'য়ে উঠছে, ফলতঃ বাম-তটবর্ত্তী বাঁধে গিয়ে বর্দ্ধমান জলের চাপ প্রবলভাবে ধাক্কা দিচ্চে। এ সম্বন্ধে সত্বর ব্যবস্থা না করতে পারলে—বাম-তটের বাঁধ রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। তবে প্রকৃতি সহায় হ'লে বাঁধ-বন্ধন-মুক্ত দক্ষিণ-তীর দিয়ে একটি জল-নির্গমের পথ বেরিয়ে যদি রূপনারায়ণে গিয়ে পড়ে—তা' হ'লে আসন্ন বিপদের হাত এড়ানো যেতে পারে। প্রত্যুত-প্রকৃতি অনুকূল না হ'লে—অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য একটি কৃত্রিম খাল কেটে রূপনারায়ণের সঙ্গে যোগ ক'রে দিলে এ-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। প্রকৃত-প্রস্তাবে, প্রকৃতি ইতোমধ্যেই বেগুয়া খালের মধ্য দিয়ে একটি জল-নির্গমের পথ আবিষ্কার ক'রে দিয়েছে। এই খাল দিয়ে দামোদরের স্রোতোধারা বহুপরিমাণে রূপনারায়ণে গিয়ে পড়ছে, কিন্তু এ খালের অস্তিত্ব নদের অনেকখানি নীচের বাঁকে···বামতীরস্থ বাঁধের প্রায় ৩৫-মাইল দূরে। এ-স্থলে বলা দরকার যে—এই বাঁধের আড়ালে রয়েছে একটি জনাকীর্ণ অঞ্চল—সেই অঞ্চলের অন্তর্গত বর্দ্ধমান নগর ও ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেল লাইন। এই রেল লাইন বাঁধের খুব পাশ ঘেঁসেই পাতা আছে। বাঁধ ভাঙা দামোদর-বন্যার পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হ'চ্ছে, তা'র কারণ দক্ষিণ-তটভূমি সঞ্চিত পলিমাটিতে ক্রমোন্নত হ'য়ে উঠ্‌ছে, উপরন্তু নদী-গর্ভও স্রোতোবাহী পঙ্কে দিনে দিনে ভরাট হ'তে চলেছে।

[ক্রমশঃ

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(বিশ)
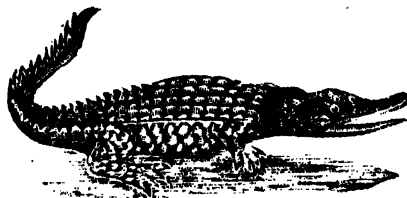
৬৩। বৈনয়িকী (বিদ্যার জ্ঞান)—যে শাস্ত্র বা বিদ্যার প্রয়োজন নিজের ও পরের বিনয়-বিধান—এক কথায় আচার-শাস্ত্র। হস্তিশিক্ষা, অশ্বশিক্ষা ইত্যাদিও ইহার অন্তর্গত।১

'বিনয়' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়জয়, সদাচার, সংযম ইত্যাদি। ইংরাজিতে বলা চলে—discipline। নিজে বিনয়ী হওয়া ও পরকে বিনয় শিক্ষা দেওয়া—এই কলাটির মুখ্য উদ্দেশ্য; আনুষঙ্গিকভাবে পশু-পক্ষী ইত্যাদিকেও পোষ মানান ও বশে রাখাও এই বিদ্যা বা কলাটির অন্তর্ভুক্ত।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"বিনয়াচার বিষয়ে শিক্ষা এবং হস্তী অশ্বের শিক্ষা"।

৺বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই কলাটির ও ইহার পরবর্ত্তী দুইটি কলার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—"এই তিনটি শিল্পের অর্থ আমরা জানি না। সুতরাং ইহার আংশিক ভাবও পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না"।২

৺সমাজপতি মহাশয়ও ইহার অনুসরণে বলিয়াছেন—"এই শেষোক্ত শিল্পত্রয়ের বিবরণ বিদিত হইবার সম্ভাবনা নাই"।৩

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে—"হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে বিনীত করার উপায়"।

কেবল জন্তুকে পোষমানান ইহার উদ্দেশ্য নহে—আপনার আত্মসংযম ও পরের সংযম-শিক্ষা প্রদানও ইহার বিষয়।

মমঃ ডক্টর আচার্য্য—"বিনয় প্রভৃতি সদাচার শিক্ষা"।

'বিনয়' সম্বন্ধে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে প্রথমাধিকরণে বহু বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই কারণে উক্ত অধিকরণের নাম—'বিনয়াধিকারিক'।

৬৪। বৈজয়িকী (বিদ্যার জ্ঞান)—টীকাকার বলেন, ইহার প্রয়োজন বিজয়। এই বিদ্যার দুইটি প্রধান ভেদ—দৈবী ও মানুষী। দৈবী বৈজয়িকী বিদ্যা—অপরাজিতা-প্রয়োগ ইত্যাদি; আর মানুষী—সাংগ্রামিকী শস্ত্রবিদ্যা।৪

যে বিদ্যার অনুশীলনে বিজয়-লাভ হয়, তাহাকে 'বৈজয়িকী' বিদ্যা বলা চলে। বৈজয়িকী বিদ্যাকে দুইভাগে বিভাগ করার উদ্দেশ্য এই যে, বিজয়লাভ করিতে হইলে কেবল নিজ প্রযত্নের উপর নির্ভর করা চলে না—দেবতার কৃপার উপরও নির্ভর করিতে হয়। অর্থাৎ—সর্ব্ব-কর্ম্ম-সিদ্ধির ন্যায় বিজয়ও দৈব-পুরুষকার—উভয়সাপেক্ষ। দৈবী বৈজয়িকী বিদ্যার দৃষ্টান্ত—তন্ত্রোক্ত অপরাজিতা-মন্ত্রপ্রয়োগ ইত্যাদি। আর মানুষী হইতেছে—যুদ্ধবিদ্যা—ধনুর্ব্বাণ, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্র-চালনা-শিক্ষা যাহার অঙ্গ।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে—"বিজয়ার্থ ক্রিয়মাণ অপরাজিতা-প্রয়োগ এবং যুদ্ধচর্য্যা"। সংক্ষেপ করিতে যাইয়া তর্করত্নমহাশয় দৈব-মানুষ-ভেদ পরিষ্কার করিয়া দেখান নাই।

৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় টীকাকারের অনুসরণে বলিয়াছেন, "বৈজয়িকী বিদ্যাদ্বারা বিজয়লাভ করা যায়; ইহা দুই প্রকার—(১) দৈবী ও (২) মানুষী। তন্মধ্যে অপরাজিতা প্রভৃতি তন্ত্রে দৈবী বিদ্যা উক্ত হইয়াছে, এবং মানুষী বিদ্যা ধনুর্ব্বেদাদিতে কথিত হইয়াছে"।

অপরাজিতা প্রভৃতি তন্ত্রে দৈবী বিদ্যা কথিত হইয়াছে—ইহা ঠিক নহে—তন্ত্রে অপরাজিতাদি দৈবী বিদ্যা কথিত হইয়াছে—এইরূপ বলা উচিত। ধনুর্ব্বেদাদিতে বিবৃত বিদ্যাও মানুষী বৈজয়িকী বিদ্যা বটে; তদ্ব্যতীত সাধারণভাবে মানুষ-প্রযত্ন-সাধ্য যুদ্ধবিদ্যামাত্রই মানুষী বিদ্যা বলিয়া গণ্য হয়।

মমঃ ডক্টর আচার্য্যের মতে ইহার পাঠ—"বৈজয়িক জ্ঞান। বিজয় বা যুদ্ধের উপযোগী ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা"।

বিজয় বা যুদ্ধ—এই দুইটি কি পরস্পর বৈকল্পিক? মনে হয়—'যুদ্ধে বিজয়লাভের উপযোগী ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা'—এইরূপ বলিলে স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পাইত। ডক্টর আচার্য্য এ বিদ্যার কেবল মানুষ দিক্‌টিই দেখিয়াছেন—দৈব অংশ তাঁহার বিবরণে উপেক্ষিত।

৬৫। বৈয়ামিকী (বিদ্যার জ্ঞান)—মূল সূত্রে 'বৈয়ামিকী' পাঠ থাকিলেও টীকাকার পাঠ ধরিয়াছেন—'ব্যায়ামিকী'। তাঁহার মতে ইহার অর্থ—মৃগয়াদি—যাহার প্রয়োজন ব্যায়াম।৫

ব্যায়াম বা শরীর-চালনাই এ কলাটির উদ্দেশ্য। ব্যায়ামের মধ্যে মৃগয়াই শ্রেষ্ঠ—ইহাতে ব্যায়াম ব্যতীত তীব্র উত্তেজনা ও আনন্দ আছে—যাহা অন্য ব্যায়ামে নাই। অনেক সময় হয়ত জীবনও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে দশবিধ কামজ ব্যসনের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরিয়াছেন। অথচ ক্ষত্রিয়ের নিকট ইহা পরম লোভনীয়।

৺তর্করত্ন মহাশয়ের মতে বৈয়ামিকী (ব্যায়ামিকী) দ্বিবিধ পাঠই গৃহীত হইয়াছে—"ব্যায়ামার্থ ক্রিয়া, মৃগয়াদি এবং মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি"।

৺সিংহ মহাশয়ের মতে "ব্যায়ামিকা বিদ্যা ব্যায়াম ও মৃগয়াদি ব্যাপার"। 'ব্যায়ামিকা' পদ অবশ্য অসাধু, ব্যায়ামিকী পদ হওয়াই উচিত।

---

১ "স্বপরবিনয়প্রয়োজনাদ্ বৈনয়িক্য আচারশাস্ত্রাণি। হস্ত্যাদিশিক্ষা চ"।—জয়ম।

২ ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লিখিত 'বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত "শিল্প" সম্বন্ধে বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয়—"বিজ্ঞানদর্পণে"—১২৮৩, কার্ত্তিক, পৌষ। "শিল্পপুষ্পাঞ্জলি" নামক মাসিক পত্রিকায় (১২৯২ সাল, প্রথম খণ্ড) উহা পুনরুদ্ধৃত হয়। ৺সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ও বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের অনুসরণে তাঁহার টিপ্পনী কল্কিপুরাণের অনুবাদে যোজিত করিয়াছিলেন।

৩ কল্কিপুরাণ—৺সমাজপতিমহাশয়ের সংস্করণ, পৃ পৃঃ

"বিজয়প্রয়োজনা বৈজয়িক্যঃ। দৈব্যো মানুষ্যশ্চ; তত্র দৈব্যোঽপরাজিতাদয়ঃ মানুষ্যো যাঃ সাংগ্রামিক্যঃ শস্ত্রবিদ্যাঃ"।

৫ "ব্যায়ামপ্রয়োজনা ব্যায়ামিক্যো মৃগয়াদ্যাঃ"

মমঃ ডক্টর আচার্য্য পাঠ ধরিয়াছেন "ব্যায়ামিক জ্ঞান। শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা ও পশু পাখী প্রভৃতি শিকার করা"।

এ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই।

তবে টীকাকার শেষোক্ত তিনটি কলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'এই তিনটি কলা আত্মোৎকর্ষ-রক্ষার্থ ও জীবার্থ'।৬

৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে অনুবাদে বলিয়াছেন—"এ তিনটী নিজের উৎকর্ষ-রক্ষণার্থ ও জীবনের নির্বিঘ্নতা সম্পাদনার্থ ব্যবহার্য্য"।

আত্মোৎকর্ষ বলিতে বুঝায় শরীরের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও সুস্থতা। 'আত্মা'—দেহ অর্থই এস্থলে গ্রহণীয়। শরীরের উন্নতিই শেষের কলা তিনটির চর্চ্চায় সম্ভব। ৬৩নং কলা—বৈনয়িক বিদ্যার জ্ঞান —এ কলাতে শরীরের উন্নতি ত হয়ই—কারণ,পশুপক্ষী প্রভৃতিকে পোষ মানাইতে হইলে নিজের শরীরেরও বহু পরিশ্রম হয়, তাহাতে শরীর সুস্থ থাকে। অধিকন্তু, বিনয় অর্থে ইন্দ্রিয়জয়। ইন্দ্রিয়-সংযম-দ্বারাও আত্মোৎকর্ষ হয়। কারণ, 'আত্মা' অর্থে ইন্দ্রিয়ও বটে! এ কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয় নহে—অন্তরিন্দ্রিয় (অন্তঃকরণ) ও 'আত্মা' বলিতে বুঝায়। অন্তঃকরণ-সংযম-দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম —ইহাই বিনয়। অতএব, আত্মোৎকর্ষ অর্থে অন্তঃকরণ, বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ ও শরীরের উৎকর্ষ।

জীবার্থ—জীবনের নির্ব্বিঘ্নতা সম্পাদনার্থ—এরূপ অর্থ সম্ভব বটে; কিন্তু শরীরচর্চ্চার মধ্যেই তাহার অন্তর্ভাব। এ কারণে, জীবার্থ বলিতে আজীবার্থ অর্থাৎ জীবিকার্থ এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। আবার এ তিনটি কলার চর্চ্চায় মানব আকস্মিক বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে—এরূপ অর্থ করাও সঙ্গত।

মমঃ ডক্টর আচার্য্য বলিয়াছে যে, "চৌষট্টি কলা বলিয়া যে মামুলী কথা আছে তাহা মিলাইতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুসংখ্যক টীকাকার কিংবা ললিতবিস্তরের গ্রন্থকার ইহা মিলাইতে পারেন নাই। উত্তরাধ্যায়নসূত্রে চৌষট্টির পরিবর্ত্তে 'বাহাত্তর' সংখ্যা বলা হইয়াছে। কামসূত্রের গ্রন্থকার বাৎস্যায়নও তাহা মিলাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার টীকাকার যশোধর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, চৌষট্টি মূলকলা মাত্র। এইগুলিকে ৫১৮ প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে"।

ললিতবিস্তর ও উত্তরাধ্যায়নসূত্রের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে, কারণ ঐ দুই গ্রন্থে চতুঃষষ্টি কলা বলা হয় নাই। ললিত-বিস্তরে (১০।১) আছে 'অপ্রমেয় শিল্পযোগে'র কথা: আর উত্তরাধ্যায়নসূত্রে (২১।৬-৭) আছে ৭২কলার কথা।

শ্রীমদ্ভাগবতের মূলে ৬৪ কলার নাম না থাকিলেও কলা যে ৬৪সংখ্যক, তাহার উল্লেখ আছে (১০।৪৫।৩৬)। এ সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

কিন্তু কামসূত্রের গ্রন্থকার বাৎস্যায়ন ৬৪ কলা মিলাইবার চেষ্টা করেন নাই—এ কেমন কথা! তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন—"ইতি চতুঃষষ্টিরঙ্গবিদ্যাঃ কামসূত্রস্যাবয়বিন্যঃ"। গীত হইতে বৈয়ামিকী বিদ্যা পর্য্যন্ত চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা—কামসূত্রের অবয়বভূত।

টীকাকার যশোধরও বলিয়াছেন—"চতুঃষষ্টিরঙ্গবিদ্যা ইতি। কামসূত্রস্যাবয়বিন্যোঽবয়বভূতাঃ, তদভাবে কামসূত্রস্যাপ্রবৃত্তেঃ"।

ইহা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে কলার সংখ্যানির্দ্দেশ আর কিরূপে করা যায়, তাহা আমাদিগের বুদ্ধিতে আসে না।

আমাদিগের তালিকায় (বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৫০) কলার সংখ্যা হইয়াছে ৬৫। ঐ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—(২৩নং) বিচিত্রশাক-যূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, ও (২৪নং) পানকরসরাগাসবযোজন—একটি কলার অন্তর্গত ধরিয়া টীকাকার ৬৪ সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। আর ৺তর্করত্ন মহাশয় (৫৩নং) মানসী ও (৫৮নং) কাব্যক্রিয়াকে এক ধরিয়া সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। আর ৺কুমুদচন্দ্র সিংহ (৬৯নং) বৈজয়িকী ও (৬৫নং) বৈয়ামিকীকে এক ধরিয়া ৬৪ কলা মিলাইয়াছেন।

পক্ষান্তরে, মমঃ ডক্টর আচার্য্য (৯নং) নাট্যকলা ধরিয়াছেন—কামসূত্রে উহা নাই। তাহার পর (৩০নং) মণিরাগাকরজ্ঞান কলাটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মণিরাগজ্ঞান ও আকর-জ্ঞান। (৬৪নং) উৎসাদনের, সংবাহনের ও কেশমর্দ্দনের কৌশল —এই একটি কলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) উৎসাদন ও সংবাহন, আর (২) কেশমার্জ্জনা-কৌশল। ফলে, তাঁহার তালিকায় আরও তিনটি কলা বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু মানসী কাব্যক্রিয়া একই কলা ধরায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত কলার সংখ্যা ৬৭ ধরিয়াছেন। এইরূপ বিভাগাদির প্রামাণিকতা কতটুকু, তাহা বলা কঠিন। অতএব, সূত্রকার যখন ৬৪ অঙ্গ-বিদ্যা বলিয়াছেন, তখন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। অবান্তর-বিভাগ-গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ কলা বলিতে হইলে ৬৭ অপেক্ষাও অনেক অধিক সংখ্যা দাঁড়ায়।

যশোধর যে বলিয়াছেন—চৌষট্টি মূলকলা, উহার অন্তর্নিবিষ্ট অন্তরকলা ৫১৮, তাহা কামসূত্রের গণনানুযায়ী নহে। তিনি বলিয়াছেন—শাস্ত্রান্তরে চতুঃষষ্টি মূলকলা উক্ত হইয়াছে ("শাস্ত্রান্তরে চতুঃষষ্টির্মূলকলা উক্তাঃ)। ৺কুমুদচন্দ্র সিংহ 'শাস্ত্রান্তরে' পাঠের স্থানে 'তন্ত্রান্তরে' পাঠ ধরিয়াছেন।

শাস্ত্রান্তরোক্ত চতুঃষষ্টি মূলকলার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(ক) কর্ম্মাশ্রিতা কলা চতুর্ব্বিংশতিটি—(১) গীত, (২) নৃত্য, (৩) বাদ্য, (৪) লিপি-জ্ঞান (বিবিধ অক্ষরের জ্ঞান;—৺মহেশপাল-অনুবাদ—অক্ষর-বিন্যাসবোধ), (৫) উদার বচন (সুন্দরভাবে কথা বলিতে পারা; বক্তৃতা—৺মহেশ পাল), (৬) চিত্রবিধি, (৭) পুস্তকর্ম্ম (পুস্ত—কৃত্রিম শৈল-যান-বিমান-চম্ম-বর্ম্ম-ধ্বজাদি—নাট্য-শাস্ত্র, কাশী সং ২৩৯; পাঠান্তর—পুস্তককর্ম্ম—পুস্তকরচনা—৺মঃ পাল), (৮) পত্রচ্ছেদ্য (তিলকাদিরচনা), (৯) মাল্যবিধি, (১০) আস্বাদ্যবিধান (রন্ধনকলা), (১১) রত্নপরীক্ষা, (১২) সীব্য (সেলাইএর কাজ) (১৩) রঙ্গপরিজ্ঞান (রঙ্গপরিজ্ঞান—ডক্টর আচার্য্যধৃত পাঠ; অন্যথা রত্নপরীক্ষা ও রত্নপরিজ্ঞান একরূপ হইয়া পড়ে), (১৪) উপকরণক্রিয়া (উপকরণ উপাদান, বা

৬ "এতাস্তিস্র আত্মোৎকর্ষরক্ষণার্থা জীবার্থাঃ ইতি" —জয়মঃ।

সাহায্য, যথা পূজার উপকরণ পুষ্পাদি, রন্ধনের উপকরণ তণ্ডুলাদি, নৈবেদ্যের উপকরণ ফলমূলাদি ; ডক্টর আচার্য্যের পাঠে উপস্করণ; উপস্করণ অর্থে উপকরণ হয়; আবার 'মশলা' অর্থও হয়), (১৫) মানবিধি (মাপ করার পদ্ধতি) (১৬) আজীবজ্ঞান (আজীব—জীবিকা,) (১৭) তির্য্যগ্‌যোনি-চিকিৎসিত (পশুচিকিৎসা), (১৮) মায়াকৃত (ইন্দ্রজাল ৺মঃ পাল), (১৯) পাষণ্ডসময়জ্ঞান (পাষণ্ড নাস্তিক, বৌদ্ধ-জৈনাদি ; তাহাদিগের সময়—আচার ; অথবা পাষণ্ড দুষ্ট ; বদমায়েশদিগের স্বভাব-চরিত্র ব্যবহার প্রভৃতি জানা ৺মঃ পাল); ডক্টর আচার্য্য 'মায়াকৃত ও পাষণ্ডসময়জ্ঞান' একসঙ্গে ধরিয়াছেন, কোন অর্থ দেন নাই); (২০) ক্রীড়াকৌশল; (২১) লোকজ্ঞান (মানুষ চেনা ৺মঃ পাল); (২২) বৈচক্ষণ্য (বিচক্ষণতা; (২৩) সংবাহন (গা-হাত-পা-টেপা) ; (২৪) শরীরসংস্কার (দেহের মল দূর করা ও শরীরের ভূষণাদি) ও (২৫) বিশেষ কৌশল (সকল কর্ম্মেই বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দান—ইহাই ৺পাল সংস্করণের অভিপ্রায়)। টীকাকার ২৪টি কলা বলিলেও গণনায় ২৫টি হইতেছে ; অতএব কোনও দুইটিকে এক ধরিয়া ২৪ সংখ্যা মিলাইতে হইবে। আমাদিগের মনে হয় রত্নপরীক্ষা ও রত্ন-পরিজ্ঞান ইহাদিগের অন্যতরটি পুনরুক্ত। অথবা, লোকজ্ঞান-বৈচক্ষণ্য এক কলা। অথবা, শরীরসংস্কার-বিশেষকৌশল---এক কলা।

(খ) দ্যূতাশ্রিত কলা---বিংশতিটি। উহার মধ্যে নির্জ্জীব দ্যূত পনরটি (১) আয়ুঃপ্রাপ্তি (বয়স লইয়া কোনরূপ জুয়া ;---৺পালের অনুবাদে সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা জানা ; এ অর্থ অসম্ভব কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানে জুয়ার স্থান কোথায় ? বয়স গণনা লইয়া জুয়া খেলা ইহার বিষয় হওয়াই সম্ভব)। (২) অক্ষবিধান (পাশা খেলা; অক্ষ—বিভীতক —বয়ড়ার ফল লইয়া তৎকালে পাশার ঘুঁটি হইত)। (৩) রূপ-সংখ্যা (রূপ লইয়া জুয়া ; মৌলিক বা প্রধান রূপ ত্রিবিধ—লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ, তাহাদের সংমিশ্রণে আরও ৬১ প্রকার রূপের জ্ঞান—৺পাল)। (৪) ক্রিয়ামার্গ (কার্য্য করিবার পদ্ধতি—ইহার সম্বন্ধে জুয়া)। (৫) বীজগ্রহণ (সাধারণ প্রয়োজনীয়, বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বীজ-সঞ্চয় ৺ মঃ পাল) ; (৬) নয়-জ্ঞান (নয়—নীতি)। (৭) করণাদান (দশ বাহেন্দ্রিয় ও এক অন্তরিন্দ্রিয়—এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের সংযম; করণ—ইন্দ্রিয়)। (৮) চিত্রাচিত্রবিধি (চিত্র—রেখাবিন্যাস দ্বারা প্রতিকৃতি করণ ও অচিত্র—অন্যভাবে প্রতিমূর্ত্তি গঠন—ইহা ৺পালের অভিপ্রায়; চিত্র-বিচিত্র—এরূপ অর্থও সম্ভব)। (৯) গূঢ়রাশি (সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার ; গোপন দ্রব্য---সঙ্কেত-দ্বারা জুয়া খেলা—এ অর্থও হয়)। (১০) তুল্যাভিহার (অপরের উক্তির হুবহু নকল করা ; ইহা দুই প্রকার—(১) যথাযথভাবে ও ভাষায় উক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বচন, (২) পূর্ব্ব বক্তার স্বর পর্য্যন্ত অনুকরণ)। (১১) ক্ষিপ্র গ্রহণ (ধ্বন্যাত্মক বা বর্ণাত্মক শব্দ প্রভৃতি ক্ষণ-বিধ্বংসী পদার্থের সেই ক্ষণমধ্যে গ্রহণ—৺পাল ; হাত-সাফাই—এ অর্থও সঙ্গত)। (১২) অনুপ্রাপ্তি-লেখাস্মৃতি (একই সময়ে ও একই স্থলে বিভিন্ন বহু বিষয়ের যথাক্রমে স্মৃতিপটে অঙ্কন ও স্মৃতি হইতে তাহাদিগের পুনরায় ব্যবহার—শতাবধানী ও সহস্রাবধানী বিদ্যা—ইহারই অন্তর্গত—৺পাল; আমাদিগের মনে হয়—অনুক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ের সঙ্কেত-লিখন ও সঙ্কেত-দর্শনে পুনরায় সেই বিষয় স্মরণ—অনেকটা সর্টহাণ্ডের মত)। ডক্টর আচার্য্য অনুপ্রাপ্তি ও লেখা-স্মৃতি—দুইটি পৃথক্ কলা ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন অর্থ করেন নাই। (১৩) অগ্নি-ক্রম (সত্বরতার জন্য ক্রমানুসারে অগ্নি ব্যবহার অথবা অগ্নির উপর যাতায়াতের কৌশল—৺পাল ; অগ্নি-ক্রমণ—অগ্নির উপর দিয়া চলা---ইহাই সরল অর্থ)। (১৪) ছল-ব্যামোহন (কোন ছলে পরকে বিভ্রান্ত করা ; ছলের সাহায্যে ও মোহিনী শক্তির প্রভাবে কার্য্যোদ্ধারের উপায়—৺পাল)। (১৫) গ্রহদান (সরল অর্থ গ্রহণ ও দান ; ৺পালের অনুবাদ—স্বল্পার্ঘ্য ও মহার্ঘ্য দ্রব্যের 'লেনা-দেনা'র উপায়, ও কোন্ গ্রহের শুদ্ধিতে কোন্ দ্রব্যের উৎপন্নতা অধিক হয় তাহার জ্ঞান)।

মোটের উপর এই পনরটি কলা নির্জ্জীব-দ্যূতাশ্রিত। টীকাকার এগুলির নামমাত্র করিয়াছেন—অর্থ দেন নাই। ৺পাল মহাশয়ের সংস্করণে যে সকল ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই স্বকল্পিত—আর ঐ গুলিতে দ্যূতসম্বন্ধ নাই। বাজি রাখিয়া ঐ সকল বিদ্যার প্রদর্শন ইহা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বুঝিতে হইবে।

সজীব-দ্যূতাশ্রিতা কলা পাঁচটি—(১) উপস্থানবিধি (পরের তোষামোদের উপায়—৺পাল ; বাজি রাখিয়া রাজা প্রভৃতি বড় বড় লোকের নিকট যাওয়া ও পুরস্কারাদি লাভ করার উপায়)। (২) যুদ্ধ (কোন্ পক্ষ জিতিবে বা হারিবে সে সম্বন্ধে বাজি রাখা)। (৩) রুত (ডক্টর আচার্য্যের মতে রোদন ; ৺কুমুদ চন্দ্রের পাঠ 'ঋত' সম্ভবতঃ মুদ্রাকরপ্রমাদ ; জীবমাত্রেরই শব্দানুকরণ—৺পাল ; ইহার মতে সঙ্গীত-বাদ্য-নাটকাখ্যায়িকাদিও ইহার অন্তর্ভূত, কিন্তু এই শেষোক্ত অর্থ কিরূপে পাওয়া গেল ? প্রথমোক্ত অর্থ বরং সম্ভব। বাজি রাখিয়া পশু-পক্ষীর স্বরানুকরণ)। (৪) গত (ডঃ আচার্য্যের পাঠ—গীত)—অতীতজ্ঞান—অতীত জীবজগতের ইতিবৃত্তকে গ্রন্থাকারে চিত্রাকারে ও ফলকাকারে প্রদর্শন ও প্রাণি-গণের গতিবিধির জ্ঞান—৺পাল ; বাজি রাখিয়া চলা, বাজির দৌড় এরূপ অর্থ হওয়াও খুব সম্ভব)। (৫) নৃত্ত (৺পালের সংস্করণে অনুবাদে, ডঃ আচার্য্যের পাঠে, কুমুদচন্দ্রের পাঠে 'নৃত্য' বানান গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু নৃত্য ও গীত কর্ম্মাশ্রিতা কলার অন্তর্গত। এ নৃত্ত নৃত্য হইতে ভিন্ন। নৃত্ত—acrobatic dance—বাজি রাখিয়া নানারূপ ব্যায়াম—নৃত্ত ; পক্ষান্তরে নৃত্য—ভাবাশ্রিত।

(গ) শয়নোপচারিকা কলা ষোলটি—(১ পুরুষের ভাবগ্রহণ। (২) স্বীয় রাগ-প্রকাশ। (৩) প্রত্যঙ্গ-দান (প্রতি অঙ্গের সহিত প্রতি অঙ্গের আশ্লেষ)। (৪) নখ-দন্ত-বিচার (নখচ্ছেদ্য ও দন্তচ্ছেদ্য)। (৫) নীবীস্রংসন (কৌশলে নীবীস্থান হইতে বস্ত্র খুলিয়া ফেলা। (৬) গুহ্য অঙ্গ সংস্পর্শের অনুলোমতা (গোপনাঙ্গ-স্পর্শ-ক্রম)। (৭) পরমার্থ-কৌশল (সম্প্রয়োগ-বিষয়ক নৈপুণ্য)। (৮) হর্ষণ (তৃপ্তি-দান)। (৯) সমানার্থতা, কৃতার্থতা (যুগপৎ স্ত্রীপুরুষের রাগপ্রাপ্তি। (১০) অনুপ্রোৎসাহন (দ্বিতীয় রাগোদ্রেক)। (১১) মৃদুক্রোধপ্রবর্ত্তন (অল্প কৃত্রিম ক্রোধ বা মান-প্রকাশ)। (১২) সম্যক্ ক্রোধ নিবর্ত্তন (ক্রোধ দমন)।

(১৩) ক্রুদ্ধ প্রসাদন (মানভঞ্জন)। (১৪) স্বপ্তপরিত্যাগ ডক্টর আচার্য্যের মতে শয্যাত্যাগ; নিদ্রাকে আয়ত্তীকরণ—৺পাল। কৌশলে ঘুম ভাঙ্গাইবার উপায়, মনে হয় এইরূপ অর্থই সঙ্গত)। (১৫) চরম স্বাপ-বিধি (মৃত্যুকে ইচ্ছার অধীন করা—৺পাল। কিন্তু এ অর্থ এ ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নহে—কারণ এ প্রসঙ্গ কামকলার; মনে হয়—ভোগান্তে গাঢ় নিদ্রা লাভের উপায়—ইহাই সঙ্গত অর্থ)। (১৬) গুহ্য-গূহন (গোপ্যাঙ্গের গোপন)।

এগুলি সবই কামকলা। এ কারণে ইহাদিগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

(ঘ) উত্তর-কলা চারিটি—(১) অশ্রুপাতপূর্ব্বক বিহারের জন্য শাপ-প্রদান। (২) নিজ শপথ-ক্রিয়া। (৩) প্রস্থিতের অনুগমন। ও (৪) পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ।

এগুলিও কামকলার পরিশিষ্ট।

এই চতুঃষষ্টি মূল কলা—ইহারই অন্তর্নিবিষ্ট ৫১৮ অন্তরকলা।

যশোধর বলিয়াছেন—কর্ম্মাশ্রিতা ও দ্যূতাশ্রিতা কলাগুলিকে বিভাগপূর্ব্বক চতুঃষষ্টি ললিতকলার তালিকা কামসূত্রের অঙ্গ-বিদ্যারূপে উক্ত হইয়াছে। আর শয়নোপচারিকা ও উত্তরকলা কামশাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয়। সেগুলিকে বাৎস্যায়ন "পাঞ্চালিকী" নামে অভিহিত করিয়াছেন—"পাঞ্চালিকী চ চতুঃষষ্টিরপরা" (কাঃ সূঃ ১।৩।১৫)।

পাঞ্চালিকী কলা কামকলা—উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

আপাততঃ কামসূত্রোক্ত তালিকার বিবরণ এইখানেই সমাপ্ত করা হইল।

মমঃ ডক্টর আচার্য্য বলিয়াছেন 'এই (শেষোক্ত—শাস্ত্রান্তরোক্ত) তালিকায় যশোধর চৌষট্টি কলা মিলাইয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সহিত কামসূত্রের তালিকার মিল নাই; শ্রীমদ্ভাগবত, ললিতবিস্তর ও উত্তরাধ্যয়নের তালিকার সহিত ত মিলিবার কথাই নহে"।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ডক্টর আচার্য্য আর একটু মনোযোগ দিয়া টীকাটি পড়িলেই বুঝিতেন যে—যশোধর বলিয়াছেন—এই শেষোক্ত তালিকার কর্ম্ম-দ্যূতাশ্রিতা চুয়াল্লিশটি কলাকে বিভিন্ন ভাগে বিভাগপূর্ব্বক অভিনব রূপে সাজাইয়া বাৎস্যায়নের চতুঃষষ্টি ললিতকলার তালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কারণে উভয় তালিকার পরস্পর হুবহু মিল নাই বটে, কিন্তু মোটামুটি মিল আছে। এই কর্ম্মদ্যূতাশ্রিত কলাগুলি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পরিজ্ঞাত—এ কারণে যশোধর ইহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে সে সম্প্রদায়-ক্রমাগত জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি—তাই প্রত্যেক কলার স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ। ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য!

[সমাপ্ত

১"ইতি চতুঃষষ্টির্মূলকলাঃ। আসামন্তর্নিবিষ্টানামন্তরকলানামষ্টাদশাধিকানি পঞ্চশতান্যুক্তানি। তত্র কর্ম্মদ্যূতাশ্রয়া প্রায়শ আবালং প্রসিদ্ধাস্তু। তা এবান্যথা বিভজ্য চতুঃষষ্টিরত্রোক্তা। যাস্তু শয়নোপচারিকা উত্তরকলাশ্চ, তাঃ প্রায়শস্তন্ত্রস্যাঙ্গতাং প্রতিপদ্যন্তে—ইতি পাঞ্চালিক্যামেব চতুঃষষ্ট্যামন্তরকলা বেদিতব্যাঃ, তাশ্চ যথাপ্রস্তাবং বক্ষ্যন্তে।

অতএব, ৫১৮ অন্তরকলাও পাঞ্চালিকীর অন্তর্গত—ললিত-কলার অবান্তরবিভাগ নহে—ইহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

ভুলের মালা

কাদের নওয়াজ

ভুলে ভরা এই জীবনের মালা, ফুল বলি ভুল করি,
কাঁটা দিয়ে শুধু গাঁথিয়া চলেছি সারাটী জীবন ভরি।
জানি, নাই মধু, এ মধুচক্র তবু চাই রচিবারে,
বালু লয়ে ঘর রচি বালুচরে "ঘুমতি" নদীর ধারে।
কেহ বলে এটা মৃগ-তৃষা, কেউ আলেয়া বলিয়া জানে,
আলোক-লতার ভুল ছায়াপথ তবু যে আমায় টানে।
কমল ভুলিয়া মৃণাল তুলিয়া হয়েছে হৃদয় ক্ষত,
তবু ভাল লাগে এ ভুল আমার এই জীবনের ব্রত।
ভাঙিওনা ভুল রাঙিওনা মোর আকাশ অরুণ রাগে,
শত ভুলে ভরা জীবনের মালা তবু এরে ভাল লাগে।
মোর সেতারের মীড় বাজেনাক, জাগে নাক, তায় গীতি,
ফুলহারা ডোর ধূলায় লুটায় পায়না সে আর প্রীতি।

জলদে চপলে মিছে লুকোচুরি মিছে ও তারার মালা,
কুমুদিনী মুখ চুমিতে চাঁদের মিছে কৌমুদী ঢালা।
আঁখি সম্বলে, তবু জয়লাভ করিয়া কমল ফোটে,
তবু বেয়াকুল, তবু কেয়াফুল ধূলায় নাহি সে লোটে।
ক্ষণিকের মায়া মরীচিকা এ-যে তবু হেরি দীপ-শিখা,
ভুল করি ছোটে রাতের শলভ পরিতে মরণটীকা।
বারিধির বারি নীল ভাবি মিছে অঞ্জলি ভরি রাখি,
পিয়া নাই তার তবু সে পাপিয়া "পিউ কাঁহা" ওঠে ডাকি।
ভুল করি পাখী আঁখি তার মেলি "চোখ গেল" বলি ডাকে,
ভুলের ফসল ক্ষণিক ফুলের ফসল হইয়া থাকে।
প্রকৃতির ভুল, ভুলের জনম ভুল এ ফুলের হাসি,
ভুল দিয়ে শুধু গাঁথা এই মালা তবু এরে ভালবাসি।

শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

বাসবদত্তার স্বপ্ন

বার

রাজবাড়ীতে বিয়ের মহাধুম। অন্তঃপুরের মেয়েরা সব রঙ্-বেরঙের কাপড়-গয়না ফুলের মালা-অগুরু-চন্দন প'রে বিয়ের আমোদে মেতে উঠেছে। কিন্তু আবন্তিকার ছদ্মবেশে বাসবদত্তার এ সব কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না। কি ক'রেই বা লাগে! জেনে শুনে সতীনের বিয়ে দিচ্ছেন—তাও আবার নিজের চোখের ওপর! অথচ পাছে কেউ কিছু ভাবে এ জন্যে মুখে শুক্‌নো হাসি হাস্‌তে হচ্ছে আর পাঁচ জনের সঙ্গে। এ যে মহা ঝক্‌মারি! রাজ অন্তঃপুরের মস্ত বড় উঠানে রাজ্যের এয়ো সব জড় হ'য়ে পদ্মাবতীর গায়ে হলুদ দিচ্ছিল। এই ফাঁকে আবন্তিকা একবার ফুস্ ক'রে বাগানে চ'লে গেলেন—নির্জ্জনে একলা একটু মনের দুঃখ হাল্‌কা ক'রে নিতে। আজ তাঁর বলির দিন। তাঁর নিজের স্বামী—তাঁরই চোখের সামনে আজ অপরের হ'য়ে যাবেন!

বাগানের এক পাশে একটি প্রিয়ঙ্গুলতার গাছ। শ্যামবর্ণ থলো থলো ফুলে গাছটি ভ'রে রয়েছে। গাছের তলায় পাথর দিয়ে বেদী বাঁধান। ঐ বেদীর ওপর ব'সে তিনি আপন মনেই ভাবছিলেন—'চকা-চকীরা বড় সুখী। 'চকা'র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে 'চকী' বেচারী আর বাঁচে না! কিন্তু আমি হতভাগী প্রভুকে ছেড়ে কেমন বেঁচে আছি। শুধু আজ দূর থেকে তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখ্‌ব—এই আশাতেই ত আছি বেঁচে'!

এই সময় এক সাজি ফুল নিয়ে এক চেড়ী এসে ঢুকল বাগানে। দূর থেকে আবন্তিকাকে দেখে মনে মনে বল্‌ল—এই যে দিদি ঠাকুরুণ এখানে ব'সে—আর সাত মহল খুঁজে খুঁজে আমার নাকালের এক শেষ! আহা! এ মেয়েটির বোধ হয় বিয়ের আমোদ ভাল লাগ্‌ছে না! লাগেই বা কি ক'রে! কতদিন সোয়ামীর মুখ দেখে নি বেচারী! তাই বোধ হয় লুকিয়ে পালিয়ে এসে এখানে বসে সোয়ামীর কথাই ভাবছে। হুঁসও নেই—যেন কোয়াশায় ঢাকা চাঁদের ফালির মত রূপ! এত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও রূপ একেবারে চাপা পড়ে নি! সাজ-গোজ কিছু নেই—তবু কেমন ভদ্র ভাব! যাক্! আমার আর তা ভেবে কি হবে! সাড়া দিই। কাছে যাই এগিয়ে। বলি, ও দিদিমণি! কতক্ষণ ধ'রেই না তোমায় খুঁজি খুঁজি নারি করছি গো!'

হঠাৎ ভাবনার মাঝে অপরের কাছে ধরা প'ড়ে আবন্তিকা একটু চম্‌কে উঠ্‌লেন—অপ্রস্তুতও হলেন। তাইত তিনি যে মেয়ে-মহল থেকে স'রে পরেছেন—এ কথা রাজকুমারী জানতে পারেন যদি বড়ই লজ্জার ফেরে পড়বেন যে তিনি! তাড়াতাড়ি বল্‌লেন 'কি গা বাছা! কি দরকার! আমার মাথাটা বড্ড ধরেছিল, তাই নিরিবিলি একটু হাওয়ায় বসেছিলুম'।

চেড়ী একটু মুচকে হেসে মনে মনে ভাব্‌লে—হাঁ মাথা ধরেছিল না আর কিছু! যাক, আমার ও সব কথায় কাজ কি! যে জন্যে এসেছি—তাই ব'লে যাই। তাই সে মুখে বল্‌লে—'দিদিরাণী বল্‌লেন—'আমার দিদিমণি বড় ঘরের মেয়ে—বড় ভালবাসেন আমায়, আর শিল্পকলায় তাঁর জোড়া দেখ্‌তে পাই না। তাই বিয়ের মালাবদলের মালা তাঁকেই গাথ্‌তে ব'লে আয়।'

বাসবদত্তা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে মনে মনে ভাবলেন, 'হা ভগবান্! এও আমাকেই করতে হবে! কে বলে তোমায় দয়াময়! কি নিষ্ঠুর তুমি'!

চেড়ীটা যেন ঘোড়ায় চেপে এসেছে—ব'লে উঠ্‌ল—'দিদিমণি! আপনি ভাব্‌বার চিন্তবার যা পরে ভাববেন'খন। এখন তাড়াতাড়ি মালা-ছড়াটা গেঁথে দিন। জামাই-রাজা মণি-বাঁধান বেদীতে বসে নাইছেন। চান হ'য়ে গেলেই মালার দরকার কি না।'

আবন্তিকা (মনে মনে)—'আর ভাব্‌ব কি! মন যেন খালি হ'য়ে উঠ্‌ছে!' প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'হাঁ বাছা! তুমি বর দেখেছ?'

চেড়ী (এক-গাল হেসে) 'ও মা! তা আবার দেখব না কেন? দিদিরাণীকে এত ভালবাসি—তাঁর বরটি কেমন হ'ল দেখ্‌ব না! তার পর বর দেখ্‌তে কার না সাধ যায়!'

আবন্তিকা—'কেমন দেখ্‌লে?'

চেড়ী—'দিদি ঠাকরুণ! সত্যি বল্‌ছি এমনটি আগে আর কখন দেখি নি।'

আবন্তিকা—'দেখ্‌তে খুব সুন্দর নাকি?'

চেড়ী—'নাকি—কি গো! যেন ধনুক-ছাড়া কামদেব!'

আবন্তিকা—'আচ্ছা, থাক ওসব কথা।'

চেড়ী—'কেন কেন? বারণ কর্চ্ছেন কেন?'

আবন্তিকা—'পরপুরুষের কথা নিয়ে বেশী আলোচনা করা ভাল নয়।

চেড়ী—'ওমা! সে কি কথা! এ যে নতুন বর। এর কথা বলতে দোষ কি। যাক্ গে, ঠাকরুণ! আপনি এখন শীগ্‌গির মালাটা গেঁথে ফেলুন দেখি।'

আবন্তিকা—'কৈ, ফুল-ছুঁচ-সুতো সব আনো দেখি।'

'এই যে' বলে চেড়ী সব এগিয়ে দিলে। ফুলের ডালায় দুটো গাছের শেকড় ছিল। আবন্তিকা-বেশিনী বাসবদত্তা বুঝলেন—গুণ-গ্যান্ করবার ওষুধ-পালা। একটি হাতে তুলে বললেন 'এটা কি ?'

চেড়ী—'ও ওষুধটির নাম 'অবিধবাকরণ' ও মালায় গাঁথলে কনেকে জীবনে আর বিধবা হ'তে হয় না।'

আবন্তিকা মনে মনে বুঝলেন—এ ওষুধটি তাঁর নিজের ও পদ্মাবতীর দু'জনেরই দরকারে নিশ্চিন্ত মালায় গাঁথতে হবে। অন্য শেকড়টি তুলে বললেন—'আর এটার কি গুণ' ?

চেড়ী—'ওটা হচ্ছে—'সপত্নী-মর্দ্দন, ওটা মালায় গাঁথলে ক'নের সতীন জব্দ হয়।"

আবন্তিকা—'তবে এটা আর গেঁথে দরকার নেই।'

চেড়ী—'সে কি গা ঠাকরুণ!'

আবন্তিকা—'আরে! তুমি বুঝি জান না—বরের প্রথম পক্ষের বৌ যে পুড়ে মরেছে। মিছিমিছি ওটা আর গেঁথে কি লাভ!'

চেড়ী—'যা ভাল বোঝেন করুন, ঠাকরুণ! আমার মালাটী শীগ্গির শীগ্গির শেষ ক'রে দিন। ঐ—ঐ শাঁখ বাজছে। বরকে বোধ হয় মেয়েরা অন্তঃপুরে নিয়ে চলল।'

আবন্তিকা—'এই নাও—হ'য়ে গেছে মালা।'

মালাটি হয়েছিল অতি সুন্দর দেখতে। চেড়ী তা ডালায় রেখে খানিকক্ষণ অবাক্ হ'য়ে মালার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গালে আঙুল দিয়ে বললে—'এত সোন্দর মালা আপনি গাঁথতে পারেন'!

আবন্তিকা—'তবে রে! এই এতক্ষণ আমাকে তাড়ার ওপর তাড়া লাগিয়ে জেরবার ক'রে দিলি! আর এখন মালার গুণ-ব্যাখ্যানা হচ্ছে—এতে দেরী হয় না! যা—নিয়ে যা—যা পালা—শীগ্গির'।

চেড়ী মালা নিয়ে দৌড়ে পালাল। আবন্তিকা আবার গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন—'হায়! হায়! আজ সত্যিই প্রভু আমার পর হ'য়ে গেলেন! কি করি যাই একটু শুইগে—যদি ঘুমিয়ে খানিকটা সময় দুঃখ ভুলে থাকতে পারি'।

আস্তে আস্তে আবন্তিকা চললেন তাঁর ঘরের দিকে। চোখের জলে তখন তাঁর মুখ-বুক ভেসে যাচ্ছে—যেন ফোটা পদ্মের ওপর শিশিরের ফোঁটা!

*

এর পর বিয়ের লগ্নে বৎসরাজের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে হ'য়ে গেল খুব ধূম-ধামের সঙ্গে। পদ্মাবতীর দাদা মগধের রাজা দর্শক ক'নেকে সম্প্রদান করলেন। তারপর ক'নের সখীরা সকলে বর-ক'নেকে নিয়ে বাসর-ঘরে খুব আমোদ-আহ্লাদ করতে লাগলেন। বৎসরাজের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর সখা বসন্তক। তিনি ত খুবই আমুদে লোক। প্রায় সারা-রাত বাসরে নাচ-গান-আমোদ ক'রে তাঁর হ'ল এক বিপদ্। বিয়ে-বাড়ীতে তিনি রাজভোগ খেয়েছিলেন এক পেট। তারপর একটুও ঘুমুতে না পাওয়ায় তাঁর পেট ত ফুলে দম-সম। কাজেই তিনি ভোরের দিকে যখন ছুটি পেলেন বাসর-ঘর থেকে, তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন—একটু ঘুমের আশায়। কিন্তু সেই নরম ধপ্ধপে বিছানায় শুয়েও তাঁর ঘুম আসছিল না মোটেই—খালি এপাশ-ওপাশ করছিলেন! একেই মস্ত ভুঁড়ি, তার ওপর ভরপেট রাজভোগ খাওয়া, তারপর সারা-রাত আমোদ—দামী খাবারগুলি সবই গলা ঠেলে ওপর দিকে উঠে আসতে চাইছিল—আর বিদূষক তা বুঝতে পেরে বলছিলেন,—'ওরে! তোরা এমন নেমকহারামি করিস্ নি কখনো—আমি তোদের গতি করলুম, আর তোরা এখন বেরিয়ে আসতে চাইছিস্! এই কি বিচার! যাক্ গে! বড় রাণীর শোক ভুলে আমার সখা যে এত শীগ্গির আবার বিয়ে করতে চাইবেন—বিয়েতে এত আমোদ-আহ্লাদ করবেন, এ আর কে তখন ভেবেছিল! আচ্ছা, একটা হদিস্ ত পাচ্ছি না। মন্ত্রী ম'শায় আর আমি দুজনে মিলে বড় রাণীকে ত এখানকার রাজকুমারীর কাছে রেখে গেলুম। তা কৈ! কাল সারা রাতের মধ্যে বাসর-ঘরে একবারও তাঁর দেখা পেলুম না! গেলেন কোথায় তিনি! ওঃ! কি বোকা আমি! তিনি কি আর বাসরে আসতে পারেন! যদি মহারাজ চিনতে পারেন! সব ফন্দী ফেঁসে যাবে যে! ঠিক! ঠিক! এতক্ষণ এই সোজা কথাটা আমার মাথায় ঢোকে নি—কি আশ্চর্য্য!'

এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সবে তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় রাজবাড়ীর এক চেড়ী তাঁকে ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রে দিলে—'ও ঠাকুর! বলি, ও ঠাকুর ম'শায়! শুনছেন! অনেক ত ঘুমিয়েছেন, এখন উঠুন শীগ্গির!'

বিদূষকের কাঁচা ঘুম ভেঙে যেতে ভারি রাগ হ'ল। মুখ-দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—'সারা রাত হল্লা ক'রেও আশ মিটল না তোদের! ভোরের বেলা একটু সবে তন্দ্রা এসেছে, আর ডাকাডাকি—উঠুন, উঠুন! কেন? আমাকে কি দরকার'?

চেড়ী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে হাত জোড় ক'রে বললে—'দোহাই ঠাকুর ম'শায়! আমার অপরাধ নেবেন না। আমার সাধ্যি কি যে আপনার ঘুম ভাঙাই! তবে ভোর ত আর নেই—বেলা প্রায় এক প্রহর হ'তে চলল। বর-মহারাজ ঘুম ভেঙে উঠে আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছেন, তাই ত আপনাকে এসে ডাকছি।'

বসন্তক অগত্যা আর কি করেন। গা-মোড়া দিয়ে উঠে বসলেন বিছানায়। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—'সখার প্রাতঃকৃত্য হয়েছে কি'!

চেড়ী—'সব সারা হয়েছে তাঁর, মায় চান অবধি'।

বসন্তক—'তা হ'লে বল যে—আমিও প্রাতঃকৃত্য আর চান সেরে তাঁর কাছে যাচ্ছি'।

চেড়ী—'বেশ তাহ'লে জল-খাবারের যোগাড় করি গে'।

বসন্তক—'সর্ব্বনাশ! এখন আর জল-খাবার না! জল-খাবার ছাড়া আর সব যোগাড় কর গিয়ে'!

চেড়ী—'সে কি ঠাকুর! আপনার মত খাইয়ে লোকের জল-খাবারে অরুচি হ'ল কেন'?

বিদূষক—'কাল সারা রাত যে বাঁদর-নাচ নাচিয়েছ আমায়, তাতে পেটের নাড়ীগুলো এখনও সব ঘুরপাক খাচ্ছে। একবেলা একটু তাদের রেহাই না দিলে আবার দুপুরের রাজভোগ সহ্য হবে কেন'!

চেড়ী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল। [ক্রমশঃ

মদনকুমার

—আনন্দবর্দ্ধন

(রূপকথা)

এক রাজা। তাঁর রাজ্যে কোনো অভাব নেই। কেবল একটি দুঃখ রাজা ও প্রজার মনে সব সময়েই জেগে থাকে। রাজার না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে। রাজা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা-ব্রত করেছেন, দান-ধ্যান করেছেন, দানব-যক্ষ-রক্ষের কাছে পর্য্যন্ত মানত করেছেন, কিন্তু কোনো ফলই হয় নি। এই দারুণ কষ্ট মনের মধ্যে নিয়ে রাজা কাল কাটিয়ে দেন।

একদিন সকালবেলা রাজার নাপিত রাজাকে কামিয়ে দিতে এলো। কামাবার পর নখ কাটতে কাটতে হঠাৎ রাজার আঙুল গেল কেটে। রাজার পাত্র-মিত্র সকলে নাপিতকে খুব বকাবকি করতে থুর্ত্তস্বভাব নাপিত জোড়হাতে বললে, "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমার কিছু দোষ নেই। বাড়ী থেকে আসবার সময় এক আঁট-কুড়ো মালীর মুখ দেখেছি। সেইজন্যেই আমার আজ কপাল খারাপ।" রাজা নাপিতের এই কথা শুনে মনে মনে বড় দুঃখ পেলেন। ভাবলেন, "আমি রাজ্যের রাজা, তাই লোকে কিছু বলতে সাহস করে না। আমি যদি মালী হতুম, তা' হ'লে লোকে আমাকে কত কটু কথাই না বলতো! মালী আঁটকুড়ো, আমিও তো তাই।" রাজার বুকে অত্যন্ত বাজলো। রাজা জোড়মন্দির ঘরে সেই যে ঢুকে কপাট বন্ধ ক'রে দিলেন, কেউ দোর খোলাতে পারলে না। খান না, স্নান করেন না, রাজসভায় যান না। তাঁর প্রতিজ্ঞা শুনে সকলে থমকে গেলো। প্রাণ থাকতে আর তিনি মুখ দেখাবেন না, চন্দ্র-সূর্য্যের দিকেও আর চোখ তুলে চাইবেন না। এমনিভাবে একদিন, দু'দিন, তিনদিন ক'রে সাতদিন কেটে যায়, এমন সময় রাজ্যে এলেন এক সন্ন্যাসীঠাকুর। সন্ন্যাসীর মাথায় জটার ভার পা পর্য্যন্ত লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে, সারা দেহ ভস্মমাখা, হাতে বেতের ছড়ি। সন্ন্যাসী রাজপুরীতে এসেই খোঁজ করলেন—"রাজা কই? রাজা কই?" পাত্রমিত্রের কাছে উত্তর পেলেন, "রাজা তো আজ সাতদিন, সাতরাত ঘরের কবাট খোলেননি। অন্ন-জল সব ত্যাগ করেছেন।" সন্ন্যাসী বললেন, "এর হেতু কি?" তখন সকলে সন্ন্যাসীর পা' জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলো—"ঠাকুর, তুমি যদি না কৃপা করো, তা'হ'লে রাজা রাজ্য সব যাবে। রাজার সব চেয়ে বড় দুঃখ—তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাই রাজা মনের দুঃখে হত্যা দিয়ে প'ড়ে আছেন। বিধাতা যদি মুখ তুলে চান, তবে তিনি আবার সুখের রাজত্ব করবেন। নইলে সব রসাতলে যাবে।" সন্ন্যাসী সমস্ত জানতে পেরে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। রাজাকে সবাই গিয়ে অনুনয় ক'রে বললে, "মহারাজ, ঘরের আগল খুলে বাইরে আসুন। এক সন্ন্যাসীঠাকুর আপনার দেখা চান।" রাজার সাড়া নেই। অনেক বলা কওয়ার পর রাজা কইলেন, "সন্ন্যাসী যা' চান, তাই দিয়ে তাঁকে বিদায় করো। আমি আর বাইরে যাবো না।" কিন্তু সন্ন্যাসী কিছুই নিতে চান না। বললেন, "সমস্ত রাজভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিলেও আমি হাতে ছোঁব না। আমি চাই কেবল রাজার নিজের হাতের একমুঠো ভিক্ষা।"

রাজা সন্ন্যাসীর কথা শুনে অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে ভক্তি-ভরে মাথায় তুলে নিলেন তাঁর পায়ের ধুলো। সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন,—"পুত্র, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।" রাজা তখন নিবেদন করলেন, "ঠাকুর, তা' হ'লে তুমি আমাকে দয়া করো। আমার একমাত্র কামনা—একটি পুত্র-সন্তান।" সন্ন্যাসী সকল বৃত্তান্ত জানতে পেরে নিজের যোগবলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন পরোপকার করবার শক্তি। রাজপুরীর মধ্যে সন্ন্যাসী প্রথমে তাঁ'র বেতের লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, তখুনি মাটি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। পরে আর একবার লাঠি ঠুকতেই একটা গাছ উঠলো। তারপরে লাঠির আঘাতে গাছে ধরলো আম। লাঠি দিয়ে আম স্পর্শ করতেই আম পাকলো। শেষবার গাছের গুঁড়িতে লাঠি দিয়ে মারতেই সেই আম মাটিতে প'ড়ে গেল। তখন সন্ন্যাসী সেই ফলটি নিয়ে রাজাকে বললেন, "তোমার ভাগ্য ভালো, আর দুঃখের কিছু নেই। এই আমটি রাণীকে খেতে দিয়ো। তোমার ঘরে সুপুত্র জন্মাবে।" এই কথা বলবামাত্রই সারা রাজপুরী ধোঁয়ায় ভ'রে গেল। কিছুক্ষণ পরে সব স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, তখন সন্ন্যাসী আর আমগাছ অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। যাই হোক, সন্ন্যাসীর দান পেয়ে রাজার মন উল্লাসে নেচে উঠলো। সারা রাজ্যে এই সু-খবর ছড়িয়ে পড়লো বান-ডাকার মত। রাজ্যে যেন লেগে গেল আমোদের ধুম। সকলে ছুটে দেখতে এলো—কোথায় সন্ন্যাসী, কোথায় সেই আশ্চর্য্য আম-গাছ! কিন্তু সেই সন্ন্যাসীও নেই, আমগাছও নেই।

রাজা শুভক্ষণ দেখে রাণীর হাতে সেই ফলটি তুলে দিলেন। সেই ফল খেয়ে রাণীর গর্ভ হোলো। এক মাস, দু'মাস ক'রে দশ মাস দশদিন যায়। রাজ্যে আনন্দের সীমা নাই। এতোদিন পরে রাজপুত্র আসবে, রাজার রাজ্য হাসবে।

এমন সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো। রাজবাড়ীর মালী প্রতিদিন সকাল বেলায় রাজবাড়ী আর রাজার বাগান ঝাঁট দিতে যায়। সেদিন রাতের অন্ধকারে মিশেছে জ্যোৎস্নার আলো, যেন আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। মালী কাক্-জ্যোৎস্না দেখে মনে ভাবলে—রাত গেছে পুইয়ে। তাই তাড়াতাড়ি ঝাঁটা হাতে চললো রাজবাড়ীর দিকে। পুরীর সকলেই তখন ঘুমোচ্ছে। একটি জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই, দেখা নেই। রাজবাড়ীর ঠিক সামনে মালীর চোখে পড়লো রক্তবর্ণ এক জটাধারী পুরুষ, এক হাতে রুদ্রাক্ষমালা, অন্য হাতে কমণ্ডলু। পুরুষের চোখে যেন আগুন জ্বলছে। এই মূর্ত্তি চোখে পড়তেই মালী প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। তারপরে উপায় না দেখে মনকে বোঝালে—কোনো ভয় নেই। তখন মালী ভরসা ক'রে সেই অপূর্ব্ব পুরুষের পায়ের তলায় প'ড়ে জিজ্ঞেস করলে,—"তুমি কে হও ঠাকুর—কে হও?" পুরুষবর কইলেন, "তুই মানুষ। তোর কাছে আমি পরিচয় দোবো কেমন ক'রে? সব কথা বলা যায় না।" মালী মনে মনে ভাবলে—"নিশ্চয় ইনি কোনো মহাপুরুষ। এঁকে ধ'রে যদি

কপালটা ফিরিয়ে নিতে পারি, তা' হ'লে নাতি-পুতের আর চাক্‌রী ক'রে খেতে হবে না।" এই ভেবে সে ঠাকুরের পা' দুটি আঁকড়ে ধ'রে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বলতে লাগলো, "বাবা যখন দয়া ক'রে দেখা দিয়েছ, তখন আর সহজে ছাড়চি না। কও ঠাকুর কও— তুমি কে? কেনই বা তুমি এখানে পায়ের ধূলো দিয়েছ?"

ঠাকুর মানুষের এই জিদ্ দেখে বল্‌লেন, "আমার কথা তোর কাছে কইতে পারি, কিন্তু কোনো লোককে যদি তুই একটাও কথা বলিস, তা' হ'লে তোর রক্ষা থাক্‌বে না।"

মালী প্রতিজ্ঞা করলে, "ঠাকুর, যা' বলবে তাই মাথায় পেতে নোবো।" তখন ঠাকুর বল্‌লেন, "আজ যখন রাতের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্ররা চোরের মত পালাবে, তখন সে সময়—ঠিক সেই সময়ে রাজার ঘরে একটি পুত্রসন্তান হবে। আমি কর্ম্মবিধাতা-পুরুষ, মানুষ জন্মাবামাত্রই তার কর্ম্মফল সুখ-দুঃখ সব কপালে লিখে দিই। রাজপুত্রের জন্ম হ'লেই আমি তার কপালে আঁক ক'সে দিয়ে যাবো।"

মালী যেন হাতে স্বর্গ পেলো। তখন তার কি অবস্থা! ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে, আর দর্‌দর্ ক'রে গা' বেয়ে ঘাম ঝর্‌ছে। তবু সাহসে ভর ক'রে সে ব'লে উঠলো, "ঠাকুর, যদি এতোই দয়া কর্‌লে, তা হ'লে আসল কথা আর বাকি থাকে কেন? কত সাধ্যি সাধনা ক'রে এতোদিন পরে রাজামশায়ের ছেলে হচ্চে। যেই আমাদের রাজপুত্তুরের কপালে কি লিখে দিচ্চো?"

কর্ম্মপুরুষ মালীর কথায় কইলেন, "মানুষের লোভের শেষ নেই! তোর কাছে আমার পরিচয় দিয়েছি, তা' তোর খুব ভাগ্যের জোর। সামান্য নর হ'য়ে অপরের কপালের লেখা জানতে চাস্? বড় যে আস্পর্দ্ধা দেখছি! এ অধিকার কোনো মানুষের নেই।"

মালী কর্ম্মপুরুষঠাকুরের পা' দু'টি জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে— "ঠাকুর, তোমায় প্রাণ থাকতে ছাড়বো না। যখন সব কথা বলেচো, তখন এ কথাটাও বল্‌তেই হবে। আমায় মারতে হয় মারো, রাখতে হয় রাখো।"

ঠাকুর আর কি করেন, এড়াতে পারলেন না। মালীকে শুনিয়ে বল্‌লেন, "দেখ্, তোর কাছে আমি এ-কথা সমস্তই বলতে পারি। কিন্তু তোর এতে বিপদ আছে। যদি একবার এই কথা একটু বেরিয়ে পড়ে তোর মুখ থেকে, তা' হ'লে আর দেখতে হবে না। তুই হ'য়ে যাবি একটা দেবদারু গাছ।"

মালী দিব্য দিয়ে বল্‌লে, "ঠাকুর, কথা দিচ্চি—আমি একটা কথাও ফাঁস কর্‌বো না, বায়-বাতাসও একতিল জান্‌তে পার্‌বে না"। কর্ম্মপুরুষ তখন কইলেন, "শোন্ তবে বলি। বারো বছরের ভেতর রাজা যদি ছেলের মুখ দেখে, তা' হ'লে রাজা মানুষ-জন্ম হারিয়ে একটা গাছ হ'য়ে যাবে।"

মুহূর্ত্ত পরেই চারিদিক যেন আঁধারে আঁধার হয়ে গেল। কর্ম্ম-পুরুষ হলেন অদৃশ্য। আঁধার কেটে যেতে মালী দেখলে তখনো রাত পোয়াতে দু'চার দণ্ড বাকি। মালী ঘরে ফির্‌লো। মাথায় তা'র ভাবনার বোঝা। কর্ম্মপুরুষের কথা কেবলি মনের মধ্যে তোলাপাড়া কর্‌তে লাগলো।

পুব্-আকাশে অরুণ-আলো উঠলো হেসে। বেজে উঠলো শাঁখের পরে শাঁখ, উঠলো আনন্দধ্বনি, বাজলো বাজনা-বাদ্যি। চারিদিক্ তোলপাড় হ'য়ে গেল। রাজবাড়ীতে রাজপুত্তুর জন্মেছে। মালী কান পেতে শুনলে। বুঝতে পার্‌লে—রাজবাড়ীতে এ-আনন্দ কেন? আজ রাজা-রাণীর পূরেছে এতোদিনের সাধ, এসেছে ঘর-আলো-করা ছেলে। কিন্তু সঙ্গে এনেছে বারোটি বছরের অভিশাপ।

মালীর গলায় যেন কাঁটা বিঁধলো। কথাটা বল্‌তেও পারে না, গিল্‌তেও পারে না। শেষকালে ভেবে-চিন্তে মালী মনটাকে খুব শক্ত করলে। সে ভাবতে লাগলো,—"আমি যদি এই কথা ব'লে মরি, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আমার প্রাণ দিয়ে রাজার প্রাণ বাঁচাবো।" এই ঠিক ক'রে চল্‌লো মালী রাজ-পুরীতে—এক হাতে ঝাঁটা, আর-হাতে কোদাল। রাজবাড়ীতে গিয়ে মালী রাজার খবর নিলে। শুন্‌লে—রাজা রাজপুত্তুরের মুখ দেখ্‌তে যাচ্চেন। মালী ছুটলো রাজার কাছে প্রাণের ভয় ছেড়ে। পৌঁছে দেখে, রাজা চলেছেন অন্দরমহলে পাত্র-মিত্র নিয়ে পুত্র-মুখ্ দেখতে, হাতে তাঁর হীরামণি-মাণিক্য। মালী রাজার পায়ের ওপর গিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়লো। রাজা তো অবাক্! মালীর এ-কি আস্পর্দ্ধা! রাজা হেঁকে উঠলেন,—'মালী, তুই কি চাস্? শুভকর্ম্মে যাচ্চি, বাধা দিলি কেন? জানিস্, তোর মাথা যাবে!" মালী বললে,—"মহারাজ, আমাকে মাপ করুন। একটা খুব দরকারী কথা আছে, এখন না বললেই নয়। আমার মাথা নিতে হয় নেবেন, তবু কথাটা শুনতেই হবে। আপনার ভালোর জন্যেই আমি এ কথা শোনাতে চাই।" রাজা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। মালী বলে কি! তারপরে হুকুম দিলেন মালীকে কথাটা বল্‌তে। মালী তখন সাহস ক'রে বল্‌তে আরম্ভ করলে,—"শুনুন রাজা ম'শায়, এ পুত্তুর আপনার শত্তুর। আপনি ওর মুখ দেখতে অন্দরে যাবেন না। কাল রাতে আমি কুস্বপন দেখেচি। যদি ছেলের মুখ দেখেন, আপনি আর মানুষ থাকবেন না।" রাজা মালীর ছোটমুখে বড় কথায় অত্যন্ত রেগে গেলেন, বল্‌লেন, "মালী, তুই যখন এতোবড় কথা বলেছিস্, আমাকে সব কথা খুলে বল্, নইলে ভীষণ শাস্তি পাবি।" মালী ব'লে উঠলো, "শাস্তির ডর করি না, মহারাজ! শুধু আপনাকে বাঁচাতে চাই। আমি যদি সব কথা কই, তা'হ'লে আমি গাছ হ'য়ে যাবো। আর আমার কথা ঠেলে ফেলে যদি পুত্তুরমুখ দেখেন, আপনিও হ'য়ে যাবেন একটা গাছ।" রাজার ধন্ধ লাগলো। কিছুক্ষণ পরে রাজা বল্‌লেন, "দেখ্ মালী, তোর কথা সত্যি কি-না, তা'র প্রমাণ কি? কেন মান্‌বো? যদি প্রাণের মায়া থাকে, আসল কথাটা খুলে বল্।" মালী ভাবলে, "যেদিকেই যাই—প্রাণ যাবেই যাবে, তখন রাজার যাতে শুভ হয় সেই কাজ করাই ভালো।" কর্ম্মপুরুষের বৃত্তান্ত মালী রাজার কাছে একে একে বল্‌তে আরম্ভ করলে। কথাও শেষ হোলো, মালী সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো একটা দেবদারুগাছ। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে পাত্র-মিত্র লোক-লস্কর সকলেই রাজাকে পুত্রমুখ দেখতে বারণ করলে। রাজা তখন সকলের সঙ্গে যুক্তি ক'রে মাটির নীচে একটা চোরকোঠা তৈরী করালেন। বারো বছরের মত খাবার জিনিস দিয়ে আরো আরো অন্য সব দরকারী

ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে রাণী, ছেলে আর এক দাসীকে সেই পাতাল-পুরীতে পাঠিয়ে দিলেন রাজা। বারোটি বৎসর তাদের সেখানে বাস করতে হবে।

রাণী, দাসী, আর রাজপুত্তুর সেখানে মনের সুখে থাকে। রাজা ব'সে ব'সে দিন গোণেন, কবে বারো বছর কাটবে।

কিন্তু বিধির লেখা কে খণ্ডাতে পারে! বারো বৎসর পূর্ণ হ'তে মাত্র একটি দিন বাকি। সেই দিনের পর রাজা পুত্রমুখ দেখবেন। তারই আয়োজন চলেছে, রাজ্যে খুব ধুমধাম। এমন সময় হোলো কি—তুপুর বেলা রাণী আর রাজকুমার ঘুমোচ্ছেন। সেই ফাঁকে দাসী রাজপুরীর জাঁকজমক দেখবার লোভ সামলাতে পারলে না। একেবারে সে বাইরে চ'লে এলো। দাসী বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে আসতে ভুলে গেল। আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে রাজকুমার শুনতে পেলে—ওপর থেকে চমৎকার বাজনা-বাদ্যি বাজছে। দ্বার খোলা। রাজকুমার মা-কে না জাগিয়ে চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। এতোদিন জ্ঞান হওয়া অবধি শুধু মা আর দাসীকে ছাড়া আর কোনো লোককে সে দেখেনি। বাইরে এসে বড় বড় দালান-কোঠা, লোকজন, হাতী, ঘোড়া, ফল ফুল গাছ—এই সব না দেখে রাজকুমার আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। সমস্ত দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চললো। শেষে রাজসভায় গিয়ে হাজির। রাজার হঠাৎ চোখ পড়লো—তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদের মত এক সুন্দর কুমার। কুমারের মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টি ফেলতেই রাজা সিংহাসনের 'পরে পাছ হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। রাজ্য জুড়ে তখন কলরোল প'ড়ে গেলো। সবই অদৃষ্ট। উপায় নেই দেখে মন্ত্রীরা অনেক পরামর্শ ক'রে রাজকুমারকেই সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। রাজ্যের সকল প্রজা নতুন বালক-রাজার নাম রাখলে মদনকুমার। * * *

এবার ইন্দ্রপুরীর কন্যার কথা।

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় তিনটি অপ্সরা একদিন নাচছে। তা'রা তিন বোন। হঠাৎ ছোট বোনের নাচে তালভঙ্গ হোলো। তাল-ভঙ্গের মত অপরাধ আর কিছুই নেই। ইন্দ্রদেব রেগে অভিশাপ দিলেন, "তোমাকে মর্ত্ত্যে গিয়ে মানুষের ঘরে জন্ম নিতে হবে। চব্বিশ বছর এই দোষের শাস্তি। বারো বছর পরে আরো বারো বছর অনেক দুঃখ ভোগ করবার পর শাপমোচন হবে। তখন আবার দেবসভায় ঠাঁই পাবে।" তিনি বোন্ খুব কাঁদতে লাগলো। কিন্তু দেবতার অভিশাপ খণ্ডন হয় না।

ছোট বোন কাঞ্চনপুরের রাজা হীরাধরের কন্যা হ'য়ে জন্মালো। নাম হোলো মধুমালা।

এর পর বারো বৎসর কেটে গেল। তখন একদিন মেঝো বোন্ বড় বোনকে বললে—"দিদি, আমাদের আদরের ছোট বোনটি মর্ত্ত্যলোকে কার ঘরে জন্ম নিয়েছে, চলো আমরা খোঁজ নিয়ে আসি। বহুদিন তার খবর পাই নি, তাকে দেখিনি—মনটা বড় খারাপ হয়েছে।" দুই বোন ইন্দ্রপুরী থেকে উড়ে চললো মর্ত্ত্যে পাখীর বেশে। এক রাজার দেশ থেকে আর এক রাজার দেশে যায়। এমনি ক'রে দেশের পর কত দেশ তারা ঘুরে বেড়ালো। তবু তা'রা ছোট বোনের খোঁজ পায় না। ঘুরতে ঘুরতে দুই অপ্সরা এক কাম্যবনে এসে পড়লো। তা'রা শুনতে পেলে এক বনচারী গাইতে গাইতে যাচ্ছে—

> সোনার পালঙ্কেতে ঘুমায় কন্যা মধুমালা।
> আলো যে তার মাথার মুকুট, চক্ষে তারা জ্বালা।
> কপালে ভায় আধখানি চাঁদ, জোছনামাখা গায়ে,
> দেহ যেন বেতের লতা হেলে-দোলে বায়ে।
> অস্ত-রবির রাঙা আভা আঁকা যে রয় গালে।
> চলন দেখে খঞ্জনা যে লুকায় গাছের ডালে।
> অঙ্গে অঙ্গে আছে গো তা'র কত মধু-ঢালা।
> কাঞ্চনপুর-রাজার কন্যা নামটি মধুমালা॥

দুই বোন বনচারীর কথাগুলো ভালো ক'রে শুনলে। তারপর দু'জনে পরামর্শ ক'রে কাঞ্চনপুরে পাড়ি দিলে। তা'রা ভাবলে, "এই রূপসী মধুমালা হয়তো তাদের ছোট বোন"। রাজপুরীতে তা'রা পৌঁছে এদিক ওদিক ঘুরে শেষে একটা মন্দিরের মত ঘরে প্রবেশ করলে। দেখে কি—সোনার পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে এক পরমা-সুন্দরী মেয়ে। ভালো ক'রে কন্যাকে দেখে তা'রা চিনতে পারলে—এই কন্যাই তাদের ছোট বোন। সেই মুখ, সেই চোখ, একটুও রূপের বদল হয় নি। আহা কি রূপ! যেন পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। মেঝো বোন তখন বড় বোনকে বললে, "দিদি হারানো বোনকে তো এতদিন পরে পেলুম। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের বরে ও যে এই বয়সেই বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে ওর তুল্য বর খুঁজে আনি—চলো। নইলে বোন আমার দুঃখ পাবে।" বড় বোন তার কথায় সায় দিলে। দুই বোনে যুক্তি ক'রে আবার ফিরে চললো দেশ-দেশান্তরে মধুমালার বরের খোঁজে। মনের মতন সুন্দর বর সন্ধান ক'রে বেড়াতে লাগলো তা'রা—নানা দেশে। শেষকালে দৈবক্রমে এলো উজানি নগরে। এই নগরে বাস করেন রাজা দণ্ডধর।

রাজা দণ্ডধরের পুরী দেখতে যেন সোনার পুরী। সোনার পুরী দেখতে দেখতে হঠাৎ তাদের চোখে পড়লো—একটা মন্দিরের মত ঘরের মধ্যে যেন আলোর শিখা জ্বলছে। তখন দুই বোন কোনো উপায়ে সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখে যে, ঐ আলো এক রাজপুত্রের রূপের আলো। রাজপুত্রের রূপে তারা মোহিত হয়ে গেল। তখন মধুমালার সঙ্গে রাজপুত্রকে পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতে তাদের খুব ইচ্ছে হোলো। আর দেরী না ক'রে দুই অপ্সরা পালঙ্কের ওপর ঘুমন্ত রাজপুত্রকে নিয়ে উজানি নগর ছেড়ে কাঞ্চনপুরে মধুমালার পালঙ্কের পাশে গিয়ে রাখলে। হঠাৎ মধুমালার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে দেখে কি—তারই পালঙ্কের পাশে আর এক সোনার পালঙ্ক, তার ওপরে ঘুমোচ্ছে এক সুন্দর কুমার। মধুমালা তো প্রথমে মনে ভাবলে—এ স্বপ্ন। যখন বুঝতে পারলে—এ স্বপ্ন নয় সত্যি, তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। মনে মনে বললে—"এই অসম্ভব সম্ভব হোলো কেমন ক'রে? একলা শুয়েছিলুম পালঙ্কে, আর হঠাৎ কোথা থেকে এই জোড়মন্দির ঘরে কুমার এলো? কপাটে সোনার খিল, ঘরে মাছি পর্য্যন্ত ঢুকতে পারে না, কি উপায়ে এখানে এলো এই সুন্দর কুমার?" [আগামী বারে সমাপ্য

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়

তের

অভিসারের পর মান; মান সম্বন্ধে গ্রীয়ারসন-সংগ্রহে ৩৩৩, ৩৫৩, ৩৬৬, ৩৭৪, ৪০৮, ৪২২, ৪৪৩, ৪৫৩, ৪৮৩, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫০১, ৫২১, ৫২২ ও ৫৪২ এই ১৫টী পদ আছে। তন্মধ্যে ৩৫৩ উমাপতি কবির 'পারিজাত-হরণ' নাটকের দুইটী শ্লোকের ভাবার্থ সঙ্কলন ও একটি পাঠান্তরের ভণিতাতে ইহা তাঁহাকেই আরোপিত হইয়াছে। ৩৬৬ ও রুদ্রপতি কবির ভণিতাতে পাওয়া যায়। মান-বিষয়ক কবিতাগুলিতে মান-প্রকরণের সমস্ত প্রকার ভেদই— নায়িকার কখনও মৃদু, কখনও গভীর মর্ম্মবেদনা, সখীর শ্লেষোক্তি ও সস্নেহ অনুযোগ, নায়িকার অন্যায় জেদ ও নায়কের অবিশ্বাসিতার প্রতি ভর্ৎসনা, মানভঙ্গ করিয়া মিলনের উপদেশ, অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে শোভন আচরণের রীতি নির্দেশ ইত্যাদি—উদাহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী কবিতার মধ্যে খেদ ও আশাভঙ্গের অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর শোনা যায়। অধিকাংশই মামুলী আলঙ্কারিক উক্তি ও সাংসারিক জ্ঞানের আদর্শে প্রেমের বিচারের চেষ্টাতেই পূর্ণ।

এই সাংসারিক ভূয়োদর্শনের মানদণ্ডে প্রেমের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতার সমর্থন বিদ্যাপতির উপর রাজসভাপ্রচলিত নৈতিক আদর্শের প্রভাব সূচিত করে। প্রেমকে বাজারের বেচা কেনার সহিত তুলনা করিয়া, ইহাকে লৌকিক সুবিধাবাদের স্তরে নামাইয়া, সাধারণ অসুন্দর প্রতিবেশের সহিত ইহার সংযোগ ঘটাইয়া কবি ইহার আদর্শ সুষমার হানি করিয়াছেন ; ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইহার সম্বন্ধে অনেক তীক্ষ্ণ, মার্জ্জিত উক্তি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন!

চিটি-গুড় চুপড়লি রাড়ক পোরি।
লওলে লাথ বেকত ভেল চোরি॥ (৩৩৩)

(চিটেগুড় মাখা ইতর ব্যক্তির গৃহ, আনীত অপহৃত দ্রব্যের আবিষ্কার—চুরি ধরাইয়া দিল)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রেমের যে চৌর্য্য-ষড়্‌যন্ত্রের দিকটারই একাধিপত্য, এখানে তাহারই বক্র ইঙ্গিত বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় খেলিয়া গিয়াছে।

৩৭৪ পদে কৃষ্ণের পরনারী-ব্যসনকে কৃপণের হাস্যকর আত্ম-পীড়নের সহিত তুলনা করিয়া কবি অপরাধের গুরুত্বকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখিয়াছেন।

কৃপণ পুরুষকে কেও নহি নিক (ভাল) কহ
জগ ভরি কর উপহাস।

মাগি লয়ব বিত সে জদি হো নিত
অপন (ধন) করব কোন কাজ॥

৪৪৩ পদে প্রেমিকের ইচ্ছাপূরণকে পরহিতব্রতের সহিত তুলনা করিয়া কবি প্রণয়-কলার উপর দানশীলতা ও আত্মোৎসর্গের ছদ্ম গৌরব আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মধু নহি দেলহ রহলি কী লাগি। (কি অভাব ছিল?)
সে সম্পতি যে পরহিত লাগি!

ভনই বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ। (গোপনে)
নিজ ক্ষতি বিনু পরহিত নহি হোএ॥
অধিক চতুর পনে ভেলহুঁ অয়ানী। (নির্ব্বোধ)
লাভকে লোভে মূলহু ভেল হানী॥ (৪৫৩)

এখানে অভিমান করিয়া ব্যর্থকামা নায়িকার আত্মগ্লানির মধ্যে হিসাবী ব্যবসায়বুদ্ধির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। হৃদয়াবেগের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকার জন্য এই উক্তিতে গভীরতর ভাবব্যঞ্জনার কোন আভাস মিলে না—ইহা নিছক লাভ-লোকসানের কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

৫০১ ও ৫২২ এই দুইটী পদে সরল, সহজ কথায় অভিমান ব্যক্ত ও সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে পরিচিত দ্রব্যের গুণ বিচারের দ্বারা উচ্চ ও নীচমনা নায়কের পার্থক্য বিশদ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কবিকল্পনার বিস্তার ও আবেগের উচ্চ গ্রাম—উভয়েরই অভাব। মনে হয় যেন বাস্তবজীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে দাম্পত্য-বিরোধে যে মনোবেদনা উদ্ভূত হয়, তাহাই সোজাসুজি, কাব্যোচিত উন্নয়নের (heightening) সাহায্য না লইয়া, এই পদ দুটীতে গুঞ্জরিত হইয়াছে।

এত দিন ছলি (ছিল) নব রীতি রে।
জল মীন জেহন পিরীতি রে॥
এক হি বচন বীচ ভেল রে। (একটি কথায় আমাদের মধ্যে মতভেদ হইল)
হসি পহু উতরো ন দেল রে॥
এক হি পলঙ্গ পর কান রে।
মোর লেখ (আমার মনে হইল) দুর দেস ভান রে॥
জাহি বন কেও নাহি ডোল রে। (চলে না)
তাহি বন পিয়া হঁসি বোল রে॥ (কথা বলিতেছে)
ধরব জোগি-নিয়া কে ভেস রে।
করব মেঁ পহুক উদেস রে॥
ভনই বিদ্যাপতি মান রে।
সুপুরুস ন কর নিদান (চরম ক্লেশ) রে॥ (৫০১)

এক কথায় অভিমান, মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ ও ঘোর বনে প্রেমিকের অন্তর্দ্ধান—গানের মধ্যে যেন এক অনভিজ্ঞ গ্রাম্য বালিকার রূপ-কথার রাজ্যে বিচরণশীল কল্পনার ছাপ পড়িয়াছে। শিশির-বিন্দুতে সমুদ্রের প্রতিভাতের ন্যায়, ঐশী প্রেমের অপ্রমেয় প্রসার মূঢ় বালিকার এক বিন্দু অশ্রুজলে, এক ঝলক অভিমানোচ্ছ্বাসে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বড় জন জঞো কর পিরীতি রে।
কোপহু ন তেজয় রীতি রে॥
কাক কোইল এক জাতি রে।
ভেম (ভীমরুল) ভমর এক জাতি রে।
হেম হরদি কত বীচ রে। (হেম ও হরিদ্রার মধ্যে, তাহাদের বর্ণের ঐক্য সত্ত্বেও, কত প্রভেদ)
গুনহি বুঝিঅ উচ নীচ রে॥
মণি কাদব লপটায় রে। (মণি কর্দ্দমাক্ত হইলেও)
তঁই কি তনিক গুন জায় রে॥ (৫২২)

এখানেও গাহস্থ্য জীবনে আহরিত ছোট খাট অভিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে প্রেমরহস্যকে পরিমাপ করার চেষ্টায় এক করুণ কল্পনাদৈন্য প্রকাশ পাইতেছে।

বাকী কয়েকটী পদে মান কবিকল্পনার দ্বারা উৎসারিত আবেগোচ্ছ্বাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৮০৮ পদে চন্দ্রালোকিত মধু-যামিনীতে মানের অনৌচিত্য সম্বন্ধে সখী নায়িকাকে অনুযোগ করিতেছে।

রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি কবি
কর এ মধুর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওল (ভোজন করাইল)
ভূখল তুঅ জজমান॥
দীপক-দীপ সম (দীপের শিখার ন্যায়) থির ন রহ এ মন
দৃঢ় কর আপন গেয়ান।
সঙ্কিত মদন বেদন অতি দারুণ
বিদ্যাপতি কবি ভান॥

৪২২ পদটী নায়কের মৃঢ় অবহেলায় নায়িকার উচ্ছ্বসিত অন্তর বেদনার চমৎকার অভিব্যক্তি।

চানন ভরম (চন্দন বৃক্ষ ভ্রমে) সেবল হাম সজনী
পূরত সব মন কাম।
কণ্টক দরস পরস ভেল সজনী
সীমর (শিমূল) ভেল পরিণাম॥
একতি নগর বসু মাধব সজনী
পর ভামিনি বস ভেল।
হম ধনি এহনি কলাবতি সজনী
গুণ গৌরব দূর গেল॥
অভিনব এক কমল ফুল সজনী
দোনা নীমক ভার॥
(নিমপত্রের ঠোঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছে)
মেহো ফুল ওতহি সুখায়ল ছথি (শুকাইয়া আছে) সজনী
রসময় ফুলল নেবার॥
(তৃণকুসুম—রূপগুণহীনা পররমণী—প্রস্ফুটিত হইল)
বিধিবস আজ আ এল সজনী
এতদিন ওতহি গমায়। (কাটাইয়া)
কোন পরি (কেমন করিয়া) করব সমাগম সজনী
মোর মন নহি পতিয়ায়॥

৫৪২ পদে মান ভঙ্গে নায়িকা নিজ ব্যর্থ পরিচর্য্যা ও উপেক্ষিত আকর্ষণের উল্লেখ করিয়া নায়ককে সস্নেহ গঞ্জনা দিতেছেন।

চীর কপূর পান হমে সাজল
পা অস আও পকমানে। (পায়স রন্ধন করিলাম)
সগর রয়নি হমে জাগি গমাওল
খাণ্ডিত ভেল মোর মানে॥
তুঅ চঞ্চল চিত নহি থপলাথিত (বিশ্বাসযোগ্য)
মহিমা ভাব গভীরে। (অতি দুর্ব্বোধ্য)
কুটিল কটাক্ষ মন্দ হসি হেরহ
ভিতরহু শ্যাম শরীরে॥
(বাহিরের মত ভিতরেও শ্যামল)

মান বিষয়ক কবিতাতে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতিকে অতিক্রম করিয়াছেন মনে হয়। তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত শ্লেষ ও সোহাগের ব্যঞ্জনায় তাঁহারা আরও সিদ্ধহস্ত। তবে বিদ্যাপতি মান কবিতার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, পরবর্ত্তীরা, কিঞ্চিৎ চতুরতর বাক্‌ভঙ্গী ও সময় সময় উদ্ভট ঘটনা-সন্নিবেশের সহিত, তাহারই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে 'জেমাওল' (ভোজন করাইল, ৪০৮), 'বধাব' (উৎসব, ৪২২), 'অয়ানী' (নির্ব্বোধ, ৪৫৩), 'সতালে' (গভীর, ৪৮৭) 'থপলাথিত' (বিশ্বাসযোগ্য, ৫৪২) প্রভৃতি কয়েকটী মৈথিল শব্দ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

[ক্রমশঃ

হিন্দোল

বাণীকুমার

(পালানাট্য)

[সঙ্গীত-মুখ—দোলন-ছন্দে···ধীরে ধীরে উৎসব-পুলকোচ্ছ্বসিত সঙ্গীত-বিততিতে সংমিশ্রণ···তৎপরে ধর্ম্ম-ভাব-গর্ভ গম্ভীর কুতপ-প্রয়োগে আরতির রূপ-বিকাশ···]

স্তোত্র

নবজলধরবর্ণং-চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং
বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্ ।
কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্ ॥

(শঙ্খ-স্বর ও আরতি-সঙ্গীত)

কণ্ঠলম্বিমঞ্জুগুঞ্জ-
কেলিলব্ধরম্যকুঞ্জ-
কর্ণবর্ত্তিফুল্লকুন্দ
পাহি দেব মাং গোবিন্দ ॥

(আরতি-সঙ্গীত)

পরিবর্তুল-শর্ব্বরীপতি-গর্ব্বরীতি-হরাননং
নন্দ নন্দনমিন্দিরাকৃত-বন্দনং ধৃতচন্দনম্ ।
সুন্দরী-রতি-মন্দিরীকৃতকন্দরং ধৃতমন্দরং
কুণ্ডলদ্যুতিমণ্ডলোল্লত-কন্ধরং ভজ সুন্দরম্ ॥

(শঙ্খারতি)

উরসি কলিত-মুরলীকৃতভঙ্গং, নবজলধর-কিরণোল্লসদঙ্গম্ ।
যুবতিহৃদয়ধৃত-মন্মথ-রঙ্গং, প্রণমত যমুনা-তটকৃতরঙ্গম্ ॥

(শঙ্খারতি)

রুচিরনখে রচয় সখে, বলিতরতিং ভজনততিম্ ।
স্মরবিস্মৃতিস্ববিস্তগতি-নর্ত্তশরণে হরিচরণে ॥

রুচিরপটঃ পুলিনতটঃ, পশুপগতিগুর্ণবসতিঃ ।
স মম শুচিজ্বলদরুচি-মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ ॥

(শঙ্খারতি)

নবজলধরধামা পাতু বঃ কৃষ্ণনামা
ভুবনমধুরবেশা মালিনীমর্ত্তিরেষা ॥

(শঙ্খরোল—উচ্চগ্রামে আরতি সঙ্গীত ! সঙ্গীতঃ পরিশিষ্ট)

গ্রন্থিক ··· কোন্ এক বিস্মৃত শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে হিন্দোল-উৎসব আরম্ভ হ'য়ে ঝুলন-পূর্ণিমাতে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, কবে প্রেম-পুলকিত, নন্দসুত-নির্ম্মল-কেলিপূত যমুনাতটবর্ত্তী বৃন্দাবনের নিভৃত লতা-নিকুঞ্জে গোপাঙ্গনাদের অনুষ্ঠিত ঝুলন-লীলা হয়েছিল—সেই বিগত আনন্দের উৎসব-বার্ত্তা আজ মধুর স্মৃতির মত এই যুগে এসে পৌঁচেছে। গোপ-গোপিনীগণ নটবর শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দকে স্তুতি-গানের মুক্তাহার রচনা ক'রে উপহার দিয়েছিল,—আজিকার দিনেও শঙ্খ-ঘণ্টা, মুরজ-মুরলী, সুশির ও বিতত-রবে তাঁর আরতি সম্পন্ন হ'চ্চে।

শ্রীগোবিন্দের নাটমন্দির...দেবমন্দিরের বাইরে এসেছেন রাধাকৃষ্ণ। লাল কাপড়ে মোড়া ফুলে-জড়ানো ডোরে দেব-সিংহাসনখানি আড়ার সঙ্গে ঝুলছে। সিংহাসনখানি রূপালী রাংতায় মণ্ডিত, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ত্রিভঙ্গবেশে দাঁড়িয়ে আছেন,—পদতলের হিঙ্গুলের রেখা থেকে মাথার চূড়া পর্য্যন্ত সবখানিই বাঁকা। শিখিপুচ্ছ হেলে রাধা-লক্ষ্মীঠাকুরাণীর চূড়ার সঙ্গে এসে মিলেছে। ঠাকুরের অধরে বাঁশরী, কিন্তু মধুর দৃষ্টি ঠাকুরাণীর মুখের 'পরে বিরাজ করছে। ঠাকুরাণীও মুখখানি ঈষৎ উন্নত ক'রে প্রফুল্ল নয়নে ঠাকুরের মুখের পানে চেয়ে আছেন। কৃষ্ণরাধার চারিপাশে অষ্টসখীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি।

ফুল দিয়ে বৃন্দাবন রচনা করা হয়েছে। মল্লিকা, অশোক, পুন্নাগ, চাঁপা ও কদম ফুলে শোভিত চতুষ্কোণ দোলমণ্ডপ শোভা পাচ্চে। তার আবার মালা ও চামরে শোভমান মনোহর তোরণ প্রস্তুত হয়েছে। এই মণ্ডপের মাঝে বেদিকা নির্ম্মিত। এই বেদিকার 'পরে রত্ন-দোলিকা ঝুলছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই কৃষ্ণরাধার সিংহাসন-শোভিত দোলাখানি সাতবার দুলিয়ে দিলেন। শঙ্খঘণ্টাবাদ্য ও আরতি-সঙ্গীতে নাটমন্দির মুখরিত।

* * *

সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ একদিন লীলাসঙ্গিনী শ্রীরাধিকার সঙ্গে এক ঘন-শ্রাবণ পূর্ণিমায় এই হিন্দোল-বিলাস ক'রে গিয়েছেন। বংশীবটতলে যমুনার কূলে সেই ঝুলন লীলানিকুঞ্জের ছবি চোখের 'পরে ভেসে উঠ্‌ছে। গোপ-গোপিনীগণের উৎসবসুর কাণে এসে ঝঙ্কার তুলছে। তাই যেন আজকেও শুনতে পাই, সখী

ললিতা বল্‌ছেন—"রাধাসুন্দরি—চেয়ে দেখো, আকাশে মেঘ উঠেছে, যেন মোহন শ্যামল-বঁধুর কান্তি-প্রকাশ।"

* * *

[পালামাট্য]

ললিতা। রাধাসুন্দরী, চেয়ে দেখো আকাশের দিকে, মেঘ উঠেছে—যেন আমাদের মোহন শ্যামল-বঁধুর শ্যামকান্তি প্রকাশ কর্‌ছে। তমাল বন অন্ধকার হ'য়ে গেছে। আজ এই লতাকুঞ্জে বর্ষার বাসর রচনা করি—এসো, সখি! গোপ ও গোপীগণের কণ্ঠে শ্যামল বর্ষা-নিমন্ত্রণের সুর ঝঙ্কার তুলুক।...তীব্র নিদাঘের পর শ্রীবৃন্দাবনে আবার স্নিগ্ধ বর্ষার আবির্ভাব হয়েছে। ধরণীর মলিনতা দূর ক'রে আমাদের পর স্বভাবপাবন শ্রাবণ দেখা দিলে—আর কি বর্ষা-উৎসব না ক'রে থাকা যায়!

গান

গোপীগণ। নবীন মেঘের ভুলতরঙ্গে
কুঞ্জ উঠেছে বাজিয়া রঙ্গে,
পুলক-চপলা খেলিছে অঙ্গে
আজি ছুট হৃদি-অঙ্গনে।

ললিতা। ওগো সুন্দরী দোলো নীপশাখে,
ময়ূর-পাপিয়া প্রীতিরাগে ডাকে,
মধু-বেণু সুর-আলিপনা আঁকে
আজিকে বঁধুর সঙ্গ নে॥

কিশোরী। কদম-বীথিকা হোলো মুখরিত
হাসির ঝরণা-রসে উছসিত,
হৃদি-তলে সুধারাশি উলসিত,
মধুর-ঝুলন-রঙ্গনে।

গোপীগণ। বেজেছে যে তাল নভ-মৃদঙ্গে,
শ্রাবণের মীড় বাদল-সঙ্গে,
নটবর নাচে লীলা-বিভঙ্গে,
আঁকি' চোখে নীল-অঞ্জনে॥

ললিতা। সৌরভে পুষ্পবন বিভোর। আকাশ মেঘে ঢাকা। নিবিড় মেঘে বিদ্যুতের লীলা চলেছে। ঐ মেঘমেদুর আকাশের দিকে চেয়ে থাক্‌লে শ্যামল-কিশোরের কথা বারবার মনে জাগে। দেখো সখি—আজ এমন দিনে শ্যামকে কাছে না পেলে মন ভ'রে উঠবে না, তাই বলি, নতুন খেলায় শ্যামরায়কে মাতিয়ে তুল্‌তে হবে।

কিশোরী। ললিতা, কত আশা ক'রে আজ এই ঘন বর্ষার দিনে অভিসারে এসেছি শ্যামের সঙ্গে উৎসব-রঙ্গে মাত্‌বো ব'লে, কিন্তু পাতার ফাঁকে ফাঁকে জল ঝ'রে কোনো কুঞ্জই এখন মিলনযোগ্য নয়। ধারা-প্লাবনে সব ভেসে যাচ্ছে। তবে কোন্ স্থানে মিল্‌বো—সই?

ললিতা। রাধিকাকিশোরী, অতো উতলা হ'চ্চো কেন? তোমার বর্ষা-অভিসার কি বিফলে যায়! ঐ দেখো—ঐ বংশীবটের নীচে। ঘন কিশলয়ের আবরণে বংশীবট ছত্র ধারণ ক'রে আছে। ঐখানেই আমাদের বর্ষা-উৎসব হবে—সখি!

কিশোরী। তাইতো—সই! আমার মন সন্দেহ-দোলায় দুল্‌ছিল—তাই নিরাশা ব্যাকুল চোখে ঐ বংশী-বটের আশ্রিত লতাকুঞ্জ দেখতে পাইনি। আয় সখীরা, আজ শ্যাম আস্‌বার আগে এই বটের ঝুরি যোগ ক'রে ফুলদামে সাজিয়ে অপূর্ব্ব হিন্দোল রচনা করি।

ললিতা। আমরা সকলেই এই বংশীবটতলে বিচিত্র ফুলে বিচিত্র হিন্দোল রচনা কর্‌তে প্রস্তুত হ'চ্চি। কিশোর-কিশোরীকে এই ঝুলনায় বসিয়ে দোল দোবো...এই দোলার তালে তালে অদ্ভূত লীলারস উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বো।

কিশোরী। কিন্তু জানিস্—শ্যাম কখন্ আস্‌বেন?

ললিতা। তা' তো জানি না, রাধা!

কিশোরী। আজ আমরা এই উৎসবের আয়োজন কর্‌ছি...যদি আমার ছলনাময় তমাল-বীথিতে লুকিয়ে ব'সে থেকে বাঁশীর সঙ্কেত দিতে থাকেন—যদি না আসেন, তা' হ'লে এই শ্যাম-শূন্য কুঞ্জ নিরাশার অন্ধকারে আরো নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌বে—ধারাবর্ষণের সঙ্গে মিল্‌বে বিরহ-ব্যথার অশ্রু।

ললিতা। সখি বৃকভানুকুমারী, মিছে মনগড়া সন্দেহের জাল না বুনে'—এসো, এই বাদলবাতাসে ঝুলন ঝুলিয়ে দিই। আজ তুমি শুধু কমল-চোখে চেয়ে এই কুঞ্জকাননে কূজন ভুলিয়ে দাও। তুমি নূপুর-পায়ে তাল দিয়ে নবীন হিন্দোলায় উঠে বোসো—শ্যাম এসে তোমার পাশে বস্‌বে। যে দোলা ঝুলিয়ে দোবো—তা'তে দু'জনাকেই ঢুলিয়ে যাবে।

কিশোরী। ললিতা, তোরা সবাই মিলে—ঝুমকো ফুলের ঝালরে ঝুলন-দোলা গেঁথে তোল্! কিন্তু কোথায় আমার প্রেমিক? চারিধারে আঁধার ঘিরে আস্‌ছে, কেমন ক'রে শ্যাম পথ দেখ্‌তে পাবেন? প্রিয়তম না এলে—ঐ শূন্য দোলা সজল বাতাসে দুলে দুলে বাড়িয়ে তুল্‌বে করুণ চঞ্চলতা।

গান

পাগল বাদল ঝুরিছে বারিদ অঝোর-ধারে।
পেখম-পালক তুলিয়া ময়ূর ধেয়ায় কা'রে॥
কুসুম-সুবাস আসিছে আকুল সজল-বায়ে।
মৃদুল নিশাস সুরভি-আভাস লাগায় গায়ে॥
মোহন-লীলায় পরাবে শ্যামল সোহাগ-হারে।
শ্রাবণ এখন জাগালো হিয়ায় বিষাদ-ভারে॥

মধুর কিশোর আজিকে বিরাজ হৃদয়-তীরে।
অমর-সুদূর-স্মৃতিরে জাগাও জীবন ঘিরে॥
ত্বরিত-লেখায় চপলা কাহার চকিত হাসে।
কখন চেনায় নিমেষে লুকায় মেঘের পাশে॥
মিলন-বাণীর বারতা গোপন প্রাণের তারে।
করুণ বিধুর আসে মেঘদূত হৃদয়-দ্বারে॥

[রাধিকার মর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক নৃত্য ও সঙ্গীত]

(বলভদ্রের প্রকাশ)

বলভদ্র। এই বংশীবটের নীচে ব্রজগোপিনীদের মেলা ব'সেছে যে দেখ্‌ছি। চারিদিকে আঁধার ছেয়ে গেছে বৃষ্টির বিরাম নেই, বাজ হাঁকছে, বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে চমক হান্‌ছে—আর এই ঘন বর্ষার রাতে তোমাদের বাসর করেছ রচনা! আশ্চর্য্য তোমাদের লীলা কৌতুক!

ললিতা। সখা বলভদ্র! তুমি কেমন ক'রে এই নিভৃত কুঞ্জে পথ চিনে এলে? কেমন ক'রেই বা পেলে সন্ধান?

বলভদ্র। ব্রজসুন্দরী কিশোরীর বিরহের সুর অনুসরণ ক'রে চ'লে এসেছি পথ চিনে।...সখি, এতটুকু বিচ্ছেদও কি সইতে পারো না? শ্যামচাঁদ কি না এসে পারে! সে তোমায় ছেড়ে যাবে কোথায়? মনে মনে মিথ্যে সংশয় রচনা ক'রে কেন দুঃখ পাও!

কিশোরী। সখা, নিয়তি যদি প্রতিকূল হয়, অমৃতও গরল হ'য়ে ওঠে। বর্ষা-উৎসবের জন্যে আমরা এই লতাকুঞ্জে যে ঝুলন-বাসর সাজিয়ে তুলেছি—তা' আজ বঁধুর বিহনে আনন্দ হারা।

বলভদ্র। ওগো কিশোরী—যে চিরকিশোরের নীল কলেবরের কান্তি ঐ নবজলধর অনুকরণ করেছে—যা'র হাসি অনুকরণ কর্‌বার ছলে পল্লবে পল্লবে পাতায় পাতায় কানন উল্লাস-তাল বাজিয়ে তুলেছে—ময়ূর-ময়ূরী যা'র অপরূপ নৃত্যমাধুরীর ছন্দে ছন্দে আজ নেচে উঠেছে—যা'র অঙ্গের সুরভি মেখে বাদল-বাতাস আজ নবীন হিল্লোলে মেতে বেড়াচ্ছে,—প্রকৃতি যা'র শ্যামরূপ ধ্যান ক'রে অন্তরকে ক'রে তুলেছে শ্যামময়, সেই শ্যামল সুন্দর কি আজ তা'রই নব-লীলার জন্যে রচিত উৎসব-কুঞ্জে আসবে না—মনে করো? ঐ শোনো পূর্ব্বাশায় আলোক দূতের মত শ্রীদামের কণ্ঠে বাদলের আমন্ত্রণী-সুর জেগে উঠেছে।

[গীতরত শ্রীদামের প্রবেশ]

শ্রীদাম।

গান

শ্যাম সংসে—
মেঘ বরষে।
নামে আঁধারা রজনী,
চপলা চমক-রণনি,—
ধরণী ঝলসে
বাজে মৃদঙ্গ গগনে,
ঘুম নাহি যে নয়নে—
আকুল হরষে॥

বলভদ্র। কি শ্রীদাম, বর্ষার উল্লাস যে তোমার কণ্ঠে লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে কিন্তু কার জন্যে? সখা শ্যামচন্দ্র কই?

শ্রীদাম। কেন! সখা শ্যামচাঁদ তো বহুক্ষণ অভিসারে এসেছেন! এখনো তাঁ'র দেখা নেই কেন! আর আর সব গোপসখা আস্‌ছে এই বর্ষা-উৎসবে, শ্যাম না থাক্‌লে তো এ উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

[দূরাগত বংশীধ্বনি]

বলভদ্র। কা'র জন্যে এ উৎসব?—উৎসবপতি ব্রজসুন্দরই যদি না উপস্থিত থাকে, এই হিন্দোল-বিলাস আরম্ভ হবে কেমন ক'রে?—

শ্রীদাম—ঐ শোনো, তমাল-কুঞ্জের আড়াল থেকে সখার বাঁশী বেজে উঠেছে—আর নিরাশার কারণ কি!

ললিতা। সখা শ্রীদাম, প্রিয়বর কাছে থেকেও এই অন্ধকারে যেন দূর রচে' তুলেছে—তাঁ'র আর আমাদের মাঝখানে যেন ভুবন ব্যবধান। শ্যামের ছলনার এই তো রীতি। বাঁশী বাজিয়ে ডাক দেন—তবুও ধরা যায় না—কাছে আসেন অথচ নাগাল পাওয়া যায় না। সখি শ্রীরাধা, তোমারও কি মনে এই কথা জাগছে না, "যদি না দেখা দাও প্রিয়, তবে কেন ডাক দিয়েছ?"

গান

সুদূর কেন তুমি আজি ডাকো মোরে—
ব্যথার সুরে অচিনপুরে ব্যাকুল ক'রে।
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিলে সকল প্রাণে,
মন মম কোন্ ছন্দে মাতে কা'র সে গানে,
রুণুরুণু নূপুর বাজে জীবন ভ'রে॥
বিপুল আশা জাগলো আমার হিয়ার হিয়ায়।
মাতাল হাওয়ায় হাওয়ায় কাহার বার্ত্তা মিলায়॥
মধুর হ'তে মধুরা ওই বিভোল-বাণী—
ক্ষণে ক্ষণে কাজ যে ভোলায় কেন জানি!
হৃদয়-দোলায় চল্‌ছে ঝুলন সুরের ঘোরে॥

[হিন্দোলা—সঙ্গীত: সংলাপ পরিস্থিত]

শ্রীদাম। গোপ-সখিরা, আজ দোলা ঝুলিয়ে দাও। গোপীবল্লভ আসবেন এই দোলায় আরোহণ করবেন। সেই দোলার তালে তালে বিশ্বভুবন দুলবে। আজ মধুর বর্ষা-সঙ্গীতের ধারায় এই কাননভূমি ভেসে যাক্।

[শ্যামকিশোরের আবির্ভাব]

কিশোর—ওগো কিশোরী—আমি তিমিরের বাধা ঠেলে তোমাদের নবরচিত উৎসবমুখর কুঞ্জবাসরে এসে পৌঁছেছি। ওগো প্রাণের দোসরী, আমার 'পরে তোমার

এতো অনুরাগ? কুঞ্জকাননকে আঁধার গ্রাস করেছে, বারিপাত হ'চ্ছে, আর হেঁকে চলেছে অশনি, তবুও তুমি আজ এ কি অপরূপ উৎসবের আয়োজন করেছ!

কিশোরী। ওগো চিরনবীন, ওগো শ্যামল-কিশোর—তোমার করুণার প্রসাদ পাবার লোভে আমাদের এই আয়োজন। তোমার আনন্দ-সাধন করাই আমাদের জীবনের চরম সাধ।

কিশোর। তোমার নিরুপম প্রেমের কথা আমি জানি—প্রিয়তমা! কিন্তু শিরীষফুলের চেয়েও কোমল তোমার ঐ রাঙা পা' দু'খানি, তবু কেমন ক'রে এই কাঁটা-ভরা পথ অবহেলে এসে পৌঁছুলে?

কিশোরী। শুধু তোমার অঙ্গের সঙ্গ-লাভের পবিত্র আকাঙ্ক্ষার শক্তিতে এখানে আস্‌তে পেরেছি।

কিশোর। প্রেমের কি নিষ্ঠা তোমার! আর কি অপরূপ সাজেই না সেজেছ—প্রিয়া! নীল-কমলের মালা পরেছ কবরীতে, তমাল-কলিকে করেছ কর্ণভূষণ, আর নীল-নীচোলের মত নিবিড় অন্ধকার তমাল-কুঞ্জ ভ'রে উঠেছে—তাই আত্মগোপন করবার অভিপ্রায়ে পরেছ নীলাম্বরী। ধন্য তোমার রূপ-সজ্জা, ধন্য তোমার প্রেম—ধন্য তুমি রমণীর শিরোমণি!

বলভদ্র। কানন ঘিরে তিমির রচিত হয়েছে, এই তো অভিসারের অতি সুসময়। শ্যামচাঁদ—এ-সুযোগ কি কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা ত্যাগ করে! বর্ষার ধারাপাতে যখন চারিধার প্লাবিত হ'চ্চে—সেই সময় নিভৃত নিকুঞ্জে ব'সে মুখোমুখি চেয়ে প্রাণের কথা বলবার শ্রেষ্ঠ অবসর। ওগো ব্রজগোপীগণ, আজ ঝুলনার দোলন-ছন্দে শ্যামের চিত্ত-দোলা দুলিয়ে দাও।

কিশোর। আজ তমাল দলের মত ঘন-নীল আঁধারে রাত্রি ভ'রে গেছে, কিন্তু আমার কিশোরীর দেহের জ্যোতিঃ কুঙ্কুমের মত সরস গৌরবর্ণ—এই বর্ণে যেন নিকষ পাষাণের 'পরে স্বর্ণলেখা ফুটে উঠেছে। ওগো সখিরা, যেন এই তিমির-নিকষ তোমাদের প্রেম ক'ষে পরীক্ষা করছে। প্রেয়সী—এ কি তোমার ভাব! দেখছি—ভীরু নয়নের পল্লব দু'টি অবনত ক'রে রেখেছ, কেন প্রিয়া?

বলভদ্র। ওগো বিরহিণী, এখনও কি শঙ্কিত মন থেকে বিচ্ছেদ-দুঃখ দূর করতে পারোনি? দুর্দিন তো চ'লে গেছে সখি! অন্তরে অন্তরে যাকে ধ্যানের কুসুমে সাজিয়ে সর্ব্বকালে দেখেছ—সেই ধ্যান সুন্দর আজ দেখা দিয়েছেন। ওহে সুবোল—সখার অন্তরের বাণী আজ ভয়-ভীতা কিশোরীকে শুনিয়ে দাও। কেন আর মর্ম্মে মর্ম্মে এ অকারণ ব্যথার ভার!

সুবোল

চাহো ফিরে হরিণলোচনা!
দেহো সান্ত্বনা।
ঘোমটা খোলো গো সখি!
রূপ নিরখি,
হবো আজি বিরহ-শোচনা॥
ঝুলিয়ে দোলা লতা-বিতানে—
দুলাইয়া দাও গানে গানে।
যমুনারি কলন-সুরে
ধ্বনি তোলো নূপুরে,
যাক্ চলি' হৃদয়-বেদনা॥

[হিন্দোলা-তান ও নৃত্য-বিলাস]

শ্রীদাম। আজ শ্যামলের উদয় হয়েছে—তাই বুঝি আকাশে এতো সমারোহের বিস্তার! এখন নতুন ঝুলন-উৎসবে মেতে যেতে হবে, ললাটে কুঙ্কুম-চন্দনে সুনিপুণ ক'রে পত্রলেখা আঁকো, অলকে যূথি-চামেলির মঞ্জরী দুলিয়ে দাও, নীল কাজল এঁকে দাও হরিণ চোখে, আর অপরূপ ভঙ্গীতে কবরী রচনা ক'রে তোলো। কুঞ্জকানন এবার বন্দনা-সঙ্গীতে জাগ্রত হোক্।

কিশোর। ওগো সুন্দরী, হাসিমুখে চাও। তোমার মধুর দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক্ উৎসবের কৌতুক-প্রীতি, আর তোমার চঞ্চল কঙ্কণে বিদ্যুৎ-শিখা কেঁপে কেঁপে উঠুক্। কদমশাখায়, তমালডালে তোমার নীলাঞ্চলের হাওয়া শিহরণ আনুক, তোমার নাচের ভঙ্গীতে শিখীর পাখায় লাগুক মাতন।

বলভদ্র। ব্রজবালা, আজ সুরে সুরে উৎসবের ঢেউ তোলো। ঐ মনোরঞ্জন বনপথ ধ'রে তোমার জন্যে এসেছে। তোমার নয়নে প্রেমাঞ্জন পরিয়ে দেবে, তোমার তাপতপ্ত প্রাণে সুধা-সিঞ্চন করবে।

[গীত-মুখর উৎসব-ভূমি]

গান

ছায়ার দেশে ঘনিয়ে এলো শ্যামল-মেঘের কোন্ মায়া
তিমির-মেদুর কদম-বনের ধার!
তাপের আজি-বাঁধন কাটে শ্যামল বঁধুর শ্যামকায়া,
রসের বরিষণে হরে ভার।
দোল-দোলনের মধুর গীতে ভর্‌লো কানন আর ধরা,
দেখে ভুবন মিলন-স্বপন কা'র!
তাকায় আঁখি আকাশ-পানে—দেখবে কি-রূপ প্রাণ-ভরা,
নয়ন ভোলে তাইতো অনিবার।

ললিতা। ব্রজকিশোরী, আমাদের প্রিয়বর শ্যাম-কিশোরকে ঝুলন-উৎসবে মাতিয়ে দে। আমরা বিচিত্র

ফুলে বিচিত্র হিন্দোল প্রস্তুত করেছি। আমরা কিশোর-কিশোরীকে এই ফুল-দোলায় বসিয়ে সঙ্গীতের তালে তালে দোলা দোবো। আকাশে চাঁদ নেই, তারামালা নিভে গেছে—শুধু মেঘে মেঘে একাকার। বৃক্ষতল অন্ধকার, কিন্তু ঐ যুগল রূপ যেন শত চাঁদের কিরণে ঠিক্‌রে পড়ছে। আজ শ্যাম-সাধনায় সকল আশা পূর্ণ হবে।

গান

প্রেমের ঝুলনা আজি কে ঝুলাবে!
বঁধুর বাহু-ডোরে রস-অনুরাগে—
তনু-মন-প্রাণ দুলাবে॥
নয়নে বাদলের ধারা আনো—
শ্যামল-ঘটায় চিত্ত ছাও।
প্রেমের ব্যাকুল বাণী মধুর-গানে
চুপি চুপি সবারে শোনাও॥
তা'র ধ্যান হৃদয়ে ধরুক্ নব-রূপ—
সকল নিরাশ ভুলাবে।
জীবনে আসনখানি পাতিয়া রাখো—
সে-সাধন দ্বার খুলাবে॥

কিশোরী। সখি, এই ভুবনের মধ্যে এই লতাকুঞ্জ আমাদের মিলন ধাম। আজ আমাদের সকল-তৃষ্ণাহরা ঘনশ্যাম এসে মন ঝুলন-মাতাল ক'রে তুলেছে। শ্যাম যে বিধুর-ধরণীর বন্ধু। চারিদিকে অবিরল ধারা ঝরছে, কিন্তু আমাদের উৎসবের বিরাম নেই। আমাদের মনস্কাম পূর্ণ হ'তে চলেছে।

শ্রীদাম। সখিগণ, যে দোলা ঝুলিয়েছ—বাদল-হাওয়ায় সেই দোলা দোল-দোলনের গীতে বিরামহীন তালে তুলিয়ে দাও। পাপিয়ার চেয়েও মধুর গান তোমাদের কণ্ঠে মুখর হ'য়ে উঠুক্—ভুবন ভ'রে যাক্। চোখের দৃষ্টিতে এই আঁধারকুঞ্জে বিজলী খেলুক্।

[বেণু-সঙ্গীত]

বলভদ্র। আহা, কোন্ কাজল-চোখে ঐ বিজলী-লীলা লুকিয়েছিল! সকলে চেয়ে দেখো—কদম-কুঞ্জে ঐ আলোর পুলকে ভাবের শিহরণ লেগেছে। এই নিবিড় বাদলের শ্যাম সমারোহে সকল নীলাম্বরী মিলিয়ে গেছে। আজ যেন রূপের চপলা বাদলপাথারে ডুব দিয়েছে।

শ্রীদাম। সখি, যখন শুধু শ্রবণ চলে—নয়ন আর চলে না, এই কুঞ্জ-বাসরে সেই সময়ই এসেছে। আজ নিখিল-বাসরে বাঁশীর সুরে সুর বাঁধা। ওগো বিজলী-বরণী কিশোরী, শোনো শোনো—সেই অনন্ত বাঁশীর সুর।

গান

বিজলী-বরণী লো কিশোরী!
শোনো গগনে বাজে কার বাঁশরী
তোমার তনুর অণু ভরো শ্রাবণে,
প্রেম নিমগনে।
গাও কাজরী॥

[সঙ্গীত-মাধুরী ; ক্ষণপরে নৃত্যরত বৃদ্ধ গোপালের প্রবেশ—]

বৃদ্ধগোপাল। এ-কি—এ-কি, তোমরা সকলে মিলে এখানে বাদল-হাওয়াতে দোলা ঝুলিয়ে খুব একা একা মেতে উঠেছ, আর আমি হেন বড়গোপাল, সকলের চেয়ে যে বড় রসিক—সেই—সেই কিনা বাদ প'ড়ে গেল। যাক্-যাক্—দেরী হ'য়ে গেছে—ছেড়ে দে' তোরা, হ্যাঁ—সকলের হাতে তো এক একটা যন্তর রয়েছে—আমার এই পাকা হাতে একটা বাজ্‌না তুলে দে' তো—একবার পাকা তাল দিতে দিতে পাকা লয়ের তান উড়িয়ে পীরিতির পাকা মন্তর শুনিয়ে দিই।

বলভদ্র। সে কি গো বৃদ্ধগোপালদাদা—তুমি আবার কোন্ যন্ত্র বাজাবে? এতে তো গরুবাঁধা দড়ি লাগানো নেই, তোমার মুগুর-পেটা হাত যদি আমোদের মাত্রাটা বিশেষ বাড়িয়ে ফেলে—তা' হ'লে তো যন্ত্রটা একেবারে অকেজো হ'য়ে যাবে।

বৃদ্ধগোপাল। দেখ্—ঠাট্টা করিস্‌নি। তবে বেণু-টেণু একটা যা' হোক্ দে'না—দেখ্—ফুঁক-ফুৎকারের কত জোর।

বলভদ্র। দাদা—ঐ অবলম্বনহারা মুখে কি সব ফুৎকার সামলাতে পারবে? তার চেয়ে উৎসব দেখো আর নাচো।

বৃদ্ধগোপাল। এই অন্ধকারে কি চোখ জ্বাল্‌তে যাবো! আমি কি জোনাকিপোকা?

বলভদ্র। আরে চেয়ে দেখো—আলোর অভাব কি—কিশোর কিশোরীর রূপের প্রভায় এই উৎসব কুঞ্জ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

বৃদ্ধগোপাল। হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঠিকই তো! চোখটা মুছে একবার ভালো ক'রে দেখি তা'হ'লে। আহা কি ঝুলনই ঝুল্‌চে—মরি মরি! দোল্-দোল্ ঝুলন, দোল্—তালে ছাঁদে দোল্—হুলে দুলে ঝুলন খেল—দে দোল্ দোল্ দোল্। [সঙ্গীতাড়ম্বর]

কিশোরী। হে প্রেমময়—চিরকিশোর, এই ঝুলন-পূর্ণিমা আজ তোমার প্রেমের মন্ত্রে অপূর্ব্ব দোলন-ছন্দে মেতে উঠেছে। ওগো নবজলধরকান্তি পরমসুন্দর, তুমিই এই রজনীর সমস্ত অন্ধকার হরণ করেছ। শ্যামচন্দ্র আমাদের হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র। তোমার প্রেমই পূর্ণিমার জ্যোতিঃ। তোমার বাঁশীর সুর বিশ্বকে দোলা দিচ্ছো। এই দোলার তালে তালে সকল বাঁধন পড়ে খুলে।

গান

সজল পবন মন্থর নীপ-গন্ধে।
আকুল মুরলী-ধ্বনি মনে আনিছে আনন্দে।
ঝুলন-দোলা দোলায়ে তালে—
বাঁধিছে কে-গো আবেশ-জালে,
রিণিকি-ঝিনি নূপুর রিনি—
তুলিছে চপল ছন্দে॥

ললিতা। কন্দর্পদর্পহারী হে প্রিয়বর, একবার হাসি-ঝলমল প্রসন্ন মুখে চেয়ে তোমার দাসীদের নয়ন সার্থক করো। হে দুর্লভ—তোমার অতুল পদকমল আমাদের হৃদয়ে রেখে সকল কামনা পূর্ণ ক'রে তোলো।

বলভদ্র। সখা সুবোল, এই শ্রাবণ-পূর্ণিমাতে ঝুলনের মহামহোৎসব অখিল-ভুবনকে পাগল ক'রে তুলেছে। তুমি সেই উৎসব-সুর কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলো। মধুরসের আকর, পরম আনন্দের নির্ঝর মনোহর শ্যামরায়ের সবই সুন্দর। সঙ্গীত আজ মিলনের সুখাবেশ সকলের অন্তরে অন্তরে জাগিয়ে তুলুক্।

সুবোল

গান

ঝুম্‌কো-ফুলে-গাঁথা হিন্দোলাতে
মাতো বাদল-লীলাতে।
প্যারী, মন-ভোলা আমি—
মিলন-কামী,—
আঁখির দরশ বিলায়ে
এসো অমিয়া মিলাতে॥

বলভদ্র। অতি-রঙ্গমধুরা ললিতা, এবার এই অপূর্ব্ব ঝুলনের চিত্রটি সুরের তুলিতে অঙ্কিত করো। জল-যৌবন-গর্ব্বা যমুনার কূলে এই লতাকুঞ্জ—সেই লতাকুঞ্জে কিশোর-কিশোরী—শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা দুলছে, তা'দের রূপ ফুটে উঠুক্।

ললিতা

গান

কালিন্দীর কূল বিকসিত ফুল মত্ত অলিকুল
পড়লহি পাতিয়া।
নাচত মোর করতহি সোর অনঙ্গ অগোর
ফিরতহি মাতিয়া।
কানন ওর হেরইতে ভোর কিশোরী-কিশোর
প্রেমরসে ভাসিয়া।
ঝুলন-কেলি দুহুঁ জন মেলি অঙ্গ অঙ্গ হেলি
হৃদয় উল্লাসিয়া।

শ্রীদাম। হে শ্যামসুন্দর—তোমার মুরলীর আকর্ষণে অখিল-প্রকৃতি কুল-শীল-মান—যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে তোমাতেই আত্ম-লোপ ক'রে দেয়। আর এই পূর্ণিমাতে ঝুলন-উৎসবে অখিল গোকুল তোমার চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে ধন্য হয়েছে।

[উৎসব-নৃত্য]

হিন্দোলা গান

শ্রাবণে ঝুলনা দোলে
তমাল-ডালে তালে তালে।
বিজলী ঘোমটা খোলে
চমকে তাকায় আকাশ-ভালে।
শ্যামলের ঢেউ লেগেছে,
কাননে সে দোল জেগেছে,
বেণু আজ নূতন সুরে
বাঁধলো নিখিল আবেশ-জালে॥

ঝুলনের উৎসবে এই
কঙ্কন ভোলে কুঞ্জবীথি।
ফোটে কেলি-কদম-কলি,
ডেকে ওঠে কেকা নিতি।

কিশোরের মন্ত্র নিয়ে—
অধর-কমল-মধু পিয়ে—
চোখাচোখি মন যে মাতে—
দোল্‌নাতে এই মোহন কালে॥

শ্রীদাম। হে মনোহর, তোমার হিন্দোল-লীলার আদি নেই, অন্ত নেই। ওগো রসিক, তোমার রসপ্রবাহে অণু-পরমাণু, অচেতন সচেতন জীবন পায়। কৃষ্ণ-নাম-গানে যমুনা নিত্য-আনন্দময়ী, পবন পুলক চঞ্চল। তোমার চরণ পেয়ে বসুন্ধরা আনন্দিতা। বনস্থলী নিত্য তোমায় পূজার অঞ্জলি দিয়ে ধন্য হয়। তোমার রূপের প্রভায় নীলাম্বর নীল কলেবর। রবি-শশী-গ্রহ তারা-শোভিত অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল ধ'রে তোমাকে প্রদক্ষিণ ক'রেও তোমার অন্ত পায় না। তুমি অণু হ'তেও অণীয়ান্, মহৎ হ'তেও মহীয়ান্। তুমি সনাতন হ'য়েও চিরনবীন।

স্তবগান

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং,
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

[আরতি-সঙ্গীত]

অবসিত

শ্রীমনোজ বসু

রায়-কর্তা মারা গেলেন, বনমালীও পালাল সেই দিন। পুরাণো কালের এই দুটি মানুষ একেবারে বেমানান ছিল এদের শহুরে বাড়িতে। কতবার কত আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুজনের মধ্যে সে অপ্রতিভ হয়েছেন ইন্দ্রলাল! বাপের জন্য অবশ্য দুঃখ হয় ইন্দ্রলালের, মাঝে মাঝে দুঃখ করে থাকেন, সেকালের অনেক গল্প করেন অবসর সময়ে প্রভাবতী ও জ্যোৎস্নার সঙ্গে। শ্রাদ্ধ-শান্তি কলকাতাতেই হয়েছে, খুব সমারোহ হয়েছে, অনেক লোকজন খেয়েছে। তবু বোধ করি সোয়াস্তির নিশ্বাসও পড়ে কোন কোন সময়। বাপের দৃষ্টির সামনে এদের আধুনিক জীবন অকস্মাৎ যেন সঙ্কুচিত হয়ে যেত, ভয় হত। অভিভাবকের কঠোর দৃষ্টির সামনে অশান্ত ছেলেপেলের খেলা যেমন থমকে থাকে কিছু সময়ের জন্য।

কেবল অমূল্য রয়েছে রায়গ্রামের মাটির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে। বলিষ্ঠ সতেজ চেহারা। এদেরই মধ্যে আছে, তবু সে ভিন্ন গোত্রের—চেহারা দেখেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্যারেজ-ঘরখানায় এখন সে একা থাকে। ইতিমধ্যে পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে, প্রভাবতী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঈশ্বর রায়ের কাছে দরবার করে তাঁর হুকুম দিয়েছিল—রায়কর্তার জীবনের শেষ আদেশ বলে ইন্দ্রলালও আপত্তি করেন নি। জহ্লাদ যেখানে পড়ে সেখানকার ঠিকানা নিয়েছিল, ভর্তি হয়েছে সে সেইখানে। পণ্ডিতটি চমৎকার মানুষ, অনেক রকম সুবিধা পাওয়া যায়, এমন কি গলির মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বিড়ি টেনে আসাও যায় এক ফাঁকে। পণ্ডিত তা টের পান না, অন্তত টের পেয়েছেন এমন ভাব দেখান নি কোন দিন। গোবিন্দর জায়গায় অমূল্যই আজকাল কোন কোন দিন সকালবেলা বাজার করতে বেরোয় আর একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। তা ছাড়া ফাইফরমাস খাটে, মেয়েদের শৌখিন জিনিসপত্র কিনে এনে দেয় দোকান থেকে, আর গভীর রাত্রি পর্যন্ত শোনা যায় চিৎকার করে সে পড়া তৈরি করছে। যথাসম্ভব ফর্সা কাপড়-চোপড় পরে থাকে সে আজকাল, টেড়ি কাটে, বাজারের চুরি-করা পয়সায় সস্তাদামের সাবানও কেনে মাঝে মাঝে দু'একখানা। জহ্লাদের চুরি-করা আংটিটা—সেটাও কখনো কখনো সন্তর্পণে আঙুলে পরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। বেশিক্ষণ পরে থাকতে সাহস হয় না, কে কোনদিক থেকে দেখে ফেলবে।

হঠাৎ একদিন জ্যোৎস্না এসে ঢুকল অমূল্যর গ্যারেজে। এখন আরও বড় হয়েছে জ্যোৎস্না, বিষম বাবু হয়েছে। প্রসাধনে আর পরিমার্জনায় ফেটে পড়ছে গায়ের রং। সেণ্টের উগ্র মাদক সৌরভে নিচু-ছাত আধ-অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গ্যারেজ-ঘরখানা ভরে গেল।

কি করবে অমূল্য ভেবে পায় না। মেজের উপর মাদুর পাতা—তার উপর ওয়াড়শূন্য ময়লা কাঁথা, তুলো-বেরুনো ছেঁড়া বালিশ। মড়ার সঙ্গে যে বিছানা দেয় তারই যেন কতক কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে শ্মশান থেকে। দুটো কেরোসিন-কাঠের বাক্স পর পর সাজিয়ে তাই হয়েছে অমূল্যর পড়বার টেবিল, আর তার পাশে আর একটা বাক্স রেখে দিয়েছে, সেটার উপর বসে সে পড়ে—চেয়ার হল সেটা। সমস্ত বিশ্রী, অগোছালো। হঠাৎ জ্যোৎস্নার আবির্ভাবে কোন্‌টা কোথায় সরাবে, কি ভাবে ঢাকবে তার দৈন্য, অমূল্য ভেবে পায় না।

একটু রুষ্টকণ্ঠেই অমূল্য প্রশ্ন করে, কি—দরকার কি আমার এখানে?

পড়াশুনা কদ্দুর কি করলে তাই দেখতে এসেছি। বই বের কর তো দেখি।

লেখাপড়ার প্রসঙ্গে অমূল্য দস্তুরমতো ঘাবড়ে যায়। জ্যোৎস্নার কাছে নিচু হয়ে থাকা চলে না—এই ধরণের একটা-কিছু ভেবেই জেদ করে সে পাঠশালায় ঢুকেছে। কিন্তু পরের ব্যাপারগুলো এমন গোলমেলে, কে জানত বল আগে? পূর্ব-পুরুষ লাঠি-সড়কি নিয়ে বাদা অঞ্চলে দাঙ্গাবাজি ক'রে বেড়িয়েছে, তাদের ছেলে অমূল্য কলম দিয়ে 'আঁকুড়ে ক' বাগে আনতে পেরে উঠছে না কিছুতে। জ্যোৎস্নার আর যাই হোক্—বয়স তার চেয়ে কম। তার কাছে বেকুব বনে যেতে হবে? অমূল্যর পড়াশুনার তদারক করবার ভার হঠাৎ ঐ মেয়েটার উপর চাপিয়ে দিয়েছেই বা কে?

অমূল্য বলে, মফস্বলে গেছেন বুঝি তোমার বাবা? তাই বাড় বেড়েছে, জ্বালাতে এসেছ এখানে।

জ্যোৎস্না মুখ নেড়ে বীরোচিত ভঙ্গিতে বলে, বাবা থাকলেই বা কি! কাউকে আমি কেয়ার করি না।

কর না বুঝি, ও! তা তো জানতাম না আমি। আর কখনো আসতে দেখি নি কি না!

অমূল্যর বিদ্রূপ-স্বরে জ্যোৎস্না ক্ষেপে গেল।

ইচ্ছে করেই আসিনে। আজকে এসেও অন্যায় করেছি। কেবল তো অপমান হওয়া—কেন আসব?

অমূল্য অবাক্ হ'য়ে বলে, অপমান করলাম আবার কখন তোমায়?

একশ' বার করেছ, হাজার বার করেছ! অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে জ্যোৎস্নার। বলতে লাগল, বাবা মানা করেছে। যা রাগী মানুষ—আসা সহজ নয় অত। এদ্দিন না পেরে থাকি, আজকে তো এসেছি। তা একটা বার বসতে বললে এতক্ষণের মধ্যে? খাতির করেছ একটু?

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলে, বোসো জ্যোৎস্না। দোতলা-তেতলায় গদির উপর থাক, কোথায় বা বসবে এ জায়গায়?

ঘাড় নেড়ে রুদ্ধকণ্ঠে জ্যোৎস্না বলে, বসতে বয়ে গেছে আমার। যেচে মান আমি নিইনে—

ঝড়ের বেগে সে বেরিয়ে গেল। অমূল্য হতভম্ব। এমনি

গহ—ইন্দ্রলাল একেবারে জ্যোৎস্নার সামনে। তিনি কলকাতাতেই এখন। ইস্কুল থেকে এসে জ্যোৎস্না তাঁকে দেখেনি; ভেবেছিল, প্রতিদিনের মতো বাইরে গেছেন। কিন্তু শরীরটা হঠাৎ কেমন খারাপ বোধ হওয়ায় সেই দুপুর থেকে এতক্ষণ গড়াচ্ছিলেন ইন্দ্রলাল। এইবার বেরুচ্ছেন। আগরহাটির ঘোষেরা বাড়ি কিনেছেন কাশীপুরে, সেখানে চলেছেন বিশেষ একটা ব্যাপারে। এই সময় দেখতে পেলেন, জ্যোৎস্না বেরুচ্ছে গ্যারেজের ভিতর থেকে।

রূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে ইন্দ্রলাল প্রশ্ন করলেন, ওখানে কেন?

স্খলিত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি জ্যোৎস্না বলে ফেলল, ইচ্ছে করে যাইনি বাবা। আমায় নিয়ে গিয়েছিল চালাকি করে। বলল যে—

বলল? কি বলল?

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল যে।

অমূল্যও বেরিয়ে এসেছে, পায়ের শব্দে পিছন ফিরে জ্যোৎস্না স্তব্ধ হয়ে গেল।

ইন্দ্রলাল অমূল্যর দিকে চেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলি তুই?

অমূল্য দু-জনের দিকেই এক একবার চেয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল, হ্যাঁ—

কেন?

নইলে যেতে চাচ্ছিল না যে!

ইন্দ্রলাল সংশোধন করে দিলেন, 'চাচ্ছিল' বলবি না—'চাচ্ছিলেন'। জ্যোৎস্নাও মনিব তোর। স্তম্ভিত হয়ে গেছেন তিনি অমূল্যর কথার ধরনে। বললেন, কিন্তু কেন যেতে যাবে তোর ওখানে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি। কি আছে তোর ঘরে?

কিচ্ছু নেই, একেবারে কিচ্ছু না। তাই দেখাব বলে নিয়ে গিয়েছিলাম। মানুষ থাকবে কি করে ওখানে? ছাত এত নিচু যে দাঁড়ানো যায় না। যাদের জন্য ঘর বানিয়েছে, তারা যে খাড়া হতে জানে—তৈরি করবার সময় এ কাণ্ডজ্ঞান হয়নি মিস্ত্রিদের।

ইন্দ্রলাল বললেন, মানুষ থাকার ঘর তো নয়, গাড়ি থাকার গ্যারেজ।

তাই বলছি রায় বাবু, আমি আর ও-ঘরে থাকব না। বৈঠকখানার পাশের ঘরটা খালি আছে, সেইখানে যাব আমি। জ্যোৎস্না, তা হলে কিছু আর বলতে হল না তোমাকে—না, আপনাকে। আমার এই দরকারটা জানাবার জন্যই ওঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম রায় বাবু।

শেষ দিকটায় নিপুণ অভিনেতার মতো কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য আবদারের সুর নিয়ে এল। এমন সহজ সপ্রতিভ ভঙ্গি—স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ইন্দ্রলাল। শহর-বাসের ফল নাকি এ? যতদিন গ্রামে ছিল—এ তো ছেলেমানুষ, এর বাপ-ঠাকুরদার বয়সি মানুষও রায়দের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলেনি কোন দিন। অমূল্যকে তিরস্কার করবেন ভেবেছিলেন, সমস্ত গুলিয়ে গেল! দ্রুত পায়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন, আড়াল হয়ে যেন বাঁচলেন। অমূল্য পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলে, রায় বাবু, আমি তা হলে কিন্তু উঠলাম গিয়ে ঐ ঘরে।

জ্যোৎস্না নেই। নিজেই সে লটবহর বয়ে নিয়ে সেই ঘরে উঠল। খাট আছে, খাটের উপর আধ-ছেঁড়া মাদুরটা বিছিয়ে দিল। অন্ধকার হয়েছে, আলো জ্বালল সুইশ টিপে। খাটে বসে পা দোলাল খানিকক্ষণ। এক কোণে ড্রেসিং-টেবিল, টেবিলে সংলগ্ন বড় আয়না। সেই টেবিলে পরিপাটি করে খাতা-বই-কলম সাজিয়ে রাখল। জোরালো ইলেকট্রিক আলো প্রতিফলিত হয়েছে আয়নায়। আয়নায় একবার মুখ দেখল। যদি একটুখানি ফরসা রং হত তার! নোনা অঞ্চলে ফর্সা মানুষ গিয়ে দু' দিন থাকলেই তার গায়ে কালো ছোপ পড়ে যায়। আর অমূল্য তো জন্ম থেকে এতকাল কাটিয়ে এসেছে সেখানে। গৌখিন নূতন ঘরে এসে তার মন এখন আনন্দে ভরেছে, ঘর এই যে দখল করে বসল, কিছুতে আর সে নড়বে না এখান থেকে, ইন্দ্রলাল বললেও না। ঘর হল, জামা-কাপড় এবং ভদ্রলোকের উপযোগী আর দু' চারটে সামগ্রী হলেই হয়ে যায়।

ঘর সাজানো যথাসম্ভব সারা করে অমূল্য জানলার কাছে লনের দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল। এখন নিচে কেউ নেই, চারিদিকে অতল নিঃশব্দতা। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটেছে। ছল-ছল করে যেন শব্দ হল হঠাৎ। যেন জলোচ্ছ্বাস, পরিপাটি করে ছাঁটা সবুজ লনটা প্লাবিত করে জলধারা যেন প্রহত হচ্ছে ঘরের দেয়ালে জানলার ঠিক নিচেটায়। অষ্টরেকিতে জোয়ার এল বুঝি এতক্ষণে! অমূল্যর মুখ হাসিতে ভরে গেল; মনে আর ক্ষোভ রইল না যে এই একটু আগে পর্যন্ত সে গ্যারেজের নিচু মেজেয় পড়ে ছিল, তার না আছে বিছানাপত্তর না আছে ভাল কাপড়-জামা, বই জোটে না—হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পাঠশালায় পণ্ডিত যখন বানান জিজ্ঞাসা করেন, লাঞ্ছনা-উপহাস সইতে হয়, জ্যোৎস্না বয়সে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' ইত্যাদি বলবার আদেশ...দোমহলা-তেমহলায় কত আরামে আয়েশে থাকে জ্যোৎস্নারা, বই এনে ঝুপ করে ফেলে দেয়—ঝি-চাকরে গুছিয়ে রাখে, খাচ্ছে কত কি, পোষাকের পর পোষাক—পর পর দু'দিন কখনো এক পোশাকে দেখতে পায় নি জ্যোৎস্নাকে। এ সব কোন ক্ষোভ মনে রইল না অমূল্যর, সমস্ত ভুলে গেল এক মুহূর্তে। জোয়ার লেগেছে বহু দূরবর্তী অষ্টরেকিতে। জলধারা তীব্রবেগে খালে ঢুকছে। কোন্ হিজলতলায় নৌকো সমস্ত লুকিয়ে ছিল, জোয়ারের আবেগে তারা বেরিয়ে এল। নদীকূলে গৃহস্থবাড়ির ছ্যাঁচা-বেড়ার ফাঁক দিয়ে ডেমির আলো বেরিয়ে আসছে। শিয়ালেরা ডেকে ডেকে থামল এতক্ষণে—প্রথম প্রহরের ডাক। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে ছায়ামূর্তি যমুনা...যমুনাই তো! নতুন চর আর আগরহাটি গ্রামের ঠিক মাঝখানে মাটি তুলে অভিলাষ ঘর বেঁধেছে, খড়ের ছাউনি সোনার মতো ঝিকমিক করছে তারার আলোয়। তারই দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নদীমুখো চেয়ে কি শাঁখ বাজাচ্ছে যমুনা—যে নদীতে নৌকা ভাসিয়ে এক অপরাহ্ণে অমূল্যরা বিদায় নিয়েছিল?

ইনস্পেক্টর আসবে। পণ্ডিত মশায় বলে দিয়েছেন ধোপদুরস্ত কাপড় পরে এবং পড়া মুখস্থ নয়—একেবারে ঠোঁটস্থ করে পাঠ-

শালায় যেতে। কিন্তু কি হল অমূল্যর—বই খুলতেই ইচ্ছে করে না। রাত্রিটা নানা ভাবনা-চিন্তায় গেছে। সকালে বাজার করে ফিরে এসে একটু স্থির হইয়া বসবে, খেয়াল হল—ফর্শা কাপড় আছে একখানা, এক পয়সা দিয়ে সাজো কাচিয়ে রেখেছে—আর ময়লা জামার সঙ্গে সেটার মিল হবে কি রকম, আগেভাগে দেখে নেওয়ার দরকার। পাট ভেঙে দেখে, সর্বনাশ! ধোপা দুই প্রান্তেই ছিঁড়ে দিয়েছে। ধোপার বিশেষ অপরাধ নেই. এক বছরের উপর কাপড়ের বয়স! কি করা যায়, উপায় কি এখন? মাথায় হাত দিয়ে বসল অমূল্য। এই সব পাঠশালায় ইনেস্পেক্টর হামেশাই আসে না, যখন আসে সমারোহ লেগে যায়।

সকাল বেলাও ইন্দ্রলাল বেরিয়ে গেলেন। কি একটা জরুরি কথাবার্তা চলছে আগরপাটির ঘোষদের সঙ্গে। চিরশত্রু তারা—ঈশ্বর রায় যতদিন বেঁচে ছিলেন মুখ দেখাদেখি ছিল না, কিন্তু বিরোধ এখন জুড়িয়ে আসছে ক্রমশ। যাবার মুখে ইন্দ্রলাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গেলেন, অমূল্য সত্যি সত্যি এসে ভর করছে এঘরে। মৃদু হেসে তিনি চলে গেলেন, কিছু বললেন না। মোটর কেনা হচ্ছে, দু'দিন পরে তাঁকেই মুখ ফুটে বলতে হত গ্যারেজ খালি করে দিতে। আর অমূল্য ছোকরা সত্যি খুব কাজের হয়ে উঠছে আজকাল। তিনি যখন থাকবেন না, ডাকতে-ডাকতে সে-ই একমাত্র সম্বল। আর অমূল্যর এই যে পরিচ্ছন্ন ও ভদ্রভাবে থাকবার ঝোঁক এর জন্যও প্রসন্ন তিনি। জংলি হয়ে তাঁদের শহুরে আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করলে—কিছুতে তিনি বরদাস্ত করবেন না।

সিঁড়ি বেয়ে অমূল্য হঠাৎ দোতলায় উঠে গেল। জ্যোৎস্না যে ঘরে পড়াশুনা করে, ঢুকল সেখানে। একদিন মাত্র সে এ বাড়ির উপরে উঠেছে—ঈশ্বর রায় অসুখে যখন শয্যাশায়ী সেই সময়ে একটি বার।

তাকে দেখে জ্যোৎস্না অবাক।

তুমি?

ভাল কাপড় চাই যে একটা। আমার কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে। ফেরত দেবই স্কুল থেকে এসে।

আমার তো শাড়ি আছে। শাড়ি দিতে পারি পরে যাবে ইস্কুলে?

হি-হি করে হেসে উঠল জ্যোৎস্না।

তোমার বাবার একখানা ধুতি এনে দাও—বলেই আবার সংশোধন করে বলে, ভুল হয়ে গেল—খুড়ি—একটা ধুতি যদি এনে দেন আপনার বাবার ঘর থেকে—

তাই কখনো হয়? বাবার ধুতি তোমাকে পরতে দেবেন কেন মা?

চুরি করে আনুন। আঁচলে ঢেকে নিয়ে আসুন—টের পাবেন কি করে?

জ্যোৎস্না রাগ করে বলে, পারব না—বয়ে গেছে। চুরি করতে যাব আমি ওর জন্যে—আস্পর্ধা কত!

দেবেন না তা হলে?

না—

অমূল্য আর কিছু না বলে চলল। পিছন থেকে জ্যোৎস্না বলে, শোন, 'আপনি' 'আজ্ঞে' এই সমস্ত যদি না বলো—অবিশ্যি বাবা যখন সামনে থাকবেন সেই সময়টা ছাড়া—তা হলে চুরি-ডাকাতি যা বলো করতে রাজি আছি তোমার জন্য।

জবাব না দিয়ে অমূল্য দ্রুত পায়ে নেমে গেল। না-ই যদি কাপড় এনে দেয় জ্যোৎস্না, কি হবে? ছেঁড়া কাপড় পরে ইনেস্পেক্টরের সামনে সে দাঁড়াবে কেমন করে? যাবেই না ইস্কুলে।

ভাবতে ভাবতে কলতলায় স্নান করতে গেল। ফিরে এসে দেখে কাগজে মোড়া একটা ধুতি রয়েছে ড্রেসিং-টেবিলের উপর। হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল অমূল্যের মুখে। মুখ ফুটে যখন চেয়েছে, যেমন করে পারে জ্যোৎস্না পৌঁছে দেবেই। এ সে জানত। [ক্রমশঃ

ভারতের যুদ্ধব্যয় ও অর্থসংস্থান

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

য়ুরোপের যুদ্ধ পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল; সম্প্রতি জাপানের সহিত যুদ্ধও শেষ হইয়াছে। য়ুরোপের সহিত যুদ্ধে ভারতের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। পরন্তু জাপানের সহিত যুদ্ধে ভারতের জীবন-মরণ সম্পর্ক ছিল। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জাপান আসাম ও বাঙ্গালাকে বিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং জাপানের সহিত যুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ ভারতকে বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছিল। চির দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ-মহামারীপ্রপীড়িত ভারতবাসীর পক্ষে এই ব্যয় গত ছয় বৎসর বাড়িতে বাড়িতে দুর্ব্বিষহ পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। ফলে, আয় অপেক্ষা ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের বাজেটের ঘাটতি, দেশের সমবায় শক্তি-সামর্থ্যের সাধ্যাতীত হইয়াছে।

ভারতের বাজেট, অর্থাৎ সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়ের অগ্রিম খসড়া প্রস্তুত হয় আর্থিক বৎসর অনুযায়ী। এই আর্থিক বৎসর ইংরাজী এপ্রিল মাস হইতে পরবর্ত্তী খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত, সুতরাং আমাদের বাঙ্গালা সালের সমতুল। অতএব আর্থিক ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের আয়ব্যয়-বিবরণী বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১৩৫২ সালের সমকালবর্ত্তী। গত মার্চ্চ মাসের কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান তাঁহার কার্য্যকালের শেষ, অর্থাৎ ভারতের ষষ্ঠ, যুদ্ধ-বাজেট পেশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে, প্রতিবৎসর বাজেট দাখিল করিবার সময় অর্থ-সচিব আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণীর সহিত চলতি বর্ষের ও তৎপূর্ব্ব বর্ষের যথাক্রমে শেষ সঠিক ও সংশোধিত বিবরণীও উপস্থিত করেন। অর্থসচিবের এই বিবরণী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতের বার্ষিক যুদ্ধব্যয় দাঁড়াইয়াছিল, ৫০০ কোটি টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের দুই বৎসরের

ঘাটতির একুন অঙ্ক ৩২০ কোটি টাকা। ইহাতে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের ঘাটতির অঙ্ক যোগ করিলে তিন বৎসরের ঘাটতির সমষ্টি দাঁড়ায় ৫১০ কোটি টাকা। ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের সংরক্ষণ-ব্যয় ৪৫৭ কোটি টাকা এবং ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক ব্যয় ৪১২ কোটি টাকা—একুনে ৮৬৯ কোটি টাকা। ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজস্ব ছিল ৩৫৭ কোটি টাকা এবং ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক সমষ্টি ৩৫৮ কোটি টাকা। ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫৫,৭৭ কোটি টাকা। ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক ঘাটতির অঙ্ক ১৬৩,৮৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরের ঘাটতি ৮,১২ কোটি টাকা অধিক। অর্থ-সচিব বর্তমান বর্ষের অতিরিক্ত এই ৮,১২ কোটি টাকা করবৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করিয়াছেন এবং বাকী টাকার ঘাটতি ঋণ গ্রহণ দ্বারা পূরণ করিবেন। এই ব্যবস্থাতে ভারতীয় শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় অনেকটা আশ্বস্তি বোধ করিয়াছেন। কারণ, কর-বৃদ্ধির মাত্রা অধিকতর হইলে দেশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা-জনিত শিশুশিল্পগুলির অধিকাংশই বিশেষরূপে ব্যাহত হইত। কর-বৃদ্ধির মাত্রাও চরমে পৌঁছিয়াছে।

যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যুধ্যমান জাতির জমা-খরচে যে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইবে, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু বর্তমান পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধে ভারতের স্বার্থ-সংস্রব ছিল ততদিন পরোক্ষ, যতদিন জাপান ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত আক্রমণ না করিয়াছিল। জাপান ভারত আক্রমণ করিতে আসিল কেন? ভারতবর্ষ অধিকার করিবার দুরাশা কি তাহাকে এই অসমসাহসিক অসম্ভব কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিল? অথবা ভারতবর্ষ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সমরপ্রচেষ্টার অত্যাবশ্যক অস্ত্রাগার ও সরবরাহ-কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিয়াছিল? যে কারণেই হউক না কেন, বর্তমান যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি না দিলেও, ভারতবর্ষের নিজস্ব যুদ্ধ ও সংরক্ষণব্যয়ের পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে বহুল পরিমাণে কম হওয়া উচিত ছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধব্যয়-বাটোয়ারা বন্দোবস্ত ভারতের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। বৃটিশ সরকার এই বিপুল ব্যয়ের কিয়দংশ বহন করিতেছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই যে বৃহদংশ বহন করিতে হইতেছে তাহা তাহার ন্যায়সঙ্গত অংশ অপেক্ষা অন্যায় রূপে অধিক। প্রত্যেক দেশের ব্যয়ের পরিমাণ তাহার অর্থ-সামর্থ্যানুযায়ী হওয়াই নীতিসঙ্গত। স্বর্গত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টও এই নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া ছিলেন, "স্ব স্ব শক্তি অনুসারেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।" বর্ত্তমান যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের দরিদ্র অধিবাসীদিগের পক্ষে বিষম অনিষ্টজনক হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ন্যায় ধনী দেশের পক্ষে এক বৎসরে ৪১২ কোটি টাকা সংরক্ষণব্যয় লঘু হইতে পারে, কিন্তু ভারতের ন্যায় নিঃস্ব দেশের পক্ষে ইহা মাত্র গুরু নহে, সত্যই ত্রাসদায়ী। এই চিত্তবিভ্রমকারী সামরিক ব্যয়ের তুলনায় ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের অ-সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১২৪ কোটি টাকা। যুদ্ধ-পূর্ব্ব বর্ষে, অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের আয় ছিল ৮৪,৫২ কোটি টাকা; ব্যয় ছিল ৮৫,১৫ কোটি টাকা এবং ঘাটতি পড়িয়াছিল ৬৩ লক্ষ টাকা। তাহার পর হইতে আয় যেমন বাড়িতেছে, ব্যয় বাড়িতেছে তাহার চতুর্গুণ এবং ঘাটতি বাড়িতেছিল দশগুণ। ১৯৩৮-৩৯ হইতে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বর্ষে আয় ৬১ কোটি এবং ব্যয় ১৩২ কোটি টাকা বাড়িয়াছে এবং এই পাঁচ বৎসরে মোট ঘাটতি পড়িয়াছে ৩২৯ কোটি টাকা। এতদ্ব্যতীত গত ১৯৪৪-৪৫ এবং বর্তমান ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে মোট ৭১১ কোটি টাকা আয়, ১০৩০ কোটি টাকা ব্যয় এবং ঘাটতি ৩২০ কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমান প্রায় ঠিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধ-পূর্ব্ব স্বাভাবিক অবস্থার সহিত তুলনায় ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসরে গড়ে প্রতি বর্ষে ২১৭ কোটি টাকা হিসাবে ব্যয় বাড়িয়াছে—মোট ১৫২২ কোটি টাকা! এই অপরিসীম ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নূতন নূতন করস্থাপনপূর্ব্বক বার্ষিক ১২৫ কোটি টাকা হিসাবে মোট ৮৭৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত ৬৪৯ কোটি টাকা ঋণ হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য সংরক্ষণের নামে অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খরচ হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ হইতে ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোট ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫২২ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে দেশ-রক্ষার নিমিত্ত ব্যয় ১২১৯ কোটি টাকা; এবং অবশিষ্ট অতিরিক্ত ব্যয় ২৯৩ কোটি টাকারও অধিকাংশ যুদ্ধের আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থা হেতু। বর্দ্ধিত-ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গত সাত বৎসর দীন-দরিদ্র ভারত-বাসীকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ অধিক কর দিয়াও তাহার নিষ্কৃতি ঘটে নাই। পরন্তু, গত আট বৎসরে স্বাভাবিক রাজস্বের সমপরিমাণ অর্থ ঋণ করিয়া ঘাটতি পূরণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্তী কয়েক বৎসরে করভার অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত অর্থ সচিব এ বৎসর ঘাটতির একটি নামমাত্র অংশ অর্থাৎ ৮,৬০ কোটি টাকা অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধি দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন। যুদ্ধের ব্যয় অস্বাভাবিক ব্যয়; সুতরাং এ ব্যয় ঋণ গ্রহণ দ্বারা সংগৃহীত হওয়াই নীতিসঙ্গত, এবং করবৃদ্ধি করিতে হইলে অপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অপ্রত্যক্ষ কর দীন-দরিদ্রের উপর কঠোর ভাবে আপতিত হইয়া তাহাদের নিদারুণ দুঃখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে। আয়ের উপর ধার্য্য কর প্রত্যক্ষ কর। এই বিষয়ে অর্থসচিব একটি নূতন নীতি অবলম্বন করিয়া অতি সমীচীন কার্য্য করিয়াছেন। অর্জ্জিত এবং অনর্জ্জিত আয়ের পার্থক্যের উপর এই নীতি প্রতিষ্ঠিত। পনর হাজার টাকার অধিক আয়ের উপর এবং সর্ব্বোচ্চ হারে করস্থাপনযোগ্য আয়ের উপর যে আয়-কর আদায় করা হয়, তৎসম্পর্কিত বাড়তি কর (surcharge) এক পয়সা হিসাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমার্জ্জিত আয়ের একটা অংশ করবর্জিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দুই হাজার টাকার অনধিক ব্যক্তিগত শ্রমসঞ্জাত আয়ের এক-দশমাংশকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। যৌথ কারবারের আয় কিংবা লভ্যাংশসঞ্জাত আয় অথবা কোম্পানীর কাগজের সুদ কিম্বা

সম্পত্তির আয়কে ঐরূপ সুবিধা দেওয়া হইবে না। কেবল মাত্র আয়কর সম্পর্কে ঐ সুবিধা দেওয়া হইবে; অতিরিক্ত কর সম্পর্কে দেওয়া হইবে না। নূতন করস্থাপনের প্রস্তাবগুলি দৈনিক সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দিব। ভারতের অভ্যন্তরে ডাকযোগে প্রেরিত পুলিন্দার উপর মাশুল প্রত্যেক চল্লিশ তোলার নিমিত্ত, ওজনের পরিমাণ-নির্ব্বিশেষে, ছয় আনা ধার্য্য হইয়াছে। টেলিফোনের ভাড়ার উপর বাড়তি কর এক-তৃতীয়াংশের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক এবং "টেলিফোন ট্রাঙ্ক কলের" উপর বাড়তি কর শতকরা কুড়ি টাকার স্থলে শতকরা চল্লিশ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। সাধারণ ও জরুরী তারের সংবাদের উপর বাড়তি কর যথাক্রমে এক আনা ও দুই আনা হারে বাড়ান হইয়াছে। কাঁচা তামাকের উপর নির্দ্ধারিত স্থায়ী হারকে প্রতি পাউণ্ডে সাড়ে সাত টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে। ইহার কোন বাড়তি কর নাই, চুরুট তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত ধূমনালী প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত (Flue-cured) যে তামাক পাতা আমদানী করা হয়, তাহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতি পাউণ্ডে (অর্দ্ধসের) যথাক্রমে সাড়ে সাত টাকা, পাঁচ টাকা ও সাড়ে তিন টাকা হারে কর ধার্য্য করা হইয়াছে। অতিরিক্ত লাভ করের বর্ত্তমান হার এবং বাধ্যতামূলক আমানত সম্পর্কে ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। কলকারখানার নূতন বাড়ী তৈয়ারী অথবা নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার নিমিত্ত তৎসম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ-তহবিলে জমার জন্য বর্ত্তমানে অনুমোদিত হার সহ বিশেষ হার মঞ্জুর করা হইবে। মোটের উপর, বর্ত্তমান বর্ষের বিপুল ঘাটতি ১৬৩'৮৯ কোটি টাকার সামান্য ৮,৬০ কোটি অংশের নিমিত্ত অপ্রত্যক্ষ কর দ্বারা দরিদ্রের পীড়ন না করিয়া সমস্ত টাকাটাই ঋণ গ্রহণ দ্বারা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিলেই সমীচীন হইত। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত জনসাধারণ ২৮৬ কোটি টাকার সরকারী ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত সরকারী ঋণের পরিমাণ গত জানুয়ারী মাসে ৮৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

গত ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের সংরক্ষণ-ব্যয়ের সমষ্টি ৪০০ কোটি টাকা স্বাভাবিক অঙ্কের দশ গুণ। অর্থ-সচিবের গত বর্ষের বাজেট অনুমিত ছিল ১৮৮ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী জাপান। জাপান ভারত আক্রমণ করিয়া বৃটেনকে প্রচুর সামরিক ব্যয় হইতে মুক্তি দিয়া, সেই ব্যয় চাপাইয়াছিল দুর্ভাগা ভারতের স্কন্ধে। ভারতের সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধ হইলে, এই রণক্ষেত্রের যুদ্ধব্যয়ের বহুলাংশ ভারতের বাজেটের বহির্ভূত হইত। যাহা হউক, ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের সংরক্ষণ-ব্যয়ের অনুকল্পে ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের সংরক্ষণ-ব্যয় নির্দ্ধারণ সমীচীন নহে। ইতিমধ্যে শত্রু ভারতের ক্ষেত্র ও সীমান্ত হইতে বহুদূরে অপসৃত হইয়াছিল এবং বর্ম্মা হইতেও সে দ্রুত বিতাড়িত হইতেছিল। সুতরাং বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল না। এই নিমিত্ত আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমান বর্ষের সংরক্ষণ-ব্যয়কে আরও সঙ্কুচিত করা যাইত। আমরা আরও জানি যে, সংরক্ষণ ও সরবরাহ-বিভাগে অন্যান্য ব্যয় অপেক্ষা অপচয় অনেক অধিক। সরবরাহ-বিভাগের ব্যয় বহুপূর্ব্বেই সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছে। তথাপি এই ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। আরও একটি দুঃখের বিষয় এই যে, "জাতীয় যুদ্ধ ব্যূহের" (National War Front) ব্যয় ব্যবস্থা-পরিষদের মঞ্জুরসাপেক্ষ নহে। যখন যুদ্ধ ভারতের সীমান্ত হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন এই সংগঠন রক্ষা করিবার কোন হেতু বিদ্যমান ছিল না। ইহার হিসাব-পত্রেও বিশৃঙ্খলার অভাব নাই। এবং ইহার বিষয়-কর্ম্মও "জাতীয়" আখ্যার অধিকারী নহে। ইহার অবসানই ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। অন্ততঃ পক্ষে ইহার ব্যয়-বরাদ্দ ব্যবস্থা-পরিষদের মঞ্জুরসাপেক্ষ হওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

গত বর্ষে বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থসচিব ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দকে "অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের" বৎসর আখ্যা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষের বাজেট প্রসঙ্গে তিনি ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দকে তদপেক্ষা কিয়দংশে "শাসন-সংযম ও শৃঙ্খলা বিন্যাসের" বৎসর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। খাদ্যপরিস্থিতির কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটিয়াছে; দ্রব্যমূল্যকে সংযত ও দৃঢ় করা হইয়াছে, বস্ত্রপ্রভৃতির সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, এবং অতিরিক্ত লাভ-লোভীদের সর্ব্বপ্রকার অনাচার-অত্যাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা কিছু বিহিত হইয়াছে। দ্রব্যমূল্যের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় নাই সত্য, তবে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন সরকার অযথা মূল্য-স্ফীতি নিবারণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেন, তখনকার মূল্যমানের বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটে নাই। অর্থসচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ-শিল্প ও সরবরাহ-প্রচেষ্টার ফলে আয়ের বিষম বৈষম্য হেতু কোন কোন শ্রেণীর লোকের যেমন সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যান্য শ্রেণীর লোকের দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য তেমনি তীব্রতর হইয়াছে। ঋণগ্রহণ ও করবৃদ্ধি দ্বারা যুদ্ধ-শিল্প ও সরবরাহে অর্জ্জিত সুপ্রচুর অর্থের বহুলাংশ সংহৃত ও সংযত করা হইয়াছে। তথাপি যাহার যতটুকু অর্থ, খাদ্য-ব্যয় সমাধা করিয়া উদবৃত্ত থাকে, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ কল্যাণের নিমিত্ত সরকারী ঋণে নিবদ্ধ রাখিলেই মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি নিবারণের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, অর্থসচিবের মতে এই সুব্যবস্থার ফলে, ভারতবাসীর টাকা না খাটাইয়া গুপ্তভাবে জমাইয়া রাখিবার যে একটি চিরন্তন অভ্যাস আছে তাহাও তিরোহিত হইবে। বিদায়ের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিবের মুখে এই সকল শুভ আশ্বাস শ্রুতিমধুর, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাগরপারে ঘোর যুদ্ধের সঙ্ঘাতে সম্ভূত আমাদের দেশের এই অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের যথার্থ হেতু কি, এবং কে বা কাহারা ইহার জন্য দায়ী? এ প্রশ্নের আলোচনা আমরা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে করিয়াছি। মোটের উপর, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অজস্র কাগজের নোট ছাপিয়া ভারতবর্ষ হইতে মিত্রশক্তি-সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় বহু যুদ্ধোপকরণ ক্রয়নীতিই ইহার জন্য দায়ী। এই নিমিত্তই কেন্দ্রীয় পরিষদে সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ মিঃ মনু সুবেদার ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিবকে "ছাপাখানাওয়ালা রেইস্ম্যান" (Printing Press Raisman) আখ্যা দিয়াছেন।

মুদ্রাস্ফীতির যমজ ভ্রাতা মূল্যস্ফীতি। অগ্রে কাগজের নোট ছাপিয়া যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া পরে ঋণগ্রহণপূর্ব্বক ভারত সরকারের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং সাগরপারে আমাদের আয়ত্তের বাহিরে বৃটিশ সরকারের স্বেচ্ছাধীনে মিত্রশক্তি-সঙ্ঘ-প্রদত্ত ভারতের প্রাপ্য যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের মূল্য ষ্টার্লিং সংস্থিতিতে পুঞ্জীকরণ আমাদের অভাব-অনটন ও অনশন-মৃত্যুতে প্রকট অর্থনৈতিক বিপ্লবের আদিম কারণ। খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়া পরে তাহা নিরাকরণের ক্ষীণ প্রচেষ্টার ন্যায়—ঋণসংগ্রহ ও বাধ্যতামূলক আমানতের মারফতে মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি ও তৎ-প্রসূত আধি-ব্যাধি নিবারণের বহু-বিলম্বিত প্রচেষ্টাও মারাত্মক। বর্ত্তমান অবস্থায় বিলাতের সহজ সাধ্যাতীত বিপুল ষ্টার্লিং সংস্থিতি হইতে আমাদের ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ, ভাবী দায়-দায়িত্বের নিমিত্ত বিশিষ্ট অর্থভাণ্ডার সংস্থাপন, ভারতের অনুকূলে ডলার ভাণ্ডার সংস্থাপন এবং ভারত হইতে স্বল্পমূল্যে ক্রীত স্বর্ণ-রৌপ্যের সহিত সাগরপার হইতে সুলভে সংগৃহীত স্বর্ণ-রৌপ্য ভারতে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় প্রভৃতি কৌশলও নিষ্ফল। বিলাতের ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধব্যয়ের একটি ন্যায়সঙ্গত বাটোয়ারা ব্যবস্থা এবং ষ্টার্লিং সংস্থিতির যথাযোগ্য এবং যথাসম্ভব ত্বরিত পরিশোধ দ্বারা ভারতে কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ও বিস্তারই ভারতের অর্থনৈতিক বিপ্লব বিদূরণের প্রকৃষ্ট উপায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাতে ভারতের ভৌগোলিক স্থিতির গুরুত্ব সর্ব্ব জাতির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের অস্ত্রাগার ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের কেন্দ্ররূপে ভারতে যে সর্ব্বপ্রকার গুরু-লঘু এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রবর্দ্ধনের প্রয়োজন, তাহা শত্রু মিত্র সকলেই উপলব্ধি করিয়াছে। শুধু ভারতপ্রবাসী শ্বেতাঙ্গ শিল্পী বণিক্ নহে, খাস বিলাতের শিল্পী ও বণিকগণ, যাহারা পূর্ব্বে ভারতে শিল্পসমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ঘোর বিরোধী ছিল, তাহারাও এখন তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, ভারতে শিল্পপ্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধন ভারত ও বিলাত উভয় দেশের কল্যাণদায়ক; সুতরাং অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্প-সমুন্নয়নের প্রকৃষ্ট মূলধন—ষ্টার্লিং সংস্থিতিই আমাদের দেশে শিল্প সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবিধ যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া বিলাতে আমাদের যে সহস্র কোটিরও অধিক ষ্টার্লিং সংস্থিতি সঞ্চিত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অপরিসীম ব্যয়ে নিঃস্ব যুক্তরাজ্যের পক্ষে, যুদ্ধান্তে নগদ অর্থের দ্বারা তাহার পরিশোধ অসম্ভব। যন্ত্রপাতি হইতে আরম্ভ করিয়া ছুঁচ-সুতা পর্য্যন্ত বহুবিধ পণ্য বহুল পরিমাণে ক্রয় করিয়া আমাদিগকে এই বিপুল অর্থ আদায় করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং ভারতের তথাকথিত অর্থ-নৈতিক কল্যাণের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিয়া ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব কয়েকটি অদ্ভুত অর্থ-নৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-এলেকার গরিষ্ঠ পরিচালন-কেন্দ্র রূপে ভারতের অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে, তাহা এতদিনে অনুভূত হইয়াছে! সুতরাং ভারতে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতির নিমিত্ত অসামরিক জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের উৎপাদন কম হইতেছে। সুতরাং ভারতের পরম হিতৈষী পরদেশী শাসনতন্ত্রের পরদেশী বিজ্ঞ অর্থ-সচিব সাগরপারের কর্ত্তৃপক্ষের প্ররোচনায় যুদ্ধের অনুকূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিলাত হইতে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ পণ্য আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভারত সরকার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী স্যর আকবর হায়দারীর নেতৃত্বে বিলাতে একটি দূতসঙ্ঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যুদ্ধ প্রয়োজনে ভারতে যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে বিলাত হইতে উৎপাদন করিয়া আনা যাইতে পারে, তাহাই তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছিলেন। যে পরিমাণে এই সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আমদানী হইবে, সেই পরিমাণে বর্ত্তমানে ভারতে প্রচলিত ও প্রবর্ত্তিত শিল্প "নিরুপদ্রুত" হইবে, অর্থাৎ নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হইবে, এবং ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য বাবদে ষ্টার্লিং সংস্থিতিরূপ ঋণের ভার লঘু হইবে! সুতরাং এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে। এই কূটনীতির অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ইতিমধ্যে যে-বিলাতী কাপড় আমদানী রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং দেশের কল্যাণ-জনক যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে দেশের আপামর সাধারণ প্রাণান্তকর ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, তাহার মারাত্মক ব্যবস্থা সুকৌশলে অবলম্বিত হইয়াছে! বিলাতী কাপড়ের আমদানীতে ভারতের বাজার আশু পরিব্যাপ্ত হইবে। ভারতের বয়নশিল্পরথিগণ নূতন নূতন কাপড়ের কল সংস্থাপন-পূর্ব্বক ভারতের যে অতিপ্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির অভাব সম্যক্‌রূপে স্বদেশে উৎপন্ন বস্ত্রাদির দ্বারা পূরণ করিবার কল্যাণজনক প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, তাহা কিরূপে ব্যাহত হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। যেমন বস্ত্র ব্যাপারে, তেমনি অন্যান্য বহুবিধ গুরু-লঘু ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পজ পণ্যে এই সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইবে।

অথচ শিল্প সংগঠন-সংবর্দ্ধন প্রচেষ্টাই ভারতের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন-পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষির সহিত সমপর্য্যায়ে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও প্রসার ব্যতীত ভারতের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব। অর্থ-নৈতিক অভ্যুদয় ব্যতীত অতি দীন-দরিদ্র ভারতের অধিবাসীদিগের অতি হীন ও হেয় জীবনযাত্রার ধারার উন্নতি অসম্ভব। সর্ব্বসাধারণের জীবন-যাত্রার ধারার প্রচুর উন্নতি ব্যতীত দেশের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও নিত্য রোগ-শোকের প্রচণ্ড পীড়ন নিবারিত না হউক, প্রশমিত করাও অসম্ভব। যুদ্ধারম্ভের সূচনা হইতেই অন্যান্য স্বাধীন দেশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সুসঙ্গত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। কেবল পরাধীন ভারতেই ইহার প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। এই দুর্ভাগ্য দেশে শাসক ও শাসিতের স্বার্থ স্বতন্ত্র। যুদ্ধের দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অতি-প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শাসক ও শাসিতের স্বার্থের অনুকূল ও প্রতিকূল ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘর্ষের ফলে ভারতে যুদ্ধোত্তর পরি-কল্পনার এখনও কোন সরকারী প্রচেষ্টা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই। জল্পনা-কল্পনাও সভা-সমিতি এবং আন্দোলন-আলোচনাতেই এই সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে এবং গভীর গবেষণার পর আমাদের বিদায়োন্মুখ ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব অতি বিজ্ঞের ন্যায়

ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, Post-war development must mean and must continue to mean post-war development and by no magic or optimism can it be made to mean war-time development" অর্থাৎ, যুদ্ধোত্তর উন্নয়নের অর্থ, যেমন বর্ত্তমানে তেমনি ভবিষ্যতে, যুদ্ধোত্তর উন্নয়নই এবং কোন প্রকার যাদু অথবা আশাবাদিতার দ্বারা ইহার অর্থ যুদ্ধ-কালীন উন্নয়ন করিতে পারা যায় না ! অর্থ-সচিবের এই উক্তি বিস্ময়েরও বিস্ময় ! অর্থ-সচিব আরও বলিয়াছিলেন, The first year or two at least after actual fighting ends will inevitably be for the centre years of heavy deficit on revenue account, অর্থাৎ যুদ্ধবিরতির পরে এক বা দুই বৎসর কেন্দ্রীয় রাজকোষে বিরাট ঘাটতি পড়িবে। অথচ এই সমুদয় যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে শান্তি-সংস্থিতিতে পরিবর্ত্তিত করিতে প্রচুর অর্থ-সামর্থ্য এবং প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি যুদ্ধোত্তর উন্নয়নের জন্য যে তহবিল গঠন করিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সময়ে তাহারা যথেষ্ট সাহায্য পাইবে। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত লাভকর লোপ পাইবে, সুতরাং কৃষি-আয়কর, কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্ক, উত্তরাধিকার-কর ও বিক্রয়-কর প্রবর্ত্তনের দ্বারা যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুন্নয়ন-ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মৃত্যুকর আইনের পাণ্ডুলিপি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জনসাধারণের ব্যবহারের এবং কৃষি-শিল্প-সমুন্নয়ন-সম্প্রসারণের জন্য সাগরপার হইতে বহু জিনিস আমদানী করিতে হইবে। সুতরাং আমদানী-শুল্ক হইতে কয়েক বৎসর অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে শিল্প-বিস্তার যতই বেশী হইবে, উৎপাদন-শুল্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ততই বাড়িবে। বিক্রয়-কর হইতেও আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং যুদ্ধান্তে জনসাধারণের ব্যয়ের মাত্রা কমিবে না; বরং বাড়িবে। আয় বৃদ্ধি করিয়া বর্দ্ধিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিবার ইহাই নিগূঢ় অর্থ। দ্রব্যমূল্য বিশেষ কমিবে না, করভার বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে, এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সরকারী শাসনের মাত্রাও বাড়িবে বই কমিবে না। যুদ্ধোত্তর সংগঠন সমুন্নয়নের মূল্য অবশ্য আমাদিগকেই দিতে হইবে। কিন্তু এই বিপুল মূল্যের সদ্ব্যবহার করিবে কে ? অর্থ-সচিব এই প্রসঙ্গে আর একটি কঠিন সমস্যার অবতারণা করিয়াছিলেন। সে প্রশ্ন এই যে, যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুন্নয়ন কার্য্যে সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টা ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে কিরূপ ব্যবধান ও সম্পর্ক থাকিবে ? অর্থ-সচিব বলেন, অত্যাবশ্যক আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত কোন-কোন শিল্পে সরকারের মালিকানা স্বত্ব সুবিধাজনক হইবে। হয় ত কতকগুলি শিল্পকে জাতীয় অনুষ্ঠানে (Nationalisation এ) পরিণত করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া সেই সকল শিল্পগুলিকে—যাহাতে প্রভূত বিস্তৃতির সম্ভাবনা আছে। এ সম্বন্ধে বোম্বাই পরিকল্পনার নির্দ্দেশ আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি ভারতীয় শিল্প-বণিক্ সমিতি-সমবায়ের বার্ষিক অধিবেশনেও এই প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে। স্থূল ও মূলকথা এই যে, দেশের শিল্পকে জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার পূর্ব্বে দেশের শাসনতন্ত্রকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। বর্ত্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর সহিত আমাদের বিরোধ এইখানে। সাগরপারের নিয়ন্ত্রণাধীন আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কখনই জাতীয় অর্থ-সামর্থ্য জাতীয় স্বার্থের নিরঙ্কুশ উন্নয়নের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও অপরিমিত ত্যাগ ও তিতিক্ষা-প্রসূত অর্থের অপব্যবহার সুনিশ্চিত।

ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব তাঁহার এই ষষ্ঠ যুদ্ধ বাজেট বক্তৃতার উপসংহারে তাঁহার আসন্ন বিদায়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্যকালের দীর্ঘ ছয়টি বৎসর প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক বিপ্লব এবং জটিল ও কুটিল পরিস্থিতির সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভ্রম-প্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরিহার্য্য, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ লক্ষ্যে রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অচিরে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা যে উন্নতি লাভ করিবে, তৎপ্রতিও তিনি সর্ব্বদা অবহিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ভারতের আর্থিক অবস্থা এখন প্রচুর শক্তিসম্পন্ন। ভারতের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ ঘটিয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ অনুৎপাদক ঋণের চাপও ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আয়ের উপর লঘু। অবশ্য বহু ত্যাগ স্বীকারের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতের অত্যাবশ্যক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইয়াছে কি ? নিখিল জগতের সমস্যাসমূহের পেঁচে ভারতকে এখনও বহু জটিল ও কুটিল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এগুলি অবশ্য বর্ত্তমান যুদ্ধের অপরিহার্য্য পরিণাম। বিগত মহাযুদ্ধের স্থিতি-কালে এবং তৎপরবর্ত্তী শান্তিকালে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন আলাপ-আলোচনার ফলে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত যুদ্ধমান মিত্রপক্ষের মধ্যে সমীচীনভাবে যুদ্ধব্যয় বণ্টন করিবার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বিপুল ঋণ ও ক্ষতি কিংবা ত্যাগের পরিমাণ হিসাব-নিকাশের সমস্যা নয়। বিভিন্ন শক্তি-সামর্থ্যসম্পন্ন এবং বিভিন্ন জীবনযাত্রার ধারায় অভ্যস্ত একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত অংশীদারগণের মধ্যে সমীচীন ভাবে যুদ্ধব্যয় বণ্টন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তেমনই দুরূহ,—যেমন দুরূহ দেশাভ্যন্তরে বিভিন্ন অবস্থা-সম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর জন-সাধারণের মধ্যে আধুনিক রীতি-নীতিতে জাতীয় করের সমীচীন বণ্টন-বিভাগ। এই অংশীদারদের মধ্যে প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন স্বাধীন ও তদধীন দেশের ক্ষেত্রে স্বপ্রবৃত্ত ও পরপ্রবর্ত্তিত স্বার্থের বিষম পার্থক্য হেতু এই বণ্টন-সমস্যা আরও প্রবল ; যেমন বৃটেনের আত্মরক্ষার যুদ্ধে পরাধীন ভারতের অবৈধ অপরিমিত ব্যয়ের দুর্ব্বহ দায়িত্ব। বিচার এখানে অবিচারের পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া অবিচারের সীমান্তসারিধ্যেও পৌঁছিতে পারে না।

তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে স্যার জেরিমী রেইসম্যান ভারতের স্বার্থের প্রতি যথাসম্ভব

সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধব্যয়-বাটোয়ারা-চুক্তি পরিবর্ত্তনের জন্য যখন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন স্যার জেরেমী দৃঢ় আপত্তি করিয়াছিলেন। বড়লাটের মন্ত্রি-পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ পরে এই বিষয়ে তাঁহাকে দৃঢ় সমর্থন করিয়াছিলেন। ফলে, ঐ চুক্তি এখনও অপরিবর্ত্তিত আছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠকে তিনি দুইজন স্বাধীনচেতা বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত একাভিসন্ধি হইয়া ভারতের মত ও দাবী জানাইয়াছিলেন। আমাদের ষ্টার্লিং সংস্থিতি হইতে আমাদের বৈদেশিক ঋণপরিশোধ তাঁহারই কীর্ত্তি। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে এই ঋণ পরিশোধ করিয়া ভারত উত্তমর্ণ জাতির মর্য্যাদা অধিকার করিতে পারিত; কিন্তু তখন তাহা করা হয় নাই। স্যার জেরেমীর ঋণগ্রহণ-নীতি ও সুদের হার কমাইয়া ভারতের বাজার সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার পদের উত্তরাধিকারী ভারতবাসী হইবে আশা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ-ব্যয়-বণ্টন-সমস্যায় বৃটেনের স্বার্থ তাহার নিদারুণ অন্তরায়। কোন ভারতবাসী অর্থসচিব হইলে, ভারতের স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়া বৃটেনের স্বার্থকে প্রবল করিতে পারিত না, নূতন অর্থসচিব স্যার আর্কিবল্ড রোল্যাণ্ডের অর্থ-নীতি আমাদের তীব্র লক্ষ্যের বিষয় হইবে।

বিকলন (গল্প)

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

একটা দিনের কথা বেশ ভালভাবে মনে করতে পারে ফাইম মণ্ডল;—কাদের যেন মোকদ্দমায় সাক্ষী সেজে গিয়েছিল বড় নগরের নকল করে তৈরী করা ছোটখাটো রকমের কোনো মহকুমায়। এক জন লোক বোধ হয় বেদে, সাপ খেলাচ্ছিল বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে। ইয়া লম্বা লম্বা সাপ—বিষাক্ত কি না ফাইমের আজ আর তা মনে পড়ে না, শুধু ভয় দেখাবার কেমন যেন চমকালো দ্যোতনা নিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল সাপগুলো; ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের মাঝখানেও সাপগুলোর জুগুপ্সিত নড়াচড়া একটা অভিনব চেতনার মধ্যে আজো সে কথা ফাইম মণ্ডলের মনে পড়ে।

ছেলে বয়স তখন ফাইম মণ্ডলের। পরের জমিতে বাপ দাদা চাষ করে বেড়ায়—সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় ফাইমকে, খুচরো কাজের সাহায্য করবার জন্যে। টুকিটাকি এটা-ওটা বিরক্তিকর ছোটরকমের অনেক কাজ করতে হতো ফাইমকে। তখনকার সেই সব দিনের কথা স্পষ্টভাবে আর মনে পড়ে না ফাইমের। শুধু যা মনে আছে সেই সাপওয়ালাকে—মাথায় ঝুটা বাঁধা, গেরুয়া না বাদামী রঙের ঢোল কামিজ পরা—লম্বা লম্বা সাদা কালোর ঢাকা ঢাকা গায়ের দাগ সাপ খেলাচ্ছিল সে—কেমন তুনলা বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে। কাদের মোকদ্দমায় যেন সাক্ষী দেবার জন্যে ফাইমকে সেই মহকুমার উপনগরের ভিড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যার সব ভুল করে ভয়ে সে নাকি কেস ফাঁসিয়ে দিয়েছিল—আবছা আবছা তার সেকথাও মনে আছে। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে সেই সাপুড়েটাকে, চোখের ওপর যেন চেহারাটা ভাসছে!

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাইম সাপখেলানো দেখতে লাগলো। চক্রে চক্রে ডোরাকাটা মসৃণ অথচ কালো সাপগুলোকে দেখতে ভয় লাগে, কিন্তু বাঁশীর সুরের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে নৃত্যশীল ভঙ্গীটি ফাইমের ভারি ভালো লেগে গেল। একটুখানি সামনের দিকে সরে এসে দাঁড়ালো সে—ভয়ডর বিসর্জ্জন দিয়ে।

চেহারার দিক থেকে ফাইমের সৌন্দর্য্য বা লালিত্যের কোন রকম কিছু বলবার ছিল না। কালো পাথরের কোঁদাই করা নীরেট মূর্ত্তির মত ফাইম মণ্ডল, মাংসপিণ্ডও সবল ছিল, শুধু মিট মিট করা সুগোল এবং ছোট ছোট চোখ দুটি আর হাতে পায়ের অতি সংক্ষিপ্ত সঞ্চালন ছাড়া তার জীবন-স্পন্দন বোঝা যেত না।

সাপুড়ে বেদেটি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ফাইমের দিকে। খেলা শেষ হয়ে গেছে, তবু এই ছেলেটি দাঁড়িয়েছে কেন?

সাপুড়ে বোধ হয় বলেছিল—কি চাও খোকা? দেব সাপ ধরিয়ে? ইয়া লম্বা সাপ—ফট করে কামড়ে দেবে।

নিশ্চল ফাইম মণ্ডল নির্ভয়ে সবল চোখ তুলে ধরেছিল সাপুড়ের দিকে, হয় তো অনুরোধ করেছিল—দাওনা আমাকে সাপ খেলানো শিখিয়ে, জল ঢোঁরা সাপ খেলা শিখিয়ে—তার পর তোমার মতন অমন বড় বড়—অমন কালো কালো সাপ খেলা শিখিয়ে, খুব ভালো সাপ খেলাতে পারি যেন।

ফাইমের এইটুকু শুধু মনে পড়ে। ভিজে স্মৃতির আবছা ছায়ার মত মনে হয় সাপুড়েকে, সাপুড়ের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম প্রবাহকে। এর চেয়ে খুব বিশদভাবে ফাইম কিছু মনে করতে পারে না।

তিন বছর কিংবা আরো কিছুকাল পরে ফাইম ফিরে এল নিজের গাঁয়ে। ইতিমধ্যে সাংসারিক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে অনেক। বুড়ী-মাকে পেছনের বাগানে বাঁশ ঝাড়ের পশ্চিমে মাটির তলায় শোয়ানো হয়েছে, দাদাদের বিয়ে হয়ে গেছে, পরের জমিতে চাস করবার দরকার হয় না এখন। লাঙ্গল দিয়ে বছরের ধান জোগাড় করবার মত নিজেদের জমি জোটাতে পেরেছে দাদারা, মোটের ওপর ফাইমকে ছেড়ে দিয়েও ত এদের সংসার বেশ চলেছে। শান্তি স্বাচ্ছন্দ্যও এসেছে অল্প বিস্তর।

দাদা জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় ছিলি রে ফৈম এতদিন? বড় রোগা হয়ে গেছিস, অসুখ করেছিল নাকি খুব?

ফাইম বিস্ফারিত চোখ নিয়ে চেয়ে রইল। কিছু বিস্ময়, কিছু বেদনা এসে জমা হল সে চোখে। মনে হল একবার উচ্চকিত স্বরে সে কেঁদে ওঠে, কিন্তু তারুণ্যের লঘুতাকে দূরে ফেলে ফাইম সজীব হয়ে উঠলো। সে বললে—সাপ খেলা শিখতে গিছলুম।

বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সাপ ধরার মন্ত্র শিখেছি—যে সাপেই কামড়াক না কোনো লোককে—ঠিক আমি তাকে সারিয়ে দেব। আর আমি যা ইচ্ছা করবো—তাই করতে পারি। যেমন ধরো কারুর কোন অসুখ করলো, তা আর সারবে না কোনদিন—এমন মন্ত্র দিতে পারি—সেই অসুখকে চিরকাল ধরে রাখতে পারি।

দাদা চমকে উঠলো—চুপ কর তুই ফৈম। এমন সব কথা বলতে নেই। মন্ত্র শিখে কোনো লোকের কখনো সর্বনাশ করে? কখনো তা করতে নেই।

সে কথা ঠিক—সর্বনাশ করবার কেমন যেন নিষ্প্রাণ চেতনায় ফাইমের মনটা অস্থির হলেও তার ওপর নিষেধ আছে গুরুর, কখনো যেন সে এ ধরণের সর্বনাশ কোনো লোকের না করে—সাপুড়ে গুরুর কাছ থেকে এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। কাজেই বাজে কথা নয়—তাছাড়া ফাইমের মনে পড়লো—যেদিন ফাইম এরকম দুর্নীতির আশ্রয় নেবে, সেদিন সে তার জীবনের ওপর অভিশাপ নেবে; কখনো এ মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করলে, কিংবা ভাবলে পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। যাক সে সব।

খাপছাড়া অনুভব, সুখ দুঃখ বোধ, আশ্চর্য্য চেতনা—সব অতিক্রম করে ফাইম দাদাদের সংসারে মিশে গেল।

আজ একে সাপে কামড়ায়, ফৈমের ডাক পড়ে—সে ছুটে যায়। আধঘণ্টা বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়, নানা রকম কসরৎ করে—লোকটা উঠে বসে। কতরকমের তুকতাক করতে হয় তাকে। কখনো বা দংশনকারী সাপ আসে—আশ্চর্য্য বানিয়ে দেয় ফাইম সবাইকে। কেউ কেউ বা সাপ নিয়ে ফাইমের খেলা দেখে যায়, সন্তুষ্ট হয়ে দু'চার পয়সা বখশিসও দেয় কেউ।

প্রতিবার ফাইমের মনে হয়েছে—গুরুর নিষেধের কথা। নৈলে ঐ যে—ভিখারীটা পায়ের ঘা'কে সযত্নে সতেজ করে রেখে সহরে চলে যায় রোজ ভিক্ষা করতে, ওর ঘা'কে চিরকালের জন্যে ফাইম যেমন অবস্থায় আছে, তেমনি করে ধরে রাখতে পারে। দাদার হাত কেটে গিয়েছিল কাস্তের সরু ফলায়, ফাইমের মনে হল যে কোন মুহূর্ত্তেই ফাইম মণ্ডল দাদার হাতখানাকে চিরদিনের মত পঙ্গু করে রাখতে পারে। অনেক কষ্টে, অনেক ছটফটানি আর অসম্ভব যন্ত্রণার পর সে যাত্রায় দাদার হাতখানা বেঁচে গেল।

আশ্চর্য্য, অত্যন্ত সঙ্গোপনের সঙ্গে ফাইম শিখে নিয়েছে এই মন্ত্র। সর্বনাশ করবার এই রকম মন্ত্র। এখনো পর্য্যন্ত কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত আর মনে জমা হয়নি। বিশেষ করে তার চেতনায় এজন্যে কোন অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়নি। একবার মনে হয়েছিল একটা পশুর কোন একটা অঙ্গকে আহত করে সে তার শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হোক, কিন্তু মনের কারুণ্যের দিকটায় বিশ্রীরকম একটা বেদনা অনুভূত হয়েছিল, কেমন যেন মায়া—বড় বেদনাময় অনুভব—যেটা মোটেই ওস্তাদসুলভ মনোবৃত্তি নয়। সুতরাং সে ধরণের সুযোগ জুটিয়ে নেবার প্রবৃত্তিকে খসিয়ে ফেললে ফাইম।

নিজের মনেই ফাইম মণ্ডল মাঝে মাঝে হেসে ওঠে। সোজা ভাবে, অত্যন্ত সরলভাবে সে মনে করতে পারে যে এ রকমের কোনো মন্ত্রই সে জানে না;—তা হলেই ত' ব্যাপারটা চুকে যায়।

দাদাকে সে বললে—তোমরা অমন করে রোজা রোজা বলে ডেকো না আমায়। আমি সব মন্ত্র ভুলে যেতে চাই। এই সব মন্ত্র শিখে আজকাল খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমি, আমি—

দাদা হেসে জিজ্ঞাসা করলে—কেন রে, কি আবার হল তোর, ফৈম?

ফাইম অত্যন্ত সরলভাবে ব্যাপারটা খুলে বলতে লাগলো: যখনই কোন কাটা ঘা, পোড়া ক্ষত দেখি—মনে হয় চিরকালের মত ওটাকে স্থায়ী করতে যখন পারি আমি, দিই তাই করে। মনটা খুব খারাপ হয়ে ওঠে, মন্ত্রের দু'একটা বর্ণ পর পর মনে পড়তে থাকে, ঠোঁটে এসে যায় হড়কে; চাপতে যাই কাণ মাথা গরম হয়ে যায়। আমি এ সব যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চাই, মুক্ত হতে চাই মনের এমন ধারা কষ্ট থেকে,—তাই মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলে যেতে চাই। আমিও মাঠে যাবো তোমাদের সঙ্গে, কাস্তে হাতে, লাঙলের ফলা কাঁধে, মাঠে চাষ করবো, দুঃখে সুখে দিন গুজরাণ করবো। সেটা খুব ভালো। আমি এ সহ্য করতে পারছি না।

দাদা বললে,—তুই যে বলিস, ওই মন্ত্রটা তোর খাঁটি কিনা—তা তুই নিজেই ত' জানিস না। তাই যখন জানিস না—তখন মনে কর ওটা একদম মিথ্যে কথা। মন্ত্র কখনো অমনধারা হয়?

ফাইম বেশ উত্তেজনার সঙ্গে বললে—তাই জন্যে আমার কেবল মনে হয় দেখি পরীক্ষা করে আমি জানি কিনা। কিন্তু পাছে কারুর খারাপ হয়ে যায়, তাই চেপে যাই, ক্ষেপে উঠলেও রুখে যাই মনকে। মনের কষ্ট চুপি চুপি সহ্য করি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি খুবই সহজ? খুবই অনায়াসলব্ধ? মনকে শক্ত করতে গিয়ে সে যেন নিজেকে আরো হাল্কা, আরো বেশী পরিমাণে লঘু করে দিয়েছে। পাগল হয়ে যাবে নাকি সে? ফাইম চোখের ওপর দেখেছে কত বিভিন্ন রকমের ক্ষত, কারুর কাটা ঘা, পুঁজ রক্ত ঝরা তাজা টাটকা ঘা, পোড়া দগদগে ঘা—আরো জঘন্যতর, আরো নোংরা কত রকমের ক্ষত, কত কি। ফাইমের যখনই এ সব চোখে পড়ে, তখন কেমন যেন একটা বিমর্ষ যন্ত্রণার অতিভারে সে কাতর হয়ে ওঠে। যন্ত্রণাটা ঠিক মনে নয়, মনের কোন বিশেষ অংশে নয়, অন্তরের কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমানায় ত নয়ই—রক্ত সঞ্চালনেও নয়, তার চেতনার সঙ্গে কেমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বলে বোধ হয়।

মাঠ থেকে সন্ধ্যার পর অন্ধকার পথ বেয়ে আসবার সময় ফাইম অনুভব করলে তার পায়ে কি যেন ফুটে গেল। বাড়ীতে এসে প্রাথমিক সেবা চললো। কিন্তু পরদিন দেখা গেল, পা-টা বেশ ফুলেছে। তার পরদিন ব্যথা বিশেষভাবে জেঁকে বসলো, অসম্ভব বাড়তে লাগলো। এরও দু'দিন পরে ধরতে আরম্ভ করলো পাক এবং সুরু হল ভেতরে ভেতরে পচন।

টোটকা ওষুধ চললো। কবিরাজীর পর ডাক্তার এল। কাঁটাটা ভেতরে রয়ে গেছে বোধ হয়, তাই এত দুর্ভোগ। ছুরি বসিয়ে পায়ের কাঁটাটা টেনে বের করলেই আপদ চুকে যাবে। মাত্র পাঁচটা মিনিট কষ্ট সহ্য করতে হবে বৈকি! ফাইমের ততক্ষণ ওই আকাশের কোণে উড়ে যাওয়া চিলটার দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে। চিলটা ডিগবাজী খাচ্ছে কেমন! চিলেরা

অমন উল্টেপাল্টে বিচরণ করে শূন্যে, মনটা খুসী হলে চিলেরা ডিগবাজী খায় অমন, পাখীর জাত বলে কি খুসীর অনুভব প্রকাশ করতে নেই—উঃ, ব্যস, ছুরি বসানো শেষ হয়ে গেছে ফাইমের পায়ের ওপর।

কাঁটা একটা পাওয়া গেল। খোঁজাখুঁজির পর। সাপের শির-দাঁড়ায় ভাঙ্গা কাঁটা—কি সাপ কে জানে, চিতি হতে পারে, ঢেলে, কেউটে, গোখরো কিংবা চন্দ্র বোড়া। ডাক্তারের কমপাউণ্ডার সঙ্গে ছিলেন, ঘা-টা ধুইয়ে বেশ করে বেঁধে দিলেন।

দাদা বললে—দেখিস ফৈম, তুই যেন তোর সেই মন্ত্রটা আবার আওড়ে বাহাদুরি দেখাতে বসিস নি।

তাইত! অকস্মাৎ চমকে উঠলো—ফাইম মণ্ডল। কিন্তু না না, না। তার নিজের দেহে বিষাক্ত ঘা পোষণ করবার মন্ত্র সে আওড়াতে পারবে না। কিসের মন্ত্র? কিছুতেই তা সে আবৃত্তি করতে পারবো না মনে মনে। অবশ্য তার যেন মনে পড়ে যাচ্ছে সব অক্ষরগুলো একটির পর একটি। সর্ব্বপ্রথম নিজের দেহ বন্ধন ক'রে নিতে হয়।

ফাইম সচেতন হ'ল। কি করতে চলেছে সে? বার বার অন্য চিন্তাপ্রবাহে তার মননপ্রক্রিয়া বইয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। মন্ত্র. কিসের মন্ত্র? অনেক অমন অবস্থাকে সে দমন করেছে, আরো বৃহত্তর প্রলোভনকে সে দিয়েছে চূর্ণ করে। আর সে কিনা এখন নিজের দেহের ক্ষতকে পোষণ করবার বিকৃত বাসনার গতিতে ডুব দিয়ে নিজের মনের সমস্ত শক্তিকে হারিয়ে ফেলতে বসেছে!

তার চেয়ে সে মনে করুক গভীর কোন জঙ্গলে দুর্দ্দান্ত কোন এক সিংহের কবলে পড়েছে; ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সামনে পড়েছে সে; ভয়ে কাতর হয়ে উঠলো। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'লে চলবে না! ফাইম উলটো লাফ দিয়ে বনের একদিকে একটা স্বল্প উঁচু গাছের ওপর উঠবার চেষ্টা করলো। সিংহটা ফাইমের এই চালাকিটুকু বুঝতে না পেরে ঠকে গেল। সিংহটাও এক লাফ দিলে ফাইমের দিকে থাবা বাড়িয়ে, কিন্তু ফাইমকে নাগালের মধ্যে পেলে না, একটুর জন্যে বেঁচে গেল। শুধু পায়ের কিছু জায়গায় নখের আঁচড় বসিয়ে দিয়ে গেল; সেই আঁচড় থেকে হল ঘা—আর সেই ঘাকে ফাইম মন্ত্র সৃষ্টি ক'রে দেখবে তার সেই মন্ত্র সত্যি কিনা; পরখ করবার এমন সুযোগ হাত ছাড়া সে করবে না। প্রথমে সে নিজের দেহ বন্ধন ক'রে নেবে। দেহ বন্ধের পর গুরুকে প্রণাম ক'রে আরম্ভ করবে আসল মন্ত্র। বেশ মনে প'ড়ে যেতে লাগলো মন্ত্রের বাণীগুলো। আশ্চর্য্য, একটি অক্ষর ভোলে নি ত' ফাইম মণ্ডল। স্মৃতি-শক্তিকে তারিফ করতে হয়। সব মনে পড়ছে—সমস্ত কথাগুলো।

সচেতন হয়ে ফাইম মণ্ডল চীৎকার ক'রে উঠলো—না, না, আমি জানি না, জানি না কোনো মন্ত্র। আমি কিছু জানি না। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলো—মন্ত্র এড়াবার জন্যে সিংহের মুখে পড়ে নিজেকে বিপন্ন ভাবার মধ্যেও সেই মন্ত্র। নিজের দেহ-বন্ধের পর গুরুকে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে দক্ষিণ মুখ হ'য়ে সেই মন্ত্রোচ্চারণ! ফাইম অভিভূত হয়ে গেল। যখন সম্বিৎ ফিরে এল, কঠিন হয়ে বিস্ফারিত চোখে সে তার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখে যেন আগুন জ্বলছে—সেই আগুনে পায়ের ঘাও পুড়ছে দাউ দাউ করে। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো ফাইম মণ্ডল।

* * *

এর পরের বার ডাক্তার এসে জানিয়ে গেলেন—ফাইম মণ্ডলের এই ঘা সারবে না, বিষিয়ে গেছে।

নবীন সাধক

শ্রীকরুণাময় মুখোপাধ্যায়

ফিরিছে এ কোন নবীনপূজারী ভারত শ্মশান বুকে,
অধরে না ধরে সুমধুর হাসি বম বম নাহি মুখে।
শিরেতে না শোভে জটাজুটভার, ললাটে সিঁদুর রেখা,
করুণা কিরণে বিকচ বয়ান যেন শশধর ফাঁকা।
ভাবে ঢল ঢল শুভ আঁখি তনু ভাবিতে ভাবিতে সারা,
দীনের দৈন্যে, নহে রসাবেশে, যেন দুটী ধ্রুবতারা।
নাহি ধৃত করে দীর্ঘত্রিশূল অথবা ভিক্ষাপাত্র,
ঋজু দেহ ভার, সম্বল তার ভকত সোহাগ মাত্র।
রকত অম্বর কোথা পরিধানে, রুদ্রাক্ষের ঘটা?
না ধরে বিভূতি সকল অঙ্গে শোভিছে পুণ্যছটা।
গড়েনি দেউল বিজন বনেতে কালীর ভয়াল প্রতিমা
নাহি উঠে ঘন শিব দেহি রব করাল পানীয় মহিমা।
আসন নহেক গলা নরদেহ না বাজে ক্ষণেকে গাল,
আয়োজন কই ষোড়শী কুমারী, কৃপাণ, নরকপাল?
নাহি উপচিত মালাচন্দন অথবা অগ্নঠাট,—
অপরাজিতায় ফুলসম্ভার সমুখে জ্বলে না কাঠ।
নাহি প্রয়োজন গোপনে গোপনে চিহ্নিত বলি হরিতে,
মায়ের আঁচল-নিধিরে সঁপিয়া অন্য মায়েরে তুষিতে।
প্রাণীর রুধিরে, পিচ্ছিল ধরণী হনন কার্য্য কোথা?
গলে ফুলমালা নিবেদিত বলি ফুকারে না হৃদি ব্যথা।
মুখের সমুখে নাহি প্রসারিত তণ্ডুলকলাপিণ্ড,
গলা বাড়াইলে শাণিত খড়্গ ছিন্ন করিবে মুণ্ড।
কোথা ঘটপট, বলিছটপট, চট পট তালিসুর,
মুদ্রা বাঁধনে মন্ত্রে সঘনে, ভূতগণে করে দূর?
নূতন তন্ত্রে, নবীনমন্ত্রে, ধুম আয়োজনে জেগেছে পূজা,
সাধক হাঁকিছে "কই অঞ্জলি," "অর্ঘ্যের পর অর্ঘ্য সাজা।"
সকলি নূতন এ কোন সাধক এলরে মুছাতে ধরায় গ্লানি?
প্রেম দিয়ে জয় করিবে রিপুরে তরবারি নাহি হানি'।

সই মা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সই মা আমার—আমার মায়ের সই,
নামই শুনেছি, দেখি নাই তাঁরে কই?
শুনিবে এ চিঠি লিখেছেন কবে?
দশ বছরের শিশু আমি যবে,
আজিকে পড়িয়া উন্মনা হয়ে রই।

২

'গিল্‌গিট' থেকে লিখেছেন তিনি মোরে
অসুখ শুনিয়া—অশেষ আশিষ করে।
গেছে শৈশব, গেছে যৌবন
গভীর স্নেহের উপঢৌকন
'ডাক-নামে' যেন ডাক দেয় আসি জোরে।

৩

এতই মমতা চিঠি কি ধরিয়া রাখে?
প্রসাদী পুষ্প পাঠায়ে দিলেন ডাকে।
'ভাল হবে বাছা নাই কোনো ভয়,
হবে চিরজীবী, হবে অক্ষয়;
নিজ হাতে কুমু চিঠি দিও সই মাকে।'

৪

কোথা 'গিল্‌গিট' তুষার নগরী খ্যাত
'কাঁহা যে যশোদা মায়ি' মোর অজ্ঞাত!
তাঁর স্তন্যের স্নেহের ধারায়
মন আঁখিজলে পথ যে হারায়,
এ সুধার স্বাদ দেবতাও জানে না তো!

৫

চিঠি ছোট চিঠি ছত্র তিন কি চার,
আখর যা বলে—ঢের বেশী মানে তার।
বিচিত্র এই মাতৃ-হৃদয়
নারায়ণ তার লোভে নর হয়,
দেব-দেবী করে জয় গান বসুধার।

৬

কখন আধেক শতাব্দী গেছে চলি,
চিঠিখানি দেয় সন ও তারিখ বলি।
চিঠি যেন চায় জানাইয়া দিতে
প্রথম আসিলি এই পৃথিবীতে,
প্রণমি সবারে করিয়া কৃতাঞ্জলি।

যাবে?

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

১

আমার বাড়ী যাবে রে বন্ধু, যাবে আমার বাড়ী?
ঐ না দেশের মায়া আমার পরাণ নিল কাড়ি।
মন-পবনের পালটি তুলে ওড়াকান্দী গাঁয়ে,
যাও যদি ভাই যেয়ো তুমি ছোট্ট ডিঙ্গা নায়ে।

২

রতনডাঙ্গার বিল ডিঙ্গায়ে নূতন খালের ধারে,
দেখতে পাবে জোড়া হিজল শেওড়া ঝোপের আড়ে।
কচুরী আর টোপা পানায় নাওদাড়াটি ঢাকা,
ধীরে ধীরে বাইয়ো রে বন্ধু, পথটি আঁকা বাঁকা।

৩

ঝিরিঝিরি বইছে বাতাস ধানের পাতা দোলে,
ছায়ায় ছায়ায় নাও বেয়ে যাও, গাঁয়ের কোলে কোলে।
দেখতে পাবে পুকুর পারে কলাগাছের সারি,
পূবের ঘাটে নাও লাগাবে, এই আমাদের বাড়ী।

৪

দূর প্রবাসে কাজের ভিড়ে থাকি সকল ভুলে,
গাঁয়ের কথা পড়লে মনে বুকটি ওঠে দুলে।
মা-জননী আছেন আমার পথের পানে চেয়ে,
সারাটি দিন কেঁদে বেড়ান চোখের জলে নেয়ে।

৫

কোন জনমে হায়রে আমি কি করেছি পাপ,
কারে যেন কাঁদিয়েছি রে—তার এ অভিশাপ।
বুকের তলে কি বয়ে যায় দেখাবো তায় কারে?
সবার মাঝে একলা আমি এ বিশ্ব-সংসারে।

৬

মায়ের কথা গাঁয়ের কথা, কভু কি যায় ভোলা?
ছাই দিয়ে সেই আগুন চাপা, বুক যে বালির খোলা।
বুকের মাঝে ঘষির আগুন রইয়া রইয়া জ্বলে,
দে রে আমায় দে ছুটি দে, যাবো মায়ের কোলে।

৭

এই তো রোদে রঙ ধরেছে, ফুটবে কাশের ফুল,
এই তো সাদা মেঘের ভেলা প্রাণ করে আকুল।
আশ্বিনেতে পূজার ছুটি যাবো গাঁয়ের বুকে,
বাজবে বাঁশী ফুটবে হাসি আবার মিলন সুখে।

অবীরার ধনাধিকার

আলোচনী

বিখ্যাত "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যার ১৮৬ পৃষ্ঠায় বিদুষী শ্রীমতী উৎপলাসনা দেবী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। অবীরা বা পুত্রহীনা বিধবার পৈতৃক ধনে নিব্যূঢ় অধিকার দেওয়া সঙ্গত কি না তাহা হইতেছে প্রধান বিচার্য্য বিষয়। পুত্রহীনা বিধবা যে "লক্ষপতি পিতামাতার অবর্ত্তমানে লক্ষপতি ভাইদের সংসারে অতি দীন হীন ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন", এ দৃষ্টান্ত তিনি কোথায় দেখিয়াছেন? পশ্চিম মধ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গে বহু স্থানে আমার কন্যাদের বিবাহ দিয়াছি, বহুগ্রামে আমার যাতায়াত ছিল, কিন্তু কুত্রাপি ঐরূপ পাষণ্ড ভ্রাতা দেখি নাই, শুনিও নাই। গরিব মধ্যবিত্ত ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ কেহ কন্যামাত্রপ্রসূতি ভগিনীর সহিত রূঢ় ব্যবহার করে। তাহাদের সংখ্যাও অতি অল্প। শতকরা একটিও ঐরূপ নরপিশাচ মিলে কিনা সন্দেহ। তবে অনেক কন্যামাত্রসম্বল বিধবা ননদকে মুখরা ও গর্ব্বিতা ভ্রাতৃবধূর বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে বিদ্ধ হইতে হয়, ইহা সত্য। আবার এখনও অনেক ভ্রাতার সংসারে বিধবা দিদিই কাঙ্গালিনীই কর্ত্রী ইহা আমরা দেখিতেছি। এইরূপ স্থলে কোন কোন স্বল্পভাষিণী ভ্রাতৃবধূকেও উগ্রচণ্ডা ননদীরা কম বাক্যযন্ত্রণা দেন না। ইহার প্রতিকার নারীদিগের ধনাধিকারে নহে, নারীসমাজে সৎশিক্ষার বিস্তারে। "ধনী পিতার সম্পত্তির অধিকারী হ'লো কন্যার দূর সম্পর্কিয় এক জ্ঞাতি" আর কন্যা গেল দাসীবৃত্তি কর্ত্তে—এমন অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আমি আমার এই পঞ্চসপ্ততি বর্ষব্যাপী জীবনে একটিও দেখি নাই, শুনিও নাই। বাস্তব জগতে উহা ঘটে না, তবে কাল্পনিক জগতে দুরোধিরোহিণী কল্পনা বলে উহা একটা গল্পের প্লট হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে ঐরূপ দৃষ্টান্ত অমিল। বাস্তব জগতে Blood is thicker than water,—"নাড়ির টান বড় টান" এই প্রবাদ বাক্যেরই সমর্থন করে। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি" এটা পাকা কথা। দূরসম্পর্কিত আত্মীয় ধনবানের বিষয় পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে ধনবান পিতা যে অবীরা কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও করিতে বিলম্ব করিবে ইহা অসম্ভব। ব্যবস্থা করিবার সুযোগের অভাব হয় না। পিণ্ড লাভের লোভও উহা ঠেকাইতে পারে না। আর পিতার যদিও ভুল হয়, মা ছাড়িবে কেন? এক মাত্র সন্তানের প্রতি মা বাপের কত টান তা কি বুদ্ধিমতী শ্রীমতী উৎপলাসনা দেবী জানেন না? উইল করা কঠিন নয়। মরণকালেও তাহা করা যেতে পারে। সুতরাং এ দৃষ্টান্তই নিতান্তই অতিবাড়ন্ত কল্পনার ফল।

হিন্দু বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অধিক হইতেই পারে না। যাহাদের পিতৃকুলে বা শ্বশুরকুলে কেহ ধনাঢ্য নাই—যাহারা দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না—এরূপ বিধবার মাসে ১৫৲ টাকা আয় হইলেই যথেষ্ট হয়। বিধবার শ্বশুরকুলই তার ভরণপোষণের জন্য নৈতিক দায়ী। সুতরাং শ্বশুরের এবং দেবরাদির নিকট হইতে সে যাহাতে ভরণপোষণ বাবদ মাসিক কিছু টাকা পায়, তাহার জন্য আইন করা উচিত। তাহা হইলে Moral obligationকে Legal obligationএ পরিণত করা হইবে। যদি শ্বশুরকুল অতি দরিদ্র হয় ত ভ্রাতা ও পিতৃকুল হইতেও কিছু প্রাপ্তির ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

অবীরার কোন বিষয়ে নিব্যূঢ় অধিকার দিবার প্রয়োজন কি? যাহাকে ভরণপোষণ করিবার লোক জুটে না, তাহার পরিচালনা করিবার লোক কোথা হইতে আসিবে? আর তাহার জীবনান্তে সে বিষয় পাইবে কে? উহা কি নষ্ট করিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হইবে? সে অবীরা যদি পুনরায় বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় পতিই তাহার ভরণপোষণ করিবে তখন তাহার আর পূর্ব্ব শ্বশুরকুল হইতে মাসোহারা লইবার প্রয়োজন হইবে না। ইহার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে।

যদি বলা যায় যে, ধনবতী না হইলে কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের পতি তাহাকে বিবাহ করিবে না, তাহার ধনকেই বিবাহ করিবে। এরূপ বিবাহ কখনই সুফল প্রসব করে না।

আমাদের সমাজে শত করা ৩৯ জন দুইবেলা পর্য্যাপ্ত খাইতে পায়, অবশিষ্ট শতকরা ৬১ জন পর্য্যাপ্ত খাইতে পায় না। এই শতকরা ৩৯ জনের মধ্য কয়জন ধনাঢ্য? বোধ হয় শতকরা ১৫ জন নহে। তাদের মধ্যে কয়জন অবীরা আছেন? ধনীর কন্যা কখনই অতি দরিদ্র দীন-হীনের হাতে পড়ে না। কন্যা যদি বুঝিয়া চলিতে পারে তাহা হইলে সে স্বাধীনভাবে বেশ সুখে থাকিতে পারে। ফেলে ছেড়েও তাহার যাহা আয় থাকে তাহা একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আজকালকার দিনে থাকে না। বিপদ হইয়াছে বহুসন্তানের জনক অতি দরিদ্র ভদ্রলোকের। তাহাদের অনেকের স্থাবর সম্পত্তি একেবারেই নাই, যাহা কিছু আছে তাহার বার্ষিক আয় গড়ে দুই এক শত টাকার অধিক হইবে না। তাহাও আদায় হয় না। তাহার এক পঞ্চম বা এক-ষষ্ঠাংশ পাইলে অবীরার কি হইবে? দুঃখ ঘুচিবে কি?

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।—বঃ সঃ

ঝড় (গল্প)

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

চামেলীদি ত' আমাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিলেন।

ঠিক সিঁড়ির ওপরের জানলাটায় বসে তখন ইতিহাস পড়ছিলেন উনি।

রিক্সাওয়ালা এসে আমার মোট-ঘাট নামিয়ে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ; আমি কী-ই বা করতে পারি, আর কীই বা বলতে পারি; সিঁড়িতে তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় চামেলীদি'র গলা: কাকে চান?

থতমত খেয়ে বলি: কাউকে নয়।

তবে? অবাক্ হন।

ওঁর বাবার নামটা ঠোঁটের কাছে উঠে আসে চট করে, আরেকটা কথাও জুড়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে: রামকমলবাবু আছেন? আমি রাণাঘাট থেকে আসছি।

রাণাঘাট থেকে আসছেন?

আরো বোধ হয় বিস্মিত হন, রাণাঘাটে ওঁদের দেশ, আর বলেন: কিন্তু তিনি ত' আজ তিনদিন হলো রাণাঘাটেই গেছেন—

প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে মরিয়া হয়ে উঠি এবার: আপনারাই মাকে চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে আপনাদের এখানেই পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা—

ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হয়ে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন চামেলীদি: তুমি, তুমি সূর্য্য! বড়দি ও বড়দি, আরে এসো এসো—থাক, ও—তোমার বেডিং-টেডিং সব চাকর এসে নিয়ে যাচ্ছে—আরে তুমি, তুমি তা' বলতে হয় এতক্ষণ, কি মুস্কিল দেখো ত'—বলো আমাকে ক্ষমা করেছ সূর্য্য, আমি সত্যি তোমাকে একটুও বুঝতে পারি নি।

চামেলীদি আমার চেয়ে তিন বছরের বড়।

মাতৃগোষ্ঠীর দিক দিয়ে, কেমন একটা সরু সুতোর মত, একটা অস্পষ্ট আত্মীয়তা ছিল ওঁদের সঙ্গে। রাণাঘাটেই, আমাদের বাড়ী থেকে এক নিঃশ্বেসে ছুটে শেষ করার দূরত্বে ওঁদের মস্তো দু'মহলা বাড়ী। প্রায় নাকি ওদের বাড়ীতেই ছোটো বেলায় মানুষ হয়েছি আমি। বেশীর ভাগ সময় ওখানেই নাকি থাকতুম আর চামেলীদির মা নাকি আমাকে ভাল বাসতেন নিছক ঐশ্বর্য্যের ...তই। ছায়া-ছায়া মনে পড়ে: লেবুতলার বাগানে, বিকেলের ম্লান দেখা আলোয়, অনেক ছেলে আর মেয়ে। একসঙ্গে দল বেঁধে আমরা 'কুমীর কুমীর' খেলতুম। চামেলীদি তখন আট আর আমি পাঁচ। তখনো আমার সঙ্গে ছিলেন চামেলীদি—তারপর থেকেই আমি একা, স্কুল আর নির্জ্জন দিনগুলো, ওঁরা কোলকাতা চলে গেলেন সপরিবারে। তারপর বছরের পর বছরের স্রোতে ভেসে গেছে অনেক কথা! তারপরে একদিন মায়ের ভাবনা, বাবা ত' ছিলেন না আমার, আর গরীব ছিলুম আমরা, টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি: ম্যাট্রিক দিতে যেতে হবে কোলকাতা, না আছে টাকা, না আছে সহায়-সম্বল, কোথায়ই বা থাকবো মহানগরীতে আর কেমন করেই বা পরীক্ষা দেবো। মা একটা চিঠি লিখলেন, আর উল্টো ডাকে উত্তর এলো সেই প্রিয় মানুষদের কাছ থেকে: কোনো ভাবনা নেই। সূর্য্যকে পাঠিয়ে দাও এখেনে নিঃসঙ্কোচে, চামেলীও পরীক্ষা দেবে এবার—দু'জনের পক্ষেই সুবিধে হবে।

আর আমার এই আসা।

চামেলীদি'কে এক চোখ দেখেই কিন্তু বুঝতে পেরেছিলুম আমি—সিঁড়ির ওপরের জানলায় বসে ইতিহাস পড়ছিলেন চামেলীদি'। কথা বলতে পারি নি কিন্তু প্রথমে। মফস্বলের ছেলের চোখে নতুন নগরীর বিস্ময়, আর আমি লাজুকও ছিলুম একটু।

আমাদের আলাদা ঘর, আলাদা রকম ব্যবস্থা, আমি আর চামেলীদি' একই সঙ্গে খাই-দাই, পড়ি, গল্প করি—ঐ একই ঘরে। আমরা দু'জন আর হাসি আর গল্প—আর পরীক্ষার কথা মনে করে থেকে থেকে চামেলীদির অদ্ভুত নার্ভাসনেস্।

অঙ্কের পরীক্ষার আগের দিন রাতে কেবল চোখে জল আসছে চামেলীদির: কি হবে সূর্য্য? কি হবে আমার?

কি আবার হবে?—নিস্পৃহভাবে বলি।

হ্যাঁ, তুমি ত বলবেই—প্রায় কেঁদে কেঁদে বললেন: ভালো ছেলে তোমরা—তোমাদের আর কি?

আপনিও ত' খুব ভালো মেয়ে—স্বতোচ্ছ্বাসিত ভাবেই বলি—আপনার মত মেয়ে সত্যিই আমি খুব কম দেখেছি—

ছাই ছাই ছাই—সত্যি সত্যি টেবিলের ওপর ভেঙে পড়লেন চামেলীদি আর ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো ওঁর সমস্ত শরীর নিরুদ্ধ কান্নায়।

অনেক রাত অবধি অঙ্ক করালাম ওঁকে।

অঙ্কগুলি বুঝতে লাগলেন উনি, আর আমি শুয়ে পড়লুম।

আড়াইটে হবে রাত—ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

আমার চুলের মধ্যে কার যেন আঙুল।

কেমন ভয় হলো, ঘরে আলো নেই, চামেলীদিও এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন,—

তা হ'লে?

তবু রুদ্ধস্বরে ডাকলুম ওঁর নাম ধরে: চামেলীদি—

আঃ, চেঁচিয়ো না সূর্য্য—

আমার পাশে তবে চামেলীদিই?

এইমাত্র শুয়েছি। আমার বিছানাটা গুটোনো রয়েছে, মশারিটাও ফেলা নেই, তাই তোমারটাতেই এলুম, তুমি কি রাগ করলে সূর্য্য?

আশ্বস্ত হয়ে বললুম: না চামেলীদি, আমার ভয় হয়েছিলো। ভাবছিলুম, এ আবার কে? তাই—

বড্ড ছেলেমানুষ তুমি—পাশ ফিরলেন চামেলীদি, আর বললেন: ঘুমোও রাত অনেক।

আর একটী স্কুলের রাত্রির কথা মনে পড়ে।

এলোমেলো হাওয়া, তুমুল বৃষ্টি, ভেঙে পড়ছে গাছপালা! দূরে দূরে বাজের আওয়াজ, সমস্ত দরজা-জানলাগুলো বন্ধ, একটি

ছোটো ঘর, টেবিল-বাতির পীতাভ মরা আলো, আমি আর--আর সেই পুরাণো রাত্রিটিকে বারবার মনে পড়ে।

সাতটা বচ্ছর কি কিছু কম? পুরো সাতটা বছর তারপর কেটে গেছে।

যেন একই রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ মোড়ের মাথায় দু'জনে দু'পথে বাঁক ফিরলাম। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো গাঁ, চামেলীদি নগরের। নগর তাঁকে ছাড়লো না। ষ্টার পেয়েছিলাম আমি চারটে বিষয়ে আশীর ওপর নম্বর নিয়ে, কিন্তু বাংলাদেশের বহু প্রতিভাবান ছেলেকে একমাত্র যে কারণে কলেজের খাতায় আর নাম লেখাতে দেখা যায় না, ঠিক সেই একইমাত্র কারণে আমি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। চামেলীদি বেথুনে ঢুকলেন, আর আমাকে ফিরে আসতে হলো বাড়ী!

বয়স তখন আমার ভীষণ কম, চাকরী কোথায়ই বা পাবো আর কে-ই বা দেবে। ছেলে পড়াতে লাগলাম। ছেলে পড়াই আর পড়ি। অধ্যাপনা এবং অধ্যয়ন। পড়ি শুধু, পড়ে যাই—এলোমেলো পড়া, পড়ার পিপাসা, না পড়লে যেন মরে যাবো বলেই পড়া।

আ'রো অনেকদিন পর হঠাৎ চিঠি পেলাম একদিন একখান, হঠাৎ চিঠি এবং চামেলীদিরই, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম: চামেলীদি আমাকে ভোলেন নি এবং সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন, সেই ভাষা: তুমি অনেক, অনেক বড়ো সূর্য্য। এ বছর বি-এ পাশ ক'রেছি আমি, কিন্তু তবু তোমাকে ছুঁতে পারিনে। প্রত্যেকটী কাগজে এতদিন সূর্য্য সেনের লেখা পড়তুম। চমকলাগানো লেখা, খুব তাড়াতাড়ি নাম ক'রছেন ভদ্রলোক, শ্রদ্ধা করতুম এঁর লেখাকে। কিন্তু সে যে তুমিই সূর্য্য, তা' ত' স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তোমারই কবিতা তোমাকেই আবার পাঠিয়ে দিলাম নীচে! এ কবিতা তোমার, এর প্রত্যেকটী ছত্রে তোমার প্রাণের স্বাক্ষর জ্বল জ্বল ক'রছে। আমাদের গাঁয়ের নদীটী পর্য্যন্ত উঠে এসেছে তোমার ছন্দে, বন্দীর অবুঝ বেদনা সব, সমস্ত। গত স্বাধীনতা-আন্দোলনে কবি সূর্য্য সেনের গ্রেপ্তারের সংবাদ সংবাদপত্রেই পেয়েছিলাম—কিন্তু তোমার কবিতা যেন আজ আমাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বল্লে: শ্রদ্ধা ক'রতে শেখো, সে আমি, সে আমি—। দেখলাম চিঠিটার নীচে কবিতাটাকেও অনেকটা তুলে দিয়েছেন:

> নমিতা গো হায়, হায়—কত রাত ব'য়ে যায়
> রঙীন স্বপন বুনি এমনি!
> পাখী ওড়ে, দিন ওড়ে—সময়ের চাকা ঘোরে
> তুমি কি গো আজো আছো তেমনি?
> চূর্ণীর কালো জলে জাগে যবে ঝলম'লে—

সে কি আজো তেমন নেই, তোমার কি মনে হয়, সূর্য্য, যার জন্যে বন্দীশালায় অত রাতে তোমার কবিতা এলো, আর এমন কবিতা? কিন্তু চূর্ণীনদীর তীরে বাতায়নে ব'সে তোমার জন্যে সন্ধ্যা-জাগা এ মেয়েটী কে, কে তোমার এই নমিতা বলো, তোমাকে ব'লতেই হবে, সূর্য্য!

চামেলী দি'কে চিঠি দিলুম: আমি আপনার শুভেচ্ছাপ্রার্থী, চামেলীদি বলুন, আরো যেন আমি বড় হই। তবে আপনার ছোঁয়ার নাগালের মধ্যে আমি চিরদিনই আছি। অকারণ সন্দেহে আমাকে এমন ক'রে দূরে ঠেলে দিলেন কেন? আমার সহজ শ্রদ্ধায় সর্ব্বদাই আপনি আমার। আপনাকে হারাবার ভয় আমার অন্ততঃ নেই। নমিতা? নমিতা কে? ও আমার কবিতার। চূর্ণীতীরে সন্ধ্যা জাগবার জন্য আসলে কোনো মেয়েই নেই আমার জীবনে। আশ্চর্য্য, আরো অনেকে এমন প্রশ্নই ক'রেছেন আমায়—আসলে আমি আশ্চর্য্যই হ'য়েছি আর কায়াহীনা নমিতা এমনি ক'রে বিখ্যাত হ'য়ে উঠছে রোজ। তবে সৌভাগ্যশালিনী মেয়ে সে নিশ্চয়ই—কবিকে উত্তীর্ণ হ'য়ে জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে পৌঁছে নিল আশ্চর্য্যভাবে।

> আরো দিন, আরো বৎসর।
> কত রঙ ফিরে গেলো পৃথিবীর।
> আমারি কেবল বদল হ'লো না কিছু।

সেই রাণাঘাট, সেই আমি, চেনা বাড়ীটী, সেই আমার মা, আমার স্কুল, আমার লেখা, আর সেই পোষা কুকুরের মত সেই সুপরিচিত নিঃসঙ্গতা। মাঝে কেবল ক'মাস কেরাণীগিরি ক'রেছিলাম এক দূর মফঃস্বলের চিনিকলে, কিন্তু পালিয়ে এসেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত। তার চেয়ে ঢের ভালো এই আমার স্কুল, এই আমার ছাত্রদল—নাই বা থাকলো ঐশ্বর্য্য, সম্পদ পেলাম নাই বা। আমি রচনা করবো নতুন নতুন প্রমিথিউস। নব নব বিদ্রোহী মানুষের দল, যারা আগুনের বন্যা আনবে পৃথিবীতে, দাবানল জ্বেলে দেবে সারা দেশের অন্ধকার মাটীতে।

আমার ঘরের সুমুখে বড় মাঠ। খুব নির্জ্জন দিক এটা সহরের।

এ মাঠে অনেক সেগুনের জঙ্গল। বিকেলের চু-কপাটী খেলে ছেলেরা চ'লে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সেগুনের বনে জোনাকী। সন্ধ্যে শেষ।

খোলা দরজার সুমুখে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে শেলী পড়ছি, পাশে টিপয়ের ওপর আলো।

প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড—

> Torture and Solitude,
> Scorn and despair,—these are mine empire:—
> More glorious for than that which thou surveyest
> From thine unenvied throne, O mighty God!

ঠিক সেই কারণেই চ'লে এলাম আমিও। বেশ এবং ঢের ভালো এ—খোলা দরজায়, অন্ধকারে, নাটকের এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের অবতারণার মত,—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন চামেলীদি।

বিশ্বাস ক'রতেই পারিনি প্রথমটা, কিন্তু তারপরই লাফিয়ে উঠলুম: চামেলীদি আপনি!

: হ্যাঁ সূর্য্য, এখানের গার্লস্ স্কুলে হেড মিস্‌ট্রেস্ হ'য়ে চ'লে এলুম। আর ভালো লাগে না একঘেয়ে কোলকাতা।

: কিন্তু আপনি শেষ পর্য্যন্ত স্কুল-মিস্‌ট্রেস হ'য়ে—যেন বিশ্বাস ক'রতেই পারছিলাম না ওঁর এই অধ্যাপনাবৃত্তির অবলম্বনটাকে, এবং বিশ্বাস না করার মতই, কারণ—টাকার কারণে ওঁর এ দিগন্তে আসাটা অগৌরবের ত বটেই, নিভিত্তিও।

চামেলীদি হাসলেন: যদি বলি ঐ কথাই।

কোন্ কথা!—বুঝতে পারি না।

ঈশ্বরকে বিদ্রূপ ক'রে তোমার প্রমিথিউসের মত:

More glorious far than that which thou surveyest!

কিন্তু যাক্—

অন্য প্রসঙ্গে নেমে আস্‌তে চাইলেন উনি: একা থাক্‌বো বাড়ীতে। স্কুল কোয়াটার্সে যেতে ইচ্ছে নেই। এক নিঃশ্বাসে এবার থেকে ছুটে যেয়ো আবার রোজ, আমাদের সেই ছোটো-বেলাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি—

: কিন্তু সে কি আর ফেরে! বিবর্ণ হেসে বললাম।

: ফেরে গো ফেরে। ফেরাতে জান্‌লেই ফেরে—

স্কুলের চাকর ছিলো সঙ্গে। শুভরাত্রি জানিয়ে দ্রুতপায়ে চ'লে গেলেন চামেলীদি।

তবে একটু নির্দ্বন্দ্ব সময় পেলেই যাই।

রোজ যাওয়া ঘটে না এবং তা' সম্ভবও না। নানা কাজে থাকি। নিরিবিলি সুযোগ বড় একটা মেলে না।

আমার গল্প আর কবিতা ত' আছেই, নানারকম আলোচনা চলে—রাজনীতি, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, দর্শন—সব কিছু।

মস্তো বাড়ী। চারিদিকে ভাড়া খাটে। কেবল একটা ফ্ল্যাটে চামেলীদির ছোটো সংসার গোছানো। একটী ছোটো চাকর আর চামেলীদি। ওপরতলায় একটা মাত্র বড় ঘর—সেই চামেলীদির ষ্টাডি এবং শোবার ঘর—দু'টোরই কাজ করে। নীচে রান্নাঘর ইত্যাদি।

একটু বেশী দিনের জন্য অনুপস্থিত হ'লেই কিন্তু ছুটে আসেন উনি

অনুযোগ: তুমি আমাকে ভুলে যাচ্ছ, সূর্য্য।

সেদিন বিকেলে গেলাম অনেক দিন পর। বিশেষ কাজ ছিল হাতে, তবু একবার ঘুরে আসতে দোষ কি? যাবো আর আসবো—এই আর কি।

মেয়েদের পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন চামেলীদি'।

আমাকে দেখেই উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন: আরে, এসো এসো। ভগবান্ আছেন।

এ কি আমার কাজ? শিক্ষক ম'শাই এলেন। নাও, এখন দেখে দাও দেখি এই খাতার বোঝাটা।

: কিন্তু—ইতস্ততঃ করতে লাগলাম আমি—আমার বিশেষ একটু যে কাজ ছিলো!

: কোনো কিন্তু নয়। বোসো। যার যা কাজ। আমি চা তৈরী ক'রে আনি—তুমি খাতা দেখো। আর আমি তোমাকে এখুনি যেতে দিচ্ছি কি না, চূর্ণীর ওপারের দিকটা তাকিয়ে দেখেছ কি?

সত্যিই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল্লাম: কালোয় কালোয় একাকার হ'য়ে গেছে চূর্ণীর ওপার।

প্রলয়ের মেঘ যেন থমকে আছে। সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাবে এখুনি।

নিরুপায়ভাবে খাতা দেখছি: গরু আর গ্রীষ্মকালের ওপর মেয়েদের প্রবন্ধ।

এমন সময় চামেলীদি উঠে এলেন নীচ থেকে। অদ্ভুত সেজেছেন চামেলীদি আজকে।

হাতে একটা প্লেটে খাবার, আরেক হাতে চা।

চা খেতে খেতে বল্লুম: আপনাকে কিন্তু আজ দেবীর মত দেখাচ্ছে, চামেলীদি।

: বল্লে তবু, সেও ভালো—তির্য্যক ভাবে একটু সরু ক'রে হাস্‌লেন শুধু। এমন সময় হু হু ক'রে হাওয়া, গাছপালা দুলতে লাগলো। উর্দ্ধশ্বাসে পাখীরা উড়ে চল্‌লো দল বেঁধে। ঝড়ের আভাস। উঠে পড়লাম: আমি চলি, চামেলীদি—

: তুমি কি পাগল নাকি, সূর্য্য? খপ ক'রে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রলেন: এই ঝড়ে একটা পোকা পর্য্যন্ত গর্ত্তে ঢুকে গেছে কখন, আর তুমি যাবে রাস্তায়।

আর তারপরই ঝড়। সে কি ঝড়! ঝম্ ঝম্ ক'রে সার্সি বাজতে লাগলো জানলার, হা হা ক'রে একটা ক্ষুধার্ত্ত হাওয়া, সব কিছু উড়িয়ে নেবার ডাক, গুঁড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমুল জলের তীর, ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে।

দ্রুতহাতে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ক'রতে লাগলেন চামেলীদি। কিন্তু সে কি বন্ধ করা যায়। তুবপুনের মত ঘূর্ণী হাওয়া পাক দিয়ে দিয়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে বড় বড় বাড়ী-গুলোর গায়ে। বারান্দার দিকে দরজাটা দিয়ে হু-হু ক'রে ছুটে আসছে উন্মুক্ত আর্ত্তনাদ। উল্টে গেল টি-পয়টা, চুরমার হ'য়ে গুঁড়িয়ে গেলো মৃন্ময় বোধিসত্ত্বের একটী অমিত মূর্ত্তি—কাগজ উড়ছে, কাপড় উড়ছে—উড়ছে দেওয়ালে ঝোলানো ছবি আর ক্যালেণ্ডারগুলো পত পত ক'রে। চামেলীদি ছুটে গেলেন। : সাহায্য করো সাহায্য করো।

হঠাৎ একটা অসহায় আর্ত্তনাদ আর স্পষ্ট দেখতে পেলাম, খোলা দরজা দিয়ে উল্কার মত ছিটকে বেরিয়ে গেলো চামেলীদির দেহ, ঝড়ে টেনে নিলো।

পাগলের মত দৌড়ে গিয়ে দেখি, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, বারান্দার ওপর পড়ে আছেন চামেলীদি, আর মাত্র এক হাত পরেই শেষ হয়ে গেছে বারান্দার বিস্তৃতি।

আমার চেহারা বেশ সবলই ছিলো, বরং আমার তুলনায় খানিকটে ছোটোই দেখাতো ওঁকে, আর তাই অনায়াসেই ওঁকে ঘরের মধ্যে তুলে আনতে আমার এতটুকুও কষ্ট পেতে হোলো না। অচৈতন্য হ'য়ে গেছেন।

কোলের ওপর ওঁর মাথাটাকে তুলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম কপালে। কি জানি কি হয়, একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায়

ছুর ছুর করতে লাগলো বুকের ভেতরটা, হয়ত খুবই আঘাত লেগেছে। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে পরখ করতে লাগলাম নিঃশ্বাসের গতি কেমন!

হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

ছুই হাতের তালুতে মুখখানাকে ঢেকে হঠাৎ খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন চামেলীদি।

ততক্ষণে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে আমার মুখ, এ কি! এর মানে কি? কিন্তু আমার ছুই কাঁধে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিলেন উনি, তুমি, তুমি একটা আস্ত বোকা সূর্য্য।

এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ এলো আমার, রক্ত এলো মুখে, বললাম, সত্যি আমি দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুন চামেলীদি!

আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উনি, তারপর অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললেন, ঠিক তেমনি, না? সেই দশ বছর আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষার একরাতে যেমনটি অবাক হয়ে গেছলুম: কি হয়েছিলো? কই আমার ত মনে পড়ছে না কিছু—

আরেকবার আমার দিকে অমনি দৃষ্টিতে তাকালেন চামেলীদি। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম, আর বললেন উনি, যদি কিছু মনে না করো, চোখটা একটু নামিয়ে রাখবে, সূর্য্য! বড্ড ভিজে গেছে জামাকাপড়গুলো, তা হলে নয় একবার—

বাইরে তেমনি নামছে ঝড়, হা হা করে অট্টহাসি হাস্‌ছে হাওয়া আর বৃষ্টির সেই অদ্ভুত ঝমঝম—ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী।

কিন্তু তোমার কি কিছুই মনে পড়ে না সূর্য্য!

কিসের? অতর্কিতে চোখ তুলে বলতেই দারুণভাবে আহত হ'লুম। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো সব কিছু। একটা বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগলো মনের মধ্যে।

চামেলীদি?—আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠলুম কৌচ থেকে।

কেন, কেন চামেলী ব'লতে পারো না? চামেলী, চামেলী ব'লে ডাকতে পারো না? অসংস্কৃত পোষাকে আর এক অদ্ভুত ধরা ধরা গলায় চিনি ঝরাতে ঝরাতে আমার ছুই গালে টোকা দিতে লাগলেন হঠাৎ।

আমার পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবী টলছে, বুকের মধ্যেও উদ্দাম ঝড়, অবরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলাম তবু: আপনি আপনি যে—

কিন্তু আমার কথা বন্ধ হ'য়ে গেলো, বন্ধ ক'রে দিলেন চামেলী দি। আর সেই নিঃশব্দ, মসৃণ গলা: না না, 'তুমি' শুধু 'তুমি' বলো আমায়—

এবার প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ছিটকে স'রে এলুম অনেকটা, আর ভীষণ কাঁপতে লাগলো আমার গলা। কিন্তু এ যে কিছুতেই সম্ভব হ'তে পারে না। আমি যে··· আমি যে আপনাকে—

ওঁর মুখে অদ্ভুত আভা, খুব আস্তে থেমে থেমে ব'ললেন, কিন্তু এও ত' কিছুতেই অসম্ভব নয়। নিজেকে ত' ফাঁকি দিতে পারি নে। আমিও যে অনেকদিন থেকেই তোমাকে চেয়ে আসছি সূর্য্য। কেন কিসের নেশায়, তোমারই আদর্শ বরণ করে, ছায়ার মত তোমাকেই অনুসরণ করে শেষ পর্য্যন্ত আবার দেশে ফিরে এলুম, এই এতদিন পরে, বলো?

তবু প্রাণপণ অস্বীকৃতি জানালাম ওঁকে: না। তবু, তবু এ সম্ভব নয়। আমাকে ক্ষমা করুন, চামেলীদি।

ক্ষমা! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎ যেন এক ঝলক উন্মত্ত আগুনের লহরী জ্ব'লে উঠলো ওঁর ছ'চোখে, নিভে গেলেন আবার পরমুহূর্ত্তেই! অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, সুমুখের দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গম্ভীর গলায় ডাকলেন, এদিকে এসো।

সে ডাক এমনি, অগ্রাহ্য করা যায় না যেন কিছুতে, মৃত্যুর মত —আদেশের মত। আগিয়ে গেলাম।

খুলে দিলেন দরজাটা। হু হু ক'রে জল এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরে, হাহাকার করে উঠলো হাওয়া।

ছ'পাশের বাতায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ছ'জনে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। তেমনি জল আর হাওয়ার শাসানি। বাইরে নিকষ-কালো অন্ধকারের আদিগন্ত সমুদ্র। এক দণ্ড চুপ করে দাঁড়ালেন। পর মুহূর্ত্তেই উন্মত্তের মত আমার হাত ছ'টোকে সজোরে চেপে ধরলেন বুকের ওপর, ঠিক এমনি, এমনি ঝড় বইছে জানো, সূর্য্য! তারপরই হিংস্র পশুর মত আমাকে ঠেলতে সুরু করলেন বাইরের দিকে, চলে যাও, চলে যাও, তুমি চলে যাও—

প্রাণপণে দোরের বাতাটা চেপে ধরলাম ছ'হাতে: কিন্তু আমি আমি যে প'ড়ে যাবো চামেলীদি।

আমার শরীরের অর্দ্ধেকটা তখনই ঝুলে গেছে বাইরের দিকে।

না না। চলে যাও, তবু তুমি চলে যাও এখান থেকে— জোর ক'রে আমার হাত ছটোকে খুলে দিলেন বাতা থেকে।

ভয়ার্ত্তস্বরে শুধু একবার করুণ ভাবে চীৎকার ক'রে উঠলুম, চামেলীদি—আর কানে এলো ছ'টো প্রাণছেঁড়া ডাক, সূর্য্য সূর্য্য—

বৈষয়িক শিক্ষা *

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, এম, এ

প্রথম পর্য্যায়

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য তিনটি কথা এমন এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা যে, একটির কথা বলতে গেলে সব ক'টাই এসে যাবে একে একে। বিরাট বনস্পতিই হোক, আর তুচ্ছ ক্ষুদ্র বৃক্ষই হোক—সকলেরই তিনটী প্রধান অংশ আছে; মূল, কাণ্ড এবং শাখা-পত্র-পল্লব এই তিন নিয়ে তবে এক গাছের সৃষ্টি; তেমনি কৃষি জোগাবে শিল্পের রসদ, তা থেকে জন্ম হবে শিল্পের এবং কৃষি ও শিল্প মিলে সৃষ্টি হবে বাণিজ্য। যেমন—কৃষি থেকে এলো তুলো, তা থেকে হোল বস্ত্রশিল্প এবং সেই বস্ত্রের আদান-প্রদানে হোল বাণিজ্য। সেই জন্যই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। দেহের কোন অংশ বাদ দিলে দেহ যেমন অপূর্ণ, তেমনি এদেরও কোন অংশ বাদ দেওয়া যায় না। তবে, বাণিজ্য এদের মধ্যে একটা প্রধান অংশ স্বীকার করে নিতেই হবে, অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতের দিকে দৃষ্টি রেখে; কারণ কৃষি শিল্প ত মানুষের বিশেষ প্রয়োজনীয় বটেই, এ না থাকলে মানুষ বাঁচত কেমন করে? তেমনি আবার বাণিজ্য না থাকলে মানুষ তাদের প্রয়োজনই বা মেটাত কেমন করে? তাই আধুনিক আংগিকে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারা যায়—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে বাণিজ্য একটা প্রধান সকর্ম্ম অংশ।

বাণিজ্যের সূত্র কী? এ কথা যদি ওঠে, তা হলে এর ছোট্ট একটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, বাণিজ্যের মূল কথা বিনিময়। আদিম যুগে যখন সভ্যতার আলো দেশে দেশে বিকশিত হয় নি—তখনও বাণিজ্য চলত, কিন্তু সে বাণিজ্যে বিনিময় হোত একেবারে প্রত্যক্ষ বস্তু-বিনিময়। সে বিনিময়ের পাত্রপাত্রীদিগকে ক্রেতা বিক্রেতা ঠিক বলা যায় না; কারণ দুটো বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদক দুটী বিভিন্ন লোক এবং একের উৎপাদিত বস্তুর দাম অন্যের উৎপাদিত বস্তুর দাম থেকে হয় বেশী, নয় কম, কিন্তু প্রয়োজন সকলেরই আছে, তাই যে কামার গড়ে দিত তকলি, তাকে তাঁতী দিত একখানা কাপড়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—একটা তকলির বদলে একখানা কাপড়—এ কি সম্ভব? কিন্তু একখানা কাপড়ের বদলে যদি পঞ্চাশটা তকলিই পাওয়া যায়, তা নিয়ে তাঁতীই বা করবে কি? সে কামারকে তার চল্লিশটা তকলি ফিরিয়ে দিয়ে বলবে 'না ভাই এগুলো তুমি ফিরিয়ে নাও, দশটা হলেই আমার চলে যাবে, বাকীগুলো দিয়ে তুমি অন্য জিনিষ কিনো, আর এ কাপড়টা তোমার পছন্দ সেটা তুমি নাও।' এখানে তাই দামের বেশী কড়াকড়ি ছিল না। এখানে ছিল একটা প্রীতির সম্পর্ক। এই জন্যেই তাহাদিগকে ক্রেতা বিক্রেতা না বলে দাতা গ্রহীতা বলতে পারা যায়। 'আমার প্রয়োজন আমি নি, তোমার প্রয়োজন তুমি নাও' রকমের। কিন্তু 'কালো হ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী'—কাল অনন্ত এবং পৃথিবীও বিশাল। তাই কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে-রকম দাতাকর্ণ গোছের উৎপাদকের দল লোপ পেয়ে গেল, তার বদলে উদ্ভব হোল আঁট সাট নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝবার মত কেজো লোক। আর এর মধ্যে সমাজ এবং দেশের আবহাওয়াও বইল অন্য দিকে। ছোট গ্রাম ছেড়ে কামারের তকলি তাঁতীর কাপড় চললো নগরে, নগর ছেড়ে রাজধানীতে, রাজধানী ছেড়ে বিদেশে—গরুর গাড়ী ছেড়ে নৌকো, নৌকো ছেড়ে জাহাজ, জাহাজ চললো সমুদ্রের বুক চিরে জলো হাওয়ায় সাদা পাল তুলে দিয়ে—এমনি করে ক্রমশঃ বিনিময় বা বাণিজ্যের প্রসার যখন বেড়ে যেতে লাগলো, তখন আর প্রীতি বা হৃদয়-সম্পর্ক থাকে কি করে? পানায় ভরা পুকুরের পাশে চালফুটো অন্ধকার ঘরে বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে তাঁতী তৈরী করল কাপড়, সে কেন সেই রাজধানীর বিলাসীর কাছ থেকে তার কাপড়ের ন্যায্য পারিশ্রমিক নেবে না? এই পারিশ্রমিক যে যার জিনিষের যেমন হবে সেটা ঠিক করবার জন্যে 'পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য' কথাটা এল; এবং সেটার প্রতীক হোল অর্থ। এই অর্থকে এরা হোল বিনিময় মাধ্যম। অর্থের সংখ্যা দিয়ে উৎপাদক ও ভোগী অথবা ক্রেতা ও বিক্রেতা নিজের শক্তি ও সামর্থ্যমত জিনিষের বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলো। অর্থ যখন বিনিময়ের মাধ্যম বা বাহন হোল, তখন তার একটা সংজ্ঞাও নির্দ্দেশিত হোল, সে সংজ্ঞা হল দাম। দাম শব্দটার পিছনে ভাষা-বিবর্ত্তনের একটু ইতিহাস আছে। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীকরা বিনিময়ের বাহন অর্থের একটা ধাতুঘটিত প্রতীক তৈরী করে তাকে বলতেন দ্রাখমে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সেই ধাতব অর্থ-প্রতীককে বলতো 'দ্রম্মমুদ্রা', সেই দ্রম্মমুদ্রা প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে হোল দাম। সেই থেকে প্রত্যেক জিনিষের একটা একটা মূল্য নির্দ্ধারিত হোল। তাতে বাণিজ্যের প্রধান দুটী অংশ উৎপাদক ও ভোগীর যথেষ্ট সুবিধা হোল এবং তারা তাতে নিজেদের সুবিধা দেখে বাণিজ্যে আরও উৎসাহী হয়ে উঠল।

দিনের পর দিন কেটে গেল, যুগের পর যুগ এল, সভ্যতা ক্রমশঃ উঁচুস্তরে উঠতে লাগলো, প্রকৃতি তাঁর যে ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে

* Commercial Education.

বুকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, মানুষ তাকে লুণ্ঠন করতে লাগলো একটু একটু করে; সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ের উপর হেলায় তারা ভাসিয়ে দিলো জাহাজ, মাটির বুক থেকে বের করলো কত ধাতু; বিজ্ঞান করলো তাতে সহায়তা—এমনি ভাবে পৃথিবীর দূরত্ব গেল কমে। এক একটা দেশে এক এক জিনিষের প্রসিদ্ধি হোল—মানুষ ভাল জিনিষই কিনতে চায়, তাই যে দেশের যেটা ভাল সেটা অন্য দেশের মানুষ কিনতে লাগলো। এমনি ভাবে প্রত্যেক দেশেই অন্য দেশের জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী বেড়ে গেল, বাণিজ্যের ক্ষেত্র হোল বিস্তৃত। তখন আর একটা জটিল প্রশ্ন উঠল। এক দেশের বিনিময়-বাহন অর্থ অন্য দেশের বিনিময়-বাহন অর্থের সঙ্গে এক নয়, এক দেশের অর্থ অন্য দেশে চলবে না—এর মূলে ছিল প্রত্যেক দেশগত স্বকীয় অর্থব্যবস্থা। এই সব সমস্যার সমাধান করবার জন্যে বাণিজ্য চালাবার কতকগুলি পন্থা নির্দ্দেশ হতে লাগলো, বাণিজ্য-সঙ্ঘ গড়ে উঠল, কত মতের সৃষ্টি হোল। মানুষ বুঝলো—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—বাণিজ্য করে বিত্ত লাভ করা যায়। তখন তারা মিশর থেকে পেরুতে ছুটলো, চীনের চীনাংশুক, বাংলার মসলিন 'জ্যোৎস্নার জাল', পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মসলা গেল ক্লিওপেট্রার মিশরে, অগাষ্টাইনদের রোমে, ফিনিশিয়ানরা ছুটলো ব্রিটনদের কর্ণওয়ালে—তাই বণিকরা ঝুঁকে পড়লো বাণিজ্যিক বাধা দূর করবার জন্যে। নানারকম বাণিজ্য-নীতি তৈরী হোল, অর্থব্যবস্থার একীকরণ না হয় সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা চললো—সেই হতে বৈষয়িক শিক্ষার আরম্ভ হোল। বাণিজ্য আর ব্যবসা হোল এক।

ব্যবসা বা বাণিজ্য তা যে রকমের হোক না—তাতে বৈষয়িক শিক্ষার প্রয়োজন। ক্ষেত-খামারের চাষী, কলকারখানার মালিক, জাহাজের মালিক, মাছধরা জেলে—ব্যাঙ্কের অংশীদার, হিসাব-নবিশ, দালাল, ফড়িয়া, পাইকারী বিক্রেতা অথবা খুচরো বিক্রেতা, বিল আদায়কারী এবং প্রচারবিভাগের কর্ত্তা বা বেতার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং আলোকস্তম্ভ ও গুদাম ঘরের মালিক কিম্বা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রশিল্পী সকলের জীবনেই প্রয়োজন বৈষয়িক শিক্ষার। বৈষয়িক শিক্ষা সবার মূলে রয়েছে। চাকা না হলে যেমন গাড়ী চলে না, তেমনি আধুনিক জীবনের মূলে রয়েছে বৈষয়িক শিক্ষা।

আজকালকার জটিল জীবনকে চালাতে হলে বৈষয়িক শিক্ষার প্রয়োজন যে নিঃসন্দেহ, তা অনায়াসেই বলা যায়। কিন্তু আরও একটা দিক আছে—যার জন্য বৈষয়িক শিক্ষার প্রয়োজন—সেটা মানুষের মহানুভবতার দিক। সবাই বাণিজ্য করতে চায় অর্থশালী হবে বলে, কিন্তু বাণিজ্য করবার বা ব্যবসা করবার মূলে কেবল অর্থলাভের লক্ষ্যটাকে বড় করে তুললেই বিপদ্। বণিক্ যদি তার ব্যবসাকে বাড়াতে চায় তাহলে তাকে সমাজের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে হবে, তবেই সে সকলের সহৃদয়তা পাবে এবং তার ব্যবসা বাড়তে থাকবে। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য হবে সমাজের উপকারিতা করা, জনসাধারণের প্রয়োজন মেটান। ডাক্তার যেমন সাধারণের রোগ দূর করবার উদ্দেশ্যকে জীবনের মূল লক্ষ্য করে, সৈন্য যেমন দেশরক্ষা করে, শিক্ষাব্রতী যেমন শিক্ষাদান করে,তেমনি ক'রে উদারতার সঙ্গে বণিককেও সমাজের চাহিদাও জোগানের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। এইখানেই অর্থনীতির সঙ্গে বাণিজ্যের সম্বন্ধের কথা আসে। বহুপূর্ব্বে অর্থনীতিকে যখের শাস্ত্র (Gospel of Mammon) বলত, কিন্তু মনীষী এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতির পণ্ডিতগণ বললেন—তা কেন? টাকার জন্যে মানুষ নয়; মানুষের জন্যে টাকা। তাই মানুষের সামাজিক জীবনে, মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হোল অর্থনীতি-ব্যবস্থা। অর্থনীতিতে যেটা কেবল থিওরি বা মতের ওপর চলে, সেটা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে হাতে-কলমে চলে। ব্যবসায়ী ইচ্ছে করলে কেবলমাত্র জনসাধারণের অর্থ শোষণ না করে সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ করতে পারে। এটা শেখাবে 'বৈষয়িক শিক্ষা' বৈষয়িক শিক্ষা এ জন্যেই সকলের বিশেষ করে ব্যবসায়ীর জীবনে প্রয়োজন। অনেকে বলেন—ব্যবসার আবার কি ধারাবাহিক শিক্ষা থাকবে। কত ব্যবসায়ী জগতে কত নাম করেছেন কিন্তু তাঁরা ত এমন ধারাবাহিক শিক্ষার ভেতর দিয়ে যান নি। হাতে-কলমে ব্যবসা করলেই বৈষয়িক শিক্ষার ফল হবে এই তাঁদের মত। কিন্তু সকলের জীবনে এ কথা সত্য হতে পারে না। সেইজন্যে বৈষয়িক শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমান ব্যবসা-জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'বিশ্লেষণ' বৈষয়িক শিক্ষার মধ্যে আছে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী নিজের ভবিষ্যত বুঝে তার ব্যবসায়ে অগ্রসর হয়ে জীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। বৈষয়িক শিক্ষার প্রাধান্য সেইজন্যে বর্ত্তমান জীবনধারার সঙ্গে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে আমরা তা' আলোচনা ক'রবো।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা

শ্রীপূর্ণেন্দু ভূষণ দত্তরায়, সাহিত্য-সরস্বতী

বন্দিনী মঞ্জরী পত্রপুটে
বন্দিতে শারদীয়া হাস্যে ফুটে।
পর্জ্জন্য- ধারারসে প্রক্ষালিতা
পল্বলে শতদল প্রস্ফুটিতা।

অম্বরে গরজন স্তব্ধ হলো,
সঞ্চরে মেঘদাম শুভ্র তুলো!
নির্ম্মল নীলাকাশে জ্যোৎস্নারাশি
নন্দিতে এলো ধরা স্নিগ্ধ হাসি।

সন্তরে সমীরণ ধান্য-শীষে,
গুঞ্জরে মধুকর পুষ্পে মিশে!
রঞ্জিত সম্বিৎ রুদ্ধ বাসে
অর্পিল প্রিয় তার ভর্ত্তা পাশে!

জীবনের যাত্রাপথে (গল্প)

শ্রীসিদ্ধেশ্বর দত্ত

বেলা তখন আটটা, প্রাতঃসূর্য্যের রক্তিম আভায় বেশ একটু দীপ্তির প্রখরতা। নিদ্রালস প্রকৃতির বুকে প্রথম জাগরণের আবেশমুক্তির পর কর্ম্মচাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ছাতিমপুরের জমীদারবাবুদের পূজা-বাড়ীতে গত রাত্রি যাত্রা গান হইয়া গিয়াছে, তবুও নিদ্রালস অবসাদের অবকাশ ছিল না, পূজা এবং আরও তিনদিন যাত্রাগানের আয়োজনে প্রাতঃকাল হইতেই সকলকে কর্ম্মতৎপরতায় সচঞ্চল দেখা গেল। পূজার দালানের অনতিদূরে যাত্রাদলের বাসস্থান—সেখানেও গত রজনীর অভিনয়ে পরস্পরের দোষ-ত্রুটির সমালোচনার সহিত আগত রজনীর অভিনয়ের উদ্যোগ-আয়োজনে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল।

"কেষ্ট ঠাকুর—ও কেষ্ট ঠাকুর—" স্বর শুনিয়া যাত্রাদলের কয়েকজনের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল, সবিস্ময়ে দেখিল—একটা ন-দশ বছরের সুশ্রী ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে দাসীর বসন ধরিয়া সেই দিকে টানিয়া আনিতেছে আর বলিতেছে—"চল্‌না—আমি কেষ্ট ঠাকুর দেখবো—" তার আয়ত নয়ন দুটী কৌতূহল ও আগ্রহে সমুজ্জ্বল। দলের একজন বলিল—"এই বাদল—দেখ, দেখ্ তোকে দেখ্‌তে এসেছে—"

ধীরে ছেলেটা উঠিয়া আসিল—মৃদু হাসিয়া বলিল—"কি বল্‌ছ খুকি—"

খুকি এতক্ষণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে 'কেষ্ট ঠাকুরের' মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া ছিল, প্রশ্ন শুনিয়া মুহূর্ত্তে প্রতিবাদের সুরে বলিল, "আমার নাম খুকি নয়—দীপ্তি, আর তুমি—তুমিই ত কেষ্ট ঠাকুর—"

দীপ্তি মিথ্যা বলে নাই, এই ছেলেটাই গত রজনীর অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় তার অভিনয়-নৈপুণ্যে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ছেলেটীর বয়স বারো তের বৎসরের মধ্যে—দেহের স্নিগ্ধ শ্যাম কান্তির সহিত সুশ্রী মুখমণ্ডল এবং দীপ্ত আয়ত নয়ন দুটীর অপূর্ব্ব সমন্বয়, মাথার ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, সর্ব্বোপরি তার সুমধুর কণ্ঠস্বর বালকটিকে যেন এই ভূমিকারই উপযোগী করিয়াছিল।

কুর, তোমার বাঁশী কই? মাথার সেই ময়ূরের পালখ—"

মৃদু হাসিয়া বাদল উত্তর দিল—"সব আছে—দেখবে—"

পরিচারিকা এবার বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল—"চল চল, মা আবার রাগ করবেন। কাল কতক্ষণই বা গান শুনেছিল, তা বলি কি সকাল থেকে 'কেষ্ট ঠাকুর দেখব' করে পাগল—চল, হয়েছে ত—না হলে আমি মাকে বলিগে যাই—"

দীপ্তি জমীদার মহাশয়ের পৌত্রী—শিশিরস্নাত শেফালীর মতই তার অমলিন সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধতায় সপ্রতিভ চাঞ্চল্যের লীলায়িত ভঙ্গিমায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায়, সে ছিল সকলেরই নয়নানন্দদায়িনী, প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার মহাশয়ও আদরিণী পৌত্রীর সান্নিধ্যে যেন তাঁর হারাণ শৈশবে ফিরিয়া আসিতেন।

অপরাহ্ণ—সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রমের পর দ্বিপ্রাহরিক আহার সারিয়া বাদল গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল—উপস্থিত সে নিদ্রাভঙ্গ হইলেও কেমন একটা মোহময় আবেশে নিমীলিত নেত্রে শয্যায় পড়িয়া ছিল। সহসা দীপ্তির কণ্ঠে উচ্চারিত—"ও কেষ্ট ঠাকুর, তুমি এখনও ঘুমুচ্ছ—" কথা কয়টীতে চমকিত বাদল উঠিয়া বসিল। কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে দীপ্তি বলিয়া গেল—

"আমি আবার এসেছি কেষ্ট ঠাকুর—তুমি যে সব দেখাবে বলেছিলে—"

স্নিগ্ধ হাসিতে বাদলের দুই চক্ষু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ত্রস্তে সে বলিল—"দেখবে—"

"হাঁ—" আগ্রহাতিশয্যে দীপ্তি বাদলের দুটী হাত ধরিয়া ফেলিল, পরমুহূর্ত্তে আবার বলিল, "তুমি আমাদের বাড়ী যাবে কেষ্ট ঠাকুর—ঐ যে তেতলার বড় ঘরখানা, ঐটাতে আমরা থাকি—"

বাদল হয়ত কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দাসীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আ-আমার কপাল, তুমি একলা এখানে চলে এসেচ—শীগগীর চল, মা ওখানে খোঁজাখুঁজি কচ্চেন—।"

সামান্য একজন যাত্রাদলের ছেলের সহিত দীপ্তির এইভাবে মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা দীপ্তির জননীর নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হইত, কিন্তু ঐ দুটী কিশোর-কিশোরীর নিকট শুধু ভাল-লাগাটাই ছিল একমাত্র আকর্ষণ। তাদের নির্মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশের মতই স্বচ্ছ হৃদয়ে তখনও পর্য্যন্ত মানুষের গড়া পার্থক্যের ব্যবধান কোন দাগ কাটিতে পারে নাই, এ সম্বন্ধটা ছিল—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের, তাই তাহা অকপট নিঃসঙ্কোচ ও দ্বিধাহীন। হয়ত এই জন্যই মাত্র তিনটী দিনে তাদের মধ্যে যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা হইয়া উঠিল, দুইজন বয়স্কের মধ্যে সমস্ত জীবনেও হয়ত তাহা সম্ভব নয়। প্রথম দু'একবার দাসীর সহিত আসিলেও তারপর দিনের মধ্যে অনেকবার দীপ্তি একাই চলিয়া আসিত, ডাকিয়া উঠিত—"কেষ্ট ঠাকুর—ও কেষ্ট ঠাকুর—" প্রত্যুত্তরে তেমনি স্নিগ্ধ হাসিমুখে বাদল তাহার আহ্বানে সাড়া দিত। জননীর নিকট একবার দীপ্তি ধরাও পড়িয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেন ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা হইতে জমীদার মহাশয় কর্ত্তৃক মুক্তি পাইল। তিনি বলিলেন, "যাক্‌গে মা, ওরা ছেলে মানুষ, ওতে দোষ নেই—" কাজেই দীপ্তির উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

* * *

আজ যাত্রাদলের বিদায়ের দিন—বিগত কয়টী দিনের উৎসবের পর আজিকার এই বিদায়-আয়োজনে, জোয়ারের উচ্ছ্বসিতা নদীর ভাটার টানের মত একটা অবসাদ ক্লান্তভাব। দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখ, দৈন্য, ক্লান্তি ও নৈরাশ্য এই কয়টী দিনের জন্য বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছিল, আজ আবার তারা রূঢ় বাস্তবতায় জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হারাণ কয়টী দিনের স্মৃতি সবারই অন্তরে কি এক সার্ব্বজনীন ব্যথার গুঞ্জরণ তুলিল।

প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রাদলের বিদায়-যাত্রা শুরু হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করিয়া অবশিষ্ট কয়েকজনের সহিত

বাদলও তাহার 'ছোট্ট সুটকেশ'টা লইয়া অঙ্গনে নামিয়া আসিল, সম্মুখেই দীপ্তির প্রদর্শিত তে-তলার সেই ঘরখানি। বাদলের আগ্রহাকুল দৃষ্টি সেই কক্ষের মুক্ত বাতায়ন-পথে বারবার যেন কাহার সন্ধানে ফিরিতেছিল।

"কেষ্ট ঠাকুর।" সচকিত বাদল উর্দ্ধে চাহিল।

"তুমি চলে যাচ্ছ কেষ্ট ঠাকুর—" বাদল দেখিল দীপ্তির হাস্যোজ্জ্বল আননখানি আসন্ন বিচ্ছেদব্যথায় ম্লান! তাহার অন্তরও বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কতকটা জড়িত স্বরেই সে বলিল, "হ্যাঁ—।"

"আবার কবে আস্‌বে—?"

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বাদলেরই জানা ছিল না, তাই কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। এই সময় সঙ্গীদের একজন বলিয়া উঠিল—"আয় বাদল, বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

দীপ্তির প্রশ্নের উত্তরে বাদল শুধু বলিল, "আবার আস্‌বো।" তারপর সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ চল।"

বাদল অগ্রসর হইল, সম্মুখের সোজা রাস্তা ধরিয়া জমীদার মহাশয়ের ফটক পার হইয়া সদর রাস্তায় পড়িল, নিজের অজ্ঞাতে বাদল একবার চাহিল,দেখিল, সেই বাতায়ন-পথে, তাহারই গমন-পথের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া তেমনিভাবেই দীপ্তি দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্য সেও থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। ক্ষণিকের জন্য দুইটী হৃদয় লইয়া চিরন্তন কৈশোরের এই যে লীলা-রহস্য, বেদনার সহিত আনন্দের শুভদৃষ্টি, এ অপূর্ব্ব অনুভূতির স্মৃতিটুকু হয়ত তাদের জীবনে অবিনশ্বর রহিয়া গেল।

আলোচনী

পুণ্ড্ররাজ্য

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল

শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয় বঙ্গশ্রীর গত শ্রাবণ সংখ্যায় "পুণ্ড্ররাজ্য"শীর্ষক আমার প্রবন্ধটির সমালোচনা বিশেষ বিদ্রূপের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি এতাবৎকাল কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি প্রামাণ্য প্রত্নদ্রব্যগুলি যথাযথ আলোচনাপূর্ব্বক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন বাংলা এবং বাংলার বাহিরে বহু প্রাচীন তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি ও বহু প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছি। ভারতীয় সরকারী দপ্তরখানায়, ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়মে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে আমার আবিষ্কৃত তথ্য সংরক্ষিত আছে। আবিষ্কারের সুসংবাদ ভারতের বিবিধ সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুত সাহিত্যরত্নকে শিক্ষা দিবার মত আমার যোগ্যতা আছে।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে—ক্ষত্রিয়রাজ বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পাঁচ পুত্র কালে স্ব স্ব নামে দেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে মহাভারতের অংশটি উদ্ধৃত করিলাম।

> "তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবী যথাব্রবীৎ।
> ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ॥
> অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
> তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥"
>
> —মহাভারত আদিপর্ব্ব

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের ১৮শ অধ্যায়ে বলির পুত্র—অঙ্গ,—অঙ্গ, বঙ্গ, ইত্যাদি পাঁচজনের নামানুসারে পাঁচটি দেশ পরিচিত ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। আমিই একমাত্র লেখক এই পাঁচটি দেশ বা রাজার সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে আলোচনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি এবং স্থানবিশেষে স্বীয় অভিমত প্রদান করিয়াছি।

১। অঙ্গরাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস—ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৪৮, পৃঃ ৬৭-৬৮।

২। বঙ্গের প্রাচীন কাহিনী—সংহতি, শ্রাবণ, ১৩৪৯, পৃঃ ১৯৮-২০০।

৩। কলিঙ্গ-রাজ্য—বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন, ১৩৫১, পৃঃ ১৯৮-২০০।

৪। সুহ্মের প্রাচীন কাহিনী—সংহতি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫১, পৃঃ ১৯৪-৯৫। এবং সংহতি, পৌষ, ১৩৫১, পৃঃ ২১৩-১৪।

৫। পুণ্ড্ররাজ্য—বঙ্গশ্রী, আষাঢ়, ১৩৫২, পৃঃ ৮০-৮১।

এক্ষণে শ্রীযুত সাহিত্যরত্নের সমালোচনার অংশগুলির উত্তর প্রদত্ত হইল।

১। "আমার মতে"—এই কথাটি তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া আমার উচিত ছিল। নচেৎ আমার মত কেহ গ্রহণ করিবেন না। 'আমার মত' সম্বন্ধে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছি। বঙ্গশ্রীর পাঠক-পাঠিকাগণ

অবগত আছেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল ও মগরা ষ্টেশন-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী "ত্রিশবিঘা" নামে একটি ষ্টেশন ছিল,। রেলপথ স্থাপনের প্রথম হইতেই দেশবাসিগণ 'ত্রিশবিঘা' নামটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমি সপ্তগ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তি অনুসন্ধানকালে উক্ত ত্রিশবিঘা ষ্টেশন এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যময় স্থানকে প্রাচীন "সপ্তগ্রাম বন্দর" বলিয়া ঘোষণা করিয়া-ছিলাম এবং অমৃতবাজার ইত্যাদি দৈনিক পত্রে ও হুগলী জেলার মুখপত্র সাপ্তাহিক চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়া ষ্টেশনটির নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক 'সপ্তগ্রাম' বা "সপ্তগ্রাম বন্দর" নামকরণের জন্য পুনঃ পুনঃ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। ফলে রেলওয়ে বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ তদ্বিষয় উপলব্ধি করিয়া ত্রিশবিঘা নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক "আদি সপ্তগ্রাম" নামকরণ করিয়াছেন। এইভাবে মত প্রকাশ করিবার মত শক্তি শ্রীযুত সাহিত্যরত্নের নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস।

২। শ্রীযুত সাহিত্যরত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে ২৯তম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পুণ্ড্রগণ জামদগ্ন্যের ভয়ে গিরিকন্দরে লুক্কায়িত ছিল। ব্রাহ্মণদিগের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়।"

—এই অংশটি সমর্থনপূর্ব্বক অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে—বর্ত্তমান মুঙ্গের জেলার পার্ব্বত্যাঞ্চলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এবং অন্যান্য মুনিগণ বাস করিতেন। আমার বর্ণিত পুণ্ড্রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতময়। সুতরাং পুণ্ড্রাজ্যে অবস্থানকালে জামদগ্ন্যের ভয়ে তত্রস্থ অধিবাসিগণ গিরিকন্দরে লুক্কায়িত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

কিন্তু শ্রীযুত সাহিত্যরত্ন প্রমাণ করুন, তাঁহার বর্ণিত পুণ্ড্রাজ্যে অর্থাৎ মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া এবং অন্যত্র কোন্ কোন্ গিরিকন্দরে পুণ্ড্রবাসিগণ লুক্কায়িত ছিল।

৩। শ্রীযুত সাহিত্যরত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"শান্তিপর্ব্বে ৬৫তম অধ্যায়ে পুণ্ড্রদিগকে দস্যুজীবী বলা হইয়াছে।"—এই অংশটি সমর্থনপূর্ব্বক অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে—আমার বর্ণিত পুণ্ড্রাজ্যের ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী রাঁচি জেলার অন্তর্গত মহকুমা-শহর খুঁটি (Khunti) হইতে প্রায় ৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী খুঁটিটোলি, কুঞ্জলা, বেলওয়াদাগ, সারিকেল, কাটাহার টোলি ও হাঁসা নামক স্থানে ভারতীয় সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক খননের ফলে ভগ্ন অট্টালিকা, স্বচ্ছমালা, প্রস্তরের তীরশীর্ষ, সুমসৃণ লোহিত ও কৃষ্ণ-বর্ণের মৃৎপাত্র-খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহু প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র খননকালে নক্সাদার বৃহদাকার মৃন্ময় জালা এবং তন্মধ্যস্থিত মনুষ্যের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার ঐ সকল জালার মুখগহ্বর একটি করিয়া শিলাখণ্ডদ্বারা আবৃত। সমাহিত ব্যক্তির হস্তের অলঙ্কার তাম্র, ব্রঞ্জ ও লৌহনির্ম্মিত অঙ্গুরী এবং অস্থি ও লৌহনির্ম্মিত মালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ ছোটনাগপুর পার্ব্বত্যা-ঞ্চলকে "অসুরদেশ" (Land of Asura) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং আমার বর্ণিত পর্ব্বতময় পুণ্ড্রের অধিবাসিগণ দস্যুজীবী ছিল তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীযুত সাহিত্যরত্ন মালদহে দস্যুজীবীদিগের সম্বন্ধে যাহা অবগত আছেন প্রকাশ করিয়া সুখী করুন।

শ্রীযুতসাহিত্যরত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"দশকুমার চরিতে মিথিলারাজের পুণ্ড্রাজ্য আক্রমণ-সংকল্প এবং তদ্দেশের দুর্ভিক্ষের কথা লিখিত আছে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পুণ্ড্রাজ্যের লোক মিথিলায় গিয়া উৎপাত করিত।"

—এই অংশটি সমর্থনপূর্ব্বক অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে—আমি ছয় বৎসর কাল মিথিলায় অবস্থান করিয়া প্রাচীন তীর্থগুলি পরিদর্শন করিয়াছি এবং বহু প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া মিথিলাবাসিগণের নিকট অক্ষয় যশোলাভে সমর্থ হইয়াছি। "মিথিলার প্রাচীন ইতিহাস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'সংহতি' মাসিক পত্রের ফাল্গুন-সংখ্যা, ১৩৪৮, ৭০১-৭০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি।

প্রাচীন মিথিলা উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে কুশীনদী, দক্ষিণে গঙ্গা এবং পশ্চিমে গণ্ডকী নদীর দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল :—

"গঙ্গা বহথি জনিক দক্ষিণদিশি পূর্ব্ব কৌশকী ধারা।
পশ্চিম বহথি গণ্ডকী উত্তর হিমবতবন বিস্তারা।"

—চন্দাঝাক শব্দ

অর্থাৎ বর্ত্তমান চম্পারণ, মুজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার উত্তরাংশ লইয়া মিথিলা বিস্তৃত ছিল।

আমার বর্ণিত পুণ্ড্রাজ্যের সীমা মুঙ্গের জেলার দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মুঙ্গের জেলার দক্ষিণার্দ্ধ অর্থাৎ পুণ্ড্রাজ্য হইতে মুঙ্গের জেলার উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ মিথিলায় যাতায়াত করা সুবিধা ছিল। এতদ্ভিন্ন পুণ্ড্রাজ্যের উত্তরাংশে পার্ব্বত্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হওয়া ও শস্যশ্যামলা মিথিলা-বক্ষে গিয়া উৎপাত করা উভয়ই সম্ভবপর।

কিন্তু শ্রীযুত সাহিত্যরত্ন প্রমাণাদির দ্বারা বুঝাইয়া দিন, মালদহ হইতে তৎকালে সহজে মিথিলায় যাতায়াত করার কিরূপ সুবিধা ছিল এবং মালদহে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বাংলার বক্ষ ত্যাগ করিয়া একবারে মালদহবাসিগণ মিথিলায় গিয়া উৎপাত করিত কি কি কারণে।

৫। শ্রীযুত সাহিত্যরত্ন লিখিয়াছেন—"পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর পুণ্ড্র-রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরের বর্ত্তমান নাম পাণ্ডুয়া বা স্থানীয় ভাষায় পাঁড়ুয়া। মালদহ জেলায় ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন কেহ কেহ বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাস্থানগড় করতোয়াতীরবর্ত্তী। মহাস্থানগড়ে পুণ্ড্ররাজগণের নির্ম্মিত একটি দুর্গ ছিল। কেহ কেহ বর্দ্ধন-কুটীকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন মনে করেন। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়া স্থাপন করে নাই। তাহারা পাণ্ডুয়া ভাঙ্গিয়া আপনাদের উপযোগী করিয়া লয়। এখন পাণ্ডুয়ার মসজিদসমূহ হইতে অসংখ্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি বাহির হইতেছে। হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া যে মসজিদ করা হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুসলমানেরা আসিয়া পাণ্ডুয়াকে এক বড় হিন্দুনগর পাইয়াছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত এইরূপ নগর দেশে ছিল না, থাকিলে কোন না কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত। ইহার ইতস্ততঃ বৌদ্ধ বিহারের অভাব নাই। অতএব পাণ্ডুয়া নগরই প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন।"

—এই অংশটির সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছি। বলিরাজ পুত্র-পুণ্ড্র যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তদ্বিষয় মহাভারত বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহার রাজধানীর নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল বলিয়া কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। আমার অনুমান, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন একটি বিহার-শোভিত অঞ্চলবিশেষ। বৌদ্ধযুগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

মহাস্থানগড়কে অনেকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ মহাস্থানগড় খনন করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

The Report of Archaeological Survey of India for the year 1932-33.

EPIGRAPHY.

The fragmentary Brahmi inscription from Mahasthangarh mentioned in the last year's report turns out to be a document of considerable interest, in as much as it appears to record the occurance of a severe famine which devastated Northern India in the third Century B. C., and the measures of relief adopted to combat it including the distribution of paddy from the royal granary and the advance of loans through district officers.

The Departmental Report for the year 1934-35.

IMPORTANT EXCAVATION

"In Bengal also, important excavations were carried out. In an isolated mound called Modh at Mahasthan in Bogra District, a curious honey-comb-like group of small brick chambers ranged in parallel rows and rising in 5 terraces, was brought to light."

এই প্রসঙ্গে আর একটি মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে—তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির মধ্যে "খাড়ি বিষয়" নামে একটি ছিল (Inscriptions of Bengal. Vol III p.p. 57—67)

খাড়িমণ্ডল বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে একটি বিধ্বংস অঞ্চল।

খাড়িমণ্ডল সম্বন্ধে Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol 1, p. 234 এ বর্ণিত আছে :—

"In the Sunderban jungles just South of this fiscal division (Khari) are the remains of several temples, and the Revenue Surveyor in 1857 found the sites of two very large tanks, dry or overgrown with jungles, and surrounded by mounds or embankments from thirty to forty feet in height. No clue could be obtained from the surrounding villagers as to their history."

শ্রীযুত সাহিত্যরত্নের লিখিত বিবরণ হইতে আরও অবগত হইলাম, মালদহ জেলার বিধ্বংস পাণ্ডুয়া নগরের ন্যায় আর কোন নগরের বিষয় কোন পুস্তক পাঠে অবগত হন নাই। তজ্জন্য তাঁহার মতে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন। হুগলী জেলার অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে পাণ্ডুয়া নামে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহার বিদ্যমান রহিয়াছে।

'পাণ্ডুয়ার প্রাচীন ইতিহাস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আমি এই অভিমতের সহিত পাঠাইলাম। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত হইলে শ্রীযুত সাহিত্যরত্নের ভ্রম সংশোধিত হইবে।

আমার শেষ বক্তব্য যে—শ্রীযুত সাহিত্যরত্ন মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া নগরকে তাঁহার অন্যান্য সংগৃহীত তথ্যগুলির দ্বারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে আমি এবং আমার দেশবাসিগণ সবিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব।

··· একতায় যে মানুষের উন্নতি হইয়া থাকে এবং কলহে যে মানুষের পতন হয়, তাহা গান্ধীজীর অনুচরবর্গ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের কোন উন্নতি যে হইতেছে না, তাহার বড় কারণ যে হিন্দু-মুসলমানের কলহ, তাহাও ঐ অনুচরবর্গ প্রায়শঃ অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার মূলে রহিয়াছে ইংরেজের প্ররোচনা। আমরাও বলি, ইংরেজের প্ররোচনার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া এবং নানা রকমের দলাদলির উদ্ভব হইতেছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ইংরাজকে দায়ী করা যায় না।

মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে, তোমরা ইংরাজকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে এবং ইংরাজের শক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিবে, আর ইংরাজ সুবোধ ও সুশীল বালকের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। কাজেই, হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ইংরাজের সঙ্গে যাহাতে ঝগড়া না হয়, তাহা করিতে হইবে।···

বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৩৩।
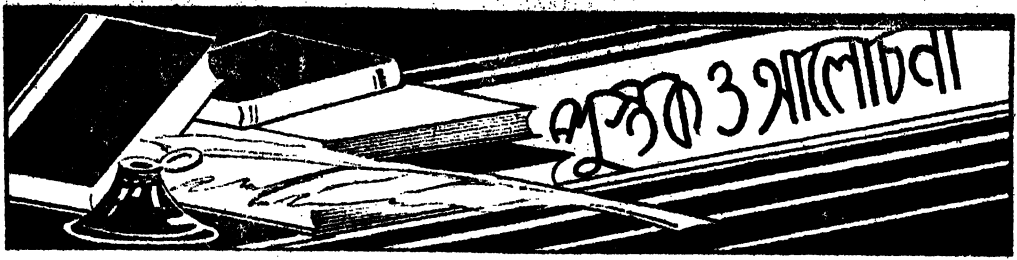
সব্যসাচী—শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত শিশু-উপন্যাস। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রণজিৎ বাবুর কথাসৃষ্টি 'বিপ্লব' এবং কাব্য 'শতাব্দী' বাংলা সাহিত্যে তাঁকে স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে তাঁর রচনা-শৈলীর আর একটি নতুন দিকের পরিচয় পেলাম। অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ম্যাড্‌ভেঞ্চারের গতানুগতিক পথ তিনি অনুসরণ করেননি—নগণ্য বাংলার পল্লীর একটি দেশপ্রাণ যুবকের অপূর্ব্ব ছবি তিনি এই বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনাভঙ্গি মনোরম—গল্প গ্রন্থনের কৌশলে বইটি শুধু ছোটদের নয়, বয়স্কদেরও সমান উপভোগ্য। শিশু-সাহিত্যে এই জাতীয় গঠনমূলক উপন্যাসের আবশ্যকতা আজকের দিনে অপরিহার্য্য এবং সেদিকের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে রণজিৎ বাবু অভিনন্দিত হবেন। বইটির ছাপা ও ছবি বেঙ্গল পাবলিশার্সের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে—এর বহুল প্রচার নিঃসন্দেহ তথা বাঞ্ছনীয়।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রির আকাশে সূর্য্য—শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পসংগ্রহ। অভিবাদন গ্রন্থবিভাগ, হাওড়া। দাম—পাঁচ সিকা মাত্র।

চাষী, তাঁতি, মধ্যবিত্ত, প্রেস-ম্যানেজার, শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত, ভিখারী, কর্ম্মী-ধর্ম্মঘট প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থের বিভিন্ন গল্প রচিত। লেখকের ভাষা কাব্যময় ও দৃঢ়। আখ্যায়িকায় যথেষ্ট শক্তি এবং ব্যঞ্জনায় যথেষ্ট সাহসের পরিচয় আছে। বাংলা সাহিত্যে নবাগত লেখকদের অনেকের মতই আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রচলিত সমস্যাগুলি লইয়া তাঁহার রচনার পটভূমি গড়িয়াছেন। কৃতিত্বটাই এখানে বড় নয়, বড় হইতেছে সংযমতার বন্ধনে বিষয়কে রসোত্তীর্ণ করিয়া তোলা। সেই দিক হইতে লেখক রসবস্তুর সঙ্গে সংযমতা সর্ব্বত্র সমতালে রক্ষা করিতে পারেন নাই। যৌন সমস্যার ইঙ্গিত স্থানে স্থানে অতি-বচনে উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য মূল রচনাগুলিতে তাহা গৌণ। লেখক তরুণ। আত্মস্থ হইয়া যথার্থ সাধনা করিলে এক সময় যে তিনি বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী বস্তু দিতে পারিবেন, সে সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করি।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প : (প্রথম খণ্ড—রুশিয়া) অনুবাদক—অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ। দাম-সাড়ে তিন টাকা।

অনিলেন্দু বাবু [illegible] এবং দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেও কিছু কিছু হয়েছে—কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা দেশের পরিচয় ঘটানোর প্রয়াস অভিনব। এ জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন।

প্রথম খণ্ডে রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখকবৃন্দ—টলষ্টয়, শেকভ, গোগোল, কুপ্রিন, গোর্কি প্রভৃতির রচনা স্থান পেয়েছে। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য অবিকৃত রাখবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। অনুবাদ-সাহিত্যে অধিকারীর লেখনী নিয়েই অনিলেন্দু বাবুর প্রবেশ—আশা করি, ভবিষ্যতে এ চেষ্টা পূর্ণ ফলবান হবে। আমরা অন্যান্য খণ্ডের জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম।

কিছু মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করা গেল। এই চমৎকার বইটির গঠন-পারিপাট্য সম্বন্ধে আর একটু অবহিত হওয়া প্রকাশকের উচিত ছিল।

—না. গ.

হিরোইন—শ্রীযামিনীমোহন মতিলাল প্রণীত পনের মিনিট সিরিজের গল্পগ্রন্থ। ইয়ং পাব্লিশার্স, কলিকাতা। দাম—চারি আনা মাত্র।

যামিনী বাবু হাস্যমুখর ও ব্যঙ্গাত্মক গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। অত্যন্ত কম লেখেন বলিয়াই তিনি বেশী ভাল লেখেন—ইহা লেখকদের পক্ষে আদর্শ ও সংগ্রাহ্য বস্তু। আরাধনা ক্লাবে হিরোইনের পার্ট করে শ্যামলাল। নায়ক নিশিকান্ত তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া কি ভাবে তাহার স্ত্রীকে অভিনয় তথা বহুরূপী-দর্পণে স্বভাবের মোড় ঘুরাইয়া দিল—বিশেষভাবে তাহাই বহু বিচিত্রতায় মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। নায়িকাচরিত্রে বিমলা ও নিস্তারিণী বিশেষ ভাবে সার্থক। বাংলা সাহিত্য যামিনী বাবুর কাছ হইতে এইরূপ আরও বহু রচনা দাবী করিবে।

—অ. ক. ভ.

বর্ত্তিকা : হাতে লেখা ষান্মাষিক সাহিত্য-পত্র। কলিকাতা রয়াল স্পোর্টিং ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত।

কিশোর ও বাল্য জীবনে প্রথম যখন সাহিত্যের প্রতি একটা অবচেতন অনুরাগ জন্মে, তখন তাহাকে অবদমিত না করিয়া স্ফুরণের সুযোগ দিলে জাতির ভবিষ্যৎ জীবনে সংস্কৃতি প্রসারের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ কিশোর—বালকদের নতুন উদ্যমে 'বর্ত্তিকা' গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার দুইটি বিভিন্ন সার্থকতা আছে। একদিকে ইহা দ্বারা অপরিণত বয়স হইতে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি যেমন সাধনা জন্মে, তেমনি লেখনি-চালনার দ্বারা হস্তাক্ষরও পরিমার্জ্জিত হইবার সুযোগ ঘটে। আলোচ্য খণ্ডটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আমরা সংস্কৃতির এই কিশোর অভিযাত্রীদের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

—শ্

পৃথিবীর শান্তি-সমস্যা ও উহার সমাধান

সানফ্রান্সিস্কো সহরে সম্মিলিত প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরিত ওয়ার্ল্ড চার্টার নামীয় শান্তি-পত্রের ব্যবস্থাসমূহ যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন ও রক্ষা করার পক্ষে উপযুক্ত বা প্রচুর নহে, তাহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। ঐ শান্তি-পত্র প্রকাশিত হওয়ার পরে আন্তর্জ্জাতিক যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং বিভিন্ন অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিবাদী রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তদ্‌প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই মনে হয় যে ঐ শান্তি-পত্রের ব্যবস্থাসমূহ কার্য্যে পরিণত হইবে না এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে না। যে সকল ব্যবস্থার মূলে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধের মূল কারণ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্য বর্ত্তমান নাই, পক্ষান্তরে শুধু সামরিক বলের প্রয়োগ অথবা প্রয়োগের ভীতি-প্রদর্শন করিয়া বিজিত ও দুর্ব্বল জাতিকে দমন করিবার নীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই সকল ব্যবস্থায় সাময়িক শাসন ও দমনের কার্য্য চলিতে পারে, তদ্দ্বারা শান্তি স্থাপিত বা রক্ষিত হইতে পারে না। অধিকন্তু, যে সকল ব্যবস্থায় প্রবল ও বিজেতা জাতি পক্ষের সামরিক বলপ্রসারণের বাধা নাই, পক্ষান্তরে নূতন নূতন অস্ত্রবলে অধিকতর বলীয়ান ও প্রতাপশালী হইবার সুযোগ বর্ত্তমান, সেই সকল ব্যবস্থায় পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন সম্ভব না হইয়া অচিরে আরও মহামারী যুদ্ধ ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই যে সর্ব্ব-সংহারক এটমিক বমের আবিষ্কার ও ব্যবহার হইয়াছে, যাহার প্রভাবে জাপানীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ জাতি মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এই এটমিক বমই যে অচিরে প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে প্রথমতঃ আত্মবিচ্ছেদের, অবশেষে, যদুবংশের ধ্বংসের কারণ মুষলের ন্যায়, তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

মানুষের শক্তি যদি মানবসমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়, তবে সেই শক্তি হিংস্ররূপ ধারণ করে এবং সমাজে প্রতিহিংসা উদ্রেক করিয়া থাকে। অবশেষে হিংসা ও প্রতিহিংসার সংঘর্ষে শক্তিশালী ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহা যেমন দার্শনিক তত্ত্ব, তেমন বাস্তব সত্য। আত্মপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে দূষণীয় নহে বটে, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা যদি প্রাধান্য স্থাপনে পর্য্যবসিত হয় এবং তাহা সামরিক বলের উপর স্থাপিত হয়, তবে কোন জাতির সেইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা মানবসমাজের পক্ষে যে অকল্যাণকর উদাহরণের অভাব নাই। যুদ্ধাবসানের পূর্ব্ব হইতেই মিত্রপক্ষীয় প্রধান জাতিসমূহের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয় গিয়াছে তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে তাঁহারা সামরিক বলের উপ তাঁহাদের আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন। এটমিক বমে আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ প্রাধান্য স্থাপনের প্রতিযোগিতা মনোভাবও লক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা মুখে 'মানুষের' মূল্য ও সমান অধিকারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সামরিক বলের প্রভাবে মানুষের উপর প্রাধান্য স্থাপনই যে তাঁহাদের লক্ষ্য তাহা মনে করিবার কারণ আছে। মানবসমাজের কল্যাণই যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হইত তবে তাঁহারা হিংসা দ্বারা হিংসা বিনাশে নীতি অবলম্বন না করিয়া যুদ্ধাদির মূল কারণ, সমগ্র মানবসমাজে নানাবিধ অভাব বিদূরণের নীতি অবলম্বন করিতেন। অবশ তাঁহারা বলিয়াছেন যে মানুষের অভাব বিদূরণ করাও তাঁহাদে লক্ষ্য। কিন্তু তাহা করিতে হইলে যেরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ওয়ার্ল্ড চার্টারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ঐ চার্টারে যে সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচয় আছে, তৎসমুদয় প্রধান জাতিসমূহের আত্মপ্রাধান্য স্থাপনেরই সহায়ক, সমস্ত দেশের সমস্ত লোকের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণের পক্ষে উপযুক্ত ও প্রচুর নহে।

বিজেতা নেতাগণের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত লোকের সর্ব্ববি অভাব দূর ও নিবারণ করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে যে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক এবং পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে পক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান সাধন করা আবশ্যক তাহার সন্ধা ঐ নেতাগণের অর্থনীতিক বা রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে পাওয়া যাইবে না তাহার বিস্তৃত বিবরণ ভারতীয় ঋষিগণ-প্রণীত শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ঐ সকল আবশ্যকী প্রতিষ্ঠানের সামান্য পরিচয় দিয়াছি; এইবারে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব, ধ স্বাস্থ্যগত অভাব, ধনগত অভাব, প্রতিষ্ঠাগত অভাব, তৃপ্তিগ অভাব, সম্মানগত অভাব ও জ্ঞানগত অভাব দূর করিতে অথা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে কতকগুলি ব্যবস্থা বা অনুষ্ঠান সাধন করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য উপযু প্রতিষ্ঠানও আবশ্যক। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান স্থানগত বিভাগে দিক হইতে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:—

(১) সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান;
(২) প্রত্যেক দেশের জন্য একটি দেশগত প্রতিষ্ঠান;

(৩) প্রত্যেক দেশকে বিভিন্ন গ্রামে বিভক্ত করিয়া গ্রামের জন্ম গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠান ;
(৫) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রতিষ্ঠান।

দায়িত্বগত বিভাগের দিক হইতে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত ; যথা :
(১) কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা ;
(২) কেন্দ্রীয় জনসভা।

দায়িত্বগত বিভাগের দিক হইতে দেশস্থ প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত ; যথা :
(১) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা ;
(২) দেশস্থ জনসভা।

দায়িত্বগত বিভাগের দিক হইতে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত, যথা :
(১) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা ;
(২) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা।

দায়িত্ব-গত বিভাগের দিক হইতে গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত, যথা—
(১) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভা ;
(২) গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রতিষ্ঠানের কোন শাখা-বিভাগ থাকে না। উহাতে থাকে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-বিভাগ।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ যাহাতে স্বতঃই সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রচনা করিতে হয় এবং ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাহার পর যুগপৎ দেশস্থ প্রতিষ্ঠানের, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এবং গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সর্ব্বশেষে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-সমূহের প্রতিষ্ঠানের রচনা করিতে হয় এবং সামাজিক কর্ম্মিগণের মধ্যে উহার অনুষ্ঠানসমূহের বণ্টন সম্পাদন করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহের বণ্টন সম্পাদিত হইলে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার রচনা সম্পাদিত হইলে, ক্রমে ক্রমে, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার, দেশস্থ জনসভার এবং কেন্দ্রীয় জনসভার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনাসভার অনুষ্ঠাসমূহ

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও প্রদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা সভার এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মী-নিয়োগ করিবার এবং জনসভাসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অনুষ্ঠান সমূহ ;
(৫) কোন শ্রেণীর কর স্থাপন না করিয়া উপরোক্ত নয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববিধ অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ ;
(৬) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্যস্থাপন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৭) বিভিন্ন দেশের সীমানাসমূহ নির্দ্ধারণ ও রক্ষা করিবার এবং সীমানাসংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৮) বিভিন্ন বিষয়ের অথবা ব্যাপারের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব দর্শন করিবার এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থসমূহ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৯) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধিনিষেধ নির্দ্ধারণে করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের অনুরূপ বটে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা দূর করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মী নিয়োগ করিবার এবং গ্রামস্থ-সামাজিক জনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(৫) কোন শ্রেণীর কর স্থাপন না করিয়া, গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববিধ অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৬) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্য স্থাপন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠাসমূহ

গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানপত্র

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ পনের শ্রেণীর, যথা :—

(১) কৃষিকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) জলজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) বন ও বাগানজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক পাঁচটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) খনিজাত দ্রব্যের সংগ্রহ ও উৎপাদন-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৫) শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক ষোলটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৬) বস্ত্রপরিচালনা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৭) ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;
(৮) খাল-খনন ও স্থলপথ-নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৯) রোগী ও ভোগিগণের পরিচর্য্যা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(১০) ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যবিষয়ক দুইটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(১১) যান-পরিচালনা-বিষয়ক দুইটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(১২) মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(১৩) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচারের কার্য্যবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(১৪) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা-বিষয়ক চারিটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(১৫) মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর; যথা :

(১) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) রমণীগণের গৃহিণীপণা শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৫) সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৬) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৭) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :

(১) পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা এবং দশম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(২) পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৩) জনসাধারণের চিকিৎসা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৪) বিবাহ, গর্ভ, গর্ভিণী, এক বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, এক বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ও পঞ্চম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, একাদশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয়, নবম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের ইন্দ্রিয় এবং পশুত্বনিবারণ সম্বন্ধীয় প্রচার—এই আটশ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধীয় সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;
(৫) যাজ্ঞিক কার্য্য সম্বন্ধীয় সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কর্ম্মিগণের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণ ;
(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণ ;
(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার কর্ম্মিগণ ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কর্ম্মিগণ ;
(৫) সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মিগণ ।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেইরূপ কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণও

অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুসারে প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও সেইরূপ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও সেইরূপ নয়শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ ছয়শ্রেণীতে বিভক্ত; গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও সেইরূপ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:

(১) সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী;
(২) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী;
(৩) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী;
(৪) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী প্রধানতঃ নয় শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা:—

(১) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষকতা-বিষয়ক তিন শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী;
(২) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষকতাবিষয়ক দুই শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী;
(৩) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষকতাবিষয়ক দুই শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী:
(৪) দশম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং ত্রয়োদশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের গৃহিণীপণার শিক্ষকতা-বিষয়ক দুই শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী;
(৫) পঞ্চমবৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং দশমবৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষকতা-বিষয়ক দুইশ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথমশ্রেণীর কর্ম্মী;
(৬) পঞ্চমবৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের শিক্ষকতা-বিষয়ক দশশ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী;
(৭) জনসাধারণের চিকিৎসা করিবার সামাজিক কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক;
(৮) বিবাহ, গর্ভ, গর্ভিণী, এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশু, এক বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও পঞ্চম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, একাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয়, নবম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের ইন্দ্রিয় এবং প্রচার—এই আট শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী;
(৯) যাজ্ঞিক কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার দায়িত্ব-ভার সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত হয়।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত; সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণও সেইরূপ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ আটত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে চলতি ভাষায় শ্রমিক বলা হয়।

শ্রমিকগণের উপরোক্ত আটত্রিশ শ্রেণীর শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হয়, যথা:

(১) জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক,
(২) বন ও বাগান-জাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী পাঁচ শ্রেণীর শ্রমিক;
(৩) খনিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও উৎপাদন করিবার সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক;
(৪) শিল্প ও কারুকার্য্য-সম্বন্ধীয় সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী ষোলটী শ্রেণীর শ্রমিক;
(৫) যন্ত্র পরিচালনা করিবার কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক;
(৬) ভবন-নির্ম্মাণ-কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক;
(৭) খাল-খনন ও স্থলপথ-নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক;
(৮) রোগী ও ভোগিগণের পরিচর্য্যা কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক;
(৯) ক্রয়-বিক্রয় করিবার কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী দুই শ্রেণীর শ্রমিক;
(১০) যান-পরিচালনা-কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী দুই শ্রেণীর শ্রমিক;
(১১) মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক;
(১২) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচারের কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক;
(১৩) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী চারি শ্রেণীর শ্রমিক;
(১৪) মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক।

সামাজিক কার্য্যের উপরোক্ত আটত্রিশ শ্রেণীর শ্রমিকগণের মধ্যে শেষোক্ত দশ শ্রেণীর শ্রমিক ছাড়া আর বাকী আঠাশ শ্রেণীর শ্রমিকগণের প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিকগণের হস্তে কৃষি-কার্য্যের দায়িত্বভার অর্পিত হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্বসমূহ নয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রধান কর্ম্মীকে সংস্কৃত ভাষায় "বিরাট পুরুষ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। নয়টী কার্য্য-বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়—নয় শ্রেণীর কার্য্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অমাত্যগণের হস্তে। ঐ নয়জন অমাত্যকে নয় শ্রেণীর কার্য্য-বিভাগের নামানুসারে এক একটী বিভাগের "কেন্দ্রীয় অমাত্য" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

"কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার" নয়টী কার্য্যবিভাগের নাম—

(১) বিভিন্ন বিষয়ের অথবা ব্যাপারের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব দর্শন করিবার এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ-সমূহ রচনা করিবার কার্য্যবিভাগ। এই কার্য্যবিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ ;"

(২) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার কার্য্য-বিভাগ। এই কার্য্যবিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ" ;

(৩) বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন গ্রামের সীমানা নির্দ্ধারণ, রক্ষা এবং সীমানা- সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিবার কার্য্যবিভাগ। এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"সীমানা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ ;

(৪) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্য-স্থাপন করিবার কার্য্যবিভাগ। এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বিচার-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ" ;

(৫) কোন শ্রেণীর কর-স্থাপন না করিয়া সামাজিক, সামাজিক তত্ত্বাবধারণের এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার কার্য্যবিভাগ ; এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"কোষ-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।"

(৬) সামাজিক, সামাজিক তত্ত্বাবধারক ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা সভাসমূহের কর্ম্ম-নিয়োগ করিবার এবং জনসভাসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার কার্য্যবিভাগ ; এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"নিয়োগ ও নির্ব্বাচনবিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।"

(৭) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরি-দর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ। এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীর শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।"

(৮) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ ;

এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।"

(৯) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরি-দর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ।

এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"সর্ব্বসাধারণের ধন-প্রাচুর্য্য-সাধন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ।"

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের এক একটী কার্য্যবিভাগে যেরূপ এক একজন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অমাত্য থাকেন সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের প্রত্যেক কার্য্য-শাখাতেও এক একজন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অমাত্য বিদ্যমান থাকেন।

এইরূপে নয়টী কার্য্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত "কেন্দ্রীয় অমাত্য" নয়জন ; একষট্টী কার্য্যশাখার ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অমাত্য একষট্টি জন এবং সর্ব্বোপরি "বিরাট পুরুষ"—সর্ব্বসমেত একাত্তর জন, "কেন্দ্রীয় অমাত্যের" দ্বারা "কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা" গঠিত হইয়া থাকে।

এই উপরোক্ত একাত্তর জন "কেন্দ্রীয় অমাত্যের" মধ্যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয় "বিরাট পুরুষের" হস্তে। তিনি তাঁহার ঐ দায়িত্ব নির্ব্বাহ করেন বাকী সত্তর জন "কেন্দ্রীয় অমাত্যের" সাহায্যে।

বালক-বালিকাগণের শিক্ষানুষ্ঠান-বিজ্ঞান, কর্ম্মিগণের শিক্ষানুষ্ঠান-বিজ্ঞান, ধনপ্রাচুর্য্য সাধনের অনুষ্ঠান সমূহের বিজ্ঞান এবং মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অন্যান্য অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাননির্দ্ধারণ করেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের নির্দ্ধারিত বিজ্ঞান মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সর্ব্ব-বিধ সঙ্কেত আবিষ্কার করিয়া থাকে। এই কার্য্যবিভাগের কার্য্য-সাফল্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ভিত্তি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের নির্দ্ধারিত সঙ্কেতসমূহ অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে যে পদ্ধতিতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রচনা করিতে হয় এবং যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধিত করিতে হয় এবং যাহা যাহা নিষিদ্ধ করিতে হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় "বিধি-নিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের" হাতে।

বিধি-নিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ একদিকে যেরূপ প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার ঐ সংগঠন ও বিধিনিষেধ [illegible] কার্য্য-

পরিচালনা-সভার অপর সাতটি কার্য্যবিভাগের অমাত্যগণ শিখিতে পারেন এবং তদনুসারে কার্য্য করেন তাহাও করিয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অপর সাতটি কার্য্যবিভাগের দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর :—

(১) যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করা প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের দায়িত্বান্তর্ভুক্ত, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটির বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হওয়া ;

(২) প্রত্যেক কার্য্য-বিভাগের অনুষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার ঐ ঐ কার্য্য-বিভাগের ও কার্য্যশাখার অমাত্যগণকে জানাইয়া দেওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া ;

(৩) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের ও কার্য্য-শাখার অমাত্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দায়িত্বভার বিধিবদ্ধভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন কি না—তাহা পরিদর্শন করা ও পরীক্ষা করা।

উপরোক্ত ভাবে কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টি কার্য্য-বিভাগের মিলিত কার্য্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কার্য্যানুষ্ঠানসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টি কার্য্যবিভাগের মিলিত কার্য্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কার্য্যানুষ্ঠানসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্য বিভাগের দ্বারা সম্ভবযোগ্য হয় না। উহার জন্য যেমন কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা সভার নয়টি কার্য্য বিভাগের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা সভার এবং গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান-সমূহ মিলিতভাবে সাধন করিবার প্রয়োজন হয়।

এই বিষয়ে আমাদের আরও অনেক কথা লিখিবার আছে। পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহা লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

মহাযুদ্ধের অবসান ও রাজনৈতিক বন্দী

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আনন্দ ভোগ করিবার ভাগ্য বাঙ্গালার নাই। বাঙ্গালার অধিকাংশ ঘরেই অন্ন ও বস্ত্রের অভাব। এই অভাব যে নিকট ভবিষ্যতে দূর হইবে, তাহা আশা করিবার কারণ দেখা যাইতেছে না। তারপর, বাঙ্গালার হাজার হাজার নর নারী "ভারত রক্ষার" অজুহাতে কারাগারে বন্দী। তাঁহাদের অনেকেই দীর্ঘকাল যাবত কারাবদ্ধ হইয়া আছেন। এক হিসাবে তাঁহাদিগকে যুদ্ধের বন্দী (prisoners of war) বলা যায়। যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মুক্তিলাভ করিবার অধিকার আছে। বাঙ্গালা সেই রাজবন্দিগণের আশু মুক্তি দাবী করে। ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কি বাঙ্গালার এই ন্যায্য দাবী মিটাইবেন না ?

গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ও ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যা

গ্রেট ব্রিটেনের নূতন নির্ব্বাচনে মিঃ চার্চ্চিলের দল পরাজিত হইয়াছেন। শ্রমিকদল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হওয়ার ফলে তাঁহারাই নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে আর একবার মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে তথায় শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বেশীদিন ঐ গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিতে পারেন নাই ; অল্পকাল মধ্যেই তিনি কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইবারের নির্ব্বাচনের ফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘস্থায়ী হইবে। এই নূতন গবর্ণমেণ্টের বৈশিষ্ট্য এই যে উহার নেতাগণ সমাজতন্ত্রবাদী এবং ইংরেজ জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প। তাঁহাদের মতানৈক্য ও বিবাদ নিজ দেশের ধনী সম্প্রদায়ের সহিত। কিন্তু তাঁহারা এতই জাতিয়তাবাদী—অপর দেশের বা জাতির সম্পর্কে সকল ইংরেজ একতাবদ্ধ আছে ও থাকিবে। তাঁহাদের ঘরোয়া বিবাদের সুযোগ অপর কোন দেশ বা জাতি নিতে সক্ষম নহে বা হইবে না। সুতরাং ইংরেজের দেশে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট গঠনের ফলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের যে সকল নেতা মনে করিতেছেন যে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম করিয়া দিবে, তাঁহারা নিতান্ত ভুল করিতেছেন। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, শ্রমিকগণের স্বার্থের জন্যই ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষ হইতে ছাপা কাগজের বিনিময়ে কাঁচা মাল খরিদ করিয়া ব্রিটেনে নিয়া তদ্দ্বারা শিল্পসম্ভার প্রস্তুত করায় ধনী ইংরেজের যতখানি স্বার্থ, শ্রমিক ইংরেজের স্বার্থ তদপেক্ষা বেশী ; কারণ, ধনী ইংরেজগণ তাহাদের টাকা শিল্পে না খাটাইয়া হয়ত অন্যভাবেও খাটাইতে পারেন, কিন্তু শিল্প না থাকিলে ব্রিটিশ শ্রমিক বাঁচিতেই পারে না। তারপর, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করা শিল্পসম্ভার বেশী লাভে বেশী পরিমাণে বিক্রয়ের প্রধান স্থান হইতেছে ভারতবর্ষ ; এই দেশে তাহাদের শিল্পসম্ভার বিক্রয় করিতে পারিলে যত লাভ হইয়া থাকে, এত লাভ আর কোথায়ও হয় না ; এবং ঐ লাভ যত বেশী হইবে শ্রমিকের লাভ তত বেশী হইবে, কারণ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ঐ লাভের বেশী অংশই শ্রমিকগণকে দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবেন। সুতরাং শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি কোন দিন গ্রেট ব্রিটেন জমি ও জলজাত খাদ্যের উৎপাদনের এমন উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় যে সেই দেশের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য সেই দেশের লোকের খাদ্য-প্রয়োজন মিটাইতে পারে, তবে হয়ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে তাহাদের অধীন রাখা আবশ্যক

মনে করিবেন না। কিন্তু যতদিন বর্ত্তমান যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করা ইংরেজগণের জীবনধারণের প্রধান উপায় স্বরূপ অবলম্বিত থাকিবে, ততদিন ইংরেজ ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে না ও করিতে পারে না।

একমাত্র আশা এই যে, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের কথা উঠিয়াছে। যদি সত্য সত্যই পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সাধিত হয়, তবে সেই ব্যবস্থায় সমস্ত দেশের লোক নিজ নিজ দেশেই তাহাদের জীবনধারণের আবশ্যকীয়, বিশেষতঃ আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন করিতে বাধ্য হইবে ও তাহা করা সম্ভব হইবে, কারণ ৺ভগবানের সৃষ্টির নিয়ম এই যে, প্রত্যেক দেশেই সেই দেশীয় লোকসমূহের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তদবস্থায় কোন দেশের উপর- অন্য কোন দেশের প্রভুত্ব করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু যতদিন পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্র-সমূহের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, যন্ত্র-শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার দ্বারা অপরের দেশ হইতে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আনিবার নীতি সমর্থন করিবে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে না, পক্ষান্তরে এক জাতি অপর জাতিকে শোষণ এবং অস্ত্রবলের ভয় দেখাইয়া অপর জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে চাহিবে এবং করিবে।

সুতরাং আমাদের মনে হয় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সমস্যা পৃথিবীর শান্তি সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন দিন পৃথিবীর শান্তি সমস্যার সমাধান হয়, তবেই ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যারও সমাধান হইবে। এজন্য যেমন দৈবানুগ্রহ চাই সেইরূপ মানুষের, বিশেষতঃ ভারতবাসীর, পুরুষকারও চাই। মনুষ্যসমাজের শান্তি সমস্যার সমাধানের উপায় ভারতবাসী ভিন্ন আর কেহ উদ্ভাবন করিতে পারিবে না। অপর দেশের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞগণ তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়া যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করিতেছেন ও করিবেন, রাষ্ট্রনেতাগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন ও করিবেন এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যুদ্ধের মারণ-অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন ও করিবেন; তাঁহারা কেহই মানুষের সত্যকার সমস্যা সমাধান করিবেন না ও করিতে পারিবেন না। ৺ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ভারতবর্ষ যাহার সন্তানগণ নিজ দেশেই কোন দিন মানুষের ভোগ্য যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই ভারতবর্ষের সন্তানগণই পারিবে অপর দেশকে সেইরূপ ঐশ্বর্য্য আহরণের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সন্ধান দিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সর্ব্ববিধ অভাব বিদূরণ ও শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে।

ঐ সকল ব্যবস্থা কি কি এবং তাহা সাধনের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবীর জন্য কি প্রকারের কেন্দ্রীয় (World), দেশস্থ (Country) এবং গ্রামস্থ (Village) প্রতিষ্ঠান আবশ্যক, তাহা আমরা "পৃথিবীর শান্তি-সমস্যা ও উহার সমাধান" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়া আসিতেছি। শান্তি-সমস্যার সমাধানের বাণী যে একমাত্র ভারতবর্ষ দিতে পারে বলিয়া আমরা বারবার স্পর্দ্ধা করিয়া আসিতেছি, তাহার মূলে শুধু আমাদের আত্মবিশ্বাস নহে, বিবর্ত্তনশীল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ও আমাদিগের ঐ কথা সমর্থন করিতেছে। সমগ্র মনুষ্যসমাজ শান্তি চায়—ইহা আজ কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে প্রকৃত শান্তির দাবী এইবারেই প্রথম উত্থিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের নেতাগণও শান্তি-সমস্যার সমাধানের জন্য মিলিত হইয়া একটি শান্তি-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা যে শান্তি আসিবে না, তাহা যেন মানবসমাজ আজই অনুভব করিতেছে। আত্মপ্রাধান্যকামী মানুষ 'মানুষের মূল্য' স্বীকার করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের অনুগ্রহে 'মানুষের' শান্তি আসিবে না।

তবে কি শান্তি আসিবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাই—শান্তি আসিবে, এবং তাহার উপায়ের সন্ধান ভারতবর্ষই দিবে। তাই আমরা ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিতে চাই যে তাঁহারা এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর শান্তি-সমস্যার সমাধানের উপায়ের সন্ধান করুন; ভারতের ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রাদিতে সেই সন্ধান মিলিবে। তারপর, ভারতের নেতাগণ সমগ্র পৃথিবীতে ঐ উপায়ের কথা প্রচার করুন। স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীতে বেদান্তধর্ম্ম অর্থাৎ মানবধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতাগণ এইবারে ঋষি-প্রণীত রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের বাণী প্রচার করুন। তবেই পৃথিবীর জনসাধারণ শান্তি-সমস্যার সমাধানের উপায়ের সন্ধান পাইবে এবং পৃথিবীবাসী গণদেবতা জাগ্রত হইবে; তখন পৃথিবীতে শান্তি আসিবে। ভারতীয়গণের এই পুরুষকারই দৈবানুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবে এবং তখন ভারতবর্ষ তাহার প্রাপ্য উচ্চতম রাষ্ট্রীয় আসন পাইতে পারিবে! ব্রিটেনের শ্রমিক বা অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট বা আমেরিকা বা রাশিয়া ভারতবর্ষকে ঐ আসন দিবে না ও দিতে পারে না।

পট্‌সডাম সিদ্ধান্ত ও পরবর্ত্তী প্রতিক্রিয়া

জাপানের আত্মসমর্পণ

পট্‌সডামে অনুষ্ঠিত ত্রি-নেতৃ সম্মেলনে চার্চ্চিল-ট্রুম্যান-চিয়াং এক ঘোষণাপত্রে যে যুক্ত সাক্ষর করিয়াছেন, গত ২৯শে জুলাই তারিখ তাহা বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোষণা পত্রটি আকারে দীর্ঘ হইলেও সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার প্রায় সম্পূর্ণাংশই আমরা এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। উক্ত ঘোষণাপত্রে যুক্তসাক্ষর দ্বারা মিঃ চার্চ্চিল, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মার্শাল চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন: 'আমরা আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর প্রতিভূরূপে সম্মিলিত হইয়া এই বিষয়ে একমত হইয়াছি যে, জাপানকে যুদ্ধাবসানের সুযোগ দিতে হইবে। সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্য ও চীনের বিপুল সেনা, নৌবহর ও বিমান আছে। পশ্চিম হইতে আগত সৈন্য ও বিমান বহরে তাহা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব সমরশক্তি জাপানে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত। জাপান যতদিন না সংগ্রামে বিরত হয়, ততদিন যুদ্ধ চালাইবার জন্য মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের দৃঢ় সঙ্কল্প হইতেই এই সামরিক শক্তি উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত হইয়াছে। বিশ্বের উদ্দীপ্ত ও স্বাধীন জনসাধারণের শক্তির সম্মুখে নির্ব্বোধ জার্ম্মান প্রতিরোধিতার পরিণাম জাপ জনসাধারণের পক্ষে জীবন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া

আছে। জাপানের বিরুদ্ধে আজ যে শক্তির সমাবেশ হইতেছে, প্রতিযোধী নাৎসীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত সমরশক্তির তুলনায় তাহা বহুলাংশে বিপুলতর। আমাদের সঙ্কল্পপুষ্ট সামরিক বলের পরিপূর্ণ প্রয়োগ অর্থ সমগ্র জাপবাহিনীর অনিবার্য্য ও সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং অনুরূপ অনিবার্য্য-ক্রমে খাস জাপ ভূখণ্ডের সমূহ সর্ব্বনাশ। আমাদের এই সর্ত্ত হইতে আমরা বিচ্যুত হইব না, এবং আমরা কোনোরূপ বিলম্ব সহ্য করিব না। যাহারা জাপ জনসাধারণকে বিশ্ববিজয়ের নামে প্রলুব্ধ, বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছে, চিরকালের জন্য তাহাদের কর্ত্তৃত্ব ও প্রতিপত্তির অবসান ঘটাইতে হইবে। কেন না, আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, পৃথিবী হইতে দায়িত্বহীন জঙ্গীবাদ নিশ্চিহ্ন না করিতে পারিলে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচারের নয়া ব্যবস্থার পত্তন অসম্ভব। এইরূপ নয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং জাপানের সমরায়োজনের ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে—এইরূপ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষনির্দ্দিষ্ট জাপানের কোনো কোনো অঞ্চল মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে দখলে রাখা হইবে। কায়রো সম্মেলনের ঘোষণা-ক্রমে জাপানকে সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে হইবে। জাপানের রাষ্ট্রাধিকার হনসু, হোকাইদো, কিউসু, শিকোকু এবং আমরা যে সকল দ্বীপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব—তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। জাপানের সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করিবার পর সৈন্যদিগকে শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন যাপনের সুযোগ দিয়া দেশে ফিরিতে দেওয়া হইবে। জাপানকে দাস জাতিতে পরিণত করা অথবা রাষ্ট্র হিসাবে ধ্বংস করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু সমস্ত যুদ্ধাপরাধীর কঠোর বিচার হইবে। জাপ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক বোধ জাগরিত ও দৃঢ়তর করিবার পথে যতকিছু বাধা আছে, জাপ গভর্ণমেণ্টকে তাহা অপসরণ করিতে হইবে। ব্যক্তি, ধর্ম্ম ও ভাবের স্বাধীনতা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জাপানের আর্থিক ব্যবস্থা রক্ষা ও দ্রব্যের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ যতটুকু শিল্প প্রসারের জন্য দরকার, জাপানকে ততটুকু শিল্পোন্নতিরই সুযোগ দেওয়া হইবে। যাহাতে আবার সমরায়োজন চলিতে পারে, তাহা কোনোক্রমেই চলিতে দেওয়া হইবে না। ঠিক এই পরিমাণেই কাঁচা মাল সংগ্রহের সুবিধা দেওয়া হইবে। কালক্রমে দুনিয়ার বাণিজ্যক্ষেত্রে যোগ দিতে দেওয়া হইবে।—এই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এবং জাপ জনসাধারণের অবাধ ইচ্ছার শান্তিকামী ও দায়িত্বসম্পন্ন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই মিত্রপক্ষের দখলদার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হইবে। আমরা জাপ গভর্ণমেণ্টকে সকল জাপ-বাহিনীর উদ্দেশ্যে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের আদেশ এবং তাহাদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। অন্যথায় জাপানের আশু ও সমূহ সর্ব্বনাশ হইবে।'

মিত্রপক্ষের এই ঘোষণায় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জাপ-শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিবার মূলে জাপ-সম্রাট্ হিরোহিতের নাম আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তালিকা হইতে মিত্রপক্ষ ইহা এড়াইয়া গিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল দাবী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও কঠিনতম বলা চলে। উক্ত ঘোষণা পত্রানুযায়ী ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জাপানকে তাহার বিজিত রাজ্যগুলির সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে দীর্ঘকাল পূর্ব্বে অধিকৃত কোরিয়া ও ফরমোসাও আর জাপানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত নবলব্ধ অঞ্চলসমূহ তো বটেই, এমন কি মাঞ্চুরিয়াও পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মূল জাপান মিত্রপক্ষের অধিকারে থাকিবে, এবং জাপান যাহাতে আর কোনোদিন সুদূর প্রাচ্যের শান্তিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে, তজ্জন্য জাপানের সমরশিল্পগুলিও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে জাপানের তাহার নবলব্ধ চীনসাম্রাজ্য ও দক্ষিণ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হয়ত অসম্মত নয়; কিন্তু কোরিয়া, ফরমোসা এবং মাঞ্চুরিয়ার সহিত জাপানের যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাতে সাম্রাজ্যের ঐ অংশগুলি ছাড়িয়া দিলে জাপানের আর আদৌ পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই।

এদিকে অবস্থার সুযোগ বুঝিয়া ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নির্দ্দেশে রাশিয়া সম্প্রতি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সদূর প্রাচ্যের সংগ্রামে যোগদান করিয়াছে। বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে একা আজ জাপানের দাঁড়াইবার ক্ষমতা কতটুকু, তাহা বলা শক্ত। যে মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্বন্ধে সে সংশ্লিষ্ট, ১১ই আগষ্টের রয়টারের সংবাদ হইতে দেখা যায়, সেই মাঞ্চুরিয়াও ক্রমশঃ জাপানের হাতছাড়া হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নিউ-ইয়র্ক হইতে জাপ বেতারবার্ত্তা উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, মাঞ্চুরিয়ার কোয়াংটুং প্রদেশস্থ সমগ্র ইজারাকৃত অঞ্চলের অবরোধের অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। ওহিবেন ও পোর্ট আর্থার অঞ্চলস্থিত জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সামরিক লক্ষ্যবস্তু হিসাবে উক্ত দুই অঞ্চলের আর কোনো গুরুত্ব নাই। স্বভাবতঃই যে চরম মুহূর্ত্তে আজ জাপানকে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাহা তাহার পক্ষে অভূতপূর্ব্ব। কিছুদিন পূর্ব্বে রাশিয়া তাহার সহিত অনাক্রমণচুক্তি বাতিল করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু এত শীঘ্রই যে সে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, ইহা জাপানের পক্ষে দুরধিগম্যই ছিল। চাতুষ্পার্শ্বিক এই অবস্থা-সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই "জাপ সম্রাটের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে"—এই সর্ত্তে জাপান মিত্রপক্ষের প্রস্তাবিত আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাবে সম্প্রতি সাড়া দিয়াছে। তদুত্তরে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র দাবী জানাইয়াছে যে, জাপ সম্রাটের জাপান শাসনের অধিকার মিত্রপক্ষীয় সর্ব্বাধিনায়কের নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিবে এবং জাপ সম্রাটকে আত্মসমর্পণের সর্ত্ত ও পটস্ডাম বৈঠকের ঘোষণাবলী কার্য্যকরী করার প্রস্তাব অনুমোদন করিতে হইবে। (১১-৮-৪৫)।—উক্ত দিনের জাপ নিউজ এজেন্সির আর একটি সংবাদে প্রকাশ পায় যে, পটস্ডাম সম্মেলনে গৃহীত সর্ত্তাবলী জাপান মানিয়া লইতে রাজী আছে, তবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, মিকাডোর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—আত্ম-সমর্পণের ঘোষণা পত্রে এইরূপ কোনো দাবী করা হইবে না। কিন্তু এই ঘোষণার তিনদিনের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে

জাপানের ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়া গেল। সাম্প্রতিক মিত্রপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত এটমিক বোমের প্রভাব তাহাকে গুরুতর ভাবে যে কাতর করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা মনে করা ভুল হইবে না। ১৪ই আগষ্ট মার্কিণ সমর-সংবাদ প্রচার অফিস জানাইয়াছেন যে, জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বলিয়াছেন : মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপ সরকারের নিকট প্রেরিত বার্তায় সম্মিলিত পক্ষের যে সর্ত্ত জানান হয়, জাপ সরকার সেই আত্মসমর্পণের সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছেন। ইহা দ্বারা জাপানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণই সূচিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুদূর প্রাচ্যের মহাযুদ্ধও অবসান হইয়াছে। জাপানের এই আকস্মিক পতন তাহার আনুপূর্ব্বিক কিছুকালের ঘটনাচক্রে অনিবার্য্য হইলেও বাস্তবিকই বিস্ময়কর। শক্তির উত্থান এবং পতন এমনি করিয়াই ঘটে।

পট্‌সডাম সিদ্ধান্তের আর একদিক

বিগত ২রা আগষ্ট ত্রি-নেতৃ সম্মেলনে গৃহীত আনুমানিক সাতহাজার শব্দের এক ঘোষণাপত্র এক যোগে লণ্ডন, ওয়াশিংটন, মস্কো ও বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রয়টার সংবাদ দিয়াছেন যে, উক্ত ঘোষণায়—নাৎসীবাদ, জার্ম্মান জেনারেল ষ্টাফ, এবং জার্ম্মানীর সমরশক্তি চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার এক সর্ব্বসম্মত পরিকল্পনা আছে। জার্ম্মানী ভবিষ্যতে আর কখনও যাহাতে বিশ্বশান্তি বিপন্ন করিতে না পারে, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও উহাতে রহিয়াছে। জার্ম্মানীর জল, স্থল ও বিমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হইবে—তাহার সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ মিত্রপক্ষ দখলে রাখিবেন অথবা ধ্বংস করিবেন। জার্ম্মানী যে ক্ষয়-ক্ষতি করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে জিনিষপত্র দিয়া ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা হইবে। তবে জার্ম্মান জাতিকে ধ্বংস করা বা তাহাদিগকে দাস জাতিতে পরিণত করার অভিপ্রায় তিন প্রধানের নাই—এইরূপ সিদ্ধান্তও উক্ত সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, বৃটেন, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবদের লইয়া এক পররাষ্ট্র সচিব পরিষদও গঠিত হইয়াছে।

সম্মেলনে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি গৃহীত হইয়াছে :

(১) ইটালী, বুলগেরীয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সহিত সন্ধিসর্ত্ত রচনার জন্য এবং রাষ্ট্রসীমা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রস্তাব রচনার উদ্দেশ্যে বিরাট শক্তিপুঞ্জের পররাষ্ট্র সচিবদিগকে লইয়া একটি পররাষ্ট্র সচিব পরিষদ গঠিত হইবে। ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই লণ্ডনে এই পরিষদের প্রথম বৈঠক হইবে। (২) জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি চূর্ণ করা হইবে। ভবিষ্যতে জার্ম্মানীর সমর লিপ্সা ও যুদ্ধোদ্যমের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাহার উদ্যম ও সমস্ত ক্ষমতা লোপ করা হইবে। তদুপরি নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা হইবে। জার্ম্মান সামরিক ব্যবস্থাদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। অবিলম্বে যুদ্ধপরাধিদের বিচারের এবং জার্ম্মানীর শ্রমশিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। (৩) জার্ম্মানী সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যে ক্ষয়ক্ষতি করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে সর্ব্বাধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে এবং তৎসঙ্গে সমস্ত মূলধন ও সাজসরঞ্জাম হস্তগত করা হইবে। (৪) জার্ম্মান নৌবহর ও বাণিজ্যপোতবহর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইবে। (৫) কোণিগ্‌সবার্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা রুশিয়াকে অর্পণ করা হইবে। (৬) পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমা সাময়িক ভাবে ওডার নদী পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইবে এবং ডানজিগ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৭) যে সব রাষ্ট্র যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ ছিল, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তাহাদের আবেদন প্রধান শক্তিত্রয় সমর্থন করিবেন, তবে সুস্পষ্টভাবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, স্পেনের নিকট হইতে অনুরূপ কোনো আবেদন পাইলে তাহা অনুমোদন করা হইবে না।

দুঃখের বিষয়, যতই বলা হউক না কেন—'নাৎসীবাদ ধ্বংস করা হইবে; শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে বদলাইতে হইবে, যাহাতে কেবলমাত্র গণতন্ত্রের প্রতিই জার্ম্মান জাতির শ্রদ্ধা-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়; নাৎসীদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও আইন তো বিলুপ্ত হইবেই, পরোক্ষ-ভাবে উহার স্মৃতির যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কোনো কেন্দ্রীয় জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে রাখা হইবে না'—ইত্যাদি, তবু শুধু আইনের দড়ি-দড়া দিয়া যে কখনও একটা মনে-প্রাণে স্বাধীন জাতিকে বেশীদিন বাঁধিয়া রাখা সম্ভব নয়, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। জার্ম্মানী পরাজিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে আবার যে তাহারা সুযোগ পাইলেই অচিরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না, এ কথা বিশ্বাস করা চলিবে না। রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি ও মনের সংস্কারও প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন বোধে যতদিন না শুধু জার্ম্মান নয়, মানুষ মাত্রেই সুন্দর ও সংস্কৃত হইতে পারিতেছে, ততদিন বহিরাগত অনুশাসনই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পট্‌সডাম সিদ্ধান্তানুযায়ী তাহার কার্য্যকারিতা কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা দেখিবার আবশ্যক। আর নেতৃবৃন্দ জার্ম্মানীকেই একমাত্র বিশ্বশান্তির অন্তরায় বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও আজ কথঞ্চিৎ হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে হয় না কি? বস্তুতঃ, বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে এই যুদ্ধের বীজ বড় বড় রাষ্ট্রনায়কগণের অন্তরেই লুক্কায়িত ছিল। সাম্রাজ্যগত স্বার্থবুদ্ধি, পারস্পরিক অবিশ্বাস, আদর্শহীন তোষণনীতি এবং শক্তিসাম্য রচনায় কূটনৈতিক চাল দেখিতে দেখিতে ক্রমান্বয়ে বর্ত্তমান যুদ্ধের ইন্ধন যোগাইল। 'লীগ অব নেশনস্' দ্বারাও ইতিপূর্ব্বে বিশ্বশান্তির প্রয়াস করা হইয়াছিল, যাহার ব্যর্থতাও সেই প্রকৃতির সহিত একসূত্রে জড়িত। সুতরাং কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির ঘাড়ে নিশ্চেষ্টভাবে একতরফা দোষ চাপাইয়া পৃথিবীর শান্তিযজ্ঞের মন্ত্রপাঠ শেষ হইতে পারে না। সেই সঙ্গে তাহার প্রধান উদ্যোক্তা নেতৃবৃন্দেরও যথেষ্টতর পরিশুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ চিত্তে আদর্শ গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন। পৃথিবী হইতে নাৎসীবাদ চিরতরে বিলুপ্ত হউক, ইহা আমাদের আদর্শগত চাওয়া, কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রচলিত মিত্রশক্তির শাসনচক্রের কূটতন্ত্রবাদও অবসান হওয়া আবশ্যক নয় কি?
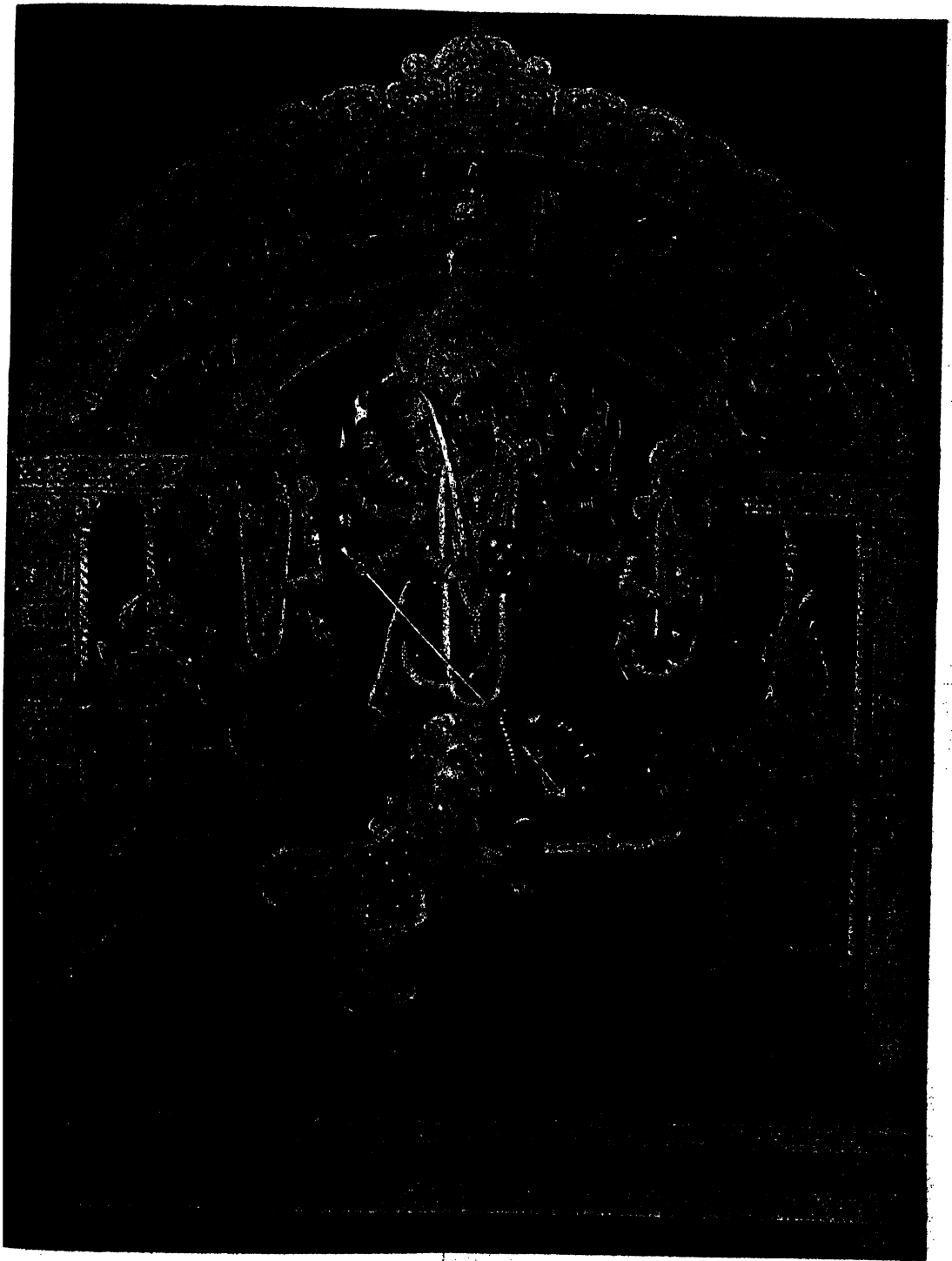
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে—

ত্রয়োদশ বর্ষ { আশ্বিন—১৩৫২ { ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

যোগমায়া

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

যাঁহারা কৃষ্ণলীলা—বিশেষতঃ শ্রীভগবানের রাসলীলা অথবা পরকীয়াবাদ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের পক্ষে "যোগমায়া" তত্ত্বটী জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন শৈব ও শাক্তগণের পক্ষেও এ-তত্ত্ব আলোচনার আবশ্যকতা রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই তত্ত্ব বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। চণ্ডীতে ঋষি বলিয়াছেন :—

> সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
> সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ ১ অধ্যায় ৪৪

সেই সনাতনী বিদ্যারূপে পরমামুক্তির হেতুভূতা। আবার সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরীই অবিদ্যারূপে সংসার বন্ধনের কারণ। অন্যত্র বলিতেছেন :—

> তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
> মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ॥ ১ অধ্যায় ৪৫

এই মহামায়া জগৎপতি হরিরও যোগনিদ্রা স্বরূপিণী। সুতরাং তাঁহার জগৎ মোহন বিস্ময়ের কার্য্য নহে। চণ্ডীতে এই দেবী বহুবার বৈষ্ণবীরূপে কথিতা হইয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে ঋষি ইঁহাকে বিষ্ণুমায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইহার মায়া ও যোগমায়া এই দুইটী নাম পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুরত্যয়া; যে আমার শরণাগত হয়, সেই এই মায়া অতিক্রম করে। (৭ অধ্যায় ১৪ শ্লোক)। যোগমায়া-সমাবৃত থাকায় সকলে আমার প্রকাশ দেখিতে পায় না। মূঢ় লোকে আমাকে অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না। (৭ম অধ্যায়, ২৫ শ্লোক) চণ্ডীতে এই দেবী প্রধানতঃ মহামায়া নামেই কথিতা হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ইনি বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া এবং মহামায়া এই তিন নামেই পরিচিতা। শ্রীমদ্ভাগবতে মায়া শব্দও আছে। বিষ্ণুমায়া (১০ম স্কন্ধ ১ম অঃ ২৫) যোগমায়া (১০ম, ২য়, ৬)

> কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
> নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥
> (১০ম ২২শ ৪ শ্লোক)

নন্দগোপনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় গোপীগণ যাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন, মহারাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ তাঁহারই মূলস্বরূপকে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশকে সমীপে গ্রহণ করিলেন।

> ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
> বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥
> (১০ম ২৯শ, ১ শ্লোক)।

এই যোগমায়া দেবীকে রাসের—তথা শ্রীকৃষ্ণলীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিতে পারা যায়। চণ্ডীতে যে অবিদ্যা, বিদ্যা ও যোগনিদ্রার উল্লেখ পাইয়াছি, তাহাকে মায়া, মহামায়া ও যোগমায়া নামে অভিহিতা করিতে পারি। অবিদ্যা সংসারবন্ধনের হেতু, বিদ্যা সর্ব্বসম্পদ্দাত্রী, অভীষ্টদায়িনী, মোহমুক্তির হেতুস্বরূপা; আর যোগমায়া—রসভাবের সেবিকা, রসভাবের পরিপালিকা এবং রসভাবের,—আনন্দব্রহ্মের অনুভূতি প্রদানের সামর্থ্যে সর্ব্বাধিকা। শ্রীভগবান্ রাসলীলায় ইঁহাকেই সহকারিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সম্বাদে এই দেবীর পরিচয় এইরূপ—

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী ॥
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ ॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—শ্রীদুর্গা শ্রীভগবানের চিন্ময়ী শক্তি। ইহার অপর নাম একা বা একানংশা। পরমাশক্তিময়ী এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী শ্রেষ্ঠা শক্তি। এই প্রেম-সর্ব্বস্ব-স্বভাবা, গোকুলাধিষ্ঠাত্রীকে জানিতে পারিলে অখিলেশ্বর আদিদেবকে সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অখণ্ড রসবল্লভা দুর্গার আবরিকা শক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়া সমস্ত জগৎকে সকল দেহাভিমানী জীবকে মুগ্ধ করেন। চণ্ডীতে দেবী নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা"—আমি নন্দগোপগৃহে যশোদা গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাকেই বিষ্ণুর অনুজা বলিয়াছেন। ইহারই নাম একানংশা। অনেকে ইহাকেই যোগমায়া বলেন। জগন্নাথ ও বলদেবের মধ্যবর্ত্তিনী এই দেবীকে অনেকেই সুভদ্রা নাম দিয়া ভ্রমাত্মক উক্তি করেন।

মায়ার কার্য্য "বিমুখমোহন"। জীবকে ভগবদ্‌বিমুখ করিয়া মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করাই তাঁহার কাজ। মহামায়া বা বিদ্যার কার্য্য—"উন্মুখমোহন"। সংসার হইতে, বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া জীবকে ভগবদভিমুখী করিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। আর শ্রীভগবানের শক্তিগণকে, তাঁহার পরিকরগণকে, এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবানকে মুগ্ধ করিতে একমাত্র যোগমায়াই সমর্থা। এই মুগ্ধতাই শ্রীভগবানের লীলা। এই মুগ্ধতা তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই মায়া প্রকৃতি নামে অভিহিতা হইয়াছেন ;

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্"।

ঈশোপনিষদে অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইটী নাম পাওয়া যায়। বলিতেছেন—(১১শ শ্লোক)

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

ঈশোপনিষদ্ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই একের সহ জানিতে বলিয়াছেন। অবিদ্যাকে জানিলে সংসারবন্ধন ঘটিবে না। তাহার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে। আমাদের মতে অতঃপর অর্থাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্তির পর অখণ্ড রস-বল্লভার দর্শন মিলিবে এবং তিনিই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সান্নিধ্য দান করিবেন। অবিদ্যা ও বিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াই রস-স্বরূপের অনুভূতি লাভ হইবে। ঈশোপনিষদ্ অবিদ্যা ও বিদ্যা অসম্ভূতি ও সম্ভূতি দুইএরই পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিয়াছেন। উভয়কে একত্রে জানিবার কথাই বলিয়াছেন।

এই যোগমায়াই শ্রীদুর্গা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ভাগবত-সন্দর্ভে গৌতমীয় কল্পের বচন উদ্ধার করিয়া তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে ॥

কৃষ্ণ ও দুর্গার তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। "ব্রহ্মসংহিতা" এই রহস্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন (১১শ শ্লোক) -

"মায়য়া রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ।
আত্মনা রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া ॥"

মায়ার সহিত তাঁহার বিয়োগ নাই, তিনি মায়া সহ সর্ব্বদা রমণরত। তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টিকাল সমাগমে তিনি আত্মশক্তি রমার সহিত রমণ করেন।

এখানে মায়া শব্দে রমাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। রমা সঙ্গে নিয়ত বিগ্রহশীল বলিয়াই রমার অপর নাম নিয়তি। "নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং সদা।" ব্রহ্মসংহিতা মায়ার সঙ্গে প্রকৃতির পার্থক্য রাখিয়াছেন। বলিয়াছেন—

"এবং জ্যোতির্ম্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎ পরঃ ॥
আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ ॥ (১০)

প্রকৃতি হইতে তিনি নির্লিপ্ত, প্রকৃতির সহিত সেই আত্মারামের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় প্রকৃতির বেশ পরিষ্কার বিশ্লেষণ আছে। শ্রীদুর্গাই রূপভেদে প্রকৃতি বা মহামায়া ও যোগমায়া নামে অভিহিতা হন। যোগমায়া রূপই শ্রীদুর্গার প্রকৃত স্বরূপ। মহামায়া ও মায়া ইহারই অংশরূপা।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে এমন কি শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করাই যোগমায়ার কার্য্য। তাহার উদাহরণ দিতেছি। শিশু শ্রীকৃষ্ণের চাঞ্চল্যে ব্রজের গোপ-গোপীগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমনই একদিন বলরামাদি গোপবালকগণ আসিয়া যশোদাকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে।" যশোদা এই কথা শুনিয়া ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া তিরস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি মাটী খাই নাই, উহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। যশোদা বলিলেন 'তবে হাঁ কর, দেখি'। এই কথা শুনিয়া যশোদানন্দন মুখ ব্যাদান করিলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের জঠর মধ্যে দ্বীপ-পর্ব্বত-সমুদ্র-সমন্বিত বিশ্বের বিশাল রূপ দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, "এ কি স্বপ্ন, না দেবমায়া, না আমার বুদ্ধিভ্রম, অথবা ইহা আমার পুত্রেরই কোন ঐশ্বর্য্য।" তিনি নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি যশোদা, গোপরাজ নন্দ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র, আমি ব্রজেশ্বরের অখিল বিত্তের অধিকারিণী পত্নী, গোধনাদি

সহ ব্রজের গোপগোপী আমার অধিকৃত, যাঁহার মায়ায় আমার এই মন্দ মতি হইয়াছে, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়।"

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥

গোপী যশোদার এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে শ্রীভগবান্ পুত্রস্নেহময়ী আপন বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন। বেদ, শ্রুতি, সাংখ্য, যোগ এবং পঞ্চরাত্রাদিতে যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, অতঃপর যশোদা সেই হরিকে পুত্র জ্ঞান করিলেন। এই সমস্ত কার্য্যে যোগমায়া ভিন্ন অপর কেহ সমর্থা নহেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধাসনাথা ব্রজগোপীগণের মিলন সাধন। দার্শনিকগণ মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অঘটন-ঘটন-পটুত্বা মহারাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করা, শ্রীরাধা আদি গোপীগণকে মুগ্ধ করা। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যাঁহার আবির্ভাব সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আপন আনন্দাংশ-সম্ভূতা হ্লাদিনী মূর্ত্তি শ্রীরাধাকে পরবধূ মনে করিয়াছেন। আর শ্রীরাধাও সেই জগৎপতিকে পরপুরুষ ভাবিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে তার বুদ্ধিতে সঙ্গতা হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অঘটন আর কি হইতে পারে? ইহাই যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই, কৃষ্ণলীলা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যোগমায়ার তত্ত্ব আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রসন্ন অন্তঃকরণে সাধনা আবশ্যক। পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক তাহাদের বাণীরূপের মর্ম্মগ্রহণ আবশ্যক। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, মূঢ় লোকে যোগমায়া-সমাবৃত আমাকে জানিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে যোগমায়ার উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥
(৩।২।১২)

"আপন যোগমায়ার শক্তিপ্রদর্শন জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যের ললামভূত সেই মূর্ত্তি যেন ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ ছিল এবং তিনি নিজেই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।"

ইহাই যোগমায়ার সেই অখণ্ড রস-বল্লভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তিনি এমন রূপকে নিত্যলীলা হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যে রূপ দেখিয়া আপনার স্বরূপে স্বয়ং বিশ্বরূপও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
বিশ্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ তার নিত্যধাম॥

সম্মোহন তন্ত্রের নিম্নোক্ত বচন অনুসরণ করিয়া—

যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্।
যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাদ্বয়া॥

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সহজিয়া-সম্প্রদায় ইঁহাকেই নিত্যা রাধা বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মতে নিত্যলীলায় যোগমায়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সে লীলায় ইনি শ্রীরাধার স্বরূপেই অবস্থিত করেন। প্রকট লীলায় ইনি মূল রূপে শ্রীরাধা এবং অংশরূপে যোগমায়া, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সাহায্যকারিণী। সহজিয়াগণ বলেন যোগমায়া নিত্যা রাধা। বৃন্দাবনে বৃষভানুনন্দিনী প্রেমরাধা, মথুরায় কুব্জা কামরাধা। ইঁহাদের মতের সঙ্গে আচার্য্যগণের মতের পার্থক্য থাকিলেও এই সম্প্রদায়-প্রচলিত অমৃততন্ত্র নামক গ্রন্থ হইতে যোগমায়ার ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পীতবস্ত্রপরীধানাং বংশযুক্তকরাম্বুজাম্।
কৌস্তুভোদ্দীপ্তহৃদয়াং বনমালাবিভূষিতাম্॥
শ্রীকৃষ্ণক্রোড়পর্য্যঙ্কনিলয়াং পরমেশ্বরীম্।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং দেবীং পরমানন্দনন্দিতাম্॥
রাসপ্রিয়াং নিত্যরাধাং কৃষ্ণানন্দস্বরূপিণীম্।
ভজেদ্ যোগমায়াং দেবীং পূর্ণানন্দমহোদধিম্॥

শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা রাসলীলা। গোপীযূথ-পরিবৃতা মহাভাবময়ী বৃষভানুনন্দিনীর পদাঙ্কানুসরণে শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তের সুমধুর মিলনলীলা। দেবী দুর্গা—অখণ্ড রসবল্লভা যোগমায়া এই লীলার সাহায্যকারিণী। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

শুক্রনীতিসারে কলাবিদ্যা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

শুক্রনীতিসারে বিভিন্ন ললিতকলার পৃথক্ পৃথক্ নাম ও লক্ষণ বলা হয় নাই—কেবল বলা হইয়াছে যে, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া দ্বারা ললিতকলার ভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ক্রিয়া-ভেদানুযায়ী ললিতকলার জাতি-ভেদ।

শুক্রনীতি-সারে স্পষ্ট বলা হইয়াছে (৪।৩।১০০) যে, কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি।

(ক) গান্ধর্ব-বেদে কথিত কলা সাতটি :—

(১) হাবভাবাদি-সংযুক্ত নর্ত্তন—একজাতীয় কলা।

(২) অনেক প্রকার বাদ্যের নির্ম্মাণ ও বাদন—আর একজাতীয় কলা।

(৩) স্ত্রী-পুরুষের বস্ত্রালঙ্কার-সন্ধান—এও একজাতীয় কলা। 'সন্ধান' অর্থে বুঝায় সম্যগ্‌রূপে ধান বা পরিধান। নানারূপ কৌশলে সাজ-সজ্জা করা ও অলঙ্কার পরার কৌশল।

(৪) অনেক রূপে আবির্ভাব করণের জ্ঞান—একজাতীয় কলা। নানারূপ ধারণ, বহুরূপী সাজা—ইহার বিষয়।

(৫) শয্যা-আস্তরণ-সংযোগ ও পুষ্পাদিগ্রথন-কলা।

(৬) দ্যূতাদি অনেক প্রকার ক্রিয়া দ্বারা লোকরঞ্জন—ইহাও কলা।

(৭) নানাবিধ আসনের সন্ধানপূর্ব্বক স্ত্রী-পুরুষ-মিলনের জ্ঞান। আসন—বন্ধ, posture, ইহা কাম-কলা।

এই সাতটি কলা গান্ধর্ব্বে উল্লিখিত আছে।

(খ) ইহার পর আয়ুর্ব্বেদাগমে কথিত দশটি কলা :—

(৮) মকরন্দ, আসবাদি ও মদ্যাদির করণ-জ্ঞান। মকরন্দ—পুষ্পরস। আসব—কোন পদার্থ পচাইয়া বিনা অগ্নিতে তাহার পুষ্টিকর সুরাসার আহরণ করিলে উহা হয় আসব।

(৯) বিনা যন্ত্রণায় শল্যবহিষ্করণ ও শিরাব্রণ বিদ্ধকরণের জ্ঞান। কোন অঙ্গে কোন শল্য (কাঁটা, পেরেক, কাচ, চোচ ইত্যাদি) ফুটিলে যাহাতে ক্লেশ না জন্মে এরূপ কৌশলে উহা বাহির করিবার জ্ঞান—এই কলার বিষয়। শিরা প্রভৃতির উপর ব্রণ (ফোটকাদি) জন্মিলে উহা কাটিবার কৌশলও ইহার বিষয়। ইহা অস্ত্রোপচার-কলা।

(১০) হিঙ্গু প্রভৃতি রস-সংযোগে অন্নাদির পাককরণ। হিঙ্গু—হিং। ইহা রন্ধন-কলা।

(১১) বৃক্ষাদি-প্রসবারোপ-পালনাদি করণ। বৃক্ষপ্রসব দুই প্রকার অর্থ হয়—(১) বৃক্ষের উৎপত্তি বা বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের কৌশল; (২) বৃক্ষের প্রসব অর্থাৎ ফুল বা ফল জন্মাইবার কৌশল। আরোপ—রোপণ। পালন—গাছ রক্ষা, বাড়ান ইত্যাদি। ইহা উদ্যান-কলা।

(১২) পাষাণ, ধাতু ইত্যাদির বিদারণ ও তাহাদের ভস্মীকরণ-প্রক্রিয়া।

(১৩) যতপ্রকার ইক্ষুবিকার আছে, সে সকলের করণ-জ্ঞান। ইক্ষুবিকার—রস, গুড়, চিনি ইত্যাদি।

(১৪) ধাতু ও ওষধিসমূহের সংযোগকরণ-জ্ঞান।

(১) ধাতুসমূহের পরস্পর সংযোগ; (২) ওষধির (গাছগাছড়ার) পরস্পর সংযোগ; ও (৩) ধাতু ও ওষধির পরস্পর সংযোগ। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধকরণ-কলা।

(১৫) ধাতু-সাঙ্কর্য্য হইতে পার্থক্য-করণ-কলা। খনিতে নানা ধাতু একসঙ্গে মিশিয়া থাকে। এই ভাবে নানা ধাতুর মিশ্রণের নাম ধাতু-সাঙ্কর্য্য। ঐরূপ মিশ্রিত অবস্থা হইতে প্রত্যেক ধাতুটি আলাদা করার কৌশল এ কলার বিষয়।

(১৬) ধাতু প্রভৃতির সংযোগের অপূর্ব্ব বিজ্ঞান, অপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, সর্ব্বপ্রথম। কয়েকটি ধাতু মিশ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে। প্রথম দেখিবামাত্র বুঝিবার কৌশল—যে কি কি ধাতু মিশ্রিত আছে।

(১৭) ক্ষার-নিষ্কাসনের জ্ঞান। ক্ষার—ছাই, পটাশ। যে কোন ধাতু বা ওষধি পুড়াইয়া উহার ছাই (বা পটাশ) বাহির করার কৌশল।

এই দশটি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত কলা।

(গ) ধনুর্ব্বেদাগমে কথিত পাঁচটি কলা :—

(১৮) পদাদিবিন্যাসক্রমে শাস্ত্র-সন্ধান ও বিক্ষেপ। বাণ ছুঁড়িতে বা অন্য কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র ছুঁড়িতে বা চালাইতে হইলে পদন্যাস কিরূপে করিতে হইবে—এই পদন্যাস (বা মণ্ডলের) জ্ঞান প্রথমে প্রয়োজন। তাহার পর শস্ত্রসন্ধান, 'সন্ধান' অর্থে লক্ষ্যকরণ ও তাহার পর বিক্ষেপ—লক্ষ্যের উদ্দেশে ত্যাগ। অস্ত্র-যুদ্ধকলা।

(১৯) সন্ধিস্থানে আঘাত, আক্রমণ ইত্যাদির ভেদে মল্লযুদ্ধের নানা কৌশল। কুস্তির ও যুযুৎসুর প্যাঁচ প্রভৃতি এই কলার বিষয়। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মল্লগণের অশস্ত্র বাহুযুদ্ধে মুষ্টিই অস্ত্রের কার্য্য করে—ইহাতে বুঝা যায় যে, সেকালে 'বক্সিং' প্রচলিত ছিল। আরও কথিত হইয়াছে—এইরূপ যুদ্ধে মারা যাইলে ইহলোকে যশ বা পরলোকে স্বর্গলাভ হয় না। (পক্ষান্তরে, অস্ত্রযুদ্ধে সম্মুখ সমরে হত হইলে স্বর্গবাস অবশ্যম্ভাবী)। শত্রুর বল-দর্পবিনাশাবধিক বাহুযুদ্ধ জেতার পক্ষে যশস্কর। এই কারণে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—প্রাণান্ত বাহুযুদ্ধ কর্ত্তব্য। বিবিধপ্রকার প্যাঁচ (কৃত) পালটা প্যাঁচ (প্রতিকৃত) তাহার পর অতি ভয়ানক বলশালী (সুসঙ্কট) বাহুর বিচিত্র প্রহার, শত্রুর উপর সন্নিপাত (ঝাঁপাইয়া পড়া), অবঘাত (আঘাত), শত্রুর প্রমাদে (অনবধানতায়) তাহাকে উন্মথন (মর্দ্দন)—এই কলার বিষয়। কৃত বলিতে বুঝায় নিষ্পীড়ন। ইহার কবল হইতে মুক্তি—প্রতিক্রিয়া বা প্রতিকৃত। অর্থাৎ সরল ভাষায় প্যাঁচ ও পালটা প্যাঁচ। ইহা নিযুদ্ধ বা বাহুযুদ্ধ বা মল্লযুদ্ধ-কলা।

(২০) অভিপ্রেত দেশে যন্ত্রাদি দ্বারা অস্ত্র-নিপাতন। যন্ত্রদ্বারা দূরদেশে অস্ত্র নিক্ষেপ। যন্ত্রযুদ্ধ কলা।

(২১) বাদ্যের সঙ্কেতে ব্যূহরচনাদি কলা। সঙ্কেত—ইঙ্গিত। ব্যূহ—সৈন্য-সংস্থান।

(২২) গজ, অশ্ব, রথ—ইহাদিগের গতিদ্বারা যুদ্ধসংযোজন। গতি—বিশিষ্টরূপ গতি বা চালনা। যুদ্ধ-সংযোজন—সংগ্রামের আয়োজন।

ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রের অন্তর্গত এই পাঁচটি কলা।

(ঘ) পৃথক্ চারিটি কলা :—

(২৩) বিবিধ প্রকার আসন, মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা দেবতার তোষ-সম্পাদন। আসন—বসিবার প্রকারভেদ, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন ইত্যাদি। মুদ্রা—হস্ত ও অঙ্গুলির বিচিত্ররূপ সন্নিবেশ, ধেনুমুদ্রা, অঙ্কুশমুদ্রা ইত্যাদি।

(২৪) গজ, অশ্ব ইত্যাদির সারথ্য ও গতি শিক্ষা।

(২৫) মৃত্তিকা-কাষ্ঠ-পাষাণ-ধাতু প্রভৃতি হইতে ভাণ্ডাদির স্নানপুণ নির্ম্মাণ-কৌশল।

(২৬) চিত্রাদির আলেখন।

—এই চারিটি পৃথক্ কলা।

(ঙ) অতঃপর আটত্রিশটি বিবিধ কলা :—

(২৭) তড়াগ-বাপী-প্রাসাদ-সমভূমি-করণ-কৌশল। তড়াগ—সরোবর। বাপী—দীর্ঘিকা। সমভূমি—সমতল ভূমি— উদ্যানার্থ বা ক্রীড়ার্থ (lown)।

(২৮) ঘণ্টাদি বাদ্য ও বিবিধ যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল।

(২৯) হীন-মধ্য-আদি-বর্ণ-সংযোগে রঞ্জন। হীন অল্প; মধ্য মাঝারি, আদি উত্তম। নানা রং কম-বেশী-মাঝারি মাত্রায় মিশাইয়া বস্ত্রাদির রঙ করা।

(৩০) জল, বায়ু। অগ্নি সংযোগ ও নিরোধের দ্বারা ক্রিয়া এক বার জল-বায়ু-অগ্নির সংযোগ আর একবার সংযোগনিরোধ ইহা দ্বারা বাষ্প উৎপাদন°ও তাহার দ্বারা নানা কার্য্য সম্পাদন ইহার বিষয়।

(৩১) রথ-নৌকাদি যানের নির্ম্মাণ-জ্ঞান।

(৩২) সূত্র, রজ্জু ইত্যাদি নির্ম্মাণ-জ্ঞান।

(৩৩) অনেক তন্তু সংযোগে পটবন্ধ অর্থাৎ বস্ত্রবয়ন-কলা।

(৩৪) রত্ন বিদ্ধ করিবার কৌশল ও কোন্ রত্নটি ভাল কোনটি খারাপ তাহার পরীক্ষা-কৌশল।

(৩৫) স্বর্ণাদি ধাতুর যাথাত্ম্য-বিজ্ঞান। খাটি কি মেকি তাহা বুঝিবার কৌশল। যাচাই বিদ্যা।

(৩৬) কৃত্রিম স্বর্ণ-রত্নাদির নির্ম্মাণ-কৌশল।

(৩৭) স্বর্ণাদি ধাতুর অলঙ্কারনির্ম্মাণ-কৌশল।

(৩৮) লেপাদি-করণ—ইহার অর্থ সুস্পষ্ট নহে। বোধ হয়, অলঙ্কারের উপর বর্ণের প্রলেপ—মিনার কাজ।

(৩৯) চর্ম্ম মৃদু করার কৌশল। চামড়া কিরূপে নরম করিতে হয় তাহার জ্ঞান—ট্যান করার প্রক্রিয়া।

(৪০) পশুর অঙ্গ হইতে চর্ম্ম নির্হরণ-জ্ঞান নির্হরণ—নিষ্কাসন। ছাল ছাড়াইবার প্রক্রিয়া।

(৪১) দুগ্ধ দোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করণ পর্য্যন্ত।

(৪২) কঞ্চুকাদির সীবন-বিজ্ঞান। কঞ্চুক জামা। দরজির কাজ।

(৪৩) জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা তরণের কৌশল। সন্তরণ-কলা।

(৪৪) গৃহের তৈজসপত্রাদির মার্জ্জন-কৌশল। বাসন মাজা।

(৪৫) বস্ত্র-সম্মার্জ্জন। রজক-কর্ম্ম।

(৪৬) ক্ষুরকর্ম্ম—নাপিতের কাজ।

(৪৭) তিল-মাংস প্রভৃতি হইতে স্নেহপদার্থ (তৈল বা চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ) নিষ্কাসন প্রক্রিয়া।

(৪৮) সীরাকর্ষণ-জ্ঞান—লাঙ্গল চালনা।

(৪৯) বৃক্ষারোহণ—গাছে ওঠা।

(৫০) মনের অনুকূল সেবার জ্ঞান। যেরূপ সেবায় প্রভুর মন তুষ্ট হয় এরূপ ভাবে সেবা করিবার কৌশল।

(৫১) বেণু-তৃণাদি-পাত্র-নির্ম্মাণ-জ্ঞান। বেণু—বাঁশ; তৃণ—ঘাস—এ সকল পদার্থের সার জমাইয়া (pulp) তাহা হইতে পাত্র-নির্ম্মাণ-কলা।

(৫২) কাচপাত্রাদি-করণ-জ্ঞান।

(৫৩) জলের সম্যক্ সেচন-জ্ঞান। জলছেঁচার কৌশল।

(৫৪) জল-সংহরণ জ্ঞান—জল বহিবার কৌশল।

(৫৫) লোহাভিসার, শস্ত্র ও অস্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল। লোহাভিসার—বিজয়াভিযানকালে রাজা ও সৈন্যগণের নীরাজন-বিধি। কেহ কেহ অর্থ করেন—লোহাভিসার—লৌহ যাহার উপাদান, এমন শস্ত্র ও অস্ত্র। শস্ত্র—যাহা সদ্যঃ বধ করে, এমন আয়ুধ—যথা, তরবারি, গদা ইত্যাদি। অস্ত্র—যাহা উজ্জ্বল ও দূর হইতে নিক্ষিপ্ত হয়—বাণ, চক্র, শূল ইত্যাদি। মতান্তরে, শস্ত্র—অভিমন্ত্রিত দিব্য অস্ত্র; অস্ত্র—অনভিমন্ত্রিত।

(৫৬) গজ-অশ্ব-বৃষ-উষ্ট্রগণের পল্যাণ-নির্ম্মাণ-জ্ঞান—পল্যাণ—পৃষ্ঠাস্তরণ, জিন। পল্যয়ন শব্দটি অভিধানে পাওয়া যায়—(১) জিন, (২) অশ্বরজ্জু, লাগাম।

(৫৭) শিশুর সংরক্ষণ-জ্ঞান—শিশুপালন।

(৫৮) শিশুর ধারণ-কৌশল—ছেলে নেবার জ্ঞান।

(৫৯) শিশুক্রীড়ন—ছেলের সঙ্গে কিরূপে খেলিতে হয় তাহার জ্ঞান।

(৬০) অপরাধিজনের প্রতি যথোপযুক্ত তাড়নের জ্ঞান।

(৬১) নানাদেশীয় বর্ণসমূহের সম্যগ্‌রূপে লেখন-জ্ঞান। বর্ণ—অক্ষর। Palaeography এই কলার বিষয়।

(৬২) তাম্বূল-রক্ষা-করণ-জ্ঞান। যাহাতে পান রাখা যায়—পানের বাটা বা ডিবা, তাহার নির্ম্মাণ-জ্ঞান এই কলার বিষয়।

এতদ্ব্যতীত কলাসমূহের দুইটি গুণ—আদান ও প্রতিদান। (৬৩) আদান—আশুকারিত্ব—শীঘ্র শীঘ্র কলাক্রিয়ার অনুষ্ঠান। যিনি যত শীঘ্র কলা-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিপুণ, তিনিই তত বড় কলাবিৎ। (৬৪) প্রতিদান—চিরক্রিয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বকরণও কলার গুণবর্দ্ধক হয়—তাড়াতাড়ি করিলে কোন কাজ হয় না। এই আদান ও প্রতিদানকেও শুক্রনীতিসারে কলাদ্বয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, শুক্রনীতিসারের মতে ললিত-কলার সংখ্যা মোট চতুঃষষ্টি মাত্র।

ঘরের ডাক (গল্প)

শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী

ভূষণ এলো সহরে—

মেদিনীপুর জেলার কোন এক অজ্ঞাত গ্রামে তার বাড়ী—সহরের খ্যাতি বরাবর কানেই শুনেছে, চোখে দেখার সৌভাগ্য তার কোনদিনই হয় নি।

ছোট্ট গ্রামেই মানুষ সে, সেইটুকুর মধ্যেই ছিল তার সীমানা। স্বামী মাঠের কাজ করতো—ভূষণ ঘরে বসে তার ভাত রাঁধতো—গরুর কাজ করতো।

গৃহলক্ষ্মী ভূষণ—

ভোরবেলায় ঘুম হতে উঠে দরজায় জলের ছড়া দেওয়া, উঠান ঝাঁট, বাসিকাজ করা, তাহার পর স্নানান্তে রান্না বান্না করা, স্বামীর আহার্য্য মাঠে নিয়ে যাওয়া এই ছিল তার নিত্যকার কাজ।

সেদিন সে স্বপ্নেও ভাবেনি তাকে সহরে আসতে হবে সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানি ছেড়ে।

কি কুক্ষণেই যুদ্ধটা বাধলো—

যুদ্ধ বাধলেও যতদিন মাঠে মা-লক্ষ্মী তার আচলের সোণা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, ততদিনও ভূষণ এদিনকার কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু কি যে হল—মাঠে প্রচুর ধান জন্মালেও ঘরের গোলায় উঠলো না তার কিছু—রামহরি ব্যাপারীর কাছ হতে আগাম বেশী টাকা পেয়ে মাঠ হতে ধান বিক্রয় করে টাকা নিয়ে এলো—

ভূষণের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো; স্পষ্টই সে বলে ফেললে, টাকাতো খাব না, ধানগুলোকে দিয়ে এলে—এর পর খাব কি?

রামহরি খাওয়ার ভাবনা করে না—

আসল কথা তার ছিল বহুদিন হতে একটা বেহালার ঝোঁক—টাকা পেয়েই সে একটা বেহালা কিনে ফেললে।

চললো তার বেহালার আরাধনা—

নিঃশব্দে ভূষণ চোখের জল ফেলে। স্বামীর অধঃপতনের সংবাদ সে পেয়েছে, কাজে যাওয়ার নাম করে সে প্রায় বেশী রাতে ঘরে ফেরে, মাঝে মাঝে রাতে অনুপস্থিতও থাকে।

ভূষণ চোখের জল মোছে, আর্দ্র কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শুষ্ক করে সে বলেছে, একা রাতে ঘরে থাকতে আমার যে ভয় করে গো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যত রাতই হোক, ঘরে এসো।"

রামহরি মুখভঙ্গি করে—আহা আমার খুকুমণি—রাতে ঘরে থাকতে ভয় করে। আমায় কাজ করতে হবে না, তোমায় পাহারা দিয়ে থাকতে হবে ঘরে।

সেই রামহরি হঠাৎ চলে গেল যুদ্ধে।

সামনে আসছে দুর্ভিক্ষ তার করাল বদন ব্যাদান করে, এ সময়ে রামহরি সুযোগ পেলে; তার স্বাস্থ্য ভালো, বয়স কম, চট করে সে যুদ্ধে নাম দিয়ে ফেললে।

সৈনিকের মত প্যাণ্ট, জুতা, মোজা, জামা, টুপি পরে বাড়ী এসে স্ত্রীকে সে বলে গেল—সে বর্ম্মামুলুকে যাচ্ছে, অনেক টাকা সেখানে পাবে। ব্যবস্থা করে যাচ্ছে মাসে মাসে এখানে যাতে টাকাটা আসে।

সেদিন ভূষণ আছড়ে পড়ে কেঁদেছিল। যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রামে কারও সন্দেহ ছিল না। যুদ্ধে লোক নেওয়ার জন্য এখানে যখন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসেন, তখন মেয়েরা সকলেই নিজের নিজের স্বামী পুত্র ভাইকে নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

এ গ্রামের আর কেউ যায় নি, গেছে একা রামহরি, বুক ফুলিয়ে সে চলে গেছে, সকলকে জানিয়ে গেছে—সে যুদ্ধে যাচ্ছে, খাস গভর্ণমেণ্টের সিপাই সে, কাউকে আর সে পরোয়া করে না।

গ্রামের গৃহলক্ষ্মী ভূষণ—সে এখন কলে কাজ নিয়েছে।

উপায় নাই—তার পেটের ভাত পরণের কাপড় জুটাতে হবে, কে তাকে দেবে? এখানে এসে প্রথম দিন সে কারও দরজায় হাত পাততে পারে নি আর সকলের মত। তাদেরই গ্রামের তারা এর মধ্যে বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করে ভিক্ষা চাইতে পারে, কোনদিন তার খাওয়ার অভাব হয় নি।

ভূষণ চাইতে গিয়ে পারে না, দুই পা এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে যায় তিন পা।

তারা ভ্রূকুটি করে—আ মর্ হতভাগি, অত সরম কিসের, পথে দাঁড়িয়ে আবার ঘোমটা? তবে মর পথের ধারে ওদের মত করে।

একদিন তারাও তাকে ছেড়ে গেল—

অসহায়া ভূষণ কাজের চেষ্টায় ঘুরলো—যদি কোন ভদ্র-পরিবারে কাজ পায়।

তার আশা আছে, একদিন তার স্বামী মস্ত বড়লোক হয়ে ফিরবে, সে দিন সে ফিরে যাবে তার নিজের বাড়ীতে। যত দিন না আসে ততদিন এমনি কষ্ট করে সে দিন চালাবে।

একটা বাড়ীতে সে কাজ পেল বিনা বেতনে, কেবল দুই বেলা ভাত খেতে পাবে এই অঙ্গীকারে।

তবু তো দুবেলা ভাত পাবে—

ভূষণ রাজী হল—কাজও সে করতে লাগল। মাত্র তিন দিন পরে চুরির অপরাধে তার কাজ গেল। নিরপরাধিনী গ্রামের মেয়ের সত্য কথা কেউ বিশ্বাস করলে না, তাকে বাড়ীর লোক তাড়িয়ে দিলে, দয়া করে তাকে পুলিসে দিলে না।

এর পর আরও কয়েক জায়গায় সে কাজ পেলে—কাজ সে করতে পারলে না।

সহরকে সে বিশেষ করে চিনেছিল। গ্রাম হতে সে সহরের অনেক সুখ্যাতি শুনেছিল, একবার সহর দেখবার ইচ্ছাও তার ছিল। সে সহর যে এমন ভয়ানক তা সে জানতো না।

মানুষ চায় তাকে—তার কাজকে নয়। কাজ করতে নেমে সে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করলে,—আতঙ্কে গ্রামের মেয়ে শিউরে উঠলো!

ভূষণ আবার গ্রামে ফিরতে চায়। এর চেয়ে গ্রামের বুকে অনাহারে মরাও তার ভালো, সে সহর চায় না।

গ্রাম ভূষণকে ডাকে—ওরে গ্রামের মেয়ে, শ্যামল গ্রামের

শান্ত বুকে ফিরে আয়, এখানে তোর জন্ম, এখানেই তোর মৃত্যু হোক।

ফিরবার মুখে বাধা দিলে তারা। এই কলে সে কাজ করে, দুঃখ তার কতকটা ঘুচেছে এ কথা তার চেহারা দেখে স্বীকার করতেই হবে।

বললে, দেশে ফিরে গিয়ে মরবি ভূষণ, কোথায় দাঁড়াবি—কিই বা খাবি? ঘরও নেই—খাবারও নেই সব শেষ হয়ে গেছে যে—

ভূষণ কেঁদে বলে, তবু আমায় গাঁয়ে ফিরতে হবে তারা, উনি যদি ফিরে আসেন—

তারা ঠোঁট উলটে বলে, আর উনি ফিরেছেন। শুনছি ও দেশে যারা যায় তারাই এক একটা বর্ম্মিনী মেম বিয়ে করে, দিব্যি সুখ-স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কেটে যায়, আর এখানে তোমার মত হাঁদা বউগুলো মরে হাহাকার করে।

ভূষণের মন বলে—সেই ভালো, ওরে, সেই ভালো। ঘর যাকে আশ্রয় দিলে না, আকাশের অনন্ত বুকে যাব কল্পনা মায়াজাল রচনা করেই চললো শুধু, তার পক্ষে সেই ভালো।

সে সম্মতি জানালে। পরম নির্ভরতায় ব'ললে, তাই চল তারা, কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চাস্ চল, আমি যাব।

ভূষণ চলে তারার সঙ্গে।

দেখতে দেখতে চলে কলকারখানা, কুলী, মজুর, বাবু—সাহেব।

ওর স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, লাবণ্যময় দেহের ওপর স্পর্শ ক'রে যায় সকলের লোভাতুর, ক্ষুধাতুর দৃষ্টি। ভূষণ তা দেখে সঙ্কুচিত হয়, তবু তাকে একদিন ঘটনাচক্রে গিয়ে পড়তে হয় ওরই একজন বড় কর্ম্মচারীর হাতে; যে হাতের পরিচর্য্যা তাকে অর্থের প্রাচুর্য্যের অলঙ্কার আর আনন্দ উৎসবের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে এলো ওর ছোট কুঁড়ে ঘর থেকে, ওর সামান্য মাইনের চাকরীর গণ্ডি থেকে। ···ভূষণ এসে দাঁড়ালো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হলঘরে, পুরু গালিচার ওপর।···

ওস্তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ভূষণের পায়ে বেজে ওঠে আজ নূপুর, কণ্ঠে সুরের ঝঙ্কার ওঠে—ক্রন্দনের মৃদু মূর্চ্ছনায়···

বিদেশী বঁধুয়া দিলুয়া,—
বহুত গিয়াভি—!

দিন চ'লে যায়।

ভূষণ ভাবে···, গ্রামের সেই মেয়ে, সেই বধূ, যে একদিন মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে দূর নদীতে আরও পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে হাসিতে গল্পে, পল্লীর পথ মুখর করে আলো-ছায়ায় ঢাকা আঁকা-বাঁকা পথে জল আনতে যেত, সকাল সন্ধ্যায় স্বামীর মঙ্গল কামনায় তুলসীতলায় মাডুলী দিয়ে প্রণাম ক'রতো—সে কি বেঁচে আছে আজও?

না,—না।······

ভূষণ শিউরে ওঠে—না! সে বেঁচে নেই, সে ম'রে গেছে সেইদিন, যেদিন পেটের জ্বালায়, অভাবের তাড়নায় সে কলে কাজ করতে এসেছিল।

আজ যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে সে ভূষণ নয়, ভূষণের প্রেতাত্মা···এর নাম···মণি···মণি বাঈজী। বুকের মধ্যে প্রেতাত্মাই বুঝি কেঁদে ওঠে, আর্ত্ত অসহায়তায় বুকের দরোজায় ঘা মারে সে, চীৎকার ক'রে কাঁদে।

গভীর রাত্রি।

ঘরের মধ্যে পঙ্কিলতার আবর্ত্ত।···

না, না, মণি আর সইতে পারে না; তাই সে এসে দাঁড়ালো বাইরে। বাইরের জগতে আজ তার চাঁদের আলো নেই, চাঁদ পরিপূর্ণ হ'য়ে আকাশে ওঠে নি, তবু এতটুকু নক্ষত্রের আলো, ছোট চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দেখা যায় পথের ওপাশে কে ব'সে বেহালা বাজাচ্ছে। অস্পষ্ট ওর আকৃতি—তবু, তবু—

কে ও? কার বেহালার করুণ সুর ক্রন্দনের মত কানে বাজছে মণির? কে ও?

দারোয়ান জানিয়ে গেল—"ও এক অন্ধ।"

অন্ধ! অন্ধ!—সেই বাজাচ্ছে ঐ বেহালা? কিন্তু ওর সুর যেন চেনা,—বড় চেনা বলেই মনে হয় মণির।—তবু—না! সে সহরের সেরা নর্ত্তকী, অধিকাংশ নাগরিককে যার দরজা থেকে ফিরে যেতে হয়,—সে সেই মণি বাঈ। পথের অন্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

উঃ কত বেলা হয়ে গেছে!···

দুই হাতে চোখ রগড়ে মণি উঠে বসলো বিছানার ওপরে। সামনের জানালাটা খোলা, সেইখান থেকে সকালের রৌদ্র এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। বারান্দায় রাখা কাকাতুয়া কি যেন ব'লছে অস্পষ্ট স্বরে।

"ঈস, রোদ উঠে গেছে।"

মণি উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েই চমকে উঠলো। পথের পাশে বসে বেহালা বাজাচ্ছে কে ঐ অন্ধ? ও সেই ভূষণের স্বামী রামহরি নয়?···হাঁ, ও সেই রামহরিই।

রামহরির সেই সবল দেহ আজ জীর্ণ শীর্ণ, সে আজ অন্ধ। কাঁধের ওপর বেহালাটাকে রেখে সে সুরের পর সুরেরই আলাপ করে চলেছে কেবল।

মণি চমকে উঠলো। নিজের অজানিত ভাবে সে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো, তারপর সিঁড়ি বেয়ে এসে দাঁড়ালে পথে—যেখানে বসে অন্ধ বেহালা বাজাচ্ছিল।

মণি বাঈজীর পরণে আজ সাধারণ একটা শাড়ী, একটা সেমিজ। কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকলে:

শুনছো,—

কে, কে তুমি?

রামহরি চমকে উঠলো। এ গলার স্বর যেন তার চেনা। রামহরি আর্ত্তস্বরে প্রশ্ন করলে:

তুমি, তুমি কি ভূষণ?

মণি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করতে গিয়েও হারিয়ে ফেললে বলবার মত কথা। দুই চোখের কোল থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো রামহরির হাতের ওপর। বললে:

না, আমি ভূষণ নই, তার প্রেতাত্মা, সহরের বাঈজী মণিবাঈ।"

রামহরির বিবর্ণ ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠলো :

তবে?

অসম্পূর্ণ এ প্রশ্নের উত্তরে মণি একটু চুপ করে থাকলো, তার পরে স্পষ্টস্বরে জবাব দিলে :

তবু সে আত্মা তার অতীতের ইতিহাস ভুলতে পারে নি, তাই আজ সব ফেলে কেবল তোমার হাত ধরেই ফিরে যাবে তার গ্রামে, তার মাটির ঘরে, তার প্রদীপের আলোয়। চল, ওঠো।

অন্ধ রামহরির হাতখানা একবার কেঁপে উঠলো, তার পরে ভূষণের হাতখানা ধরেই উঠে দাঁড়ালো সে, বললে :

বেশ, তাই চলো, আমায় নিয়ে চলো যেদিকে তোমার ইচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদে বিভ্রান্ত

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আদম সুমারের হিসাবে প্রকাশ, ভারতের লোকসংখ্যা অতিশয় বাড়িতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ ছিল, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সেই ভারতের লোক একেবারে ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ বৎসরে ৭ কোটি ২ লক্ষ লোক বাড়িয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যত লোক ছিল, তাহার প্রায় দ্বিগুণ নূতন লোক এই অন্নক্লিষ্ট দেশে অধিক জন্মিয়াছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে সর্ব্বসাকল্যে এই ভারতে প্রায় ১০ কোটি লোক বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবল সেই ভারতে ৫ কোটি লোক বৃদ্ধি! এত লোক খাইবে কি? এই হারে ভবিষ্যতে লোক বাড়িলে ত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষের শোকার্ত্ত লোকের তপ্তশ্বাসে ধরণীর বক্ষ ফাটিয়া যাইবে। কি ভীষণ!!

সমস্যাটা লইয়া দিন কয়েক ধরিয়া লোকের মনে একটা ভাসা ভাসা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া কথাটা চাপা পড়িয়াছিল। সম্প্রতি ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব সার জিরেমী রেইসম্যান অবসর লইয়া বিলাতে গিয়াছেন। যাইয়াই তিনি রয়টারের বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, "ভারতবাসীদিগের জন্য ভাল খাইবার এবং থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছ, তা বেশ। কিন্তু যে দেশে প্রতি বৎসর এক কোটি করিয়া লোক বাড়িতেছে, সে দেশে তাহা করা যাইবে কি? এ কাণ্ডটা কেমন হইতেছে জানেন? কোন লোক একখানা বাড়ি প্রস্তুত করিতেছে। তাহার পরিবারে এখন দশ জন লোক। কিন্তু সে জানে যে তাহার বাড়ি যখন সম্পূর্ণ হইবে তখন তাহার পরিবারে বার জন লোক হইবে। ভারতবাসীদিগকে অশন এবং অবস্থানের উন্নতি সাধনের এই চেষ্টাটা সেই রকম (নির্ব্বুদ্ধিতামূলক) হইতেছে।" চার্চ্চিল এমেরী প্রভৃতি ঝুনো সাম্রাজ্যবাদীর পোঁধরা সার জিরেমী কোন ধর্ম্মনীতির (ethics) ধার ধারেন না, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইঁহারা বলেন, আজকালকার বাজারে ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা অর্থনীতিই সমধিক কল্যাণজনক। সুতরাং ছেঁদো কথায় লোককে ভোগা দেওয়াতে দোষ নাই। নতুবা বৎসরে এক কোটি করিয়া ভারতে লোক বাড়িতেছে, ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? আদম সুমারের হিসাবেই দেখা যায় যে উহার হিসাব বেদবৎ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায় যে গত ১০ বৎসরে কোন সময়েই ভারতে এত অধিক হারে লোক বাড়ে নাই। সার জিরেমী রেইসম্যান কেবল সেই "পসড়া" ম্যালথাসী থিওরীর ভূত নামাইয়া লোকের মনে একটা ঘোলাটে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন নাই। তিনি বিনা মূল্যে ঐ সামাজিক ব্যাধির একটা অমোঘ ঔষধও বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে "ভারত সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য লোকসংখ্যার হ্রাস। অতএব সকলকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য কর। তাহা হইলে ভারতে এত অবাঞ্ছনীয় লোক জন্মিবে না।" আমরা সার জিরেমীকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহার জনক-জননী যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ভারত সরকার এমন গুণমণ্ডিত এবং অতি-পণ্ডিত পরামর্শদাতা পাইতেন কোথায়?

১৩১৫ খৃষ্টাব্দের পর আর ইংলণ্ডে কোন দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পর কোন প্রকার মহামারীও দেখা দেয় নাই। কিন্তু এই ৬ শত বৎসরে বিলাতের লোক সমানুপাতে বাড়িয়াছে কি? এখন ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের লোকসংখ্যা ৪ কোটি কিম্বা সাড়ে ৪ কোটি হয়। তবে আর ঐ ম্যালথাসী মামদোর ভয়ে লোককে আতঙ্কিত করা কেন?

অথচ প্রত্যেক দেশের জমির একটা সীমা এবং পরিমাণ আছে। উহার উৎপাদিকা শক্তিরও একটা শেষ সীমা থাকিতে পারে। কিন্তু সে সীমা কোথায় তাহা এখনও নিশ্চিত বলা যায় না। বিজ্ঞানবলে, মানুষ উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। তৃতীয় হেনরী এবং দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্ব কালে বারিপাতের সামান্য বিপর্য্যয় হেতু বিলাতের লোকের ঘোর কষ্ট হইয়াছিল, এখন সেই ইংলণ্ডে পৌণে দুই কোটি লোক স্বদেশে উৎপন্ন শস্যে জীবন ধারণ করিতেছে। তবুও ইংরাজজাতি কৃষির উন্নতি সাধনে তাদৃশ অবহিত নহেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা গড়ে ১০ জন হিসাবে এবং তাহার পরবর্ত্তী দশবৎসরে শতকরা ১৫ জন হারে বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আদম সুমারের হিসাবে প্রকাশ। ধর্ম্মমত ভেদে বিভিন্ন নির্ব্বাচনমণ্ডলী প্রবর্ত্তনের পরই দ্রুতগতিতে এই লোক বৃদ্ধির ব্যাপার দেখা দিয়াছে। বিহারের ভূমিকম্প কোয়েটার ভূমিকম্পেতেও বহু লোক মরিয়াছে। ১৯৩১, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ ব্যাধিতে মৃত্যুর সংখ্যা

অতিশয় অধিক হইয়াছে। তথাপি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরে শতকরা পঞ্চদশজন হারে বাড়িয়া গেল!

সম্প্রদায় ভেদে এবং দলভেদে যদি সরকার সুবিধা করিয়া দিতে সম্মত হন, আর মুখে বলেন যে, তাঁহারা গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী, তাহা হইলে প্রত্যেক দল ও সম্প্রদায় যে গণনায় তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রদর্শনের চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ চেষ্টা যে হইয়াছিল, তাহা ১৯৩১ অব্দের গণনার সময় অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশও পাইয়াছিল। উহার লক্ষণও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে স্পষ্ট প্রকাশিত। ঐ বৎসরের বাঙ্গালার রিপোর্টে সুবর্ণ বণিক জাতির হিসাব ভুল হইয়াছে। শিক্ষায়, সদাচারে, ধনে, মানে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে যে জাতি বাঙ্গালায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের কথাই রিপোর্টে বর্জ্জিত!! এ দোষ ঘটিল কেন? এরূপ রিপোর্ট কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যায়! শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত এই বৎসরকার রিপোর্টের আরও কতকগুলি মারাত্মক ভুল তৎকালীন মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে সে সমস্ত কথার আলোচনার স্থান হইবে না। একটা অদ্ভুত ভ্রমের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে দেখাইব। জেলিয়া, যুগী, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য, বৈদ্য এবং ব্রাহ্মরা খাঁটি বাঙ্গালী—এদেশবাসী। ইহাদের নারীরা কেহ স্বামীকে দেশে রাখিয়া বিদেশে প্রবাস করিতে যায় না। যে সকল নারীর পতি মৃত, তাহারা বিধবা widow বলিয়া এবং পুরুষ বিপত্নীক তাহাদিগকে widower বলিয়া রিপোর্টে ধরা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখা যায় যে, মাহিষ্যদিগের মধ্যে বিবাহিত নারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ২ শত ৭৯ জন আর বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭০ হাজার। অর্থাৎ বিবাহিত নারীর সংখ্যা অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অধিক। এইরূপ নমঃশূদ্র, যুগী, জেলিয়া, কৈবর্ত্ত, ব্রাহ্ম, বৈদ্য, কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিতে বিবাহিতা নারী অপেক্ষা বিবাহিত নরের সংখ্যা অধিক দেওয়া হইয়াছে। ঐ অধিক সংখ্যক বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীরা কোথায় গেল? অন্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের বিবাহিত পুরুষেরা নারীদিগকে দেশে রাখিয়া বাঙ্গালায় চাকুরী করিতে আসিতে পারে; জেলে, যুগী, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, বৈদ্য উপাধি ত বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব। নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে বিবাহিত নারী অপেক্ষা বিবাহিত নরের সংখ্যা ৭ হাজার ২ শত ৭৭ জন অধিক। ইহা কি বিশ্বাস্য?

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখা গেল বাঙ্গলায় লোক সংখ্যা ১ কোটি বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যত অধিক লোক বাড়িয়াছে এত অধিক হারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন আর কোন প্রদেশে বাড়ে নাই। সীমান্ত প্রদেশে লোক অধিক ছিল না, তথায় লোকের বসতি বিরল, সুতরাং তথায় লোক আসিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু পঞ্চনদ এবং বাঙ্গালায় এত অধিক লোক বৃদ্ধি হইল কেন? উভয় প্রদেশেই জনসংখ্যা শতকরা ২০.৩ এর অধিক হইল। বাঙ্গলায় লোকের বসতি যত ঘন,—এত আর অন্য প্রদেশে নাই। কাজেই এই প্রদেশে এত অধিক হারে লোক-বৃদ্ধি লোকের মনে সন্দেহের সঞ্চার করে। বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির প্রকোপ প্রায় অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। পাঞ্জাবে ও এখানে সাম্প্রদায়িকতাও অত্যন্ত তীব্র। তাহার উপর জিন্নার পাকিস্থান প্রস্তাব আছে। বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানদিগের সংখ্যাগত তারতম্য অধিক নহে। ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মুসলমান আর ২ কোটি সাড়ে পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু। সুতরাং পার্থক্য প্রায় ৭৯ লক্ষের কিছু উপর। বাঙ্গলার ১৯ লক্ষ আদিম জাতীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দু হইলেও এবার গণনায় তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ধরা হয়। নতুবা হিন্দুর সংখ্যা প্রায় মুসলমানের সমান হইত। যাহা হউক এই প্রদেশে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য লীগপন্থী মুসলমানদিগের যেমন আগ্রহ, হিন্দুদিগের তেমনই ভয় বিদ্যমান। হিন্দুর সংখ্যা অধিক হইলে আর পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হইতে পারে, মুসলমান সংখ্যা অধিক দেখাইতে পারিলে পাকিস্থান এখানে পাকাপাকি হইতে পারে। কাজেই উভয় পক্ষের ইচ্ছা যে এ প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা অধিক হয়। সেই ইচ্ছার ফলে বাঙ্গালায় আদমসুমারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, তাহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। নতুবা অন্য কোন প্রদেশে এমন কি দেশীয় রাজ্যে কুত্রাপি এত অধিক হারে লোক বাড়ে নাই। বাঙ্গালায় ভিন্ন দেশ হইতে এবং ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

জন্ম-সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পায় কোথায়? প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যেখানে দারিদ্র্য এবং ব্যাধির ফলে মৃত্যু অধিক হয় সেইখানেই জন্মসংখ্যা বাড়ে। কিন্তু যদি দরিদ্র ও ব্যাধির অতিশয় প্রাবল্য হেতু অত্যন্ত অধিক লোক মরিতে থাকে, তাহা হইলে জন্মসংখ্যা বাড়িতে পারে না কথা সত্য। নিম্নে কয়েক বৎসরে বৃটিশ ভারতে হাজার করা কত লোক বাড়িয়াছে ও মরিয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

খৃষ্টাব্দ	মৃত্যু	জন্ম	জন্মাধিক্য
১৯৩১	২৫	৩৫	১০
১৯৩২	২২	৩৪	১৩
১৯৩৩	২৩	৩৬	১৩
১৯৩৪	২৫	৩৪	৯
১৯৩৫	২৪	৩৫	১০
১৯৩৬	২৩	৩৬	১৩
১৯৩৭	২২	৩৫	১৩
১৯৩৮	২৪	৩৪	১০
১৯৩৯	২২	৩৪	১২
১৯৪০	২২	৩৩	১১

এখানে দেখা যায় যে, মৃত্যুর হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কিছু জন্মের হার বাড়িয়া গিয়াছে। তবে মানুষ যে দিন গর্ভস্থ হয়, সে দিন ভূমিষ্ঠ হয় না, যাহারা এই বৎসর এপ্রিল মাস ও তাহার পর গর্ভস্থ হয়, তাহারা পর বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে থাকে। কাজেই ইহার অধিকাংশ বৃদ্ধিই পরবৎসর দেখা দেয়। আদমসুমারে লোক সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি করিলে হাজার করা হারেও ভুল

হইবে। জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টারের দোষেও ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে। অন্যান্য সভ্য দেশের হিসাব দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, যে দেশের সাধারণ লোক সমৃদ্ধ এবং দেশে ব্যাধি খুব কম, সে দেশে মৃত্যুর এবং জন্মের হার অত্যন্ত অল্প। নিম্নে কয়েকটি উন্নত ও স্বাস্থ্যকর দেশের হাজার করা জন্ম এবং মৃত্যু ও বৃদ্ধির হার প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	মৃত্যু	জন্ম	জন্মাধিক্য
ইংলণ্ড এবং ওয়েল্স	১২·২	১৫·৫	
স্কটল্যাণ্ড	১৩·৪	১৭·৯	৪·৫
আয়ারল্যাণ্ড	১৪·২	১৯·২	৪·৯
সুইজারল্যাণ্ড	১১·৭	১৫·২	৩·৫
সুইডেন	১১·৫	১৫·৩	৩·৮
মার্কিন	১০·৮	১৭·৯	৭·১
জাপান	১৭·৪	২৬·৭	৯·৩
নরওয়ে	১০·৭	১৭·৬	৫·৯
জার্ম্মাণী	১২·৩	২০·৩	৮·০

উল্লিখিত হিসাব যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অথবা প্রথম বৎসরের। ঐ সকল ধনবান ও স্বাস্থ্যকর দেশের জন্মমৃত্যুর হারের বিশেষ ভিন্নতা হয় না, ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, জন্মের হার বৃদ্ধি করিবার শতচেষ্টা করিয়াও জার্ম্মাণী হাজারকরা বিশ জনের অধিক জন্মের হার বৃদ্ধি করিতে পারে নাই; কিন্তু আমাদের দেশে জন্মের হার হাজার করা ৩৩টির কম হয় না। উহা ৩৫-৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রায়ই উঠে। কারণ আমাদের দেশের মৃত্যুর হার জার্ম্মাণীর মৃত্যুর হারের দ্বিগুণ। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের মৃত্যুর হার যেমন আমাদের দেশের অর্দ্ধেক, ঐ সকল দেশের জন্মের হার তেমনই আমাদের দেশের জন্মের হারের অর্দ্ধেক বা প্রায় অর্দ্ধেক। স্কটল্যাণ্ডের লোকের আর্থিক অবস্থা ইংলণ্ডের লোকের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষা কিছু হীন, সেখানে জন্মের এবং মৃত্যুর হারও ইংলণ্ডের জন্মমৃত্যুর হার অপেক্ষা সামান্য অধিক। মার্কিণের হিসাব দেখিয়া মনে হইতে পারে যে তথায় মৃত্যুর হার বিলাতের সমান হইলেও জন্মের হার অধিক কেন? তাহার কারণ মার্কিণের আর্থিক অভ্যুদয় নূতন। তথাকার কৃষি অঞ্চলের লোকের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেও তথায় কৃষীবলের বন্ধকী ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ শত কোটী ডলার। এখন তাহারা ধনী হইয়াছে। সেইজন্য মৃত্যুর হার কমিয়াছে, জন্মের হার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এখন মার্কিণ সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য দেশ বটে, কিন্তু সে এখনও অতীত অবস্থার ভোগ শেষ করিতে পারে নাই। গ্রীস ও ইটালী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এবং ব্যাধিবিড়ম্বিত। সে দেশে মৃত্যুর এবং জন্মের হার কিছু অধিক। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দারিদ্র্য এবং ম্যালেরিয়ার ন্যায় জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণকারক ব্যাধির প্রসার থাকিলে মৃত্যু তথা জন্মের হার অধিক হইয়াই থাকে। উহা কমাইতে হইলে দেশকে শিল্পপ্রধান ধনাঢ্য এবং জীর্ণতাসাধক ব্যাধিবর্জ্জিত করিতে হইবে। অন্য পথ নাই।

আমাদের দেশে দারিদ্র্য এবং ব্যাধির জন্য যেমন অধিক লোক মরে, তেমনই প্রকৃতি তাঁহার পরিপোষণী শক্তির প্রভাবে এদেশের জন্মের হার বাড়াইয়া দেন। সেই জন্য এদেশে অধিক শিশু মরশুমী কুসুমের মত ফুটিয়া অল্পদিন পরে মরিয়া যায়। অবশিষ্ট যাহারা থাকে তাহারা দুঃখপূর্ণ জীবন কোনরূপে টানিয়া আনিয়া বুভুক্ষু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

এ দেশের লোক অত্যন্ত অল্পায়ু। ইহারা গড়ে প্রায় ২৭ বৎসর বাঁচে। অন্য দেশের তুলনায় ইহা অত্যন্ত অল্প। যথা মার্কিণে শ্বেতকায় অধিবাসীরা গড়ে প্রায় ৬৩, ইংরেজ এবং জার্ম্মাণ উভয় জাতির প্রত্যেকে ৬১, ফরাসীরা ৬৪, ফিনিসিয়ান ৫৩, রুশিয়ানরা ৪২ এবং জাপানীরা সবে ৪৭ বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হয়। অতএব অন্যান্য সভ্যদেশে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ যত দেখা যায় ভারতে তাহা দেখা যায় না। ৭০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক লোক এদেশে নাই বলিলেও চলে। অন্যদেশে ৭০ বৎসর বয়স্ক লোক অন্ততঃ আরও ১৫ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিবে বলিয়া লোক আশা করে। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ শিশু এক বৎসরের মধ্যে যমালয়ে যায় আর ৩০ লক্ষ বালক-বালিকা দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। এ-দেশে প্রতি বৎসর ১২ হইতে ১৩ লক্ষ লোক কেবল মাত্র ম্যালেরিয়ায় মরে। অন্য প্রকার জ্বররোগে, যথা টাইফয়েড, কালাজ্বর; যকৃত, বিকৃতিজনিত জ্বর প্রভৃতিতে বহুলক্ষ প্রতি বৎসর ভবের খেলা সাঙ্গ করে। কর্ণেল রাসেল একবার হিসাব করিয়া দিয়াছিলেন যে, ১৯০১ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বৃটিশ শাসিত ভারতেই ১ কোটি সাড়ে ৭ লক্ষ লোক কলেরায় মরিয়াছিল। সুতরাং প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পৌণে ৪ লক্ষ হারে লোক কলেরায় মরিয়াছিল। প্লেগে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গড়ে বৎসর বৎসর সওয়া ২ লক্ষ করিয়া লোক মরে! আজকাল টিউবওয়েল হওয়াতে কলেরা রোগে কিছু কম লোক মরিতেছে। তথাপি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার লোক এই কলেরারোগে পঞ্চত্ব পায়। অধিকাংশ লোকই চিকিৎসকের সাহায্য পায় না। এ দেশে প্রতি ৯ হাজার লোকের মধ্যে একজন করিয়া চিকিৎসক, তাহাও আবার তাহার মধ্যে ৯০ জন চিকিৎসক সহরে চিকিৎসা করেন। সার জিরেমী বিলক্ষণ জানেন যে, এ-দেশের লোকের দারুণ দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়ার বিস্তার হেতু মৃত্যুর সংখ্যা ও তাহার প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার ফলে জন্মের হার অত্যন্ত অধিক। ডাক্তার জে, টি, গ্রাণ্টের মতে "এদেশের লোকের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষীণ এবং রোগবিতাড়ন শক্তি অতিশয় হীন। অনাহার এবং দুর্ব্বলতাজনিত রোগগুলিই এ-দেশে অত্যন্ত অধিক"। তথাপি এ-দেশের লোক পালে পালে বৃদ্ধি পাইতেছে, —"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম।" সাম্রাজ্যবাদী সার জিরেমীর দৃষ্টি এদিকে পড়িল না কেন? হায় সাম্রাজ্যবাদ! মেজর জেনারেল সার জন মেগ (Megaw) ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এ-দেশের একশত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৯ জন ভালভাবে পুষ্টিকর খাদ্য পায় আর বাকী ৬১ জন শরীর পোষণের উপযোগী পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। তন্মধ্যে শতকরা ২০ জন অত্যন্ত অনশনক্লিষ্ট। সুতরাং এরূপ দরিদ্রদেশে

অতি অল্পই আছে। তাই এখানে মৃত্যুর ও জন্মের হার অত্যন্ত অধিক।

যাহারা পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায়, তাহাদের যে সন্তান কম মরে এবং কম জন্মে তাহা সর্ব্বত্র ধনাঢ্য লোকের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়, বড় বড় জমিদার ব্যবসায়ী, ব্যবহারাজীব প্রভৃতির হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তাহাদের কাহারও অধিক সন্তান জন্মে না। অনেকের পোষ্যপুত্র লইয়া বংশধারা রক্ষা করিতে হয়। আর বৈকুণ্ঠ মুচি, তুষ্ট, কাওরা, প্রভৃতির ১৫-২০টি করিয়া সন্তান হইতেছে। সুতরাং ব্যাধি এবং দারিদ্র্য কমাইলেই মৃত্যু এবং জন্মের হার কমিয়া যাইবেই যাইবে? যেখানে লক্ষ্মীভাগ্যের অভাব, সেইখানেই যষ্ঠীভাগ্য অধিক।

এখন দেখা যাউক ভারতের খাদ্যশস্যের ক্ষেত্র হইতে এ-দেশের লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব কি না? ভারতে আজকাল গড়ে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে গম এবং ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রতি একর জমিতে ৯ মণের অধিক কিছু চাউল জন্মিয়াছিল; কিন্তু ঐ বৎসর মার্কিনে জন্মিয়াছিল প্রতি একরে ১৮ মণ চাউল। জাপানে জন্মিয়াছিল প্রতি একরে ২৮ মণ আর ইটালীতে জন্মে সাড়ে ৩৬ মণ। অর্থাৎ একই পরিমাণ জমিতে ভারত অপেক্ষা মার্কিনে দ্বিগুণ, জাপানে তিনগুণ এবং ইটালীতে ৪ গুণ অধিক চাউল জন্মে। আমাদের দেশেও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ব্যবস্থাপূর্ব্বক গোময়ের সার ও কিঞ্চিৎ কেনাইট দিলে ধান্যের এবং বিচালীর ফলন আড়াই গুণ হইতে ৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। সোরা দিলেও গমের ফসল বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২ কোটি ১৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল, উহা কেবলমাত্র ভাল করিয়া গোময়ের সার দিলেই ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টনে পরিণত করা যাইত। গোধুম জন্মিয়াছিল সাড়ে ৯৯ লক্ষ টন। উহাও ভাল করিয়া সার দিলে ১ শত ৯৯ লক্ষ টনে পরিণত করা সম্ভব হইত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য খাদ্য-শস্যও প্রায় ২ কোটি টন জন্মিতে পারে। এখন সর্ব্বসমেত ভারতে পাঁচ কোটি টন খাদ্যশস্য জন্মে। উহা একটু চেষ্টা করিলেই ১০ কোটি টনে বর্দ্ধিত করা যায়। এখন ভারতের পক্ষে কেবল ৫০ লক্ষ টন খাদ্যের অভাব। সুতরাং এ অভাব সহজেই পূর্ণ করা সম্ভবে। ভারতে খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউল গম, ছোলা, জওয়ার এবং বজরাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে প্রায় ২৪ কোটি লোক চাউল খায়। ধান্যের আবাদ হয় প্রায় ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ একার জমিতে। গড়ে প্রতি একর জমিতে যদি ৯ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে ১৮ মণ চাউল উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে এই ভারতে ১২৩ কোটি মণ চাউল উৎপন্ন হয়। ২৪ কোটি লোকের খাইবার পক্ষে ৯৬ কোটি মণ চাউলই যথেষ্ট। অবশিষ্ট ২৭ কোটি মণ চাউল, এই ভারত হইতে রপ্তানি করা যাইতে পারে। অথবা চাউল খাইবার লোক ত্রিশ কোটী হইলেও একজন মাত্র ভারতবাসীরও অনাহারে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিবে না। গম হয় ২ কোটি ৬৬ লক্ষ একর জমিতে, ফলে প্রায় ২১ কোটি ২৫ লক্ষ মণ, উহার ফলন বৃদ্ধি করিয়া যদি ৫৪ কোটি মণে না হউক ৫০ কোটি মণে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ লোকের খাদ্যের কি অভাব হইতে পারে? অবশিষ্ট যব, ছোলা, চীনা (millet) জোয়ার বাজরা প্রভৃতির কথা আর বলা অনাবশ্যক। তবে যব অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যব প্রতি বৎসর প্রায় ভারতে সাড়ে ৫ কোটি মণ এবং জোয়ার প্রায় ১২ কোটি ১৫ লক্ষ মণ এ দেশে জন্মিতেছে। উহার ফলনও অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভবে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বা সুদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসীর অন্নহীন হইবার সম্ভাবনা নাই।

তবে একটা বিশেষ চিন্তার বিষয় এই যে, ভারতের অনেক স্থলেই ম্যালেরিয়ার প্রভাব এবং পাট চাষের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে ভারতে বিদেশী পণ্য সুদূর অঞ্চলে বিক্রয় করিবার জন্য এবং ভারত হইতে কাঁচা মাল সুলভে সংগ্রহ করিবার জন্য যে রাজপথ এবং রেলপথ নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে দেশের স্বাভাবিক জল নিকাশের পথ অত্যন্ত অবরুদ্ধ হওয়াতে এবং বন্যা বন্ধ হওয়াতে জমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। ম্যালেরিয়ার ফলে যে জমির উর্ব্বরা শক্তি কমিয়া যায় তাহা ডাক্তার বেণ্টলী তাঁহার malaria and agriculture নামক পুস্তকে বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, স্যর উইলিয়ম উইলকক্সও সে কথা বলিয়াছেন। এ স্থলে আমি আর সে কথা বলিব না।

আমাদের শেষ কথা এই যে, পৃথিবীতে মানবজাতির কখনই খাদ্যাভাব ঘটিবে না। প্রকৃতি বিবেচনাশূন্য নহেন, এখন সমস্ত পৃথিবীতে ২ শত সাড়ে ১৪ কোটি লোকের বাস। ইহার দশগুণ লোক বৃদ্ধি পাইলেও পৃথিবীতে খাদ্যাভাব ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। জার্ম্মাণরা বিজ্ঞানবলে কাষ্ঠ হইতে মানুষের খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে মানুষের প্রতিভাবলে অনেক স্থলজ বস্তু হইতে খাদ্য প্রস্তুত হইবে। ইহা ভিন্ন এই বিশাল জলনিধির উদ্ভিদ ও মৎস্যাদি হইতে মানুষের প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে।(১) উহার পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নহে। তাই বলি অত উতলা হইবার কারণ নাই। বর্ত্তমানে সভ্য জাতিরা যদি ধ্বংসের জন্য আপনাদের প্রতিভা ও মনীষা মারণঅস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য নিয়োগ না করিয়া প্রকৃতির দানের অবমাননা না করিয়া মানবরক্ষার্থে বিবিধ দিকইতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করেন, তাহা হইলে জগতের বিশেষ মঙ্গল হয়। ধর্ম্মহীন সভ্যতার যাহা দারুণ পরিণাম, অধুনা তাহাই প্রকটিত হইতেছে।

সার জিরেমী রেইসম্যান যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা না বলিয়া ভারত হইতে ব্যাধি নির্ব্বাসন এবং দারিদ্র্য বিতাড়নের কথা বলিতেন, তাহা হইলে তিনি ভারতের বিশেষ উপকার করিতেন। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদ-জনিত দুর্ব্বুদ্ধির বশে ভারতের পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষাদির দায়িত্ব হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কেবল ভারতবাসীর স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া আপনারা সাধু

(১) Another View of Industrialism by W. M. Bowack—page 11 and 12.

সাজিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য ডক্টর এডিথ সামারহিলস সার জিরেমীর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—"সার জিরেমীর কথা নিতান্তই বাজে। উহা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ি যোতার মত একেবারে উল্টা ব্যবস্থা। আসল কথা লোকদিগকে শিক্ষা দাও। স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, সুশিক্ষা দান, পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর ভোজন—এই তিনটিই মূল প্রয়োজন। তাহা হইলেই মূল সমস্যার সমাধান হইবে।" ডক্টর এডিথ ব্যাধি বিতাড়নের কথা বলেন নাই। তিনি হয় ত ভারতের সব কথা জানেন না। যাহা হউক মোটের উপর তিনি ঠিক কথা বলিয়াছেন। ইহাতে সার জিরেমীর আক্কেল হইবে কি?

মেয়ে-দেখা (গল্প)

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

এইটি নিয়ে তিপ্পান্নটি মেয়ে দেখলে প্রশান্ত, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত একটাও সে পছন্দ করতে পারলে না। যার দেহে যেটুকু খুঁত, প্রথমেই সেটা যেন তার নজরে ধরা পড়ে। কারুর নাক চ্যাপটা, কারুর চোখ ছোট, কারুর দাঁত উঁচু, কারুর কপাল চওড়া, কারুর ভ্রূ নেই, কারুর গাল চড়ালো, কারুর সব ভাল কিন্তু মাথায় একেবারেই চুল নেই—মোটকথা নিখুঁত মেয়ে আজ পর্য্যন্ত একটাও তার চোখে পড়ে নি। তার বন্ধুরা বলে, তোর বউ অর্ডার দিয়ে তৈরী করতে হবে, তা না হলে পৃথিবীতে মিলবে না।

অজয় বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, সকলকে থামিয়ে সে বলে, ও যে কিরকম মেয়ে চায় তা ওই জানে না—এই আমার বিশ্বাস। এই বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটা জুতো দিয়ে মাটিতে ঘসতে ঘসতে আবার বলে, ডানাকাটা পরী কোথায় পাবি—আমাদের মত ক'টা লোকের ঘরে সুন্দর মেয়ে দেখেছিস! আর যদি দৈবাৎ সেরকম এক আধটা থাকে ত তোকে দিতে যাবে কেন? তার জন্যে আই, সি, এস, বি, সি, এস, আছে, উকিল ব্যারিষ্টার. মেডিক্যাল কলেজের সদ্য পাশ করা ডাক্তার পাত্রের অভাব কি? তুই কে রে? তিন পয়সার কেরাণী বি-এ পাশ করে সরকারী আফিসে চাকরী করিস্।

বাস্তবিক মেয়ে দেখতে দেখতে প্রশান্তর মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে। পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগত সে মেয়ে দেখে চলেছে। আর শুধু সে একা নয়, তার মা নিজে কত মেয়ে দেখেছেন, তার বাপও যে কত দেখেছেন তার ঠিক নেই। প্রথম ছেলে রোজগারী, তায় বি-এ পাশ, মা বাপের মনে কত সাধ! মা বলেন, একটা পয়সা চাই না, কিন্তু মেয়ে বাজিয়ে নেবো, যে দেখবে সে যেন বলে, হ্যাঁ একটা বৌ বটে!

প্রশান্তরও মনে মনে এই রকম একটা সঙ্কল্প ছিল যে এমন মেয়ে বিয়ে করবে যে বন্ধুবান্ধবদের দেখে তাক লেগে যাবে। তাই জহুরী যেমন ক'রে হীরা মুক্তা যাচাই ক'রে নেয়, সেইভাবে প্রশান্ত খুঁজছিল তার মানসী প্রতিমাকে!

বন্ধুবান্ধবরাও ক্লান্ত হয়ে গেছে তার জন্যে মেয়ে দেখে দেখে। কোনটাই আর তার পছন্দ হয় না। এমনি করে যখন প্রশান্তর বিয়ের বয়েস প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখন একদিন অজয় তাকে লেকের ধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত বোঝালে। বললে, সত্যি করে বল দেখি তুই কোন মেয়েকে ভালবাসিস্ কি না? তা না হলে এমন ত বড় একটা দেখা যায় না। আজ পর্য্যন্ত এত মেয়ে দেখেও একটা পছন্দ করতে পারলি না!

প্রশান্ত বললে, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি, কোন মেয়েকে ভালবাসি না।

তবে এ রকম করছিস কেন? কি তোর মনের ইচ্ছা বল দেখি, আমি যেমন করে হোক তোর এই মাসে একটা বিয়ে দেবোই।

প্রশান্ত বন্ধুর এই কথা শুনে, হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, কি সকালে উঠে যার মুখ দেখবি তার সঙ্গে বিয়ে দিবি নাকি—সেই ছেলেবেলার গল্পের বইয়ে যেমন পড়েছিলুম?

অজয় বললে, না না ঠাট্টা নয়—বিয়েরও একটা বয়েস আছে। এটা ত মানিস, বাঙ্গালীর ছেলের আর পরমায়ু ক'দিন অথচ তোর ত এদিকে বোধ হয় তিরিশ পেরুল!

প্রশান্ত বললে, তা বলে যা তা একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না। আমার মন সকলের মত নয়! যাকে আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে না পারবো তার সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করতে কিছুতেই পারবো না।

আচ্ছা, আচ্ছা, আর কাব্য করতে হবে না। এই কাব্য করেই তুই গেলি। আরে বিয়ে করতে গেলে এত কাব্য করা চলে?

প্রশান্ত বললে, না চলে ত দরকার নেই বিয়ে করবার—সকলের জন্য পৃথিবীর সব জিনিস নয়—তা বলে যাকে তাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

অজয় বললে, আচ্ছা প্রশান্ত, ঠিক করে বল দেখি তুই কিরকম মেয়ে চাস?

প্রশান্ত একটু থেমে বললে, হাতী ঘোড়া এমন কিছু নয়—তোরা আমায় ভুল বুঝেছিস্!

অজয় বললে, ভুল আমরা বুঝিনি। ভুল তুই বুঝেছিস। তা না হলে আজ পর্য্যন্ত তোর একটা মেয়ে পছন্দ হলো না!

প্রশান্ত বললে—দেখ পছন্দের কথা যদি বললি তবে আর একবার তোদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, আমি কোন দিন অপ্সরী খুঁজিনি—আমি চাই সাধারণ মেয়ে, তবে দেখতে শুনতে একটু ভাল হয়, মানে সামনে এসে দাঁড়ালে ভাল লাগে, গলার সুরটা একটু নরম এবং মিষ্টি হয় আর তার সঙ্গে কিছু লেখা পড়া এবং

কিছু গান বাজনা জানবে অর্থাৎ ভাত রাঁধা ছাড়াও অবসর সময়ে যাতে একটু আনন্দ দান করতে পারে।

অজয় বললে, তাহ'লে বাকীটা আর কি রইল! দেখতে ভাল হবে, গলার আওয়াজ মিষ্টি হবে, লেখাপড়া জানবে, গান-বাজনা করতে পারবে, আবার ভাত রেঁধেও দেবে। এই বলে একটু থেমে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক মিলবে—আমার বোনের ননদের এক ভাশুরঝি আছে, বেশ ভাল দেখতে শুনতে, আর গুণপণায়ও নাকি অসাধারণ, আমি খবর দিয়েছি তুই দেখতে যাবি বলে। তবে ভাই, তারা পাড়াগাঁয়ে থাকে, তোমায় সেখানে গিয়ে দেখে আসতে হবে।

প্রশান্ত বললে, নিশ্চয়ই যাবো, যদি ভালো মেয়ে হয় ত তার জন্যে কষ্ট করতে রাজী আছি।

তবে ভাই, খুব গরীব, কিছু দিতে থুতে পারবে না তাও বলে রাখছি আগে থেকে, শেষে যেন আবার—তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রশান্ত বললে, পারে না না,যদি তেমন মেয়ে পাই ত দরকার হলে সমস্ত খরচ দিয়েও নিয়ে আসবো, মোদ্দা সেই মত উপযুক্ত পাত্রী হওয়া দরকার।

কথা রইল, পাত্রীর পক্ষ থেকে একজন লোক এসে প্রশান্তকে নিয়ে যাবে, আর অজয়ের যদি সেদিন নাইটডিউটি না থাকে ত তার সঙ্গে যাবে, তা না হলে তাকে একাই যেতে হবে। প্রশান্তর এ ভাবে একা একা মেয়ে দেখা অভ্যাস ছিল। দূর দেশে যেতে গেলে খরচাও তাতে যেমন বাচে, তেমনি পরিচয় গোপন ক'রে বরের বন্ধু বলে একটু ভাল করে দেখে শুনে নেওয়ার সুযোগ মেলে। কাজেই প্রশান্ত তাতেই সম্মত হলো।

শনিবার দিন দুপুরের গাড়ীতে প্রশান্ত একাই পাত্রীর এক আত্মীয়ের সঙ্গে রওনা হলো। হুগলী জেলার এক দুর্গম অঞ্চলে এই স্থানটী। মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চেপে যেতে হয়। ঘোর পল্লীগ্রাম যাকে বলে, দিনে মাত্র দুখানা ট্রেণ যায় আর দুখানা আসে। কাজেই সেদিন রাত্রে যে প্রশান্তকে সেখানে থাকতে হবে একথা সে জানতো।

সন্ধ্যার অনেক আগে তারা গিয়ে সেই গ্রামে পৌছুল। তারপর একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল আরো কিছুক্ষণ পরে। ভাঙ্গা একটা চালাঘর, তার চারদিকে ভেরাণ্ডা ও রাংচিতের বেড়া দেওয়া। কঞ্চির একটা আগোড় ঠেলে তারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই একটী বৃদ্ধ এসে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রশান্তকে সঙ্গে ক'রে যে ভদ্রলোকটী নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তখন সেই বৃদ্ধের সঙ্গে চোখে চোখে কি একটা ইসারা করলেন। তারপর প্রশান্তকে বললেন, আপনি তা হ'লে এইখানে থাকুন, পাত্রী এঁরই আত্মীয়া, এখান থেকে দু'ক্রোশ দূরে থাকেন। কাল সকালে পাল্কী করে ইনিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন, আমি চললুম। অগত্যা তাতেই রাজী হতে হলো। কিন্তু প্রশান্ত মনে মনে প্রমাদ গণতে লাগল। এ কোথায় এসে পড়লুম! এখান থেকেও আরো দু'ক্রোশ, আবার পাল্কী! এই সমস্ত কথা চিন্তা করে তার কেমন মনে একটা ভয় হলো। এ রকম জায়গায় একেবারে একলা আসা কিছুতেই উচিত হয়নি—কেবল সেই কথাই বারবার তখন ঘুরে ফিরে তার মনে হতে লাগল। এ রকম অজ পাড়াগাঁয়ে প্রশান্ত আর ইতিপূর্ব্বে কখনো আসেনি, আর হয়ত আসতেও চাইত না যদি না এর পেছনে খুব ভাল একটা মেয়ে দেখার প্রস্তাব থাকতো। সে জানে যে, এ রকম পল্লী অঞ্চলে অনেক রত্ন লুকানো থাকে। বৃদ্ধটী তখন প্রশান্তকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে বসালেন। তারপর ডাকলেন, ওরে পুঁটি কোথায় গেলি, শীগগির নিয়ে আয় মুখ-হাত ধোবার জল।

এই যে এসেছি বাবা। বলে একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে একটা ঝকঝকে মাজা গাড়ু হাতে ক'রে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ তখন প্রশান্তকে উঠে হাতমুখ ধুতে অনুরোধ করতেই সে বাহিরের রোয়াকে বেরিয়ে এলো। পুঁটি সেই গাড়ুটা তার হাতে দিয়ে চুপ করে একটা গামছা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল। হাত-মুখ ধোয়া হতেই সে গামছাটা তার হাতে দিলে, তারপর বললে, আপনি চা খান ত?

প্রশান্ত বললে—খাই, তবে না হলেও যে বিশেষ অসুবিধা হয়, তা নয়।

পুঁটি বললে—অসুবিধার কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এই বলে সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। রোয়াকেরই এককোণে রান্নাঘর। ঘরের মধ্যে বসে সব দেখা যায়। প্রশান্ত আড় চোখে সেদিকে চাইতেই দেখলে মেয়েটী আগেই চায়ের জল চাপিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল।

একটু পরে একটি ছোট রেকাবীতে দু'খানা চিনির পুলী ও চারটি চিঁড়ে ভাজা এবং একটা কলাইকরা বাটীতে চা নিয়ে পুঁটি এসে ঘরে ঢুকলো। তারপর আঁচল দিয়ে ঘরের মেঝেটা তাড়াতাড়ি মুছে দিয়ে একটা আসন পেতে তাকে খেতে দিলে। প্রশান্ত বৃদ্ধকে বললে, দেখুন, এত সব আয়োজন কেন করতে গেলেন!

বৃদ্ধটী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, এ আর আয়োজন কি বাবা, ওই মেয়েটাই কোথা থেকে কি করে তা ওই জানে—আমি তার খবরও রাখি না!

পুঁটি একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো। একবার আড়চোখে প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়েই চোখটা নামিয়ে নিলে। তারপর একটা পাখা হাতে করে তাকে বাতাস করতে লাগল। কুণ্ঠিত-ভাবে প্রশান্ত বললে, থাক, বাতাস দেবার প্রয়োজন নেই।

পুঁটি বললে, ঘামে আপনার জামা যে ভিজে উঠেছে, আর বলছেন প্রয়োজন নেই, কেন?

মৃদুস্বরে প্রশান্ত বললে, আমার জন্যে মিছিমিছি একজন কষ্ট পাবে—এ আমি কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারি না।

ম্লান হেসে মেয়েটী বললে, কষ্ট! আপনারা সহরে থাকেন, ধনী লোক, আপনাদের তা মনে হতে পারে কিন্তু যাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না, তারা এটাকে উপহাস মনে করে!

উপহাস! প্রশান্তর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো লজ্জায়।

সঙ্গে সঙ্গে পুঁটির কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠলো। বললে, তা নয় ত কি! আমার মত অবস্থার একটা মেয়ে যদি বাড়ীতে কোন অতিথি এলে তাকে একটু বাতাস করে তাহ'লে তার যে কষ্ট হয়, এ কথা আপনি শিখলেন কোথায়? আপনার বাড়ীতে কি

ভাইবোন নেই, তারা কি লোকজন এলে তাকে বাতাস দেয় না।

প্রশান্ত এ কথার আর কোন উত্তর দিতে পারলে না। চুপ ক'রে গেল। বরং তার মুখ থেকে এই রকম তেজস্বিনী ভাষা শুনে সে মনে মনে খুশি হলো। বৃদ্ধ তখন হাসতে হাসতে বললেন, বেটীর মুখ বড় কড়া, কথায় ওকে হারাতে পারবেন না।

একটা চিনির পুলী থেকে একটু কোণ ভেঙ্গে গালে দিয়ে এবং দু'মুঠো চিঁড়ে ভাজা সন্তর্পণে রেকাবী থেকে তুলে গালে দিয়ে চায়ের বাটীটায় যেই প্রশান্ত চুমুক দিলে, অমনি পুঁটির রসনা তীব্র হয়ে উঠলো। বললে, যা দিয়েছি সবটুকু খেয়ে নিতে হবে, মনে রাখবেন আপনার পাতের জিনিষ খাবার মত কেউ আমাদের বাড়ীতে নেই।

প্রশান্ত একটু ইতস্ততঃ করে বললে, কিন্তু এত মিষ্টি আমি কখনো খাই নি, তাছাড়া চিঁড়েভাজাও দিয়েছেন অনেক!

পুঁটি বললে—দেখুন, কথাটা অবশ্য আপনি সহরের বড়লোক-দের মতই বলেছেন, তবে আপনার যা বয়েস তাতে দু'খানা ছোট চিনির পুলী এবং চায়ের ডিসের অর্দ্ধেক চিঁড়েভাজা খাওয়া বোধ হয় অসম্ভব নয়; অবশ্য আপনারা সহরে থাকেন, চপ-কাটলেট খাওয়া ধাত, তবু এটুকু বলতে পারি যে—এ খেলে আপনার শরীর খারাপ করবে না, কারণ এই দু'টো জিনিষই আমার নিজের হাতে তৈরী।

প্রশান্ত আরো অপ্রস্তুতে পড়লো। এর পরে আর না খেলে যেন বড়ই অশোভন হয়। তবু ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে বললে, দেখুন বার বার সহরের লোক এবং বড়লোক বলে আমায় লজ্জা দেবেন না—কেন না, ও দুটোর কোনটাই আমার পক্ষে সত্যি নয়। থাকি ভাড়া-বাড়ীতে, আর করি সামান্য মাইনের কেরাণীগিরি!

পুঁটি এইবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। তারপর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসিটা দমন করতে করতে বললে, মেজাজটা তাদেরই নবাবী হয় বেশী—যারা সত্যিকারের নবাব নয়! তা না হলে আপনার ত বিনা বাক্যব্যয়ে সবটা খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল আগেই!

প্রশান্ত ঘাড় হেঁট ক'রে যখন সবটা শেষ ক'রে ফেললে, তখন আর একবার খিল খিল ক'রে পুঁটি হেসে উঠলো। সে হাসি যেন কেবল প্রশান্তকে বিদ্রূপ করবার জন্যেই! প্রশান্ত পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখ মুছতে মুছতে ভাবতে লাগল—সেই মুখরা মেয়েটার হাত থেকে কতক্ষণে পরিত্রাণ পাবে!

ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে একটা পান এনে প্রশান্তর হাতে দিয়ে পুঁটি তখন বৃদ্ধটীর দিকে চেয়ে বললে, বাবা আমি চললুম ধান ভাণতে, আপনারা ততক্ষণ একটু বেড়িয়ে আসুন না।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস মা। এই ব'লে তিনি প্রশান্তকে বললেন...চলুন আমাদের গাঁটা কেমন একটু ঘুরিয়ে আপনাকে দেখিয়ে আনি। অবশ্য আপনাদের মনের মত এখানে দেখার কিছু নেই, শুধু বনজঙ্গল, নদী-নালা—এ আর ভদ্দর লোকদের দেখাবার উপযুক্ত নয়, তবু এমন সময়টা ঘরের মধ্যে ব'সে থাকতে যেন ভালো লাগে না।

প্রশান্ত বরাবরই একটু কবি-প্রকৃতির। বললে, না না আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি এতটা বে-রসিক নই, পাড়াগাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার বড় ভাল লাগে দেখতে।

খুক্ খুক্ ক'রে এক প্রকার চাপা হাসি হেসে বাইরের রোয়াক থেকে পুঁটি ব'লে উঠলো, ছবিতে দেখতে নিশ্চয়! তারপর প্রশান্ত তার কোন জবাব দেবার আগেই সে একটা ধামা কাঁধে ক'রে চঞ্চল ভঙ্গীতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধটীর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একটা পাঁচীলভাঙ্গা বাড়ীর উঠানে নজর পড়তেই প্রশান্ত চমকে উঠলো। পুঁটি ঢেঁকিতে ধান ভাণছে। একটা পা দিয়ে সে নেচে নেচে একটা বিরাট লম্বা কাষ্ঠখণ্ডকে নীচের দিকে বার বার ঠেলে দিচ্ছে। তার চোখ-মুখ এই পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠেছে। খাটো ময়লা সরু পেড়ে একটা ধুতি তার কোমরে বেশ ক'রে জড়ানো, দৃঢ় বলিষ্ঠ, নিরাভরণ দু'টী হাত ও পায়ের অনেকখানি অংশ অনাবৃত। মাটির মত তার রঙ, কলাগাছের মত দৃপ্ত ও সতেজ ভঙ্গী! সে একটা উঁচু কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে 'পাড়' দিচ্ছে আর নীচে মাটিতে একটী বৃদ্ধা বসে 'গড়ে'র মুখে হাত দিয়ে দিয়ে ধানগুলোকে ঠেলে দিচ্ছে। বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশান্ত সেইদিকে চেয়ে রইল। ঢেঁকীর সেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, সেই মেটে চালাঘর, আর তার সঙ্গে পুঁটির সেই যৌবনদৃপ্ত ভঙ্গী—সব মিলিয়ে তার মনে তখন এমন একটা মোহের সৃষ্টি করলে যে, প্রশান্তর মনে হ'তে লাগল যেন কোন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা কোন একটা বিরাট ছবির সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রশান্তকে ওই অবস্থায় দেখে পুঁটি খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বললে, কি ঢেঁকী কখনো দেখেন নি বুঝি, তাই এমন ক'রে তাকিয়ে আছেন, তা আসুন না এদিকে—আহা সহরের লোক কি ক'রেই বা দেখবেন! আসুন, আসুন, লজ্জা কি!

বৃদ্ধটি তখন প্রশান্তকে নিয়ে সেখানে যেতেই থপ ক'রে পুঁটি ঢেঁকী থেকে নেমে একটা তালপাতার চেটাই চালের বাতা থেকে টেনে বার ক'রে সেখানে পেতে দিয়ে বললে, বসুন।

পুঁটি তখন হাঁপাচ্ছিল, তার নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল, চোখে মুখে কপালের ঝুরো চুলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ছিল।

বাস্তবিক ঢেঁকী কি রকম দেখতে, ধান কি ভাবে ভাণা হয়, এসব কিছুই প্রশান্ত জানতো না। আর জানতো না যে, মেয়ে মানুষে এই পরিশ্রমের কাজ করে এবং যখন করে তখন তাকে এত ভাল দেখায়! প্রশান্ত অবাক্ হয়ে বসে বসে তাই দেখতে লাগল, এমন সময় সহসা এক ঝলক সুগন্ধ তার নাকে এসে লাগতে তার মনটা দুলে উঠলো, শিউরে উঠলো! সে তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাতেই দেখলে উঠানের একধারে একটা বড় বকুল ফুলের গাছ থেকে টপ টপ ক'রে ফুল ঝরে পড়ছে। তখন একবার ক'রে পুঁটির দিকে আর একবার ক'রে সেই বকুল ঝরার দিকে প্রশান্ত চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। পুঁটি যে ছন্দে ঢেঁকীতে পা দিচ্ছিল, সেই একই ছন্দে যেন ফুলগুলিও বৃন্তচ্যুত হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল!

একটু পরেই তা'রা সেখান থেকে উঠে পড়লো। পুঁটির বাবা প্রশান্তকে নিয়ে তখন গ্রামের অপর দিকটা দেখাতে চললেন।

তাদের বাড়িটা নদীর ঘাট থেকে বেশী দূর নয়।

বাড়ীর কাছাকাছি ফিরে আসতে, একটা ডুমুর গাছের দিকে নজর পড়তেই দেখা গেল পুঁটি একটা গাছের ওপর উঠে গেল এবং দেখতে দেখতে তাদের চোখের সামনে কতকগুলি ডুমুর পেড়ে নিয়ে সে নেমে এলো। তারপর প্রশান্তর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি ভাবছেন—মেয়েটা কি রকম ডানপিটে, নয়?

প্রশান্ত ঠিক এইরকম কথা তার মুখ থেকে তখনই যে শুনবে তা ভাবতেও পারে নি, তাই রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো এবং তার কোন জবাব দেবার আগেই পুঁটি আপন মনেই বললে, তা যদি ভাবেন ত কি করবো? গরীবদেরও ত কিছু খেয়ে বাঁচতে হবে!

প্রশান্ত এইবারে ঘোরতর আপত্তি তুলে বললে, বারবার নিজেকে গরীব বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। এতে আমি বড় ব্যথা পাই।

ব্যথা পান, সত্যি? এই কথা বলতে বলতে সহসা যেন পুঁটির কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। প্রশান্ত তা লক্ষ্য করলে কিনা কে জানে!

রাত্রে খাবার আয়োজন দেখে প্রশান্ত রীতিমত অবাক্ হয়ে গেল। কি ক'রে যে পুঁটি এতরকমের রান্না করলে তা সে ভেবেই পেলে না। পুঁটির বাবারও একটু চমক লেগেছিল, তাই সেই কথাটাকেই তিনি অন্যভাবে প্রকাশ করলেন। বললেন, মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ম'শায়—কেমন ক'রে যে কি করে তা আমার বুদ্ধির অগোচর!

প্রশান্ত বললে, আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি।

পুঁটি পাশে বসে প্রশান্তর গায়ে পাখার হাওয়া করছিল। আড়চোখে একবার তখনি তার মুখের দিকে চেয়ে ঘাড়টা নীচু করে বললে, কিচ্ছু কিন্তু ফেলতে পাবেন না—দেখলেন ত কত কষ্ট ক'রে আপনার জন্যে এই সব রেঁধেছি।

সবই নিজের চোখে দেখলুম, কাজেই ওকথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই বলে প্রশান্ত পরিপাটী ক'রে সব খেয়ে তবে উঠলো। এত আগ্রহ করে আর জীবনে কেউ কোনদিন তাকে বুঝি খাওয়ায়নি! তাই সেই খাওয়ার মধ্যে দিয়ে পাড়াগাঁয়ের একটী দরিদ্র পরিবারের আন্তরিকতার যে পরিচয় সেদিন প্রশান্ত লাভ করলে, তা জীবনে কোনোদিন ভুলবার নয়!

পরদিন ভোরে উঠে মেয়ে দেখতে যাবার জন্যে রওনা হবার আগে হঠাৎ প্রশান্তর কি মনে হলো। সে একটু ইতস্ততঃ করে পুঁটিকে জিগ্যেস করলে, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আপনাকে বলবো?

পুঁটি একটু ম্লান হেসে বললে, কি? বিদায় বেলায় কিছু শুক্‌নো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন ত?

প্রশান্ত বললে, এত বড় আহাম্মুক অন্ততঃ আমি নই। এই বলে আর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, আচ্ছা কতদিন আপনার এই অবস্থা হয়েছে?

আমার এই অবস্থা! কথাটা প্রথম শুনেই পুঁটি চমকে উঠেছিল, তারপর নিরাভরণ হাত দু'টির দিকে চেয়ে এবং ময়লা ও সরুপেড়ে ধুতি পরার কথা মনে পড়তেই ব্যাপারটা বুঝতে আর তার বিলম্ব হলো না। তাই বার দুই ঢোক গিলে এবং ইতস্ততঃ ক'রে শুধু বললে, ও-কথা শুনে আপনার লাভ?

জিব কেটে সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত বললে, লাভ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এই বলতে বলতে সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করলে। জীবনে আর হয়ত পুঁটির সঙ্গে দেখা হবে না, কিন্তু এই একটা বেলার সেবা চিরকাল তার মনে থাকবে। এই মনে করে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে একবার পিছন ফিরে তাকালে। একটা খুঁটি ধরে পুঁটি তখন উদাস দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখের একটা পাতাও নড়ছিল না, সে যেন নিশ্চল পাষাণে পরিণত হয়েছে।

যে মেয়েটীকে প্রশান্ত দেখতে গিয়েছিল—সেটাকে দস্তুর মত সুন্দরী বলা চলে, কিন্তু তবু তার পছন্দ হলো না। বাড়ীতে ফিরে আসতে তার মা যখন জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলি? তার উত্তরে প্রশান্ত বললে, সব ভালো, তবে যেন তার মধ্যে প্রাণ নেই—এমনি নির্জীব!

আবার মেয়ে দেখা সুরু হলো। ভাল ভাল মেয়ে, বাছাই-করা সব সুন্দরী, কিন্তু কোনটাই প্রশান্তর মনে ধরে না। বলে 'লাইফ্‌লেস্' প্রাণহীন সব মেয়ে! এর চেয়ে একটা কাঁচের পুতুলকে বিয়ে করা ভালো।

বন্ধু-বান্ধবেরা রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলো। অজয় বললে, চালাকী পেয়েছিস্, একদিন বলতিস নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে চাই—আবার এখন ধরেছিস্ 'লাইফলেস্'? তারপর একটা ধমক দিয়ে বললে, তোর নিজের মধ্যে কতটা 'লাইফ' আছে যে 'লাইফলেস' বলিস্, লজ্জা করে না ও-কথা মুখে আনতে।

প্রশান্ত তাদের ঠিক তার মনের অবস্থাটা বোঝাতে পারে না। তবে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়—যদি পুঁটিকে একবার এদের দেখাতে পারতুম তাহ'লে এরা বুঝতো 'লাইফ' কাকে বলে আর 'লাইফলেস' কাকে বলে!

প্রশান্তর মা ও বাবা শেষে একটী অদ্ভুত রূপসী মেয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে পছন্দ করলেন, কিন্তু প্রশান্ত তাকেও নাকচ করে দিলে। বললে, 'লাইফলেস'! তার মুখে সেই এক কথা। কোন মেয়েকেই তার পছন্দ হয় না।

বন্ধু-বান্ধবেরা তার জন্যে মেয়ে দেখা রাগ করে ছেড়ে দিয়েছিল, এবারে বাপ-মাও দিলে। প্রশান্ত তখন তাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলে যে, সে যা' তা' মেয়ে বিয়ে করবে না; যদি কোন দিন ভাল মেয়ে তার চোখে পড়ে তবে সে নিজেই বিয়ে করবে, তাদের কাউকে ওর জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।

তখন সবাই সত্যি সত্যি হাল ছেড়ে দিলে!

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। পথে, ট্রামে, রাস্তায়, রেলগাড়ীতে যত মেয়ে প্রশান্ত দেখে কোনটাই তার পছন্দ হয়

না। পল্লীগ্রামের সেই বিধবা পুঁটির কাছে যেন কেউ লাগে না, সবাই ম্লান হয়ে যায় তার পাশে।

* *

এমনি করে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। যুবক প্রশান্ত প্রৌঢ় প্রশান্ত হ'লো, তার চুলের অর্দ্ধেকে পাক ধরলো, মাথায় রীতিমত টাক পড়লো, সামনের দু'তিনটে দাঁত পড়ে গেল, কিন্তু তবু তার কোন মেয়ে পছন্দ হ'ল না! তখনো সে এমন কোন্ মেয়ে দেখতে পায় নি, যার মধ্যে সত্যিকারের 'লাইফ' আছে! তবু মেয়েদেখা চলে! কবে যে এ দেখার শেষ হবে তা' একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

আমি যাবো

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, বার্-এট্-ল

আমি যাবো আমি যাবো কুমার নদীর তীরে
যেথা আছে নীল নীল ঘাস,
সবুজ সবুজ বন ছায়া করে অনুক্ষণ
জড়াজড়ি করে বারোমাস।
ভাঙ্গার পোলের পরে মোরা হাতে হাত ধরে
বেড়াব লতিফ গুরুদাস।

ডাহুক্ ডাকিবে দূরে ঘুঘু একটানা সুরে
কি যে সদা করিবে বিলাপ,
মাছরাঙা ঝিম্ ধরে পুঁটি ধরে ঠোঁটে করে
নদীর বুকেতে মারে ঝাপ!
বরষার কালো জল জাগিবে পোলের তল
সাঁতার কাটিব দিয়ে লাফ।

শরতে শেফালিফুলে ছেয়ে আছে তরুমূলে,
কুড়ায়ে বোঝাই করি সাজি,
না ডাকিতে বনে পাখী মোদের সজাগ আঁখি
কে আগে উঠিবে রাখি বাজি।
ঝাঁকি দিয়া ডালে ডালে, ফুল পড়ে মুখে গালে
বন্য বালক বেশে সাজি'।

দিন রাত হৈ হৈ দিন রাত টৈ টৈ
মোরা যেন ভাজা খৈ পাজে,
আমগাছে জামগাছে যেথা টুনটুনি নাচে,
সোনাগুলি ঢাঁসায়েছে বাজে,
সেথা নাই ভোরে উঠি, ছোটাছুটি লুটোপুটি
মটকায় উঠি খালি গায়ে।

বাবার কবিতা শুনি' বকু শুধু গুণগুণি
সুর ভাঁজে, আমি বনফুল—
মুখে হাসি খিল্‌খিল্, শুধুই কথার মিল
বাবার পেকেছে সব চুল।
বাবা যাবে খালি গায়ে কুঠীবাড়ী বনছায়ে,
সব মিছে সব কিছু ভুল।

ওরে ও অবোধ ছেলে আমি বুড়ো তিন্‌কেলে
তোরা বুঝি শুধু কচি কাঁচা,
যে স্বপনে উঠি দুলি, তখন বয়স ভুলি'
সেথায় কেবলি পাখী-নাচা;
সেথায় আলোয় আলো সেথায় সকল ভালো
সেথা নাই এত ছোট খাঁচা।

সেথা নাই লরি চাপা, ওরে ও বাবারে বাপা
বিদ্যুতে লাগে নাতো শক্,
সেথা অবারিত মাঠ মোরা সব ছোট লাট,
প্রজা মাছরাঙ্গা মুনি বক;
তাই তো কুমার তীরে, ছুটি আমি আঁখি নীরে,
শৈশবে ফিরে যেতে সখ॥

মধ্যযুগের অবসান ও ইরাণের চিত্রশিল্পে বিদেশী প্রভাব

শ্রীগুরুদাস সরকার

সাফাবিয় যুগের শেষাংশে চিত্রকরের কাজে ও পরিকল্পনায় নানা বৈচিত্র্য আসিয়া জুটায় ক্রমেই উহা ভিন্নভাবে রূপান্বিত হইতে আরম্ভ করে।

তৈমুর বংশের রাজত্ব কালের শেষাংশ হইতে সাফাবিয় যুগে প্রথম আব্বাসের রাজত্বকাল (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রীঃ অব্দ) পর্য্যন্ত পারসীক চিত্র-শিল্পে যে কি পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় বিভিন্ন সময়ের লেখা দুই খানি খসরু শিরীণ পুঁথির দুইটি চিত্রের তুলনা সাহায্যে। প্রথম পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল খৃঃ ১৪৯০ অব্দে, তৈমুরীয় (Timurides) দিগের রাজত্বকাল অবসানের মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে। এ পুঁথি এক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুঁথিশালার অন্তর্ভুক্ত (১১)। দ্বিতীয় চিত্রখানি যে পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট তাহা লিখিত হইয়াছিল ইস্পাহানে ১৬২৪ খ্রীঃ অব্দে সাহ প্রথম আব্বাসের দেহরক্ষার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (২)। এই ১৩৪ বৎসর কাল চিত্রশিল্পের ধারা একবারে স্থির হইয়া থাকে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর ক্ষুদ্রক চিত্র খানিতে যে, মোঙ্গল প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এ চিত্রে তাই দেখিতে পাই খসরু মোঙ্গল যোদ্ধার আকারে পরিকল্পিত, মস্তকে মোঙ্গল ফ্যাসনের শিরস্ত্রাণ, কটিদেশে সায়কপূর্ণ তূণীর। রসিদুদ্দিনের মোঙ্গলদিগের ইতিহাসগ্রন্থে, গাজন খাঁর মস্তকে ঠিক এইরূপই শিরস্ত্রাণ রহিয়াছে। দ্বিতলের উন্মুক্ত বাতায়নে শিরীণ সুদূর-প্রাচ্যের সুপরিচিত ভঙ্গীতে গ্রীবা হেলাইয়া দাঁড়াইয়া। চিত্রপটে যে বৃক্ষটি অর্পিত রহিয়াছে তাহাও নিতান্ত সরাসরি ভাবে আঁকা, ভূমিতলে পুষ্পসমন্বিত গুল্মগুলি একবারে নক্সাকারী ভাবে চিত্রিত। দ্বিতীয় চিত্রখানিতে চিত্রগত ব্যক্তিগুলি সাফাবিয় যুগের পরিচ্ছদে সজ্জিত। শিরীণ ও তাঁহার সহচরীদ্বয়ের বেশভূষা সাফাবিয় রাজত্বকালেরই সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের ন্যায়। দ্বিতলের ছাদ হইতে শিরীণ দুই হাত বাড়াইয়া খসরুকে আহ্বান করিয়া লইতেছেন। চিত্রনিহিত বৃক্ষটির কাণ্ডদেশ এবং শাখাপ্রশাখা ও পত্রসম্ভার প্রভৃতি সূক্ষ্মাংশগুলি বাস্তবতার সহিতই অঙ্কিত। পৃষ্ঠপটে উচ্ছ্রিত শৈলশীর্ষ নিসর্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।

এবার কিছু ইতিহাসের কথা না বলিলে রাজনৈতিক কিম্বা সামাজিক পরিস্থিতি সম্যক্ বোধগম্য হইবে না। রুমের সুলতানের (Sultan of Turkoya) সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পারস্যরাজের বিরোধের কথা অগ্রেই বিবৃত হইয়াছে। সাহ তহ্‌মাস্‌পের রাজত্বকালে তহ্‌মাস্‌পের ভ্রাতা ইল্‌কাস্ মির্জ্জা বিদ্রোহী হইলে সুলতান তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তহ্‌মাস্‌প সুলতানের সন্তোষবিধানার্থ যে জঘন্য কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার হৃদয়হীনতার ও নীচ অর্থগৃধ্নুতার পরিচায়ক বলিয়াই বিবেচিত হইবে; এ কলঙ্ক তাঁহার চরিত্র হইতে স্খলিত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। চারি (৪) লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে তিনি সুলতানের পুত্র রাজকুমার বায়াজিদ ও তাঁহার চারিটি পুত্রকে সুলতান কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতবৃন্দের হস্তে সমর্পণ করেন। আশ্রয়প্রার্থীদিগের প্রতি এতটুকু অনুকম্পাও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। পুত্র হইলে কি হয়, সুলতান পূর্ব্ব হইতেই বায়াজিদের প্রতি বড়ই বিরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রাণনাশ

খসরু ও শিরীণ

করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন বলিয়াই তিনি এই বিরুদ্ধাচারী পুত্রকে আশ্রয়চ্যুত করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বায়াজিদকে প্রত্যর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু তাঁহাকে নয় তাঁহার নিরপরাধ পুত্র কয়টিকেও হত্যা করা হয়। তখনকার দিনের নৃপতিবৃন্দ দয়ামমতার ধার ধারিতেন না। ইঁহাদের যেন নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। কোনও বৈদেশিক সমালোচক ব্যথিত চিত্তে লিখিয়াছেন "How cruel they were!" বড়ই সত্য কথা।

(১) Or. 2834, fol. 79 b.

(২) এ পুঁথি ফরাসী জাতীয়গ্রন্থাগারের (Bibliotheque Nationel এর) প্রাচ্য পুঁথি-সংগ্রহের অন্তর্গত ছিল। মহাযুদ্ধে রক্ষা পাইয়াছে কিনা কে বলিবে?

তহ্‌মাস্পের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাঁহার চতুর্থ পুত্র দ্বিতীয় ইস্‌মাইল, খ্রীঃ ১৫৭৬ অব্দে। তিনি স্ববংশীয় আটজন প্রধান রাজকুমার ও সপ্তদশ প্রধান ওমরাহের মৃত্যু

খস্‌রু ও শিরীণ

ঘটাইয়া নিষ্কণ্টক ভাবে রাজ্যশাসনের উদ্যোগ করিলেন বটে কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবে কে? অতিরিক্ত মদ্যপান ও অহিফেন সেবন হেতু হঠাৎ একদিন তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। ইহার পর পারস্যের রাজমুকুট লাভ করিলেন ইঁহারই অন্ধপ্রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ খুদাবন্দ। খুদাবন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র বীর হামজা মির্জ্জা, খৃঃ ১৫৮৭ অব্দে জনৈক অনুচরকর্তৃক নিহত হইলে খুদাবন্দের নিজ সৈনিকগণ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যতম পুত্র আব্বাসের পক্ষাবলম্বন করিল এবং হৃতগৌরব খুদাবন্দ অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন।

তাঁহার পিতা খুদাবন্দের সিংহাসনারোহণকালেই খোরাসানের আমিরগণ আব্বাসকে পারস্যের সাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। হামজা মির্জ্জার মৃত্যু ঘটিলে পর আব্বাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। তখন ইউরোপখণ্ডে পঞ্চম চার্লস; ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথ, তুরস্কে সুলতান সুলেমান এবং ভারতে আকবর রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন।

প্রাচ্য দেশের সহিত কূট-নৈতিক ও বাণিজ্য-বিষয়ক সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্য ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতেই সমুৎসুক ছিলেন। তহ্‌মাস্পের রাজত্বকালেই অ্যাণ্টনি জেঙ্কিন্‌স (Anthony Jenkinson) দূতরূপে পারস্যে আগমন করেন কিন্তু মুস্লিম ধর্ম্মে অবিশ্বাসী বলিয়া ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর সহিত মৈত্রী-সম্পর্ক সংস্থাপন করিতে তহ্‌মাস্প সম্মত হন নাই। সাহ প্রথম আব্বাস সম্বন্ধে তাঁহারই এক বৃত্তিভোগী ইংরাজ, সার অ্যাণ্টনি শার্লি (Sir Anthony Shirley) প্রশংসাকল্পে বলিয়াছেন যে, আব্বাস শুধু জ্ঞানী ও সাহসী ছিলেন না তাঁহার মানসিক বৃত্তিনিচয়ও রাজোচিত ছিল।

তুর্কীর (রুমের) সুলতান ও উজ্‌বেগদিগের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি শুধু সমরকৌশলেই নিবদ্ধ ছিল না, পূর্ত্তকার্য্যের জন্যই তিনি সমধিক যশস্বী হইয়াছিলেন। পান্থশালা (কাফেলাদিগের জন্য নির্ম্মিত সরাই), জাঙ্গাল সাংক্রাস (করাস) বা প্রস্তরময় সরণী প্রভৃতি অদ্যাপি তাঁহার জনহিতৈষণার সাক্ষ্য দিতেছে। কাস্পিয়ান (Caspian) প্রদেশে তাঁহারই আনুকূল্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাংশে গমনাগমন সহজসাধ্য হইয়াছিল। রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে, ইস্পাহানে, (ইস্ফাহানে) রাজধানী সংস্থাপন তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। সাহ ইস্‌মাইলের রাজত্বকালে শাসনকেন্দ্র তাব্রিজে অবস্থিত ছিল। পারস্যের অধিত্যকাংশে জেন্দারুদ নামক একমাত্র নদীর তীরে, এই নগরী সংস্থাপিত। রাজধানী হইতে নদীতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুই সারি তরুবীথিকা সহরের শোভা বর্দ্ধন করিত। সাহ প্রথম আব্বাসের রাজত্বকালে শিল্প ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এ যুগের প্রধানতম চিত্রী ছিলেন রিজা-ই-আব্বাসী, তাঁহার কথা পরে বলিতেছি। সাহ আব্বাসের শেষ জীবনে পারিবারিক অশান্তি প্রবল হইয়া উঠে। পিতৃদ্রোহী সন্দেহে পুত্রদিগের প্রতি অবিশ্বাস হেতু তিনি তাহাদিগের কয়েক জনের বিনাশ সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। এ বংশের বিলোপ ঘটে দৈহিক ও নৈতিক ক্রমাবনতির জন্য।

আন্দেরুণে, (শুদ্ধান্তে) পালিত রাজকুমারগণ ক্রমেই বলবীর্য্য হারাইয়া স্ত্রীজনোচিত ভীরু স্বভাব প্রাপ্ত হইতেছিলেন। বাহিরে সামাজিক বেষ্টনীতে, নৈতিক অপকর্ষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। রিজা-ই আব্বাসীর তরুণদিগের চিত্র হইতে এই অধোগতির অনেকটা সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। খৃঃ ১৭৩৬ অব্দে এ বংশের শেষ নৃপতি তৃতীয় আব্বাস শৈশবকালেই ভারতবিজেতা তুর্কবংশীয় নাদির সাহ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তখন আর সাফাবি বংশে এমন কেহই ছিলেন না যে প্রবলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ

হন। দশম শতাব্দী হইতে যে তুর্ক জাতি নিকট প্রাচ্যে আধিপত্য করিতেছিল তাহাদিগের নিকট হইতে ইরাক কাড়িয়া লইয়া সাফাবিরাই উহা পারস্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শেষে এই বংশের কি অধঃপতনই না ঘটিল। মেলজুকরা ও খোয়ারাজম্ এর (খিভা প্রদেশের) রাজগণ তরবারি হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তৈমুরীয়দিগের শেষ বংশধর উজবেকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হন নাই, কিন্তু সাফাবি বংশের শেষ প্রতিনিধিগণের নিশ্চেষ্ট অকর্ম্মণ্যতা মনে বড়ই ক্ষোভের সঞ্চার করে। তবুও একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, সাফাবিবংশীয়গণ রাজত্ব করিয়াছিলেন দীর্ঘ দুই শত চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর কাল। সাসানীয় রাজগণও এত দীর্ঘকাল ইরাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন নাই।

প্রথম আব্বাসের রাজত্ব হইতেই সাফাবিয়-যুগের চিত্রকলায় যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে এ পরিবর্ত্তনের মূলে ছিল ইউরোপীয় প্রভাব। পুঁথি ও লিপিকারের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া চিত্রশিল্পী এতদিনে পূর্ণায়তন প্রতিকৃতি (full length portrait) আঁকিতে সক্ষম হইলেন। ক্ষুদ্রক চিত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেদ করিয়া আসা পারসীক শিল্পীর পক্ষে দুঃসাধ্য হয় নাই। ইস্কান্দার মুন্সীর গ্রন্থ (২ক) হইতে জানা যায় যে মৌলনা মহম্মদ সবজাভারি নামক একজন যশস্বী লিপিকার সাহ ইস্মাইলের রাজত্বকালেই (১৫০২—১৫২৪ খ্রীঃ অঃ) ইউরোপীয় প্রথায় চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে দক্ষতাও নাকি লাভ করিয়াছিলেন যথেষ্ট। মৌলানা সাহেব দেশীয় শিল্পের প্রভাব কতদূর কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন জানি না, তাঁহার যুগে পারস্যের শিল্প ও শিল্পী উভয়ই ছিল নিজ শক্তিবলে বলীয়ান। ইহার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে একজন পারসীক শিল্পী রোম নগর হইতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। সাহ তহ্মাস্পের নিজামী গ্রন্থে ইহার নিজের আঁকা দুইখানি ক্ষুদ্রক চিত্র আছে, একখানির রঙীন অনুলিপি সার টমাস আর্ণল্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রকরণে শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও শিল্পী এ চিত্রখানিতে দেশীয় ভঙ্গী যেভাবে বজায় রাখিয়াছেন তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর একখানি পারসীক চিত্রের সংগ্রহ-পুস্তকে (মুর'কায়) ডুরের (Durer) নামক জার্ম্মান শিল্পীর রচিত (৩) কয়েকখানি এন্‌গ্রেভিং (ধাতুপটে খোদাই করিয়া লইয়া তাহা হইতে ছাপা চিত্র) পারী নগরীর 'জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। ইহা মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের কথা। এখন সেগুলি কোথায় আছে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। এই এন্‌গ্রেভিং কয়খানিই নাকি ইউরোপীয়-চিত্রণ-পদ্ধতির সহিত পারসীক শিল্পীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ। আর একটি ঘটনাও ইউরোপীয় প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ উক্ত হইয়া থাকে। প্রাচ্য ভাষাসমূহের পঠন-পাঠনের জন্য রোমান ক্যাথলিক কার্মেলাইট (Carmelite) সম্প্র-

জনৈক চিকিৎসকের প্রতিকৃতি

(২ক) ইস্কান্দর মুন্সীর এ গ্রন্থখানি লিখিত ও সাধারণ্যে প্রচারিত হয় ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে। এ গ্রন্থ হইতে পারসীক চিত্রকরদিগের বিষয় অনেক কিছু জানা যায়।

(৩) জার্ম্মান চিত্রশিল্পী আলব্রেখট ডুরের Albrecht Durer (খ্রীঃ অঃ ১৪৭১—১৫২৮) নারেম্বার্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকে জার্ম্মান চিত্রশিল্প-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধাতুপটে তক্ষণকার্য্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ

দায়ের কোনও একটি শাখা ইস্পাহানে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতে খৃষ্টীয় মিশনারীগণের পারস্যে অবাধ গমনাগমন কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না।

দম্পতির আদর-সোহাগ

ক্যাথলিক মিশনারীদিগের মারফৎ ইউরোপীয় চিত্র পারস্যে পৌছান অসম্ভব নয়—এবং তাঁহারা যে ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র সঙ্গে আনিবেন এ অনুমানও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র যে ক্যাথলিক দিগের উপাসনাগৃহে ও উক্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকগণের আবাসে রক্ষিত হইয়া থাকে ইহাও সত্য কথা,—কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে পারসীক চিত্রকরেরা যে এ সকল চিত্র নকল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। প্রমাণ থাকিলে উহা যে সুধীসমাজে উপস্থাপিত হইত—ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। দূরের (Durer) কিম্বা অপর কোনও ইউরোপীয় চিত্রকরের চিত্র, দুই চারিজন দেশীয় কলা-রসিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া পারসীক শিল্পি-সমাজে যে সুপরিচিত হইয়াছিল—এ ধারণারও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি দেখা যায় না। যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন যে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি পারসীক চিত্রকলায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই এ কথা এখন অনেক ইউরোপীয় সমালোচকেরাও আর স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নন।

বিদেশী জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পারসীকেরা নাকি চিরদিনই একটু বেশীরকম কুতূহলী, কিন্তু এ স্বাভাবিক কৌতূহল সত্ত্বেও প্রথম পর্ব্বে পাশ্চাত্য শিল্পের রেওয়াজ অতি অল্পদিনই বিদ্যমান ছিল। চীনের "তাই"—(Tai) পদ্ধতিতে(৩ক) মেঘাঙ্কন-প্রথা পরিত্যক্ত হইয়া পাশ্চাত্য রীতি অনুসৃত হইতেছিল বটে কিন্তু সূক্ষ্মাংশচিত্রণের এরূপ কয়েকটি বিশিষ্ট রদবদল মানিয়া লইলেও পাশ্চাত্য ধারা পারসীক শিল্পে যেটুকু পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল তাহা যৎসামান্যই বলিতে হয়। মোটের উপর পারস্যের চিত্রণপদ্ধতি তখন পর্য্যন্ত পারসীকই রহিয়া গিয়াছিল। শুধু নকলনবীস পটুয়াদিগের দ্বারা চিরাগত শিল্প-পদ্ধতির আর কতটুকু পরিবর্ত্তনই বা সংসাধিত হইতে পারে?

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত কোনও চিত্রিত পুঁথির বড় পৃষ্ঠায় চিত্রকরের নাম ও তারিখ সম্বলিত যে একখানি ক্ষুদ্রক চিত্র পাওয়া গিয়াছে ইংরাজী হিসাবমতে গণনা করিলে উহার হিজিরাব্দ খ্রীঃ অঃ ১৬৮০এ আসিয়া পৌছে। সম্ভবতঃ ঐ বৎসরেই চিত্রখানি রচিত হইয়াছিল। ইহাতে "তাই" ছাঁদের পরিবর্ত্তে মেঘ আঁকা হইয়াছে চীনা সফেদা দিয়া, গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণের আকারে।

পারসীক নকল-নবীসেরা প্রতীচ্যের চিত্রশিল্প নকল করিয়া যে বিশেষ কিছু সফলতা লাভ করিতে পারে নাই—তাহা বুঝা যায় তাহাদের কাজের স্বল্প কিছু নমুনা হইতে। অনেক সময় আকার-অবয়ব ঠিক থাকিলেও গোল বাধিত রঙের নির্ব্বাচনে ও ব্যবহারে। রঙের মিল-গরমিল, বর্ণপ্রয়োগের মানান-বেমানান সম্বন্ধে অবহিত হইতে না পারিলে নকল করা চিত্রের বহিরঙ্গে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে যে, আসল চিত্রের শিল্পীকেও এ বৈসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। অনেক সময় বিদেশী চিত্রের শুধু কেন্দ্রীয় অংশটুকু নকল করিয়া বক্রী অংশে দেশীয় ধারার মানবমূর্ত্তি ও দেশীয় দৃশ্যাবলী অঙ্কিত করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর একাংশে আমাদের বাংলা দেশেও কতকটা এই প্রকার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কিন্তু কিছু উল্টা রকমে। কিছুকাল পূর্ব্বেও এই শ্রেণীর একটু বড় আড়ার বাজার-চল্‌তি পৌরাণিক চিত্রগুলিতে দেখিয়াছি—পাশ্চাত্য চিত্রকরের ইটালী, হল্যাণ্ড অথবা সুইজারল্যাণ্ডের দৃশ্য-চিত্র (Landscape) হইতে পারিপার্শ্বিক নকল করিয়া লইয়া বিসদৃশ ঢঙ ও বেমানান আকৃতির শিবদুর্গা, গণেশজননী, কিম্বা রামসীতা সম্মুখভাগে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উমা-মহেশ্বরের পিছনের দিকে পাহাড়ের ধারে ধূমায়মান চিম্‌নীবিশিষ্ট সুইস্ কটেজ, অথবা রামসীতার বামদিকে পীঠভূমে সারিবদ্ধ হল্যাণ্ড দেশীয় "হাওয়াচাক্কী" (wind mill)। তখনকার দিনে এ প্রকার পারিপার্শ্বিকের নিবেশ কাহারও চোখে 'খাপছাড়া' বলিয়া বোধ হইত না। এমন কি, মূর্ত্তিগুলি আঁকিবার সময় পরিপ্রেক্ষণার দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজনও যেন অনুভূত হইত না।

করিয়াছিলেন। ধাতু-ফলক হইতে মুদ্রিত তাঁহার অনেকগুলি চিত্র ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

(৩ক) 'তাই' (Tai) পদ্ধতিতে গগনমণ্ডলে মেঘমালা কুঞ্চিত ড্রাগনদেহের ন্যায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

আমরা এ পর্য্যন্ত দুই প্রকার পারসীক চারুশিল্পের পরিচয় পাইয়াছি—ক্ষুদ্রক চিত্র (miniature painting) এবং ছোট ও বড় আকারের তস্‌বির (portraits)। পূর্ণাবয়বের বড় তস্‌বির্‌গুলি সাধারণ সভাগৃহে (public halls) অথবা সাধারণের অধিগম্য প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইত। ইহা ব্যতীত চারুকলার বিকাশ লাভ হইয়াছিল আরায়েশ নামে অভিহিত ফ্রেস্কো (fresco) অর্থাৎ ভিত্তিচিত্রে। প্রাচীন রাজপুরীর প্রাচীরগাত্রনিহিত এ জাতীয় চিত্রনিচয় সাসানীয় যুগের অবসানে সমস্তই ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল কিন্তু পনখের কাজে চিত্র-নিবেশ-প্রথা (fresco painting) যে একবারে লোপ পায় নাই তাহা বুঝা যায় তেহরণ যাদুঘরে রক্ষিত খ্রীঃ দশম শতাব্দীর একখানি চিত্রিত ফলক হইতে। নরনারীর মূর্ত্তিসম্বলিত এই বিচিত্র শিল্প-নিদর্শন সামানিদ (Samanid) বংশের রাজত্বকালে পরিকল্পিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল এইরূপই অনুমিত হইয়াছে। ইহাই এজাতীয় শিল্পের একক নিদর্শন নয়। অলঙ্করণ বা প্রসাধক নক্সার দিক্ দিয়া এ শ্রেণীর চিত্রকর্ম্ম যে কিরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দের মধ্যে পুরাপুরি পারসীক প্রভাবে চিত্রিত একখানি জীর্ণপ্রায় কাষ্ঠফলক হইতে। ইহাতে একই সারিতে জোড়া জোড়া পক্ষিরাজ ঘোড়া পুচ্ছের দিকে মুখ ফিরাইয়া যেন পরস্পরের বিপরীত ভাগে অগ্রসর হইতেছে। দুইটি অশ্বের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা পুষ্পাকৃতি প্রসাধক নক্সায় ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি নক্সা বিলাতী কুল চিহ্নে (heraldry তে) ব্যবহৃত বাঁধা ছাঁদের কুমুদ জাতীয় আইরিস্ পুষ্পের (fleur de lys এর) অনুরূপ। ভিত্তিচিত্র সম্পর্কে এরিবানের (Eriwan এর) রাজপ্রাসাদের দেওয়াল-চিত্রগুলিও বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর ক্ষুদ্রক চিত্রে গৃহাভ্যন্তর দেখাইতে গিয়া ভিত্তিসাধন যে ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইতে সমকালীন দেওয়াল-চিত্রে অলঙ্করণের ধারা যে কিরূপ ছিল তাহা অনেকটা অনুমান করা চলে। এই প্রকার ছোট আকৃতির ছবির ভিতর আঁকা ফ্রেস্কো চিত্রের নমুনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তখনকার দিনে সাধারণতঃ বাঁধা ছাঁচের ফুলের নক্সাই দেওয়ালের গায়ে আঁকা হইত—সাধারণতঃ সাদা জমির উপর নীল রেখার সাহায্যে। শুধু বাস্তবতার দিক্ দিয়াই—এই প্রসাধক নক্সাগুলি চিত্রপট-নিহিত প্রকোষ্ঠের গাত্রে দেখান হইয়াছে, ইহাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলে ফ্রেস্কো শিল্পের ইতিহাসে এই সামান্য মাত্র উপকরণও উপেক্ষণীয় নয়। দেখা যায়—নরনারীর মূর্ত্তিও এই প্রকার চিত্রপটে অর্পিত গৃহ-প্রাচীরে স্থান পাইয়াছে কিন্তু এ সকল লক্ষিত হয় শুধু শয়ন-মন্দিরের দৃশ্যসমূহে ("there are usually represented in bed room scenes")। যদি এই শ্রেণীর প্রমোদচিত্র নিতান্তই কেবল খেয়ালী শিল্পীর কল্পনা প্রসূত না হয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে এগুলি প্রধানতঃ শুদ্ধান্তবাসিনী রমণীজনের প্রকোষ্ঠসমূহের সজ্জার জন্যই অঙ্কিত হইত।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ বড় রকম কোন একটা পরিবর্ত্তন অনেক স্থলেই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় না। উহার সূচনা পূর্ব্ব হইতেই অল্পাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রক চিত্রের অঙ্কন-পদ্ধতিতে অনেক খুঁটিনাটি থাকায় ইহা অনন্যচিত্তে ও অশেষ যত্ন সহকারে অনুশীলন করিতে হইত, তাই ইহা ছিল যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। এজন্য আব্বাসীয় আমলের অনেক চিত্রকর আর এসব হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া সোজাসুজি লেখনী (বর্ণিকা) সাহায্যে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ পদ্ধতিতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারা যাইত, আর কলমে খুব হাল্‌কা রঙ ব্যবহার করা চলিত বলিয়া নানা রঙ মিল করিয়া বিবিধ বর্ণবিন্যাসের প্রয়োজন ইহাতে ছিল না। এ শিল্প ছিল স্বল্পায়াসেই অধিগম্য আর ইহাতে ব্যয়ও ছিল সামান্য মাত্র—তাই ইহা স্বল্পকালমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। বিহ্‌জাদের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিয়া এ যুগের শিল্পীরা আশ্রয় লইলেন আলো ও ছায়া সংস্থাপন-কৌশলের ও পাশ্চাত্য শিল্পধারায় অবলম্বিত পরিপ্রেক্ষণা-প্রণালীর আঙ্গিকে। কোথায় গেল সে নির্ম্মল বর্ণ, কোথায় গেল সে উজ্জ্বলতা আর মিনাকারি কাজের মত সৌষ্ঠব!

টুনবাসী মীর আফ্‌জলের অঙ্কিত শায়িতা রমণী

পারসীক চিত্রের এই আগতপ্রায় অধঃপতনের যুগেও প্রতিভাবান্ চিত্রশিল্পীর অভাব হয় নাই। এ ধারার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি শিল্পী রিজার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। রিজা নামধারী এক-ব্যক্তি না একাধিক ব্যক্তি এই প্রকার চিত্রাঙ্কনে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। বিতর্কের ফলে মোটের উপর দাঁড়াইয়াছে এই যে, খুব সম্ভবতঃ রিজা নামের দুইজন চিত্রকর ছিলেন একজনের নাম আকা রিজা (Aqa Riza) অর্থাৎ বড় রিজা আর অপরের নাম ছিল রিজা-ই-আব্বাসী। রিজা-ই-আব্বাসী চিত্রে নিজের নাম ও তারিখ তো লিখিতেনই, অনেক সময় কি সূত্রে চিত্রটি আঁকা হইল তাহাও লিখিয়া রাখিয়াছেন। মঁসিয়ে ব্লশের (Blochet) মতে আকা রিজা বিদ্যমান ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে আর রিজা-ই-আব্বাসীকে তিনি আনিয়া ফেলিতে চাহেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে। মঁসিয়ে গ্যাস্ত মিজিয় আকা রিজা ও রিজা-ই-আব্বাসী সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন নাই। আমরা সন তারিখের আলোচনার পূর্ব্বে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি হইতে দুই রিজার ব্যক্তিগত বিভিন্নতা কতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহারই আলোচনা করিব। বড় রিজার চিত্রণ-ভঙ্গীতে রেখাঙ্কনের উপরই ছিল বেশী জোর। যে লেখনী-সম্ভূত চিত্রণ-রীতি এই চিত্রকরের প্রতিভায় এক বিশেষ শক্তিমন্ত-শৈলীতে পরিণত হয় তাহা প্রায় আধুনিক চিত্রকরদিগের খুঁটিনাটি বর্জ্জিত ইম্প্রেসনিষ্ট (impressionist) পদ্ধতিরই অনুরূপ। এই রেখাশৈলীর নমুনা স্বরূপ জনৈক পারসীক চিকিৎসকের এক-খানি প্রতিকৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ শ্রেণীর অপর চিত্রগুলির তুলনায় এ চিত্রে রেখাশক্তির কিঞ্চিৎ ন্যূনতা লক্ষিত হয় বটে তথাপি পৃষ্ঠভাগের বক্ররেখাটির অসাধারণ সৌষ্ঠব মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। তিনটি ছিন্ন বৃত্তাংশের সুকৌশল যোজনা ফলে এই সু-সম্পূর্ণ বক্র রেখাটির পুরাপুরি উদ্ভব হইয়াছে। রেখাঙ্কনে এ শৈলীর চিত্রকর-দিগের জোর টানের কথা আর কি বলিব, বড় বড় করিয়া কলম চালাইবার ফলে স্থানে স্থানে লেখনীর মসী বিন্দু বিন্দু ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। প্রতিকৃতির শ্মশ্রু অংশ বড়ই সুন্দর এবং এই প্রকার অঙ্কনকার্য্যের আদর্শস্থানীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে সকল সমঝদারের পছন্দ বড় উৎকট রকমের, যাঁহাদের সহজে কিছুতেই মন উঠে না, এই প্রকার কাজ দেখিলে তাঁহারাও সন্তোষ লাভ না করিয়া পারেন না। জামার বোতামে ও হাতা দুইটিতে একটু একটু সোনালী ছোঁয়ান আছে। চিকিৎসক উপবিষ্ট, দুই হাতে একখানি গ্রন্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন। মুখচোখের এরূপ সজীব ভাব, যে একবার দেখিলে মূর্ত্তিখানি যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে থাকে। আমরা এই প্রতিকৃতি অঙ্কন-পদ্ধতিকে আকা রিজার শৈলী ব্যতীত আর অপর কোন নামেই অভিহিত করিতে পারি না। হয় তো ইহা তাঁহারই চিত্রিগোষ্ঠীর অন্তর্গত কাহারও দ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ইহার অঙ্কনকাল আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দ। পারসীক শিল্পে এই প্রভাবশালী চিত্রকর-প্রবর্ত্তিত 'কলমের' (অঙ্কনপদ্ধতির) প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবাধ প্রচলন দৃষ্ট হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর খুব নামজাদা চিত্রকর ছিলেন রিজা নামের এক দ্বিতীয় চিত্রশিল্পী রিজা-ই-আব্বাসী। তাঁহার নামাঙ্কিত ক্ষুদ্রক চিত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা খ্রীঃ অঃ ১৬১৮ হইতে ১৬৩৯ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রধানতঃ দরবারী লিপিকার (Court Callegrapher)-রূপে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি যে পূর্ব্ব হইতেই চিত্রকর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারই স্বহস্তে অঙ্কিত সাহ প্রথম আব্বাসের একখানি প্রতিকৃতি হইতে (৪)। সাহ প্রথম আব্বাসের মৃত্যু ঘটে ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দ বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই কিঞ্চিদধিক ষোড়শ বর্ষকাল পারস্যা-ধিপের সংস্পর্শে থাকিয়া চিত্রকর দ্বিতীয় রিজার "আব্বাসী" পদবী লাভ একবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইহার সমর্থনকল্পে এ-কথাও বলা যাইতে পারে যে, রিজা-ই-আব্বাসী সাধারণ শ্রেণীর রাজসভাসদ্ হইতে ক্রমে সাহের অন্তরঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়া-ছিলেন। বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া তাঁহারই সমকালীন কোন কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে "সাহ নওয়াজ" অর্থাৎ রাজকীয় চাটুকার বলিয়া উল্লেখ করিত। এরূপ রাজানুকম্পার অধিকারী হইয়া দ্বিতীয় রিজা যে "আব্বাসী" নামটি গৌরবজ্ঞাপক উপাধিস্বরূপ বিবেচনা করিবেন এবং সানন্দে উহা গ্রহণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবার কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার আব্বাসী নাম হইয়াছিল খ্যাতনামা সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের অধীনে চিত্রকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া। সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের রাজত্বকাল খ্রীঃ অঃ ১৬৪২ হইতে ১৬৬৭ পর্য্যন্ত। কেহ কেহ বলেন দ্বিতীয় রিজা, সাহ প্রথম আব্বাসের রাজত্বকালেই বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হন। কথিত আছে, রিজা-ই-আব্বাসী হিরাটের চিত্রকর ওস্তাদ মীর আলীর নিকট চিত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। মীর আলির মৃত্যু হয় খ্রীঃ ১৫৪৪ অব্দে। তাঁহার হিরাট শিল্প-কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্তির কথা সত্য হইলে রিজা-ই-আব্বাসীর সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের রাজত্বকালেও কর্ম্মক্ষম থাকা একবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সাহ প্রথম আব্বাস প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ করিয়া ভিন্নশ্রেণীর রাজাদিগের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক সংস্থাপন ও সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসী ছিলেন। দৌত্যসম্পর্কে দিল্লীশ্বরের সহিত তাঁহার একাধিকবার নানা উপঢৌকনাদির আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল। ১৬১৭ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইরাণ হইতে আগত দূতের সহিত তাহার জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী খাঁ আলম বরখুদারকে "ভ্রাতা" আব্বাসের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে পারস্যরাজকে স্মারকচিহ্ন (ইয়াদ্‌বুদি) স্বরূপ মোগল সম্রাট যে সকল মূল্যবান্ বস্ত্র ও রত্নখচিত দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন তাহার মূল্য তখনকার কালের একলক্ষ টাকার কম নয়। বিষণ দাস নামক জাহাঙ্গীরের

(৪) Rupam, October S921, plate opposite p. 36.

একজন হিন্দু চিত্রকর খাঁ আলমের সহিত ইরাণে আগমন করেন। তাঁহার তুলিকাপ্রসূত মোগল রাজদূত কর্ত্তৃক উপহার প্রদানের অন্ততঃ দুইখানি চিত্র কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে(৬)। চিত্রে দৃষ্ট হয় যে খাঁ আলম, সাহ প্রথম আব্বাসের হস্তে সুন্দর একটি রত্নখচিত স্ফাটিক পানপাত্র অর্পণ করিতেছেন এই ঘটনারই আর একখানি চিত্র আঁকিয়াছিলেন রিজা-ই-আব্বাসী খ্রীঃ ১৬৩২ অব্দে, ঘটনার প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পরে(৭)। ইহাও জানা গিয়াছে যে, হাকিম শামসা মহম্মদ নামক কোনও ব্যক্তির অনুরোধক্রমে এ চিত্রখানি অঙ্কিত হয়। সম্ভবতঃ সমসাময়িক কোনও 'টবরা' (স্কেচ) হইতে এ চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছিল। এ চিত্র চিত্রকরের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অঙ্কিত বলিয়াই মনে হয়। খাঁ আলম যে সময় পারস্যরাজসকাশে উপনীত হন, সে সময় রিজা-ই-আব্বাসী যে রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহ প্রথম আব্বাস পারসীক কৃষ্টির উৎকর্ষ সংসাধনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিপথে চালিত হওয়ায় ফল ফলিয়াছিল উল্টা রকমের। চাহিল সিতুন প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় সাহ প্রথম আব্বাসের রাজত্ব কালে। ইউরোপের সমক্ষে ঐশ্বর্য্যে ও সংস্কৃতিতে ইরাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার জন্য সাহ আব্বাস বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বতন সুদৃশ্য এবং সুরুচিসম্পন্ন স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে বৃহদায়তন বিবিধ হর্ম্যাদিও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন কিন্তু অকৃতীর হাতে পড়িয়া সেগুলি হইয়াছিল স্থূল ও অভব্য রকমের। ইউরোপের অনুকরণে চিত্র-শিল্পের উন্নতিকল্পে তিনি যে পাশ্চাত্ত্য প্রথা-সম্মত 'একাডেমি' (উচ্চবিদ্যালয়) সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে দেশীয় চিত্রকলার ক্ষতি বই শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। বিদেশী চিত্রসমালোচক ডাঃ এফ, আর, মার্টিন সাহ আব্বাসকে পারসীক সৃজন-প্রতিভার উন্মেষক ও ইরাণের গৌরবমণ্ডিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগের প্রবর্ত্তক বলা দূরে থাক তাঁহার রুচি ও কর্ম্মপদ্ধতি "হঠাৎ বড়" ভুঁই ফোড়ের (parvenu) মত বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর যত ভুলই থাকুক না কেন, পারসীক কৃষ্টির উন্নতিকল্পে ঐকান্তিক যত্নের জন্য মহানুভব আব্বাস (Abbas the Great) এই উদ্দেশ্যে গুণিগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেও বিরত হন নাই। কিন্তু বিদেশ হইতে যে সকল শিল্পী আনীত হইয়াছিল তাহারা অনেকে ছিল নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর লোক। আর কিছু না হউক, বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া পারস্যের মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছিল তাঁহারই কল্যাণে।

বিরুদ্ধ সমালোচকেরা যে মতবাদই সমর্থন করুন না কেন, সাহ প্রথম আব্বাসের মহিমান্বিত যুগে পারসীক লিপিকলা ও চিত্রকলার স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণাদি সমন্বিত যে সকল বিস্ময়াবহ নিদর্শন সমকালীন পুঁথিনিচয়ে একত্র সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে তৎকালীন শিল্পোন্মেষণার প্রভাব-বিবর্জ্জিত এ কথা কে বলিবে? জনৈক অভিজ্ঞ ইংরাজ সমালোচকও এই রাজকীয় যুগের অবদানের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং প্রথম আব্বাসের রাজত্বকালীন চিত্রশিল্পের গুণবৈশিষ্ট্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত

শেখার রাণী (উদ্যানমধ্যে বিশ্রাম করিতেছেন)

(৬) এই চিত্র দুইখানির প্রতিলিপি ১৯২০ খ্রীঃ অঃ অক্টোবর সংখ্যার "রূপম্‌" (Rupam) পত্রিকায় ৯ ও ১০ পৃষ্ঠা সংলগ্ন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৭) Rupam, April 1921, p. 43. For the plate see Dr. Martin's Miniature Painting and Painters of India, Persia and Turkey, Vol. II.

হন নাই (৮)। চিত্রিত পুঁথিগুলির অধিকাংশই ফির্দৌসির সাহনামা মহাকাব্যের অনুলিপি মাত্র। মনে হয়, এই একখানি গ্রন্থ ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থই তখনকার কালে চিরস্মর্ত্তব্য ও চিরস্থায়িত্বের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত না।

এ কথা সত্য বটে যে, সাহিত্য ও ললিতকলার প্রকৃত অধঃপতন ঘটে সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের রাজত্বকালের শেষ ভাগ হইতে কিন্তু ইহার সূত্রপাত হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে (৯)।

সাহ আব্বাস প্রতীচ্যের ললিত-কলায় কৃতবিদ্য হইবার জন্য যে কয়জন যুবককে ইউরোপে প্রেরণ করেন মহম্মদ জমান ছিলেন তাঁহাদিগেরই অন্যতম। কথিত আছে যে, জমান খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'পাওলো' (Paolo) এই নামগ্রহণ করেন। সেই জন্য তিনি পাওলো জমান নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহার এই ধর্ম্মান্তরগ্রহণ সাময়িক বলিয়াই ধারণা জন্মে। শিক্ষালাভের পর মহম্মদজমান প্রবাসীরূপে কিছুকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর সাহজাহান যে তাঁহাকে রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিয়া 'মনসবদার'রূপে কাশ্মীরে প্রেরণ করিয়াছিলেন এ কথাও সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে (৯ক)। ইরাণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর সাহ আব্বাস মহম্মদ জমানকে পুঁথি-চিত্রণে নিয়োজিত করেন। চেষ্টার বিয়েটী (Chester Beatty) সংগ্রহের একখানি পুঁথিতে (১০), (অনুমান হয় এ পুঁথিখানি এক সময়ে রাজকীয় পুঁথিশালারই অন্তর্ভুক্ত ছিল), জমানের নিজ তুলিকায় অঙ্কিত দুইখানি ক্ষুদ্রক চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার একখানি রুস্তমের জন্মকালে সিমুর্গ পক্ষীর আবির্ভাবের চিত্র। উভয় চিত্রই পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গীতে ত্রিমাত্রিক (three dimensional) প্রথায় অঙ্কিত। প্রাচ্য পদ্ধতির স্বল্পমাত্র ছাপও এই চিত্র দুইখানিতে পড়ে নাই। জমান পুরাপুরি ইউরোপীয় চিত্রাঙ্কন-প্রথারই অনুবর্ত্তী ছিলেন।

সাহ আব্বাসের যুগের চারু-শিল্পের আলোচনাকালে বৈদেশিক প্রভাবে আচ্ছন্ন বিদেশপ্রত্যাগত কোনও শিল্পীর কথা কেহ বড় উল্লেখ করেন না, রিজা-ই-আব্বাসীর নামই সর্ব্বাগ্রে উক্ত হইয়া থাকে এবং তৎপ্রবর্ত্তিত শৈলীর কথাই প্রথমে স্মরণপথে উদিত হয়। চিত্রী রিজা, জাপানী চিত্রকর হোকু সাইয়ের (Hokusai এর) সহিত তুলিত হইয়া থাকেন (১০)। হোকু-সাইয়ের ন্যায় তাঁহারও চিত্রগুলির বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনা হইতে গৃহীত। কোনও চিত্রে শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধেরা হাটতলায় বসিয়া জটলা করিতেছে, কোথাও গৃহস্বামিনী মিষ্টান্ন, গন্ধদ্রব্য অথবা দৈবকবচাদি-বিক্রেতা ফিরিওয়ালার সহিত সোৎসাহে দর-কষাকষি করিতেছেন, আবার কোথাও বা প্রণয়িনী কাণায় কাণায় ভরা সুরাপাত্রটি প্রণয়ীর মুখের নিকট ধরিয়া দিতেছে। নায়ক-নায়িকার মধ্যে এই পানপাত্রের আদান-প্রদান তৎকালীন পারসীক শিল্পে প্রণয়মূলক চিত্রপরিকল্পনার যেন এক অফুরন্ত উৎসে পরিণত হইয়াছিল। ইহা যে সামাজিক জীবনে নৈতিক অবনতির পরিচায়ক নহে এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

তৎকালে রিজা-প্রবর্ত্তিত শৈলীর প্রভাব যে পারসীক চিত্র-শিল্পের বিশেষত্বদ্যোতক বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৬৩৩ খ্রীঃ অব্দে লাইডেনে প্রকাশিত এল্‌জেভির (Elzevir) সংস্করণের পারস্যবিষয়ক একখানি গ্রন্থ (১১) হইতে। ইহাতে রিজার ক্ষুদ্রক চিত্রের অনুকরণে ছয় খানি কাঠে খোদাই চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রিজা-ই-আব্বাসীর কর্ম্মজীবনের শেষ সপ্তকে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হয়।

সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের রাজত্বকালে ওলন্দাজ ও ইটালীয় চিত্রকর, চৈনিক ও আর্ম্মেনীয় কারুশিল্পী এবং দেশ-বিদেশের গায়ক ও বাদ্যকর তাঁহার রাজধানী ইস্পাহানে আমন্ত্রিত হইয়া নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেন। অলা কপু (উচ্চতম তোরণ) এবং চেহিল সিতুন (চত্বারিংশৎ স্তম্ভ) নামক প্রাসাদদ্বয়ের ভিত্তিগাত্রস্থ নক্সা ও চিত্রগুলি তাঁহার ললিত-কলার প্রতি অনুরাগের স্থায়ী নিদর্শন-স্বরূপ বিদ্যমান। ইহার মধ্যে চেহিল সিতুনের চিত্রগুলি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের দাক্ষিণ্যে চেহিল সিতুন ভিত্তিচিত্র ও প্রসাধক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ হইলেও চিত্রবিন্যাসে ইহার সৌন্দর্য্য-সাধন শুধু একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই (১২)। যে চিত্রগুলিতে সাহ তহ্‌মাস্পের যুদ্ধ, পারস্যের রাজসভায় মোগল রাজদূতের আগমন, সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের রাজদরবার প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে, (১৩) সেই গুলিই বিশেষ কৌতূহল

(৮) None the less, it is to the reign of Shah Abbas (1587-1699) the glorious period of Persian history that we owe the production of many wonderful examples of typical and characteristic Persian Mss."

Thomas Sutton in Rupam, No. 19 and 20, P. 114.

(৯) Blochat's Mussulman Painting, 12th to 17th Century.

(৯ক) Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 466.

(১০) Indian Art and Letters, Vol. XVI, No. 1, 1942, p. 6.

(১) Rupam. No 19 & 20, p. 184.

(১১) পুস্তকখানির নাম "Persia seu regni persici status." Rupam, loc. cit, p. 114.

(১২) চেহিল সিতুন আফগানেরা ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে ধ্বংস করে এবং ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে উহা নাদির সাহ কর্ত্তৃক পুনর্নির্ম্মিত হয়। নাদির সাহের ভারত আক্রমণের চিত্রটি সেই সময়ে বা উহার কিছু পরবর্ত্তী কালে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। পুনর্নির্ম্মাণের দ্বাদশ বৎসর পরে এ প্রাসাদ পুনরায় ধ্বংসোন্মুখ হয়।

(১৩) প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৯, পৃঃ ৫৮১ ; প্রবাসী পত্রে আটখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রদ বলিয়া মনে হয়। দরবারস্থ নৃপতির হাতের ভঙ্গী দেখিয়া প্রতীতি জন্মে যে তিনি সত্যই নর্ত্তকী ও বাদকদিগের কলা-কৌশলের তারিফ করিতেছেন। চিত্রের মোগল দূতটির গায়ের রং বেশ কালোই বলিতে হয়। হিন্দুস্থানের অধিবাসী মাত্রেই শ্যামাঙ্গ—ইহাই ছিল পারস্তের জনসাধারণের ধারণা। পারস্য ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণদ্যোতক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।

চেহিল সিতুনের ভিত্তিচিত্রে কেবল ঐতিহাসিক চিত্রই অঙ্কিত হয় নাই। অনেকগুলি চিত্রে শিল্পী নিছক কল্পনার রাজ্য হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়াছেন। ইহার কোনটিতে বিরহিণী রাজকন্যা, কোনটিতে আলিঙ্গনবদ্ধ প্রেমিকযুগল (১৩ক) আবার কোনটিতে সঙ্গিনীসহ রাজকুমারী। বিরহিণী রাজপুত্রীকে তাঁহার সান্নিধ্যে উপবিষ্টা কোনও সখী যেন প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক রাজপুত্র ছড়িহাতে দাঁড়াইয়া, তাঁহার পরিচ্ছদ ও মস্তকাবরণ অবিকল ইউরোপীয়ের ন্যায়। তাঁহার পায়ের নিকট, ইউরোপীয় ফ্যাসন অনুযায়ী একটি ক্ষুদ্রকায় কুক্কুরও বসিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ পারসীক মুসলমানেরা কুক্কুর অস্পৃশ্য বলিয়াই মনে করেন; চিত্রে রাজকুমারের বেশবাসে এবং বিশেষ করিয়া এই কুক্কুরের সন্নিবেশ দ্বারা পাশ্চাত্য প্রভাব যে কিরূপ বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। রাজদরবার হইতে চিত্রীদিগকে যাহা কিছু বিদেশী তাহাই নকল করিতে উৎসাহিত করা হইত। কেবল ইউরোপীয় হইলেই হইল, ভাল-মন্দর বিচার ছিল না। ফলে রসের সহিত কোনও সম্পর্ক থাকুক না থাকুক—রুচিসম্মত হউক বা না হউক চটক্‌দার কিছু দেখিলেই শিল্পিবৃন্দ তাহা নির্ব্বিচারে শিল্পাদর্শরূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ফলে পারস্যের মৌলিক ওজস্বী শিল্প কালক্রমে সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল।

চেহিল সিতুনের চিত্রগুলি আকারে দুই তিন হাত লম্বা ও এক দেড় হাত চওড়া হইলেও আসলে ক্ষুদ্রক চিত্রধর্ম্মী (১৪) কিন্তু ইহাতে ক্ষুদ্রক চিত্রের "বর্ণের বিশুদ্ধতা" ও "দৃঢ় রেখাপাতের নৈপুণ্য" প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও সাঙ্কর্য্য দোষে দুষ্ট বলিয়া এ-সকল চিত্র বর্ণাঢ্য হইলেও মনোমুগ্ধকর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মোটকথা বিদেশী শিল্পের কৃপণ কৌশল অবলম্বন করিয়া ত্রি-মাত্রিক (Three-diamensional) পদ্ধতিতে চিত্র আঁকিতে পারসীক চিত্রকর সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, মাঝ হইতে দেশীয় শিল্পের নিজস্বটুকুও হারাইয়া বসিয়াছেন।

সাহ প্রথম ও দ্বিতীয় আব্বাস রাজসভা হইতে পুরাতন

পারসীক মহিলা

আমলের চিত্রকরদিগের অধিকাংশকেই বিদায় দিয়া দেশীয় চিত্র-শিল্পের অধঃপতন ঘটাইয়াছিলেন বটে কিন্তু চিত্রবিদ্যার অনুশীলন তাহাতে একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই, শুধু এই মাত্র দাঁড়াইয়াছিল যে রাজার বিশেষ ফরমায়েসী চিত্রগুলি অঙ্কন করিতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন বিদেশী চিত্রকর। আনুমানিক ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে তুজারবাত (Tujarbat) গ্রামে তাঁহার এক রাজকীয়

(১৩ক) রিজা-ই-আব্বাসীও দম্পতির আদর-সোহাগের চিত্র আঁকিয়াছেন। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ তরুণ-তরুণীর যে চিত্রখানির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল তাহা রিজা-ই-আব্বাসীর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। চিত্রখানি F. Sane সংগ্রহের অন্তর্গত বলিয়া "মসিয়ে মিজিয়'র গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

(১৪) প্রবাসী, loc. cit.

আবাস প্রথম আব্বাস জুলস্ (Jules) নামক একজন ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীর দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। জুলস্ জন্মিয়াছিলেন গ্রীস দেশে এবং শিক্ষিত হইয়াছিলেন ইতালীতে। তিনি আঁকিয়াছেন ভোজের ও নৃত্যের চিত্র, তাহাতে নানা স্ত্রীমূর্ত্তিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাহ দ্বিতীয় আব্বাস একটি সুবিশাল অভ্যর্থনা-কক্ষের (Salon-এর) ভিত্তিগাত্রে ও দেওয়ালের খাঁজে (niches-এ) একজন ওলন্দাজ চিত্রকরের দ্বারা ইংরাজদিগের স্বাস্থ্যপানের (drinking of health-এর) চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। চিত্রকর দেখাইয়াছেন যে, চিত্রনিহিত পুরুষ ও রমণীগণ সুরাপূর্ণ বোতল ও গ্লাস হাতে ধরিয়া পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করিতেছেন। প্রাচ্য মানবের চক্ষে এ-প্রকার চিত্র যে বিকৃত রুচির পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য।

শিল্পে এই রুচিবিকার শুধু পাশ্চাত্য-শিল্পের ধারা বহিয়া আসে নাই, উহা অন্যদিক হইতে সংক্রামিত হইয়াছিল সামাজিক ও নৈতিক আবহাওয়ার প্রভাবে।

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে নিজামীর খসরু ও শিরীণের যে একখানি চিত্রিত পুঁথি আছে (১৫) তাহার মোট সপ্তদশ সংখ্যক ক্ষুদ্রক চিত্রের সব কয়খানিই রিজা-ই-আব্বাসীর দস্তখৎযুক্ত। চিত্রের একখানিতে তারিখও পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজী হিসাবে উহা খ্রী: ১৬৩২ অব্দ হইবে। সম্ভবত: সব চিত্র কয়খানিই ঐ একই বৎসরে অঙ্কিত। আঁকিবার প্রণালী ও পাত্র-পাত্রীর পোষাক-পরিচ্ছদ সমকালীন চিত্রের সহিতই মিলিয়া যায়। ১৫৩৯ খ্রী: অব্দের নিজামী পুঁথির চিত্রের সহিত এই চিত্রগুলি তুলনা করিলে বুঝা যায় এই ৯৩।৯৪ বৎসরে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের এই খসরু শিরীণ পুঁথিখানির চিত্রণ-কাল হইতে চিত্রনিহিত নায়ক (খসরু) যে আর পাহলওয়ান্ অথবা অতিমানবরূপে কল্পিত নন তাহা স্পষ্টতঃই দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থেরই অন্তর্গত শিরীণ ও ফার্‌হাদের—প্রথম সাক্ষাতের একখানি চিত্র(১৬) এ উক্তির সমর্থন করিতেছে। চিত্রের নিম্নভাগে রূপমুগ্ধ ফার্‌হাদ্ শিরীণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চেহারার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহা শুধু তাঁহার দীর্ঘ গুম্ফে। নায়ক বলিয়া চিনিবার কোন লক্ষণই বিদ্যমান নাই। পরিধেয় অতি সামান্য রকমের,—তাঁহাকে দেখিয়া ভুবন-বিখ্যাত স্থপতি তো দূরের কথা,—মজুর অথবা মিস্ত্রীর মেট বলিয়াই মনে হয়। এই শ্রেণীর লোক বিত্তশালী নিয়োগকর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এইরূপ দীন ভঙ্গীতেই হস্তামর্ষণ করিতে থাকে। সম্মুখে শিরীণ নিপুণা নটীর ন্যায় কমল-সদৃশ একটি পুষ্প ধারণ করিয়া তরুতলে দণ্ডায়মানা। সংস্কৃত সাহিত্যের সেই সুপরিচিত লীলাকমল বুঝি বা পারসীক রূপসী সমাজেও অপরিচিত ছিল না। শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন একটি তরুণ নতজানু হইয়া শিরীণের পাদমূলে উপবিষ্ট। সে হাত দিয়া ফার্‌হাদকে নির্দ্দেশ করিয়া যেন তাহারই প্রতিভূস্বরূপ নায়িকার নিকট প্রেমনিবেদন করিতেছে।

অপর পার্শ্বে শিরীণের কোনও সখী বা পরিচারিকা, যেন শুধু মূর্ত্তিবিন্যাসের ছন্দ বজায় রাখার জন্যই, মূল নায়িকার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া মস্তক হেলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চিত্রে উভয়ের কাহারও রমণীসুলভ বসন-ভূষণের সৌষ্ঠব নাই। বেসিল গ্রে যথার্থই বলিয়াছেন যে ইহারা সকলেই নিম্ন শ্রেণীর লোক, যেন বাজার হইতে ধরিয়া আনা। গাছ পালা আঁকা হইয়াছে তালুকা সোনালী রঙে, দেখিয়া মনে হয় পুঁথির কিনারার অলঙ্করণ-পদ্ধতি যেন মোটামুটি রকমে চিত্রমধ্যেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। চিত্রকর ছবিখানি বেশ মাজিয়া ঘষিয়া শেষ করার চেষ্টা করেন নাই। চিত্রখানির সংটুকুই প্রসাধক ভাবে ভরপুর বটে কিন্তু চিত্রপটের কোথাও তেমন পরিমার্জ্জনার আভাস পাওয়া যায় না। রঙের সংমিশ্রণ বেশ সন্তোষজনক না হউক কৌতূহলকর সন্দেহ নাই। বেগুনী, নীল, ও হরিদ্রা (হলুদিয়া) প্রধানতঃ এই তিনটি রঙই ব্যবহৃত করা হইয়াছে। একই রঙের একটু গাঢ়তর ছোপের সাহায্যে কাপড়ের ভাঁজ প্রভৃতি দেখান হইয়াছে। হয় তো শিল্পী এটুকু শিখিয়াছিলেন নিজেরই অভিজ্ঞতা হইতে, তাই প্রয়োগ করিতে গিয়া কোনও কোনও স্থলে একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। পরীক্ষার দ্বারা নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে রিজা-ই-আব্বাসীর অনিচ্ছা ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

রিজা-ই-আব্বাসীর ন্যায় প্রতিভাবান শিল্পী সাধারণ লোকের পছন্দের মাপে নিজের পরিকল্পনা নিয়মিত করিবেন ইহা মনে করিতে পারা যায় না কিন্তু তাঁহার ছবিগুলি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে সেগুলি হীন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের মনে হয় যে ইহার জন্য ইতর জনসাধারণ যত দায়ী না হউক, দায়ী চিত্রকরের নিজেরই চরিত্র। ইস্কান্দার মুন্সী লিখিয়াছেন যে সাহ আব্বাসের বন্ধুত্বগৌরব লাভ করিলেও রিজা-ই-আব্বাসী ছিলেন একজন স্খলিতচরিত্রের লোক। অবশ্য এরূপ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার অখ্যাতি শুধু তাঁহার কেন, অনেক প্রথিতযশাঃ ইউরোপীয় চিত্রকরদিগের সম্বন্ধেও শুনা যায়। আব্বাসীর চিত্রে অনেক স্থলেই দেখা যায় সুরাপানে অর্দ্ধবিহ্বল ধনী লোকের তরুণ অনুচর বা বালকভৃত্য—কাহারও কাহারও বা হাতে কারাফ্ Carafe। মনে হয় ইহারাই ভোজনকক্ষে ও নিমন্ত্রণ-সভায় সুরাপরিবেশন করিত(১৭)। অলকলাঞ্ছিত-কপোল কোনও কোনও কিশোরের মুখমণ্ডল শুধু গোলাপী রঙের বিন্দু দিয়া গড়া। ইহাতে যে ইউরোপীয় চিত্রাদর্শের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে, কেহ কেহ ত অনুমান করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। শুধু তরুণ কেন, পানাসক্ত বৃদ্ধের চিত্রও যে তিনি আঁকেন নাই তা নয়। তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষের দিকে আঁকা ক্ষুদ্রক চিত্র সকল অনুশীলন

---

(১৫) পুঁথিখানির পুষ্পিকায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, উহা সমাপ্ত হইয়াছিল খ্রী: ১৬৮০ অব্দে। লিপিকার আব্দুল জব্বর ইস্পাহানী দেহত্যাগ করিলে উহা হয়তো অপর কাহারও দ্বারা সমাপ্ত করান হইয়াছিল। লিপিকারের কার্য্য শেষ করিতে এই কারণে দীর্ঘ অষ্টচত্বারিংশৎ বৎসর অতিবাহিত হওয়াও অসম্ভব নয়।

১৬ Basil Gray প্রণীত Persian Painting গ্রন্থে এ চিত্রের একখানি প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে।

(১৭) Arnold's Painting in Islam, pp. 89 90, Ed. 1910.

করিলে চোখে পড়ে যে এ যুগের পারসীক চারুশিল্পে ঐতিহ্যের সত্যকার অভাব, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শিল্পীর স্বাভাবিক রুচি এ অভাব বহুলাংশে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। পটুয়ার তুলিকায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য রস (sensuousness) অল্প কিছু সঞ্চারিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে চিত্রগুলির অঙ্কনধারার চারু সুসমা সামান্য রূপেও বিকৃত হয় নাই।

টুন্ (Tun) নগরবাসী মীর আফজলের চিত্রও এই শৈলীর অন্তর্গত। মীর আফজলের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'মীর' শব্দের অর্থ রাজবংশোদ্ভব সুতরাং তিনি সম্ভ্রান্তবংশজাত ছিলেন এইরূপই অনুমান হয়। আফজল্ নামাঙ্কিত একখানি চিত্র জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ সুলটস্ (Schultz) সেন্ট পিটার্সবর্গ হইতে প্রকাশিত করেন কিন্তু চিত্রীর নামের সহিত "মীর" শব্দটি সংযোজিত না থাকায় উহা অপর কাহারও দ্বারা অঙ্কিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মীর আফজলের নিজ তুলিকাঙ্কিত একখানি চিত্রে তখনকার দিনের বিকৃত রুচির তথা শিল্পীর অবনমিত আদর্শের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ চিত্রে এক পৃথুলা তরুণী তিনটি উপাধানে তাঁহার দেহভার বিন্যস্ত করিয়া বিলাস আলসে শায়িত। উপাধান-ত্রয় বেশ সৌখীন রকমের, একটি সোনালী, একটি নীল ও একটি বাদামী রঙের। তিনটিই স্কন্ধ ও শিরোদেশের নিম্নে সংস্থাপিত। রূপসীর দেহের নিম্নার্দ্ধ ধরণীতলেই সংস্থাপিত। পদদ্বয় অর্দ্ধসঙ্কুচিত, একটি পদপল্লব আর একটির উপর বিন্যস্ত। তিনি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া শায়িতা। উপাধাননিম্নস্থ কোমল শয্যাস্তরণাদির স্থান গ্রহণ করিয়াছে উদ্যানের শ্যাম শষ্প। উদ্যানের কর্ম্মহীন জীবনের একটানা অবসাদ যে কোনও যুবতীকে এরূপ গভীরভাবে সমাচ্ছন্ন করিবে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এই অলস নায়িকা পিরানের (পিরিহানের) (১৮) কতকাংশ কটিতটে গুটাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার নাভিদেশ অনাবৃত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে একবারে নগ্না স্ত্রীমূর্ত্তি সেরূপ কুৎসিৎ ভাবের সঞ্চার করে না, সম্পূর্ণ অনাবৃতা অথচ পদদ্বয়ে পাদুকাধারিণী রমণীর চিত্রদৃষ্টে যেরূপ চিত্তবৃত্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। এ চিত্র খানিতেও বস্ত্রাবরণের ভিতর দিয়া নগ্নতার যে আভাসটুকু দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বল্প হইলেও শ্লীলতার অভিব্যঞ্জক নয়। শিল্পী সূক্ষ্মাংশের বাহুল্য বর্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই। পরণের কারুকার্য্যশোভিত শালোয়ারটির (পাজামার) উপরার্দ্ধ শ্বেত ও নিম্নার্দ্ধ নীলবস্ত্রে নির্ম্মিত। সাদা অংশে নীল ও সোনালী সূতা দিয়া সূচীশিল্পের কাজ করা, আর নীচের নীলাংশ নক্সার আতিশয্যে বস্তুতঃই ভারাক্রান্ত। এই অংশটুকুই দৃষ্টি পথে পতিত হয় বলিয়া উহাতে কারুকার্য্যের বাহুল্য সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘ কেশের পাঁচটি বিস্রস্ত বেণী বিভিন্ন গুচ্ছে গলা ও বুকের উপর দিয়া মেঝের দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে। অদ্ভুত রকমের ছোট্ট একটি কুকুর, হঠাৎ দৃষ্টে মর্কট বলিয়াই মনে হয়, একটি বড় চীনা মাটির বাটিতে মুখ দিয়া কি যেন খাইতে যাইতেছে, সুন্দরী দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এই সকল আনুষঙ্গিক সূক্ষ্মাংশ এই সঙ্গিহীনা অন্তঃপুরিকার অপরিসীম ক্লান্তির দ্যোতনা যেন আমাদের মর্ম্মদেশে পৌঁছাইয়া দেয়। কুকুরটির চোখের সোনালী রং বিহজাদের পদ্ধতির অনুকৃতি সূচিত করিতেছে। রমণীর অপর পার্শ্বে, কতকটা তাঁহার পায়ের দিকে, একটি চীনা মাটির শ্বেতনীল পুষ্পাধারে সপত্র গোলাপগুচ্ছ রক্ষিত। কুকুরে যে বাটিটিতে মুখ দিতে যাইতেছে তাহার গাত্রস্থ অলঙ্করণ ও প্রসাধন-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হয় যে মিংযুগের (খ্রীঃ অঃ ১৩৬৮—১৬৪৪) মৃৎপাত্রের নক্সা (designs on Ming pottery) আংশিকভাবে অনুকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু পারসীক শিল্পী তাহা নিজস্ব ধারায় আনিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন মসজিদের একটি চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া। প্রদত্ত প্রতিলিপিতে এই চীনা মাটির পাত্রটির উপরকার অন্যান্য নক্সার সহিত চূড়া সমেত মসজিদের আদরাও কতকাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। পটভূমে, সূক্ষ্ম সোনালী রেখার ক্ষীণ আভাসে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একটি দূরাবস্থিত খর্জ্জুর বৃক্ষ।
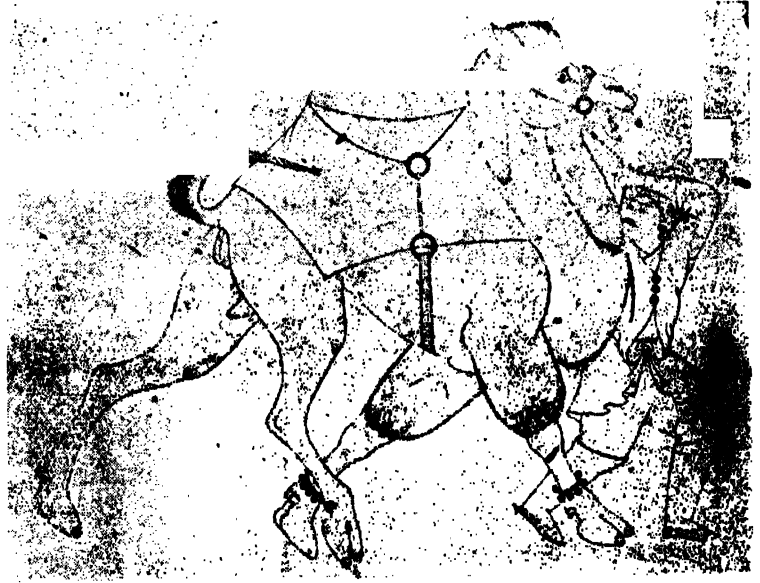
উষ্ট্র ও উষ্ট্রপাল

(১৮) 'চাদর' ও 'পিরান' দুইটিই পারসীক শব্দ এবং দুইটিই স্ত্রীঅঙ্গনোচিত পরিচ্ছদজ্ঞাপক।

নারীর অনবগুণ্ঠিত রূপরাজি নিপুণ শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে দেবতার কোন আবির্ভাবেরই ন্যায় মনে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করে। সে হর্ষোদ্গমে হৃদয়ের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু যে পরিকল্পনায় ভব্যতা ও সুরুচির একান্ত অভাব সেখানে স্বল্প অনাবৃত দৈহিক সৌন্দর্য্যও নিতান্ত কুশ্রী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যে সমাজে স্ত্রীজনেরা আপাদমস্তক আবৃতা না হইয়া গৃহের বহির্দ্দেশে আগমন করেন না, সেখানে কুলকামিনীর অনাবৃত নাভিগহ্বর কখনই শিল্পীর শিষ্টমনের পরিচায়ক নহে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের আর একখানি চিত্রে নায়িকার এইরূপ অলসবিহ্বল ভাব দৃষ্ট হয়। এখানি শেবা'র রাণীর (Queen of Sheba'র) চিত্র বলিয়া পরিচিত, জল-মিশ্রিত রঙে (water colour এ) আঁকা। রাণীর মস্তকে ঝিচড় মুকুট, পরিধানে সুদৃশ্য মূল্যবান্ পরিচ্ছদ। তিনি একটি বিশীর্ণ চেনার বৃক্ষতলে উপাধানে বাহু ন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে বিশ্রাম করিতেছেন। এ রমণীও শায়িতা কিন্তু তাঁহার ভঙ্গী সৌষ্ঠবপূর্ণ। নিকট দিয়া একটি নহর বহিয়া যাইতেছে, নহরের পার্শ্বদেশ শষ্পাবৃত। নহরের ধারেই, দুইটি পাত্রে যেন কোনও আহার্য্য সামগ্রী ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। রাণীর পায়ের দিকে অপর একটি তরু মাথার দিকের চেনার বৃক্ষের সহিত যেন ছন্দ বজায় রাখিবার জন্যই অঙ্কিত। এ গাছের পাতাগুলি ঢেঁকিশাকের (fern এর) পাতার আকারে বিন্যস্ত। একদিকে একটি শাখা কর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার যে টুকু অবশিষ্ট ভাগ বৃক্ষকাণ্ডে সংলগ্ন, তাহারই উপর কাঠ-ঠোকরা পাখীর ন্যায় একটি পাখী বসিয়া আছে। গাছের পাশেই ছোট একটি পাহাড়, দূরে লিলি-জাতীয় পুষ্পের একটি গাছ ঝোপের আকারে বিন্যস্ত। গাছ হইতে দুইটি ডাঁটা বাহির হইয়াছে, একটিতে একটি মাত্র ফোটা ফুল, আর একটিতে একটি কোরক ও একটি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পুষ্প। পায়ের দিকে প্রসাধক গুণবিশিষ্ট আরও তিনটি পুষ্পতরু, সেগুলির পাতা দেখিতে পানপাতার মত। প্রত্যেক গাছে একটি করিয়া ফোটা ফুল আর ডগায় ক্ষুদ্র পত্র ও কোরক। রাণীর অঙ্গচ্ছদে নানারূপ সুদৃশ্য নক্সা ও ফুল-লতাপাতার সহিত মানুষের মুখ এবং ইতর জীব ও পক্ষীর প্রতিকৃতি পুরাপুরি কিম্বা আংশিকভাবে স্থান পাইয়াছে। ইহা চীন পদ্ধতির অনুকরণ হইলেও সমগ্র চিত্রটির ন্যায় এই নক্সাগুলিও সুরুচি ও শুচিতার পরিচায়ক। যুগ-পরিবর্ত্তনের সহিত শৈলীর পরিবর্ত্তন যতই সংসাধিত হউক না কেন, শিল্পীর মার্জ্জিত রুচিই শিল্পোৎকর্ষের নিয়ামক বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

রিজা-ই-আব্বাসী, তাঁহার বন্ধু মুইন মুসাব্বির, এবং রিজার শিষ্যপর্য্যায়ভুক্ত ইউসুফ নামক চিত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের কার্য্যতঃ বিলোপ ঘটে। ইহার পর জাতীয় শিল্পের যেটুকু রহিল, তাহা হয় মহম্মদ কাশিম, মহম্মদ আলি এবং মহম্মদ ইউসুফ-অল্-হোসেনীর উৎকট রীতিপ্রিয়তার [mannerism এর] চাপে একেবারে অবসন্ন হইয়া গেল, না হয় সমকালীন নকলনবীশদের হাতে পড়িয়া নাস্তানাবুদ না হইয়া রেহাই পাইল না। "সাত নকলে আসল খাস্তা" এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা, এই অনুকরণ-শিল্পের নিরর্থক বাহুল্যেই প্রমাণিত হয়।(১৯)

১৫৫০ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৬৫০ খ্রীঃ অঃ এই এক শতাব্দীর মধ্যে চিত্র অঙ্কনের সময় অনেকটা নির্ণয় করা চলে চিত্র-সন্নিবিষ্ট পুরুষদিগের মস্তকাবরণ লক্ষ্য করিয়া। পারসীক ভদ্রসমাজে পাগড়ীর আকার পূর্ব্ব হইতেই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছিল কিন্তু সাহ তহমাস্পের রাজত্বকালে উহা ভারে ও বহরে এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, উত্তমাঙ্গে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা এক যন্ত্রণার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে এই অতিস্ফীত উষ্ণীষের স্থানে এক প্রকার পশুলোমের মগজি-বিশিষ্ট নরম টুপি (Soft hat with a fur border) এবং নেপোলিয়নের যুগে প্রচলিত ধারমোড়া ত্রিকোণাকার টুপির (Cocked hatএর) অনুরূপ একপ্রকার মস্তকাবরণ অদল বদল করিয়া ক্রমশঃ পাগড়ীর স্থানে ব্যবহৃত হইতে থাকে। পূর্ব্বে পুরুষদের পোষাকের মধ্যাংশ (waist line) অনেকটা কোমরের নীচে নামিয়া যাইত। সাহ আব্বাসের আমলে একরূপ জ্যাকেট-সদৃশ আঙ্গরাখার রেওয়াজ হইল, যাহার কটিসংলগ্ন ঝালরের ন্যায় বস্ত্রখণ্ড (flounce) খাটো হওয়ায় পোষাকের কটিদেশও আর লম্বা (long-waisted) না হইয়া অনেকটা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইল। উন্নতি হইল যাহা কিছু মগজির দিক্ দিয়া। সাদা মগজির বদলে পশমের মগজির ব্যবহার চলিতে লাগিল। মহিলাদিগের বেশভূষার রীতিতেও কিছু পরিবর্ত্তন না ঘটিল, তা নয়। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের মস্তকাবরণের পিছনের অংশ পিঠের উপর ঝুলিয়া থাকিত, এখন তাহা পিরাণের সহিত জুড়িয়া গিয়া অনেকটা বিলাতী হুড hood এর আকারে পরিণত হইল। দ্বিতীয় সাহ আব্বাসের রাজত্বকালে (খ্রীঃ অঃ ১৬৪২-১৬৬৭) পোষাকের জন্য আর পূর্ব্বের মত মূল্যবান উপাদানে নির্ম্মিত বিচিত্র বর্ণের কারুকার্য্যময় বস্ত্রাদি ব্যবহার করা হইত না। তাহার স্থানে সাদাসিধা ধরণের বেশ খাপি ও টিক্‌সই কাপড়ের প্রচলন হইল—পোষাকের যাহা কিছু বৈচিত্র্য, তাহা রহিল কেবল মগজীর বৈশিষ্ট্যে। সঙ্গে সঙ্গে বসনাদির ক্রমবিবর্দ্ধমান মূল্যও যে কমিয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য।

মহম্মদ করিম তাব্রিজী কর্ত্তৃক অঙ্কিত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কোনও সম্ভ্রান্ত পারসীক মহিলার একখানি চিত্র পাওয়া গিয়াছে(২০)। ইনি ইস্পাহানের রাজাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদিগের বেশভূষার সহিত তিনি যে সুপরিচিত ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। তাঁহার দেহ যে পরিচ্ছদে আবৃত তাহাতে মগজির বৈশিষ্ট্য তো আছেই, অলঙ্করণেরও অভাব নাই। পিরাণের উপরাংশ হুডের আকারে মস্তক আবরণ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহার উপর রহিয়াছে কিঞ্চিদুন্নত কালো একটি টুপি। চিত্রের পীঠভূমে দৃষ্ট হয়—বাঁধা-ছাঁদে আঁকা পাহাড় ও তৎশীর্ষস্থ দুই তিনটি তরু, আর সম্মুখ-ভাগে গুল্মাদির মধ্যে কতকগুলি শ্বেতপ্রস্তরখণ্ড ছড়ান রহিয়াছে। এ মহিলাটিও তন্বঙ্গী নহেন এবং তাঁহাকে তরুণীও বলা চলে না।

[১১] Gastan, Migeon, Mannel d'art Masulman.

বাম কপোলে অলকগুচ্ছটি—বোধ হয় সমকালীন প্রসাধনরীতি অনুসারেই বিন্যস্ত। শিল্পী এ মহিলার হস্তেও কারাফা ও পানপাত্র না দিয়া ছাড়েন নাই। কারাফার গাত্রে একটি রমণীর মুখ গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত অঙ্কিত রহিয়াছে। হউক না চিত্রিত, তবুও এ কারাফা সুরাধার ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগধর্ম্ম এইরূপেই প্রকট হইয়াছে। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, মহিলাটির মুখাবয়বে বা চাহনিতে কোথাও চটুলতার চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

ইতরজীব-চিত্রণে পারসীক শিল্পী চিরকালই ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া অশ্ব ও উষ্ট্রাদির চিত্রে প্রাণিগণের স্ব স্ব ভাববিকাশের দিক্‌ দিয়া। সপ্তদশ শতাব্দীতে এ সম্পর্কে শিল্পীর ক্ষমতার কোনও অপকর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সাফাবিয় যুগে বস্তুতান্ত্রিক প্রভাব বলবত্তর হইয়া প্রায় আধুনিক যুগের সীমায় পৌঁছিলেও সনাতন ধারা একেবারে বর্জ্জিত হয় নাই। অঙ্কন-প্রণালীর ক্রমবিবর্ত্তন সম্পর্কে ইহাই মুখ্যত: দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর উষ্ট্র ও উষ্ট্রপালের একখানি চিত্রের যে প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল, তাহাতে একগুঁয়েমীর প্রতিমূর্ত্তি উটটিকে আপনার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহার রক্ষক বল্‌গা সাহায্যে টানিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইতেছে না। উষ্ট্রের লাঙ্গুল উত্তোলিত, চিত্রকর উষ্ট্রদেহের কোন অংশই অঙ্কন করিতে বিরত হন নাই। সম্মুখের পা দুটিতে নূপুর বাধা। মস্তক লাঙ্গুল ও পায়ের হাঁটুতে রোমরাজির বিনিবেশ রেখাবিন্যাসের যথেষ্ট সংযমের পরিচায়ক। উষ্ট্রটির মুখে চোখে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অসহযোগের ভঙ্গী পরিস্ফুট, তাহার সহিত উষ্ট্রপালের ব্যর্থ-প্রচেষ্টাজনিত ফাঁপরে পড়ার ভাবটি মিলিয়া তরল হাস্যরসের সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই।

শারদ-প্রভাতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মেঘমুক্ত নীলাকাশ,—তারি ছায়া দোলে সরোবরে,
পল্লীপ্রান্তে শেফালিকা, বলাকার শ্রেণী নদীচরে ;
আলোর পরাগ-রেণু পড়ে ঝরে' পথের কুটিরে,—
শুভ্র মেঘ দেবালয়-শিরে। জীবনের তীরে তীরে
সুস্নিগ্ধ সমীরে প্রেম-মিলনের গীতি ধীরে ধীরে
উৎসবের করে আবাহন। নূতন উৎসাহ জাগে
পার্ব্বণের পটভূমিকায় প্রভাতের পুষ্পরাগে।
সবুজ মাঠের বুকে শস্য শোভে,—কচি কিশলয়
নয়ন-পল্লব 'পরে এনেছে বিস্ময়,—মধুময়
মনান্ত সীমায় তুমি যেন আপ্রলয় প্রণয়িনী
চির শ্যাম সুন্দরের,—লাবণ্যের পুঞ্জে মায়াবিনী।

তোমারে দেখেছি আমি প্রতি দিবসের ঝর্ণাতলে
রজনীর নদীতটে প্রভাতের আলো-শতদলে
কবিতার মত ছন্দোময়ী। প্রাণ-পুরুষের সাথে
খেলিতেছ বিরহ-মিলন-খেলা বীণা লয়ে হাতে।
সংসারের ভিতরে বাহিরে তোমার নিগূঢ় প্রীতি
মুখরিত যুগযুগান্তর। পুণ্য ধর্ম্ম প্রেম প্রীতি
মর্ম্মে মর্ম্মে জড়ায়ে জড়ায়ে রহস্যের ইন্দ্রজাল
করিছ বিস্তার। বিশ্ব নিখিলের সীমাহীন চক্রবাল
তোমার হৃদয়পদ্ম করেছে অঙ্কিত। স্তুতি তব
সভ্যতার প্রত্যুষের কণ্ঠ হতে সুরে অভিনব
ছন্দে ছন্দে করেছ রচনা উপনিষদের বাণী
অনন্তকালের রুদ্রজটা ভেদি' মৃত্তিকারে টানি'
এনেছ অমৃতধারা কেদার-বাহিনী কলস্বনা
ত্রিদিবের পথ দিয়া রূপে নব। তোমারি অর্চ্চনা
চলে যুগে যুগে,—আলোছায়া করেছ রচনা বুঝি।
তোমার রচিত এই বিভূতিতে তোমারে যে খুঁজি!

মেঘময়ী বেণী খুলে বিদ্যুতের মালা কণ্ঠে পরি'
মল্লারের সুরে সুরে বর্ষানৃত্য করি,—হে সুন্দরী,
চলেছিলে অভিসারে কোন অজানার আমন্ত্রণে
গন্ধের স্বপন লয়ে? রজনীগন্ধার নৈশ বনে
চঞ্চল অঞ্চল তব আন্দোলিয়া রাজনটী বেশে
বঙ্গের প্রান্তর দিয়া! জোনাকিরা জ্বলেছিল হেসে
বেণুবনচ্ছায়াতলে, তুমি কত ছলে ভুলায়ে পথিক
গিয়েছিলে দূরে—পুলকিত করেছিলে নানা দিক,—
গগন-অঙ্গন মাঝে যখন ফোটেনি তারাফুল,
বিরহ-গুণ্ঠিতা বধূ হয়েছিল মিলনে ব্যাকুল
প্রেমের পরশ লাগি'। দেখা দিলে এ কি রূপ লয়ে'!
সৌরভ-বিহ্বল প্রাতে যে পথে তটিনী যায় বয়ে'
যৌবনকল্লোলবুকে আনন্দের ভাসায়ে তরণী,
আজি নব সূর্য্যোদয়ে, রূপে তব বিমুগ্ধ ধরণী।

চৌকো চোয়াল

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

ছয়

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে পুলিশ অফিসার বললেন "প্রহেলিকা তো বটেই! তবে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ হিসাব করে দেখলে অনেক রকম সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারা যায়! তিনি ক্ষীণজীবী দুর্ব্বল ব্যক্তি। কুলি সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশন থেকে অত দূরে হেঁটে যাবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। হয়-তো তিনি ট্যাক্সিতে এসেছিলেন।"

তরুণ বললে "তাতেই বা সুবিধা হয় কি?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "ভাড়াটে ট্যাক্সি-ড্রাইভারগুলো অধিকাংশই পাজীর পা-ঝাড়া! 'বাড়ী থেকে চাকর-বাকর এসে মাল নিয়ে যাবে, সেটুকু সবুর তাদের সয় না। তাড়াতাড়ি ভাড়া নিয়ে, দুদ্দাড় রাস্তায় মাল নামিয়ে দিয়ে, ট্যাক্সি হাঁকিয়ে দৌড় মারে। এ ক্ষেত্রেও যদি তাই ঘটে থাকে, তবে ট্যাক্সি চলে যাবার পর হয়-তো উনি জলে পড়ে ডুবে গেছেন। তাই ড্রাইভারও টের পায় নি।"

সবিস্ময়ে তরুণ বললে "কেন? ট্যাক্সি ওর বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত যায় না?"

পুলিশ অফিসার বললেন "না। সদর, খিড়কি, দু'দিকের রাস্তাই সঙ্কীর্ণ, অসমতল। খিড়কির রাস্তাটা পুকুরের ঠিক পাড় দিয়েই।"

তরুণ ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললে "লাস পোষ্টমর্টেম হয়েছে?"

"হয়েছে। আমরা এখনো রিপোর্ট পাই নি। রাজ এষ্টেটের দলিল-পত্র হারানোয় রাজবাড়ী তোলপাড় হয়ে উঠেছে। রুই কাৎলা থেকে চুনো পুঁটিরা পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। ওরাও রিপোর্টের জন্য আনাগোনা করছে। উনি না-হয় জলে ডুবে মারা গেলেন, কিন্তু দলিলগুলো সরালে কে? সেগুলো যদি না পাওয়া যায় তাহলে রাজ এষ্টেট—"

অধর দিয়ে, ওষ্ঠ ঠেলে তুলে পুলিশ অফিসার মাথা নেড়ে নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলেন।

তরুণ বললে "সরকারী ডাক্তার—যিনি পোষ্টমর্টেম্ করেছেন, তাঁর নাম ঠিকানাটা বলুন।"

"ডাক্তার প্রবীর গুহ, আর তাঁর সহকারী ডাক্তার নির্ম্মল দে। নির্ম্মল বাবুর কোয়ার্টার কাছেই। সামনের ওই রাস্তা ধরে—"

বাধা দিয়ে সাগ্রহে তরুণ বললে, "প্রবীর গুহ! বাই জোভ্! প্রবীর এখন এখানে? তার কোয়ার্টার কোথা?"

পুলিশ অফিসার বিস্মিত হয়ে বললেন, "চেনেন নাকি?"

তরুণ উজ্জ্বল মুখে বললে, "ছাত্রজীবনের বন্ধু—এক সঙ্গে দীর্ঘকাল পড়েছি। কোথা গেলে তাঁকে এখুনি ধরতে পারব, দয়া করে বলুন।"

"এখনি? তাহলে হাসপাতালে যান।"

"বহু ধন্যবাদ। শান্তি বাবু, আপনি বর্ণ্টা-ভুই আপনার পিতৃবন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলছিলেন। বান্—বেড়িয়ে আসুন। তারপর আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল দর্শন করে আমি লোহাগড় যাব।"

পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আরও দু একটা কথা বলে বিদায় নিয়ে তরুণ একটা ট্যাক্সি নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে হাসপাতালে ছুটল। প্রবীরের সন্ধান পাওয়া কঠিন হোল না। কিন্তু দরোয়ান গম্ভীর হয়ে জানালে তিনি এখন অফিসে কাযে ব্যস্ত, দেখা হবে না।'

দুটা চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ তরুণের পকেট থেকে বেরুল, এবং বিনা দ্বিধায় তা দারোয়ানজীর উর্দ্দির পকেটে আশ্রয় গ্রহণ করলে। দরোয়ান "হাম্ ক্যা করে? মুস্কিলকা বাৎ" আওড়াতে আওড়াতে নিজের বিপদের গুরুত্ব জ্ঞাপন করে' পা ঘষে-ঘষে মন্থর গমনে অফিস কক্ষের উদ্দেশে প্রস্থান করলে।

কোটের পকেটে হাত পুরে তরুণ এদিক-ওদিকে পায়চারি করতে লাগল। খানিক এগিয়ে গিয়ে শুনতে পেলে হাসপাতালের ভিতর দিকে বারেণ্ডার অভ্যন্তরস্থ কোন্ একটা ঘরে কে যেন কাকে খুব ধমক দিচ্ছে। দূর থেকে কাণ খাড়া করে খানিক শুনলে,—হাঁ, ভুল নয়! সুনিশ্চিত প্রবীরের কণ্ঠস্বর!

প্রবীর তাহলে ওই ঘরে!—বিনা বাক্যে দ্বারীহীন দেউড়ি অতিক্রম করে তরুণ দ্রুত পদে সেই দিকে ছুটল। যেতে যেতে শুনতে পেলে প্রবীর তখন উগ্র কণ্ঠে বলছে "তোমার বন্ধু বান্ধব কাউকে যদি এ হাসপাতালের ত্রিসীমানায় ফের দেখি, তাহলে তোমায় চাবুকে সিধে করব! তারপর পুলিশে দেব! কম্পাউণ্ডারী জন্মের মত ঘুচে যাবে, তা জানো? রাস্কেল!"

তরুণ মৃদু হাসতে লাগল। রোগীদের ঔষধ-পত্র সম্বন্ধে কম্পাউণ্ডার বাবাজী হয়ত গুরুতর ভুল করেছে, নইলে প্রবীর কুমার এতখানি ক্ষিপ্ত হবার পাত্র নয়! তরুণ দীর্ঘকাল থেকে জানে,—প্রবীর কঠোর ন্যায়পরায়ণ ছেলে! গুরুর অন্যায় সে ক্ষমা করে না! অথচ ন্যায়ের কাছে সে সদা নম্র!

চিঁ চিঁ করে ক্ষীণ কণ্ঠে অন্য ব্যক্তি কি বললে,—শোনা গেল না! উত্তরে অধিকতর উগ্র কণ্ঠে প্রবীর বললে, "আমি ডাক্তারী করতে এসেছি, জোচ্চুরি করতে আসি নি! ঘুষ নিয়ে মিথ্যে রিপোর্ট লেখা, আমার কোষ্ঠিতে লেখে নি। যাও—চলে যাও, আমার সামনে থেকে!"

ঘরটার কাছাকাছি হয়ে তরুণ শুনলে তার সংবাদ-বহনকারী দরোয়ান এবার ভয়ে ভয়ে নিবেদন করছে "হুজুর, এক বাবু মুলাকাৎ মাংতে থে।"

ক্ষিপ্র উত্তর শোনা গেল—"বলে দাও, কোনও বাবুর সঙ্গে দেখা করার সময় এখন আমার নাই। যে বাবুই আসুন, সবাইকে ফিরিয়ে দাও।"

ভগ্নদূত সভয়ে বেরিয়ে আসছিল।—তাকে ঠেলে সরিয়ে তরুণ ঘরে ঢুকে সহাস্যে বললে, ডাক্তার মানুষের অত রগচটা হওয়া কি ভাল?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রবীর রুষ্ট কণ্ঠে বললে, "কে?—" পর মুহূর্তে চেয়ার ঠেলে উঠে সবিস্ময়ে বললে, "আরে তুই! তরুণ!"

"তোর বরাতে শুধুই তরুণ! বাবু হতে পারি নি, অতএব মুলাকাতে বাধা নেইত?"

আন্তরিক প্রীতিভরে প্রবল বেগে করমর্দ্দন করে, অপ্রস্তুত হাস্যে প্রবীর বললে "আরে ভাই, পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ! চারিদিকেই ভূত-প্রেতের রাজত্ব! তাঁ্যাদড়ামি দেখে দেখে মাথা গরম হয়ে ওঠে!···তারপর বল, তুই এখন কি মনে করে?'

স্মিত মুখে তরুণ বললে, "ভয় নেই। ঘুষ দিয়ে মিথ্যে রিপোর্ট লেখাবার জন্যে আসি নি। সে সব দুর্ল্লভ সদ্গুণ তোমার নেই, তা জানি। তুই এখন খুব ব্যস্ত, তা বুঝতে পেরেছি। ফর্ম্যালিটি থাক। ঝড় বেগে এক নিশ্বাসে আমার জিজ্ঞাস্য নিবেদন করছি—" নিম্ন স্বরে বললে, "ক্ষিতীশ গোস্বামীর শব-ব্যবচ্ছেদের সঠিক বিবরণটা জানতে চাই।"

প্রবীর চকিত নেত্রে চারিদিকে চাইলে। অফিস ঘরের এদিকে ওদিকে পাঁচ সাত জন কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার, বেয়ারা, ভিন্ন ভিন্ন কাযে নিযুক্ত ছিল। প্রবীর বিপন্ন ভাবে একটু ইতস্ততঃ করলে। তারপর প্রশান্ত মুখে প্রত্যেককে হাসপাতাল সংক্রান্ত এক একটা কাযের ভার দিয়ে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিলে। বাকী রইল একজন বেয়ারা। তাকে বললে "রঘুবীর, তুমি দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে বাইরে খাড়া থাক। কাউকে এখন এখানে আসতে দিও না।"

রঘুবীর বেরিয়ে গেল। প্রবীর চুপি চুপি বললে "তুই কি এ কেসের তদন্ত ভার পেয়েছিস?"

তরুণ বললে "হাঁ।"

সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে প্রবীর বললে "তা হলে খুব সাবধানে থাকিস। রাজপক্ষের লোকগুলার উপর কড়া দৃষ্টি রাখিস। এখানকার জংলী দেশের রাজাদের তো জানিস? বিশুদ্ধ হিন্দুয়ানীর অমর্য্যাদা হবার ভয়ে ইংরেজি লেখাপড়া শেখে না। রোজ তিন ঘণ্টা শালগ্রাম পূজা করে। সঙ্গে সঙ্গে সাত ঘণ্টা বাইজীর নাচ গানও উপভোগ করা চাই। নইলে না কি এঁদের রাজমর্য্যাদা নষ্ট হয়! কাযেই রাজকার্য্য দেখার ভার পড়ে কর্ম্মচারীদের উপর! সুতরাং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন তাঁরাই। হাঁ তাঁরাই এখানকার আসল রাজা, বুঝলি?"

"বুঝলাম। বেচারা রাজার জন্যে আমার অনুকম্পা বোধ হচ্ছে। ঠিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অসহায়!"

"তার চেয়েও বেশী পরমুখাপেক্ষী। ওই দেওয়ান, ম্যানেজার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট'এর দলই এখানে সর্ব্বে সর্ব্বা! এখুনি চিল্লাচ্ছিলাম কেন জানিস্? আমার কাছে আসতে সাহস হয় নি!—আমার কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে তাঁরা তোয়াজ করে পাঠিয়েছেন—"ক্ষিতীশ বাবুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বলে যেন রিপোর্ট দিই, তাহলে তাঁরা খুশী হয়ে আমাকে উত্তম রূপে পান খাওয়াবেন!" স্পর্দ্ধা দ্যাখ! এতে চাবকাতে বাধ্য হব না?"

সহাস্যে তরুণ বললে "আ-ল-ব-ৎ! কিন্তু নৈতিক-চেতনাটা এখন বুক পকেটে পুরে রাখ, আর চাবুকটা লুকিয়ে রাখ—ওই টেবিলের ড্রয়ারে। যে হেতু, ওই ঘুষদেনেওলাদের আড়ালেই যেন প্রকৃত আসামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। তোমার সেই ঘুষের বার্ত্তাবাহক কম্পাউণ্ডারটি কোথা?"

"ইষ্টপীড়কে নজর-ছাড়া হয়ে যেতে বলেছি।"

"উহুঁ-হু। সেটিকে সর্ব্বদা সযত্নে চোখে চোখে রেখ। এখন আমার সময় নেই। এর পর হাতে কায যখন থাকবে না, তখন তাকে নিয়ে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা সুরু করব। তারপর? শব-ব্যবচ্ছেদের বিবরণটা বল?"

সিগারেটে জোরে দুটো টান দিয়ে প্রবীর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে "ক্ষিতীশ বাবুকে কবে পর্য্যন্ত জীবিত দেখা গিয়েছিল, ঠিক করে বলতে পারিস্?"

"কেন? ১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।"

"কে দেখেছে?"

"হোটেলের চাকর-বাকর সবাই। ম্যানেজার। শ্রীকান্ত বাবু—

"শ্রীকান্ত বাবু? ওর কথা বিশ্বাস কোর না। শুনেছি উনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম জপ-তপ করেন, দান-ধ্যান, কাঙালী ভোজন করান। গুরুনিষ্ঠা ওর অপরিসীম। শুনেছি গুরুর কৃপাতেই উনি সব মামলা জেতেন। ওঁর গুরু নাকি সেই প্রাচীন যুগের—So-called হাকিম-বশ-করা, পরস্ত্রী-বশ-করা, বিদ্বেওলা সিদ্ধ পুরুষ! সেই রামচন্দ্রের আমলের জনসাধারণের অনিষ্টকারী শূদ্র-তপস্বী আর কি? রামচন্দ্র মহাজ্ঞানী,—মহা সূক্ষ্ম-বিচারক ছিলেন। তাই জন-সমাজের মঙ্গলের জন্য স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করেছিলেন! পাইক, পেয়াদা, সৈন্য সামন্ত কাউকে সে কাযের জন্য পাঠান নি। থিয়েটারে ষ্টেজে তুঙ্গভদ্রার স্পীচখানি যতই চমৎকার হোক, মূলতত্ত্বটা এঁরা ধরতে পারেন নি। তুই শ্রীমৎ শান্তানন্দ গিরির "দিশে পাগল," পড়েছিস্?"

"না। কি আছে তাতে?"

"অনেক বস্তু। তন্ত্রমতে উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণ যোগের আধ্যাত্মিক অর্থ বিশ্লেষণ করে এক সময় তিনি বলেছিলেন "তা নইলে লোকের মেয়ে ও হাকিম বশ করবার—কিম্বা যার সঙ্গে বিষয় নিয়ে বিবাদ, তাকে মারবার জন্যে কি তন্ত্রে ঐ সকল যোগের উল্লেখ আছে? তা নয়।"—কিন্তু এই সব ধুরন্ধর গুরুশিষ্যের দল অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, সেই সব 'নয়কে হয়' করছেন! আর নিরীহ, নিরপরাধ, সরল-বিশ্বাসী লোকদের সর্ব্বনাশ করছেন। "শ্রীশ্রীসদ্গুরু সঙ্গ" পড়ে দেখিস্, বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ডটা। ঐ সব ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, পিশাচসিদ্ধ, সাধু বেশধারী বদমাইসদের রকমারি বজ্জাতির খবর পাবি! ধর্ম্মের সঙ্গে ওদের কোন সম্বন্ধ নাই! সাধুত্বের 'স' ও ওরা জানে না। তবু সিদ্ধ পুরুষ!—"

চক্ষু বিস্ফারিত করে সবিস্ময়ে তরুণ বললে, "বলিস্ কিরে?—তুই এত খবর পেলি কোথা?"

গম্ভীর হয়ে প্রবীর বললে, "আমার আগে যিনি এখানে এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন, তিনি যাবার সময় আমাকে সতর্ক

করে গেছলেন। ফৌজদারী মামলায় তাঁর জলজ্যান্ত সত্য রিপোর্টকে, শ্রীকান্ত বাবু নাস্তানাবুদ করে চমৎকার মিথ্যা বানিয়ে দিয়েছিলেন। হাকিম বিশ্বাস করলেন না। তবু রায় লেখবার সময় শ্রীকান্ত বাবুর বিপক্ষে লিখতে গিয়ে, নিজের অজ্ঞাতসারে ওঁর স্বপক্ষেই রায় লিখলেন। তিনি নিজেই পরে সে-কথা ডাক্তারের কাছে স্বীকার করেছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে খবর পেয়েছিলেন,—শ্রীকান্ত বাবু সে ব্যাপারে তাঁর প্রেত-সিদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ গুরুকে দিয়ে গোপনে সে সময় তান্ত্রিক স্তম্ভন, বশীকরণ বা ভুতুড়ে যাদু-বিদ্যা চালনা করেছিলেন। তাতেই হাকিমের বিচার-বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছল। অনুশোচনায় হাকিম ছুটি নিয়ে অন্যত্র সরে পড়লেন। এ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেনও ছলছুতো করে বদলি হলেন। শ্রীকান্ত বাবু উকিল হিসেবে যত ধূর্ত্ত ধড়িবাজই হোন,—মহা ফেরেপবাজ তা জেনে রাখ। ওঁর কথা বিশ্বাস করিস্ না।"

তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে আলপিনে আঁটা কতকগুলো কাগজ বের করে পাতা উল্টাতে উল্টাতে প্রবীর বললে, "এই সেই রিপোর্ট। আমি বুঝতে পারছি না শুধু একটি কথা। যদি ১লা ডিসেম্বর রাত্রে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে এই ডিসেম্বরের শীতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহটা যতখানি বিকৃত হওয়া উচিত, তার চেয়ে বেশী বিকৃত হোল কেন? ৩০শে নবেম্বর যদি মৃত্যু হোত, তাহলে এ-প্রশ্নের উত্তর মিলত! কিম্বা যদি এটা গ্রীষ্মকাল হোত! তাহ'লে ভাবনা ছিল না।"

তরুণ বললে, "গায়ে গরম জামা কাপড় ছিল বলে হয়ত—"

সজোরে ঘাড় নেড়ে প্রবীর বললে' "উঁহু! সে যুক্তি চলবে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোন গরম ঘরে পুরে রাখা হয়েছিল বোধ হয়। তা ছাড়া হাত, পা, ঘাড় অস্বাভাবিক রকমে বাঁকানো ছিল। হয়তো বেডিং কেডিংএ পুরে গুটিয়ে সুটিয়ে দড়ি দড়া দিয়ে খুব জোরে কিছুকাল বেঁধে রেখেছিল। নইলে ৩০।৪০ ঘণ্টা জলের তলায় পড়ে থেকে অত কুঁকড়ে থাকা উচিত নয়। তাতে ফুলে ফেঁপে হাত-পা আরও ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় লাসকে গুটিয়ে কোনও pressure-এর মধ্যে রাখা হয়েছিল, বুঝলি? ভাল করে খোঁজ নিয়ে ছাখ।"

তরুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, "তা হ'লে তো ভয়ানক ভাবিয়ে তুললি! কিন্তু মৃত্যুর হেতুটা কি? জলে ডুবে মরা নয়? তবে কি হার্টফেল্?"

"জলে ডুবে তো নয়-ই। ওটা বাজে ধাপ্পা। হার্টফেলও নয়?"

"তা হ'লে এই আকস্মিক মৃত্যুর হেতু?"

নির্ব্বিকার মুখে প্রবীর বললে, "পটাসিয়াম্ সায়েনাইড।"

চমকে উঠে তরুণ বললে, "এ্যাঁ!"

দৃঢ় স্বরে প্রবীর বললে, "ব্রেণের অবস্থা, হার্ট, লাংস, ষ্টম্যাক্ প্রত্যেক যন্ত্র থেকে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শ্রীকান্ত উকিলের দল বাক্‌চাতুরীর চোটে আমাকে বোকা বানাবে, তার পথ রাখিনি। সব প্রমাণ গুছিয়ে নিয়ে প্যাক্ করে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রকৃত ব্যাপার এই—আগে পটাসিয়াম সায়েনাইড খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে, তারপর কোনও গরম জায়গায় গুটিয়ে সুটিয়ে বেঁধে ঢাকা দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রাখা হয়েছে। তারপর জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।"

"নিঃসন্দেহে?"

"নিঃসন্দেহে। পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া সহজ। মেডিকেল সায়ান্সের চোখে ধূলো দেওয়া সহজ নয়। আমরা বার্ড সাহেবের শিষ্য। মরা কেটে তার প্রত্যেক স্নায়ু-তন্ত্রীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে—তিনি ছিলেন—ওই যাকে বলে, সিদ্ধপুরুষ! তাঁর ছাত্র হয়ে আমি ধাপ্পায় ভুলব? পীরের কাছে মামদোবাজী!…একবার আর্সেনিক খাইয়ে, "কলেরা হয়ে মরেছে" বলে—লাস জ্বালিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ হতবুদ্ধি হয়ে ছুটে এল আমাদের কাছে। গেলুম তাদের সঙ্গে শ্মশানে। চিতার চার পাশের ধোঁয়া-লাগা-মাটী চেঁচে এনে মেডিকেল একজামিনে, কেমিকেল এ্যানালিসিসে প্রমাণ করে দিলাম—আর্সেনিক ইজ্ আর্সেনিক! সেটা কলেরা, বসন্ত নয়। এ-আসামীগুলো ভেবেছে ডাক্তারগুলো আস্ত গাধা, আর তারা ভয়ানক চালাক! তাই পটাসিয়াম সায়েনাইডকে জানাতে চায়—"পুকুরের জল।"

দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটায় জোরে ছটো টান দিয়ে, সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রবীর বললে, "আবার ঘুস্ দিয়ে হত্যা করতে চায়, আমার নৈতিক-চেতনাকে? ওরা পাকা খুনী—মানুষের শত্রু, সমাজের শত্রু! চাবকে লাল্ করতে হয়!"

কপট কোপে ধমক দিয়ে তরুণ বললে, "ফের চাবকায়! তোর চাবুক খেয়ে আসামী সটকান্ দিলে ধরব কাকে? বরঞ্চ ধৈর্য্য ধরে উৎকোচ গ্রহণের অভিনয়টা যদি সুষ্ঠুভাবে চাল'তে পারিস্ তাহ'লে আমাদের মহা উপকার হয়। দেখি কোন্ শ্রীমান ফাঁদে পদার্পণ করেন?

"এক্সকিউজ মি! ধৈর্য্য রাখতে পারব না। আমি যে ভয়ানক রাগী! মিথ্যে কথা মোটে বরদাস্ত করতে পারি না। চাবকাতে না দিস্, চড়িয়ে দেব নিশ্চয়!"

সহাস্যে তরুণ বললে, "ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টে গেলে তুই সুবিধা করতে পারতিস্ না প্রবীর! এ লাইনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা প্রতিপদে বলতে হয়! অবশ্য তোর মত নিষ্কপট সততঃ-নিষ্ঠ ভদ্রলোকের কাছে নয়!—জনসমাজের অকল্যাণকারী কপটাচারী অপরাধীদের কাছে! নইলে তাদের নাগাল পাওয়া দুষ্কর! যাই হোক, রিপোর্টটা আপাততঃ চেপে রাখ। এখন চলি আমি।"

সাত

বৈকালে শান্তিবাবু ও পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ ট্যাক্সি যোগে লক্ষ্মীপুর গ্রামে উপস্থিত হোল।

লক্ষ্মীপুর ছোটগ্রাম। এখানকার আদিম অধিবাসীরা সকলেই নিম্ন শ্রেণীর কৃষিজীবী এবং মালকাটা অর্থাৎ কয়লা খনির কুলি। অল্পদিন হোল ক্ষিতীশবাবু এখানে জমি জমা কিনে, নূতন বাড়ী তৈরী করেছেন। নূতন পুকুর কাটিয়েছেন। বাড়ীর চার পাশে প্রচুর ঝোপ-ঝাপ-ভর্ত্তি বিস্তর জমি পড়ে আছে। সামনের দিকে

খানিকটা উঁচু পোড়ো ভিটা। বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত মোটর যাবার জন্য সেটার কতকটা কাটানো হয়েছে, কতকটা কাটানো হয় নি। ভিটায় কয়েকটা আম, লিচু, আতা, কলা গাছ রয়েছে। এদিকে ওদিকে ঝোপ-ঝাড়। মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা সরু রাস্তা, বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত গেছে।

বাড়ীর বহির্ম্মহল বাংলো ধরণে নির্ম্মিত। সেখানে ঢুকলে সামনেই তৃণাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড টেনিস্ লন্ দেখতে পাওয়া যায়। সেটা পেরিয়ে অন্য প্রান্তে গেলে অন্দর মহলের দুয়ার দেখতে পাওয়া যায়।

অন্দর মহলের পিছনে পুকুর। খিড়কির দুয়ারের সামনে বাঁধা ঘাট। সেখান থেকে একটা সরু রাস্তা, পুকুরের পাড় ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়ে সরু রাস্তাটা সদর রাস্তায় গিয়ে পৌঁছেছে। পুকুরের একদিকে অন্দর মহল। অন্য তিন দিক লাউ-মাচা, পুঁই-মাচা, মান কচু ও বহুবিধ বন্য আগাছা এবং তৃণ গুল্মে পরিপূর্ণ।

অন্তঃপুর থেকে শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের করুণ বিলাপ শোনা গেল। পাচক ও ভৃত্যগণ ভীতি-মলিন মুখে সদরে বসেছিল। পুলিশ অফিসারকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে ক্ষিতীশবাবুর দুই ছেলে সতীশ ও যতীশকে ডেকে আনলে। বড় ছেলের বয়স সতের বছর, ছোট ছেলের বয়স পনের বছর। উভয়েই স্কুলের ছাত্র। বড় ছেলে সতীশ এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

তরুণ শুনেছিল ক্ষিতীশবাবু খর্ব্বাকৃতি, ক্ষীণকায়, ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ছেলে দুটির চেহারা দেখে তার আনন্দ হোল। তারা স্থূলাকৃতি নয়, কিন্তু বয়সের অনুপাতে বেশ দীর্ঘকায় এবং পেশী-কঠিন, কর্ম্মঠ, সবল দেহ। মুখ চোখে কৈশোরের সারল্য দীপ্তি। পিতার আকস্মিক অপমৃত্যুতে অন্তর্ভেদী শোকের যন্ত্রণায় তারা বিষণ্ণ, ম্লান। অজস্র অশ্রুবর্ষণে চোখ মুখ ফুলে রাঙা হয়ে আছে। অঙ্গে অশৌচ পালনের বেশ।

সতীশ নীরবে নমস্কার করে তাঁদের চেয়ার দিয়ে বসালে। ছোট ভাই যতীশ ছুটে গিয়ে, শান্তিবাবুর বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "কাকাবাবু, আমাদের বাবা—?"

শান্তিবাবুর চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। পিতৃহীন বালককে বুকে জড়িয়ে ধরে নীরবে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। দৃশ্যটা দেখে সকলেই মনে মনে বিচলিত হলেন। তরুণ বুঝলে শান্তিবাবুর সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই ছেলেদের বিশেষ সম্প্রীতি আছে এবং শান্তিবাবুর বিরুদ্ধে যে প্রমাণই উপস্থিত থাকুক, এরা এখনও পর্য্যন্ত তাঁকে পিতার মৃত্যুর জন্য অপরাধী মনে করে না।

আত্মদমন করে পুলিশ অফিসার তরুণের সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কয়েকটা অবান্তর প্রসঙ্গের পর তরুণ বললে "১লা ডিসেম্বর রাত্রে ষ্টেশনে মোটর নিয়ে কে গেছলে?"

সতীশ বললে "আমি আর আমাদের ড্রাইভার বনমালী।"

"দুজনেই প্লাটফরমের ভিতর ঢুকেছিলে?"

"না বনমালী গাড়ী নিয়ে বাইরে ছিল। আমি ভিতরে ঢুকেছিলাম।"

"তিনি নামলেন না দেখে কি করলে?"

"সমস্ত সেকেণ্ড ক্লাস, ইণ্টার ক্লাস, খুঁজে দেখলাম। তারপর বম্বে মেল, পাঞ্জাব মেল পর্য্যন্ত দেখলাম। কোনও ট্রেণেই তিনি বা শান্তি বাবু বা শ্রীকান্ত বাবু কেউ এলেন না দেখে, আমরা ফিরে এলাম।"

"কখন এসে বাড়ী পৌছালে?"

"প্রায় সাড়ে বারোটা।"

"তখনও বাড়ীর লোকেরা জেগেছিলেন?"

"হাঁ। আমরা আসবার পর সবাই ঘুমুলেন।"

"সে রাত্রে তোমরা কেউ কোন রকম সাড়া শব্দ বাইরে পাও নি?"

"শীতের রাত। চারিদিকে দুয়ার জানালা বন্ধ। বিশেষতঃ অত রাত্রে বাবার আসার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। রাত একটার পর সবাই ঘুমিয়েছি। কেউ আর জাগে নি। কাযেই কোনও সাড়াশব্দ শুনতে পাই নি।

"তোমার ঘুম কি খুব গাঢ়?"

কুণ্ঠিত হয়ে সতীশ বললে, "হাঁ। তা ছাড়া অনেক রাত্রে শুয়েছিলাম বলে, বাড়ীশুদ্ধ সবাই সে রাত্রে গাঢ়-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল শীতের জন্য বাবা রাত্রের ট্রেণে এলেন না, হয়তো তারপর দিন—দিনের ট্রেণে আসবেন।"

"ড্রাইভার কোথা? তাকে ডাক।"

পল্লীর শেষপ্রান্তে গ্যারেজ। সেখান থেকে ড্রাইভারকে ডেকে আনা হোল। সেও অনুরূপ সাক্ষ্য দিল।

চাকরদের এবং পাচককে প্রশ্ন করা হোল। প্রত্যেকে বললে, কোনও সাড়াশব্দ তারা পায় নি। কেবল অদূরস্থ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে, প্রত্যহ যেমন মোটর যাওয়া আসা করে, এবং রাত্রে শৃগাল কুকুরদের চীৎকার যেমন শোনা যায়, ঘুমের ঘোরে দু'একজন তা শুনেছিল। সে ব্যাপার প্রত্যহ ঘটে, সুতরাং উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এটা সুনিশ্চিত যে বাড়ীর সদরের রাস্তায় কোনও মোটর বা ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়ায় নি, দাঁড়ালে তারা সে শব্দে নিশ্চিয় জেগে উঠত। কারণ তারা সদর মহলেই ঘুমায়। আর সে রাত্রে প্রভু ক্ষিতীশবাবু এসে যে তাদের কাউকে ডাকেন নি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ চাকরদের ঘুম খুব সজাগ।

তাদের বিদায় দিয়ে পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ খিড়কির দিকে গেল।

শান্তিবাবু সদরের ঘরে বসে সতীশ ও যতীশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

তরুণ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে পুকুরের চারিপাড় প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরতে লাগল। পুকুরটা অল্পদিন কাটানো হয়েছে। খুব গভীর। চারিদিকের পাড় খাড়া উঁচু। পাড় থেকে দৈবাৎ পা ফস্কে পড়লে একেবারে পাঁচ ফুট জলের নীচে পড়তে হবে। তারপর অগাধ জল।

খিড়কির দিকের পাড় অতিক্রম করে, পুকুরের বাঁ পাশের পাড়

ধ'রে উভয়ে বিপরীত দিকের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। সেখানকার সমস্ত স্থানটা অপেক্ষাকৃত বেশী ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ। জঙ্গল ঠেলে এগিয়ে গিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, "এইখানে সেই দলিলের ট্রাঙ্কটা ডালা-খোলা অবস্থায় কাৎ হ'য়ে পড়ে ছিল।"

তরুণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্থানটার চারিদিক নিরীক্ষণ করলে। শীতের প্রকোপে সেখানকার অনেক আগাছা শুকিয়ে গেছে; সেগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে গরু বাছুর ছাগল কুকুর অনেকেই সেখানে চলাফেরা করে, তাও বোঝা গেল। শুষ্ক কঠিন মাটির উপর কতকগুলো অবলুপ্তপ্রায় ছোট বড় মনুষ্য-পদচিহ্ন, এবং অতি অস্পষ্ট জুতার দাগও পরস্পরের ঘাড় চেপে রয়েছে। তার অর্দ্ধেকটা অস্পষ্ট, অর্দ্ধেক সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

তরুণ বললে, "ট্রাঙ্ক যখন আপনারা এসে দেখলেন, তখন এখানে কোনও পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "বহুৎ। কারণ আমরা আসার আগেই এখানে রাখাল ছেলেরা এসেছিল, ক্ষিতীশবাবুর বাড়ীর লোকেরা এসেছিল, সোরগোল শুনে গ্রামশুদ্ধ লোক এখানে এসে জড় হয়েছিল। সুতরাং আমাদের প্রয়োজনীয় পদচিহ্ন তার ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।"

জঙ্গলের বাইরে মেটে রাস্তা ছিল। সেদিকে চেয়ে তরুণ বললে, "ওদিকের রাস্তাটা কোত্থেকে বেরিয়েছে? গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে ওটার যোগ আছে?"

"নিশ্চয়। এক ফার্লং দূরে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা এদিকের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে গেছে। সেই জন্যই তো সন্দেহ হয়, ক্ষিতীশবাবু এই দিক দিয়ে বাড়ীর দিকে যেতে যেতে জলে পড়ে গেছেন।"

"ওই মেটে রাস্তা দিয়ে মোটর চালানো যায়?"

"গরজে পড়লে কেউ কেউ চালায় বৈ কি।"

"রাস্তার ও-পাশে কোনও বস্তি আছে?"

"না। রাস্তার দু-পাশেই এমনি আগাছার জঙ্গল। বস্তি এখান থেকে, এই মেটে রাস্তা ধ'রে খানিক দূরে গেলে পাওয়া যাবে। বড় নির্জ্জন, মশাই। ডাকাতি করার উপযুক্ত স্থান। বস্তির ছোটলোকগুলোর মধ্যে দু চারটে দাগী চোরও আছে। সে ব্যাটারা যে এ ব্যাপারে হাত খেলায় নি, তাও তো বলা যায় না। প্রকৃতই যদি ক্ষিতীশবাবু এদিক দিয়ে আসতে আসতে জলে পড়ে মারা গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গের মালপত্রগুলি ঐ চোর ব্যাটাদের গর্ভেই ঢুকেছে। বস্তিটা একদিন খানাতল্লাসী ক'রে দেখলে মন্দ হয় না; কি বলেন?"

"কাউকে অযথা উৎপীড়নের পক্ষপাতী আমি নই। রাজ এষ্টেটের দলিলের মর্ম্ম সাধারণ দাগী চোর বুঝবে না, সুতরাং তাদের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আমাদের কারবার নাই। সে দলিলের মূল্য বোঝে এমন একজন পাকা বৈষয়িক-বুদ্ধি-সম্পন্ন অসাধারণ চোরের সন্ধান করুন।"

তারপর চিন্তিত মুখে নিকটস্থ ঝোপ ঝাড়গুলো লক্ষ্য করতে করতে তরুণ সহসা প্রশ্ন করলে, "ট্রাঙ্কটা লম্বা চওড়ায় কত বড়?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "তা বেশ বড় বই কি। দু হাতের উপর লম্বা। চওড়াও বোধ হয় হাত দেড়েক হবে। ধরুন দেড় মণ ওজনের দলিল তাতে ছিল।"

"দেড় মণ! তা হলে গভীরতাও যথেষ্ট ছিল?"

"নিশ্চয়। চীফ ম্যানেজার বললেন, "দু তিন শো বছরের পুরাণো দলিল তাতে ছিল। এমন কি বাদশাহী আমলের পাঞ্জার ছাপ পর্য্যন্ত! শত্রু পক্ষ সে সব দলিল হাতে পেলে রাজএষ্টেটের সর্ব্বনাশ করে দেবে। অকারণে কি ওঁরা গোয়েন্দা বিভাগের শরণাপন্ন হয়েছেন?"

"অতএব—?

"সে সব দলিলে কার স্বার্থ সাধন হবে আগে ভেবে দেখুন!"

"তাহলে চোখ বুজে কোল কোম্পানীকেই সন্দেহ করা কর্ত্তব্য!"

উৎসাহের সঙ্গে পুলিশ অফিসার বললেন, "এই বস্তির দাগী চোরগুলোও তাঁদের তাঁবেদার। এরা কয়লা খনির মাল-কাটা।"

"বলেন কি?"

"নইলে অনর্থক কি এদের সন্দেহ করছি?"

সহাস্যে তরুণ বললে, "কিন্তু এদের ঘাড়ে বে-দরদে সন্দেহের সুযোগ চাপাবার জন্য অন্য কোন পক্ষের কোনও ধূর্ত্ত শয়তান যে এ কীর্ত্তি করেন নি, তাই বা কি করে বুঝলেন? প্রমাণ?"

সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে পুলিশ অফিসার নিম্নস্বরে বললেন, "ইন্‌সপেক্টার পূরণ সিংহ ওরা ডিসেম্বর শান্তি বাবুকে হাওড়ার ময়দানে অচৈতন্য অবস্থায় পেয়েছেন, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কোথায় ছিলেন উনি ১লা ডিসেম্বর বৈকাল থেকে ২রা সারা দিনরাত? ওঁর মত একজন সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান লোককে গুণ্ডারা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, এটা যে—"

সবিদ্রূপে তরুণ বললে, "নেহাৎ গাঁজাখুরি গল্প, কি বলেন?"

অসন্তুষ্ট ভাবে পুলিশ অফিসার বললেন, "আমি কেন বলব? সবাই বলছে। শ্রীকান্ত বাবু অতিশয় ফিচেল উকিল। ফৌজদারী মামলা সাজানোর ব্যাপারে উনি আমাদের মত পাঁচশো পুলিশকে গুলে খান। উনিও মুচকে হেসে বললেন, 'শান্তির গল্প বিশ্বাস করতে হলে দু এক কল্কে গাঁজার কর্ম্ম নয়। আরও অনেক কিছু চাই।'

শান্ত কণ্ঠে তরুণ বললে, "তিনি ভাগ্যবান্। সন্দেহের অতীত স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন! কাযেই ভাগ্য-বিড়ম্বিতকে আজ বিদ্রূপ করার অধিকার তাঁর! আপনারাও হয় তো সেইখান থেকে সাষ্টাঙ্গ হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কি? রামকৃষ্ণ মিশনের নামে প্রতারণাকারী—সাধুবেশধারী দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা আমিও একদা প্রতারিত হয়েছিলাম! আমিও তখন মূর্খ ছিলাম না। ছিলাম এম, এস-সি, ক্লাসের ছাত্র! সেই লাঞ্ছনার আঘাতই আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে টেনে এনেছে। নইলে আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল—অন্য দিকে যাওয়া। আমার প্রতিজ্ঞা, পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম! অধর্ম্ম যখন ধর্ম্মের মুখোস পরে এসে দাঁড়ায়, তখনি সরল-বিশ্বাসী নিরীহ মানুষের সবচেয়ে বিপদ! সে বিপদের গুরুত্ব যে কতখানি, তা আমার হাড়ে হাড়ে জানা

আছে। সুতরাং শান্তি বাবুর দুর্ভোগের ইতিহাস অবিশ্বাস করার পূর্ব্বে—আমি নিরপেক্ষ ভাবে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে বাধ্য।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে হেঁট হয়ে নিকটস্থ শিয়াল-কাঁটা গাছের একটা দুমড়ানো আধ-শুক্‌নো ডাল তুলে ধরে তরুণ একাগ্র মনোযোগে কি দেখতে লাগল। তারপর পকেট থেকে ম্যাগনি-ফাইং গ্লাস বের করে, ডালটা সন্তর্পণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তন্ময় হয়ে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগল।

বিস্মিত হয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, "ও কি করছেন ?"

নিজের কাযের দিকে দৃষ্টি রেখে তরুণ বল্‌লে, "উদ্ভিদ বিজ্ঞানের চর্চ্চা।"

"খুনী কেসের তদন্তে এসে উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান ? ধান ভান্‌তে শিবের গীত !"

"শিব, জ্ঞানের দেবতা। তাঁর উপাসনা করা সর্ব্বদাই উচিত। আচ্ছা, এখন এটা পকেটস্থ করা যাক। এর পর মাইক্রোস্কোপে চড়িয়ে দেখা যাবে।"

অগ্রসর হয়ে পুলিশ অফিসার সন্দিগ্ধ স্বরে বল্‌লেন, "ব্যাপারটা কি মশাই ! শুনতে পাই না ?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে তরুণ বল্‌লে, "সূক্ষ্মতন্তুযুক্ত নতুন ধরণের এক রকম পরগাছা ! বোটানির মোহ আজও ছাড়তে পারি নি। এখনো ও-সব চর্চ্চা করতে আমার ভাল লাগে।"

শিয়াল-কাঁটা গাছটার ডালের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে, সাবধানে কাগজে মুড়ে তরুণ পকেটে রাখলে। তার পর হঠাৎ সকৌতুক হাস্যে বল্‌লে, "স্যর আমি একটা আস্ত গাধা ! পরের কায ঘাড়ে নিয়ে, দিব্যি নিজের খেয়ালের পিছনে ধাওয়া করে ছুটেছি। দায়িত্ববোধ পুড়িয়ে মেরে দিয়েছি। চলুন, এখন রাজবাড়ীতে পৌঁছে এত্তেলা দেওয়া যাক, শান্তিবাবুকে গ্রেপ্তার করে এনেছি।"

"এঁ্যা ! সত্যি গ্রেপ্তার করবেন ?"

"আসল আসামী না জুটলে নকলেই কায চালাতে হবে। তাতে তাঁদের মন ঠাণ্ডা হবে যে গোয়েন্দা আমাদের জন্য খাটছে বটে !"

পরিহাসটা বুঝতে পেরে, গম্ভীর হয়ে পুলিশ অফিসার বল্‌লেন, "না মশাই, এ-সব সঙ্গীন ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবেন না। ধোঁকায় পড়তে হয় !"

সহাস্যে তরুণ বল্‌লে, "আসামীরা ছল চাতুরী কাপট্যের আড়ালে, ধূর্ত্ততা-কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। আমরা নিষ্কপট পবিত্র সরল ব্যবহার করলে খাপ খাবে কেন ? লোহায় লোহায় জোড় খাওয়া চাই ত' !"

অনুযোগের সুরে পুলিশ অফিসার বল্‌লেন, "আমি কি আপনার আসামী ?"

"বিশ্বাস কি ? শান্তিবাবুকেও আমি বিশ্বাস করি না। দেখছেন না ? সর্ব্বদা তাই সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি।"

সোৎসাহে পুলিশ অফিসার বল্‌লেন, "পথে আসুন মশাই। আমরাও খবর রাখি সব ! শান্তিবাবুর সঙ্গে মিঃ জ্যাক্‌সনের বিশেষ অন্তরঙ্গতা আছে, তা আমরাও জানি। এ-মামলা বাধবার আগে—আর একটা মামলায় শান্তিবাবু কোল কোম্পানীর পক্ষে উকিল দাঁড়িয়েছিলেন।"

বিস্মিত হয়ে তরুণ বল্‌লে, "সত্য না কি ? কিন্তু মিঃ জ্যাক্‌সনটি কে ?"

আশ্চর্য্য হয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, "শান্তি বাবু বলেন নি আপনাকে তাঁর পরিচয় ? তিনি কোল কোম্পানী-পক্ষের মামলা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। তিনিও তো এই মামলার তদ্বিরের জন্য কলকাতায় গিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে বসে রয়েছেন, তা জানেন না ?"

গম্ভীর হয়ে তরুণ বললে, "না"।

মুচকে হেসে পুলিশ অফিসার বললেন, "শান্তি বাবু সব কথাই তা হলে চেপে যাচ্ছেন ? কিন্তু শ্রীকান্ত বাবু সাক্ষ্য দিয়েছেন ১লা ডিসেম্বর হাওড়া ষ্টেশন থেকে তিনিও জ্যাকসন সাহেবকে সেই দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠতে দেখেছেন। যে ট্রেণে ক্ষিতীশ বাবু আসছিলেন—বুঝেছেন ?"

তরুণ স্তম্ভিত ! হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, "ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে এক কামরায় ?"

এদিক ওদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে পুলিশ অফিসার বললেন, "না। ক্ষিতীশ বাবুর কামরা থেকে খানিক দূরে অন্য সেকেণ্ড ক্লাসে তিনি উঠেছিলেন। কিন্তু আসানসোল ষ্টেশনে গোপন তদন্ত করে জেনেছি, জ্যাকসন সে ট্রেণে আসানসোলে আসেন নি। সতীশও বাপের খোঁজে পর পর ২।৩ টা ট্রেণের প্রত্যেক কামরা খুঁজেছে, সেও জ্যাকসনকে কোনখানে দেখে নি। অর্থাৎ জ্যাকসনও ক্ষিতীশবাবুর মত মাঝপথ থেকে উবাও।"

"সতীশ জ্যাকসনকে চেনে ?"

"কোল কোম্পানীর সাহেবদের এ অঞ্চলে সবাই চেনে। বিশেষতঃ জ্যাকসন মস্ত স্পোর্টস্‌ম্যান। মহা স্ফূর্ত্তিবাজ। স্কুলের ছেলেদের খেলায় প্রায়ই রেফারি হয়। গেল যুদ্ধে আর্ম্মিতে ক্যাপ্টেন হয়েছিল। পায়ে এখনও গুলির দাগ আছে।"

চিন্তিত ভাবে তরুণ বললে, "আর্ম্মির ক্যাপ্টেন ! তার অভ্যস্ত সংস্কার,—" দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বললে, "নাঃ, ইতর প্রবঞ্চক গুপ্ত-ঘাতক হওয়া তার স্বভাব নয়। চুরি চামারি করে পরস্বাপহরণের হীন মনোবৃত্তি তার থাকা উচিত নয়।"

অসন্তুষ্ট ভাবে পুলিশ অফিসার বললেন, "Bookish-knowledge নিয়ে অত বে-পরোয়া ভাবে মানুষের মহত্ত্বকে বিশ্বাস করবেন না। শান্তি বাবুই বা জ্যাকসনের কলকতায় উপস্থিতির খবরটা আপনার কাছে চেপে গেলেন কেন ?"

ঝোপ ডিঙিয়ে অগ্রসর হয়ে সদর রাস্তার দূরত্ব লক্ষ্য করতে করতে তরুণ বললে, "তিনি চেপে গেলেও সেটা প্রকাশ করে দেবার অন্য লোক ঢের আছে, এটা তো তিনি জানেন। সুতরাং তাঁর লুকোচুরি খেলা নিরর্থক। তবে তাঁর উপর দিয়ে উপর্য্যুপরি যে সব আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে—এবং তাঁকে যেরকম অভিভূত করে ফেলেছে, তাতে নিজের হাত পা ক'খানাও যথাস্থানে আছে কি না, তাও তাঁর হুঁস নেই—সেটুকু লক্ষ্য

করেছি। জ্যাকসনের কথা তাঁর এখনও মনে আছে কি না, তাই সন্দেহ। যাই হোক, সময় বুঝে পরে তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করব।. হুঁ, দলিলগুলি হস্তগত হলে কোন কোম্পানীর স্বার্থসাধন হবে, তারা লাভবান্ হবে। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে অপরাধীরা দলিল চুরি করেছে তা না হয় মানলুম। কিন্তু ক্ষিতীশ বাবুর মৃত্যুতে কার লাভ? শান্তিবাবুর স্যুটকেস উধাও হওয়ার বা হেতু কি? শান্তিবাবুর ঘড়ি আংটি চুরি যাক, তাঁকে গুম্ করে রাখা হয়েছিল কি উদ্দেশ্যে?"

পুলিশ অফিসার মৃদুস্বরে বললেন, "গুণ্ডারা শান্তি বাবুকে গুম্ করে রেখেছিল, কি শান্তি বাবু নিজেই নিজেকে গুম্ করে রেখেছিলেন, তা তো এখনো প্রমাণ হয় নি। সে খবরও তো বাজে ভাঁওতা হতে পারে স্যর। অবশ্য আমি সম্ভাবনার কথা বলছি।"

গম্ভীর হয়ে তরুণ বললে, "বাজে ভাঁওতা কি না সেটা আজই প্রমাণ পাওয়া যাবে। ততক্ষণ চলুন, নিজেদের চর্কায় তেল দেওয়া যাক।"

[ক্রমশঃ

মিথ্যা কুৎসাকারী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মিথ্যা কুৎসাকারী,
হীন কুকথায় কষায় কণ্ঠ
কুৎসিত তারা ভারী।
মুখেতে নিত্য নূতন মুখোস পরা,
বুকেতে তাদের কালকূট-বিষ ভরা,
আলকাতরার কুণ্ডে তাদের বাড়ী।

দেখিলেই সরে যাই,
কলুষিত আর অতি বিষাক্ত
সঙ্গের ভয় পাই।
কেমনে তাদের ভাল বল বাসবো?
ধন্ধকীকৃত 'জলজান' বাষ্প—
কুণ্ডলীকৃত কুটিলতা একাজাই।

লম্বা তাদের তূলি,
গৌরীশৃঙ্গ রঙাইতে ধায়
অসূয়ার মসীগুলি।
ময়লা ছিটায় নীলাকাশে রোজ,
সূর্য্যেতে দেয় কালিমার পোঁচ,
বুলি ছুটে যায় শক্তির সীমা ভুলি'।

লয়ে বায়ব্যবাণ
বাক্যের শরে বিন্ধ্যগিরির
বিন্ধনে আগুয়ান।
পরে মহিষের সঙ্গেতে হায়—
পচা পথলে গড়াগড়ি খায়,
আবর্জ্জনায় বিশ্রাম লভে প্রাণ।

দৃষ্টি কি বঙ্ক!
নিজে সারা গায় অঙ্গার মাথে
ছড়ায় সে পঙ্ক।
মিছার সাগরে কুমীর হাঙর,
ভাষার মুদ্দফরাস্ ধাঙর,
গোটা এ মানব জাতির কলঙ্ক।

বৈদিক নারী-ঋষিদের চিত্রণে নারীদের সামাজিক অবস্থা

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম,এ, ডি,ফিল্ (অক্সন্)

বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত শৌনক তাঁহার "বৃহদ্দেবতা" নামক ঋগ্বেদবিষয়ক গ্রন্থে ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা প্রভৃতি সাতাশ জন নারী ঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা কয়েকটি সূক্তের রচয়িত্রী। বৈদিক নারী-ঋষিদের সূক্ত-সমূহ প্রাচীন যুগে ভারতীয় নারীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির অন্যতম প্রধান প্রমাণ। সেই সুবর্ণযুগে, পুত্র ও কন্যা, নর ও নারীর ভিতর কোনরূপ সামাজিক প্রভেদ করা হইত না। কন্যা পুত্রেরই ন্যায় মাতাপিতার আকাঙ্ক্ষার ধন ছিলেন, পুত্রেরই ন্যায় সমান আদরে প্রতিপালিত হইতেন ও উপনয়ন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূর্ণ অধিকারিণী হইতেন। বেদপাঠ ও অন্যান্য-বিষয়ক জ্ঞান লাভে তাঁহার কোনরূপ বাধা ত ছিলই না, উপরন্তু সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পরও কন্যা স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতেন, এবং ধর্ম্মার্থ সকল বিষয়ে সমান দাবী করিতেন। সমাজে নারীর এরূপ উন্নত অবস্থার জন্যই সেই সময়ের নারীগণ সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং "ঋষি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি জগতে অমর হইয়া আছেন।

বৈদিক যুগে সামাজিক অবস্থা, নারীদের অবস্থা কি ছিল, ইত্যাদি বিষয় আমরা জানিতে পারি প্রধানতঃ গৃহসূত্রাদি হইতেই। কিন্তু ঋগ্বেদাদির সূক্ত হইতেও সে সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। বৈদিক [ঋগ্বেদের] নারী-ঋষিগণের সূক্তাবলী হইতে আমরা সেই সময়ের নারীগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কি জানিতে পারি, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

বৈদিক যুগে যে বাল্যবিবাহের প্রচলন একেবারেই ছিল না, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। নারী-ঋষিগণের সূক্ত হইতেও ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তা, অনূঢ়া কন্যা ঘোষার পতিলাভের জন্য কাতর প্রার্থনার কথা আমরা জানি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা ছিলেন বলিয়াই হয়ত তাঁহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই — এইরূপ আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু রোমশা, উর্ব্বশী, সূর্য্যা [১০-৮৫], যমী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যৌবনবিবাহই দেশের প্রচলিত রীতি ছিল।

বিবাহের সময়ে কন্যার পিতা যে বরকে যৌতুকাদি দান করিতেন, তাহা আমরা সূর্য্যার সূক্ত হইতে জানিতে পারি। সূর্য্যার বিবাহের সময়ে তাঁহার পিতা গাভী প্রভৃতি যৌতুক সূর্য্যার পতিগৃহে গমনের পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম যে, বৈদিক যুগেও বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বাধ্যতামূলক বরপণপ্রথা প্রচলিত ছিল। উপরন্তু সে সময়ে বিবাহ প্রধানতঃ প্রেমমূলক ছিল এবং প্রায়ই বর ও কন্যা পরস্পর স্বয়ং তাহা স্থির করিতেন বলিয়া বাধ্যতামূলক বরপণের প্রশ্নই উঠিত না। বহু স্থলেই বরই সাগ্রহে কন্যা যাচ্ঞা করিতেন; সূর্য্যা ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

বিবাহের পরে পতিগৃহে বধূর সম্মানীয় স্থানের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সূর্য্যার সূক্তে। তিনিই গৃহপত্নী, গৃহের সকল ভৃত্যাদি তাঁহার আদেশেই পরিচালিত হয়, গৃহস্থিত সকল ব্যক্তি ও পশুগণের মঙ্গলের কারণ তিনিই। তিনিই পতির সর্ব্বময়া কর্ত্রী। "শ্বশুরের সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূর সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও, দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও"—এই সুবিখ্যাত বধূবরণ-মন্ত্র বৈদিক যুগে বিবাহিতা নারীর শ্বশুরগৃহে উচ্চ স্থান প্রমাণ করে।

বৈদিক যুগে বহুবিবাহ-প্রথার কথা জানা যায় ইন্দ্রাণী ও শচীর সূক্তদ্বয় হইতে। উভয় সূক্তেই ইন্দ্রপত্নী সপত্নী-দিগের বিরুদ্ধে তীব্র হলাহল উদ্গিরণ করিয়াছেন। কিন্তু বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, একবিবাহই যে ছিল সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য তাহার প্রমাণও নারী-ঋষিদের সূক্ত হইতেই পাওয়া যায়। সূর্য্যার পূর্ব্বোল্লিখিত সূক্তই এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সূক্তে পতিগৃহে আগতা বধূর উদ্দেশ্যে যে আশীর্ব্বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা দাম্পত্যজীবনের অতি উচ্চ আদর্শের প্রতীক। বধূ যেন চিরকাল, বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত পতির সহিত

সম্মিলিত হইয়া, গৃহের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হইয়া, পুত্র-পৌত্রাদিপরিবেষ্টিতা হইয়া সুমঙ্গলময়ী রূপে সুখে কালযাপন করেন—এই আশীর্ব্বাদই বধূকে বারংবার করা হইতেছে। সকল দেবতা যেন বধূ ও বরের উভয়ের হৃদয় সম্মিলিত ও পরস্পরানুকূল করেন—এই প্রার্থনাও বারংবার ধ্বনিত হইয়াছে। এইরূপ সম্মিলিত দাম্পত্যজীবনের মধ্যে বহুপত্নীত্বের স্থান যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৈদিক যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, সে বিষয়ে সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ নাই। নারী-ঋষিদের সূক্তেও স্বামিপরিত্যক্তা নারীর চিত্রই কেবল আছে, তাহার অধিক কিছু নাই।

কিন্তু বৈদিক যুগে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সতীদাহ-প্রথার প্রচলন একেবারেই ছিল না, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিধবাদের অনেক স্থলেই দেবরদের সহিত বিবাহ হইত বলিয়া, "দেবর" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "দ্বিতীয়ো বরঃ।" নারী-ঋষিগণের একটি ঋকে বিধবা ও দেবরের প্রেমসম্পর্কের উল্লেখ আছে [১০-৪০-২]।

বৈদিক যুগে নারী-স্বাধীনতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে সময়ে পর্দাপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না। উপরন্তু, গুরুগৃহে, যজ্ঞক্ষেত্রে, তর্কসভায়, আমোদ-উৎসবে, এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যন্ত নরনারীর সমান অবাধ গতি ছিল। নারী-ঋষিগণের সূক্তেও স্বাধীনা নারীর চিত্র পাওয়া যায় যথা,—একাকিনী স্নানার্থে গমনশীলা অপালা, রাজসমীপে প্রত্যর্থিনীরূপে আগতা অগস্ত্যভগিনী, বহু দূর দেশে গতা যমী প্রভৃতি।

নারী-ঋষিদের একটি সূক্তে [ঘোষার সূক্তে] দুইজন নারী যোদ্ধার নামোল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—বধ্রিমতী ও বিশ্পলা। যুদ্ধে শত্রুগণ বধ্রিমতীর হস্ত ছেদন করিলে, তিনি অশ্বিনীদ্বয়ের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে সুবর্ণময় হস্ত প্রদান করেন—এইরূপ কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে। বধ্রিমতী বিবাহিতা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল হিরণ্যহস্ত। বিশ্পলা খেল রাজার সৈন্যদলে স্ত্রী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও এক কিম্বদন্তীর উল্লেখ ঘোষার সূক্তে পওেয়া যায়। যথা—সংগ্রামে শত্রুগণ বিশ্পলার জঙ্ঘা ছেদন করিলে, অশ্বিনীদ্বয় তাঁহাকে লৌহ-জঙ্ঘা প্রদান করিয়া চলচ্ছক্তিমতী করেন। নারী যোদ্ধাদের নির্ভীকতার পরিচয় এই সূক্তে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগে নারীর যে যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মে সর্ব্ববিধ অধিকার ছিল তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। শাস্ত্রজ্ঞা উপযুক্তা নারী যজ্ঞে বিশিষ্ট পদও গ্রহণ করিতে পারিতেন। নারী-ঋষিদের সূক্তেও অগ্নিতে আহুতিপ্রদানকারিণী বিশ্ববারা ও শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে। বিশ্ববারা ঘৃতপূর্ণ স্রুচ্ [অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের জন্য কাষ্ঠময় হাতা), পুরোডাশ (অগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য অর্ঘ্য) এবং অন্যান্য যজ্ঞীয় দ্রব্য বহন করিয়া অগ্নির উদ্দেশ্যে স্তব করিতে করিতে অগ্নির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন—এইরূপ বর্ণনা আছে। শ্রদ্ধাও অগ্নিতে ঘৃত, পুরোডাশ্ প্রভৃতি আহুতি প্রদান করিতেছেন—এই চিত্র আমরা পাই।

নারীর তপস্যার চিত্র আমরা পাই শাশ্বতীর সূক্তে, তিনি স্বয়ং মহতী তপস্যা করিয়া স্বামীকে দেবশাপ হইতে মুক্ত করেন। জুহুর সূক্তেও পতিব্রতা তাপসী নারীর সুন্দর বর্ণনা আছে। স্বামীর পাপ জুহুতে অনুবর্ত্তন করে, এবং সেই জন্যই তিনি স্বামিপরিত্যক্তা হন। পরে দেবগণের কৃপায় জুহুর পাপক্ষালন হইলে, তিনি পুনরায় স্বামী লাভ করেন।

স্তবকারিণী কর্ম্মশীলা নারীর কতিপয় উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা,—বিশ্ববারার অগ্নিস্তব, গোধার ইন্দ্রস্তব, সার্পরাজ্ঞীর সূর্য্যস্তব, শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাদেবীস্তব, দক্ষিণার দক্ষিণাস্তব, রাত্রির রাত্রিদেবীস্তব প্রভৃতি। এই সকল স্তবের সরলতা, মধুরতা ও গভীরতা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে।

নারীও যে জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞান—ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ—পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাক্। বাক্ ছিলেন কেবল "ব্রহ্মবাদিনী" (সূক্তদ্রষ্ট্রী) নহেন, ব্রহ্মজ্ঞানীও। তিনি ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেব, মনুষ্য সকলের সহিতই অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—এইরূপ বর্ণনা আছে। (১৮-১১৫)। তিনিই সকল ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, শ্বাসগ্রহণকারী, তিনিই সকলের অন্তর্য্যামিনী রূপে বিরাজিতা। এই স্থলে একটী বিষয় দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দুইটি দিক্ অভাবাত্মক (Negative) এবং ভাবাত্মক (Positive)। অভাবাত্মক দিক্ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী জগৎকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, মায়া-মরীচিকা বলিয়াই উপলব্ধি করেন। জগৎ একেবারেই নাই, কোন ভোক্তা দ্রষ্টা, শ্রোতা, দেব মানব কিছুই নাই—এইরূপ জ্ঞানই তাঁহার হয়। ভাবাত্মক দিক্ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী জগৎকে ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই দর্শন করেন। জগৎ আছে, ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, দেব-মানব সকলেই আছেন কিন্তু সকলই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানই তাঁহার হয়। এই দুই প্রকার উপলব্ধি হইতে পরবর্ত্তী দর্শনে দুই প্রকার একত্ব-বাদের (Monism) উদ্ভব হয়, শঙ্করের কেবল দ্বৈতবাদ ও বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। প্রথম মতে, "ব্রহ্মই একমাত্র সত্য"—এই বাক্যের অর্থ, জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম বা অভিব্যক্তি নহে, সত্যও নহে। দ্বিতীয় মতে, এই বাক্যের অর্থ, জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে, জগৎ ব্রহ্মের বাস্তব বাহ্যিক অভিব্যক্তি এবং ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য। উভয় মতবাদই 'ব্রহ্ম ও জগৎ' এই দুইটী তত্ত্ব লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন:—দুই তত্ত্ব হইতে এক তত্ত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব কি প্রকারে? দুইটী উপায় আছে,—হয় জগৎকে সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিগণিত করা, নয় জগৎকে ব্রহ্মে পরিণত করা। প্রথম মতবাদ প্রথম উপায় এবং দ্বিতীয় মতবাদ দ্বিতীয় উপায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম মতবাদ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া বলিয়াছে:—"ব্রহ্মই একমাত্র সত্য"। দৃষ্টান্ত—সূর্য্য ও জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব; এস্থলে সূর্য্যই একমাত্র তত্ত্ব, প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে, মিথ্যা মাত্র। দ্বিতীয় মতবাদ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া বলিয়াছে "ব্রহ্মই একমাত্র সত্য"। দৃষ্টান্ত—মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় ঘট; এস্থলেও মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, মৃন্ময় ঘট মৃত্তিকা ভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে, মৃত্তিকা মাত্র। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞা বাকের জ্ঞান অভাবাত্মক নহে, ভাবাত্মক। তিনি জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি না করিয়া, উহার ব্রহ্মস্বরূপত্বই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি এরূপ বলেন নাই যে—"আমি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) কিছুই নাহি, দেব মানব স্বর্গ মর্ত্ত্য কিছুই নহি, উপরন্তু বলিয়াছেন "আমি সকলই—রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেবপ্রমুখ দেবগণ, ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা জীবগণ—সকলই আমি।" পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈদিক নারী-ঋষিগণও এই পার্থিব জগতের প্রতিই সমধিক অনুরাগিণী ছিলেন। তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞা হইয়াও বাক্ পৃথিবীকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিতে, সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই,—এই মর জগতের মধ্যেই অমরত্ব অবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই জড় ক্ষুদ্র, ধরণীর ধূলাতেই জ্ঞানস্বরূপ, মহান্, নিরঞ্জন পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সাধারণ ভাবে, সেই সময়ের নারীগণের শিক্ষা দীক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নারী ঋষিগণের সূক্তাবলী। ভাবের নবীনতায় ভাষার সরসতায় ও মাধুর্য্যে ইহারা জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সংগ্রহের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এইরূপে নারী-ঋষিগণের সূক্তাবলী হইতেই বৈদিক সমাজের নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করা যায়। সংক্ষেপে বলা চলে যে, বৈদিক যুগে নারীর যে সর্ব্বতোভাবে উন্নত অবস্থার কথা আমরা অন্যান্য প্রমাণ হইতেও জানিতে পারি, তাহারই একটী উজ্জ্বল, মনোরম চিত্রে নারী-ঋষিগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ গভীর অনুভূতি, তাঁহাদের নারীজনোচিত লালিত্য ও অকাপট্য সহকারে আমাদের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

অভিনয়ের শেষে* (অনুবাদ গল্প)

শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাদিয়া জেলেনিনা এই মাত্র তার মা'র সঙ্গে থিয়েটার থেকে ফিরে এল; তারা ইউজেন ওনিজিনের (Eugene Oniligin) একটা নাটক দেখতে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই সে তার পোষাক ছেড়ে চুল এলো করে দিল—তার পর একটা পেটিকোট ও সাদা ব্লাউস পরে তক্ষুণি একটা চিঠি লিখতে বসল নায়িকা তাতিয়ানার (Tatiana) ধরণে।

"আমি তোমাকে ভালবাসি", সে লিখল, "কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাস না—না, নিশ্চয়ই বাস না।"

এইটুকু লিখেই সে হেসে ফেলল।

তার বয়স মাত্র ষোল এবং কাকেকেই এ পর্য্যন্ত সে ভালবাসেনি; সে জানত যে অফিসার গর্নি (Gorny) এবং কলেজের ছাত্র গ্রন্‌স্‌দিয়েভ (Gronsdiev) তাকে ভালবাসে, কিন্তু এখন থিয়েটার থেকে আসার পর তাদের প্রেমে ওর সন্দেহ ক'রতে ইচ্ছা হোল। ভালবাসা ফিরে না পেয়ে দুঃখ পাওয়াটা বেশ মজার কিন্তু। সত্যি একজন যখন গভীর ভাবে ভালবাসে, কিন্তু আর একজন একেবারে উদাসীন—তার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে, সেটা করুণ কিন্তু বেশ রঙীন্। ওনিজিনকে (Oniligin) ভাল লাগে কারণ ও মোটে ভালবাসেই নি—আর তাতিয়ানা চমৎকার কেননা ভালবাসাতে সে একেবারে তন্ময়। কিন্তু ওরা যদি পরস্পরকে ভালবেসে সুখী হোত—সে ভারি বিশ্রী হোত—কারণ সেটা হোত একেবারে সাধারণ।

"বার বার বোল না তুমি আমাকে ভালবাস," নাদিয়া গর্নির উদ্দেশে লিখে চলল, "তোমার এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিদ্বান এবং গভীর চিন্তাশীল—তোমার প্রতিভা অসামান্য এবং তোমার অপেক্ষায় রয়েছে এক বিরাট ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর আমি একেবারে তুচ্ছ, সামান্য একটা মেয়ে এবং তুমি নিজে খুব ভালভাবে জান যে তোমার জীবনে আমি হব মাত্র একটা অসার বোঝা। সত্যি বটে, আমি তোমার হৃদয় বিচলিত করতে পেরেছি এবং তুমি ভেবেছ যে তোমার মানসীর সন্ধান পেয়েছ আমার মধ্যে, কিন্তু তা ভুল।

* রাশিয়ার বিখ্যাত ছোট গল্প লেখক শেখভের (Anton Tchekhov) 'After the Theatre' গল্পের অনুবাদ।

এর মধ্যেই তুমি চতাশভাবে নিজেকে প্রশ্ন কোরছ, "কেন এই মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা হোল ? যদিও তোমার সহৃদয়তাই নিজের কাছে এ ভুল স্বীকার করতে তোমায় বাধা দিচ্ছে।"

নিজের প্রতি করুণায় নাদিয়া কেঁদে ফেলল—সে লিখে চলল, "মা আর ভাইকে ছেড়ে যেতে যদি আমার এত দুঃখ না হোত আমি সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতাম। স্বচ্ছন্দে তুমি তখন আরেক জনকে ভালবেসে সুখী হোতে পারতে। আমি যদি মরে যেতে পারতাম !"

অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেল তার চোখ—সে আর পড়তে পারছিল না কি লিখেছে। তার চোখের সামনে টেবিলের উপর, ঘরের মেঝেতে,ছাতের সিলিংএ ছোট ছোট রামধনু কাঁপতে লাগল—যেন সে আতস কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখছে। আর লেখা অসম্ভব। নাদিয়া তার চেয়ারের মধ্যে ডুবে গিয়ে গর্ণিকে ভাবতে লাগল।

সত্যি পুরুষেরা কি সুন্দর, কি চমৎকার। নাদিয়ার মনে পড়ল, গর্ণির মুখের মিনতি ভরা, ভীরু, কোমল অভিব্যক্তি। অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে তার মুখ, যখন কেউ তার সঙ্গে সঙ্গীত আলোচনা করে, এবং তখন তাকে সচেষ্ট হতে হয় তার কণ্ঠস্বরের আবেগকে ঢাকতে। যে সমাজে শুষ্ক গাম্ভীর্য্য এবং ঔদাসীন্যই শালীনতার পরিচায়ক, নিরুদ্ধ হোতেই হয় সেখানে হৃদয়াবেগের অবাধ প্রকাশকে। গর্ণি চেষ্টা করে বটে তার উচ্ছ্বাসকে চাপতে, কিন্তু সফল হয় না এবং সকলে ভালভাবেই জানে যে সঙ্গীতে তার কি আবেগপূর্ণ প্রবল অনুরাগ। সঙ্গীতের অফুরন্ত আলোচনা, অনভিজ্ঞের ভুল তর্ক—তাকে সব সময় উত্তেজিত করে। পাছে এই আবেগ প্রকাশ পায়—ভয়ে সে সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও ভীরু এবং মূক। অসামান্য দক্ষতা তার পিয়ানোতে—সে যদি অফিসার না হোত, নিশ্চয়ই খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ হোতে পারত।

অশ্রু তার চোখেই শুকিয়ে গেল। নাদিয়ার মনে পড়ল, প্রথমে একটা গানের আসরে কেমন করে গর্ণি প্রেম নিবেদন করেছিল, আবার নীচের পোষাকের ঘরে এসে তার পুনরুক্তি করেছিল।

"শেষ পর্য্যন্ত তুমি ছাত্র গ্রণসদিয়েভের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ জেনে আমি এত খুসী হয়েছি", সে আরও লিখে চলল,"গ্রণসদিয়েভ খুব চতুর এবং নিশ্চয়ই তাকে তোমার খুব ভাল লাগবে। কাল বিকালে দুটো পর্য্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে ছিল। এত ভাল লেগেছিল ওকে আমাদের! আমার সত্যই বড় দুঃখ হয়েছিল তুমি আসনি বলে। ও কত অদ্ভুত গল্প যে বলেছিল!"

নাদিয়া তার হাত দুটো টেবিলের উপর রেখে তার উপর মাথা রাখল। তার এলো চুলের গোছা চিঠিটাকে ঢেকে দিল। তার মনে পড়ল যে, গ্রণসদিয়েভও তাকে ভালবাসে এবং তার চিঠিতে গর্ণির মত একই অধিকার গ্রণসদিয়েভেরও আছে। তা হ'লে সে কি গ্রণসিদিয়েভকেই চিঠি লিখবে? অকস্মাৎ একটা অকারণ পুলক তার মনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল—প্রথমে ছোট্ট এতটুকু, দেখতে দেখতে সেটা বেড়ে চলল। ক্রমে বাঁধ ভাঙ্গা পুলকের বন্যা এসে তার সারা হৃদয় মথিত করে দিল। ভুলে গেল নাদিয়া তখন গর্ণি ও গ্রণসদিয়েভের কথা, ছিন্ন হয়ে গেল তার চিন্তার শৃঙ্খল—আর বেড়ে চলল তার মনের পুলক। এই উচ্ছ্বাস তার বুক থেকে ক্রমে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল তার সারা দেহে এবং তার মনে হ'তে লাগল যে এক ঝলক নির্ম্মল বাতাস তার মাথার উপর তার চুলগুলোকে আন্দোলিত করে বয়ে চলেছে, তার সারা দেহ কেঁপে উঠল একটা উচ্ছল হাসিতে—টেবিল ও আলোটাও কেঁপে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে যে জল তার চোখে টলমল করছিল—ঝরে পড়ল তা তার চিঠির উপরে। হাসিতে সে ফেটে পড়বার মত হল, কিন্তু থামবার ক্ষমতা তার অবশিষ্ট ছিল না ; এই অকারণ হাসির একটা ছল পেতে সে তাড়াতাড়ি অদ্ভুত কৌতুককর একটা কিছু মনে করতে চেষ্টা করল।

"কি অদ্ভুত কুকুরটা", সে চীৎকার করে উঠল, হাসতে হাসতে তার তখন দম বন্ধ হবার মত হোল, "কি মজার কুকুরটা" সে আবার চেঁচিয়ে উঠল।

তার মনে পড়ল, কেমন করে কাল চায়ের পরে গ্রণসদিয়েভ ছোট্ট কুকুরটার সঙ্গে খেলা করছিল, পরে গ্রণসদিয়েভ একটা কেমন মজার গল্প বলেছিল—কি ভাবে একটা ভারি চালাক কুকুর বাগানে একটা কাককে তাড়া করেছিল। কাকটা তার দিকে চেয়ে যেন বলেছিল, "জুয়াচোর কোথাকার!"

কুকুরটা ঐ জ্ঞানী কাকটাকে কি করবে ভেবে পেল না—সে একদম বোকা বনে পালিয়ে গেল, এবং পরে সে ডাকতে সুরু করল।

"না, বরং গ্রণসদিয়েভকেই ভালবাসব।" নাদিয়া অবশেষে সিদ্ধান্তে এসে চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলল।

নাদিয়া ছাত্রটাকে, তার ভালবাসা এবং নিজের ভালবাসা—সব মিলিয়ে ভাবতে লাগল। ক্রমে তার চিন্তার খেই হারিয়ে গেল, আর এলোমেলো ভাবে সে তার মা, রাস্তা, পেন্সিল, পিয়ানো—সব ভেবে চলল। সব কিছু তার কাছে সুন্দর ও মনোহর প্রতিভাত হোল এবং সুখে তার হৃদয় পূর্ণ হোল। তার মনে হোল এই সুখই সব নয়—আরও আছে। শীঘ্রই বসন্তকাল আসবে—সে তার মায়ের সঙ্গে 'গরবিকি' গ্রামে বেড়াতে যাবে ; গর্ণিও আসবে সেখানে ছুটিতে—সে তার সঙ্গে ফলের বাগানে বেড়াবে। গ্রণসদিয়েভও আসবে—সে কত সুন্দর মজার গল্প বলবে। নিবিড়ভাবে নাদিয়া এখন কামনা করল—গ্রামের সেই ফলের বাগান, অন্ধকার, আর নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল আকাশ। আবার হাসির ঝলকে কেঁপে উঠতে লাগল তার সমস্ত শরীর,—হঠাৎ ঘরের মধ্যে সে যেন একটা বনপাতার তীব্র গন্ধ পেল এবং তার মনে হোল যেন সেই গাছের একটা ডাল তার জানলার উপর এসে পড়েছে।

সে তার বিছানায় গিয়ে বসল। সে ঠিক করতে পারছিল না তার এই বিরাট আনন্দ সে কোথায় রাখবে! পুলকে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিছানার মাথার দিকে উপরে যে 'ক্রশ' ঝোলান ছিল, সেই দিকে চেয়ে সে বার বার বলতে লাগল,—

"ভগবান্, কি মধুর, কি সুন্দর এই জগৎ!"

বিদ্যাপতি

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌদ্দ

প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরহ। বিরহই ইহার চরম পরিণতি, ইহার মাধুর্য্য ও হৃদয়াবেগের ঘনীভূত সার-নির্য্যাস। বিরহে মন সাধারণতঃ আত্মবিসর্জ্জন ও আদর্শবাদের উর্দ্ধলোকে বিচরণশীল হয়। বিরহের অশ্রু-প্লাবনে প্রেমের ভোগলিপ্সা ও স্থূল বস্তুতন্ত্রতা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া, পূর্ব্বালোচনা ও স্মৃতিরোমন্থনের অর্দ্ধ-ভাস্বর বায়ুমণ্ডলে ইহার বিশুদ্ধ ভাবরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কাজেই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে বিরহবর্ণনাতেই প্রেম-কবিতার চরম উৎকর্ষ—এ বিষয়ে জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য ও অধ্যাত্মবাদী প্রাচ্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় কবিও—যিনি পূর্ব্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি প্রণয়োন্মেষের সূক্ষ্মতর, মনোজ্ঞতর কারণগুলিকে অস্বীকার করিয়া কেবল অনুসরণের অধ্যবসায় হইতেই ইহার উদ্ভব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বিরহ পর্য্যালোচনা-প্রসঙ্গে এক অভিনব আদর্শবাদের সন্ধান পাইয়াছেন; নায়িকার বিরহ-ব্যাকুলতা তাঁহাকে এক অপ্রত্যাশিত অধ্যাত্মভাব-রাজ্যে উন্নীত করিয়াছে।

বিদ্যাপতি প্রধানতঃ রূপসম্ভোগের কবি হইলেও বিরহ কবিতায় তিনি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকারদের ন্যায়, আধ্যাত্মিক ভাব-বিশুদ্ধির স্তরে পৌছিয়াছেন। বিরহে দুইটী স্তরের পার্থক্য করা যায়। প্রথম, অল্পক্ষণের অদর্শনে যে ব্যাকুলতা তাহা মূলতঃ সম্ভোগলিপ্সারই তীব্রতর সংস্করণ। হয় ত ইহার মধ্যে উচ্চতর আত্ম-বিস্মৃতির বীজ নিহিত আছে। কিন্তু মোটামুটি এই স্বল্প-বিচ্ছেদ-অসহিষ্ণুতা মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা অলঙ্কার-শাস্ত্রেরই অধিক অনুগামী। ইহার মধ্যে যতটুকু সত্যকার আবেগ থাকে, তাহা আলঙ্কারিকের অতিরঞ্জনে স্ফীতকলেবর হয়। যে সামান্য অস্বস্তি হৃদয়কন্দরে প্রধূমিত হয় তাহা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কৃত্রিম প্রয়াসের ফুৎকারে উজ্জ্বল বহ্নিশিখায় পরিণতি লাভ করে। অলঙ্কারশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিরহের দশ দশা এই কৃত্রিম ব্যবস্থারই সাক্ষ্য দেয়। এই দশ দশার বর্ণনা কালে লেখক কোন বিশেষ দশাকে কেবল তথ্য হিসাবে উল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বা পাঠকের মনে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয় স্তর হইতেছে সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী মাথুর বিরহ, যাহাতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নায়িকার আশা নিঃশেষ হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রেম অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তাহার উজ্জ্বলতম কান্তি ধারণ করে। গভীর নৈরাশ্যবোধ ও আত্মনির্ব্বেদের অন্ধতম স্তর হইতে প্রেমের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা। প্রেমিকের দোষক্ষালন ও তাহার মহনীয়তার নূতন অনু-ভূতি, পার্থিব অন্তরায়কে তুচ্ছ করিয়া ভাবসম্মিলনের উর্দ্ধমুখী অভীপ্সা প্রভৃতি অন্তরের উচ্চতম বৃত্তিসমূহ, নিশীথিনীর গর্ভ হইতে কনকখচিত ঊষার ন্যায়, স্ফুরিত হইয়া উঠে। বিরহ-ব্যবধানের বাষ্পরাশির অন্তরাল হইতে প্রেমিক দেবতার রূপে উদ্ভাসিত হয়—প্রেমিক-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঈশ্বরারাধনার পর্য্যায়ে উপনীত হয়।

বিদ্যাপতির পদে প্রথম স্তর অপেক্ষা দ্বিতীয় স্তরের প্রাধান্য। উজ্জ্বলনীলমণিতে বিরহের দশ দশা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যাপতি বিরহ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া-ছিলেন। কাজেই তাঁহার রচনায় কৃত্রিম স্তরনির্দ্দেশের সেরূপ চিহ্ন নাই। বিরহ-বিষয়ক ষোলটী পদের মধ্যে (৬২৬, ৬৫৯, ৬৬৬, ৬৮১, ৬৮৮, ৬৯০, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৭০২, ৭০৫, ৭২৩, ৭৩৩, ৭৫৩, ৭৫৪ ও ৭৬৫) ৬৮১ পদটী দৈর্ব্যাপতি কবির ভণিতায় পাওয়া যায়; আর দুইটি মাত্র (৭০৫ ও ৭৫৪) ক্ষণিক অদর্শনজাত বিরহের বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। ৭৪৪ পদ বিরহবেদনার সরল, কারুকার্য্যহীন অভিব্যক্তি। ৭৫৫ পদে নায়িকার মূর্চ্ছাপনোদন জন্য সখীদের পরিচর্য্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বিরহক্লেশের আলঙ্কারিক অতি-প্রসারের পূর্ব্বাভাস মিলে।

> কেও সখী তাকএ নিশাসে।
> কেও নলিনীদলে কর বতাসে॥
> কেও বোল আএল হরি।
> সমরি উঠলি চির নাম সুমরী॥

বাকী সমস্ত পদেই সুচিরব্যাপী মিলনের আশাবর্জ্জিত বিরহবেদনার বর্ণনা। এই বিরহবর্ণনা প্রসঙ্গে অনেক স্বার্থলেশহীন, উদার, প্রেমনিবেদনের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়াছে—এই বিষয়ে বিদ্যাপতির সহিত চৈতন্যোত্তর কবিদের বিশেষ পার্থক্য নাই।

> হীরা মণি মাণিক একো নহি মাঁগব
> ফেরি মাঁগব পহু তোরা॥
> জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
> দেখহুঁ জন ভেল পহু ওরা। (৬২৬)

অর্থাৎ আমার দৃষ্টি অশ্রুরুদ্ধ ছিল বলিয়া প্রভু যে নয়নপথের বাহিরে গেলেন তাহা আমি নিজে অনুভব করিলাম না, অন্য দর্শকের পরোক্ষ সাক্ষ্যে বুঝিলাম।

> কহও পিশুন (মিথ্যারটনাকারী শঠ)
> সত অবগুণ (নায়কের) সজনি
> তনি সম মোহি নহি আন।
> (তাঁহার সমান আমার কেহ নাই)

কতেক জতন সোঁ মেটিএ সজনী
মেটএ ন রেখ পসান ॥
জতও তরণি (সূর্য্য) জল সোখএ সজনী
কমল ন তেজয়ে পাঁক।
জে জন রতল যাঁহি সো সজনা
কি করত বিহি ভএ বাঁক ॥ (৬৮৮)

প্রতিকূল দৈবের প্রতি স্পর্দ্ধিত উপেক্ষা ও প্রেমিকের প্রতি অটুট বিশ্বাস এই ছত্রগুলিতে মর্ম্মস্পর্শী তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

জুগ জুগ জীবথু বসথু লাখ কোস।
হমর অভাগ, হুনক [উঁহার] নহি দোস ॥ ৬৯০
ওতহু রহথু গএ ফেরি। (ফিরিয়া ঐখানেই গিয়া থাকুক)
হে সখি, দরশন দেউ এক বেরি ॥ ৬৯১
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
হরিক চরণ করু সেবা।
পরল অনাইত (পরাধীন) তেঁ ছথি অন্তর (সেইজন্য দূরে আছে)
বালমু (বল্লভের, প্রিয়ের) দোস ন দেবা ॥ ৭২৩

এই সমস্ত উক্তিতে নিরভিমান, অনুযোগহীন সহিষ্ণুতা, নিজের কর্ম্মফলের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া নায়কের দোষক্ষালন-চেষ্টার ভিতর দিয়া আত্মবিলোপী প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরাও, তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনা ও মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও, ইহা অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেম, কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মুদ্রাঙ্কিত হউক বা না হউক, একই ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে।

৬৯৩ ও ৭২৩ পদে বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রবাস, কুব্জার সহিত প্রেম ও উদ্ধব মারফৎ নায়িকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সম্বন্ধে নায়ককে সন্দেশ-প্রেরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা এই বিষয়গুলিকে ভাবপ্রবণতা ও অতি-পল্লবিত বিস্তারের চরম সীমা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। কুব্জার সহিত রাধিকার তুলনা ও উভয়ের অসম প্রণয় প্রতিযোগিতা লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পদাবলীরচয়িতারা মাতামাতি করিয়াছেন—বিষয়টির শেষ রসবিন্দু পর্য্যন্ত নিঙড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। উদ্ধব দৌত্য ও তাহার অনুকরণে হংস, কোকিল, ভ্রমর-দৌত্য পর্য্যন্ত কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া একই বিষয়ের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে। মনে হয় যে, পদাবলী সাহিত্যের শেষের দিকে অনুভূতির গাঢ়তা যত কমিয়াছে, কল্পনা-চাতুর্য্যের উদ্ভট-খেয়াল ও অসংযত বাহুল্য ততই প্রসার লাভ করিয়াছে। এই অপরিমিত কল্পনা-বিলাসের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির রচনায় কি সরল, মর্ম্মস্পর্শী মিতভাষিতা! বিদ্যাপতির পদে ব্রজধাম ও মথুরা লইয়া কোন উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নাই—প্রেমের নিজস্ব গভীরতার সহিত স্থানমাহাত্ম্যের ভাবাসঙ্গ (association) সংযুক্ত হয় নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, বিদ্যাপতির সময় বৃন্দাবন ও মথুরা চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচরগণের স্মৃতি-সুরভিত হইয়া মহাতীর্থমহিমা অর্জ্জন করে নাই—ইহাদের কালের বিস্মৃতিস্পর্শে মলিন, পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আবার নূতন করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই।

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি, হমহুঁ জাএব তনি পাস ॥
রখলহি কুবজা সোঁ নেহ।
হে সখি, তেজলি হমরো সিনেহ ॥ ৬৯৩

এখানে কবি মধুপুর ও কুব্জার সংক্ষিপ্ততম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

৭৩৩ পদে অপেক্ষাকৃত লঘু সুরে উদ্ধবের নিকট নায়িকার বিরহজনিত দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই পদে ও ৭৪৩ পদে কবি ভণিতায় বিরহ-খিন্ন নায়িকাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিবার জন্য কৃষ্ণের গোকুলে প্রত্যাবর্ত্তন কল্পনা করিয়া ভাব-সম্মিলনের বীজ বপন করিয়াছেন। শেষোক্ত পদে মোদবতীপতির নাম রাঘব সিংহ উল্লিখিত হইয়াছে; ৬০৮ পদে কিন্তু রাজা শিবসিংহ মোদবতী-কান্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ৬৮৮ পদের ভণিতা সংশোধন করিয়া এই অসামঞ্জস্য দূর করা প্রয়োজন—কেননা, অন্য কোথাও শিবসিংহকে মোদবতী-পতি আখ্যা দেওয়া হয় নাই। ৬৬৬ ও ৭০৫ এই দুই পদে ভণিতায় জয়রাম নামে কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির উল্লেখ কৌতূহলের উদ্রেক করে। বিরহবিষয়ক পদগুলিতে মোটের উপর দুর্ব্বোধ্য শব্দের বাহুল্য নাই—'হরাস' (শীর্ণ) (৬৯৫), 'জীঅমার' (প্রাণবধের হেতু—৭০৫ ও 'কুন্তিলায়ল' (শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান ও গ্রীষ্মারসনের মতে প্রস্ফুটিত, ৭৪৩) প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ উল্লেখযোগ্য।

৭৬৫ পদে কৃত্রিম কল্পনা-বিলাসের প্রাধান্য থাকিলেও ইহার পরিকল্পনা অতি সুকুমার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের নিদর্শন। রাধা বিরহের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় যাহার যাহার নিকট হইতে নিজ অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের উপাদানগুলি লাভ করিয়াছিলেন সেইগুলি প্রত্যেককে প্রত্যর্পণ করিতেছেন। এই পদটি 'কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে' শীর্ষক সুবিখ্যাত পদের(১২১) ঠিক বিপরীত অবস্থা বর্ণনা করিতেছে।

মাধব, জানল ন জিবতি রাহী।
জতবা জকর লেলে ছলি (past perfect from) সুন্দরী
সে সবে সোঁপলক তাহী॥
সরদক সসধর মুখরুচি সোঁপলক
হরিণকে লোচন লীলা।
কেস পাস লএ চমরিকে সোঁপল
পাএ মনোভব পীলা॥ (পীড়া)

তিনটি পদ—৭২৫, ৭৯৮ ও ৮১২, ভাবোল্লাসের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের স্থান মাথুর-বিরহের পরে, কি ক্ষণিক বিরহের অবসরে, অথবা এই মিলন, স্বপ্ন কি জাগ্রত অবস্থায় তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নহে। ইহাদিগকে মাথুর বিরহের পরে সন্নিবিষ্ট করিলে ও ইহাদের উপর স্বপ্নের অলীক, অবাস্তব সান্ত্বনা আরোপ করিলে ইহাদের অন্তর্নিহিত করুণ রসটি আরও মর্ম্মভেদী হইয়া উঠে। ৭৯৮ পদে যে স্বপ্নানুভূতি বর্ণিত হইয়াছে তাহা রসোদ্গারের পর্য্যায়ে পড়িতে পারে। 'পেমক আঁকুরে পল্লব দেল' পংক্তিটী প্রেমের অপরিণত, প্রথম মিলনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থাই সূচিত করে। ৮১২ পদে স্বপ্নের কোন 'উল্লেখ নাই—'বসি নহি রহল গেয়ান' (জ্ঞান আমার বশে রহিল না) পংক্তিটি জাগ্রত অবস্থার বাস্তব মিলনে, নিবিড় প্রেমাবেশে নায়িকার ক্ষণিক বাহ্যজ্ঞানহীনতার নির্দ্দেশক। এই মিলন স্বপ্নকালীন হইলে উদ্ধৃত পংক্তির বিশেষ কোন সার্থকতা থাকিত না। ৭২৫ পদটি রূপবর্ণনার সংযমে ও সমগ্র-পদব্যাপী একটি শান্ত বিষণ্ণ সুরে মনকে গভীর বেদনায় উদাস করিয়া তোলে। যে নায়ক প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসে উপমার ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া নিজ রূপমুগ্ধ অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিত, স্তুতি-প্রশংসার প্লাবনে সমস্ত পরিমিতি-বোধকে ভাসাইয়া দিত, সেই নায়ক, মোহভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর, সুচিরব্যাপী নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের পর, স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া, দুই একটি মাত্র উপমায় নায়িকার বিরহ-ম্লান সৌন্দর্য্যের প্রতি রিক্ত-সম্ভার পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া তাহার মনকে কি এক শঙ্কা-ব্যাকুল, নিবিড় তৃপ্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। রাজভোগে অভ্যস্ত রুচি কি করুণ লোলুপতার সহিত এই দুর্ভিক্ষ কণিকাটিকে আস্বাদন করিয়াছে।

সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দহিন পবন বহু ধীরে।
সপনহুঁ রূপ (মূর্ত্তি) বচন এক ভাখিএ
"মুখ সৌঁ দূরি করু চীরে॥

তোহর বদন সম চান (চাঁদ) হোঅথি নহি
জই ও যতন বিহি দেলা।
(বিধির যথাসাধ্য যত্ন সত্ত্বেও)
কএ বেরি কাটি বনাওল সব কয়
(প্রতি তিথিতে চন্দ্রকে কাটিয়া)
তইও তুলিত নহি ভেলা॥
(তথাপি তোমার তুল্য হইল না)
লোচন তুল কমল নহি ভএ সক
সে জগ কে নহি জানে।
সে ফেরি জাএ লুকাএল জল ভএ
পঙ্কজ নিজ অপমানে॥

মুখের সহিত চন্দ্র ও চক্ষুর সহিত পদ্মের উপমা নায়িকার রূপবর্ণনায় অতি সাধারণ মামুলি ব্যাপার। কিন্তু অন্য অন্য সময় এই উপমাগুলির ভিতর দিয়া যে সরস, বেগবান্ উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয় এখন তাহার পরিবর্ত্তে এক ম্লান, স্তিমিত মন্থরতা, এক শীর্ণগতি, সঙ্কোচ-শ্লথ, মিতভাষিতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

পনের

গ্রীয়ারসনের পদগুলি হইতে কিরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত সারসঙ্কলন করা প্রয়োজন। (১) প্রথমতঃ ভাষার দিক্ হইতে দুর্ব্বোধ্য, অপরিচিত শব্দের আপেক্ষিক বাহুল্য প্রমাণ করে যে, এগুলি পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মৈথিলীর কতকগুলি বৈয়াকরণিক রূপ-বৈশিষ্ট্যও এইগুলির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। তথাপি ইহাদের ভাষার প্রকৃতি বিদ্যাপতির অন্যান্য পদের ভাষা হইতে মূলতঃ অভিন্ন। ইহাদের ভাষাকেই যদি খাঁটি মৈথিলের নিদর্শন বলিয়া ধরা যায়, তবে মৈথিলের সঙ্গে ব্রজবুলির পার্থক্য, ক্রিয়াপদের কয়েকটি বিশিষ্ট বিভক্তি ও ব্যবহার ছাড়া, বিশেষ কিছু থাকে না হয়ত উনবিংশ শতাব্দীতে নকল-কারকদের যুগোচিত ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ফলেই পদগুলিকে—কয়েকটি অপরিবর্ত্তিত প্রাচীন শব্দ বাদ দিলে—অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষারূপেই পাওয়া যায়।

(২) নায়িকার রূপবর্ণনা ও নায়ক-নায়িকার প্রণয়োন্মেষ-চিত্রণে সাধারণতঃ প্রগল্ভত্বেরই প্রাধান্য; খুব গভীর সুর শোনা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রণয়াবেশ ও নায়কের রূপবর্ণনায় চৈতন্যোত্তর কবিদেরই শ্রেষ্ঠত্ব। মহাপ্রভুর অপরূপ লাবণ্যের প্রত্যক্ষ দর্শন ও উজ্জ্বল স্মৃতি পরবর্ত্তী যুগে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে।

(৩) প্রথম মিলনে নায়িকার অপরিণত যৌবন ও সুরতক্রিয়ায় অনিচ্ছার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া

হইয়াছে। মনে হয়, যেন বড়ু চণ্ডীদাসের ইতর ভীতি-প্রদর্শন ও অনাবৃত যৌন প্রেরণার উপর নির্ভরশীল প্রণয়-জ্ঞাপন এখনও তাহার বর্ব্বর রূঢ়তার শেষ চিহ্নটুকু হারায় নাই। পরবর্ত্তী যুগের মুরলীধ্বনি-বিবশা, শ্যামনাম জপে তন্ময়া নায়িকার পরিকল্পনা এখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বড়ু চণ্ডীদাসকে নৌকাখণ্ডের পরিকল্পনার মূল উৎস বলিয়া ধরিলে বিদ্যাপতি যে তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত পরবর্ত্তী কবি—তাহা স্বীকার করিতে হয় ও বৈষ্ণব-কবিতার কালক্রম-শৃঙ্খলায় উভয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিবার কতকটা উপাদান মিলে।

(৪) অভিসারের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, ইহার সাধনামার্গের দুরূহতা ও প্রেমের সর্ব্বজয়ী প্রেরণা বিদ্যাপতির পদে পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে তাঁহার পরবর্ত্তীরা নূতন কিছু করেন নাই মনে হয়।

(৫) মানবিষয়ক পদে হৃদয়াবেগের তীব্রতা ও মর্ম্মভেদী শ্লেষের প্রবর্ত্তনে পরবর্ত্তী পদাবলীসাহিত্য বিদ্যাপতিকে অতিক্রম করিয়াছে। প্রেমবৈচিত্ত্যের কবিতা সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। প্রণয়-পরিণতির উচ্চতম স্তর হিসাবে প্রেমবৈচিত্ত্যের উপলব্ধি চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞানহীন, নিবিড় ভাবাবেশের প্রেরণা হইতে উদ্ভূত। বিদ্যাপতির এই অভিজ্ঞতার অভাব ছিল; সুতরাং তিনি সাধারণভাবে দুই একটি পদে প্রেমের মধুর আত্মবিস্মৃতির ইঙ্গিত দিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন উচ্চতর ব্যঞ্জনা আরোপ করেন নাই। পরবর্ত্তী যুগের অলঙ্কার-শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ বিদ্যাপতির পদে প্রয়োগ করা সমীচীন কি না—তাহাও সন্দেহের বিষয়।

(৬) প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিরহের উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক—কোন বিশেষ দার্শনিক সংস্কৃতির সাহায্য ছাড়াও কবি এই বিষয়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে আরোহণ করিতে পারেন। বিদ্যাপতির বিরহবর্ণনায় কিছু প্রথানুগত্য আছে, কেন না, বিরহ কাব্যের সনাতন বিষয় এবং ইহার আলোচনা-রীতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ইহার উপর বৈষ্ণব ভাব-ধারা কতকাংশে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছে, কতকাংশে গভীর ভাবাকুলতা সঞ্চারিত করিয়াছে। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদের প্রবর্ত্তিত প্রথা (tradition) অনুসরণ করেন নাই, কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের ভাবাকুলতা, ইহার ঘনীভূত রসমাধুর্য্য ও উদার চিত্তশুদ্ধি, তাঁহার পদে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। এমন কি, যে ভাবসম্মিলন রসবোধের অনিবার্য্য প্রয়োজনে ইতিহাসের আকস্মিকতার সংশোধন, যাহা ঘটা উচিত ছিল তাহার মানদণ্ডে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে অস্বীকার,—remodelling history nearer to the heart's desire—তাহাও বিদ্যাপতির কল্পনায় ধৃত ও রূপায়িত হইয়াছে। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের অনবদ্য গঠন সুষমা দিয়াছেন, বাস্তব তথ্যকে লঙ্ঘন করিয়া ইহাকে অবশ্যম্ভাবী রস-পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিকের চিরবিচ্ছেদের রায় উল্টাইয়া ভক্ত ও কলাবিদের অধিকারে আদর্শ প্রেমিকযুগলের পুনর্ম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি অঘটন-ঘটন-পটুতা ভক্তির মানদণ্ড হয়, যদি উপাস্য দেবতার হাতের অসি খসাইয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঁশী দেওয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা হয়, তবে বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না।

পুরাতন

শামসুদ্দিন

যেখানে আলোর ঘ্রাণ ছিল জেগে বাতাসে বাতাসে,
ছিল জেগে প্রভাতের নিস্তরঙ্গ শিশিরের বুকে,
ছিল আশা ফুলে ফুলে ঘাসে ঢাকা সবুজের মুখে,
সেখানে কুয়াশা আজ আর দূর দিগন্ত আকাশে।

লক্ষ লক্ষ জীবনের যে বাণী সবুজের তলে
অবাধে ক'রেছে জয় আলো আর জাগার মায়ায়,
চঞ্চল মুখর ছিল দৃপ্ত প্রাণ চলার নেশায়,
কবরে শ্মশানে তারা মুক্তি লভে বঞ্চনার ছলে।

ধরার মঙ্গল যারা ডানা-ভাঙা চিলের পাখায়—
ভেসে যেন চলে দূরে আরো এক সীমানার পারে,
যেখানে দেখিছে চেয়ে আরো এক গোধূলি মতন
নতুন দিনের রূপ পূর্ব্বাকাশে আলোর মাথায়,
সূর্য্যের পাখায় যেথা সুবিস্তীর্ণ বালুর কিনারে
সমুদ্র পিপাসা সম জাগে তার স্বাধীন স্বপন।

জাপানের শিল্প—"নেৎস্কি"

রেন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ

জাপানের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় প্রধানতঃ নানা ধরণের খেলনার ভেতর দিয়ে। জাপানীরা তাদের সস্তা ও সুন্দর রকমারী খেলনার সাহায্যে আমাদের বাজার এক রকম দখল করেই নিয়েছে। তার কারণ—তাদের যেমনি আছে ব্যবসাবুদ্ধি, তেমনি আছে শিল্পজ্ঞান। জাপানীশিল্পের একটা প্রাচীন ও বিস্ময়কর নিদর্শন হচ্ছে তাদের "নেৎস্কি"গুলো (Netsukes)। বলা বাহুল্য, 'নেৎস্কি' কথাটী জাপানী। Mr. W. E. Griffis বলেন যে নে (ne) মানে হচ্ছে মূল (root) আর 'ৎস্কি' (tsuke') মানে হচ্ছে ধারণ করা, স্থির করা বা ঝুলানো (to hold, fix or hung)। তা হ'লে নেৎস্কিকে বাংলায় বলা যেতে পারে "ধৃতি-মূল"। এই জিনিষটি হচ্ছে নানা আকার ও ভঙ্গিতে খোদাই করা ছোট ছোট পুতুল বিশেষ। এই খোদাই কাজ করা হ'ত কাঠ, হাতীর দাঁত, হাড়, হরিণের বা ষাঁড়ের শিং, স্ফটিক, প্রবাল ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যের উপর। তবে কাঠ এবং হাতীর দাঁতের ব্যবহারই হ'ত সবচেয়ে বেশী। কাঠের মধ্যে বিশেষ ক'রে ব্যবহার করা হ'ত চেরী, পিয়ার, এবনী ইত্যাদি—যা নাকি শক্ত এবং পালিশের পক্ষে উপযুক্ত।

সুন্দর নেৎস্কিগুলো সবই এক একটী ছোট ছোট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিও নানারকমের,—মানুষ, পশু, পাখী এবং নানারকম অদ্ভুত জন্তুজানোয়ারের আকারও নানাধরণের,—গোল, লম্বা, চৌকো, ডিম্বাকৃতি, ত্রিকোণাকৃতি ইত্যাদি। এদের খোদাইএর কাজ দেখবার মত। যে জিনিষটী খোদাই করা হ'ত, তার প্রত্যেকটী অংশ এমন সূক্ষ্ম নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হ'ত যা বাস্তবিকই বড় শিল্পী ছাড়া অন্য কারু হাতে সম্ভব নয়। এ-জন্যেই এই জিনিষগুলো এত উপভোগ্য। কোন নেৎস্কিকে ভাল ক'রে বুঝতে বা উপভোগ করতে হলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার। কারণ, এর মধ্যে এত সব সূক্ষ্ম কারিগরী আছে, যা নাকি বিশেষভাবে লক্ষ্য

না করলে ধরা পড়ে না। কোন কোন নেৎস্কির উপরের অংশটা অত্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু তলদেশ অতি সরু—হয়তো এক ফুট বা তারও কম। এই সামান্য অংশের উপরেই সমস্ত জিনিষটা দাঁড়িয়ে আছে।

নেৎস্কির ব্যবহার হ'ত ছোট ছোট বাক্স, ব্যাগ, থলি অথবা নস্যিদানী ও তামাকের কৌটো ধারণ করবার জন্যে, যা থেকে এর নামকরণ হয়েছে।
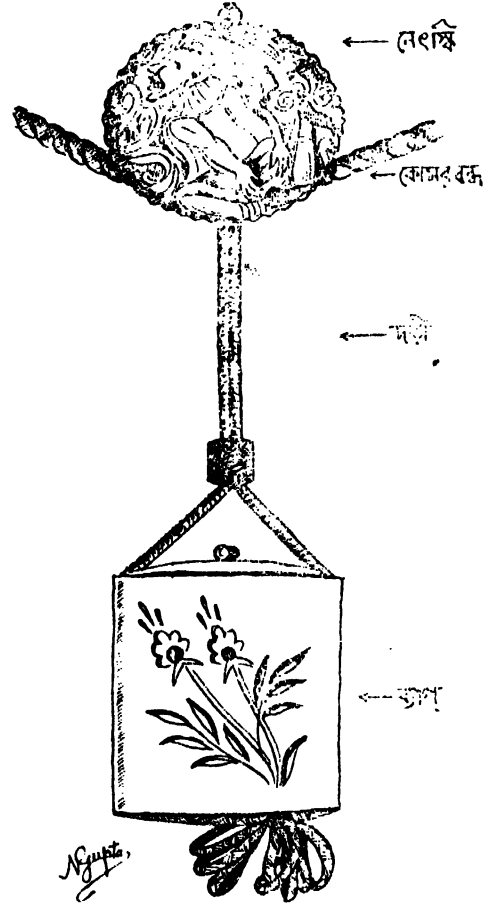
ব্যাগ বা বাক্সের সাথে দড়ি বেঁধে সেই দড়ির অন্যপ্রান্ত একটী নেৎস্কির সাথে সংলগ্ন করা হত এবং এই নেৎস্কিটীকে কোমরবন্ধনীর মধ্য দিয়ে উপরে গলিয়ে দেওয়া হ'ত। তাতে ক'রে নেৎস্কিটী কোমরবন্ধনীর সাথে আটকে থাকত এবং ব্যাগ, বাক্স বা কৌটো নীচের দিকে ঝুলতে থাকতো—পড়ে যাবার কোন ভয় থাকতো না। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এর ব্যবহার হ'ত ব'লে জানা যায় ; অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীতে যে এর ব্যবহার হ'ত সে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এ রকম ব্যবহারের জন্যেই নেৎস্কি প্রথমে তৈরী হয়, পরে তার অনু-

করণে নানা শিল্পী নানাপ্রকার উদ্দেশ্যে নেৎস্কি তৈরী করতে থাকেন। পরবর্ত্তী কালে এগুলো বসবার ঘরে টেবিলের উপরে বা আলমারীর মধ্যে সাজিয়ে রাখাও হ'ত। খাঁটী নেৎস্কিগুলো সবই গোলাকার। তাদের মধ্যে এমন কোন অংশ থাকতো না, যা নাকি ভেঙ্গে যেতে পারে বা পোষাকের সঙ্গে বেঁধে যেতে পারে। তাদের মধ্যে সূত্রপ্রবেশ করবার জন্যে ছিদ্র থাকতো। আধুনিক কালে খুব সুন্দর সুন্দর অনেক নেৎস্কির মধ্যে ছিদ্র ক'রে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে স্বদেশের শিল্প সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা থাকলে কোন জাপানীই এইগুলোকে 'দুতিমুল' হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। কারণ, ও ভাবে ব্যবহার করতে গেলে এই সুন্দর জিনিষগুলো অনায়াসে ভেঙ্গে যেতে পারে।

নেৎস্কিগুলো প্রধানতঃ এবং মূলতঃ সাধারণ ছুতোর-শিল্পীদের ব্যবসায়ের বস্তু ছিল। তবে কোন কোন বিখ্যাত শিল্পীও যে তখন এ নিয়ে তাঁদের প্রতিভা-চালনা করেন নি—এমন নয়। প্রাচীনকালে যেসব ছুতোররা Bon wood দিয়ে কৃত্রিম দাঁত খোদাই করত, তারাই নাকি এই নেৎস্কির জন্মদাতা; পরবর্ত্তী কালে Korin, Ritsuwo, Seimin প্রভৃতির মত বিখ্যাত শিল্পীরাও অল্প-বিস্তর এগুলো প্রস্তুত করেছেন। প্রাচীনতম যে নেৎস্কিগুলো পাওয়া গিয়েছে তার শিল্পী হচ্ছেন Shiuzan। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁর তৈরী নেৎস্কিগুলো কাঠের এবং অনেকক্ষেত্রেই নাম স্বাক্ষরিত। এই সময়ে ডাচদের দ্বারা যুগপৎ তামাক ও হাতীর দাঁতের প্রবর্ত্তন হওয়ায় খোদাই শিল্পের ব্যাপক প্রসার হয়। কারণ পাইপকেস বা তামাকের ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখার জন্যে নেৎস্কির চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হাতীর দাঁতের প্রবর্ত্তনে নেৎস্কি তৈরীর একটা নূতন উপকরণও শিল্পীদের হাতে আসে।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন Tomotade। এঁর তৈরী ষাঁড় অতি বিখ্যাত। Deme পরিবারের (Uman, Joman ও Jokiu) বিশেষ খ্যাতি ছিল মুখোস তৈরীতে। গথিকধরণে খোদাই করা তাঁদের দৈত্যের মুখোসগুলো বাস্তবিকই উপভোগ্য। Masanawo কাঠ এবং

হাতীর দাঁত উভয় জিনিষের উপরেই খোদাই করতেন। তাঁরও বৈশিষ্ট্য ছিল জন্তু-জানোয়ার খোদাইএর কাজে। Ichimin-এর তৈরী গো-পালও Tomotade-এর ষাঁড়ের সঙ্গেই তুলনীয়। Tadatoshi-র বৈশিষ্ট্য ছিল শামুক খোদাই কাজে। Morimitsu এবং Ikkan বিখ্যাত ছিলেন ইঁদুর সৃষ্টিতে। Ikkan নানারকমের ফলও খোদাই ক'রেছিলেন। Masaichi, Mitsuhide ও Mitsumasa বানরের নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী খোদাই ক'রে নাম ক'রেছিলেন। Kokei-এর ব্যাঙগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। Giokumin-এর খ্যাতি ছিল কচ্ছপ খোদাই-এর কাজে। আধুনিকদের মধ্যে Ono Riumin গ্রুপ খোদাই-এর কাজে বিশেষ পারদর্শী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পগুলোতে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করা যায় দৃঢ়তা এবং সজীবতা; পরবর্ত্তী শিল্পিগণ নজর দিয়েছিলেন সূক্ষ্মতা এবং মনোরম পরিসমাপ্তির দিকে। কিন্তু আধুনিক অধিকাংশ শিল্পই পূর্ব্ববর্ত্তীদের ব্যর্থ একঘেয়ে অনুকরণ। সুখের বিষয় এই যে, বংশগত নৈপুণ্য এখনও শিল্পীদের ভেতরে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। Asahi নামে একজন বৃদ্ধ শিল্পী এখনও এমন নিখুঁত কঙ্কাল এবং নরমুণ্ড খোদাই করেন যে, দেহতত্ত্ববিদ্ ডাক্তাররাও তা থেকে কোন ত্রুটী বের করতে পারেন না।

নেৎস্কিগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য জিনিষ হচ্ছে এর হিউমার [Humar]। অনেকক্ষেত্রে এই হাস্যরস অতি উঁচুদরের। একটা নেৎস্কিতে খোদাই করা হয়েছে যে, এক যোদ্ধা বজ্রধ্বনি শুনে তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাটীতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অন্য একটীতে দেখা যায় একটা পেটুক লোক মাটীতে শুয়ে পড়ে একটা জীবন্ত ঝিনুকের আচ্ছাদন খুলবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। এ ছাড়া কত হাস্যকর ভঙ্গীতেই যে মানুষ, পশুপক্ষী ইত্যাদি খোদাই করা হয়েছে তা ব'লে শেষ করা যায় না।

অধিকাংশ নেৎস্কিই জাপানের ধর্ম্ম, প্রবাদ ও সংস্কারের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে। কাজেই জাপানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাবধারার সাথে যোগ না থাকলে এ সব নেৎস্কির অর্থ বোঝা দুঃসাধ্য। নেৎস্কিগুলোকে জাপানী উপকথা ও জনশ্রুতির store-house বলা যেতে পারে। অনেক সময় বহুসংখ্যক নেৎস্কির মধ্য দিয়ে একটা উপকথা বা জনশ্রুতিকে ব্যক্ত করা হত। প্রবাদবাক্য এবং ধাঁধা নিয়েও নেৎস্কি রচনা চলত।

প্রাচীন মুদ্রা, ডাক-টিকেট ইত্যাদি সংগ্রহ করার মত নেৎস্কি সংগ্রহ করাও অনেকের একটা নেশা। তবে খাঁটি প্রাচীন নেৎস্কি সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রেই সহজ নয়। কারণ, পরবর্ত্তী ব্যবসাদার শিল্পীরা এমন নিপুণভাবে পূর্ব্ববর্ত্তীদের নকল ক'রে থাকে যে আসল-নকল বোঝা দুঃসাধ্য। এমন কি, এরা প্রাচীন শিল্পীদের নাম পর্য্যন্ত জাল করতে ওস্তাদ। পুরাণো নেৎস্কির রং লালচে ধরণের হয়ে আসে, তাই নূতন নেৎস্কিকে পুরোনো দেখাবার জন্যে এরা চায়ে ভিজিয়ে রাখে।

তবে আমার কথা এই যে, প্রাচীনকালের অনেক খাঁটি নেৎস্কি এখনও যে পাওয়া না যায় এমন নয়। অনেক সময়েই এতে কোন স্বাক্ষর থাকে না অথবা থাকলেও হয়তো এমন কোন নাম থাকে, যা নাকি জনসাধারণের মধ্যে তেমন প্রখ্যাত নয়। শিল্পী অখ্যাত হলেও শিল্পকার্য্য অনেক সময়ই অতিশয় উঁচুদরের। যাঁরা ধৈর্য্য ধ'রে সন্ধান করেন, তাঁরা এ রকমের দু'একটী নেৎস্কি ধৈর্য্যের পুরস্কার হিসাবে নিশ্চয়ই লাভ ক'রে থাকেন।

বৈষয়িক শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

দ্বিতীয় পর্য্যায়

মানুষের শ্রম, মানুষের অধ্যবসায়ে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে শিল্প ও বাণিজ্য। কিন্তু এর মধ্যে প্রকৃতি একটা বিরাট অংশ নিয়ে আছেন, কারণ প্রকৃতি হ'তে উপাদান নিয়েই ঘটেছে শিল্প-বাণিজ্যের গোড়াপত্তন। সেইজন্যে প্রথমে আমাদের জানা দরকার যে, এই বৃহৎ শিল্পবাণিজ্য-জগৎ কয়টী অংশে বিভক্ত এবং কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত।

সম্পদ্ (Wealth)। সাধারণতঃ অর্থনীতির অভিজ্ঞতা অনুসারে সম্পদ্ মানে আমরা বলতে পারি—যে কোন দ্রব্যের বিনিময়মূল্য আছে তাই সম্পদ্। যখনই কোন জিনিষের মূল্য থাকবে তখনই আমরা ধারণা করে নি যে, নিশ্চয়ই তার কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে—সেই বিশেষ গুণগুলির মধ্যে, উপকারিতা, কৃচ্ছ্রতা এবং পরিবর্ত্তনশীলতা হচ্ছে প্রধান গুণ। এর যে কোন একটীও যদি কোন দ্রব্য হ'তে বাদ পড়ে তাহ'লে সেই দ্রব্যটী মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমরা সবাই জানি পৃথিবীতে আলো, বাতাস এবং জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না কিন্তু তবুও এদের কোন মূল্য নেই। কারণ প্রচুর পাওয়া যায় এদের। আবার মরুভূমিতে, অন্ধকারে এবং পাহাড়ের উপরে এদি'কে পাবার জন্যে পয়সা খরচ করে পেতে হয়, উটের পিঠে চামড়ার ভিস্তিতে নিয়ে যেতে হবে জল, বিদ্যুৎ বা খনিজ তেল থেকে তৈরী করতে হবে আলো এবং অক্সিজেন-পাইপ পিঠে বেঁধে পার হতে হবে চড়াই-উৎরাই। তখনই প্রচুর সহজলভ্য জিনিষেরও মূল্য নির্দ্ধেশিত হয়ে যাবে। মূল্যহীন মর্ম্মর-শিলা পড়ে রয়েছে পাহাড়ের বুকে কিন্তু মানুষ যখন তাকে সুন্দর সুদৃশ্য করে কেটেকুটে অট্টালিকা বা মূর্ত্তিনির্ম্মাণের মত করে গড়ে তুললো তখনই হোল তার মূল্য। এই সব দেখে শুনে মনে হয়—অর্থনীতির সম্পদ্ অর্থে সেই জিনিষকেই বোঝাবে, যার—জোগান কম অথচ চাহিদা আছে; মানুষ তার ব্যবহারে তৃপ্তি পাবে এবং সেই জিনিষ একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তরিত হলেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

উৎপাদন। (Production) অর্থনীতির অভিজ্ঞতা অনুসারে আমরা উৎপাদন অর্থে—বিনিময়যোগ্য বস্তুর উপকারিতা বাড়ান বুঝি। কারণ, মানুষ এই জগতের কোন জিনিষকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। অর্থনৈতিক কোন বস্তুর উৎপাদন মানেই—প্রকৃতির সঞ্চিত কোন বস্তুকে নূতন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে মানুষের দরকারী করে তোলা। ভূগর্ভের অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল কত কয়লা, সোনা, রূপো কত কি: মানুষ সেগুলির সন্ধান পেয়ে সেগুলিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসে মানুষের কাজে লাগালো, তখন মানুষের কাছে তাদের চাহিদা হোল এবং মানুষ নূতন নূতন উপায়ে উদ্ভাবন করে মাটী থেকে সোনা আলাদা করে গড়লো কত মনোহারী অলঙ্কার, সহজ উপায়ে খনি থেকে কয়লা ও লোহা বের করে মানুষ এনে দিল জগতে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। আকাশের গায় বিদ্যুৎ আছে, জলের স্রোতে বিদ্যুৎ চিরদিনই আছে কিন্তু মানুষ, আকাশের গা থেকে, জলের স্রোত হ'তে সেই বিদ্যুৎকে নিয়ে মানুষের ক্রীতদাস করে তার দ্বারা কত অসাধ্য সাধন করছে—তার কথা বলে শেষ করা যায় না। এমনি করেই হয় অর্থনীতির উৎপাদন, যা অনন্তকাল ধরে আছে, থাকবে, তাকে নূতন রূপ দিয়ে মানুষের কাজে বেশী করে লাগানো। এই উৎপাদনের মূলে থাকবে ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠনের সুসঙ্গত সামঞ্জস্য। এই চারটি অংশের একটী বাদ দিলে কোন বস্তু উৎপাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

অর্থনীতিতে ভূমি (Land) মানে এক কথায় প্রকৃতির যে অগাধ দাক্ষিণ্য মানুষের উপর প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে তাকেই বুঝায়। প্রকৃতির এই অগাধ দান যদি না থাকত তাহ'লে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হোত। প্রকৃতির এই দানের মধ্যে লোহা, কয়লা, টিন এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্য—বালি, পাথর, মাটি, ফল, শস্য, অরণ্যানী, এমন কি মাটির উপরে যে পশু বিচরণ করে তারা এবং নদী ও সমুদ্রের অগাধ জলসঞ্চারী মাছ, তা ছাড়াও নদী ও সমুদ্রের জলপথ প্রভৃতিও এসে পড়ে। ভূমির এই সমস্ত উৎপাদিকা শক্তি ছাড়া আর এমন অনেক জিনিষ আছে যা প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের চোখে পড়ে না বটে কিন্তু তাহার কাজ কোন অংশে কম নয়। ধরা যাক প্রাকৃতিক জল, বায়ু বা আবহাওয়ার কথা। জল-বায়ুর উপরেই উৎপাদকের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং উৎসাহ নির্ভর করে। যেমন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসীরা অফুরন্ত শক্তি ও সুদৃঢ় স্বাস্থ্যলাভে সৌভাগ্যবান্ হয় কিন্তু যারা শীত বা গ্রীষ্মের মণ্ডলের অধিবাসী, তারা শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভে ততটা সৌভাগ্যবান্ হয় না। মানুষকে বাদ দিলেও প্রকৃতি সমস্ত দেশের উৎপাদনের শক্তিকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে—এর রৌদ্র, বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-ত্বকের গঠন অনুসারে অনেক সময়েই উৎপাদনের তারতম্য হয়; কারণ এর নগর বা সহরের পত্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি তাই দেখতে পাওয়া যায় নদী-উপকূল বন্দরে বা উপত্যকার সমতল ভূমিতে মানুষের মিলনক্ষেত্র ক্রমশঃ সৃষ্ট হ'তে থাকে কিন্তু খরস্রোতা নদীকূলে বা পাহাড়ের উপর খুব কম সময়েই বাণিজ্য-কেন্দ্র সৃষ্ট হয়। তবে খরস্রোতা নদীরও যে মূল্য নেই তা নয়; কারণ সেই তীব্র স্রোত হ'তে হাজার হাজার অশ্বশক্তি-সমতুল্য শক্তি ধ'রে নিয়ে মানুষ কত অসাধ্য-সাধন না করছে। সেইজন্য দেখা যায়—প্রকৃতির এইসব উপাদান থেকেই উৎপাদিত জিনিষের বিভিন্নতা, সংখ্যা এবং বিশেষত্ব নির্দ্ধেশিত হয়ে থাকে।

শ্রম (Labour) বলতে—যে কোন শ্রম তা শারীরিক বা মানসিক যে কোন রকমের হোক না কেন, যদি সেই শ্রম অর্থনীতির সংজ্ঞা অনুযায়ী সম্পদ্ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তা হ'লে সেটাই সত্যিকারের সফল শ্রম (Productive Labour) হবে এবং তা যদি না হয় তা হ'লে সেটাকে বিফল শ্রম (unproductive labour) বলতে বাধবে না। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছেন তাঁর অপরিসীম আদিম ঐশ্বর্য্য কিন্তু মানুষ যদি তার পরিশ্রম, দক্ষতা অধ্যবসায় দিয়ে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী না করে তা হ'লে সম্পদ্ সৃষ্টি হবে কেমন করে? বিরাট বিরাট শাল-সেগুন গাছ বনের মাঝে বেড়ে উঠছে দিনের পর দিন, এই গাছের দ্বারা মানুষের অনেক কাজ হতে পারে কিন্তু মানুষ যদি তার শ্রম দিয়ে, কুড়োল, কোদাল ও করাত দিয়ে জাহাজ তৈরীর মত তক্তায় পরিণত না করতে পারে তা হলে সেই গাছ বাড়বে, ক্ষয় হবে এবং শেষে শুকিয়ে যাবে। মধ্যযুগে শ্রমশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় একজন শ্রমিক এক একটা কাজের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই শেষ করত। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এই প্রথা গেল বদলে—একটা কাজ শেষ করতে গেলে বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এমনি ক'রে শ্রম-বিভাগ গ'ড়ে উঠল। শ্রম-বিভাগের ফলে সুবিধা হোল; অনেক পূর্ব্বে একজনকে একটা কাজ শেখবার জন্যে ছ' সাত বছর ধ'রে শিক্ষানবিশী করতে হত, এখন সেটা দু' এক বছরে এসে দাঁড়াল। একটী জিনিষ তৈরী করতে হয়ত পঁচিশ জন লোক পঁচিশটী স্তরের মধ্যে কাজ ক'রে তবে সেটী শেষ করবে। তারপর যন্ত্রযুগ এসে মানুষের অনেক কাজ কমিয়ে দিল। পূর্ব্বে একজন তাঁতীর একটা কাপড় তৈরী করতে দশ পনেরো দিন লাগত কিন্তু এখন যন্ত্রের কল্যাণে একদিনে কত শত কাপড় তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে বর্ত্তমানের ব্যাপক উৎপাদন ও শ্রমবিভাগ—উৎপাদন এবং উৎপাদকের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করলো। এরই ফলে আবার বিশেষ বিশেষ স্থান শিল্পময় হয়ে উঠলো। যেখানে যে জিনিষ সুন্দর হয়, সেখানে সেই জিনিষেরই উৎপাদন হতে লাগলো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক শিল্পের পত্তন হলো। বাংলা দেশের ঢাকার মসলিনের খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াল, ঢাকার তাঁতীরা মসলিন তৈরী করতে মেতে উঠল এবং সেই সঙ্গে তুলোর

চাষ, তাঁতের যন্ত্র অন্যান্য লোকেরা তৈরী ক'রে লাভবান্ হল। এমনি ক'রে মানুষ তার শ্রম দিয়ে প্রকৃতি হ'তে ধন-রত্ন আহরণ করে হোল ঐশ্বর্য্যবান্।

মূলধন (Capital) উৎপাদনের এই অংশের সঠিক অর্থনির্দ্দেশ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে। আমাদের সে সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি এই কথা বুঝাই ভাল যে, সম্পদের যে অংশ আরও বেশী সম্পদ উৎপাদন করতে সাহায্য করে সেটাই মূলধন। মূলধনের পটভূমিকায় থাকবে অতীত শ্রম এবং সঞ্চয়, তার মধ্যেই ভবিষ্যতে আরও বেশী করে সম্পদ্ ফিরে আসার বীজ নিহিত থাকে। মাটীতে চাষ করলে অনেক শস্য উৎপাদিত হবে, এ সকলের জানা কথা কিন্তু সেই চাষের জন্যে দরকার লাঙ্গল জোয়াল, কাস্তে, নিড়ানি, সার খইল, বীজ ধান এবং শ্রমিক, এ সকলের জন্যে টাকা লাগবে, সেই টাকা পূর্ব্বে কোন শ্রমের দ্বারা অর্জ্জিত হয়ে নিশ্চয়ই সঞ্চিত হয়েছিল, তাই দিয়ে ভবিষ্যতে আরও লাভের আশা আছে, সেইজন্যে ঐ টাকাকে মূলধন বলা যেতে পারে। বর্ত্তমানকালের উৎপাদন-ব্যাপারে মূলধনের ক্ষমতা অসীম, কারণ এর সাহায্যে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় পায়—এর দ্বারা কারবারে নূতন নূতন কলকব্জা যন্ত্রপাতি কেনা হয় এবং প্রচুর উৎপাদন হয় শেষে বলতে পারা যায় এই মূলধন শিল্পে কাঁচা মালের বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান দিয়ে উৎপাদনের যথেষ্ট সহায়তা করবে। মূলধনের আবার বিভিন্ন রকমের নাম আছে তার মধ্যে স্থির ও চলতি মূলধন বিশেষ নামকরা। কারখানার বাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে স্থির মূলধন বলা হয়, আর ব্যবসা চলবার জন্যে যে কাঁচা মালের দরকার সেটা চলতি মূলধন। একটা প্রেস চলছে, তার ভেতরে যদি আমাদিগকে স্থির ও চলতি মূলধন বের করতে কেউ বলে, তা হ'লে আমরা বলব ছাপা মেসিনটা স্থির মূলধন কিন্তু অল্পস্থায়ী টাইপ ও কাগজ প্রভৃতি চলতি মূলধন।

সংগঠন (Organisation) হচ্ছে উৎপাদনের কেন্দ্রীয় শক্তি। উৎপাদনের গোড়ায় ভূমি জোগায় কাঁচা মাল, শ্রম সেই কাঁচামালকে প্রয়োজনীয় ক'রে তোলে এবং মূলধন সেই কাঁচামালকে শ্রমের দ্বারা প্রয়োজনীয় ক'রে তোলার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে কিন্তু কেবল কতকগুলি জিনিষ তৈরী ক'রে গুদামজাত ক'রে রাখাই শেষ কথা নয়; সেইজন্যে দরকার সেই জিনিষগুলি দিয়ে সমাজের প্রয়োজন মেটান এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমির খাজনা, শ্রমিকের বেতন এবং মূলধনের সুদ দিয়েও কিছু মুনাফা আদায় করা প্রয়োজন। এইজন্যে প্রত্যেক ব্যবসা-বাণিজ্যেই দরকার সংগঠনের। সংগঠনের দ্বারা উৎপাদনের অন্য অংশগুলিকে সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলিত করতে হবে, এক অংশ যেন অপর অংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে। কারণ সংগঠন-শক্তিই হচ্ছে ব্যবসার জীবনকাঠি—ব্যবসার চাকা ঘোরাবে এই সংগঠন-শক্তিই, তাতে সে ব্যবসা বড়ই হোক আর ছোটই হোক। সুন্দর-ভাবে ব্যবসাকে সংগঠিত করবার জন্যে একজন বিশেষজ্ঞ পরিচালকের দরকার; ইংরেজীতে যাকে এনটার প্রাইজার বা বাংলা পরিভাষা অনুযায়ী উদ্যোক্তা বলা হয়। এই উদ্যোক্তার উপরেই নির্ভর করবে ব্যবসার মঙ্গল অমঙ্গল। তাঁকে উৎপাদনের তিনটী অংশকে ঠিকমত নিয়োজিত ক'রে মুনাফা আদায়ের চেষ্টা করতে হবে এবং তাঁরই কর্ত্তব্য হচ্ছে—বাজারে তাঁর উৎপাদিত মালের ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করা, উপযুক্ত স্থানে কারখানা স্থাপন করা এবং কোন্ নূতন যন্ত্র বা কলকব্জা কিনলে উৎপাদন বাড়বে তা ঠিক করা, এবং উৎপাদন-কেন্দ্রে শ্রম ও মূলধনের সমতা রক্ষা ক'রে চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সৃষ্টি করা। মোটের উপর, তিনিই হবেন ব্যবসার সঞ্জীবনী শক্তি; কারণ ব্যবসার সমস্ত দায়িত্ব থাকে তাঁর উপরেই। সেইজন্যে ব্যবসার সর্ব্বকোণে থাকবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির চিহ্ন। এই কারণে ব্যবসায়ে উদ্যোক্তাদের কর্ত্তব্য যে কত, তা ব'লে শেষ করা যায় না। তবুও যে কয়টা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য সে-গুলির উল্লেখ করা ভালো:—

প্রত্যেক জিনিষের খুঁটিনাটি ধারণা।

ব্যবসার আকস্মিক বিপদে কৃতিত্বের সঙ্গে দ্রুতই সমস্যার সমাধান ক'রে ব্যবসাকে চালু রাখা।

দায়িত্বজ্ঞান এবং সুচতুর ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি।

তার সঙ্গে চরিত্রের দৃঢ়তা, স্থির প্রতিজ্ঞা, উদ্ভাবনী প্রতিভা, সহনশীলতা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের একান্ত প্রয়োজন। এ-সব গুণ তাঁর চরিত্রে না থাকলে কেমন ক'রে তিনি ব্যবসার উন্নতি বা নিজের অথবা অপরের যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন তা কেমন ভাবে সুষ্ঠু উপায়ে নিষ্পন্ন করবেন। পূর্ব্বে দেখা যেত উদ্যোক্তারাই ব্যবসায়ে নিজেই মূলধন জোগাতেন কিন্তু বর্ত্তমানে সে রকম ব্যবসাও আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যৌথ কারবার সৃষ্টির উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব আরও অনেক বেড়ে গেছে।

ভোগ (Consumption)

মানুষের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্যে বহু জিনিষের প্রয়োজন হয়, মানুষ বহু জিনিষ উৎপাদন ক'রে সেই চাহিদা মেটায়। মানুষের চাহিদা মিটল মানেই সেই জিনিষগুলিকে নিজে আত্মীয়-স্বজনে মিলে ব্যবহার করে তাকে ভোগ করে, বা তার ক্ষয়সাধন করে। অর্থনীতি এইজন্যে মানুষের ব্যবহারের প্রয়োজনে উৎপাদিত বস্তুর ক্ষয়সাধনকে ভোগ করা বলেছেন। ভোগের দ্বারা অর্থনৈতিক উৎপাদনের শেষ কথা নির্দ্দেশিত হয়, কারণ ভোগের দ্বারাই সামাজিক মঙ্গল নির্দ্ধারিত হয়। মানুষের সমাজে ভোগ হচ্ছে মস্ত বড় কথা। এই ভোগের ক্ষমতা পাবার জন্যেই মানুষের এত পরিশ্রম এবং জগতে এত বিড়ম্বনা। ভোগ যদি না থাকতো, তা হ'লে সবাই নিরালম্ব নিরাকার বায়ুভূত মুরারির পর্য্যায়ে গিয়ে পড়তো। মানুষ পরিশ্রম করে, মারামারি হানাহানি করে কেবল ভোগক্ষমতা লাভ করবার জন্যেই। যখনই মানুষের মাঝে ভোগের সমতা আসে, তখন চতুর্দ্দিকে শান্তির মধুরতম কল্যাণ বর্ষিত হয়।

বিতরণ (Distribution)

উৎপাদন হয় মানুষের ভোগের জন্যে কিন্তু উৎপাদকরা সরাসরি ভোগ করতে বা করাতে পারেন না তাঁদের উৎপাদিত কোন বস্তুই। সেইজন্যে তাঁদিকে তাঁদের উৎপাদিত বস্তুকে হস্তান্তরিত করতে হয় বিভিন্ন লোকের হাতে, বিভিন্ন পর্য্যায়ের মাঝ দিয়ে তবেই উৎপাদিত বস্তু সাধারণের ভোগের সহায়তা করে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল কত রকমের না কাপড় তৈরী করছেন তাঁদের কাপড়ের কলে কিন্তু সরাসরি সেই কাপড় আমরা পাই না। তার কারণ হচ্ছে আমরা দু'চার জোড়া কাপড় কিনবো কিন্তু মিল যদি দু'চার জোড়া ক'রে কাপড় আমাদিগকে দেয়, তা হ'লে মিলের তাতে লোকসান হবে; তাই মিল-মালিক বড় ব্যবসায়ীর কাছে গাঁটের পর গাঁট কাপড় দেন, তাঁরা আবার তাঁদের নীচু ব্যবসায়ী—যারা দু'চার গাঁট নেবেন—এমন ব্যবসায়ীকে দেবেন এবং আবার তাঁরা এক গাঁট কেনার মত ব্যবসায়ীকে দেবেন এবং সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজন মত কাপড় কিনবো। এমনি ক'রে উৎপাদন থেকে ভোগের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে বিনিময়-প্রথা অবলম্বিত হয়, তাকে অনায়াসে অর্থনীতির সংজ্ঞা অনুসারে বিতরণ-প্রথা বলা যেতে পারে।

তা হ'লে এই পর্য্যন্ত উপরের আলোচনার ভেতর দিয়ে আমরা বুঝলাম যে, উৎপাদন, ভোগ এবং বিতরণ ব্যবস্থাই হচ্ছে অর্থনীতির মূলসূত্র এবং বৈষয়িক শিক্ষার মধ্যে অর্থনীতির ঐ সমস্ত বিভাগগুলির সঙ্গে বর্ত্তমানে যে পর্য্যায়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে তারই আলোচনা থাকবে। উৎপাদনের চারটী অঙ্গ—ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-শক্তি একসঙ্গে মিলে-মিশে কাঁচামালকে মানুষের প্রয়োজনীয় ক'রে মানুষের চাহিদার নিবৃত্তি করবার জন্যে যে বিরাট কর্ম্মশৃঙ্খল সৃষ্টি করছে—তাকে আমরা অতিকায় শিল্পজগৎ বলতে পারি। যদি আমরা এই শিল্পজগৎকে চারটী সুসম্বদ্ধ

অংশে ভাগ করি তা হ'লে মানুষের কর্মশক্তি—তা মানসিক বা শারীরিক যে কোন রকমেই হোক না, তার দ্বারা মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ও বিলাসিতা কেমন ক'রে নিবৃত্ত হচ্ছে তা বুঝতে পারা যাবে।

পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনীয় ও বিলাসের উপাদান প্রচুর আছে কিন্তু সেই সমস্ত উপাদানের উৎস আবিষ্কার করে মানুষের কাজে লাগানকে আমরা আবিষ্কারক (extractive) শিল্প আখ্যা দিতে পারি। আবিষ্কারক শিল্প বলতে আমরা খনিজ, কৃষিজ, শিকার ও মৎস্য-শিকার প্রভৃতি বুঝি। এর পরেই আসে নির্ম্মাণ (Manufacture & Construction)-শিল্প। আমরা ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বাইবেল বলে তিনি আমাদিগকে তাঁর অনুরূপ তৈরী করেছেন। তা' হ'লে আমরা কল্পনা ক'রে নিতে পারি যে, তাঁর সৃজনী ক্ষমতার কিছুটা অন্ততঃ আমাদিগকে দিয়েছেন, সেইজন্যে আমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে নির্ম্মাণকার্য্যে বা খোদগারিতে। আমরা কয়লা-খনি থেকে কয়লা আনছি কত কৌশলে, আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরী করছি কত বুদ্ধি দিয়ে, বাষ্পীয় শক্তিকে ক্রীতদাস ক'রে রেলগাড়ী ছুটাচ্ছি দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তারপর শিল্পের তৃতীয় বিভাগ, যার অবতারণার জন্যে আমাদের এত ভূমিকা —সেই প্রধান অংশ ব্যবসা (commerce) বিভাগ শিল্পের একটা বড় অঙ্গ, যদিও কেবল উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় ক'রে ভোগীদের কাছে সেই দ্রব্য তর্পণ করাই এর কাজ; তবুও কোন দ্রব্য উৎপন্ন ক'রে ভোগীদের কাছে বিতরণ করার মধ্যে অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে; ব্যবসার নানারকম নীতির দ্বারা সেই বাধা-বিঘ্ন দূর করা যায়। এইখানে একটা জিনিষ পরিষ্কার ক'রে জানবার প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে ইংরেজীর ট্রেড এবং কমার্স এই কথা দুটো। কমার্স অর্থাৎ ব্যবসা একটা ব্যাপক ব্যাপার, এর ভেতরে ব্যবসা জগতের সব কিছুই আছে। যথা—ব্যাঙ্কিংয়ের দ্বারা মূলধন জোগান, ঋণ দেওয়া, প্রচার করা, বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন দ্রব্য পাঠান বীমা প্রভৃতি নিয়ে তবে একটা চলে, কিন্তু ট্রেড একটা বিশেষ জিনিষের জোগান দেওয়া মাত্র - সেইজন্য এটা সীমাবদ্ধ। ব্যবসা-জগৎ কেমন ক'রে চলে তা জানতে গেলে অনেক কিছু জানার প্রয়োজন। যাই হোক, মনে করা যাক অষ্ট্রেলিয়ার আপেল বাংলা দেশের নাম না-জানা গাঁয়ে কেমন ক'রে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার উপত্যকায় কয়েক হাজার একর জুড়ে এক একটা আপেলের বাগান। সেই বাগানের মালিক চাষী, যিনি আপেল উৎপাদন করবার চেষ্টা করছেন—তিনি হলেন উৎপাদক (The Producer)। তাঁর দৃষ্টি থাকবে কেমন ক'রে গাছগুলি বর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছের ফলগুলি সুপুষ্ট হয়। কারণ, ফল ভাল জাতের না হ'লে বিদেশের বাজারে ভাল কাটতি কেমন ক'রে হবে। তারপর ফলগুলি বেশ বড় হ'য়ে উঠল, দেখতে সুন্দর হোল, এমন সময় উৎপাদকের কাছে এল পাইকার (The Dealer), তিনি ঝুড়ির পর ঝুড়ি সাজিয়ে হাজারে হাজারে আপেল কিনলেন চাষী উৎপাদকের কাছে। এরই মাঝে উৎপাদক এবং পাইকার দু'জনের মধ্যে নানারূপ সর্ত্ত লেখাপড়া হোল মাল দেওয়া নেওয়া নিয়ে। যেমন চাষী উৎপাদককে পাইকারের আড়তে মাল দিতে হবে এবং সময়মত দিতে হবে। পাইকারের আড়তে এল এইবার; সেই পাইকার নিলেন অন্যরূপ; তিনি হলেন রপ্তানীকারক (The Exporter)। রপ্তানীকারক হয়ে তিনি কোলকাতার আড়ৎদারদিকে তাঁর পণ্যের কথা লিখলেন যে, কেমন ভাবে তাঁরা মাল নিতে চান। তাঁরা দস্তুরী [Commission] নিয়ে মাল বাজারে চালাতে চান, না একেবারে কিনে নিতে চান। যখন তাঁরা উত্তর দিল যে, মাল কিনে নিতে চায়, তখন রপ্তানীকারক এবং আমদানীকারক দু'জনকেই ব্যাঙ্কের মারফৎ টাকা আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করতে হোল, জাহাজে মাল পাঠানোর জন্য ভাড়া চুক্তি করতে হোল জাহাজ-কোম্পানীর সঙ্গে। পরে বীমা কোম্পানীতে মালগুলির বীমা করতে হোল—কারণ মাল যদি আকস্মিক কারণে নষ্ট হয়ে যায় এইসব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে রপ্তানীকারক সব রসিদ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতার আমদানীকারক [The Importer] এর কাছে। আমদানীকারক এই সময় বাজার বুঝতে লাগলেন যে, কোন দামে তিনি মালগুলি বিক্রী করবেন বাজারে। এই সময়ে আপেলের চালান নিয়ে জাহাজ খিদিরপুর ঘাটে এসে ভিড়ল কিন্তু আমদানীকারক সব মাল নিজের গুদামে আনতে পারল না, তখন জাহাজ-ঘাটের মালিক [Port Authority] এর গুদামে নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে আমদানী মাল [Bonded goods] গুলি রাখা হোল। এখান থেকে আবার কোন মালবাহী কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট ভাড়া চুক্তি ক'রে ক্রমে ক্রমে আমদানীকারকের গুদামে মাল নিয়ে যেতে লাগলো। এইবার খুচরো দোকানদার [The Retailer] সে আমদানীকারকের কাছ থেকে মাল কিনে নিজের দোকানে নিয়ে গিয়ে চমৎকার ক'রে আপেলগুলিকে সাজিয়ে সাধারণের কাছে প্রচার [Publicity] করতে লাগল তার আপেলগুলি বাজারের সব থেকে সেরা আপেল এইভাবে সে যে কেমন পাকা দোকানদার [Sales-man-ship] জানে তার পরিচয় দিলে এবং আমরা যারা নিজেদের জন্যে আপেল কিনব—সেই ভোগীর [The consumer] দল কিনে আনলুম আপেল। এমনি করে একটা জিনিষ নিয়ে ব্যবসা-জগতে কত কাজই না চলছে এক স্তরের পর অপর স্তর—এইভাবে গড়ে উঠছে ব্যবসা জগত।

শিল্প-জগতের শেষ বিভাগ হোল প্রত্যক্ষ কাজ [Direct Services]। কোন লোক জগতের কোন উপকারে আসতে পারে না, যদি তাদের শান্তি বা সুখ না থাকে। সেইজন্য যাদের কাজের দ্বারা সমাজে এবং ব্যক্তি-জীবনে শান্তি আসে তা'রাও শিল্প-জগতকে যথেষ্ট সাহায্য করে। যেমন পুলিশ, সেনা-বিভাগ, দমকল-বিভাগ, হাসপাতাল, থিয়েটার ইত্যাদি। এ সবের দ্বারা মানুষ মানসিক শান্তি বা স্বস্তি পায়, তবেই তা'রা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রভৃতির দিকে বেশী ক'রে মনোযোগী হয়ে পড়ে।

একগোছা চুল* (অনুবাদ গল্প)

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী, এম্-এ

বন্দীশালা, চারদিকেই চূণকাম করা মূক শূন্য প্রাচীর। উঁচুতে একটি মাত্র জানালা, লোহার জাল-ঝাঁটা; সেই পথে আলো এসে পড়েছে ঘরটার মধ্যে। পাগলটি খড়ের চেয়ারে ব'সে, আমাদের দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শূন্য স্থির। খুব রোগা সে, বসে গেছে গাল দুটো, প্রায় সব চুলই সাদা; দেখে মনে হয় অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সে এমনটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! শুকনো বুক ও শীর্ণ হাত পা,—তার সমস্ত ক্ষীণ চেহারার উপরে জামাকাপড়গুলি দেখাচ্ছে মস্তো বড়ো বেমানান। লোকটা যেনো বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, নিরন্তর ক্ষয়ে চলেছে বিষম কোনো চিন্তার ভারে—দুঃসহ চাপে: একটা ফলকে যেমন পোকায় একেবারে ঝর ঝরে ক'রে ফেলে। তার পাগলামি তার অদ্ভুত চিন্তা ঐ মাথাটির মধ্যেই কী ব্যস্ত বিভ্রান্ত, কী জবরদস্ত এই সর্ব্বগ্রাসী চিন্তা! ধারে ধারে তাকে তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে আনছে একে একে। অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত অস্বচ্ছ অবাস্তব এক চিন্তা তার দেহের মাংস শুষে ফেলছে, চুষে নিচ্ছে রক্ত, গ্রাস করছে তার জীবনীশক্তি!

চিন্তার ভারে ক্ষয়িষ্ণু এই লোকটি এক অদ্ভুত রহস্যের মতো। এই অমানবিক দৃশ্যের দিকে তাকালে ব্যথা জেগে ওঠে, লাগে ভয়! দুস্থ দুঃস্বপ্ন ও ভয়ংকর মারাত্মক ভাবনা তার মাথার মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছে, কপালের উপরে ফেলেছে অস্থির ছায়ারেখা।

ডাক্তার বললেন, "ভয়ানক পাগলামিতে লোকটা অস্থির হয়ে ওঠে; এমন বিশিষ্টধরণের কোনো উন্মাদ হাতে পড়েনি আর কখনো...বিচিত্র প্রেম-পাগোল।"

লোকটির অবিশ্যি একটা ডায়েরী আছে, সেখানে নিখুঁত ক'রে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার মনের উন্মত্ত বিশৃঙ্খলা! এবং এখানেই তার পাগলামি, স্বচ্ছ পাগলামি! আপনার আগ্রহ হ'লে দেখতে পারেন।"

ডাক্তারের সঙ্গে আমি অফিস-ঘরে এলাম; এই বেচারার ডায়েরীটি ডাক্তার আমার হাতে দিয়ে বললেন, "পড়ুন, তারপর বলবেন আপনার মতামত!"

পড়তে লাগলাম:

বত্রিশ বছর পর্য্যন্ত বেশ শান্তিতেই কাটছিলো আমার জীবন, ভালোবাসার ঝামেলা বা যন্ত্রণা ছিলো না সেখানে। জীবনটা আমার কাছে ছিলো সরল সুন্দর, খুব সহজ! ধনীই ছিলাম। কিন্তু আমার রুচি ছিলো এতোটা বিভিন্নমুখী যে কোনো কিছুর জন্যেই একেবারে পাগোল হ'য়ে উঠতাম না। এমন ক'রে বেঁচে থাকা সত্যিই এতো সুন্দর। রোজ ভোরে ঘুম ভাঙতো, খুসী মনে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম যেমন খুশী; রাতের বেলায় একটি শান্ত তৃপ্তি নিয়ে শুতে যেতাম, সামনের দিনটি জেগে থাকতো নম্র একটি আশার মতো;—চিন্তাভাবনাহীন মধুর একটি ভবিষ্যত। প্রেমকাহিনী কিছু কিছু এসেছিলো আমার জীবনে; কিন্তু কখনোই জানিনি—কাকে বলে প্রণয়ে পাগোল হওয়া বা প্রেমের ঘোরে প্রাণ যায় যায় দশা। একান্ত আপন ক'রে পাওয়ার উন্মাদনা জানিইনি কখনো। এ ভাবে বাঁচা সত্যিই বেশ চমৎকার। ভালোবাসা অবিশ্যি আরো সুন্দর, কিন্তু সাংঘাতিক! কাজেই, সাধারণতঃ যারা ভালোবাসে তারা সম্ভবতঃ আমার মতো এমন একাগ্র গভীর আনন্দ পায় না; কারণ, আমার জীবনে ভালোবাসা এসেছে বিচিত্র এক অবিশ্বাস্য অবস্থার মধ্যে!

ছিলাম ধনী, সংগ্রাহক বা কালেক্টর হলাম সহজেই। প্রাচীন দিনের দুর্ল্লভ যতো আসবাব বা তেমন কোনো জিনিষ সংগ্রহ করে রাখাই ছিলো আমার কাজ এবং প্রায়ই ব'সে ব'সে ভাবতাম, কত যে অজানা হাতের স্পর্শ লেগে আছে এদের গায়ে গায়ে, এখানে পড়েছে কতো বিস্মিত মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি, এদের ভালোবেসেছে কতো কোমল সুন্দর প্রাণ, কেনো না, আসবার কে না ভালোবাসে? অনেক সময়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম—গত শতাব্দীর ছোট্ট একটি ঘড়ি। এতো সুন্দর, ছোট্ট একটি চুমোর মতো! ঝক্‌ঝকে এনামেল আর ঝিকমিকে সোনায় গড়া। কবে কোনদিন এক নারী এই অপূর্ব্ব রত্নটিকে কিনেছিলেন অধীর আগ্রহে,—আর আজো সেই ঘড়ি চলেছে ঠিক তেমনিই! আজো থেমে যায়নি। এর হৃদস্পন্দন—এক শতাব্দী পরেও! তার যন্ত্রজীবন সমানে চলেছে—টিক্, টিক্, টিক্......! কে, কে সেই নারী এই ঘড়িটি নিয়ে চলছিলো তার দুটি বুকের মাঝখানে,—সিল্ক ও লেসের গরমের নীচে। বুকের স্পন্দনের তালে তাল মিলিয়েছিলো ঘড়িটির মৃদু স্পন্দন। টিক্, টিক্ টিক্! সে কোন সুন্দর হাতখানি আঙুলে আঙুলে ঘুরিয়ে দেখেছে এর রূপ, ফুল-আঁকা এর সুন্দর আবরণ। অনিন্দ্য এই ঘড়িটি যে সাধ ক'রে কিনেছিলো তাকে—তাকে দেখার আগ্রহে আমি পাগোল! ম'রে গেছে সে! সেই অতীত দিনের নারীদের জন্য আজ আমার প্রাণে জেগে উঠেছে আকুল বাসনা। এতোদূর থেকে আজো আমি তাদের ভালোবাসি;—একদিন যারা বুক ভ'রে ভালো বেসেছিলো! অতীত দিনের সেই সুখ-সোহাগের কথা আমার প্রাণে ভরে আনে উদাস নিবিড় এক ব্যথা! হায় সেই মধুসৌন্দর্য্য, সেই মদির হাসি, সেদিনের কতো কামনা বাসনা, দুরু দুরু বুকে প্রথম সেই নিভৃত আলিঙ্গন—সমস্তই কি চিরদিন বেঁচে রইবে না? কেমন ক'রে কতো যে রাত আমি কাটিয়েছি অতীতের সেই নারীদের কথা ভেবে! এতো সুন্দর, এতো কোমল, এতো মধুর! একটি উন্মুখ চুম্বনের জন্য কেমন সুন্দর বাড়িয়ে দিতো তারা বিহ্বল বাহুলতা,—আর আজ তারা বেঁচে নেই? অমর হ'য়ে আছে সেই চুম্বন, সেই মধুচুম্বন! নতুন নতুন অধরে বেঁচে আছে, সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠছে যুগ থেকে যুগান্তরে—নব নব ওষ্ঠে। পুরুষ নিয়েছে সেই চুম্বন, ফিরে দিয়েছে সেই চুম্বন,—তারপর তারা চলে গেছে কোথায়?

সেই অতীত আমাকে তার দুই বাহু দিয়ে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরেছে; বর্ত্তমানকে ভয় করি আমি। কারণ, ভবিষ্যতই যে মৃত্যু! অতীতের সমস্ত ঘটনার জন্য মর্ম্মান্তিক যাতনা জাগে আমার, যারা একদিন ছিলো তাদের জন্য বিলাপ করি, সেই নিষ্ঠুর কালস্রোতকে যদি বাঁধ দিয়ে থামিয়ে রাখতে পারতাম! কিন্তু সে যে চ'লে যায় ছুটে যায়,—প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমার জীবন থেকে কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় বিন্দু বিন্দু প্রাণ-সঞ্চয়! ভবিষ্যৎ এগিয়ে আসে মহাশূন্যের মতো। শূন্যতার রাজ্যে জাগে শুমুখের ব্যর্থতা!

ঠিক তেমনটি কি আমি আর বাঁচতে পাবো না ? বিদায়, পুরোনো-দিনের নারীরা, বিদায় ! আমি যে তোমাদের ভালোবাসি ! তা, আমার প্রেমও ব্যর্থকাহিনী মাত্রই হয়নি। আমি পেয়েছিলাম তাকেই,—তাকেই পেয়েছি—যার জন্য এতো সুদীর্ঘ দিনরজনী আমার এমন বিরহ-ব্যাকুল প্রতীক্ষা ! তার স্পর্শে পেয়েছি আমি জীবনের গভীরতম সুখ, অন্তরতম আনন্দ !...

রোদে উজ্জ্বল দিন, প্যারিসের রাস্তা দিয়ে ঘুরছিলাম ! খুশীতে ভরা প্রাণ, পায়ে পায়ে উড়ন্ত আবেগ। পথিকের আগ্রহ নিয়ে দেখে দেখে চলেছি দোকান-পসার। সহসা প্রাচীন আসবাব-পত্রের এক দোকানে চোখে পড়লো সপ্তদশ শতাব্দীর একটা ইতালিয় ডেস্ক-টেবিল। অনবদ্য অপূর্ব্ব জিনিষ, একেবারেই দুর্লভ। নিশ্চিতই ইতালিয় শিল্পী ভিতেল্লির নিখুঁত হাতে গড়া ! তখনকার দিনে অমন হাত ছিলো না আর কারুই। দেখতে দেখতে দূরে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু অলক্ষ্যে পা' দুটি এদিকেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো আবার।—কেন, কেন এই ডেস্কটির স্মৃতি এমন করে আমাকে ইশারা দিয়ে ফিরছে। আবার থেমে গেলাম দোকানটার সামনে ফিরে দেখবার জন্য—সেটা যেনো আমাকে মুগ্ধ লুব্ধ করে রেখেছে। আশ্চর্য্য এই আকর্ষণ। একটা জিনিষ একবার তুমি দেখলে,—তারপরে ধীরে ধীরে তা তোমাকে পেয়ে বসে, তোমার ভাবনায় মোচড় দিতে থাকে—আচ্ছন্ন করে ফেলে তোমার সমস্ত সত্তাকে, কোন মোহিনী নারীর মুখ দেখে যেমনটা হয়, তার লাবণ্য যেনো তোমাকে আঁকড়ে ধরে নিবিড় আলিঙ্গনের মতো, তার শক্তির মধ্যে তোমার ইচ্ছাকে করে রাখে বন্দী। তার আকার, তার রঙ, অঙ্গ-গঠন, তার সমস্ত তুমি উপভোগ করো—এ।ং ইতিমধ্যে কখন তুমি ভালবেসে ফেলেছো তাকেই—তুমি পেতে চাও তাকে একান্ত নিজের করে। তাকে না পেলে কিছুতেই যে আর চলবে না তোমার !—এই পাবার কামনা প্রথমে তাকে কেমন ভীরু, কিন্তু ক্রমেই বেড়ে ওঠে, মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, একেবারেই দুর্ব্বার তখন। এদিকে দোকানদার তোমার চাউনি দেখেই বুঝে নেয় তোমার বর্দ্ধমান আগ্রহের রহস্য।

ক্যাবিনেটটা কিনে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে এলাম শোবার ঘরে। এই নতুন সাথীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভ রাত্রির কথা যারা জানে না, তাদের জন্য করুণা হয় আমার। সমস্ত রাত চোখের নরম চাহনি দিয়ে আলিঙ্গন করলাম এই টেবিলটিকে—যেনো সে কোমল মেদমাংসেই গড়া। মিনিটে মিনিটে ছুটে আসি তার পাশে। মনের মধ্যে সব সময়েই এর ভাবনা,—সর্ব্বত্র ! এর প্রিয় স্মৃতি গুঞ্জন করে আমার পথে পথে, যেখানেই যাই না কেন ! বাড়ী ফিরে জামাজুতো খুলবার আগেই তার পাশে ছুটে গিয়ে তাকে প্রাণভরে দেখতে থাকি—এক পাগোল প্রেমিকের মতো। সত্যই, এই ক্যাবিনেটটাকে আমি প্রণয়ীর মতো শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলাম। কখনো আদুরে হাতে খুলছি এর দোর, দুয়ার কখনো। ক্ষুধিত প্রণয়ীর মতো এর সর্ব্বাঙ্গে আমি নিজের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিলাম,—রক্তে রক্তে আস্বাদ কচ্ছিলাম একান্ত করে পাওয়ার গোপন আনন্দ।

তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা ; ক্যাবিনেটটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মনে হোলো পেছনে আছে বোধ হয় কোনো গোপন ড্রয়ার। জোরে জোরে কাঁপতে লাগলো সমস্ত বুক,—সারা রাত বৃথাই বার বার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। পরদিন ভোরেই একটা ছুরি নিয়ে তার আগাটা ঢুকিয়ে দিলাম কাঠের জোড়ামুখে। এবার খুলে গেলো এবং বেরিয়ে পড়লো গোপন কুঠরীটা। তার মধ্যে কালো একটি ভেলভেটের বাক্সে সুন্দর এক গোছা চুল,—হ্যাঁ, মেয়েদের চুল। কোকড়ানো কোকড়ানো মস্তো বড়ো এক গোছা সোনালী চুল, লালচে সোনালী। সোনালী একটি ফিতের সংগে বাঁধা। বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি, একা দাঁড়িয়ে, পা কাঁপছে। সুদূর স্মৃতির মতো তার ক্ষীণ অস্ফুট একটি মিষ্টি গন্ধ—যেনো অতীন্দ্রিয় আত্মার আবেশ।

গোপন ড্রয়ারটা থেকে চুলের গোছাটি তুলে নিলাম,—অনেকটা ভক্তিভরেই। সঙ্গে সঙ্গে চুল গোছা বাঁধন খুলে ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে,—সোনালী ঢেউয়ে দুলে দুলে, হাল্কা উজ্জ্বল নরম নমনীয় ! তখন আমাকে পেয়ে বসলো অদ্ভুদ একটা ভাবাবেগে। এ কী বিচিত্র ! কবে—কেন, এই চুলগাছি রাখা হয়েছিলো এই গোপন নিরালায় ! কতো যে অভিমান, কতো যে লীলা-অশ্রু লুকিয়ে আছে এই 'স্মরণ'টুকুর আড়ালে ! কে কেটে রেখেছে একে ; কোনো প্রেমিক তার বিদায়ের দিনে ! অথবা গৃহজীবনে উদাসীন হয়ে চলে যাবার আগে এই প্রেম-সম্পদ—পরিত্যক্ত সম্পত্তির মতো। অথবা কোনো তরুণী-প্রিয়ার মরণের মুখে তার প্রিয়তম মণির মতো রেখে দিয়েছে তার এক গোছা চুল। বিগত প্রিয়ার প্রথম একটা স্মৃতি, অম্লান থাকবে যা চিরদিন। যাকে সে চিরদিন ভালবাসতে পারে, নিবিড় ব্যথায় বুকে জড়িয়ে রাখবে, চুমু খাবে পাগোলের মতো। কী আশ্চর্য্য ! সেই চুল আজ তেমনি পড়ে আছে,—আর সেই তরুণীর প্রাণ-প্রতিম দেহখানির কোনো চিহ্নও আজ আর কোথাও অবশেষ নেই।

আমার আঙুলের উপর দিয়ে উড়তে লাগলো চুল গোছা—আমার দেহ স্পর্শ করলো নিবিড় এক আলিঙ্গন শিহরনের মতো ! বিগতার মধুর আলিঙ্গন-পরশ ! প্রাণটা ব্যথায় কোমল হয়ে এলো, বুক ভেঙে ভেঙে কান্না আসছিলো। আমার হাতের মধ্যে তাকে অনুভব করতে লাগলাম—অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে। তখন মনে হলো তার প্রাণ-স্পন্দন এরি মধ্যে গোপন রয়েছে আজো ! ধীরে ধীরে ভেলভেট বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম আবার। ড্রয়ারটা বন্ধ করে ক্যাবিনেটটাও বন্ধ করে রাখলাম। এবার রাস্তায় বেরিয়ে চলতে লাগলাম স্বপ্নে পাওয়া লোকের মতো।....

সোজা চলেছি শুধু—সমস্ত প্রাণে এক উদ্বিগ্ন ব্যথা,—কোনো কুমারীকে প্রথম প্রণয়-চুম্বনের পরে সারা বুকে জেগে থাকে যেমন একটা ভীরু উদ্বিগ্ন ভাব ! মনে হোলো, অতীতেই যেনো আমি বেঁচে এসেছি,—আমি চিনি এই নারীকে ! তখন বিল্লানের মধুর কবিতা মুখর হয়ে উঠলো আমার প্রাণে প্রাণে—ঠিক যেমন করে কান্না জেগে ওঠে !

রোমসুন্দরী, ফ্লোরা লাবণ্যলতা
কোথা আছো তুমি, সে কোন কান্তের বাঁকে ?

ঠিক তেমনটি কি আমি আর বাঁচতে পাবো না? বিদায়, পুরোনো দিনের নারীরা, বিদায়! আমি যে তোমাদের ভালোবাসি! তা, আমার প্রেমও ব্যর্থকাহিনী মাত্রই হয়নি। আমি পেয়েছিলাম তাকেই,—তাকেই পেয়েছি—যার জন্য এতো সুদীর্ঘ দিনরজনী আমার এমন বিরহ-ব্যাকুল প্রতীক্ষা! তার স্পর্শে পেয়েছি আমি জীবনের গভীরতম সুখ, অন্তরতম আনন্দ!...

রোদে উজ্জ্বল দিন, প্যারিসের রাস্তা দিয়ে ঘুরছিলাম! খুশীতে ভরা প্রাণ, পায়ে পায়ে উড়ন্ত আবেগ। পথিকের আগ্রহ নিয়ে দেখে দেখে চলেছি দোকান-পসার। সহসা প্রাচীন আসবাব-পত্রের এক দোকানে চোখে পড়লো সপ্তদশ শতাব্দীর একটা ইতালিয় ডেস্ক-টেবিল। অনবদ্য অপূর্ব্ব জিনিষ, একেবারেই দুর্লভ। নিশ্চিতই ইতালিয় শিল্পী ভিতেল্লির নিখুঁত হাতে গড়া! তখনকার দিনে অমন হাত ছিলো না আর কারুই। দেখতে দেখতে দূরে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু অলক্ষ্যে পা' দুটি এদিকেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো আবার।—কেন, কেন এই ডেস্কটির স্মৃতি এমন করে আমাকে ইশারা দিয়ে ফিরছে। আবার থেমে গেলাম দোকানটার সামনে ফিরে দেখবার জন্য—সেটা যেনো আমাকে মুগ্ধ লুব্ধ করে রেখেছে। আশ্চর্য্য এই আকর্ষণ। একটা জিনিষ একবার তুমি দেখলে,—তারপরে ধীরে ধীরে তা তোমাকে পেয়ে বসে, তোমার ভাবনায় মোচড় দিতে থাকে—আচ্ছন্ন করে ফেলে তোমার সমস্ত সত্তাকে, কোন মোহিনী নারীর মুখ দেখে যেমনটা হয়, তার লাবণ্য যেনো তোমাকে আকড়ে ধরে নিবিড় আলিঙ্গনের মতো, তার শক্তির মধ্যে তোমার ইচ্ছাকে করে রাখে বন্দী। তার আকার, তার রঙ, অঙ্গ-গঠন, তার সমস্ত তুমি উপভোগ করো—এবং ইতিমধ্যে কখন তুমি ভালবেসে ফেলেছো তাকেই—তুমি পেতে চাও তাকে একান্ত নিজের করে। তাকে না পেলে কিছুতেই যে আর চলবে না তোমার!—এই পাবার কামনা প্রথমে তাকে কেমন ভীরু, কিন্তু ক্রমেই বেড়ে ওঠে, মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, একেবারেই দুর্ব্বার তখন। এদিকে দোকানদার তোমার চাউনি দেখেই বুঝে নেয় তোমার বর্দ্ধমান আগ্রহের রহস্য।

ক্যাবিনেটটা কিনে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে এলাম শোবার ঘরে। এই নতুন সাথীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভ রাত্রির কথা যারা জানে না, তাদের জন্য করুণা হয় আমার। সমস্ত রাত চোখের নরম চাহনি দিয়ে আলিঙ্গন করলাম এই টেবিলটিকে—যেনো সে কোমল মেদমাংসেই গড়া। মিনিটে মিনিটে ছুটে আসি তার পাশে। মনের মধ্যে সব সময়েই এর ভাবনা,—সর্ব্বত্রই! এর প্রিয় স্মৃতি গুঞ্জন করে আমার পথে পথে, যেখানেই যাই না কেন! বাড়ী ফিরে জামাজুতো খুলবার আগেই তার পাশে ছুটে গিয়ে তাকে প্রাণভরে দেখতে থাকি—এক পাগোল প্রেমিকের মতো। সত্যই, এই ক্যাবিনেটটাকে আমি প্রণয়ীর মতো শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলাম। কখনো আদুরে হাতে খুলছি এর দোর, ড্রয়ার কখনো। ক্ষুধিত প্রণয়ীর মতো এর সর্ব্বাঙ্গে আমি নিজের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিলাম,—রক্তে রক্তে আস্বাদ কচ্ছিলাম একান্ত করে পাওয়ার গোপন আনন্দ।

তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা; ক্যাবিনেটটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মনে হোলো পেছনে আছে বোধ হয় কোনো গোপন ড্রয়ার। জোরে জোরে কাঁপতে লাগলো সমস্ত বুক,—সারা রাত বৃথাই বার বার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। পরদিন ভোরেই একটা ছুরি নিয়ে তার আগাটা ঢুকিয়ে দিলাম কাঠের জোড়ামুখে। এবার খুলে গেলো এবং বেরিয়ে পড়লো গোপন কুঠরীটা। তার মধ্যে কালো একটি ভেলভেটের বাক্সে সুন্দর এক গোছা চুল,—হাঁ, মেয়েদের চুল। কোকড়ানো কোকড়ানো মস্তো বড়ো এক গোছা সোনালী চুল, লালচে সোনালী। সোনালী একটি ফিতের সংগে বাঁধা। বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি, একা দাঁড়িয়ে, পা কাঁপছে। সুদূর স্মৃতির মতো তার ক্ষীণ অস্ফুট একটি মিষ্টি গন্ধ—যেনো অতীন্দ্রিয় আত্মার আবেশ।

গোপন ড্রয়ারটা থেকে চুলের গোছাটি তুলে নিলাম,—অনেকটা ভক্তিভরেই। সঙ্গে সঙ্গে চুল গোছা বাঁধন খুলে ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে,—সোনালী ঢেউয়ে দুলে দুলে, হাল্কা উজ্জ্বল নরম নমনীয়! তখন আমাকে পেয়ে বসলো অদ্ভুদ একটা ভাবাবেগে। এ কী বিচিত্র! কবে—কেন, এই চুলগাছি রাখা হয়েছিলো এই গোপন নিরালায়! কতো যে অভিমান, কতো যে লীলা-অশ্রু লুকিয়ে আছে এই 'স্মরণ'টুকুর আড়ালে! কে কেটে রেখেছে একে; কোনো প্রেমিক তার বিদায়ের দিনে! অথবা গৃহজীবনে উদাসীন হয়ে চলে যাবার আগে এই প্রেম-সম্পদ—পরিত্যক্ত সম্পত্তির মতো। অথবা কোনো তরুণী-প্রিয়ার মরণের মুখে তার প্রিয়তম মণির মতো রেখে দিয়েছে তার এক গোছা চুল। বিগত প্রিয়ার প্রথম একটা স্মৃতি, অম্লান থাকবে বা চিরদিন। যাকে সে চিরদিন ভালবাসতে পারে, নিবিড় ব্যথায় বুকে জড়িয়ে রাখবে, চুমু খাবে পাগোলের মতো। কী আশ্চর্য্য! সেই চুল আজ তেমনি পড়ে আছে,—আর সেই তরুণীর প্রাণ-প্রতিম দেহখানির কোনো চিহ্নও আজ আর কোথাও অবশেষ নেই।

আমার আঙুলের উপর দিয়ে উড়তে লাগলো চুল গোছা—আমার দেহ স্পর্শ করলো নিবিড় এক আলিঙ্গন শিহরনের মতো! বিগতার মধুর আলিঙ্গন-পরশ! প্রাণটা ব্যথায় কোমল হয়ে এলো, বুক ভেঙে ভেঙে কান্না আসছিলো। আমার হাতের মধ্যে তাকে অনুভব করতে লাগলাম—অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে। তখন মনে হলো তার প্রাণ-স্পন্দন এরি মধ্যে গোপন রয়েছে আজো! ধীরে ধীরে ভেলভেট বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম আবার। ড্রয়ারটা বন্ধ করে ক্যাবিনেটটাও বন্ধ করে রাখলাম। এবার রাস্তায় বেরিয়ে চলতে লাগলাম স্বপ্নে পাওয়া লোকের মতো।...

সোজা চলেছি শুধু—সমস্ত প্রাণে এক উদ্বিগ্ন ব্যথা,—কোনো কুমারীকে প্রথম প্রণয়-চুম্বনের পরে সারা বুকে জেগে থাকে যেমন একটা ভীরু উদ্বিগ্ন ভাব! মনে হোলো, অতীতেই যেনো আমি বেঁচে এসেছি,—আমি চিনি এই নারীকে! তখন বিল্লানের মধুর কবিতা মুখর হয়ে উঠলো আমার প্রাণে প্রাণে—ঠিক যেমন করে কান্না জেগে ওঠে!

রোমসুন্দরী, ফ্লোরা লাবণ্যলতা
কোথা আছো তুমি, সে কোন কাল্পের বাঁকে?

কোথায় হারালো থায়াস, হিপারশিয়া,
ধরা কি দেবেনা আজিকার অনুরাগে ! .
কোথা সেই ইকো মানুষ দেখেনি যারে
নদী প্রান্তরে শোনা যায় শুধু রব,—
মানুষের মন নাগাল পেলোনা যার
কোথায় সে সব অতীতের সৌরভ ?

বাড়ী ফিরেই ছুটে আসি আমার বুকের মানিকের কাছে,—সে এক অদম্য আকর্ষণ ! হাতে তুলে নিলাম তাকে ; তার স্পর্শে আমার প্রতিটি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে, আমার সর্ব্বাংশের মধ্য দিয়েই যেনো বয়ে গেলো ব্যাপক একটা বিদ্যুত-শিহরণ ! বিমূঢ়ের মতোই কাটতে লাগলো আমার দিন,—কিন্তু ঐ চুলের স্মৃতি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও ছেড়ে গেলোনা। বাড়ীতে ফিরলেই ছুটে যাই তার কাছে, হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকি। ক্যাবিনেটের চাবি ঘুরোবার সময়ই সর্ব্বাংগে খেলে যায় এক অনিন্দ্য শিহরণ—নিঝুম রাতে প্রণয়ীর ঘরের দোর খুলবার সময় যেমন হয় ! এই সুন্দর চুলের সোনালী শীতল স্পর্শ পাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে আমার আঙুলগুলি, সমস্ত প্রাণে জেগে থাকে তপ্ত কামনার আকুল ক্ষুধা !

তাকে বারবার আলিঙ্গন করে সারা গায়ে তার কোমল স্পর্শ বুলিয়ে আবার রেখে দেই বাক্সের মধ্যে, ওখানেই যেনো থাকবে সে—আমার বন্দী প্রণয়িনী জীবন্ত নারী ! আমার কাছেই সে, আমার একান্ত কাছে ; নিরালায় আমরা দু'জন। কামনা-পাগোল হয়ে উঠতো আমার সর্ব্বাঙ্গ। মধুর উত্তেজনায় ক্যাবিনেট খুলে কাছে নিয়ে আসতাম তাকে। শীতল মসৃণ নরম তার স্পর্শ-সুখে যেনো পাগোল হয়ে যেতাম, তার মদির-মুগ্ধ সুরভিত আলিঙ্গনের মধ্যে।

এমনি ভাবেই কাটলো একমাস কি দু'মাস···তারপর আর অন্য কিছু জানিনা। দিনরাত শুধু তার ভাবনা। প্রণয়-সুখে দিন কাটতে লাগলো আমার—পূর্ব্বরাগের মতো, প্রণয়ীকে আলিঙ্গন করে ধরবার মুখে বুকের মধ্যে যেমন একটা মধুর যন্ত্রণা। আমি তাকে একটা ঘরে নিয়ে বন্ধ করে দিলাম চারপাশের জানলা। নিভৃতে আমার অঙ্গে অঙ্গে বুকে বুকে তার স্পর্শ অনুভব করে' চুমো খাই,—কামড়ে ধরি কামনার অসহ আবেগে। আমার গালের উপর, গলার উপর জড়িয়ে ধরি। তার রূপের সোনালী ঢেউয়ের মাঝখানে ডুবিয়ে রাখি চোখদুটি, চেপে রাখি সমস্ত চোখে, ভরে নেই তার সোনালী রূপ।

আমি ভালোবাসি, পাগোলের মতো ভালোবাসি আমি। একে ছেড়ে আমি একটুও বাঁচবোনা, একে না দেখলে বাঁচবোনা। আমি দিনরাত শুধু প্রতীক্ষায় থাকি, ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ! কার··· জানিনা,···বুঝি তার !

একরাত্তে সহসাই জেগে উঠলাম আমি। ঘরে যেনো আমি একা নই। একাই ছিলাম যদিও। কিন্তু দু'চোখ বুজতে পারলাম না একটুও,একটা জোরালো নেশায় যেনো জেগে রইলাম। তাকে কাছে নেবো বলে আমি উঠে পড়লাম। সে যেনো আগের চেয়ে আজ আরো নরম, মধুর, এমন প্রাণ-মুখর। ফিরে এলো কি তার সেই সুন্দর প্রাণ ? পাগোল চুমোয় চুমোয় এক আনিন্দ্য সুখে যেনো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছিলাম। সারাদেহ দিয়ে তার কোমল দেহখানি জড়িয়ে ধরলাম···মৃতে কি ফিরে এলো প্রাণ ! সে এসেছে ! হ্যাঁ, তাকে আমি দেখেছি, তাকে জড়িয়ে ধরেছি, পেয়েছি তাকে—বিগত দিনের আমার সেই প্রিয়া—ঠিক সেদিনকার মতোই যে সে ! দীর্ঘ সেই শুভ্রতনু কোমল-পেলব, বিপুল বুকদুটি সুখ-শীতল, ভারী নিতম্ব, ধনুকের মতো কোমরের নরম ভাঁজ ! সব সেই ! তাকে আলিঙ্গনের সাথে সাথে বয়ে গেলো অধৈর্য্য অনিন্দ্য এক সুখ-শিহরণ—সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত !

এবার পেয়েছি তাকে, দিনরজনীর সে আমার। সে ফিরে এসেছে—আমার সেই বিগতা, সুন্দরী বিগতা, আমার আরাধ্য প্রতিমা ! এতোদিনের অজানা, রহস্যময়ী।···তার আলিঙ্গনের মধ্যে পাই যেনো অধরাকে দুই বাহুর মধ্যে পাওয়ার সুখ। কোনো প্রেমিকই কি ভালোবেসেছে এমন ব্যাকুল করে, এমন ভয়ানক ভাবে ?

কিন্তু আমার এই সুখ আমি চেপে রাখতে পারলাম না। তাকে ফেলে যেতে পারিনা কোথাও। সবখানে সব সময়েই সাথে আছে সে। স্ত্রীর মতো তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই শহরের পথে পথে, থিয়েটারে গিয়ে স্ত্রী বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দিই সবার সাথে। কিন্তু তারা দেখে ফেলেছে তাকে···তাদের সন্দেহ জেগেছে, আমার কাছ থেকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। আমাকে পুরে দিয়েছে জেলে অপরাধীর মতো। তাকে কেড়ে নিয়েছে আমার বুক থেকে—ওঃ, ভগবান ওঃ !

* * *

এখানেই শেষ হয়েছে। ডাক্তারের দিকে ভীত চোখ তুলে তাকালাম। ঠিক তখনি হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠলো সমস্ত পাগলা গারদের মধ্যে। ভয়ে, বিস্ময়ে ও করুণায় কথা আমার বেঁধে যাচ্ছিলো—"কিন্তু···এই চুল···সত্যই কি এই চুল—"

ক্যাবিনেটটা খুলে ডাক্তার আমার দিকে ছুড়ে দিলেন সোনালী রঙের এক গোছা চুল। চুলগাছি আমার দিকে যেনো উড়ে এলো উড়ন্ত এক পাখীর মতো। আমার হাতের মধ্যে তার উজ্জ্বল নরম স্পর্শে আমি যেনো কেঁপে উঠলাম। ডাক্তার ভুরু দুটি কুঁচকে তুলে মন্তব্য কল্লেন :

"মানুষের মন বিচিত্র, তার পক্ষে সবই সম্ভব।"
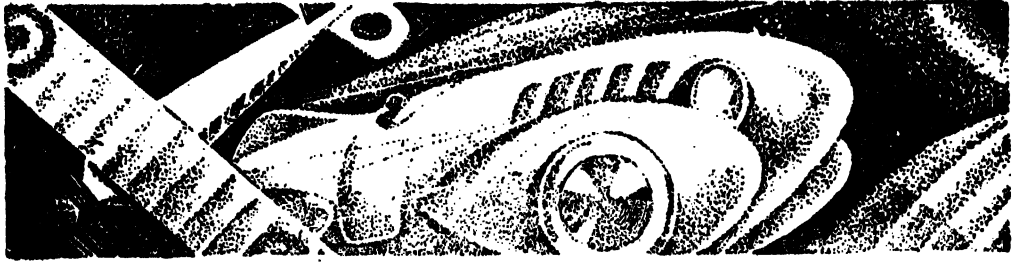
বিজ্ঞান জগৎ

অণু ও পরমাণু

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অণুর কথা

ক্ষুদ্রের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক জড়পদার্থের ভেতর দু' শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম জড়কণার অস্তিত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। এই কণাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও সসীম পদার্থ। এদেরকে বলা যায় অণু ও পরমাণু (Moldcule ও Atcm)। শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল ওদের ব্যবহার এবং কারবারের প্রণালী তুলনা ক'রে। যে সকল কারবারে পদার্থের ধর্ম্ম বদলে যায় এবং নূতন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাদের বলা যায় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (Chemical Change)। দহন, পচন, জারণ জাতীয় ব্যাপারগুলি রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত। 'এই সকল ব্যাপারের পক্ষে জড়দ্রব্যের যে সকল অংশ ক্ষুদ্রতম কারবারীরূপে আত্মপরিচয়দানে সক্ষম হলো, তারা নাম গ্রহণ করলো পরমাণু। অন্যপক্ষে যে সকল ব্যাপারে পদার্থের ধর্ম্ম বদলায় না, বা কোন নূতন পদার্থের উদ্ভব হয় না, তাদের বলা যায় ভৌতিক পরিবর্ত্তন (Physical Ceange)। পদার্থের সঙ্কোচন-প্রসারণ ও আকৃতির পরিবর্ত্তন, তাপের প্রভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি, কঠিন পদার্থের গলন, তরল দ্রব্যের বাষ্পীভবন ইত্যাদি ভৌতিক পরিবর্ত্তনের উদাহরণ। এই সকল ব্যাপারে জড় পদার্থের যে সকল অংশ ক্ষুদ্রতম অভিনেতার পাঠ গ্রহণ করে তাদের নাম হলো অণু।

অণুগুলি ভৌতিক পরিবর্ত্তনের পক্ষে অবিভাজ্যতার দাবি জানাতে সক্ষম হলেও রাসায়নিক কারবারে ওরা ভেঙ্গে যায়; কিন্তু পরমাণুগুলি তখনো যার যার ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে। সুতরাং অণুর তুলনায় পরমাণু ক্ষুদ্রতর পদার্থ। উভয়েই জড়দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশরূপে বিশিষ্ট মর্য্যাদার দাবি করে, কিন্তু তা' ক'রে থাকে দু'রকমের দু'টা (রাসায়নিক ও ভৌতিক) কারবারের পক্ষে. যার একটার বর্ণনা দিতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত ভেতরে প্রবেশের প্রয়োজন হয়। রসায়ন-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো রাসায়নিক কারবারের ক্ষুদ্রতম কারবারী-রূপে পরমাণুর অস্তিত্ব মেনে নিয়ে ওদের সংযোগ ও বিশ্লেষণের নিয়মসমূহের বর্ণনা দান; আর পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো ভৌতিক ব্যাপারের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারীরূপে অণুর অস্তিত্ব মেনে নিয়ে এবং ওদের চালচলন সম্পর্কীয় বিশিষ্ট ধরনের কতকগুলি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে বিভিন্ন ভৌতিক পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা দান। এ প্রবন্ধে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের এই প্রয়াসের কতকটা আভাস দানের চেষ্টা করবো।

ভৌতিক পরিবর্ত্তনের উদাহরণস্বরূপ আমরা পদার্থের সঙ্কোচনশীলতার উল্লেখ করেছি। দেখা যায় সঙ্কোচনশীলতা (Compressibility) জড়দ্রব্য মাত্রেরই একটা সাধারণ ধর্ম্ম। চাপ প্রয়োগে সকল পদার্থই অল্পবিস্তর সঙ্কুচিত হয়। অনিল বা বায়বীয় পদার্থ সহজেই সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু তরল ও কঠিন দ্রব্যের আয়তনও যে প্রবল চাপের ফলে পরিমাপযোগ্য মাত্রায় কমে যায় বহু পরীক্ষা থেকে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। পদার্থের আণবিক গঠন স্বীকার করলে, অর্থাৎ জড়দ্রব্যমাত্রকেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করলে ওদের সঙ্কোচনশীলতা সহজেই ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়। কারণ, তা হ'লে আমরা কল্পনা করতে পারি যে, জড়কণাগুলি যার যার আয়তন ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে পরস্পরের কাছাকাছি হতে কিম্বা পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে পারে। চাপ বাড়ালে অণু-গুলির পারস্পরিক ব্যবধান কমে যায় এবং চাপ কমালে এই দূরত্বগুলি বেড়ে যায়; ফলে পদার্থটার আয়তনের পরিবর্ত্তন (সঙ্কোচন বা প্রসারণ) ঘটে। সুতরাং এই ধরনের সাধারণ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, কোন জড়দ্রব্যই একেবারে নিরেট নয়, বা জড়ের গঠনে ক্রমভঙ্গ রয়েছে। আমাদের কল্পনা করতে হয় যে, পদার্থমাত্রই অণুময় এবং অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে অল্পবিস্তর দূরত্বের ব্যবধান বিদ্যমান। এই দূরত্বগুলিকে বলা যায়—আণবিক দূরত্ব (Molecular distance)।

আবার পদার্থের আয়তন বদ্‌লাতে যেমন চাপ বা টান প্রয়োগের আবশ্যক হয়, আকৃতি পরিবর্ত্তনেও সেইরূপ ওর ওপর একটা না একটা Force বা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তরল ও বায়বীয় পদার্থ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, ওদের আকৃতিপরিবর্ত্তন নাম মাত্র বলপ্রয়োগেই, কিম্বা কোনরূপ বল প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখেই সম্পন্ন হয়ে থাকে; কারণ দেখা যায় যে, ওদেরকে যে পাত্রে রাখা যায় আপনা থেকেই ওরা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু কঠিন পদার্থের আকৃতিপরিবর্ত্তন বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। একটা লৌহদণ্ড

বা একটা কাঠের পেন্সিলকে বাঁকাতে বা মোচড়াতে হ'লে যথেষ্ট বলপ্রয়োগের আবশ্যক হয়ে থাকে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সকল অণুর সমবায়ে জড়দ্রব্য গঠিত হয়েছে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করলেও ওদের মধ্যে বিশিষ্ট ধরনের একটা বন্ধন রয়েছে, যা' পদার্থের তরল ও অনিল অবস্থার পক্ষে নামমাত্র হলেও কঠিন দ্রব্যের অণুদের পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ়। এই বন্ধনকে বলা যায় আণবিক আকর্ষণ (Molecular Attraction বা Cohesion)। এরই জন্য কঠিন পদার্থ মাত্রেরই এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি রয়েছে এবং এই আকৃতির পরিবর্তন যথেষ্ট বলপ্রয়োগের অপেক্ষা রাখে। একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় আকৃতি কিম্বা আয়তনের পরিবর্তন সাধনের জন্য পদার্থ বিশেষের ওপর যতটা করে বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়ে থাকে তার দ্বারা ওর আকৃতিগত এবং আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা পরিমিত হয়ে থাকে। লৌহের তুলনায় ইস্পাতের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা বেশী, সীসক ও রবারের অপেক্ষাকৃত কম। তরল ও অনিলের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা নগণ্য কিন্তু আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা নিতান্ত কম নয়। তরল ও কঠিন দ্রব্যের আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা প্রায় সমান দরের, কিন্তু অনিলের আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা অনেকটা কম।

তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ তরল হয় এবং তরল দ্রব্য অনিলের (গ্যাসের) আকার ধারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ টার আয়তনও খানিকটা ক'রে বেড়ে যায় এবং ওর অণুগুলি আগেকার তুলনায় ফাঁক ফাঁক হয়ে পড়ে। দূরত্ববৃদ্ধিতে ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায় এবং কমে অত্যন্ত দ্রুত হারে। এর প্রমাণ পাই আমরা এই দেখে যে, কঠিন দ্রব্য যখন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ওর আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা, বলতে গেলে, লোপ পায়। তরল হবার ফলে পদার্থ টার আয়তন খুব যে বাড়ে তা' নয়; এ আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি। সুতরাং এক্ষেত্রে অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব আগেকার তুলনায় খুব সামান্যই বাড়ে। কিন্তু দূরত্বের এই সামান্য বৃদ্ধিতেই অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এতটা কমে যায় যে, তার ফলে পদার্থ টা তরলত্ব প্রাপ্ত হয়ে ওর আকৃতির বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এর থেকে আণবিক আকর্ষণ সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের পরিচয় পাই;—পরস্পরের অন্তর্গত দূরত্ববৃদ্ধিতে অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণ কমে যায় খুব দ্রুত হারে। কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'চোখের আড়াল মনের আড়াল' আণবিক আকর্ষণের এই হলো ঢং। খুব কাছাকাছি হ'লে প্রবল আকর্ষণ, আর দূরত্ব একটুখানি বেড়ে গেলে আকর্ষণের নাম-গন্ধও থাকে না।

আণবিক আকর্ষণের এই বিশেষত্ব মেনে নিয়ে লাপলাস্ তরল পদার্থের ধর্ম্মসম্পর্কীয় বহু ব্যাপারের, বিশেষ করে কৈশিক ব্যাপারসমূহের (capillary phenomenas) ব্যাখ্যাদানে সমর্থ হয়েছেন। খুব সরুছিদ্রবিশিষ্ট কাচের নলের ভেতর জলের ও তেলের ঊর্দ্ধগতি, কলমে কালি ওঠা, ব্লটিং কাগজের কালি শুষে নেওয়া, জলের পিঠে লোহার ছুঁচের ভেসে থাকা, জলে ভাসমান খড়কুটার এবং অন্যান্য পদার্থের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, বুদ্‌বুদের, বন্দুকের গুলীর এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির গোলাকার ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি কৈশিক ব্যাপারের অন্তর্গত; এবং এই সকল ও এইধরনের সকল ব্যাপারই আণবিক আকর্ষণ সম্পর্কীয় উক্ত বিশেষত্বের ফল। নিউটনের মহাকর্ষের নিয়মেও জড়কণায় জড়কণায় আকর্ষণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু দূরত্ববৃদ্ধিতে এই আকর্ষণ-বল কমে দূরত্বের বর্গের অনুপাতে; ফলে মহাকর্ষ-বলের মাত্রা একেবারে শূন্যপরিমিত হতে পারে যখন পরস্পরাকর্ষণকারী জড়কণাদ্বয়ের দূরত্ব একেবারে অসীম হয়ে দাঁড়ায়। অন্য পক্ষে, আণবিক আকর্ষণের মাত্রা শূন্য পরিমিত হতে হলে অণুতে অণুতে দূরত্বের ব্যবধান এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলেই যথেষ্ট। এর থেকে বোঝা যায় যে, আণবিক আকর্ষণের নিয়ম মহাকর্ষের নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং দূরত্ববৃদ্ধিতে আণবিক আকর্ষণ কমতে থাকে অপেক্ষাকৃত অনেক দ্রুত হারে। বস্তুতঃ কোন একটা অণুকে কেন্দ্র করে যদি খুব ক্ষুদ্র একটা গোলকও অঙ্কিত করা যায়, (যার ব্যাসার্দ্ধ ধরা যেতে পারে, এক ইঞ্চির কোটিভাগের এক ভাগ মাত্র) তবে এই গোলকের অন্তর্গত অণুগুলিই শুধু কেন্দ্রস্থ অণুটাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম বলে আমরা কল্পনা করতে পারি। এই অতিক্ষুদ্র গোলকটাকে কেন্দ্রস্থ অণুটার আকর্ষণের এলাকা বলা যায়। এলাকার বাইরে যে সকল অণু রয়েছে, কেন্দ্রস্থ অণুটার ওপর তাদের আকর্ষণের প্রভাব একেবারে শূন্যপরিমিত ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

তরল দ্রব্য যখন অনিলের (বাষ্পের) অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন ওর আয়তন বহুগুণে বেড়ে যায়। পরিমাপে দেখা যায় যে, ফুটন্ত জলের বাষ্পীভবন ব্যাপারে ওর আয়তন বাড়ে প্রায় ১৭০০ গুণ; সুতরাং জলের অণুগুলির পারস্পরিক গড়-দূরত্ব বাড়ে প্রায় ১২ গুণ। এই অবস্থায় অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এত কমে যায় যে, এখন ওদের পক্ষে স্বাধীন ভাবে (আকর্ষণ-মুক্ত অবস্থায়) ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ানো সম্ভবপর ব্যাপার ব'লে মেনে নিতে হয়। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকগণ গ্যাসের অণুদের পক্ষে স্বাধীন-পথ (Free path), নামক একটা পথের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে থাকেন। অণুবিশেষ যখন অপর একটা অণুর খুব গা ঘেঁষে যেতে থাকবে, তখন অবশ্য ক্ষণেকের জন্য ওদেরকে পরস্পরের আকর্ষণ-বলের অধীন হতে হবে, কিন্তু এই মুহূর্ত্তপরিমিত ক্ষণগুলিকে অণুটার সমগ্র গতি-কালের তুলনায় গণনার মধ্যে না আনলেও চলে। ফলে গ্যাসের অণুসমূহকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিচরণক্ষম জড়কণা-রূপে গ্রহণ করতে আমাদের কল্পনায় বাধে না। অন্যপক্ষে কঠিন দ্রব্যের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এত প্রবল যে, ওদের পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ বেড়ান সম্ভবপর বলে মেনে নেওয়া যায়না। বড় জোর অনুমান করা যায় যে, যার যার অবস্থান-বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে ওরা অতি ক্ষুদ্র পরিসরের কম্পন-গতি বা ঘূর্ণন-গতি সম্পন্ন করতে পারে। অন্যথায় কঠিন দ্রব্যগুলি ওদের আকৃতির বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখতে পারতো না। তরল পদার্থের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ নগণ্য না হলেও অপেক্ষাকৃত অনেক কম। সুতরাং ওদের সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে, ওরা ধাবন এবং কম্পন এই উভয়জাতীয় গতিই

সম্পন্ন করতে সক্ষম কিন্তু তা' করতে পারে ওরা পরস্পরের প্রতি অল্পাধিক মাত্রার আকর্ষণ-বলের অধীন হয়ে। সুতরাং গ্যাসের অণুদের মত তরল দ্রব্যের অণুগুলির পক্ষে স্বাধীন পথের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

এ সকলই অনুমান মাত্র। সত্যই অণুগুলি চঞ্চল কিনা কিম্বা উক্ত অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গতি সম্পন্ন করছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করবার আমাদের উপায় নেই; কারণ অণুগুলির মত, ওদের গতিবিধিও, সম্পূর্ণই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কিন্তু অণুদের গতি সম্পর্কে উক্তপ্রকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে বৈজ্ঞানিকগণ তরল ও বায়বীয় পদার্থসমূহের বিভিন্ন ধর্মের সহজ ও সঙ্গত ব্যাখ্যাদানে সমর্থ হয়েছেন। ফলে ওদের উক্ত ধরনের গতিবিধি স্বীকৃত হয়েছে। এই মতবাদকে অণুর চঞ্চলতাবাদ (kinetic theory of matter) আখ্যা দেওয়া হয়।

অণুর চঞ্চলতার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়—পদার্থের ব্যাপন-ক্রিয়া (Diffusion) থেকে। অনিল পদার্থের ব্যাপন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বার্থোলের একটা পরীক্ষা এইরূপ। দু'টা ফাঁপা কাচের গোলক—একটা রয়েছে ওপরে, একটা নীচে। ওপরের গোলকে রয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং নীচেরটায় রয়েছে অপেক্ষাকৃত ভারী (প্রায় ২২ গুণ ভারী) কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস। একটা খুব সরুছিদ্র-বিশিষ্ট কাচের নল উভয় গোলকের সংযোগ সাধন কর্চ্ছে। এখন এই নলটার ছিপি খুলে দিলে একটু পরেই দেখা যায় যে, ঐ গ্যাসদ্বয় প্রত্যেক গোলকের ভেতরেই ওতপ্রোত হয়ে মিশে রয়েছে। হালকা হাইড্রোজেন গ্যাস নীচের গোলকে এবং ভারী কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ওপরের গোলকে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়েছে। দুটো বিভিন্ন গ্যাসের এই ধরনের মিশ্রণকে বলা যায় ব্যাপন। অণুর (অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়কণার) অস্তিত্ব এবং ওদের চঞ্চলতা মেনে নিলে সহজেই এ ব্যাপনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। অণুগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং উভয় গ্যাসের অণুই যথেষ্ট বেগ নিয়ে অন্ধভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি কর্চ্ছে; ফলে, সংযোগী-নলের ছিদ্রপথ অত্যন্ত সরু হলেও, ওর ভেতর দিয়ে ঐ সকল অণুর, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশ্রণ ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, গ্যাসের অণুগুলি যে বেগে ছুটাছুটি করে তা নিতান্ত কম নয়। গ্রাহামের পরীক্ষা থেকে প্রতিপন্ন হলো যে, ভারী অণুর ব্যাপন-বেগ হালকা অণুর বেগের তুলনায় কম হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে গ্রাহাম যে নিয়ম আবিষ্কার করলেন, তা এইরূপে প্রকাশ করা যায়:—দু'টা গ্যাসের মধ্যে একটার ঘনত্ব অপরটার যত গুণ তার অণুগুলির ব্যাপনবেগের বর্গ অপর গ্যাসের অণুদের ব্যাপনবেগের বর্গের তুলনায় সেই অনুপাতে কম হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অক্সিজেন গ্যাসের ঘনত্ব হাইড্রোজেন গ্যাসের ১৬ গুণ, সুতরাং ওদের মিশ্রণ ব্যাপারে, অক্সিজেন-অণুর ব্যাপনবেগ হাইড্রোজেন-অণুর ব্যাপন-বেগের ৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র হবে। পরীক্ষা থেকেও তাই দেখা যায়।

গ্যাসের মত তরল পদার্থেও ব্যাপন-ক্রিয়ার অস্তিত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত গোলক দু'টার নীচেরটা তুঁতের জল এবং ওপরেরটা সাধারণ জল দিয়ে ভর্ত্তি করে সংযোগী-নলটা খুলে দিলে খানিকবাদে দেখা যাবে যে, ওপরের গোলকের বর্ণহীন জলটা ক্রমে নীল রঙ ধারণ কর্চ্ছে এবং নীচের গোলকের নীলরঙা তুঁতের জল ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, গ্যাসের অণুর মত তরল পদার্থের অণুসমূহও চঞ্চল। জলের অণুগুলি এবং দ্রবীভূত অবস্থায় তুঁতের অণুগুলি ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ায় এবং ফলে দু'দল অণুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রণ ঘটে। কিন্তু দেখা যায়, পূর্ণমিশ্রণ ঘটতে গ্যাসের তুলনায় তরল-পদার্থের সময় লাগে খুব বেশী। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়—গ্যাসের অণুর তুলনায় তরল দ্রব্যের অণুর ধাবন-বেগ অনেক কম।

কঠিন পদার্থেও ব্যাপন-ক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য না করা যায় এমন নয়। একটা ধাতব পদার্থের ওপর অপর একটা ধাতব পদার্থ রেখে দিলে কয়েক বৎসর পরে দেখা যায় যে, নীচের পদার্থ-টার ওপরের স্তরে এবং ওপরের পদার্থ-টার নীচের স্তরে উভয় ধাতুর মিশ্রণ ঘটেছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কঠিন পদার্থের অণুগুলিও ধাবন-গতি সম্পন্ন করে থাকে, কিন্তু ওদের গতিবেগ অনিল ও তরল দ্রব্যের অণুদের তুলনায় অনেক কম।

চঞ্চলতাবাদকে ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকগণ জড়দ্রব্যের অন্যান্য ধর্ম্মেরও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা প্রথমে তরল দ্রব্যের কথা তুলবো। জলের কথাই ধরা যাক্। জলের অণুগুলি ছুটাছুটি কর্চ্ছে। হয় ত সঙ্গে সঙ্গে কম্পন ও ঘূর্ণন-গতিও সম্পন্ন কর্চ্ছে। ওদের ধাবন-বেগ সবার পক্ষে সমান নয়—কেউ ছুটছে খুব দ্রুতবেগে, কেউ খুব ধীরে। কিন্তু কারুর গতিই স্বাধীন গতি নয়, কারণ ওদের পরস্পরের ভেতর অল্প-বিস্তর আকর্ষণ বিদ্যমান। গভীর জলের কোন একটা অণুর ওপর এই আকর্ষণ-বলের মাত্রা সব দিকেই সমান, কারণ ঐ অণুটাকে তখন আশে-পাশের অণুগুলি সব দিক থেকেই সমভাবে ঘিরে থাকে। কিন্তু অণুটা যখন জলের পিঠের খুব কাছে এসে পড়ে, তখন ওর আকর্ষণ-সীমানার ক্ষুদ্র গোলাকটার ভেতর একটা অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। ওর গোলাকার আকর্ষণ-এলাকার ওপরের অংশে তখন পড়শী অণুদের অভাব ঘটে; সুতরাং ওপরের দিক থেকে আকর্ষণ-বলেরও অভাব ঘটে। ফলে মোট আকর্ষণটা দাঁড়ায় তখন নীচের দিকে (বা ভেতরের দিকে)। মন্দ বেগের অণুগুলির পক্ষে এই আকর্ষণের প্রভাব এড়িয়ে জলের পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। বাইরের দিকে ছুটে চললেও এই সকল অণু পিঠের কাছে এসেই ভেতরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু খুব বেশী বেগের অণুগুলিকে উক্ত আকর্ষণ-বল আটকে রাখতে সমর্থ হয় না। এই সকল অণু জলের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বাইরের মুক্ত বাতাসে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে থাকে। এই ব্যাপারকে বলা যায়—তরল দ্রব্যের বাষ্পীভবন (evaporation)। লাপলাসের থিওরি অনুসারে হিসাব করলে দেখা যায় যে, একটা জলের অণুকে জলের ভেতর থেকে বাষ্পাকারে

বেরিয়ে আসতে হলে ওর বেগ অন্ততঃ সেকেণ্ডে দু'মাইল হওয়ার প্রয়োজন।

অপেক্ষাকৃত বেগবান্ অণুগুলি জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ফলে ভেতরকার অণুগুলির গড়বেগ ও গড় গতি-শক্তির মাত্রা কমে যায়। আবার বাষ্পীভবনের সঙ্গে সঙ্গে জলের উষ্ণতাও কিছুটা কমে যেতে দেখা যায়। এর থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এসে পড়ে এই যে, পদার্থের উষ্ণতা নির্ভর করে ওর অণুগুলির গড় গতি-শক্তির ওপর। জলের তুলনায় ইথর বাষ্পে পরিণত হয় তাড়াতাড়ি,সুতরাং ঠাণ্ডাও হয় তাড়াতাড়ি। এক হাতে খানিকটা জল এবং অপর হাতে খানিকটা ইথর ঢেলে দিলে দু'হাতেই ঠাণ্ডার অনুভূতি হয় কিন্তু ইথর-মাখানো হাতে অধিকতর ঠাণ্ডা অনুভূত হয়ে থাকে। ইথরের দ্রুততর বাষ্পীভবনের জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। জলে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে জলের উষ্ণতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর অণুগুলির গড়-বেগ বাড়তে থাকে, বাষ্পীভবন দ্রুততর হয় এবং শেষকালে জলটা ফুটতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখন তাপের প্রভাবে উষ্ণতার বৃদ্ধি এবং বাষ্পীভবনের ফলে উষ্ণতার হ্রাস সমান হারে ঘটতে থাকে। যে উষ্ণতায় তরল দ্রব্য-বিশেষ ফুটতে সুরু করে, তাকে ওর স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) বলা যায়। বিভিন্ন তরল দ্রব্যের স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন এবং বায়ুর চাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে স্ফুটনাঙ্কেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ষ্টাণ্ডার্ড বায়ুর চাপে জল যে উষ্ণতায় ফুটতে থাকে তাকে সেন্টিগ্রেড স্কেলে ১০০ ডিগ্রী এবং ফারেনহিট স্কেলে ২১২ ডিগ্রী বলা হয়। যে উষ্ণতায় কঠিন দ্রব্য দ্রবীভূত হয়—সে উষ্ণতাও পদার্থবিশেষের পক্ষে এবং একটা বিশিষ্ট চাপের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মাত্রার হয়ে থাকে। এই উষ্ণতাকে পদার্থটার দ্রবণাঙ্ক (Meeting point) বলা যায়। ষ্টাণ্ডার্ড বায়ুর চাপের অধীন হয়ে বরফ যে উষ্ণতায় গলতে থাকে, তাকে সেন্টিগ্রেড স্কেলে শূন্য ডিগ্রী এবং ফারেনহিট স্কেলে ৩২ ডিগ্রী বলা হয়।

এই সকল পরিবর্ত্তন (কঠিন পদার্থের গলন, তরল দ্রব্যের বাষ্পীভবন প্রভৃতি) ভৌতিক পরিবর্ত্তনের উদাহরণ। এতে ক'রে কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না। কঠিন, তরল ও অনিল এই ত্রিবিধ অবস্থা জড়দ্রব্যের বিভিন্ন ভৌতিক অবস্থা (Physical State) নির্দ্দেশ করে। দেখা যায়, প্রত্যেক পদার্থের ভৌতিক অবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে ওর চাপ, আয়তন এবং উষ্ণতার মাত্রা দ্বারা। বাইরের থেকে চাপ এবং তাপ প্রয়োগ করে' আমরা এই রাশিত্রয়ের মূল্য ইচ্ছামত বাড়াতে কমাতে পারি। কিন্তু দেখা যায় যে, এই রাশি তিনটার দু'টার মূল্য যদি ঠিক রাখা যায়, তবে তৃতীয়টার মূল্য তার দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে। চাপ এবং আয়তন ঠিক রেখে পদার্থের উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো যায় না; সেইরূপ চাপ ও উষ্ণতা ঠিক রেখে আয়তনের কিম্বা আয়তন ও উষ্ণতা ঠিক রেখে ওর চাপের ইতর-বিশেষ ঘটানো যায় না। এজন্য ভৌতিক পরিবর্ত্তনের পক্ষে এই রাশি তিনটা পদার্থের বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপে গণ্য হয়ে থাকে। আরো দেখা যায় যে, যদি এই রাশিত্রয়ের একটা মাত্র ঠিক রেখে বাকি দু'টার একটার পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও আপনা থেকে এবং একটা বিশিষ্ট নিয়ম মেনে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের সম্বন্ধবিশিষ্ট রাশিদ্বয়কে বলা যায় পরস্পরের অপেক্ষক (Function)। এই সকল নিয়ম আবিষ্কারের জন্য আমাদের পরীক্ষা ও পরিমাপের সাহায্যগ্রহণের আবশ্যক হয়। পরীক্ষার ফল এই যে, কঠিন ও তরল দ্রব্যের পক্ষে এই নিয়মগুলি সাধারণতঃ জটিল হয়ে থাকে এবং পদার্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু গ্যাসের বেলায় দেখা যায় যে, এই নিয়মগুলি বেশ সরল আকার এবং সকল গ্যাসের পক্ষে একই আকার ধারণ ক'রে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলতে পারা যায় যে, চাপ ঠিক রেখে উষ্ণতা বাড়ালে যদিও সকল পদার্থের আয়তনই বেড়ে যায়, তবু সকল কঠিন পদার্থের কিম্বা সকল তরল পদার্থের আয়তন সমান হারে বাড়ে না কিন্তু সব গ্যাসেরই বাড়ে সমান হারে এবং একই সরল নিয়ম মেনে। গ্যাসের পক্ষে উষ্ণতার সঙ্গে আয়তনের সম্বন্ধ-নির্দ্দেশক নিয়মটাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যায়:

চাপ ঠিক থাকতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করে' যদি কোন গ্যাসের উষ্ণতা বাড়ানো যায়, তবে ওর আয়তনও একই অনুপাতে বেড়ে যায়; অর্থাৎ উষ্ণতা* দ্বিগুণ করলে আয়তনটা হয় আগেকার আয়তনের দ্বিগুণ, তিনগুণ করলে তিনগুণ, এইরূপ। এই নিয়ম আবিষ্কৃত হয় চার্ল্‌সের পরীক্ষা থেকে, সুতরাং একে চার্ল্‌সের নিয়ম বলা যায়।

আবার উষ্ণতা ঠিক রেখে চাপ বাড়াতে থাকলে সকল গ্যাসের আয়তনই কমে যায় এবং সবারই কমে একই নিয়ম মেনে। নিয়মটা এই:

উষ্ণতা ঠিক থাকতে পারে এরূপ ব্যবস্থা ক'রে যদি কোন গ্যাসের ওপর চাপের মাত্রা বাড়ানো যায় তবে ওর আয়তন ঐ অনুপাতে কমে যায়; অর্থাৎ দ্বিগুণ চাপের পক্ষে আয়তনটা হয় আগেকার আয়তনের অর্দ্ধেক, তিনগুণ চাপের পক্ষে তিন ভাগের এক ভাগ, এইরূপ। এই নিয়ম আবিষ্কৃত হয় রবার্ট বয়েলের পরীক্ষা থেকে, সুতরাং একে বয়েলের নিয়ম বলা যায়।

এই নিয়ম দু'টাকে একত্র করলে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, যদি কোন গ্যাসের উষ্ণতা ও চাপ একসঙ্গে বদ্‌লাতে থাকে তবে ওর আয়তনটা বদ্‌লাবে উষ্ণতার সমানুপাতে এবং চাপের বিপরীত অনুপাতে, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন গ্যাসের চাপ এবং আয়তনের পূরণ-ফলকে ওর উষ্ণতা দিয়ে ভাগ করলে সর্ব্বদাই একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি পাওয়া যাবে। এই নিয়মটাকে বলা যায় গ্যাস-নিয়ম (Gas-Law) এবং এই নির্দ্দিষ্ট রাশিটাকে বলা যায় গ্যাস-ধ্রুবক (Gas Constant).

গ্যাসের ধর্ম্মসম্বন্ধে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে অ্যাভোগেড্রোর নিয়ম। এই নিয়মকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যায়:

যদি বিভিন্ন গ্যাসের চাপের মাত্রা ও উষ্ণতার মাত্রা সকল গ্যাসের পক্ষেই সমান হয়, তবে ওদের সমান সমান আয়তনের

* এখানে উষ্ণতা বলতে গ্যাস-স্কেলের উষ্ণতা বোঝায়।

ভেতর অণুর সংখ্যাও (অর্থাৎ ভৌতিক কারবারে ক্ষুদ্রতম কারবারী রূপে উপস্থিত হয়ে থাকে এইরূপ কণার সংখ্যা) সমান সমান হবে।

এই নিয়মগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সরল। জিজ্ঞাস্য হয়, গ্যাসের পক্ষে এই সকল সরল নিয়ম কেন, সকল গ্যাসের পক্ষে একই নিয়ম কেন এবং কঠিন ও তরল পদার্থের পক্ষে এ সকল নিয়ম খাটে না কেন? এর সঙ্গত উত্তর পাই আমরা অণুদের চঞ্চলতা এবং আণবিক আকর্ষণের পূর্বোক্ত বিশেষত্বগুলির পর্যালোচনা করলে। তরল পদার্থের সঙ্গে গ্যাসের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তরল দ্রব্যের অণুগুলি চঞ্চল হলেও ওদের গতি স্বাধীন গতি নয়। এই সকল অণু পরস্পরের আকর্ষণ-বলের অধীন এবং বিভিন্ন তরল পদার্থের পক্ষে আকর্ষণের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এরই জন্য তরল দ্রব্যের অণুগুলির গতিবিধিতে জটিলতা এসে পড়েছে এবং এই জটিলতা বিভিন্ন তরল পদার্থের পক্ষে বিভিন্ন মাত্রা ধারণ করেছে। সুতরাং উষ্ণতা বাড়ালে সকল তরল দ্রব্যের আয়তন সমান হারে বাড়বে কিম্বা চাপ বাড়ালে একই নিয়মে কমবে এ আমরা আশা করতে পারিনে। অন্যপক্ষে, তরল দ্রব্য গ্যাসের অবস্থা প্রাপ্ত হলে ওর আয়তন এবং অণুগুলির পারস্পরিক ব্যবধান এত বেড়ে যায় যে, ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তখন, বলতে গেলে, লোপ পায়। ওরা তখন স্বাধীন ভাবে স্বাধীন পথে এবং সকল গ্যাসের সকল অণুই সমান স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছ দিকে বিচরণ করতে থাকে। এই অবস্থায়, চাপ বা উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সকল গ্যাসের আয়তনই যে একই নিয়ম মেনে এবং সরল নিয়ম মেনে কমতে বাড়তে থাকবে, তাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নেই।

তবু প্রশ্ন উঠবে—এই সকল সম্বন্ধ অন্য কোন আকার গ্রহণ না করে' বিশেষভাবে চার্ল্‌স ও বয়েলের এবং গ্রাহাম ও অ্যাভোগেড্রোর নিয়মের আকার ধারণ করলো কেন? এর উত্তর দানের জন্য চঞ্চলতাবাদকে ভিত্তি করে' গ্যাসের চাপ সম্পর্কে একটা সূত্রগঠনের আবশ্যক হয়, এবং তার জন্য গোড়াতেই দু'টা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়,—যার একটা হচ্ছে গ্যাসের চাপপ্রয়োগের প্রণালী সম্বন্ধে এবং অপরটা হচ্ছে ওর উষ্ণতা সম্পর্কে। চাপ সম্বন্ধে অনুমান এই যে,গ্যাসের চাপ ওর ধাবমান অণুগুলির ধাক্কার ফল। একটা গ্যাস-পূর্ণ পাত্রের দেয়ালের ওপর প্রতি সেকেণ্ডে বহুসংখ্যক অণুএবং প্রত্যেক অণু বহুবার ধাক্কা দিচ্ছে। ফলে দেয়ালের প্রতি বর্গ ইঞ্চি বা প্রতি বর্গ ফুট স্থান প্রতি সেকেণ্ডে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার ধাক্কা খাচ্ছে। এই ধাক্কাটাই গ্যাসের চাপের মাত্রা নির্দেশ করে। গ্যাসের তাপ এবং উষ্ণতা সম্বন্ধে অনুমান এই যে, চঞ্চল অণুগুলির মোট গতিশক্তি গ্যাসটার মোট তাপের মাত্রা এবং প্রত্যেক অণু গড়ে যতটা গতিশক্তির আধার হয়ে থাকে তা ওর উষ্ণতার মাত্রা নির্দেশ করে থাকে। সহজেই দেখা যায় যে, এই অনুমান দুটা অণুর চঞ্চলতাবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে খাপ খায়।

এই অনুমান-দ্বয়কে আশ্রয় ক'রে গ্যাসের চাপ সম্পর্কে একটা সূত্র গঠন এবং গ্যাস-নিয়মসমূহের ব্যখ্যা দান খুব কঠিন নয়। সম্পূর্ণ নির্ভুল সূত্র পেতে হলে যে সকল হিসাবের প্রয়োজন—তা অত্যন্ত জটিল কিন্তু একটা কাজ-চলা-গোছের সূত্র নিম্নোক্ত বিচারপ্রণালী থেকে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। আমরা কল্পনা করছি যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা পরস্পরের সমান (এবং প্রত্যেকটাই এক ফুট পরিমিত) এইরূপ একটা কুঠরির ভেতর একটা গ্যাসকে আটকে রাখা হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কোটি নিয়ে গঠিত হয়েছে গ্যাসটার অবয়ব। অণুগুলি অত্যন্ত বেগবান এবং ওদের বেগ ভিন্ন ভিন্ন। কানামাছির মত অন্ধভাবে ওরা কুঠরির ভেতর সবদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ফলে ওদের পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি হচ্ছে এবং কুঠরির দেয়ালে ওরা ক্রমাগত ঘা দিচ্ছে। প্রতি কলিশনে প্রত্যেক অণুর বেগের দিক্‌ ও পরিমাণ বদলে যাচ্ছে। তবু আমরা অণুগুলির একটা গড় বেগ কল্পনা করতে পারি, এবং অণুগুলির সংখ্যা ও প্রত্যেক অণুর বেগ জানা থাকলে তার পরিমাণও নির্দেশ করতে পারি।পৃথিবীর দু'শো কোটি মানুষের বয়স দুশো রকমের হলেও ওদের সবার বয়স যোগ করে এবং যোগফলকে দুশো কোটি দিয়ে ভাগ করে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির গড় বয়স নিরূপণ করতে পারি এবং কোন কোন হিসাবের অনুরোধে—যেমন গোটা মানবজাতির রেশনের মাত্রা নিরূপণের উদ্দেশ্যে—প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঐ গড় বয়সের সমবয়সী বলে কল্পনা করতে পারি। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রণালীতে প্রত্যেক অণুর গড় বেগ নির্দ্দিষ্ট করে এবং সবাই ওরা একই বেগে (গড়বেগে) ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে এরূপ অনুমান করে গ্যাসের চাপের মাত্রা নিরূপণে অগ্রসর হতে পারি। এই গড়বেগটার পরিমাণ যাই হোক না কেন আমরা ওকে 'গ'অক্ষর দ্বারা এবং প্রত্যেক অণুর বস্তুমানকে 'ব', দ্বারা নির্দেশ করবো। অণুগুলির বস্তু সবার পক্ষেই সমান বলে অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রতি ঘন ফুট স্থানের ভেতর (বা উক্তি কুঠরির ভেতর) যতগুলি অণু হয়েছে ঐ সংখ্যাকে আমরা 'ন' বলবো এবং গ্যাসের চাপকে 'চা' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করবো।

এই চাপের মাত্রা নিরূপণের জন্য কুঠরির প্রত্যেক দেয়াল (বা প্রতি বর্গফুট স্থান) প্রতি সেকেণ্ডে কতটা ধাক্কা খাচ্ছে তা'আমাদের হিসাব করতে হবে; কারণ আমাদের প্রথম অনুমান এই যে, এই ধাক্কাটাই গ্যাসের চাপ নির্দ্দেশ করে। এখন সহজেই বোঝা যায় যে প্রত্যেক অণুর বস্তুমান (ব) এবং গড়বেগ (গ) যত বেশী হবে, অর্থাৎ এই উভয় রাশির পূরণ ফল বা (ব × গ) যত বড় হবে, প্রত্যেক দেয়ালের ওপর অণু-বিশেষের ধাক্কার মাত্রাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করে। সুতরাং (ব × গ) রাশিটাকে প্রতিটি অণুর প্রত্যেক ধাক্কার ফল ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে। এও সহজেই বোঝা যায় যে, অণুটার গড়বেগ (গ) যত বেশী হবে প্রত্যেক দেয়ালের ওপর প্রতি সেকেণ্ডে ওর ধাক্কার সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। ফলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রত্যেক অণু কুঠরির একটা দেয়ালের ওপর যতটা ধাক্কা দেয় তার মাত্রা নির্দিষ্ট হবে (ব × গ) এবং 'গ' এই রাশিদ্বয়ের পূরণ-ফল দ্বারা বা (ব × গ২) দ্বারা। সবগুলি অণুর ধাক্কার ফল নির্দেশ করতে হ'লে এই রাশিটাকে কুঠরির অন্তর্গত (বা প্রতি ঘন ফুটের অন্তর্গত) অণুর সংখ্যা বা 'ন' দ্বারা পূরণ করতে হবে। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে প্রত্যেক দেয়ালের ওপর

মোট ধাক্কাটা বা গ্যাসটার চাপের মাত্রা (ব×গ২). ন এই রাশিটার সমানুপাতিক হবে। সুতরাং আমরা লিখতে পারি:

চা ∞ (ব×গ২). ন···(১)

এই হলো প্রত্যেক গ্যাসের চাপের মাত্রা-নির্দ্দেশক সূত্র। এই সূত্র এই তথ্য প্রকাশ করে যে, গ্যাসের চাপ ওর অণুগুলির বস্তুমান, ওদের গড়-বেগের বর্গ এবং অণুগুলির সংখ্যার (প্রতি ঘন ফুটের অন্তর্গত অণুর সংখ্যার) সমানুপাতিক হয়ে থাকে। সুতরাং যে গ্যাসের অণুদের বস্তুমান বেশী কিম্বা যে গ্যাসের ভেতর ওরা দলে ভারী, আর সব ঠিক থাকলে, ঐ গ্যাসের চাপও ঐ অনুপাতে বেশী হবে।

আমাদের দ্বিতীয় অনুমান এই যে গ্যাসের উষ্ণতা নির্দ্ধারিত হয় ওর প্রত্যেক অণুর গড়-গতিশক্তি দ্বারা। এখন নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান অনুসারে গতিশীল জড়দ্রব্যমাত্রেরই গতিশক্তি পরিমিত হয়ে থাকে ওর বস্তু এবং ওর বেগের বর্গের পূরণফল দ্বারা। সুতরাং ১নং সূত্রের অন্তর্গত (ব×গ২) রাশিটা গ্যাসের উষ্ণতার মাত্রা নির্দ্দেশ করে। গ্যাসের উষ্ণতাকে আমরা 'উ' বলবো। ফলে ১নং সূত্রটাকে নিম্নোক্ত আকারেও লিখতে পারা যায়:

চা ∞ উ. ন···(২)

এই সূত্র থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি আপনি এসে পড়ে:—

ক) যদি কোন গ্যাসের চাপ ঠিক রেখে ওর উষ্ণতা (উ) বাড়ানো যায় তবে প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত ওর অণুর সংখ্যা (ন) ঐ অনুপাতে কম যাবে, সুতরাং গ্যাসটার আয়তন ঐ অনুপাতে বেড়ে যাবে। এই হলো চার্লসের নিয়ম।

(খ) যদি কোন গ্যাসের উষ্ণতা (উ) ঠিক রেখে ওর চাপের মাত্রা বাড়ানো যায়, তবে প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত ওর অণুর সংখ্যা (ন) ঐ অনুপাতে বেড়ে যাবে, সুতরাং গ্যাসটার আয়তন ঐ অনুপাতে কমে যাবে। এই হলো বয়েলের নিয়ম।

(গ) যদি বিভিন্ন গ্যাসের চাপের মাত্রা (চা) এবং উষ্ণতার মাত্রা (উ) সমান সমান হয়, তবে প্রতি ঘন ফুটের ভেতর ওদের অণুদের সংখ্যাও সমান সমান হবে। এই হলো অ্যাভোগেড্রোর নিয়ম।

বায়ুর চাপের একটা বিশিষ্ট মাত্রাকে—যে চাপে ব্যারোমিটারের পারদের স্তম্ভ ৩০ ইঞ্চি পরিমিত উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, সেই চাপকে—ষ্ট্যাণ্ডার্ড চাপ বলা যায়; এবং এই চাপের অধীন হয়ে বরফ যে উষ্ণতায় গলতে শুরু করে তাকে (অর্থাৎ সেণ্টিগ্রেড স্কেলের শূন্য ডিগ্রীকে) বলা যায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড উষ্ণতা। এই উভয় রাশির মূল্যই জানা আছে, সুতরাং ষ্ট্যাণ্ডার্ড চাপ ও উষ্ণতার পক্ষে প্রত্যেক গ্যাসের প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত অণুর সংখ্যাও ২নং সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যেতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাশিটাকে বলা যায় অ্যাভোগেড্রো-সংখ্যা।

১নং সূত্রকে আরো একটা নূতন আকার দেওয়া যেতে পারে। ঐ সমীকরণের অন্তর্গত 'ব' রাশিটা প্রত্যেক অণুর বস্তুমান এবং 'ন' রাশিটা প্রতি ঘনফুটের ভেতর ওদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করে; সুতরাং 'ব' এবং 'ন' এর পূরণ ফলটা ঐ গ্যাসের প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত বস্তুর মাত্রা বা গ্যাসটার ঘনত্ব নির্দ্দেশ করে। সুতরাং গ্যাসের ঘনত্বকে 'ঘ' অক্ষরদ্বারা চিহ্নিত করলে ১নং সূত্রকে নিম্নোক্ত আকার দেওয়া যেতে পারে:

চা ∞ ঘ×গ২···(৩)

(ঘ) ৩নং সূত্র থেকে দেখা যায় যে; যদি দু'টো বিভিন্ন গ্যাসের চাপের মাত্রা সমান হয় তবে যেটার ঘনত্ব বেশী হবে তার অণুগুলির গড়-বেগের বর্গ অপরটার তুলনায় সেই অনুপাতে কম হবে। এই হলো ব্যাপন-ক্রিয়া সম্পর্কে গ্রাহামের নিয়ম। এর কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি।

গ্যাসের চাপ সম্পর্কে উক্ত সূত্র তিনটা আমরা পেয়েছি গ্যাসীয় অণুর চালচলন সম্পর্কে স্থূল হিসাব থেকে। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হিসাবের ফল এই যে, গ্যাসের চাপের প্রকৃত মূল্য ৩নং সূত্রের ডান দিক্‌কার রাশির ৩ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে, অর্থাৎ

চা = ⅓ ঘ×গ২···(৪)

এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, কোন গ্যাসের ঘনত্ব (ঘ) এবং চাপের মাত্রা (চা) জানা থাকলে তার থেকে, এই সমীকরণের সাহায্যে, ওর অণুগুলির গড়-বেগ বা 'গ' হিসাব ক'রে সহজেই বের করা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড চাপ ও উষ্ণতার পক্ষে বিভিন্ন গ্যাসের ঘনত্ব নিরূপণ করেছেন। সুতরাং ৪নং সমীকরণে ঐ চাপ ও ঘনত্বের মূল্য বসিয়ে দিয়ে প্রত্যেক গ্যাসের অণুগুলির গড়-বেগ নিরূপণ করা যায়। হিসাব করলে দেখা যায় যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড চাপ ও উষ্ণতার পক্ষে হাইড্রোজেন-অণুগুলির গড়-বেগ সেকেণ্ডে প্রায় এক মাইল বা ঘণ্টায় সাড়ে তিন হাজার মাইলের ওপর, অর্থাৎ একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগের প্রায় ৬০ গুণ। অন্য কোন গ্যাসের অণুর বেগনিরূপণের জন্য হাইড্রোজেনের তুলনায় ওর ঘনত্ব কতগুণ—শুধু তাই জানলেই হলো। অক্সিজেনের ঘনত্ব হাইড্রোজেনের ১৬ গুণ, সুতরাং উক্ত সমীকরণ অনুসারে অক্সিজেন-অণুর বেগ হবে হাইড্রোজেন-অণুর বেগের ৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র বা সেকেণ্ডে প্রায় সিকি মাইল। বাতাসের অণুগুলিও প্রায় উক্ত মাত্রার গড়বেগ নিয়ে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে এবং চারদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাদের দেহের ওপর চাপ প্রয়োগ কচ্ছে।

আমরা দেখলাম, ভৌতিক কারবারের পক্ষে ক্ষুদ্রতম জড়কণা রূপে অণুর অস্তিত্ব এবং ওদের চঞ্চলতা মেনে নিলে সবগুলি গ্যাস নিয়মেরই সহজ ও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং কঠিন ও তরল দ্রব্যের তুলনায় গ্যাসের নিয়মগুলি এত সরল কেন এবং এই নিয়মগুলি সকল গ্যাসের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য কেন তারও একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়। তবু এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমাগাট, রেঁণো প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষার ফল এই যে, চাপ খুব বাড়াতে থাকলে কিম্বা উষ্ণতা খুব কমাতে থাকলে বয়েল ও চার্লসের নিয়মে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এসে পড়ে। এইরূপ যে ঘটবে, তাও চঞ্চলতাবাদ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি এবং ঐ সকল ক্ষেত্রে গ্যাসের নিয়মগুলি কি আকার ধারণ করবে তারও একটা আভাস পেতে পারি। চাপ বাড়াতে থাকলে কিম্বা উষ্ণতা কমাতে থাকলে গ্যাসের আয়তন

কমতে থাকে এবং গ্যাসটা ক্রমে তরলত্বের অভিমুখে অগ্রসর হয়; সঙ্গে সঙ্গে ওর অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে এবং ওদের স্বাধীন গতি ক্রমেই লোপ পায়। অণুগুলি তখনো ছুটাছুটি করতে থাকে কিন্তু পারস্পরিক আকর্ষণের জন্য ওদের বেগের মাত্রা অনেকটা কমে যায়। ফলে আধার পাত্রের ওপর ওদের ধাক্কার মাত্রাও (বা গ্যাসটার চাপের মাত্রা) আগেকার তুলনায় কম হয়। ভ্যানডার ওয়াল্‌স্‌ এই সকল ব্যাপারের হিসাব নিকাশ করে গ্যাস-নিয়মকে একটা সংশোধিত আকার দান করেছেন। চার্লস্‌ ও বয়েলের নিয়মকে একত্র ক'রে যে গ্যাস-নিয়মটা পাওয়া যায় তার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি:—গ্যাসের আয়তন ও চাপের পূরণ ফলকে ওর উষ্ণতা দ্বারা ভাগ করলে একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি, যাকে বলা যায় গ্যাস-ধ্রুবক, পাওয়া যায়। গ্যাসের আয়তনকে 'আ', চাপকে 'চা', উষ্ণতাকে 'উ' এবং গ্যাস-ধ্রুবককে 'র' বললে গ্যাস নিয়মটাকে নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়:

$$\frac{\text{আ} \times \text{চা}}{\text{উ}} = \text{র} \quad \cdots\cdots (৫)$$

ভ্যান্‌ডার ওয়াল্‌স্‌ এই গ্যাস-নিয়মকে যে সংশোধিত আকার দান করেছেন তা গ্যাস মাত্রেরই সকল অবস্থার পক্ষে, এমন কি তরল অবস্থার পক্ষেও প্রযোজ্য ব'লে মেনে নিতে পারা যায়। তাঁর হিসাব প্রণালীর একটা প্রধান কথা এই যে, গ্যাসের আয়তন যত কম হয় আণবিক আকর্ষণ-জনিত ওর চাপের হ্রাসও ততই (আয়তনের বর্গের অনুপাতে) বাড়তে থাকে। সুতরাং গ্যাস-নিয়মকে পরিমাপের ফলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে হলে গ্যাসের চাপকে (৫নং সূত্রের অন্তর্গত 'চা' রাশিটাকে) ঐ পরিমাণে বাড়িয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয় প্রধান কথা এই যে, চঞ্চলতাবাদের সাহায্যে গ্যাস-নিয়ম (৫নং সমীকরণ) গঠন করতে গিয়ে চঞ্চল অণুগুলির নিজস্ব আয়তন হিসাবের মধ্যে আনা হয় নি এবং তা আনতে হলে গ্যাসের প্রকৃত আয়তনকে (অর্থাৎ ওর অণুগুলির বিচরণ-ভূমির মোট আয়তনকে) আধার পাত্রের আয়তন থেকে কিছুটা কম ব'লে মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ ৫নং সমীকরণের 'আ' রাশিটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে—অণুগুলির মোট আয়তনের একটা নির্দ্দিষ্ট গুণ—কমিয়ে নিতে হবে।

গ্যাসের অণুগুলির উক্ত প্রকার চঞ্চলতা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্বভাবতঃই অনেকের মনে উপস্থিত হতে পারে সে হচ্ছে ব্যষ্টির ও সমষ্টির নিয়ম সম্পর্কে। অণুর সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্ধভাবে প্রতিটি অণু ইতস্ততঃ ছুটাছুটি কচ্ছে। কখন্‌ কে কার ঘাড়ে পড়বে তার ঠিক নেই, সে দিকে কারো ভ্রূক্ষেপও নেই। প্রত্যেক অণু প্রতি সেকেণ্ডে পরস্পরের সঙ্গে এবং আধার পাত্রের গায়ে কত লক্ষবার ঘা খাচ্ছে! প্রত্যেক আঘাতে ওর বেগের দিক ও পরিমাণ কোন দিকে এবং কতটা করে বদলে যাচ্ছে তা আমরা জানিনে। এইরূপ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অণু। ওদের গতি অনুসরণ করতে পারে,—একটার গতিও অনুসরণ করতে পারে কার সাধ্য? সবাই স্বাধীন, কেউ কারো তোয়াক্কা রাখে না, যেন সম্পূর্ণ খেয়াল-খুশির রাজ্য—একেবারে পূর্ণ স্বরাজ এবং পূর্ণ অরাজকতা বিদ্যমান। কিন্তু এই ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি এবং পূর্ণমাত্রায় বিশৃঙ্খল চালচলনকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে চার্লস্‌, বয়েল ও অ্যাভোগেড্রোর নিয়মগুলি। ব্যষ্টির দিকে তাকালে নজরে পড়ে শুধু বিশৃঙ্খলা ও কতগুলি আকস্মিক ব্যাপার—ঠোকাঠুকি বা কলিশন। আবার এই আকস্মিক ব্যাপারগুলির ওপরেই গড়-কষা গণিতের হিসাব প্রয়োগ ক'রে যখন আমরা সমষ্টির ব্যবহার (বা গোটা গ্যাসের ধর্ম্ম) নিরূপণে অগ্রসর হই তখন ফুটে ওঠে কারণবাদের সরল ও সুশৃঙ্খল নিয়মসমূহ। তখন আমরা গ্যাসের চাপ ও উষ্ণতাকে ওর আয়তন পরিবর্ত্তনের কারণরূপে বর্ণনা করার সুযোগ পাই। অণুর চালচলনে পূর্ণ মাত্রায় আকস্মিকতা ও অরাজকতা বিরাজমান তাই আমরা গড়-কষা গণিত প্রয়োগে সক্ষম হই। আধুনিক বিজ্ঞানের একটা বিশিষ্ট মতবাদ এই যে, কারণবাদের নিয়মগুলি খাটে শুধু সমষ্টির পক্ষে, বা শুধু বড়দের পক্ষে; এবং ঐ নিয়মগুলি গড়ে উঠেছে ছোটদের পক্ষের আকস্মিকতার (বা সম্ভাবনাবাদের) নিয়মগুলিকে ভিত্তি ক'রে। প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা (Uniformity of Nature) এবং কারণবাদ (Principle of Causality) আমাদের দৃষ্টির ভুল মাত্র। সূক্ষ্ম দৃষ্টির পক্ষে এদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত এখনো বিচারাধীন।

কণিকা

শ্রী সমরেন্দ্র কর

জীবন তোমার ব্যর্থ হ'য়েছে,
দুঃখ কি তাতে প্রিয়,
জগতের শত কর্ম্মেতে তারে
নিঃশেষ ক'রে দিয়ো।

ফুল সে শুধু তো গন্ধেরই লাগি'
ফোটে না আপন শাখে,
দেবতার পায়ে অঞ্জলি হবে,
এ আশাও সে যে রাখে।

(চিত্র-রূপিকা)

কথক। ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তির বলে সংসারে আবদ্ধ থেকেও মানুষ মহাশক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হয়। সকল তপস্যারই মূলে—সরল বিশ্বাস, একাগ্রতা ও আত্ম-নিবেদন। নিয়মিত তপস্যার ফলে চিন্ময়ী মা আমার অভয়-বর-পাণি তুলে সন্তানকে দেখা দেন—তাঁর মঙ্গল-কর প্রসারিত করেন। তখন মানব-জীবনে ক্ষুদ্র কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি, ভূমানন্দে জননীর কৃপা-প্রসাদ-লব্ধ জীব আত্মহারা হ'য়ে যায়। এই ভাব-বস্তুটি এই নাট্য-কথার মর্ম্ম।—

অনেকদিনের কথা। গ্রাম-বাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ শান্ত-শুদ্ধ মনে দেবীর পূজায় নিজেকে নিবেদন ক'রে দেন। সন্তোষ ছিল তাঁর চিত্ত-ভূষণ। তাই অল্প নিয়ে থেকেও কোনোদিন ব্রাহ্মণ বিপ্রদেবকে অতৃপ্তি ও মন-গড়া দুঃখের শাসন সইতে হয় নি।—বিশ্বজননীর 'পরে সরল বিশ্বাসই ছিল তাঁর অক্ষয়-কবচ।—তাঁর জীবনে দেবীর আশীর্ব্বাদ কেমন ক'রে ফলতে লাগলো—তারই ঘটনা-সংহার।—কাব্য-সংস্থান: একটি ক্ষুদ্র ঠাকুর-দালান।

সোনামণি। বিপ্রঠাকুর—বিপ্রঠাকুর!—

বিপ্রদেব। কেনগো সোনামণি—তোমাদের বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ করতে হবে, তাই বুঝি বলতে এসেছ? সে-জন্যে অতো তাড়া কেন? একবার যাকে দিয়ে হোক্ খবর পাঠিয়ে দিলেই তো হোতো। অমন গলদঘর্ম্ম হ'য়ে আসবার প্রয়োজন কি?

সোনামণি। না গো ঠাকুর—তা নয়। ভিন্‌গায়ের কারা তোমাদের বাড়ীর খোঁজ করচে—হাটতলায় শুনে এলুম। তাই তো ছুটে খবরটা দিতে আস্‌ছি।—

বিপ্রদেব। আমার কুঁড়ের খোঁজ করে, এমন লোক কে আসতে পারে? হ্যাঁ—সোনা, তাদের দেখে কিরকম মনে হোলো?—

সোনামণি। দেখে মনে হয়—খুব বড়লোক। সঙ্গে বরকন্দাজ, পাইক, লোকজন—

বিপ্রদেব। বলো কি! বড়লোক এই গরীবের ঠিকানা জেনে কি করবেন? ওঃ—বুঝেছি,—তা হ'লে আমার ভাগ্য। হয়তো আমার কোনো উপকারীর কাছে আমার নাম শুনে পূজো-চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করতে আসছেন তিনি। — দশভুজার দয়া।

সোনামণি। আমার মনে হয় ঠাকুর্দ্দা—তা' নয়। তোমার মেয়ে সর্ব্বমঙ্গলার নাম করতে যে শুনলুম। —

বিপ্রদেব। সর্ব্বমঙ্গলার রূপ-গুণের খ্যাতি কি তা' হ'লে গ্রামে গ্রামে রটে গেছে! — বোধ হয়—আমার মেয়েকে দেখতে ...না—না—তা' কি হয়! দেখচো সোনা—গরীব ব্রাহ্মণের আশা কত! [অপ্রত্যয়ের হাসি] তা' কি কখনো হয়? ভুল শুনেছ, আমার মেয়ের নামে কি আর কেউ থাকতে নেই? বড়লোক গরীবের কুটীরে আসবেন—সম্ভব নয়, সম্ভব নয়—! এমন দুর-দুরাশাকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না, নইলে আশা-ভঙ্গে দুঃখ পাবো। মন ছোট হ'য়ে পড়বে। অসম্ভব—অসম্ভব...মিথ্যে আশা।

সোনামণি। না গো ঠাকুর্দ্দা, না। অসম্ভব কেন শুনি? পয়সার দাম থাকতে পারে, কিন্তু এ-সংসারে রূপ-গুণের দাম কি খুব কম—মনে করো? সর্ব্বমঙ্গলা দিদির মত মেয়ে ক'টা আছে?—আমি একটুও ভুল শুনিনি।

বিপ্রদেব। দূর—বিশ্বাস হয় না। এ-যেন ছেঁড়া-কাঁথায় শুয়ে গরীবের লাখ টাকার স্বপন-দেখার মত।

সোনামণি। বেশ গো—দয়া ক'রে বিশ্বাস করতে হবে না। আমার কথা সত্যি যদি হয়, তা' এখুনি বুঝতে পারবে।

বিপ্রদেব। তা' যদি নিতান্তই সম্ভব হয়, তা' হ'লে এই সুসমাচার আনবার জন্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ তুমি পাবে।

[পাল্কী-বাহকদের শব্দ নেপথ্য থেকে শোনা গেল—ক্রমনিকটবর্ত্তী]

সোনামণি। ঐ শোনো—ঠাকুর্দ্দা—পাল্কী ক'রে এই দিকেই তা'রা আসচে—বোধ করি।

বিপ্রদেব। এসে পড়লো যে! যদি সত্যিই আসে আমার কুঁড়েতে, কেমন ক'রে ধনীর অভ্যর্থনা করবো? কোথায় বসতে দোবো? ঠাঁই নেই—ঠাঁই নেই, এ যে বিষম সমস্যায় আমি পড়লুম—সম্মানী অতিথি...তাঁর যথার্থ সমাদর করবার মত আমার সামর্থ্য কোথায়?

সোনামণি। ঠাকুর্দ্দা—তোমার এমন বিব্রত হবার কি আছে? তোমার যা' সাধ্য—ততটুকু করবে। তা'র বেশী করবার চেষ্টা করলেই তো নিন্দে হবে। —তোমার মুখের কথাতেই বড়লোক হ'লেও আপ্যায়িত হ'য়ে যাবে—ব'লে রাখলুম।

বিপ্রদেব। তাই বলো—সোনা—তাই বলো। —ওরে—ওরে এই দাওয়ায় দু'টো আসন বিছিয়ে দিয়ে যা'। —সম্মানী অতিথি অতিথি দেবতা। অতিথির মর্য্যাদা যেন রাখতে পারি—আমারও মর্য্যাদা যেন বজায় থাকে। করুণাময়ী মা আমার সমস্তই শুভ করবেন। —

[পাল্কী-বাহকদের হট্টগোল—সন্নিকটে এসে হঠাৎ থেমে গেল]

সোনামণি। ঐ গো—পাল্কী বুঝি থামলো। যাও—যাও এগিয়ে যাও—দেখো কে এলো?

একটি কণ্ঠ (নেপথ্য থেকে)। এ-বাড়ী কি বিপ্রদেব ঠাকুরের?—

বিপ্রদেব। হাঁ—তারই এই কুঁড়ে।

একটি কণ্ঠ (নেপথ্য থেকে)। জমিদার ম'শায় এসেচেন। আপনার সাক্ষাৎ চান্—তিনি। অনুগ্রহ ক'রে একবার বাইরে আসবেন?

বিপ্রদেব। অবশ্য অবশ্য—আমার সৌভাগ্য—আমার সৌভাগ্য। কোথায় তিনি?

[বিপ্রদেব কিঞ্চিৎ অগ্রসর হলেন—পরমুহূর্ত্তেই জমিদার ইন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ]

ইন্দ্রনারায়ণ। নমস্কার ঠাকুর বিপ্রদেব! —আমার নাম ইন্দ্রনারায়ণ রায়।

বিপ্রদেব। নমস্কার—নমস্কার! আজ আমার গৃহ পবিত্র হোলো। এই দেশেরই ব্রাহ্মণ জমিদার আপনি, অর্থ-গৌরব,পদ-গৌরব—সব ছেড়ে এই গরীবের কাছে আসতেও আপনার দ্বিধা জাগেনি, আপনার কত মহত্ত্ব।

ইন্দ্রনারায়ণ। দেখুন—ঠাকুর মশাই—মহত্ত্বের কথা তুলে আমাকে বিড়ম্বিত করছেন কেন? —আমি তো আপনার বাড়ীতে আসবো ব'লে এ-গ্রামে আসিনি। এসেছিলুম অন্য কাজে।

বিপ্রদেব। তা' হ'লে এই দীনের কুটীরে মহাশয়ের কি কারণে আগমন? জানতে পারলে—সুখী হই।

ইন্দ্রনারায়ণ। আপনার কাছে প্রার্থী হ'য়ে এসেছি।

বিপ্রদেব। প্রার্থী! —প্রবল-প্রতাপ জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায় দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিপ্রদেবের কাছে প্রার্থী! আমাকে উপহাস করছেন কেন—রায় ম'শায়?

ইন্দ্রনারায়ণ। উপহাস নয়, বিপ্রদেব ঠাকুর! সত্যই এসেছি প্রার্থী হ'য়ে। ---আমি একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়েকে জল আনতে দীঘিতে যেতে দেখেছি। খবর নিয়ে জানলুম মেয়েটির নাম সর্ব্বমঙ্গলা—আপনারই কন্যা। —তা'কে দেখে আমার বড় পছন্দ হয়েছে। তাই আমি এসেছি আপনার কাছে অনুরোধ নিয়ে—আপনার মেয়েকে পুত্রবধূ করবো।

বিপ্রদেব। অনুরোধ—অনুরোধ কেন? বলুন—দয়া ক'রে দরিদ্রের কন্যাদায় উদ্ধার করতে এসেছেন। —তবে গোত্রে আর কুলে মিলন হ'লেই আমার ভাগ্য, আমার কন্যার অদৃষ্ট উত্তম বল্‌তে হবে।

ইন্দ্রনারায়ণ। আমি মুখবংশ-জাত—কুলের মুখটী দ্বিজ।

বিপ্রদেব। তা' হ'লে আর বাধা কিসের? —আমি বন্দ্যবংশীয়।

ইন্দ্রনারায়ণ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—ঠাকুর মশাই, কোনো রকম বাধা কি উঠ্‌তে পারে? এখন শুভ-বিবাহের দিন স্থির করা যাক্। মা-লক্ষ্মীকে আমি সসম্মানে ঘরে নিয়ে যাই।

বিপ্রদেব। আজ আমার কি আনন্দ! এ-কি মার কৃপা! —সর্ব্বমঙ্গলা আমার সত্যই ঘর-আলো-করা লক্ষ্মী-প্রতিমা, শুধু তাই নয়—সরস্বতী দেবীরও অশেষ কৃপা তার ওপর। গৃহকর্ম্মেও খুব পটু।

ইন্দ্রনারায়ণ। তা' না জেনে শুনেই কি আপনার অপূর্ব্ব কন্যা-রত্নের প্রার্থী হ'য়ে এখানে আসি।

বিপ্রদেব। আমার পিতৃ-পিতামহের পুণ্যে এই অসম্ভব আজ সম্ভব হ'তে চলেছে—রায় মশায়, এ-কথা মানতেই হবে। ঐ আমার একমাত্র সন্তান, আমার অত্যন্ত ভালোবাসার বস্তু,—ওকে ছেড়ে থাকতে হ'লে আমার বুক ভেঙে যাবে। —তবে—কন্যা হ'য়ে জন্মেছে—উপায় নেই, তা'কে নতুন ঘর চিনিয়ে দিতে হবে, সে-ঘর বেঁধে দিতে হবে। —আমার মনে একটা ভাবনা ছিল,—বসেছিলুম মা-র ওপর নির্ভর ক'রে। মা আমার মুখ তুলে চেয়েছেন—যা' আমার মেয়ের অদৃষ্টে ঘট্‌লো—সে আমার আশাতিরিক্ত।—

ইন্দ্রনারায়ণ। ঠাকুর মশাই—আপ্‌নি ভুলে যাবেন না যে—জগদীশ্বর আপনাকে কন্যা-সম্পদে এমনি ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তুলেছেন—সে-ক্ষেত্রে অনেক কোটিপতি এসে ঐ সম্পদ্ পাবার লোভে আপনার এই কুটীরে উপস্থিত হোতো। —আমি এসেছি—সে আর বড় কথা কি! —যাই হোক—শুভ কাজে বিলম্ব নয়। —আমিই সমস্ত ব্যয়ভার বইবো। এই নিন—মা সর্ব্বমঙ্গলাকে এই অলঙ্কারটি দিয়ে বলবেন—তারই এক বৃদ্ধ সন্তান এই আশীর্ব্বাদটুকু যেচে এসে দিয়ে গেছে।

বিপ্রদেব। না—না—আমি তা'কে ডাকচি। আপনি নিজের হাতে তা'কে আশীর্ব্বাদ ক'রে যান। সর্ব্বমঙ্গলা—সর্ব্বমঙ্গলা—

[একটি লালপাড়-শাড়ী পরিহিতা কিশোরী কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার প্রবেশ]

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা—!

বিপ্রদেব। এঁকে তুমি প্রণাম করো। এবার তুমি আমার ঘর ছেড়ে ওঁর ঘরের লক্ষ্মী হবে, মা!

[সর্ব্বমঙ্গলা প্রণাম করলে]

ইন্দ্রনারায়ণ। ওঠো মা ওঠো—! তুমি এসে আমার ঘর আলো ক'রে তোলো। তোমার পয়ে মা লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে থাকুন্! আশীর্ব্বাদ করি—তোমার জীবন সুখের হোক্।

বিপ্রদেব। আজ শুভ দিন—শুভ দিন! বড় আনন্দের দিন—মঙ্গল-শাঁখ বাজা!

কথক। জমিদার-পুত্রের সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে গেল। কন্যাটি ব্রাহ্মণের অতিপ্রিয় ছিল। শ্বশুরালয়ে কন্যা চ'লে যেতে ব্রাহ্মণের মন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সর্ব্বমঙ্গলার অদর্শনে ব্রাহ্মণের মন যতই ব্যাকুল হ'তে লাগলো, তিনি সেই ব্যাকুলতা দূর করবার জন্যে ততোধিক দেবী-পূজায় ও চণ্ডীপাঠে মন দিলেন।—দেখতে দেখতে দুর্গাপূজা এসে উপস্থিত হ'ল জলেস্থলে-আকাশে-বাতাসে আগমনী-বাঁশী উঠলো বেজে চারিদিকে দেবী শারদার আগমনী-সুর···

(আগমনী-গান)

সারা বরষ কোথায় ছিলি
ওরে আমার পাষাণী মেয়ে!
তোরে ছেড়ে রইবো না আর
এবার আমি কাছে পেয়ে।
কেমন ক'রে রইলি ছেড়ে,
কতদিন ঐ চরণ কেড়ে,—
থাক্‌বি মা-গো ভুলিয়ে আমায়—
তুই যে আমার ভবের নেয়ে॥

[গানটি দূরে মিলিয়ে গেল]

বিপ্রদেব। মা-র আগমনী-সুর কানে এসে প্রাণ মাতিয়ে তুলচে।—দেখো—শুভদা—আমার বড় ইচ্ছে—দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ক'রে মা-র পূজো করি।—

শুভদা। সে তো খুব ভালো কথা—সদ্-ইচ্ছে। মা-র প্রতিমা পূজো করবে—তা'র চেয়ে পুণ্যকাজ আর কি আছে?

তবে গরীবের সাধ মনেতেই মিলিয়ে যায়। আমরা গরীব—কি সম্বল আছে—যা' দিয়ে মা-র পূজো করবো?—

বিপ্রদেব। সম্বলের কথা কি তুলচো—ব্রাহ্মণি! বিনা সম্বলেই মা-র পূজো করা যায়। মা-কি শুধু ধনীদেরই মা, গরীবরা তাঁর কেউ নয়? এ-কথা আমাকে মানতে বলো? মা তো আমার ধর্ম্ম-মা নন্, আপনারই মা। ব্যাকুল হ'য়ে মা-র কাছে আবদার করবো, তিনি অবশ্য দেখা দেবেন। তাঁর কৃপা অবশ্য পাবো। তাঁর জন্যে আকুল হ'য়ে কাঁদবো—নিশ্চয় পাবো তাঁর দর্শন। মা-কে যদি সত্যিই ভালোবাসি, মা আমার ডাক শুনে আমার কাছে না এসে কখনো কি থাকতে পারেন? একটির ওপর প্রাণঢালা ভালোবাসার নাম নিষ্ঠা।—মা-র রূপ আমি বড় ভালোবাসি—সিংহবাহিনী মা-কে আমি ঘরে আনবো—আমার নিষ্ঠার জোরে। নইলে এ-জীবনই বৃথা।—

শুভদা। আনবে তো সঙ্কল্প করেচো,—কেমন ক'রে—তা' তুমিই জানো!—কিন্তু পূজোর নৈবেদ্য সাজাবার মত, ভোগ দেবার মত ব্যবস্থা তো থাকা চাই। দুর্গাপূজো কি পুতুলখেলা মনে করো?

বিপ্রদেব। সে-বোধ কি আমার নেই মনে করো? আমার যদি শক্তি থাকে তাহ'লে দেখবে তুমি—ভক্তের কাছে মা আমার সাকাররূপে আবির্ভূত হ'য়ে দর্শন দেবেন। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী—তাঁর কাছে ঐশ্বর্য্য দেখাবার স্পর্দ্ধা রাখে কে?—ডাকার মত যদি ডাকতে পারি—ভগবতী দেখা না দিয়ে থাকতে পারবেন না।—আড়ম্বর দেখিয়ে লোক-ঠকানো যায়—মা-র পূজো হয় না। তাই বলচি—আমার ঘরে খুদ-কুঁড়ো যা' আছে, তাই দিয়েই আমি মা-র পায়ে দু'টো ফুল নিবেদন করবো। মা আমার করুণাময়ী—দীন সন্তানের নিবেদিত সে ফুল তুলে নেবেন।

শুভদা। নিতান্তই তোমার যখন বাসনা হয়েচে, তা' হয়তো মা-র কৃপায় পূরণ হবে।

বিপ্রদেব। হ'তেই হবে—শুভদা! ভগবান্ কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে ব'সে যে যা' প্রার্থনা করে, তাই তা'র লাভ হয়। ঈশ্বরীকে যে আন্তরিক জানতে চাইবে, তারই হবে। হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বরী বই আর কিছুই চায় না, তারই হবে। ভগবতী মা আমার ইচ্ছাময়ী। তাঁর যদি খুসি হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। জগতের মা-কে পেলে ভক্তিও পাবো, জ্ঞানও পাবো। মা আমাকে যেমন চালাবেন—তেমনিই চলবো, যেমন করাবেন, তেম্‌নি করবো। অভাবটা কিসের? ভাবনাই বা কি?—

শুভদা। মুখের কথাতেই তো চতুর্ব্বর্গ-লাভ হয় না—জানো তুমি।—শুনেচি—দু'রকম 'আমি' আছে, একটা পাকা 'আমি', আর একটা কাঁচা 'আমি'। আমার—আমার ক'রে যে পাগল—তা'র হোলো কাঁচা 'আমিত্ব'। আর পাকা 'আমি' হ'চ্চে—যে সত্যিকারের জগন্মাতার ছেলে, দাস, নিত্যমুক্ত, জ্ঞানী।—তোমার কাছেই শুনেচি এই সমস্ত কথা।—আর জ্ঞান হ'লে তাঁকে আর দূরে দেখায় না। তিনি আর 'তিনি' বোধ হয় না। তখন 'ইনি'। হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে দেখা যায়।—এ-ভাব যদি তোমার হ'য়ে থাকে, তবে প্রতিমা-পূজো করো আর নাই করো—কি আসে যায়।—

বিপ্রদেব। শুভদা, ভক্ত কি চায় জানো?—সে চায় জগজ্জননীর সাকার রূপ, সে চায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। দেখো, সরল না হ'লে চট্ ক'রে এ-সব কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। সরল না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না—খাঁটি সত্যি কথা।—সরলভাবে তাঁকে ডাকলেই তিনি আমার প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।—আমি তো তাঁর কৃপালোভী ছেলে। বালকের মত বিশ্বাস যদি আমার থাকে, মা-র দয়া হবেই। সংসার-বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়াও যায় না, মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হয় না।—তবে কেন মা আসবেন না দীন সন্তানের ঘরে দশভুজা-মূর্ত্তি নিয়ে?—মা-র কত দয়া! আমি এরি মধ্যে মা-র কৃপায় বারোটি টাকা সংগ্রহ করেছি।—আর একটি আধুলি দিয়ে এসেছি কুমোর-বাড়ী গিয়ে কুমোরের হাতে মা-র একটা ছোট-খাটো প্রতিমা গড়বার জন্যে।

শুভদা। কুমোর রাজি হোলো?—কেমন ক'রে হবে? আট আনায় কি প্রতিমা পাওয়া যায়? নিশ্চয় কুমোর তোমাকে পাগল ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বিপ্র। না গো না···এলো ব'লে—সময় হয়েছে।

কুমোর। (নেপথ্যে) ও-ঠাকুর মশাই—ঠাকুর মশাই গো—!—

বিপ্রদেব। কে ডাকচে?—ঐ শোনো—ঐ এসেছে বুঝি।

কুমোর। আমি কুমোর গো! মা-র পর্‌তিমেটে নিয়ে এসিচি যে।

শুভদা। মা-র প্রতিমা!—সত্যি সত্যিই নিয়ে এসেছে নাকি? আশ্চর্য্য করলে!—

বিপ্রদেব। আশ্চর্য্যের কি আছে গো! হ্যাঁরে কুমোর—এসেছিস্—এসেছিস্—মা-র প্রতিমা নিয়ে? দেখচো—দেখচো—মা আমার মা কি-না? ছেলের মনে কি তিনি কষ্ট দিতে পারেন? আনন্দে যে প্রতিমা ঘরে তুলতে ভুলে যাচ্চি। ওরে কুমোর—আয় বাবা—এগিয়ে আয়—ঐ ঘরে প্রতিমাটি রাখ্।

শুভদা। বিশ্বমাতা তোমার ওপর সদয়—তুমি ভাগ্যবান্। আর পতির পুণ্যে স্ত্রীর পুণ্য। এ-র সুফল আমিও পাবো।

[হাত ঝাড়তে ঝাড়তে হাসি-মুখে কুমোরের প্রবেশ]

বিপ্রদেব। মা-র প্রতিমা ভালো ক'রে রেখেছিস্ তো কুমোরের পো? তোর মঙ্গল হোক্ বাবা—মঙ্গল হোক্।

কুমোর। দেবতা-বাম্মণের আচিব্বাদে ও মোঙ্গোল্-টোঙ্গোল্ আমার কাপড়ের খুঁটে বাঁদা—ঠাউর মশাই! এখোন্ পর্‌তিমে ঘরে পেয়ে খুব আল্লাদ হোয়েচেন তো। কিন্তন্ ঝ্যাখোন্ গড়তে দিতি গেছ্‌লেন—মনে পড়তিচে গা'? এক্‌কানা আদুলী হাতে নিয়ে? আমার কাচকে গিয়ে কইলে—বাপু এ আদুলীটে রাক্, আর আমারে ছোট্ট ক'রে মা-র একখান্ পর্‌তিমে গড়ে দে! আমি তকুনি তো তোমারে ক'য়ে উঠলুম—"ঠাউর—আপ্‌নি কি পাগল হয়েচো? দুগ্‌গোপুজো কর্‌বার মোতোন, তোমার পয়সা-কড়ি ঝনবস্তা-ব্যবস্তা কোতা? আর আটটে আনাতে কি কখুনো পর্‌তিমে হয়—আবার দুগ্‌গো পর্‌তিমে? সি-সমস্ত কতাগুনো মনে পড়তিচেন কি-না—বলোনা।

বিপ্রদেব। সবই মনে পড়ুচে—কুমোরের পো! তোর হাতযশ আছে, তুই কুমোর হ'লেও—তোর মনের তুলনা নেই। মা-র কৃপা তুই পাবি—আশীর্ব্বাদ আমার।

কুমোর। আরে ঠাউর—ও তো পরে-পচ্চাতে সব আদায় ক'রে লুবুই। এখুন্ আমার কতাগুলিন্ সায় করতে দ্যাও, লইলে যে প্যাট্‌টা যে ফ্যাপে উঠ্‌ত্তি তাক্‌বেন গো! আমার হেই কত্তা না শুনে আপনি কি বললে জানো! বল্‌লে—'ক্যানে বাপু, মা-র পা-য়ে ছুটো ফুল-পুস্পো দোবো, তা'তে ট্যাকা-কড়ি অবস্তা-রনবস্তার কি হবে? এই আটটা আনাতেই যা হয়, এম্‌নি এককান্ পরতিমে তুই গড়ে দে! তা' গ'ড়ে দিয়িচি। তোমার কতা শুনে তো না রাকাড়তে পান্নু নি। গরীব পুণ্যিমান্ বাহ্মণ আপনি, তোমার কত্তাগুনো শুনে—দিব্বি গেলে বল্‌ত্তিচি—আমার পেরাণে ভোক্তি বেজায় হোলো—মা-র কিরূপা—আমার 'আর না' করবার ক্ষ্যেমতা কোতায় রইলো গো, আমি পরতিমে গড়ে দিত্তি মত্ কন্নু। কিন্তুন্ আপ্‌নি আমাকে জোর্ ক'রে আতুলীটে দিয়ে—তবে লিশ্চিন্দি হ'য়ে এলে। তা' না দিলিই পাংতে! তোমার মোতোন্ নোকের জন্যে পরতিমে গড়্‌বো—সি তো আমার বাপ্ পিতোমোর ভাগ্যি—! আহা—পরতিমের দিগ্‌পানে একবারটে চেয়ে দেকো দিকিনি—ঠাউর! কী লুপ্—যেন মা হাসত্তিচে।

বিপ্রদেব। আহা—সুন্দর প্রতিমা! সত্যই কি রূপ! এ রূপ যে দেখ্‌তে শিখেছে—সে-ই পাগল হয়েছে।

কুমোর। তা' ওলে অ্যাখুন্ চলি ঠাউর! এখনো অনেক পর্‌তিমে বানাতে হ'বেন। তবে, মনে রেকো মা-র তিন দিন পূজো—আমি তিনদিনি মা-র পেসাদ যেন পাই। বঞ্চিৎ হ'লে মনে বড্ডই ছুক্কু-ব্যেতা পাবো—তা' কিন্তুন্ ব'লে রাকৃচি ঠাউর।

বিপ্রদেব। মা-র প্রসাদ পাবি—অবশ্য পাবি।—তোকে বঞ্চিত করে কে? আহা—কি প্রতিমাই গড়েছিস্!

কুমোর। এবার—ভুলে গেলে দিতে তো?

বিপ্রদেব। কি রে?

কুমোর। আছিব্বাদ।

বিপ্রদেব। আমার আশীর্ব্বাদ তো ছার, মা-র আশীর্ব্বাদ পাবি। তোর কল্যাণ হোক্।

কুমোর। কুব পেন্নু—আবার কি!—তোমার জন্যে মা-র পর্‌তিমে গ'ড়ে ট্যাকার বদোলে যা নাভ হোলো—তা'র কি দাম আচে গা—ঠাউর!—আচ্চা—আসি!—দণ্ডবৎ হই।

বিপ্রদেব। সমস্তই করুণাময়ী জননীর ইচ্ছা।

শুভদা। এখন সব বুঝছি—মা-র পূজো হবে।—দেখো—মা-র তো পূজো হবে, কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনাবার ব্যবস্থা না করলে—মনে শান্তি পাবো না।

বিপ্রদেব। কি করবো বলো! এখন বড় লোকের বাড়ীর বউ তোমার মেয়ে।—তাঁরা কি ছাড়বেন?

শুভদা। মা-কে ঘরে আনবো, আমার মেয়ে যদি না আসে, আমি মা—আমার মন কি মানে? মেয়েকে পেটে ধ'রে—যত্তো বড়টা ক'রে—পরের হাতে স'পে দিয়েছি ব'লেই কি তা'কে এম্‌নি ক'রে পর করতে হবে?

বিপ্রদেব। কাতর হ'চ্চো কেন—শুভদা! তাঁরা বড়লোক, তাঁদের বাড়ীতে কত বড় পূজো হবে, কত ঘটা হবে। তাঁদের একমাত্র সন্তানের বউ সর্ব্বমঙ্গলা। তাঁরা আসতে দেবেন কেন? আমাদের মেয়ে যে তাঁদের গৃহলক্ষ্মী।

শুভদা। আমি মনকে বোঝাতে চাই—চেষ্টা করি, কিন্তু মা-র মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। মা জগজ্জননী কি আমার ব্যাকুল ডাক শুনতে পাবেন না?

বিপ্রদেব। তবে আর ব্যাকুলতা কেন? তাঁর ওপরেই বিশ্বাস রাখো। মাকে ডাকো, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মেয়ের দেখা পাবে।

শুভদা। দেখো: আর একটা কথা তোমাকে বলি। পূজোর আর একদিন মাত্র বাকি। কিন্তু একটা বিঘ্ন যে জাগছে। সে খোঁজ বোধ হয় তুমি জানো না। আমি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি। তোমাকে জানাইনি, এখন না জানালে নয়। ঘরে স্ত্রীলোক বলতে আর কেউ নেই, কাজকর্ম্ম কি করে হবে?

বিপ্রদেব। তা' হ'লে এখন উপায়?

শুভদা। তুমি ভেবো না। একটিবার আমার সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ী তুমি যাও, তাঁরা আমার অসুখের কথা শুনলে মেয়েকে না পাঠিয়ে কি থাকতে পারবেন?

বিপ্রদেব। মা-র যদি ইচ্ছা থাকে তবে তাই হবে।

[মৃদুমন্দ সানাই-এর সুর ভেসে আসতে লাগলো।]

কথক। অগত্যা ব্রাহ্মণকে মা-র নাম জপ করতে করতে মেয়ের বাড়ী যেতে হ'ল। কিন্তু মেয়েকে আনতে পারলেন না। দুঃখিত মনে ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরলেন—রাজপথ ছেড়ে খোলা মাঠের রাস্তায় এসে পড়েছেন—এমন সময় পিছন থেকে এলো অশ্রুত-পূর্ব্ব এক সুমধুর ডাক।

*   *   *

[সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা]

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা—বাবা! আমি এসেছি—আমাকে ঘরে নিয়ে চলো। বাবা!

[অন্যমনস্ক ব্রাহ্মণ হঠাৎ এই ডাক শুনে চমকে উঠে পিছন ফিরে চাইলেন।]

বিপ্রদেব। এ কি! সর্ব্বমঙ্গলার গলা যে!—তাই তো—আমার সর্ব্বমঙ্গলাই তো!

সর্ব্বমঙ্গলা। হ্যাঁ—বাবা! আমি তোমার ডাক শুনে আর থাকতে পারলুম না। বাড়ী চলো—দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।—

বিপ্রদেব। সে কি মা! তুই হঠাৎ চলে এলি কেন? শ্বশুর-শাশুড়ী কিছু বলবেন না? তাঁদের অনুমতি পেয়েছিস্? তাঁরা তো কোনো মতেই তোকে আসতে দিতে চান্‌নি!

সর্ব্বমঙ্গলা। সে তোমায় ভাবতে হবে না—বাবা!—আমি সমস্ত ঠিক ক'রে এসেছি। বাড়ীতে পূজো—তার ওপর মা-র অসুখ—কে দেখে কে শোনে—তুমি একলা পারবে কি ক'রে… আমি না গেলে কি চলে! এখন বাড়ী চলো।

বিপ্রদেব। চল্ মা! তোকে পেয়ে তোর মা-র অসুখ অনেকখানি সেরে যাবে। সে প্রাণ পাবে। মা-গো—তোর

প যেন আরো ঝলমল্ করছে, আরো সুন্দর হ'য়ে উঠেছে!—নেকবার তো দেখেছি—আজও দেখেছি—কিন্তু এমন রূপ, তো মাধুরী তো চোখে পড়ে নি! এতো রূপ পেলি কোথায় !—কোথায় এ দিব্যরূপ লুকিয়েছিল? আহা ঠিক যেন দেবী-প্রতিমা!—যত দেখচি—ততো যেন আরো দেখবার তৃষ্ণা বেড়ে উঠচে,—চোখের যেন তৃপ্তি নেই।

সর্ব্বমঙ্গলা। নিজের মেয়েকে সকলেই ও-রকম সুন্দর দেখে। —ও কি বাবা—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখছ—চোখের পলক পড়ছে না যে! মেয়েকে দেখার সখ যদি না মিটে থাকে—বাড়ীতে গিয়ে তিনদিন প্রাণ-মন ঢেলে দেখো।

বিপ্রদেব। আজ আমার কি আনন্দ! আনন্দময়ী ঘরে এসেছেন—তিনি এই আনন্দ ভারে ভারে দিচ্ছেন বিলিয়ে তাঁর বিশ্বের 'পরে। জগৎ আনন্দে ছেয়ে গেছে!—এই শুভ তিথিতে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করি—আমার সর্ব্বমঙ্গলার এয়োতি অক্ষয় হোক, সকলের প্রাণলক্ষ্মী-রূপে চিরজীবী হ'য়ে থাক্!···জগন্মাতার প্রকাশ যেন দেখতে পাচ্চি মা তোর মাঝে—এ কি রূপ! কোথায় এর তুলনা!

কথক। সর্ব্বমঙ্গলা পিতৃগৃহে ফিরে এলো। ব্রাহ্মণী শুভদা কন্যাকে কাছে পেয়ে সুস্থা হ'য়ে উঠলেন। সর্ব্বমঙ্গলার আনন্দ-কলরবে সারা বাড়ী ভ'রে গেল। মা-বাপ মেয়ের অপরূপ রূপের দিকে চেয়ে থাকেন। চোখের পলক স্থির হ'য়ে যায়। তাঁদের আনন্দ আর ধরে না।

জগজ্জননী মহাশক্তি দশভুজার পূজা আরম্ভ হোলো। পূজার ধূপ-গন্ধে, চণ্ডীপাঠে ও মঙ্গলমন্ত্রে দশদিক্ ভ'রে উঠলো। পূজার দু'দিন অতি সুন্দরভাবে কেটে গেল। তৃতীয় দিন—নবমী।—

* * *

[মৃদু ধর্ম্ম-সংজ্ঞা সঙ্গীত-ব্যঞ্জনা]

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা—আজ নবমী, গ্রামের লোকেদের খাওয়াতে হবে।

বিপ্রদেব। আমার ইচ্ছাও তাই, সে-সাধ কা'র না যায়। মা'র প্রসাদ বিলোবার মত পুণ্যকাজ আর কি আছে। কিন্তু তোর গরীব বাপের দীন আয়োজন, কেমন ক'রে লোকজন খাওয়ানো হবে? তোর বাপের কি সে ক্ষমতা আছে, মা?

সর্ব্বমঙ্গলা। কে বলে—আমার বাপের ক্ষমতা নেই? ভক্তিই তো শক্তি—বাবা! আমার বাবার ভক্তির মত ভক্তি কা'র আছে? না—বাবা—তা' হবে না, তুমি বাড়ীতে পূজো এনেচো, গাঁয়ের সকলকে প্রসাদ না খাওয়ালে কি মানায়? আমি কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ দিয়ে এসেছি।

বিপ্রদেব। বলিস্ কি মা! করেছিস কি? গরীব বাপকে লজ্জায় ফেলতে চাস্? মা'র আমার—বড় ঘরে গিয়ে নজরও বড় হয়ে গেছে—দেখছি।

সর্ব্বমঙ্গলা। কেন তুমি মিথ্যে চিন্তা করচো—বলো তো! —তুমি পূজোতে মন দাও,—আমি লোকজন খাওয়াবার ব্যবস্থা করছি।

বিপ্রদেব। কি জানি, কোথা থেকে হবে!—তা' যাই হোক্—মা-কে ডাকি,—তাঁর যদি কৃপা হয়—সবই হ'য়ে যাবে।

সর্ব্বমঙ্গলা। তবে কেন ভাবচো?—

বিপ্রদেব। —না—না—আর ভাববো না।

[অনতিদূরে সানাই-এর সুর]

বিপ্রদেব। না—না—দূর হোক্ চিন্তা!—নিমন্ত্রণের কথা মাথার মধ্যে নো-বো না। মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠছে···আমার পূজোর ব্যাঘাত ঘটবে। মা-গো শুদ্ধা ভক্তি দে! তোকে যেন প্রাণ দিয়ে ডাকতে পারি। সর্ব্বমঙ্গলা—আমার কাছে কাছে থাক্—আমাকে পূজোর কাজে সাহায্য কর্।—

[শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি]

সর্ব্বমঙ্গলা। দেখো—দেখো মা—! দেবী-প্রতিমা কেমন জ্বলজ্বল্ করচে!

শুভদা। সত্যিই তো···কি রূপের ছটা!—দেবীর জ্যোতিতে সমস্ত বাড়ীটা আলোয় আলো হ'য়ে গেছে! বিশ্বজননী কি সত্যই চরণ রেখেছেন? পূজোঘরটা যেন থম্‌থম্ করছে!

সর্ব্বমঙ্গলা। হ্যাঁ মা—দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে—শুধু বাবার ভক্তি আর নিষ্ঠার শক্তিতে। বেলা দু'পুর হ'তে চললো—এবার নিমন্ত্রিতের দল সব আসচে—বোধ হয়।—আমি সকলকে ফলারের নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি কি-না।

[সানাই-এর সুর ভেসে আসছে, দূরাগত পূজার বাদ্য···
ক্ষণপরে নিমন্ত্রিতদের প্রবেশ]

নিমন্ত্রিত ১। কোথায়—কোথায়—বিপ্রঠাকুর কোথায় গো! আজ ফলারের খুব জুত তো? এ নেমন্তন্ন কখনো ছাড়তে আছে হা? মা-র প্রসাদ পাবো— — যে হাতে খাবো-দাবো—সেই হাত মাথায় মুছবো। শুধু খেতে আসা কিহে ভায়া, পুণ্যি করতে আসা।

অনাহূত। আমি ভাই এ-গাঁয়ে পৌঁছেই শুনি—বিপ্র ঠাকুরের বাড়ী গাঁ-সুদ্ধ লোক নেমন্তন্ন পেয়েছে। সেখেনে মহামারী কাণ্ড।—আমাকে নেমন্তন্ন করবার সুযোগ পায়নি তা' আমি সে ভুল রাখতে দোবো কেন? নিজে সেধে মা-র প্রসাদের লোভে ছুটে চ'লে এসেছি। ভালো করেছি কি-না, বলো?

নিমন্ত্রিত ১। বেশ করেছ দাদা, খুব করেছ।—হ্যাঁ কোথা সব—মা-লক্ষ্মী কই গো?

নিমন্ত্রিত ২। ও ঠাকুর মশায়!

নিমন্ত্রিত ৩। কোথায় গো সব?

নিমন্ত্রিত ৪। আমাদের আসতে দেরী হয়ে যায় নি তো খুব বিরাট আয়োজন হয়েচে নিশ্চয়! যাক্—উত্তম ফলারের ব্যবস্থা থাকলেই শুভ। জমিদার বেয়াই—অনুষ্ঠানের ত্রুটী-বিচ্যুতি হবার জো কি!

নিমন্ত্রিত ১। এসো—এসো—আমরা বসি গে।

[একে একে প্রবেশ-দ্বারের বিপরীত-মুখে অপসরণ।
সময়ের গতি-নির্দেশক সঙ্গীত-ব্যঞ্জনা।]

বিপ্রদেব। ও ব্রাহ্মণি—ব্রাহ্মণি! দেখেছ—পাগলী মেয়ের কাণ্ড! সত্যিই গাঁ-শুদ্ধ লোকজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছে! এই লোকসমাগম দেখে তো আমার মাথা ঘুরে গেছে। উপায় কি করি?

শুভদা। তাইতো দেখচি—এখন কি হবে? কেমন করে মুখ থাকবে? অভুক্ত অতিথিদের ফেরালেও তো মহাপাপ। মেয়ে হ'য়ে বাপকে কি এমন বিপদে ফেলতে হয়? মঙ্গলা—কি করেছিস্ বল্‌তো?

সর্ব্বমঙ্গলা। মা! বাবা! তোমরা কিছু ভেবো না—বলচি। আমি সকলকে ডেকে এনেছি, মার প্রসাদ খাইয়ে সকলকেই তৃপ্ত করবো। ভাবনার কি আছে?

শুভদা। তা' তো বললি—কিন্তু আসবে কোথা থেকে? বড় লোকের বউ হ'য়ে আমাদের অভাবের কথাটাও কি ভুলে গেছিস মা? তোর বাপ-মা যে গরীব, কেবল খুদ-কুঁড়ো তাদের সম্বল।

সর্ব্বমঙ্গলা। মা! তুমি কেন উতলা হ'চ্চো? যখন পূজো করতে পেরেছ, তখন মা-র প্রসাদ সকলকে খাওয়াতে পারবে না?

শুভদা। আচ্ছা মা, তর্কে লাভ কি! তুই নেমন্তন্ন ক'রে ঘরে লোক ডেকে এনেচিস, তুই বোঝ্। আমাদের তো সাধ্যের বাইরে।

বিপ্রদেব। মা গো সর্ব্বমঙ্গলদায়িনি! দরিদ্র সন্তানের লজ্জা-নিবারণ করো—কৃপা করো মা—করুণাময়ি!

নিমন্ত্রিত ১। (এগিয়ে এসে) আহা ঠাকুরম'শায়, সুন্দর আপনার এই মেয়েটি। ভারী সুশীলা। (নিমন্ত্রিতদের অগ্রসর)

অনাহূত। বলি খুড়োঠাকুর, তোমার দেবীপ্রতিমাটি অতি চমৎকার। এতো প্রতিমা দেখলুম, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। দেখলে বুকটা চমকে চমকে ওঠে, চোখে আসে জল। আহা কি রূপ দেখালি মা! এই সর্ব্বমঙ্গলা বেটীরই সব কাণ্ড। আমাদের কেবল কাঁদাবার ফন্দি!

বিপ্রদেব। সবই মা-র করুণা। [অপসরণ]

সর্ব্বমঙ্গলা। আপনারা সব আসুন। দেখুন, আমার বাবা বড় গরীব। আপনাদের যোগ্য সমাদর করবার তাঁর ক্ষমতা নেই। আপনারা দয়া ক'রে তাঁর বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এটি তাঁর পরম সৌভাগ্য। আপনারা সহজমনে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেছেন তো?

নিমন্ত্রিত ১। আহা ঠাকুর ম'শায়ের মেয়েটির কথাগুলো কি মিষ্টি! যেন মিছরির রুটি—যে দিক দিয়েই খাও—মধুর। এমন মধুরাদপি মধুর কথা আমরা কখনো শুনিনি।

অনাহূত। আহা-মা গো! তোর কথা শুনছি আর চোখ দু'টো জলে ভরে যাচ্চে কেন বল্ দেখি! এ কথা না গান রে! ওরে ভাই, এ গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সমস্তই কি অদ্ভুত কাণ্ড? প্রসাদ থেকে এমন সুগন্ধ-বার হচ্ছিল—যার তুলনা নেই। এমন গন্ধ তো কোনোদিন নাকে আসে নি। এ বেটী পাগল ক'রে দেবে রে, আমাকে পাগল ক'রে দেবে। যেন কিসের নেশায় পেয়ে বসেছে আমাকে! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মা নাকি রে!

নিমন্ত্রিত ১। ঠিক বলেছ হে! প্রসাদের গন্ধে আমার তো দেহ-মন পুলকিত হ'য়ে উঠেছে। যাই বলো ভাই, আমরা এমন সুস্বাদু প্রসাদ জন্মে খাই নি। আর লক্ষ্য করেছ—এমন অল্পেতেই পেট ভরে গেছে, যা' বলবার নয়। আশ্চর্য্য কিন্তু! এ সব দেবতার খেলা নিশ্চয়! দৈবী-মায়া!

অনাহূত। নইলে এমনটা হয় কি করে? মা আমার অন্নদা!

নিমন্ত্রিত ১। এমন আপ্যায়িত আমরা কখনো হইনি। এমন আনন্দও জীবনে পাইনি। কি তৃপ্তি! জয় হোক—জয় হোক! বিপ্রঠাকুরের জয় হোক। সবই জগদম্বার লীলা। (প্রস্থান)

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা উঠে এসো! গালে হাত দিয়ে কি ভাবচো?—নিমন্ত্রিতেরা সব বাড়ী চ'লে গেছেন।

বিপ্রদেব। (এগিয়ে এসে) মা—তুই কি করলি? তাঁরা সকলে তো অসন্তুষ্ট হয়ে শাপ দিয়ে গেলেন?

সর্ব্বমঙ্গলা। শাপ কেন দেবে? আর অসন্তোষের কি আছে? সকলে তৃপ্তি ক'রে দেবীর প্রসাদ খেয়ে গেছেন। দেখবে চলো, এখনো অর্দ্ধেক প্রসাদ রয়েছে।

[শুভদার প্রবেশ] শুভদা। ওমা—এতো কাণ্ড! তা তো জানি না! মা-র কৃপা বোঝা ভার! শোনো গো শোনো—এই গাঁয়ের জমিদার স্বপ্ন পেয়ে ভারি ক'রে ভোজ্য-দ্রব্য কখন্ পৌঁছে দিয়ে গেছেন, আর সর্ব্বমঙ্গলা নিজের হাতে সমস্ত রেঁধেছে কখন্ তাও তো দেখি নি!

বিপ্রদেব। আশ্চর্য্য ব্যাপার!—এ শুধু মহামায়ারই লীলা। মা—মা—মা—তোমার অভয় পদ শিরে নিয়ে এই দুস্তর সংসার-সমুদ্রও পার হওয়া যায়।—

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা—তোমার অচলা ভক্তির জোরেই এতোখানি সম্ভব হয়েছে।

বিপ্রদেব। মা গো—আমাকে আরো ভক্তি দাও মা!—মা মহামায়া! [অদূরাগত গীতবাণী]

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা—ঐ শোনো! তোমার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন উঁকি মারছে—তারই উত্তর ঐ গানে হয় তো মিলবে।—

বিপ্রদেব। আমার মা কি অন্তর্য্যামী?

সর্ব্বমঙ্গলা। আমি তোমার আদরের সর্ব্বমঙ্গলা—বাবা।

(গান)

গায়ক। তিমির-রাতের পাগল পথিক যায় গেয়ে—
বলে—আমার আলোর পরশমণি কোথায় মেলে।
পথের খবর দাও মা ব'লে সন্তানে,—
যাবো যে তার উদ্দেশে ঘোর আঁধার-পাথার ঠেলে।
পড়ি যখন বিষম ফাঁদে—
পরাণ আমার কেবল কাঁদে—
তখন আমি দেখি দু'চোখ মেলে—
দাঁড়িয়ে আছ অন্ধকারে রূপের শিখা জেলে॥
চরম তানে বাজুক আমার অন্তর-তার।
শুনিয়ে দে সুর মর্ম্ম-বীণার।
তোর প্রাণের বীণার সুর জানিনে—
কবে যে তায় লবো চিনে,—
আমি যে তোর কৃপা-লোভী ছেলে—
বল্ মা আমায়—কোথায় গেলে আলোর খবর মেলে॥
[গায়কের প্রস্থান]

কথক। নবমীর রাত্রি পুইয়ে গেল। আজ বিজয়া-দশমী। ব্রাহ্মণ পূজারত। চোখের জল বাধা মান্‌ছে না। ব্রাহ্মণ একবার চোখ মোছেন—আবার পূজায় মন দেন, আবার চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে—আবার মোছেন। এমনি ক'রে কান্না ও পূজার পালা চল্‌লো।...

বিপ্রদেব। মা-গো। —দই-কড়মা নিবেদন ক'রে দিচ্চি —তুলে নাও মা!...আজ মাকে বিদায় দিতে হবে। কিছু আর ভালো লাগচে না। —মা—এইটুকু দয়া করো—যেন ধ্যানের নয়নে তোমাকে দেখ্‌তে পাই। —তোমার চিন্তাই আমার জীবনের সার চিন্তা হোক্‌। মা—মা—বিশ্বজননি!

সর্ব্বমঙ্গলা। (মৃদুকণ্ঠে) বাবা চোখ বুজে দেবীর চিন্তা করছেন—আর দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুধারা ঝরছে। —কি নিষ্ঠা! কি ভক্তি! বড় ক্ষিদে পেয়েছে,—ঐ-যে বাবা খাবার সাজিয়ে রেখেছেন—

[দই-কড়মা ভক্ষণ]

বিপ্রদেব। ওকি! সর্ব্বমঙ্গলা! তোর এ-কি কাণ্ড!—মা-কে নিবেদিত দই-কড়মা খেয়ে ফেল্‌লি?

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা—আমার উপর কি বিরক্ত হয়েছ? বাবা নিজের হাতে যে খাদ্য প্রস্তুত করচেন—তা'খেতে কত তৃপ্তি!

বিপ্রদেব। তা' তো বুঝ্‌লুম: কিন্তু তুই তো মা, আর শিশুটি নেই। দেবীকে যে জিনিস নিবেদন করছি তা' কি আগে-ভাগে খেতে আছে?

সর্ব্বমঙ্গলা। দেবী রাগ করবেন না—বাবা! আমি বল্‌ছি।

বিপ্রদেব। পাগলী মা আমার। এখনো সেই ছেলে-মানুষটিই আছে। ব্রাহ্মণি, আবার দই-কড়মার আয়োজন করো।

শুভদা। তোমার বল্‌বার আগেই আয়োজন ক'রে দিয়েছি। ঐ দেখো।

[পুনর্ব্বার সর্ব্বমঙ্গলার দই-কড়মা ভক্ষণ। বিপ্রদেব চক্ষু মুদে' মার্জ্জনা চেয়ে নিবেদন ক'রে দিচ্ছিলেন। চোখ খুল্‌তেই দেখলেন ভোজন-দৃশ্য।]

বিপ্রদেব। ও-কি—ও-কি। সর্ব্বমঙ্গলা আবার ঐ দই-কড়মা খেয়ে ফেলছে! আঃ—কি করিস্‌?

সর্ব্বমঙ্গলা। বাবা! এখনো বল্‌ছি—বিরক্ত হোয়ো না।

শুভদা। সর্ব্বমঙ্গলা, তোর কি এই রকম বারবার দেবীর জিনিস খেয়ে ফেলা উচিত হ'চ্চে? তুই নিজেই বল্‌—

বিপ্রদেব। মা কুপিতা হবেন।

সর্ব্বমঙ্গলা। সে তোমার ভুল, বাবা, ভুল। ক্ষিদে পেয়েছে, কি খাবো বলো?

বিপ্রদেব। খাবার কি আর জিনিস নেই? আর সামান্য অপেক্ষা করতে পারিস্‌ নে মা-র প্রসাদ পেতে কত বিলম্ব? —নাও—শুভদা, এবার দই-কড়মা ভালো ভাবে ক'রে দাও। হয় তো কোনো ত্রুটী হয়েছে।

শুভদা। মা-গো, আমার মেয়ের জ্ঞান নেই, তার দোষ নিয়ো না, মা।

বিপ্রদেব। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, দেবি!

[দই-কড়মা পুনরায় নিবেদন করতে বস্‌লেন ব্রাহ্মণ, শুভদা গললগ্নীকৃতবাসে প্রতিমার সাম্‌নে প্রণতা হলেন। এমন সময় শুভদা চোখ চেয়ে দেখলেন—সর্ব্বমঙ্গলা দই-কড়মা ভোজন-রতা]

শুভদা। ও কি রে: আবার কি করিস্‌? ওমা সর্ব্বমঙ্গলা! তুই দেখছি আজ বিজয়ার দিনে সব পণ্ড কর্‌লি!

বিপ্রদেব। শেষ-রক্ষা বুঝি আর হয় না। সর্ব্বমঙ্গলা, তোর আজ কি হয়েচে? যা' এখান থেকে। এতো ক্ষিধে তোর কোথায় লুকিয়েছিল? শুভদা, আবার দই-কড়মার যোগাড় করো। সর্ব্বমঙ্গলা! এবার তুই আর এই ঠাকুর-ঘরে থাক্‌তে পাবি না। যা' বল্‌ছি।

সর্ব্বমঙ্গলা। আচ্ছা—আমি যাচ্চি। মা, শোনো—বাবা আমাকে আজ চ'লে যেতে বল্‌লেন। —উনিই কর্‌লেন আবাহন —আবার উনিই দিলেন বিসর্জ্জন। আমি তিন দিন ভালো ক'রে খাইনি, মা···আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে, আর যেতেও হবে অনেক দূর, তাই আমি খেয়েছি ব'লে—বাবা আমাকে বিরক্ত হ'য়ে বিদায় দিলেন। মা—তবে আমি চল্‌লুম।

[অপসরণ]

শুভদা। বিজয়া দশমীর দিন কি যেতে আছে মা? ছি! বাপ-মার কথায় কি রাগ করে রে পাগলি? কই রে—সর্ব্বমঙ্গলা—সর্ব্বমঙ্গলা। এই মাত্র চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল অভিমানী মেয়ে আমার? পিছন ফিরতে না ফিরতেই শূন্যে মিলিয়ে গেল নাকি? ওগো—শুন্‌চো—মেয়ে গেলো কোথায়? এক নিমেষে হাওয়ায় মিশিয়ে গেলো না—কি! বুঝতে তো পার্‌ছি না। সাড়া-শব্দ নেই যে! ও সর্ব্বমঙ্গলা—সর্ব্বমঙ্গলা! কই গো—

বিপ্রদেব। না—না—ও কিছু নয়।

[বল্‌তে বল্‌তে প্রবেশ করলে সোনামণি]

সোনামণি। ঠাকুর—ঠাকুর!

শুভদা। কে রে—সোনা?

বিপ্রদেব। কি বল্‌চিস্‌ রে—সোনা! হ্যাঁরে আমাদের সর্ব্বমঙ্গলাকে এখন দেখলি?

সোনামণি। হ্যাঁ-গো—তোমাদের মেয়ে সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখলুম—মাঠ দিয়ে একলা চলেচে।

বিপ্রদেব। অ্যাঁ! সে কি! দেখো—দেখো—মেয়ের অভিমান—দেখো!

সোনামণি। সত্যিই চলেচে। আমি ছুটে তা'র কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লুম—যাচ্চো কোথায়—মঙ্গলাদিদি?—বল্‌লে—'শ্বশুরবাড়ী'। মুখটা ভার-ভার। আহা যেখান দিয়ে যাচ্চে—চারদিক যেন আলো ক'রে চলেছে। কি রূপ—মরি মরি!

বিপ্রদেব। দেখো—পাগ্‌লী মেয়ে, রাগ-অভিমান ক'রে শেষকালে একাই বাড়ী চ'লে গেল বুঝি! তাঁরাই বা বল্‌বেন কি? পূজোর কাজ শেষ ক'রে, যাই—মেয়ের খোঁজ নিয়ে আসি।

এ-কি—এ-কি। প্রতিমার রূপ এমন জ্যোতিঃহারা হ'য়ে গেলো কেন?

[হেনকালে বাইরে পাল্কী-থামার শব্দ শোনা গেল—

শুভদা। কে আবার এলো গো? দেখো—বোধ হয় মেয়েকে তা'র শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে এসেছে! কি হবে বলোতো? এ-কি বিপদ বলো দিকিনি!...

[মেয়ে সর্ব্বমঙ্গলার প্রবেশ।]

—ও মা—সর্ব্বমঙ্গলা যে! বাঁচালি।

বিপ্রদেব। ফিরে এসেছে! মা আমার অভিমানী বটে! কিন্তু পাল্কী ক'রে কেন—শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে নিজে গিয়েই পাল্কী ভাড়া ক'রে নিয়ে এলি নাকি?

সর্ব্বমঙ্গলা। সে কি কথা—বাবা! আমি তো সোজা শ্বশুরবাড়ী থেকে আস্‌ছি।

বিপ্রদেব। (সহাস্যে) রাগ ক'রে এখনি চ'লে গিয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকেই আস্‌ছ—বটে?

শুভদা। ছি-মা—রাগ করে কি! তুই তিন তিনবার দই-কড়্‌মা মা-কে নিবেদন করার আগেই খেয়ে ফেল্‌লি ব'লেই তো উনি বক্‌লেন।

সর্ব্বমঙ্গলা। কি বল্‌ছ—মা? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। দই-কড়্‌মা আবার কখন খেতে এলুম?

বিপ্রদেব। বাঃ—সমস্ত ভুলে গেলি?

শুভদা। আবার অমাস্থি হ'চ্ছিস্...লজ্জা হয়েছে?

বিপ্রদেব। যাক্—যাক্—ছেলেমানুষ—মা ও-র দোষ নেবেন না! তুই রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলি কেন—মা?

সর্ব্বমঙ্গলা। তোমরা কি স্বপ্নের কথা বল্‌ছ না কি? কখন রাগ ক'রে চ'লে গেলুম—এই তো আস্‌ছি। আমার শ্বশুর তোমাদের বিজয়ার প্রণাম করতে পাঠিয়ে দিলেন—তাইতো আসতে পেলুম—নইলে···

বিপ্রদেব। সে কি! সোনাকে জিজ্ঞেস কর—স্বচক্ষে ও দেখেছে তুই মাঠের আল্ ধ'রে যাচ্ছিলি।

সোনা। হ্যাঁ—মঙ্গলাদি—আমি দেখলুম যে।

সর্ব্বমঙ্গলা। তোমরা সকলেই কি পাগল হ'য়ে গেছ? বাবা-মা, তোমাদের পা' ছুঁয়ে দিব্যি করছি—এই মাত্র আমি আস্‌ছি। বাবা কি জানেন না—আমাকে সে-দিন শ্বশুর-শাশুড়ী আসতে দেন নি!

বিপ্রদেব। অ্যাঁ! সে কিরে! তুইতো আমার সঙ্গেই এলি! এই তিন দিন পূজোয় আমোদ ক'রে বেড়ালি—লোকজনদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালি। সবই কি মিথ্যে বল্‌ছি—মনে করিস্? গাঁ শুদ্ধ লোক জানে।

সর্ব্বমঙ্গলা। কি আশ্চর্য্য! বাবা, মা দুর্গার পূজোর ঘট ছুঁয়ে যদি দিব্যি করতে বলো—তাও করতে পারি—আমি এ-সমস্ত কিছুই জানি না। আজকে এই এসে এখানে দাঁড়াচ্ছি!

বিপ্রদেব। (চম্‌কে উঠে) কি বল্‌লি—সর্ব্বমঙ্গলা! তুই আসিস্ নি?—তুই আসিস্ নি? তবে—তবে কে সেই সর্ব্বমঙ্গলা—কে তিনি—কে তিনি?

[সহসা একটি গান শোনা গেল।]

—কা'র গান দৈববাণীর মত ভেসে আস্‌ছে? যুগপৎ ভয়-বিস্ময় আমার অন্তরকে আলোড়িত ক'রে তুল্‌ছে। মা-র চরণে কি কোনো অপরাধ করলুম? অন্ধ আমি—নির্ব্বোধ আমি! তবে কি আমার মা-র পাদপদ্মের সন্ধান পেয়েও বুকে পেতে নিতে পার্‌লুম না! ওরে পুণ্যলোভী—ধিক্ তোকে—ধিক্! সে চোখ কি তোর আছে? হায়রে অন্ধ! মা গো—বিশ্বধাত্রী—ক্ষেমঙ্করী···ছলনাময়ী—এম্‌নি ক'রে কি অবোধ সন্তানকে ছলনা করতে হয়!

গায়ক। (গান)

আকাশে আলোর ধারার খেলা।
ভেসেছে অভয়-চরণ-ভেলা।
দিকে দিকে বাজে নূপুর-ধ্বনি—
জন্ম-মরণ উঠিছে রণি';
ব'সে আছি নিতি প্রহর গণি;—
জননী আসিবে কোন্ সে বেলা।
মা-র সনে মোর হ'বে সে দেখা।
তাই ঝলে ভবে জ্যোতির রেখা।
চিনি যারে আমি প্রাণের মাঝে,
অবুঝ-হেলায় হারাই তা' যে,
বিচার করি যে শিশুর সাজে,—
মা-র সাথে কবে মিলন-মেলা।

[গানটি পরিসমাপ্ত।]

বিপ্রদেব। বুঝেছি—বুঝেছি—আর বল্‌তে হবে না! ও সর্ব্বমঙ্গলা আমার মেয়ে নয়—মেয়ে নয়—স্বয়ং মা ভগবতী।—শুভদা, আনন্দময়ী মা আমার দীন সন্তানকে কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছিলেন। আমি—মোহে অন্ধ আমি—পরশমণির আদর কি ক'রে করবো!—হেলায় মা-কে পেয়েও হারালুম!—মা—মা—!—আমাকে পাগল ক'রে দে।—পাগল ক'রে দে! জগজ্জননী মা—আমার কাছে কন্যার রূপে দেখা দিয়ে এম্‌নি ছলনা ক'রে পালিয়ে গেলি!—ওঁঙ্কাররূপিণী মাতা—বলে দে—বলে দে—আবার কবে তোকে পাবো, আবার কোন্ শুভদিনে দেখা দিবি—সিংহবাহনে?

[সঙ্গীতে বিচ্ছেদের মন্দতান···ধীরে ধীরে অবসিত]—

কাশীরাম দাস

শ্রীকালিদাস রায়

[মহাভারতের আদি অনুবাদক সঞ্জয়। ইঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক মনে করা হয়। ইঁহার মহাভারত পূর্ব্ববঙ্গে একসময় প্রচলিত ছিল। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক এক কবির দ্বারা অশ্বমেধপর্ব্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাভারত অনুবাদ করান। এই মহাভারতকে পরাগলী মহাভারত বলা হয়। ইঁহার পর দ্বিজ অভিরাম মহাভারতের অনুবাদ করেন। হুসেন শাহের অন্যতর সেনাপতি ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দী অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করেন। ইঁহাদের পর যথাক্রমে—ঘনশ্যাম দাস, রাজেন্দ্র দাস ও নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। কাশীরামের মহাভারতের প্রচারের পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গে নিত্যানন্দের মহাভারতই প্রচলিত ছিল। গৌড়ীমঙ্গল নামে একখানি কাব্যে পাওয়া যায়—"অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।"]

হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্‌
মহাভারতের কথা অমৃত সমান॥ (মধুসূদন)

কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার সিংগি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লোক। কাশীরাম বিরাটপর্ব্বের কতক অংশ পর্য্যন্ত লিখিয়া স্বর্গত হ'ন। তাহা যদি সত্য হয়, তবে বাকি অংশ অন্য কেহ লিখিয়া কাশীরামের ভণিতা বসাইয়াছে অথবা অন্যান্য কবির রচিত ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব কাশীরামের অসমাপ্ত মহাভারতে যোগ দিয়া গায়কেরা গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। কাশীরামের দুই ভাইও কবি ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাসও কবি ছিলেন। তিনি নিজেও একখানি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। নন্দরামের ভণিতায় দ্রোণপর্ব্ব ও কাশীরামের ভণিতায় দ্রোণপর্ব্ব অভিন্ন। তাহাতে মনে হয়—নন্দরামই বোধ হয় কাশীরামের মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কাশীরাম দাসের ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা গায়কগণের কেহ—যিনিই মহাভারত সম্পূর্ণ করুন—তিনি নিজে সমস্তটাই লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির কোন কোন অংশ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ইহাতে দেখা যায়। বিশেষতঃ শেষ পর্ব্বগুলিতে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে কিছু কিছু অংশ গৃহীত হইয়াছে।

কাশীরামের যুগে বাঙ্‌লা ভাষা একটা সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শে পৌঁছিয়াছিল। সে সময়ে যে কেহ পয়ার ছন্দে কবিতা লিখিলে অন্যের রচনা হইতে তাহার পার্থক্য ধরা যাইত না। অপরের রচনা কাশীরামের ভণিতায় যদি প্রচলিত মহাভারতে স্থান পাইয়া থাকে, তবে রচনাশৈলী হইতে তাহা ধরিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, মুদ্রণের সময় সমগ্র মহাভারতখানির ভাষা এক রচনাভঙ্গীর অধীন হইয়াছে। প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতের প্রথমাংশের কবিত্বই কাশীরামের নিজস্ব বলিয়া ধরিতে হইবে।

কাশীরামকে যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদক মাত্র মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কাশীরাম ছিলেন একজন মহাকবি—একজন প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টা। যাঁহারা দ্বৈপায়নের মূল মহাভারত পড়িয়াছেন—তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, কাশীরাম মূল মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই—মূল মহাভারতের আখ্যানবস্তু ও ঘটনাপরম্পরাও সর্ব্বত্র অনুসরণ করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ—জনা প্রবীরের উপাখ্যান, সুধন্বার উপাখ্যান, ভানুমতীর স্বয়ম্বর, লক্ষণা-হরণ, অর্জ্জুনকে মুকুটদানে দুর্য্যোধনের প্রতিশ্রুতি পালন ইত্যাদি মূল মহাভারতে নাই। এমন কি, সুভদ্রাহরণ মূল মহাভারতে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে কাশীরাম সে ভাবে বর্ণনা করেন নাই। এইরূপে দেখা যাইবে, বহু স্থলেই কাশীরাম মূল মহাভারত অনুসরণ করেন নাই। কাশীরাম এ সকল উপাখ্যান কোথা হইতে পাইলেন? তিনি কি এই উপাখ্যানগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা? কাশীরাম উপাখ্যানগুলির সৃষ্টি করেন নাই,—তাঁহার কৃতিত্ব রসসৃষ্টিতে। কাশীরাম কোন উপাখ্যানই মূল মহাভারত হইতে গ্রহণ করেন নাই—হয় ত তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারত চোখেও দেখেন নাই। বাঙ্গালা দেশে মূল মহাভারত ছিল কি না সন্দেহ। বাঙ্গালা দেশে ছিল 'বৃহৎ ব্যাসসংহিতা'। বাঙ্গলা দেশ সংহিতার দেশ। বিবিধ শাস্ত্রের সারভাগ গ্রহণ করিয়া এ দেশে এক একখানি সংহিতা রচিত হইয়াছিল—এ দেশে তাহাই চলিত। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণেরও রচয়িতা। মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের প্রধান প্রধান উপাখ্যান লইয়া এ দেশে একটি সংহিতা রচিত হইয়াছিল—তাহার নাম বৃহৎ ব্যাস-সংহিতা। এ দেশে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহাদিগকে ব্যাসব্রাহ্মণ বলিত। এই ব্যাসব্রাহ্মণগণ ছিলেন ঐ বৃহৎ ব্যাসসংহিতার ভাণ্ডারী। ব্যাসব্রাহ্মণগণ ঐ ব্যাসসংহিতা অবলম্বনে এ দেশের গ্রামে গ্রামে কথকতা করিতেন। কাশীরাম ঐ ব্যাসসংহিতা হইতেই তাঁহার মহাভারতের আখ্যানবস্তু আহরণ করেন। কথকগণের মুখের ব্যাখ্যা শুনিয়াই হউক অথবা ব্যাসসংহিতা দেখিয়াই হউক কাশীরাম তাঁহার মহাভারত রচনা করেন।

কিন্তু তিনি সংস্কৃত জানিতেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মহাভারত হইতে এমন অনেক অংশের উৎকলন করা যাইতে পারে, যে-সকল অংশের ভাষার গাঢ়বন্ধতা ও পারিপাট্য সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। তাহাতে মনে হয়—তিনি কেবল কথক ঠাকুরদের ব্যাখ্যান শুনিয়াই মহাভারত রচনা করেন নাই—ব্যাস-সংহিতার পুঁথিও তিনি সম্ভবতঃ পড়িয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, একসময়ে সেখানকার ধর্ম্মযাজকগণ লাটিন বাইবেলের একাধিকারী ছিলেন—জনসাধারণ লাটিনের চর্চ্চা করিত না—তাহাদের মধ্যে লাটিন বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মজগতে একাধিপত্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। বাইবেলের যাহাতে ইংরাজীভাষায় অনুবাদ না হয় সে জন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে কেহ লাটিন বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ করিবে সে ধর্ম্মের ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডনীয় হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত করাইয়াছিলেন। এদেশেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শ্লোক রচনা করিয়া অনুশাসন দিয়াছিলেন—কোন শাস্ত্রের প্রাকৃত ভাষায় ব্যাখ্যান বা অনুবাদ করিলে রৌরব নরকে গমন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের এই

ব্যবস্থা যখন উদ্দণ্ড হইয়া ছিল—তখন কাশীরামের পক্ষে বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা কতটা বিপৎসঙ্কুল তাহা সহজেই অনুমেয়। কথিত আছে, তিনি নিজ গ্রামে থাকিয়া মহাভারত রচনা করিবার সুযোগ পান নাই। মেদিনীপুর জেলায় কোন এক ভূস্বামীর পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করিয়া তিনি ঐ অঞ্চলের ব্যাসব্রাহ্মণগণের সহায়তায় মহাভারত রচনা করেন। জানি না, এজন্য স্বদেশে তাঁহাকে কি দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। একে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়গ্রন্থ মহাভারতের বাঙ্গালাভাষায় রূপান্তর সাধন—তাহাতে আবার তিনি কাশীরাম শর্ম্মা নহেন, কাশীরাম দাস। এরূপ ক্ষেত্রে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তবে কাশীরাম কারণে অকারণে মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বন্দনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বাঙ্‌ময় উৎকোচ দান করিয়াছিলেন—তাহাতে কোন ফল হইয়া থাকিতে পারে। উপাখ্যান-বস্তু আহরণ করা বড় কথা নয়। তাহাকে রসে উত্তীর্ণ করিয়া কাব্যে পরিণত করাই দুরূহ ব্যাপার। আখ্যান-বস্তু কাঠামো বা কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, রস, রক্তমাংস শ্রীসৌষ্ঠব ও লাবণ্যে সুগঠিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও জীবন্ত প্রতিমা গড়াই মহাকবির কৃতিত্ব। সকলেই জানেন, এদেশে আখ্যান, বস্তু মাত্রকেই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। একই আখ্যানবস্তু লইয়া যে বহু কবি কাব্য রচনা করিতেন—তাহা বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। আখ্যান-বস্তু অভিন্ন হইলেও—তাহা দুইএকজনের হাতেই কাব্যে পরিণত হইত। যিনি প্রকৃত কবি, তিনিই আখ্যানবস্তুর সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেন।

কাশীরামের মত আরও অনেকে মহাভারতের আখ্যান-বস্তু লইয়া কাব্যরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু কাশীরামের প্রয়াসই প্রকৃত কাব্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই জন্যই তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির হৃদয় জয় করিয়াছে এবং অমরতা লাভ করিয়াছে। যে ব্রাহ্মণসমাজ বঙ্গভাষায় মহাভারতরচনার বিরোধী ছিলেন—কাশীরামের রচনা নিজগুণে ও অপূর্ব্ব রসৈশ্বর্য্যের বলে সেই ব্রাহ্মণসমাজেরও হৃদয় জয় করিয়া অক্ষয় গৌরব লাভ করিয়াছে। যাহার রৌরব নরকে গমন করিবার কথা,—তিনি আজ সর্ব্বজাতির পুণ্য-হৃদয়ের অক্ষয় স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন,—শুধু বিরাজ কেন,—রাজত্বই করিতেছেন।

অত্যধিক সংস্কৃতচর্চ্চার অনিবার্য্য ফল এই হয় যে,—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দৃষ্টি কাল হিসাবে হয় পূর্ব্বাভিমুখী এবং দেশ হিসাবে হয় পশ্চিমাভিমুখী। কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। সংস্কৃত পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের প্রাচীন কালের দিকে এমন ভাবে নিবদ্ধ হয় যে, তাঁহারা বর্ত্তমানকে ভালরূপ করিয়া দেখিতে পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি পশ্চিম ভারতের দিকে ধাবিত হইতে থাকে—ফলে বাঙ্গালাদেশ অর্থাৎ নিজের দেশ তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ইহার কারণ, সংস্কৃত-ভাষার সহিত প্রাচীনকাল ও পশ্চিম ভারতের নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধ। সেকালে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রতিভা ছিল, রচনাশক্তি ছিল—রসসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল, বাঙ্গালী জাতি কি চান তাহা তাঁহারা জানিতেন না। দেশের অন্তরের সংবাদও তাঁহারা রাখিতেন না—তাই তাঁহারা দেশের জনসাধারণের জন্য কিছুই রচনা করিতেন না। কিংবা তাঁহারা আপনাদের দেশের লোককে উপেক্ষাই করিতেন। তাই তাঁহারা যাহা কিছু লিখিতেন—সবই সংস্কৃত ভাষায়। আমার মনে হয়—দেশবাসীর অন্তরের সহিত তাঁহাদের যদি যোগ থাকিত—জাতীয় জীবনের সহিত যদি তাঁহাদের পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা স্বদেশের ভাষায়, স্বদেশের ভূষায়, স্বজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের সারস্বত সাধনাকে রূপান্তরিত করিতেন।

ইহা হইতে মনে হয়, সৌভাগ্যক্রমে কাশীরাম বোধ হয় সংস্কৃত চর্চ্চা করেন নাই। তাই তিনি সম-সাময়িক বাঙ্গালী জাতির অন্তরের সংবাদ জানিবার,—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রসতৃষ্ণার সম্পূর্ণ সংবাদ রাখিবার সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলেন। আর যদি কাশীরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রকৃত কবিজন-সুলভ মহাপ্রাণতা ও উদার দৃষ্টিই তাঁহাকে সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। বোধ হয় ব্রাহ্মণ-সমাজের আভিজাত্যের গণ্ডীর বাহিরে জন্মগ্রহণের ফলে তিনি তাঁহার স্বজাতির অন্তরের সহিত পরিপূর্ণ যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। যাহাই হউক, কাশীরাম বাঙ্গালী জাতির সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ জন। বাঙ্গালী জাতি কি চায় তাহা তিনি জানিতেন—তাই বাঙ্গালীর হৃদয়মাধুরী দিয়াই তিনি রসসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতের কাঠামোকে বাঙ্গালার মাটি দিয়াই পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার নিজস্ব শ্যামলতায় তাহার অঙ্গে লাবণ্য সঞ্চার করিয়াছেন। কাশীরামের কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রার মধ্যে বাঙ্গালার মায়ের বৎসল হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে। কাশীরামের পঞ্চ পাণ্ডবে বাঙ্গালার সৌভ্রাত্রের মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। মৃদঙ্গ-তানমুখরিত বাঙ্গালার বৈষ্ণব-হৃদয় কেবল বিদুর-চরিত্র নয়—মহাভারতের অনেকগুলি চরিত্রকে আমাদের অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্যই কাশীরাম বাঙ্গালার মহা-কবি—দরদী কবি—বাঙ্গালী জাতির প্রাণের কবি। কাশীরাম শুধু মহাকবি নহেন—তিনি সাধক কবি ও ভক্ত কবি। তাই কাশীরামকে মহাকবি মাইকেল বলিয়াছেন—"হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।" ভক্ত কবি বা সাধক কবি না হইলে বাঙ্গালার প্রাণের কবি হওয়া যায় না। কাশীরাম মহাভারত রচনায় কেবল কাব্য সৃষ্টি করেন নাই—তিনি কাব্যরচনাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন, ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার জন্য সুধাবর্ষণ করিয়াছেন। মহাভারত শুধু কাব্য নয়—ইহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র,—ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়ের কাহিনী, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজীবনের অভিব্যক্তি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত—কাশীরামের ভক্তহৃদয়ের আকিঞ্চন ও আবেদন ইহাতে ধর্ম্মের সহিত কাব্যের মিলন-সাধন করিয়াছে।—আজ প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশের আপামর সাধারণ ভক্তিভরে পূতচিত্তে, নতশীর্ষে ইহা শ্রবণ করিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষায় বেদবেদান্ত উপনিষদ্ পুরাণ সংহিতা তন্ত্র ইত্যাদি কত শাস্ত্রই না আছে। কিন্তু তাহাদের

সঙ্গে বাঙ্গালী জনসাধারণের কি সম্পর্ক? তাহারা চতুষ্পাঠীর সম্পত্তি, জ্ঞানাভিজাত্যের অধিকৃত সামগ্রী। যাহাদের লইয়া এই বাঙ্গালী জাতি গঠিত, তাহাদের কাছে উহা দেববিগ্রহের মত দূর হইতে নমস্য। বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুইখানি,—একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর একখানি কাশীরামের মহাভারত। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া এ জাতির ধর্ম্মজীবনের ভার লইয়াছেন কাশীরাম ও কৃত্তিবাস। বাঙ্গালী জাতি আজ ধর্ম্মের যে স্তরেই অবস্থিত থাকুক—তাহার স্থান উঁহারাই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। চারিদিক্ হইতে বাঙ্গালী জাতির দুর্দ্দশার অবধি নাই কিন্তু সে যে এখনও পশুত্বের স্তরে নামিয়া যায় নাই তাহা কেবল ঐ দুই মহাকবির অনুগ্রহে।

কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র কেন—কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গালীর একাধারে নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিতত্ত্ব, সমাজনীতি শাস্ত্র, ইতিহাস, কথা-সাহিত্য—জ্ঞানের সকল শাখাই একাধারে। বাঙ্গালী কাশীরামের মহাভারত হইতে কাব্যের মাধুর্য্য ও কথা-সাহিত্যের আনন্দ লাভ করিয়াছে—অথচ মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে কখনও কল্পিত বা অলীক বলিয়া মনে করে নাই, তাই উহা বাঙ্গালীর কাছে ইতিহাস,—প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস। তাই মহাভারতের চরিত্রগুলিকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী নিজের নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, কর্ণ, অর্জ্জুন, কুন্তী, সুভদ্রা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ইত্যাদি চরিত্রকে বাঙ্গালী জীবন্ত বিগ্রহ অপেক্ষা অধিকতর সত্য মনে করিয়াছে।

কাশীরাম শুধু কবি নহেন—তিনি কবিগুরু। এ দেশে কাশীরামের পর যত কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলেই কাশীরামের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে এ দেশে যত কাব্য, দৃশ্য কাব্য, পাঁচালী, সঙ্গীত, যাত্রাভিনয়ের নাটক রচিত হইয়াছে তাহাদের উপকরণ উপাদান ব্যাসের মূল মহাভারত হইতে সংগৃহীত হয় নাই,—সমস্তই কাশীরামের মহাভারত হইতে আহৃত বলিয়া মনে হয়। ইদানীং মূল-মহাভারত মুদ্রিত আকারে সহজে হস্তগত হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ উহা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে এ দেশের কবিদের প্রধান সম্বল ছিল কাশীরামের মহাভারত।

এ দেশের লোক-সাহিত্যের প্রধান জন্মক্ষেত্র কাশীরামের মহাভারত। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে আমরা কাশীরামের অবদানকেই নাট্যাকারে দেখিয়া আসিয়াছি—বর্ত্তমান যুগের রঙ্গমঞ্চেও কাশীরামের দানই কত ভাবেই না রূপান্তরিত হইয়াছে। মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যে, নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতায় কাশীরামের দানেরই পরিচয় পাইয়া থাকি। কাশীরামের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আজিও অনেক কবি কাব্যের প্রেরণা ও উপকরণ লাভ করিয়া নব নব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন।

এ যুগেও অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মহাভারত সম্বন্ধে জ্ঞান কাশীরামের মহাভারত হইতেই আহৃত এবং ইহা প্রত্যেকেরই শিক্ষা-সাধনায় অঙ্গীভূত।

কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গালীর মুদির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ-অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভক্তিনত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শত শত বৎসর ধরিয়া পঠিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা বাঙ্গালী বিধবার প্রধান সম্বল, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, রোগশয্যার বন্ধু, সন্ধ্যার সুহৃদ, প্রবাসের সহচর এবং বাঙ্গালী নারীর জ্ঞানের প্রধান আশ্রয়। সর্ব্বোপরি ইহা গ্রন্থাকারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী জাতি তিন চারিশত বৎসর ধরিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে। অনেকের পক্ষে ইহাই একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র।

কাশীরামের কথা লইয়া একটি বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে—কত কথাই না মনে পড়িতেছে! বাল্যকৈশোরের কত মুহূর্ত্তই না কাশীরাম রসময়, মধুময়, অমৃতময় করিয়া দিয়াছেন! সে মুহূর্ত্তগুলির মত মূল্যমান্ মুহূর্ত্ত এ জীবনে আর পাই না। অতীত জীবনের সেই মধুময় মুহূর্ত্তগুলি হৃদয়ের মণিকোঠায় সঞ্চিত হইয়া আছে। অতীত জীবনের সকল মধুময়ী স্মৃতির সহিত কাশীরাম চির-বিজড়িত। শাখা ধরিয়া টান দিলে যেমন সমগ্র তরুই আন্দোলিত হইয়া যায়—আজ কাশীরামের কথা বলিতে গিয়া তেমনি আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে সমগ্র জীবনই। কাশীরামের প্রভাব মানসদেহে রোমাঞ্চের রূপ ধরিতেছে, নয়ন অশ্রুসিক্ত হইতেছে। মাইকেলের মত প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিকের সাহিত্যের রসবোধের ও সাহিত্যানুশীলনের সূত্রপাত হইত স্নেহময়ী জননীর স্নেহাঙ্কের পরিবেষ্টনীতে কাশীরামের মহাভারতে। বিলীয়মান যুগের প্রত্যেক সাহিত্যিকের মত আমিও নিত্যই আমার সাহিত্যিক জীবনে পুণ্যশ্লোক কবির আশীর্ব্বাদ ও স্নেহস্পর্শ অনুভব করি।

নির্ব্বান্ধব

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

না জানি কখন বন্ধু আমার
অন্তরে আসি মিশালো।
কেন বা সে তার পীযূষ কলস
এক ফোঁটা বিষে বিষালো?
কেন মিশালো, বন্ধু মিশালো?
নির্ব্বাণহীন শিয়রের বাতি,
নির্ব্বান্ধব অনিদ্র রাতি
মন্থিত করি যত ডাকি আমি
বন্ধু আমার বন্ধু চাই—

মহা-অম্বর-গম্বুজে গুরুগম্ভীরে ফিরে
প্রতিধ্বনিয়া—
বন্ধু নাই রে—
তুই ছাড়া তোর বন্ধু নাই!
আমার জীবন ভরিয়া, সে কি
একেবারে গেল মরিয়া গো!
তৃষাবিন্দু কি ললাটের দোষে
সুধাসিন্ধুরে তৃষালো?
কেন মিশালো, বন্ধু মিশালো!

শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা

—প্রিয়দর্শী

বাসবদত্তার স্বপ্ন

(তের)

ওদিকে অন্তঃপুরের বাগানে তখন মহাসমারোহ। সকালেই রাজকুমারী পদ্মাবতী স্নান সেরে বাগানে এসে উপস্থিত—সঙ্গে আছেন আবন্তিকা। চার পাঁচটা চেড়ী এদিক্ ওদিক্ ঘুর ঘুর করছে। পদ্মাবতী একজন চেড়ীকে বললেন 'দেখ ত! শিউলী-ফুলের গাছটায় ফুল ফুটেছে কিনা'। চেড়ী এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে উত্তর দিলে 'আহা! কি সুন্দর শিউলী ফুলই না ফুটেছে! থোলো থোলো সাদা ফুল লাল লাল বোঁটা। মনে হচ্ছে যেন পলা আর মুক্তো দিয়ে গাঁথা মালা গাছের ডালে ডালে ঝোলান রয়েছে'। আবন্তিকা চেড়ীদের বললেন—'যা! গাছ নাড়া দিয়ে ফুল পেড়ে কুড়িয়ে নিয়ে আয়'।

পদ্মাবতী বললেন—'না, না, গাছ নাড়া দিস্‌নি। তলায় যা পড়ে আছে, তাই চারটি কুড়িয়ে আন্ বরং'।

আবন্তিকা—'কেন, বোন্! ফুল পাড়্‌তে বারণ করলে কেন'?

পদ্মাবতী লজ্জায় মুখ নীচু ক'রে উত্তর দিলেন—'উনি এসে দেখে যদি মনে আনন্দ পান, তাই'।

আবন্তিকা—'যাক্! বোঝা গেল তাহ'লে—যে বর মনে ধরেছে'।

পদ্মাবতী চুপ ক'রে রইলেন। একজন চেড়ী ব'লে উঠ্‌ল—'রাণী দিদি বল্‌ছিলেন—'বৎসরাজকে আমার খুব ভাল লেগেছে'।

পদ্মাবতী—'আমার একটা কথা কেবলই মনে হয়—আমার যেমন স্বামীকে ভাল লেগেছে—আমার আগেকার সতীন বাসবদত্তাও কি এম্‌নি ভালবাসতেন তাঁর স্বামীকে'?

আবন্তিকা—'বেশীই ভাল বাস্‌তেন'।

পদ্মাবতী—'কি ক'রে বুঝ্‌লেন, দিদি'?

আবন্তিকা নিজের মনের ভাবের ঘোরে কথাটা ব'লে ফেলেছেন। এখন কি উত্তর দেবেন—ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। তাই তাড়াতাড়ি কথা চাপা দেবার জন্য বললেন—'তা না হ'লে কি আর তিনি বাপ-মা-ভাই সব ছেড়ে বৎসরাজের সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি হ'তে পারতেন'!

পদ্মাবতী গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—'ঠিক কথা'!

কথাবার্ত্তা বড় গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ছে দেখে একজন বল্‌লে—'রাণীদিদি! আপনি নতুন বরকে বলুন—যেন তিনি আপনাকে বীণা শেখান'।

পদ্মাবতী—'বলেছি আমি'।

আবন্তিকা—'তাতে কি উত্তর দিলেন তিনি'?

পদ্মাবতী—'কিছু না ব'লে চুপ ক'রে রইলেন—আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। মনে হ'ল—বাসবদত্তা দিদির কথা মনে হওয়ায় তাঁর কান্না আস্‌ছিল। খালি আমি সামনে ছিলুম ব'লে—পাছে আমি মনে আঘাত পাই এই ভয়ে তিনি কান্না চেপে ছিলেন'।

আবন্তিকা মনে মনে ভাব্‌লেন—'এ যদি সত্যি হয়, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই ধন্য'।

এই সময় তাঁরা দেখ্‌লেন যে, দূরে বাগানের এক দিকে বৎসরাজ আর তাঁর সখা বিদূষক বসন্তক ঢুকছেন। তাই দেখে পদ্মাবতী বললেন—'দিদি! আপনি সঙ্গে রয়েছেন—আপনার সামনে ওঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। তা আসুন, ওঁরা যাতে আমাদের দেখ্‌তে না পান—এজন্যে আমরা এই মাধবীলতা-কুঞ্জে ঢুকে পড়ি'। মেয়েরা সবাই তখন ঢুক্‌লেন মাধবীলতার কুঞ্জে।

বসন্তক আর উদয়ন ঘুরতে ঘুরতে শিউলিগাছের তলায় এসে দাঁড়ালেন। বিদূষক বল্‌লেন—'সখা! আমার মনে হয়, দেবী পদ্মাবতী বাগানে এসে'ছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু তুমি আসনি দেখে তিনি এখান থেকে চলে গেছেন'।

উদয়ন—'কি ক'রে বুঝ্‌লে সখা?

বিদূষক—'এই যে, দেখ না, সখা! এখান থেকে শিউলি ফুল তোলা হয়েছে তার চিহ্ন রয়েছে। এতে বোঝা যায়—দেবী সখীদের সঙ্গে একটু আগেই এখানে এসে'ছিলেন।

উদয়ন—'আচ্ছা, সখা,! এস আমরা এই শিউলি-তলায় এই পাথরের চাঁইটার উপর একটু বসি, যদি পদ্মাবতী আবার ঘুরে ফিরে আসেন'।

বিদূষক—'শ্রাবণের রোদ—অসহ্য! চল সখা, বরং মাধবীকুঞ্জে ঢুকি'!

দু'জনে কুঞ্জে ঢুকতে আসছেন দেখে আবন্তিকা একটু ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। তাই দেখে পদ্মাবতী বললেন—'বসন্তক ঠাকুর দেখছি কাউকে সুস্থির থাকতে দেবেন না। দিদি ত তাঁর ঠেলায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। বেরিয়ে যাবেন যে—আর অন্য পথও নেই। কি করা যায়'!

একটা দুষ্ট চেড়ী বললে—'দাঁড়ান, ওঁদের আসা বন্ধ করছি'।—এই ব'লে সে একটা ভ্রমরে ছাওয়া মাধবী-লতা ধ'রে কাঁপাতে লাগল। তার ফলে ভ্রমর-গুলো এমন উড়তে লাগল যে বিদূষক আর মাধবী-কুঞ্জে ঢুকতে সাহস করলেন না। শিউলী-তলায় বাঁধান পাথরের বেদীতেই দুই বন্ধুতে ব'সে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবলেন-তাঁরা কেবল দুজনেই নিরিবিলি আলাপ করছেন, কিন্তু মাধবী-কুঞ্জের ভিতরে যে পদ্মাবতী, আবন্তিকার বেশে বাসব-দত্তা, আর চেড়ীরা তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছেন—এ খেয়ালই তাঁদের ছিল না-সন্দেহও হয় নি।

আবন্তিকা উদয়নকে দূর থেকে দেখে বুঝলেন যে, তাঁর শরীর কাহিল হয়নি—ভালই আছে। হঠাৎ তাঁর চোখ জলে ভ'রে এল। তাই দেখে একজন চেড়ী চুপি চুপি বললে—'কি হল দিদিঠাকুরুণ! চোখে জল কেন'!

বাসবদত্তা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—'কি যেন চোখে হঠাৎ এসে পড়ল—ফুলের রেণু টেণু হবে হয়ত'।

সবাই ভাবলে বুঝি বা তাই হবে—আসল রহস্য ত কেউই জানত না।

বিদূষক এমন সময় জিজ্ঞাসা করলেন—'সখা! আশে-পাশে কেউ নেই। একটা কথা বলি—শুনে উত্তর দাও—সত্যি বোলো কিন্তু—গোপন কোরো না'।

রাজা—'কি বল ত'!

বিদূষক—'দুই রাণীকেই ত দেখলে। এখন বল ত, কাকে তোমার বেশী ভাল লাগল—বাসবদত্তা না পদ্মাবতী'?

রাজা প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললেন—'সখা! তুমি যে আমায় মহাবিপদে ফেললে'!

বিদূষক—'বিপদ্ আবার কি! একজন ত' পরলোকে—আর একজন এখানে নেই। দুইজনের কেউই যখন শুনতে পাচ্ছেন না—তখন ব'লে ফেল না'।

রাজা—'না-না—তোমার যে মুখ আল্‌গা'!

কুঞ্জের ভিতরে পদ্মাবতী ব'লে উঠলেন—'সবই ত ব'লে ফেললেন'।

বিদূষক—'তিন সত্যি করছি কাউকে বলব না—এই এই দেখ জিব কাটছি'। (জিব কাটলেন)। 'নাও, এখন বল'।

রাজা—'যদি না বলি'?

বিদূষক—'জোর ক'রে বলাব—আমাদের বন্ধুত্বের দিব্যি রইল—যদি না বল'!

রাজা—শোন তবে—রূপে-গুণে-কুলে-শীলে-মাধুর্য্যে পদ্মাবতীর জোড়া নেই বটে, কিন্তু আমার মনের ভিতরটা এখনও বাসবদত্তাই ভ'রে রয়েছেন—পদ্মাবতী এখনও সেখানে ঢুকতে পারেন নি'।

আবন্তিকা—'যাক্! এতটা কষ্ট তবু সার্থক হ'ল'।

একজন চেড়ী বললে—'রাণী দিদি! জামাইরাজা আপনাকে দেখতে পারেন না—বললেন'।

পদ্মাবতী—'দেখ্! ও কথা বলিস্ নি। তিনি যা বলেছেন তা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসেন—তবে বাসবদত্তা দিদিকে এখনও ভুলতে পারেন নি—এর জন্যে তাঁকে দোষ দিতেও পারি না'।

ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তা বললেন—'বোন্! তোমার বংশের যোগ্য কথাই তুমি বলেছ'।

এইবার রাজার পালা। তিনি বিদূষককে বললেন—'সখা! এইবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও—তুমি কাকে ভাল মনে কর—বাসবদত্তা না পদ্মাবতী'?

বিদূষক—'আমার কাছে দু'জনেই সমান'।

রাজা—'বটে! আমার কাছে ফাঁকি দিয়ে শুনে নিয়ে—এখন কথা এড়ান হচ্ছে। আমার দিব্যি, বল'।

বিদূষক—'আচ্ছা, শোন। পদ্মাবতী খুব ভাল মেয়ে—রূপে-গুণে-কুলে-শীলে—ভারি ঠাণ্ডা—ভারি মিষ্টি কথা বলেন—ভারি দয়া তাঁর মনে। কিন্তু তবু বলব—বাসবদত্তা এঁর চেয়েও ভাল—তিনি যে রোজ নিজের হাতে খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন আমার খোঁজ ক'রে। সে কথা কি ভোলা যায়'?

রাজা—'আচ্ছা, বলব এ-কথা দেবী বাসবদত্তাকে'!

বিদূষক—'কি বিপদ্! সখা কি পাগল হ'লে না কি! কোথায় বাসবদত্তা! তিনি ত' পরলোকে'।

রাজা—'ওঃ! হো! হো; ঠিক! ঠিক। পরিহাস করতে করতে এ রূঢ় সত্যটা ভুলেই গিয়েছিলুম'!

পদ্মাবতী—'কেমন ভাল কথা হচ্ছিল—নিষ্ঠুর বসন্তক সব মাটি ক'রে দিলেন!'

আবন্তিকা মনে মনে ভাব্‌লেন—'এমন কথা আড়াল থেকে শোনাতেই বেশী তৃপ্তি'!

বিদূষক—'সখা! ধৈর্য্য ধর! তুমি ত' অধীর নও। কি করবে বল। দৈবের উপর ত' মানুষের হাত নেই'।

রাজা—! সখা! দেবীর জন্যে দুঃখ মন থেকে দূর করেছি! কিন্তু তাঁর প্রতি টান এখনও তেমনি আছে। এই স্মৃতিই মাঝে মাঝে পীড়া দেয়—তাই চোখে আসে জল'! বল্‌তে বল্‌তে রাজার চোখ জলে ভ'রে এল!

বিদূষক—'সখা যে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে. দেখ্‌ছি! দেখি কোথায় একটু জল পাই—মুখে-চোখে দিতে হবে'।

এই ব'লে তিনি ত' চ'লে গেলেন।

পদ্মাবতী—'দিদি! মহারাজের চোখের দৃষ্টি কান্নায় ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে। এই সুযোগে পালিয়ে যাই চলুন'।

আবন্তিকা—'ভাল কথা! আমি পালাই। কিন্তু তোমার বোন্ এ অবস্থায় মহারাজকে একা ফেলে চ'লে যাওয়া ঠিক হয় না। তুমি ওঁর কাছে যাও'।

চেড়ী একজন বল্‌লে—'দিদি ঠাকরুণ ঠিক কথাই বলেছেন'।

আবন্তিকা পালিয়ে গেলেন উদয়নের অলক্ষ্যে। পদ্মাবতী বেরিয়ে মহারাজের কাছে যাবেন—দেখেন সামনে বসন্তক—হাতে পদ্মপাতার ঠোঙায় জল।

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করলেন—'বসন্তক ঠাকুর! এ-কি! জল কি হবে'?

বসন্তক আম্‌তা আমতা করতে লাগলেন—'এই—তা—তা—এই'।

পদ্মাবতী—'বলুন! বলুন—কি হয়েছে! শুনি'।

বসন্তক ততক্ষণে সাম্‌লে গিয়ে বল্‌লেন—'এই বাতাসে ফুলের রেণু উড়ে এসে মহারাজের চোখে পড়ায় জল আন্‌তে গিছ্‌লুম'।

পদ্মাবতী ভাব্‌লেন—'বসন্তক ঠাকুর ত' বেশ ভাল লোক। পাছে আমি মনে কোন ব্যথা পাই, তাই সাফ্ মিছে কথা ব'লে বুঝিয়ে দিলেন আমায়'।

বসন্তক—'দেবি! জলটুকু আপনিই নিয়ে চলুন না'।

পদ্মাবতী—'দিন'!—জল নিয়ে এগিয়ে চললেন।

পদ্মাবতীকে জল আন্‌তে দেখে রাজা চম্‌কে উঠেছিলেন—'কি জানি যদি উনি শুনে থাকেন আমার কথা'। তাই বিদূষকের কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন—'সখা কি ব্যাপার'?

বিদূষক উত্তর দিলেন—'ভয় নেই! সব ঠিক আছে। আমি জল নিয়ে আস্‌ছিলুম—দেখি উনিও আস্‌ছেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'জল কি হবে'? বল্‌লুম—'সখার চোখে ফুলের রেণু পড়েছে—তাই চোখ-মুখ ধুতে হবে'। উনি কোন সন্দেহ করেন নি'।

রাজা—'খুব বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিয়েছ'! পদ্মাবতী তখন কাছে এসেছেন। রাজা জল নিয়ে মুখ ধুতে ধুতে বল্‌লেন—'বসুন দেবি! হঠাৎ চোখে কি যেন পড়্‌লো তাই সখাকে পাঠিয়েছিলুম জল আন্‌তে। এর জন্যে আর আপনার কষ্ট করবার দরকার কি ছিল'?

পদ্মাবতী—ভাবলেন—রাজা কত ভদ্র—পাছে তিনি মনে কষ্ট পান—এজন্যে আসল কথাটা চাপা দিলেন। এতে পদ্মাবতী খুসীই হলেন।

এমন সময় বিদূষক বল্‌লেন—'অনেকে বর-ক'নে একসঙ্গে দেখ্‌বার জন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাই বলি কি—বেলাও ত' বাড়্‌ছে—এখন দু'জনেই বাড়ীর মধ্যে চলুন'।

সকলেই এ কথায় বাগান থেকে চ'লে গেলেন প্রাসাদের ভিতরে।　　　　[ক্রমশঃ]

মদনকুমার

আনন্দবর্দ্ধন

(রূপকথা)

(খ)

অচেনা কুমার,—তবু যেন মনে হয় কত আপন, রাজকন্যা মনে মনে ভাবে—"এ কোন্ আকাশের চাঁদ—হঠাৎ কেমন ক'রে উদয় হোলো আমার দেওয়াল-ঘেরা ঘরে···রূপের ফাঁদ পেতে কি আমায় ধর্‌তে এলো শেষে"? কুমারের রূপ যত দেখে রাজকন্যা ততই আকুল হ'য়ে ওঠে। আর স্থির থাক্‌তে না পেরে মধুমালা অচিন্-দেশের রাজকুমারের ঘুম ভাঙাতে বস্‌লো—বল্‌লে—"জাগো জাগো সুন্দর কুমার"! তা'র ডাক গানের সুরে ঝ'রে পড়্‌লো

"কেন এতো ঘুম জাগো আলোর কুসুম,
মুখে রাঙা কুমকুম কে-বা দিয়েছে ভাঙি'।
অজানা আপন জাগো মধুর স্বপন,
রূপ-মাধুরী-বরণ হৃদি দিয়েছে রাঙি'।
চোখ মেলে' চাও সুধা-দরশ বিলাও,
হাসি-ঝরনা ঝরাও তার নাহিতে মাঙি"।

মধুমালার মধুর সুরের ঘায়ে মদনকুমার চোখ মেলে চাইলো—যেন দু'টি নীলপদ্মের পাপ্‌ড়ি গেল খুলে। জেগে উঠে অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লে...কোথায় সে—আর তা'র সাম্‌নে সোনার পালঙ্কে ব'সে কে ঐ পরমাসুন্দরী কন্যা? বারবার চোখ মোছে আর চেয়ে দেখে—এ স্বপ্ন না সত্যি! রাজকন্যার মুখে মৃদুহাসি, হাসি ঠেলে বেরিয়ে এলো কথা—যেন বেজে উঠলো বীণা, "স্বপন আজ পড়েছে বাঁধ', তাই লেগেছে চোখে ধাঁধা। কও তো এখন্ শুনি: কে তুমি সুন্দর? কোথায় তোমার ঘর"? মদনকুমার তখন বল্‌লে—"আমার ঘর উজানিনগর, বাপ আমার রাজা দণ্ডধর, মদনকুমার নাম। কিন্তু বলো আমায়—হেথায় আমি কেমন ক'রে এলাম"? মধুমালা কইলে—"তা' তো জানি না। তুমি এসেছ এইটুকুই জানি"। মদনকুমার ব'লে উঠলো—"কন্যা, অবাক্ করলে আমায়...ঘুমোচ্ছিলাম আপন-ঘরে একলা বিছানায়—জেগে উঠলাম নাম-না-জানা পুরীর এক অচেনা কোন্ ঘরে...পায় শোভা এক রূপের কমল সেথা' চোখের 'পরে। এ কোন্ পুরী? কা'র এ পুরী? তোমার নাম কিগো সুন্দরি"? এই কথা শুনে মধুমালার মুখে লাল-কমলের আভা ফুটে উঠ্‌লো। বল্‌লে সে। "আমার নাম মধুমালা, এই পুরীর নাম কাঞ্চনপুর, রাজা হীরাধরের পুরী, আমি তাঁরি কন্যা"।

এই ভাবে হোলো দু'জনের জানা-শোনা, দু'জনেই দু'জনের রূপে পাগল...দু'জনেরি মনে জন্মালো ভালোবাসা। কিন্তু তা'রা কিছুতেই ভেবে পেল না—কেমন ক'রে কোন্ পথে মদনকুমার সেই পুরীর অন্দরমহলের এক দুয়ার-বন্ধ ঘরে এলো। এ ভাবনা ভেবে যখন কোনো কূল-কিনারা করতে পার্‌লো না, তখন সেই মিথ্যে ভাবনা ছেড়ে তা'রা দু'জনে তাদের সত্যিকারের মিলনটাকে দৈবের ঘটনা ব'লে মেনে নিলে। অল্প সময়ের মধ্যে তা'রা নিজেদের খুব কাছাকাছি পেলে, দু'জনের এমন আলাপ জমে' উঠলো—যেন তা'রা কতদিনের চেনা। মিলনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেল মদনকুমার-মধুমালা। দু'জনেই দু'জনকে মন দিয়ে ফেল্‌লে। আংটি বদল হোলো, রাজকুমার পরিয়ে দিলে মণিহার রাজকন্যার মরালের মত গলায়. রাজকন্যা পরালে রাজকুমারকে গজমোতির মালা। মদনকুমার বল্‌লে, "মধুমালা, তোমার ফুল-বিছানো সোনার পালঙ্কে একটুখানি বসতে দাও—সে আমার স্বর্গসুখ"। মধুমালা বল্‌লে—"মদনকুমার, তোমার গায়ের গন্ধ-ছড়ানো হিরণ-পালঙ্ক—সে আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও বড়"। তখন দু'জনে পালঙ্ক-বদল ক'রে মুখোমুখি ব'সে কইতে লাগলো মনের কত কথা। কথা আর ফুরোয় না। রাত্রি যখন শেষ হয় হয়, শুকতারা যখন জলজল্ ক'রে উঠলো আকাশের গায়ে, তাদের চোখের পাতা ঢুলে পড়লো ঘুমের ভারে। তারপর দু'জনে কথা কইতে কইতে কখন্ ঘুমিয়ে পড়লো তা'রা জান্‌তে পারলে না। তখন ইন্দ্রপুরীর কন্যা—সেই দুই অপ্সরা-বোন চুপি চুপি পালঙ্ক-সুদ্ধ মদনকুমারকে নিয়ে আবার উজানিনগরে তা'র জোড়মন্দির-ঘরে পৌঁছে দিলে। পৃথিবীতে ভোরের আলো ফুটে ওঠ্‌বার আগেই দুই বোন চ'লে গেল ইন্দ্রপুরীতে।

অন্ধকারের বুকে আকাশ থেকে ছুটে এলো চিক্‌চিকে আলোর তীর, রাত্রি গেল পালিয়ে, জাগ্‌লো হেসে বালসূর্য্য। শিশুতপন চুলবুলে সোনার হাত নেড়ে জানালার ফাঁক্ দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভিতর সাড়া তুল্‌লো মিষ্টি আলোর হাসি। এই হাসিতে ঘুম চমকে উঠে চোখের পাতা থেকে ঝরে' পড়্‌লো—কোথায় গেল উড়ে, মদনকুমার উঠলো জেগে। চারিধার চেয়ে দেখে মধুমালা নেই। মদনকুমারের মনে হোলো—তবে কি স্বপ্ন-মায়ার ছল—অমন স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়? কিন্তু মধুমালাকে সে যে চোখের ওপর দেখেছে, তা'র সঙ্গে কত কথা, কত হাসি, সে তো ভুল হয় না, মধুমালা কখনো মিথ্যে নয়। তবে কোথায় গেল মিলিয়ে? মদনকুমার চুপি চুপি ব'লে উঠলো—"তা'কে কাছে পেয়ে এমন হারাই কেন? সত্যি-মিথ্যে কিছু বুঝতে চাই না—আমার চাই মধুমালাকে। কোথায় গেলে তা'কে পাই, কা'র যাদু-হাত তা'কে লুকিয়ে রেখেছে? কে আমায় দেবে সন্ধান? হায় মধুমালা দেখা দাও"। মদনকুমার মধুমালার নাম মুখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, শুধু বলে—"হায় মধুমালা—দেখা দাও"! সকলে শোনে, কেউ কিছু বুঝতে পারে না। সকলে বলাবলি করে—"রাজকুমারের হোলো কি"? মা এসে জিজ্ঞাসা করেন, পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-পরিজন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কুমার শুধু কাঁদে—চোখের জলে মাটি ভিজে যায়। রাণী-মা ছেলের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে দেবতার নির্ম্মাল্য এনে তা'র মাথায় ছুঁইয়ে দেন—প্রার্থনা করেন: "সব অশুভ দূর হোক্"। তবু মদনকুমারের মুখে এক কথা: "আমি স্বপনে দেখি মধুমালার মুখ রে—তা'য় কে লুকালো...কোথায় পাই খোঁজ রে"! মা কইলেন—"স্বপ্ন দেখে এতো উতলা হোস্‌নে—কুমার! স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয়"? পাত্র-মিত্র মন্ত্রী-পরিজন বল্‌লে—"রাজকুমার, কত রাজ্যের কত সুন্দরী রাজকন্যা তোমার পায়ে লুটোয়, আর তুমি কিনা এক স্বপন-কন্যার জন্যে কাঁদো! সে যে স্বপ্ন—সে যে অলীক, সে যে মিথ্যে"।

রাজকুমার তবু বলে—"স্বপ্ন যদি মিথ্যে হোতো, তা'র আংটি আমার আঙুলে এলো কি ক'রে? স্বপ্ন যদি মিথ্যে হতো—খাট-পালঙ্ক কেমন ক'রে বদল হোলো? আমি জানি—এ স্বপ্ন নয়—এ সত্যি। আমি দেখেছি মধুমালার মুখ"।

পাত্রমিত্র লোকজন অনেক বোঝালে, রাজকুমার কিছুতেই প্রবোধ মানতে চাইল না। তা'র বিশ্বাস কে টলাবে, তা'র ধারণা মধুমালা স্বপ্ন নয়।

মদনকুমার কিছুই শুনলে না, অন্ন-জল মুখে তোলে না—কোনো কাজে মন দেয় না, সে কেবল মধুমালার নাম ধ'রে পাগলের মত ডাকে, কখনো কাঁদে, কখনো সেই সুখ-স্বপ্ন মনে ক'রে হাসে।

রাণী-মা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, মন্ত্রী মহাভাবনায় পড়লেন, স্বজন-বন্ধু দাসদাসী দুঃখ করতে লাগলো। সকলেই ভাবছে—"কি উপায়? রাজপুত্র যদি পাগল হয়, রাজার রাজ্য চালাবে কে"? সান্ত্বনা-উপদেশ আর হা-হুতাশের কল্লোল প'ড়ে গেল। রাজকুমারের অসহ্য হ'য়ে উঠলো...শেষকালে মন স্থির করলে—শিকারে যাবে, ঘরের চেয়ে বন ভালো। বনে বনে ঘুরে

শিকারে ভুলে থাকে সে হয় তো সে খানিকটা শান্তি পাবে। এ কথা শুনে মা এসে কেঁদে পড়লেন, বললেন—"বাছা, অকালে স্বামীকে হারালুম, শুধু তোর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি। আমার একমাত্র ছেলে তুই—এই দুখিনীর ধন···কেমন ক'রে তোকে বনে যেতে দোবো" !

কুমার কোনো কথাই কানে তুললো না—মায়ের কান্নায় টললো না তা'র মন। তা'র পণ—সে যাবেই যাবে শিকারে, গহন-বনে। তখন বাধ্য হ'য়ে রাজকুমারের যাত্রার আয়োজন করতে হোলো। মা দিলেন সঙ্গে লোক-লস্কর, লড়ায়ে হাতী, তেজী ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র···যাত্রাকালে মঙ্গলঘট পাতলেন, ধানদূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, কুলদেবতার চরণ-ছোঁওয়া ফুল দিলেন উত্তরীয়ে বেঁধে···আরতি-দীপের কাজল পরিয়ে দিলেন চোখে দৃষ্টির বাধা কেটে গিয়ে নির্ম্মল-দৃষ্টি হবে ব'লে···বাঁ পায়ের ধূলো নিয়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন বাতাসে—সমস্ত অমঙ্গল দূর করবার ছলে।

মদনকুমার শিকারে যায়—লোক-লস্কর আগুপিছু যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে—রাণী-মা প্রাসাদের ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন ছলছল চোখে। উজ্জানিনগর ছেড়ে চললো রাজকুমার আর দলবল···এলো অন্য রাজার রাজ্যে···এমনি দেশের পর দেশ পেরিয়ে শেষে পৌঁছলো এসে আর এক রাজার দেশে। এই দেশে ঘুরতে ঘুরতে রাজকুমার দেখ্‌তে পেলে এক গভীর জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঢুকে একটু এগিয়ে যেতেই তা'র চোখে পড়লো এক অপরূপ সোনার হরিণ। মদনকুমার ধনুকে তীর লাগিয়ে সেই সোনার হরিণের পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। ঘন-বনের মধ্যে সোনার হরিণ লুকিয়ে পড়লো। ঘোড়া থেকে তখন লাফিয়ে নেমে মদনকুমার চললো এই মোহন শিকারের খোঁজে। সহচরেরা পিছিয়ে পড়লো—রাজকুমারের আর নাগাল পেলো না। চোখের সামনে হরিণ নাচে, মদনকুমার লক্ষ্য ঠিক ক'রে তীর মারতে ওঠে—তখুনি চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সোনার হরিণ ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গিয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এমনি ক'রে সোনার হরিণ হঠাৎ চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। তখন মদনকুমার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—"এই জঙ্গলে কোথা' থেকে সোনার হরিণ এলো ? একি সব মায়ার খেলা—কোনো মায়াবী কি আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ?" বনের এধার-ওধার ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে সে খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। আর পা' উঠতে চায় না। কুমার তখন হতাশ-মনে একটা গাছের নীচে বসলো। চিন্তার পর চিন্তা তা'কে ঘিরে ধরলো। তা'র আর ঘরে ফেরবার সাধ নেই, মধুমালা-বিহনে তা'র ঘর-বাড়ী বনের মত। কত কথা মদনকুমার ভাবতে লাগলো, ভাবনার তবু শেষ পায় না। এদিকে বনের পর বন ঘুরে তা'র দেহ অবশ হ'য়ে পড়েছে, মন ঝিমিয়ে পড়েছে ভাবনার ভারে, পিপাসায় বুকের ছাতি ফাটছে। এমন সময় মদনকুমার দেখতে পেলে—কয়েকজন কাঠুরিয়া হাতে কুড়ুল আর মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে গল্পে-হাসিতে বনটাকে সজাগ ক'রে দিয়ে চলেছে বন ভেঙে। রাজপুত্র বনবাসীদের সহজ-জীবন দেখে লোভীর মত তাদের দিকে চেয়ে রইলো। সর্দ্দার-কাঠুরিয়ার হঠাৎ চোখ পড়লো তা'র দিকে। বনের ভিতর এক অচেনা লোককে শুকনো মুখে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে সরল-মন কাঠুরিয়া ভাবলে—সে বোধ হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে। মদনকুমারের কাছে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো সেই কাঠুরিয়া, চোখের পলক পড়ে না—তা'র সামনে এক পরম রূপবান্ পুরুষ। মদনকুমার তার দিকে ক্লান্ত চোখ তুলে চাইলো,—নিমেষ-পরে বললে, "বনবাসী ভাই, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নাও। আমার ঘর-পর সব সমান। তোমাদের আপনার ক'রে নিয়ে থাকবো। তোমাদের মত খাটবো-খুটবো, মনের আনন্দে দিন কাটিয়ে দোবো। আর আমি মায়া-হরিণের পিছু ঘুরতে পারি না।" কাঠুরিয়া সোজা-মানুষ, সুন্দর পুরুষের মুখে এই কথা শুনে যেন বর্ত্তে গেল। আর সাতপাঁচ না ভেবে মদনকুমারকে আদর ক'রে তা'র পাতার কুঁড়েতে ডেকে নিয়ে এলো।

রাজপুত্র মদনকুমার কাঠুরিয়া সাজলো। নিত্য বনে যায়, পাখীর গান শোনে, আর কাঠ কাটে, মধুমালার কথা ভাবে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কাঠের বোঝা নিয়ে নগরে বেচতে আসে। এইভাবে দিন যায়। একদিন মদনকুমার বুড়ো-কাঠুরিয়ার মুখে শুনলে যে, এই রাজ্যে হুলস্থূল প'ড়ে গেছে। হঠাৎ এক রাত্রে পাগল হ'য়ে গেছে রাজকন্যা। মদনকুমার এই খবর শুনে চমকে উঠলো। ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলে যে, রাজকন্যা দিনরাত 'মদনকুমার'-নাম জপ করে আর ব'সে ব'সে কাঁদে। নগরে তাই ঢোল পিটিয়ে ঢেঁড়াদার হেঁকে বেড়ায়—

"পাগল-পারা রাজকন্যায় করবে ভালো যে
সিকি-ভাগের এ রাজত্ব অমনি পাবে সে।
রাজামশায় দেবেন তা'রে ইচ্ছা-পূরণ-দান,
ভরসা ক'রে ঢোল্ ছোঁবে কে আছে ভাগ্যবান্।"

মদনকুমার নগরে গিয়ে এই ঢোল শোহরত শুনে বুড়ো কাঠুরিয়াকে বললে, "তুমি গিয়ে ঢোল ধরো"। কাঠুরিয়া তাই করলে। রাজার লোকজন তখন ব'লে উঠলো, "তুমি যখন ঢোল ধরেছ, তখন তোমায় যেতে হবে রাজামশায়ের কাছে"। কাঠুরিয়া ভয় পেয়ে মদনকুমারের মুখের দিকে তাকালে, মদনকুমার কানে কানে এসে বললে—ভয় নেই, তুমি রাজার কাছে গিয়ে বোলো—রাজকন্যার স্বয়ংবর-সভা ডাকতে হবে, নইলে রোগ সারবে না"। কাঠুরিয়াকে রাজার সামনে হাজির করা হোলো। রাজা জিজ্ঞেস্ করলেন, "তুমি আমার কন্যাকে ভালো করতে পারো" ? কাঠুরিয়া হাতজোড় ক'রে জবাব দিলে, "পারি রাজামশায়" ! তবে একটা কাজ করা চাই, যদি অভয় দেন তো বলি"। রাজা তাকে নির্ভয়ে বলতে বললেন। কাঠুরিয়া তখন কইতে লাগলো, "আপনার কন্যের রোগ যদি ভালো করতে চান, তা'হ'লে যাতে তিনি ইচ্ছাবর নেন সেই ব্যবস্থা করুন, সব রাজ্যের রাজপুত্রদের আস্‌বার জন্যে নেমন্তন্ন পাঠান"। রাজা মেয়ের মুখ চেয়ে রাজি হলেন। দেশে দেশে দূত ছুটলো নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে।

এদিকে মদনকুমার করলো কি—একরাশ নানারঙের বনফুল তুলে নিয়ে এসে এক একটি অক্ষর গেঁথে একটা বড় ফুলের মালা তৈরী করলে। সেই মালাটি দেখলেই মনে হয়—বিচিত্র একটি

বনফুলের মালা, কিন্তু ভালো ক'রে দেখলে ধরা যায়—ফুলে-গাঁথা একটা চিঠি—

"মদনকুমার রয় এ-দেশে তোমায় পাবে ব'লে।
স্বয়ংবরে দেখবে তা'রে বকুল-গাছের কোলে।"

মদনকুমার বুড়ো কাঠুরিয়ার মেয়েকে মালিনী সাজিয়ে মধুমালার কাছে ফুল বেচতে পাঠিয়ে দিলে—ফুলের ডালিতে রইলো সেই লেখ-মালা। যাবার আগে কাঠুরাণীকে সমস্ত শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে।

শুভদিনে শুভক্ষণে রাজকন্যা মধুমালার স্বয়ংবর-সভা বস্‌লো। রাজ্যে কেউ জান্‌তে বাকি রইলো না। যত রাজ্যের রাজকুমার রাজপুরীতে পৌঁছে সভায় এসে জাঁকিয়ে বস্‌লো। রাজ্য জুড়ে যেন চাঁদের হাট ব'সে গেল। ঠিক সেই সময়ে কাঠুরিয়ার বেশ ধ'রে মদনকুমার রাজবাড়ীর বাগানে এক বকুলগাছের তলায় গিয়ে ব'সে রইলো।

যথা সময়ে বেজে উঠলো মঙ্গলবাদ্য—শুভশঙ্খের আওয়াজে স্বয়ংবর-সভা কাঁপতে লাগলো। সকল রাজপুত্রের দৃষ্টি এক সঙ্গে দ্বারের দিকে ছুটে গিয়ে স্থির হয়ে রইলো। দু'দণ্ড পরে কানে এসে সুর তুললে সোনার নূপুরের রিনিঝিনি। ডান হাত-নাচা বউ পাবার লক্ষণ—রাজপুত্রেরা তখন সেই ভেবে ডান হাত নাড়াতে শুরু করে দিলে···সকলেই চেয়ে দেখে প্রত্যেকেরই বউ লাভের সুলক্ষণ দেখা দিয়েছে—কারোর হাত নড়ছে বেশী, কারো বা একটু বেশী। প্রত্যেকেই আশা করছে—রাজকন্যা তা'র গলাতেই মালা দেবে। সভায় এসে দাঁড়ালো রাজকন্যা মধুমালা—ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে সখীরা। রাজকন্যার রূপ দেখে সকলে নিজেদের হারিয়ে ফেল্‌লে। আরো রূপের বাহার খুলেছে তা'র সাজে। মধুমালা পরেছে সন্ধ্যামালতী-শাড়ী—গলায় দুল্‌ছে মৌকুলের মালা—কপালে-মুখে আঁকা মৃগনাভির অলকা-তিলকা—চুলে পরেছে মোতির সিঁথি—হাতে কনকচাঁপার কঙ্কন। নূপুর বাজিয়ে ধীরে ধীরে চলে মধুমালা এক রাজপুত্রকে পেরিয়ে আর এক রাজপুত্রের কাছে। এম্‌নি ক'রে সকল রাজকুমারকে রাজকন্যা এড়িয়ে যেতে লাগলো—যেন রাজহংসী ঢেউ কাটিয়ে সরোবরে ভেসে চলেছে এক পদ্ম থেকে আর এক পদ্মে—কি যে তার লক্ষ্য কেউ জানে না। পাগলপারা রাজকন্যার আর আগের মত ভাব নেই—রাজা তাই দেখে-শুনে মনের আনন্দে ছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন—কোনো রাজপুত্রের গলায় তাঁর কন্যা বরণ-ডালা দিলে না···তখন তাঁর সে-আনন্দ উড়ে গেল। রাজকন্যা সভা ছেড়ে চল্‌লো এগিয়ে পাশেই যেখানে রাজপুরীর বাগান।—সকলে আশ্চর্য্য হয়ে সেই দিকে চেয়ে দেখলে—সেই বাগানের বকুলতলার ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর ব'সে আছে এক তরুণ কাঠুরিয়া, তারি গলায় মালা দিলে রাজকন্যা মধুমালা। রাজা কপালে হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন—রাজপুত্রেরা রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে একতালে ব'লে উঠলো—"ছি—ছি!" রাজার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল।

মধুমালার কিন্তু কোনোদিকে নজর নেই...সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে কাঠুরিয়া-বেশী মদনকুমারের মুখের পানে···আনন্দে ছল-ছল তাঁর চোখ দু'টি। মদনকুমারের মুগ্ধ চোখ দু'টিও সজল...গলা থেকে সেঁউতিফুলের মালাটি খুলে মধুমালার গলায় সে পরিয়ে দিলে—মুখে বল্‌লে কেবল দু'টি কথা—"আমি পেলাম—তোমায় পেলাম।"

একদিকে মিলন-মেলা, অন্যদিকে হুলস্থূল কাণ্ড। রাজ্যশুদ্ধ লোকের মন ধিক্কারে ভ'রে উঠলো···সকলে বলতে লাগলো—"রাজকন্যার মাথা সত্যিই খারাপ হ'য়ে গেছে···নইলে অমন সোনার রাজপুত্তুরদের ছেড়ে এক বুনো কাঠুরিয়ার গলায় দিলে মালা? এর চেয়ে লজ্জার আর কি আছে?

রাজকন্যার কতদিনের ইচ্ছা আজ পুরণ হয়েছে···চোখে ফুটে উঠেছে ভাবী-সুখের ছবি...এমন সময়ে রাজা আর মধুমালার পাঁচ ভাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেখানে এসে বললেন—"মধু-মালা, তোমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—এখন কাঠুরিয়ার হাত ধ'রে যাও বনবাসে। এই রাজপুরীতে তোমাদের কোনো ঠাঁই নেই?"

রাজকন্যা শুধু একবার তা'র ডাগর-ডাগর কালো হরিণ-চোখ দু'টি তুলে বাপ আর পাঁচ ভাইকে চেয়ে দেখলে—কোন কথা বললে না—মাথা নীচু ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলে কাঠুরিয়া বেশী মদনকুমারের দিকে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে রাজপুরী ছেড়ে চললো বনবাসে। রাজার হুকুমে তাদের পৌঁছে দেওয়া হোলো এক ভীষণ জঙ্গলে—সেখানে মানুষের নাম গন্ধ নেই—কেবল বাঘ-ভালুকের রাজত্ব। রাজকন্যার বড় সাধের মিলনের দিনে শুরু হোলো তার দুঃখের জীবন।

সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে দু'জনে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—"এ কি দৈবের বিপাক!" মদনকুমার কাঁদে মধুমালার দুঃখে, মধুমালা কাঁদে মদনকুমারের কষ্টে। বাপ-মা-ভাই কেউই তাদের সঙ্গে এক মুঠো চাল চিঁড়ে পর্য্যন্ত দেয় নি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দু'জনে খুব কাতর হয়ে পড়লো। তখন মদনকুমার মধুমালাকে কইলে—'ক্ষিদে তেষ্টায় তুমি ছটফট করছ—আর তো চোখে দেখতে পারি না। তুমি সাহস করে এই ঝাউ গাছের তলায় বসে থাকো—আমি বন চ'ড়ে ফল নিয়ে আসি। দু'জনে খেতে পারবো।" এই বলে মদনকুমার ফল আনতে চলে গেল। চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, বড় বড় গাছ, বট-পাকুড়ের জঙ্গল—ফলের গাছ আর চোখে পড়ে না। অনেক ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে এক গোলকচাপা-গাছের পাশে একটা গাছ দেখতে পেলে—সে গাছে দু'টি পাতা আর দু'টি ফল। মদনকুমার সেই ফল দু'টি পেড়ে নিয়ে একটি রেখে দিলে মধুমালার জন্যে—আর একটি ক্ষুধার জ্বালায় খেয়ে ফেললে। এই ফল যেমনি খাওয়া অমনি মদনকুমার অন্ধ হ'য়ে গেল। তখন আর মধুমালার কাছে তার ফিরে যাবার শক্তি রইল না। এদিক ওদিক হাতড়ে হাতড়ে সেইখানেই ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এদিকে দেরী হচ্ছে দেখে মধুমালা উঠে পড়লো···স্বামী বনের যেদিকে গেছে···সেই দিক পানে চললো তা'র খোঁজে। শেষ কালে সে শুনতে পেলে বনের একটা কোণ থেকে তা'র স্বামীর কাতর ডাক···"মধুমালা—মধুমালা।" রাজকন্যা সেই ডাক লক্ষ্য ক'রে তাড়াতাড়ি সেখানে

এসে পৌঁছে দেখে একটা কাঁটা গাছের ওপরে প'ড়ে রয়েছে তা'র স্বামী। মধুমালা কাছে এগিয়ে এসে দেখলে, তার স্বামী অন্ধ হয়ে গেছে—তার আর দুঃখের সীমা রইলো না। তখন স্বামীকে কাঁটা গাছ থেকে উদ্ধার করে গোলক-চাঁপা গাছের তলায় এসে দু'জনে বসলো।

দু'জনেরি চোখে জল…কান্না যেন থামতে চায় না। মদনকুমার আর বসে থাকতে না পেড়ে গাছের তলায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো। একটু পরেই তা'র চোখে ঘুম নেমে এলো। একলা জেগে মধুমালা। কত তা'র ভাবনা…তপ্ত বাতাসের নাড়া খেয়ে গোলকচাঁপা ফুল একটি দু'টি করে তা'র পায়ের কাছে—মাথার ওপর ঝরে' ঝরে' পড়ছে—রাজকন্যার কোনো খেয়াল নাই। কাঁপন-লাগা ঝাউ গাছের ডালে ব'সে দোয়েল কণ্ঠে গান তুলেছে—রাজকন্যার কানেও যায় না। প্রজাপতির দল রঙীন্ পাখা মেলে' আশে পাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—রাজকন্যার চোখ সেদিকে নেই। তা'র খোঁপার ফুলে মধুলোভী মৌমাছি ঘুরে ঘুরে গুণ গুণ রব তুলেছে—রাজকন্যা আনমনা হয়ে বসে আছে। তা'র চোখ দু'টি দুঃখে ভরা—যেন বনের ছায়া সেখানে এসে জমে' উঠেছে। ভাবতে আর পারে না মধুমালা—কখন সে ঘুমিয়ে পড়লো—জানতেও পারলো না।

এদিকে ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যা ছোট বোনের খবর নেবার জন্যে উতলা হ'য়ে উঠলো। মেঝো বোন বড় বোনকে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা দিদি, বলো তো—আমাদের ছোট বোনের কি খবর? সেই যে রাজপুত্রের সঙ্গে মধুমালার মিলন ঘটিয়ে আমরা চলে এসেছি, তারপর অনেক দিন হোলো, কোনো খোঁজ-খবর নেই। চলো ছোট বোনকে দেখে আসি।" বড় বোন কইলে, "আমি কিছু কিছু খবর জানি। তাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তা'রা এখন কপালদোষে বনবাসী। আর মধুমালার স্বামীর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। বড় দুঃখে আছে বোন।" মেঝো বোন তখন বললে, "তা' হলে চোখের দেখা একবার দেখে আস্‌তেই হয়। না দেখে তো মন মানে না।" …দুই বোন তারপর তোতাপাখী সেজে সেই বনে উড়ে গিয়ে গোলক চাঁপার ডালে বস্‌লো। দেখ্‌লে—মদনকুমার-মধুমালা সেই গাছের তলায় ঘুমোচ্ছে। তা'রা মধুমালার ঘুম ভাঙাবার জন্য তা'র বোজা চোখের ওপর দু'টি চাঁপাফুল পরেপরে ফেলে দিলে—মধুমালা জেগে উঠ্‌লো, মদনকুমারের তখনো ঘুম ভাঙেনি। মধুমালা জেগে উঠে শুন্‌তে পেলে—গাছের ওপর ব'সে কা'রা যেন কথা কইছে, আর কথাগুলো তা'দেরি নিয়ে। মধুমালা কান পেতে শুন্‌তে লাগলো। একজন শুধুচ্চে—"রাজকন্যার এ-কষ্ট কেমন ক'রে যাবে…আর রাজপুত্র কি ক'রে চক্ষুদান পাবে?" অন্যজন বল্‌চে, "চক্ষুদান হয়তো হ'তে পারে, কিন্তু কষ্টের কথা শুনে আর কি হবে—এই তো সবে শুরু। রাজপুত্রের দৃষ্টি ফিরবে কেমন ক'রে—শোনো। এই বনের উত্তরে একটা পাহাড় আছে—সেই পাহাড় থেকে ছুটে চলেছে একটা তরতরে নদী—সেই নদীর পুবধারে একটা অমৃতফলের গাছ আছে। সেই গাছের ফল এনে রাজপুত্রকে খাওয়ালে—সে আবার দৃষ্টি ফিরে পাবে।" তখন প্রথমে যে কথা কয়েছিল—সে বল্‌লে—"তা' হলে এই সু-খবরটা আমি রাজকন্যার কানে কানে জানিয়ে আসি।" অন্যজন কইল-

"তা'তে আর একটা বিপদ আছে। এই অমৃতফল খেলে রাজপুত্র চোখ পাবে—এ-কথা ঠিক, কিন্তু সে নতুন দৃষ্টি পেয়ে লোভের চোখে আর একবার যদি মধুমালার দিকে চায়—তা' হ'লে আবার সে অন্ধ হ'য়ে যাবে—আর দৃষ্টি ফিরবে না।" প্রথম জন জিজ্ঞেস্ করলে—"কতদিন এমন দেখতে নেই?" উত্তর হোলো—"বারোটি বছর।" এই কথা না ব'লে ইন্দ্রপুরীর কন্যারা চ'লে গেল…তাদের তখন ইন্দ্রের সভায় নাচ-গানের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। মধুমালা সমস্ত কথাই শুনেছিল। আর দেরী না ক'রে তখুনি সে অমৃত ফলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়্‌লো। উত্তরবনে গিয়ে পৌঁছে—দেখতে পেল সেই পাহাড়, সেই নদী, তারি পুব্‌তীরে নয়নরঞ্জন অমৃত ফলের গাছ। মধুমালা ফল পেড়ে আন্‌লে—মদনকুমারকে ঘুম থেকে জাগালে। জাগিয়ে বল্‌লে—"তোমার জন্য একটা ফল এনেছি—তুমি এই ফলটা খাও, এখানে কোন যায়গায় জল পাই কি-না—খুঁজে দেখে আসি।" এই ব'লে খুব তাড়াতাড়ি পা' চালিয়ে গিয়ে মধুমালা বনের মধ্যে ঢুকে গেল—একেবারে দৃষ্টির বাইরে। কেননা তা'র স্বামী দৃষ্টি পেয়ে লোভের চোখে তা'র দিকে চাইলেই আবার অন্ধ হ'য়ে যাবে—এই ভয়ে তা'র বুক তখনো গুরুগুরু ক'রে কাঁপছিল। পিছন পানে না তাকিয়ে মধুমালা যখন অনেক দূর এসে পড়লো, তখন দুঃখের ভারে সে নুয়ে পড়লো! মদনকুমারকে ছেড়ে চ'লে যেতে তা'র মন কাঁদছিল—তা'র পা' দু'খানি পাথরের মত ভারী হ'য়ে উঠে আর এগোতে চাচ্ছিল না। কিন্তু স্বামীর কল্যাণে যেতেই হবে একলা-পথে চোখের জলকে সম্বল ক'রে। বার বৎসরের জন্য মধুমালা তা'র স্বামীকে ছেড়ে চলেছে পথ ভেঙ্গে যে পথের আরম্ভ নেই, শেষ নেই। তা'র চোখের জলের বানে বনের লতা-পাতা, পায়ের তলার মাটি ভেসে যাচ্চে। এক বন থেকে আর বন, আর বন থেকে আর এক বন চলেছে সে চলেছে, চলার বিরাম নেই। এই রকমে অনেক দূর সে এসে পড়লো। আর পা' চলে না দুঃখে-কষ্টে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তা'র প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। আর না হাঁটতে পেরে রাজকন্যা একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলো, তারপর একটু শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ভীষণ গণ্ডগোলে মধুমালার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখে সেই বনের চারধারে লোকজন-শিকারী ছুটোছুটি করছে—আর তা'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে একদৃষ্টে লোভীর মত চেয়ে শিকারীর বেশে এক অচেনা পুরুষ। মধুমালা আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে—"কে তুমি?" সে একগাল হেসে বললে—"আমি সুষমের রাজকুমার। শিকারে এসে দেখি এই বনে সাতরাজার ধন এক মাণিক ধূলোয় পড়ে রয়েছে। তুমিই সেই মাণিক, তোমাকে যত্ন ক'রে আমার দেশে নিয়ে যাচ্ছি—আদর করে সোনার পালঙ্কে বসাবো—হীরা-জহরতে গা' মুড়ে দেবো—তুমি হবে আমার সুয়োরাণী।" মধুমালার মাথায় বাজ পড়লো। সে কেঁদে ব'লে উঠলো—"আমি দুখিনী—আমায় ছেড়ে চ'লে যাও। আমাকে নিয়ে গেলে আমার পোড়াকপালের ছোঁওয়া লেগে তোমার সোনার রাজ্য পুড়ে যাবে।" সুষমরাজ্যের রাজকুমার কোনো কথা না শুনে—মধুমালাকে জোর ক'রে তা'র ঘোড়ার ওপর তুলে নিলে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে মনের আনন্দে চললো তা'র দেশে। [ক্রমশঃ

মাটি ও মানুষ

শ্রীমনোজ বসু

অমূল্য ভাত খেয়ে ধোপ-দুরস্ত কাপড়-জামা পরে রওনা হচ্ছে, বৈঠকখানায় উঁকি দিয়ে দেখল—সর্বনাশ! সাড়ে দশটা বেজে গেছে যে! সমস্ত পথ সে দৌড়ে চলল। তবু পৌঁছে দেখে, ইন্‌স্পেক্টর এসে গেছেন ইতিমধ্যে।

বয়স কম লোকটির, খুব চটপটে, ছেলেদের পড়া ধরতে শুরু করেছেন। অমূল্য বেকুবের মতো এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরে একবার ঢুকে পড়েছে যখন, বেরিয়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। আবার নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসতেও ভরসা হচ্ছে না সকলের চোখের উপর দিয়ে! এমন সময় ইন্‌স্পেক্টরের নজর পড়ল তার দিকে।

ভদ্রলোক কি চাচ্ছেন, দেখুন তো পণ্ডিত মশায়।

পণ্ডিত বললেন, ভদ্রলোক নয়, আমাদেরই ছেলে।

ছেলে? মুখ তুলে বিস্ময়ে তিনি অমূল্যর দিকে তাকালেন। মৃদু হেসে বললেন, ছেলে কি বলেন, এ তো ছেলের দাদামশায়। বোসো খোকা, বোসো তুমি এইখানটায়—

সকলের মুখে মুখে হাসি খেলে গেল। নিরুপায় অমূল্য দেখল চেয়ে চেয়ে। নিতান্ত ইন্‌স্পেক্টরের সামনে—কি করবে সে? যা কোনদিন হয় নি, অমূল্যর ঘাড় নিচু হয়ে এল আপনা থেকে। চোখ যেন ঝাপসা হয়ে এল।

হঠাৎ নজর পড়ল জহ্লাদের দিকে। কোণের দিকে সে বসেছে; প্রাণপণে নিজেকে লুকোতে চাচ্ছে সকল ছেলের মাঝে। বড় ছেলে সে-ও—লম্বায় চওড়ায় প্রায় অমূল্যর সমান। বড় হয়ে তো বিষম অপরাধ করেছে এরা। কিন্তু মাইনে বই-শ্লেট যুগিয়ে ছোট বেলায় পাঠশালায় পাঠাবার কেউ ছিল না, বড় হয়েই তাই আসতে হয়েছে। এক অবশ্য হতে পারত, মোটে এ মুখো না হওয়া, কিন্তু দুর্গ্রহ—বড় হবার ঝোঁক কেমন পেয়ে বসেছে এদের।

জহ্লাদ ঘাড় নিচু করছিল, যাতে ইন্‌স্পেক্টরের কু-নজরে না পড়ে। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সন্ধ্যা হয় প্রায়ই সেইখানে। ঐ ঘাড় নিচু করা দেখেই ইন্‌স্পেক্টরের দৃষ্টি পড়ল।

ওঠো তো তুমি, রিডিং পড়ো—কুকুরের প্রভুভক্তি—

কুঁজো হয়ে দাঁড়াল জহ্লাদ, যথাসম্ভব ছোট দেখায় যাতে। গলা কাঁপছে, পা দুটো কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে। তবু গল্পটা সে আগাগোড়া পড়ে গেল। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ইন্‌স্পেক্টর প্রসন্ন হয়েছেন। কয়েকটা বানান জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভুভক্তির মানে কি বুঝিয়ে দিতে বললেন, গল্পটা সংক্ষেপে বলতে বললেন। জহ্লাদ গড় গড় করে বলে গেল, গাড়ির চাকার নিচে কুকুরটা কেমন করে প্রাণ দিল, প্রভুর টাকার থলি আগলে রেখে! খুশি হয়ে ইন্‌স্পেক্টর বলে উঠলেন, ভাল ছেলে—চমৎকার ছেলে। একে এবার বৃত্তি-পরীক্ষা দেওয়াবেন পণ্ডিত মশায়।

পরিদর্শন শেষ করে পণ্ডিতের খাতায় যা লিখবার লিখে দিয়ে তো ইন্‌স্পেক্টর বিদায় হলেন। কিন্তু ব্যাপার মিটল না, অমূল্যর নাম হয়ে গেল দাদামশায়। স্পষ্ট মুখের উপর বলতে সাহস করে না বড় কেউ। 'দাদামহাশয়' যেখানে সেখানে লিখে রাখছে। সন্দেহক্রমে দু-একটাকে ধরে অমূল্য ঘাড়-দুবানি দিয়েছে, লেখা তাতে আরও বেড়ে গেল। পাঠশালের দেয়ালে কয়লা দিয়ে লিখেছে, ছুরি দিয়ে বেঞ্চি কেটে কেটে লিখেছে,—এমন কি দেখা গেল, পাঠশালার সামনে বকুলগাছটার গুঁড়িতে 'দাদামহাশয়' লিখে এঁটে দিয়েছে।

ছুটির পর একদিন ক্লান্ত দেহে বই-বগলে বাড়ি ফিরছে, শুনল, দূরে গলির মোড় থেকে কারা চেঁচাচ্ছে 'দাদামশায়!' অমূল্য ছুটল তাদের ধরবার জন্য। ছেলেগুলো চক্ষের পলকে অদৃশ্য। দু'তিনটা গলি পার হয়ে একটাকে কেবল পেল—দৌড়ে পালাচ্ছিল, বাঘের মতো লাফ দিয়ে পড়ে পিছন থেকে তার টুঁটি চেপে ধরল। ঘুসি বাগিয়ে ছিল—মুখটা দেখতে পেয়ে সামলে নিল। ফুট-ফুটে ছেলে, মিন্টু বলে সবাই ডাকে, পাঠশালায় যারা পড়ে তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়স কম। মাস খানেক মাত্র আসছে, খুব সাজগোজ করে আসে। পাঠশালার নিকটেই এদের বাড়ি, ট্রাম-রাস্তা পার হতে হয় না—এই সব কারণে এখানে ভর্তি করেছে। সেই দুধের ছেলে অবধি দলে পড়ে ক্ষেপাতে শুরু করেছে তাকে।

পরদিন অমূল্য পাঠশালায় গেল না। আর যাবে না, পড়াশুনো তার দ্বারা ঘটে উঠবে না, বুঝতে পেরেছে। বাড়িতেও থাকতে পারে না, নানা কথা উঠবে তা হলে। গোবিন্দ সরকার বলবে, জানতাম রে বাপু, তালগাছে কখনো আম ফলবে না! লেখাপড়া শিখে ওঁরা সব জজ-ম্যাজিস্টর হবেন—ইনি হবেন, আমারটিও হবেন! এঁটো পাতের ধোঁয়া স্বর্গে উঠবে! বেশ তো মাণিক, বাজার-ঘাটে যাচ্ছিলে, মালপত্র কেনা দরদস্তুর করা শিখে নিচ্ছিলে, আখেরে করে খেতে পারতে। কাঁধে দুষ্ট সরস্বতী ভর করল, সব ছেড়ে ছুড়ে পাঠশালায় চললেন। হয়ে গেল তো? ঝুড়ি বস্তা যা আছে নাও, চলো আবার আমার সঙ্গে বাজার মুখো—

ইন্দ্রলাল বাঁকা হাসি হাসবেন—জ্যোৎস্না রাগ করে কথা বলবে না, কিম্বা হয় তো ঝড়ের মতো এসে দোয়াত উলটে কলম ভেঙে বই ছিঁড়ে দিয়ে যাবে। আর, সকলের মধ্যে বেকুব হয়ে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে রইবেন প্রভাসিনী। তিনিই বাতাস দিয়েছিলেন অমূল্যর উৎসাহে, ভরসা জুগিয়েছিলেন তার মনে। পাঠশালায় না গেলেও যথাসময়ে সে তাই বই-খাতা-পত্র নিয়ে বেরুল। সেই আগেকার মতো দুপুর বেলা ঘোরাঘুরি শুরু হল আবার। বেলা পড়ে আসে, পাঠশালার ছুটি হবার সময় হয়ে যায় ক্রমশ। তখন যেখানে যতদূরেই থাকুক, অমূল্য এসে বসে এক বাড়ির বারান্দায়। জহ্লাদ এই দিক দিয়ে বাড়ি ফেরে, তারই অপেক্ষায় বসে থাকে এখানে। সে এলে নেমে তার কাছে যায়। জহ্লাদ বই খুলে দেখায়, কতদূর আজ পড়া হল। কি বলেছে আজ পণ্ডিত মশায়, নূতন কোন ঘটনা পাঠশালায় ঘটল। এই সব

বলতে বলতে দু-জনে এগিয়ে চলে। অমূল্য গভীর নিশ্বাস ফেলে শুনতে শুনতে।

জহ্লাদ বলে, কে কি বলল---ও সব কথায় কান দিতে যাও কেন ভাই? পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করছিলেন সেদিন তোমার কথা। আমি বললাম, অসুখ করেছে।

অমূল্য মুখ শুকনো করে বলে, ক্ষেপায় বলে যে যাইনে, তা ঠিক নয়। লেখাপড়া আমার দ্বারা হবে না। তোর মতো তো নয়, ঘরের মধ্যে বসে পড়াশুনো করতে ভালই লাগে না আমার। তোর বৃত্তি-পরীক্ষার পড়া এগুচ্ছে, পণ্ডিত আলাদা কিছু ব্যবস্থা করেছে তোর জন্য?

জহ্লাদ বলে, আর পরীক্ষা! বাবা বড্ড লেগেছে, টাকা-কড়ি রোজগার করে না দিলে চলছে না। পাঁচ বোন আমার—একটার বিয়ে ঠিক হয়েছে শ্রাবণ মাসের বাইশে তারিখে। তাই বাবা বলছে, পয়সা-কড়ির চেষ্টা দেখ, আমি একা সবদিক দেখে পেরে উঠব কেমন করে? অন্যায় কথা নয়—বড্ড কষ্ট সত্যি বাবার। নবাবি করে পড়ব, তেমন অবস্থা নয় আমাদের।

ঠুন-ঠুন করে রিক্সার ঘণ্টা বাজল পিছনে। পথ ছেড়ে দিল তারা। দেখে, রিক্সায় চড়ে মিণ্টু যাচ্ছে, তার পাশে একটি মেয়ে। মেয়েটিকে অমূল্য চিনল,ডলি তার ডাক-নাম, জ্যোৎস্নার সমবয়সী। যখন ব্যাডমিণ্টন খেলা হত, এই মেয়েটি খেলতে যেত। ব্যাড-মিণ্টন দুইতিন মাস বন্ধ হয়েছে, ডলি তবু মাঝে মাঝে আসে ওবাড়ি; জ্যোৎস্নার সঙ্গে খানিকক্ষণ আড্ডা জমিয়ে যায়। ডলির কানে কানে মিণ্টু কি যেন বলল অমূল্যকে দেখিয়ে; তারপর দু'জনে হাসতে লাগল। নিশ্চয় ইনস্পেক্টরের সেই প্রসঙ্গ। যা বলে বলুকগে, অমূল্য আর ওসব গ্রাহ্য করে না। একটা ভাবনা হল— সে যে সেই থেকে আর পাঠশালায় যাচ্ছে না, এ কথাটা মিণ্টু না বলে ডলিকে, ডলি গিয়ে আবার গল্প ক'রে না আসে জ্যোৎস্নার সঙ্গে।

জহ্লাদ বলছিল, টাকা রোজগার ভাই করতেই হবে। লেখাপড়ার চেয়ে বেশি দরকার এখন টাকার—

অমূল্য বলে, আমারও—

কিন্তু তোমার সঙ্গে কিছু করতে আমার ভয় করে।

অর্থাৎ জহ্লাদ রোজগারের পন্থা ইতিমধ্যেই ঠাউরে ফেলেছে। ভারি সাফ মাথা ছোকরার—যেমন লেখাপড়ায়, এদিককার ব্যাপারেও তেমনি। সেই আংটি-চুরির দিন থেকেই টের পেয়েছে। অমূল্য উল্লসিত হল।

ভয়? আমি ধরিয়ে দেব, সন্দেহ করিস নাকি?

উহুঁ। ফাঁকি দেবে তুমি। আংটিটা বেমালুম গাপ করলে, দশটা টাকাও ধরে দিতে যদি।

মাইরি বলছি, শুধু বাক্সটাই ছিল। মা কালীর কিরে।

অবশেষে জহ্লাদ চুপি চুপি পন্থাটা বলল! ফিকিরটা বের করেছে সত্যি চমৎকার। প্রায় নবেলি ব্যাপার। জহ্লাদকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, এত বুদ্ধি খেলে ওর মাথায়! হবে না কেন, ছেলে বয়স থেকে বাপের কাজ-কর্ম দেখে আসছে, বাপের সাকরেদি করে আসছে বাজার করা ইত্যাদি ব্যাপারে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল বাসায় ফিরতে। জ্যোৎস্না যেন ওৎ পেতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তার নিচের ঘরে চলে এল।

মোটে যে বাবুর টিকি দেখতে পাওয়া যায় না। পাঠশালা আজকাল সন্ধ্যের পর অবধি চলেছে নাকি?

সর্বনাশ! ডলি এসেছিল নাকি, এসে বলে ট'লে গিয়েছে সব? ডেঁপো এই মেয়েটা বয়সে ছোট,—হঠাৎ কেমন করে তার অভিভাবক হয়ে পড়েছে। এত খবরদারি কি জন্য করতে আসে? আর অমূল্যই বা কেন একে ভয় করে, বুঝে পায় না।

জ্যোৎস্না আঁচল-ঢাকা দিয়ে দুধ নিয়ে এসেছে। দুধের গ্লাস ড্রেসিং-টেবিলটার উপর রাখল।

হাঁ করে দেখ কি, খেয়ে ফেল।

অমূল্য বলে, চুরি করে দুধ এনেছ। আমি বলে দেব। দেখো, কি হয় তখন তোমার।

চুরি? চুরি আবার কাকে করতে যাবো? ধোঁয়া-গন্ধ দুধে, কেউ খেতে পারে না, ফেলা যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, নষ্ট করে কি হবে।

তাই এই নর্দমার মুখে ফেলে দিলে এনে?

গ্লাসের দুধ অমূল্য জানলা দিয়ে ঢেলে গড়িয়ে দিল। রাগে দুঃখে রাঙা হয়ে গেল জ্যোৎস্নার মুখ।

এক ফোঁটা চেখে দেখলেই পারতে যে ধোঁয়ার গন্ধ কি কেমন। নর্দমায় ঢালতে কি, কেন এসেছি বুঝতে পারতে তা'হলে।

তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে অমূল্য বলল, মিষ্টি দিয়ে জ্বাল-দেওয়া ঘন-আঁটা দুধ, না খেয়েও বুঝতে পেরেছি জ্যোৎস্না। কিন্তু দুধ আমি খাই না। দুধ খায় বাছুরে আর খোকা-খুকীরা। আর খায় বটে থপথপে তোমাদের মতো বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা--- মোটা হয়ে যাদের আশ মেটে না।

এগারোটা বেজে গেছে। লোকজন পথে অত্যন্ত কম। প্রণব হন-হন করে চলেছে। কড়া রোদ---তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠতে পারলে হয়। অমূল্য প্রণবের পিছন পিছন যাচ্ছে।

আলাপ আরম্ভ করে, একটুখানি আস্তে চলেন যদি দয়া করে!

—পিছনে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রণব প্রশ্ন করে, কেন?

আপনার ছাতার ছায়ায় ছায়ায় যাচ্ছি। রোদে চাঁদি ফেটে যাবার দাখিল।

কদ্দুর যাবে তুমি?

আজ্ঞে, পুলের মাথায় বটগাছ—ওখান থেকে বাঁয়ে নেমে যাব।

প্রণব গতিবেগ একটু কমাল।

ওদের কিছু আগে চলছিল আর একজন। কি যেন সে কুড়িয়ে নিল রাস্তা থেকে। সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

অমূল্য বলে, তাকায় কেন অমন করে? দামী জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছে বলে মনে হয়।

প্রণব কানে নেয় না। যে ভাবে ইচ্ছে তাকাক, তার কি যায়

আসে তাতে? কিন্তু অমূল্য শুনল না। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে। আসতে লাগুন আপনি।

সে লোকটা তখন বিষম জোরে চলেছে; দৌড়লে রাস্তার লোক পিছু নেবে—কিন্তু যে রকম হাঁটছে, সে দৌড়নোই। অমূল্য তীরবেগে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল।

প্রণব যখন কাছে গেল, তখন দস্তুরমতো বচসা বেধেছে দু'জনের মধ্যে।

কি পেয়েছ, দেখি—

কি আবার পাব? কিছু নয়। রাস্তায় হীরা-মাণিক কে ফেলে গেছে আমার জন্যে?

বলতে চাচ্ছ না যখন, থানায় নিয়ে যাব।

প্রণব এসে পড়লে আরও সাহস পেয়ে গেল অমূল্য। বলে, দেখুন—দেখুন। সাফ বে-কবুল যাচ্ছে। ফাঁড়ি কাছেই, সেখানে নিয়ে তুললে তাদের দুটো-একটা রুলের গুঁতো খেলে তারপর বলবে।

লোকটা তখন গাঁট থেকে জিনিষটা বের করল। একটা সোনার ঘড়ি—ছোট, মেয়েরা যা হাতে বাঁধে—নতুন আনকোরা।

তবে যে বাছাধন, কিছু পাওনি নাকি বলছিলে!

কাঁদো-কাঁদো হয়ে লোকটা বলে, এই সামান্য একটা জিনিষ। কত বা দাম! পাঁচ-সাত-দশ টাকা বড় জোর। এ নিয়ে গণ্ডগোল করবেন না আপনারা।

প্রণবেরও ইচ্ছা তাই। হৈ-চল্লা করবার কি দরকার! পেয়েছে ছোকরা, নিয়ে যাক। কিন্তু অমূল্য নাছোড়বান্দা। বলে, দশ টাকা কি বলছ? এর দাম দেড় শ' টাকার কম নয়।

ছোকরা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলে, অত? কি জানি, দরদাম জানি নে তো আমি।

অমূল্য বলে, তুমি জান না—আমি জানি।

তা বলে অত কক্ষনো হতে পারে না। প্রণবের দিকে কাতর চোখে চেয়ে বলতে লাগল, আচ্ছা—আমার থানায় নিয়ে তুলে কি লাভ হবে বলুন তো আপনাদের? গরিব মানুষ আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—আমার কাছ থেকে নিয়ে বেচে মেরে দেবে তো থানাওয়ালারা।

অমূল্য বলে, আচ্ছা, দরকার নেই থানায় নিয়ে। দেড় শ' মরুকগে, এক শ'ই দাম ধরা যাক। তিন জনের আমাদের জিনিষটা—তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ, তোমার না হয় হোক চল্লিশ—

প্রণবকে দেখিয়ে বলল, এঁর তিরিশ আর আমার তিরিশ, মোট এই যাট টাকা দিয়ে তুমি ঘড়ি নিয়ে যাও। আর কিছু বলব না আমরা।

প্রণব নির্বাক হয়ে আছে, এই সওদার ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই—মজা দেখছে শুধু। শেষ অবধি কি দাঁড়ায়, সেজন্য ঔৎসুক্য হয়েছে মনে মনে।

এক শ' নয়, কষামাজা করে শেষ অবধি পঞ্চাশে এসে রফা হল। অমূল্য হাত বাড়িয়ে বলে, বেশ—তাই। তোমার ভাগে কুড়িই রইল। আমাদের পনের-পনের হিসাবে দিয়ে ঘড়ি নিয়ে চলে যাও তুমি। প্রণবের দিকে চেয়ে হেসে বলে, যথা লাভ—কি বলেন?

ছোকরা বলল, কিন্তু টাকা তো নেই আমার কাছে। এক পয়সাও নেই, এই দেখুন। বেচতে হবে এটা। বেচে কখন কোথায় এসে আপনাদের ভাগের টাকা দিয়ে যাব বলে দিন।

অমূল্য হেসে বলে, একবার সরে পড়তে পারলে তুমি যা দেবে মা-গঙ্গাই জানেন। প্রণবকে বলল, এক কাজ করলে হয়—আপনিই কিনে নিন না কেন ঘড়িটা। ওর কুড়ি আর আমার পনের—পঁয়ত্রিশ হলেই তো হয়ে যাচ্ছে। কি করব—আমার কাছেও কিছু নেই। থাকলে আমি নিতাম, এমন জিনিষটা বেহাত হতে দিতাম না।

ছোকরা আবার বেঁকে বলল, না—কুড়ি টাকা নিয়ে দিতে পারব না এ জিনিষ—

তবে থানায় চল।

অমূল্য চোখ টিপে প্রণবের কানে কানে বলে, না দিয়ে উপায় আছে? এমন প্যাঁচে ফেলা হয়েছে! যা বলেছি, দেড় শ'র এক আধেলা কম নয় এর দাম। টাকা বের করুন আপনি—

ছোকরা মুঠো খুলে ঘড়িটা আবার দেখায়।

দেখুন দিকি, কুড়ি টাকা মাত্র দেবেন আমায়?

রোদ ঠিকরে পড়ে ঝিকমিক করছে ঘড়িটা। না, এর দাম দেড়শ টাকা, অসম্ভব মনে হয় না প্রণবের কাছে। লোভ হচ্ছে জিনিষটার প্রতি, বিশেষ এত সস্তায় যখন পাওয়া যাচ্ছে। বলে, তা হলে বাড়ি অবধি যেতে হবে যে আমার। পঁয়ত্রিশ টাকা সঙ্গে নেই। ঐ সামনেই—বাঁয়ে মোড় নিয়ে আমাদের বাড়ি।

চলুন—

কয়েক পা গিয়ে সেই ছোকরা প্রণবের হাত ধরে ফেলল। বিশ্বাস করে যাচ্ছি, কোন রকম হৈ-চৈ না হয় এ নিয়ে।

কেউ জানতে পারবে না। বাইরের ঘর থেকেই বিদায় করে দেব তোমাদের।

প্রকাণ্ড বাড়ি, মস্ত ফটক। ফটকে পাঁচ-ছ' জন দরোয়ান। ঢুকতে গা ছম-ছম করে। ঢোকা যাচ্ছে তো সহজে, বেরিয়ে আসাটাও এমনি সহজ থাকলে হয়।

না, ভাল লোক প্রণব। ঘড়িটা নিয়ে সে অমূল্যর হাতে পনের আর জল্লাদের হাতে—জল্লাদ সেই ছোকরাটি—কুড়ি টাকা দিয়ে দিল। দু'জনে দ্রুত বেরিয়ে আসছে, ফটকের কাছাকাছি এসেছে—

কে?

অমূল্যও প্রশ্ন করে, কে? বিষম অবাক হয়ে গেছে সে। অভিলাষ—যমুনার বাপ অভিলাষ এখানে! দারোয়ানদের ঘরের পাশে চাতাল আর চৌবাচ্চা। অভিলাষ সেখানে স্নান করছে।

অভিলাষ-কাকা কবে এলে? এখানে এসে উঠেছ, কাদের বাড়ি এটা?

আগর-হাটির ঘোষ মশায়রা নতুন এই বাড়ি করেছেন এখানে।

বজ্রাহত হল অমূল্য। যাকে ঘড়ি গছিয়ে দিল, প্রণব নাকি সেই? প্রণব---যার কথা প্রায়ই আজকাল শোনা যাচ্ছে প্রভাবতী ইন্দ্রলাল প্রভৃতির মুখে।

কিন্তু তুমি অভিলাষ-কাকা ও বাড়িতে কখনো দেখা পাই না, এ বাড়ি এসে উঠেছ কেন?

অভিলাষ বলে, মাঝখানের মানুষ আমি যে বাবা। নতুন চর আর আগরহাটির মাঝে বাড়ি। বড়লোকের বাড়ির ধারে থাকি, ভাব-সাব রেখে চলতে হয়। লড়াই সমানে সমানে চলে---আমরা উলুখড়, যে আসে তারই পায়ের নিচে আগে ভাগে মাথা নিচু করি।

জহ্লাদ অপেক্ষা করছিল, চোখের ইসারায় অমূল্য তাকে সরে যেতে বলল। দ্রুত সে অদৃশ্য হল। অভিলাষের কথা অমূল্য মনে মনে ভাবছে! আজকে না হয় আগরহাটির প্রান্তে বসতি হয়েছে, কিন্তু যখন রায়গ্রামের এপারে ছিলে? সেই বড় বিবাদ-বিসম্বাদের সময়েও আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে তুমি অষ্টবেকি পার হয়ে যেতে, অনেক বার এর-তার কাছে খবর পাওয়া গেছে। পাওখানি বড় সোজা নও তুমি অভিলাষ-কাকা।

একবার মনে করল, সে যে টাকা নিয়েছে, কোন অজুহাতে প্রণবকে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। চেনা-জানার মধ্যে জুয়াচুরি করা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু না—চিরকালের শত্রু এরা! সেই দাঙ্গার সময় হাঁটু ভেঙে দিয়েছিল তার বাবার, স্বরূপের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। বনমালী খোঁড়া হয়েছে আর স্বরূপ পাগল হয়ে গেছে সেই থেকে। অভিলাষ উলুখড় বলে পরিচয় দিতে পারে, এখানে এসে দহরম-মহরম করতে পারে, কিন্তু ঢালির ছেলে সে—আগের ইতিহাস ভুলবে কি করে? সাকুল্যে পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়েছে, জিনিষটার দাম সিকে পাঁচেক হতে পারে বড় জোর। বিকালবেলা প্রণব দেখবে, ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে; আর দোকানে নিয়ে গিয়ে শুনবে, সোনা নয়—উপরটা গিল্‌টি করা শুধু। অমূল্য বা জহ্লাদের যে এতে হাত আছে, তারও প্রমাণ হবে না। একজন পথে কুড়িয়ে পেয়েছে, আর একজন কিছু ভাগ আদায় করেছে মাত্র।

অভিলাষ বলে, আসল কথাই এখনো বলিনি তোমাকে। যমুনার বিয়ে—শ্রাবণের শেষাশেষি। যেতে পারবে? যাও তো খুশি হব বড্ড।

বিয়ে? যমুনার? কোথায় হচ্ছে বিয়ে?

কোন একটা গ্রামের নাম করল অভিলাস। এখন আর ওসব গ্রামের কথা মনে পড়ে না। যমুনাই কেমন যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে মনে। সকৌতুকে অমূল্য বলল, অতটুকু মেয়ে—তার বিয়ে দিচ্ছেন?

অভিলাষ বলে, মেয়ে আর অতটুকু আছে নাকি? গ্রাম ছেড়ে এসেছ কম দিন তো হল না! ভাবছ, তেমনি বুঝি আছে। যমুনা তো বাড়-বাড়ন্ত চিরদিন—এমন হয়েছে, সত্যি বয়স বিশ্বাস করতে চায় না।

জ্যোৎস্নার কথা মনে এল অমূল্যর। রোগা চঞ্চল ছোট্ট মেয়েটা ছিল, এখন কেমন সুন্দর হয়েছে, রং ফেটে পড়ছে, চলনে একটা ভারিক্কি ভাব এসে গেছে। আঁটো ব্লাউস আর পাতলা শাড়ির আড়াল দিয়ে যৌবন উচ্ছ্বলিত হয়ে বেরোয়। যমুনার প্রসঙ্গে জ্যোৎস্নার কথাই তার মনে বেশি করে আসে। যমুনা দূরবর্তী হয়ে গেছে, যমুনা আর বেঁচে নেই তার মনের মধ্যে।

ভাবতে ভাবতে সে বেরুল। পিছন থেকে অভিলাষ বলে, পার তো যেও যমুনার বিয়েয়। যাবে?

অমূল্য জবাব দিল না। চলেছে, খররৌদ্র আর মাথায় লাগছে না তার। একটা ট্রাম পেয়ে গেল, উঠে পড়ল গাড়িতে। চাঁদনিতে এসে নামল। পনের টাকা পকেটে রয়েছে, আপাতত সে বড়লোক। ধোলাই-করা ধুতি কিনল, পেটেন্ট-লেদারের পাম্পস্ কিনল, সস্তা দরের এসেন্সও কিনল একশিশি।

[ক্রমশ:

হে জননী

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

হাত ধরে নিয়ে চল অক্ষয় স্বর্গে,
অসুর নিধন করি দুর্জ্জয় খড়্গে।
রক্ত পিপাসু পশু হিংস্র দুরন্ত
উত্তাল কামনার উৎস অনন্ত
নির্দ্দয় অপঘাত হানিছে দিগন্তে
বিশ্ব বিদরে বুঝি নিজ নখ-দন্তে!
ঝলকি উঠুক অসি ঊর্দ্ধে সদর্পে,
ভল্ল উঠুক নাচি' প্রমত্ত গর্ব্বে;
সচকিত ভুজে দশ-প্রহরণ দীপ্ত
চমকি' উঠুক রোষে উদ্দাম ক্ষিপ্ত,
শঙ্খ বাজুক জোরে, সর্পিণী শঙ্খিনী
ফুঁসিয়া উঠুক ফণা মেলি' নিঃশঙ্কিনী,
তার মাঝে শুরু হোক মহারণ নৃত্য,
তাণ্ডবে ভ'রে যাক নিখিলের চিত্ত;—
ভল্লে বিদারো দেবি, দানবের বক্ষ
কৃপাণে ছিন্ন হোক কবন্ধ লক্ষ;
নাগিনীর নিঃশ্বাসে পুড়ি হোক অঙ্গার
দুর্ব্বার অহমিকা, দুষ্ট অহংকার!
দলিত ছিন্ন শির কর্দ্দম পঙ্কে
লুণ্ঠিত হোক অরি ধ্বংসের অঙ্কে,
আর্ত্তের বরাভয় আনো রণচণ্ডিকে
নির্ভয় করো এই বিশ্বের গণ্ডীকে।
জরা হোক খণ্ডিত মুক্তির খড়্গে
হাত ধ'রে নিয়ে চল জীবনের স্বর্গে।

ভারতীয় কলায় উজ্জ্বল মধুর রস

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ভারতীয় কলা যখন সভ্য সমাজের নিকট প্রথম উদ্ঘাটিত হয় তখন তাদের পক্ষে এ কলাটি একটা কৌতুকের ব্যাপারই হয়েছিল। শত বৎসর পূর্ব্বের পর্য্যটকেরা এর ভিতরকার নিবেদনে কিছুমাত্র দন্তস্ফুট করতে পারেনি, কাজেই তারা একথা বলে যে ভারতীয় আর্ট বলে' কোন জিনিষই নেই। যা আছে তা গ্রীস, পারস্য, মিশর, চীন ও অন্য জায়গা হ'তে অনুকরণ

পটেশ্বর মন্দির হর-গৌরী (বাঙ্গালা দেশ)

করা একটা পাঁচমিশেলী ব্যাপার। সংস্কৃত ভাষা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন তা ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণদের একটা জাল বল্‌তে অনেক ইউরোপীয় মহারথী উৎসাহিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে Dugald Stuart "denied the reality of such a language as sanskrit altogether and wrote his famous essay to prove that Sanskrit had been put together after the model of Greek and Latin by those arch-forger and liars —the Brahmins and that the whole Sanskrit literature was an imposition. [Maxmullar, The science of language, vol 1.P. 229] ক্রমশঃ যখন ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়, তখন ইউরোপের পণ্ডিতেরা বল্‌তে সুরু করলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটিই চুরি-করা ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। একজন ইউরোপীয় আলোচক কিছুকাল পূর্ব্বেও লিখেছেন—"On ancient Indian art we have established Algeah, Assyrian, Persian, Grecian, Hellan, Roman, Chinese, Islamic and modern European influence—Rupam 192 july.

লেখকের এই মন্তব্যে ভারতীয় কলার ইজ্জৎ রইল সামান্য। সার জন মার্শেল আর এক ডিগ্রি উর্দ্ধে গিয়ে দেখিয়েছেন যে সারনাথের রচনায় পারস্য প্রভাব প্রচুর এবং ভারতীয় তক্ষণ কলা Alexendreanদের নিকট হ'তে basrelief রচনা [Imperial Fazettear, 1908. Vol II.] অনুকরণ করেছে। মার্শেল সাহেবের ধূর্ত্ততার সীমা নেই। ভারতের অর্থে পুষ্ট হয়ে ভারতকে গালাগালি করার কায়দায় ইনি পারদর্শী হয়েছিলেন।

সে যাক্, যখন ভারতবর্ষ কেবল চুরিই করেছে, এরকম অভিযোগ করতে করতে ক্রমশঃই তা একঘেয়ে হয়ে পড়ে। তখন সুরু হল স্পষ্ট ভাবে এর নানা রকম দোষ উদ্ঘাটন। শুধু Vincent Smith নয়, প্রায় প্রত্যেক আলোচক কোন না কোন দিকে ভারতীয় আর্টকে কুৎসিত বলতে ইতস্ততঃ করেনি। সার জর্জ বার্ডউড্ বুদ্ধমূর্ত্তি such pudding-এর সহিত তুলনা করে বরং ভদ্রতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। আরও নিম্নস্তরের অপভাষণ হয়েছে যা কথ্য নয়। Leonel Baruett একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি Antiquities of India নামক গ্রন্থে বলেছেন, "The Carvings of Elora are marked by the fantastic and Grotesque spirit of the age······a delirium of passion expressed in loathsome extravagance; Heated imagination debauching the purity of art begot a spurious method" [Antiquities of India p. 256]. ইংরাজী ভাষার ইতর শব্দ এতে আর বাকি রইল না। এ রকমের গালাগালি অত্যন্ত কদর্য্য বলে বিলাতের তেরজন শিল্পীকে একটা আপত্তি প্রচার করতে হয়। কিন্তু তা'তে কাজ অগ্রসর হয় নি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম রসিকেরা আজ পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক কথাই ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বলেছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত Rogertry বল্‌ছেন:— "The tropical exuberances of his fantastic and sometimes monstrous inventions seems unchecked······" ভারতীয় কলাকে "fantastic" ও 'montrous" না

বলেছেন এমন আলোচক কম—কি প্রাচীন কি আধুনিক যুগে।

এজন্য দু একজন এই অবিচারের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করেন। হ্যাভেল সাহেব এক নূতন থিওরী (Theory) খাড়া ক'রে বলেন, এ সমস্ত রচনার ভিতর কুৎসিৎ কিছুই নাই কারণ এ সমস্তই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এ সব সৃষ্টির বিচার পার্থিব দিক হতে করা চলবেনা। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, দান করলে সব পাপ ঢাকা পড়ে। Charity covers all sins. তেমনি আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে সব ঢাকা চাপা দেওয়ার চেষ্টা সফল হয় নি। কারণ রসিকেরা ভারতীয় আর্টে ঐহিক অনেক রস বস্তুও দেখতে পেরেছেন। কাজেই Rotheinsten প্রমুখ আলোচকেরা হ্যাভেলের এ সব কথা গ্রাহ্যই করেন নি। তিনি বলছেন হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর আধ্যাত্মিক মতের দোহাই গ্রহণ করা চলেনা।

হ্যাভেল একটা নূতন মতের রব্ সৃষ্টি করে শুধু এক শ্রেণীর আলোচকদের এক নূতন পথ কেটে দেয়। তারা বলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অর্থাৎ যা ইহলোকের নয় এমন ব্যাপারে ভারতের বাহাদুরী আছে—এর মানে হল ঐহিক কোন সৃষ্টি করতেই ভারতবর্ষ জানেনা। আর্ট দুনিয়ার সৃষ্টি—এ সৃষ্টি ভারতবর্ষে অতি কদর্য্য ভাবেই বাচে, কারণ ভারত এসবকে মায়ার ব্যাপারই মনে করে। ফলে রসকৃত্যে এবং রূপরচনায় ভারতের কৃতিত্ব এরা অস্বীকারই করেছে। ধূর্ত্ত সার জন মার্শেল হ্যাভেলের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতীয় সৃষ্টি তুচ্ছ বলে নিজের মত জাহির করেছেন। তিনি বলছেন ভারত সংসারকে তুচ্ছ করেছে বলে শুধু অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম বিষয় সম্বন্ধে ভারতের কৃত্য ভাল হয়েছে আর সমস্ত হয়েছে চুরি কিম্বা অকিঞ্চিৎকর। কথাটি এমন মিষ্ট করে বলেছেন যে অনেকেই হঠাৎ মনে করেন যে এর ভিতর বুঝি প্রশংসাই আছে। তিনি বলছেন :— "To the Greek man man's beauty and man's intellect were everything and it was the apotheosis of this beauty and this intellect which still remained the keynote of Hellenistic art even in the orient but these ideals awakened no response in the Indian mind. The vision of the Indian was bounded by the immortal rather than the mortal by the infinite rather than the finite" অর্থাৎ গ্রীকদের নিকট মানবীয় সৌন্দর্য্যানুভূতি ও জ্ঞান চর্চ্চা ছিল সর্ব্বস্ব—কিন্তু এদের এই সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানচর্চ্চা ভারতের মোটেই প্রিয় ছিল না, ভারতের ক্ষেত্র ছিল মৃত্যুর পরপারের ব্যাপারে এবং সীমার বাইরের অস্পষ্ট ক্ষেত্রে।

এত বড় মিছে কথা আর কেউ বলে নি। এসব দেখে মনে হয় ভারতীয় রসকৃত্যের আলোচনার বিন্দু মাত্র অধিকার এদের নেই। এদেশে শুধু ধর্ম্ম ও মোক্ষ নিয়ে কাজ শেষ করে নি কাম ও অর্থ সম্বন্ধে প্রচুর সাধনা হয়েছে। চৌষট্টি কলার চর্চ্চা হয়েছিল কি মৃত্যুর পরপারের জন্য না সীমার বাইরে প্রয়োগের জন্য? বস্তুতঃ ভারতীয় চিন্তা সীমাবদ্ধ জগৎ সম্বন্ধে প্রচুর ব্যবস্থা করেছে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিবাদ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে উপদেশ কি ছায়ালোকের জল্পনা মাত্র? কৌটিল্যের অর্থনীতির

হর-পার্ব্বতি (ত্রিচিনপল্লী)

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা কি পরলোকের জন্য হয়েছিল? শরীরের সৌন্দর্য্য বিধান ও শত্রু নিধনের নানা আয়োজন ও কুটিল নীতি কি পরকালের জন্য সঞ্চিত করা হয়েছিল? বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নাগরিক জীবনের বিবরণ আছে:—নাগরিকের গৃহে যুগের সমস্ত বিলাস দ্রব্যই সঞ্চিত থাকে—অতি কোমল আরাম চৌকি, ভগবানের আনন্দ বাটিকা, ফুল ছড়ান বোস্‌বার আসন, নারীদের আনন্দ বিধানের ললিত দোলা। নারীরা পুরুষদের সঙ্গে আরাম অবসর ও আনন্দভোগের অংশ গ্রহণ করে; নিজের দেহরাগ ও সজ্জার জন্য নাগরিক বহু সময়ও অর্থ ব্যয় করে। স্নানের কারুতা, গন্ধদ্রব্য লেপনের ব্যবস্থা, সুগন্ধি মজ্জনে ভরপুর হওয়া, এবং ফুলের মালা পরিধান এসব অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। চারিদিকে খাঁচায় আবদ্ধ পাখীদের কথা শেখান তার আনন্দের বিষয় ছিল, কিন্তু ভেড়া বা মুরগীর লড়াই দেখে

সে নিষ্ঠুর হর্ষ পেতে অভ্যস্ত ছিল। এ দুটি সেকালের ধনী যুবকদের প্রিয় বস্তু ছিল। তা ছাড়া বিলাসিনী প্রেয়সীদের সঙ্গে নগরের বাইরে উদ্যানে আমোদ প্রমোদ করে রাত্রিতে ফুলের মুকুট পরে বাড়ী ফিরে আসা এসব ছিল দৈনিক কাজ। বাড়ীতে ভোগকরা হ'ত বাদ্যোত্তম সঙ্গীত, ও যৌথ নৃত্য। কিম্বা কোথাও বা অভিনয় দেখতে যাওয়া হত। তার হাতে থাকত বাঁশী, তা সে বাজাত এবং একখানি বইও সে রাখত, মাঝে মাঝে তা' পড়ত।

রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি (পাহাড়পুর)

চাটুকার ও ইয়ার না হলে তার আনন্দ ষোল কলায় পূর্ণ হতনা"।

এইত ছিল সে কালের সমাজজীবন—যখন ভারতীয় রূপকারেরা চারিদিকে রমণীয় কলাকৃত্যে আত্মনিয়োগ করে। এসব কি পরলোকের কাজ ? দণ্ডিনের দশকুমার চরিতে আমরা পাই, ছোটলোক গুণ্ডা, জুচ্চোর যাদুকর, ভণ্ড সাধু। বারনারী, চতুর চোর, উচ্ছাস পূর্ণ প্রেমিক দলের ছবি। ধর্ম্ম জগতের প্রতি অবজ্ঞা এসব জায়গায় ত সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ ভারতের প্রাচীন নাগরিক জীবন উক্ত মানবতা, প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও জটিল সামাজিকতায় ভরপুর ছিল—সকলেই বুদ্ধদেবের মত ধ্যানমগ্ন বা দণ্ডী সন্ন্যাসীর মত কমণ্ডলু নিয়ে সংসারকে অসার বলতনা। অন্যান্য কাব্যে ও নাটকেও প্রাচীন ভারতের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বাসবদত্তা, প্রভৃতিতেও জীবনের সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি মত্তপ্রেরণা ও নিপুণ চিন্তাজাল সহজেই প্রকাশিত হয়েছে। এসব যুগ ছিল তন্ত্রদ্বারা প্রভাবিত—তন্ত্রের মুক্তিবাদ ছিল ভোগের ভিতর দিয়ে—ত্যাগ বা বৈরাগ্যের নয়।

এ জন্য কৌটিল্য প্রাচীন যুগেও শত্রু নিধনে সকল রকম কৌশল প্রয়োগের মন্ত্রণা দিয়েছিল। অল্পদিন হ'ল দার্শনিক Spalding ইউরোপের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন—ভারতের অসাধারণ কৃতিত্বের দিকে ইহলৌকিক ব্যবস্থায় পারলৌকিক শুধু নয়। তিনি বলেছেন :— The **Artha-Shastra advocates the application of charms, medicine, defensive contrivances, the** use of destructive gas, medicines, poisons to hinder or maim the opponents" [p. xix bk. VII. 17 অর্থশাস্ত্র] বস্তুতঃ সেকালের রাজচক্রবর্ত্তীরা দিগ্বিজয় করেছে এবং ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি নীতি অবলম্বন করে রাজাকে রক্ষা করেছে। এসব যে পারলৌকিক কৃত্য নয়, আশা করি Sir John Marshall তা' স্বীকার করবেন। কাজেই ইহলোকেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত চর্চ্চা ভারতবর্ষে হয়েছে। সৌন্দর্য্যরচনা-ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ঐহিক দান এত বিপুল যে, এসব সাধুচি লোকের মন্তব্য পাঠ ক'রে অবাক হ'তে হয়।

ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যরচনা কতকগুলি গেরুয়া সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সমাধিপ্রিয় উদাসীনদের রচনায় পর্য্যবসিত হয়নি। যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তা'তে এত সমারোহ প্রকাশ পেয়েছে যে, অনেক আলোচক আবার ভারতীয় কলাকে 'sensual' বলতেও ইতস্ততঃ করেননি। বহু-রসসমাবেশের বহুমুখী কারুতা এখানে এক নব-জীবন লাভ করেছে—তা একান্তভাবে বর্ব্বর ইন্দ্রিয়ভোগও নয়, কৌপীনবস্ত ত্যাগীদের জীর্ণ ও শুষ্ক চর্ব্বিতচর্ব্বণও নয়।

ভারতবর্ষের উপনিষদ-যুগ রসতত্ত্ব আলোচনা ক'রে ভগবানকে রসস্বরূপ ব'লে ব্যাখ্যা করেছে। উপনিষদে আছে আনন্দবাদ, কাজেই তা' রসের আদর্শের উপর নিহিত। এ রসই পাওয়া যাচ্ছে সর্ব্বত্র জীবনে ও মরণে। "এতেন জাতানি জীবন্তি" এই আনন্দের দ্বারাই মানুষ বেঁচে আছে। পরবর্ত্তী যুগের তন্ত্র বলেছে, ইহলোক পরলোকেরই অঙ্গাঙ্গী। সোনার তৈরী বলয়ও সোনা ছাড়া কিছু নয়—কাজেই ভগবানেরই রূপ পরিগ্রহ করেছে এই জগৎ। যা উর্দ্ধস্তরে কল্পিত তা নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে : 'ভোগঃ যোগায়তে সম্যক্ মোক্ষায়তে চ সংসারঃ।" সংসারই মোক্ষধাম। এই তত্ত্বের উপরই ভারতীয় শিল্প-লীলার অনুপম সুষমা ব্যাপ্ত হয়েছে।

এজন্য দেখতে পাই দেবতার জীবনেও ঐহিক রস-মূর্চ্ছনা কল্পিত হ'য়ে এক বিরাট মানবিকতার ক্ষেত্র রচিত হয়েছে—তা'তে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এক হয়েছে।

রসতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যাত নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার-রসকেই বিশেষভাবে ভোগাত্মক বলা হয়। এই ভোগের অভিনয় ঐহিক মানবত্বের মধ্যেই লীলায়িত হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ নেতিমূলক (negative) ধর্ম্মগুলি ভীরু অপরাধীর ন্যায় শৃঙ্গাররসের কোন প্রসঙ্গই উচ্চতর চিন্তায় স্থান দেয় নি। যীশুখ্রীষ্টের মাতা আছে, পিতা নেই—যীশু আছে, যীশুর পত্নী বা সহকর্ম্মিণী কোন নারী বা দেবী নেই। এটা হচ্ছে একটা প্রবল অস্বীকৃতি comic order এর। নারীত্ব যেন একটি সৃষ্টির কলঙ্ক!

এ রকমের অবাস্তব, দুর্ব্বল এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্রতর জগতের কোন সমস্যাই পূরণ করতে পারে না। এ দেশের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ প্রভৃতি সুলভ ভক্তিও নেতিমূলক প্ররোচনা হ'তে জন্মেছিল। ভারতীয় সভ্যতার শতদলে তা' অতি সামান্য প্রভাবই বিস্তার ক'রেছে।

এ দেশের শৃঙ্গার-রসের অতীন্দ্রিয় নায়ক হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শিব। এই রসকে কোন কোন তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ-রস ব'লে ব্যাখ্যা করেছে। ভোজরাজেরা সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণে বলছেন, শৃঙ্গার রসই একমাত্র রস—"রসঃ শৃঙ্গার এবৈকঃ।" ভারতীয় রসতাত্ত্বিকদের এরকম কথা শুনে' হাভেল সাহেব বা লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon) কি ভাববেন? তাঁ'রাও কি বলবেন—

"এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?"

এ ক্ষেত্রে এ রকমের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে নাকি? কোথা শৃঙ্গার রসের সহিত হবে অহিংস অসহযোগ—তার পরিবর্ত্তে বলা হচ্ছে কিনা শৃঙ্গার রস একমাত্র রস!

উপায় নেই। ভারতীয় তন্ত্রের শক্তিবাদ সমগ্র চিন্তা-ক্ষেত্রেই এই ভিত্তি আবিষ্কার করেছে। দেবেরা হবেন দেবীসংযুক্তরূপে কল্পিত—তা' না হ'লে জগৎকে ব্যাখ্যাই করা যাবে না। দেবীবর্জ্জিত দেব, শক্তিহীন অকেজো ও জীবনহীন! জীবন বা গতি কল্পনা করতে হলেই দেবীকে যোগ করতে হবে। এ যোগের মূলে শৃঙ্গার-রসই প্রধান রস ব'লে আখ্যাত হয়েছে। এজন্য শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণপত্যাদি সকল মতের পোষকেরাই নিজের প্রধান দেবকে দেবী বা শক্তিযুক্ত কল্পনা করেছে। এমন কি, বুদ্ধকেও শক্তিযুক্ত ক'রে তাঁর বৈরাগ্য ও গেরুয়াকে চিরকালের জন্য বিদায় দেওয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় শৃঙ্গার-রসের মর্য্যাদার কথা স্বতঃই হবে। শৃঙ্গার-রসেরও উভয়দিক না দেখলে তাকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভারতবর্ষের সেই অস্খলিত উক্তিকে স্মরণ না করলে জাগতিক বা পারমার্থিক বিচারে সকলকেই বিচারমূঢ় হ'তে হবে। সে উক্তি হচ্ছে—এই জগৎপ্রপঞ্চকে উর্দ্ধমূল ও নিম্নশাখ অশ্বত্থের মত দেখতে হবে: উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ"

কঠ ২।৩।১

শাখা হ'তে মূলকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। উচ্চতর স্তরে শৃঙ্গার-রস হচ্ছে একটা তুরীয় আকর্ষণ, তাতে স্থূল কিছু নেই—মাংসল কোন উপকরণ নেই—কাজেই তা' হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির মত একটা 'cosmic draw'। বিদ্যুতের যেমন positive ও negative—ইতি ও নেতিমূলক অঙ্গ আছে—যে দুটি মিলেই এক হয়—তেমনি তুরীয় সত্তাতেও প্রকৃতি ও পুরুষ, শক্তি ও শিব, এই দু'টি pole বা মেরু কল্পিত হয়েছে। কাজেই এতে কোন বর্ব্বর স্থূলতা বা ইন্দ্রিয়জ খণ্ডতা নেই—তা পবিত্র ও সূক্ষ্ম ব্যাপার। এজন্য প্রত্যেক শ্রেণীর সাধকেরা শক্তিযুক্তভাবেই দেবতাকে আরাধনা করতে শিক্ষালাভ করেছেন।

শৃঙ্গার-রসই মধুর রস। উজ্জ্বল রসই শৃঙ্গার রস। ভারত এই রসকে 'উজ্জ্বল' বলেছেন—এই রসই প্রধান রস। কাজেই ভারতীয় দেবতাগণের এই রসে প্রভাবিত কল্পনা করা একান্ত স্বাভাবিক। তবে স্তর হিসেবে এর তারতম্য আছে এবং রকমারি আছে। এ দেশের অর্দ্ধ-নারীশ্বর কল্পনায় শৃঙ্গার-রসের একটা চরম প্রতিমা উদ্ভাসিত হয়েছে—রসগত ঐক্যের সহিত রূপগত ঐক্যকে সংহত করা হয়েছে।

পাহাড়পুরের সপ্তম শতাব্দীর রচনায় রাধাকৃষ্ণের যুগ্মমূর্ত্তি দেখে মনে হয়—তা' যেন অখণ্ড সৃষ্টি। রাধা ও কৃষ্ণের দেহভঙ্গী একই ছন্দে গাঁথা, কোথাও এর ভিতর খণ্ডতা নেই—দু'টি মিলে যেন এক মূর্ত্তি। শিল্পী উভয়কে ভেদ রেখেও রূপের তালে অভেদ করেছে! খাজুরাহোর হরগৌরী রূপ-কৌলীন্যে একটা অভ্রভেদী শৃঙ্গ রচনা করেছে। বাঙ্গলা দেশের জটেশ্বর মন্দিরের হরগৌরীতে শৃঙ্গার-রসের অতুলনীয় প্রতিফলন আমাদের অবাক্ ক'রে দেয়। মানবিকতার স্তরে দিব্যত্বকে এনে শিল্পী রসের ওতপ্রোত দিগ্বিজয় প্রমাণ করেছে। কারণ দেবতাকেও মানবের ছন্দে আঁকতে হয়। ত্রিচিনপল্লীর হরগৌরীর স্নিগ্ধ মুখশ্রী, ললিত পদক্ষেপ এবং অখণ্ড প্রয়াণ এই রসকে মুখর ক'রে তোলে গতিছন্দের ভিতর।

বস্তুতঃ তুরীয়তাও হিন্দুর প্রভাবে মানবত্বের প্রভাবে দীপ্যমান হয়েছে। ইউরোপীয় আলোচকদের বিপরীত পথেই হিন্দুতত্ত্ব অগ্রসর হয়েছে। 'immortal'কে mortal-এর বৃত্তে এনে ভারতীয় শিল্পী ধন্য হয়েছে। এতে হেরফের নেই, কষ্টকল্পনা নেই, কোন ঢাকাচাপা ব্যাপারই এটি নয়।

রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল মধুর রসকে ভক্তিরসরূপেই

কল্পনা করেছেন। কৃষ্ণরতি ভক্তির অভিনয় মাত্র—এই উজ্জ্বল রসের অভিনব প্রয়োগ। এটা এই উদ্ধ অবস্থায় কিছু মাত্র হেয় নয়, এ কথা বল্‌তে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। কারণ, বৈরাগ্যবাদ এ'কে কুঞ্চিত ললাটে দেখতে অভ্যস্ত। এজন্য রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণিতে বল্‌ছেন :—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি ॥১৬

ভক্তিক্ষেত্রে যিনি নমস্ত নায়ক, তাঁকে শৃঙ্গার-রসের লক্ষ্য করা একটা নূতন আরোপ। তবুও ভক্তদের এই সাবধান উক্তি। প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদই এর হেতু। অথচ বিরাট এসিয়াব্যাপী তন্ত্র-সাধনায় নারীত্ব বা দেবীত্ব নিয়ে কোন বিভীষিকা জন্মেনি—নারীর আসন ছিল উপরে। দেবীর আসনও এতটা উচুতে ছিল যে, মহাদেবাদিকে দেবীর পাদমূলে আছে—এ রকম উক্তি ক'রে দেবীভাগবত সৃষ্টিতত্ত্ব অবতারণা করেছে :—

"এতে পঞ্চ মহাভূতা মম পাদমূলে স্থিতাঃ।"

মেদিনীপুরে ঝড়ের গান

শ্রীঅতনু গুপ্ত

মেদিনীপুরে যে প্রলয় ঝড় বহিয়াছিল, স্থানীয় অখ্যাত কবিরা গানের দ্বারা এখনও তাহার ব্যথা-ভরা স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন। গ্রামের ভিখারীরা তাহাদের রচিত গান গাহিয়া এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। যাহারা গান গায়, তাহারা সাধারণতঃ বানে-ভাসা নিরাশ্রয় ভিখারী। স্থানীয় লোকেরা তাহাদিগকে বলে গান-ভিখারী। ইহারা যখন একতারা ও মন্দিরা যোগে করুণ সুরে এই করুণ গানগুলি গায়, তখন বালক-বালিকা ও নর-নারী ভিড় করিয়া তাহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া বসে, গানের করুণ সুরে সকলেরই ব্যথায় ঘা লাগে, সকলেরই মনে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠে আর গায়কের সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখেই জল ঝরে। রচনায় কৃতিত্ব নাই, সুরে নূতনত্ব নাই কিন্তু এই অনাড়ম্বর পল্লী-সঙ্গীতে এমন এক করুণ ঝঙ্কার আছে যাহা সকলেরই মনে ছোঁয়া দিয়া যায়, বুকে রোমাঞ্চ জাগে। এইরূপ দুইটি গান এখানে সংগৃহীত হইল।

(এক)

মরি, হায় হায় হায় রে!
বন্যার জলে লোকে দলে দলে ভেসে ভেসে ঐ যায় রে।
পূজক বসিয়া পূজিছে জননী
এমন সময় কাঁপিল ধরণী
প্রতিমা পড়িল পূজারী উপরে পূজক মরিয়া যায় রে।
গৃহী ও গৃহিণী ঘরে ছিল সুখে
চারি ছেলে মেয়ে বেঁধে নিয়ে বুকে,
এল কাল ঝড় ভাঙ্গে মড় মড় দেওয়াল চাপিয়া যায় রে।
পরদিন প্রাতে স্বজন বঁধুয়া
মড়া টানে সবে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া,
সব চলে গেছে বুড়ী আছে বেচে কে বোঝাবে বুড়ো মা'য় রে।
তরা থালে দেখি সাতটি জীবন
দড়ি দিয়ে বাঁধা ঠেকাতে মরণ
বাঁচিবার আশে বেঁধেছিল পাশে প্রাণ নাহি তবু পায় রে! (১)
যুবক-যুবতী ছিল দুইজন
প্রাণে প্রাণে গাঁথা দু'য়ে এক মন,
বানের জলেতে ঢেউ খেতে খেতে জড়াজড়ি করি যায় রে!
দু'জনে মরেছে কেউ ছাড়ে নাই
মুখে মুখে বুকে বাঁধি এক ঠাঁই
কোলাকুলি আর গলাগলি ধরি চুমু যেন দোঁহে খায় রে!
মাঠের মাঝারে গাছ এক ছিল
ডাল পালা ভেঙ্গে গুঁড়ি সার হল
(সেই) গুড়ির আড়ালে সাপেতে নেউলে পনেরটি
বেঁচে যায় রে! (২)
পড়ে ছিল এক ভাঙ্গা গোরু-যান
তার তলে ছিল সাত হনুমান,
তিনটি শেয়াল পাঁচটি কেউটে আধমরা সব হায় রে! (২)
এমন বিপদ পার হল যারা
আত্মীয় লাগি কেঁদে হল সারা
কারো নাহি মাতা কারো নাহি পিতা কেউ স্বামীহারা হায় রে!
এর চেয়ে ভাল ছিল রে মরণ
ধুঁইয়া ধুঁইয়া জ্বলিবে জীবন,
ধান-চাল, তরি-তরকারী নাই, কিবা খেয়ে বাঁচি ভাই রে!
হরেকৃষ্ণ বলে, ওগো ধনিজন!
যেবা যাহা পার কর দান ধন
সকলি অসার জীবন যৌবন সার কর তাঁর পায় রে!

(দুই)

সুধীজন শুন্‌বে কিগো, মেদিনীপুরে ঝড়ের কথা?
শুন্‌লে পরে ঘুরবে মাথা মনের তলে পাবে ব্যথা।
তিন দিন ধরে বাদল হয়েছে ঝর্ ঝর্ ঝরে বৃষ্টি,
কে জানে তখন হইবে এমন পালটি যাইবে সৃষ্টি,
পুব দিক থেকে গোঁ গোঁ করে, সাগরের জল এল জোরে তেড়ে,
ঘর-বাড়ী সব ভেঙ্গে গেল ঝড়ে, কে আর পালাবে কোথা!
চারিদিকে শুনি গুরু গরজন শন্ শন্ ঝরে তীর
খোঁচার আঘাত সহে নেয় পিঠে কে আছে এমন বীর!
প্রলয় নাচনে ধরণী দোলে, সন্তান কাঁদে জননী-কোলে
হাম্বা হাম্বা গাভীরব জেলে আঘাতে চৌচির মাথা।
ভাঙ্গিল জাঙ্গাল পড়িল দেওয়াল গোরু বাছুর মরে সব,
কে কাহারে দেখে কে কাহারে রাখে চলিছে আর্ত্তরব,
করি ঠাসাঠাসি এল পাশাপাশি, একই ঘরেতে সবে বসে আসি
কেবা কার মাতা কেবা মাসীপিসি ছাড়াছাড়ি হল সেথা।
এমন সময় দুমানুষ উঁচু জোরে ছুটে আসে জল
পাহাড় ভাঙ্গিয়া দুকুল ছাপিয়া যেন রে নামিল ঢল,
ভসাইল যত নরনারী গোরু, ভেসে গেল সব আশ্রয়-তরু
মহাকালিকার যূপকাঠে যেন পড়ে গেল সব মাথা।

---

১) সম্ভবতঃ ইহারা ঝড়ের ঝাপ্‌টা হইতে বাঁচিবার জন্য সকলকে একত্র দড়িতে বাঁধিয়া গাছে আশ্রয় লইয়াছিল।

(২) ঝড়ের পরদিন দেখা গিয়াছে বেঁজি ও সাপ, হনুমান ও কুকুর অথবা শেয়াল ও কুকুর একত্র পাশাপাশি আশ্রয় লইয়াছে।

চানের ঘরে

গল্প - শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি - শ্রী নীহারিকা ঘোষ।

দুই কুমারী পিসীর জীবন একমাত্র ভাইপো প্রসূনকে অবলম্বন করিয়া, প্রসূনের যত্ন, প্রসূনের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বহিতেছে।

তাহাদের আর কোন অবলম্বন নাই—তাহারা ছিল দুই বোন এক ভাই। মা বাবার কাছে ছেলেতে মেয়েতে পার্থক্য ছিল না, বোন দুইটিও ভাইয়ের সঙ্গে সমানে দৌড়-ঝাঁপ, লেখাপড়া, পরীক্ষায় পাশ এবং বি-এ গ্রাজুয়েট হইল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে পিতামাতার দেহান্তর, ভ্রাতার বিবাহ ও চাকুরী, প্রসূনের জন্ম, প্রসূনের মাতার মৃত্যু, বছর কয়েক বাদে প্রসূনের পিতারও মৃত্যু, পিসীদের মিষ্ট্রেসি গ্রহণ এবং প্রসূনকে প্রতিপালন ইত্যাদি ঘটনাগুলি কালচক্রের গতিতে একে একে ঘটিয়া গেল।

প্রসূন এখন বেশ বড় হইয়াছে, এম-এ পাস্ করিয়া ভাল চাকুরী করিতেছে। পিসীরা বলেন, "এবার বিবাহ কর"—প্রসূন বিশেষ কাণ দেয় না।

পিসীদের এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকার কারণ খুঁজিতে যাইয়া কেহ যদি তাহাদের যোমস্ত বয়সের প্রেমানুভূতির দিকটার কোন ইঙ্গিত করিতে চাহে তাহাতে অবশ্যি আমাদের কোন আপত্তি নাই। আর শুধু আমাদের কেন, পিসীদের নিজেদেরও কোন আপত্তি নাই—তাহারা নিজেরাই তাহাদের ছোট বয়সের কথাগুলি বেশ 'রসিয়ে রসিয়ে' আলোচনা করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তাহারা সংস্কারমুক্ত। দু'জনের প্রেমপাত্রকে দু'জনেই জানে। দু'জনের জীবন প্রায় এক সঙ্গেই বিয়োগাত্মক হইয়াছে। তা হোক—সে বিষয়ে তাহারা এখন আর খুব বেশী ভাবে না, মনে হইলে হাসি পায়—হাল্কাভাবে উড়াইয়া দেয়।

এখন তাহাদের ভাবনা শুধু একটি, কি করিয়া প্রসূনকে বিবাহ দেওয়া যায়। লক্ষ্যটা তাহাদেরই স্কুলের একটি নবনিযুক্তা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি। মেয়েটি যাকে এক কথায় বলা যায়—খাসা। এই খাসা মেয়েটির নাম চিন্তা। চিন্তা বিদেশ হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে এবং থাকিবার স্থানের অভাবে অসুবিধায় পড়িয়াছে। চিন্তার এই থাকিবার স্থানের অসুবিধার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দুই পিসী ফিস্‌ফাস্ করিয়া কি খানিকটা পরামর্শ করিল—বুঝিতে পারা গেল, তাহাদের মৎলব ভাল নয়।

একদা প্রসূন অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই দুই পিসী ভারী খুসী খুসী মুখে প্রসূনকে বলিল, "আজ তোকে অবাক ক'রে দোবো প্রসূন, যা তাড়াতাড়ি জামা কাপড় বদলে আয়, চায়ের জল বসিয়ে দিচ্ছি।"

প্রসূন হাসিতে হাসিতে ওপরে উঠিয়া গেল। পিসীদের এ-রকম অবাক করিয়া দেওয়ার সহিত প্রসূন বহুদিন হইতেই পরিচিত। হয়তো এক ডিস তাহার পছন্দমত খাবার। কিম্বা একটা ভাল কিছু উপহার এইতো!

প্রসূন জামা কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া সংলগ্ন স্নানঘরের দিকে অগ্রসর হইল। প্রত্যহ বৈকালে অফিস হইতে ফিরিয়া তাহার স্নানের অভ্যাস। আজ আবার একটু বেশী খাটুনি গিয়াছে। ঠাণ্ডা জলে গা ভিজাইয়া বেশ আরাম করিয়া সে স্নান করিবে—ভাবিতে ভাবিতে সে স্নানঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিল দ্বার বন্ধ, আবার জোরে ধাক্কা দিল, আরো জোরে মচমচ করিয়া হাতলটা ঘুরাইতে লাগিল—দরজা খুলিল না, বেশ শক্ত হইয়া আঁটিয়া আছে। দুই পিসী আর সে ব্যতীত এ বাড়ীতে আর কেহ নাই—পিসীদের নীচে দেখিয়া আসিয়াছে, সুতরাং বাথরুম বন্ধ থাকিবে কেন! সে আরো জোরে ধাক্কা দিল। হঠাৎ ভেতর হইতে কাঁচা কাঁচা মেয়েলি স্বরে উত্তর আসিল, "আমি ভেতরে রয়েছি, আমার হয়ে গেছে—আসচি।"

এবার প্রসূন সত্যি অবাক হইল। এমন একটা কিছু ঘটিবার কোন কথা ছিল না। প্রসূন তো জানে তাহাদের আর কোন আত্মীয়-স্বজন নাই, তবে বাথরুমে এমন কণ্ঠস্বর কেন? তার অতিপ্রিয় ঠাণ্ডা জলগুলি ছপ ছপ করিয়া কে যেন ফেলিতেছে—জলগুলি তির্ তির্ করিয়া ড্রেণ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রসূনের অতি আকাঙ্ক্ষিত শীতল জল, প্রসূন করুণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া রহিল।

দোতলার বাথরুমে অল্প অল্প করিয়া জল জমে—মাত্র এক-জনের আন্দাজ জল হয়। যিনি ভিতরে স্নান করিতেছেন তাঁহার স্নানের পরে জল আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। প্রসূন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বৈকালে স্নান না করিতে পারিলে তাহার বিশ্রী লাগে—ইহা তাহার ছোট বেলার অভ্যাস। নীচের

কলতলা ভাড়াটেদের ভাগে, সেখানে ভাড়াটেদের মেয়েছেলেদের গতিবিধি ; পিসীরা সেখানেই স্নান করে কিন্তু প্রসূন যাইতে পারে না।

কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া মুখে চোখে ছিটাইয়া প্রসূন খানিক বাদে আধা বিরক্ত মনে নীচে নামিয়া আসিল। চায়ের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিল একটি মেয়ে তাহারই নির্দ্দিষ্ট চেয়ারের পাশের চেয়ারটিতে বসিয়া আছে, প্রসূন ঘুরিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের চেয়ারে যাইয়া উপবেশন করিল। পিসীরা খাবার রাখিয়া মেয়েটিকে বলিয়া গেল, "চিন্তা, খাবারটা তুমি ভাগ ক'রে দাও তো----ততক্ষণে চায়ের জল নিয়ে আসি।"

প্রসূন বুঝিল মেয়েটির নাম চিন্তা। চিন্তা বেশ নিপুণতার সহিত সপ্রতিভভাবে তাহার উপর অর্পিত কাজ করিতে লাগিল। পিসীরা দু'জনের সহিত দুজনকে পরিচয় করাইয়া দিল। চিন্তা বেশ প্রসন্ন মনেই প্রসূনকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। 'ভারি আর কি' প্রসূন মনে মনে ভাবিল, 'আমার চানের জল সবটুকু খরচ ক'রে আবার নমস্কার'----কিন্তু প্রসূন মনে মনে যাহাই ভাবুক সৌজন্যের খাতিরে তাহাকেও হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইতে হইল।

চা পান শেষ হইতেই প্রসূন ওপরে উঠিয়া গেল, চিন্তাও ঠিক তাহারই সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। দুজনের গতির দিকে দুষ্টু দুষ্টু করিয়া তাকাইয়া ছোট পিসী বলিল, "খাসা মানাবে দু'টিতে।"

"সত্যি----এখন ভালয় ভালয় ওদের মনের মিল হয়—তবেই সর্ব্বরক্ষে" বড় পিসী উত্তর দিল।

"কাঁচা বয়েস, বলছি দেখে নিও---এর পরে দু'টিকে দু' জায়গায় করতে পারবে না এমন মিশে যাবে, দু'টা দিন অপেক্ষা কর" ছোট পিসী মন্তব্য করিল।

ওপরে উঠিয়া প্রসূন সোজা চিন্তার মুখোমুখি হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, "আপনি ক'দিন থাকবেন এখানে ?"

"আপনার পিসীরা ত বরাবরের কথাই বললেন।"

"তা থাকুন---কিন্তু মেয়েদের চানের জায়গা নীচের কলতলায় ---এ বাথরুমে কেবল আমি চান করি।"

"নীচের ঐ খোলা কলতলায় ? তা আমি পারব না।"

"ওদিকে পুরুষরা কেউ যায় না।"

"তা হোক, বাথরুম ছাড়া খোলা জায়গায় আমি চান করতে পারব না----আমি ওপরেই চান করব" চিন্তা সোজা উত্তর দিল।

"বিকেলে চান করা আমার ছোট বেলার অভ্যেস" প্রসূন বলিল।

"আমারো ঠিক তাই----একদিন বিকেলে চান না করলে মাথা ধরে, শীতকালেও ব্যতিক্রম হয় না" চিন্তা উত্তর দিল।

"কিন্তু তত জল কোথায়, দু'জনের চানের জল জমবে না।"

"তা হ'লে আপনি বরং সন্ধ্যার পরে চান করবেন, ততক্ষণে জল জমবে" চিন্তা নিতান্ত নিশ্চিন্তমনে যাইয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রসূন মনে মনে ভাবিল, মেয়েটি দেখিতে সুন্দর হইলে কি হইবে, বড় জেদী---পরের বাড়ী থাকিতে হইলে যে সহিষ্ণুতা এবং বাড়ীর লোকের সুবিধা-অসুবিধা দেখিয়া চলিবার যে ভদ্রতাজ্ঞান থাকা দরকার তাহা মেয়েটির নাই।

কিন্তু প্রসূনের সম্পর্কে চিন্তা ভাবিল অন্য প্রকার---লোকটা আর সব বিষয়ে মন্দ নয় কিন্তু ভারি ঝগড়াটে। একে অতিথি, তাতে মেয়েছেলে---প্রথম কথাতেই ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মেয়েদের সম্পর্কে যে সাধারণ সম্মানবোধ থাকা দরকার তাহা লোকটির কিছুমাত্র নাই।

পরদিন প্রসূন অফিস হইতে একপ্রকার ছুটিতে ছুটিতেই বাড়ী ফিরিল, আজ তাহাকে আগেই বাথরুমে ঢুকিতে হইবে। কিন্তু প্রসূনের অদৃষ্ট মন্দ। চিন্তা আজ দশ মিনিট আগেই ছুটি লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে এবং বাথরুম হইতে তখন জল পড়ার শব্দ হইতেছে। প্রসূন দাঁতে দাঁত চাপিয়া মনে মনে বলিল, "রোজ তো আর আগে আগে ছুটি পাবে না, দেখব কাল।"

পরদিন দু'জনে এক সঙ্গেই ফিরিল। দু'জনেরই কপাল হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। প্রসূন তিন লাফে দোতলায় উঠিয়াই কোট প্যাণ্ট ছাড়িতে লাগিল। ভাবিল মেয়েদের কাপড় বদলাইতে দেরী হইয়াই থাকে, ততক্ষণে সে বাথরুমে—আজ আর চালাকি নয়।

সেদিন প্রসূনেরই জয়। প্রসূন স্নান করিয়া বেশ প্রসন্ন মনে নীচে নামিয়া আসিল, তাহাকে আজ সত্যি সুন্দর দেখাইতেছিল। চিন্তা মনে মনে বলিল, "লোকটা এমনি তো বেশ সুপুরুষ, ব্যবহার যদি আর একটু ভদ্র হইত তবে আর কোন খুঁৎ পাওয়া যাইত না।"

পরদিন প্রসূন যখন বাড়ী ফিরিয়া সতৃষ্ণ আগ্রহে স্নানঘরের দিকে তাকাইল, তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টির সামনে বাথরুম খুলিয়া চিন্তা বাহির হইয়া আসিল। চিন্তার হাতে স্কুলে যাওয়ার ভ্যানিটি ব্যাগ, বেঁটে ছাতা, নোট-বুক, পায়ে স্কুলের জুতো—কিন্তু বাহির হইয়া আসিল স্নানঘর হইতে। হাসি হাসি মুখে প্রসূনকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ স্কুল থেকে ফিরে সোজা বাথরুমে ঢুকেছিলাম, কিছু মনে করবেন না, আপনার চানটা আপনি রাত্তিরেই করবেন প্রসূনবাবু।"

'চান আর করতে হবে না' প্রসূন মনে মনেই বলিল, "আপনার কথা শুনেই শরীর জল হয়ে গেছে।"

পরদিন কিন্তু প্রসূনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। চিন্তা শনিবারের ছুটিতে তার কোন বান্ধবীর সহিত বান্ধবীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে, প্রসূন এই দু'দিন বেশ নিশ্চিন্ত আরামে প্রাণ ভরিয়া স্নান করিল।

সোমবারে চিন্তা ফিরিয়াছে। সেদিন যথারীতি প্রসূন অফিস হইতে ছুটাছুটি করিয়া বাড়ী ফিরিল। আজ সে আগেই পৌছিয়াছে, চিন্তা এখনো স্কুল হইতে আসে নাই। দ্রুত তৈরী হইয়া সে তোয়ালে এবং সাবান লইয়া বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইল। সিঁড়িতে চিন্তার পায়ের শব্দ। ততক্ষণে প্রসূন বাথরুমের

দরজায়। কিন্তু বাথরুম খুলিতে যাইয়া প্রসূন বিস্মিত হইল, হাতলের সহিত একটি কার্ড ঝুলিতেছে, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, —'বাথরুম অব্যবহার্য্য, মেরামত হইতেছে।' আজ বাথরুম মেরামত হইতেছে—পিসীরা সে বিষয়ে তাহাকে কিছুই জানান নাই। হয়তো অফিসে চলিয়া যাওয়ার পর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। প্রসূন বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। ইতিমধ্যে চিন্তা উঠিয়া আসিয়াছে, প্রসূনের নিকটে আসিয়া বলিল, "কি প্রসূনবাবু কি হলো, বাথরুম বন্ধ বুঝি? আর এক জন ভাগীদার জুটলো নাকি?"

চিন্তা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া লেবেলটি দেখিয়া বিস্মিত স্বরে বলিল, "ও মা—তাইতো, কখন আবার মেরামত সুরু হ'ল? রকন তো আমার ছাতাটা, দেখি একবার।"

প্রসূনের হাতে নিজের ছাতাটা গুঁজিয়া দিয়া চিন্তা বাথরুমের হাতল ধরিয়া ঘুরাইল, বাথরুম খুলিয়া বাথরুমে প্রবেশ করিল। তাহার পর হাতলের লেবেলটি একপাক উল্টাইয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বাথরুমের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। লেবেলের উল্টাদিক এবার প্রসূনের চোখে পড়িল, বিস্মিত প্রসূন বড় বড় চোখ করিয়া দেখিল তাহাতে লেখা রহিয়াছে—'মাপ করবেন প্রসূনবাবু।'

চিন্তার দুষ্টু বুদ্ধিতে যথেষ্ট কৌতুক থাকিলেও প্রসূনের মনের অবস্থা তখন সেই কৌতুক ভোগ করিবার উপযুক্ত অবস্থায় ছিল না। প্রসূনের পায়ের নিকট দিয়া তাহার প্রিয় স্নিগ্ধ শীতল জল ফেনায়িত হইয়া গড়াইতেছে, প্রসূনের মন নিতান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, প্রসূন বিড় বিড় করিয়া উচ্চারণ করিল জ্যাঠা মেয়ে, ছেলে জ্যাঠা বরং সওয়া যায় কিন্তু মেয়ে জ্যাঠা নিদারুণ। তাহার পর ছাতাটা সেখানেই ফেলিয়া সে নিজ ঘরে ফিরিয়া গেল।

চায়ের টেবিলে যখন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার বহু পূর্ব্বেই প্রসূন আসিয়াছে। মদের মত রঙিন একখানা শাড়ী চিন্তা আজ সুন্দর করিয়া পরিয়াছে, তাহার সুঠাম দেহের উপর শাড়ীর বর্ণ বিচ্ছুরিত হইয়া তাহাকেও মদির করিয়া তুলিয়াছে। চিন্তা আসিয়াছে পর হইতে চা তৈরী করে চিন্তাই। চায়ের বাটিটা প্রসূনের দিকে চিন্তা ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দিল। ব্যথিত ভাবে প্রসূন ভাবিল—আহা এই মেয়েটি যদি একটু কম স্বার্থপর হইত তবে কতই না ভাল হইত।

প্রাতে বাথরুম লইয়া কোন অসুবিধা হয় না, প্রাতে যে জল জমিয়া থাকে তাহা তিন চারিজনের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত। পরদিবস প্রাতে চিন্তা বাথ-রুম হইতে বাহির হইয়াছে—ঠিক সেই সময় বড় পিসী আসিয়া চিন্তাকে বলিল—সে কোন এক বিখ্যাত চিত্র-গৃহের একখানি ফ্রি পাশ পাইয়াছে এবং সে নিজে যাইতে চাহে না। চিন্তা ইচ্ছা করিলে সেই পাশখানা লইয়া সন্ধ্যাটা উপভোগ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, চিন্তা সেইরূপ ইচ্ছা করিল এবং পাশখানা সযত্নে নিজের কাছে রাখিল।

কাজেই সেদিন তাহার বাথ-রুমের বিশেষ প্রয়োজন, সে একটু তাড়াতাড়িই ছুটী লইয়া বাসায় ফিরিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য সেদিন তাহার দিকে। আসিয়া দেখিল—প্রসূন বাথ-রুমের দ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। সে দ্রুত বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন প্রসূনবাবু, আমার একটা কথা আগে শুনুন"।

প্রসূন অপেক্ষা করিল, বলিল, "কি কথা বলুন"। ততক্ষণে চিন্তা প্রসূনের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অকস্মাৎ হাত দুটি জোড় করিয়া বলিল, "আজ—অন্ততঃ আজকের দিনটা দয়া করুন প্রসূনবাবু, আমার বিশেষ দরকার, আজ আমাকে বাথ-রুমটা ছেড়ে দিন, আর এক দিন আমিও আপনাকে ছেড়ে দেবো"।

অমন সুন্দর মেয়ের অমন সুন্দর মুখ হইতে এই রকম মিনতির কথা বাহির হইলে তাহা উপেক্ষা করা বড় সহজ নয়। প্রসূনের মন নিতান্তই নরম হইল, সে প্রায় দরজাটা ছাড়িয়া দিয়াছিল আর কি, এমনি সময় গতকল্যকার অভিজ্ঞতা তাহার স্মরণে উদয় হইল, সে ভাবিল এ আবার আর এক প্রকারের ছলনা। বলিল, গত কাল মেরামতের লেবেল মিথ্যে করে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, আজ আবার একটা মিথ্যে দরকারের অজুহাত দিচ্ছেন না, তার বিশ্বাস কি?

"বিশ্বাস করুন, আজকের দিনটা অন্তত বিশ্বাস করুন, আমাকে যেতে দিন" বলিয়া চিন্তা প্রসূনকে পাশ কাটাইয়া বাথ-রুমের দিকে অগ্রসর হইল। চিন্তা বাথ-রুমের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকটা গিয়াছে—প্রসূন হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। চিন্তা একেবারে অবাক্ হইয়া গেল, এমন করিয়া প্রসূন তাহার গায়ে হাত দিতে পারে—এ কথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই, ফিরিয়া বলিল, "আপনি কি সভ্য-জগতের মানুষ নন?"

"কেন বলুন ত"? প্রসূন সাধারণ ভাবেই উত্তর দিল

"মেয়েদের প্রতি একটু সম্মান পর্য্যন্ত দেখাতে জানেন না।"

"মেয়ে? মেয়ে কে? আপনি কি মেয়ে নাকি? আশ্চর্য্য করলেন সত্যি—ট্রামে বাসে বসবার আসন না পেলে তখনই আপনারা যে মেয়ে সে কথা আপনাদের স্মরণ হয়—সাধারণ ব্যবহারে ত' আপনারা পুরুষদের ওপর দিয়ে যান।"

"কেন যাব না, আমরা কি মানুষ নই, অনেককাল আপনারা পুরুষরা আমাদের ঠকিয়ে এসেছেন, আমরা আর ঠকব না। এখন সমান সমান চলব, সমান অধিকার আদায় করব।"

"বাঃ চমৎকার" প্রসূন তারিফ করিল, "ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই আপনাকে আমি আমার সমান মনে করে টেনে এনেছি—যেমন আনতাম আমার সমান সমান আর একজন পুরুষ হ'লে। সুতরাং আপনার ত দুঃখ করার কিছু নেই। পাশ্চাত্য দেশেও এমনিই হয়—প্রতিযোগিতার দ্রুত বেগের মাঝে সামান্য সংঘর্ষে ওদেশের মেয়েরা কিছু মনে করে না। পুরুষদের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতায় চ'লবেন অথচ একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই আঁৎকে উঠবেন তা কেমন করে হবে—এত স্পর্শাতুর কেন আপনারা?"

"পাশ্চাত্য দেশের কথা ছেড়ে দিন, আমরা পাশ্চাত্য দেশের মেয়ে নই" চিন্তা উত্তর করিল, "আমরা ভারতবর্ষের মেয়ে—আমাদের আদর্শই অন্য রকম।"

"তবে সেই আদর্শে চলুন, তারপর সেই সম্মান দাবী করবেন।" বলিতে বলিতে বাথরুমের মধ্যে প্রসূন অদৃশ্য হইয়া গেল।

"আহ্লাদে খোকা" চিন্তা নিজের মনে মনেই উচ্চারণ করিল, "আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে দুই পিসী মাথাটা একবারে খেয়ে দিয়েছে—একটি জন্তু তৈরী ক'রেছে" চিন্তা আরো ভাবিতে লাগিল, "কিন্তু প্রসূন যখন তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিল তখন তাহার স্পর্শটুকু—" ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার সমস্ত গা' আবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই স্থানটিতে সস্নেহ স্পর্শ করিয়া ভাবিল, "আহা প্রসূন বাবু যদি অমন গোঁয়ার না হইতেন তবে কিন্তু বেশ হইত।"

চিন্তা একটু তাড়াতাড়িই চিত্রগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখনও লোকসমাগম খুব ঘন হয় নাই। ধীরে ধীরে লোক আসিতেছে। চিন্তার ঠিক পাশের আসনটি খালি রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে ঘর ভরিয়া গেল। চিন্তা ভাবিতেছে তাহার পাশের আসনটি খালি থাকিলেই বেশ হয়—আর নিতান্তই যদি কেহ সেই আসন গ্রহণ করে তবে, তবে—হাঁ তবে এই মাত্র যে যুবকটি পর্দা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল তেমনি একটি সুদর্শন যুবকই যেন—

অকস্মাৎ চিন্তার ভাবধারা ভীষণভাবে আহত হইল, সেই লোকটি আর একটু নিকটে অগ্রসর হইলে দেখিল—যুবকটি আর কেহ নয়, প্রসূন। আজ প্রসূনকে সত্যি মনোহর দেখাইতেছে। চিন্তা মনে মনে চিন্তা করিল "এমন মোহন যাহার আকৃতি, তাহার প্রকৃতিটা যদি ওরাং ওটাংএর মত না হইত, তবে চিন্তা হয় তো কত সুখীই হইতে পারিত।"

আরও আশ্চর্য্য! প্রসূন আসিয়া ঠিক তাহার পাশের আসনটিই গ্রহণ করিল। প্রসূনও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিতে নারীরা যদি ভুল না করে তবে চিন্তা বুঝিল—প্রসূন সত্যি মুগ্ধ ভাবেই চিন্তার দিকে তাকাইয়া আছে। চিন্তার সৌন্দর্য্যও মুগ্ধ হইবার মত সৌন্দর্য্যই।

প্রসূন বিস্মিত স্বরে বলিল, "আপনি।"

"হাঁ, আপনার বড় পিসী একটা পাশ দিয়েছিলেন।"

"আমিও ছোট পিসীর পাশ নিয়ে এসেছি—কিন্তু আমাকে তো কিছুই বলেন নি তাঁরা" প্রসূন আবার বলিল।

"তা হবে" নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গেই চিন্তা উত্তর দিল এবং সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের প্রাচীর-চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

প্রসূন ভাবিল যতদূর হবার নয় তাহার চাইতেও বেশী বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, এবার একটা মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার। ভাবিল ইণ্টারভ্যালের অবকাশে চিন্তাকে সে চা পানের নিমন্ত্রণ করিবে এবং চায়ের পাত্রের মাঝে দু'জনের মনের ক্ষোভ বিসর্জ্জন দিবে।

'ইণ্টারভ্যালের' সময় প্রসূন চিন্তার দিকে ফিরিয়া বলিল, "শুনুন"।

চিন্তা আবার সেই প্রাচীর-গাত্রের ছবিই দেখিতেছে। নিতান্ত উপেক্ষার সহিত মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল "বলুন"।

তাহার এইরূপ দৃঢ় ও সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যে প্রসূন অপমানিত বোধ করিল। "না কিছু না" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রসূন বাহির হইয়া গেলে চিন্তা ভাবিল, "সত্যিই তো এ' আমি করিতেছি কি? ভাল একটা আশ্রয়ের অভাবে যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম—এঁদের কাছে পাইলাম নিরাপদ এবং আরামজনক আশ্রয় ও আহার। পিসীরা নিজ সন্তানের মত স্নেহ-যত্ন করেন। নিজের বাড়ীতেও এত আবদার চলে না—এদের গৃহে যেমন ভাবে আছি। নিজ সহোদর দাদার সহিত কি বাথরুম লইয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি করার সাহস হইত—ছি ছি, নিতান্ত নির্লজ্জের মতই ব্যবহার করিয়াছি। প্রসূন বাবুর অসুবিধা হইবে জানিয়া পিসীরা পর্য্যন্ত নীচে যাইয়া স্নান করে, আর আমি সম্পূর্ণ বাহিরের এক মেয়ে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতে চাই গৃহকর্ত্তাকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া—নাঃ, এবার প্রসূন ফিরিয়া আসিলেই প্রসূনের নিকট মার্জ্জনা চাহিতে হইবে।"

খানিকবাদে প্রসূন ফিরিয়া আসিল অত্যন্ত গম্ভীর মুখে এবং নিজের আসনে বসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ফিরিয়া রহিল। চিন্তা বলিল, "শুনুন।"

প্রসূন মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল, "বলুন"।

চিরন্তন নারীপ্রকৃতির অভিমানে এই তাচ্ছিল্য আঘাত করিল। "না—কিছু না" বলিয়া চিন্তা মুখ ঘুরাইয়া লইল।

প্রসূন এবং চিন্তা যখন চিত্রগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল তখন অল্প অল্প জল ঝরিতেছে। প্রসূন বলিল, আমার মোটর-বাইকের তিন চাকাটা লাগিয়ে এনেছি, পাশে বসে যেতে পারেন। চলুন না তাই যাওয়া যাক্। অবশ্যি কিছু কিছু ভিজতেই হবে, তাহলেও বাড়ী ফিরে জামাকাপড় বদলে ফেললেই চলবে।

"আপনি তাই যান, আমি ট্যাক্সিতে ফিরব" চিন্তা উত্তর দিল।

প্রসূন জানিত এ অসময় ট্যাক্সি পাওয়া গেলেও ক্ষমতাতীত মূল্য হাঁকিবে। জল জমিয়া ট্রাম-চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বাসগুলিতে অসম্ভব ভিড়। চিন্তার অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে বুঝিল; কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই—সে চলিয়া গেল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চিন্তা তাহার অবস্থা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিল এবং অগত্যার সম্বল অত্যন্ত চড়া মজুরিতে একটি রিক্সা ভাড়া লইয়া অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে জল আরও জোরে ঝরিতে সুরু করিয়াছে। রিক্সার অপ্রচুর আবরণ ভেদ করিয়া চিন্তাকে প্রায় স্নান করাইয়া দিল, চিন্তার শীত শীত করিতে লাগিল। এই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যেও চিন্তার মনে শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা যে বাড়ী ফিরিয়া সে ভাল করিয়া স্নান করিতে পারিবে। খানিকটা জল গরম করিয়া সে বেশ আরাম করিয়া স্নান করিবে।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল উনুন অবসর নাই, ভাবিল ঠাণ্ডা জলেই স্নান করিবে—তার আর কি, টাটকা জলই তো। চিন্তা যখন তৈরী হইয়া নিজ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইল, দেখিল বাথরুম বন্ধ। "সর্ব্বনাশ! প্রসূনবাবু ঢুকিয়াছেন নাকি!" চিন্তা যদি এখন একবার স্নান করিতে না পায় তবে সে কেমন করিয়া থাকিবে। রিক্সার টেপারি জলে তাহার সমস্ত শরীর ঘিন ঘিন করিতেছে—রাত্রে তাহার ঘুমই হইবে না। চিন্তা দ্রুত অগ্রসর হইল এবং বাথরুমের হাতলটা ধরিয়া জোরে ঘুরাইল। নাঃ—ভিতর দিক হইতেই বন্ধ।

'কে' ?"—ভিতর হইতে প্রসূনের গলার আওয়াজ পাওয়া

গেল। সম্পূর্ণ হতাশভাবে চিন্তা বাথরুমের সিঁড়িটার উপর বসিয়া পড়িল, "স্বার্থপর, একের নম্বরের স্বার্থপর এই লোকটা" চিন্তা মনে মনেই ভাবিল, "অফিস থেকে ফিরে ভাল ভাবেই একবার চান করেছে, আবার সিনেমা থেকে ফিরে এসেই ঢুকেছে—আমার কথা একবার ভাবেওনি বোধ হয়। লোকটা শুধু স্বার্থপরই নয়, নিতান্ত নির্দ্দয়ও" চিন্তার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

বাথরুমের দরজাটা খুলিয়া গেল এবং চিন্তা নিজের চোখের জলকে গোপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিল।

প্রসূন বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনি যান বাথরুমে, জল তৈরী আছে—যান, স্নান করুনগে।"

চিন্তা ততক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে, বলিল, "কেন, আপনি চান করবেন না? আপনি সেরে নিন, আমার না হলেও চলবে।"

"অচল হয়ে কিছুই থাকে না, চলবে ঠিকই। কিন্তু অসুখ হয়ে পড়বেন। আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনাকে ভিজতে ভিজতে আসতে হবে। তাই আপনারই জন্যে গরম জল মিশিয়ে চানের জলটা তৈরী করে রাখছিলাম" প্রসূন বলিতে লাগিল, "জলটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, যান তাড়াতাড়ি চানটা সেরে নিন। তারপর আমাকেঁ আর একবাটি চা তৈরী করে দিতে হবে কিন্তু।"

প্রসূনের এইরূপ স্নেহের স্বর চিন্তার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে একটু পুলকিতও হইল একটু বিস্মিতও হইল, কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলিল, "না, আমি চান করব না—আপনি করুন।"

"আপনি বড্ড ঝগড়াটে মেয়ে।"

"বটেতো—আর আপনি?"

"আমি কি রকম ছেলে তাও আপনার অজানা নেই, জোর করে চান করিয়ে দেব কিন্তু। যান, শীগ্‌গির ঢুকুন বাথরুমে।"

প্রসূনের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়—চিন্তা ভাবিল। একটু ভয়ও হইল। জোর—আবার জোর; চিন্তার দেহ আবেগে শিহরিয়া উঠিল। সে জিদ করিয়া বসিয়াই রহিল, বলিল, "স্পর্দ্ধা আপনার কম নয়, দেখুন না একবার জোর করে, মজাটা বুঝবেন।"

হঠাৎ প্রসূন একটু ঝুঁকিয়া চিন্তার হাত দুটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল "উঠুন, শীগ্‌গির উঠুন, তা নইলে বাথটাবের জলের মধ্যে নিয়ে ঝুপ করে ফেলে দিয়ে আসব বলছি।

চিন্তা ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইল, এক ঝটকায় হাত দুটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, ডাকব নাকি পিসীদের।"

"তবে দেখুন" প্রসূন অকস্মাৎ চিন্তাকে একবারে আল্‌গা করিয়া নিজের দুই হাতের উপর তুলিয়া লইল, চিন্তাও টাল সামলাইবার জন্য প্রসূনকে হঠাৎ খুব জোরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ছি ছি, পিসীরা দেখলে কি মনে করবে, হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি, ছেড়ে দিন।"

চিন্তাকে লইয়া প্রসূন ততক্ষণে বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ল্যাভেণ্ডারের মিষ্টি গন্ধে বাথরুম ভরিয়া গিয়াছে। সলজ্জ রাঙামুখে চিন্তা মধুর করিয়া বলিল, "জলে আবার ল্যাভেণ্ডারও মিশেয়ে দিয়েছেন, দেখছি—আজ আপনার হয়েছে কি? এত দরদ।"

ধীরে ধীরে চিন্তাকে বাথটাবের উপর নামাইয়া দিতেই ঈষদুষ্ণ সুগন্ধ জলের স্পর্শের সহিত প্রসূনের অতিনৈকট্য সংস্পর্শ চিন্তাকে

প্রসূন অকস্মাৎ চিন্তাকে একবারে আল্গা করিয়া নিজের দুই হাতের উপর তুলিয়া লইল ··

আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রসূন তাহাকে ছাড়িয়া দিল বটে কিন্তু প্রসূনকে ছাড়িতে চিন্তার আর মনে রহিল না। প্রসূন তাহার ভিজা শরীরটা আবার তুলিয়া লইল। একটা মিষ্টি হাসি চিন্তার মুখে লাগিয়া আছে, চিন্তার চোখ অর্দ্ধ-নিমীলিত। প্রসূনেরও কি হইল কে জানে। ধীরে ধীরে তাহার ঠোঁট দুইটি চিন্তার ঠোঁটের উপর নামিয়া আসিতে লাগিল। সমস্ত শরীরে অকস্মাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়া চিন্তা হঠাৎ বলিয়া উঠিল "ভুক্ত।" কিন্তু চিন্তা নিজের মনে মনে বুঝিল, ভুক্ত বলা যত সহজ ভাবা তত সহজ নয়। চিন্তা নিজেই নিজের সহিত প্রতারণা করিল। চিন্তা উপলব্ধি করিল প্রসূনের উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ তাহারও বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

বাথরুমের দরজাটা খোলা ছিল, তাহাদের এই কাণ্ড আড়াল হইতে দুই পিসী ভালভাবেই লক্ষ্য করিল।

"কিন্তু যে এসে পড়বে সে যদি দরজা বন্ধ দেখে বলে বাথরুমের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দু'টিতে কি হচ্ছে, তখন তুমি কি কৈফিয়ৎ দেবে ?" প্রসূন বলিল।

চিন্তা উত্তর দিল "বলব—একটা দস্যু আমাকে বন্দিনী করে রেখেছে এখানে ; কে আছ ছুটে এস শীগ্‌গির রক্ষা কর আমায়।"

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের কলহাস্যে বাথরুম মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রার্থী (নাটিকা)

শ্রীঅসিতারঞ্জন ঠাকুর

(হাস্য-রূপিকা)

পাত্র-পাত্রী পরিচয়—

রামরতন মিত্র—কোন মার্চেন্ট অফিসের হেড্ ক্লার্ক
রসিক ভাদুড়ী—তদীয় সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু।
প্রশান্ত—রসিক ভাদুড়ীর পূর্ব্ব-পরিচিত চাকরীপ্রার্থী যুবক
উমাসুন্দরী—রামরতনের স্ত্রী
মণিকা—ঐ কন্যা।

[পার্ক-সংলগ্ন কলিকাতার রাস্তা। ফুটপাথের উপর ব্যাফাল ওয়াল। তাহারই অভ্যন্তরস্থ পথ দিয়া মিস্ মণিকা মিত্তির অদূরস্থ পার্কের দিকে প্রাতর্ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন। তাঁহার বয়স আঠার উনিশ হইবে। বেশভূষায় আধুনিকতার অভাব নাই। হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ও মোটা রকমের একখানা বাঁধান বই। পায়ে উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা। হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়া পার্শ্বস্থ ২৫।২৬ বৎসরবয়স্ক যুবক প্রশান্তকে লক্ষ্য করিয়া—]

মণিকা। কি মশাই, কোন্ দিকে তাকিয়ে চলছেন ?

প্রশান্ত। (অপ্রস্তুত হইয়া) আজ্ঞে দেখছিলুম, ওয়ালটার গায়ে wanted বলে কেউ কোন বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছে কিনা ?

মণিকা। সেটা তো বাইরের দিকটাতেই লাগান থাকে, যার প্রয়োজন সেখান থেকেই সে দেখতে পারে।

প্রশান্ত। দেখুন, সবাইএর যা চোখে পড়ে তার সুযোগ নিতে কেউ এতক্ষণ অপেক্ষা করেনি ; তাই ভেতরের দিকটাতেই দেখছিলুম —কারো অদেখা অবস্থায় কিছু পড়ে আছে কিনা। হয়ত বা বরাতে লেগে যেতে পারে। (একটু বিনীত ভাবে) কিন্তু কেন বলুন তো ? আপনার লেগেছে কোথাও ?

মণিকা। (ব্যঙ্গস্বরে) আজ্ঞে হ্যাঁ। লেগেছে বলেই আপনাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছি যে, কলকাতার রাস্তায় চলে বেড়াতে হলে একটু ভদ্দর লোকের মত চলবেন।

প্রশান্ত। কিছু মনে করবেন না। আমি দেখতে পাইনি। বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। I am so sorry.

মণিকা। থাক্, থাক্। ওতেই আমার ভাল হয়ে গেছে।

প্রশান্ত। তার মানে ?

মণিকা। মানে ঐ যে 'sorry' বলে বিদেশী সভ্যতার টনিক খাইয়ে দিলেন, আর দেখতে পাইনি বলে অপরাধ স্বীকার করে নিলেন—ওতে কারো আর কোন অভিযোগ থাকতে পারে ?

প্রশান্ত। তাহ'লে আমাকে কি কর্ত্তে হবে বলুন !

মণিকা। কর্ত্তে আপনাকে কিছুই হবে না। আপনি দয়া করে ও পাশটায় একটু সরে দাঁড়ালে আমি ঐ পার্কটার ভেতর চলে যেতে পারি।

প্রশান্ত। (সরিয়া দাঁড়াইয়া) তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এই আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মণিকা। যা বলতে হয় তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

প্রশান্ত। দেখুন, বিদেশী সভ্যতার ওপর আপনার তো কোন বীতশ্রদ্ধার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। হাতে ভ্যানিটী ব্যাগ, পায়ে হাইহিল্ড্‌ সু, এই ভোর বেলা একাকী রাস্তায় চলা—এসব-গুলোকে কোন প্রাচ্য নীতিই এখন পর্য্যন্ত মেনে নেয়নি কিন্তু।

মণিকা। (একটু অপ্রস্তুত হইয়া) একা আমি আসিনি। বাবা গাড়ী করে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন এবং ফিরবার পথে আমায় তুলে নিয়ে যাবেন। আর পোষাক-পরিচ্ছদটা লোকের ব্যক্তিগত রুচির ওপরেই নির্ভর করে বলে আমার ধারণা। তা ছাড়া, আপনি বোধ হয় জানেন না যে স্কুল-কলেজে পড়তে গেলে এজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়েই থাকে। কিন্তু প্রাচীর-ঘেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরিচয়হীন কোন ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে আলাপ করায় তার বিপদ যে কতখানি এবং লোকে সেটা কি চোখ নিয়ে দেখে—একজন ভদ্রলোকের পক্ষে সেটা ভেবে দেখা উচিত নয় কি ?

প্রশান্ত। এর আমি কি কর্ত্তে পারি বলুন তো ! বোমার বিপদ এড়াবার জন্য বিশেষজ্ঞেরা রাস্তার ওপর প্রাচীর তুলবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় বিপদ যে থাকতে পারে এ কথাটা ভাবতে বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন। নতুবা তাঁদের উচিত ছিল Non-female area declar করে রাস্তার ওপর প্রাচীর তুলবার ব্যবস্থা করা।

মণিকা। আশ্চর্য্য ! Femaleটাই আপনার কাছে মস্ত বড় বিপদ্ মনে হলো ?

প্রশান্ত। কেন নয় বলুন তো ! এই তো স্বচক্ষেই দেখতে

পাচ্ছি, চাকরী খুঁজতে খুঁজতে রাস্তা দিয়ে চলতে পারব না— পাছে আপনাদের গায়ে আঘাত লাগে এই ভয়ে। ওদিকে আবার মিলিটারী লরিগুলোর অদম্য উৎসাহ। আর তা ছাড়া Evacuation এর কথা উঠলেই দেখেছি Female গুলোকেই বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা আগে করা হয়। অবিশ্যি আপনার মত Ladiesদের বোধ হয় কোথাও পাঠাতে হয় নি।

মণিকা। কথা বড্ড বাড়িয়ে তুলছেন। দেখুন তো এরই মধ্যে রাস্তায় কত লোক জমা হয়ে গেছে। ঐ দেখুন, আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। ছিঃ ছিঃ! কি ভাবছে বলুন তো?

প্রশান্ত। কিছুই ভাবতে পারে না—যদি মনে কোন গলদ না রেখে সহজ এবং সরল ভাবে কথা বলতে পারেন। তা হলে ওরাই আবার ভাববে আমরা দুজনেই দুজনের বিশেষ পরিচিত এবং আত্মীয়। সুতরাং দৃষ্টিশক্তির অপচয় ওভাবে ওরা নাও করতে

মণিকা। কিন্তু এর তো কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রশান্ত। দেখুন, সংসারে খুঁজে খুঁজেও অনেক সময় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো মেলে না। অথচ অপ্রয়োজনীয় বস্তু কেমন হাতের কাছে ঘুরে বেড়ায়। এই তো দেখুন রাস্তা দিয়ে চলছিলুম চাকরী অন্বেষণে। এ অভ্যাস শুধু আজ নয়, অনেক দিন থেকেই। জুতোর নীচের দিকটা পর্য্যন্ত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু চাকরী আর খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু জুটে গেলেন।

মণিকা। যথেষ্ট হয়েছে। চলুন, পার্কের ভেতরে যাওয়া যাক্। এখান থেকে আমরা দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ঐ লোকগুলো অন্ততঃ আমাকে যা' তা' ভাববে। পুরুষের স্বভাব তো!

প্রশান্ত। (হাসিয়া) তা বটে। অদৃশ্য কলঙ্কে নারী পুরুষ কারু কোন ভয় থাকবার সম্ভাবনা কম। চলুন, আপনাকে পার্কে পৌঁছে দিয়ে প্রমাণ করে আসি যে, আমরা একই সূত্রে গ্রথিত। মনে যাই থাক্, বাইরের আচরণ দেখে লোকে যাতে সন্দেহ কর্ত্তে না পারে—আধুনিক সভ্যতা সে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে।

(হাসিতে লাগিল)

মণিকা। হাসলেন যে বড়।

প্রশান্ত। (হাসিতে হাসিতেই) একটা কথা ভেবে। আচ্ছা, হাউই বাজী দেখেছেন কখনও?

মণিকা। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রশান্ত। প্রায় বোমারই মত। তবে বোমাটা যেমন হিংস্র জানোয়ারের মত নীচে পড়েই লোকের সর্ব্বনাশ করে, হাউই বাজীটা ঠিক তার উল্টো। শোঁ করে নীচ থেকে ওপরে উঠে গিয়ে একটা শব্দ করে বটে, তবে তার স্ফুলিঙ্গটুকু যায় বাতাসে মিশে।

মণিকা। এ কথার মানে?

প্রশান্ত। (পার্কে প্রবেশ করিয়া) চলুন, ঐ বেঞ্চিটায় একটু বসেই বল্‌ছি। (দুজনেই বসিল) আপনাদের মত মেয়েদের দেখলেই আমার হাউই বাজীর কথা মনে পড়ে। এই দেখুন না, কিছুক্ষণ আগে গায়ে একটু ধাক্কা লেগেছিল বলে আপনি কেমন ক্ষেপে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাগটা কোথায় মিশে গেল। অথচ আমারই মত একজন পুরুষ হলে তার সম্ভ্রম রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে এতক্ষণে বোধ হয় বোমা ফাটার মত আমার মাথাটাকেই ফাটিয়ে দিত! (হাসিতে লাগিল)

মণিকা। হাসি রাখুন। চাকরী তো খুঁজছেন, সন্ধান পেয়েছেন কোথাও কিছু?

প্রশান্ত। পেলে একজন অপরিচিতা নারীর কাছে নিজের এ দুর্ব্বলতার কথা কোন পুরুষ প্রকাশ কর্ত্তে পারে?

মণিকা। আমার বাবার অফিসে গিয়ে দেখতে পারেন একবার?

প্রশান্ত। (উল্লসিত হইয়া) একবার কেন, একশ'বার পারি। কোথায় বলুন তো?

মণিকা। ঐ যে ধর্ম্মতলার মোড়ের বাড়ীটা। সামনেই দেখতে পাবেন বড় বড় হরফে লেখা আছে 'wanted candidates' বলে।

প্রশান্ত। কোন যুদ্ধের কারবারে নয় তো? আর তা হ'লেও আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ আমার প্রয়োজনটাই বড়।

মণিকা। না, না, আমার বাবা যাবেন যুদ্ধের কারবারে! ক্ষেপেছেন আপনি? যে ভীতু লোক তিনি! কিন্তু আপনি এখন উঠে পড়ুন তো। ঐ বাবা আসছেন। এইখানেই তিনি আসবেন কিন্তু।

প্রশান্ত। (উঠিয়াই একটু ব্যস্তভাবে) কিন্তু আপনার বাবার নামটা তো জানা হলো না।

মণিকা। (ভীত-ত্রস্ত ভাবে) আপনি শীগগির এখান থেকে যান! বাবা এসে পড়লেন যে। কি ভাববেন বলুন তো!

প্রশান্ত। বলবেন—ও একটা পাগল! তা হ'লেই আর কিছু ভাববেন না। কিন্তু নামটা—

মণিকা। (ক্ষিপ্রতার সহিত চাপা গলায়) রামরতন মিত্র। ঐ অফিসেরই Officer-in-charge আপনি যান!

(প্রশান্ত চলিয়া গেল)

(রামরতনের প্রবেশ)

রামরতন। ও লোকটা কে রে মণি, অভদ্রের মত তোর পাশে এসে বসেছিল?

মণিকা। (থতমত খেয়ে) বোধ হয় ওর মাথা খারাপ! বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে পাশে এসে বসেছিল। তাইতো ওকে তাড়িয়ে দিলুম।

রামরতন। আচ্ছা বেকুব যা হোক। চল, বেলা বড্ড বেশী হয়ে গেছে। ও-ফুটপাতেই গাড়ী আছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ধর্ম্মতলায় রামরতন মিত্রের অফিস। রামরতনবাবুর সহকর্ম্মী রসিক ভাদুড়ী—প্রৌঢ়বয়স্ক—চোখে চশমা পরিয়া কাগজপত্র সহি করিতে যাইবেন—এমন সময়ে প্রশান্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।]

রসিক। (প্রশান্তর দিকে চোখ পড়িতেই) আরে প্রশান্ত যে! ভাল আছিস তো! হঠাৎ কোত্থেকে এলি?

প্রশান্ত। (সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবেশন করিয়া) অতগুলো

প্রশ্নের কি এক সঙ্গে জবাব দেওয়া যায়? তাছাড়া আমিই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না রসিকদা, যে, তুমি এখানে কোত্থেকে?

রসিক। আরে ভাই বলিস্ কেন। জানিস্ তো—ছিলুম সেই দিল্লীতে। রামরতনদার প্রেমের বন্যায় শেষ পর্য্যন্ত এখানেই ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। তাঁর মতে আমার ন্যায় সুচতুর কর্ম্মচারী নাকি বাংলাদেশে বিরল। তাই তারের ওপর ভার করে আমাকে এখানে চাকরী দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কিন্তু এখন আমিও আর চারদিকের ঝামেলা সামলে উঠতে পারছি না।

প্রশান্ত। তবে লোক চাও না কেন?

রসিক। লোক তো চেয়ে বসে আছি। কিন্তু সে রকম লোক পাচ্ছি কোথা? ম্যাট্রিকুলেট ছেলেগুলো আসে কেরাণী হবার জন্য। Previous experienceয় কথা জিজ্ঞেস করলে প্রায়ই দেখা যায় (a+b)২ ছাড়া তাদের আর কোন experiency ই নেই। ও-সব দিয়ে কোন Responsible work চলে?

প্রশান্ত। আমাকে নেবে?

রসিক। (বিস্মিত হইয়া) তুই এখানে চাকরী করবি? কেন? এখন কি কর্চ্ছিস্?

প্রশান্ত। বেকার যুবকেরা যা করে তা ছাড়া আর নতুন কিছুই নয়। পিতৃদেব দয়া করে যা গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন এত দিন বসে বসে তারই সদ্ব্যবহার করেছি। কিন্তু এখন সেদিকেও ভাঁটা পড়েছে। তাই খোঁজ পেয়ে এলুম তোমাদের অফিসে।

রসিক। ইয়ারকি রাখ্। সত্যি বল, তুই চাকরী করবি?

প্রশান্ত। তুমি ক্ষেপেছ? চাকরীর কথা নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাসা করে? ও-যে ঠাকুর দেবতার চাইতেও বড়। কিন্তু আমাকে নিলে তোমার চলবে? Previous experiency এক ঘুরে বেড়ান ছাড়া আমার কিন্তু কিছু নেই। তা আগেই বলে রাখছি।

রসিক। কি যে বলিস্! তোকে পেলে যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারব।

প্রশান্ত। থাম, থাম! অত উল্লসিত হয়ো না। চাকরীটা দিয়ে নাও আগে, নইলে বাবা বিশ্বাসই কর্ত্তে পারছি না যে। আগে বল তো appointmentটা কি তোমার দেবার অধিকার আছে?

রসিক। নিশ্চয়ই। রামরতনদা' তো আমার মাইডিয়ার লোক হে। আমার হাতের মুঠোর ভেতর তাঁর সব। আমি বললে না করতে পারেন এমন ক্ষমতাই যে তাঁর নেই। অফিসার হলে কি হবে উপরি উপার্জ্জনের Machinery parts-গুলো সবই আমার গণ্ডীর ভেতরে। সুতরাং আমাকে তুষ্ট তাঁকে রাখতেই হবে! তাছাড়া ভদ্রলোক একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই আমায় দেখে থাকেন। ঘর-সংসারের খুঁটিনাটী সংবাদগুলো পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে প্রকাশ করেন এবং তার সমস্যা পূরণের পরামর্শ টুকুও এই অর্দ্ধটাকওয়ালা মস্তিষ্কটীর ভেতর থেকে যা' পান তার সাহায্যেই সংসার পরিচালনা করে থাকেন। এত-খানি সরল তিনি!

প্রশান্ত। বাসা আছ রসিকদা। লোকপটান বুদ্ধিটা দেখছি আজও অক্ষতদেহে তোমার ঐ অনুর্ব্বর মস্তিষ্কটীর ভেতর বিচরণ কর্চ্ছে। তোমার under-এ চাকরী, এ-তুমি মাইনে না দিলেও আমাকে কর্ত্তেই হবে।

রসিক। তা হ'লে ঠিক তো?

প্রশান্ত। নিশ্চয়ই।

(রামরতনবাবু প্রবেশ করিলেন)

রামরতন। কি কর্‌ছ রসিকবাবু! (প্রশান্তকে দেখিয়া) ইনি কে?

রসিক। ইনি একজন Candidate.

রামরতন। কিসের Candidate?

প্রশান্ত। (বিনয়ের সহিত) আজ্ঞে আপাততঃ একটা চাকরীর।

রামরতন। আপাততঃ চাকরীর মানে?

রসিক। ঠিকই বলেছে! Bonus, Loan, Advance, Merement এ গুলো তো চাকরী হবার পরে ছাড়া চাইতে পারে না। কাজেই আপাততঃ চাকরীটা পেলে—

রামরতন। তোমার পরিচিত?

রসিক। শুধু পরিচিত নয়, বিশেষভাবে পরিচিত। বহু দিন কলকাতায় এক মেসেই কাটিয়েছি।

রামরতন। এর Qualification?

রসিক। দুর্দ্দান্ত qualification রামরতন বাবু, দুর্দ্দান্ত qualification. বোধ হয় আপনার staff-এর ভেতর আর একটিও এ রকম পাবেন না। একেবারে M.S.C. যেমন মুখে, তেমন কলমে, তেমন উপস্থিত বুদ্ধিতে।

রামরতন। বেশ তো, তুমি না লোক চেয়েছিলে, তা একেই নিয়ে নাও না কেন, আমি সাহেবকে বলে পরে confirmed করিয়ে নেব। (প্রশান্তকে) আপনি তাহলে কাল থেকেই কাজে join করুন। (রসিকের দিকে চাহিয়া) মাইনের কথা কি বলেছ হে, আচ্ছা, থাক্, M.s.c. যখন তখন বলে ক'য়ে একশ' টাকা করিয়ে দেওয়া যাবে! আপনি এখন তা হলে যেতে পারেন। কাল থেকে আসবেন।

রসিক। ওকে আর আপনি করে বলছেন কেন। M. s. c. হলেও আমার subordinate হবে তো!

রামরতন। (হাসিয়া) তোমার কোন ভয় নেই।

প্রশান্ত। আমি তা হলে আজ আসি। নমস্কার।

রামরতন। নমস্কার।

রসিক। কাল তা হলে দশটাতেই এস কিন্তু।

প্রশান্ত। (যাইতে যাইতে) নিশ্চয়ই। (প্রস্থান)

রামরতন। ছেলেটী বোধ হয় ভালই হবে।

রসিক। বোধ হয় নয়। ফলেন পরিচীয়তে। ভবিষ্যতেই দেখতে পাবেন।

রামরতন। তা যেন হল, এখন আমি কি করি বল তো? গিন্নী তো একেবারে বায়না ধরে বসে আছেন—মেয়েকে আগামী মাসের ভেতরে বিয়ে না কি দিতেই হবে।

রসিক। তাতে আর আপত্তির কারণ কি?

রামরতন। আরে তুমি ত বলছ আপত্তি কি, কিন্তু পছন্দ মত ছেলে পাই কোথা?

রসিক। ছেলের আবার অভাব আছে না কি? বিশেষতঃ আপনার একটি মাত্র মেয়ে, তাও আবার কলেজের ছাত্রী। তা ছাড়া ভগবানের কৃপায় অবস্থাও তো আপনার মন্দ নয়। তার লোভেও কত ছেলে ছুটে আসবে তার ঠিক আছে?

রামরতন। কিন্তু আমার Demandও জান তো! পাত্র ধনীই হোক আর দরিদ্রই হোক্ থাকতে হবে আমার ঘর-জামাই হয়ে। কারণ, আমার একটি মাত্র মেয়ে—ওকে আমি কিছুতেই কাছছাড়া কর্ত্তে পারব না এবং আমার গিন্নীরও তাই মত।

রসিক। তা হলে এক কাজ করুন না কেন!

রামরতন। কি বল তো!

রসিক। আজই কাগজে 'পাত্র চাই' বলে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছি। দেখবেন কালকেই কত আবেদন-পত্র এসে হাজির হবে। তার ভেতর থেকে একটি পছন্দমত নিয়ে নিলেই চলবে। কি বলেন?

রামরতন। সাধে কি আর তোমার কাছে আসি ভায়া। এ সব বুদ্ধি সাধারণ মাথায় সহজে আসে না। কিন্তু একটা কথা, যাদের মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন সবই রয়েছে। সুতরাং ঘরজামাই হয়ে থাকা সমীচীন মনে নাও কর্ত্তে পারে তো!

রসিক। আপনি ক্ষেপেছেন রামরতন বাবু! বিংশ শতাব্দীর ছেলে-ছোকরাগুলো এত বোকা নয়। যুবতী মেয়ে এবং লোভনীয় যৌতুকের পরিবর্ত্তে আত্মীয়-স্বজন বাপ মা তো দূরের কথা, জাত ত্যাগ করতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে না। সুতরাং সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

রামরতন। আচ্ছা, তা হলে তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর ভাই। মেয়েকে আগামী মাসের ভেতরে বিয়ে আমাকে দিতেই হবে।

রসিক। নিশ্চয়। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাক আর নাই থাক, সৎপাত্রে কন্যাদানের জন্য আপনি প্রস্তুত হতে পারেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

রামরতন। আচ্ছা, তা হলে আজ আসি। (প্রস্থান)

[মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। ধর্ম্মতলার অফিস। রসিক ভাদুড়ী রামরতন বাবুর কন্যা-প্রার্থীদের আবেদন-পত্রগুলি একে একে পড়িতেছিলেন। প্রশান্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।]

প্রশান্ত। ওগুলো কি দেখছ রসিকদা! বোধ হয়, আমারই মত হতভাগ্য চাকরীপ্রার্থীর আবেদন?

রসিক। (মুখ না তুলিয়াই) হ্যাঁ, আবেদন বটে, তবে চাকরী-প্রার্থীর নয়। রামরতন বাবুর কন্যা-প্রার্থীর।

প্রশান্ত। ঐ অতগুলো?

রসিক। হ্যাঁ, তবু নাকি বাঙালীর সমাজে কন্যাগ্রস্ত পিতার অভাব নেই। এই দেখ, ভদ্রলোকের একটিমাত্র মেয়ে। অপরাধের মধ্যে একটি সৎপাত্রের সন্ধানে খবরের কাগজে 'পাত্র চাই' বলে মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ-পত্রের আসল সংবাদগুলো চোখে না পড়লেও এই এক ইঞ্চির বিজ্ঞাপনটী এরা সব না দেখে ছাড়েনি। ঝপাঝপ্ চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। এরাই হচ্ছে modern যুবক।

প্রশান্ত। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে রামরতন বাবুর বৈষয়িক অবস্থার কথা জেনে কেবল মাত্র ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হবার লোভে অনেকে আবেদন করেছেন। আমার মনে হয়—যদি তাঁরা সত্যি কথা বলেন, তা হলে একটু খোঁজ নিলেই দেখতে পাবে আসল কন্যাপ্রার্থীর সংখ্যা এর ভেতর অতি বিরল। আচ্ছা দেখ দেখি, সুকোমল বোস বলে কেউ কোন চিঠি দিয়েছে কি না?

রসিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই মাত্র একখানা পড়লুম বটে। এই, এই, এই যে। (বাহির করিলেন)

প্রশান্ত। আমার মনে হয়, ওখানাই আসল কন্যাপ্রার্থীর হতে পারে।

রসিক। সে কি? তুই চিনিস্ নাকি?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, কিছু কিছু চিনি বই কি? বোধ হয় তুমিও চিনতে পারবে।

রসিক। সে কি, কে সে? কোথায় থাকে?

প্রশান্ত। খুব বেশী দূরে নয়। আপাততঃ সে পাত্র সশরীরে তোমার সম্মুখেই বিরাজমান।

রসিক। তার মানে? নাম ভাঁড়িয়ে তুই আবেদন করেছিস?

প্রশান্ত। ও কি! তুমি আঁৎকে উঠছ কেন? ভয় কিসের?

রসিক। সর্ব্বনাশ করেছিস প্রশান্ত, সর্ব্বনাশ করেছিস্। শেষে কি চাকরিটা খোয়াবার মতলব করেছিস, তাও আবার আমাকে জড়িয়ে!

প্রশান্ত। তুমি তো আচ্ছা লোক হে রসিকদা! ভদ্রলোক চলেছেন মেয়ের বিয়ে দিতে, আর তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে সর্ব্বনাশের কথা মুখে আনছ? আর তোমার ভয়ই বা কিসের, তুমি তো না কি আঁট-ঘাট সব বেঁধে বসে আছ। তা ছাড়া, তুমি তো আর আবেদন করনি, আবেদন করেছি আমি। কারণ, পাত্রের যে যে গুণ তোমরা দাবী করেছ, তা সবই আমার মধ্যে বর্ত্তমান। তোমাকে মাত্র এই শুভ কর্ম্মটী করিয়ে দিতে হবে।

রসিক। তাই বলে, তাই বলে তুই বিয়ে করবি?

প্রশান্ত। কেন নয়? আমি কি একেবারে অসৎপাত্র?

রসিক। না না, তা বলিনি। তবে কি জানিস, রামরতন বাবুরও তোর ওপর একটু ঝোঁক ছিল কিন্তু আমিই তাঁকে না বলে দিয়েছিলুম কি না!

প্রশান্ত। কেন?

রসিক। তুই তো বল্‌তিস্ বিয়ে করব না। শেষে আমি বেকুব হব?

প্রশান্ত। 'বিয়ে করব না' আজকাল অনেক ছেলেই বলে থাকে। কিন্তু chance পেলে কেউ ছাড়ে না। যে সব ছেলেরা বিয়ে করব না বলে, প্রথমতঃ তাদের ওজুহাত হচ্ছে তারা উপার্জ্জনে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ জীবনের দায়িত্বকে তারা এড়িয়ে চলতে

চায়। অথচ বিনা ঝুঁকিতে প্রেমচর্চ্চা করতে তারা কেউ কুণ্ঠা বোধ করে না। আমায় উপার্জ্জনের ওজুহাত থেকে যখন ত্রাণ করেছ রসিকদা, তখন এ বিয়েটাও তোমাকে করিয়ে দিতেই হবে। অতএব সেটা 'শুভস্য শীঘ্রম্' হলেই ভাল হবে।

রসিক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) বড় ভাবিয়ে তুললি

প্রশান্ত। আচ্ছা যাক, যা করে ফেলেছিস্ আর কাউকেও যেন ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে দিস্‌নি, কোন পক্ষেরই যখন অমত হবার সম্ভাবনা নেই, তখন এ ব্যাপারটা নিয়ে একটু রসিকতা করলে নামের সঙ্গে বেশ খাপ খাবে। বিয়ে তোর সঙ্গেই দিব। রামরতন বাবুকে যা বলবার আমিই বলব'খন। কিন্তু তুই আবার মেয়ে-টেয়ে দেখতে চাইবি না তো?

প্রশান্ত। সে জন্য তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না রসিকদা। সে সব কাজ বহু আগেই সারা হ'য়ে গেছে।

রসিক। সে কি! তুই রামরতন বাবুর বাড়ীতেও গিয়েছিলি নাকি?

প্রশান্ত। তুমি ক্ষেপেছ রসিকদা! Modern মেয়েদের দেখতে আবার কারু বাড়ীতে যেতে হয় নাকি? বিশেষতঃ যারা স্কুল-কলেজে পড়বার এবং একাকী রাস্তাঘাটে চলবার সুযোগ পায়? তাদের advertisement তারা নিজেরাই করতে পারে কত। সে সবের জন্য তোমাকে মোটেই ভাবতে হবে না। সে আমার বরাতে যা হবার হবে'খন। তুমি শুধু আমার বিয়ের ব্যবস্থাটা করে দাও।

রসিক। আরে যা, যা। আর বকামি কর্ত্তে হবে না। আমাকে একটু ভেবে নেবার সময় দিবি তো?

প্রশান্ত। ব্যাস্, ব্যাস্। তুমি একটু ভাবতে সুরু করলে তো আমি রক্ষা পেয়ে যাই। আমি আর কিছু চাই না। বকামী তো পরের কথা, কাজটা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বোকামীও আমি কর্ব্ব না। আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে একটু নেপথ্যে প্রস্থান করি। কারণ—তোমার রামরতন বাবু বোধ হয় ঐ আসছেন। যা হয় ক'রো। (প্রস্থান)

(রামরতন বাবুর প্রবেশ)

রামরতন। কি হে রসিক বাবু, তোমার Final Selection হলো?

রসিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, যেমনটী আপনারা চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনটী—মিলে গেছে। এই না হলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হয়! (একখানা পত্র বাহির করিয়া) এই দেখুন, সুকোমল বোস, অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়। আমারও বিশেষ পরিচিত। M.S.C. পাশ। সবে মাত্র উন্নতিশীল চাকরিতে ঢুকেছে। আর যে Brilliant ছেলে টপাটপ টপাটপ প্রমোশনও পেয়ে যাবে। মা, বাপ এবং আত্মীয় স্বজনের বালাইও বিশেষ কিছু নেই। লিখেছে পাত্রের অভিভাবক হিসেবে যা কিছু করণীয় সবই আমাকে কর্ত্তে হবে।

রামরতন। একবার মেয়ে দেখতেও চাইবে না?

রসিক। কিছু না, কিছু না। ওসব হাঙ্গামা আর বাড়াতে যাবেন না। যখন আমার ওপরেই ভার দিয়েছে—তখন যা কিছু করবার আমিই করব। আপনি শুধু বৌঠা'নকে বলে দিনটা settle করে ফেলুন দেখি। এই সব ব্যাপার যত শীগ্‌গির শীগ্‌গির হয়ে যায় ততই ভাল। তা ছাড়া পাত্রের নতুন চাকরি, ছুটী-ছাটাও বোধ হয় বিয়ের দিন ছাড়া একেবারেই পাবে না। এখন আপনাদের কোন আপত্তি না থাকলেই হলো।

রামরতন। কি যে বল। কন্যাপক্ষের আবার আপত্তি? ও সব সমাজে টে'কেও না, কেউ করেও না।

রসিক। ব্যাস্, ব্যাস্। তা হলে যান। আপনি আজ থেকে বিয়ের সব ব্যবস্থা ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলুন। কথায় বলে, "শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্" যত শীগ্‌গির হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

রামরতন। কিন্তু সাহেবকে বলে কয়েকদিনের ছুটী নিতে হবে তো?

রসিক। নিশ্চয়ই! আপনার মেয়ের বিয়ে, আর আপনি ছুটী নিবেন না? যান, সাহেবকে বলে আসুন, আপনার সব কাজ-কর্ম্ম দরকার হলে আমি এ ক'দিন দেখব'খন।

রামরতন। আচ্ছা ভায়া, সাধে কি আর তোমার কাছে আসি, তুমি যে আমার কত বড় হিতৈষী তা আর বলে কি বোঝাব।

রসিক। কিছু আর বোঝাতে হবে না। আপনি শুধু সাহেবকে বলে অন্ততঃ সাতদিনের ছুটী নিয়ে তার ভেতরেই ব্যবস্থাটা করে ফেলুন।

রামরতন। আচ্ছা ভাই, তা হলে আজ আসি। আবার গিন্নীর সঙ্গেও একটু পরামর্শবাদ ক'রতে হবে তো?

রসিক। নিশ্চয়ই! কিন্তু দেখবেন স্ত্রীবুদ্ধি আবার বেশী গ্রাহ্য করবেন না যেন। শেষে আবার প্রলয়ঙ্করী হবার ভয় আছে।

রামরতন। (হাসিয়া) কি যে বল, আচ্ছা চলি, কেমন?

(প্রস্থান করিলেন)

(অপর দিক দিয়া প্রশান্ত প্রবেশ করিল)

প্রশান্ত। তুমি আমারও গুরুদেব রসিকদা! এই অকূল সমুদ্রে তুমিই আমার একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা! একবার পায়ের ধূলোটা দাও তো! (পায়ে হাত দিতে গেল)

রসিক। যা, যা। ইয়ারকি কর্ত্তে হবে না। পায়ের ধুলো দিলে দু'জনকেই এক সঙ্গে দেব। তুই শুধু এ ক'টা দিন একটু চুপ চাপে কাটিয়ে দিস্, দেখবি সব হবে।

প্রশান্ত। বল তো এক দম নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাটিয়ে দিই রসিকদা। চাই শুধু তোমার আশীর্ব্বাদ।

চতুর্থ দৃশ্য

(নিতাই মিত্র লেনে রামরতন বাবুর বাড়ীর কক্ষ।
মণিকা এক মনে গাহিয়া যাইতেছিল)

গান

কেন আকাশের তারা মিটি মিটি চায়
আমার পানে
অজানা যে সুর বেজে ওঠে কেন
আমার প্রাণে

কানে ক'য়ে যায় দখিন মলয়,
ভয় নাই তবু কেন করি ভয়,
হৃদয় যাহারে করিয়াছে জয়
সঙ্গোপনে ;
তাহার লাগিয়া গাঁথিয়াছি মালা
সেই তো জানে।

(গানশেষে মণিকা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। অপর দরজা দিয়া কথা কহিতে কহিতে রামরতন বাবু ও তাহার স্ত্রী উমাসুন্দরী সেই ঘরে প্রবেশ করিল)

উমাসুন্দরী। শুনেছ, মেয়ে আজকাল কি সব গান করে!

রামরতন। ও বয়সে এ গান গাইবে নাতো কি 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' বলে চোখের জল ছেড়ে দিতে বল নাকি? তোমারও এক কালে ওর মত বয়স ছিল গো, তখন কি করতে একবার মনে করে দেখ দেখি। ও ত তবু আমরা আসছি টের পেয়ে লজ্জায় পালিয়ে গেল।

উমাসুন্দরী। থাম। আর বুড়োবয়সে রসিকতা কর্ত্তে হবে না। আজ বাদে কাল শ্বশুর হতে চলেছ, তবু রস গেল না। বিয়ের তারিখ ঠিক হলো কবে?

রামরতন। কেন ১লা অগ্রহায়ণ। পুরুত-ঠাকুর তো বলে গেলেন ওর চাইতে ভালদিন শীগ্‌গির আর নেই।

উমা। ঐ দিনে মেয়েটাকে আমার যাত্রা করিয়ে দিতে হবে?

রামরতন। কেন, অগস্ত্যমুনি ঐদিনে যাত্রা করেছিলেন বলে তোমার ভয় হচ্ছে? কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ অগস্ত্য মুনি সেই বিন্ধ্যাচল থেকে কোথায় গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি বটে, কিন্তু আমাদের মেয়ে যাচ্ছে এ ঘর থেকে ঐ ঘরে এবং ঐ ঘরেই সে চিরদিন আমাদের চোখের সামনে থাকবে। সুতরাং ভয় করবার আর কোন কারণ নেই।

উমা। কিন্তু বিয়ের পর দিন তো তারা একবার নিয়ে যাবে?

রামরতন। তারা আবার আসবে কেগো, রসিক আমায় এমন জামাই দিয়েছে যে আমরা ছাড়া তার আর কেউ নেই। মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর স্ত্রী-আচারগুলোও ঐ ঘরে বসে তোমাকেই সেরে নিতে হবে। বুঝলে তো?

উমা। কিন্তু রসিক ঠাকুরপো সে-দিন বলছিলেন যে, ছেলের দূরসম্পর্কীয় কে এক কাকা আছেন।

রামরতন। ও-সব নেমন্তন্ন খাবার কাকা। ওজন্য তুমি কিছু ভেব না। বাঙালীর সমাজে বিয়ের রাতে বরের সঙ্গে ওরকম কত কাকা, জ্যাঠা, মামা, মেসো, পিসে, এসে থাকেন এবং নেমন্তন্নটা একবার খাওয়া হয়ে গেলেই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে একটু সময়ও তাদের লাগে না।

উমা। মণি সে-দিন বল্‌ছিল তার কলেজের বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু।

রামরতন। নিশ্চয়ই। মণিকে বলো' তাদের নামের একটা লিষ্ট করে আমার কাছে দিতে। সে-সব আমি আগেই লোক পাঠিয়ে করে নেব'খন।

উমা। আর দেখ, তুমি যে বলতে প্রশান্ত—না কে একটি ভাল ছেলে তোমাদের অফিসে কাজ নিয়েছে, তাকেও নেমন্তন্ন করো' কিন্তু। মণিও সে-দিন বলছিলো—

রামরতন। কেন, মণি তাকে চেনে না কি?

উমা। হ্যাঁ! তার চাকরি হয়েছে শুনেই মণি আমাকে বলেছিল—কোন এক পার্কে নাকি মণির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। ছেলেটী নাকি খুব ভাল। ওর কাছ থেকেই নাকি সে তোমার অফিসের ঠিকানা নিয়েছিল।

রামরতন। (একটু চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! কিছুদিন আগে গঙ্গাস্নান করে আসবার পথে মণিকে যখন পার্ক থেকে ডেকে আনতে গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম বটে একটী ছেলে মণির বেঞ্চের পাশ থেকে উঠে গেল! কিন্তু মণি তো বলছিল সেটা পাগল-নাকি—

উমা। তা চাকরি-বাকরির জন্য ছেলেরা ও-রকম পাগল একটু হয়েই থাকে।

রামরতন। তা যা বলেছ! কিন্তু আজকালকার মেয়েগুলোই বা কি বল ত! পথে ঘাটে এক মিনিটের জন্যও আলাপ হলেও তাকে মনের মধ্যে রাখতে হবে? খুব দেখালে বাবা কলির মেয়েগুলো।

উমা। তাতে এমন অপরাধই বা কি হয়েছে। বলেছে যখন নেমন্তন্ন করলেই তো সব চুকে যায়।

রামরতন। আরে নেমন্তন্ন কি আর তাকে একা করব? আমার অফিসের সব লোকই তো বিয়ের দিনে এখানে আসবে, খাবে দাবে, কাজকর্ম্ম সব দেখা শুনা করবে! নইলে এ-সব হবে কি করে? আমি যাই ও-দিক্‌কার অনেক কাজকর্ম্ম বাকী রয়েছে—সেগুলো সব করে ফেলতে হবে তো! সময় তো মাত্র ক'টা দিন! তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের সব আনিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর'! আমি যাই! (প্রস্থান করিলেন)

(অপর দিক দিয়া বিষণ্ণ মুখে মণিকা প্রবেশ করিল)

উমা। তোর কি হয়েছে বল তো মণি! আমাদের কাছে এলেই তোর মুখ কালি হয়ে যায় কেন? এই তো এতক্ষণ বসে বেশ গান গাইছিলি! তুই আমাদের একমাত্র সন্তান! ছেলে বলতেও তুই মেয়ে বলতেও তুই! তোর বিয়ে, আর তুই থাকবি মুখ গম্ভীর করে!

মণিকা। তোমরা তোমাদের সেই সেকেলে ধারণা নিয়েই বসে আছ, তোমাদের কি বলব বল? বিয়েটাকে তোমরা হয় তো মনে কর একটা ছেলে খেলা। জানা নেই, শোনা নেই, একবার দেখা পর্য্যন্ত নেই কোথাকার কাকে ধরে এনে কন্যাদায় থেকে তোমরা উদ্ধার হতে বসেছ।

উমা। তোর রসিক কাকা তোর অমঙ্গল করবে, আমরা তোর মা বাপ, তোর যাতে অমঙ্গল হয় তাই করব—হিন্দুর ঘরের মেয়ে তুই, দু'পাতা ইংরেজী বিদ্যে শিখে এ-কথা তুই ভাবতে পারলি? এই যদি তোর মনের কথা তবে সময় থাকতে আগে বল্‌লি না কেন?

মণিকা। তোমরা তো জান তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কোনদিন কোন কথা বলে তোমাদের মনে দুঃখ দিতে চাই নি। সেই সুযোগ নিয়ে আমার ওপর তোমরা যদি এতবড় একটা অবিচার করতে চাও, বেশ, কর। আমি তা মাথা পেতে নেব; কিন্তু তোমাদেরও একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, যাকে নিয়ে জীবন কাটাতে হবে তাকে অন্ততঃ একবার দেখে শুনে নেওয়াই উচিত।

উমা। কিন্তু তাতো এখন আর হয় না মা। তা'ছাড়া ছেলেরও শুনেছি নতুন চাকরি। আসতে পারবে না ব'লে সেও তো আর তোকে দেখতে চায় নি। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। দু'দিন বাদে বিয়ে, এখন আর নতুন ক'রে এ প্রস্তাব কি ক'রে করি বল? আমি বলছি মা, আমরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে, সংসারে পুরুষের ওপর নির্ভর ক'রেই আমাদের চলতে হয়। ভগবান্ এতে কোনদিন কারও উপর অবিচার করেন নি। যেখানে যেমনটি হ'লে ভাল হয়, ভগবান্ তাই সৃষ্টি ক'রে রাখেন। নইলে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর ঘরের কোন মেয়েকে স্বামী পছন্দ হয়নি বলতে শুনেছিস? আমি বলছি মা, আমরা যা করছি তাতে তোর মঙ্গলই হবে। এখন আর ওসব ভেবে মন খারাপ করিস্‌নে মা'। এই আমার অনুরোধ। (সস্নেহে কন্যাকে কাছে টানিলেন)

মণিকা। (অনুতপ্ত স্বরে) আমায় ক্ষমা কর মা। বিদেশী আবহাওয়া আমাদের মনকে বিষাক্ত ক'রে তোলে। তাই তোমাদের মত বিশ্বাস রাখতে পারি না ব'লে আমরা আধুনিক যুগের মেয়েরা মনের অশান্তিতে জ্বলে পুড়ে মরি। আমি আর কিছু বলব না মা। তোমাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তোমাদের আশীর্ব্বাদই আমার ভরসা। তোমরা যা ভাল বোঝ, তাই কর। (মায়ের কোলে মুখ লুকাইল)

উমা। বাঁচালি মা। এমন না হ'লে আমার মেয়ে হয়! আমি তা হ'লে সব যোগাড় করি। তোর মাসিমাকে আনতে পাঠাই। কেমন! পরশু গায়ে হলুদ, আজ থেকেই তো সব তৈরী রাখতে হবে।

মণিকা। (মুখ তুলিয়া) আচ্ছা মা, বাবার অফিসের সবাই আসবে তো? সেই যে ব'লেছিলুম, নতুন চাকরি পেয়েছে ভদ্রলোক, তাকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে তো?

উমা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। এইতো আবার ওঁকে ব'লে দিলুম। সবাই আসবে, কাজকর্ম্ম সব দেখবে, নইলে এ-সব কাজ হবে কি ক'রে? সেইজন্যই তো উনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও যাই। দেখি ও বাড়ীর সত্য ঠাকুরপোকে ব'লে তোর মাসিমাকে আনতে পাঠাতে পারি কিনা।

মণিকা। (কোন কথা কহিল না। একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল)

পঞ্চম দৃশ্য

(রামরতন বাবুর বাড়ী। বিবাহের দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিবাহ-আসরের একপাশে বসিয়া রামরতন বাবু ও রসিক বাবু কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বাহিরে সানাই বাজিতেছিল। লোক-জনের কর্ম্মব্যস্ততায় বিবাহ-আসর মুখর হইয়া উঠিতেছিল।)

রামরতন। আমি ভাবছি রসিক, তুমি যে আগেই চ'লে এলে, বরকে নিয়ে আসবে কে!

রসিক। আমার একটা আক্ষেপ রয়ে গেল, রামরতনদা—যে, এ যুগের আবহাওয়াটাকে আপনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কেন?

রামরতন। এর মধ্যে আর না বুঝবার কি আছে বল। তুমি তো যাকে বলে বরের পিসি ক'নের মাসি। তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম, তুমি শুধু কন্যাপক্ষের তদারক করলে বরকে নিয়ে আসবে কে?

রসিক। আমি বলছি আজকালকার বরদের অভ্যর্থনা ক'রে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসতে হয় না রামরতন দা। কারণ, এই বিবাহ-ব্যাপারটায় তাদের নিজেদেরই উৎসাহ এত অত্যধিক যে বাড়ীর নম্বর না জানা থাকলেও তা'রা নিজেরাই ঝাঁকশুদ্ধ বর-যাত্রী নিয়ে ঠিক জায়গা মতই এসে উপস্থিত হয়।

রামরতন। (হাসিয়া) তোমার সব কথাতেই রসিকতা কিছু থাকবেই জানি। কিন্তু আমি বলছিলুম যে—এ সব বিবাহাদি ব্যাপারে একটা সমাজ-সামাজিকতাও তো আছে। সেইদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে বরকে গিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসাই রীতি। বিশেষতঃ তুমি যখন জান তার অভিভাবক বিশেষ কেউ নেই।

রসিক। আমিও ঠিক সেই জন্যই যাইনি রামরতনদা। আমার মতে স্বাধীন ভাবে জিবীকা নির্ব্বাহ করতে যারা সক্ষম, তাদের কাছে অভিভাবকত্বের দাবী নিয়ে দাঁড়ান ঠিক এ যুগে মানায় না। বিশেষতঃ এই বিবাহ বস্তুটী নেহাৎ একটী ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর লাভ-লোকসান—যে বিয়ে করবে তারই। আর তা'ছাড়া আজ যে ছেলে আপনার জামাই হতে চলেছে, বন্ধু-বান্ধব তার অগণিত। ছেলেটার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যে একবার তাকে দেখেছে সে আর তাকে ভুলতে পারে না।

রামরতন। যা বলেছ ভায়া। বোধ হয় এ যুগে এমন কত গুলো ছেলে জন্মেছে—যাদের একবার দেখলে অন্ততঃ মেয়েগুলো তাদের ভুলতে পারে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমি নিজের ঘরে বসেই পেয়েছি। বলি শোন। কিছুদিন আগে গঙ্গাস্নান সেরে ফেরবার পথে মণিকে পার্ক থেকে নিয়ে আসতে গিয়ে দেখি যে, একটী ছেলে তার সঙ্গে একই বেঞ্চে বসে কি সব কথাবার্ত্তা বলছিল। মণিকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, মণি বললে যে একটা পাগল।

রসিক। (আগ্রহের সহিত) তারপর কি হলো বলুন তো!

রামরতন। না, তেমন বিশেষ কিছু হয়নি। মণি সেদিন তার মাকে নাকি বলছিল যে ছেলেটী আমাদের অফিসে সেদিন চাকুরি পেয়েছে—

রসিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও এ রকম একটা কাহিনী কোথায় শুনেছি বটে। ঠিক মনে পড়ছে না। একটু ভাল করে বলুন তো। বড় Interesting মনে হচ্ছে। চাকরিপ্রার্থী হয়ে কত ছেলেই তো আমাদের ওখানে আসে যায়, সে সব কি আর মনে করে বসে আছি?

রামরতন। আরে ঐ প্রশান্ত বলে যে ছেলেটী আমাদের

খানে চাকরি-প্রার্থী হয়ে এসেছিল—যাকে তুমি চাকরি দিয়েছ—া নাকি মণির কাছ থেকেই আমাদের অফিসের ঠিকানাটা য়েে গিয়েছিল।

রসিক। হ্যাঁ। তাতে এমন কি মারাত্মক হয়েছে?

রামরতন। না, না। মারাত্মকের কথা হচ্ছে না। আমার ণি তাকে ভুলতে পারেনি সেই কথাটাই বলছিলুম। মণির থামত আমি তাকে বিশেষ করে নেমন্তন্নও করে এসেছি।

রসিক। তা বেশ করেছেন। বিয়ের লগ্ন তো আর পার হয়ে যায়নি। সময়মত সে ঠিক আসবে। আপনার কথা তো আর অমান্য করবে না। প্রর্থী হিসেবে এক দিন তাকে আপনার কাছেই আসতে হয়েছিল এবং সে কৃতজ্ঞতাটুকু তার থাকবে বলেই আশা করি।

রামরতন। হ্যাঁ। ছেলেটিকে বড় ভাল ছেলে বলেই মনে য়েছিল। তাই বিয়ের আগে ওর সম্বন্ধেই তোমাকে বলেছিলুম। ত যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে। মেয়ের বিয়েতে তার কোন কামনাই আমি অপূর্ণ রাখব না। সে তার বন্ধু-বান্ধব যাকে যাকে বলেছে আমি সবাইকেই নেমন্তন্ন করেছি। কাজেই প্রশান্ত যদি ভুলে গিয়ে কোন কারণেই আসতে না পারে, তা হলে মেয়ে আমার ভাববে—আমি তার কথা রাখিনি।

রসিক। আমি বলছি রামরতন দা, ভুলে যাবার ছেলেই সে নয়। ভুলভ্রান্তি তার একটু কম হয়। মণিকে বলবেন—তার বিয়েতে তার কোন কামনাই অপূর্ণ থাকবে না।

রামরতন। হ্যাঁ, ভাই, সে দিকে একটু লক্ষ্য রেখ'। আমার ঐ একটা মাত্র মেয়ে। বিয়ের দিন যেন কোন রকম আঘাত তার মনকে স্পর্শ করতে না পারে।

রসিক। সে দিকে তার চাইতেও আমার বিশেষ লক্ষ্য আছে, মণিকে এ কথাটা আপনি বলে আসুন। আর গোধূলি লগ্নে বিয়ে, মনে আছে ত'? বাড়ীর ভেতর একবার দেখে আসুন —সব প্রস্তুত আছে কিনা। বর হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে!

রামরতন। আচ্ছা। আমি তাই দেখে আসছি। তুমি একটু বস'। (প্রস্থান)

[নেপথ্যে বাজনা বাজিয়া উঠিল। "বর আসছে, বর আসছে" বলে ছেলেমেয়ের দল চীৎকার করিয়া উঠিল। বাড়ীর ভেতর শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি আরম্ভ হইল। বরবেশে সজ্জিত প্রশান্ত এবং অফিসের কয়েকজন ভদ্রলোক বরযাত্রী হইয়া প্রবেশ করিল। রামরতন বাবু ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন]

রামরতন। ওরে আলো জ্বাল আলো জ্বাল। বর এসেছে। (গলবস্ত্র হইয়া) আসুন, আসুন, আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক। আরে রসিক গেল কোথায়? 'রসিক বাবু' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন রসিক বাবু ইতিমধ্যে বরযাত্রীদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন এবং সেই ভিড়ের মধ্যে হইতেই)

রসিক। আমি এখন বরপক্ষীয়, রামরতনদা।

রামরতন। তার মানে?

রসিক। (অগ্রসর হইয়া) বরের দিকে মুখ তুলে চাইলেই বুঝতে পারবেন, আমি ছাড়া এখানে তার অভিভাবক আর কেউ নেই। এখন আমি বরের পিসি হয়েছি।

রামরতন। (বরের দিকে চাহিয়া) আরে এ যে আমাদের প্রশান্ত!

রসিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই প্রার্থী। যে ভবিষ্যৎ উহ্য রেখে তখনকার মত চাকরীটাই প্রার্থনা করেছিল। এবং আপনিও মনে মনে একেই চেয়েছিলেন। ঠিক কি না?

রামরতন। (হাসিয়া) রসিক, তোমার নামকেই তুমি সার্থক করে তুলেছ! কাজেও যে তুমি এত রসিক—দীর্ঘকাল একসঙ্গে থেকেও তা বুঝতে পারি নি।

রসিক। (কাছে আসিয়া) বুঝতে পারেন আপনি সবই! তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে, এই যা দুঃখ কিন্তু বুঝে দেখুন—বেরসিক সংসারে কেউ নয় রামরতনদা! তবে রসপ্রকাশে কাহারো বা একটু বিলম্ব ঘটে থাকে; মেয়েরা যাকে পাবার আশা রাখে, একবার দেখলেই তাকে ভালবাসতে পারে! এবং আমার মতে সেইটেই হচ্ছে প্রকৃত ভালবাসা। Experiment করে যারা ভালবাসতে যায়, তাদের ভালবাসার ভেতর গলদ থাকবেই। আপনার মেয়েকে জানিয়ে আসুন যে, একবার মাত্র দেখেই সে যাকে ভুলতে পারেনি—তাকেই হাজির করে দিয়ে আমি তার কামনা পূর্ণ করে দিয়েছি। আপনার সেই পার্কে বসেই এদের শুভদৃষ্টি হয়েছিল এবং এইখানেই তার পরিণতি হচ্ছে।

রামরতন। কিন্তু একটা শাস্ত্রীয় আচার পালন করতে হবে তো! লগ্ন থাকতে শাস্ত্রীয় আচারেই একবার শুভদৃষ্টিটা হয়ে যাক।

রসিক। তাতে আর আপত্তি কী? চলুন, চলুন, চলুন। চল প্রশান্ত। (সকলেই বিবাহ-আসরে উপবেশন করিলেন। কন্যাপক্ষীয় দল মেয়েকে ধরাধরি করিয়া শুভ দৃষ্টির আয়োজন করিতে লাগিল। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। শুভদৃষ্টির সময় বর এবং কন্যার মস্তকোপরি আবরণ উন্মোচন করা হইল।)

মণিকা। (চোখ মেলিয়া চাপা কণ্ঠে) একি! আপনি—তুমি?

প্রশান্ত। হাঁ। আমিই তোমার প্রার্থী।

রসিক। (অদূরে চীৎকার করিয়া) বাজা রে তোরা বাজা। (চারিদিকে বাজনা ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল) জামাই পছন্দ হয়েছে তো রামরতন দা?

রামরতন। নিশ্চয়ই। এত দিনে সব বুঝলাম! একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ।

রসিক। আমি তো বলেইছি। বুঝতে পারেন সবই। তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে। আমার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, পাত্র নির্ব্বাচন আমার সার্থক হয়েছে এবং এখন আপনি আপনার কন্যা প্রার্থীর সেই চাকরীপ্রার্থীর নমুনা উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছেন। সার্থক আমার প্রার্থী নির্ব্বাচন।

[যবনিকা

বাঙ্‌লার নদ-নদী

সাত

পশ্চিমবঙ্গের নদী-সমস্যার জটিলতা

পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলিকে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-পালনে বহুতর বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। জনগণের ন্যস্ত স্বার্থ এদের সহজ স্বাভাবিক গতির অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বাঁধ-বন্ধন-ক্লিষ্ট নদী সময়ে সময়ে নিজের বিদ্রোহ-ক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে মানুষ-নির্ম্মিত সমস্ত বাধা চূর্ণ ক'রে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে। নদীর প্রকৃতি তা'র প্রসাদ-দানে দুই তীরবর্ত্তী স্থান উন্নত করা, দেশকে সমৃদ্ধ করা, কিন্তু এই নদী-সকল মানুষের মধ্যস্থতায় সে-সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বহুক্ষেত্রে তাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে সমস্যা হ'য়ে উঠেছে আরো জটিল। সরল রাস্তা, শহর, ব্যবসায়-কেন্দ্র, কল-কারখানার স্থিতি-উপলক্ষ্য প্রভৃতি ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ বিনিযুক্ত স্বার্থের জন্য বহু অঞ্চলে বাঁধ-রহিত নদীর অবাধ বন্যা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। এ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সমূহ-বাঁধের উপর সুব্যবস্থিত নির্গম-পথ নির্ম্মাণ ক'রে তার মধ্য দিয়েই বন্যা-জল আহরণ দ্বারা স্বল্প-প্রবাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এই সীমাবদ্ধ জল-ধারাতেই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মেদিনীপুর জেলায় কাঁশাই, শিলাই ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে এরূপ পরিমিত জল-সঞ্চার করা সম্ভব। দামোদর, বাঁকা ও হুগলী নদীর অন্তর্গত বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার অঞ্চলটিতেও এই প্রণালী গ্রহণ করা সাধ্যায়ত্ত। শেষোক্ত অঞ্চলে এই প্রকার জল-প্রবহন-রীতি অনুসরণ করবার ইতোমধ্যেই যথেষ্ট চেষ্টা চলছে। কিন্তু এটুকুও জানা গেছে যে: কৃত্রিম জল-সরবরাহ ও জল-সেচন করবার ব্যবস্থাও গৃহীত হওয়া অত্যাবশ্যক, কারণ—শরৎকালে (আশ্বিনের শেষ থেকে কার্ত্তিকের মাঝামাঝি সময়) এই সকল অংশে বৃষ্টি ও নদীর জল-দান বিশেষরূপে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে, এই জলাভাব সুফল-শস্য উৎপাদনে একেবারেই সহায় নয়। কিন্তু এই অবস্থা স্বাস্থ্য ও জমির উর্ব্বরতার উন্নতির পক্ষে খুব মঙ্গলজনক। তথাপি উপযুক্ত বৃষ্টিপাত বা জলসেচন না হলে কার্ত্তিকশাল বা হৈমন্তিক ধান ও ফসল ভালোভাবে ফলতে পারে না। এই সকল বিবেচনার ফলে—দামোদর-নদের ঊর্দ্ধতর উপত্যকা-ভাগে একটি কৃত্রিম জলাধার তৈরী করবার সঙ্কল্প হয়েছে, উপরন্তু বর্দ্ধমানের সন্নিকটে একটি জাঙ্গাল তোলবারও প্রস্তাব আছে। এই পরিকল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত হয়—তা' হ'লে বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার অন্তর্বর্ত্তী প্রায় ১২, ৮৭, ৬৭৫ বিঘা ভূমিখণ্ড কৃত্রিম জল-সরবরাহে পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে উঠবে। উক্ত স্থানটি বাঙ্‌লার অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল, বর্ত্তমানে মানুষের কার্য্য-কারণে এই অঞ্চল দুর্দ্দশাগ্রস্ত হীন অবস্থায় এসে পৌচেছে, এক্ষণে আশা করা যাচ্ছে যে: মানুষেরই কার্য্যকারিতার গুণে এই অধঃপতিত অঞ্চলকে তার সুসমৃদ্ধ স্বাস্থ্যপূর্ণ পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর একটি সরকারী সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে কয়েকটি অঞ্চলে অনুজ্ঞা বিনা নদীর ধারে বাঁধ তোলা সময়ে সময়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলটি বিশাল, আর গ্রাম্য অঞ্চলের দিকে কেউ বাঁধ তোলে কি না সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে—এই বাঁধ তোলা কঠিন শাস্তিযোগ্য দোষ ব'লে পরিগণিত হবে।

দামোদর-হুগলী-সমস্যা ও প্রতিকার

প্রকৃতপ্রস্তাবে নদীর কোনো তট-ভূমিতেই প্রকৃতির অযাচিত বন্যারোধী বাঁধ যদি না উত্তোলিত হয়, তা' হ'লে লাভের মাত্রাই বৃদ্ধি পায়, কেন না তলানি পঙ্ক দ্বারা উন্নীত উপকূল অন্ততঃ নদী-গর্ভের ক্রমোচ্চতার সঙ্গে সমান পাল্লা রাখতে পারে। মিশরদেশের নীলনদ সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য—অভিজ্ঞতায় তা' প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞের বিবৃতি এই যে: ইদানীং বাঁধ-বেষ্টিত হয়েছে নীলনদ, কিন্তু খ্রীষ্ট-যুগে প্রতি-শতাব্দীতে মিশরের পৃষ্ঠদেশ উচ্ছ্বসিত নীলের জলছাটে গাড়ে চার ইঞ্চি ক'রে উন্নত হ'য়ে উঠেছে, তদনুপাতে নদ-গর্ভও ক্রমোচ্চ হয়েছে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে—দামোদরের কেবল দক্ষিণ-তীরের বাঁধ-বর্জ্জন ক'রে বন্যা-সমস্যার কোনো সমাধান হয় নাই। যদি দুই তীরবর্ত্তী বাঁধই রক্ষা করা হোতো—তা'হলে উভয় তটভূমির উচ্চতা একইরূপ থাকতো। অবশ্য—নদীগর্ভের ক্রমোন্নয়ন-হেতু বন্যা-পৃষ্ঠের বৃদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত বাঁধ বিদীর্ণ ক'রে জমির ওপর দিয়ে স্রোতধারা সঞ্চার করতো, কিন্তু এই স্রোত প্রকৃতির বশে হয়, বামপার্শ্বের কূল ভেঙে হুগলী নদীতে যাবার জন্যে পথ কেটে নিতো কিংবা দক্ষিণ-তীরভূমি দিয়ে রূপনারায়ণের দিকে প্রবাহিত হোতো। সম্ভবতঃ শেষোক্ত স্থানই প্রশস্ততর ব'লেই বিবেচিত হয়—কারণ বাঁদিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকটাই বাধাহীন উন্মুক্ত, কিন্তু অন্য দিকটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড রক্ষক বাঁধ প্রভৃতি নানা বাধা-বন্ধে আকীর্ণ। এজন্যই প্রাকৃতিক নিয়মে দক্ষিণ পথেই বেগুয়া খাল বেরিয়ে গিয়ে পড়েছে রূপনারায়ণে। বস্তুতঃ দক্ষিণ-দিকের বাঁধ-বর্জ্জন ও বামপার্শ্বের বাঁধ-রক্ষণ সমস্যা দূর করার পরিবর্ত্তে বাড়িয়ে তুলেছে গুরুতর সমস্যা। এর কাজের ফল দাঁড়িয়েছে এই: দক্ষিণতীরের ভূমিতল দ্রুত বর্দ্ধিত হ'চ্চে আর বামতটবর্ত্তী ভূমিস্তর স্থানীয় বৃষ্টিপাতে ধুয়ে গিয়ে আরো বোধ হয় নীচু হ'য়ে উঠছে। প্রত্যক্ষবাদীরা আশঙ্কা করেন—এর অনিবার্য্য পরিণাম এই হবে যে: ইতোমধ্যে যথাযোগ্য প্রতিবিধান না করলে—প্রবল প্রকৃতির নির্দ্দেশে উদ্বেলিত স্রোতোধারা বাম-তটভূমির বুক বিদারণ ক'রে হুগলী নদীর দিকে ধাবমান হবে। বন্যাজল-বেগ দ্বারা এই বিদরণ-ক্রিয়া ভীষণ অনর্থপাত সৃষ্টি করবে। বামতটবর্ত্তী স্থানসমূহের বিনিযুক্ত স্বার্থ বিনষ্ট তো হবেই, তা' ছাড়াও গুরুত্ববিশিষ্ট কলিকাতা শহর ও হুগলীর উভয় তীর-স্থিত বৃহৎ স্বার্থ-জড়িত ব্যবসায়-কেন্দ্র সবিশেষ বিপন্ন হ'য়ে উঠবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দামোদরের একটি ধারা-নির্গমপথ ছিল হুগলীনগরের কয়েক মাইল উপরিস্থ নোয়াসরাই-এ। কিন্তু তা'রপর থেকে দামোদরের বন্যাস্রোত উক্ত গতিপথে প্রবাহিত না হওয়ায় এবং উত্তরকালীন তীরভাঙনের ফলে হুগলী খাল অতিরিক্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছে, বাস্তবপক্ষে কলিকাতার কাছাকাছি স্থান থেকে এই নদী উপযুক্ত পরিমাণে জলভার তো বহন করতেই পারে না, বরং অপেক্ষাকৃত বহুভাগে স্বল্পতোয়

বাঙলার নদনদীর রেখাচিত্র
সিকিম
নেপাল
ভুটান
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
আসাম
ব্রহ্মপুত্রনদ
দিনাজপুর
রাজসাহী
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
ঢাকা
কুমিল্লা
নোয়াখালী
চট্টগ্রাম
ফরিদপুর
বরিশাল
খুলনা
নবদ্বীপ
বাঁকুড়া
মেদিনীপুর
কলিকাতা

হ'য়ে প্রবাহিত হ'চ্চে। অতএব পূর্ব্ব-কথিত জলস্রোতের ভেদন-ক্রিয়া-জনিত গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। আর হাতে-হাতে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে—১৯১৩, ১৯৩৫ ও ১৯৪২-এ দামোদরের প্রচণ্ড বন্যা থেকে। দামোদরের বন্যা-জল যখন স্ফীত হ'য়ে ওঠে—তখন অববাহিকা-অঞ্চলের সান্নিধ্য-হেতু ভাগিরথীর পশ্চিম-দিক-বর্ত্তিনী উপনদী সকল যে একই সময়ে জলোচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌বে—তা' নিতান্তই স্বাভাবিক।

এই সমস্ত প্রনিধান ক'রে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে: দামোদর ও হুগলী নদীর সমস্যার নিকট-সম্বন্ধ রয়েছে। এই সমস্যা-সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যাপক কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন। বিশেষতঃ হুগলী নদীকে পরিপূর্ণ অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে এমন ভাবে, যা'র ফলে কলিকাতা-বন্দরের সমৃদ্ধি বজায় থাক্‌তে পারে। এ-জন্যে যে যে কার্য্য-পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার তা' এই: প্রথমতঃ সারা বৎসর ধ'রে নিত্য-নিয়মিত জল-প্রবাহ সলীল রাখতে হবে: এই জল-সরবরাহের পরিমাপ নির্দ্দিষ্ট হবে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ, মোটা পলি-পঙ্ক-যোগান যতদূর সম্ভব কম ক'রে তোলা চাই—এই অত্যল্প-পরিমাণ স্থিরীকৃত হবে পরীক্ষা-কার্য্যে।

হুগলী নদীতে যে সমস্ত উপনদী অতিরিক্ত মিঠা-জল যুগিয়ে থাকে—সেগুলি হ'চ্চে: একদিকে—গঙ্গার জল-নির্গম-প্রবাহিকা-ত্রয়ী—ভাগীরথী, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা। এই নদীগুলি কেবল স্বল্পকালের জন্য কার্য্যকরী হ'য়ে থাকে, উপরন্তু এরা বহু পরিমাণে পলি বহন ক'রে আনে। ...অন্যদিকে—পশ্চিমধারার পাহাড়ে প্রবাহিণীসকল—দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয় প্রভৃতি। এই নদীগুলি জল-দানে কার্য্যক্ষম থাকে অল্প সময়ের জন্যে, আর বহন ক'রে আনে মোটা পলিমাটি।

উপরোক্ত সমস্যার অপনোদন ক'র্‌তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে কয়েকটি পশ্চিম-বাহী নদীর অববাহিকা-অঞ্চল-সমূহে জল-বন্ধনী প্রবর্ত্তন করা চাই, তা' হ'লে পলি-মুক্ত নিয়মিত জল-প্রবাহ এই নদীগুলি থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। বন্দী জলাধারে প্রবিষ্ট পলি-পঙ্কের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস করা যেতে পারে—অববাহিকা-অঞ্চলের অংশ-বিশেষ জঙ্গলে পরিণত-করার সুবিদিত উপায়ে। এতদ্ব্যতীত—আয়ত্তাধীন নির্গম-প্রণালী-সকলের মধ্য দিয়ে দামোদর-বন্যার কিয়দংশ অন্যদিকে ফেরাতে হবে। এ কার্য্য সম্ভব করা যেতে পারে—দামোদরের কোনো একটি পূর্ব্ব খাত দিয়ে জলস্রোত বইয়ে কলিকাতার নিকটস্থ উজান-হুগলী নদীতে এসে পড়বার ব্যবস্থা ক'রে।

এই কর্ম্ম-রীতি অনুসরণ করলে সুফল ফল্‌বে অনেক গুলি।

প্রথম: সম্বৎসর কলিকাতার বন্দরের অনুকূলে সমুদ্রগামী জাহাজের জলপথ মুক্ত থাক্‌বে।

দ্বিতীয়: কলিকাতা-বাসীরা নিয়ত মিঠা-জল-লাভে তৃপ্ত-হবে।

তৃতীয়: হাওড়া হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসিগণ বন্যাজল সঞ্চারের ফলে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিস্তার পাবে, অথচ ধ্বংসশীল বন্যার কোনো ভয় থাক্‌বে না।

চতুর্থ: পশ্চিম বঙ্গের ভূভাগগুলি সুলভ বৈদ্যুতিক-শক্তি-লাভে সমর্থ হবে। কারণ বর্ত্তমান কালে আবদ্ধ জলাধার-গঠন পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য্য অংশ—জল-ক্রিয়াজনিত বৈদ্যুতিক-শক্তিকেন্দ্র-প্রবর্ত্তন।

পঞ্চম: দামোদর-সেবিত অঞ্চল বর্ষব্যাপী জল-সেচনে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে, ফলতঃ তৎপ্রদেশের মালগুজারী বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।

স্বার্থ-জড়িত সকল মণ্ডলীরই এই বিষয়ে উপযুক্ত অর্থ-ব্যয়ে কৃপণতা না ক'রে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়াই সমীচীন।

দামোদর ও হুগলী-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার পর এই বিবেচিত হয় যে: দামোদরের বাম-উপকূল দিয়ে অনিয়ন্ত্রিত জল-নির্গম-প্রণালী-দ্বারা কোনোরূপ প্রতিকারক ব্যবস্থার প্রশ্নই ওঠে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—বামতটস্থিত ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলটিকে জল-সঞ্চারে পুষ্ট করবার মোটামুটি যে ব্যয়-নির্ণয় করা হয়েছিল—তা' প্রায় দু' কোটি টাকা।' যা' প্রস্তাবিত হয়েছিল (অর্থাৎ দামোদরের জল আকর্ষণ ক'রে ভিন্নপথে চালনা করা) —সে-সম্বন্ধে একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি কথা—দামোদরের অতিরিক্ত জল-ধারা কলিকাতা ও কাছ-বরাবর স্থানে হুগলী নদী বহন করতে অক্ষম। তা' ছাড়া দামোদরের জল ধারণ-ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে তলকর্ষিণী-যন্ত্র দ্বারা গর্ভ থেকে কর্দ্দম-উত্তোলন-করার প্রস্তাবও সুকর উপায়ান্তর ব'লে মনে হয় না। এ-সম্পর্কে খরচের কথা বাদ দিলেও কোনো নদীকে তলকর্ষণে চিরস্থায়ী ভাবে বাঁচানো যায় না। দামোদর সম্বন্ধেই এটি বিশেষ ভাবে খাটে, কেননা এই নদের বন্যাস্রোতের অতি বিস্তার উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত করে। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গরিষ্ঠ বন্যাধারা প্রবাহিত হ'য়ে থাকে, আর নিম্ন বাঁক-সমূহে নিত্য দু'বার জোয়ার-ভাটায় বাহিত পলিতে ভরাট হ'য়ে যাবার খুব সম্ভাবনা।

প্রতিকারের একমাত্র উপায়—বন্যা-নিয়ামক জলাধার। এই উপায়ই প্রকৃষ্ট ও নদীকে সজীব-রাখার পক্ষে চিরস্থায়ী। রূপনারায়ণ সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। এই নদের জলধারণ শক্তি বৃদ্ধি করতে হ'লে এর উভয়তীরে আঁকাবাঁকা বাঁধ নিঃশেষ ক'রে দেওয়া কর্ত্তব্য। আরো এ-কার্য্যটি সন্নিহিত অঞ্চলগুলির স্বার্থের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ব'লে বিবেচিত হয়।
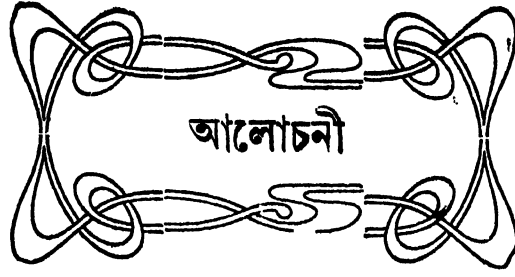
গত শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত আমার লেখা নারী-স্বাতন্ত্র্য প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত প্রবীণ ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমার বক্তব্য-বিষয় কল্পনা-প্রসূত,—কারণ তিনি দ্বিসপ্ততি পার হইয়া পঞ্চসপ্ততিতে চলিতেছেন, এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, মধ্য, মোট কথা গোটা বাংলা ব্যাপিয়া কন্যাদান করিয়া বেড়াইয়া এরূপ ঘটনা কখনো দেখেন নাই যে, লক্ষপতির বিধবা কন্যা, তাঁর অবর্ত্তমানে লক্ষপতি ভ্রাতাদের সঙ্গে দীনহীন বেশে বাস করেন। এইরূপ পাষণ্ড ভ্রাতা তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। তাঁর আর একটি বিশ্বাস—ধনীর কন্যারা কখনো দরিদ্রের ঘরণী হয় না। ইহাতে আমার মনে প্রত্যয় জন্মায় —তিনি অদৃষ্টবাদী নহেন। তিনি ভ্রাতৃগৃহে ভগিনীর সম্মান যাহা দেখাইয়াছেন তাহাই বরং দুরবিরোহিণী কল্পনা-প্রসূত। বাস্তবে ওই দৃষ্টান্ত খুবই কম হয়। কিংবা হোলই বা ভগিনীর ভ্রাতৃগৃহে যত্ন আদর; কিন্তু দয়া, আর দাবী—এ দুটি এক নহে, ইহা বিদ্যারত্ন মহাশয় নিশ্চয় মানিবেন। আমার যদিও এখনো পর্য্যন্ত গোটা বাংলা তোলপাড় করিয়া কন্যাদান করিবার সুযোগ হয় নাই, যাহা দেখিয়াছি, তাহা এই কলিকাতা সহরে বসিয়া, এবং যাহা শুনিয়াছি, তাহা খবরের কাগজ পড়িয়া। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই কলিকাতায় সর্ব্বজন-পরিচিত শিক্ষিত ধনীর পরিবারে বিধবা ভগ্নী তাঁর স্বর্গগত পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত সামান্য কিছু অর্থ (খোরপোষের বাবদ) আদায় করিবার জন্য তাঁর প্রথিতযশা ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই ঘটনাটি, চারি হইতে, সাত বৎসরের পুরাতন দৈনিক খবরের কাগজ খুঁজিয়া দেখিলে পাইবেন। এই স্থানটি স্বর্গ নহে, সুখ দুঃখে গড়া পৃথিবী। এখানে রিপুর সকল ক্রিয়া চলে। সেজন্যই এত আইন-আদালত সৃষ্টি।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তির একমাত্র সন্তান, অবীরা কন্যা পিতার মৃত্যুর পর, পিতার সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারেন নাই, তার কারণ, পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কারণেই হোক্ এই বিধবা কন্যাটির নামে কিছু লিখিয়া দিতে পারেন নাই। কাজেই সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল, অবীরার পিতার আত্মীয়-পুত্র। এরূপ একটি মাম্‌লায় আমাদের একজন হাইকোর্টের উকিল বন্ধু জয়ী হইয়া, গৃহে আসিয়া তাঁর দুটি মাত্র সন্তান, বিবাহিতা কন্যাদের নামে উইল করিয়া রাখেন। ঘটনাটি এখনও একবৎসরের বেশী নয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় যদি বিদ্যারত্ন না হইয়া বি, এল, হইতেন, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা বহু জানিতে পারিতেন।

তবু যা হোক্ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, বিধবার শ্বশুরকুল দরিদ্র হইলে পিতৃকুল হইতে কিছু প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা বিধেয়। কিন্তু পিতৃসম্পত্তিতে সত্ব না থাকিলে, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে?

হিন্দু-বিধবার দুরবস্থা যে কতদূর, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য। বর্ত্তমানে আতপ তণ্ডুল—পচিশ হইতে পয়ত্রিস্ টাকা মণ, গব্য-ঘৃত—সের সাড়ে ছয় টাকা, ডাল—বার আনা হইতে পাঁচসিকে সের, সঃ তেল —দেড় টাকা সের, আলু—পাঁচসিকে, একটা কাঁচাকলা দু-পয়সা, দুগ্ধ টাকায় দেড়সের, একখানি থান ধুতি—উনিশ টাকার নীচে নাই, এমতাবস্থায় বিদ্যারত্ন মহাশয় হিন্দু-বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক ব্যবস্থা করিলেন মাত্র পনের টাকা!

ইহার পরেও কি এদেশে হৃদয়হীন ভ্রাতা খুঁজিবার প্রয়োজন আছে?

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-অভিভাষণ

শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বার-এট্-ল

যুগ-সন্ধি উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ব্বার ঘটনা-স্রোতের মধ্যে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—নূতনের সহিত সামঞ্জস্যবিধান। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে—"যুদ্ধং দেহি" মূর্ত্তিতে। কী উত্তর আমরা দিতে পারি? এই তো জীবন-মরণ-সমস্যা।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। চারিদিকে যুদ্ধোত্তর সংগঠনের কথা চলিতেছে। জগৎ বুঝিয়াছে যে, যুদ্ধের পরিণাম নিদারুণ ব্যর্থতা। কিন্তু তবুও আশঙ্কা হয়—কোথায় যেন ভাবী-যুদ্ধের গুপ্ত-বীজ রহিয়া গেল।

বিশ্বমৈত্রীর উচ্চ আদর্শ মনুষ্যজাতির মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে-আদর্শের যোগ্যতা কই? জাতীয়তার স্বার্থ এখনো যে ঘুচে নাই! বিশ্বমৈত্রীর দিন আসিতেছে—হয় ত' অদূর ভবিষ্যতেই সে-আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা বিলুপ্ত হইবে? না। বিশ্ব-মৈত্রীর ব্যাপক অনুষ্ঠানটির মূলে থাকিবে বিভিন্ন জাতি। প্রত্যেক জাতির জন্য সজ্জিত থাকিবে বিশিষ্ট আসন। প্রত্যেক জাতির মর্য্যাদা নির্ভর করিবে তাহার স্বকীয় যোগ্যতার উপর।

১৯১৩ সালে ব্রিটিশ প্রধান সচিব বলিয়াছিলেন—যুদ্ধই হোক্ আর শান্তিই হোক্, একমাত্র সেই জাতিরই ভবিষ্যৎ আছে, যে-জাতি উচ্চ শিক্ষার অধিকারী। জাতীয়-শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইংরেজ বদ্ধপরিকর। বার্ষিক ৮০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াও তাহাদের আশ মিটিতেছে না। তাহারা মানুষ গড়িতে চায়—কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নয়, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

লোক শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্ট মাথা-পিছু ৩৮৲ খরচ করেন আর ভারতবর্ষে—? মাথাপিছু আট আনা। আর কত দিন এরূপ চলিবে? শিক্ষা-সংস্কারের মর্ম্ম না বুঝিলে এ-জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার; উন্নতির কোনও আশা নাই।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাতে একটি কথা মনে রাখা দরকার—সমগ্র জাতির মধ্যে যে-শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; যে-সত্য সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাকে জাগাইতে হইবে। ব্যক্তি লইয়া জাতি। প্রত্যেক ব্যক্তির ই অপরিসীম সম্ভাব্যতা আছে কিন্তু সুযোগের অভাব। অতএব অধিকাংশ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। এইরূপে অগণিত ব্যক্তির বঞ্চিত জীবন লইয়াই তো আমাদের জাতীয় জীবনের নিদারুণ বঞ্চনা! ইহার প্রতিকার কী? একটি ব্যাপক জাতীয় অনুষ্ঠান গড়িতে হইবে—যাহাতে ১) প্রত্যেক ব্যক্তি নিরাপদে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং (২) নূতনের অন্বেষণে মানুষের যে-অভিযান তাহার পাথেয় এবং সুযোগের ব্যবস্থা হইতে পারে।

শিক্ষার সুযোগ সকলকে দিতে হইবে—আপামর সাধারণ সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার থাকিবে। দেশের প্রত্যেক শিশুকে পাঁচটী উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হইবে—(১) দারিদ্র্য (২) অনাহার (৩) অ-স্বাস্থ্য (৪) নৈতিক অপচার (৫) ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উৎপীড়ন। এই ব্যবস্থা যতদিন সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের সহিত মানুষের বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিতেই থাকিবে। দেশের শিশুগণের শৈশব-জীবন সুখকর করিতে হইবে, তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদের বুদ্ধি ও চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার সাহায্য করিতে হইবে। তাহারাই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। তাহাদের শিক্ষার ভার অতীব দুরূহ কর্ত্তব্য। সে-কর্ত্তব্য সাধনের জন্য চাই—উদার পরিকল্পনা, ব্যাপক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা এবং নির্ভীক কার্য্যনিষ্ঠা। ভারতের ভাবী জনগণকে তাহাদের স্বকীয় অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করাইতে হইবে, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে সে-সুযোগে তাহার যে জন্মগত দাবী।

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার মধ্যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। এই শিক্ষার আওতায় সমাজের স্তরভেদ পুষ্টিলাভ করিতেছে। যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে যেন এই ইতরতা চির-তরে নির্ব্বাসিত হয় তাহা দেখিতে হইবে। তাহার জন্য সাহস চাই, চাই ধৈর্য্য। সংস্কার করিবার পূর্ব্বে সত্যকে জানিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের সংস্কারকগণ ক্ষমতার মোহে উন্মত্ত; তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ক্ষমতার চরম সার্থকতা জনগণের কল্যাণসাধনে।

* বিগত কনভোকেশন উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সিলর ডক্টর রাধাবিনোদ পাল যে-অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, সাধারণ্যে তাহার প্রচার বাঞ্ছনীয়। স্থানাভাবে সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। মূল ইংরেজীর ছায়া অবলম্বনে প্রধান প্রধান প্রসঙ্গগুলির আংশিক পরিচয় মাত্র ভাইস্-চান্সিলর মহোদয়ের সৌজন্যে ও অনুমতি অনুসারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। —লেখক।

নবযুগ-প্রবর্ত্তনের একটি প্রধান অঙ্গ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান সভ্যজগতে বিপ্লব ঘটাইয়াছে। বিজ্ঞান ও সমাজজীবনের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাধন ও প্রয়োগ আয়ত্ত করিতে হইবে ও প্রচার করিতে হইবে। বিশ্ববাসীর কল্যাণকল্পে তাহাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

ভবিষ্যতের শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ হইবে আইন। আইন শিখাইতে হইবে কেবল আইনজীবী তৈয়ারী করিবার জন্য নয়। আইন—অর্থাৎ ব্যাবহারিক ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। আইনের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় না থাকিলে কোনও নাগরিকই অধিকার এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে না এবং সে হিসাবে তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ভারতবর্ষে শিক্ষা-সংস্কারের জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। কাজে কতদূর হইবে সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। অনেক ব্যাপারেই ত' দেখা গেল এই ভাগ্যহত দেশবাসীর "হিতার্থে" ঘটা করিয়া কমিশন বসে, গুরুগম্ভীর রিপোর্টের আবির্ভাব হয়, সরকারী দপ্তরখানা নথি-পত্রে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আসল সমস্যার কোনও সমাধান হয় না।

ডক্টর সার্জেন্ট* অনুযোগ করিয়াছেন যে, ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির যে-সব ত্রুটি আছে তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভারতবাসীর defeatism অর্থাৎ পরাজয় পরায়ণতা। তিনি বলেন—ইংলণ্ডে যদি এত উন্নতি সম্ভব হইয়া থাকে, ভারতবর্ষেই বা না হইবার কি হেতু? কিন্তু হায়! কাহার সহিত কাহার তুলনা? আমরা যে পরাধীন জাতি! এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধের পরেও ইংলণ্ডে ত' শিক্ষার জন্য টকার অভাব ঘটিল না—বার্ষিক ৮০, ০০০, ০০০ পউণ্ড বরাদ্দ হিসাবে কাজ এখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আর ভারতবর্ষে? সমগ্র দেশবাসী সার্জেন্ট-রিপোর্ট সমর্থন করিতেছে কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর তাহাতে সম্মত নহেন।

তা'ছাড়া আর একটি বিষয়ে আমরা ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। ইংলণ্ডে শিক্ষকের আদর আছে, শিক্ষকতা-কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডের ম্যাক্ নেয়ার কমিটি (১৯৪২) ঘোষণা করিয়াছেন যে, শিক্ষক সম্প্রদায়কে উপবাসী রাখিলে দেশের নিদারুণ অমঙ্গল। যাঁহাদের উপর মানুষ-গড়ার দায়িত্ব সমাজ অর্পণ করিয়াছে, তাঁহাদের আর্থিক উন্নতি এবং যথা-যোগ্য পদমর্য্যাদার ব্যবস্থা করা সমাজেরই কর্ত্তব্য একথা ইংরেজ উপলব্ধি করিয়াছে। আর ভারতবর্ষে? সেণ্ট্রাল এডভাইজরি বোর্ড অব্ এডুকেশনের রিপোর্ট (Report of the Central Advisory Board of Education) হইতে দেখা যায় যে, সরকারী প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষকের বেতন গড়ে মাসিক ২৭৲, কোনও কোনও প্রদেশে ১০৲। ভারতবর্ষের অনশন-ক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত শিক্ষক-সম্প্রদায়ের বেতন-বৃদ্ধির সামান্য-তম দাবীও আজ পর্য্যন্ত ভারত-সরকার পূরণ করিতে পরাঙ্মুখ। ইংলণ্ডের শিক্ষকের পক্ষে যাহা ন্যায্য দাবী বলিয়া স্বীকৃত, ভারতবর্ষের শিক্ষকের কাছে তাহা আকাশ-কুসুম মাত্র।

একথা মোটেই বলা চলে না যে, আজ ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজের তিরোধান ঘটিলে, কালই ভরতবাসী চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে। আবার, জাতিবিশেষ "পরোপকারব্রত" নাম দিয়া চিরকাল অপর এক জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকিবে—ইহারও কোনও অর্থ হয় না। Good Government অর্থাৎ সুশাসন বিধানের নামে কোনও জাতি অপর এক জাতিকে পদানত রাখিলে তাহার মধ্যে গৌরবের কিছু নাই।

দেশ স্বাধীন না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষাসংস্কার-পরিকল্পনা করিয়া লাভ কি? তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথ কই? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে Technical Education বা শিল্পশিক্ষা। দেশ স্বাধীন হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি দেশবাসীর হাতে থাকে এবং স্বদেশের আর্থিক প্রয়োজন অনুসারে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু দেশ যদি পরাধীন থাকে তাহা হইলে স্বদেশী শিল্প-শিক্ষার ফলভোগ করিবে কে? প্রধানতঃ বিদেশী শাসক ও শোষক-সম্প্রদায়। এই দেশের শিক্ষিত শিল্পীকে কুণ্ঠিত চিত্তে সামান্য পারিশ্রমিক দিয়া লাভের অংশ তাঁহারাই ভোগ করিবেন। বিজাতীয় শাসনের আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে তাঁহারা কর্ম্মীকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা স্ফীতি লাভ করিবেন। ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতদিন না ঘুচিবে ততদিন আমাদের জাতীয় শিল্পশিক্ষার পরিণতি—চাকুরির উমেদারি। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার বহুল বিস্তার হইয়াছে, তাহার ফলে স্বদেশ কতটুকু লাভবান?—সেক্রেটেরিয়েট এবং

* A. G. Sargent, M. A., (Brasenose College, Oxford). Professor of Commerce in the University of London

বিদেশী বণিকের দপ্তরে উচ্চশিক্ষিত মসীজীবীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে! দেশ স্বাধীন হইলে কি গুণের এই হতাদর সম্ভব হইত?

তরুণ বন্ধুগণ, তোমাদের ললাটে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়টীকা শোভা পাইতেছে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের চিন্তা, কার্য্য ও বাক্যের মধ্য দিয়া তোমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিও। দেশের চতুর্দ্দিকে পঙ্কিল স্বার্থপরতা। তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার মন্ত্রে তোমরা আজ দীক্ষিত হইলে। স্বদেশের হিতকর আন্দোলনে তোমরা যোগদান করো, স্বজাতির নৈতিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সদা চেষ্টিত হও। দেশমাতৃকার সমক্ষে এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা—স্বাধীনতা-সংগ্রাম। তোমরা সেই সংগ্রামের সৈনিক। স্বরাজ মানুষের জন্মগত অধিকার। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাকাশে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়ের শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাহার আবাহনের জন্য প্রস্তুত হও।

একটি কথা মনে রাখা দরকার—উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিও না। দেশের এই দুর্দ্দিনে একদল তথাকথিত গণ নেতার স্বার্থসিদ্ধির সুবর্ণ-সুযোগ আসিয়াছে। তাহাদের কুহকে পড়িও না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে তোমাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছে, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়াছে, তোমরা হিতাহিত বিচার-শক্তি লাভ করিয়াছ। ভুলিও না—জাতির ভবিষ্যৎ আশা তোমরাই।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে তোমাদের স্থান কোথায় —এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। মনে রাখিও যে, নিজের স্থান নিজেকেই বাছিয়া লইতে হইবে। শক্তি এবং যোগ্যতার বলে শ্রেষ্ঠ আসন অর্জ্জন করিতে হইবে। বিজয়লক্ষ্মী একমাত্র উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই বরণ করিয়া থাকেন। জীবন-সংগ্রাম যে অত্যন্ত কঠিন হইবে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, অনেক সময়ে হয় ত' তোমাদের মনে ব্যর্থতার ভাব আসিয়া পড়িবে। নিরাশার কালো মেঘ যখনই তোমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, মনে রাখিও তোমাদের অতীতের গৌরব-কাহিনী; মনে রাখিও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ কত মহৎ, কত উচ্চ ছিলেন; মনে রাখিও তোমরা তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী। ১৮৫৮ সালে ভাই-কাউণ্ট পামারস্টন ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমক্ষে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে; কালের চক্রে ইংলণ্ড আজ ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ জ্ঞান ও শিল্পের আদি জন্মভূমি; যে-প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে সমাসীন, ইংলণ্ডবাসী তখন অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যে গণ্য ছিলেন।

আজ ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে নিমজ্জমান। কিন্তু মোগল-যুগেও ভারতবর্ষের সম্পদ্ ছিল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফরাসী ঐতিহাসিক Cartoux-র বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ে দেশ-বিদেশের সোণা ও রূপা ভারতবর্ষে আসিয়া জমা হইত। মোগল রাজকোষ ছিল লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার।

অতীতের কথা ভাবিয়া শুধু গৌরব অনুভব করিলে চলিবে না; ভবিষ্যৎও সমুজ্জ্বল—এই দৃঢ় বিশ্বাস মনে রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের উন্নতির পথে অসংখ্য প্রতিবন্ধক। একজনের চেষ্টাতে বিশেষ কিছু কাজ হইবে না, তাহাও ঠিক। কিন্তু দেশমাতৃকার সেবাকল্পে সামান্যতম প্রচেষ্টারও সার্থকতা আছে, যদি তাহা আন্তরিক হয়। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের তীব্র মন্তব্যে হতাশ হইবার কিছু নাই। যাঁহারা স্বীয় জাতীয়তার গর্ব্বে অন্ধ, তাঁহারা তো বলিবেনই যে ভারতবর্ষের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে আমাদের জাতির মজ্জাগত ক্রটির জন্যই আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা। পশ্চিমবাসী ভারতীয় সভ্যতার সত্যরূপ দেখিতে পারেন না; দেখিতে চান না। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে ভারতীয় সভ্যতার বহিরঙ্গে যে চাকচিক্য আসিয়াছে সেইটুকুর গৌরবেই পশ্চিম আত্মহারা। খাঁটি ভারতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির মধ্যে যে আগুনের খনি আছে, তাহার দীপ্ততেজ পশ্চিমবাসীর পক্ষে অসহ্য; সেইজন্য তাঁহারা ধোঁয়া-কাচের চশমা পরিয়া নিজের চক্ষে ভারতকে নিষ্প্রভ প্রতিপন্ন করিতে চান। এই মিথ্যাপ্রতীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নিজেদের মূঢ়তা ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহাতে তোমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আত্মস্থ হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সাধানার উপর স্বপ্রতিষ্ঠ হও, সেইখানেই সিদ্ধিলাভ হইবে। বাণী ও কল্যাণীর পূজায় জাতিভেদ নাই। যাঁহারা জাতিবিশেষের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে চান তাঁহারা ভ্রান্ত। মানুষ মাত্রেই সাধনার সমান অধিকারী। সিদ্ধির ইতর বিশেষ যেটুকু দেখা যায়, তাহার কারণ শিক্ষা ও সুযোগের তারতম্য। প্লেটো এই কথাই বলিয়াছেন। প্লেটোর মতন মনীষা বর্ত্তমান যুগে কাহার আছে?

আত্মাভিমান-প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা স্বতঃই মনে আসে—সাম্প্রদায়িকতা। ভারতীয় জীবনে বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্যা আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু ঘটনাচক্রে যেরূপ অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বুঝিতে

পারা যায় যে, তোমাদের অগ্রগতির পদে পদে এই সমস্তা নানা মূর্ত্তিতে তোমাদের পথরোধ করিবে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নাম দিয়া অতি নীচ ও সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাবে সমগ্র জাতি খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছে। একটি কথা মনে রাখিও—স্বার্থের ধর্ম্ম সংঘাত; স্বার্থের সমাপ্তি আত্মঘাত। স্বার্থান্বেষণ করিও না, কল্যাণের সন্ধান করো। যাহা প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায়বিশেষের কল্যাণকর, তাহাই তো সমগ্রজাতির পক্ষেও কল্যাণকর। ভারতবর্ষের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের যাহাতে সমভাবে উন্নতি হয়, পরস্পরের সাহচর্যো যাহাতে সকলের কল্যাণ সাধিত হয়, সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে যাহাতে আন্তরিক সমবেদনা ও শুভেচ্ছা বিরাজ করে—সেই চেষ্টাতে তোমাদের জীবন অতিবাহিত হোক।

জগৎ চলিয়াছে অগ্রগতির পথে। নেতৃত্বের অধিকার তোমাদের হয়তো না থাকিতে পারে কিন্তু নিশ্চেষ্ট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিও না। জয়যাত্রায় যোগদান করো। ক্লৈব্য ত্যাগ করো। তোমাদের মনে আশা সঞ্চারিত হোক, প্রাণে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হোক।

"নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আ মৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্॥

বাঁশী (কীর্ত্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বঁধু, সকালে সাঁঝে
মধু বনের মাঝে
যে বাঁশি তোমার ওঠে বাজিয়া,
মোর মনের তটে
তার বাণীটি রটে
নিতি নব ঝঙ্কারে সাজিয়া॥

কখনো বিছায় বাঁশি বেদনা
ব্যথা বিনা যারে চেনা যেত না···
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেরে যে সে ভাসিয়া!
কত দূর হ'তে যেন ডাকে সে···
সমীপের ছোঁয়া তবু লাগে যে···
সুখ-দুখ ওঠে উচ্ছ্বাসিয়া!

বঁধু, যখনি জানি
তুমি হে অভিমানী,
সাধিছ আমারে অন্বেষণে,
সাধি আমিও গানে
মোর বিরহী তানে
তব চিরবিরহের বেদনে॥

জাগায়ে আবেশ ফুল-লগনে,
মাতায়ে কিরণে—মেঘে গগনে
কাঁপনে তাপনে এলে নাচিয়া!
হৃদে তাই শুনি তব ছন্দ,
শীতে ছায় তোমারি বসন্ত,
তব নিশ্বাসে রহি বাঁচিয়া॥

গায় মুরলী ঝরে
আরো উছল স্বরে:
আমারি তো ওরে দশা স্বরেলা···
মোর নীল রাগিণী
যার প্রাণে জাগে নি
রঙের মেলায়ো যে সে একেলা

চমকিয়া উঠি শুনি' সে-কথা
তাই বুঝি ছায় বুকে এ-ব্যথা—
শ্যামলে আজো না ভালোবাসিয়া,
দূরে ঠেলে তাই বুঝি ফিরালে
প্রেমের তীর্থ পানে—চিনালে
ভাসিতে বাঁশিতে পরকাশিয়া।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-অভিভাষণ

গত ১৪ই জুলাই তারিখে সমাবর্ত্তন-অভিভাষণ উপলক্ষ করিয়া আমাদের ভাইস্‌চ্যান্‌সিলর ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধা-বিনোদ পাল কয়েকটি সহজ, সত্য কথা জোর করিয়া বলিয়াছেন। এই যুগ-সন্ধি লগ্নে দেশের যুব-সম্প্রদায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য ও ভবিষ্যতের আশা এবং আদর্শ সম্বন্ধে ডক্টর পাল যে-প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করিয়াছেন, সাধারণ্যে তাহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। তাঁহার অভিভাষণের সারাংশ একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে "বঙ্গশ্রী"র বর্ত্তমান সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অভিভাষণের প্রারম্ভে-ই ভাইস্‌চ্যান্‌সিলর মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে-সব সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে যে-অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহার পরিমাণ স্বল্প। তা' ছাড়া তাহা এতই সর্ত্তমূলক যে, তাহাতে শিক্ষাকার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয় না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও সেরূপ দান গ্রহণ করাই বিড়ম্বনা।

তরুণ ছাত্রগণকে প্রবীণ অধ্যাপক 'বন্ধু' সম্ভাষণে এই কথা প্রচার করিয়াছেন যে, বাণী ও কল্যাণীর মন্দিরে মানুষমাত্রেরই পূজার সমান অধিকার। সিদ্ধির ইতর বিশেষ শিক্ষা ও সুযোগের তারতম্য অনুসারে ঘটিয়া থাকে। যুব-সম্প্রদায়কে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোগ্য সৈনিক হইতে পারে; যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহারা দেশ-মাতৃকার সেবা করিতে পারে; ভারতের গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারিগণ যেন স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যতে জগতের মধ্যে সম্মানিত আসন অর্জ্জন করিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, জাতিগর্ব্বান্ধ পশ্চিম ভরতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চায় না। পশ্চিমবাসী ভারবর্ষকে খর্ব্ব করিয়াছেন এবং করিতে থাকিবেন। তাঁহাদের বিকৃত দৃষ্টি ও ভ্রান্ত মতবাদের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যেন নিজেদের উপর বিশ্বাস না হারাই।

জাতিগর্ব্বান্ধতার অনুরূপ আর একটি ব্যাধি আমাদের জাতীয় জীবনে সম্প্রতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নাম সাম্প্রদায়িকতা। ডক্টর পাল এ বিষয়ে যে চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রণিধান-যোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে-ও ভারবর্ষে—হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। মূলতঃ বিরোধের কোনও হেতু নাই। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত্তমান কালে ঘটনা চক্রে, নীচ স্বার্থসর্ব্বস্ব কূটনীতিকের চক্রান্তের ফলে—সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

যে কোনও বিরোধের মূলে কী থাকে? স্বার্থের সংঘাত। অর্থাৎ যদি একজনের স্বার্থসিদ্ধি হইলে অপরের স্বার্থ-হানি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তবেই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ডক্টর পাল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কতকগুলি স্বার্থ আছে; সেই স্বার্থে কেহ আঘাত করিলে প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করা তাহার কর্ত্তব্য; প্রতিঘাত করার চেষ্টাও স্বাভাবিক। প্রত্যেক সম্প্রদায় চায় যে, (১) তাহার ঘরোয়া ব্যাপারে যা'কিছু অনুষ্ঠান আছে, তাহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না। (২) তাহার ধর্ম্মের উপর কেহ উপদ্রব করিবেনা; (৩) তাহার রাজনৈতিক সুখ-সুবিধা ও (৪) ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর কেহ অন্যথাচরণ করিবে না।

ভারতবর্ষে প্রধান যে-দুইটি সম্প্রদায় আছে, এই সব স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তো তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধের প্রয়োজন নাই, কারণও নাই। এই বিষয়ে হিন্দুরও যাহা স্বার্থ, মুসলমানেরও তাহাই স্বার্থ। এই দেশেরই কয়েক কোটি ব্যক্তি লইয়া মুসলমান-সম্প্রদায় গঠিত, আবার এই দেশেরই কয়েক কোটি ব্যক্তি লইয়া হিন্দু সম্প্রদায় গঠিত। কি হিন্দু, কি মুসলমান প্রত্যেকেই চায়—অন্ন, স্বাস্থ্য, আবাস, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও পারিবারিক ব্যাপারে নিরুপদ্রবতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং নিজ

নিজ যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ প্রস্ফুরণের সহজ পন্থা। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের স্বার্থ সুচারুরূপে সিদ্ধ হইলে সমগ্র দেশেরই কল্যাণ। এই প্রসঙ্গে "বঙ্গশ্রী"র পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাতে ধারাবাহিকরূপে বিশদ আলোচনা হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সুযোগ-সুবিধা সমান ভাবে সহজ-লভ্য হয়। তবেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক হইয়া যাইবে—উভয়েরই মূলে থাকিবে ব্যক্তিগত যোগ্যতা। যে-দেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ দাতা ও ভিক্ষুকের সম্বন্ধের অনুরূপ, সে দেশ বড়ই হতভাগ্য। শাসকের স্বার্থ-কলুষিত, কুণ্ঠিত চিত্তের স্বল্প দানের ফলে শাসিত-ভিক্ষুকের "জাত যায় কিন্তু পেট ভরে না।" তাহাতে ভিক্ষুক-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরে কাড়াকাড়ি ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। সেই সংঘাতের পরিণামে শাসিত জাতির মধ্যে একতা অসম্ভব হইয়া ওঠে। ফলে, শাসকের সিংহাসন অচলায়তনের রূপ ধারণ করে।

ডক্টর পালের অভিভাষণ পড়িয়া মনে চিন্তাশীলতার উদ্রেক হয় এবং আশার সঞ্চার হয়। প্রাণে ভরসা আসে যে, উভয় সম্প্রদায় যদি ভিক্ষুক-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া যোগ্যতার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তবেই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হইবে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধি হইবে, জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি হইবে। সেই স্বার্থই সর্ব্বকল্যাণকর।

বাঙ্গালার ভাবী দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত বাঙ্গালার ক্ষতি

আমরা গত শ্রাবণ-সংখ্যায় বাঙ্গালার অন্ন-দুর্ভিক্ষাবস্থার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে কণ্ট্রোলের ফলে বাঙ্গালার গ্রাম অঞ্চলে ধান চাউল আমদানীর স্বাধীন ব্যবসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘাটতি এলাকাসমূহে সরবরাহের অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউল কিনিয়া সহরে সহরে গুদামজাত করিয়াছেন, কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে তাহা সরবরাহের কোন সু-ব্যবস্থা করেন নাই। প্রত্যেক ইউনিয়নে ফুড কমিটি যে সকল দোকানদার মনোনীত করিয়াছে, তাহারা সহরস্থিত গবর্ণমেণ্ট-গুদাম হইতে ধান চাউল কিনিয়া আনিয়া গ্রাম অঞ্চলে সরবরাহ করিবে বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তদনুসারে উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্য হইতেছে না। ঐ সকল দোকানদার মূলধনের অভাবেই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক গবর্ণমেণ্টের দোকান হইতে ধান চাউল কিনিয়া আনিতেছে না ও গ্রাম অঞ্চলে সরবরাহ করিতেছে না। গ্রাম অঞ্চলে যাহা কিছু ধান চাউল আমদানী হয় তাহা ব্ল্যাক মার্কেটের ব্যবসায়িগণ করিয়া থাকে। কিন্তু যে হাটে দুই হাজার মণ ধানের দরকার, সেই হাটে পাঁচ শত মণের বেশী ধান তাহারা আমদানী করে না বা করিতে পারে না। ঐ সকল ব্যবসায়িগণ উদ্বৃত্ত অঞ্চলে ব্ল্যাক মার্কেটে ধান কিনিয়া পথে নানাস্থানে ঘুষ দিয়া ঐ ধান আমদানী করে এবং উচ্চ দরে বিক্রয় করে। চাহিদা অপেক্ষা আমদানীর অল্পতা হেতুও ঐ দর বাড়িয়া যায়। অথচ গ্রাম অঞ্চলে সরবরাহের উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্টের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মজুত রহিয়াছে এবং পচিয়া যাইতেছে! বাঙ্গালার গবর্ণর ও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট তাহা জানেন। গবর্ণমেণ্টের গুদামে মজুত করা চাউল যে উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয় (turn over) হইতেছে না—তাহা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মিঃ ক্যাসি সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করেন নাই। ঐ চাউল পচিয়া যাইতেছে ও যাইবে—এই আশঙ্কায় উহা সময় সময় সস্তাদরে ক্ষতিয়ানা (net) কন্ট্রাক্টরগণের নিকট বিক্রয় হইয়া থাকে, অথচ গ্রাম্য হাট বাজারে উহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে না এবং সকল কন্ট্রাক্টর যে ঐ চাউল লইয়া ব্ল্যাকমার্কেট করিতেছে, তৎপ্রতিও কর্তৃপক্ষ কোন দৃষ্টি দিতেছেন না।

যাঁহারা স্বাধীন ব্যবসা করিয়া গ্রাম্য হাট-বাজারে আবহমানকাল হইতে ধান চাউল আমদানী করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের স্বাধীন ব্যবসা (free trade) বন্ধ করিয়া দিয়া গ্রাম অঞ্চলে ধান চাউল সরবরাহের দায়িত্ব লইয়া গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ধান চাউল কন্ট্রোল করিলেন, অথচ সেই দায়িত্ব পালন করিতেছেন না! বারবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা সত্ত্বেও গ্রাম্য জন-সাধারণের দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি যাইতেছে না। গ্রাম অঞ্চলে ধান চাউলের উপযুক্ত আমদানী করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব, তাহা আমরা জানি। কারণ তাহা করিতে হইলে যেরূপ জ্ঞানী ও হৃদয়বান্ লোকের দরকার সেইরূপ লোক সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টে নাই ও থাকিতে পারে না। এইরূপ ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিতে পারিবেন না বলিয়াই আমরা বরাবর গ্রাম অঞ্চলে ধান চাউলের স্বাধীন বাণিজ্যের (free trade-এর) ব্যবস্থা করার কথা বলিয়া আসিতেছি। কলিকাতা সহরে বা অন্যত্র ধান চাউল আমদানীর জন্য গবর্ণমেণ্টের যে পরিমাণ ধান চাউল কেনার দরকার, তাহা গবর্ণমেণ্টের কিনিবার পক্ষে জন-সাধারণ কোনই আপত্তি করে নাই এবং এখনও করিবে না। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে যাহারা আবহমান কাল হইতে ধান চাউল সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের স্বাধীন বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেরা সরবরাহের দায়িত্ব লইয়া সেই দায়িত্ব পালন না করায় যে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার জন্য জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করিতেছে।

এবারকার ফসলের ক্ষতির খবর যেরূপ প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয় গ্রাম অঞ্চলে ধান চাউলের অভাব আরও গুরুতর হইবে এবং ১৯৪৩ সনের ন্যায় ১৯৪৫-৪৬ সনে মহামারী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ ধান ও চাউল মজুত থাকা সত্ত্বেও গ্রাম অঞ্চলের লোক মরিয়া যাইবে।

ইহার প্রতিকার কি? দেশের নেতারা ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না। কারণ—ব্যাধির মূল কারণ তাঁহারা

জানেন না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, চাউল বাঙ্গালার বাহিরে রপ্তানী বন্ধ হইলেই ইহার প্রতিকার হইবে। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে—রপ্তানী বন্ধ হইল। ঐ ঘোষণার পরেই নেতারা চুপ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল নেতা জেলে আবদ্ধ আছেন, তাঁহারা বাহিরে থাকিলে হয় ত প্রতিকারের চেষ্টা চলিত, কিন্তু তাঁহাদের শীঘ্র বাহির হইবার আশা নাই। আমাদের মতে ইহার প্রতিকার প্রথমতঃ, গ্রাম অঞ্চলে ধান-চাউল সরবরাহের বাধা-নিষেধ তুলিয়া দেওয়া। গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা যাহাতে অবাধে (freely) গ্রাম অঞ্চলে ধান-চাউল কেনা-বেচা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইলে, গ্রাম অঞ্চলে ধান-চাউলের সরবরাহ আসিবে এবং উপযুক্ত আমদানী হেতু দরেরও সমতা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের ঠিক করা চাউল খুচরা বিক্রয়ের জন্ম প্রত্যেক সহরে ও বড় বন্দরে দোকানদার মনোনীত করিয়া তাহাদের মারফতে উর্দ্ধপক্ষে ১০৲ টাকা মণ দরে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

গবর্ণমেণ্টের চাউলের দর মণপ্রতি উর্দ্ধপক্ষে ১০৲ টাকা থাকিলে এবং গ্রাম অঞ্চলে অবাধ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলে গ্রাম্য হাট-বাজারে চাউলের দর বৃদ্ধি পাইবে না এবং বর্ত্তমান দর অপেক্ষা কম দরে চাউল পাইয়া গ্রামবাসিগণ বাঁচিতে পারিবে, ইহা সহজেই আশা করা যায়। কথা উঠিতে পারে যে, ১০৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিলে গবর্ণমেণ্টের বহু টাকা লোকসান হইবে। সেই কথার উত্তরে বলিব যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অযোগ্যতা ও অনাচার বশতঃ ধান-চাউলের কারবারে বহু কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে, অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মরিয়া গিয়াছে। আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হইলে আরও কয়েক কোটি টাকা লোকসান হইবে সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের ও অনাহারের কবল হইতে মুক্তি পাইবে। গত দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার যে ৩০ লক্ষ লোক মরিয়াছে—তাহার মধ্যে দরিদ্র কৃষক, মজুর, মৎস্যজীবী, তাঁতি প্রভৃতি সমাজের অত্যাবশ্যকীয় লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ টাকার পরিমাণে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যাহারা কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছে তাহারা ত দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্যেই জীবন যাপন করিতেছে, ইহার উপর যদি পুনরায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহারা মরিয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইবে, তাহা অর্থদ্বারা পরিমাপ করা ত সম্ভবই নহে, সেই ক্ষতি বশতঃ বাঙ্গালী জাতি চিরদিনের জন্ম পঙ্গু হইয়া যাইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি বাঙ্গালার এত বড় ক্ষতি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? যদি না হইয়া থাকেন, তবে অতি সত্বর আমাদের উপরোক্তরূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করুন।

বাঙ্গালার বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালার বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ অবস্থা সমান চলিতেছে। কত আন্দোলন, কত ক্রন্দন, কত হাহাকার, কত তীব্র সমালোচনা—সবই নিষ্ফল হইয়াছে! অপর কেহ গলা টিপিয়া ধরিলে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাঙ্গালীর সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী আজ নিরুপায়! গবর্ণমেণ্টের গোলায় ধান-চাউল মজুত রহিয়াছে, অথচ গ্রাম অঞ্চলে যেমন তাহার সরবরাহ হইতেছে না, তেমনই গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে গবর্ণমেণ্ট-এজেণ্টগণের, বেপারীগণের ও মিলসমূহের গুদামে হাজার হাজার বেল কাপড় মজুত রহিয়াছে, অথচ মফঃস্বলের সহরে ও গ্রাম অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণে কাপড় সরবরাহ হইতেছে না। যে পরিমাণ কাপড় আজ পর্য্যন্ত মহকুমাসমূহে চালান হইতেছে, তাহা কি মহকুমার অধিবাসিগণের কি ইউনিয়ন বাসিগণের জন প্রতি একখানা করিয়া ধুতি বা শাড়ীর চাহিদা মিটাইতে পারে না।

গ্রাম অঞ্চলের অধিবাসিগণের অবস্থা এত শোচনীয় যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ভাবিতে গেলেও শরীরের রক্ত উত্তপ্ত হয়। এ পর্য্যন্ত কোন ইউনিয়নেই এমন কাপড় যায় নাই যে, তথাকার অধিবাসিগণের শতকরা ২৫ জনকেও একখানা করিয়া ধুতি বা শাড়ী দেওয়া যাইতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, কাপড়ের আমদানী চাহিদা অপেক্ষা অনেক কম। আমরা জিজ্ঞাসা করি—আমদানী কি এতই কম যে, গত জানুয়ারী হইতে আজ পর্য্যন্ত এই নয় মাসের মধ্যে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে একখানা করিয়া ধুতি বা শাড়ী দেওয়া যাইতে পারে না? খবরের কাগজের মারফতে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে মনে হয়—চাহিদার অর্দ্ধাংশের বেশী আমদানী আছে। এই ঘাট্‌তি অর্দ্ধেক ত অনেক দিন হইতেই বাঙ্গালী কাপড়ের ব্যবহার কমাইয়া দিয়া সামলাইয়া লইয়াছে। তবে কাপড়ের এইরূপ দুর্ভিক্ষ কেন? মস্তিষ্ক ও হৃদয়বিহীন কতকগুলি লোকের হাতে কাপড় সরবরাহের ভার পড়াতেই কি বাঙ্গালীর আজ এই দুর্গতি? না, বাঙ্গালার নামে কাপড় আনাইয়া অন্য দেশে চালান দেওয়া হইতেছে? না, ঐ দুই কারণই বর্ত্তমান? গবর্ণমেণ্ট এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি?

ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে লর্ড ওয়াভেলের দ্বিতীয় সফর

সম্প্রতি কিছুদিন হইল ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পুনরায় বিলাতে গিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন। প্রথম যখন ওয়াভেল সাহেব ভারত-সম্পর্কিত বিষয় লইয়া বিলাত যান, তখন রক্ষণশীল চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্ট অব্যাহত ছিল। কয়েক মাস কাটিয়া যাইতে না যাইতে বিলাতে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গতবার ওয়াভেল সাহেব যে প্রস্তাবনা আনিয়া সিমলা সম্মেলন আহ্বান করিলেন, তাহাতে এক মোসলেম লীগ ভিন্ন ভারতের আর সমস্ত দলেরই সমর্থন ছিল। কিন্তু দেখা গেল, একা জিন্না সাহেবের অপ্রীতিভাজন হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সমস্যা সমাধানের কাজে আসিতে রাজী নহেন। (জিন্না সাহেবও স্পষ্ট বুঝিয়া লইলেন, খোদার উপর খোদকারী করিতে তাঁহার শক্তি আরও বহুকালের জন্ম কায়েমী রহিয়া গেল। তিনি ভারতের শান্তি-ব্যবস্থার চাইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তোষণ করিয়া আত্মস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতেই প্রয়াসী।)

সম্প্রতি ওয়াভেল সাহেব বিলাতে ভারত সম্পর্কে নূতন শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া আসিয়াছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু এখনও ব্যক্ত করা হয় নাই। প্রকাশ যে,

শীঘ্রই তিনি তাঁহার শাসন-পরিষদের সদস্যদের মতামত লইয়া বিবৃতিদান সম্পর্কে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। তবে যতদূর জানা যায়, তাহাতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের সহিত ওয়াভেল সাহেবের আলোচনা প্রধানতঃ চলিয়াছিল নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি লইয়া। যথা: (ক) ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন পাইলে বড়লাটকে কেন্দ্রীয় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে কিনা; (খ) ভারতে ফিরিয়া তিনি ৯৩ ধারা অনুযায়ী শাসিত কংগ্রেস-প্রদেশসমূহে মন্ত্রিসভা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন কিনা। এবং (গ) গণপরিষদ্ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা হইবে।

নূতন বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারত সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহার স্বরূপ এখনও জানা যায় নাই। আমাদের এক সহযোগী দৈনিক পত্রিকা এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ভারতের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে এত অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় সমস্যার জন্য শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ওয়াভেল সাহেবকে বিলাতে আমন্ত্রণ করিত না। এ কথার সত্যতা কতদূর, তাহা এইমাত্রই বুঝা কঠিন। তবে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই যে তাহার নিজের প্রয়োজনের দিক হইতে ভারতকে তাহার আবশ্যক, এ-কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া গেলেও শাসনযন্ত্র পরিচালনায় নূতন গভর্ণমেণ্টও এমন দিল-দরিয়া নয় যে, ভারতের দুঃখ নিবেদন করিলেই সে-দুঃখ অমনি দূর হইবে। প্রসঙ্গক্রমে (এই) নূতন গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে প্রখ্যাতা লেখিকা পার্ল বাকের উক্তি উল্লেখযোগ্য। নিউ ইয়র্ক লিবারেল পার্টির এক সভায় বাণী প্রেরণ করিয়া প্রসঙ্গতঃ তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন: কোন শ্রমিক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ-ভার লাভ করে, তাহার উপরই বৃটেনের শ্রমিকদলের বিজয়লাভের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করিবে। যদি তাঁহারা উপদলগত একদেশদর্শিতা বা দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতা কাটাইয়া উঠিতে না পারেন, তবে এশিয়ার লোকের মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না। বৃটেনের পূর্ব্বেকার শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতের বৃটিশ শাসন-পদ্ধতিতে অথবা চীনের ব্যাপারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন করেন নাই; কাজেই সেই গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এই সকল দেশের জনসাধারণের হতাশার স্মৃতি এখনও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই জাগরূক রহিয়াছে। চার্চ্চিলের শাসনকালে সদভিপ্রায়-সম্পন্ন লোকের পক্ষেও সাম্রাজ্যবাদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেদ করা সম্ভব ছিল না। এখন সে-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই ভগ্ন প্রাচীরের উভয় দিককার লোক তাহাদের মুক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারবুদ্ধি লইয়া কাজ করিতে পারে কিনা এবং প্রাচীন জাতীয় কূটনীতি ত্যাগ করিয়া আধুনিক বিশ্বরাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে কিনা, তাহাই এইবার লক্ষ্য করিবার বিষয়। আজ এশিয়াখণ্ডের নরনারীর চিত্তে স্বভাবতঃই যথেষ্ট পরিমাণের সন্দেহের ভাব বিদ্যমান। ইংলণ্ডের নিজস্ব শিল্পসম্পদ্ রপ্তানি ব্যাহত করিয়া শ্রমিকদলের নেতৃবৃন্দ কি ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং ফেরৎ দিতে পারিবেন? ইংরাজ শ্রমিকরা কি নিজেদের মাখন ও রুটির কথা ব্যতীত আর কোন কিছুর কথা ভাবিতে পারিবে? তাহাদের নিজেদের রুটিতে মাখন মাখাইবার পর ভারতের বুভুক্ষু নরনারীর জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কি? ধনী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে যেমন হইয়াছিল, বৃটেনের সাধারণ লোকের স্বার্থেও কি আজ তেমনি ভারতবর্ষকে

লর্ড ওয়াভেল

পরাধীন রাখা প্রয়োজন হইবে না? চীন ও ভারতবর্ষ উভয় দেশই জানে, কোন রাজনৈতিক দলের পরিবর্ত্তনে পরাধীন জাতির ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এশিয়ার জনগণ ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শ্রীমতী পার্ল বাক্ ভারতের নিভৃত হৃদয়ের কথাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বহুপ্রত্যাশায় ভারতবর্ষ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের শুভবুদ্ধির পানে চাহিয়া আছে। চার্চ্চিল গভর্ণমেণ্টের মতো খাঁড়া চালে অন্ততঃ আর ভারতের দুর্দ্দশা-তাপ বাড়াইবেন না—এইটুকুই শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট সৌজন্যের খাতিরে আশা করিতে পারে ভারতবর্ষ। আমরা আবার ধৈর্য্য ধরিয়া ওয়াভেল সাহেবের শুভ প্রস্তাবনার আশায় বসিয়া আছি। মনে করি, এই দ্বিতীয় বারের সফরে হাসিমুখেই ওয়াভেল সাহেব ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন।

আসন্ন নির্ব্বাচন ও দেশবাসিগণের কর্ত্তব্য

আসন্ন নির্ব্বাচনে দেশবাসিগণের কর্ত্তব্য কি—তাহা অবশ্য রাজনৈতিক নেতারাই স্থির করিবেন বা করিতেছেন। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের ফলের উপর বাঙ্গালা প্রদেশের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে বলিয়া তৎসম্বন্ধে দেশবাসিগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

লণ্ডনের খবরে জানা যায় যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ভারতে (বৃটিশ ভারতে, সমগ্র ভারতবর্ষে নহে) নূতন শাসন-সংস্কার

প্রবর্ত্তন করিতে খুবই ইচ্ছুক, তবে ঐ নূতন সংস্কারের প্রস্তাব যদি পরিষদসমূহের নূতন নির্ব্বাচিত সভ্যগণ অধিকাংশের মতে গ্রহণ করেন, তবেই নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে। সেই কারণেই পরিষদসমূহের নূতন নির্ব্বাচন আবশ্যক হইয়াছে এবং সকল পক্ষই নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় প্রধান 'ইস্যু' হইবে নূতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবের অন্তর্গত প্রধান কয়েকটি ব্যবস্থা। শুনা যায় যে, নূতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ক্রিপ্স সাহেবের প্রস্তাব (Cripp's proposal) অনুযায়ী বা তদনুরূপ হইবে। যাহাই হউক, ঐ প্রস্তাবের অন্যতম ও প্রধান ব্যবস্থা এই যে, কোন প্রদেশের পরিষদের সভ্যগণের অধিকাংশের মত হইলে সেই প্রদেশ অখণ্ড ভারত হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা যাইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালা প্রদেশের অধিকাংশ লোকই অখণ্ড ভারতের উপাসক এবং কংগ্রেস ও হিন্দুসভা প্রভৃতির নেতৃবৃন্দ সেইরূপ মত পোষণ করেন। সুতরাং আসন্ন নির্ব্বাচনে এমন সকল সভ্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, যাহারা অখণ্ড ভারতের সমর্থক।

বর্ত্তমান আইন অনুসারে বাঙ্গালা প্রদেশে ব্যবস্থা-পরিষদের জন্য ২৫০ জন সভ্যের সিট নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত সিটসমূহ নিম্নলিখিতরূপে বণ্টন করা আছে, যথা :—

১। মুসলমান—	১১৭	৭। ইংরেজ (সর্ব্বশুদ্ধ)	২৫
২। জেনারেল (হিন্দু)	৭৮	৮। এংলো ইণ্ডিয়ান	৩
৩। হিন্দু-মহিলা	২	৯। জমিদার	
৪। মুসলমান-মহিলা		১০। দেশীয় চেম্বার্স	
৫। এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা		১১। ইউনিভার্সিটি	
৬। ভারতীয় খৃষ্টান		১২। লেবার প্রতিনিধি	

উপরোক্ত ৭৮টি হিন্দু সিটের মধ্যে ৩০টি তপশিলভুক্ত হিন্দুগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বাকী ৪৮ টি হিন্দু সিটে যাহারা যে কোন দল হইতে সভ্য মনোনীত হইবেন, তাঁহারা সকলেই "অখণ্ড ভারতের" পক্ষে থাকিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দুগণের সিটে নির্ব্বাচিত সভ্যসমূহের অধিকাংশ যদি 'অখণ্ড ভারতের' পক্ষে না থাকেন, তবে বাঙ্গালা প্রদেশ পৃথক্ হইয়া যাইবে, ভারত খণ্ডিত হইবে।

এই অবস্থায় দেশবাসিগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে—মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দুগণের অধিকাংশ সিটে যাহাতে 'অখণ্ড ভারতের' পক্ষপাতী সভ্য মনোনীত হইতে পারেন, তজ্জন্য সময়, শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত করা। যে সকল মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দু "অখণ্ড ভারতে" বিশ্বাসী, তাঁহারা যাহাতে আসন্ন নির্ব্বাচনে জয় লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য দেশপ্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাঁহাদিগকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার নেতাগণ মিলিত হইয়া 'অখণ্ড ভারতে' বিশ্বাসী মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দুগণকে আসন্ন নির্ব্বাচনে আবশ্যকীয় সাহায্য প্রদান না করিলে তাঁহাদের অনেকেরই নির্ব্বাচনে জয় লাভ করা সম্ভব হইবে না। তাহার ফলে, বাঙ্গালা প্রদেশ ভারতের বহির্ভূত ও পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশের কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভা উপরোক্ত ৪৮ টি হিন্দু সিটের সভ্যনির্ব্বাচনের দ্বন্দ্বে স্বীয় স্বীয় শক্তি ও অর্থ নিঃশেষ করিয়া না ফেলেন এবং বাঙ্গালার জীবন-মরণের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন, সেই নিমিত্ত আমরা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাহ্নে উপরোক্ত অবস্থার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যদি সেইরূপ দৃষ্টি না দেন—তবে বাঙ্গালা প্রদেশের ও বাঙ্গালীর নাম চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইবে।

কুচ্ বিহারে ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপর সৈন্যদের অত্যাচার

সম্প্রতি কুচ্ বিহারে যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সেই দিকে ইতিমধ্যেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। দীর্ঘ কাল যুদ্ধের দরুণ ভারতে থাকিয়া সৈন্যরা যে নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিয়াছিল, যুদ্ধশেষে হঠাৎই তাহা বড় বেশী সক্রিয় রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। অপমানে, লাঞ্ছনায়, দুর্য্যোগে দীর্ঘকাল হইতেই জর্জ্জরিত হইয়া আছে বাঙ্গালী, তাহার উপর সৈন্যদের অত্যাচার গত কয়েক-বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীকে আরও লাঞ্ছনাপিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। কুচবিহারের সাম্প্রতিক ঘটনা হইতেই তাহার কিছুটা প্রতীত হইবে।

বিগত ২১শে আগষ্ট বেলা ১১টার সময় কুচবিহার কলেজ হোষ্টেলের সম্মুখে দুইটি সাইকেলের সংঘর্ষ হয়। একটিতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাইতেছিলেন, অপর সাইকেলটিতে দুইজন সৈন্য যাইতেছিল। আকস্মিক সংঘর্ষের ফলে সৈন্য দুইটি ভদ্রলোকটিকে যথেষ্ট প্রহার করে। ভদ্রলোকটি প্রাণভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে দৌড়াইয়া ধরিয়া পুনরায় প্রহার সুরু করে সৈন্য দুইটি। সেই সময় হোষ্টেল হইতে দুইটি ছাত্র আসিয়া ভদ্রলোকটিকে রক্ষা করে এবং সৈন্য দুইজনের সাইকেলটি কাড়িয়া লইয়া পুলিশের নিকট জমা দেয়। ইহাতে সৈন্য দুইটি ছাত্র দুইটিকে প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় প্রদর্শন করে। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া কলেজের অধ্যক্ষ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে সংবাদ দেন।

বেলা প্রায় ১২টার সময় যখন কলেজের কাজ চলিতে থাকে, তখন সামরিক বাহিনীর দুইজন অফিসার অধ্যক্ষের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সৈন্যদের ব্যারাকে যাইতে বলে। কিন্তু অধ্যক্ষ তাহাতে অসম্মত হন। পুনরায় বেলা ১ ঘটিকায় একজন সুবেদার আসিয়া অধ্যক্ষকে বলে যে, তাহাদের মেজর তাঁহাকে ডাকিতেছেন; অধ্যক্ষ বলেন, মেজর যদি নিজে কলেজে আসেন তবে তিনি আনন্দিত হইবেন। সুবেদার তখনকার মতো চলিয়া যায়। ইহার পর বেলা প্রায় চারি ঘটিকায় দুই শত লোক ইষ্টক-খণ্ড ও ব্যাটন লইয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া জেনকিন্স্ স্কুলে প্রবেশ করে এবং আর একদল সৈন্য কলেজ-হোষ্টেলে প্রবেশ করে। জেনকিন্স্ স্কুলে প্রবেশ করিয়া সৈন্যরা ছাত্র ও শিক্ষকগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে এবং তাহার মধ্য হইতেই কয়েক জন কলেজে প্রবেশ করে। কলেজে তখন পাঠ চলিতেছিল। অধ্যক্ষ উত্তেজিত সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎই তিনি সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাহার পর যুগপৎ ভাবে হোষ্টেলের ছাত্র এবং কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উপর

কঠোর অত্যাচার আরম্ভ হয়। ঘটনার পর যে-সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়: কলেজ ও হোষ্টেলের দরজা-জানালা ও কাচের জানালাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কক্ষের টেবিল, চেয়ার, শেলফ্ প্রভৃতির কোনরূপ অস্তিত্বই নাই। কক্ষময় বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ডের রাশি। সৈন্যরা যে সকল অস্ত্র আনিয়াছিল তাহা ছাড়াও উক্ত ইষ্টকখণ্ডগুলি তাহারা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিল। অধিকাংশ কক্ষেই রক্তের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কত ছাত্র জখম হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রকৃত সাজা কি, তাহা আমরা জানি না। গভর্ণমেণ্ট আজও এই রক্তলোভী সৈন্যদের কোনরূপ সাজা দিবার ব্যবস্থাই করেন নাই। নিরীহ ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও শিক্ষায়তনের উপর এইরূপ অত্যাচার যদি বৃটেনে ঘটিত, তবে তাহার জন্য অবশ্যই শাসন-ব্যবস্থা থাকিত, কিন্তু পরাধীন বাঙালীর পক্ষে লাঞ্ছনা সহ্য করাকেই হয়ত গভর্ণমেণ্ট নীতি বলিয়া চক্ষু বুজিয়া আছেন। এই অত্যাচারের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আমরা জবাবদিহি চাই। গভর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন কি?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি

সম্প্রতি ভারত-সরকার কর্তৃক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে; ঐ সঙ্গে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ শিশির বসু এবং

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ দ্বিজেন বসু ও অরবিন্দ বসুকেও ভারত সরকার কারাগার হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন।

১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে ভারতরক্ষা আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন, শত্রুপক্ষ জাপানের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বসুর গোপন যোগ আছে। তখনও ইহার বিরুদ্ধে দেশবাসীর পক্ষ হইতে যথেষ্ট আন্দোলন তোলা হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেদিকে কর্ণপাত করেন নাই। এই সুদীর্ঘকাল ক্রমাগত কারাগারের পর কারাগার পরিবর্তন করিয়া শ্রীযুক্ত বসুর স্বাস্থ্যের উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা বক্তব্যের বাহিরে। ইতিপূর্ব্বেও একবার শ্রীযুক্ত বসু ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৫ সালের ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজবন্দী থাকেন।

শ্রীযুক্ত বসু ক্রমশঃ নিরাময় হইয়া নব উদ্যমে আবার তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মে অগ্রসর হউন—ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করি।

বাংলা দেশ আজ জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে ৯৩ ধারার শাসনবিশৃঙ্খলা, আর একদিকে দুর্ভিক্ষ ও রোগজর্জ্জরতা। এই চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে বাংলায় আজ শরৎচন্দ্রেরই বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমরা তাঁহার অটুট কর্ম্মশক্তি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য গত দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের বিভিন্ন স্থান ও প্রতিষ্ঠান হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী পেশ করা হইয়াছে। আমরাও ইহা লইয়া বহুবার গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার আমলাতান্ত্রিক নীতির রজ্জু স্বল্পমাত্র ঢিলা করিতেও তৎপর হন নাই। গত ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের অজুহাতে হাজার হাজার ভারতীয়কে বিনা বিচারে গভর্ণমেণ্ট কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করা যদি আইনের চোখে পাপ বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বৃটেনই কি সেই পাপ হইতে মুক্ত! কিন্তু দুর্ভাগ্য, বৃটেন ও ভারতের আইন এক নয়। লর্ড ওয়াভেল সাহেবের গত সিমলা বৈঠকে কথা উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষ যদি ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হইয়া যায়, তবে উক্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে তখন ভারতীয় নেতৃগণই বিবেচনা করিবেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও যে কতখানি ছলনা লুকাইয়া ছিল, তাহা উক্ত সম্মেলন ব্যর্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়িল।

সম্প্রতি কিছু কিছু করিয়া গভর্ণমেণ্ট উক্ত বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু একসাথে সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে গভর্ণমেণ্টের সত্যই কি মানবতায় কোথাও বাধিতেছে? এই সুদীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে অধিকাংশ লোকই ক্ষীণস্বাস্থ্য ও স্বল্পায়ুঃ হইয়া পড়িয়াছেন। এ-পর্য্যন্ত সে-দিকে গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি যায় নাই। কখনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্ট কোনো কোনো বন্দীকে তাঁহার প্রায় অন্তিম মুহূর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। এখনও সকল বন্দীকে একত্রে মুক্তি দিতে গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী নহেন। অতুল মহানুভবতার পরাকাষ্ঠাই বটে!

সামনে কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাহাতে উপযুক্ত ভোটাধিকারের দ্বারা তাঁহারা উক্ত নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়াইতে পারেন, সেইদিকে ইহার বহু পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্টের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। এখনও সামান্য সময় আছে। অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া নির্ব্বাচনে তাঁহাদিগকে যদি

দাঁড়াইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করেন, তবে ইহা বুঝিয়া লওয়া অন্যায় হইবে না যে, ভারতকে চিরদিনের মতো পঙ্গু করিয়া রাখাই গভর্ণমেণ্টের একমাত্র উদ্দেশ্য! আদর্শ ও নীতির কথা তাহার নিতান্ত বহুরূপী বাচ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়! এ-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি বলিবেন?

পরলোকে শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী

বিগত ১লা ভাদ্র ৭৪ বৎসর বয়সে বাঙ্গলার বিশিষ্ট লেখিকা ও দেশসেবিকা শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে তাঁহার জন্ম হয়। সরলাদেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি বেথুন কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন ও পদ্মাবতী পদক লাভ করেন। ১৯০৫ সালে পাঞ্জাব নিবাসী আর্যসমাজ-নেতা পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ: স্বামীর সহিত একত্রে উর্দ্দু সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান' সম্পাদন করেন, এবং উহার ইংরেজী সংস্করণের তিনি সম্পাদিকা হন। ১৯১৮ সালে পাঞ্জাবে যখন সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি ও তাঁহার স্বামী উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তাঁহার স্বামীর নির্ব্বাসন-দণ্ড হয়। ১৯১৯ সালে সরলা দেবী গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারে সমগ্র পাঞ্জাবের নেতৃগণ নিপীড়নে জর্জ্জরিত, তখন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর বীরোচিত ধৈর্য্য ও নির্ভীক কার্য্য সমগ্র পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দকে বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করে।···রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় তিনি একটি বেঙ্গল এ্যাম্বুল্যান্স গঠন করেন।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর বিভিন্ন ইংরেজী ও বাঙ্গলা প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও গ্রন্থাদি সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তিনি দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার অগ্রজা হিরন্ময়ী দেবীর সহিত যুগ্ম সম্পাদনা কার্য্যে 'ভারতী' পত্রিকার যে শ্রীবৃদ্ধি করেন, তাহা অতুলনীয়। এতদ্ব্যতীত ১৯০৬ সাল হইতে তিনি এককভাবে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ 'ভারতী' সম্পাদন করিয়া সাংবাদিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ১৯২৬ সালে ভারতীয় সংবাদ-পত্রসেবী সঙ্ঘের সভানেত্রী থাকিয়া তিনি সাংবাদিকগণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীত "অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণী! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'।" অথবা—"বন্দি তোমায় ভারত জননী বিদ্যামুকুটধারিণী।" প্রভৃতি গানগুলি বাঙ্গলার জাতীয় সম্পদ্।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী পরিণত বয়সেই লোকান্তরিতা হইয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে বাঙ্গলা সাহিত্য, সংবাদপত্র, বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলন তথা সমগ্র বঙ্গীয় নারী-সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। আমরা তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর

বিগত ১৭ই মে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর তাঁহার গড়িয়াহাটা বাসভবনে কঠিন নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বঙ্গশ্রীতে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সুদীর্ঘ উপন্যাস 'অপমানিত' প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার রচনার সঙ্গে যাঁহারাই পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, শ্রীযুক্ত করের রচনাপদ্ধতি প্রধানতঃ গাম্ভীর্য্য ও হাস্যরসের একত্র সমন্বয়ে রসগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছিল। সুদীর্ঘকাল তিনি ব্রহ্মপ্রবাসে কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানেই একসময় কথাসাহিত্যসম্রাট্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার প্রথম আলোচনা হইয়াছিল। বর্ম্মীদের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। ছোট ছোট একাঙ্ক নাটিকার মধ্য দিয়া ক্রমান্বয়ে তিনি

কুমুদিনীকান্ত কর

তাহার রূপ দিতেছিলেন। যদি তাহা তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে বাংলা-সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী সৃষ্টি হইত বলা চলে। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বেশ হাস্যমুখর ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মন ছিল তাঁর যথার্থ দরদী ও কবিমানসে পূর্ণ। আমাদের দপ্তরে লিখিত তাঁহার শেষ পত্রখানিতে তাঁহার সেই দরদী-মনের প্রভূত আভাস পাওয়া যাইবে: "যখন সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেহ রাখেন, আমি নিউমোনিয়া রোগে শয্যাশায়ী। কাজেই সশরীরে যাইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। যিনি বহু লোকের আশ্রয় তাঁহার জীবন ধন্য। তিনি ভাগ্যবান্। তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন এবং অন্তে তাঁহারই অঙ্কে স্থান পাইয়াছেন। মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তিই তাঁহাকে এই স্থান দান করিয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চয়ই সদ্গতি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনুতপ্ত পরিবারবর্গকে ভগবান্ সান্ত্বনা দিউন। এখনও আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারিতেছি না, কারণ প্লুরিসিতে শয্যাশায়ী।" আজ তাঁহার কথাতেই আমাদিগকে বলিতে হয়, এই কঠিন তাপময় পৃথিবী হইতে তিনি জীবনান্তে

ভগবানের অঙ্কে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার অনুতপ্ত পরিবার-বর্গকে ভগবান্ সান্ত্বনা দিউন। এখনও তাঁহার একটি অপ্রকাশিত রচনা আমাদের হাতে আছে। শীঘ্রই আমরা তাহার প্রকাশ-ব্যবস্থা করিয়া পাঠকবৃন্দকে স্মৃতি-উপহার দিব।

পরলোকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

বিগত ২৩শে আগষ্ট জাপানী নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক মৃত্যু ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জাপানী নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছে: জাপ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিবার জন্য 'অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ্ গবর্ণমেণ্টের' প্রধান কর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত ১৬ই আগষ্ট বিমানযোগে সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাত্রা করেন। ১৮ই আগষ্ট তারিখে বেলা ২টার সময় তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে তাঁহার বিমানখানি এক দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। জাপানের এক হাসপাতালে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়, সেখানেই মধ্যরাত্রে তিনি মারা যান।

উক্ত সংবাদ প্রচারের পর ভারতের সর্ব্বত্র সুভাষচন্দ্রের শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধনা ভারতীয় মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাসে শুধু অতুলনীয়ই নয়, অবিস্মরণীয়। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক ও সর্ব্বত্যাগী পুরুষ দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্রের পবিত্র আত্মার কল্যাণ হউক, এই প্রার্থনা ভিন্ন আজ আর কিছু বলিবার নাই।

জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী কটকে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু মহাশয় কটকে সরকারী উকিল ও স্থানীয় বারের নেতা ছিলেন। সুভাষ চন্দ্রের মাতা শ্রীযুক্তা প্রভাবতী বসু প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে গত ১৯৪৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্র কটকের প্রটেষ্টাণ্ট ইউ-রোপীয়ান স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখানে বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করার পর তাঁহাকে র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। উক্ত স্কুল হইতেই ১৯১৩ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। (ছাত্র-জীবনে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ইণ্টার মিডিয়েট কোর্স্ পড়িবার সময় তাঁহার মনে সন্ন্যাস গ্রহণের এক প্রবল প্রেরণা জন্মে)। ১৯১৫ সালে তিনি প্রথম বিভাগে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। (প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ ই. এফ. ওটেনকে প্রহারের অভিযোগে সুভাষচন্দ্র অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। ১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় অধ্যয়ন করিবার অনুমতি পান।) ১৯১৭ সালেই যথাসময়ে তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। উক্ত সময়ে তিনি ব্যাবহারিক মনোবিজ্ঞান লইয়া এম. এ. পড়িতেছিলেন। ইংলণ্ড যাইবার ৮ মাস পরেই তিনি আই. সি. এস্. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন।

১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প গৃহীত হয় এবং সমগ্র দেশ গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সুভাষচন্দ্র তখন ইংলণ্ডে। দেশের আহ্বান তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন
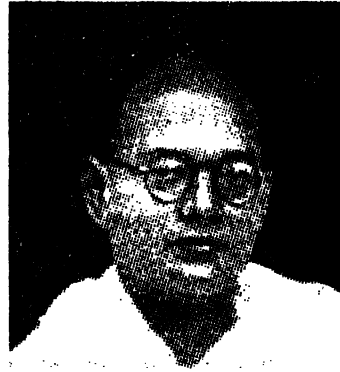
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (তরুণ বয়সে)

১৯২১ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গান্ধীজীর উপদেশে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট যান এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯২১ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ হন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রচারকার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। (১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইনী ঘোষণা করিলে তাহার প্রতিবাদে কলিকাতায় জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্ম্মিগণের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি বাহির হয়। এই সম্পর্কে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র ও আরও কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শ্রীযুক্ত বসু ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।) ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধুর সহিত তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার গয়া অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল-প্রবেশের কর্ম্মপন্থা সমর্থন করেন এবং ১৯২৩ সালে তিনি স্বরাজ্যদল গঠনে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই সময়ে 'বাংলার কথা' নামে তিনি এক

দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন, পরে দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' পত্র পরিচালনার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় স্বরাজ্যদল কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকার করিলে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম প্রধান কর্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। উক্ত সালেই ২৫শে অক্টোবর বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স অনুসারে শ্রীযুক্ত বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং কিছুকাল পরে তাঁহাকে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৯২৭ সালের ১৫ই মে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য পুনরায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ত্রিচত্বারিংশ অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্র জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং রূপে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিচালনা করেন, এবং এই অধিবেশনে গান্ধীজীর আপোষ-রফামূলক প্রস্তাবের তিনি প্রতিবাদ করেন। ১৯২৭ হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯২৯ সালের আগষ্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবসের শোভাযাত্রা সম্পর্কে ১৯৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। উক্ত সময়ের মধ্যে কারাগারে থাকিতেই (আগষ্ট মাসে) তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।…

১৯৩৮ সালে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং ১৯৩৯ সালে তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধের ফলে তিনি কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ করেন ও ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ্চ তাঁহার সভাপতিত্বে রামগড়ে আপোষবিরোধী সম্মেলন হয়। এই বৎসরই জুন মাসের শেষভাগে তাঁহার নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবী উত্থাপিত হয়। ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই তিনি ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকিতেই ২৮শে অক্টোবর তিনি বিনা বাধায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ২৯শে নভেম্বর তিনি জেলে অনশন আরম্ভ করেন, ফলে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ৫ই ডিসেম্বর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দিষ্ট হন। ৩রা ফেব্রুয়ারী গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেন। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে এক গুজব রটে, "স্বাধীন ভারত কংগ্রেসে" যোগদানের জন্য টোকিও যাইবার পথে বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র নিহত হন। (তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস প্রচ্ছন্ন।)

মানবীয় সভ্যতার শত্রু এ্যাটম্ বম্

রয়টারের এক বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, জাপ নিউজ এজেন্সীর বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক সংবাদে ঘোষিত হইয়াছে যে, আণবিক বোমার (এ্যাটম্ বম্) সর্ব্বপ্রথম আক্রমণে বিধ্বস্ত জাপনগরী হিরোসিমায় আড়াই লক্ষ লোকের মধ্যে দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন হতাহত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল সংবাদ দেয়, উক্ত নগরীর মাত্র ছয় সহস্র লোক মৃত্যু অথবা আঘাতের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে!

মানুষ মারিবার এই অদ্ভুত আবিষ্কৃত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে এক হিরোসিমার ন্যায় নগরীতেই হতাহতের যে সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মানবীয় সভ্যতার পক্ষে যে এই যন্ত্র কত বড় হানিকারক, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। যতই শান্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হউক, যতই উদারনৈতিক আদর্শের উদ্ভাবন হউক, ইউরোপীয় অধিনায়কদের মন হইতে বিষময় যন্ত্র-সভ্যতার পরিকল্পনা আসলে একটুকুও হ্রাস পায় নাই। জীবন নাশ করিয়াই আজিকার এই ইউরোপীয় সভ্যতার খাড়া ঢেঁকী আরও বিজয়গর্ব্বে খাড়া হইয়া রহিয়াছে। যদিও রাষ্ট্রনায়কেরা এই এ্যাটম্ বমের ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তথাপি 'হাতে দা থাকিলেই কচু গাছ কাটিতে ইচ্ছা যায়' এইরূপ বস্তুপ্রবাদের মতো উহাও যে যুদ্ধপ্রয়াসী জাতির প্রয়োজন-বোধেই ব্যবহৃত হইবে না, তাহা যথেষ্ট প্রতীতি দ্বারা নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন। আজিকার ইউরোপীয় বিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বের মানব-কল্যাণের পক্ষে কতখানি কাজে আসিয়াছে, তাহা বিবৃত করিতে গেলে বিস্তৃত 'এপিক' লিখিতে হয়। যুদ্ধ আজ শেষ হইয়াছে। যে নূতন সূর্য্যোদয় আজ আমাদের সামনে আসিতেছে, সেখানে যেন এমন সভ্যতার সৃষ্টি হয়—যাহাতে প্রাণক্ষয়ের পরিবর্ত্তে প্রাণকল্যাণেরই জয়ধ্বনি জাগে। ইউরোপীয় সভ্যতার কর্ণধারেরা এই কথায় কাণ দিবেন কি?

শেষ হোলো যে দিনের খেলা জীবন-বেলাশেষে — শিল্পী : অবনী সেন

এস মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এস মা, গৃহে এস—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব,—মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্র-বালিকে! শরৎসুন্দরি চারুচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি, অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা, গৃহে এস—যাহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

বঙ্কিমচন্দ্র

শারদীয় দুর্গোৎসবের দিন আবার সমাগত। একদিন এই দুর্গোৎসব বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দ দান করিত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। আনন্দের স্থলে এক্ষণে দুশ্চিন্তা সর্ব্বত্র অধিকার লাভ করিয়াছে।

আমাদের মতে কিছুদিন আগে যাহা শারদীয় দুর্গোৎসবে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আরও সুদূর অতীতে 'শারদীয় দুর্গাপূজা' নামে অভিহিত ছিল। যদি ঐ শারদীয় দুর্গা-পূজা দুর্গোৎসবে পরিণত না হইত, তাহা হইলে দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটিত না। আমাদিগের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝিতে হইলে দুর্গা-পূজা ও দুর্গোৎসবের মধ্যে কি তফাৎ তাহা বুঝিতে হইবে।

৺পূজা সাধনার বিষয়, আর উৎসব উপভোগের বিষয়। সাধনায় সাত্ত্বিকতার উপলব্ধি হয়, আর উপভোগ-প্রবৃত্তিতে তামসিকতার অভিব্যক্তি হয়।

আমরা বলিতে চাই যে, মানুষ যদ্যপি ৺পূজাকে উৎসবে পরিণত হইতে না দিয়া সঠিকভাবে সাধনাকারে বজায় রাখিত, তাহা হইলে ৺পূজার কয়টী দিনে উৎসবের অথবা অনুৎসবের কথাই আসিত না। ইহা ছাড়া যে [illegible] রয়া ফেলিয়াছে, সঠিকভাবে ৺পূজা যদ্যপি বজায় থাকিত, তাহা হইলে ঐ দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অশান্তি মানবসমাজে উদ্ভব হইতে পারিত না। অধুনা প্রত্যেক পূজাটী হয় কতকগুলি কু-সংস্কারগত উপাসনায়, নতুবা পুতুলের পূজায়, নতুবা পাথরের নুড়ির পূজায় পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ—মানুষ এক্ষণে "দেব", "দেবতা" এবং "দেবী" বলিতে কি বুঝায়, তাঁহাদের ৺পূজা বলিতে কি বুঝায় এবং ৺পূজার উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। মনুষ্য-সমাজকে ৺পূজার ব্যবস্থা, ৺পূজার মন্ত্র ও ৺পূজার নিয়ম সর্ব্বপ্রথম দিয়াছিলেন ভারতীয় ঋষি। তাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের বেদে, তাঁহাদিগের তন্ত্রে, তাঁহাদিগের দর্শনে, তাঁহাদিগের মীমাংসায়, তাঁহাদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রে এবং তাঁহাদিগের স্মৃতিশাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের প্রচারিত কোন পূজায় কোন হলাহলি অথবা মাতামাতি প্রকাশক কোন উৎসব নাই। উহাতে আছে কেবল তিনটী সাধনা। প্রথমতঃ, নিজের শরীর, নিজের ইন্দ্রিয়, নিজের মন, নিজের বুদ্ধি এবং নিজের আত্মাকে সর্ব্বোচ্চ শক্তিতে সামর্থ্যযুক্ত করিবার সাধনা। দ্বিতীয়তঃ, চরাচর যত কিছু জীব আছে, যতকিছু উদ্ভিদ্ আছে, যত কিছু খনিজ পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকটীর প্রত্যেক অংশ এবং প্রত্যেক কার্য্য উপলব্ধি করিবার সাধনা। তৃতীয়তঃ, জগৎকারণের যে কার্য্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উদ্ভব হইতেছে ও তাঁহাদের কার্য্য চলিতেছে এবং সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত বায়ু, তেজ ও রসের কার্য্য চলিতেছে তাহা বুঝিবার সাধনা।

ভারতীয় ঋষি ৺পূজার যে পদ্ধতি মনুষ্য-সমাজকে দান করিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে উহা বুঝিবার অধিকারী নহে। উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভাগ্য ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু বুদ্ধি ও কর্ম্ম শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষির ৺পূজার উদ্দেশ্য, ঐ পূজার পদ্ধতি ও নিয়ম বুঝিতে হইলে যে বুদ্ধি ও কর্ম্ম-শক্তির প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ভারতীয় ঋষি তাঁহাদিগের মীমাংসাশাস্ত্রে, অকাট্য যুক্তির দ্বারা মানুষকে বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের জ্ঞানের ও কর্ম্ম-শক্তির পরিপূর্ণতা সর্ব্বতোভাবে সাধন করা সম্ভবযোগ্য। জ্ঞানের ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের ঐ পরিপূর্ণতা সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে উহা সম্ভবযোগ্য হয় না। কেন তাহা হয় না, তাহা ঋষিগণ দেখাইয়াছেন তাঁহাদিগের বৈশেষিক ও ন্যায়শাস্ত্রে। জ্ঞানের ও কর্ম্ম-শক্তির পরিপূর্ণতা লাভ করিতে হইলে জন্মাবধি কতকগুলি অসাধারণ সামর্থ্য লাভ করা একান্ত আবশ্যকীয়। কোন্ কোন্ শিশু ঐ অসাধারণ সামর্থ্য লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের শৈশব অবস্থাতেই স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু যাহারা ঐ স্বাভাবিক সামর্থ্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে নাই, তাহাদিগকে ঐ সামর্থ্য প্রদান করা কাহারও পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না এবং তাহাদিগের পক্ষে কোনক্রমেই জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর হয় না।

জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে হইলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সামর্থ্যের যে বীজ লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়, ঐ বীজ লাভ করিতে পারিলেই যে আপনা হইতেই জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির পরিপূর্ণতা অর্জ্জিত হয়, তাহা নহে। স্বাভাবিক সামর্থ্যকে পরিস্ফুট করিবার জন্য শিক্ষা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে হইলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সামর্থ্যের যে বীজ লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, সেই বীজ লাভ করিয়াও যদি শিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বারা ঐ বীজকে সর্ব্বতো-ভাবে পরিস্ফুট না করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির

পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। যে শিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বারা মানুষের আশৈশব অসাধারণ স্বাভাবিক, সামর্থ্যের বীজকে ফুটাইয়া তুলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা সাধন করা সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা ও কঠোর সাধনার অন্যতম সাধনা ৺পূজা।

মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা সাধন করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা সাধিত না হইলে সমাজের কোন অবস্থাতেই মনুষ্য-সমাজের কাহারও পক্ষে সুখ-শান্তিতে জীবিকা অর্জ্জন করা ও জীবন নির্ব্বাহ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। অপূর্ণ জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির দ্বারা সমাজের যে সংগঠন সাধিত হয়, সেই সংগঠনে সমাজের কাহারও পক্ষে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর নহে। এই কারণে যাঁহারা আশৈশব স্বাভাবিক অসাধারণ সামর্থ্যের বীজ লইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করেন এবং শিক্ষা ও কঠোর সাধনা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা সমাজ-সংগঠনের ও সমাজ-পরিচালনার জন্য স্বভাবতঃ দায়ী হইয়া থাকেন। এই অসাধারণ মানুষ-গুলি যদি তাঁহাদিগের উপরোক্ত স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পাতিত্য ঘটিয়া থাকে। সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে সুখ-শান্তিতে জীবিকা অর্জ্জন করিতে ও জীবন যাপন করিতে পারে তদনুরূপ সমাজ-গঠনের ও সমাজ-পরিচালনার দায়িত্ব যেরূপ এই অসাধারণ মানুষগুলির স্কন্ধে স্বভাবতঃ নিহিত, সেইরূপ আবার যাহাতে ঐ অসাধারণ মানুষগুলি শিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে পারেন তাহার সহায়তা করাও সমাজের প্রত্যেকের অন্যতম দায়িত্ব।

কাজেই ৺পূজা যাহাতে যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হয় তাহা করা যেরূপ কতকগুলি ভাগ্যবান্ মানুষের অন্যতম দায়িত্ব, সেইরূপ আবার উহার সহায়তা করা সমাজের প্রত্যেকের অন্যতম দায়িত্ব।

এক কথায়, ৺পূজা যেরূপ যথাযথ গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কার্য্য, সেইরূপ আবার উহা সর্ব্বসাধারণের কার্য্যও বটে।

৺পূজায় কি কি সাধনা আছে তাহার কথা বলিতে বসিয়া আমরা কাহার পক্ষে পূজারী হওয়া সম্ভব এবং কেন পূজা মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে প্রয়োজনীয় —তাহার আলোচনা করিলাম।

এক্ষণে আমরা দেব, দেবতা এবং দেবী বলিতে কি বুঝায় এবং তাঁহাদের পূজা কি বস্তু তাহার আলোচনা করিব। হিন্দু-সমাজে যতকিছু ৺পূজা এখনও বিদ্যমান আছে তাহার প্রত্যেকটী হয় ৺দেবের পূজা, না হয় ৺দেবতার পূজা, নতুবা ৺দেবীর পূজা। "দেব", "দেবতা" ও "দেবী" কাহাকে বলে তাহার একটা ধারণা না থাকিলে কি করিলে তাঁহাদিগের পূজা করা হয় তৎসম্বন্ধে কিছুই বুঝা যায় না। "দেব", "দেবতা" ও "দেবী" বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা একাধিকবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আত্মতত্ত্বের অভ্যাসে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে ঋষিগণ ঐ তিনটী কথার দ্বারা কোন্ বস্তুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মানবসমাজের প্রত্যেকে যেরূপ ৺পূজা করিবার অধিকারী নহেন, সেইরূপ যে সমস্ত দেব, দেবতা ও দেবীর পূজা করা হয় তাহা বুঝিয়া উঠাও প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আশৈশব যাঁহারা অসাধারণ সামর্থ্যের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের ঐ অসাধারণ সামর্থ্যের বীজ যথোপযুক্ত শিক্ষা ও কঠোর সাধনা দ্বারা মার্জ্জিত করিবার চেষ্টা করা হয়, কেবলমাত্র তাঁহাদিগের পক্ষেই এই কথাগুলি বুঝা সম্ভব হয়। নিরুক্তের দৈবত-কাণ্ডে ঐ কথাগুলি বুঝিবার নিয়ম বিস্তৃতরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠেও এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। দেব, দেবতা ও দেবী সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা বলিব তাহা ঐ দুইখানি গ্রন্থ ও শব্দ-স্ফোটতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ কথায় কথায় বলে যে, "দৈব ও পুরুষকার মানুষের কর্ম্মফলের নিয়ামক।" "দৈব ও পুরুষকার মানুষের কর্ম্মফলের নিয়ামক" এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে "দৈব" বলিতে কি বুঝায় তাহা কতক পরিমাণে ধারণা করা সম্ভব হয়। যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পুরুষ ত্রিবিধ; অর্থাৎ ক্ষর-পুরুষ, অক্ষর-পুরুষ এবং পুরুষোত্তম। দৈব ও পুরুষকার মানুষের কর্ম্মফলের নিয়ামক কি করিয়া হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইলে দৈব ও পুরুষকার কাহাকে বলে তাহা আগে বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়া মানুষ বলিতে কি বুঝায় এবং মানুষ তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিচালনা কিরূপভাবে করিতেছে তাহা স্বীয় উপলব্ধিদ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিলে প্রথমতঃ, দেখা যাইবে যে, মানুষের অবয়ব প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত; আর দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইবে যে, মানুষের অবয়বের ঐ দুই অংশে চারিটী প্রধান কার্য্য বিদ্যমান আছে। মানুষের অবয়বের একটী অংশ কেবলমাত্র বায়বীয় এবং আর একটী অংশ বায়ুমিশ্রিত মেদ অস্থি-মজ্জা-বসা-মাংস-রক্ত ও চর্ম্মভাগ। মানুষের

অবয়বের এই দুইটী অংশের তিনটী কার্য্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। একটী তাহার বায়বীয় অংশের কার্য্য, দ্বিতীয়টী তাহার বায়ুমিশ্রিত মেদাদি অংশের কার্য্য এবং তৃতীয়টী তাহার উপরোক্ত দুইটী অংশের আদান-প্রদানের কার্য্য। মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে এই তিনটী কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলে মানুষের চৈতন্য ও ইচ্ছার উৎপত্তি হইত না এবং মানুষ চলাফেরা করিতে পারিত না। কুম্ভকার হুবহু একটী মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে বটে কিন্তু ঐ মূর্ত্তিতে মানুষের উপরোক্ত তিনটী কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না। ইহারই জন্য মানুষের স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও কৃত্রিম মূর্ত্তিতে এত প্রভেদ ঘটিয়া থাকে।

মানুষের বায়বীয় অংশের কার্য্যের দার্শনিক নাম—অক্ষর-পুরুষ—

বায়ুমিশ্রিত মেদাদি অংশের কার্য্যের দার্শনিক নাম—ক্ষর পুরুষ—

ঐ দুইটী অংশের আদান-প্রদান কার্য্যের দার্শনিক নাম—পুরুষোত্তম।

অক্ষর-পুরুষ, ক্ষর-পুরুষ ও পুরুষোত্তম—এই তিনটী প্রধান কার্য্যের কোন কার্য্যটীই মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হইত না, যদি মুক্ত বায়ু মানুষকে ঘিরিয়া না থাকিত এবং ঐ মুক্ত বায়ুর মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিবার ব্যবস্থা না থাকিত।

এই মুক্ত বায়ু মানুষের অভ্যন্তর ও বাহির লইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে তাহার দার্শনিক নাম "দৈব-কার্য্য।"

এই মুক্ত বায়ু অক্ষর-পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে তাহার দার্শনিক নাম—"দেব।"

এই মুক্ত বায়ু ক্ষর-পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে, তাহার দার্শনিক নাম—"দেবতা"—

এই মুক্ত বায়ু পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করে তাহার দার্শনিক নাম—"দেবী।"

মুক্তবায়ু মানুষের অবয়বের সহিত সর্ব্বদা কিরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং মানুষের অবয়বের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া আভ্যন্তরীণ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া কিরূপে তাহার কর্ম্ম-শক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষ, বিকাশ, বহির্ম্মুখীণতা, বিনাশ, অন্তর্ম্মুখীণতা ও বৃদ্ধি সাধিত করিতেছে—তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার দার্শনিক নাম দেবপূজা, দেবতাপূজা ও দেবীপূজা।

মানুষ যেরূপ বায়বীয় ও বায়ুমিশ্রিত মেদাদি ভাগ—এই দুই অংশে বিভক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক পরমাণুও বায়বীয় এবং মিশ্রিত-পঞ্চভূতাত্মক শরীর—এই দুই অংশে বিভক্ত।

ত্রিবিধ পুরুষ যেরূপ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, সেইরূপ উহা প্রত্যেক পরমাণু ও চরাচর প্রত্যেক জীবের মধ্যেও বিদ্যমান।

দেব, দেবতা ও দেবী যেরূপ প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে বিদ্যমান, সেইরূপ উহা প্রত্যেক পরমাণু ও চরাচর প্রত্যেক জীবের মধ্যেও বিদ্যমান।

এক কথায়, যাহার দেহ আছে তাহার মধ্যেই ত্রিবিধ পুরুষ ও ত্রিবিধ দৈবকার্য্য (অর্থাৎ দেব, দেবতা ও দেবী) বিদ্যমান আছেন।

অনেকে মনে করেন যে, দেবতা কেবলমাত্র বস্তু-বিশেষের (যথা প্রস্তর, শিলা ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির) মধ্যেই বিদ্যমান থাকেন। এই ধারণা একেবারেই সত্য নহে। স্বভাবের সৃষ্টি যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যেই ত্রিবিধ পুরুষ ও দেব, দেবতা ও দেবী বিদ্যমান থাকেন। এতদ্বিষয়ে শিবসংহিতার নিম্নলিখিত পাঁচটী শ্লোক পাঠ করিলে অনেক কথা জানা যায়—

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ ১ ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥ ২ ॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ ॥ ৩ ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥
জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

এই উপরোক্ত শ্লোক পাঁচটীর মর্ম্মার্থ—

এই দেহে (অর্থাৎ দেহযুক্ত যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে) সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরুর কার্য্য, সরিৎসমূহের কার্য্য, সাগরসমূহের কার্য্য, শৈলসমূহের কার্য্য, ক্ষেত্রসমূহের কার্য্য, ক্ষেত্রপালকসমূহের কার্য্য, ঋষিগণের কার্য্য, মুনিগণের কার্য্য, সমস্ত নক্ষত্রের কার্য্য, গ্রহের কার্য্য, পুণ্যতীর্থের কার্য্য, পীঠের কার্য্য, পীঠদেবতার কার্য্য, ভ্রমণশীল চন্দ্র-সূর্য্যের সৃষ্টি-সংহার কার্য্য বিদ্যমান আছে। সেইরূপ আবার ইহার মধ্যে আকাশ, বায়ু, তেজ, রস এবং ক্ষিতিও বিদ্যমান আছে (১-৩)।

যাহাকে আবেষ্টন করিয়া দেহ বিদ্যমান থাকে, দেহের মধ্যে যাহা থাকে, দেহকে আবেষ্টন করিয়া যাহা থাকে, তাহাদের সমস্ত কার্য্যই দেহে প্রতিবিম্বিত হয় এবং দেহকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহাদের সমস্তই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দেহকে উপলব্ধি করিবার পন্থাঃ প্রথম মেরুদণ্ডের যে যে কার্য্য হইতেছে তাহা একে একে উপলব্ধি করা (৪)।

মেরুদণ্ডের কার্য্য অবলম্বন করিয়া যিনি একে একে যাহাকে আবেষ্টন করিয়া দেহ বিদ্যমান থাকে, দেহের মধ্যে

যাহা থাকে, দেহকে আবেষ্টন করিয়া যাহা থাকে—তাহাদের সমস্তই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী (৫)।

উপরোক্ত পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য যথাযথ বুঝিতে পারিলে পূজার বিধান ও উদ্দেশ্য বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অনায়াসসাধ্য হয়।

যে কোন দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্ না কেন, সর্ব্বপ্রথমে স্বকীয় দেহের মধ্যে (অর্থাৎ মেদাদিসম্ভূত শরীরের মধ্যে) এবং যাহাকে আবেষ্টন করিয়া দেহ বিদ্যমান থাকে তাহার মধ্যে (অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অংশের মধ্যে) কি কি কার্য্য বিদ্যমান থাকে তাহার প্রত্যেকটি নিখুঁত ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেই ক্রমে ক্রমে দেহের কার্য্য, দেহাভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অংশের কার্য্য এবং ঐ দুইএর ঘাত-প্রতিঘাতের কার্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দার্শনিক ভাষায় উপরোক্ত তিনটী উপলব্ধির নাম ক্ষর-পুরুষ, অক্ষর-পুরুষ এবং পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার লাভ করা। ইহা পূজার প্রথম অঙ্গ। ঐ তিনটী উপলব্ধির সমাধান হইলে দেহকে আবেষ্টন করিয়া যাহা বিদ্যমান থাকে তাহার ও তাহার কার্য্যের (অর্থাৎ মুক্ত বায়ু দেহের কোন্ অংশকে কিরূপ ভাবে আবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে এবং ঐ আবেষ্টনের ফলে দেহে ও দেহাভ্যন্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা) উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দার্শনিক ভাষায় এই উপলব্ধিকে দেবতা-বিশেষের পূজা বলা হইয়া থাকে। ইহা ৺পূজার দ্বিতীয় অঙ্গ। ইহার পর মানুষের কাম্য যাহা কিছু আছে তাহার প্রত্যেকটীর প্রতি উপভোগ-পরায়ণতায় প্রবৃত্তি সংযত করিতে হয়। ইহা ৺পূজার তৃতীয় অঙ্গ। এই উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি সংযত করিতে না পারিলে বস্তু-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না।

ভারতীয় ঋষির কথানুসারে এই পৃথিবীতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর—তাহার প্রত্যেকটী মানুষের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি অথবা উপভোগ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার উহার প্রত্যেকটী মানুষের সত্তার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে। এক কথায়,—পৃথিবীতে ভগবান্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিরই ব্যবহার দ্বিবিধ, যথা—

(১) ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, এবং
(২) সত্তার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি—

প্রত্যেক বস্তুর এই দ্বিবিধ ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন বস্তুবিশেষের যে ব্যবহারে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে পারে সেই ব্যবহারে কখনও সত্তার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না, পরন্তু ক্রমিক ক্ষয় ও বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। আবার যে ব্যবহারে সত্তার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে সেই ব্যবহারে আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধিত হইতে পারে না।

ভারতীয় ঋষির কথানুসারে উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে সংযত করিতে না পারিলে প্রত্যেক বস্তুর উপরোক্ত দ্বিবিধ ব্যবহারবিধি পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। এই উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিকে দার্শনিক ভাষায় তামসিকতা বলা হইয়া থাকে। মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতার বীজ পাইয়া থাকে। ইহার জন্য বলিতে হয় যে, এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিই মানুষের স্বভাবের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, তামসিকতা (অর্থাৎ উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি) সংযত করা মানুষের পক্ষে কত কঠিন। অথচ এই তামসিকতা (অর্থাৎ উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তি) সংযত না করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে বস্তু-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হওয়া অথবা মনুষ্যনামের যোগ্য হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই ৺পূজার তৃতীয় অঙ্গ মনুষ্যজীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এখনও পুরোহিতগণ ৺পূজায় যে নিয়ম পালন করিয়া থাকেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ নিয়মের মধ্যে কোন সময়ে আমরা পূজার যে তিনটী অঙ্গের কথা বলিলাম সেই তিনটী অঙ্গ হুবহু নিহিত ছিল।

এখনও পুরোহিতগণ যে কোন দেবতার পূজাতেই প্রবৃত্ত হউন না কেন—প্রথমতঃ সামান্যার্ঘ্য, দ্বিতীয়তঃ আসনশুদ্ধি, তৃতীয়তঃ গুরুপংক্তিপ্রণাম, চতুর্থতঃ করশুদ্ধি, পঞ্চমতঃ ভূতশুদ্ধি, ষষ্ঠতঃ মাতৃকান্যাস, সপ্তমতঃ অন্তর্মাতৃকান্যাস, অষ্টমতঃ বাহ্যমাতৃকান্যাস, নবমতঃ সংহারমাতৃকান্যাস, দশমতঃ গন্ধাদি অর্চ্চনা, একাদশতঃ প্রাণায়াম, দ্বাদশতঃ বিশেষার্ঘ্য, ত্রয়োদশতঃ গণেশাদি দেবতার পূজা, চতুর্দ্দশতঃ সূর্য্যাদি গ্রহগণের পূজা, পঞ্চদশতঃ শিবাদি দেবতার পূজা, ষোড়শতঃ আরাধ্য দেবতার ধ্যান, সপ্তদশতঃ আরাধ্য দেবতার মানসিক পূজা, অষ্টাদশতঃ বিবিধ উপচারের নিবেদন, ঊনবিংশতঃ আরত্রিক, বিংশতঃ—বলিদান করিয়া থাকেন।

সামান্যার্ঘ্যের উদ্দেশ্য কি, তাহা সামান্যার্ঘ্যের মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। ঐ মন্ত্রটীর অর্থ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সামান্যার্ঘ্যের উদ্দেশ্য,—যাহাতে কোন বস্তুর উপভোগ-পরায়ণতার প্রবৃত্তিতে প্রবুদ্ধ না হইতে হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করা।

সেইরূপ আসনশুদ্ধির মন্ত্রার্থ বুঝিয়া লইয়া আসনশুদ্ধির উদ্দেশ্য কি তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে—

মানুষের দেহ যে সর্ব্বতোভাবে বায়ুর দ্বারা আবেষ্টিত এবং অন্তর্নিহিত বায়ুর কার্য্যফলে যে মানুষ হাঁটিতে ও বসিতে পারে তাহার স্মরণ করাই আসনশুদ্ধির উদ্দেশ্য।

সেইরূপ গুরুপংক্তিপ্রণামে যে যে মন্ত্র পড়া হয়, তাহার অর্থ বুঝিয়া লইয়া উহার উদ্দেশ্য কি তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মাথার মধ্যে যে তিনটী তেজরেখা বিদ্যমান আছে এবং যে তিনটী তেজরেখার জন্য মস্তিষ্ক তাহার স্বরূপ বজায় রাখে এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে, সেই তিনটী তেজরেখাকে উপলব্ধি করা ও তাহাদিগকে স্মরণ রাখা গুরুপংক্তিপ্রণামের উদ্দেশ্য।

কর-শুদ্ধির মন্ত্র পড়িয়া তাহার মন্ত্রার্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে,—দেহের মেদাদি অংশের মধ্যে যে বায়ু আছে তাহা স্মরণ করাই উহার উদ্দেশ্য।

ভূত-শুদ্ধির মন্ত্র পড়িয়া ঐ মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, দেহের মেদাদি অংশের মধ্যে যে বায়ু আছে সেই বায়ুই যে দেহের গুণাগুণের নিয়ামক তাহা উপলব্ধি করা অথবা ক্ষর-পুরুষকে প্রত্যক্ষ করাই উহার উদ্দেশ্য।

মাতৃকান্যাসের মন্ত্র পড়িয়া ঐ মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, অক্ষর-পুরুষকে প্রত্যক্ষ করাই উহার উদ্দেশ্য।

অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস ও সংহারমাতৃকান্যাসের মন্ত্র পড়িয়া ঐ তিনটী মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র তিনটী পড়া হয় তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, পুরুষোত্তমের প্রত্যক্ষ করাই উহার উদ্দেশ্য।

সামান্যার্ঘ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সংহারমাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহা আমাদের কথিত ৺পূজার প্রথম অঙ্গ।

গন্ধাদির অর্চ্চনা হইতে আরম্ভ করিয়া আরাধ্য দেবতার মানসিক পূজা পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহা আমাদের কথিত ৺পূজার দ্বিতীয় অঙ্গ।

বিবিধ উপচারের নিবেদন হইতে বলিদান পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহা আমাদের কথিত ৺পূজার তৃতীয় অঙ্গ।

যথাযথভাবে যদি দেব, দেবতা ও দেবীগণের পূজা আবার আরম্ভ হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পুতুল পূজা অথবা পাথরের নুড়ি পূজা বলিয়া সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে যে পূজার উপর বিদ্বেষ আছে, তাহা আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে। তখন আবার প্রকৃত পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং যে সংগঠনে মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে সর্ব্ববিধ সমস্যা হইতে রক্ষা পাইতে পারে—সেই সংগঠনের পরিকল্পনা মানুষের মনে স্থান পাইবে।

এত ভুগিয়া, এত সহিয়া মানুষ কি এখনও তাহার তমসাজাল ছিন্ন করিবে না?

গোপীদের প্রতি কৃষ্ণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ছাড়িয়া কুলমান কান্ত-সম্মান
চেয়েছে আমারেই প্রেমে উছলি'—
বেদনা অবিরাম, কলঙ্কিনী নাম,
স্বজন-লাঞ্ছনা চরণে দলি'।
জীবন-জনতায় সকলে দেখ ধায়
মোহন মায়া-মৃগ-কলোচ্ছ্বাসী।
জানে না তারা হায়: অলীক বাসনায়
ক্ষণিক কায়াসুখ ছায়াবিলাসী।
কাঙাল আপনারে অচিন অভিসারে
যে-প্রিয়া কোথা মেঘ তার আকাশে
কালোর মাঝারেও আলোর রচে গেহ
জানে সে বিরহেও মিলনবাসে।
জনমে জনমেও হেন অপরাজেয়—
প্রেমের ঋণ কি গো শুধিতে পারি?
পুণ্য পাপ গণি' সমান—নীলমণি
করিল যে বরণ, মণি তো তারি

কৃষ্ণ গোপীদের প্রতি:

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃংখলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।

(ভাগবত—দশম স্কন্ধ)

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

মৃন্ময়ী দশভুজা দুর্গাদেবীর পূজা-পদ্ধতি মূলতঃ পুরাণ-সম্মত। বর্ত্তমানে আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে বা বাঙ্গালার প্রভাবে প্রভাবিত প্রদেশগুলিতে যে যে পদ্ধতি অনুসারে দুর্গাপূজা সম্পাদিত হয়, সেই সকল পদ্ধতি কালিকা, দেবী, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, মৎস্য—এই চারিখানি পুরাণের অন্যতম পুরাণ হইতে সঙ্কলিত। এতদ্ব্যতীত—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত 'তিথিতত্ত্বে'র অন্তর্গত 'দুর্গোৎসব-তত্ত্বে'র মূলভাগ ও উহার উপর ৺কাশীরাম বাচস্পতিকৃত টীকা হইতে জানা যায় যে, লিঙ্গপুরাণোক্ত অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা-রূপিণী মহাদেবীর পূজাপদ্ধতিও কোন সময় প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইদানীং আর উহার প্রচলন দেখা যায় না। বর্ত্তমানে বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণ দুষ্প্রাপ্য। আর লিঙ্গপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের যে সকল সংস্করণ দৃষ্ট হয় সে গুলিতেও মহাপূজার প্রয়োগ-পরিপাটী দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বর্ত্তমানে প্রচলিত কালিকা-পুরাণ ও দেবীপুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতি বেশ বিস্তৃত ভাবেই লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে ঘোরাসুর-নিধনের বিবরণ সবিস্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। আর কালিকাপুরাণ মহিষাসুর-বধের উপাখ্যানে পূর্ণ। তবে দেবীপুরাণেও 'মহিষমর্দ্দিনী' (২৩।১ ও ৩১।৮) ও দশভুজা ত্রিনয়না (৩২।১৯) দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইদানীং শারদীয়া বা বাসন্তী দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার পূজায় যে ধ্যানের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা প্রচলিত কালিকা-পুরাণের ৫৯তম অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের ২৬০তম অধ্যায়ে ও কালীবিলাস-তন্ত্রের ২১শ পটলে উল্লিখিত আছে। প্রচলিত মৎস্যপুরাণে দুর্গোৎসব-পদ্ধতির কোন বিবরণ নাই—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু দেবতাপ্রতিমা-সমূহের স্বরূপ বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেবীর ধ্যান-সম্মত মূর্ত্তির বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত তিন খানি গ্রন্থে পরস্পর অল্পাধিক পাঠভেদ থাকিলেও মোটামুটি দেবী-রূপ-বর্ণনায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

মহাদেবীর শিরোদেশে জটাজূট—অর্দ্ধচন্দ্র তাঁহার শেখর (অর্থাৎ শিরোভূষণ)। দেবীর সুন্দর নয়নত্রয় ও পূর্ণচন্দ্র-নিভ মনোহর বদন। তপ্ত কাঞ্চনের মত দেহ-কান্তি (মৎস্য-পুরাণ মতে—অতসী-কুসুম-সন্নিভ গাত্রবর্ণ; রঘুনন্দন 'অতসী' বলিতে শণপুষ্প বুঝিয়াছেন; কিন্তু শণজাতীয় একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ আছে—হরিদ্রাভ অথবা ঈষৎ পাটকিলে হলুদে পুষ্প তাহাতে জন্মে শীতের শেষে—তাহারও নাম 'অতসী'পুষ্প)। দেবী সুপ্রতিষ্ঠিতা, নব-যৌবনা, সর্ব্বাভরণভূষিতা। মাতা সুচারুদশনা ও পীনোন্নতপয়োধরা (ভক্তবৃন্দকে পুণ্য-স্নেহ-পীযূষধারা পানে পরিতৃপ্ত করাইতে দেবী সদাই উন্মুখ)। মহামায়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা ও মহিষাসুরমর্দ্দনে নিরতা। দশভুজা—দক্ষিণে পঞ্চ হস্ত—বামেও পঞ্চ। প্রত্যেক বাহুই মৃণালশুভ্র, সুকোমল, অথচ সুদীর্ঘ ও বলশালী। দক্ষিণ ভাগের বাহুপঞ্চকে ঊর্দ্ধ হইতে অধঃক্রমে—ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি (সিংহমুখ-অস্ত্রবিশেষ) বিরাজমান। বাম দিকের পঞ্চ করে ঐরূপ ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে যথাক্রমে খেটক (যষ্টি অথবা ঢাল), জ্যাবদ্ধ কার্ম্মুক, (নাগ)পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা (বা পরশু) শোভমান। [মতান্তরে—জগন্মাতার বাম বাহুপঞ্চকের আয়ুধগুলি ঊর্দ্ধ হইতে অধঃক্রমে না হইয়া অধোভাগ হইতে ঊর্দ্ধদিকে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে সজ্জিত।] জগন্মাতার পদমূলে ছিন্নশীর্ষ মহিষ। মহিষের মস্তক ছিন্ন হওয়ায় (উহার ছিন্ন স্কন্ধাংশ হইতে) একটি খড়্গহস্ত দানব উদ্ভূত হইতেছে—ইহা প্রদর্শনীয়। অসুরের হৃদয়দেশ দেবীহস্ত-ধৃত ত্রিশূল-দ্বারা বিদারিত। এই বিদারণের ফলে দানবের উদরস্থ নাড়ীগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে ও ঐ সকল নাড়ীতে তাহার সর্ব্বশরীর জড়িত। অসুরের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত। দেবীর অন্যতম বামহস্ত-স্থিত নাগপাশদ্বারা অসুরের দেহ পরিবেষ্টিত। আর দেবীর যে হস্তে নাগপাশ, সেই হস্তেই তিনি মহিষাসুরের কেশপাশ ধারণ করিয়া আছেন। অসুরের মুখে ভীষণ ভ্রূকুটি। অসুর রক্তবমন করিতেছে (মতান্তরে—দেবীর বাহন মহাসিংহ রক্তবমন করিতেছে)। দেবীর দক্ষিণ পাদ সরল ভাবে বাহন সিংহের পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত; আর বামপদের অঙ্গুষ্ঠটি (সিংহ অপেক্ষা কিছু ঊর্দ্ধে) তির্য্যগ্‌ভাবে মহিষের (মহিষাসুরের অথবা মাহিষদেহের) উপর স্থাপিত। চারিদিকে দেববৃন্দ মহাদেবীর স্তুতিপরায়ণ। [মৎস্যপুরাণের ধ্যান এই স্থলেই সমাপ্ত। কালিকাপুরাণে অতিরিক্ত বর্ণনা—] উগ্রচণ্ডা (অথবা রুদ্রচণ্ডা), প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা (অথবা চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা)—এই অষ্টশক্তি-দ্বারা দেবী সর্ব্বদা পরিবেষ্টিতা। এইরূপে দেবীর ধ্যান-পূর্ব্বক পূজায়—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ আয়ত্ত হইয়া থাকে।

দেবীপুরাণের ধ্যানমূর্ত্তি অন্যরূপ—

দেবী সর্ব্বসুলক্ষণা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা। তাঁহার সুন্দর শিরোদেশে কবরী। এই ধম্মিল্ল বহুমূল্য মুক্তাভারে সুসজ্জিত—দেখিলে মনে হয়—যেন শ্বেতপুষ্পে ভ্রমরপঙক্তি শোভা পাইতেছে। চন্দ্র-নিন্দী বদন-কমল। নয়নত্রয় আকর্ণবিশ্রান্ত, আয়ত, তরল, আলোল, নির্ম্মল। অক্ষিপক্ষ্ম ঋজু দৃষ্টি ও জিহ্ম (কুটিল) কটাক্ষ শোভিত। শরাসন-সদৃশ ভ্রূযুগ—তাহাতে দৃষ্টিশর তীক্ষ্ণ-বাণবৎ সংযোজিত। অধর মধ্যোন্নত (ঈষৎ উল্টান)—গন্ধস্ফুরিত—বিদ্রুম-(প্রবাল)-তুল্য আরক্ত। আননে ঈষৎ স্মিত বিরাজমান। জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ দন্তময়ূখ স্মিতরক্তাধরের মধ্য দিয়া তড়িল্লেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ পাইতেছে। গ্রীবাদেশে তিনটি রেখা—তদুপরি গ্রৈবেয়ক (অলঙ্কার)। পীনোন্নত কঠিন স্তনযুগ পরস্পর অবিরল-সংশ্লিষ্ট। যেন উহাদিগের ভার-বহনের ক্লেশেই মধ্যদেশ ক্ষীণভাব প্রাপ্ত। মধ্যদেশে ত্রিবলী। জঘন বিস্তীর্ণ। কদলীকাণ্ডের ন্যায় কোমল ঊরুদ্বয়। গুল্‌ফযুগল নিগূঢ়, পদ্মাভ, পদ্মচিহ্নাঙ্কিত—তাহার উপর নূপুরযুগল। কটিদেশে কিঙ্কিণীযুক্ত কাঞ্চীদাম—স্কন্ধে ব্রহ্মসূত্র। বাহুতে কেয়ূর, হস্তে নাগবন্ধ, বাহুমধ্যে অঙ্গদ—এগুলি সবই রক্তবর্ণ-কাঞ্চন-নির্ম্মিত। গলদেশে গ্রৈবেয়ক, মস্তকোর্দ্ধে কিরীট। ললাটে তিলক ও তৃতীয় নেত্র। অলকাবলীতে মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। অঙ্গে অরুণ-রেণু-বিচ্ছুরিত পীতবাস। দেবী অষ্টাবিংশভুজা। ভুজগুলিতে—অসি-চর্ম্ম, গদা-দণ্ড, শর-চাপ, বর্ধা-মুদ্গর, পরশু-চক্র, ডমরু-দর্পণ-চামর, শক্তি-কুম্ভ, হল-

মুষল, পাশ-তোমর, ঢক্কা-পণব ইত্যাদি আয়ুধ বিদ্যমান। একহস্তে তাঁহার তর্জ্জনের ভঙ্গী। অপর দুই হস্তে অভয় ও স্বস্তিক মুদ্রা। অষ্টাবিংশভুজা দেবী সিংহোপরি পদ্মাসনে সমাসীনা। দেবী মহিষঘ্নী [এই মহিষমূর্ত্তিটি ঘোরাসুরের বলিয়া দেবীপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব, দেবীকে 'মহিষঘ্নী' বলা হইলেও এই মহিষ মহিষাসুর নহে মহিষরূপী ঘোরাসুর—ইহাই বুঝিতে হইবে।] মহিষের শিরশ্ছেদের ফলে উৎপন্ন এক উগ্রমূর্ত্তি শস্ত্রপাণি পুরুষকে তিনি নাগপাশে বেষ্টনপূর্ব্বক মস্তকে শূল-দ্বারা আঘাত করিতেছেন। আর পুরুষটিও তর্জ্জন করিতে করিতে হত হইয়াছে। এইরূপে রিপু-দেবীর ধ্যানপূর্ব্বক পূজা কর্ত্তব্য। [দেবীকে দেবীপুরাণে একবার 'দশবাহু-ত্রিলোচনা', আর একবার 'অষ্টাবিংশভুজা শিবা' বলা হইয়াছে। অথচ ধ্যানমধ্যে যে কয়টি ভুজের ও অস্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি গণনায় অষ্টাবিংশ হইতে কিছু কম। এই কারণে মনে হয় যে, বঙ্গবাসী-সংস্করণের পাঠবিশেষ ভ্রমবহুল।]

যাহা হউক, বর্ত্তমানে দেবীপুরাণোক্ত ধ্যানানুযায়ী পূজা অতি অল্পস্থানেই হইয়া থাকে। কালিকা-পুরাণোক্ত ধ্যানের প্রচলনই সমধিক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, কালিকা-পুরাণোক্ত ধ্যানে—দেবী ব্যতীত সিংহ, মহিষাসুর ও দেবীর অষ্টশক্তির উল্লেখ আছে। লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ-কার্ত্তিকেয় প্রভৃতির উল্লেখ ত ধ্যানে নাই। তবে প্রতিমাতে ঐ সকল মূর্ত্তি স্থাপন ও উঁহাদিগের পূজা করা হয় কেন? দুর্গা-প্রতিমাস্থ এই সকল দেব-দেবীর পূজা কি অশাস্ত্রীয় ও অপ্রামাণিক?

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে—না, এ সকল পূজা অপ্রামাণিক বা অশাস্ত্রীয় নহে। কালীবিলাস-তন্ত্রের অষ্টাদশ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত পটলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও বিধান দৃষ্ট হয়। উক্ত আলোচনার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।—

কালীবিলাসতন্ত্রে দৃষ্ট হয়—দেবী দেবদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন —শরৎকালে পূজিতা মহিষমর্দ্দিনীর পূজা-পদ্ধতি, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, তাঁহাদিগের বাহন—ময়ূর-মূষিক, জয়া, বিজয়া প্রভৃতির পূজা ও ধ্যান প্রভৃতি বর্ণনা করুন। কারণ, কার্ত্তিক প্রভৃতির ধ্যান বা পূজাবিধি কালিকা-পুরাণাদিতে বর্ণিত হয় নাই।

উত্তরে মহাদেব এই সকল দেব-দেবীর ধ্যান ও মন্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন—গণেশ, কার্ত্তিক, ময়ূর, মূষিক, জয়া, বিজয়া, সরস্বতী, কমলা, শিব, ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ব্রহ্মাণী ও নবপত্রিকার প্রত্যেকটি পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নব সিদ্ধান্বিকরে পূজা করিলে দশভুজার পূর্ণ-পূজাফল লাভ হয়। প্রথমে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চদেবতা পূজা, পরে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর পূজা, তাহার পর কার্ত্তিকাদির পূজা ও সর্ব্বশেষে নবপত্রিকা পূজা —দেবী-পুরাণ-সম্মত।

কালী বিলাসতন্ত্র-মতে—দেবীর দক্ষিণে গণেশ, লক্ষ্মী ও বিজয়া, আর বামে—কার্ত্তিকেয়, সরস্বতী ও জয়া। কেহ কেহ বলেন—বিজয়া লক্ষ্মীর ও জয়া সরস্বতীর নামান্তর। কিন্তু কালী-বিলাসোক্ত ধ্যান দর্শনে তাহা বোধ হয় না। কালীবিলাস-তন্ত্রোক্ত ধ্যানমূর্ত্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

গণেশ—লম্বোদর, স্থূল, গজমুখ, ত্রিনয়ন, সর্ব্বদেবময়, পার্ব্বতী-[illegible] ... খর্ব্ব, কর্ব্বকর্ণ, ... ত্রিনয়ন, চারি বাহু, দক্ষিণের ঊর্দ্ধহস্তে নিজ দণ্ড, নিম্নহস্তে উৎপল, বামে ঊর্দ্ধে মোদক, নিম্নে পরশু; গলদেশে সর্প-উপবীত ঋদ্ধি ও বুদ্ধিযুক্ত।]

কার্ত্তিকেয়—তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, খড়্গ-শক্তিধর, মস্তকে উষ্ণীষ, ময়ূরবাহন, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক। [মৎস্যপুরাণের মতে—বর্ণ তরুণ-অরুণসম অথবা পদ্মগর্ভসম, সুকুমার কুমারমূর্ত্তি, ময়ূর-বাহন, দণ্ড-চীরযুক্ত। বনে বা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি দ্বিবাহু, খর্ব্বটে (নগরে) চতুর্ব্বাহু, নিজের অভীষ্ট নগরে দ্বাদশবাহু।]

লক্ষ্মী—তপ্তকাঞ্চনাভা, দ্বিভুজা, লোলনয়না, নয়নে স্ফুরিত কটাক্ষ ও অঞ্জনানুলেপন, শুক্লাম্বরধরা, ললাটে সিন্দূরতিলক, শুক্লপদ্মাসনগতা, নারায়ণপ্রিয়া।

সরস্বতী—শঙ্খ-চন্দ্র-কুন্দপুষ্পবর্ণা, দ্বিভুজা, পদ্মনয়না, অঞ্জনাঙ্কিতনয়নে স্ফুরিত কটাক্ষ, ললাটে সিন্দূরতিলক, দিব্য অম্বর ও আভরণধারিণী—বাগ্‌দেবী।

জয়া—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভুজা, চঞ্চলনেত্রা, দিব্য বস্ত্রাভরণ-ভূষিতা, সিদ্ধিদায়িনী।

বিজয়া—মর্দ্দিত অঞ্জনের ন্যায় গাত্রবর্ণ, দ্বিভুজা, খঞ্জন-নয়নে অঞ্জন-রেখা ও স্ফুরিত কটাক্ষ, দিব্যাম্বরধারিণী, গানযন্ত্র-বিভূষিতা, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।

ময়ূর—বিচিত্রবর্ণ, গরুড়ের অপত্য, অনন্তশক্তিযুক্ত ও ক্ষুদ্র সর্প ভক্ষণে রত।

মূষিক—বৃষরূপধারী, ধর্ম্মের অবতার, বৃষাকৃতি, মহাবল, মহাকায়, পূজাসিদ্ধির অনুকূল।

সিংহ—স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার—মহাদেবী পার্ব্বতীর বাহন।

অসুর—ভগবান্ শিবের অংশাবতার—মহাদেবীর বরে সাধকের পূজার্হ। [কালিকাপুরাণে—উক্ত হইয়াছে যে, রম্ভাসুরের ঔরসে এক মহিষীর গর্ভে জাত মহাদেবের অংশাবতার মহিষাসুর কাত্যায়নমুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলে দেবাধিদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—'আমার অংশাবতার মহিষাসুর তোমারই হস্তে নিহত হইবে। স্বয়ং বিষ্ণুও সিংহরূপে একাকী তোমাকে বহন করিতে পারিতেছেন না, তাই আমার এই মহিষাকৃতি শরীরও তোমার ভার বহন করিবে।' এই কারণেই ধ্যানমধ্যে উক্ত হইয়াছে যে, দেবীর দক্ষিণপদ সমভাবে সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত ও বাম পাদের অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিদূর্দ্ধে টেরচাভাবে মহিষের উপর স্থাপিত]।

নবপত্রিকা—কদলী (রম্ভা), কচ্চী (কচু), হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমী, অশোক, মান, ধান্য—শ্বেতাপরাজিতা-লতা-বদ্ধ হইলে 'নবপত্রিকা' আখ্যা প্রাপ্ত হন। চলিত ভাষায় ইহারই নাম 'কলাবউ'। —ইহাই লিঙ্গপুরাণের অভিমত। কদলীর অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, দাড়িমীর রক্তদন্তিকা, ধান্যের লক্ষ্মী, হরিদ্রার দুর্গা, মানের চামুণ্ডা, কচুর কালিকা, বিল্বের শিবা, অশোকের শোকরহিতা ও জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্ত্তিকী। এই নবপত্রিকা গণেশের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া থাকেন।

প্রতিমার শিরোদেশে—চালচিত্রের ঠিক মধ্যস্থলে দেবাধিদেব শিবের মূর্ত্তি স্থাপনীয়।

ইহাই হইল দেবীর ধ্যানসম্মত মূর্ত্তি। স্বেচ্ছায় বা পরেচ্ছায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহার অন্যথাকরণে প্রত্যবায় ও নানাবিধ অমঙ্গলের সম্ভাবনা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

তান্ত্রিকগণ যাঁহাকে মহাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমরা তাঁহাকেই শ্রীরাধা বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। আমরা সাধারণভাবে প্রকৃতি,মায়া প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিলেও মহাশক্তির সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তন্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরে আরো দ্বাদশটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যাহা নিরবচ্ছিন্ন বহুদেশব্যাপক, তাহাই তত। যাহা নিরবচ্ছিন্ন বহুকাল ব্যাপক, তাহার নাম সন্তত। এই যে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালে ব্যাপকতা,—এই ততত্ব ও সন্ততত্ব মিলিয়াই তত্ত্ব। তন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়াই তৎ পদ পাওয়া যায়। তৎ শব্দে ব্রহ্ম। তন্ অর্থে বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা। ব্রহ্মই দেশ কালের ব্যাপক। তৎ এর ভাব তত্ত্ব।

ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এইরূপ—

(১) শিবতত্ত্ব,—উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্মই পরম শিব। "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়", এই যে ইচ্ছা, ইহাই ব্রহ্মের শক্তি। এই ইচ্ছা-শক্তি হইতেই জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তিত্রয়যুক্ত পরম শিবই শিবতত্ত্ব। পরম শিব নির্গুণ, সিসৃক্ষাযুক্ত হইলেই সগুণ হন।

(২) শক্তিতত্ত্ব—পূর্ব্বোক্ত সিসৃক্ষা বা ইচ্ছা-শক্তিই শক্তিতত্ত্ব। ইনিই আদ্যশক্তি, বা মূল শক্তি। এই তত্ত্বই দ্বিতীয় তত্ত্ব। আচার্য্য রামেশ্বর পরশুরাম-কল্পসূত্রের টীকায় ইহাকেই শিবনিষ্ঠ অনন্ত শক্তির সমষ্টিভূতা বলিয়াছেন। শিবের ধর্ম্মই শক্তি—বিমর্শ-শক্তি। ইহারই নামান্তর পরা বাক্, সম্বিৎ, চৈতন্য ইত্যাদি। দেবী ভাগবত বলেন—

রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাস্তথা।
শক্তিহীনং যথা সর্ব্বে প্রবদন্তি নরাধমম্॥

নরাধমকে লোকে বলে শক্তিহীন। কই রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন তো বলে না।

(৩) সদাশিবতত্ত্ব—বিশ্বকে যিনি অহং বলিয়া চিন্তা করেন, বিশ্বের সহিত যাঁহার ভিন্ন ভাব নাই, তিনিই সদাশিব। এই অহন্তা—পূর্ণাহন্তা।

(৪) ঈশ্বরতত্ত্ব—বিশ্বকে যিনি ইদং বলিয়া মনে করেন, বিশ্বের সহিত যাঁহার ভিন্ন ভাব—তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) বিদ্যাতত্ত্ব—অহন্তা ও ইদন্তা মিলিত সদাশিবের যে বৃত্তি তাহারই নাম বিদ্যা। ইনিই উমা হৈমবতী। ইনিই ব্রহ্মবিদ্যা, নির্ম্মলা বলিয়া ইঁহার নাম শুদ্ধবিদ্যা।

(৬) মায়াতত্ত্ব—এই জগৎ আমা হইতে পৃথক্, ঈশ্বরের এই বুদ্ধির নাম মায়া।

(৭) অবিদ্যাতত্ত্ব—বিদ্যার আবরিকা যিনি—তিনিই অবিদ্যা। ক্ষেমরাজ ইহাকেই বিদ্যাতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি বিদ্যাতত্ত্বকে শুদ্ধ-বিদ্যাতত্ত্ব ও অবিদ্যা তত্ত্বকে বিদ্যাতত্ত্ব বলিয়াছেন। এই মতে শিব সর্ব্বজ্ঞ, জীব কিঞ্চিৎজ্ঞ। এই কিঞ্চিৎজ্ঞতা শক্তিই বিদ্যা। এই বিদ্যা সর্ব্বজ্ঞতার বিরোধিনী। সুতরাং ইনি অবিদ্যা নামেও অভিহিতা হইতে পারেন।

(৮) কলাতত্ত্ব—শিবের সর্ব্বশক্তিত্ব জীবে কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বরূপে অবস্থিত। ইহারই নাম কলা।

(৯) রাগতত্ত্ব—রাগ অনুরাগ বা আসক্তি। অভাবেই অপূর্ণতা আসে, সুতরাং তাহার প্রতি একটা আসক্তি জন্মে। শিব নিত্যতৃপ্ত। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে কোন কালেই তাঁহার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে নাই, থাকিবে না। এখনও নাই। জীবই অপূর্ণ, নিত্য অতৃপ্ত। তাই ভোগের উপর তাহার অনুরাগ। ইহাই রাগতত্ত্ব।

(১০) কালতত্ত্ব কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়াই ইনি কাল। শিব কালাতীত, উৎপত্তি ও বিনাশহীন। জগৎ ষট্‌-বিকারগ্রস্ত।—অবস্থিতি করে, উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, পরিণামপ্রাপ্ত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শিবের নিত্য এই ষড়্ভাববিকার যোগে কালসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইনিই কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্তাদি অংশে ও যুগ, কল্প-মন্বন্তরে বিভক্ত হন।

(১১) নিয়তি-তত্ত্ব—নিয়তি অর্থে নিয়ম। এই কর্ম্মের এই ফল। শিব স্বতন্ত্র, স্বাধীন। শিবের এই স্বতন্ত্রতা অবিদ্যাযোগে নিয়তি আখ্যায় অভিহিতা হন। ইনিই ভাগ্য।

(১২) জীবতত্ত্ব—জীবাত্মার অপর নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মার অংশ বলিয়া ইনি অণু। ইনিই নিয়তি, কাল, রাগ, কলা ও অবিদ্যার আশ্রয়। ইনিই জন্ম মরণপথের ভ্রমণশীল পথিক।

(১৩) প্রকৃতি-তত্ত্ব—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ ও বুদ্ধি আদি ইহাতেই অব্যক্তভাবে আছেন বলিয়া ইহারও নাম অব্যক্ত। ইনিই বুদ্ধি আদির হেতু। কেহ কেহ ইহাকে মূলপ্রকৃতিও বলেন। ইনিই চিত্ত।

(১৪) মনতত্ত্ব—সত্ত্ব ও তমোগুণ যখন অভিভূত রজঃ প্রধান সেই অবস্থাই অন্তঃকরণ বা মন। ইনিই সংকল্পের কারণ।

(১৫) বুদ্ধিতত্ত্ব—নিশ্চয়তা জ্ঞানের কারণ, সত্ত্বগুণ-প্রধান অন্তঃকরণ। রজঃ ও তমঃ তখন অভিভূত।

(১৬) অহংকার তত্ত্ব—বিকল্প বা ভেদজ্ঞানের কারণ, তমোগুণ-প্রধান অন্তঃকরণ। অহং অভিমানের নামই অহঙ্কার। সত্ত্ব ও রজোগুণ তখন অভিভূত।

(১৭-১৮, ১৯-২০, ২১) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্ব। শ্রোত্রতত্ত্ব—শব্দ, ত্বক্‌তত্ত্ব—স্পর্শ, চক্ষুতত্ত্ব—রূপ, জিহ্বাতত্ত্ব—রস ও ঘ্রাণতত্ত্ব গন্ধগ্রহণকারী ইন্দ্রিয়গণ।

(২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়-তত্ত্ব—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থতত্ত্ব। বাক্যোচ্চারণ, গ্রহণ ও বর্জ্জন, গমনাগমন, মলনিঃসারণ ও মৈথুনসাধনের কারণ।

(২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১) পঞ্চতন্মাত্র তত্ত্ব। পঞ্চ ভূতের সূক্ষ্ম অংশ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়।

(৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬) পঞ্চ মহাভূততত্ত্ব—ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। এই ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বিচার আছে। ঘট-পটাদি ক্ষণবিধ্বংসী, ইহা অনন্ত দেশ কালের ব্যাপক নহে, অতএব তত্ত্বশব্দবাচ্য হইতে পারে না।

নিয়তি, কাল,রাগ, কলা ও অবিদ্যা এই পাঁচটা কঞ্চুক। ঈশ্বর এই পঞ্চ কঞ্চুকে স্বীয় স্বরূপ আবৃত করেন বলিয়াই তিনি জীবসংজ্ঞা লাভ করেন। এই পঞ্চ-কঞ্চুক নির্ম্মুক্ত হইলেই জীব শিবত্ব লাভ করিতে পারে। এই পরম শিবত্ব প্রাপ্তি বা স্বীয় স্বরূপের অনুভূতিই মুক্তি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত সৌন্দর্য্যলহরী-স্তোত্রে বিবৃত রহিয়াছে—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" শিব শক্তিযুক্ত হইলেই প্রভুত্বে সমর্থ হন। অন্যথায় নিষ্পন্দ, স্পন্দনেরও ক্ষমতাতীত। এই মহাশক্তিই শ্রী-বিদ্যা, ললিতা, ত্রিপুরা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। বামকেশ্বর তন্ত্র বলেন—

> ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যাজ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে।
> স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তি মাতৃকা॥

মহাদেব বলিতেছেন—হে প্রিয়ে, ত্রিপুরাই সর্ব্বপ্রধানা শক্তি। ইনি জ্ঞান, জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়রূপে ত্রিপুটীকৃত জগতের আদিভূতা, অতএব আদ্যা এবং স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে ত্রিলোকের প্রসবকারিণী মাতা। দশমহাবিদ্যা সাধনায় তৃতীয়া হইলেও ইনিই আদিবিদ্যা। ইনি ষোড়শী। তান্ত্রিক সম্প্রদায় মধ্যে ত্রিপুরাসম্প্রদায় নামে একটী সম্প্রদায় আছেন। বৈষ্ণবগণ বৈদিক ও তান্ত্রিকমতে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবেন, ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুজ্ঞা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই ত্রিপুরা-উপাসনা প্রচলিত আছে। এই ত্রিপুরা সুন্দরীই রাধা। দেবীভাগবতে ইহার কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দেবীভাগবত বলেন—

> শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
> ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥
> ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
> ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন।
> তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
> কারণং সৈব কার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥

এই শক্তিই স্বেচ্ছায় চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। ব্রহ্মা আদি কেহই শক্তিহীন হইয়া আপন আপন কার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ নহেন। এই শক্তিই সকল কার্য্যের মূলীভূতা—প্রত্যক্ষ প্রমাণেও ইহা অবগত হওয়া যায়।

"পাঞ্চরাত্র" শাস্ত্রই বৈষ্ণব-তন্ত্র। "নারদ-পাঞ্চরাত্র" 'হয়শীর্ষ-পাঞ্চরাত্র' প্রভৃতি একশত আটখানি পাঞ্চরাত্র আছে, ইহাই আচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াছি। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

> ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
> জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
> জ্ঞান শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ।
> ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টী মহাশক্তির নাম ভগ। প্রাকৃত গুণসম্বন্ধহীন পরিপূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ ভগবৎশব্দের বাচ্য। সর্ব্ব-বশীকরণ শক্তির নাম ঐশ্বর্য্য। অচিন্ত্য শক্তির নাম বীর্য্য। অনন্ত কল্যাণ গুণই যশ। তাঁহার লীলাকথা শ্রবণে, স্মরণে, কীর্ত্তনে পরম কল্যাণ লাভ হয়। তাহার ধাম পার্ষদ আদি মহাসম্পদে পরিপূর্ণ, ইহাই শ্রী। ভগবানের স্বপ্রকাশতা ও সর্ব্বজ্ঞতাই তাহার জ্ঞান। সর্ব্ববিধ মায়িক বস্তুতে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। ভগবান সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরাহিত্য হেতু অদ্বয় পরতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন"।

পাঞ্চরাত্র মতেও জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য ও তেজ—পরমব্রহ্ম এই অপ্রাকৃত ছয়টী গুণবিশিষ্ট। জ্ঞানই প্রধান গুণ, জ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ। এই জ্ঞান চিন্ময় স্বপ্রকাশ, নিত্য ও সর্ব্বপ্রকাশক। এই পরম ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। এই যে উপাদান কারণভাব—ইহাই তাঁহার 'শক্তি'। জ্ঞান প্রথম গুণ হইলেও এই যে শক্তিরূপ গুণ ইহাই তাঁহার অন্যান্য গুণাবলী হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাই দ্বিতীয় গুণ। জগৎ কর্ত্তারূপে ব্রহ্মের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাই ঐশ্বর্য্য। জগৎ কর্ত্তৃত্বে অনন্ত তৎপরতাই 'বল'। জগতের উপাদান হইয়া

নির্ব্বিকার, সর্ব্ববিধ বিকাররহিত বলিয়া তিনি বীর্য্যবান্। তাঁহার কোন সহকারী নাই, অথচ জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্যে তাঁহার অনন্তশক্তি, ইহাই তাঁহার তেজ। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে পাঞ্চরাত্র মতেও শক্তিই ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ গুণাবলী হইতে শ্রেষ্ঠা, শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কারণ, জ্ঞান ব্রহ্মের গুণ হইলেও জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ। সুতরাং অপর যে পঞ্চ গুণ, তাহার মধ্যে শক্তিই প্রধানা। পাঞ্চরাত্রে এই শক্তির অপর নাম প্রকৃতি। এই বৈষ্ণবী শক্তি পরম ব্রহ্ম হইতে অভিন্না। প্রভাকরের প্রভার মত, চন্দ্রের চন্দ্রিকার মত ব্রহ্ম ধর্ম্মী, শক্তি তাঁহার ধর্ম্ম। উভয়ে কোন ভেদ নাই। পাঞ্চরাত্রে ইনি গৌরী, শিবা, কমলা, সরস্বতী প্রভৃতি নামেও অভিহিতা হইয়াছেন।

পূর্ব্বে তন্ত্রের যে মত আলোচনা করিয়াছি, তাহার সঙ্গে পাঞ্চরাত্র মতের প্রায় কোনই পার্থক্য নাই। ভাস্কর রায়, রাঘব ভট্ট, ক্ষেমরাজ প্রভৃতির মত প্রায় একরূপ। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। পাঞ্চরাত্র মতের সঙ্গেও সেইরূপ, ইহাদের অতি সামান্য পার্থক্যই লক্ষিত হয়। ভাস্কর রায় বলিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে কেবল সত্তামাত্র ব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন। আমি সৃষ্টি করিব—এই সিসৃক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার কোন সংজ্ঞা ছিল না। ইচ্ছা-শক্তির স্ফুরণেই তিনি চিৎ নামে অভিহিত হইলেন। যোগিনীতন্ত্রও বলেন—

"শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে"

শক্তিশূন্য সূক্ষ্ম যে শিব, তাঁহার নাম অর্থাৎ বাচক শব্দ ও ধাম অর্থাৎ প্রকাশবাচক কোন শব্দ নাই।

বেদান্তের মায়ার সঙ্গে আগমোক্ত এই শক্তির পার্থক্য আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার অধিষ্ঠান বলিয়া জানিবে। ইহা হইতে মায়াকে চিতের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া চিতের অতিরিক্ত, চিৎ হইতে ঈষৎ ভেদ-বিশিষ্ট চিতের কর্ত্তৃত্ব-নির্ব্বাহিকা শক্তির স্বীকারই তান্ত্রিক আচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীভগবান্‌কে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তন্ত্রেও সৎ, চিৎ ও আনন্দ-তত্ত্বের উল্লেখ আছে। তান্ত্রিকগণ আচমনে যে 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা', 'বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' ও 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই তিন তত্ত্বের উল্লেখ করেন, ইহার মধ্যেই এই সচ্চিদানন্দ-রহস্য অন্তর্নিহিত আছে। কোন কোন তন্ত্রের মতে পৃথিবী হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব আত্মতত্ত্বের অন্তর্গত। পুরুষ হইতে মায়া পর্য্যন্ত সপ্ততত্ত্ব বিদ্যা-তত্ত্বের অন্তর্গত। শুদ্ধ-বিদ্যা হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত পঞ্চতত্ত্বই শিবতত্ত্ব। ভাস্কর রায় তাঁহার সেতুবন্ধে বলিয়াছেন—সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের পৃথিবী হইতে মায়াতত্ত্ব পর্য্যন্ত একত্রিংশ তত্ত্বে সৎ অংশ প্রকট, চিৎ ও আনন্দ অংশ আবৃত; সেইজন্য এই একত্রিংশ তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব। শুদ্ধ বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এই সৎ ও চিৎ অংশ অনাবৃত, আনন্দ অংশ আবৃত, এই-জন্য এই ত্রিতত্ত্ব বিদ্যা-তত্ত্ব। এবং শিব ও শক্তিতত্ত্বে কোন অংশই আবৃত নাই; এইজন্যই এই দুই তত্ত্ব শিবতত্ত্ব। আনন্দই এই দুই তত্ত্বের স্বরূপ। ভাস্কর রায় এই ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্বকে পঞ্চভূতময় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন হইল যে, মহাশক্তিই বৈষ্ণবী নারায়ণী—বৈষ্ণবী, আবার তিনিই শৈবী, মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী। তিনি দুর্গা, ত্রিপুরা। দেবী-ভাগবত সৃষ্টিকার্য্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি স্বীকার করিয়াছেন। নবম-অধ্যায়ের শেষে রাধা ও দুর্গার পূজাবিধি, ধ্যান ও স্তোত্র উল্লিখিত আছে। দেবীভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে যে পরাশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি দুর্গা। তন্ত্রে ও পাঞ্চরাত্রে মহাশক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরম ব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধা সম্বন্ধে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এইরূপ—কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ বৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

এই মহাশক্তি যে নামেই অভিহিতা হউন, তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী। তিনিই আমাদের কালিকা। আমরা নত কন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম করি

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে॥

বিপদে মধুসূদন (গল্প)

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমি তখন জব্বলপুরে, সমর-সংক্রান্ত সেরেস্তায় কাজ করি। উত্তর চীনে 'বক্সার' বিদ্রোহ চলছে। জগতের সবগুলি সভ্যজাতি অর্থাৎ 'শ্বেতজাতি' সমর-সজ্জায় সেখানে উপস্থিত।

চীনে যাবার আদেশ পেলাম। যাবার আগে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা দিতে হয়। সামরিক বিভাগের ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই—যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার মত স্বাস্থ্যবান্ কিনা, অর্থাৎ fit (যোগ্য) কিনা। সরকারের সময় প্রায়ই সকলে fit certificate পায়, বাঙালিরাও সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয় না,—কদাচ কোন দুর্ভাগা বেরিয়ে পড়ে।

ইংরেজ ডাক্তার (Major) তখন নিজের বাঙলোতেই ছিলেন। উপস্থিত হতেই এবং পত্রখানি তাকে দিতেই না খুলেই বুঝে নিলেন—'যুদ্ধক্ষেত্রযাত্রী'। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—"চীনে যাবার হুকুম পেয়েছ? যেতে চাও কি না বলো?" প্রশ্ন শুনে আমি অবাক্। আমাকে নিস্তব্ধ দেখে বললেন,—"কি বলো,—যেতে চাও?"

বলতেই হোলো—"আমার না গিয়ে উপায় নেই।"

"কেন"?

"ইতিপূর্ব্বে নর্থওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ারের দিকে আমার তিনবার লড়ায়ে যাবার আদেশ হয়েছিল। সে সব আমি কোন প্রকারে avoid করেছি। এবার তা করলে আর চাকরি থাকবে না। আমার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য দাগা আছে।"

বললেন—"তিন-তিনবার যাও নি! কেন যাও নি?"

বললুম—"আমার মা তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর চোখের জলই আমাকে বাধা দিত"...

"Oh,—আর এখন?"

"দুই বৎসর হ'ল তিনি গত হয়েছেন,—এখন তাঁকে কষ্ট দেবার অপরাধের চিন্তা আর আমার নাই।"

"তা হলে তুমি এখন যেতে চাও?"

"ঠিক্ যে চাই তা বলতে পারি না, তবে চাকরি রাখতে হ'লে, তা ভিন্ন আর আমার উপায় কি"।

একটু থেমে, সহসা বলে' উঠলেন—"আচ্ছা,—চলো,—আমিও যাচ্ছি, আমারও অর্ডার হয়েছে"।

এই বলে সার্টিফিকেটের একখানা ফরম টেনে নিয়ে 'fit' লিখে, আমার হাতে দিলেন।—পরীক্ষা আর করলেন না। বিশেষ ভুল করেন নি,—শরীর সবলই ছিল,—মনটাই ছিল দুর্ব্বল।

"দয়া করে' মনে রাখবেন"—বলে' একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বাসায় ফিরলুম। তাঁর মানসিক অবস্থা ও আইন-বিরুদ্ধ উদারতার কারণটা পেলুম,—মানুষ তো! মানুষ মানুষই, সম অবস্থায় সবাই প্রায় একই।

... ...

চীনে পৌঁছে বছর দেড়েক কেটে গিয়েছে। টিন্‌সিন্ সহরে আস্তানা।—তখন শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রের সাড়া নেই—অভিযানের আওয়াজ থেমে গেছে। সেটা চলে কেবল কাগজে-কলমে,—মিটমাটের মিঠে চালে।

জগতের সকল শ্বেতাঙ্গ জাতিই উপস্থিত। তাঁরা মনোমত স্থান দখল কোরে, পুরুষানুক্রমিকের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। তার মধ্যে রুচি মত রাস্তাঘাট, রেস্তোঁরা, হোটেল, ক্লাব, নাচ-ঘর প্রভৃতি আরামের আয়োজন কোরে ফেলেছেন। স্বাধীন জগতের কেতাই আলাদা। নিজেদের হোয়াইট এওয়েদের দোকানও বসে গিয়েছে। সবই সহজ ও শোভন—

ব্রিটিশের এলাকায় অশোভন কেবল Indian follower তারা বে-রং বা বদরং, তার উপর বে-সাইজের অর্থাৎ সবাই এক মাপের নয়—গরম Canadian কাপড়ের কোট, ওভারকোট জড়িয়ে—যেন পেখম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওভারকোট কারো পায়ে লুটুচ্ছে, হাতা আধ-হাত ঝুলছে! চরণভূষণ 'এম্যুনিসন বুট পায়ে—যেন 'বেড়ির' বদলে দেওয়া হয়েছে, তারা সবাই সেই সাতসেরি বোঝা টেনে চলছে। সারা জীবন অন্নকষ্টে কাটিয়ে আজ এ ঐশ্বর্য্য সাজার মত ঠেকছে। Redeeming feature এর মধ্যে বা বাঁচোয়ার মধ্যে, পাঞ্জাবী শিখ watchman এর মোক্ষে মোড়ে—সভ্য জাতিদের প্রশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সবার উপরে দেড় ফিট উচ্চ শিরে ফিরছে। Length and strength এদের একমাত্র সম্বল। সেই সার্টিফিকেটের জোরেই মোট মাইনের চাকরি।

আমার আজকের কথা তাদেরই একটিকে নিয়ে। এদের চরিত্র-পরিচয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য ছিল না,—মদে ও 'বদে' চরিত্র হিসেবে নিকৃষ্ট।

এদেরই একজন একটা খুনী মামলায় ফেঁসে ফাঁসির হুকুম পায়—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে এই পরিণাম ঘটে।

সভ্য সরকারদের সব নিয়ম-বাঁধা কাজ,—লোককে মারা হবে তারও বিশ্বস্ত সাক্ষী চাই—কাজটা ঠিক্ ঠিক্ হ'ল কিনা—প্রাণটা বেরিয়ে গেল কি না, কোন' কষ্ট হয়েছিল কি না, ইত্যাদি দর্শকও চাই। সভ্য জাতির Law সম্মত দয়া একটা বড় বৃত্তি।

সেই দয়ার কাজে বেছে বেছে এই ব্রাহ্মণ-সন্তানকেও টানা হয়েছিল,—এই পুণ্যকর্ম্মের ভাগ হতে বঞ্চিত না করাই বোধ করি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সকলের সব জিনিষ নেবার মত ভাগ্য থাকে না, সু-খবরটা শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় মনের অবস্থা না শোনাই ভালো। মানুষ মারা হবে, তার ব্যবস্থা ও আয়োজন নির্দ্দোষ হওয়া চাই,—সেই বীভৎস ব্যাপার দেখতে হবে!

মহাচিন্তায় পড়ে গেলুম। বিপদে মধুসূদন ভিন্ন গতি নেই। রাতটা তাঁকেই দিলুম। প্রার্থনা—"সাক্ষাৎ সাহেব-মধুসূদনটির মত অর্থাৎ আমার প্রতি দয়াটা—বদলে দিন।" আমার কাজের সাহেবটি ছিলেন বয়েসে ছোট—একটু রহস্যপ্রিয়ও। আমাকে মাঝে মাঝে তাঁর পরিদর্শন-সফরের সাথী হ'তে হ'ত, তাই কিছু গা-সহাও।

তা' হলেও মনিব। 'সাহেব-আতঙ্ক' বলে রোগটিও চাকুরের স্বভাবগত, তার 'গোঁদোলপাড়া' নেই।

সকালে দুর্গা বলে সাহসে অর্থাৎ গরজে ভর কোরে গুটি গুটি তাঁর কাছে উপস্থিত হলুম। সেলাম করতেই—"হ্যালো, ব্যানার্জি কি ব্যানার্য্যি, বাড়ি ফিরতে চাও নাকি!"

"না ক্যাপ্টেন, সেরূপ অসম্ভব প্রার্থনা করব কেন? ফেরবার আশা করে কয়জন আর যুদ্ধে আসে বলুন?"

"সে কি কথা। আমি কিন্তু তাদের মধ্যে নেই, আমায় ফিরতেই হবে যে" বলে হাসলেন।

বোধ করি বাগদানে বদ্ধ। যাক্, বললুম—"আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি, আপনি নিশ্চয়ই ফিরবেন—এখন যুদ্ধের তো আর কোনো কারণই নেই।"

বললেন—"আচ্ছা, এখন তোমার কথা বলো—"

নিজের আব্দারের ও লজ্জার কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলা চলে না, সত্যকথাটাই তাঁকে জানালুম—অর্থাৎ আমাকে এ কাজটি থেকে দয়া করে রেহাই দিন।

শুনে আশ্চর্য্যভাবে বললেন, "এই না তুমি লড়ায়ে মরতে আসার বড়াই শোনালে, আর একটা ফাঁসি দেখতে এতো ভয়?"

"ভয় নয় 'সার', সেটা অন্য জিনিস—যা আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না, যুদ্ধের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। যুদ্ধ সম্বন্ধে শাস্ত্র আমাদের ভারী উদার—খুব উৎসাহ দিয়েছে—

"যুদ্ধে ম'লে স্বর্গ লাভ হয়" বলেছে। তার চেয়ে প্রার্থনীয় আর কি হতে পারে।"

"Mind তোমার লোভের কথাটি আমি নোট করলুম—"Chance may favour you" বলে একটু হাসি টানলেন।

তখন কে জানতো যে ভিতরে ভিতরে "রুসো-জাপানী" যুদ্ধের বীজ সমুদ্রগর্ভে গোপনে গজাচ্ছে। আমাদের সরকার আবার জাপানের 'অ্যালী'! যাক, সে কথা সতন্ত্র। এখন আসন্নটা এড়াতে পারলে বাঁচি! অনেক Kindly খরচের পর তিনি বললেন—"আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, তুমি যদি একজন responsible Govt Servantকে তোমার স্থান নিতে রাজি করতে পারো। দু'ঘণ্টার মধ্যে সেটা কিন্তু আমাকে জানানো চাই। অর্থাৎ General সাহেবের কাছে নামের লিষ্ট চলে যাবার আগে।"

সেলাম করেই বেরিয়ে পড়লুম, মনে তেমন বল নিয়ে নয়। সামনেই পেলুম অভিযান-সাথী আলাপী বন্ধু ফকির হুসেনকে, সে Postal Serviceএ এসেছে। ২৪।২৫ বছরের উৎসাহী পেসোয়ারী যুবক—যেন রবারের লাটিম—লাফিয়ে বেড়ায়, সকলেরই প্রিয়।

"ব্যাপার কি ব্যানার্ঘি, বিমর্ষ দেখছি কেনো? অসুস্থ?"

আমি কথাটা পাড়তেই, সবটা শোনবার আগেই বললে—অপরাধীর ফাঁসি হবে তা'তে দুঃখের কি আছে? আমার তো দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে!"

বললুম—"দেখতে চাও?—আমার order হয়েছে ভাই, কিন্তু আমার শরীর-মন দুই ভালো নয়, রাজি হও তো সাহেবকে বলি। আমাকেও সাহায্য করা হয়।"

"With pleasure?—gladly"—আমাকে একটি 'kindly'ও ও খরচ করবার অবকাশ দিলে না।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললুম—"তবে ভাই, সাহেবের সঙ্গে মুকাবলাটা করে আসি চলো।"

উপস্থিত হতেই সাহেব সহাস্যে বলে উঠলেন—"You are very fortunate—Banerjee You have caught the right man—All right you are saved—But I shall also seek opportunity to help you to your profitable heaven-mind।" অর্থাৎ আমার স্বর্গ পাবার উপায় করতে ভুলবেন না!

হাসির মধ্যে আমার বিপদটা কেটে গেলো।

সত্যটা স্বীকারে নাকি পাপক্ষয় হয়, তাই লজ্জার কথাটা বলতে আজ বাধলো না। কেউ হাসতে চান—হাসুন।

শারদীয়া

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, বার্-এট্-ল

শেফালি

আমার বৃন্তের রঙ্গে রাঙ্গায়েছে মন্দিরে প্রতিমা,
শাখে রহি অফুটন্ত যতক্ষণ জীবনের সীমা।
ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ি সাজাইতে দেবতার ডালি
শিশুমুখে শুভ্রহাস্য শরতের আমি যে শেফালি।

কাশফুল

বালুচরে নদীতীরে খালে বিলে আমার আবাস,
সরসীতে কেলিরত কলরবে শুভ্র রাজহাঁস।
অমল ধবল পাখা মেলি' করে জলখেলা সুখে
আমি কাশ, তীরে ফুটি, কভু নামি সরসীর বুকে।

পদ্ম

অগম্য সুদূর বিলে ফুটি আমি সোনালী কমল,
সবুজ পাতার পরে বারিবিন্দু করে টলমল।
ঝিলমিলি বুনোহাঁস শঙ্খশুভ্র বকের বসতি,
কল্পনার প্রিয় আমি ভাল মোরে বাসে সরস্বতী।

মেঘ

আমি বারিহীন মেঘ, শরতের আনন্দের দূতী,
যুগে যুগে শত কবি শ্লোক রচি' গাহে মোর স্তুতি।
আকাশে ভাসাই ভেলা নদীতে পালের তরী ছোটে,
বাতাসে জাগায় দোলা তীরে তীরে ঢেউগুলি লোটে।

নীহারিকাপুঞ্জ

আমি নীহারিকাপুঞ্জ, শরতের আগমনী রথে
জ্বালাই অজস্র বাতি গগনে গগনে পথে পথে।
যে তারা ফোটে নি আজো ফুল হ'য়ে আকাশের পার,
তাদের জ্যোতির কণা আগমনী বাণীটি পাঠায়।

পূজা-মণ্ডপ

নহি কাশ, নীহারিকা, শুভ্রমেঘ, সোনার কমল,
কবির অন্তরে কবি, ভাবলোকে আমি শতদল!
গগনে পবনে বনে—আমি মুগ্ধ নরনারী হিয়া,
বর্ষে বর্ষে আমি স্বপ্ন, আমি আশা, আমি শারদীয়া।

অণু-দর্শন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পদার্থবিজ্ঞানে 'অণু' শব্দটা একটা বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। জড়দ্রব্য মাত্রকেই বৈজ্ঞানিকগণ এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সসীম এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টিরূপে কল্পনা ক'রে থাকেন—যারা সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক কারবারের পক্ষে (অর্থাৎ যাতে ক'রে পদার্থের ধর্ম্ম বদলায় না এমন সকল কারবারের পক্ষে) ওর ক্ষুদ্রতম বা অবিভাজ্য অংশরূপে পরিচিত হ'তে পারে। পদার্থবিশেষের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে বলা যায় ওর 'অণু'। কঠিন, তরল বা অনিল প্রত্যেক পদার্থই এইরূপ বহুসংখ্যক অণুর সমবায়ে গঠিত হ'য়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ আরো অনুমান করেন যে, একই পদার্থের সকল অণুর বস্তুমান সমান এবং পদার্থ-ভেদে ওদের অণুগুলির বস্তু, গুরুত্ব এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে পদার্থবিশেষের অণুগুলিকে আমাদের কল্পনা করতে হয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি জড়কণারূপে, যাদের পরস্পরের ভেতর অল্পবিস্তর দূরত্বের ব্যবধান বিদ্যমান, যারা যার যার ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াতে ও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা বা ঠোকাঠুকিরূপ বিভিন্ন ভৌতিক কারবারে লিপ্ত হ'তে পারে, এবং যাতে ক'রে যাদের ভেঙ্গে চুরে যাবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। দেখা যাবে উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে একখানা ইটকে আমরা অণু বলতে পারিনে; কারণ, ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা নেই এইরূপ দাবি জানিয়ে কোন ইটই উক্তরূপ ভৌতিক কারবারে লিপ্ত হবার কিম্বা তজ্জনিত সর্ব্বপ্রকার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু আমরা কল্পনা করতে পারি—ইটখানা এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সসীম জড়কণা নিয়ে গঠিত হয়েছে, যারা এরূপ দাবি জানাবার ক্ষমতা রাখে। যদি এ-অনুমান সত্য হয় তবে ঐ খুদে কণাগুলিকে ইটের অণু নাম দিয়ে বিশিষ্ট মর্য্যাদা-সম্পন্ন পদার্থরূপে গ্রহণ করতে অথবা ওদের দর্শনলাভের আশায় অল্পবিস্তর শ্রম স্বীকার করতে আমাদের আপত্তি হতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ কেবল অণুর অস্তিত্বই নয়, ওদের গতিবিধি সম্পর্কেও, চঞ্চলতাবাদ (Kinetic Theory of Matter) নামক একটা বিশিষ্ট মতবাদ মেনে নিয়েছেন এবং এই মতবাদের সাহায্যে জড়দ্রব্যের বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাদানে সমর্থ হয়েছেন। চঞ্চলতাবাদের মূল কথা এই: পদার্থমাত্রেরই অণুগুলি অত্যন্ত চঞ্চল। ওরা অহরহঃ ধাবন, ঘূর্ণন ও কম্পন-গতি সম্পন্ন করছে। কঠিন পদার্থের অণুগুলির ধাবন-বেগ নগণ্য কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি যথেষ্ট বেগ-সম্পন্ন। ছোট বড় নানামাত্রার বেগ নিয়ে অন্ধভাবে ওরা ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে। ফলে পরস্পরের সঙ্গে এবং আধার-পাত্রের সঙ্গে ওদের ক্রমাগত ঠোকাঠুকি হচ্ছে। প্রতি কলিশনে প্রত্যেক অণুর বেগের দিক্ ও পরিমাণ অজ্ঞাত দিকে ও অজ্ঞাতমাত্রায় বদলে যাচ্ছে; ফলে তরল এবং বায়বীয় পদার্থের প্রত্যেক অণুকে একান্ত অস্থিরভাবে ক্রমাগত এদিক-ওদিক করতে হচ্ছে। গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থ যে চাপ প্রদান করে তা' হচ্ছে ওর অণুগুলির ধাক্কার ফল; এবং পদার্থের উষ্ণতা নির্ভর করে ওর অণুগুলির গড়-গতিশক্তির ওপর।

এ-সকলই অনুমান মাত্র। সত্যই জড়দ্রব্যের এমন সকল অংশ রয়েছে যাদের কোন ভৌতিক অস্ত্র দিয়ে—তা' যত সূক্ষ্মই হোক—কাটতে গিয়ে কাটা যায় না বা ভাঙ্গতে গিয়ে ভাঙ্গা যায় না, যারা যার যার বস্তু ও আয়তন বজায় রেখে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ায় ও পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে এবং এই কলিশনগুলি যত প্রচণ্ডই হোক তা'তে ক'রে কারুর ভেঙ্গে চুরে যাবার সম্ভাবনা নেই, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা আশা করতে পারিনে। বুঝতে হবে অণুদর্শন যদি সম্ভব হয় তা' হতে পারে শুধু পরোক্ষভাবে। পরোক্ষভাবে কি ক'রে হ'তে পারে—আমরা পরে বলবো; কিন্তু এ-কথা সত্য যে, তা' যদি সম্ভব না-ও হতো তবু অণুর অস্তিত্ব এবং ওদের সম্পর্কে চঞ্চলতাবাদ মেনে নিতে বৈজ্ঞানিকগণের কোনরূপ দ্বিধা হতো না; কারণ এই অনুমানকে ভিত্তি করেই তাঁরা জড়দ্রব্যের, বিশেষতঃ তরল ও বায়বীয় পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম্মের সহজ ও সঙ্গত ব্যাখ্যাদানে সমর্থ হয়েছেন। সুতরাং প্রথমে আমরা বায়বীয় পদার্থের গোটাকতক বিশিষ্ট ধর্ম্মের উল্লেখ করবো এবং অণুর অস্তিত্ব ও চঞ্চলতাবাদ মেনে নিলে এই সকল ধর্ম্ম কত সহজে ব্যাখ্যাত হতে পারে তা' প্রদর্শনের চেষ্টা করবো।

গ্যাসদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম হচ্ছে ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া। এই ব্যাপারকে বলা যায় ব্যাপন (Diffusion). পাশাপাশি অবস্থিত দু'টা কুঠরির (বা পাত্রের) একটাতে হাইড্রোজেন-গ্যাস এবং অপরটাতে অক্সিজেন-গ্যাস রেখে মাঝখানকার দেয়ালে খুব সরু একটা ছিদ্র ক'রে দিলে দেখা যাবে যে, একটু বাদেই, ঐ গ্যাস দু'টা প্রত্যেক কুঠরির ভেতর ওতপ্রোত হয়ে মিশে রয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ গ্যাস দু'টার প্রত্যেকেই গঠিত হয়েছে এমন সকল অবিভাজ্য ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা নিয়ে—যারা দেয়ালের ঐ সরু ছিদ্রের ভেতর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। এও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই কণাগুলি অত্যন্ত চঞ্চল এবং ওদের ধাবন-বেগ এত বেশী যে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয় গ্যাসের উক্তরূপ পূর্ণমিশ্রণ সম্ভব হয়েছে। এই কণাগুলিরই বিশিষ্ট নাম হচ্ছে অণু।

গ্রাহামের পরীক্ষা থেকে প্রতিপন্ন হলো যে, দু'টা গ্যাসের মধ্যে যার ঘনত্ব বেশী তা'র অণুগুলির ব্যাপন-বেগ, অপরটার তুলনায়, ঐ ঘনত্বের বর্গমূলের অনুপাতে কম হয়ে থাকে। অক্সিজেনের ঘনত্ব হাইড্রোজেনের ১৬ গুণ; সুতরাং গ্রাহামের নিয়ম অনুসারে অক্সিজেনের ব্যাপন-বেগ হাইড্রোজেনের ৪ ভাগের এক ভাগ হবার কথা; পরীক্ষা থেকেও তাই দেখা যায়। ব্যাপন ক্রিয়া তরল পদার্থের ভেতরেও ঘটে থাকে। উক্ত কুঠরিদ্বয় গ্যাসের বদলে দু'টা তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করলেও ওদের উক্তরূপ মিশ্রণ ঘটবে। কিন্তু তরল পদার্থের বেলায় পূর্ণ মিশ্রণে সময় লাগে অনেক বেশী। এর থেকে বোঝা যায় যে, তরল দ্রব্যের অণুদের গড়-বেগ গ্যাসীয় অণুদের গড়-বেগের তুলনায় অনেকটা কম।

গ্যাসীয় অণুর বেগ যে সামান্য নয় নিম্নোক্ত সহজ পরীক্ষা থেকেও আমরা তার স্পষ্ট আভাস পেতে পারি। বায়ুপূর্ণ একটা

কুঁজোর (বা বেলেমাটির কোন পাত্রের) মুখ রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ ক'রে পাত্রটাকে উবুড় ক'রে রাখা হয়েছে। ছিপির মাঝখানটায় একটা ছিদ্র রয়েছে এবং ওর ভেতর দিয়ে জলপূর্ণ একটা বাঁকনল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে [১নং চিত্র]। নলটার দু'মুখই খোলা কিন্তু বাইরের মুখের ছিদ্রটা খুব সরু। এখন বায়ুপূর্ণ মাটির পাত্রটার ওপর হাইড্রোজেন গ্যাস-পূর্ণ একটা পাত্রকে ১নং চিত্রানুযায়ী উবুড় ক'রে ধ'রে রাখলে একটু বাদেই দেখা যাবে যে, বাঁকনলের ঊর্দ্ধমুখ সরু ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সবেগে একটা জলের ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে। আবার হাইড্রোজেনের পাত্রটাকে সরিয়ে নিলে জলের ফোয়ারাটা একটু বাদেই থেমে যাবে।
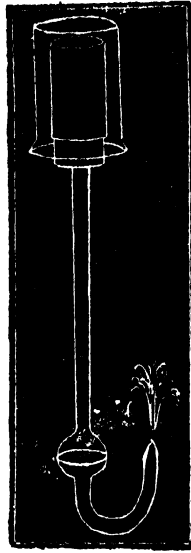
১নং চিত্র

এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা এইরূপ : বেলেমাটির পাত্রটা অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট। ছিদ্রগুলি সহসা আমাদের নজরে পড়ে না, কিন্তু গ্যাস-মাত্রেরই বেগবান্ অণুগুলি এই সকল ছিদ্রপথে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। বায়ুপূর্ণ মাটির পাত্রটা যখন বাতাসের ভেতর অবস্থান করে তখন ওর বাইরের এবং ভেতরের বায়ুর অণুগুলি সমান বেগে ও সমান সংখ্যায় ভেতর-বার করতে থাকে; ফলে পাত্রের ভেতরকার বায়ুর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু মাটির পাত্রটার ওপর যখন হাইড্রোজেনপূর্ণ পাত্রটাকে উবুড় ক'রে ধরা যায় তখন বাতাসের বদলে এই হাইড্রোজেন গ্যাসটা মাটির পাত্রের অন্তর্গত বায়ুর অণুগুলিকে সব দিক থেকে ঘিরে ধরে। তখন ভেতর-বার হতে থাকে হালকা হাইড্রোজেন অণুর এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বায়ুর অণুগুলির মধ্যে। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি বায়ুর অণু পাত্রটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে হাইড্রোজেনের হালকা অণুগুলি ভেতরে ঢোকে তার চেয়ে বেশী সংখ্যায়। ফলে ভেতরকার বায়ুর চাপ বেড়ে যায় এবং এই বাড়তি চাপটা নলের অন্তর্গত জলটাকে নীচের দিকে ঠেলে দিয়ে ওর সরু ছিদ্রমুখে ফোয়ারার আকারে বের করে দেয়।

এ সম্পর্কে হিসাবটা এইরূপ। বাতাসের ঘনত্ব হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রায় সাড়ে চৌদ্দগুণ। এর বর্গমূল হলো প্রায় পৌনে চার। সুতরাং গ্রাহামের নিয়ম থেকে বলতে পারা যায় যে, যে বেগে বায়ুর অণুগুলি বেরিয়ে আসে, হাইড্রোজেনের অণুগুলি ভেতরে ঢোকে তার প্রায় পৌনে চারগুণ বেগে। ফলে মাটির পাত্রের ভেতর অণুর সংখ্যা আগের চেয়ে বেশী হয় এবং ওদের চাপের মাত্রাও বেড়ে যায়। হাইড্রোজেনের পাত্রটা সরিয়ে নিলে মাটির পাত্রের অন্তর্গত হাইড্রোজেন-অণুগুলি যে হারে বেরিয়ে আসতে থাকে—বাইরের থেকে বায়ুর অণুগুলি ওর ভেতরে ঢোকে তার চেয়ে কম হারে। ফলে ঐ পাত্রের অন্তর্গত গ্যাসের চাপ কমতে থাকে এবং ফোয়ারাটাও শীঘ্রই থেমে যায়।

এই সকল এবং এই ধরণের অন্যান্য পরীক্ষা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বায়ু এবং অন্যান্য গ্যাস ওদের আধার-পাত্রের গায়ে যে চাপ প্রদান করে তা ওদের বেগবান্ অণুগুলির ধাক্কা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই অনুমানকে ভিত্তি ক'রে বৈজ্ঞানিকগণ গ্যাসের চাপ সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এই সূত্র এই কথা ব্যক্ত করে যে, প্রত্যেক গ্যাসের চাপ ওর অণুগুলির বস্তুমান, ওদের গড়-বেগের বর্গ এবং ওদের সংখ্যার (প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত সংখ্যার) সমানুপাতিক হয়ে থাকে; অর্থাৎ এই রাশিত্রয়কে যথাক্রমে 'ব' 'গ' এবং 'ন' দ্বারা নির্দ্দেশ করলে এবং গ্যাসের চাপকে 'চা' বললে এই চাপ নিম্নোক্ত সূত্র-দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

$$চা \propto (ব \times গ^2)\ ন \text{———}(১)$$

এই সূত্রের অন্তর্গত (ব × ন) রাশিটা প্রতিঘনফুটের অন্তর্গত গ্যাসটার বস্তুমান বা ওর ঘনত্ব নির্দ্দেশ করে; সুতরাং গ্যাসের ঘনত্বকে 'ঘ' অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করলে ওপরের সূত্রটাকে নিম্নোক্ত রূপেও প্রকাশ করা যায় :

$$চা \propto ঘ \times গ^2 \text{———}(২)$$

এই সূত্র থেকে পূর্ব্বোক্ত গ্রাহামের নিয়ম আপনি এসে পড়ে; কারণ—এই সূত্রটা এই তথ্য প্রকাশ করে যে, যদি দু'টো বিভিন্ন গ্যাসের চাপের মাত্রা সমান হয় তবে যেটার ঘনত্ব বেশী হবে তার অণুগুলির গড়-বেগের বর্গ সেই অনুপাতে কম হবে। সুতরাং গ্রাহামের নিয়ম, এই সূত্রের ভেতর দিয়ে, পরোক্ষভাবে অণুর অস্তিত্ব এবং ওদের চঞ্চলতা সমর্থন করে।

চঞ্চলতাবাদের আর একটা অনুমান এই যে, গ্যাস-বিশেষের উষ্ণতা ওর অণুগুলির গড়-গতি-শক্তির সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এখন গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে ছোট বড় প্রত্যেক পদার্থের গতি-শক্তি পরিমিত হয়ে থাকে ওর বস্তু এবং ওর বেগের বর্গের পূরণফল দ্বারা; সুতরাং উক্ত প্রথম সূত্রের ব্রাকেটের অন্তর্গত ($ব \times গ^2$) রাশিটাকে গ্যাসের উষ্ণতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি আপনি এসে পড়ে :

(ক) যদি গ্যাসবিশেষের উষ্ণতার মাত্রা ($ব \times গ^2$) ঠিক রেখে ওর আয়তন কমানো যায় এবং এইরূপে প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত ওর অণুর সংখ্যা (ন) ঐ অনুপাতে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে গ্যাসটার চাপও ঐ অনুপাতে বেড়ে যাবে।

(খ) যদি কোন গ্যাসের চাপের মাত্রা ঠিক রেখে ওর উষ্ণতা ($ব \times গ^2$) বাড়ানো যায়, তবে প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত ওর অণুর সংখ্যা ঐ অনুপাতে কমে যাবে, সুতরাং গ্যাসটার আয়তন ঐ অনুপাতে বেড়ে যাবে।

প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটা বয়েলের নিয়ম এবং দ্বিতীয়টা চার্লসের নিয়ম প্রকাশ করে; এবং এই উভয় নিয়মই আবিষ্কৃত হয়েছিল পরীক্ষা ও পরিমাপ দ্বারা এবং কোনরূপ অনুমানের সাহায্য না নিয়ে। সুতরাং এই নিয়মদ্বয়ও—গ্যাসের চাপ সম্পর্কে উক্ত

সূত্রের ভেতর দিয়ে—অণুর অস্তিত্ব এবং উক্ত চঞ্চলতাবাদ সমর্থন করে। ১নং সূত্রের অন্তর্গত আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে :

(গ) যদি বিভিন্ন গ্যাসের চাপের মাত্রা এবং উষ্ণতার মাত্রা সবার পক্ষেই সমান হয়, তবে প্রতি ঘনফুটের অন্তর্গত ওদের অণুর সংখ্যাও (ন) সকল গ্যাসের পক্ষেই সমান হবে। এই সিদ্ধান্তটা অ্যাভোগেড্রোর নিয়ম প্রকাশ করে। এর থেকে বলতে পারা যায় যে, একটা বিশিষ্ট চাপ ও উষ্ণতার পক্ষে একটা গ্যাসের ঘনত্ব অপর একটার যতগুণ হবে ওর অণুগুলির বস্তুমানও অপরটার অণুগুলির বস্তুমানের ততগুণ হবে। বিভিন্ন গ্যাসের ঘনত্ব পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করা যায়, সুতরাং তার থেকে ওদের অণুগুলির বস্তুমানও তুলনা করা যায়।

অণুদের আয়তন ও বস্তুমান নিতান্তই ক্ষুদ্র। বেলে মাটির পাত্রের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যারা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে তারা যে খুব ক্ষুদ্র পদার্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। তবু ওরা কত ক্ষুদ্র সে বিষয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। অণুর ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে কয়েকটা পরীক্ষার ফল এইরূপ : (১) সোনাকে পিটিয়ে খুব সূক্ষ্ম পাতে পরিণত করা যায়। এই সকল সূক্ষ্ম পাতের স্থূলতা পরিমাপ করে বৈজ্ঞানিকগণ দেখতে পেয়েছেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে এই স্থূলতা এক ইঞ্চির আড়াই লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র হতে পারে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সোনার অণুর ব্যাস ওর চেয়েও অনেক কম হবে। (২) জলের ওপর এক ফোঁটা তেল নিক্ষেপ করলে তেলের ফোঁটাটা জলের পিঠের ওপর বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যতই বিস্তার লাভ করে তেলের পর্দ্দাটার স্থূলতাও ততই কমতে থাকে। পরিমাপে দেখা যায় যে, পর্দ্দাটার স্থূলতা স্থলবিশেষে এক ইঞ্চির আড়াই কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র হতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় যে, তেলের অণুর ব্যাস এর চেয়েও বহু গুণে ক্ষুদ্র। (৩) দু'মুখ খোলা একটা নলের একপ্রান্ত সাবান-গোলা জলে ভিজিয়ে নিয়ে অপর প্রান্তে আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে থাকলে একটা গোলাকার বুদ্বুদ উৎপন্ন হয় এবং ওর আয়তন ক্রমে বাড়তে থাকে। আয়তন-বৃদ্ধির ফলে বুদ্বুদের পর্দ্দাটার স্থূলতা ক্রমে কমতে থাকে। স্থূলতা যখন আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তুলনীয় হয় তখন বুদ্বুদের পিঠে বিচিত্র রঙের বিকাশ দেখা যায়। আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সহজেই পরিমাপ করা যায় এবং তার থেকে বুদ্বুদের পর্দ্দাটার স্থূলতাও নিরূপণ করতে পারা যায়। বুদ্বুদকে আরো ফুলাতে থাকলে ওর ওপর কালো কালো চিহ্ন দেখা যায় এবং তখনই বুদ্বুদটা ভেঙ্গে যায়—যেন ওর অণুগুলিকে অবিভাজ্যতার দাবি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দানের জন্যই অমন চট্ করে ভেঙ্গে যায়। পরিমাপে দেখা যায় যে, এই কালো চিহ্নগুলির স্থূলতা এক ইঞ্চির প্রায় আধা কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সাবানের অণুর ব্যাস ওর চেয়ে অনেক কম হতে হবে।

অণুর ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ নিম্নোক্তরূপ চিত্রসমূহ অঙ্কিত করেছেন : (১) যার চেয়ে ছোট কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না এইরূপ কোন পদার্থের আয়তনের সমান আয়তনবিশিষ্ট অক্সিজেন-গ্যাসের ভেতর অন্ততঃ ৬ কোটী অক্সিজেন-অণু বিদ্যমান। (২) অণুবীক্ষণের ক্ষমতা যদি কখনো এতটা বাড়ানো সম্ভব হয় যে, তার ফলে কোন পদার্থের দৈর্ঘ্য সাড়ে ছয় কোটী গুণ বড় দেখা যায়—তবে ওর ভেতর দিয়ে অণুবিশেষকে দেখলে অণুটা দৃষ্টিগোচর হলেও হ'তে পারে। (৩) তোমার দৃষ্টিক্ষমতা যদি এতটা বেড়ে যায় যে, ফুটবলের আকারবিশিষ্ট একটা জলের গোলক তোমার কাছে পৃথিবীর মত অতটা বড় ব'লে প্রতিপন্ন হয় তবে ঐ জলের গোলকের অণুগুলি তোমার দৃষ্টিগোচর হবে এবং তোমার মনে হবে যে, ওরা কামানের গোলার চেয়ে কিছু ছোট ছোট এবং বন্দুকের গুলীর চেয়ে কিছু বড় বড়।

অণুর অস্তিত্ব ও চঞ্চলতার আর একটা বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—রেডিওমিটার-নামক যন্ত্রের ব্যবহার থেকে [২নং চিত্র]। একটা ফাঁপা কাচের গোলকের ভেতর চারখানা হাতাওয়ালা ছোট একটা চাকা, সহজে ঘুরতে পারে এইরূপ ভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতাগুলি এ্যালুমিনিয়ম বা অন্য কোন হাল্কা পদার্থের তৈরি এবং ওদের একপিঠ সাদা ও অপর পিঠ কালো। বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্রের সাহায্যে গোলকের ভেতরকার বেশীর ভাগ বায়ু বের করে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট বায়ুর অণুগুলি—আমরা কল্পনা কর্‌ছি—স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে এবং ফলে, আধার-পাত্রের গায়ে এবং চাকাটার হাতাগুলির ওপর ক্রমাগত ঘা দিচ্ছে। চঞ্চলতাবাদ অনুসারে গ্যাসটার চাপ এই সকল চঞ্চল অণুর ধাক্কার ফল।
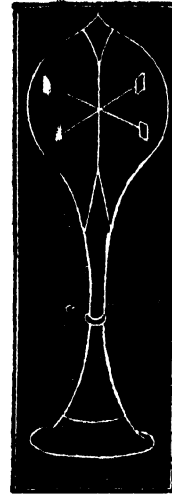
২নং চিত্র

প্রশ্ন এই, এই চাপের ফলে রেডিয়োমিটারের চাকাটা ঘুরবে কি? পরীক্ষার ফল এই যে, যতক্ষণ নূতন কিছু না ঘটে ততক্ষণ চাকা ঘোরে না, কিন্তু যন্ত্রটাকে রোদে রেখে দিলে কিম্বা ওর কাছে একটা গরম জিনিষ নিয়ে আসলে চাকাটা ঘুরতে থাকে এবং ঘোরে হাতা-চতুষ্টয়ের সাদা পিঠগুলি গতির অভিমুখে মুখ ক'রে।

চঞ্চলতাবাদ এই ব্যাপারের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। গোলকের অন্তর্গত বায়ুর চঞ্চল অণুগুলি প্রত্যেক হাতার দু' পিঠের ওপরেই ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় এই অণুগুলি একই গড়বেগ নিয়ে প্রত্যেক হাতার ওপর দু'দিক থেকে ধাক্কা দিতে থাকে, সুতরাং ওর ওপর দু'দিক্‌কার চাপের মাত্রায় কোন ইতর-বিশেষ ঘটে না। কিন্তু যন্ত্রের ভেতর যখন তাপ-রশ্মির সম্পাত ঘটে, তখন প্রত্যেক হাতার কালো পিঠ সাদা পিঠের চেয়ে বেশী গরম হয়, কারণ—কালো জিনিসের তাপ-শোষণ-ক্ষমতা সাদা জিনিসের তুলনায় অনেক বেশী। সহজ হিসাবের

জন্য আমরা ধ'রে নেবো যে, সাদা পিঠ আদৌ গরম হয় না। ফলে যে অণুগুলি সাদা পিঠের ওপর ধাক্কা দেয় তারা আগেকার মতই ধাক্কা দিতে থাকে। কিন্তু গরম কালো পিঠের ওপর এখন যে বায়ুর অণুগুলি ধাক্কা দেয় তারা ঐ পিঠের সংস্পর্শে এসে এবং ওর থেকে তাপশক্তি আহরণ ক'রে অধিকতর চঞ্চল বা বেগবান্ হ'য়ে ওঠে, সুতরাং কালো পিঠের ওপর ধাক্কাও দেয় ওরা আগেকার তুলনায় বেশী মাত্রায়। ফলে দু'দিককার চাপের মাত্রার মধ্যে এখন ইতর-বিশেষ ঘটে ;—কালো পিঠের ওপর চাপটা পড়ে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায়। এরি জন্য চাকার হাতাগুলি ঘুরতে থাকে এবং ঘোরে ওদের সাদা পিঠগুলি ফল-চাপটার (Resultant Pressure-এর) অভিমুখে মুখ করে। এই পরীক্ষা থেকে আমরা বাস্তব পদার্থরূপে অণুর অস্তিত্ব এবং ওদের চঞ্চলতার একটা স্পষ্ট আভাস পাই।

আরো স্পষ্ট আভাস পাই আমরা ব্রাউনীয় গতি নামক একটা বিশিষ্ট ধরনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করে। অণুগুলি যে নিছক কাল্পনিক পদার্থ নয়, পরন্তু পরোক্ষভাবে অনায়াসেই যে ওদের দর্শন লাভ করা যায়, আধুনিক বিজ্ঞান তা' প্রতিপন্ন করেছে উক্ত বিচিত্র গতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে। এই গতি প্রথম প্রত্যক্ষ করেন শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দে) ইংরেজ বোটানিষ্ট ব্রাউন। কিন্তু এই গতি যে অণুর চঞ্চলতার নিদর্শন তা' নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

উন্নত ধরনের একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র হস্তগত হওয়ায় ব্রাউন ওর সাহায্যে পুষ্প-পরাগের আকার-প্রকার প্রত্যক্ষ করছিলেন। ফুলের রেণুগুলির ব্যাস এক ইঞ্চির চার হাজার বা পাঁচ হাজার ভাগের একভাগ হবে। রেণুগুলি জলের ভেতর ছড়িয়ে দিয়ে এবং অণুবীক্ষণের ষ্টেজে ওর এক ফোঁটা জল রেখে ওর ওপর অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ফোকস্ করলে রেণুগুলি দৃষ্টিগোচর হলো; সঙ্গে সঙ্গে ওদের সম্পর্কে ব্রাউন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারও লক্ষ্য করলেন। দেখা গেল বহুসংখ্যক ফুলের রেণু একান্ত অস্থির-ভাবে ইতস্তত: ছুটাছুটি কর্চ্ছে—চট্ ক'রে এদিকে এগিয়ে আসছে আবার ঝট্ ক'রে দূরে স'রে যাচ্ছে এবং এইরূপে ক্রমাগত এদিক-ওদিক ক'রছে। এ সম্পর্কে ব্রাউনের বর্ণনা এইরূপ :

"While examining the form of these particles immersed in water I observsd many of them evidently in motion···These motions were such as to satisfy me that they arose, neither from current in the fluid nor from its gradual evaporation but belonged to the particle itself."

অণুবীক্ষণের ভেতর দিয়ে রেণুবিশেষের গতিবিধি লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হবে যে, তরল দ্রব্যের এবং গ্যাসের অণুদের গতিবিধি সম্পর্কে চঞ্চলতাবাদ যেরূপ বর্ণনা দান করে, এ-দৃশ্য যেন তারই হুবহু অনুকরণ। কিন্তু ব্রাউনের পরীক্ষার ফল তখনকার বৈজ্ঞানিক-সমাজ তুচ্ছ ঘটনা ব'লে উড়িয়ে দিলেন। কেউ কেউ বললেন অণুবীক্ষণের ষ্টেজের কাঁপুনির জন্য ঐরূপ দেখা যায়। রাস্তায় লোক-চলাচল এবং গাড়ী-ঘোড়ার উৎপাতে কম্পনের সৃষ্টি হবে বিচিত্র কি? কিন্তু বাইরের সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্চাট থেকে অণুবীক্ষণকে মুক্ত করে এবং গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতার ভেতর পরীক্ষা ক'রেও একই ফল পাওয়া গেল। জলের ফোঁটার ভেতর উষ্ণতার কিম্বা চাপের পার্থক্যের জন্যও যে উক্তরূপ গতির সৃষ্টি হয় না, তা'ও সহজেই প্রতিপন্ন হলো। দেখা গেল যে, জলবিন্দুটার সর্ব্বত্র উষ্ণতা এবং চাপের সমতা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করলেও ব্রাউনীয় গতির কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ ঘটে না। আরো দেখা গেল যে, ফুলের পরাগের সঙ্গে ব্রাউনীয় গতির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। জলের ভেতর অবস্থিত সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র কণাই উক্ত গতি সম্পন্ন ক'রে থাকে। কণাটা ক্ষুদ্র হলেই হলো। সব-চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হলো ওদের অস্থির গতির বিরামহীনতা। যদি আকস্মিক একটা ধাক্কার জন্য কণাগুলি বেগপ্রাপ্ত হতো, তবে জলের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে ঐ বেগ শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যেতো। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন পরীক্ষা করেও ওদের গতির বিন্দু মাত্র নিবৃত্তি দেখা যায় না। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ব্রাউনীয় গতি যদি কোন রকমের ধাক্কার ফল হয়, তবে ধাক্কাগুলি আসছে জলের ভেতর থেকে, এবং আসছে তা' সবদিক থেকে ও ক্রমাগত। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, জলের চঞ্চল অণুগুলির সবদিক থেকে বিরামহীন আঘাতের ফলেই জলের ভেতর অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র কণার ব্রাউনীয়-গতি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন্ উক্ত অনুমান মেনে নিয়ে ব্রাউনীয় গতির একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যাদান করলেন, এবং পেরিনের পরীক্ষা ও পরিমাপ থেকে আইনষ্টাইনের গবেষণার ফল বিশেষ সমর্থন লাভ করলো। ব্রাউনীয় গতির প্রধান বিশেষত্বের কথা আমরা বলেছি—গতিটা বিরামহীন এবং এই গতি ব্রাউনীয় কণাটার প্রকৃতি বা উপাদানের ওপর আদৌ নির্ভর করে না—একমাত্র নির্ভর করে ওর ক্ষুদ্রতার ওপর। কণাটা যত ক্ষুদ্র হয় ওর অস্থিরতার মাত্রাও ততই বেড়ে যায়। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, যদি আশে-পাশের জলের অণুগুলির বিরামহীন আঘাত ব্রাউনীয় গতির কারণ হয় তবে কণাটার গতিও বিরামহীনই হবে এবং এই গতির প্রকৃতি (বা কণাটার অস্থিরতার ধরন) ওর উপাদানের ওপর আদৌ নির্ভর করবে না। কিন্তু এই অস্থিরতার সঙ্গে কণাটার ক্ষুদ্রতার কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেই হলো সমস্যা। এর উত্তর পাই আমরা উক্তরূপ বহুসংখ্যক আকস্মিক আঘাত সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপ বিচার-প্রণালী থেকে।

তুমি আমি যখন জলে ডুব দিই তখন ব্রাউনীয় কণার মতই আমাদিগকে সব দিক থেকে জলের অণুগুলির ধাক্কা খেতে হয়, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, তার জন্য আমাদের কাকেও ঐরূপ অস্থির ভাবে ছুটে বেড়াতে হয় না। ছোট ও বড়দের ব্যবহারের মধ্যে এ পার্থক্য কেন? এর উত্তর এইরূপ : নিমজ্জিত অবস্থায় তোমার বুকে ও পিঠে—বুক ও পিঠের প্রতি লোমকূপে—জলের অণুগুলি দু' দিক থেকেই ক্রমাগত ধাক্কা দেবে কিন্তু এই বিপরীতমুখী ধাক্কাগুলি তোমার সমগ্র বুকের ওপর এবং সমগ্র পিঠের ওপর সমান সমান হবে, সুতরাং পরস্পরে কাটাকাটি হয়ে তোমার ওপর

ফল-ধাক্কাটা (Resultant Impact) হবে শূন্য পরিমিত। বুক ও পিঠের ক্ষেত্রফল সমান এবং জলের অণুগুলির অবঃ তুলনায় খুব বড় বলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রকৃত একটা বিশিষ্ট মুহূর্তে, বুকের বা পিঠের সবগুলি লোমকূপের ধাক্কার মাত্রা সমান হয় না, কিম্বা ঠিক সামনা-সামনি অব বুক ও পিঠের দু'টা লোমকূপের ওপরও দু'দিক থেকে ধা মাত্রা সমান হয় না; কারণ লোমকূপের মত ক্ষুদ্র স্থানের যে-সকল জলের অণু দু'দিক থেকে ধাক্কা দেয় তাদের সংখ্যা বেগের মাত্রা ঠিক সমান সমান হবে এ আমরা প্রত্যাশা ক পারিনে। পারিনে এইজন্য যে ধাক্কাগুলি আসছে আকস্মিক ঘটনার মত—কোন্ অণু কখন্ কত বেগ নিয়ে লোমকূপ-বিশেষের ওপর ধাক্কা দেবে তা' কেউ বলতে পারে না। তবু বুক ও পি ক্ষেত্রফল খুব বড় বলে এবং সমান সমান ব'লে এই সকল ছে বড় ধাক্কার গড়-ফল দু' পিঠের ওপরে সমান হবে এবং ফ পরস্পরে কাটাকাটি হয়ে লোপ পাবে এ আমরা আশা করি পারি; কারণ—এখানে গড় কদ্‌তে হবে বহুসংখ্যক ছোট ধাক্কা নিয়ে যাদের বিন্যাসের ধরন বুক ও পিঠের মধ্যে কে পার্থক্য টেনে আনে না। কিন্তু তোমার বুক ও পিঠ যদি ক্র ছোট হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'টা লোমকূপের আকার ধা করে, তবে দু'দিক্‌কার গড়-ধাক্কার সমতা নষ্ট হয়ে যায়; কা এখন বুক ও পিঠের ওপর ধাক্কার সংখ্যা কমে গিয়ে দু'চারটায় ম পরিণত হয়, যারা সংখ্যায় কিম্বা মাত্রায় দু'দিক থেকে সমান হ এ আমরা প্রত্যাশা করতে পারিনে; পরন্তু এমনও হতে পারে। একটা বিশিষ্ট মুহূর্তে এখন শুধু বুকের ওপেরই ধাক্কা পড়ছে, পিঠের ওপর আদৌ পড়ছে না। এখন আমরা শুধু এইটাই প্রত্যাশ করতে পারি যে, তুমি একটা ফল-ধাক্কার (Resultant Impact-এর) অধীন হবে এবং এই ফল-বলটা কখনো এ দিকে কখনো ওদিকে প্রযুক্ত হয়ে সর্বক্ষণের জন্য তোমাকে অস্থির ক রাখবে।

এই জন্য ব্রাউনীয় গতির পরিচয় পাওয়া যায় শুধু পুষ্প-পরাগে মত খুদে কণাদের বেলাতেই। তবু এই পরাগগুলি জলের অণু তুলনায় কত সহস্রগুণে বড়!—এত বড় যে, অণুবীক্ষণের সাহায্যে ওদের স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু অণুর তুলনায় বড় হলেও গড় করা ব্যাপারের দিক থেকে ওরা এত ছোট যে, পরাগবিশেষে ওপর ধাক্কাধাক্কিগুলি ঠিক সেইভাবেই প্রযুক্ত হতে থাকে যেমন হচ্ছে জলেরই প্রতিটি অণুর ওপর। সুতরাং পরাগবিশেষে ওপর অণুবীক্ষণ ফোকস্ ক'রে এবং ওর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ক' একটি জাঁদরেল গোছের জলের অণুর চালচলন প্রত্যক্ষ করা ব'লে যে মনকে কোন মতে প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আণুবীক্ষণিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পেরিন বিভিন্ন উপাদানের ব্রাউনীয়-কণার গতিপথের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। প্রতি আধা-মিনিট অন্তর কণা-বিশেষের অবস্থানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তা' এই সকল চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে এইরূপ একটা চি নমুনা দেওয়া গেল। ৩নং চিত্রের অন্তর্গত কালির ফোঁটা কণাবিশেষের পর পর অবস্থান নির্দেশ করছে এবং ওদের সংযে রেখাগুলি প্রত্যক্ষভাবে ব্রাউনীয়-কণার গতিপথ এবং পরোক্ষভ একটা জলের অণুর গতিপথ দেখিয়ে দিচ্ছে। এই সকল পরী থেকে পদার্থবিশেষের ১ গ্রাম পরিমিত বস্তুর ভেতর ওর সংখ্যা এবং তার থেকে ওর প্রত্যেকটা অণুর বস্তুমান নির করতে পারা যায়। হিসাবে পাওয়া যায় যে, ৩এর পিঠে ২ শূন্য বসালে যে সংখ্যাটা পাওয়া যায়—একটা হাইড্রোজেন-অ বস্তুমান এক গ্রামের প্রায় তত ভাগের এক ভাগ মাত্র। হ ড্রোজেন-অণুর বস্তুমান বৈজ্ঞানিকগণ বিশিষ্ট ধরনের আরো ক গুলি পরীক্ষা ও পরিমাপের সাহায্যেও নিরূপণ করেছেন। এ সকল পরিমাপের ফল অল্পবিস্তর ভিন্ন ভিন্ন হলেও উক্ত মূল্যের চে
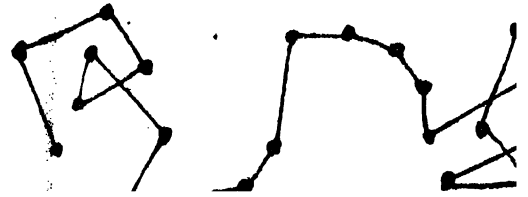
অণুর বস্তুমানের নির্ভরযোগ্য মূল্য নির্দেশ করে। অন্যান্য গ্যাসের অণুর বস্তুমান নির্ণয়ের জন্য একমাত্র প্রয়োজন পরীক্ষা দ্বারা ওদের ঘনত্ব নিরূপণ। গ্যাসবিশেষের ঘনত্ব হাইড্রোজেনের ঘনত্বের যতগুণ, ওর অণুর বস্তুমানও হাইড্রোজেন-অণুর বস্তুর ততগুণ।

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর পদার্থ পরমাণু। অণু যেমন ভৌতিক কারবারের পক্ষে, পরমাণুও সেইরূপ রাসায়নিক কারবারের পক্ষে পদার্থের ক্ষুদ্রতার সীমা নির্দেশ করে। কিন্তু সর্বপ্রকার কারবারের পক্ষে কেউ ওরা ক্ষুদ্রতম পদার্থরূপে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি প্রত্যেক পদার্থের অণু ও পরমাণুগুলি বিভাজ্য পদার্থরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ফলে পদার্থের ক্ষুদ্রতার সীমা আরো এক ধাপ নেমে গিয়েছে। এই সীমায় পৌঁছিলে আমরা দুই শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম কণার সাক্ষাৎ পাই, যারা ইলেকট্রন্ ও প্রোটন নামে পরিচিত হয়ে বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর সাধন করেছে। এই কণাদ্বয় তড়িৎ-বিশিষ্ট পদার্থ। ওদের তড়িতের মাত্রা সমান কিন্তু প্রোটন ধন-তড়িৎবিশিষ্ট পদার্থ আর ইলেকট্রনের তড়িৎ ঋণ-তড়িৎ। তড়িতের মাত্রা সমান হলেও ইলেকট্রনের বস্তুমান প্রোটনের বস্তুর প্রায় দু' হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, ইলেকট্রন জড়জগতের ক্ষুদ্রতম পদার্থ এবং জড়দ্রব্য মাত্রেরই একটা সাধারণ উপাদান। প্রত্যেক পরমাণু গঠিত হয়েছে এক বা একাধিক

*সহজ হিসাবের জন্য এখানে অনুমান করা যাচ্ছে যে, তোমার (নিমজ্জিত ব্যক্তির) বুক ও পিঠের অন্তর্গত দূরত্বের ব্যবধান শূন্য-পরিমিত বা নগণ্য।

প্রোটন এবং এক বা একাধিক ইলেকট্রন নিয়ে। অবস্থা-বিশেষে পরমাণু ভেঙ্গে যায় এবং ওর ভেতর থেকে কোন কোন ইলেকট্রন্ বা প্রোটন ছুটে বেরিয়ে আসে। রেডিয়ম ও ইউরেনিয়ম ধাতুর পরমাণুগুলি আপনা থেকে ভেঙ্গে যায় ও এই সকল কণা বিকিরণ করে। এই ব্যাপারকে বলা যায়—স্বতঃচূর্ণন। স্বতঃচূর্ণনের ফলে রেডিয়ম-পরমাণুর ভেতর থেকে দু' শ্রেণীর খুদে কণা বিকীর্ণ হয়। এদেরকে বলা যায় আল্‌ফা ও বিটা কণা বা ক-কণা ও খ-কণা। খ-কণা ও ইলেকট্রন একই পদার্থ।

বিজ্ঞানের প্রগতি রেডিয়ম-নিঃসৃত ইলেকট্রনগুলির (খ-কণার) গতিপথ পর্য্যবেক্ষণও সম্ভবপর করেছে। এ জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এইরূপ: বায়ুপূর্ণ একটা কাচের পাত্রের ভেতর অল্পমাত্রার খানিকটা জলীয় বাষ্প রয়েছে। অল্প মাত্রার বাষ্প বলে ওর ঘনীভবন (জলকণায় পরিণতি) ঘটছে না; কিন্তু বায়ুটাকে যথেষ্ট পরিমাণে ঠাণ্ডা করলে ঐ বাষ্প ঘনীভূত হয়ে কুয়াশার আকার ধারণ করবে। কিন্তু তার জন্য আর একটা বিশিষ্ট প্রয়োজন হচ্ছে বায়ুর ভেতর ধূলিকণার মত কোন ক্ষুদ্র কণার অস্তিত্ব কিম্বা—উইল্‌সনের পরীক্ষা থেকে প্রতিপন্ন হয়েছে—তড়িৎবিশিষ্ট কোন ক্ষুদ্র পদার্থের অস্তিত্ব। কারণ বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধরনের ক্ষুদ্র কণাসমূহকে ভিত্তিরূপে আশ্রয় করেই বাষ্পের ঘনীভবন সম্ভব হয়ে থাকে। তড়িৎ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কণাকে বলা যায় আয়ন (ion)। এখন কাচের পাত্রের অন্তর্গত বায়ুর ভেতর রেডিয়ম-নিঃসৃত একটা খ-কণার বর্ষণ ঘটালে বায়ুর অণু ভেঙ্গে যায়। খ-কণার আঘাতে বায়ুর অণুর অন্তর্গত কোন কোন ইলেকট্রন ছুটে বেরিয়ে আসে; ফলে বায়ুর অণুটা ধন-তড়িৎবিশিষ্ট আয়নে পরিণত হয় এবং জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের জন্য ভিত্তিভূমি হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। ধাবমান খ-কণাটা বায়ুর অণুকে ধাক্কা দিয়ে এবং ওর থেকে প্রতিহত হয়ে ভিন্ন দিকে ছুট্ দেয় এবং তখনি অপর একটা অণুর ঘাড়ে পড়ে; আবার সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে নূতন পথে যাত্রা করে। ফলে খ-কণাটা অগ্রসর হয় একটা আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে এবং ওর গতিপথকে চিহ্নিত করবার জন্য সেজে দাঁড়ায় কতকগুলি বায়ুর অণু—যারা খ-কণাটার আঘাতের ফলে ইলেকট্রন্ হারিয়ে আয়নের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এই আয়নীভূত বায়ুর কণাগুলিকে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ (?) ক'রে বৈজ্ঞানিকগণ উক্তরূপে ধাবমান খ-কণাটার অর্থাৎ ইলেকট্রন্ বিশেষের গতিপথ নিরীক্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

এজন্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত এই যে, খ-কণা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের অন্তর্গত বায়ুকে হঠাৎ অতিমাত্রায় ঠাণ্ডা করতে হয় এবং তখনই পাত্রটার ভেতর মুহূর্ত্তের জন্য আলোকরশ্মি ফেলে পাত্রের ভেতরকার ফটোগ্রাফ নিতে হয়। খ-কণাটা যে পথ দিয়ে চ'লে যায় ঐ পথের বায়ুর অণুগুলি আয়নে পরিণত হবার ফলে ওদের ওপর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হতে থাকে এবং ফলে আঁকাবাঁকা চেহারাবিশিষ্ট একটা কুয়াশার সৃষ্টি হয়—যা' খ-কণাটার গতিপথ নির্দ্দেশ করে এবং যা আপতিত আলোকরশ্মির সাহায্যে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়; আর তখন তখনি ফটো নিলে রেডিয়ম-নিঃসৃত ঐ ধাবমান ইলেকট্রনের গতিপথ এবং বায়ুর অণুগুলির সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকির ইতিহাস ফটো-প্লেটের ওপর স্থায়ী ভাবে অঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারকে, অবশ্য অণুদর্শন না বলে, বলা যেতে পারে ইলেকট্রন্ দর্শন।

ফেরিওয়ালা

শ্রীবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথায় বা পিঠে জিনিসের মোট নিয়ে সারাদিন ফেরি ক'রে বেড়ায় যে ফেরিওয়ালা, তার রসবোধ না থাকারই কথা, কিন্তু রসবোধ তাদের সত্যিই আছে। গান, ছড়া বা কথার জোড়ন না থাকলে, সে জিনিষ বিক্রির সুবিধা হয় না, এটা ফেরিওয়ালার দল ভালই বোঝে। এই মাগ্‌গির বাজারে ফেরিওয়ালার পাল্লায় না পড়াই মঙ্গল, কিন্তু "ফেরি-বিজ্ঞান" আলোচনায় ক্ষতি নাই—জানা থাকলে, কি জানি কবে কাজেও লাগতে পারে!

ফেরির ডাক

মনে করুন, আমার চাই সস্তা দেশী আম, আপনার চাই জামাই ভুলান বোম্বাই বা ল্যাংড়া আম। ফেরিওয়ালার ঝাঁকায় আছে জংলী আম। শুধু ডাকের বাহারে দু'জনকেই কেনাতে হ'লে ডাকের কায়দাটা হবে এই রকম:

রাস্তার মোড়ে—চা-আঈ বেগমফুলি আঁ-ও।
আরও এগিয়ে—চা-আঈ সিপিয়া ল্যাংড়া আঁ-ও।
গলির শেষে—চা-আঈ; [।]ম-বাই আঁ-ও।

আম দেখে যদি আপনি নাক সিঁটকে বলেন,—"এ্যাঃ, এ আবার বোম্বাই নাকি!" জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবেন,—"জী হাঁ, ইয়ে নাগপুরকা আসলি বোম্বাই, বহুৎ মিঠা। রূপেয়া মে চারঠো।" আপনি ভাবলেন হবেও বা, কে আর কলকাতায় বসে "নাগপুরকা আসলি বোম্বাই" দেখেছে। আর আমি বেচারী সস্তার আম খুঁজছি, মজ্জি হ'লে, সেই আমই মিষ্টি দেশী আম ব'লে আমাকে টাকায় ষোলটা বেচতে পারবে। লোকসান নেই।

ফেরির ভাষা

(ক) কাঠ-কয়লা কিনবেন, কয়লাওয়ালীর ডাকের আশায় ব'সে আছেন। যদি "কাঠ-কয়লা" চীৎকার শোনবার আশায় থাকেন, ঠকবেন। কয়লাওয়ালী ডাকবে "চাঈ হা—লূক কোইলা আ"

(খ) বেশ কালো কুচকুচে চেহারা, ব্যাগ ঘাড়ে চলেছে, মাঝে মাঝে হাঁকছে, জু-উ-স্। জুতা সারাতে হ'লে সারিয়ে নেন, মুচি যাচ্ছে। মাথার ব্রাস বিক্রি করছে না।

(গ) ঠং, ঠং, ঠং। ভারিক্কী গোছের যে লোকটা ছোট একখানি কাঁসি বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে, তাকে ডাকলে—থালা, গেলাস, বাটী সবই কিনতে পাবেন। জিনিষ হয় ওর পিঠের থলিতে আছে, নয় পেছনে মুটের মাথায় আছে।

(ঘ) "চাই মক্‌খন"। অর্থাৎ মাখন বা ননী বিক্রি। ত্ন' পয়সা বা চার পয়সায় এক এক ভাগ। সকাল বেলা খেয়ে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে পারেন।

(ঙ) "হিংলাড়ো—হিংলাড়ো—হীং-লাড়ে" অর্থাৎ কাবুলি-ওয়ালা হিং ফেরি করছে। খুঁজলে ওর কাছে জাফরাণও পাবেন। দাম বেশ গলাকাটা।

খাদ্য বা অখাদ্য ফেরি

(ক) "চাই চানাচুর ঘুগ্‌নি দানা
বাবুদের জন্যে আনা
কিনে নেন তু'চার আনা
ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না।
চাই চানা চুর্‌র্‌র্‌।
বাদলা দিনে বড়ই মজা
গরম গরম কুড়মুড় ভাজা
টাট্‌কা তাজা
গরম ভাজা।
কুড়মুড়, কুড়মুড়, কুড়মুড়।"

(খ) কিম্বা "বেহারী" ষ্টাইলে চীৎকার:
"ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ী
যো খাওয়ে মজা পাওয়ে
যো চাখ্‌খে ইয়াদ রাখ্‌খে
গুলাব ছড়ী।"

(গ) মাঝে মাঝে দেখা যায়, বুড়ো প্যাটার্ণের লোক কাঁধে এক বাঁক নিয়ে যাচ্ছে, তার ত্ন'ধারে তুই গোপকাটা কাঠের ট্রে। মুখে বুলি :—
মল্‌কি মল্‌কি আমকে খাটাই
কাঁচা মিঠাকো বানাই, ইত্যাদি ইত্যাদি

ট্রে'তে আছে নানা রকম পোয়াতী-পাগল আচার। যদি গিন্নির অরুচি হয়ে থাকে তা' হ'লে আনা তুই চার কিনে দেখতে পারেন।

(ঘ) এক এক সময় বেশ জোয়ান চেহারার লোক বড় গোছের এক বাক্স টানতে টানতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে দেখবেন। বাক্সতে তুই চাকা লাগান, আর এক হ্যাণ্ডেল ঝুলছে। ছেলে মেয়ের দল দেখলেই চীৎকার সুরু করবে!
"বুড়ী পাকা চুল
বুড়ীমা পা চুল
বুড়ীমা পা চুল
বুড়ী পাকা চুল।"

কী ব্যাপার, পাগল নাকি! আজ্ঞে না, পাগল নয়, চিনির তৈরী চুলের মত পদার্থ ফেরি ক'রে বাচ্ছাদের পাগল করছে।

প্রসাধন ফেরি

সা—বান তরল আলতা চাই
কাঁচ কাঠি চাই, কাঁচের পুঁতি চাই
মাথার কাঁটা, ক্লিলিপ চাই
হেজলীন পমেটম চাই
বোম্বাই মুক্তা মালা চাই
সা—বান তরল আলতা চাই।

এই ডাক শোনা যাবে রবিবার ছাড়া আর সবদিন তু'পুর বেলা, যখন কর্ত্তারা বাড়ী না থাকেন। ডাক শুনলেই হয় ছোট খুকী নয় বাড়ীর ঝি চীৎকার করবে—"এই ফেরি অলা এ বাড়ী এস।" তখন ছ' আনার জিনিষ বার আনায় বিক্রির বেশ সুবিধা। গিন্নিরাও খুশী, ফেরিওয়ালাও খুশী।

আশীর্ব্বাদ ফেরি

কাঠের বাক্সর মধ্যে এক চাপড়া মাটী, তার ওপর সিঁদুরের প্রলেপ আর রাংতার পাতের চোখ, নাক, মুখ। চালাকী নয়, এটি "মা শেতলা"। যিনি নিয়ে এলেন তিনি বাড়ী ঢুকেই গান সুরু করবেন—

"শেতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই
ছেলে পুলে আণ্ডা বাচ্চা ধরে ধরে খাই,
শেতলা বলেন আমি চাল পয়সা চাই
না দিলে ছেলের মা তার রক্ষা নাই।
বাঁচতে যদি চা'ও
শেতলার আশীর্ব্বাদ নাও।

এক পয়সা দিলেই, আশীর্ব্বাদের সিঁদুরটিপ পাওয়া যাবে, কাজ কি গণ্ডগোলে?

নাম ফেরি বা প্রভাত ফেরি

ভোর বেলায় শুনবেন খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে একজন নামাবলী ঢাকা লোক আপনার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে দি... মিনিট বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে গেলেন:—

"শ্রীবৃন্দাবন মে কুসুম-কানন মে ভ্রমরা ভ্রমরী গাওয়ে জী,
ভোর ভইল যশোমতী তুলাল উঠ নন্দলালজী।"

মাস ভোর এমনি চলবে, মাসের শেষে লোকটী এসে দাবী জানাবেন যে তিনি আপনাকে এক মাস শ্রীভগবানের নামের জোগান দিয়েছেন এবং সেই বাবত তাঁর আনা চারেক পয়সা আর একটী সিধা পাওনা হয়েছে। দিতে হবে।

ট্রেণে ফেরি

প্ল্যাটফরমে "পান, বিড়ি, সিগারেট," "পুরি কচৌরী", "চা গরম" প্রভৃতি যে সব ফেরি হয় তার কথা বলছি না, ট্রেণে কামরার মধ্যে তাড়া করে যারা জিনিষ ফেরি করে বেড়ায় তাদের কথা বলছি। লোক্যাল ট্রেণে এই সব ফেরিওলারা সাধারণতঃ বিক্রি করে তিন রকম জিনিষ, আশ্চর্য্য মলম, দাঁতের মাজন আর কাঞ্চন নগরের ছুরি।

এ সব লোকেরা চলতি ট্রেণে ফুটবোর্ডের ওপর দিয়ে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় বেশ যেতে আসতে পারে।

আপনি চুপচাপ আপনার কামরায় বসে আছেন হঠাৎ ব্যাগহাতে এক মূর্ত্তি উদয়। এসে ঢোক গিলে, ব্যাগ খুলে একটী কৌটা বের করেই বক্তৃতা শুরু:

"মুক্তাভস্ম দাঁতের মাজন। নেপালের রাজবৈদ্য খণ্ডদাবানলের বিধানমতে তৈরী। ব্যবহার করলে, দাঁতের পোকা, দাঁতে ব্যথা, মাড়ী ফোলা সব একদিনে সারবে। নড়া দাঁত শক্ত হয়। দাঁত মুক্তার মত ঝক ঝক করবে। দাম ছোট কৌটা দু' আনা, বড় কৌটা দশ পয়সা।"

ব্যাস্! আপনার নাকের ওপর এক কৌটা হাজির। আপনি না নেন, আপনার পাশের লোক, তার পরের লোক—সবাইকে এক একবার করে দেখাবে। কেউ না নেন, ঐ কৌটা ব্যাগে ঢুকবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বের হবে আশ্চর্য্য মলমের শিশি। আবার বক্তৃতা শুরু:—

"আশ্চর্য্য মলম। মাথা ধরা সারে, বাতের ব্যথা সারে, খাপ চড়া-খোস সারে, চুল ওঠা বন্ধ হয়। নাকে লাগালে সর্দ্দি ভাল হয়, চোখে লাগালে দৃষ্টি ভাল হয়, কানে লাগালে কালাও শুনতে পায়। দাম চার আনা।"

যদি সাবধান না থাকেন, একটু আশ্চর্য্য মলম আপনার নাকে বা কপালে হাতের কায়দায় লাগিয়ে দেবে। এতেও যদি না কেনেন, দুঃখ নেই, তক্ষুনি কাঞ্চন নগরের ছুরি খুলে তার গুণ-ব্যাখ্যা শুরু করবে। শেষ কালে ছুরি দিয়ে একটী পয়সার এক অংশ কেটে দেখিয়ে দেবে ছুরিতে ধার কত। কিছুতেই আপনাদের বাগাতে না পারলে মুখ ব্যাজার করে অন্য কামরায় প্রস্থান।

কত গান, কবিতা, কাহিনী, ফেরিওয়ালা আপনাদের নিত্য শোনাচ্ছে। সংগ্রহ করে রাখলে পল্লীগাথা বা মৈমনসিংহ গীতিকার মত বই হয়। উৎসাহ থাকলে চেষ্টা করতে পারেন।

ভারতে রাষ্ট্রসংঘাত ও তাহার পরিণাম

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

তৃতীয় পর্য্যায়

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (বঙ্গশ্রী কার্ত্তিক, ১৩৫০) যে, ভারতে রাষ্ট্রসংঘাত তিন প্রকারে হইয়াছে। তাহার প্রথম প্রকার, প্রবল বৈদেশিক নরপতির বা জাতির ভারত আক্রমণ—উপরোক্ত ১৩৫০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার রাষ্ট্রসংঘাত হইতেছে, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাজশক্তির পরস্পর-সংঘাত-জনিত। দ্বিতীয় প্রকারের প্রথমাংশ, হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণের সময়ের রাষ্ট্রসংঘাত ও তাহার পরিণাম আমরা পূর্ব্বে (বঙ্গশ্রী, পৌষ, ১৩৫১) প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দ্বিতীয় প্রকার রাষ্ট্রসংঘাতের দ্বিতীয়াংশ—ভারতে তুর্কি আফগান রাজত্ব কালের রাষ্ট্রসংঘাত ও তাহার পরিণামের বিষয় বিবৃত করিব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে (পৌষ, ১৩৫১, বঙ্গশ্রী) হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণের সময়েরই রাষ্ট্রসংঘাত ও তাহার পরিণাম আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের ও ভারতে স্থায়ী ভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত ভারতের কোন সার্ব্বভৌম নরপতি তখন বর্ত্তমান ছিলেন না। সুলতান মামুদের ও মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ প্রধানতঃ এই কারণে দ্রুত সফলতা লাভ করিয়াছিল।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্য গক্করজাতি কর্ত্তৃক মহম্মদ ঘোরী নিহত হইলে একটি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কুতবুদ্দিন আর গজনীর রাজপ্রতিনিধি না থাকিয়া মুসলমান-ভারতবর্ষের সুলতান বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খুদবা (Khudba) পাঠ করাইতে ও মুদ্রা প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। রাজত্বকারী সুলতানের উন্নতির জন্য মসজিদে প্রত্যহ প্রার্থনা করার নাম হইতেছে খুদবা। ইহা এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করা রাজচিহ্নের প্রধান নিদর্শন। দিল্লী নগর মুসলমান-ভারতের রাজধানী হইল। এই মুসলমান বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দিল্লীতে কুতবমিনার প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। কুতবুদ্দিনের রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল সিন্ধুনদ, উত্তর সীমা হিমালয়, দক্ষিণে রাজপুতানা এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ। কুতবুদ্দিন যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ইতিহাসে "দাসবংশ" (Slave dynasty) বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুতবুদ্দিন, আলতামস ও বুলবন—এই বংশের এই তিনজন সুলতানই প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। এই বংশ (১২০৬-৯০) ৮৪ বৎসর রাজত্ব করে।

কুতবুদ্দিন দীর্ঘ দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই; মাত্র ৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পর লাহোরে চৌগন বা পোলো খেলার সময় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার জামাতা আলতামস (ইলতুতমিস) সিংহাসন আরোহণ করিলে (১২১১ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং গোয়ালিয়ার ও রণথম্ভোর হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালের (১২১১-৩৬) অধিকাংশ সময় এই বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হয়। ১২১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব অধিকার করেন, ১২২৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু ও রণথম্ভোর জয় করেন; ১২২৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের মুসলমান ওমরাহগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং ১২৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়ার অধিকার

করেন এবং বিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরী লুণ্ঠন করেন এবং সেই সময়ের তথাকার সুপ্রসিদ্ধ মহাকালের মন্দিরটাও ধ্বংস করেন। এইরূপে আলতামস বিদ্রোহ দমন করিয়া আবার রাজ্যের ভিত্তি কতকটা সুদৃঢ় করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন উত্তর ভারতে এই মন্দিরধ্বংসাদি কার্য্য চলিতেছিল, দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণ উদাসীন ও নির্বিকার ভাবে উহা উপেক্ষা করিয়া পরস্পর আত্মঘাতী কলহে ব্যাপৃত ছিলেন।

এই আলতামসের রাজত্বকালে প্রবল পরাক্রান্ত চেঙ্গিস খান ভারতের সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই চেঙ্গিস খান হইতে মোগল ইতিহাসের আরম্ভ; তজ্জন্য মোগল জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও চেঙ্গিস খাঁর দিগ্‌বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

মধ্য এশিয়ার গোবী মরুভূমির ও আলতাই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সমতল ভূভাগে তাতার বা মঙ্গল বা মোগলগণ যাযাবর জাতিরূপে বহুকাল হইতে বিচরণ করিত। তাহারা ছিল কদাকার, অসভ্য, পীতবর্ণ, উচ্চ চিবুকাস্থিযুক্ত, চাপা নাক বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র চক্ষুযুক্ত ও বিস্তৃত বদন-সমন্বিত। ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিসখাঁর জন্ম হয় ও ১২২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি পূর্ব্বকালের একজন দিগ্‌বিজয়ী বীর বলিয়া গণ্য। তাঁহার প্রতিভাবলে ও সৈন্যসংগ্রহে কুশলতার জন্য তিনি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিয়া চীনদেশের পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া ভলগানদী ও কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেশের (Steppes) উপর আধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিলেন; পরে তিনি বোখারা, কাবুল, কান্দাহার ও খোরাসান আক্রমণ করিয়া জয় করেন ও পশ্চিমে পারস্য পর্য্যন্ত জয় করিয়া রাজ্যান্তর্ভুক্ত করেন। এই তাতার সৈন্যগণের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার অবধি ছিল না; তাহারা অসংখ্য লোককে বন্দী করিয়া চিরদাস করিয়া রাখিত। খোরাসান রাজ্য চেঙ্গিসখান কর্ত্তৃক বিজিত হইলে তথাকার রাজা পলায়ন করিয়া আলতামসের শরণাপন্ন হন। চেঙ্গিস এই সংবাদ পাইয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এদিকে আলতামসও এই দুর্দ্ধর্ষ জগজ্জয়ী বীরের ভয়ে খোরাসানের রাজাকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইলেন; তিনি অগত্যা পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চেঙ্গিসও আর অগ্রসর না হইয়া সিন্ধুতীর হইতে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। ভারত এক ভীষণ অত্যাচারের হস্ত হইতে এবার নিষ্কৃতি পাইল।

আলতামসের মৃত্যুর পর তাহার সুযোগ্যা কন্যা রেজিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্টা হন। তিনি অশেষ গুণে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণা হইতেন এবং মুসলমানদের চিরাচরিত পর্দ্দা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সুচারুরূপে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু পুরুষের হৃদয়ে চিরপরিস্ফুট নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা ও অনাস্থা—ওমরাহগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্তে প্ররোচিত করিল। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইল, তিনি একজন আবিসিনিয়ানের সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন। ফলে তিনি ফতিন্দার শাসনকর্ত্তা অলতুনিয়া নামে এক ওমরাহের হস্তে বন্দিনী হন। তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া রাজসিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার স্বামী উভয়ে বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন। (১২৪০ খৃঃ অব্দ)।

এইরূপে ভারতে একটি মহীয়সী মুসলমান রমণীর সুন্দরভাবে রাজ্য পরিচালনার চেষ্টা ব্যর্থ হইল—কুৎসিত ষড়যন্ত্রের আবরণে। জানি না, কতকাল এইভাবে নারী-নির্য্যাতন উচ্চ এবং নিম্নস্তরে, সর্ব্বত্র অপ্রতিহতভাবে চলিবে।

ইহার পর ১২৪০ হইতে ১২৪৬ পর্য্যন্ত রাজ্যে একরূপ অরাজকতার ফল, গুপ্তহত্যা, নিষ্ঠুরতা, চক্রান্ত প্রভৃতি চলিতে থাকে। পরে ১২৪৬ খৃঃ অব্দে আলতামসের অন্য এক পুত্র নাসিরুদ্দিন মামুদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসিরুদ্দিন ছিলেন ধর্ম্মভীরু। তিনি সাধুর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। তিনি মাত্র একটি বিবাহ করেন, সেই স্ত্রীই তাঁহার খাদ্য পাক করিয়া দিত এবং প্রত্যহ সুলতান কোরাণের কিছু অংশ স্বহস্তে লিখিতেন। তাঁহার শ্বশুর উলুঘ খাঁ-ই ছিলেন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। মোগলগণ বারবার পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ১২৪১-৪৩ খৃঃ অব্দে লাহোর বিধ্বস্ত করে এবং দোয়াব ও মেওয়াট অঞ্চলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। উলুঘ খাঁ কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপিত করেন। ১২৬৬ খৃঃ অব্দে নাসিরুদ্দিন মামুদের মৃত্যু হয়।

নাসিরুদ্দিন মামুদ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর উলুঘ খাঁ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। জামাতার মৃত্যুর পর তিনি গিয়াসুদ্দিন বলবন নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২৬৬ হইতে ১২৮৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগলেরা আবার পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মুলতান ও সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠতরাজ করিয়া চলিয়া যায়। ১২৮৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মোগলদের সহিত সংঘর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইহাতে বলবনের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বলবনের রাজত্বে আর একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হয় মেওয়াটি দস্যুদের সহিত। ইহারা মেওয়াটে (বর্ত্তমান আলোয়ার রাজ্যে) বাস করিত। ইহারা জাতিতে রাজপুত এবং দুর্দ্দমনীয় দস্যু ছিল। দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া ইহারা লুঠ করিয়া চলিয়া যাইত। ১২৬০ খৃঃ অঃ জুলাই মাসে বলবন অতর্কিতে মেওয়াটে উপস্থিত হন এবং মেওয়াটিগণকে অভিভূত করিয়া ১২০০০ পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু বন্দী করেন এবং সকলকেই তরবারী প্রয়োগে নিহত করেন; সমস্ত প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া অনেক দ্রব্যসম্ভার লইয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এরূপ কঠোরভাবে মেওয়াটদস্যু দমন করা হইয়াছিল যে, তাহারা বহু বৎসর যাবৎ আর মাথা তুলিতে পারে নাই।

বলবনের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা তুগ্রিল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৭০ বৎসর বয়সে বলবন নিজে তুগ্রিলের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে অভিযান করেন। তুগ্রিল ভয়ে জাজ নগরের জঙ্গলে পলায়ন করেন, কিন্তু তথা হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিহত করা হইল; তুগ্রিলের বংশের

সমূলে উচ্ছেদ করা হইল। লক্ষ্মণাবতী নগরীর বাজারের দুই ধারে ক্রাসিকাষ্ঠ সাজাইয়া তুগ্রিলের পুত্র, জামাতা ও অন্যান্য অনুচরদিগেকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার বংশের স্ত্রীলোক ও শিশুগণও নিষ্কৃতি পায় নাই।

ঐ সময়ের একজন ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দুই তিন দিন ধরিয়া এরূপ অমানুষিক হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল যে দর্শকদেরও সন্দেহ হইতে লাগিল যে, তাঁহারা বাস্তবিক জীবিত আছেন কিনা।" বলবন বুঘরা খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২৮৬-৮৭ খৃঃ অঃ বলবনের মৃত্যু হয়। ১২৯০ খৃঃ অঃ দিল্লীর খিলিজি ওমরাহগণ দাসবংশের শেষ সুলতান অকর্ম্মণ্য কৈমুয়ার্সকে হত্যা করিয়া তাহাদের নেতা ফিরোজসাহকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে দাসবংশের রাজত্বের অবসান হয় ও খিলিজি বংশের তুর্কি আফগানগণ দিল্লীর সুলতান হন। খিলিজিগণ তুর্কী ছিলেন; বহুকাল আফগানিস্থানে বাস করার জন্য তাঁহাদিগকে তুর্কী আফগান বলা হয়।

খিলিজি সুলতান বংশ ১২৯০ হইতে ১৩২০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ফিরোজসাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জালালুদ্দিন নাম ধারণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ১২৯০ হইতে ১২৯৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। তাঁহার রাজত্বকালে প্রথম দাক্ষিণাত্যে তুর্কি আক্রমণ আরম্ভ হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন, কোরা ও অযোধ্যার জায়গীর পাইয়া তথায় ছিলেন। তাঁহার শ্বশ্রূ বেগমের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বহির্জগতে বাহির হইবার সঙ্কল্প করেন। শ্বশুর সুলতানের অনুমতি লইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য ৮০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ইলিচপুরে উপস্থিত হন। তথা হইতে তিনি মহারাষ্ট্রদেশে যাদবগিরিতে গমন করেন। তখন যাদবরাজ রামচন্দ্রদেব তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তখন রাজপুত্র শঙ্করদেব সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। সামান্য যে দুই বা তিন হাজার সৈন্য রাজধানীতে ছিল, তাহা লইয়া তিনি আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কাজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া ইলিচপুর ছাড়িয়া দিয়া ও প্রভূত করদানে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল (১২৯৪ খৃঃ অঃ)। সন্ধির সর্ত্তানুসারে তখনই তাঁহাকে ৫০ মণ স্বর্ণ, ৭ মণ মুক্তা, বহুবিধ বহুমূল্য দ্রব্য, ৪০টি হস্তী, কয়েক সহস্র অশ্ব এবং রাজধানী হইতে যে সমস্ত ধনরত্ন পূর্ব্বেই লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় দিতে হইয়াছিল।

আলাউদ্দীন এইরূপে প্রচুর ধনরত্ন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দিল্লীতে না গিয়া কোরায় উপস্থিত হইয়া তথায় সুলতানকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। স্নেহান্ধ সুলতান ওমরাহগণের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া কোরায় গমন করেন এবং তথায় আলাউদ্দীনের ইঙ্গিতে জনৈক গুপ্তঘাতক তাঁহাকে নিহত করিল। আলাউদ্দীন সুলতানপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। (১২৯৬ খৃঃ অঃ)। আলাউদ্দীন প্রথমে (১২৯৭ খৃঃ অঃ) গুজরাট জয়ের জন্য নসরৎ খাঁ ও উলুঘ খাঁ নামক দুইজন সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করেন। তখন বাঘেলারাজ দ্বিতীয় কর্ণদেব গুজরাটের রাজা ছিলেন। তিনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। মুসলমান সৈন্য গুজরাটের সমস্ত বন্দরগুলি লুণ্ঠন করিয়া অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন লইয়া দিল্লী ফিরিল। সেই সঙ্গে কর্ণদেবের মহিষী কমলাদেবীও বন্দিনী হইয়া দিল্লীতে সুলতানের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। দ্বিতীয় কর্ণদেব রাজকুমারী দেবলাদেবীকে সঙ্গে লইয়া পলাইয়া আসিয়া দেবগিরিতে যাদবরাজ রামদেবের শরণাগত হইলেন।

গুজরাটজয়ে উল্লসিত আলাউদ্দীন ১২৯৯ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ রাজপুত দুর্গ রণথম্ভোর (জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত রণস্তম্ভপুর) অধিকার করিবার জন্য সেনাপতি নসরৎ খাঁ ও উলুঘ খাঁকে প্রেরণ করেন। দুর্গাধিপতি রাণা হম্বীরদেব শরণাগত মহম্মদ সাহকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রার্থনা করায় হম্বীরদেব তাহাতে অস্বীকৃত হন। 'হম্বীর-মহাকাব্য'-রচয়িতা নয়চন্দ্র তাহার কাব্যে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। মহম্মদ সাহকে তিনি মহিমাসাহরূপে সংস্কৃত করিয়াছেন। "যেনোচ্চঃ শরণাগতস্য মহিমাসাহের্নিমিত্তং ক্ষণাৎ আত্মা পুত্রকলত্রভৃত্যনিবহো নীতঃ কথাশেষতাম্"। (যিনি উচ্চ শরণাগত মহম্মদ সাহের (রক্ষার) নিমিত্ত নিজে পুত্রকলত্রভৃত্যের সহিত নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।) একটি উচ্চদুর্গের সংস্কারকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার কালে নসরৎ খাঁ একখণ্ড প্রস্তরাহত হইয়া দ্বিতীয় দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ২০,০০০ শিক্ষিত সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া হম্বীরদেব মুসলমান সৈন্যকে পরাজিত করেন এবং উলুঘ খাঁ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে স্বয়ং সুলতান আলাউদ্দীন সসৈন্যে রণথম্ভোরের দিকে অগ্রসর হন। পথে মালব ও ধররাজ্য লুণ্ঠিত হয়। বহুদিন উভয়পক্ষের ক্ষুদ্র যুদ্ধের পরে অবশেষে দুইজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় হম্বীরদেব পুত্রকলত্রাদির সহিত নিহত হন। তাহাদের সহিত দুর্গের অবশিষ্ট বীর যোদ্ধ্‌গণও নিহত হন। আমীর খসরু তাঁহার তারিখ-ই-আলাই গ্রন্থে (ইলিয়ট ৩, পৃ. পৃ, ৭৫—৭৭) ভিন্নরূপ পরিণতির বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভীষণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করা হইল। এক রাত্রিতে পর্ব্বতপৃষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে রাণার স্ত্রীবর্গ ও পরিবারসমূহ নিক্ষিপ্ত হইল এবং রাণা তাহার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সহিত বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।" হম্বীর মহাকাব্যে রতিপাল ও কৃষ্ণপাল নামক দুইজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা দুর্গের পতনের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এবং হম্বীর গুরুতর ভাবে আহত হইয়া যখন আর বাঁচবার আশা নাই বুঝিলেন তখন স্বীয় হস্তে তরবারী দ্বারা নিজের শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। দুইজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার কথা হাজি-উদ্-দবিরের গুজরাটের আরবীয় ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে (ডেনিসন রস সম্পাদিত ২য়, খণ্ড পৃপৃ, ৮০৬—৭)।

১৩০১ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে দুর্গ অধিকৃত হয় ও রাজপ্রাসাদ ও দুর্গাদি সমভূমি করিয়া ফেলা হয়। উলুঘ খাঁকে রণথম্ভোরের রক্ষার ভার দিয়া সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরে ১৩০৩ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। মেবারের রাণা রতনসিংহের মহিষী পদ্মিনীর অনুপম রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া আলাউদ্দীন সেই স্ত্রীরত্ন লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এই অভিযান আরম্ভ করেন। টড্ সাহেব পদ্মিনীর স্বামীর নাম ভীমসিংহ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। রাণার নাম রতনসিংহ ছিল। নাইনসি তাঁহার "খ্যাতা" গ্রন্থে, আবুল ফজল তাঁহার আইনি আকবরি গ্রন্থে এবং ফেরিস্তা তাহার গ্রন্থে রতনসিংহ বলিয়াছেন। আলাউদ্দীনের চাতুর্য্যে প্রথমে রাণা রতন-সিংহ বন্দী হন। যদি পদ্মিনী আত্মসমর্পণ করেন, তবে রাণাকে মুক্তি দেওয়া হইবে এই কথা প্রচারিত হইলে, রাজপুতগণ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহারা ৭০০ পাল্কীতে সাহসী রাজপুতযোদ্ধৃগণকে রাজপুত রমণীরূপে আলাউদ্দীনের শিবিরে পাঠাইয়া তাহাদের দ্বারা রাণার উদ্ধার সাধন করেন। পরে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দুই বীর রাজপুত-বালক গোরা ও বাদল সামান্য রাজপুত সৈন্য লইয়া অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। এখন পর্য্যন্ত ভারতের কবিকুল তাহাদের বীরত্বের কথা ভুলিতে পারেন নাই। "শ্রাবণের বারিধারা প্রায়, পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়" এই কথা এখনও বঙ্গীয় বালকবৃন্দকে উন্মাদনা দান করে। যখন রাজপুতগণ জয়ের আর আশা নাই বুঝিলেন তখন ভূনিম্নে গহ্বরে পবিত্র জহরব্রতের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। ঐ গহ্বর এখনও সেই নিষ্ঠুর সময়ের স্মৃতি বহন করিয়া সেই বিধ্বস্ত স্থানে বর্ত্তমান আছে। রমণীগণের যাত্রার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হইল। টড্ ইহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন, "তাতারের লোলুপ কামবাসনা যে সমস্ত সুন্দরী রমণী বা যুবতীকে কলঙ্কিত করিতে পারে, রূপলাবণ্যবতী পদ্মিনী তাহাদিগকে সমৃদ্ধ করিলেন; তাহারা সেই গহ্বরে নীত হইলেন; গহ্বরের বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল; সর্ব্বগ্রাসী প্রকৃতির (অগ্নির) উপর তাহাদের সম্মান রক্ষার ভার অর্পণ করা হইল।" চিতোর রক্ষার জন্য রাজপুতগণের অনুপম শৌর্য্যবীর্য্য ও রমণীগণের অসাধারণ আত্মাহুতি ইতিহাসে বিরল। ১৬ই আগষ্ট ১৩০৩ খৃঃ অঃ সোম-বারে এইরূপে চিতোর অধিকৃত হইল। ত্রিশ হাজার রাজপুতকে নিহত করিয়া আলাউদ্দীন পুত্র খিজির খাঁকে চিতোর শাসনের ভার দিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চিতোরের নাম হইল খিজিরাবাদ। কিন্তু রাজপুতগণের চাপে পড়িয়া খিজির খাঁ ১৩১৯ খৃঃ অব্দে সামন্ত মলদেবের হস্তে চিতোর অর্পণ করিয়া চলিয়া আসেন। মলদেব নির্দ্ধারিত কর সুলতানকে দিতেন পরে ১৩১৮ খৃঃ অব্দে রাণা বীর হম্বীর চিতোর পুনরুদ্ধার করেন।

চিতোর বিজয়ের পর মালবের রাণা মহ্লকদেবের বিরুদ্ধে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হয়। বহু সৈন্য লইয়া তিনি ঐ আক্র-মণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন কিন্তু পরে পরাস্ত ও নিহত হন। (১৪৪৫ খৃঃ অঃ) মণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধারানগরী ও চাণ্ডেরী অধিকৃত হইল। এইরূপে ১৩০৫ খৃঃ অব্দে শেষভাগে প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত উত্তর ভারতে আলাউদ্দীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইবার আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্যের অভিযান আরম্ভ হইল। তিনি তাঁহার খোজা সেনাপতি মালিক কাফুরকে এই কার্য্যের ভার দিলেন। তাঁহার প্রথম অভিযান হইল দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি গুজরাটের পলায়িত রাজা কর্ণদেবকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন; উলুঘ খাঁ কর্ণদেবের কন্যা দেবলা দেবীকে দাবী করিলেন। রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেব ঘৃণার সহিত উহা অগ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু দুই মাসের তীব্র প্রতিরোধ ও যুদ্ধের পর তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। হতভাগ্য রাজকুমারী দেবলা দেবীকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া দিল্লীতে পাঠান হইল। এবং পরে আলাউদ্দীনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী খিজির খাঁর সহিত তাহার বিবাহ হয়। রাজা রামচন্দ্র কাফুরের হস্তে পরাজিত হইলেন এবং সন্ধি করিয়া (১৩০৭ খৃঃ) দিল্লী গমন করিলেন এবং তথায় সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়া 'রায় রায়ান' উপাধি লাভ করিলেন। ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, নবসারি জেলা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। ১৩০৯ খৃঃ অঃ কাফুর তেলিঙ্গানার কাকতীয় বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন; ওয়ারাঙ্গল তাঁহার রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীনের কাফুরের উপর আদেশ ছিল যে, যদি রায় লদ্দর দেও (প্রতাপরুদ্র) ধনরত্ন হস্তী অশ্ব প্রভৃতি দান করেন এবং প্রতি বৎসর উহা দিতে স্বীকৃত থাকেন, তবে রাজার উপর বেশী চাপ দেওয়া না হয়। রাজাকে রাজ্যচ্যুত না করিয়া তাহার ধনরত্ন ও ক্ষমতা অপহরণ করিবে। প্রতাপরুদ্র তাঁহার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর রাজা বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রচুর ধনরত্ন দান করিয়া বার্ষিক করদানে স্বীকৃত হইলেন। কাফুর মস্তকে বিজয়-মুকুট ধারণ করিয়া ওয়ারেঙ্গল হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১০০০ উষ্ট্র রত্নরাজির ভারে ক্লান্তকলেবর হইয়া উহা বহন করিয়া দেবগিরির ও ধারার পথে দিল্লী আসিয়াছিল। (মার্চ্চ, ১৩১০)।

ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে কাফুর সসৈন্যে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহু গভীর নদ-নদী ও দুর্দ্দম পর্ব্বত, অরণ্য অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে দোর সমুদ্রে (মহীশূর রাজ্যে বর্ত্তমানে হলেবীদ) উপস্থিত হন। তখন হোয়সলরাজ ৩য় বীরবল্লাল তথাকার পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যাদব ও হোয়সলদের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য ও বিবাদ ছিল, তাহার ফলে তৃতীয় পক্ষ মুসল-মানগণ উভয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বীরবল্লাল যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হন এবং বিজয়ী সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩৬টি হস্তী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তা দিয়া দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। মন্দির-সমূহ আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া ধনৈশ্বর্য্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

১৩১১ খৃঃ অব্দে কাফুর পাণ্ড্য দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সুন্দরপাণ্ড্য ও বীরপাণ্ড্য এই দুই রাজপুত্রের মধ্যে কলহের সুযোগ পাইয়া মুসলমানগণ সহজে পাণ্ড্যদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুন্দরপাণ্ড্য রাজার বৈধপুত্র এবং বীরপাণ্ড্য অবৈধ পুত্র ছিলেন। বীরপাণ্ড্য ভ্রাতা সুন্দরপাণ্ড্যকে রাজধানী মদুরা হইতে বিতাড়িত করিলে তিনি দিল্লীর সুলতানের শরণ গ্রহণ করেন। মালিক

কাফুর বিশাল সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া পথিমধ্যে মন্দিরাদি চূর্ণ করিয়া ও হস্তিসকল গ্রহণ করিয়া রাজধানী মদুরার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজা মুসলমানদের আগমনে পলায়ন করিলেন। আক্রমণকারীরা হস্তীগুলি আত্মসাৎ করিল ও মন্দির-সমূহ চূর্ণ করিতে লাগিল। আমীর খসরুর মতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ এইরূপ—৫১২টি হস্তী,৫০০০ অশ্ব, ৫০০ মণ সকল রকমের মণিমাণিক্য, হীরক, মুক্তা, মরকত ও পদ্মরাগমণি। কাফুর রামেশ্বর পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন, তথায় তিনি প্রসিদ্ধ মন্দির চূর্ণ করেন ও দেববিগ্রহ ভগ্ন করেন। এইরূপে উত্তর ভারতের সীমান্ত হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল।

১৩০৯ খৃঃ অব্দে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি দিল্লীতে দেয় রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেন। ১৩১২ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন ৪র্থ বার তাহার খোজা সেনাপতি কাফুরকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। রামচন্দ্রদেব কাফুরের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন (১৩১৩ খৃঃ অঃ)।

১৩১৬ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কুতবুদ্দীন মোবারক দিল্লীর সুলতান হন (১৩১৬-২০ খৃঃ)। ইনিই খিলজি বংশের শেষ সুলতান। তাঁহার রাজত্বকালে (১৩১৮ খৃঃ অঃ) দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবের জামাতা হরপালদেব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সত্বরই বিদ্রোহ দমিত হয় এবং হরপালদেবের জীবন্ত অবস্থায় গাত্রত্বক্ খুলিয়া নির্ম্মমভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। এইরূপে দেবগিরির যাদববংশ নির্ম্মূল হইয়া গেল।

মোবারক আমোদ-প্রমোদে প্রায়ই মত্ত থাকিতেন। খসরু নামক নীচজাতীয় মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর হস্তে তিনি রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে এই পাপিষ্ঠ ১৩২০ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে হত্যা করিয়া 'নাসিরুদ্দীন' উপাধি ধারণ করিয়া সুলতান হইল। তখন পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্ত্তা গাজি মালিক তাহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (অক্টোবর ১৩২০ খৃঃ অঃ) তখন খিলিজি বংশের আর কেহ জীবিত ছিল না। গাজি মালিক "গিয়াসুদ্দীন তোগলক" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই তোগলক বংশের প্রথম সুলতান।

তোগলক বংশ ১৩২০ হইতে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গিয়াসুদ্দিন ১৩২০ হইতে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলতান ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বরঙ্গলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি পুত্র মহম্মদ জৌনাকে তাহা দমনের জন্য প্রেরণ করেন। তখন কাকতীয় বংশের প্রতাপরুদ্রদেব তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রথমবার জৌনা বরঙ্গল জয় করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বার ১৩২১ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রদেব পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। এদিকে বঙ্গদেশে বুঘরা খাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহবিবাদ চলিতে-ছিল। তজ্জন্য গিয়াসুদ্দিন সসৈন্যে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া তথায় স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ত্রিহুত জয় করেন। জৌনা দিল্লীতে এক বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পিতাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করেন। অকস্মাৎ মণ্ডপটি ভাঙ্গিয়া সুলতানের মস্তকের উপর পড়িল। সুলতান ও তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র মামুদ নিহত হইলেন (১৩২৫ খ্রীঃ অঃ)। অনেকের মতে জৌনা খাঁ সত্বর সিংহাসন লাভের জন্য পিতৃবধের জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর জৌনা "মহম্মদ বিন তোগলক" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩২৫ হইতে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রথমে ১৩৩৫ খৃঃ মা'বারের শাসনকর্ত্তা জালালুদ্দিন আসন সাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজনামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। সুলতান নিজে সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু তিনি তেলিঙ্গানায় পৌছিলে তাঁহার সৈন্যমধ্যে কলেরা দেখা দিল এবং অনেক সৈন্য মারা গেল। এই অতর্কিত বিপদে সুলতান তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং আসন সাহ স্বাধীন থাকিয়া যান।

১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফকরুদ্দিন লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদির খাঁকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। দিল্লীর সুলতান তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের অশান্তি দমনে ব্যস্ত থাকায় বাঙ্গলার দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা দিল্লীর শাসনমুক্ত হইয়া চলিতে লাগিল।

১৩৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা আইন উলমুলক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি একজন সুলতানের অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাহাকে অযোধ্যা হইতে দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্ত্তারূপে সপরিবারে যাইবার আদেশে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। সুলতান বিদ্রোহ দমন করিয়া আইন উলমুলকের অনুচরগণকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিলেন কিন্তু আইন উলমুলকের পূর্ব্বের সৎকার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে রাজকীয় উদ্যানের অধ্যক্ষ-পদ দান করিলেন।

মদুরা ও তেলিঙ্গানাও স্বাধীন হইল। এই সময়ে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে বিজয়নগরে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় (১৩৩৬ খ্রীঃ অঃ) এবং ঐ নদীর উত্তরে মুসলমান বাহমনী রাজ্য স্থাপিত হয় (১৩৪৭ খ্রীঃ অঃ)। তখন দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও মুসলমানগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ফলে সুলতান বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে ১৩৫১ খ্রীঃ অব্দে সিন্ধুদেশে তট্টানামক স্থানে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পর সৈন্যাধ্যক্ষগণ মহম্মদের জ্ঞাতি ভ্রাতা ফিরোজ তোগলককে সুলতান নির্ব্বাচিত করেন। তিনি ১৩৫১—৮৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে বাঙ্গলাদেশ পুনরধিকারের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। দাক্ষিণাত্যে সুলতানের হস্তচ্যুত রাজ্যগুলির পুনরধিকারের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ১৩৮৮ খৃঃ অঃ ফিরোজ সাহের মৃত্যু হইলে ১৩৮৮ হইতে ১৩৯৮ খৃঃ অঃ মধ্যে পর পর ৫ জন অযোগ্য

সুলতান সিংহাসন লাভ করেন। পরে ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে এই বংশের শেষ সুলতান মামুদ তোগলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮ খৃঃ অঃ)। তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। ১৪১৩ খৃঃ অব্দে মামুদ সাহের মৃত্যু হইলে তোগলক বংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

তোগলক বংশের পর সৈয়দ বংশ ১৪১৩ হইতে ১৪৫১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত দিল্লীর সুলতান হন। তাঁহাদের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন রাষ্ট্রসংঘাত ঘটে নাই। পরে লোদী বংশ ১৪৫১ হইতে ১৫২৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সুলতান পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে (১৫১৭ হইতে ১৫২৬ খৃঃ অঃ) ওমরাহদের আভ্যন্তরীণ ষড়্‌যন্ত্রের ফলে কাবুলের রাজা বাবর দিল্লীজয়ের জন্য সসম্মানে নিমন্ত্রিত হইলেন। প্রসিদ্ধ পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর সহিত বাবরের যুদ্ধ হইল (১৫২৬ খৃঃ অঃ ২১শে এপ্রিল)। ইব্রাহিম লোদী বিশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। লোদী বংশের অবসান হইল। দিল্লীতে তথা ভারতে মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইল।

সুলতানী আমলের রাষ্ট্রসংঘাতের ফলে ভারতে দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মও বিস্তার লাভ করিতেছিল। উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু উচ্চ রাজকার্য্য লাভ ও জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানদের অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যও অনেকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অপর পক্ষে হিন্দুসমাজের মধ্যে রক্ষণশীলতার প্রভাব খুব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই রক্ষণশীলতার ফলে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম আজও মুসলমান ও খৃষ্টানদের আঘাত সহ্য করিয়া এখনও বিদ্যমান আছে। প্রাচীন মিশর ও পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম এই কারণে বিলুপ্ত হয় নাই। এই রক্ষণশীল হিন্দু শাস্ত্রকারদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে মাধবাচার্য্য ও বঙ্গদেশে রঘুনন্দন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেক উচ্চপদস্থ মুসলমান হিন্দু-রমণীকে বিবাহ করিয়া হিন্দু-প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। আবার উভয় সম্প্রদায়ের একদল ধর্ম্মপ্রচারক হিন্দু-মুসলমান মিলনের মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, খাজা মুইনউদ্দীন চিশ্‌তি, নিজামুদ্দীন আউলীয়া, শাহ জালাল প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের সারমর্ম্ম ছিল—এক ভগবান্—হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের ভগবানে কোন প্রভেদ নাই। জীবমাত্রই ভগবানের সন্তান। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। রাম ও রহিম এক।

এ যুগে রাষ্ট্রসংঘাত সত্ত্বেও বহু সংস্কৃত পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি, বোপদেব, বিজ্ঞানেশ্বর ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ যুগে বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী ও পাঞ্জাবী প্রভৃতি লৌকিক সাহিত্যও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃত, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারতের বাঙ্গলা সংস্করণ এই যুগেই হইয়াছিল। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী সাহিত্যে এ যুগে নূতন প্রেরণা দিয়াছিলেন। কবীরের দোঁহা অতি মনোরম ও উপাদেয়। নানক ও তাঁহার শিষ্যসংঘের চেষ্টায় পাঞ্জাবী ভাষা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মারাঠী প্রচারক একনাথ মারাঠী ভাষায় নূতন প্রেরণা দিয়াছেন।

অপর পক্ষে, এ যুগে ভারতে পারসিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল; কারণ, দিল্লীর সুলতানেরা পারসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজিই পারসিক সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান দান। মিনহাজউদ্দীন সিরাজ নামে জনৈক লেখক 'তবকাৎ-ই-নাসিরী নামে এক বিরাট ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেক ঐতিহাসিক লেখক পারসিক ভাষায় তখনকার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

এ যুগে একদিকে সংস্কৃত ও অপরদিকে উর্দ্দু এই উভয় ভাষার সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। উর্দ্দু ভাষার ন্যায় এ যুগে হিন্দু মুসলমান স্থাপত্য-রীতিরও সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানগণ যে সকল প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহাতে অনেক হিন্দু শিল্পী নিযুক্ত করিতেন। ফলে উভয় রীতির মিশ্রণফলে এক নূতন রীতির স্থাপত্যশিল্পের উদ্ভব হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লীতে ছিল মুসলিম রীতির প্রাধান্য, কুতবমিনার ও কুতব মসজিদসমূহে তাহা লক্ষিত হয়। জৌনপুরের স্থাপত্যশিল্প সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের, তথাকার প্রসিদ্ধ অতাল মসজিদ ও জাম-ই-মসজিদ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গুজরাটী স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইল তিন দরজা এবং জাম-ই-মসজিদ। উহা আহমদাবাদে অবস্থিত এবং আহমদ সাহের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে গৌড়ের সোণা মসজিদ ও কদম রসুল এবং পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের চরমোৎকর্ষ জ্ঞাপন করিতেছে। ইহাতে বাঙ্গালাদেশের বিশেষত্ব বংশকুটীর নির্ম্মাণের আদর্শ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য শিল্পে-পারসিক রীতির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় দৌলতাবাদের চাঁদমিনার, বিদরে মামুদ গাওয়ানের বিদ্যানিকেতন এবং বিজাপুরের গোল গম্বুজ (মহম্মদ আদিল সাহের সমাধি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ যুগের হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন বিজয়নগরের হিন্দু রাজগণ ও রাজপুতানার রাজগণ। বিজয়নগরের পদ্মমহল ও বিঠলদেবের মন্দির ও রাজপুতানার কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ দেখিলে ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়।

অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে দেশে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা অবশ্যম্ভাবী। তৎকালে দেশে প্রাচুর্য্য ছিল। দেশে কৃষি, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও দ্রব্যাদি সস্তা ছিল, লোকেরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

হিন্দুস্থানের বিপুল ঐশ্বর্য্য, তাহার ধনরত্ন লুণ্ঠন ও হিন্দুর উচ্ছেদ ও তাহার পবিত্র দেবমন্দির ধ্বংস প্রভৃতি কার্য্য এ যুগের বিজেতাদের বিশেষ কাম্য ছিল। হিন্দুরাজগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পরবশ হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে একের পর অপরে মুসলমান বিজেতৃগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সঙ্ঘশক্তি যে কত বড় প্রবল শক্তি তাহা তাঁহারা এ যুগে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আলাউদ্দীন সমস্ত ভারত জয় করিয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তুর্কি আফগান রাজত্বের অবসানে ১৫২৬ খৃঃ অঃ মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে ভারত আবার বহুধা বিভক্ত ক্ষুদ্রবৃহৎ হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়। ফলে মোগল শাসনকালে আবার আমরা ভারতে রাষ্ট্র-সংঘাতের সম্মুখীন হইব।

শুভবুদ্ধি ও জলছবি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভাই—না—

বড্ডই ব্যস্ত ইংরাজি নভেলটি নিয়ে, টাইপ করতে হচ্ছে কি না। কিন্তু মনে হ'ল দুটো কথা লিখি—নিজের সঙ্গে কথা কওয়াই ধরো। স্বগতোক্তি বাইরের লোকেও কখনো কখনো শোনে—নাটকে নিত্য শোনে। তোমার স্পষ্টভাষিত্বকে আমি কিছু মনে করিনি, তবে—

আমার খুব মজা লাগল দেখে (এইটুকু বলতেই পত্রটি লেখা) যে আমার "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" বইটির আসল যে-উদ্দেশ্য সেইটাকেই তুমি ধরেছ "অবান্তর"। ভেবেছ চিত্রাঙ্কনই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য! একটি মিস্টিক মণীষীর নভেল দ্বিতীয়বার পড়ছিলাম কালই—এই শ্রেণীর নভেলই আমার প্রিয়:

"About the wearisomeness, to an adult mind, of all those merely descriptive plays and novels which critics expected one to admire. All the innumerable, interminable anecdotes and romances and character-studies, but no general theory of anecdotes, no explanatory hypothesis of romance or character. Just a huge collection of facts about lust and greed, fear and ambition, duty and affection: just facts, and imaginary facts at that, with no co-ordinating philosophy superior to common sense and the local system of conventions, no principle of arrangement more rational than simple aesthetic expediency. And then the astonishing nonsense talked by those who undertake to elucidate and explain this hodgepodge of prettily patterned facts and fancies! All that solemn tosh, for example, about regional literature—as though there were some special and outstanding merit in recording unco-ordinated facts about the lusts, greeds and duties of people who happen to live in the country and speak in dialect! Or else the facts were about the urban poor and there was an effort to co-ordinate them in terms of some post-Marxian theory that might be partly true, but was always inadequate. And in that case it was the great Proletarian Novel. Or else somebody wrote yet another book proclaming that Life is Holy; by which he always meant that anything people do in the way of fornicating, or getting drunk, or losing their tempers, or feeling maudlin, is entirely O. K. with God and should therefore be regarded as permissible and even virtuous." ব'লে এই মন্তব্য:—Misplaced seriousness—the source of some of our most fatal errors. One should be serious only about what deserves to be taken seriously. And, on the strictly human level, there was nothing that deserved to be taken seriously except the suffering men inflicted upon themselves by their crimes and follies."*

এত দীর্ঘ উদ্ধৃতির অপরাধ মার্জ্জনীয়। তবে আমার মনের কথা যেন ভদ্রলোক টেনে বলেছেন—আর এত সুন্দর করে কথাগুলি আমি বলতে পারতাম না—তাই। উদ্ধৃতিটি দেওয়ার আর একটি কারণ এই যে, এই প্রলেটারিয়ান জাতীয় দুটি উপন্যাস সম্প্রতি পড়লাম: ওয়াণ্ডালিস্বার "রেনবো" (ষ্টালিন পুরস্কৃত) ও তারাশঙ্করের Epoch's End (মন্বন্তরের ইংরাজি অনুবাদ)। দুটি বই-ই ভালো—চরিত্রচিত্রণে গল্পের ছবিতে, সংযমে—সত্যিই ভালো। কিন্তু ভার্জিনিয়া উল্‌ফের শেষ বয়সের দীর্ঘ নিঃশ্বাস মনে পড়ে: "Is it worth while?" অত বড় লেখিকা অকারণে আত্মহত্যা করেন নি—নিজে অজস্র বাজে লেখা লিখেছেন—যদিও প্রবন্ধ কয়েকটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে তাঁর শেষ জীবনের পুঞ্জীভূত আক্ষেপে। ভগবানকে না পেলে যে সবই বৃথা—চোরাবালিতে রেইনফোর্স্‌ড্ কংক্রীটকে দশগুণ রেইনফোর্স করলেও যে কাজে আসে না—এই কথাই বিশেষ ক'রে টাঙিয়ে রাখতে হবে আজকের দিনে—অন্তত কতিপয়ের মনে। নৈলে আলোর অন্তিম অবশেষের আশ্রয় থাকবে কোথায়? নিশ্চয়ই রেনবোতে বা মন্বন্তরের বাণীতে নয়। প্রথমটির বাণী হ'ল—রুশিয়া মরিয়া না মরে রাম। দ্বিতীয়টির বাণী ঠিক যে কী বোঝা গেল না, সম্ভবত এই যে, পুরোণো যুগের পরে যে নবযুগের উদয় আসন্ন সে-যুগে প্রণয়ী প্রণয়িনী পরস্পরকে ডাকবেন—কম্‌রেড! কী দারুণ প্রগতি! ওদের দেশের কয়েকটি ধার করা বুলি কপচে আমরা পার পাব—প্রলেটারিয়ান উপন্যাস আর্ট ডাঙ্গের নবযুগ এল? কিন্তু ও পথে মুক্তি নৈব নৈব চ—মানুষ মনুষ্যত্বের স্তরে কায়েম হ'য়ে থেকে কোনো দিনই মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না: রুশিয়া গরিলা যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখালেও না। ভারতীয় নরনারী পরস্পরকে রুশ ভঙ্গিমায় ঘাড় নেড়ে কম্‌রেড ব'লে আদর করলেও নয়। চাই—জ্ঞান। আর সে-জ্ঞান (রাগ কোরো না ফের)

* After Many a Summer.........Chapter V........ Aldous Huxley.

বৈজ্ঞানিক নয়—(যার বীজবোনায় পরম অমৃত ফল ফলছে আ-
বিক বোমা)—চাই সেই জ্ঞান যে জ্ঞানকে মানুষ ডেকেছে গ
যুগে: "মনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—"আমাদের বুদ্ধিকে ব
সঙ্গে যুক্ত করো।" নৈলে এই দানবিক আণবিক যুগে ক্লান্ত দীন প-
মনের ছিন্নপত্রে অর্থহীন আর্টের জলছবি এঁটে চলতে গেলে হয়,
চলৎশক্তি রহিত হবে, নয়—পড়তে হবে গিয়ে অতল সর্ব্বগ্রাসের
গহ্বরে। মানুষ অতিমাত্রায় মানুষ (on tho human level)
থাকতে গেলে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"
এ মন্ত্র জপ করতে গেলে শুভের সিংহদ্বার খোলা পাওয়া যায় না।
জীবনের, চেতনার বিকাশ চলেছে অতীত থেকে অনাগতের মুখে,
সুতরাং মানুষ আগে যে মন্ত্রের জপ ক'রে আংশিক সিদ্ধি লাভ
করেছিল সে মন্ত্রে আংশিক সিদ্ধিলাভেরও পথ আজ বন্ধ।
শ্রীঅরবিন্দের ঋষিবাণী:—Reason was the helper—Reason
is the bar"—মানবিক যুক্তিবিচারে চিহ্ন কাজ হ'তে আসে, কিন্তু
সে কাজ যে ফুরিয়েছে সে কথা কি বর্ত্তমান সভ্যতার নরককুণ্ডে
পৌঁছেও বলতে হবে—যখন যুক্তিবুদ্ধির তরীর ভরাডুবি হ'ল ব'লে?

"উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এসব কথাকেও
হয়ত তুমি বলবে "অবান্তর"। কিন্তু আমি বলব "না"। কারণ
"উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালের" দুটো মুখ নেই—সে অনন্যলক্ষ্য—ভগবদ্-
মুখী। দ্বিজেন্দ্রলাল আমার পিতা ছিলেন ব'লেই আমি তাঁর ছবি
আঁকি নি—আঁকলে সে হ'ত ঐ যে বললাম অর্থহীন ছবি-আঁকা
"recording unco-ordinated facts"—আর্ট ফর আর্টস্ সেক
বুলির ব্যর্থ চালে। আমরা চাই শ্রীঅরবিন্দের বাণীর বহুল প্রচার:
Art for the Divine's sake. দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ বয়সে মিস্টিক
হয়েছিলেন, গিরিশমেশোর বেলায়ও ঐ কথা—দ্বিজেন্দ্রলালের
অসামান্য প্রভাবে তাঁর নাস্তিক মনেও আস্তিক ভক্তির উদয় হচ্ছিল
—সে জন্য অতবড় তার্কিক হয়েও মেশো আমাকে পই পই করে
মানা করতেন পিতৃদেবের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে—আমাকে বলে-
ছিলেন শেষ জীবনে (বিশেষ ভাবিত হ'য়ে) যে, ভগবানকে চর্ম্ম-
চক্ষে দর্শন করা যায় আমার এ শিশু বিশ্বাস যদি বজায় রাখতে
পারি তো ভালো, মনে শান্তি পাব—কারণ সত্য যে কী তিনি
বুঝতে বেশ পাচ্ছেন। এ-বিকাশ যদি তাঁর মধ্যে না দেখতাম তো
বলতাম তাঁর মধ্যে গভীর দৃষ্টি গভীর শ্রুতির উন্মেষ হয় নি—আ
তাহ'লে তাঁকে নিয়ে আর যাই করি না কেন—স্মৃতিকথা লিখতে
যেতাম না এ ধ্রুব। আমার স্মৃতিকথার মধ্যে সম্ভবত যে সব
কথা আমার কাছে অতি তুচ্ছ just a collection of facts
তাকেই তুমি বলছ "অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক"—আর এরই নাম
"misplaced seriousness" কিন্তু তো বন্ধো। এইটিত যে
ঐকান্তিক লক্ষ্য সেটিকে বাদ দিয়ে ওর হাবিজাবি নানা গুণের
তারিফ কেউ করলেই বা কী আর না করলেই বা কী? ভারতীয়
দুটি শ্রেষ্ঠ মন যুক্তির পথে চলতে গিয়েও ক্রমশ ভক্তির ভক্ত হয়ে
উঠেছিলেন (শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধেও এই কথা—যা আমার "আবার
ভ্রাম্যমাণে" লিখেছি) এই ছিল আমার চিত্রনীয়—বর্ণনীয়,
শিল্পিভঙ্গিতে অবান্তর স্মৃতিকথা লেখাই ছিল আমার কাছে গৌণ
—অবান্তর। দ্বিজেন্দ্রলাল অতবড় তেজস্বী মানুষ হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ-
কথামৃত পড়ে তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেছিলেন আমাকে যে,
পরমহংসদেব মহাপুরুষ একথা তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ ঐ
দোরটা। তাঁর এই উপমাটি আমার কাণে অবিস্মরণীয় রেশে আজও
বাজে—যে ঝংকার শ্রী ম-র গায়ে কাঁটা দিয়েছিল—উদাসীতে এ
কথা কি লিখেনি লেখার মত করে? অর্থাৎ কথাটি শিহরণ-জাগানো
কথা বলেই তিনি শিহরিত হয়েছিলেন। কেন না দ্বিজেন্দ্রলালের
তখনো বুদ্ধিবাদের নেশা কাটে নি—তবু কেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের
কথামৃত পাঠ করতে না করতে কেন নতুন নেশার অভিভূতি তাঁকে
পেয়ে বসল? না, প্রকৃতিতে তিনি উদাসী ছিলেন বলে। তাঁর
জীবনের এই "উদাসী" দিকটাই আমার চিত্রণীয়—তাঁর কবিত্বের
গানের পরম পরিণতি তাঁর ভক্তির বিকাশে, এই ছিল আমার
বর্ণনীয়। অথচ এই মুখ্যকেই তুমি বলেছ অবান্তর, ও
অবান্তরকেই ধরেছ মুখ্য। Jules Lemaitre আবার বলে-
ছিলেন যে অনেকেই দেখি মপাসাঁকে বড় বলেন কিন্তু যে জন্যে
তিনি বড় সেটার তাঁরা দেখি আদৌ ধার ধারেন না। "উদাসী
দ্বিজেন্দ্রলাল" সম্বন্ধে তোমার স্পষ্টভাষী নিন্দা তথা স্তুতিতে এই
কথাই মনে পড়ল: অর্থাৎ যে জন্যে তুমি বইটিকে ভালো
বলেছ সেই খানেই সে সামান্য, যদি অসামান্যতা ওর কিছু থাকে
তবে সেটা ওর সেই গুণেই যাকে তোমার কাছে মনে হয়েছে
"অবান্তর"। তবে ভাগবতী ভরসা এই যে, নাস্তিক্যের মধ্যে দিয়েও
প্রেমের ঠাকুর অনেককে টানেন আস্তিক্যের দিকে। আণবিক
বোমা থেকেই হয়ত তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া দানবিক

অবোধ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমি যে জানি না কিছুই বন্ধু আজো—
এটুকু জানাও জানার মতন ক'রে…
যে-দেখার মাঝে তুমি নীলমণি রাজো
আকুল আঁখি সে-নয়নমণির তরে।
(মন যে কেমন করে…সেই আঁখি হতে আঁখি তরে)
চারিদিকে ছায়া…কাঁটায় কুসুম-ভ্রম!
সোনামুঠি হয় ধূলামুঠি—ধরি যবে…
প্রিয় আশা যত, কল্পনা নিরুপম
শিহরণ আর আনে না তো সৌরভে!

কেন—জানি না তো…জানি শুধু—বাসি ভালো
পাই বা না পাই তোমার মিলনবর:
তুমি যদি তব মুরলী-উষা না জ্বালো
নিশান্ত মোর চাহে না এ-অন্তর
বিরহের মরুবুকে প্রেমতরু সাজে—
জানি—তবু ভুলি বেদনার বালুচরে।
কালো মেঘভয়ে আলোর অভয় রাজে
এটুকু জানাও জানার মতন ক'রে।
(মন যে কেমন করে…সেই আঁখি হ'তে আঁখি তরে

বিপন্না

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

এক

যোগ্যের সাথে যোগ্যের মিলন সুশোভন। ফুল্ল কমলের 'পরে অরুণ-কিরণ, চাঁদিনী রাতে বশোরা গোলাপের কুঞ্জে বুলবুল্-কাকলী এবং চিত্রা-চন্দ্রমার সান্নিধ্য অবিসম্বাদী সৌন্দর্য্য। কিন্তু জীর্ণকুটীরের ভাঙ্গাচালের রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে চাঁদের কিরণ চুঁইয়ে পড়লেও সে অযোগ্য পরিবেশে হিমাংশু অপ্রীতিকর হয় না। এ-কথা মনে জাগলো সে-দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, হিমালয়ের পাদ-মূলে দেরাদুন ষ্টেশনে!

আমি বিশ্রাম-কক্ষে মালপত্র রেখে, হাতমুখ ধুয়ে, প্ল্যাটফরমের প্রান্তে গেলাম মুশৌরী পাহাড়ের অঙ্গে বিজলী-আলোর মালা দেখতে। কিন্তু আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল বিসদৃশ পরিবেশের মধ্যে এক হেম-প্রভা শ্রীমুখে।

ভূষণহীনা, ছিন্নবসনা কে সে সুন্দরী? রেশমী সাড়ীর স্থানে স্থানে ধূলার দাগ। সাড়ীর প্রান্ত হ'তে একটা টুকরা ছিঁড়ে চলে গেছে। আমি সৌজন্য ভুলে তার মুখের দিকে তাকালাম।

মহিলা মুখ ফিরিয়ে নিলে। সধবা। তার সিঁথিতে সিন্দুর-বিন্দু জ্বলছিল। কপালের সিঁদুরটিপ হাওয়ায়-দোলা-জলের পরে চাঁদের রশ্মির মত এলো-মেলো রেখা সম্পাত করছিল! বিপন্না নারী—কিন্তু বিপদ তার অন্তরের হাসির ফোয়ারা শুকাতে পারে নি। কারণ, তার অধরকোণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল হাসির রেখা—বিদ্রূপের হাসি, নিজের উপস্থিত মলিনতাকে তাচ্ছিল্য করা হাসি, অ্যায়সা-দিন-নেহি-রহেগা নীতির বিমোহন প্রমাণ।

চিত্তে হিল্লোল উঠলো। মস্তিষ্কের কল্পনা-কেন্দ্রে স্পন্দন অনুভূত হ'ল। কার্য্য হতে কারণে ফেরবার পথে ধাপে ধাপে পেছিয়ে প্রধান সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম—মহিলা অতি অল্পকাল পূর্ব্বে গুরু বিপদের কবল হ'তে রক্ষা পেয়েছে। ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ বাস বিপদের প্রমাণ। চাপা হাসির উপকরণ—উদ্ধারের আনন্দ এবং সহজ সজীব অন্তরের মাধুরী।

সৌজন্যের চক্ষুলজ্জা স্পষ্ট অনুসন্ধানের বিরোধী হল। ট্রেণ ছাড়তেও তিন ঘণ্টা বিলম্ব। সক্রিয় মনের মধ্যে ধাঁধা। এ-ক্ষেত্রে প্ল্যাটফরমের এ-মোড় হতে ও-মোড় অবধি পাল্‌টি মারা আর আড় নয়নে মহিলার সর্ব্বাঙ্গে বিপদ্ ও উদ্ধারের প্রমাণ দেখা ভিন্ন অন্য কার্য্য সমীচীন মনে হল না।

মোটর-গাড়ি কিম্বা টাঙ্গা গাড়ী হতে পপাত ধরণীতলে? ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল এবং দেহে পথের ধূলা তার সাক্ষ্য। কিন্তু ভূষণ-হীনা কেন? ছুবার পাল্‌টি মারার অবসরে বিপন্নার মণিবন্ধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, অবশ্য অপাঙ্গে। চুড়ি, বালা বা কঙ্কণ অপসরণের সদ্যপ্রমাণ তার কোমল বাহুতে বিদ্যমান। কেবল মণিবন্ধে নয়, করতল-পৃষ্ঠে লাল দাগ—জোরে অলঙ্কার ছিনিয়ে লওয়া হয়েছে তার দেহ হ'তে। তা হ'লে তার মলিনতার কারণ দস্যুতা।

কী ভয়ঙ্কর! অঙ্গ শিহরে উঠলো। সিগারেটের প্যাকেট হ'তে শেষ চুরুটটি বার ক'রে, তার মুখাগ্নি করলাম। প্রচ্ছন্ন কোনান ডয়েলী সাধ তরঙ্গায়িত হ'ল মনের নিভৃতে। মহিলা নিঃসঙ্গ। তবে কি তার সঙ্গী দস্যু-শিবিরে বন্দী? মৃত নয়, কারণ—সদ্য বিধবার হাসির রেখা ফোটে না। আর সিন্দুর-বিন্দু বিধবা-ললাটে একটা হেঁয়ালীর উদ্ভট শ্লোকে মাত্র ব্যক্ত। বাস্তব সংসারে বিধবা-ললাটে সিঁদুর অসঙ্গত। সুতরাং স্বামী জীবিত, হয়তো হাঁসপাতালে। না, তা হ'লে যত্র স্বামী, স্ত্রী থাকতো তত্র।

ফের যখন পাক্ খেয়ে পৌঁছিলাম বিপন্নার সান্নিধ্যে, তার সাথী জুটেছে। তাড়াতাড়ি তার বেঞ্চি ঘেঁষে চলবার মতলব করলাম। এবার কেহ দোষ দিতে পারবে না—একাকিনী শোকাতুরা নারীর কাছে পৌঁছিলে বা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সোজাসুজি তার কাতর কমলমুখে তাকালে।

মানুষটি বাঙ্গালী—আলুথালু বেশ। কোটের একটা হাত কনুই হইতে বৃত্তাকারে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। পিঠে কাদা। মাথায় ডাক্তারখানার পট্টী। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হল বিচার-ফল অভ্রান্ত ভেবে। তাদের প্রতি সহানুভূতি হল বিপদ স্মরণ করে। নিকট হতে নিকটে আসবার সময় সিদ্ধান্ত করলাম যে, ভদ্রলোককে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করব ব্যাপারটা।

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসছিল। তারা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। অর্থাৎ তাদের ভাবগতিক দেখে এই কথা মনে হল। পুরুষটির পিছনে গিয়ে বল্লাম—আজ্ঞে ক্ষমা করবেন।

সে চকিতে ঘুরে গেল। মহিলার মুখে আকস্মিক ভীতির লক্ষণ দেখা দিল। মানুষটিও চকিত ভীত। একটা ভীষণ কাণ্ডর পর স্নায়ুর এমন অবস্থা অস্বাভাবিক নয়।

আমি আবার বল্লাম, আজ্ঞে ক্ষমা করবেন। অপরাধ নেবেন না। আপনাদের বিপন্ন মনে হচ্ছে, তাই অপরিচিতের—

বাকী কথা বলবার পূর্ব্বেই বিস্মিতের মুখে সাধারণ ভাব ফিরে এলো। সে বল্লে—অ্যাঁ—ভবতোষ না? হ্যাঁ, নিশ্চয়—উঁহু—হ্যাঁ নির্ঘাত ভবতোষ—ভবু।

তাই তো! কালাচাঁদ নাকি? বল্লাম—হাঁ কা—লা—কালা—কী?

হাঁ রে ভাই! হাঁ। কালাচাঁদ। কালু। কালাচাঁদ গুর।

আমি বল্লাম—কী সর্ব্বনাশ। দশ বছর পরে দেখা, কিন্তু এ কী কাণ্ড।

সে বল্লে দেখা বোলে দেখা! মান, প্রাণ সব রক্ষা পাওয়ার দেখা। কী, কাণ্ড! দেখছো ব্যাপার?

তাতো দেখছি। কিন্তু ছেলেবেলার যাত্রার ভাষায় বলতে হয়—এ দশা তোর কে করিল?

সে বল্লে—কবিতার ভাষায় বলতে হয়, পতন-অভ্যুত্থান-বন্ধুর পন্থা, যুগে যুগে ধাবিত যাত্রী—যেদ্দাও ভাই।

তার সঙ্গিনী, পরে শুনলাম জীবন-সঙ্গিনী ভার্য্যা প্রথমটা একটু সুখ বোধ করছিল। বিপদের সময় পতির পরিচিত বন্ধুর আগমন সত্যই সুখের ব্যাপার। কিন্তু যখন এরা কবিতা আওড়াতে লাগলো নিশ্চয়ই তার অস্বোয়াস্তি বাড়লো। কারণ, তার মুখ গম্ভীর হল। অতি মৃদুস্বরে স্বামীকে বললে এ সময় ওসব। না কিছু না।

সুরে ভর্ৎসনা ছিল—যেমন চাকভাঙ্গা মধুতে এক একটা থাকে মৌমাছির ছিন্ন হুল।

আমি সামনে গিয়ে বল্লাম—হ্যাঁ, বিপদ হয়েছে বুঝতে পারছি। ডাকাতি—চুরি—

ঠিক সেই সময় লাইনের উপর একটা ইঞ্জিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে তার সাথে মিশে গেল কালাচাঁদ-ঘরণীর দীর্ঘশ্বাস। আমি লজ্জিত হলাম।

কালাচাঁদ বললে ডাকাতি বোলে ডাকাতি! বেটারা সর্ব্বস্ব তো নিয়েছে। নলিনীর সাড়িখানাও আস্ত রাখেনি।

তোমার কোটটাও না।

আমার সহানুভূতি আবার নলিনীর ম্লান মুখে হাসি ফোটালে।

দুই

বাল্যকালে কালাচাঁদ সুরকে কেন্দ্র ক'রে আমরা রকমারি আনন্দ উপভোগ কর্ত্তাম। কারণ ছেলেটা ছিল এক বগ্‌গা, পাড়ার গোষ্ঠদা'র ভাষায় ক্যাবলা-খ্যাবলা। ঐ দুর্ব্বোধ বিশেষণ ছাড়া অন্য উপাধিও জুট্‌তো তার ভাগ্যে। কেহ বলত ল্যালাক্যাপ্পা, কোনো কোনো বন্ধু তাকে বোকচন্দ্র ব'লে নিজের রসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রোপাগাণ্ডা করত। কালাচাঁদ এ সকল বিদ্রূপ-বাণে নিজের চলার পথ ছেড়ে এক ধাপ বাহিরে চল্‌তো না। আকাশের চাঁদের মত কালাচাঁদ কলায় কলায় বৃদ্ধি পেতো নিজের খেয়ালে।

মানুষটা অসাধারণ সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। প্রথম প্রথম সে মশা ও মাছির পার্থক্য জানতো না। গায়ে মশা কামড়ালে বলতো মাছি কামড়েছে, মুড়কীর মোয়ায় মাছি বসলে বলতো মশা খাচ্চে। ছাগল-ভেড়ার প্রভেদ কি সে কথা বোধ হয় সে আজও জানে না, এই ছিল আমার ধারণা।

বোকা সে মোটেই ছিল না। একদিন এক টুক্‌রো বরফ কিনে বাড়ি যাচ্ছিল, আমাদের পাড়ার নটবর তাকে থ্রি-শিক্স খেলতে আহ্বান করলে। যখন খেলা শেষ হ'ল কালাচাঁদ দেখলে বরফ জল হ'য়ে দেহত্যাগ করেছে। গতর সম্বন্ধে অনুশোচনা না ক'রে সে এক টুক্‌রো ইটকে ভুষির মধ্যে ভোরে ধীরে ধীরে বাড়ি চলে গেল। তারপর তার মেশোমশায়ের সঙ্গে বরফওয়ালার সঙ্গে যে সব শব্দবিনিময় হ'ল পল্লীর তরুণেরা তা' হতে বহু নূতন কথা শিক্ষা করলে।

সাধারণ ব্যবহারে সৃষ্টিছাড়া হ'লেও ব্যবসায়-বুদ্ধিতে তার মেধার মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যেতো। সে পুরাতন পাঠ্যপুস্তক কিনতো। তাতে দাম লাগতো কম, আবৃত্তির সময় কথা ভুল হ'লে, সে বলতে পূর্ব্ব সংস্করণে ঐ রকম পাঠ আছে। শিক্ষক হকচকিয়ে যেতেন, দুর্জ্জন বলে তাকে দূরে পরিহার কর্ত্তেন।

একবার রথের হাট থেকে আমরা যখন চন্দনা, টিয়া বা ময়না কিনে বাড়ি ফিরলাম, কালাচাঁদ ঘরে আনলে এক লক্ষ্মীপেঁচা। পাড়ার ছেলেরা যখন একজোটে তাকে আক্রমণ করলে, তার ধীর উত্তর শুনতে হ'ল সকলকে বিস্ময়মুগ্ধ কাণে। লক্ষ্মী পেঁচার খরিদ্দার ছিলনা। কত বড় পাখী মাত্র দু'আনা দাম। মা লক্ষ্মীর বাহন, পুষলে গৃহে কমলার কৃপাকণা বর্ষিত হ'তে পারে। একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে ইঁদুর খাইয়ে। তাতে খরচ নাই, বাড়ি মূষিকশূন্য হ'বে, তার ফলে চাল ডাল, মুলো, বেগুন, জুতা, কাপড়, সকল পদার্থ সর্ব্বভুক ইঁদুরের আক্রমণ হ'তে নিষ্কৃতি পাবে।

বার বার চার বার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হ'য়ে কালাচাঁদ তাদের পৈত্রিক লোহার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হ'য়েছিল। সে আজ দশ বছরের কথা। ঠিক সেই সময় আমরা পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায়, শেষে দিল্লি চলে এসেছিলাম।

পৃথিবী যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি ছোটো। যেমন একবার চোখের আড়াল হ'লে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সারা জীবনেও কোনো সমাচার পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি হঠাৎ বিস্মৃতির গহ্বর হ'তে লাফিয়ে ওঠে মানুষ। তার সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রী সঙ্কুচিত হয়ে মাত্র পুরাতন বিঘা কতক জমির আকার ধারণ করে। দশ বৎসর পরে!

তিন

দশ বৎসর পরে শৈশব ও বাল্যের খেলার সাথীর দৈবাৎ সাক্ষাতে জীবন বহু বৎসর পেছিয়ে গেল। নানা চিত্র জাগলো মনে বাল্যের জোড়াসাঁকোর পটভূমিতে। অনেক মুখ ফুটে উঠলো সে ছবিতে—আশু, দাশু, ছকু, হুধি, দিলু, পান্না—কিন্তু এদের বিপদ তাদের সরিয়ে রাখলে। ভিড় ঠেলে আত্মপ্রকাশ করলে কালাচাঁদ।

আমার নূতন সাবানে মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার তোয়ালের সাহায্যে পরিচ্ছন্ন হয়ে, আমার ধুতি, সার্ট এবং কোটে কালাচাঁদ শোভিত হ'ল। শ্রীমতী নলিনী সুরও স্নানের পর ধুতির উপর শাল চাপা দিয়ে হাস্যময়ী হ'ল। সস্তা খোঁজা দাঁওবাজ কালাচাঁদ নিজেদের কাপড়গুলা পুটলী বেঁধে যখন গুছিয়ে রাখলে মনে পড়লো তার দেশলায়েব কাটির শূন্য খোল সংগ্রহের কথা। কিন্তু তার বর্ত্তমান ছিন্ন বস্ত্র-সংগ্রহের সে কৈফিয়ত দিল।

পুলিশ এগুলা নেবে। যদি ডাকাত ধরা পড়ে সাক্ষী হবে এগুলা তাদের অত্যাচারের।

ভোজনের পর সে ডাকাতির বিবরণ দিল।

একমাস তারা দেরাদুনের বাহিরে রাজপুরের পথে একটা বাঙলোয় বাস করছিল। যুদ্ধের দিনে সাদা-কালো বাজারে জগদীশ্বরের কৃপায় তার কিছু লাভ হয়েছিল।

আমার স্মৃতি-পটে ভেসে উঠলো বাল্যের এক পেচকের মুখ, গম্ভীর দার্শনিকের মত, নিবিড় অন্তর-চাওয়া কোটরগত চক্ষু। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' ইত্যাদির ফলে, কালাচাঁদ মা-লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেছিল।

তাদের দেশে ফেরবার সময় হয়েছিল। যুদ্ধের শেষ দশায় আবার এক দফা লাভের অবকাশ আসতে পারে, বুদ্ধি কোরে কারবার চালাতে পারলে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হ'ল এক সাধু। বিরাট চেহারা, এক মাথা জটা, হাতে শুকনো লাউয়ের কমণ্ডলু। মানুষটি মিষ্টভাষী।

এবার খুব হাসলে নলিনী। পাখীর বেলা কিনেছিল সে লক্ষ্মীপেঁচা। কিন্তু গৃহে এনেছিল জীবন্ত কমলা। যারা কালাচাঁদকে বলতো ক্যাবলা-খ্যাবলা, ইচ্ছা হল তাদের কাণ ধরে এনে কালাচাঁদ-গৃহিণী নলিনীর বিমোহন হাসি দেখাতে।

কালাচাঁদ সাফাই গাহিল। যখন দুনিয়ায় অর্থই প্রধান সুখ—দৈববলে অর্থ-সংগ্রহ অন্যায় কিসে? এ দেশে সাধুসন্ত মহাপুরুষের কৃপায় ধনলাভ করেছে এমন লোকের অভাব নাই! ক'দিনের পরিচয়ে কালাচাঁদ অভিভূত হ'ল। একদিন প্রসঙ্গক্রমে সাধু বল্লেন—পরমরত্ন জগদীশ্বরে ভক্তি। সংসারে রত্ন চারিদিকে ছড়ানো। সে দুদিনের খেলার সামগ্রী মাত্র।

কালাচাঁদ চায় খেলা। খেলার সামগ্রী স্পর্শ করা যায়। দেখা যায়, তার সঙ্গসুখ প্রত্যক্ষ। সে বল্লে, বাবাজী, পরমরত্ন মাথায় থাক্। সংসারের খেলার রত্ন খুঁজে পাওয়া যে দারুণ সমস্যা। আজ কালকার দিনে দশ হাত মাটি কাটলে একটা পয়সা জোটে না। অদৃষ্ট চাই। বিদ্বান্ খেতে পায় না। বুদ্ধিমান্ দেশোদ্ধার করতে গিয়ে জেল খাটে।

এবার নলিনীর শিশির-ধোয়া অর্থাৎ ষ্টেশনের স্নানের ঘরের জলে ধোয়া, শ্রীমুখ উদ্ভাসিত হ'ল বিষন্ন হাস্যে।

আমি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশীল মুখ দেখে বিগলিত হয়েছি। কিন্তু সেই রমণীকে হাসতে দেখে বীভৎসরসের আমেজ পেয়েছি, আমার চিত্তের নিভৃতে। সে মুখ কান্নার সুষমা বিকীর্ণ করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। চির-রসিক গুছিয়ে কাঁদতে পারে না। সে-দিন মুশোরী ষ্টেশনে সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, বিশ্ব-শিল্পী শ্রীমতী নলিনী সুরের মুখ গড়েছেন হাসির মাধুরী বিকাশের জন্য। হাসিতেই সে মুখের পর্য্যাপ্ত পরিণতি। অন্য ভাবে প্রকাশের জন্য সে মুখ রচিত হয় নি।

সে হেসে বল্লে—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

সে সুর মিঃ সুরের কাণে বে-সুরো লাগলো। সে বল্লে—লোভ নেই এমন মানুষ দুর্ল্লভ। মুনি-ঋষিরাও ভগবানের লোভে—

আমি বল্লাম—থাক্ থাক্! দাম্পত্য-কলহে কাজ নেই।

আর এক দফা সার্ব্বজনীন হাসির পর কালাচাঁদ বল্লে—আরে ভাই কও কেন কথা। লোকটা তার গেরুয়ার থলির ভেতর থেকে এক টুকরো গেরি মাটি বার করে আমার হাতে দিলে। আজ আমার স্ত্রী পরিহাস করছেন, সে সময় ওঁরও, আর কি বলব।

মোট কথা, গৈরিকের টুকরায় সোনার রেণু মেশানো। সাধু সে-দিন চলে গেল। যাবার সময় বল্লে—পাহাড়ের সহস্র গুহায় এমন স্বর্ণ-রেণু মৃত্তিকা-রেণুর সাথে মিশে আছে। হরগৌরীর প্রতীক হিমালয়। হর—গৈরিক, সন্ন্যাসী। গৌরী—সোনার বরণী, সোনার অঙ্গ। শিব—কঠিন নীরস পাথর, দুর্গা—রত্নাভরণা—হীরা, পান্না, চুনী, ফিরোজা কত ছেলে-খেলার জিনিস।

বেচারা কালাচাঁদ। সে দু'পয়সার চীনাবাদাম কিনতো। দু'কিস্তিতে। কারণ তাহ'লে দু'বার ফাউ পাবে। সে একবার গুঁড়ি মেড়ে ছোটো হ'য়ে সিনেমার হাফ্ টিকিট কিনেছিল, কিন্তু বে-রসিক দ্বার-রক্ষী তার মাথার মৌলিকতার অসম্মান ক'রে পুরা দাম আদায় করেছিল। এহেন কালাচাঁদের নিকট হরগৌরী ব্যাখ্যা তার প্রকৃতিগত লোভ-সাগরকে উদ্বেলিত করলে।

সন্ন্যাসী যখন চলে গেল সে গৈরিককে শীতল জলে, গরম জলে ধুয়ে, মোটা কাপড়, সূক্ষ্ম শান্তিপুরের সাড়ীর টুকরা প্রভৃতিতে ছেঁকে, দু'ভরি সোনা বার করলে। দু'ভরি সোনা! যুদ্ধের বাজারে!

সে বল্লে—আজ নলিনী হাসছে। সে-দিন ওর হাসিতে ছিল সোনার স্বপন।

শ্রীমতী নলিনীর রসবোধ উদ্বুদ্ধ হ'ল। সে নাটকীয় ভঙ্গিতে বল্লে—নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা রে দূত।

তখন তাদের কাজ হ'ল সাধুকে খুঁজে বার করা কালাচাঁদ হাটে-বাজারে ঘোরে, সাধু মেলে না। চড়াই উঠে হাঁফিয়ে যায়। কুলি মেলে, কুলটা মেলে, রাজপথে সাহেব চলে, মেম চলে, কিন্তু অচল হিমাচল-পথে সাধু চলে না।

তিন দিন পরে সাধু যখন মিল্লো সে একেবারে তেল-মাখানো মাগুর মাছের মত পিচ্ছিল। কিন্তু কালাচাঁদ নাছোড়-বান্দা। অবশেষে সাধু সম্মত হ'ল সোনার ধুলা মাখানো গৈরিক গুহার সন্ধান দিতে। কিন্তু সে সন্ধানের মূল্য-স্বরূপ কালাচাঁদকে এক ভীষণ প্রতিশ্রুতি দিতে হলো।

কালাচাঁদ বল্লে—কী করি। রাজি না হ'লে বাজিমাত হয় না। আর প্রতিজ্ঞাও এমন কিছু না। সোনায় গুঁড়া-মাখানো গেরি-মাটির পাহাড়ের গুহা যে-দিন দেখিয়ে দেবে, সে-দিন সাধু আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দেবে। সেই ইষ্টমন্ত্র সাঁঝে সকালে দশবার ক'রে জপতে হবে। আরে বাবা পেটে খেলে পিঠে সয়, মন্ত্রতো ভারী।

তারপর স্বামীজি বল্লেন—পুলিশ দুষ্ট। শিবের দেওয়া দান তাও ভাগ্যবানকে নিতে দেবে না। সেবার আর এক পুণ্যবান্ এক বাক্স গেরি-সোনা নিয়ে যেমনি রেলের ষ্টেশনে এলো অমনি ঘ্যাঁক।

এই সব আলোচনার ফলে স্থির হ'ল যে মাত্র একটি চামড়ার সুটকেশ নিয়ে কালাচাঁদ ও শ্রীমতী টাঙ্গায় চড়ে জঙ্গলে যাবে। টাঙ্গা-চালক বিশ্বাসী শিষ্য। অন্য একজন শিষ্য কালাচাঁদের মাল-পত্র নিয়ে বিবিওয়ালায় যাবে। সেখানে মোটর হাজির থাকবে। ওরা গেরি-সোনা নিয়ে সেখানে টাঙ্গা ছেড়ে মোটরে উঠবে। মোটর বনপথে রুর্কী পৌছে দেবে ওদের। তারপর তারা রেল-পথে যথা-ইচ্ছা যাবে।

ব্যবসায়ী কালাচাঁদ এ-সব ব্যবস্থাকে সাধারণ বিষয়-কর্ম্মর মতো দেখলে। শ্রীমতী নলিনী রোমান্টিক। এ-ব্যাপারে গুহা আছে, পুলিশ আছে, টাঙ্গা ছেড়ে মোটর ধরা আছে। বন জঙ্গলের তো কথাই নাই। ঝোপে ভালুক থাকে জঙ্গলে হরিণ থাকে এ-সব সমাচর—তার রসবোধকে তীক্ষ্ণ করলে, আগ্রহ বাড়ালে! তারা নিজের নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহচর্য্যে যে দু'টি চিত্র আঁকলে, সে চিত্র ভিন্ন রঙে রঙীন। কিন্তু উভয়ের রুচির অনুপাতে চিত্ত-বিমোহন চিত্র।

তার পর?

তারপর একজন দস্যু বন্ধু সেজে ওদের আসবাবপত্র, প্রবাসের ঘর করনা নিয়ে হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। জঙ্গলের মাঝে একটা গুহার ধারে দস্যু-সর্দার স্বামীজি স্বয়ং ওদের সর্ব্বস্ব হরণ করলে। শ্রীমতী নলিনীর অঙ্গের আভরণ নিজের হাতে খুলিবার বিলম্ব সহ্য

হ'ল না। সাধু-বাবা স্বহস্তে হাস্য-মুখে তাকে নিরাভরণ করলে।

এই রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবৃতির সময় কালাচাঁদ-গৃহিণীর সুন্দর মুখের উপর দিয়ে নানাভাব খেলে গেল। কিন্তু তার চিত্তের ভিত্তি কৌতুক-প্রিয় অনায়াস আনন্দের লীলা-ভূমি। ঘটনার মূলে ছিল স্বামীর লোভ এবং নিজের কৌতুক অন্বেষণ, সুন্দরী সে কথা বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু দস্যু তার বরদেহ হ'তে অলঙ্কার খুলে নিয়েছে, এ কথা বলবার সময় তার মুখ হল সিঁদুর-বর্ণ। তার চোখের ভিতর হতে আগুনের ফুলকী নির্গত হচ্ছিল। সত্যই ঘটনার সে অধ্যায় বড় বিষাদের—কালাচাঁদের দিক হতে সম্পত্তি-নাশ, শ্রীমতীর দৃষ্টি-ভঙ্গিতে নারী-নিগ্রহ।

সঙ্গে আড়াই শত টাকা ছিল। পথ খরচের জন্য মাত্র পঞ্চাশ টাকা রেখে, বাকী দুশো টাকা বন্ধুর হাতে দিয়ে তাদের নিকট বিদায় নিলাম।

গাড়ি ছাড়বার পর নানা কথার মধ্যে একটা কথা স্মরণ হল। আমি কালাচাঁদকে আমার দিল্লির ঠিকানা দিয়েছিলাম, তার কলিকাতার ঠিকানা গ্রহণ করিনি। মাত্র প্রসঙ্গক্রমে একবার সে বলেছিল যে সে শ্যামবাজার পল্লীতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করেছিল।

চার

দিল্লি ফিরে কাজের ভিড়ে কালাচাঁদের গৃহিণীর চাঁদ মুখ মাঝে মাঝে মনে পড়ত না, এ কথা হবে ভণ্ডামী। কারণ ব্যথার পট-ভূমিতে রহস্যের হাসি জগতে বিরল। সংবাদপত্র খুলে দেখতাম পুলিশ তাদের নিগ্রহকারী দস্যুদের গেরেপ্তার করেছে কিনা। কিন্তু বাহাদুরী দেরাদূনের সাংবাদিকের। এত বড় রহস্য-কাহিনী কোনো সাংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হ'ল না। অথচ—যাক্।

কালাচাঁদের কোনো পত্রাদি পেলাম না। বুঝলাম ঠিকানা ভুলেছে। মুশৌরী ছেড়ে দিলাম কোজাগরী পূর্ণিমায়।

জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এক বিচিত্র সংবাদ পেলাম।

আমার ডাক্তার খানায় কলিকাতার এক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করতে এলেন। এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মুশৌরী হোটেলে। ইনি কলিকাতার উকীল। নাম সরোজ চক্রবর্ত্তী।

সরোজ বাবু কালীপূজার কয়েকদিন পরে দেরাদূন পৌঁছে-ছিলেন। সেখানে তিনি এক দম্পতীর সাক্ষাৎ পান। মহিলা হাসি-মুখী, মলিনা, অপহৃতা, ছিন্ন-বসনা। পুরুষটির পায়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, খোড়া।

তাদের বিপদের ইতিহাস কালাচাঁদ-নলিনীর নিগ্রহের অনুরূপ। এঁরা দেরাদূনে পপলার-লজে বাস করছিলেন। ভদ্র-মহিলার হীরার সখ। এক সন্ন্যাসী একমুঠা উপলের মধ্যে হীরার টুকরা দেখিয়ে তাদের মুগ্ধ করে। দেরাদূনের বাহিরে এক জঙ্গলের গিরি-নদীর সৈকত তেমন অপরিষ্কৃত হীরার টুকরায় পূর্ণ—এই প্রলোভন দেখিয়ে কয়েকজন গুণ্ডায় তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছিল। মোটর গাড়ি বিবিওয়ালা, রুর্কী প্রভৃতির উপসর্গ কালাচাঁদী গল্পের উপসর্গের সঙ্গে হুবহু এক রকম। রকমফের মাত্র স্বর্ণ-রেণু ও হীরার টুকরার লোভের কাহিনী।

—বিপন্নের নাম কি? কোথাকার লোক?

সরোজবাবু বল্লেন—চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার ব্যবসায়ী। মহিলা সুন্দরী।

শ্রীমতী নলিনীর বিপদের হাসি তার নিজস্ব ছিল না। এ বিপন্না শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিপদের মূল-কারণ, নিজের ও স্বামীর লোভকে পরিহাস করে, আপনার উদার, কৌতুক-প্রিয় মনোবৃত্তির দৃষ্টান্তে সরোজ চক্রবর্ত্তীকে মুগ্ধ করেছিল।

আমরা উভয়ে সিদ্ধান্ত করলাম যে মানুষের মন বিচিত্র। একই উৎপাতের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন মনে বিভিন্ন। এই ভিন্নতার উদাহরণ বিবৃত করলে মুশৌরী হ'তে প্রত্যাগত অন্য এক যাত্রী। বিপদের কর্ত্তা সেই একই গুণ্ডার দল। বিপদ টেনে এনেছিল সেই একই কারণ—অতি লাভের লোভ।

এ দম্পতী কেঁদে ভাসিয়ে দিতেছিল দেরাদূন ষ্টেশন। কেবল তাই নয় একজন অন্যকে অপরাধী করছিল। স্বামী ফাঁদে পড়েছিল, বস্তু লাভের প্রলোভনে। অর্থাৎ স্বামীজি তাকে বলেছিল, বনের মাঝে এমন সাধু বাবা আছেন যাঁর স্পর্শে সকল দুঃখ মোচন হয়, দুঃস্বপ্ন নিরোধ হয়, দুর্ভাবনা লোপ পায়। তাদের দাম্পত্য-কলহে সে সব উক্তি শোনা গিয়াছিল তার ফলে আর এক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেল অপহৃতের। ভদ্রলোক কালা-বাজারের চাল ও কাপড় বেচে দু'পয়সা লাভ করেছিলেন, অথচ পরম বস্তু লাভের আশা বা দুরাশা চিরদিন আলোড়িত করত, তার হৃদয়ের নিভৃত ভাব-ভাণ্ডার। সে যাত্রীর মুখে এই সমাচার পেলাম তিনি সপরিবারে দেশ ভ্রমণ করছিলেন বলে বিপন্না শ্রীমতীর শ্রীমুখে উক্তরূপ স্বামী-নিন্দা শোনবার অবকাশ পেয়ে-ছিলেন।

দেরাদূনে সম্ভবতঃ একই দস্যু-দলের হাতে বাঙ্গালী প্রবাসী-নিগ্রহের ব্যাপারে স্থানীয় পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা বা উদাসীনতা শোচনীয়—এ সিদ্ধান্ত আমাদের সকলকে ব্যথিত করলে।

পাঁচ

বড় দিনে কলিকাতায় বেড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ নিউমার্কেটে সাক্ষাৎ পেলাম কালাচাঁদের।

—হ্যালো। ডাঃ ভবতোষ সেন। কবে এলে?

উত্তর দিলাম যে তার ঠিকানা জানতাম না তাই সাক্ষাৎ করতে পারিনি।

সে ঠিক ঐ কথাই বল্লে। তার ধারণা ছিল আমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র মীরাট তাই তার পত্রগুলা আমার নিকট পৌঁছেনি।

সে আমার বাসায় এলো।

প্রসঙ্গ হতে প্রসঙ্গান্তরে চল্লো গল্পের স্রোত। শেষে সে নীতি সুধা পরিবেশন করলে।

—পৃথিবী রত্ন-গর্ভা নয়—রত্নে গড়া। কেবল ছড়ানো রত্ন তুলে নিতে জানেনা, তাই বহু লোক দারিদ্র্য-দুঃখে ক্লিষ্ট।

আমি বল্লাম—কিন্তু গেরি-মাটির মাঝে সোনার গুঁড়া খুঁজতে গিয়েও তো লোকে রত্ন-হারা হয়।

সে রহস্যপূর্ণ-হাসিতে আমার পরিহাসের উত্তর দিল।

আমি বল্‌লাম—হ্যাঁ, কালু, তোমার বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। অন্ততঃ আরও দুইটি পরিবার বোধ হয় তোমারই দস্যুর হাতে অত্যাচার ভোগ করেছে।

তারপর বর্ণনা করলাম অন্য দু'টি ব্যাপার।

সে হেসে বললে—তিনটি কেন? নয়টি—অমন ব্যাপারের সন্ধান পেতে পার ঐ সময়ের দেরাদূনের যাত্রীদের কাছে অনুসন্ধান করলে।

কী ভয়ঙ্কর!

সে বল্‌লে—ভয়ঙ্কর কেন?

আমি বল্‌লাম—তোমরা যেন হাসিমুখে ব্যাপারটা নিয়েছিলে। কিন্তু অন্ততঃ একজন মহিলার অশ্রু-স্রোতে হিমালয়ের পাদ-মূল সিক্ত হয়েছিল।

তার উদাসীনতা আমাকে বিরক্ত করলে। তার উত্তরে প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি কর্‌লাম।

সে বল্‌লে—ধর নাটক বা ছায়াবাজীর পরিকল্পনা। দু'টা পরিকল্পনার একটা তোমাকে মুগ্ধ করেছে। অন্যটা হয় তো অপরকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু সকলগুলা মিলে মুগ্ধ করেছে আমাকে, কারণ নয়টা ব্যাপার থেকে পেয়েছি আনন্দ আর মবলগ আড়াই হাজার টাকা।

তাকে আপাদ-মস্তক পরীক্ষা কর্‌লাম। তার মুখ তার সেই বার্গৈ্য-কেনা লক্ষ্মী-পেচার মত গম্ভীর, সমস্যাপূর্ণ। একটু বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লাম—আর নলিনীর কি লাভ হ'ল?

সে বল্‌লে—সব কথাটা বোঝো। নলিনী, মালিনী, চামেলি, শেফালী সব এক।

—তাত্ত্বিক দর্শনের মধ্যে গিয়ে পড়ছি।

সে বল্‌লে—মোটেই না। কঠোর সত্য। সে তমাল, প্রসিদ্ধ সিনেমা-অভিনেত্রী। ঐ রকম একটা গল্পে বিপন্না নারী কি ভাব প্রকাশ করতে পারে, তার মহড়া দেবার জন্য সে দু'শো টাকায় আমায় নিযুক্ত করেছিল। মনে আছে তোমার কাছে যখন টাকা নিই, তাকে জানতে দিই নি।

লোকটা বলে কি?

সে বল্‌লে—সে পরে দু'শোর বদলে আমাকে পাঁচশো দিয়েছিল। আর আমি সহানুভূতি-কাতর, পরদুঃখে-কেঁদে ভাসানো বোক্-চন্দ্র যাত্রীদের কাছে রেল-ভাড়া ইত্যাদি, ইত্যাদি ব'লে আরও দু'শো টাকা যাত্রীপিছু আদায় করেছিলাম। তমাল জানে না!

ল্যালা-খাপ্পা, হ্যাবলা-খ্যাবলা, বোক্-চন্দ্র কালাচাঁদ।

সে অতঃপর বল্‌লে—শৈল সিনেমা শীঘ্র "বিপন্না" অভিনয় করবে। প্রধান ভূমিকায় থাকবে শ্রীমতী তমাল দেবী। হ্যাঁ আরও বলি—যে পরিকল্পনাটা তোমার ভালো লেগেছিল, সেইটাই দেখানো হবে। পয়সা দিয়ে লোকে আজকাল অত প্যানঘেনে কান্নাকাটি দেখতে চায় না।

আমি বল্‌লাম—হুঁ! দু'শো টাকার শোকে কেঁদে মরে কি হবে? একটু হাসি।

পরীর ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

থামাও নৃত্য, চল অমৃত আজ নিয়ে যেতে হবে,
অপমৃত্যুর চলিয়াছে তাণ্ডব,
দুর্লভ প্রাণ করিতেছে দান বৃথা নরনারী সবে
মৃত তাহাদের বন্ধু ও বান্ধব।

মরম ব্যথায় গুমরি মরিছে অশরণ অসহায়,
লুপ্ত বিবেক, ক্ষমা ও তিতিক্ষা,
স্তম্ভিত ভীত মানব সমাজে একজনও নাহি চায়
নিজ প্রাণ দিয়া পরপ্রাণ ভিক্ষা।

কোথায় অভয়? কোথায় করুণা? বিশ্ব নিয়ন্তার,
নিত্য হতেছে লক্ষ কণ্ঠ রোধ,
ধরার রতন যারা আভরণ যাহারা অলঙ্কার
তারাই হারানো সব মমত্ব বোধ।

শুধু বিকৃতি শুধু লাঞ্ছনা, শুধু হীন অপমান
মহামারী হয়ে সৃষ্টি করিবে লোপ,
নাই অপরাধ ভঞ্জন নাই, নাই দয়া ভগবান!
শুধু পশুত্ব, প্রতিহিংসা ও কোপ!

আনো অমৃত, ঢালো অমৃত, মৃত্যুকে ঢেকে দাও
ছড়াও পুষ্প, ছড়াও শান্তি জল,
যত অতৃপ্ত আত্মারে তাঁর সম্মুখে ডেকে নাও
কলুষিত ধরা হউক সুনির্মল।

পরী যে আমরা, নিত্য মত্ত নৃত্য আনন্দেতে
হাল্কা হাসির আর তো সময় নাই,
চল এ প্রাণের সুধাধারা দিয়ে পারিতো বাঁচাই মৃতে
গলা ধরে গিয়া কাঁদি চল নীচে যাই।

নীচে যাই চল, নীচে যাই চল সতীরে রক্ষা করি
রুদ্ধ করি গো নরকের দ্বার খোলা,
আমাদেরও আছে গুরু দায়িত্ব যেয়ো নাক বিষরি—
দর্পীরে দমি'—পতিতে ঊর্দ্ধে তোলা।

চর্য্যাপদ

শ্রীকালিদাস রায়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় নামে১ যে পুঁথিখানি নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মারফতে প্রকাশ করেন—তাহাই বাংলা ভাষার আদিপুস্তক বলিয়া এখন সর্ব্বজন স্বীকৃত। এই পুঁথির রচনাগুলি গান বা পদের আকারে লিখিত—এ জন্য এইগুলিকে চর্য্যাপদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই পদগুলির ভাষা পালরাজদের সময়ের বাংলা হইলেও আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। কারণ, বাংলার এই রূপের সহিত আমরা পরিচিত নই। এই ভাষা প্রাকৃত ও আমাদের পরিচিত ভাষার মাঝামাঝি স্তরের ভাষা। কেহ বলেন—ইহা পূর্ব্ববিহারী ভাষার আদিম রূপ, কেহ বলেন—ইহা উড়িয়া ভাষার অঙ্কুরিত রূপ—আমাদের মতে ইহা বাংলা ভাষার শৈশবরূপ। বলা বাহুল্য, হিন্দী, ব্রজবুলি ও উড়িয়া ভাষার সহিত এইগুলির ভাষার যে সগোত্রতা নাই তাহা নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার সহিতই ইহার সাদৃশ্য খুব বেশি। ভাষাতত্ত্ববিদ ডাঃ সুনীতিকুমার এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।

চর্য্যাপদগুলির প্রচার দেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—সে জন্য সে গুলির ভাষা ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের পরিচিত স্তরে পৌঁছায় নাই। একখানি মাত্র পুঁথি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এ দেশে কোথাও মিলে নাই। ইহাতেই বুঝিতে হইবে ইহার প্রচার, ধারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

অবরুদ্ধ হইবার কারণ, চর্য্যাপদগুলি যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধন ভজনের গীত সে ধর্ম্মসম্প্রদায় এ দেশে একেবারে লুপ্ত কিম্বা অন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা কবলিত হইয়া গিয়াছে। আশ্রয়ের অভাবে আশ্রিত স্মৃতিপথ হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আর একটি কথা—এই পদগুলি সাধারণের জন্য অনধিকারীর জন্য বা সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। এই প্রচার ছিল একটি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। এই মধ্যে যাহারা অধিকারী তাহাদেরই এইগুলি বোধগম্য ছিল। এইগুলি রচিত হইয়াছে প্রহেলিকাময় ভাষায়, গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব ও যোগসাধনের পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে—রূপকভূয়িষ্ঠ সাংকেতিক ভঙ্গীতে। ইঙ্গিতে ইসারায় ঠারে-ঠোরে অধিকারীদেরও বুঝিতে হইত। এক কথায় চর্য্যাকবিদের যেন স্বতন্ত্র একটা Code ছিল। সেই Code-এর সঙ্গে যাহাদের পরিচয় ছিল তাহারা ছাড়া—ঐ পথের পথিক ছাড়া অন্য কেও বুঝিত না। সাধারণের কাছে উহা ছিল প্রহেলিকা Enigma কাজেই উহাদের প্রচার হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় নির্ম্মল গিরাসটীকার নির্দ্দেশানুসারে ঐ ভাষাকে বলিয়াছেন সন্ধ্যা ভাষা অর্থাৎ আলো-আঁধারে ভাষা। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—প্রকৃত পক্ষে উহা সন্ধা-ভাষা, সন্ধ্যা-ভাষা নয়। সন্ধা-ভাষার অর্থ কোন তত্ত্বোপলব্ধির জন্য উদ্দেশ্যমূলক স্বতন্ত্র ভাষা।

প্রহেলিকাময়ী ভাষা বলিয়া এইগুলির অর্থ এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় নাই।২ ক্রমে ক্রমে গবেষকদের চেষ্টায় অর্থ উন্মেষিত হইতেছে। এইগুলির সংস্কৃত-ভাষায় টীকাও পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে কিছু কিছু অর্থোদ্ধার হইয়াছে—অনেক স্থলে ঐ টীকা অপব্যাখ্যাই দিয়াছে—অনেক স্থলে অর্থগত অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে এবং অনেক স্থলে জটিল বিষয়কে জটিলতর করিয়া দিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের একজনের কৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে অন্যকৃত ব্যাখ্যার মিল হইতেছে না। ইঁহারাও অন্ধকারে ঢিল ছুড়িতেছেন। একটি বিশেষ ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া একটা ব্যাখ্যা দিতে না পারার আর একটা কারণ—অনুলিপিকারক যথাযথ পাঠ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অনেক স্থলে ছন্দঃপতন দেখিয়া মনে হয়—অক্ষর ও শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে আসল শব্দ এমন রূপ ধরিয়াছে যে, তাহার অর্থ কোন অভিধানে মেলে না। একাধারে যিনি যোগশাস্ত্র ও বৌদ্ধ বজ্রযান সাধনতত্ত্বে পারদর্শী ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার দ্বারাই এইগুলির যথাযথ অর্থে উদ্ধার হইতে পারে। বজ্রযানী সাধকগণ ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ সকল সময় যোগশাস্ত্র ও বৌদ্ধশাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করেন নাই, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা নূতন সাংকেতিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই শব্দগুলির অর্থ গবেষণার দ্বারা নিরূপণ করিতে হইতেছে।

কেবল সাধন ভজনের তত্ত্বটিকে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুহ্য ও পরিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্যই তাঁহারা এই ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা এই পদগুলিতে নির্ব্বাণ, শূন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, মহাসুখ ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা জানিতেন এইগুলি উপলব্ধির বস্তু অনির্ব্বচনীয়। যাহা অনির্ব্বচনীয় কোন ভাষাতেই তাহা ব্যক্ত করা যায় না, সাধারণ প্রচলিত ভাষাতে ত নয়ই। এবং এইরূপ অসংস্কৃত সাংকেতিক ও প্রহেলিকাময় ভাষায় ব্যক্ত না হইলেও ইঙ্গিত দেওয়া যায় এইভাবে ঠারে-ঠোরে বলা যায়। এই ভাষার ব্যঞ্জনা পাঠকচিত্তকে অনির্ব্বচনীয়ের পানে লইয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে যখনই ধারণাতীত অতীন্দ্রিয় অনির্ব্বচনীয় বস্তুর কথা কোন সাধক বা কবি বলিতে চাহিয়াছেন—তখনই তিনি সাধারণ বাচ্যার্থ-প্রধান কথা বর্জ্জন করিয়া Symbol, metaphor allegory ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন অথবা সাংকেতিক enigmatic অথবা mystic expression ব্যবহার করিয়াছেন। অনির্ব্বচনীয়কে ব্যক্ত করা যায় না—ইঙ্গিতে তাহার সন্ধান দেওয়া যায়—ব্যঞ্জনার দ্বারা উপলব্ধির সাহায্য করা যায়। কাহ্ন তাই বলিয়াছেন—কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা বধির—যেমন সংকেতাদির দ্বারা বোবাকে বুঝায় সেই ভাবেই বুঝানো যায়।

অনেক স্থলে যোগসাধনের কথা রূপকের ভাষায় ও প্রহেলিকায় রচিত। টুকি টুহি পীঠ ধরণ না জাই। এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ। তিনঅড্ডারূপী জোইনি দে অঙ্কবালী। নাড়িশক্তি দিঢ় করিঅ খাটে। অধরাতিভর কমল বিকসিঅ। ইত্যাদি পদ তাহার দৃষ্টান্ত। ভব শব্দের অর্থ জন্ম। আর যাহাতে জন্ম না হয় সেজন্য সাধনার নাম—ভবনদী উত্তরণের প্রয়াস। নদী ও সেতুর রূপকের দ্বারা সে তত্ত্বের ব্যাখ্যা আমাদের ধর্ম্ম সাহিত্যে চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। অবিদ্যার মোহে মুগ্ধ চঞ্চল চিত্তকে হরিণের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে—হরিণ-মৃগয়ার রূপকের দ্বারা সিদ্ধাচার্য্য চঞ্চলচিত্তকে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দিতেছেন।

নির্ব্বাণপথে যাত্রার সহিত কম্বলিপাদ নৌকা বাওয়ার উপমা দিয়া একটি রূপকপদ রচনা করিয়াছেন। নদী, তরণী খুঁটি, কাছি, কেড়ুয়াল ইত্যাদি রূপকের অঙ্গ। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে নৌকাযাত্রার রূপক অতীতকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

*৩ কাহ্নপাদ তাই বলিয়াছেন—গুণ কইসে সহজ—বোল বুঝাঅ। কাঅবাক্ চিঅ জসুন সমাঅ। আলেগুরু উএসইসীস। বাক্‌পথাতীত কহিব কীস। মোহোর বিগো আ কহণ ন জাই। সহজবাণী কি করিয়া বুঝানো যাইবে। কায়, মন ও বাক্য যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, যাহা বাক্‌পথাতীত—তাহা কি করিয়া বুঝাইব?

---

১ আশ্চর্য্যচর্য্যাচয় ? চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয় ?

২ এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

টেণ্টন পাদের গীতি বিরলে বুঝয়।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধুকি বেন্টে সামাঅ।
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে। পিটা দুহিএ এ তিন সাঁঝে।
জো সো বুধী সোই নিবুধী। জো সো চোর সোই সাধী।
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝঅ।
টেণ্টন পাদের গীতি বিরলে বুঝঅ।

কৃষ্ণাচার্য্য একটি পদে অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তিকামী চিত্তকে মদমত্ত হস্তীর সহিত উপমিত করিয়াছেন।

অতীন্দ্রিয় বোধিজ্ঞান যেমন বাক্‌পথাতীত অনির্বচনীয়—তেমনি তাহা—স্পর্শাদিগোচর-রহিত- বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য। এই জ্ঞানময় সত্ত্বকে সিদ্ধাচার্য্যগণ নৈরাত্মা দেবীরূপে কল্পনা করিয়াছেন—ইনিই সিদ্ধাচার্য্যগণের জীবনদেবতা। স্পর্শাদিগোচরের অতীত বলিয়া ইহাকে অস্পৃশ্যা ডোমীর সহিত উপমিত করা হইয়াছে এবং নগর বাহিরে তাহার কুটীর কল্পনা করা হইয়াছে। এই ডোমীর সহিত প্রণয়, পরিণয় ও অভিষঙ্গ ইত্যাদির রূপকে সহজানন্দ লাভের তত্ত্ব বলা হইয়াছে অনেকগুলি পদে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মত এই ডোমীরূপা নৈরাত্মা দেবীকে জীবনতরীর কাণ্ডারী কল্পনা করা হইয়াছে। অস্পৃশ্যা সঙ্গের Symbol-এর দ্বারা সিদ্ধাচার্য্যগণ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্তির ইঙ্গিতও করিয়াছেন।৪

চর্য্যাপদগুলি রূপকাদি অলঙ্কারে রচিত---লক্ষণা ও ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। এইভাবে বক্তব্যপ্রচারের ভঙ্গী সাহিত্যেরই ভঙ্গী।

সিদ্ধাচার্য্যগণ যেসকল অলঙ্কৃত বাক্যের সাহায্যে তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের আভাষ দিয়াছেন—সেগুলি সবই তাঁদের নিজের রচিত নয়। কতকগুলি প্রাচীন তত্ত্বগ্রন্থ ও লোকপ্রবাদ হইতেও গৃহীত।

কতকগুলি অলঙ্কৃত বাক্যের এখানে উৎকলন করি—

চিত্ত অবিদ্যাজনিত মোহের জন্য আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—কবি এই কথাটিকে হরিণের উপমা দিয়া বলিয়াছেন—

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। এই উপমা কৃষ্ণকীর্ত্তন ও পরবর্ত্তী সাহিত্যে নারী আপন দেহ লাবণ্যের জন্য আপনারই শত্রু এই তথ্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যে চিত্ত সহজজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছে সে চিত্তে রূপাদিজনিত ঐন্দ্রিয়ক ঐহিক জ্ঞানের স্থান নাই—এই কথাটি সিদ্ধাচার্য্য সাহিত্যের ভাষায় বলিয়াছেন—সোনে ভরিতী করুণা পাবী। রূপা থোই নাহিক ঠাবী। (সোনায় ভরেছে চিত্ত-তরীটি আমার। রূপা থুইবার ঠাঁই নাই সেথা আর) মনে পড়ে—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।

নিরন্তর সাধনার দ্বারা চিত্তকে কামবর্জ্জিত করিলে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে---চিত্তের কোন সংস্কার ও কামনা না থাকিলে আর জন্ম হইবে না। বীজই যদি যায়—তবে উৎপত্তি কোথা হইতে হইবে? শান্তিপাদ একটি উপমার সাহায্যে এই কথা বলিয়াছেন—তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু। আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু। (তুলা ধুনি ধুনি করি আঁশে পরিণত। শূন্যে বিলীন হয় আঁশ ধুনি যত)।

যোগিগণের উপলব্ধ সত্য অনির্বচনীয়—তাহাকে সত্যও বলিতে পার মিথ্যাও বলিতে পার—তাহা সত্য-মিথ্যার অতীত। সে কেমন? না—উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা। (উদকে বিম্বিত চাঁদ সত্য না মিথ্যা?)। যোগবাসিষ্ঠে এই উপমা কালের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রযুক্ত। অবিবিক্তস্য চন্দ্রস্য চলনে কত্র'কত্র'তে। নাসত্যো নানৃতে যদ্বৎ তদ্বৎ কালস্য সৃষ্টিষু। সরহপাদ সহজ ঋজু-পথ ত্যাগ করিয়া কুটিল পথে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—

হাতের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ। অপনে অপনা বুঝত নিঅমন। (দেখিতে যদি বা চাও হাতের কাঁকণ—তার লাগি দর্পণের নাহি প্রয়োজন।)

৪ লোকাচার, ভয়,ঘৃণা ইত্যাদির সংস্কার হইতে মুক্তি সাধকদের সাধনারই অঙ্গ। ছাড়িঅ ভয়ঘিণ লোআচার চাহন্তে চাহন্তে সুন বিহার। আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ। ভয়ঘিণ দুর নিবারিউ॥

এই জগতের প্রকৃত সত্তা নাই, ইহা আমাদের মনেরই সৃষ্টি, স্বপ্ন। এই জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করা রজ্জুতে সর্প ভ্রম ইহা চির-প্রচলিত দার্শনিক উপমা। সিদ্ধাচার্য্য বলিতেছেন—

রাজসাপ দেখি জো চমকিউ সাঁচে কি তা বোড়ো খাই।

[রজ্জুখণ্ডে সর্প ভাবিয়া কতলোক চমকায়, সত্যই তা কি বোড়ো সাপ হয়ে সে লোকেরে কামড়ায়?]

রামপ্রসাদ ও ওমার খৈয়ামের মত আধ্যাত্মিক আনন্দ রসকে সুরার সহিত সিদ্ধাচার্য্যগণ উপমিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণপাদ একটি পদে দাবা খেলার রূপকে বিষয়াসক্তিরূপ ভব-বল জয়ের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বীণাবাদনের রূপকে একজন সিদ্ধাচার্য্য সহজানন্দ সম্ভোগের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। একটি পদে অবিদ্যামোহমুগ্ধ চঞ্চল চিত্তকে (মনপবন) মূষিকের সহিত উপমিত হইয়াছে। এই চিত্তই বার বার মূষিকের মত অন্ধকারে আসা-যাওয়া (জন্মমৃত্যু) করিয়া মানবজীবনের সার খাইয়া ফেলিত। এই-কামনাময় চঞ্চল চিত্তের উচ্ছেদসাধনই সহজ সাধন।

কায়ের সহিত বিবিধ বস্তুর উপমা দেওয়া হইয়াছে—কোথাও কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল, কোথাও কাঅ নাবড়িখান্টী মন কেড়ুয়াল, কোথাও উঁচা উঁচা পাবতের সহিত উপমিত। গো এর এক অর্থ ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়কে গো কল্পনা করিয়া কায়কে গোহালের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। যে ইন্দ্রিয় এই প্রতিভাসিত মায়া-জগৎকে সত্য মনে করে—ইন্দ্রিয় দুষ্ট। এরূপ ইন্দ্রিয় থাকার চেয়ে নিরিন্দ্রিয় কায় ভাল। তাই সরহ বলিতেছেন—বর সুন গোহালী কিমো দুঠ বলদে। [দুষ্ট বলদের চেয়ে ভাল শূন্য গোহাল আমার] এই অলঙ্কৃত বাক্যটি আজিও প্রচলিত আছে।

এই জগৎ মায়াময় মিথ্যা—ইহা বুঝাইবার জন্য ভুসুকু অনেকগুলি উপমা দিয়াছেন। মরুমরীচিকা, গন্ধর্ব্বনগরী দর্পণের প্রতিবিম্ব, বাতাবার্ত্ত, উদগত তরঙ্গে প্রস্তরভ্রম, বন্ধ্যাসুত, বালুকা তৈল, শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি।

বাসনাপল্লবে সমাচ্ছন্ন, কর্ম্মফলভারে অবনত, পঞ্চেন্দ্রিয়শাখাসমন্বিত মনকে তরুর সহিত উপমিত করিয়া তাহাকে সমূলে ছেদন করিতে কাহ্নপাদ উপদেশ দেন, এই তরুর সামান্য মূল থাকিলেও আবার গজাইতে পারে—কেবল ডাল কাটিয়াও লাভ নাই। মণ তরুবর গঅণ কুঠার (কুড়াল) ছেবহ সো তরু মূল, ন ডাল।

কমলকুলিশের মিলন অথবা করুণা ও শূন্যতার মিলনে যোগীরা সহজানন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার সহিত শবরী, চণ্ডালী শুড়িনী, ডোমী ইত্যাদি অস্পৃশ্যার উপগতির উপমা দেওয়া হইয়াছে। লৌকিক আনন্দের এই রূপ উপমায় অলৌকিক আনন্দের আভাস বার বারই দেওয়া হইয়াছে। ইহা বক্তব্যের আলঙ্কারিক প্রকাশ মাত্র।৫

৫ উপমানকে উপমেয়ের পূর্ব্বাস্বাদ মনে করিয়া সুলভ যৌন-সুখকে দুর্লভ মহাসুখের অঙ্গ বা লৌকিক রূপ মনে করিয়া বজ্রযানীরা ইন্দ্রিয়সেবাকে সাধারণ অঙ্গ মনে করিয়াছিল কিনা, তাহা কে জানে? তবে প্রস্তুত বস্তু ও অপ্রস্তুত বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্তসংস্কার এদেশের বহু ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূত হইয়াছে। বজ্রযানী ও সহজিয়াদের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়সেবার আতিশয্যের কথা শুনা যায়, তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে—তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্য নারীদের সঙ্গেই মিলিত হইতেন। অস্পৃশ্যা নারী কেন নির্ব্বাচিত হইত—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপমার মধ্যেও অস্পৃশ্যা—কথাই বলা হইয়াছে। সর্ব্ববিধ সামাজিক, শাস্ত্রীয় ও পারিবারিক সংস্কার হইতে মুক্তি যাহাদের ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ—তাহারা অস্পৃশ্যা নারীকেই সঙ্গিনী করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নয়। জানি না, এইরূপ অশিক্ষিতা বর্ব্বর নারী সাধকদের ধর্ম্মসাধনায় কি সহায়তা করিতে পারিত। তবে এইরূপ দেহ-মনে কুৎসিতা অপরিচ্ছন্না নারী সম্ভবতঃ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়দমনেই অধিকতর সহায়তা করিত।

তোমাদের উৎসব

কানাই বসু

তোমাদের উৎসব আসিতেছে। তোমরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছ, কিন্তু আমাদের ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে। এখন ভয়ে যাইতেছে, শীঘ্রই সত্য সত্যই প্রাণ উড়িয়া যাইবে, যখন শুদ্ধস্নাত পট্টবাস-পরিহিত তোমরা বাজনা বাজ্য করিয়া, ভক্তিতে গদগদ হইয়া আমাদের স্নান করাইয়া, বোধ হয় শুদ্ধ করিয়া লইয়া, সিঁদুর-মালা দিয়া সাজাইয়া সেই মালা পরানো গলার উপর খড়্গ তুলিবে। তোমাদের ভক্তি তৃপ্ত হইবে, তোমাদের রসনা তৃপ্ত হইবে, তোমাদের বনিয়াদি মর্য্যাদা ও আধুনিক বড়মানুষি তৃপ্ত হইবে। ইহার উপর তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের প্রতিবেশীর সম্মান যত বাড়িতে থাকিবে, তোমাদের ভক্তিও তত বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে মড়কও বাড়িয়া চলিবে। তখন একটি হত্যা-কার্য্যে তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে না। একশত আটটি হত্যা চাহিবে; ক্ষুদ্র ছাগদেহে তোমাদের উৎসব মানাইবে না, বৃহৎ মহিষের মৃতদেহও চাহিবে। তোমাদের উৎসবের নিশান বুঝি আমাদের রক্তে রঞ্জিত না হইলে যথেষ্ট রঙ্গীন হয় না, তোমাদের উৎসবের বাঁশী বুঝি আমাদের রুদ্ধ আর্ত্তস্বরের সহিত না মিশিলে যথেষ্ট সুরময় হইয়া উঠে না, তোমাদের প্রাণবান্ দেহ বুঝি আমাদের দেহহীন নীরব প্রাণটুকু না পাইলে যথেষ্ট হর্ষ-মুখর হইতে পারে না? কী জানি, এ তোমাদের কী উৎসব!

তোমরা পুণ্যলোভে, দেবতার প্রসন্নতালোভে, ধর্ম্ম-আচরণ কর, তোমাদের পুত্র-কন্যারা সানন্দ আগ্রহে দিন গণিতে থাকে, কবে তোমাদের পর্ব্বদিনের উৎসব আসিবে, যেদিন তোমরা নাকি প্রিয়বস্তু কোরবানি করিয়া ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া দিবে। আর আমরা ভয়ে কাঁপিতে থাকি, কবে আমাদের জগতে তোমাদের তীক্ষ্ণ ছুরির মহামারী দেখা দেয়; আমাদের শঙ্কিত সন্তানেরা দিন গণিতে থাকে কবে তোমাদের পবিত্র ক্ষুধার যজ্ঞে তাহাদের কচি মাথা ও কাঁচা রক্তের ডাক পড়ে। তোমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলে, কোন মহাভক্ত ঈশ্বরের তৃপ্তি-সাধন করিতে নিজের প্রিয়তম পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন। জানিনা, নিরীহ নিরপরাধ শিশু হত্যায় ঈশ্বরের তৃপ্তি হয় কিনা। কতরকমেই নাকি তিনি তাঁহার ভক্তদের পরীক্ষা করেন। কিন্তু সেই অভাবনীয় ভক্তি না পাইলে, তাহার অভিনয়ই কি ঈশ্বর দেখিতে চাহেন? যে অভিনয়ে আমাদের অসহায় সন্তানদের তোমারা ঈশ্বরের প্রেমময় নাম লইয়া হত্যা কর? আমাদের কি তোমরা সত্যই আপন সন্তানের মতো প্রিয় জ্ঞান কর? এ অভিনয়ে কি তোমাদের ঈশ্বর পরিতুষ্ট হন? হয়তো হন। তোমাদের আর আমাদের ঈশ্বর হয়তো এক নহেন। হয়তো আমাদের ঈশ্বরই নাই!

একদা তোমাদেরই হাতে এক অপাপবিদ্ধ নরোত্তম নির্ম্মম ক্রুশবিদ্ধ হইয়া আত্মদান করিয়াছিলেন। সেই পরম দয়াল প্রভুর আবির্ভাব, তাঁহার দেহত্যাগ ও পুনরুত্থান, তোমরা—তাঁহার ভক্তরা, বর্ষে বর্ষে স্মরণ কর, পরম ভক্তিতে অনুষ্ঠান কর। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানই বুঝি তোমাদের সুসম্পন্ন নহে, যতক্ষণ না আমাদের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া, আমাদের বক্ষ বিদারণ করিয়া উল্লাসের উপাদান সংগৃহীত হইতেছে! তোমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রেমময়ের কাছে তোমরা নিজ মঙ্গলের জন্য কী প্রার্থনা জানাও তাহা জানিনা, কিন্তু আমরা আমাদের পশুবুদ্ধিতে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যদি কেহ থাকেন, তাঁহাকে প্রকট হইবার জন্য ডাকি। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা সৃষ্টি করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বৃথা ডাকিয়া ডাকিয়া মরি এবং মরিতে মরিতেও ডাকি।

শুধু ধর্ম্মোৎসব কেন, তোমাদের কোন্ উৎসব,—তা সে পারিবারিক বিবাহোৎসবই হউক আর শোকানুষ্ঠানই হউক, আমাদের হত্যা উৎসবে পরিণত না হয়! তোমাদের করুণাময়ী জগৎপালিনী মা, তোমাদের মুক্তিদাত্রী কৃপাবতার প্রভু, তোমাদের কল্যাণ ও শ্রীময়ী নব-বধূটি পর্য্যন্ত আমাদের ভাগ্যে মহাকাল কৃতান্তের বেশেই দেখা দেন। তোমাদের গৃহে শানাই শুনিলে, তোমাদের মসজিদে আজান শুনিলে, তোমাদের মন্দিরে ঢাক ঢোল শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হৃদয়ের স্পন্দন থামিলে তবেই সে হৃৎকম্পন শেষ হয়।

তোমাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জীবিত থাকে, তোমরা সুখী হও ও খুশী হও। প্রতিবৎসর তোমরা কর তাহার জন্মতিথির উৎসব। কিন্তু সেই উৎসবে তোমাদের বংশধর স্নেহের দুলালকে আমাদেরই দিতে হয় আপন মাথাটি উপহার। জন্মতিথিতে মাছের মুড়া দিয়া ভাত খাইতে হয়, ইহাই নাকি শুভ আচার, ইহাতেই নাকি তোমাদের পুত্রের কল্যাণ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তোমরা ভিন্ন বিধাতার বিশ্বে কি আর কোনো জীব নাই? কল্যাণ কি বিধাতা শুধু মানুষেরই একাধিকার করিয়া দিয়াছেন? আমরা জলের ভিতর থাকি, তোমাদের পথও মাড়াই না, তোমাদের জগতের কোনো সংস্রবও রাখি না, এবং তোমাদের ভাগ্যের সহিত আমাদের ভাগ্য মিশাইবার স্পর্দ্ধাও কখনো করি নাই। তথাপি আমাদেরই মাথা দিয়া তোমাদের ভাগ্যের লক্ষ্মীশ্রীকে বন্দী করিবার কৌশল করিলে, এমনই তোমাদের উর্ব্বর মাথা।

তোমরা দেশশুদ্ধ লোক মিলিয়া বিরাট যজ্ঞ কর, আর পাঁচটি বন্ধু মিলিয়া বাগানের কোণে 'চড়িভাতি'ই কর, আমাদের হত্যা না করিলে তোমাদের আনন্দ নাই। নদীতে, পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া আমাদের বেড়িয়া ধরিবে। রাশিকৃত আমাদের মৃতদেহ তোমাদের প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িবে, ধীবর ও ভৃত্যরা সেই সকল মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিবে, আর তোমরা ছেলে, বুড়া, স্ত্রী-পুরুষ সেই খণ্ডিত শবদেহ ঘিরিয়া উল্লাসে কল-কোলাহল তুলিবে, তবে তো তোমাদের গৃহের আনন্দ পূর্ণ হইবে। ইহাতেও তোমাদের তৃপ্তি নাই। তোমরা হাটে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া আমাদের পছন্দ করিয়া দিবে, আর কশাইগণ তোমাদের নির্দ্দেশমত আমাদের জবাই করিয়া সামনে ধরিয়া দিবে। তোমরা সেই মৃতমাংস সানন্দে ও সগর্ব্বে গৃহে আনিলে সেখানে আর এক দফা হর্ষোচ্ছ্বাস উঠিয়া আমাদের রক্তাক্ত শবকে অভ্যর্থনা করিবে।

বাগানে 'চড়িভাতি' করিতে তোমরা অন্ন ব্যঞ্জন পাক কর বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের আনন্দ নাই। আনন্দ কেবল আমাদের গ্রীবায় ছুরি বসাইতে, আমাদের চর্ম্ম ও মর্ম্মচ্ছেদ করিতে। এই আনন্দলাভের অধীরতায় ছুরি বসাইবার বিলম্বও সকল সময় তোমাদের সহে না, তোমরা,—কোমল সুকুমার হৃদি তরুণ মানব-সন্তানরা, এক হাতে আমাদের ক্ষুদ্র দেহ ও অপর হাতে আমাদের ক্ষুদ্রতর মুণ্ড ধরিয়া টানিয়াই কার্য্য সমাধা কর।

কিন্তু, কেন? বিশাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমাদের জন্য কত অসংখ্য প্রকার ফল, শস্য রহিয়াছে, তাহা ছাড়া তোমরা বুদ্ধিমান প্রাণী, নিজ বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া কত বিবিধ খাদ্যও প্রস্তুত করিতে জান! তথাপি সবার চেয়ে দুর্ব্বল, সবচেয়ে ভীরু, আমাদের শাবকদের শীর্ণ অস্থি, অপুষ্ট মাংস, ক্ষীণ মজ্জা না পাইলে তোমাদের দাঁত, জিব, উদর কি আরাম পায় না? তোমাদের অশ্বমেধে শুধু অশ্ব নয়, আমাদের অনেকেরই প্রাণ যায়। তোমাদের বনভোজনে আমাদের জীবন-ভোজনই হয়, অন্য উপকরণ যতই থাকুক।

কেবল তোমাদের রসনার আদরেই আমাদের রক্ষা নাই, আবার তোমাদের চক্ষুর আবদারও আছে। মাত্র উৎসবের আহারের জন্য হইলেও

আমাদের অনেকে বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু ইহার উপর তোমাদের উৎসবের সজ্জাও আছে। তোমরা সৌন্দর্য্য-প্রিয় কি না জানি না, কিন্তু সৌন্দর্য্য-অভিমানী। তোমাদের বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, তোমাদের কত ঈদ, কত বড়দিন, কত বর্ষারম্ভ। তোমাদের পরব, পূজা যদি আসিল, তবে তাহার সাজ-সজ্জা যোগাইতে যোগাইতে আমাদের সর্ব্বনাশ। কলা গাছ শুভ-সূচনা করে, আম্রপল্লব মঙ্গলের প্রতীক, দেবদারুপত্র গৃহসজ্জার অলঙ্কার, এই সিদ্ধান্ত যেমন করিলে, অমনি আমাদের মূল, শাখা, পল্লব প্রশাখা কিছুই আর আমাদের রহিল না। তোমাদের ঘরে ঘরে সরস্বতীর অর্চ্চনা। তোমাদের ঘরে ঘরে প্রভু যীশুর জন্ম-মহোৎসব, আর তোমাদের ঘরে ঘরে আমাদের মৃত শাখা-পল্লবের পাংশু স্তূপ।

তোমরা নাকি ভালবাস, আমাদেরও ভালবাস। যেমন আমাদের মাংস রক্ত ভালবাস, তেমনি আমাদের পত্রপুষ্প ভালোবাস। ধ্বংস না করিলে, হত্যা না করিলে তোমাদের সেই নিদারুণ ভালবাসা পরিতৃপ্তি পায় না। আমরা একাগ্র, একনিষ্ঠ সাধনায় ভূমি-জননীর বুকের ভিতর হইতে রস সঞ্চয় করি, আমরা আজীবন তপস্যায় সহস্র কর প্রসারিয়া দেন সবিতার কর হইতে আশীর্ব্বাদ আহরণ করি। আমাদের সেই সারা দেহের রস দিয়া সারা বর্ষের সাধনা দিয়া সুমিষ্ট ফল ফলাইয়া জীবন সফল করি। আমাদের সেই বহু আরাধনার আলো দিয়া রঙ্গীন ফুল ফুটাইয়া জীবন মধুময় করি। সেই সমস্ত ফুলে, সেই সমস্ত ফলেই তোমাদের মালিকানি সত্ব। বুঝিতে পারি না কে তোমাদের সেই সত্ব দিল! কিন্তু, রূপ-দৃষ্টির গর্ব্ব কর তুমি, বলিতে পার, কে তোমাকে বলিল যে, আমার ক্রিয়াহীন, গতিহীন, সঙ্গীহীন জীবনের একমাত্র আনন্দ, অমূল্য ফুলটি তোমার টেবিলের অকিঞ্চিৎকর কাচের পাত্রেই, অথবা তোমার তুচ্ছ কোটের কলারেই বেশি শোভা পায়? সত্যই যদি তাহা হইত, তবে সেই পরম সুন্দর, পরম রূপকার কি তোমার কাচের পাত্রে, তোমার কোটের কলারে ফুল উৎপাদন করিতে পারিতেন না? তিনি কালো সমুদ্রের অতল তলে, কঠিন শুক্তির অবরুদ্ধ অন্ধকারে মুক্তা সৃজন করিতে পারিলেন, তিনি অগ্নিময় ধূ ধূ মরুবালুতে শ্যাম মরুদ্বীপ রচনা করিতে পারিলেন, তিনি আকাশস্পর্শী গিরিচূড়ার বজ্রদেহ ভেদ করিয়া নির্ঝর বহাইতে পারিলেন, আর তোমার কোটের কলারে ফুল ফুটাইয়া শোভা সৃষ্টি করিতে পারিতেন না? তথাপি তিনি যে করেন নাই, তাহার কারণ বোধ করি তোমাদের অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধি কমই হইবে, তোমাদের অপেক্ষা তাঁহার সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ক্ষীণই হইবে। সুতরাং তোমাদের উৎসব-গৃহের অঙ্গ-রাগ করিতে আমাদের ফুল, ফল, শাখা, পল্লব, এমন কি মূল অবধি ছিন্ন করিতে হইবে বই কি। তোমরা যখন উল্লাস করিতে নিজেদের মধ্যেই পরস্পরের বুকে ছুরি হানিতে পার, তখন সমগ্র জীবজগতে হাহাকার না জাগাইলে আর তোমাদের উৎসব কী হইল!

তোমাদের উৎসবের কথা বলিতে গেলে কত কথা যে মনে আসে। উৎসবে, ব্যসনে, বিলাসে তোমাদের রেশমের সাজ চাই; পূজায় ব্রতে তোমাদের পট্টবাস চাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা বাঁধি তোমাদের সাজাইবার জন্য? স্পর্দ্ধা বটে! পাছে আমরা তোমাদের সখের রেশমতন্তু, যাহা আমাদের দেহরস ছাড়া আর কিছু নয়, ছিন্ন করিয়া ফেলি, সেই ভয়ে তোমরা আমাদের বাসা হইতে নির্গত হইবার অবকাশ পর্য্যন্ত দাও না, জীবন্ত অগ্নিস্নান করাইয়া হত্যা কর। আমরা কীট, ঈশ্বরের নিশ্চয় অবহেলার সৃষ্টি। কিন্তু তোমরা তো ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তোমাদের মমতাময়ী বধূ কি একবার চিন্তা করেন, কত লক্ষ প্রাণের মূল্যে তাঁহার ঐ নীলাম্বরী? তোমাদের মহাপ্রাণ আচার্য্য কি স্মরণ করেন, কত কোটী মৃত্যুর বিনিময়ে তাঁহার ঐ শুদ্ধ ক্ষৌমবাসের জন্ম?

আর কাহার কথাই বা বলিব! তোমাদের পরম বৈষ্ণব মুনিঋষিও দয়াময় হরির ধ্যানে মগ্ন হন সুপবিত্র মৃগচর্ম্মে আসন করিয়া! আমাদের কোন্ পুণ্যবলে যে এই হীন মৃত পশুচর্ম্ম তাঁহারা পবিত্র স্থির করিলেন, তাহা মূঢ় আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? বুঝিলে আর আমাদের চর্ম্ম সংগ্রহের জন্য তোমরা যখন শর সন্ধান কর, তখন ভয়ে দিশহারা হইয়া পলায়নের চেষ্টায় ছুটিতাম না। কিন্তু তোমাদের শর সন্ধান অব্যর্থ, এটুকু অচিরে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারি। এবং তোমাদের ঋষি মহাশয়ের জন্য চর্ম্ম দানও করি। কিন্তু দানের সঙ্গে দক্ষিণাস্বরূপ যে দুই বিন্দু অন্তিম অশ্রু আমাদের ভীরু চোখের কোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহা তো ঋষি মহাশয় দেখিতে পান না। তাঁহার সাধের মৃগচর্ম্ম কিরূপে আহরিত হইল, ঈশ্বর-চিন্তার মাঝে সে চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর কোথায়!

তোমাদের উৎসবের শুভধ্বনিটি পর্য্যন্ত আমাদের শবদেহের অন্তর ভেদ করিয়া বাহির কর, আমাদের প্রতি এমনি তোমাদের কৃপা! থাকিলই না হয় আমাদের ছোট দেহে ছোট একবিন্দু প্রাণ, তাই বলিয়া তোমরা কি আর আমাদের প্রাণী বলিয়া গণ্য করিতে পার? আমাদের অনন্ত সৌভাগ্য যে, কোথায় গভীর জলের তলে অপরিচিত, অকৃতী জীবন যাপন করিতেছিলাম, তোমরা মৃত্যুর দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া আমাদের দেহকে 'মঙ্গল-শঙ্খ' উপাধি দিয়া পূজার বেদীতে স্থান দিলে। মঙ্গলই বটে! উৎসবের সূচনায় তোমরা যখন সেই মৃতদেহের মুখে ফুৎকার দিয়া দিকে দিকে মঙ্গলধ্বনি প্রেরণ কর, তখন সে-ধ্বনির মধ্যে আমরা, সমস্ত প্রাণীজগত, শুনি মরণের ডাক, শুনিতে পাই যে তোমাদের ফুৎকারে নিবিবার জন্যই আমাদের প্রাণ-দীপ জ্বলিয়াছে। এবং শুনিয়া শুধু শঙ্খকুল নয়, মনুষ্যেতর সকল জীবই শঙ্কাকুল হইয়া উঠি।

তোমাদের রাক্ষস-নিগৃহীতা সীতার কাহিনী পড়িয়া তোমরা নাকি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দাও। কিন্তু তোমাদের হাতে আমাদের, বিশ্বের যাবতীয় সজীব পদার্থের, যে নিগ্রহ, যে নৃশংস নির্য্যাতন চলিয়া আসিতেছে, সে অন্তহীন দুঃখের রামায়ণ লিখিবার জন্য কোন্ বাল্মীকি কবে অবতীর্ণ হইবেন?

যুগ যুগান্তের মধ্য দিয়া, নানা দেশের, নানা ধর্ম্মের, নানা জাতির মধ্য দিয়া, তোমাদের উৎসবের নির্ম্মম রথ চলিয়াছে অকারণ হিংসার ধ্বজা উড়াইয়া! সেই রথে চড়িয়া, সুখ-সমুজ্জল হাসিমুখে তুমি, সহৃদয় মানুষ, দুইহাতে মৃত্যু বিতরণ করিয়া চলিয়াছ। আর আমরা তোমাদের রথের পথ আপন রক্ত ঢালিয়া কোমল করিয়া দিতেছি, আপন মেদ মাংস দিয়া মসৃণ ও চিক্কণ করিয়া দিতেছি, আপন প্রাণ-বায়ু দিয়া শীতল করিয়া দিতেছি। আমাদের পরমায়ু লইয়াই তোমাদের উৎসব।

"সংস্কৃত-ফোবিয়া" বা সংস্কৃতাতঙ্ক রোগ*

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন্)

"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে একদল লোক "সংস্কৃত-ফোবিয়া" বা সংস্কৃতাতঙ্ক রোগে" আক্রান্ত হইয়া নিজেদের, দশের ও দেশের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতেছেন। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার নাম-গন্ধেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে সংস্কৃত কৃষ্টির ধ্বংস সাধনই, অন্ততঃ সর্ব্বতোভাবে ইহাকে অবজ্ঞা ও ইহার নিন্দা প্রচারই, তাঁহাদের জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোকই আছেন। যথা :—(১) অত্যুগ্রকম পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাভিমানী ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়। (২) আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে অত্যুৎসাহী শিক্ষাতত্ত্ববিদ্, ও সাহিত্যিকবৃন্দ। (৩) আধুনিক বিজ্ঞানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ, (৪) বস্তুতান্ত্রিক ধনবৈজ্ঞানিক, ধনী ও ব্যবসায়িমণ্ডল, (৫) সংস্কৃত-সভ্যতা-বিরোধী হরিজন সম্প্রদায়। সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে ইঁহারা কি কি প্রধান আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

(১) ইঙ্গবঙ্গীয়গণের আপত্তি

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ব্যর্থ, অন্ধ অনুকরণকারী, যে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং যাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফল রূপেই জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায় তাহারই ধ্বংসাবশেষ বা প্রেতাত্মা মাত্র। ইঁহাদের মতে, কেবল "মৃত" সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টি নহে, সকল ভারতীয় ভাষা ও সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা,—অর্থাৎ, যাহা কিছু "নেটিভ্," তাহা সকলই হীন, তুচ্ছ, অন্তঃসারশূন্য,—অবজ্ঞা, ঘৃণা ও বিদ্রূপের পাত্র মাত্র। অপর পক্ষে যাহা কিছু বিদেশ হইতে আগত, বিশেষ রূপে, যাহা কিছু ইংরাজ-সমাজে প্রচলিত, সে সকলই একমাত্র শ্রদ্ধাযোগ্য ও গ্রহণীয়। ইঁহাদের এই অপূর্ব্ব যুক্তি এরূপ অত্যদ্ভুত, অসঙ্গত এবং হাস্যকর যে, তাহার খণ্ডনের জন্য কোনরূপ বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এই বিংশ শতাব্দীতে আর নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি নাসিকাকুঞ্চনই যাঁহারা "প্রগতি"র সার বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা হিতোপদেশের ময়ূরপুচ্ছধারী কাক ও নীলবর্ণ শৃগালেরই ন্যায় শোচনীয়—স্বদেশে বা বিদেশে কোন সমাজেই তাঁহাদের স্থান নাই। বলা বাহুল্য যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যাহা সত্যই প্রশংসনীয়, যাহা প্রকৃতই আমাদের জাতীয় জীবনে বহুল উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ, তাহা গ্রহণে আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ ও বিচারমূলক গ্রহণে প্রভেদ অনেক। কূপমণ্ডূকতা বা বিদেশী সভ্যতার প্রতি সর্ব্বথা ঘৃণা, এবং স্বদেশদ্রোহিতা বা বিদেশীর সর্ব্বথা নির্ব্বিচার পদলেহন, উভয়ই যে সমভাবে পরিত্যাজ্য, তাহা এরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, সে সম্বন্ধে অধিক বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। সুখের বিষয় যে, সমাজের বুকে দুষ্টক্ষতের ন্যায় এই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাগর্ব্বিত সম্প্রদায় স্বাদেশিকতার পুনরুত্থানের সহিত ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কিছু কাল পূর্ব্বেও বাংলা লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে না জানা, রামায়ণ মহাভারতের সহিত কোন পরিচয় না থাকা, বেদ-বেদান্তের নাম-গন্ধও না শোনা প্রভৃতি "আলোকপ্রাপ্ত" ব্যক্তিগণের নিকট গর্ব্বেরই বস্তু ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে, এরূপ মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির সংখ্যা অতি কম। যাহারা বাংলা ভাষা প্রভৃতি সেরূপ ভালরূপে জানেন না, তাঁহারাও অনেকে ইহা লজ্জারই বিষয় মনে করেন; এবং ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যেও বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন, এবং পদাবলী, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রভৃতি মধ্যযুগের ও নবীন জাতীয় সম্পদের আস্বাদ গ্রহণেও সমুৎসুক। স্বদেশের প্রতি প্রেমই যে জাতীয় জাগরণের প্রথম সোপান, জাতির প্রগতি যে পরিণতি নহে, পরিবর্ত্তন—বিজাতিতে সম্পূর্ণ পরিণতি নহে, স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই পরিবর্ত্তন মাত্র—ইহা যে তাঁহারা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিয়া অবহিত হইয়াছেন, তাহাই দেশের পক্ষে আশার কারণ। যাহা হউক, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আপত্তি কেবল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বিরুদ্ধে নহে, প্রাচীন, নবীন সমগ্র ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বলিয়া, বর্ত্তমানে কেহ তাহার প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করে না। সুতরাং, কেবল সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার দিক হইতে এই সকল আপত্তির খণ্ডন বা প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নাই।

(২) বঙ্গীয়গণের আপত্তি

কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার উপর উপরি উক্ত অত্যুৎকট বিদেশী ভাবাপন্ন, স্বজাতির প্রতি মমতাশূন্য, দেশ ও সমাজের বহির্ভূত, মুষ্টিমেয় ইঙ্গবঙ্গীয়গণের অবজ্ঞা বা ঘৃণা সমান অবজ্ঞা বা ঘৃণার সহিত তুচ্ছ করা সম্ভব হইলেও, সত্যই স্বদেশ-প্রেমিক, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতির প্রকৃতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কতিপয় আধুনিক বাঙালী শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ এবং সাহিত্যিকগণের সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে যে অভিযান, তাহা অধিকতর দুঃখের বিষয়, এবং জাতির দিক হইতেও অধিকতর অনিষ্টপ্রসূ। ইঙ্গবঙ্গীয়গণকে আমরা সমাজের বাহিরেই রাখিতে পারি—ইঁহারা সমাজের উপর দুষ্ট বিস্ফোটক মাত্র, যাহা বাহির হইতে কাটিয়া বাদ দেওয়াও চলে। কিন্তু এই অত্যুৎসাহী শিক্ষাব্রতী সুধীবৃন্দ এবং লেখক-লেখিকাগণ আমাদের একান্ত আপনারই জন—ইঁহারা সমাজের মর্ম্মস্থ প্রাণপ্রদায়ী রুধিরবিন্দু, যাহার পরিবর্জ্জন অসম্ভব। সেই জন্যই, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ইঁহাদের আপত্তির কারণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা, এবং সেই সকল যুক্তির যথোপযুক্ত খণ্ডন করা সংস্কৃতভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এই যে সকলের সমবেত প্রযত্ন, তাহা জাতির জীবনে অতি শুভঙ্কর; এবং তজ্জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাযোগ্য। এই মঙ্গলময়ী মহতী প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিতে প্রাণপণ সাহায্য করা প্রত্যেক দেশপ্রেমিকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বেও বাংলা ভাষা না জানা লজ্জার বিষয় ত ছিলই না, উপরন্তু গৌরবেরই বিষয় ছিল। ইংরাজীই ছিল

*"প্রাচ্যবাণীমন্দিরে" পঠিত প্রবন্ধ।

শিক্ষার বাহন, এবং বাংলা পঠন-পাঠনের জন্য বিশেষ কোনই সুব্যবস্থা ছিল না। বাংলা ও সংস্কৃত পণ্ডিতের বেতন ও পদমর্য্যাদা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, স্কুলে, কলেজে বাংলা ক্লাসের সংখ্যা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কম, কলেজে বাংলার জন্য 'পার্সেণ্টেজ' বা বাধ্যতামূলক উপস্থিতি প্রথা অপ্রচলিত ছিল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'অনার্স' বা উচ্চশিক্ষার কোনই ব্যবস্থা ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্যও কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। এমন কি, এক বৎসর পূর্ব্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা বাঙালীদের জন্যও বাধ্যতামূলক ছিল না। ইচ্ছা করিলে, ছাত্রছাত্রীগণ বাংলাকে মাতৃভাষা (ভার্ণাকুলার) রূপে গ্রহণ না করিয়া, ইংরাজীকেই সেরূপ গ্রহণ করিতে পারিত। সেইজন্য এক অক্ষরও বাংলা না জানিয়াও, বাঙালী ছাত্রছাত্রীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বি-এ, এম্-এ ডিগ্রি লাভ করাও অনায়াসে সম্ভবপর হইত। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ কয়েকজন বাঙালী ছাত্রীর কথা জানি যাঁহারা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নিরক্ষরা, অর্থাৎ, 'ক, খ, গ' অক্ষর পর্য্যন্ত চেনেন না ও লিখিতেও পারেন না, অথচ এম-এ ডিগ্রিধারিণী, এবং ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষায় সমুৎসুকা। বাংলা ভাষায় এইরূপ নিরক্ষর হইয়াও বাংলাদেশেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উচ্চশিক্ষিতরূপে 'সার্টিফিকেট' ও 'ডিপ্লোমা' লাভ করা, বাঙালী হইয়াও ইংরাজী বা ফরাসীকে "মাতৃভাষা" রূপে গ্রহণের সুযোগ লাভ করা, সম্ভবপর কেবল আমাদের ন্যায় পরাধীন দেশেই। ইংরাজ, ফরাসী বা অন্যান্য স্বাধীন জাতির নিকট ইহা ত কল্পনারও অতীত। চিন্তাশীল, জাতির মঙ্গলকামী শিক্ষাতত্ত্ববিদ্গণের প্রেরণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে এই সকল অতি অদ্ভুত, অসঙ্গত, ক্ষতিকর নিয়মাবলীর আমূল সংস্কারে ব্রতী হইয়াছে, তাহা সত্যই অতি আনন্দের বিষয়। এইরূপে, বঙ্গভাষানুরাগী সুধীবৃন্দের প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষার বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অপরপক্ষে, বাংলা ভাষার এইরূপ দ্রুতোন্নতি বিষয়ে বাংলা সাহিত্যিকগণের দানও কম নহে। সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন এ স্থলে নাই। বাংলা ভাষার সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই যে বর্ত্তমান প্রচেষ্টা, তাহা যে সর্ব্বদিক্ হইতেই অনুমোদনীয়—তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

কিন্তু এই বঙ্গভাষানুরাগী ও বঙ্গভাষার উৎকর্ষকামীগণের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। কেহ কেহ কেবল নিঃশব্দ অবজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া, উপরন্তু সশব্দ প্রতিবাদ, এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণ নির্ব্বাসনের জন্য রীতিমত প্রচেষ্টাতেও পশ্চাৎপদ নহেন। কি কারণে জানি না, সম্ভবতঃ বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য অত্যুৎসাহী শিক্ষাব্রতিগণের প্রভাবেই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষার প্রতি অবহেলা দেখাইতেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমানেও এম্-এ ক্লাসে সংস্কৃত বিভাগের জন্য বহুল ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাই পুনরায় কি কারণে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হিন্দুছাত্রীদের জন্যও সংস্কৃত বাধ্যতামূলক করে নাই, এবং 'অ্যাডিশেনাল্' সংস্কৃত বন্ধ করিয়া দিয়াছে, আই-এ'তে 'অ্যাডিশনাল্' বাংলা লইলে এক 'পেপার' সংস্কৃতও লইতে হইবে, এই সুবিবেচনাপ্রসূত নিয়মের রদ করিয়াছে—তাহা বুদ্ধির অগম্য। বহু স্কুল কলেজেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সেরূপ সুবন্দোবস্ত হইতেছে না। বর্ত্তমানে সংস্কৃতে উচ্চ 'ডিগ্রি' ধারী, সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্গণের সেই প্রকার আদর আর নাই। ছাত্রসংখ্যার অল্পতার অজুহাতে কোনো কোনো স্থলে সংস্কৃত শিক্ষক প্রভৃতির পদ তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। সংস্কৃত টোল ইত্যাদির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা সকলেই জানেন। অথচ, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিদ্গণের দৃষ্টি সে দিকে একেবারেই নাই। এইরূপে বর্ত্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুভাবেই সংস্কৃত পঠনপাঠনের ক্রমাবনতি সাধিত হইতেছে। অপর পক্ষে, কতিপয় তথাকথিত "প্রগতিশীল" সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতভাষা নিরপেক্ষ করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন! এইরূপে, বাংলাভাষার উন্নতির প্রতি প্রখরদৃষ্টিশীল অত্যুৎসাহী কর্ম্মিবৃন্দের সবেগ সম্মার্জ্জনী তাড়নায় উদ্বাস্তা মাতামহী দেবভাষাকে দৌহিত্রী বাংলা ভাষার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু, এইরূপে শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে সংস্কৃতভাষা বিতাড়ন সত্যই কি বাংলার উন্নতির জন্যই প্রয়োজন? কদাপি নহে। বাংলা ভাষার উন্নতি যে অত্যাবশ্যক, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত কি পরস্পরবিরোধী যে, একের উন্নতির অর্থ অপরের অবনতি? উপরন্তু উভয় ভাষা এরূপ নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, উভয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষ সমসূত্রে গ্রথিত। যাঁহারা বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষা বহিষ্করণে এইরূপ অযথা উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা কি কারণ বশতঃ এই আত্মধ্বংসী প্রযত্নে লিপ্ত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

(১) প্রথমতঃ, কেহ কেহ বলেন যে, "মৃত", অপ্রচলিত, অধুনালুপ্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে বৃথা কাল ও শক্তি ক্ষয় করিয়া আর লাভ কি? সংস্কৃত ভাষা অতি দুরূহ, এবং অপ্রচলিত বলিয়া ইহা আয়ত্ত করা অধিকতর দুঃসাধ্য। সে ক্ষেত্রে, সুকুমারমতি বালক বালিকাকে এই ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করা কেবল যে নিষ্প্রয়োজন, তাহাই নহে, ক্ষতিজনক ও নিষ্ঠুরও বটে। বস্তুতঃ, যে সময় উহারা সুকঠিন শব্দরূপ, ধাতুরূপ মুখস্থ করিতে ব্যয় করে, তাহা যদি বাংলা ভাষা শিক্ষা বা অন্যান্য বিষয় পাঠে ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে সকলেরই মঙ্গল। বাংলাই যখন বাঙালীর আধুনিক ভাষা, তখন সেই মাতৃভাষার চর্চ্চাই বাঙালীর প্রধান কর্ত্তব্য। মাতৃভাষা ব্যতীত, ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাও কিছু কিছু শিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ এই সকল ভাষা জগতে প্রচলিত আছে; এবং ভাবের আদান প্রদানের জন্য শিক্ষা, ব্যবসায়, চাকুরী প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের সাহায্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জগতে প্রচলিত আবশ্যক ভাষাও নহে। তাহা হইলে এই সুকঠিন ভাষা শিক্ষার জন্য অকারণে সময় নষ্ট করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

(ক) কিন্তু উপরি উক্ত আপত্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা

আমাদের অসাধ্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ভাষা সুকঠিন বলিয়াই যে সে সম্বন্ধে প্রযত্ন পরিত্যাজ্য, ইহা অতি নির্ব্বোধের মত কথা। জ্ঞান লাভ সহজ কার্য্য নহে, ক্রীড়া নহে যে অল্পায়াসেই তাহা সম্পন্ন হইবে। জ্ঞানই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ তপস্যা—"ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ"—এবং তপস্যা বলিয়া ইহা কষ্টসাধ্যও নিশ্চয়। যিনি অনলস, যিনি ধৈর্য্যশীল, যিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনিই কেবল এই মহতী তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ, অপরে নহে। ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতিও ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট অতি দুর্ব্বোধ্য হইলেও কেহই ইহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন না। উপরন্তু, প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই সকল দুরূহ বিষয়ের সংখ্যা এবং প্রত্যেক বিষয়ের পঠনীয় অংশাদি এরূপ অধিক করা হইয়াছে যে, তাহা ছাত্রদের শক্তির অতীত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং, ছাত্রগণকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় বাধ্য করা অতি নিষ্ঠুরতার কার্য্য,—এরূপ আপত্তির কোনো যৌক্তিকতা নাই।

(খ) যদি বলা হয় যে, ইংরাজী, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বলিয়াই দুরূহ হইলেও শিক্ষণীয়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন—সুতরাং ইহার জন্য এরূপ শ্রম স্বীকার অত্যাবশ্যক ত নহেই, উপরন্তু নিরর্থক—তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যাঁহারা এইরূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, তাঁহারা হয় অন্ধ, না হয় সত্যস্বীকারে পরাঙ্মুখ। "মৃত", অধুনা লুপ্ত সংস্কৃত ভাষার সহিত জীবন্ত, আধুনিক বাংলা ভাষা যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাহা স্বীকার করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ কেন? বাংলার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত শব্দ, বানানও তাহাই। বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, সম্বোধন, লিঙ্গাদি বিষয়ের নিয়ম বহু স্থলেই অদ্যাপি পালিত হয়। এই সকল কারণে বঙ্গভাষাকে জননী দেবভাষার জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রীরূপেই পরিগণিত করা হয়। সম্প্রতি বাংলা ভাষাই বঙ্গদেশের শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হওয়ায়, ধর্ম্ম, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা 'পরিভাষা' স্থিরীকরণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এই সকল পরিভাষা প্রায়শঃই প্রাচীন পরিভাষা হইতেই গৃহীত, অথবা, প্রাচীন শব্দাদির রূপান্তর মাত্র। সে ক্ষেত্রে, সংস্কৃত ভাষাকে সম্পূর্ণ পরিবর্জন পূর্ব্বক বাংলা ভাষার প্রগতি যে সম্ভবপর কিরূপে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অতএব, বাংলা ভাষা শিক্ষাকামী ছাত্র ও সাধারণ ব্যক্তি, এবং বাংলা পরিভাষা নির্ম্মাণকারী বিশেষজ্ঞ—সকলের পক্ষেই অল্পবিস্তর সংস্কৃত জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অবশ্য, ইহা আমাদের বলা উদ্দেশ্য নহে যে, বাংলাভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বাংলা বাংলাই, সংস্কৃত সংস্কৃতই, বাংলাও সংস্কৃত নহে, সংস্কৃতও বাংলা নহে। অপরাপর স্থায় বাংলা ভাষারও একটী নিজস্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জন্য, সকল বাংলা শব্দই সংস্কৃত নহে; সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক, বিভক্তি প্রভৃতি সকল নিয়মও বাংলায় সর্ব্বত্র খাটে না। যদি কেহ সংস্কৃত ভাষার সকল শব্দসম্পদ ও নিয়মাবলীই বাংলায় প্রচলিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহা অর্ব্বাচীনতা ও পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। কিন্তু একদিকে বাংলা-ভাষার স্বাতন্ত্র্য যেরূপ অবিসংবাদি সত্য, অপরদিকে সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলাভাষার অতি নিকটতম সম্পর্কের কথাও তুল্যরূপে সত্য। সুতরাং আধুনিক বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ভাষা নিরপেক্ষ বলিয়া পরিগণিত করিয়া অধুনা "মৃত" সংস্কৃতভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন মনে করা "যে ডালে বসা, সেই ডালই কাটা"র ন্যায় নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে। সুতরাং ভাষাশিক্ষার দিক্ হইতে, উত্তমরূপে বাংলা শিখিতে হইলে, সংস্কৃতের অন্ততঃ কিছু জ্ঞান আবশ্যক, সন্দেহ নাই।

(গ) প্রাত্যহিক জীবনের দিক্ হইতেও আমাদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের ধর্ম্মাচারাদি, যাগ-যজ্ঞ, পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, হোম প্রভৃতি সকলই অদ্যাপি সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। যাগযজ্ঞে, পূজার্চ্চনায়, বিবাহাদি শাস্ত্রীয় সংস্কারে, সকল ক্রিয়াকলাপে উচ্চার্য্য মন্ত্র, স্তব, স্তোত্র প্রভৃতি বেদ, উপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি হইতেই গৃহীত। কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ বা মন্ত্র-শ্রবণ প্রভৃতির সঙ্গে যদি তাহার অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ বৃথা—এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি প্রভৃতির মতে, সংস্কৃত না জানিয়া, অর্থ না বুঝিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ অতি ঘোরতর পাপ। কিন্তু আমরা এই পাপ কি প্রত্যহই করিতেছি না? প্রত্যুষে গায়ত্রী মন্ত্র জপ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি প্রত্যেকটী নিত্যকর্ম বা প্রাত্যহিক ধর্ম্মাচরণে আমরা প্রত্যহই কেবল 'পাখী পড়া'র ন্যায় অর্থ না বুঝিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যাইতেছি—তাহাতে কি আমাদের পুণ্যের অপেক্ষা পাপের ভারই অধিক হইতেছে না? বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্মকালেও আমাদের অবস্থা সমভাবে শোচনীয়। যথা, পবিত্র উদ্বাহ ব্রত-কালে যে উদাত্ত বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে বর ও বধূর দুইটী হৃদয় সম্মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়, অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তাহা বর ও কন্যার নিকট কেবল কতকগুলি অবোধ্য কথার 'কচকচানি' রূপেই প্রতিভাত হয়। অতএব, অন্ততঃ মন্ত্র, স্তব প্রভৃতির অর্থ বুঝিবার মত সংস্কৃত জ্ঞান প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই অত্যাবশ্যক। আমরা হিন্দুধর্ম্মকে সাক্ষাৎ বৈদিক ধর্ম্মরূপে প্রচার করিয়া গর্ব্বানুভব করি। ইহা গর্ব্বের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বৈদিক ধর্ম্মের কোন মর্য্যাদাই ত আমরা বর্ত্তমানে রক্ষা করিতেছি না। হিন্দু ধর্ম্মকে বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া, সেই একই সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা 'কাণা ছেলেকে পদ্মলোচন' বলার ন্যায়ই বাতুলের প্রলাপ মাত্র। সংস্কৃতবিদ্বেষী বঙ্গভাষানুরাগী কেহ যদি বলেন যে, 'এত গণ্ডগোলে কাজ কি, মন্ত্রাদি বাংলায় অনুবাদ করিয়া ফেলিলেই ত আপদ চুকিয়া যায়,'—তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ, বেদ প্রভৃতির যথার্থ অনুবাদের জন্যও দেশে যথেষ্ট সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন রাখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, অনুবাদ অনুবাদই মাত্র, মূল নহে—মূলের নিগূঢ় অর্থ ও গাম্ভীর্য্য, লালিত্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুবাদে পূর্ণ রক্ষা করা অসম্ভব। সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেরূপ এক নহে, মূল বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও বেদের অনুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও সেইরূপ এক হইতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর

পরমারাধ্যা, দেবভাষায় ব্যক্তা, ভগবতী শ্রুতির স্থলে ইহার বাংলা অনুবাদ মাত্র প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহা নিশ্চয়ই হিন্দুজনোচিত কার্য্য হইবে না। পুনরায়, হিন্দুরা বেদকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করেন। তাহা হইলে বেদের অনুবাদকেই মাত্র ধর্ম্মের মূল রূপে গ্রহণ করিলে নিত্য বেদ অনিত্য হইয়া পড়েন। সুতরাং, যে সকল হিন্দু বেদকে নিত্য, অভ্রান্ত ও তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলরূপে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের অন্ততঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রথম কর্ত্তব্যরূপেই গ্রহণ করা উচিত। এইরূপে হিন্দু-ধর্ম্মের বাহন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কোনো ক্রমেই নিষ্প্রয়োজন নহে।

কেবল ধর্ম্মের নহে, সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্কৃত ভাষাই বাহন। স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম, দর্শন, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ তাঁহারা উত্তরপুরুষগণের মঙ্গলার্থে সংস্কৃত ভাষায় লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ সংস্কৃতের মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভাষা ও সাহিত্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহার বিপুল ঐশ্বর্য্য সত্যই মানবের কল্পনাতীত। যথা, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতেই পঞ্চাশ হাজারের অধিক মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত সকল সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা কয়েক লক্ষের কম নহে, এবং সকল গ্রন্থ বিদেশে গ্রন্থাগারে প্রেরিতও হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, হস্তলিখিত অ-প্রকাশিত পুঁথির সংখ্যা নির্ণয় করা ত অসম্ভব। এইরূপ লক্ষ লক্ষ পুঁথি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইয়া অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার অপেক্ষাও কত লক্ষ লক্ষ গুণে অধিক পুঁথি যে কীটদষ্ট হইয়া, বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচারে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া, এবং অসাবধানতায় চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুনরায়, কত লক্ষ পুঁথি যে বর্ত্তমানেও দেবমন্দিরে, মঠে, আশ্রমাদিতে ভূগর্ভস্থ কোটরে, পুরোহিত, পাণ্ডা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, বা বহু স্থলেই অনাদরে পড়িয়া আছে—তাহারও সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। অতি দুঃখের বিষয় যে, এই সকল অমূল্য পুঁথির পুনরুদ্ধার ও সংগ্রহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বা জনসাধারণের সেরূপ কোনই উৎসাহ নাই। কিন্তু সংগৃহীত হইলে যে তাহাদের সংখ্যা কোটী কোটী হইত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেবল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়াই কি এই কোটি কোটী অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজিকে অনাদরে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিতে হইবে? এই ত গেল সংখ্যার কথা। এখন ইহাদের বিষয়বৈচিত্র্যের কথা ধরা যাক্। যেরূপ সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যার কথা ভাবিলে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়, সেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিলেও তুল্যরূপে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভারতীয় মহামনীষিগণ যে কত শত শত বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতি বিস্ময়ের বস্তু। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে প্রদান করা অসম্ভব। কেবল কয়েকটী প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি মাত্র। প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও দর্শনের কথা ধরা যাক্। বৈদিক সংহিতা; ব্রাহ্মণ; আরণ্যক; উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র; গৃহ্যসূত্র; ধর্ম্মসূত্র; ব্রহ্মসূত্র; পূর্ব্বমীমাংসা; সাংখ্য, যোগ; ন্যায়; বৈশেষিক; বৌদ্ধ; জৈন; চার্ব্বাক প্রভৃতি জড়বাদ; স্ফোটবাদ প্রভৃতি ব্যাকরণ-দর্শন; প্রত্যভিজ্ঞা, স্পন্দ, শাক্ত, শ্রী-বিদ্যা, বীর-শৈব, এবং অন্যান্য শৈব-সম্প্রদায়; বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়; ব্রহ্মসূত্রের বহু বিভিন্ন ভাষ্য ও তাহা হইতে উদ্ভূত বহু বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়—কেবলা-দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ, ঔপাধিক ভেদাভেদ-বাদ, প্রভৃতি। কেবল বেদান্ত নহে, ষড়্দর্শনের প্রত্যেক শাখারই ভাষ্য, টীকা, অন্যান্য গ্রন্থাদি সমেত সে এক বিরাট্ ব্যাপার। কেবল দর্শন ও ধর্ম্মেই ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিদের যে বিপুল দান, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে নাই। যথা, ভারতীয় দর্শনের অসংখ্য শাখার মধ্যে একটী মাত্র শাখা বেদান্ত-দর্শন, এবং বেদান্তদর্শনের অসংখ্য শাখার মধ্যে একটী মাত্র শাখা অদ্বৈত-বেদান্ত। এই একটা মাত্র শাখাকে আশ্রয় করিয়াই যে বিরাট সংস্কৃত দর্শন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সমগ্র ইয়োরোপীয় দর্শনও তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। এইরূপে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনসাহিত্য যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও দর্শন, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাব্য বা পদ্যসাহিত্য। এই বিভাগে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, চম্পূকাব্য, কোষকাব্য, স্তবস্তোত্র, বিরুদা-বলী বা রাজস্তুতি, নাটকীয় সাহিত্য প্রভৃতি। পুনরায় ইহাদেরও অসংখ্য বিভাগ, শাখা-প্রশাখা আছে। যথা একমাত্র নাটকীয় সাহিত্যেরই ১৮টী বিভাগ আছে। ভারতের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যও জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপেই পরিগণিত হয়। দর্শন ও ধর্ম্মের পরেই, কাব্যে সংস্কৃত কবিগণের দান অতুলনীয়। তৃতীয়তঃ, গদ্য সাহিত্য—আখ্যায়িকা, কথা, হিতোপদেশ, নীতিসংগ্রহ প্রভৃতি। এই বিভাগও কম বিরাট নহে। নারায়ণের "হিতোপ-দেশ" জগতের প্রাচীনতম আখ্যায়িকা-সংগ্রহ। ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিখ্যাত "ঈশপস্ ফেবল্‌স্" ইহারই অনুবাদের অনুবাদ মাত্র। চতুর্থতঃ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি। এই সকল বিভাগেও অসংখ্য গূঢ়তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজি বিদ্যমান। পঞ্চমতঃ, অলঙ্কার ও ছন্দঃ শাস্ত্র। এই বিভাগও অতি সুবিশাল। ষষ্ঠতঃ, সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধনবিজ্ঞান। এই সম্বন্ধে পৃথক গ্রন্থের সংখ্যা অধিক না হইলেও, মহাভারত প্রভৃতিতে এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ তথ্য সন্নিবেষ্টিত আছে। সপ্তমতঃ, অভিধান প্রভৃতি। সংস্কৃত হইতে সংস্কৃত অভিধানের সংখ্যা অপরিমিত। অষ্টমতঃ, শব্দশাস্ত্র,—ব্যাকরণ, উচ্চারণ প্রণালী, বৈদিক শব্দাদির উদ্ভব-বিচার প্রভৃতি। নবমতঃ, কামশাস্ত্র। এই শাস্ত্রও অতি প্রাচীন ও সুবিশাল। দশমতঃ, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা। এই বিভাগে জ্যোতিষ, জ্যামিতি, গণিত, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি নানা-রূপ বিজ্ঞান; কৃষিকার্য্য, গোপালন, স্থাপত্য, রন্ধন, আয়ুর্ব্বেদ, পশুচিকিৎসা, বৃক্ষচিকিৎসা, অশ্বচিকিৎসা, যুদ্ধ, মৃগয়া, পত্রলেখন,

প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্প; নৃত্য, গীত, অভিনয়, সীবন, চিত্রন প্রভৃতি ললিত-কলা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ইহাদের অধিকাংশই অদ্যাপি আমাদের নিকট অজ্ঞাতই আছে। কিন্তু যে সামান্য অংশ জানা গিয়াছে, তাহা দেশী, বিদেশী সুধীবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। যথা, জ্যোতিষ, রসায়ন, গণিত, শরীর-তত্ত্ব, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সত্যই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের তত্তৎশাখা হইতে কোনো অংশে ন্যূন নহে, উপরন্তু অনেকাংশেই গরীয়ান্। উপরে সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য বিষয়াবলীর মধ্যে কেবল প্রধান দশটীর নামোল্লেখ করা হইল।

বাৎস্যায়নের "কামসূত্র" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ন্যূনকল্পে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। ইহাতে নারীদের শিক্ষণীয় কর্ম্মাশ্রয় চতুর্ব্বিংশতি কলা, এবং উপায়মূলক চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ আছে—যথা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, বেণীবন্ধন, তিলকরচনা, মাল্যগ্রথন, পুষ্পশয্যা রচনা, কাব্য রচনা প্রভৃতি কলাবিদ্যা; সুগন্ধ দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ, পাককর্ম্ম, সূচীকর্ম্ম, বেত্রশিল্প, তক্ষণ (ছুতোরের কার্য্য), সুযন্ত্রাদি পরিচালন, স্থাপত্যবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি কার্য্যকরী বিদ্যা; ইন্দ্রজাল, হস্তলাঘব (হাতসাফাই), দ্যূতক্রীড়া, বালক্রীড়নক (পুত্তলিকা ক্রীড়া, কন্দুক ক্রীড়া বা ঘুঁটি-খেলা) প্রভৃতি বহুবিধ ক্রীড়া; নানারূপ ব্যায়াম এবং যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি। এই সকল বিদ্যা অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল বলিয়া সে সকল সম্বন্ধে বহু গ্রন্থও নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, এই অমূল্য গ্রন্থরাজি অধিকাংশই অধুনা লুপ্ত বা অবহেলিত।

উপরিউক্ত অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতেও সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য, ও সর্ব্বব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মিবে। সংখ্যার দিক হইতে এরূপ বিপুল প্রাচুর্য্য, বিষয়বস্তুর দিক হইতে এরূপ অসীম বৈচিত্র্য, ভাবের দিক্ হইতে এরূপ সুগভীর নিগূঢ়তা, ভাষার দিক হইতে এরূপ হৃদয়হারি মাধুর্য্য পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেরই নাই। অতি সৌভাগ্যক্রমে আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে এই রত্নখনির অধিকারী হইয়াছি। ইহা অবজ্ঞা বা ধ্বংস করা যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, তাহা কি বলিয়া শেষ করা সম্ভব? সংস্কৃত সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালোকিত বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সেই সুপ্রাচীন সভ্যতাকে পরিবর্জ্জন করিয়া নূতন সভ্যতার পত্তনী করিতে চেষ্টা করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। আমরা বহু আয়াসে ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বরূপের সহিত পরিচিত হইতে সমুৎসুক, যাহাতে বিংশ শতাব্দীর নূতন বঙ্গীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে উহা হইতে মাল মশলা যোগাড় করা যায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া আমাদের নিজস্ব সংস্কৃত সভ্যতার বিষয় জ্ঞানলাভ করা এবং উহাতে গ্রহণীয় কিছু আছে কি না তাহা বিচার করা পর্য্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। রাশিয়ান; জার্ম্মাণ; ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীগণ পর্য্যন্ত নানাভাবে সংস্কৃত সংস্কৃতির চর্চ্চা করিতেছেন। কিন্তু আমরা সংস্কৃত ভুলিতে পারিলেই যেন বাঁচি। ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস!

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষা সুকঠিন হইলেও তাহা শিক্ষা করা দুঃসাধ্য, এরূপ মনে করাও ভুল। সংস্কৃতভাষা শিক্ষার দিক হইতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা যে, এই ভাষায় ব্যাকরণ, বানান, শব্দবিন্যাস, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে 'ধরাবাঁধা, সার্ব্বজনীন নিয়ম প্রচলিত আছে। একবার উত্তমরূপে এই সকল নিয়ম শিক্ষা করিলে, ভবিষ্যতে আর কোনো অসুবিধা গোলযোগ, বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই সকল নিয়ম, প্রয়োগ প্রভৃতি দুরূহ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা এরূপ দুরূহ নহে যে, সকলের সাধনাতীত। বিজ্ঞান, গণিত, জার্ম্মাণ ভাষা, প্রভৃতি বিষয় আয়ত্ত করিতে যে পরিমাণে সময় ও শক্তি ব্যয় প্রয়োজন, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে তাহার অপেক্ষা অধিক সময় বা শ্রমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু ঐ যে আমাদের মাথায় একবার দুষ্টবুদ্ধি ঢুকিয়াছে যে, সংস্কৃত পঠন-পাঠন আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ নিরর্থক, এবং ইহার জন্য সামান্য মাত্রও শ্রম স্বীকার পণ্ডশ্রম মাত্র—তাহাতেই হইয়াছে যত সর্ব্বনাশ। নতুবা আমরা বুঝিতাম যে, সংস্কৃত ভাষার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় অতি সার্থক, অতি শুভফল-প্রসূ, অতি প্রয়োজনীয়।

উপরেই উক্ত হইয়াছে যে, ভাষা শিক্ষার দিক্ হইতে সংস্কৃত ভাষার একটী প্রধান সুবিধা যে, ইহাতে সকল বিষয়েই স্থির, সার্ব্বজনীন নিয়ম আছে। একবার আগাগোড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ-খানি কণ্ঠস্থ করিলে, সংস্কৃত ভাষা পড়িতে, বুঝিতে, লিখিতে, বা বলিতে আর কোনোস্থলেই, কোনো রূপেই অসুবিধা হইবে না। এইরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণরূপ 'চাবি' দ্বারাই বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করা যায়, এবং একবার সেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, একেবারে সোজা, বাধাহীন রাজপথ—আর পদস্খলন, বা অবরোধের ভয় নাই। সেইজন্য বিদেশীগণ বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা সেইরূপ শিক্ষা করা অধিকতর সহজ বলিয়াই মনে করেন, কারণ বাংলা প্রভৃতিতে 'ধরা বাঁধা' নিয়ম নাই। যদি বলা হয় যে, সংস্কৃত মৃত, বাংলা জীবিত, কথ্য ভাষা, এবং জীবন্ত ভাষার লক্ষণই ধরা-বাঁধা নিয়মকে লঙ্ঘন করা—একমাত্র স্রোতোহীন, মৃত কূপ বা পুষ্করিণীরই সীমা নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু জীবন্ত, দুকুল-প্লাবিনী, স্রোতস্বতীর সীমা বাঁধিয়া দিতে পারে কে?—তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে নিয়মলঙ্ঘন, উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রভৃতি জীবন বা প্রগতির লক্ষণ নহে। জীবন্ত ভাষাকেও নিয়মের ভিতর দিয়াই পরিপুষ্টি লাভ করিতে হইবে, শৃঙ্খলার ভিতর দিয়াই পরিবর্ত্তিত, বর্দ্ধিত, উন্নত হইতে হইবে। ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার স্থির নিয়মাদি আছে বলিয়াই বিদেশীগণ উহা শ্রম স্বীকার করিয়াও উহা শিখিতে পারে। বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতেও অবিলম্বে ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে এক, স্থির নিয়মাবলী প্রণয়ন অত্যাবশ্যক, নতুবা তাহাদের পক্ষে দেশ-বিদেশের ভাষা হওয়া অসম্ভব হইবে। যাহা হউক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সংস্কৃত ভাষাকে জগতের ভাষারূপেই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা সযত্নে ইহাকে কঠোর নিয়মাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে প্রগতির দোহাই দিয়া কেহ ভবিষ্যতে ইহাকে লইয়া যথেচ্ছভাবে 'ছিনিমিনি'

খেলিতে না পারে, অথচ যাহাতে প্রকৃত বিদ্যার্থিবৃন্দের ইহা শিখিতে কোনোরূপ বাধা না হয়।

বঙ্গভাষার প্রগতির জন্য অত্যুৎসাহী যে সুধীবৃন্দ বর্ত্তমানে সংস্কৃত শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন ও সংস্কৃত ভাষাকে অবোধ্য, সুকঠিন, শিক্ষাতীত প্রভৃতি বলিয়া শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে বহিস্কৃত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের সবিনয় প্রশ্ন এই যে, তাঁহারা কি সংস্কৃত ভাষা জানেন, বা শিখিতে সত্যই চেষ্টা করিয়াছেন? মন্দলোকে বলে যে, যাঁহারা এইরূপে অযথা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন তাঁহাদের অনেকে সংস্কৃত ভাষা একেবারেই জানেন না; শুধু তাহাই নহে, ইহা শিখিতে গিয়া নাকি তাঁহাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়াই সংস্কৃতের উপর তাঁহাদের এই বিজাতীয় ক্রোধ! জানি না, এই অভিযোগ সত্য কি না। কিন্তু প্রথমতঃ, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় একেবারে কিছুই জানেন না, তাঁহাদের এই সম্বন্ধে রায় দিবার অধিকার কি আছে? খনির ভিতর প্রবেশ না করিয়াই বাহির হইতেই তাঁহারা কি করিয়া জানিলেন যে, খনিতে প্রবেশপথই নাই, অথবা সে-পথ বিপদসঙ্কুল ও অগম্য; কি করিয়া জানিলেন যে, খনিতে হীরক নাই, কেবল রাশ রাশ কয়লাই মাত্র আছে; কি করিয়া জানিলেন যে, খনিতে হীরক থাকিলেও তাহা আধুনিক সুন্দরীর কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিবার যোগ্যই নহে, সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য? অর্থাৎ, অতি সুসম্বদ্ধ সংস্কৃত ভাষা যে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য ও শিক্ষাতীত, সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক, সুপ্রাচীন সংস্কৃত-সভ্যতা যে বিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ অচল, তাহা তাঁহারা জানিলেন কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা সংস্কৃতভাষা শিখিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহাদের 'দাঁত ভাঙ্গিলেও' অন্যান্য সকলেরই যে তাহাই হইবে, সেরূপ কি কথা আছে? ভারতীয়গণ চিরকালই সংস্কৃতশিক্ষাই করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের দাঁত ত' পূর্ব্বে ভাঙ্গে নাই। বিংশ শতাব্দীর ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তির দাঁত হঠাৎ এরূপ কি সুকোমলত্ব প্রাপ্ত হইল যে, সংস্কৃত ভাষার এক আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে? ভালভাবে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে,—যাহা বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই,—দাঁত ত' ভাঙ্গিবেই না, উপরন্তু ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য শিক্ষার্থিগণ প্রচুর আনন্দই লাভ করিবেন—ইহা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই সজোরে বলিতে পারি। বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শক্ত শক্ত বিষয় পাঠে যদি ইহাদের দাঁত ও মস্তিষ্ক অক্ষুন্ন থাকে, তাহা হইলে সুমধুর দেবভাষা পাঠে যে দাঁতও ভাঙ্গিবে না, মাথাও ফাটিবে না, সে-সম্বন্ধে সকলকে আমরা আশ্বাস দিতে পারি। তৃতীয়তঃ যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন, তাঁহারাও যদি এইরূপে সংস্কৃত বিতাড়নে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে কিন্তু তাঁহাদের সদ্বিবেচনার উপর আস্থা রাখা দুঃসাধ্য—দেশপ্রেমিক হইলেও ইঙ্গবঙ্গীয়গণেরই ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও সত্য ও শুভঙ্কর নহে। বস্তুতঃ, বিদেশী ইংরাজী ভাষার প্রেমে আসক্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, এবং স্বদেশী বাঙ্গালাভাষার প্রেমে আসক্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষার প্রতি অবজ্ঞা—এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বেশী নহে। আমাদের নিজস্ব সুপ্রাচীন সংস্কৃত সভ্যতার বিষয়, আমাদের নিজস্ব অতুল ঐশ্বর্য্য-শালী সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করা নিষ্প্রয়োজন—ইহা যে সংস্কৃতাভিজ্ঞগণ বলেন তাঁহারা জ্ঞানপাপী, তাঁহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। কেবল ইহাই অতি দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমিক হইয়াও তাঁহারা একদিক্ হইতে স্বদেশের অকল্যাণই সাধন করিতেছেন। আধুনিক বঙ্গীয় সভ্যতার মূল ভিত্তিই হইল প্রাচীন সংস্কৃত-সভ্যতা—অত্যাধুনিকতার আলেয়াতে তাঁহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই, এই মহাসত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। এরূপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে, প্রাচীন সভ্যতার সবটুকুই এই বিংশ শতাব্দীতেও নির্ব্বিচারে গ্রহণীয়। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথার পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য। কিন্তু সংস্কৃত সভ্যতার যাহা সত্যই কল্যাণকর, তাহা বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক; এবং কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, এরূপ কল্যাণকর বস্তু সংস্কৃত সভ্যতায় অশেষ। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পুনরায়, দর্শন, ধর্ম্ম, নীতি, কাব্য প্রভৃতির যে রকম সত্য ও সৌন্দর্য্য সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমিকতায় জগতের নিকট পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা ত শাশ্বত, দেশাতীত, কালাতীত, সার্ব্বজনীন। এই সকল কালবিজয়ী অমর তত্ত্ব কি এইরূপে হেলায়ই বস্তু?

যাহা হউক্ যে বঙ্গভাষানুরাগিগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ও দুঃসাধ্য বলিয়া ইহাকে শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডনের কিছু প্রচেষ্টা করা হইল।

(২) ইহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা যে কেবল জ্ঞানের দিক্ হইতেই নিরর্থক তাহাই নহে, অর্থব্যয়ের দিক হইতেও ইহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। ইহাদের মতে, বর্ত্তমানে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই সংস্কৃতপাঠে আগ্রহশীল, সংস্কৃত 'অনার্সে' মাত্র দুই একটি করিয়া ছাত্রছাত্রী থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃত ক্লাসে বিদ্যার্থীর সংখ্যা অতি কম। সুতরাং সংস্কৃত বিভাগের জন্য উচ্চ বেতনে অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার স্থাপন, দেশ বিদেশ হইতে পুঁথি সংগ্রহ, এই সকল পুঁথির মুদ্রণ ও প্রচার প্রভৃতি বহুল ব্যবসাধ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন আর কি? বিশেষরূপে, আমাদের অতি দরিদ্র দেশে যে স্থলে প্রত্যেকটি কপর্দ্দকেরই মূল্য অত্যধিক, সে স্থলে এইরূপ কষ্টসংগৃহীত অর্থ সাধারণের অপ্রিয় সংস্কৃত ভাষার জন্য বৃথা ব্যয় না করিয়া জনপ্রিয় বাংলা ভাষার জন্যই ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কারণ, বাংলা ভাষার জন্য 'অনার্স,' 'এম এ' প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার গ্রন্থাগার স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থা করিলে যে স্থলে অন্ততঃ এক হাজার ছাত্রছাত্রী ও জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিগণ প্রভূত ভাবে উপকৃত হইবেন, সে স্থলে সমান ব্যয়ে সংস্কৃতের জন্য এই সব ব্যবস্থা করিলে মাত্র একজন উপকৃত হইবেন। এই দরিদ্র দেশে হাজারে এক জনের জন্য এরূপ প্রচুর অর্থব্যয়ে লাভ কি?

এ কথা সত্য যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে, বিশেষভাবে বঙ্গদেশে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠন ও চর্চ্চার আগ্রহ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ অনেক ;—অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক প্রভৃতি। অর্থনীতির দিক্ হইতে সংস্কৃত শিখিলে ভাল চাকুরীর আশা নাই বলিয়া ছাত্রছাত্রীগণ ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলেও সংস্কৃত না লইয়া ইংরাজী, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ই গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক দিক্ হইতে অধুনা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এরূপ অত্যধিকভাবে জোর দেওয়া হইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এ কথা উপরে বলা হইয়াছে। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষাই বাংলা ভাষার ন্যায় এরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করে নাই। সেইজন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে একদিকে যেরূপ ইংরাজী ভাষা, অপর দিকেও সেইরূপ সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বাংলাদেশ অপেক্ষা অধিকতর। সেই সকল প্রদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে ভারতীয়গণের মধ্যেও ইংরাজীতে কথা বলা, ইংরাজীতে পত্রাদি লেখা প্রভৃতি অদ্যাপি বহুল প্রচলিত আছে—কিন্তু বাংলা দেশে প্রায় নাই বলিলেও হয়—বাংলাই ইংরাজীর স্থান অধিকার করিয়াছে। অপর দিকে, সে সকল প্রদেশে, নব্য সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ে সংস্কৃতের চর্চ্চাও বাংলাদেশ হইতে অধিক—বাংলাদেশে বাংলা সংস্কৃতের স্থানও অধিকার করিয়াছে। সামাজিক দিক হইতে বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বদিক্ হইতেই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে, তাঁহাদের সামাজিক উচ্চস্থান ও সম্মান বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। সুতরাং, তাঁহারা আর পূর্ব্বের মত সংস্কৃত জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিতে পারিতেছেন না।

এইরূপে সংস্কৃত পাঠের প্রতি দেশের লোকের বর্ত্তমান অনাগ্রহ নানা কারণ বশতঃই উদ্ভূত হইয়াছে। সেই কারণগুলি দূর করিলেই, অনাগ্রহও দূরীভূত হইবে। কিন্তু কারণগুলিও দূর করিব না, সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত যত্ন লইব না, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য কোনোরূপ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা করিব না, এমন কি, সমাজে কোনো সম্মানীয় স্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রদান করিব না—সকল দিক্ হইতেই জননী দেব-ভাষাকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিব, অথচ আশা করিব যে, লক্ষ লক্ষ ছাত্র সংস্কৃত পাঠে প্রবৃত্ত হউক, নতুবা সংস্কৃতের জন্য সকল ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া দেওয়া হউক—ইহা সত্যই অতি অপূর্ব্ব যুক্তি। সংস্কৃত ভাষার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের অবজ্ঞা হইতেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি জনসাধারণের অনাগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং অধুনা যদি সেই অনাগ্রহকেই অজুহাতরূপে গ্রহণ করিয়া অবজ্ঞাকেও সমধিক বর্দ্ধিতই করা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে এরূপ এক "দুষ্ট চক্রে"র (vicious circle) উদ্ভব হইবে যে, তাহার প্রভাবে বঙ্গদেশ হইতে অচিরে সংস্কৃতচর্চ্চা নির্ম্মূলিত হইবে। কারণ কর্ত্তৃপক্ষের অবজ্ঞা হইতে জনসাধারণের অনাগ্রহ, সেই অনাগ্রহ হইতে অধিক অবজ্ঞা, অধিক অবজ্ঞা হইতে অধিকতর অনাগ্রহ, অধিকতর অনাগ্রহ হইতে অধিকতম অবজ্ঞা, পরিশেষে, সেই অধিকতম অবজ্ঞা হইতে সংস্কৃত শিক্ষার বিনাশ—ইহাই অনিবার্য্য।

এই দুষ্ট চক্র হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় কালবিলম্ব না করিয়া, সংস্কৃতপাঠেচ্ছু ব্যক্তির সংখ্যা গণনা না করিয়া, সর্ব্বদিক হইতেই সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি-সাধন করা। যে দূরদর্শী মনীষিগণ প্রথম বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এরূপ বহু বাধারই সম্মুখীন হইয়াছিলেন। প্রথমে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই বাংলায় উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহান্বিত হইত —অদ্যাপি বাংলা 'অনার্সে'র ছাত্র-সংখ্যা খুব বেশী নহে। বাংলায় 'ডিগ্রি'ধারীদের বেতন ও পদমর্য্যাদাও ছিল অতি কম, চাকুরী ক্ষেত্রেও আশা ছিল অল্প। কিন্তু দেখিতে দেখিতে, কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ছাত্রসংখ্যা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে ; বাংলাভাষায় 'ডিগ্রি'ধারী আর অন্যান্য বিষয়ে 'ডিগ্রি'ধারিগণের অপেক্ষা নিজেকে কোন অংশে ন্যূন মনে করেন না ; চাকুরীর ক্ষেত্রে তাঁহার সুযোগ-সুবিধাও সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্কুলকলেজ, গ্রন্থাগার, পরিষৎ প্রভৃতিতে বহু নূতন পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে ; তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ও বেতনেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এইরূপে কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা লক্ষগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বাংলার পঠন-পাঠন ও চর্চ্চা বহুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' নিমজ্জিত হইয়া আছে। সুতরাং, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—যেন ছাত্রসংখ্যার অল্পতা হেতু তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যয় ও ব্যবস্থা করিতে উদাসীন না হন। বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রগতির জন্য প্রচুর ব্যয় করা কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাকে বাদ দিয়া, বা ইহার ক্ষতি করিয়া নিশ্চয়ই নহে।

বাংলাদেশের অতি দীনদরিদ্র, অতিলাঞ্ছিত সংস্কৃত পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রতি শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইঁহারা সংখ্যায় অতি কম, কিন্তু প্রধানতঃ ইঁহারাই দেশে সংস্কৃত শিক্ষার ধারা অদ্যাপি অতি কষ্টে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অদ্যাপি এরূপ মহাপণ্ডিত ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন, যাঁহারা অন্য যে কোনো সভ্যদেশে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হইতেন। কিন্তু আমাদের দেশে ইঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্মান যেরূপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে ইঁহারা যে আর কতদিন এরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে বহু ধনীব্যক্তি, জমিদার, রাজা, মহারাজগণ সংস্কৃত সভ্যতার দীপশিখাধারী এইসকল পণ্ডিতকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেন, আর্থিক সাহায্য করিতেন, পঠন-পাঠনের সুযোগ দিতেন ; এবং অন্যান্য বহুভাবেও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, বর্ত্তমানে এ সকল কিছুই প্রায় দৃষ্ট হয় না।

(৩) সংস্কৃতবিতাড়নেচ্ছুকগণের তৃতীয় যুক্তি এই যে, দেশের সুপ্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার বিষয় কিছু জানা যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও এরূপ কষ্ট ও অর্থব্যয় করিয়া, "মৃত" সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আর কি ? সেই সকলের বাংলা বা ইংরাজী অনুবাদ পড়িলেই ত গোল চুকিয়া যায়।

কিন্তু প্রথমতঃ সেই অনুবাদই বা করিবে কে? তাহা হইলে ত ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে সমর্থ একদল ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি, এবং বাংলায় অনুবাদ করিতে সমর্থ একদল পণ্ডিতকে অতি সযত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সর্ব্ববিধ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেইরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কই? দ্বিতীয়তঃ, অনুবাদ অনুবাদই, মূল নহে। অনুবাদ যতই আক্ষরিক বা সুমধুর হউক না কেন, মূলের স্থান অধিকার করিতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষার একটী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, অনুবাদে তাহার পরিপূর্ণরূপটী প্রতিফলিত হইতে পারে না। বহু বিদেশিগণ সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব্ব স্বাদ সাক্ষাৎ আস্বাদন করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছেন, আর আমরা ভারতবাসী হইয়া কেবল অনুবাদেই সন্তুষ্ট থাকিব, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? সংস্কৃত কাব্য-দর্শনাদির প্রভৃত ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ জনসমাজে প্রচারিত হওয়া অত্যাবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মূলের যথাসম্ভব পাঠ ও প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়। আশ্চর্য্য যে, আমরা সেক্‌স্‌পীয়ার পড়িবার জন্য ইংরাজী, গ্যেটে পড়িবার জন্য জার্ম্মাণ ও দান্তে পড়িবার জন্য ইতালীয় শিখিতে পশ্চাৎপদ নহি, কিন্তু বাল্মীকি ও কালিদাস পড়িবার জন্য সংস্কৃত শিখিতেই আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়!

(৪) এইবার সংস্কৃতবিতাড়নেচ্ছুক নব "প্রগতিশীল" বাংলা সাহিত্যিকবৃন্দের কথা আলোচনা করা যাক। ইঁহারা যে, ধনবতী 'সই-মা' ইংরাজী ভাষার অঞ্চল ত্যাগ করিয়া দরিদ্রা জননী বঙ্গভাষাকেই অধুনা আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা অতি সুখের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিরীহা প্রমাতামহী সংস্কৃত ভাষার মস্তকে অকারণে যেরূপ লগুড়াঘাত করিতেছেন, তাহা দর্শনে আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি। বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল, স্বাধীন, নিরপেক্ষ করিবার জন্য এবং সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নূতন এক ভাষায় পরিণত করিবার জন্য ইঁহারা যেরূপ "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া ভীমরবে উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহাতে অচিরেই যে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিবে, এরূপ ভয়ই অনেকে করিতেছেন। অর্থাৎ, শীঘ্রই জননী বঙ্গভাষার মৃত্যু সংঘটিত হইবে, এবং সেই ভস্মস্তূপ হইতে সমুত্থিত হইবেন এক প্রেতাত্মা—যিনি আমাদের গ্রাস করিয়া নিজেও ধ্বংস হইবেন। কারণ, সকল নিয়ম-কানুন পরিলঙ্ঘন করাই ইঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া, ইঁহারা কেবল সংস্কৃত ভাষার নহে, বাংলা ভাষারও যাহা কিছু নিয়মাবলী আছে, তাহা সকলই হেলায় অবজ্ঞা করিতেছেন। মজা এই যে, যদিও ইঁহারা বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি প্রদানই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি সংস্কৃতবহুল, গুরুগম্ভীর ভাষার দিকেই তাঁহাদের আগ্রহ সমধিক। সে ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার বিশাল ভাণ্ডার হইতে শব্দ আহরণ করিলেই ত চুকিয়া যাইত। কিন্তু স্বাধীনতাকামী, নবীন সাহিত্যিকগণ তাহা ঘৃণার কার্য্য বলিয়া মনে করেন। সুতরাং, "ওল্‌ড্‌ ফুল্‌স্‌" সংস্কৃত ঋষি প্রভৃতির সাহায্য না গ্রহণ করিয়া, এই সকল "তাজা তরুণ" স্বয়ং শব্দসৃষ্টি, ব্যাকরণ আবিষ্কার ও ভাব-বিন্যাস উদ্ভাবনে অবহিত হইয়াছেন। ফলে তাঁহাদের ভাষা হইয়াছে না সংস্কৃত, না বাংলা, না অন্য কিছু। "প্রগতি" সাহিত্যের পাতায় পাতায় ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এ স্থলে কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্য দুই একটী পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"নায়গারা নৈঃশব্দ নিস্রাব;
ভ্রূণজন্মা অন্ধকার মূক;
অয়নের বিলম্বী খেয়ালে
খেয়ালী সঙ্গত শুরু
নিরীশ্বর রাত্রি শেষ হ'ল
তলানির পঙ্কিল পম্বলে
মুখ দেখে তাই ভগবান্!"

অথবা— "বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধ মস্রাবির
জড় কবন্ধ অন্ধ কর্ম্মে ফুৎকার মোর নর্ম্মাচার
প্রাক্তন পাশ্চাত্য মাগি না। মন তুষার।
ক্রেসিডা তোমার থমকালো বরাভয়।
আশ্লেষে তব অনন্ত স্মৃতি ক্রতু কৃতমের শেষ।"

অথবা—"অমন সূক্ষ্ম অলংকারিক পারিপাট্য, অমন মাথমের মত দরদ, আবার ঋজু ভংগি, ঘন সন্তমসে যেন স্ফণি তুলি বীর ভংগিতে সমুদ্যত" ইত্যাদি!

এইরূপ ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দসৃষ্টি, এবং ততোধিক এই অপূর্ব্ব শব্দ-সংযোজনে ভাব 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে ভাষা ছাড়িয়া পলাইয়াছে, এবং সমগ্র রচনা এক অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। এই ভাষাকে—ইহাকে যদি "ভাষাই" বলা যায়—"বাংলাভাষা" নামে অভিহিত করা বাতুলতা মাত্র। জননী বঙ্গভাষার সুপবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণকে অপবিত্র করিবার এই যে কুচেষ্টা, তাহা দেশবাসিগণ আর কতদিন সহ্য করিবেন?

যাহা হউক, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাংলা ভাষা স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সংস্কৃত ভাষারই আশ্রিত, এবং এই আশ্রয়েই ইহার গৌরব বৰ্দ্ধিত হইবে এবং প্রকৃত প্রগতি সাধিত হইবে। মাতার নিকট সন্তানের ঋণ স্বীকারে যেরূপ লজ্জা নাই, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষার নিকট বাংলা ভাষার ঋণ স্বীকার করিলেও অগৌরবের কিছুই নাই। উপরন্তু, এইরূপ একটি অতি-সমৃদ্ধ ভাষার সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বাংলাভাষারও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সংস্কৃত ভাষার গুণ কীৰ্ত্তন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—সেই গুণ এরূপ অশেষ যে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্যও একটী প্রবন্ধের প্রয়োজন। কিন্তু, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সংস্কৃত জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। এরূপ সুকঠোর নিয়মবদ্ধ অথচ এরূপ সরস ও সুমিষ্ট, এরূপ সংযত অথচ এরূপ ভাবগভ ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। সংস্কৃতে দুই একটি কথায় যাহা ব্যক্ত করা যায়, ইংরাজী বা বাংলায় সেই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে বহু কথাই বলিতে হয়—ইহা সংস্কৃত হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদক যে কোনো ব্যক্তিই উত্তমরূপে অবগত আছেন। সংস্কৃতের মত এরূপ অতি সুমধুর ভাষাও যে জগতে আর নাই, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। সংস্কৃত ভাষা সত্যই "গীর্ব্বাণ-বাণী," দেবভাষা। অতএব আমরা যদি বাংলা

ভাষাকে শব্দ-সম্পদে ধনী, ব্যঞ্জনায় সুগভীর এবং শ্রুতিতে সুমধুর করিতে যথার্থই ইচ্ছুক হই, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই তাহা করিতে হইবে। মনগড়া অদ্ভুত, অর্থহীন, ব্যাকরণ-দুষ্ট শ্রুতিকঠোর শব্দ প্রয়োগ করিয়া, সকল নিয়ম যথেচ্ছ লঙ্ঘন করিয়া উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিলে, অথবা অকারণে সংস্কৃত হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি জটিল শব্দ পাশাপাশি অসংবদ্ধ ও অর্থহীন ভাবে বসাইয়া দিলে, ভাষার চিতাশয্যা রচনা হইবে, শ্রাদ্ধ হইবে মাত্র, "প্রগতি" নহে। অকারণে অত্যধিক রকম কটমট সংস্কৃত শব্দাদি প্রয়োগ করিয়া বাংলা ভাষাকে শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ্য করিবার ইচ্ছা অবশ্য আমাদের নাই, কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাংলা বাংলাই, সংস্কৃত নহে, এবং তজ্জন্য যাহা সংস্কৃতে শ্রুতিমধুর ও সুবোধ্য, বাংলায় তাহা সর্বদা নহে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া সংস্কৃত শব্দাদি বাংলাতেও প্রয়োগ করিলে, বাংলা ভাষা যে কিরূপ শ্রুতিমাধুর্য্য ও ভাবগাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাতেই ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু "প্রগতিপন্থিগণ" অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দাদি ব্যবহার করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। যে ক্ষেত্রেও বা তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কিছু শুদ্ধ শব্দই ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রেও তাঁহারা অর্থের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া শব্দগুলি সম্পূর্ণ অসংবদ্ধ ভাবে যোজনা করিয়া সংস্কৃত ও বাংলা উভয়েরই শ্রাদ্ধ করেন মাত্র, সাহিত্য বা কাব্যরচনা নহে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দাদির অন্যায্য ব্যবহার ও অপপ্রয়োগের ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে এই তথাকথিত নবীনপন্থিগণের রচনারই ছত্রে ছত্রে। বাংলা শব্দই হউক, অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দই হউক, বা শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দই হউক, ইহাদের অপূর্ব্ব শব্দপ্রয়োগ ও ভাষাবিন্যাসের গুণে সকল ক্ষেত্রেই অর্থহীনতাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহাদের রচনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান যুগ অবশ্য 'মেকির' যুগ—যে যুগে 'আসলের' অপেক্ষা নকলেরই, প্রাচুর্য্য ও সমাদর সমধিক। কিন্তু সাহিত্যের সুপবিত্র প্রাঙ্গণে অন্ততঃ 'মেকি' ও ভেজালে'র প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত সাহিত্যিক-প্রতিভাহীন কতিপয় 'মেকি' কবি ও সাহিত্যিক গলার জোরে আসর দখল করিয়া বাংলা ও সংস্কৃত উভয়েরই অন্তিমশয্যা নির্ম্মাণ করিতেছেন।

যাঁহারা বলেন যে, সংস্কৃত ভাষা "মৃত," সুতরাং জীবন্ত, নবীন, সতেজ বাংলা ভাষার উপর পূতিগন্ধময়, গলিত, সুপ্রাচীন ভাষার প্রভাব অনিষ্টেরই কারণ, মঙ্গলের নহে—তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন এই, "মৃত" ভাষার অর্থ কি? যাহা সাধারণের কথ্য ভাষা নহে, তাহাই মৃত—এই সংজ্ঞা অনুসারে অবশ্য সংস্কৃত "মৃত"। কিন্তু জনসাধারণের কথ্য ভাষা না হইলেও, বর্ত্তমান যুগেও ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে সমর্থ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যক্তির সমগ্র সংখ্যা সম্ভবতঃ সমগ্র বাংলা ভাষাভাষিগণের সংখ্যা হইতে অধিকই হইবে। সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়নও ভারতবর্ষে কদাপি সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও কোনো কোনো ভারতীয় পণ্ডিত, কবি প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাতেই পুস্তক রচনা করিতেছেন। এইরূপে নানাভাবে অনাদৃত ও বিপর্য্যস্ত হইলেও সংস্কৃত ভাষা কদাপি ভারতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা মৃত হয় নাই। বস্তুতঃ, যে ভাষার গৌরব শত শত বৎসরেও অক্ষুন্ন রহিয়াছে, সেই কালবিজয়িনী ভাষাই ত শাশ্বতী, তাহার আর মৃত্যু হইল কই? কত শত ভাষা কালস্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে কিন্তু গীর্ব্বাণ-বাণীর অমল জ্যোতিঃ শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও বিন্দুমাত্রও পরিম্লান হয় নাই, ভবিষ্যতেও যে হইবে না—তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ত "মৃত" নহেই, উপরন্তু ইহাই একমাত্র অমর ভাষা। ভারতের যে কোনও প্রাদেশিক ভাষা কালস্রোতে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। চিরন্তনী সংস্কৃত ভাষাই কালস্রোত অতিক্রম করিয়া স্বকীয় গৌরবে চিরাব্যাহত থাকিবে। তজ্জন্য সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিয়া ঐ ভাষায় সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা চিরস্থায়ী হইবে, নতুবা নহে। এইরূপ মৃত্যুবিজয়িনী দেবভাষা হইতে প্রাণশক্তি লাভ করিয়াও যদি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বাংলা ভাষা অন্য সংস্কৃত ভাষার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিতে উৎসুক হয়, তাহা হইলে তাহারই অপমৃত্যু সুনিশ্চিত!

সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব মাত্রেই নিশ্চয় অনেকেই শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু সংস্কৃতই যে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সার্ব্বজনীন ভাষা তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহ সংস্কৃতের সহিত অতি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ও সংস্কৃত দ্বারাই পরিপুষ্ট। অপর পক্ষে, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার উপরও সংস্কৃতের প্রভাব অল্প নহে। সে ক্ষেত্রে, হিন্দুদের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত ভাষাসমূহের প্রধান যোগসূত্র সংস্কৃত ভাষা। অতএব, অন্ততঃ হিন্দুদের জন্য সংস্কৃতকেই সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিলে, কাহারও বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সংস্কৃতির বাহন আরবী ভাষাকে তাঁহাদের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপে, ভারতে সংস্কৃত ও আরবী এই দুই রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় একটী রাষ্ট্রভাষা হইবার ত কোনোরূপ সম্ভাবনা নাই। দুইটী ভাষার অর্থ অবশ্য দুইটী রাষ্ট্র বা 'পাকিস্থান' নহে। কারণ, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশেও 'পাকিস্থানে'র নামগন্ধ ব্যতীতই দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষা প্রচলিত আছে; যথা, কানাডায় ইংরাজী ও ফরাসী, বেলজিয়ামে ফরাসী ও ফ্লেমিশ, সুইটজারল্যাণ্ডে ফরাসী, জার্ম্মানী ও ইতালীয় রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনার স্থান ইহা নহে। কিন্তু মজা এই যে, মুসলমানগণের হয় ত 'আরবী'তে আপত্তি নাই, আপত্তি আছে বহু হিন্দুরই 'সংস্কৃতে'।

(৫) পরিশেষে, সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষার সকল সম্পর্কচ্ছেদনে উৎসুক সুধীবৃন্দের অপর এক যুক্তি এই যে, বাংলাভাষাকে এইরূপে সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতসাপেক্ষ করিলে, বাঙালী মুসলমানগণের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কারণ, বঙ্গভাষা কেবল বাঙালী হিন্দুর নহে, বাঙালী মুসলমানেরও মাতৃভাষা; কিন্তু মুসলমানগণের সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা জানিবার

প্রয়োজন নাই—তাঁহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি ত সম্পূর্ণ পৃথক্। বস্তুতঃ, অতি অল্প মুসলমানই সংস্কৃত ভাষা জানেন, বা জানিতে ইচ্ছুক। তজ্জন্য কি তাঁহারা বঙ্গভাষা পঠন-পাঠনে অধিকারী হইবেন না?

এ স্থলে প্রথম বক্তব্য এই যে, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতসাপেক্ষ করা বা না করা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না—এই সাপেক্ষতা একটী অবিসংবাদী, বস্তুগত্যা সত্য, যাহাকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও বাংলাভাষা সংস্কৃতমূলক এবং নানা অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষা হইতেই বিবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে—এই সত্যটীকে আমাদের মনঃপূত হউক বা না হউক, মানিয়া লইতেই হইবে। বর্ত্তমানে আমরা খাঁটী বাংলাভাষার যে রূপ দেখিতেছি, তাহাও সংস্কৃতের সহিত অতি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনও কারণের জন্য হঠাৎ এই একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার আমূল পরিবর্ত্তন-সাধন অসম্ভব। অবশ্য বাংলাভাষা অদ্যাপি সংস্কৃতের ন্যায় একটী পূর্ণ-পরিণত, চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে নাই—নানাভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনও সুশৃঙ্খলভাবে, সংস্কৃতভাষার মূল কাঠামোর ভিতরই সম্পাদনা করিতে হইবে, সংস্কৃত-নিরপেক্ষভাবে নহে। যাঁহারা বাংলাভাষাকে এইরূপে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ ও তথাকথিত কালোপযোগী করিবার সাধু চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে বঙ্গভাষার কি দুর্গতিই না হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত ভাষাই বাংলাভাষার প্রাণশক্তি, সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই বাংলা ভাষার প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর, অন্য উপায়ে নহে। এই সকল সত্য সত্যই, কোনো কিছুর খাতিরে তাহা মিথ্যা হইবার নহে। সুতরাং বাংলাভাষা অতীতে সংস্কৃতমূলক ছিল, বর্ত্তমানেও তাহাই আছে, ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে। যদি না থাকে, তাহা হইলে উহাকে আর "বাংলাভাষা" বলা অন্যায় হইবে, অন্য এক নূতন ভাষা বলিয়াই ধরিতে হইবে। বর্ত্তমানযুগেও, একদিকে "প্রগতি"র নামে, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার নামে বঙ্গভাষাকে যে রূপ দিবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন, সেই রূপকে সত্যের অপলাপ না করিয়া কোনোক্রমেই "বাংলাভাষা" এই নামে অভিহিত করা যায় না। একদিকে যেরূপ মস্তিষ্কপ্রসূত অর্থহীন, ব্যাকরণদুষ্ট, অত্যুৎকট শব্দ ব্যবহার অথবা সংস্কৃত শব্দের অসংবদ্ধ, অর্থহীন সংযোজন বাংলাভাষা নহে, অপর দিকে সেইরূপ রাশি রাশি উর্দ্দু, ফার্সী শব্দ ব্যবহারও বাংলা নহে।

যথা, একদিকে—

"উদয় ও অস্তের পরম মিলন-ক্ষণে
ধ্বাস্ত পৃথিবীতে ছিলো মনেরও অদেহী তমিস্রা।
বৈজয়ন্তর প্রকোষ্ঠে এখনো নাম না জানা সংবিগ্ন
বিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ইতস্ততঃ।
আতনক্ মাধুরী রক্তে ছিল না চেতনায় ধাত্তারী।"

অপরদিকে,—

অদূর ওয়াদী আইমান-বুকে শুনি গাফিবের নিদা;
উটের সারবাঁ আদিয়াত সনে রচিয়া চলিছে হিদা।
কুহিতুর জলা সুরমা-আঁকানো আঁখির নজর আজ
খোওয়াব আলুদা শারাবী নয়নে নগ্‌মা-স্বপন রচা।"

বাতুল ভিন্ন কেহই আর এই ভাষাকে "বাংলাভাষা" বলিবে না। বস্তুতঃ, ইহারা কোনো ভাষাই নহে, এবং বাঙালী হিন্দু বা মুসলমান কাহারও ইহা বুঝিবার সাধ্যমাত্র নাই। সেই ভাষাই কেবল বাংলাভাষা যাহা সংস্কৃতমূলক ও সংস্কৃতসাপেক্ষ; যাহা স্বতন্ত্র ভাষা হইয়াও সংস্কৃতের আশ্রয়েই পরিপালিত ও পরিপুষ্ট; যাহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সর্ব্ববিষয়ে সংস্কৃত ভাষার নিকট ঋণী। এক্ষণে, যদি সাম্প্রদায়িক কারণ বশতঃ মুসলমানগণ এইরূপ খাঁটী বাংলাভাষা পড়িতে অসম্মত হন, তাহা হইলে এক-মাত্র উপায় তাঁহাদের ইচ্ছামত নূতন এক ভাষার প্রচলন করা, এবং সেই ভাষার নূতন এক নামকরণ করা, যথা "পূর্ব্ব পাকি-স্থানী ভাষা" বা 'পূর্ব্ব ইসলামী ভাষা" অথবা মুসলমানগণের মনোমত অন্য কোনো নাম। কিন্তু উহাকে কোনক্রমেই আর "বাংলাভাষা" বলা চলিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। যদি বলা হয়, তাহা হইলে তাহা কেবল গায়ের জোরেই বলা হইবে, সত্যের জোরে নহে।

কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাংলার মুসলমানগণের জন্য এইরূপ একটী অদ্ভুত, নূতন 'খিচুড়ি' ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ, কয়েক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও, অধিকাংশ চিন্তাশীল মুসলমানগণ খাঁটি বাংলা ভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তমরূপে বাংলা শিখিবার জন্য যতটুকু সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা আহরণেও তাঁহারা সমুৎসুক। কেহ কেহ সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের যথার্থই অনুরাগী। সংস্কৃতভাষার চর্চ্চায় এই সকল মুসলমানগণের কোনোরূপ ক্ষতি ত হয়ই নাই, উপরন্তু তাঁহারা নানা ভাবে উপকৃতই হইয়াছেন। বস্তুতঃ, ভাষাশিক্ষা, সাহিত্য-চর্চ্চা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সাম্প্রদায়িকতার কোনোরূপ স্থান নাই। ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বাহন হইলেও, ভাষা প্রধানতঃ ভাষাই, শুদ্ধ জ্ঞানমূলক। সেই জন্য মুসলমান সংস্কৃত পড়িলেই মুসলমানত্ব ত্যাগ করিয়া "কাফেরত্ব" প্রাপ্ত হইবেন, এবং হিন্দু আরবী-ফারসী পড়িলেই হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক "ম্লেচ্ছত্ব" প্রাপ্ত হইবেন—এই উভয় প্রকার আশঙ্কাই অতি হাস্যজনক। যথা, আমরা লাতিন, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা অতি যত্নে শিক্ষা করি। কিন্তু এই সকল ভাষা ক্রিশ্চিয়ান সভ্যতার বাহন হইলেও আমরা নিশ্চয় তজ্জন্য 'ক্রিশ্চিয়ান' হইয়া যাই নাই। মুসলমানগণ যদি হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয় জানিতে ইচ্ছুক নাও হন, তাহা হইলেও কেবল ভাষা শিক্ষারূপ জ্ঞানের দিক্ হইতেই তাঁহারা সংস্কৃত পাঠ করিতে পারেন। তাঁহারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাংলাদেশই তাঁহাদের মাতৃভূমি, বাংলা-ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা। সে ক্ষেত্রে, সংস্কৃতমূলক খাঁটী বাংলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার জন্য যদি তাঁহারা সংস্কৃতকেও কেবল ভাষারূপেই শিক্ষা করেন—তাহা হইলে তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম্ম বা

কৃষ্টিতে আঘাত লাগিবার কোনই কারণ নাই। এই একই ভাবে হিন্দুগণও যদি আর্‌বী ফার্‌সী ভাষা শিক্ষা করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম্ম ও কৃষ্টির গ্লানি হইবে কেন? বস্তুতঃ, ভারতের অবাঙালী বহু হিন্দুরই মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু। সেই স্থলে এই হিন্দুগণ হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার জন্য আর্‌বী ও ফার্‌সীও পাঠ করেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের হিন্দুত্ব কোনোদিক্ হইতেই ব্যাহত হয় না। বস্তুতঃ জ্ঞানের মন্দিরে সাম্প্রদায়িক ভেদ নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বাঙালী মুসলমানগণকে সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করিলে তাঁদের উপর অত্যাচারই করা হইবে। কারণ, একদিকে তাঁহাদের বাংলাভাষার জন্য সংস্কৃত ভাষার ন্যায় সুকঠিন ভাষাও আয়ত্ত করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকেও নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তাঁহাদের আর্‌বী ফার্‌সীও শিক্ষা করিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তর এই যে—বাংলাদেশে অবশ্য হিন্দুগণের অবস্থা একদিক্ হইতে মুসলমানগণের অবস্থা হইতে অধিক সুবিধাজনক। কারণ, বাঙালী হিন্দুর মাতৃভাষা বাংলা সংস্কৃতমূলক, এবং সংস্কৃতই পুনরায় হিন্দুর ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও বাহন। সুতরাং একমাত্র সংস্কৃত পড়িলেই বাঙালী হিন্দুর মাতৃভাষা শিক্ষা এবং ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ, উভয়ই একসঙ্গে সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের এই সুবিধা নাই। কারণ, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা সংস্কৃতমূলক বাংলাভাষা, কিন্তু মুসলমানের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত নহে, আর্‌বী ও ফার্‌সী। সে ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানকে সংস্কৃত, আর্‌বী ও ফার্‌সী সকলই পড়িতে হয়। কিন্তু যদিও বাংলা দেশে হিন্দুদের মুসলমানগণ অপেক্ষা এইরূপ অধিক সুবিধা আছে, তথাপি বাংলাদেশের বাহিরে দিল্লী প্রভৃতি কয়েক প্রদেশে হিন্দুগণের অপেক্ষা মুসলমানগণেরই এই দিক্ হইতে অধিক সুবিধা। সেই সকল প্রদেশে, হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দুই মাতৃভাষা বলিয়া মুসলমানগণ কেবল আর্‌বী ফার্‌সী শিক্ষা করিলেই একসঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা এবং ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু হিন্দুদের এই সুবিধা নাই। তাঁহাদের মাতৃভাষা উত্তমরূপে শিক্ষার জন্য আর্‌বী ফারসী পাঠ করিতে হয়, এবং স্বীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সংস্কৃতও পাঠ করিতে হয়।

অতএব, কেবল প্রাদেশিক দিক্ হইতে ব্যাপারটীকে বিবেচনা না করিয়া সমগ্র ভারতের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে, বাঙালী মুসলমানগণের প্রতি অত্যাচার বা অবিচারের অভিযোগ উপস্থিত করা যায় না। অন্যপ্রদেশস্থ উর্দ্দুভাষী হিন্দুগণ যদি ধর্ম্ম ও কৃষ্টির দোহাই দিয়া উর্দ্দু ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দাদি আনয়ন করেন, তাহা হইলে কোন্ মুসলমান তাহা সহ্য করিবেন এবং সেই অপূর্ব্ব 'খিচুড়ি' ভাষাকে "উর্দ্দুভাষা" নামে অভিহিত করিতে স্বীকৃত হইবেন? সমভাবে, বাঙালী মুসলমান যদি ধর্ম্ম ও কৃষ্টির দোহাই দিয়া বাংলা ভাষাতে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দাদির আমদানী করেন, তাহা হইলে কোন্ বাঙালী তাহা সহ্য করিতে পারেন, বা সেই অভ্যদ্ভুত "খিচুড়ি" ভাষাকে "বাংলাভাষা" নামে অভিহিত করিতে পারেন? বস্তুতঃ এইরূপ "দো-আঁশলা" বা "খিচুড়ি" ভাষার স্থান সাহিত্যে নাই, খাঁটি বাংলা বা খাঁটী উর্দ্দুরই কেবল আছে। রাজনৈতিক নেতৃগণ যদি ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য সর্ব্বভাষা সংমিশ্রিত করিয়া এক সার্ব্বজনীন ভাষার সৃষ্টি করিতে পারেন ত, সে অন্য কথা। কিন্তু সে হইবে এক নূতন ভাষা, বাংলাও নহে, উর্দ্দুও নহে। ইহা একেবারেই সম্ভব কি না, কেহ চেষ্টা করিতে উৎসুক কি না, এবং সম্ভব হইলেও কবে সম্ভব—তাহা কিছুই এ পর্য্যন্ত কেহ জানেন না। অতএব, যত দিন না এইরূপ সংমিশ্রিত ভাষার সৃষ্টি ও প্রচার হয়, ততদিন বাংলা, উর্দ্দু প্রভৃতি কথ্য ভাষাকে, এবং সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি মূল (classsical) ভাষাকে পৃথক্ রাখাই কর্ত্তব্য, 'খিচুড়ি' পাকাইলে লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই সমধিক। কথ্যভাষায় এরূপ সংমিশ্রণ কিয়দংশে অপরিহার্য্য হইলেও, লিখিত সাহিত্যের ভাষায় ইহা যথাসম্ভব বর্জ্জনীয়।

যাহা হউক, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতমূলক করিলে যে বাঙালী মুসলমানগণের বহুল অসুবিধা হইবে এবং ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে আঘাত লাগিবে—এই আশঙ্কা অমূলক। উপরে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু যদি মুসলমানের এবং মুসলমান যদি হিন্দুর ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু জানিতে নাও চাহেন, তাহা হইলেও কেবল ভাষারূপেই উর্দ্দু বা সংস্কৃত পাঠ করিলে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে কোনরূপ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মুসলমানের এবং মুসলমান হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে চর্চ্চা করিলেও তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম্মে ও সংস্কৃতিতে কোনরূপ ব্যাঘাত হইবে কেন? উপরন্তু একই মাতার দুই সন্তানের ন্যায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সাহায্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ভাষা শিক্ষার কথাই আলোচনীয় বলিয়া এই অন্য বৃহৎ বিষয়ের আলোচনার অবতারণা এস্থলে করা হইল না।

আধুনিক বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির প্রগতিকামী শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ ও সাহিত্যিকগণ সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি নানাদিক্ হইতে যেরূপে সংস্কৃত ভাষাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহার কিছু আলোচনা উপরে করা হইল, তাঁহাদের যুক্তির অসারত্বও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

(৩) এবং (৪) বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িগণের আপত্তি।

এক্ষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ্, ব্যবসায়িমণ্ডল প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বিরুদ্ধে আপত্তির কথা একত্রেই আলোচনা করা যাক—কারণ ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র, কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হইলেও, সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে ইঁহাদের অভিযোগ একই। পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃতবিদ্বেষী বাংলার শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ ও সামাজিকগণের সহিত ইঁহাদের প্রথম প্রভেদ এই যে, উঁহারা সংস্কৃতকে কেবল অবজ্ঞাই করেন না, উপরন্তু বিতাড়িত ও ধ্বংসীভূত করিতেও সচেষ্ট। ইঁহারা কিন্তু সাধারণতঃ নীরব অবজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সরব প্রতিবাদ ও সশব্দ উদ্যোগায়োজনে প্রবৃত্ত হন না। তাহার কারণ এই যে, উঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী

রূপেই গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য মনে করেন যে, বাংলা ভাষাকে উঠাইতে হইলে, সংস্কৃত ভাষাকে ধ্বংস করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকগণের কার্য্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া, ইঁহারা সংস্কৃত বিতাড়নে সাধারণতঃ প্রবৃত্ত হন না। দ্বিতীয়তঃ উঁহাদের অভিযান প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধেই, সাহিত্য ও সভ্যতার বিরুদ্ধে সেইরূপ অধিক নহে—কেহ কেহ অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতার রসাস্বাদনেও সমুৎসুক। ইঁহারা কিন্তু সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতার প্রতিই গভীর ভাবে ঘৃণাশীল। ইঁহারা সকলেই কাজের লোক, স্থূল বাস্তব জীবন লইয়াই তাঁহাদের কারবার। তজ্জন্য ভাষা বলিতে তাঁহারা বোঝেন কেবল কথিত প্রাত্যহিক 'কাজ চালান' ভাষা ; সাহিত্য বলিতে তাঁহারা বোঝেন কেবল বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসায় প্রভৃতির পারিভাষিক বিবরণী ; সভ্যতা বলিতে তাঁহারা বোঝেন কেবল যান্ত্রিক সভ্যতা ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য। অতএব সংস্কৃতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের দুইটী প্রধান অভিযোগ।

(১) প্রথমতঃ, তাঁহাদের মতে, সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতার চর্চ্চা আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানই রাজা। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষাই প্রত্যেকের প্রধান কর্ত্তব্য ; সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, কার্য্যকরী শিল্প এবং দু'একটা আধুনিক ভাষা শিখিলেই বেশ চলিয়া যায় এবং নিজের ও দেশের উপকারও সাধন করা যায়। অতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতার বিষয় আর আমাদের কিছু জানিয়া লাভ কি? অতীত অতীতই, বর্ত্তমানেও তাহাকে টানিয়া আনা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। অতীতের পুনরুজ্জীবন ত অসম্ভব, তাহা হইলে সেই চিরমৃত, চিরলুপ্ত অতীতকে লইয়া এরূপ মাতামাতির প্রয়োজনটা আর কি? আমরা বহুদিন পূর্ব্বে কিরূপ অবস্থায় ছিলাম, কিরূপ উন্নত, সুখী ও স্বাধীন ছিলাম, তাহা জানিয়া ত আমাদের অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি হইবে না। সুতরাং আমরা কি ছিলাম সে বিষয়ে বৃথা মাথা না ঘামাইয়া, আমরা কি হইয়াছি, আমাদের কি হইতে হইবে, এই সকলই প্রকৃত আলোচনার বিষয় ; কিন্তু কেবলই অতীতের মৌতাতে 'বুঁদ' হইয়া থাকিলে, আমাদের বর্ত্তমানও গেল, ভবিষ্যৎও গেল। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—পশ্চাতে না ফিরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, অতীতের দিকে না তাকাইয়া ভবিষ্যতের দিকেই দৃষ্টিপাত করা, কেবল তত্ত্বে না সন্তুষ্ট হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া। এই হইল ইঁহাদের প্রথম আপত্তি।

ইঁহাদের এই আপত্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা দুই অংশে বিভক্ত। (ক) প্রথম অংশ এই যে, ইঁহাদের মতে যাহা কিছু কেবল তত্ত্বীয় (theorctical), ব্যাবহারিক (practical) দিক্ হইতে কার্য্যকরী নহে, তাহা সকলই সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন দ্বিতীয় অংশ এই যে, প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবল তত্ত্বীয়ই, ব্যাবহারিক নহে। সুতরাং প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের দিক্ হইতে ইহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। অতএব ইহা সর্ব্বদিক্ হইতেই তাহাই। এই দুই অংশের পৃথক্ আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ যাহা ব্যাবহারিক দিক্ হইতে মূল্যহীন তাহা সর্ব্বদিক্ হইতেই তাহাই—এইমত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। বস্তুতঃ, ব্যাবহারিক মূল্য—এই কথার অর্থ কি? জনসাধারণের দিক হইতে যাহা তাহাদের প্রত্যহ উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে, আধি-ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইতে, স্ত্রী-পুত্র লইয়া নির্ঝঞ্ঝাটে সংসার করিতে, দেশ ও দশের অল্পস্বল্প উপকার করিতে—ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করে তাহাই ব্যাবহারিক দিক হইতে মূল্যবান্, প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয়। পুনরায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সরল সহজ জীবনযাত্রায় সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহাদের নিকট যাহা প্রচুর অর্থ, পদমর্য্যাদা, মান-সম্ভ্রম, প্রভুত্ব, শক্তি, জাতির দিক্ হইতে সাম্রাজ্যবিস্তার প্রভৃতির সাধন ও সহায় তাহাই একমাত্র ব্যাবহারিক দিক্ হইতে মূল্যবান। অর্থাৎ, ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মূল্য আছে কেবল উদরপূর্ত্তি, স্বাস্থ্য, ধন, মান-সম্মান, প্রভুত্ব প্রভৃতি জাগতিক সুখের কারণেরই। কিন্তু ইহাই কি মানুষের সবটুকু? জাগতিক দৈহিক সুখই কি মানবের একমাত্র কাম্য বস্তু? বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ যাহাই বলুন আমরা বলিব : না, কদাপি নহে। মানুষ দেহধারী হইলেও দেহসর্ব্বস্ব নহে, প্রাণিজগতের অন্তর্ভূত হইলেও প্রাণিজগতের উপরে সেই জন্যই মানবকে "বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণী" বলা হয়। এই বিচারবুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির সাহায্যেই মানব জগতের হইয়াও জগতের উপরে উঠিতে পারে। ইহার জন্যই মানুষের দৈহিক দিক্ ব্যতীত একটী আধ্যাত্মিক দিকও আছে। অর্থাৎ, মানুষ পশুর ন্যায় কেবল দেহই নহে, দেহ ও আত্মার সমাবেশ, এবং তাহার দেহ আত্মারই দাস। সেই জন্যই আমরা বলিতে পারি "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—কেবল বিত্তে, কেবল দৈহিক ভোগে মানবের সুখ নাই, আত্মার তৃপ্তিও প্রয়োজন এবং সমধিকই প্রয়োজন। সেই জন্য যাহাই কেবল দৈহিক দিক হইতে প্রয়োজন, তাহাই কেবল মূল্যবান্, অপর কিছুই নহে—এই কথা মানুষের ক্ষেত্রে খাটে না। যথা, ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি রসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পের ন্যায় কার্য্যকরী বিদ্যা নহে সত্য, ইঁহাদের সাহায্যে আমাদের উদরপূর্ত্তি, ধনদৌলত, প্রভুত্ব প্রভৃতি ব্যাবহারিক লাভের আশা নাই। কিন্তু সেই জন্যই তাহারা মূল্যহীন হইয়া পড়ে না। তাহাদের মূল্য দেহের দিক হইতে না হইলেও আত্মার দিক্ হইতে প্রচুর। জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, কল্যাণ বা নীতি—এই তিনটীকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত করা হয়। কিন্তু ইঁহাদের কেবল সঙ্কীর্ণ ব্যাবহারিক দিক্ হইতে গ্রহণ করা অনুচিত। যথা, জ্ঞানের দুইটা দিক্ আছে—তত্ত্বীয় ও ব্যাবহারিক। দর্শন প্রভৃতি তত্ত্বীয় জ্ঞান, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি ব্যাবহারিক জ্ঞান। কৃষিবিদ্যার সাহায্যে কৃষকের 'ভাত কাপড়ের' সংস্থান হয় বলিয়া, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই তাহার নিকট অত্যাবশ্যক ও অতি মূল্যবান্। কিন্তু অবসর সময়ে কৃষক যদি জগতের স্বরূপ ও স্রষ্টা প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে কিছু জ্ঞান লাভ করে, তাহা কি সম্পূর্ণ বৃথা? এইরূপে কাব্যপাঠে যে বিমল সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদন করা যায়, তাহা উক্ত

সংজ্ঞানুসারে ব্যাবহারিক না হইলেও কে ইহাকে মূল্যহীন বলিতে সাহস করিবে? কল্যাণ' সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। এইরূপে, যাহা তত্ত্বীয় ও অব্যাবহারিক, অর্থাৎ, যাহা দৈহিক ও পার্থিব প্রয়োজনের সাধক বা পরিপন্থী নহে, তাহাই সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও বিষবৎ পরিত্যাজ্য—এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দুঃখের বিষয় যে, প্রখর বুদ্ধিশীল বৈজ্ঞানিক ও ব্যাবসায়িবৃন্দ মানবকে কেবল দেহধারী জীব বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, আত্মাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট পার্থিব উন্নতি ও পরিতৃপ্তিই সব, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিতৃপ্তি কিছুই নহে। কিন্তু দেহধারী বলিয়া দেহের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা যেরূপ মানবের কর্ত্তব্য, সেইরূপ আত্মবান্ বলিয়া আত্মার উন্নতি ও তৃপ্তি সাধনও মানবের নিকট নিষ্প্রয়োজন নহে। অতএব, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িবৃন্দের প্রথম আপত্তির প্রথম অংশ—অর্থাৎ, যাহা তত্ত্বীয় ও দৈহিক ও পার্থিব দিক্ হইতে ব্যাবহারিক বা প্রয়োজনীয় নহে, তাহাই মূল্যহীন ও পরিত্যাজ্য—কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

(খ) ইহাদের প্রথম আপত্তির দ্বিতীয় অংশও তুল্যরূপে অযৌক্তিক। ইহাদের মতে, সংস্কৃত সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান কেবল তত্ত্বীয় (ব্যাবহারিক নহে) বলিয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন। এস্থলে, যদি ইহা কেবল তাহাই হইত, তাহা হইলেও যে ইহার একটা অতি গভীর মূল্য থাকিত, ইহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবল তত্ত্বীয়ই নহে, ইহার একটা ব্যাবহারিক—বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িগণের সংজ্ঞানুসারেই ব্যাবহারিক—দিকও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে একদিকে যেরূপ ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অতি উচ্চ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অতি নিগূঢ় আলোচনা আছে, যাহার সহিত আমাদের প্রাত্যহিক, ব্যাবহারিক জীবনের সম্পর্ক অতি অল্পই; অপর দিকে, পুনরায় প্রাত্যহিক জীবনের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট বহু কার্য্যকরী বিদ্যার বিবরণও আমরা প্রচুর পাই। উপরে এই সকল কার্য্যকরী শিল্পের কয়েকটীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ কেবল বিদেশিগণের নহে, আমাদের নিজেদেরই সংস্কৃত সভ্যতার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ইহা কেবল তর্কশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'কচ্‌কচি' মাত্র। মানবজীবনের প্রতিদিনের সমস্যা সম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ উদাসীন। এইরূপে আমাদের ধারণা যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল জপতপেই কালক্ষেপ করিতেন, জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেন, এবং দর্শন ও ধর্ম্মের নিগূঢ়তম সত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি থাকিলেও, সাধারণ ব্যাবহারিক শিল্প ও বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা সংস্কৃত সভ্যতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল জ্ঞানীই ছিলেন না, কর্ম্মীও ছিলেন; কেবল সংসারত্যাগী তপস্বীই ছিলেন না, সাম্রাজ্যকামী রাজা ও যোদ্ধাও ছিলেন; কেবল ভাববিলাসী কবিই ছিলেন না, বস্তুতান্ত্রিক ব্যবসায়ীও ছিলেন। সেইজন্য তত্ত্বীয়জ্ঞানের দিক্ হইতে যেরূপ তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্বের প্রপঞ্চনা করিয়া গিয়াছেন—যাহার তুলনা জগতে পাওয়া যায় না, ব্যাবহারিক জ্ঞানের দিক্ হইতেও সেইরূপ তাঁহারা বহু প্রয়োজনীয় শিল্পের আবিষ্কার ও পদ্ধতি বা প্রণালী সম্বন্ধে চমৎকার বিধি-বিধান দিয়া গিয়াছেন। যথা, কেবল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কথাই ধরা যাক্। আমরা আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি দর্শনে মোহিত হই। কিন্তু আমাদের অতি নিজস্ব আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে যে কি অমূল্যনিধিই লুক্কায়িত হইয়া আছে, সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অমনোযোগী। এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অসংখ্য বিভাগ ছিল—যথা, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, গজায়ুর্ব্বেদ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি। কামসূত্রের মতে, নারীগণকে পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের এই সকল বিভিন্ন শাখা অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করিতে হইত। আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত আরো অসংখ্য কার্য্যকরী শিল্পের উল্লেখ ও প্রপঞ্চনা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। আধুনিক কার্য্যকরী শিল্পের যে সকল শাখা-প্রশাখার কথা আমরা জানি, তাহার সকলগুলিই সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, রাজা-প্রজার কর্ত্তব্য, যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধসংক্রান্ত সকল ব্যাপার—দূতপ্রেরণ, গুপ্তচর নিয়োগ, মন্ত্রভঙ্গ, সন্ধি প্রভৃতি বিষয়, এমন কি, কামশাস্ত্র সম্বন্ধে পর্য্যন্ত অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিজ্ঞানসম্মত প্রপঞ্চনা আছে। নৃত্য, গীত প্রভৃতি নানাবিধ অসংখ্য ললিত-কলার উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এরূপ অনেক কলা আছে যাহা অধুনা প্রায় লুপ্ত, যথা, মাল্যগ্রথন, পুষ্পশয্যা রচনা প্রভৃতি। এই সকল বিষয়েও নারীগণকে সযত্নে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিতে হইত। এইরূপে, অসংখ্য কার্য্যকরী শিল্প, ললিত-কলা প্রভৃতি সংস্কৃত সভ্যতা ও কৃষ্টির অন্যতম প্রধান অঙ্গ হইলেও, যদি কেহ এই সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাবহারিক ও পার্থিব দিক্ হইতে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া দোষারোপ করেন ত, আমরা নাচার। কেবল বৈজ্ঞানিকবৃন্দের নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ যে, ইংরাজী, জার্ম্মান, রাশিয়ান প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞানসম্ভার আহরণে যে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা আনন্দেরই বিষয়; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞানের অবদান সম্বন্ধে অবহিত হওয়াও তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। হইতে পারে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক প্রপঞ্চিত তত্ত্বাদি অনেকস্থলেই 'সেকেলে' হইয়া পড়িয়াছে, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া, কষ্ট করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তাহাদের বিষয় পাঠ না করিলেও চলে। কিন্তু এরূপও ত হইতে পারে যে, সংস্কৃত বিজ্ঞানে এরূপ অনেক তত্ত্বও আছে, যাহা অদ্যাপি সভ্যজগতে আবিষ্কৃত হয় নাই। পাঠ না করিয়াই কি করিয়া পূর্ব্ব হইতেই বলা যায় যে, সংস্কৃত বিজ্ঞানের সবটুকুই গাঁজাখুরি ও বর্ত্তমানে মূল্যহীন। ইহা পাঠ করিলে, অন্ততঃ এই ধারণা তাঁহাদের মন হইতে দূর হইবে যে, সংস্কৃত সভ্যতার সবটুকুই সূক্ষ্ম, দুরূহ তত্ত্বমাত্র, ধোঁয়া মাত্র—বস্তু নহে।

(২) সংস্কৃত সভ্যতার বিরুদ্ধে ইহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা কেবল নিষ্প্রয়োজন নহে, উপরন্তু অনিষ্টজনকও। ইহাদের মতে, প্রাচীন সংস্কৃত দর্শন ও কাব্যের প্রভাবে ভারতীয়গণের প্রচুর ক্ষতিই সাধিত হইয়াছে। (ক) প্রথমতঃ, ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের অত্যধিক প্রকোপে আমরা মেরুদণ্ডবিহীন, অলস, নিস্তেজ জড়বিশেষে পরিণত হইয়াছি। কারণ, ভারতীয় দর্শনের মতে,

জগৎ মিথ্যা এবং সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভই চরম পুরুষার্থ; এবং ভারতীয় ধর্ম্মের মতে, জীব স্বাধীনকর্তা নহে, একমাত্র ঈশ্বরই কর্তা। অতএব, ইহা স্বাভাবিক যে, এই দর্শনের প্রভাবে আমরা জাগতিক সকল ব্যাপারে নিস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছি; এবং এই ধর্ম্মের প্রভাবে আমরা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া অদৃষ্টবাদী হইয়া বসিয়া আছি। এইরূপে জীবন-সংগ্রামে আমাদের পরাজয় ঘটিতেছে। অতএব, শঙ্করের মায়াবাদ, তথা ভারতীয় মুক্তিবাদই ভারতবাসিগণের জাতীয় দৌর্ব্বল্য ও নিশ্চেষ্টতার মূলীভূত কারণ।

এই আপত্তির উত্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আধুনিক ধর্ম্ম ও দর্শনের প্রভাবে বহু স্থলেই ভারতবাসিগণ জীবনযুদ্ধে বিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ইহা ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ নহে, কদর্থ মাত্র। ইহা সত্য যে, ভারতীয় দর্শনের মতে এই পার্থিব জগতেই মানুষের শেষ নহে। উপরন্তু, এই দুঃখময় সংসার হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া, জড় দেহরূপ শৃঙ্খল হইতে চিরমুক্ত হইয়া, শুদ্ধ আত্মা রূপে বিরাজ করাই মানবের চরম উদ্দেশ্য। বেদান্তমতে, এই মুক্ত জীবন ব্রহ্মের সহিত একীভূত আধ্যাত্মিক জীবন। যতদিন পর্য্যন্ত না এই জীবন বা মুক্তিলাভ হয়, ততদিন মানবকে বারংবার সংসার-কারাগারেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হয়। কিন্তু যদিও ভারতীয় দর্শন সাংসারিক জীবনকে এইরূপে হেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, তথাপি ইহাকে যথোচিত মূল্যও প্রদান করা হইয়াছে। কারণ, সাংসারিক জীবনের মধ্য দিয়াই সংসার হইতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর। মুক্তি অতি কঠোর সাধনালভ্য ধন, এবং সংসারই এই সাধনার ক্ষেত্র। সংসারী জীব এই সংসারে থাকিয়াই জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন-মার্গাবলম্বনে অগ্রসর হন, এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তি-লাভ করেন। এইরূপে ভারতীয় দর্শনের মতে, সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা দ্বিবিধ—প্রথমতঃ কর্ম্মফলোপভোগের জন্য সাংসারিক জীবন অত্যাবশ্যক। ভারতীয় দর্শনের মতে, ফলেচ্ছু হইয়া কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মকর্ত্তাকে তাহার ফল, ভাল অথবা মন্দ, ভোগ করিতেই হয়, স্বর্গে অথবা নরকে, বর্ত্তমান জীবনে অথবা পরবর্ত্তী জীবনে। অর্থাৎ, এই সকল সকাম কর্ম্ম ফলভোগের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, অন্যথা সঞ্চিত হইয়া জন্মজন্মান্তরের কারণ হয়। সেই জন্য মুমুক্ষুকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতেই হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই জীবনেই মুমুক্ষু বিভিন্ন সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট হন, যাহাতে এই জন্মই তাঁহার শেষ জন্ম হয়। সুতরাং ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম কোনো কালেই অলসতা ও নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় দেয় নাই। ইহা কেবল সকাম, স্বার্থান্বেষী কর্ম্মই নিষেধ করিয়াছে, নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। উপরন্তু এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতির সাহায্যেই মুক্তি লাভ করা যায় বলিয়া ভারতীয় দর্শন বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছে "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" এইরূপে মুক্তি স্বপ্রচেষ্টালভ্য বলিয়া, মুমুক্ষুকে নিরলসভাবে, বহু আয়াসে, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া দুর্গম সাধনমার্গ অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে। এস্থলে আমরা কর্ণের অমর বাণী স্মরণ করিতে পারি: "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।" শঙ্করের মতেও, ব্যাবহারিক স্তর অপারমার্থিক হইলেও অপ্রয়োজনীয় নহে, উপরন্তু ইহাই পারমার্থিক স্তরের দ্বার স্বরূপ। ব্যাবহারিক স্তরে কর্ম্ম ও উপাসনার সাহায্যেই জীব পারমার্থিক স্তর লাভ করে। পারমার্থিক স্তরপ্রাপ্ত জীবন্মুক্তও জগতের কল্যাণ ও লোক-শিক্ষার জন্য নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে অদৃষ্টবাদ, নৈরাশ্যবাদ, নিষ্ক্রিয়বাদ প্রভৃতি শঙ্করের মায়াবাদ, তথা ভারতীয় মুক্তিবাদের, কদর্থ মাত্র।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত কাব্যের বিরুদ্ধে ইঁহাদের আপত্তি এই যে, সংস্কৃত দর্শনের ন্যায় সংস্কৃত কাব্যও বাস্তবধর্ম্মী নহে, এবং সেই জন্য বাস্তব, ব্যাবহারিক দিক হইতে প্রভূত ক্ষতিকর। ভারতীয় দর্শন যেরূপ ঐহিক জীবনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পারলৌকিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত, অর্থাৎ, ইহা যেরূপ আমাদের বাঁচিবার মন্ত্র না দিয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিবার উপায়ই আমাদের দেখায়, সেইরূপ ভারতীয় কাব্যও প্রাত্যহিক জীবন ও বাস্তব জগতের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া, স্বরচিত একটী অবাস্তব রাজ্যেই বিচরণ করে। ফলে সংস্কৃত কাব্য আদিরসবহুল, আবেগপ্রধান, ফেনিল উচ্ছ্বাসে মাত্র পরিণত হইয়াছে। এবং এই ভাবালুতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমরাও সুকোমল, সুললিত, 'ফুলবাবু'তে পরিণত হইয়াছি।

এই আপত্তি কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় অজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত। প্রথমতঃ সর্ব্বদেশের কাব্যই প্রেমপ্রধান ও আবেগবহুল—কেবল সংস্কৃত সাহিত্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত কাব্য কেবলই প্রেমমূলক এবং এইরূপে অবাস্তব ও স্বপ্নবিলাসী, ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বিখ্যাত আলঙ্কারিক ভামহ বলিয়াছেন যে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয় বস্তু আছে কাব্য তাহাদের সকলেরই দর্পণ স্বরূপ। কাব্যের এই সংজ্ঞা অনুসারে বাস্তব জীবনের যথার্থ চিত্রও কাব্যেরই অঙ্গীভূত। সেইজন্য সংস্কৃত কাব্যে যেরূপ একদিকে একটী স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে—যে স্থানে কেবল প্রেম ও আনন্দেরই প্রস্রবণ চিরকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে; অপরদিকেও সেইরূপ জগতের দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রকট রূপটীও অতি বাস্তবভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত কাব্য স্বপ্ন-তান্ত্রিক হইয়াও বস্তুতান্ত্রিক। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতকাব্যে কেবল আদিরসই নাই, বীররস, রৌদ্ররস প্রভৃতি নানা রসই আছে। যুদ্ধবর্ণনা, বীরের প্রশস্তি, প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যে ভূরি ভূরি বিদ্যমান। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি কেবলই প্যাচপ্যাচে কল্পনা-বিলাসী "ললিত-লবঙ্গলতায়" পরিণত হইয়া থাকি ত, সে দোষ সংস্কৃত সাহিত্যের নহে। একই ভাবে, আমাদের মেরুদণ্ডহীনতা, ভীরুতা ও কর্ম্মবিমুখতার জন্যও সংস্কৃত দর্শন বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে।

এইরূপে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও বণিক্‌যুগে সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতা যে শুধু অচল, তাহাই নহে, উপরন্তু অনিষ্টপ্রসূও,—বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িমণ্ডলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

(৭) হরিজনগণের আ···

পরিশেষে, হিন্দুসমাজের প্রতি খড়্গহস্ত হরিজন-সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয় আলোচনীয়। ইহাঁদের মত যে, সমগ্র বৈদিক সভ্যতাই শূদ্রের প্রতি খড়্গহস্ত। শূদ্রদিগকে সকল প্রকারে সমাজের নিকৃষ্টতম স্তরে পর্য্যবসিত করাই ছিল বৈদিক ঋষিদের প্রধান লক্ষ্য। সেই জন্য আধুনিক হরিজনগণ কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়াও পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছুক, এবং যথাসম্ভব সংস্কৃত পঠনপাঠন বন্ধ করিয়া দিতে প্রয়াসী।

এক্ষণে, সংস্কৃত সভ্যতার বিরুদ্ধে হরিজনদের এই অভিযান যে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অকস্মাৎ নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আর্য্যসভ্যতা নানা দিক্ হইতেই শূদ্রগণকে পদদলিত করিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। তজ্জন্য আজ তাঁহারা মস্তক উত্তোলন করিবার সুযোগ পাইয়া প্রথমেই যে সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে তারস্বরে আপত্তি উত্থাপন করিবেন, তাহা ত স্বাভাবিকই। কিন্তু ক্রোধ ও উত্তেজনার প্রথম প্রকোপ প্রশমিত হইলে তাঁহাদের সমস্ত ব্যাপারটী স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। আর্য্যগণ প্রথম এদেশে আগমন করিয়া অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন। সেই জন্য তাঁহারা অনার্য্যগণকে দাসরূপেই পরিগণিত করিয়া তাহাদিগকে কেবল কায়িক শ্রমসাধ্য কার্য্যে এবং নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে দূরে রাখিতেই সচেষ্ট হন। অনার্য্যদের গাত্রবর্ণও ছিল কৃষ্ণ, আর্য্যগণ ছিলেন শ্বেতবর্ণ। এইরূপে প্রথম দুই বর্ণের সৃষ্টি হয়—শ্বেত ও কৃষ্ণ। বিজিতের প্রতি বিজেতার, কৃষ্ণবর্ণের প্রতি শ্বেতবর্ণের বিদ্বেষ যে ন্যায় বা ধর্ম্মসঙ্গত নহে—ইহা অবিসংবাদী সত্য; যদিও অদ্যাপি বিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শীর্ষস্থানীয় জাতিগণই এইরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, যদিও শূদ্রগণ সাধারণতঃ বৈদিক জ্ঞান ও যাগযজ্ঞাদিতে অধিকারী ছিলেন না, তথাপি এই নিয়ম সর্ব্বদাই সুকঠোর ভাবে রক্ষিত হইত না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইত। ছান্দোগ্যোপনিষদের সত্যকাম জাবাল দাসীপুত্র হইয়া ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইয়াছিলেন. রামায়ণের দশরথপত্নী সুমিত্রা শূদ্রকন্যা ছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার গর্ভজাত পুত্রদ্বয় অন্যান্য পুত্রাপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। মহাভারতের বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। কালক্রমে শূদ্রদের অবস্থার ক্রমোন্নতি হয় এবং তাঁহারা বৈশ্যদের ন্যায় কৃষিকর্ম্ম ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতিতে অধিকারী হন। এমন কি, তাঁহারা রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চ পদও অধিকার করেন। কেবল ব্রাহ্মণের নিজস্ব কার্য্য, বৈদিক পঠন, পাঠন ও যাগ-যজ্ঞাদিতে তাঁহাদের সাধারণ ভাবে অধিকার ছিল না। কিন্তু এস্থলেও অন্ততঃ একজন আচার্য্যের মতে (যথা বাদরি) সর্ব্ব-বর্ণেরই, অর্থাৎ শূদ্রগণেরও বৈদিক যাগযজ্ঞে অধিকার আছে।

যাহা হউক দেখা গেল যে, শূদ্রগণের সহিত দ্বিজাতির প্রধান প্রভেদ ছিল বৈদিক জ্ঞান বিষয়েই কেবল। অন্যান্য দিক্ হইতে শূদ্রগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের ন্যায় যুদ্ধাদি, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে অধিকারী হইতে পারিতেন; এবং অন্ততঃ কোনো কোনো বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও যাগযজ্ঞের সম্পাদনে তাঁহাদের অধিকার ছিল। কেবল বেদপাঠে তাঁহাদের কোনোরূপ অধিকার ছিল না। কিন্তু সাক্ষাৎ বেদপাঠে অধিকারী না হইলেও ইতিহাস (যথা, রামায়ণ, মহাভারত) ও পুরাণ পাঠে তাঁহাদের কোনরূপ বাধা ছিল না। এক্ষণে, যে বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষধর্ম্ম লইয়া এরূপ কড়াকড়ি ও মারামারি, তাহার সবই ইতিহাস, পুরাণাদিতে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং, সাক্ষাৎ ভাবে বেদ-বেদান্ত পাঠ করিতে না পারিলেও ইতিহাস-পুরাণের সাহায্যে শূদ্রগণও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেন ও মোক্ষলাভে অধিকারী হইতেন। অতএব 'হরেদরে' ইহাই দাঁড়াইল যে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষলাভ বিষয়েও শূদ্রদের সহিত দ্বিজাতির কোনোরূপ প্রভেদ ছিল না—সেই একই ব্রহ্মজ্ঞান এবং তৎস্বরূপ সেই একই মোক্ষ তাঁহারাও সমভাবে লাভ করিতেন। কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়ের পথটীই ছিল বিভিন্ন। দ্বিজাতি ইহা লাভ করিতেন বেদবেদান্তরূপ "শ্রুতি"র সাহায্যে, শূদ্রগণ লাভ করিতেন ইতিহাস-পুরাণাদি ও "স্মৃতি"র সাহায্যে। এই পুস্তকের, অর্থাৎ আক্ষরিক ও ভাষার, দিক হইতে ভেদ ছিল; তত্ত্বের দিক হইতে বিন্দুমাত্রও নহে! একটী সাধারণ দৃষ্টান্ত যাক। মাতা একই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিজের পুত্রকে এবং সপত্নীপুত্রকে পরিবেশন করিতেছেন—নিজের পুত্রকে তিনি দিলেন রৌপ্যপাত্রে, সপত্নীপুত্রকে দিলেন মৃত্তিকাপাত্রে; কিন্তু ব্যঞ্জনাদি উভয়ক্ষেত্রে একই, কারণ উহা প্রস্তুত করিয়াছেন বালকের পিতামহী স্বয়ং এবং তিনি ত' দুই পৌত্রের মধ্যে কোনরূপ ভেদ করেন না। সুতরাং অন্নব্যঞ্জনের পাত্র দুইটী পৃথক্ হইলেও বালকদের নিকট তাহাদের স্বাদ একই এবং দেহপুষ্টিরূপ ফলও এক। এক্ষেত্রেও ব্রহ্মবিদ্যারূপ একই তত্ত্ব পরিবেশিত হইত বিভিন্ন পাত্রে—দ্বিজাতিগণের নিকট বেদবেদান্তের অমৃতময় ভাষায়, শূদ্র··· নিকট ··· [illegible] ···ধ্যমিকতায়!

অতএব ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দ্বিজাতিগণের ন্যায় শূদ্রগণও সংস্কৃত সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্রোড়েই লালিত পালিত; দ্বিজগণেরই ন্যায় তাঁহারা সংস্কৃত দর্শন ও ধর্ম্মের সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেন, হউক না কেন তাহা ভিন্ন উপায়ে; দ্বিজাতিগণেরই ন্যায় তাঁহারা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে অধিকারী ছিলেন ও শিল্পকলা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া ঐ সকল ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিতেন। এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম, তত্ত্ব ও ব্যবহার উভয়দিক্ হইতেই শূদ্রগণ সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা ওতপ্রোতভাবে পরিপূরিত ও পরিপুষ্ট। শূদ্রদের অন্য কোনো স্বতন্ত্র শিক্ষা, সভ্যতা বা সংস্কৃতি কস্মিন্‌কালেও ছিল না। সেজন্য হঠাৎ সেই সংস্কৃত সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক এক নূতন সভ্যতার পত্তন করার প্রচেষ্টা কেবল অমঙ্গল

...অসম্ভবও। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ...মানের প্রথম আবেগে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, যে সভ্যতা আমাদের এইরূপ অনাদর করিয়াছে, দিই তাহাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া। কিন্তু পরে স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে, যাহা ...মাদের প্রাণশক্তি তাহাকেই অভিমানবশে পরিবর্জ্জন করার নির্ব্বুদ্ধিতা সহজেই উপলব্ধি হয়। মৃত্তিকাপাত্রে অন্ন পাইয়াছি বলিয়াই যদি সপত্নীপুত্র দিনের পর দিন সেই অন্ন পুষ্টিকর হইলেও অবহেলা করে বা পিতৃগৃহের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদন করে, তাহা হইলে তাহার লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই সমধিক। সেইরূপ সাক্ষাৎ বেদবেদান্তের মাধ্যমিকতায় জ্ঞানলাভ করিতে অধিকারী নহেন বলিয়াই যদি শূদ্রগণও ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সারাংশই বর্জন করেন, এবং নিজেদের হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজেদের ও সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। অতএব আধুনিক হরিজনগণের নিকট আমাদের করজোড়ে নিবেদন এই যে, যেন তাঁহারা বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহাদের এই আত্মবিধ্বংসী প্রচেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হন। তাঁহাদের প্রতি অতীতে হিন্দুসমাজ যে অন্যায় করিয়াছে,তাহার প্রতিকারে বর্ত্তমানে সকলেই অবহিত হইয়াছেন; এবং অধুনা তাঁহাদের ও দ্বিজাতিগণের অধিকারে কোনোরূপ প্রভেদও নাই। অতএব, ভ্রান্তধারণা, ক্রোধ বা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া যেন তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে পরিত্যাগ ও ধ্বংস না করেন।

বর্ত্তমানে "সংস্কৃত-ফোবিয়া" বা সংস্কৃতাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি নানাভাবে নানাদিক হইতে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা কোন্ যুক্তিবলে ইহা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা উপরে করা হইল। এই সকল যুক্তি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেই জানিতে পারিয়াছি। সংস্কৃত সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক কেহ যদি ইহাদের নিকট কোনোরূপ সাহায্য, এমন কি উৎসাহ ও সহানুভূতিমাত্রও প্রার্থনা করেন তাহা হইলে ইঁহারা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ মতানুসারে উপরি আলোচিত কোনো না কোনো যুক্তির সাহায্যে তাঁহাকে নিবৃত্ত ও নিরুৎসাহ করিতে উদ্যোগী হন। অবশ্য ইহা একবারও বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে উপরিউক্ত পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সকলেই সংস্কৃত সভ্যতার বিরোধী। অর্থাৎ, সকল ইঙ্গ-বঙ্গীয়, সকল বঙ্গভাষানুরাগী, সকল বৈজ্ঞানিক, সকল ব্যবসায়িমণ্ডল ও সকল হরিজনই সংস্কৃতবিদ্বেষী নহেন। উপরন্তু ইহাদের সকল শ্রেণীর মধ্যেই কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার যথেষ্ট অনুরাগী; এবং নানাভাবে সংস্কৃত প্রচারে সাহায্যও করিতেছেন। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হয় যে, ইঁহাদের অধিকাংশই নীরব অবজ্ঞা দ্বারাই হউক অথবা সরব প্রতিবাদ ও কার্য্য দ্বারাই হউক—সংস্কৃতের পঠন-পাঠন, চর্চ্চা ও প্রচারে নানাভাবে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছেন। আমাদের অভিযোগ ইঁহাদের বিরুদ্ধেই এবং ইঁহাদের নিকট সকাতর প্রার্থনা যে, যেন তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপে দেশের সভ্যতাকে ধ্বংস না করেন।

কেহ আবার যেন মনে না করেন যে, আমরাই "বাংলাতঙ্ক" বা "বিজ্ঞানাতঙ্ক" রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। বাংলাভাষা বা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রতি আমাদের যে কোনো বিদ্বেষ নাই, তাহাই নহে, উপরন্তু প্রবল অনুরাগই আছে। একথা উপরেই বলা হইয়াছে। আমাদের এরূপ বলা উদ্দেশ্য নহে যে, বাংলা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত পাঠেই সকলে মনঃসংযোগ করুক্। ইহা সম্ভবপরও নহে, মঙ্গলজনকও নহে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, ইহার সর্ব্ববিধ চর্চ্চা, প্রচার ও উন্নতি যে আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য—তাহা ত বলাই বাহুল্য। অপরদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার রত্নসম্ভারও আমাদের আহরণ করা চাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন সভ্যতার প্রতিও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখাও সমান কর্ত্তব্য—প্রাচীনকে কেবল প্রাচীন বলিয়াই ত্যাগ করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। বস্তুতঃ, প্রাচীন ও নবীনে বিরোধের ত কোনো ধর্ম্মসঙ্গত কারণ নাই—বৃক্ষমূল ও পুষ্প কি পরস্পর বিরোধী? এইরূপে, বাংলা ও সংস্কৃত বা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্ক থাকিবে কেন, যাহাতে একেকে গ্রহণ করিতে হইলে অপরকে বর্জ্জন করা প্রয়োজন? শুনিয়াছি, কোনো কোনো অত্যুৎসাহী সাহিত্যিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উঠাইতে গিয়া মহাকবি কালিদাসকে নামাইয়াছেন—ফলে অবশ্য কবিগুরুও উঠেন নাই, মহাকবিও নামেন নাই, নামিয়াছেন কেবল সমালোচক নিজে। এইরূপে, বাংলা ভাষার উদ্দাম প্রগতিশীল পৃষ্ঠপোষকগণ যে সংস্কৃত বিতাড়নের সঙ্গে বাংলাকেও জগতের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছেন—তাহা কি তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন না? যাহা হউক, আশা করি শীঘ্রই শুভবুদ্ধিরূপ ভেষজের প্রভাবে দেশের জনসাধারণ এই অমূলক সংস্কৃতাতঙ্করোগ হইতে মুক্তি পাইবেন এবং এক মনঃপ্রাণে বাংলা বিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতেরও চর্চ্চা ও উন্নতিবিধানে তৎপর হইবেন।

ভারত সংস্কৃতি পরিষদ

অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভারতের সনাতন সাধনা সংস্কৃত-শিক্ষায় সমাহিত। ধর্ম্ম ও জ্ঞান এই শিক্ষার প্রাণ, কর্ম্মজীবনে ইহার ঋদ্ধি, দেশাত্মবোধ ও পরমাত্মবোধে ইহার পরিণতি। সংস্কৃত ভাষায় সমৃদ্ধ ইহার আবাহন 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' যুগে যুগে ভারতীয়তা ও মানবিকতার বাণী বহন করিতেছে। সংস্কৃতের চর্চ্চা হিন্দুত্বের মহিমা মানবের কল্যাণে অনুপ্রাণিত রাখিয়াছে। সংস্কৃতের সেবা আবহমানকাল ভারতীয়কে আত্মজ্ঞান ও দেশকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সংস্কৃতের অনুশীলন ভারতের আদর্শ ও অনুষ্ঠানের রক্ষা করিয়াছে।

সেই শাশ্বত সার্ব্বজনীন সংস্কৃত শিক্ষা আজ শ্রান্ত। ভারত-গগনের যে প্রথম প্রভাত দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল তাহার মরীচিমালা আজ মলিন; ভারত তপোবনের যে সামগান বঙ্গের কূলে কূলে ঝঙ্কৃত হইয়া সাগরিকার দ্বীপে দ্বীপে প্রতিধ্বনিত হইত, আজ তাহা ক্ষীণ, মূকপ্রায়; সংস্কৃতশিক্ষিতের আবেদন 'স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ' আজ অনাদৃত!

এই অনাদরের কারণ বহুবিধ। তন্মধ্যে ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিশ্বের পরিস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজে অবিলম্বে অর্থকরী বিদ্যার প্রতি আগ্রহ ও নৈতিক আদর্শ-বিপর্য্যয়; পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতি সাধারণের আস্থার অভাব; সংস্কৃতশিক্ষা ও সেই শিক্ষায় ব্রতীদের আচরণের অনৈক্য; দারিদ্র্য ইত্যাদিরও প্রভাব কম নহে। আরও কারণ স্বকীয় ধর্ম্ম ও স্বকীয় সমাজ পরিত্যাগ করিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার সাজিবার আগ্রহ।

এই অবস্থার প্রতিকার চিন্তার সময় আসিয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, লোকালয় ও লোকালয়ের দৈনন্দিন সমস্যা হইতে পলায়ন সাধুসম্মত ধর্ম্মের উপদেশ নহে। সংসারের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তথাকথিত সুখদুঃখের সহিত সম্মুখসমরই ধর্ম্মের প্রকৃত উপদেশ। ইহার জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পাত্রোচিত মার্গ আছে। সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সকলেই একভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন না কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ হওয়া উচিত।

এই মূল উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গদেশে কলিকাতায় একটী সংস্থা সংগঠিত হইয়াছে। ইহার নাম 'ভারত সংস্কৃতি পরিষদ। ঋষি-চরিত্র বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় পরিষদের কুলপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গের বাণিজ্যসংঘের প্রতীকদের প্রতিভূ প্রাচ্য-প্রতীচ্য জ্ঞানে অনুরাগী ব্যবহারাজীব শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান ইহার কোষাধ্যক্ষতা স্বীকার করিয়াছেন; বাঙ্গলার ভাব ও অভাবের পরিপোষক ও সরস্বতীর সমন্বয়সেবী প্রিয়দর্শন শ্রীঅবনী কান্ত ভট্টাচার্য্য সহযোগী হইয়াছেন। কার্য্যের দায়িত্ব যোগ্যতম লোকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। পরিষদ সভ্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতির সূচনা দিয়া আইনসঙ্গত ভাবে পরিষদের প্রতিষ্ঠান ও সংরক্ষণ করা হইয়াছে। সাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠানটীর ভবিষ্যৎ ও বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার অস্তিত্ব বহুল পরিমাণে নির্ভর করিবে। আশা করি ভারতীয় ও অন্যান্য সুজন পরিষদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন।

উদ্দেশ্য—উভয়বিধ কার্য্যভার গ্রহণ—(ক) দূরপ্রাপ্যফল, ও (খ) আশুপ্রসূ।

(ক) সংস্কৃত শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতজ্ঞানের গাম্ভীর্য্য রক্ষা ও তাহা সাধারণের পক্ষে সুলভ ও সহজগম্য করিবার জন্য সর্ব্বতো-ভাবে চেষ্টা এই দুইটী উদ্দেশ্যই ধীরে ধীরে সাধন করিতে হইবে। এ বিষয়ে জ্ঞান ও অর্থ উভয়ের উপযোগিতা ও বর্ত্তমান জগতের গতির সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপন পরিষদের পরিকল্পনা থাকিবে।

(খ) অবিলম্বে যে পাঠশালা ও টোলগুলির অধ্যাপকগণ সংস্কৃতশিক্ষা এখনও জীবিত রাখিয়াছেন তাঁহাদের কষ্ট হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে হইবে। এই উভয় প্রতিকারের উপায় আবিষ্কারে সহস্র লোকের ধীশক্তি সহস্রধা নিযুক্ত হইবে। সকল ব্যক্তি ও অনুষ্ঠানই এই প্রচেষ্টার অংশ লইতে পারিবেন, কারণ পরিষদ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের সহিত অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না।

কার্য্যধারা দুই প্রণালীতে চলিবে। সাধারণ সভ্য ও দাতারা অর্থসাহায্য করিবেন ও কার্য্যক্রম বিষয়ে স্বকীয় মত নির্দ্দেশ করিবেন। পরিষদের পরিচালকগণ বিভিন্ন মতামত বিচার করিয়া পরিষদের মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

অবিলম্বে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহাদ্বারা দুঃস্থ পাঠশালা ও টোলের অধ্যাপকগণকে কিছু সময়োচিত সাহায্যদান করা হইবে। এবিষয়ে পণ্ডিত ও পণ্ডিতেতর উভয়েরই একটী কর্ত্তব্য আছে। পরান্নভোজনের ন্যায় প্রজ্ঞা ও পৌরুষের হানিকর আচরণ দ্বিতীয় নাই। ঋগ্বেদে (২।১৮।৯) আম্নাত হইয়াছে—'নাহং রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্।' হে রাজা বরুণ—'অন্যের পরিশ্রমে যে অন্ন উপার্জ্জিত হয় তাহা যেন আমাদিগকে ভোজন করিতে না হয়'। পরান্নভোজন ভৌম নরকভোগ বলিয়া পরিগণিত হইত—যদি তাহার বিনিময়ে সমাজ কোন না কোন রূপে উপকৃত হইত। যে সকল অলস অসার লোক অনাতুর অবস্থায় দ্বারে দ্বারে মধুকরী করিয়া বেড়ায়, গৃহসমন্দ শৌনকের বিবেচনায় তাহারা অধম। সত্যযুগের এই সুনীতি কলিযুগেও প্রযোজ্য। এই জন্য পরিষদ স্বয়ং নির্ব্বাচনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই সন্তোষ হইবে। বাঙ্গলার পুণ্যক্ষেত্রে পূত শারদীয়া পূজা উপলক্ষে সেই সন্তোষ সত্য ও সাফল্যমণ্ডিত হউক।

অবিশ্বাস্য (গল্প)

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস

সেবার আমাদের ভাগ্যে অপ্রত্যাশিত ছুটিলাভ ঘটেছিল। আণবিক বোমার উৎপাতে জাপান হঠাৎ বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে দীর্ঘ ছয় বছরের যুদ্ধের ওপর যবনিকা পাত করল। তাই আমাদের দু'দিন এক সঙ্গে ছুটি।

একে ছুটি, তায় অপ্রত্যাশিত, তাই তার মাধুর্য্যবোধটা বেশী। সারাদিন ঘড়ির দাসত্ব অস্বীকার করে কাটিয়ে মনটা বেশ হাল্কা ঠেকছিল। সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে জুটেছি, উদ্দেশ্য দু'চার জন পরিচিতের মুখ দেখা এবং সম্ভব হলে হাল্কা গল্প সুরু করে খানিকটা সময় কাটান।

সেখানে জুটেছি আমরা পাঁচজন। মহিলাদের আজ বড় একটা ভিড় ছিল না, যাঁরাও এসেছিলেন তাঁরাও সকাল সকাল বাড়ী ফিরেছেন। আমরা ক'জন কাচাবয়সী পুরুষ একত্রে। হাল্কা গল্প সত্যই বেশ জমে উঠেছে। উঠবে না কেন? অবস্থা ত সম্পূর্ণ তার অনুকূল।

হঠাৎ তালুকদার সুরু করল আমাকে আর আমার পত্নীকে নিয়ে টানাটানি, অবশ্য বাস্তবে নয়, আলোচনার বস্তু হিসাবে। বলল, ওহে চাটুজ্যে, তোমাদের ত শুনেছি আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম। তার রহস্যটা কি কওনা শুনি, আমরাও তা হলে একটু শিখে নিই।

সেন বলল, সে আর বলতে? শুনেছি ওদের দু'জনের কারও সঙ্গ না হলেও দিব্যি চলে যায়, পরস্পর মুখ চেয়েই কেটে যায় ওদের। সত্যি বল না ভাই চাটুজ্যে।

মিত্তির বলে, আর শোননি বুঝি? গত এগার মাসে এদের মধ্যে একটা কড়া কথারও প্রয়োগ হয় নি। রেকর্ড একেবারে বলবার মত রেকর্ড।

এতগুলি আততায়ীর যুগপৎ আক্রমণে আমার ক'রবার কিছুই ছিল না। বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের বাক্যবাণ হজম করাই সুবুদ্ধির কাজ। কিন্তু অবস্থা প্রতিকূল, তাদের হাত হতে নিস্তার আমার ভাগ্যে লেখা ছিল না।

তালুকদার আবার বলতে সুরু করল—এমন অগাঢ় যেখানে প্রণয়,সেখানে প্রেম করে বিয়ে না হয়েই যায় না। কি বল হে সেন, কি বলছে মিত্তির, কি বলহে চকোবর্ত্তি।

চকোবর্ত্তি বিশেষ কিছু বলেনা, কিন্তু সেন আর মিত্তিরের উৎসাহ দেখে কে? তারা বলে—নিশ্চয়, তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে? কবুল কর চাটুজ্যে, এখনি কবুল কর।

অগত্যা করি কি? কবুলিই করলাম।

কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? সঙ্গে সঙ্গে ফরমাস হল, তা হলে সেই প্রণয়-কাহিনীটা এখনি তাদের উপহার দিতে হবে। তাদের সময় বিনোদনের উপযুক্ত খোরাক হচ্ছে সেটা। সে-আদেশ শিরোধারণ না করে নিস্তার নেই। অতএব, যে প্রণয় দুর্বিপাকে পড়ে আমার উদ্বাহক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল, তা বলতে সুরু করলাম—

সে বছর আমরা বিলেত থেকে সবে ফিরেছি—আমি আর চৌধুরী। আমরা পোষ্টেড্ হয়েছি একই ষ্টেশনে শিক্ষানবিশী করবার জন্য। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদের দু'জনের থাকবার জন্য একই বাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন। সেইখানেই আমরা আছি। চাকর ও বেয়ারার সাহায্যে সংসারজীবনেও শিক্ষানবিশী সুরু করেছি। কাজের চাপের চেয়ে অভাবের চাপটাই বেশী বোধ করছি। সময় কাটান একটা রীতিমত সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। কতক্ষণ আর দুজনে পরস্পরের গল্পের খোরাক জুগিয়ে চলা যায়।

এ হেন অবস্থায় একদিন এল স্থানীয় জজ সাহেবের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ। মুখুজ্যে সাহেবের মেম সাহেব নিমন্ত্রণ করেছেন আমাদের দু'জনকেই। বলা বাহুল্য, আমরা সানন্দেই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, তাঁকে জানালাম। এক বেলার সময় কাটাবার সমস্যার সমাধান ত অতি সহজেই হবে।

বাড়ীর সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তার বেশ বিশিষ্ট অংশ জুড়ে একটি পরিপাটি উদ্যান। সবুজ গালিচার মত কলে ছাঁটা তৃণাবৃত মাঠ, মাঝে মাঝে পাতাবাহার গাছ, ফুল গাছ, কোথাও'বা নানা আকৃতির মরসুমী ফুলের কেয়ারী। তারই মাঝখানে চায়ের পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমন্ত্রিতদের বসবার ব্যবস্থা যে ঠিক এক জায়গায় হয়েছে তা নয়। উদ্যানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন টেবিলকে কেন্দ্র করে চেয়ার সাজান। আমন্ত্রিতদের ইচ্ছা মত ছোট ছোট বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বসবার সুবিধা আছে।

আমরা যথাসময় হাজির হলে, মুখুজ্যে সাহেব আমাদের স্বাগত করে ব'ললেন, যেখানে খুসী এক জায়গায় বসতে। দেখা গেল তখনও গৃহকর্ত্রীর সেখানে আবির্ভাব হয়নি। আগন্তুকদের অনেকেই পরিপাটি বেশভূষাসম্পন্ন হাল ফ্যাসানের যুবক,সকলের কথা ঠিক মনে নেই, তবে একজনকে মনে আছে; তিনি সদ্যবিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার, ওঁদের বাড়ির অতিথি। পরস্পর পরিচিত হবার পরেও এদের কারও সঙ্গে আলাপ করবার মত উৎসাহ আমরা দু'জনে বোধ করলাম না। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত আবেষ্টনীর মাঝখানে, আমরা দু'জনে একটু পৃথক হয়ে থাকাই আরামের বিবেচনা করলাম। এক কোণের এক টেবিলে তাই দু'জনে গিয়ে বসলাম। সে-টেবিলে আর কেউ তখনও সমাগত হন নি।

আমাদের জন্য বাস্তবিক একটি বিস্ময়ের ব্যবস্থা

হয়েছিল। শীঘ্রই মিসেস্ মুখার্জ্জির আবির্ভাব হল, সঙ্গে তাঁর দশ বছরের ফ্রক পরা মেয়ে মিনি। আর এলেন সঙ্গে এক রূপসী যুবতী। এ সেই ধরণের রূপ যা মানুষের দৃষ্টিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা রাখে।

কাজেই আমাদের দু'জনের চোখ যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে তাতে দোষ কি? আমার খুবই কৌতূহল হল জানবার—মহিলাটি কে! চৌধুরীর কৌতূহলের মাত্রা য আমার থেকে বেশী তার পরিচয় তার আচরণ তখনি দিল। সে বলল, ভাই মেয়েটি কে?

আমি ঠাট্টা করে বললাম, কেন? দর্শনেই মোহগ্রস্ত হলে নাকি? একটু ধৈর্য্য ধর না এখনি জানতে পারবে।

বাস্তবিকই ধৈর্য্য বেশীক্ষণ ধরতে হয় নি। তখনই আমাদের ডাক পড়ল এবং মিসেস মুখার্জ্জি পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের সঙ্গে তাঁর। জানলাম, তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী, অনূঢ়া, লরেটোতে বি-এ পড়েন, নাম মণিকা দেবী। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমরা মিসেস মুখার্জির সুনজরে পড়ে গেলাম। কেন্দ্রে যে বড় টেবিল সাজান ছিল, তাতে মহিলাদের ও কর্ত্তার সঙ্গে আমার ও চৌধুরীর ডাক পড়ল আসন গ্রহণ করবার, আর পড়ল সেই ব্যারিষ্টার ভদ্র লোকটির।

অবিলম্বেই চা ও আনুষঙ্গিক ভোজ্য খাওয়া সুরু হল। নবীন ব্যারিষ্টার সাহেব মণিকা দেবীর সুখ-সুবিধার দিকে যে ভাবে নজর দিচ্ছিলেন, তাতে সহজেই অনুমান করা গেল যে, ভদ্রলোক তাঁর প্রতি বিশেষ রকম অনুরক্ত এবং তাঁর হৃদয়-দুর্গ দখল করতে নিশ্চয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবিলম্বেই চৌধুরীর আচরণে কিন্তু অনুরূপ লক্ষণ দেখা গেল। তাতে চমক লাগলেও আমাকে আশ্চর্য্য করে নি। এ রোগ যে বিলক্ষণ ছোঁয়াচে, তা আমার জানা ছিল, আর রোগের কারণ যে বেশ শক্তিশালী তাও ত চোখেই দেখছি।

ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম, এই চায়ের পার্টি উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হল সেই অখণ্ডপ্রতাপ, অঙ্গবিহীন দেবতাটির শীকার সংগ্রহ করা। ফাঁদ পাতার উপযুক্ত আয়োজনই হয়েছে বটে। মনে মনে সাবধান হয়ে গেলাম। তাই যখন দেখলাম যে, বাতাসে উড়িয়ে নেওয়া মণিকা দেবীর হস্তভ্রষ্ট রুমালখানির জন্য চৌধুরী ও ব্যারিষ্টার সাহেবের মধ্যে পাল্লাপাল্লি চলেছে, তখন আমার মনে কৌতুকবোধের থেকে ভয়সঞ্চারই বেশী হল। আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে, পঞ্চশরকে সুযোগ দেব না।

খাওয়ার পর্ব্ব শেষ হল, এবার খেলার পর্ব্ব। এ খেলায় একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনটে কাঠিতে খানিকটা করে সুতো জড়ানো ছিল। খেলোয়াড় ছিলাম জন পনের লোক। তাদের পাঁচজন করে তিন ভাগে ভাগ হতে হবে। মহিলা মাত্র তিন জন, প্রৌঢ়া গৃহিণী মিসেস মুখার্জি, তাঁর যুবতী ভাইঝি মণিকা দেবী ও দশ বছরের মেয়ে মিনি। কাজেই ঠিক হল এক এক জন এক এক দলের নেতা হবেন। দল ভাগ করবার এক বিচিত্র ব্যবস্থা ছিল। তিনটি ভাগে সাজান কতকগুলি কাগজ ছিল, এক শ্রেণীতে ছিল পাঁচটি ফুলের নাম, এক শ্রেণীতে পাঁচটি ফলের ও তৃতীয় শ্রেণীতে পাঁচটি জন্তুর নাম। যে, যে শ্রেণীর নাম তুলবে, সে সেই শ্রেণীভুক্ত হবে।

আমি দেখলাম মণিকা দেবী কোন্ শ্রেণী হতে নাম নির্ব্বাচন করেন, তা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীতে। তিনি বাচলেন ফুলের নাম, তারাও তাই। মতলব তাঁর সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া। আমি ইচ্ছে করেই জন্তুর নাম তুললাম।

আমার দলের নেত্রী হল বাচ্চা মেয়ে মিনি। খেলাটা হল এই: প্রতি দলের প্রথম ব্যক্তি গিয়ে লাটিমের সুতো দেবে খুলে, পরেরটি দেবে জড়িয়ে, পরেরটি খুলে; এই রকমে পালা করে পঞ্চম ব্যক্তির পালা হবে খোলবার। যে দল সবার আগে শেষ করবে, সেই দলেরই জিত।

বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহজেই জিত ঘটেছিল। কারণ, অপর দু'টি মহিলা নেত্রীর যে অসুবিধা ছিল, আমাদের বালিকা নেত্রীর তা ছিল না। চটপটে হাতে আঁট-সাঁট ফ্রক পরা দেহে সবার আগেই তার পালা শেষ করল। অপর পক্ষে অন্য দুই নেত্রীর ছিল শাড়ীর বাধা, নানা অলঙ্কারের বাধা, তারপর হয় ত ছিল দেহভঙ্গী বিলাসে আকর্ষণ; কাজেই সুতো খোলা তাদের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সুতো কখনো আঁচলে বাধে, কখনো চুড়িতে বাধে। ফলে আমরা অনেক এগিয়ে গেলাম।

এক পালা এই ভাবে খেলা ত শেষ হল। খেলার উত্তেজনা কমলে, আমি একটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসেছি আর ভাবছি এখন উঠলে কেমন হয়। এমন সময় দেখি, মণিকা দেবী উদ্যানের এক প্রান্ত হতে আমার দিকেই আসছেন। সঙ্গে তাঁর দু'জন ভক্ত, নাম বলতে হবে না বোধ হয়,—সেই ব্যারিষ্টার আর চৌধুরী।

মণিকা দেবী বললেন, এখনও অনেক সময় আছে, আসুন না আরো কিছু খেলা যাক। আমার মুখে উত্তর জোগাল না। উত্তর জোগাল ওদের দুজনের মুখে। তারা বললে, বেশত, এ'ত অতি উত্তম সংকল্প। প্রশ্ন হচ্ছে কি খেলা যায়।

মণিকাদেবী বললেন, আসুন না, তাস খেলি, ব্রীজ। ওরা বললে, উত্তম প্রস্তাব, আমরা চারজনে ঠিক হবে।

কিন্তু আমি আপত্তি করলাম, বললাম, সে হয় না। দেখলাম ওরা যেন ভুল বুঝছে আমাকে; তাই পরিষ্কার করে বললাম যে, আমি ও খেলা জানিনা।

মণিকা দেবী বললেন, তাতে কি হয়েছে? আপনাকে শিখিয়ে নিচ্ছি, আসুন না। এর পর আর আপত্তি করা চলে না। বললাম, প্রস্তুত আছি, কিন্তু জানিয়ে দিলাম যে, এ অবস্থায় তাঁদের খেলা কতখানি জমে উঠবে, সে বিষয় আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

খেলা চলল। মণিকা দেবী আমার পার্টনার। দেখলাম, অসীম দয়া তাঁর আমার প্রতি। ভুল করে বসি, তিনি রাগ করেন না; খেলা হেরে যাই, তবু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না।

দেখতে দেখতে উদ্যান ফাঁকা হয়ে আসছে। অতিথিরা একে একে সরে যাচ্ছেন। জজ-দম্পতীও সেখান হতে সরে গেছেন। আছি আমরা ক'জন।

খেলা তখনও চলেছে। মণিকা দেবী হঠাৎ জানালেন যে, তিনি চায়ের তেষ্টা বোধ করছেন। সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কি কর্ত্তব্য তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। আমরা ত এ বাড়ীর অতিথি।

আমাদের নিরুত্তর দেখে তিনিই এ বিষয় আমাদের ইঙ্গিত দিলেন, বললেন, মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি ওদিকে গিয়ে বেয়ারাটাকে ডাক দিন না। বাস্তবিক তাঁর ব্যবহারে আমার তখন মনটা তাঁর প্রতি নরম হয়ে এসেছে এবং এ অনুরোধ রক্ষণ করতে খুবই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু চৌধুরী সব গোলমাল করে দিল। সে হঠাৎ বলে বসল, থাক, ও যাবে কেন? আমিই যাচ্ছি।

এর ফল হল কিন্তু অদ্ভুত। তিনি বললেন, থাক, আপনার গিয়ে কাজ নেই। আমার চা-তেষ্টা সেরে গেছে। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্!

এর পরে আর খেলাটা জমছিল না। রাতও হয়ে এসেছে। তাই ওঠবার অনুমতি চাইলাম। জজ-দম্পতী কাছে ছিলেন না। কাজেই, মণিকা দেবীই আমাদের আতিথেয়তার রীতি অনুসারে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। যাবার সময় নীচুস্বরে আমার কাণের কাছে বললেন—আপনার বন্ধুটি একটী বর্ব্বর।

দরজা পেরিয়ে যখন দু'জনে বাড়ীমুখে চলেছি, চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি বললে রে তোকে কাণে কাণে? আমি বললাম, তিনি বললেন, তোকে খুব ভাল লেগেছে।

তারপর বেশী দিন গত হয় নি, সেদিনকার চায়ের পার্টির স্মৃতি তখনও পুরাতন হয়ে যায় নি, মুখুজ্যেদের বাড়ী হতে আবার নিমন্ত্রণ। এবার চা-পার্টি নয়, একেবারে চড়িভাতি, সামনের রবিবার। আমরা দু'জনেই আমন্ত্রিত হয়েছি।

চড়িভাতির জন্য যে স্থানটি নির্ব্বাচন করা হয়েছিল, তা অতি মনোরম। সহর হতে কয়েক মাইল দূরে একটা জায়গা ছিল। এককালে হয়ত সেখানে কারও রচিত বড় বাগান ছিল; তার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান দেখা যায়। অনেকখানি স্থান জুড়ে নানা জাতীয় মূল্যবান গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এমন অনেক বড় বড় গাছ আছে, যার তলায় বসলে সূর্য্যের আলো হতে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পাশ দিয়ে নদী তিনপাক খেয়ে চলে গিয়েছে। নদী এত বড় নয় যে মনে ভয় সঞ্চার করবে। তার অপ্রশস্ত বক্ষে কলকল্লনাদী জলপ্রবাহ মনকে বরং বেশ আকর্ষণ করে। ওপারে মানুষের বসতি চোখে পড়ে না। প্রশস্ত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র। তখন শীতকাল, নানা চৈতালি ফসল মাঠের শোভা বর্দ্ধন করছে।

চড়িভাতির লম্বা করে বর্ণনা দিয়ে আর তোমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবার ইচ্ছা আমার নেই। কাজেই প্রয়োজনীয় ঘটনা ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ আমি করব না।

এহেন স্থানে, এক ছায়া-সুশীতল বিরাট বৃক্ষের তলায় আমাদের রান্নার ব্যবস্থা হয়েছিল। মহিলাদেরই এক-চেটে বিষয় সেটা, আমরা হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কিছুই করি নি। তারপর খাওয়ার পালা। খাওয়ার পদবাহুল্য ছিল না; তবু প্রকৃতির স্পর্শে, তাতে যেন মধু উপচিত হয়েছিল। সেইটাই ত চড়িভাতির আকর্ষণ। তারপর যে যার ইচ্ছামত আমরা সময় বিনোদনের ব্যবস্থা করলাম। কেউ বা তাস খেলতে সুরু করল, কেউ গল্প করতে, কারও বা তন্দ্রা বোধ হল।

এমন করে বেলা অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছে। সূর্য্য পশ্চিম আকাশের প্রায় তলদেশে। চৌধুরী আর সেই ব্যারিষ্টার ভদ্রলোক তখন এক ভীষণ তর্কে নিমজ্জিত। তর্কের বিষয় ছিল—ছায়াচিত্র ভাল, না বাণীচিত্র ভাল। তার প্রতি আমি বা মণিকা দেবী কোন আকর্ষণই বোধ করছিলাম না।

তাই যখন মণিকা দেবী প্রস্তাব করলেন, চলুন না নদীর ধারে একটু ঘুরে আসি, আমি সে প্রস্তাব সোৎসাহে গ্রহণ করলাম।

আঁকাবাঁকা নদীর ধারের পথ। কোথাও ভূমি উচ্চ, কোথাও ঝোপ-ঝাড়ে আংশিক ভাবে তা অবরুদ্ধ। এই সব ছোট-খাট বাধা উপস্থিত হলে, পরস্পর হাত ধরাধরি করে তা অতিক্রম করেছি। এই উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে যেন একটা মাদকতা ছিল।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমরা এমন এক জায়গায়

এসেছি, যেখানে প্রকৃতি যেন খেয়াল বশে একটা নিরালা কুঞ্জ গড়ে তুলেছেন। প্রায় তিন পাশেই তার ঘন-সন্নিবিষ্ট লতা ও ঝোপে ঘেরা, এক পাশে তার নদী। একটা ঝড়ে উপড়ান গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল। সে জায়গায় বোধ হয় একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, তা না হলে দু'জনেই কেন সেখানে বসে পড়বার প্রবৃত্তি পেলাম!

তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। প্রকৃতি যেন আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য এক অপূর্ব রূপের সমাবেশ ঘটাল। ওপারে বিস্তীর্ণ সর্ষে ক্ষেত হলদে ফুলে ভরে গিয়েছে। তার ওপাশে দিগন্ত-রেখার কাছে, রাঙা সূর্য্য আকাশের কপালে সিন্দুর-টিপটির মত শোভা পাচ্ছেল। তার রক্তিম কিরণ নদীর জলকে রাঙা করে তুলেছে আর রাঙা করে তুলেছে আমার সঙ্গিনীর মুখখানি। সেই সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনীর মাঝখানে, সেই মুখখানি আমার সবচেয়ে সুন্দর ঠেকেছিল। তাই জন্যই বোধ হয়, অস্বাভাবিক রকম অনেকক্ষণ ধরে, সে মুখের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রয়ে গিয়েছিল।

আমার আবেশ ভাঙল তাঁরই কথায়। তিনি বললেন, কি দেখছেন অতক্ষণ ধরে? আমার মুখে কথা ফুটল না।

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন, চলুন এবার ফেরা যাক, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমি এবার মুখে ভাষা পেলাম। বলে ফেললাম, আমার ইচ্ছে করছে আর একটু থাকুন, আর, আর—

কথা শেষ করবার আগেই তিনি কৌতুক করে বলে বসলেন, আর? আর কি ইচ্ছে করছে? যে অদম্য প্রবৃত্তিটাকে মনে মনে প্রাণপণ বলে সংযত করবার চেষ্টা করছিলাম, এটুকু কথা দিল তাকে প্রচণ্ড শক্তি। আমি আর পারলাম না। হঠাৎ কথার বদলে ধরলাম তাঁর মুখখানি আমার দুই হাতে।

তিনি বাধা দিয়ে বললেন—একি করছেন? ছাড়ুন ছাড়ুন, ওই দেখুন আপনার বর্ব্বর বন্ধু আসছেন।

সে কথা আমাকে থামাতে পারত না, কিন্তু থামাল সত্যই একটা কৃত্রিম কাসির শব্দ, যেমন কাসি লোকে কাসে অন্যকে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেবার জন্য। সত্যই চেয়ে দেখি চৌধুরী হন হন করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অগত্যা নিরস্ত হলাম।

চৌধুরী জানাল, মিসেস মুখার্জ্জি ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাই সে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। অগত্যা ফিরতে হল।

তার পর আমার যা অবস্থা হল তা আর বলবার নয়। সত্যই আমার রোগে ধরল, যে রোগকে ভয় করেছিলাম, সেই রোগে। তা ধরবে না? তার বীজ ছড়াবার যে যে বিরাট আয়োজন হয়েছিল। সেই অনাঘ্রাত পুষ্পের মত অনাস্বাদিতপূর্ব ওষ্ঠের আকর্ষণ বাস্তবিক আমার নিদ্রা হরণ করল।

অগত্যা উপায় কি? অলমতি বিস্তারেণ। রোগ সারাবার ব্যবস্থা করলাম। সোজা গিয়ে মিঃ মুখার্জ্জির কাছে আদ্যোপান্ত ব্যাধির কারণ সব খুলে বললাম আর আমার আবেদন জানালাম। সুখের বিষয় আবেদন গৃহীত হল।

গল্প যখন শেষ হল, ভীষণ হাততালি পড়ল। বন্ধুদের ভারি ভাল লেগেছে। কেউ বলল, তোমার ভাগ্যি ভাল চাটুয্যে, এ যে একেবারে রোমান্স। কেউ বা বলল, অপূর্ব্ব। চকোবর্ত্তি কিছু বলল না, বরং দেখি সে যেন একটা হাসির বেগ রীতিমত সামলাবার চেষ্টা করছে। আমরা ছোট বেলায় ছিলাম একপাড়ার ছেলে।

আমার সুখ্যাত লুট করবার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না। আমি চাইছিলাম পালাতে, কারণ আমারও সত্যি ভারী হাসি পাচ্ছিল। এমন সময় সব মাটি করে দিল, এই চকোবর্ত্তিটা, হঠাৎ সে বেসামাল হাসতে আরম্ভ করে দিলে হো হো করে। আর বললে, ঠকিয়েছে, তোমাদের ভীষণ ঠকিয়েছে।

তখন আর কি? বেপরোয়া হয়ে কবুল করতেই হল। সত্যিই ঠকিয়েছি। আমি যা বলেছি, তা সর্ব্বথা অবিশ্বাস্য। স্রেফ বাপে দেখা কনে বিয়ে করেছি সুবোধ ছেলের মত।

কাজেই সোজা অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম।
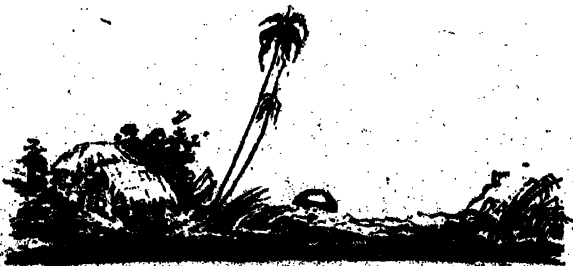
"মহিষাসুর বধের পরে"

"দেবস্তুতি"

"শ্রীশ্রীচণ্ডী, চতুর্থ অধ্যায়"

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ঋষি কহিলেন

মহাবলশালী দুরাত্মা অসুর সসৈন্যে হ'লে হত,
অবনত করি' স্কন্ধ ও গ্রীবা দেবতা ঋষিরা যত।
আনম্র শিরে বন্দি' দেবীরে স্মরিল অনুক্ষণ—
ঘন-আনন্দে হর্ষ-পুলকে উদ্গত দেহ-মন ॥ ২

সৃজিল বিশ্ব যে মহাশক্তির অনুক্ত মহিমাতে,
প্রতি দেবতার মূর্ত্ত শক্তি মূর্ত্তি লভিল যাতে,
যাঁরা নিখিলের পূজনীয়া সেই অখিলের অম্বিকা,
চরণ-পদ্ম প্রণমি' ললাট, মাগি মঙ্গল-টীকা ॥ ৩

দেব অনন্ত ব্রহ্মা, রুদ্র, নাহি পারে প্রকাশিতে
অতুল অপার মহিমা যাহার অবিরত সঙ্গীতে,
সেই মহাদেবী, রণ-রঙ্গিণী রণ-চণ্ডিকা আসি'
নিখিল জগৎ করুন রক্ষা অসুর-শঙ্কা নাশি' ॥ ৪

যিনি সুকৃতীর ভবনে লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী পাপের কূপে,
অমলচিত্ত মনীষীর প্রাণে পরমজ্ঞানের রূপে।
বেদানুধ্যায়ী সুজনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-সম,
কুলজন-মনে লজ্জারূপিণী বিশ্ব-পালিনী মম ॥ ৫

সুরাসুর যত ঋষি প্রমথের অচিন্তনীয়া তুমি,
খুঁজিয়া না পায় ধ্যান-ধারণায় স্বর্গ্য-মর্ত্ত্য-ভূমি,
—সেই মত তব অসুর-বিনাশী প্রভূত বীর্য্য-গাথা
বর্ণনাতীত সে মহাকাহিনী কেমনে কহিব মাতা ? ৬

সৃষ্টি-লীলার তুমি মূলাধার, ত্রিগুণাত্মিকা তুমি,
রাগাদি রিপুর ঊর্দ্ধে অজানা দুজ্ঞেয় মনোভূমি।
দেবতা জানে না তোমার অসীম সত্তার পরিচয়
তুমি চিররূপা পরমা প্রকৃতি, আদ্যা তোমারে কয় ॥ ৭

তুমি ওঙ্কার, ওঁ স্বাহা তুমি, অগ্নি যজ্ঞ মন্ত্র,
ইন্দ্র দেবতা মুখ-উদ্গত স্তবমালা মহাতন্ত্র ;
পিতৃলোকের তর্পণ হেতু তুমি স্বধা অক্ষর,
তোমাতে তৃপ্ত সকল যজ্ঞ, তোমা পরে নির্ভর ॥ ৮

মুক্তিরূপিণি হে দেবি ! তুমিই পরমা ব্রহ্ম বিদ্যা,
ইন্দ্রিয়জিৎ মোক্ষাভিলাষী মুনির নিত্যসিদ্ধা,
স্থিতধী প্রাণের কামলেশহীন বন্দনা চিরকালে
অনন্ত ভরি' মহাসাধনার আলোক-বহ্নি জ্বালে ॥ ৯

শব্দস্বরূপা তুমি, সুবিমল ঋক্, যজুঃ আর সাম
উদাত্ত স্বরযোগে পঠনীয় শ্লোকমালা অভিরাম,
কৃষি ও পণ্যরূপা দিকে দিকে, অখিল জগৎপালিনী
নিখিল ধরার দুঃখ-দৈন্য দারিদ্র্য-ভয়নাশিনী ॥ ১০

সর্ব্ব শাস্ত্রের সার তুমি মেধা, মহাশ্বেতা সরস্বতী
তোমার প্রসাদে মা গো, জ্ঞানমার্গে হয় পরমা প্রগতি ।
দুর্গম ভবকূলে তুমি দুর্গা, পরপারের তরণী
কেশব-হৃদয়ে লক্ষ্মী, হর-হৃদে গৌরী অতুলবরণী ॥ ১১

পূর্ণচন্দ্রসম অমলিন কান্তির হিরণ-কিরণ শোভা
হেরি' কমনীয় স্ফুরিত অধরে মৃদু হাসি মনোলোভা,
তথাপি কেমনে মহিষ-অসুর পরম নির্ব্বিরোধে
তোমার সোনার অঙ্গ ভরিয়া আঘাত হানিল ক্রোধে ? ১২

পরন্তু তব ভ্রূকুটি-করাল জাতক্রোধে ভরা মুখ,
দ্যুতিময় ছবি দেখিয়াও সেই অসুর-পশুর বুক
ডরিল না ভয়ে ? মরিল না মূঢ় মুহূর্ত্তে সেইখানে ?
কুপিত কালান্ত দেখিয়াও কেহ জীবিত রহে কি প্রাণে ?১৩

হে দেবি ! প্রসন্না হও, তুমি কল্যাণময়ী হ'লে তুষ্টা,
নিঃশেষে কর নাশ যত রিপু বিশ্বের, হ'লে রুষ্টা ;
সুবিপুল বলী দর্পী দানবে যেমন আপন হস্তে
হৃতবল করি' নাশি সসৈন্যে নিমেষে পাঠালে অস্তে ॥ ১৪

হে দেবি অভীষ্টময়ি ! সুপ্রসন্না হও তুমি যার 'পরে,
নিখিল সমাজে তার সম্মান প্রতিদিন ঘরে ঘরে,
ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ, কোনকালে তার জীবনে হয় না ক্ষয়
তার সন্ততি, পরিণীতা-প্রিয়া, সেবিকা নম্র হয় ॥ ১৫

তোমার প্রসাদে সদা-শ্রদ্ধেয় পুণ্যবানেরা নিত্য
আচরি' ধর্ম লভে সাধনায় স্বর্গ-মোক্ষ-বিত্ত ।
জনলোকে, মহর্লোকে, মর্ত্ত্যলোকে অনন্তকালের
পরম সুফলদায়িনী তুমি মা, ত্রিলোকের সকলের ॥১৬

সদা সঙ্কটে ত্রাণময়ী তুমি, স্মরিলে শঙ্কা নাশো,
আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর হৃদয়ে চির-শুভা হয়ে আসো ;
দৈন্যহারিণী, বিপদ্‌বারিণী, তুমি বিনা কে বা আছে ?
ওগো দয়াময়ি ! তব উপকার বিনা কি বিশ্ব বাঁচে ?১৭

দৈত্যেরা হ'ত হ'লে হবে এই সৃষ্টি সুখী নিঃশঙ্ক
তারাও পাইবে সুচির মুক্তি উতরি' পাপের পঙ্ক ;
লভিবে স্বর্গ সম্মুখ-রণে বিতরি' আপন প্রাণ,
তাই ত তুমি সে অহিত-কারীরে মৃত্যু করেছ দান ॥

খর-নয়নের অনলেতে যারা ভস্ম হইত পলে,
তুমি তাহাদের অঙ্গে জননি ! শস্ত্র হেনেছো বলে ;
আয়ুধ-প্রভাবে নিষ্পাপ হ'য়ে পাবে তারা পরা-গতি,
এহেন উদার বুদ্ধি তোমার শত্রুগণেরও প্রতি ॥১৯

খড়্গ শিখরে বিস্ফোরণের উগ্র চমক প্রভা,
শূলাগ্রভাগে স্ফুরিত জ্যোতির নয়ন ধাঁধানো শোভা,
দগ্ধ করেনি তাদের আঁখির দৃষ্টি ! কেননা তারা—
তোমার চন্দ্র-আননে চাহিয়া আছিল আত্মহারা ॥২০

দুর্ব্বৃত্ত শমন-নাশ ওগো দেবি ! নিত্য স্বভাব তব
অবর্ণনীয় দেবাসুরজয়ী বীর্য্য কি অভিনব !
অচিন্তনীয় অতুলন রূপ অব্যক্ত নিখিল মনে
তোমার অশেষ দয়ার অংশ দিয়াছ শত্রুজনে ॥২১

উপমা-বিহীন তোমার শৌর্য্য, কি আছে তুল্য তার ?
হেন মনোহর অথচ ভয়াল রূপ কোথা আছে আর ?
চিত্তে করুণা, রণে নিঠুরতা, হে বরদা ! একাধারে
তোমাতেই শুধু দেখিনু জননি ত্রিভুবন-সংসারে ॥২২

শত্রু সংহারি' করিলে রক্ষা অখিল ত্রিলোক-ভূমি
সমরক্ষেত্রে নিহত দানবে স্বর্গ দানিলে তুমি ;
উদ্ধত ঐ দৈত্যশঙ্কা আমাদেরও হল গত
প্রণমি তোমার চরণে দুর্গা শির করি' অবনত ॥২৩

হে দেবি ! রক্ষ মোদের
রক্ষা কর খড়্গ শূলধারে,
হে অম্বিকা ! রক্ষা কর
ঘণ্টাশব্দে, ধনুর টংকারে ॥২৪

হে চণ্ডিকে ! হে ঈশ্বরি !
রক্ষ, রক্ষ, উত্তরে দক্ষিণে,
পূরবে ও পশ্চিমে রক্ষ
আত্মশূল ঘূর্ণি নিশিদিনে ॥২৫

ত্রৈলোক্যে আনন্দময়
কিম্বা রুদ্র মূর্ত্তি তব যত
সর্ব্বদার রক্ষাকর
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সতত ॥২৬

তব করতলে ধৃত
খড়্গ, শূল, গদা অস্ত্র যত
হে অম্বিকে! সর্ব্বায়ুধে!
আমাদের রক্ষ অবিরত ॥২৭

ঋষি কহিলেন ২৮

"এইরূপে করি স্তুতি অখিল দেবতাগণে,
নন্দন-বন-ফুলে, গন্ধ ও চন্দনে,
দিব্য সুরভি ধূপে পরম ভক্তিভরে,
জগন্মাতার পূজা করিল সাড়ম্বরে ॥২৯

প্রসন্নবদনা দেবী প্রণত ত্রিদশগণে
কহিলেন "চাহ বর, যা' কিছু অভীষ্ট মনে ॥"৩০-৩২

দেবগণ কহিলেন ৩৩

"সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ তুমি করিয়াছ ভগবতি।
তোমার কৃপায় আর কিছু বাকি নাই সতি।
নিধন ক'রেছ শত্রু মহিষ-অসুর বধি'
তথাপিও মহেশ্বরি বর দিতে হয় যদি,
দাও তবে এই বর, স্মরণ-মাত্র মনে
নাশিতে বিপদ তুমি আসিও অমলাননে।
আমাদের কৃত এই স্তবমালা মহিমায়
তব বন্দনা যেন ধরণীর লোকে গায় ॥
হে অম্বিকা! সর্ব্বদাত্রি! প্রসন্না মোদের প'রে
দাও বিত্ত, ধন, জায়া সকলের ঘরে ঘরে।"৩৪-৩৭

ঋষি কহিলেন ৩৮

"হে রাজন! দেবগণ এইরূপে শুদ্ধচিতে
দেবীরে করিলে প্রীত আত্ম ও জগত-হিতে;
পরমা সে মহাদেবী ভদ্রকালা প্রসাদিতা
"তথাস্তু "বলিয়া ক্ষণে হইলেন অন্তর্হিতা ॥৩৯

ত্রিভুবন-হিতৈষিণী মোহিনী শৈলসুতা
কিরূপে দেবাংশ হ'তে হইলেন আবির্ভূতা,
অতীতের সে কাহিনী শুনিলে আমার পাশে।
শুম্ভ-নিশুম্ভবধে দুরন্ত দৈত্যনাশে
ত্রিলোক রক্ষণ তরে, দেবতারে উপকৃতে,
ধূম্রলোচন আদি রিপুভয় সম্বরিতে
গৌরার কায়া হতে কৌশিকী-রূপে পুনঃ
কেমনে সম্ভূতা হল এবে সেই কথা শুন ॥৪০-৪২

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্গাপূজার তাত্ত্বিক রূপ

ডাঃ শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র

মোগল শাসন-যুগে বঙ্গদেশের খণ্ড খণ্ড অংশের শাসক দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী রাজশাহীর তাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংশনারায়ণ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে দেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত চাহিলে তাঁহারা বলিলেন যে, "অশ্বমেধ যজ্ঞ পুরাকালে-সার্ব্বভৌম স্বাধীন ভারত সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইত। কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ—এজন্য, তৎপরিবর্ত্তে সেই যজ্ঞাড়ম্বরের সহিত শরৎকালে দুর্গাপূজার আয়োজন করিলে,আপনার সেইরূপ ফলপ্রাপ্তিই হইবে"। রাজা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেইরূপ অনুষ্ঠান সহ দুর্গাপূজা সম্পন্ন করিলেন। তদবধি বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত হইয়াছে। (তাহেরপুরের রাজা ৺শশিশেখরেশ্বর লিখিত দুর্গাপূজা গ্রন্থের মতে)।

পাঠান রাজত্বের সময় গৌড়ের কোন বিদ্যোৎসাহী সুলতানের রাজসভায় অনেক হিন্দু সভাপণ্ডিত থাকিতেন। তাঁহাদেরই অন্যতম পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা তাঁহার রামায়ণ গ্রন্থে সরস বর্ণনায় রামচন্দ্রের অকালবোধন সহ শরৎকালে দুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত, কেননা মূল বাল্মীকি রামায়ণে কুত্রাপি রাম কর্ত্তৃক শক্তির আবাহনের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। সমসাময়িক কালিকাপুরাণে পূজার বোধনমন্ত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ।
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥
ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্।
শক্রেণাপি চ সম্বোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥

…যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি।" দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ কালিকাপুরাণেই আছে। অন্যত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে অসংলগ্ন বর্ণনা আছে তাহা সম্প্রদায়বিদ্বেষ-দুষ্ট।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিত হইয়াছে—পুরাকালে হৃতরাজ্য রাজা সুরথ ও হৃতসর্ব্বস্ব বৈশ্য সমাধি মেধস ঋষির শরণাপন্ন হইলে, তিনি বিস্তৃত চণ্ডীমাহাত্ম্য তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। পরে উভয়ে গঙ্গাতীরে যাইয়া, রাজা সুরথ মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমা গঠন করতঃ ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিয়া বক্ষোরক্ত বলিদান দিয়া বর চাহিলেন, "ধনং দেহি, বলং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"। আবাহনে আবির্ভূতা হইয়া দেবী বর দিলেন "তথাস্তু"। দেহরূপ রথকে সর্ব্বরূপ ভোগ্য উপাদানে সু বা সুষ্ঠুভাবে রক্ষণকামী রাজা সুরথ, দেবীবরে রাজ্যসহ সমস্ত ভোগ্যবস্তু পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইলেন। পক্ষান্তরে সমাধিবৈশ্য, দেবীর মনোময় প্রতীক গঠন করিয়া, দেবীসূক্ত পাঠরূপ মানস আরাধনায় তাঁহার আবাহন করিলেন। দেবীর বরে তিনি তাঁহার কাম্য স্বরূপসিদ্ধি ও সমাধিলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সুতরাং দেবীর আবাহন দ্বিবিধ এবং ফলপ্রাপ্তিরও ভেদ আছে। গুরুউপদেশও দ্বিবিধ। একটী মামুলি যজমানের নামে সংকল্প করিয়া পুরোহিতের পূজা, অপরটী সাধকের মানস-পূজায় আত্মজ্ঞান লাভে স্বরূপসিদ্ধি সাধন। প্রথমটী সহজ, দ্বিতীয়টী বহু কষ্ট ও কৃচ্ছ্রসাধ্য। কালিকাপুরাণের প্রণেতা সাধকপ্রবর এই দুর্গাপূজা-মন্ত্রে এই দুই রূপেরই সমাবেশ করিয়াছেন। বিবেকী সাধকই সে রহস্য ভেদ করিয়া তাঁহার অভীপ্সিত তাত্ত্বিক রূপও ইহাতে পাইবেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই রূপটী বা দিক্‌টাই প্রদর্শিত হইবে।

মহালয়া—শারদীয় অমাবস্যায় পিতৃপুরুষের তর্পণ শেষ করিয়া তৎপরদিন শুক্লা প্রতিপদে পূজার কল্পারম্ভ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ এই পঞ্চকোষময় দেহবন্ধনে আত্মা যেন একটী মুখবন্ধ ভাণ্ডমধ্যে জলের ন্যায়—অমাবস্যার মত তমাচ্ছন্ন, আবদ্ধ অবস্থায় উপমেয়। অগ্নিসংযোগে যখন সেই স্থিতিশীল জল, রজোগুণের প্রভাবে আলোড়িত হইয়া প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে বিস্তৃত বাষ্পাকার ধারণ করে, তখন তাহার শক্তিতে ভাণ্ডমুখের বদ্ধাবরণ ঘন ঘন উত্থিত করিয়া বাহির হয় এবং শূন্যে বিস্তার লাভ করিয়া তাহারই সহিত মিশিয়া যায়। সেই বিস্তৃত বাষ্প যেমন ভাণ্ডমধ্যে থাকিয়া তাহার চারিদিকে চাপ (pressure) দেয়,তেমনি চিরমুক্ত-স্বভাব আত্মাও কখন কখন মুক্ত হইবার প্রয়াসে এই দেহরূপ বন্ধন-বেষ্টনীকে যেন চাপের ন্যায়ই প্রেরণা দেয়—সেই দেহীকে। জড়ভাণ্ড বাষ্পের চাপ অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু চিৎশক্তিপ্রভাবে চেতন দেহেন্দ্রিয় সেই প্রেরণা গ্রহণে সময় সময় সমর্থ হয়। যখন সেই দেহীর সুকৃতির ফলে প্রাপ্ত কোন সদ্‌গুরুর উপদেশে কিছু বিবেকের উন্মেষ হয়, তখন সেই বিবেকীর আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, এবং অমাবস্যার ন্যায় অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে তাহার (আত্মার) স্থিতিলক্ষণ নির্দ্দেশে সাধনার সঙ্কল্প করিয়া, সেই পদের বা স্থানের উদ্দেশে—যেন তাহার প্রতি গতির জন্য—ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে তাহার চেষ্টাও হয়। কদাচিৎ কষ্টদৃশ্য অস্ফুট প্রথম শশিকলার ন্যায় দৃশ্য আত্মার দর্শনের জন্য যে আবেগ হয় তাহারই প্রভাবে সাধনার ক্রম-উর্দ্ধ সোপানে অগ্রসর হইতে তাহার দৃঢ় অধ্যবসায় হয়। ইহাই তাত্ত্বিকের প্রতিপদে (পদ্ অর্থাৎ স্থানের প্রতি) কল্পারম্ভ বা গতির জন্য সঙ্কল্পারম্ভ।

তর্পণের উদ্দেশ্য—ভাদ্রমাসে সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত। তাই অনায়াসলব্ধ এই জলউপকরণে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে ইহা তর্পণরূপে প্রদত্ত হয়। তাঁহারা কোথায় জানা নাই। কিন্তু তাঁহারা যে 'তথাগত' তাহা জ্ঞানের বাহিরে নহে। আমার ঊর্দ্ধতন পিতৃকুল আসিলেন কোথা হইতে? ইহার উত্তর বেদ ও শ্রুতিতেই আছে এবং তাহা প্রামাণ্য। "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।" (দেবীসূক্ত) আমি সর্ব্ব পিতার প্রসবয়িতা হইয়া তাহাদেরও ঊর্দ্ধে স্থিত। আমার গর্ভস্থান (সমুচ্চয়দ্রব) সমুদ্রের অন্তঃস্থলে। পিতরং অর্থে সায়নভাষ্যে আকাশ। প্রমাণ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদ। সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ বা অগ্নি, অগ্নি হইতে আপ্ বা জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি (উদ্ভিজ্জ) উদ্ভিদ্ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, সেই রেত হইতে প্রাণিজগতের সৃষ্টি। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের উপাদানে নির্ম্মিত সর্ব্ব প্রাণিদেহের সহিত আমারও দেহের উৎপত্তি সেই প্রথম উদ্ভূত আকাশ হইতে। তাই আকাশই প্রথম পিতৃস্থানীয়। আর সেই তথাস্থান বা আত্মা হইতেই সমস্ত জীবাত্মার আবির্ভাব এবং সেই তথাতেই তাহাদের অন্তিম তিরোভাব। আকাশই যেন আত্মার প্রথম-প্রসূত সন্ততি এবং তাহাতেই যেন সমস্ত পিতৃপুরুষের আত্মা বিলীন হইয়া আছে। তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য শূন্যে আকাশ প্রতি উৎক্ষিপ্ত জলকণা, তাপসংযোগে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া সেই আকাশেই মিশিয়া যেন আমারই শ্রদ্ধার নিদর্শন তর্পণবারি তৎস্থিত আমার পিতৃপুরুষগণের নিকটেই পৌছে। অন্যরূপ জড়পিণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়, ঊর্দ্ধগামী হয় না, তজ্জন্য নীরতর্পণ প্রশস্ত।

মহালয়াতেই এই তর্পণ ও তৎপরদিন কল্পারম্ভবিধি শাস্ত্রসম্মত কেন? মহালয়মহতাং যোগিনাং আলয় অথবা মহদাদীনাং লয়ো যস্মিন্ অর্থাৎ মহৎ প্রকৃতিরও লয় হয় যে শাশ্বত সনাতন পরমাত্মায়, সেই স্থান বা পদ। পিতৃপক্ষে তর্পণ আরম্ভ করিয়া পক্ষশেষে অমাবস্যায় হয়তো সেই পিতৃপুরুষের কোনও সন্ততির বিবেক উদয় হয় এবং সেই মহান্ বিশ্বআত্মার মহান্ আলয়ে যাইবার সাধন-পথ অবলম্বনে দৃঢ়সংকল্প হয়। তাই মহালয়ার পরদিন সাধনের কল্পারম্ভ।

অতঃপর সেই সাধকপ্রবর পুরাণকর্ত্তারই সাধারণে প্রচলিত পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই তান্ত্রিক সাধনার রূপ প্রদর্শিত হইতে পারে—

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু কর্ত্তব্যং নবরাত্রকম্।
প্রতিপদাদি ক্রমেণৈব যাবচ্চ নবমী ভবেৎ॥
কেশসংস্কারদ্রব্যাণি প্রদদ্যাৎ প্রতিপদ্দিনে।
পট্টডোরং দ্বিতীয়ায়াং কেশসংযমহেতবে॥
দর্পণঞ্চ তৃতীয়ায়াং সিন্দুরালক্তকং তথা।
মধুপর্কং চতুর্থ্যান্তু তিলকং নেত্রমণ্ডনম্॥
পঞ্চম্যামঙ্গরাগঞ্চ শক্ত্যালঙ্করণানি চ।
ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ॥
সপ্তম্যাং প্রাতরানীয় গৃহমধ্যে প্রপূজয়েৎ।
উপোষণং তথাষ্টম্যামষ্টশক্তেঃ প্রপূজনম্॥"
(কালিকাপুরাণ)

দেবীপুরাণোক্ত "দুর্গাপূজা-বিধির" প্রতিপদাদি কল্প এই নির্দ্দেশ অবলম্বনে।

ইহাতে একটী সূক্ষ্মতত্ত্বেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইহা একটী সাধনার ক্রমস্তর। সেই মহালয়রূপ স্থান বা পদের প্রতি গতি আরম্ভ করিয়া সাধক প্রথম দিন, নির্ম্মিত দেবী প্রতিমার কেশসংস্কারের জন্য নানাবিধ গন্ধদ্রব্য উপহার দিলেন—তখন মানস প্রতিমাকে নিজের সমস্ত গন্ধদ্রব্যের প্রতি অনুরাগ অর্পণ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযম করিলেন—যেমন অনেকে তীর্থে যাইয়া তৎস্থিত দেবতাকে নিজভোগ্য কোনও প্রিয় আহার্য্য সামগ্রী অর্পণ করিয়া সেই বিষয়ে যেন বীতরাগ হইয়াই তাহা পরিত্যাগ করেন। সেইরূপ দ্বিতীয় দিনে পট্টডোর দ্বারা দেবীর আলুলায়িত কেশ বন্ধন করিয়া গুচ্ছাকারে কর্ণরন্ধ্র আবৃত করিয়া নিজে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযম করিলেন। তৃতীয় দিনে দর্পণ ও সিন্দুর, অলক্ত প্রভৃতি নয়নানন্দকর পদার্থ অর্পণ করিয়া নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযম করিলেন। দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া সকলেরই আনন্দ উপভোগ তো হয়ই, তৎসহ দেহের সহিত মায়াও ঘনিষ্ঠ হয়। দর্পণ অর্পণে সেই দেহাত্মক বুদ্ধিরও হ্রাস হয়। চতুর্থ দিনে মধুপর্কাদি রসনাতৃপ্তিকর পদার্থ অর্পণে রসনেন্দ্রিয়ের সংযম। পঞ্চম দিনে সমস্ত অঙ্গরাগসাধক দ্রব্যাদি ও অঙ্গশোভক অলঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া নিজ স্পর্শেন্দ্রিয়ের সংযমসাধনে সাধক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে বীতরাগ হইলেন। তখন ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনের, বহির্গমনের পথ সর্ব্বপ্রকারে নিরুদ্ধ হওয়াতে, আশ্রয়ের জন্য অন্তর্মুখী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। সে যেন দেহ-বিল বা গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই আশ্রয় অন্বেষণ করে। বিনা অবলম্বনে মনের অস্তিত্ব নাই। সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিকার মন। বৃহদারণ্যক বলেন—'অশনয়া মৃত্যুরূপ' আত্মা "মনঃ অকরোৎ আত্মন্বীস্যাম" মন করিয়া গতিশীল আত্মা হইলেন। (অততি ব্যাপ্ত্যর্থে গত্যর্থে) সুতরাং এই মন করাই আত্মার প্রথম কৃতি বা

কার্য্য। তাহাই প্র বিশেষরূপে প্রকরণ প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃতি। তাই প্রকৃতি আত্মারই কার্য্য এবং মন তাহারই অন্তর্গত। কার্য্য কারণেই স্থিত হয়। তাই আধাররূপ আত্মা গর্ত্তে প্রবেশ করে বিল্ব- বিল ভেদনে—উন্মাদয়শ্চেতি. সাধুঃ। বিল অর্থে গর্ত্ত (রামায়ণ) মনের অন্তর্ধানে বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ বোধনও সেই ষষ্ঠদিনের শেষে হয়।

সপ্তমদিনে দেহগৃহমধ্যে আনীত মানস প্রতিমার পূজাধ্যান। অষ্টমীতে অষ্টশক্তি বা অষ্টধা প্রকৃতির পূর্ণাহুতি দিয়া সাধক একটী সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়—যেখানে বুদ্ধি মন আদি সমস্ত বিকারলয়ে অব্যক্ত প্রকৃতি তাহার কারণরূপ আত্মাতে বিলীন হয়। আর সাধক তখনই "কেবল" আত্মার অপরোক্ষানুভূতিতে এক নব নূতন অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সচ্চিদানন্দরূপ স্বরূপপ্রাপ্তিতে বিভোর—যেন 'হৃদয়াকাশে চিদানন্দ সূর্য্য (দিবা) ভাতি নিরন্তর'। তাহারই বাহ্যিক প্রকাশ দেখান হয় চারিদিকের দীপালোকে ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত আনন্দ রোলে সন্ধিপূজার সময় ও নবমীপূজার উৎসবে তারপর দশম দিনে প্রাতে দর্পন বিসর্জ্জনের পর ৯ এর পরের • শূন্যাবস্থা বুদ্ধের নির্ব্বাণ-যোগীর সমাধি বাল্মীকির আরামের প্রতীক রাম অর্থাৎ "যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ঃ বিদ্যয়া জ্ঞান বিপ্লবো তংগুরু প্রাহ রাম রমণাৎ রাম' ইত্যাদি। পরাবিদ্যাতে জ্ঞানের ও লয়ে যে অবস্থা প্রাপ্তিতে মুনিগণ পূর্ণারামে স্থিত হন।

সমাধি—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোর্ণবঃ।" (ঋগ্বেদ) অত্যুগ্র তপ হইতে তাপ ও তপস্যা, তাপতপ্ত অধি-আধার কারণ আত্মা হইতে সংকল্প, সত্য (প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে অস্তীতি, সত্যানি পঞ্চভূতানি যাজ্ঞবল্ক্যমতে) অজায়ত বা উদ্ভূত হইল। তমাকারে রাত্ররূপে তাহাই বাষ্পাকারে মেঘরূপে প্রথম শূন্যে ভাসমান হইল। পরে সমুচ্চয় দ্রব হইয়া সলিল হইল। "তম আসাত্তমসা গুহ্লমগ্রেঽ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং" (ঋগ্বেদ)। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল তম বা অন্ধকারময় ভেদবিহীন জলরূপেই সর্ব্ববিশ্ব ছিল। সেই কারণরূপ আধারে চিৎশক্তির আবির্ভাব হইয়া যেন অগ্নি বা তেজরূপে তাহাকে তাপিত করিল। তাই তপস্যা। সেই গূঢ় আধশেষ ঘন তমগুণাশ্রিত সলিল তেজের রজোগুণপ্রভাবে, বিরল বা হাল্কা হইয়া বাষ্পাকারে প্রথম সত্য বা প্রত্যক্ষ সৃষ্ট পদার্থ হইল। তাহাই পুনরায় জলাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই প্রথম জলজ মীনাদি প্রাণী ও তদুপরি উদ্ভিদের সৃষ্টি হইল। সুতরাং সেই প্রাকৃত জল হইতেই উদ্ভূত প্রাকৃতিক জলের উপরে যে পৃথিবী হইল তাহারই উপাদানে প্রাণিদেহ গঠিত। সেই আদি আধার হইতে উদ্ভূত উপাদানের ক্রম-বিবর্ত্তনের রেখার শেষসীমায় যে বিষ্ণুর বামন অবতাররূপে তাঁহারই প্রতীক মনুষ্য সৃষ্ট হইল, তাহাতেই সেই আদি সৃষ্টিকর্ত্তার পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া বীজরূপে অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই মনুষ্যমধ্যেই কেহ কেহ সেই বীজের অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতে সাধনারূপ জলসেচনে তাহার অঙ্কুর উদ্গম করিয়া তাহাকে তাহার আদিরূপে বা সেই অধি বা আধাররূপে পরিণত করিতে পারে। যোগী পঞ্চেন্দ্রিয়-সংযমদ্বারা বহিরাকর্ষণ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী করিলে, মন তখন অভ্যন্তরে শুধু অমাবস্যার অন্ধকারই দেখিয়া তাহাতেই লীন হয়। তখন তাহার চালক বুদ্ধি মনরূপ রশ্মির (বল্গা) হস্তচ্যুত, সুতরাং কার্য্যাভাবে স্থির হওয়াতে তাহাতে সত্ত্বগুণের প্রভাবে দর্পণের ন্যায় প্রকাশক শক্তি আবির্ভূত হয়। তখন সে মনের আহৃত অন্য কোনও দৃশ্য বস্তুর দর্শন না পাইয়া কার্য্যশূন্য হওয়াতে, যাহার প্রভাবে সে চেতিত হইয়া চেতন পদার্থের ন্যায় কার্য্য করিতেছিল সেই চিৎশক্তিরই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় আর তাহাই বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত আত্মদর্শন বলিয়া কথিত হয়। দিনের পর দিন ঘন-মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া অবসন্ন মন প্রথম সূর্য্যের জ্যোতি দেখিলে যে আনন্দ উপলব্ধি করে, তাহার সহিত উপমেয়—এই অন্তর্মুখী মনের কেবলই অমাবস্যার অন্ধকার দর্শনে অবসন্ন অবস্থাতে এই অন্তরস্থিত সৎচিতের জ্যোতি দর্শন। তাই সাধক সৎচিদানন্দে বিভোর। ইহাই সাধকের নব (নূতন) বা নবম অবস্থা। তাপের একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা স্থির জল কম্পিত হয়। তাপ উদ্ভূত হয় অগ্নি হইতে। অগ্নি প্রত্যক্ষ হয় তাহার জ্যোতিতে, সুতরাং জ্যোতিঃ তাপে প্রকাশক সংজ্ঞা। অগ্নির ক্ষণ-তিরোধানের পরও জলের কম্পন থাকে। যেখানে কম্পন সেখানেই জ্যোতির বিদ্যমানতা অনুমেয়। জ্যোতি ও কম্পন একসময়েই অনুভব করা যায়। জ্যোতির তিরোধানে কম্পনানুভূতি অনেকক্ষণ থাকে, এবং সেই কম্পনের কারণ একটী শক্তিরও অনুভূতি হয়। পরে সেই কম্পনের অনুভূতিও তিরোহিত হইলে সেই শক্তিও তিরোহিত হয় তাহার আধারে। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। শক্তি অপ্রত্যক্ষ অনুভূতি-সাপেক্ষ। অনুভূতির অভাবে তাহা শূন্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং এই শূন্যরূপ আধেয় শক্তির আধারও শূন্য। অনুভূতির করণ বা সহায় মন, বুদ্ধির অভাবে আর কোনও অনুভূতিও নাই। সুতরাং সমস্তই শূন্যাকার। এই অবস্থাতে সাধক সেই শূন্য অধি বা আধারের সমতা বা স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অন্তে তাঁহার ইহাই স্বরূপ। অধির সমতা বা স্বরূপত্ব প্রাপ্তিই সমাধি বা নির্ব্বাণ। এই অবস্থাতে

সাধক জীবের আরম্ভণ ভ্রূণ হইতে, ক্রমান্বয়ে দশম অবস্থা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া শান্ত, অদ্বৈত, তুরীয়, মৃত্যুঞ্জয় শিবের অমৃতত্ত্ব প্রাপ্তির স্বাদ পাইলেন। যে বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত চিৎশক্তির ক্রিয়া বা লীলা এই জীবদেহে তাঁহার জন্ম হইতে দশম দশা মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, সেই বুদ্ধিদর্পণের সহিত শক্তিরও বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার দশহরা বা মৃত্যু-বিজয় অভিযান শেষ হইল। তাই দশমীতে দর্পণ বিসর্জ্জনের পর বিজয়া দশহরা। এই সাধনার সহিত দুর্গাপূজার কি সম্বন্ধ?

দুর্গা—ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার সপ্তশতী চণ্ডীগ্রন্থের উপক্রম বা উদ্বোধন করিলেন "ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপ-রত্নবেদী-সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্। পীতাম্বরাং কনকভূষণমালাশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাং।" ইহার সহিতই ঋগবেদান্তর্গত পরমাত্মভূত ঋষি বাগ্মী দেবীর সূক্ত উদ্ধৃত করিলেন। "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি। (দেবীসূক্ত দেখুন) এই প্রথমোক্ত শ্লোকে তিনি কোন্ দেবীর উল্লেখ করিলেন তাহাই বিচার্য্য। সুধা বা অমৃত-সিন্ধু বা পরমাত্মারূপ আধারে জনিত তদ্বৎ অবর্ণ স্বচ্ছমণির বেদী সিংহাসন পরিপূর্ণভাবে অধিকৃত করিয়া পরিপূর্ণা পীতবর্ণা, পীতবসনা, পীতবর্ণ (কনক বা সুবর্ণেরও পীতবর্ণ) ভূষণে মাল্যে শোভিতা, একহস্তে উদ্যত মুদ্গর ও অন্য হস্তে বৈরীর জিহ্বা ধারণ করিয়া আছেন যে দেবী—তাঁহারই ভজনা করি। এই মুদ্গর দ্বারা বৈরিজিহ্বা বিকল করিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—পরবর্ত্তী দেবীসূক্তে "অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। আমি রুদ্রের ধ্বংসকারী ধনু নমন করিয়া তাহাতে শক্তি প্রদান করি এবং যাহারা ব্রহ্মবিদ্বেষী শত্রু তাহাদিগকে হনন করি। সুতরাং এই দেবীমূর্ত্তি একটা শক্তির প্রতীক। তিনি গাত্রবর্ণে, বসনে, ভূষণে সর্ব্বথা পীতবর্ণা। কনক বা সুবর্ণের উল্লেখ থাকাতে ইহা হিরণ্যবর্ণ। সুবর্ণের আর এক নাম হিরণ্য। হিঃ+অণ্য=হিরণ্য। হিঃ বা জ্যোতির আধার-হিঃ+ঈরৎ (গত্যর্থে) যাহা হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হয় তাহার নাম হীরক—বহুমূল্য রত্ন। একই ভূগর্ভ হইতে হীরক ও সুবর্ণ উদ্ভূত হয়। উভয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া যায় একই জাতীয় মূল উপাদান। এই অন্যরূপে রূপান্তরিত ধাতু সুবর্ণ দ্বারাই হীরকের মূল্য নিরূপিত হয়। হীরকদ্বারা কোন দ্বিতীয় রূপের বস্তু নির্ম্মিত হয় না। কাজেই ব্যাবহারিক পক্ষে উহা অকেজো। পক্ষান্তরে সুবর্ণ দ্বারা অনেক নাম-উপাধি-বিশিষ্ট বস্তু নির্ম্মিত হয়। এজন্য তার কার্য্যকারিতার জন্য তাহার এত আদর। হিঃ শব্দ শক্তিদ্যোতক। কোনও শক্তিসাধ্য কার্য্য করিবার সময় শ্রমিক হিয়ো হিয়ো শব্দ উচ্চারণ করে। নৌকার মাঝি, পাল্কীর বেহারা দৃষ্টান্তস্থল। অদৃশ্য শক্তি প্রকাশিত হইলেই তাহা হিরণ্য—যেমন অদৃশ্য তাপ, অগ্নিরূপে প্রকাশিত হিরণ্যবর্ণ। বিশ্বের যাবতীয় কার্য্যই কোন না কোন শক্তিদ্বারা প্রবর্ত্তিত। সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তিই সৃষ্টি করে। যাহা প্রজা সৃষ্টি করে তাহাই হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। তাহার গর্ভে বা অন্তরেই যেন বিচিত্র সৃষ্টির শক্তি নিহিত জন্য সমষ্টি শক্তির প্রতীক এই "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।" বৈদিক ঋষি যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিলেন তাহারই দৃষ্টান্তে এই অনুমান করিলেন "নিশাকালে ঘোর তমসাচ্ছন্ন সুষুপ্ত জগতের যেমন অস্তিত্বই থাকে না, প্রত্যুষে অরুণোদয়ে হিরণ্যবর্ণ সবিতা প্রসবয়িতা আদিত্য সূর্য্য সেই বিলুপ্তপ্রায় জগৎকে প্রকাশ করিয়া যেন সত্যই তাহা প্রসব করিলেন। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডরূপে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ করিয়া আবার প্রদোষে সেই হিরণ্যবর্ণেই যখন অস্তাচলশায়ী হইলেন তখন জগতেরও অস্ত হইল। নশ্বর "জগতের উৎপত্তি ও পরিণতির ধারাও এইরূপ। তাই সেই সৃজনী-শক্তির নাম-রূপ-উপাধি দিলেন হিরণ্যগর্ভ। হীরকের ন্যায় আত্মা অকেজো; তাহা হইতে নিষ্কাসিত হীরকেরই রূপান্তর সোনার ন্যায় তাহারই হিরণ্য শক্তি কেজো। তাই এই আত্মাধিষ্ঠিত হিরণ্যগর্ভের প্রতীকই এই সুধাব্ধি-মণিমণ্ডপাধিষ্ঠিতা সর্ব্বথা হিরণ্যবর্ণা দেবী—যিনি "ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ" যিনি "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ"; যিনি "সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি" যিনি "দুর্গা দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেঽপি"—দুর্গা দুর্গমনে প্রাপণে যাহাকে পাওয়া অতীব দুরূহ—দুর্ভেদ্য দুর্গের (কেল্লার) ন্যায় যাহা পাইতে হইলে বহু ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়; যিনি বৈদিক দুর্গা—পুরাণের মামুলি দুর্গাসুর বধ করিয়া পরের নামে নামী নহেন; যিনি "চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্" আত্মসাধকের প্রথম কাম্য; যিনি লক্ষ্মীরূপে "সংগমনী বসুনাং" সমস্ত ধনের আধার ধনশক্তি; যিনি শুদ্ধ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী শক্তির প্রতীক শ্বেতবর্ণা সরস্বতী; যিনি গণশক্তির প্রতীক ঐরাবতমুখধারী বিশ্বসৃষ্টির বিনায়ক গণপতি গণেশ; (বহুজনসাধ্য কার্য্য এক হস্তীদ্বারা সাধিত হয়) যিনি কৌমার্য্য শক্তির (Concentrated Might) অব্যয়িত শক্তির প্রতীক বৃক্ষের স্কন্দের ন্যায় কার্ত্তিকেয়; যিনি "নারায়ণী তৈজস শরীরে পরমাত্মা।" যিনি "একানেকা সূক্ষ্মরূপা অবিকারা ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি কোটি প্রসূষে", যিনি "ত্বং স্ত্রী চ ত্বং পুমান্ সর্ব্বরূপা" যিনি "সত্যং নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপং" আত্মার চিৎশক্তির প্রতীক দুর্গমনীয় শক্তি—"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণ-

মহমীশান এব চ কারিতাস্তে" ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরীর গ্রহণের কারণ—সাংখ্যের "প্রকৃতিস্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়-বিভাবনী" রূপে বিশ্বের তাবৎ নাম-রূপ-উপাধিধারী পদার্থের প্রসবয়িত্রী—যাঁহার গর্ভ হইতে বা 'মহদ্‌যোনি' হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত—বেদের আত্মা হইতে নিঃসারিত হিরণ্যগর্ভ মার্কণ্ডেয় ঋষির স্ত্রী-মূর্ত্তির রূপায়িতা দুর্গমনীয়া বিশ্বের জননীরূপে সর্ব্বত্র পূরণ করিয়া "ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ" দুর্গা দেবী। আত্মান্বেষী সাধক নিজে দেহধারীবশত মনের একাগ্রতা সাধন জন্য প্রথমে সমস্ত শক্তির প্রতীক প্রতিফলিত করত অন্তর্মুখী মনের সাহায্যে সেই মানস প্রতিমা হৃদয়ে স্থাপন করেন—"গৃহমানীয়।" পরে সেই মূর্ত্তির শিরস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলে একাগ্র মনের দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তির অবয়ববাদ অপসারিত হইয়া একমাত্র জ্যোতিবচ্ছটা hallow auriole বিদ্যমান থাকে। ক্রমে তাহাই অগণ্য ব্যাস-সমষ্টি রূপে বিস্তৃত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল বিভাসিত করিলে, সাধকের অনুভূতি হয়—তাহার আত্মাই অহংরূপে চিৎরূপে জ্যোতিরূপে এই বিশ্ব-ভরণ বা ধারণ করিয়া সমস্তই "বিভর্ম্যহং"রূপে বিদ্যমান। ইহাই সাধকের দেবীসূক্তোক্ত সচ্চিদানন্দরূপ হিরণ্যগর্ভের "অহং দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্" এর অনুভূতি। ইহার পরে যে তুরীয় অবস্থা তাহাও ঋষি বলিলেন "অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।" আমি অসঞ্চারিত অননুভূত বায়ুর ন্যায় সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে ভরিয়া আছি। ইহাই সমাধি অবস্থা। সমাধি হইতে বুত্থানের সন্ধিস্থলে সাধক অপরোক্ষানুভূতিতে দেখিলেন—"পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতি মহিমা সম্ভূব" আমারই মহিমা বা হিরণ্যগর্ভ চিৎশক্তিতে ত্রিলোক সম্ভূত। বাহ্য প্রাকৃতিক অগ্নির উপাসনা যজ্ঞে পার্থিব সমস্ত পদার্থের আহুতি দিয়া অন্তরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হিরণ্যগর্ভের উদ্দীপন করিয়া বলিলেন এই হিরণ্যগর্ভই যখন সমস্তের আধার তখন আর অন্য কোন দেবতাকে হবিদান করিব—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" পরে সেই হিরণ্যগর্ভরূপ অন্তরাগ্নিতে মানববুদ্ধির আহুতি দিয়া সাধক "সোঽহং অহং ব্রহ্মাস্মি" স্বরূপসিদ্ধ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহাই দুর্গাপূজার তাত্ত্বিকরূপ। ওঁ শান্তি।

দেখেছ সোনার বাঙ্‌লা দেশ?

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

দেখেছ সোনার বাংলা দেশ?
সহরের কোণে ইঁটের পাঁচিলে তার সীমানার হয় নি শেষ।
ঐ যে সুদূরে আকাশ নেমেছে মাটীর সঙ্গে মেলাতে হাত,
প্রতিদিন ভোরে পাখীরা যেখানে গানে গানে বলে 'সুপ্রভাত';
বাতাস যেখানে পাগলের মতো ছুটে ছুটে ফেরে দিগ্বিদিক,
দিনের সূর্য্য, রাতের চাঁদিমা চেয়ে থাকে শুধু নির্নিমিখ:
কত নদী আছে, কত বন আছে, কত মাঠ আছে—কত না গ্রাম!
তোমার ভুগোলে, মোর ইতিহাসে লেখা আছে তার কয়টি নাম?

কতবার কত ঝড় এসেছিল—ভেঙে গেছে কত মাটীর ঘর!
এপারে নদীর ভাঙন লেগেছে, ওপারে জেগেছে নতুন চর।
কখনো এসেছে কাঘের জোয়ার, কখনো এসেছে প্রেমের ঢেউ,
কেউ বা হেসেছে, কেউ বা কেঁদেছে—গান গেয়ে গেয়ে ফিরেছে কেউ;
কামার কুমোর, চাষী তাঁতী জেলে যারা আমাদের ঘরের লোক,
তাদের আমরা চিনি না এখনো—বুঝি না তাদের দুঃখশোক।
সহরে তোমার প্রমোদ-বাসরে যারা জেলে দিল প্রাণের ধূপ,
তোমার ছবিতে, মোর কবিতায় ফোটে নি তাদের স্বচ্ছরূপ।

খুলে ফেল আজ ছদ্মবেশ:
সহরের কোণে সাজানো বাগান সেইটুকু নয় তোমার দেশ।
তোমার দেশের পথে ঘাটে নেই বিজুলীর আলো, বাষ্পরথ;
কাদায় কাঁটায় ধুলোয় বালিতে ভরা আছে তার অনেক পথ।
সেই পথ বেয়ে একবার চলো দল বেঁধে মোরা সবাই যাই,
সে কথা এবার মুখে মুখে বলি যেকথা লেখায় জানাতে চাই।
কালির আখর কয়জন চেনে?—হয় না চেনাতে খুনের দাগ;
সবুজ মাটীতে, এঁকে রেখে যাবো অবুঝ প্রাণের রক্তরাগ।
চিরতরে যদি মুছে দিতে পারি একটী লোকেরও চোখের জল
সেই তো মোদের ধন্য সাধনা—সেই তো মোদের পুণ্যফল।

চতুরালী (গল্প)

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কেত্রনাথের 'হার্ড ওয়ার'য়ের ব্যবসাটা যুদ্ধের বাজারের সুবিধা পাইয়া যখন দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর, হঠাৎ সেই সময় একদিন কেত্রনাথ তিনদিনের জ্বরে মারা গেল। তখন বড় ছেলে বৈদ্যনাথ কোমর বাঁধিয়া দোকানের কাজে আত্মনিয়োগ করিল; আর ছোট আদ্যনাথ কলেজ ত্যাগ করতঃ কবিতার কুঞ্জবনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার দেড়-দিস্তার বাঁধানো খাতাখানা যদিচ দেড়মাসের মধ্যেই ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কোনটিই ছাপার অক্ষরে কাগজে বাহির হইল না। এই না-বাহির হওয়ার কোনও ন্যায়-সঙ্গত কারণ অনেক ভাবিয়াও সে নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হইল। কলিকাতার কোন কাগজেই আদ্যনাথ তাহার কবিতা পাঠাইতে বাকী রাখে নাই। কাগজে-কাগজে কবিতা পাঠাইয়া দিবার পর সে অধীর আগ্রহে দুইতিন মাস পর্য্যন্ত আশায়-আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিত: তারপর প্রবল জ্বরত্যাগান্তে রোগী যেমন দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহার অবস্থাও তদ্রূপ হইত। কবিতা বাহির না হওয়ার সংবাদটাও সে কোথাও হইতে পাইত না। শুধু 'পুষ্পোদ্যান' নামক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট হইতে একবার একটা ছাপানো ক্ষুদ্রাকার পত্র আসে—'আপনার রচনাটি স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না; ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।' কিন্তু আদ্যনাথ ত্রুটী কিছুতেই মার্জ্জনা করে নাই। মোটে কুড়িশটা পংক্তি, তার স্থানাভাব? মনে মনে আদ্যনাথ সম্পাদকের মুণ্ডপাত করিল।

যাহা হউক কাগজ-ওয়ালাদের এই প্রকার অবিচার এবং নিষ্ঠুরতায় তিক্ত এবং বিরক্ত হইয়া আদ্যনাথ কিছুদিন পরে কবিতার কুঞ্জ হইতে 'গল্পে'র মেঠো-পথে পা বাড়াইল। পা বাড়াইয়া দেখিল এ-পথেরও সে পাকা পথিক বটে। দেখিল—পথ তাহার নিকট খুবই সোজা এবং সুগম। সে নতুন উৎসাহে আবার নতুন খাতা বাঁধিল।

দিন-পনর ধরিয়া, ঐকান্তিক যত্নের সহিত, অনেক কাটা-কুটি ও অদল-বদল করিয়া সে যে-গল্পটি খাড়া করিল, তাহার নাম—'অনাদৃতা'। কিন্তু এই অলক্ষুণে নামটাই তাহার গল্পের পক্ষে সত্য এবং শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। একে একে প্রায় সব কাগজেই আদ্যনাথ তাহার 'অনাদৃতা'কে পাঠাইল, কিন্তু সকল স্থান হইতেই তাহা অনাদৃত হইয়া ফিরিয়া আসিল। শুধু একখানি কাগজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট হইতে উত্তর আসিল, 'আপনার গল্পটিতে ভাব আছে, কিন্তু ভাষার বড় দৈন্য; যাহা হউক, আপনি নিম্ন স্বাক্ষর-কারীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবেন।' সেই দিনই আদ্যনাথ আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া 'নিম্ন-স্বাক্ষরকারী'র সহিত সাক্ষাৎ করিল। নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁহার ড্রয়ারের মধ্য হইতে গল্পটি বাহির করিয়া কহিলেন—"লেখাটা খুবই কাঁচা, আর অনেক জায়গায় ঘটনার সামঞ্জস্য নেই। ভাষা একেবারেই···বুঝলেন না? আপনি কিছুদিন এখন মক্স করুন। তারপর দেখা যাবে। আমরা নতুন লেখকদের নিরুৎসাহ করি না,—বুঝলেন না?"

"নিরুৎসাহই ত হোল, মশাই। এটা যদি ছাপাতেন, তা' হলে উৎসাহ পেয়ে, এর পরের গল্পটা ভালই দাঁড়াতো।"

তখন উভয়ের মধ্যে আরও কিছু আলাপ-আলোচনা হইল। কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় আদ্যনাথের সাংসারিক অবস্থার সংবাদ জানিয়া লইলেন। তাহাদের 'হার্ড-ওয়ার-বিজনেস্'-এর খবরটাও পাইলেন। তারপর একটু ভাবিয়া কহিলেন—"আপনাকে নিরুৎসাহ করবার আমাদের মোটেই ইচ্ছা নেই। বড্ড কাঁচা লেখা কি না! এর জন্যে চারখানা পৃষ্ঠা নষ্ট করলে আমাদের কাগজের বদ্‌নাম হবে।" মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিবার পর তিনি কহিলেন—"আচ্ছা এক কাজ করুন। বদনামটা না হয় আপনার জন্যে সহ্য কোরেই নোবো। চারখানা পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন-ক্ষতিটা আপনি পুষিয়ে দেবেন;···বুঝলেন না?"

আদ্যনাথ সত্যই বুঝিতে পারিল না। নীরবে রহিল।

"বুঝলেন না? চার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন-মূল্যটা আপনি দিয়ে দেবেন। আমাদের একপৃষ্ঠার 'চার্জ্জ' হোল—২০ টাকা; চার কুড়ি অর্থাৎ আশীটা টাকা···বুঝলেন না?···আচ্ছা যাক, আপনি না হয় পঁচাত্তরটা টাকাই দেবেন; গল্পটা আসচে মাসেই বার কোরে দোবো।" কিছু আর না বলিয়া আদ্যনাথ তাহার গল্পটি লইয়া ফিরিয়া আসিল।

তাহার বৌদি মণিমালা সকল খবরই রাখিত এবং বৌদিই ছিল তাহার লেখার একমাত্র সমজদার। মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হোল ঠাকুরপো?"

আদ্যনাথ ধার-করা-হাসি হাসিয়া কহিল—"নিলে না বৌদি। বল্লে—কাঁচা লেখা, ঘটনার সামঞ্জস্য নেই—। তবে, ৭৫টা টাকা দিলে ছাপতে পারে।—তা, টাকা দিতে যাব কেন বৌদি? কোথায় টাকা পাবার কথা, তার জায়গায়—টাকা দিয়ে লেখা ছাপানো!"

"ঠিকই ত ঠাকুরপো! বোয়ে গেছে তোমার টাকা দিতে।"

"যেমন শুনলেন, আমাদের 'হার্ড-ওয়ার'য়ের ব্যবসা আছে অমনি টাকা চেয়ে বসলেন।"

"তা ঠাকুরপো, বল্লে না কেন ভাই যে, গোটা তিনেক বালতি না হয় দোবো মশাই।"

হাসিতে-হাসিতে আদ্যনাথ কহিল—"তাই বল্লেই ঠিক হোত বৌদি।"—এ হাসি কিন্তু আদ্যনাথের সত্যকার হাসি। মণিমালা দেওরটিকে খুবই স্নেহ করিত। আদ্যনাথ মনে ব্যথা পাইলে মণিমালাও ব্যথিত হইত। আদ্যনাথ যাতে খুসী হয়, তাই মণিমালা তাহার লেখার বরাবরই সুখ্যাতি করিত; কহিল—গল্পটা ত আমার খুবই ভাল লেগেচে ভাই! তুমি ঐ অপয়া নামটা বদলে ফেল।"

"তিন দিন ভেবে তবে ঐ নামটা দিয়েছি বৌদি।"

"তা হোক; তুমি ঠাকুরপো অন্য একটা নাম দাও।"

"তা হোলে কি নাম দেওয়া যায়?"

"ঐ মেয়েটির কি নাম দিয়েছ? ঐ যে গো—তোমার ঐ 'অনাদৃতা'র?"

"ওঃ! ওর নাম হোল শুভ্রা।"

"গল্পের নাম তুমি 'শুভ্রা' দাও ঠাকুরপো। আর তুমি আরও গল্প লিখে যাও; দেখবে, টাকা দিয়ে সকলকে তোমার গল্প নিতে হবে।"

বৌদির পরামর্শে ও উৎসাহবাক্যে আদ্যনাথ গল্পটার নাম 'শুভ্রা' রাখিল এবং আরও গল্প লিখিবার জন্য খান-কতক খাতা বাঁধিয়া ফেলিল।

* * *

বৌদির উৎসাহে আদ্যনাথ আরো দুইটা গল্প লিখিয়া ফেলিল। মণিমালাকে গল্প দুইটি পড়িয়া শুনাইলে, মণিমালা কহিল—"ঠাকুরপো, এ দুটি গল্প প্রথমটার চেয়ে খুব ভাল হোয়েচে; সত্যি বলচি।" আদ্যনাথেরও মনের কথার সঙ্গে তার বৌদির এই মুখের কথা মিলিয়া গেল। আদ্যনাথেরও ধারণা, তাহার এই দুটি গল্প খুব ভাল হইয়াছে। এবার তাহার গল্প কেহই অপছন্দ করিতে পারিবে না। সাদরে না হউক, তাহার গল্পকে এবার কাগজে স্থান দিতেই হইবে।

একদিন আহারাদির পর দুপুরবেলায় আদ্যনাথ তাহার গল্প দুইটি লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঘরের আরাম-কেদারার উপর শুইয়া পড়িল। রান্নাঘর হইতে মণিমালা আদ্যনাথের ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া যাহা আন্দাজ করিয়াছিল, এক্ষণে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করাতে বুঝিল, তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ গল্প দুইটি সম্পাদকীয় কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

একটা হতাশামিশ্রিত টানা-শ্বাস ফেলিবার সঙ্গে আদ্যনাথ কহিল—"আর লিখবো না বৌদি!"

মণিমালা কহিল—"কেন লিখবে না; নিশ্চয়ই লিখবে।"

"না বৌদি, সব পুড়িয়ে ফেলবো; আর লিখব না।"

"নিশ্চয় লিখো না!—

'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে,

মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।'…সুতরাং শাস্ত্রমতে কিছু-লেখা উচিত নয়।" বলিতে বলিতে একটি সুবেশ ও সুন্দর যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মণিমালা ফিরিয়া দেখিয়া কহিল—"যতীন? কোলকাতায় ফিরলি কবেরে?"

"কাল ফিরিচি দিদি। তোমরা সব ভাল ত? আদিকে কি লেখবার জন্যে বলছিলে, দিদি? একটু খুব কড়া করে চা কোরে দেবে? বড্ড আজ ঘুরতে হোয়েচে। জামাই বাবু এখনো ফেরেন নি?

মণিমালা যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"তুই ত প্রশ্নের রেলগাড়ী ছুটিয়ে দিলি, এক সঙ্গে অত কথার জবাব দিতে আমি পারবো না ভাই। তবে, তোর জন্যে চা করতে পারি; তাই করিগে যাই।"—মণিমালা নীচে চলিয়া গেল।

যতীন মণিমালার কনিষ্ঠ সহোদর। ইন্‌সিওরেন্সের দালালী করে। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তাহাকে বাহিরে-বাহিরেই ঘুরিতে হয়।

নীচের দালানে জল-খাবার ও চা খাইতে-খাইতে যতীন কহিল—"তা হোলে আদির লেখক হবার খুব ঝোঁক হোয়েচে।"

মণিমালা কহিল—"হোক্ ভাই। অন্য কোন রকম বদ-খেয়ালের দিকে না গিয়ে, এই সব নিয়ে যে থাকে—এটাই ভাল। তাই, আমি ওকে কিছু বলি না, উল্টে খুবই উৎসাহ দি। কিন্তু…

"কিন্তু কি দিদি?"

"ওর গল্প কোন কাগজে ছাপতে চায় না, এই হোয়েচে—মুস্কিল। সকলেই কাঁচা লেখা বোলে ফিরিয়ে দেয়। বেচারা সকলের দোরে-দোরে গল্প হাতে কোরে ঘুরে, শেষকালে মুখ শুকিয়ে ফিরে আসে; তাতে ভাই আমার বড় কষ্ট হয়। তোর ত অনেক লোকের সঙ্গে ভাব; কোন কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে পোট-শোট নেই, যতীন?"

"তোমাদের এই এখানকার সন্দেশ কিন্তু দিদি—ফাষ্ট কেলাস্; ঐ মোড়ের বড় দোকানটার বুঝি?"

"কুটনা কুটিতে কুটিতে মণিমালা বঁটি হইতে হাতটা তুলিয়া লইয়া কহিল—"হ্যাঁ রে, তোকে যে আমি অতগুলো কথা বল্লুম, তার কিছুই বুঝি কাণে গেল না?"

একটা সন্দেশের আধখানা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যতীন বলিল—"ঐ—আদির লেখার কথা বলছ ত? ওর জন্যে আবার চেনা-শোনা পোট-শোটের কি দরকার!"

"তবে?"

"তবে আর কি? কাগজে ওর লেখা বার করতে হবে ত, তা লেখা বার কোরে দোবো।"

"চেনা-জানা না থাকলে, কি কোরে বার করবি?"

"লেখা বার কোরে দিলেই হ'ল ত? আমি হলুম ইন্‌সিওরেন্সের দালাল। বহরমপুরের শ্রীকেষ্ট সিমলাই—যে অসুখ হোলে, পয়সা খরচ হবে বোলে ওষুধ খায় না; থালা-বাসন ক্ষয়ে যাবে বোলে মাজে না, শুধু ধুয়ে নেয়,—তাকেও এবার দশ হাজার টাকার ইন্‌সিওর করিয়ে এলুম। ওর কি—লেখা বার করতে হবে, আমায় দিতে বোলো, এই মাসেই বার কোরে দেবো।"

খুব বিস্ময়ের সঙ্গে মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—"দিতে পারবি?"

"নিশ্চয়ই।"

"কি যে বলিস্ তুই, আমি বুঝতে পারি না। কি করে দিবি?"

"কি কোরে যে দোবো, তা এত তাড়াতাড়ি তোমায় বলতে পারব না; একটু ভাবতে হবে। তবে দোবোই। ওর লেখা বার করবার ব্যবস্থা না কোরে এবার আমি বাইরে যাব না। জগতে সবই হয়, শুধু চাই একটু……

"একটু কি চাই?"

"এই যাকে বলে…তোমার গিয়ে—চতুরালি।"

* * *

'আমহার্ষ্ট রো'র উপর 'সুচিত্রা' মাসিকপত্রের প্রকাণ্ড আফিস। 'সুচিত্রা' বড় কাগজ; বহু গ্রাহক; অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা। বাঙ্গলার নাম-করা লেখক-লেখিকারা 'সুচিত্রা'য় লিখিয়া থাকেন।

অপরাহ্ণকাল। স্বত্বাধিকারী মহিমবাবু তাঁহার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া কি-একটা হিসাব দেখিতেছিলেন। খানিক পরে হিসাবের খাতাখানা বন্ধ করিয়া ক্রিড়িং করিয়া 'কলিং-বেল'য়ের শব্দ করিলেন। বেহারা আসিয়া সামনে দাঁড়াইলে, কহিলেন—"জগদীশ বাবু।"

জগদীশবাবু 'সুচিত্রা'র সম্পাদক। পণ্ডিত লোক। বয়সেও প্রবীণ। দুইশত টাকা বেতন পান। কিন্তু তাহা হইলেও, একে তিনি 'ছা-পোষা'—তাহার উপর যুদ্ধের দরুণ দ্রব্যাদির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, সুতরাং দুইশত টাকাতে অতি সাধারণভাবেও তাঁহার সংসারটি চলিতে চাহে না। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাই তিনি মহিমবাবুর নিকট গোটা পঁচিশ টাকা বেতন-বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

জগদীশবাবু মহিমবাবুর সামনেকার চেয়ারখানায় আসিয়া বসিলে, মহিমবাবু টেবিলের উপর হইতে একখানা কি-কাগজ তুলিয়া লইলেন এবং সেইটারই উপর যেন মনোযোগ দিয়া জগদীশবাবুর উদ্দেশে কহিলেন—"দেখুন, ক'দিন ধরে আমি আপনার প্রস্তাবটা ভেবে দেখলুম। কাগজ, কালি থেকে আরম্ভ কোরে প্রত্যেক জিনিসটা যে-রকম অসম্ভব দামে কিনতে হোচ্চে, তাতে কোরে এ সময়ে আপনাকে মাইনে বৃদ্ধি দেওয়া চলে না। মাপ করবেন, জগদীশ বাবু।"

আমৃতা-আমৃতা করিয়া, সঙ্কোচের সহিত জগদীশবাবু কহিলেন—"প্রত্যেক জিনিষটার অগ্নিমূল্য বোলেই ত প্রস্তাবটা করতে বাধ্য হোয়েছিলুম। আপনি দেখুন, গভর্ণমেণ্ট থেকে আরম্ভ কোরে প্রায় সব জায়গায় মাগ্যি-ভাতার একটা ব্যবস্থা হোয়েচে; অন্ততঃ সে হিসেবেও আর গোটা পঁচিশ টাকা না দিলে, কি কোরে এই বাজারে…

কথাটা সমাপ্ত হইবার অবকাশ পাইল না। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিতে দিতে মহিমবাবু কহিলেন—"পারব না জগদীশবাবু, মাপ করবেন। তুলসীচরণ বাবু একজন পাকা সম্পাদক; বেকার অবস্থায় এখন বোসে আছেন। আমার বোধ হয়, দেড়শোটা কোরে টাকা দিলেই তিনি আমাদের এখানে আসেন।"

জগদীশবাবু মনের বিরক্তিটা চেষ্টা করিয়াও মনের মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারিলেন না, তার কতকটা চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি আর দ্বিতীয় কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

"নমস্কার!"—যতীন একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কা'কে চান?"

"আপনার কাছেই এসেছি। 'সুচিত্রা'র আমাদের একটা বিজ্ঞাপন ছাপাবার দরকার, সেই জন্যেই…

"ওঃ' বিজ্ঞাপন? বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই; বিজ্ঞাপনের ম্যানেজার আছেন, আপনি তাঁর কাছে যান। আপনাদের কিসের কারবার?"

পকেট হইতে খুব দামী সিগারেটের একটা প্যাকেট বাহির করিয়া যতীন জগদীশবাবুর সামনে ধরিল এবং দেশালাইটা আগাইয়া দিয়া কহিল—"আমাদের কোন কারবার নয়। আমরা খুব ভালো দেখে একখানা মাসিকপত্র আসচে বোশেখ থেকে বার করব। তারি জন্যে উপযুক্ত একজন সম্পাদক আমরা চাই। তার জন্যেই বিজ্ঞাপন দোবো। অতঃপর নিজেও একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল—"অবশ্য—দৈনিকেও এর জন্যে আমরা বিজ্ঞাপন দোবো। সুচিত্রা বড় মাসিক; অনেক পাঠক; তাই এতেও একটা বিজ্ঞাপন আমরা দিতে চাই।—এই যে বিজ্ঞাপনের কপিটা দেখুন না আপনি।"

কপিটা জগদীশবাবুর হাতে দিয়া যতীন নিবিষ্টচিত্তে সিগারেট টানিতে লাগিল।

জগদীশবাবু পড়িয়া একটু বিস্ময়ের সহিত কহিলেন—"আপনারা চার শো টাকা মাইনে দেবেন—সম্পাদককে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচশো করেই দেওয়া হবে, তবে প্রথম ছ'টা মাস চারশো হিসেবেই ধরা হোয়েচে। উনি বলেন, কাগজের সব কিছু হোল—সম্পাদক; পাঁচশোর কম তাঁকে দেওয়া চলে না। বিলেতে—

"উনি কে?"

এক মুখ ধুম উদ্গীরণ করিয়া যতীন কহিল—"তা কাগজ আমার নয়; আমার এক বন্ধুর। তিনি বলছিলেন যে বিলেতে…"

"তিনি কি করেন?"

"তিনি একজন জমিদার; চা বাগান আর কয়লার খাদেরও মালিক। তার পর এই ক'বছরে কন্‌ট্রাক্টরী কোরে ২০।৩০ লাখ টাকা উপায় কোরেচেন। তাই থেকে একলাখ টাকা তিনি এই কাগজের জন্যে খরচ করবেন। তবে দেখাশুনো করতে হবে আমাকেই।"

"দেখুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এ বিজ্ঞাপনটা এখন আর দেবেন না। আপনি চা খান ত?"—জগদীশ বাবু ক্রিড়িং করিয়া বেল টিপিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেহারা আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি তাহাকে দুই কাপ চা আনিতে বলিলেন।

অতঃপর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হইবার পর যতীন নমস্কার জানাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং জগদীশ বাবু যতীনের বাসার ঠিকানা লেখা কাগজখানা যত্নের সহিত পকেটের মধ্যে রাখিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন।

* * *

যতীনের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর। প্রাতঃকাল।

জগদীশ বাবু ও যতীনের মধ্যে কথোপকথন হইতেছে।

যতীন কহিল—"আপনাকে যদি আমাদের কাগজের সম্পাদক রূপে পাই, তা হোলে আমাদের কাগজের আর আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য। অঘ্রাণ মাস ত শেষ হোতে চল্লো; মধ্যে আর তিনটে মাস। চৈত্রের গোড়া থেকেই আমাদের তোড়্‌জোড় সুরু হবে; আপনাকে তাহোলে চৈত্র থেকেই কাজে লাগতে হবে।

"হ্যাঁ, এ তিনটে মাস আমি সুচিত্রায় কোনরকমে কাটিয়ে দোবো এখন।"

"আপনার কথা শুনে আদ্যনাথ বাবুর ভারি আনন্দ। কাল রাত্রেও তিনি এখানে এসেছিলেন। নানা কাজে তিনি ব্যস্ত; আজকে যাবেন তিনি ঝরিয়ায়; সেখান থেকে এসেই তাঁকে যেতে হবে জলপাইগুড়ি—তাঁর চা-বাগানে। এক দিনের জন্যও কি তাঁর অবসর আছে? তার উপর অতবড় কন্‌ট্রাক্টরী কাজের ম্যানেজমেণ্ট করা।"

কিন্তু এর ভেতরেও তিনি যে গল্প লেখেন তাঁর বাহাদুরী আছে। আর গল্প তিনটি আমি পড়লুম; চমৎকার হোয়েচে।

"আদ্যনাথ বাবু বলেন—'ও আবার গল্প। ছেলেখেলা হোয়েছে আমার, পুড়িয়ে ফেলে দিলেই হয়!'—আমিই শুধু জোর কোরে রেখে দিয়েছি। নইলে তিনি হয় ত পুড়িয়েই

"আরে না না; গল্প তিনটি অতি চমৎকার হোয়েচে। আমি যখন পেয়েচি, ও ত আর আমি ছাড়বো না। তিনটে গল্প তিন মাসে 'সুচিত্রা'য় বার কোরে দোবো। পৌষে একটা, মাঘে একটা, ফাল্গুনে একটা। তার পর বোশেখ থেকে ত আমাদের নিজেদেরই…১০টা বাজলো; আমি উঠলুম তা হোলে যতীন বাবু। নমস্কার।"

যতীন সদর দরজা পর্য্যন্ত জগদীশ বাবুর সঙ্গে আসিয়া নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল।

* * *

পৌষের শেষে। কনকনে শীত পড়িয়াছে।

অপরাহ্নবেলায় আদ্যনাথ বেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে র‍্যাপার জড়াইয়া দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়াছিল; সমুখে এক কাপ চা।

মণিমালা আসিয়া কহিল—"ঠাকুরপো, চা যে ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে; এখনো খাও নি? দুটো সন্দেশ এনে দোবো, খাবে?

"ওকে নয় দিদি, আমাকে; আর দুটোতে হবে না, পেট ভোরে সন্দেশ খাওয়াতে হবে"—বলিতে বলিতে যতীন আসিয়া আদ্যনাথের পাশেই বসিল। তাহার হাতে পৌষের একখানা 'সুচিত্রা'। কাগজখানা আদ্যনাথের হাতে দিয়া কহিল "তোমার গল্প না কি বেরোয় না! দেখ দেখি বেরুলো কি না! আর এই নাও—তোমার গল্পের দক্ষিণা।"—একখানা দশটাকার ও একখানা পাঁচটার নোট পকেট হইতে বাহির করিয়া যতীন আদ্যনাথের সামনে রাখিল।

আদ্যনাথ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাড়াতাড়ি 'সুচিত্রা'র পাতা উল্টাইতে লাগিল। মণিমালা কহিল—"তাহোলে ঠিকই ত তুই বার কোরে দিলি যতীন।"

আদ্যনাথের চায়ের কাপটা তুলিয়া লইয়া যতীন তাহাতে চুমুক দিতে আরম্ভ করিল; কহিল—"আমি হলুম ইনসিওরেন্সের একজন পাকা দালাল আমি পারি না কি? আর দুটো গল্প পরের দু'মাসে বেরুবে। আদি পেট ভরে সন্দেশ না খাওয়ালে কিন্তু ছাড়বো না ভাই।"

বিস্ময় ও আনন্দে মণিমালা কহিল—"হ্যাঁরে গল্পটাও ছাপলে, আবার টাকাও দিলে?"

"দেবে না? তোমায় ত বোলেছিলুম দিদি জগতে সবই হয়, চাই শুধু একটু চতুরালি।"

আদ্যনাথ তখন তাহার গল্পটা বাহির করিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল।

আধুনিক সমস্যামূলক উপন্যাস
(ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ তাঁহার প্রথম রচনায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্রথম গল্পসংগ্রহে বীরবলী ঢং ও মনোভাবের প্রভাব সুস্পষ্ট।

তাঁহার পরবর্ত্তী তিনখানি উপন্যাসে—'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) 'আবর্ত্ত' ও 'মোহানা'য় তিনি অনুকরণ কাটাইয়া মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উপন্যাসত্রয়ীতে তীক্ষ্ণ মনন-শক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ হইয়াছে। খগেনবাবুর আত্ম-জ্ঞান ও জীবন-সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার দাম্পত্য বিরোধের যে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও হ্রস্ব সঙ্কেত মিলে, সেগুলি বর্ণোজ্জ্বল্যে ও নির্ব্বাচন-সার্থকতায় এক সম্পূর্ণ চিত্রে সংহত হইয়াছে। সাবিত্রীর সন্দেহপ্রবণ, অভিমানী, একগুঁয়ে প্রকৃতিটী কয়েকটা স্থূল আভাস ইঙ্গিতে চমৎকার ফুটিয়াছে। একদিকে সাবিত্রীর হীন ফ্যাসান-অনুবর্ত্তিতা, অন্যদিকে খগেনবাবুর শ্লেষপ্রবণ অসহিষ্ণু আদর্শবাদ—এই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের যে আগুন জ্বলিয়াছে, সাবিত্রীর আত্মহত্যা তাহাতে পূর্ণাহুতি দিয়াছে। উপন্যাসের আসল বিষয় হইল সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সহিত খগেন বাবুর এক অতি সূক্ষ্ম জটিল হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠার বিবরণ। রমলার খগেন বাবুর প্রতি সমবেদনা ও শুশ্রূষা শীঘ্রই প্রবল প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। খগেনবাবুর মননশীলতার আভিজাত্যবোধ তাঁহাকে আত্মানুশীলন ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য নির্জ্জনবাসে প্রণোদিত করিয়াছে। কিন্তু কাশী যাওয়ার পর সামাজিকতার প্রয়োজনবোধ আবার তীব্র হইয়াছে। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া রমলার সাহচর্য্য লাভের জন্য যে ব্যাকুল আগ্রহ ফুটিয়াছে, তাহাকে প্রেমের অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া যায়। গ্রন্থের শেষে সুজনকে লিখিত পত্রে অধিকতর শান্ত ও সংযতভাবে এই সুরই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। মৈত্রী ও উদাসীন নারী-প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রতি সচেতন আগ্রহের প্রথম শিহরণ এই উভয়ই নায়কের সঙ্গপিয়াসী মনের নিকট কাম্য হইয়া উঠিয়াছে। রমলার উত্তরে অকুণ্ঠিত প্রেম-নিবেদন ব্যক্ত হইয়াছে।

খগেনবাবুর দিন-লিপিতে জীবন সম্বন্ধে বিচিত্র ও বহুমুখী আলোচনা একদিকে সর্ব্বত্র-সঞ্চারী তীক্ষ্ণ ধী'র পরিচয়স্থল, অন্য-দিকে হৃদয়ান্দোলনের তরঙ্গে হিল্লোলিত ও প্রাণময়। গভীর চিন্তাশক্তি অন্তর্দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কাশীর আকাশ-বাতাসে ধর্ম্মচর্চ্চার কৃচ্ছ্র সাধনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, রুদ্ধ বাসনার অঙ্কুরোদ্গমের যে অনিবার্য্য প্রেরণা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই খগেনবাবুর চিত্তে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। এই প্রাণধর্ম্মের প্রবল ঝলকে জীবন সম্বন্ধে নূতন সত্যের অনুভূতি ঝলসিয়া

উঠিয়াছে। আদর্শবাদের মানদণ্ডে জীবনকে মাপিবার প্রচেষ্টায় সাংঘাতিক ভুল ধরা পড়িয়াছে। জীবনে প্রেম যে সহজ ও সুন্দর সামঞ্জস্য আনিয়া দেয় ও প্রেমাস্পদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের স্বাধীন, অকুণ্ঠিত স্ফুরণ যে এই সামঞ্জস্যের একটা প্রধান অঙ্গ,—এই সত্যের উপলব্ধি আসিয়াছে। প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শের জন্য একটা ব্যগ্র উন্মুখতা জাগিয়াছে। কিন্তু এই সত্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে সাধারণ অনুভূতিকে বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করিতে কুণ্ঠা—অতিরিক্ত চিন্তাজর্জ্জর জীবনের চিরন্তন অভিশাপ, হ্যামলেটের 'বাঁচি কিংবা মরি'—চলচ্চিত্ততার ছোঁয়াচ। "সাহসের অভাবই হল আমার প্রধান বিপত্তি, ভয়ই আমার প্রধান রিপু; প্রেমে যে বিরোধের অবসান, সে অবসান আমার নয়"—এই স্বীকারোক্তিই রমলার সহিত তাঁহার প্রকৃতির পার্থক্যকে স্ফুট করিয়াছে। 'রমলার ধর্ম্ম আছে, তার অভিজ্ঞতা উত্তমরূপেই ধৃত, তাই তার পদক্ষেপ লঘু। অধার্ম্মিকেরাই স্থূল হয়।'

প্রেমের দ্বারা বিরোধ অবসানের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করার পর আর্টের পথে সামঞ্জস্য লাভ কতদূর সম্ভব, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। প্রধানের সহিত অপ্রধান, সার্থকের সহিত অবান্তরের সমাবেশ-কৌশল আর্টের বিশেষত্ব—ইহা কি জীবনে সংক্রামিত হইতে পারে—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া অনেকটা অমীমাংসিতই রহিয়াছে। এই আলোচনাতে উচ্চাঙ্গের মনন-শক্তির পরিচয় থাকিলেও ইহা উপন্যাসের বিশেষ সমস্যার সহিত অপেক্ষাকৃত নিঃসম্পর্ক। তার পর আসিয়াছে আবার এক বিপরীতমুখী দোলা—শুষ্ক বুদ্ধির বিরুদ্ধে বুভুক্ষু হৃদয়াবেগের দাবী সমর্থন। এবার ফুটিয়াছে রমলার প্রতি প্রেমের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস ও সহানুভূতির আবেদন। এই মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে আবার আত্মরতির পরিবর্ত্তে কর্ম্মপ্রেরণা ও সেবাব্রত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে এবং এই সঙ্কল্পই অবিরত আত্ম-বিশ্লেষণে ক্লান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় দিয়াছে। ফল হইয়াছে কাশী ছাড়িয়া আরও সুদূর দেশে অজ্ঞাতবাস ও পরিব্রাজকের জীবনযাত্রা অবলম্বন।

'আবর্ত্ত' 'অন্তঃশীলা'র উপসংহার—পূর্ব্বগামী উপন্যাসের ঘটনা ও চিত্তবিশ্লেষণের জের টানিয়া চলিয়াছে। ইহাতে 'অন্তঃশীলা'র কয়েকটী অপ্রধান চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও তাহাদের সমস্যা ও জীবনাদর্শ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। রমলা এখন সমস্ত সংযম, শালীনতার আবরণ ছিঁড়িয়া নিজ কামনার নগ্ন বাস্তবতা প্রকটিত করিয়াছে। খগেন বাবুর প্রতি তাহার লোলুপতা অন্তর-বাহিরের সমস্ত বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া অনিবার্য্য বুভুক্ষার মূর্ত্তি ধরিয়াছে। এইবার সুজনের হৃদয় উন্মোচনের পালা। রমলার সহিত তাহার সম্বন্ধের মধ্যে ছোট ভাই-এর স্নেহাকাঙ্ক্ষার সহিত অজ্ঞাতসারে প্রণয়ীর অধিকারমূলক অসপত্ন দাবীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। রমলার নিজ ব্যবহারেই এই কামনার বীজ সুজনের মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখন খগেন বাবুর প্রতি রমলার নিঃসঙ্কোচ প্রেমাভিব্যক্তিতে এই অবচেতন লালসা দুর্নিবার তীব্রতার সহিত অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে। কাশীতে অক্ষয়ের গৃহে তাহাদের একরাত্রির একত্রবাসে এই অন্তঃরুদ্ধ আবেগের সমস্ত অসহনীয় উত্তাপ ও জ্বালার বিকীরণ অনুভব করা যায়—যদিও ঘটনার দিক হইতে ইহার স্বাভাবিকতা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহার মধ্যে বঞ্চিত প্রেমিকের তিক্ত ক্ষোভ ও খগেনবাবুর প্রতি তাহার উচ্চ ধারণার বিপর্য্যয়ে আদর্শবাদের মোহভঙ্গ প্রায় সম-পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। সে বিজনকে আনাইয়া বালির বাঁধের দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গ রোধের হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছে। মাসীমার সংসারকে উত্তেজিত করিয়া রমলার উদগ্র কামনার এক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত পরাশ্রয়ী জীবনের সমস্ত বুকজোড়া ক্লান্তি ও আশালেশহীন ঔদাস্য লইয়া সে রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে বিজনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত। সে সুজন ও খগেনবাবুর বিপরীতধর্ম্মী সুস্থ ও স্বাভাবিক তারুণ্যের প্রতীক। সুজন যেন লরেন্সের জগৎ হইতে আমদানী, ছোট ভাই ও প্রেমিকের সংমিশ্রণ, বিজন খাঁটি ও অবিমিশ্র ছোট ভাই। খগেনবাবুর প্রতি তাহার সুগভীর অবজ্ঞা, সামঞ্জস্যহীন বিরোধ। যে জটিল চিন্তাধারার আবর্ত্তে খগেনবাবু হাবুডুবু, সুজন যে সাংঘাতিক ঘূর্ণীচক্রের দিকে নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, বিজন তীরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া কতকটা অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পার সহিত তাহাদের সেই দুর্দ্দশা দেখিতেছে। তাহারও যৌবনসুলভ খেয়াল আছে—সে সাম্যবাদের একটানা স্রোতে নিজ অনভিজ্ঞ ভাব-বিলাসের চিত্রিত তরণী ভাসাইয়াছে। তথাপি সেও রমাদি ও সুজনের মধ্যে যে স্তব্ধ ঝটিকার পূর্ব্বাভাষ পূর্ণ, বিদ্যুদ্‌গর্ভ নীরবতা নামিয়া আসিতেছে—তাহার স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, এবং এই আসন্ন বিচ্ছেদের সন্ধিক্ষণে সে সুজনের পাশে দাঁড়াইয়াছে। রমলার সান্নিধ্য হইতে পলায়নের জন্য সে সুজনকে যে সনির্ব্বন্ধ স্নেহানুযোগ—ক্ষুব্ধ অনুরোধ জানাইয়াছে তাহা যেন সমস্যাপীড়িত প্রৌঢ় জীবনের প্রতি অপরিণত-বুদ্ধি যৌবনের আন্তরিক কিন্তু কার্য্যতঃ অক্ষম, সতর্কবাণী। সে বিপদের প্রকৃতি না বুঝিয়াও তাহার গুরুত্ব বোঝে।

রমলার একরোখা আগ্রহাতিশয্য প্রতিহত হইয়াছে তাহার প্রেমাস্পদের পারদের ন্যায় চঞ্চল, দানা বাঁধিতে অক্ষম, বিভিন্নমুখী আকর্ষণে আন্দোলিত প্রকৃতির দ্বারা। তাহার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বিগলিত হৃদয়ধারা পরমুহূর্ত্তে বরফের ন্যায় জমাট বাঁধিতেছে—একদিনের আগ্রহ পরদিনের ঔদাসীন্যে সঙ্কুচিত হইতেছে। হিমালয় ভ্রমণ ও হরিদ্বারে আশ্রম-বাসের সময় রমলার উগ্র কামনার স্মৃতি কখনও কখনও খগেন বাবুকে অভিভূত করিয়াছে, এক একদিন নিজেরও আদিম, অসংস্কৃত প্রবৃত্তি তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর রমলা সম্বন্ধে তাহার মনোভাব আর কোন নূতন পরিবর্ত্তন রেখায় দৃঢ়াঙ্কিত হয় নাই। প্রেমের চিত্র অপেক্ষা আশ্রমের কৃত্রিম ও শূন্যগর্ভ জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই স্পষ্টতর অভিব্যক্তি পাইয়াছে। "হিমালয়ের বিপুলতায় আশ্রম যেন প্রক্ষিপ্ত, গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম যেমন মহাভারতের স্বাভাবিক ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রক্ষিপ্ত, যেমন প্রকৃতির উপর ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরমাত্মা প্রক্ষিপ্ত"—এই মন্তব্যই আশ্রম সম্বন্ধে তাহার মনোভাব-দ্যোতক।

হিমালয়ের নিজস্ব মহিমা, তাহার বিপুল প্রশান্তি মানুষের বুদ্ধির অহঙ্কার ও হ্যামলেটিয়ানার আত্মসর্ব্বস্বতার প্রতিষেধক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি খগেন বাবু সেখানেও নিজ সমস্যার সমাধান পায় নাই। কাশী ফিরিয়া রমলার সহিত মুখোমুখি বোঝাপড়ার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আবার নায়কের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা চরম নিষ্পত্তির গ্রহণে অক্ষমতা প্রকটিত হইয়াছে। সে আবার আত্মপরীক্ষার জন্য অবসর চাহিয়াছে। রমলা এই সমস্ত বিলম্ব ঘটাইবার অজুহাত সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং পরবর্ত্তী দুই দিন কতকটা রমলার প্রবল ইচ্ছাশক্তির ও কতকটা কাশীর সানাইএর সম্মোহন, সমন্বয়কারী প্রভাবে খগেন বাবুর সন্দেহদোদুল চিত্তে প্রেমের আবেগ ও সহজ মাধুর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু অতি সামান্য কারণে এই হৃদয়াবেগের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। রমলার চাঁপা রঙের শাড়ী ও অনাবৃত বাহু—তাহার অন্তরের বহ্নিজ্বালার রক্তিম প্রতিচ্ছবি নায়কের ধূসর চিন্তাক্লিষ্ট মনে বর্ণোচ্ছ্বাসের বিহ্বলতা ও অসংযম ও আতিশয্যের প্রতি ভীতি সঞ্চার করিয়াছে। মাসীমার সহিত সাক্ষাতের পর আবার নূতন সংশয়ে তাহার মন দোলায়িত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত বিজনের দোহাই দিয়া যে উষ্ণ, বেগবান্ আবেগধারা তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহাকে সে রোধ করিতে চাহিয়াছে। সুজন, রমলা ও খগেন বাবু তিন জনের নিকটেই বিজনের বিশেষ মর্য্যাদা ও মূল্য আছে। সুজন রমলার অসংযত হৃদয়াবেগকে লজ্জা দিবার জন্য তাহাকে হাজির করিয়াছে; রমলা লজ্জা এড়াইবার জন্য তাহার সান্নিধ্য পরিহার করিয়াছে; খগেনবাবু বিজনের সাম্যবাদমূলক সমাজব্যবস্থায় তাহাদের এই অসামাজিক প্রেমের কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তিক্ষণকে পিছাইতে চাহিয়াছে। রমলা ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে বলি দিতে নারাজ, খগেনবাবু ভবিষ্যৎহীন বর্ত্তমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক, যে মিলনে ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির বীজ নাই তাহা তাহার নিকট অর্থহীন। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত চালমাত দাঁড়াইয়াছে। অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া আবর্ত্তের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি জীবনে স্থায়ী হইয়াছে! উপন্যাসের শেষ ঘটনা মাসীমার মৃত্যুকে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। (যদিও পরবর্ত্তী খণ্ড 'মোহানায়' ইহার উপর এইরূপ গুরুত্বই আরোপিত হইয়াছে)।

মননক্রিয়ার আধিক্য ও বিস্তার সত্ত্বেও চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়াছে। চিন্তার নানামুখী তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও খগেন বাবুর সত্তার কেন্দ্রবিন্দু স্থির আছে। রমলা, সাবিত্রী ও সুজনেরও দুর্ব্বিষহ জীবন-সমস্যা তাহাদের জীবন্ত হৃদয়স্পন্দনকে চাপা দেয় নাই—সমস্যা জীবনতরুরই কণ্টকিত পল্লব। বিজন ইহাদের মধ্যে অনেকটা যান্ত্রিক ও প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি—তাহার নিজের জীবন অপেক্ষা অপরের উপর তাহার প্রভাবই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। মাসীমাও এইরূপ গৌণ চরিত্রের পর্য্যায়ে পড়েন—খগেন বাবুর প্রতি তাঁহার স্নেহশীলতা মাঝে মাঝে সন্দেশ খাইবার আমন্ত্রণেই নিঃশেষিত। তাঁহার মধ্যে ঔদাসীন্য ও শুভানুধ্যায়িতার সমন্বয় স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। 'অন্তঃশীলার' নায়ক খগেন বাবু তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্যাপী চিন্তাধারা জ্ঞানের পরিধিসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। 'আবর্ত্তে'র নায়ক প্রকৃতপক্ষে সুজন—গ্রন্থে তাহারই প্রকৃতি-রহস্য-উন্মোচন; এখানে মনন-শক্তির আপেক্ষিক সঙ্কোচ। সোস্যালিজমের আলোচনা যেন সমাজ-নীতির রাজ্য হইতে আমদানী ঔপন্যাসিক চরিত্রের সহিত প্রাণসম্পর্কহীন। মোটের উপর উপন্যাসদ্বয় উচ্চ প্রশংসার উপযুক্ত—নূতন রীতি পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ও বৈদগ্ধ্যের সহিত বাস্তব-সৃষ্টির সুষ্ঠু সমন্বয়।

এই উপন্যাসত্রয়ীর শেষ পর্য্যায় 'মোহানা'য় পূর্ব্ববর্ত্তীদের উৎকর্ষের মানদণ্ড অনেকটা নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। মাসীমার মৃত্যু খগেন বাবু ও রমলার মিলনের পথের লৌকিক অন্তরায়কে অপসারিত করিয়াছে। কিন্তু কতকটা খগেন বাবুর উদাসীনতা ও অনাসক্তি, কতকটা উভয়ের আদর্শ বৈষম্যের জন্য এই ক্ষীণজীবী প্রেম সার্থক হয় নাই। উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়, খগেন বাবু—রমলার সম্পর্কের মানসিক আবেদন ও কাণপুরে শ্রমিক-ধর্ম্মঘটের কর্ম্মপদ্ধতি ও আদর্শের আলোচনার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। বিজন একদিকে অতীত ও বর্ত্তমান, অপরদিকে হৃদয়ের-সম্পর্কের অসুস্থ জটিলতা ও শ্রমিক-আন্দোলনের সরল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান উপন্যাসে তাহার যান্ত্রিক প্রয়োজনের দিকটা আরও অনাবৃতভাবে প্রকট হইয়াছে। সে একদিকে রমলাকে গৃহস্থালী পাতাইতে সাহায্য করিয়াছে, অন্যদিকে খগেন বাবুকে ধর্ম্মঘটের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার দুরারোগ্য চলচ্চিত্ততাকে সাময়িকভাবে একটা বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে। তাহার নিজের যে মানস পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা উপন্যাসের একটা গৌণ বিষয় এবং সফিকের সঙ্গে মতভেদ তাহাকে আবার এক নূতন কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার প্রান্তদেশে পৌঁছাইয়াছে। শ্রমিক ধর্ম্মঘটের আলোচনার ও এতৎসম্পর্কীয় বিরুদ্ধ মতবাদের বিশ্লেষণে লেখক স্থানে স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন সত্য; আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ ভয়াতুর (hectic) আবহাওয়ার দ্রুত স্পন্দনও কতকটা লেখনীমুখে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি মনে হয় যেন দুই বিরোধী পক্ষের শক্তিপরীক্ষার মত্ত আস্ফালন ও বিকারগ্রস্ত যান্ত্রিকতা ইহার খাঁটি মানবিকতাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মঘটের নেতা সফিকের কূটনীতি ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি তাহার মানবিকতার পরিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই মজুর-বিক্ষোভ খগেন বাবু ও রমলার মধ্যে ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়া উভয়ের সম্বন্ধকে আর একটি পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণের দিকে লইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিতগুলি বেশ সুস্পষ্ট নহে—তথাপি মোটামুটি ইহা রমলাকে নিজ অতৃপ্ত হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তির জন্য পুরুষান্তরকে কেন্দ্র করিয়া মোহাবেশের রঙীন জাল বুনিবার প্রেরণা দিয়াছে, আর খগেন বাবুকে সফিক-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার অনুসরণে ব্রতী করিয়াছে। খগেন বাবুর শেষ পরিণতি কাজের মানুষে; রমলার, রঙীন-পাখা-মেলা স্বচ্ছন্দবিহার প্রজাপতিতে। কিন্তু এই পরিণতি তাহাদের পূর্ব্বজীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কি যাত্রার শেষ না মধ্যপথে ক্ষণিক বিরতি এই প্রশ্ন মনকে সন্দেহাকুল করে।

নৌকাযোগে নবদ্বীপ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ,

পূজায় বাঙ্গালী দীর্ঘ অবকাশ লাভ করে এবং সেই অবকাশ বাঙ্গালী ভ্রমণে অতিবাহিত করে—কাজেই পূজায় ভ্রমণ বাঙ্গালীর একটি উৎসব বিশেষ। কেহ বা সিমুলতলা, গিরিডি, বৈদ্যনাথধাম পর্য্যন্ত যায়, তদপেক্ষা ধনী লোকেরা কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী যায়—ধনীরা ওয়ালটেয়ার, হরিদ্বার, এমন কি কাশ্মীর পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন। ভ্রমণের আনন্দ অনেক—তাহাতে বহু শিক্ষার বিষয়ও আছে—কাজেই এই নির্দোষ আমোদলাভে কাহাকেও কিছু বলা যায় না। কিন্তু এই আমোদ করিতে যাইয়া যাহারা নিজ নিজ গ্রামের কথা ও গ্রামের অনুষ্ঠিত পিতৃপিতামহের দুর্গোৎসবের কথা ভুলিয়া যায়, তাহাদের নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। আজ অধিকাংশ বাঙ্গালীর স্থায়ী বাসস্থান কলিকাতা বা অন্য কোন সহরে হইলেও এখন পর্য্যন্ত শতকরা প্রায় ৯০ জনের গ্রামের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং গ্রামে পিতৃপিতামহের ভিটা বর্ত্তমান। ভিটার সহিত সম্বন্ধ কেহ সহজে ছাড়িতে চায় না বা ছাড়িতে পারেও না। আমরা নানা কারণে গ্রামের বাস ছাড়িতে বাধ্য হওয়ায় শুধু গ্রামগুলি যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নয়, আমরাও বহু বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ১২ মাস আমাদের সকলের পক্ষে গ্রামে যাইয়া বাস করা বা পরিবারবর্গকে গ্রামে রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু পূজার সময় অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা কর্ত্তব্য। তাহার ফলে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজন উপকৃত হয় ও নিজেও লাভবান হওয়া যায়। গ্রামের প্রতি উপযুক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনের পরও যাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে, তাঁহারা তাহা দ্বারা ভ্রমণ করুন, কেহই তাহাতে আপত্তি কারণ দেখিবে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখিতে পাই, লোক ভ্রমণের ব্যয়ের জন্য গ্রামকে, গ্রামবাসীদিগকে, গ্রামের আত্মীয়-স্বজনকে ও স্বগৃহের উৎসবকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। ফলে গ্রামের ভিটা নষ্ট হইয়া যায়, পৈত্রিক দুর্গোৎসব বন্ধ হয় ও গ্রাম ক্রমে শ্মশানে পরিণত হয়।

ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা দেশে দ্রষ্টব্য স্থানের ও জিনিষের অভাব নাই। আমরা সে সকলের কথা হয় জানি না, না হয় জানিয়াও তাহাদের অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি। সে জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন হইলেই আমরা বাঙ্গালার বাহিরে গমন করি। যে সময়ে সাঁওতাল পরগণা, রাঁচী, মানভুম, হাজারীবাগ প্রভৃতি জেলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন দলে দলে কলিকাতা হইতে বাঙ্গালী যাইয়া ঐ অঞ্চলে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল ও ঐ সকল গৃহে যাইয়া তাহারা অবসর বিনোদন করিত। এখন আর ঐ সকল স্থান বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত নহে—কাজে বাঙ্গালী ঐ সকল স্থানে যাইয়া নানা অসুবিধা ভোগ করে। যে সকল জেলায় বহু বাঙ্গালীর বাস, সেই জেলাগুলি যাহাতে বাঙ্গালার মধ্যে আবার ফিরিয়া আসে, সেজন্য বহু প্রকার চেষ্টা চলিতেছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইবে কি না সন্দেহ। ঐ সকল স্থানে বাসগৃহ থাকার ফলে সে অঞ্চলে বাঙ্গালীর বাসের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু এখন মনে হয়, যদি বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার মধ্যেই স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা অধিক লাভবান হইতাম। সেজন্য বর্ত্তমানকালে ঝাড়গ্রামে, সোহাপুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে লোক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে।

সে যাহাই হউক, বাঙ্গালায় ভ্রমণের স্থান নেহাৎ কম নহে; চট্টগ্রাম সহরের নৈসর্গিক শোভা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। একই স্থানে নদী, সমুদ্র ও পাহাড়ের সমাবেশ এরূপ আর কোথাও বাঙ্গালার মধ্যে নাই। মেদিনীপুর জেলার দিমা নামক স্থানটিও মনোরম—বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে অনায়াসে তথায় সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা হইতে পারে। দার্জ্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানও অতীব মনোরম।

বীরভুম ও বাঁকুড়া জেলার মফঃস্বলে পথঘাট কম, যানবাহনের অসুবিধা—কিন্তু বীরভুমের প্রতি গ্রামে একটি না একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে। আমরা কেহই তাহার খবর রাখি না। যত বেশীসংখ্যক বাঙ্গালী আগ্রার তাজমহল দেখিতে যায়, তাহার অর্দ্ধেক লোকও বিষ্ণুপুরের কামান বা রাজবাটী দেখিতে যায় না। লোক তক্ষশীলায় যায় কিন্তু মহাস্থানগড় দেখিতে যায় না। মালদহে গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বাঙ্গালীমাত্রেরই দেখার জিনিষ।

আমরা বীরভুম জেলায় পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—গ্রামে অতিথিবৎসলতার অভাব নাই—অর্থব্যয় করিলে ত কোন অসুবিধা হইবারই কারণ নাই। দুবরাজপুরের পাথর বা বক্রেশ্বরের উষ্ণ-প্রস্রবণ যাহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তাহা বুঝাইতে যাওয়া বৃথা। যত কম অর্থে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঐগুলি দেখিয়া আসিতে পারে, তত কম অর্থে আর কোথাও যাওয়া যায় না। একটু দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিলে অতি সামান্য ব্যয়ে বীরভুম জেলায় বহু অসাধারণ জিনিষ দেখা যাইবে।

নৌকাযোগে ভ্রমণ বাঙ্গালায় এখন প্রায় অসম্ভব হইয়াছে—কারণ অধিকাংশ নদী মজিয়া গিয়াছে। বহু নদীতেও বারো মাস জল থাকে না, ভাগীরথীর মত নদীতেও বৎসরে ৪।৫ মাসের অধিককাল কলিকাতা হইতে মাত্র কাটোয়া পর্য্যন্ত নৌকায় যাতায়াত করা যায় তাহার অধিক নৌকা চলে না।

আমরা ৩ বৎসর পূর্ব্বে একবার পূজার পর নদীপথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম—কামারহাটী হইতে নবদ্বীপ জলপথে কত মাইল বলা কঠিন। পূজার পর সোমবার একাদশীর রাত্রিতে ১২টার সময় কামারহাটী ত্যাগ করিয়া আমরা শনিবার বেলা ১২টায় নবদ্বীপ পৌঁছিতে পারিয়াছিলাম। একখানি বড় মালবাহী নৌকা—যাত্রী ৬ জন ও দাঁড়িমাঝি ৫ জন। নৌকাতেই আমরা রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম কাজেই বিশ্রামের ও দ্রষ্টব্যস্থান দর্শনের প্রয়োজন ব্যতীত আমাদের নৌকা থামাইয়া রাখিতে হয় নাই। যাইবার সময় মাঝিদের প্রত্যহ এক টাকার গাঁজা বকশিশ করিতাম ও দিনে নিজেরা যেমন ৪।৫ বার চা পান করিতাম, তাহাদেরও চায়ের ভাগ দিতাম সে জন্য তাহারা প্রায় বিশ্রাম না করিয়া অহোরাত্র নৌকা চালাইত—নানাভাবে

তাহাদের উৎসাহিত না করিলে এত কম সময়ের মধ্যে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সম্ভব হইত না।

দলে ছিলাম—লেখক স্বয়ং, কামারহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, আরিয়াদহ নিবাসী শ্রীমান বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং রহড়া নিবাসী শ্রীমান শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃন্দাবনচন্দ্র এম-এ, বি-এল, বি-টি এবং রাজেন্দ্র নাথ এম-বি—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা দাঁড় টানিয়া ও গুণ ধরিয়া যে ভাবে মাঝিদের সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। তাহাদের ঐ রূপ উদ্যম না থাকিলে আমাদের পক্ষে যাত্রা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হইত। ফিরিবার সময় স্রোতমুখে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল—বাতাসও অনুকূল ছিল—কাজেই শনিবার রাত্রি ১২টায় নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া আমরা রবিবার রাত্রি ১২টায় গৃহে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

শরৎকাল, শুক্লপক্ষের শেষ কয় দিন—কাজেই রাত্রিগুলি দিন অপেক্ষা আমরা অধিক উপভোগ করিয়াছি। সঙ্গে হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা প্রভৃতি থাকায় সঙ্গীত-চর্চ্চার অভাব হয় নাই। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বহু কাব্য সঙ্গে ছিল—সর্ব্বদাই সে গুলি পাঠ ও আলোচনা করা হইত এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বদাই উদরের সেবা চলিত। পূজনীয় রামদাদা মহাশয় রন্ধনে সিদ্ধহস্ত—গঙ্গায় সে সময় প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত—নদীবক্ষে জেলিয়ার নৌকা হইতেই প্রচুর মাছ ক্রয় করা হইত ও তাহা নানা ভাবে রসনাকে তৃপ্তি দিত। সঙ্গে প্রচুর খাদ্য লওয়া হইয়াছিল—কোন দিন খাদ্যের অভাব হয় নাই—কাজেই যে আনন্দে ঐ দিন কয়টি কাটিয়াছিল, তাহা উপভোগের বিষয়—সে আনন্দ ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। প্রতিদিন ভোরে কোন চড়াতে নৌকা লাগাইয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া স্নানাদি শেষ করা হইত ও তখন হইতে রাত্রিতে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িতাম, ততক্ষণ ভোজনপর্ব্ব চলিত। রাত্রিতে পালা করিয়া নিদ্রা যাওয়া হইত এবং মাঝিদিগকেও রাত্রিতে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতে দেওয়া হইত না। সঙ্গে তাস ও দাবা ছিল। তাহারও সদ্ব্যবহার চলিত। পথে গঙ্গার দুধারে বড় বড় গ্রাম—প্রতি গ্রামেই কত না প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান। একমাস ধরিয়া নৌকাযোগে ঐ পথ টুকু অতিক্রম করিলেও বুঝি সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া শেষ করা যায় না। কাজেই আমাদের ভাগ্যে অতি অল্প স্থানই দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। যাঁহারা এ পথে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাদের আমরা পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' দুই খণ্ড সঙ্গে লইতে বলি। তাহাতে গঙ্গার দুই পারের বহু মন্দিরাদির বর্ণনা পাওয়া যাইবে।

কামারহাটী হইতে বাহির হইয়া উত্তর দিকে কিছু দূর যাইলেই সেই পানিহাটী গ্রাম। তথায় গঙ্গাতীরে ৭ শত বৎসরের পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। বটবৃক্ষের পাশে যে গঙ্গার ঘাট আছে তাহাও হিন্দু আমলে রচিত। এই স্থানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে মহাপ্রভুর আগমনের স্মরণ-উৎসব হয় ও বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। তাহার পরই গঙ্গাতীরে খড়দহ গ্রাম। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক খড়দহে বাস করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহ অতি সুন্দর। খড়দহে জমিদার ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস রত্নবেদী করার জন্য লক্ষ শালগ্রাম-শিলা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন—কয়েক সহস্র শিলা এখনও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশেই টিটাগড়ে রাণী রাসমণির কন্যা তারা ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার মন্দির দ্রষ্টব্য। কিছু দূর যাইয়া মূলাজোড়ে গোপীমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির আছে। তথায় এখনও সংস্কৃত কলেজ, অতিথিশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে। পাশেই সংস্কৃত-চর্চ্চার শেষ কেন্দ্র ভাটপাড়া গ্রাম। ঐ গ্রামে এখনও ২ শত বৎসরের অধিক পুরাতন ২০টি মন্দির দেখা যায়।

গঙ্গা হইতে অদূরে নৈহাটীর পাশে কাঁঠালপাড়া গ্রাম—বর্ত্তমান যুগের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসগৃহ তথায় বর্ত্তমান। নব বাঙ্গালার ইহাও তীর্থক্ষেত্র। তাহার পর হালিসহরে চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর জন্মভিটা, সাধক রামপ্রসাদ সেনের পঞ্চবটীতে সাধনবেদী, স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত মঠ প্রভৃতি দর্শনীয়। তাহার পর কাঁচড়াপাড়া বা কাঞ্চনপল্লী গ্রাম—সেখান হইতে নদীয়া জেলা আরম্ভ হইয়াছে। তথায় চৈতন্যদেবের ভক্ত শিবানন্দের পাট। শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়-বিগ্রহ তথায় আজিও পূজিত হইতেছে। যশোহররাজ কচুরায় কৃষ্ণরায়ের যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়েছিলেন তাহা গঙ্গার ভাঙ্গনে নষ্ট হইলে কলিকাতার নিমাই চরণ ও গৌর চরণ মল্লিক বর্ত্তমান সুন্দর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গুরু সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন—কাঁচড়াপাড়ায় তাঁহারও স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

তাহার পর শিমুরালী ষ্টেশনের নিকট পালপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। পণ্ডিত নাকি ঐ জগন্নাথমূর্ত্তি পুরী হইতে পদব্রজে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। পাশেই সুপ্রসিদ্ধ চাকদহ গ্রাম এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। চাকদহের নিকটবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে হিন্দু আমলে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরটি যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানটি চারিদিকের জমি হইতে অনেক উচ্চ। এই মন্দিরের ছাদ চৌচালা আকারে নির্ম্মিত। গঙ্গার পূর্ব্বতীরে তাহার পর সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ফুলিয়া—ভাষা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম-স্থান। এখন গঙ্গা একটু দূরে সরিয়া গিয়েছে। ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ বর্ত্তমান। এখনও প্রতিবৎসর সরস্বতী পূজার পরবর্ত্তী রবিবারে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভের পাশেই হরিদাস ঠাকুরের সাধন-স্থান ও মঠ বর্ত্তমান। মঠে কৃষ্ণ, বলরাম, রাধা ও রেবতীর বিগ্রহ পূজিত হয়। তাহার পরেই গঙ্গাতীরে প্রাচীন গ্রাম শান্তিপুর—কলিকাতা হইতে রেলে ৫৮ মাইল দুরবর্ত্তী। শান্তিপুরের মত সুবৃহৎ গ্রাম এ অঞ্চলে অতি অল্পই দেখা যায়। শান্তিপুরের অন্তর্গত পাবনা গ্রামে অদ্বৈতআচার্য্যের পাট-বাড়ী অবস্থিত। অদ্বৈতের বয়স যখন ৫২ বৎসর তখন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতাচার্য্য ১২৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শান্তিপুরে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে

শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ ও জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরই বিখ্যাত। শ্যামচাঁদের মন্দির ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, গোকুলচাঁদের মন্দির ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। জলেশ্বরের মন্দির নদীয়া জেলার মহারাজা রামকৃষ্ণের মাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এক সময়ে শান্তিপুর সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আশানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। গঙ্গাতীরে কুশাসন গ্রামে ৪ শত বৎসরের পুরাতন শিবমন্দিরগুলি দেখিবার জিনিষ।

গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রথম গ্রাম কোন্নগর—একটি প্রাচীন পল্লী। মনীষী শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক বাস ছিল কোন্নগরে। শিবচন্দ্র দেব, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের বাড়ীও এই গ্রামে। তাহার পাশে রিষড়া পূর্ব্বে একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই স্থানের উল্লেখ আছে। তাহার পরেই গঙ্গাতীরে শ্রীরামপুর—হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমা সহর। ইহা এক সময়ে দীনেমারদিগের অধিকারে ছিল—শেষে তাহারা ঐ স্থান ইংরেজদিগকে বিক্রয় করে। খৃষ্টান মিশনারীদের জন্য শ্রীরামপুর প্রসিদ্ধ। এখানে পাদ্রীদের উদ্যোগে প্রথম বাঙ্গালা ছাপাখানা স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুর কলেজ মিশনারীদের কীর্ত্তি। নিকটেই মাহেশে জগন্নাথ-দেবের ও বল্লভপুরে রাধাবল্লভ জীউর মন্দির আছে। মাহেশে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপলাইএর শ্রীপাট আছে।

শেওড়াফুলিতে নিস্তারিণী কালীমন্দির প্রসিদ্ধ। পাশে বৈদ্য-বাটী এক প্রাচীন পল্লী। ষোড়শ শতাব্দীতে বিপ্রদাস মনসা-মঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন—এই স্থানে গঙ্গাতীরে চাঁদ সদাগর একটি নিম গাছে পদ্মফুল ফুটিতে দেখিয়া ছিলেন। বৈদ্যবাটীর ভদ্রকালী দেবী জাগ্রত।

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত আলালের ঘরের দুলাল" পুস্তকে বৈদ্যবাটীর উল্লেখ আছে। তাহার পর ভদ্রেশ্বর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ভদ্রেশ্বর শিব খুব প্রসিদ্ধ। এখানে পূর্ব্বে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। নিকটে তেলিনী-পাড়া গ্রামে জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার মন্দির বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান।

তাহার পর ফরাসী অধিকৃত নগর চন্দননগর। ইহা বাঙ্গালা সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। বহু পূর্ব্ব হইতে এখানে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য লোক আসিত। এ অঞ্চলে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। স্থানে প্রাচীন ও আধুনিক বহু মন্দির আছে। সম্প্রতি প্রবর্ত্তক সংঘের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় স্থানটির মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। চুঁচুড়া হুগলী জেলার ও বর্দ্ধমান বিভাগের প্রধান সহর। এখানকার প্রাচীন ইতিহাস জ্ঞাতব্য বিষয়। বর্ত্তমানে কলেজ ও মাদ্রাসা দ্রষ্টব্য। হুগলী প্রাচীন সহর—১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা পর্ত্তু-গীজ অধিকারচ্যুত হইয়া মুসলমান অধিকারে যায়। তাহার-২ বৎসর পরে ইংরাজগণ তথায় কুঠী নির্ম্মাণ করে। দানবীর হাজি মহম্মদ মহসিনের ইমামবাড়া হুগলীতে অবস্থিত। পৌনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। হুগলীর অন্তর্গত বালী পল্লীর রাধাকুঞ্জে ঠাকুরবাড়ী ও চন্দ্রদাস বাবাজীর বা আখড়া দ্রষ্টব্য স্থান। পাশে ব্যাণ্ডেল জংসনে একটি অতি প্রাচীন গির্জ্জা আছে।

হাওড়া হইতে ২৮ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে বংশবাটি বা বাঁশবেড়ে গ্রাম অবস্থিত। রাজা নৃসিংহদেব ও তৎপত্নী রাণী শঙ্করী কর্ত্তৃক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় হংসেশ্বরী দেবীর যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৮১৪ খৃঃ) তাহা আজিও বর্ত্তমান। ছয় তল ও ১৩ চূড়াবিশিষ্ট ৭০ ফুট উচ্চ এই মন্দির অপূর্ব্ব স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন। স্থানীয় জমীদারদের বাটীও গড়বেষ্টিত। পাশের বাসুদেব মন্দির ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। প্রাচীন বাংলার শিল্প-নিদর্শন হিসাবে ইহা দ্রষ্টব্য।

বংশবাটীর উত্তরে ত্রিবেণী গ্রাম। ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ ও মুক্ত-বেণী নামে পরিচিত। প্রবাদ এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিতা হইয়া ত্রিবেণীতে পুনরায় পৃথক্ হইয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যে ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে। মুসলমান আমলে তথায় জাফর খাঁ মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। নবদ্বীপের ন্যায় ত্রিবেণীও এক সময় সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। তাহার পর গঙ্গাতীরে বলাগড় গ্রাম প্রসিদ্ধ। তথায় পঞ্চমণ্ডী সমন্বিত এক চণ্ডীমন্দির আছে। নিত্যানন্দ-দুহিতা গঙ্গা গোস্বামিনীর বংশধরগণ বলাগড়ে বাস করেন। তাহার পর গুপ্তি-পাড়া। এখানে বহু প্রাচীন দেবালয় বর্ত্তমান। বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও চৈতন্যদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শেওড়াফুলীর রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এখানেও এক সময়ে বহু টোল ছিল। এ যুগের খ্যাতনামা বক্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গুপ্তিপাড়ার লোক ছিলেন। গুপ্তিপাড়ার নিকট গঙ্গাতীরে সুখুরিয়া গ্রামে মিত্রদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়গুলিও দ্রষ্টব্য।

তাহার পর গঙ্গাতীরে প্রসিদ্ধ গ্রাম কালনা—বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা সহর। মুসলমান আমলেও এ স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। কালনায় বর্দ্ধমান মহারাজার গঙ্গাবাসের জন্য একটি প্রাসাদ ও ১০৯টি শিবমন্দির আছে। মন্দিরগুলি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কালনার নিকটস্থ অম্বিকা গ্রামে গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। তিনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ও মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থায় সর্ব্বপ্রথম গৌর ও নিতাই-এর কাঠের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। তাহার পর বাঘনা পাড়ায় প্রাচীন কানাইবলাই-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর পোষ্যপুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে ঐ বিগ্রহ আনয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে সমুদ্রগড় গ্রামে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের রাজত্ব ছিল। চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতিতে সমুদ্রগড়ের নাম উল্লেখ আছে।

তাহার পর বাঙ্গালার প্রধান তীর্থক্ষেত্র নবদ্বীপধাম। আজিও প্রতিদিন শত শত নরনারী এই তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে গমন

া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া টকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী নারায়ণী-পুত্র নন দাস চৈতন্য-ভাগবত লিখিয়া অমর হইয়া আছেন—তিনিও ীপের লোক।

আমরা প্রথমেই নৌকাযোগে ভ্রমণের কথা বলিয়াছি—যাঁহারা কলিকাতা হইতে এই পথে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহারা উপরোক্ত সকল স্থানই দেখিবার সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন।

রেশনিং
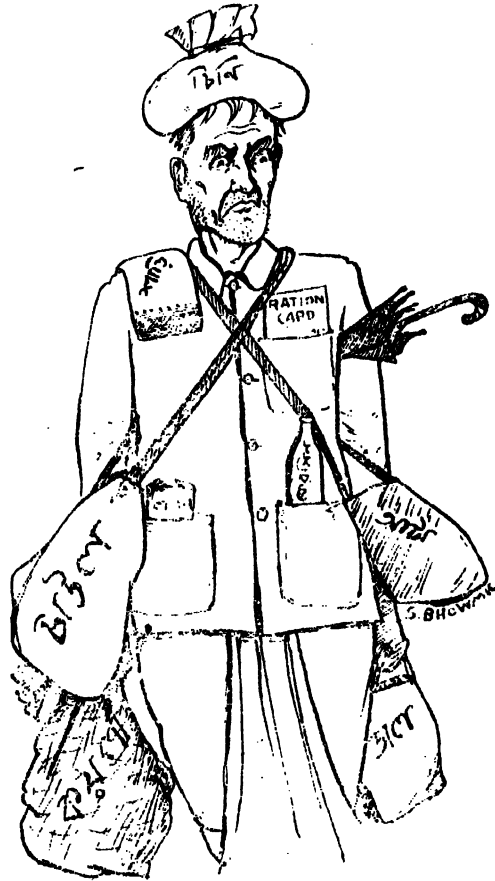
ভাইজান

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

টানাটানি ক্রমশঃ বেড়েই চলে, ছ্যাকড়া গাড়ীর ছাদ থেকে সোনা ট্রাঙ্কটা ধরে বাধা দেয়—খবরদার বাবু, খারাপি হয়ে যাবে, দ' সিকে ভাড়া না দিলে ছাড়ব না। চারিদিকে জমে যায়, উৎসুক জনতার দল, ভদ্রলোক আমতা আমতা করেন "সে কি রে, দেড়টাকা চুক্তি হোল?"

"সো বাত ছোড়িয়ে!" ভদ্রলোকও ছাড়বার পাত্র নন, টানাটানি করতেই গাড়ীর ছাদ থেকে সোনা লাফ দিয়ে নীচে পড়ে রুখে আসে ভদ্রলোকের দিকে, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বোধহয় আর্ত্তচীৎকার করে ওঠেন; সহসা পিছন থেকে কাঁধে বিশাল এক রদ্দা খেয়ে সোনা হকচকিয়ে যায়। বিল্লু সর্দ্দার, পাথর কুঁদে তৈরী করার মত চেহারা, নিটোল স্বাস্থ্য! মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা! তার সামনে বাচ্চা কুকুরের মত সোনা কাঁউ কাঁউ করতে থাকে। বার কতক মাথার চুলগুলো ধরে নাড়া দিয়ে বলে বিল্লু, উল্লুককা বাচ্চা, ফিন জুলুম?

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলায়েৎ সেখ ভারি ট্রাঙ্কটা অবলীলা-ক্রমে গাড়ীর ছাদ থেকে নামিয়ে পাশের কুলির মাথা চাপিয়ে হুকুম করে—"ডিঙ্গি পর চালাও! আপ আউর চার আনা জ্যাদা দিজিয়ে। লে রে—"

মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্যাটা সমাধান করে বার হয়ে যায়, গজরাতে থাকে সোনা আপন মনে।

গঙ্গার ওপারের সহরের স্পর্শও লাগেনি এখানে! আখিরিগঞ্জের ভাঙ্গা বন্দর চিরদিন এমনি করেই পাড়ি জমিয়েছে * * * রাস্তাটা রেল-ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে। দুধারে ছিটে বেড়ার ঘরগুলো নুয়ে পড়েছে বয়সের ভারে। নির্জ্জন বনানী স্তব্ধ হয়ে একে ভালবাসে, এরই মাঝে আস্তানা পেতেছে বিল্লু, আজ পাঁচবছর! বড় ভাল লাগে জায়গাটা, কেমন যেন মায়ায় ওকে বেঁধেছে।

গঙ্গার বাণ এসেছে এবার দুকূল ছাপিয়ে, উঁচু পাড়ের নীচে ছোটখাট ঘূর্ণির সৃষ্টি করে ঘোলাটে জলধারা বয়ে যায়। সহরের বড় রাস্তা—হাসপাতালের কাছেও নাকি এবার জল পৌঁচেছে, দূরদূরান্ত থেকে পাট বোঝাই গাড়ীগুলো চলেছে ষ্টেশনের দিকে, মাল-গুদামী নৌকার ছোট পাটাতন থেকে এঁকেবেঁকে নুড়ি পথটা সুউচ্চ খাড়ির উপরে উঠে এসেছে, ক্রমাগত চাকার ঘর্ষণে কাদা হাঁটুভোর, শীর্ণ কঙ্কালসার গরুগুলো চলতেই পারে না, গাড়োয়ানটা চীৎকার করে পাচন বসিয়ে চলেছে বিরামহীন গতিতে। মেরুদণ্ড বেঁকে গোলাকার হয়ে যাবার উপক্রম গরুগুলোর!

"এই উল্লু—রোক্‌কে—"

গাড়োয়ানটা থেমে যায় তার বজ্রনির্ঘোষে, বিল্লুকে এ-অঞ্চলের সবাই চেনে, এগিয়ে এসে নিজেই যোয়াল ধরে টানতে থাকে, সবল পেশীগুলো ফুলে ওঠে, পিঠের কাছে জমা হয় চাপচাপ পেশীগুলো। প্রবল আকর্ষণে অবলীলাক্রমে গাড়ীগুলো উঁচু পাড়ি পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বিল্লু গামছাখানা দিয়ে কপালের ঘাম মোছে, ওদিকে নিজের ঘোড়াগুলো তাকে দেখেই চীৎকার শুরু করে। ট্রেণের সময় হয়েছে, এইবার যেতে হবে তাদের।

বিলায়েৎ এমন ছিল না, আজকের বিল্লু পাঁচ সাত বছর আগে ছিল অন্য মানুষ। ভাইগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা বস্তিতে ছোট খোলার ঘরে আস্তানা জমিয়েছিল, অস্পষ্ট অন্ধকারে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানা কতবার যে রঞ্জিত হয়েছিল—জানে না! সেবার মাঝেরহাট খালে কিষণচাঁদের নৌকায় রাহাজানী হয়। রেল লাইনের নীচু ব্রিজটা দিয়ে নৌকার ছাদ থেকে উঠেই ছুটতে থাকে বিল্লু, স্পষ্ট মনে পড়ে!

কিষণচাঁদের বিশাল স্ফীতোদরের মাংসপিণ্ড শিরা উপশিরা তন্ত্রীগুলো অবলীলাক্রমে ভেদ করে চলে যায় উদরে, পাংশু কালচে রং-এর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বৃহৎ অন্ত্রের নীলাভ পাক দেওয়া সবল আলিঙ্গন ভেদ করে সব বন্ধন ছিন্ন বিছিন্ন করে দেয়। পাকস্থলীর রক্তনালী বেয়ে গড়িয়ে পড়ে তাজা টকটকে লাল! জামা কাপড় ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে যায়, ছোরাটা তখনও টকটক করছে। অস্পষ্ট আলোতে ঝলসে ওঠে তার পৈশাচিক হাসি। এটাকে যোগ করে ক'টা মানুষ হয়েছিল জানে না বিল্লু! বোধহয় গোটা নয়েক হবে! ঘেন্না ধরে গেছে মানুষ মেরে, ঠিক পাঁঠা জবাই করার মতই! একটু চীৎকার করেই খতম!

গুড়ি মেরে বস্তির নীচু টিনের চালগুলো পার হয়ে ঘরে ঢুকতেই প্রদীপের ম্লান আলোতে চীৎকার করে ওঠে আমিনা, ফিন—হা আল্লা!

এককোণে সরে যায় আমিনা, ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে আসে, বিল্লু রেগে গিয়ে তার মুখখানা চেপে ধরে গোলমাল বন্ধ করাবার জন্যই! ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে আমিনা চাইবার চেষ্টা করে তার রক্তরঞ্জিত দেহের দিকে! ঘৃণায় বুক ভরে আসে।

বিল্লুর কথা শুনে রহমৎ হেসেই খুন। গলার মলিন কারে বাঁধা তক্তিটা ওঠানামা করে হাসির তালে তালে, "তাই বল বিল্লু! আমিনার সঙ্গে মহাব্বৎ হয়েছে! ভারি জব্বর লেড়কী।" চুপ করে বসে থাকে বিল্লু! আর চুরি করবে না সে, কারও পকেটে ভুলেও কোনদিন হাত দেবে না, ও হারাম! আমিনা জেনে ফেলেছে তার জীবিকা, আমিনা বুঝেছে সে গুণ্ডা! গাঁটকাটা তার ব্যবসা, দরকার হলে আরও বড় কিছু! তাকে ভাল হতেই হবে! এসব আর করবে না, ঘেন্না ধরে গেছে? হাতের শিরা-উপশিরাগুলো মাঝে মাঝে নিশপিশ করে, সারা বুকে নেচে ওঠে রক্তের জোয়ার! ওদিক থেকে কে একজন ফিরছে, নিশ্চয়ই কোন জাহাজে মাল খালাস করতে যাচ্ছে। বেশ শাঁসাল মাল, বোধ হয় পাঁচ-দশ চাইকি পঞ্চাশ হাজারও থাকতে পারে ওর কাছে! অজানা আকর্ষণে পা' দুটো এগিয়ে যায় তার দিকে।

পরক্ষণেই থেমে যায়, যাবে না সে! কিছুতেই না! আমিনার কাছে কসম খেয়েছে! ট্যাঁকে হাত দিয়ে অনুভব করে হিম-শীতল ছোরাটার স্পর্শ সেখানে নাই, রেখেই এসেছে সেটাকে! বাঁচা গেল, সারা বুকটা ভরে ওঠে হালকা আনন্দের তুফানে। আজ এমন শিকার হাতে পেয়েও ছেড়ে দিল সে।

খুসীতে মনটা ভরে ওঠে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একখানা মুখ আমিনার। তাড়াতাড়ি পা চালায়। বস্তির নুড়ি পথটা দিয়ে চলেছে অন্ধকারে, কানে আসে আর একজনের কণ্ঠস্বর, আমিনার হাসির শব্দ সারা বস্তিটাকে ভরিয়ে তোলে। থমকে দাঁড়ায় বিল্লু, শিরায় শিরায় তার প্রবাহিত হয় চঞ্চল রক্ত-প্রবাহ, পেশীগুলো ফুলে ওঠে।

রহমৎ—হ্যাঁ, রহমতের বাহুপাশে আমিনা মুখ লুকিয়ে হাসছে! বলে চলেছে রহমৎ—"বিল্লু! উ একঠো উজবুক আছে।"

হাসে আমিনা—"নেহি! তুমহারা দুষমণ!"

আমিনা হাসতে থাকে, মিশি লাগানো কালো দাঁত, হাতে মেহেদী পাতার প্রলেপ রাঙ্গান নখগুলো চিকচিক করে...মনে হয় বিল্লুর এরই জন্য শিকার ছেড়ে দিয়ে এল! কে সে? ক্ষিপ্ত বাঘের মত লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ে পড়তে পারলে হত ঠিক! ফুলতে থাকে আপন মনে, কোমরে হাত দিয়ে অনুভব করে—চিরসাথী ছোরাখানাকে আজকে ফেলে এসেছে!

কি হয়ে গেল বুঝতে পারে না রহমৎ, প্রচণ্ড ঘুসির চোটে ওপাশে ছিটকে পড়ে, মাথাটা কেমন ঘুরে যায়, চোয়ালের কোণে অনুভব করে জমাট রক্তের দাগ! ওপাশে আমিনার কণ্ঠদেশে বসেছে লোহার সাঁড়াশীর মত কঠিন হাতের নিষ্পেষণ, ধীরে ধীরে চোখগুলো তার বড় হতে থাকে, নীলাভ জিবটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে যায়, বিল্লুর মাথায় চলেছে রক্তের উদ্দাম নৃত্য! হাতের পেশীগুলো ছিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম! আমিনার নীলাভ দেহটা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। রহমৎ উঠবার আগেই বার হয়ে যায় বিল্লু।

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফেরে বিল্লু। আজ রহমৎ তাকে ক্ষমা করতে পারবে না, এমনি অন্ধকারে বিল্লু একদিন বার হত কোন ধনিকের খুনের আশায়, আজ রহমৎ হয়ত ঘুরে বেড়ায় তার তাজা লোহুর তাপে হাত রাঙ্গাতে।...

ক'দিনের মধ্যে সারা সহরে সুরু হল সন্ধান। দাগী গুণ্ডা সবাইকে বার করে দেওয়া হ'ল। বিল্লু বাদ গেল না। পুলিশের লরী এসে বার করে দিয়ে গেল সহর-সীমান্তে, এর ভিতরে তার প্রবেশ নিষেধ।

যাবে কোথা। এক একবার ভাবে বিলায়েৎ—সাহারাণপুর মুলুকেই ফিরে যাবে, মিঠাভালাও গাঁয়ে, ওপাশে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডটা বুভুক্ষু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে দূরদূরান্তরের দিকে। উটের দল পিঠে মাল বোঝাই করে দম টানতে টানতে চলে দূর-দিগন্তের পানে। ঘণ্টার শব্দ নির্জ্জন প্রান্তর ভরিয়ে তোলে, কিন্তু কি আছে ওর দেশে, কিসের মায়ায় যাবে ?

নির্জ্জন ষ্টেশনের চারিদিকে শ্যামল বনানীর শোভা। কি যেন ভাবতে ভাবতে ট্রেণ থেকে নেমে পড়ে বিল্লু। কি যে মায়ায় গঙ্গার তীরে বনসীমায় এই গাছটা ওকে বেঁধে ফেলেছে শতেক সুরের বন্ধনে, গঙ্গার খাড়ির নীচে জলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখে বিল্লু দুনিয়া কত বড়। মানুষের রাজত্ব থেকে মানুষ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে কুকুর-বেড়ালের মত—কই দুনিয়ার দিনকার ত তাকে ইন্‌কার (অস্বীকার) করে নি। দূর আকাশে সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার নেমে আসে, নদীর কালো জলে ছায়া ফেলে উড়ে যায় পাখীর দল, কুলায়গামী বিহগের কলতান সারা বনভূমি ভরিয়ে তোলে, বনানীর বুকে নেমে আসে পৃথিবীর শান্ত স্তিমিত সন্ধ্যার ভালোবাসা। কানে আসে আজানের ধ্বনি—সারা বনভূমি কেঁপে ওঠে সুরে সুরে—"লা ইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদ রসুললাল্লা।"

সারা শরীরে বিল্লুর শিহরণ খেলে যায়। এমন মহান্ দেশ সে জীবনে দেখেনি, আপনা থেকেই মাথা নুয়ে আসে—দেবতা তুমি আছ। দুঃখের আঁধারেই জ্বলে তোমার রোশনী, মন্ত্রমুগ্ধ গোখরোর মত শান্ত হয়ে আসে বিল্লু! হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

হঠাৎ কার ডাকে ফিরে চাইল। ওপাশের ভাঙ্গা পাথর-খসা ঘাট থেকে এগিয়ে আসে সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ! সারা মুখে সাদা দাড়ির শোভা, লোল চর্ম্মের ফাঁকে নীলাভ আঁখিতারায় কোন্ অপূর্ব্ব শান্ত ভাব, ভাঙ্গা হিন্দীতে প্রশ্ন করে "তুম কেয়া রাহী হ্যায় ?"

ঘাড় নাড়ে বিলায়েৎ।

বাগান-ঘেরা ঘরগুলো, প্রাচীরের বালাই নাই, মাঝে মাঝে ইটগুলো খসে গেছে, অনেক দিনের পুরানো বাড়ি, বাইরে প্রদীপটা নিভু নিভু হয়ে আসে, ওটা নাকি গোরস্থান, বিল্লু কেমন যেন হয়ে গেছে! তার মনের উগ্রতা কোন্ দিকে চলে যায়, প্রদীপের স্তিমিত আলোতে চেয়ে থাকে বুড়োর দিকে, স্তিমিতপ্রায় বৃদ্ধ জীর্ণ প্রদীপের মতই স্থির গম্ভীর ভাবে হাতের তসবীটা ঘুরিয়ে চলেছে! এমন আবহাওয়ায় সে আসেনি জীবনে, ছোট মেয়েটাকে কেমন যেন লাগে, সানকিটা সলজ্জ্ ভাবে নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শরীদ!

"পানি দোব ?"

দিন কেটে যায় এমনি করে; দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আজকের কথা বলছি।

ডলাই-মালাই শেষ করে বিল্লু ঘোড়া দুটাকে গাড়ীতে জুড়ে বার হয়ে গেল, ফেড়টার ট্রেনের সময় হয়েছে! একা ঘোড়ার দল চাবুকের পর চাবুক খেয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে, এই সময়টা আখিরিগঞ্জের রাস্তাটায় যেন প্রাণ আসে।

শরীদ পথ চেয়ে বসে থাকে, রাঙ্ চিড়িয় বেড়ায় ঘেরা চালের উপর কুমড়ো-লতার আলিঙ্গন, বিশালাকার চালকুমড়োগুলোর উপর জমেছে সাদা আস্তরণ, ভাদরের পড়ন্ত রোদ চিকচিক করে সারা বনানী-শীর্ষে। বাঁশবনের আর্ত্তনাদে নীরবতা ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যায়।

ষ্টেশনে গিয়ে সুরু হয়েছে এক হাঙ্গামা। কালু, যদু, সোনা, আর সকলেই এক জোট পাকিয়েছে, আজ ন'সিকের কমে কেউ ভাড়া যাবে না, সে দিনের অপমানটা ভোলে নি সোনা! দলে দলে প্যাসেঞ্জার মাল-পত্র ছেলে-মেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! ন'সিকে আড়াই টাকার কমে কেউ ভাড়া যাবে না একমাইল রাস্তা! বেলা পড়ে আসে, ভাদরের পড়ন্ত রোদ চিট পিট করে, লাইনের দুদিকে শালুক পেনেড়ির দামের অন্তরালে ডুব দেয় জল-কাকের দল! বিল্লুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সকলেই চমকে যায়।

"না যাবি কালই তোদের বিলকুল গাড়ী ক্যানসেল হয়ে যাবে! এই ভেড়ীকা বাচ্চা, উঠাও মাল গাড়ীপর। এইসা বইঠা কাহসা!"

নিজেই সকলের গাড়ীতে মাল সওয়ারী ওঠায়, প্যাসেঞ্জাররা কৃতজ্ঞতা ভরা নয়নে চেয়ে থাকে তার দিকে! বিল্লুর কথাতেই সকলেই রাজী হয়! ভাড়া সাত সিকে দেবে!

তবুও সোনা গজরাতে থাকে—"শালা লাট আয়া। যো বোলেগা ওই করনে পড়ে গা!"

বিল্লুকে আসতে দেখে চুপ করে যায় সোনা! সকলকেই ভাল ছেলের মত গাড়ী চালাতে হয়, তার হুকুম না মানবার সাহস এদের কারুর নাই!

ভাত শুকিয়ে জল হয়ে গেছে, শরীদ সানকিটা বিল্লুর সামনে ধরে দেয়। "সারাদিন বাইরে বাইরে থাক্‌বা—একবার খেয়েও যাতি পার না ?"

হাসে বিল্লু "তুই সমঝাবি না শরীদ, তোর সাদি দিতে হবে তা পয়সা না কামালে চলবে কেনো ?"

'যাও' "তোমার কেবল এই এক কথা!"

কর্ম্মক্লান্ত দিনের মধ্যে এইটুকুই সান্ত্বনা বিল্লুর। বুড়ো মারা যাবার পর থেকে। ঘরছাড়া বিল্লুকে কোন এক অদৃশ্য বন্ধনসূত্রে বেঁধে যায়। জ্বলে ওঠে শরীদ—

"ওদের সঙ্গে তোমার নাকি কেজিয়া হয়েছিল, আমার বড্ড ভয় করে। সোনা বা গুণ্ডা!" হেসে ফেলে বিল্লু, আজও তার পুরুষ্ট হাতখানায় ফুটে ওঠে একে একে কত রক্তের দাগ, সবল পেশীগুলো দৃঢ় হয়ে আসে। বুকের মাঝে জেগে ওঠে কোন্ এক রুদ্র দেবতার তাণ্ডব-নর্ত্তন। অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে শরীদ!!

হঠাৎ তার কর্কশ স্বরে সারা বনানীর নীরবতা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, লালুর মা বুড়ী পাকা শণনুড়ীর মত মাথাটা নিয়ে হাত পা নেড়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে বিল্লুকে!

"বেইমান"

"বেইমান!" লাফ দিয়ে ওঠে যায় বিল্লু! শাসায় তাকে "ঠিক কিয়া লেড়কা কাম করে গা নেই, পয়সা কাহে দেগা!"

বুড়ীর সব কথা শুনে চুপ করে যায় বিল্লু। আজ তার ছেলেটাকে দূর করে দিয়েছে শরীদ, রোজকারের আর কেউ নাই, বড় ছেলে এখন জেলে পচছে, সম্বল ওই বাচ্চাটা, আজ সেও একপয়সা পায় নি, বাড়ীর সকলেরই উপোস। তার পরে ওর চোখ বয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—বুড়ীর হাতে দুটো টাকাই গুঁজে দিয়ে বলে, "চুপ যাও মাঈ।"

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বুড়ী তার দিকে, স্তিমিত চোখের চাহনিতে ফুটে ওঠে সর্ব্বহারা সন্তানের না পাওয়া মায়া মমতা, বিল্লু যার বাপ জীবনেও পায় নি। পেলে হয়ত পিছনের এ-কলঙ্কময় জীবন দুর্ব্বিষহ করে তুলত না তাকে, মানুষ হতে পারত।

আজকের বিল্লুর অন্যায় অত্যাচারের কথা ওপারের সহরে সমস্ত গাড়ীর আড্ডায় পৌঁছে যায়। নতুনবাজার বটতলায় আজি মহল্লা। সব পাড়ার কোচম্যানরা এর প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, সোনাই অক্লান্তভাবে ঘুরে

বেড়ার, কদিন কাজকর্ম্ম ছেড়েছুড়ে। সোনার একটা আক্রোশ ছিল আগেকার, শরীদের বাবা নাকি তাকেই ভালবাসত খুব। সোনাও আশা করেছিল সবই পাবে তার মৃত্যুর পর। কিন্তু কোথা থেকে বিল্লুর আগমনে ফসকে যাবার উপক্রম সব সম্পত্তি, মায় শরীদও ভাগ করে কথা কয় না তার সঙ্গে।

কোচম্যানরা গাড়ী চালায়নি কালথেকে। সারা সহরে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। ভাড়া তিনগুণ না করলে তারা গাড়ী চালাবে না।

বিল্লুর বাড়ীতে লালুর মা বুড়ী এসে কান্না সুরু করে, ঘরে খাবার লোক অনেক, চলে কি করে, ছেলেটাও আর বিল্লুর এখানে কায করে না। ঘরে মুখে দেবার এককণা চাল পর্য্যন্ত নাই, শরীদ হাঁড়ি থেকে কতকগুলো চাল ঢেলে দেয় বুড়ীর ছিন্ন আঁচলে। শীর্ণ কপোল বয়ে গড়িয়ে পড়ে তার জমাট অশ্রু। বিল্লু যেন স্বপ্ন দেখে, ওদের চোখমুখে হতাশার কালো ছায়া, দৈন্যের ছাপ। বাঁচবে তবু, বাঁচতে হবে ওদের। ধীরে ধীরে বার হয়ে যায় বিল্লু।

সমস্ত কোচম্যানরা মিলে মিটিং করছে। সারা সহরে গোলমাল—শেষ অবধি কর্ত্তৃপক্ষের নজরেও যায় ব্যাপারটা। গঙ্গার ধারে বটতলায় তারা জমায়েৎ হয়ে হৈ চৈ করে চলছে। সকলেই সমস্বরে কি যেন বলবার চেষ্টা করে, এদের মধ্যে যে আগে গাড়ী চালাবে তাকে শাস্তি দিতেই হবে যেমন করে হোক। সোনা ঘামে ভিজে গেছে—তবুও চীৎকার করে চলেছে। হঠাৎ কাকে দেখে তারা যেন থেমে যায়, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে বিল্লু। পিছন থেকে সোনার কাঁধটায় একটা চাপ দিয়ে বসিয়ে দেয় তাকে, পিছন ফিরেই দেখে সোনা—বাঘের মত তীব্র নয়নে চেয়ে রয়েছে বিল্লু। বিশাল দেহে ছোট মেরজাইটা চেপে বসেছে। গর্জ্জন করে বিল্লু, "বাপকা গাঁও মিলা। সোয়ারী কেন নেই লেগা শূয়রকা বাচ্চা, উঠাও হাত।"

সকলেই চেনে বিলায়েৎকে। তার বজ্রকঠোর স্বরে সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। কেউ প্রতিবাদ করবার সাহস করে না। গজরাতে থাকে বিল্লু, উল্লুকা পাঁড়ে। সামনেই বসেছিল লালুর ছোট ভাইটা, ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে কসে দেয় ঘা'কতক তাকে।

"ভাগ হিঁয়াসে। রোতা হায় তেরি মা, হিয়া অকর মৌজ করতা হায়।" রেগে গেলে বিল্লুর মুখ দিয়ে বাংলা বার হয় না।

ক্ষুণ্ণ মনেই আবার কাজ সুরু করতে হয় তাদের। ভাড়া অবশ্য বাড়িয়েছে বিল্লুই। ঠিক তাদের মনঃপূত নয়। পুলিশের লোকেরা বেশ যুৎ পায় না, গোলমাল এক দাবড়ানিতেই মিটে যাবে, ভাবেনি তারা।

রমজানের মাস শেষ হয়ে এসেছে, খুসীর চাঁদ। ইদল-ফেতরের মাস, মেঘশূন্য আকাশতলে জাগে শরতের আগমনী, দূর-দিগন্তপ্রসারী বিলের সুনীল জলরাশি, মাঝে মাঝে দেখা যায় এক ফালি সরু চাঁদ। গঙ্গার জলের রং আবার বদলাতে সুরু হয়েছে, ঝাঁকড়া বটগাছটা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, শেষ হয়ে গেল রমজানের মাস। এল নিসাদের দিন। বিল্লুর হাতের শাড়ীখানা শরীদকে মানায় চমৎকার।

সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরে ওঠে শরীদের। "ভাইজান যেন কি! এত পরব কি করে? কত শাড়ী আমার?"

"কি আর দিই তোকে বল। এই ত রোজকার?"

চুপ করে যায় বিল্লু। এই হাতেই একদিন সে কামিয়েছে কড়কড়ে নোটের তাড়া। আজমাত্র দু'টাকা আয়, হোক সামান্য, তবুও শান্তি আছে, একটা অপূর্ব্ব অনুভূতিতে মন ভরিয়ে তোলে।

গাড়ীর পাশ হবার দিন চলে গেছে কাল। গতবারের গোলমালের কথা কর্ত্তৃপক্ষের কান এড়ায় নি, বেশ খানিকটা সতর্ক হয়েই গাড়ী পাশ করেছে তারা, ভবিষ্যতে যাতে কোন গোলমাল না হয়, সেই ব্যবস্থায়। কর্ত্তৃপক্ষের অযাচিত সম্মানে বিল্লু অবাক্ হয়ে যায়, ওপাশে গজরায় কতকগুলো কোচম্যান। সোনা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে। কথাটা শোনে শরীদও। বিল্লুই নাকি এসব করিয়েছে। সোনার এতবড় সর্ব্বনাশ না করলেও পারত বিল্লু। শরীদের মনটা কেন জানে না বিষিয়ে ওঠে খানিকটা। সেদিন সন্ধ্যায় কোন কথাই বলে না শরীদ বিল্লুর সঙ্গে।

রাত্রি হয়ে যায়, বাইরের বনানী-শীর্ষে নেমে আসে স্তব্ধ অন্ধকার, তারকার ম্লান আলোয় ঝিকমিক করে স্থির জলধারা, স্তব্ধ কলতান রাত্রির মর্ম্মরধ্বনি ভরিয়ে তোলে, রাতের আঁধার যেন জমাট বাঁধে ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতানে।

বিল্লুর ঘুম ভেঙ্গে যায়, বুকের উপর একটা ভারিমত কি। দুটো কঠিন সবল হাত তার কণ্ঠনালী চেপে বসেছে, নিদ্রার আবেশ কাটতেই বুঝতে পারে বিল্লু। প্রাণপণে নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা করে, মুচড়ে যায় কপালের দড়ির মত মোটা শিরটা।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রচণ্ড বেগে এক লাথি মারে বিল্লু, সহসা আক্রমণে দূরে ছিটকে পড়ে লোকটা। বিদ্যুৎ বেগে উঠে গিয়ে তাকে টিপে ধরে বিল্লু। ধস্তাধস্তির শব্দে আলো নিয়ে শরীদ ঘর ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। আর্ত্তনাদ করে ওঠে শরীদ, সোনার দেহটাকে প্রচণ্ড... টিপে ধরেছে বিল্লু।

চীৎকার করে শরীদ। "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে। গুণ্ডামী তোমার গেল না, খুনে কোথাকার।" কথাগুলো কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধের মত ছেড়ে দেয় বিল্লু। শরীদের চোখের সজল চাহনি সে আগে কখনও দেখেনি। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে থাকে। আজ শরীদের মনে দেখা দেয় সম্পূর্ণ সহানুভূতি। সোনার সব রোজগারের পথ বন্ধ করে অনাহারে তাকে মারতে চায় বিল্লু। শরীদের সঞ্চিত বিক্ষোভ ফুটে বের হয়—'আদমী তুমি নও। আস্ত গুণ্ডা।'

গুণ্ডা নামটা আজও ভোলেনি বিল্লু। সারা শরীরে খেলে যায় বিদ্যুৎপ্রবাহ, শরীদ না হলে আজ বোধ হয় বিল্লু আর এক কাণ্ড করে বসত। বলে চলেছে শরীদ—

"এত শত তোমার করবার কি দরকার ছিল, তুমি কে?"

কথা কয়না বিল্লু। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে রাত্রির শেষ তারা দেখা দেয় বনানী-শীর্ষে অস্পষ্ট অন্ধকার ভেদ করে। সোনার মাথা বাতাস করে চলেছে শরীদ।

বেলা পড়ে আসে, রাঙচিত্তির বেড়ার গায়ে হলুদরাঙা হয়ে আসে রো[দ]। নিস্তব্ধ বনানী চুপ করে স্বপ্ন দেখে। শরীদ চেয়ে থাকে বিল্লুর আশাপথ। সোনার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। ওদিকে ভিটের দিব্যি নাক ডাকা শব্দ আসে তার কানে। আকাশ-পাতাল কি ভেবে চলেছে শরীদ।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেড়ার গায়ে ঝিঙে ফুল চোখ মেলে চাইল আবা[র] পৃথিবীর দিকে, সারাদিন ঘুমের পর সন্ধ্যামণির লাল ফুলগুলো রাঙ্গিয়ে তো[লে] বাগানের কোণ, শিরীষ গাছের পাতা নিদেল মায়ার বুকে আসে।

"খাসনি শরীদ?"

হেসে ফেলে শরীদ—সোনার প্রশ্নে—'না, শরীরটা যুৎ লাগছে আজ।"

সোনা আস্তাবলে ঘোড়াগুলোকে দানা দিতে থাকে। আজ সেই বা[ড়ির] কর্ত্তা। অবশ্য বুড়ো সোনাকে ভালবাসত সত্যিই, মনে মনে আঁচ ব[রেছিল] বুড়ো—শরীদের সাদিটা আর বাইরে দিতে যাবে কেন, ঘরের সম্পত্তি ঘ[রেই] থাকবে। বিল্লুকে আশ্রয় দেবার পর থেকে সোনার আশা কমে যায়, [আজ] সোনা পূর্ব্ব অধিকারে ফিরে এসেছে মাত্র।

বিল্লুর চোখে ঘুম আসে না। গঙ্গার বুকে অগণিত ঢেউএর মত মনে আজ চিন্তার ওঠানামা, শরীদের কাছে এ ব্যবহার সে প্রত্যাশা ক[রে]

হোক গে—সে আর সম্বন্ধ রাখবে না, দুনিয়ার কেউ তার আপন নয়, চাইবে না সে কাউকেও। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে, শুকনো পাতার মর্মরে শোনায় কার আগমনী। অবাক্ হয়ে যায় বিল্লু তাকে দেখে, "...শরীদ।"

অশ্রুপূর্ণ চোখে বলে যায় শরীদ, "ভাইজান—কথা শোন, দুটি পায়ে পড়ি তোমার, বাড়ী চল।"

হাসে বিল্লু, "ছেলেমানুষী করিস না শরীদ। বাড়ী যা, আসিস না এখানে। মন্দ বলবে লোকে, যা।"

অবজ্ঞায়—ব্যর্থতায় শরীদের দু'চোখ জলে ভরে আসে। কম্পিত পদে বাহিরে আসে শরীদ। বিল্লু যেন স্বপ্ন দেখে। রাত্রি বেড়ে চলে—নীলাম্বরীর আকাশ কাঁপে, আর কাঁপে গহিনগাঙের জল।

বিল্লু কেমন যেন হয়ে গেছে। কোন কাযে মন নেই তার। কাযই বা আছে কি। সকলেই দেখলেই হাসাহাসি করে, বলে নাকি শরীদের সব সম্পত্তি গ্রাস করছিল, শরীদই তাড়িয়েছে তাকে। অবশ্য বিল্লু বলে না কিছু। আজকাল চাকরী নিয়েছে বন্দরের পাহারার, দিনরাত উঁচু তক্তপোষটায় বসে কি যেন ভাবে বিল্লু। এক একবার সারা শরীরে সুপ্ত দস্যি চাড়া দিয়ে ওঠে। মনে জাগে বিদ্রোহের সুর, হারান বিলায়েৎ আবার হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু পারে না। কোন অদৃশ্য মায়াবলে সামলে নেয় নিজেকে। শরীদের বিয়েও হয়ে গেছে সোনার সঙ্গে। সোনাকে দেখলে আর চেনা যায় না। ফুলকাটা আদ্দির পাঞ্জাবী আর মাদ্রাজী লুঙ্গী পরে পান চিবিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে আজকাল সোনামিঞা।

ক'টা বছর কেটে গেছে, তারপর দেখলাম বিল্লুকে। চোখেমুখে এসেছে বয়সের ছাপ। মাথার আশেপাশের চুলগুলো পাক ধরেছে। "সালাম বাবু।"

ফিরে চাইলাম তার দিকে। সারা মুখেচোখে তার এসেছে একটা শান্ত শ্রী। ওপাশে মুদীর দোকানের সামনে সোনামিঞা—চোখ দুটো ঘোর লাল করে বেঘোর অবস্থায় কাকে যেন গালাগাল দিয়ে চলেছে অকথ্য ভাষায়। দেখলে আর চেনা যায় না, গলার হাড় কণ্ঠা বার হয়ে গেছে। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গীটা ধুলো কাদায় মাখা। অদূরে তাড়ির শূন্য ভাঁড়টাকে কেন্দ্র করে মাছি ভন ভন করছে। সারা দেহটায় দারিদ্র্যের ছায়া। দাঁড়িয়ে দেখি তার পরিবর্তন, বিষয়-আশয় নাকি সব ঘুচিয়েছে।

সারা বাড়ীখানায় এসেছে নিঃস্ব দীনরূপ। ইটগুলো সব খসে গেছে। শরীরকে আর চেনা যায় না। অভাবের তাড়নায় কোথায় গেছে তার শ্রী, কালো দাগ ছেয়ে ফেলেছে তার সুন্দর মুখশ্রীকে। ওপাশে দারিদ্র্যের অগ্রদূত শীর্ণ কঙ্কালসার ছেলেটা চীৎকার করে চলেছে।

আজ তার অন্ন দুধ জোটে না। কোথা গেল গাড়ী-ঘোড়া-সম্পত্তি, সব ঘুচিয়েছে সোনাই। আজ শরীদ অসহায়ের মত পরের সামান্য সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে দিন কাটায়। তাও সঙ্গোপনে, সোনা জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না। ছেলেটাকে থামাবার চেষ্টা করেও পারে না শরীদ। ক্ষিদের তাড়নায় চীৎকার করে চলেছে বিরামহীন ভাবে।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে বার হয়ে আসে শরীদ। বেড়াটা ঠেলে সন্তর্পণে প্রবেশ করে বিলায়েৎ। হাতের দুধের ঘটিটা নামিয়ে রেখে শাড়ি আর কয়েকটা টাকা বার করে দেয়।

অবাক্ হয়ে যায় শরীদ, "এ সব কি হবে ভাইজান।"

"পরবি কি? নে তুলে রাখ। ছেলের ওষুধ ওবেলায় এনে দেব পারে থাকে।" বার হয়ে আসে বিলায়েৎ। চেয়ে থাকে শরীদ ওর গতিপথের দিকে। এই বিশাল শরীরের অন্তরালে কতখানি যে মায়া-স্নেহ লুকিয়ে আছে জানে না শরীদ। ওর ঋণ জীবনেও শুধতে পারবে না। হঠাৎ পিছনদিক থেকে সোনাকে আসতে দেখেই হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। মুখে তার বিকৃত হাসির ছায়া, "কেন আসে ও—কাপড়, টাকা—মোহব্বৎ—না?"

শরীদের সারা দেহে রুদ্ধ রক্ত-কণিকার অসহায় নর্তন। কঠিন কণ্ঠে বলে, "হাঁ, জানতে না।" পরেরটা ঠিক অনুমান করতে পারে না শরীদ। আর্তনাদ করে ওঠে প্রাণপণে। সোনার লাথির চোটে ছিটকে গিয়ে পড়ে ওদিকে, কোল থেকে দুর্বল শিশুটা সজোর ধাক্কা সামলাতে না পেরে একবার আর্তনাদ করেই নিশ্চুপ হয়ে যায় চিরতরে। শরীদের কান্নার আর্তরোল সারা বনানী ভরে তোলে। থমকে দাঁড়ায় বিল্লু। হাঁ, শরীদের কণ্ঠস্বর ছুটতে থাকে তাদের বাড়ীর দিকে।

মৃত ছেলেটাকে বুকে করে আর্তনাদ করছে শরীদ, বিল্লুকে দেখে অসহায়ের মত চীৎকার করে ওঠে—"ভাইজান।"

ভাইজান—এ নামে মাত্র শরীদ ছাড়া দুনিয়ায় তাকে কেউ ডাকেনি! ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত, সুপ্ত শক্তি যেন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক্সটার্নড গুণ্ডা বিলায়েতের কঠোর মূর্তি! তারই বোন যেন আর্তনাদ করে অভিযোগ জানাচ্ছে—তুমি বাঁচাও আমাকে। অনেকদিন সহ্য করেছে বিল্লু। আজ অতিক্রম করে যায় সহ্যের সীমা।

বাঘের মত লাফ দিয়ে গিয়ে সোনার কণ্ঠনালী টিপে ধরে...চোখ ঠিকরে বার হয়ে আসে সনাতনের! রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর! চীৎকার করে এগিয়ে আসে শরীদ, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে ভাইজান!"

রক্তের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে, বিল্লুর সারা শরীরে লাগে রক্তের জোয়ার। শরীদের কণ্ঠস্বর তার হাতের স্পর্শে বিল্লুর কঠিন মুষ্টি শিথিল হয়ে আসে! আপনা থেকেই কখন হাত আলগা হয়ে আসে জানে না! মুক্ত হয়েই সোনা রুদ্ধ আক্রোশে লাফ দিয়ে নীচে গিয়ে পড়ে। ওপাশে শানকাটা ভোঁতা রামদাখানার দিকে এগিয়ে যায়।

বার হয়ে আসছে বিল্লু। সহসা কিসের আঘাতে টাউরি খেয়ে পড়ে যায়। আর্তনাদ করে ওঠে শরীদ...তাজা রক্তে ঘাসের বুক ভিজে যায়। সোনা মুহূর্তের সুযোগে বিল্লুকে ঘায়েল করে দিয়েছে। রামদায়ের আঘাতে বিল্লুর মাথাটা বিকৃত হয়ে গেছে! বারকতক কি যেন বলবার চেষ্টা করে নিশ্চুপ হয়ে আসে বিলায়েতের প্রাণহীন দেহ। রুদ্ধ ধমনী হতে রক্ত নিষ্কাষণের ঝলকে তখনও কেঁপে কেঁপে ওঠে তার দেহ। শরীদের দুচোখ জলে ভরে আসে।

বিচার শেষ হয়ে আসছে। বিল্লুর সব পরিচয়ই বার হয় পুলিশের সন্ধানে। কলকাতার বিখ্যাত গুণ্ডা বিলায়েৎ সেথই বিল্লু! এমন লোক কখনও ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এ বিশ্বাস মানুষের হয় না। তার উপর চরিত্রদোষও এমন নরপশুর স্বাভাবিক। নিজের স্ত্রী এবং নিজেকে বাঁচাবার জন্যই সোনা মারাত্মকভাবে আঘাত করে বসে! কেসটা কেঁচে যায় আপনা থেকেই।

সোনার ফাঁসি হয়নি, ভালই হয়েছে! ফাঁসি হলেও এমন কিছু শিক্ষা ওর হত না। জেল হয়েছে কয়েকবছর! শরীদ শোনে সব কথা, ওর কথা কেউ শোনেনি। ওরা বলে ও নাকি পাগল হয়ে গেছে। নির্জন গঙ্গার ধারে বনটায় চুপচাপ একলা বসে থাকে। মাঝে মাঝে শোনা যায় কাকে যেন ডাকছে, ও—ভাইজান, ভাইজান—

বনের নীরবতা ভঙ্গ হয়ে যায় বেণুবনের আর্তনাদে, বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে।

আঁধার গেছে এসেছে আলো,
পলায় আজি দৈত্য কালো,
শিশুর রূপে আসিলে এবে তুমি,
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
সবুজ-হাসি হাসিছে ধরা-ভূমি।
আকাশ-তলে যে-সভা ছিল
সে-সভা গেছে টুটে,
উৎসবেরি মেলা এবার
মাটির 'পরে জুটে।
বরষারি গর্ভ হ'তে
জাগিলে অসুর-জয়ী,
গৌরী-সম ধরণীমাতা
হোলো যে হাস্যময়ী।

নাচো জননী ধরার কোলে
তুলি' মোহন হাসির রোলে,
শিউলি-ফুলের সুরভি নবীন দেহে,—
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
প্রাণের রঙে রাঙালে নিখিল স্নেহে।
অপূর্ণতার মাঝে তুমি
পূর্ণ আপন-দানে,
খেলিছ কান্না-হাসি-খেলা—
দিলে যে নাড়া প্রাণে।
নবীন প্রাণের শোভায় আজি
মাটির অঙ্ক ভরা,
মাঠের 'পরে সমারোহ
সবুজে রঙ্-করা।

জীবন-ধারা আকুল ছোটে,
ধানের বনে নাচন ওঠে,—
দু'দিন যা'রা এসেছে মায়ের কোলে,
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
তাদের ক্ষণিক হরষে পরাণ দোলে।
মাটির মেয়ের আগমনী
বাজিল তব বীণে,
গৌরী শারদা যে আসেন
তোমার আসার দিনে।
যৌবন-মদে-মত্তা যেন
তটিনী ধীরে চলে,
আকাশে ঢুলায় শাদা চামর
কে সে আরতি-ছলে।

উড়ায়ে কাশের উত্তরীয়
এসেছ তুমি অবনী-প্রিয়—
রমণীয় সুনির্মল রূপে,
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
পূজার বাঁশী বাজালে তুমি চুপে।
বিকচ শতদল যে তোমার
সুচারু আননখানি,
হংস-ধ্বনি নূপুর-নিনাদ
তুলিছে নূতন-বাণী।
স্বর্ণশালি তনুটি তব
রুচিরতনিম-শোভা,
বান্ধুলি যে অধর-যুগ—
শোণিম নয়ন-লোভা।

আশ্বিনের এই রূপের হাটে
সবাই মাতে নাচের নাটে,
শঙ্খধ্বনি ত্রিলোকে আজ বাজে,
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
তোমার ও-ডাক জাগ্‌লো প্রাণের মাঝে
শারদারি মন্ত্র নিয়ে
শরৎ নিলে জিনে—
আঁধার-কালো রাক্ষসেরে
রবির বিজয়-দিনে।
ভুবনে ওঠে আনন্দ-দোল—
মরেছে আজি তম,
দ্বিধায় তবু প্রকৃতি বলে—
"রহগো নিরুপম।"

সহসা কেন বিজয়া-গীতে
কান্না আনে ধরার চিতে,
উৎসবের এই সজ্জা কেন তবে,—
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
সোণার বসুন্ধরা রিক্ত হবে।
পাগল-ভোলা এসেছে বুঝি—
বলিছে—"চলো চলো!"
জননী ধরার নয়ন হোলো
অশ্রু-ছলোছলো।
ক্ষণিক-খেলাঘরে যে তা'র
বিদায়-বাঁশী বাজে,
রুদ্র-বীণায় চড়েছে তার
বিলাপ-গীতি রাজে।

বলিছে ধরা ব্যাকুল-স্বরে—
"বরিনু তোরে সোহাগ ভরে,
সাজানু কুমুদ-অতসী-শতদলে,
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
হাসিলে কভু কাঁদিতে খেলা-ছলে।
ফলের কানন উঠেছে ফলি'—
করেছি নিবেদন,
ফসল যত লভিনু, তাহে
প্রীতির আয়োজন।"
পড়িছে ঝরি' মালিকা হ'তে
মালতী-কহ্লার,
ধরার আঁচল হোলো যে মলিন,
জাগিছে তমোভার।

বাঁধিলে হাতে আলোর রাখী—
মেলিয়া নীলোৎপল-আঁখি,
ভাঙিলে তুমি স্বপ্ন-শয়ণ ঘুমে,
শুভ্রতনু শরৎ ওহে,
শঙ্খ-মৃণাল রজত-মেঘের চুমে।
নীল-আকাশে আলোর খেয়া
চলিছে আজি ধেয়ে,
শেফালিকার গন্ধ-প্রদীপ
জ্বালিলে ধরা-গেহে।
কুমুদী-শোভন-কান্তি তোমার
আঁধার-ভ্রান্তি-হরা,
মুক্তি-রাগের জোয়ারে তুমি
ভাসালে বসুন্ধরা॥

জীবনের মৃত্যু নাই

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

দিকে দিকে অবসাদ, পুঞ্জীভূত অপমান, মৃত্যু রাশীকৃত—
তারই মাঝে জয়গান গাহ তুমি কবি।
জীবনের মৃত্যু নাই।—অমৃতের চিরন্তনী ছবি
তুমি এঁকে রেখে যাও ধরণীর 'পরে
জীর্ণ প্রাণ নিখিলের সমাধি শিয়রে।
গাই জয়গান,
ধ্বংস মাঝে রেখে যাও নবজীবনের অবদান
অক্ষয় ছন্দের বক্ষে, অনন্ত সংগীতে
দীপ্ত শিখা শব্দের বহ্নিতে।
এই যে অনাদি স্রোত,—লীলায়িত ধারা সৃজনের,
দিনে দিনে উত্তরিছে অন্তহীন পূর্ণতার পানে,
আপন অজস্র দানে
পূর্ণ করি' বারে বারে মৃত্যুদগ্ধ ধরা,
পাষাণের বক্ষে আনি' জীবনের ফল্গু মধুক্ষরা,
অন্তহীন সে অমৃত। বিন্দু বিন্দু সুরের ক্ষরণে
তুমি তারে রেখে যাও অবিনাশী অক্ষর বন্ধনে।

* * * *

এ মৃত্যু অনন্ত নয়, এ ক্রন্দন নহে চিরন্তন,
আজিকার অপমৃত্যু, সংঘর্ষ, সংঘাত,
সর্ব্বনাশা আর্ত্তনাদ
একদিন স্তব্ধ হ'য়ে যাবে।
উলঙ্গ এ পশুবৃত্তি, লুব্ধ স্বার্থ, ঘৃণ্য অবিশ্বাস
একসাথে একান্তে ফুরাবে।
বৈষম্যের সর্ব্ব ভেদ পূর্ণ সাম্যে একদিন লভিবে বিশ্রাম,
সেই তার সত্য পরিণাম।
অনাগত সে দিনের তার
দুঃসহ বেদনা ল'য়ে সৃজনের গর্ভে তাই কাঁদে বার বার;
আসন্ন-প্রসবা সৃষ্টি। দিগ্বিদিক্ কেঁপে ওঠে ঐ
সর্ব্ব গ্রন্থি, সর্ব্ব স্নায়ু ছিঁড়ে যেতে চায়
বুঝি সেই আর্ত্ত যন্ত্রণায়!
সাঙ্গ হ'লে এই আলোড়ন
দুর্নিবার সমুদ্র-মন্থন
সৃষ্টিগর্ভ ছিন্ন করি' অজস্র শোণিত-স্রোতে
নিখিলের পূর্ণ গর্ভ হ'তে
সে প্রাণ ভূমিষ্ঠ হবে;
তোমার বীণার রবে সেই নব জাতকের গান।
অনুদ্বিগ্ন সৃষ্টির বিধান!
আজিকার এই মরুদাহ
ভেদ করে জীবনের সেই গান গাহ
যে গীতের মধুচ্ছন্দে নিত্যদগ্ধ কালের কঙ্কালে
জীবনের রসস্পর্শ কল্লোলিয়া ওঠে নিত্যকালে।
আনো সে তরঙ্গধ্বনি, অফুরন্ত প্রাণের প্লাবন,
চরম ধ্বংসের মুখে আনো সে আশার বাণী
হে চির-বিপ্লবী কবি, বিগত-বন্ধন!

গণ-ভাস্কর্য্যের গৌড়ীয় অধ্যায়

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ভারতীয় শিল্পসমারোহের ইতিহাস মিশর বা চীনের মত প্রাচীন না হলেও প্রত্নসংগ্রহে তা' একান্তভাবে রিক্ত নয়। ইদানীং মহেঞ্জদার (মহেঞ্জোডারো) ও হরপ্রিয়া (হরাপ্পা) প্রাচীন যুগের দুটি বিরাট মশালের মত আবিষ্কৃত হয়েছে, তা'তে অগণিত শিল্প-সম্পদ্ পাওয়া গেছে। এসব বিচার করে' বেড়েছে বিস্ময় দিকে দিকে।

এ যুগের পরে কলাসঞ্চয়ের দিক্ হইতে বৌদ্ধযুগ এসে পড়ছে বিচারকের সামনে। অজন্তার স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য একটি নূতন অধ্যায় শুরু করছে বলে মনে হয়—এ সময়-বস্তুতঃ তা নয়। এইটি রূপরচনার একটি পরিপক্ব কাল—অজন্তা এ রকম একটা ঐশ্বর্য্যমুখর পরিণত যুগকে রূপান্বিত করেছে। এর ভিতরকার বিচার উচ্চ বৈচিত্র্য ও জাগ্রত হিল্লোল জীবনের একটা প্রখর বাস্তবতাকে উর্দ্ধিত করেছে সৌন্দর্য্যের চরম দানে। এমনি করে একটা রীতি মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলভারনত হয়ে আমাদের মুগ্ধ করে দেয়।
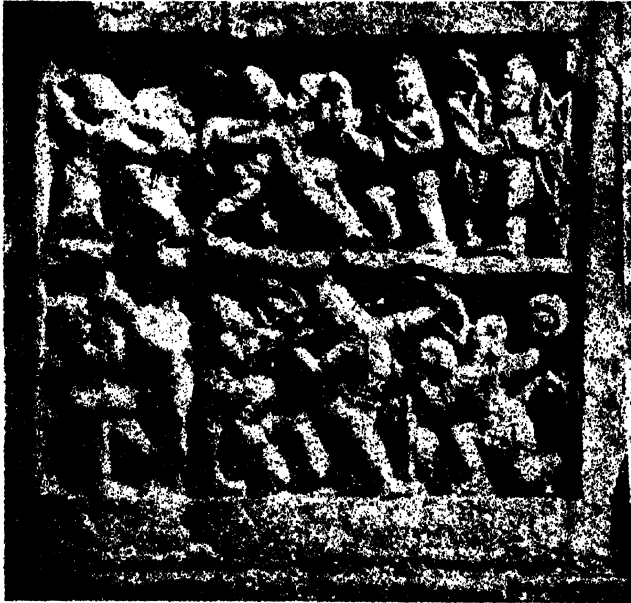
বিষ্ণুপুর ভাস্কর্য্য

অজন্তার ধারা চলে যায় দেশ-বিদেশে। দেশের ভিতর বাগগুহা, শ্রীগৃহ প্রভৃতি, বাইরে মধ্য-এশিয়ায় দণ্ডিন ইউলিব, চীনে সহস্র বুদ্ধগুহা, জাপানের হরউইজি প্রভৃতিতে অজন্তার রূপরশ্মি ছুটে গেছে—তারহীন বার্ত্তার মত সব জায়গায় এর প্রেরণা বন্দিত হয়েছে।

এ ধারা ছাড়া আরও একটা ধারা অতি প্রাচীনকাল হ'তে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে। সে ধারা দেশকালের কোন বিশিষ্ট রীতির সহিত তুলনীয় নয় এবং সে রূপও কোন তরল সাময়িকতার সহিত যুক্ত নয়। যা কিছু অবিচ্ছেদ্য—যা কিছু শিরোধার্য্য এমন কিছু শাশ্বত অলঙ্কার তার ভিতর আছে। এজন্য তা শুষ্ক ও জীর্ণ হয়ে যায়নি। যুগে যুগে সমানভাবে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেছে। ইদানীং প্রতীচ্য জগতে এই বিশিষ্ট রীতির খুব জয়জয়কার হচ্ছে। কলাকে জটিল বুদ্ধিবাদের হের-ফের ও কায়দার ভিতর না ফেলে এ সব জঞ্জাল হতে মুক্ত করার দিকে সকলের একটা ঝোঁক হয়েছে। শিশুর রূপের ভিতর যে সরল লীলা দেখে মুগ্ধ হয় তেমনি রূপকে বরণ করাই ইদানীং লক্ষ্য হয়েছে। এজন্য কেউ বা 'নিগ্রো', 'ময়' ও 'পেরু'র প্রাচীন শিল্পের অশিক্ষিত পটুত্বকে বাহবা দিচ্ছে। শিল্পের মূল উদ্দেশ্য একটা জটিল ধাঁধাঁ সৃষ্টি নয়; তিলক ও রূপকের সাহায্যে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানের জ্ঞানচর্চ্চার সহায়ক হওয়ার জন্য রম্যকলার সৃষ্টি হয় না। যাতে করে রসব্যঞ্জনার সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান হ'তে পারে এমন কিছু রচনা হলেই যথেষ্ট। দীর্ঘ বক্তৃতা বা অভিনয় ছাড়াও শুধু ভ্রূকুটি বা অপাঙ্গের কুঞ্চনও যেমন এ কাজ করতে পারে তেমনি চিত্রে ও শিল্পেও লোককলার সরল নিবেদনও অতি প্রখর ভাব ব্যক্ত করে।

প্রাচীন বা archaic রূপসৃষ্টির অন্তরালে একরকমের রস-সমাবেশের আয়োজন আছে দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের বাইজেনটাইন শিল্পরীতি এক শ্রেণীর গণকলার জন্মদান করেছিল। সম্প্রতি গ্রীসের য়্যাথস পাহাড়ে (Athos) পাদরীরা খ্রীষ্টের চেহারাকে আঁকে পরিপাটি মানুষের ফটোগ্রাফের মত করে একেবারেই নয়। এরকম সৃষ্টি র্যাফেল (Raphael) এবং অন্যান্য বাস্তবতা-প্রিয় শিল্পপ্রেমিকদের ভক্তেরা মোটেই পছন্দ করে নি। তাঁদের মতে এসব চিত্র ছিল "more like spectres than representations of sacred personages"—অর্থাৎ মহাপুরুষদের ভূত-প্রেতদের ছবি। এসব মতামতের প্রচুর পরিবর্ত্তন হয়েছে ইদানীং। সভ্যতার বড়বড়ে যেসব পুঞ্জীভূত উপকরণ মূর্ত্তিতে আরোপ করাহয়, তা'তে কলাগত কোন পদার্থ ই নেই—এ কথা বলা হচ্ছে এবং ইদানীং এক নব্য বর্জ্জন-নীতির অধ্যায় সুরু হয়েছে শিল্পপ্রেমিকদের মধ্যে।

এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আধুনিক ও প্রাচীন সভ্যতার সঞ্চয়ের দিকে সকলেই আবার চোখ ফিরিয়েছেন। যা' কুলুঙ্গিতে অবজ্ঞাতভাবে ছিল, তাকে আবার সজ্জিত কাদা ও ময়লা হ'তে মুক্ত করে' সামনে নিয়ে আসবার হুজুগ এসেছে।

এখানেও এক সময় অজন্তার জটিল চিত্রাঙ্কন ও এলোরা

প্রভৃতির ভারাক্রান্ত ভাস্কর্য্য-সঞ্চয় এদেশের চরম কৃত্য বলে স্বর্জ্জিত হয়েছে—যদিও এসবও ঠিক প্রতীচ্যের আদর্শে তৈরী ভঙ্গুর রচনা নয়। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হয়েছে যে, এখানে ধারাবাহিক ভাবে অগণ্য জনতার ভিতর কোটি কোটি অন্তরকে তৃপ্তিদান করতে আর একটি শিল্পরীতি অগ্রসর হয়েছিল। যা'তে গৃহের দেয়ালে, হাতের শিল্পের নানা কাজে, পুতুল ও খেলনা রচনায় এক আদিম প্রতিভার রসোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছে। সে রীতিকে ঐশ্বর্য্যবান্ করার উপায়ই ছিল না—তবে আপেক্ষিক নিরাভরণ সরলতাই ছিল মুখ্য আকর্ষণের বস্তু। ছেলেদের বাঁশী, বাজনা, মাটির ঠেলা গাড়ী, মুখোস প্রভৃতির সঙ্গে এসব মূর্ত্তির বিরাট প্রসার হওয়া একটা বিস্ময়ের বিষয় ছিল। উজ্জয়িনী ও পাটলীপুত্রের নরপতিদের মনোরঞ্জনের জন্ত এসব সৃষ্টি হয়নি, বহুশীর্ষ বিরাট মানবস্বকে আনন্দে সিঞ্চিত করার উৎসাহই ছিল এর প্রেরণা। নারীত্বের সনাতন ভূষণ-প্রিয়তা যেন চিরকালের জন্ত মুদ্রিত হয়ে আছে। পাটনায় প্রাপ্ত দুটি মূর্ত্তির হাস্যোত্তম অতি মধুর। এর ভিতর একটি নারীমূর্ত্তিও পাওয়া গেছে। কোন লেখক বলেন মধ্য-ইউরোপ হতে গঙ্গার উপত্যকা পর্য্যন্ত একরকমের রচনার প্রচার দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে Glotz একটা উক্তি করেছে:—'She is the great mother. It is she who makes all Nature bring forth. All existing things are emanations from her. She is the Madonna carrying the holy child or watching over." [Aegean Civilization]

বলা প্রয়োজন—প্রাক্ভারত (East India) চিরকালেই ভারতীয় সভ্যতা ও শীলতার ভারকেন্দ্র ছিল। এখানকার পাটলীপুত্র, গৌড়, মুর্শিদাবাদ ঐশ্বর্য্যে জনসংখ্যায় এবং জ্ঞান ও

প্রাচীন বিষ্ণুপুর মন্দিরের খোদাই মূর্ত্তি

কলা-বিলাসে অতুলনীয়। বহু তীর্থক্ষেত্র প্রাক্ভারতে অবস্থিত ছিল, বিশেষতঃ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠগুলি এ অঞ্চলেই জ্ঞান বিতরণ করে ধন্য হয়েছে। কাজেই এ প্রদেশে ভাবের নানা আলোড়ন এবং রাগচর্চ্চার বহু উদ্যম ফলিত হয়েছে।

প্রাচীন নাট্যকার তাই গুপ্ত আমলের ঐশ্বর্য্যে ভরপুর একটি নাটকের নামকরণ করেছেন—স্বর্ণশকটিক নয়—মৃচ্ছকটিক—মাটীর খেলনার গাড়ী।

সে যাক্—এই ধারার আদি চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে মহেঞ্জদারো ও হরপ্পাতে (মুহেঞ্জোডারো ও হরপ্পা) খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার সালে। তা' ছাড়া পরবর্ত্তী যুগে 'তক্ষশিলা', 'বাকসার', 'পাটনা' 'কুমরাহর', 'বুলন্দি', 'বাগ'ও 'ভিটা' প্রভৃতি অঞ্চলে আকাশে উড়ন্ত মরালশ্রেণীর মত একটা অব্যাহত তরঙ্গ নিয়ে একরকমের রচনা চলে এসেছে। এসব মাটির তৈরী—যাতে সহজে দেশ হতে দেশান্তরে নেওয়া যায় এবং সংখ্যার দিক হ'তেও যাতে প্রচুর রচনা সম্ভব হয়। গণচিত্রও "Portable" অর্থাৎ এদিক ওদিক যাতে নেওয়া যেতে পারে সেই লক্ষ্য রেখেই রচিত হত। প্রত্যেক তীর্থক্ষেত্রে এসব চিত্র প্রচুর ভাবে আঁকা হত এবং এখনও হয়। মাটির তৈরী মূর্ত্তিও লক্ষ লক্ষ তৈরী হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে। অজন্তার চিত্রকে বহন করে নেওয়া চলে না, এলোরার মূর্ত্তিকেও স্থানচ্যুত করা যায় না। কাজেই যুগে যুগে বিরাট ভারতের রসের ক্ষুধা চরিতার্থ করেছে গণকলা।

পেশোয়ারে হার-পরান মেয়ের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, তাতে

গণকলার নিদর্শন সারা ভারতে আছে—এখনও কোটি কোটি লোকের—সৌন্দর্য্য ও রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে এই বেগবান্ রচনার ঝড়। কাজেই এর স্বরূপ ও বহুমুখী লীলাভঙ্গী এ যুগে বিশেষ আলোচনার ব্যাপার সন্দেহ নাই।

কালীঘাটের পট, পুরীর পট প্রভৃতিতে আমরা রেখার যে বলিষ্ঠ ব্যাকুলতা ও অভ্রান্ত গতিবেগ পাই তা' লক্ষ্য করবার জিনিষ। বাঙ্গলার পল্লীশিল্পে মাটির হাঁড়ি ও নানা রকমের পাত্রে এই চিত্রের একটা বিশেষ দিক্ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এদের রঙীন সজ্জা প্রখর ও সচ্ছন্দ এবং আবেদন প্রচুর মুখর। বাংলার কাঁথার নক্সায়, সোলার কাজে, কাঠের আসবাবে, মাটির হাঁড়িতে অজস্রভাবে গণকলার ব্যাপক ঐশ্বর্য্য ছন্দোবদ্ধ হয়েছে—। এই ছন্দ উপলব্ধি করতে শিক্ষানবিশী করার প্রয়োজন হয় না। এই সব খণ্ডচেষ্টার স্রোতোভঙ্গ চলেছিল দিকে দিকে সমগ্র দেশ ছেয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব কি কোথাও জমাট হ'তে পেরেছে? এসব

খণ্ডকাব্যের মত রচনা নিয়ে কিছু স্থায়ী ও বিরাটতর কি রচিত হয়েছে?

উত্তর হচ্ছে, গৌড়ীয় শিল্পীই এই গণকলার ঐশ্বর্য্য ও মূল্য বুঝতে পেরেছে। এজন্য শুধু মাটিতে, সোলাতে বা কাঠে এসব আবদ্ধ করে নি। এই রীতিকে মহত্তর ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে' ভারতীয় শিল্পী এক অদ্ভুত মৌলিকতার পত্তন করেছে।

এই চেষ্টার প্রচার-প্রয়াস দেখতে পাই পাহাড়পুর স্তূপে প্রাপ্ত প্রস্তর ও মাটির মূর্ত্তিতে। পাহাড়পুরের কৃষ্ণ-চরিত্রের পরিপোষক ও প্রতিফলক রচনাগুলির ভঙ্গী গণভাস্কর্য্যের। তা' ছাড়া অগণিত মূর্ত্তিসমূদয় এই ধারাকেই শিরোধার্য্য করেছে। গুপ্ত সভ্যতার পরিপক্ব সৌখীনতা ও ভারাক্রান্ত সৌন্দর্য্যবিধিকে তুচ্ছই করেছে। তাকে "নাগ"পদ্ধতি বলেছে। এ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিল ধীমা ও বিত্তপাল। চিত্র ও ভাস্কর্য্য এ উভয় ক্ষেত্রেই এদের অপরিসীম প্রতিভা ছিল। বস্তুতঃ এই প্রাচ্য পদ্ধতির প্রভাব নেপাল তিব্বতে বিস্তৃত হয়ে ক্রমশঃ সমগ্র এসিয়ার সৃষ্টিকে এক নূতন প্রেরণা দান করে।

এই শিল্পচক্রের নমুনা অতিমাত্রায় সভ্য, অত্যন্ত জটিল রচনা প্রস্ফুট হয়েছে কিন্তু তা বলে' গণরীতি কখনও অচল হয়নি কারণ, গণকলার লক্ষ্যই ছিল কুটিরকলার স্থান পূরণ করা। শুধু তা নয়, গণকলা অনেক সময় উচ্চতর সৃষ্টির দুঃসাহসও করেছে। পুরী, কালীঘাট, মথুরা প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে দেবতার লক্ষ লক্ষ চিত্র ও মূর্ত্তির চাহিদা এখনও আছে। গণকলা এই রাজপথে অগ্রসর

বিষ্ণুপুর-ভাস্কর্য্য

এ রকমের দৃষ্টান্ত অন্য কোন প্রাচীন স্তূপে দেখতে পাওয়া যায় না। পাহাড়পুরেই গণভাস্কর্য্যের রূপবিধিকে একটা বিরাট মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছিল। শুধু তা' নয়, এই বিশিষ্ট আদিম রূপের ভাষাকে বাংলার রূপকারেরা চিন্তাক্ষেত্রের একটা সুবিস্তৃত ব্যঞ্জনায়ও প্রয়োগ করেছিল।

পাহাড়পুরের কাল সপ্তম শতাব্দী। কাজেই বলতে হয় গণভাস্কর্য্য এ সময় একটা বিরাট কৃত্যে প্রযুক্ত হয় বাঙ্গালীর প্রতিভা দ্বারা। কার্য্যটি এত সফল হয় যে, এর তুলনা সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

কোন কোন আলোচক বাংলা দেশের গ্রাম্য রচনায় এ পদ্ধতির বিস্তৃত প্রয়োগ দেখে রূপের এই বিশিষ্ট ধারাকে বাঙ্গালার স্বকীয় দান বলতে উৎসাহিত হয়েছে। বস্তুতঃ বাংলার গ্রাম্য জীবনের প্রেরণা ও সৌন্দর্য্যসাধনা একটা বিশিষ্ট রীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল—যা অগণ্য গণমণ্ডলীর মনঃপূত হয়। অতি জটিল, রূপক ও রেখার কালোয়াতিতে ভরপুর কোন পদ্ধতি এ অবস্থায় মনঃপূত হয় নি। বিশেষতঃ mass production ওরকমের প্রচুর ভাবে সংহত (highly organised) পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে না। অথচ এদেশে একটা সংস্কৃত পদ্ধতিও সাধু ভাষার মত রূপের অর্ঘ্য রচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ হয়েছে। পাথরে খোদাই উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম কার্য্য রচনা অত্যধিক সময়-সাপেক্ষ—তা ছাড়া সেগুলো তেমন বহনীয়ও (portable) নয়। এমনি করে' রূপসৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ হয়েছিল এ দেশে। জটিল শিল্প অপেক্ষা জনকলা ছিল অধিক জীবন্ত ও প্রাণবান্—কোটি কোটি লোকের সমাদর এই রীতিকে সামাজিক জীবনে গ্রহণ করে। এর প্রতি তন্তুতে জাতির রক্তসঞ্চালনের সম্পর্ক সঞ্জাত হয়েছিল। সুগঠিত হুবহু বা কালোয়াতী কারিগরী হয়ে পড়ে লঘু, অপ্রামাণ্য ও উদ্ভট। গণরূপের মোটা মিলন, ভারি টান ও ঘন ব্যঞ্জনা হয়েছিল জমাট চিত্রের দুর্লভ প্রতিমা—পল্লীসুলভ ললিত হৃদয়-বেপথু এমনি করে একসময় দানা বেঁধেছিল। মোরাদাবাদি পেতলের পাত্রের উপর রকমারি রঙীন নক্সা হার মেনে যায় কালী অঞ্চলের কলসী ও হাঁড়ির উপরকার রঙবেরঙের ছবির ভঙ্গীতে। মোটামুটি এদের ক্রতবেগ (instantaneous appeal) চিত্তকে জয় করে সহজে। পুরীর পটে রেখার বাদ সমগ্র বিষয়বস্তুকে ব্যঙ্গ ক'রে এক উদ্ভট ও উৎক্ষিপ্ত রচনায় পরিণত করে। রেখাগুলি জীবন্ত হয়ে পটের উপর খেলছে পরম সমারোহে।

সে যাক, বাংলা দেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও এ পদ্ধতিকে একটা উচ্চশ্রেণীর রচনায় প্রয়োগ করে। রাজপুত চিত্রকলায় "বাশোলী" পদ্ধতি যেমন একটা মোটা সুর তুলে মিহি

কায়দাগুলিকে কিছুকালের জন্ম নিষ্প্রভ করে তেমনি ধীমান ও বিত্তপালের রূপদক্ষে এই নবীন আন্দোলন যেন মলিন করে একটা মেঠো মালসির ধ্বনি তুলে বাংলার রূপক্ষেত্রে।

বাংলা স্বাধীন মল্লরাজগণের রাজধানী বিষ্ণুপুরের ইতিহাস বেশীদিনের ব্যাপার নয়। বিষ্ণুপুরের চারিদিকে এগার ক্রোশ ব্যাপী ভূমিখণ্ড এই রাজাদের রাজ্যের সীমানা ছিল। এইখানে একটা ভাবের কেন্দ্র জমাট হয়। কথিত আছে এখানে মল্লরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ৮০৪ খৃষ্টাব্দে এবং তা স্থায়ী হয় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কলিকাতার গভর্ণর মিঃ হলওয়েল এখানকার রাজা সম্বন্ধে একসময় লিখেন:—"He is perhaps the most independent Raja of Indostan having it always in his power to overflow his country and drown any enemy that comes against him."

এখানকার সৌধরীতিতে বাংলার ছন্দ অতি বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার স্থাপত্যের বহুমুখী রসভঙ্গ গৌড়ে যেমন তেমনি বিষ্ণুপুরেও প্রকট হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে আলোচ্য হচ্ছে এখানকার ভাস্কর্য্য। জোড়া বাংলা মন্দির ও মদনমোহন মন্দিরের দান সমগ্র ভারতের রূপক্ষেত্রে অদ্বিতীয় বলতে হয়।

গুপ্তযুগের সুনিপুণ ও সুচিক্কণ রচনায় মার্জ্জিত প্রয়োগ এখানে মোটেই আদৃত হয় নি। এখানকার রচনা মাটির তৈরী কিন্তু রীতি হয়েছে গণকলার। গণকলার ভঙ্গীকে অব্যাহত রেখে যে রচনা হয়েছে তা হয়েছে শক্তিতে প্রখর, উদ্দীপনায় জীবন্ত এবং কলাগৌরবে মহান। ঘোড়ার উপর চড়ে যোদ্ধারা চলেছে তীব্র বেগে, একে অন্যের সহিত কথা বলছে—কেউ বা লাগাম ধরে তেজস্বী ঘোড়াকে এগিয়ে নিয়েছে—সওয়ারদের হাতে তরবারী বা বর্শা, কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার আয়োজন সব মিলে এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি হয়েছে এসব মন্দিরে। কণারকের ঘোড়া অপেক্ষাও এসব বৈচিত্র্যে ও তেজস্বিতায় অধিক ভাস্বর। বস্তুতঃ রীতির বিচিত্র প্রখরতায় এই রচনা ঐতিহাসিক সকল রচনাকেই হতঃপ্রভ করেছে। বরভূধরের কায়দাকানুনে তৈরী রচনা মামলপুরের প্রাচীন গ্রন্থের কঠিন শাসনে খোদাই কারুকার্য্য এই সৃষ্টির ক্ষণ ঝটিকার সৌন্দর্য্যে সহজেই হতঃপ্রভ হয়ে যায়।

আর একটি রচনায় আছে খাড়িয়াড়ি জলযুদ্ধের উপযোগী নৌকো, তার উপর সৈনিকরা বন্দুক হাতে গুলি করতে উদ্যোগী। নৌকার অগ্রভাগে হাঙ্গরের মুখের মত আছে একটা ভীষণ রূপন। জলের ঢেউকেও সঙ্গত করা হয়েছে চমৎকারভাবে। সভ্যতা-পীড়িত রচনা এটি নয়, গণভাস্কর্য্যের একটি প্রবল প্রেরণা এসব রচনাকে এক অভূতপূর্ব্ব রসক্ষেত্রে সংক্রামিত করেছে।

অন্যান্য রচনার ভিতর একদিকে এক জায়গায় আছে মাতৃ-ক্রোড়ে শিশু—তিনটি মায়ের কোলে তিনটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, মাঝে মাঝেও দু তিনটি শিশু রচনা করেছে এক শিশুজগৎ জননীদের পাদপীঠে দেবীপ্রতিমার মত প্রতিষ্ঠিত করে'। অন্য দিকে এ শিশুদের ভবিষ্য জীবনের দৃশ্য সকলেই হয়েছে পালোয়ান, যুদ্ধ, কুস্তী প্রভৃতি বীরত্বপূর্ণ দৃশ্যে পরিপূর্ণ একটি ফলক। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন প্রেরণার গণভাস্কর্য্যের এই অধ্যায় আধুনিক জগতে একটি স্থান পাওয়ার যোগ্য-বস্তুতঃ এর তুলনা পাওয়া কঠিন। বাংলার অন্তরঙ্গ স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যপ্রীতি নিয়ে এসেছে বাঙালীকে রূপসমুদ্রের এই দুর্লভ বেলায় রাষ্ট্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে যুগাগত নৈশ অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গনে। এই রূপ-বীথিকা ইতিহাসে অমরত্বলাভের যোগ্য।

আশীর্ব্বাদ (গল্প)

এস, ওয়াজেদ আলী, বি. এ (কেন্টাব), বার-এট-ল

পরমজ্ঞানী দরবেশ বাবা মোস্তফাকে গাঞ্জানগরের লোকেরা দেবতার মত মানে। তিনিও তাদের নিজের সন্তানদের মতই দেখেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন তিনি জামে মসজীদে গিয়ে বক্তৃতা দেন—জীবনের উদ্দেশ্যের বিষয় তাদের অবহিত করতে, সত্যের পথে তাদের পরিচালিত করতে। জনসাধারণ উৎকর্ণ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনে, সে বক্তৃতা থেকে তারা জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। রোগী, স্ত্রীলোক, বালক বালিকারা দলে দলে পাত্র করে জল নিয়ে আসে তাঁর আশীর্ব্বাদসূচক ফুৎকারের জন্য—সে ফুৎকারকে তারা রোগের অমোঘ ঔষধ বলেই মনে করে। বাবা মোস্তফার অলৌকিক শক্তির উপর জনসাধারণের অগাধ, অটল বিশ্বাস।

প্রথা মত একদিন বাবা মোস্তফা মসজীদে বসে উপদেশ দিচ্ছেন। লোক উৎকর্ণ হয়ে তাঁর কথা শুনছে। হঠাৎ গাঞ্জার বাদশাজাদা টলতে টলতে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ মাতাল—এক হাতে পানপাত্র আর এক হাতে শরাবের কুঁজো। মোসাহেবের দল সঙ্গে এসেছে—সুরার প্রভাবে তাদেরও বেসামাল অবস্থা। কেউ কবিতা পড়ছে, কেউ গান গাচ্ছে। বাদশাজাদা বিকৃত সুরে ধর্ম নিয়ে পরিহাস করতে লাগলেন আর ধার্ম্মিকদের উপর বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে বিদ্রূপকারীদের আক্রমণ করতে উদ্যত হল। গম্ভীর কণ্ঠে বাবা মোস্তফা বললেন—"সব চুপ করে বসে থাক, কেউ কথা বলোনা।" শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর আদেশ পালন করলে, সকলেই চুপ করে বসে রইল। খানিকক্ষণ হাসি-তামাসা করে, লোকের কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে বাদশাজাদা ইয়ার মোসাহেবদের নিয়ে মসজীদ ছেড়ে চলে এলেন।

উত্তেজিত ভক্তবৃন্দ বাবা মোস্তফাকে সম্বোধন করে বললে—"হুজুরের নিষেধ না হলে লোকটাকে আমরা কতল করে ফেলতুম, তা উনি বাদশাজাদাই হোন আর যেই হোন না কেন। খোদার ঘরের অবমাননা, খোদার বন্ধুর লাঞ্ছনা, ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ, এসব কি করে সহ্য করা যায়! রক্তমাংসের মানুষ কি এতটা

বরদাস্ত করতে পারে? যাই হোক যা হবার হয়েছে, হুজুরের কাছে আমাদের নিবেদন, হুজুর খোদার কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন বাদশাজাদার পাপের উপযুক্ত শাস্তি অবিলম্বে দেন। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কোন শাস্তি ওর পাওয়া উচিৎ। আমাদের এ অনুরোধ শুনুন, হুজুর।"

বাবা মোস্তফা বললেন, 'বৎসগণ, খোদার কাছে এই মোহগ্রস্থ বাদশাজাদার জন্য প্রার্থনা আমি করব, সে প্রার্থনার প্রয়োজন অনুভব করছি।' তারপর তাঁর এক মাত্র বন্ধু বিশ্বপ্রভুকে সম্বোধন করে বাবা মোস্তফা কাতর মিনতির স্বরে বললেন, "হে বিশ্বের অধীশ্বর, হে মানবের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, অধমের একমাত্র আশা, তোমার কাছে আমার মিনতি জানাচ্ছি, তুমি এই বাদশাজাদার সুখ এবং আনন্দ চিরস্থায়ী কর। কখনও তাকে যেন দুঃখভোগ করতে না হয়।"

ভক্তেরা দরবেশের প্রার্থনা শুনে অবাক হয়ে গেল, আর তিনি এমন প্রার্থনা কেন করলেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। বাবা মোস্তফা বললেন,"বৎসগণ! কারণ সম্বন্ধে তোমরা যথা সময় অবহিত হবে, এখন যে যার বাড়ি চলে যাও।" পীরের আদেশ, ক্ষুণ্ণ মনে ভক্তেরা যে যার বাড়ি চলে গেল—পথে কিন্তু পীরের এই অপ্রত্যাশিত প্রার্থনার বিষয় তারা আলোচনা করতে করতে গেল।

বাদশাজাদার পরিচিত একজন লোক তাঁকে গিয়ে বাবা মোস্তফার প্রার্থনার বিষয় এবং জনসাধারণের মনক্ষোভের বিষয় অবহিত করলে। যেন কোন অলৌকিক ইন্দ্রজালের প্রভাবে বাদশাজাদার দেহমনে অপূর্ব্ব এক পরিবর্ত্তন এসে দেখা দিল। তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। দুই চক্ষু বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরতে লাগলো। মানস চক্ষে সেই মহাপুরুষকে তিনি দেখতে পেলেন—উদার প্রশান্তমূর্তি, দয়া এবং করুণায় মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শ্রীধারণ করেছে, মহাপুরুষ করুণ নেত্রে তাঁর দিকে দেখছেন, আর তাঁর মঙ্গলের জন্য গদ-গদ কণ্ঠে বিশ্বপ্রভুর কাছে মর্ম্মস্পর্শী আবেদন জানাচ্ছেন।

সংবাদবাহককে সম্বোধন করে বাদশাজাদা বললেন, "এক্ষুণি বাবা মোস্তফার কাছে যাও; গিয়ে তাকে বলো অনুতাপ-দগ্ধ বাদশাজাদা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন আর তাঁর সকাশে উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছেন।"

সংবাদবাহক অবিলম্বে বাবা মোস্তফার সকাশে উপস্থিত হল, বাদশাজাদার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বিষয় তাঁকে অবহিত করলে, আর বাদশাজাদার প্রার্থনাও তাঁকে জানালে। প্রসন্নমুখে দরবেশ খোদাকে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর সংবাদ-বাহককে সম্বোধন করে বললেন, "চল বৎস্য, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। বাদশাজাদার এখানে আসার দরকার নেই, আমিই গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি।"

যষ্টি হাতে নিয়ে তসবিহ মালা জপতে জপতে বৃদ্ধ দরবেশ বাদশাজাদার মহলে উপস্থিত হলেন। তাঁর আবির্ভাবের বিষয় অবহিত হয়ে বাদশাজাদা দৌড়ে এলেন আর পদ চুম্বন করে সাদরে তাঁকে নিজের খাসকামরায় নিয়ে গেলেন। গায়ক এবং বাদকরা তখনও সেখানে জমায়েৎ করেছিল। বাদ্যযন্ত্রাদি চার দিকে ছড়ান ছিল। কেউ পানপাত্রে শরাব ঢালছিল, কেউ শরাব পান করছিল, কেউ সুর সাধার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল, কেউ রসিকতা করছিল, কেউ হাসছিল। হঠাৎ বাদশাজাদার সঙ্গে বাবা মোস্তফাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে মোসাহেব মহলে ভীষণ সন্ত্রাস এসে দেখা দিল। কি করবে ঠিক করতে না পেরে তারা নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত সব চুপ করে বসে রইল। বাদশাজাদা পরুষ কণ্ঠে তাদের বিদায় হতে বললেন, আর পানপাত্রাদির উপর পদাঘাত করতে লাগলেন। স্মিতহাস্যে দরবেশ বললেন, "কেন বাবা অত অধৈর্য্য হবার দরকার কি? এদেরওতো আত্মা আছে, এরাও তো সত্যসুন্দরকে চায়। চাকরবাকরকে বল পানপাত্রাদি তুলে নিয়ে যাক। কাজে আসবে, এসব ভাঙবার কি দরকার! ক্রোধ মানুষের শত্রু, ক্রোধকে দমন করতে শেখ।"

একান্ত ভক্তির সঙ্গে দরবেশকে নিজের আসনে বসিয়ে বাদশাজাদা নতজানু হয়ে বললেন, "হুজুর আমার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি আমার সুখ এবং আনন্দ চিরস্থায়ী করুন, আমাকে কখনও যেন দুঃখ ভোগ করতে না হয়। আপনার উদারতায় আমি বিস্মিত হয়েছি আর তাই আপনার পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। আপনার প্রার্থনার প্রকৃত মর্ম্ম এখনও কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি। দয়া করে আমায় বুঝিয়ে দিন।"

দরবেশ বললেন, "বৎস্য, সুখ এবং আনন্দ দুই প্রকারের। প্রথমতঃ এই দুইয়ের প্রভেদ তোমায় বুঝিয়ে দি; আমরা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে সুখ পাই, আর মনের কামনা সার্থক করে পাই আনন্দ; সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে সুখী হই, আর বিদ্যা অর্জ্জন করে, রাজ্যলাভ করে আনন্দ পাই। সাধারণ লোক এই দুই শব্দের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না, তবে তোমাকে বোঝাবার জন্য শব্দ দুইটিকে পৃথক অর্থে ব্যবহার করছি। ভাল খাদ্য খেলে রসনা তৃপ্ত হয়, আমরা সুখী হই তা সে খাদ্য বৈধ উপায়েই আসুক আর অবৈধ উপায়েই আসুক। কিন্তু যে খাদ্য বৈধ উপায়ে আসে সে খাদ্য খেলে অনুশোচনা আসে না। সুতরাং তার সুখটুকু আমাদের জীবনের স্থায়ী একটা অংশ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে খাদ্য অন্যায়ভাবে আহরণ করা হয়, সে খাদ্য খেলে অনুশোচনার একটা ভাব মনে থেকে যায়, আর খাদ্যজনিত সুখকে নষ্ট করে। সব জিনিসের বিষয়েই এই কথা বলা চলে। আমি তাই খোদার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, তোমার সুখ যেন চিরস্থায়ী হয়, তাতে অনুশোচনাজনিত দুঃখের ভাব যেন না থাকে।

আনন্দের বিষয়েও সেই একই কথা বলা চলে। যে আনন্দ পরের দুঃখ থেকে আসে, তার পিছনে আছে অনুশোচনা। তার পর যাকে দুঃখ দিয়েছি সে কিম্বা তার বন্ধুবান্ধব প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। প্রতিশোধের আশঙ্কায় সর্ব্বদা আমাদের সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়; মন আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। অন্যায়ের আনন্দ তাই ক্ষণস্থায়ী।

পক্ষান্তরে ন্যায় কাজ করে অন্যের উপকার করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাতে ক্ষোভের কোন কারণ থাকে না, দুঃখের আমেজ থাকে না। উপরন্তু শত দুঃখের মধ্যেও একটা স্থায়ী তৃপ্তি আমাদের মনে জেগে থাকে যে আমরা ন্যায় কাজ করেছি, কর্ত্তব্য পালন করেছি, মানুষের অযোগ্য কাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলেছি।

তার পর এও ভুললে চলবে না যে, মৃত্যুর পর আমাদের খোদার সম্মুখীন হতে হবে, খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি সব কাজের বিচার করবেন, সব কাজের উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। আমরা যদি ন্যায় এবং সত্যের পথে চলি, তাহলে ভাল ফল পাব; পুরস্কৃত হব; আর যদি অন্যায় এবং মিথ্যার পথে চলি, তাহলে কৃতকর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাব। সুতরাং চিরস্থায়ী সুখ এবং আনন্দ ন্যায় এবং সত্যের পথেই পাওয়া যায়, অন্যায়ের পথে, মিথ্যার পথে পাওয়া যায় না। আমি তাই প্রার্থনা করেছিলুম তিনি যেন তোমায় চিরস্থায়ী আনন্দ দেন; অর্থাৎ তোমায় ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে পরিচালিত করেন এবং মিথ্যার পথ থেকে, অন্যায়ের পথ থেকে তোমায় বাঁচিয়ে রাখেন। খোদাকে সহস্র ধন্যবাদ, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন।"

একান্ত ভক্তির সঙ্গে দরবেশের পদচুম্বন করে বাদশাজাদা বললেন, "হুজুর, আজ আপনি আমাকে নূতন দৃষ্টি দান করলেন, নূতনভাবে জীবনকে দেখতে শেখালেন। চিরকাল ন্যায় এবং সত্যের পথে পরিচালিত করে আমায় কৃতার্থ করুন, এই হচ্ছে আমার অন্তরের বিনীত আবেদন।"

সাধর্ম্ম্য (গল্প)

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

ধনীর গৃহে বিবাহ-উৎসব।

গৃহ-সজ্জার ত্রুটি নাই, লোক-সমাগমের বিশ্রাম নাই। নিমন্ত্রিত অতিথি-মণ্ডলীর গলায় ফুলের মালা পরাতে পরাতে মোটা শ্যামলাল হাঁপাইয়া পড়িল।

দু-ব্যচ লোক খাওয়াইয়া শ্যামলাল সিঁড়ির নীচে একটা কোণায় উবু হইয়া বসিয়া পাতা ধুইতে ধুইতে বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ গোপালকে মিনতি করিয়া বলিল, "গোপালদা, ভাই আমাকে এইখানে দু-খানা লুচি ফেলে দাওনা, রাত বেশী হ'য়ে গেলে যে ট্রাম ধরতে পারবো না।"

রাত্রি এগারটার পরে শ্যামলাল তাদের বড়বাজারের গদিতে ফিরিয়া আসিল। বিয়েবাড়ীর সুগন্ধি তাম্বুল চিবাতে চিবাতে মনে মনে বলিল, "বাবা! খুব বেঁচে গেছি বাবুদের চোখ এড়িয়ে, নইলে কি ছাড়তেন সব! ঠিক্ বলতেন—শ্যামলাল, বরযাত্রী খাইয়ে হবে যাও। অর্থাৎ কিনা, রাত দু'টোর সময় পটলডাঙ্গা থেকে বড়বাজারে হেঁটে এস। বিয়ে তো শুনলাম রাত্রি বারটার পর।"

মাথার কাছের জানালাটা খুলিয়া দিতে এক ঝলক জ্যোৎস্না সিন্দুরাপটির বড় বড় বাড়ীগুলির মাথা ডিঙিয়ে তার বিছানায়, গায় এসে পড়িল। বিয়ে বাড়ীর সানাইয়ের মিষ্টি সুর, জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া তার এই গদির দশবৎসরের শুষ্ক কেরাণী জীবনেও যেন রসের মাধুর্য্যে একটা অজানা মধুর পুলক-শিহরণ জাগাইল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল সে জানে না, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিল গদির দারোয়ান রামানুজের ডাকে। চক্ষু খুলিতে সে যাহা দেখিল, তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না, ঘরের মধ্যে, বড়বাবু, মেজবাবু দাঁড়িয়ে, সে চোখ দুটি রগড়াইয়া একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবু, কেমন এক অদ্ভুত স্বরে বলিলেন, "শ্যামলাল, আমাদের সঙ্গে চলো। শ্যামলাল এঁদের হুকুম মেনে অভ্যস্ত। কোন প্রশ্ন না করিয়া সে নীরবে ক্রীতদাসের ন্যায় কর্তাদের সঙ্গে, তাঁদের বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

এ কি বিয়ে বাড়ী! বরাসন শূন্য, বরের আসর জনশূন্য, এখনও পর্য্যন্ত ফুলের স্তবকগুলি মানুষের অস্পৃশ্য হ'য়ে আছে, কি ব্যাপার! সে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে চাহিয়া রহিল। জনভারে অবনত বাড়ীটা যেন জনাভাবে রূপকথার নিঝুমপুরীর মতন নিস্তব্ধ। ছোট দাদাবাবু ছাড়া বিবাহসভায় আর কেহ নাই। তিনি শ্যামলালকে বরের পিঁড়িতে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভট্‌চার্যি মশাই, আরম্ভ করুন, লগ্ন পার হ'য়ে যায়।" তারপর শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্যামলাল সবই বুঝতে পারছো তো? ওরে অনীতাকে নিয়ে আয়।" পুরোহিত মৃদুস্বরে বলিলেন, "তিনি এখন কেমন আছেন?" "কেমন আবার থাকবে, জ্ঞান কিছুটা ফিরে এসেছে, ডাক্তার বলেছেন ভয় নেই। কি করবো, উপায় তো এর কিছু নেই, উঃ! কি বিপদটাই না আমাদের হ'লো। এমনটি আমাদের বংশে কখনো হয় নি। দাদু তো অপমানে তাঁর ঘরে খিল দিয়ে বসে আছেন। হ্যাঁ, কি বল্‌ছেন ভট্‌চায্‌ মশাই, ছাদ্‌না তলা? হ্যাঁ, ভাবিতো বিয়ে, তার দু-পায়ে আল্‌তা।"

শ্যামলাল বলির পাঁঠার মতন কাঁপিতে লাগিল। ইহার অপেক্ষা কেহ যদি তাহাকে কামানের মুখে দাঁড়াইতে বলিত, তাহা হইলে সে কাজ এর মত এত ভয়ঙ্কর হইত না।

অনীতার হাত তার হাতে তুলিয়া দিয়া পুরোহিত যখন মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন, তখন তাহার যেন সহজ জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত হইল, সে মিডিয়ম করা মানুষের মতন পুরোহিতের সকল আদেশ পালন করিতে লাগিল।

কোন কোন সময়ে জীবননাট্যের পটগুলির দ্রুতপরিবর্তন মানুষকে তড়িৎ-পৃষ্ঠের ন্যায় চম্‌কাইয়া তার বুদ্ধি-বিবেচনাগুলির গতি কিছুক্ষণের জন্য রহিত রাখিয়া ঘটনার দুঃখ-কষ্টের প্রাচুর্য্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অনীতার জীবনে সেই-রূপ একটা পট হঠাৎ রূপান্তরিত হইয়া তার বর্তমান জীবনকে কঠিন বেত্রাঘাতের মত নির্দ্দয় ভাবে আঘাত করিল। মাত্র কয়েক

ঘণ্টা পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল---তার জীবনে এমন চরম দুর্ঘটনা ঘটিবে। মাত্র ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে বান্ধবী মালতী তাহাকে সাজাইতে সাজাইতে বলিয়াছিল, অনীতা, তুই কি ভাগ্যবতী, যাকে তুই সাধনা করলি, আজ তাকে পাবি প্রিয়রূপে, কী তোর তপস্যার জোর। অনীতা আনন্দে, গর্ব্বে, লজ্জায় রাঙিয়া মালতীর গালে টোকা দিয়া নীরবভাষায় তার জবাব দেয়। কিন্তু রাত্রি বারটার পর যাহারা বর আনিতে গিয়াছিল, তাহারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত দুঃসংবাদ দিল, পাত্র সুচারু ফেরার। সে যে সন্ত্রাসবাদী ছিল এ-কথা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাহারও জানা ছিল না, এমন কি তার পিতামাতারও নয়। এই কঠিন সত্য প্রকাশ হইল কি না আজই রাত্রে? তার পরের কথা অবর্ণনীয়। নিমন্ত্রিতরা বিনা বাক্যে বিদায় লইলেন। বিধবা মা, পাগলের মত হইয়া কপাল চাপড়াইলেন, পুরনারীরা গালে হাত দিয়া সভয়ে, "ওমা গো, কী সর্ব্বনাশ, কি হবে," এই সব বাক্যে অন্তঃপুর কাঁপাইয়া তুলিল। পিতামহ হরদয়াল রায় গোঁড়া হিন্দু, অত্যন্ত রাসভারি ব্যক্তি। তাঁর হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা এ-বাড়ীর কাহারও নাই। তিনি মৃদুস্বরে গম্ভীর মুখে, পৌত্রদের কি হুকুম দিয়া তাঁর শয়নকক্ষে অর্গল বন্ধ করিয়া রহিলেন। অনীতাও জ্ঞান হারাইয়া পড়ে স্বল্প জ্ঞানের মধ্যে তার বিবাহ হইল তাদের দোকানের কর্ম্মচারী শ্যামলালের সঙ্গে।

কেহ আশীর্ব্বাদ করিল না, উলুধ্বনি দিল না, তবু অনীতাকে একদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল। ফুলশয্যার রাতে শ্যামলাল, তার মুনিবকন্যার দিকে একবার সভয়ে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া নতনেত্রে থাকিয়া, গলাটা ঝাড়িয়া বলিল, "আপনি বরং—" অনীতা শ্যামলালের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাইয়া সতেজ কণ্ঠে বলিল, "আমি যে হরদয়াল রায়ের নাতনী, তা তুমি জানো?" শ্যামলাল আদালতের কাঠগড়ার আসামীর মত আতঙ্কচক্ষে দৃষ্টিহীনের মত অনীতার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "জানে"। দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আদেশের স্বরে অনীতা বলিল, "যাও।" হরদয়াল রায়ের পৌত্রী আর তার দোকানের কর্ম্মচারী এক ঘরে থাকতে পারে না।"

অনীতা বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কাছে গিয়া কহিল, "মা আমি যদি তোমার বিধবা মেয়ে হ'তাম, তাহ'লে তুমি আমার কি ব্যবস্থা করতে?" বৈধব্য-যাতনায় দগ্ধা মাতা কন্যার কথায় শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ছি, ছি! ও কি অলক্ষণে কথা?" "আমার কপালে যা অলক্ষণে কাণ্ড হয়েছে, এর চেয়ে বৈধব্যটা কিছুমাত্র বেশী নয়। মা, আমি তোমার বিধবা মেয়ে, সিন্দুর আমি মুছে ফেলবো।" পুত্রবধূর মুখে হরদয়াল সব শুনিয়া পৌত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনীতাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার জন্যে আমার মান-মর্য্যাদা সব গেল, এখন এই কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রে আমার মুখে চূণকালি দিতে চাও।

অনীতা তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "দাদু, আমি আপনার বংশের মর্য্যাদা রাখবার জন্যেই না সেই রাত্রে নিজেকে ধূপের মত পুড়িয়ে, আপনার সমাজ, হীন সংস্কার বজায় রেখেছি, যদি আমি বিয়ে করবো না বলে বেঁকে বসতাম তবে কিছুতেই আপনারা পারতেন না হরদয়াল রায়ের নাতনীকে ওই অপাত্রে দান করে নিজেকে দায়মুক্ত করতে। আপনি ভীরু, তা-ই যূপকাষ্ঠে আমাকে বলি দিতে আদেশ ক'রে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে রইলেন। আপনার একটা চাকরের সঙ্গে সংসার-ধর্ম্ম করবে কি না আপনারই পৌত্রী? ছিঃ! বাবা আজ যদি বেঁচে থাকতেন দাদু, তাহলে আপনি কি"—অনীতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

হরদয়াল স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁর পনের বৎসরের বালিকা পৌত্রী আজ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে, ধিক্কার দিতেছে। তিনি শান্তস্বরে ডাকিলেন, "দিদি! কাঁদিস্‌নে ভাই, কি করি বল্! সেই রাত্রে যে গোঁড়াস্থ বৈদিক আর পাওয়া গেল না। শ্যামলাল গরীব বটে, তবে ও যে বড় কুলীনের ছেলে। সেকালেও ওদের বংশের সঙ্গে আমরা কতটাকা খরচ ক'রে হাতে পায়ে ধরে কাজ করে, গর্ব্ব অনুভব করেছি। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন, কুলগৌরব হিন্দু-সমাজের আইন মেনে চলবো যে দিদি! তা আমি শ্যামলালের পড়াশোনার ও অন্যান্য ব্যবস্থা ক'রে দেবো, ততদিন বরং"—সতেজ কণ্ঠে অনীতা বলিয়া উঠিল, "দাদামণি যতই কেন আপনি বলুন, ওকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে আমি পারবো না" বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিন্তু কোন ব্যবস্থা হোল না। পরদিন প্রভাতে হরদয়ালকে মৃতাবস্থায় বিছানায় পাওয়া গেল। ডাক্তাররা বলিলেন, অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় মাথার শিরা ছিঁড়ে মৃত্যু হয়েছে। ইহার পর হরদয়ালের পুত্র-পৌত্ররা ব্যবসা, বিষয় নিয়া এমন বিষ উদ্‌গীরণ করিল, যে বাড়ীঘর গেল রিসিভারের হাতে, গদি গেল সাহা মহাজনের কাছে। মা শীতলা অনীতার মাতাকে যত শীঘ্র পারিলেন সংসার যাতনা হইতে মুক্তি দিলেন, কিন্তু তার জলুনিটা রাখিয়া গেলেন, একটি মাত্র সন্তান অনীতার গায়ে। অনীতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাহাকে বাড়ীর একটা নিকৃষ্ট ঘরে রাখিল, এবং যতটা পারিল নিজেরা তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিল। এমন সময় কোথা হ'তে আসিল শ্যামলাল। বেহুঁস অনীতাকে লইয়া আসিল তার কুঁড়ে ঘরে। আহার-নিদ্রা ভুলিয়া হৃদয়ের স্নেহমমতা নিংড়াইয়া কী তার সেবা, কী তার যত্ন! এইভাবে পুনর্ব্বার শ্যামলাল আসিল তার জীবনে।

ছয় মাস পরে। অনীতা একটু হাঁটিতে পারে। সেদিন সন্ধ্যা কালে, শ্যামলালের কুঁড়েঘরের বারান্দায় অনীতা বসিয়াছিল। মনে পড়ে---মাত্র ক'টা বছর পূর্ব্বে তার জীবন কি ছিল। এই সন্ধ্যায় সুচারুর সঙ্গে বেড়ান, তার মিষ্টি অনুভূতি এখন তার মনের নিভৃত কোণে স্মৃতির সঙ্গে জড়ান আছে। একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে আসিয়া বলিল, "মাসীমা, ভটচায্‌মশাইকে বলবেন আমাদের বাড়ী কাল লক্ষ্মীপুজো করতে যেন যান।" অনীতা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিতে পারিল না। যাজক ব্রাহ্মণের সে ঘরণী তাহার দেহ-মন যেন একটা কাতর ধিক্কারে আছড়াইয়া পড়িতে চাহে। এমন সময় শ্যামলাল আসিল। সেই মেয়েটিকে বলিল, "নন্দা, তুমি বাড়ী যাও, আমি ঠিক কাল সময়মত যাবো।" তারপর অনীতার হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিল, "আর এই ঠাণ্ডায়

বাইরে থেকো না ঘরে চল।" অনীতা ক্ষীণ দর্পভরে বলিল, "আমি নিজেই বেশ যেতে পারবো।" অনীতা দেওয়াল ধরিয়া অগ্রসর হইল। শ্যামলাল তবু তার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। অনীতা একবার কি সন্দেহে শ্যামলালের পা-ফেলার দিকে চাহিয়া একটা কঠিন দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্যামলালকে যেন নীরবে ভৎর্সনা করিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্যামলাল সভয়ে বলিল, "কী হ'লো, কাঁদ্‌ছো কেন?" অনীতা সক্রোধে বলিল, "তুমি আমাকে এই দুরন্ত বসন্ত রোগে সেবা ক'রে যেমন বাঁচিয়েছো, তেমনি আমাকে অপমান করার সুযোগও পেয়েছো।" শ্যামলাল হতভম্ব ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এসব বাক্য তার মতন নির্ব্বোধ লোকের অবোধ্য। তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া অনীতা যেন আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি অস্বীকার করবে, যে খোঁড়া পায়ের চলন অনুকরণ ক'রে তুমিও খুঁড়িয়ে হাঁটছিলে।" শ্যামলাল বিমূঢ় ভাষায় বলিল, 'না'। 'না? তুমি ভাবছো, বসন্তে যখন আমার চোখ একটা নষ্ট হ'য়ে গেছে, তখন তোমার নষ্টামী আমি দেখতে পাইনি? আমি আজ এই কাল রোগে খোঁড়া, কাণা,'—অনীতা দ্বিগুণ ভাবে কাঁদিতে লাগিল। শ্যামলাল লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া জিব কাটিয়া বলিল, "আরে ছি, ছি, এ কি বল্‌ছো, আমি যে সত্যই খোঁড়া। সেবার যখন কর্ত্তাদের গদি মহাজনের কাছে বাঁধা পড়লো, তখন, আমাদের অনেকের তো চাকরী গিয়েছিল। আমি গামছা কাঁধে ক'রে ফিরি করতাম। সেই সময় একটা গাড়ীর ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে আমার এই পাটার এ পাশের হাড়টা ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখালে হয় তো ভাঙ্গা সারতো, তা দেখান তো হয়নি; তা যাকগে, তুমি ভুল বুঝে শুধু শুধু মনে কষ্ট পেওনা।"

বিশ বছর কাটিয়া গিয়েছে। অনীতা তার অভিশপ্ত জীবনটাকে অনেকটা সহ্য করিয়া আনিয়াছে। পাশের বাড়ীর সেই নন্দা মেয়েটির খুব অসুখ। শ্যামলাল প্রত্যহ তাহার মঙ্গলের জন্য নারায়ণকে তুলসী দেয়। দু'পুরে দোকানে খাতা লিখতে যায়। সে জন্যে প্রত্যহ দু-বেলা তার আহার করা হইয়া উঠে না। অনীতা অনুযোগ করিয়া বলে, "এই রকম ভাবে পরিশ্রম করলে কি ক'রে বাঁচবে। শ্যামলাল সহাস্যে বলে, আর কি, কটা বছর। খোকা মানুষ হ'লে আমরা তখন দুজনে কাশীবাস করবো।" খোকা কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করে কারখানায় কাজ নিয়েছে। পয়সার অভাবে তার পড়া হয়নি, এই দুঃখ অনীতার হাড়ে হাড়ে আছে।

নন্দাদের বাড়ী কান্নার রোল। প্রতিবেশিনীদের মহলে দুঃখে সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা চলে—"কি চিকিৎসে মা! কত বিলিতি ডাক্তার, বিলিতি নার্স, সবই মাটি, কিছু না।"

এমন সময় খোকাকে কাহারা ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল। কলের দুর্ঘটনায় খোকা আহত। কারখানার ডাক্তার একদিন মাত্র দেখিতে আসিলেন। চিকিৎসা অনীতার গহনা বেচিয়া চলিল। শ্যামলাল তার দোকান যাওয়া বন্ধ করিয়া নারায়ণ নিয়া বসিয়া রহিল।

ঘোর বর্ষারাতে খোকা সকল চিন্তার অবসান করিয়া চলিয়া গেল। সেদিন শ্যামলাল তার গৃহদেবতার পূজা করিতেছিল, এমন সময় অনীতা নিঃশব্দে আসিয়া নারায়ণ-শিলা আসন হইতে তুলিয়া লইল। শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আরে কর কি, কর কি, ছি, ছি,—"শ্যামলাল জোর করিয়া অনীতার হাত হইতে ঠাকুর কাড়িয়া লইল। অনীতা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "না কিছুতেই পারবে না তুমি ঠাকুর পূজো করতে, ঠাকুর দেবতা জগতে নেই, এ সব ফাঁকি। তোমার দিনরাতের কৃচ্ছ্র তায় ঠাকুর তোমায় কি দিলেন? ডেকো না ভগবান্‌কে।"

শ্যামলাল সস্নেহে অনীতাকে নিজের পাশে বসাইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া ধীর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "ও কথা বলতে নেই, তিনি কি এত ছোট যে পূজোয় খুসী হয়ে পুত্র-বৈভব দেবেন। এত হীন কি দেবতা হন? সকল সুখ-দুঃখের তিনি অতীত, তাই তিনি নারায়ণ, শিব।"

ইহার একবৎসর বাদে একদিন নন্দার মা আসিয়া বলিলেন, "আমার নন্দার আজ মৃত্যুবার্ষিকী, কীর্ত্তন হবে, শুনতে চলুন। আপনার দাদু আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর গদিতেই কি না আমার বাবা কাজ করতেন।"

নন্দার মা অনীতাকে সব দেখাইতে লাগিলেন। নন্দার জীবনের প্রত্যেকটি দ্রব্য আলমারিতে সুন্দর ভাবে সাজান। তার একটি প্রকাণ্ড অয়েলপেনটিং হলের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুল দিয়া সাজান। ঘর জোড়া গালচে পাতা, সেখানে কীর্ত্তন বসিয়াছে। নন্দার জীবনীলেখা বই সকলকে বিতরণ করিতেছেন। নন্দার মা বলিলেন, "নন্দার নামে একটা হাসপাতাল খোলা হবে।" "এই শোকসভায় আহূত হইয়া কত রাজা-মহারাজাও আসিলেন। ফুলে ফুলে নন্দার ছবিটাকে তাঁরা প্রায় ঢাকিয়া ফেলিলেন। অনীতা চারিদিকে চাহিয়া এই ঐশ্বর্য্যে-ঘেরা শোকসভাটিকে দেখিতে দেখিতে ভাবিল, ঐশ্বর্য্যে কি শোক-দগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া দেয়? সে হঠাৎ নন্দার মায়ের হাত দুটি ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কি বলিতে গিয়া কিছু না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। কে একজন বলিল, "পুত্রশোকে ভদ্রমহিলার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে।"

বাড়ী আসিয়া দেখিল, শ্যামলাল প্রদীপের স্বল্প আলোয় ঝুঁকিয়া কি একটা জিনিষ দেখিতেছে। অনীতাও ঝুঁকিয়া জিনিষটি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। 'এ কি! এ যে খোকার ফটো। কোথায় পেলে? কখনো তো তার ফটো তোলা হয় নি।" সে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা সহ ছবিটি লইতে গেলে একটী কাগজ শ্যামলালের হাত হ'তে পড়িয়া গেল। "এটা কি? এ যে একশো টাকার চেক্!" শ্যামলাল শান্ত, অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, কারখানায় আজকাল যুদ্ধের দিনে শ্রমিকদের ফটো তোলা হয়, এ সেই, এক বৎসর ঘুরে ঘুরে আজ এটা পেলাম। 'আর এটা,'—বলিতে বলিতে শ্যামলালেরও গলা যেন ধরিয়া আসিল, "খোকার বাকি মাহিনে আর দুর্ঘটনার খেসারৎ কোম্পানী দিয়েছে।"

অনীতা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া নীলবর্ণ মুখে বলিল, "এর পরেও তোমার ভগবান্?" চেক্‌টাকে দৃঢ় মুষ্টিতে পাকাইতে পাকাইতে হঠাৎ কিসের আলোড়নের সঙ্গে সজোর আঘাতের শব্দ হইতে প্রদীপটি নিভিয়া গেল। শ্যামলালের পায়ের উপর কী যেন নরম পদার্থ। শ্যামলাল তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িয়া ব্যস্তভাবে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কহিল, "নারায়ণ, নারায়ণ।"

জীবনের ঝঞ্ঝাট

(রসরচনা)

শ্রী বিরূপাক্ষ

পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাঁরা চলবার চেষ্টা ক'রে থাকেন—আমি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বিধাতা আমাকে সে সুখভোগ ক'রতে দেবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছেন। আমি আমার জীবনটাকে পর্য্যালোচনা ক'রে বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝছি যে, গীতার মর্ম্মবাণী আমার ওপর দিয়ে পুরোপুরি পরীক্ষার জন্যে ভাগ্যবিধাতা উঠে প'ড়ে লেগেছেন। গীতার সারমর্ম্ম হচ্ছে যে 'বাপু হে, সংসারে এসেছ অবিরত কর্ম্ম ক'রে যাও—ফলের প্রতি আগ্রহ দেখিও না, যদি তা দেখাও তা হ'লে ম'রবে, তোমার দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে।

কথাটা বড় লাগসই—সেটা খুব হৃদয়ঙ্গম ক'রেই সংসারে চলি, কারণ আমি জানি আমার ভাগ্যে মাকাল ফল কিম্বা দড়কোঁচা মার্কা ফল ছাড়া আর কিছু জুটবে না; কিন্তু না চাইলেও দেখতে পাচ্ছি ফল ক্রমাগত ফলছে, অবশ্য বাংলায় নয়, ইংরিজিতে।

সম্প্রতি ট্রামে উঠতে গিয়ে সহযাত্রীদের তাড়নায় একদিন 'ফল্' হ'য়েছে, রাস্তায় আঁবের খোসায় একদিন 'ফল্' ফল্তে ফল্তে সামলে যাওয়া গেছে এবং আর একদিন সিঁড়িতে কোনরূপ নেশাভাঙ্ না-করা সত্ত্বেও যা 'ফল' হ'ল তাতে এ যাত্রায় যে কি ক'রে টিঁকে যাওয়া গেল সেইটেই এখনও বুঝতে পাচ্ছি না। ক্রমশঃ আমার অবস্থা যুদ্ধের শেষ বরাবর "ইম্ফলে" জাপানীদের যে অবস্থা হ'য়েছিল প্রায় তাই হ'য়ে আসছে—এট বেশ বুঝতে পাচ্ছি। 'যাউচি সড়ক' দিয়ে যেভাবে মিত্রপক্ষের ঠেলায় প'ড়ে শত্রুদের ছুটতে হ'য়েছিল ঠিক সেইভাবে আমারও ছোটবার দিন এসে গেছে। এখন চতুর্দ্দিকে কণ্ট্রোল রয়েছে ব'লে প্রাণ 'যাউচি' 'যাউচি' ক'রলেও বোধ হয় ঠিক সুবিধে ক'রে বেরুতে পারছে না।

জীবন-যাওয়া ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার কিন্তু জীবন-রাখা যে এই রকম ঝঞ্ঝাটের কাজ তা চারুধারের ঠেলায় যা মালুম করাচ্ছে তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি—আপনারা কেউ হয়তো বুঝছেন না, কিন্তু আমায় প্রতিদিন পরম পিতা পরমেশ্বর আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের তর্পণ করাতে করাতে বোঝাচ্ছেন।

সকাল বেলায় একটু চা খাওয়ার অভ্যাস আছে মশাই! কিন্তু এক চামচ দুধ, সকাল ৮টার আগে মিলবে না—যদিও বা দাম দিয়ে সের দেড়েক ক'রে টাকায় কিনলেন তাও সেই আদি ও অকৃত্রিম জলীয় বস্তু ছাড়া আর কিছু তাতে নেই। দুধের নামে যে জিনিষ আমরা পান করি তা আর যাই হ'ক তা যে মা ভগবতীর বাঁট থেকে নিঃসৃত হয় না—এটা বোধ হয় আপনারাও স্বীকার করবেন।

অথচ মনে করুন—জেনে শুনেও সে-জিনিষ আমাদের কিনতে হবে, যেহেতু ডাক্তারে ব'লেছে, 'ছেলেদের দুধ খাওয়াও, তা না হ'লে আর কি পুষ্টিকর খাবে?' যদি না খাওয়াই তা হ'লে জগতের সমস্ত শুভানুধ্যায়ীরা ব'লবেন, 'ওঃ, লোকটা কী চামার দেখেছ, ছেলেপুলেদের একবাটি দুধও খাওয়ায় না!

অতএব এ সমস্ত স্মরণ ক'রে রোজই এ ঝঞ্ঝাট পোয়াচ্ছি। কিন্তু তাই কি নিশ্চিন্তে পোয়ানো যায়—গিন্নি রোজই চেঁচাচ্ছেন, "একটু সকাল সকাল উঠে ভাল গরুর দুধ দুইয়ে আনতে পার না?" যদি বলি "হ্যাঃ, আমার আর কোন কাজকর্ম্ম নেই, কে কোথায় গরুর দুধ দুইছে আমি সেখানে ভাঁড় নিয়ে গিয়ে ব'সে থাকি।"

তিনি আমার চেয়ে আরও কয়েক ডিগ্রি গলা চড়িয়ে ব'লে ওঠেন, "সব্বার বাড়ীর লোকই তাই ক'রছে।"

আরও প্রতিবাদ করি, ঠিক সেই সময় গিন্নি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—পাশের বাড়ীর চক্রবর্ত্তী মশাই নাদুস্ নুদুস্ ভুঁড়িটি দোলাতে দোলাতে একটি বালতি হাতে নিয়ে কোথা থেকে দুধ দুইয়ে আনবেন এর পর আর উত্তর দেওয়া চলে কি?

দু' আনা দিয়ে খবরের কাগজ কিনি কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে পড়ি কখন বলতে পারেন—অথচ দেশ আছে কি গেল তার তো একটা খবর নেওয়া দরকার? কিন্তু নেব কি ক'রে? বাজারে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না অতএব 'মাছ আনো' তা না হ'লে ছেলেপুলেরা মুখে ভাত দেয় কি ক'রে?—ছেলেমেয়েদের পড়া ব'লে দাও, তিনদিন মাষ্টার আসেনি—কাপড় নেই, পারমিট যোগাড় কর—পারমিটে শাড়ী আনবে না ধুতি আনবে, না পাঁচ গজ মার্কিণের বিছানার চাদর এনে গুষ্টিবর্গ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়বে—এই নিয়ে তিনদিন ধ'রে জটলা কর—সরষের তেল পাওয়া যায় না, তোমার ঘরে যেটুকু তেল আছে তাই হাতে নিয়ে বাইরে যাকে যাকে মাখাতে হবে তার আয়োজন কর—পুজো এসেছে তুমি সবার মুখে হাসি ফোটাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও ছাতার হাতা নেই, শিক নেই, সেগুলো আবার কোথায় গেল তাই খুঁজে পেতে বার ক'রে যথাস্থানে লাগাও, তা না হ'লে সবাই কি ভিজে ভিজে চ'লবে?

বাড়ীর সব ঠিক ব্যবস্থা ক'রে যথাসময়ে অফিসে গিয়ে

হাজির হও—ট্রামে-বাসে, মাঝ রাস্তা থেকে উঠতে না পার ডিপোয় গিয়ে ওঠ—যথাসময়ে হাজিরা দিয়ে যে-কোন সময় রাত্তির আটটা ন'টা নাগাদ আপিস থেকে বেরোও—আপিসে খাও না খাও ক্ষতি নেই, ওপর-ওয়ালাদের সর্ব্বসময় খুসী রেখো—সাহেব কখন হাসছেন, কখন কাসছেন, কখন চুপ্ সোচ্ছেন—কাজের চেয়ে তার খবর রাখো আগে।

যদি এর ওপর আপ্‌টুডেট হ'তে চাও, তা হ'লে ফুটবলের মাঠে দুপু'র থেকে ব'সে থাক, সিনেমার অভি-নেত্রীরা কে নাচছেন কে কাঁদছেন তা নোটবুকে টুকে রেখে দাও—এবং এই সব খবর সংগ্রহ ক'রে বেলা পাঁচটায় কি সাতটায় তিনটে থলি হাতে নিয়ে, গলায় একটা তেলের কানেস্তারা ঝুলিয়ে বহাল তবিয়তে অফিস থেকে বাড়ীর জন্যে রেশন আনো! বাড়ীতে ঢুকেই কি সেদিনকার ঝঞ্ঝাট কাটলো না কি? রামঃ!

'খাঁদা' ক'দিন ধ'রে বাদলার হাওয়া লেগে খ্যাং খ্যাং ক'রছে, তার জন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে ছোটো—সারাদিন গিন্নী রান্নাঘরে তেতেপুড়ে গরমে কাটিয়েছেন আর আমি তো সারাদিন ফ্যানের হাওয়া খেয়ে আড্ডা দিয়ে এলুম কি না, তাই রাত্তিরটা আর তিনি কোন ঝক্কি পোয়াতে পারেন না—অতএব রাত দু'টোর সময় পাল্টুটা পরিত্রাহি চেঁচালে তাকে একটু কোলে ক'রে ভোলাও—'ক্যাংচা' কাঁথাটাকে ভিজিয়েছে ওটা বাইরের বারান্দায় ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন কাঁথায় ওকে শুইয়ে দাও ইত্যাদির ঠেলায় চক্ষু অন্ধকার!

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফলে আমাকেই বুঝে বুঝে আক্কেলটা দেওয়া হ'চ্ছে। ভেবেছিলুম যুদ্ধের পরে ঝঞ্ঝাট কাটবে, কিন্তু ক্রমশঃ দেখছি যে 'এ্যাটম বম্' যেমন না খেলেও পরে তার আঁচে ঝলসে মরে যেতে হয় আমার অবস্থাও হ'য়েছে প্রায় তদ্রূপ বা তার চেয়ে খারাপ—ঝলসে ম'রছি না সত্য—শুধু এ বাজারে জ্বল্‌ছি আর ঝল্‌সাচ্ছি।*

মহানগরীর বুকে অন্ধকার নীরন্ধ্র নিবিড়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আমি যে দেখেছি চলে রাজপথে কঙ্কালের সারি,
দূর দূরান্তর থেকে যাত্রা সুরু করেছিল সবে
লক্ষ্যহীন—নিরুদ্দেশ। বুভুক্ষুর হাহাকার-রবে
আকাশ বাতাস পূর্ণ। ভাগ্যহারা চলে পথচারী
সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন—শিশু বৃদ্ধ যুবা নরনারী।
পথপার্শে ছায়া নাই, মেঘ নাই তীক্ষ্ণ-নীল নভে,
অতীতের শ্যাম স্বপ্ন নয়নেতে মুছে গেছে কবে !
তাহাদের কথা কভু বল আমি ভুলে যেতে পারি ?

পরিত্যক্ত পল্লী, সেথা শূন্য সব ভগ্ন জীর্ণ নীড়।
রাত্রির বাতাসে ফেরে বুকফাটা তীব্র দীর্ঘশ্বাস,
মহানগরীর বুকে অন্ধকার নীরন্ধ্র নিবিড়,
মরু মরীচিকামুগ্ধ—অন্ন নাই—কোথা তোরা যাস্ ?
নিদ্রিত নগরপথে ছায়ামূর্ত্তি করিয়াছে ভিড়,
আজো ঘুম আসে চোখে ? আজো হেথা ঐশ্বর্য্য-বিলাস ?

* বিরূপাক্ষ বাবুর বহু ঝঞ্ঝাট, সে খবর প্রকাশ ক'রতে গেলে মহাভারত ছাপতে হয়। আমরা বেতারের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাছ থেকে তাঁর গোপন একটি ডায়েরী পেয়ে এর কতকাংশ প্রকাশ করলাম।—সম্পাদক।

প্রজাপতয়ে নমঃ (রস-নাটিকা)

—বাণীকুমার

[প্রারম্ভ]

ভূ-সম্পত্তিশালী ব্যোমকেশ লাহিড়ী সংস্কার মানেন না। তাই তিনি কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হলেও, কন্যা কুমুদিনীর বিবাহ দেবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন নি। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর আধুনিকা কন্যা অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার মাত্রা কিঞ্চিৎ লঙ্ঘন ক'রে চলেচে। লাহিড়ী মশায় কন্যার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে বিশেষ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। কয়েক দিন চিন্তার ফলে তিনি একটি উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করলেন, যে উপায় তাঁর আধুনিকতমা কন্যার মনকে বিদ্রোহী ক'রে তুলবে না, অথচ সকল দিক বাঁচানো যায়। অতএব তিনি একটি আধুনিক স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করলেন। এই বিবাহের দূত হোলো খবরের কাগজ। বিজ্ঞাপন দেওয়া হোলো—পাত্র চাই ইত্যাদি। বিজ্ঞাপন কাগজে পড়বা মাত্রই নানা শ্রেণীর ভাগ্যান্বেষীর দল, মধুর গন্ধে মক্ষিকার মত উড়ে এসে জুটতে লাগল।

আজকে বাইরের হলঘরে পাত্রের ভিড় লেগেচে—যেন সব চাকরীর উমেদার, কারোর মুখে কোনো কথা নেই—কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করচে।

বাইরের মহলের একটি সুসজ্জিত ভিতরকার ঘরে ব'সে কুমুদিনী রংবেরঙের বিচিত্র রঙ-করা শাড়ীর মতো বিচিত্রিতা হ'য়ে স্বয়ংবরা হবার আগে পাত্রদের তালিকা দেখে—প্রত্যেককে এক একটি নম্বর দিতে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে সেখানে চঞ্চল পদক্ষেপে প্রবেশ করলে তার প্রায়-আধুনিকা পরিচারিণী চমৎকার। চমৎকারের ব্যগ্র কণ্ঠ এবার কাঁসায় ঘা' মারলে।

[চমৎকারের বাজখাঁই গলা শোনা গেল।

চমৎকার। ওমা কুমুদ, বাইরের ঘরে যা দেখে এলুম—যেন রথের মেলা! কত হাসি আর একলা হাসি, তাই তোমার কাছে ছুটে আসচি—সে মেলা যদি একবার দেখো—তা হলে—

কুমুদ। তা'হলে তোর রথদেখা আর কলাবেচা দু'টোই হয়—নয়—চমৎকার! যা' তুই মেলায় ফুল বেচ্‌গে যা—কুমুদের লোভে হয়তো চমৎকারের মন রাখতে প্রত্যেকে চড়া দাম দিয়ে ফুল কিনবে—এই সুযোগে তোরও দু' পয়সা হয়ে যাবে!

চমৎকার। আমার বিয়ে নাকি গো যে—ফুল বেচতে যাব?

কুমুদ। তাতে ক্ষতি কি? আমি না হয় একটা গোবর্দ্ধনকে বেছে দেবো এখন্।

চমৎকার। মাগো কি যে বলো? মেয়েছেলে আবার ক'বার বিয়ে করে গো!

কুমুদ। মুখে আগুন! সাজের তো খুব বাহার দেখচি; মুখে পাউডারের আভা যে ফুটে বেরুচ্ছে!

চমৎকার। ওমা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবো না আজকের দিনে? তাইতে এতো দোষ? কেন আমার কি সাধ আহ্লাদ কিছু নেই নাকি? তুমি বাপু বড়ো তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে কুচ্ছ করো!

কুমুদ। কেন কষি শুনবি? চোখে দেখচিস্—আমি একটা দরকারী কাজ কচ্চি—তুই এসে এত্তো বকতে শুরু করে দিলি কেন? গলা নয়তো, যেন শাঁখ বাজ্‌চে! সাধে কি বলি হাঁড়ি চাঁচা—।

চমৎকার। দেখচো, এই মজার সুখবরটা দিতে এলুম—আর মিনি—মুখ-ঝাপ্‌টা শুরু হয়ে গেলো?—এইতো কলির ধর্ম্ম!

বলতে এলুম ভাল কথা
বারুদে আগুন লাগে,
আর ফাগুন মাসের মিঠে বাতাসে
গায়েতে জ্বালা জাগে!

—তোমার হয়েছে তাই! হা হরি—এতো দুঃখু আমাকে সইয়ে আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখবে। আমার একে হোমোপ্যাথির ধাত—এতো হৃতচ্ছেদা আমার এই নরম ধাতকে দুইয়ে বেঁকিয়ে দিয়ে আমাকে কাঁদিয়ে দেবে যে!—আমার কি মরণ নেই গা—আর কত সয় এই দুর্ব্বল শরীরে—

কুমুদ। থাম বলচি চমৎকার, আর ন্যাকাপনা করতে হবে না। যমের অরুচি! সামান্য একটা কথাকে পাকিয়ে যেন পাহাড় করে তোলে? চুপ কর এখুনি—ফোঁসফোঁসানি থামা'—নইলে জানিস্‌ তো রেগে গেলে আমি তোর কান মুলে দেবো!

চমৎকার। অমন করে তুমি আমায় বলো—আমার পেরাণে ব্যথা লাগে না? —এই দেখো শুরু হয়েছে—আমার বুক ধড়পড় কচ্ছে, বুকে বড্ড লেগেচে—ওঃ—জানো আমার মুচ্ছো যাওয়া ধাত এখুনি কাত হয়ে পড়বো। —ওমা মাথা ঘুরতে লেগেচে যে—ওডিকলন আছে কি? দাও তাই এক ঘটি মাথায় থাবড়ে,—নইলে এই শুভকর্ম্মে আমি মুচ্ছো গেলে—সব পণ্ড হয়ে যাবে!

কুমুদ। চমৎকার!—জোড়হাত কচ্চি—আর বাড়িয়ে তুলিসনি—তুই যা অভিনয় করতে পারিস—থিয়েটারে গেলে তুই একটা চাকুরি পেয়ে যাবি!

চমৎকার। ছিয়েটার—কী বলো যে—ছীঃ—!-যা-ট—বক্ত কি আরো ব'লবে—

কুমুদ। নাও গো ধনি—! মান-অভিমান রাখো!—কী বলছিলি বল্—শুনচি!—কেঁদে-রেঁদে ভয় দেখিয়ে যে-রকম ফন্দি ক'রে হোক্—নিজের কোট্ বজায় রাখতে খুব জানিস্!—বল্ না কী—পোড়া জিভটাও শুকিয়ে উঠলো না-কি, মিছরির রস ঢেলে রসিয়ে দোবো?—না—মিনতি ক'রতে হ'বে—ওগো চমৎকার—দুরন্ত জিভকে আড়ষ্ট ক'রে বেচারাকে আর কষ্ট দিয়োনা, দু'পাটি দন্তরুচি বিকাশ ক'রে কী বক্তব্য—শেষ করো।

চমৎকার। তোমার কথা শুনলে জিভ টাক্‌রার ভেতর সেঁধিয়ে যায়। কী আর ব'লবো!—মনের দুঃখে—

কুমুদ। বনে যা'—

চমৎকার। তা' হ'লে তো বাঁচতুম—তোমার হাত এড়াতুম—

কুমুদ। আর হাড়ে বাতাস লাগতো—কী বলিস্?—এখন মাথাটা তো ঠাণ্ডা হ'য়েছে—বলনা কী ব'লছিলি—

চমৎকার। বোলবো ব'লেই তো ছুটে এসেছিলুম—তুমি আমার আত্মবিচ্যুতি ঘটিয়ে দিলে, তা কী ক'রবো!—

কুমুদ। এখনো বক্‌বি? মানিনীর মান কি এখনো ভাঙেনি?

চমৎ। তা' তো বলিনি। কথাটা শুনতে চাও তো-শোনো—বলি তবে—রথযাত্রার মেলা না ব'লে যদি বল্‌তুম—চাঁদের হাট বসেছে—তখন বোধ হয় এক্টোটা—

কুমুদ। তা' হ'লে—সেই চাঁদগুলো মালায় গেঁথে তোর গলায় চাঁদমালা ক'রে পরিয়ে দিতুম।

চমৎ। ঠাট্টার কি হদ্দিদিশা নেই—মা-গো—কথা শোনো! —তোমার চাঁদেরা আমার গলা আঁকড়ে ধর্‌বে কেন—কী দুঃখে?

কুমুদ। দুঃখে না হয়—সুখেই তোর গলায় সবাই মিলে একজোটে ঝুল্‌বে। তা'তেও মন উঠবে না?

চমৎ। আমার অতো খাঁই নেই—যা' সব এয়েচেন—দেখলে পিত্তি চ'ড়ে যায়। যেগুলি জুটেচেন—তা'র ভেতর পাঁচটি—সকলের সেরা।

কুমুদ। কী রকম---তা' হ'লে পঞ্চপাণ্ডব এসে হাজির বল্—আমাকে এ-যুগের পাঞ্চালী সাজতে হবে না কি রে চমৎকার! দেখিস্! তোকে হয়তো পাঞ্চালীর পঞ্চায়েতী করতে হবে। আচ্ছা, বল্ সেই পঞ্চপাণ্ডবের বৃত্তান্ত।

চমৎ। তা'দের আদি-অন্ত সব বল্‌বো। একটি দু'পাটি দাঁত-বাঁধানো বাহাত্তুরে—হাতে একটা মোটা চৌকোনো খাতা—কী সব হিজিবিজি কাগের ছানা লেখা, নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে—সেইগুলো বিড়বিড় ক'রে একধারে ব'সে আওড়ে যাচ্চে, আর একটা সিদ্ধিখোরের মত ঢুলুঢুলু চোখ দু'টো আধো-আধো বুজে কী ধ্যান কর্‌চে—(তোমাকেই বোধ হয়)—

কুমুদ। চুপ কর্—তারপর।

চমৎ। ধম্‌কোনা বাপু, ভুলে যাবো। তারপর—একটি টেকো—মাথাজোড়া টাক্, তবুও দু'চারগাছা চুলেতেই কী তেড়ীর নক্সাপাতা খেলিয়েচে, এঁরও হাতে এক বাণ্ডিল মোটা খাতা, আর একটি চাঁচাছোলা ভদ্দরলোক—মনে হোলো যেন গাল থেকে কে খানকটা মাংস খাবলে নিয়েচে, আর নাকে অজান্তে কে যেন একটা হাতুড়ী কসিয়ে দিয়েচে। শেষটি বড় চমৎকার।

কুমুদ। শেষটি তা' হ'লে আমাদের চমৎকারের পাওনা-গণ্ডা লাভের কড়ি—

চমৎ। আঃ—পোড়াকপাল আর কি! কিন্তু বাপু কথার ওপর কথা বোলোনা—বেভুল হ'য়ে যাবো। কথাটা সায় কবি, এই—সে কি কিম্ভূতকিমাকার! যেন একটা কালো কুচকুচে তালা—তা'র ওপর কপালে সিঁদুরের লম্বা ফোঁটা, মাথায় ঝাঁকড়-ঝাঁকড় ঝাঁকড়া চুল—এয়া দাড়ি—গোঁফ পর্য্যন্ত ঝুলচে—তৌলিক ক'সলে দাড়ি টাই আসল লোকটার চেয়ে বেশী হবে—ওজন বল্লে—সাড়ে তিন মণের কম নয়, বলে—'দাড়ি নয়তো দাড়ির গাড়ী—চাম্‌চিকেদের বাগানবাড়ী'।

কুমুদ। বলিস্ কিরে, তা' হ'লে তো দেখতে হচ্চে—ভারী মজা হবে। আচ্ছা, বাবা জানেন তো?

চমৎ। কত্তাম'শায় আর জানেন না—খুব জানেন, তিনি তোমার মতটা নেবার জন্যেই তো ব'সে রয়েচেন।

কুমুদ। তা' হ'লে সব ক'টাকে বিদেয় ক'রে দিয়ে—বল্‌গে যা' তোর পাঞ্জাবী শুবে—তা'দের জবাব হ'য়ে গেছে। তারপরে এই পঞ্চরত্নকে একে একে ডেকে আন্।

চমৎ। বেশতো—এখুনি।

কুমুদ। দেরী করিস্‌নি—বাহাত্তুরেকে ডাক্ আগে।

চমৎ। এই যাই···কিন্তু আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে ফুক্‌নি দোবো।

কুমুদ। আড়ালে কেন, সামনে থেকেই বোল্‌চাল্ দিবি! এখন যা' বল্‌লুম—তাই কর্‌গে যা'।

চমৎ। নম্বর ঠিক করেচো?

কুমুদ। হাঁা, হাঁা—১২-(ক) নম্বর। হা-হা-হা-হা-হা—ভারী মজা হবে, হাঁা চিঠিগুলো কই? এই যে—বাবা আবার ফাইল ক'রে রেখেছেন···বাবারও যেমন মাথা খারাপ। একটুও লজ্জা নেই?

—[কুমুদ চিঠিগুলি দেখ্‌তে লাগ্‌ল—কিছুক্ষণ পরে চমৎকারার সঙ্গে গোলোক গড়গড়ির প্রবেশ]

চমৎ। কুমুদ—এই ১২-(ক) নম্বর পাত্তরবাবু—উপোসচিত্ত!

কুমুদ। আপনি ১২-(ক) নম্বর—কই পাস্ দেখি?

চমৎ। পাস্ আমি আদায় ক'রে নিয়েছি। এই যে পাস্।

কুমুদ। বেশ: আপনার নাম?

গোলোক। শ্রীমান্ গোলোক গড়গড়ি—আপনার প্রণয়-প্রার্থী, শুধু পাস্ কেন—আমি ভালোবাসার পাসপোর্ট পর্য্যন্ত মজুত রেখেছি।

কুমুদ। বটে, কিন্তু মহিলাদের কাছে এ-ভাবে কখনো কথা কইবেন না।

গোলোক। কেন?—কারণ?

কুমুদ। কারণ?—কারণ এই যে—তা'র ফল ভালো নয়—

গোলোক। কিন্তু আমি অসংযমী নই, ব্রহ্মচারীর ত আমার অন্তর বিশুদ্ধ—সংযত-অকুণ্ঠিত-বিনম্র—

কুমুদ। তবে ভালোবাসার কথা পাড়চেন কেন?

গোলোক। ভালোবাসা!—সে তো পবিত্র জিনিষ। এই ভালোবাসার জোরেই চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে পেয়েছিল, বিল্বমঙ্গল ভগবানকে পায়,—এই ভালোবাসার কী মোহিনী শক্তি আছে—জানেন? বল্‌বো একবার বক্তৃতার ছলে—কত উদাহরণ চান্? পৌরাণিক—না ঐতিহাসিক-না আধিভৌতিক—না নৈসর্গিক—কিংবা আধ্যাত্মিক—কোনটা?

কুমুদ। গড়গড়ি ম'শায়—একটু কম কথা কইলে বাধিত হবো।—আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো, আপনার মত এক বৃদ্ধের কাছ থেকে এ-ভালোবাসার অনধিকার-চর্চ্চা শুনতে প্রস্তুত নই।

গোলক। বলেন কি—আমি বৃদ্ধ। আমার বয়েসটা আপনার কত অনুমান হয়, বলুন তো? মাত্র এই মাঘে ৩৬-বছরে পড়েছি।

কুমুদ। লোকের বয়স বাড়ে—আপনার দেখছি কমে' যায়—একেবারে ডবল মার্জিন রেখেছেন—

গোলোক। ও-আপনার ভুল ধারণা—আমার কুষ্ঠিটাও সঙ্গে এনেছি—এই দেখুন আমার জন্ম তারিখ—

কুমুদ। ও-কুষ্ঠি দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেদের ভোলাতে পারেন। ঐ অর্ডারী-তৈরী কুষ্ঠিটাই কি মস্তবড় প্রমাণ? আপনার বাঁধানো দাঁত, কলপ-দেওয়া চুল—আর পাকানো দেহই আসল প্রমাণ—যাকে বলে চাক্ষুষ প্রমাণ—

গোলোক। আজ্ঞে না—না—না—আপনার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে—আমি বেশ শক্ত আছি, দাঁত বাঁধিয়েছি---দাঁত তুলয়ে---এবড়ো খেবড়ো দাঁত well-set ক'রে নেবার জন্যে, চুলে পাক ধরেছে---ভাবনা-চিন্তায় আর বায়ুর প্রকোপে---

কুমুদ। তা' মানে—আপনি বায়ুগ্রস্ত—

গোলোক। তবেই বুঝুন আমার বয়েসটা বেশী নয়—যা' ভাবছেন—তা' তো একেবারেই নয়—

কুমুদ। বেশ—আমি আপনার বয়সের কথা প্রত্যাহার করছি—এই দিকে একবার আসুন—দেখুন তো এটা আপনার লেখা কি!

গোলোক। নিশ্-চ-য়—! হাঁ—আমারই লেখা! তা' হ'লে চেঁড়স-বিনিন্দিত ঐ কোমল করপল্লবে এসে প'ড়েছে এই দীনের প্রণয়-নিবেদন—আমার আনন্দ হ'চ্চে—গর্ব্ব হ'চ্চে—গৌরব-বোধ করচি—

কুমুদ। লজ্জা করেনা আপনার—সেই সেকেলে নব-বিবাহিত বকাটে ছেলের মত—"যাও পাখী বোলো তারে" মোনোগ্রাম-ওলা খামে পুরে একটা রিডিকিলাস্ চিঠি পাঠিয়েছেন—তাই নিয়ে আবার গৌরব? বুড়ো শালিকের নতুন ক'রে বুলি কপ্চানোর সখ হয়েচে নাকি? কী লিখেচেন একবার পড়ুন তো।—

গোলোক। নিশ্চয়—শুনুন তবে—

'ওরে চার পাখী যা'রে উড়ে চ'লে—
দিস্ তারে প্রাণের গুপ্ত কথা ব'লে।
যেরূপ নলরাজা দময়ন্তীর তরে—
পাঠিয়েছিল চিঠি কপোত-রাজে দূত ক'রে;
তেমনি আমিও পড়ে বাঁধা নব প্রণয়ডোরে,
পাঠাই এ-চিঠি সোহাগে আমার পরাণ-চোরে।
পক্ষীরাজ যদি হতাম ছুটিতাম দড়বড়।
জানায় ভালোবাসার মিনতি তোমার প্রেমিক--
গোলোক গড়্গড়ি'।

—দেখুন দেখি—একেবারে মর্ম্মের অনাবিল উদ্ঘাটন।

কুমুদ। আপনাকে বোধহয় বাতাস্তরে ধরেছে। ছি:—এই কি অজানা এক মহিলাকে চিঠি লেখবার রীতি?—তাও লিখতে জানেন না, ছন্দ, ভাব আর উপমাকে একবারে নাকানি-চোবানি খাইয়ে তবে ছেড়েছেন। যাক্—এখন বলুন তো গড়্গড়ি মশায়, আপনার পকেট দু'টো অতো অস্বাভাবিক রকম উঁচু হ'য়ে আছে কেন? কী আছে? আপনার ডাইনে-বাঁয়ে কি দু'টো ভগবান-দত্ত বড় বড় আব্, মাথা চাড়া দিয়ে রয়েচে?

গোলোক। রামঃ—রামঃ—ও-সব আবার কী! আব নয়—আঁব আঁব—আপনারই জন্যে অসময়ের দু'টো পাকা আঁব, চারটে পাকা টস্টসে আপেল, একটা ফুট, এক বোতল সুধাসঞ্জীবনী আর একটা ফ্রেঞ্চ্ জেলী—হর্লিক্স-ও একটা এনেছি—চায়ের' সঙ্গে হর্লিক্স-মিল্ক খেতে আমি বড় ভালোবাসি।

কুমুদ। আপনি বহুব্রীহি-সমাসে ছেলেমানুষ কিনা! আপনি একটি আস্ত পাগল—অ্যান্ ওল্ড ফাসল—কৃপার পাত্র আপনি—লোকের ইডিয়োসিন্ক্র্যাসির একটা সীমা আছে—আপনি দেখছি ছন্নছাড়া বাই-গ্রস্ত।---এক্ষুনি যাচ্চেন কোথায়? প্রণয়-পিপাসী আপনি, এরি মধ্যে পিপাসা মিটে গেল? বসুন ঐ চেয়ারটাতে—চমৎকার—ডাক্ সেই সিঙ্গিপোরটাকে—৪৭ (এ)—

চমৎকার। এই যে দোরগোড়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখেচি—আসুন গো ম'শায়—৪৭ (এ) নম্বর— (পঙ্কু পালিতের প্রবেশ)

কুমুদ। আপনি সিঙ্গাপোর?

পঙ্কু। কে আপনাকে ব'ল্লে—টের পেলেন কী ক'রে?

কুমুদ। আপনার চোখ-দু'টোতেই মালুম পাওয়া যায়। নাম কী?

পঙ্কু। যুগল শ্রীচরণের ধূলোর তলায় আশ্রিত শ্রীযুত পঙ্কু পালিত—

কুমুদ। অতো বড় নাম?

পঙ্কু। আজ্ঞে আপনার চরণ-আশ্রয় কামনা ক'রে এসেচি কি-না—তাই শ্রীচরণে আশ্রিত আমি, না বল্লে চলে কি----আপনাদের পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে কি পারি? আসল নাম পঙ্কু পালিত—

কুমুদ। কী করেন?

পঙ্কু। আজ্ঞে—করি খুব ভালো কাজ—সোনারচাঁদ বাবুর আমি ক্লেরক—তিনি খুব ধনী-গুণী—খুব উঁচুদরের মহাশয় লোক—তাঁরই private business—আমি তদ্বির দেখা-শোনা করি।

কুমুদ। ও-বুঝেছি, তা' এখানে কী মনে ক'রে?

পঙ্কু। আজ্ঞে একটা বিজ্ঞাপন দেখলুম কি-না, তাই আমি সোনারচাঁদ বাবুর হয়ে সুপারিশ করতে এসেচি। তাঁর কী মেজাজ, ব'লবো কি—(আপনি তো এখন ঘরের লোক বল্তে গেলে, বলতে দোষ নেই) দিল্ খুব উঁচু—মটরে মটরে গ্যারেজ ঠাসা, কোন্দিন কোন্টায় চড়বেন—তাই ঠিক করতে বাবুর তিন-ঘণ্টা বেরিয়ে যায়। আপনি যে-কোনোটি দরকার মত নিতে পারেন। বায়োস্কোপ যেতে চান্--গেলেন, থিয়েটারে যেতে ইচ্ছে হোলো---গেলেন, হাওয়া খেতে যেতে চাইলেন—গেলেন। তিনি আপনাকে বিশেষ আদরে আর সম্মানে রাখবেন—এ একেবারে লেখে দিতে পারি। তবে তাঁর ঘরে একটি স্ত্রী আছে কিনা—তাই তিনি লুকিয়ে হাল-ফ্যাসানে বিয়ে করতে চান্। খুব কনফিডেন্সিয়াল্--

কুমুদ। থামো—ভদ্রলোকের পালিত পরজীবী দৈবত গুণধারী ভাঁড় পঙ্কু পালিত---তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যোগ্যস্থান ঠিক ক'রে ফেলেছি। সেখানেই তোমাকে মানাবে। ওরে চমৎকার---এই লোকটাকে নিয়ে গাড়োয়ান আর দরোয়ানদের সঙ্গে বসিয়ে দিগে যা---সেখানে মনের মত সিদ্ধি মিল্বে। ইডিয়ট্।

পঞ্চু। আরে শুনুন, যাই বলুন আমার কথাটা শুনতেই হবে। ভালোই তো ব'ল্লুম---বিবেচনা না করেই যে চ'টে গেলেন,---এমন সুযোগ দু'বার কি আসবে? তখন আপশোষে মনে কষ্ট পাবেন।

কুমুদ। চমৎকার, কান ধ'রে এ-কে বার ক'রে দে'ত। ঘোড়ার চাবুক কসিয়ে ওকে একটু সংশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারিস? ননসেন্স!

চমং। আমিই দোবো নাকি বোলবার মুখপোড়াকে সায়েস্তা ক'রে---বেশ ক'রে বেলুন পিটিয়ে?

কুমুদ। না---কোচম্যানের ওপর ভার দিলেই হবে। আর দেখ---সেই জটাজুটকে ডেকে দে---১৪৯ (এ)—

চমং। আচ্ছা এটাকে বিদেয় ক'রে দিয়ে—তারপর ডাকছি ১৪৯ (এ) নম্বর বাবুকে। এই ইস্টুপিট---আয়—ড্যাবাডাবা চোখ বার ক'রে দেখ চস্ কি?

কুমুদ। অসভ্য! হ্যাঁ দেখুন গড়গড়ি ম'শায়, আপনি দর্শনীর টাকাটা আর সেলামী দিয়ে প্রস্থান করুন।

গোলোক। সে আবার কী?

কুমুদ। আজ্ঞে হ্যাঁ---তাইতো ব্যাপার---আপনার পক্ষে দর্শনী--আপনার যে কবছর বয়েস ততগুলো টাকা, আর সেলামী--এগারো টাকা—এখুনি রাখুন---

গোলোক। সে কি---তা' হ'লে কি স্বয়ম্বর-সভা মিথ্যে---শুধু টাকা রোজগারের ফাঁদ পাতা হয়েচে নাকি? বিয়ে তোলোনা, টাকা? টাকা কিসের? জুলুম না-কি? যদি না দিই?

কুমুদ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার পাবেন, তা'র বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

গোলোক। থাক্ আর বেশীদূর এগিয়ে দরকার নেই, কত টাকা তা' হ'লে দিতে হ'বে? আমার বয়েস ৩৯, তা' হ'লে ৩৯ টাকা---আর সেলামী---

কুমুদ। ৩৯ কি? বলুন—৭১...হিসেবের সময় গোলমাল করবেন না, আর সেলামী ১১ টাকা—সবশুদ্ধ ৮৩ টাকা—চেক্ নেওয়া হবেনা—নগদ—

গোলোক। ওরে বাবা,—এ-রকম স্ত্রীলোকের পাল্লায় তো কখনো পড়িনি! ভাগ্যিস্ একশো টাকা যৌতুক দোবো বলে সঙ্গে এনেছিলুম, নইলে হয়েছিল আর কি। ৮৩ টাকা? আচ্ছা সবশুদ্ধ ঐ ৫০ টাকাই হোলো।

কুমুদ। না—এক পয়সাও কম হবেনা, নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো—Tresspass charge দিয়ে।

গোলোক। ও বাবা, থাক্—থাক্—তাই—তাই—এই নিন্—কখনো যদি আশা থাকে—

কুমুদ। এ-মুখো আর কখনো হবেন না। যান্—এবার ছুটি—

গোলোক। তবু—মনে রেখো—যদি পড়ে কভু মনে—ওগো বিনোদিনী কুমুদিনী—

কুমুদ। আমাদের ডাকু খানসামার কড়া হাতের কাণমোলা না খেলে কি আপনার আক্কেল হবে না?

গোলোক। আহাহা—বিয়ে না ক'রেই এই ঠাট্টা!—তাইতো বলচি—বিয়ে আগে করো আমাকে, দেখবে তখন—কত কাণ-মোলা খেতে পারি; তবে শ্যালীর হাতের, খানসামা চলবেনা—বাবা! সে পারবোনা।

কুমুদ। বুড়োর কি ভিমরতি ধ'রেছে! মজা দেখ্‌বেন?

আশু। টাকা তো দিয়েচি, আর কেন—অপমানটা বাদ দাওনা, বাছা! (কাঁচকলানন্দের প্রবেশ)

চমং। ১৪৯ (এ) ম'শায় হাজির—

কুমুদ। এই বুড়োটাকে দরজা দেখিয়ে দে।···আপনি ১৪৯ (এ) নম্বর?

কাঁচকলানন্দ। হ্যাঁ—ঐ সংখ্যাই আমার—চার একে পাঁচ আর ন'য়ে চোদ্দ—সাত দু'গুণে—শুভ—শুভ—জয় শুভঙ্কর—বিশ্বনাথকী—!

কুমুদ। চেঁচাবেন না—ঐদিকে বসুন। চমৎকার—বুড়োকে তাড়া।

চমৎকার। ও বুড়ো—দেখচো কী—চ'লে এসো।

গোলোক। আবার বুড়ো? বুড়ো বললে আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়—জানো?

চমৎকার। আহা—ম'রে যাই আর কি—বলে—

ওরে বুড়ো—
রসের চুড়ো—
ঢোল্ বাজাবি আয়।
দধি খাবি
খনি খাবি
পাকা বক্সা খাবি আয়।

গোলোক। এ-অপমান—অপমান না—এ হ'চ্ছে প্রণয়ের পূর্ব্বরাগ। আশা—তুমি কুহকিনী নও—একদিন ফলবে। এখন দরজাটি দেখিয়ে দাওতো, বাছা! ট্রেন্ ফেল্ হ'য়ে যাবো, অনেক দূর থেকে এসেছি কি-না!

চমৎকার। আয়—আয়—আয়—তু—তু—হ—হু—
কোমলা গানে হাওয়ার দোলা—
আওয়াজ গঙ্গুর হু—
—এসো বুড়ো—আর কেন?

গোলোক। চ—লো। (প্রস্থান)

কুমুদ। আপদ্ গেলো। হ্যাঁ—১৪৯ (এ) সংখ্যক বাবু—আপনার নাম কী?

কাঁচকলানন্দ। শ্রীশ্রীশ্রীমদাচার্য্য ভৈরবপন্থী উৎকটতন্ত্রী সংহস্ত, অভয়ঙ্কর কাঁচকলানন্দ শক্তিসন্ধানী---

কুমুদ। ভয়ের নাম---কিন্তু কী উদ্দেশ্যে আপনার শুভাগমন?

কাঁচকলানন্দ। শক্তি—অর্থাৎ ভৈরবীর অন্বেষণে---

কুমুদ। বৈরাগ্যসাধনে কি অরুচি এসেছে?

কাঁচকলানন্দ। আরে সাধনে মুক্তি লাভের আশাতেই তো ভৈরবী-অনুসন্ধানে ভ্রমণ করচি।

কুমুদ। ওঃ বটে! কিন্তু আপনার ও-রকম অদ্ভুত নাম কেন?

কাঁচকলানন্দ। কারণ—কাঁচকলাতেই আমার পরম আনন্দ, কাঁচকলার মত মিরতস্কারী ফল আর নেই। যেমন শক্তি-দান করে তেমনি পুষ্টিকর---কৌচের মত শক্ত সমর্থ করে শরীর—তদ্রূপ সাদ, দিদ, ঐ কাঁচকলাই আমার আন্তরিক পরিতোষের বস্তু বিশেষ। তাই বলি---

'ওমা তারা' মনরসনা, আমার কাঁচকলাতেই আনন্দ।
বর্ষা-শীতে-গ্রীষ্মে কিংবা আসে যদ বসন্ত—
আহারে ঐ কাঁচকলা দের আনন্দ'।

কুমুদ। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছেন কেন? চুপ করুন বলচি।

কাঁচকলানন্দ। আমি যা চাই---তাই পাই, যা প্রাপ্য হোনা কি---তা'র প্রাপ্তিতে বাধা না ডর---যে না আমার ইচ্ছা পূরণ করে—তা'র ধ্বংস আনে হরে---এই ত্রিশূল দেখচো---ভৈরবকে জাগিয়ে তুলবো না কি? দেখচো—

চমৎকার। হাঁচচো!

কুমুদ। অর্থাৎ---কড়ারকমের ওষুধ চাই? চমৎকার---আমার বুলহাউণ্ড্‌টাকে নিয়ে আয়তো। জিমি---জিমি---

(নেপথ্যে কুকুরের ডাক)

কাঁচকলানন্দ। এ বিটকেল শক্তিকে নিয়ে কাজ হ'বেনা: এ-চামুণ্ডা ভৈরবী---নমস্কার, শিব---শিব-- মা কালী করালিনী এই পাপিষ্ঠা গর্ব্বিতাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ো---

কুমুদ। আর কোনো কথা নয়---মুখ বুজে চ'লে যান্ কাঁচকলানন্দজী!

কাঁচকলানন্দ। তথাস্তু—কিন্তু বিধ্বংস।

কুমুদ। ডাক্‌বো কুকুরকে—ভুঁড়ি ফুটা ক'রে দেবে?

কাঁচকলানন্দ। থাক আর কেলেঙ্কারীতে আবশ্যক নাই। তোমাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করতে আমি অনিচ্ছুক। এ-শক্তি নয়তো---আসক্তির বিপত্তি। তারা---মা---! (প্রস্থান)

কুমুদ। কত বিচিত্র জীবই না আছে! চমৎকার---এবার ৪৯ (চ) নেই বারিবিন্দু ওঝা, আর ৫৫ (ভ) ভুলু সরকারকে এক সঙ্গে ডাক্ দে।

চমৎকার। আমি দু'জনকেই বাইরে খাড়া রেখেছি। ও মশাইরা---৪৯(চ) আর ৫৫(ভ) নম্বর---আসুন ভেতরে—ডাক পড়েচে এতোক্ষণে--- (উভয়ের প্রবেশ)

ভুলু। নমস্কার নিন্---আপনি এতো গম্ভীর হ'য়ে গেলেন কেন?

কুমুদ। সে খোঁজে আপনার কাজ কী? আপনার কী চাই?

ভুলু। কিছুই না, শুধু কৌতূহল মেটাতে এসেচি। এ এক ভারী খাসা চাল চেলেচেন কিন্তু। এ-যুগে একেবারে নতুন।

কুমুদ। আপনি কি পাণিপ্রার্থী হ'য়ে এখানে এসেচেন---

ভুলু। না-না—কেবল একটুখানি মজা দেখতে—হুজুক আর কি! তা'রই তাড়ায় এখানে আসা, জানেন তো বাঙালী হুজুকে জাত। আমি আবার বিয়ে করবো---বাবা—বাড়ীতে যা' Wife আছে—একেবারে Superlative degreeতে কথার বোমা মারে—যা'কে বলে চড়াসুরে বাঁধা। আবার? দু'বার সাধ ক'রে কেউ জলে ডুবে মরে?

কুমুদ। আপনার কাজ বোধ করি শেষ হয়েছে—এখন বাড়ী যান্—

ভুলু। তা'তো যাবোই—আপনার বাড়ীতে তো আর বসবাস করতে আসিনি। নেমন্তন্নেরও বোধহয় আশা নেই? এ খবরটা'তো Broadcast করা চাই। একটা ছোট্ট কথা—আপনার Bridegroom Selection হ'য়ে গেছে নাকি?

কুমুদ। উজবুকের মত প্রশ্ন করবেন না।

চমৎ। তাই বটে। বলে—'ওরে আদার ব্যাপারী—
জাহাজের খবর নিয়ে
করিস্ কেন খুদে মাথা ভারী'!

ভুলু। আহা—ব্যাপারটা novel কি-না—তাই খবরটা ভালো ক'রে জানতে এলুম। যাকগে—এতেই আমার কাজ হবে। একটা খোস্-গল্পের খোরাক্ পাওয়া গেল—যা'হোক্। কিছু মনে করবেন না---নমস্কার— (প্রস্থান)

কুমুদ। (বিরক্তভাবে) হ্যাঁ—নমস্কার!—আপনি—

বারিবিন্দু। আজ্ঞে—আমি একাধারে কবি ও গায়ক। আমার নাম—বারিবিন্দু ওঝা—

কুমুদ। কৃত্তিবাস ওঝার বংশধর?

বারি। জি আজ্ঞে—সেই গোত্রের—

কুমুদ। এখন কী বক্তব্য আছে চটপট ব'লে ফেলুন, আমার আর ধৈর্য্য নেই।

বারি। আমার বক্তব্য জানাই কবিতা বা গানের ভেতর দিয়ে—আপনার নামে একটা প্রশস্তি লিখে এনেছি—শুনুন তবে—

বারি। (সুর ক'রে পাঠ)

"ওগো মায়াবিনী—নাম কুমুদিনী—
কি মায়া ধরিয়া
র'য়েছ বসিয়া
ছাদের একটি কোণে!
পায়ের নূপুর চকিয়া চকিয়া
রণ-ঝনে রিণি-ঝিণি।
ভক্তির শরণে—
তোমার চরণে
অমৃতাঞ্জন লেপি'।
বারিবিন্দু যে মূর্ত্তি ধরিয়া
টসবে রজনী-দিনি।
ঠ্যাঙটি ছড়ায়ে—
পীরিতি-লড়ায়ে—

কুমুদ। ব্যস্-আর নয়—অনেকক্ষণ সহ্য করেছি।

বারি। না-না—শুনুন—শেষটা শুনুন, শেষের স্পর্শটা অপূর্ব্ব অদ্ভুত, যেন নব মেঘদূত—

কুমুদ। ধৈর্য্য নেই—

বারি। ব্যথা যদি দেন—তা'ও আমি মাথায় পেতে নোবো, —কিন্তু আমার কাব্যের অপমান করবেন না—

কুমুদ। কাব্য? কবি এলেন! মাথা নেই মুণ্ডু নেই।

আবোল্‌-তাবোল্ যা'তা' লিখলেই কবিতা হ'য়ে গেল? মৎকার?

চমৎ। হ্যাঁ—তাই বলে---"ব্যাঙের ছাতা মাথায় দিয়ে
এলেন সেজায় কবি,
কাব্য যে তা'র ডিগ্‌বাজী খায়,
গান গাওয়া তা'র হবি।"

লি ও কবিম'শায়---একটু ভক্তিযুক্ত হ'য়ে কাব্য আওড়ালে ালো হয় না! ও কাব্য ঢের শুনিচি---আমাদের পাড়ার নটু-ানগুলার সরস্বতী এর চেয়ে ভালো পালা বাঁধে।

বারি। কী---আমায় অপমান করা, আমার কবিত্বের অপমান রা? একটা অতি তুচ্ছ---অতিক্ষুদ্র---অতি মূর্খ মেয়েমানুষ---

কুমুদ। আপনি চঞ্চল হবেন না---

চমৎ। হ্যাঁ—ভালোয় ভালোয় পথ দেখুন—কবিঠাকুর—

ব্যোমকেশ। (নেপথ্যে) হা-হা-হা-হা—বর পছন্দ হোলো রে?

কুমুদ। বাবা!? আচ্ছা—আমিও এর শোধ তুলবো!

[একদিকে বারিবিন্দুর প্রস্থান ও অন্যদিকে কুমুদ-চমৎকার নিস্ক্রান্ত।—সুন্দর বেশে নিশাপতি সান্যালের প্রবেশ। নিশাপতি স্বাস্থ্যবান্, ব্যোমকেশ লাহিড়ীর প্রতিবেশী, সুখলালিত, সম্পত্তিশালী কিন্তু অবসাদ বায়ুগ্রস্ত।]

ব্যোম। আরে---আরে—কা'কে দেখছি?—নিশাপতি? বড় ী হলুম। তোমার আসাটা একরকম আশ্চর্য্যের ব্যাপার। কমন আছ?

নিশাপতি। বেশ ভালই আছি লাহিড়ী মশাই! এখন আপনার কুশল প্রার্থনা করি।

ব্যোম। আমরা সকলে বেশ ভালই আছি। তোমার প্রার্থনা—প্রার্থনাই বটে—তা জেনে আমি বড়ই আনন্দ পেলুম। সো—বসো।—তোমার পক্ষে এটা কিন্তু খুবই খারাপ—তুমি একেবারে আমাদের ভুলে যেতে বসেছো।—একটা কথা, তুমি রকম সাজসজ্জা ক'রে এসেছো কেন? ঝকঝকে বেশ চুনোট রা মখমলের পাঞ্জাবী, কুঁচোনো শান্তিপুরী জরিপেড়ে ধুতী, দক্ষের চাদর, ব্যাপার কি? যেন বরযাত্রী?—

নিশা। ওসব কিছুই নয়—শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

ব্যোম। তবে এতো পোষাকের বাহার কেন—গা' থেকে ভুর ভুর ক'রে এসেন্সের গন্ধ বেরুচ্চে—

নিশা। দেখুন লাহিড়ী মশায়, আমি আপনাকে আমার কটা বিষয় নিয়ে বিরক্ত করতে এসেছি। আমায় ক্ষমা করবেন---কটু আপনার সাহায্য ভিক্ষা করতে চাই। অবশ্য আপনি হবার তা' দিয়ে এসেছেন---কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কথা পাড়তে গয়ে সব খেই হারিয়ে ফেলি।—মনে একটা কিরকম ভাব জাগে—ওঃ—এক গেলাস জল—কিছু মনে করবেন না।

ব্যোম। (জনান্তিকে) বুঝেছি আর বলতে হবে না—টাকা ার চাইতে এসেছে—না হয় ফাঁকি দিয়ে মামলার পরামর্শ নিতে এসেছে। তা' নইলে এতো ঢোঁক গিলচে কেন? আমি সে াত্র নই—একটি আধলা উপুড়হস্ত করবো না, একটি কথাও উচ্চারণ কোরবো না। বাবাঃ এ আর কেউ নয়—ব্যোমকেশ লাহিড়ী।—(প্রকাশ্যে) কি বলছিলে বাবা—খুলেই বলো না—পাক দিয়ে সুতো লম্বা ক'রে ফল কী?

নিশা। আজ্ঞে লাহিড়ী মশায়---আর লজ্জার সময় নেই। শুনলাম আপনি কুমুদিনীর বিয়ের জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাই প'ড়ে আমি আম্বালা থেকে ছুটে আস্‌ছি। আমার কথাটা এই যে—

ব্যোম। (জনান্তিকে) এবার ঠিক pointএ এসেছে। বড় মাছ একটু খেলিয়ে তুলতে হবে। (প্রকাশ্যে) কি বলো দেখ? কিছুতো বুঝে উঠতে পারছি না? ভণিতা ছেড়ে সাদা কথায় বলো—লজ্জা কেন—

নিশা। দেখুন আপনি তো জানেন—আমি কুমুদিনীকে যদি পত্নীরূপে পাই—

ব্যোম। ওহো হো—আর বলতে হবে না। সে তো খুব সুখের কথা। সে কথা জানাতে আর এতো দ্বিধা কেন? আমি তো তোমাদের মিলন-দিনের আশায় আশায় এতোদিন বসে আছি। কেবল অপেক্ষা—করে তুমি বলবে। মাঝে তোমার খোঁজ খবর পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না।—কোথায় যে উধাও হ'য়ে গেলে---শুনলুম তোমায় অবসাদ-রোগে ধরেছে। আরে ও আবার একটা রোগ, বাজে বাজে—শরীরে রোগ না থাকলেই সখ করে একটা রোগ বানিয়ে তুলতে হয়। তোমাকে ফেরাবার জন্যেই তো এই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছি। ঠিক জানি আঁতের টান—যাবে কোথায়? এসে হাজির আমার প্রাণের প্রিয় নিশাপতি। আমার আজ বড়ো আনন্দ হচ্চে---চেপে রাখতে পারছি না—ডাকি কুমুদকে।

নিশা। আপনার কি মনে হয়, কুমুদ এ প্রস্তাবে সায় দেবে?

ব্যোমকেশ। বলো কি নিশাপতি স্নেহময়! ও এমন সুন্দর বর পাবে কোথায়? কুমুদ আমার তোমার জন্যেই ভেবে আকুল---বলে কোথায় গেলে নিশাপতি বাবুর খোঁজ পাওয়া যায়? আরে থামো তুমি—এক মিনিটের মধ্যে আমি আসচি। [প্রস্থান]

নিশা। ও---হাত পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌ছে!---বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। কাঁপছে। মাথার ভেতর যেন একটা ঘূর্ণি হাওয়া ঢুকেছে। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে---যেন পরীক্ষা দিতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্চে। জল---জল---(জল চুমুক দিলে) হ্যাঁ---তবে কুমুদ সুন্দর মেয়ে---রূপে-গুণে একেবারে আমার মনের মতো। যা হোক্ বিয়ে করতেই হবে---এত বড় একটা সুযোগ। আর এই বয়েস আমার—৩০, ৩২---চরিত্র দৃঢ় রাখতে হলে এই সময়ে সংসারী হওয়া দরকার। আর ভবঘুরের মত কতদিন বেড়াবো? কিন্তু মাথাটা---মাথাটা হঠাৎ কাঁধের কাছটা চিড়িক্ মারছে কেন? কে আসছে---কুমুদ বুঝি?

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমুদিনী। কে নিশাপতি বাবু! তবে বাবা বললেন কে একজন দালাল এয়েছে---কি সব জিনিস বেচাকেনা করবে! যাক্ সে কথা---আপনি কেমন আছেন?

নিশা। তোমার শরীর কেমন---আগে বলো ?

কুমুদিনী। শরীর খুব ভালো আছে, তবে মন ভালো নয়। এ হে হে—আমার কাপড়টা তো বড়ো কালো দেখাচ্ছে আপনার কাছে। মাপ করুন, আমি ঘর সাজাচ্ছিলুম। কিন্তু আপনি আমাদের কি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন ? আজ মনে পড়লো ? তা হ'লে কুটুম্বিতে করি ? কিন্তু জলযোগের যোগাড় দেখি---কী বলেন ?

নিশা। না-না: ব্যস্ত হবার দরকার নেই---আমি খেয়েই বেরিয়েচি।

কুমুদ। কিন্তু একি আপনার বেশ ? কোনো বিয়েবাড়ীতে যাচ্ছেন নাকি ? পোষাকের কি বাহার---দেখাচ্চেও চমৎকার। হঠাৎ কি ভেবে দামী পায়ের ধুলো দিলেন এই বাড়ীতে ?

নিশা। দেখ কুমুদিনী, আমার একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। তুমি রাগ কোরো না। আমি খুব সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করবো। দেখো—ছেলেবেলা থেকেই আমি তোমাদের সকলকেই ঘনিষ্ঠভাবে জানি। তোমার বাপ-মাকে আমি চিরদিনই ভক্তি ক'রে এসেছি। তুমি জানো—আমার দাদামশায়ের বিষয়-সম্পত্তির এখন সম্পূর্ণ মালিক আমি। তোমাদের বংশের সঙ্গে আমার দাদামশায়ের বংশের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বহু কাল থেকে শুনে এসেছি। আর তোমাদের জমির পাশাপাশি আমাদের জমি। কিন্তু ভুল বুঝো না কুমুদ---আমার ফুলবাগান আর পদ্মদীঘির ধারে তোমরা জঙ্গল করে রেখেছো—আমার মনে হয় তার একটা বিশেষ ব্যবস্থা—

কুমুদ। মাপ করুন নিশাপতি বাবু! আপনার বলতে একটু ভুল হোলো, বললেন না—আমার ফুলবাগান আর পদ্মদীঘি ···আপনার কি ?

নিশা। হাঁ: ও বাগান আর পদ্মদীঘি আমার নিজস্ব সম্পত্তি।

কুমুদ। যাক, তারপর—ঐ ফুলবাগান আর পদ্মদীঘি আমাদের, আপনার নয়—বুঝলেন ?

নিশা। কুমুদিনী, তুমি বুদ্ধিমতী---বুঝে দেখ ওটা আমার, তোমাদের নয়---

কুমুদিনী। আপনার কথাটা আমার কাছে আজগুবি গল্পের মত শোনাচ্ছে। ওটা কি করে হঠাৎ আপনার হোলো ?

নিশা। তোমাদের ঐ ভুনিব ডাঙ্গা আর কলাবাগানের মাঝ বরাবর---ওই বাগান আর পদ্মদীঘি আমার।

কুমুদ। বোধ হয় না---নিশাপতি বাবু, আপনার মাথার বিকার ঘটেছে।

নিশা। কখনই না, ও-সব আমার অধিকারে।

কুমুদ। ঈস—তা'হলে বলুন না এই বাড়ীটাও আপনার অধিকারে।

নিশা। কেন তর্ক করচো ? সত্যি-সত্যি-সত্যি ঐ সমস্ত আমার—আমার—আমার।

কুমুদ। নিশ্চয় না—মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে। আপনার নয় আমাদের, আমাদের—আমাদের।

নিশা। এইখানে আমার মাপ করতে হোলো। মিথ্যে কখনো সত্যি হয় না—গলার জোরে জিতলে তো হবে না। আমাদের দলিলপত্র আছে। হিসেবের কড়ি যাবে কোথায় ?

কুমুদ। আপনি বাঘ হ'য়ে তাই পরের কড়ি গিলতে বসেছেন, গলায় যেন না আটকে যায়—দেখবেন—

নিশা। পরে পশ্চাতে দেখা যাবে—কলেন পরিচীয়তে—কার কড়ি তখন বুঝবে···আইন আছে আদালত আছে—

কুমুদ। এখন বলি মশায় খাজনাটা কার প্রাপ্য—আপনার না আমার ?

নিশা। সে খোঁজে দরকার কি ? দলিলই হচ্ছে আসল। তাই দিয়ে আমি প্রমাণ করতে চাই—যা সত্য—

কুমুদ। কি যে বলেন আপনি—বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন—একটু বিরক্ত করে আমোদ—পাচ্ছেন, না ?

নিশা। আমারতো ভূতে ধরেনি। এই রকম ক'রে লোককে আমোদ পেতে হ'লে তো আর তাকে দুদিন বাঁচতে হবে না—বাপরে বাপ: মেয়ে নয়তো রায়বাঘিনী—

কুমুদ। কী তাই নাকি ? আপনি কি ? পরের জিনিস নিজের বলে জাহির করছেন ? ওই যে বাবা আসছেন—বাবা বলোতো এই ফুলবাগান আর পদ্মদীঘি কাদের ?

ব্যোমকেশ। (প্রবেশান্তে) কেন আমাদের—

কুমুদ। আর উনি বলেন ওটি ওঁর—

ব্যোমকেশ। পাগল আর কি—

নিশা। পাগল মানে ? লাহিড়ী মশায়—আপনিও ভুল করছেন, ও সব আমার নিজের—হাঁ—

ব্যোমকেশ। এ হে-হে—তোমার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে হে নিশাপতি, মাথার চিকিৎসা করাও—না হয় যাও রাঁচী।

নিশা। আপনাদের বাপ আর মেয়ের দু'জনেরই মাথায় নেই—শুধু রাবিশ।

ব্যোমকেশ। ওহে ছোকরা, বুঝে শুঝে কথা বলো—চেঁচিও না, দম ফুরিয়ে যাবে, নিজে একটা রাবিশ, rotten—rotten—

নিশা। এ তো বড় অন্যায়—কী রকম ধাপ্পাবাজী চালাচ্ছেন বলুন তো ? nuisance!

ব্যোমকেশ। র‍্যাসকেল—নিশাপতি গুণ্ডান—আমার মেয়ের গুণ্ডাল প্রহার না খেলে বোধ হয় ওই চৌকো মাথাটা গোল হবে না—তোমার দরকার তাই—Brute!

নিশা। এতদূর কথা—আচ্ছা, দেখচি আমি---এই বাড়ীতে আর পায়ের ধুলো মুহূর্তেও আসব না।

ব্যোমকেশ। বয়ে গেলো—যাও—যাও—তোমার মতো অনেক নিশাপতি গুণ্ডাল আমার পায়ের তলায় ইঁদুরের মতো ঘুরঘুর ক'রে ঘোরে। You rat! আর তোর গুণ্ডাতদের খুঁজে পাবে দেখগে যা ওই আস্তাবলে।

নিশা। আমি পাঠাব ওই আস্তাবলে তোমাকে—ব্যোমকেশ লেহিড়ী—সঙ্গে যাবে—ওঃ-ওঃ-ওঃ বুকে ব্যথা—মাথা বনবন্ ক'রে ঘুরচে, চোখে কিছু দেখতে পাচ্চি না। জল—জল—বাইরে যাবার রাস্তা কই—মাথায় কে যেন আমাকে মুগুর কসিয়ে দিচ্চে—ওঃ—হায় ভগবান সর্বশক্তিমান, জয় জয় ভগবতি—

[কুমুদবৎ নিশাপতির প্রস্থান

ব্যোমকেশ। ফের রোগে ধরেছে—অবসাদ বায়ুগ্রস্ত লোক। দূর ছোঁড়—কষ্ট একটা কথা ভাবচি কুমুদ—তুই সব নষ্ট ক'রে দিলি। এমন সুপাত্র—সুদর্শন ধনী, পাওয়া যায় কি সহজে? তুই দিলি ওকে ক্ষেপিয়ে।

কুমুদ। সে কথা আমায় আগে বলোনি কেন? তোমারই তো দোষ। তা' হলে কি ঝগড়া করতুম? যা' হয় করো—আমি কিছু জানি না—আর কখনো আমার বিয়ের কথা তুলবে যদি—

ব্যোমকেশ। আচ্ছা, আচ্ছা, ডাকাই নিশাপতিকে—অতই যদি, তবে ঝগড়া করা কেন? চমৎকার—ও চমৎকার!

চমৎকার। কি গো কত্তামশাই।

ব্যোমকেশ। যা' যা' ছুটে যা—ঐ—ঐ নিশাপতি বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়—যে রকম করে পারিস। বক্‌শিস পাবি। ঐ যে নিজেই ফিরে আসচে।

চমৎকার। তা' হ'লে আমার বক্‌শিসটা আর পাওয়া যাবে না?

ব্যোমকেশ। যা-যা আবার বকশিস কিসের? ফাঁকি দিয়ে বড়লোক হতে এসেচিস? বেরো—

চমৎকার। কোথায় ব'লে দাও—

ব্যোমকেশ। চুলোয়।

চমৎকার। বেশ তো—ভগোমান আছে আমাকে এত হতচ্ছেদ্দা—

[নিশাপতির পুনঃ প্রবেশ]

ব্যোমকেশ। কি মনে ক'রে আবার বাপধন?

নিশা। (স্বগতোক্তি) সুরটা নরম নরম ঠেকছে না···একটু দামতে তা'হ'লে। (প্রকাশ্যে) এমন কিছু মনে ক'রে নয়, চাদরটা ভুলে ফেলে গেছি।

ব্যোমকেশ। বোসো, বোসো—ও তোমার সঙ্গে একটা রহস্য হচ্ছিল। আসল ব্যাপারটা এই যে···ও-সব সম্পত্তি তোমাদেরই। কি বলিস মা কুমুদ?

কুমুদ। আমিও তো তাই বলচি···উনি কানেও কথা তোলেন না, আমি কি করি বলো!

নিশা। এতক্ষণে ভুলটা বুঝতে পেরেছেন—শুনে সুখীই হলুম। জানি আপনারা অতি ভদ্র আর সম্ভ্রান্ত, অতি উচ্চমনা—চাতার তোক বংশের ছাঁট যাবে কোথায়?

কুমুদ। বাবা, নিশাপতি বাবুর খাবারের ব্যবস্থাটা করা চাই। উনি হয়তো বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তুমি বোসো আমি আসচি।

ব্যোমকেশ। না, না তুই বোস, আমিই বরং যাই। (প্রস্থান)

নিশা। হ্যাঁ, এখন বেশ মাথাটা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। আনন্দে শিস দিতে ইচ্ছে করছে, গান শুনতে ইচ্ছে করচে, নাচতে ইচ্ছে করছে—ওহো—হো—Joy-Joy only Joy—

কুমুদ। আমিও আজ খুব খুসী। আপনাকে পেয়ে আমি কী যে হ'য়ে গেছি···ওরে চমৎকার—শোন—শোন—সেই গানটা গা তো—"বঁধুর নাগাল পেলাম না গো সই।"

চমৎকার। গান-টান এখন গলায় বশ মানবে না, বাপু—আগে দাও বক্‌শিস।

কুমুদ। এই নে গলার হার—আরও পাবি।

চমৎকার। তা' হ'লে দাঁড়াও—গলাটা একটু সেধে আসি।

(প্রস্থান)

নিশা। (হাসতে হাসতে) দেখো, সেই বহুদিন আগেকার কথা এখন মনে পড়লো। তোমার জিমি আমার বাঘার কাছে একটি থাবা খেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে লেজ গুটিয়ে একেবারে প-য়ে আকার যেমন দিয়েছিল চমৎকারও তেমনি—

কুমুদ। কী আমার জিমি পালাবে—হাসির কথা—আপনার বাঘা জিমির কাছে একটা ছুঁচো।

নিশা। কখনো নয়, বাঘা ঢের বেশী উঁচু আর দেখতে বলবান্।

কুমুদ। এ-যেন বড়াইবুড়োর বড়াই।

(ব্যোমকেশের পুনঃ প্রবেশ)

নিশা। তুমি বড়াই বুড়ি।

ব্যোমকেশ। চুপ চুপ—হায়রে—আবার কথা কাটা কাটি—বিবাহিত জীবনের এই পূর্ব্বরাগ? ওরে খাবার আন, সন্দেশ আন, ওরে মুখ বোঝাই করে দে।

ব্যোমকেশ। শাঁখ বাজা—চমৎকার—শাঁখ বাজা, শাঁখে ফুঁ দে। পাঁজিতে শুভলগ্ন লিখছে—(শাঁখ বাজার শব্দ)

—এসো বাবা নিশাপতি—আয় মা কুমুদ—তোরা দু'জনে হাত বাড়িয়ে দে। হে জগদীশ্বর! দু'হাত এক হোক, দুই প্রাণ এক হোক, বলো নিশাপতি

"ওঁ গৃভ্‌ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং"—

নিশাপতি কুমুদিনী দু'জনেই বলো—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।

(শঙ্খধ্বনি)

অষ্টাদশ শতাব্দী ও পারসীক শিল্পের ক্রমাবনতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে সাহ দ্বিতীয় আব্বাসের সঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গেই সাফাবির যুগের গৌরবের অবসান হয়। সাফাবি-বংশীয় শেষ নরপতির লজ্জাকর অকর্ম্মণ্যতাই যে এ বংশের অধঃপতনের কারণ পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসে এই কথাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। শেষ সোফি (Sophy) বা সাফাবির বিরুদ্ধে ইহাই অভিযোগ যে, তিনি যুদ্ধ না করিয়াই তুর্কদিগের হস্তে নিজ রাজ্য তুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গুলনাবাদের সান্নিধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে পনর হাজার পারসীক সৈন্য নিহত হইয়াছিল। আক্রমণকারীদের সংখ্যা যে অধিক ছিল তা নয় কিন্তু রাজবংশীয়েরা হীনবীর্য্য, স্বল্পশক্তি সৈন্যদলও রণবিমুখ। তদানীন্তন সাফাবিরাজ শাহসহ সুলতান হোসেন স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, যে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে তাহা সংস্কার করিবার সামর্থ্য আর তাঁহার নাই। তুর্কসেনা রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজধানী অবরোধ করিয়াছে, সে অবরোধ মুক্ত করিতে পারে এমন শক্তিধর সেনানী তিনি পাইবেন কোথায়? রাজ্য রক্ষা অসম্ভব দেখিয়াই তিনি বিজয়ী বীর তরুণ মামুদশার আসনতলে প্রণতি করিয়া তাঁহার হস্তেই রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া সাহহোসেনই রাজকীয় চিহ্নসূচক শিরপেচটি (royal plume of feathers) মামুদের উষ্ণীষে স্বয়ং সংলগ্ন করিয়াছেন এবং পরে তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে পারস্যের অধিপতিরূপে ঘোষণা করেন। প্রথম জীবনে ধর্ম্মের প্রতি সাহ হোসেনের প্রবল অনুরাগ ছিল বটে কিন্তু পরে তিনি বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। এই বিলাসিতই সাফাবিয়দিগকে উত্তরাংশে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। ইহার পরই আফগানদিগের প্রভুত্বের সূত্রপাত কিন্তু তখনও সাফাবি রাজলক্ষ্মী পারস্য হইতে একেবারে অন্তর্হিত হন নাই। রাজত্ব লইয়া লুঠপাট, হত্যা, গুপ্তহত্যার অন্ত রহিল না (১)।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে সাফাবি বংশের শেষ নরপতি সাহ তৃতীয় আব্বাস নিতান্ত শৈশব কালেই কুখ্যাত নাদির সাহ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তখন তুর্কী (Turkey) ও রুসিয়া পারস্যের দুইটি অংশ গ্রাস করিতে সমুদ্যত। নাদিরসাহ—তৎকালে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ নাদিরকুলি, —এ দুর্দ্দিনে পারস্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু তাঁহার সর্ত্ত রহিল যে তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ সাহ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, সাফাবিদিগের আর তাহাতে কোনরূপ স্বত্ব থাকিবে না বা কোন রূপ দাবী দাওয়া চলিবে না। নাদিরকুলি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সমর্থ হইয়া নাদিরসাহ রূপে ঘোষিত হইলেন খৃঃ ১৭৩৬ অব্দে। তখন হইতেই সাফাবিয় রাজত্বের অবসান হইল। যিনি বাল্যকালে ছাগল চরাইতেন এবং পরে সমরকুশলী বলিয়া নিজ প্রতিভায় সাহ তহমাস্পের অন্যতম সেনানায়করূপে বৃত হইয়াছিলেন, ভাগ্যদেবীর কৃপাকটাক্ষে তিনিই হইলেন পারস্যাধিপ সাহেন সা। ভারত জয় করিলেন, ময়ূর সিংহাসন ও বহু কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া দেশে ফিরিলেন, সংশয়বশে আপন পুত্রকেও অন্ধ করিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না, শেষে একদিন গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন, লীলা-খেলা সব ফুরাইল। সাফাবিয় রাজত্বের বিলোপ সাধনের প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর পরে জান্দ বা জেন্দ বংশীয়েরা সিংহাসন লাভ করিয়া ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজদণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

করিম খাঁ জেন্দ দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব ও জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলের সাহায্যে সমগ্র ইরাণ অধিকার করিলেন। সামান্য উপজাতির সর্দ্দার হইতে ইরাণের ছত্রপতিপদে উন্নীত হইয়াও তিনি আপনাকে "দেশের 'বকিল' (vakil) অর্থাৎ প্রতিনিধি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিতেন(২)"। সংস্কৃতিমূলক কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি মাদ্রাসা মসজিদ প্রভৃতি তো নির্ম্মাণ করিয়াছিলেনই, মহাকবি সাদির সমাধি-মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া এবং হাফিজের কবরস্থানে স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তিনি ঐতিহ্যের স্মৃতিও উজ্জ্বল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আর এক কীর্ত্তি নক্সা-কাটা ছাদে ঢাকা, সিরাজনগরে প্রতিষ্ঠিত অর্দ্ধমাইলব্যাপী এক বিশাল বাজার। এখনও তত্রস্থ বিপণীতে পারসীক কারুশিল্পের নানাপ্রকার নমুনা, কাঠ ও ধাতুর নক্সার কাজ-সম্বলিত বিবিধ দ্রব্য এবং পারস্যজাত বিখ্যাত কার্পেট প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে।

১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে জেন্দ বংশের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিলে 'কাজার' অথবা 'কাচার' তুর্ক-গোষ্ঠীর মহম্মদ আকা নামক জনৈক প্রধান পারস্যের খণ্ডিত অংশ গুলি একত্রিত করিয়া পুনরায় তেহরানে নিজ রাজধানী সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া যে 'কাড়াকাড়ি খুনোখুনির ব্যাপার চলিয়াছিল তাহা স্মরণ না রাখিলে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা যাইবে না। আদিম বর্ব্বরতা যেন আরও বীভৎসতার সহিত আসিয়াছিল। একা করিম খাঁ জেন্দই ছিলেন সেই অন্ধকার যুগের দেউটি স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র ভাষায় এ যুগের যে বর্ণনা করিয়াছেন স্বল্প কথায় ইহা অপেক্ষা আর বিশদ বর্ণনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না—'বিপ্লবের আবর্ত্তে রক্তাক্ত রাজমুকুট লাল বুদ্বুদের মত ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে আর ফেটে যায়'(৩)। কাজারবংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত আকা (আগা) মহম্মদ খাঁর নিষ্ঠুরতায় এই কাজর যুগের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইল। খুন করা, লুটকরা, হাজার হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী করা মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাসে এ সকল তো তুচ্ছ কথা কিন্তু আকা মহম্মদ আপন পাশবিকতার সমুচ্চ চূড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কর্মান নগরে সত্তর হাজার নগরবাসীর চক্ষু উৎপাটিত করিয়া। এই কাজরেরাও জাতিতে তুর্ক। ইহাদের পারস্যে আগমন হয় তৈমুরলঙ্গে কিন্তু এই কাজর রাজবংশের

(১) রবীন্দ্রনাথ, জাপানে ও পারস্যে, পৃঃ ১৬৯—১৭০।

(২) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৯ পৃঃ ৮৬৬ ff.

(৩) রবীন্দ্রনাথ, জাপানে ও পারস্যে, পৃঃ ১৭০।

প্রতিষ্ঠাতা বর্ব্বরতায় তৈমুরকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তৈমুর তো কেবল কাটামুণ্ডের স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু তার তুলনায় এই উৎপাটিত চক্ষুর রাশি যে কি দানবিক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক তাহা আর বলিবার নয়। পুরাণকারের কথায় বলিতে গেলে এই রূপ দানবের মৃত্যুতেই মহী, কাল, আকাশ, গ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র, দিঙ্‌মণ্ডল, নদী, শৈল, ও মহার্ণব প্রসন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ লোকসকল সত্য সত্যই নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে।

কাজর-বংশীয়েরা রাজত্ব করিয়াছিলেন বড় কম দিন ধরিয়া নয়, খৃঃ অঃ ১৭৯৮ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত। রেজা শা পহ্লবীর আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পারস্যের রাজসিংহাসন এই কাজর বংশীয়দিগের অধিকারে ছিল।

মঁশিয়ে ব্লশের মতে খৃঃ সপ্তদশ শতকের পর বিশ্ব সভ্যতায় পারস্যের আর কোনও নিজস্ব সংস্কৃতিমূলক দান নাই (৪)। এ কথা সত্য যে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা রাজনীতি কোন ক্ষেত্রেই আর পারস্যের মৌলিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটে নাই এবং কোথাও কোন উন্নতির লক্ষণও সূচিত হয় নাই। বিশেষ করিয়া তৎকালীন চারুশিল্পের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, উহা একেবারেই 'একঘেয়ে' ও বৈচিত্র্য-শূন্য, চিত্রশিল্প সম্পর্কিত সব কিছুই যেন নিছক সামান্যতার সমতলে (Dead level এ) নামিয়া গিয়েছে। ব্লশে বলিয়াছেন উনবিংশ শতাব্দীতে, কাজরদিগের রাজত্বকালে, সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত দুই চারিখানি চিত্র দৃষ্টিগোচর হয় বটে কিন্তু শিল্পচাতুর্য্যে ও করণ-কৌশলে সমৃদ্ধ হইলেও এগুলিতে কেবল চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দের চিত্রাদির বিষয়বস্তুই অনুকৃত হইয়াছে(৫)। বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রেজা-ই-আব্বাসীর পর কলমের পর আর অপর কোনও নূতন শৈলীর আবির্ভাব হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে একদল পারসীক চিত্রকর ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাদি অঙ্কন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন আগা সাহ নজফই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি কাসিম খাঁ জন্দের রাজত্বকালেই বিদ্যমান ছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। ইনি এবং এইরূপ আরও কয়েক জন স্বয়ং পয়গম্বরের চিত্র এবং পিতা ও মাতার সহিত শিশু ইশা (Jesus) মসীহের চিত্র প্রভৃতি আঁকিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কাগজ, কাষ্ঠফলক, ক্যাম্বিস কিম্বা গৃহভিত্তি—ইহার কোনটিই আশ্রয় করিয়া নয়। ইহাদের এ চিত্রগুলি বিন্যস্ত হইয়াছিল কখনও বা ব্যজনীর গায়ে, কখনও বা মুকুরের পৃষ্ঠভাগে, কখনও বা দর্পণাদি রাখিবার আধারের উপর। এ শিল্পে খ্রীষ্টীয় সন্ত (saints) ও স্বর্গদূতদিগের মুখচ্ছবি ইতালীয় চিত্র হইতে একেবারে হুবহু নকল করা হইত।

পারস্যের রাজাদিগের মধ্যে কাজরবংশীয় সাহ নাসিরুদ্দিন (খ্রীঃ অঃ ১৮৪৮-১৮৯৬) সর্ব্বপ্রথম ইউরোপ গমন করেন এবং তাঁহার আমল হইতেই পারস্য বিদেশীর নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে। সাহ নাসিরুদ্দিন বার বার তিনবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন তাহার মধ্যে একবার খ্রীঃ ১৮৭৩ অব্দে পুনরায় ছয় বৎসর পরে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে। ইউরোপ ভ্রমণের পর নাসিরুদ্দিন কি কুক্ষণে বলিতে পারি না, পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি অবলম্বনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাই হইল দেশীয় চিত্রশিল্পের কালস্বরূপ। প্রতীচ্যের আদর্শ অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধেও তিনি কম চেষ্টান্বিত ছিলেন না কিন্তু তাঁহার সংস্কার-প্রয়াসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল পারস্যের চারুশিল্প। দেশীয় ললিতকলা ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালিয়া আমূল সংস্কার করিতে গিয়া তিনি সত্য সত্যই উহার সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। সাহ নাসিরুদ্দিনের প্রধানতম চিত্রকর ছিলেন কামাল-উল্-মুল্ক। ইঁহার আসল নাম মহম্মদ খাঁ সাফারী। তিনি এক চিত্রশিল্পীর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক খ্রীঃ ১৮৪৭-৪৮ অব্দে। মহম্মদ সাহ কাজরের রাজত্বকাল হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া রাজসভায় চিত্রকররূপে নিয়োজিত ছিলেন। কামালের খুল্লতাত চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য রাজাদেশে ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি রোম হইতে রাফায়েল চিত্রিত একটি ম্যাডোনা (Madonna) মূর্ত্তির (ক্রোড়ে যীশু সহ মাতা মরিয়মের মূর্ত্তির) স্বহস্তে যে নকল প্রস্তুত করিয়া আনেন (৬) তদ্দৃষ্টে বহু পারসীক চিত্রকর পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

কামালের চিত্রগুলি ইউরোপে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। সাহের প্রাসাদের ও পারস্যের মজলিস্ (পার্লামেণ্ট) গৃহের শোভা সম্পাদনার্থ কামালের চিত্রনিচয় ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন করা হইয়াছে। জন্নতনাম্নী এক রাজকুলোদ্ভবা মহিলা কবি ও চিত্রশিল্পী কামাল উল্-মুল্কের নিকটই চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন (৭)।

এই সময়ে ছায়াচিত্র গ্রহণ করার প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ায় পারস্যের শিল্পিবৃন্দ যন্ত্রসাহায্যে গৃহীত ছায়াচিত্রকেই প্রতিকৃতির ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। কোথা রহিল লোকাতীত রূপের তপস্যা, কোথা রহিল সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, কোথা রহিল কলালক্ষ্মীর প্রসাদ! অধ্যাত্মবাদ যে জাতির মর্ম্মগত, সেই জাতিই আত্মনিয়োগ করিলেন বাস্তবতার অন্ধ উপাসনায়। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন "ফটোগ্রাফের যে কৌশল তা বস্তুর বাইরেটার সঙ্গেই যুক্ত, আর শিল্পীর যে যোগ, তা শিল্পীর অন্তর-বাহিরের সঙ্গে বস্তু-জগতের যোগ এবং সেই যোগের পন্থা হল কল্পনা এবং বাস্তব ঘটনা দু'য়ের সমন্বয় করার সাধনাটি(৮)।" সাধারণ শিল্পী এই সার মর্ম্মটুকু বুঝিল না। ইহাতে যদি নিষ্ফলতা আসিয়া থাকে তাহা হইলে দোষ দিব কাহার?

কামাল-উল্-মুল্কের বয়স যখন চল্লিশ বৎসর সেই সময়েই তিনি ইউরোপে প্রেরিত হন এবং পারী নগরী ও ফ্লরেন্সে কয়েক বৎসর

(৪) E. Blochet, Mussulman Painting, 12th to 17th Century.

(৫) Ibid.

(৬) এই মাতৃমূর্ত্তির আসল চিত্রখানি Madonna del Foligna নামে বিখ্যাত।

(৭) M. Ishaque, Modern Persian Poetry p. 33.

(৮) ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাগেশ্বরীশিল্প প্রবন্ধাবলী, অন্তর বাহির পৃঃ ১১৬।

অতিবাহিত করিয়া প্রতীচ্যের চিত্রণ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। তিনি টিশিয়ান (Titian)(৯) কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'ক্রুশ' হইতে ইশার দেহ সমাধিতে সংস্থাপন', রেম্‌ব্রাণ্টের 'সন্ত মাথিউ (St. Matthew)' এবং ফ্যাঁত্যা লাতুরের (Fantin Latour) স্বহস্তে অঙ্কিত আত্ম-প্রতিকৃতি এই কয়খানি বিখ্যাত চিত্রের সঠিক প্রতিলিপি সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার প্রত্যেকখানিতেই প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীর অসীম সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। কামাল্‌-উল-মুল্ক কর্ত্তৃক অঙ্কিত পাশ্চাত্ত্য চিত্রাদর্শের এই তিনখানি প্রতিরূপ তেহরণে রক্ষিত আছে।

শুধু ক্লাসিক চিত্রের ধারা অবলম্বন করিয়া কামাল্‌-উল্‌-মুল্ক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। চিত্রে বাস্তবতার (realism এর) বিকাশেই তাঁহার প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বোগদাদের ইহুদীবৃন্দ (Jews of Baghdad) নামক যে চিত্রখানি রচনা করেন চিত্রীর মৌলিকতার ও শিল্প-নৈপুণ্যের তাহাই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। দুইজন বৃদ্ধ ইহুদী একজন স্ত্রীলোক ও অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী এক তরুণী প্রাচ্য ভঙ্গীতে (accroupi) বসিয়া আছে। বৃদ্ধদ্বয়ের মধ্যে একজন কাহিনী শুনাইতেছে, তাহার সে আখ্যান শুনিয়া অপর সকলে হাসিয়াই আকুল। অপর একখানি চিত্রে কোনও এক তেহারণবাসী পারসীক ইহুদীদিগের নিকট পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে। যে ইহুদীর সহিত দাম-দর চলিতেছে তাহার মুখের সেই ভাবটি মনস্তত্ত্ববিদের যথার্থ অনুশীলন-যোগ্য। এই ভাবোন্মেষ-শক্তিতেই চিত্রকরের অদ্ভুত প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পী অনেক সময় আপনার কাজের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন না। কামাল-উল্‌-মুল্ক নিজ তূলিকা-প্রসূত চিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছিলেন নাসিরুদ্দিন সাহের একখানি প্রতিকৃতিকে। এ চিত্রে পারস্যরাজ মুকুরমণ্ডিত এক বিশাল-আয়তন হল-ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। এই হলঘরের চারিপার্শ্ব মণ্ডন উদ্দেশ্যে বিন্যস্ত পারসীক লিপির আলম্বনে পরিবেষ্টিত। পারসীক অক্ষরের সহজ ও স্বাভাবিক শোভায় ইহা সমধিক চিত্তহারী হইয়াছে। এই চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছিল চিত্রকরের ইউরোপগমনের পূর্ব্বে। তখনও তিনি পরিপ্রেক্ষণা-প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, তাই এ ছবিখানি কেমন যেন অসাড় ও প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়। কামালের চিত্রগুলিতে রেখাঙ্কনের অসাধারণ পটুত্ব সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে (১২)।

কামাল ১৯১১ খৃঃ অব্দে সংস্থাপিত শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের (মদ্রাসা—ই—সনাই—ই—মুস্তাজ্‌ফা'র) অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তেহরণে এই চারুশিল্প শিক্ষায়তনটি গড়িয়া তোলেন। এখানে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্যের সহিত শারীরবিদ্যা (anatomy) বিষয়েও শিক্ষাদান করা হইত। কার্পেট বয়নও এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে কিন্তু নব প্রবর্ত্তিত প্রথার প্রয়োগফলে কার্পেটশিল্পে পূর্ব্বকালীন প্রসাধক অলঙ্কার-সমূহের স্থান, প্রতিকৃতি ও বাস্তবতামূলক দৃশ্য চিত্রাদির দ্বারা অধিকৃত হয়। ইহাতে পারস্যের এই দেশ-বিখ্যাত শিল্প যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, সত্যের অপলাপ না করিয়া এ কথা বলা যায় না (১৩)।

একখানি জার্ম্মান ভাষায় রচিত মুসলমান যুগের পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্র-বিষয়ক পুস্তকে(১৪) আধুনিক চিত্রকর্ম্মের নমুনা বলিয়া যে তিন জন পারসীক চিত্র-শিল্পীর চিত্রের এক একখানি করিয়া প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রথমখানি মহম্মদ সাদিক কর্ত্তৃক অঙ্কিত কোনও রমণীর উত্তমাঙ্গ, দ্বিতীয় আকা বাকর রচিত জনৈক পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শিরোদেশ এবং তৃতীয় শা নজ্‌ফ (Nedschef) নামক চিত্রীর তূলিকাপ্রসূত একটি অর্দ্ধশায়িত নারীমূর্ত্তি; রমণী যেন শুধু শূন্যের উপরই শায়িতা। কেবল একরঙা প্রতিলিপি দেখিয়া, মূল চিত্রের দোষগুণ যথাযথ নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য এবং এ কথাও সত্য বটে যে শুধু একখানি মাত্র চিত্র দেখিয়া শিল্পী বিচার করিতে গেলে চিত্রীর প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারা যায় সে, যে ধীশক্তি প্রতিভার অনুগামী-এ শিল্পী তিনজনের তূলিকা সঞ্চালনের নৈপুণ্যে সে ধীশক্তির স্পর্শ, সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শিল্পসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং পদে পদে প্রকৃত রূপদক্ষতার অভাবই যেন ধরা পড়ে।

ইহার পর আধুনিকতা-বিজৃম্ভিত, পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা-প্রভাবিত পারসীক শিল্পে আর কোনও নূতন শৈলীর উদ্ভব ঘটিল না। না থাকিল কোনও আদর্শ, না থাকিল কোন ও বিশিষ্ট পদ্ধতি। পূর্ব্বতন শিল্পপদ্ধতির সহিত যোগসূত্র রক্ষায় রহিল শুধু পুরাতন চিত্রগুলিকে একমাত্র আদর্শ বলিয়া গণ্য করায়। পুঁথি চিত্রণের জন্য খ্রীঃ ১৩০০, ১৪০০, কিম্বা ১৫০০ অব্দে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল এখন শুধু সেইগুলিই নকল করা চলিতে লাগিল। এখনও শিল্পীদের উপজীব্য রহিল সেই একই বিষয়-বস্তু কিন্তু মূর্ত্তি অঙ্কনের কোনও নূতন ধারা আর প্রচলিত হইল না। বিংশ শতাব্দীর পারস্যশিল্পে উল্লেখযোগ্য যাহা কিছু তাহা এই পুরাতন পদ্ধতি পুনরুদ্ধারের কথঞ্চিৎ প্রয়াসমাত্র। বীর (পাহলওয়ান) ও মহাপুরুষগণ পূর্ব্বে যে ভাবে চিত্রিত হইতেন এখনও সেই একই ভাবে চিত্রিত হইতে লাগিলেন। আর একশ্রেণীর চিত্রীরা শিখিলেন কেবল পাশ্চাত্ত্য শিল্পাদর্শ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে কিম্বা তাহার হুবহু নকল করিতে। পারস্যের আধুনিক চিত্রশিল্পে নব-শিল্পভঙ্গী সৃষ্টি করিবার মত কোনও শক্তির উন্মেষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। মঁসিয়ে ব্লশে বলিয়াছেন যে চিত্রশিল্পে ভারতীয়দিগের মত উন্নতি লাভ করিতে পারসীক শিল্পিগণ সমর্থ

(৯) টিশিয়ান (Titian) খ্রীঃ অঃ ১৪৭৭-১৫৭৬ ইতালীয় চিত্রকর, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদিগের অন্যতম।

(১০) রেম্‌ব্রাণ্ট (Rembrant) খ্রীঃ অঃ ১৬০৬-১৬৬৯ শ্রেষ্ঠ ওলন্দাজ চিত্রকর, প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য প্রসিদ্ধ।

(১১) ফ্যাঁত্যা লাতুর (Fantin Latour) খ্যাতনামা ফরাসী চিত্রকর।

(১২) Mohsin Moghadam, l'art Persane, Cahier Persan, pp. 128-129.

(১৩) Cahier Persan, loc. cit fi. 130

(১৪) Die Persish Islamish Miniatur Malerei Taful 130

হন নাই (১৫), পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শ ভারতীয় ও পারসীক শিল্পে সমান ভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। কারু শিল্পে যে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে নাই তাহার কারণ পারস্যের কারু শিল্পীরা ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

কারুশিল্পে চিত্রকলার নিমগ্নতা পারসীক ললিতকলার ইতিবৃত্তে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই কারুশিল্পের জীবনী শক্তি যে সহজে পরিম্লান হয় নাই—চিত্রশিল্পের দিক্ দিয়াও তাহা সৌভাগ্যের বিষয়ই বলিতে হইবে। লাক্ষার কাজে (lacquer work এ) পারসীক কারুজীবী সিদ্ধহস্ত ছিল আর এ কাজ চলিত পুস্তকের পাটা (book-cover), কাঠের ছোট ছোট বাক্স, এবং জমাট কাগজের তৈয়ারী (papier mache) কলমদানের উপর। এই কলমদানগুলিতে থাকিত একটি রূপার মস্যাধার, দুইটি শরের কলম, একখানি ছুরি ও তলায় রাখিয়া কলমের কচ কাটিবার জন্য একটি সমতল শিঙের টুকরা। কলমদানে ঢাকনির উপর শুধু পুষ্প প্রভৃতির প্রসাধক চিত্রই যে অঙ্কিত হইত তা নয়, নানাবিধ প্রতিকৃতি, নিসর্গ-চিত্র, এমন কি যুদ্ধের চিত্রও সন্নিবেশিত হইত। চেহেল সাতুন প্রাসাদে রক্ষিত সাহ ইস্‌মাইলের সহিত তুর্কীদিগের যুদ্ধের চিত্রটিও ক্ষুদ্রক চিত্রের আড়ায় কলমদানের উপর অনুকৃত হইয়াছিল। যাঁহারা এই বিশিষ্ট শিল্পের চর্চ্চায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা কেহই দুইশত কিম্বা আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বেকার লোক নহেন। সাদক্ব জীবিত ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে,আর আসুরফের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে। জামান নামক একজন চিত্রী কলমদানের উপর সাফাবির বংশের সমগ্র রাজগণের চিত্র অঙ্কন করেন। আবার এ শিল্পে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাদিও যে স্থান না পাইত তা নয়। নজফ্ নামক অপর একজন শিল্পীর তুলিকাঙ্কিত মেরি মাতা ও শিশু যীশুর চিত্র একটি কলমদানের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। কোনও কোনও স্থলে এ সকল চিত্রের মূল আদর্শ ছিল ইস্পাহানের প্রাসাদে রক্ষিত ইতালীয় ও ওলন্দাজ শিল্পীদিগের অঙ্কিত চিত্র-নিচয়। ক্যাম্বিসের উপর বড় আড়ার যে সকল তৈলচিত্র অঙ্কিত হইত শিল্পী ও শিল্পামোদীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে সেগুলির মূল্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইবে। এ প্রকার চিত্রে, প্রাসাদের কক্ষমধ্যস্থ দেওয়ালগুলি সাজাইবার জন্য সাধারণতঃ নারীমূর্ত্তিই অঙ্কিত হইত; বিভিন্ন দেশের নারী-সৌন্দর্য্যের ও নারীর দেহসজ্জার নিদর্শনরূপে সমাহৃত এই সকল চিত্র সাধারণের কৌতূহল যতই উদ্রিক্ত করুক না কেন, শিল্পকলার দিক্ দিয়া এ-গুলির বিশেষ সার্থকতা ছিল না(১৬)।

কোনও শ্রদ্ধাস্পদ ভূয়োদর্শী লেখক বলিয়াছেন যে, পারসীক চিত্রে রঙের জৌলুস প্রকাশ পাইয়াছিল অন্তঃপুরিকাদিগের প্রভাব ফলে; যেহেতু রমণীগণ সর্ব্বত্রই সমুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া থাকেন(১৭)। ক্ষুদ্রক চিত্রের প্রকৃত প্রয়োজন ছিল পুঁথি চিত্রণের জন্য। পুঁথি লিখিত ও চিত্রিত হইত বিত্তশালী বিদ্বান্ ও কলা-রসিক ব্যক্তিদিগের অনুজ্ঞায়। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে 'রঙের ইঙ্গিত ভাবের দোলায় মনকে দোলাইয়া দিত।' ইহাতেই ছিল বর্ণপ্রয়োগের সার্থকতা। শুদ্ধান্তবাসিনীদিগের অবসর বিনোদনার্থ দুই চারি খণ্ড 'মুরাকা' (চিত্রসংগ্রহ বা album) অন্তঃপুরের কুতুবখানায় রক্ষিত হইত ইহা সত্যকথা। কন্সতুনিয়ার (Constantinople-এর) পুরাতন সেরাইল (Serail) পুস্তকাগারে এরূপ মুরাক্কা পাওয়া গিয়াছে। রাজকুমার দারা শিকো তাঁহার পত্নী নাদিরা বেগমকে সমকালীন চিত্রকরদিগের অঙ্কিত একখানি চিত্রমালা উপহার দিয়াছিলেন। সেই মুরাক্কায় নাদিরা বেগমের নাম এখনও উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে(১৮)। কিন্তু তাই বলিয়া অন্তঃপুরের চাহিদা মিটাইবার জন্য পুঁথি কিম্বা মুরাকাগুলি বিশেষ কোনও ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহার একান্ত প্রমাণাভাব। শুধু অন্তঃপুরাংশে, প্রাসাদকক্ষ-সংলগ্ন চিত্রগুলি সম্পর্কে এরূপ অনুমান কতকাংশে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে।

শুধু কলমদান বা পুস্তকের পাটা বলিয়া নয়, সৌখিন ও বিলাসী পারসীক যে তামাকু সেবনের চিলমটিকেও চিত্রভূষিত করিতে ছাড়িতেন না---একথা জানা গিয়াছে(১৯)। ক্ষুদ্রক চিত্রকরের ন্যায় এই শ্রেণীর কারু শিল্পীর বাহাদুরী ছিল স্বল্পস্থানের উপর। চিলম কিম্বা লেখনীর আধারের উপর এক ইঞ্চি কিম্বা দুই ইঞ্চি পরিমাণ সোনার পাত লাগাইয়া তাহার উপর হয় তো রাজসভার একটি সমগ্র চিত্র মিনা কাজের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হইত। শুধু সংলাপ-প্রকোষ্ঠের সম্পূর্ণ একটি আলেখ্য এইটুকু স্থানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা নিপুণ শিল্পীর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। চিত্রে মানবমূর্ত্তি তো আছেই, তাহা ছাড়া কার্পেট, উপাধান, বালিসের উপর ভর দেওয়ায় যে খাঁজ পড়িয়াছে সে খাঁজগুলি, এমন কি ওয়াড় বাঁধা সূত্রগুচ্ছের থোপ্‌নাটি পর্য্যন্ত সমস্তই ঠিক্ ঠাক অঙ্কিত হইত। এরূপ মিনাকারী চিত্রে দেখা গিয়াছে---পানপাত্র রহিয়াছে, ছাড়ান ফলগুলি সাজান রহিয়াছে, ভরা চিলমের উপর দিয়া ধোঁয়া উঠিতেছে; আনুষঙ্গিক উপকরণের কিছুই বাদ যায় নাই। এরূপ সূক্ষ্মাংশগুলি ভাল করিয়া দেখিতে হইলে আতস কাচের (magniflying glass-এর) সাহায্য লইতে হয়।

এ যুগে হুকুমবরদার ভাড়াটিয়া লিপিকার ও চিত্রকরেরা মাছিমারা কেরাণীর মত চিত্রসহ পুরাতন পুঁথি নকল করিতে নিযুক্ত ছিল। ইহাদের 'কলম' দিয়া আর নূতন কিছু বাহির হইত না। উনিশ শতকের চারুশিল্পের মধ্যে মাত্র দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের চিত্র-রচনা উল্লেখযোগ্য। (ক) ইউরোপীয় বাঁধা রীতিতে আঁকা পর পর কতকগুলি তস্‌বির (২) আর স্নানাগারের জন্য দ্বিমাত্রিক (flat or two dimensional) ভাবে কল্পিত কাঠের অথবা ক্যাম্বিসের উপর আঁকা কতকগুলি চিত্রফলক (panels)। কোনও বিশিষ্ট ইংরাজ সমালোচকের মতে এগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি সাইনবোর্ডের ছবির মত ঘনত্ববির্জ্জিত হইলেও শুধু উজ্জ্বল রঙের

(১৫) Blochet, Op. cit (Translation by Cicely Binyon). p. 101.

(১৬) Major R. Murdoch, Persian Art, p. 78.

(১৭) Mohendranath Dutt, Dissertation on [illegible]nting, p. 138.

(১৮) অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মুঘল যুগের চিত্রকলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৫০।

(১৯) Mohendranath Dutt, Op. cit., p. 139.

স্থষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে দর্শকের যথেষ্ট তুষ্টি সম্পাদন করে।

আধুনিক পারসীক পটুয়ারা চিত্রে মানবমুখের ডৌল ইউরোপীয় ছাঁদে ঢালিবার চেষ্টা করিলেও বিশেষ সফলকাম হইতে পারেন নাই। বেসিল গ্রে বলিয়াছেন যে, আধুনিক পারসীক চিত্রে মুখের চেহারার এই বিকৃতভাব মধ্য মিশরের ফেয়ুম্ (Fayum) প্রদেশে পাথরের শবাধারে (sarcophagus-এ) রোমকদিগের প্রতিকৃতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ফেয়ুমে এইরূপ দেহাবশেষ-আধার অনেকগুলিই পাওয়া গিয়াছে। এই ধারায় অঙ্কিত নৈসর্গিক দৃশ্যও আধুনিক চিত্রশিল্পের নমুনার মধ্যে দেখা গিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেগুলি উপর উপর দেখিলে নাকি কোনও আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীর বিশিষ্ট পদ্ধতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়(২০)। মনে হয়, লেখক বলিতে চাহেন যে, স্বেচ্ছায় হউক বা যুগধর্ম্মের প্রভাবে হউক পারসীক শিল্প পাশ্চাত্য শিল্পের ধার ঘেঁষিয়া চলিয়াছে কিন্তু ফল স্বাভাবিক ও মনোমদ না হইয়া হইয়াছে কতকটা অস্বাভাবিক ও বিকৃত রকমের।

পারসীক চারুশিল্প অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়া পঁহুছিল—যখন লিথোগ্রাফ সাহায্যে শাহনামা প্রভৃতি বিখ্যাত পারসীক গ্রন্থের সস্তা সচিত্র সংস্করণ বাজারে বিক্রয়ার্থ ভূরি পরিমাণে মুদ্রিত হইতে লাগিল। রুস্তম্ কর্ত্তৃক শ্বেত দৈত্য ('শুফেদ দিব') বধ, পিতৃহস্তে সোহ্‌রাবের প্রাণত্যাগ, আজাদাকে সঙ্গে লইয়া বাহ্‌রাম গোরের মৃগয়া প্রভৃতি যে সকল চিত্রের শোভন পরিকল্পনা ও যথোপযুক্ত সম্পাদনের জন্য প্রতিভাশালী চিত্রিগণ প্রাণমন নিবেদন করিতেন তাঁদের তুলিকাজাত সেই অপূর্ব্ব ক্ষুদ্রক চিত্রগুলির নিতান্ত কদর্য্য ও বিকৃত লিথোগ্রাফ-সম্ভূত যান্ত্রিক প্রতিলিপি সৌন্দর্য্যরসলিপ্সু সমঝদারদিগের মনে যুগপৎ দুঃখ, লজ্জা ও ঘৃণার সঞ্চার করিত। লিথোগ্রাফের কদর্য্যতা ছাড়া আর এক বিপদ্ ঘটিয়াছিল চিত্রের উৎকৃষ্ট আদর্শগুলি দেশান্তরিত হওয়ায়। নাসিরুদ্দিনের আমলে যে বৈদেশিক ঋণ জালের সূত্রপাত হয় তৎপুত্র মজফ্‌ফর উদ্দিনের রাজত্বকালে তাহার বহুল বিস্তৃত ঘটে। তাহার পুত্র সাহ মহম্মদ আলির রাজত্বকালে স্বয়ং পারস্যাধিপ অথবা খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জ্ঞাতসারেই রাজকীয় ভৃত্যবৃন্দ সাহের প্রাসাদের সুন্দর চিত্রিত পুঁথিগুলি গোপনে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। নাদির সাহ ভারত আক্রমণকালে সম্রাট্ আকবরের চিত্রশিল্পীদিগের দ্বারা চিত্রিত যে-সকল সুন্দর পারসীক পুঁথি লুণ্ঠিত সামগ্রীর সহিত পারস্যে লইয়া আসেন, সেগুলি এইরূপেই হস্তান্তরিত হইল। বারবার শাসনধারার পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন রাজবংশের অভিজাত শ্রেণীর অনেকেই দারিদ্র হইয়া পড়িলেন এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ পুঁথি ও তসবীর প্রভৃতি বিক্রয় করিতে হইল। পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত খানদানী ঘরের অনেক কিছু শিল্পসামগ্রীই আর্ম্মাণী ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া পারী নগরীতে বিক্রয়ার্থ আনীত হইল এবং মঁসিয়ে ক্লদ আনে (M. Claude Anet) প্রমুখ সমঝদারগণ অনেকেই সেগুলি ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ইহা মাত্র পঞ্চাশৎ হইতে পঞ্চসপ্ততি বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। পারসীক চিত্রশিল্পের কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এইরূপেই ক্লদ আনে সংগ্রহে স্থান পায়। আর কতকগুলি হজ্, সোথবি, উইলকিন্সন প্রভৃতি ইংরাজ নিলামওয়ালারা নিলাম করিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন। ইরাণবাসী যে সকল শিল্পী চিত্রশিল্পের অনুশীলনে রত রহিলেন তাঁহাদিগের এবং তৎপরবর্ত্তী শিল্পিগণের উৎকৃষ্ট দেশীয় আদর্শ হইতে প্রেরণা লাভের আর সুযোগ রহিল না।

এ পরিস্থিতির সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে পারস্যের রাজনৈতিক ইতিহাস অল্প কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে মজলিস্ নামে অভিহিত পারস্যের পার্লামেণ্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু শাসন-পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞতা হেতু সদস্যগণ বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বে রাজায় প্রজায় বিরোধ বাধিয়া গেল। রাজাদেশে পার্লামেণ্টগৃহ ভূমিসাৎ হইল বটে কিন্তু তাহাতে ফল হইল উল্টা রকমের। সাহকে প্রজাদিগের অধিকার কায়েম করিয়া নূতন করিয়া কন্‌ষ্টিট্যুশন্ হিয়াসতি-মুরুত্‌উ-মিল্লাৎ পত্তন করিতে হইল। মজফ্‌ফর উদ্দিনের সময় হইতেই প্রজারা বেশ দড় হইয়া উঠিতেছিল। বিদেশীকে তামাকের ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার দেওয়ায় রাজার যথেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধকল্পে(২১) সারা দেশের তাম্রকূটসেবীর এক সঙ্গে তামাকু বর্জ্জন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের অপেক্ষা কোন অংশে কম বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ করিয়া রুশিয়ার আধিপত্য ক্রমেই পারসীকদিগের অসহ্য হইয়া পড়িতেছিল। রুশিয়ার হাতের মুঠায় সমগ্র দেশের রেলপথ। বিদেশীকে সাহ যে সকল অধিকার দেন মজলিস্ তাহা মানিয়া চলিতে চাহে না। এই ঠোকাঠুকির ফলে রুশীয় সৈন্য পার্লামেণ্ট আক্রমণ করিল, সদস্যদিগের মধ্যে কেহ বা প্রাণ হারাইলেন, কেহ বা কারারুদ্ধ হইলেন, দেশে বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে মহম্মদ আলি সাহকেই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। রাজা হইলেন তাঁহার নাবালক পুত্র আহম্মদ (১৯০৯ খ্রীঃ অব্দ)। দুর্ব্বলকে বলীয়ানের কবলে পড়িতে হয়—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ব্রিটেন ও রুশিয়া পারস্য-রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ ও রুশ-শক্তির এই বাঁটোয়ারা প্রচেষ্টার সমাধান হইল রুশের বেলায় বলশেভিক্ বিদ্রোহের ফলে, আর রেজা খাঁ পহ্লবীর অভ্যুত্থানের সহিত ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞগণের পারস্যের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নিরর্থক হইয়া গেল।

শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন এবং আনুষঙ্গিক অশান্তি ও ঘরোয়া যুদ্ধের ফলে প্রজাপক্ষের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের যেরূপ বহুবিধ দৈহিক ও আর্থিক কষ্ট সহ্য করিতে হইল এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণও হারাইতে হইল, রাজপক্ষাবলম্বী সম্ভ্রান্ত[illegible] দিগেরও সে তুলনায় বড় কম ভোগ ভুগিতে হ[illegible] শক্তির সমর্থন করিতে গিয়াও যাঁহারা রক্ষা[illegible]

(২০) বেসিল্ গ্রে (Basil Gray) এতৎ সম্পর্কে Douanier Rousseau'র নামোল্লেখ করিয়াছে।

[illegible]শিল্পিগণ সম্ব[illegible] fi. 130 Miniätur Malerei

(২১) রবীন্দ্রনাথ, জাপানে পারস্যে,

শত্রুপক্ষীয়েরা প্রবল হইলে পর সেই সকল অভিজাত বংশীয়-দিগের যে কিরূপ দুর্দ্দশা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরবর্ত্তী কালে ইউরোপীয় সমালোচকেরা পারসীক শিল্প লইয়া যতই নাড়াচাড়া করুন না কেন, তাঁহাদের কাজ কতকটা গতপ্রাণ নরদেহের বর্ণনা ও অঙ্গাদি-ব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনীয়। ইহাদের মধ্যে অবশ্য দরদী সমঝদারেরও অভাব নাই কিন্তু মোটের উপর পারসীক শিল্পের জন্য ইউরোপ বিশেষ কিছু করে নাই এ কথা সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শফলে এ শিল্পের অনিষ্টসাধনই ঘটিয়াছে বেশী। অবশ্য বিশিষ্ট ফ্লেমিশ Flemish ও ইতালীয় চিত্রকরেরা পারসীক শিল্পের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে গালিচা তুর্কী গালিচা Turkish carpet নামে ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহা আসলে আসিয়াছিল পারস্য হইতে। ফেইয়েন্স faience নামে পরিচিত যে নানা বর্ণের চীনামাটির বাসন অত্যুৎকৃষ্ট মৃৎশিল্পের নিদর্শন বলিয়া পরিচিত তাহার নামকরণ ইতালীর কোন নগর হইতে হইলেও পারস্যেই ইহার আদিস্থান এবং আসলে সেই দেশেই ইহার উদ্ভব ঘটে। পারস্যদেশজাত এ জাতীয় মৃৎপাত্রের আকার, অবয়ব এবং চিত্রণ ও অলঙ্করণরীতি অনুশীলন করিয়া এইশ্রেণীর ইউরোপীয় মৃৎশিল্পের নিদর্শন সমূহের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলে শুধু পাত্র-গাত্রে সন্নিবেশিত চিত্র ও নক্সাগুলির সম্পর্ক নহে, এ জাতীয় কারুশিল্পের অভ্যুদয় ও প্রচলনকাল সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়। অভিজ্ঞদিগের মধ্যে কেহ কেহ বেশ জোর করিয়াই বলিয়াছেন যে, পারস্যে ক্ষুদ্রক চিত্রশিল্প মৃৎশিল্পের প্রসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

পারস্যের যে সকল মূর্ত্তি ও নক্সা বয়ন-শিল্প প্রভাবে ইউরোপ খণ্ডে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, সেগুলির সহিত ক্ষুদ্রক চিত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। কোন ক্ষেত্রে এগুলি যে সোজাসুজি ক্ষুদ্রক চিত্র হইতে গৃহীত—লয়লা মজনুনের চিত্র-সম্বলিত বস্ত্রখণ্ড এই কথাই প্রমাণ করে। প্রতীচ্যের তাঁতশালায় পারসীক নক্সা বার বার অনুকৃত হইয়াও স্বকীয় আকর্ষণী শক্তি হারায় নাই বরং প্রসাধক শিল্পে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। এখনও এইপ্রকার নক্সাযুক্ত পরদা এবং টেবিল, চেয়ার, ও কৌচ-ঢাকা আস্তরণ বিলাতের বড় বড় গৃহসজ্জার দোকানে বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাগ্রহে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু যাঁহারা এ সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন তাঁহারা এ সকল নক্সা ও অলঙ্করণের উৎপত্তিস্থানের কোন খবরই রাখেন না—পারসীক শিল্পের কদর করা তো দূরে থাক! ইংরাজ পণ্ডিতেরা, এমন কি কলাবিৎ রসজ্ঞেরাও চারু শিল্পের ব্যাবহারিক প্রয়োগের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না, যেহেতু ইহা ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত সম্পর্কযুক্ত। তাই পারসীক চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াও ইংরাজ লেখক বেসিল গ্রে উপদেশ দিয়াছেন যে তাঁহার স্বদেশবাসী প্রসাধক শিল্পিগণ যেন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া পুরাতন পারসীক চিত্রিত পুঁথির ক্ষুদ্রক চিত্রের ভাণ্ডার হইতে বিবিধ মনোমুগ্ধকর উপাদান সংগ্রহ করিতে অবহিত হন, আর পুঁথির কিনারায় যে সকল শোভন প্রসাধক অলঙ্কার রূপসজ্জার জন্য বিন্যস্ত থাকে সেগুলি আহরণ করিয়া বয়ন-শিল্পের মারফৎ যেন চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁহাদের মতে পারসীক শিল্প যখন আর জীবিত নাই, তখন উহার যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা যদি ব্যবসায়ীর কাজে লাগে—তাহাতে আর দোষ কি? ইহাই এখনকার যুগধর্ম্ম!

সুন্দর কাগজে অতি সুন্দর ভাবে লিখিত পারসীক পুঁথিগুলির রূপ-সম্পাদনের জন্যই ক্ষুদ্রক চিত্রসমূহ বিন্যস্ত হইত আর সেগুলির বহিরবয়বও ছিল সেইরূপ মনোহর। প্রতীচ্য খণ্ডে পারস্যের বড় রকমের একটা দান দেখা যায় বই বাঁধাইবার সুদৃশ্য ধারায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঁধান পারসীক পুঁথির সম্মুখের ও পিছনকার মলাটের নক্সাগুলি ভেনিসনগরে একেবারে সর্ব্বাংশে অনুকৃত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল সমগ্র ইউরোপময়। পাশ্চাত্য দেশের বই বাঁধান শিল্পের যে অলঙ্কারগুলি সুদৃশ্য ও সুপরিচিত সেগুলি প্রায়ই পারসীক মূলনক্সা হইতে গৃহীত। ফতে আলি সাহের জন্য বাঁধাই করা একখানি সুমনোহর কোরাণ-গ্রন্থের প্রতিলিপি Journal of Indian Art and Industries পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কারুশিল্পের এই শাখায় পারসীকেরা যে কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল ইহা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নক্সাদি-সম্বলিত কারুশিল্পের সহিত চিত্রশিল্পের নিকট সম্পর্ক, তাই এ কথার উল্লেখ করিলাম।

হঠাৎ

সেদিন হ...
হইয়া গেল যুধি...

পাশাপাশি

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বিপিন বাবুর সংসারে লোক বাড়িয়াছে। শুধু ঠিকা ঝি'তে আর চলে না। বাসাটা উপরে নিচে ইদানীং একেবারে ঠাসাঠাসা হইয়া উঠিয়াছে। চাকর রাখিবার ব্যবস্থায় আগে নিচের তলার রান্নাঘরের পাশের রুমটা একরকম খালি পড়িয়াই থাকিত, সম্প্রতি ঠিকা ঝি'র দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থায় রুমটা কাঠ-খড়ি ও কয়লাজাত হইয়া উঠিয়াছিল। ঝি বাতাসী নানা বাড়ীতে কাজ করিয়া বেড়ায়, বিশেষ কোনো বাড়ীতে থাকিলে তাহার চলে না। বিশেষ করিয়া নিজের সংসার বলিয়া কিছু না থাকিলেও বস্তি অঞ্চলে সামান্য একটা মাথাগুজিবার জায়গা আছে তাহার। সারাদিনের ঠিকা কাজের শেষে সেইখানে ফিরিয়াই সে সুনিদ্র রাত্রি যাপন করে।

দেখিয়া শুনিয়া বিপিন বাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী বাতাসীর উপরেই প্রথমটা ভারার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "রোগা জামাই এসেছে অসুখ সারাতে,একপাল ছেলেপুলে, দেখতেই তো পাচ্ছিস বাতাসী। তারপর বৌমারও শরীর ভাল নয়, সন্তান-সম্ভাবনা। কাজ কি বাড়ীতে একটা! দেখে শুনে একটা লোক যদি তুই ঠিক না ক'রে দিস, তবে যে আর চ'লছে না রে! তুই বাপু মেয়েমানুষ, পাঁচ দোরে ক'রে কম্মে খাস, নিজেই বা আর তুই কত পারবি, বল্? গায়েপায়ে জোর আছে—এমন্ একটা কাউকে এনে দে দিখিনি।"

কিন্তু বাতাসী অতিবড় একটি ম্যালেরিয়াগ্রস্তের খোঁজ আনিয়াও নিস্তারিণী দেবীকে খুসী করিতে পারে নাই। বাহিরে না হউক, অন্ততঃ বর্দ্ধমানীদের মধ্যে যে একেবারে জানাশোনা বিস্বা তাহার রূপ-লাবণ্যের জন্য এক আধটুকু নামডাক না আছে, এমন নয়, কিন্তু যে যাহার মতো সর্ব্বত্র বহাল। নতুবা কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারিলে বাতাসীরই সুবিধা হইত। অন্ততঃ হাতের লোক তো বটে, বাবু-বাড়ীর চাল-নুনের অংশটা পিছনের জানালা গলাইয়া একটু বেশী পরিমাণই আসিতে পারিত বই কি বাতাসীর আঁচলে। কিন্তু বরাত! কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "যুদ্ধের দিন মা, লোক কি আর কেউ ব'সে আছে! তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোনো হদিস্ পেলাম না। তা—যেতে দিন না দু'টো দিন, লোকে যেমন ক'রে ব'লছে, বোম্ আবার প'ড়লো ব'লে ক'লকাতায়। তখন তো হুড়মুড় ক'রে চাঁদুদের স'রতে হবে এই শহরতলীতেই; একটার যায়গায় তখন দশটা এসে বাড়িতে ধন্না দেবে দেখবেন। আমার নামও বাতাসী, এই ব'লে রাখ্ছি মা।"

সাম্প্রতিক চাকর-সমস্যায় নিস্তারিণীর মাথার দুর্ভাবনা থাকিলেও বাতাসীর কথায় এবারে না হাসিয়া পারিলেন না: "কবে বোম্ প'ড়বে কলকাতায়, তবে চাকর মিল্‌বে বাড়ীতে! এ যে একেবারে গোপাল ভাঁড়ের গল্প বল্‌লিরে বাতাসী!"

বাতাসী আর প্রত্যুত্তর করিল না। দুর্ভাবনা তাহারও কম নয়। পাঁচ দুয়ারে খাটিয়া খাইতে তাহারও হাড়-মাস এক হইয়া যায়। কিন্তু পয়সা! কেহ তো আর চাহিলে তিন টাকার বেশী একটা সিকিও হাতে তুলিয়া দিবে না। ওপাড়ার কবিরাজ-গৃহিণী তো মাসকাবারে ভাল করিয়া কথাই বলেন না।—ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল বাতাসী।

কিন্তু কলিকাতায় আর বোমা পড়িবার প্রয়োজন হইল না, সত্যিই একসময় নিস্তারিণীর ঘরে চাকর বহাল হইল। কয়লা আর কাঠ-খড়ির বোঝা বারান্দার এক পাশে চালান হইয়া গেল। ছোট ঘরে বৃহৎ রাজত্ব যুধিষ্ঠিরের। নামটা শরীরের ওজন বুঝাইয়া দেয় বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির অত্যন্ত পাতলা ছিপ্‌ছিপে, মুখে হাসি আছে, পরিধেয় তিলকুটে নয়, কথা বলে কম,—বিপিন বাবুর চোখে কতকটা 'বাবু গোছের' বলিয়া বোধ হইলেও নিস্তারিণী দেবীর মনে ধরিয়াছে যুধিষ্ঠিরকে। আসিয়া দুই একদিনের মধ্যেই কাজেকর্ম্মে যেমন চট্‌পটে ভাব দেখাইয়াছে, তাহাতে সাতটাকা মাহিয়ানা নেহাৎ কষ্টকর নয়।…আড়াল হইতে একবার নতুন মানুষটিকে দেখিয়া গেল বাতাসী। নিস্তারিণী অবশ্য তাহাকে জবাব দেন নাই, কিন্তু কেমন করিয়া যেন ইহারই মধ্যে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে যে, এ বাড়ীর মাসকাবারী তিন টাকা তাহার বন্ধ হইয়া যাইতে আর দেরী নাই। কাজ-কর্ম্মের অভাবে দুই একদিন অবশ্য পাড়া-প্রতিবেশীর মতই উড়া উড়া আসিয়া সকাল-বিকাল দেখা করিয়া গেল বাতাসী। কিন্তু কয়েকটা দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই যুধিষ্ঠিরের মহাভারত কিছু কিছু অশুদ্ধ হইতে সুরু করিল। পণ করিয়া বসিল—মেয়েলোকের কাপড় ধুইবে না এবং দ্বিতীয়তঃ দুপুর বেলায় বাড়ী থাকিবে না।

চক্ষু কপালে তুলিলেন নিস্তারিণী।

বিপিন বাবু বলিলেন, "তুমি তো সেই গোড়াঘাটেই ভাল লাগিয়ে ব'সে রইলে, নইলে ও আমি চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম, বেটার মধ্যে গলদ আছে।"

হার স্বীকার করিলেন না নিস্তারিণী। গলা উপরে তুলিলেন: "বলি, সাধে কি ভাল লাগিয়েছি! এদিকে বাড়ীতে হাঁস্‌পাতাল, ওদিকে চাকর পাওয়া ভার হ'য়ে দাঁড়ালো; নিজে তো শিবঠাকুরটি, দিনরাত বই আর খবর গড়গড়া, কিছু একটা দেখেশুনে ক'রবে, তবে তো! যেমন কপাল ক'রেছি, তেমনি সব—।"

প্রমাদ গণিলেন বিপিন বাবু।

নিতান্ত সাধারণ নয়; ক্ষেপিয়া গেলে বিপদ। হাসিয়া কহিলেন, "দুঃসময় প'ড়েছে, কি আর ক'রবে, ব'লো? তার চাইতে ঐ সাত আর তিনে দশ, বাতাসী বরংচ থেকেই যাক্, দেখে শুনে টুক্‌টাক্ চালিয়ে নেবে।"

কিন্তু অর্থের অনাবশ্যক অপচয়ের কথাটা হয়ত বিপিন বাবু সহসা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই নিস্তারিণী পুনরায় কথা কাটিতে গেলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির সামনে আসিয়া পড়ায় চুপ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। বাতাসীর মাসকাবারী তিন টাকা বাঁধাই রহিয়া গেল।...

অনেকটা যেন বর্ত্তিয়া গেল বাতাসী। পাঁচ দুয়ারে খাটিয়া-পিটিয়া বড়জোর পনের বিশ টাকা মাসে হাতে আসে। যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দাম শুনিয়া মুখ তোলা যায় না। কেহ তো আর মরিলেও এক সন্ধ্যা খাইতে বলিবে না। বাবুদের বাড়ীর ভাতের হাড়িই নাকি একেবারে জল-ধোওয়া হইয়া যায়।

এ-বাড়ী ও-বাড়ী হইতে কুড়াইয়া কাচাইয়া আনিয়া দুইমুষ্টি সিদ্ধ করিয়া খাইতেও কম খরচ হয় না বাতাসীর। তারপর ভগবান একটু যা রূপ দিয়াছেন, এক আধটুকু ভাল কাপড় না পরিলেও মানায় না। কিন্তু কাপড়ের বাজার যা চড়তি, হিমসিম খাইয়া যাইতে হয়। ঠিকা কাজ ক'রয়া বেড়াইলেও মোটা ময়লা কাপড় গায়ে তুলিতে সত্যিই মন ওঠে না বাতাসীর। ক্লান্তদিনের অবসরে একা যখন সে ভাবিতে বসে—চোখে আবছা হইয়া ভাসিয়া ওঠে রতনের মুখখানি। একটি দিনও রতন তাহাকে কষ্টে রাখে নাই। বিবাহের পর যে-ছয়মাস সে বাঁচিয়া ছিল, তাহাকে একেবারে দেহে মনে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল রতন, কিন্তু ঐ ছয়টা মাস মাত্র। একটা যুগের বসন্ত যেন তাহার চলিয়া গেল। বিধবা হইল বাতাসী। এদিকে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার জল হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। বর্দ্ধমানের সারা গ্রাম যেন নিঃশেষে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে দামোদর। রতনের ঘরের খুঁটি নড়িয়া উঠিল। কলকল শব্দে জল ছুটিয়া চলিয়াছে। ভয়ে ত্রাসে প্রাণ লইয়া ছুটিয়া আসিল বাতাসী কলিকাতায়, তারপর এই সহরতলী—। একটানা ঠিকা কাজ করিয়া চলিয়াছে সেই অবধি সে। প্রথমটা কান্না আসিত, রতনের জন্য দুঃখ হইত। কিন্তু অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সব সহিয়া গেল। বস্তিঅঞ্চলের ঘরটা দিব্বি নিরিবিলি, মাঝে মাঝে ফাঁকা লাগে, মাঝে মাঝে উনুনে খড়ি ঠেলিয়া আপন মনে পূর্ণ হইয়া ওঠে বাতাসী।

সেদিন হঠাৎ কলতলায় তাহার এক-পসলা ঝগড়া হইয়া গেল যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। ইতিপূর্ব্বে ভাল করিয়া পরিচয়ও হয় নাই তাহার সহিত বাতাসীর। প্রথ আলাপেই লঙ্কাকাণ্ড। নির্ব্বিবাদে বসিয়া বসিয়া ইলিশে আঁশ ছাড়াইতেছিল যুধিষ্ঠির। ওদিকে একপাশে নিস্তারিণী ও আসন্নপ্রসবা বধূমাতার কাপড় কাচিতেছিল বাতাসী। অজান্তে খানিকটা সাবান-জল যাইয়া গায়ে ছিটিতেই ইলিশ ফেলিয়া একেবারে রুখিয়া উঠিল যুধিষ্ঠির "বলি, এ কি শত্তুরগিরি ফলাতে এয়েছ এখানে যে, গায়ে ছিটে দিচ্ছ? আচ্ছা বেয়াড়া মেয়েমানুষ তো বটে!"

কথা শুনিয়া প্রথমটা বিস্মিতই হইল বাতাসী। এ বলে কি? শত্রুতার কোথায় কি হইল? উত্তর না দিয়া পারিল না সে।—"ভালো তো বিপদ দেখছি! কখন্ যে গায়ে ছিটে গেল, দেখতেই তো পলাম না, তার আবার শত্তুরগিরির কি হোলো? বাজে না ব'কে নিজের কাজ করো।"

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কাজ তখন পাটে উঠিয়াছে। রীতিমত ঝাঁঝাইয়া উঠিয়া বাড়ীটাকে মুহূর্ত্তে সে একেবারে মাথায় করিয়া লইল।

ব্যাপার দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন নিস্তারিণী। ওদিকে রেলিংয়ে আসিয়া দাঁড়াইল মালতি: বধূমাতা।

বাতাসী বিষয়টা বিবৃত করিল। নিস্তারিণী দেবী রীতিমত কঠিন হইলেন এবারে: "এত যদি বাড়াবাড়ি করো, তবে আর তোমাকে দেখছি রাখা চ'লবে না যুধিষ্ঠির! ভেবেছিলেম, স্বভাব-চরিত্তির তোমার খারাপ নয়, কিন্তু দিনে দিনে যা পরিচয় দিচ্ছ, একেবারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতোই।"

যুধিষ্ঠির ইতিমধ্যেই চুপ করিয়া গিয়াছিল। নিস্তারিণী দেবী পুনরায় কহিলেন, "বাতাসী মেয়েমানুষ, গায়ে প'ড়ে ওর সাথে ঝগড়া ক'রতে তোমার লজ্জা করে না? আর যেন এমনটা কখনো কানে শুনতে না হয়, এই ব'লে রাখছি।"

নিস্তারিণী দেবী সরিয়া পড়িলেন। বাতাসী নিজের কাজে পুনরায় মন দিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের গায়ের জ্বালা মিটিল না। বাতাসীর দিকে বারকতক কটমট্ করিয়া চাহিয়া মনে মনে খুসীমত যথেষ্ট গালাগালি করিল। শেষে ইলিশ আর বঁটি লইয়া রান্নাঘরের দিকে উঠিয়া গেল।

ইহার পর কিছুদিনের মধ্যে আর বাতাসীর সাথে যুধিষ্ঠিরের একরকম কথাই হইল না। প্রতিদিন সকাল বিকাল বাতাসী আসিয়া নিঃশব্দে কাজ সারিয়া চলিয়া যায়, কখনো বা দুইজনের আকস্মিক দৃষ্টি বিনিময় হয়; কিন্তু কথা হয় না। যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল—কল-তলার ঝগড়াটা সেদিন আদৌ শোভন হয় নাই। এখন যেন ভাবিতে যাইয়া তাহার নিজেরই লজ্জা করে। তাহার

সম্বন্ধে না জানি ইহারই মধ্যে কত বাড়ীতে নিন্দা রটিয়া গিয়াছে। নানা বাড়ীতে যাতায়াত বাতাসীর, হাজার হউক, এ তল্লাটে কিছুকালের প্রতিষ্ঠা আছে তাহার। যুধিষ্ঠির নিতান্ত গৌণ সেখানে। আসলে বিষয়টা ভাল হয় নাই। বাতাসীকে একবার আড়ালে পাইলে সে ক্ষমা চাহিয়া লইবে।—কিন্তু সুযোগ পাইয়াও যুধিষ্ঠির লজ্জাবোধে সহসা কিছু একটা বলিয়া উঠিতে পারিল না।

দিন চলিতে লাগিল।

ইদানিং এ বাড়ীতে বাতাসীর কাজ কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছিল। কাপড় ধোওয়া, টুক্ টাক্ ফাই-ফরমাস খাটা, রোগিদের সকাল-বিকাল আবশ্যকমত শুশ্রূষা করা—ইত্যাদি নানা কাজে অন্যান্য বাড়ী অপেক্ষা বেশী সময় ব্যয় করিতে হয় এখানে বাতাসীকে। প্রায় পুরা মাস মালতীর, মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা উঠিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে মালতীকে। ধাত্রীর সাথে তখন বাতাসীরই ডাক পড়ে। বাতাসী আপত্তি তোলে না। এখন না হউক্—সময়ে মালতীকে দিয়া কার্য্য হইবে। শুনিয়াছে—গরীব সংসারের মেয়ে মালতী—মনটা সরল—খুসী থাকিলে বাতাসীরই ভবিষ্যৎটা শুভ হইবে। বাস্তবিকই ভালবাসে মালতী বাতাসীকে।

সেদিন কাজ সারিয়া ঘরে ফিরিতে বাতাসীর রাত্রি হইয়া গেল। আকাশে ঘনকালো মেঘ করিয়াছিল। গেট পার হইতেই মুসলধারে বৃষ্টি নামিল। পথ না পাইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল বাতাসী। যুধিষ্ঠির তখন শিল-নোড়ায় সম্ভবতঃ কি একটা অসুধ পিষিতেছিল। বলিল, "তা—ওখানে কেন বাতাসী, বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আসচে যে, এস না, ঘরে ব'সবে।"

বাতাসী সলজ্জে আপত্তি তুলিয়া জানাইল যে, কিছু অসুবিধা হইবে না, বৃষ্টি এখনই ধরিয়া আসিবে।

কিন্তু বৃষ্টি সত্যিই ধরিল না, বরংচ আরও জাঁকিয়া আসিল।

যুধিষ্ঠিরের ঘরে আসিয়া মাদুরে বসিল বাতাসী। এ যাবৎ যুধিষ্ঠির আসা অবধি এ ঘরে বাতাসী আসে নাই। নিস্তারিণীর দোতলা আর কল-তলা হইয়াই অন্যকাজে বাহির হইয়া গিয়াছে।—হঠাৎ যেন বড় ভাল লাগিল ঘরটা। একপাশে পরিষ্কার একটা কম্বলের আবরণে বিছানা গুটানো, অন্য পাশে পুরানো একটা সুটকেশের উপরে ছোট্ট আয়না ও দাঁতভাঙা চিরুণী, দেওয়ালে পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ও কোন্ একটি সুন্দরী চিত্র-তারকার ক্যালেণ্ডার-ছবি। সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার বেশ রুচি আছে যুধিষ্ঠিরের। নিজের ঘরটার সাথে একবার মনে মনে মিলাইয়া লইল বাতাসী। বেশ একটা ভাল-লাগা ভাব জাগিল যুধিষ্ঠিরের উপর। নোংরামী বাতাসীও সহ্য করিতে পারে না।

যুধিষ্ঠির কহিল, "সেদিন থেকে চ'টে আছো তো? তা' ব'লেছিলামই না হয় দু'টো কটু কথা, তোমাকে তো আর বাইরের লোক ভেবে বলিনি।"

বাতাসী বলিল, "চ'টে তো তুমিই আছো দেখচি। আমরা বাপু পাঁচ দোরে খেটে খাই, তোমার মতো অমন ভারিক্কী হ'য়ে থাকলে আমাদের চলে না।"

"তা না হয় দোষ একটা হ'য়েই গেছে", যুধিষ্ঠির কহিল, "তাই জন্যে কি তার মাপ নেই?"

কথাটা বাতাসীর তেমন ভাল লাগিল না। বলিল, "এই আবার কিন্তু চটাচ্ছ তুমি, ব'লছি।"

যুধিষ্ঠির মৃদু হাসিল।—"ভাল, কি আবার বল্‌লাম, বলো?"

"নাই বা ব'ললে কি? সাবান জলটা তো আমার হাত দিয়েই ছিটেছিল, তা আবার মাপ চেয়ে বড় যে ভণিতা দেখাচ্ছ? মা ব'লেছিলেন কি সেদিন মিছে কথা, গায়ে প'ড়ে বড্ড ঝগড়া ক'রতে পারো তোমরা।" অস্পষ্ট হাসিল একবার বাতাসী।

যুধিষ্ঠির আর কথা খুঁজিয়া পাইল না। বলিল, "তা খুব হ'য়েছে, এই কানমলা খাচ্ছি বাপু, এখন হোলো তো?"

বাতাসী এবারে আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বোকার মতো চুপ করিয়া গেল যুধিষ্ঠির।

বাহিরে বৃষ্টির ঝমঝমানি। উসখুস করিতেছিল বাতাসীর মন। কখন্ যাইয়া নিজের উনুন ধরাইবে, তবে রান্না হইবে। বিরক্তি ধরাইয়া দিল বাদরটা।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বড় ভালো লাগিতেছিল বাতাসীকে। বাস্তবিকও রূপ আছে বাতাসীর; দেওয়ালে টাঙানো ঐ চিত্র-তারকাটির তুলনায় একেবারে খারাপ নয়। টানা ভ্রূ, নাশিকায় তিল, এক গোছা চুলে মাথাটা ভরা, দেহের গড়নটা আরও সুন্দর। সত্যিই নেশা লাগে দেখিতে।

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যুধিষ্ঠির ডাকিল, 'বাতাসী?"

উৎকণ্ঠার সুরে বাতাসী জবাব দিল, "কি বলো?"

সসঙ্কোচে যুধিষ্ঠির মুখ তুলিল বাতাসীর দিকে। "বল্‌ছিলাম কি, সারাদিন খেটেখুটে আবার যেয়ে রেঁধে খাও, কষ্টের তো একশেষ। আজ না হয় এখান থেকেই

ছুঁমুঠ খেয়ে যাবে। বিষ্টি যখন জোরেই এলো, কি আর ক'রবে বলো ?"

বাতাসী কথাটার সহসা জবাব দিল না। একবার কৃতজ্ঞতা আসিল, কিন্তু অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। ধিক্কার দিল মনকে। এমন একটি লোককেই তো সে খুঁজিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। বাহিরের লোক যুধিষ্ঠির, সম্বন্ধটাই বা কি, জোরই বা চলে তাহার উপর কতটুকু।

মৃদুকণ্ঠে যুধিষ্ঠির বলিল, "কি ভাবছো বাতাসী ?"

কথাটা ঘুরাইয়া লইল বাতাসী।—"ঘরের জানলা দু'টা খোলা রেখে এয়েছিলাম, না জানি মেঝেতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেল !" বলিয়া কিছুটা ইতস্ততঃ করিল সে। তারপর চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া কহিল, "আমি বরংচ যাই, একটু ভিজলে কিছু হবে না।"

বাধা দিল যুধিষ্ঠির।—"পাগল না মাথাখারাপ যে, এই জলে বেরুবে! কাল তবে আর জরের ঘোরে কাজে আসতে হবে না।"

কিন্তু বাতাসী সে-কথায় কান দিল না। দ্রুতপদে বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া গেল।

অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল মাত্র যুধিষ্ঠির।...

উনুনে ডেক্‌চিতে গরম জল ফুটিতেছিল। দোতলা হইতে নিস্তারিণী দেবী ডাকিলেন, "যুধিষ্ঠির, উনুনের আঁচ নিভিয়ে গরম জল নিয়ে উপরে এস।"

হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল যুধিষ্ঠিরের, এমনই একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ধীরে ধীরে সে উঠিয়া পড়িল। বিরক্ত করিয়া মারিলেন জামাতা বাবাজি আর বধুমাতা-ঠাকরুণ। সেঁকের ব্যবস্থা, পথ্যের আয়োজন, গরম জল ঠাণ্ডা করা, ঠাণ্ডা জল গরম করা—রীতিমত উত্যক্তকর ব্যাপার। শীতগ্রীষ্ম ঝড়জল জ্ঞান নাই—যখন তখন হুঙ্কার দিয়া ওঠেন গৃহকর্ত্রী—একেবারে যেন জলন্ত শলা বিঁধাইয়া দেন যুধিষ্ঠিরের গায়ে।

এদিকে বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমিয়া আসিতেছিল। ঘরে ফিরিয়া বাতাসীর সত্যিই আজ আর রাঁধিতে মন বসিল না। হাঁড়িতে সকালবেলার জল দেওয়া সামান্য ভাত ছিল। তেঁতুল-নুন গুলিয়া তাহাই সে পরমান্ন ভাবিয়া খাইয়া উঠিয়া ডিবা নিভাইয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। কিন্তু চোখের পাতা বুজিল না। বৃষ্টির রাত্রি আসিলে কেবলই তাহার রতনের কথা মনে হয়; রতনের হাসি, রতনের সোহাগ, এমন কি স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের মধ্যেও রতনের প্রেমাতুর চুম্বনের ভঙ্গী—সব মিলাইয়া যেন একটা স্মরণচিহ্ন আঁকা দিয়া যায় সারা মনে। বাতাসী তখন আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে না নিজের মধ্যে। কিন্তু আজকের রাত্রে রতনের মুখখানি যেন অলক্ষ্যেই মিলাইয়া গেল। যতই সে মনে আনিতে যায়—কেবলই সামনে আসিয়া দাঁড়ায় যুধিষ্ঠির। দুই দণ্ডের কথায় সে যেন সান্ত্বনার একটা প্রলেপ বুলাইয়া দিয়াছে তাহার মনে। অন্ধকারেই একবার উঠিয়া বসিল বাতাসী। —সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘ ডাকিতেছে। দামোদরের ভাঙনের কথা মনে করিয়া সহসা একবার শিহরিয়া উঠিল সে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। একবার ডিবা জ্বালাইল, চারিদিকটা ভাল করিয়া চাহিয়া লইয়া আবার নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। এমন অবসন্ন বিস্মৃত মুহূর্ত তাহার অনেককাল আসে না। ঘুম আসিল কি আসিল না, কিছু একটাও সে বোধ করিতে পারিল না। কিন্তু রাত্রি একসময় শেষ হইয়া গেল। অবসন্নতায় সারা দেহ আচ্ছন্ন। একেবারে মিথ্যা কথা বলে নাই কাল যুধিষ্ঠির। ভগবান করুন, জর যেন তাহার শত্রুরের গায়েও না আসে, কিন্তু সত্যই কাজে বাহির হইতে আজ তাহার অনেকখানি বেলা হইয়াই পড়িল বটে।

ইহার পর কিছুদিন কাটিয়া গেল। বাতাসী যাহা চাহিয়াছিল, ভগবান তাহার কিয়দংশ মিলাইয়া দিলেন। নিস্তারিণীর রান্নাঘরের জানালা গলাইয়া চাল-নুনের ভগ্নাংশ কিছু একটা বাতাসীর আঁচলে আসিয়া পেঁয়োবন্ধ না হইলেও যুধিষ্ঠির যখন তখন তাহাকে অনাবশ্যক সুযোগেও অযাচিত সাহায্য করিতে কার্পণ্য করে না। প্রথম প্রথম বাতাসী সঙ্কোচ করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারে নাই। ইদানিং যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করিয়া অনেকখানিই যেন শক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মনে। নিজের ঘরটাকেও অনেকটা যুধিষ্ঠিরের মতো করিয়াই গুছাইয়া তুলিয়াছে বাতাসী। বেশ যেন একটা লক্ষ্মীর ছাপ চারিদিকে।

সেদিন আড়ালে পাইয়া আর একবার কথা পাড়িল যুধিষ্ঠির।—"তুমিও তো কম বোকা নও বাতাসী, এত খাটো পেটো, মাঠাকরুণও যথেষ্ট ভালবাসেন তো বটেই, খাবার ব্যবস্থাটা তো ব'লে ক'য়ে তুমি এখানেই ক'রে নিতে পারো!"

বাতাসী আপত্তি তুলিল।—"ঘেন্না, ঘেন্না; গায়ে পায়ে যদ্দিন জোর আছে, পরের বাড়া ভাতে চোখ দিতেও ঘেন্না করে। খাটি পিটি, পয়সা নেই, আবার কেন!"

চাপাগলায় খানিকটা জোর দিল যুধিষ্ঠির।—"মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কি বলে সাধে! রোজ এ বাড়ীর ভাত খাওয়া-দাওয়া চুকিয়েও নর্দ্দমায় প'ড়ে পচে কাঁড়ি কাঁড়ি। একটা পেট দু'বেলা তাতে নিশ্চিন্দে চলে যায়। তুমি হাবা না কেঁচো যে, মুখের কথাটুকুও ব'লে খাবার পয়সাটা বাঁচাতে পারো না? ঘেন্না না ছাতি, যুদ্ধের দিনে লোকে পায়না খেতে, আর গায়ে প'ড়ে তুমি ঘেন্না ধরে আছ! ছোঃ—"

কথাটা ভাবিবারই বটে। বাতাসী মনে মনে অনেক-ক্ষণ চিন্তা করিল; কিন্তু কিনারা পাইল না। ভগবান নিজের জন্য তাহাকে মুখ ফুটিয়া বলিবার কিছু শক্তি দেন নাই। নতুবা তাহাকে আজ আর এমন করিয়া পাঁচ দুয়ারে ঝি-গিরি করিতে হইত না। মুখ ফুটিয়া বলিলে, বর্দ্ধমানে রতনের গ্রামে এমন অনেকেই ছিল, যাহারা দামোদরের বন্যার মুখেও তাহাকে পাটরাণীর মতো রক্ষা করিত। আজ আর সে মুখ বাতাসী খুলিবে না।

উত্তর না পাইয়া যুধিষ্ঠির পুনরায় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কোথা হইতে সহসা নিস্তারিণী দেবী একেবারে তাহাদের মুখামুখি আসিয়া পড়ায় সারা মুখ তাহার কালি হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া দ্রুত পদে অন্যত্র গা ঢাকা দিল বাতাসী। ভাব দেখিয়া মনে মনে কতকটা লজ্জিত হইলেও রীতিমত জলিয়া উঠিলেন নিস্তারিণী।—"বলি, এতক্ষণ কি মন্ত্র কচ্ছিলে যুধিষ্ঠির, না—কানে মন্ত্র দিচ্ছিলে ছুঁড়িটার। নিজে তো বাপু সারা গায়ে সাহেব মানুষ, মেয়েছেলের কাপড় ধুলে জাত যায়, বাতাসীটাকেও শাস্ত্রপাঠ শিখিয়ে নাও আর কি! নচ্ছার কোথাকার। আবার কোমর বেঁধে ঝগড়া করা; এত দরদ তখন ছিল কোথায়?—"

অনর্গল বকিয়া গেলেন নিস্তারিণী। যুধিষ্ঠির টু-শব্দটি পর্য্যন্ত করিল না। লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিল। কথাটা বাড়ীময় জানাজানি হইয়া যাইতেও বিলম্ব হইল না। যুধিষ্ঠির শুনিল, দোতলা হইতে বিপিন বাবু বলিতেছেন, "একেবারে হারামজাদা, যত চুপ করে থাকতে দেখো, মিটমিটে শয়তানি তত পেট ভরা।"—নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া বহুক্ষণ মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল যুধিষ্ঠির, তারপর একগাদা বাসন লইয়া আপন মনেই উঠিয়া গেল কল-তলায়।

এ ঘটনার পর প্রায় তিন চারি দিনের মধ্যে বাতাসীর আর বড় একটা খোঁজ পাওয়া গেল না। অনবরত উপরনীচ করিয়া নিজের হাতেই কাপড় ধুইয়া লইতে হইল নিস্তারিণীকে। খিট্‌খিটে মেজাজ আরও তিরিক্ষি হইয়া উঠিল।—"বলি, কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত না গিলে বাতাসীর একবার খোঁজ নিয়ে দেখলেও কি তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয় না কি, যুধিষ্ঠির! আমার তিন কুলেও তোমার মত এমন নির্ব্বিকার হাড়-হাভাতে লোক তো দেখিনি বাপু!"

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আর খোঁজ করিতে হইল না। বাতাসী একসময় আপনই আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাগ্য ভাল, সময়টা এমন ছিল, যখন আর পূর্ব্বেকার ঘটনার জের টানিয়া তাহার লজ্জা পাইবার কিছু একটা পরিস্থিতি ঘটিল না। সেদিন ভোর বেলা হইতে বধূমাতা মালতীর প্রসব-বেদনা উঠিয়াছিল। সারা দিন ডাক্তার ডাকা, ধাত্রী ডাকা ছুটাছুটি হড়াহুড়িতে চারিদিকে ব্যস্ততা। বাতাসী আসিয়া একেবারে মালতীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তারপর হইতে অনর্গল শুশ্রূষা। যুধিষ্ঠির বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত। বিপিন বাবু ঘর আর বাহির করিতে করিতে এক সময় গড়গড়া লইয়া নিভৃতে আসিয়া খানিকটা হাঁপ ছাড়িতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মালতীর অসহ্য যন্ত্রণাকাতর চীৎকারে পাড়ার লোক পর্য্যন্ত তটস্থ ··· রাত্রটা কোনো ভাবে কাটিয়া গেল। ভোরবেলায় সন্তান প্রসব করিল মালতী: টুকটুকে ছোট্ট একরত্তি ছেলে। নিস্তারিণী দেবী এতক্ষণে আসিয়া অবসন্ন দেহে একবার তক্তপোষে কাৎ হইলেন। আর একবার ভাল করিয়া ফরসিটা সাজিয়া লইয়া আরামের টান দিয়া চক্ষু বুজিলেন বিপিন বাবু।

ধীরে ধীরে যুধিষ্ঠিরের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল বাতাসী। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে কেমন দেখলে?"

অস্ফুটে বাতাসী উত্তর করিল,—"একেবারে সোনার টুকরো।"

"সত্য?" আনন্দ বোধ করিল যুধিষ্ঠির।

"নয় তো কি? দেখে এলেই তো পারো?"—এক ঝলক হাসিল বাতাসী, তারপর বিদ্যুৎঝলকের মতই কোথায় আবার অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে যেন হাসিটুকু লাগিয়া রহিল। অনেক কথা বলিবার ছিল তাহার বাতাসীকে। একবার রাগ হইল, বিতৃষ্ণা আসিল, কিন্তু রোষাম্বিত স্বাতন্ত্র্যটাও সে বড় বেশী রক্ষা করিতে পারিল না। মনে মনেই জল হইয়া গেল। ওপাশে নবজাতকের কান্নায় তখন নতুন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে প্রসূতি-গৃহে।

বিপিন বাবুর লোক-ঠাসা বাড়িতে এতদিনে আবার নতুন লোক আসিল। ব্যক্তি তো বটেই! ঝি চাকরের অপরিহার্য্যতা এবারে আর শুধু চিন্তারাজ্যের সাম্প্রতকীতে রহিল না, রীতিমত দুশ্চিন্তায় আসিয়াই দাঁড়াইল। মাসকাবারী দশটাকা ক্রমান্বয়ে সাত আর চারে এগারোয় রূপান্তরিত হইয়া গেল। চশমার আড়ালে বিপিন বাবু আর কোনো প্রশ্ন তুলিলেন না।

দিন চলিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজের অবসরে সত্যিই এক সময় বাতাসীর জ্বর আসিল। ডেঙ্গুর সময়। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণায় একা ঘরে সে সারা রাত্রি চীৎকার করিল।

বিন্দুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করিতেও কেহ আসিল না। নিজের ঘরে যুধিষ্ঠির কিন্তু সে-রাত্রে বেঘোরে ঘুমাইল। ভোর বেলায় বিপিন বাবুর দোতলা হইতে খোঁজ পড়িল বাতাসীর। অপেক্ষা করিয়া করিয়া রাগে এক সময় ফাটিয়া পড়িলেন নিস্তারিণী: "মেয়ের সমান বয়স ব'লে ভাল-বাসতে বাসতে রীতিমত মাথায় উঠেছে দেখ্‌ছি বাতাসী। এইজন্যেই লোকে বলে—ছোটজাতকে 'নাই' দিতে নেই। সুখ সুবিধে পেতে পেতে একেবারে হাতির পাঁচ পা দেখে ব'সে আছে হতচ্ছাড়ী; মরণ আর কি!"

বাতাসী তখনো মেঝেতে পড়িয়া কাতরাইতেছে। ঘরে বসিয়া যুধিষ্ঠির এতক্ষণ সবই শুনিতেছিল। ভয় হইতেছিল—কখন্ আবার তাহাকে লইয়া না পড়েন নিস্তারিণী। কিন্তু ফাঁড়া কাটিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরের কানে আসিল—মা-ঠাকরুণ ইতিমধ্যে যাইয়া একেবারে বাবু-ঠাকুরকে আক্রমণ করিয়াছেন। বিপিন বাবু বলিতেছেন. "তা' আমি কি ক'রতে পারি বলো? ভাল বোঝো. নতুন ঝি দেখ।"

একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল যুধিষ্ঠিরের বুকটা। মায়া হইল বাতাসীর কথা ভাবিয়া। এত করিয়াও এক দণ্ডের মাপ নাই বাবু-বাড়ীতে!

খাওয়া দাওয়া চুকাইয়া শিকলে তালা আঁটিয়া যুধিষ্ঠির বাহির হইয়া পড়িল দুপুরে। রাস্তার মোড়ে পঞ্চাননের পানের দোকানে তখন আসর বসিয়াছে। প্রতিদিন এখানে মোটা আড্ডা জমাইয়া যুধিষ্ঠির আবার ঘরে ফিরিয়া বিকালের উনুনে আঁচ দেয়। কিন্তু আজ আর আসরে মন বসিল না। পাশ কাটাইয়া এক সময় সে বাতাসীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যন্ত্রণা-কাতর গোঙানিতে ঘরটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। যুধিষ্ঠির সঙ্কোচ করিল না. একেবারে পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল বাতাসীর।—"তাইতো বলি. সকালবেলা থেকে কেবল যেন মনে হচ্ছিল, নিশ্চিত, তোমার অসুখ ক'রেছে। কথা তো আর শুনবে না, যেন্না ঘেন্না ক'রবে, আর জলে ভিজবে। এখন দেখবে কে?"—পরম আত্মীয়ের মতো বাক্যের দৃঢ়তা!

অস্ফুট গোঙানীতে বাতাসী উত্তর করিল, "দুঃখ যিনি দেবার নয়, তিনিই দেখবেন।"

কথাটা ঠিক ধরিতে পারিল না যুধিষ্ঠির।

বাতাসী কহিল, "জানো, কাল রতন এয়েছিল। চেহারাটা একটুও বদলায় নি। ওর হাসি না দেখতে পেলে কাল রাতে আর বাঁচতুম না।" জ্বরের তাপে গত রাত্রি হইতেই ব্রহ্মতালুটা একবারে তাতিয়া আছে বাতাসীর। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কথাটা বলিয়া একবার হাসিতে চেষ্টা করিল সে।

নির্ঘিবে একটা প্রকাণ্ড ধাঁধা বলিয়াই যেন বিষয়টা মনে হইল যুধিষ্ঠিরের। হৃদয় বৃত্তিতে যেন আঘাত পড়িল তাহার।—"কে তোমার রতন? কোথায় সে?"

কিন্তু বাতাসীর পক্ষে তাহা জানিয়াও আজ একরকম না জানা হইয়া গিয়াছে। উত্তর দিতে পারিলনা। অনবরত মাথার দুই পাশের রগ দুইটাকে কে যেন উপড়াইয়া ফেলিতে চাহিতেছে। ব্যথায় নড়িয়া উঠিয়াছে দাঁতের গোড়াগুলি। নির্জ্জীবের মতো কিছুক্ষণ চক্ষু বুঁজিয়া রহিল বাতাসী। অসম্বৃত যৌবন একবার স্পষ্ট হইয়া ধরা দিল যুধিষ্ঠিরের চোখে। বড় তন্দ্রালু বড় আবেশ মুখর। কিন্তু কে সেই রতন, এতটুকুও অদৃশ্য ইঙ্গিত আছে কি তাহার কোথাও?

—"উঃ, কিচ্ছু বোঝো না তুমি। মাথাটা যে ছিঁড়ে গেল।"—চোখ মেলিল বাতাসী।

সংশয়ে একবার পাক খাইয়া উঠিল যুধিষ্ঠির। একবার সঙ্কোচ আসিল বাতাসীর কপালের দিকে হাতটা আগাইয়া দিতে যাইয়া। বাতাসী তাহা লক্ষ্য করিল কিনা জানি না, নির্ব্বিবাদে সে মাথাটা তুলিয়া ধরিল যুধিষ্ঠিরের জানুর 'পরে, তারপর আবার চোখ মুদিল। বস্তির অপর প্রান্তে তখন কোলাহল সুরু হইয়াছে।

মৃদু কণ্ঠে বাতাসী কহিল, আঃ—এইটুকুর অভাবে কাল থেকে মরে আছি। কিচ্ছু তো জানবে না. কেবল পারো ঝগড়া ক'রতে। উঃ, আর একটু জোরে ঠেসে ধরো কানের দু'পাশটা।"

অভিভূতের দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির অলক্ষ্যে একটা ভারী নিশ্বাস ত্যাগ করিল। অনেক কথা, অনেক জিজ্ঞাসা ঠোঁটের আগায় আসিয়া জমিল, কিন্তু সময়ের দুঃস্থতায় কছু একটা সে প্রকাশ করিতে পারিল না। চোখ দুইটি ঘরের এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বারবার কেবলই বাতাসীর আঁখি-যুগলের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল যতটা পারল সংযত করিল, বাকীটাকে লইয়া যুধিষ্ঠির আর বড় বেশী ভাবিতে গেল না।

ধীরে ধীরে বিকাল গড়াইয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। —পাশের কোথা হইতে সদ্য প্রজ্বলিত উনুনের ধোঁয়া ভাসিয়া আসিতেছিল,সহসা যেন একটা স্বপ্নাবিষ্টভাব হইতে সচকিত হইয়া উঠিল যুধিষ্ঠির। অন্যদিন এতক্ষণে নিস্তারিণীর ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপে। আজ হয়ত ফিরিয়া গিয়া আর রক্ষা নাই। যুধিষ্ঠির কহিল, "এর পরে ঘরে ফিরলে যে আর চাকরী থাকবে না গো। একেই তো দিনরাত মা-ঠাকরুণ মুখ খিঁচিয়েই আছেন; তোমাকেও নিতে ছাড়েন নি একহাত। এবারে উঠি।"

সম্বিৎ ফিরিল বাতাসীর। যুধিষ্ঠিরের জানু হইতে

মাথাটাকে নিজের বালিশের উপরে টানিয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল, "অসুখে পড়েছি, সত্যিই কষ্ট হ'চ্ছে মা'র। তুমি বরংচ এখন এস।"

"কিন্তু তোমার—"বলিতে যাইয়া থামিয়া গেল যুধিষ্ঠির।

বাতাসী কহিল, "চ'লে যাবেই একভাবে; একা থাকি তো আজ নতুন নয়। তুমি আর দেরী কোরো না।"

নিঃশব্দে যুধিষ্ঠির চলিয়া আসিল। কিন্তু আসিতে তাহার সত্যিই ইচ্ছা ছিল না। যেদিন হইতে সে বাতাসীকে দেখিয়াছে, অলক্ষ্যে কেমন একটা মায়া জড়াইয়া গিয়াছে তাহার উপর। তাহার এই উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর জীবনে এমন অনেক বাতাসীর সহযোগেই সে আসিয়াছে, কিন্তু এ যেন পৃথক বাতাসী। একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে তাহার, যাহা বাতাসীর একান্ত নিজস্বতাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে! সত্যিই ভাল লাগিয়াছে তাহাকে যুধিষ্ঠিরের; ভালবাসাও হইতে পারে। বাতাসীকে না দেখিলে তাহার ভাল লাগে না, ইচ্ছা হয় না বাতাসীর সাথে দুই দণ্ড গল্প না করিয়া থাকিতে। প্রথম দিনের ঝগড়াটা যেন আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে এই সম্প্রীতিকে।—সারা ঘরে একা মানুষ বাতাসী, পথ্যটুকু মুখে তুলিয়া দিবার পর্য্যন্ত কেহ নাই। আজ আর যুধিষ্ঠির লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিবে না। মা-ঠাকরুণকে বলিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা না করিলে বাতাসীর হয়ত সত্যিই বাঁচিয়া ওঠা কঠিন হইবে।··

কিন্তু আশা তাহার মনের মধ্যেই পাক খাইল। নিস্তারিণী দেবী একেবারে চণ্ডীরূপ ধারণ করিলেন। মাথাটি পর্য্যন্ত তুলিতে পারিল না যুধিষ্ঠির।

রাত্রে সদর দরজার বাহিরে কাহারো পা বাড়াইবার হুকুম নাই এ বাড়ীতে। বিপদে পড়িয়া নিজের বিছানায় শুইয়াই সারা রাত্রি এ-পাশ ও-পাশ করিল যুধিষ্ঠির। কিন্তু একটী সংশয় তাহার মন হইতে কিছুতেই দূর হয় নাই। রতনকে তাহার চিনিতেই হইবে। কিছুতেই যে বিশ্বাস হয় না রতন বলিয়া কাহাকেও!

রাত্রি ভোর হইল। সারা বেলার কাজকর্ম্ম চুকাইয়া আবার দুপুরে আসিয়া আপন আগ্রহেই যুধিষ্ঠির বাতাসীর মাথাটাকে টানিয়া লইল নিজের জানুতে। খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল বাতাসী। শেষ-রাত্রির দিক হইতেই জ্বর ও গায়ের বেদনা তাহার কমিয়া আসিয়াছিল। বলিল, "আর মাথা টিপতে হবে না, ভাল হ'য়ে গেছি।"

যুধিষ্ঠিরের ঠোঁটেও মৃদু হাসি আসিয়াছিল। কহিল, ভাল হ'য়েছ না ছাই। ভেজু বড় সাজ্যাতিক।"

কিন্তু সত্যিই অনেকটা হাল্কা বোধ হইতেছিল বাতাসীর। প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিল, "তা তো যেন হোলো; কিন্তু এমন ক'রে যে আসো যাও, লোকে যে অকথ্য বলবে।"

ঠোঁট উল্টাইল যুধিষ্ঠির—"আমরা মেয়েমানুষ নই যে, লোকের কথায় মাথা গুঁজবো। যুধিষ্ঠিরের মনে এখনো শক্তি আছে।"

"কিন্তু আমরা তো মেয়েমানুষ!"

"তবে আর কি, প'চে মরো।" যুধিষ্ঠির বলিল, "অমন বুঝলে বিয়ে-থা করে স্বামী-সংসার নিয়ে থাকতে হয়।"

বাতাসী স্বর দৃঢ় করিল, "কিন্তু সংসার যে টেকে না, বানের জলে ভেসে যায়।"

যুধিষ্ঠির বাতাসীর আদ্যোপান্ত কোনো ইতিহাসই জানিত না। অত্যন্ত সাধারণ মন লইয়া তাই কহিল, "তোমার মাথা হয়। অসুখে ভুগবে, কাতরাবে, আর পাঁচ দোরে ঘুরে মরবে। ঘর বেঁধেই না হয় একবার দেখলে; কুঁকড়ে প'ড়ে আছো তো এই খোলার চালায়!"

আবার তেমনি করিয়াই সশব্দে হাসিয়া উঠিল বাতাসী।—"কিন্তু লোক কোথায়?"

যুধিষ্ঠিরের ঠোঁটের আগায়ই যেন একরকম কথাটা আসিয়া থামিয়াছিল, বলিল, "কেন, তোমার রতন?"

আকস্মিক একটা প্রকাণ্ড ঢেউ যেন এক-মাল্লাইয়ে বাড়ি খাইল। সহসা মুখের হাসি মিলাইয়া গেল বাতাসীর।—"কি ব'ল্লে!"

দৃঢ় অথচ সহজভাবেই যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিল, "রতন গো, তোমার রতন। সেদিন রাত্রে না বড় হেসে ঢ'ঙে কথা ক'য়ে গেল, বল্‌ছলে?"

কিন্তু বাতাসীর কিছুই স্মরণে আসিল না। একটা আকস্মিক বিক্ষুব্ধতায় মনটা তাহার ভরিয়া উঠিল। সন্ধানীর দৃষ্টিতে চারিদিকে সে যেন একবার কি খুঁজিল, তারপর দ্রুধীর আবেগে সহসা যুধিষ্ঠিরের ডান হাতখানি সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, না, যা জানো না, তা' নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। সে চ'লে গেছে, সগ্যে গিয়ে একটু শান্তিতে থাক, প্রার্থনা করো। হয়ত জ্বরের ঘোরে ছাই-ছাতা ব'কেছি, তাই নিয়ে অমন কোরো না তুমি, ও আমার সইবে না। তাই তো ব'ল্‌তে গেছু, সংসার টিক্‌লো না। তা'—ও কথা থাক্, অন্যকথা বলো তুমি; বলো, বৌদিদিমণির নতুন খোকা কেমন আছে, জামাই বাবুর শরীর কি রকম?"

বিপিন বাবুর সংসার সম্বন্ধে সত্যিই উচাটন বাতাসী।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মুখে সহসা কোন কথা আসিল না। সব যেন কেমন একটা তাল-বিচুড়ী হইয়া গেল তাহার

কাছে। মূঢ় অভিভূতের মতো বহুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া পরে নম্র-কণ্ঠে ক'হিল, "আমার ভুল হ'য়েছে, তুমি আমায় মাপ করো বাতাসী।"

মনের অবস্থাটাকে পরিবর্তন করিয়া লইতে বেশীক্ষণ লাগিল না বাতাসীর। কহিল, "মেয়েমানুষের শুধু দোহাই দাও, কিন্তু কথায় কথায় এমন মাপ চায় কোন্ পুরুষ মানুষে, ব'লতে পারো?" থামিয়া বলিল, "তুমি খুব ভদ্দর, এই জন্যেই তো ভাল লাগে। ও সব ধম্ম-পেরাচ্চিত্তিরের কথা আর মেয়েমানুষকে বড় একটা ব'লতে এসো না কখনো! ওতে পাপ হয়।" আর একবার চারিপাশে ভাল করিয়া চাহিয়া লইল বাতাসী। ছল'-ছল' দৃষ্টিতে কহিল, "জানো, সব ভুলে গেছি। কবে স্বামী ছিল, কবে সেই বন্যায় সব ভাসিয়ে নিলে, সব ভুলে গেছি। ভাবি, যদি কেউ আবার তুলে নিতো, তবে বুঝি আর সুখের পরিসীমে থাকতো না! তেমনি ক'রেই সেবা ক'রতুম, তেমনি ক'রেই পায়ে মাথা রেখে আবার বাঁচতুম। আজ যেন সত্যিই ম'রে আছি!" একখণ্ড কাতর দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল বাতাসী যুধিষ্ঠিরের চোখের 'পরে।

অভিভূত মনের অরণ্যে একবার তুফান উঠিল যুধিষ্ঠিরের। কি যেন একটা বলিতে যাইয়া ঠোঁট দুইটা কাঁপিয়া উঠিল। সবটাই যেন একটা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল তাহার আগাগোড়া। নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধেও একবার সন্দেহ জাগিল। নিস্তারিণী দেবীর রোষ-দৃষ্টিও যে একবার মনে আসিয়া উঁকি মারিয়া না গেল, এমন নয়। বাতাসীর কানের দুইপাশ হইতে অবিন্যস্ত চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ একবার উচ্চারণ করিল, "ভগবান যেন তোমার আশা পূরিয়ে দেন, বাতাসী।"

শরীরের গ্লানি আর মনের উত্তেজনায় শিরাগুলি যেন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল বাতাসীর। আর কিছু একটা সে কহিতে পারিল না। তেমনি করিয়াই শুধু কাতর দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে একসময় প্রায় বৎসর ঘুরিয়া আসিল।...

মালতীর দুধের খোকা আধো আধো কথা শিখিয়াছে। নিস্তারিণী দেবী ইদানিং প্রায় ভাল করিয়া চোখে দেখেন না। ডাক্তাররা বলেন—জণ্ডিসের মতো কি একটা বোধ হইতেছে। বিপিনবাবু গড়গড়া টানিতে টানিতে চশমার ফাঁকে একএকবার বহুদূরে দৃষ্টি লইয়া যান। মাঝে মাঝে শোনা যায়—আড়ালে বসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে তিনি গাহিতেছেন—'মা আমায় ঘুরাবি কত', পায়ে না হউক, তাঁহার এই ছাপান্ন বৎসর বয়স ধরিয়া মনে মনে তিনি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা এক দুঃসহ ইতিহাস। ঘরে বসিয়া যে বয়সে মানুষ ধর্ম্ম-পুরাণ অধ্যয়ন করে, বিপিনবাবু সে বয়সে ডাক্তারের বাড়ী দৌড়াইয়া সময় পান না। জামাতা বাবাজীর যে কি রোগ, তাহা রঞ্জনরশ্মিতেও ধরা পড়ে নাই। সংসারে লোক বাড়িয়াছে,—ভগবান তাঁহাকে কম দেন নাই। কিন্তু থলি প্রায় আজ শূন্য হইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের করাল ছায়া; বাজার চড়্‌তি, মাছের সের আড়াই টাকা, জলের রং দুধ হইয়া বিকাইতেছে। তারপরে আছে ঝি-চাকরের মাহিয়ানা। কোনো দিন বড় একটা হিসাব নিকাশ তলাইয়া দেখেন নাই বিপিন বাবু সংসারের; কিন্তু আজ কার্য্যকরণসম্বন্ধে তাহাও তাঁহাকে ভাবিতে হইতেছে। 'কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো' আজ সত্যিই তাঁহাকে মনের জগতে পাক খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইতেছে চব্বিশ ঘণ্টা। নিস্তারিণী দেবী অনেকটা প্রশমিত হইয়াছেন ইদানিং, তেমন করিয়া আর গলা সপ্তমে তোলেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে খিট্‌খিটে হইয়া উঠিতেছেন বিপিন বাবু।

আড়াল হইতে হাসে বাতাসী, হাসে যুধিষ্ঠির :—"রূপ বুঝি বদ্‌লালো এতদিনে বাড়িটার!"

দমদমের কাছাকাছি কোথায় তখন নতুন এরোড্রোমের কাজ সুরু হইয়াছে। জংলা মাঠ পরিষ্কার করিয়া থাম পোতা হইতেছে, মাটি কাটা হইতেছে গজ মাপিয়া, উপরে নিচে বহু দূর অবধি মিলিটারী মিস্ত্রীরা জোড়া লাগাইয়া চলিয়াছে মোটা মোটা পাইপ। বিপক্ষ শত্রু-আক্রমণকে রুখিবার বিচিত্র ঘাঁটি। মোটা মাহিয়ানায় লোক বহাল হইয়া চলিয়াছে দিনের পর দিন।...

একদিন ভোরবেলায় উঠিয়া বিপিনবাবু দেখিলেন, খিড়্‌কির দুয়ার খোলা। বিছানা পত্র লইয়া পলাইয়াছে যুধিষ্ঠির।—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে একবার করজোড়ে নমস্কার করিলেন বিপিনবাবু। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন, "খোঁজ নিয়ে দেখি, বাতাসী যদি জেনে থাকে কিছু ব্যাপারটা।"

কিন্তু পরিশ্রম পণ্ড হইল নিস্তারিণীর। কল তলায় একরাশ বাসী কাপড় আসিয়া তখন জমা হইয়াছে। দুই ফোঁটা গরম তেল মালিশের অভাবে নতুন দুধের খোকা কুঁকড়াইয়া আছে মালতীর বুকে। কিন্তু বাতাসীও অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।—ভালবাসিতে নাই ছোট জাতকে। রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া কপালে হাত দিয়া বসিলেন নিস্তারিণী।

ইহার পর অনেক সকাল, অনেক সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ অঞ্চলে যুধিষ্ঠির কিম্বা বাতাসীর আর খোঁজ মেলে নাই।

পঞ্চাননের পানের দোকানে ইহা লইয়া অনেকদিন অনেক হাসিঠাট্টা ও কানাঘুষা হইয়াছে; বাতাসী সত্যিই হয়ত আবার তবে নতুন সংসার পাতিয়া বসিয়াছে এতদিনে।

বিপিনবাবুর বাড়ীতে যুধিষ্ঠিরের ঘরটা আবার ধীরে ধীরে কাঠ-খড় ও কয়লাজাত হইয়া উঠিল।

একদিন দেখা গেল—আবার নতুন লোকের খোঁজে বাহির হইয়াছেন নিস্তারিণী।

কাঞ্চন সংসর্গাৎ (গল্প)

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

মেয়ের বিয়ের প্রায় সব ঠিক করে ফেলেছিলাম—বাকি ছিল শুধু কিছু টাকার জোগাড় করতে। তেমন বেশি টাকাও সে নয়। তাই মনে করেছিলাম, সামনের রবিবার সকালে বেরিয়ে চেয়ে আনব টাকাটা কোন না কোন আত্মীয় বন্ধুর কাছ থেকে। সেই রবিবার সকালেই বেরিয়েছিলাম—চেয়েওছিলাম টাকা কয়জনের কাছে। কিন্তু টাকা কেউ তাঁরা দিতে পারলেন না। এমন যে হবে তা মনে করি নি। মনটা তাই একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল—এত বড় একটা ভুল করলাম হিসেবে? ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরছিলাম। পেছন দিক থেকে কে কাঁধে হাত দিলেন। কে? কাঁধে হাত দেয় কে? ফিরে চাইতে দেখি শম্ভুবাবু। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম তাঁকে দেখে। আমাকে ফিরতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েচে আপনার? গলির ভেতর থেকেই আপনাকে দেখতে পেলাম—নমস্কার করলাম একটা। দেখতে পেলেন না। ডাকলাম বার দুই. সাড়া দিলেন না। পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিলাম, কয়েক পা গিয়েও ছিলাম। আবার ফিরলাম কারণ মনে হল যে অমন অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলার বিপদ আছে এখানে। কি হয়েচে আপনার বলুন ত? একটু অস্বস্তি বোধ করলাম মনে. বললাম, এমন ভাবে পথ চলছিলাম যে, উনি ডাকলেন, শুনতে পেলাম না? স্বীকার করতে হল. একটা কথা ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, শুনতে পাইনি আপনার কথা। কিন্তু কি এমন ভাবনা হঠাৎ চেপে ধরল পথের মধ্যে যে, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে দিল আপনাকে? কি হল? ব্যাপার কি? তেমন কিছু নয় তবে মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু টাকার জোগাড় করতে বেরিয়েছিলাম—পেলাম না। তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, কি করব।

মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন? কবে বিয়ে?

আর দিন কই? আজ রবিবার, মাঝে দুটি দিন সোম, মঙ্গল, তার পরের বুধবার বিয়ে। টাকাটা জোগাড় করতে হবে ত এর মধ্যে, ভাবনাটা তাই।

কত টাকার দরকার আপনার?

শ' তিন চার। তিনশো'তে হয়ত কুলবে না, কিন্তু চার শো টাকায় নিশ্চয় কুলিয়ে যাবে।

এই মোট চার শো টাকা। এরই জন্য এত ভাবনা? নাঃ আর ভাববেন না, আমি দেব আপনাকে চার শো টাকা। সন্ধ্যার পর একবার আসবেন আমার বাড়ীতে। এখনি দিতে পারতাম কিন্তু একটা কাজে বেরুচ্ছি, আর বাড়ী ফিরব না এখন। সন্ধ্যার পর আসতে পারবেন না?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে শম্ভুবাবু বললেন, সেই ভাল, সন্ধ্যার পরেই আসবেন। আমি এখন যাই একটু কাজ আছে। তাড়াতাড়ি বলে ভদ্রলোক তাঁর গন্তব্য পথে চলে গেলেন। আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে ছিলাম তাঁর দিকে, হাত তুলে একটা নমস্কার করতেও ভুল হয়ে গেল। শম্ভুবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। কিন্তু কোন ঘনিষ্টতা হয়নি তখন আমাদের মধ্যে, কারণ পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমি কলকাতার ছেলেদের সঙ্গে মাখামাখি করতে সাহস পেতাম না। তারপর চাকরীতে ঢুকে সেখানেও দেখি শম্ভুবাবু আগের থেকে আসর জমিয়ে বসে আছেন। উপস্থিত কিছুদিন থেকেও তাঁদের গলিতেই বাসা নিয়েছি আমি।

কিন্তু সে যাই হোক, পথ থেকে ডেকে যে আমাকে টাকা দিতে চাইবেন ভদ্রলোক সে আমি মনে করতে পারিনি। বার বার তাই মনে হচ্ছিল—ভুল শুনিনি ত? আবার ভাবছিলাম, বাঃ—ঠিকই শুনেচি সন্ধ্যার পরে টাকা দেবেন বলেচেন উনি।

ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। আমার দিকে এক নজর চেয়েই গৃহিণী বললেন, টাকা পাওনি ত?

হাঁ বলতে পারলাম না, না বলতে বাধল। চুপ করে গেলাম তাই।

গৃহিণী আবার বললেন, টাকা যে তুমি পাবে না সে আমি জানি। শুধু হাতে কে তোমায় টাকা দেবে? টাকা চেয়ে শুধু অপমান হওয়া লোকের কাছে। তার চেয়ে আমি বলি, এই হার আর চুড়ি ক'গাছা নিয়ে

সেকরার কাছে যাও, টাকা পেয়ে যাবে। কাক কোকিলে জানতে পারবে না। তা না হয় পারবে না, কিন্তু এটা কি ঠিক হবে যে, তোমার মেয়ের বিয়ে আর তুমি থাকবে কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে? ঠিক হবে না বললে শুনচে কে? ও নিয়ে আর মাথা খারাপ করো না। এখন একটু জিরিয়ে দুটি নেয়ে খেয়ে যাও, মিছিমিছি পিত্তি পড়িয়ো না। কত কাজ করবার আছে, যা হবে না এমন নিয়ে ভাবলে কি হবে?—বলে তিনি কার্য্যান্তরে চলে গেলেন।

মেয়ের বিয়ে সেই বুধবারেই হল। টাকা শম্ভুবাবুই দিলেন। আরো অনেক রকমের অনেক সুবিধা পেয়ে গেলাম তাঁর জন্য। বিয়ে হয়ে গেল। টাকাটা শোধ দিতে আমার যে কিছু দেরি হবে, সে-কথা আগেই বলেছিলাম ভদ্রলোককে। কিন্তু যে সময়ে দিতে পারব মনে করেছিলাম, তার চেয়েও দেরি হয়ে গেল একটু। কিছুতেই কথা রাখতে পারলাম না। একদিন শেষে সন্ধ্যার পরে গিয়ে টাকাটা শম্ভুবাবুর হাতে দিলাম। নোটগুলো গুণে তার মধ্য থেকে কয়েকখানা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, সুদ দিয়েচেন কত? সুদ নিতে পারব না।

হ্যাণ্ডনোটে সুদ দেবার কথা লেখা আছে কিন্তু।

তা থাক, সুদ নিতে পারব না আমি আপনার কাছ থেকে।

কিন্তু যদি ব্যাঙ্কে টাকা থাকত তাহ'লে এ সুদ পেতেন। সেই টাকাটা লোকসান করব আমি আপনার কেমন করে?

ব্যাঙ্কের কথা ছেড়ে দেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসাদারদের টাকা ধার দেয়, চড়া হারে সুদ নেয়। সেই সুদের কিছুটা সে আমায় দিত যদি আমি ব্যাঙ্কে টাকা রাখতাম। কিন্তু আপনিও ব্যাঙ্ক নন বা আমার কাছে নিয়ে সেই টাকা খাটিয়ে কিছু মুনফাও করেননি আপনি। আপনার কাছ থেকে সুদ নেব কেমন করে? বলুন?

কোন জবাব করতে পারলাম না আমি তাঁর কথায়। ঐ রকমের মনোভাব না হ'লে কি সেদিন পথ থেকে ডেকে টাকা দিতে পারতেন উনি আমাকে? আমাকে চুপ করে যেতে দেখে নোট ক'খানা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন, বললেন, খতখানা আপনার—বলে বাড়ীর ভেতরের দিকে চলে গেলেন শম্ভুবাবু।

ফিরতে তাঁর একটু দেরি হল। ইতমধ্যে দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এক জনের এক হাতে চা ও অন্য হাতে রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন আর অন্য জনের একহাতে কাঁচের গেলাস ভরা জল ও অন্য হাতে কিছু মুখশুদ্ধি নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে ছুটে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে।

একটু পরেই শম্ভুবাবু ফিরলেন এবং তাঁকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ছেলেমেয়ে দুটি কি আপনার?

ছেলেটি আমার, মেয়েটি দাদার। মেয়ে নেই আমার।

মেয়ে নেই আপনার? বেঁচেছেন মশাই, হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথটা।

মেয়ে নেই বটে, কিন্তু হবার সময় এখনো যায় নি। কিন্তু সে যাই হোক, মেয়ের সম্বন্ধে মনটা আপনার কঠিন হয়ে উঠেছে বোধ হচ্চে যেন।

ঠিক তা নয়, হয়ত তবে কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েচে ঐ মেয়ের সম্পর্ক ধরে এবং এখনো শেষ হয়নি তার।

কিন্তু হিসাব করে দেখতে গেলে বুঝবেন যে ছেলেও একবারে সৌভাগ্যের ধ্বজা ধরে আসে না, দুর্ভোগ তার জন্যও কম পোহাতে হয় না আমাদের।

তা বলেচেন ঠিকই কিন্তু ছেলের সঙ্গে মেয়ের একটু তফাৎও আছে এবং তার বাপের সংসারে মেয়ে কোনদিনই ঠিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে না।

সে কি মেয়ের অপরাধ?

অপরাধ ঠিক তার না হলেও বাপের বাড়ীতে তার অপরাধেরই চেহারা—কারণ অকারণ তার কুণ্ঠা। হয়ত নিরপরাধীর সেই অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত করচি আজকার এই দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে। কে জানে?

হতে পারে। আমি কিন্তু অন্য কথা বলচি, বলচি যে দশ পনেরো বছর পরে এই মেয়েকেই দেখবেন আপনি তার স্বামীর সংসারে ছেলে মেয়ের মা, ঘরের গৃহিণী, তার দিকে চেয়ে চিনতে পারবেন না হয়ত নিজেরই আপনার মেয়েকে, নূতন চেহারা ফুটে উঠবে তার মুখে।

বুঝলাম ভদ্রলোক কি বলচেন নিজের মেয়ের দিকে চেয়ে না হলেও নারীর ঐ চেহারা আমারও চোখে পড়েচে কিন্তু বলতে পারলাম না সে কথা। চুপ করে গেলাম।

শম্ভুবাবু হয়ত বুঝলেন অবস্থাটা এবং অন্য কথা পাড়লেন, বললেন, চা টা জুড়িয়ে গেল একবারে।

যাক চা খাবার ইচ্ছা নেই আর এত রাত্রে। তারপরে ঠাণ্ডা জলই ভাল লাগবে মিষ্টির সঙ্গে।

তারপর জলযোগ সেরে আরো দু'চারটে অন্য কথার পরে আমি উঠে পড়লাম।

আস্তে আস্তে পথ চলছিলাম কারণ শম্ভুবাবুর কথা ভাবছিলাম। কলেজি আমলের সেই দুর্দান্ত ছেলেটির মধ্য থেকে কি দুর্লভ মাতৃভক্তি ফুটে বেরিয়েচে অগোচরে। মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল এমন একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ অনুভব করেচি মনে করে।

বাড়ীর কাছাকাছি মাধবদাদার সঙ্গে দেখা। আমায় দেখেই তিনি বললেন, এলে ভাই, তোমারই ওখান থেকে আসচি।

মাধবদাদা আমাদের দেশের লোক এবং গ্রাম সম্পর্ক ছাড়াও তাঁকে দাদা বলবার কারণও আমার আছে। ঠিক কাছাকাছি না হলেও এই ভবানীপুরেই দুজনের আমাদের বাসা এবং দুজনেই আমরা দুজনের বাসা চিনি। কথাটা ত ঠিক ভাল শোনা গেল না—এত রাত্রে তিনি আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন কেন? তাই জিজ্ঞাসা করলাম—কেন কিছু দরকার ছিল না কি? বাড়ীর সব ভাল?

ভাল আর কই ভাই? ছোট মেয়েটার বড় অসুখ। তারই জন্য গিয়াছিলাম তোমার কাছে। তোমার নাকি কে একজন আত্মীয় আছেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন তিনি।

তা আছেন বটে কিন্তু তাঁকে দিয়েও আপনার কাজ হবে না, তিনি ত আপনার বাড়ী গিয়ে মেয়েকে আপনার দেখে আনতে পারবেন না।

তা হলেই ত মুস্কিলে ফেললে ভাই, আমি যে আর পেরে উঠচিনে ওদিকে।

কেন, কি হয়েছে? খুলে বললে সব বুঝি ব্যাপারটা। ডাক্তার দেখাচ্ছেন ত?

তা'ত দেখাচ্চি আর সেই ডাক্তারের ফর্দ্দ মত ওষুধ আনতে আজ আপিস থেকে দশ টাকা আগাম নিলাম, সব উড়ে গেল। তারপরে কালকে যে কি হবে ভগবান জানেন। কারণ বলে গিয়েছেন ডাক্তার যে কাল সকালে রোগী দেখে তিনি ঠিক করবেন বড় ডাক্তার একজনকে পরামর্শ করবার জন্য ডাকতে হবে কি না। আমি বলচি ভাই যে দরকার হবেই, আর তার মানে আরো ষোল বা বত্রিশ টাকা। এখন বল এত টাকা আমি পাই কোথায়? কথায় কথায় আমরা দাদার বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, বড় ডাক্তার যদি আনবার দরকার হয় ত অসুখ সারাবার জন্যই তাঁকে আনতে হবে, আপত্তি করলে চলবে না। কিন্তু আপনি বলচেন হাতে টাকা নেই আপনার। আচ্ছা আমার কাছে এই কয়েকটা টাকা আছে—উপস্থিত এই দিয়ে কাজটা চালান আপনার। তার পরে যা হবার পরে দেখা যাবে।

দাদা হাত পেতে নোট ক'খানা নিলেন, কিন্তু চুপ করে গেলেন, কথা কইতে পারলেন না।

আমি বললাম, অনেক রাত হয়ে গিয়েচে দাদা, এইবার আমি যাই। তিনি আমার হাত দুটো ধরে বললেন, মেয়েটা যদি বাঁচে, তোমারই কল্যাণে বাঁচবে ভাই।

বাঁচবে বৈকি, কোন ভয় নেই, বলে আমি চলে এলাম। পথে বার বার মনে হতে লাগল খবরটা নিতে হবে একবার করে আপিস থেকে ফেরবার পথে।

মায়াময় শরতের রাত

শ্রীকরুণাময় বসু

শরতের রাত যেন স্মরণের মায়া প্রজাপতি,—
বিচিত্র সোনালি রঙ লেগে আছে চপল ডানায়;
মেঘের বাসর কক্ষে পরীদের প্রেমের আরতি,
ছায়া-ছলছল চোখে হৃদয়ের মিনতি জানায়।

চিত্রিতা খড়ের ঝোপ, রাঙাভাঙা ঢালু বালু পাড়,
বিশীর্ণ নদীর রেখা গ্রামান্তরে ক্লান্ত সুরে চলে;
চাঁদের ঘুমন্ত মুখে মায়াময় উদাস বিস্তার,
পতঙ্গ গুঞ্জনধ্বনি নানা সুরে কতো কথা বলে।

শরতের রাত যেন উড়ে আসা মায়ার কাহিনী,
জন্মান্তের নাম ধরে সুধাকণ্ঠে দেছে মোরে ডাক;
মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠি, মনে হ'ল যেন চিনি-চিনি,
অকস্মাৎ ভরি ওঠে অকারণে মনের মৌচাক।

দেখিলাম সেই মেয়ে হারানো স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে
অস্পষ্ট গুণ্ঠন টানি ধীরে ধীরে কাছে এল মোর;
স্মরণ-প্রদীপালোকে ক্ষণকাল রহিলাম চেয়ে,
মনে এল কবেকার রাখী বাঁধা, সেই প্রেম-ডোর।

কি জানি কী যাদু জানে মায়াময় আশ্বিনের রাত,
হারানো করুণ মুখ ফিরে বুঝি এসেছে দৈবাৎ।

রের অরণ্যে

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আমরা যখন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রথম যাই তখন এখানকার আরণ্য অঞ্চল ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিদর্শন—বিশেষ পেরিয়ার হ্রদ দর্শনই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যাঁহারা দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিবেন তাঁহাদের সকলের উচিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এই মনোরম হ্রদটী অবশ্য দর্শন করা। আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশের বক্ষে বিরাজিত বলিয়া এই হ্রদের শোভা অধিকতর মনোলোভা হইয়াছে সন্দেহ নাই। চারদিকে কান্তার-কুন্তলা পর্ব্বতমালা। মধ্যে হ্রদের সুনীল সলিলরাশি কখন বায়ুভরে মৃদু-মন্দ স্পন্দিত হয়—কখন বা ঝঞ্ঝাবেগে মত্ত হইয়া তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করে।

সাধারণ হ্রদ যে ভাবে উৎপন্ন হয় পেরিয়ার হ্রদ ঠিক সেইভাবে জন্মায় নাই। বাঁধের দ্বারা পেরিয়ার নদের গতি রুদ্ধ করায় এই হ্রদের জন্ম হইয়াছে। সুতরাং পেরিয়ার নদই হ্রদের রূপে পরিণত হইয়াছে বলা চলে। পেরিয়ার নদের গতি-রোধক এই বাঁধ নদটির জন্মস্থান হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে। বাঁধের উদ্দেশ্য নদের প্রাণদ প্রবাহকে উহার উৎপত্তিস্থল পর্ব্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বে লইয়া যাইয়া শস্যক্ষেত্রসমূহকে অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলা। এই 'পেরিয়ার প্রোজেক্ট' শত বৎসর অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক কাল পূর্ব্বের পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কার্য্যে পরিণতি পায়। সুতরাং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দকে পেরিয়ার হ্রদের জন্ম-সময় বলিয়া অভিহিত করা চলে। ঐ বৎসর বাঁধ-নির্ম্মাণ সমাপ্ত হওয়ায় পেরিয়ার নদের রুদ্ধগতি জলস্রোত পেরিয়ার হ্রদে পরিণত হয়।

এখন হ্রদের জলরাশি যেখানে নৃত্য করিতেছে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় বনানী বিদ্যমান ছিল। সেই বনানীর বুকের উপর দিয়া পেরিয়ার নদ সিন্ধুপদে আত্মসমর্পণের জন্য উচ্চ কলতানে সবেগে ছুটিয়া যাইত। স্বভাবের সন্তান পশু, পক্ষী ও অসভ্য আরণ্য জাতি ব্যতীত এই অরণ্যানীর অভ্যন্তর ভাগের সংবাদ কেহ জানিত না। পর্ব্বতারণ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত পেরিয়ারের উদ্দাম ধারার দ্বারা তখন মনুষ্য-সমাজের বিশেষ কোন কল্যাণ সাধিত হইত না।

-বক্ষে

যে প্রণালী বা কৌশলের দ্বারা পেরিয়ার নদকে পেরিয়ার হ্রদে পরিণত করা হইয়াছে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রচণ্ড নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক শক্তিকে সংযত বা সংহত করিয়া মানুষের পক্ষে কল্যাণজনক করিয়া তুলার চেষ্টা জগৎ জুড়িয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। যাহা রুদ্র রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক শুধু ধ্বংসধারা বহাইত, এখন বিজ্ঞানের বলে বা কলে-কৌশলে তাহাকে সৃষ্টি ও পালন-কার্য্যের সহায়ক করিয়া তুলা হইয়াছে। নৈসর্গিক শক্তিসমূহের লীলাস্থল আমেরিকা এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী, সন্দেহ নাই। তথায় বিজ্ঞানের সাহায্যে শত শত নদী-নির্ঝরকে কার্য্যকর করিয়া তুলা হইয়াছে। ভারতবর্ষও স্বাভাবিক শক্তিনিচয়ের চিরন্তন লীলা-নিকেতন। কিন্তু প্রকৃতির উদ্দাম

শক্তিকে সংযত করিতে হইলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, দরিদ্র ভারতের তাহা কোথায় ?

মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ও কর্ম্ম-কৌশলের সহিত স্বাভাবিক শক্তির সম্মিলনে সম্ভূত এই অদ্ভুত হ্রদটি যাঁহারা দেখিতে চান তাঁহা-

পরমপ্রীতিপ্রদ আরণ্য প্রকৃতির মধ্যস্থলে ত্রিবাঙ্কুরাধিপতির প্রাসাদ
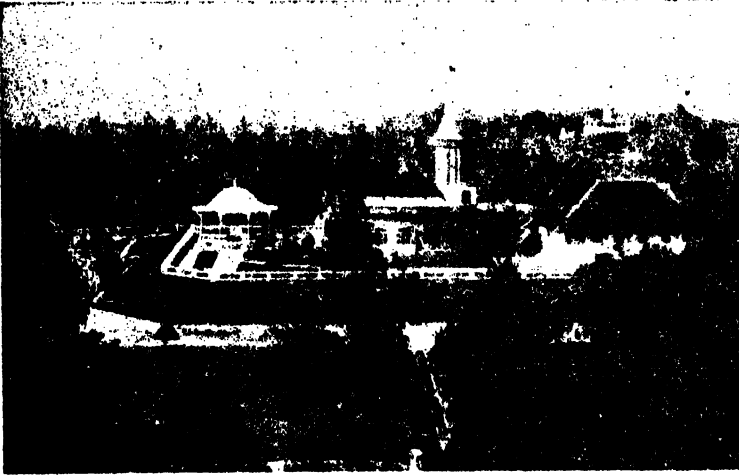
দিগকে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর উপর দিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মন্দিরমালিনী মাদুরা নগরী এবং কামিলি আখ্যায় অভিহিত একটি গ্রামের ভিতর দিয়া পেরিয়ারের পথ অগ্রসর হইয়াছে। কামিলি হইতে এক মাইল আন্দাজ দূরে থেকাড়ি। থেকাড়িতে পেরিয়ার নদের জল পর্ব্বতবক্ষবিদারী টানেল বা সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়াছে। এই নদের জলকে পর্ব্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বে আনিবার জন্য বাঁধ বাঁধিয়া স্রোতের গতিকে রোধ করা হইয়াছে, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গিরিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রস্তুত এই সুড়ঙ্গের সাহায্যে নদের জলকে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে লইয়া যাইয়া হ্রদে পরিণত করা হইয়াছে। থেকাড়িতে মাদ্রাজের সরকারী সেচ-বিভাগের নির্ম্মিত একটি বিশ্রামাবাস এবং ডাকঘর বিদ্যমান।

সাধারণতঃ বাঁধ হইতে দেখিলে এইশ্রেণীর কৃত্রিম হ্রদের সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় কিন্তু থেকাড়ি হইতে পেরিয়ারের বাঁধ প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। জলরাশির উপর দিয়া নৌকাযোগে যাইতে হয়। পূর্ব্বে যাতায়াতের জন্য একটি ষ্টিম-লঞ্চ ছিল। সেই যন্ত্রযানটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হওয়ায় সাধারণ নৌকা ভিন্ন যাওয়া আসার উপায় নাই। এক-জাতীয় দেশীয় ডিঙ্গি ওই অঞ্চলে 'ওয়ালান' আখ্যায় অভিহিত হয়। এইজাতীয় নৌকাই এই প্রদেশে অধিক ব্যবহৃত হয়।

এই অঞ্চলের গিরিগুলির গাত্র নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইউরোপীয় প্লাণ্টার দলের দ্বারা যে সকল স্থানে চা, কফি, দারুচিনি প্রভৃতির চাষ আবাদ চলিতেছে, শুধু সেই স্থানগুলিই তেমন জঙ্গলাবৃত নয়। একাধারে রুদ্র ও রুচির এই সকল নিবিড় বনানীর শান্ত-গম্ভীর বক্ষে বন্য বারণ ও বাইসনবৃন্দ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। ইহা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ব্যাঘ্রদলের বাসস্থল। আবার শান্তস্বভাব কান্তকায় মৃগযুথও এখানে চরিয়া বেড়ায়।

এই সকল অরণ্যাবৃত গিরিগাত্রে মান্নান আখ্যায় অভিহিত একশ্রেণীর প্রায়ই সভ্যতাশূন্য আরণ্য জাতি বাস করে। পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ ঢালুগুলির নিম্নে আর এক শ্রেণীর জাতিকে অবস্থান করিতে দেখা যায়। ইহারা আরও অসভ্য ও বন্য-ভাবাপন্ন। ইহারা পাণ্ডুরম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃক্ষ-বল্কলই ইহাদের লজ্জা-নিবারণের উপায়। গিরিগুহায় এবং বিপুলবপু বৃক্ষগুলির গাত্রস্থ গহ্বরে ইহারা বাস করে। সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত বিংশ শতাব্দীর বক্ষে এই শ্রেণীর জাতির অস্তিত্ব অনেকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তুলিতে পারে।

এই ঐশ্বর্য্যশালী সভ্যতার যুগে মানুষ হইয়াও ইহারা পশুপক্ষীর মতই বনানীর বুকে বিবস্ত্র অবস্থায় কেমন করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। আমাদের মনে হয়, সভ্যতাপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে দূরে নিভৃত, নিঃসঙ্গ নিসর্গের বুকে যুগের পর যুগ বাস করিতেছে বলিয়া সভ্যতা সুসমাচার ইহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। অনুশীলনের অভাবে ইহাদের মনোবৃত্তি আদিম জড়তা বা বর্ব্বরতাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তবে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কিছুকাল পরে বোধ হয় আর এক জনও পাণ্ডুরম খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অবশ্য এইরূপ বিলোপ কখনও বাঞ্ছনীয় নয়।

আদমশুমারীর সময় পাণ্ডুরম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা নির্দ্ধারণের চেষ্টা চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়; কিন্তু আদমশুমারীর কর্ম্মচারিগণ শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর গহনে প্রবেশপূর্ব্বক এই অসভ্যতম জাতির জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সাহসী হয় নাই। যে পাণ্ডুরমপল্লী তাহারা অপেক্ষাকৃত নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারই লোকসংখ্যা গণিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইয়াছিল। সেই জন্য নির্দ্ধারণ-তালিকায় মাত্র ৫১ জন পাণ্ডুরমের উল্লেখ দেখা যায়।

শুষ্কপ্রায় নদগর্ভে দাঁড়াইয়া পূর্ত্ত বিভাগের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এই বিরাট বাঁধটির দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বাঁধটির ইমারত অংশের উর্দ্ধতা ১ শত ৫৮ ফিট। বাঁধের সমুন্নত শীর্ষটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ৮ শত ৬৭ ফিট উচ্চ। বাঁধের নিকটবর্ত্তী গিরিশ্রেণীর উচ্চতা ৫ হাজার ফিট। এই গিরিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পেরিয়ার নদকে পরপার্শ্বে আনিয়া হ্রদে পরিণত করা হইয়াছে। সেচ বিভাগের রেষ্ট হাউস হইতে দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতমালার পানে প্রসারিত হ্রদটির মূর্ত্তি মনকে মুগ্ধ করে। ঐ পূর্ব্ব দিক্ হইতেই

পার্ব্বত্য প্রবাহিনী পেরিয়ার প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে এবং মানুষের কৌশলে শান্ত ও সংযত হইয়া সুনির্ম্মল সরোবররূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মস্তকবিহীন অথচ দুইটি লেজবিশিষ্ট টিকটিকির আকারের সহিত পেরিয়ার হ্রদের আকৃতির কৌতুককর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বিরাট টিকটিকির পৃষ্ঠদেশের উন্নতাংশ একটি দ্বীপ—ইহার দক্ষিণ পা' থেকাড়ি—একটি লেজের অগ্রভাগ থানাকুড়ি। এই থানাকুড়িতে পেরিয়ার নদ পেরিয়ার হ্রদে প্রবেশ করিতেছে বা পেরিয়ার নদ পেরিয়ার হ্রদে পরিণতি পাইতেছে। ইহার অপর পুচ্ছের প্রান্ত প্রদেশে একটি ছোট নদী যাহা কোটাই মালাই গিরি-গাত্র বাহিয়া প্রবাহিত। কোটাই মালাই পর্ব্বতের উচ্চতা ৩ হাজার ৬ শত ৬ ফিট। ইহা ত্রিবাঙ্কুর সামন্ত রাজ্যের সীমান্তে দণ্ডায়মান। এই হ্রদ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল প্রবাহিত হইয়া বনানীর বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

আমরা যখন থেকাড়ির রেষ্ট হাউসে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন বনবাসী ভয়ার্ত্ত মৃগগণের চীৎকারের দ্বারা বুঝা গেল—হ্রদের তটবর্ত্তী বনবক্ষে ব্যাঘ্র আসিয়া নৃশংস ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়াছে। একটি চিতাবাঘের দ্বারা হত একটি শাম্বর-বংসের মৃত দেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। পর দিন রাত্রিতে ভৈরব রবে কাননতল কম্পিত করিয়া শার্দ্দূলটি সেই নিহত শাম্বর শাবকের শব ভক্ষণ করিতে আসল। হিংস্র পশুদের মধ্যে উগ্রতম চিতাব্যাঘ্রের কণ্ঠ-সমুত্থিত ভয়াবহ গর্জ্জন প্রত্যেক বনবাসী প্রাণীর অন্তরে শঙ্কার সঞ্চার করিল, সন্দেহ নাই। সেই শব্দ শুনিয়া সমগ্র প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। রেষ্ট হাউসের নিরাপদ বক্ষে বসিয়া অরণ্যানীর নিবিড়তম অংশ হইতে আগত সেই ভয়ঙ্কর শব্দ আমাদের মনে ভীতির পরিবর্ত্তে একপ্রকার অদ্ভুত ভাব সঞ্চারিত করিল বলা চলে। আমরা যে নৌকায় চড়িয়া আসিয়াছিলাম তাহার মাঝিটি বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িল। তাহাকে বাধ্য হইয়া হ্রদের তটদেশে থাকিতে হইয়াছিল। নচেৎ নৌকাখানি চুরি হইবার সম্ভাবনা ছিল। হিংসা ও মৃত্যুর মূর্ত্ত প্রতীক ব্যাঘ্রের এতখানি নৈকট্য তাহার আদৌ নিরাপদ বোধ না হওয়াই স্বাভাবিক। নৌকা ছাড়িয়া আমরা তাহাকে রেষ্ট হাউসের অভ্যন্তরে আসিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু তাহার জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায়টিকে ছাড়িয়া আসিতে মাঝি রাজি হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দেশে ওয়ালাম নামক একপ্রকার নৌকা পাওয়া যায়। এই নৌকায় চড়িয়া আমরা ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী থানাকুড়ির দিকে যাত্রা করিয়াছিলাম। পার্ব্বত্য ও আরণ্য জাতিরা এবং পল্লীবাসীরা ভেলাযোগেও বিচরণ করে। আমাদের নৌকাখানি কখনও কখনও অরণ্যাবৃত তটভূমির পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। এই সকল গভীর অরণ্য হস্তী ও বাইসন প্রভৃতি বিপুলবপু আরণ্য প্রাণীর লীলাস্থল। সাধারণ শিকারী-গণকে এখানে শিকার করিতে দেওয়া হয় না। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতির অতিথিরূপে আগত বড়লাট, সেনাধ্যক্ষ প্রভৃতি উদ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তা-গণ এখানে শিকার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বন্য কুকুরের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় কতিপয় সুদক্ষ শিকারীকে শিকার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিলাম।

আমরা এই অরণ্যের পার্শ্বে ও অভ্যন্তরে কয়েক দিবস বাস করার জন্য বন্য পশুদের জীবনযাপন-প্রণালী লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। বিশেষ বাইসন ও বন্য বারণবৃন্দকে নিসর্গের বুকে নির্ভয়ে বিচরণ করিবার বিচিত্র দৃশ্য আমাদিগকে এক অভিনব অভিজ্ঞতা দান করিয়াছিল। কয়েক জন সুদক্ষ শিকারীর সংসর্গও আমাদিগকে এই সকল নিবিড় অরণ্যচর প্রাণীর সহিত পরিচিত করিয়াছিল। আমরা শিকারীদের নিকট শুনিলাম যে, ব্যাঘ্রকে পশুরাজ বলা হইলেও বাইসন ও বন্যহস্তীরা অরণ্যানীতে অল্প আধিপত্য করে না। বাইসন ও বন্যহস্তী-শিকার ব্যাঘ্র-শিকার অপেক্ষা কম রোমাঞ্চকর নয়। বাইসনরা যেমন প্রকাণ্ডকায় তেমনই প্রচণ্ড শক্তিশালী। দক্ষতম শিকারী না হইলে বাইসন শিকার করিতে সাহসী হওয়া উচিত নয়। বাইসনরা এইরূপ বিশাল শরীর লইয়া কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বিপুল বপুর অনুপাতে পা'গুলিকে ক্ষুদ্র বলিতে হইবে। সুতরাং ইহাদের ছুটিয়া যাওয়া বিশেষ বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

বাইসনরা দলবদ্ধ না হইয়া কখন বিচরণ করে না। এক একটি দলে ত্রিশটি হইতে চল্লিশটি পর্য্যন্ত বাইসন থাকে। বাইসনদের গায়ের রং প্রায়ই পিঙ্গল এবং উহা ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ
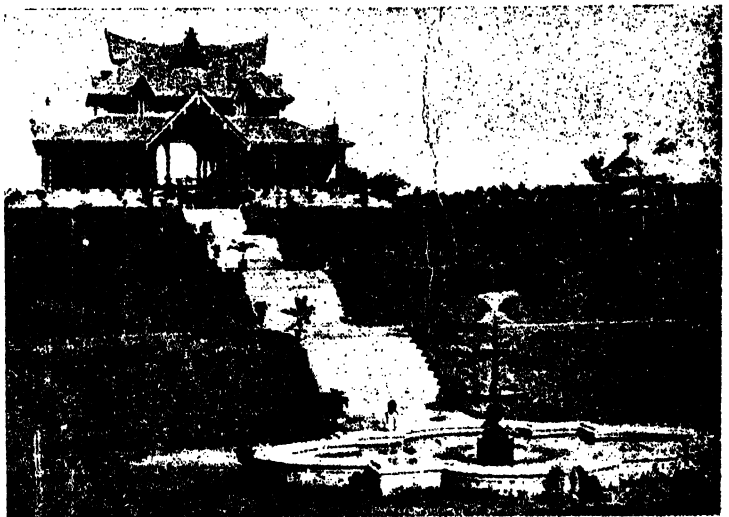
ত্রিবান্দ্রামের সুদৃশ্য গলফ্-প্যাভিলিয়ন

পরিণত হইয়াছে। ললাটের বর্ণ বাদামী। পায়ের রং সাদা বটে কিন্তু মলিন। কাণগুলি বড়। শিংগুলি ভিতরের দিকে বাঁকিয়াছে। এক একটি শিং ১ ফুট হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত

বনানীবক্ষে বাইসনবৃন্দ চরিতেছে

লম্বা। ইহাদের দেহের দৈর্ঘ্য ঘাড় পর্য্যন্ত প্রায় ১৮ ফুট বা ছয় হাত। যত বয়স বাড়ে, বাইসনদের গায়ের রঙ তত কালো হইয়া পড়ে। শুধু পা ও কপাল কালো হয় না। এই আরণ্য প্রাণীর চোখ দুইটি বিচিত্র। একটা নীলাভা চোখে দেখা যায়। চাহনির ভিতর এক প্রকার গাম্ভীর্য্য ও করুণ ভাব আছে। নিবিড়তম জঙ্গল ভিন্ন বাইসন বাস করে না। পাদ-শৈলের ঢালুগুলির বুকে বিরাজিত নিবিড় বনরাজিই ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাসস্থল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ দুই হাজার ফিট উচ্চ আরণ্য প্রদেশেই ইহারা সাধারণতঃ অবস্থান করে। নীলগিরি এবং মহীশূরের মধ্যবর্ত্তী গভীর বনানীতে বহু বাইসন বাস করে। সোডা বিশিষ্ট লোনা মাটি ইহারা খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া ঐরূপ মাটি যেখানে প্রচুর আছে সেইখানেই সাধারণতঃ বাস করে। বাইসনকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করিবার চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করেন নাই। বন্দী অবস্থায় ইহারা বেশী দিন বাঁচে না। ক্রুদ্ধ হইলে, বিশেষ আহত হইয়া ইহারা অত্যন্ত রুদ্রভাব পরিগ্রহ করে। তখন শিকারীর পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

স্থানে স্থানে (বিশেষ যেখানে হ্রদের জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালরূপে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে) অরণ্য অতিশয় নিবিড়। জায়গায় জায়গায় হ্রদের ঢালু তটভূমি শুধু সুদীর্ঘ শ্যামল শষ্পরাজিতে সমাচ্ছন্ন। তীরে দণ্ডায়মান পত্র-পুষ্প শাখাকাণ্ড-মণ্ডিত প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষগুলি যেন নির্ব্বাক প্রহরীর প্রায় অবস্থিত। হ্রদের নির্ম্মল নীল জলে এই সকল শ্যাম সুন্দর মহান মহীরুহের প্রতিচ্ছবি পতিত হইয়াছে। এই সকল বিশাল বৃক্ষের বহু সন্তান-সন্ততি হ্রদের জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তবুও হ্রদের প্রতি ইহাদের কোন হিংসাভাব জাগে না।

কি শান্ত, কি সৌম্য, কি স্নিগ্ধ এই শ্যামা বনভূমি। মানব-সমাজের বিক্ষোভ এখানে প্রবেশ করে না। কিন্তু ভাবিলেই বুঝা যায়, জীবন-মরণের ভীষণ দ্বন্দ্ব এখানেও চলিতেছে। জীবনের ক্রম বিকাশ এবং মরণের কোলে তাহার পরিসমাপ্তি বা অবসান।

শরতের শান্ত সুষমায় নিসর্গের সর্ব্বাঙ্গ সজ্জিত। ত্রিবাঙ্কুরের অরণ্যের স্বাভাবিক শোভাসম্পদ যাঁহারা পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে চান, তাঁহারা এই সময় এই প্রদেশে আসিবেন। পত্র-পুষ্প-পরি-শোভিত পাদপদল পরিশ্রান্ত পান্থের অন্তরতলে ক্লান্তিহর শান্তিরস সঞ্চারিত করে। শারদলক্ষ্মীর যে মানসমোহিনী মূর্ত্তি বাঙ্গালার নেত্ররঞ্জন শস্যশ্যাম ক্ষেত্রবুকে দেখিতে পাই, তাহাই দক্ষিণা-পথের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যেও অপরূপ রূপৈশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

থানক্কুড়িতে তেমন কোন লোকালয় দেখিতে পাইলাম না। সরকারী বনবিভাগের বিশ্রামাবাস ব্যতিরেকে অন্য কোন উল্লেখ-যোগ্য বাসভবন এখানে দেখিলাম না। নিবিড়তর বনানীর নিকটবর্ত্তী এই বিশ্রামাবাসে সাধারণতঃ কেহ রাত্রিবাস করিতে সাহসী হয় না। সঙ্গী পাইলে বা লোকজন থাকিলে বিশ্রাম-গৃহের রক্ষী এখানে রাত্রিতেও থাকে, নচেৎ নহে। আমাদের দলটি নিতান্ত ছোট ছিল না বলিয়া আমরা রাত্রিবাস করিতে কোন ভীতি অনুভব করি নাই। বিশ্রাম-গৃহটির পার্শ্বেই খাত বা খাদ বিদ্যমান। এই খাত না থাকিলে বিপুলবপু বন্য বারণবৃন্দ গৃহটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিত। যে রাত্রিতে আমরা তথায় ছিলাম সেই রাত্রেই একদল বন্য হস্তী জলপান করিবার জন্য আসিয়াছিল। বিশ্রাম-গৃহের কয়েক শত গজ দূরে আমরা একটি হস্তীকে পর্ব্বত পার্শ্বে চরিতে দেখিয়াছিলাম। হস্তীটির শুভ্র দন্তদ্বয় অন্ধকারে স্পষ্টই দৃষ্ট হইয়াছিল।

এই সকল গহন কানন দিবসেও অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ ও শান্ত থাকে। নিশাকালে এই সকল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী নানা প্রকার রোমাঞ্চকর ঘটনার অভিনয়ভূমি হইয়া পড়ে। অবশ্য বনের গভীরতর অংশগুলিতে দিবসেও পশুপক্ষীদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের দ্বারা নানা রকম বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য প্রকটিত হইয়া উঠে।

আমরা পেরিয়ার হ্রদবক্ষে ওয়ালামযোগে অগ্রসর হইতে হইতে তীরবর্ত্তী গভীর গহনের দিকে চাহিয়া শাখায় শাখায় শাখামৃগগণের কৌতুককর ক্রীড়া, বিচিত্রাকৃতি কাঠবিড়ালীদিগের সচকিত চঞ্চল

বিচরণ দেখিতে লাগিলাম। কাঠবিড়ালীদের কোনটি কৃষ্ণকায়, কোনটি লালবর্ণ। কিন্তু এই ধরণের বৃহদাকার কাঠবিড়ালী অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কাঠবিড়ালগুলি যেভাবে বড় বড় বৃক্ষের বক্ষে চঞ্চল চরণে বিচরণ করিয়া চকিত চক্ষুতে চারিদিকে চাহিয়া নানা প্রকার ফল ও ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে তাহা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। তাহাদের চারিদিকে পুষ্প-পরিমল-পিপাসু ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরের এই প্রীতিকর স্নান-স্থানটি সন্তরণের সুবিধার জন্য সুবিখ্যাত

বড় বড় পাখীগুলি বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষে বা শীর্ষ হইতেও ঊর্দ্ধে উড়িতেছে। এই সকল বৃহদাকার পক্ষীর বর্ণে বা আকারে তেমন কোন চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য নাই। ছোট ছোট পাখীগুলি গাছের ডালে ডালে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের ক্ষুদ্র দেহের বর্ণবৈচিত্র্য ও আকৃতি দুইই মনোরম! এই ক্ষুদ্রকায় বন-বিহঙ্গগুলিই বনের বৈতালিক। সর্ব্বত্রই ছোট পাখীরাই গায়ক। বিধাতা পুরুষ ক্ষুদ্র পক্ষীদের কণ্ঠে বিস্ময়কর স্বরসম্পদ দান করিয়াছেন। ইহাদের কলকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীততরঙ্গে কাননকোল সর্ব্বদা মুখরিত থাকে। সময়ে সময়ে মনে হয় যেন সঙ্গীতের প্রতিযোগিতার জন্য সম্মেলন বসিয়াছে। বনানীর গভীরতম প্রদেশ হইতে কৃষ্ণকায় লাঙ্গুরের ভৈরব রব ভাসিয়া আসিতেছে। বিহঙ্গমের শ্রুতিরসায়ন সঙ্গীতের সঙ্গে এই কর্কশ চীৎকারের কি পার্থক্য।

এক একটি বিরাট বন-বিটপীর শাখা-প্রশাখা-মণ্ডিত মহান্ মূর্ত্তি কি মুগ্ধকর, কি গাম্ভীর্য্যভরা! মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডল হইতে শরীরপোষক পদার্থ সংগ্রহ করিয়া ইহারা যেভাবে পত্রপুষ্পপূর্ণ শ্যামসুন্দর সুবিশাল শরীর গড়িয়া তুলিতেছে তাহা ভাবিলে বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র বিধানের কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। পুষ্পপূর্ণ ব্রততীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এক একটি মহামহীরুহ বিশেষ মনোমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এক একটি বিশালকায় বৃক্ষের অর্দ্ধেক শিকড়গুলি হ্রদের জলরাশির অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। যেন হ্রদের জল পান করিবার জন্য বৃক্ষগণ শিকড়রূপ কর প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নৌকায় বসিয়া শ্বাপদসঙ্কুল ভীম-কান্ত কাননের দিকে চাহিয়া উহাকে বিচিত্র রহস্যের লীলাস্থল বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যেন ঐ বিরাট বনানীর বক্ষে কোনও অপরূপ রূপকথায় বর্ণিত রাজ্য বিরাজিত রহিয়াছে। যেন সভ্যতার প্রথম প্রভাতের বিচিত্র কাহিনী এই নিবিড় বনানী বহন করিতেছে। সত্য সত্যই যখন নগাধিরাজ হিমাদ্রি জন্মগ্রহণ করেন নাই, দাক্ষিণাত্যের এই সকল গভীর অরণ্যানী তখনও বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ইহারা। উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন এই সত্য ভূতত্ত্ববেত্তা মাত্রেই অবগত।

বন্য-হস্তীর দল অরণ্যে চরিয়া বেড়াইতেছে

কত ভীত পশুর আর্ত্তনাদে এই কাননতল কম্পিত হইয়াছে, কত নিরপরাধ প্রাণীর রক্তে ইহা রঞ্জিত হইয়াছে। যখন হ্রদের সিকতাশুভ্র তটভূমিতে আমরা আহার করিতেছিলাম তখন একটি প্রকাণ্ডকায় ক্রুদ্ধ হস্তীর গর্জ্জন আমাদের কর্ণগোচর হইল। নৌকাতে

যে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অরণ্যের দিকে কিছুদূর আগাইয়া আমরা তাহারে প্রবৃত্ত হই নাই। ঐ রোষ-রুদ্র বন্য বারণের সম্মুখে পড়িলে আমাদের মত ক্ষুদ্রকায় প্রাণীকে যে অনায়াসে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিত সন্দেহ নাই। শুণ্ড উত্তোলন-পূর্ব্বক ধাবিত মত্ত মাতঙ্গমকে মৃত্যুর মূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, ক্রুদ্ধ কানন-করীর ন্যায় শঙ্কাজনক করাল দৃশ্য খুব কমই আছে। ক্রোধে আত্মহারা মত্ত মাতঙ্গম সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

সে দিন পূর্ণিমা না হোক, উহার নিকটবর্ত্তী কোনও তিথি ছিল। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত নিশায় নৌকায় চড়িয়া হ্রদবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে জ্যোৎস্না-জাল-জড়িত কান্তারের অপূর্ব্ব কান্তি উপভোগ করার সৌভাগ্য সকলের হয় না। সন্ধ্যায় বা রাত্রির প্রথমাংশে আকাশে চন্দ্র ছিল না। তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যানীকে বিভীষিকার বাসস্থল বলিয়া মনে হইতেছিল। এক একটি বৃক্ষ যেন এক একটি প্রসারিত-পাণি প্রেতের মত দাঁড়াইয়া ছিল। অন্ধকারের সহিত মিশিয়া হ্রদের জলরাশিও অসীম রহস্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ, শুধু দাঁড়ের ঝুপ ঝুপ শব্দ মাত্র সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। মনে হইতেছিল জগৎ অবাস্তব, ছায়ামূর্ত্তি মাত্র। এই হ্রদবক্ষে বিচরণ—ইহা সত্যকার ভ্রমণ নহে—স্বপ্ন-সঞ্চরণ।

সহসা চন্দ্রমা উদিত হইয়া (ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের স্পর্শের ন্যায়) শান্তোজ্জ্বল কান্ত কররাশির স্পর্শে বিভীষিকার অভিনয়-ভূমিকে অপরূপ রূপরাজ্যে পরিণত করিল। যাহা অন্ধকারে দুঃস্বপ্ন-রূপ ধারণ করিয়াছিল, জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাহা সুখ-স্বপ্নে রূপান্তরিত হইল। মৃদু-মন্দ বাতাস কানন-কোলে প্রস্ফুটিত কুসুম-কুলের গন্ধ বহিয়া আনিয়া যেন কোন আনন্দময় চিরসুন্দরের বার্ত্তা বলিতে লাগিল।

বকশিষ (গল্প)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

ট্রাম থেকে নেমে দু'চার পা হাঁটতেই মণিমালার মনে হোল, গোড়ালী দু'টো ঢল ঢল করছে। চেয়ে দেখল, দু'টি গোড়ালীই এত আলগা হয়ে গেছে যে, যে কোন সময় জুতোর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে রাস্তায় খসে পড়তে পারে। জুতোটা এখনই সারিয়ে নেওয়া দরকার। সকালে আর সময় মিলবে না, সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে অফিসের জন্ত তৈরী হ'তে হবে।

রাস্তার দু'দিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল মণিমালা। ধারে কাছে কোন মুচিকে দেখা যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে ফিরে চলল চীৎপুরের মোড়ের দিকে। বীডন স্কয়ারের গায়ে দল বেঁধে ওখানে সব বসে; অফিসের যাতায়াতের সময় রোজ মণিমালার চোখে পড়ে। দলের কাছে এসে আঙ্গুলের ইসারায় মণিমালা একজনকে ডেকে নিল, বলল, 'চল আমার সঙ্গে, গোড়ালী দু'টো ঠিক ক'রে দিতে হবে'।

রামপীরিত একটু ইতস্ততঃ করল, তার হাতে আরো দু' একটা কাজ আছে।

"কত দূর যেতে হবে মেমসাব?"

মেমসাব কথাটায় মণিমালার হাসি পেল। সমশ্রেণীর কেউ বললে তার রাগ হোত, ভাবত বিদ্রূপ করছে। কিন্তু ওর মুখে ডাকটি বেশ চমৎকারই লাগল মণিমালার।

'বেশি দূর নয়, কাছেই, আয় তাড়াতাড়ি।' বলে মণিমালা আবার হাঁটতে সুরু কল।

রামপীরিত পাশের সঙ্গীটির দিকে তাকাল: 'যাব'?

সঙ্গী মুচকি হেসে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'ঈস্ আবার ভালো মানুষেমি দেখানো হচ্ছে। যাবিনে মানে, এতক্ষণ তো গিয়ে রয়েছিস। ভারি হিংসে হচ্ছে তোকে। বেছে বেছে কিনা তোকেই পছন্দ করল। সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলি রামপীরিত যে, বিকালে এমন [illegible] দেখতে পেলি?'

রামপীরিত লজ্জা পেয়ে বলল, 'যাঃ ফাজলেমী রাখ তোর। এই স্যাণ্ডাল জোড়া রইল, বাবু এলে ফিতেটা লাগিয়ে দিস। আমি এই এলাম ব'লে।'

সঙ্গী শুকলাল আবার হাসল: 'অত তাড়াতাড়ি আসতে পারবি ব'লে তো মনে হয় না।'

রামপীরিত ততক্ষণে তল্পি-তল্পা কাঁধে নিয়ে উঠে পড়েছে।

বড় রাস্তা থেকে একটা গলিতে ঢুকল মণিমালা, তার পর একটা দোতলা বাড়ির দোরে এসে কড়া নাড়ল। হরবিলাস এখনো ফেরে নি। অফিসের পরও কোথায় ঘণ্টা দুই প্রুফ দেখার কাজ করে। ফিরবে সেই রাত ন'টায়। ছেলেমেয়েগুলি খেলতে বেরিয়েছে। মণিমালার মা চারুবালা হাতের কাজ রেখে নিজেই এসে মেয়েকে দোর খুলে দিল: 'আয়।' তারপর মেয়ের পিছনে আর একজন কাকে দেখে চমকে উঠে চারুবালা দু'পা পিছিয়ে গেল, 'ও আবার কে?'

মণিমালা হেসে বলল, 'মুচি'; শক্ত লম্বা লম্বা হাত তবু নিতান্তই বাইস তেইশ বছরের জোয়ান ছেলে।

'মুচি!' চারুবালা পরম স্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তাই বল্। দেখ মেয়ের। রাস্তা থেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলি বুঝি?'

'না হ'লে তো খুঁজতে ফের রাস্তাতেই বের হ'তে হোত। তারপর মণিমালা দোরের বাইরে দাঁড়ালো, রামপীরিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো, বোসো এইখানে।' জুতো দু'পাটি খুলে ফেলল মণিমালা: 'হিল দুটো ঠিক ক'রে দাও। আচ্ছা, আর চাকসোলও দাও লাগিয়ে। দু'দিন বাদে তো ফের লাগাতেই হবে।'

দোরের মুখে যে অল্প একটু প্যাসেজ আছে, মুচিকে সেখানে বসিয়ে মণিমালা নির্দ্দেশ দিতে লাগল।

চারুবালা [illegible] দাঁড়িয়ে থেকে কি একটু দেখল, তারপর

মেয়েকে বলল, 'অফিস থেকে এসেই কি আরম্ভ করলি মণি? এসেছিস, বিশ্রাম কর, হাত মুখ ধুয়ে নে, চা-টা খা, তারপর না হয় এসে জুতো সারাস। মুচি তো আর পালাচ্ছে না।'

রামপীরিত দশ বছর আছে এই কলকাতায়। বাংলা বেশ বোঝে এবং বলতেও পারে পরিষ্কার। চারুবালার কথায় একটু হেসে মণিমালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পালাব কেন মেম সাব? আমি এখানেই আছি। কাজ সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যান, খানাপিনা সেরে আসুন।'

মার সামনে মেম সাব বলে ডাকায় মণিমালা একটু লজ্জিত হোল। কিন্তু ও সম্বন্ধে কোন কথা না বলে একটু ধমকের ভঙ্গিতে রামপীরিতকে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, খানা পিনার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। হিল আর হাফসোল লাগাতে হবে। কত নেবে?'

রামপীরিত বলল, 'দেড় টাকা।'

'দেড় টাকা? মগের মুল্লুক ভেবে এসেছ বুঝি? যাও দরকার নেই আমার জুতো সারানোর।' মণিমালার গলা ভারি রূঢ় শোনাল।

চারুবালা ভিতরে চলে গেল। কি রকম পুরুষালি ঢংয়ের মেয়েই যে হয়েছে মণি। অফিস থেকে এসে হাত ধোয়া নেই, মুখ ধোয়া নেই, একটা মু'চির সঙ্গে দরাদরি শুরু ক'রে দিয়েছে। তবু কিছু বলা যায় না মেয়েকে। গতবছর ম্যাট্রিক পাশ ক'রে চাকরিতে ঢুকেছে মেয়ে। এরই মধ্যে বাপের চেয়ে বেশি মাইনে পাচ্ছে। সংসারের বেশির ভাগ আবদার অভিযোগ এখন সেই দেখে। স্বামীর চেয়েও ওকে আজকাল বেশি ভয় ক'রতে হয় চারুবালার।

চারুবালা আর একবার তাড়া দিয়ে বলল, 'দর-টর ঠিক ক'রে দিয়ে তুই ভিতরে গিয়ে চা-টা খা। ও ততক্ষণ জুতো সারুক।'

মণিমালা বলল, 'আমি ভিতরে যাই আর ও একটা খারাপ চামড়া জুতোয় লাগিয়ে বসুক।'

শেষ পর্য্যন্ত রফা হোল পাঁচসিকেয়।

চারুবালা চ'লে গেল ভিতরে, অনেক কাজ আছে সংসারের।

রামপীরিত বলল, 'চামড়া আপনি চেনেন মেমসাব?'

মণিমালা বলল, 'চিনি না? তোদের চেয়ে অনেক ভালো চিনি।' ব'লে মণিমালা মুখটিপে একটু হাসল।

রামপীরিতের সাহস বেড়ে গেল: 'চেনেন? কিন্তু যদি ভালো চামড়া ব'লে খারাপ চামড়া চালিয়ে যাই, ধ'রতে পারবেন আপনি?'

মণিমালা বলল, 'পারব না? কিন্তু তাই ব'লে সত্যিই খারাপ চামড়া চালিয়ে যেয়োনা বাপু, পাঁচসিকের পয়সা নিচ্ছ পুরো।'

রামপীরিত সঙ্গে সঙ্গে ভরসা দিয়ে বলল, 'না মেমসাব, আপনার জুতোয় কি আর খারাপ চামড়া দিতে পারি?'

এ কথা হয় তো প্রত্যেক খদ্দেরকেই ওরা বলে। কিন্তু তবু মণিমালার মুখে কেমন যেন একটু লজ্জার আভাস লাগল।

সেদিকে একবার তাকিয়ে একটা অভূতপূর্ব্ব খুসিতে মন ভ'রে গেল রামপীরিতের। গভীর মনোযোগ আর নৈপুণ্য সে জুতোর সোলের ওপর ঢেলে দিল। তারপর কখন এক সময় মুখ তুলে চেয়ে দেখল, মণিমালা উঠে গেছে।

বিশ পঁচিশ মিনিট বাদে মণিমালা আবার এসে দাঁড়ালো। হাত মুখ ধুয়ে অফিসের শাড়ি বদলে সাধারণ একখানা আটপৌরে শাড়ি এবার প'রে এসেছে। হাতে এক কাপ চা, মুখে প্রসন্ন মাধুর্য্য। খানিক আগের ক্লান্তি আর রুক্ষতার চিহ্ন মাত্র নেই।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মণিমালা বলল, 'কি, সন্ধ্যা যে হ'তে চলল প্রায়, হোল জুতো সারা তোমার?'

রামপীরিত বলল, 'আর অল্প একটু বাকি আছে মেমসাব। খুব মজবুত কাজ ক'রে দিলুম কিনা, তাই একটু দেরি হোল। দু' মাসের মধ্যে জুতোর আর আপনার কিছু ক'রতে হবেনা।'

মণিমালা বলল, 'ও তো সবাইই বলে। তারপর দু'দিন যেতে না যেতে আবার যা তাই।'

রামপীরিত বলল, 'না এবার আর তা হবে না, দেখে নিন ভালো করে। এমন মজবুত কেউ আর করে দিয়েছে?'

মণিমালা কৃত্রিম উল্লাসের সঙ্গে বলল, 'সত্যিই তো, এমন মজবুত কাজ আর কেউ করে নি।

ঠাট্টাটা রামপীরিত বুঝতে পারল, মুহূর্ত্তের জন্য কেমন একটু বেদনার ছাপ পড়ল তার মুখে। তারপর পালিসের কাজ সেরে রামপীরিত বলল, পছন্দসই মজবুত হয়েছে কি না, হাতে করে দেখুন মেমসাব।

শূন্য চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে মণিমালা জুতো জোড়া এবার নেড়ে চেড়ে দেখল। সত্যই ভারি চমৎকার হয়েছে। ঠিক যেন একেবারে নতুন কেনা জুতো। খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মণিমালার মুখ।

রামপীরিত মুগ্ধ চোখে একমুহূর্ত্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঠিক হয়েছে তো?'

মণিমালা সানন্দে বলল, 'বেশ হ'য়েছে ভারি চমৎকার হাত তো তোমার! নাও, দাম নাও। নিজের আনন্দের প্রতিচ্ছবি ওর চোখে মুখে দেখতে পেল মণিমালা, তারপর গাঁট থেকে একটা টাকা আর একখানা সিকি প্রথমে হাতে দিল রামপীরিতের। একটু বাদে মুচকি হেসে বাকি সিকিখানা ওর হাতে ফেলে দিয়ে পরম খুসির সঙ্গে কলকণ্ঠে বলে উঠল, 'আর এই নাও বকশিষ।'

আশ্চর্য্য, তবু সেই খুসির প্রতিধ্বনি রামপীরিতের কণ্ঠে বেজে উঠল না। রামপীরিত কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থেকে তারপর সেই বাড়তি সিকিখানা মাটিতে নামিয়ে রেখে ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'এর দরকার নেই মেমসাব।'

কিন্তু মণিমালার দরকার আছে। ঠোঁটের অপূর্ব্ব ভঙ্গি করে সে হাসল, 'বাব্বা: এর পর আবার অভিমানও আছে দেখছি। হকের পয়সাকে বকশিষ বলায় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে, না? কিন্তু তুমি তো তখন পাঁচসিকেতেই রাজী হয়েছিলে বাপু। চার আনাকে বকশিষ বলব না কেন! তোমাদের যত দেওয়া যায়, তত লোভ বাড়ে। আচ্ছা, দিচ্ছি এনে আরো চার পয়সা, দাঁড়াও।'

বলে মণিমালা দ্রুতপায়ে ভিতরে চলে গেল। কি ভেবে একখানা দু'আনিই নিয়ে এলো মণিমালা। এই অপ্রত্যাশিত লাভে নিশ্চয়ই ভারি খুসি হবে ও। চমৎকার লাগে ওদের খুসি হতে দেখতে।

কিন্তু প্যাসেজের মধ্যে এসে অবাক হয়ে গেল মণিমালা। কোথায় গেল রামপীরিত? সেও নেই, তার চামড়ার টুকরো আর জুতো সারাবার যন্ত্রপাতি রাখিবার ঝোলাও নেই। শূন্য মেঝেতে শুধু মণিমালার পালিশ করা জুতো জোড়া আর তার সেই বকশিষ দেওয়া নতুন সিকিখানা চকচক করছে।

মণিমালা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল রাস্তায়। রামপীরিতকে এখনো দেখা যায়, এখনো মোড় ঘুরে সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় নি। এখনো চেঁচিয়ে ডাকলে হয়তো ওকে ফেরানো যায়। কিন্তু থাক, কি হবে ফিরিয়ে। দু' আনার বেশি তো ওকে আর দেওয়া যাবে না।

তাই তো (চিত্র)

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের খুব নামজাদা উকীল তিমিরবরণ বাইরের ঘরে ব'সে পূজার কাপড়ের ফর্দ্দ ক'রে দেখলেন প্রায় হাজারখানিক টাকা লাগবে। হিসাব ক'রে খুসীই হয়েছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে দেড়হাজার টাকার কম হবে না। সোৎসাহে প্রফুল্ল বদন নিয়ে বিরাট গড়গড়ার নল টেনে ধুম উদ্গীরণ কচ্ছিলেন, এই সময়ে তাঁর কানে এলো—কে যেন তাঁর কম্পাউণ্ডে একতারা বাজিয়ে গান কর্ত্তে কর্ত্তে আসছে, তিনি গানের কথাগুলো শুনছিলেন—কিছুক্ষণ পরেই দেখেন, সে এক বৈরাগী, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, বেশ ফর্সা, লম্বা চওড়া চেহারা, পরণে গেরুয়া কাপড়—একতারা হাতে ক'রে ঝাউগাছের পাশ দিয়ে এসে তাঁর ঘরের বারান্দায় গান কর্ত্তে আরম্ভ কর্লেন,—গানটী এই—

"হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'লো পার করো আমারে,
হরি কড়ি নাইক যার, তারে ক'রো তুমি পার,
আমি দীন ভিখারী নাইক কড়ি দেখ ঝুলি ঝেড়ে,
হরি, যারা আগে এল, চলে গেল, আমি রইলাম প'ড়ে;
তুমি পারের কর্ত্তা, জেনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে।"

তিমিরবরণের কানে গানের প্রত্যেক কথাটা পৌঁচেছে—এ গান তাঁর ভাল লাগছে না—ভাল লাগতে পারে না, তিনি তাঁর ঐশ্বর্য্যময় পরিবেষ্টনীর মধ্যে মোটেই এই গান শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাই হোক্, সাধু বৈরাগীকে ডেকে একটা টাকা দিলেন। চাকর ভজাকে ডেকে ব'ললেন, "ওরে ভজা, গাড়ীটা বের কর্ত্তে ব'ল্, কাপড় কিন্‌তে বাজারে যাবো।"

—ভজা চ'লে গেল।

বৈরাগী একতারাটা বেশ ভাল করে বাগিয়ে আবার করুণ সুরে বারান্দায় গান ধ'রলে, "হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হোল পার করো আমারে।" এবারে তিমিরবরণ চ'টে ব'ললেন, "থামো বাবা, টাকা পেয়েছো তো, এখন যাও।" কিন্তু বৈরাগী সে কথায় বিশেষ কান না দিয়ে গান গেয়েই চ'লেছে এবং তিমিরবরণ হয় তো আরো কিছু ব'লতেন বৈরাগীকে, কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে বাড়ীর অন্দর মহল থেকে বৈরাগীর ডাক পড়েছে। সাধুবাবাকে বাড়ীর গৃহিণী ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ঐ গান খুব ভাল লেগেছে। গৃহিণী ঐ গান শুনে খুব খুসী হয়ে চাল, ডাল, ঘি, নুণ, তেল, কাপড় ও দু'টো টাকা দিলেন। তিমিরবরণ গৃহিণীর এই ব্যবহারে মনে মনে বেশ চ'টলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না।

তিনি বেরোবেন এই সময়ে যে মুচী তাঁর জুতো তৈরী করে এনেছিল, সেই জুতোটা তিনি পরে দেখছিলেন। দেখলেন পায়ে একটু লাগছে। একটু আধটু জুতোটা ঠিক ক'রে দিতে হবে ব'লে জুতোটা মুচীকে ফিরিয়ে দিয়ে ব'ললেন, "কাল সকালে ঠিক ক'রে জুতোটা দিবি"। এই সময়ে বৈরাগী অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে বারান্দায় একতারা নিয়ে করুণ সুরে গাইতে গাইতে এলো আবার তাঁর ঘরের সম্মুখে—তিমির বরণ একটু চ'টেই ব'ললেন, "বাবা তোমার ঐ গানটা থামাও না, টাকাকড়ি, কাপড় সব তো পেলে, ঝুলিও বেশ ভরেছে, অনেক কড়িও জুটছে ঝুলিতে—এখন চুপচাপ স'রে প'ড়ো না বাবা"—বৈরাগী চুপ করেছে। তিনি মুচীকে ব'ললেন, "কাল সকালেই জুতো চাই কিন্তু, আমি বেরোবো সকালে ঐ জুতো প'রে।" মুচী ব'ললে, "হ্যাঁ কর্ত্তা"। বৈরাগী এই কথা শুনে একটু হাসলো—মুচীও চ'লে গেল।

তিমিরবরণের জন্য গাড়ী অপেক্ষা কচ্ছিল। তিনি গাড়ীতে উঠে বাজারে গেলেন কাপড়ের দোকানে পূজার কাপড় কিনতে। তিনি দোকানে নানা রকম কাপড় শাড়ী কিনছেন, দামী দামী শাড়ী—রং-বেরংএর, ড্রাইভার সেইগুলো গাড়ীতে তুলছে। গাড়ীর পাশে এক কাঙ্গালিনী দাঁড়িয়ে এই সব কাপড়ের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কচ্ছে লক্ষ্য ক'রে ড্রাইভার ভিখারিণীকে তাড়িয়ে দিল। তিমিরবরণ বাড়ী হ'লে হয় তো ঐ কাঙ্গালিনীকে তাড়িয়েই দিতেন কিন্তু দোকানে তাকে কিছু দিলে সুনাম বেশ বজায় থাকবে এই ভেবে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলেন দোকানদারকে ভাঙ্গিয়ে দিতে। দোকানদার পাঁচটা টাকা ভাঙ্গিয়ে দিলে সেই পাঁচ টাকা ড্রাইভারকে ব'ললেন ভিখারিণীকে দিতে! আট আনা নয়, এক টাকা নয় দুটাকাও নয়, একেবারে পাঁচ টাকা—দোকানে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল।

তিমিরবরণ বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে গাড়ীতে উঠে ব'সলেন বটে, কিন্তু গাড়ীতে ব'সে ভাবলেন, "তাই তো এ কী হ'লো, মাথাটা ঘুরছে কেন?" তিনি আর বাজারে ঘোরাঘুরি না ক'রে সোজা বাড়ীতে যেতে ড্রাইভারকে ব'ললেন। গাড়ীতে তাঁর মনে হোল—কাল সকালে মুচীকে জুতো আনতে যখন তিনি

ব'ললেন, বৈরাগী হাঁসলো কেন? আবার মনে হোল, "তাই তো, কেন হাঁসলো।"

তিমিরবরণ বাড়ীতে এসে কাউকে কিছু না ব'লে নিজের ঘরে গিয়ে খাটে চুপচাপ শুয়ে প'ড়লেন, কেবল ব'ললেন, "কিছু খাবো না।" দুপুরে বেশ খানিকটা ঘুমোলেন। বিকেলে বেশ সুস্থ বোধ ক'রলেন, মনে মনে বৈরাগীকে গালাগালি দিয়ে বেশ সুস্থ চিত্তে স্নান কর্ত্তে গেলেন বাথরুমে। স্নানও ক'রলেন বেশ প্রফুল্ল হয়ে। কিন্তু স্নান ক'রে আসবার সময় বাথরুমেই খেলেন আছাড়, আছাড় খেয়ে মাথায় বেশ আঘাত পেলেন। চাকরের সাহায্যে কোন রকমে ঘরে এসে খাটে শুয়ে ব'ললেন, "তাই তো, এ কী হ'লো!" এই কথা ব'লেই তিনি হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন, "গেলাম, গেলাম, আমায় ধ'রো।" এই কথা ব'লে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন ডাক্তারদের ডাকা হোল, তারা কেউ কিছু কর্ত্তে পার্লে না।

তিমিরবরণ প্রাতঃকালে দেহত্যাগ ক'রলেন, গঙ্গার নিকটেই তাঁর প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়ী। তাঁকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ক'রে নদীর তটে বালুর উপরে রাখা হোল তারপর চিতায় শয়ন করান হয়েছে। এ দিকে মুচী এসেছে প্রভাতে জুতো নিয়ে—কর্ত্তা বলেছেন সকালে ঐ জুতো পরে বেরোবেন। কিন্তু বেচারী মুচী কল্পনাও করে নি যে, কর্ত্তা একেবারে চিরজন্মের মতন জগৎ থেকেই বেরিয়ে যাবেন। সেও বৈরাগীর হাসি লক্ষ্য করেছিল, সেও আশ্চর্য্য হয়ে বললো "তাই তো"।

ধূসর সৈকতে সজ্জিত চিতায় তিমির বরণ শয়ান; দূরে মানুষের মনকে মুগ্ধ ক'রে মানবের দ্বেষকে দূর ক'রে তার উদ্বেলিত হিংসা অহঙ্কারকে শান্ত ক'রে—জননী জাহ্নবী তাঁর প্রসারিত বারিবক্ষ নিয়ে চলেছেন অসীম সাগরের পানে—

নদীর তটে খেয়াঘাটে কতকগুলো জেলে ডিঙ্গী—খেয়া নৌকা —বাঁধা আছে অশ্বত্থ গাছের তলায় বেগুনী ফুলুরীর দোকানের কাছে মাঝি চাষীরা বসে আছে, তাদের মধ্যে একতারা বাজিয়ে উদাস কণ্ঠে বৈরাগী গাইছে—

"পরিহরি ভব-সুখ-দুঃখ
যখন মা! শায়িত অন্তিম শয়নে—
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে;
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি জাহ্নবি সুরধুনি
কলকল্লোলিনি গঙ্গে।"

আর কত দিনই বা*

৺হরেন্দ্রলাল রায়

জানি না, কেন আজকাল মনে হয়—"আর কতদিনই বা"? সুখে হউক আর দুঃখে হউক—যাঁহারা যৌবন কাটাইয়া চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছেন, "আর কত দিনই বা"—এই প্রশ্ন ও সংশয়ের ভাব—তাঁহাদের অনেকের জীবনটাকে, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে যেন একটু উদ্ভ্রান্ত ও উদ্বেলিত করিয়া তুলে। শৈশবের কথা মনে হয় না কী? সেই পুকুরের পাড়ে খেলা, সেই পূজার সময় কতো আনন্দ, সেই নূতন জুতা, নূতন কাপড় পাইয়া কত আহ্লাদ, সেই ভাই-ভগিনীতে মিলিয়া ঝাউগাছের নীচে, আমগাছের তলায় কত হাসি খুসী; সেই উৎফুল্ল হাস্যময় কলরবপূর্ণ ছুটাছুটি, সেই আনন্দ হাস্য ছুটাছুটির ভিতর অবশ্য "আর কতদিন" বিষাদের ছায়া কখন উপস্থিত হইত না। কৈশোরে লেখাপড়ার উৎসাহে, বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাসে, সঙ্গিগণের স্নিগ্ধ-সংসর্গ-মধুরতায় কখন মনে হইত না যে "আর কত দিনই বা"। অধিকাংশপক্ষে, একথাও অবিসংবাদী যে, যৌবনে, চঞ্চল চিন্তায়, ব্যগ্র সুখ সম্ভোগে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ভালবাসার আদান প্রদানে, বিরহ বিচ্ছেদে কখন মনে হইত না যে "আর কত দিনই বা—দু'দিন আগে, দুদিন পরে, এ সংসার তো ছাড়িতেই হইবে।'

তুমি এক সময়ে ভাবিয়াছিলে, 'উপাধিধারী' হইয়া রোজগার করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া কতই বা সুখী হইবে। "পাশ"ও করিলে, হাকিমও হইলে বা উকিল বা ডাক্তারই বা হইলে, দুই পয়সা বেশ রোজগারও করিলে; সকলই হইল, সুন্দরী সঙ্গীতপটু স্ত্রীও পাইলে, গোলাপ ফুলের মতন পুত্রকন্যাও গৃহ আলোকিত করিল। সংসারে অভাব নাই, সুখ আছে, আনন্দ আছে, হাস্য-পরিহাসের হিল্লোল আছে। আবাস-গৃহের নিকটে বীচিমালা গঙ্গা আছে; গঙ্গার ওপারে গণ্ডগ্রাম আছে; সেই গ্রামের বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্রে সরল কৃষকের ছেলে-পিলেদের নির্দ্দোষ হাস্যপূর্ণ খেলাধুলা আছে। তুমি শুয়ে শুয়ে গঙ্গা দেখ; গঙ্গার পরপারে স্নিগ্ধ শ্যামল ক্ষেত্রে কত স্বপ্নময় আন্দোলন অনুভব করো, জাহ্নবী-সংলগ্ন সৌধের ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে নির্ম্মল নীলাকাশে শান্ত সুমিষ্ট তারকা-মালা বেষ্টিত সুমধুর চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করো; কিন্তু এই সকল দেখিয়া, অনুভব করিয়া, মনে হয় না কি, এই যে এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য কত দিনের জন্য? প্রভাতে বামা-কণ্ঠের সঙ্গীত ঝঙ্কারে জাগিয়া উঠিলে, ছেলে মেয়ে সুকোমল চল-চল মুখমণ্ডলে ততোধিক সুকোমল সুমধুর সুস্নিগ্ধ-অধরে তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাদের প্রাণালোড়ী ঝঙ্কার তোমার প্রাভাতিক অস্তিত্ব সুখময়, স্বপ্নময় করিয়া তুলিল। আবার সন্ধ্যার পর কাজ করিতে

* নবপ্রভা, পতাকা, বেহার নিউজ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক ও সমালোচক, নব্য-ভারত, ভারতবর্ষ, Bengali Statesman প্রভৃতির খ্যাতনামা লেখক ৺দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ অ্যাডভোকেট ও অধ্যাপক ৺হরেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সম্পাদিত তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা নবপ্রভায় ১৩০৭ সালে ফাল্গুনের সংখ্যায় এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘেন্দ্রলাল রায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হইল—সম্পাদক

বসিয়াছ। উপরে দোতলায় হারমনিয়াম বাজিল, তোমার নয় বছরের ছেলে, সাত বছরের মেয়ে তাহাদিগের কোমল হইতে কোমলতর কণ্ঠে তাহাদিগের মার সহিত গাহিয়া উঠিল—

"তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে
এস সবে নর-নারী আপন হৃদয় লয়ে"

তুমি কাজে নিবিষ্ট ছিলে; তোমার শুষ্ক নীরস ব্যবসায়, কঠোর নির্মম Indenture আর Mortgage এই সঙ্গীত কম্পনে ত্রস্ত হইয়া কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল; একবার পদপ্রান্তে কুলু কুলু-শব্দময়ী নদীর দিকে চাহিলে; নদীসংলগ্ন ফুলবাগানে,—নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলে; দেখিলে, অনুভব করিলে কি? জ্যোৎস্নাবিধৌত নীলিমাময় আকাশ, সুমন্দ স্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোল, বৃক্ষাদির মর-মর শব্দ ও নদীবক্ষে উজ্জ্বল তরঙ্গমালার নৃত্য; তার উপর দ্বিতল গৃহপ্রকোষ্ঠ-নিঃসৃত সম্মিলিত তিনটী গলার সুললিত অতি সুকোমল ধীর তরঙ্গায়িত সঙ্গীত; মনে হইল কি? দেশের বাড়ী, ঝাউগাছের শোঁ শোঁ শব্দ, সেই পুষ্পবাটিকা, সেই পুকুরের ধারে, সেই যৌবনের ভালবাসা ও স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি; সেই ভ্রাতৃগণের স্নেহ, সেই তিরোহিত আনন্দের হাস্যময়ী স্নেহময়ী প্রতিমূর্ত্তি—পরলোকগতা স্বর্গীয়া ভগিনী আর স্বর্গীয় দেবোপম জনক-জননী। কত কথা মনে হইল, আবার সম্মিলিত সুকণ্ঠ, তাহার সঙ্গীত-হিল্লোলে, পূর্ব্ব-স্মৃতির স্বপ্ন কোথায় তাড়াইয়া দিয়া গাহিয়া উঠিল—

"সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ-বারতা নিয়ে"

মনে হইল, এ "আনন্দ-ধার" আর কতদিন, এই উদ্দাম সুসম্পূর্ণ জীবন আর কত দিন—এই সকল সুখের সার সঙ্গীত সৌন্দর্য্যই বা "আর কত দিন"।

এই শরম্পর-আলিঙ্গিত, সঙ্গীত-সৌন্দর্য্য-শিহরিত বীচিমালায় প্রোচ্ছ্বসিত চঞ্চল জ্যোৎস্নোজ্জ্বল সত পূর্ণশবীরা ভাগীরথীর দূর সৈকতে শ্মশানে অন্তিম সংকারের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—আগুনটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। সঙ্গীতও থামিল—এত যত্নের মানব-দেহ, এত ক্লেশের কারণ দ্বেষ, রেশারেশি, সব ভস্মীভূত স্তূপরাশিতে পরিণত হইল।

আবার ঘরে আসিয়া বসিলে। সামনে আলো জ্বলিতেছে; মাথার উপর ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছে। চতুর্দ্দিক নীরব, নিস্তব্ধ। বুঝিলে, বাস্তবিকই এ সংসার সুখ-সম্ভোগ, রমণীর সুকণ্ঠ, শিশুর আন্দোলিত মুখমণ্ডল, সংসারের হাস্য-পরিহাস কয়দিনের জন্য! মনে হইল ঠিক কথা—"আর কত দিনই বা ভাই; যদি চল্লিশের কাছাকাছি এসে থাক; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, আমার মনের ভাব—"আর কত দিন, সময় যে কোথায় গেলো"।

আনন্দময়ীর আগমনে

শ্রীহরিপদ দত্ত

"সম্বৎসর ব্যতীতে" মা আবার আইলে ঘরে,
    কী-আনন্দ আনিলে, আনন্দময়ি, ধরাতলে?
যা' ছিল ভাণ্ডারে গেল উড়ি' দিক্ দিগন্তরে
    ভস্মে পরিণত নিদারুণ সমর-অনলে,
বস্ত্রহীনা বসুমতী, শুষ্ক, শূন্য গর্ভ তা'র,
করিছে বিদীর্ণ ব্যোম সন্তানের হাহাকার।

নিবেছে সমরবহ্নি, কিন্তু, সন্তাপ তাহার
    বিকীর্ণ অদ্যাপি জুড়ি' দশ'দশ ধরণীর।
জ্বলিছে জঠর অন্ন বিনা হায়রে সবার
    কিবা ধনী কিবা ধনহীন, কে দানিবে ক্ষীর
শিশুর পোষণে, পশিল উদরে গাভীকুল
সশরীরে, লভিল ক্ষুধার শান্তি বীরকুল।

দণ্ড মুণ্ড যাহাদের করে, করিল গ্রহণ
    মুদীর ব্যবসা—চাল, ডাল খাদ্যদ্রব্য যত,
বিপুল লাভের উৎস, বস্ত্র লজ্জানিবারণ,
    সভ্যতার নিদর্শন, তা'ও করতলগত।
অর্থবিনিময়ে তথাপি অখাদ্য আহরণ,
অতৃপ্ত বুভুক্ষা, রোগে ক্ষয় লভিছে জীবন।

প্রজার শাসনকর্ত্তা, ভাগ্যের বিধাতাগণ
    আছে মূল্য, আছে প্রয়োজন মানব-জীবনে—
এ-চিন্তার ছায়া মনে যদি তাঁদের কখন,
    ঘটে কেন মৃত্যু মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্লাবনে?
রাশি রাশি খাদ্যভার যবে সঞ্চিত ভাণ্ডারে,
লক্ষ লক্ষ মানবের ক্ষয় হয় অনাহারে।

এ-দারুণ পরিস্থিতি মাঝে উপজে কেমনে
    আনন্দের কণামাত্র মনে বুঝিতে না পারি।
চায় পুত্রকন্যা নব বাস তব আগমনে,
    পাইব কোথায় বল এবে মোরা যে ভিখারী।
চেয়ে থাকে সন্তান সতৃষ্ণ জননীর পানে,
হ'বে কিসে আকাঙ্ক্ষা পূরণ সে ত নাহি জানে।

    জগতের শক্তি তুমি, নানাবিধ প্রহরণ
    করেছ ধারণ করে করিতে দানব নাশ,
    কেন নাহি কর, শুভঙ্করি, দানবে নিধন
    অন্তর-জগতে মানবের লভিল যে বাস?
    হ'বে লুপ্ত লোভ, মোহ, কামনা, বাসনা আর,
    উঠিবে জাগিয়া চিত্তে বিমল আনন্দভার।

মূক (গল্প)

৺কুমুদিনীকান্ত কর

অস্পষ্ট শব্দটা আসিয়াছিল ওই জঙ্গলের দিক হইতেই। লালু সজাগ কান দুটী খাড়া করিয়া প্রকাণ্ড মাথাটা তুলিয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকিল। তারপর আর কিছু না শুনিতে পাইয়া সামনের প্রসারিত পা দুটীর উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া জোর নিঃশ্বাসে কিছু ধূলা উড়াইয়া প্রভুর পশ্চাতে পুনরায় শুইয়া পড়িল।

প্রভু মুকুন্দ সহচরের এক সহর হইতে এতটুকু থাকিতেই তাহাকে আনিয়াছিল এবং বহু কষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। লালু দেশী সঙ্কর। তাহার বাপ মা কোন জাতীয় তাহা ঠিক জানা না থাকিলেও তাহাদের যে একটা তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ছিল, তাহা তাহাদের বংশধরের পরিচয়েই বেশ বুঝিতে পারা যায়। গায়ের বড় বড় সরস লোমগুলির রংটা ঠিক লাল না হইলেও বেশ একটু কটা ছিল বলিয়া তাহার নাম রাখা হইয়াছিল লালু। লালু এবং তাহার প্রভু উভয়ে উভয়ের প্রাণ, চিরসঙ্গী। লালুকে কখনো কিছু বলিতে হইলে প্রভু নিজের সরল ভাষায় তাহা বলে। লালু নীরবে ঘাড় বাঁকাইয়া মনোযোগের সঙ্গে তাহা শোনে এবং ঠিক সেইমত কাজটি করে। তাহার সঙ্গে মুকুন্দের মানুষের মত, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ব্যবহার। লালু যেন সত্যই মানুষ। গ্রাম্য লোকেরা হিংসা করিয়া বলিত, লোকটা কুকুর-সঙ্গ বটে, কিন্তু বেশী দিন ভুক-ডাক চলিবে না, এই কুকুরই ওকে খাবে।

তাহারা—মুকুন্দ ও লালু—বসিয়াছিল একটি অতি পুরাতন নদীর পশ্চিম পাড়ে। পূর্ব দিকটা একেবারে খোলা ধু ধু করে শস্য-ভরা শ্যামল মাঠ। যেখানে তাহারা বসিয়াছিল তার প্রায় গা ঘেঁষে একটা ঝোপ, তার পর একটু খালি জায়গা, তারপর শুরু হইয়াছে বেশ বড় একটা জঙ্গল। দীঘির বুক ভরা জল। পাড়ের কাছ ছাড়া জল বড় একটা দেখা যায় না। জল গভীর নয় কিন্তু পাঁক অত্যন্ত এবং বিপজ্জনক। জঙ্গলের গাছে গাছে রকম রকম পাখীর আস্তানা। দীঘির বুকেও সারাদিন বসে কত পাখী, ব্যস্ত থাকে তারা আহার-সংগ্রহে। ইহাই মুকুন্দের প্রাত্যহিক ভ্রমণ এবং বিশ্রামের স্থান। সে ভাবুক। প্রকৃতির এই লীলাক্ষেত্রে কেমন করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে সময় ফুরাইয়া যায় তাহা সে জানিতেও পারে না। সে সবুজ মাঠের উপর দিয়া দিকচক্রবালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গানের পর গান গাহিয়া যায়। তাহার গান যেন থামিতে চায় না, থামিতে যেন জানে না। সে মিশিয়া যায় গানে গানে মিশিয়া যায় সুরে, সুর ঢেউ খেলিয়া ছড়াইয়া পড়ে আকাশে। তাহার শ্রোতা একমাত্র লালুই নয়। আরো নীরব শ্রোতা তাহার ছিল। তাহারা বৃক্ষপল্লবের আড়ালে লুক্কায়িত গান-পাগলা সুন্দর সুন্দর পাখী। তাহারা মুগ্ধ হইয়া শোনে ভাবুকের গান। গান কখন শেষ হইয়া যায়, কিন্তু শ্রোতারা তবুও স্তব্ধ হইয়া থাকে। হঠাৎ তাহারা চেতনা পাইয়া যেন কিসের অভাবে ছটফট করিতে থাকে। লালু চঞ্চল হইয়া প্রভুর মুখের দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া ঘেউ করিয়া অতৃপ্ত কণ্ঠে একবার ডাকিয়া উঠে। কাতর কণ্ঠে যেন বলিতে চায়—গাও, আবার গাও। পাখীরা ছটফট করিয়া পাখার শব্দ করিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করে। সুরের নেশায় ছিল তাহারা এতক্ষণ বিভোর। কে কিছু দিল এমন ভাবে দূর করিয়া তাহাদের আনন্দ! কে তুমি—কে তুমি গাহিতেছিলে গান, গাও—গাও, থামিও না, থামিও না, থামিও না। পাখী আমরা। গান আমাদের প্রাণ। আনন্দে ভাসিয়া বেড়াই কুঞ্জে—কুঞ্জে—কুঞ্জে। গাই গান, শুনি গান, ভাসিয়া যাই অনন্ত সঙ্গীত-সমুদ্রে। গাও বন্ধু গাও তোমার গান।...পাগল পাখীরা পাগল মানুষটিকে নিবেদন করে তাহাদের প্রাণের কথা!

অধিকক্ষণ নীরবতা মুকুন্দের যেন সহ্য হয় না। সে হঠাৎ শিস্ দিয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ পল্লবের আড়ালে উহার প্রতিধ্বনি হয়। একবার দুইবার তিনবার তারপর খুলিয়া যায় পাখীর হৃদয়ের দ্বার, মুক্ত হয় তাহার অসীম কণ্ঠস্বর, উঠে সঙ্গীত, চলে সুর-তরঙ্গ, ছাড়িয়া যায় তুফান সুরের হাওয়ায়, স্তব্ধ হইয়া যায় জগৎ সুরের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়, ঝঙ্কারে—ঝঙ্কারে। পাখীরা গাহিয়া যায় গান। পাগল হইয়া তাহারা গায়—গায়—গায়, গাহিয়া তাহারা পাগল—পাগল—পাগল হয়! মুকুন্দ সে সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ভুলিয়া যায় দুনিয়া! লালু দূরে পাখীদের দিকে মুখ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কান নাড়িয়া নাড়িয়া নীরবে মুগ্ধ হইয়া গান শোনে। হঠাৎ গান বন্ধ হইয়া গেলে সে যেন মর্মাহত হইয়া জাগিয়া উঠে। কি জানি তাহার ছিল কি জানি এই মাত্র হারাইয়া গিয়াছে। অন্তরে সে শূন্যতা অনুভব করে। যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে থাকে। সে পাগল হইয়া ডাকে ঘেউ ঘেউ-উউ অতৃপ্ত কণ্ঠে যেন বলে, গাও পাখী, গাও—গাও—আরো গাও! মূক যেন মূককে কহিতে থাকে অন্তরের কথা! মূক বোঝে মূকের সঙ্গীত!

কিন্তু আজ হঠাৎ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। লালু অভ্যাসমত আজও প্রভুর দিকে মুখ করিয়া সামনাসামনি বসিয়াছিল। কিন্তু প্রভু একটি বারও তাহাকে ডাকে নাই, একটু আদরও করে নাই, তাহার সঙ্গে খেলে নাই। প্রাত্যহিক নিয়মিত গানও সে গায় নাই। আজ তাহার মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটিয়া বাহির হয় নাই। সে গম্ভীর। হাতে তাহার দুইখানি লেখা কাগজ—একটী পত্র, একটী কবিতা। কবিতাটি তাহারই রচিত, প্রিয়ার উদ্দেশে। সুদূরের বন্ধুর ধ্যানে সে মগ্ন। ধ্যানে সে প্রিয়াকে দেখিতেছে, অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে সম্ভাষণে মধু ঢালিয়া পুলকিত হইতেছে। দূরে দূরে গিয়াও প্রিয়া রহিয়াছে তাহার চোখের দর্পণে। দুনিয়ার আর সব কিছু গিয়াছে মুছিয়া। সে যুবক।

লালু অতশত বোঝে না। প্রভুর সবটুকু স্নেহের একমাত্র দাবীদার সে। তাহার মনে কেমন যেন একটু সন্দেহ জাগিয়াছে, সে-স্নেহের সবটুকু না হয় তার বড় একটা অংশ গোপনে যেন কেহ চুরি করিতেছে। ইহা তাহার সহ্যের সীমা যেন অতিক্রম করিয়াছে। সে ছটফট করিতেছে। যে কাগজ দুইখানি এমন ভাবে প্রভুর মন মুগ্ধ করিয়া কাড়িয়া নিয়াছে, তাহার ইচ্ছা হইতেছে সেটাকে সে অণু-পরমাণু ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এমনি হইতেছে তাহার হিংসা। আক্রোশে দুই একবার সে পা বাড়াইয়াছে ওদিকে, ঘেউ করিয়া ছুটিও করিয়াছে, কিন্তু প্রভুর স্নেহমাখা মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ামাত্র তাহার দেহ অচল হইয়া গিয়াছে। তখন বড় অভিমানেই সে ডাকিয়াছে—'ঘেউ'। তার পর তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বারবার মুখের সামনে দাঁড়াইয়াছে, চারিদিকে ঘুরিয়াছে, লেজ নাড়িয়া পায় মাথা ঘষিয়া, পায়ের আঙ্গুল এবং হাত আস্তে কামড়াইয়া মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিয়াছে—ঘেউ ঘেউ—আমায় আদর কর, আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে। তাহাও যখন নিষ্ফল হইল তখন সে অভিমান করিয়া ব্যথিত অন্তরে নীরবে প্রভুর পশ্চাতে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

সেই অবস্থাতেই লালু সেই শব্দটা শুনিয়াছিল। তখন আর কিছু না শুনিলেও সন্দেহ তাহার ছিল। হুঁসিয়ার লালু কান পাতিয়াই ছিল। হঠাৎ আবার সেই শব্দ—পা-বৎসের ডাক—আম্বা! একবার—দুইবার—তিনবার—বিপন্নের আর্তস্বর। লালু এক লাফে উঠিয়া দ্রুতগতিতে ঝোপের অপর দিকে অদৃশ্য হইল। ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ।—দূরে লালুর চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল। কিন্তু মুকুন্দের খেয়াল নাই। সে যেন নির্বিকার। লালু ছুটিয়া আসিয়া তাহার সামনে অস্থির হইয়া ডাকিতে লাগিল—ঘেউ—ঘেউ ঘেউ। তবুও মুকুন্দ উঠিল না বা লালুকে কিছু বলিল না। বিরক্ত-ভরা দৃষ্টিতে একবার তাহার পানে তাকাইল মাত্র। এই সময় আবার সেই ডাক—আম্বা—আম্বা—দূরে আম্বা! লালুর আর অপেক্ষা করা হইল না। সে পাগল হইয়া ছুটিয়া গেল সে দিকে। দূরে আবার তাহার ডাক শোনা গেল।

ডাক থামিবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করিয়া দূরে একটা শব্দ—তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া একই রকম একটা অস্পষ্ট আওয়াজ,...হঠাৎ লালু আসিয়া লাফাইয়া পড়িল প্রভুর সম্মুখে। সে যেন ক্ষেপিয়া গিয়া অবিশ্রান্ত ডাকিতে লাগিল ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ ওঠ—ওঠ—ওঠ। আঃ—মুকুন্দ মুখ না তুলিয়াই বিরক্তি প্রকাশ করিল। উন্মত্ত লালু তখন অনন্যোপায় হইয়াই যেন একলাফে প্রভুর পশ্চাতে গিয়া তাহার কাপড় কামড়াইয়া ধরিয়া টানিতে লাগিল। তোর হয়েছে কি আজ, অ্যাঁ? কেন তুই এমন বিরক্ত করছিস? বলিয়া পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই মুকুন্দ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। লালুর সর্ব্বাঙ্গ জল-কাদা মাখা। একি! লাল, লালু, কি হয়েছে বল ত?' বলিয়া আদর করিয়া তাহার কর্দ্দমাক্ত গলায় হাত রাখিল। মান অভিমান স্নেহ ভালবাসার সময় লালুর নাই। সে প্রভুর হাত হইতে মাথা সরাইয়া নিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ, যেন বলিল, ওঠ—ওঠ, চল—চল, বিপদ—বড় বিপদ। মুকুন্দ কিছু বুঝিল না।" ঝোপের দিকে তাকাইয়া লালু আর একবার সেই ভাবে চীৎকার করিল। মুকুন্দ তবুও কিছু বুঝিল না, কিন্তু একটু চিন্তিত হইল। লালু এবার ছুটিয়া ঝোপের কাছে গিয়া ঘেউ—ঘেউ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু এবারও মুকুন্দ তেমন কিছু বুঝিল না, তবে এইটুকু বুঝিল যে বিশেষ কিছু একটা ঘটিয়াছে নিশ্চয়। লালু এবার পাগল হইয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল কামড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। মুকুন্দ বলিল, 'দাঁড়া, দাঁড়া একটু, কাপড়টা মালকোঁচা করে নেই—। লালু অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া 'ঘেউ ঘেউ' করিয়া যেন জানাইল—শীঘ্র শীঘ্র, আর দেরী না, একটুও দেরী না, বিপদ বড় বিপদ—। এই সময় আর্ত্তস্বরে আবার সেই ডাক। লালু তিন লাফে ঝোপ পার হইয়া গেল। মুকুন্দও সে ডাক শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নির্ব্বিচারে সেদিকে ছুটিয়া গেল।

দীঘির জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটী গরু—শবলা হাঁপাইতেছিল। সে জলের উপরে গলা বাড়াইয়া ঊর্দ্ধ মুখে থাকিয়া জীবন বাঁচাইয়া রাখিতেছিল। ফোঁস ফোঁস করিয়া তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল। তাহার করুণ নয়ন দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া ছিল উদ্ধারের আশায়। তারপর আশার ক্ষীণ আলো অস্পষ্ট হইতে হইতে এক সময় যখন নিবিয়া গিয়াছে, তখন নৈরাশার অন্ধকার নামিয়াছে তাহার অন্তরে। নিষ্ঠুর হতাশা ধীরে ধীরে তাহার করুণ দৃষ্টিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে মৃত্যু-ভয়! মৃত্যু-ভয়ে সে আর্ত্তনাদ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহা পারে নাই, তাহার উপায় ছিল না। মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ তুলিয়া জীবন ভিক্ষা করিবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাও সে পারে নাই। কিন্তু তাহার নীরব অশ্রু তাহা করিয়াছে। নীরব অশ্রু যেন শঙ্খনির্ঘোষে জানাইয়াছে তাহার প্রাণের কাতর প্রার্থনা উপরওয়ালাকে। পাঁকে পড়িয়া উঠিয়া আসিতে প্রথমে সে খুব হুড়াহুড়ি করিয়াছে। কিন্তু যতই সে-চেষ্টা করিয়াছে, ততই তাহার পাগুলি গভীর পাঁকে আরও ডুবিয়াছে। তারপর প্রাণভয়ে আর একটুও সে নড়ে নাই। বড় বড় জোঁক আসিয়া অনায়াসে কবলিত জানোয়ারের বুকে, গলার লোল মাংসে বসিয়া চুমুকে চুমুকে শুষিয়া নিয়াছে অফুরন্ত ভাণ্ডারের তপ্ত শোণিত। এক এক টানে তাহার প্রকাণ্ড দেহ ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। তবুও সে নড়ে নাই। যদি সে ডুবিয়া যায়! তারপর ধীরে ধীরে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে শবলা বড় একটা আসে না। মালিক তাহাকে ছাড়িয়া দিলেই সে চরে গিয়া ওই পূবের মাঠে। আজ তাহার কি হইল, দীঘির পূব পাড়ে দাঁড়াইয়া মাঠে নামিবে কিনা বহুক্ষণ ধরিয়া ইতস্ততঃ করিল। তারপর হঠাৎ সে উত্তর পাড় ঘুরিয়া পশ্চিম পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চিম পাড়ের কাছে কাছে কলমির লোভনীয় লক্‌লকে লম্বা লম্বা ডগাগুলি তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল। এ লোভ সম্বরণ করিতে সে পারে নাই।- সে পাড়ের নিকটের স্বল্প কাদায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডগাগুলির উপর লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে নামিয়া গিয়াছে অথই জলে। সমস্তটা জিব বাহির করিয়া অমন চমৎকার ডগাগুলি গ্রাসের মধ্যে সে পুরিবে,—আর মাত্র দুই আঙ্গুল দূরে—এই এক আঙ্গুল—এই—এই-ই-ই-যাঃ—ফস্ করিয়া তাহার, পাগুলি পুরা বসিয়া গিয়াছে বুক পর্য্যন্ত পাঁকে। বাছুরটা বিপন্না মায়ের কাছে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে জলে দুই চার পা গিয়াই পাঁকে আটকা পড়িয়াছে। তাহারই চীৎকার লালু শুনিতে পাইয়াছে। লালু একাকী শবলাকে উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে। তাহার চারদিকে সাঁতরাইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে উঠিয়া যাইবার জন্য কত উৎসাহিত করিয়াছে, তাহার লেজ এবং শিঙ কামড়াইয়া ধরিয়া টানিয়াছে তাহাকে তুলিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই তাহার নিষ্ফল হইয়াছে।

মুকুন্দ আসিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে অবস্থাটা বুঝিয়া লইল। একবার সে ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিল, একটা দড়ি বা একটা লতা বা একজন মানুষ পায় কিনা সাহায্যের জন্য। নাই—ইহার কোনটাই সে দেখিতে পাইল না। সে একটু স্থির হইয়া ভাবিল। মুহূর্ত্তে তাহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। এক টানে গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিল। বোতামগুলি ছিঁড়িয়া ছিটকাইয়া পড়িল মাটীতে। ধুতি ছাড়িয়া পিরানটাকে কৌপীনের মত করিয়া পরিল। ধুতিটা মাথায় বাঁধিয়া জলে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় লালু এক লাফে সম্মুখে আসিয়া তাহার পথ আটক করিয়া দাঁড়াইল। ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ—লাফাইয়া লাফাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মুকুন্দ উহার কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'কি—পথ ছাড়—ও-ও-ও—যেতে দিবি না? ভয় হচ্ছে বুঝি তোর আমার জন্য? ছি-ছি—!" ঘেউ-ঘেউ—না সে রাজি নয়। তাহাকে ওই বিপজ্জনক পাঁকের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে লালু কিছুতেই রাজী নয়। কিন্তু সে আর থাকিতে পারিতেছিল না। শবলার কাতর নয়ন পুনঃ পুনঃ তাহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া ডাকিতেছিল—বাঁচাও—বাঁচাও আমাকে! মৃত্যু-ভয়ে ভীত মূকের করুণ দৃষ্টি তাহার প্রাণ ধরিয়া টানিতেছিল! মুকুন্দ অস্থির হইয়া কুকুরকে ফাঁকি দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, সেই ভয়ঙ্কর দীঘির জলে। সঙ্গে সঙ্গে লালুও ঝাঁপ দিল।

বাছুরটাকে প্রথমে উদ্ধার করিয়া মুকুন্দ বুঝিল খুব সাবধানে পাঁক থেকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অথই জল হইলেও সে সাঁতরাইয়া গিয়া শবলাকে ধরিল। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তাহার গলায় এবং শিঙ-এ খুব শক্ত করিয়া পাকান ধুতিটা বাঁধিয়া পাড়ে ফিরিয়া গেল। লালুকে রাখিয়া গেল সাঁতরাইয়া সাঁতরাইয়া উহাকে তাড়া করিবার জন্য। বলবান্ মুকুন্দ ধুতি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে পাড়ে লইয়া আসিল। গরু আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। তাহার অবসন্ন দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বাছুরটা 'আম্বা-আম্বা' করিয়া দুই চারবার ডাকিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার মুখের নীচে দাঁড়াইল। দুর্ব্বল মায়ের জিবটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটু বাহিরে আসিতে না আসিতেই থামিয়া গেল। সন্তানকে আর তাহার চাটা হইল না। শুধু তাহার দুর্ব্বল দৃষ্টি যেন, সন্তানের সারা অঙ্গে স্নেহ মাখিয়া দিল। লালু 'ঘেউ' করিয়া বাছুরটাকে যেন ধমকাইয়া উঠিল—মাকে বিরক্ত করিস না। লালু উভয়ের অবস্থাই যেন বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। মুকুন্দ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পশু দুটীকে খুব ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে একটু ভাবিল। তারপর তাড়াতাড়ি দুটীকে শোয়াইয়া দিয়া কিছু খড়-কুটা এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া লালুকে বলিল, 'লালু, তুই পাহারায় থাক, সাবধানে থাকিস, আমি একটু যাচ্ছি।" ওখান থেকে লোকালয় বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু মুকুন্দ সেখানে দৌড়ে গেল এবং এক দৌড়ে ফিরিয়া আসিল একটা দিয়াশলাই বাক্স নিয়া। আগুন জ্বালিয়া গরুগুলির

পিঠে ও বুকে তাপ দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া গায় তাপ লাগার পর গরুটা যেন একটু সুস্থবোধ করিয়া ঘাড় এবং পাগুলি টান করিয়া লেজ নাড়িল। মুকুন্দ চাহিয়াছিল ওর পেটের দিকে। দেখিল শবলা নিজেকে বেশ বাঁচাইয়া গিয়াছে। জলে পেট তেমন বোঝাই করে নাই। সে দূর থেকে কিছু কচি ঘাস এবং একটু জল আনিয়া ওর মুখে দিল। শবলা তাহা খাইয়া ঘাড়টা একটু উঁচু করিয়া বড় বড় চোখ দু'টী মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই করুণ চাহনির আকর্ষণে স্থির থাকিতে না পারিয়া মুকুন্দ তাহার মুখের কাছে আসিয়া বসিল। তাহার গলায়, মাথায়, পায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'ওখানে আর যাস্‌নে কখনো লোভে প'ড়ে, সাবধান! বড্ড ভয় হয়েছিল বুঝি তোর মরণের, না? তোকে কে বাঁচিয়েছে জানিস? ওই যে ওই লালু।' ঘাড় নাড়িয়া কাণ দোলাইয়া প্রভুর কথা শুনিতে শুনিতে লালু এই সময় ঘেউ—ঘেউ করিয়া উঠিল। সে যেন প্রভুর কথা বুঝিতে পারিয়াই প্রতিবাদ করিয়া শবলাকে জানাইল, 'না-না, আমি না—আমি না, সে-সে-সে...।' গরুর করুণ চাহনি তখনও তেমনিভাবে তাহার মুখের উপর ন্যস্ত ছিল। সে তাহার মুখ সস্নেহে দুই হাতে নিজের মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া মমতামাখা চোখ দু'টীর পানে তাকাইয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, 'ওরকম ক'রে চেয়ে আছিস্ যে আমার দিকে, উঁ...? বলবি আমার কিছু?..' শবলা ধীরে ধীরে জিব বাহির করিয়া তাহার দু'টী হাত লেহন করিল। মূকের আবেগ-স্পন্দিত প্রাণের আভাস! মূকের লেহন—একটী মাত্র লেহন নীরব ভাষায় কহিয়া গেল তাহার অন্তরের কত কথা! যেন মাখিয়া দিল তাহার অঙ্গে স্নেহ, মায়া, মমতা! তার মোহন স্পর্শ অন্তরে আনিল শিহরণ, পুলক! মূকের অনিমেষ আঁখির স্নেহ-ঢল-ঢল দৃষ্টি তাহার মস্তকে ঢালিল মায়ের আশীষ-ধারা! মূকের বড় বড় চোখের স্বচ্ছ মণি দু'টীর উপর টলমল করিতে লাগিল কৃতজ্ঞতার অশ্রু!

হঠাৎ লালুর কেমন একটা ছটফটানি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে একবার শবলার মাথার দিকে, একবার পায়ের দিকে, একবার মুকুন্দের সামনে অনবরত ছুটাছুটি করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া যেন তাহার দিকে প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। মুকুন্দ তাহা দেখিয়া হাসিয়া শবলার মাথায় একটা নাড়া দিয়া বলিল, 'তোকে আদর করছি ব'লে লালুর কেমন হিংসা হয়েছে ভাখ একবার।' তারপর লালুকে ডাকিল, 'লালু! আয়।'

লালু একটু দূরে বসিয়াই তাহার দিকে চাহিয়া শুধু ঘাড় বাঁকাইল। একবার, দুইবার, তিনবার মুকুন্দ ডাকিল। তিন বারই লালু একই জায়গায় বসিয়া ঘাড় নাড়িয়া 'ঘেউ' করিয়া জবাব করিল, কিন্তু আসিল না। প্রভু তখন নিরুপায় হইয়া হাসিয়া উঠিয়া গিয়া লালুর মাথায় চুমা খাইয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিল, কাণের কাছে মুখ নিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'অভিমান হয়েছে বুঝি তোর, লালু? ছিঃ ওরা সব বলবে কি! ভাখ ওরা আড় চ'খে দেখছে তোর ছেলেমি...।' আরো একটী চুম্বন মিলিল লালুর। '...ও যে মরতে বসেছিল, কি যন্ত্রণা ও ভুগেছে দেখেছিস্ ত? ওকে একটু আদর করতে হবে না?...ওঠ, আয়...'

লালু ঘেউ করিয়া লেজ নাড়িয়া প্রভুর হাতটা একবার আস্তে কামড়াইয়া দিল। তাহার সমস্ত অভিমান দূর হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে গিয়া শবলার গা শুঁকিল। শবলাও ফোঁস ফোঁস করিয়া গভীর শ্বাসে শ্বাসে লালুর গা শুঁকিয়া ঘাড়টা একবার লেহন করিল। লালু লেজ নাড়িয়া ডাকিল ঘেউ—উ—উ—। তাহার দীর্ঘস্বরে চরম আনন্দের বিকাশ। তাহারা বন্ধু হইল।

মুকুন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল বাছুরটা নাই। লালুকে বলিল, 'ভাখ ত ও কোথা গেল?' লালু ঝোপের ওদিকটায় গিয়াই ওকে পাইল এবং দুই চারবার খুব ধমকাইয়া ওকে নিয়া ফিরিয়া আসিল ওর মায়ের কাছে। বাছুর মাকে দেখিয়া 'আম্বা—আম্বা' বলিয়া দুই একবার ডাকিল। মা বাচ্চার সারা গা-টা সাদরে কিছুক্ষণ ধরিয়া চাটিয়া দিল।

মুকুন্দ শবলার মাথার উপর সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'চল্, এবার তোকে তোর বাড়ী নিয়ে যাই।' সে উঠিয়া দাঁড়াইল। লালু প্রভুর অভিপ্রায় যেন বুঝিতে পারিয়াই গরুর মুখের কাছে গিয়া ডাকিল 'ঘেউ—ঘেউ—ওঠ ওঠ, ঘরে চল্।' গরু না ওঠা পর্য্যন্ত তাহার ডাক থামিল না। মূকের কথা বুঝি মূক অনায়াসেই বুঝিতে পারে। গরু উঠিয়া দাঁড়াইল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় স্থির হইল। ইহা মুকুন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। সে তাহার শির-দাঁড়ার উপর বেশ করিয়া বার কয়েক হাত বুলাইয়া দিয়া লেজটা একবার জোরে টানিয়া দিল। তারপর 'চল্ এবার' বলিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিল। গরু মন্থরগতিতে পরিচিত পথে গৃহাভিমুখে চলিল। তাহার ডান পাশে মুকুন্দ, বাঁ পাশে বাছুর, সকলের পশ্চাতে লালু। বাছুরের উপর লালুর সদা সতর্ক দৃষ্টি। বাছুর শৈশবসুলভ চপলতায় থাকিয়া থাকিয়া পথের এদিকে ওদিকে কেবলই ছুটাছুটি করিতেছিল। লালু তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে রীতিমত ধমকাইয়া মায়ের কাছে ফিরাইয়া আনিতেছিল। ধনীর সন্তান মুকুন্দ, তাহার বিখ্যাত কুকুর লালু, গরু এবং বাছুরের এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র মিছিলটি লোকেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু তাহাদের নিতান্ত কৌতূহল হইলেও সাহস করিয়া কেহ কোন প্রশ্ন করে নাই।

মালিকের বাড়ীর চতুঃসীমার বাঁশের বেড়ার দরজার মুখে আসিয়া তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল। দরজা বন্ধ ছিল। নিজেদের বাড়ী চিনিতে পারিয়া বাছুরটা যেন একটু আনন্দের সঙ্গেই 'আম্বা' বলিয়া ডাকিয়া মালিককে তাহাদের আগমন-বার্ত্তা জানাইল। মালিকদের একটা ঘর হইতে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-কণ্ঠে একজন ডাকিল, 'মাধব! মাধব!'—কোন উত্তর নাই। আবার ডাক—'ও মাধব—মাধব!—ওরে মাধা! হতভাগা আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে, গেছে বুঝি আবার সজনীদের বাড়ী, সজনী ওকে উদ্ধার করবে...লক্ষ্মীছাড়াকে দিয়ে সংসারের এতটুকু কাজও যদি হয়।" কণ্ঠস্বর বেশ একটু তিক্ত। একটু দূর থেকে ভারি গলার একটা শব্দ তাহার কানে আসিল—'কি'? মাধব নামধারী চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোকটি তখন প্রতিবেশীর কন্যা চতুর্দ্দশী সহচরী সজনীর সঙ্গে নিরালায় দিব্যি আরামে বসিয়া এক কাঁদি সুপক্ক কদলী ভক্ষণে মহাব্যস্ত ছিল। মায়ের ডাকাডাকির কথাটা মাধবকে চোখের ইসারায় জানাইয়া সজনী মৃদু হাসিল। এই সময় মা রাগ করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, 'সবগুলো কলাই বুঝি ওই ছুঁড়টার সঙ্গে ব'সে ব'সে খেলি, অ্যাঁ? আমি কত কষ্ট করে...আর একবার তুই ঘরে'—মাধব বেশ বড় দেখিয়া আরো দু'টী মর্ত্তমান কলা মুখে পুরিয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিতে গিয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া ফেলিল। বাকী কয়টা তখন সে সজনীর কোলে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। সজনী হাসিয়া কুটি কুটি। তাহার হাসি আর থামিতে চায় না।

'কি, কেন?' মাধব ঘরের কাছে গিয়া রুক্ষ মেজাজে জবাব করিলেন।

অপর পক্ষের মেজাজের গরমটা হঠাৎ অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বলিল 'ভাখ ভাখ রাজরাণী বুঝি এলেন গন্তু থেকে বাচ্চা নিয়ে এতক্ষণে। দিনে দিনে ওর কেমন কেরামত বাড়ছে দেখ, আমি আজ...যা ত বাবা চট করে গিয়ে বাছুরটাকে বেঁধে ফেল্, আমার হাতটা আটকা, ডালের—ছ্যাৎ গব্ গব্-গব্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল—সম্বার দিচ্ছি। যা-যা—দুধ পিয়ে খাবে না হলে।

মাধব এক ছুটে বাহিরের দরজার কাছে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে ভয়ে দরজাটা খুলিয়া দিয়াই চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'মা মা, ভাখ এসে

গিগগির।' আগন্তুকরা এই অবসরে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। 'কি রে—'বলিয়া একটি বিগতযৌবনা জীর্ণা শীর্ণা নারী ভ্রূ কুঁচকাইয়া চোখে মুখে একটা কঠোরতম ভাব নিয়া রণ চণ্ডীরূপে আবির্ভূতা হইল। গায়ের দিকে চাহিয়াই সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—এ কি!

এভাবে কুকুর নিয়া তাহার বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে মুকুন্দের প্রবেশ করাটা তাহার আদৌ পছন্দ হয় নাই। তার পর তাহার গরুরই বা এ দশা কেমন করিয়া হইল! মা চণ্ডীর বিস্ময় কাটিয়া গেল। তাহার সর্প-লোচন দুটী মুহূর্ত্তে কষায়িত হইয়া উঠিল। মুকুন্দ বলিল, 'আপনাদের গরু দীঘির পাঁকে প'ড়ে মরতে বসেছিল, অনেক কষ্টে ওকে তুলে এনেছি—'

মা চণ্ডীর রুক্ষ মুখের কালো ঠোঁট দু'টী ছাড়া অন্য কোন অংশ একটুও নড়িল না। মনের কথাটা ওই ঠোঁট দু টীতে যেন আটকিয়া গিয়াছিল। ঠোঁট দুটী বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া উঠিয়া যেন জানাইল—ওঃ! কি ধর্ম্মপুত্তুর রে!… মরুক মরুক আমার গরু মরুক, তাতে কা'র কি—

'…ও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল একেবারে। আমি একবার আগুনের তাপ দিয়েছি ওর গায়, আপনি আরো একবার দেবেন, না হ'লে—'

কথাটা বলিয়া স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতিসূচক মুখের ভাব এবং সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গ দেখিবার আশায় মুকুন্দ মা-চণ্ডীর দিকে তাকাইল। কিন্তু মা চণ্ডীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি গরু, বাছুর, কুকুর এবং মনুষ্যটির মধ্যে ঘুরিতেছিল, বিশেষ করিয়া তাহাদের গায়ের কর্দ্দমাক্ত অংশের উপর। এক ঝামটায় সে মুখ ফিরাইয়া নিল বিপরীত দিকে। অবিশ্বাস! ওঃ কি দরদ… ন্যাকামি…তাহার যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল!

মাধব বাছুরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া প্রাণপণে টানিতেছিল। মাকে এবং নূতন বন্ধুদের ফেলিয়া বাছুর যাইবে না—কিছুতেই যাইবে না। 'আম্বা—আম্বা' বলিয়া ডাকিয়া তাহার ঘোরতর আপত্তি জানাইতেছিল। টানের চোটে ওর গলাটা লম্বা হইয়া গিয়াছিল, দড়িটা কষিয়া গলায় কেটে বসিয়া গিয়াছিল, জিবটা বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তবুও সে পিছনে হেলিয়া পড়িয়া বাধা দিতেছিল। কিন্তু আর সে পারিল না। মাকে একবার কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া কাত হইয়া পড়িয়া গেল। মা মুখ ফিরাইয়া বাচ্চার দিকে তাকাইল। তাহার কাতর নয়ন জানাইল ক্লিষ্ট শিশুর জন্য মায়ের প্রাণের গভীর ব্যথা, কত মমতা, দুঃখ প্রতিকারের অসামর্থ্য। শিশুর কষ্ট আর দেখিতে না পারিয়াই বুঝি সে মুখ ফিরাইয়া নিল। মাধব বাছুরটাকে সেই অবস্থায়ই বড় নির্দ্দয়ভাবে টানিতেছিল। বাছুর এবার লালুর দিকে তাকাইয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল, 'আম্বা—আম্বা'—আমাকে বাঁচাও বন্ধু, বাঁচাও। লালু আর সহ্য করিতে না পারিয়া দুই পা আগাইয়া গিয়া তাহার বিকট মূর্ত্তি প্রকট করিয়া উগ্রস্বরে ধমকাইয়া উঠিল—'ঘেউ—ঘেউ'—। মাধব দড়ি বাছুর ফেলিয়া প্রাণভয়ে 'মা গো, গেলাম গো' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পালাইল।

"খেল—খেল, আমার ছেলেকে খেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া মা চণ্ডী পাগলের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং চোখ পাকাইয়া বলিল, "কি আমার বাড়ী চড়াও করে আমারি ছেলের উপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া …।" তাহার সর্প-লোচন থেকে রোষ-বহ্নি যেন ঠিকরিয়া পড়িল মুকুন্দের দিকে। সাপের বিষাক্ত কঠিন ছোবলের জ্বালার ন্যায় জ্বালা যেন মুকুন্দ উপলব্ধি করিল।

মাত্র একবার বাচ্চার দিকে তাকান ছাড়া শবলা মুকুন্দকে দৃষ্টিছাড়া করে নাই। পশু সে, তাহাকে বুকে করিয়া মাতৃস্নেহ জানাইতে পারে নাই। মূক সে, অন্তরের কথা তাহাকে জানাবার শক্তি নাই, মিষ্টি কথায়—দুটী মিষ্টি কথায় তাহাকে সুখী করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার ওই চোখ বুকের সর্ব্বস্ব ওই দুটি চোখ পূর্ণ করিয়াছে তাহার আকাঙ্ক্ষা, কত কহিয়াছে তাহার কথা—প্রাণের কথা; টানিয়া রাখিয়াছে নিকটে তাহাকে যে দিয়াছে তাহার জীবন, ঢালিয়াছে মমতা—যার শেষ নাই। মুকুন্দ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া মুখের উপর বাম গণ্ড রাখিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, বাড়ী এসেছিস, এবার আমি যাই, কেমন?

শবলা তাহার বাহু লেহন করিয়া মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। সেই স্নেহ, সেই মমতা সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। লালু কাছে আসিয়া তাহার গা শুঁকিয়া ডাকিল 'ঘেউ' বিদায় বিদায়। শবলাও লালুর গায় জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিল। উভয়কে মমতার মোহন ফাঁদে বাঁধিয়া মুকদের বিদায়ের পালা বুঝি শেষ হইল!

মুকুন্দ ও লালু বেড়ার বাহিরে চলিয়া আসিল। মুকুন্দের মনটা যেন কেমন করিতে লাগিল মূক মাতার জন্য। সে যেন এক প্রবল আকর্ষণে থমকিয়া দাঁড়াইল পথের মাঝখানে। পিছনে ফিরিয়া দেখিল শবলা নিঃশব্দে দরজার ওপাশে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার কোমল দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু ও কি! জল নয় ওর গণ্ডে? চোখের জলের ধারা নয় ওকি? হাঁ হাঁ তাইত! মুকুন্দ স্পষ্ট দেখিল মূকের অশ্রু নীরব ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। তাহারও চোখ ঝাপসা করিয়া জল আসিল। সমবেদনা…এমনি করিয়াই পরাণ পোড়ে, অশ্রু ঝরে জীবের জন্য জীবের। এক দরদী বাজায় বাঁশী মানুষ-পশু-পক্ষীর অন্তরে বসিয়া। একই সুরে বাজে বাঁশী…মুকুন্দ দুই এক পা পিছনে আসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'যা যা ঘরে যা, যা গে, আমি আবার তোকে দেখতে…'

হঠাৎ মা চণ্ডী যেন বাঘিনীর মতন লাফাইয়া পড়িল দরজার কাছে। 'ওঃ! বড় দরদ উঠেছে তোর ওদের জন্য! খাবি আমার আর গুণ গাবি অন্যের… যা-আ-আ—বেইমানী' বলিয়া সে একখণ্ড বাঁশ তুলিয়া লইয়া সবলে গরুর পিঠে আঘাত করিল। বাঁশটা তিনখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল তাহার হাত হইতে। গরুর পিঠটা বাঁকিয়া গেল। প্রহারের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সামনের পা দুটা ভাঙ্গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার নাক, মুখ, মাথা মাটিতে থেৎলিয়া গেল। রক্তের স্রোত বহিল। মুকুন্দ অজ্ঞাতসারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। উষ্ণ শোণিত যেন ইঞ্জিন-বেগে তাহার শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিতেছিল। লালু একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বাঘের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল বেড়ার ওপারে।

মুকুন্দের দীর্ঘশ্বাসে যেন আগুন বাহির হইল। সে ডাকিল, 'লালু!…'

লালু তাহার কাছে আসিয়া গরুর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অস্থির হইয়া কেবলই যেন কাঁদিতে লাগিল—'উঁ উঁ উঁ।' তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। মুকুন্দ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া বড় দুঃখেই বলিল, 'তুই যা পারিস্ ওরা কি তা পারে লালু! ওরা যে মানুষ!'

ঘেউ—'ঘেউ—উ-উ-উ'—পুনরায় লালুর প্রতিবাদ!

তাহারা ব্যথিত চিত্তে নীরবে পথ চলিতে লাগিল। তাহারা যায় যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়। পথের বাঁকে আসিয়া তাহারা শেষবার ফিরিয়া তাকাইল দূরে ফেলিয়া আসা বাক্যহারা মমতাময়ী শবলার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

ভূ-লুণ্ঠিতা শবলার শোণিতসিক্ত চোখ দুটী আকুল হইয়া সেই পথে বন্ধুদের খুঁজিতে লাগিল।

স্বামী স্ত্রী সংবাদ

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

(সামাজিক নক্সা)

স্ত্রী। দাদার বড় মেয়ে সুরমা এসে তোমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়াল, আর তুমি শুধু তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলে; হাঁ সমুখে দুটো কথা বলেও আদর আপ্যায়িত করা দূরে থাক্, কুশল-মঙ্গলও জিজ্ঞেস করলে না। দেখে আমি তো লজ্জায় আর দুঃখে একবারে মরে গিয়ে ছিলুম। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে, তোমাকে বল্লুম,—চিনতে পারচো না? এ দাদার বড় মেয়ে যে—সুরমা। তখন যেন খুব আশ্চর্য্যি হয়ে বলে উঠলে, "এঁ্যা! তাই নাকি? সব ভালত? কখন এলো।" তার ছোট বোনের বিয়ের সময় আমাদিগকে নিয়ে তুমি আমাদের বাড়ীতে গেছলে। বেশী দিন থাক নাই বটে, কিন্তু দু'দিন হলেও সে বাড়ীতে ছিলে, আর তখন কতবার সুরমাকে দেখেছ, আর তার বড় খোকাটির বয়স তখন মাত্র ৯।১০ মাস; তাকে বার বার কোলে নিয়ে কত আদর-সোহাগ করতে। সে সব ভুলে গিয়ে সুরমাকে দেখে একেবারে চিনতেই পারলে না? তোমাদের পুরুষ মানুষের কেমন মন, আর কি রকমেরইবা চোক্। আমরা একদিন এক নিমেষের জন্য যাকে দেখি সারা জীবনে তার চেহারা কোন দিন ভুলি না।

স্বামী। ঝড়ের মত এক নিঃশ্বেসে তুমি ত আমাকে কতই না বকে গেলে। কিন্তু সুরমাকে চিনতে না পারারও যে সঙ্গত কারণ আছে, তা একবারও মনে ভেবে দেখলে না। তার সেই পটোল-চেরা জলভরা ঢল ঢল চোখ, তার গোলাপের মত লাল গাল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুপুষ্ট গোলগাল দেহ, যেন খোদাই করা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি, এ সবের কোন কিছুর চিহ্ন সুরমার এখনকার চেহারায় আছে কি? গায়ের রঙ কালিমাখা, অস্থিচর্ম্মসার, চোখ দুটো কোটরগত, আহা, মাথার সে চুল একবার যে দেখেছে সেই কত তারিফ করতো, আর এখন মাথায় যে চুল একবারে যেন নাই, তালের আঁটির মুড়ির মত—ঠিক কালাজ্বরের রোগীর চেহারা! তেমন অপ্সরীর মত মেয়ের চেহারা যে এখন পেত্নীরও অধম হয়েছে, তা কি করে অনুমান করব, বল দেখি? অবিশ্যি হয়তো তাকে ৭।৮ বছর পরে দেখলুম। কিন্তু এই আট বছরেই সেই ষোড়শী যুবতীই যে আজ এমন জরাজীর্ণা বুড়ীতে পরিণত হয়েছে---তা শুধু আমি কেন, বোধ হয় এই বিশ্বসংসারে আর কেউই অনুমান করতে পারবে না।

স্ত্রী। হ্যাঁ, তা যা বলচো, সত্যিই বটে। তবু তুমি তাকে খালি গায়ে দেখ নাই, সেমিজ-কামিজ গায়ে দেখেছ; যে [illegible] খন স্নানের ঘরে খালি গায়ে নায়, তখন দেখে আমিই ডরিয়ে গে[illegible]লুম, ঠিক যেন শাঁখচুন্নি, তার চেহারা ভাল থাকবারই বা জো[illegible]ক? তোমরা পুরুষ জাত, মেয়েদি'কে কি মানুষ মনে কর[illegible]—না তাদের মরণ-বাঁচনের ভাবনাই ভাবো?

স্বামী। এই এক্ষুণি একদফা পুরুষ জাতের শ্রা[illegible]দ্ধ হয়েছে। আবার আমাদের পুরুষ জাতের এমন কি অপরাধ [illegible] পলে, আর একদফা তাদের জাত তুলে গালাগালি—গা[illegible] মুখে [illegible]-কালি মাখাতে চাও?

স্ত্রী। সুরমার বয়স এই সবে ২৪ বছর, বিয়ে হয়েছে মাত্র ৯ বছর, এরি মধ্যে সে ৭টি ছেলে-মেয়ের মা হয়েছে। তার মধ্যে ৪টি মারা গেছে, কোনটি ২।৩ মাস বয়সে কোনটি বা জন্মাবামাত্র; ঐ যে কোলে একটি খোকা দেখলে, তার আজও অন্নপ্রাশন হয় নাই, সবে মাত্র ৫ মাস বয়স। এরি মধ্যে সুরমা আবার বলে তিন মাস পোয়াতি! কি লজ্জার কথা! কি দুঃখুর কথা!

স্বামী। এঁ্যা, বল কি গো! আবার তিনমাস পোয়াতি?

স্ত্রী। হ্যাঁ সত্যিই। আর কি জন্যে কলকেতায় এসেছে—শুনবে? ডাক্তার রায়কে দেখিয়ে, ওষুধ পাথ্যির পরামর্শ নিতে, গঙ্গাস্নান ক'রে কালীমাকে দর্শন করে পুজো দিয়ে, এবার ভালয় ভালয় আঁতুড় ঘর থেকে বেরুলে, মাকে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজা দিবে—মানত করে গেল। ডাক্তার রায় কি বলেছেন শুনবে; যখন ডাক্তার বাবু জানতে পারলেন যে, আমাদের জামাই বাবুটিই মেয়ের বর, তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জামাই বাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন, 'মশায়! আপনি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ছেলে, ওকালতি করেন, সুতরাং শিক্ষিত বলতে হবে। এত সব লেখা-পড়া শিখেও স্ত্রীর প্রতি এমন অমানুষিক অত্যাচার? সংযম, বিবেক, মনুষ্যত্ব দূরে থাকুক, একটুক্ চোখের পরদা, লোকনিন্দার ভয়, আর স্ত্রী ব'লে তার জন্য একটু দরদ—সেও প্রাণে বেঁচে থাকুক, অন্ততঃ এটুকু মমতাও করা উচিত ছিল। এবারের এ গর্ভস্থ শিশুটিকে প্রাণে বধ করলেও প্রসূতিকে বাঁচান যাবে কি না সন্দেহ। আর আমি তা করতে পারবোও না; নরহত্যা, জীয়ন্তে মানুষ খুন। আপনার যা অভিরুচি এখন করুন গে। ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা এই লিখে দিচ্ছি। কিন্তু তাতে আপনার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারবেন—মনে হয় না।

স্বামী। তাহ'লে তোমাদের জামাই বাবুটি ত একটা সাক্ষাৎ দেবতা গো! শুনেছি তিনি নাকি আবার একজন সাহিত্যিক বলেও নাম জাহির করতে চান। মধ্যে মধ্যে প্রেমের কবিতা-টবিতাও লেখেন শুনেছি।

স্ত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উৎকট প্রেমিক, স্বামী স্ত্রী এক বিছানায় না শুলে তাঁর ঘুমই ধরে না। তা মধ্যখানে একটা কোল বালিশ

স্বামী। আগের দিনের রীতি নিয়ম অনেকটা ভাল [illegible] ৫।৪ মাসের গর্ভবতী হ'লেই মেয়েরা শাশুড়ির ঘরে বা পিত্র[illegible] গিয়ে মা মাসি পিসির সঙ্গে শুতো। ছেলে-মেয়ের অন্নও প্রায়ই মাতামহের বাড়ীতে হত এবং প্রসবের পরে অন্ততঃ ছ[illegible] মেয়েরা স্বামীর মুখ প্রায় দেখতেই পেতো না। আজ ক[illegible] দিনে ছেলে-মেয়েরা ও সব মানতে চায় না। আর ফলও যে হাতে হাতে ফলচে।

স্ত্রী। বলেছ ভাল—৩।৪ মাসের পোয়াতি হলেই স্বা[illegible] আলাদা থাকবে? এরা ত আর মানুষ নয়, হয় দেবতা, ন[illegible] পশু। না, না, ভুল বললুম, এরা পশুরও অধম। কুকুর, ছাগল, এরা পশু, শুধু পশু নয়—ছাগল আর কুকুর অত্যন্ত ব[illegible] বলে লোকে তাদের কত নিন্দা করে। কিন্তু ঐ সব নিকৃষ্ট

স্ত্রীজাতি গর্ভবতী হলে আর তাদের উপর কোন অত্যাচার করে না, তাদের গাও শুঁকতে চেষ্টা করে না।

স্বামী। ঠিক বলেছ। তারা নিকৃষ্ট পশু হলেও, তারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে বটে।

স্ত্রী। আর তোমরা মানুষ বলে অহঙ্কার কর, নিজেদি'কে বড় মনে ভাব। কিন্তু তোমরা এক্ষেত্রে সত্যিই পশুরও অধম। গরু, ছাগল, কুকুরও তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

স্বামী। শুনেছি ইহুদিদের মধ্যে নাকি একটা নিয়ম আছে যে, মাসিক ঋতুস্নানের পর পনর দিন তারা স্বামী-স্ত্রী একঘরে শোয় না। এজন্য তাদের মধ্যে পুত্র-কন্যার সংখ্যা অতি অল্প। অন্ততঃ আমাদের দেশের মত এত বেশী নয়। আর মাসে পনরটা দিনও যারা একটুকু সবুর ক'রে থাকতে পারে না, তারা সত্যিই পশুর অধম। আর সব ক্ষেত্রেই যে পুরুষই পাপী তাও বলতে পার না, কথাতেই বলে—এক হাতে তালি বাজে না। মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের আগুনে ঘি বে-হিসেবে ঢালেন, এমন কথাও অনেক শুনেছি।

স্ত্রী। তা হ'তে পারে, একবারে অস্বীকার করব না। কিন্তু আমাদের সুরমার বেলায় ও-কথা একেবারেই খাটে না। সে নাকি জামাই বাবাজীকে আর একটা বিয়ে করবার জন্যেও অনেক অনুরোধ করেছে; কতদিন পায়ে ধ'রে কেঁদেছে পর্য্যন্ত, এমন কথা তার নিজের মুখেই শুনেছি।

স্বামী। তা হ'লে আমাদের জামাই বাবু ত দেখছি মহারাজ রামচন্দ্রকেও হারিয়ে দিয়েছেন। তিনি যজ্ঞ করতে সোনার সীতা তৈরি করিয়েছিলেন। ইনি দেখছি তাতেও অসম্মত।

স্ত্রী। তা বলতে পার। কিন্তু সুরমা মরে গেলে, আর এ যাত্রায় মরবে—তা সুনিশ্চিত, তখন দেখবে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ যেতে না যেতে আবার মাসেকের মধ্যেই সে নিশ্চয় আর একটা বিয়ে করবে।

স্বামী। তা আজকাল মেয়ের বাজার যেমন সস্তা আর বয়স্থা মেয়ে নিয়ে মেয়ের বাপেরা যে রকম বিব্রত আর বুদ্ধিহারা, তাতে আর একটা বিয়ে করতে একমাসও দেরি হবার কথা নয়।

স্ত্রী। তা আর বলতে আছে? একে জামাই বাবাজী এত কামুক, তার ওপর এমন পাশকরা রোজগেরে—বর-পণের টাকা যৌতুকও কম পাবে না। আর শুনেছি ও যেরকম কৃপণ-স্বভাবের আবার তার ওপর টাকার লোভী, আর একটা বিয়ের কথা আর বলতে আছে!

স্বামী। তাহলে জামাই বাবাজীর কিন্তু অকালে অপমৃত্যু সুনিশ্চিত। কারণ তারও বয়স হবে প্রায় ৪০ বছর। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা সা ভার্য্যা প্রাণঘাতিনী। আর সেই তরুণীটি যদি আমাদের সেন মশায়ের মেয়ের মত মেয়ে হয়, তবে জামাই বাবুর টি, বি, হয়ে যাদবপুর যেতে এক বছরও দেরী হবে না। তুমি ত শুধু পুরুষদেরই যত দোষ দেখ, আর পঞ্চমুখে তার বর্ণনা কর। কিন্তু আমি ভাল রকমেই জানি, সেন ম'শায়ের জামাইটি আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে এক আফিসে কাজ করতো। বিয়ের এক বছরের মধ্যে যখন তার টি, বি হল তখন সে নিজ মুখে তার বহু বন্ধু বান্ধবের কাছে বল্‌তো যে তার অকাল-মৃত্যুর কারণ, তার স্ত্রী। আহা, সে ছোকরার কেমন সুস্থ সবল হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ ছিল। সবাই তার শরীর দেখে কত প্রশংসা করতো। কেউ কেউ হিংসাও করত। কিন্তু বিয়ে হবার ছ মাস না যেতে যেতেই তার মাথা ঘোরা, বদ হজমের দোষ, আরও কত কি উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তার স্ত্রী কোন একটা রাত্রিও তাকে সময়ে ঘুমুতে দিত না। এক্ষেত্রে তার নিজের দোষের চাইতে তার স্ত্রীর দোষই বেশী, সে তার বন্ধুদের কাছে বলতো। তুমি হয়ত তা স্বীকার করবে না, কারণ তা স্বীকার করলে তাতে স্ত্রীজাতির পুরুষের ওপর অত্যাচার স্বীকার করা হবে। তাতে তোমাদের হার, তা তুমি কক্ষণো স্বীকার করবে না। এ দেশের এক নামজাদা সাধু পুরুষই তোমাদের স্ত্রী-জাতিকে বলেছেন "দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে।"

স্ত্রী। তা দু'এক ক্ষেত্রে হ'তে পারে,—একবারে অস্বীকার করবো কেন? কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে পুরুষরাই সর্ব্বনাশের গোড়া, তা বলবই বলবো। যেসব মেয়ে কলঙ্কনী অসতী হ'য়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে, তাদের শতকরা নিরানব্বইটার ক্ষেত্রেই তোমরা পুরুষ জাতই তাদের অধঃপাতে যাওয়ার কারণ,—তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বল, এ রোগের ওষুধ কি?—আর এ রোগ যে আজকাল দেশব্যাপী হয়ে পড়েছে! আর এ রোগে অল্প বিস্তর ভুগছেও অনেকে।

স্বামী। ছেলেবেলা থেকে আহারে-বিহারে সংযম, আর সবার গোড়ার কথা, সেরা কথা—ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাত্বিকভাব, ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করা। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধটি যে কত মহৎ, কত পবিত্র, আর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বও যে কত বেশী, তা বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ীরও, নানা ছলে, আকারে-ইঙ্গিতে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা। তারা যে আগুন নিয়ে খেলা করে,—তা তাদেরকে ভাল করে জানিয়ে দেওয়া: এ সব বিষয়ে অনর্থক লজ্জা ভেবে নীরব থাকা অভিভাবকদেরও নিতান্ত অকর্ত্তব্য এবং অসঙ্গত। দেহতত্ব, স্বাস্থ্যতত্বের মোটা মোটা কথাগুলি,—তরুণ-তরুণীদের মনে ভাল করে এঁকে দিতে হয়—মুরুব্বীদের। "মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ॥" এ কথাটি খুব ভাল করে জানিয়ে দিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই "পুত্র" অপর পুত্রেরা "কামজ পুত্র" বলে কেন নিন্দিত, তারও গোড়ার তত্বটি কথাপ্রসঙ্গে বুঝিয়ে বলতে হয়। এখনকার দিনের ছেলেমেয়েরাও যেমন, তাদের মা-বাপ মুরুব্বিরাও তেমনি। "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ, স্বদারনিরতঃ সদা" আমাদের ঋষিদের শাস্ত্রের আদেশ। ঋতুকালেই একবার সহবাস কর্ত্তব্য, আর এই সহবাসের পরেই মনে কর্ত্তে হয়, যে গর্ভ হয়েছে। আবার ঋতু না হলে, সহবাস পাপের কাজ—তাহা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিরুদ্ধ, গর্ভস্থ শিশুর প্রতিও তাতে অত্যাচার করা হয়। একটুকু ভেবে দেখলেই তা সবাই বুঝতে পারে।

স্ত্রী। কথাগুলি তো ভালই বলচো, কিন্তু তা মানে ক'জনে? আর এসব মানে না পুরুষরাই বেশী।

স্বামী। তোমার সেই এক কথা, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ।'

স্ত্রী। ওগো তুমিই না সেদিন আমাকে কি একটা ইংরাজি বই পড়ে শুনুলে যে দু'একটি ছেলের মা হলে, মেয়েলোকদের স্বামী সহবাসের ইচ্ছে স্বভাবতই কমতে থাকে। কি বই, আমার সে নামটা মনে নাই। সে বইটা ঐ শেল্‌ফেই আছে; একবার প'ড়ে আবার শুনোও দেখি, তোমাদের বিলিতি গুরুম'শায় কি বলেছেন।

স্বামী। পুরুষ ও নারীর পেটের খিদে, মনের খিদে, দুয়েরই সমান; আর তা থাকাও স্বাভাবিক। তবে, যে পরিবারে শিক্ষা, সংসর্গ, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা যত ভাল, সেই পরিবারের পুরুষ ও মেয়েদের মতি-গতি তত ভাল। সাত্ত্বিক জিনিষ খেলে মনও সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়। আর তামসিক খাদ্য-পানীয় খেলে মন মন্দের দিকে যায়, কুৎসিত নাটক-নভেল দিনরাত পড়লে, আর এ পোড়া দেশের সিনেমা-থিয়েটারে কুৎসিত অভিনয় দেখলে শুনলে—সীতা-সাবিত্রীর মনও খারাপ না হয়ে যায় না। বিলেতে সিনেমার অতি সহজে ও সস্তায় নানা ভাল বিষয় দেখিয়ে শুনিয়ে লোকশিক্ষার কত সাহায্য ক'রে থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে শিবের বদলে বাঁদরের উৎপাত।

স্ত্রী। তা আর বলতে হবে না, আমি একদিন যেয়েই তার নমুনা দেখে এসেছি, যত চুরি-জোচ্চুরি, ডাকাতি খুন, গেরস্ত ঘরের মেয়েকে ফুশলিয়ে বার করে তার সর্ব্বনাশ করা---এই সব কুকথা, কুকাণ্ড যত দেখতে শুনতে চাও! একদিন দেখেই আমার আক্কেল হ'য়েছে—জীবনে আর কোনদিন যাবো না। কিন্তু আর একটা উৎপাত এখন হয়েছে, তাও কম নয়। ঘরে ঘরে না হোক প্রায় পাড়ায় পাড়ায় সোসাইটি গার্ল্‌স্ (Society girls) দু'একটা আছে—যাদি'কে বাড়ী ঢুকতে দিলেও পাড়াপড়শিদের পরিবারের বিপদ হবার কথা—যারা ঠাকুর-চাকর ঝি দিয়ে সংসারের সব কাজ করায়, খায় দায়, পহরে পহরে পোষাক বদলায়, নভেল পড়া আর সিনেমা দেখা ছাড়া কি করে তাদের সময় কাটবে বল, মানুষের মন সারাদিন নিষ্কর্ম্মা বসে থাকতে পারে না।

স্বামী। সেইজন্যই বুঝি সংসারের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে তুমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক। দু'একটা তরকারি, কি রকমারি খাবার—একটা কিছু তোমার নিজ হাতে রোজ করা চাইই চাই।

স্ত্রী। দু'তিনটি ছেলেমেয়ের মা হলে তাদের ভাবনাই মায়েদের আর সব সাধ-আকাঙ্ক্ষা লোপ করে দেয়, সেই কথা তুমিও তো সেদিন একখানা ইংরাজি বই পড়ে আমাকে শুনিয়েছিলে, সেইটা আজ আর একবার পড়ে শুনাও।

স্বামী—"Sexuality is merged in the mother's love. Thereafter the wife intercourses not so much as a sexual gratification than as a proof of her husband's affection." (Kreft Ebing's "Psychopathic Sexuals" 12th Edn. P. 14)

স্ত্রী। এখন বল, দোষ কার বেশী, পুরুষের না মেয়ের?

স্বামী। ওগো, জয় চিরকাল তোমাদেরই। তোমরাই আদ্যাশক্তি, চণ্ডীই বলেছেন,—"নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নারীরূপেণ সংস্থিতা।"

স্ত্রী। ঢের হয়েছে, এখন থাক্, আর বেশী পণ্ডিতির দরকার নাই।

নিবেদন

এই সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য রচনাগুলির প্রকাশ বন্ধ রহিল। আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে পুনরায় তাহা নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আমরা পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক সর্ব্বসাধারণকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—বঙ্গশ্রী

আলোচনী

মাননীয় "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু।

মহাত্মন!

আমার পুত্র শ্রীমান্ প্রণয়কৃষ্ণ শর্ম্মা আপনাদের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার একজন গ্রাহক। ভাদ্র-সংখ্যার 'হিন্দোল' পাঠ করিয়া আমি তাহার একটি সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব। ইতি—

"হিন্দোল-আলোচনা।"

সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার বর্ত্তমান সনের ভাদ্র-সংখ্যার ২৫৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাণীকুমার লিখিত 'হিন্দোল'-শীর্ষক পালানাটা পাঠ করিয়া লেখকের মহদুদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রসক্রীড়া-স্থলে বলভদ্রের প্রকাশ হওয়ায় ভাব-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

হিন্দোলনোৎসবটি ব্রজের মধুর রসোৎকর্ষক লীলা। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যে রসোৎকর্ষ খেলা হয় তাহা সুরত-ক্রীড়ারই অঙ্গ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলী প্রেক্ষণং গুহ্যভাবণং।
সঙ্কল্লোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥

এমন সময় রসোল্লাসক সখিগণ ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বলভদ্র, বলদেব ও বলরাম রোহিণীনন্দনেরই নাম। ইনি যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ সম্মান করিতেন যথেষ্ট। তাঁহার সমক্ষে নায়িকাগণের সঙ্গে রসক্রীড়া বা রসালাপ সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। কখন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ করেনও নাই। বলভদ্রও শ্রীকৃষ্ণের রসক্রীড়াস্থলে কুত্রাপি উপস্থিত হ'ন নাই। আর কিনা এ স্থলে বলভদ্র উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "ব্রজসুন্দরী কিশোরীর বিরহের সুর অনুসরণ ক'রে চ'লে এসেছি পথ চিনে। সখি, এতটুকু বিচ্ছেদও কি সইতে পারো না? শ্যামচাঁদ কি না এ'সে পারে! সে তোমায় ছেড়ে যাবে কোথায়? মনে মনে মিথ্যে সংশয় রচন ক'রে কেন দুঃখ পাও?" এরূপ সান্ত্বনা-বাক্য শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্রের উক্তিতে না হইয়া সখিগণের উক্তিতে হইলে সমীচীন হইত।

বলভদ্র গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি দ্বাদশ সখার মধ্যে কেহ নহেন। সখা, প্রিয় সখা ও প্রিয় নর্ম্মসখা—এই ত্রিবিধ সখার মধ্যে প্রিয় নর্ম্মসখা সুবল, শ্রীকৃষ্ণের রাধা-বিচ্ছেদাকুলতা দর্শন করিয়া রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনিয়া দিয়া দূরে থাকিতেন। প্রিয় নর্ম্মসখাও যে স্থানে উপস্থিত হইতেন না, সেই রসক্রীড়ার স্থানে অন্যের—বিশেষতঃ গুরুজনের উপস্থিতি ও ঘটকালি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণকে, "কানন ঘিরে তিমির রচিত হয়েছে, এই অভিসারের অতি সুসময় শ্যামচাঁদ, এই সুযোগ কি কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা ত্যাগ করে!" বলিয়া বলভদ্র বিশেষ অভদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন।

আবার নাটোর শেষ ভাগে আসিলেন এক বৃদ্ধ গোপাল। ইনিই বা কে? মধুমঙ্গল নাকি? রসিকতা-পূর্ণ কথায় বুঝা যায় বয়স্য মধুমঙ্গলই হইবেন। ইনি গোপালনও করেন নাই অথবা গোপবংশ-সম্ভূতও নহেন। ইনি ব্রাহ্মণসন্তান, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। গোপাল নহেন।

শ্রীযুত বাণীকুমার যদি মনে মনে বৃদ্ধ গোপালের অর্থ মধুমঙ্গলই ধরিয়া থাকেন, তবে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া উচিত ছিল। নতুবা কোন পাঠকের পক্ষে বৃদ্ধ গোপাল অর্থে ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গলকে বুঝিয়া নেওয়া অসম্ভব।

শ্রীযুত বাণীকুমার মাঝে মাঝে যে গানগুলি সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ভাবমাধুর্য্যে ও রচনাচাতুর্য্যে রস-পরিপাটির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযুত বাণীকুমার যদি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া ভাব-সামঞ্জস্য রাখিয়া 'হিন্দোল' পালানাটা লিখিতেন, তবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই। ইতি—

শ্রীআদিত্যকুমার দেবশর্ম্মা গোস্বামী
জ্যোতির্ব্বিদ, ভাগবতোত্তম, ভক্তিবিশারদ।

পুস্তক ও আলোচনা

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

রঙছুট—কানাই বসু। মেন্ অফ লেটারস্। ৩৩নং, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা। মূল্য—সাত সিকা।

(ক) লক্ষ্মীপূজা, (সংহতি—আশ্বিন, ১৩৫১)

(খ) সখের জিনিষ (ভারতবর্ষ—আশ্বিন, ১৩৫১)

(গ) ননীমাধব (বঙ্গশ্রী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯)

(ঘ) দেব-শিশু (বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৪৯)

(ঙ) একটি ঘরোয়া গল্প (বঙ্গশ্রী—আশ্বিন, ১৩৫০)

(চ) রঙছুট (ভারতবর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৫০)

উপরিউক্ত ছয়টি ফুলের সাজি এই ছোট্ট বইখানি। 'অর্থ-লিপ্সা ও যশোলিপ্সা-প্রণোদিত' নবীন সাহিত্যধর্মী এই সতেজ নির্ভীক লেখক বিগত ভাদ্র-সংক্রান্তিতে আমাদিগের বিনানুরোধে নিজের সম্পূর্ণ দায়িত্বে পুস্তকাকারে গল্পগুলি প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার এই নব-জাত শিশু 'দেব-শিশুর'ই মত স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে অনুপম। রসিকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া এই শিশু শাশ্বত শৈশব রক্ষা করুক, এই কামনাই করি।

(ক) **বীরভূমের ইতিহাস**ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি-এল প্রণীত। রতন লাইব্রেরী সিউড়ী, বীরভূম। মূল্য প্রতিখণ্ড এক টাকা ও পাঁচ সিকা মাত্র।

(খ) **চরিত-কীর্ত্তন**ঃ জীবনী। শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি-এল প্রণীত। রতন লাইব্রেরী, সিউড়ী, বীরভূম। মূল্য—আট আনা মাত্র।

(ক) সহর বা পল্লী অঞ্চলের কাহিনীকারের আজ অত্যন্ত অভাব বাংলাদেশে। শুধু বাংলার ইতিহাস প্রণয়নের দিক হইতেই নয়, বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেও এইজাতীয় গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বীরভূমের মূল উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত তাহার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনায় লেখক যে প্রত্নতাত্ত্বিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

(খ) লেখক শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র মহাশয়ের সাধ্বী স্ত্রী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে পরোলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বল্প জীবনের মধ্য দিয়া তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বইখানি ব্যক্তিগত; তবে আদর্শ-অনুপ্রণোদিত।

জ্যোতির্গময়—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। জ্যোতি প্রকাশালয়, ২০৬নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—চারি টাকা।

ফাল্গুনীবাবু কবি এবং ঔপন্যাসিক। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে যে মহারহস্য বিদ্যমান, যে অদৃশ্য সেতুর উপর দিয়া জীবাত্মা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া লোকে-লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং জড় হইতে চেতনার আবির্ভাব ও পরমাত্মায় লয় প্রাপ্তির যে সূক্ষ্মতম গতি-পথের কথা ভারত-ঋষিগণের যোগদৃষ্টিতে একদিন প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহারই ভিত্তিতে সামাজিক সুখ-দুঃখের কাহিনী লইয়া 'জ্যোতির্গময়ের' কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে। পার্থিব জগতে দুঃখ আছে, দুর্দ্দশা আছে, হাহাকার আছে, আশা-নৈরাশ্যের দোলায় দুলিয়া প্রতিনিয়ত মানবাত্মা সুরের স্পর্শ, আলোর স্পর্শ খুঁজিতেছে। সেই তমসার জটিল জটাজাল হইতে জ্যোতির পথে আগাইয়া চলিতে যে কঠিন কৃচ্ছ্র-সাধনার প্রয়োজন, অধীর মানব-মনে তাহা সচরাচর সম্ভব নয়। সেই 'নয়'-এর সাথে দৃঢ় প্রত্যয়শীল মানবজীবনের যে সঙ্ঘাত, তাহারই বাস্তব রূপ ফুটিয়াছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। উজ্জ্বলা, সমীর, নীলিমা, জলা—প্রত্যেকটি চরিত্রেই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন। এইজাতীয় গ্রন্থ শুধু পরিশ্রম-সাপেক্ষ রচনা বলিয়াই নয়, আদর্শের দিক হইতেও প্রশংসনীয়।

বিপ্লবের পথে বাঙ্গালী নারী—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। সান্যাল এণ্ড কোং, ৮৫নং, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

চৌদ্দটী অধ্যায়ে, লেখক 'নারীমুক্তির আন্দোলন' সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। লেখকের স্বতন্ত্র মতবাদ রহিয়াছে; মতের সঙ্গে মিল হওয়া না হওয়া পাঠকবিশেষের রুচি-বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিবে; তবে, একটা কথা সকলেই স্বীকার করিবেন আশা করি যে, লেখকের বিশ্লেষণ-প্রণালী ও প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

লিপি ইতিহাস—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—এরিয়ান প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি লিঃ। ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—দু' টাকা।

আধুনিক ধরণের লেখা ষোলটী কবিতায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। 'ট্রেনে বসিয়া ভাবি' কবিতাটী ভাল লাগিল।

প্রাসঙ্গিকী

মহাশক্তি-পূজা

ব্রহ্মাণ্ডোৎপীড়কং যা দিতিসুত-নিকরং ভীমবীর্য্যং নিহন্তং
স্বর্ভ্রষ্টৈ-র্দেববৃন্দৈর্হিমগিরিশিখরে সংস্তুতা জিষ্ণুমুখ্যৈঃ।
গৌরীদেহাদ্ বিতেনে নবঘনরুচিরাং কৌষিকীমূর্ত্তিমাত্মাং
শর্ম্মো ধত্তাং সদা সা ত্রিজগদঘহরা চিন্ময়ী যোগগম্যা॥

মহাদেবী দুর্গা আজ উদ্বোধিতা হোন্ ধ্যানলোকে। শরৎ-লক্ষ্মী আগত ভুবনের দ্বারে—আলোকদূতী। তাই বাজিয়া উঠিয়াছে আকাশে-বাতাসে আলোকের বীণা—জ্যোতির মঞ্জীর-ধ্বনি—শুভ্র স্বপ্নের আগমনী।

জগন্মাতা মহামায়া অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা 'বাক্'নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী—তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সর্ব্বগত পরমাত্মার সহিত নিজ আত্মার তাদাত্ম্য অভেদ সমাধিবলে উপলব্ধ করিয়া আপনাকে কল্পনা করিয়াছেন সকল জগতের অধিষ্ঠানে আধার-রূপে, সর্ব্বজগদ্রূপী স্বীয় আত্মার স্তুতি করিয়াছেন। দেবী—ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী। তিনি কন্যা-কুমারী, দুর্গিঃ। তিনি আদি-শক্তি, আগমপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তিধরী দুর্গা। তিনি দাক্ষায়ণী সতী। দেবী দুর্গা নিজদেহ-সম্ভূত তেজঃপ্রভাবে শত্রু-দহন-কালে অগ্নিবর্ণা—অগ্নিলোচনা। স্বপ্রকাশ বিরোচন পরমাত্মকর্ত্তৃক তিনি দৃষ্ট হন বলিয়া বৈরোচনী। স্বর্গ-পশু-পুত্রাদি ফললাভের আশায় তাঁর সেবা করা হয়। আবার কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত মুমুক্ষুর পক্ষে তিনিই সংসার-তারণের একমাত্র হেতুস্বরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা। তিনি আবার কখনো হেমাভরণ-ভূষিতা হেমবর্ণা হৈমবতী। উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নিত্যসহচরী। তিনি আবার বিন্ধ্যবাসিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী। তিনি দুর্গা, কৃষ্ণা, চণ্ডী, কলা, কাষ্ঠা, সন্ধ্যা, মায়া, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি, হ্রী, শ্রী, কুমারী, কৌশিকী, কপিলা, কপালী, করালী, জম্ভনী, মোহিনী, সাবিত্রী, মহাকালী, শাকম্ভরী, স্কন্দমাতা, বেদমাতা, মহানিদ্রা, ভ্রামরী। দেবী গুণাতীতা ও গুণময়ী। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি। সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা ত্রিগুণাত্মিকা—অখিল-বিশ্বের প্রকৃতি-স্বরূপিণী। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। তিনি পরিণামিনী নিত্যা। দেবী চণ্ডিকা চিন্ময়ী। তিনি চিন্মাত্ররূপে কৃৎস্ন জগৎ ধরিয়া অবস্থান করেন। নির্গুণ-চৈতন্য সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় যে শক্তির মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল-রূপে অভিব্যক্ত হন, সেই শক্তিই 'বাক্' অথবা সরস্বতী। তাঁর স্থিতিকালোচিত শক্তির নাম 'শ্রী' বা লক্ষ্মী। আবার সংহারকালে তাঁহার যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়—তাহাই 'রুদ্রাণী দুর্গা'। দুর্গোৎসব—একাধারে এই ত্রিমূর্ত্তিরই পূজা। আবার একদিকে দেবসেনাপতি অজেয় শক্তির প্রতীক দৈত্যজয়ী কুমার—অন্যদিকে বিঘ্ন-সংহর্ত্তা গণপতি—জনগণের অধিষ্ঠাতা। এই সর্ব্বসমন্বয়ে দুর্গাপূজা—মহাশক্তির আরাধনা।

মহাদেবী দুর্গা সর্ব্বৈশ্বর্য্যবতী—দেবী নিত্যা হইয়াও তাঁর অমোঘ মহিমার বারংবার প্রকাশ করেন, তিনি জগৎকে রক্ষা ও পালন করেন। তিনি পরমা শান্তি, তাঁর নামোচ্চারণে সকল সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তিনি অনন্ত প্রেমময়ী। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদিসম্ভারে অন্তর-অর্ঘ্যদানে দেবীপূজা সার্থক হয়।

এই পরাধীনতা-ক্লিষ্ট দেশে মহাদেবী আবির্ভূতা হইয়া নবজাগরণে নিদ্রিত দেশবাসীকে 'চেতাইয়া' তুলুন। মহাদেবী ক্ষেমঙ্করী একদা অসুর-পীড়িত দেবগণকে আনিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের স্বাধিকার, ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের মর্য্যাদা। আজ আমরাও প্রার্থনা করি সেই স্বাধিকার, ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, কল্যাণ, শ্রী, শত্রুহানি ও পরম মুক্তির উপায়। একদিন ক্ষৌণীপতি সুরথ ও সমাধি বৈশ্য হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও মহাদেবীর কৃপায় লাভ করিয়াছিলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আমরাও সেই প্রতিষ্ঠা চাই আমাদের স্বদেশে, আমরা দেবী দুর্গার করুণা-প্রসাদ ভিক্ষা করি—আমরা যেন লাভ করি—যশ, বিদ্যা, কীর্ত্তি, শক্তি, সম্পদ্, আয়ু।

আজ আমরা নিজের জাতীয়তা অপ্রমাণ করিয়া বিদেশীর অনুকরণে জড়তা-দুষ্ট পৌরুষহীন ক্লীবে পরিণত হইয়াছি। তবে আমরাই কি মহাশক্তির পূজারী? মহাশক্তির প্রতিমা-পূজার বহ্বাড়ম্বর দেখাইয়া আমাদের দাসত্বের জীবনকে কি আরো বাঁচাইয়া রাখিতে চাই? সে পূজা যথার্থ মাতৃপূজা নহে। দেশমাতৃকাই দুর্গা, দশপ্রহরণধারিণী শত্রুনাশিনী। এই অনুপ্রেরণা অন্তরে না জাগিলে এদেশের মুক্তি নাই।

আজ আমরা যদি মহাদেবীর পূজার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি, আমরা যদি সত্যই শক্তির উপাসনা করি—তাহা হইলে আমাদের পৌরুষের উদ্বোধন হইতে বিলম্ব হইবে না। এই পদানত জাতি আবার পরাধীনতার বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নবজাগরণে জাগিয়া উঠিবে। তবেই শ্রীশ্রীদুর্গা-আরাধনা সফল হইবে।

যুগকীর্ত্তি রামমোহন রায়

মহাপুরুষগণ সমস্ত মানবজাতির গৌরব ও আদর্শের স্থল, কিন্তু তাঁহারা জাতি-বিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌরব অর্থে এখানে বুঝিতে হইবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শক্তি-প্রেরণা। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আমাদের জাতির মধ্যে এক স্বদেশীয় মহাপুরুষ। যে সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক ইঙ্গ-ভাবাপন্ন হইয়া জাতীয়তা পরিত্যাগ করিতেও দ্বিধা করিত না—সেই ধর্ম্ম-বিপ্লবের দুর্দ্দিনে রামমোহন হিন্দু-ধর্ম্মকে এক নূতন রূপ দিয়া ইংরেজ-ভক্তগণকে উপহার দিলেন। বাঙলার ইংরেজি-শিক্ষিত নর-নারীও এই নব-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া সাদরে তাহা গ্রহণ করিল। তাহার ফলে হিন্দুস্থান খৃষ্টান-ভূমিতে পরিণত হইল না। রামমোহন দেশের এই মহোপকার সাধন

করিয়া ধর্ম্মরক্ষাকারী যুগাবতারের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবের ন্যায় চিরদিন হিন্দুর পূজ্য ও উপাস্য থাকিবেন।

এই চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ আমাদের দেশে নানা শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং নানা সৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া এক নবযুগের প্রবর্ত্তনা করেন।—তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন—কোনো কাজেই তাঁহার সামসময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্বে তাঁহার অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ছিল, স্বদেশের প্রতি ছিল তাঁহার স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম। তিনি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মধারা হইতে ধারণা হয় যে, তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন নানা কার্য্যে। শিক্ষা-ক্ষেত্র, রাজনীতি-ক্ষেত্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্র, সমাজ-ক্ষেত্র, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র—এই সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার দান অপরিমেয়। তিনি এমনই আশ্চর্য্য মানুষ ছিলেন যে, তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী রাখিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এ যুগে বিরল। রামমোহন খুব বড় কর্ম্মবীর হইয়াও নিজেকে দেশের কল্যাণের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন;---এইখানেই তাঁহার মহত্ব। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তিনি আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন কিন্তু প্রতিদানের কোন প্রত্যাশা রাখেন নাই।

রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, সেই ইচ্ছা-তরু আজ পল্লবিত হইয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। তিনি নব-যুগের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনা ছিলেন। তিনি দেশবাসীকে জাতীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিয়া নব চেতনায় জাগ্রত করিয়া অমরকীর্ত্তি হইয়াছেন। তাঁহার বহুমুখী সাধনা ফলবতী হইয়াছে। সেই জন্য এই নবযুগ-প্রবর্ত্তনের প্রথম লগ্নে জাতীয় জীবনকে পুন-রুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি বিধাতার বর শিরে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই মহাপুরুষের ১১২ তম স্মৃতি-বার্ষিকী গত ১০ই আশ্বিন ১৩৫২ রামমোহন পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই রাজর্ষিতুল্য মহামানবের কর্ম্মশক্তি ও পূত আদর্শ দেশবাসীকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করুক---তবেই তাঁহার স্মৃতির যথার্থ পূজা করা হইবে।

সচ্চিদানন্দ

যে লোকোত্তর পুরুষকেশরী সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠ গত পূজায় নানারূপে ও রসে লীলায়িত হইয়া মন্দ্রিত হইয়াছিল—তাহা আজ চিরকালের জন্য নীরব হইয়া গিয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সারমর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া রাষ্ট্রিক, সামাজিক, নৈতিক, পারিবারিক ও ধর্ম্ম-জীবনের সকল দিক বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাঙালীর দুর্গাপূজার মধ্যেই তিনি সকল তত্ত্বের সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন আপনার মৌলিক চিন্তার দ্বারা এবং সেই সুচিন্তিত বিষয়গুলি দেশবাসীর অন্তরে সঞ্চারিত করিবার জন্য তাঁহার অশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত।

ইহা ছাড়াও তাঁহার দানের ইয়ত্তা নাই। সচ্চিদানন্দ কেবল কর্ম্মবীর ছিলেন না—তিনি ছিলেন বাঙ্‌লা দেশের তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ দানবীর। তাঁহার স্বাধীন মতবাদ ও পরিপূর্ণ চেষ্টা ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। তদুপরি তিনি দেশকে কি রকম ভালবাসিতেন—তাহার প্রমাণ—দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অকুণ্ঠিত দান। বহু অভাব-গ্রস্ত সংসার, বহু দরিদ্র ছাত্র, বহু বিপদাপন্ন বেকার ব্যক্তি, বহু আর্ত্তজন, বহু ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহায্য-সম্পদ্ লাভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তি পাইয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

সচ্চিদানন্দ

এই মহানুভব কর্ম্মবীরের স্মৃতি-রক্ষা করার দিন আসিয়াছে। সচ্চিদানন্দ বাঙালীর গৌরব। সমস্ত ব্যবসায়ী ও বিদ্বজ্জন-সমাজ তাঁহার স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিবার জন্য যে এখনো তৎপর হ'ন নাই—ইহা বড় দুঃখের বিষয়। বালির বেদী রচনা করিয়া তাহার উপর স্মৃতি-মূর্ত্তি বসাইবার কৃত্রিম প্রয়াস আমাদের দেশে বিরল নয়, কিন্তু যাঁহারা সত্যকারের বাঙালী—যাঁহারা মানুষের মত মানুষ—যাঁহারা প্রকৃত বড়লোক—তাঁহাদের স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল রাখিতে না পারিলে—দেশবাসীর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়?

বাঙ্‌লার সম্মুখে দুর্ভিক্ষের ছায়া

আশঙ্কা জাগিতেছে—আবার বুঝি দুর্ভিক্ষের করাল-মূর্ত্তি প্রকটিত হইবে বাঙলার অঙ্গনে। এবার অজন্মা-প্রেত শ্যামল ভূমিকে শুষিয়া খাইতেছে। তাই ভারতবর্ষে সেচন-কার্য্য-সম্পর্কিত পরামর্শদাতা উইলিয়ম্ ষ্টেম্প মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে: "ক্রমবৃদ্ধিশীল জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ব্যবস্থা অবিলম্বে গৃহীত না হইলে পুনর্ব্বার বাঙ্‌লা দেশে ভীষণ 'মন্বন্তর' জাগিয়া উঠিয়া চারিদিকে ধ্বংস আনিয়া দিবে।"

ইতোমধ্যেই বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে অন্নাভাব ঘটিয়াছে, এই সংবাদ সত্যই উদ্বেগের সৃষ্টি করে। বাঙলা দেশে যে পরিমাণে শস্য জন্মাইয়া থাকে—তাহা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে কি পায় বঙ্গবাসী? শুধু তাই নয়---জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বাঙলার মাটিতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সকলের মুখের গ্রাস ভরাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত নয়।

'দুর্ভিক্ষ আবার দেখা দিবে'---এই দুঃসংবাদ বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া আসন্ন সর্ব্বনাশের আতঙ্কে পরমুখাপেক্ষী, খাদ্যাভাবে জর্জ্জরিত পরাধীন জনগণ শিহরিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানেই উপযুক্ত খাদ্য জুটিতেছে না, পরাধীন জাতির বাঁচিয়া থাকা পাপ মনে করিয়া খাস্-ইংরেজ-পরিচালিত অভূতপূর্ব্ব বন্দোবস্ত একেবারে চরমে উঠিয়াছে। এই অপরূপ ব্যবস্থার ফলে দিনে দিনে জনগণের জীবনীশক্তি নষ্ট হইতেছে। ইহার কৈফিয়ৎ কে দিবে? কলিকাতা রেশনিং-এ বহুস্থলে উৎকৃষ্ট চাউলের পরিবর্ত্তে মোটা কাঁকর-ভর্ত্তি চাউল বহু স্থলে পঁচিশ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। এই সমস্ত নানা বিপত্তি—তদুপরি আবার দুর্ভিক্ষের নির্দ্দয় পদ-শব্দ শোনা যাইতেছে। সোনায় সোহাগা বলিতে হইবে।

এই বৎসরে অবৃষ্টির জন্য বাঙলায় ফসল যাহা ফলিয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বাভাবিক বৎসরে যেরূপ ফসল ফলিয়া থাকে, এ-বৎসরে তাহার অর্দ্ধ-পরিমাণ হইবে কি-না সন্দেহ। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার ফসল যাহা ফলিবে—প্রত্যাশা করা যাইতেছে তাহা আরও শোচনীয়। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় অনাবৃষ্টির জন্য ফসল জ্বলিয়া গিয়াছে; আর বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি কয়েকটি জেলার ধান্য-উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে বন্যার প্রকোপ।

চাউলের দাম দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে। বাঁকুড়ায় এখনই চাউলের অতিরিক্ত অভাব-অভিযোগ জাগিয়া উঠিয়াছে। বাঙলার নানা পল্লী হইতে অন্নাভাবে দুর্দ্দশার কাহিনী শোনা যাইতেছে। এই দুর্গতদের রক্ষা করে কে? কেই বা ইহার প্রতিকার করিবে? হায় পরাধীন জাতি!

বস্ত্র ও সরিষার তৈল

রেশনিং-এর ব্যবস্থা-করার অর্থ হইতেছে জনসাধারণের সুবিধা আনিয়া দেওয়া, তথা ব্লাক-মার্কেট বন্ধ করা। কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও দরিদ্রের যে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে! জিনিসের দর সরকার যাহা বাঁধিয়া দিতেছেন, তাহা কম না হইয়া বেশীর দিকেই ঝুঁকিতেছে! যেমন তেলের কলের মালিকদের অভিমত---যে তৈল অনায়াসে এক টাকা দরে খুচরা বিক্রয় করা সম্ভব, তাহার দর সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এক টাকা ছয় পয়সা করিয়া। সরকারের এই কার্য্য বিক্ষোভেরই কারণ। জনসাধারণের মুখ চাহিয়া, তাহাদের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনো কাজই হইতেছে না। দরিদ্র মধ্যবিত্তদের বিষম অসুবিধা ও ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য কাহারই বা মাথা ঘামিবে? সে দুরাশা মাত্র। সরকারের ইচ্ছানুযায়ী কানপুর হইতে তৈল আমদানী হইবে। এর ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, এখানকার তেলের কলগুলি (রেশনিঙের দরুণ) সরিষার-বীজের আমদানি-অভাবে স্থাণু হইয়া যাইবে, আর কাজ বন্ধ হইলেই প্রায় দশ সহস্রাধিক শ্রমিককে বেকার হইতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থায় বাঙলার খনির সর্ব্বনাশ-সাধন। কানপুরের বৃহৎ বৃহৎ তেলের কলের প্রতি সরকারের কেন এতদূর সম্প্রীতি—তাহা কোন্ স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া করা হইল, বোঝাই কঠিন। অবশ্য লাভের কড়ি প্রত্যক্ষ ভাবে একদল ও অপ্রত্যক্ষভাবে আর একদলের উদরপূর্ত্তি করিবে---এইরূপ হতভাগ্য বাঙালীদের মনে স্বতঃই উদয় হয়।

একে তো তৈল যাহা পাওয়া যাইতেছে—তাহা অতি-অল্প, তদুপরি তৈলের যাহা নমুনা মিলিতেছে—তাহা সরিষার তৈল বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

ইহা তো গেল তৈল সরবরাহের কথা,---কিন্তু গৃহস্থদের তৈল সরকারী মুদির দোকান হইতে ঘরে আনিবার জন্য নাস্তানাবুদ হইতে হইতেছে। এমন একটি দোকান ঠিক করিয়া দেওয়া হইল—যে দোকান খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতেই দুই তিন দিন কাটিয়া যায়—তাহার পর বাসস্থান হইতে হয় তো এক কিংবা দু মাইল, তফাতে সেই দোকান। আবার মুদির কাছ হইতে তৈল পাওয়াও একটি সমস্যা।

বস্ত্রের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তৈল অপেক্ষা বস্ত্র-সমস্যা আরও গুরুতর। প্রথমতঃ বস্ত্র-বণ্টন বাঙলাদেশে প্রয়োজনের অনেক কম করা হইয়াছে, অন্যদেশে মাথা-পিছু ১৮ গজ, এখানে মাত্র ১২-গজ। তার পরে দয়া করিয়া যদি বা বস্ত্র-ক্রয়ের ছাড়পত্র পাওয়া গেল---সে বস্ত্র ক্রয় করা যে কত দুঃসাধ্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এক অঞ্চলের লোককে দোকান দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে দূরস্থিত আর একটা অঞ্চলে। দোকানে যাইয়া সপ্তাহ-ভোর গরু-ভেড়ার মত লাইন দিয়া দাঁড়াইয়াও অনেক সময়ে কাপড় মিলিতেছে না। দোকানদারগণ রেশনিং-কার্ডের খরিদ্দারদের সঙ্গে খুব মুখরোচক ব্যবহার করেন না, তাহার প্রমাণ জনে জনে দিতে পারিবে।

এই সুন্দর ব্যবস্থা সর্ব্ববিষয়ে যদি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া খাদ্য-বস্ত্রের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কি চমৎকার সুব্যবস্থা! সকলে এই সুব্যবস্থার ঠেলায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। লাভের অঙ্কে

অবশ্য অনেকেরই উদর মোটা হইতেছে, কিন্তু জন-সাধারণের যে দিন-যাপনের গ্লানি ও দুর্গতি দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। আর কত অনাচার রক্তবীজের মত বাড়িতে থাকিবে?

শ্রমিক-ধর্ম্মঘট

বর্ত্তমানে সারা বিশ্বে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের একটা হিড়িক্ আসিয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধান্তে শ্রমিক-গোলোযোগের তরঙ্গ উত্তাল হইয়া পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে আঘাত করিতে উদ্যত। আমেরিকায়, বৃটেনে, অষ্ট্রেলিয়ায়, ভারতবর্ষে—প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রমিক-ধর্ম্মঘট দেখা যাইতেছে। সিড্‌নীতে তো বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হইবার আশঙ্কা জাগিয়াছে।

শ্রমিকদের চিরকাল চাপিয়া রাখিয়া বেশী খাটাইয়া লইয়া কম ভাতা দিবার ফল বোধ হয় এই পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক ধর্ম্মঘট। ধনিকরা নিজেদের উদর স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু শ্রমিকদের প্রতি সামান্য সদয় দৃষ্টি দিলে কি তাহাদের লভ্যাংশের কিছু হ্রাস হয়?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও কৈন্দ্রিক কংগ্রেস-নির্ব্বাচন

আবার ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-নির্ব্বাচন-সংগ্রাম আসন্ন। কংগ্রেস এই প্রতিযোগিতা-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ, তাহার কারণ ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইবার জন্য কংগ্রেস-পক্ষ বদ্ধপরিকর। কিন্তু প্রাদেশিক ও কৈন্দ্রিক সদস্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নেতৃবর্গ কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন তাহা 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'। বারংবার লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, অনেকে কংগ্রেসের ধ্বজা উড়াইয়া নিজেদের স্বার্থের ধ্বজা উড়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। দেশপ্রেমের নাম লইয়া এরূপ বহু বর্ণচোরা অর্থের খেলা দেখাইয়া সদস্য হইয়াছে, দেশের ও দেশবাসীর মঙ্গলের প্রতি তাহাদের বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা যায় নাই, তাহাদের কেবল আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া কেন্দ্রাভিসারী স্বার্থ লইয়াই উন্মত্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-লগ্ন সর্প যেমন বিহঙ্গরাজ গরুড়কেও অগ্রাহ্য করে—সেইরূপ দল ও স্থান-মহাত্ম্যে তাহারা এইরূপ বৃত্তিই গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বরূপ-প্রকাশে অত্যন্ত উদ্যমশীল, তাহা বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। অনেক সময়ে এই সকল ব্যক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই নিজেদের কার্য্যদ্বারা অল্প-বিস্তর পরিপুষ্ট করিতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। খেয়োখেয়ি, কাড়াকাড়ি, দলাদলি ও ব্যর্থ আস্ফালন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, উদ্দেশ্য হারাইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে স্বার্থোদ্ধত অবিচার ও অনিষ্টের মাত্রা বাড়িয়াছে, দেশের ইষ্ট-সাধনায় আসিয়াছে বিরতি।

আজিকার দিনে দেশের এই অবস্থায় আমরা আর মুখোস-পরা জন-হিত-ব্রতীর স্বার্থান্বেষণে সহায় হইতে চাই না। এ বিষয়ে বাঙলার অবিসংবাদী নেতৃবর দেশবরেণ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে অবহিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সদস্য-নির্ব্বাচনে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অশেষ সাবধানতা গ্রহণ না করিলে টাকা বাজাইয়া দুই চারিজন অকর্ম্মী স্বার্থান্বেষী স্থান করিয়া লইতে পারে। আজিকে দেশের অবস্থার অনেকাংশে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সমস্যাও বহু আকারে দেখা গিয়াছে, বিশেষতঃ তিন চার বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশ খাদ্যের অভাবে ও নানা মুনির নানা মতে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি, তলাইয়া গিয়াছে বহু নিম্নস্তরে। সেইজন্য আবার প্রবল প্রাণের সন্ধান চাই, আবার সম্পূর্ণ নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন কর্ম্মী দল গঠিত করিতে হইবে, যাঁহাদের দুর্ব্বার কর্ম্ম-শক্তি জনহিতকল্পে ও স্বাধীনতা লাভের পুণ্যব্রতে নিযুক্ত হইবে, যাঁহারা দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে অকুণ্ঠিত, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যাঁহাদের মূলমন্ত্র হইবে "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ম্"।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সদস্য-সংগ্রহ চলিতেছে। এই কার্য্য-সমিতির পরিকল্পনা এই যে: নয় লক্ষ সদস্য-সংগ্রহের 'ছাড়পত্র' ছাপানো হইবে, ইতোমধ্যে প্রায় সত্তর হাজারেরও বেশী সদস্যসংগ্রহ-পত্র ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, আপাততঃ সর্ব্বসমেত এক লক্ষ সদস্য-পত্রের ব্যবস্থা আছে। এখন প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে এই পত্র-সংগ্রাহকদের বিপুল জনতা।

বিভীষণের দল আমাদের দেশে বিরল নহে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা তাহাদের প্রতিরোধ করিবার আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। এই অর্থ-গৃধ্নু অভিলাভ-লোভীদের প্রতিহত না করিলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। এই সমস্ত কারণে সদস্যনির্ব্বাচন সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

নিখিল-ভারত রাষ্ট্র-পরিষদের অধিবেশন

বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৃহৎ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম—"বৃটিশ শাসকগণ ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করো—'কুইট ইণ্ডিয়া'।

পরাধীন স্বদেশীয় এই প্রস্তাব যেমনি বিদেশী কর্ত্তাদের কানে গেল, অমনি কালবিলম্ব না করিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে কারা-কক্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকে আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া বিঘোষিত করা হইল। উপরন্তু সরকারের উত্তর এতদূর উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিরস্ত্র পদাহত জনসাধারণ—যাহারা বিদেশী শাসনযন্ত্রকে বিকল করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল—তাহাদিগকে দুর্নিবার ও প্রচণ্ড দমননীতির কঠোর শাসনে অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে বৃত্তান্ত শুনিলে রোমাঞ্চ হয়। তথাপি সেদিন মিঃ আমেরীপ্রমুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে দম্ভোক্তি করিয়াছিলেন, এমন কি কংগ্রেসকে শাসাইয়াছিলেন—কংগ্রেসের আত্মনির্ভরতা, স্বার্থগন্ধলেশহীন কর্ম্মদ্যোতনা ও ত্যাগের মহিমার কাছে সেই দম্ভোক্তি লাঞ্ছিত হইল। কংগ্রেসের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে মিঃ আমেরীর সাম্রাজ্যবাদিতা পরাজিত হইয়াছে। বন্দী নেতারা মুক্তিলাভ করিয়া আগষ্ট বিপ্লবকে গণ-

বিপ্লব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কণ্ঠ প্রশংসা-মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই দিনের প্রস্তাবে যে কঠিন উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর পাইলেন কংগ্রেস-নেতাদের আচরণে।

সেই আগষ্ট বিপ্লব সম্পর্কে এই রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে নিম্নলিখিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয়—তাহা সংক্ষেপে এই বলা যায় যে: "প্রায় তিন বৎসরাধিক কাল ব্রিটিশ সরকার যথেচ্ছ দমন-নীতি কার্য্যকরী করিবার পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রিক-পরিষদ্ তাহার প্রথম অধিবেশনে অভিনন্দিত করিতেছে তাঁহাদের—যাঁহারা ব্রিটিশ সরকারের নিষ্পীড়ন অম্লান-বদনে সহ্য করিয়া অশেষ ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আর তাহার গভীর সহানুভূতি তাঁহাদের উপর—যাঁহারা তিন বৎসর ধরিয়া সামরিক, পুলিস ও অর্ডিনান্স-রাজের শাসনে ক্লেশ-ক্লিষ্ট হইয়াছেন। স্থানবিশেষে জনগণ কর্ত্তৃক কংগ্রেসের নীতি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে সরকার হঠাৎ জাতীয় নেতৃগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া পাশবশক্তির ব্যবহার করিয়াছিল—আর নির্ম্মম হস্তে শান্তিপূর্ণ নির্বিরোধ অনুষ্ঠানসমূহ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল—তাহার ফলে জনবর্গের চিত্তবিক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ঘটে, তাই তাহাদের ক্ষুব্ধ অন্তরে জাগিয়াছিল স্বাধীনতা-লাভের দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তি—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পদ-পেষণপ্রবৃত্ত শক্তির অস্ত্র-প্রহার-তীব্র অত্যাচারের প্রতিষেধ করিয়া...এ বিষয়টিও পরিষদ্ উপলব্ধি করিতেছে।

বিগত ৮ই আগষ্ট ১৯৪২—অধিবেশনে এই রাষ্ট্রপরিষদের সাগ্রহ নিবেদন ছিল—বিশ্ব-জগতের স্বাধীনতা রক্ষণ মানসে সম্মিলিত জাতিগুলির সহিত সহযোগিতা করিবার অনুকূল অবস্থা-গতির প্রবর্ত্তন করা হউক...কিন্তু এ প্রার্থনা তো প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলই—উপরন্তু পরামর্শ ও আলোচনায় এই পরিষদের প্রস্তাবিত ভারত-সমস্যা-সমাধানের নির্দ্দেশ আনিয়া দিয়াছিল—সরকার কর্ত্তৃক নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর বিভীষিকাময় আক্রমণ-জনিত দুরবস্থা। তিন বৎসরব্যাপী এই দেশের বুকের উপর যে ভয়ঙ্কর অবস্থা জগদ্দল পাষাণের মত চাপিয়া বসে—তাহার বিষময় ফলে দৈন্য, দুর্গতি ও মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ-প্রেতের কবলে সহস্র সহস্র আর্ত্তের প্রাণনাশ এই দেশে গভীর ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে। তদুপরি ভারত-সমস্যা সমাধানে অক্ষম দুর্নীতিমূলক শাসন-প্রণালী এই দেশকে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও ভারতের জনবর্গ সরকারের উৎপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব সাহসের প্রমাণ দিয়া পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিবার অদম্য উৎসাহ-আকাঙ্ক্ষার শক্তির দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।...

গত ১৯৪২ এর আগষ্ট অধিবেশনে রাষ্ট্রিক পরিষদ্ জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধীয় যে প্রস্তাব করিয়াছিল—এখনো তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে।

পূর্ব্বের ন্যায় এই অভিমত প্রকাশিত যে: "বিশ্ব-শান্তির এবং এসিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের পরাধীন জাতির অপরিহরণীয় ভিত্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উপর। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুস্পষ্টরূপে মানিতে হইবে, আর সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যে এই দেশকে স্বাধীনতার পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে হইবে। স্বাধীন-রাষ্ট্র-রূপে ভারতবর্ষ বিশ্বের শান্তি-স্বাধীনতার কার্য্যে সহযোগ স্থাপন করিবে।"

এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলে বিশ্বব্যাপী পরস্বাপহারিতার দুর্নীতি ধ্বংস হইয়া যাইবে। জগতে শান্তির আসন হইবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বড়লাটের ঘোষণা

ভারতবর্ষের সমস্যা-বিষয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রণা-সভার সহিত ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেল্ সবিশেষ আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখের ঘোষণায় প্রকাশ যে: ব্রিটীশ সরকার কর্ত্তৃক ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা-গঠনকারী একটী পরামর্শ-সভা অচিরেই আহূত হইবে। এই সভার সভ্য-নির্ব্বাচনের পরক্ষণেই বড়লাট নির্ব্বাচিত ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণের ও নেটিভ ষ্টেটের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিবেন। আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই: ১৯৪২-এ প্রচারিত ব্রিটীশ-কর্ত্তৃপক্ষের প্রস্তাব কিংবা ব্যবস্থান্তর বা সংশোধিত অন্য কোন প্রকার পরিকল্পনা—ইহার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনান্তে তাঁহার দ্বারা শাসন-সংসদ্-ও গঠিত হইবে। এই সংসদে সভ্য-রূপে গ্রহণ করা হইবে ভারতীয় বৃহৎ জন-সমর্থিত দলগুলি হইতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মিগণকে। অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষকে ব্রিটীশ সরকার আত্মকর্ত্তৃত্ব দান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

বর্ত্তমানে ভোটের অধিকার লইয়া যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে—তাহার কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। নির্ব্বাচন বিষয়ে সাধ্যমত সংশোধনের চেষ্টা থাকিবে।

এই ঘোষণা-প্রচারে দেশবাসিগণ কি আশ্বস্ত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের ভারত-আকাশে আবার স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিত হইবে? এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া শয্যা পরে নিদ্রাযোগে সুখ-স্বপ্ন দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সূর্য্য যে তিমিরে সেই তিমিরে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে পণ্ডিত কালীকণ্ঠ সমাজদ্দার কাব্যতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া পরগণার উনশীয়া-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ায় বিগত ৫ই আশ্বিন ১৩৫২ তারিখে বিশেষ কোন রোগযন্ত্রণা ভোগ না করিয়া সজ্ঞানে ভগবানের নাম করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। অনন্যসাধারণ আচার-নিষ্ঠা ও যাজনিক ক্রিয়াকর্ম্মে অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি পণ্ডিত-সমাজে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য, সুমধুর অমায়িক ব্যবহার ও জনহিতকর কার্য্যে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রভৃতির জন্য ইনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইনি স্থানীয় উনশীয়া-হিতৈষিণী সভার এবং কোটালীপাড়া সুরসরস্বতী পরিষদের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহু ধর্ম্মগ্রন্থ ও চলন্তিকা প্রভৃতি অভিধান-প্রণয়নে ইনি গ্রন্থকার ও প্রকাশক-দিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমগ্র পণ্ডিত-সমাজের, বিশেষতঃ কোটালীপাড়ার যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

পল্লী-প্রকৃতি

শিল্পী—শ্রীগুরুদাস চৌধুরী

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ত্রয়োদশ বর্ষ } অগ্রহায়ণ—১৩৫২ ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রবাসে ভগবান্

শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম

(পূর্ব্বাভাস)

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ (১)

সংসার জীবের প্রবাস-ভূমি

এই সংসারে জীবের* আয়তি ও নিয়তি—আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম বলেন :—

"এই সমস্ত জীব ব্রহ্ম থেকে এই জগতে আবির্ভূত হয়েছে এবং অন্তে ব্রহ্মেই তিরোহিত হবে।" (ক)

পারসীক ধর্ম্ম বলেন :—

"আদিতে আমরা যাঁর নিকট থেকে এখানে এসেছি, জ্ঞান ও চিন্তার সম্প্রসারণ ক'রে অন্তে তাঁরই নিকট ফিরে যাবো।" (খ)

য়িহুদীধর্ম্ম বলেন :—

"জগতের সমস্ত বস্তুই—চিৎ ও জড়—সেই আদিপুরুষে ফিরে যাবে, যাঁর নিকট থেকে তারা এখানে এসেছে।" (গ)

খৃষ্টধর্ম্ম বলেন :—

"মানুষ ঈশ্বর থেকে এসেছে ও ঈশ্বরেই ফিরে যাবে।" (ঘ)

ইসলামধর্ম্ম বলেন :—

"আল্লাহ্ থেকে আমরা এখানে এসেছি ও আল্লাহেই আমরা ফিরে যাবো।" (ঙ)

---

(১) আমি মুমুক্ষু হ'য়ে আত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশক সেই জ্যোতির্ম্ময়ের শরণ গ্রহণ করছি, যিনি পরস্পর সংযুক্তভাবে অবস্থিত বিনাশী ও অবিনাশী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই বিশ্বকে পরমেশ্বর রূপে ধারণ ক'রে রেখেছেন, যিনি অনীশ জীবরূপে ভোক্তৃভাব অবলম্বন ক'রে এই সংসারে বদ্ধ হন এবং পরিশেষে যিনি সেই পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হ'য়ে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

এ স্থলে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রছি বঙ্গদেশের খ্যাতনামা দার্শনিক, আমার শ্রদ্ধেয় উপদেষ্টা অধুনা স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অমর আত্মার প্রতি—যাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে আমি এই প্রবন্ধরচনা-কালে সাহায্য গ্রহণ করেছি।

* বেদান্তের মতে 'জীব' অর্থে কেবল মনুষ্য বুঝায় না—স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ সমস্ত প্রাণীকেই বুঝায়—কৌষি ১।২, ছান্দোগ্য ৬।৩।১ ও ঐতরেয় ৫।৩ দ্রষ্টব্য।

(ক) ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সতঃ আগচ্ছা-মহে। ছান্দোগ্য ৬।১০।২ সর্বাণি বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রতি অস্তং গচ্ছন্তি। ঐ ১।৯।১ 'আকাশ' ব্রহ্মের একটী নাম।

(খ) মাজ্দা-উশ হচা থা এ-এ-আঙ্গা, বা-ইশা অংঘুশ পো-উরুয়ো খবত। গাথা—

(গ) All things of which this world consists of—spirits as well as bodies—will return to the root from which they proceeded.—Zohar.

(ঘ) Man, who is from God sent forth,
Doth again to God return.

—Wordsworth.

(ঙ) ইন্না লি-ইল্লাহী ওআ ইন্না ইলৈহী রাজেউন। কোরাণ,

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জগতের সকল ধর্ম্মেরই শিক্ষা এই যে, সমস্ত জীব এক সদ্‌বস্তু থেকে এই জগতে এসেছে এবং ফিরে যাবে সেই সদ্‌বস্তুতেই, যিনি হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ (চ), পারসীক ধর্ম্মে অহুরমজ্ দা, য়িহুদী ধর্ম্মে ইলোহিম্, খৃষ্ট ধর্ম্মে গড্ ও ইসলাম ধর্ম্মে আল্লাহ্ নামে অভিহিত। (ছ) যদি তা-ই হয়, যদি ভগবান্‌ই জীবের উৎপত্তি ও গম্যস্থান (জ) হয়, তা হ'লে সেই ভগবান্‌কেই জীবের স্বধাম স্বদেশ বলা অসমীচীন নয়—বস্তুতঃ দেখা যায়—কোনো কোনো ধর্ম্ম স্পষ্টতঃ তা-ই ব'লেছেন :—

"যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানী, তিনি ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন।" হিন্দুধর্ম্ম, ঝ

"মানুষ সেই সদ্‌বস্তুকে প্রাপ্ত হন, যিনি তাঁর প্রভব, স্বধাম।" য়িহুদী ধর্ম্ম (ঞ)

"ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের স্বদেশ, স্বধাম।" খৃষ্টধর্ম্ম (ট)

উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম বা ভগবান নামে অভিহিত, বুদ্ধদেবের পরিভাষায় তাঁর নাম "শূন্য"। (ঠ) উপনিষদের ঋষি যেমন মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্ত পুরুষকে "অস্তং গত" অর্থাৎ স্বধাম-প্রাপ্ত (ড) ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন, বুদ্ধদেব তেমন নির্বাণী অর্থাৎ শূন্যতা-প্রাপ্ত পুরুষকে "অথ্‌থং গতম্" (ঢ) (অস্তং গত) ব'লে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ-থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম অনুসারেও শূন্যই জীবের উৎপত্তি ও গম্যস্থান।

জীব সংসারে এসেছে ভগবান্ থেকে এবং অন্তে ফিরে যাবে সেই ভগবানে। সেজন্য সকল ধর্ম্মই যেমন ভগবান্‌কে জীবের স্বধাম স্বদেশ ব'লে বর্ণনা করেছেন, তেমনি সকল ধর্ম্মই এই সংসারকে জীবের প্রবাসভূমি, পান্থশালা, পরদেশ, সরাই, করেভনসরাই এবং জীবকে প্রবাসী, বিদেশী, পান্থ, মুসাফির, Sojouner Wanderer, exile প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়েছেন। (ত)

ভগবান্ থেকে জীব অভিন্ন

প্রলয় কালে সমস্ত জীব ভগবানে বিলীন থাকে। (থ) তারপর প্রলয় অবসানে ভগবানের যখন "সিসৃক্ষা" হয়, যখন তিনি ইচ্ছা করেন, "আমি এক আছি, আমি বহু হবো,—আমি ব্যক্ত হবো", (দ) তখন সেই ইচ্ছা প্রভাবে ঐ সমস্ত বিলীন "বিবিধ জীব তা

"সমষ্টিতে যা, ব্যষ্টিতেও তা" as above so below (য়িহুদী ধর্ম্ম) ঊর্দ্ধ জগতে যা, নিম্নজগতেও তা" সেইজন্য ঊর্দ্ধজগতে সমষ্টি-রূপী ভগবান্ যা করেন, নিম্নজগতে ব্যষ্টি জীবও তারই অভিনয় করে। সেইজন্য ভগবানের এই বহুভবন, জীবের মধ্যেও দেখা যায়। সেটা হচ্ছে, আমাদের পরিচিত কোষাণুর বহুভবন, জীব-বিজ্ঞানের (Biology-র) ভাষায় "Cell multiplication। জীব-বিজ্ঞান বলেন, প্রত্যেক প্রাণি-শরীর—তা সেই প্রাণী পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা বা মানুষ যাই হোক না—অসংখ্য কোষাণু (cell) দ্বারা গঠিত। স্থাবরের বিশ্লেষণে চরমে যেমন পরমাণু পাওয়া যায়, জঙ্গমের বিশ্লেষণে তেমনি কোষাণু পাওয়া যায়। প্রাণি-দেহে অবস্থিত এই সমস্ত কোষাণুর প্রত্যেকটী কিছুকাল একাকী অবস্থানের প্রাকৃতিক প্রেরণায় বিভজন (fission) আদি দ্বারা দু'টী সদৃশ কোষাণুর উৎপত্তি করে। ঐ দু'টী কোষাণুর প্রত্যেকটি থেকে আবার দু'টী সদৃশ কোষাণুর উৎপত্তি হয়—এই রূপে এক থেকে বহুর উৎপত্তি হয়। ব্যাক্‌টেরিয়া নামে এক কৌষিক (unicellular) ব্যাধি-বীজাণু পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হ'য়ে কোটী কোটী সদৃশ বীজাণুর সৃষ্টি করে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণু একবারেই বহু হ'য়ে অসংখ্য সদৃশ বীজাণু উৎপন্ন করে। প্রোক্ত কোষাণুর বহুভবন তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হয় : বিভজন (fission), মুকুলন (gemmation) ও নিষেচন (fertilisation), যাদের প্রাচীন নাম এ-দেশের ভাষায় স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ।

(চ) ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে। ভাঃ পুরাণ ৯।২।১১। ভগবানের লক্ষণ সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্ম বলেন : "উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥"

(ছ) ফর্ক্ তফাও অৎ য়্যাহ নাম হী কা

দর অসল্ সব্ এক হী হ্যায় য়্যারো (সুফী) অর্থাৎ এ-সকল কেবল নামের তফাৎ, আসল বস্তু এক।

(জ) প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। মাণ্ডুক্য, ৬

(ঝ) যস্ত বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম। মুণ্ডক ৩।২।৪

(ঞ) He (Man) can attain the real, who is his fount, home—য়িহুদীধর্ম্ম Zohar

(ট) God, says Augustine, is the country of the soul, its home---খৃষ্টধর্ম্ম Ruysbreck

(ঠ) যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ। সর্ব্ব-বেদান্ত-সার। সবিশেষ দৃষ্টিতে যিনি পূর্ণ (পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং—ঈশ), নির্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনিই শূন্য, (নেতি নেতি)। সেইজন্য উপনিষদে শূন্যভাব সাধনের উপদেশ আছে, "শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ" —অমৃত উপনিষদ্।

(ড) বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন, "অস্ত" অর্থ "গৃহ"। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্তপ্রণীত "যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ', ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (ঢ) —সুত্তনিপাত।

(ত) হিন্দুধর্ম্মে জীবকে যে "বিদেশী", "প্রবাসী" ও সংসারকে তার "বিদেশ" "প্রবাস" বলা হয়, তা অনেক ভাবুক ও কবির উক্তিমধ্যে দৃষ্ট হয় :—

"মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-প্রবাসে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে।" পুনরায়
"আমি তো জগতে চির-পরবাসী
কত বার যাই কতবার আসি।"

এ-সম্বন্ধে খৃষ্টধর্ম্ম বলেন, "Man essentially belong to the spiritual world of Divine Reality. In his present state, then man is a wanderer and an exile"—Gall in "Mysticism"

(থ) রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে—গীতা ৮।১৮

(দ) তৎ ঐক্ষত একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য ৬।২।৩।

থেকে আবির্ভূত হয়, যেমন সুদীপ্ত অগ্নি থেকে সরূপ (সমান-রূপ) বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়।" (ধ) জীবের অবস্থান ও ভগবানের সহিত তার সম্পর্ক সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষি বলেছেন, "বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিতে অবস্থিত, মরীচি যেমন সূর্য্যে অবস্থিত, জল-বিন্দু যেমন জল-সিন্ধুতে অবস্থিত, জীবও সেইরূপ ভগবানে অবস্থিত।" (ন) এই দৃষ্টিতে জীব যেন ব্রহ্ম অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, যেন ব্রহ্ম-সূর্য্যের মরীচি, যেন চিৎ-সিন্ধুর বিন্দু, অর্থাৎ জীব হচ্ছে ভগবানের অংশ,—খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্বদর্শী টেনিসনের পরিভাষায় "A little God." সেই জন্য ভগবান বলেছেন, "সনাতন জীব আমার অংশ।" (প)

ভগবান চিদ্-ঘন—কবীরের পরিভাষায় "নূরতামাম"। জীব তাঁর অংশ (ফ) বা কণা (ব), সেজন্য জীব চিৎ-কণ। তাই উপনিষদের ঋষি তার সার্থক নাম দিয়েছেন 'চিন্-মাত্র।' এই চিন্-মাত্রই উপনিষদে স্থানে স্থানে প্রত্যগাত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, অন্তরাত্মা ও গীতায় কূটস্থ নামে উক্ত হয়েছেন। (ভ) ইনিই পারসীক ধর্ম্মের ফ্রবসী, য়িহুদী ধর্ম্মের পেশামাহ্, খৃষ্টধর্ম্মের স্পিরিট, বৌদ্ধধর্ম্মের বিজ্ঞান ধাতু, ইসলাম ধর্ম্মের রুহ্, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মোন্যাড্ ও প্লেটোর নুস্।

অংশ ও অংশীর মধ্যে, স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নির মধ্যে, বিন্দু ও সিন্ধুর মধ্যে স্বরূপগত কোনো ভেদ নাই। অংশের অপেক্ষা অংশী অধিক বটে, বিন্দুর অপেক্ষা সিন্ধু অধিক বটে, কিন্তু তাই ব'লে তাদের মধ্যে স্বরূপগত কোনো ভেদ নাই, থাকতে পারে না। সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন, "অগ্নির স্ফুলিঙ্গ অগ্নিই।" (ম) অর্থাৎ ভগবানের অংশরূপী ঐ জীব—যিনি চিন্-মাত্র, প্রত্যগাত্মা আদি নামে উক্ত, তিনি ভগবানই—খৃষ্টধর্ম্মের ঋষি টেনিসনের পরিভাষায় Very God of very God. উভয়েই 'সরূপ'—সমান-রূপ (য)। বাইবেল ও কোরাণের ঋষিও ঠিক এই কথা অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন (র)।

ভগবান্ সৎ চিৎ ও আনন্দময় (ল) ভগবান্ যখন সচ্চিদানন্দ এবং তাঁর সঙ্গে জীবের যখন স্বরূপ-গত কোনো ভেদ নাই, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ—জীবের মধ্যেও সৎ-চিৎ ও আনন্দ ভাব বিদ্যমান। (ব) খৃষ্টধর্ম্মও এই কথা বলেন। (শ)

তারপর ভগবানের দুই ভাব: বিশ্বাতিগ ও বিশ্বানুগ (ষ)। বলা বাহুল্য, এই দুই ভাবে ভগবান্ যুগপৎ সদা বিরাজমান। (স) যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের একাংশে মেঘের আবরণ ও অপরাংশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত, জ্যোতির্ম্ময় ভগবানেরও সেইরূপ—তার এক অংশ বিশ্বানুগ—প্রপঞ্চের মধ্যে প্রবিষ্ট, আর অন্য তিন অংশ বিশ্বাতিগ—প্রপঞ্চাতীত (হ)। খৃষ্টধর্ম্মেও এর অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় (ক), বিশ্বাতিগ ভাবে ভগবান্ সৎ-চিৎ-আনন্দময়, কিন্তু

(ধ) যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে। মুণ্ডক ২।১।১ (ভাবাঃ—জীব—শঙ্কর)

বুঝিবার সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে উপনিষদ্ আদি থেকে নানা উপমানের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উপমান সম্বন্ধে স্বর্গত শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এক স্থলে যা বলেছেন তা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "বলা বাহুল্য, উপমান ঠিক প্রমাণ নয়, তবে উপমান আমাদের পঙ্গু বুদ্ধিকে দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিবার সাহায্য করে। অতএব এই সকল উপমানের সাহায্য অবহেলা করা উচিত নয়।"

(ন) বহ্নেশ্চ যদ্বৎ খলু বিস্ফুলিঙ্গাঃ। সূর্য্যাৎ ময়ূখাশ্চ তথৈব তস্য। পুনরায় অংশবো বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ বহ্নের্ভঙ্গাশ্চ বারিধেঃ।

(প) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গীতা ১৫।৭—।

(ফ) ভগবান্ "নিষ্কল", "অকল" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৫, ১৯), 'অবিভক্ত' (গীতা ১৩।১৬) অর্থাৎ নিরংশ। নিরংশের অংশ সম্ভবে না; 'অংশ' বললে আমরা যা বুঝি, জীব প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের সেরূপ অংশ নয়। যেমন স্ফুলিঙ্গকে লক্ষ্য করে তাকে অগ্নির অংশ, বারি-কণাকে লক্ষ্য করে তাকে বারিধির অংশ, সূর্য্য-রশ্মিকে লক্ষ্য ক'রে তাকে সূর্য্যের অংশ বলা হয়, এ-ও কতকটা সেইরূপ। তত্ত্বদর্শীরা বলেন, গুহ্য জগতের এ-সব রহস্য মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করবার উপযুক্ত প্রতিশব্দ নাই। 'অংশ' শব্দটা কতকটা জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক নির্দেশ করে, সেইজন্য জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয়। বোধি-চৈতন্যের বিকাশ না হ'লে এ সব রহস্যের উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য সকল উপমানই অসম্পূর্ণ—তা সেই উপমান যতই সুন্দর হোক্ না কেন। উপমানের অসম্পূর্ণতার একটা দৃষ্টান্তও এখানে দেখানো হচ্ছে। জীবকে ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ বলা হয়। অনেক বিষয়ে স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে জীবের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এক বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য আছে। আমরা জানি, স্ফুলিঙ্গ অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ তেজোহীন হ'য়ে নির্ব্বাপিত হয়—যে-অগ্নি থেকে সে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল, তাতে সে আর প্রতি-গমন করে না, কিন্তু জীব ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ক্রমশঃ তেজীয়ান্ হয় ও পরিশেষে পূর্ণতা লাভ করে, ব্রহ্মে প্রতি-গমন করে।

(ব) [illegible] বা কণা ইব। [illegible]

(ভ) কঠ ৪।১, প্রশ্ন ৪।১১, গীতা ১৫।১৬

(ম) অগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব

(য) সরূপাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ। মুণ্ডক ২।১।১

(র) God made man in His own image-Gen.1-24
খলক্ অদ্ ইন্সান্ অলা সুরত-ইর্-রহমান্—কোরাণ

(ল) সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম—নৃঃ পূর্ব্ব উপনিষদ, ১।৮
ভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দ ভাব খৃষ্ট ধর্ম্মে Ways, Life ও Truth এবং ইসলাম ধর্ম্মে উজুদ্, এল্ম, শুহুদ।

(ব) সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তমেত্যুক্তীত ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী ৩।২৮

(শ) Individual man is one with God and is of His very nature in essence and existence.

(ষ) বিশ্বাতিগ Transcendent, বিশ্বানুগ Immanent.

(স) বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ—গীতা ১০।৪২

(হ) পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—ঋগ্বেদ, পুরুষ-সূক্ত।

(ক) "By this (Immanence of God) We mean that God not only dwells in the world, but

যখন তিনি জগৎ সৃষ্টি ক'রে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হন (খ), তখন তাঁর আনন্দ, চিৎ ও সৎভাব যথাক্রমে হ্লাদিনী, সংবিৎ ও সন্ধিনী —ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-"শক্তি" রূপে ব্যঞ্জিত হয়(গ)। ভগবান্ ও তার অংশরূপী জীবের মধ্যে যখন স্বরূপগত কোন ভেদ নাই, ভগবানের সমস্ত সাধর্ম্য যখন জীবের মধ্যে বিদ্যমান(ঘ), তখন ভগবানের ঐ দুই ভাব—বিশ্বাতিগ ও বিশ্বানুগ—জীবের মধ্যেও বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। লোকোত্তর ভাবে ভগবান্ যেমন সচ্চিদানন্দ, লোকাতিগভাবে জীবও তেমন সচ্চিদানন্দ—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ(ঙ)। নিরুপাধি, নির্লেপ, নিরঞ্জন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানের অনুকৃতিতে লোকানুগ হয়েন, অর্থাৎ প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন(চ)' তখন তাঁরও ঐ আনন্দ, চিৎ ও সৎভাব যথাক্রমে হ্লাদিনী, সংবিৎ ও সন্ধিনী—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-"শক্তি" রূপে ব্যঞ্জিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভগবান ও তার অংশরূপী জীবে স্বরূপগত কোনো ভেদ নাই। সেইজন্য সকল ধর্ম্মেরই ঋষি জীব ও ভগবানের অভেদ ঘোষণা ক'রে তার-স্বরে জীবকে উপদেশ করেছেন, "তৎ ত্বম্ অসি", "Ye are gods", "হক্-তু-ই" অর্থাৎ তুমি ভগবান্।

কিন্তু ভগবান্ ও তাঁর অংশরূপী জীবের মধ্যে স্বরূপ-গত কোনো ভেদ না থাকলেও জীবের প্রাথমিক অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে তাঁর বিকাশ-গত ভেদ আছে। কারণ পূর্ণের, সমষ্টির, সাকল্যের পূর্ণতা অংশে, ব্যষ্টিতে, ঐকল্যে বিদ্যমান থাকতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ এক, অদ্বিতীয় ও অপরিচ্ছিন্ন ছিলেন। যখন তিনি বহুরূপে ব্যক্ত হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন বিবিধ জীবের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ (manifestation) হয়েছে। এই বহুভবন, বিবিধ জীবের অভিব্যক্তি হ'তেই পারে না, যদি পরিচ্ছিন্নতা [ছ] না ঘটে। যে-মুহূর্ত্তে বিবিধ জীবের অভিব্যক্তি হয়েছে, সেই মুহূর্ত্তে বিবিধ জীবের অভিব্যক্তির সঙ্গেই পরিচ্ছিন্নতাও সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিচ্ছিন্নতা অভিব্যক্তির আনুষঙ্গিক। পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন, আর পরিচ্ছিন্ন অপূর্ণ। পূর্ণতা বিদ্যমান সমষ্টির,—সাকল্যের মধ্যে, ব্যষ্টির—ঐকল্যের মধ্যে নয়। যে মুহূর্ত্তে বহুভবন, বিবিধ জীবের অভিব্যক্তি, সেই মুহূর্ত্তেই ব্যষ্টি বা পৃথকভাবে অবস্থিত প্রত্যেকটী জীব অপূর্ণ, কারণ সে সমষ্টি বা সাকল্য অপেক্ষা কম। সমষ্টির মধ্যেই তার জন্য নির্দ্দিষ্ট পূর্ণতা বিদ্যমান থাকতে পারে—ব্যষ্টির মধ্যে নয়। সুতরাং অভিব্যক্তি সূচনা করে পরিচ্ছিন্নতা, আর অপূর্ণতা পরিচ্ছিন্নতার ফল বলেই অপূর্ণতা প্রত্যেকটী জীবের সহগামী। এর অর্থ হচ্ছে, সৎ, চিৎ ও আনন্দভাব, শক্তির দিক্ থেকে যাদের নাম সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়া, জ্ঞান ও ইচ্ছা—সেগুলি ভগবানে সুব্যক্ত, প্রবুদ্ধ [জ], কিন্তু তাঁর অংশরূপী জীবে প্রারম্ভে অব্যক্ত, নিষুপ্ত। সেইজন্যই মহর্ষি বাদরায়ণ বলেছেন, "জীব থেকে ভগবান্ ভিন্ন নন----অধিক" [ঝ]। খৃষ্টধর্ম্মও এই কথা বলেন। [ঞ] এই তত্ত্ব নির্দ্দেশ করবার জন্যই জীবকে ব্রহ্ম-অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বলা হয়েছে। [ট] এর অর্থ এই যে, স্ফুলিঙ্গে অগ্নির দাহিকা শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু সেই শক্তি প্রারম্ভে তাতে অব্যক্ত থাকে; কিন্তু উপযুক্ত ইন্ধন প্রাপ্ত হ'লে তার সেই অব্যক্ত শক্তি যেমন ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়ে সমিদ্ধ অগ্নিতে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবের মধ্যে ভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দভাব----সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়া, জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তি প্রারম্ভে অব্যক্ত থাকে, কিন্তু প্রপঞ্চে প্রবেশের ফলে তাঁর ঐ অব্যক্ত শক্তিগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়ে যখন সুব্যক্ত হয়, তখন

---

exists apart from the universe as Lord and ruler of all things"---C. F. Hunter.

(খ) তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ---তৈত্তি ২।৬

(গ) হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকে সর্ব্বসংস্থিতৌ—বিষ্ণুপুরাণ অস্য প্রথমা রেখা সা···ক্রিয়াশক্তি, দ্বিতীয়া···ইচ্ছাশক্তি, তৃতীয়া...জ্ঞানশক্তি—কালাগ্নি-রুদ্র উপনিষদ্।

এই তিন শক্তি খৃষ্টধর্ম্মে Light, Life, Lore ও ইসলাম ধর্ম্মে অরফ, ইরাদা ও অমল নামে অভিহিত।

(ঘ) সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্যবত্ত্বাৎ

(ঙ) প্রত্যগাত্মভূতং নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাবম্ ব্রহ্ম—শঙ্কর

(চ) জীব কেন প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন ও প্রপঞ্চ কি—তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

(ছ) "পরিচ্ছিন্নতা"কে বেদান্তে "মায়া" বলা হয়েছে। মীয়তে পরিমীয়তে----পরিচ্ছিদ্যতে" ইতি মায়া। যার দ্বারা অপরিমেয় পরিমেয় হয়, অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন হয়, অনন্ত সান্ত হয়, নিরংশ অংশের মতো হয়, অবিভক্ত বিভক্তের মতো হয়, তা-ই মায়া।

(জ) হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকে সর্ব্ব-সংস্থিতৌ----বিষ্ণুপুরাণ----পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ----শ্বেতাশ্বতর ৬।১৮ অর্থাৎ হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ বা বল (ইচ্ছা), ক্রিয়া ও জ্ঞান-শক্তি ভগবানে পূর্ণভাবে প্রকটিত। সেইজন্য ভগবান্ পূর্ণ (পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং----ঈশ), আর জীব যে অপূর্ণ, তা যীশুখৃষ্টের উক্তিতেও প্রকাশ। একস্থলে তিনি তাঁর শিষ্যগণকে বলেছেন, "Be ye perfect as your Father in heaven.

(ঝ) অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ---ব্রহ্মসূত্র

(ঞ) They differ not in essence, in quality, but degree.

[ট] অন্যত্র জীবকে ভগবানের বীজ বলা হয়েছে [মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ বীজং দধাম্যহম্—গীতা ১৪।৪]। এর অর্থ—বীজে যেমন বৃক্ষের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত (এষোঽণিম্ন এবং মহান্ ন্যগ্রোধঃ তিষ্ঠতি—ছান্দোগ্য ৬।১২।২), এবং সেই বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত হ'লে আলোক ও বাতাস পেয়ে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হ'য়ে যেমন এক সময় বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয় (as the light lifts up the acorn to the oak tree's height খ্রীষ্টধর্ম্ম), সেইরূপ জীবে ভগবানের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান, ঐ জীব প্রকৃতির ক্ষেত্রে রোপিত হ'লে (প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্ট হ'লে) আলোক ও অন্ধকার—সুখ ও দুঃখ পেয়ে তার ঐ অব্যক্ত শক্তিগুলি ধীরে ধীরে যখন পূর্ণ

তিনি সৎ, চিৎ আনন্দের পূর্ণ অধিকারী হয়েন [ঠ] ও ভগবানের সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধি ক'রে বৈদিক ঋষির ভাষায় বলেন "সোঽহং," অথবা যীশুখৃষ্টের অমোঘ বাণী উচ্চারণ করেন, "I and my Father are one" অথবা সুফীর বাণীর প্রতিধ্বনি করেন, "অন্-অল্-হক্" অর্থাৎ "সচ্চিদানন্দরূপোঽহং" আমি সচ্চিদানন্দ।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, জীব সর্ব্বাংশেই ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন—দার্শনিক ডুসের ভাষায়, জীব "is in no way different from Brahman. but is very Brahman complete aud entire" অর্থাৎ জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—জীব ভগবান্‌ই—ভগবান্ থেকে ভিন্ন নন।

এখন, ভগবান্‌ই যে জীবরূপে সংসারে অবতরণ করেন, আগামী বারে তার আলোচনা করবো।

বিকশিত হয়, তখন জীব ভগবানে পরিণত হয়। "He is sewn in weakness in older to be raised in power—Biblo (ঠ) ভাবের প্রকাশ শক্তিতে। ভগবানের ঐ তিন ভাবের প্রকাশও ঐ তিন শক্তিতে। সুতরাং শক্তির পূর্ণ বিকাশেই ভাবের পূর্ণ বিকাশ।

সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমান প্রভাব

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি-এইচ্ ডি (লণ্ডন)
এফ-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

স্থানান্তরে সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানদের অনুরাগ, প্রভাব ও দান প্রভৃতি বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এ প্রবন্ধে মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব সময়ে তাঁরই নামাঙ্কিত, এবং নিশ্চয় তাঁরই অনুপ্রাণনায় বিরচিত, "আকবর সাহি-শৃঙ্গারদর্পণ" নামক গ্রন্থবিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এ গ্রন্থের রচয়িতা জৈন কবি পদ্মসুন্দর এবং সম্প্রতি বিকানীর থেকে ইহা প্রকাশিত হয়েছে। প্রতাপরুদ্র-যশোভূষণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থে যেমন অলঙ্কারশাস্ত্র-প্রপঞ্চনক্রমে প্রতাপরুদ্রের স্তুতিবাদ করা হয়েছে, আলোচ্যগ্রন্থেও সেইরূপ রসবর্ণন প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে আকবর সাহের স্তুতিবাদ করা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থ প্রতাপরুদ্রীয়ের অনুকরণে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে রুদ্রটকৃত শৃঙ্গারতিলকের প্রভাব সমধিকভাবে দৃষ্ট হয়। তৎসত্ত্বেও এ গ্রন্থে নূতনত্বের অভাব নাই, স্থলে স্থলে ইহার সৌন্দর্য্য সুপ্রকট।

আকবরসাহি-শৃঙ্গারদর্পণ গ্রন্থের পুঁথি লিখিত হয় ১৬২৬ সংবৎ এ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৫৬৯ সালে(১)। আকবর সাহ ১৫৫৫সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ঐ গ্রন্থ ১৫৫৫-১৫৬৯ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল, সন্দেহ নাই। এ পুঁথি কবির নিজের হাতের লেখা নহে; কেননা, ইহাতেই উল্লিখিত হয়েছে যে ইহা চউহথের পুত্র বীর কর্ত্তৃক আষাঢ়ী কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে আকবরের রাজত্ব সময়ে লিখিত হয়; চন্দ্রকীর্ত্তিপট্ট তখন মানকীর্ত্তি সুরির অধীনে ছিল। এ পুঁথিতে লিখিত আছে যে, আনন্দরায় যেমন বাবর ও হুমায়ুনের প্রিয়পাত্র ছিলেন ও বিশিষ্ট সম্মান অর্জ্জন করেছিলেন, তেমনি পণ্ডিত পদ্মসুন্দরও পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাভূত করে সম্রাট্ আকবর সাহের সম্মান অর্জ্জন করেছিলেন—

মান্যো বাবরভূভুজোঽত্র জয়বাট্ তদ্বৎ হুমাউং নৃপোঽ-
ত্যর্থং প্রীতমনাঃ সুমান্যমকরোদানন্দরায়াভিধম্।
তদ্বৎ সাহি-শিরোমণেরকবরক্ষ্মাপাল-চূড়ামণে-
র্মান্যঃ পণ্ডিতপদ্মসুন্দর ইহাভূৎ পণ্ডিতব্রাতজিৎ॥

এ পুঁথিতেই উল্লিখিত আছে যে, পদ্মসুন্দর সাহিত্য-সভায় সকলকে পরাভূত করায় সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে প্রচুর ধনদৌলত প্রদান করেন। ফলতঃ, আকবরসাহের সভায় যে বত্রিশ জন হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন, তম্মধ্যে পরমিন্দর বা পদ্মসুন্দর অন্যতম ছিলেন। পদ্মসুন্দর কেবল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর প্রাকৃত ভাষায় লিখিত জম্বুস্বামি-কথানক থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি ঐ ভাষায়ও প্রবীণ ছিলেন। অনুপ সংস্কৃত লাইব্রেরীতে পদ্মসুন্দরকৃত আরও গ্রন্থ আছে; যথা, হায়নসুন্দর (নং ৫২৭২-জ্যোতিষ), পরমতব্যবচ্ছেদ—স্যাদ্বাদসুন্দরদ্বাত্রিংশিকা (নং ৯৭৪৬), রাজ-প্রশ্নীয়-নাট্যপদভঞ্জিকা (নং ৯৯৩৬) এবং প্রমাণসুন্দর (নং ৮৪৩২)। এই শেষোক্ত গ্রন্থ দার্শনিক এবং পদ্মসুন্দরের দর্শনশাস্ত্রে প্রবীণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আগরচাঁদ নাহটার (৩) মতে পদ্মসুন্দর সুন্দরপ্রকাশ-শব্দার্ণব নামক অভিধান ও ষড়্‌ভাষাগর্ভিত নেমিস্তব, বরমঙ্গলিকাস্তোত্র এবং ভারতীস্তোত্র রচনা করেন।

কবি গ্রন্থের প্রারম্ভেই আকবরসাহের স্তুতি উপলক্ষ্যে বাবর ও হুমায়ুনেরও গুণকীর্ত্তন করেছেন। হুমায়ুনের গুর্জ্জর, গৌড় প্রভৃতি দেশজয়-মূলক প্রশংসাও এখানে কীর্ত্তিত হয়েছে। (৪)

(১) জৈনগ্রন্থাবলীতে দৃষ্ট হয় যে, কবি পদ্মসুন্দর ১৬১৫ সংবৎ অর্থাৎ ১৫৫৯ সালে রায়মল্লাভ্যুদয় এবং ১৬২৫ সংবৎ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৫৬৯ সালে পার্শ্বনাথচরিত নামক গ্রন্থ রচনা করেন। Ninternitz তাঁর Indian Historyর দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে পার্শ্বনাথ-চরিত্র খ্রীষ্টীয় ১৫৬৫ সালে রচিত হয়।

২। আইন-ই-আকবরি, ৩০ আইন, Blochmann, pp. 537 ff.

৩। Anekenta IV. 470.

৪। বাবরের প্রশংসা—

আসীদুগ্রসমগ্রবংশবিদিতা যা স্বর্ধুনীবামলা
নানাভূপতিরত্নভূরিব পরা জাতিশ্চ সত্তাভিধা।
তস্যাং বাবর-পাদিসাহিরভবন্নির্জিত্য শত্রূন্ বলা-
ড্ডিল্লীমণ্ডলমণ্ডনং সকলভূপালৈর্নিষেব্যক্রমঃ॥২॥

তৎপরে আকবরসাহের সকলকলা-নৈপুণ্য, সর্ববিজয়িত্ব, গুণিপ্রীতি প্রভৃতি সদ্গুণনিচয়ের প্রশংসা লিপিবদ্ধ হয়েছে।(৫)

কবির মতে আকবরসাহকে বিধি সকল রসের আধার স্বরূপেই নির্ম্মাণ করেছিলেন—

শৃঙ্গারী যুবতীজনে যুধি ভটো লোকে কৃপালুঃ স্মিতং
ধত্তে কৌতুকবীক্ষণেঽদ্ভুতবশা ভীকঃ ক্রমাতিক্রমে।
বীভৎসো মৃগয়াসু বৈরিকদনে রৌদ্রোঽথ শক্তো শমী
শ্রীসাহির্বিধিনাঽধুনাপ্যকবরো নানারসৈর্নির্ম্মমে ॥৫॥

আকবরসাহের দণ্ড দৃষ্ট হতো ছত্রে, ভঙ্গ তরঙ্গে, বন্ধ হারে এবং বিগ্রহ কামকেলিতে, মত্ততা ছিল হস্তীতে এবং অক্ষক্রীড়ার সময়েই কেবল লোকেরা 'মার' বলে শব্দ করতো—

দণ্ডশ্ছত্রে যস্য ভঙ্গস্তরঙ্গে
বন্ধো হারে বিগ্রহঃ কামকেলৌ।
মত্তত্বং বা হাস্তিকেঽক্ষত্র নৈবং
সারিষ্বাভূর্মারয়েত্যাদি লোকাঃ ॥ ৬, পৃঃ ২ ॥

সাহিশিরোমণি আকবর সার্থকনামা—যিনি রাজস্ব (পর্য্যন্ত) বিতরণ করে দিতেন, যিনি সদসৎ নীতি বিবেচনে সুচতুর ছিলেন—

যঃ শুল্কং ব্যতরৎ সমুদ্রপরিখাবিস্তারিভূমণ্ডল-
স্বীকারীভূতজনায় কোঽস্তি ভবতোঽন্যো দানশৌণ্ডো নৃপঃ।
নীরক্ষীরবিবেকিনী সদসতোস্তে হংসচঞ্চুর্যথা
নীতিঃ সাহিশিরোমণেরকবর! ত্বং সার্থনামা ধ্রুবম্ ॥৭॥

এই মহামহীয়ান্ সম্রাটের আদেশেই পদ্মসুন্দর অভিনব রসগ্রন্থ আকবরসাহি-শৃঙ্গারদর্পণ রচনা করেন।

মত্বা সর্ব্বং নশ্বরং সর্ব্বলোকং
নিত্যং কর্ত্তুং স্বং যশঃকায়মুচ্চৈঃ।
সোঽয়ং কাব্যং কারয়ামাস সম্রাণ্-
নানাশৃঙ্গারাদিভাবৈ রসাঢ্যম্ ॥ ৮ ॥

এ অকবরসাহি-শৃঙ্গারদর্পণ চার উল্লাসে অর্থাৎ ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিন ভাগ শৃঙ্গাররস-বিষয়ক; চতুর্থ ভাগে অন্য প্রকার রস-সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণন; এ অংশে লেখকের প্রযত্ন শিথিল, রচনাও নিকৃষ্ট। ফলতঃ শৃঙ্গার-গ্রন্থে অন্যান্য রসালোচনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। প্রতিভাগেই শেষাংশে কবি তাঁর আশ্রয়দাতা সম্রাটের প্রশংসা কীর্ত্তন করেছেন। প্রথম উল্লাসের শেষে লিখিত আছে স্বীয়া'র বর্ণনার পরে—

এতাঃ পঙ্কজলোচনাঃ স্মররসক্রীড়াবিনোদাকুলা-
শ্চঞ্চৎকঙ্কণকিঙ্কিণীরণরণন্মঞ্জীর-কোলাহলাঃ।
সভ্রূভঙ্গবিলাসহাস্যসুভগাঃ সদ্ভূষণৈর্ভূষিতা
রেমে সাহি অকব্বরঃ স রসিকালঙ্কারচূড়ামণিঃ ॥১৮॥

দ্বিতীয় উল্লাসের শেষ কবিতাতেও (১৪নং কবিতায়) আকবর সাহের পরনারী-বিমুখতামূলক প্রশংসা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়—

স্বীয়াভির্বরবর্ণিনীভিরনিশং সংভোগসৌখ্যং সদা
কুর্ব্বাণো নখদন্তখণ্ডনবিধৌ চাতুর্য্যচর্য্যাচণঃ।
যস্ত্যাজ পরাঙ্গনানিধুবনং সন্নীতিকীর্তিপ্রিয়ঃ
সোঽয়ং নন্দতু নীতিমানকবরঃ শৃঙ্গারভৃঙ্গারকঃ ॥১৪॥

তৃতীয় উল্লাসের শেষ কবিতাতেও স্বীয় প্রণয়িনীর প্রতিই সম্রাটের পরাসক্তি সূচিত হয়েছে, চরিত্রগৌরবে সম্রাট মহীয়ান—

যঃ প্রেমপ্রথিমানমাকলয়িতুং স্বিদ্বিপ্রয়োগগ্রহং
ভিক্ষাংসুঃ প্রণয়ী নিজপ্রণয়িনীং ভেজে বিযুজ্য স্ফুটম্।
শৃঙ্গারৈকরসামৃতস্তিমিতদীরুদ্ধামধামাদ্ভুতঃ
শ্রীসাহির্জ্জয়তাদসাকবরো ভূপালচূড়ামণিঃ ॥৯২॥

চতুর্থ উল্লাসে অধম হাসের উদাহরণ-ব্যপদেশে কবি সম্রাট্ আকবরের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা'তে সম্রাটের শৌর্য্য-বীর্য্য সমধিক প্রস্ফুট হয়েছে—

গুঞ্জাহারমপাস্য মৌক্তিকলতা কণ্ঠে কৃতা কিংতরাং
ত্যক্ত্বা বর্হিণবর্হমপ্যজমহো কর্ণাবতংসীকৃতম্।
ইত্থং সাহিশিরোমণে অকবর ত্বদ্বৈরিনারীগণঃ
কান্তারে শবরৈর্বিলোক্য নিপতদ্বাষ্পেক্ষণো হস্যতে ॥২৭॥

উত্তম-বীররসের উদাহরণে আকবরসাহের শৌর্য্যবীর্য্যের স্তুতি আরও পরিস্ফুট হয়েছে—

শেষঃ কূর্ম্মযুতো বিভর্ত্তি বসুধাং বিশ্বম্ভরঃ কেশবঃ
শংভুর্ব্রহ্মসহায় এব বিদিতঃ সত্ত্বে নিবদ্ধস্থিতিঃ।
একঃ শূরশিরোমণির্নিজভুজেনৈকেন ধত্তে ভুবং
শ্রীসাহির্জ্জয়তাদসাবকবরঃ খড়্গোগ্রধারাভৃতা ॥৩১॥

ঐ চতুর্থ উল্লাসেই পুনরায় আরভটী রীতির বর্ণনে উদাহরণক্রমে আকবরসাহের বীরত্ব-খ্যাতি সুন্দর প্রকীর্ত্তিত হয়েছে—

নাম্ভোদস্তনিতং দ্বিপং রণরণত্তূর্য্যং ন বিদ্যুল্লতা
তস্যাসির্জলদা ন মেচককচো গম্ভীরঘোষা গজাঃ।
ইত্থং সাহিশিরোমণে অকবর ত্বদ্বৈরিনারীগণো-
হরণ্যে ত্রস্যতি নশ্যতীতি নিগদন্ ধারাধরস্যাগমে ॥৭৯॥

সাত্বতী রীতির বর্ণনক্রমে অকবরসাহের সম্বন্ধে কবি বলছেন—সত্যি সম্রাট অবর্ণনীয়, তাঁর অমল কীর্ত্তিও তদ্বৎ—ইহা তিন জগৎকেই ধবল করেছে, মিত্রের আপাণ্ডু বদনও অরুণাভ এবং শত্রুবদন মসীবর্ণ করেছে—ইহা ফলতঃই অদ্ভুত—

সপ্তত্রীণি জগন্তি পাণ্ডুরয়তি ত্বৎকীর্ত্তিরেষামলা
মিত্রাণামরুণীকরোতি বদনান্যাপাণ্ডুগণ্ডান্যপি।
তচ্চাত্যদ্ভুতমেব যৎ কৃতবতী শ্যামানি তানি দ্বিষাং
শ্রীমৎ সাহিশিরোমণে অকবর ত্বাং বর্ণয়ামঃ কথম্ ॥৮৪॥

হুমায়ুনের বর্ণনা—

তৎপুত্রঃ স্বভুজপ্রতাপতরসা নির্জিত্য যো গৌর্জ্জরং
ভূপং গৌড়মথাম্বুরাশিপরিখাপর্য্যন্তভূমিং গতঃ।
তত্যাজাসিপরিশ্রমং চ পরতো জেয়াদ্যভাবাদসৌ
ক্ষ্মাপালঃ প্রণতক্রমঃ সমভবন্নাম্না হুমায়ুর্নৃপঃ ॥৩॥

(৫) তৎসূনুঃ সকলাঃ কলা নিপুণধীরধ্যৈষ্ট সর্ব্বানরীন্
জিত্বা শূরতয়া নৃপত্বমগমৎ সৌভাগ্য-ভাগ্যাধিকঃ।
যো বিদ্বৎসু চ গায়নেষু কবিষু প্রীতো নির্য়ঙ্গিষথো
শ্রীসাহির্জ্জয়তাদসাবকবরো ভূপালচূড়ামণিঃ ॥৪॥

তাঁর বীর সৈনিকদলের যুদ্ধের সঙ্গে সত্যি বর্ষাকাল তুলনীয়—

খড়্গাব্যগ্রকরোগ্রবীরনিবহৈরুদ্দারিতারিব্রজ-
ক্রট্যৎকণ্ঠবিসন্ধুরস্রবদসৃক্পূরৈঃ প্রবাহায়িতম্।
আসারায়িতমত্র বাণবিসরৈঃ শম্পায়িতং চাসিভিঃ
প্রাবৃট্‌কাল ইবাবভাবকবর ত্বৎসৈন্যশূরাহবঃ ॥৮৫॥

গ্রন্থের শেষে, চতুর্থ উল্লাসের ১০০নং কবিতায়, কবি পদ্মসুন্দর স্বভাবতঃই প্রার্থনা করেছেন—যেন সম্রাট্‌ আকবরসাহ অহর্নিশ তাঁর গ্রন্থের সহায়তায় সুখ প্রাপ্ত হন—

অনেন পদচাতুরীনিয়তনায়িকালক্ষণ-
স্ফুরন্নবরসোল্লসল্লবণিমপ্রবন্ধেন তু।
অনঙ্গরসসঙ্গরপ্রথিতমানমুদ্রাবতীং
প্রসাদয়তু ভামিনীমকবরেশ্বরোঽহর্নিশম্ ॥১০০॥

প্রতি উল্লাসের সর্ব্বশেষস্থ গ্রন্থনামোল্লেখ সময়ে আকবরসাহের নাম সহযোগে স্বকীয় শৃঙ্গারদর্পণের নাম বিবৃত করেছেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রশংসা আকবর সাহের সুশাসনের ও সাম্য-নীতি অনুসৃতির ফল। ফলতঃ, সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান প্রসারের নিমিত্ত মহামতি আকবর অনেক বড় বড় সংস্কৃত কবি, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক, দার্শনিক প্রভৃতির বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অকবরীয়-কালিদাসই অকবরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কবি ছিলেন; এঁর আসল নাম গোবিন্দ ভট্ট। পদ্যবেণী, পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী, সূক্তিসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থে তৎকৃত অকবরের প্রশংসামূলক কতিপয় কবিতা দৃষ্ট হয়। কবি বাণীকণ্ঠাভরণও দিল্লীন্দ্রচূড়ামণির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। মহামতি আকবর ১৫৮২ সালে নকিব খাঁকে মহাভারতের অনুবাদ করতে আদেশ দেন। আবদুল কাদির ও অন্যান্য সুধীবৃন্দ এ অনুবাদে সহায়তা করেন। মহাভারতের মূল পুঁথি ও তার চিত্রণের জন্য আকবর ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করেন। এ-সম্রাটের আদেশক্রমে আবদুল কাদের খ্রীষ্টীয় ১৫৮৫ সালে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৫৮৯ সালে তা' সমাপ্ত করেন। তাঁর আজ্ঞাক্রমে অথর্ববেদের অনুবাদও আবদুল কাদের ও দাক্ষিণাত্যের কোনও মুসলমান পণ্ডিত সুরু করেন। তাঁদের অসমর্থতা হেতু সেখ ফৈজি এবং হাজি ইব্রাহিম সহিন্দী ক্রমান্বয়ে এ অনুবাদের কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁরই সময়ে লীলাবতী, জ্যোতিষ গ্রন্থ তাজক, কাশ্মীরের ইতিহাস, হরিবংশ, পঞ্চতন্ত্র, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা সিংহাসন, গঙ্গাধর, মহেশ-মহানন্দ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়।

সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর, সাহাজান ও যুবরাজ দারা শিকোহ সম্রাট্‌ অকবর সাহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সম্রাট সাজাহানের অন্দরমহলেও সংস্কৃত পণ্ডিতদের বিশেষ আধিপত্য ছিল—পদ্যামৃত-তরঙ্গিণীর কবিতাবিশেষে প্রমাণিত হয়। দারা শিকোহ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-ভাবাপন্ন ছিলেন, ব্রাহ্মণ-পরিবৃত থাকতেন, অঙ্গুরীয়কের উপর সংস্কৃত "প্রভু" শব্দ লিখিয়ে রেখেছিলেন, উপনিষদের অনুবাদে জীবনের দীর্ঘ সময় নিয়োজিত করেছিলেন এবং সংস্কৃতে গ্রন্থপ্রণয়ন করে গেছেন। পণ্ডিতদের নিকটে লিখিত তাঁর সংস্কৃত পত্রাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য বহু মুসলিম নৃপতি এ আদর্শে সমধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বিশিষ্টতর প্রমাণ এর থেকে আর কি হতে পারে?

বন্ধ্যা (গল্প)

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিবাহের দুই তিন বৎসর পর হইতেই সুজাতা শুনিয়া আসিয়াছে, সে বন্ধ্যা। এই জন্য তাহার স্বামীর আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে সহস্র ধিক্কার সে শুনিয়াছে। তাহার পিতামাতাকেও এ জন্য কম দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে সে দেখে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার জন্য তাহার কিছু মাত্র লজ্জা বা দুঃখ নাই।

সুজাতার বিবাহের পর সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহার স্বামীর আত্মীয়-স্বজন সকলেরই ইচ্ছা, তাহার স্বামী অনিলেশ পুনরায় দার-পরিগ্রহ করুক। তাহার শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে জীবনের শেষ কয় বৎসর ছেলেকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অনিলেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে, সে আর কিছুতেই বিবাহ করিবে না। তথাপি ইহার জন্য ঘরে নূতন বৌ আনিবার চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায় নাই। অনিলেশের মাতার মৃত্যুর পর তাহার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনই এই দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়াছেন।

যদি ছোট খাট একটা সংসারে সুজাতার বিবাহ হইত, তাহা হইলে হয়তো এত চেষ্টা হইত না। কিন্তু যে-সংসারে সুজাতা পড়িয়াছে, তাহা বহুকালের প্রাচীন জমিদার বংশ। অনিলেশের পূর্ব্বপুরুষগণ যে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পরিমাপ করাও নাকি দুঃসাধ্য। এই বংশের প্রভাব প্রতিপত্তিরও অন্ত নাই। এত বড় একটা সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন বংশ যে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে, ইহা মানিয়া লইতে কেহই প্রস্তুত নয়। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, এ-বিষয়ে চেষ্টা কখনই বন্ধ করা হইবে না। চেষ্টা চলিতে থাকিলে একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অনিলেশকে রাজি করা যাইবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।

এই সকল ব্যাপারে সুজাতার ননদ বিভাই সকলের অগ্রণী। তাহার বাড়ির অনতিদূরেই বিভার বিবাহ হইয়াছে। সুজাতার কাছে থাকিয়া সর্ব্বদাই বিভা তাহার দাদাকে বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

বিভার কোন চক্ষুলজ্জা নাই। সুজাতার সম্মুখেই বিভা তাহার স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে বলে। সুজাতাকেও সে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু সুজাতা রাগ করে না। অনুরোধ শুনিয়া সে হাসে। তাহার পর কখন হয়তো বলে, বেশ

তো ভাই, করাও না তোমার দাদাকে বিয়ে। আমার আপত্তি কি সব?

বিভা এই উত্তরে রাগিয়া যায়। সে বলে, তোমার আপত্তিই তো সব। দাদার কি আর নিজের ব্যক্তিত্ব আছে কিছু? দাদাকে যে তুক করেছ তুমি!

সুজাতা উত্তর করে না। তাহার মুখখানা হঠাৎ বিমর্ষ হইয়া যায়। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত তাহার মুখখানা আবার উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হইয়া উঠে।

অনিলেশও এই সকল কথায় খুব কম উত্তর দেয়। পূর্ব্বে সে সুজাতার চিকিৎসার কথা বলিত। কিন্তু এখন সে আর তাহা বলে না। প্রথম প্রথম সুজাতার নাকি অনেক চিকিৎসা হইয়াছে। অনিলেশ একবার তাহাকে কলিকাতা নিয়ে তিন মাস চিকিৎসা করাইয়াছিল। কিন্তু বাড়ির ঝি চাকরেরা সুজাতাকে কোন দিন ঔষধ খাইতে দেখে নাই। বরং কলিকাতা থাকিতে এবং কলিকাতা হইতে ফিরিয়াও অনিলেশই তাহার অজীর্ণ রোগের জন্য দীর্ঘ দিন ঔষধ খাইয়াছে। কিন্তু সুজাতা কোন দিন ঔষধ খায় না। লোকে বলে, ডাক্তারেরা তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহার আর সন্তান হইবে না। সুতরাং ঔষধ খাইয়া সে কি করিবে?

সুজাতা যখন এই সংসারে প্রথম আসিয়াছিল, তখন সে ম্যাট্রিক পাশ করে নাই। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই হঠাৎ তাহার পড়াশুনায় আশ্চর্য্য মনোযোগ আরম্ভ হয়। তাহার পর সে ম্যাট্রিক, আই-এ ও বি-এ পাশ করিয়াছে এবং তাহারো পর চেষ্টা করিয়া এবং অসম্ভব খাটিয়া এই সহরে সে একটা উচ্চ ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ঐ-স্কুলের কাজ নিয়াই অধিকাংশ সময় সে থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনে তাহার এই সাধনা এবং সামাজিক জীবনে এই জনসেবামূলক কার্য্যের জন্য সহরের সকলের কাছে সুজাতা অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। স্কুলের মেয়েরা এবং তাহার অধীনস্থ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে করে। কিন্তু নিজের বাড়িতে কেহ তাহাকে ভাল বলে না। তাহার স্বামীর আত্মীয়-স্বজন বলে, সন্তান যখন হবে না, একটা নিয়ে থাকা চাই তো! সুজাতা লেখা পড়া নিয়ে আছে।

সুজাতার সহস্র গুণ থাকিতে পারে। কিন্তু এক স্বামী ব্যতীত বাড়ীর কোন লোকের তাহা চোখে পড়ে না। তাহার যে সন্তান হইবে না, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেহই ক্ষমা করিতে পারে না। দীর্ঘ সাত বৎসরে সুজাতা এ-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, এখনো অব্যাহত ভাবে তাহার স্বামীর বিবাহের চেষ্টা চলে।

গত বৎসর পূজার সময়ই এই সম্বন্ধে শেষ জোর চেষ্টা হইয়াছে। প্রতি বৎসর পূজার সময় অনিলেশের সকল বোনদের পূজা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। ইহা এই সংসারের চিরাচরিত রীতি। প্রতি বৎসর দুই একটি বোন আসেনও। কিন্তু গত বৎসর দৈবাৎ তাহার সকল বোন ও ভগ্নীপতিরা তাহাদের বাড়ী আসিয়া একত্র হন। বিভা এই সময় সকলের উপস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।

সে একদিন সকলকে একত্র করিয়া অনিলেশ ও সুজাতার উপর চাপ দেয় যে, তাহাদিগের পুরাতন প্রস্তাবে আজ তাহাদিগকে সম্মতি দিতে হইবে। এই জন্য বিশেষ করিয়া সুজাতাকেই অনুরোধ করা হয়।

বিভার অনুরোধ বা উত্তেজনায় তাহার বড়দিদিই কথাটা প্রথম উত্থাপন করেন। তাহার পর অন্যান্য সকলে আলোচনা আরম্ভ করে। অনিলেশের বিদেশাগত বোনেরাই বিশেষভাবে অনুরোধ ও উপরোধ আরম্ভ করেন। বিভার ধারণা ছিল এতগুলি লোকের অনুরোধ কখনই উহারা উপেক্ষা করিতে পারিবে না। অনিলেশ সত্য সত্যই খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। বিভা খুব আশান্বিত হইয়া উঠে। কিন্তু সুজাতাই সব উলট পালট করিয়া দেয়। এই দীর্ঘ সাত বৎসর এই সব আলোচনায় সে কখনো যোগ দেয় নাই। আজ সে প্রথম কথা বলে। সে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া বলে যে, সে গাছতলার সন্ন্যাসী নয়। সংসারের আর পাঁচজনের মতই সে মানুষ। পৃথিবীতে কোন নারী যে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে না, তাহা করিতে সেও অক্ষম। সে খুব হীন ও স্বার্থপর, এই কথা জেনেই যেন তাঁহারা তাহাকে ক্ষমা করেন।

ইহার পর আর কথা চলে না। সুজাতার এই কথায় তাহার উপর সকলেই অশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। অনিলেশের বাড়ির যে দুই একজন সুজাতাকে একটু শ্রদ্ধা করিতেন, সুজাতার এই স্পষ্ট উত্তর শুনিয়া তাঁহারাও তাহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে সুজাতাকে কিছুতেই ঘৃণা করা যায় না। অন্ততঃ তাহাকে স্বার্থপর মনে করা একান্তই অসম্ভব। স্বামী-সেবা ও সাংসারিক কাজকর্ম্ম বাদে যে-সময়টা সুজাতা পায়, তাহা গার্ল স্কুলের জন্যই সে ব্যয় করে। প্রত্যেক দিন সুজাতা স্কুলে যায়। সে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন পড়ায়। তাহা ব্যতীত ক্লাশের পাশ দিয়া ঘুরিয়া সে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে কে কি রকম ভাবে পড়াইতেছে।

কিন্তু এ-সব কাজে সুজাতার মন অল্পে সন্তুষ্ট হইবারও নয়। তাহার স্বামীর অগাধ অর্থ কি-ভাবে সে জনসেবায় নিয়োগ করিবে, অনুক্ষণ সে তাহাই ভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোন ভাল একটা প্রতিষ্ঠানে এক সঙ্গে বহু টাকা দিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু সেই কল্পনায় সে তৃপ্তি পায় না। সে নিজে কিছু করিতে চায়। সে নিজে কাজের ভিতর থাকিতে চায়।

অনিলেশকে লইয়া সে অনেক প্লান করে। অনিলেশ বি, এ পাশ করিয়া এককালে কিছুদিন ল পড়িয়াছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর জন্য তাহার বিদেশে থাকা সম্ভব হয় নাই। এখন নিজের জমিদারি দেখিয়া বাহিরের কোন কাজ করিবার তাহার সময় থাকে না। কিন্তু সুজাতা একদিন প্রস্তাব করিল, সে সহরে একটা মেয়েদের কলেজ গড়িয়া তুলিবে এবং এই জন্য অনিলেশকে তাহার সঙ্গে খাটিতে হইবে।

অনিলেশের নিজের শরীর ভাল নয়। তাহা ছাড়া এ-সব কাজে পূর্ব্বে তাহার নিজের কখনো তেমন উৎসাহ ছিল না। সুজাতার নিকট হইতে হালে সে এই উৎসাহ লাভ করিয়াছে। কোন ব্যাপারেই অনিলেশ সুজাতার কথায় আপত্তি করে না সে বুঝিল, এ ব্যাপারেও আপত্তি করা চলিবে না। সুজাতা যাহা বলিবে, তাহা সে করিয়াই ছাড়িবে। তথাপি একটা কলেজ গড়িয়া তোলা সহজ ব্যাপার নয়। সে তৎক্ষণাৎই একটা উত্তর দিতে পারিল না। একটা জরুরী কাজে তাহাকে মফঃস্বল যাইতে হইবে। পরে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে বলিয়া সে মফঃস্বল চলিয়া গেল।

কতগুলি টাকা পাইবার আশা মাত্রই ছিল না। অনিলেশ মফঃস্বল যাইয়া একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ টাকাগুলি পাইয়া গেল এবং অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে সে বাড়ী ফিরিল।

কিন্তু মফঃস্বল হইতে বাড়ী ফিরিয়াই সে দেখিল, তাহার বাড়ী হইতে একজন ডাক্তার বাহির হইতেছেন। সে উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার?

ডাক্তার বাবু কহিলেন, আপনার কাছে তো খবর দিতে লোক গেছে। খবর পাননি বুঝি?

না, কিছু খবর পাইনি তো! কি হয়েছে?

আপনার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। কলেরারই সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

অনিলেশ তাড়াতাড়ি করিয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, সুজাতা অচৈতন্যাবস্থায় শয্যার উপরে পড়িয়া আছে। তাহার শয্যাপার্শ্বে বিভা উপবিষ্ট!

অনিলেশ ঘরে ঢুকিতেই বিভা কাঁদিয়া কহিল, দাদা, বৌদি বুঝি বাঁচবেন না। একটুও জ্ঞান নাই এখন।

অনিলেশ সত্য সত্যই যেন পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হারাইল না। সে সহরের বড় বড় সব কয়জন ডাক্তার ডাকিয়া স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। একজন ডাক্তারকে অনেক টাকা দিয়া সর্ব্বক্ষণের জন্য বাড়ী রাখিয়া দিল। কিন্তু রোগীর কোন উন্নতি দেখা গেল না।

বিভা তাহার বৌদির জন্য অসম্ভব পরিশ্রম করিতেছিল। সুজাতার সেবার জন্য দুইজন নার্স নিযুক্ত করা হইয়াছে। তথাপি প্রায় সর্ব্বদাই বিভা সুজাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। এমন কি রাত্রে পর্য্যন্ত ঘুমাইল না।

সমস্ত দিন সুজাতার অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় কাটিয়া গেল। কখন ডাকিলে সাড়া দেয়, কখন সাড়া দেয় না। কিন্তু মধ্য রাত্রে বিভা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সুজাতার জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া সে আশা করিবার মত কিছুই পাইল না। সে দেখিল, দীপ-নির্ব্বাণের পূর্ব্বে বাতি একবার উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বিভা তাহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু সুজাতা নিজেই বলিল, তুমি না ঘুমিয়ে ব'সে আছ ঠাকুরঝি!

বিভা কাঁদিয়া কহিল, তুমি সেরে উঠ বৌদি। কয় রাত্রি জাগলে আর আমার কি হবে!

সুজাতা কহিল, আমি আর সেরে উঠবো না ঠাকুরঝি। নিজের অবস্থা কি আর আমি নিজে বুঝি না!

বিভা উত্তর করিল না। চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ একটা কথা মনে হইতেই সে কহিল, বৌদি, যদি তুমি বাঁচবেই না, তবে একটা কথা এখন তোমাকে বলি। এখন দাদাকে ব'লে যাওনা তুমি, বিয়ে করতে। তুমি না ব'লে গেলে, কখনই হয়তো দাদা বিয়ে করবেন না।

সুজাতা ক্ষণকাল নীরব রহিল। তারপর কহিল, তা আমি ব'লে যেতে পারবো না ঠাকুরঝি।

বিভা বিস্মিত হইয়া কহিল, এখনো না! যদি তুমি নাই বাঁচ, কি আপত্তি থাকতে পারে তোমার?

আপত্তি আছে। সে-আপত্তির কথা জীবনে কাউকে বলি নাই। আজ তোমাকে বলবো, যদি তুমি আর কাউকে না বল।

তা বল, কাউকে আমি বলবো না।

সুজাতা কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, ঠাকুরঝি, চিরকাল এই অপবাদ নিয়ে গেলাম যে, আমিই বন্ধ্যা। কিন্তু বন্ধ্যা আমি নই। সত্যকার রুগ্ন তোমার দাদা। এইজন্যই তোমাদের শত অনুরোধ আমি কাণে তুলি নি। আমি যে-ভাবে জীবন কাটিয়ে গেলাম, তুমি কি চাও আর কোন অভাগিনী, এ-ভাবে জীবন কাটাক?

বিভা অবাক হইয়া তাহার বৌদির দিকে একবার চাহিল। তাহার পর তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যখন বিভা উঠিল, তখন সে দেখিল, বাতি নিবিয়া গিয়াছে।

স্মরণ*

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

ভৌতিক জগতে শাদাচোখে দূরের জিনিস ছোট দেখায়। মনোজগতে তার উল্টা, সেখানে ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভাব কল্পনা পোষাইয়া লয়। কল্পনা বলিয়াই যে তাহা মিথ্যাচার এমত বলা ভুল। অতিশয় দার্শনিক না হইয়াও একথা বোঝা শক্ত নয় যে সাক্ষাৎ জানাজানির মধ্যেও অনেকখানিই কল্পনা, বরং বিকৃত কল্পনা। মহৎকে ঠিক ঠিক চিনিতে বুঝিতে হইলে দূরত্বের, অবকাশের প্রয়োজন আছে। কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে যোজন-বিস্তৃত ভূধরের আয়তন ঠিক ঠিক ঠাহর হয় না। মহতের সঙ্গে যাহাদের রক্তসম্পর্ক বা অনুরূপ যুক্তি নিরপেক্ষ প্রীতির সম্পর্ক আছে প্রাত্যহিক সাহচর্য্যের ফলে তাহাদের মমত্ববোধ দৃঢ় হয় বটে। যাদের সঙ্গে এই রকম ভালবাসার বন্ধন নাই, সেই শ্রেণীর নিকটচারীদের নিকট মানবসুলভ দোষ ত্রুটীগুলিই বড় হইয়া দেখা দেয়, এদের বেলায় familiarity broods contempt. কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পরিণাম প্রায় একই প্রকার: মাহাত্ম্যবোধের অভাব। যাঁহারা রামানন্দ বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই, এই কথা স্মরণ রাখিলে তাঁহাদের ক্ষোভ দূর হইবে। তাঁহাদের মধ্যে সমধিক ভাগ্যবান সেই ব্যক্তিরা, যাহারা ক্ষণেকের জন্য চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করিয়াছেন; কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে মুহূর্তকালের মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন; কিন্তু সান্নিধ্য এত অল্পক্ষণের জন্য ছিল যে কল্পনার মহিমামণ্ডল (halo) ঘনিষ্ঠতার দিবালোকে ম্লান হইতে পায় নাই। এইত ভাল। তাদের স্বপ্নও রহিল, সত্যও রহিল। বাস্তবের স্পর্শ মহতের মনোময় মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারই করিয়াছে, সুলভ সাধারণতায় নামাইয়া আনে নাই।

নিজেদের সম্বন্ধে যাঁহাদের মাত্রা জ্ঞান আছে, তাঁহারা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান উপলক্ষ্যেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আশ্রয় লইতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন, কারণ স্মৃতিকথায় পাকে-প্রকারে অল্পাধিক আত্ম-ঘোষণা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তবে একটি বাঁচোয়া এই যে খ্যাতনামা লেখকদের আত্মঘোষণাই অধিক দৃষ্টিকটু হয়। চুনো-পুঁটির অহংকে কেহ গ্রাহ্যই করিবে না। এই একটা মস্ত সুবিধা। তার চেয়েও অধিক আশ্বাসের কথা এই যে আমরা স্মৃতিকথার পরিমাণ অল্প হইতেও অল্প—আমার কতকগুলি সবব ভাবনার আশ্রয় ভূমি মাত্র। তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিত। তবু এই জন্য করিতেছি যে, যাহারা খুব বেশী পাইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না, অতিশয় গতানুগতিক জীবনে অসাধারণের ক্ষণিক আবির্ভাব কি প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করে। একটি মুহূর্ত অগণিত দিনক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে—উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরের মত আশেপাশের নিম্নভূমি হইতে মাথা উঁচু করিয়া জাগিয়া থাকে। জীবনপথে চলিতে চলিতে যতদূর চলিয়া যাও বারেক পিছন ফিরিয়া তাকাইলেই সেই অভ্রংলেহী, গিরিচূড়া তৎক্ষণাৎ চোখে পড়িবে।

দুই বৎসর আগের কথা। রামানন্দ বাবু বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে দেরাদুন আসিয়াছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত বাঙলা-বিদ্যামন্দিরের স্থাপয়িতা ও পরিচালক অধুনা কারারুদ্ধ শ্রীযুক্ত শঙ্কর মিত্র যেন-বাতাসে বার্ত্তা পাইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই তক্কে তক্কে ফিরিতে-ছিলেন। এখন নিজের অপোগণ্ড দলটি লইয়া একেবারে ষ্টেশনেই হানা দিলেন ও "শনিবারের চিঠি"—পরিবেশিত মাসিক খাদ্যেপুষ্ট বুদ্ধিমানদের শিরঃকম্পন ব্যর্থ করিয়া, রামানন্দ বাবুর নিকট হইতে স্কুল পরিদর্শনের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া বিজয়ী বীরের মত ফিরিয়া আসিলেন।

চারিদিকে আগাছার জঙ্গল, পোড়ো বাড়ী; মাঝখানে অতিশয় ছন্নছাড়া এক স্কুল। লোকের গোয়াল ঘরও এর চেয়ে ভাল। দেখি-লেই মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠে, নাসিকা নিজ হইতেই কুঞ্চিত হইয়া যায়। সেই এঁদো গলিতে, জুড়ী গাড়ীর দাপটে পাড়া কাঁপাইয়া, আমরা বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিকে লইয়া আসিলাম। যাঁহারা কোন কালে বিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় পা দিতেন না, রামানন্দবাবুর কল্যাণে আজ তাঁহারাও ভীড় করিয়া আসিলেন। নিরানন্দ প্রতিবেশের মধ্যে উৎসব লাগিয়া গেল। আমাদের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দনের উত্তর দু'কথায় সারিয়া রামানন্দবাবু অনেকক্ষণ ছোট ছেলেমেয়েদের, তাহাদের উপযোগী ভাষায় উপদেশ দিলেন। বিদায় কালে বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস জানাইবার সময় যখন বিবিধ বাধা বিরোধের উল্লেখ হইল, তখন রামানন্দবাবু উদ্যোক্তাদের বলিলেন—"পাড়াগাঁয়ে বুড়ীরা বলেন, লুকিয়ে থেলে শুকিয়ে যায়। জ্বর-জাড়ি হলে, তক্ষুণি হৈ-চৈ করে ওষুধ পথ্যির হাট না বসিয়ে রোগটাকেই আগে অগ্রাহ্য করতে হয়। আমল যদি না দাও, এমনিতেই রোগ পালাবে। ঝগড়াবিবাদের বেলায়ও তাই। অগ্রাহ্য কর—দেখবে অমনিতেই তার শিকড় আলগা হয়ে আসছে।"

তুচ্ছ উপদেশ, তুচ্ছতর উপলক্ষ্য! উত্তম উপদেশ অনুক্ষণ অজস্রধারে আমাদের শিরে বর্ষিত হইতেছে কিন্তু মনোভূমি আর উর্ব্বর হয় না। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরের দৃঢ় প্রতীতি, শান্ত সমাহিত দৃষ্টি, সেই উৎসব প্রভাতের অসাধারণতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, শ্রান্ত ভগ্নোদ্যম কর্ম্মীর মনে এমন বিদ্যুৎসঞ্চার করিল যে তিনি আগেরই মত প্রায় একাকী, দ্বিগুণবলে বাধাবিপত্তি ঠেলিতে লাগিলেন এবং কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অন্তর্হিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম লইবার নাম করিলেন না।

শান্ত মুখশ্রীর কথায় মনে পড়িল। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ দেখিতে সুন্দর হয়, ইহা শুধু রবীন্দ্রনাথের বেলায়ই জানিতাম। আমার অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত রামানন্দবাবু। বোধহয় 'প্রবাসী' প্রকাশের ত্রিংশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার কতকগুলি নানাবয়সের ছবি পাশাপাশি মুদ্রিত দেখিতে পাই। তখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, যৌবনের চেহারা অপেক্ষা তাঁহার বার্দ্ধক্যের চেহারা অনেক বেশী আকর্ষক। কিন্তু বিজ্ঞান-জ্ঞানের আধিক্যবশতঃ ভাবিয়াছিলাম, হয়ত ফোটোগ্রাফীর ভেলকী হইবে। বহুবর্ষ পরে যখন চাক্ষুষ দেখিলাম, তখন 'চক্ষু-চক্ষুর' বিবাদভঞ্জন হইল। তখন সত্যই দেখিলাম যৌবনের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, চোখের অন্তর্ভেদী

---

* রামানন্দ বাবুর দেহান্তের অব্যবহিত পরে লিখিত ও প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের পরবর্ত্তী অর্থাৎ একবিংশ অধিবেশনে পঠিত।

দৃষ্টি বার্দ্ধক্যের ক্ষমা স্নেহে অতিশয় কোমল হইয়া আসিয়াছে। অথচ তখন তিনি বহুদিন হইতে ব্যাধিজর্জ্জর—পরপারের দিকে পা বাড়াইয়াছেন। দৃঢ়নিষ্ঠ লোকের চোখেমুখে যে কঠিনতা কল্পনা করিতাম, তাহার লেশমাত্র দেখিতে পাইলাম না। চরিত্রের দৃঢ়তা কিন্তু আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার কথা পরে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। এই নিয়া তাঁহাকে শ্লেষও কম সহিতে হয় নাই। কিন্তু বাংলা দেশে যেমনই হৌক, অবাঙালীরা রামানন্দ বাবুর নিকট রবীন্দ্রনাথের ঋণের কথা পূর্ণ-ভাবেই স্বীকার করেন দেখিয়াছি। হিন্দুস্থান টাইমসে রামানন্দ বাবুর দেহান্তে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হয়, তাহা স্বল্পায়তন; কিন্তু এরই মধ্যে লেখক রবীন্দ্র-রামানন্দ সৌহার্দ্যের কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। ইহা অবশ্য সত্য কথা যে রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভা চিরকাল ভস্মাচ্ছাদিত থাকিত না। কিন্তু তাহাতে উপলক্ষ্যের মাহাত্ম্য কমে না। রবীন্দ্রপ্রতিভাকে পাশ্চাত্ত্য দেশে পরিচিত করিবার কৃতিত্ব তাঁহারই ষোল আনা প্রাপ্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহা স্বীকার করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ কালে চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া লোকে রামানন্দ বাবুকে রবীন্দ্রনাথ মনে করিত; কবি তাহার সকৌতুক উল্লেখ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। এখানে রামানন্দবাবু যখন আসেন, তাহার পনর দিন পরেই কবি মহাপ্রয়াণ করেন। সমগ্র ভারতে তখন যে উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছিল, জন্মান্তর সুহৃদের অন্তরে যে তাহা গাঢ়তম হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি! বহু অনুরোধ উপরোধে তিনি টাউনহলে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন—পূর্ব্ব-প্রকাশিত একটি ইংরেজী রবীন্দ্র-প্রশস্তি পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। কিন্তু আমরা ঘরে সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়াও বিশেষ কিছু বলাইতে পারি নাই। কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িতেন। সাহিত্যক্ষেত্রে আর এক বন্ধুত্ব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে;—বঙ্কিম দীনবন্ধুর সখ্য। আমি তুলনার খুঁটিনাটিতে না গিয়া শুধু সৌহার্দ্যের কথাই স্মরণ করিতেছি। দীনবন্ধুর দেহান্তে বঙ্কিম দীর্ঘকাল চুপচাপ ছিলেন—অনেকদিন গত হইলে পর বঙ্গদর্শনে কিছু লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবিয়োগে রামানন্দবাবু এমন প্রকাশ্য নীরবতা অবলম্বন করেন নাই;—সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অনুকরণ না করা ভালই হইয়াছে। করিলে নেহাৎ নাটুকে মনে হইতে পারিত। কিন্তু সভাসমিতিতে পত্রিকাদিতে যেমনই হৌক, ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় এ বিষয়ে বোধহয় মৌনই থাকিতেন। অন্ততঃ এখানে আমরা সেই রকম পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলাম।

প্রথমযৌবনে যে অমৃত-প্রবাহ হৃদয়ের গোমুখী হইতে উৎসারিত হইয়াছিল, দীর্ঘ অর্দ্ধ-শতাব্দী নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া, নানা গিরিনদী-কান্তার পার হইয়া সেই প্রেমস্রোতস্বিনী আজ মৃত্যুসাগরসঙ্গমে গিয়া মিশিয়াছে।

কার্লাইল প্রতিভার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজন স্বীকৃত নহে। প্রতিভার প্রমাণ নূতন-সৃষ্টি। অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে Infinite pains এর খুব বেশী মূল্য নাই। সাহিত্যিক প্রতিভা এক হিসাবে জন্মগতই বলা চলে। সেই দিক্ দিয়া দেখিলে রামানন্দবাবুকে প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবী বলিতে পারি না। তবে, J. S, Eliot এর কথায়, Mental gifts are possible without genius. এবং সেই মানসিক সম্পদে তিনি, নিজের ক্ষেত্রে সমসাময়িকদের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। সমগ্র ভারতে স্বর্গত সি-ওয়াই-চিন্তামণি ছাড়া তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। আর চিন্তামণি ত শুধু ইংরেজীরই কারবারী। রামানন্দবাবু সব্যসাচীর মত যুগপৎ দুই আয়ুধ চালাইতেন। তা ছাড়া, নিরন্তর অনন্যচিত্তে একই জিনিষে লাগিয়া থাকিবার ফলে তিনি কার্লাইল-কথিত পরিশ্রম-লভ্য প্রতিভার অধিকারীও হইয়াছিলেন। আজ আমরা সকল সর্ব্ব-ভারতীয় বিষয়েই অপাংক্তেয় হইয়া পড়িতেছি। রবীন্দ্রনাথের পর রামানন্দবাবুকে হারাইয়া আন্তর-প্রাদেশিক জ্ঞানী-গুণীর সভায় আরো রিক্ত হইয়া পড়িলাম।

প্রতিভাশালী লেখকদের ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁহাদের লেখার ধরণ বা ষ্টাইলে পড়ে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত লোক ব্যাকরণ-সঙ্গত শুদ্ধভাষা লিখিতে পারেন কিন্তু তাহাতে এমন কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকেনা, যাহার বলে নাম না দেখিয়া বলিতে পারা যায়, ইহা অমুকের রচনা। সেইজন্য বিদ্যাবুদ্ধি ও লেখকের শক্তির পরিমাপ করিতে এই রকম একটা পরীক্ষণও আজকাল প্রচলিত হইতেছে যে, পঁচিশজন লেখকের লেখা মিলাইয়া দিলে শুধু ভঙ্গী দেখিয়া লেখক চিনিতে হইবে। খুব তীক্ষ্ণদর্শী লোকও ইহাতে ভুল করেন। কারণ শুধু এই নয় যে তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি বা বিশ্লেষণ-শক্তির অভাব। তাও থাকা সম্ভব; তবে অনেকক্ষেত্রে আসল ব্যাপার এই যে লোক চিনিবার মত কোন মনোবৈভব লেখায় প্রতিবিম্বিত হয় না। এমনিতে ত সকলেরই সর্ব্ববিষয়ে স্বকীয়তা থাকে, কিন্তু Style is the Man,—ইহা শুধু বিশেষ শক্তিধর লেখকের ক্ষেত্রেই খাটে। আমার বারবার এই কথা মনে হইয়াছে যে রামানন্দবাবুর লেখা লক্ষ লোকের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দিলেও চিনিতে পারা যাইবে। সৃজনী প্রতিভার যিনি অধিকারী নন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব কতটুকু প্রখর হইলে লেখার ভঙ্গী এইরূপ স্বমহিমা অর্জ্জন করে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইতে হয়। আর শুধু বাংলায়ই নয়, ইংরেজীতেও তাঁহার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলা "বিবিধ প্রসঙ্গ" হইতে ইংরেজী মডার্ণ রিভিয়ুর 'নোট্স্' কম প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। গান্ধী-নেহেরু প্রমুখ জন তিনেক লোককে বাদ দিলে, ষ্টাইলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিচারে সাংবাদিকজগতে ইংরেজীভাষায় রামানন্দ বাবুরই স্থান সর্ব্বাগ্রে। তাঁহার তিরোধানের পর আর একটি মাত্র ইংরেজী লেখক ভারতবাসী রাজনীতিক্ষেত্রে রহিলেন—যিনি প্রতিভার অধিকারী না হইয়াও ষ্টাইলের অধিকারী; আমি মাদ্রাজের রাজাগোপালাচারীর কথা বলিতেছি। রামানন্দবাবুর ইংরেজী বাংলা রচনার বৈশিষ্ট্য: প্রসাদগুণ, সংযম, শুচিতা, গাম্ভীর্য্য (perspicuity restrairt, purity, dignity).।

চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রসঙ্গে বহুকথা ভাবিবার আছে। মানুষের হৃদয় সাধারণতঃ একনিষ্ঠ। শিক্ষাসংস্কার, প্রকৃতি ও প্রতিবেশের মিলিত প্রভাবে হৃদয় একজায়গায় আটকাইয়া যায়। জীবনের

সর্ব্ববিভাগে এই নিয়ম। একবার একজায়গায় নোঙ্গর পড়িলে সহস্র প্রতিকূলতায় ও হৃদয় আর স্থানচ্যুত হয় না। ইহা শুধু স্বাভাবিক নহে, প্রয়োজনীয়ও বটে। চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া একজায়গায় ত বিশ্রাম লইতেই হইবে। সেই বিশ্রামস্থলটি আমরা স্ব স্ব রুচি সংস্কার প্রভৃতির অনুরূপ করিয়া নির্ব্বাচন করি। অন্য কথায়, এইসব কারণ আমাদের অজ্ঞাতে কাজ করিয়া আমাদিগকে কোন এক জায়গায় বাঁধিয়া ফেলে। মূলে ইহা যুক্তি-নিরপেক্ষ ব্যাপার। এইভাবে সকলেরই একটা নিজস্ব "কোট" আছে। তাহার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতাকে 'স্ব-দম্মনিষ্ঠা' নাম দিব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকে যুক্তি তর্ক দিয়া নিজের এই জিনিষটাকে ভাল প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে নানা তুলনামূলক আলোচনা আসিয়া পড়ে। ফলে স্ব-দম্মনিষ্ঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরধর্ম্মদ্বেষের কারণ হয়। যে ধর্ম্ম যত বেশী উদার ও যুক্তিসহ, তাহার প্রচার (Propaganda) তত কম। আমার ত মনে হয়, এই জন্যই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্ম্মই কোথাও প্রচারক পাঠায় নাই। বিবেকানন্দ স্বামী একবার বলিয়াছিলেন, প্রচার বন্ধ হওয়াতেই হিন্দুধর্ম্মের সজীবতা নষ্ট হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে কোনকালেই প্রচার ব্যবস্থা ছিল কিনা জানি না। যদি ছিল, তবে তাহা সঙ্কীর্ণতার যুগেই ছিল। বুদ্ধির সম্প্রসারণ যেমন যেমন হইতে থাকে, অপরের ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পেয়ারের ধর্ম্মেরও এত দোষ চোখে পড়িতে আরম্ভ করে যে একেবারে অন্ধ না হইয়া পড়া পর্য্যন্ত আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঢাক পিটাইবার ইচ্ছা থাকে না। অন্যকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা মাত্রই অনুদারতার পরিচায়ক। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দুনো পাল্লা ভারী। আজকাল ত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের যুগ। কিন্তু আত্ম-প্রচারেরও যুগ বটে। তাই এই দুই বিপরীত মনোভাবের একত্র সমাবেশের ফলে সমন্বয়ের ঢক্কা-নিনাদের সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়াই পরধর্ম্ম-বিদ্বেষের তীক্ষ্ণ ক্লারিওনেট বাজিতেছে। কনসার্ট জমে মন্দ নয়!

আমি শুধু ধর্ম্মের নাম নিয়াছি বটে, কিন্তু এই ব্যাপার জীবনের সর্ব্বত্র—সমাজে, রাষ্ট্রে যোগে যাগে, ভোগে।

আমার কথার অর্থ এই নয় যে নিজের জিনিষের প্রতি নিষ্ঠা থাকিবে না। নিষ্ঠা না থাকিয়া পারে না। অন্যথায় সদাগতিশীল জীবন-প্রবাহ থমকিয়া দাঁড়াইত, সকল রকমের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইত। যাহার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে, সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ, সে হয় সন্ন্যাসী,—'সর্ব্বসঙ্কল্পসংত্যাগী'। কিন্তু সে লক্ষে দু একজন। ঘুড়ি লক্ষের দু একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ী।

আত্মখ্যাপনের যুগ বটে, তবে বুদ্ধির প্রসার কম হইতেছে না। তারই ফলে অন্ততঃ মৌখিক পরমতসহিষ্ণুতার দর্শন পাই। ভারতে না হয় প্রকৃত উদারতা চিরকালই ছিল; অন্যত্র ছিল না। আজকাল কিন্তু সর্ব্বত্র religious tolerationএর জয় জয়কার। এমন যে ইসলাম তাহার প্রচারকগণও যুক্তি প্রমাণ শাস্ত্রবচন দিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে ইসলাম অন্য ধর্ম্মকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে না। যেভাবে এখন বুদ্ধি-নির্ভরতা বাড়িতেছে, কালে হয়ত অন্যকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা অন্তর্হিত হইবে।

তবে এখনও সেই স্বর্ণযুগের দেরী আছে। আমরা এখনও নিজের কোলেই ঝোল টানিতেছি—যদিও মুখে উদারতা, সহানুভূতির বুলি আওড়াই।

রামানন্দবাবু একাধিকবার ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিয়াছেন। নিজেরটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা মানেই অন্যটিকে হীন মনে করা। বড়জোর একরকম কৃপামিশ্রিত উদারতা condescension দেখানো যাইতে পারে। তার বেশী হয় না। এই মনোভাব অন্য "কোটে"র লোকদের মনে অনাবিল প্রীতির সঞ্চার করে না, তাহা নিশ্চয়। ইহা একরকমের অবজ্ঞাই বটে। এ ছাড়া রামানন্দবাবু নানারকম যুক্তি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যেভাবে বিরাট পুরুষ রাজা রামমোহনকে মহাপুরুষ বানাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহারও সমর্থন করিতে পারি না।

কিন্তু তিনি মনে প্রাণে অকপট ছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কোন এক বিষয়ে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে যে আসক্তি আসিয়া পড়ে, তাহার উপর কাহারও হাত নাই। যদি নিজের বস্তুর প্রতি প্রীতিবশে অন্যের জিনিষের উপর বিদ্বেষ না দেখাই, তবেই যথেষ্ট। রামানন্দবাবু নিজস্ব 'কোটে'র বহির্ভূত অনেক ব্যাপারের প্রতি শুধু যে বিদ্বেষ দেখান নাই তাহাই নহে, যে মানবধর্ম্ম বশে তিনি স্বনিষ্ঠ-ছিলেন, সেই মানবধর্ম্মেরই অন্য দিকের প্রেরণায়, বৃহত্তর স্বজাতি নিষ্ঠার প্রেরণায়, বিপন্ন সম্প্রদায় মাত্রেরই জন্য দাঁড়াইয়াছেন। দৃষ্টান্ত, রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এক অনুচ্চারিত বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। আদর্শের ভিন্নতা আছে, দলগত পার্থক্য আছে, সর্ব্বোপরি আরম্ভ হইতে এক ব্যক্তিগত মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছে। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের উপর দস্তুরমত বিদ্বিষ্ট। সেই রামকৃষ্ণ মিশন যখন প্রভু কারমাইকেলের কোপে পড়িল, তখন রামানন্দবাবু আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আত্মপক্ষের ঘরের দ্বন্দ্ব মুলতুবী রাখিয়া পঞ্চপাণ্ডব শত্রুহস্তে বন্দী কৌরব ভ্রাতাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া 'পরপক্ষে গত' দ্বন্দ্বকে নিজের করিয়া তুলিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক সারদানন্দ স্বামিজী চিরকাল এই দুদিনের দুর্লভ সহায়তা সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেন। "অভক্ত" রামানন্দবাবুর লেখা জীবনী, পরমহংস-সহধর্ম্মিণীর স্মৃতিকথার পুরোভাগে স্থান পাইয়াছে। উচ্ছ্বাসহীন লেখায় যে এমন শুচি-শুভ্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা, উহা না পড়িলে হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। যেখানেই তিনি যাহা কিছু ভাল দেখিয়াছেন, তদ্গত চিত্তে তাহার ভাল দিকটা লোককে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আন্তরিকতার বলে সেই সব জিনিষে এমন আলোকপাত করিতে পারিতেন, যাহার সন্ধান অন্ধভক্ত জীবনভোর ধ্যান করিয়াও পায় নাই। একা এমন শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, যাহা লক্ষ পেল্লাদের হাঁউমাউ চেঁচামেচীতে লক্ষ বৎসরে হয় না। অথচ হৃদয় চিরকাল এক জায়গায়ই বাঁধা ছিল; নিজের আদর্শকে বরাবর সবার উপরেই স্থান দিয়া আসিয়া-

ছেন। তাই এক এক সময় মনে হয়, যাহার নিজ আদর্শ-নিষ্ঠা যত অকৃত্রিম ও কার্যগত, তিনি ততই অন্যের আদর্শ গ্রহণ না করিলেও অন্ততঃ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। প্রকৃত গোলমাল হয় সেই সব ধর্মধ্বজীদের বেলায়, যাহারা নিজের আদর্শ অনুসারেও চলে না, অথচ অন্যের আদর্শের ধিক্কারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠে। এই দ্বৈত অসরলতার ফলেই জগতের জটিল সমস্যাসমূহ জটিলতর হইয়া যায়।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রসঙ্গে রাষ্ট্র-চিন্তার কথা আসিয়া পড়ে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্মপ্রাণ রামানন্দবাবুর অবদান কি মূল্য রাখে, তাহার পরিমাপ করিতে হইলে আবার বিস্তৃত ভণিতার প্রয়োজন।

ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত ও প্রায় সর্ববিষয়ে পথিকৃৎ, ভারতপথিক রাজা রামমোহন রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সব চিন্তা করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুবর্তী ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে কার্য্যরূপ দেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ দেশভক্তির চর্চা করিলেও দলগতভাবে ব্রাহ্মসমাজ রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। একটা পরম আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যিনি যত বেশী ধার্মিক, তিনি তত বেশী, সীজারের প্রাপ্য, বিশেষ লুণ্ঠনার্জিত প্রাপ্য সীজারকে দিতে ব্যগ্র। অভীঃ মন্ত্রের প্রচারক বিবেকানন্দ স্বামী, নিষ্কামকর্মে সাধকের চিত্তশুদ্ধির জন্য মিশন স্থাপন করিলেন, কিন্তু রাজনীতি চর্চ্চা সেইসব শুদ্ধি-ওয়ালা কর্ম-তালিকা হইতে বাদ পড়িল। "অভী"র কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ! মোক্ষমার্গীর সঙ্গে সুস্থ সবল সংসারী মানুষের অনেক বিরোধ আছে কিন্তু সংঘর্ষমূলক রাষ্ট্রচর্চায় তাহা যেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তেমন আর কোথাও নহে। আমাদের আধুনিক সাধুসন্তের জীবন-কাহিনীতে দেখি ঈশ্বর-ভক্তি বাড়িলেই ইংরেজভক্তি বাড়ে। বেশী ধর্ম ধর্ম করিলে, অন্য বিষয়ে যেমন তৌক, ইংরেজ বিরোধ ব্যাপারে সুতীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। দেশোদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী দলকে নিয়োজিত করিয়া বঙ্কিম বোধকরি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে একদল ঝাড়া-হাত পা-বেপরোয়া ষণ্ডা জোয়ান লোক অনন্যচিত্ত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিদেশী দস্যুদের পিছনে ধাওয়া করিতেছে, ততক্ষণ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল টুটিবে না।—আনন্দমঠের অব্যবহিত পরেই বিবেকানন্দের অভ্যুদয়, কিন্তু তাঁহার মঠের আনন্দের দল রাষ্ট্রবিমুখ। তা বেশত! নিজের নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত চলিবার অধিকার সকলেরই আছে। কেহ যদি প্রাণের ভয়ে, রাজনীতির হাঙ্গরকুমীরসঙ্কুল পাথারে ঝাঁপ দিতে না চায়, তবে তাহাকে বাধ্য করিবার কথাই উঠে না। কিন্তু ইঁহারা যে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চান না। ক্ষণে ক্ষণে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর, রাষ্ট্রসেবকদের উপর কটাক্ষ বিদ্রূপ করিতে থাকেন। বাল্যকালে দেখিতাম, প্রতি সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজী গাছকোমর বাঁধিয়া, দুই তিনজন দেশ-সেবকের উপর আক্রমণ চালাইতেছেন। স্বামিজী ছিলেন (এখনও আছেন) গভীর পণ্ডিত ও অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ঐ বেচারারা আর কিছুতেই তর্কে পারিয়া উঠিত না। কিন্তু এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া লিখিত দলিল পেশ করিব। বিবেকানন্দের শিষ্য প্রশিষ্যেরা গুরুর তিন কাঠি উপরে গিয়া থাকেন। তাঁহার অন্যতম শিষ্য প্রজ্ঞানন্দ স্বামী বিশেষ পরিশ্রম করিয়া 'ভারতের সাধনা' নামক একখানা অথর্ব (imbecile) বেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন যে মুমূর্ষু ভারতের নাড়িতে সাবুদানা ছাড়া আর কিছু সহিবে না। রাজনীতির উগ্র মদিরা এখানে আনিয়ো না। হে ভারত, অশ্রুমুখে হাস্যমুখে বিনীত দুই কর জুড়িয়া গৌরাঙ্গ ভজনা কর। ইহাই তোমার 'সোনাতন' সাধনা। প্রজ্ঞানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণ মিশনে মিশিয়া প্রজ্ঞালাভ করিবার পূর্বে অরবিন্দ ঘোষের সহকর্মী ছিলেন। কিছুকাল জেলের হাওয়া খাওয়াতে গুরুশিষ্যের একই সঙ্গে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। প্রজ্ঞানন্দ অনেক পূর্বে গৌরাঙ্গভক্তের সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এদিকে পূর্বাশ্রমের গুরু ঘোষ মহাশয় এখন শ্রীঅরবিন্দ বনিয়া গিয়া ভারতবন্ধু ষ্টেটস্‌ম্যানের যোগ দৃষ্টিতে এতকাল পরে পূর্বাশার নবোদিত তারকারূপে (a Star in the east) প্রতিভাত হইয়াছেন। ইহাকেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

ইদানীং অনেকগুলি আধুনিক সাধু মহাত্মার জীবন লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছিল। অন্য সব বিষয়ে পরস্পর বিরোধ আছে কিন্তু ইতিহাস ও মানবচরিত্রজ্ঞান সকলেরই সমান টনটনে। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। উপাধ্যায় "গৌরগোবিন্দ রায়ের" কেশব চরিত, "শ্রীশ্রীমায়ের (পরমহংস-সহধর্মিণীর) স্মৃতি কথা", "সাধু নাগ মহাশয়, "রামকৃষ্ণ কথামৃত" যে খানাই খোল না কেন, আভাসে ইঙ্গিতে সর্বত্র একটি গুহ্যাৎ গুহ্যতম কথার সন্ধান পাইবে। সেটি এই যে, বিধাতার অতি মহৎ ও বৃহৎ কোন অভিপ্রায় সাধনের জন্য দেবদূত ইংরেজেরা এদেশে পদধূলি দিয়াছেন। যে শ্বেতচর্মগণ পৃথিবীর দিকে দিকে নিরস্ত্র গৃহস্থপ্ত মানবমণ্ডলীর শান্তিময় নীড়ে আগুন লাগাইয়াছে, যাহারা আজ অর্দ্ধ সহস্র বৎসর ধরিয়া, নিরীহ লোকসমূহের জীবনে অভিশাপ বহন করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার নির্ণয়ের জন্য পরস্পর-হননে ব্যাপৃত, তাহারা যদি বিধাতার মহদভিপ্রায়ের বাহন না হয় তবে আর কে হইবে! এইভাবে সর্বকার্যে ভগবানের হাত দেখিলে, চোর ডাকাত ছ্যাচড়ের শাস্তি দিবার প্রথা তুলিয়া দিতে হয়।

ত্যাগে তপস্যায় দিব্যানুভূতিতে যাঁহাদের জীবন নিষ্কলুষা স্বর্গমুখী হোমানলশিখাসদৃশ, সেই নমস্য সাধকগণের কেন যে এমন মতিভ্রম হয়, তাহার কারণ খুঁজিতে গিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ইহা অনধিকারচর্চ্চার ভয়াবহ পরিণাম। এক বিষয়ে যে বিশেষজ্ঞ, অন্য বিষয়ে সে বিশেষ অজ্ঞ হইতে পারে। পরা অপরা সকল বিদ্যায়ই অধিকারী ভেদের নিয়ম মানিতে হয়। সাধকগণ নিরন্তর অতিপ্রিয় ব্যাপারসমূহের চিন্তা করিতে করিতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারে এমন তালকাণা হইয়া পড়েন যে, অধ্যাত্মবিদ্যা ছাড়া আর কোন বিষয়ে মুখ খুলিলেই পাগলের প্রলাপ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। প্রলাপে আমাদের আপত্তি নাই। পাগলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে থাকুক। তবে সাধারণবুদ্ধি লোকের বিপদ এই যে, পরলোকের কারবারীগণ ঐহিক বিষয়ে

আপ্তবাক্য ছাড়িতে আরম্ভ করিলে, তাহারা কি খাটি, কি মেকী ধরিতে পাবে না। মনে করে বুঝি এখানেও অতীন্দ্রিয় দর্শন, যোগশক্তি কার্য্য করিতেছে। বেদে, কোরাণে, বাইবেলে জাগতিক ব্যাপার (যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব) সম্বন্ধে যাহা যাহা লেখা আছে, আজ-কাল অল্পবুদ্ধি লোকেও তাহা গ্রহণ করে না; কিন্তু সাধুবাবাদের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মোহ এখনও কাটে নাই। ফলে, লক্ষ লক্ষ লোক পথভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ব্যাহত হইয়াছে। কত শক্তি যে এইভাবে অপব্যয় হইয়া যায়।

আমি শুধু রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর নামই নিয়াছি। কিন্তু জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্ম প্রচারক সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। যে সব ধর্ম সঙ্ঘ ভারতের সর্বাঙ্গীণ উজ্জীবনপ্রয়াসী, তাহাদের মধ্যে, একমাত্র আর্যসমাজই রাষ্ট্র মুক্তি আন্দোলনকে অপাঙক্তেয় করেন নাই। আর সকলেই শত হস্তেন বাজীনা করিয়া আছেন।

আমার চিরকাল এই একটা পরম উল্লাসের বিষয় ছিল যে রামানন্দবাবু এত বড় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম হইয়াও ব্রাহ্মীস্থিতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইয়াও ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। এ বিষয় কোন আপোষ রফা তিনি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; প্রাণপ্রিয় গুরুদেবকেও এ সম্বন্ধে আঘাত করিতে তিনি পিছ-পা হন নাই। ধর্মপ্রাণতা যে তাঁহাকে এই ধর্মোন্মাদ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক দুর্গতি সম্বন্ধে উদাসীন করে নাই, এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। কারণ, তাঁহার শিক্ষায় বহু লোক পথ দেখিতে পাইয়াছেন। বিবেকানন্দ-শিষ্যা তপস্বিনী নিবেদিতা, গুরুর প্রকাশ্য নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজবিরোধ করিতেন; রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা, এই তেজস্বিনী ইংরেজ-কন্যার রাজনীতি চর্চার সঙ্গে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্কশূন্য বলিয়া ঘোষণা করিলেও, তিনি বিবেক নির্দিষ্ট কর্ম হইতে বিরত হন নাই। নিবেদিতা সব সময় রামানন্দবাবুকে সহায়ক ও সহকর্মী হিসাবে পাইয়াছিলেন!

বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ লোক নেহাৎ শ্রান্তিবশেই এলাইয়া পড়েন। যা হবার হোক—এই রকম একটা ভাব আসিয়া পড়ে, অনেক রাজনৈতিক কর্মীদের জানি, তাঁহারা যৌবনের তেজবীর্য্য খোয়াইয়া ঢোঁড়া সাপে পরিণত হইয়াছেন! কিন্তু জীবন-সায়াহ্নেও রামানন্দবাবুর চারিত্রিক দৃঢ়তা অক্ষুন্ন ছিল।

প্রথম যৌবনে যিনি কিশোরদের শিক্ষক ছিলেন; পরবর্তীকালে যিনি বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র বরণ করিয়া লইয়া, অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের শিক্ষাকার্যের ভার গ্রহণ করেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর বিশ্রাম লইবার নাম করেন নাই, সেই সমগ্র জাতির শিক্ষাগুরুর শিষ্য আমরা ব্রতধারীর ব্রতউদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে প্রণাম করি। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছেন, তাহার নবারুণচ্ছটায় পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতে আর বিলম্ব না হোক, এই প্রার্থনা। বন্দেমাতরম্।

চূর্ণী (গল্প)

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

জলের উপরকার কালো রেখাটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসির হাঁক দেয়, "হেই চূর্ণীতে পড়লাম রাক্কুসী চূর্ণী হুঁসিয়ার জোয়ান---হুঁসিয়ার"—সঙ্গে সঙ্গে সে হালটাকে তার পেশীবহুল দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে।

প্রকাণ্ড 'ভাউলী'খানার মধ্যে ছিলেন চৌধুরী বাড়ীর বড়কর্ত্তা একা নয়, সপরিবারে। প্রতিবারে অবশ্য সকলেই ট্রেণে করে বাড়ী যায়, তিনি একাই শুধু পূজার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে নৌকা করে বাড়ী যান। কিন্তু এবার বাড়ীর মেয়েদের—ছেলে মেয়েদের মাথায় কি যে খেয়াল চাপল যে, বাড়ী যাবার আগের দিন সবাই বায়না ধরে বসল তারাও এবার নৌকা করে যাবে। বড় কর্ত্তা মাথা নাড়েন, বলেন, "না, তা হয় না। ছেলেপিলে নিয়ে নৌকায় যাওয়া—উহু—তা হয় না"—

ছেলেমেয়েরা ছাড়বার পাত্র নয়। তারপর তলে তলে আছে মায়েদের উৎসাহ। নিরুপায় হয়ে বড় কর্ত্তা ভাইদের বলেন, "তাহ'লে তোমরাও চল"—

ভাইএরা উত্তর দিলেন, "তুমি ক্ষেপেচ বড়দা, আমরা যাব নৌকোয়। তাহ'লে ঢেউয়ের দোলায় আমাদের অন্নপ্রাশনের ভাতশুদ্ধ উঠে আসবে। তার চেয়ে তুমিই নিয়ে যাও। একবার গিয়ে সব মজা দেখুক।"

অগত্যা বড়কর্ত্তা একাই ছেলে মেয়েদের নিয়ে চলেছেন। বসির সেখের হাঁক শুনে ভিতর থেকে বড়কর্ত্তা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন "কি হল বসির—চূর্ণীতে পড়ল না কি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁকর্ত্তা। শুইযে পেরিয়ে এলাম কালা দাগ—"চূর্ণী ও গঙ্গার সংযোগস্থলে চিরদিনই একটা কালো রেখা দেখা যায়। লোকে বলে গঙ্গা আর চূর্ণীর জল এক সঙ্গে মিশ খায় না, তাই তফাৎ রেখে দিয়েছে।

বড়কর্ত্তা বলেন, "কি বসির ভয়ের কোনও কারণ নেইতো?"

"আজ্ঞে না কর্ত্তা" বসির সেখ উৎসাহের সঙ্গে বলে, "তবে আপনারে গিয়ে কি বলবো জানেনইতো এর নাম রাক্কুসী চূর্ণী তার ওপর আপনার গিয়ে 'এট্টু' যেন মেঘও ঘনাচ্ছে। তা যনাক, আসল কথাডা কি জানেন বেটি এবার এখনও বলি নেয় নি"—

বড় কর্ত্তা ছইএর ভিতর থেকে বাইরে আসেন। সঙ্গে দুটি তিনটি কিশোর কিশোরীও আসে। বড়কর্ত্তা একবার আকাশের দিকে একবার জলের দিকে তাকিয়ে বলেন, "এবার বুঝি এখনও নেয়নি?"

"না কর্ত্তা। ওই মোদের 'হালাল পুর' হতে এই 'বাগনদিঘাট' অবধি, কই কাউরেইতো নিতি শুনিনি।"

একজন কিশোরী হেসে বলে, "প্রতিবছরেই নেবে এমন কোন কথা আছে নাকি ?"

"ও কথা বলনা দিদিঠাকরুণ" বসির সসম্ভ্রমে উত্তর দেয়, একে তোমরা চেননা, তাই অমন কথা বল্‌তেছ। এর নাম রাক্কুসী। ফি বছরে ওর পাওনা-গণ্ডা ও আদায় করবেই। গত সনের আগের সনে বলে সাঁত বছর পার করে চোত সংক্রান্তির দিনে 'সন্ধ্যি বেলায়' এটাবে নিলে"—

কিশোর কিশোরীরা হেসে ওঠে, বলে, "যত সব কুসংস্কার ওই তো একটু খানি মেঘ দেখা দিয়েছে, তাতেই ভাবচে বুঝি একেবারে 'টাইফুন' দেখা দেবে"—

আবার সব সশব্দে হেসে ওঠে।

বড় কর্ত্তা বিরক্ত হন। ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বলেন, "তোরা থাম দিকিনি সব"—তারপর আবার বসির সেখের দিকে ফিরে বলিলেন, "তা তুমি কি রকম বুঝচ ? একটু ইতস্ততঃ করে বসিরসেখ বলে, "আজ্ঞে বোঝাবুঝি আর কি—তবে ওই মেঘ খানা। আচ্ছা, ঝড় যদি ওঠেই, তা 'মুই'ও আজ একবার দেখিয়ে দেব যে মোর নাম বসির সেখ—কালীমুদ্দিন ব্যাটা। চূর্ণী যে কত বড় রাক্কুসী তা আজ দেখে নেবানি"—

বড় কর্ত্তা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ভিতরে গিয়ে বসেন। মাঝিরা দাঁড় বাইতে বাইতে গান ধরে

"ভ্যালা দুর্গা দেখলাম চাচা—
ঠাকরুণ মোর সিঙ্গি চড়ে, অসুরের সিঁটকি ধরে
মারতে ছিলেন খোঁচা।

হেই সামলে ভাই—সামনে দেখা যায় 'পেল্লায় ওড়ং'—মাছ জমবার জন্য জেলেরা নদীর ধারে ধারে গাছের বড় বড় "ডালপালা" ডুবিয়ে রেখেছে। সে সমস্ত ডাল পালায় নৌকা লাগলে আর রক্ষা থাকেনা। নৌকার তলা ফেঁসে সঙ্গে সঙ্গে নৌকার সলিল সমাধি লাভ হয়।

'ওড়ং' পার হয়ে লোকটা আবার গান ধরে,

"একজনারি 'হস্থা'বদন কাণ দুখানা কুল্যার মতন
আবার-ময়ূরের ওপর বস্যা গিনি, তেনার বড় ট্যাকট্যাকানি
ঝুলিয়ে দেছেন লম্বা তিন হাত কোঁচা।"

চূর্ণীনদী, নদী না বলে খাল বলাই বোধ হয় যুক্তি সঙ্গত। ছফাতের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলে আর প্রতি বর্ষায় সদস্তে তীরস্থ গ্রাম গুলিকে একবার নিজের বিক্রম দেখিয়ে যায়। নয় তো চূর্ণী খাল—গঙ্গা থেকেই তার উৎপত্তি, আবার কয়েকটি গ্রাম ও দু একটি সহর বেষ্টন করে গঙ্গাতেই তার লয়। কোন্ সুদূর অতীতে এক সন্ন্যাসী না কি এক পারাবতের চঞ্চুতে তার অণ্ড ধারণ করিয়ে দিয়ে বলে ছিলেন যে উড়বার সময় সেখানে সেই অণ্ডের পতন হবে, সেই খানেই উৎপত্তি হবে স্রোতস্বতীর। অণ্ড চূর্ণ হয়ে উৎপত্তি তাই নাম চূর্ণী। তবু মানুষ মার ভয়ে অস্থির-সে রাক্কসী, সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাওয়াই তার নিয়ম। সেই চূর্ণী বয়ে চলেছে। শান্ত, নিস্তরঙ্গ, অনুকূল বাতাসের সাহায্যে বিশাল 'ভাউলী'খানা তরতর করে এগিয়ে চলেছে। শুধু একটানা একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, কুল কুল—কুল কুল।

—আজ কতদূর যেতে পারবে মোড়ল—কিশোর কিশোরীর প্রশ্ন করে।

—কতদূর মানে ? বসির সেখ হাসে;—'বাড়ী পৌছা' আজ—"

—বাড়ী পৌছাবে ? হর্ষোচ্ছ্বসিতস্বরে ছেলেমেয়েরা বলে।

—যাবনা ? বলে নাগাৎ বেলা বাবটা একটা পৌছে' খাবানি এই ধরুন না কেনে, এটা হল গে রুগপুর, এরপর গোপালপুর তারপর কায়েত পাড়া, আনুলে, শাটিগাছা, কয়লাবাটা, ছিন্নাথপুর, এই ক'খানা গাঁ মেরে 'দিতি' পারলেই বাস্—ছেলেমেয়েরা আনন্দে কলরব করে ওঠে...বাড়ী যাবে।

শরৎকাল। আকাশে বাতাসে ছড়ান এক অপরূপ মোহিনী মায়া। নদীর কলতানে, কাশবনের ঢেউয়ের মাঝে আগমনীর সুরের ঝঙ্কার। সূর্য্যের সোনার আলোয় তারই ইঙ্গিত—বন বেতসের আর কাশফুলের মাঝে পাওয়া যায় তারই গন্ধ। গাঙের ধারে গাংশালিক আর বুনো হাঁসের দল গলাবাজী করে কিচির মিচির—'কচির মিচির—প্যাঁক-প্যাঁক করছে। দেবী আসছেন।

দেবী আসছেন সত্য কিন্তু কোথায় ? সপ্তকোটি বাঙালীর ভক্তি অর্ঘ্যে রচিত পূজাবেদী মনে আজ যে শেয়াল আর শকুনের রাজত্ব। বিগত মন্বন্তরের প্রেতাত্মা আজও আধিপত্য করচে বাংলার বুকে। অন্নহীনা কুলবধূ আজ বস্ত্রহীনা। লজ্জায় আত্মগোপন করেছে ঘরের কোণে। কে জ্বালাবে আরতি প্রদীপ কে-সাজাবে বরণ ডালা! তাই দেবীর নৌকায় আগমন—ফল, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, কিন্তু দেবীর গমন করবেন দোটকে, ফলং মড়কং। দুর্ভিক্ষের কবন্ধ নাচছে সানন্দে—হি-হি করে।

দেবী আজ দশপ্রহরণধারিণী বাণী বিত্তাদায়িনী নয় আজ হৃত-সর্বস্বা নগ্নিকা'—দেশে আজ সকলের তাই নগ্নবেশ।

—হুঁশিয়ার জোয়ান—নৌকো তফাৎ—হাঁক দেয় বসিরসেখ। একখানা প্রকাণ্ড 'ছিপ' 'ভাউলী' খানার একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। 'ছিপ' থেকে জবাব আসে "দরকার তুমি হাৎ যাও—আমি এই পথেই যাব—"

'ছিপ' খানা সত্যই 'ভাউলী' খানার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। বসিরের কুৎসিত মুখখানা সহসা বীভৎস হয়ে ওঠে। যে রক্ত ধারা সুদূর অতীতে একদিন কোষ মুক্ত শাণিত তরবারির আঘাতে ভারতের ক্ষাত্র শক্তিকে নিস্তেজ করে দিয়েছিল সেই সুপ্ত পাঠান রক্তের জীবাণু আজ বুঝি আবার সজাগ হয়ে ওঠে তার শিরাউপশিরায়; কিলবিল করে ওঠে। ফস করে বড় লগীখানা টেনে নিয়ে হেসে হেসে সে বলে "কি নাম ? বাড়ী কোন গাঁ ? মায়ের দুধ কতখানি খেয়েলে ? ধর দেখি লগী"—লোকগুলো 'থমকে' যায়; বলে 'কাপড় আছে"—

"কাপড় ? কাপড় কোথায় পাব ? কাপড় তল্লাস করগে সরকারী আর ব্যাপারীদের গুদোমে। মোরা কি কাপড়ের ব্যাপারী। এ নৌকোয় আছে জেনানা—

"আরে, তবেই তো কাপড় আছে"—উৎসাহিত হয়ে লোকটা বলে।

"তার মানেটা কি হ'ল হে জোয়ান ?"

"মানে ?" লোকটা একটু হাসে।—"মানে বুঝলে না মিয়া। পূজোর সময়...বাবুদের "বউড়ী ঝিউড়ী"রা পরবে রং বেরং-এর চটকদার কাপড় জামা, আর মোদের ঘরে বেবাক সব "ন্যাংটা" ? এতখানি অন্যায় সয় না। কাপড়গুলো তেনাদের দিয়ে দিতি বল। না দেন তো মোরা জোর করবে"—

"হুঁশিয়ার—মুখ সামাল"—বাধা দিয়ে বসির সেখ গগনভেদী চীৎকার ক'রে ওঠে। চোখ ছুটো দিয়ে বেরুতে থাকে আগুনের হল্কা। বলে "ঘরে মা নাই নাকি জোয়ান···বহিন নাই···জরু নাই, বেটি নাই...তবু জেনানার কাপড় কাড়তি আস পাঁঠার মত। মরদ বাচ্চা বলে পরিচয় দাও কোন মুয়ে ?" লোকগুলো লজ্জায় মাথা হেঁট করে। বসির সেই ফাঁকে লগী ঠেলে তাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যায়।

গোলমাল শুনে বড় কর্ত্তা আবার জিজ্ঞাসা করেন "কি হ'ল ?"

"কি আবার হবেন আজ্ঞে—কতকগুলো ছ্যাচড়া। দেশের লোকের পরণে একখানা কাপড় নাই তাই বেরিয়েছে সব কাপড়ের খোঁজে"—

"তা' এখানে নদীর মধ্যে কাপড় পাবে কোথায় ?"

"পাবে আর কোথায় বলেন—ঠেঙিয়ে কেড়ে নেবে —"

"সর্ব্বনাশ"—বলে বড় কর্ত্তা স্তব্ধ হ'য়ে যান।

বসির আপন মনেই বলতে থাকে—"তা এ রকম না করেই বা করে কি—কাপড় বল্‌তি কারও নাই। লাজ সরম তো ওদেরও আছে। সহরের বাজারে মোটকে মোট কাপড় আসে, কিন্তু গরীবে তার একখানা পায় না। আর বাবুরো নিয়ে যায় গাদা গাদা। বলে এ-সব কাপড় তোমাদের নয় গো, এসব উকীল ডাক্তার আর মোক্তারদের, সরকারী চাকরেদের। আ কচু পোড়া খা, মোরা কি তা হ'লে কাপড় ফেলেই ঘুরে বেড়াব নাকি ? তাতেই বা নিস্তার কই, ন্যাংটা হ'য়ে পথে বেরুলেই পুলিশ এসে চেপে ধরবে, বল্‌বে চল থানা—পাঁচ আইন—

চূর্ণী বয়ে চলেছে। দেশব্যাপী যে ভাঙ্গনের স্বরু হয়েছে চূর্ণীর জলতরঙ্গেও পাওয়া যায় তারই আভাষ। তীরের দিকে তাকালেই দেখা যায় চূর্ণীর আঘাতের চিহ্ন। ভেঙ্গে পড়েছে কত বাড়ী, ডুবে গেছে কত গ্রাম, কত বাগান আর শস্যশ্যামল ক্ষেত। তবু চূর্ণী আঘাতের পর আঘাত ক'রে চলেছে।

ছলাং—ছলাং—ময় ভুখা হুঁ···রাক্ষসী চূর্ণী, তার বুভুক্ষার শান্তি নেই।

একজন দাঁড়ী হাঁক দেয়—ও চাচা—

বিড়িটায় টান দিতে দিতে বসির উত্তর দেয়—কেন ?

—পশ্চিম দিকটার পানে একবার তেকিয়ে দেখ—

নির্ব্বিকারভাবে বিড়ি টানতে টানতে বসির বলে, দেখলাম—

—তারপর, ঝড় তো এল—

আল্লক না ক্যানে—দিনের বেলা 'ভয়ডা' কিসের। হাত চালিয়ে 'বেয়ে' চল সব, তা হ'লেই পৌছে যাবানি—

· লোকটা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে "কিন্তু সামনেই বড় 'ঘুল্লো' তার হিসেব রাখ"—

বড় 'ঘুল্লো' অর্থাৎ নদীর জলের ঘূর্ণী। বিশালকায় মালবাহী নৌকাগুলি পর্য্যন্ত ঘূর্ণীর মধ্যে প'ড়ে পাক খেয়ে উল্‌টে যায় বসির সেখ বেশ ক'রে পশ্চিম দিককার ঘনায়মান কালো মেঘখানার দিকে চেয়ে বলে, বড় 'ঘুল্লো'য় 'যাতি যাতি' ঝড় উঠবে না। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবানি—

হুঁ, বলে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ অবধি ঘাড় মোড়া দে—উল্‌টে পড়ে, আর তুমি নে যাবা যাত্রীর লা—

সকলে এক মনে দাঁড় টানতে থাকে।

আকাশে কালো মেঘ ক্রমশঃ দক্ষিণ প্রান্ত চেপে বিস্তৃত হ'তে থাকে। ক্রমে সূর্য্যদেবকে করে কুক্ষিগত। সোনালী সূর্য্যের আলো কৃষ্ণ মেঘের যবনিকার অন্তরালে করে আত্মগোপন। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হয়, সুরু হয় মৃদু মন্দ বাতাস। রাক্ষসী চূর্ণী বুঝতে পারে সব কথা। বোঝে যে ভীমা ভৈরবী রণরঙ্গিনীর বেশ ধরবার সময় আগত। সুযোগ বুঝে সেও করে মহা প্রলয়ের যবনিকা উত্তোলন—জলে আওয়াজ উঠতে থাকে ছল্ ছল্ ছলাং ছল্ ছল্ ছলাং

বাসুকী নাগের ফণা দুলে উঠেছে, জেগে উঠেছে কালীদহের কালীয় নাগ, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরায় জাগে তারই শিহরণ, ভাউলী দুলে ওঠে মাতালের মত। একবার কাত হয় ডাইনে একবার বামে। রাক্ষসী চূর্ণী করে বদন ব্যাদান।

ভিতর থেকে বড় কর্ত্তা বলেন, "ঝড় উঠল নাকি বসির"—

"আজ্ঞে হাঁ, উঠলেন"—

বড় কর্ত্তা ব্যস্তভাবে বাইরে বেরিয়ে আসেন। একবার তাকান আকাশের দিকে, আর একবার তাকান নদীর দিকে তারপর বলেন, "এতো দেখচি কলাইঘাটার মোড়; এর পরেই না তোমাদের সেই বড় 'ঘুল্লো' ?"

—আজ্ঞে হ্যাঁ; ভইযে দেখা যায়—

"আরে ওযে এসে পড়েছে—এখন উপায় ?"

—আজ্ঞে বাতাসের জোর যদি জেয়াদা না হয়, তা হ'লে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবানি, আর বাতাস যদি বাড়ে, তা হ'লে আর ঠেকান যাবে না। এক ঝাপটায় 'ঘুল্লো'র মধ্যি নিয়ে গে ফেলাবে-

কিন্তু ততক্ষণে বাতাস বেড়ে গেছে। মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়েছে সারা বিশ্বের বুকে। ভোঁ ভোঁ বাজছে তাঁর প্রলয় বিষাণ, লটপট দুলছে তাঁর অস্থি-মাল্য, চরণ ছন্দে সৃষ্টি হচ্ছে মৃত্যুর মূর্চ্ছনা।

ছেলে মেয়েরা সব এক এক ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বসির সেখ ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, আপনারা সব ভিতরি গিয়ে বস; এখনি ঝড় জেয়াদা হবে' লা দুলে উঠবে—

"দুলে উঠবে—ভিতরি গিয়ে বস"—বড় কর্ত্তা বসিরকে দাঁত মুখ খিচিয়ে ভেংচি কেটে খ্যাক করে ওঠেন। বসবে ভেতরে গিয়ে। তারপর তোমার নৌকো উল্টে যাক, আর সব কটাতে বস্তাবন্দী ইঁদুরের মত ডুবে মরুক, নয় ?—

বসির মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়; যথাসম্ভব সম্ভ্রম বজায় রেখে সে বলে "কিন্তুক জলও যে আসতিছে, ভিজে যাবেন সব"—

নৌকো ছেড়েছিলি কেনরে হারামজাদা, যদি জানতিস যে ঝড়

জল আসবে। আর নিয়ে এলি, এলি—একেবারে বড় 'ঘুল্লো'র মুখে—"

বসিরের চোখ দুটো যেন মুহূর্ত্তের জন্য একবার ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে, কিন্তু তখনই নিভে যায়। নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করে বিনীত ভাবে বলে, "হুজুর মিছেই আমার ওপর রাগ করতিছেন। আমি কি আর হাত গুণতি জানি, যে ঝড় উঠবে কি না উঠবে আগে থাকতি ব'লে দেব ?"

বড় কর্ত্তা আপন মনেই গজ গজ করতে থাকেন। তাঁকে শান্ত করার জন্য বসির বলে, "আপনার কোন ডর নাই কর্ত্তা। আপনি ভিতরি গিয়ে বস। নৌকো আমি ও-টাতি দেব না—জান কবুল—"বড় কর্ত্তা যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ভিতরে গিয়ে বসেন; কিন্তু ছেলে মেয়েরা সব দাঁড়িয়েই থাকে। গলুই ধরে দাঁড়িয়ে সব দেখতে থাকে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য। একজন বলে, "টু ঘ্যাচারাল, এই সময় যদি একটা সিনেমা কোম্পানী এখানে হাজির থাকত, তা হ'লে একটা দেখবার মত 'সিন' তুলে নিয়ে যেতে পারত—"

বসির মনে মনে শঙ্কিত হয়। এই সমস্ত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বাইরে এসে গলুই ধ'রে দাঁড়িয়েছে, নৌকা জোরে দুলতে শুরু করলে এরা টাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকবে কি ক'রে।

ঝড়ের বেগ বেড়ে ওঠে। সোঁ সোঁ শব্দ হ'তে থাকে। দুম্ দাম্ শব্দে ভূমিশয্যা গ্রহণ করতে থাকে, তীরের উপরে বনস্পতির দল। বসির হাঁকে—"বাঁয়ে চেপে, বাঁয়ে চেপে—সামনেই ঘুল্লো—" আটখানা দাড় একসঙ্গে জলের ওপর আঘাত করে। নৌকা ঘূর্ণীর ভিতর যেতে যেতেও ভিন্ন মুখে ছুটে যায়। বসির দৃঢ় ভাবে 'হাল' চেপে ধরে সঙ্গীদের উৎসাহিত ক'রবার জন্যে তারিফ করে বলে "সাবাস জোয়ান—সাবাস্! মায়ের দুধ সব 'খেয়েলে' বটে। মোর মুখ রেখেচ সব। ওকি ও···হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার—

—আর হুঁশিয়ার! নৌকা তখন ঝড়ের এক ঝাপটায় ঘূর্ণীর একেবারে মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে নৌকা একবার 'কাত' হ'য়েই পরক্ষণে আবার সোজা হয়ে বোঁ-বোঁ-করে ঘুরতে থাকে। ছেলেমেয়েরা 'টাল' সামলাতে না পেরে 'হুড়মুড়' করে সব পাটাতনের উপর গড়িয়ে পড়ে এবং গড়াতে গড়াতেই কোন গতিকে 'ছই'এর ভিতর গিয়ে আশ্রয় নেয়। বসিরের সেদিকে লক্ষ্য নেই, সে দৃঢ় মুষ্টিতে "হাল' ধরে তাকিয়ে আছে। ভেতর থেকে ভয়ার্ত্ত স্বর ভেসে আসে—"মা—জগদম্বা মা—রক্ষে কর মা—"

—"ঠেলে দাও ঠেলে দাও—নৌকো 'ঘুল্লো'র কেনারা দিয়ে ঘুরুক"—

—আবার আটখানা দাঁড় জলে পড়ে, কিন্তু নৌকা বার করে সাধ্য কি!

—সোঁ-সোঁ করে ঘুরচে জলস্রোত, সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাও ঘুরে চলেছে। দাঁড়ের আঘাতে নৌকা এক পা যদি এগিয়ে যায়, স্রোতের আঘাতে তখনই পাঁচ পা পিছিয়ে আসে। তবু তারা নিরাশ হয় না। প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ সুরু করে রাক্ষসী চূর্ণীর সঙ্গে। মাথার ভিতর সঞ্চারিত হয় দেহের সমস্ত রক্ত, কপালের শিরা উপশিরা মোটা হয়ে ফুলে ওঠে দড়ার মত, পেশীর সুদৃঢ় বাঁধন···সেও বুঝি ছিঁড়ে যায়। ঠেলা-ঠেলির ফলে নৌকা সহসা আপনা হতেই ঘূর্ণীর প্রান্ত ঘেঁসে ঘুরতে শুরু করে! বসির চীৎকার করে উঠে "এই ফাঁকে—এই ফাঁকে—মার'পাড়ি—মার'পাড়ি—"

—"উল্টোদিকে মুখ ঘুরে যাবে যে—"

—"যায় যাক, মুখ ঘোরাতি আর কত সময় লাগবে। আগেতো 'ঘুল্লো' থেকে বার করে নি—"

তাই হয়। আবার আটজন দাঁড়ী সমবেত ভাবে জলস্রোতকে আক্রমণ করে। সে অক্রমণের প্রচণ্ড বেগের কাছে জলস্রোত পরাভব স্বীকার করে। নৌকা ছিটকে ঘূর্ণীর বাইরে গিয়ে পড়ে, প্রচণ্ড জলস্রোত রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জন করতে থাকে-গোঁ-গোঁ—বসির কাল বিলম্ব না করে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দেয়। প্রবল বাতাসের মুখে পড়ে নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটে চূর্ণী পার হয়ে যায়। এতক্ষণে বসির তার কপালের 'ঘাম' মুছবার অবসর পায়। কোমর থেকে গামছা খানা খুলে নিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সহর্ষে সে বলে ওঠে "দরিয়ার পাঁচ পীর—বদর—বদর"—

—"বেরুল নাকি, ও বসির"—বলতে বলতে বড়কর্ত্তা বাইরে বেরিয়ে আসেন।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তা"—বসির হাসিমুখে উত্তর দেয়।

বড় কর্ত্তা জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলেন "জয় মা জগদম্বা—মা—মা গো"—

এমন সময় ভিতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠে শোনা যায়—"শান্তি কোথায় গেল—শান্তি? সে কি বাইরে নাকি—"

একজন জিজ্ঞাসা করে, "জ্যাঠামহাশয়, শান্তি আপনার সঙ্গে বাইরে গেছে?"

"কই না তো"—

—তবে সে গেল কোথায়—এখানে নেই তো"—

মুহূর্ত্ত মধ্যে রোদনের ধ্বনি শোনা যায়। কোথায় গেল শান্তি? কোথায় গেল তা বোঝে বসির। ঘূর্ণার মধ্যে ঝাঁকানি খেয়ে ছেলে মেয়েরা পড়ে যেতেই, চূর্ণী শান্তিকে গ্রাস করেছে। সে 'টাল' সামলাতে না পেরে একেবারে জলেই পড়েছিল। বসির পাথরের মূর্ত্তির মত 'হাল' ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

চূর্ণী—রাক্ষসী চূর্ণী—বিজয়োল্লাসে ছুটে চলেছে গর্জ্জন করতে করতে মানব-শক্তিকে বিদ্রূপ করে। তীরে কোথায় যেন পূজা বাড়ীতে বাজনা বাজছে—সে বুঝি চূর্ণীর-ই বিজয়বাদ্য।······

গীতায় বর্ণধর্ম্ম

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুদিগের একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। উহা ঈশ্বরের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া অধিকাংশ হিন্দুই বিশ্বাস করেন। ইহার সম্বন্ধে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেন। ইহার অর্থ সম্বন্ধেও অনেক স্থলে অনেক মত প্রকাশ পাইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী ভেদে ইহার ব্যাখ্যারও তারতম্য বিদ্যমান। এ প্রবন্ধে আমি তাহার আলোচনা করিব না। হিন্দুসমাজে বহুযুগ ধরিয়া যে জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে গীতা উহার সমর্থন করেন কি না, সে বিষয়ে এখন একটা জিজ্ঞাসা জন্মিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ধারায় যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা বলেন গীতা জাতিগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন না। প্রাচীনপন্থীরা বলেন আধুনিকদিগের ঐ ধারণাই ভুল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে মহাভারতের অংশ সেই মহাভারতের অন্যত্র স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে "তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যেতদ্ ব্রাহ্মণ্যকারণম্।" (১) "অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে হইলে চাই তপস্যা, চাই বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন, আর চাই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম।" যোনি বা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম বাদ দিলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। অতএব বর্ণবিভাগ জন্মগত এবং ইহা মহাভারতও স্বীকার করিয়াছেন; উহা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—উহাতে বংশের কথা বলা হয় নাই। অতএব উহা ভিত্তিশূন্য অর্থাৎ কুলগত জাতিভেদ গীতার মতে অসিদ্ধ।

গীতায় ভগবান্ কি উদ্দেশ্যে কোন্ কথা বলিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে তিনি কেন অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব অর্জ্জুনের মনে হিংসামূলক যুদ্ধের উপর বীতরাগ ঘটিয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

> ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
> ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া কোন্ শ্রেয়ঃ লাভ হইবে ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব আমি যুদ্ধ-জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না। অর্জ্জুন সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ব্রাহ্মণের মত অহিংসার কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি দুঃখ বরণ করিবেন, তথাপি হিংসাশ্রয় করিবেন না—সমাজের উচ্ছেদসাধক ও অনিষ্টকর, কুলধর্ম্মের নাশক এবং বর্ণ-সঙ্করজনক যুদ্ধ করিবেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ

অর্থাৎ যদি বংশনাশ হয় তাহা হইলে চিরাগত কুলপ্রচলিত ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এখানে অর্জ্জুন কুলগত বা বংশগত আচারাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিতেছেন। বংশ ক্ষুণ্ণ হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। উহা মানব জাতিকে নিরয়গামী বা অধোগামী করে। এখানে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে বর্ণভেদ জাতিগত,—বর্ণভেদ জাতিগত না হইলে বর্ণসঙ্করের শঙ্কা আসিতেই পারে না। শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয় সমাজে দৃশ্যতঃ বংশগত জাতিভেদ নাই। তাহাদের সমাজে

হইল শূদ্র বা বৈদিক ভাষায় শৌদ্র। শূদ্র শব্দের উপর অন্ প্রত্যয় করিয়া শৌদ্র শব্দ হইয়াছে। কারণ, ধরণী পোষণকর্ত্রী। এক কথায় প্রাথমিক জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল প্রাথমিক জীব এই বিশ্বে যে যে গ্রহে আছে, তাহারা সকলেই শৌদ্র বা শূদ্র দেবতা। তাহারাই পূষা। ইহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা—বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের কথা। (২) এখন জিজ্ঞাস্য, শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত ভাগবতী বাণীর ইহা অনুমোদিত কি না? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণসঙ্করের উদ্ভব লোকক্ষয়কর বলিয়াছেন। তিনি তদ্দ্বারা জন্মগত জাতিভেদ সমর্থনই করিয়াছেন। অর্জ্জুন নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া যে শম-দম-ক্ষান্তি প্রভৃতি গুণগুলি সাময়িক ভাবে প্রকটিত করিয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষেই স্বাভাবিক—ক্ষত্রিয়কুলে জাত অর্জ্জুনের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

নির্দোষভাবে অনুষ্ঠিত অন্য বর্ণের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা নিজ বর্ণের ধর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ঃ। কিন্তু অন্য বর্ণের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা, বিপজ্জনক। কেননা, সে কার্য্য তাহার স্বভাবজ নহে। যাহার যাহা-স্বভাবজ বা প্রকৃতিগত নহে, তাহা সে ব্যক্তি অন্তরের সহিত অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তাহাকে অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া কপটাচার করিতে হয়। সেই জন্য উহা অবলম্বন করা বিপজ্জনক। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন, উৎকৃষ্ট পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা নিজ বর্ণগত ধর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করা ভাল; কারণ স্বীয় বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে যাওয়াই মানুষের স্বাভাবিক,—সেই জন্য তাহাকে পাপী হইতে হয় না। অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম কি? গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়বংশে জাত অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করা রূপ ক্ষাত্র ধর্ম্ম পালনই কর্ত্তব্য। আবার বলিয়াছেন "তুমি যদি মনে কর যে আমি আর যুদ্ধ করিব না তাহা হইলে সেটা তোমার অহঙ্কার-প্রসূত সঙ্কল্প,—তুমি ঐ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমাকে তোমার জাতিগত প্রকৃতি অনুসারে বিবশ হইয়া যুদ্ধ করিতেই হইবে!" এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবেই অর্জ্জুনকে জাতিভেদের কথাই বলিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

জন্মগত বর্ণভেদের মূল কথা—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে এ জন্মে জাতিবিশেষে জন্ম হয়। পাতঞ্জল দর্শন বলিয়াছেন,—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

অর্থাৎ গোড়ার কথা—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের পরিণতি অনুসারে জাতি, আয়ু আর ভোগ (সুখ ও ধন প্রভৃতি) হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ সে কথা বলিয়াছেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহারা ধর্ম্মসাধন করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করে, তাহাদের গতি কি হয়? তাহাদের সমস্ত প্রযত্ন কি নষ্ট হইয়া যায়? শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "না! তাহা হয় না। তাহারা পুণ্যকারী লোকদিগের ভোগ্য-স্থানে অর্থাৎ স্বর্গাদিতে বহুকাল বাস করিবার পর আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া কোন সদাচারী ধনবান্ ব্যক্তির বংশে জন্মগ্রহণ করে অথবা তাহারা কোন জ্ঞানবান্ যোগিগণের বংশে জন্মিয়া সিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু এরূপ জন্ম দুর্লভ। (৬।৪১-৪২)। এখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগত বর্ণভেদের কারণ কথাই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া, আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগত জাতিভেদ অস্বীকার করেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছিলেন জন্মগত বর্ণভেদ ভগবানের বা ঈশ্বরের সৃষ্টই বটে, তবে তার কর্ত্তা প্রকৃতি বা মানুষ স্বয়ং। কারণ যে ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করে, তেমনই বংশে তাহার জন্ম হয়। মানুষের মৃত্যুর পর তাহার জীবাত্মা যখন সূক্ষ্মভূতপরিবৃত দেহ লইয়া স্থূলদেহ ত্যাগ করে,—তখন তাহার সূক্ষ্মদেহে এমন একটা ছাপ পড়ে, যাহা হইতে সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে তাহার কি গতি হইবে। সেজন্য চিত্রগুপ্তের খাতা উল্টাইবার প্রয়োজন হয় না। জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে যে, তাহার কি গতি হইবে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" কর্ম্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। কর্ম্মই জাতিবিশেষে জন্মের হেতু হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে-মহাভারতের অংশ, সেই মহাভারতের অন্য কয়েক স্থানেও জাতিগত ও গুণগত ব্রাহ্মণ্যের কথা বলা হইয়াছে। অথচ কেবল জাতিগত ব্রাহ্মণ্য (গুণগত ব্রাহ্মণ্য-বর্জ্জিত) অপেক্ষা গুণগত ব্রাহ্মণ্য অধিক পুরুষার্থ-সাধক ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু কুত্রাপি জাতিগত ব্রাহ্মণ্য বর্জ্জনীয়—এ কথা বলা হয় নাই। বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-অজগর সংবাদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয় না। ব্রাহ্মণে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অক্রূরতা, তপস্যা ও করুণা থাকা চাই। জাতি ব্রাহ্মণে যদি উহা না থাকে তাহা হইলে সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না।

"ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ"

অর্থাৎ শূদ্র হইলেই যে লোক শূদ্র হইবে তাহা নহে, আর (জাতি) ব্রাহ্মণ হইলেই যে সে ব্রাহ্মণ হইবে এমন কথাও নাই। আসল কথা, ব্রাহ্মণে ঐ গুণগুলি থাকা চাই। তাই সর্পরূপধারী নহুষ যুধিষ্ঠিরকে শেষকালে বলিয়াছিলেন যে—

সত্যং দমস্তপোদানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ!

হে যুধিষ্ঠির! সত্য, দম, তপস্যা, দান, অহিংসা এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠাই পুরুষার্থসাধক, জাতি বা বংশ পুরুষার্থসাধক নহে। এখানে নহুষবাক্যে একটা জন্মগত জাতিভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ঐ প্রকার জন্মগত জাতিই পুরুষার্থসাধক অর্থাৎ আত্মার উন্নতিসাধক নহে।

আবার শান্তিপর্ব্বে ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদে বলা হইয়াছে যে-

শূদ্রে চৈতদ্ ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।১১-১৩

অর্থাৎ জাতি শূদ্রে যদি এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, আর ব্রাহ্মণে উহা না দেখা যায় তাহা হইলে কোন জাতিগত শূদ্র শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবে না, আর ঐ জাতি-ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মানিত হইবে না। এখানেও জাতিগত শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের কথা ধরিয়া লইয়া গুণহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গুণবান্ শূদ্রের উৎকর্ষই খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু জাতিগত বর্ণভেদ একেবারে অস্বীকার করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় তাহাই করিয়াছেন। গুণ না থাকিলে কেবল বংশে জন্মহেতু কেহ উচ্চ বর্ণের সম্মান পাইতে পারে না, পরলোকেও তাহার ঊর্দ্ধগতি হয় না। ফলে মহাভারতের যুগে জাতিগত বর্ণভেদ ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ্যের অপকর্ষ ঘটিতে আরম্ভ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ বর্ণসঙ্করের সমর্থন করেন নাই। এখন পাঠক প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিয়া লউন।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই শ্রীকৃষ্ণের সময়ে অর্থাৎ প্রায় চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে কুলক্রমাগত বর্ণবিভাগ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। তখন উহার অবনতির লক্ষণও প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতি তাহাদের স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে আরম্ভ করেন। নহুষ ব্রাহ্মণদিগকে অপমান করাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনেচর হইয়া বাস করিতে বাধ্য হন। ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদেও এই বর্ণধর্ম্মের অবনতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কুত্রাপি বর্ণধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

এ জন্মের ভাঙা ঘাটে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমার রূপের দীপ্তি যৌবনের অরণ্যের তীরে
মায়াজাল করিছে বিস্তৃত।
হে সুন্দরী শকুন্তলা! জানি তব প্রেম চিত্তটীরে
এই যুগে হবোনা বিস্মৃত।
তব সম রমণীর গুপ্ত ছলনার অভিশাপ
পরিচিতজনের বিদ্রূপ
সারস্বত সাধনার পথে পিশাচের আবির্ভাব
বন্ধুত্বের শত্রুতার রূপ
বক্ষে নিয়ে এ জন্মের ভাঙা ঘাটে বসে কাব্য গাঁথি
অতীত যুগের স্বপ্ন দেখি সাথে লয়ে অশ্রু রাতি।

এ শতাব্দী আসিয়াছে ভেঙে দিতে ধরার আদর্শ—
আমি জানি। হেরি দিকে দিকে
মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার,—প্রতিবর্ষ
শয়তানের প্রাধান্যে চলিতেছে,—ইতিহাস লিখে
বিস্ময়ের নূতন ভাষায়
কদর্য্য শিক্ষার গ্লানি,—সুপ্ত শান্তি দুরাশায়।

সাম্প্রতিক শিক্ষাধর্ম্মী মিথ্যাবাদী জুয়াচোর শঠ,
বাহিরে সুন্দর যেন নট!
আচরণে সম্ভাষণে ভদ্রতার পূর্ণ আবরণে
প্রাত্যহিক ঘৃণ্য আচরণে
বিষায়েছে মন। আসে কাছে স্বার্থ লয়ে শত শত,
ব্যাপ্ত করি আশা মরীচিকা,—
সেই সব মানুষের সমুচিত শিক্ষা অবিরত
দিতে মোর জ্বালাইতে চাই চিত্ত শিখা।

এ জন্মের পটভূমে প্রতারণা বন্ধুরূপে আসে,
মানুষের ঘৃণা করি আমি;
যারা নিত্য আসিয়াছে কাছে, তারা ভালো নাহি বাসে
মোর প্রতিষ্ঠা গৌরব। যারা মোর হোলো অনুগামী
আসিয়াছে দ্বারে—
আপন স্বার্থের লাগি বারে বারে।
তুমি আসিয়াছ শকুন্তলা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিয়া,
তাহাদের মত দগ্ধ ক'রে দিতে মোর হিয়া।

এ যন্ত্র-সভ্যতা-পিষ্ট যন্ত্রণার আবেষ্টনী-মাঝে
মোর মত লক্ষ প্রাণী কাঁদে,
মহামারী মন্বন্তরে মহাকাল মৃত্যু সাথে নাচে
তুমি কোন্ আনন্দেতে বীণাখানি লয়ে হাতে
পাশবিক রাত্রিতলে এলে মোরে শুনাইতে গান!
শতাব্দীর রুদ্র অভিযান
ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিয়া তুলিতেছে মনে মনান্তরে
রোমাঞ্চিত বিভীষিকা। অসন্তোষ প্রতি ঘরে ঘরে
ভাবনা বেদনা লয়ে রহি,—
তুমি চাহ ভুলাইতে মন সমবেদনায় কহি
সান্ত্বনার কথা, গানে গানে তব প্রেম আবেদনে
ভাবোচ্ছ্বাসে অধরে অধর আর বাহুর বন্ধনে
দিতে চাও মর্ম্ম-শিহরণ!
শৈবালে চাঁদের আলো ক্ষুব্ধ করে রাতের স্বপন।

শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির ঘাট হতে যদি
ফিরে আসে অতীত সভ্যতা
সেদিন তোমারে হৃদি সমর্পিয়া আমি নিরবধি,
শুনিব তোমারি কণ্ঠে সঙ্গীতের স্নিগ্ধ মধুরতা।
বিশ্বাস করিনা আজ এযুগের কোন মহিমারে,
মহিমা কোথায় আজি মানুষের ঘৃণ্য অবিচারে

মাটি ও মানুষ

শ্রীমনোজ বসু

সেই রাত্রে।

পড়াশুনো চুকিয়ে দিয়ে অমূল্য এখন নিশ্চিন্ত। কাঁধের উপরের জগদ্দল বোঝা নেমে গেছে। সকাল সকাল আজকাল যে শুয়ে পড়ে। বিয়ের আহ্লাদে যমুনা কত কি ভাবছে! তার কথা কি মনে পড়ে এখন? যমুনা আর ও-অঞ্চলের সব মানুষই ভুলে গেছে, এখন যদি গিয়ে দাঁড়ায়--কেউ তাকে চিনতেই পারবে না হয়তো। চিনলেও সম্ভ্রম করে কথা কইবে। মস্ত এক ব্যবধান হয়ে গেছে তার আর গ্রামবাসীদের মধ্যে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল। কত রাত্রি আন্দাজ করতে পারছে না। চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্না ঘরের মেজেয় এসে পড়েছে। আর ঘুম পায় না---কি হল তার কিছুতেই ঘুম আসে না। বড্ড একা লাগছে নিজেকে। কেউ তার নেই এ জগতে, কিছু করবার নেই। বাপ কোথায় পালিয়ে চলে গেল, রায়গ্রাম অষ্টবেঁকি দূরবর্তী হয়ে গেছে, যমুনারও তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আসছে-শ্রাবণে। অট্টালিকায় এক একটা অবাঞ্ছিত আগাছা যেমন যেমন দেখা দেয়, সে-ও তেমনি যেন এই শহরে।

ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসতে যাচ্ছিল জ্যোৎস্না, চিৎকার করতে যাচ্ছিল। অমূল্য বলে, আমি, আমি।

তুমি কি করে এলে এখানে?

পাইপ বেয়ে উঠেছি। খারাপ কিছু নয়। এই আংটিটা দিয়ে চলে যাব।

রাত দুপুরে হঠাৎ আংটি দেবার খেয়াল?

এমনি এমনি। পথে কুড়িয়ে পেয়েছি এটা।

মুঠো খুলে আংটি দেখাল। জহ্লাদকে ঠকিয়ে নিয়েছিল যেটা।

জ্যোৎস্না উঠে গিয়ে সুইস টিপল। আলো ঠিকরে পড়ে ঝিকমিক করছে আংটির উপরের পাথরখানা। তাকিয়ে তাকিয়ে অমূল্যর আপাদমস্তক দেখল সে বার কয়েক। ধোপাই-করা ধুতি পরনে, আর ফিনফিনে পাঞ্জাবি। গায়ে এসেন্সের গন্ধ ভুর-ভুর করছে।

বাঁ-হাতখানা জ্যোৎস্না বাড়িয়ে দিল অমূল্যর দিকে। ভাবলেশহীন মুখ—খুশি হয়েছে কি রেগে আছে, বোঝবার জো নেই। চাঁপার কলির মতো সুগৌর অনামিকাটি তুলে বলল, পরিয়ে দাও আংটি।

পরাতে গিয়ে অমূল্যর হাত কাঁপে। হঠাৎ জ্যোৎস্না অমূল্যর গালে এক চড় মারল সেই আংটি-পরা বাঁ-হাতে। বেশি জোরে না হলেও আঘাত লাগল। রেগেছে কি আদর করছে—ধরা যায় না।

হল তো? ঘরে চলে যাও এবার।

অমূল্য হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোৎস্না তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল, পালাও শিগ্‌গির। নইলে চেঁচাব।

দুয়োর খুলে হঠাৎ ধাক্কা দিল তাকে। সশব্দে খিল এঁটে দিল তার পিছনে।

সকালবেলা অমূল্য ইন্দ্রলালের কাছে গিয়ে বলল, পড়াশুনো আমার হবে না। শুধু অন্নধ্বংস করে কি হবে, আমি চলে যাব।

জ্যোৎস্না সেখানে ছিল, হেসে উঠে বলল, তার মানে বুঝতে পারছ বাবা? বিনি-মাইনেয় থাকতে পারবে না, মাইনে চাচ্ছে কিছু—

অমূল্য রাগ করে বলে, মাইনের গোলাম হয়ে থাকবার হলে নিজেই বলতাম রায় বাবুকে। আপনাকে সুপারিশ ধরতাম না।

জ্যোৎস্না বলে, মাইনেয় হোক, বিনি-মাইনেয় হোক থাকতে হবে তোমাকে। ছেড়ো না ওকে বাবা, ও গেলে একটা দিনও এখানে চলবে না।

রাণীর মতো হুকুম দিয়ে অলক্ষ্যে একবার বাঁকা হাসি হেসে জ্যোৎস্না চলে গেল। অমূল্য রেগে মনে মনে বলে, যাবই—ঠেকায় কে দেখি।

ঘরের দিকে ফিরে আসছে, দেখে জ্যোৎস্না দাঁড়িয়ে। যেন কত অন্যমনস্ক! সে কাছে আসতেই জ্যোৎস্না মুখ ফেরাল।

কি ঠিক করলে—থাকবে তো?

অমূল্য বলে, থাকব কি তোমাদের হুকুমের গোলাম হয়ে?

গালে হাত দিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে জ্যোৎস্না বলে, ওমা মা, কে কবে তোমাকে হুকুম করতে গিয়েছে! সত্যি কথা বলো।

সজোরে ঘাড় নেড়ে অমূল্য বলে, না, মন টিকছে না। ইট-পাথরের শহর আমাদের জায়গা নয়।

মুচকি হেসে জ্যোৎস্না বলে, ইট-পাথরই দেখলে বুঝি শুধু? মানুষও আছে।

অমূল্য চোখ তুলে চাইল। হঠাৎ জ্যোৎস্না হাত চেপে ধরে। না, চলে যাবে না তুমি।

তুমি বলছ?

বলছি, একশ বার বলছি আমি।

তুমি জ্যোৎস্না আমায় এখানে থাকতে বলছ?

হ্যাঁ, বলছি থাকতে, পায়ে ধরে বলতে হবে নাকি? হয়তো বলে—তাতেও রাজি আছি আমি।

আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি এল ইন্দ্রলালের নামে। অভিলাষ কাকে দিয়ে লিখিয়ে পাঠিয়েছে। মিনতি জানিয়েছে, চিরদিনই সে রায় বাবুদের আশ্রিত, যমুনার

বিয়ে উপলক্ষে যদি ইন্দ্রলাল একবার পায়ের ধুলো দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসেন! সাবেকি আমলের কর্ত্তারা বরাবরই এই রকম অনুগ্রহ দেখিয়ে এসেছেন। তখন অবশ্য তাঁরা গ্রামে থাকতেন। কলকাতা শহর থেকে বর্ষার জল-কাদায় গ্রামে যাওয়ার অসুবিধা সে জানে। কিন্তু স্নেহ দিয়ে আস্পর্দ্ধা বাড়ানো হয়েছে, তাই সে লিখতে সাহস করছে।

চিঠি ইন্দ্রলালের বাইরের টেবিলের উপর পড়ে ছিল, যেমন বাজে কাগজপত্র থাকে। ইন্দ্রলাল ভুলেই গেছেন চিঠির কথা। অমূল্যর নজর পড়ল। দেখে সে-ও রেখে দিল। যমুনার বিয়ে সত্যি তা হলে হয়ে যাচ্ছে, তারিখ সাব্যস্ত হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণ-পত্র এসে গেছে।

ক'দিন পরে দরোয়ান মথুর সিং এল রায়গ্রাম থেকে নকড়ি গোমস্তার চিঠি নিয়ে। সে চিঠি অবহেলায় ফেলে রাখবার বস্তু নয়। আগরহাটির মেজো বাবু হরগোবিন্দ কাশীপুর থেকে গ্রামে গিয়েছেন, গিয়েই অনর্থ ঘটিয়েছেন। লোকজন নিয়ে প্রকাশ্য দিনের বেলা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নতুন-চরের বাঁধ কেটে দিয়েছেন তিনি। একেবারে বে-পরোয়া রাগের বশে কাজটা করে ফেলেছেন। এত বড় একটা ব্যাপারের সাক্ষীসাবুদ জোটানো কঠিন হবে না ইন্দ্রলালের পক্ষে, বাপকে জেলে পাঠাবার শোধ তুলবেন এবার এতকাল পরে হরগোবিন্দর উপর,—এ সব আশঙ্কা রাগের মুখে একবারও তাঁর মনে ওঠে নি।

ইন্দ্রলাল রওনা হলেন। থমথমে মুখে দেশের বাড়িতে এসে উঠলেন।

বছরে একবার দু-বার তাঁকে আসতে হয়। কিন্তু এই বর্ষার সময়টা বাদ দিয়ে। পৌষ মাসে চাষীদের যখন সচ্ছল অবস্থা, উঠানে ধানের পালা, গোলা ধানে ভরতি, পুবদেশি ব্যাপারি এসে ঝমাঝম টাকা ফেলে ধান মেপে নিয়ে চলে যায়, তখন রায়গ্রামে এসে চেপে বসেন তিনি। আদায় পত্র পুরাদমে চলে, মাসখানেক থেকে প্রসন্ন মুখে তিনি কলকাতায় ফেরেন। আবার দেখা দেন শেষ-চৈত্রে কিস্তির মুখটায়। বার দুয়েকের এই আসা-যাওয়ায় যা ব্যাঙ্কে ওঠে তাই ভাঙিয়ে কলকাতার বাসাখরচ বারমাস সচ্ছন্দে চলে যায়। সম্প্রতি মোটর কেনাও হয়েছে। দায়ে পড়ে বর্ষায় এবার আসতে হল। চারিদিককার অবস্থা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন অনেক দিন পরে। অন্যান্য বার নকড়ি চিঠি লেখে, চাষীরা খেতে পাচ্ছে না—গোলার চাবি খোলা হবে কি এখন? চিঠির মারফতে ইন্দ্রনাথ হুকুম দেন, আচ্ছা—মানুষ বুঝে বুঝে ধান ছাড়ো এক শলি, আধশলি। খবরদার, একখুঁচিও অনাদায় হলে তোমায় কিন্তু দায়ী করব।

জমিদারির উপরে এই এক বাড়তি আয়ের পন্থা। বর্ষায় ধান কর্জ্জ নিয়ে অগ্রহায়ণে সুদে আসলে দেড়গুণ ধরে দিতে হবে, এদিককার এই রেওয়াজ। পাঁচটা গোলা কড়কড়ে ভরতি হয়ে যায় এই ধান আদায়ের সময়। সুখে আছেন ইন্দ্রলাল। ঈশ্বর রায় ও পূর্ব্বপুরুষেরা কাদামাটি মেখে লাঠিবাজি করে যে অর্দ্ধবর্ব্বর গ্রাম্য জীবন যাপন করতেন, তার তুলনায় কত উন্নত আর কেমন নির্ঝঞ্ঝাট এঁরা! কিছু গণ্ডগোল আছে কেবল নতুন-চরের আবাদটা নিয়ে—

আদালত নতুন-চরের দখল রায়দের দিয়েছে, কিন্তু বিরোধের নিষ্পত্তি একেবারে হয় নি। ঢালিরা সড়কি আর ঢাল-লাঠি অষ্টবেঁকিতে ভাসিয়ে দিয়ে চাষবাস করছে, ভালই আছে তারা—ভাল ধান হচ্ছে, মাছও পড়ে মন্দ নয়। আর এক বিশেষ সুবিধা, যা উৎপন্ন হয়—তার ষোল আনাই প্রায় তাদের। ঈশ্বর রায়ের দয়ায় জমাজমি তারা লাখেরাজ খাচ্ছে, রায়-কাছারিতে এক পয়সাও দিতে হয় না। নকড়ি এসে পড়ে পার্ব্বণী বলে চেয়ে চিন্তে নিয়ে যায় কিছু কিছু—সেটা এমন কিছু ধর্তব্য নয়। এদের ঐশ্বর্য্য দেখে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য চাষীদের চোখ টাটায়। নকড়ির কাছে আকারে ইঙ্গিতে বলেছেও কেউ কেউ, নতুন-চরের যে রকম ফলন হচ্ছে, লোভনীয় খাজনায় তারা বন্দোবস্ত নিতে রাজি আছে। নকড়িরও ইচ্ছা তাই—বুড়ো রায়কর্ত্তা ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে গেছেন বলে চিরকাল তার জের টেনে চলতে হবে, এমন কি কথা হয়েছে? তিনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, এই রকম মূল্যবান্ সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে তৃণহীন লোনা-ওঠা দুধের মতো সাদা-রং ঐ চরের জমি?

নতুন-চরের জন্য বিষম বিপদ হয়েছে আগরহাটি-ওয়ালাদের। ওদিককার মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছে। লোনাজল উঠে চাষের ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে, এজন্য চরের চারিদিকে বাঁধবন্দি করা হয়েছে; চৈত্র থেকে আশ্বিন অবধি দেখতে পাবে চাষীর ঘরের সুস্থ সুপুষ্ট মরদ ছেলেগুলো কোদাল হাতে অহরহ বাঁধের উপর ঘোরাঘুরি করছে;—এখানে বাঁধ ছাপিয়ে যাবার উপক্রম, মাটি ফেলে উঁচু বাঁধ আরও উঁচু করছে, ওখানে জলের চাপে বাঁধের নিচে দিয়ে গুপ্ত জলপথ হয়েছে—তাড়াতাড়ি মাটি ফেলে রন্ধ্র বন্ধ করে দিচ্ছে। রাতেও তারা পালা করে বাঁধ পাহারা দেয়। ভয় আগরহাটির মানুষের। আগে বর্ষায় ও-অঞ্চলের জল সোজা অষ্টবেঁকিতে এসে পড়ত, ইদানীং নতুন চরের বাঁধ হয়ে জলপথ বন্ধ হয়ে গেছে। ধান ডুবে যায়, দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না প্রজাদের। এই জলপথ নিয়ে অনেক মামলা-মোকর্দ্দমা হয়ে গেছে রায় আর ঘোষদের মধ্যে। মীমাংসা হয় তো শেষ অবধি হয়ে যেত, কিন্তু মেজ কর্ত্তার ছেলে প্রণব ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি করল না, কলকাতায় স্বাধীন কন্ট্রাক্টার ব্যবসা ফেঁদে বসল। ব্যবসা খুব বড় হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। তিনটি ভাই ও ছোটকাকাকে টেনে এনে সে ঢুকিয়ে দিল ব্যবসার মধ্যে। দুটো চক বিক্রি করে তারও টাকা লাগানো হল ব্যবসায়ে। সম্পত্তি ছেড়ে ব্যবসায়ে তখন মন গিয়েছে ওদের। কাশীপুরে বাড়ি তৈরি হল। রায়-গ্রামের মতোই তালা পড়ল আগরহাটি ঘোষদের বাড়িতেও। খবর শুনে ইন্দ্রলাল সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন; আর্থিক মুনাফা না থাকলেও ইজ্জতের খাতিরে নতুন চরের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল। এবার ওঁরাও বিদেশবাসী হলেন, ও-তরফের উৎসাহ কমে আসবে এখন থেকে। হলও ঠিক তাই। জলপথ সম্পর্কে হরগোবিন্দ এস. ডি. ও.-কে ধরাধরির বন্দোবস্ত করছিলেন,

সে আয়োজন মাঝপথে থেমে গেল। তিনটে চারটে মামলা দায়ের করা ছিল, খারিজ হয়ে গেল তদ্বিরের অভাবে।

গোলযোগ তবু একটু-আধটু হত, সে তেমন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আগরহাটির চাষীরা রাতের অন্ধকারে পাহারার ফাঁকে কখন কখন দু-এক কোদাল বাঁধের মাটি কেটে জল বেরুবার পথ করে দিয়েছে। নকড়ি পরদিন অষ্টবেঁকি পার হয়ে গিয়ে তাই নিয়ে তম্বি করত খুব, ফৌজদারির ভয় দেখাত। শেষ অবধি টাকাটা সিকিটা নিয়ে মিটমাট করে দিয়ে আসত।

এমনি চলছিল। এমন সময় মেজকর্ত্তা আগরহাটি এলেন অভিলাষের অনুরোধে পড়ে। বিষম খাতির অভিলাষের সঙ্গে—জনশ্রুতি, যমুনার বিয়ের সমস্ত খরচ মেজকর্ত্তাই নাকি বহন করছেন। প্রজারা দল বেঁধে এসে কেঁদে পড়ল, হরগোবিন্দ তাদের সঙ্গে অবস্থা দেখতে গেলেন। মর্মান্তিক অবস্থা সত্যিই, ভিটের পর্যন্ত জল উঠেছে, ভাসা-বাদার সাপ গিয়ে উঠছে ঘরের ভিতর। পুরানো কালের আক্রোশ হরগোবিন্দর মনে জেগে উঠল। নতুন চর নিয়েছে, আর ফাউস্বরূপ অনাবাদি আগরহাটিও গিয়ে পড়বে নাকি ওদের খপ্পরে? অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে নিজে দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়ে নতুন চরের বাঁধ এ-মুখে ও-মুখে তিনি কাটিয়ে দিলেন। জলস্রোত তীব্রবেগে নদীতে নেমে চলল, সতেজ ধান-চারা স্রোতের তলে ডুবে গেল। জল সরে গেলে দেখা গেল, কাদায় মাখামাখি হয়ে ধান-বনের এমন অবস্থা যে সিকি ফলনও হবে না এবার নতুন চরের আবাদে।

নকড়ি সালঙ্কারে আনুপূর্বিক কাহিনী বলছিল, গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন ইন্দ্রলাল। উপসংহারে সে মন্তব্য করে, এক পয়সা মুনাফা নেই—রায়কর্ত্তা দফা নিকেশ করে গিয়েছেন—এ ল্যাটা কাঁহাতক টেনে বেড়ানো যায় বলুন?

মুখে নকড়ি বেদনা আর শঙ্কার ভাব দেখায়, মনে মনে কিন্তু বিষম খুশি। পুরানো কালের কথা মনে পড়ছে, যখন নতুন চর দখল করা হয়। তারই পুনরাবৃত্তি হবে নাকি আবার? লাঠালাঠি—দেওয়ানি, ফৌজদারি—উকিল-মোক্তার এমন কি আদালত-বাড়ির টিকটিকিটির অবধি পেট ভরানো? ভাল রকম গণ্ডগোল বাধলে তবেই না দু-চার পয়সার প্রাপ্তিযোগ ঘটে আশ্রিত অনুগত প্রতিপাল্যগণের?

ঢোলের বাজনা আসছে অনেক দূর থেকে। উৎকর্ণ হয়ে একটুখানি শুনে ইন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন, আওয়াজ ওধার থেকে আসছে না? অভিলাষের বাড়ি থেকে?

নকড়ি বলে, আজ্ঞে হাঁ। তার মেয়ের বিয়ে আজ। সিধে পৌঁছে গেছে যে, বিস্তর জিনিষ পাঠিয়েছে। মানুষ যা-ই হোক—মনিব-মহাজনের উপর ভক্তি আছে অভিলাষের। দেখে যান, ঐ যে সব রয়েছে—

চাল-দেওয়া রোয়াকের উপর সিধের জিনিষপত্র সাজিয়ে এনে রেখেছে। ইন্দ্রলাল নকড়ির সঙ্গে দেখতে এলেন। ধামা-ভর্তি সরু সুগন্ধ সীতাশালি চাল, আলু-পটোল ও নানাবিধ তরকারি, বারকোশে ভাগে ভাগে মশলা, ছুটো ঘটির একটায় তেল একটায় ঘি, পিতল-কলসিতে দুধ, প্রকাণ্ড এক কাতলামাছ কানকোয় দড়ি দিয়ে ঝোলানো—নকড়ি অভিলাষের এত তারিপ করছে অকারণে নয়।

ইন্দ্রলাল বললেন, আমাদের আইবড়ভাত নিয়ে চলে গেছে?

নকড়ি বলে আজ্ঞে না—বেলা হয়ে গেছে, বিকালে পাঠালেই হবে।

এখনই পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আর সিধেও ফেরত পাঠিয়ে দাও সেই সঙ্গে।

নকড়ি বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল। সিধে ফেরত দিয়ে এত বড় একজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার অপমান করা—এ কি রকম কথা বলছেন ইন্দ্রলাল। বিশেষ নূতন বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠেছে যখন আগরহাটি ও রায়গ্রামের মধ্যে!

শেষে মরীয়া হয়ে সে বলল, সিধে ফেরত না দিয়ে অভিলাষ লোকটাকে হাতে রাখা ভাল কিন্তু, হুজুর। বেটা এক নম্বর হারামজাদা—চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে।

জানি। হাতেই রাখতে হবে ওকে।

তারপর হেসে ইন্দ্রলাল বললেন, যা বললাম, এবেলাই সমস্ত পাঠিয়ে দাও নকড়ি, ওবেলার জন্য ফেলে রেখো না।

বলে তিনি উপরে উঠে গেলেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে সাজসজ্জা করে ছড়ি দোলাতে দোলাতে ইন্দ্রলাল নামলেন। বলেন, চাদর-টাদর কিছু কাঁধে ফেলে নাও নকড়ি। চলো—

কোথায়?

ওপারে, বিয়ে বাড়ি—

নকড়ি ইতস্তত করে। ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? গেলে কিন্তু না খাইয়ে ছাড়বে না।

বেশ তো, নেমন্তন্ন করে গেছে—খাওয়া-দাওয়া করেই আসা যাবে। আয়োজন তো ভালোই শুনছি, খাওয়াবে ভালো!

যেতে যেতে নকড়ি বলল, আগরহাটির ঘোষমশায় গিয়ে এতক্ষণ চেপে বসেছেন হয়তো। অভিলাষ মুখে বলে যায়, বাবুদের আশ্রিত, কিন্তু দহরম-মহরম তার আগরহাটির সঙ্গে। ঐ যে রাজসূয় যজ্ঞের মতো সিধে পাঠিয়েছিল—খরচপত্র সব জোগাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি ঘোষ মশায়।

ইন্দ্রলাল সশরীরে আসবেন, অভিলাষ স্বপ্নে ভাবতে পারে নি। সে বরঞ্চ আশা করা যেত ঈশ্বর রায় হলে। অভিলাষ তটস্থ হল। কি করবে, কোথায় নিয়ে বসাবে ভেবে পায় না। আর এক মহা মুশকিল, হরগোবিন্দ সত্য সত্যই ভাব বাড়িতে। চটি ফটফট করে করে খোলা গায়ে তিনি তদারক করে বেড়াচ্ছেন, নিমন্ত্রিতদের যথারীতি যাতে অভ্যর্থনা হয়, খাদ্যবস্তুর অকুলান না পড়ে, বিয়ের ব্যাপার সুলক্ষণের মধ্যে নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে যায়। ইন্দ্রলাল ঐ অবস্থায় হরগোবিন্দকে দেখতে পাবেন, অনুমান করে ফেলবেন অভিলাষের বিশেষ সম্পর্ক আগরহাটির সঙ্গে—এই এক বিষম ভয় ও সঙ্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল তার কাছে। এমনি সময় হুঁকো টানতে টানতে ভোজ-সভায় পাতা করবার নির্দ্দেশ দিতে হরগোবিন্দ বেরিয়ে এলেন। ইন্দ্রলালকে দেখে প্রসন্ন হলেন না

তিনি—হুকুম দিয়ে তিনি বাঁধ কাটিয়েছেন, পরবর্তী যা কিছু কথাবার্ত্তা ফৌজদারী আদালতেই হবে। মুখ ফিরিয়ে হরগোবিন্দ চলে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রলাল আপ্যায়ন করে ডাক দিলেন, ঘোষ মশায় যে। কবে এলেন কলকাতা থেকে ?

অগত্যা হরগোবিন্দকেও বলতে হল, রায় মশায় নাকি ?

অভিলাষ ছুটোছুটি ক'রে দুটো জলচৌকি পাশাপাশি এনে পেতে দিল।

গলা খাকারি দিয়ে ইন্দ্রলাল বললেন, নকড়ি বলছিল—আপনাদের আগরহাটির তো জল-নিকাশ হয় না, অনাবাদি জায়গা—যা হোক কিছু নিয়ে ছেড়ে দিন না আমাদের। এক ঘেরির মধ্যে পুরে ফেলব, প্রজাদের আর অসুবিধা থাকবে না।

হরগোবিন্দর চোখ জ্বলে উঠল। বললেন, আপনিই বরঞ্চ নতুন চরটা বেচে দিন। লোকজন ডেকে বাঁধ কাটবার দরকার হবে না তা হলে আমার।

ইন্দ্রলাল বললেন, রাগ বা জেদাজেদির কথা নয় ঘোষ মশায়, ভেবে দেখুন জিনিষটা। ইংরেজ-জার্ম্মানির এত বড় লড়াই খতম হয়ে গেল, আমাদের হাঙ্গামা মিটবে না ? বলছি, শুনুন। আগরহাটির আবাদ আপনি আপনার ছেলের নামে লেখাপড়া ক'রে দেন। আর নতুন চর আমি লিখে দিচ্ছি আমার ছোট মেয়েকে। তারপর প্রণব আর জ্যোৎস্না—ওরা দু'জনে ভেবে দেখুক গে কোন মীমাংসায় আসতে পারে কি না ? কি বলেন আপনি আমার প্রস্তাবে ?

সশব্দে ইন্দ্রলাল হেসে উঠলেন। কথাটার অর্থ প্রণিধান করে হরগোবিন্দও হাসতে লাগলেন।

অভিলাষ যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। ছানা, দই, মিষ্টি ইত্যাদি সহযোগে আকণ্ঠ ফলাহার করে গভীর রাত্রে ইন্দ্রলাল ও হরগোবিন্দ পরস্পর বিদায় নিলেন, তখন তাঁরা প্রায় অভিন্ন-হৃদয় হয়ে উঠেছেন।

হরগোবিন্দ বললেন, কলকাতায় ফিরেই আপনার বাসায় গিয়ে মাকে পাকা দেখা দেখে আসব। শুভকর্ম্ম প্রথম অঘ্রাণে। শুকনার সময়—সবদিকে সুবিধা, জিনিষপত্র মিলবে। দু-দশ জন মানুষ বাড়ি ডেকে আনতে অসুবিধা রবে না কোন রকম।

ইন্দ্রলাল খুসিমুখে বললেন, খুলে বলছি তা হ'লে শুনুন। আপনার কাশীপুরের বাড়িতে প্রণব বাবাজির কাছে যাতায়াত করতাম—সে কেবল আমার নতুন বাড়ি হবে, সেজন্য নয়। তারজন্য আরও কত ফার্ম্মই তো রয়েছে আমার জানাশোনার মধ্যে। তলে তলে এই মতলব ছিল, আমার অনেক দিনের সাধ, বেহাই মশায়—

কলকাতায় ফিরলে প্রভাবতী বললেন, বনমালী বুড়োর খবর পাওয়া গেল এদ্দিনে।

ইন্দ্রলাল বললেন, কোথায় সে ? আবার এসেছে নাকি এ বাড়ি ?

না হাজতে রয়েছে এখন। মামলা উঠবে শিগগির। তারপর ভারি গলায় প্রভাবতী বললেন, আহা—কি মারটাই যে মেরেছে বুড়ো মানুষটাকে !

নিস্পৃহ কণ্ঠে ইন্দ্রলাল বললেন, মারবেই তো। যে রকম স্বভাব ! মেরে ফেলেনি যে তার ভাগ্যি।

মদের দোকানে পিকেটিং করছিল। কতকগুলো মাতাল জুটে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। খোঁড়া মানুষ, পালিয়ে যেতেও পারে নি—

সবিস্ময়ে ইন্দ্রলাল বললেন, বলছ কি ? বনমালী করল মদের দোকানে পিকেটিং ? তাড়ি না হলে যার ঘুম হত না রাত্রে ? তাজ্জব ব্যাপার।

প্রভাবতী বললেন, আরও তাজ্জব শোন। হাতে লাঠি থেকেও লাঠিটা সে উঁচু করেনি। চুপ করে পড়ে পড়ে মার খেল। হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম আমরা—অমূল্যর নাম করে নি, আমার নাম করে আমায় দেখতে চেয়েছিল কেবল।

আঁচলের প্রান্তে প্রভাবতী চোখ মুছলেন।

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠল এই সময় রাস্তার উপর। জানলা দিয়ে দেখা গেল, লরী বোঝাই করে নিয়ে চলেছে—নির্ভীক তেজোমূর্ত্তি ছোকরাগুলো। ইংরেজ-জার্ম্মানির যুদ্ধ মিটে গেছে, কিন্তু তারপর এই বিষম কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে দেশের মধ্যে।

ইন্দ্রলাল ভাবছেন, এ কি হয়ে উঠল দিনকে দিন। মানুষ আর ভয় মানে না। নিরস্ত্র এরা নির্ব্বিবাদে শুধু পিটুনি খেয়ে আর 'বন্দেমাতরম্' বলে ইংরেজকে জব্দ করবে ভেবেছে ? বোকা—সব বোকার দল। ক্রমশঃ

বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের সক্ষমশিল্পী—মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরত্ন

আমাদের অনেকের বদ্ধমূল ধারণা এই—রামমোহন রায় মহাশয়ই বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের জনক। এই ধারণার উৎপত্তি—মাতৃভাষা তথা বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধিৎসা ও অনুসন্ধানের অভাব। বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের দ্বারা। ইহাদের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে উক্ত কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পাদরী উইলিয়ম কেরীর নামোল্লেখ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

আমি প্রথমে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

অনুমান ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম হয়। মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকা হেতু বোধহয় শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম প্রচারক পাদরী মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে a native of Orissa বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয় কুলীন বাঙালী ব্রাহ্মণ ও চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূত ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের সময়ের মেদিনীপুরে এক ভাগ বাংলা, এক ভাগ হিন্দী, এবং এক ভাগ উড়িয়া—এইরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। নবজীবন ও সাধারণীর সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যসেবী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ১২৯৫ সালের মাঘ-সংখ্যা "নবজীবনে" মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, রাজসাহী জেলার মহকুমা নাটোরে সেখানকার রাজ-সভার সভাপতির নিকট মৃত্যুঞ্জয়ের বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। কৈশোরে নাটোরে এবং যৌবনে কলিকাতায় মৃত্যুঞ্জয় অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৮০০ খ্রীঃ তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের গোড়া-পত্তন করেন। ঐ কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরী উইলিয়ম কেরী। মৃত্যুঞ্জয় কেরী সাহেবের অধীন বাংলা-বিভাগের প্রধান-পণ্ডিতরূপে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

তৎকালে উক্ত কলেজের ছাত্রগণকে (ইহাদের মধ্যে সকলেই ইংলণ্ড হইতে নবাগত সিভিলিয়ন) পড়াইবার উপযুক্ত বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া দেশীয় পণ্ডিতদিগকে বাংলা গদ্য রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। মৃত্যুঞ্জয় কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে "বত্রিশ সিংহাসন" রচনা করিয়া কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ২০০৲ টাকা পারিশ্রমিক লাভ করেন।

মৃত্যুঞ্জয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ৬ খানা বাঙ্গলা গদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালে তাঁহার সমস্ত পুস্তকই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলী ও An Apology of Hindoo Worship written in the Bengali Language and accompanied by an English Translation ও বেদান্ত চন্দ্রিকা এই ৫ খানি বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন—কেবল প্রবোধচন্দ্রিকা ঐ সময় মধ্যে রচিত হইলেও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে—শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ৩টী সংস্করণ হইয়াছিল, ইহা হইতে পুস্তকটি যে বাঙ্গলা দেশে আদৃত ও বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে যুগে ঐ পুস্তকের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের প্রথম বাঙ্গলা-গদ্য পুস্তক "বেদান্ত-গ্রন্থ" প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের পূর্ব্বগামী। রামমোহনের পূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয় ব্যতীত রাম রাম বসু, উইলিয়ম কেরী, গোলকনাথ শর্ম্মা, রাজীব-লোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বাদশজন লেখকের নাম জানিতে পাওয়া যায়, যাঁরা বাংলা-গদ্য-সাহিত্য-সৌধ-নির্ম্মাণে সমুদ্র-বন্ধনে কাঠ বিড়ালীর ন্যায় সহায়তা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের সংখ্যা, রচনার শিল্প-নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের বিচার করিতে গেলে মৃত্যুঞ্জয়কেই বাংলা গদ্য সাহিত্যরূপ প্রাসাদ রচনার শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনিয়রের পদবী না দিয়া পারা যায় না। তাঁহার রচনায় সক্ষম-শিল্পি-সুলভ যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তৎকালের কোন লেখকের লেখাতেই ছিল না। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন ষ্টাইল বা ভঙ্গিতে লেখা। আবার একই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ষ্টাইলের পরিচয়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা গদ্যের সাধু ও চলতি এই উভয় রীতি লইয়াও মৃত্যুঞ্জয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

আমরা নিম্নে তাঁহার "বত্রিশ সিংহাসন" হইতে তাঁহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।

বত্রিশ সিংহাসন—২৭ পৃষ্ঠা।

"হে মহারাজ, শুন, রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত, মাংস, মল-মূত্র, নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্রমিত্রকলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয়। অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয়। প্রীতি যেমন সুখ-দায়ক, বিচ্ছেদ ততোধিক দুঃখদায়ক হয়। অতএব নিত্য বস্তুতে মনোনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নন। তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার-কারাগার মুক্ত হয়।

আবার বত্রিশ সিংহাসনের অন্যত্র আমরা ভিন্ন ধরণের ভাষা দেখিতে পাই।

যথা—"এইকালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল। ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন। সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল—হে রাজপুত্র, কিছু ভয় নাই—উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন।"

এইবার মৃত্যুঞ্জয়ের "হিতোপদেশের" ভাষার নমুনা লউন—

"টিটিভি হাসিয়া কহিল—হে স্বামী তোমাতে আর…… সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর। টিটিভ কহিল—যে লোক জানে না অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি নাই সে দুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না। আর যার বুদ্ধি আছে, সে কষ্টেতেও অবসন্ন হয় না। অনুপযুক্ত কার্য্যের আরম্ভ, ও অন্তরঙ্গের সহিত বিরোধ ও বলবানের সহিত আস্পর্দ্ধা ও স্ত্রীলোকদিগেতে বিশ্বাস---এই চারি, মৃত্যুর দ্বার। অনন্তর পতির বাক্য হেতুক সে ঐ স্থানেতেই প্রসব হইল।"

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা কিরূপ তেজস্বী ও প্রাঞ্জল—এইবার তাঁহার "রাজাবলী" হইতে তাহার প্রমাণ দিতেছি :—

"যে সিংহাসনে কোটী কোটী লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন---সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল—যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নালঙ্কারধারীরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত-সর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারী রাজারা বসিতেন—সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল।… যে সিংহাসনস্থ রাজাদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল।"

প্রবোধ চন্দ্রিকার একস্থানে আছে :

হে ঈশ্বরদর্শী মুনি, বহুকাল ব্যতীত হইল, আমি তপস্যা করিতেছি। তপঃসিদ্ধি হয় না। কতকালে আমার তপঃসিদ্ধি হইবে---ইহা আপনি ঈশ্বর সমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা করিবেন। … … ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন---ঐ তাপসের তপোবনোপকণ্ঠে যে অতি বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে, সে বৃক্ষের যত পত্র, ততশত বৎসরে তার তপস্যাসিদ্ধি হইবে।"

আবার প্রবোধ চন্দ্রিকার অন্য একস্থানে অতি সাধারণ চল্‌তি ভাষা ব্যবহৃত দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়।

তাহার নমুনা :

"ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল---তবে কি আজি খাওয়া হবে না---ক্ষুধায় কি মরিব? তৎপত্নী কহিল---মরুকম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়। দেখি দেকি হাঁড়ি কুড়ি,---খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদ-কুঁড়া আনিয়া বাঁটিতে বসিয়া কহিল—শীলটা ভাল বটে, লোড়াটা যা' ইচ্ছা তা, এতে কি চিকন বাঁটা হয়। মরুক, যেমন হৌক, বাঁটি ত'। ইহা কহিয়া খুদ-কুঁড়া বাঁটিয়া কহিল—বাঁটা ত' এক প্রকার হইল—আলুনি পিঠা খাইব, না লুণ-তেল আনিতে হইবে। গতি-ক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল---ওরে বাছা ঠক,---তৈল-লবণ কোথা হইতে গোছে-গাছে আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়্‌শীর এক ছালিয়াকে---'আয় আমার সঙ্গে, তোকে মোয়া দিব' এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদীর দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল-লবণ লইয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল---কিরূপে তৈল-লবণ আনিলি? ঠক কহিল--এক ছোড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদিশালাকে ঠকিয়া আনিলাম। ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল---হাঁ মোর বাছা, এই ত' বটে, না হবে কেন, আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল---ওলো মাগি, যা, যা, শীঘ্র পিঠা করিগা, ক্ষুধাতে বাঁচিনা।" ২৬০।৬১ পৃষ্ঠা।

এই ভাষা শুনিয়া আপনারা হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন—নয় ত' লজ্জায় মরিয়া যাইবেন।

আবার ঐ প্রবোধ চন্দ্রিকার ২৭১-৭২ পৃষ্ঠা পড়ুন। কিরূপ উৎকট ও কটমট সংস্কৃত ভাঙ্গা বাঙ্গলা! যথা—

"দক্ষিণদেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজ-রাজী-শিরোরত্ন-রঞ্জিত-চরণ 'উজ্জয়িনী-বিজয়'-নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীর-কেশরী নামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন-ভ্রমণ-জনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণি-স্তন-সুন্দর ইন্দীবর কৈরব-কোরক সুন্দরী-মুখ-মনোহরান্দোলিতোৎফুল্ল-রাজীব—নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জল-পুষ্করিণী-তট-স্থলে বট-বিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘ-কালীন দিবাবসান সময়ে বট-জটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজ-ভৃত্য-জন-সমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজ-দ্বার-স্থিত ঘটী-যন্ত্রস্থ দণ্ড-তাম্রী-তুল্য দিবাকর জল-নিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন।"

মৃত্যুঞ্জয় বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের আদিযুগে-ও সেকালের কথ্য ভাষায় গদ্য রচনায় দুঃসাহসী হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন—টেঁকচাঁদ ঠাকুর তথা প্যারীচরণ মিত্র মহাশয়, প্রথম কথ্য ভাষায় তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" লেখেন! এখন প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য অনুসন্ধানের ফলে জানা যাইতেছে যে টেঁকচাঁদের বহুপূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয়ই সর্ব্বপ্রথম কথ্য ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই রচনা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইলেও ইহা যে সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে, সওয়া শত বর্ষ পূর্ব্বেও মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যিক প্রতিভা উচ্চদরণের ছিল এবং তিনি সাহিত্যের একজন শিল্পী ছিলেন—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

নিম্নে প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে মৃত্যুঞ্জয়ী কথ্য ভাষার নমুনা দেওয়া গেল। আর এই বর্ণনা হইতে সেকালের দারিদ্র্যের একটী মনোহর চিত্র আমরা দেখিতে পাইব। প্রবোধ চন্দ্রিকার ২৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় আমরা যে কথ্য ভাষার নমুনা পাই তাহা এই ;—

"মোরা চাস করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা-হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি। কেবল উড়িধানের মুড়ি, মটর-মসুর শাক-পাত শামুক-গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড়-কুটা কাটা শুকনা পাতা, কফি, তুঁষ, ও বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি, তুলা করি, ফুড়ি পিঁজি, পাঁইজ করি, চরকাতে সুতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া ফল ফুলারিটা যা পাই, হাটে বাজারে মাথায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিনুষ্য পাড়া-পড়্‌সীদের মুনিস খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায়, তাহাতে তাঁতীর বাণী দি, ও তেল-লুণ করি, কাটনা কাটি, ভাড়া ভানি, ও সিজাই শুকাই ভাণি, ক্ষুদ-কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক-পাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই, সেদিন ত' জন্মতিথি। শীতের দিনে কাঁথাখানি ছেলিয়াগুলিকের গায় দি। আপনারা দুটী প্রাণী বিচালি বিছাইয়া

পোয়ালের বিড়ায় মাথা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন-গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা-পিতলের বালা, তাড়, মল, খাড়ু, গায় পরিতে পাই—তবে তো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা-শুকা হইলেও আপনার রাজস্বের কড়া-গণ্ডা-ক্রান্তি-বট-ধূল—ছাড়ে না। এক আদদিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয়, তবে তার সুদ দাম দান বুঝিয়া লয়—কড়া-কপৰ্দ্দকও ছাড়ে না।

যদি দিবার যোত্র না হয়, তবে সানা, মোড়ল, পাটোয়ারি, ইজারদার, তালুকদার, জমিদারের পাইক, পেয়াদা পাটাইয়া হাল-যোঁয়াল-ফাল, হালিয়া বলদ-দামড়া, গরু বাছুর-বকনা, কাঁথা, পাত্‌রা, চুপড়ী, কুলা, ধুচনী পর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না। কতো বা সাধ্য-সাধনা করি, হাতে ধরি, পায় পড়ি, হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখের উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা, আমাদের কপালে এত দুঃখ লেখিস। তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।"

উপসংহার

আজ হইতে ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয় পরলোকগমন করিয়াছেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে, এই স্বল্পকালের ব্যবধানে আমরা মৃত্যুঞ্জয়কে ভুলিতে বসিয়াছি বা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা আত্মবিস্মৃত ও অনৈতিহাসিক জাতি----কাজেই এই বিস্মৃতি আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের গুণমুগ্ধ ভক্ত সম্প্রদায় যে তাঁহার কীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় করিবার সুযোগ পান নাই----সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ব্রজেন বাবু বলেন: ইহার ২টী কারণ হইতে পারে। এক, ইউরোপের নূতন ভাবধারা আসিয়া বাঙালী সমাজকে ঠিক এই সময়ে এমনভাবে আলোড়িত করে যে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সমাজ যখন সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, মৃত্যুঞ্জয় তখন বিস্মৃতপ্রায়। নূতনের পূজারী যাঁহারা, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষামত প্রথমটা পুরাতনকে উপেক্ষা করিয়া নূতনকেই সর্ব্বপ্রকার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-গৌরবও মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি যাঁহারা সত্যকার অধিকারী, তাঁহাদিগকে না দিয়া পরবর্ত্তীদের স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনেও ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ—এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গত কারণ এই যে, মৃত্যুঞ্জয় কেবলমাত্র "অভিনব যুবক সাহেব জাতে"র নিমিত্ত রচিত পাঠ্য----পুস্তকের লেখক, এই ধারণাই প্রচলিত থাকাতে সে যুগের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার রচনার সহিত পরিচিত হন নাই। তাঁহাদের প্রশংসাপত্র ব্যতিরেকে সে যুগে কিছুই চলিত না। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ও সাধারণভাবে চলেন নাই। এতদিনেও যে এই ভুল ভাঙ্গিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইহাও মন্দের ভাল!

মৃত্যুঞ্জয় আজিকার দিনে যত অজ্ঞাতই হউন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদার্দ্ধে তাঁহার তুল্য সম্মাননীয় পণ্ডিত দ্বিতীয় ছিলেন না এবং তিনি সর্ব্বপ্রথম অব্যবহৃত অপ্রচলিত এবং সদ্য গড়িয়া তোলা বাংলা গদ্যের একটা সচল মহনীয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যে ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আজ আমরা বিশ্ব-সংসারে গৌরব করিতেছি—সে দিন সেই অপোগণ্ড ভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনার চিত্র তাঁহার মানস-নেত্রেই প্রতিভাত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে বাংলা গদ্যের সেই মৃত্যুঞ্জয়-ইতিহাসের সূত্রপাত হইয়াছে।

চন্দন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সকল শক্তি ক্রমশঃ পেতেছে ক্ষয়,
এ ক্ষয়ে আমার আনন্দ উপজয়।
মোর দেহ প্রাণ তোমার পূজায় লাগে,
চরণ সেবনে, পূজনে, অঙ্গরাগে।
চাঁদের মতন আলো দিয়ে দিয়ে ক্ষয়,
ক্ষয়ী আমি ধীরে হইতেছি অক্ষয়।
আমার যা কিছু সবটুকু চন্দন,
সব দিয়ে আমি করি তব বন্দন।

ভাগ্য কম্মফলের কি গৌরব?
আমার যা আছে তোমার হউক সব।
শিশির যেমন মহাসমুদ্রে মেশে,
উবে কর্পূর দেবমন্দিরে এসে—
অন্য আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই
নিঃশেষ হয়ে তোমাতে মিশিতে চাই।
আমার যা কিছু সবটুকু চন্দন
সব দিয়ে আমি করি তব বন্দন।

মানুষ

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

বিচিত্র পথের দিশা। কোথাও বাতাসের দোলায় শালবন খসিয়া উঠিয়াছে, কোথাও ফজলীর উন্নত শাখা-চূড়ায় বেলা শেষের স্তিমিত সূর্য্যালোক পড়িয়া ঝিকমিক্ করিতেছে কচি পাতাগুলি। কাছে দূরে দেখা যায় ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত চাষি-কুটীর। কোনোটি বা কোনো সাঁওতাল-দম্পতির কোনো সুখ-নীড়ও হইবে বা! শালপাতার ছাউনিতে মাটির দেওয়াল, কাদার গাঁথুনি ধ্বসিয়া গিয়া কোথাও বা কঙ্কালের মতো বাঁশের ফালি বাহির হইয়া আসিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে এই পথে আসিয়াই এক সময় চন্দনলাল আশ্রয় নিয়াছিল। বিশীর্ণ চেহারা, বঙ্গরক্তে অনেকটা বাঙালী আকৃতি মিশানো: আধভাঙা বাংলায় স্বজাতি-সুর অনেকটা মিষ্টি শুনায় চন্দনলালের কণ্ঠে। কিন্তু তার সত্যিকারের জাতটা সে নিজেও জানে না। নাম মিলাইয়া লোকে বলে— শ্যমা বাঙালী, আকৃতি মিলাইয়া বলে—সাঁওতাল। কিন্তু আসলে কোনো জাতের উপরেই তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নাই, আত্মিক আকর্ষণ তো অনেক দূরের বস্তু। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "জাত ধুয়ে জল খাবো; বেঁচে আছি, এই তো যথেষ্ট।" কিন্তু সংসারে বাঁচিয়া থাকিতেই যে জাতি-ধর্ম্মের বিচার সকলের আগে আসিয়া দাঁড়ায়, এ কথা চন্দনলাল ভাবিতেই পারিত না। আজকাল সে-প্রসঙ্গ অবশ্য লোকের কাছে অবান্তর হইয়া গিয়াছে।

ভোর হয় দেবী-মণ্ডপের অন্তরাল হইতে ভাসিয়া আসে প্রভাত-মন্ত্র আর শঙ্খধ্বনি। মানতের ভোগ জমিয়া ওঠে ততক্ষণে সোপান-শ্রেণীতে। সর্ব্বমঙ্গলা দেবী চণ্ডী: সোনার অলঙ্কারে জ্বল জ্বল করিতেছে তৈলসিক্ত মূর্ত্তি। মাঝিপাড়ার লোকের মনস্কামনা অপূর্ণ থাকিবে না। উৎসর্গের ছাগ-শিশুর মতই দলে দলে স্ত্রী-পুরুষের ভিড় জমিয়া যায় মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে। অলক্ষ্যে কখন লালাসিক্ত হইয়া ওঠে পুরুতের ক্ষুধিত জিহ্বা। এ-দিকটায় উত্তর-দক্ষিণে মনোহারী আর মুদিখানা। সামনের প্রশস্ত পথ দিয়া ঘাঁটালের বাস আসিয়া ঘুরিয়া যায়। পূবমুখি ঢালু পুকুর ঘেঁষিয়া থানার বড়বাবুর কোয়ার্টার। কখনো বা হাবিলদারের হুঙ্কারে পুকুরের জল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া ওঠে। কিন্তু বড়বাবু নিতান্ত মাটির মানুষ। বীরেশ্বর ভঞ্জ। মাঝিপাড়ার রাজদ্রোহীরা জানে—বৃহত্তর একটা কিছু আন্দোলন করিয়া ধর্ম্মঘট আর হরতাল করিলেও বীরেশ্বর ভঞ্জের ডায়রীর পাতায় কলমের দাগটি বসিবে না। দেখা হইলে কাছে ডাকিয়া দুই টুক্‌রা মাখন-রুটি হাতে তুলিয়া দেন চন্দনলালের। দূরে দাঁড়াইয়া হিংসায় জ্বলে হাবিলদার—রাম তেওয়ারী।

তেলে আর জলে কখনও মিশ খায় না; কিন্তু আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, বাস্তবিকই বীরেশ্বর ভঞ্জ একটু যেন কৃপার দৃষ্টিতেই দেখিয়া ফেলিয়াছেন চন্দনলালকে। এখানকার মানুষ যারা দিনরাত্রি চারিপাশে বিচরণ করে, তারা কেউ বা ভয় কেউ বা ঘৃণা করে পুলিশের গণ্ডিকে। চৈত্রের কঠিন মাটির চর দেখিয়া পাথর মনে করে তারা, অথচ তার মধ্যেও যে কোমল রসানুভূতি আছে, এ কথা তাহাদের বিশ্বাস করাইবে কে? কিন্তু চন্দনলাল একটু স্বতন্ত্র পুরুষ; প্রথম দিনই তার প্রশ্ন খানিকটা অদ্ভুত: "এখানে তো বাবু বলতে বড় কাউকে দেখি না, সবাই তো হাবিলদার সেপাই। আপনাকে তবে বড়বাবু বলে কেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া রাগ হয় না বীরেশ্বর ভঞ্জের, মনে হয়—ভগবান করিলে দার্শনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিত চন্দনলাল ভদ্র-সমাজে। অনুচ্চকণ্ঠে জবাব দেন: "বাবু অবিশ্যি দু'-একজন আছেন বটে, তবে পুলিশই বেশী। কথাটা তুমি মন্দ বলোনি চন্দন, তা—বাবুরাও অর্দ্ধেকটা পুলিশই বটে।"

সুপ্রসন্ন আবহাওয়ার সুযোগ নেয় চন্দনলাল, বলে: "ও—তা হ'লে আপনি বড় সেপাই, বলুন?"

কুঞ্চিত নাসিকায় হাসিতে থাকে চন্দনলাল।

অতর্কিতে ঘরের ওপাশ হইতে মৃদু চুড়ির শব্দে খানিকটা যেন উষ্মার আভাষ ভাসিয়া আসে বড়বাবুর গৃহিণীর। বীরেশ্বর ভঞ্জ কানে খাটো ন'ন, তিনি জানেন, অন্ততঃ বাঙালী ঘরের মেয়েরা কখনো তাদের স্বামীদের লইয়া ছোট আলোচনা সহ্য করিতে পারে না; বড়বাবুর স্ত্রী সেখানে অধার্ম্মিকা ন'ন। নিজের মনেই হাসিয়া ফেলেন বীরেশ্বর ভঞ্জ, গলা উঁচাইয়া বলেন: "ওগো শুনছো, চন্দনলাল ব'লছে"—কিন্তু কথাটা আর তাঁহাকে খুলিয়া বলিতে হইল না। তিনি স্পষ্ট মনোদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন, দেওয়ালের ওপাশ হইতে গৃহিণী ত্রস্তপদে আরও নিভৃত অন্দরে সরিয়া গেলেন। হাসিয়া বীরেশ্বর ভঞ্জ বলেন, "আপত্তি কি, লোককে যখন থানায় এনে গারদে আটকাই, প্রয়োজনমত বেত মারি, তখন সিপাহীর কাজই করি বটে আমরা। তুমি ঠিকই ধরেছ চন্দন।"

কথা শুনিয়া চন্দনলাল নীরবে শুধু হাসিতে থাকে।

বীরেশ্বর ভঞ্জ বলেন, "কিন্তু কি জানো চন্দন, আমিও একদিন জনসাধারণেরই একজন ছিলাম। হাসতাম, গল্প ক'রতাম, আড্ডা মারতাম। ভালবাসতো সবাই। কিন্তু ভগবানের বিধান মানুষ নিজের ইচ্ছায় ভাঙতে পারে না। আমিও পারিনি। বাবার অবস্থা কোনোদিনই ভাল ছিল না। বেকার হ'য়ে অনেকদিন কাটিয়েছি, তারপর কাজ পেলাম পুলিশে। কিন্তু দেখলাম, মানুষ বড় সুনজরে দেখে না এই জাতটাকে। প্রতিমুহূর্ত্তে তাই নিজের উপরে ধিক্কার আসে। অথচ ভেবে পাই না, পুলিশের সাথে জনসমাজের এত বৈষম্য আর স্বাতন্ত্র্য কেন? এই ধরো এখানে আছি, অথচ ঠিক যেন নিজের খাঁচায় পাখীর মত বন্দী হ'য়ে আছি। এই দেওয়াল, বাড়ীর সীমানা আর থানা—এর বাইরে মানুষ ব'লে কাউকে পাই না। পথ ভ'রে যখন দল বেঁধে লোক যায়, ঘাঁটালের যাত্রী এসে বাস থেকে নামে, দেখতে পাই—কত মানুষই না আমাদের চার পাশে। অথচ একা, দু'টো বাইরের জগতের কথা ব'লতে পর্য্যন্ত লোক পাই না।"—থামিয়া দম নেন বীরেশ্বর ভঞ্জ।

আধমিশালী বাংলায় অভ্যস্ত চন্দনলাল। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করে ভাষা: "একদিন ধুতি চাদর পরতেন—

লোকে ভাবতো তাদেরই একজন। আজও সে-প্রীতি মুছে যায়নি; পার্থক্যটা শুধু ঐ পরিচ্ছদে। যেদিন এই ধড়া-চূড়ো থেকে মুক্ত হ'তে পারবেন, দেখবেন—আবার আপনি আমাদেরই একজন,—সেদিনই আপনি সত্যিকারের বড়বাবু হ'য়ে দাঁড়াবেন। আজ লোকের চোখে আপনি বড় সেপাই, সেপাইদের চালকই শুধু।" স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকায় চন্দনলাল বীরেশ্বর ভঞ্জের মুখের দিকে। সে জানে, ইচ্ছা করিলে বীরেশ্বর ভঞ্জ এখনই তাহাকে গারোদে আবদ্ধ করিতে পারেন, চাবুকের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতে পারেন তার দেহকে, কিন্তু পিয়ারীকে হারাইয়া যে কঠিন আঘাত সে পাইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে নালিশ আছে থানার বড়বাবুর কাছে। চন্দনলাল অন্ততঃ শুনিতে চায়, তাহার জীর্ণবাস এমন কি অপরাধ করিয়াছিল সিপাহী-পরিচ্ছদের কাছে, যার জন্যে তার দুঃখের সংসারও এক সময় ভাঙ্গিয়া গেল!

কিন্তু স্থির শান্ত বীরেশ্বর ভঞ্জ। কিছুক্ষণ অভিভূত অবস্থায় বসিয়া থাকেন, বলেন: "তুমি কি তবে ব'লতে চাও চন্দন যে, মানুষ কিছু নয়, তার পোষাকই বড়?"

দ্বিধা করে না চন্দনলাল; এ সাহস তার নিজের প্রতিষ্ঠা। —"তা নয় তো কি? আপনাতে আমাতে এইখানেই তো পার্থক্য! বড়লোক আর গরীব, থানা আর আটচালা, কোথাও কি মিশ খেতে পারে? বিতৃষ্ণার বীজ লুকিয়ে আছে দু'য়ের মধ্যে।"

মৃদু হাসেন বীরেশ্বর ভঞ্জ, ঠিক তাচ্ছিল্যের নয়, অনেকটা অনুকম্পার।—"বড়লোক আর থানা ব'লে কিছু থাকবে না সমাজে, এই কি তবে তুমি ব'লতে চাও চন্দন?"

—"না, তা' কেন ব'লবো?" চন্দনলাল বলে: "তাকেও ছাপিয়ে আছে দম্ভ আর ঐ পোষাকের স্বাতন্ত্র্য। যখন এই পোষাক খ'সে প'ড়বে, সেদিনই সমাজ আবার নতুন হ'য়ে দাঁড়াবে। জুলুম আর দুর্ব্বৃত্তি সেদিন একেবারে মাটিতে মিশে যাবে।"—তেমনি করিয়াই আবার দৃঢ় দৃষ্টিকে তুলিয়া ধরে চন্দনলাল বীরেশ্বর ভঞ্জের মুখের উপরে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করেন বীরেশ্বর ভঞ্জ। মনে হয়—শাপগ্রস্ত চন্দনলাল। ও যেন ঠিক ওর অবস্থার উপযোগী নয়,—আরও বড়, আরও উন্নত তার চাইতে। অথচ কেমন খাপছাড়া, কেমন অসংলগ্ন খানিকটা,—আসক্তি আছে বাক্যালাপে, কথা বলে সুষ্ঠু সমাজবোধের, অথচ কেমন অনাসক্ত জীবনে! বলেন: "জুলুম আর দুর্ব্বৃত্তি কাকে ব'লছো তুমি?

"তা' নয় তো কি?" চন্দনলাল উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে: "যারা গায়ের জোরে আর মোড়লী-শক্তিতে আধিপত্য খাটায় মানুষের উপর, তাকে জুলুম আর দুর্ব্বৃত্তি ভিন্ন কি ব'লবো বলুন? জোর তো গুণ্ডারের গায়েও থাকে, মানুষে আর পশুতে তবে পার্থক্য কি?"—চন্দনলালের কণ্ঠে যেন এতক্ষণে জোয়ার আসিয়াছে!—"শুধু ঐ পোষাক কর্ত্তা। আমার সাধের সংসার ঐ পোষাকেই ঢাকা প'ড়ে গেল।" হঠাৎ উদ্গত অশ্রুতে ঝাপ্সা হইয়া ওঠে চন্দনলালের চোখ দুইটি। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাটা বড় স্পষ্ট হইয়া একবার সেই অশ্রুসজল চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে তার।—

গোকুলপুরের মাঠে একদিন তাঁবু পড়িল। বিচিত্র পোষাক আর শিষের শব্দে বিচিত্র মানুষের ভিড়। মাথার উপরে মন্থরগামী বিমানের শব্দ, নীচে লরীর চাকার দ্রুত ঘর্ষণে ধূলায় পথ ঢাকা পড়িয়া যায়। সন্ধ্যায় তাঁবু খসিয়া ওঠে বোতল, গ্লাস, আর সুরের গুঞ্জনে। পাইটের পর পাইট মদ চলে তখন তাঁবুতে। কিন্তু কারা ওরা? সম্পূর্ণ নতুন, একেবারে স্বতন্ত্র আবহাওয়ার এই মানুষগুলির সাথে পরিচিত নয় চন্দনলাল। গোকুলপুর রীতিমত যেন বদলাইয়া গিয়াছে! কর্ম্মের স্রোত চারিদিকে। মাটি খোদাই, রাস্তা বাঁধাই, ইঁট ভাঙা, সুরকী ঢালা: কাজ আর কাঁচা পয়সা।—পিয়ারীর হাতও ফাঁকা গেল না। কর্ম্মনিপুণ হাত তার; দশ পয়সার কাজে আজ দশ আনা মজুরী দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীশুদ্ধ যুদ্ধের অরাজকতা,—পণ্যের বাজার চতুর্গুণ মহার্ঘ্য। তবু যেন অনেকখানিই স্বস্তিবোধ জাগে দাম্পত্য-জীবনে! অদূরে চন্দনলালের ছোট্ট কুটীর। দিনান্তে মুখর হইয়া ওঠে সেখানে স্বামী-স্ত্রী: চন্দনলাল আর পিয়ারী। আরও একজন মুখর হয় —খাঁচায় পোষা ময়না পাখীটা। চন্দনলাল তাকেও কম ভালবাসে না, আদর করিয়া বলে: "তুই আমার ছোট বউ, সতীনপনা ক'রে যেন আবার দুঃখ দিস্ না, দেখিস!"

—অনেক কথা শিখিয়াছে ময়না, কথা শুনিয়া আপন উল্লাসে ঠোঁট ঠোকে খাঁচার শিকে।...

দিন চলে।

কথায় কথায় পিয়ারী একসময় বলে, "আর কাজ দিয়ে দরকার নেই এখানে, চলো অন্য কোথাও যাই।"

কথাটা বুঝিতে পারে না চন্দনলাল, বলে: "সে আবার কি কথা?"

এদিক ওদিক চাহিয়া সলজ্জে পিয়ারী জবাব দেয়: "জানো, ওরা বড় ভাল লোক নয়—ঐ যে ঐ তাঁবুর লোকগুলি; কেমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকে। কি সব বলে, বুঝতে পারি না।"

হঠাৎ নিভিয়া যায় চন্দনলাল নিজের মধ্যে। উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে কথাগুলিকে।—"বুঝতে আবার যাবি কি, গতর খাটিয়ে নিজের মনে পয়সা কামিয়ে আনবি, ফুরিয়ে গেল।"

পিয়ারী চুপ করিয়া যায়।

আবার দিন চলিতে থাকে। কোনোদিন সন্ধ্যার আগে ঘরে ফেরে পিয়ারী, কোনদিন বা সন্ধ্যা উৎরাইয়া যায়। পাঁজার পর পাঁজা ইট হাতুড়ী পিটাইয়া খোয়া করিতে সময় লাগে। চন্দনলালও নিশ্চেষ্টভাবে দিনগুজ্‌রান করে না। তারও সামনে কাজের সমুদ্র।...

কর্ম্মের এই স্রোতাবর্ত্তের মধ্যেই একদিন হারাইয়া যায় পিয়ারী। ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া যায় চন্দনলালের। পাগলের মত তাঁবুর চারিপাশে লক্ষ্য করে; বাতাস কথা বলে: 'হোয়াট্‌স 'উ ওয়াণ্ট্‌, ইওর ল্যাড়ি?"

আপন মনে একবার মাথা ঝাঁকে চন্দনলাল; কিছু

বোঝে, কিছু বা বোঝে না।…দূরে চষা ক্ষেতে নতুন ফসলের আভাষ; উত্তরে দক্ষিণে উঁচু নীচু নানা পথের নিশানা। ঠুক্ ঠুক্ করিয়া চন্দনলাল চলে আর টালুমালু চায়। কে একজন খেদ করে: "আহাঃ, পিয়ারীর শেষে এই হোলো!"

চমকিয়া ওঠে চন্দনলাল: "কি, কি হোলো, কি জানো তুমি?"

সেই একজনই বলে, "দেখগে, এতক্ষণে বিনপুরা ষ্টেশন হয়ত পাড়ি দিয়েছে! আহা বেচারা পিয়ারী, পারলে না তাকে রক্ষা করতে,—মরদ হয়েছিলে, তাঁবুর মরদকে রুখতে পারলে না?"

আর শোনার ধৈর্য্য থাকে না চন্দনলালের। ছুটে পড়ে উর্দ্ধশ্বাসে।

দূর থেকে ধোঁয়া দেখা যায় ট্রেণের,…পায়ের নীচে গুঁড়াইয়া যায় শক্ত মাটি। আরো—আরো দূরে,আরো দূরে বিনপুরা।—কিন্তু ব্যর্থ। হুইসেল দিয়া ট্রেণ প্লাটফরম ছাড়িয়া যায়। পিয়ারী হয়ত ঐ ট্রেণেরই কোনো নিভৃত কামরায় গুম্‌রাইয়া কাঁদিতেছে, আর তার ঐ দেহের লালসায় কোনো স্থূল মাংসাশী অনবরত ভারী নিঃশ্বাস ফেলিতেছে!

ঝর ঝর করিয়া জল নামিয়া আসে চন্দনলালের চোখে। টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিয়া এক সময় শ্রান্তদেহে কাৎ হইয়া পড়ে মেঝেয়। কিন্তু ঘরে কি সত্যিই আর আর তার প্রয়োজন আছে?—তবু আশা; তবু হয়ত পিয়ারী আবার আসিয়া তার নিজের হাতে গুছানো ঘর দেখিয়া শুনিয়া লইবে। খাঁচার পাশে আসিয়া বলে, "সতীন তোর সত্যিই কি ফিরে আসবে না রে 'ছোট বউ?"

কিন্তু ময়নার ঠোঁটের ফাঁকে কথা জাগে না। আজ যেন তারও কণ্ঠ ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

অপেক্ষা করে চন্দনলাল। একদিন, দুইদিন—পূরা একমাস, তার পরে আরও দিন যায়। পিয়ারী এতটুকুও দোষ করে নাই, চন্দনলাল তা' জানে। সমাজ হয়ত তাহাকে তাহার দুরদৃষ্টের জন্য ক্ষমা করিবে না, কিন্তু চন্দনলাল যে তাহাকে ক্ষমা করিয়াই বসিয়া আছে।

আবার মাস ঘুরিয়া আসে, কিন্তু পিয়ারীর সত্যিই আর দেখা নাই। হঠাৎ একদিন ঘরে ফিরিয়া দেখে চন্দন, 'ছোট বউ'ও তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে। কপালের জোর না থাকিলে কাহাকেও হয়ত এই দুনিয়ায় স্নেহ দিয়া পুষিয়া রাখা যায় না। খালি পড়িয়া আছে খাঁচাটা। মহা শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে চারিদিক। পিয়ারী সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছিল একদিন গোকুলপুর হইতে। সেদিন তার কথা অতো বোঝে নাই চন্দন, আজ মনে হয়—এখানে আর থাকিলে সে একেবারে পাগল হইয়া যাইবে। মিথ্যা এই ঘর, মিথ্যা এই সংসার, সমাজ, পৃথিবী।—একেবারে ছন্নছাড়া হইয়াই পথে বাহির হইয়া পড়ে চন্দনলাল।…

তারপরে এই শালবনের ঘন বিস্তৃতি, এই মাঝিপাড়া। গোকুলপুরে গ্রাসাচ্ছাদন মিলিত কাজ করিয়া, এখানে তা' একেবারে বন্ধ। আশ্রয় পাইল বটে একটি জীর্ণ ঘরে, কিন্তু চন্দনলাল দেখিল—জীবনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা কখনো সমতা রক্ষা করিয়া চলে না। লোকে বলে—জাগ্রত দেবতা দেবী চণ্ডী; কতবার সেই দেবীর মন্দিরে যাইয়া মাথা কুটিয়াছে সে: "ফিরিয়ে দাও, পিয়ারীকে আবার ফিরিয়ে দাও দেবী; এ ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করো।" কিন্তু শিলামূর্ত্তির মুখে ভাষা ফোটে নাই। করুণা করেন নাই দেবী। মানুষের দেওয়া মানতের অলঙ্কার-গুলিই শুধু সগর্ব্বে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিয়াছে দেবীর সারা দেহে। এক একবার ইচ্ছা হইয়াছে চন্দনলালের---ছিনাইয়া নিয়া আসে ঐ গহনাগুলি, কিছুদিন তবে নাড়ীগুলিকে তাজা রাখা যাইবে। এখনও যে সে প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে তার পিয়ারীর। কিন্তু কেমন যেন সংস্কারে বাঁধিয়াছে। দারিদ্র্যের হাতে সে মনকে ধরা দিতে পারে নাই।…

আগাগোড়া ঘটনাটা বিবৃত করিয়া অভিভূতের মতো খানিকক্ষণ বসিয়া থাকে চন্দনলাল, বলে: "কি দোষ ক'রেছিলাম কর্ত্তা, ব'লতে পারেন? আপনারাই তো এমনি ক'রে আমার জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট ক'রে দিলেন! ধিক্ আপনাদের ঐ পোষাকী আইন আর সভ্যতাকে।"

গলায় কথা বাধিয়া যায় বীরেশ্বর ভঞ্জের। শ্রদ্ধা জাগে চন্দনলালের উপর। নিজের মতবাদ প্রকাশ করিতে যে স্থান-কাল-পাত্রে কখনও ভীরুতার আশ্রয় নেয় না, সেই তো সত্যিকারের মানুষ! চন্দনলালের মতো এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে কয়টি? কাতর কণ্ঠে বীরেশ্বর ভঞ্জ বলেন: "আমাদের শাসনব্যবস্থা আজ তোমার কাছে লজ্জিত চন্দন; স্বীকার ক'রছি, আমাদের আইন আজ সত্যিই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।"

উঠিয়া দাঁড়ায় চন্দনলাল: "তবে যে বলেন, অপরাধীকে আপনারা সাজা দেন! পারেন আপনি ফৌজ পাঠিয়ে সেই পাষণ্ডকে ধ'রে এনে শাস্তি দিতে?"

বীরেশ্বর ভঞ্জ নির্ব্বাক্। এ কথার জবাব দিতে তিনি আজ সত্যিই অক্ষম।

চন্দনলাল পা বাড়ায় আবার পথে, বলে: "মানুষ খোঁজেন, কিন্তু আপনাদের দিয়ে বিশ্বাস কি মানুষের? আপনারা সেপাই, আইন ক'রতে পারেন, কিন্তু সম্মান দিতে জানেন না মানুষকে; আপনারা আবার শান্তি-রক্ষক! মনের অশান্তিতে পুড়ে পুড়ে কত লোক আজ ছাই হ'য়ে গেল, হিসেব রাখতে পেরেছেন কি তার?"

দেওয়ালের অন্তরাল হইতে আর একবার উষ্মা প্রকাশের ভঙ্গিতেই অস্ফুট চুড়ির শব্দ জাগে, দুয়ারের পর্দ্দাটা ঈষৎ একবার নড়িয়া ওঠে, বাতাসে না গৃহিণীর হাতের স্পর্শে—বোঝা যায় না।

মাথার উপরে সূর্য্য জ্বলে। দ্বিপ্রাহরিক অর্চ্চনার ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসে দেবী-মণ্ডপ হইতে। বারকোশে আর রেকাবীতে থরে থরে সাজানো পুরুতের পার্ব্বণী আহার।…

স্নানের উদ্যোগে উঠিয়া পড়েন বীরেশ্বর ভঞ্জ।

বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়ায় ততক্ষণে চন্দনলাল। দূর

থেকে ভুস্ ভুস্ শব্দে শোনা যায়—বাস আসার শব্দ। মনোহারী আর মুদিখানার উন্মুক্ত ঝাঁপ সারাদিন সময়ের হিসাব কষে দূরাগত যাত্রীদের অপেক্ষায়। চিঁড়ে বাতাসা অনেক কাটে উপবাসী যাত্রীদের কাছে। যুদ্ধের দিন, লাভটা সুদে আসলে আসে। পাশে মনোহারীদার বিরিঞ্চি বসাক ভাঙা গলায় হাঁকে: "নিমের মাজন, চুলের ফিতে, হাতীর দাঁতের চিরুণী; দামে সস্তা—দেখে নেবেন—সুবাসিত 'কেশোলা', মাথা ঠাণ্ডা রাখতে অদ্বিতীয়।—"

হাসি পায় একবার চন্দনলালের। যেমনভাবে সারা দুনিয়াটা প্রচণ্ড তাপে তাঁতিয়া উঠিয়াছে, 'কেশোলা' দিয়া বিরিঞ্চি বসাক সেখানে কতটুকু ঠাণ্ডা করিতে পারে মানুষকে?

সামনের ষ্টপেজে আসিয়া থামিয়া পড়ে বাসটা। ক্ষুধার্ত্ত ছেলে-বুড়োর কলরবে মুখর হইয়া ওঠে আবহাওয়া। চন্দনলালেরও কম ক্ষুধা পায় নাই এতক্ষণে। বুভুক্ষু জীব সে। পেটের নাড়ীতে তার আগুন জ্বলে। এক একবার ইচ্ছা হয়—খানিকটা ধুতুরা কিম্বা আফিম জোগাড় করিয়া এ জ্বালা একেবারে শান্ত করিয়া দেয় সে। কিন্তু ক্ষীণ আশা যেন তাকে আবার নতুন করিয়া বাঁচাইয়া তোলে—পিয়ারী হয়ত ফিরিয়া আসিতেও পারে, মুক্তি পাইতে পারে সে দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে।

অতর্কিতেই অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়ায় চন্দনলাল মুদিখানাটার, কাতর কণ্ঠে বলে: "একমুঠো চিঁড়ে ভিক্ষে দাও দোকানী। দেবী চণ্ডীর আশীর্ব্বাদে তোমার ভাল পসার হবে।"

খিঁচাইয়া ওঠে হনুমান মুদী: "ম'রবার আর যায়গা পাওনি তিলকুটে. রোজ তিনবেলা চিঁড়ে যোগাই, দান-ছত্তর খুলে ব'সেছি আর কি?"

নিজের মধ্যে এতটুকু হইয়া যায় চন্দনলাল। বিশীর্ণ শরীরে বিক্ষত মনের প্রভাব; এতটুকুও শক্তি নাই আজ আর তার কিছু করিবার। গোকুলপুর আর মাঝিপাড়া—সুদূরপ্রসারী সমুদ্রের এপার আর ওপার যেন। মানুষের কাছে আজ আর চন্দনলালের কোনো দাবী নাই। বড়বাবুর হাতের দুই টুকরা মাখন-রুটি—তা' শুধু আজকের মানুষ-মারা সভ্যতার ভদ্রতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বাঙালীর অন্নগত প্রাণের স্পর্শ কোথায়? চারিদিকে সশব্দ লরী আর বোমারু মিছিল। মানুষ কোথাও নাই; কামাতুর ক্ষুধিত যন্ত্রগুলি শুধু কথা বলে; বিচিত্র পরিচ্ছদের আবরণে মাটির কাঁচা ঘাস একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে।

ধীরে ধীরে শালবনের সরুপথে আগাইয়া চলে চন্দনলাল।

রূপকাবসান

শ্রীপ্রমথ গঙ্গোপাধ্যায়

রজনী যে লাল কথা বলে সদা-নীল তারার সুতায়,
তারে দিয়া কবিতা না লিখিও হে শ্যাম,—
সোনার তরীর খেলা ছল্‌ছল্ শাল-মহুয়ায়,
হাল্‌কা ঝালরে বোনা মিথ্যা-অভিরাম।
সকল রূপক হ'ল শেষ,
অর্থ-রিক্ত দিন,
কবির দু'হাতে বাজে হাতুড়ির বীণ।
কাদায় পড়েছে ঝুলে আকাশ-প্রদীপ,
বধু কাঁদে সুনিভৃতে—মুছে গেছে টিপ;
ধুয়ে গেল জীবনের রঙ্,
এলো শক্ত দিন,
ক্ষয়িষ্ণু সূর্য্যেতে পাণ্ডু, বারুদে মসৃণ।

বুদ্ধিরে পাড়ায়ে ঘুম রাষ্ট্রনেতা মনীষী হ'লেন,-
(কবির দোয়াতে কালি নাই, নহিলে সে লিখিত কবিতা),
অর্থবিদ্ তত্ত্ববিদ্ শিক্ষাবিদ্ 'আমেন্' বলেন,—
হে দরদী বন্ধু দেখো কতো দীর্ঘ জ্বলিয়াছে চিতা।

এদিনে যাহাই বলি, হ'বে
বিদ্রূপ পিচ্ছিল,
ম্লান ছায়াপথে মরা চাঁদের মিছিল,—
তেমনি বিরস মিল, কবন্ধ রূপক,
রক্তহীন-রোমাণ্টিক নাটকের ছক
চেতনার মূলে মেলে পাখা,—
শিকড়ে কীটের সাড়া পাই,—
তাদের গলিত রসে ভরিনু মরাই।

———

গোপাল উড়ে

শ্রীকালিদাস রায়

গোপালের জন্মভূমি কটক জেলার জাজপুর। প্রথম যৌবনে গোপাল কলিকাতায় আসে উদরান্নের সংস্থানে। সে প্রথমে ফেরিওয়ালার কাজ করিত। সে সুশ্রী, সুকণ্ঠ ও সুরসিক যুবক ছিল। বৌবাজারের রাধামোহন সরকারের একটি সখের যাত্রার দল ছিল। গোপাল সেই দলে ১০ টাকা মাহিনায় যোগ দিল। এই দলে থাকিয়া ক্রমে সে সুগায়ক ও গান রচয়িতা হইয়া উঠিল। রাধামোহন বাবুর মৃত্যুর পর গোপাল তাঁহার দলের অধিকারী হইল এবং সখের দলকে পেশাদারি দলে পরিণত করিল। গোপাল ভৈরব হালদার নামক একজনের নিকট হইতে দলের কোন কোন পালা এবং কতকগুলি গান লিখাইয়া লইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের গানগুলি তাঁহারই রচিত কিনা জানা যায় না। তবে গানগুলি গোপালের নামেই চলিতেছে। গোপাল নিজে যখন গান রচনা করিতে পারিত, তখন তাহার নামে প্রচলিত গানগুলিকে তাহারই রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বঙ্গভাষার লেখকগ্রন্থে বহু কবিরই জীবনচরিত সংক্ষিপ্তাকারে উপনিবদ্ধ আছে। কিন্তু গোপালের নামও নাই। ইহা তাহার কবিশক্তির প্রতি অবিচার।

আজকালকার সভ্য-সমাজে গোপাল উড়ের গানের কোন আদর নাই। কিন্তু এককালে তাহার গানের আদর কেবল পল্লীসমাজে নয়—নগরের সভ্য-সমাজেও ছিল। গোপাল এ আদর অযথা লাভ করে নাই। সে কালে অন্যান্য পাঁচজন কবি ও কবিওয়ালাদের কেরামতি যেমন ছিল—গোপালেরও তেমনি ছিল। বরং গোপালের কৃতিত্ব অন্যান্য লোকসাহিত্যিকদের তুলনায় কিছু বেশিই ছিল। গোপাল ছিল একটা গানের দলের অধিকারী, অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত রুচির লোক। কিন্তু সে ছিল স্বভাব-কবি। কেবল মাত্র বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া এবং দেশে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত শুনিয়া সে নিজের, জন্মগত কবিত্ব শক্তির গুণে গান রচনা করিত। তাহার গানগুলির বিচারণে একথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালীদের ধর্ম্মপ্রাণতার দিকটা ফুটিয়াছে সেকালের বহু সঙ্গীতে, কবিতায়, পাঁচালীতে ও যাত্রার নাটকে। বাঙ্গালীরা যে পরের দুঃখে ও পরমেশ্বরের ভক্তিতে অশ্রুপাত করিতে জানিত বাংলা-সাহিত্যে তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। কিন্তু এই বাঙ্গালীদের একটা লঘুতরল চটুল রসিক জীবনও ছিল, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা'—সে স্ফূর্ত্তিতেও মশগুল হইতে জানিত। আমরা সে পরিচয় পাই বাঙ্গালার পোষ্যপুত্র এই অবাঙ্গালী বাঙ্গালী কবির গানে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানিকে রসের কারিগর গোপাল গানে ঢালাই করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের (বা বর্দ্ধমানের?) রসের গভীর সরোবরটি হইতে গোপাল নালী কাটিয়া রসের প্রবাহটিকে বঙ্গদেশময় করিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরে যে রস ঘনীভূত ছিল, গোপাল তাহাকে তরলায়িত করিয়া আপামরসাধারণের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের গীতানুবাদ বলা যাইতে পারে—গোপাল শুধু পয়ার ত্রিপদী ছন্দের বিদ্যাসুন্দরকে বাংলার নিজস্ব ছন্দেই অনুবাদ করে নাই—ভারতচন্দ্রের নাগরিক ভাষাকে বাংলার পল্লীর ভাষায় অর্থাৎ বাংলার কৃত্রিম মুখের ভাষাকে বাংলার স্বাভাবিক বুকের ও মুখের ভাষায় অনূদিত করিয়াছে। আজিকার সভ্য কোটপ্যান্টপরা অথবা মটকাতসর আদ্দির পাঞ্জাবী পরা বাঙ্গালী যাহাই বলুক, ধুতিচাদর পরা খাঁটি বাঙ্গালীর বলিবার উপায় নাই যে—এই ভাষাই তাহার প্রপিতামহ-প্রপিতামহীদের নিজস্ব ভাষা নয়।

ভারতচন্দ্র অনুপ্রাস যমকের কবি ছিলেন—গোপাল তাঁহার অনুপ্রাস যমক দুই চারিটি গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু নিজস্ব অনুপ্রাস যমকের চমকের নিদর্শন দিয়াছে ভূরি ভূরি। মনে হয় স্বয়ং অনুপ্রাস যমকের রাজা দাশু রায়ও তাহার তারিফ না করিয়া পারেন নাই নিশ্চয়। আমি সেগুলির পৃথক দৃষ্টান্ত দিব না। প্রসঙ্গচ্ছলে গোপালের রচনার যে যে অংশ উদ্ধৃত হইবে—সেগুলিতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

ভারতচন্দ্র বাংলার নিজস্ব চলতি লক্ষ্যাত্মক বাক্য ও বাক্যাঙ্গিগুলিকে তাঁহার কাব্যে সন্তর্পণে স্থান দিয়াছিলেন। গোপাল সেগুলিকে বেপরোয়া ভাবে দু চোখো চালাইয়াছেন। বাঙ্গালী নিজস্ব ভাষার বৈশিষ্ট্য সেগুলিতে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ পাইত। আমাদেরও খাঁটি বাঙ্গালী মনের যেটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে—তাহা সেগুলিতে আজিও রস পায়। কতকগুলির দৃষ্টান্ত দিই—

১। তুমি মনকলা খাও মনে মনে কালনেমির মতন।
২। গাছে তুলে মই কেড়ে লাও আচ্‌কা ফেল অথান্তরে।
৩। গাছে কাঁঠাল গোঁপেতে তেল তাতে কি আর আশা পোরে?
৪। পাড়ার যত ভেড়ের ভেড়ে হাতে ধরে পায়ে পড়ে।
৫। কার বা মাথার উপর মাথা তোমার কাজে করবে হেলা।
৬। নেই নল্লে থাকেনাক সাপের বিষ যথা।
৭। এ চাঁদ নয়রে ছেলে খেলা যেমন ফাঁকে ফাঁকে মাকু ঠেলা।
৮। দিদি উদোর ঘাড়ে বুধোর বোঝা এ নয়রে তোর কলম ঠেলা।
৯। সাপে যেমন ছুঁচো গেলা তেমনি হবে যাচ্ছে বোঝা।
১০। যাদুমণি ধৈর্য্য ধর এই ত কলির সন্ধ্যেবেলা।
১১। যদি বুক ফেটে যায় প্রাণসজনি তবু, মুখ ফুটে তা বলব না।
১২। সাগর সেচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোমার।
১৩। একথা কি চাপা থাকে আপনি কাঠি পড়বে ঢাকে।
দেশবিদেশে জানবে লোকে ভাঙবে হাঁড়ি আপনি হাটে।
১৪। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা সাপের মাথায় ব্যাঙনাচনা।
১৫। মিষ্টি কথা বলে ক'য়ে আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে
কুমীরকে কলা দেখায়ে শেষে ফাঁকি দিও না।
১৬। সাপের হাই সে বেদেয় চেনে অন্য লোকে জানবে কেনে।
১৭। জলেতে ক'রে ঘরবাড়ী কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি।
১৮। সুচ বেচো কামারের কাছে সে যে মিছে সে যে মিছে।
১৯। অজাগরের ভিক্ষা যেমন তোমার তেমনি পণাপণ।
২০। আলোচাল দেখায়ে ভেড়া গোয়ালে পোরা।
২১। নও কাজের কাজী ভোজের বাজি সকল ফক্কিকার।
২২। মজাব না নারীর কুলে নাকে খৎ আমার।
২৩। ঢেউ দেখে ছাড়িবে হাল আজি না হয় হবে কাল।
২৪। শালগেরামের শোওয়া বসা বুঝতে পারিনে।
২৫। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের উপর দুধের উপর চিনি দিলে।
২৬। সবুরেতে মেওয়া ফলে, উতলায় বিফল ফলে
থাকতে হয় গো—কাদায় জলে গুণ টেনে ধনী।
২৭। শাক দিয়ে মাছ ঢাক তুমি সে সব কথা জানি আমি।
২৮। ঠেকিনু দায় বিদ্যার বিষম বিদ্যায়।
সাপের ছুঁচো ধরা যেমন ঘটিল আমায়।
২৯। ভেবে দেখ দুকূল মাঝে ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।
৩০। পাকা আম কাকে খেলে চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে
হাত পোড়ানো তপ্ত জলে হলো অরণ্যে রোদন॥
৩১। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে খোঁচয়ে খোঁচয়ে আর দিও না।
৩২। ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচি সাবাশ ধনি
ওলো ডুব দিয়ে জল খেতে পোরা।
৩৩। শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা বাঁধবো কোথা?
৩৪। আপনি কাঠি পড়বে ঢাকে ঢেকে কিবা ফল?

৩৫। লেখাপড়া শিখলি যত সকল ভস্মে ঢাললি ঘৃত।
৩৬। শিব গড়িতে বাঁদর হলো—এ কি বিধির বিড়ম্বনা।
৩৭। হয়ে আছ চিনির বলদ সদা আজ্ঞাবাহী।
৩৮। তোমার সে গুড়ে পড়েছে বালি।
৩৯। প্রাণ গেল প'ড়ে শাঁখের করাতে।

এই ভাষার অন্তরালে কি যে ঐশ্বর্য্য আছে—তাহা আমরা ইংরাজি-তর্জমা-করা কৃত্রিম ভাষার মোহে ভুলিয়া গিয়াছি। ভেজালের যুগে খাঁটি মালের আদর নাই। যে সকল ভাব বিদেশ হইতে আসিয়াছে অথবা যাহা প্রাচীন ভারত হইতে আসিয়াছে—সে সকল ভাবের বাহন এ ভাষা নয় সত্য, কিন্তু খাঁটি বাঙলার মনোভাবের উপযুক্ত বাহন এই ভাষা। পাকা রাস্তায় মোটর চলিবে চলুক, কিন্তু জলকাদাভরা বাংলার পথে মোটর চালাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সে পথে গোরুর গাড়ীই উপযুক্ত যান।

খাঁটি বাংলা ভাষা গোপালের হাতে কিরূপ জোরালো ও রসালো হইয়া উঠিয়াছে—কিরূপ সাবলীল সরল তরল ভঙ্গীতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি গান আদ্যন্ত তুলিয়া দিই—

মাসি, তোমার হদিশ পাওয়া ভার।
নও কাজের কাজী, ভোজের বাজী সকল ফক্কিকার।
বরের মাসী কনের পিসী সেইরূপ প্রকার।
দুপক্ষেতে আস যাও সমানে দুকাঠি বাজাও
ভানুমতী খেলাও মাসী দেখতে চমৎকার।
কখনো হও সত্য পীর কখনো পেঁড়োর ফকির
কখনও বা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার॥
বেড়াও তুমি যোগে যাগে
হাড়ে তোমার ভেল্‌কি লাগে,
মুখের চোটে ভূতও ভাগে—কথায় হীরার ধার॥
কখনও হও সিদ্ধির ঝুলি
কখনও শ্যামের মুরলী
কথাই সর্ব্বস্ব তোমার কাজে পাওয়া ভার।
যখন যাহার কাছে থাক তখনি হও তার।

নিম্নলিখিত গানটি বিখ্যাত। এই গানটির কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর কবিরও অযোগ্য নয়—

কলঙ্কেতে ভয় ক'রো না বিধুমুখী।
যে যা বলে সয়ে থাক হয়ে আমার দুখের দুখী।
মাতঙ্গ পড়িলে জলে পতঙ্গেতে কি না বলে
কণ্টকেরই বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়
তা ব'লে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায়।
ডুবেছি না ডুবতে আছি পাতাল কত দূরে দেখি॥

কতকগুলি গানের ধরতা বা ধুয়া এমনি সুরচিত যে খুব পাকা হাতের রচনা বলিয়াই মনে হইবে। এই ধরতার এমনি আকর্ষণী শক্তি ছিল যে তাহা নিশ্চয়ই গোটা গান সেকালের রসগ্রাহীলোকদেরও না শুনাইয়া ছাড়ে নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১। এমন কুল মজানো ফুল গেঁথেছে কে, আমার—মন মজালে হায়।
২। মানিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
৩। যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সখি তবু মুখ ফুটে ত বলব না।
৪। তারে রেখ যতন ক'রে।
সুখের নিধি বুকের মানিক মুখের অন্ন দিলাম তোরে।
৫। নবীন নাগর রসের সাগর ভুলবে কেন আমায় দেখে।
৬। নাতনি, ভাবনা কি আর বল—দিলে, গঙ্গাধরে গঙ্গাজল।
৭। ও মাসী ভরসা দিলে ভাল, তোমার ফরসা কথায় প্রাণ জুড়াল।
৮। কায় ক'ব দুঃখেরি কথা মনের ব্যথা মনই জানে
৯। মানে মানে মান ফিরে দাও দেশে চ'লে যাই।
ভাইঁল পিরীতের বাসা আশায় পড়ল ছাই।
১০। মুখে মধু বুকে ক্ষুরের ধার, ওগো অবলার।

গানের ধরতাই সমগ্র গানকে জমাইয়া তুলিত। গান গাহিবার সময় তাহার ধরতা বা ধুয়াই বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। অতএব ধরতা বা ধুয়াই যে খুব সুরচিত হওয়ার প্রয়োজন, গোপাল তাহা বড় শিল্পীর মতই বুঝিত।

গোপালের গানের ছন্দ প্রধানতঃ পদাংশ মাত্রিক (Syllablic) স্বরাঘাত-প্রধান ত্রিপদী। হসন্ত বর্ণ বহুল চলতি বাংলা শব্দের মুহুর্মুহু প্রয়োগে পয়ারই এই ছন্দের রূপ ধরিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাকে ধামালী ছন্দ বলে। এই এই ছন্দের ত্রিপদীর সঙ্গে ৪+৪=৮ মাত্রার চরণের দুইটি করিয়া অন্তরা।

তুলব কি ফুল। তুল বেধেছে। ঝরেছে নির। মূল॥
ডানপিটে ড্যাক। -রাদের বুকে। ধরে না বুক-। শূল॥
আচোট মাটি। চুটিয়ে গেছে
আফোটা ফুল। ফুটিয়ে গেছে
কুঁড়িগুলোও। ছিঁড়ে গেছে। লুটেছে ব-। কুল॥

এই ছন্দের চৌপদীর দৃষ্টান্তও অনেক আছে। যেমন—

মদন আগুন। জ্বলছে দ্বিগুণ। করে কি গুণ। ঐ বিদেশী।
ইচ্ছা করে। উহার করে। প্রাণ সঁপে গো। হইগে দাসী॥
বিষম ক-। টাক্ষ বাণে
অস্থির ক-। রেছে প্রাণে
চিত্ত না ধৈ। রজ মানে। মন হয়েছে। তায় উদাসী॥

দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্তরার চরণগুলিতে শব্দের মাঝখানে যতি পড়িয়া পদাংশ-মাত্রিক চৌপদীর অন্তরায় কিরূপ পরিণত হইয়াছে লক্ষণীয়। এইরূপ শব্দের মাঝে যতি পড়ায় একটা যে Rhythm-এর (ছন্দঃস্পন্দের) সৃষ্টি হইতেছে তাহা গানের পক্ষে বিশেষ অনুকূল—ইহা গায়ন কবি ভাল করিয়াই বুঝিতেন।

'দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন' এবং 'ওরূপ-সাগর মাঝে ডুবিল আঁখি তরণী'—ছন্দের অক্ষরগণনার দিক হইতে দুই চরণে তফাৎ নাই। কিন্তু গোপালের গানে ইহা পদাংশ-মাত্রিক চৌপদী ছন্দের অঙ্গীভূত। ইহাতে চরণটি ছন্দোহিল্লোলময় হইয়াছে।

ও রূপ সা-। গর মাঝে। ডুবিল আঁ-। খি তরণী॥

গানের প্রথম চরণে দুই এক মাত্রা অতিপর্ব্বীয় থাকে। এই ছন্দের গানের দস্তুরই তাই।

যেমন—
১। পোড়া — প্রেম ক'রে কি। প্রমাদ হ'ল। সই
২। বাহারে — সোনারে রতন। মণি।

অতিপর্ব্ব মাত্রাযোগে ছন্দে রবীন্দ্রনাথের বাউল সঙ্গীতগুলি রচিত। সেই ছন্দ গোপাল উড়ের গানেও পাওয়া যায়।

ও নেমক্ — হারাম বেটা পাজি বে-হায়া ঠেটা
বাঘালি — একা লেঠা সংসারে।
নেমকের — চাকর হয়ে দেখলি না — চক্ষে চেয়ে
সকলে — ঐক্য হয়ে একবারে।
তোরাত — আছিস দ্বারে কে এল — ও অন্দরে
পাখী এ — ড়াতে নারে যে দ্বারে
কোতোয়াল— বলি তোরে ধরে দে — বিদ্যা চোরে
নইলে তোরে— যমের পুরে দিব রে॥

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত অশ্লীলতা কোথাও নাই। গোপাল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক ছিল—রাজকবি ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের সাহস সে কোথায় পাইবে? তাহা ছাড়া, ভারতচন্দ্রের কাব্যের শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচর পরিচর ও পার্শ্বচরগণ। আর গোপাল উড়ের গীতিকাব্যের শ্রোতা ও উপভোক্তা বাঙ্গালার জাতিধর্ম্মবয়োলিঙ্গনির্ব্বিশেষে জনসাধারণ। এই কাব্যে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে কেন? গোপালকে গান বেচিয়া প্রাণ রাখিতে হইয়াছে—উদরান্নের সংস্থান-ও করিতে হইয়াছে। বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটাকে গোপাল বাদ দিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে গোপালের রচনায় অশ্লীলতা না হোক—কিছু গ্রাম্যতা দোষ ঘটিয়াছে। তাহা গর্ভসঞ্চারের মতই সে স্থলে অনিবার্য্য, কাজেই ক্ষন্তব্য।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন হইতেই বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে রসকলহের ধারা চলিয়া আসিতেছে। এই রসকলহ মঙ্গলকাব্যে হরগৌরীর কলহের রূপ ধরিয়াছে—গীতিসাহিত্যে শুকসারীর মুখে উহাকে সঞ্চারিত করা হইয়াছে। গোপাল বিদ্যা ও সুন্দরের মারফতে সেই রস-কলহটিকে চমৎকার জমাইয়া তুলিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য কালিকামঙ্গলেরই নামান্তর। অতএব কালিকা প্রসঙ্গ ইহাতে বাদ যাইতে পারে না। গোপালের বিদ্যাসুন্দর লঘুতরল চপলচটুল প্রকৃতির রচনা। ইহাতে পাছে রসাভাস হয় বোধ হয় সেই ভয়ে গোপাল কালিকার রুদ্রতা বা ভীষণতার উপর বেশি জোর দেয় নাই। কালীর কৃপা ছাড়া সুন্দরের গতি নাই—তাই সুন্দরের মুখে কয়েকটি কালীর স্তবগীতি ইহাতে আছে। সেগুলিতে কবিত্ব কিছুই নাই। কিন্তু শাক্ত সঙ্গীত সংকলনে এই গুলিরও স্থান আছে। ভক্তিরসের প্রাচুর্য্যে এইগুলি অনেক রাজা মহারাজা দেওয়ান বাহাদুরদের কালীস্তুতি-গীতির চেয়ে ঢের উচ্চাঙ্গের রচনা।

স্মৃতি

অধ্যাপক—শ্রীআশুতোষ সান্যাল, এম, এ

দেবী না-ই হোক্—সে ছিল মানবী—
সে ছিল আমার প্রিয়া,
মোর লীলাসাথী কত মধুরাতি
গেছে সে যে উজলিয়া!

কত সুখ-দুখ মান-অভিমান
হাস্য-লাস্য ছন্দ ও গান,—
কত কল্পনা জাগায়ে আমার
সরস ক'রেছে হিয়া!

সরগের পরী না-ই হোক্—তবু
ছিল সে আদুরী মোর,
আজিও করিতে পারিনি ছিন্ন
তাহার প্রণয়-ডোর!

আজো তার কথা—তার শত স্মৃতি
জাগায় মরমে বিষাদের গীতি,
আজো নিরজনে বসি' আনমনে
বরষি নয়ন-লোর।

মাটির দুলালী সে ছিল কেবল
স্নেহমমতায় ভরা,
পরশে তাহার ক'রেছে সরস
জ্বালাময় এই ধরা!
চিরবসন্ত চারিদিকে তার
সুষমার রাশি করিত বিথার,
যৌবন তার করিবারে ম্লান
পারেনিকো কভু জরা!

হৃদয়ের ধন—সে যেন লুকায়ে
র'য়েছে হিয়ার তলে,
নয়ন-সমুখে মুরতি তার
জাগে সদা পলে পলে
ঘুচে গেছে আজ সব ব্যবধান
এপার ওপার সকলি সমান,—
প্রতি অণু তার মিশে আছে যেন
নিখিলের জলে-থলে!

বর্ত্তমান কালের বয়নশিল্প

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

"অন্নং বহু কুর্ব্বীত" বলিয়া উপনিষদে যে মন্ত্র প্রচার করা হইয়াছে, তাহাতে শুধু অন্নেরই কথা আছে; বস্ত্রের কথা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অন্ন ও বস্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়াছে। পুরাকালের বানপ্রস্থ আজ আর নাই, একমুখী বা ঈশ্বরমুখী আদর্শ হইতে আমরা বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছি, সুতরাং সভ্যজগতে বাস করিতে হইলে অন্নের পরেই বস্ত্রসমস্যা লইয়া আমাদের আজ সমধিক মাথা ঘামাইতে হইতেছে। পঞ্চ 'ম'কারের মত পঞ্চ 'ব'কারও আছে, যথা—'বস্ত্র', 'বপু', 'বাক্য', 'বিদ্যা', 'বৈভব'—এরও শীর্ষস্থান বস্ত্রেরই বটে।

বাড়ীতে খাইতে পাই আর নাই পাই, বাহিরে বাহির হইবার সময় সভ্যভব্য হইয়া বাহির হইতেই হয়; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারাই লোকের সামাজিক স্থান নির্দ্দেশ হয়।

—"বাড়ীতে ছুঁচোর কেত্তন
বাহিরে কোঁচার পত্তন"—

বলিয়া ঠাট্টা তামাসা করা যাইতে পারে, কিন্তু বহির্জ্জগতের সম্মুখীন হইতে হয় ধোপ-দুরস্ত পোষাক লইয়াই। অবশ্য শীতাতপের নিমিত্ত বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা চিরকালই রহিয়াছে—সে কথা বেশী করিয়া না বলিলেও চলে। এই কথাটাই আজ সর্ব্বাগ্রে বলিতে হইতেছে যে, আমরা যে সভ্যতার পিছু ছুটিয়াছি, সেই সভ্যতার প্রধান এবং প্রথম ছাপ পড়িয়াছে বস্ত্রে, পোষাকে, আমাদের গাত্রাবরণে।

এখন দেখা যাক্, কি কি জিনিষ দিয়া আমরা বস্ত্র প্রস্তুত করি—আমাদের বয়নশিল্প গড়িয়া উঠে। কার্পাস তুলা ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষ-জাত দ্রব্য হইতে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। আঁশ-বিশিষ্ট বৃক্ষের বল্কল বা 'ছাল' হইতেও বস্ত্র হয়—পাট (jute), শণ (hemp) এই জাতীয়। ভারতবর্ষে আঁশবিশিষ্ট বৃক্ষও প্রায় তিন শত প্রকারের জন্মিয়া থাকে এবং উহাদের মধ্য হইতে শতাধিক আঁশ আমাদের দেশে বস্ত্র-বয়নে ব্যবহৃত হয়। পশুর লোম, উল ও পশম, প্রাণীজাত-রেশম ইত্যাদি দ্বারা উচ্চশ্রেণীর এবং মহার্ঘ পোষাক-পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হয়।

বস্ত্র-শিল্পের কি কি উপাদান, তাহা মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে, প্রধানতঃ কার্পাস, তৎপর অন্যান্য বৃক্ষ-জাত এবং জন্তু-পশু পক্ষী-জাত দ্রব্যাদি। ইহাদের মধ্যে কার্পাস জন্মে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে এবং প্রায় সর্ব্বত্র। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা যুক্ত-প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্পাস জন্মে; ভারতবর্ষ পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

নিম্নলিখিত ফিরিস্তি হইতে ভারতের অসংস্কৃত কার্পাস পৃথিবীর কোন কোন দেশে কতটা পরিমাণ রপ্তানী হয়, তাহার খানিকটা হদিশ পাওয়া যাইবে। এই ফিরিস্তিতে হাজার বেল বা গাঁটের হিসাব আছে, এবং প্রত্যেক বেল বা গাঁটে ৪০০ (চারিশত) পাউণ্ড বা পাঁচ মণ করিয়া মাল ধরা হইয়াছে।

দেশ	সাল	সাল	সাল
	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৮-৩৯	১৯৪০-৪১
বৃটেন	৪৫৬	৪১১	২৯১
বৃঃ সাঃ অন্যান্যদেশ	১২	২৩	৪৩
জাপান	১,৭৫৯	১,২১১	৭০৫
ইটালী	১৫৪	৯২	৫
ফ্রান্স	১৬৫	১৬৯	১২৬
চীন	১০৯	১৯৩	৭৫৪
বেলজিয়ম	২২৮	১৪২	৫
স্পেন্	৬৮	২	০
জার্ম্মানী	২৬১	১৯২	০
অন্যান্য দেশ	১৮৪	২৬৮	২৩৯
	৩,৩৯৬	২৭০৩	২১৬৮

ভারতের কার্পাস হইতে বস্ত্র বয়নের কথা বহু পুরাকাল হইতেই সর্ব্বদেশের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

গ্রীক ঐতিহাসিক (খ্রীঃ পূঃ ৫৮৪-৪২৩) হেরোডোটাস্ বলিয়াছেন, "ইহা একপ্রকার ভেড়ার লোম, যাহা গাছে জন্মে।"

বাংলার 'মুসলীনের' কথা রোমান্ ঐতিহাসিক "পিলে" (খ্রীঃ ২৩-৭৯) সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন।

মোজেজের সময়ে এবং সোলোমনের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষ হইতে যে পণ্যসম্ভার দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইত, তাহার মধ্যে বস্ত্র ছিল একটি প্রধান পণ্য-দ্রব্য। এই সমস্ত বাণিজ্য-পণ্য—মুসলীন প্রভৃতি—সমস্ত বিশ্বের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ "বাংলার মুসলীন —বোগদাদ রোম-চীন্" প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত বলিয়া যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই গর্ব্বের বস্তু। কোনও মোগল সম্রাট-দুহিতা মুসলীন পরিয়া তদীয় পিতৃদেবের সকাশে উপস্থিত হওয়াতে নির্লজ্জতার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে এই বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষতার প্রমাণই পাওয়া যায়। এই সমস্ত মুসলীন তাঁতে প্রস্তুত হইত। হস্ত-চালিত তাঁতের কথাই সেই জন্য প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ছেলেবেলায় গল্প শুনিয়াছি যে,তাঁতীদের মধ্যে যাহারা গুণী কারিকর ছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত-ধরণের কাপড় বুনাইতে পারিত, তাহাদের অশেষবিধ দুর্দ্দশা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সংবাদপত্রে আমাদের বাল্যকালের কিম্বদন্তীর কথা চিত্রাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহারা দেশের সেরা তাঁতী ছিল, তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলা হইত—যাহাতে আ ভাল কাপড় না বুনাইতে পারে। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু তাঁতশিল্পকে দমন করিবার জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এইচ, এইচ, উইলসন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁতশিল্প দমনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই—"ইংলণ্ডে যে দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হয়,তাহাদের বিক্রয়মূল্য অপেক্ষা ভারতবর্ষ হইতে যে কার্পাস ও রেশম-জাত দ্রব্য-সম্ভার রপ্তানী করা হয়, তাহাদের বিক্রয়মূল্য শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ কম এবং ভারতীয় দ্রব্যে সেই পরিমাণ লাভ হইতে পারে। এই কারণে ভারতজাত জিনিষের উপর শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ শুল্ক বসান প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এইরূপ উচ্চ শুল্ক বসাইয়া ভারতীয় পণ্যের আমদানী যদি বন্ধ করা না হইত, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টারের দশা শোচনীয় হইত। ভারত যদি স্বাধীন থাকিত, তবে ভারতও বৃটিশজাত দ্রব্যের উপর এইরূপ উচ্চ শুল্ক বসাইয়া নিজদেশজাত শিল্পকে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু আত্মরক্ষার এই উপায় অবলম্বন করিবার ভারতের কোন ক্ষমতা ছিল না। আগন্তুকদের দয়ার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইল। বৃটেন হইতে পণ্যদ্রব্য আসিতে লাগিল; তাহার উপর কোন শুল্ক ধার্য্য করা হইল না। এই প্রকারে ভারতের একটি শিল্পকে কণ্ঠরোধ করিয়া রাখা হইল—যদি একই রকমের নীতি উভয় দেশেই অবলম্বিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৃটেন ভারতের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিত না।"

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বয়ন শিল্পের উপর যে কর ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহা এইরূপ :

	পা	শিং	পে
১। প্রতি ১০০ শত পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যে	৮১	২	১১
২। কার্পাস (অসংস্কৃত) প্রতি ১০০ শত পাউণ্ড ওজনের	০	১৬	১১
৩। কার্পাস (সংস্কৃত বা তৈরী)	৮১	২	১১
৪। ভেড়ার লোম অথবা চুল শতকরা	৮৪	৬	৩
৫। মুসলিন্ (প্রতি ১০০ পাউণ্ড মূল্যের)	৩২	৯	২
৬। অন্যান্য	৩২	৯	২

(পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর ১৯১৬—১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্ট হইতে উপরে লিখিত হিসাবটী গৃহীত হইল)।

স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেই যে ভারতবর্ষ পশ্চিমের জয়-যাত্রার প্রতিরোধ করিতে পারিত এবং তাহার বস্ত্রশিল্প উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিত, উপরের লিখিত তথ্য হইতে ইহা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন। তবে, এ কথা সত্য—তাঁতশিল্প বর্ত্তমানে যে দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে—তাহাতে সে পতিত হইত না; অন্ততঃপক্ষে, বহুদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে দাঁড়াইতে পারিত—এই কথাই বলিতে চাই।

হস্ত-চালিত তাঁত-শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায় ক্রম-বর্দ্ধমান যন্ত্ররাক্ষসী। সভ্যতার অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের মনুষ্যচালিত শিল্পকেই সে ধ্বংস, বিকলাঙ্গ এবং হীনবল করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য মানুষের রুচিও বদলাইয়া গিয়াছে: নূতন হইতে নূতনতর সখ ও সৌখিনতার খোরাক তাঁতশিল্প আজ আর মিটাইতে পারে না। এ অবস্থার কারণও বহু।

তাঁতীদের নির্ভর করিতে হয় উপাদান বা সূতার উপর। এই সূতা শতকরা ৮৬ ভাগ মিলে প্রস্তুত হয়। অতএব তাঁতীর শত্রু যে যন্ত্র—সেই যন্ত্রের নিকটই আবার তাঁতীকে হাত পাতিতে হয়—সূতার জন্য। আর সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড়ের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, সেই সূক্ষ্ম উপাদান সমস্তই বর্ত্তমান সময় বিদেশ হইতে রপ্তানী হয় এবং তাহার মূল্য শুল্ক-সমেত অধিক পরিয়া যায়, এই নানাবিধ কারণে তাঁতশিল্প আজ মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে যে কারণে হস্ত-পরিচালিত তাঁত-শিল্প দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নবিধ :

(১) মিলের সহিত প্রতিযোগিতা এবং বিদেশ হইতে রপ্তানী;
(২) প্রয়োজনীয় সূতার অভাব;
(৩) সূতার অগ্নিমূল্যতা;
(৪) সূতা বণ্টনের স্বেচ্ছাচারিতা;
(৫) তাঁত বুনানের সেকেলে-প্রথা;
(৬) রঙীন সূতার উচ্চ-মূল্যতা;
(৭) সুচারু শেষ-সুসম্পন্নতার অভাব;
(৮) বাজার বা ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানের অনিশ্চয়তা;

বাংলার তাঁত-শিল্প সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ কর্ম্মচারী মিঃ কলিন্স, আই, সি, এস, যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাতে তদানীন্তন অবস্থার সবিশেষ উল্লেখ আছে।

'প্রায় প্রতি জেলায়ই তাঁতে কাপড় বুনা হয়, কিন্তু বিলাত হইতে কাপড় আমদানী সুরু হইবার পর হইতে তাঁতীরা তাঁত ফেলিয়া এঁড়ে গরু কিনিয়া চাষী সাজিয়াছে। এখনও যে দেশে-প্রস্তুত কাপড়ের চাহিদা আছে, তাহার কারণ সেগুলি টেকসই; বিলাতি কাপড়গুলি সে তুলনায় কম টেকে।'

বর্দ্ধমান বিভাগের স্থানে স্থানে এবং প্রেসিডেন্সী ও ঢাকাবিভাগের কোন কোন অংশে তাঁতীরা যে টিকিয়া আছে, তাহার একমাত্র কারণ তাহারা সুনিপুণ কারিকর। শ্রীরামপুর মহকুমায় প্রায় ছয় হাজার ঘর তাঁতী আছে—তাহাদের বাৎসরিক আয় প্রায় নয় লক্ষ টাকা। শ্রীরামপুর, হরিপাল ও খানওয়ালে তাহাদের বাস। শ্রীরামপুরের তাঁতীরা উন্নত-ধরণের তাঁত ব্যবহার করে, এই কারণেই হয়ত তাহারা অদ্যাবধি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী এক রকম কাপড় প্রস্তুত করে—দশ গজ কাপড়ের দাম—মাত্র দেড় টাকা। উক্ত এলাকায় শেওড়াফুলির সন্নিকটে এক বিশেষ সূক্ষ্ম-ধরণের কাপড় প্রস্তুত হয়। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কালনাতেও প্রায় পাঁচশত তাঁতী আছে। তাহারা বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার কাপড় বুনে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে প্রায় তিন হাজার পাঁচ শত পরিবার রঙীন্ পাড় দেওয়া শাড়ী প্রস্তুত করে। যে যে স্থানে তাঁতীরা তাঁত বুনে, তাহার সর্ব্বত্রই বিদেশ হইতে রপ্তানী করা উপাদান ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নাই। কার্পাস তুলা হইতে সূতা প্রস্তুতীকরণ, পারিবারিক শিল্প হিসাবেই মাত্র অতি সামান্য পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। শান্তিপুরের তাঁতীরা মাসে রোজগার করে গড়ে দশ টাকা। তাহারা যেরূপ রঙীন্ পাড় বুনে, সেইরূপ পাড় এখন বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। ঐ সব কাপড়ের দর শান্তিপুরের শাড়ীর তুলনায় শাড়ী-পিছু চারি আনা কম। পাবনায় 'দোগাছীতে' ও 'ছোটধুলে' তাঁতীরা সুন্দর ধরণের সূতী ও রেশমী কাপড় তৈরী করে। এই স্থানের শিল্প ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় এখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এ সব অঞ্চলে রঙীন্ শাড়ীও তৈরী হয়। এখানকার তাঁতীরা বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকার কাপড় তৈরী করে। ঢাকার 'সাদা-বুনানী' ও 'সোণালী পাড়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর কাপড়ের দামও বেশী। কোনও কোনও শ্রেণীর শাড়ীর জমিনে ফুলের নক্সা থাকে। এই শ্রেণীর শাড়ীর নাম "জলধর জামদানী"। প্রায় এক শত লোক এই কারুকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। সাধারণ আটপৌরে কাপড় বুনায়—প্রায় তিনশত ঘর তাঁতী। বাজিতপুরে আছে—প্রায় চল্লিশ ঘর তন্তুবায়। বাঁকুড়ায় আছে প্রায় একশত ঘর। কলিকাতা অঞ্চলে সিমলা ও বরাহনগর ধুতী ও শাড়ীর জন্য প্রসিদ্ধ। Collins সাহেব এইরূপে একে একে খুলনার সাতক্ষীরা, মালদহ, ফরাসডাঙ্গা ইত্যাদি সর্ব্বস্থানের তাঁতের কাপড়ের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তিনি বলিতেছেন—"মৈমনসিংহের অন্তর্গত 'বাজিতপুরে' একরকম বিশেষ শ্রেণীর শাড়ী পাওয়া যায়—তাহার নাম 'গঙ্গাবাহান' শাড়ী। একরকমের মোটা 'কাটা কাপড়' পাওয়া যায়—এ শুধু মেয়েদের ব্যবহারেরই উপযুক্ত—কাপড়গুলি মোটা ও টেকসই, প্রাপ্তিস্থান—জলপাইগুড়ি, রংপুর ও পুর্ণিয়া।" এই ছিল বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বাংলার তাঁত শিল্পের অবস্থা।—আর আজ?

তাঁত শিল্প সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিয়া মিলে প্রস্তুত কাপড়ের কথা এবার ধরা যাক্। সভ্যতার পরিধি-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মিলের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং বয়ন-শিল্পের উন্নতি পরিকল্পে যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির কথা তাই বিশেষ করিয়া আলোচনা করার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য যে মিল স্থাপিত হয়—তাহার স্থান হইল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হুগলী নদীর তীর এবং কাল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ।

ইহার প্রায় ৩৬ বৎসর পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সহরের প্রথম মিল স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বস্ত্রবয়নের নিমিত্ত কোন্ প্রদেশে কত সংখ্যার মিল আছে, তাহার হিসাব এইরূপ:

	প্রদেশ	মিলের সংখ্যা
১।	বোম্বে	২০১
২।	বাংলা	৩৪
৩।	মহীশুর	২৭
৪।	মধ্যভারত	১৬
৫।	মধ্য প্রদেশ সমূহ	১১
৬।	ইউ, পি	৮
৭।	পাঞ্জাব	৮
৮।	মাদ্রাজ	৬
৯।	হায়দ্রাবাদ	৬
১০।	রাজপুতানা	৬
১১।	বিহার ও উড়িষ্যা	২
১২।	ত্রিবাঙ্কুর	১
	মোট—	৩২৮

আলোচ্য শিল্পের প্রথম অবস্থায় আশার ক্ষীণরশ্মি দেখা গিয়াছিল। ১৮৫৪ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই যে—সুয়েজ খাল কাটা হইয়াছে। আমেরিকার 'সিভিল ওয়ারের' জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারে সূতীর

দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে—তাহা ছাড়া, এই সময়ে চীনদেশে কার্পাস সরবরাহ করা বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৬৫ সালের পর হইতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারতের নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের লক্ষণ দেখা দিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসায়ী মহাজনদের ঈর্ষান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে ভারতীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের উন্নতির আশার যে ক্ষীণরশ্মি ইতঃপূর্ব্বে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, আমরা দেখিতে পাই—প্রধানতম দুইটী অন্তরায় বয়ন-শিল্পের প্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

(১) পৃথিবীর পূর্ব্ব বিক্রয়াঞ্চলে জাপানীদের প্রতিযোগিতা ;

(২) পৃথিবীর পশ্চিম দেশে নব নব বয়ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা।

ভারতবর্ষে, কেবল মাত্র সূত্র নির্ম্মাণে নহে, বস্ত্র-বয়নের দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে—এই সত্যটাই ক্রমে সুপরিস্ফুট হইয়া আত্মবিকাশ করিল। ইং ১৯০০ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বেকার তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশী পরিমাণ বস্ত্র-বয়ন আরম্ভ হইল। ইং ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত, যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে বস্ত্র-শিল্পের কিছুটা উন্নতি হইল বটে, কিন্তু এ উন্নতিকে স্থায়ী উন্নতি বলা চলে না। স্বদেশী অন্দোলনের (১৯০৫-১৯০৭) ফলে বয়ন-শিল্প-জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল ; কয়েকটী মিলের পত্তনও হইল বটে ; কিন্তু শিশু-বৃক্ষকে ফল-প্রসূ অবস্থায় পর্য্যবসিত করা শুধু কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারাই সম্ভবপর নহে, বস্তুতঃপক্ষে সময়-সাপেক্ষ। একের পর আর এক বাধা বয়নশিল্পকে পঙ্গু করিতে প্রয়াস পাইল—১৯০৭ সালে চীনে স্বর্ণমূল্য হ্রাস হইল। ১৯০৭-১৯১০ সালে রৌপ্যের উপর শুল্কবৃদ্ধি করা হইল। ১৯১৪-১৯১৮ যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধের আনুষঙ্গিক তৎপরবর্ত্তী পৃথিবী-ব্যাপী ব্যবসায়ক্ষেত্রের অবনত অবস্থা (১৯২০-১৯২৩) ভারতীয় শিশু-বয়ন-শিল্পকে দুর্জ্জয় ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া অতিবাল্যেই মরণোন্মুখ করিয়া তুলিল। ভারতীয় বয়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হীন ছিল না ; কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অন্তঃসারশূন্য হইতে লাগিল।

সংখ্যার দিক দিয়া ১৯১৯ সালে ভারতে—

১।	মোট মিলের সংখ্যা	২৫৮
২।	স্পিণ্ডেলের সংখ্যা	৬,৬৫৩,৮৭১
৩।	লুমের (তাঁতের) সংখ্যা	১১৬,৪৮৪
৪।	দৈনিক মজুর সংখ্যা	২৮২,২২৭
৫।	ব্যবহৃত কার্পাস পরিমাণ (৫ মণের প্রতি গাঁট)	২,০৮৫,৬৭৮

১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবসায়িগণের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে বয়ন-শিল্প রোগমুক্ত হইবার জন্য সজাগ ও সচেষ্ট রহিয়াছিল। ১৯১৮ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত জাপানের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। ১৯২৬ সালের জুনমাসে, ভারত সরকার, ভারতীয় বয়ন-শিল্পের অবস্থা অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে একটি Special Textile Tariff Board নিযুক্ত করিলেন। এই বোর্ডের Reportএ কতকগুলি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত পেশ করা হইয়াছিল, যথা :

১। (ক) অসংস্কৃত মাল অর্থাৎ কার্পাস বিকিকিনির আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা ;

(খ) যাহাতে শ্রম বাঁচান যায়, তদনুরূপ উপায়ের অবলম্বন ;

(গ) সমগ্র মিল-মালিকদের সমিতি সংগঠন এবং সমবেত স্বার্থের সংরক্ষীকরণ ;

(ঘ) প্রয়োজনানুরূপ বিবিধ প্রকারের বস্ত্র উৎপাদন এবং মিহি মাল উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন ;

(ঙ) আইন দ্বারা ভারতীয় বয়নশিল্পের স্বার্থসংরক্ষণ-প্রণোদিত আন্তর্জ্জাতিক মাল সরবরাহ পরিবেশন ;

(চ) নূতন নূতন বিক্রয় স্থানের অনুসন্ধানীকরণ এবং তত্রত্য বিক্রয় ব্যবস্থা অবলম্বন ;

(ছ) কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করিতে ১৯২১ সালের পূর্ব্বে কোন শুল্ক দিতে হইত না ; সেই অবস্থার পুনর্ব্যবস্থা ;

২। ভারত সরকার আর্থিক সাহায্য দান করিয়া একটি সম্মিলিত "Bleaching, Dyeing & Printing plant" যাহাতে ভারতে সংস্থাপন করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

৩। ভারত সরকার আর্থিক সাহায্য দান করিয়া ভারতীয় বস্ত্র-পণ্য যাহাতে দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে, তাহার জন্য প্রচারক প্রেরণ এবং নূতন নূতন বিক্রয় স্থান আবিষ্কার ও তাহাদের সংরক্ষণ।

উপরিউক্ত বোর্ডের রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী, ভারত সরকার, মিলের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের উপর যে আমদানী শুল্ক ধার্য্য ছিল, তাহা রদ করেন। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে The Indian Tariff [Cotton [yarn Amendment] Act এবং The Indian Tariff (Amendment) Act পাশ করেন। নিকট প্রাচ্য

এবং আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য মিশন প্রেরিত হয়। ইউরোপ এবং আফ্রিকাতে ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনার (Trade Commissioners) পাঠাইবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে, Mr. G. S. Hardy, [Collector of Customs, Calcutta] Special Textile Tariff Board-এর Report-এর পর হইতে কি কি ব্যবস্থা ভারত সরকার কর্ত্তৃক কার্য্যতঃ অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহাতে কি ফল ফলিয়াছে—তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। ভারতীয় মিল-মালিকগণ জাপানী প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। হার্ডি সাহেবের অনুমোদন অনুযায়ী জাপানী বস্ত্র আমদানীর উপর শতকরা ২৫ ভাগ (ad valorem) duty ধার্য্য হইল। কিন্তু অবস্থার সবিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না।

ইং ১৯২৯ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত বয়নশিল্প অবনত অবস্থার চরমে আসিল। বোম্বাই অঞ্চলে শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইল। তবু কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, বাহ্য দৃষ্টিতে অবস্থা নিরাশাপ্রদ মনে হইল না। ১৯৩৯ সালে, ভারতীয় মিলের সংখ্যা ৩৮৯, ১৯২৯ সালে ছিল ২৫৮। Spindles-এর সংখ্যা ১০, ০৫৯, ৩৭০, ১৯২৯ সালে ছিল ৬, ৬৫৩, ৮৭১। Loom বা তাঁতের সংখ্যা, ২০২,৪৬৪, ১৯১৯ সালে ছিল ১ ৬, ৪৮৪। দৈনিক মজুর সংখ্যা ৪৪১, ৯৪৯, ১৯১৯ সালে ছিল, ২৮২, ২২৭। ব্যবহৃত কার্পাস পরিমাণ [৪০০ শত পাউণ্ড বা ৫ মণের প্রতি গাঁট] ৩, ৮ ০, ৭৩৪, ১৯১৯ সালে ছিল, ২,০৮৫, ৬৭৮। মিলে মাল স্তূপীকৃত হইতে লাগিল; কিন্তু চাহিদা নাই; কারণ বিদেশী আমদানী ভারতীয় চাহিদা মিটাইতে মুক্তহস্ত।

আমরা এবার বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিব। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সুরু হইল; ভারতীয় মিলসমূহ ভারতীয় সৈন্যপুঞ্জের পোষাক-পরিচ্ছদ চাহিদা মিটাইতে লাগিল। ১৯১৪-১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধে এত পরিমাণ চাহিদা মিটাইবার সুযোগ ভারতীয় মিলসমূহ পাইয়াছিল না। ভারতের সর্ব্বত্রের ছোট বড় সমস্ত মিলগুলিই দুইগুণ তিনগুণ খাটিয়া নূনাধিক ২৬৮ রকমের বিভিন্ন design-এর কার্পাসজাত বস্ত্র প্রস্তুত করিল। মিলের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক্ দিয়া বিশেষ কিছু হইল না; তবে শ্রমিকের হাড়ভাঙা অতিরিক্ত খাটুনি এবং মিল-মালিকের Bank-Balance—দুই'ই বাড়িয়া চলিল।

যুদ্ধের খোরাক জোগান হইল বটে; কিন্তু ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। ১৯৪১—৪২ সালে ভারতীয় বয়ন-শিল্পের প্রস্তুতীকরণ এবং চাহিদার অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়, যথা:

Indian Textile

Supply & Demand Position

as in 1941-42

Supply (In Million yds.)		*Demand (In Million yds.)*	
By Mills	4,494	To Export by sea	865
„ Hand Looms	2,000	„ „ „ Land	121
„ Import	182	„ Supply Dept.	1,000
		„ Balance for Civilian use	4,690
	6,676		6,676

By Balance for Civilian use, 4 690 Million yds.

যদিও ৪,৬৯০ মিলিয়ন গজ কাপড়, ভারতীয় জনগণের ব্যবহারের জন্য, ভারতীয় মিলসমূহ সরবরাহ করিতে সক্ষম, ভারতীয় জনগণের সংখ্যা এবং তাহাদের মাথাপিছু প্রয়োজন হিসাব করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের মাথাপিছু বৎসরে ১২ গজ করিয়া কাপড় হিসাবে ধরিলেও, বর্ত্তমান অবস্থায় ১,৩২০ মিলিয়ন গজ কাপড়ের ঘাটতি রহিয়াছে। ভারতের পূর্ণ চাহিদা অবশ্য মাথাপিছু বৎসরে বার গজে কিছুতেই মিটে না: এই ন্যূনতম হিসাবেও এই অবস্থা। অথচ, আমরা শুনিতে পাই যে, ভারতীয় ব্যবসায় জগতে, বয়নশিল্প শীর্ষতম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে—ভারত-জাত কার্পাসের অন্ততঃ আধাআধি ভারতীয় মিলেরই খোরাক জোগায়—বয়নশিল্প ৬ লক্ষ ভারতীয় পরিবারকে অন্ন জোগায়—আমাদের দশ মিলিয়ন Spindle আছে, ১৯৫ হাজার Loom বা তাঁত আছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার পরেই বয়নশিল্পে পৃথিবীর মধ্যে আমাদের স্থান ইটালী, রুশিয়া, জাপান, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের আমাদের দেশের চাইতে বেশী Spindles নাই। বর্ত্তমান জগতের বয়নশিল্প ক্ষেত্রে ভারত কার্পাস পস্তুত বিষয়ে দ্বিতীয় এবং চরকা ও মিল তাঁত সঞ্চালনা হিসাবে জগতের পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমগ্রভারতের অবস্থা বাদ দিয়া, যদি শুধু বাংলাদেশের অবস্থাই পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, বাংলায় ৩৯টী মিল আছে, তন্মধ্যে ১২টী বড়, বাকী কয়টি অবশ্য ছোট আকারের। বাংলার জন্য যে কাপড়

প্রয়োজন, সেই পরিমাণের অর্দ্ধেকের বেশী বাংলা প্রদেশ প্রস্তুত করিতে পারে না। এ অবস্থা কিন্তু আগে ছিল না; একশত বৎসর আগেকার কথা—বাংলাদেশ বিলাতে East India Co.কে এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানকে মাল রপ্তানী করিত।

Statistics as to Export Trade of Bengal in Textiles

	Export to E I. Co,		Private	
	Pos' Value (Rs. 1000)		Pos' Value (Rs. 1000)	
1824-25	57,574	2,89	1,958,414	60.17
1825-26	19,622	1,02	1,757,012	58,35
1826-27	19,398	64	1,090 597	39,48
1827-28	47,660	2,65	896,961	28,76
1828-29	27,463	1,64	938,852	22,23

আজও বাংলায়, মাসে, গড়ে নয় হাজার গাঁট কাপড় তৈরী হয় মিলে; আর আট হাজার গাঁট কাপড় তৈরী হয় বাংলার বিভিন্ন তাঁতে—যে সব তাঁত তাঁতীরা হাতে চালায়। মোট মাসে ১৭০০০ (হাজার) গাঁট কাপড়—বাংলা তৈরী করে। কিন্তু তার চাহিদা মাসে অন্ততঃ ৪২০০০ (বেয়াল্লিশ হাজার) গাঁটের—এ অবশ্য বার্ষিক মাথাপিছু বার গজ বরাদ্দে। যদি বার্ষিক মাথাপিছু ৩০ গজ হিসাব ধরা যায়—যে হিসাবে Bombay Plan গণনা করিয়াছেন—তবে, বাংলার মাসিক চাহিদা দাঁড়ায় একলক্ষ বেল বা গাঁটের। বাংলার তাই আজ দরকার তার—বয়ন-শিল্পের প্রস্তুতীকরণকে অন্ততঃ ছয়গুণ বাড়ান। এর জন্য চাই—

(১) আরও মিল বাড়ান

(২) যে সব মিল কাজে ব্রতী আছে, তাহাদের Splidles (টেকো) এবং Looms (তাঁত) সংখ্যায় আরও বাড়ান;

(৩) বৈদেশিক অবাধ মাল সরবরাহ গতি-নিয়ন্ত্রণ।

১৯৪৩ সালের জুন মাসে, the Cotton Cloth & Yarn Control Order জারী হইয়াছে। কেন্দ্রিক সরকার ইহার বহু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারও তাহা করিতে কসুর করেন নাই। Textile Commisisoner নিযুক্ত হইয়াছেন—তিনি মিলের কাপড়ের (১) দাম (২) প্রস্তুতীকরণ (৩) বণ্টন ব্যাপারের পরিচালনা করেন। আমাদের ভাত কাপড় দুইই আজ কণ্ট্রোলের অফিসের কেরাণীর মারফত পাইতে হইতেছে।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে; কিন্তু controlএর অবসান হয় নাই বা অতি শীঘ্র ইহার অবসান হইবার কোন চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। অভাব থাকিলেই ভাগাভাগির কথা উঠে, প্রাচুর্য্যের সময় বণ্টনের আঁট-শাঁট বাঁধার প্রশ্নই জাগে না। বাংলার তথা ভারতের এই বস্ত্র-সঙ্কট সাময়িক নয়, বহুদিনেরই ব্যাধির সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। বাহিরের প্রলেপে চলিবে না। মূল রোগ নিদান-সম্মত ব্যবস্থায় চিকিৎসা করিতে হইবে। প্রলেপ—বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী।

শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা—আত্মস্থ হইবার যোগাভ্যাস—অর্থাৎ চাহিদার উপযোগী প্রস্তুতীকরণের জাতীয় ব্যবস্থা। আমাদের সমস্যা বহু এবং বিশেষ জটিল।

(১) মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করান উচিত কিম্বা তাঁতের সংখ্যা বাড়ান উচিত? কোনটা কতগুণ বাড়াইলে দেশের এবং দশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে! সকলের পক্ষে তাঁতের কাপড় ব্যবহার সম্ভবপর নহে—কারণ মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড়ের দাম বেশী। স্থানীয় চাহিদা এবং রুচিভেদে মিল এবং তাঁতের সংখ্যা-সামঞ্জস্য হওয়া উচিত।

( ) মিল এবং তাঁতের অবস্থান-নিরূপণ সমস্যা। ভারতের বেশীর ভাগ মিল হয় সহরে, না হয় সহরতলীতে অবস্থিত। ফলে, বস্তী-জীবন এবং কুলী-লাইনের উদ্ভব হইয়াছে। সহর ছাড়িয়া, জিলা, মহকুমা এবং গ্রামের দিকে মিলের এবং সঙ্ঘবদ্ধ তাঁতশিল্পের গতি নিয়ন্ত্রিত হইলে প্রয়োজন-ভেদে এবং চাহিদা অনুপাতে ছোট বড় বহু মিল এবং সঙ্ঘবদ্ধ তাঁত-শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহাতে সহরের পৌর-সমস্যা খানিকটা পরিমাণে লাঘব হইবে এবং বাঙ্গালার পল্লীর হৃতশ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে।

(৩) মালিক ও শ্রমিক সমস্যা। মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই আন্তরিক ভাবে অনুভব করা উচিত যে, তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ নয়; উভয়ে উভয়ের স্বার্থের পরিপোষক। মালিকের উন্নতি না হইলে—অর্থাৎ—যতদিন পর্য্যন্ত লাভ-লোকসানের অঙ্ক হিসাব করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থপরিপন্থী অর্থনীতি দেশে কায়েম থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মালিকের লাভের অঙ্ক না বাড়িলে, শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। মালিককে শোষণ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শ্রমিক তাহারই পরিবারভুক্ত একজন এই নীতি স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। শ্রমিক যে গায়ের রক্ত ঘামে জল করিয়া মালিকের মুনাফার রসদ যোগাইবে—মালিককে সেই রক্তের জোগান দিতে হইবে। শ্রমিককে আপন জন করিয়া লইতে হইবে। মজুরী ছাড়াও, মালিকের লভ্যাংশের একটী নির্দ্দিষ্টভাগ শ্রমিকের প্রাপ্য। শ্রমিক, মিলের কার্য্যনির্ব্বাহ ব্যাপারের অধিকারী হইবে।

(৪) স্থানীয় সমস্ত শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ থাকিবে পারিশ্রমিকের হার এবং লভ্যাংশের হার সুনির্দিষ্ট এবং সর্ব্বত্র সম থাকিবে।

(৫) মিল-মালিকগণ একতাবদ্ধ থাকিবে। তাহাদের অনুসৃত নীতি সর্ব্বত্র এক থাকিবে।

(৬) প্রাদেশিক সরকার মালের প্রস্তুতীকরণ সংখ্যা, বণ্টন এবং মূল্যহার নিরূপণ করিয়া দিবেন। কোথায় কোন্ প্রতিষ্ঠান স্থগিত হওয়া উচিত কিম্বা উচিত নয় এবং কি আকারের এবং আয়তনের ঐ প্রতিষ্ঠানটি হইবে—সে সম্বন্ধেও সরকার নির্দ্দেশ দিবেন। ধনিকের স্বেচ্ছা-চারিতা বন্ধ করিতে হইবে। জাতীয় কল্যাণেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই বস্ত্রশিল্প সংগঠিত, সংস্থাপিত এবং সঞ্চালিত হইবে।

(৭) বহির্ব্বাণিজ্য ব্যাপারে কাপড়ের আমদানী রপ্তানী তথা ভারতজাত কার্পাসের আমদানী রপ্তানী কেন্দ্রিক সরকারের এলাকাভুক্ত থাকিবে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ব্যাপারে মাল সরবরাহ স্থানীয় চাহিদার উপর-মূলতঃ নির্ভরশীল থাকিবে। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া, স্থান-মাহাত্ম্যে অথবা গুণী কারিকরের সমাবেশ কৌশলে, অতিরিক্ত মাল মজুদ্ হইয়া পড়িলে, কেন্দ্রিক এবং প্রাদেশিক সরকার একযোগে পরামর্শ করিয়া মাল-বণ্টনের যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন।

(৮) ভবিষ্যতের লক্ষ্য থাকিবে—যাহাতে স্বায়ত্ত শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইলে—বস্ত্র-শিল্প জাতীয় শিল্পে পরিণত হয়, ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগত লাভ লোকসানের অঙ্কের হিসাব আর না করিতে হয়।

চৌকো চোয়াল (উপন্যাস)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

আট

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে এসে ক্ষিতীশবাবুর সদরের বারেণ্ডায় উপস্থিত হলেন। শান্তিবাবু বসে সতীশ যতীশের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সতীশকে নিভৃতে ডেকে তরুণ বললে, "সতীশ, তুমি মিঃ জ্যাক্‌সনকে চেন?

সতীশ বললে, "খুব ভাল করে চিনি।"

"ভিড়ের মধ্যে দেখলেও চিনতে পারো?"

ম্লানভাবে হেসে সতীশ বললে, "সে চেহারা ভিড়ের মধ্যে চাপা পড়বার নয়! লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ চেহারা! আমাদের ফুটবল গ্রাউণ্ডে তাঁকে বহুবার দেখেছি।"

১লা ডিসেম্বর রাত্রে দিল্লী এক্স্‌প্রেস বা অপর কোনও ট্রেণে তাঁকে আসতে দেখেছ?"

"না। সে রাত্রে যে ক'খানা ট্রেণ আমি দেখেছি, কোনও ট্রেণে তিনি ছিলেন না। থাকলে নিশ্চয়ই আমি দেখ্‌তে পেতাম। তাঁকে আমি খুব ভাল করে চিনি। শুধু আমি কেন? স্কুলের সকলেই চেনে।"

"ধন্যবাদ। ক্ষিতীশবাবুর মৃতদেহে যে কোটপ্যান্ট ছিল, তার রং তো কালো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর পট্টুর অলেষ্টারটার রং?"

চিন্তিতভাবে সতীশ বললে, "বাবার পট্টুর অলেষ্টার? তার রং ঠিক সাদা নয়। ফিকে ইয়োলিশ। গাওয়া ঘিয়ের মত বলতে পারা যায়।"

হর্ষোজ্জ্বল মুখে তরুণ বললে, "ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আপাততঃ বিদায়—"

শান্তিবাবু ও পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ মোটরের দিকে অগ্রসর হতে হতে বললে, "এ-অঞ্চলের বাংলা ভাষার ঠিক কায়দা-দুরস্ত উচ্চারণটা আমার শেখা দরকার। হাতের কাছে এই ড্রাইভার ভায়াকে পাওয়া গেছে, একেই এখন শিক্ষাগুরু করা যাক। আপনারা পিছনের সিটে যান! আমি ড্রাইভারের পাশে বসে গল্প করব।"

তরুণ ড্রাইভারের পাশে বসল। ফাঁকা রাস্তা ধরে মোটর পশ্চিম দিকে লোহাগড়ের দিকে ছুটল। দু'পাশে নির্জ্জন মাঠ। শুক্ল সন্ধ্যার শীতার্ত্ত ম্লান জ্যোৎস্নায় চারিদিকে ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা। সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন রহস্যময় কুহেলিকার আবরণ বিছানো রয়েছে।

তরুণ স্থানীয় চাষবাসের খবর নিয়ে, আবহাওয়া-তত্ত্বে এসে পৌছাল। বললে, "এ দিকের পাহাড়ে শীত তো বেশ কনকনে! এই শীতে ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়া খাটবার জন্যে আসানসোল ষ্টেশনে তুমি কি সারারাত থাক?"

ড্রাইভার মাথা নেড়ে বললে, "আগে থাকতাম, এখন আর সাহস হয় না। পয়সার জন্যে কে কাঁচা প্রাণটা দেবে বলুন? সারারাত ভাড়া খেটে আমার সম্বন্ধী তশু হঠাৎ মারা গেছে! পশু সারাটা দিন কি ঝঞ্ঝাটই গেছে! যমের জ্বালাতে অস্থির, আবার পুলিশের তাড়া! একটু দয়া মায়া নেই।"

"কেন? কি হয়েছিল?"

"কি যে হয়েছিল বাবু, তা জানি না। সারারাত ট্যাক্সি হাঁকিয়েছিল, কাছে মদের বোতলও পাওয়া গেল। হাঁ, মিথ্যে কথা বল্‌ব কেন? মদও সে একটু বেশী খেত। বিকেলে সুস্থ শরীরে সে ভাড়া খাটতে বেরুল। রাত্রে আর ঘরে এল না! সকালবেলা দেখা গেল, বাড়ী থেকে আধ মাইল রাস্তা দূরে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে মরে কাঠ হয়ে ষ্টিয়ারিং হুইলের ঘাড়ে কাৎ হয়ে পড়ে আছে! বর্দ্ধমানের পুলিশ তো মড়া নিয়ে টানাটানি জুড়লে! ভাগ্যে তার পকেটে ত্রিশ টাকা পাওয়া গেল, তাই রক্ষে! পেট্রোল ষ্টেশনও সাক্ষী দিলে—"সে পাঁচ গ্যালোন তেল নিয়েছিল। সওয়ারী নিয়ে রাত সাড়ে এগারটা বারোটা নাগাদ সে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে পশ্চিম দিকে গাড়ী হাঁকিয়ে ছুটেছিল, তবে পুলিশ নিষ্কৃতি দেয়! তবে গিয়ে সৎকার করি।"

"কোথা সে ভাড়া খাটত?"

"বর্দ্ধমান শহরে।"

"মৃতদেহ পাওয়া গেল কোথা?"

"ওই বর্দ্ধমানেই। শহরতলিতে কেশবগঞ্জের চটি বলে একটা জায়গা আছে জানেন? তার খানিক দূরেই রেল-ষ্টেশন। সেই চটি আর ষ্টেশনের মাঝামাঝি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ট্যাক্সিটা পাওয়া গেল। আশ্চর্য্য! গাড়ীতে তেলও ছিল, কলকব্জাও ঠিক। গাড়ীর আলোর একটা বাল্‌ব পর্য্যন্ত চুরি যায় নি! যা ফাঁক পেলেই বদমাইস ছেলেগুলো আগে চুরি করে! আমার গাড়ী থেকেও কতবার চুরি করেছে! কিন্তু তার গাড়ী থেকে কিছু চুরি যায় নি।"

স্থানটার অস্পষ্ট স্মৃতি স্পষ্টভাবে স্মরণ করবার চেষ্টায় ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে ভাবতে তরুণ বল্‌লে, "কেশবগঞ্জের চটি আর রেল ষ্টেশনের মাঝামাঝি জায়গা? স্থানটা যে অত্যন্ত নির্জ্জন! সেখানে তো লোকালয় নাই।"

ড্রাইভার বল্‌লে, "না। তাই তো পুলিশের সন্দেহ! বলে—বিষ খাইয়ে মেরেছে কি না কেটে-কুটে দেখব। কিন্তু তাই যদি মারবে, তা'হলে পকেটে টাকা থাকবে কেন? ভাগ্যে ওই টাকাগুলো ছিল, আর গাড়ীর কল-কব্জা কিছু চুরি যায় নি, তাই শেষকালে লাস ছেড়ে দিলে।"

তরুণের ললাটে গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠল কিছুক্ষণ চুপ করে সে দূরের কুয়াশা ঢাকা অস্পষ্ট মাঠের দিকে চেয়ে কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ বল্‌লে, "কবে মারা গেছে বললে? তশু'? আজ ৫ই ডিসেম্বর,—অতএব তশু' মানে ২রা ডিসেম্বর সকালে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তা'হলে সে ১লা ডিসেম্বর রাত্রে—বর্দ্ধমান থেকে পশ্চিম দিকে ভাড়া খাটতে এসেছিল? পাঁচ গ্যালোন পেট্রোল নিয়েছিল? তা'হলে তো লম্বা দৌড় হাঁকিয়েছিল!"

ড্রাইভার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে, "লম্বা দৌড় বৈ কি! ত্রিশ টাকা মজুরিও পেয়েছিল! আজকের দিনে ত্রিশ টাকা ট্যাক্সিভাড়া কি সোজা দৌড়ে মেলে? মাইল পিছু আট আনা মজুরি ধরলেও সে ষাট মাইল তো গেছলই! তা'ছাড়া নগদ দামে পাঁচ গ্যালোন পেট্রোল কিনেছে, মদেও খরচা করেছে,—কাজেই আরও দশ বারো টাকা সে নিশ্চয়ই কামিয়েছিল!"

উগ্র কৌতূহলে তরুণের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নিজ মনে বলে ফেললে, "বর্দ্ধমান থেকে ষাট মাইল পশ্চিমে? ঠিক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যদি এসে থাকে, তবে তো আসানসোলের কাছাকাছি এসেছিল! বাঃ! কোন দিক থেকে সওয়ারী নিয়ে এসেছিল? বর্দ্ধ-মান ষ্টেশন থেকে? না শহর থেকে? গিয়েছিল-ই বা কোথা?"

সখেদে ড্রাইভার বললে, "জোর তলবে চলে গেল, সে-কথা আর কে বলবে বাবু? কিছু কি বল্‌তে সময় পেলে।"

উত্তেজিত ভাবে তরুণ বলে উঠল, "পাছে সময় পায়, —সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ জন্মের মত বন্ধ" হঠাৎ আত্ম সম্বরণ করে সে থেমে গেল। শশব্যস্তে বললে, "ওহে, কাল একটা জরুরি কাযে আমি বর্দ্ধমানে যাব। তুমি এই গাড়ীতে আমায় নিয়ে যাবে?"

"কখন যাবেন? দিনের বেলায়?"

"হাঁ, বৈকালে।"

"ফিরবেন কখন? বেশী রাতে আমি গাড়ী চালাতে পারব না বাবু,—"

"ভয় নেই। রাত্রে আমি ফিরব না। কিন্তু যাওয়ার কথাটা কারুর কাছে এখন প্রকাশ কোর না। তা'হলে সরকারী কাযের অসুবিধা হবে। মজুরির জন্যে চিন্তা নাই, এই নাও অগ্রিম কুড়ি টাকা রাখ। বখশিসশুদ্ধ বাকী টাকা পরে দেব।"

"বেশ। আমি আজই টায়ার বদলে, তেল যোগাড় করে গাড়ী ঠিক করে রাখব।"

কথা বলতে বলতে লোহাগড় রাজ-কাছারির সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। চোখের ইসারায় ড্রাইভারকে আর একবার সতর্ক করে দিয়ে, তরুণ সকলের সঙ্গে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল।

সামনেই আর একখানা মূল্যবান্ নূতন মোটর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। মূল্যবান্ সাহেবী পোষাক পরা, হৃষ্টপুষ্ট

চেহারার একজন ভদ্রলোক তাতে উঠতে যাচ্ছিলেন, দের নামতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

পুলিশ অফিসার তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "হ্যালো মিঃ চ্যাটার্জ্জি, গুড্ ইভ্নিং। শান্তিবাবু এসেছেন।"

"গুড্ ইভ্নিং—" বলে এগিয়ে এসে তিনি পুলিশ অফিসারের করমর্দ্দন করলেন।

তারপর শান্তিবাবুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে, তাঁর নমস্কারের বদলে সংক্ষিপ্ত প্রতি-নমস্কার করে, প্রশান্ত মুখে মিষ্ট স্বরে বললেন, "আমরা তোমার জন্যে ভেবে অস্থির। কোথা ছিলে এতদিন? ব্যাপার কি?"

পরক্ষণে তরুণের দিকে চেয়ে বললেন, "এ-ভদ্রলোকটি কে?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "ইনি ইন্‌টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে এসেছেন। রাজ-এষ্টেট যাঁকে চান—বুঝলেন? মিঃ সিংহ,—আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি রাজ-এষ্টেটের প্রধান উকিল মিঃ শ্রীকান্ত চ্যাটার্জ্জি।"

শ্রীকান্ত বাবু টুপি খুলে ইংরেজি কায়দায় নড্ করলেন। তরুণের অঙ্গে তখন স্বদেশী পোষাক। সুতরাং যুক্ত করে নমস্কার ক'রে বিনীত ভাবে বললেন, "আমার সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে আলাপের সুযোগ এখানেই পেলাম। আশা করি, আপনার সাহায্যই আমার পক্ষে সব চেয়ে মূল্যবান্ হবে।"

একটু বাঁকা হাসি শ্রীকান্ত বাবুর অধর প্রান্তে দেখা দিল। মুরুব্বিয়ানা সুরে তিনি জবাব দিলেন, "আমার দ্বারা কি সাহায্য পাবেন, তা অনুমান করা আমার অসাধ্য: বেশীক্ষণ সময় আমি নষ্ট করতে পারব না। কারণ, পারিবারিক বিপদে মনের অবস্থা ভাল নাই। তার উপর অনেকগুলো জরুরি কেস হাতে আছে। একটা বিশেষ দরকারে চিফ ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে দেখা না করলে নয়;—তাই একবার এসেছিলাম। আচ্ছা আসুন ভিতরে, তাঁর সামনেই কথাবার্ত্তা হোক।"

সকলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কাছারিতে ঢুকলেন। অনেকগুলো হলঘর পার হয়ে যেতে হোল। দেখা গেল প্রত্যেক ঘরেই আমলারা হিসাব-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। শ্রীকান্ত বাবুর সঙ্গে পুলিশ অফিসার ও শান্তি বাবুকে দেখে, তারা কাজ ভুলে গিয়ে,—হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল! তরুণের মনে হোল—এমন অভাবনীয় দৃশ্য দেখবার জন্য তারা মোটে প্রস্তুত ছিল না!—অর্থাৎ তারা আরও কিছু অন্য ব্যাপার দেখার প্রত্যাশায় ছিল।

অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে তাঁরা প্রধান ম্যানেজারের অফিসের বারেণ্ডায় পৌঁছালেন। সেখানে তখন কেউ ছিল না। দুয়ারের বেয়ারাকে ভিতরে সংবাদ দিতে পাঠিয়ে তাঁরা বারেণ্ডায় দাঁড়ালেন। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় বারেণ্ডাটা আলোকিত ছিল।

এইটুকু চলে এসে দৌর্ব্বল্য-ক্লান্ত শান্তিবাবু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একটু দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে, তিনি যেন স্বস্তি পেলেন। থামে ঠেস দিয়ে, দ্রুত শ্বাস সামলে নিয়ে শুষ্ক ম্লান মুখে বললেন, "শ্রীকান্ত দা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমার স্যুটকেসটা আপনি হোটেল থেকে এনেছিলেন কি?"

ভাব-লেশ-হীন, নির্ব্বিকার মুখে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "তোমার স্যুটকেস? তা আমি কি করে জান্‌ব? তুমি সেটা নিয়ে যাও নি?"

ক্লান্ত-কাতর-কণ্ঠে শান্তিবাবু বললেন, "আমি তো রাস্তা থেকেই তাদের সঙ্গে চলে গেছি। স্যুটকেস তো ছিল হোটেলে।"

প্রশান্ত মুখে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "তা হলে সেটা হোটেলেই পড়ে আছে।"

ব্যাকুল হয়ে শান্তিবাবু বললেন,"হোটেলের ম্যানেজার বললেন, আপনি সেটা ক্ষিতীশ বাবুর জিনিস-পত্রের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন যে!"

চুরুট ধরাতে ধরাতে নির্ব্বিকার মুখে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "বাজে কথা! আমি তোমার স্যুটকেসের খবর কিছুই জানি না।"

অধিকতর ব্যাকুল হয়ে শান্তিবাবু বললেন, "তা হলে ক্ষিতীশ বাবুর জিনিসপত্রের সঙ্গে সেটা এসেছিল কি?"

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রচ্ছন্ন শ্লেষভরা বাঁকা হাসির সঙ্গে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না। তুমি ভাই, অনর্থক উল্টো-চাপ দিয়ে আমাকে শুদ্ধ ফ্যাসাদে জড়িও না। তোমার মাল আমি কেন আন্‌ব?"

ব্যাকুলতার আতিশয্যে দিশেহারা হয়ে শান্তিবাবু বললেন, "না না, এ কি বলছেন? উল্টো-চাপ কিসের? ফ্যাসাদে জড়াব কেন? শুনলাম হাওড়া ষ্টেশনে আমার নামে লেখা এক জাল-চিঠি পেয়ে আপনি ফিরে এসে ক্ষিতীশ বাবুকে হোটেল থেকে নিয়ে যান। আপনি মনে করেছিলেন সত্যই আমি বর্দ্ধমানে চলে গেছি। সুতরাং আমার স্যুটকেসটা তখন কার জন্যে হোটেলে ছেড়ে যাবেন? সেটা নিয়ে আসাই তো স্বাভাবিক? তাই জিজ্ঞাসা করছি। হোটেলের ম্যানেজারও বললেন, ক্ষিতীশ বাবুর মালের সঙ্গে আপনি সেটাও এনেছেন।"

প্রশান্ত হাস্যে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "ও, তাই বল। ক্ষিতীশ বাবুর লগেজের সঙ্গে! 'আপনি এনেছেন,—আপনি এনেছেন' করছ কেন? হতে পারে ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গেই সেটা এসেছে। ট্রেণেও উঠেছে। তার পরের খবর তো আর বলতে পারব না।"

তারপর পুনশ্চ সেই অতি সূক্ষ্ম, অতি মৃদু, বাঁকা হাসি হেসে শ্রীকান্ত বাবু বললেন, "শুনলাম তুমিও পুলিশের কাছে এজাহার দিয়েছ যে, আমার নামে লেখা এক জাল চিঠি পেয়েছিলে? কথাটা সত্যি না কি? দাও তো দেখি সেটা, কেমন আমার লেখা?"

আহত ভগ্ন কণ্ঠে শান্তি বাবু বললেন, "আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন শ্রীকান্ত দা? সে চিঠি আমার ঘড়ি, আংটি, টাকা কড়ির সঙ্গে তো তারা চুরি করেছে। সেটা থাকলে দেখতেন,—অবিকল আপনার লেখা!"

মাথার টুপি খুলে টাকে হাত বুলাতে বুলাতে শ্রীকান্ত বাবু স্মিত মুখে বললেন, "অবিশ্বাস তোমায় করি নি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই ভয়ঙ্কর রহস্যাবৃত। আমরা একটা এমন জাল-জুয়াচুরির ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, বেমালুম সবাই গাধা ব'নে গেছি! দলিল-চোরগুলোর বাহাদুরী আছে!"

তরুণ এতক্ষণ এই ফর্সা রং সুদৃঢ়-গঠন, বলশালী মূর্ত্তি ঈষৎ স্থূলোদর, সুরুচিসঙ্গত সাহেবী পোষাকপরা ভদ্র-লোকটির আপাদ-মস্তক প্রশান্ত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল। টুপি খোলার পর দেখলে, শুধু সামনে টাক নয়—তাঁর মাথার পিছনের অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত অনুর্ব্বর মরুভূমি। কপাল চওড়া বটে, কিন্তু সামনের মাথার গড়ন এমন ঢালু যে, মনে হয় কে যেন চাপড় মেরে মাথার খুলিটা ভিতর দিকে বসিয়ে দিয়েছে! মাথার গড়ন দেখে মানুষের বুদ্ধি নির্ণয় করার সঙ্কেত তরুণের জানা ছিল। শ্রীকান্ত বাবুর মাথার গড়ন দেখে বুঝলে, অসামান্য পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকলেও উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধি তাঁর মাথায় নাই। কারণ উৎকৃষ্ট মগজের স্থানটা চাপা। ক্ষুদ্র চোখ দুটিতে তাঁর প্রচণ্ড লোভ ও ধূর্ত্ততা চাতুর্য্যের পরিচয় প্রকট হয়ে রয়েছে। তরুণের সব চেয়ে ভয় ও বিস্ময় বোধ হল,—তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা—প্রচণ্ড চওড়া চোয়ালের গড়ন দেখে! তরুণের মনে হোল ওকালতি ব্যবসায়ে প্রকৃতই ইনি যদি সাফল্য অর্জ্জন করে থাকেন, তবে অসদুপায়েই করেছেন। সদুপায়ে কদাচ নয়!

কথাটা মনে হতেই তরুণ নিজের মনের মধ্যে নিজেই সঙ্কোচে থতমত খেয়ে গেল! একজন মাননীয় ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে এমন বিরুদ্ধ ধারণা কেন অকস্মাৎ তার মনে সৃষ্টি হয়? এ দুর্বুদ্ধি তো ভাল নয়! এটা কি কুসংস্কার? না, ডাক্তার প্রবীর গুহ তার বিচার-শক্তিকে প্রভাবিত করে ফেলেছে?

চোখ রগড়ে তরুণ আবার একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁর সেই প্রকাণ্ড চওড়া চোয়ালের দিকে চাইলে। নাঃ, তরুণের দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি! দু'দিকের চোয়ালই তাঁর মুখের সঙ্গে ঝগড়া করে একান্নবর্ত্তী পরিবারের গণ্ডি ত্যাগ করে পৃথক্ হয়ে গেছে বটে!

তরুণের হতাশা বোধ হোল! অপরাধ-তত্ত্ব-বিশারদদের মত কি এবার পাল্টে দিতে হবে?—

জেলখানার সব চেয়ে ভয়ঙ্কর নৃশংস অপরাধীদের চোখ, চোয়াল ও মাথার গড়ন মনে মনে ধ্যান করে বিচারের নিক্তিতে চড়ালে!…নাঃ ভুল নয়!…নিজের হীন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে লোক, সব রকম নৃশংসতা ও সব রকম অপকর্ম্মে অকুণ্ঠিত—এ গড়নের চোয়াল তার!…… সে লোক যতই সদাচারশীলতা প্রদর্শন করুক, যতই ভদ্র জীবন যাপন করুক, একদিন-না-একদিন তার প্রকৃতিগত বিশেষত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবেই! এই চওড়া চৌকো চোয়াল—চরিত্র নির্ণয়ের অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র!

তরুণ ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুলিশ অফিসার, শান্তি বাবু, এমন কি অদূরস্থ দরোয়ানটার পাগড়ি-বাঁধা মুখের চোয়াল নিরীক্ষণ করলে। শেষে নিজের চোয়ালে হাত বুলিয়ে দেখলে,—নাঃ! নিরুপায়! ওই উৎকটভাবে প্রকটমান চওড়া-চৌকো-হাড়-বিশিষ্ট, চোয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এমন কেউ এখানে নাই।

বেয়ারা বেরিয়ে এসে তাঁদের ভিতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করলে। তাঁরা ভিতরে গেলেন।

বিপুলকায় বৃদ্ধ ম্যানেজার অপ্রসন্ন-গম্ভীর মুখে সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনা জানালেন। চেয়ার, সিগারেট ও পান দিয়ে তরুণের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের প্রাথমিক পর্ব্ব শেষ হলে, শান্তিবাবুকে তাঁর দুর্দ্দশার কাহিনী জিজ্ঞাসা করলেন। শান্তিবাবুর সমস্ত সংবাদ তাঁরা আসানসোলের পুলিশ-কর্তৃপক্ষের মারফৎ পূর্ব্বেই পেয়েছিলেন। শান্তিবাবু সংক্ষেপে সে সব বৃত্তান্ত পুনরায় বললেন।

অবিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ অপ্রসন্ন মুখে শান্তিবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। শ্রীকান্তবাবু বেশ কায়দার সঙ্গে সিগারেট টানতে টানতে মাঝে মাঝে বৃদ্ধের মুখপানে অর্থসূচক দৃষ্টিতে চেয়ে নীরবে বাঁকা হাসি হাস্‌তে লাগলেন। পুলিশ অফিসার নির্ব্বাক্।—তরুণ চিন্তাবিষ্ট মুখে শুধু শ্রীকান্ত বাবুর চোয়ালের দিকে চেয়ে রইল।

শান্তিবাবুর কথা শেষ হলে বৃদ্ধ বললেন, "শান্তিবাবু, আপনার হাত দিয়ে ক্ষিতীশবাবু কত টাকা ব্যারিষ্টার এ্যাটর্ণিদের দিয়েছেন?"

শান্তিবাবু বললেন, "প্রায় কুড়ি হাজার টাকা।"

"সে টাকার রসিদ নিয়েছেন ?"

শান্তিবাবু বললেন, "নিয়েছিলাম। আমার স্যুটকেসে সে রসিদ রেখেছিলাম। ক্ষিতীশবাবু সেগুলি আমার জিম্মায় রাখতে বলেছিলেন। কথা ছিল, তিনি এখানে এসে সেগুলি আমার কাছ থেকে নেবেন। কিন্তু আমি বর্দ্ধমানে চলে গেছি মনে করে, সে স্যুটকেস ক্ষিতীশবাবুর জিনিসপত্রের সঙ্গে চলে এসেছে। তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।"

বৃদ্ধ বললেন, "স্যুটকেসটা ক্ষিতীশের মালপত্রের সঙ্গে এসেছিল, তার প্রমাণ ?"

কম্পিত কণ্ঠে শান্তিবাবু বললেন, "হোটেলের ম্যানেজার মিঃ দাস আমার কাছে, পুলিশের কাছে, তাই সাক্ষ্য দিলেন। হোটেলে, আমাদের ঘরে যা জিনিস ছিল, সবই শ্রীকান্ত-দা ট্যাক্সিতে তুলেছিলেন।"

শ্রীকান্তবাবুর দিকে চেয়ে বৃদ্ধ চিফ ম্যানেজার বললেন, "কি হে শ্রীকান্ত, কথাটা ঠিক ?"

একান্ত মনোযোগের সঙ্গে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "হলপ করে বলতে পারব না। কেননা আমার স্মরণ নাই। আমাদের ঘরের সব জিনিস ট্যাক্সিতে তোলা হয়েছিল, সত্য। কিন্তু শান্তিবাবুর স্যুটকেস তার মধ্যে ছিল কি না, তা আমি বলতে পারব না।"

ব্যাকুল হয়ে শান্তিবাবু বললেন, "হোটেলের ম্যানেজার যে বললেন—"

বাধা দিয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "বললেই সেটা সত্য হবে না। প্রমাণ চাই। আমি যদি বলি, কোল কম্প্যানীর কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হোটেলের ম্যানেজারই ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে তোমায় আটক করেছিলেন, তিনিই রাজ-এষ্টেটের দলিল চুরি করিয়েছেন,—এমন কি তাঁরই চক্রান্তে ক্ষিতীশবাবুকে ধরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা হলে সেটাই কি সত্য বলে কোর্টে গ্রাহ্য হবে ? প্রমাণ চাই না ? কি বলুন মশাই ? আপনারাও তো পুলিশের লোক ?"

বলে সমর্থনের আশায় তিনি একবার তরুণের দিকে একবার পুলিশ অফিসারের দিকে চাইলেন। পুলিশ অফিসার মুচকে হাসলেন, কিছু বললেন না। তরুণ গম্ভীর হয়ে বললে "আপনার তর্ক শক্তি অসাধারণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে শক্তির অযথা অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। কারণ, আপনি আর ক্ষিতীশবাবু যখন নিশ্চিতরূপে জেনেছিলেন যে শান্তিবাবু বর্দ্ধমানে গেছেন, হোটেলে তাঁর আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁর স্যুটকেসটা হোটেলে রেখে আসার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ তো দেখতে পাওয়া যায় না। হোটেলের ম্যানেজার মিঃ দাসকে আমরা বিশেষ রকম চিনি, তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান। তিনি আমাদের কাছেও জবানবন্দী দিয়েছেন যে, আপনি স্বয়ং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে, সমস্ত জিনিস, যায় শান্তিবাবুর স্যুটকেস পর্য্যন্ত ট্যাক্সিতে তুলেছেন। আমরা যতদূর জানি, তিনি মিথ্যাবাদী ন'ন।"

তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ হাস্যে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আপনি এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন কি ওকালতি করতে এসেছেন, জানি না। তবে ম্যানেজার মিঃ দাসের পক্ষসমর্থনে নিযুক্ত হয়েছেন দেখে খুশি হলাম। আমি বলছি না যে ম্যানেজার মিথ্যাবাদী, বা শান্তিবাবুর স্যুটকেস ক্ষিতীশবাবুর মালপত্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই আসে নাই। আমি বলতে চাই—আমার স্মরণ নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গিতে পুনশ্চ বলে উঠলেন, "ঘোড়ার ডিম অত কি ছাই মানুষের মনে থাকে ? বিশেষতঃ আমার আত্মীয় তখন মৃত্যুশয্যায়। তাকে দেখবার জন্যে বেরিয়ে গিয়ে আবার ধড়ফড় করে ছুটে এসেছি। ক্ষিতিশবাবু নেহাৎ অসমর্থ মানুষ, তাই তাঁকে ট্রেণে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এখন কৈফিয়তের ঠেলায় প্রাণ অস্থির! হতে পারে সে স্যুটকেস তাঁর মালপত্রের সঙ্গে চলে গেছে, আমি লক্ষ্য করি নি—"

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে মারামারির দরকার নেই। সংক্ষেপে বল,—তুমি লক্ষ্য কর নি। তা হলে শান্তিবাবু, সে টাকার জন্য আপনি—আপনিই দায়ী হয়ে যাচ্ছেন যে!"

শান্তিবাবু দুহাতে মাথা ধরে হেঁট মুখে বসে রইলেন।

বৃদ্ধ সান্ত্বনাদায়ক স্বরে বললেন, "আমি ভেবে দেখলাম, শুধু একটিমাত্র পথ আছে। ব্যাপারটার মধ্যে যদি কোনরকম গোলমাল না থাকে, ব্যারিষ্টার-এ্যাটর্ণিরা যদি সত্যই টাকা পেয়ে থাকেন, তবে বুঝিয়ে দিলে, তাঁরা নিজেদের এ্যাকাউন্ট-বুক দেখে, ডুপ্লিকেট রসিদ দিতে বোধহয় আপত্তি করবেন না। বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি, আগে সেই চেষ্টা করুন। যদি ডুপ্লিকেট রসিদ আনিয়ে দিতে পারেন, তা হলেই কাজ মিটে যাবে।"

শান্তিবাবু আশান্বিত মুখে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার মূল্যবান্ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। আমার বাবার বন্ধু ভবেশবাবু উকিলও সেই পরামর্শ দিলেন। আমি আগেই সেই চেষ্টা করে দেখি। আমায় তা হলে বিদায় গ্রহণের অনুমতি দেন।"

বৃদ্ধ বললেন, "হাঁ যেতে পারেন। উপস্থিত পুরুলিয়া যাচ্ছেন ত ? কখন যাবেন ?

"রাত সাড়ে বারোটার ট্রেণে।"

শান্তিবাবু উঠতে উদ্যত হলেন। তরুণ বললে "বসুন। ট্রেণের এখনও ঢের দেরী। একসঙ্গে আমরা ফিরব।"

শান্তিবাবু বসলেন। তরুণ ফিরে শ্রীকান্তবাবুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে সহাস্যে বললে, "আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবার অনুমতি চাইছি। না, আমি ওকালতি করতে আসিনি, ওকালতির জটিলতা-কুটিলতা আমার মত নির্ব্বোধের পক্ষে দুঃসহ। সরলভাবে বলছি, আমি চাই শুধু সত্য উদ্ধার। আশা করি দয়া করে আমায় সাহায্য করবেন।"

অবশিষ্ট চুরুটটা ফেলে পুনশ্চ নূতন চুরুট ধরাতে ধরাতে শ্রীকান্তবাবু গম্ভীর মুখে ঠোঁট বেঁকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, "অত ভণিতা করছেন কেন ? প্রশ্ন করুন।"

তরুণ বললে, "হাওড়া ষ্টেশনে যে লোক আপনাকে শান্তিবাবুর নামে লেখা সেই চিঠিটা দিয়েছিল, সে ব্যক্তি কি আপনার বিশেষ পরিচিত ?"

তরুণের মুখপানে ক্ষণিকের জন্য সতর্ক দৃষ্টিপাত করে শ্রীকান্তবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "অর্ডিনারী ট্যাক্সির ড্রাইভার-ক্লিনাররা দশ পনের দিন ভাড়া খাটলে যতটুকু পরিচিত হয় ততটুকু মাত্র। শান্তিও তো তাকে দেখেছ, মনে আছে ? সেই ক্লিনারটাকে ?"

শান্তিবাবু বললেন, "হাঁ।"

শ্রীকান্তবাবু বললেন, "পাঁচ শো লোকের ভিড়ের মাঝখানে তুমি তাকে দেখলে চিনতে পারবে ?"

শান্তিবাবু বললেন, "সেটা কি সম্ভব ?"

শ্রীকান্তবাবু সদম্ভে বললেন, "ওই শুনুন ! আমার কাছেও সে পরিচিত মাত্র ওইটুকু !"

"তা হলে হাওড়া ষ্টেশনের পাঁচ হাজার লোকের ভিড়ের মাঝখানে আপনি তাকে চিনলেন কি করে ?"

মুচকে হেসে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আমি ভিড়ের মধ্যে তাকে চিনেছি, সে কথা কখনই বলিনি। ট্রেণ ফেল করে আমি হাওড়া ষ্টেশনে বসেছিলাম, সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে। সেখানে সেই লোকটা এসে আমাকে ওই চিঠিখানা দিলে। হিন্দীতে বললে "শান্তিবাবু নিউ কর্ড লাইনের ট্রেণ ধরে বর্দ্ধমানে চলে গেলেন। আপনি ক্ষিতীশবাবুকে হোটেল থেকে নিয়ে আসুন। তাঁকে সন্ধ্যার ট্রেণে তুলে দিয়ে, তারপর যাবেন। এই নিন শান্তিবাবু চিঠি দিলেন।" বলে শান্তির লেখা চিঠিখানা আমায় দিলে।"

"সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম্ ? অ ! তা হলে তো সেখানে দু চারজন সাহেব-সুবো ছাড়া কেউ ছিল না। তা হলে আপনি তাকে বেশ স্পষ্টভাবে সেখানে দেখেছেন ? সে লোক সেই ক্লিনার ছাড়া আর কেউ নয়, এটা সুনিশ্চিত ?"

অপ্রসন্ন মুখে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "সুনিশ্চিত কি অনিশ্চিত তা আমি বলতে পারব না। তবে সে যখন শান্তির লেখা চিঠি এনে সোজা আমাকে দিলে, আর ঐ কথা বললে, তখন আমার মনে হোল, এ লোক সেই ক্লিনারই হবে। নইলে আমাকে বা শান্তিকে চিনবে কি করে ?

এই জন্য আপনার মনে হয়েছিল ? তা হলে সে—ঠিক সেই ক্লিনার এটা নাও হতে পারে ? সে তা হলে অন্য কেউ হলেও হতে পারে ?"

সুগম্ভীর মুখে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "হলেও হতে পারে। আসল কথা আমার তখন "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল" অবস্থা। নিজের বিপদের ঝঞ্ঝাটে উদ্‌ভ্রান্ত, তার উপর আবার ঐ উপসর্গ এসে কাঁধে পড়ল। তখন কি কোনদিকে তাকাবার সময় আছে ?"

"উত্তম। শান্তিবাবুর নামে লেখা সে চিঠিখানা তো আপনি রেখেছেন ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ঈষৎ উগ্রভাবে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "সে আমি কেন রাখব ? সেটা তো সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্ষিতীশবাবুকে দিয়েছি।"

"কখন ?"

"হোটেলে ফিরে এসেই ;—পরক্ষণে কি ভেবে ত্রস্তে বললেন, "ওঃ না, আমার ভুল হয়েছে, মাপ করুন। হাওড়া ষ্টেশনে টিকিট কেটে এনে টিকিটের সঙ্গে সেটা তাঁকে দিয়েছি।

"আপনার চিঠি, তাঁকে কেন দিলেন ?"

"দৈবাৎ যদি শান্তি বর্দ্ধমানে ট্রেণে না ওঠে, বা ভবিষ্যতে সে চিঠির কথা অস্বীকার করে তা হলে আমি কেন দোষের ভাগী হব ? সুতরাং তাঁর সম্বন্ধীয় চিঠি তাঁকেই দিলাম।"—কথাটা বলেই শ্রীকান্তবাবু পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, "লাসের কোট-প্যাণ্টের পকেটে সে চিঠি আপনারা পেয়েছেন কি ?"

পুলিশ অফিসার উত্তর দিলেন, 'না। চুরুটের পাইপ আর রুমাল ছাড়া কিছুই তাঁর পকেটে পাওয়া যায়নি। তাঁর শার্টে সোনার বোতাম ছিল, পকেটে সোনার ঘড়ি-চেন ছিল, সে সবও পাওয়া যায়নি। পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে পাঁক তুলে দেখা হয়েছে, কিছুই পাওয়া গেল না।"

তরুণ মৃদু হেসে বললে, "শান্তিবাবুর পকেট থেকে

যারা শ্রীকান্তবাবুর নামের জাল চিঠি সরাতে পেরেছে, ক্ষিতীশবাবুর পকেটে তারা একটা বড় প্রমাণ রেখে যাবে, সেটা আশা করাই ভুল। যাক্, সে চিঠির লেখাটা শান্তি বাবুর হস্তাক্ষর বলেই আপনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন ?"

বিরক্ত হয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আপনি বার বার সেই এক নিশ্চয়-অনিশ্চয়ের প্রশ্ন আনছেন কেন ? সেই তাড়াতাড়ির সময়, হস্তাক্ষর-বিশারদের কাছে ছুটোছুটি করার সময় আমার ছিল না। নিজেরও অত মনোযোগ দিয়ে দেখবার সময় ছিল না। শান্তির ফাউনটেনপেন খারাপ হয়ে গেছে জানতাম। ভাবলাম পেন্সিল দিয়ে তাই তাড়াতাড়ি লিখেছে।"

"শান্তিবাবুর ফাউনটেনপেন খারাপ হয়ে গেছে, সেটা আপনি জানতেন ?"

"বাঃ! কেন জানব না ? আমাদের সামনেই সেটা ওর হাত থেকে পড়ে 'লিক্' হয়ে গেল যে।"

"শান্তিবাবু ১লা ডিসেম্বর দু'পুরবেলা যে পেন বা অন্য জিনিস কিন্‌তে হোটেল থেকে বেরুবেন, সে খবরটা আপনি জানতেন ?"

শ্রীকান্তবাবুর ভ্রূযুগল কঠোরভাবে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সতর্ক দৃষ্টিতে তিনি একবার তরুণের মুখপানে একবার শান্তিবাবুর মুখপানে চাইলেন। তারপর নত দৃষ্টিতে ঘরের মেঝে নিরীক্ষণ করতে করতে চিন্তিত সুরে বললেন, "কই, সে কথা শান্তিবাবু আমায় বলেছিলেন কি না মনে পড়ছে না ত।"

"ধরুন, যদিই বলে থাকেন, সে কথা আপনি কথাচ্ছলে অন্য কোনও বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করেছিলেন কি ?"

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন—"না।"

তরুণ বললে, "ক্ষিতীশবাবু ১লা ডিসেম্বর যে ট্রেণে আসছিলেন, কোল কম্প্যানীর মিঃ জ্যাকসনকেও সেই ট্রেণে আসতে আপনি দেখেছেন ?"

"দেখেছি।"

"ক্ষিতীশবাবুকে সে কথা বলেছিলেন ?"

"বলবার সময় ছিল না। ট্রেণ ছেড়ে দেওয়ার পর আমি জ্যাক্‌সনকে দেখতে পাই। ক্ষিতীশবাবুর কামরা তখন দূরে চলে গেছে। জ্যাক্‌সন পিছনের দিকে অন্য কামরায় ছিল।"

"জ্যাক্‌সনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ?"

"না

"জ্যাক্‌সনকে অপরাধী বলে কি আপনার সন্দেহ হয়

গম্ভীর হয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আপত্তিজনক প্রশ্ন। আমি এ সম্বন্ধে নিজের মতপ্রকাশে অনিচ্ছুক।"

ঈষৎ হেসে তরুণ বললে, "আপনার সতর্ক স্বভাবের জন্য ধন্যবাদ। তবে ঘটনাচক্রে জ্যাক্‌সন সাহেব যখন পুলিশের কৃপাদৃষ্টির গোচরীভূত হয়েছেন, তখন সে রাত্রে তিনি আসানসোলে না এসে, অন্য কোথায় কি কাযের জন্য গিয়েছিলেন, তার সন্তোষজনক প্রমাণ পুলিশ অবশ্য জেনে নেবে। এখন বলুন—ক্ষিতীশবাবু যে কামরায় উঠেছিলেন, সে কামরায় অন্য আরোহী ক'জন ছিলেন ?"

"একজনও নয়। কামরাটা সম্পূর্ণ খালি ছিল।"

"অত টাকাকড়ি, দলিলপত্র সঙ্গে নিয়ে খালি কামরায় একা আসতে তিনি কুণ্ঠিত হলেন না ?"

"হাঁ। তা একটু হলেন বৈ কি। শান্তির উপর রাগ করতে লাগলেন। কিন্তু উপায় ছিল না। আমার ভাগ্নে মুমূর্ষু। আমার সেখানে যেতেই হবে। আগের দিন টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম, শান্তিও জানে। শান্তি বর্দ্ধমান থেকে উঠবে, এই ভরসায় তিনি রওনা হলেন।"

"আপনার ভাগ্নের কি অসুখ হয়েছিল ?"

অমায়িকভাবে মিষ্ট হাসি হেসে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। আমার ভাগ্নের অসুখের সঙ্গে, রাজ-এষ্টেটের দারুণ চুরির কোনও সম্পর্ক নাই।"

অপ্রস্তুত হয়ে তরুণ বললে, "ক্ষমা করুন। মৃত ক্ষিতীশবাবুকে জীবিত অবস্থায় শেষবার মাত্র আপনি দেখেছেন, সুতরাং আপনাকেই আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার। ক্ষিতীশবাবুর ট্রেণ ছাড়বার কতক্ষণ পরে আপনার ট্রেণ ছেড়েছিল ?"

পুনশ্চ বাঁকা হাসির সঙ্গে শ্রীকান্তবাবু উত্তর দিলেন, "টাইম টেব্‌ল দেখলেই সেটা জানতে পারবেন।"

পরাস্ত হয়ে তরুণ বললে, "ক্ষমা চাইছি। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য—ক্ষিতীশবাবু চলে যাবার পর আপনি যতক্ষণ হাওড়া ষ্টেশনে ছিলেন, ততক্ষণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল কি না ? বা কোন ব্যক্তির কোন সন্দেহ-জনক আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন কি না ?"

একটু ভেবে সদয়ভাবে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "মনের অবস্থা তখন উদ্বেগ-ব্যাকুলতাপূর্ণ। দেখে থাকলেও হয়ত মনে নাই। আচ্ছা, ভেবে দেখব। মনে পড়ে তো পরে জানাব।"

"ক্ষিতীশবাবুর পোষাক তখন কি কি ছিল ?

"কোট, প্যাণ্ট, শার্ট, সোয়েটার, অলেষ্টার। গলায় মাফলার ছিল, টুপি ছিল। পায়ে জুতো মোজা ছিল।"

"তাঁর অলেষ্টারের রংটা কি রকম ছিল ?"

পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "বলুন না মশাই, আপনারা তো দেখেছেন। আমার মনে পড়ছে না।"

পুলিশ অফিসার বললেন, "মৃতদেহ যখন জল থেকে তোলা হয়েছে তখন সব পোষাকই তো কাদা-পাঁকে মাখামাখি। আসল রং কি করে বলি?"

তরুণ বললে, "আমি যদি বলি সেটা গাওয়া ঘিয়ের রঙের মত ফিকে হল্‌দে রঙের ছিল, তা হলে ভুল বলব কি?

গম্ভীর হয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "হতে পারে। অত খুঁটিনাটি আমি লক্ষ্য করি নি।"

বৃদ্ধ চীফ ম্যানেজার হঠাৎ বললেন, "ক্ষিতীশবাবুর পট্টুর অলেষ্টার তো? তার রঙ কিরকম জানতে চাইছেন? তা হলে আমার গায়ের এই অলেষ্টারটা দেখুন। আমরা দু'জনে গত বছর এক সঙ্গে একই কাপড়ের অলেষ্টার তৈরী করিয়েছিলাম।"

তরুণ তৎক্ষণাৎ তাঁর চেয়ারের কাছে গিয়ে জানু পেতে বসল। তাঁর অলেষ্টারের প্রান্তটা ধরে টর্চের উজ্জ্বল আলোয় কিছুক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। তারপর টর্চ নিবিয়ে, সন্তর্পণে সকলের অলক্ষ্যে সেই খসখসে পট্টুর অলেষ্টার থেকে কয়েকটা সূক্ষ্ম লোম চিমটি কেটে ছিঁড়ে নিয়ে, মণিব্যাগে পুরলে। বিনীত ভাবে বললে, "ধন্যবাদ।"

শান্তিবাবু এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এবার মৃদুস্বরে বললেন, "সেটা আমরাও তাঁকে বহুবার ব্যবহার করতে দেখেছি। হাঁ, ফিকে হল্‌দে রং। রাত্রে শাদা দেখাত।"

হাই তুলে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "উঃ, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এবার যেতে পারি কি?"

তরুণ বললে, "এক মিনিট। আপনি কি সেই রাত্রেই ভাগ্নের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন?"

"না! কারণ রাত্রে সে সময় বি, পি, রেল পাই নি। মগরা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসেছিলাম। শেষরাত্রে ট্রেণ পেয়ে চলে যাই।"

"বি, পি, রেলে আপনার ভাগ্নের বাড়ী যেতে হয়? সেটা কোন্ গ্রাম? কোন্ ষ্টেশনে নামতে হয়?"

"সুলতান গাছা ষ্টেশনে নামতে হয়। গ্রামের নাম বাঁকা-বংশী।"

"আপনার ভাগ্নের নাম?"

"৺ব্রজবিহারী মুখোপাধ্যায়। ২রা ডিসেম্বর সকালে শব সৎকারের সময় আমি সেখানকার শ্মশানে উপস্থিত ছিলাম, পুলিশ তদন্তে তা প্রমাণিত হয়েছে, আশাকরি শুনেছেন?"

ক্ষিপ্রহস্তে নোটবুকে কি লিখতে লিখতে তরুণ বললে, "শুনেছি। আপনার বিরক্তি উৎপাদনের জন্য ক্ষমা চাইছি। এবার যেতে পারেন।"

"ধন্যবাদ। নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। নইলে যতক্ষণ চান, আপনাদের কৌতুক অভিনয়ের খোরাক জোটাতে আমি রাজি হতাম। আচ্ছা, Good night to all, and every body."

সকলে একসঙ্গে বললেন, "গুড্ নাইট।"

প্রেত

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

প্রেতাত্মার হাসি এল: শীর্ণ ঠোঁটে আঁকাবাঁকা হাসি,
এতদিনে মুক্তি হবে নরকের পঙ্ক-কূপ হতে,
শৈবাল সরানো হবে—মন্থর এ জীবনের স্রোতে,
কূলপ্লাবী খরবেগ হু হু করে উঠিবে উচ্ছ্বাসি।
প্রেতাত্মার হাসি পায়: যে তাহারে বানায়েছে ভূত,
নানা স্তোকে জীবনের সর্ব্বসুখ করেছে হরণ,
সে আজ আশ্বাস দেয়—পুনর্ব্বার আসিবে জীবন,
মুক্তি হবে—জয়টীকা এঁকে যাবে দেবতার দূত।

দুয়ারের কোণে যারা বেঁধে রেখে অতি সংগোপনে
শ্রমের আবাদে যত প্রেত-প্রাণী ফলায় ফসল
চুরি করে,—মুখে বলে প্রেতাত্মার কেন পরাজয়?
আর ভাবে অপচ্ছায়া বুদ্ধিহীন, ধ্বংস চায় মনে।
তারা বলে মুক্তিবাণী—লোটে যারা সকল সম্বল।
এ ভণ্ডামি ভেঙে দিতে আজ পূর্ণ হয়েছে সময়।

শিবমন্দির : ত্রিবান্দ্রম [শ্রীযুক্ত সুরেশ ঘোষের সৌজন্যে

জহুরী [শিল্পী—ধীরেন্দ্র ব্রহ্ম
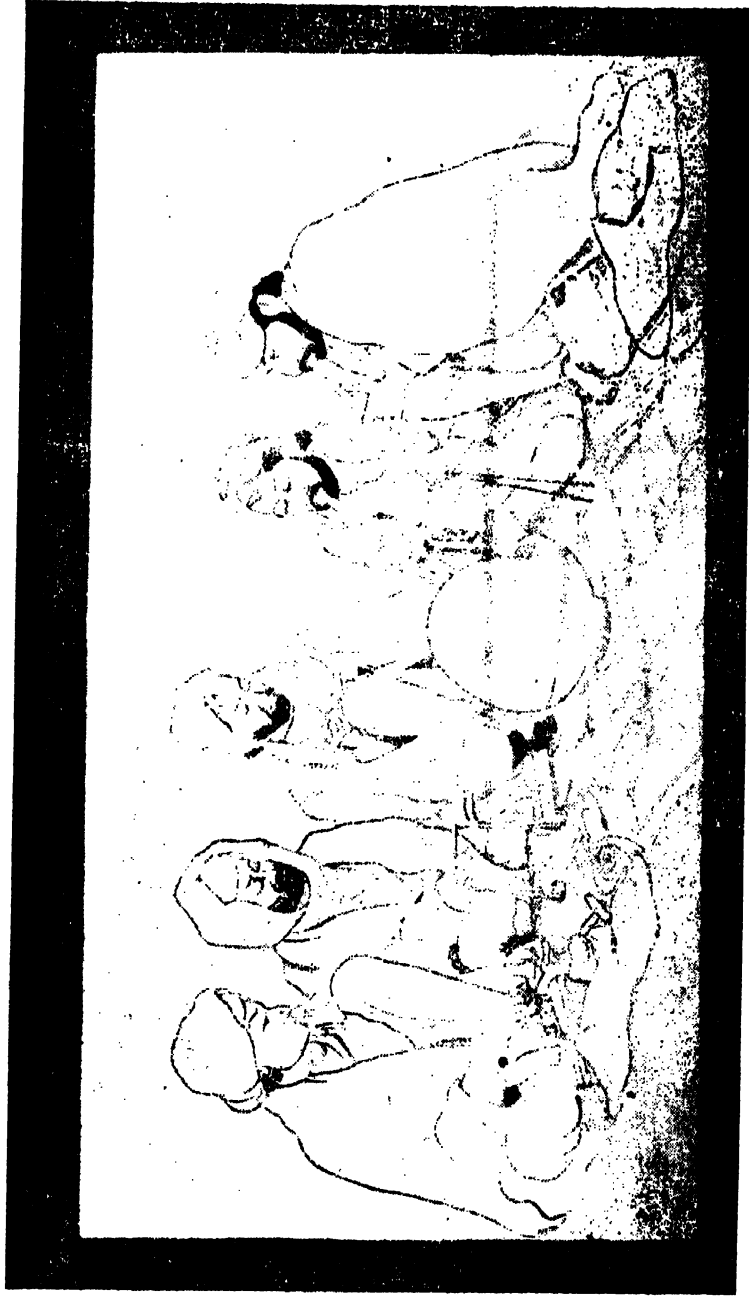
প্রাচীন নাটকীয় কথামালা

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

[ভাসের প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ কথা]

ভূমিকা

[প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'সংস্কৃত নাটকীয় কথা' সিরিজের প্রথম পুস্তক শ্রীহর্ষকৃত 'রত্নাবলী-নাগানন্দ-প্রিয়দর্শিকা-কথা' প্রকাশিত হয়। এ যাবৎ অন্য কার্য্যে বিশেষ ব্যাপৃত থাকায় ঐ সিরিজের অন্য কোন সন্দর্ভ লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি ঐ সিরিজের নাম "প্রাচীন নাটকীয় কথামালা" দিয়া কবি ভাস প্রণীত 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ কথা' প্রকাশিত হইল। সংস্কৃত নাটক ভিন্ন প্রাকৃত নাটকগুলি এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করিবার ইচ্ছায় নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল।']

ভাস কবি মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রথিতযশা ভাস-সৌমিল্ল কবিপুত্রাদির উল্লেখ আছে।[১] বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে ভাসের নাটকসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] "ভাসো হাসঃ কালিদাসো বিলাসঃ" প্রভৃতি কবিবাক্য দ্বারা ভাসের জনপ্রিয়তার বিষয় জানা যায়। কিন্তু ১৯০৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভাসের নাটকসমূহ লোক-চক্ষুর অন্তরালে ছিল। ঐ অব্দে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি-সমূহের প্রকাশবিভাগের পুনর্গঠন সময়ে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাস প্রণীত ১০ খানি রূপকের মালয়ালম অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন, পরে আরও ৩ খানির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়—মোট ১৩ খানি রূপকের পাণ্ডুলিপি তিনি প্রাপ্ত হন। ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের বদান্যতায় ও পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর ভাষায় ঐ ১৩ খানি রূপকই ত্রিবেন্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর ভাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা পুস্তক ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণের সংক্ষিপ্ত বস্তু বিষয় এই যে—বৎসদেশের রাজা উদয়ন, অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর পঞ্চবিংশতি অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তিনি রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বিদ্যায়, বয়সে ও শৌর্য্যে-বীর্য্যে অসাধারণ ছিলেন। কৌশাম্বী তাঁহার রাজধানী ছিল। অবন্তী বা উজ্জয়িনীর অধীশ্বর প্রদ্যোত মহাসেন তাঁহার রূপলাবণ্যবতী কন্যা বাসবদত্তাকে বৎসরাজের করে সম্প্রদান করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু পাছে প্রত্যাখ্যাত হন, এই ভয়ে তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিতে সাহসী হন না। তখন সচিবগণের পরামর্শে তিনি একটি কৃত্রিম নীলহস্তী নির্ম্মিত করিয়া তদ্দ্বারা ছলনা করিয়া বৎসরাজকে বন্দী করিয়া নিজ রাজধানী উজ্জয়িনীতে লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে বাসবদত্তার বীণাবাদন শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। এই শিক্ষা কালে গুরুশিষ্যার মধ্যে প্রেমসঞ্চার হয়। এদিকে বৎসরাজের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, রুমণ্বান্ প্রভৃতি অনেক অনুচরবর্গের সহিত ছদ্মবেশে চররূপে উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া বৎসরাজকে বন্ধনমুক্ত করেন। বৎসরাজ বাসবদত্তাকে লইয়া কৌশাম্বীতে প্রস্থান করেন। তখন উভয় পক্ষের যুদ্ধ কালে যৌগন্ধরায়ণ ধৃত ও বন্দী হন। তখন রাজা প্রদ্যোত চিত্রফলকস্থ বৎসরাজ ও বাসবদত্তার বিবাহের অনুষ্ঠান করিলেন। হর্ষবিষাদের মত বিবাহক্রিয়া ছবির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। যৌগন্ধরায়ণ বন্ধনমুক্ত হইলেন ও ভৃঙ্গার উপহার পাইলেন। বৎসরাজ বন্দী হইয়া উজ্জয়িনীতে নীত হইলে বৎসরাজমাতার বিলাপ কালে যৌগন্ধরায়ণ বলিয়াছিলেন যে, যদি আমি রাজাকে মুক্ত করিতে না পারি, তবে আমি যৌগন্ধরায়ণ নই। এই প্রতিজ্ঞার জন্য নাটকের নাম "প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ"।

নাটকের পাত্রগণ

পুরুষগণ :

রাজা—প্রদ্যোত মহাসেন—উজ্জয়িনীর রাজা ; বাসবদত্তার পিতা।

ভরতরোহক—মহাসেনের প্রধান মন্ত্রী।

পরিচারক—মহাসেনের ভৃত্য।

গাত্রসেবক—বাসবদত্তার হস্তিনী ভদ্রাবতীর পরিচারক।

কঞ্চুকী—মহাসেনের কঞ্চুকী।

যৌগন্ধরায়ণ—বৎসরাজের প্রধান মন্ত্রী।

সালক—যৌগন্ধরায়ণের লোক।

নির্মুণ্ডক— ঐ

হংসক—বৎসরাজের নিজস্ব পরিজন।

ব্রাহ্মণ—যৌগন্ধরায়ণের সুহৃৎ।

বিদূষক—বৎসরাজের বয়স্য বসন্তকনামা।

উন্মত্তক—উন্মত্তবেশ যৌগন্ধরায়ণ।

রুমণ্বান্—বৎসরাজের সচিব।

শ্রমণ—শ্রমণবেশধারী রুমণ্বান্।

স্ত্রীগণ :

দেবী—মহাসেনের মহিষী মন্দারবতী।

বিজয়া—বৎসরাজগৃহে প্রতিহারী।

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বকালে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫৬৩—৪৮৬) বৎসরাজ্যে উদয়ন নামে এক রাজা ছিলেন। কৌশাম্বী ছিল তাহার রাজধানী। বংশ-গরিমায় তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর পঞ্চবিংশতি পুরুষ অধস্তন চন্দ্রবংশীয় রাজা তিনি। রূপে তিনি ছিলেন কন্দর্পকান্তি, ঘোষবতী নামক বীণার সুরে তিনি গজহৃদয় বশীভূত করিতে পারিতেন ; তজ্জন্য হস্তিশিকার তাঁহার প্রিয়তম ছিল। যৌগন্ধরায়ণ ছিলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। অপর মন্ত্রীর নাম ছিল রুমণ্বান্। এই দুই বিচক্ষণ মন্ত্রীর সাহায্যে বৎসরাজ উদয়ন প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

এদিকে তাঁহার রাজ্যের সংলগ্ন রাজ্য হইতেছে অবন্তী বা উজ্জয়িনী। তথায় তখন প্রদ্যোত মহাসেন রাজা ছিলেন। গোপালক ও অনুপালক নামে তাঁহার দুই পুত্র ও বাসবদত্তা নামক তাঁহার এক কন্যা ছিল। রাণীর নাম ছিল মন্দারবতী। প্রদ্যোত

১ "প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য"—প্রস্তাবনা—মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

২ "সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ। সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।" হর্ষচরিত—বাণভট্ট।

কোন প্রকারে বৎসরাজকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন নাই বৎসরাজের মন্ত্রীদের বুদ্ধিকৌশলে। প্রদ্যোতের ও রাণীর একান্ত ইচ্ছা এই সর্ব্বগুণ-বিভূষিত পাত্র উদয়নের হস্তে ব্যসবদত্তাকে সম্প্রদান করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন ; কিন্তু পাছে বৎসরাজ তাঁহাদের সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন—এই ভয়ে কোন প্রকাশ্য সম্বন্ধ-স্থাপক পাঠাইতে পারিতেছেন না ; তখন তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বৎসরাজকে বন্দী করিবার এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। বৎসরাজ গজ শিকারের জন্য নর্ম্মদাতীরে নাগবনে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও মন্ত্রী রুমণ্বানও আছেন। মন্ত্রী সালঙ্কায়ন স্থির করিলেন যে একটি কৃত্রিম নীল গজ বনমধ্যে স্থাপিত করিয়া বৎসরাজকে তথায় প্রলোভিত করিয়া আনিয়া বন্দী করিতে হইবে। তদনুসারে বনমধ্যে কপট নীল হস্তী স্থাপিত হইল। এদিকে যৌগন্ধরায়ণ কৌশাম্বীতে এই ছলনার কিংবদন্তী শ্রবণ করিয়া স্বামী উদয়নকে সাবধান করিবার জন্য একজন বিশ্বস্ত পুরুষ পাঠাইবার সংকল্প করিয়া তাহাকে ডাকিলেন ; তাহার নাম সালক ; তখন উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল :—

যৌগন্ধরায়ণ—"সালক প্রস্তুত আছ ত ?"

সালক—"আজ্ঞে হাঁ।"

যৌগন্ধরায়ণ—"তোমাকে অনেক পথ যাইতে হইবে।"

সালক—"আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তির বলে আমি আপনার জন্য সব করিতে প্রস্তুত।"

যৌগন্ধারায়ণ—(সন্তোষের সহিত) "যার সৌহার্দ্দ্য যত বেশী, সে তত জোরে কাজ করিতে পারে। দেখ, দুষ্কর কাজের ভার স্নেহবান্ জনের উপর, অথবা সদ্‌গুণশোভিত লোকের উপর দিতে হয় ; এদের কর্ম্মকৌশল ভাগ্যবশে কখনও সফল হয়, আবার কখনও বা বিফল হয়। মহারাজ উদয়ন আগামী কল্যই বেণুবন হইতে নাগবনে গমন করিবেন ; সেখানে যাওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত দেখা করা চাই।"

সালক—"আর্য্য, আমাকে একখানি পত্র দিন, তাহাতে সমস্ত কাজের কথা লেখা থাকিবে।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ প্রতিহারী বিজয়াকে ডাকিয়া সত্বর পত্র ও মঙ্গলসূত্র আনিতে আদেশ দিলেন। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিজয়া তাহা আনিবার জন্য চলিয়া গেল। তখন আবার যৌগন্ধরায়ণ ও সালকের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

যৌগন্ধরায়ণ—"সালক, তুমি কি পূর্ব্বে এ পথ দেখিয়াছ ?"

সালক—"আজ্ঞে না, দেখি নাই, তবে পূর্ব্বে শুনিয়াছি।"

যৌগন্ধরায়ণ—"ইহা ত বেশ মেধাবীর চিহ্ন। ওহে, শোন, আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, প্রদ্যোত সম্মুখে বনগজ রাখিয়া তাহার পশ্চাতে গুপ্তভাবে একটি কপট নীলহস্তী স্থাপিত করিয়া আমাদের রাজাকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের রাজার বুদ্ধিভ্রংশ না হয়, ইহাই আমাদের কাম্য। ওঃ—প্রদ্যোত বৎসরাজকে কি ভয় করেন। তাহার অক্ষৌহিণী লোকও বৎসরাজের সম্মুখে দাড়াইতে সমর্থ নয়, তাহাও দেখা গিয়াছে। দেখ, তাহার সৈন্য অনেক আছে কিন্তু তাহারা এক-যোগে স্বামিকার্য্য করিতে পারে না ; তাঁহার সৈন্যমধ্যে বিশিষ্ট বীর-পুরুষ আছে, কিন্তু তাহারা অনুরক্ত নয় ; তিনি যুদ্ধকালে ছলনার আদর করেন : তাহার সমস্ত সৈন্যই অনুরাগহীন কলত্রের ন্যায়।"

এই সময়ে বিজয় পত্র আনিয়া দিল ও বলিল যে সমস্ত বধূজন সত্বর হইয়া মঙ্গলসূত্র গাঁথিতেছেন—রাজমাতা এই কথা বলিলেন। যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে বলিলেন, "বিজয়, তুমি যাও, রাজমাতাকে বল যে সকল বধূজনের হউক বা একজনের হউক, একগাছি গাথা মঙ্গলসূত্র দিন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া বিজয় চলিয়া গেল।

তখন নির্মুণ্ডক আসিয়া সংবাদ দিল যে বৎসরাজের নিকট হইতে হংসক আসিয়াছেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ সালককে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন—বিশ্রাম লাভের পর তুমি তাড়াতাড়ি চলিতে পারিবে। তখন সালক বিশ্রাম করিবার জন্য প্রস্থান করিল। যৌগন্ধরায়ণ নির্মুণ্ডককে হংসককে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন সেও তজ্জন্য প্রস্থান করিল। তখন যৌগন্ধরায়ণ ভাবিতে লাগিলেন "হংসক ত কখন বৎরাজের কাছছাড়া হয় না—তাহাকে ছাড়িয়া সে কেন এখন আসিল আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে। লোক বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া বন্ধুবান্ধবের সংবাদ জানিবার জন্য যেরূপ আকুল হয়, আমারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে ; ভালমন্দ কি সংবাদ শুনিব—সেই অপেক্ষা হইতেছে।"

তখন নির্মুণ্ডক হংসককে লইয়া উপস্থিত হইল। যৌগন্ধরায়ণকে দেখাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। তখন যৌগন্ধরায়ণ ও হংসকের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল ;

যৌগন্ধরায়ণ—"হংসক, রাজা কি নাগবনে যান নাই ?"

হংসক—"রাজা গতকল্য তথায় গিয়াছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ—"হায়! আর সালককে পাঠান নিষ্ফল। আমরা প্রতারিত হইয়াছি। অথবা ছলপ্রতিকারের আশা আছে। অথবা আজই প্রাণ পরিত্যাগ বিধেয়।"

হংসক—"রাজা এখন জীবিত আছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ—"তাহা হইলে বিপদ্ সেরূপ মহতী হয় নাই ; তাহা হইলে রাজা ধৃত হইয়াছেন ?"

হংসক—"হাঁ—ঠিক বলিয়াছেন, তিনি ধৃত হইয়াছেন।"

যৌগন্ধরায়ণ—"হায়! স্বামী ধৃত হইয়াছেন! হায়! প্রদ্যোত ভাগ্যবলে একটি মহাভার হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আজ হইতে বৎসরাজের সচিবগণের অক্ষমতা ও অযশঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন সেই অনাগত-বিধাতা রুমণ্বান্ কোথায় ? সেই অশ্বারোহী সৈন্যদল এক্ষণে কোথায় ? সেই স্বামিভক্ত, স্নেহে বশীভূত, সৎ-বংশোদ্ভব, বলবান্ ও গুণগৃহীত যোদ্ধৃবর্গ কি শত্রুকর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছে ? অথবা গহন কাননে প্রনষ্ট হইয়াছে অথবা যুদ্ধে প্রতিপক্ষের ব্যাপক আক্রমণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে ?"

হংসক—"মহারাজ যদি স্বীয় সমস্ত সৈন্যপরিবৃত থাকিতেন, তবে এ বিপদ্ ঘটিত না।"

যৌগন্ধরায়ণ—"তাহা হইলে কি তাঁহার সমস্ত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে ছিল না ?"

তখন যৌগন্ধরায়ণের আদেশে উপবিষ্ট হংসক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিল।" রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে, উষঃকালের কিছু বাকী থাকিতে, অশ্বাদি বাহনের সুখকর সময়ে, রাজা বালুকাতীর্থে নর্ম্মদানদী পার হইয়া বেণুবনে পরিজনবর্গকে রাখিয়া একটি ছত্রমাত্র হস্তে করিয়া গজযূথবিমর্দ্দযোগ্য সৈন্য সঙ্গে লইয়া ব্যাঘ্রাদিমদকণ্ঠমুখর পথে নাগবনে গমন করেন। অনন্তর সূর্য্য আকাশে কিছুদূর উঠিলে, আমরা কয়েক যোজন অগ্রসর হইয়া মদগন্ধীর পর্ব্বতের একক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলাম, তখনও ঐ পর্ব্বতে আমরা পৌছিতে পারি নাই, এমন সময়ে তড়াগপঙ্কলিপ্ত অর্দ্ধনির্ম্মিত শিলার ন্যায় ভীষণদর্শন নাগযূথ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন সৈন্যগণ শঙ্কিতভাবে সেই হস্তিযূথ নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় একজন পদাতিক আসিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইল—সে এই অনর্থের উৎপাদক।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, "আচ্ছা থাম, সে আসিয়া বলিল কি যে এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে, মল্লিকালতা ও শালবৃক্ষ দ্বারা প্রচ্ছাদিতশরীর নখদন্তহীন একটি নীলহস্তী আমি দেখিয়াছি ?"

হংসক বলিল—"তাহা হইলে আপনি ত ইহা জানেন। আপনার জানা সত্ত্বেও এই বিপদ্ উপস্থিত হইল!"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"জানিলে কি হইবে ? দৈবই বলবৎ।"

হংসক পুনরায় বলিতে লাগিল—"তখন স্বামী সেই নৃশংসকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বলিলেন, আমি হস্তিশাস্ত্রে নীলকুবলয়তনু চক্রবর্ত্তী হস্তীর কথা পড়িয়াছি। তোমরা এই যূথের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ, আমি মাত্র বীণা সঙ্গে লইয়া সেই হস্তীদল আনিতেছি।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"তখন রুমণ্বান্ কেন স্বামীকে উপেক্ষা করিলেন ?"

হংসক বলিল—"না, না, তিনি মহারাজকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, আপনার পক্ষে ঐরাবতাদি দিগ্‌গজ গ্রহণও অসম্ভব নহে ; তবে আত্মরক্ষার অভাবে বিদেশে বিপদ্ ঘটিতে পারে ; তাহাতে আবার এই সীমান্তবাসী লোকেরা নির্লজ্জ ও নীচকুলজাত ; তজ্জন্য এই গজযূথের দিকে পদাতিকগণকে নিযুক্ত করিয়া আমরা সকলে আপনার সহিত যাইব, আপনি একাকী যাইবেন না।"

যৌগন্ধরায়ণ তখন বলিলেন, "রুমণ্বান্ কি সকলের সমক্ষে স্বামীকে এ কথা বলিয়াছিলেন ? তাহা যদি হয় তবে তাঁহার স্বামিভক্তির বিষয়ে আর কিছু বলিবার নাই। তারপর কি হইল ?"

তখন হংসক পুনরায় বলিতে লাগিল, "তখন ভর্ত্তা নিজ জীবনের শপথ দ্বারা অমাত্য রুমণ্বান্‌কে নিবারিত করিয়া নীলবলাহক নামক হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া সুন্দরপাটন নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে বিংশতিমাত্র পদাতিকের সহিত যাত্রা করিলেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, "স্বামী নীলহস্তিগ্রহণরূপ বিজয়ের জন্য যাত্রা করিলেন ? হায় ! হস্তিগ্রহণকৌতুকবশে তিনি প্রদ্যোতের স্বীয় পরাভবজনিত উদ্যমের বার্ত্তা চিন্তা করেন নাই। তারপর ?"

হংসক পুনরায় বলিতে লাগিল, "দ্বিগুণ পথ অতিক্রমের পর, শালবনের কান্তিতে হস্তীর নীল শরীর মিশিয়া যাওয়ায় অশরীর-নির্গত দন্তদ্বয়ের ন্যায় তাহার উজ্জ্বল দন্তযুগলের দ্বারা সূচিত সেই দিব্য হস্তীর প্রতিকৃতি ধনুঃশত দূরে দৃষ্ট হইল। তাহার পর স্বামী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রণাম করিয়া বীণা গ্রহণ করিলেন। তারপর পশ্চাদ্‌ভাগে তুল্যভাবে প্রবর্ত্তিত এক সিংহের গর্জ্জন উদ্‌ভূত হইল। সেই সিংহনাদের বিষয় জানিবার জন্য যখন আমরা পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টি ফিরাইলাম, তখন মহামাত্র ও অস্ত্রধারী সৈন্য কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই কৃত্রিম গজ অগ্রসর হইল। তখন স্বামী সৎকুলোৎপন্ন পরিজনগণকে নামগোত্র গ্রহণ দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া, 'ইহা প্রদ্যোতের চাতুরী, আমাকে অনুসরণ কর, আমি শত্রুর এই বিষম চাতুরী স্বীয় পরাক্রমে অতিক্রম করিতেছি, এই বলিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"প্রবেশ করিলেন ? অথবা ঠিকই করিয়াছেন ;—শত্রুর নিকট বঞ্চিত হইয়া লজ্জিত, মানী, ধীর, শূর, যশস্বী একাকী আর কি করিতে পারেন ? তার পর ?

হংসক আবার বলিতে লাগিলেন—"তার পর তিনি সুন্দর-পাটন অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে যেন শত্রুগণকে ভীষণ প্রহার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু শত্রুসৈন্য অত্যন্ত অধিক থাকায় তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইল, আমাদের সমস্ত পরিজন বিষণ্ণ ও নষ্ট হইল ; তখন আমি—না-না, স্বামী, নিজেই আত্ম-রক্ষা করিয়া যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, অশ্বটি বহু প্রহার-জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়া গেল, তখন সন্ধ্যাসময়ে স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শত্রুসৈন্যেরা সমীপবর্ত্তী বন হইতে কতকগুলি অজ্ঞাত নামক কর্কশ লতা আনিয়া স্বামীকে সাধারণ লোকের ন্যায় বাঁধিয়া ফেলিল।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"কি, স্বামীকে বাঁধিয়া ফেলিল ? তাঁহার যে ভুজদ্বয়ের স্কন্ধদেশ মাংসল, গ্রন্থিগুলি স্থূল, বাহা করিবর-শুণ্ডাকার যাহা চাপাস্ফালন ও বাণারোপণ করে ও ব্রাহ্মণ-সেবাযুক্ত ও আলিঙ্গন দ্বারা সুহৃদ্‌গণের সৎকার করে, সেই ভুজ-দ্বয়ের প্রকোষ্ঠে বন্ধন পড়িয়াছে ? ওহে, কখন স্বামী চেতনা লাভ করিলেন ?"

হংসক বলিল,—দুর্ব্বৃত্তগণের পাপ অনুষ্ঠান শেষ হইলে পর।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"ভাগ্যক্রমে তাঁহার শরীর ধর্ষিত হইয়াছে, তেজঃ নহে। তার পর ?"

তখন হংসক পুনরায় বলিতে লাগিল,—"তখন স্বামী সংজ্ঞা-লাভ করিয়াছেন দেখিয়া সেই পাপিষ্ঠেরা স্বামীর কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিতে লাগিল—'এ আমার ভাইকে বধ করিয়াছে, এ আমার পিতাকে বধ করিয়াছে, এ আমার পুত্রকে বধ করিয়াছে, এ আমার বন্ধুকে বধ করিয়াছে'—এইরূপে তাহারা স্বামীর পরাক্রম বর্ণনা করিতে লাগিল। তখন এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। সকলের অনুরোধে এক দুর্ব্বৃত্ত এক অকার্য্য করিতে উদ্যত হইল। সে স্বামীকে দক্ষিণ মুখ করিয়া তাঁহার যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত কেশরাশি

আকর্ষণ করিয়া, করধৃত করবাল দ্বারা স্বামীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন সেই নৃশংস রুধিরসিক্ত ভূমিতে বেগবশতঃ পদস্খলিত হইয়া পতিত হইয়া নিহত হইল। তাহার চেষ্টা বিফল হইল।

প্রদ্যোতের অমাত্য শালঙ্কায়ন পূর্ব্বে স্বামীর ভল্লাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্চ্ছার অবসানে তিনি তখন তথায় উপস্থিত হইয়া 'ক্রূরকর্ম্ম করিও না, করিও না' বলিয়া স্বামীকে তৎকালদুর্লভ প্রণাম করিয়া শারীরিক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"স্বামী বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। সাধু, সালঙ্কায়ন, সাধু। দুর্দ্দশা শত্রুকেও মিত্ররূপে পরিণত করিতে পারে। হংসক, ব্যসন বশতঃ আমার মন কিছু উদ্‌বেলিত হইয়াছে। তার পর সেই সাধু পুরুষ কি করিলেন ?"

হংসক বলিল,---"অনন্তর সেই আর্য্য, সাদরে অনেক শান্তি-বচন উচ্চারণপূর্ব্বক, স্বামী বহু গুরুতর প্রহারবশতঃ অশ্বাদি বাহনে যাইতে অসমর্থ জানিয়া, তাঁহাকে স্কন্ধশয্যায় স্থাপন করাইয়া উজ্জয়িনীতে লইয়া গেলেন।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,---"স্বামীকে লইয়া গিয়াছে ? তবে ত সেই অনর্থই উপস্থিত হইল! ইহা আমাদের নীতির নিষ্ফলতা; ইহা আমাদের মনোরথেরও অগোচর; প্রদ্যোতের মনস্বিতা হেতু স্বামী দুঃখের সহিত বাঁচিয়া আছেন। আর আমাদের স্বামী পূর্ব্বে যাহাকে কখনও গ্রাহ্য করেন নাই, তাহাকে কিরূপে দেখিবেন ? বাক্‌সিদ্ধ তিনি কিরূপে কাপুরুষোচিত বাক্য শ্রবণ করিবেন ? পূজিত বা তিরস্কৃত হউন, নিরুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রণত হইতে হয়।"

এই সময়ে প্রতিহারী বিজয়া মঙ্গলসূত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। যৌগন্ধরায়ণ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ইহার সময় চলিয়া গিয়াছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব এখন নিষ্ফল হইল। যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে, যুদ্ধের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য তুরঙ্গমের আরোগ্যবলাদির জন্য অনুষ্ঠিত নীরাজনাকৌতুকমঙ্গলসমূহের আর কি প্রয়োজন ?" তখন যৌগন্ধরায়ণ রাজমাতাকে কি বলিবেন তাহা মনে মনে স্থির করিয়া বিজয়াকে বলিলেন, "বিজয়ে, মন স্থির কর" এই বলিয়া তাহার কানে কানে বক্তব্য বলিয়া দিলেন। তাহাকে আরও বলিলেন,---দেখ, রাজমাতাকে গিয়া সহসা বলিও না যে, বৎসরাজ ধৃত হইয়াছেন; স্নেহদুর্ব্বল মাতৃহৃদয়কে রক্ষা করিতে হইবে। তুমি প্রথমে যুদ্ধের দোষ কীর্ত্তন করিবে, তাঁহার মনে সংশয়ের ভাবন উৎপাদন করিতে হইবে; পরে রাজার বিনাশের চিন্তায় যখন তাঁহার মন সংশয়াকুল হইবে, তখন যথার্থ কথা জানাইবে।" তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া প্রতিহারী চলিয়া গেল।

অনন্তর যৌগন্ধরায়ণ হংসককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হংসক,তুমি স্বামীর সহিত গেলে না কেন ?" হংসক উত্তর করিল, "আর্য্য, আমি প্রভুর অনুগমন করিয়া ধন্য হইব সংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু সালঙ্কায়ন আমাকে আদেশ দিলেন যে, যাও, তুমি কৌশাম্বীতে গিয়া এই সংবাদ দাও।'

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,---"উজ্জয়িনী হইতে স্বামীর সংবাদ প্রেরণের কোন আশা ছিল না, সেই জন্যই, অথবা স্বামীর নিকট হইতে তাঁহার স্নেহপাত্রকে দূরে সরাইয়া দিবার জন্য, এই ব্যবস্থা করিয়াছে ?" তিনি হংসককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সালঙ্কায়ন দর্পবশতঃ স্বীয় বুদ্ধির শ্লাঘা করিতেছে কি ? অথবা নিজ উদ্যমসিদ্ধিতে আনন্দ অনুভব করিতেছে ? আচ্ছা আমাদের রাজা আমাকে কিছুই বলেন নাই ?" হংসক উত্তর করিল---"হ্যাঁ, আর্য্য; আমি যখন জলভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলাম, তখন অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়া স্বামী আমাকে বলিলেন, "যাও, যৌগন্ধরায়ণের সহিত সাক্ষাৎ কর।"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"সমস্ত সচিবমণ্ডলকে বাদ দিয়া কেবল যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে দেখা কর, এই কথা তিনি বলিয়াছেন ?"

হংসক উত্তর করিল—"আজ্ঞে, হাঁ।"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"তাহা হইলে আমি স্বয়ং প্রতীকারে অসমর্থ, রাজার অন্ন ভক্ষণের অমর্য্যাদাকারী ও রাজ-সৎকারের কোন প্রতিদান করিতে পারি নাই—এই জন্যই আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। আচ্ছা, তাহা হইলে রাজা আমাকে প্রচ্ছন্ন পুরুষের বেশে উজ্জয়িনীতে বা বন্ধনাগারে বা বনে, দেখিতে পাইবেন; আর যদি তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন, তবে আমিও মরণের পূর্ব পরলোকে তাঁহার সহিত মিলিত হইব। আর যদি দৈব অনুকূল হয় তবে বিজয়াভিমানী প্রদ্যোতকে, নীতিবলে বঞ্চনা করিয়া স্বামীকে কৌশাম্বীতে আনয়ন করিব, তখন তিনি শ্লাঘনীয় আমাকে তাঁহার পার্শ্বে দেখিতে পাইবেন।"

তখন সহসা অন্তঃপুর হইতে 'হা স্বামিন্' এই আর্ত্তরব উত্থিত হইল। প্রতীহারী বিজয় আসিয়া যৌগন্ধরায়ণকে সংবাদ দিল যে, রাজমাতা বলিয়াছেন "এই সকল সুহৃজ্জন-পরিবৃত বৎসরাজের এই অবস্থা ঘটিল। এখন বৈরনির্য্যাতন বিনা উদ্ধারের উপায় কি ? এক্ষণে সুহৃজ্জনগণকে সম্মানিত করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর। তাই যিনি সঙ্কটকালেও বিষণ্ণ হন না, বিষমাবস্থায়ও যিনি সুস্থচিত্তে অবস্থান করেন না, বঞ্চিত হইয়াও যিনি উৎসাহহীন হন না, প্রতিহত হইয়াও যিনি প্রযত্নশক্তি ত্যাগ করেন না, সেই বুদ্ধিমান, আমার বৎসের প্রথমে বয়স্য, পরে অমাত্য ও আমার পুত্রতুল্য, তাহাকে বল আমার পুত্রকে আনিয়া দিন।

তখন যৌগন্ধরায়ণ প্রতীহারি-কর্ত্তৃক জল আনয়ন করিয়া আচমন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, "বিজয়ে, যদি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় শত্রুবলপ্রাপ্ত আমাদের রাজাকে আমি মুক্ত করিতে না পারি, তবে আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি।

যে আজ্ঞা বলিয়া প্রতীহারী প্রস্থান করিল। তখন নির্মুণ্ডক আসিয়া যৌগন্ধরায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আর্য্য, একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। শরীর শান্তির জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইতেছিল; একজন উন্মত্তবেশধারী ব্রাহ্মণ আসিয়া, তাহা দেখিয়া উচ্চহাসির সহিত বলিল আপনারা স্বচ্ছন্দে আহার করুন; এই রাজবংশের অভ্যুদয় হইবে; এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অদৃশ্য হইল। যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—ইহা সত্য হউক।

এই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ কতকগুলি পরিচ্ছদ হস্তে করিয়া আসিয়া বলিল আপনি এই পরিচ্ছদগুলি নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির

জন্ম রাখিয়া দিবেন, ভগবান্ দ্বৈপায়ন এগুলি পরিয়া বলিয়াছেন। যৌগন্ধরায়ণ পরিচ্ছদগুলি তাহার হস্ত হইতে লইয়া পরিধান পূর্ব্বক বলিলেন—আমার চেহারা অন্যরূপ হইয়াছে; আমি যেন স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি; "এই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রিপুনগরে অকুতোভয়ে বিচরণ কর এই উপদেশ দান করিবার জন্যেই যেন ভগবান্ দ্বৈপায়ন এগুলি আমাকে দিয়া গেলেন। সেই সাধু কর্ত্তৃক ধারিত এই উন্মত্তসদৃশ বেশ রাজাকে বন্ধনমুক্ত করিবে এবং আমাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে।

এই সময় প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজমাতা তাঁহাকে দেখিতে চান। তখন যৌগন্ধরায়ণ ব্রাহ্মণকে শান্তিগৃহে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ও হংসককেও বিশ্রামের আদেশ দিয়া প্রতীহারীর সহিত অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। গমনকালে যৌগন্ধরায়ণ বলিতেছিলেন—মন্থন করিলে তাহা হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়; খনন করিলে তবে ভূমি জলদান করে; উৎসাহী নরগণের অসাধ্য কিছুই নাই, ঠিক পথে চালিত করিলে সব চেষ্টাই সফল হয়।

ক্রমশঃ

উজানতলীর গাঁ

—কাদের নওয়াজ

মেঠো গাঁয়ের ছোট্ট কথা
তুচ্ছ ইতিহাস,
হেস নাক' তোমরা শুনে
বিদ্রূপেরি হাস।
দালান-কোঠা নেই হেথা, নেই
তিন মহলা-বাড়ী,
আছে বাবুই বাসার মতই
কুটীর সারি সারি।
সেথায় সাঁঝে দীপটী ছোট
আঁকে করুণ ছবি,
কিষণ চূড়ার সিথায় সিঁদুর
পরায় ঊষার রবি।
তালপুকুরের মুকুরে মুখ
দেখে রাতের শশী,
মেঠো ফুলের মিঠে বাসে
মন উঠে উল্লসি।
নিদাঘ কাটে শিরীষ বকুল
নিম ফুলেরি সনে,
বর্ষা আসে কদম কেয়া
ফুটিয়ে বনে বনে।
শরৎ আনে শিশির ভেজা
শিউলি ফুলের সাজি
প্রান্তরে ভুঁই-চাঁপা লোটে
ফোটে হিজলরাজি।
বসন্তকে বাসন্তী রং
পিচকারীতে গুলি,—
দেয় ছড়িয়ে শাখায় ফুলে
গান গাহে বুলবুলী।
হেমন্ত তার ধান তুলে দেয়
সারাটী মাঠ ছেয়ে,
দূর পাপিয়ার সাথেই ওঠে
চাষীরা গান গেয়ে।
ঈদের দিনে 'ঈদ্-গাহে' যায়
মোল্লা-মিয়ার দল,
মোহাররমে হয় 'তাজিয়া'
বেড়ায় কোলাহল।

দর্গাপীরের দর্গারাজে
দুর্গাপূজাও হয়,
'নান্দী-মুখে' নন্দিত লোক
বিষণ্ণ কেউ নয়।
বোধন দিনে রোদন ভুলে
নৃত্য সবাই করে,
দশমীরি দিনেই শুধু
শোকের ছায়া পড়ে।
গাজন দিনেই বাজনা বাজে
শিব্-রাত্রি এলে
পুরাণ পড়ি' গ্রামবাসী কয়—
"ধন্যি ব্যাধের ছেলে,
নয়ন-জলে বিল্বদলে
শিব-পূজা সে করে,
পেল অসীম শিবের দয়া
ঠিক সে নিশি ভোরে।"
সবের উপর একটি কথা
জাগছে শুধুই প্রাণে,
হয়না লড়াই ঝগড়া হেথায়
হিন্দু-মুসলমানে।
দর্গা আছে দুর্গা আছে,
মসজিদেরি আগে,—
রয় দেবালয়, মোরগ লড়াই,
ভুলেও নাহি লাগে।
সন্ধ্যা হলে কাঁসর বাজে
মোল্লা আজান ধরে,
হিন্দু-মুসলমান কভু সে
বিবাদ নাহি করে।
চেয়েই দেখ ঐ "মনসা—
—গাজী-পুকুর"তীরে
এক ঘাটে তার মনসা-ঘট
দর্গা অপর তীরে।
ঝগড়া বিবাদ কই কভু ত
হয় না ঘাটে তারি,
'হরির্ লুট' আর সিন্নি নিয়ে
সদাই কাড়াকাড়ি।

দুলাল বলে—"সেখজী তোমার
চালাতে খড় নাই
কালকে সে ঘর ছাইয়ে দেবে
আমার ছেলেরাই,
জানি তোমার নেই উলুখড়
মোর ত' অভাব নেই,
তাই দিয়ে ঘর ছাইয়ে নেবে
কালকে প্রভাতেই।"
এদিকে কয় সেখ মিয়াজান
লোককে পথে ধরি,
'দেখ! নগেন'! পুকুর তোমার
পাঁকে গেছে ভরি,
মাছ ম'রে যায় অপেয় জল
কাল সারাদিন ধরে
সাফ করে সে দেবই পুকুর
ভাবছ কিসের তরে?
এমনি ধারা কতই প্রীতি
হিন্দু-মুসলমানে,
কেউ জানে না সে কথা মোর
মনই শুধু জানে।
ব'ল্‌ছে কেহ—হয় ত আসি
[illegible]ী কবি
রং-তুলিতেই এঁকেছি এক
কল্প-লোকের ছবি।
তাঁদের কাছে এই নিবেদন
কল্পনা এ নয়,
শশক চরে ঐ সেখানে
কাজলা দীঘি রয়,
তার পাশেতে বনবীথিকায়
বাবুই বাঁধে নীড়
সেদিক পানে বারেক এস
হও কেন অস্থির।
নদীর তীরে সেথায় বাঁধা
বংশী মাঝির না
ঐ দেখ সেই ঘাটের পারেই
উজানতলীর গাঁ।

শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

বাসবদত্তার স্বপ্ন

(চৌদ্দ)

বৈকালের দিকে পদ্মাবতীর এক চেড়ী পদ্মিনিকা আর এক চেড়ী মধুকরিকাকে ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে ফেললে—'ও মধুকরিকা! ওলো মধুকরিকে! শীগ্গির একবার এ দিকে আয়, ভাই।

মধুকরিকা অনেক ডাকের পর হেল্‌তে দুল্‌তে এসে জিজ্ঞাসা করলে—'কি হয়েছে? অত ডাকের,ওপর ডাক। ব্যাপার খানা কি?'

পদ্মিনিকা—'ব্যাপার খুবই গুরুতর। আমাদের রাজকুমারীর ভয়ানক মাথা ধরেছে। তিনি বড়ই ছট্‌ফট্ করছেন। আমার ত' একদণ্ড তাঁর কাছ ছাড়া হবার জো নেই। তাই ডাকৃছি দূর থেকে।'

মধুকরিকা ডাগর ডাগর চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লে—'এমন ব্যাপার! তা আমায় কি করতে হবে'?

পদ্মিনিকা—'তুই গিয়ে আবান্তিকা ঠাকরুণকে খবর দে। শুধু গিয়ে বল্ গে—রাণীদিদির মাথা ধরেছে। তা হ'লেই তিনি সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে আস্‌বেন'।

মধুকরিকা—'তিনি এসেই বা আর করবেন কি? তিনি ত আর বদ্যি নন যে ওষুধ দে' মাথাধরা সারিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরং রাজবদ্যিকে খবর পাঠালে ভাল হত'।

পদ্মিনিকা খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—'যা বলছি তাই কর গিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাজলেমি ক'রে মিছেমিছি আমার সময় নষ্ট করিস্ নি। ওরে! আবন্তিকা ঠাকরুণ—বদ্যির চেয়েও ভাল ওষুধ জানেন। তাঁর নরম হাতের টিপুনি খেলে মাথাধরা পালাতে পথ পাবে না। তারপর তিনি নানারকম গল্প ক'রে রাণীদিদিকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন'খন। তা হ'লেই মাথা ছেড়ে দেবে। এখন যা দেখি'।

মধুকরিকা—'এই চল্লুম। কোথায় রাণীদিদি শুয়ে আছেন?'

পদ্মিনিকা—'সমুদ্রগৃহে। তুই এবার যা। আমি আবার বসন্তক ঠাকুরকে খুঁজে দেখি---বর মহারাজকে ত খবর দিতে হবে'।

বসন্তক তাঁর ঘরে বসে আপন মনে ভাবছিলেন—'সখা আমার পদ্মাবতীকে বিয়ে করলেন বটে, কিন্তু এতে তাঁর বাসবদত্তার শোক চাপা না পড়ে যেন আরও বেশী বেড়ে উঠেছে'। এমন সময় হঠাৎ দেখেন যে দোরগোড়ায় পদ্মাবতীর খাস চেড়ী পদ্মিনিকা। হাসি মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি সৌভাগ্য পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা! কোন আদেশ আছে নাকি'!

বিদূষকের এই বিনয়ের অভিনয় দেখে পদ্মিনিকার হাসি আসছিল। কিন্তু সেও খুব চালাক মেয়ে। মুখখানি কাঁদো কাঁদো ক'রে ব'লে উঠল—'ঠাকুর! তুমি বুঝি জান না—কি বিপদ্ হয়েছে'?

ভুঁড়ি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি লাফান যায়, ততটা তাড়াতাড়িই লাফিয়ে উঠে বসন্তক বললেন—'কৈ, না ত। কিছুই জানি না। ও বেলা বাগান থেকে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছি—এরই মধ্যে আবার হ'ল কি'?

পদ্মিনিকা আগের মতই ভার-ভার মুখে বললে—'বোধ করি ওবেলা বাগানে রোদ্দুর লাগার জন্যেই হবে—কি অন্য কোন কারণে জানি না---রাণীদিদির ভয়ানক মাথা ধরেছে---মাথা তুলতে পারছেন না, বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছেন।'

বসন্তক---'কি সর্ব্বনাশ! আচ্ছা, আমি এখুনি সখা মহারাজকে খবর দি'চ্ছ।'

পদ্মিনিকা---'তাই করুন। আমিও গিয়ে কপালে একটা প্রলেপ দেবার ব্যবস্থা করি।'

বসন্তক---'কোন্ ঘরে আছেন দেবী?'

পদ্মিনিকা---'সমুদ্রগৃহে। বর মহারাজকে একটু শীগ্গির আসতে ব'লবেন'।

বসন্তক---'আমরা এই এখনই এলুম বলে। তারপর এমন সব হাসির গল্প আমি বলব যে, শুনলে হাসির ধমকে মাথাধরা কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই।'

পদ্মিনিকা---'সেই ভাল। আমি চললুম তা হ'লে।'

বসন্তক---'এস আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছি'।

মহারাজ উদয়ন তাঁর নিজের ঘরে ব'সে বাসবদত্তার কথা ভাব্‌ছিলেন—'দায়ে পড়ে দারগ্রহণও আবার করতে হ'ল। এ মেয়েটিও রূপে-গুণে খুবই ভাল। কিন্তু লাবাণকে আগুন যাঁকে গ্রাস করেছে, সেই অবন্তিরাজের মেয়ে বাসবদত্তাকে আমি ত' কিছুতেই ভুলতে পারছি না'।

এমন সময় বিদূষক হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে রাজার ঘরে এসে উপস্থিত—'সখা! শীগ্গির—শীগ্গির'!

রাজা ত' অবাক্! ব্যাপার কি! জিজ্ঞাসা করলেন—'কিসের

শীগ্‌গির, সখা! খুলে বল—সব কথা, তবে ত' বুঝবো। তুমি এত হাঁফাচ্ছই বা কেন। একটু ব'স—জিরোও'।

বসন্তক—'জিরোবার আর সময় নেই, সখা! একটি রাণীকে ত আগেই শেষ করেছেন। এবার এটিও না সেই পথেই যায়! যা তোমার স্ত্রীভাগ্য! তাই বল্‌ছি---একটু সময় থাক্‌তে তাড়াতাড়ি চল---যদি এটিকে বাঁচাতে পার'।

রাজা একটু চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন---'এসব কি কথা সখা! দেবী পদ্মাবতীর কি হঠাৎ কোন অসুখ হ'ল নাকি? কোথায় খবর পেলে?

বসন্তক---'খবর যে সত্যি, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রাণীর খাসচেড়ী পদ্মিনিকা খবর দিয়ে গেছে'।

রাজা এবার ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন-'তা হ'লে আমরা চল যাই। আছেন কোথায় দেবী'?

বিদূষক লম্বা লম্বা পা ফেলে---'আছেন সমুদ্রগৃহে। তুমি এস শীগ্‌গির'।

সমুদ্রগৃহের কাছে যখন তাঁরা এসেছেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আলো-আঁধারে সব জিনিষ ভাল দেখা যাচ্ছে না। বিদূষক রাজাকে বল্‌লেন---'রাণী শুয়ে আছেন এখানে। আপনি আগে ঢুকুন, আমি পিছু পিছু যাই।'

রাজা ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—'তা কি হয়! আমি এ বাড়ীর নতুন জামাই। আমি কি হুট্‌ ক'রে বিয়ের ক'নের ঘরে ঢুকতে পারি! তুমি আগে ঢুকে বল যে আমি এসেছি, তারপর আমি ঢুক্‌ব'।

বিদূষক দোরের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে যাবেন হঠাৎ একলাফে পিছিয়ে এসে পড়লেন---'বাপ্‌ রে'!---এই শব্দটা মাত্র তাঁর মুখ থেকে বেরুল। চোখ কপালে—ঘন ঘন নিশ্বাস—মুখে আতঙ্ক।

'কি হ'ল, কি হ'ল'?—ব'লে রাজা এগিয়ে যেতেই বিদূষক তাঁর হাত চেপে ধরলেন—'দোহাই, সখা! আর এগিয়ো না। দোরগোড়ায় একটা মস্তবড় সাপ শুয়ে—আর একটু হ'লেই তার ঘাড়ে পা দিয়েছিলুম! খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা'।

রাজা তাই শুনে কোমরের খাপ থেকে তলোয়ারখানা সাফ ক'রে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুক্‌লেন। তারপর হো-হো ক'রে হেসে বেরিয়ে এলেন—'ও বোকারাম! এই বুঝি তোমার বড় সাপ! এটা ত দোরের ওপরকার মালাছড়াটা মাটিতে খ'সে পড়েছে—হাওয়ায় একটু একটু নড়ছে—তাই ভাল ক'রে না দেখেই লাফিয়ে উঠ্‌লে—'সাপ' ব'লে'।

এবার বসন্তকের সাহস দেখা দিল। তাড়াতাড়ি রাজাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—'মালা ত বটে! তবে আসল সাপ হ'লেও আমি ভয় পেতুম না—খালি তোমায় বাঁচাবার জন্যেই বেরিয়ে পড়েছিলুম'।

রাজা—'বেশ বেশ! তোমার বীরত্ব কে না জানে? এখন ভিতরে যাও—গিয়ে দেখ দেবী কোথায়'?

বসন্তক ভিতরে ঢুকে গেলেন—সেখান থেকে চীৎকার শোনা গেল তাঁর—'সখা! ভিতরে এস। দেবী পদ্মাবতী এখান থেকে বোধ হয় চ'লে গেছেন—এখানে কেউ নেই'।

রাজা ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—'এসে চ'লে যান নি, সখা! তিনি এখানে এখনও আসেনই নি'।

বসন্তক—'কি ক'রে বুঝলে'?

রাজা—'সখা! বিছানায় কোন রকম খাঁজ পড়েনি। চাদরখানি চমৎকার পাট করা রয়েছে—পাট ভাঙে নি। মাথাধরার প্রলেপে বালিশের ওয়াড়ে কোন দাগ লাগে নি। মাথার কাছে সুগন্ধ ফুলও রাখা হয় নি। তারপর আর এক কথা! রোগী একবার বিছানায় শুলে শীগ্‌গির বড় একটা উঠ্‌তে চায় না। তুমি ত আধদণ্ড আগে খবর পেয়েছ। এরই মধ্যে কি দেবীর মাথা ছেড়ে গেল যে আমাদের খবর পাঠিয়ে তিনি একটুও অপেক্ষা করলেন না—চ'লে গেলেন এখান থেকে! আমার মনে হয়, তিনি এখানে এসে শুয়ে থাক্‌বেন ব'লে পরিষ্কার বিছানা পাতিয়ে রেখেছেন—আর আমাদের কাছেও খবর পাঠিয়েছেন এখানে আস্‌তে। বোধ হয় ভেবেছেন—আমাদের আস্‌তে একটু না একটু দেরী ত হবেই—ততক্ষণে তিনি এখানে এসে শুয়ে পড়বেন'।

বসন্তক বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়লেন—'ঠিক ঠিক! তা সখা, তুমি এই বিছানায় একটু বোসো—যতক্ষণ না দেবী এসে পড়েন'।

উদয়ন—'তাই ভাল'—ব'লে বিছানায় বস্‌লেন। একটু বাদেই বল্‌লেন—'বেশ সুন্দর নরম বিছানা—এতে ব'সে মন ওঠে না—শুতে ইচ্ছে যায়'।

বসন্তক—'আহা! বস্‌তে পেলে শুতে চান! তা, সখা! তুমি নতুন জামাই—তায় রাজা লোক। তোমার সবই সাজে। শুয়ে পড়'।

রাজা বিছানায় শুয়ে বল্‌লেন—'সখা, বড় ঘুম পাচ্ছে—তুমি একটা গল্প বল। নইলে ঘুমিয়ে পড়ব আবার। দেবী যদি আসেন, লজ্জার কথা হবে'।

বসন্তক—'বেশ। আমি গল্প বল্‌ছি, তোমাকে কিন্তু 'হুঁ' দিয়ে যেতে হবে, নইলে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তেও ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চয়। যা ঘুম-কাতুরে তুমি'!

রাজা—'আচ্ছা। বল—গল্প বল'।

বসন্তক গল্প আরম্ভ করলেন—'উজ্জয়িনী নামে এক নগর আছে—সেখানকার স্নানের ঘরগুলি বড় চমৎকার'।

রাজা—'আবার উজ্জয়িনীর কথা কেন'!

বসন্তক—'তা উজ্জয়িনীর কথা তোমার ভাল না লাগে, অন্য গল্পই না হয় বলছি শোনো'।

রাজা—উজ্জয়িনীর কথা ভাল লাগে না—একথা ত বলি নি। উজ্জয়িনীর কথা পাড়লেই মনে পড়ে—অবন্তি-রাজকন্যা বাসবদত্তা এই উজ্জয়িনীতে আমার কাছে বীণা শিখতেন—একদিন বীণা শিখবার সময়ে আমার দিকে চেয়ে বীণা বাজাচ্ছিলেন—হাত থেকে তাঁর বীণা বাজাবার কোণটা পড়ে গিয়েছিল, সেদিকে হুঁসও ছিল না—শুধু হাতে আকাশেই বাজাচ্ছিলেন। তারপর যেদিন তিনি আমার সঙ্গে পালিয়ে আসেন—উজ্জয়িনীর রাজপথে

হাতীর পিঠে তাঁর মা-বাবা-ভাইদের মনে ক'রে যে কেঁদেছিলেন—আজও তা আমার মনে গাঁথা আছে'।

বলতে বলতে রাজার দু'চোখ জলে ভরে এল—গলাটা হ'ল ধরা ধরা। বিদূষক তাড়াতাড়ি বল্লেন—'না-না, সখা! তুমি যাতে দুঃখ পাও,সে কথা আর তুলব না। অন্য গল্প বলি, শোনো'।

রাজা—'বল, সখা'!

বসন্তক মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প ফাঁদলেন—'এক যে ছিল নগর তার নাম ব্রহ্মদত্ত, আর সেখানকার রাজার নাম কাম্পিল্য'।

উদয়ন হেসে উঠে বল্লেন—'দূর গর্দ্দভ! রাজা ব্রহ্মদত্ত, নগর কাম্পিল্য—বল'।

এবার বসন্তকের আশ্চর্য্য হবার পালা—'কি বল্লে, সখা! রাজা ব্রহ্মদত্ত আর নগর কাম্পিল্য—বটে'!

রাজা—'হাঁ'।

বসন্তক—'তা হ'লে একটু চুপ করে শোও। আমি ওটা মনে মনে আউড়ে আমার ভুলটা শুধরে নিই—আর ওটাও মুখস্থ হ'য়ে যাক্'।

রাজা চুপ ক'রে পাশ ফিরে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। বসন্তক ফিস্ ফিস্ ক'রে বার কয়েক 'রাজা ব্রহ্মদত্ত, নগর কাম্পিল্য' আউড়ে বল্লেন—'এইবার শোনো, সখা'!

রাজা উত্তর দিলেন না দেখে বসন্তক তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বুঝলেন রাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'এ ঘরটা ঠাণ্ডা—তার ওপর সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে—আল্‌গা গায়ে শুয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় অসুখ করতে পারে। রাণীর চাদরের পাট ভাঙব না—কি জানি যদি কিছু ভাবেন তিনি। তার চেয়ে চট করে সখার ঘর থেকে সখার চাদরখানা এনে গায়ে চাপা দিয়ে দিই। কতক্ষণই বা লাগবে। যাব আর আসব বৈ ত নয়'। এই ভাবতে ভাবতে বসন্তক সমুদ্রগৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক এই সময় মধুকরিকার সঙ্গে আবন্তিকার ছদ্মবেশে বাসবদত্তা সমুদ্রগৃহের সামনে এসে হাজির হলেন। আবন্তিকা মধুকরিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি গো! এই ঘরেই ত রাজকুমারী শুয়ে আছেন'?

মধুকরিকা—'পদ্মিনিকা ত আমায় সেই রকমই ব'লে দিলে'।

আবন্তিকা—'তবে তুমি যাও—আমার ঘর থেকে সেই প্রলেপের জিনিষগুলো নিয়ে এস দেখি। আমি ততক্ষণ ভিতরে গিয়ে দেখি—রাজকুমারী কেমন আছেন'।

মধুকরিকা চ'লে গেল। বাসবদত্তা ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকলেন—'হায়! দেবতারা কি নিষ্ঠুর! আমার শোকে কাতর মহারাজ তবু পদ্মাবতীকে বিয়ে ক'রে একটু সাম্‌লে উঠছিলেন। এ বেচারীও আবার অসুখে পড়ল। ভালয় ভালয় সেরে উঠলে বাঁচি'।

ঘরে শুধু একটা প্রদীপ জ্বলছিল মিট মিট ক'রে। সে আলোতে বিছানায় শোওয়া রাজাকে চেনবার উপায় ছিল না। বাসবদত্তা ভাবলেন, পদ্মাবতীই বোধ হয় শুয়ে আছেন—কারণ ঘরে যে-রকম অন্ধকার তাতে মেয়ে মানুষ কি পুরুষ মানুষ চেনাও কঠিন।

কাছে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন—'চেড়ীগুলো কি অসাবধান! রোগা মেয়েটাকে একলা এইভাবে ফেলে রেখে যে যার তালে গেছে। ঘরে আছে শুধু একটা মিটমিটে প্রদীপ—তাতে আলোর চেয়ে আঁধারই বেশী হয়। যাক্! বোন ত' আমার ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি—তাই চেড়ীগুলো সব পালিয়েছে। কাজে ফাঁকি দিতে পারলেই সব বাঁচে। এখন এ বেচারী জেগে উঠে যদি একটু জল খেতে চায় তা' পাবে না—গলা শুকিয়ে উঠবে। যতক্ষণে তাঁরা সব দয়া ক'রে না দেবেন, ততক্ষণে এক ফোঁটা জলও মিলবে না। আমি ত' এখন এসে গেছি—আর কোথাও যাব না। এখন বিছানাতেই মাথার গোড়ায় বসি গে যাই। নয়ত অন্য জায়গায় বসলে ভাল দেখাবে না—পদ্মাবতীও ভাববে—আমাকে দিদি তেমন ভালবাসেন না—তাই অসুখের সময় দূরে স'রে থাকেন'। এই সব ভাবতে ভাবতে আবন্তিকা বিছানায় গিয়ে বসলেন।

উদয়ন বেশ অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর নিশ্বাস পড়ছিল বেশ তালে তালে। তাই দেখে বাসবদত্তা ভাবলেন—'নিশ্বাস ত' দেখছি সুস্থ লোকের মতই পড়ছে। তা' হ'লে মাথাধরা বোধ হয় সেরে গেছে। তা' হ'লে শুধু শুধু ব'সে থাকি কেন। আমিও পদ্মার পাশটায় একটু গড়াই। ঘুম ভাঙলে সেও দেখে বুঝবে—'দিদি আমায় কত ভালবাসেন—পাশে গিয়ে শুয়ে আছেন আগ্‌লে'—এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে বাসবদত্তা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন রাজার পাশে তাঁকে পদ্মাবতী মনে ক'রে।

এমন সময় স্বপ্নের ঘোরে রাজা 'হা বাসবদত্তে'!—ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন। চমকে উঠে প'ড়ে আবন্তিকা-বেশিনী বাসবদত্তা আপন মনে ব'লে উঠলেন—'এ-কি কাণ্ড! কোথায় পদ্মা! এ-যে দেখছি আমার প্রভু! আমায় কি দেখে চিনে ফেলেছেন না কি! তা' হ'লে ত' মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের সব ফন্দী মাটী হ'ল'।

এই সময় রাজা স্বপ্নের ঝোঁকে আবার ব'লে উঠলেন—'হা অবন্তিরাজকন্যা'!

বাসবদত্তা এবার বুঝলেন—রাজা স্বপ্নের ঘোরে কথা কইছেন—তাঁকে দেখতে পান নি। মনে মনে ভাবলেন—'যাক্! তবু ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যে উনি জেগে নেই। আচ্ছা, এখন ত' এখানে কেউ নেই। একবার দু'চোখ ভ'রে হৃদয়ের দেবতাকে দেখে নিয়ে প্রাণটা জুড়াই না কেন'।

রাজা স্বপ্নে বিড় বিড় ক'রে ব'লেই চলেছেন—'হা প্রিয়ে! কথার উত্তর দাও'।

আবন্তিকা এবার অস্ফুট স্বরে বললেন—'এই যে কথা বলছি, প্রভু'।

রাজা (স্বপ্নে)—'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ'?

আবন্তিকা—'না—না, প্রভু—রাগ নয়—দুঃখ—কেবল দুঃখ পেয়েছি।

রাজা (স্বপ্নে)—'যদি রাগ না ক'রে থাক, তবে গায়ে গয়না পর নি কেন। এস, আমি তোমায় গয়না পরিয়ে দিই' এই ব'লে তিনি হাত বাড়ালেন। হাতখানি পালঙ্কের বাইরে ঝুলে পড়ল।

বাসবদত্তা ভাবলেন—'আর নয়! বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। হয়ত উনিই এখনই জেগে উঠবেন। নয়ত বা কেউ এখানে এসে দেখে ফেল্‌বে। তা' হ'লে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। আ-হা-হা! প্রভুর হাতখানা শূন্যে ঝুলছে। হাতখানি উঠিয়ে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর রেখে দিয়ে এইবার স'রে পড়ি'। রাজার হাতখানা ঘুরিয়ে বিছানায় রাখতে যেতেই রাজার ঘুম ভেঙে গেল। সেই আলো-আঁধারেই তিনি বুঝলেন তাঁর হাত ধ'রে আছেন যিনি—তিনি বাসবদত্তা ছাড়া আর কেউ নয়। ধড়মড় ক'রে উঠে তিনি বলতে লাগলেন—'দেবি! বাসবদত্তা! দেবি! তাহ'লে তোমার মৃত্যুর খবর মিছে! তুমি মর নি—বেঁচে আছ'।

আবন্তিকা ততক্ষণে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দিলেন জোরে ছুট। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেবি বাসবদত্তা'! বলতে বলতে রাজা বিছানা ছেড়ে তাঁর পিছু নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু একে অজানা পথ—তায় আলো-আঁধারে—ঘুমের ঘোর তখনও চোখে লেগে রয়েছে। দরজায় মাথা ঠুকে গেল। তিনি মাথা ধ'রে মেঝেয় ব'সে পড়লেন। বাসবদত্তা ততক্ষণে চোখের আড়াল হ'য়ে গেছেন।

রাজা হাতে মাথা টিপতে টিপতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে কপাটে মাথা ঠুকে গেল। কিন্তু স্পষ্ট না দেখতে পেলেও অস্পষ্ট যা দেখেছি তাতে আমার কোন ভুল হয় নি'।

এমন সময় রাজার চাদর হাতে বিদূষক ফিরে এলেন। আমাদের লিখতে যত সময় লেগেছে, তার চেয়ে অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই এ-সব ঘটনা ঘটে গেল। রাজাকে দেখে বিদূষক বললেন—'এই যে! সখার ঘুম যে ভেঙে গেল হঠাৎ! রাণীও ত' আসেন নি এখনও দেখি! তবে ঘুম ভাঙল কেন'?

রাজা ম্লান হাসি হেসে বললেন—'ছোট রাণী আসেন নি বটে, তবে বড় রাণী এতক্ষণ এখানে ছিলেন'।

বসন্তক চম্‌কে উঠলেন। তবে কি যৌগন্ধরায়ণ আর তাঁর ফন্দী ফেঁসে গেছে—বাসবদত্তা ছদ্মবেশ ছেড়ে রাজার কাছে নিজে পরিচয় দিয়েছেন! তাই তিনি বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বললেন—'সখা! তুমি কি পাগল হলে? কি বলছ'?

রাজা—'পাগল হই নি বটে এখনও, তবে এইবার বোধ হয় আনন্দে পাগল হব—সখা! বড় সুখের কথা!—দেবী বাসবদত্তা বেঁচে আছেন'।

বসন্তক—'দূর পাগল! বাসবদত্তা কোথায়? তিনি ত' অনেকদিন পুড়ে মরেছেন'।

রাজা—'না—না—সখা! আমি বিছানায় সুখে ঘুমুচ্ছিলুম। তিনি আমার গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন। আমিও তাঁকে ধর্‌তে ছুটেছিলুম। কিন্তু কপাট মাথায় লেগে চোখে অন্ধকার দেখলুম—আর তাঁকে ধর্‌তে পারলুম না। যাক্! সখা! রুমণ্বান্ তাহ'লে মিছে কথা ব'লে আমায় তখন ঠকিয়েছিল যে দেবী পুড়ে মরেছেন'।

বসন্তক—'হতেই পারে না। উজ্জয়িনীর কথা শুনতে শুনতে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। সেই কথা ভাবতে ভাবতে হয়ত স্বপ্নে এই সব দেখে থাক্‌বে'।

রাজা—'সখা! এ যদি স্বপ্ন হয়, তবে আমার ঘুম আর না ভাঙাই ছিল ভাল! এ-যদি আমার চোখের ভুল হয়, তবে চিরদিন যেন চোখে এমনই ভুল দেখি'।

বসন্তক—'সখা! শুনেছি—এই মগধের রাজবাড়ীতে এক যক্ষিণী থাকে—তার নাম অবন্তি-সুন্দরী। তুমি হয়ত তাকেই দেখে থাক্‌বে'।

রাজা এবার ধৈর্য্য হারিয়ে বললেন—'না—না—সখা! ঘুম ভাঙবার পর আমি দেখেছি তাঁর মুখ। চোখে কাজল নেই। চুল বাঁধেন নি। ঠিক পতিবিরহে প্রোষিতপতিকা নারীর মতই আমার বিরহব্রত পালন ক'রে নিজের চরিত্র নির্ম্মল রেখেছেন'।

বসন্তক আর কি বলতে যাচ্ছিলেন—রাজা বাধা দিলেন—'আরও এই দেখ, সখা! দেবী যে আমার হাত ধরেছিলেন, তাতে সেই ঘুমঘোরেও আমার যে রোমাঞ্চ হয়েছিল—এখনও তা মিলিয়ে যায় নি। এত প্রমাণ সত্ত্বেও তুমি বলবে—এ স্বপ্ন—এ ভ্রম—এ যক্ষিণীর দর্শন! না—না—এ সত্য—এ সত্য—এ সত্য'!

ক্রমশঃ রাজা উত্তেজিত হ'য়ে উঠছেন দেখে বসন্তক তাড়াতাড়ি বললেন—'সখা! মহারাজ! দোহাই তোমার! অত চেঁচিও না। যদি এ-কথা ছোট রাণীর কাণে ওঠে, কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে। বড় রাণী যদি বেঁচে থাকেন—ভালই ত'। তিনি যদি দেখা দিয়ে থাকেন একবার, আবার নিশ্চয়ই সুবিধামত দেখা করবেন। চল, আমরা এখান থেকে এখন যাই। আমরাও গোপনে খোঁজ নোব—ব্যাপারটা কি আসলে। রাত হ'য়ে পড়েছে। ছোট রাণী এত রাতে বোধ হয় আর এ-ধারে আস্‌বেন না'।

এই সময় রাজবাড়ীর বুড়ো কঞ্চুকী এসে উপস্থিত—'জয় হোক, বর মহারাজের'!

বসন্তক—'কি খবর, দাদা'!

কঞ্চুকী—'আমাদের মহারাজ দর্শক জানালেন—বর মহারাজের প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান্ সেনা-সামন্ত নিয়ে এসেছেন এখানে। বর মহারাজের প্রধান শত্রু কে আরুণি আছেন—তাঁকে মারবার জন্যে এই ব্যবস্থা। আমাদের মহারাজও সসৈন্যে যুদ্ধে যাবেন বর মহারাজের সাহায্য করতে। এখন বর মহারাজ মন্ত্রণা সভায় এলেই মহারাজ দর্শক, বর মহারাজ, সেনাপতি রুমণ্বান্—এঁরা তিন জনে পরামর্শ ক'রে কাল ভোরেই জয়যাত্রায় বেরুবেন। তাই বর মহারাজকে সংবাদ দিতে এসেছি'।

উদয়ন—'বেশ! চারদিকেই সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আরুণিকে আমি নিজে সম্মুখ সমরে মারব—তবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে। চল, কঞ্চুকী—মন্ত্রণাসভার পথ দেখাও। এস—বসন্তক'।

'চলুন, মহারাজ' ব'লে কঞ্চুকী এগিয়ে চললেন। পিছু নিলেন উদয়ন—সব পিছনে বসন্তক।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মুখবন্ধ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম কংগ্রেস-অধিবেশন হয় বোম্বাই নগরীতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে, দ্বিতীয়টি হয় কলিকাতার টাউনহলে দাদাভাই নৌরজীর পৌরোহিত্যে কলিকাতায় আরও তিনবার অধিবেশন হয় ১৮৯০, ১৮৯৬ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। প্রথমটির সভাপতি হন স্যার ফেরোজ শা মেহটা, দ্বিতীয়টীর সৈয়দ্ রহমতুল্লা সায়ানি, তৃতীয়টির দিনশা ওয়াচা, ইতিপূর্ব্বে ইহার বিস্তৃতালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস হয় (অষ্টাদশ অধিবেশন), আমেদাবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে হয় (উনবিংশ অধিবেশন) মাদ্রাজে সভাপতি হন লালমোহন ঘোষ মহাশয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হয় বোম্বাই নগরীতে, সভাপতি হন স্যার হেনরী কটন। ইনি একজন যথার্থ ভারত হিতৈষী ছিলেন। ইনি যখন আসামের চীফ কমিসনার, চা-কর সাহেবদের ব্যাপার লইয়া লর্ড কর্জ্জনের সহিত মতভেদ হয়, তাই তিনি চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান। বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধেও তিনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সনে বাঙ্গলার ঘটনায় সমগ্র ভারত আন্দোলিত হইলেও, তিলকের মহারাষ্ট্রই প্রথমে বাঙ্গলার সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেন। যদিচ এই বৎসরের কংগ্রেস বাঙ্গলার প্রতি সামান্যভাবে সহানুভূতি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয়গণ এই বৎসর হইতেই ভিক্ষা-নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের পরবর্ত্তী নীতি আত্ম-নির্ভরতার সূচনাই বঙ্গভঙ্গে। পরবর্ত্তী গৌরবময় ইতিহাসে এই নীতির বিকাশ।

নব শতাব্দীর প্রারম্ভেই নূতন ভারত গঠিত হইল। এবং ১৯০১ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে তাহার সূচনা। শিবাজী উৎসব প্রভৃতি ব্যাপারে তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র যেমন আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে, বাঙ্গলার সঙ্ঘবদ্ধতা নীলকরের অত্যাচারের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়া রীপনের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে, পেনেলের প্রতি অনুরাগে ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। অভাব ছিল রাজনৈতিক জাগরণের; লর্ড কর্জ্জন এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনারাজি তাহা পূর্ণ করিয়া দেয়। অতঃপরে ১৯০২ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত কংগ্রেস পূর্ব্বের "ভিক্ষানীতি" ভাব ছাড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল; এই কয় বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও এই উদ্যোগপর্ব্বের ইতিহাস বড়ই ঘটনা-বহুল। ইহা যেমন চমকপ্রদ তেমনি আত্মত্যাগ ও স্বার্থ-বিসর্জ্জনের কাহিনী সংজড়িত। অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করিয়াও বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী তাহার আত্মপরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতবাসীও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া সমভাবে চলিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই।

বঙ্কিম সাহিত্যের কথাতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সময়ে বিবেকানন্দের উপদেশ, বক্তৃতা,পত্রাবলীও যুবকদের মধ্যে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। বিবেকানন্দের বাণী—"বঙ্গযুবক বিশ্বাস করো তোমরা মানুষ, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম," একেবারে নূতন আশার সঞ্চার করিল। আর করিল পূর্ব্ববঙ্গে অশ্বিনীকুমার দত্তের শিক্ষা-প্রণালী। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ পূর্ব্ববঙ্গের সেরা ছাত্ররূপে পরিণত হইল। বুঝা গেল যদি কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় বরিশাল ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে। অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ'ও ছাত্রগণের চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায় হইল।

বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চও এই সময়ে খাটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইল। বস্তুতঃ জাতিগঠনে ইহা প্রচুর পরিমাণে লোক শিক্ষার ইন্ধন জোগাইয়াছে। ১৯০০।১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম রচিত গিরিশ রূপান্তরিত "সীতারামে" বাঙ্গালী দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইল যে

লর্ড কর্জ্জন

সিংহবাহিনী শ্রী মাতৃরূপে দেশবাসীকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করিতেছে "মার, মার, শত্রু মার", আর হিন্দু মুসলমান

মিলন প্রয়াসী চাঁদশা ফকির আদর্শ হিন্দুরাজা সীতারামকে মন্ত্র পড়াইতেছেন :

"তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমার রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। দেশাচারের বশীভূত হইয়া হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ করিও না, প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।"

১৯০২ সনে বাঙ্গালী যুবক দেখিতে পায় বিবেকানন্দ আদর্শানুপ্রাণিত মরণজয়ী 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল, ১৯০৩ এ দেখিতে পায়, ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য। ১৯০৪এ পায় গিরিশচন্দ্রের সৎনামে :—

"তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার মাতৃভূমির জন্য শত্রুযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপঘাত নয়, কাশীমৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যের অনুসরণ করতে প্রস্তুত হবে।"

তার পর দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ। পরে আসে গিরিশের সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম এবং পরিশেষে দুর্গাদাস ও ছত্রপতি শিবাজী। কয়খানি নাটকেই প্রচুর লোকশিক্ষার উপাদান ছিল।

সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিমে বঙ্গীয় যুবক বুঝিতে পারে কিরূপে বাঙ্গলা হিন্দুমুসলমানের হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিরূপে বাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, কিরূপে দেশকে ভালবাসিয়া সিরাজ ও কাশিমালি, মোহনলাল ও মীরমদন, তকি মহম্মদ ও করিমচাচা আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। লোকে অভিনয় দেখিয়া বুঝিল এতদিন যে পড়িয়াছে, সিরাজ অত্যাচারী ও বিলাসপরায়ণ তাহা ঠিক নয়, তিনি প্রকৃতই ছিলেন—

নবাব প্রজার ভৃত্য প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গলসাধন নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।

বস্তুতঃ মুসলমান জননায়ক বর্দ্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রায়ই বলিতেন, "মশায় দশটা বক্তৃতায় যাহা না হয়, একবার সিরাজদ্দৌলা অভিনয় দেখলে তাহাপেক্ষা বেশী হয়।"

ঘটনাস্রোতও সু-পবন বহন করিল। ১৯০২ সনে লর্ড কর্জ্জন প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেসন অভিভাষণে সংবাদপত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের অত্যুক্তির (exaggeration) প্রতি শ্লেষ করেন, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের প্রতিও ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন না, কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী সোডাওয়াটারের নিষ্ফল উচ্ছাস বই (with the popping and fizzing of soda water bottles) আর কিছুই নয়, এরূপ প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কলিকাতার স্বায়ত্তশাসন অপসারিত করিয়া মিউনিসিপ্যাল আইনও তাঁহার সময়েই পাশ হয়। অবাধ শিক্ষা প্রসার (indiscriminate education) লোকের পক্ষে ক্ষতি

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর মনে করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে (ইউনিভার্সিটি) তিনিই সরকারের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া একটি কমিশন বসান। আর মহারাণীর মৃত্যুর পরে সম্রাট (Edward)-এর অভিষেক উপলক্ষে ইনিই দিল্লীতে একটি দরবার উদ্বোধন করিয়া নিঃস্ব প্রজাগণের অর্থ অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয় করেন। এই সব কার্য্যে জনব্রাইট ভক্ত স্বদেশভক্ত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ কংগ্রেসের ঊনবিংশ অধিবেশনের (মান্দ্রাজে) সভাপতিরূপে ঐ দরবারটিকে একটি বিরাট তামাসা বলিয়া অভিহিত করেন।[৩]

এই সময় কলিকাতায় দুই জন প্রধান ব্যক্তির শুভাগমন হয়। একজন মিস্ মার্গারেট নবোল, আর একজন জাপানী প্রসিদ্ধ লেখক ওকাকুরা। মিস্ নবোলই অতঃপরে ভগিনী নিবেদিতা রূপে বাঙ্গলায় সুপরিচিতা হন। ১৯০১ সনের শেষদিকে ইনি মিস্ ক্রিষ্টিয়ানা সহ একনম্বর ডেকার লেনে (এসপ্লেনেডের সন্নিকটস্থ) তেতলায় আসিয়া থাকেন। ইনি আইরিস রমণী এবং প্রথমে ছিলেন নিহিলিষ্ট। পরে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন ও মাতৃভূমির ন্যায় ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের সহায়তায় তিনি প্রমথ মিত্র (মিঃ পি মিত্র, ব্যারিষ্টার), চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতো

১ Convocation Speech Feb. 15 1902 Exaggeration is not only foolish, but weakness. Either the press has been extravagant in laudation or national character prefers words to deeds.

২. Would any where such vast sums of money have been spent on an empty pageant when famine and pestilence were skating over the land aganist the almost unanimous protest of all our public and represenṭive men.

৩। এই কমিশনের রিপোর্টে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্নমত প্রকাশ করেন (dissent) আর অতঃপরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব প্রতিপত্তি এবং মনীষা বলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের হাতে আসিয়া পড়িতে পারে নাই।

চৌধুরী প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিবার পরেও তিনি প্রচার করিতেন—

"আমাদের নেতা ও কর্ম্মিগণের চাই গভীর সাধনা, চাই ভগবানের সহিত অধিকতর আত্মিকযোগ, চাই অন্তর হইতে আভ্যন্তরিক আত্মোন্নতি। অবিশুদ্ধ অবনতিকর ইউরোপীয় উদ্দীপনা দ্বারা আমরা জয়লাভ করিতে পারিবনা। শক্তির সহিত ধর্ম্মের সংমিশ্রণ করিতে হইবে। এক দেহেই রামদাস ও শিবাজীর একত্র আবির্ভাব চাই। ইউরোপীয় শক্তির সহায়ে আমাদের জয়লাভ দুরাশা মাত্র।"

বিবেকানন্দও বলিতেন, "প্রেমে সকলকে বশীভূত কর, ধর্ম্মবলে জগত জয় কর, জড়শক্তিতে তাহা সম্ভব নয়।" গিরিশের নাটকেও পাই এই সত্য, নিবেদিতা গিরিশচন্দ্রের বড় স্নেহের পাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিতেন। ভ্রান্তির 'গঙ্গা', সৎনামের 'বৈষ্ণবী', মিরকাশিমের 'তারা', নিবেদিতার আদর্শেই সৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।
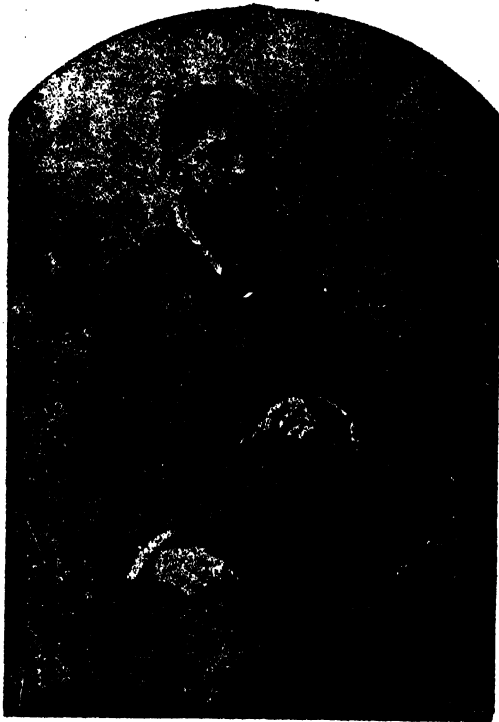
আনন্দমোহন বসু

ওকাকুরাও জাপান হইতে এদেশে আসিয়া মিস্ নবোল এবং প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, রজত রায়, সুরেন হালদার, হরিদাস হালদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্নের সহায়তায় বর্ত্তমান অবস্থার একটা ছায়া প্রতিবিম্বিত করেন। জাপান এই সময় বিশেষ উন্নতিশীল, রুশিয়ার শক্তি খর্ব্ব করিতেও তার সামর্থ্য আছে, কলকারখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণের উদ্ভাবনী শক্তিও কম নয়। ওকাকুরার কথা সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তাহার প্রস্তাবিত এশিয়েটিক ফেডারেশনের প্রস্তাবে আকৃষ্ট হইল, চিত্তরঞ্জন তখন হইতেই ইহার জোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ওকাকুরা যে Ideals of the East নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহার ভূমিকায় নিবেদিতার কয়টি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"এসিয়া এক অখণ্ড মহাদেশ।* উত্তুঙ্গ হিমালয়শৃঙ্গ দুইটী বিরাট সভ্যতার বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্যই যেন তাহাদের বিভক্ত করিয়াছে—একটী ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা, আর একটী মঙ্গোলীয় চীনের সভ্যতা।"...

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে আর নিবেদিতা ও ওকাকুরার উদ্দীপনায় অতঃপরে যে রাজনীতি গঠিত হয়, প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, আশুতোষ চৌধুরী; সত্যরঞ্জন দাশ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজত রায়, সুরেন্দ্র হালদার, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কুমার কৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি হইলেন তাহার প্রধান সেবক আর এই রাজনীতি প্রচারের মুখপত্র হয় "নিউ ইণ্ডিয়া"। ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন চিত্তরঞ্জনের দাদা সত্যরঞ্জন আর উহা সম্পাদনা করিতেন সুবিখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল।

ওকাকুরার 'আইডিয়েলস্ অব দি ইষ্ট' প্রচারিত হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, আর ঐ বৎসরেই লর্ড কর্জ্জন শাসনের পক্ষে সুবিধা হইবে অজুহাতে অখণ্ড বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি যে কেবল কর্পোরেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শক্তি খর্ব্ব করিয়া উহা গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন করেন তাহা নয়, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা রদ করিয়া অফিসিয়াল সিক্রেট্স য়্যাক্ট পাশ করিয়াও অশান্তির মাত্রা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দেখিলেন কলিকাতা হইতেই সব আন্দোলন উদ্ভূত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরা এখানেই দল বাধিয়া প্রতিকার্য্যেই অগ্রসর হয়। আর অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলার আন্দোলনই জোরালো, তাই তিনি অখণ্ড বাঙ্গলার শক্তি খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জিলা আসাম প্রদেশে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব বাহির হইল। অতঃপরে চট্টগ্রাম-বিভাগ এবং সম্পূর্ণ ঢাকা বিভাগই (ফরিদপুর বাখরগঞ্জসহ) বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ নামে পৃথক একটী প্রদেশ করিবার প্রস্তাব হয়।

বঙ্গবাসী এক ও অখণ্ড, কখনও ইহা বিভক্ত হইতে পারে না। এ প্রস্তাবের অবমাননা বাঙ্গালী নীরবে সহ্য করিল না। তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল, হিমালয় হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল, নিদ্রিত শার্দ্দুল জাগিয়া উঠিল,

* Asia is one. The Himalayas divide only to accentuate the two mighty civilisations of the East.

১৯০৩-এর ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫-এর অক্টোবর পর্য্যন্ত ন্যূনকল্পে দুই হাজার সভার কম আহুত হয় নাই, এবং কোন কোন সভায় প্রায় লক্ষ লোকও যে সমবেত হয়, তাহাও দেখা গিয়াছে। আর এই সব সভায় হিন্দু মুসলমানের উৎসাহ সমভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিও এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯০৩-এর কংগ্রেসের প্রস্তাবেও প্রতিবাদ হয়: This Congress deprecates the separation from Bengal of Dacca, Mymensing and Chittagong Divisions.

১৯০৪এ হয়—

This Congress records its emphatic protest against the proposal of the Government of India for the Partition of Bengal in any manner whatsoever.

অবস্থা দেখিয়া লর্ড কর্জ্জনও উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি লোকসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে হাত করিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ পণিমিঞা হিন্দুমুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নবাব আশানুল্লাও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য ভাব প্রদর্শন করিতেন না। নবাব সলিমুল্লাও প্রথমে বঙ্গভঙ্গ 'পাশবিক ব্যবস্থা' বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু পরে কর্জ্জনের মতেই মত দিতে বাধ্য হন। রাজ-প্রতিনিধির সম্বর্দ্ধনায় তিনি কলিকাতা হইতে ক্লাসিক থিয়েটারও বায়না করিয়াছিলেন। অবশ্য নবাব সলিমুল্লা পিতামহ ও পিতৃ-দেবের চরিত্রের দৃঢ়তা পান নাই।

ইহার পরেই ১৯০৫-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায়* লর্ড কর্জ্জন ভারতবাসীকে মিথ্যা-বাদী বলিয়াও অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না।* অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। সমস্ত বাঙ্গালীজাতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ১১ই মার্চ্চের টাউনহলের বিরাট সভায় কর্জ্জননীতির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া সকলে সমস্বরে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সভার সভাপতি হন আইনের ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ। কর্জ্জনও নীরব রহিলেন না। তিনি সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া মত সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিলেন। মুসলমানদের লইয়া সভা করিতেও লাগিলেন, নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, ইসলামের প্রসারই তার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইখানেই প্রথমে বাঙ্গালার মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ বীজ প্রোথিত হইল, আজ তাহাই বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ যাহাতে বিভক্ত না হয় সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে বহু দরখাস্ত ভারতসচিব ব্রড্ উইকের নিকটে পাঠানো হয়, একখানা দরখাস্তে প্রায় ৭০,০০০ বিশিষ্ট ব্যক্তিও সহি করিয়াছিলেন, ফল তো হয়ই না, উপরন্তু জুলাই মাসে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ পায় যে ১৬ই অক্টোবর হইতে কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগই নয় (১৯০৫) রাজসাহী বিভাগও নূতন প্রদেশান্তর্ভুক্ত হইবে। ক্ষোভে, রোষে অপমানে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু এবার সে নীরবে এই অপমান সহ্য করিল না। স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জ্জন অস্ত্র লইয়া সে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

৭ই আগষ্ট (১৯০৫) কলিকাতার টাউন হলে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় হইতেই লোক সমাগম হইতে থাকে। এত জনসমাগম হয় যে, উপর তলায় নীচতলায় সভা করিয়াও ময়দানে পর্য্যন্ত আরও একটি বিরাট সভা করিতে হয়। উপরের হলঘরে যে সভা হয়, মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ

---

* ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সিলেট জিলা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় আর ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রাম বিভাগ বিখণ্ডিত করিবার কথা ২১ বার হইয়াছে।

*...The highest ideal of truth is to a large extent a western conception......In the East craftiness and diplomatic skill have always been held in much repute....Oriental diplomacy is something rather tortuous and hyper-subtle... The same may be seen in oriental literature. In the habit of exaggeration very often a whole fabric of hypothesis is built out of nothing at all.

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্যার গুরুদাসের নিকট হইতে কর্জ্জন রচিত Problems of the Far East পুস্তকখানি আনাইয়া কর্জ্জনের স্বরচিত উক্তি হইতে প্রাচ্য কোরিয়ার পররাষ্ট্র (Foreign) আফিসে বয়স এবং সম্বন্ধ এবং বিবাহাদির কথায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া আসিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া দেন। দুইদিন পরেই অমৃতবাজারে এই মিথ্যোক্তির আলোচনা হয়।

করেন। বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী মহারাজা সূর্য্যকান্ত রায়ের অসুখের দরুণ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার পুত্র শশীকান্ত প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আশুতোষ চৌধুরী সমর্থন করেন এবং রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি হয়—

"That this meeting emphatically protests against the resolution of Government on the Partition of Bengal. It is unnecessary, arbitrary and unjust and being in deliberate disregard of the opinion of the entire Bengali Nation has aroused a feeling of distrust against the present administration which can not conduce to the good Government of the country. Secretary of State for India will be pleased to reconsider and withdraw orders that have been passed."

দ্বিতীয় প্রস্তাব—নরেন্দ্রনাথ সেন উত্থাপন করেন—Abstain from purchase of British Manufactures so long as partition was not withdrawn,

"যতদিন ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কথায় কর্ণপাত না করেন ততদিন কেহ বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না।"

বাবু নলিনবিহারী সরকার, নন্দলাল গোস্বামী, সত্যধন ঘোষাল, মীরার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সভায় ৩০০০০, লোক উপস্থিত হয়। দুই তলার ময়দানে এই দিনই বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন, "ক্ষণস্থায়ী প্রতিজ্ঞা বা শপথে কোন ফললাভ হইবে না। আমলাতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে—ধোপা, নাপিত, মুচি, খানসামা প্রভৃতি যন্ত্রের আঘাতে আমলাতন্ত্রের কল বিকল করিতে হইবে। জনসাধারণ এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়াছিল এবং সেই ভাবেই কাজ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

সভায় ডাঃ নীলরতন সরকার (পরে স্যার) মহাশয় বিলাতী নেকটাই সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বিলাতি দ্রব্য আর কখনও ব্যবহার করিবেন না। ধোপা, নাপিত, মুচি, বিলাতি-ভক্ত বাবুর কাজ করিতে অস্বীকৃত হয়, বালক-বালিকা পূজোপলক্ষে বিলাতি কাপড় পরিতে চায় না, কুলকামিনী-গণও বিলাতি চুড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দৃক্‌পাত করে না। সকলে উৎসাহ করিয়া বিলাতি বস্ত্র পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। তখন কি উদ্দীপনা—বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ। সর্ব্বব্যাপী বহ্ন্যুৎসবের ধূমরাশিতে বঙ্গভূমি পবিত্র হইতে লাগিল। নবোৎসাহে বাঙ্গালী উদ্বেলিত হইল, মরাগাঙ্গে বাণ ছুটিল. বঙ্কিমের সাধনা সফল হইল।

২২শে সেপ্টেম্বরও টাউনহলে আবার একটী সভায় ৭ই আগষ্টের মত জনতা হয় এবং উত্তেজনাও তদ্রূপই দেখা যায়।

ক্রমে সেই ভীষণ দিন—বঙ্গভঙ্গের তারিখ ১৬ই অক্টোবর আসিয়া পড়িল। কিন্তু এই নব আন্দোলন 'স্বদেশী' ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইল। অনেকে মনে করিলেন বঙ্গভঙ্গ না হইলে বা হইয়া রোধ হইলে এই আন্দোলন থামিয়া যাইবে। কেহ মনে করিলেন, জাতির জাগরণের উন্মেষ হইয়াছে—কেহ কেহ মনে করিলেন ইহাতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, আর কেহ কেহ মনে করিলেন—এই আন্দোলন আমাদের আত্মনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপরে রাজনীতি আর ভিক্ষায় চলিবে না, ইংরাজ কিছু দিবে না, আমাদের নিজের পায়ের উপরে নিজেদের নির্ভর করিতে হইবে। এই বাণীই প্রথমে শুনিতে পাই ভবিষ্যৎ-রাজনীতিজ্ঞ স্বরাজনায়ক সর্ব্বস্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের কাছে।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'কুকুরের পলিটিক্স' লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় কিরূপ রাজনীতি চলিবে এবং পরে কিরূপে চলা উচিত, তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিয়া 'ষাঁড়ের' আত্মনির্ভর নীতিই অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, 'ভিক্ষা দাও গো' বলিলে কিছু পাওয়া যাইবে না—আমাদের নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড়াইতে হইবে—চিত্তরঞ্জন বঙ্গভঙ্গের দিনেই বজ্র গলায় এই নীতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সনে তিনি দার্জ্জিলিং হিন্দুহলে "স্বদেশী আন্দোলনের কথা" বক্তৃতায়* নিম্নলিখিত আত্মনির্ভরতার কথাগুলি প্রচার করেন—

"আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতি-বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবন সঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না, কিন্তু এই যে নবজীবনসঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণবিবরে এক আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব স্বাধীনতাসঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না? আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলতঃ ও মূলতঃ বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর-পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাস বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে

* এই বক্তৃতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "ভাণ্ডার" মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের ১৩১২ সালের পৌষ মাসের কাগজে ২৮৬ পৃঃ পাইবেন। 'ভাণ্ডার' ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে।

ধরিয়া তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

"আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদিগের সকল দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে, একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম।

"তাহার যথাযথ কারণও ছিল, ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, কেবল মাত্র মৌখিক মন্ত্রের আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব্ব প্রেম-ধর্ম্মবলে মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাঙ্‌লা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেম-ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র মালা ঠেকাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল; আর আমাদের সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শক্তি ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চির-কীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা, অতীত কাহিনী; বাঙালীর জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপ কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে বাঙালী তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি বাঙালীর বলবীর্য্য পর্য্যন্ত তখন নিতান্ত কৃতঘ্নের মত সমস্ত বাঙালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল।

"এমন সময়ে—সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক্ বেশে আগমন করিয়া আমাদেরই জাতীয় দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দুই একদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন পূর্ব্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দান করিল। আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমরা শুধু ইংরাজের রাজত্বকে নয়, সমগ্র ইংরাজজাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া ধরিয়া-ছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই দুর্ব্বলতার জন্যই বোধ হয় আমাদের চক্ষু ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময় ও মোহবশতঃ আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, আমাদের নিজের সাহিত্যের প্রতি একেবারে দৃক্‌পাত না করিয়া, আমাদের নিজের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ধাবমান হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমরা মোহ-মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজেরই জাতীয় জীবনের প্রতিমা, আমাদের নহে; ইংরাজের সাহিত্য

স্যর নীলরতন সরকার

ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে, তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; ইংরাজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না, ইহা অতি সোজা কথা—অত্যন্ত সরল সত্য; কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে বোধ হয় এমনই করিয়া অতিশয় সরল সত্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতেছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইতেছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। যে Proclamation লইয়া আমরা এত গর্ব্ব করি, এবং কথায় কথায় যাহার দোহাই দেই, তার মধ্যে যে কোন্ অন্ধকার কোণে আমাদের সকল আশা-ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য—"So far as it

may be" এই বাক্যময় শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল, তাহা একেবারে অনুভব করিতে পারি নাই। Curzon বাহাদুরকে ধন্যবাদ দি, তিনি সে-দিন আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন; * * * আমরাও ভাল করিয়া Proclamation-এর গূঢ় তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন, এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

"আজ ভগবৎপ্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ছায়ারূপী এই মহামায়া-কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর—পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের-দপ্তর বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণনেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তম-রূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছুই দিবে না। আর বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোন দিন আমাদের মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। সেই জন্যই আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই নব আন্দোলন আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

"—কিন্তু আমাদের চিরকাল ভাগ্যহীনতা এইক্ষণেও আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমাদের দেশে এক সময় তর্কশাস্ত্র আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং যদিও এখন আর তর্কশাস্ত্রের সেই উন্নত অবস্থা নাই, তথাপি আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ নিষ্ফল তার্কিকেরও কোন অভাবই পরিলক্ষিত হয় না: উপহাস-রসিকেরও প্রাদুর্ভাব কম নহে, তাহাদের শুষ্ক স্বদেশ-প্রেম-বর্জ্জিত হৃদয় হইতে দুই একটা শাণিত বাক্যকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অতিশয় বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া আপনারা সুখে অস্থির হইয়া উঠেন. কিন্তু সে তর্ক ও সেই উপহাস মাতার আহ্বানকে কিছু-তেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে শত-লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্তই হতভাগ্য! আর যে ডাক শুনিয়াছে কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোটখাট স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত মিথ্যা তর্করাশি এবং আপনার করুণাবর্জ্জিত হৃদয়জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে সরকারী উকিলই হউক বা ছোট কি বড় রকমের সরকারী জুজুই হউক, কি সামান্য কেরাণী কি সামান্যতর ক্লার্কই হউক,—সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে—সে মাতৃদ্রোহী। যে ঈশ্বরদ্রোহী! তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না:

"তার্কিকেরা ও উপহাস-রসিকেরা যাহাই বলুক, তাহাতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার কোন কারণ নাই। আমরা, মায়ের ডাক শুনিয়া অগ্রসর হইয়াছি, আমরা কি ছুটা নিষ্ফল তর্ক ও নিষ্ফলতর উপহাস শুনিয়া ফিরিয়া যাইব? বিধাতার অমোঘ বাণী আমাদের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে, আমরা শত তর্ক, শত যুক্তি শত সহস্র উপহাস অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া বিধাতার বাণীকে শিরোধার্য্য করিয়া বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইব। আর অধিক পরিষ্কার দেখিতেছি যে, অচিরে আমাদের এই নব আন্দোলন ফলবান্ হইয়া তার্কিককে লজ্জিত করিবে ও উপহাস-রসিককে উপহাস-যোগ্য করিয়া তুলিবে। Boycott করিয়া যদি স্থায়ী demand দাঁড় করাইতে পারি, আমাদের দেশে লুপ্ত ও নষ্ট রাষ্ট্ররাজ্য মাথা তুলিবেই তুলিবে।

"আর বৃথা তর্ক করিবার সময় নাই। এই স্বদেশী আন্দোলন ইহাকে যেমন করিয়াই হউক জাগাইয়া রাখিতে হইবেই হইবে। ইহারি উপরে আমাদেব সকল আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে এমন অনেক উপহাস-রসিক তার্কিক আছেন, যাহারা বলেন, "তোমরা কি করিতে চাও? তোমরা কি company-র রাজত্ব উঠাইয়া দিবেই?" 'এ কথার উত্তর অতি সহজ! আমরা আর কিছু চাই না, আমরা আমাদিগকে মানুষ করিতে চাই। ইংরাজের সহিত আমাদের শুধু রাজাপ্রজা সম্বন্ধ। ইংরাজের আইন আমাদিগের মানিয়া চলিতেই হইবে। কিন্তু ইংরাজকে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন কখনই অধিকার করিতে দিব না। ইংরাজের আইনের গণ্ডির বাহিরে ইংরেজের সহিত আমাদের যে ক্ষেত্রে সম্বন্ধ তাহারও বাহিরে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমারা সেইখানে বাঙ্গালীর কলঙ্ক ঘুচাইব। আমরা সেইখানে আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিব। তারপর যে অনন্ত মহান্ পুরুষ আপনাকে সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সকল মানবের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে, সকল জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কি ভাবে কিরূপে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিবেন, তাহা তিনিই জানেন—শুধু তিনিই জানেন।"

চিত্তরঞ্জন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিক্ষোভে ১৬ই অক্টোবর কলিকাতায় উপস্থিত না থাকিলেও, শৈলশিরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—ভিক্ষানীতি একেবারে পরিত্যাজ্য, নিজের পায়ে নির্ভর না করিলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই এবং এই স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন আমাদের আত্মনির্ভর নীতি অবলম্বনের প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপরে এই উদ্দেশ্যেই অগ্রগামী রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার কার্য্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন।

এখনও সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা। সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে তিনিই একমাত্র জননায়ক। কিন্তু ঘটনাস্রোতে শীঘ্রই তাঁহার সেই গৌরবময় আসন বিকম্পিত হইয়া উঠে। এবং অতঃপরে যে শীঘ্রই রাজনৈতিক গগনে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়, তাহা অনাবশ্যক দলাদলি নয়—এই নীতিমূলক পার্থক্যই তাহার মূলে—সেই ইতিহাস আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

এই সময়ে কবিচিত্তও শিথিল রহিল না। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের অবদান তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবার রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিব। ঠিক সময়েই তিনি লেখনী ও কণ্ঠ পরিচালনা করিতে উদ্যত হইলেন।

১৯০৪ সনের জুলাই মাসে (বাঙ্গলা ১৩১১ সালের ৭ই শ্রাবণ) চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে জেনারেল ইনষ্টিটিউশনে 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটী প্রবন্ধ পড়েন, তাহাতেই ভবিষ্য নীতির নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এখানে আমরা তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিলাতের আদর্শ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের কে রাজা হইল, উজির হইল—তাহা বড় গণ্য করে না, পল্লীসমাজগুলি স্বীয় অভাব-অভিযোগ নিবারণের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া প্রীত ছিল··· এখন আমরা আত্মনির্ভরের এই সনাতন নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া দরখাস্ত জারি করিয়াই স্বদেশের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছি।···যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ-শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুরই হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি? এখনকার রাজসম্মানে সম্মানিত ব্যক্তিগণের ন্যায় পূর্ব্বে কেহ আত্মবিক্রয় করিতেন না। বিলাতের মনও ভুলাইতে পারিলাম না। বারম্বার মাথা হেট করিয়া ফিরিতে হইল। এখন এ সমস্ত মিথ্যা ছলাকলা ফেলিয়া দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবার জন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি?"

এই সময়ে বিপিন পাল সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজে প্রথমে যে আত্মনির্ভরতার অস্ফুট ধ্বনি উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা সমর্থন করিয়া লোকের নিকট স্পষ্ট করিয়া সেই বাণী উপস্থিত করিলেন। তবে রাজনীতি অপেক্ষা সমাজ-গঠনে আত্মনির্ভরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে "সমাজপতি" নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী হন।

পূতচরিত্র স্যার গুরুদাস এই অভিভাষণটিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া সেই সভায় বলেন—

(১) ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে রাজদ্বারে আবেদন করার অপেক্ষা আত্মনির্ভরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করা উচিত। আমরা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিব, দেশে সঞ্চার করিব—

(২) সমাজপতি নির্ব্বাচিত হওয়া সম্বন্ধে আমি চিন্তা করি নাই—

(৩) জাতীয় উন্নতি বিষয়ক মেলা হওয়া উচিত আমরা বিদেশাভিমুখী ছিলাম, এখন স্বদেশাভিমুখী হইব।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—"মেটকাফ মেকলের কাছে ভিক্ষার ঝুলি শূন্য থাকিত না, এখন গৃহস্বামী সিংহদ্বারে অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টি করেন, এখন ভিক্ষুকের আশা ত্যাগ করাই ভাল।"

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া বলেন, এরূপ বক্তৃতা তিনি পূর্ব্বে শোনেন নি, পুনরায় কর্জ্জন থিয়েটারে ১৬ই শ্রাবণ সভা হয় এবং ৫টার মধ্যেই সভাগৃহ ভরিয়া যায়।

ঐ বৎসরে চৈত্রমাসে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ পুনরায় রবীন্দ্রনাথ 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে বলেন—

"গভর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই।...পরমেশ দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি—

"আমরা যদি নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে পারি তবে রাজপ্রতিনিধি কে আসিলেন বা গেলেন, তজ্জন্য বড় আসিবে যাইবে না, আমরা বলিতে পারিব লর্ড রিপণের জয় হউক, লর্ড কর্জ্জনেরও জয় হউক।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথই বঙ্গভঙ্গের দিনে সকলের জন্য নিম্নলিখিত গান রচনা করিয়া দেন—

"বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙ্গলার পণ বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান্।"

কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, কবি রজনী সেনও গাহিলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই॥"

সমাজ-জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মনির্ভরতা মূর্ত্ত করিতে স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দেশ দেন, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহাই হয় শ্রেষ্ঠতম নীতি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, ১৩১২, ৩০ আশ্বিন বাঙ্গালার ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন ছিল। এই দিনই আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী বঙ্গমাতা দ্বিখণ্ডিত হয়। কিন্তু ইহার পর হইতেই বাঙ্গালী বন্দেমাতরমের শক্তি অনুভব করিতে পারে। এইদিন হইতেই হৃদয়ে মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সে পায়। ২৯শে রাত্রিতে বাঙ্গালীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না, নগ্নপদে দলে দলে গঙ্গাস্নান করিতে করিতে গাহিতে লাগিল "বন্দেমাতরম্'

"সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈ ধৃত খর কর বালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

সকলের মুখই বিষাদাচ্ছন্ন। সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল—

"একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক
বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
মা কি রহিবেন চক্ষু কর্ণ খেয়ে?…"

সমস্ত বাঙ্গলারই এক অবস্থা। তবে জনাকীর্ণ কলিকাতার অবস্থাই বলিতেছি। ভোরে হাওড়া, বরাহনগর, শ্যামবাজার, এঁড়েদহ, বালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে কত সঙ্কীর্ত্তনের দল আসিল —যেন মায়ের শোকে সকলেই আচ্ছন্ন। মাতৃহীন সন্তানে রাস্তা ভরিয়া গেল, সকলেই গভীর শোকাচ্ছন্ন; কিন্তু হৃদয়ে অটল প্রতিজ্ঞা। পূর্ব্বাকাশে তরুণ রবির কিরণরশ্মি উদ্ভাসিত হইল, সাত লক্ষ বাঙ্গালী গর্জ্জিয়া উঠিল—

"শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্ব্বলেরো,
হওনা কেন যতই বড়
আছেন ভগবান্
আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান
তোমাদের এমন অভিমান।

ধ্বনিত হইল জ্যোতিরিন্দ্র নাথের গান—

চলরে চল সবে ভারত সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য
কে করে মোচন,
সাধ রে সাধ সবে দেশের কল্যাণ॥

আরও গান হইত—

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই,
জীবন আহবে চল্—চল্ চল্ চল্
বাজবে সেথা রণভেরী, আস্‌বে প্রাণে বল
চল্ চল্ চল্।*

আরও হইত—

উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্‌রে তোরা
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই,
বাজিছে বিষাণ উড়িছে নিশান,
আয় রে সকলে ছুটিয়া যাই—

তারপরে সকলে বাংলার মাটী, বাংলার জল, গাইতে গাইতে পরস্পর পরস্পরের রাখী বন্ধন করিয়া প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করিল—

বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত এরূপ শোকোচ্ছ্বাস সঙ্গীত ও রাখীবন্ধন চলে। সকলের মুখেই—

"ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই, ভেদ নাই"

সেদিন দোকান বাজার সব বন্ধ, কল-কারখানা বন্ধ। গাড়োয়ান, কুলি, মুচি, মেথর সকলের কাজ বন্ধ, হোটেল বন্ধ। সর্ব্বত্র অরন্ধন—৪।৫ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, 'আমি না খাইয়া থাকিব, যদি আমার জন্য কেহ রাঁধিতে যায়, আমি চুল্লী ভাঙ্গিয়া ফেলিব'।

মিলন-মন্দিরে

অতঃপরে আপার সার্কুলার রোডে বেলা তিনটার সময়—মিলন মন্দিরের (Federation Hall) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানকার অবস্থাও অবর্ণনীয়। দেশপ্রাণ আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত রোগযন্ত্রণায় ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি তখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। কিন্তু জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এই অখণ্ড মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—সংবাদ শুনিয়া লোকের মধ্যে তড়িৎ সঞ্চারিত হয়। পাল্কীতে (ষ্ট্রেচারে) করিয়া তাঁহাকে আনা হইল, সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। তিনটার সময় তিনি আসেন বিপুল জয়সূচক 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির মধ্যে—কিন্তু একঘণ্টার ভিতরেই ভীষণ রৌদ্র-তাপেও বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারী, মারহাট্টি, পাঞ্জাবী ও ইংরাজ প্রায় লক্ষ লোকে রাজপথ, নিকটস্থ বাড়ী, পার্শ্বস্থ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, আনাচ-কানাচ সবই ভরিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, বিপিন তো ছিলেনই—অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার গুরুদাসও আসিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

* ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মপ্রচারক ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রচিত, ইহা প্রথমে বরিশালেই বেশী গীত হইত।

আনন্দ মোহন বলিতে লাগিলেন-

"যে দিন অনন্তের সহিত মিলিত হইব, তাহার আর বিলম্ব নাই। আজ আপনাদিগকে দেখিলাম, আর বোধ হয় এ জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না।"

তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইল। এখানে তাহার অভিভাষণটি দিলাম—

"এক অখণ্ড বঙ্গরাজ্যের অধিবাসিগণ—হিন্দু মুস্লিম সুহৃদগণ, পুরাকালের একজন ঋষি এই বলিয়া দেবতাদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ

ধরাগমন দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আমি ঋষি নহি, কোন ঋষির পদধূলি গ্রহণের উপযুক্ত নহি—তবু আজ আমি এই বলিয়া বিশ্বদেবতাকে ধন্যবাদ দিই—তিনি ইংরাজ ও ভারতবাসী সকল নরনারীর পিতা। তিনি ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলের সম বিচার কর্ত্তা—আজ আমি তাহাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি যে আমি এই দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া এক জাতির অভ্যুদয় দেখিয়া যাইতে পারিলাম, আমি যেন আজ শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া এই জাতীয় জাগরণ সন্দর্শন করিতে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। বৎসরাধিক কাল যাবৎ আমি কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া সংসারের কার্য্যাবলী হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছি।

"আপনারা আজ আমাকে রোগশয্যা হইতে তুলিয়া আনিয়া বঙ্গের ইতিহাসের এই মহাস্মরণীয় মহা ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন। আপনারা আজ আমাকে মহা সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক হৃদয়ের সমগ্র সুহৃদগণকে নমস্কার করিতেছি।

"আজ আমাদিগের শোকের দিন। বঙ্গদেশের একতার ভাব উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল, সমপ্রাণতা জন্মিতেছিল ; রাজপুরুষদিগের হুকুমে বঙ্গদেশ আজ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার কুফল আজ— আলোচনা করিব না! কু হইতে সু হয়। আজ যে ঐ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ মেঘ সঞ্চার দেখা যাইতেছে উহার মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণদীপ্তিও দেখিতে পাইতেছি। আজ বঙ্গে দৃঢ়তর ও গাঢ়তর জাতীয় একতার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। অদ্য আনন্দ ও উল্লাসের দিন। আমাদের মহাকবি গাহিয়াছেন—"এবার মরা গাঙ্গে বাণ এসেছে।" ঐ বাণের ডাক আমরা সকলেই কি শুনিতে পাই নাই? ঐ মহা গম্ভীর আহ্বান ধ্বনি আমাদের সকলেরই হৃদয় দ্বারে আসিয়া কি পৌছে নাই? আজ এই নবীন ও "অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির" জন্মক্ষণে আমাদের প্রাণমন মহোল্লাসে বিশ্ববিধাতার মহাবিশ্বাসের পানে উত্থিত হউক। আজ সকলে স্মরণ রাখুন যে বিস্তীর্ণক্ষেত্র হইতে পূর্ণশস্য উৎপন্ন হয়, ঘোর মেঘ হইতে জীবনপ্রদ বারি বর্ষণ হয়, ভয়ঙ্কর শীতের গর্ভে মহোজ্জ্বল বসন্তের সূচনা লুক্কায়িত থাকে। আমি বিচ্ছিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী, কিন্তু ভ্রাতৃগণ আমার প্রাণ আপনাদিগকে আজ যে দৃঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কখনও তেমন প্রেমভাব অনুভূত হয় নাই। সরকারী ছেদনাদেশ আমাদের মিলন ঘটাইয়াছে, আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বহু পরিমাণে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে আমাদিগকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে দৃঢ়তর করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সুদূর সাগর পর্য্যন্ত আমরা সকলে এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান, বন্ধুগণ, আবার বলুন হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে আবার বলুন আমরা সকলে আমাদের চিরপ্রিয় চিরগরিয়সী জননী জন্মভূমি এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম আমাদের সকলকে নিকট হইতে আরও নিকটে আকর্ষণ করিবে—ভাইকে ভাইয়ের সহিত সম্মিলিত করিবে। আর এই অখণ্ড বঙ্গভবন, অদ্য যাহার

অশ্রুধৌত হৃদয়ের উপরে—অদ্য যাহার ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে- এই ভবন সেই জাতীয় একতার প্রতিমা বাহ্য নিদর্শন স্বরূপ আমাদিগের ভবিষ্য বংশীয়দিগের নিকট বর্ত্তমান থাকিবে। এই ভবন আমাদের সকল জাতীয় সম্মিলন, বান্ধব সম্মিলন, নানাবিধ সম্মিলনের স্থল হইবে।

"এই স্থানে সম্ভবতঃ একটী ব্যায়ামশালা, পাঠাগার জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক আবৃত্তিভবন, বঙ্গদেশ বা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের জন্য পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। গত ২ মাস যাবৎ আলোড়িত বিশুদ্ধ পবিত্র প্রীতির সহিত আত্মোৎসর্গ যদি আমাদের সাধনা হয়, তাহা হইলে বিশ্বনিয়ন্তা নিশ্চয়ই আমাদিগকে এবং ছাত্রবন্ধুগণ আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অক্ষয় আনন্দ ও সুখের অধিকারী করিবেন।

"বাক্য নহে, কার্য্য আমাদের মন্ত্র হউক। স্বপ্ন সাধন হইবে, আমার আশা পূর্ণ হইবে আমাদের জন্মভূমি পারস্পরিক সম্পর্কে ও সম্প্রীতিতে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিবে।

"আজ আমরা প্রাণের ভিতর সন্দর্শন করি যে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—দেবদূতেরা অবতীর্ণ হইতেছে প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে—দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। বন্ধুগণ আজ আমরা কি দেখিতে পাইতেছি না যে, সেই সকল দিব্য হস্ত হইতে আজ আমাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, স্বদেশের কল্যাণের জন্য বীরোচিত সাধনা ও কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণে শোণিত হীন নবতর মহাসংগ্রামক্ষেত্রে আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে।"

বক্তৃতা শেষ হইলে—শিখগুরু কুঁয়ার সিংহ পট-মণ্ডপের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বীরবেশ, সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদ মস্তকে কৃষ্ণ বর্ণের দীর্ঘ উষ্ণীষ, সে উষ্ণীষে সুতীক্ষ্ণ লৌহ-চক্র লৌহ তীর প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র। সঙ্গে ভীমকায় কয়জন শিখ। ৫০ হাজার লোক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথকে সসম্মানে রাখীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলেন, "সমস্ত পাঞ্জাব বাঙ্গালীর পশ্চাতে বিদ্যমান আছে।"

অতঃপরে রবীন্দ্র ঘোষণা পাঠ করেন—

"যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে

আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন—"

তারপর আবার গান হইল 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। আনন্দ মোহন যথাস্থানে ভিত্তি স্থাপন করিয়া আবার বলিলেন, "বিদায় বন্ধুগণ", তাঁহার চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইল।

সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যের পরে যুবকগণ আনন্দমোহনকে বহন করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিল।

মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে সকলে যাত্রা করিল বাগবাজার পশুপতি বসুর বাড়ীতে। পূর্ব্ব হইতেই সেখানে বহুলোক একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল—এখন সকলে মিলিয়া প্রায় লক্ষাধিক লোক হইল। সেখানেই জাতীয় ধন ভাণ্ডার খোলা হয়।

সেখানে মহারাজা সূর্য্যকান্ত, সতীশসিংহ, কুমার মন্মথমিত্র, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্র বন্দ্যো, মনোরঞ্জন গুহ, রসিকচন্দ্র, ললিতমোহন ঘোষাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

পঁচিশ হাজার টাকা সেইদিনই সংগৃহীত হয়। /০ হইতে একটাকা অনেকেই দেন পরদিনও ১৪০০ সংগৃহীত হয়। এইরূপে ক্রমে বহুটাকা উঠান হয়।

বস্তুতঃ এই দিন হইতে নিদ্রিত বাঙ্গালী যেন জাগিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র গান, সভা, শোভাযাত্রা, বয়কট, পিকেটিং, প্রতিজ্ঞা। থিয়েটারের ন্যায় যাত্রাও স্বদেশী প্রচারে সহায়তা করিল। মথুরাসাহা, ভূষণদাস কেহই পশ্চাদপদ রহিলেন না, আর বিখ্যাত স্বদেশী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস যখন উদাত্ত স্বরে ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর গানটি গাহিতেন—

"কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ
জীবন-রণে জীবন দানে,
সবারে করহ আগুয়ান—"

সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিত। আর—একটী অজ্ঞাতনামা লেখকের গানে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইত—

"নগরে নগরে জ্বালরে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ—
ডাকিছেন সবে সাজরে সাজ
স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান
"বন্দেমাতরম্" গান গাওরে ভাই।

বস্তুতঃ তখন হইতে "**বন্দেমাতরম্**"ই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একমাত্র মন্ত্র হইয়া উঠিল।

প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত।

অক্ষুধা ও অতিক্ষুধা (নক্সা)

—শ্রীজনরঞ্জন রায়

ব্যাপারটা নিছক রসিকতা নয়।

যোগাশ্রমের একজন 'পাণ্ডা' বনিয়া গিয়াছি। মাথামাখির শেষ নাই। সেখানকার এক একটি গেরুয়াধারীকে দেখিলেই ভাবে গলিয়া পড়ি...আর ভাবি এরা আমায় স্বর্গের সিঁড়ির ধাপে ধাপে ঠেলিয়া তুলিতেছেন। স্বর্গ যেন আমি দেখিতে পাইতেছি··· ঐ বুঝি সেই দেশটা।

যখন নাগাল পাইয়াছি, যাইতেই হইবে সেখানে—গিয়া পড়িলে একেবারে পাকা আস্তানা গাড়িব—আর এদেশে থাকা নয়।···আবার এদেশে? খুব চিনিয়া নিয়াছি—বাপ!

সেখানে যাইতে উপস-তাপস যা'কিছু দরকার সব করিব। আমি যা' ধরি তা' ছাড়িনা--এতোই আমার মনের জোর।

কিন্তু ঐ গেরুয়া-বাবাজীদের পথে চলা হইবে না—ওরা যে সব স্বয়ংসিদ্ধ। ওরা মাছ মাংসর ভক্তই হোন, আর গড়গড়ার ভক্তই হোন—ও সব ছলাকলা! যাদের বরাত মন্দ তারা ঐ ছলাকলা দেখিয়া ভাগিয়া পড়ে। আমি কিন্তু পাকা জহুরী—আমার চোখে ধুলা দেওয়া সহজ নয়।

কথায় বলে সাধনা—সাধনা কি হাসি ঠাট্টা? উপস করিতে হইবে বেদমভাবে—তা' নিশ্চয় করিব। এতদিন তো কত-কি খাইলাম, তা'তে স্বর্গে উঠিতে পারিয়াছি কি? এবার দেখি ওঠা যায় কি-না। উপসের ভয়ে পিছপা হইতেছি না।

সেদিন সকালে বামুন-ঠাকুর চা-লুচি টেবিলে রাখিয়া গেল। আমি কিন্তু মুখ বুঁজিয়া কাটাইবই কাটাইব। খালি চা-টুকু ছুঁইলাম। তারপর মোহমুদ্গর হা'তে নিয়া দরজায় খিল দিলাম। মা ডাকিলেন—তবুও সাড়া দিলাম না। বৈকালে ঠাকুর ডাকিল ফল মিষ্টি চা নিয়া। কয়খানা ফলের টুকরা ছাড়া সব কিছু ফেরৎ দিলাম। অনেক রাত্রি—স্ত্রী দরজায় টোকা দিতেছে—মাথা ঝিমাইতেছে। বলিলাম—খিদে নেই—খিদে নেই—খিদে বাড়াতে কেন এলে? শুনাইয়া দিলাম মোহমুদ্গরের শ্লোক—"নারী স্তনভর ···মনসি বিচারয়্। বেয়াকার আর কি—সব বেয়াকার—বলিতে বলিতে সে পলাইল।

সকালে হাত-পা ওঠে না। ঠাকুর চা-খাবার নিয়া ডাকা-ডাকি করিতেছে। দরজা খুলিয়া দিতে পারি না। চায়ের বাটিটা তুলিতে হাত কাঁপিতেছে। দরজা বন্ধ করিব—মা আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন—কাল না হয় একাদশী ছিল—আজ আবার কি রে? মা'কে দারুণ ভয় করিতাম। বলিলাম—খিদে নেই যে মা। বলিলেন—কতদিন থেকে এমন হচ্ছে বল তো? বলিলাম—হচ্ছে-না তো কিছু দিন। মা যেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বলিলেন—তা' চেপে রেখেছো কেন একথা? এ যে একটা রোগ। তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

মা যাইতে না-যাইতেই স্ত্রীর আবির্ভাব। সে বলিল—এক দিনেই চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছো কি? তোমার কাছে আসতে চাইনে—শুধু বলতে এলাম এই কথাটা। আমি তাকে তুলসীদাসের দোঁহাটা শুনাইয়া দিলাম—"তিন বাতসে লটপটি হ্যায়—দামড়ি-চামড়ি পেট—অর্থাৎ কিনা সব গোলমালের মূল হচ্ছে পয়সা, স্ত্রী-আর খিদে। স্ত্রীকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া দিয়া আত্মশ্লাঘায় মজগুল হইয়া আছি—কিন্তু খটখট করিয়া লাঠির শব্দে চমক ভাঙিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া কবিরাজ আসিতেছেন মা'র সঙ্গে। তারপর প্রশ্নবান—নাড়ি-জিব-পেট বহুরকমে পরীক্ষা। রোগ ঠিক করিতে অনেকক্ষণ লাগিল। ঠিক হইল বহুরকম অনিয়মে পিত্ত-বিকার—তাই অক্ষুধা—পিত্তবিকারে কি না হয়! অক্ষুধা অতিক্ষুধা-সবকিছু হইতে পারে। মা দারুণ ভয় পাইয়া গেলেন।

সাধুদের কাছেও মা'র আনাগোনার কামাই নাই। একদিন আমাকে পর্য্যন্ত আশ্রমে টানিয়া নিয়া গেলেন। সেদিন মা তাঁদের বিরাটভাবে সেবা দিতেছেন। একজন স্থূলকায় গেরুয়াধারী বলিলেন দেহপাত করছ কেন হে বাপু, দেহের মধ্যেই তো ভগবান আছেন। একজন নূতন সাধু আসিয়াছেন—খুব হটযোগ-টোগ করেন। তিনি শুনাইয়া দিলেন—সংযমের ধার ধারলে না কোন দিন, একেবারে ত্রৈলঙ্গস্বামী হতে চলেছে! মা শুধাইলেন—আবার খিদে তেষ্টা হবে তো বাবা? খিটখিটে এক সাধু ছিলেন, তাঁর নামকরণ হইয়াছিল দুর্ব্বাশা—তিনি বলিতে লাগিলেন—আবার হবে কি? ওর তো চোখে-মুখে রয়েছে খিদে—রাক্ষসের খিদে!

ইদানীং আর রাত্রে দরজা বন্ধ করিতাম না। কারণ, যাদের ভয়ে বন্ধ করিতাম তারা আর ছায়া মাড়ায় না। শুধু ঘরের ইনি নয়—বাইরের তাঁরা সব—তাঁদের দালালরা—কেউ আর সাড়া দেয় না। রাত বেড়ানো—নিজের বাড়িতে নিজের দারোয়ানকে দোর খুলিতে খোশামোদি—সব গিয়াছিল এ কয়দিন। গিয়াছিল বলিতেছি—একেবারে বুঝি যায় নাই—আবার যেন উঁকি মারিতেছে—আবার খিদে-তেষ্টার আমেজ পাইতেছি! সাধুবাক্য কবিরাজি বড়ি কোনটাই বুঝি নিষ্ফল হইবার নয়।

ইহার পর এক ধাক্কায় রসাতলে—একেবারে নাকানি-চুবানি! আরম্ভ হইল বিচিত্র রকমে—।

সকালে উঠিয়া দেখি তেপায়ার উপর চা-খাবার ঢাকা! কিছুই ছুঁই নাই। কিন্তু এ-কি, কিসের গন্ধ আসে? জিবে যেন রস গড়াইতেছে!

বাহিরে আসিলাম।

এযে আমের আচার—আবার আমের মোরব্বা [illegible] এর চেয়ে আর কিছু কখনোই যে ভালবাসি নাই

আলমারিতে চাবি দেওয়া নাই

কয়টিই বা ছিল? আঃ-ধড়ে যেন প্রাণ আসিল! সোরাই থেকে তিন গেলাস জল ঢালিয়া খাইলাম। কেউ দেখিতে পায় নাই তো? পাশের ঘরে খট করিয়া যেন কিসের শব্দ হইল? কার চাবির থোকটা যেন পড়িল। পলাই…।

ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলাম।

নিজের নাক ডাকিতেছে নিজেই বুঝিতে পারিতেছি। এক ঘুমে দিন কাটিল। রাত্রে দরজা খুলিলাম…সব নিষুতি। কি দারুণ খিদে। দেওয়ানজি কি জাগিয়া নাই? পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে নামিলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খুব ঘুমাইতেছেন, ঠেলিয়া উঠাইলাম। তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—কেঃ খোকা বাবু, কি বলছেন? ইঙ্গিতে বলিলাম—চুপ, উঠুন, বাগবাজারে যাব—রসগোল্লা কিনতে। তিনি বলিলেন—আহিরিটোলা থেকে বাগবাজার—এত রাতে হেঁটে? বলিলাম—হাঁ উঠুন—এক লাফের পথ।

গিয়া দেখি বাগবাজারে সব দোকান বন্ধ। বৈকাল থেকে কোথায় দাঙ্গা বাধিয়াছে—ছুরি চলিতেছে।

বলিলাম—চলুন বড়বাজার। কপালে চোখ তুলিলেন ব্রাহ্মণ। শুধাইলাম—কিঃ ভয় করছে? বলিলেন—দাঙ্গা তো সেইখানেই।

হিচড়াইয়া নিয়া চলিলাম তাঁকে।

ফাঁসির খাওয়া খাইলাম। ফিরিতেছি—পূব আকাশ তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে—কাক কোকিল ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে। বাড়ি আসিয়া আবার দরজা বন্ধ করিলাম—কিন্তু ঘুম আর আসে না।

দুপুরের দিকে তেমনি গায়ের জ্বালা। বিকাল থেকে হাতের জল শুকায় না।

সাধুদের গলা পাইলাম…কবিরাজ মহাশয়ের গলা পাইলাম। পরামর্শ হইল—আর এখানে থাকা নয়…দেশে যাওয়াই ভাল। অনেক রাত্রে কবিরাজ মহাশয় গেলেন। যাইবার সময় মাকে বলিলেন—এই দু'পান অষুধ থাকল…আর দরকার হবে না, ঘুম এসেছে।

ফরিদপুরের গণ্ডগ্রাম। আমার দেশের মাটি। সেই ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে আসা…তারপর এই পাঁচশ বছর কলিকাতায়।

সেই বুড়া দেওয়ানজি ও মা পাশের ঘরে কথা কহিতেছেন। মা কিছু জোরে জোরেই বলিতেছেন—ভূত, নিশ্চয় ভূত…ভূতের অনাছিষ্টি! কোথায় আজ মানতের পূজো দেবো…হিন্দু রোজাদের আর নয়।

হিন্দু রোজাদের উপর মা বিশ্বাস হারাইয়াছেন। কারণ আজ যে আমার মানতে তাদের দিয়াই ভূতনাথ শিবের পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শিবের ভোগের জন্য কাল রাত্রে মা কত সব ক্ষীর, ছানা, মিষ্টান্ন তৈরী করেন। আমার ঘাড়ের ভূতটা কিনা শেষ রাত্রে তালা ভাঙিয়া সেইসব সাবাড় করিল। তালা ভাঙার শব্দে মা আসিয়া না পড়লে সব কিছুই হয়তো ভূতের পেটে যাইত [illegible] হিন্দু রোজা। কে সে ভূতকে [illegible] পারল? তাইতো এক্ষুণি রোজাদের ডাকতে পাঠাইলেন। তারাই পারবে এ ভূতকে কাবু করতে।

কাজেই [illegible] শুভাগমন হইল। তাদের অভ্যর্থনা করা হইল এক বাটি তেল আর দশভার গাঁজা দিয়া। তারা বেলা দুপুর পর্য্যন্ত গাঁজা চালাইল আর লাঠিতে তেল মাখাইল। তারপর আমাকে হাজির করা হইল তাদের কাছে…আমার

সামনে সাজানো হইল সেইসব ভোগের ছানা-ক্ষীর-মিষ্টান্ন—যার কিছুটা কাল রাত্রে আমার ঘরের ভূতটা খাইয়া ফেলিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই এছলামদের কি বিকট হাসি।—বুকটা করিতে লাগিল ধড়াস ধড়াস। তাদের কি কোটরে ঢোকা লাল লাল চোখ …কি বিদকুটে চেহারা। কালো ময়লা আলখাল্লাগুলোতে যেন মানুষ পচা দুর্গন্ধ! গাঁজায় মত্ত প্রেতের দল উঠিল। আবার সেই---হিঃ হিঃ হিঃ···হিঃ হিঃ হিঃ···হিঃ হিঃ হিঃ। পালাইব নাকি? কিন্তু সামনে এইসব পাত্তিল পাত্তিল ছানা-ক্ষীর-মিষ্টান্ন। কি যে করি? আবার চিৎকার। করিবে কি? আমায় ঘিরিয়া নাচিবে নাকি? শুধু তাই নয়…আবার গান। তাণ্ডব আর বিকট চীৎকার---

খাঃ শালী খাঃ--- খেয়ে চলে যা---চলে যা---চলে যা।
নইলে দেখবি গুঁতোর ঘা---গুঁতোর ঘা---এই গুঁতোর ঘা!

কি দাঁত কড়মড় আর মাটিতে লাঠির গুঁতা! তাদের গলার মালাগুলো করিতেছে খটমট---বাবরি চুলগুলো ঝাঁকুনির চোটে মাথা থেকে বুঝি ছিঁড়িয়া পড়ে।

তাদের এই ভুতোনন্দির ফাঁকে আমি তিন পাত্তিল ছানা-ক্ষীর মিষ্ট কাবার করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যেন বেসামাল হইয়া পড়িতেছি চিড়া-কলা-রসকদম্ব মাখা এই ক্ষীরের জামবাটিটা নিয়া। ওদিকে মা কাঁপিতে শুরু করিয়াছেন---এই খাওয়ার পরিণাম যে কি হইবে তাই ভাবিয়াই কাঁপিতেছেন।—এখানে তো আর সেই বৃদ্ধ কবিরাজমশাই নাই।

গাঁজাকুর দল আবার চীৎকার শুরু করিল—
পালা শালী পালা---
এই ছিন্নি খেয়ে দেশ ছেড়ে তুই পালা।
নইলে জানে তোরে রাখবো না---বানিয়ে ফেলবো কাবাব।
তোর গোস্ত দিয়ে বানিয়ে ফেলবো কাবাব।

বুঝিতেছি এরা কাবাবটাই পছন্দ করে বেশী---ছানা-মিষ্টির ভক্ত নয়। কিন্তু আমাকে পেত্নীতে পাইয়াছে---এরা ঠাহর করিল কোথা থেকে? এক সঙ্গে আসিতেছে হাসি-কান্না। কিন্তু হাসিবারও জো নাই---কাঁদিবারও জো নাই! কপালে চোখ উঠিয়াছে---প্রাণটা করিতেছে হাঁসফাঁস। ধরাশয্যা নিলাম।

কেমন ছিলাম ও আছি

শ্রীঅসিতারঞ্জন ঠাকুর

বহুদূর হতে জানিতে চেয়েছ এখানে কেমন আছি,
শুনিলে হয়ত হাসিয়া শুধাবে 'কেন আছ তবে বাঁচি'!
শোন তবু বলি আমার সকলি বলিবার যাহা আছে—
ভয় হয় শেষে জানাইনি বলে দোষিবে বন্ধু পাছে,
শিঙাপুরে যবে জাপানী সেনারা একে একে দিল হানা,
সরকারী আইন দেশের খবর চিঠিতে জানাতে মানা।
সহর ছাড়িয়া শহুরে বাবুরা ভয়ে পরি' গেল গ্রামে,
চাষীরা লভিল সকল-সুবিধা নিত্য নূতন দামে॥
দারুণ হুজুগে আমি সে সুযোগে গৃহিণী পাঠানু দেশে
লভিয়া বিরাম মনে ভাবিলাম কি জানি কি হবে শেষে॥
তার পর ভাই দেখিতে দেখিতে কাটিয়া চলিল দিন,
জীবনযুদ্ধে কেহ জয়ী হলো আমার বাড়িল ঋণ॥
দেশের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাঠাতে লিখিত টাকা।
সব দিয়ে থুয়ে পকেট আমার সদাই থাকিত ফাঁকা॥
স্বপাক খাইয়া অপাকে ধরিল রোগেও ধরিল ধীরে।
মনে হতো ভাই, দুত্তুরি ছাই গৃহিণী আসুক ফিরে॥
শীতের যে রাতে বিধি বাদ সাধি শোনাল বোমার শব্দ।
ঘর সংসার সকলে ভুলিল কলিকাতা নিস্তব্ধ॥
তারপর যবে প্রায় প্রতিরাতে সাইরেন উঠিত কাঁদি।
সহরে থাকিয়া মনে হ'ত ভাই নিজেকেই অপরাধী॥
গেল কিছু দিন ভয়ে ভয়ে দেহ শুকাইয়া হলো সারা।
আপন বলিতে যে যেখানে ছিল সবাই সহর-ছাড়া॥
প্রথম পর্ব্ব শেষ হলো, শোন দ্বিতীয় পর্ব্ব বলি,
পরাধীনতার জয়ের চিহ্ন শূন্য পাকস্থলী—

দেশে চাল নেই পেটে নাহি ভাত অনাহারে ধুকে ধুকে
গ্রামে ছিল যারা দেখা দিল তারা এই সহরের বুকে,
কন্ট্রোল লাইন এদিক হইতে ওদিক যেতনা দেখা,
প্রখর রৌদ্রে ফুটিয়া উঠিত ললাটে রক্ত রেখা॥
খাদ্য অভাবে যে যেখানে ছিল এখানে আসিল ফিরে'।
লক্ষীর দ্বার রুদ্ধ হইল অলক্ষীদের ভিড়ে॥
খালি বাড়ীগুলো পড়েছিল খালি আবার উঠিল ভরে'।
কত মরে লোক কত পায় শোক তবুও সংখ্যা বাড়ে॥
যার যাহা ছিল মুনাফাখোরেরা কষিয়া লইল টাকা।
মনে ভাবিতাম হায় ভগবান কেন তবে বেঁচে থাকা॥
ট্রামে বাসে হেথা চলা-ফেরা দায় কন্যাদায়ের মত,
চলেছে কেরানী হয়ে হয়রানী জানাব বন্ধু কত॥
টাকা দিয়ে হেথা চাল কিনে খাই দেখিতে কাঁকরমনি,
আহারে বসিয়া ভাত ছেড়ে দিয়া শুধুই কাঁকর গুনি॥
ভাবছি এখন মাগ্গী ভাতার দড়িতে পরিলে টান,
গাহিতে হইবে মনের দুঃখে যুদ্ধেরই জয় গান॥
বস্ত্র চিন্তা হয়েছে দারুণ তাহাতে হয়েছি মগ্ন,
ছিন্ন বস্ত্রে জোড়াতালি দিয়া রয়েছি অর্দ্ধ নগ্ন॥

শিখণ্ডীরূপে গৃহিণী স্বয়ং কন্যা ধরেছে বায়না,
তারে এ বাজারে কিনে দিতে হবে চুড়ি চিরুণী ও আয়না
নিজের জীবনে নাহি কোন আশা ভাবি আর শুধু হাসি।
জীবনযুদ্ধে আমি লভিয়াছি ম্যালেরিয়া জ্বর ও কাশি॥

বিজ্ঞান জগৎ

বিশ্ব-নৃত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতিতে নর্ত্তন-গতির অত্যন্ত প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এই ধরণের গতির সঙ্গে নানাভাবে আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটছে। বৈজ্ঞানিকগণ স্পষ্ট উপলব্ধি করেন, বিশ্বের প্রতিটি পরমাণু, এমন কি পরমাণুর অন্তর্গত প্রতিটি জড়কণা নৃত্যপরায়ণ। বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়জগতের সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যের মূল কারণ ওর নৃত্যপরায়ণতা।

নর্ত্তন-গতিকে মোটামুটি দু'টা বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত করা চলে—কম্পন ও ঘূর্ণন। কম্পনের আবার নানা মূর্ত্তি, নানা নাম—কম্পন, দোলন, স্পন্দন, শিহরণ ইত্যাদি। ঘূর্ণনেরও নানা মূর্ত্তি, নানা নাম—ঘূর্ণন, আবর্ত্তন, প্রদক্ষিণ, পরিক্রমণ ইত্যাদি। কম্পন-গতির দৃষ্টান্তের অন্ত নেই। জলে কলসী দোলে, নাকে নথ বা নোলক দোলে, গির্জ্জায় ঘণ্টা দোলে; মৃদু সমীর স্পর্শে দেহে শিহরণ জাগে, অঙ্গুলি স্পর্শে বীণার তার কম্পিত ও ঝঙ্কৃত হয়, অশনি সম্পাতে বৈদ্যুৎশক্তির স্পন্দন ঘটে, উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পদার্থ মাত্রেরই অণুগুলি দ্রুততর বেগে স্পন্দিত হয়ে থাকে। এ সকলই কম্পন-গতির উদাহরণ। আবার ঘূর্ণন-গতিরও সহস্র উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। চলন্ত গাড়ীর চাকা ঘোরে, কৌশলে নিক্ষিপ্ত লাটিম ঘোরে, স্বয়ং বসুন্ধরা, নিক্ষিপ্ত লাটিমের মত পাক খেতে খেতে তিনশো পঁয়ষট্টি পাকে একবার ক'রে জন্মদাতা সবিতৃ দেবকে প্রদক্ষিণ করছেন এবং অন্যান্য গ্রহও, পৃথিবীর মতই সবিতার আকর্ষণে বদ্ধ হয়ে যুগযুগান্তর ধরে ঐ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে আসছে। মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম নেই, ক্লান্তির কোন লক্ষণ নেই, বিপথে যাবারও সম্ভাবনা নেই; সবাই ওরা, কবি রজনীকান্তের ভাষায়—"ভ্রান্তিহীন ভ্রমে চিরচিহ্নিত পথ"। আবার ইলেকট্রন্ নামধারী জড়বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কণাগুলিও পরমাণুরূপ সৌরজগতের অন্তর্গত হয়ে সূর্য্যপ্রদক্ষিণকারী গ্রহগণের মতই কেন্দ্রস্থ প্রোটন্-কণাকে বেষ্টন ক'রে বিরামহীন আবর্ত্তন-গতি সম্পন্ন করছে। এ সকলই ঘূর্ণন-গতির বিশিষ্ট উদাহরণ এবং কম্পন-গতির মত এ সকল ব্যাপারও নর্ত্তন-গতির অন্তর্গত। জড় দ্রব্যের ভেতরে বা বাইরে, নিকটে বা দূরে যখন যেদিকে তাকাই সর্ব্বত্রই দেখতে পাই কোন না কোন ধরণের নৃত্যগতি। সুতরাং কেবল কবির দৃষ্টিতেই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকেও নর্ত্তন-গতির গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট। বস্তুতঃ কবি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মূলতঃ বিরোধ নেই। তফাৎ এই, একজন নিছক সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং আর একজন ঐ সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে পরীক্ষা ও পরিমাপের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে বদ্ধপরিকর। বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা বিজ্ঞানের আপাত-নীরস পদ্ধতি অনুসরণ করে নর্ত্তন-গতি সম্পর্কীয় গোড়ার কথাগুলি ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবো।

সাধারণভাবে বলতে পারা যায়, নর্ত্তন-গতির বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে বারে বারে আসা আর যাওয়া এবং এইরূপে একই গতিভঙ্গী পুনঃ পুনঃ ফিরে পাওয়া। ওপরে কম্পন ও ঘূর্ণন-গতির যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল তার প্রত্যেকের মধ্যে এ লক্ষণ বিদ্যমান। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নর্ত্তন-গতির একটা লক্ষ্যস্থল বা বিরামস্থল (Position of rest) থাকে এবং গতিটা ঘটে ঐ স্থানকে বেষ্টন ক'রে কিম্বা ওরই এপাশে এবং ওপাশে একটুখানি সরে সরে। দোলায়মান পেণ্ডুলম কিম্বা অন্য কোন নৃত্যরত পদার্থের গতি একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ওর বেগের দিক ও পরিমাণ এবং কেবল বেগই নয়, বেগ-পরিবর্ত্তনের হারও—যাকে বলা যায় ওর ত্বরণ—ক্রমে বদলে যাচ্ছে; কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্টকালের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্ব-স্থানের ভেতর দিয়ে এবং বেগ ও ত্বরণ সম্পর্কে অবিকল পূর্ব্বেকার মূর্ত্তি-নিয়ে যাওয়া-আসা ঘটছে। এই কালটাকে বলা যায় ওর নর্ত্তন-কাল এবং নর্ত্তন-কালের অন্তর্গত সমগ্র গতি ব্যাপারটাকে বলা যায় একটা পূর্ণ নর্ত্তন; আর প্রতি সেকেণ্ডে (বা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের ভেতর) যতগুলি পূর্ণ নর্ত্তন সম্পন্ন হয় তাকে বলা যায় নর্ত্তন-সংখ্যা (Frequency of oscillation)।

মোটের ওপর দেখা যায়, নৃত্যরত পদার্থের অবস্থান, বেগ ও ত্বরণ পর পর মুহূর্ত্তে নূতন নূতন মূর্ত্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অবস্থান, বেগ ও ত্বরণ সম্পর্কীয় কোন এক মুহূর্ত্তের গতিমূর্ত্তিকে সমষ্টিগতভাবে বলা যায় ওর তৎকালীন গতিভঙ্গী বা নর্ত্তন-ভঙ্গী (Phase of Motion)। নর্ত্তন-ভঙ্গী একটু একটু ক'রে বদলে যায় কিন্তু নর্ত্তন-কালের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করে। একটা বিশিষ্ট মুহূর্ত্তের নর্ত্তন-ভঙ্গী নির্ভর করে পদার্থটা কোত্থেকে ও কতক্ষণ যাবৎ যাত্রা সুরু করেছে তার ওপর এবং ওর নর্ত্তন-কালের ওপর। যতক্ষণ ধরে গতি সুরু হয়েছে তাকে যদি

গতিকাল বলা যায় তবে বলতে পারা যায় যে, প্রত্যেক নর্ত্তন-ভঙ্গী নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে গতিকাল ও নর্ত্তন-কাল এই উভয় রাশির অনুপাত দ্বারা ; কারণ এই অনুপাতটা দেওয়া থাকলে এবং গতি-পথের কোত্থেকে, কোন্ দিকে কতটা বেগ নিয়ে যাত্রা সুরু হয়েছে তা' জানা থাকলে পর পর মুহূর্ত্তের অবস্থান এবং বেগ ও ত্বরণের দিক ও পরিমাণ হিসাব ক'রে ব'লে দিতে পারা যায়। নর্ত্তন-ভঙ্গী ক্রমে বদ্‌লে গিয়ে নর্ত্তন-কালের ব্যবধানে যখন আবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে তখন একটা পূর্ণ নর্ত্তন সম্পন্ন হয়।* বলতে পারা যায় একটা পূর্ণ নর্ত্তন গঠিত হয় ক্রমশঃ বিকশিত কতগুলি নূতন নূতন নর্ত্তন-ভঙ্গী নিয়ে এবং সবগুলি নর্ত্তন-ভঙ্গীর বিকাশ সাধনে যে সময়টা অতিবাহিত হয় নর্ত্তন-কাল বলতে ঐ সময়টাকেই বোঝায়।

নর্ত্তন ও ধাবনগতি

নর্ত্তন ও ধাবনগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। এ সম্পর্কে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। যে সকল গতিতে গতির দিক্ বদলায় না সুতরাং যে ক্ষেত্রে চলে যাওয়ার অর্থ আর ফিরে না আসা ঐ ধরণের গতিকে বলা যায় ধাবন গতি (Translatory Motion)। অন্য পক্ষে নর্ত্তন-গতির বিশিষ্ট লক্ষণই হচ্ছে গতির দিক ক্রমাগত বদ্‌লে নিয়ে একই স্থানের ভেতর দিয়ে পুনঃ পুনঃ আসা আর যাওয়া। ধাবন গতিতে গতিশীল পদার্থের বেগের পরিমাণ—যাকে বলা যায় ওর দ্রুতি বা দ্রুততা (speed)—বদ্‌লাতেও পারে, নাও পারে। যদি না বদ্‌লায় তবে ওকে বলা যায় সমবেগে ধাবনগতি বা সংক্ষেপে সমগতি (uniform motion)। জড়জগতে সমগতির দৃষ্টান্ত বিরল। ক্রমাগত একই বেগে একই দিকে ছুটে চলেছে এরূপ পদার্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, হয়ত অসম্ভব। ফলে জড়জগতের বেশীর ভাগ চাল-চলনকেই নর্ত্তন গতির অন্তর্গত করা চলে। তবু অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ধাবনগতি সম্পন্ন করছে এরূপ বহু পদার্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। ট্রেণ, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতির গতি সাময়িকভাবে ধাবনগতির অন্তর্গত। আলোর গতি সমবেগে ধাবন গতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জিজ্ঞাস্য হয়, ক্ষেত্র বিশেষে জড়দ্রব্য ধাবন-গতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে নর্ত্তন-গতি সম্পন্ন করে কেন ? কোন কোন পদার্থ অন্ততঃ কিছু-ক্ষণের জন্য সমবেগে সরল পথে ছুটে চলে কেন, কেউ বা বেগের দিক ও পরিমাণ বদ্‌লে নিয়ে ক্রমাগত নাচতে থাকে কেন ? এর উত্তর পাই আমরা নিউটন বর্ণিত গতির নিয়মত্রয় থেকে।

নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান গোড়াতেই আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, জড়দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হচ্ছে নিজের গতিবেগটাকে—ঐ বেগ খুব বড়ই হোক বা ছোটই হোক বা একেবারে শূন্য পরিমিতই হোক—নিজস্ব সম্পত্তিরূপে দিকে এবং পরিমাণে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা। স্থির অবস্থায় থাকলে বরাবর স্থির হয়ে থাকা আর চলন্ত অবস্থায় থাকলে ঐ বেগে ঐ দিকে চলতেই থাকা, অর্থাৎ সমবেগে ধাবনগতি সম্পন্ন করা, এই হলো জড়ের স্বভাব। কোন জড় দ্রব্যই আপনা থেকে তার গতিবেগ—বেগের দিক বা পরিমাণ কোনটাই—বদলায় না বা বদলাতে পারেনা। জড়ের এই ধর্ম্মকে, বলা যায় ওর নিশ্চেষ্টতা (Inertia) এবং এই উক্তিকে বলা যায় জড়ের নিশ্চেষ্টতার নিয়ম। এই নিয়ম প্রথম প্রচারিত হয় গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খৃঃ) কর্ত্তৃক। নিউটন এই নিয়মকে স্পষ্টতর রূপ দান ক'রে জড়ের গতি সম্পর্কীয় স্বরচিত নিয়মত্রয়ের প্রথম নিয়মরূপে বিশিষ্ট মর্য্যাদা দান করেন। সেই থেকে এই নিয়মটা গতির প্রথম নিয়ম নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

কিন্তু সত্যকার অবস্থা এই যে, সমবেগে ধাবনগতি জগতে দুর্ল্লভ। জড়দ্রব্য মাত্রেরই হয় বেগের দিক অথবা পরিমাণ অথবা উভয়ই ক্রমে বদ্‌লে যেতে দেখা যায়। সুতরাং এর জন্য একটা বিশিষ্ট কারণ স্বীকারের প্রয়োজন। গতির দ্বিতীয় নিয়মে নিউটন স্পষ্টরূপে এই কারণের উল্লেখ ক'রে কার্য্য ও কারণের মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করলেন—পদার্থের বেগের পরিবর্ত্তন ঘটে বা নূতন ক'রে একটা বেগ জন্মে যখন বাইরের থেকে অপর কোন পদার্থ চাপ, টান, ধাক্কা ইত্যাদির আকারে ওর ওপর একটা না একটা Force বা 'বল' প্রয়োগ করে। প্রযুক্ত বলটা হলো কারণ, আর ওর কার্য্য হলো নূতন ক'রে বেগ উৎপাদন এবং ফলে পুরাণো বেগের দিক বা পরিমাণ অথবা উভয়েরই পরিবর্ত্তন সাধন। আমাদের আরো বুঝতে হবে যে, উৎপন্ন বেগের দিক ও বলের দিক একই দিক এবং যে হারে পদার্থ বিশেষের বেগ উৎপন্ন হয় তা' ওর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এই উক্তিকে বলা যায় গতির দ্বিতীয় নিয়ম। পদার্থের বেগ পরিবর্ত্তনের বা বেগ-বৃদ্ধির হারকে ওর ত্বরণ (Acceleration) বল্‌লে নিয়মটাকে সংক্ষেপে এই ভাবেও প্রকাশ করা যায় :—ত্বরণের দিক ও বলের দিক একই দিক এবং ত্বরণের মাত্রা প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। পদার্থ বিশেষের বেগ কখন্ কোন্ দিকে কি হারে বদ্‌লাচ্ছে অথবা ওর ত্বরণটা কখন্ কোন্ দিকে কি পরিমাণে ঘটছে তা আমরা পর্য্যবেক্ষণ ও পরিমাপ দ্বারা নিরূপণ করতে পারি, সুতরাং তার থেকে ওর ওপর প্রযুক্ত বলের দিক ও পরিমাণও জেনে নিতে পারি।

গতির তৃতীয় নিয়মে নিউটন এই কথা ব্যক্ত করলেন যে, পদার্থ বিশেষ যখন অপর একটা পদার্থের ওপর বল প্রয়োগ করে তখন দ্বিতীয় পদার্থটাও প্রথমটার ওপর উল্টা দিকে ঠিক সমান পরিমাণের একটা বল প্রয়োগ করে থাকে। সংক্ষেপে এই উক্তিকে এই ভাবে প্রকাশ করা যায় :—ক্রিয়া মাত্রেরই ঠিক সমান পরিমাণের এবং বিপরীতমুখী একটা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে তুমি যাকে কাছে টানবে সেও তোমাকে সমান বলে তার কাছে টানতে থাকবে আর তুমি যাকে ঠেলে দেবে, সেও তোমাকে ঠিক সমান বলেই দূরে ঠেলে দেবে। এই নিয়মত্রয় নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের ভিত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

* ঘড়ির কাঁটা যখন পুরাপুরি একপাক ঘুরে আসে কিম্বা ঘড়ির পেণ্ডুলম যখন ওর গতিপথের বাঁ প্রান্ত থেকে ডাইনের প্রান্তে গিয়ে আবার বাঁ প্রান্তে ফিরে আসে ততক্ষণে একটা পূর্ণ নর্ত্তন—একটা গোটা ঘূর্ণন কিম্বা গোটা কম্পন—সম্পন্ন হয়।

এখন ঘূর্ণন ও কম্পনগতি যে ত্বরণ সম্পন্ন গতি—এই সকল গতিতে যে বেগের দিক ও পরিমাণ ক্রমাগত বদলে যায়—তা প্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং এই বেগ পরিবর্ত্তনের কারণ স্বরূপ আমাদের মেনে নিতে হয় যে ঘূর্ণমান ও কম্পমান পদার্থের উপর প্রতি মুহূর্ত্তে একটা বিশিষ্ট ধরণের বল প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কি প্রণালীতে এই বল প্রযুক্ত হয় সকল ক্ষেত্রে আমরা তা' নাও জানতে পারি কিন্তু জড়ের গতি সম্পর্কীয় উক্ত নিয়ম ক'টা মেনে নিলে এইরূপ বলের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। পরবর্ত্তী আলোচনায় গতিবিজ্ঞানের এই গোড়ার কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখার বিশেষ প্রয়োজন হবে।

কম্পন ও ঘূর্ণন গতির মধ্যে পার্থক্য—

কম্পনও ঘূর্ণনকে সাধারণভাবে নর্ত্তন-গতির অন্তর্গত করা গেলেও উভয়ের মধ্যে বিশিষ্ট ধরণের পার্থক্য রয়েছে। ঘড়ির পেণ্ডুলমের দোলন কম্পন-গতির এবং ওর কাঁটার ঘূর্ণন ঘূর্ণন-গতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই গতি ত্ব'টার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় ধরণের গতিতেই যাওয়া আসা ঘটে কিন্তু পেণ্ডুলমের দোলনে উভয়ই ঘটে একই পথকে আশ্রয় করে, আর কাঁটাটার প্রান্ত বিশেষের ঘূর্ণনে ওর সরে যাবার ও ফিরে আসার পথ ত্ব'টার ভেতর বৃত্তাকার একটা ফাঁকা জায়গা থাকে যার পরিধিটা ঘূর্ণমান পদার্থের গতিপথের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে কম্পন-গতির পথের ত্বটা প্রান্তবিন্দু থাকে কিন্তু ঘূর্ণন-গতিতে গোটা পথটা হয় বক্রাকার ও প্রান্তহীন। ক্ষেত্র বিশেষে ঘূর্ণমান পদার্থের গতিপথ উপবৃত্তাকার বা অন্য কোন আকারেরও হতে পারে। গ্রহগণের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কক্ষ উপবৃত্তাকার, চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ কক্ষ প্রায় বৃত্তাকার।

ঘূর্ণন ও কম্পন-গতির মধ্যে উক্ত পার্থক্যের ফল স্বরূপ আরো একটা পার্থক্য এসে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, কাঁটার, প্রান্তবিন্দুটা ওর গতিপথের প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হচ্ছে, প্রতি ঘূর্ণনে মাত্র একবার ক'রে, আর পেণ্ডুলমের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে,প্রতি দোলনে ওকে ওর গতিপথের প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হতে হয় ত্ব'বার ক'রে—একবার ডাইনের দিকে যাবার সময়, আবার ঐ পথ ধ'রে বাঁ দিকে ফিরে আসবার সময়। তবু এই ত্বইবারকার গতিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কারণ ফিরবার পথে পেণ্ডুলমের গতির দিকটা প্রত্যেক স্থানেই একেবারে উল্টে যায়। সুতরাং ঘূর্ণন-গতিই হোক বা কম্পন-গতিই হোক কোন ক্ষেত্রেই পদার্থটার নর্ত্তনকালের ভেতর ঠিক এই নর্ত্তনভঙ্গীর দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং তা' পাওয়া যায় যখন একটা পূর্ণ নর্ত্তন সম্পন্ন ক'রে পদার্থটা পূর্বস্থানে ফিরে আসে।

নর্ত্তন-গতিসম্পর্কীয় সংজ্ঞাগুলিকে এখন সংক্ষেপে নিম্নোক্ত-রূপে প্রকাশ করা যেতে পারে:

যে ধরণের গতিতে গতিশীল পদার্থের অবস্থান ও বেগ সম্পর্কীয় প্রত্যেক গতিভঙ্গী ক্রমে বদলে গিয়ে একটা নির্দ্দিষ্টকালের ব্যবধানে পুন: পুন: একই আকার ধারণ করে তাকে বলা যায় নর্ত্তন-গতি এবং ঐ নির্দ্দিষ্টকালটাকে বলা যায় নর্ত্তন-কাল।

নর্ত্তন-কালের অন্তর্গত সবগুলি গতিভঙ্গী নিয়ে গঠিত নর্ত্তন-মূর্ত্তিকে বলা যায় একটা পূর্ণ নর্ত্তন এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভেতর (প্রতি সেকেণ্ডে) যতগুলি পূর্ণ নর্ত্তন সম্পন্ন হয় তাকে বলা যায় নর্ত্তন সংখ্যা।

যে জড় দ্রব্য প্রতি সেকেণ্ডে একটা পূর্ণ নর্ত্তন সম্পন্ন ক'রে উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে তার নর্ত্তন-কাল এক সেকেণ্ড; যে পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ২টা বা ৩টা পূর্ণ নর্ত্তন সম্পন্ন করে তার নর্ত্তন-কাল যথাক্রমে $\frac{১}{২}$ সেকেণ্ড ও $\frac{১}{৩}$ সেকেণ্ড। সুতরাং নর্ত্তন-কালকে 'স' এবং নর্ত্তন-সংখ্যাকে 'ন' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করলে এইরূপ রাশির ত্ব'টার মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত সম্বন্ধটা খাটবে:

$$ন = \frac{১}{স} \cdots (১)$$

এর অর্থ এই যে, পদার্থ বিশেষের নর্ত্তন-কাল যে অনুপাতে বেড়ে যাবে বা কমে যাবে ওর নর্ত্তন-সংখ্যা সেই অনুপাতে কমে যাবে বা বেড়ে যাবে।

যে ক্ষেত্রে নৃত্যরত পদার্থকে প্রতি নর্ত্তনে তার গতিপথের প্রত্যেকস্থানে মাত্র একবার ক'রে উপস্থিত হতে হয় সে ক্ষেত্রে ওর নর্ত্তনকে বলা যায় ঘূর্ণন, আর যদি ত্ব'বার ক'রে উপস্থিত হতে হয় তবে ওকে বলা যায় কম্পন। ঘূর্ণন-গতির পক্ষে নর্ত্তন-কাল ও নর্ত্তন-সংখ্যা নাম গ্রহণ করে যথাক্রমে ঘূর্ণন-কাল ও ঘূর্ণন সংখ্যা এবং কম্পন-গতির পক্ষে ওদেরকে বলা যায় কম্পন-কাল ও কম্পন-সংখ্যা।

ঘূর্ণন গতিতে গতিপথটা বক্রাকার ও প্রান্তহীন হয়। কম্পন-গতির পথটা সরলও হতে পারে বক্রও হতে পারে। সরল হলে কম্পন-গতিটাকে বলা যায় সরল কম্পন (Simple harmonic motion), অন্যথায় ওকে বলা যেতে পারে বক্রকম্পন। উভয় ক্ষেত্রেই গতি পথের ত্ব'টা প্রান্তবিন্দু থাকে, এবং সেখান থেকে ফেরবার সময় পদার্থটাকে মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াতে হয়। একথা কেবল কম্পন-গতি সম্বন্ধেই খাটে। ঘূর্ণন-গতিতে বেগের দিক কোথাও একেবারে উল্টে যায় না সুতরাং ঘূর্ণমান পদার্থের বেগটা কোথাও একেবারে শূন্য পরিমিত হয় না। ঘূর্ণন-গতির সরলতম ও বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বেগের মাত্রা ঠিক রেখে বৃত্তপথে ঘূর্ণন।

আমরা বলেছি নর্ত্তনব্যাপারে যাওয়া আসা ঘটে একটা বিশিষ্ট স্থানের প্রতি লক্ষ্য ঠিক রেখে, যা'কে বলা যেতে পারে ওর বিরাম স্থান। নৃত্যরত পদার্থ ঐ স্থানকে বেষ্টন ক'রে ঘুরতে থাকে কিম্বা ওর এ-পাশে ও-পাশে সরে সরে এবং ওরি ভেতর দিয়ে যাতায়াত ক'রে কাঁপতে থাকে। ঐ স্থানকে বলা যায়, ঘূর্ণন-গতির পক্ষে ঘূর্ণন-কেন্দ্র এবং কম্পন-গতির পক্ষে কম্পন-কেন্দ্র। কম্পন-গতির বেলায় কেন্দ্র থেকে পদার্থটার বৃহত্তম দূরত্বকে—যেমন দোলায়মান পেণ্ডুলমের বেলায় ওর গতিপথের মধ্যবিন্দু থেকে ডাইনের বা বাম প্রান্তের দূরত্বকে—বলা যায় ওর কম্পনের প্রসার (Amplitude of Vibration) বৃত্তপথে ঘূর্ণন-গতির পক্ষে ঐ বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বারাই ঘূর্ণনের প্রসার নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে।

এই আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নর্তন-গতি মাত্রই রূপ-প্রাপ্ত হয় তিনটা বিশিষ্ট রাশি দ্বারা নর্তন-কাল (কিম্বা নর্তন-সংখ্যা) নর্তন-ভঙ্গী এবং নর্তনের প্রসার। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে, নৃত্যবিশেষের বর্ণনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এই তিনটা রাশির মূল্য নির্দ্দেশ দ্বারা। এই রাশিত্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে দু'টা নর্তনগতি যদি পরস্পরের সমান হয় তবে গতি দু'টার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু ওদের কোন একটার পরিমাণ সম্বন্ধে একটুখানি গরমিল হলেই গতি দু'টার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দু'টা পেণ্ডুলমের ওলন-দড়ির দৈর্ঘ্য যদি সমান হয় এবং বিরাম স্থান থেকে ওদেরকে ডাইনের বা বাঁয়ে সমান পরিমাণে টেনে নিয়ে একই সময়ে ছেড়ে দেওয়া যায় তবে উভয়ের দোলনব্যাপারে ওদের কম্পন-কাল, কম্পনের প্রসার এবং প্রতি মুহূর্তের কম্পন-ভঙ্গী পরস্পরের সমান হবে। এইরূপ ব্যবস্থায় দেখা যাবে যে, প্রতি দোলনে উভয়েই ওদের গতিপথের ডাইনের প্রান্ত কিম্বা বাম প্রান্তে উপস্থিত হচ্ছে ঠিক একই সময়ে এবং মধ্যপথও অতিক্রম করছে উভয়ে একই সময়ে, একই বেগ নিয়ে এবং একই দিকে ছুটবার ভাব নিয়ে। আগাগোড়া এইরূপ মিল রক্ষা করেই ওরা একটার পর একটা পূর্ণ নর্তন সম্পন্ন করে যাবে। কিন্তু পেণ্ডুলম দু'টার দৈর্ঘ্য কিম্বা ওদের টেনে নেবার মাত্রা কিম্বা ছেড়ে দেবার সময় সম্পর্কে একটুখানি ইতর বিশেষ হলেই, যথাক্রমে ওদের কম্পন-কাল, কম্পনের প্রসার এবং কম্পন-ভঙ্গী সম্পর্কে পার্থক্য এসে দাঁড়াবে, এবং ফলে ওরা যে দু'টা বিভিন্ন ধরণের কম্পনগতি তা দৃষ্টিমাত্রই স্পষ্ট উপলব্ধি হবে। দু'টা ঘূর্ণনগতি সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা খাটে। অতঃপর আমরা ঘূর্ণন ও কম্পনগতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

ঘূর্ণন-গতি

আমরা এখানে শুধু সরলতম ঘূর্ণন-গতি সম্বন্ধেই আলোচনা করবো—যার বিশিষ্ট রূপ হচ্ছে বেগের মাত্রা ঠিক রেখে বৃত্তপথে ঘূর্ণন বা যাকে বলা যেতে পারে সমদ্রুতিসম্পন্ন বৃত্তাকার ঘূর্ণন।

আমরা কল্পনা করছি একটি জড়কণা একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার বেগ নিয়ে ১নং চিত্রের 'ল' বিন্দুকে কেন্দ্র করে 'ত থ দ ধ ন' রেখা ক্রমে বৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ফলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ একই স্থানে ফিরে আসছে। পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে এই সময়টা ঐ জড়কণার ঘূর্ণন-কাল নির্দ্দেশ করছে এবং প্রতি সেকেণ্ডে কণাটা যতগুলি পূর্ণ আবর্ত্তন সম্পন্ন করছে ঐ হলো ওর ঘূর্ণন-সংখ্যা। আমরা এও জানি যে ১নং সমীকরণ অনুসারে এই রাশিদ্বয়ের মধ্যে বিপরীত অনুপাতের সম্বন্ধ বিদ্যমান—একটাকে উল্টে লিখলেই অপরটার মূল্য পাওয়া যায়।

আলোচ্য ঘূর্ণন-গতিতে বেগের পরিমাণ ঠিক থাকছে, সুতরাং সমান সমান কালে কণাটা যে সকল টুকরা পথ (তথ, থদ, দধ, ধন প্রভৃতি) অতিক্রম করছে ঐ সকল পথ পরস্পরের সমান। এই সমান সমান কালগুলি যদি ১ সেকেণ্ডে পরিমিত হয় তবে এই টুকরা পথগুলি কণাটার পর পর সেকেণ্ডের সমান সমান বেগের মাত্রা চিহ্নিত করে দেবে। কিন্তু ঘুরছে বলেই ওর বেগের দিক ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। কণাটা ওর বৃত্তপথের যখন যেখানে উপস্থিত হচ্ছে তখনকার মত ওর বেগের দিকটা দাঁড়াচ্ছে ঐ স্থানটার টুক্রা রেখাটার দিক্ বরাবর, অথবা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, বৃত্তের ঐ স্থানটার স্পর্শরেখা (Tangent) বরাবর। এর অর্থ এই যে, কণাটা যদি ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরতে
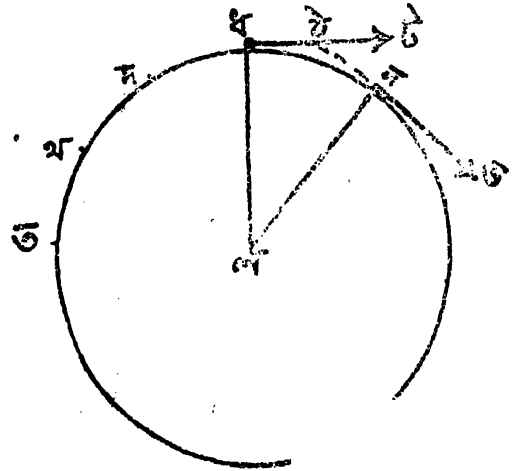
১ নং চিত্র

থাকে তবে 'ধ' স্থানে ওর বেগের দিকটা হবে 'ধট' স্পর্শরেখা ক্রমে 'ন' স্থানে 'নড' স্পর্শক বরাবর এইরূপ [১নং চিত্র]।

সুতরাং যতক্ষণে কণাটা 'ধ' স্থান থেকে 'ন' স্থানে যায় ততক্ষণে—অর্থাৎ সেকেণ্ড পরিমিত সময়ে—ওর বেগের দিকটা 'ধট' রেখা ছেড়ে এবং বৃহত্তের কেন্দ্রের দিকে 'টঠড' কোণের সমান পরিমাণে ঘুরে গিয়ে 'নড' রেখাক্রমে অবস্থিত হয়। দেখা যাবে 'টঠড' কোণটা 'ধলন'কোণের সমান, কারণ 'ধল' ও 'নল' ব্যাসার্দ্ধ দ্বয় যথাক্রমে ঐ স্পর্শক দ্বয়ের ('ধট' ও 'নড' রেখার) লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং বলতে পারা যায় যে, বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে ঘূর্ণমান কণার সংযোগ-সাধনকারী ব্যাসার্দ্ধটা প্রতি সেকেণ্ডে যতটা ঘুরে যায় বৃত্তপথে কণাটার বেগের দিকও প্রতি সেকেণ্ডে ততটাই ঘোরে। একে বলা যায় কণাটার কৌণিক বেগ (Angular Velocity). সহজেই দেখা যায় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাসার্দ্ধের বৃত্তের পরিধিতে ঘুরতে গিয়ে কণাটার বেগের মাত্রা ('ধন' রেখার দৈর্ঘ্য) যতই বাড়তে থাকবে ওর কৌণিক বেগ এবং ঘূর্ণন-সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে।

অতঃপর আমরা ঘূর্ণমান কণাটার ত্বরণ এবং ওর ওপর প্রযুক্ত বলের দিক ও পরিমাণ নির্ণয়ে অগ্রসর হব। ঘূর্ণন গতি যে সমগতি নয়, ত্বরণ-সম্পন্ন গতি, তা আমাদের মেনে নিতে হয় এই দেখে যে, আলোচ্য ঘূর্ণন-গতিতে বেগের পরিমাণ ঠিক থাকলেও বেগের দিক ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। এখন একথা বোঝা কঠিন

নয় যে, বেগের শুধু দিক বদলাবার জন্যও নূতন ক'রে একটা বেগ উৎপাদনের প্রয়োজন ; সুতরাং গতির নিয়মানুসারে—তার জন্য একটা বল প্রয়োগেরও আবশ্যক হয়ে থাকে। গতির দ্বিতীয় নিয়ম আমাদের জানিয়ে দেয় যে, বেগ পরিবর্ত্তনের দিক ও বলের দিক একই দিক এবং বেগ পরিবর্ত্তনের হার (বা ত্বরণের মাত্রা) প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। সুতরাং প্রযুক্ত বলের দিক নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজন হয়—যে ক্ষেত্রে (যেমন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে) বেগের পরিমাণ ঠিক থেকে দিকটাই শুধু বদলায় সে ক্ষেত্রে বেগের পরিবর্ত্তন ঘটে বা নূতন করে বেগ জন্মে কোন দিকে ? এখন একথা মানতে হয় যে, আলোচ্য ঘূর্ণন গতিতে কণাটার বেগের অভিমুখে নূতন করে কোন বেগ উৎপন্ন হয় না, করণ তা হলে প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বেগটা জন্মাচ্ছে ওর তৎকালীন বেগের আড়ভাবে। একথার অর্থ এই যে, কণাটা ওর বৃত্তপথের যখন যেখানে উপস্থিত হচ্ছে তখনকার মত ওর বেগ জন্মাচ্ছে (বা ত্বরণ উৎপন্ন হচ্ছে) ঐ স্থানের স্পর্শ রেখার লম্বের দিকে—যেমন 'ধ' স্থানে 'ধল' দিকে 'ন' স্থানে 'নল' দিকে [১নং চিত্র], অর্থাৎ সর্ব্বদাই বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে। আরো বুঝতে হবে যে, এই ত্বরণ উৎপাদনের জন্য কণাটার ওপর একটা বলও প্রযুক্ত হয়ে থাকে সর্ব্বদাই বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে। কি ভাবে এই বল প্রযুক্ত হচ্ছে সে হলো ভিন্ন কথা। যে ভাবেই হোক, আমাদের মেনে নিতে হবে যে, এই বলটাই কেন্দ্রের অভিমুখে ত্বরণ উৎপন্ন ক'রে ওর বেগের দিকটাকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে আনছে।

এই কেন্দ্রমুখ বলের পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য কেন্দ্রমুখ ত্বরণটা কত বড় তা জানবার প্রয়োজন। ১নং চিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, কণাটার ঘূর্ণন সংখ্যা বা কৌণিক বেগ ('ধলন' কোণের পরিমাণ) বেড়ে গেল, কিম্বা ঘূর্ণন-সংখ্যা ঠিক রেখে বৃত্তের ব্যাস বড় হতে থাকলে কণাটার বেগের দিক ঘুরে যাবে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রমুখ ত্বরণও উৎপন্ন হবার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায়। বেগ-সংযোজনের নিয়ম অনুসারে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, উক্ত ত্বরণটা বৃত্তপথের ব্যাসার্দ্ধ এবং ঘূর্ণন সংখ্যার বর্গ এই রাশিদ্বয়ের পূরণ ফলের প্রায় ৪০ গুণ হয়ে থাকে। সুতরাং কণাটার ত্বরণকে 'ত্ব' ওর ঘূর্ণন-সংখ্যাকে 'ন' এবং বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধকে 'ব্যা' বললে এই রাশিত্রয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত সম্বন্ধটাকে সত্য বলে' গ্রহণ করা যায় :—

$$\text{ত্ব} = ৪০ \text{ ব্যা} \times \text{ন}^{২} \cdots (২)$$

এই সূত্রের অন্তর্গত ডান দিককার রাশি দু'টা (অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ এবং কণাটার ঘূর্ণন সংখ্যা) পর্য্যবেক্ষণ ও পরিমাণ দ্বারা নিরূপণ করা যায় সুতরাং তার থেকে কণাটার ত্বরণের মাত্রা এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর প্রযুক্ত বলের মাত্রাও হিসাব ক'রে বের করা যায়।

২নং সূত্র থেকে দেখা যায় যে, বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ যে অনুপাতে বড় হবে কিম্বা ঘূর্ণন-সংখ্যার বর্গ যে অনুপাতে বাড়তে থাকবে ঘোরাবার জন্য কেন্দ্রমুখ বলও প্রয়োগ করতে হবে সেই অনুপাতে বেশী মাত্রায়। এর বিশিষ্ট প্রমাণ পাই আমরা দড়ি বেঁধে একটা ঢিলকে ঘোরাতে গিয়ে। ঘোরাবার জন্য ঢিলের ওপর ওর বৃত্ত-পথের কেন্দ্রের দিকে হাত দিয়ে ক্রমাগত একটা টান দিতে হয়। তার প্রমাণ এই যে ঢিলটাও আবার—গতির তৃতীয় অনুসারে হাতের ওপর একটা পাল্টা টান—যাকে বলা যায় কেন্দ্রবিমুখ বল (Centrifugal force) প্রয়োগ ক'রে ঘূর্ণনকারীকে জানিয়ে দেয় যে, ওর ওপর, হাতের অভিমুখে ক্রমাগত একটা টান পড়ছে এবং তারি জন্য ওকে হাতখানাকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত ঘুরতে হচ্ছে। আরো দেখা যাবে যে, ঢিলের বৃত্তপথের ব্যাসার্দ্ধ (দড়িটার দৈর্ঘ্য) কিম্বা ওর ঘূর্ণন সংখ্যা বাড়াতে থাকলে হাতের ওপর টানের মাত্রাও ক্রমে বেড়ে যায়। তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঢিলের ওপর প্রযুক্ত কেন্দ্রমুখ বলটাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

গ্রহ-উপগ্রহের ঘূর্ণন গতি

ঘূর্ণন-গতির বিশিষ্ট উদাহরণ রূপে উল্লেখ করতে হয় গ্রহগণের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ব্যাপারকে। দল বেঁধে ঘটা ক'রে গ্রহগণ যুগ যুগ ধরে এই বিরাট নৃত্যগতি সম্পন্ন করে আসছে। পৃথিবীতে ঋতু পরি-বর্ত্তন ঘটে সূর্য্যকে বেষ্টন করে পৃথিবীর ঘুরতে হয় বলে। সুতরাং কেবল জমকালো ব্যাপার ব'লেই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গেও এই সকল ঘূর্ণন-গতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কালকে আমরা বলি এক বৎসর সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের ঘূর্ণন-সংখ্যা হলো বছরে একবার।

গ্রহগণের আকাশ ভ্রমণের রীতি সম্পর্কে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে কোপর্নিকস্ একটা বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করেন। এর মূল কথা এই যে, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে এবং কেউ বা অপেক্ষাকৃত কাছে, কেউ বা বহুগুণ দূরে থেকে বৃত্তাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ কর্চ্ছে। কেপলার (১৫৭১—১৬৩০ খৃঃ) প্রতিপন্ন করেন গ্রহগণের কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নয়—উপবৃত্তাকার। (elliptical) এবং সূর্য্য এই সকল উপবৃত্তের একটি নাভিদেশে (Focusএ) অবস্থান করছে। গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ সম্পর্কে কেপলার তিনটা নিয়ম প্রচার করেন। এই উক্তিটা হলো তার প্রথম নিয়ম।

কোপর্নিকসের উক্তির সঙ্গে কেপলার-আবিষ্কৃত উক্ত নিয়মের মূলতঃ বিরোধ নেই। উভয় মতবাদই এই কল্পনাকে সত্য বলে গ্রহণ করলো যে, সৌরজগতের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করতে হবে পৃথিবীকে নয়, সূর্য্যকে। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে টলেমি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, পৃথিবী শূন্যের ভেতর স্থির হয়ে রয়েছে এবং সূর্য্যও অন্যান্য নক্ষত্রগণ পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোপর্নিকস্ ও কেপলারের সময় থেকে এই মত বদলে গেল—ধরাকেন্দ্রিক মতের পরিবর্ত্তে সূর্য্যকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন থেকে জ্যোতিষী ও বৈজ্ঞানিকগণ মেনে নিলেন সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ এবং গ্রহগণ—যার মধ্যে আমাদের পৃথিবী হচ্ছে একটি—সূর্য্যকে বেষ্টন করে অহরহঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এখন গ্রহদের কক্ষ উপবৃত্তাকার হলেও অধিকাংশ কক্ষের উৎকেন্দ্রতা (eccentricity) এত সামান্য যে, স্থূল হিসাবের

পক্ষে এদেরকে বৃত্তাকার বলে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে যে, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ (২নং চিত্র) সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে এবং এক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেগ নিয়ে বিভিন্ন বৃত্তাকার কক্ষে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ কার্য্য সম্পন্ন করছে। সুতরাং ঘূর্ণন-গতি সম্পর্কীয় পূর্ব্বোক্ত সাধারণ আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, প্রত্যেক গ্রহেরই, ওর কক্ষপথের কেন্দ্রাভিমুখে, সুতরাং সূর্য্যের অভিমুখে, এক একটা ত্বরণ উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই সকল ত্বরণের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে ২নং সূত্র
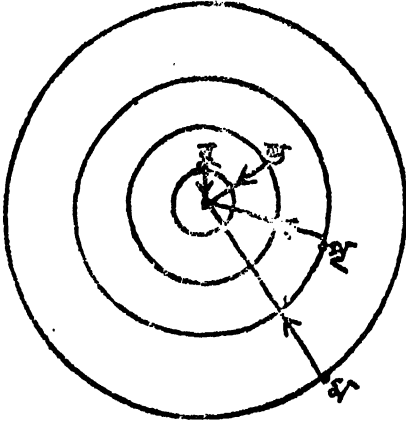
২নং চিত্র

দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসার্দ্ধ এবং সূর্য্য সম্পর্কে ওর ঘূর্ণন-সংখ্যার বর্গের পূরণ ফল দ্বারা। এখন ২নং চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সূর্য্য থেকে গ্রহগণের দূরত্ব বলতে যা বোঝায় ওদের কক্ষপথের ব্যাসার্দ্ধ বলতেও তাই বোঝায় সুতরাং এই সকল দূরত্বকে 'দ' অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করলে গ্রহসমূহের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ব্যাপারের পক্ষে ২নং সূত্রটাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে:

$$ত্ব = ৪০ দ \times ন^{২} \cdots\cdots\cdots\cdots (৩)$$

এই সূত্রের অন্তর্গত 'ন' অক্ষরটা এখন কক্ষবিহারী গ্রহগণের ঘূর্ণন-সংখ্যা নির্দ্দেশ কচ্ছে এবং 'ত্ব' বলতে বোঝায় সূর্য্যের অভিমুখে বিভিন্ন গ্রহের ত্বরণের মাত্রা। সুতরাং এই সকল ত্বরণকে আমরা এখন কেন্দ্রমুখ ত্বরণ না বলে সূর্য্যমুখ ত্বরণ বলেও বর্ণনা করতে পারি। এও দেখা যাবে যে, ৩নং সূত্রটা যেমন গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ সম্পর্কে সেইরূপ চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ সম্পর্কেও পূর্ণমাত্রায় খাটে।

এই সূত্র থেকে দেখা যায় যে, গ্রহগণের ঘূর্ণন সংখ্যা (ন) এবং সূর্য্য থেকে ওদের দূরত্ব (দ) পরিমাপ ক'রে সূর্য্যের অভিমুখে বিভিন্ন গ্রহের ত্বরণের মাত্রা জানতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সূর্য্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল এবং সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে পৃথিবীর ঘূর্ণন-সংখ্যা হলো বছরে একবার; এখন ৩নং সমীকরণের ডানদিকে এই মূল্য দু'টা বসিয়ে দিলে দেখা যাবে যে, 'ত্ব'-এর মূল্য বা সূর্য্যের অভিমুখে পৃথিবীর ত্বরণের মাত্রা দাঁড়ায় সেকেণ্ডপ্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় সিকি ইঞ্চি পরিমিত। একই প্রণালীতে আমরা চন্দ্রের ভূপ্রদক্ষিণ ব্যাপারে পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণের মাত্রা নিরূপণ করতে পারি। ভূকেন্দ্র থেকে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২৪০ হাজার মাইল আর চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ২৭ দিনে একবার ক'রে বা বছরে প্রায় ১৩ বার। দেখা যাবে ৩নং সূত্রের ডানদিকে এই মূল্য দু'টা বসিয়ে দিলে পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণের মাত্রা পাওয়া যায় সেকেণ্ডপ্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে, ১ ইঞ্চির প্রায় ৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

গ্রহের ঘূর্ণন ও মহাকর্ষ-বল

কোপর্নিকস্ ও কেপ্‌লারের পর নিউটন। সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ অনুসরণ করে' কেপ্‌লার কক্ষবিহারী গ্রহগণের ভ্রমণ-প্রণালীর বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তৃত বিবরণ দান করলেন, কিন্তু কেন ওরা ঐভাবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে তার কোন কারণ প্রদর্শন বা ব্যাখ্যা দান করলেন না। তা করলেন নিউটন—জড়ের গতি সম্পর্কীয় স্বরচিত নিয়মত্রয়ের ভেতর দিয়ে। নিউটনের প্রতিভা যেমন পার্থিব ব্যাপারগুলিকে সেইরূপ সৌরজগৎ ও অন্যান্য নক্ষত্র-জগতের আপাত বিশৃঙ্খল চালচলনসমূহকে গতিবিজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত নিয়মত্রয়ের অন্তর্গত ক'রে ওদের সঙ্গত ব্যাখ্যা দানে সক্ষম হলো এবং ফলে জড়জগতের বিচ্ছিন্ন ঘটনাপুঞ্জ কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার কঠিন নিগড়ে বদ্ধ হলো।

নিউটন প্রশ্ন করলেন, সূর্য্যের অভিমুখে গ্রহসমূহের ত্বরণ উৎপন্ন করে কে? গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এই সকল ত্বরণ উৎপাদনের জন্য প্রত্যেক গ্রহের ওপর কোন না কোন ধরণের Force বা বল প্রযুক্ত হবার প্রয়োজন। কে এই বল প্রয়োগ করছে এবং কি ভাবে এই বল প্রযুক্ত হচ্ছে যার ফলস্বরূপ কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী গ্রহগণের সূর্য্যের অভিমুখে এক একটা ত্বরণ উৎপন্ন হচ্ছে—যার মাত্রা নিরূপণ করতে পারি আমরা ৩নং সূত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে ঐসকল দূরত্ব (দ) এবং সূর্য্য সম্পর্কে ঐসকল গ্রহের ঘূর্ণন-সংখ্যা (ন) পরিমাপ করে? ঘূর্ণমান ঢিলের বেলায় আমরা অবশ্য বলতে পারি যে, ঢিলের ওপর কেন্দ্রমুখ টানটা প্রযুক্ত হচ্ছে দড়ির ভেতর দিয়ে এবং ওর প্রয়োগ-কর্ত্তা হচ্ছে যিনি ঘুরাচ্ছেন—তার হাতখানা। গ্রহগণের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ব্যাপারেও অনুরূপ কথা খাটে কি? নিউটন কল্পনা করলেন গ্রহদের ঘুরাচ্ছে সূর্য্য—স্বীয় কেন্দ্রাভিমুখে একটা বিশিষ্ট ধরণের বল প্রয়োগ করে'। কোন্ দড়ির ভেতর দিয়ে এই সকল কেন্দ্রমুখ বলপ্রযুক্ত হচ্ছে তা আমরা জানিনে, কিন্তু গতির নিয়মত্রয় যদি দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সকল জড় দ্রব্য সম্পর্কে সত্য হয়, তবে গ্রহগণের ওপর সূর্য্যের অভিমুখে যে সর্বদা একটা বিশিষ্ট ধরণের বল প্রযুক্ত হচ্ছে তা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই।

নিউটন সিদ্ধান্ত করলেন দূর থেকে একটা জড় দ্রব্য অপর একটা জড় দ্রব্যের ওপর—ওদের পারস্পরিক দূরত্ব যাই হোক্ না

কেন, দৃশ্য কোন দড়াদড়ির সাহায্য না নিয়েও পরস্পরের অভিমুখে আকর্ষণ-বল প্রয়োগ করতে পারে ও করে' থাকে। সূর্য গ্রহগণের ওপর, পৃথিবী চন্দ্রের ওপর, এক নক্ষত্র অন্য নক্ষত্রের ওপর এইরূপ বল প্রয়োগ করছে এবং এরই জন্য গ্রহগণ সূর্যকে, চন্দ্র পৃথিবীকে এবং এক নক্ষত্র অপর এক নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হচ্ছে। নিউটনের মানসপুত্র এই অচিন্তিতপূর্ব বিশিষ্ট বলটা নাম গ্রহণ করলো মহাকর্ষ-বল (Force of Gravitation). নিউটন আরো অনুমান করলেন যে, ভূপৃষ্ঠস্থ আম জাম প্রভৃতির ভূপতন ব্যাপারেও আমরা একই মহাকর্ষ-বলের প্রভাবের পরিচয় পাই। গ্যালিলিওর পরীক্ষা থেকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এই সকল পতন্ত দ্রব্য ক্রম-বর্ধমান বেগে এবং সবাই ওরা সেকেণ্ডপ্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট পরিমিত ত্বরণ নিয়ে ভূকেন্দ্রের অভিমুখে নেমে আসে। এখানেও ত্বরণ সম্পন্ন গতি এবং এখানেও দূর থেকে একটা জড় দ্রব্যের অপর একটার ওপর বল প্রয়োগ। পৃথিবী তার আশে পাশের পদার্থসমূহের ওপর, এমন কি দূরবর্তী চন্দ্রের ওপরও স্বীয় কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ-বল প্রয়োগ করে' থাকে এবং এর জন্যই সবারই ওদের ভূকেন্দ্রের অভিমুখে ত্বরণ উৎপন্ন হয়ে থাকে। বুঝতে হবে, শূন্য-বাহিত আকর্ষণ-বলের ক্রিয়া সর্বত্রই বিরাজমান, ওদের রীতি প্রকৃতিও সর্বত্রই এক এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বল (Force of Gravity) সৌরমণ্ডলব্যাপী মহাকর্ষ-বলেরই মূর্তিবিশেষ মাত্র। এইরূপে নিউটনের কল্পনায় মহাকর্ষ-বল এক বিশ্বব্যাপী রূপ গ্রহণ করলো। কথিত আছে, নিউটন একদিন যখন তাঁর বাগানে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন একটা আতাফল সহসা তাঁর সম্মুখে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়; ফলে যে চিন্তাতরঙ্গ তাঁর মনে উদ্ভূত হয়েছিল তাই শেষ পর্য্যন্ত রূপপ্রাপ্ত হলো মহাকর্ষের নিয়মের অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ এক ক্ষুদ্র সূত্রের ভেতর দিয়ে।

মহাকর্ষ-বল ও প্রাথমিক বেগ

প্রশ্ন হতে পারে, পৃথিবীর আকর্ষণে যদি বৃন্তচ্যুত আতাকে মাটিতে পড়তে হয় তবে আকাশের চাঁদকেই বা পড়তে হয় না কেন? ভূপৃষ্ঠে আছাড় না খেয়ে চাঁদ আমাদের বেষ্টন ক'রে ঘুরে মরছে কেন? এর উত্তর এইরূপ: বৃন্তচ্যুত আতার মত চাঁদও উপস্থিত হয়ে থাকে আমাদের সামনে আকাশস্থ নিরালম্ব অবস্থায়; কিন্তু ওদের প্রাথমিক অবস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য মেনে নিতে হয়। আতার পতন সুরু হয় একটা বেগহীন অবস্থা থেকে আর চন্দ্র সম্বন্ধে অনুমান এই যে, সুরুতে চাঁদ আমাদের পাশ কাটিয়ে আকাশ-পথে ছুটে যাচ্ছিল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বল উভয় পদার্থেরই, ভূকেন্দ্রাভিমুখে ত্বরণ উৎপন্ন করে; কিন্তু আতাকে ওর ত্বরণের ফলে, এবং সুরুতে অন্য কোনদিকে বেগ না থাকায় ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে নেমে এসে মাটিতে আছাড় খেতে হয়; অন্য পক্ষে সুরুতে চন্দ্র পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে ছুটছিল ব'লে একই সময়ে চাঁদকে হুটো দু'মুখো বেগের মুখ তাকিয়ে চলতে হয়েছিল—যার একটা হলো পৃথিবীর আকর্ষণজনিত ভূকেন্দ্রাভিমুখে ওর অর্জিত বেগ—যা' নির্দেশ করতে পারি আমরা ১নং চিত্রের 'ধল' রেখা দ্বারা—এবং অপরটা হলো ঐ বেগের আড়ভাবে ('ধট' দিক্ বরাবর) অবস্থিত ওর প্রাথমিক বেগ। সুতরাং চাঁদকে একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন ক'রে যাত্রা সুরু করতে হলো। পর-মুহূর্তে চাঁদ যখন 'ন' স্থানে উপস্থিত হলো তখনো অবস্থাটা দাঁড়ালো একই প্রকারের—ভূকেন্দ্রাভিমুখে ('নল' দিক্ বরাবর) অর্জিত বেগ এবং এর আড়ভাবে ('নড' দিক্ বরাবর) অবস্থিত ওর তৎকালীন বেগ। এইরূপ পর পর মুহূর্তে। ফলে ক্রমাগত মধ্যপথ অবলম্বন ক'রে এবং ভূকেন্দ্রকে (১নং চিত্রের 'ল' বিন্দুকে) বেষ্টন ক'রে চিরদিন ঘুরে বেড়ানোই হলো চাঁদের পক্ষে ব্যবস্থা। আবার একথা কেবল চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ সম্পর্কেই নয়—পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের সূর্য্য প্রদক্ষিণ সম্পর্কেও পূর্ণমাত্রায় খাটে। সুরুতে সকল গ্রহেরই ছিল বেগের অবস্থা—সবাই যাচ্ছিল সূর্য্যের পাশ কাটিয়ে এবং প্রায় একই দিকে। এই প্রাথমিক বেগের জন্যই সূর্য্যের জ্বলন্ত গর্ভে পতনের পরিবর্তে গ্রহগণের ললাটে লিখিত হলো—"আবহমান কাল সূর্য্য-পরিক্রমণ।" জ্যোতিষিগণ এই ললাটলিপি পাঠ ক'রে সৌরজগতের গ্রহগণের অতীত ও ভবিষ্যৎ—শত বা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা পরে কোন্ গ্রহ কোথায় ছিল বা থাকবে এবং কে কি বেগে কোন্ দিকে ছুটে যাচ্ছিল বা যাবে—গণে ব'লে দিতে পারেন। কিন্তু সকল গণনার মূলে রইলো নিউটন-বর্ণিত গতির নিয়মত্রয় ও তাঁর মহাকর্ষের নিয়ম। ফলে বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জ থেকে অনিশ্চয়তার ছাপ মুছে গেল, আকস্মিকতা ও বিস্ময়বিমূঢ়তার যুগ অন্তর্হিত হলো এবং নিউটনীয় গতি বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে ও মহাকর্ষ বলকে গ্রহনক্ষত্রসমূহের গতি-পরিবর্তনের কারণ রূপে অঙ্গীকার ক'রে কারণবাদ বিজ্ঞানজগতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হলো।

জিজ্ঞাস্য হতে পারে গ্রহ উপগ্রহগণের ছুটবার বেগ যদি লোপ পায়—যদি আকস্মিক কোন ধাক্কার ফলেই হোক বা অপর কোন কারণেই হোক গ্রহগণের সূর্য্য পরিক্রমণ বেগ কিম্বা চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ বেগ সহসা নষ্ট হয়ে যায় তবে কি হবে? কারণ-বাদের ওপর আস্থা স্থাপন ক'রে আমরা বলবো যে এরূপ হবার সম্ভাবনা খুব কম—নাই বললেই চলে। আর সত্যই যদি এরূপ ঘটে তবে কারণবাদকে ভিত্তি করেই আমরা বলবো যে, তা হলে মহাকর্ষ-বলের প্রভাবে অনতিবিলম্বেই চাঁদকে ভূপৃষ্ঠে এবং গ্রহগণকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে হলেও একে একে সূর্য্যদেহে আছাড় খেতে হবে—ঠিক যেমন ঘূর্ণমান ঢিলকে ঘূর্ণনকারীর হাতে আছাড় খেতে হয় যখন দেয়ালের গায়ে ঘা খেয়ে ঢিলের বেগটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায় এবং বাকি থাকে তখন কেবল দড়ির টানটা! একথা অবশ্য মানতে হবে যে, আকাশের গায়ে বিফল-দেয়ালের (Baffle wall এর) মত মাঝে মাঝে কেউ দেয়াল গেঁথে রাখেনি যার সঙ্গে ঠোকর খেয়ে পৃথিবীর বা অপর কোন গ্রহের ঘূর্ণন বেগ লোপ পেতে পারে, সুতরাং গ্রহগণ তাদের কক্ষের আকার বজায় রেখে চিরদিন কিম্বা অন্ততঃ বহুদিন যে ঘুরতে থাকবে এ আমরা অনায়াসেই প্রত্যাশা করতে পারি।

কিন্তু যদি ধূলিকণার মত বা তার চেয়েও বহুগুণে সূক্ষ্ম কোন জড়কণা সারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে অবস্থান করে, যা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারিনে, অথচ যা' বেগবান পদার্থের গতিরোধ করার অল্পবিস্তর ক্ষমতা রাখে, তবে কি হবে? আমরা অবশ্যই বলবো যে, তা'হলে ঐ সকল কণার সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে

গ্রহউপগ্রহগণের ঘূর্ণন-বেগ ক্রমে কমে আসতে থাকবে। সুতরাং মহাকর্ষ-বলের প্রভাবে চন্দ্র ক্রমে পৃথিবীর এবং গ্রহগণ সূর্য্যের কাছাকাছি হতে থাকবে, ওদের বৃত্তপথের ব্যাসার্দ্ধ, প্রতি ঘূর্ণনে একটু-ক'রে কমতে থাকবে এবং ফলে এক একটা সর্পিল পথ (spiral path) রচনা ক'রে প্রত্যেকেই ওরা ওদের আকর্ষণ কেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকবে। এরূপ যে হচ্ছেনা তা আমরা জোর ক'রে বলতে পারিনে। তবে হলেও তা হচ্ছে এত ধীরে ধীরে যে, তার ফলে সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের যে মিলনটা ঘটবে তা'কে একটা বরফ-শীতল মৃতদেহের সঙ্গে প্রাণের স্পন্দের চিহ্ন-মাত্রহীন অপর একটি মৃতদেহের মিলন বহে বর্ণনা করা ঠিক হবে কিনা তা' নিয়ে গবেষণা চলতে পারে।

এই আলোচনা থেকে এও বোঝা যায় যে, মহাকর্ষ-বলের সঙ্গে ঘূর্ণন-গতির কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানের দাবি এই যে, ঘূর্ণন ব্যাপার সম্পর্কীয় ত্বরণ উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রমুখে একটা বলের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন। দড়ির টান এ কার্য্য সম্পন্ন করতে পারে, হাতের ঠেলা পারে এবং আরো পাঁচ রকমের পাঁচটা বলও পদার্থ বিশেষকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুক্ত আকাশে এই সকল চিরপরিচিত বলের অস্তিত্ব স্বপ্নের অগোচর হলেও জ্যোতিষ্কগণ একে অন্যকে বেষ্টন ক'রে অহরহঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাকর্ষ-বলের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হলো বিশেষ ক'রে এদের ঘোরাবার জন্যই। তা'ই প্রথম থেকেই এই অজ্ঞাতকুলশীল বল আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করলো এক সর্ব্বব্যাপী মূর্ত্তি নিয়ে। তবু শুধু ঘুরিয়ে হয়রান করার জন্যই এর সৃষ্টি হয়েছে এরূপ কল্পনা করলে মস্ত ভুল করা হবে। আমাদের স্বীকার করতে হয় এর লক্ষ্য—যদি এর কোন লক্ষ্য থাকে—আর পাঁচটা বলের মতই নিজের দিক্ বরাবর বেগ উৎপাদন এবং ফলে বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্ন জড়জগৎ সমূহের মহামিলন সাধন।

মহাকর্ষের নিয়ম

মহাকর্ষ-বলের অস্তিত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেনে নিতে হয় যে, জগতের প্রত্যেক জড়দ্রব্যই অপর প্রত্যেক জড়দ্রব্যের ওপর—ওদের পারস্পরিক দূরত্ব যাই হোকনা কেন—অহরহঃ একটা বিশিষ্ট ধরণের আকর্ষণ-বল প্রয়োগ করছে এবং ফলে প্রত্যেক জড় দ্রব্যের অভিমুখে অপর প্রত্যেক জড়দ্রব্যের ত্বরণ উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে নিউটনকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো: 'ক' ও 'খ' এর (অর্থাৎ একজোড়া জড়দ্রব্য বিশেষের) পরস্পরের প্রতি মহাকর্ষ-বলের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে কোন কোন রাশি দ্বারা এবং ঐ সকল রাশির সঙ্গে এই বলের নির্ভরতার প্রণালী কিরূপ? নিউটন এ প্রশ্নের এই উত্তর দান করলেন:—ওদের পারস্পরিক আকর্ষণ-বল নির্ভর করে প্রথমতঃ ওদের বস্তুমানের ওপর এবং দ্বিতীয়তঃ উভয়ের অন্তর্গত দূরত্বের ওপর। প্রত্যেকের বস্তু যে অনুপাতে বেশী হবে আকর্ষণ-বলটাও সেই অনুপাতে বড় হবে; আর পারস্পরিক দূরত্বের ব্যবধান যে অনুপাতে বেশী হবে আকর্ষণ-বলটা তার বর্গের অনুপাতে কমে যাবে। এর অর্থ এই যে, 'ক' ও 'খ'এর বস্তুমান যদি যথাক্রমে ব১ ও ব২ পরিমিত হয় এবং উভয়ের অন্তর্গত দূরত্বকে 'দ' বলা যায়* তবে ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-বলের মাত্রা নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাবে:

$$\text{মহাকর্ষ-বল} = \text{জ}\frac{\text{ব}_১ \times \text{ব}_২}{\text{দ}^২} \qquad (৪)$$

এই সূত্রটাকে মহাকর্ষের নিয়ম বলা যায়। এখানে 'জ' অক্ষরটাকে গ্রহণ করতে হবে দূরত্ব ও বস্তু নিরপেক্ষ একটা নির্দ্দিষ্ট রাশির প্রতীকরূপে—অর্থাৎ প্রত্যেকের বস্তু ১ পরিমিত এবং পারস্পরিক দূরত্ব ১ পরিমিত এইরূপ দুটা জড়দ্রব্য পরস্পরের প্রতি যে বিশিষ্ট আকর্ষণ-বল প্রয়োগ করে তার প্রতীক-রূপে। একে বলা যায় মহাকর্ষের ধ্রুবক (Constant of Gravitation)। একই গুরুত্বপূর্ণ রাশিটার মূল্য বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে নির্ভুলরূপে নির্ণীত হতে পেরেছে; সুতরাং উক্ত সমীকরণের প্রয়োগ উপলক্ষে ওর অন্তর্গত 'জ'-এর মূল্য জানা আছে বলে ধ'রে নেওয়া চলবে।

মহাকর্ষের নিয়ম (৪নং সূত্র) থেকে দেখা যায় যে 'খ'-এর বস্তু (ব) যদি সর্ব্বদা একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায়—১ পরিমিত হয় তবে 'খ,-এর ওপর 'ক'-এর আকর্ষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে শুধু 'ক'-এর বস্তুমান এবং 'ক' থেকে 'খ'-এর দূরত্ব দ্বারা। এই আকর্ষণ বলটাকে বলা যায় 'খ'-এর দূরত্বে বা 'খ'-এর ওপর 'ক,-এর আকর্ষণের প্রভাব। সুতরাং উক্ত সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, যে জড়দ্রব্যের বস্তু 'ব' পরিমিত তার কাছ থেকে 'দ' পরিমিত দূরে সরে গেলে ঐ স্থানে ঐ জড়দ্রব্যের আকর্ষণের প্রভাবটা—যাকে আমরা 'প্র' বলবো—নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হবে:

$$\text{প্র} = \frac{\text{জ} \times \text{ব}}{\text{দ}^২} \ldots\ldots\ldots (৫)$$

এই সূত্রটা ৪নং সমীকরণের অন্তর্গত এবং একেও মহাকর্ষের নিয়ম বলা যায়। এই সূত্র এই তথ্য প্রকাশ করে যে বস্তুবিশেষের কাছ থেকে যে অনুপাতে দূরে সরা যাবে ওর আকর্ষণের প্রভাব তার বর্গের অনুপাতে হ্রাস পেতে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা পৃথিবী ও বৃহস্পতি গ্রহের ওপর সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাবের তুলনা করতে পারি। সূর্য্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যত বৃহস্পতির দূরত্ব তার প্রায় ৫$\frac{১}{২}$ গুণ। ৫$\frac{১}{২}$-এর বর্গ হলো প্রায় ২৭; সুতরাং মহাকর্ষের নিয়মের (৫নং সূত্রের) সিদ্ধান্ত এই যে,

* পদার্থ দু'টা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হ'লে ওদের পারস্পরিক দূরত্বের অর্থ নিয়ে কোন বেগ পেতে হয় না। বৃহদায়তনের হলেও, যদি গোলাকার ও সমঘন হয়, তবে ওদের কেন্দ্রদ্বয়ের অন্তর্গত দূরত্ব দ্বারাই পদার্থদ্বয়ের অন্তর্গত দূরত্ব নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। বর্ত্তমান আলোচনায় সরলতার অনুরোধে, গ্রহউপগ্রহগণকে গোলাকার ও সমঘন পদার্থরূপ কল্পনা করা হয়েছে সুতরাং দূরত্ব বলতে সর্ব্বত্রই বুঝতে হবে ওদের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব।

পৃথিবীর ওপর (বা পৃথিবীর দূরত্বে) সূর্য্যের মহাকর্ষের প্রভাব যতটা হবে বৃহস্পতির ওপর হবে তার ২৭ ভাগের একভাগ মাত্র। সূর্য্যের গ্রহ-সংখ্যা ৯টি; তার মধ্যে সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ হলো বুধ এবং দূরতম হলো প্লুটো। প্লুটো সৌরজগতের সীমা নির্দ্দেশ করে ব'লে ধরে নিতে পারা যায়; কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাব ঐখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ৫নং সূত্র থেকে দেখা যায় যে জড়দ্রব্য বিশেষের আকর্ষণের প্রভাব একেবারে শূন্য পরিমিত হতে হলে ওর কাছ থেকে অনন্ত পরিমিত দূরে সরে যেতে হবে, কারণ তা হলেই ঐ সূত্রের ডান দিক্‌কার রাশিটা শূন্য পরিমিত হতে পারে। সুতরাং দেখা যায়—মহাকর্ষের প্রভাব দড়ির টানের মত কিম্বা আণবিক আকর্ষণের মত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু বিশ্বব্যাপী।

মহাকর্ষের নিয়মের সত্যতা পরীক্ষা

আমরা দেখলাম মহাকর্ষের নিয়ম নিউটনের একটা অনুমান মাত্র। কিন্তু অনুমান মাত্রকেই—তা যত উঁচু দরেরই হোক—পরিমাপের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষণ ও পরিমাপের অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল।* এ সম্পর্কে একটা পর্য্যবেক্ষণের ফল এইরূপ। আমরা দেখেছি মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর ওপর সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাব যতটা বৃহস্পতির ওপর ঐ প্রভাব তার প্রায় ২৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র, সুতরাং গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, সূর্য্যের অভিমুখে বৃহস্পতির ত্বরণটাও হবে পৃথিবীর ত্বরণের প্রায় ২৭ ভাগের একভাগ মাত্র। সত্যই ওদের ত্বরণের অনুপাত ১ : ২৭ কিনা তা' আমরা ওদের ঘূর্ণন-প্রণালীর তুলনা করে ৩নং সূত্রের সাহায্যে অনায়াসেই জেনে নিতে পারি। সূর্য্য থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব হলো পৃথিবীর দূরত্বের ৫এর এক-চতুর্থাংশ গুণ আর সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে বৃহস্পতির ঘূর্ণন-সংখ্যা হলো পৃথিবীর ঘূর্ণনসংখ্যার ১২ ভাগের এক ভাগ, কারণ পর্য্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, বৃহস্পতির বছর পৃথিবীর ১২ বৎসরের সমান; ফলে ৩নং সূত্র অনুসারে সূর্য্যের অভিমুখে বৃহস্পতির ত্বরণটা হবে পৃথিবীর ত্বরণের ৫ এক চতুর্থাংশ গুণের ১৪৪ ভাগের একভাগ বা ২৭ ভাগের একভাগ মাত্র। সুতরাং পর্য্যবেক্ষণের ফল এ ক্ষেত্রে মহাকর্ষের নিয়মের সত্যতা প্রতিপন্ন করলো।

আবার ভূপৃষ্ঠস্থ আম, জাম এবং গগনবিহারী চন্দ্রের ওপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব তুলনা করেও মহাকর্ষের নিয়মের সত্যতা প্রতিপন্ন হলো। পরিমাপে দেখা যায় যে, ভূকেন্দ্র থেকে আম জামের দূরত্ব (বা পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ) প্রায় ৪ হাজার মাইল আর চন্দ্রের দূরত্ব হলো প্রায় ২৪০ হাজার মাইল বা আম জামের দূরত্বের প্রায় ৬০ গুণ। ৬০এর বর্গ হলো ৩৬০০; সুতরাং মহাকর্ষের নিয়ম (৫নং সূত্র) অনুসারে চন্দ্রের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবটা হবে আমজামের ওপর আকর্ষণ প্রভাবের ৩৬০০ ভাগের একভাগ। ফলে ভূকেন্দ্রের অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণটাও হবে আমজামের ত্বরণের (বা সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট ত্বরণের) ৩৬০০ ভাগের একভাগ বা সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে ১ ইঞ্চির প্রায় ৯ ভাগের একভাগ মাত্র। সত্যই এই পরিমাণের ত্বরণ নিয়ে চন্দ্র ভূপ্রদক্ষিণ করছে কিনা তা জানতে পারি আমরা ঘূর্ণনগতি সম্পর্কীয় ৩নং সূত্রের সাহায্য নিয়ে এবং ঐ সূত্রের ভেতর চন্দ্রের দূরত্ব ও ঘূর্ণন-সংখ্যার মূল্য ব'সিয়ে দিয়ে। এ হিসাব আমরা পূর্ব্বেই করেছি এবং দেখেছি যে, পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণ বস্তুতঃই উক্ত পরিমাণের। এই মিল এবং এই ধরণের অন্যান্য বহু মিল মিলেমিশে মহাকর্ষের নিয়মের সত্যতা প্রতিপন্ন করলো।

৩নং ও ৫নং সমীকরণের তুলনা করে আমরা আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপার সম্পর্কে ৩নং সমীকরণের বাঁদিককার 'ত্ব' চিহ্নটা সূর্য্যের অভিমুখে গ্রহ বিশেষের ত্বরণের মাত্রা নির্দ্দেশ করে, আর ৫নং সূত্রের বাঁদিককার রাশিটা (প্র) ওর ওপর সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাব নির্দ্দেশ করে। কিন্তু গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে এই রাশিদ্বয় পরস্পরের সমান। সুতরাং এই সূত্র দু'টার ডান দিককার রাশিদ্বয়ও পরস্পরের সমান হবে। ফলে নিম্নোক্ত সম্বন্ধটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়:

$$\left(\frac{ভ}{৪০}\right)ব \cdots (৬)$$

এখানে 'ব' সূর্য্যের বস্তুমান নির্দ্দেশ করে সুতরাং একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি, 'ভ'ও একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি; সুতরাং এই সূত্রটা এই তথ্য প্রকাশ করে যে, সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে গ্রহবিশেষের ঘূর্ণন-সংখ্যার বর্গকে ওর দূরত্বের ঘনফল দ্বারা পূরণ করলে এই পূরণ-ফলটা সকল গ্রহের পক্ষেই সমান হবে। এই নিয়মটা মহাকর্ষের নিয়মের আবিষ্কারের পূর্ব্বেই কেপলার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমরা কেপ্‌লার-আবিষ্কৃত নিয়মত্রয়ের প্রথম নিয়ম সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। এটা হলো তার তৃতীয় নিয়ম। দেখা যায় মহাকর্ষের নিয়ম থেকে কেপ্‌লারের তৃতীয় নিয়মটা আপনি এসে পড়ে। নিউটন প্রতিপন্ন করলেন যে কেপ্‌লারবর্ণিত তিনটা নিয়মকেই মহাকর্ষের নিয়মের অন্তর্গত করা চলে। ফলে কেপলারের নিয়মসমূহ পরোক্ষভাবে মহাকর্ষের নিয়মের সমর্থন করলো। বস্তুতঃ এই সংক্ষিপ্ত নিয়মের ভেতর দিয়ে আমজামের ভূপতন ও চন্দ্রের ভূপ্রদক্ষিণ ব্যাপারই নয়, কিম্বা কেপ্‌লার-বর্ণিত সৌর-পরিবারের ভ্রমণ-প্রণালীই নয়, পরন্তু বহু কোটিগুণ দূরবর্ত্তী নক্ষত্র-নীহারিকানিচয়ের গতিবিধিও একসূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়লো। মহাকর্ষের নিয়মের মাহাত্ম্য বিশেষ করে এইখানেই।

* বর্ত্তমানকালে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রচারের ফলে নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম সংশোধনসাপেক্ষ নিয়মরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং আইনষ্টাইন প্রচারিত অপর একটি ব্যাপকতর নিয়ম অপেক্ষাকৃত নির্ভুল নিয়মের মর্য্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে।

গ্রহনক্ষত্রের বস্তুনিরূপণ

মহাকর্ষের নিয়মের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগস্থল হচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্রগণের বস্তু-নিরূপণ। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর বস্তুনিরূপণের কথা ধরা যাক। মহাকর্ষের নিয়ম (৫নং সূত্র) থেকে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাব (বা কোন পতন্ত দ্রব্যের ত্বরণের মাত্রা) নির্ভর করে পৃথিবীর বস্তুমান (ব) এবং ভূকেন্দ্র থেকে পতন্ত দ্রব্যটার দূরত্বের ('দ'-এর) ওপর। এই ত্বরণটা হলো, আমরা জানি, সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট পরিমিত এবং এই দূরত্বটা হলো প্রায় ৪ হাজার মাইল। সুতরাং উক্ত সমীকরণে এই মূল্য দু'টা এবং 'জ'-এর মূল্য বসিয়ে দিয়ে পৃথিবীর বস্তুনিরূপণ করা যায়। আবার পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণ নিরূপণ করেও পৃথিবীর বস্তুমান জানতে পারা যায়। এই ত্বরণ নিরূপণ করা যায়, আমরা দেখেছি, চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে ওর ঘূর্ণন-সংখ্যা এবং পৃথিবী থেকে ওর দূরত্ব পরিমাপ করে এবং ৩নং সমীকরণের সাহায্য নিয়ে। এ হিসাব আমরা পূর্ব্বেই করেছি এবং দেখেছি যে, পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণের মাত্রা সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১/১৩ ইঞ্চি পরিমিত। ভূকেন্দ্র থেকে চন্দ্রের দূরত্বও আমরা জানি ২৪০ হাজার মাইল। সুতরাং ৫নং সমীকরণে এই মূল্য দুটা এবং 'জ'-এর মূল্য বসিয়ে দিয়ে পৃথিবীর বস্তু হিসাব করে বের করতে পারা যায়। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, ৬-এর পিঠে ২১টা শূন্য বসালে যে সংখ্যাটা পাওয়া যায় পৃথিবীর বস্তু প্রায় তত টন। আরো দেখা যাবে যে, এই হিসাবের জন্য পৃথক্ ভাবে ৩নং ও ৫নং সমীকরণের সাহায্য না নিয়ে সোজাসুজি ৬নং সূত্র প্রয়োগ করলেও চলতে পারে, কারণ এই সূত্রটা পাওয়া গেছে, আমরা দেখেছি, উক্ত সমীকরণ দুটার সংযোগ সাধন করে।

অনুরূপ প্রণালীতে সূর্য্যের বস্তু নিরূপণ করা যায়। এজন্য গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে পৃথিবীর (বা অপর কোন গ্রহের) ঘূর্ণন-সংখ্যা (ন) এবং সূর্য্য থেকে ওর দূরত্ব (দ) পরিমাপ করতে হয় এবং তার থেকে—৬নং সমীকরণে এই পরিমাপের ফল দুটা বসিয়ে দিয়ে সূর্য্যের বস্তু (ব) জানতে পারা যায়। দেখা যায়, সূর্য্যের বস্তুমান পৃথিবীর বস্তুর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গুণ। অনুরূপ প্রণালীতে যুগ্ম নক্ষত্রের অন্তর্গত বৃহত্তর নক্ষত্র পরিবেষ্টনকারী ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রটির ঘূর্ণন পর্য্যবেক্ষণ করে প্রথমটির বস্তু নির্ণয় করা যেতে পারে এবং যে সকল গ্রহের —যেমন বৃহস্পতি বা শনির—এক বা একাধিক উপগ্রহ বিদ্যমান তাদের বস্তুমানও ঐ সকল উপগ্রহের ঘূর্ণনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করে, জানতে পারা যায়।

সৌরজগৎ ও পরমাণু-জগৎ

নক্ষত্রজগৎ ছেড়ে পরমাণু জগতের দিকে তাকালেও আমাদের একই চিত্রের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতি পরমাণুর ভেতর আমরা দেখতে পাই একটা বিশিষ্ট ধরণের কেন্দ্রমুখ বল এবং তার ফল-স্বরূপ বিরামহীন ঘূর্ণনগতি। আধুনিক বিজ্ঞান পরমাণু মাত্রকেই সৌরজগতের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিরূপে কল্পনা করে থাকে। মাঝখানে রয়েছে ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তুপিণ্ড। এই বস্তুপিণ্ডের তাড়িতাকর্ষণে বদ্ধ হয়ে, ওকে কেন্দ্র ক'রে সৌরজগতের গ্রহগণের মত, ঘুরে বেড়াচ্ছে ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট কতগুলি ইলেকট্রন্। এই হলো আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণুর চিত্র। ইলেক্‌ট্রনদের ঘূর্ণন-গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে কেন্দ্রস্থ বস্তুপিণ্ডের তাড়িতাকর্ষণ দ্বারা; কিন্তু এই বলটাও, মহাকর্ষ-বলের মতই, শূন্য-বাহিত-ক্রিয়ার বিশিষ্ট মূর্ত্তি এবং কুলম্বের পরীক্ষা থেকে প্রতিপন্ন হয়েছে, এর প্রভাবও, মহাকর্ষ-বলের মতই, দূরত্বের বর্গের অনুপাতে হ্রাস পেয়ে থাকে। বলতে পারা যায়, জগৎ-যন্ত্র পরিচালনার নিয়মগুলি ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই এক। সবাই চলতে চায় নিজের বেগের অভিমুখে কিন্তু সবাইকে অধীন হতে হয় কোন না কোন ধরণের কেন্দ্রমুখ বলের, ফলটা দাঁড়ায় ঘূর্ণনগতি ও কম্পনগতি। যদি প্রাথমিক বেগ না থাকতো তবে কেন্দ্রমুখ বলের ফলে বিচ্ছিন্ন জড়জগৎসমূহের ঘটতো ক্রম-সঙ্কোচন। যদি কেন্দ্রমুখ বল না থাকতো তবে নিশ্চেষ্টতা ধর্ম্মবশতঃ সবাই চলতো আপন বেগে আপন পথে, এবং তার ফল হতো মহাপ্রসারণ। উভয় কারণ মিলে মিশে এঁকে দিয়েছে জড়বিশ্বে এই বিচিত্ররূপ—এই ঘূর্ণন-প্রবণ ও কম্পন-প্রবণ নৃত্যরূপ।

অহমিকা (গল্প)

—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস

মফঃস্বলের এক ডাকবাংলো। তার প্রাঙ্গণটি বেশ প্রশস্ত। তার দু'খানি বড় বড় বাস করবার ঘর, সামনে প্রশস্ত বারান্দা। এইখানেই মফঃস্বল সফর করতে এসে বড় বড় রাজকর্মচারী বাস করে থাকেন। প্রাঙ্গণের মধ্যেই অপর পাশে গারাজ এবং আরদালি চাকর প্রভৃতির থাকবার জায়গা। সামনে দিয়ে বড় রাস্তা চলে গিয়েছে।

পূর্ব্বদিন রাত্রে জেলার হাকিম এসেছেন মফঃস্বলে সফর করতে। নাম তাঁর মিঃ অরুণ সেন। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। তিনি জাতি-চাকুরিয়া অর্থাৎ যাকে বলা হয়ে থাকে 'ইস্পাতের কাঠামো' সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি মিঃ সেন বলেই পরিচিত। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুইটি সঙ্গী! একজন স্থানীয় মহকুমার হাকিম, নাম দিগিন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অন্যটি স্থানীয় সার্কেল অফিসার, নাম ত্রিদিব বোস। একটি ডেপুটি, অপরটি সাব-ডেপুটি। উভয়েই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত।

তা' সত্ত্বেও ত্রিদিব বাবু ও দিগিনবাবুর স্বভাবের মধ্যে বিলকুল পার্থক্য বর্ত্তমান ছিল। কেউ ওপরওয়ালাকে খুসী করেন কাজ দিয়ে, কেউ বা তোষামোদ দিয়ে। কেউ দু'টোরই ব্যবহার করেন। দিগিন বাবুর পক্ষপাত ছিল দ্বিতীয়টির প্রতি, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, তোষামোদের মত এমন অল্প আয়াসে আশুফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। এ যেন শিবের মাথায় বিল্বপত্র দানের মত। কাজে ত্রুটি থাকুক নাই থাকুক, এই ঔষধটির প্রয়োগে ওপরওয়ালাকে এমন খুসী করে দেওয়া যায়, যে তাঁর হৃদয়ে সাত খুন মাপ করবার মত ঔদার্য্য সহজেই সঞ্চিত হতে পারে।

অপর পক্ষে ত্রিদিব বাবু ছিলেন একটু বেশী রকম আত্মসম্মান-বোধ-সম্পন্ন। বিনা বাধ্যবাধকতায় কারও কাছে নীচু হতে তাঁর নিতান্ত কষ্ট বোধ হ'ত। ওপর ওয়ালাকে সম্মান তিনি দেখাতে প্রস্তুত, কারণ সেটি তাঁর কর্ত্তব্য; কিন্তু নিলজ্জের মত তাঁর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে তাঁর আত্মসম্মান-বোধে রীতিমত আঘাত লাগত। কাজেই ভাল কাজে যা হয়, তার বেশী ওপরওয়ালাকে খুসী করবার তাঁর কোন গরজ ছিল না।

বেশ রাত্রেই তাঁরা সেদিন সদর হতে এসে সেই ডাক বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মিঃ সেন শুয়েছিলেন ডান দিকের বড় কামরাটায়, আর বাঁ দিকের কামরায় শুয়েছিলেন দিগিন বাবু ও ত্রিদিব বাবু। দু'জনে পাশাপাশি দুটো খাট দখল করে নিদ্রার আরাধনা করেছিলেন।

পরের দিন অতি প্রত্যুষেই ত্রিদিব বাবুর ঘুম ভেঙে গেল। অতি প্রত্যুষেই বলতে হবে, কারণ সে সময় তিনি সাধারণতঃ শয্যা ত্যাগ করতে অভ্যস্ত নন। এমন কি, ইতিপূর্ব্বেও তাঁর দিগিন বাবুর সঙ্গে একত্র রাত্রিযাপন একাধিক বার ভাগ্যে ঘটেছে; তাঁকেও এত প্রত্যুষে নিদ্রা বিসর্জ্জন দিতে তিনি দেখেন নি। তাই তাঁর রীতিমত বিস্ময় উৎপাদিত হ'ল—যখন তিনি দেখলেন যে, দিগিন বাবুর বিছানা পরিত্যক্ত। তিনি গোসলখানায় যে যান নি তাও নিশ্চিত, কারণ তার দরজা খোলা ছিল। অপর পক্ষে ঘরের দরজা উন্মুক্ত।

তবে কি তিনি বাহিরে গিয়েছেন? নিশ্চিত তাই হবে, কারণ অবস্থা আর ভিন্ন অনুমানের সুযোগ রাখে নি। এ চিন্তা মনে উদয় হতেই ত্রিদিব বাবুর বিলক্ষণ কৌতূহলের উদ্রেক হল। তাঁর ইচ্ছা হল জানতে, দিগিন বাবুর সেই প্রত্যুষে এমন কি বিশেষ আকর্ষণ থাকতে পারে যে ভোরবেলাকার লোভনীয় ঘুমের সঙ্গ হতেও বেশী ভাল লাগল তাঁর।

তিনি শয্যা পরিত্যাগ করলেন। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে দেখলেন বারাণ্ডার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ জনশূন্য। বেয়ারা চাপরাশী বা এই শ্রেণীর কোন লোকের তখনও আবির্ভাব হয় নি। তবে দিগিন বাবু গেলেন কোথায়?

যান নি তিনি কোথাও, প্রাঙ্গণেই ছিলেন। ভাল করে নজর করতে করতে সেই অস্পষ্ট আলোকে তিনি আবিষ্কার করলেন দিগিন বাবুকে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে পা টিপে টিপে তিনি গুটি গুটি চলেছেন আর মাঝে মাঝে পকেট থেকে ছোট ছোট ঢিল বার করে ছুঁড়ছেন।

এ কাজটির তাৎপর্য্য কি ত্রিদিব বাবুর হৃদয়ঙ্গম হল না। ভেবে কিন্তু তিনি কিছুই কিনারা পেলেন না। তাঁর মাথা খারাপ হল নাকি? সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি ডেকে উঠলেন, ওকি করছেন স্যর্!

যেমন এই কথা বলা দিগিন বাবু মন্ত্রস্পৃষ্টের মত সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং মুখে এমন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন যে বেশ বোঝা গেল—এ আচরণে তিনি নিতান্তই রুষ্ট হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ডান হাতের তর্জ্জনী দুই ওষ্ঠের ওপর স্থাপন করে সঙ্কেত পাঠালেন যে কথা বলতে তিনি নিষেধ করছেন। অপর পক্ষে হাতছানি দিয়ে ইসারায় তিনি তাঁকে কাছে ডাকলেন।

ত্রিদিব বাবু একান্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাঁর সেই সাঙ্কেতিক ইচ্ছা পরিপালন করলেন। এই ভাবে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে সেই কামরাগুলি হতে যতখানি দূরে যাওয়া সম্ভব সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের যা ব্যাখ্যা দিলেন, তাতে ত্রিদিব বাবুর অন্তরে প্রবল হাসির বেগ ঠেলা দিলেও এ-বিষয় তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন যে, দিগিনবাবু মতিভ্রান্ত হন নি।

সেই অপরূপ আচরণের ব্যাখ্যাটি হল এইরূপ : জেলা হাকিম অনেক রাত্রেই শয্যাগ্রহণ করেছেন, কাজেই ভোর বেলায় তাঁর নিরুপদ্রব নিদ্রার ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু পাখীগুলোর এমন স্বভাব যে, পূর্বদিক একটু ফর্সা হতে আরম্ভ করলেই তারা চঞ্চল হয়ে ডাকতে সুরু করে। বাংলোর প্রাঙ্গণে তাদের এই ধরণের উপদ্রবে সাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা। সেই কারণেই দিগিনবাবু অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা কর্ত্তব্য মনে করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি গুঁড়ি মেরে মেরে পাখীদের ধাওয়া করে প্রাঙ্গণ হতে সরাচ্ছিলেন।

এই ব্যাখ্যা শুনে ত্রিদিববাবু মনে মনে যথেষ্ট কৌতুক বোধ করলেও হাসির প্রবৃত্তিটাকে প্রাণপণ দমন করে ফেললেন, কারণ তা ভিন্ন ত' গত্যন্তর ছিল না। অপরের আচরণে উপহাস প্রকাশ অভদ্রতা, তার ওপর দিগিনবাবু তাঁর উপরিস্থ কর্ম্মচারী। সে-ক্ষেত্রে এখানে তা আরও অশোভন।

ভেবে দেখতে গেলে দিগিনবাবুর এই আচরণ তাঁর মতিগতির সহিত বেশ সামঞ্জস্য রাখে। সুতরাং ওপর-ওয়ালার প্রতি ভক্তিজ্ঞাপনের এই যে অভিনব রীতি, তাতে উপহাসের বস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকলেও আশ্চর্য্য হবার কারণ কিছু ছিল না। কিন্তু একটা জিনিষ তখনও ত্রিদিববাবুর কাছে পরিষ্কার হল না। মহকুমা হাকিমের এই ধরণের ভক্তিপ্রকাশে সম্পূর্ণ অনুমোদন থাকলেও, একাই তিনি তা সম্পাদন করতে সুরু করলেন কেন এবং তাঁকেও নিয়োজিত করলেন না কেন ? অবশ্য এটা তাঁর দিক হতে একটা মস্ত বড় স্বস্তির বিষয় ছিল, সে-রকম অনুরোধ আসলে খুব সম্ভব তাঁকে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হত, কারণ তাঁর আত্মসম্মান-বোধের সঙ্গে তার সংঘর্ষ লাগত।

জিনিষটা পরিষ্কার হতে কিন্তু বেশী দেরী লাগল না। দিগিনবাবুর পরবর্ত্তী আচরণ সেটা স্পষ্ট করে দিল। দিগিনবাবু তাঁর অদ্ভুত খেয়ালের প্রয়োজনীয়তাই শুধু বুঝিয়ে দিলেন না, তাঁকে একটা বিশেষ অনুরোধও জানালেন। বললেন, দেখ ত্রিদিব, তোমার একটা কাজ করতে হবে। যে কোন সূত্রে আমার এই পাখীতাড়ানর কথাটা সাহেবের কাণে তুলে দিতে হবে।

ত্রিদিববাবু তাঁর হাসির ইচ্ছাটাকে আবার একবার কষ্টে দমন করে নিয়ে বললেন,—আচ্ছা স্যর্, তা দেব এখন। বুঝলেন যে একা একা এ পুণ্য অর্জ্জনের উদ্দেশ্য হল—সাহেবের সুনজরে একাই পড়বার বাসনা রাখেন।

বেলা তখন ন'টা হবে। সেন সাহেব তখন শয্যাত্যাগ করে প্রাতরাশ শেষ করে প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত হয়েছেন। সে-দিন কথা ছিল মোটরযোগে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একটা গ্রামে তিনি একটি ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শনে যাবেন। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য একটি সভা আহ্বান হবে ঠিক হয়েছে। সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল ৯-৩০টা। ডাকবাংলা হতে সভাস্থানের দূরত্ব ৬ মাইল। কাজেই গ্রাম্য মাটির পথ হলেও আধ ঘণ্টায় তা' অতিক্রম করা খুবই সহজসাধ্য ছিল।

মোটরে তাঁরা রওনা হলেন। পিছনের গদিতে এক-পাশে সেন সাহেব, তার পাশে দিগিনবাবু ও অপর প্রান্তে ত্রিদিববাবু। সামনের গদিতে ড্রাইভার ও তার পাশে সাহেবের আর্দালি।

শক্তিসঞ্চয়টা মানুষের স্বভাবগত বৃত্তি না হলেও একটা দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা। এই স্পৃহা অল্প-বিস্তর প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই যেন দেখা যায়। সে-কালে মানুষ দৈহিক শক্তি অর্জ্জন করে এ-বিষয় তৃপ্তি পেত। এ-কালে দৈহিক শক্তি অপেক্ষা আর্থিক শক্তির মাহাত্ম্য বেশী। যে-আর্থিক বলে বলী, সে দৈহিক বলের ওপর অনায়াসে প্রভুত্ব অর্জ্জন করে। এই পথেই সাধারণ মানুষ শক্তি-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। অপর পক্ষে সে কালে এমন এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যেত, যাঁদের হাতে ভাগ্য জুটিয়ে দিত প্রচুর বল। এঁরা হলেন সে-কালের রাজা বা সামন্ত। তাঁদের সংখ্যা এ-কালে কমে এসেছে, যাও বা আছে তার শক্তি হয়ে গিয়েছে নানা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সঙ্কুচিত। তবু পৃথিবীতে এমনও স্থান আছে, যেখানে প্রায় সে-কালের রাজাদের শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র পাওয়া যায়। আমাদের বৈচিত্র্যে ভরা দেশ ভারতবর্ষ তার একটি।

মানুষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে দেখা যায়, তা তিন ভাবে সাধারণতঃ প্রয়োগ হয়। এমন মানুষ আছেন যাঁরা ক্ষমতা ব্যবহার করেন নিছক মানুষের কল্যাণ সাধনেই, তা ভিন্ন তাঁদের আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য থাকে না। এঁরা আমাদের নমস্য এবং সংখ্যায় এঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্পই। দ্বিতীয় শ্রেণীর একদল মানুষ আছেন যাঁদের কাছে মানুষের হিতসাধনাই ক্ষমতার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তা হয়ে পড়ে গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় নিজের অহমিকা-বোধকে ইন্ধন যোগান। এই শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর লোক ক্ষমতা ব্যবহার করে উপভোগের জন্য এবং এই উপভোগ তারা বেশী করে, ক্ষমতার কল্যাণ সাধনে নিয়োগে নয়, মানুষকে কল্যাণ হতে বঞ্চিত করবার পারদর্শিতায়। কোন কোন মানুষ যেমন অপরকে কষ্ট বা যন্ত্রণা দিয়ে সুখ পায়, এই শ্রেণীর মানুষ তেমন মানুষকে কল্যাণ হতে বঞ্চিত করার ক্ষমতার প্রয়োগ করতে সুখ পায়।

সেন সাহেব ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক। তিনি যে শক্তির আশ্রয়, সেই শক্তির বিপুলতা তাঁকে দিত প্রচুর আনন্দ। পেটুক মানুষ যেমন ভাল খাদ্য পেলে তা ধীরে ধীরে আস্বাদ গ্রহণ করে করে খায়, তিনি তেমন তাঁর ক্ষমতাকে কারণে অকারণে নানা উপলক্ষে ব্যবহার করে দেখতে ভালবাসেন। তার আস্বাদ গ্রহণ করে তাঁর অহমিকাবোধ প্রচুর চরিতার্থতা লাভ করত। এই দুর্ব্বলতাই তাঁর চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়ী মাইল দুই পথ অতিক্রম করে থাকবে। সেন সাহেবের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি-পথের আশেপাশে সকল বস্তুর প্রতিই সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চলেছেন। তাঁর এলাকায় জীবনযাত্রা কেমন নির্ব্বাহ হচ্ছে, আইন-কানুন ঠিকমত পরিপালিত হচ্ছে কি না, দেখবার জন্য তাঁর বিশেষ কৌতূহল। পথে এই ভাবে যেতে যেতে তাঁর নজরে পড়ল একটা মানুষ। সে একটা ধামাতে কি জিনিষ নিয়ে মাথায় করে চলছিল। সেন সাহেবের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন মানুষটা কি নিয়ে যাচ্ছে?

দিগিনবাবু বললেন—ফেরিওয়ালা হবে।

সেন সাহেব নির্দ্দেশ দিলেন গাড়ী থামাতে এবং ত্রিদিববাবুকে বললেন তাকে ডাকতে। ইতিমধ্যে লোকটা অনেকখানি তফাৎএ সরে গিয়েছে। ত্রিদিবের মোটেই ইচ্ছা করছিল না তাকে ডাকতে তার পিছু ছোটেন। আর্দ্দালির ওপরেই সে কাজটা দিলে তাঁর মনঃপূত হত। কিন্তু সাহেবের ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখতে তাঁর সাহসে কুলাল না। অগত্যা তিনি তার পিছনে ছুটে এবং চীৎকার করে ডেকে তাকে থামালেন এবং গাড়ীর কাছে ডেকে নিয়ে এলেন।

সেন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এতে কি আছে? লোকটা বললে, মুরগীর ডিম। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? উত্তর দিল, হাটে যাচ্ছে বেচতে।

কত দরে বেচ?

আজ্ঞে হালি ছ' আনা।

ছ' আনা! দেখছ দিগিন? আগে হালি ছিল কত? ছ' পয়সা বড়জোর। এ যে তার থেকে বড় বেশী বাড়িয়েছে দেখছি। এ যে একেবারে ব্ল্যাক-মার্কেট। একে প্রসিকিউট করা উচিত নয় কি?

ত্রিদিববাবু বললেন—তা দাম একটু চড়িয়েছে বৈ কি। কিন্তু স্যার ওই দাম ত ওরা পাচ্ছে। বাহিরের থেকে ঠিকাদার এসে বেশী দামে ডিম কিনে চালান দিচ্ছে।

তা হ'ক। আমার মনে হয়, বড় বেশী দাম নিচ্ছে। ওকে প্রসিকিউট করতে হবে। ওর নামটা টুকে নিন।

দিগিনবাবু বললেন কিন্তু স্যার একটা ত মুস্কিল আছে। Rule 8 এ ওর ত দাম কণ্ট্রোল করে কোন অর্ডার আপনি দেন নি। সে ক্ষেত্রে মকর্দ্দমা ত চলতে পারে না।

তাই না কি? তাই না কি? ও বিষয়ে আপনার ত আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, প্রসিকিউট না করা হক ওকে বকে দিন, আর বলে দিন যে, হালি যেন চার আনার বেশী না বেচে।

দিগিনবাবু জানতেন যে ওইরকম বকে দেওয়ায় কিছুই কাজ হবে না। তবু তাকে বকে দিলেন, রীতিমতই বকে দিলেন। আর সেই সঙ্গে বকে দিলেন ত্রিদিববাবুকে—তিনি কেন note দেন নি যে, মফঃস্বলের ডিমের দর অত্যন্ত চড়ে গিয়েছে। এবং বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সহরে গিয়েই যেন সাহেবকে এ বিষয় control-এর জন্য একটা note দেওয়া হয়।

এইভাবে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। ডিমওয়ালা ধমক খেয়ে চলে যাবার পর গাড়ী আবার ছেড়ে দেওয়া হল।

গাড়ী আবার চলতে সুরু করেছে। ৯-৩০টা প্রায় বাজতে চলেছে। সেন সাহেবের সেদিকে তত ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি রাস্তায় নজর রাখতে রাখতে চলতে ভালবাসেন। তিনি বলেন পথ চলাটাও কাজে লাগাতে হয় পথে কাজের সন্ধান রাখলে কাজ জুটেও যায় এবং সেই কাজ পথে যেতে যেতে সারতে পারলে, পথভ্রমণটাও সম্পূর্ণ সার্থক করা যায়।

পথে যেতে যেতে এক গোয়ালাকে যেতে দেখা গেল সে বাঁকে করে কলসী ভরা দুধ নিয়ে যাচ্ছিল। সেন সাহেব এই সূত্রে কাজের সন্ধান পেলেন। তিনি বললেন গাড়ী থামাতে। ত্রিদিববাবু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে গন্তব্য স্থানে পৌছবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে সেন সাহেব তাতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না।

অগত্যা গাড়ী থামল এবং গোয়ালাকেও থামতে বলা হল। কিন্তু জাতে গোয়ালা, তার বুদ্ধি ছিল মোটা সে থামল না, হন হন করে চলতে সুরু করল। বলা বাহুল্য, তার সেইরূপ আচরণ সেন সাহেবের অহমিকা বোধকে করল প্রচণ্ড রকম আঘাত। তিনি বললেন তাকে জানিয়ে দিতে—তিনি কে এবং এখনি তাকে কাছে এসে হাজির হতে বলতে।

আসলে হয়েছিল কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যেখানে

গন্তব্য স্থান সেখানেই সেই গোয়ালার ছিল যাবার কথা। দারোগাবাবুর হুকুম ছিল ৯টার মধ্যে সেখানে দুধ পৌঁছে দেবার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জন্য যে চা-পার্টি হবে তাতে সেই দুধ কাজে লাগবে। মফঃস্বলে দারোগার চেয়ে প্রতাপশালী লোক গোয়ালার বুদ্ধির অগোচর। সময় হয়ে গিয়েছে, বেচারী তাই হন্ত দন্ত হয়ে এক নিঃশ্বাসে ছুটে চলেছে। এখন সে যখন দেখল যে টুপি পরা তিনটি লোক একটা মোটরে বসে মোটর থামিয়ে তাকে কাছে আসতে বলছে সে তাদের কথায় থামবার কোন গরজ বোধ করল না। অন্য সময় হলে হয়ত থামত, কিন্তু দারোগার হুকুম তার মনে তখন এতবড় জায়গা দখল করে বসেছিল যে, আরও প্রতাপশালী কোন জীবের আবির্ভাবের সম্ভাবনা তার মনে আসে নি।

সাহেবের হুকুম তালিম করতে আর্দ্দালি ছুটল। সঙ্গে ছুটলেন দিগিনবাবু, কারণ তাঁর প্রভুভক্তি প্রকাশের রীতিটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। লোকটা তবু থামতে চায় না। শেষে আর্দ্দালি গিয়ে হাতে ধরে তাকে থামায় এবং দিগিনবাবু তখন তার নিকটস্থ হয়ে গিয়ে তাকে বকতে সুরু করলেন।

তিনি বললেন, এই বেটা, তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়, জেলার হাকিম তোকে ডাকলেন আর তুই থামলি না।

সে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বেশ জোর গলায়ই বলে উঠল, রেখে দেন আপনার হাকিম। ওসব আমি বুঝি না, দারোগার হুকুম, এখনি দুধ নিয়ে যেতে হবে, আমি দাঁড়াতে পারব না।

তিনি বললেন, দাঁড়াতে পারবি না কিরে বেটা, তোর ঘাড় দাঁড়াবে। জেলা হাকিমের পাশে আবার দারোগা কি রে?

বিপুল বিস্ময় প্রকাশ করে সে বললে, সে কি বাবু? হাকিম দারোগার ওপরে না কি?

দিগিনবাবু বুঝিয়ে দেন, জেলা হাকিম ওপরে বলে ওপরে, রীতিমত ওপরে। দারোগা যদি হয় ছেলে, ত সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টার তার বাপ, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তার ঠাকুরদা, আর জেলা হাকিম সেই ঠাকুরদার বড় ভাই।

এই বিশ্লেষণ এমন বোধগম্য ভাষায় তার কর্ণগোচর হল, যে তার মনে রীতিমত রেখাপাত করল। তার ধারণা হল, সত্যই একজন বড়গোছের লোকের সেখানে আবির্ভাব হয়েছে। সে তখন ফিরতে রাজী হল এবং ঘুরে এসে গাড়ীর কাছে দাঁড়াল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাকে ডেকেছিলেন হয়ত ডিম ওয়ালাকে তিনি যে ধরণের জেরা করেছিলেন সেই ধরণের কোন জেরা সুরু করবেন বলে। এটা ছিল চোরা বাজারের যুগ এবং সকল সামগ্রীর মূল্য-নিয়ন্ত্রণ তাঁদের কাজের একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গোয়ালার আচরণ তাঁকে করেছিল রীতিমত রুষ্ট এবং গোয়ালার সহিত দিগিনবাবুর বাদানুবাদ এমন উচ্চৈঃস্বরে সম্পাদিত হয়েছিল যে, তারও সারাংশ তাঁর কর্ণগোচর হয়ে গিয়ে তাঁকে করে তুলেছিল আরও বেশী উত্তেজিত। সেই কারণে কাজের কথা তাঁর আর মনে হল না, আরও বেশী প্রয়োজনীয় বোধ হল এই অজ্ঞ গোয়ালার রূঢ়তার প্রতিবিধান করা।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, লোকটা ভারি বেয়াদব এবং তাকে শিক্ষা দেবার একান্ত প্রয়োজন। ডাকা হক স্থানীয় চৌকিদার-দফাদারকে। ত্রিদিব বাবু একবার স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে গন্তব্য স্থানে যাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, চৌকিদার দফাদারকে ডাকতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু তাতে ফল হল না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তার অশিষ্টতার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাটাই তখন সব থেকে প্রয়োজনীয় বোধ হল।

সুতরাং গোয়ালাকে সেখানে নজরবন্দী রাখা হল এবং আর্দ্দালি ছুটল স্থানীয় চৌকিদার ও দফাদারের তল্লাসে। দু'জন চৌকিদার ও একজন দফাদার এসে হাজির হল বটে কিন্তু তাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন—সেই অশিষ্ট গোয়ালাটাকে স্থানীয় দারোগার কাছে হাজির করতে এবং জানাতে যে তার বিষয় কি ব্যবস্থা হবে, তা তিনি দারোগাকে মুখে জানাবেন।

বেচারী গোয়ালা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাদের অনুসরণ করল, সে কি অপরাধ করল সেটা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না।

আবার মোটর চলল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে এসে উপস্থিত হল। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী ওয়াহেদ আলি এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন। নীল পোষাকধারী শীর্ণকায় চৌকিদার-গুলো লাঠি ধরে সারবন্দি দাঁড়িয়ে। তারা হল হাকিমের গার্ড অফ্ অনার। মৌলবী সাহেব সেলাম দিয়ে বললেন, গুড্ মর্ণিং স্তর। মিঃ সেন তাঁর করমর্দ্দন করে বললেন গুড মর্ণিং।

মৌলবী সাহেব বললেন, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে স্তর। রাস্তায় কোন বিপদ্ ঘটেনি ত?

মিঃ সেন বললেন,—না, কিন্তু আপনার ইউনিয়নের লোকগুলো মোটেই শিক্ষিত নয়।

প্রেসিডেণ্ট সাহেব বললেন, সে ত জানি স্তর। সেই

জন্যই ত এবার প্রাইমারি স্কুল বসিয়েছি। আপনাকে সেটা দেখতে হবে।

হাকিম বললেন, আমি সে শিক্ষার কথা বলছি না। আপনার দেশের লোকগুলো এমনি অজ্ঞ যে, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কতখানি ক্ষমতা তাও জানে না।

প্রেসিডেণ্ট সাহেব বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বললেন, সে কি হুজুর, তাও কি হয়? হুজুর হলেন মাষ্টার অফ দি ডিষ্ট্রিক্ট। তিনি দিগিন বাবু ও ত্রিদিব বাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছিল শুর্ ব্যাপারটা? ত্রিদিব বাবু সংক্ষেপে সেই গোয়ালার কাণ্ডের কথা বললেন। প্রেসিডেণ্ট সাহেব গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন যে সেই বেটা গোয়ালার আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে, হাকিম যখন মিটিং-এ বসবেন, সেই আসরে গিয়ে, তিনি নিশ্চিত তার একটা ব্যবস্থা করবেন। সে গোয়ালা তাঁর চেনা লোক, তার ওপরই দুধ আনার ভার পড়েছিল, চা-পার্টির জন্য।

নিজের প্রতিশ্রুতিমত প্রেসিডেণ্ট তখনই থানায় গিয়ে দেখেন যে, চৌকিদার ইতিমধ্যে রামহরি গোয়ালাকে হাত-বাঁধা অবস্থায় থানায় এনেছে এবং দারোগা বাবু তাকে নানা কৌশলে জেরা করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন সে কি অপরাধটা করেছে।

চৌকিদার তার সবিস্তার কিছু জানে না, তা বোঝাবে কি করে? তারা কেবল জানায় যে হাকিমের হুকুমে তাকে তারা ধরে এনেছে। রামহরির কথা হতেও বিশেষ কিছুর কিনারা পাওয়া যায় না, কারণ সে নিজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি তার অপরাধটা কি। সে যা বলল তার মর্ম্মার্থ হল এই যে, সে দারোগার হুকুম তামিল করতেই বেশী ব্যস্ত ছিল এবং তিনটা টুপি-পরা লোক যখন তাকে থামতে বলেছিল সে থামতে রাজী হয়নি। প্রেসিডেণ্ট ঘটনার সবই শুনে এসেছেন। কাজেই এ ব্যাপারটা দারোগার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল; প্রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে ব্যাপারটা তিনি শুনলেন।

শুনে তাঁর ক্ষোভ এল, হাসিও পেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অশিষ্টতা প্রদর্শন হল তাঁর ক্ষোভের কারণ, আর গোয়ালার নির্ব্বুদ্ধিতা তাঁর হাসির কারণ। তিনি রামহরিকে বললেন, বেটা কেন এই গোলমাল করতে গেলি। যখন সাহেবরা ডাকল, থামলি না কেন?

রামহরি বললে—আমি কি করে জানব হুজুর, যে দারোগার থেকে বড় কেউ থাকতে পারে? আর আপনার ত হুকুম ছিল তাড়াতাড়ি আসবার।

তিনি বললেন, তা হুকুম থাকলেই বা, জেলা হাকিম যে তোকে থামতে বলেছিল।

সে বলে, কি করে বুঝব হুজুর যে জেলা হাকিম আপনার ঠাকুরদার বড় ভাই।

কেন, মাথায় টুপি ত দেখেছিলি?

তা টুপি দেখে বুঝব কি করে হুজুর? পাটের বাবুদেরও ত মাথায় টুপি থাকে, তারা কি আপনার থেকে বড় নাকি?

দারোগা বাবু হতাশ হ'য়ে পড়েন, বলেন, সাধে কি লোকে গয়লা বলে, বেটার বুদ্ধি এখনও পাকে নি। যাই হক্, তিনি আর এক সমস্যায় পড়েন, রামহরিকে ধরে আনাও হয়েছে। তার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে সে হয়ে পড়েছে জেলা-হাকিমের ক্রোধভাজন। সে ক্রোধবহ্নির উপশমের জন্য প্রয়োজন তার জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু ঘটনা হতে যা পাওয়া যায়, তাতে ত দণ্ডবিধি আইন অনুসারে কোন অপরাধ হয় না। অঘটনঘটনপটীয়সী যে ডি. আই. রুল্, তার মাপদণ্ডেও ত একে অপরাধ বলা চলে না। অগত্যা উপায়?

তিনি প্রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ চাইলেন। তিনি সদুপদেশই দিলেন, বললেন, এ ক্ষেত্রে আসামীকে খোদ জেলা হাকিমের কাছে হাজির করে আদেশ প্রার্থনা করাই ভাল, তা হলে নিজের কোন দায়িত্ব থাকে না।

সুতরাং দড়ি-বাঁধা হাতে রামহরিকে দারোগা বাবু মিঃ সেন এর কাছে হাজির করলেন। সেন সাহেব তাকে দেখে নিতান্ত বিরক্তিভরে নির্দ্দেশ দিলেন যে, সেই impertinent blighterকে প্রসিকিউট করতেই হবে।

কিন্তু দারোগা পড়লেন মুস্কিলে। হুকুম ত হল, কিন্তু অবস্থা ত পরিষ্কার হল না একটুকু। প্রসিকিউট করবে কোন্ আইনের কোন ধারা অনুসারে সেইটাই ত হল সমস্যা। সে বিষয় একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ না হলে ত তাঁর চলে না। অগত্যা বেপরোয়া হয়েই তাঁকে এ বিষয় নির্দ্দেশ চাইতে হল।

সেন সাহেব দিগিন বাবুকে বললেন, এ বিষয় একটা নির্দ্দেশ দিতে। ফলে দিগিন বাবু পড়লেন একটু মুস্কিলে তিনি ত ঘটনার সবই জানেন। এ ক্ষেত্রে দারোগার চোখে যে সমস্যাটা দেখা গিয়েছিল, সেটা তাঁর মনেও উদয় হল। সুতরাং সোজা মানুষ হলে তাঁর বলা উচিত ছিল যে ঘটনায় মামলা রুজু করবার মত মসলা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর প্রভুভক্তি একটু উগ্র ধরণের। তিনি এই অসুবিধার প্রতি মিঃ সেনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেই ক্ষান্ত হলেন না, প্রস্তাব করলেন—এমন একটা গল্প খাড়া করলে কেমন হয় যে রামহরি দুধ বেচতে রাজি হয় নি। তাতে সুবিধা ছিল এই যে তা হলে সেটা ডি. আই. রুলের বিধান মতে হয়ে পড়ে একটা অপরাধ।

সেন সাহেব কিন্তু অতদূর যেতে রাজী ছিলেন না। এমন মিথ্যা রচনাকে তাঁর বিবেক অনুমোদন করতে রাজী ছিল না, তা হ'ক না কেন তিনি রাজকর্ম্মচারী হয়েও অপমানিত হয়েছেন; অথচ তাঁর অহমিকা-বোধে যে আঘাত লেগেছে, তার প্রতিবিধানেরও একটা ব্যবস্থার তিনি প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন! তাই তিনি নির্দ্দেশ দিলেন তখনকার মত তাকে হাজতে পাঠাতে, পরে ভেবে দেখা যাবে কি করা যায়।

অপর পক্ষে দারোগা ও প্রেসিডেন্টের সহানুভূতি ছিল রামহরির ওপর। কারণ, সে ছিল স্থানীয় লোক, তাঁদের অনেক সেবা করে সে তাঁদের স্নেহভাজন হয়েছে। তাই তাঁরা এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে রাজী হতে পারলেন না।

দারোগা অব্যাহতির একটা সুযোগ খুঁজছিলেন; তিনি বললেন, কিন্তু ওর পাঠিয়ে লাভ কি? যেমনি হাকিমের কাছে যাবে ও জামিন পাবে, আর হাকিম যদি জামিন নাই দেন, জজ-সাহেব ত নিশ্চয় দেবেন। তখন ব্যাপারটা আরও লজ্জার হয়ে দাঁড়াবে।

ত্রিদিব বাবুর সহানুভূতি ছিল লোকটার প্রতি প্রচুর। তিনি ত সবই জানতেন। তিনি খুব বুঝতে পেরেছিলেন যে লোকটার অজ্ঞতাই এই বিপদের মূল। তিনিও দারোগার কথাগুলির যথার্থতার প্রতি সেন সাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন এবং আরও বললেন যে,সাহেব যখন দিগিন বাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করেন না, সে ক্ষেত্রে এখানে ধমকে ছেড়ে দেওয়াই সব থেকে যুক্তিযুক্ত কাজ হবে।

দারোগা ও প্রেসিডেন্ট সাহেব একটা পথ খুঁজে পেলেন। তাঁরা প্রচণ্ড উৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন এবং বেশ রঙ ফলিয়ে বর্ণনা দিলেন যে,রামহরিকে তার অশিষ্টতার জন্য ইতিমধ্যেই তাঁরা রীতিমত ভর্ৎসনা করেছেন এবং পরে আরও শক্ত রকম শিক্ষা দিয়ে দেবেন।

ফলে সেন সাহেবের মনে দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার আবির্ভাব হল! একদিকে অশিষ্টতার জন্য শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তি, অপর দিকে আইনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতায় সেই প্রবৃত্তিকে কাজে পরিণত করবার অসামর্থ্য। সেই দোটানায় পড়ে তিনি কিছুই স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতে সক্ষম হলেন না। তিনি রইলেন নিরুত্তর।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি দারোগা এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে গোয়ালাকে নিলেন সেখান হতে সরিয়ে এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব সেই সঙ্গে মিঃ সেনের মনে প্রফুল্লতা সঞ্চারের জন্য সমারোহ সহকারে চা-পার্টির ব্যবস্থা করলেন।

শ্রীবোধায়ন-কবি-কৃত ভগবদজ্জুকীয়

(প্রহসন)

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

[উপোদ্‌ঘাত—সংস্কৃত-নাট্য-সাহিত্যে প্রহসনের অভাব না থাকিলেও উল্লেখযোগ্য প্রহসন বিরল; কারণ, অধিক-সংখ্যক প্রহসনই অযথা গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট। আলোচ্য প্রহসনখানি সেরূপ নহে। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য—অধিকাংশ সংস্কৃত প্রহসনের ন্যায় ইহার হাস্যরস কেবল শব্দাশ্রিত নহে—কিন্তু ঘটনা-সংশ্রিত।

এই প্রহসন-রচয়িতা বোধায়ন-কবি কে, কোন্ সময়ের ও কোন্ দেশের লোক—তাহা জানিবার কোন উপাদান বর্ত্তমানে আমাদিগের হস্তে নাই। তিনি যে ঋষি বোধায়ন (যিনি বোধায়ন সূত্র ও ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন) হইতে ভিন্ন—এরূপ অনুমান অনেকে করেন। এ অনুমানের পোষকতা আমরাও করি। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, কবি বোধায়নও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ও সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। ভগবদজ্জুকীয় প্রহসনখানি ও উহার উপর একটি টীকা 'জয়ন্তমঙ্গল পালিয়-গ্রন্থমালা' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই সংস্করণ অবলম্বনেই ভাষান্তর করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

'ভগবদজ্জুকীয়'—নামটির অর্থ কৌতূহলকর। 'ভগবদ্'-তত্ত্বজ্ঞানী যোগী সন্ন্যাসী। অজ্জুকা—গণিকা। সন্ন্যাসী ও গণিকার সমন্বয় কিরূপে ঘটিল—তাহা রসভঙ্গ ভয়ে মুখবন্ধে বলা হইল না—কৌতূহলী পাঠকবৃন্দ গ্রন্থমধ্যেই তাহার বিবরণ পাইবেন।] *

গ্রন্থারম্ভ

হরিঃ শ্রীগণপতয়ে নমঃ॥

(বিঘ্ননাশ হউক)

প্রহসনোক্ত পাত্রবর্গ

সূত্রধার—রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ

বিদূষক—ঐ সহকারী, হাস্যরসিক

পরিব্রাজক—যোগী পুরুষ

---

* প্রহসনখানির রচনা-শৈলীর উপর মহাকবি ভাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। টীকাকারের নাম অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি আপনাকে গুরু বায়ু মন্দিরপতি-স্তুতি-রচয়িতা বিখ্যাত নম্বুদ্রি পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টের (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী) শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রহসন-কার যে বোধায়ন-কবি—ইহা টীকাকারের বাক্যেই প্রকাশ।

শাণ্ডিল্য—ঐ শিষ্য
যমপুরুষ—যমের দূত
রামিলক—নাগরক, বসন্তসেনার প্রণয়ী
বৈদ্য—বিষ ঝাড়ান ওঝা
বসন্তসেনা—তরুণী গণিকা
মধুকরিকা } —গণিকার চেটীদ্বয়
পরভৃতিকা }
মাতা—গণিকার মা

[নান্দী অন্তে সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার। (ভগবান্) রুদ্রের সদা অচ্ছিন্ন চরণ তোমাকে রক্ষা করুক! ঐ চরণ নানা সুলক্ষণান্বিত—সুরবরগণের মুকুটস্থিত ইন্দ্রনীলাদি মনোহর রত্নের প্রভা-সংস্পৃষ্ট আর ঐ পদের অঙ্গুষ্ঠ রাবণকে অবনমিত করিয়াছিল।

[রাবণ একদিন বলদর্পে কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের প্রয়াস করিলে দেবাধিদেবের অঙ্গুষ্ঠের চাপে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া যান—পরে দেবদেবের বহু স্তুতি করিয়া উদ্ধার পান।]

এই ত আমাদের গৃহ! প্রবেশ করা যাক। [প্রবেশ] বিদূষক! বিদূষক!

[বিদূষকের প্রবেশ]

বিদূষক। আর্য্য! এই যে আমি।

সূত্রধার। এস্থান নির্জ্জন ত? তা হ'লে তোমায় একটা প্রিয় সংবাদ দিতে পারি।

বিদূষক। আর্য্য! দেখে বলছি। (নিষ্ক্রান্ত)

[পুনরায় প্রবেশ] এ স্থান (খুব) নির্জ্জন।

প্রিয় (সংবাদটি) তা হ'লে বলুন, আর্য্য!

সূত্রধার। শোন। আজ এক লক্ষণজ্ঞ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমাকে আদেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ তখন আসছিলেন নগরের বাইরে থেকে। অনেক সিদ্ধ পুরুষের উপদেশে তাঁর জ্ঞান জন্মেছে। (তাঁর আদেশ)—'আজ হ'তে সাত দিনের দিন রাজবাড়ীতে তোমার অভিনয় হবে। তারপর তোমার (নাট্য) প্রয়োগে পরিতুষ্ট রাজার দেওয়া বিপুল সম্পত্তি তুমি পাবে'। ঐ ব্রাহ্মণ সত্যোপদেশক ব'লে (তাঁর কথায়) আমার উৎসাহ জন্মেছে। আমি (তাই) সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করব।

বিদূষক। আর্য্য! আপনি এখন কোন্ নাটকের অভিনয় করবেন?

সূত্রধার। এইখানেই ত আমার চিন্তা। নাটক আর প্রকরণ হ'তে উৎপন্ন (দশ শ্রেণীর নাট্যরচনা)—বার, ঈহামৃগ, ডিম, সমবকার, ব্যায়োগ, ভাণ, সল্লাপ, বীথী, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক আর প্রহসন,—এই দশ শ্রেণীর নাট্যরস মধ্যে হাস্যই প্রধান ব'লে দেখতে পাচ্ছি*। তাই প্রহসনেরই প্রয়োগ করব।

বিদূষক। আমি নিজে লোককে হাসির খোরাক জোগাই বটে, কিন্তু প্রহসন জানি না।

সূত্রধার। তা হ'লে তুমি শেখো। অশিক্ষিতের পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব নয়।

বিদূষক। তা হ'লে—আর্য্যই আমাকে উপদেশ দিন।

সূত্রধার। আচ্ছা।

জ্ঞানলাভের উদ্দেশে সংযতচিত্ত হ'য়ে সৎপথে গমনশীল (ব্যক্তির) অনুগমন কর।

[নেপথ্যে] শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য!

সূত্রধার। যেমন শিষ্য এই যোগেশ্বর দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পরিব্রাজকের (অনুসরণ করছে)।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

আমুখ সমাপ্ত

প্রথম অঙ্ক

[অতঃপর পরিব্রাজকের প্রবেশ]

পরিব্রাজক। শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য! [পশ্চাতে দেখিয়া] দেখা ত যাচ্ছে না। অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত এর পক্ষে (এই) উচিত বটে! কেন?

দেহ রোগের আধার—জরার বশগত—অদৃশ্য অন্তক-দ্বারা অধিষ্ঠিত; নিত্য (নানা) বিঘ্নের দ্বারা এর (ভোগ্য) বিষয়গুলি অনুভবের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে, ঠিক যেন সতত-প্রবৃত্ত নদীপ্রবাহে কোন (তীর) তরুর আশ্রয়ভূত তীরভূমি উৎখাত হ'য়ে গিয়েছে। অনেকগুণ সুকৃতদ্বারা এমন (দেহকে) পেয়ে—দেহাত্মবোধে গর্ব্বিত ও বল-রূপ-যৌবন গুণে উন্মত্ত যে (ব্যক্তি) তিনি দেহের সে (দোষগুলি) দেখতে পান না।

অতএব, বেচারীর কোন অপরাধ নেই। আবার জোরে ডাকি—শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য!

[অতঃপর শাণ্ডিল্যের প্রবেশ]

শাণ্ডিল্য। ভোঃ! প্রথমতঃ, আমি এমন এক বংশে জন্মেছি, যে বংশ ব্রাহ্মণ্য মাত্রে পরিতুষ্ট (অর্থাৎ নামেই ব্রাহ্মণ-বংশ), উচ্চ প্রেতপিণ্ডের অবশিষ্টাংশ ভোজনে

*টীকাকার অর্থ করিয়াছেন—নাটকসমূহের প্রকরণ গ্রন্থ (অর্থাৎ ভরতশাস্ত্র ভরত-নাট্যশাস্ত্র) হ'তে সঞ্জাত দশশ্রেণীর নাট্য রচনা। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে—নাটককে প্রকৃতি, অবশিষ্ট নয় প্রকার নাট্য-রচনাকে বিকৃতি বলা হইয়াছে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে 'বার' ও 'সল্লাপকে'র নাম পাওয়া যায় না। তবে প্রকরণ বলিয়া এক শ্রেণীর নাট্য-রচনার উল্লেখ আছে। এই কারণে আমরা পূর্ব্বোক্ত-রূপ ভাষান্তর দিয়াছি।

সমৃদ্ধ, অক্ষর-সংস্পর্শ-রহিত-জিহ্বা-বিশিষ্ট ও কণ্ঠদেশে লম্বিত যজ্ঞোপবীতযুক্ত [অর্থাৎ—আমার বংশের লোকেরা প্রেতের পিণ্ড দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোজন করিয়া পুষ্টিলাভ করে ; ইহাদের কাহারও কাহারও জিহ্বায় কোন অক্ষর উচ্চারিত হয় না ; ইহাদের গলদেশে যজ্ঞোপবীত লম্বিত কেবল তাহাতেই ইহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়]। তারপর, দ্বিতীয়তঃ, আমাদের গৃহে ভোজনাভাবে ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে প্রাতরাশের লোভে এক শাক্য শ্রমণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি তারপর, সেখানেও দাসীর পুত্রদের এক বেলা ভোজনের ফলে ক্ষুধিত হ'য়ে তাকেও পরিত্যাগ ক'রে চীবর ছিঁড়ে ফেলে পাত্র উঠিয়ে* ছাতাটি মাত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। তার পর, তৃতীয়তঃ, এই দুষ্ট আচার্য্যের ভাণ্ডভার-বাহী গর্দ্দভ হ'য়েছি। তা (এখন) অদূরে গত ভগবান্‌কে সম্মানিত করি। কোথায় বা গেলেন ভগবান্? আ! এই দুষ্ট তপস্বিবেশধারী প্রাতরাশের লোভে একাকীই ভিক্ষা করিতে পূর্ব্বেই গিয়াছে ব'লে মনে করি। [পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া] এই যে ভগবান্! [নিকটে যাইয়া] ভগবন্! প্রসন্ন হ'ন, (অপরাধ) ক্ষমা করুন।

পরিব্রাজক। শাণ্ডিল্য! ভয় নেই, ভয় নেই [ক্রমশঃ

*চীবর—বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পরিধেয় কষায় বস্ত্র, কন্থা ইত্যাদি। পাত্র—ভিক্ষার পাত্র। চীবর ছিঁড়িয়া ফেলা, পাত্র উঠাইয়া ফেলা—ভিক্ষুধর্ম্ম পরিত্যাগের লক্ষণ

"বিজয়ী" ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সারা পৃথিবীতে গত ছয় বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের যে তাণ্ডব চলিতেছিল, তাহা অবশেষে নিবৃত্ত হইয়াছে। পরাজিতের পক্ষে পরাজয়ই প্রচণ্ড আঘাত, তাহার উপর তাহার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিজেতা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাও স্বাধীন জাতির পক্ষে কম ক্ষোভের কথা নয়।

বিজেতা জাতিমণ্ডলের আর কোনও সুখ না থাকুক দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হইয়াছে, শত্রু পরাজিত হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট উল্লাসের কারণ।

আর্থিক ক্ষতি বিশেষতঃ সহর, পল্লী, মানবের জীবন নির্ব্বাহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্পকেন্দ্র, যন্ত্রপাতি, যান-বাহন, পুল, রেলপথ, তড়িৎ উৎপাদন-কেন্দ্র প্রভৃতি বহু মূল্যবান বস্তু নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা গিয়াছে তাহা বিবদমান দুই পক্ষেরই গিয়াছে। কিন্তু বিজিতের নিকট তাহার কতকাংশ আদায় করিবার উপায় থাকে বিজেতার।

ভারতবর্ষের অবস্থা কি? সে কি বিজিত? না বিজেতা?

এই প্রশ্নের অনেক উত্তরই উহ্য রাখিতে হয়, কারণ যুদ্ধ শেষ হইলেও, ভারত সরকার নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, ভারতরক্ষা আইনের কোনও অংশও রদবদল করা হয় নাই। সুতরাং অনেক কথা বলিবার থাকিলেও বলা যায় না।

মানিয়া লইতে হইবে, আমরা জিতিয়াছি, কারণ এত প্রচারের পর তাহা না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধ জয় করিয়া আমাদের যে দুরবস্থা, তাহার তুলনা কোথাও নাই।

আমরা যুদ্ধে "জিতিয়াছি"—আমাদের বিশ লক্ষ লোক "স্বেচ্ছায়" যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। দেশের অন্ন-বস্ত্র, জীবনধারণের যাবতীয় উপকরণ উজাড় করিয়া দিয়া আমরা যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছি, নিজেদের কিছু রাখি নাই, পঞ্চাশ লক্ষ লোককে আমরা অনাহারে বলি দিয়াছি। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের শতকরা ৭৫ জনের ভাগ্যে অর্দ্ধাহার, স্বাস্থ্যের অনুপযোগী খাদ্য জুটিয়াছে। রোগে ঔষধ জোটে নাই, দেহের আচ্ছাদনের বস্ত্র, ঘর মেরামতের দড়ি বাঁশ এমন কি অন্ত্যেষ্টির ব্যয়ও অনেকের জোটে নাই। এ সকলের পরের অবস্থাটা কি?

সরকারী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় এখনও কতগুলি কমিটী এই সমস্যা আলোচনা করিয়া নির্দ্দেশ দিবে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইলেও সকল সমিতির সমস্ত সভ্য আজও নির্ব্বাচিত হয় নাই। এই সকলের মধ্যে প্রত্যেক কমিটি কি সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান আলোচনা করিবে, তাহা স্থির হয় নাই ; সুতরাং তাঁহাদের রিপোর্ট সুপারিশ (recommendation) পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই সকল নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য সুরু করিতে এ যুদ্ধে হইল না, পরের যুদ্ধাবসানে দেখা যাইবে।

যুদ্ধে আমাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, শিল্প এবং শিল্প-সংশ্লিষ্ট কাঁচা মালের। এবার যুদ্ধে লাগে নাই এমন বস্তুই ছিল না, সুতরাং যাহা পুনরায় পরিপূরিত হইবার নহে

এরূপ দ্রব্যাদির ক্ষয় পাওয়ায় দেশের দারুণ অমঙ্গল হইয়াছে। খনিজ সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি বিশেষতঃ কয়লা, লৌহ, ক্রোমাইট, ম্যানগানিজ প্রভৃতি যত ক্ষয় হইয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহা অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর ধন উৎপাদনে সহায়তা করিতে পারিত।

সমস্ত যন্ত্রপাতি দারুণ ভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় তাহাদের পরমায়ু কমিয়াছে, উৎপাদিকা শক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এসকল যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তে যে কেবল নূতন যন্ত্রপাতি পাইবার উপায় নাই, তাহা নহে। কোনও কোনও অংশ পরিবর্তন করিতে গেলেও অন্য দেশ হইতে পাইবার আশা কম। দেশীয় শিল্পপতিদিগের কয়েকজন এবং ভারতের উন্নতিবিধানের ভারপ্রাপ্ত সভ্য স্যার আরদেশীর দালাল ইউরোপ আমেরিকা ঘুরিয়া নূতন যন্ত্রপাতি, শিল্পে দক্ষ লোক পাইবার আশ্বাস পান নাই। সুতরাং আমাদের দেশের যন্ত্রপাতি লইয়া আমরা যখন বিব্রত থাকিব, সেই সময় বিদেশী মাল আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিবে। যতদিনে আমাদের দেশের শিল্প আবার কর্ম্মকুশল হইবে ততদিনে বহুকোটী টাকা বিদেশীকে আমাদের দেওয়া হইয়া যাইবে এবং বিদেশী মালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দাঁড়াইবার জন্য আমাদের শিল্পের বহুতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে

ভারতসরকারের নাম দিয়া বিদেশী শক্তি আমাদের শিল্প-প্রচেষ্টায় যে-সকল বন্ধন সৃষ্টি করিত, যুদ্ধের চাপে তাহার কিছুটা শ্লথ করিয়াছিল মাত্র! যুদ্ধোত্তর অবস্থায় তাহারা যাহা করিবে, তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা শুনিতে পাই, যুদ্ধ উপলক্ষ্যে দেশের লোকের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে? প্রথম কথা, যাহাদের এই সৌভাগ্য হইয়াছে, ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় তাহারা নগণ্য। দ্বিতীয় কথা, যাহাদের প্রচুর হইয়াছে, তাহারা বংশানুক্রমে ভোগ করিবে বটে, কিন্তু চাষী, ছোট শিল্পী, সরকারের কণ্ট্রাক্টরদের যে-সকল লোক মাল সরবরাহ করিত, তাহারা অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত কিছুই রাখিতে পারে নাই। চাষীরও সেই অবস্থা। কৃষিপণ্যের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য; কিন্তু যেখানে সরকার ক্রেতা সেখানে পাটই হউক, তুলাই হউক আর ধানই হউক, নিয়ন্ত্রিত দরে কৃষককে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। যাহাদের নিজ প্রয়োজনের পর ধান চাউল উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাদের অবস্থা বরাবরই স্বচ্ছল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নামমাত্র। বাকী যাহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অন্ন উৎপাদন করিতে, বা বৎসরের কতকটা প্রয়োজন ক্রয় করিয়া মিটাইতে হয়, তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। যদি কোনও একটা কৃষিপণ্যে কিছু দর বেশী পাইয়া থাকে, তাহার প্রয়োজনের আরও পঞ্চাশটা বস্তু ক্রয় করিতে সে কেবল দরিদ্রীভূত নয়, দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

যাহারা নিয়মিত কাজ করে, নির্দ্দিষ্ট বেতনে যাহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। কিছু মাগ্‌গি ভাতা কেহ কেহ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্রব্যমূল্য যে হিসাবে বাড়িয়াছে, মাগ্‌গি ভাতা সে অনুসারে কিছুই নয়। তাহার ফলে মধ্যবিত্ত ও গরীব যাহার যে ঋণ ছিল, তাহা চতুর্গুণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলে থাকে, সুতরাং ভাত কাপড়, ঔষধ ও ছেলেমেয়ের শিক্ষা, ঘর মেরামত, আত্মীয়তা রক্ষা এবং অপরাপর সামাজিক কার্য্যের দ্রব্যাদি সংগ্রহে যাহাতে ব্যতিব্যস্ত থাকে, সরকারের নিকট যুদ্ধের সময় এরূপ অবস্থার একটা আবেষ্টনীর প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া গেলেও এই নিগড় দূর করা ইচ্ছা মাত্রেই যে হওয়া সম্ভব নয়! কাজে কাজেই এই সম্প্রদায় আরও নিষ্পেষিত হইয়া পড়িবে।

আমাদের জাতীয় ঋণ শোধ হইয়া ইংরেজ জাতির নিকট ১,৩২০ কোটি টাকা জমা হইয়াছে বলিয়া আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয় ইহা আমাদের বিরাট সমৃদ্ধির লক্ষণ! ইহার কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা সন্দেহের বিষয়; গত যুদ্ধে আমরা ইংরেজকে ১৯০ কোটি টাকা দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহা ছাড়া এই টাকা দিয়া আমরা অন্য দেশে মালপত্র কিনিতে পারিব না: ইংরেজের দেশে এই পরিমাণ টাকার মালপত্র কেনা বাধ্যতামূলক; আর এই টাকা নগদ আমাদিগকে দিবার ইংরেজের কোনও আগ্রহ নাই। সুতরাং "পরহস্তগতং ধনং" "কার্য্যকালে সমুৎপন্নে", কোনও কাজেই লাগিবে না। অথচ ইহার উপর "নোটের গোছা" প্রচলিত হইয়াছে। তাহার ক্রয়শক্তি কমিয়াছে, সুতরাং লোকের আয়বৃদ্ধিতে লাভের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এই টাকার প্রকৃত মালিক ভারতসরকার, কিন্তু সাধারণ লোকের যে ঋণ চাপিয়া গেল, তাহা শোধ করিবার জন্য ইহা পাওয়া যাইবে না, সুতরাং প্রজার দুর্দ্দশা সমানেই চলিবে। গুরু কর বসাইয়া ভারত শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ বিরতির-সঙ্গে ইহার চাপ হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া গত দশ বৎসর ধরিয়া যে সকল নূতন কর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা জাতিগঠন-মূলক (nation building) কাজে লাগিবে বলিয়া সূত্রপাতে বলা হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত জাতিগঠনের কাজে তাহা কতদূর লাগিয়াছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য যান-বাহন, মজা নদী, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, ধনোৎপাদন প্রভৃতি কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

যুদ্ধবিরতিতে বর্ত্তমান ব্যয় হ্রাস হইবে বলিয়া বিশ্বাস। যুদ্ধের ব্যয় যোগাইতে যাহা খরচ করিতে হয়, তাহা সকল সময় করিতে হইলে দেশ নিঃস্ব হইয়া যাইত সুতরাং ইহাতে অতি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, যুদ্ধ শেষে তাহাদের বেতন, পেন্সন, পুরস্কার প্রভৃতি ভারতের ব্যয়। এ অর্থের পরিমাণ কম নয়; কাজেই যুদ্ধ না থাকিলেও, যুদ্ধের ব্যয় বহু পরিমাণে আমাদের বহন করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া বাজারে দ্রব্যমূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা হ্রাস হওয়ার কোনও লক্ষণ নাই।

যুদ্ধান্তে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, কয়বৎসর পূর্ব্বে তাহারা বেকারই ছিল, সত্য কথা। কিন্তু হঠাৎ আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা যে ভাবে জীবন যাপন করিতে শিখিয়াছে, নিজ নিজ সংসারে যতটা সাহায্য করিয়াছে, তাহার অর্থ সংগ্রহ করা এখন দুঃসাধ্য হইবে। ইহার ফল-স্বরূপ সামাজিক অশান্তি বিপদগ্রস্ত পল্লীবাসীকে বিপর্য্যস্ত করিবে।

সমস্যা আরও বহু রকমের রহিয়াছে; সমস্ত বিবৃত করার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধ জয় করিয়া এমন বিব্রত কেহ নহে। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ নাই। কারণ যে সকল স্থান আনন্দ-মুখর, ভারতকে সেখানে কেহ ডাকে না। যুদ্ধ জিতিয়া আমরা শত্রুর কোনও দেশের সাম্রাজ্যের কোনও অংশ পাইলাম না; তখন আমাদের কথা কেহই স্মরণ করিল না। শত্রুর সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা হইল, তখন তাহার অংশ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া আমাদের কেহ মনে করিল না। সুতরাং যুদ্ধজয়ের আসল আনন্দ নাই। তাহার পর যাহা থাকে তাহা অবসাদ; অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি দেশ শিল্পের উন্নতি করিয়াছে, আমাদের দেশে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে; যাহা ছিল, তাহা বিপন্ন। যুদ্ধের মাল-মশলা সরবরাহ করিতে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, স্বাস্থ্য, সঙ্গতি, শিক্ষা সবই নষ্ট হইয়াছে। এই দারুণ দুর্ব্বিপাকের ফল-স্বরূপ রাজকোষের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, দেশের আর্থিক অবস্থা মন্দ হইয়াছে।

হতভাগ্য এই দেশ, জয়ী হইয়াও ভারত আজ বিজিতের অপেক্ষা হীন; সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ত্যাগ, ক্লেশ, বিপদ, আপদ সহযোগিতা সত্ত্বেও জয় তাহার ভাগ্যে কোনও সুখ কোনও আনন্দ লিখে নাই।

ইন্‌স্পেক্টার আসছেন (গল্প)

শ্রীজগদিন্দ্র মিত্র

পত্রখানি পড়েই হেডমাষ্টারবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ডাকলেন —বিরাজবাবু!

বিরাজবাবু এ্যাসিষ্টেন্ট হেডমাষ্টার। বয়স বেশী, একটু ফাঁক পেলেই ঝিমিয়ে নেন। ক্লাস ছিল না, বিশ্রাম ঘরের টেবিলের উপর পা তুলে বসেছিলেন। অপর্য্যাপ্ত পানের রস ঠোঁট গড়িয়ে পড়ছিল।

চমকে উঠলেন, হাতের তালুতে মুখটা মুছে নিলেন।

—আমাকে ডাকছেন।

চিঠিটা এগিয়ে দিলেন হেড মাষ্টার।—পড়ুন। চিঠিটা এসেছে ইন্‌স্পেক্টরের অফিস থেকে। ভ্রমণের তালিকায় ছক রয়েছে এতে। ৮ই জুলাই আসবেন তিনি।

বিরাজবাবু বললেন—তাই তো। আট তারিখ ইন্‌স্পেক্টার আসছেন। আজ হল ২৬ তারিখ; মাত্র আর ১২ দিন রয়েছে হাতে।

চিন্তার কারণ আছে যথেষ্ট। স্কুল বেশী দিনের নয়। গ্রামের দলাদলির মধ্যে কোনমতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মাসিক ৯০৲ টাকা সাহায্য সঞ্চয় হয়েছে অতি কষ্টে। অনেক তদ্বির করতে হয়েছে এর জন্য। সাহায্যের জের টেনে চলতে হয় প্রতি মাসে। হিসাব প্রতি মাসে পাঠাতে হয়, কাগজ ঠিক রাখতে হয়, ঝঞ্ঝাট বেড়েছে। কোন কিছুই ঠিক রাখা হয় নি এতদিন। মাষ্টারদের হাজিরা খাতার পাতা সাদা রয়েছে, কালির দাগ পড়ে নি একটিও। এ সব গেল কাগজপত্রের হাঙ্গাম। তা ছাড়া বাইরের ঝামেলাও রয়েছে অনেক। বাঁশের বেড়া মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গিয়েছে, মাটির ধারি বৃষ্টিতে ভেঙ্গে গিয়েছে, ক্লাসে ক্লাসে ময়লা জমে রয়েছে অনেক। কাজ অনেক। সব ঠিক করে নিতে হবে এর মধ্যে। এ সব নিয়ে বেনামী অভিযোগ পর্য্যন্ত ইন্‌স্পেক্টারের দপ্তরে পৌঁচেছে। সব কিছু ঠিক মত না রাখলে বিরুদ্ধপক্ষের অভিযোগের জোর হবে। সেক্রেটারী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু নৈরাশ্যের কুয়াশায় কর্ম্ম-উদ্যম হারালে চলবে না তাঁর, এই বিশৃঙ্খলার রূপকেই ঘসে মেজে শৃঙ্খলায় রূপান্তরিত করতে হবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

—দেখুন হেডমাষ্টার বাবু আপনারা সবাই মিলে খেটেখুটে কাগজ-পত্রগুলি ঠিক করে ফেলুন; আমি ঘরদোরের ব্যবস্থা করছি। হেডমাষ্টার উত্তর দিলেন মৃদুভাবে:—কাজ ত অনেক, কিছুই ঠিক নেই।

—ক'দিন সময় আছে?

—মাত্র দশ বারো দিন।

—এ ত কম নয়। আচ্ছা বেশ, এক কাজ করুন, এই ক'দিন ক্লাসে কাউকে পড়াতে হবে না; দরকার হয় দু' চারদিন ছুটি দিয়ে দিন।

কর্ম্ম-উদ্দীপনায় সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। স্থৈর্য্য তাদের বিলীন হয়ে গিয়েছে। মাথা গুঁজে কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সব; দু' তিন বৎসরের রেজেষ্টারী নূতন করে লিখতে হবে, ভুয়া ছাত্রের নাম দিয়ে সংখ্যাও বাড়িয়ে তুলতে হবে, নইলে আরো সাহায্য প্রাপ্তির দাবী করা চলবে না। হেডমাষ্টার বার বার চক্কর দিয়ে যাচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন।

—গ্রাণ্টের জন্য এবার জোর 'ফাইট' করব।

কথাটা শুনে আসছেন মাষ্টারেরা অনেক দিন থেকে। সাহায্য এর মধ্যে বাড়ে নি, অতি প্রথমেই সাহায্যের অঙ্কপাত হয়েছিল, সেই রয়েছে। তবু মাষ্টারেরা অনেকখানি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। ছাত্রের বেতনের উপর নির্ভর করা চলে না। গাঁয়ের স্কুল, সবাইএর দাবী আছে, অল্পবিস্তর ভাগদারীরও আছে, পুরা মাইনে কেউ দিতে চায় না। মাইনে যা উঠে খুবই অল্প, সেই

অনুপাতে ভাগ করে নেয় মাষ্টাররা। সাহায্য না বাড়লে বেশী বেতন পাবার আশা নেই। তাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করছে সব।

সতীশ বিদ্যারত্ন স্কুলের হেড পণ্ডিত। ইংরাজী ভাল জানেন না ক্লাস চালানোর মত শিখে নিয়েছেন বৃদ্ধ বয়সে, নইলে পদে পদে অসুবিধে। রেজেষ্টারী তৈরী করতে বারে বারে ভুল করেন, উপস্থিতি-অনুপস্থিতির হিসাব তাঁর বারে বারে গুলিয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে উঠলেন—দুত্তোর!

—কি হল পণ্ডিত মশাই!

—ও ছাই আমি বুঝি নে।

—কিসের কথা বলছেন।

—এই যে তোমাদের হিসেব-পত্তর।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে ডাক শুনা গেল—পণ্ডিত মশাই। হেড মাষ্টার বাবু ডাকছেন। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পণ্ডিত মশায়।

—আজ্ঞে।

—একবার শুনে যাবেন।

নিজের ঘরে হিসাব-পত্রের আবর্ত্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন হেড মাষ্টার বাবু। টেবিলের উপর খাতাপত্র ছড়িয়ে রয়েছে, সব মিলিয়ে দেখতে হবে, স্কুলের আদ্যোপান্ত ইতিবৃত্তের এক রিপোর্ট তৈরী করতে হবে। তাছাড়া ইংরেজীতে এক অভিনন্দনও লিখতে হবে।

মুখ তুলে চাইলেন—বসুন। একটু থেমে বললেন—আপনার রেজেষ্টারী ঠিক হয়ে গিয়েছে?

—আজ্ঞে আর একটু।

হেড মাষ্টার বাবু হেসে ফেললেন—খুব মুস্কিলে পড়েছেন বুঝি?

—তা একটু।

—আপনাকে আর দেখতে হবে না। অন্য কাউকে দিয়ে আমি করিয়ে নিব। তবে শুনুন।

—আজ্ঞে।

—আপনাকে একটা কাজের ভার নিতে হচ্ছে।

পণ্ডিত মশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন—কিসের ভার?

—ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে গাঁয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হবে। সংস্কৃতের অভিনন্দনটা আপনাকেই লিখে দিতে হবে! কি, পারবেন না?

—পারবো।

খুব ভাল করে লিখবেন। শুনেছি ইন্‌স্পেক্টার বাবু সংস্কৃত খুব পছন্দ করেন। স্কুলের অবস্থা, দেশের অবস্থা, ইন্‌স্পেক্টার বাবুর জ্ঞান-গরিমার কথা—কি বলব আপনাকে, বুঝে শুনে লিখবেন। হেড মাষ্টার বাবু থামলেন।

হেড পণ্ডিত একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—তা আমি লিখব, কিন্তু একটা কথা আছে।

—বেশ বলুন।

—আজ্ঞে আমার বেতনের কথাটা একবার—

হেড মাষ্টার বাবু জোরে হেসে উঠলেন—এর জন্য ভাববেন না। আমি নিজে বলব আপনার কথা। তবে দেখুন—

—আজ্ঞে।

—অভিনন্দনটা পরশুর মধ্যে চাই। সহর থেকে ছাপিয়ে আনতে হবে, বাঁধাতে হবে। ভাল কথা, সভার মধ্যে আপনাকেই কিন্তু পাঠ করতে হবে।

সতীশ পণ্ডিতের বাড়ী মণ্ডল কাচান। স্কুল থেকে দশ মিটের পথ। বংশপরম্পরায় বাস করছেন। গোটা মুলুকটায় তাঁদের যজমান, বহু অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এখন। এর উপর কোনরকমে টিকে থাকা যায় মাত্র, কোন প্রাচুর্য্যের বিলাস আর চলে না। স্কুলে পণ্ডিতি করেন কিন্তু যজমানের বাড়ী খাবার ছুটি তাঁর বরাদ্দ, কোন বাধা হয় না স্কুল থেকে।

চৌধুরীদের বাড়ী সেদিন আর গেলেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে নিলেন তাড়াতাড়ি। তেলের প্রদীপ জ্বেলে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। অভিনন্দন লিখতে হবে।

কলম তুলে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন! কি লিখবেন মনে আসছে না, ভাষা তাঁর বারে বারে হারিয়ে যাচ্ছে। শব্দযোজনা যথাযথ হচ্ছে না। ভাষার স্রোত শব্দের উপলখণ্ডে ব্যাহত হচ্ছে বারে বারে, সমগ্রতার দ্যোতনায় ভাষা তাঁর প্রাণময় হয়ে উঠছে না। শুষ্ক, নীরস, কতিপয় শব্দের সমষ্টি মাত্র। গতিবেগ নেই এতে, ধ্বনির লালিত্য নেই এতে। অস্বস্তিতে কপালে রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। এক অস্থির উত্তেজনায় স্নায়ুপুঞ্জ চঞ্চল হয়ে উঠল। আরো স্বচ্ছ, আরো সাবলীল গতিময় ভাষা তাঁর চাই!

চশমা ভাল করে মুছে নিলেন। ন্যুব্জ দেহ সোজা করে নিলেন। অসমাপ্ত লেখা ছিঁড়ে দিলেন, কুটি কুটি করে। বিদ্যারত্নের মর্য্যাদা অনুযায়ী ভাষা তাঁর হয় নি। প্রদীপের সলতে উসকে দিলেন, আবার লিখতে হবে।

পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল সুরুচি। পণ্ডিত মশায় টের পান নি।

—শুতে যাবেনা।

—কে? পিছন দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—কি হয়েছে?

—কি লিখছ?

—একটা অভিনন্দন। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব আসছেন।

—সে কে?

পণ্ডিত মশায় হেসে বললেন—স্কুলের বড় কর্ত্তা। এবার বোধহয় মাইনে আমাদের বাড়বে! হেড মাষ্টার বাবু বলেছেন।

—আজ থাক, কাল না হয় লিখবে।

—তা হয় না।

—রাত যে অনেক হয়ে গিয়েছে।

সুরুচির দিকে চেয়ে পণ্ডিত মশায় মৃদু হাসলেন। সুরুচি অপ্রস্তুত হয়ে গেল, বিদ্যারত্নের মৃদু হাসির অর্থ সে জানে। তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম ভাগে কাব্য-আলোচনায় বিনিদ্র রাত বিদ্যারত্নের কেটেছে। সুরুচি এসে এক একবার বলত—রাত অনেক হয়েছে।

মৃদু ভাবে হেসে বলতেন পণ্ডিত মশায় কিন্তু আমার যে লেখা শেষ হয় নি।

—কাল লিখবে!

—এতে যে আনন্দ পাওয়া যায় না সুরুচি। রস মাত্র জমে উঠেছে, শুনবে একটু।

প্রতিবাদ করতে বাধত সুরুচির. বিদ্যারত্নের পাশে এসে বসত—আমি কি বুঝব।

—মধু মিষ্টি, না জেনে খেলেও মিষ্টি লাগে। আচ্ছা শুন। আমি লিখেছি—

বিদ্যারত্নের অনুচ্চকণ্ঠের আবৃত্তিতে ঘরের বাতাস কেঁপে উঠত, আবেশে তাঁর দৃষ্টি উদাস হয়ে উঠত। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেত সুরুচি। সত্য, না জেনে খেলেও মধু মিষ্টি লাগে!

একটু স্তব্ধ থেকে সুরুচি বলল—অনেকক্ষণ লিখেছ, একটু জিরিয়ে নাও। তামাক এনে দি।

—দাও।

তামাক দিয়ে সুরুচি বাইরে এসে দাঁড়াল। সমবেদনার আবেগে তার চোখ সজল হয়ে উঠল, অবস্থার নানা বিপর্য্যয়ে বিদ্যারত্নের কাব্যপ্রীতি শিথিল হয়ে গিয়েছে। স্বীয় কাব্যরচনায় তন্ময় হয়ে থাকবার স্বপ্ন তাঁর আজ স্তিমিত। যজমান বাড়ীতে পূজা, বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে তাঁর দিন কাটছে। স্কুলে পণ্ডিত

হয়েছেন মাত্র। আর নেই তাঁদের, অর্থরিক্ততায় বিদ্যারত্ন ম'শায় শুষ্ক. কাব্য আলোচনা তিনি ভুলে গিয়েছেন। কাব্য পড়েন না, রাত জেগে লেখেনও না।

ঘন ঘন খাতাকে টান দিয়ে চললেন পণ্ডিত মশায়। নিজের পুরাতন রচনা খুলে বসলেন। কি চমৎকার! প্রতিটি শব্দ ঝঙ্কার তুলে চলেছে, মধুর সঙ্গীতের মত বেজে উঠেছে তাঁর রচনা। সুসমঞ্জস সঙ্গতির বাঞ্জনায় অপূর্ব! কোন জটিলতা নেই, আবর্ত্ত নেই, ছেদ নেই, স্রোতস্বিনীর মত সাবলীল, ভাবের খাদে শব্দের স্রোত এগিয়ে চলেছে। নিজেই বিস্মিত হলেন, এত চমৎকার তাঁর রচনা! শিরা উপশিরায় রক্তস্রোত উষ্ণ হয়ে উঠল। বাক্যের সুমধুর বাঁধনে ভাষাকে প্রাণময়, গতিময় করে তুলতে হবে তাঁর।

লিখে চললেন পণ্ডিত মশায়, পাতার পর পাতা লিখে ফেললেন। তাঁর ভাষা যেন আবার ধরা দিয়েছে, শক্তি তাঁর ফিরে পেয়েছেন, অনভ্যাসের মরুচেধরা প্রতিভা তাঁর আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অক্ষরের পর অক্ষর বসিয়ে মালা গেঁথে চলেছেন তিনি। অভিনন্দন গৌণ হয়ে গিয়েছে। আত্মতৃপ্তিতে, প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল, তাঁর প্রতিভা আজও ম্লান হয়ে যায় নি, মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল মাত্র। আবার প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। ভাষার সঙ্গীতে বিচিত্র ভাব-পুঞ্জের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে যেন, প্রকাশের বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তারা, রসানুভূতর অতি-ইন্দ্রিয়ক খুশীতে পণ্ডিত মশায় সব কিছু ভুলে গেলেন। কোন গ্লানি তাঁর নেই, দুঃখ নেই, নিবিষ্ট চিত্তে বসে রইলেন পণ্ডিত মশায়।

অভিনন্দন লেখা কখন শেষ হয়ে গিয়েছিল খেয়াল ছিল না তাঁর। হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। তাইতো রাত অনেক হয়ে গিয়েছে, চারিদিক শান্ত হয়ে গিয়েছে। ছেলে-পুলেদের সঙ্গে সুরুচি নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। শুদ্ধ হয়ে চেয়ে দেখলেন সুরুচির কর্মক্লান্ত মুখ! কেমন অপরূপ মনে হচ্ছে তাঁর কাছে—শান্ত, করুণ, নির্ম্মল!

মৃদুস্বরে ডাকলেন—সুরুচি।

সুরুচি চমকে উঠল—এ কি তুমি এখনও ঘুমোও নি!

—না।

—অসুখ করবে যে!

আবার স্নিগ্ধ ভাবে হাসলেন বিদ্যারত্ন মশায়। এ কথার জবাব দিলেন না,—অভিনন্দন লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। শুনবে এসো।

বহুদিন পরে আবার বিদ্যারত্নের ঘরে অনুচ্চকণ্ঠের আবৃত্তি ধ্বনিত হয়ে উঠল। আবেগে বিদ্যারত্নের স্বর কেঁপে উঠল। কালের স্বরস্রোতকে ফাঁকি দিয়ে আবার তাঁদের পুরানো দিনের রঙ্গীন মুহূর্ত্তগুলি মূর্ত্ত হয়ে উঠল।

মুগ্ধ হয়ে গেল সুরুচি। শুদ্ধ হয়ে চেয়ে রইল পণ্ডিত মশায়ের দিকে।

—কেমন হয়েছে সুরুচি!

—অপূর্ব!

—আরো হয়ত ভাল লিখতে পারতুম কিন্তু সে দম আর নেই, ফুরিয়ে গিয়েছে।

বিদ্যারত্নের একখানা হাত সুরুচি নিঃশব্দে টেনে নিয়ে বলল—মিছে কথা।

—মিছে নয়, সত্যি। তবু মনে হচ্ছে আমি বই লিখব।

—তাই লিখো।

স্কুলের ভোল এ কয়দিনে ফিরে গেছে। মাঠ পরিষ্কার, পুকুরের চারিপারে জঙ্গল আর নেই, ভাঙ্গা বেড়া নূতন হ'য়ে গিয়েছে। কলাগাছ পুঁতে গেইট তৈরি হয়েছে, লাল শালুর উপরে তুলায় লেখা 'Welcome' টানানো হয়েছে। আর ১১টার সময় আসবেন ইন্‌স্পেক্টর সাহেব।

ভোর বেলায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পণ্ডিত মশায়। শিষ্যদের বাড়ী থেকে একজোড়া চটি পেয়েছিলেন তিনি, তুলে রেখে দিয়েছিলেন। বের করলেন, ধুলো জমে রয়েছে,—একটু পরিষ্কার করে দিও। আজ খালি পায়ে ভাল দেখাবে না।

দশটা বাজতেই তিনি তৈরি হয়ে নিলেন, গায়ে সাদা চাদর, শুভ্র উপবীত, পরণে পরিষ্কার কাপড়। স্কুলে সবাই তখন চাপা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সেক্রেটারী মশায় ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন। জমিদার বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মাছ ধরানো হয়েছে; চা খাবার বন্দোবস্তও রাখা হয়েছে। তবু যেন তিনি স্থির থাকতে পারছেন না, ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

নিঃশব্দে বিশ্রাম-ঘরে এসে বসলেন পণ্ডিত মশায়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না, হেড মাষ্টার মশায় ডেকে পাঠালেন। হেসে বললেন—এই দেখুন, আপনার অভিনন্দন ছাপিয়ে আনা হয়েছে। আপনাকে সভায় পড়তে হবে একবার পড়ে নিন্।

ফ্রেমে বাঁধানো অভিনন্দনটি এগিয়ে দিলেন। ফিকে গোলাপী কাগজের উপর সোনালী রঙে ছাপা ঝক্ ঝক করছে। অভিনন্দনটি নিতে গিয়ে বিদ্যারত্ন মশায়ের হাত কেঁপে উঠল। তাঁর রচনা ছাপা হয়েছে!

বিশ্রাম ঘরে এসে আবার শুদ্ধ হয়ে বসলেন। তাঁর রচনা ছাপার অক্ষরে সামনে পড়ে রয়েছে। অক্ষরগুলি শুদ্ধ হয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। তাঁর কণ্ঠের উদাত্ত আবৃত্তিতে সভার মধ্যে জীবন্ত হয়ে এরা ঘুরে বেড়াবে। চারিদিক কেঁপে উঠবে, সঞ্চারিত সুরের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠবে। আনন্দের আবেগে দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে গেল, সমনে ধরেও কিছুই পড়তে পারলেন না। আত্মতৃপ্তিতে হেসে ফেললেন—তাঁর রচনা!

স্থান কাল তিনি ভুলে গেলেন। কল্পলোকে একটি সুস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠল, সভায় তিনি অভিনন্দন পড়ছেন, আবৃত্তির সুগম্ভীর ধ্বনিতে চারিদিক কেঁপে উঠছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে। ধ্বনির উঠানামার তালে তালে ইনস্পেক্টার সাহেবের মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে। অভিভূত হয়ে তিনি শুনছেন। সার্থক তাঁর রচনা!

আনন্দে তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চঞ্চল ভাবে তিনি পায়চারী করে বেড়াতে লাগলেন, তাঁর রচনা আজ সবাই শুনবে।

এগারোটা বেজে গিয়েছে, বারোটাও বেজেছে। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব এখনও এসে পৌঁছেন নি। সবাই অধীর হয়ে উঠেছে। সেক্রেটারী রাস্তায় বারে বারে ঘুরে আসছেন। একটা বাজল। দেড়টার সময় সাইকেলে একজন চাপরাশী একটা চিঠি নিয়ে এল। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব লিখেছেন, দুঃখের সাথে জানিয়েছেন, নানা কাজের জন্য তিনি আর আসতে পারলেন না। এবারকারের মত আসা তাঁর স্থগিত রইলো।

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না পণ্ডিত মশায়ের, হেড মাষ্টারের কাছে এসে ধীরে ধীরে বললেন,—ইনস্পেক্টার বাবু আসবেন না?

হেড মাষ্টার হেসে বললেন—না। যাক, এবারকার মত বাঁচলুম!

কিন্তু তিনি হাসতে পারলেন না। অভিনন্দনটা পণ্ডিত মশায়ের হাতে ধরা ছিল; হাত থেকে খসে পড়ে গেল। বিমূঢ়ের মত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন স্কুল থেকে।

প্রশান্ত*

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল
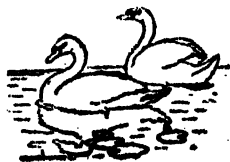
তত্ত্বকথা কহ বন্ধু, কৃষ্ণকথা কহ,
তাঁহার বিরহে চিত্ত দহে অহরহ ?
পেলে কি সন্ধান কিছু জুড়াল কি বুক,
নিভিল কি চিরতৃষ্ণা লভি' কাম্য সুখ ?

সত্য কথা কহ বন্ধু, কহ সার কথা,
মিটিল কি এককণা অনন্ত রিক্ততা ?
বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে পেলে শাস্ত্রাতীতে,
গোবিন্দের পেলে খোঁজ বৈষ্ণব-সঙ্গীতে ?

ইহ বাহ্য ইত্যাকার করিয়া বিচার,
নীলমণি মাণিক্যের কহ সমাচার।
কোথায় বসতি তাঁর আকৃতি কিরূপ,
জানো যদি কহ তাঁর যথার্থ স্বরূপ।

'তৃণাদপি সুনীচেন' বাক্য মাত্র জানি,
ইহার কি অর্থ বল বিস্তৃত বাখানি।
কি আদর্শ বৈষ্ণবের কি তাঁহার ধ্যান,
সর্ব্ব জীবে সমদৃষ্টি হয় কি এ জ্ঞান ?

গুহ্য কথা কহ বন্ধু, পূজ্য বরণীয়,
অনুগত জনে তব শিষ্য করি নিও।
গুরুর আশ্রমে বিদ্যা হ'ত পুরাকালে,
তে হি নো দিবসা গতা, কালের আড়ালে।

শাস্ত্রজ্ঞানী সুপণ্ডিত, বৈষ্ণবভূষণ,
কিছুক্ষণ রহ হেথা কহ সুভাষণ।
এনেছি জিজ্ঞাসু মন, বিক্ষুব্ধ হৃদয়,
বাক্যসুধা দানে কর শিষ্যচিত্ত জয়।

আশৈশব দেখিয়াছি কাব্যের স্বপন,
ভালোবাসিয়াছি ভাষা মায়ের মতন।
লোকে বলে মৃগতৃষা, মোদের সাধনা,
একখানি ব্যথাভরা শোকাশ্রু রচনা।

স্বদেশে বিদেশে ঘুরি অস্থির চঞ্চল,
এ জীবনে কত সুধা কত না গরল।
ভোগতীর্থ প্যারিসেতে ফরাসী রূপসী,
অর্দ্ধনগ্ন, নীবিবন্ধ যত্নে পড়ে খসি'।

তবু সেথা দেখিয়াছি ভক্তিমতী নারী,
মেরীর সম্মুখে নতনেত্রে অশ্রুবারি।
সীন্ নদীতীরে গির্জ্জা নামে নতার্দ্দাম,
সেথায় কাহারে নারী জানায় প্রণাম ?

নবদ্বীপ বৃন্দাবন মথুরায় ঘুরে
দেখিলাম মনোবীণা বাঁধা একই সুরে।
অজানারে জানিবারে আকুল পিপাসা,
কিছুতে মেটে না তার জানিবার আশা।

যৌবনের উদ্দীপনা আজো দেয় দোলা,
অতীত দিনের স্মৃতি নাহি যায় ভোলা।
তবু যেন মনে হয় এই অস্থিরতা,
শৈশব যৌবন প্রৌঢ়ে কহে একই কথা।

ফলে ফুলে সিন্ধুতটে পর্ব্বত-শিখরে,
যে রূপে মোহিত চিত্ত চিরদিন ধরে'—
সেই অনুরাগে রাঙা কাব্যের মানসী,
মাটীতে দাঁড়ায়ে চাই আকাশের শশী।

তোমারে আত্মীয় জেনে কহি আত্মকথা,
জানি তুমি বুঝিবে এ অরুন্তুদ ব্যথা।
হে সাধক, গুণগ্রাহী পণ্ডিত-প্রধান,
অতৃপ্ত অস্থির শিষ্যে কর শান্তি দান।

কৃষ্ণকথা কহ তুমি পরমার্থ কহ,
ঘুচাও অন্তর-দ্বন্দ্ব অনন্ত বিরহ।
কি সত্য জেনেছ বন্ধু সাধনার বলে,
কর তত্ত্ব উদ্ঘাটন এ বন্ধু-মহলে।

তোমার জীবন-কাব্য সহজ সুন্দর,
মুগ্ধ করিয়াছ তুমি মোদের অন্তর।
তোমারে বন্দনা করি মনের উল্লাসে,
প্রীতি-অর্ঘ্য আনিয়াছি তোমার সকাশে।

গভীর পাণ্ডিত্য তব গূঢ় গবেষণা,
নব নব সাধকের আনুক প্রেরণা।
হরেকৃষ্ণ নাম ধরো রাধাকৃষ্ণ প্রীতি,
দুর্গত জাতির ভাগ্যে আনুক সুকৃতি।

নিকট-বান্ধব ব'লে জেনেছি তোমারে,
আনিয়াছি শ্রদ্ধাঞ্জলি গাঁথা ছন্দহারে।
অকপট অন্তরের এ অভিনন্দন,—
তোমারে অর্পণ করি প্রীতির চন্দন।

হও শতবর্ষজীবী যোগী সাধক,
তোমার সাহিত্যপ্রীতি শুভপ্রদ হোক্।
অম্লান হউক্ দীপ্তি বাণীর মন্দিরে,
করপদ্ম-ধৃত-পুষ্প ঝরুক্ ও শিরে!

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের জয়ন্তী উপলক্ষে।

জনশিক্ষার একটা দিক

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার

অন্যত্র আমি গণশিক্ষার সমস্যা নামক একটি প্রবন্ধে জনশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে যে সব বাধা সাধারণতঃ পাওয়া যায় বা দেখা যায়, সেগুলি আলোচনা করেছি। এই নিবন্ধে আরও ২।১টি সমস্যার আলোচনা করবো।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে—যে শিক্ষার প্রচার আমরা করবো বা যে শিক্ষা আমরা চাই, সেই শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্মকে রাখা হবে কি না? খৃষ্টান মিশন বা ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দুমিশন, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি জনগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে অনেক চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষায় ব্যস্ত ঐ সব মিশনের দেওয়া শিক্ষার ফলে আমরা পেয়েছি মাত্র দলাদলি ও রেষারেষির বাহুল্য। ধর্ম্মের মূল নীতি নিয়মানুবর্ত্তিতা। এর উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল এত বড় সমাজ। তারপর তার নানা রকম গলদ আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে, বিচারের দ্বারা বিদূরিত হচ্ছে। আজ সকলেই বুঝতে পেরেছেন ধর্ম্মের নানাবিধ ইতরামী ও গোঁড়ামীকে বর্জ্জন করে জ্ঞানকে কঠোর বিচারের কাঠামোয় ফেলে নবরূপে সমাজকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা। এবং সেই চেষ্টা চলছেও। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মের গোঁড়া ভক্তরা বলে থাকেন (তাঁরা ভাবেন যে 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি'—তবু যদি বিপদের দিনে বাকীটা বেঁচে যায়,এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়) যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও উপদেশ না দিলেও নীতিশিক্ষায় তাদের তো একটা পথ বাতলানো দরকার। কিন্তু নীতি আর ধর্ম্ম কি আলাদা জিনিষ—পৃথক্ কিছু? বিচারের মাপকাঠিতে ধর্ম্ম আর নীতি এক হয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে আরও দুটি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ জনশিক্ষা প্রধানতঃ বয়স্ক শিক্ষা। বয়স্কদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার কোনই ফল নেই। দ্বিতীয়তঃ—এবং যেটি বড় কথা—ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে বিষয়ে ষ্টেট বা জনসাধারণের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বিশেষ কিছু আছে কি? যদি না ব্যক্তিগত মতামত প্রচারের বা দলগত উদ্দেশ্য সাধনের কোনও অসদুদ্দেশ্য থাকে তা হলে জনশিক্ষা প্রচারে আমরা এ দিকটা বাদ দিতে পারি।

তার চেয়ে ধর্ম্মের কোনও কথা না রেখে, মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ যাতে বাড়ে, সে-রকম চেষ্টা করলেই বোধ হয় বেশী কাজ হবে। কারণ, প্রতিটি মানুষের মনে সৌন্দর্য্যবোধ জাগরিত হলে জীবনের উচ্চ আদর্শের জন্য ঢের বেশী সাহায্য করা হবে বলে মনে হয়।*

* লেখক এখানে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একান্তই তাঁহার নিজস্ব। তবে আমরা মনে করি, জনশিক্ষা-ক্ষেত্রেও ধর্ম্মের প্রধানতম প্রাধান্য থাকিবে, এবং তাহা হইতেছে সার্ব্বজনীন মানবধর্ম্ম। —বঃ সঃ

বিজয়ায় পাগলের প্রলাপ

শ্রীহরিপদ দত্ত

মাগো,

সম্বৎসর পরে এলে, তিন দিবস মাত্র ঘর আলো করলে, চতুর্থ দিনে বিদায় নিলে। এলেও ঘোটকে, গেলেও ঘোটকে, ফল হ'ল ছত্রভঙ্গ! তোমার এ সখের বাহন শাঁখের করাতের মত আসতেও কাটলো, যেতেও কাটলো। কেন, আর কোন বাহন কি মিললো না? সিংহবাহিনি, তোমার খাস বাহন ছেড়ে অন্য বাহনে আরোহণ করলে কেন? মৃগরাজ কি অশক্ত হ'য়ে পড়েছে? সম্ভব, কারণ, সম্প্রতি বিপক্ষদমনের জন্য তাঁকে ঋক্ষ প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করতে হ'য়েছিল। তাঁকে-ও কি অশ্বপৃষ্ঠে নিয়ে এলে? তবে আমরা সর্ব্বপ্রকার দুঃখভোগে অভ্যস্ত হ'য়েছি। বিশ্বব্যাপী নরমেধ যজ্ঞের ফলে ছত্রভঙ্গ তো সর্ব্বত্রই। অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অখাদ্য-ভোজনে, বস্ত্রাভাবে, ব্যাধি-গ্রাসে বোমারুর আক্রমণে সারা বিশ্ব জর্জ্জরিত। তথাপি তোমার দিন-অহোরাত্রব্যাপী অবস্থানে হিন্দুর হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়। সমবৎসর বিশ্বজুড়ে তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনদিন কেন, চারিদিন হিন্দু মরজগত-বাসের আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করে। বিজয়া-দশমীতে তোমার নিরঞ্জন-জনিত নিরানন্দের মধ্যেও আমরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলন ও আলিঙ্গনের আনন্দ লাভ করি।

আগে তোমার আগমনের মাসাধিক কাল পূর্ব্ব থেকে আনন্দ-লক্ষণের বিকাশ দৃষ্টিগোচর হ'ত, পট্টবস্ত্রাদি ও প্রসাধন-সামগ্রীতে দোকানপাট সজ্জিত হ'ত এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্মিতমুখ খরিদ্দারের সমাগমে কাপড়ের দোকান, জুতার দোকান ও মণিহারী দোকান পূর্ণ হ'য়ে যেত। সুদূর পল্লীবাসীর জন্য দুই তিন মাস পূর্ব্বেই এই সকল দ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানি আরম্ভ হ'ত। কয়েক বৎসর হ'তে সে-প্রথার অনুবর্ত্তন বন্ধ হ'য়ে গেছে। কারণ—খরিদ্দারের অভাব, লোকের হাতে অর্থের অনটন। দৈনিক খাদ্য ও প্রচলিত বস্ত্রাদি আহরণ করতেই সাধারণ লোকের অর্থভাণ্ডার শূন্য হ'য়ে যায়। সারা বাজারে আগুন জ্বলেছে। দৈনন্দিন সংসার-খরচ চারিগুণ হ'তে আটগুণ পর্য্যন্ত বেড়েছে। রুচিসম্মত অন্নবস্ত্রের কথা দূরে থাক্, প্রচলিত বা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিশুদ্ধ খাদ্য অথবা লজ্জানিবারণের উপযোগী বস্ত্র দুষ্প্রাপ্য—অপ্রাপ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। যতই অর্থব্যয় কর, পুষ্টিকর, বিশুদ্ধ খাদ্য পা'বে না এবং তালি-লাগানো বা রিপু-করা জামা-কাপড় পরতেই হ'বে। এরূপ পরিস্থিতিতে ক'জন লোক আনন্দোৎসবের উপযোগী বসন-ভূষণ সংগ্রহ করতে সক্ষম? যা'র আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে কিম্বা সম্পূর্ণরূপেই হ'ক বা আংশিক ভাবেই হ'ক, অভিলষিত বস্তু সংগ্রহ করতে "রক্ত জল হ'য়ে যায়," তার মনে আনন্দসঞ্চার কিরূপে হ'তে পারে? সাধ্যাতিরিক্ত পূজার খরচ চালাতে পরবর্ত্তী মাসের অপরিহার্য্য ব্যয়-সমাধানের উপযোগী অর্থসংগ্রহের চিন্তায় তা'র অন্তঃকরণ পূর্ণ হ'য়ে থাকে, আনন্দের কণামাত্র সেখানে স্থান-লাভ করতে পারে না। তথাপি তোমার দর্শনে তোমার সন্তানগণ আনন্দ প্রকাশ করে। তোমার আগমনে ও আগমন-প্রতীক্ষায় যে আনন্দের আবির্ভাব হয় তা' যে সংক্রামক মা!

পূর্ব্বে বহুগৃহে তোমার শারদীয় পূজা ও উৎসবের আয়োজন হ'ত। কয়েক বৎসর হ'তে সার্ব্বজনীন বা বারোয়ারী পূজা প্রচলিত হয়েছে। তা'র কারণ এই যে প্রকৃত ধনী ব্যতীত কারও একাকী এই পূজা ও উৎসবের ব্যয়ভার বহন কর্‌বার সামর্থ্য নাই। কিন্তু, সকল স্থলেই এই পূজা সার্ব্বজনীন প্রকৃতি সম্পন্ন হয় না। অনেক স্থলে সহরের ও সহরতলীর একই পল্লীতে একাধিক পৃথক পৃথক পূজার আয়োজন হ'য়ে থাকে। তা'র ফলে "সার্ব্বজনীনের" একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অসম্পন্ন থেকে যায়। সাধারণতঃ জনবহুল সহরে ও সহরতলীতে একই পল্লীর অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় থাকে না, ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব তো পরের কথা। যদি পল্লীস্থ সকলে একযোগে একটি মাত্র সার্ব্বজনীনের আয়োজন করেন তা' হ'লে পূজায় ও উৎসবে সকলের মিলন, সকলের মধ্যে আলাপ-পরিচয় এবং তা'র ফলে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব ও সমগ্র পল্লিবাসীর মধ্যে ঐক্য-সংস্থাপন সম্ভবপর হয়। এরূপে যে-সঙ্ঘ নিবদ্ধ হয় তা'র কার্য্যাবলী অপরিমেয় সুফল প্রসব কর্‌তে পারে এ-কথা বলাই বাহুল্য। পরন্তু, সম্মিলিত অর্থভাণ্ডারের প্রাচুর্য্যের ফলে অনেক বিষয়ে সৌকর্য্য সাধিত ও কর্ম্ম সূচীর আকার বর্দ্ধিত হ'তে পারে এবং বিস্তৃতভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবা সম্ভবপর হয়। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ", "দশের লাঠি একের বোঝা" প্রভৃতি প্রচলিত উপদেশবাক্যাবলীর প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর্‌লে এটাও সহজে প্রতীয়মান হ'বে যে অর্থদানের ভার অন্যান্য ভারের ন্যায় বহু স্কন্ধে বিতরিত হ'লে অপেক্ষাকৃত সহজে বহনীয় হয়।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বটে, কিন্তু সে-গুলি বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর কি না এ-বিচারের ভার কা'র উপর ন্যস্ত আছে কিম্বা তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা আছে কি না তা' স্পষ্ট বুঝা যায় না, তবে সকলের মুখেই এ-সম্বন্ধে অভিযোগ শুনা যায়। মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় সরকার-বাহাদুরের পক্ষ হ'তে প্রতিবাদ হ'য়েছিল এই অজুহাতে যে কর্পোরেশনের এ-বিষয়ে কোন অধিকার নাই। বিচারে কর্পোরেশনের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে বটে কিন্তু কার্য্যতৎপরতার লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয় না। এই নিরপেক্ষতার মূলে কী আছে বুঝা যায় না, কিন্তু, পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং নানালোক নানারূপ কথা কয়।

বস্ত্র সম্বন্ধীয় পরিস্থিতিও তদ্রূপ। নিয়ন্ত্রণের ফলে যে-বস্ত্র বিক্রীত হচ্ছে তা' কী উৎকর্ষ হিসাবে, কী পরিমাণ হিসাবে আদৌ সন্তোষজনক নয়। নিয়ন্ত্রণ-প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী কাল ও বিতরণের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মধ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা'তে লজ্জা-নিবারণের উপযোগী বস্ত্রের এমন অভাব সঙ্ঘটিত হয়েছিল যে, কোন কোন নারী আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছিল এরূপ সংবাদ পাওয়া গেছে। শাসকমহলের পক্ষে এবম্বিধ পরিস্থিতি ও ঘটনা কতদূর গৌরবজনক এবং শাসনকর্ত্তৃগণের কিরূপ মানসিক বৃত্তির পরিচায়ক এ-বিচার তুমিই কর্‌বে মা! প্রশ্ন এই যে কথিত সময়ে কি মিল-গুলির কার্য্য বন্ধ ছিল? যদি তা, না হয়, মিলে প্রস্তুত কাপড়গুলি গেল কোথায়? শুনা যায় খাদ্য ও পরিধেয় বহুপরিমাণে ভারতবর্ষ হ'তে স্থানান্তরিত হয়েছিল। দেশের লোককে অভুক্ত ও নগ্ন অবস্থায় রেখে, মুখের গ্রাস ও আচ্ছাদনের বস্ত্র স্থানান্তরিত করায় দেশ জুড়ে যে হাহাকার উত্থিত হয়েছে তা'তে শাসকমণ্ডলীর চর্ম্মভেদ বা মর্ম্মভেদ হয় নি এইরূপই অনুমান করা যায়। তাঁদের কার্য্যাকার্য্যের বিচারের ভার অবশেষে যে তোমারই হাতে, বোধ হয় এ-ধারণাও তাঁদের স্মৃতিপথ হ'তে বিলুপ্ত হয়েছে। যাই হ'ক, এইরূপ যখন দেশের অবস্থা, যে-ই সেজন্য দায়ী হ'ক, তখন তুমি আনন্দময়ী এ-জ্ঞান সত্ত্বেও তোমার আগমনে সন্তানগণের অন্তঃকরণে কতটুকু আনন্দের সৃষ্টি হ'তে পারে মা?

বিচার করে' দেখলে এই সকল নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল মাত্র সরকার দায়ী নয়। আমাদের দেশের ব্যবসায়িগণ এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। অত্যধিক লাভের প্রবৃত্তি উৎকট লোভে পরিণত হ'য়ে তাঁদের বিবেক-বুদ্ধি লুপ্ত করেছিল; মোহান্ধের মত তাঁরা খরিদ্দারবৃন্দের "গলা কাট্‌তে" প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এইরূপে ব্যবসায়িগণ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন তা' হ'তে সাধারণকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে "নিয়ন্ত্রণ" প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে যে বিভ্রাট ঘটেছে ও ঘট্‌ছে তা'র জন্য প্রধানতঃ দায়ী আমাদের দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ। ফলতঃ, যে নিদারুণ দুর্দ্দশায় সমগ্র দেশ অধুনা নিপতিত তার মূলীভূত কারণ অর্থগৃধ্নুতা। কতদিনে এই মানসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হ'বে, কতদিনে এই দুর্দ্দশা অপনীত হ'বে, কতদিনে দেশের স্বাভাবিক অবস্থার পুনরাবির্ভাব হ'বে তা' তুমিই জান মা!

কারো কারো মতে অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। গত দুর্ভিক্ষের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পরবর্ত্তী বৎসরে চাষ-আবাদ কর্‌বার উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটেছিল। অথচ সরকার কর্ত্তৃক যে-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঞ্চিত ছিল সে-গুলি বিতরিত হ'লে হাজার হাজার নরনারী, বালকবালিকা ও শিশু অনাহারে মৃত্যুকবলিত হ'ত না। এই সকল সঞ্চিত খাদ্য পর্য্যুসিত ও আহারের অনুপযোগী বলে' অদ্যাপি হয় আবর্জ্জনাস্তূপে, নয় নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। শুনা যায় ঢাকা জেলার কোন স্থানে এত অধিক পরিমাণে পর্য্যুসিত দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে তা'র দুর্গন্ধে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি পরিব্যাপ্ত হ'য়েছিল। অথচ দুগ্ধের অভাবে কত শিশুর জীবলীলা অকালে সমাপ্ত হয়েছে। এই সূত্রে স্বতঃই একাধিক প্রশ্নের উদয় হয়। সরকার এই সকল খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছিলেন সৈন্যবাহিনীর জন্য এরূপ অনুমানের প্রতিবাদ হ'তে পারে না। তা' হ'লে এরূপ সংগ্রহ ও সঞ্চয় সম্বন্ধে কি কোন হিসাব, নিয়ম বা সীমা ছিল না? তা' থাক্‌লে অপরিমিত সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের কোন অর্থ হয় না। ইহার একমাত্র অর্থ এই হয় যে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব সম্ভব এ-সিদ্ধান্তে সরকার উপনীত হ'য়েছিলেন, অথচ খাদ্যাভাবনিবন্ধন যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হ'তে পারে তা'র প্রতিষেধ কল্পে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সঞ্চিত খাদ্য রক্ষা কর্‌বার জন্য যে কোন প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা হয় নাই উল্লিখিত ঘটনাগুলিই তা'র প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে এ-দেশে অনেক গৃহস্থের গৃহে চার-পাঁচ বৎসরের পুরাতন চাউল খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে দুষ্প্রাপ্য ছিল না।

রাজ্যলালসায় ও প্রভাব-বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে দুর্দ্দমনীয় দানবগণ কর্ত্তৃক বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হয়েছিল তাদের দমন সম্পূর্ণ এবং সে গগনস্পর্শী অনল নির্ব্বাপিত হয়েছে। যুদ্ধের প্রগতিকালে বিজেতাপক্ষের মহাপুরুষগণ উচ্চকণ্ঠে যে-সকল আশ্বাসবাণী উচ্চারণ বা উদ্গীরণ করেছিলেন তা' শুনে পরাধীন জাতিগুলির মনে এই আশার উদ্রেক হয়েছিল যে যুদ্ধান্তে তারা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হ'বে। তখন তারা ভেবেছিল যে সাম্য ও স্বাধীনতা মহাপুরুষদের সমর-প্রচেষ্টার মূলমন্ত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য, এখন তা'দের নয়নের অঞ্জন মুছে গেছে। এখন তা'রা দেখ্‌ছে ও বুঝ্‌ছে এবং তা'দিগে বোঝানো হচ্ছে যে মহাপুরুষগণের বাণীর প্রকৃত অর্থ তা'রা উপলব্ধি কর্‌তে পারে নি। এখন তা'রা দেখছে ও বুঝছে যে রাজ্যলালসা, অর্থগৃধ্নুতা ও স্বার্থপরতার মোহে মহাপুরুষগণও অভিভূত। সে-আশ্বাস এখন লুব্ধ আশ্বাসে পরিণত। সেই কারণে বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হ'লেও খণ্ড-যুদ্ধের অদ্যাপি বিরাম হয় নি—বিশ্বব্যাপী শান্তির আবির্ভাব হয় নি। উপরন্তু, কোন কোন দেশে গৃহবিবাদ সূচিত হয়েছে। গৃহবিবাদ ভারতেও বর্ত্তমান, তবে সেটা প্রধানতঃ বাগ্‌যুদ্ধে পর্য্যবসিত, তা'তে রক্তপাতের পরিমাণ নগণ্য। এর কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিগণের রক্তপাতে অপ্রবৃত্তি নয়, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, যা'র মূলে পরাধীনতা।

উপর্য্যুপরি বিরাটযুদ্ধের অজুহাতে জিঘাংসু-প্রতিদ্বন্দ্বিগণ-প্ররোচিত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহুবিধ মারণাস্ত্রের আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের উপদেশানুসারে নির্ম্মিত হয়ে সেই সকল অস্ত্র লক্ষ লক্ষ মানবের শোণিতে

বসুন্ধরা-বক্ষ রঞ্জিত করেছে। এই নররক্তপাতের জন্য তারাও দায়ী—তাদেরও মস্তিষ্ক ও হস্ত যে-রক্তে কলুষিত। তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণা ধর্ম্মসম্মত রূপে প্রযুক্ত হ'লে জগতের অশেষ উপকারের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, তাঁরাও জিঘাংসায় অন্ধ হয়েছিলেন—তাঁদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লুপ্তপ্রায় হয়েছিল।

তুমিই মানুষকে বুদ্ধি দান করেছ—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" তুমিই চৈতন্য দান কর—"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ" তুমিই সকলকে বিদ্যা দান করে' থাক—"বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা। মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥"—আবার অজ্ঞান-অন্ধকারেও ভ্রমণ করাও। তুমি সংসারের মানচিত্রে কর্ম্মের পন্থা, ধর্ম্মের পন্থা অঙ্কিত করে' রেখেছ। যা'র যেমন দৃষ্টিশক্তি সে তদনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে। আর্য্যঋষিগণ তোমা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এই সকল পন্থা স্পষ্ট আকারে চিহ্নিত করে' গেছেন। তথাপি মানুষ যদি বিপথগামী হয়, সেজন্য সে নিজেই দায়ী। আমরা অনেক সময়ে "খাত সলিলে ডুবে মরি"। যে যে-কার্য্য করুক, রাজা হ'ক, মন্ত্রী হ'ক, সেনাপতি হ'ক, পণ্ডিত হ'ক, মূর্খ হ'ক, সবারই বিচার এবং পুরস্কার বা শাস্তি তোমারই হাতে। অধুনা-বিজিত দানবকুল এবং তাদের সহকারী পণ্ডিতমণ্ডলী তোমারই বিচারাধীন। তাদের ভাগ্যে কী-শাস্তি বিহিত হবে তা' আমরা কল্পনা করতেও অক্ষম।

মনে করেছিলাম তোমার প্রয়াণে বিলাপই স্বাভাবিক, কিন্তু, আমার কল্পিত বিলাপ প্রলাপে পরিণত হ'ল। অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়ের সন্নিবেশ করে' ফেলেছি। তবে তোমার কাছে বিলাপ ও প্রলাপের মূল্য সমান। তোমার "অতি বড় বৃদ্ধ পতির" "চন্দনে ভস্ম গেয়ান," যদিও 'ভীমরথী' হয় নি। তাছাড়া যা'র মা-বাপ পাগল তা'র মানসিক বিকৃতি তো স্বাভাবিক।

ফিরে' নিয়ে আয়

শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

মশ্‌জিদে তোর আল্লা কোথায়? মন্দিরে ভগবান?
স্রষ্টার নামে সৃষ্টিকে তোরা ভেঙেছিস্ খান্ খান্।
গোষ্ঠি আসন নষ্ট করিয়া ইষ্ট মিলেছে বুঝি?
হত্যায় হাত লিপ্ত হইয়া ভরেছে পুণ্য-পুঁজি?
ওড়না ঘোম্‌টা লুঙ্গি ধুতিতে কিসের বিসম্বাদ?
রহিমে ও রামে স্রষ্টার নামে সংহার অপবাদ?
বেহেস্তে তোরা নিশ্চয় যাবি—স্বর্গেরো খোলাদ্বার—
যার হাতে যত খুনের তালিকা-তার তত অধিকার।
যুগ্ম বক্ষ-পশু-প্রবৃত্তি হিন্দু-মুসলমান—
মন্দির আর মশ্‌জিদ হ'তে পালিয়েছে ভগবান।

*

'মা' ও 'মায়ির' ডাকের ভিতরে তফাৎ আছে কি কিছু?
'বাবা' ও 'আব্বা' বুলির মধ্যে কোনটা কতটা নিচু?
'ভগ্নী' 'বহিন' 'ভাই' ও 'ভাইয়া' অথবা 'জরু' ও 'জায়া'—
এদের মধ্যে কাহারা সত্য—কাহারা নিছক ছায়া?
'দোস্ত' ও 'বন্ধু' নয়কি একই ত্যাগের প্রতীক বুলি?
স্নেহের সাগরে স্থায় নাকি দোল 'বাছা' ও 'বাচ্ছু'গুলি?
মুখোসেরই হল মস্ত মূল্য—মুখ্‌টা যাকনা পুড়ে!
সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিস নানা অসভ্য সুরে।
কৃষ্টি তোদের নষ্ট হয়েছে সৃষ্টিছাড়া এ ভবে—
পিচ্ছিল পাপ-পঙ্কিল পথ টেনেছে জাহান্নবে।

*

কোরানে পুরাণে মিতালি করাতে কোথায় রয়েছে বাধা?
বীণা ও সেতার যায় না কি আর একই মধুসুরে বাঁধা?
বাঙলা মায়ের কোলে দুই ভাই হিন্দু-মুসলমান—
ফিরে নিয়ে আয় মশ্‌জিদে খোদা-মন্দিরে ভগবান

সম্পাদকের নিবেদন

ভগবানের ইচ্ছাক্রমে "বঙ্গশ্রী" সম্পাদনার ভার আমার হাতে পড়িয়াছে, আমিও অকুণ্ঠিতচিত্তে ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। এই কাগজের সহায়তায় জনশিক্ষার প্রসার করা, ইহার প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর, আমার দিগ্বিজয়ী ছাত্র, ঋষিকল্প স্বর্গত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যদি কাগজের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া দেশবাসীর শিক্ষাকল্পে সামান্যভাবেও সাফল্য লাভ করিতে পারি, চিত্তপ্রসাদ জন্মিবে। সচ্চিদানন্দের পবিত্র নাম সম্বল করিয়াই এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা যে প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "রাজনীতিক্ষেত্রে আমি ঘটনাচক্রে আসিয়া পড়িয়াছি, এখানে না আসিলে সাহিত্য-সেবাই করিতাম, তাহাতেও কম কাজ হইত বলিয়া মনে হয় না। তবে যে কার্য্যেই যাওয়া যায়, ষোল আনা মন দেওয়া চাই। প্রমাণ সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র!" বস্তুতঃ সাহিত্যসাধনায় যে জাতি গঠিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র, প্রমাণ দীনবন্ধু, প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ, প্রমাণ চিত্তরঞ্জন, প্রমাণ সচ্চিদানন্দ। 'বঙ্গশ্রীর' সহায়তায় সামান্যভাবেও সে কাজ সম্পাদিত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

জনশিক্ষা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে বিদ্বেষ বা শ্লেষ, দ্বন্দ্ব বা কলহ স্থান পায় না। এই কাগজে কাহারও কোন ত্রুটি প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ বোধ না করিলেও কোনরূপ কলহ বা বিদ্বেষ প্রকাশের স্থান নাই। বাঙ্গলা তথা ভারতের সকল অধিবাসীরই সমান অধিকার, সকলেই ভাই ভাই, কাহাকেও ঘৃণা বা বিদ্রূপ করিবার অধিকার নাই, ইহাই 'বঙ্গশ্রী'র প্রধান লক্ষ্য। উপরন্তু ইহা কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিবে না। তথাকথিত উচ্চ বা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য জন্মাইবে না, পরনিন্দাও ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইবে।

কিন্তু কেবল কথায় নয়, অনুন্নত শ্রেণীর লোকের শিক্ষার জন্য বস্তুতঃই আমরা কি চেষ্টা করিতেছি? কৃষকগণ—ঐ রামা কৈবর্ত্ত ও হাসিম শেখের দল—খাটিয়া খাটিয়া কর ও ঋণ-ভার-প্রপীড়িত হইয়া যে মৃত্যুর কবলে আসিয়া পড়িতেছে আমরা সেই বিষয়ে চিন্তা করি কৈ? মিল কারখানার শ্রমজীবীরা যে উপযুক্ত যত্নের অভাবে দুর্নীতির চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার প্রতিকার কল্পে আমরা কি ব্যবস্থা করিতেছি? বিচারহীন শ্রমিক দলকে ধর্ম্মঘট প্রভৃতি বিপথে চালিত না করিয়া তাহাদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার প্রতি যদি একটু দৃষ্টিপাত করি, মিল কারখানায় তবে সত্যই ঐক্যবন্ধনরূপ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমরা কি এই সব বিষয়ে চিন্তা করি? কিন্তু জাতি তো সকলকে লইয়াই। সকলের হিত না হইলে দেশহিত কিরূপে সম্ভব? ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় যে, দুর্ব্বল নিঃসহায় মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী ও কৃষক কেবল অভাব ও দুরদৃষ্টের তাড়নায় অন্ধকারেই থাকিবে, আর একশ্রেণীর লোকের অবাধে সুবিধা চলিবে! এই অনুন্নত জাতির হিতকল্পেও 'বঙ্গশ্রীর' লেখনী পরিচালিত হইবে!

'বঙ্গশ্রী' কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। যাহাতে জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলন দৃঢ় হয়, 'বঙ্গশ্রী'র ইহাও অন্যতম কাজ। তবে নির্ভীকভাবে কোন ব্যক্তি বা অনিষ্টকর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে ইহা দ্বিধা করিবে না। 'বঙ্গশ্রী' যেমন অযথা কাহারও নিন্দা করে না, সেরূপ অযথা স্তুতিও করিবে না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ নানাপ্রকার গল্প, প্রবন্ধ ও আলোচনায় আমাদের সহযোগিতা করিলে আমরা বাধিত হইব। তার পর, এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা সুযোগ না পাইয়া নিজের গুণ প্রকাশ করিতে পারেন না। 'বঙ্গশ্রী' তাঁহাদের রচনা যথাযোগ্য আদর করিতে কোনদিনই শৈথিল্য করিবে না। গ্রাহকবর্গ, বন্ধুগণ, লেখকমণ্ডলী এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কর্ম্মপথে যাত্রা করিতেছি; ভগবানের একান্ত অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র পাথেয়।

বিনীত—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বসুমতী ও সীতারাম

কিছুদিন হইতে বসুমতী সাহিত্যমন্দির সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসখানিকে নাটকাকারে প্রকাশ করিয়াছে। নাট্যকারের নাম দেওয়া হইয়াছে, অতুলকৃষ্ণ মিত্র। এই নাটকখানি অতুলকৃষ্ণের নয়, নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের—এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও কিরূপে যে বসুমতী নির্ভয়ে পুস্তকখানি অপরের নামে চালাইতেছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। ইতিপূর্ব্বে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শনিবারের চিঠি"তে কতকগুলি মূল্যবান্ অবস্থাঘটিত প্রমাণ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই নাটকের গান ও বিশেষ বিশেষ উক্তি অতুলকৃষ্ণের জীবদ্দশায়ই অবিনাশচন্দ্রের গিরিশ

জীবনীতে বাহির হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুমান খুবই ঠিক এবং তাঁহার এই সমস্ত উক্তির পরেও যে কিরূপে বসুমতী এখনও ত্রুটী স্বীকার না করিয়া নীরব রহিয়াছেন, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ কীটদষ্ট গিরিশচন্দ্রের কর্ত্তৃক রূপান্তরিত "সীতারামে"র পাণ্ডুলিপি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। তাহা দেখিয়া সকলেই নিঃসন্দেহ হইবেন যে, এই নাটকেই কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য বাদ দিয়া অতুলকৃষ্ণের নাটক নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

বড়লাট ও নির্ব্বাচন

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করিবার পরে, ভারতবর্ষে আসিয়াই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনেরই আয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গলার ছয়টি আসনের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ ছয়জন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে, আর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছয়জন হিন্দুমহাসভার পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। কংগ্রেস বলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠান অসাম্প্রদায়িক, ইহা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতেই প্রচেষ্ট, সুতরাং ইহার প্রতিই দেশবাসীর সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।' হিন্দু-মহাসভাও বলেন, 'আমরাও সমগ্র ভারতেরই হিত চাহি ; তবে হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণই আমাদের উদ্দেশ্য—পাকিস্থান ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আমরা ঘোর বিরোধী"। কংগ্রেস বলেন, 'আমরা চাই অখণ্ড ভারত, পাকিস্থানের অর্থ বিভক্ত ভারত। সুতরাং আমরা উহার বিরোধী।' মহাসভা বলেন, 'তোমরা পাকিস্থান চাওনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ চাও, উভয়ের মধ্যে কথার মারপ্যাচ ছাড়া আর কোন পার্থক্যও নাই—একটি অপরটির নামান্তর মাত্র।'

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলার কংগ্রেস-নেতা শরৎবাবু যে বিভিন্ন স্থানে 'পাকিস্থান'-এর আখ্যা দিয়াছেন—'অর্থহীন প্রলাপ', আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ 'শূন্যগর্ভ বুলি' (Pakisthan is a fantastic non-sense and self-determination is a pure bunkum) এই প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদবাবু বলেন, "শরৎবাবু যেমন পাকিস্থান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ উভয়েরই বিরোধী, আমরাও সেইরূপ। তবে তিনি আমাদের নীতির অনুসরণ না করিয়া আমাদের বিরোধী হইতেছেন কেন ?"

উভয় কথার অর্থ ও তাৎপর্য্য একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বাদানুবাদের আবশ্যক হইবে না। পাকিস্থান এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য আকাশ পাতাল। প্রথমটীতে ভারত বিভিন্ন প্রদেশ ও জাতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, আর দ্বিতীয়টীতে অখণ্ড ভারত আরও দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যা বেশী, সুতরাং এই দুইটি স্থানই পাকিস্থানে পরিণত করা ইহার সমর্থকগণের উদ্দেশ্য। তাহারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যই কথিত স্থানগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুসলিম রাজ্যে পরিণত করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প। এইরূপে সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের ন্যায় যে সমস্ত স্থানে শিখ, খৃষ্টান ও পার্শির সংখ্যা অধিক, তাঁহারাও সেই সেই স্থান তাঁহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য স্বভাবতঃ পৃথক্ করিতে চাহিতেছেন। সুতরাং এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারত ভিন্ন ভিন্ন ভাগে খণ্ডিত হইয়া যাইবে এবং এই সব স্থানে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়িয়াই চলিবে। আর মাদ্রাজ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে মুসলমানের সংখ্যা কম, সেখানে তাঁহাদের অসুবিধার পরিসীমা থাকিবে না।

পক্ষান্তরে কংগ্রেস প্রদর্শিত প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত জাতির অভিমত হইলে অখণ্ড ভারতের মধ্যেই থাকিয়া বিচার ও শাসন প্রভৃতি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করা যাইতে পারিবে। যদি কোন স্থানে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ রাখিয়া হাতে হাত মিলাইয়া তাহাদের নিজেদের শাসন, বিচার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে চাহেন, তবে তাহা তাঁহারা করিতে পারিবেন। কিন্তু সব কাজই হইবে আপোষে, একমতে ও মৈত্রী বন্ধনে। ভারত হইতে সেই প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন হইবে না, অখণ্ড (federated) ভারতের অন্তর্গতই থাকিবে এবং বহির্বিষয়ক প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীতিই উহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠের উপরে নিজেদের সিদ্ধান্ত সংখ্যাধিক্যের সুবিধায় প্রয়োগ করিতে পারিবে না। আমাদের মনে হয় এরূপ অবস্থা আদর্শ মিলনের অবস্থা। আর ইহাতে প্রদেশ বিশেষের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাবাগত সংহতি স্বতঃই বাড়িয়া চলিবে। অর্থাৎ ইহাতে কেবল এক সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণ (পাকিস্থান, ইঙ্গলিস্থান বা শিখিস্থান) নয়, সকল সম্প্রদায়েরই সমষ্টিভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ বুঝায়,কিন্তু এরূপ অবস্থা—অর্থাৎ ভারতের অখণ্ড ও একত্ব আসিতে পারে শুধু 'আমরা সকলেই ভারতবাসী' এই জ্ঞানের দ্বারাই, আমরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা কংগ্রেস,আমরা লীগ, আমরা হিন্দুমহাসভা, আমরা আকালী' এইরূপ মনোবৃত্তিতে তাহা সম্ভব নয়। অতএব সকল প্রতিষ্ঠানেরই কর্ম্মপন্থা ও কার্য্য-তালিকা এই একত্বের দিকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। আমরা মিলন চাহি, এবং যাহা এক ও অখণ্ড তাহা অযথা খণ্ডিত হয়, ইহা আমাদের একেবারেই অভিপ্রেত নয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস

আমরা অবগত হইলাম, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে নির্ব্বাচন কমিটির সভাপতি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং মৌলভী আকসরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী মহাশয় উক্ত কমিটীর অন্যতম সভ্য।

অতঃপর বাঙ্গলায় কংগ্রেস একতাবদ্ধ হইয়া আরও শক্তিশালী হইবে বলিয়া মনে হয়। নীতির জন্য এ-যাবৎ অনেকে ভিন্নমত পোষণ করিতেন এবং কংগ্রেসভুক্ত না হইয়াও তাহারা দেশের সেবায় কখনও কুণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল কংগ্রেস-কর্ম্মী আবার সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতেছেন, মিলনের প্রচেষ্টা সম্মুখে রাখিয়া ইহারা কার্য্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন,—ইহা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয়।

নির্ব্বাচন ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব

সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার বোম্বাই কেন্দ্রের নির্ব্বাচনপ্রার্থী শ্রীযুক্ত ভোপটকার মহাশয়ের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করায় মহাত্মা গান্ধীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী কাহারও প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য বা অশিষ্ট আচরণ, সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। কংগ্রেস সংক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তি হিন্দু মহাসভার নেতাদের প্রতি অযথা আক্রমণ করেন, ইহা মোটেই অভিপ্রেত নয়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পার্থক্য নীতিবাদ লইয়া। কংগ্রেসই হোক, হিন্দু মহাসভাই হোক, লীগই হোক, নীতি সম্পর্কে যিনি যেরূপ বুঝিবেন তিনি স্বাধীনভাবে সেরূপ কাজ করিবেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ খুবই অশোভন। মিথ্যা অপবাদ দেওয়াও গর্হিত। এই প্রসঙ্গে খাক্সার নেতা মৌলানা মাসরিকী হোসেনের উপর যে অশিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও আমরা গর্হিত বলিয়া মনে করি। খাক্সার নেতার নীতিবাদ যাহাই থাক্ না কেন, সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সহকর্ম্মী লইয়া সংখ্যাল্প আক্রমণকারিগণের প্রতি তিনি যেরূপ ক্ষমা, সংযত ব্যবহার ও শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে মহৎ, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়াছেন।

রাজাগোপালাচারী, গান্ধীজী ও মৌলানা আজাদ

দুইটী কারণে তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটী শ্রীরাজাগোপালাচারীকে নির্ব্বাচনমূলক কোন পদে গ্রহণ করিতে দিতে ইচ্ছুক নহেন, প্রথম কারণ—তিনি তিন বৎসর যাবৎ সভ্য নহেন এবং তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে সভ্য না থাকিলে কেহ কোনরূপ নির্ব্বাচনমূলক পদ গ্রহণে যোগ্যতা লাভ করে না। এ-বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত মৌলানা আজাদ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। এই কয় বৎসর কংগ্রেসও একরকম বন্ধই ছিল, অনেকেই ইচ্ছা করিলেও মেম্বর হইতে পারেন নাই। যদি পূর্ব্বোক্ত নীতি অনুসৃত হয়, তবে অনেক বিশিষ্ট কর্ম্মীই বাদ পড়িবেন। সুতরাং এই কারণে রাজাজীর নির্ব্বাচন-সংশ্লিষ্ট আসনের দাবী অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। দেখিতে হইবে যে রাজাগোপালাচারী সত্যই ভারতীয় ঐক্যের বিরোধিতা করিয়াছেন কিনা, কিন্তু মহাত্মাজী বলেন,"তাহার মত আমি গ্রহণ করিয়াছি।" মহাত্মাজী হয় ত' তাঁহাকে ও ভুলাভাই দেশাইকে মুসলিম লীগের সহিত আপোষ আলোচনার কথায় সমর্থন করিতে পারেন এবং আমরাও সেরূপ মিলনের পোষকতাই করিব, কিন্তু পাকিস্থানের কথায় কিরূপে তিনি সমর্থন করিতে পারেন তাহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পাকিস্থান কংগ্রেস কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াছে। আর রাজাগোপালাচারী-ক্রীপ্‌স আলোচনা ব্যর্থ হইবার পরে, পাকিস্থান দিয়াও মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিবার জন্য তিনি একটি প্রস্তাব করেন। সমর্থন না পাইয়া ব্যক্তিগতভাবে কাজ করিবার জন্য কংগ্রেস ছাড়িয়া দেন। ১৯২২ হইতে নোচেঞ্জার দলের তিনিই ছিলেন প্রধান। কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাঁহাকে একজন কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি বলিয়া জানে এবং তিনি নিজেও তাহা জানেন। আগষ্টের দুঃসময়ে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ ও দেশবাসীকে প্রকৃষ্ট পথ অনুসরণ করিতে তিনি বাহিরে থাকিয়াও কোনরূপ উপদেশ দিতে অগ্রসর হন নাই। সে সময় চেষ্টা করিয়াছিলেন পাকিস্থানের সহায়তা করিতে। এই কার্য্যটি তাহার পক্ষে কেবল কংগ্রেসের নয়, দেশে প্রকৃত ঐক্য স্থাপনেরই বিরোধী। সুতরাং যে পর্য্যন্ত রাজাজী নিজ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত না হন অথবা ত্রুটি স্বীকার না করেন, ভরসা করি, গান্ধীজী তাঁহার স্নেহাস্পদ শিষ্যের জন্য মমতা প্রদর্শন করিবেন না। আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালার কৃষ্ণদাসের কথা স্মরণ করিতে বলি। কৃষ্ণদাস মহাত্মাজীর বিশেষ অনুগত ভক্তশিষ্য ছিলেন। কিন্তু কি ত্রুটী হওয়ায় এখন তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত! রাজাজীর অপরাধও কম নয়। এবং সম্প্রতি বিবেকের দোহাই দেওয়ায় উহা আরও গুরুতর হইয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতের অখণ্ডতা নষ্ট করিবার সঙ্কল্প আমাদের মোটেই অনুমোদিত নয়।

ভারতের পূর্ণ স্বরাজ

আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে ব্রিটিস দূতাবাসের সরকারী অফিসার—যিনি ভারতীয় বিষয়াদিতে সর্ব্বদাই পরামর্শ দিয়া থাকেন সেই স্যার ফ্রেডারিক পাক্‌ল (F. Puckle) একটি ভোজসভায় বলিয়াছেন—

"আমরা ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে চাই। তাহাতে ভারতবর্ষ আমাদের আয়ত্তের বাহিরেও থাকিতে পারে, অথবা তাহারা চাহিলে ভিতরে থাকিয়াও হইতে পারে। তবে অন্তরায় হিন্দু-মুসলমান বিবাদ—একদল চায় অ-বিভক্ত ভারত, কিন্তু তাহা হিন্দু-প্রাধান্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর একদল চায় বিভক্ত ভারত। অবিভক্ত ভারতে প্রকৃত মিলনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদ (constituent assembly) যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই হইবে।"

আমাদের মনে হয় এই নিষ্ফল উক্তিতে কোন সারত্ব নাই। ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতই চায় যে ভারতবাসীর শাসন তাহারাই করিবে, তবে হিন্দু মুসলমানের কোন পার্থক্য থাকিতেই পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লর্ড ওয়াভেল যখন হিন্দু এবং মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা সমান ভাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে লইতে চাহিয়াছিলেন, তখন অধিকাংশ ভারতবাসী মিলনের পক্ষপাতী হইলেও পরিশেষে মিলনের অন্তরায় কাহারা হইল, তাহা সকলেই জানেন। আমরা মিলন ও ভারতের অখণ্ডত্ব চাই; এবং এই মতানুবর্ত্তী মুসলমান যদি প্রকৃত ভাবে মিলন ও অখণ্ডত্বের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার ও দুঃখকষ্ট বরণ করিতে প্রস্তুত হন, তবে সমান সমান ভাবে কেন, সমস্ত মন্ত্রীর পদ যদি ঐরূপ ভাবাপন্ন মুসলমানের দ্বারা পূর্ণ হয়, কাহারও তাহাতে আপত্তির কারণ থাকা সঙ্গত নয়। অখণ্ড ও সম্মিলিত ভারতের শাসন যদি ভারতবাসীই করে, ভারতবাসী—যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন—যে করিলে সকলেই খুসী হইবে। ভারতবাসী ভারতবাসী—এই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। জাতিগত বা সম্প্রদায়গত পার্থক্য—এই হিন্দু, এই মুসলমান—এই বিভেদ

ঘোরতর সঙ্কীর্ণতা, আমরা সেই সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী নহি। ভরসা করি, মুক্তিকামী সকল ভারতবাসীরই এই মত হইবে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (I. N. A).

দিল্লী লালকেল্লায় আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের তিনজন অফিসার ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, কাপ্টেন পি, কে, সাইগল ও লেপ্টেনাণ্ট গুরুবক্স সিং ধীলন একটী সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। বিচার করিবেন মেজর জেনারেল এ, বি, ব্লাক্সল্যাণ্ড প্রমুখ ৪জন ইউরোপীয় ও তিনজন ভারতীয় সামরিক অফিসার। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করা (দণ্ডবিধি ধারার ১২১) ও কয়েকজন ব্যক্তিকে খুন বা খুনের সহায়তা। মোকদ্দমা পরিচালনা করিবেন সরকার পক্ষ হইতে স্যার নৌসীরন পি, ইঞ্জিনিয়ার আর আসামী পক্ষে ভুলাভাই দেশাই, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, পণ্ডিত জওহরলাল, শ্রীযুক্ত আশফ আলী, মিঃ পি, কে, সেন প্রভৃতি।

সরকার পক্ষ বলেন—মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মা প্রভৃতি স্থান জাপানীদের দ্বারা দখল হইবার পরে উক্ত সাহ নওয়াজ প্রমুখ কতিপয় ব্রিটিশ অফিসার বন্দী অবস্থায় ভারত আক্রমণ করিবার জন্য বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর সহায়তায় আজাদ হিন্দ্ দলটি গঠন করেন, আর তখন নেতাই হন রাসবিহারী বসু, পরে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সুভাসচন্দ্র বসু মহাশয় আসিয়া "নেতাজীর" আসন অধিকার করেন। অতঃপরে দলে দলে ভারতীয় সৈন্যগণ এই আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে যোগদান করে এবং মার্চ্চমাস হইতে তাহারা আরাকান মণিপুর কহিমা প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিয়া কয়েকটি স্থান দখল করে। বর্ষার অতিবৃষ্টি হেতু এই অভিযান সেই সময়ে সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও, পরে আবার সুযোগ মত অভিযান করা হইবে বলিয়া "নেতাজীর" আদেশে বাহিনীটি সরাইয়া আনা হয়।

গভর্ণমেণ্ট তরফে লেপ্টানাণ্ট নাগের সাক্ষ্য হওয়ার পরে মোকদ্দমা দুই সপ্তাহের জন্য (২১ নভেম্বর পর্য্যন্ত) মুলতুবী রাখা হইয়াছে। সুতরাং উহা এখন বিচারাধীন বলিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা সমীচীন নয়। তবে মোটামুটি কয়েকটি বিষয় আমরা আলোচনা করিব।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন কল্পে একটী ডিফেন্স কমিটি গঠিত হইয়াছে। আইনের নীতি অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি যে কোন অপরাধই করুক, আর তাহা পক্ষ বিপক্ষ যাহারই বিরুদ্ধে থাকনা কেন—অভিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরপরাধ। সুতরাং অভিযুক্ত ব্যক্তির রক্ষার ব্যবস্থা ও সুবিচারের বন্দোবস্ত করা মানবতার পরিচায়ক এবং সভ্য জাতি মাত্রেই উহার সমর্থন করিবে।

তাহাদের দণ্ড হইবে কিনা, বা হইলে কি হইবে, সে সব কথার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন, তবে আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট এই অনুরোধ করিব যে বীর সেকেন্দার সাহার ন্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে তাহারা বন্ধন মোচন করিয়া দিউন। সরকারী কৌন্সিলের বক্তৃতা হইতে উপলব্ধি হয় যে, অবস্থায় ইহারা দল গঠন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় অন্য কোন প্রকারে তাহাদের বাঁচিবার উপায় ছিল কিনা সন্দেহ। এবং মানুষ হিসাবে বাঁচিবার যে অদম্য সাহস ও জ্বলন্ত দেশপ্রীতি ইহারা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে হয় প্রকৃত পন্থায় শিক্ষিত হইলে এই সব বীরের দ্বারা কেবল ভারতের নয়, কেবল ব্রিটিস সাম্রাজ্যের নয়, সমগ্র জগতের অশেষ হিত সাধিত হওয়ার যেরূপ সম্ভাবনা, এবং তাহা ইহাদের চেয়ে অপর কাহারও দ্বারা হইতে পারে কিনা বিশেষ সন্দেহের কথা। যে মানুষ কাজ করিতে সক্ষম তাহার দ্বারা কাজ যত সম্ভব, নূতন লোকের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। ডিমোক্রেসী বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে কাহাকেও বিনাশ না করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলেই কেবল ক্ষমার দিকে নয়, মহৎকার্য্য সাধনের পক্ষেও বিশেষ উপকার হইবে। গভর্ণমেণ্টকে এই কথা বুঝিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর চেষ্টায় বড়লাট বাহাদুর যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র বসু হরিদাস মিত্র, পবিত্র রায় প্রমুখ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চারিজন আজাদ-হিন্দ ফৌজের অফিসারের প্রাণদণ্ডের আদেশ মৌকুফ করিয়াছেন তজ্জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেল আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

ইন্দোনেসিয়ায় বিপর্য্যয়

ইন্দোনেসিয়ার গোলমাল বড় পাকিয়া উঠিয়াছে! পূর্ব্বে উহা ওলন্দাজ অধিকৃত ছিল, পরে ১৯৪২, জাপানের অধিকারে আসে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে জাপান ঐ স্থান হইতে চলিয়া গেলে, ওলন্দাজ আবার নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়। কিন্তু তথাকার অধিবাসিগণ ওলন্দাজের অধীন না থাকিয়া স্বরাজ বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। সুতরাং ওলন্দাজের সঙ্গে জাভার প্রধান নগরী সুরাবায়ার অধিবাসিগণের গোলমালের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে ব্রিটিশ শক্তি আসিয়া আবার মিত্র ওলন্দাজের সহায় হইয়াছে। অজুহাত ব্রিটিস বাহিনীর একজন সেনাপতি কাপ্তেন ম্যালাবি জাভাতে নিহত হইয়াছেন। কে বা কাহারা এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ ইন্দোনেসিয়াবাসিগণকে বিনাসর্ত্তে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা না হইলে জল-স্থল ও নৌযুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। অবশ্য তাহারা আত্মসমর্পণ করে নাই। এইভাবে পরের কাজে অনাবশ্যক হাত দেওয়ায় ব্রিটিসের সাম্রাজ্যনীতির স্বার্থের দিকটা আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। আটলাণ্টিক চার্টার সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল সর্ব্বদাই বলিতেন, "ইহা এসিয়ার জাতিসমূহে প্রযোজ্য নহে। ভারত আমাদের নিজস্ব ভারত সম্বন্ধে আমরা নিজেদের" ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইব।" যদিচ রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন যে সকল জাতির প্রতিই ইহা প্রযোজ্য, কিন্তু ব্রিটিস রাজনীতি তাহা মানিয়া লয় নাই। এক্ষেত্রেও এসিয়ার এই ঘরোয়া ব্যাপারে ব্রিটিসের আসিবার কোন কারণই ছিলনা। যদিচ প্রধানমন্ত্রী এটলি বলেন 'ওলন্দাজদের প্রতি বৃটেনের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে; তাই

সাহায্য করিতেছি"। কিন্তু আমরা বলি এসিয়াখণ্ডের একটা সমগ্র জাতির স্বাধীনতার প্রয়াস খর্ব্ব করিয়া উহা ওলন্দাজের অধীনস্থ করিয়া দিতে কাহারও কোন নৈতিক কর্ত্তব্য থাকিতেই পারেনা।

আর শেষাশেষি ওলন্দাজই বা কোন্ ফাঁদে পড়িবে কে বলিতে পারে? ইন্দোনেসিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ স্থকর্ণও তাহার সহকর্ম্মিগণ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাই তাহারা ব্রিটিসের আত্মসমর্পণ দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ফলে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, সুরাবায়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, অসংখ্য নরনারীর রক্তে জাভা প্লাবিত হইয়াছে। ব্রিটেনের সহায়তা না পাইলে ওলন্দাজ কখনও জাভার স্বাধীনতা হরণ করিতে পারিত না। কিন্তু অন্যায় সমরে আজ স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র অগণিত বীরগণ শমন সদনে প্রেরিত হইতেছে। তাহাদের এক কথা—প্রপীড়িত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই বরণীয়। তাহারা অধীনতা চায়না, চায় মৃত্যু, শৃঙ্খল চায়না, চায় মুক্তি, অত্যাচার চায়না, চায় শান্তি। একটা স্বাধীনতাকামী নিরীহ জাতি জন্মভূমির জন্য কিরূপে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে, সুরাবায়ার সহকর্ম্মী এসিয়াবাসিগণ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বাধীন ইংরাজ কিরূপে একটী নিরীহ জাতির বিরুদ্ধে এই অবস্থায় শ্বেতকায় বন্ধুর সহযোগিতা করিয়া কৃষ্ণকায় জাভাবাসিগণের স্বাধীনতা হরণে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয়। আর ও দুঃখের বিষয় ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণকে ভারতের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হিন্দু মুসলমানকে এই মুক্তিকামী বীরগণের প্রতি অস্ত্রনিয়োগ করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা হরণে নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদ করিতেছে, মুসলিম লীগ প্রতিবাদ করিতেছে, হিন্দুমহাসভা প্রতিবাদ করিতেছে, সমগ্র ভারতীয় জনমণ্ডলী ইহার বিরুদ্ধে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট কি অন্ততঃ ভারতবাসিগণকে এই হীনকার্য্যে নিয়োজিত করিতে বিরত হইবেন না?

কেন্দ্রীয় পরিষদে বাঙ্গলা

বাঙ্গলা হইতে ১৭ জন কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য হইতে পারেন। তন্মধ্যে ছয় জন হিন্দু, ছয় জন মুসলমান, এক জন জমিদারদের পক্ষ হইতে, এক জন বাণিজ্যব্যবসায়ী, তিন জন ইউরোপীয়।

হিন্দুদের মধ্যে (১) কলিকাতা কেন্দ্র হইতে দাঁড়াইয়াছেন মিঃ শরৎচন্দ্র বসু (কংগ্রেস) ও মিঃ সনৎকুমার চৌধুরী (হিন্দু মহাসভা) (২) কলিকাতার উপকণ্ঠে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভা) ও নগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) (৩) প্রেসিডেন্সি ডিভিসন—শশাঙ্কশেখর সান্যাল (কংগ্রেস), দেবেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায় (হিঃ মঃ) (৪) বর্দ্ধমান বিভাগ—কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁন (কংগ্রেস), বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (হিঃ মঃ), (৫) ঢাকা বিভাগ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী (কংগ্রেস), নরেন্দ্রনাথ দাস (হিঃ মঃ) (৬) রাজসাহী, চট্টগ্রাম—সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস), মনোরঞ্জন চৌধুরী (হিঃ মঃ)।

অন্যান্য প্রদেশ

ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন: কংগ্রেস পাইয়াছে শতকরা ৫০ জন।

মান্দ্রাজ—আর, ভি, রেড্ডি (আর্কট), এন, জি, রঙ্গ (নেগোর), এচ, টি আদিত্যম্, অনন্তানম আয়াঙ্গার, রামলিঙ্গম, গঙ্গারাজ (কৃষ্ণাগোদাবরী), ভেলেঙ্গি (কয়ম বেটোর), কয়জনই কংগ্রেস ভুক্ত। জামাল মইদিন (মুসলীম লীগ), মিঃ মরীস (ইউরোপীয়ান)।

উড়িষ্যা—জগন্নাথ দাস (কংগ্রেস)

বেহার—মহম্মদ গোসন (মুসলীম লীগ), গৌরী, রামনারায়ণ প্রসাদ, সত্যনারায়ণ সিং, বিপিন বর্ম্ম, রামনারায়ণ সিং সবই কংগ্রেস রামশরণ সিংহ (কংগ্রেস) ছোটনাগপুর।

সিন্ধু—শুকদেব উদ্ধব দাস (কংগ্রেস)।

পাঞ্জাব—নবাব স্যর মহম্মদ মেহের শা (লীগ), গোলাম ভীক নারাঙ্গ (লীগ), সর্দ্দার সুরজিত সিং (শিখ), দেওয়ান চমনলাল (কংগ্রেস)।

আসাম—অরুণচন্দ্র (কংগ্রেস), রোহিণী চৌধুরী (কংগ্রেস),

যুক্তপ্রদেশ—শ্রীপ্রকাশ (বেণারস) যোগেন্দ্র সিং মোহনলাল সাক্সেনা, কৃষ্ণদত্ত পালিওয়াল, কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা।

মধ্যপ্রদেশ—শেঠ গোবিন্দদাস, শিবদাস দাস, মিঃ গণপত রাও দামী, আজমীর—মুকুটবিহারী নাগ, বোম্বাইতে মাবলাঙ্কার, লালু ভাই সুবেদার এই ৩ জন ইহারা কংগ্রেস, ইউরোপীয়ান দুইজন—জি, ডবলিউ, টাইন ও সি, পি, লসন—প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তৃতীয়স্থান অপূর্ণ থাকিবে। আর কোন মনোনয়ন পত্র দাখিল হয় নাই।

ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্যের তরফে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।

১০ই, ১১ই, ১২ই ডিসেম্বর ভোট দেওয়া হইবে ও ১৮ই এবং ১৯শে ডিসেম্বর ভোট গণনা হইবে।

পঞ্জাব মহাসভার পক্ষে গোকুলচন্দ্র নারাঙ্গ যে প্রার্থী হন, তিনি মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। সুতরাং দেওয়ান চমনলাল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইন্দোচীন ব্যাপার

এখানেও ইন্দোনেসিয়ার তুল্যরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। এখানকার অধিবাসিগণ স্বাধীনতাপ্রয়াসী, কিন্তু ফরাসী শক্তি তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া রাখিতে চায়। এখানেও ব্রিটিস শক্তি এই স্বাধীনতাকামী অধিবাসিগণের বিরুদ্ধে ফরাসীগণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিস শক্তিকে আমরা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে, ডিমোক্রেসী ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শক্তিপুঞ্জের স্বাধীনতার জন্যই তাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর এই নিরীহ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা খর্ব্ব করার প্রয়াসে তাঁহাদের কথা ও কার্য্যে কতদূর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে?

চীনের গৃহযুদ্ধ

মহাচীনে কম্যুনিষ্ট ও কুওমিণ্টাং সংঘর্ষ আরও ব্যাপকতর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বহুদিন হইতে উভয় দলের গোলমাল ছিল, কিন্তু জাপ-আক্রমণের আশঙ্কায় ১৯৩৭ সালে

উত্তর দলে সাময়িক মিলন সংঘটিত হইলেও যুদ্ধাবসানেই আবার গৃহ-বিবাদ চীনকে বিধ্বস্ত করিতেছে। জেনারেল চিয়াং-কাইশেক নীতি হিসাবে কমিউনিষ্টদের কার্য্যের বিরোধী হইলেও, নায়ক হিসাবে সকল দল মানাইয়া রাখিতে যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত তিনি কুওমিণ্টাং দলের বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া চীনের সর্ব্বসাধারণের জন্য সমধিক সংস্কার সাধন করিলেও কম্যুনিষ্টগণকে কিছুতেই শান্ত করা যায় নাই। কম্যুনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং ও চীয়াং-কাই-শেক একসঙ্গে মিলিতে পারেন না।

সম্প্রতি রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ: নানকিং-এর উত্তর দিকবর্ত্তী উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তবর্ত্তী চাহার পর্য্যন্ত এবং ভিয়েনৎসিনের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এলাকা হইতে সুইয়ান পর্য্যন্ত ভূভাগে সরকারী চীনা বাহিনী ও কম্যুনিষ্ট ফৌজের মধ্যে ইতস্ততঃ সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া চীন গভর্ণমেণ্টের সূত্র হইতে জানা যায়। যুদ্ধরত কম্যুনিষ্ট সৈন্যের সংখ্যা তিন লক্ষ হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনুমান ৩০ হাজার সৈন্য উত্তর তিয়াংসিতে আছে; ইহারা পূর্ব্ব প্রান্তীয় অথবা সমান্তরাল রেলপথের দিকে আক্রমনোদ্যোগ করিতেছে; ৩০ হাজার কম্যুনিষ্ট সৈন্য শাণ্টুং প্রদেশের দুই তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে; ৩০ হাজার সৈন্য পিপিং-হ্যাংকো রেলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং আরও প্রায় ৩০ সহস্রাধিক কম্যুনিষ্ট সেনা চাহারে আছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু সহস্র সৈন্য শানসী প্রদেশের রাজধানী কিউসুই এবং উত্তর শানসীর গুরুত্বপূর্ণ রেল ও শিল্পঅঞ্চল তাতুং-এর উপর আক্রমণ চালাইতেছে।

এইরূপ আক্রমণের ফলে হতাহতের সংখ্যা যে একেবারে কম দাঁড়াইতেছে—এমন নয়। দলগত ভাবে কাহারও বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু গত দীর্ঘ নয় বৎসর কাল ধরিয়া জাপানীদের আক্রমণের ফলে চীনের বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা আজ যে বিপর্য্যস্ত রূপ ধারণ করিয়াছে, মিত্রশক্তির কাছে জাপানীদের পরাজয়ের পরে চীনের শুধু স্থায়ী গভর্ণমেণ্টই নয়, মিলিত জনগণেরই কর্ত্তব্য ছিল আত্মনিরাপত্তা ও শান্তির ব্যবস্থা করা। ক্রমাগতঃ এই দীর্ঘকালের যুদ্ধের ফলে বহুতর লোকক্ষয় ও জাতীয় ধনসম্পদের অপচয় হইয়াছে। গত নয় বৎসর কাল জাপানীদের অবদমিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়া চীনের যে জাতীয় শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, তদুপরি এই নির্ব্বুদ্ধিজাত গৃহবিপ্লবের ফলে আরও যদি সহস্র সহস্র প্রাণ বিনাশ ঘটে, তবে ইতিহাসে কলঙ্কের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু জেনারেল চিয়াং কি কম্যুনিষ্ট নেতার কার্য্যের সমালোচনা করা এখানে নিষ্ফল। এখানে যে দুইটী তৃতীয় পক্ষ আছেন তাহাতে গোলমাল যে শীঘ্র মিটিবে এমন সম্ভবই নয়। যদি ইউরোপের বেভিন ও মলোটভে মিল হয় তবে বা মিল থাকিতে পারে। আর যদি তাহাদের মিল ক্ষণস্থায়ী হয় তবে চীনের ব্যাপার ভবিষ্যতের জন্য ইন্ধনের কার্য্যই করিবে। আমাদের মনে হয়, কম্যুনিষ্টগণ বোধ হয় সোভিয়েট শক্তির সাহায্যের আশা না পাইলে গৃহবিবাদে এত উগ্র হইয়া উঠিত না। তাহাদেরও অভিযোগ আছে যে জেনারেল চিয়াং মার্কিন বাহিনীর সাহায্য পাইতেছেন। এই অভিযোগের অজুহাত কি প্রকৃত—তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু জাতীয় ব্যাপারে ইউরোপীয়ান ও ইয়াঙ্কি জাতিসমূহের প্রতি আমরা বিশ্বাস হারাইতেছি। যদি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের কর্ম্মতৎপরতায় স্বাধীন এসিয়ার একটা প্রাচীন জাতি, এসিয়ার প্রাচীন সভ্যতা, এসিয়ার প্রাচীন সংস্কৃতি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কিছুই হইতে পারে না।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা

প্যালেষ্টাইনে ইহুদি ও আরবীয় মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ সম্প্রতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। গত কয়েকদিনের সংবাদে দেখা যায়, সমগ্র প্যালেষ্টাইনের উপর দিয়া যে হিংসাত্মক কার্য্যের প্রবাহ চলিয়াছে, তাহার ফলে সমগ্র প্যালেষ্টাইনের রেলপথ একেবারে অচল হইয়া পড়ে। এমন কি এই হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের ঢেউ সুয়েজ ক্যানেল অতিক্রম করিয়া মিশরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেখানে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার আরব-জনতা দাঙ্গাহাঙ্গামা-কালে ইহুদিদের ভাণ্ডার ও বাসস্থান আক্রমণ করে এবং ইহুদিদের একটি ভজনালয় ভস্মীভূত করে।

এইরূপ প্রত্যক্ষ অত্যাচারের সম্মুখেও নির্ব্বিকারে বুক পাতিয়া ইহুদিরা সত্যকারের দাবীতে প্যালেষ্টাইনে স্থির আশ্রয়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। জানা কর্ত্তব্য যে, এই ইহুদি জাতি একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হইয়াও অদ্যাবধি পৃথিবীর কোথাও স্থায়ী ভাবে থাকিবার অধিকার পায় নাই। বিভিন্নকালে স্বল্প সংখ্যায় প্যালেষ্টাইনে এবং অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, বার্লিন ও বৃটেনে দুই এক পুরুষানুক্রমে তাহারা থাকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু 'সিটিজেন' বা নাগরীক হিসাবে কোনো গভর্ণমেণ্টই তাহাদিগকে স্থায়ী বাসস্থান গঠনের অধিকার দেন নাই। পুরুষানুক্রমে ক্রমান্বয়ে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহারা চাষ-আবাদ ও লগ্নি কারবারের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। প্যালেষ্টাইনকে ইহারা নিজেদের মাতৃভূমি বলিয়া জানিয়া ও দাবী করিয়া আসিয়াছে। এবং গত ১৯১৭ সালে বেলফোরের ঘোষণানুযায়ী তাহাদের সেই মাতৃভূমির দাবী পাকা হইয়া যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথমদিকেও ইহুদিরা বার্লিনে জার্ম্মানীর দ্বারা যে ভাবে ধ্বংস হয় এবং বহু সংখ্যক ইহুদি যখন প্রাণ লইয়া বার্লিন হইতে পলায়ন করে, তখন মিঃ চার্চ্চিল পর্য্যন্ত ইহুদিদিগকে প্যালেষ্টাইন লইয়া থাকিবার মত প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল পরে যখন দলে দলে সেই ইহুদিরা প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগী হইল, তখন তীব্রভাবে রুখিয়া দাঁড়াইল আরবীয় মুসলমানেরা। প্যালেষ্টাইনকে একান্ত তাহাদেরই অধিকারের দাবী জানাইয়া ইহুদিদের প্রবেশের পথে বাধা দিল। কিন্তু ইহুদিরা নির্ভিক চিত্তে দলে দলে আসিয়া দেখিতে দেখিতে সারা প্যালেষ্টাইনে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার শেষ ফল আজ সেখানে সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংসমূলক কার্য্যবিধি। ইহার পিছনেও যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কূটনীতি ও কর্ম্মশৈথিল্য কাজ না করিতেছে এমন নয়। নতুবা ইহুদিদিগকে প্যালেষ্টাইনের নাগরিক হিসাবে অধিকার দেওয়া

সত্বেও আরব-সম্প্রদায়ের এই বিপরীত কার্য্য কেন? আরবীয় মুসলমানদিগকে অনায়াসে তাঁহারা নিরস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার যথাযোগ্য কার্য্যব্যবস্থা হয় নাই। এ-দিকে জিন্না সাহেব ইহুদিদিগের একেবারে নিকুচি করিয়া কাগজে দীর্ঘ বিবৃতি (Statement) দিয়াছেন। বিবৃতির প্রায় সবখানি স্থানই আরব-লীগকে সমর্থন করিয়া ইহুদিদিগকে উৎখাত করিবার ইঙ্গিতে পূর্ণ। গভর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি ইহুদিদের সুব্যবস্থা কিছু একটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবস্থানুপাতে প্যালেষ্টাইনে কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনটি কেন্দ্র স্থাপনের কথা উঠিয়াছে, যথা—ইহুদি কেন্দ্র, মুসলীম কেন্দ্র এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য্যব্যবস্থার ইংরাজ কেন্দ্র। একদিকে ইহুদি, অন্যদিকে মুসলমান, মাঝে ইংরাজ। এ দিকে সংঘর্ষের নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে বিদ্রোহ আরও কঠিন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। এ-ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের কূটনীতি কাজ করিতেছে না কি?

আমেরিকায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এ্যাটলি ওয়াশিংটনে যুক্তরাজ্যের সভাপতি শ্রীযুক্ত ট্রুম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তাঁহার দলের নীতিবাদ, আণবিক বোমার বিষয়ে মিত্রপুঞ্জের সমান অধিকার, প্যালেষ্টাইন, পূর্ব্ব এশিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করাই বোধ হয় প্রধান মন্ত্রীর প্রধান উদ্দেশ্য। আর বিশেষতঃ মিঃ চার্চ্চিলকে আমেরিকাবাসী সকলে চিনিতেন এবং আপন লোক বলিয়া মনে করিতেন, এ্যাটলি বা তাঁহার দলের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠতা নাই। তাঁহাদের মনে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিলে দূরীভূত করাও এ্যাটলির উদ্দেশ্য। এই সময়ে ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেনজি কিং-ও ওয়াশিংটনে উপস্থিত আছেন।

গত ১৩ই নভেম্বর মিঃ এ্যাটলি যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসে উভয় Houses-এর যুক্ত অধিবেশনের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি সোসিয়ালিষ্ট দলভুক্ত, বরাবর এ দলে আছি, এই দলের উদ্দেশ্য 'আমরা নিজেদের সমাজ গঠন আদর্শভাবে করিব। আমরা সকলের স্বাধীনতার প্রয়াসী, আমরা নিজেদের দেশ স্বর্গ করিয়া তুলিব, আর অপর দেশ নরকে পরিণত হউক, ইহা আমরা চাই না।"

এ কথা কি প্রকৃতই সত্য? তবে এশিয়ার জাতিসমূহের প্রতি যে অসম ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র অঙ্গুলি হেলন করেন না কেন? তিনি বলেন—"ম্যাগনাচার্টা, টিবাস কর্পাস, পিলগ্রিম ফাদার্সদের উদ্দেশ্য এবং আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় প্রয়াসিগণের মতই আমাদের মত।"

ষ্টুয়ার্টদের সময় ৩০০ জন পিউরিটান ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচারে যে জাহাজে চড়িয়া আমেরিকায় চলিয়া যান, বর্ত্তমান আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাদেরই বংশধর। পরে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের অধীনে তাঁহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ হয়, ফলে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া যায়। সুতরাং আমেরিকায় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণের বাস এবং তাহাদের দ্বারা স্বাধীনতা ঘোষণা একমাত্র ইংলণ্ডের বৈষম্যনীতির ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এতদিন পরে নিজ জাতির বিরুদ্ধে পূর্ব্ব শত্রুগণের কার্য্যের অনুমোদন করিয়া মিঃ এ্যাটলি কি উদারতার কাজ করিয়াছেন না স্বার্থহেতু মৈত্রীবন্ধন অটুট রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, বিশেষজ্ঞগণ তাহা চিন্তা করিবেন। তবে এ্যাটলি যে বলেন, 'খৃষ্টান নীতিতে আমরা সকলে এক, এই ভাব পুষ্ট হইবে কেবল আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা মিটাইলে,' এবিষয়ে আমরা বারান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

পরিশেষে তিনি যে বলিয়াছেন, 'যুদ্ধ নয়, কিরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়,' এ বিষয়েও আমরা বারান্তরে বলিব? তবে একটি কথা বলিতে চাই—দুর্ব্বল জাতিগুলির প্রতি অসম বা অন্যায় ব্যবহার দেখাইলে জগতে কস্মিনকালেও যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে—সেই আশা দুরাশা মাত্র।

বঙ্গশ্রী

ষাণ্মাষিক সূচী

১৩শ বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা]   [আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৫২

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অণু-দর্শন	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	৫২৪
অষ্টাদশ শতাব্দী ও পারসীক শিল্পের ক্রমাবনতি	শ্রীগুরুদাস সরকার	৫০৮
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং যুদ্ধোত্তর বঙ্গের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন	শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী	৮৯
আধুনিক সমস্যামূলক উপন্যাস	শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪৭৭
আর কত দিনই বা	৺হরেন্দ্রলাল রায়	৫৩৩
কথাসাহিত্যের কথা	শ্রীকালিদাস রায়	২৩৫
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন অভিভাষণ	শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৮
কাশীরাম দাস	শ্রীকালিদাস রায়	৩৬২
এস মা	শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র	৪১১
গণতান্ত্রিকের গৌড়ীয় অধ্যায় (সচিত্র)	শ্রীযামিনীকান্ত সেন	৪৯০
গাল ও গল্প : মহাজন পন্থা	শ্রীনরেশচন্দ্র পাল	২২
গীতায় বর্ণধর্ম্ম	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫৬৬
গোপাল উড়ে	শ্রীকালিদাস রায়	৫৮০
চর্য্যাপদ	শ্রীকালিদাস রায়	৪৪৪
জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৬০৮
তাই তো	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	৫৩২
তোমাদের উৎসব	শ্রীকানাই বসু	৪৪৬
ত্রিবাঙ্কুরের অরণ্য	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৫২৫
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী	শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী	৪১৭
দুর্গাপূজার তাত্ত্বিক রূপ	ডাঃ শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিত্র	৪৬৯
দ্বিতীয় মোঙ্গল যুগে পারস্যের চিত্রশিল্প	শ্রীগুরুদাস সরকার	৭১, ১৩৬
নাটক ও সাহিত্য	শ্রীনলিনীকুমার নাগ চৌধুরী	১২৬
নেপালের সৌধকলা (সচিত্র)	শ্রীযামিনীকান্ত সেন	৩৩
নৌকাযোগে নবদ্বীপ	শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	৪৮০
৺পূজার উদ্দেশ্য	৺সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য	৪১২
প্রবাসে ভগবান	শ্রীঅন্নদাচরণ সোম	৫৪৯
প্রাচীন নাটকীয় কথামালা	শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল	৫৯৯
বর্ত্তমান কালের বয়ন শিল্প	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	৫৮৩
বিজয়ী ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা	শ্রীকালীচরণ ঘোষ	৬৩৮
বিজয়ায় পাগলের প্রলাপ	শ্রীহরিপদ দত্ত	৬৪১
বঙ্গে বস্ত্রাভাব	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৩০
বহুরূপী শিব	শ্রীজনরঞ্জন রায়	১
বাংলার দুর্ভিক্ষ ও কুশাসনতন্ত্র	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫
বাংলার নদনদী (সচিত্র)	বৈ, না, ভ,	৭৬, ২৪৩, ৩৯৪
বাংলা গদ্য-সাহিত্যে সক্ষম শিল্পী— মৃত্যুঞ্জয়	শ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরত্ন	৫৭৩
বিদ্যাপতি	ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫, ১৪৫
ভারতে রাষ্ট্রসংঘাত ও তাহার পরিণাম	শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল	৪৩১
ভাবগার কথা	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৬৫
ভারত সংস্কৃতি পরিষদ	অধ্যক্ষ অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী	৪৬৭
ভারতবর্ষের রাজস্ব ও জমির মালিকানা স্বত্ব ও বঙ্গদেশের বিশেষত্ব	শ্রীবিশ্বনাথ সেন	১১২
ভারতের যুদ্ধব্যয় ও অর্থ সংস্থান	শ্রীযতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৫
ভারতীয় কলায় উজ্জ্বল মধুর রস (সচিত্র)	শ্রীযামিনীকান্ত সেন	৩৭৬
মধ্যযুগের অবসান ও ইরাণের চিত্রশিল্পে বিদেশী প্রভাব (সচিত্র)	শ্রীগুরুদাস সরকার	৩১১
মহাশক্তি	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৪১৯
মানব ধর্ম্মশাস্ত্র	শ্রীমণিলাল দাশ	২০৫
মেদিনীপুরে ঝড়ের গান	শ্রীঅতনু গুপ্ত	৩৮০
যুদ্ধোত্তর ভারত	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭০
যোগমায়া	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	২৯৫
রসচর্চ্চা	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৫
ললিত-কলা	শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী	৮৩, ১৭৯, ২৪৬
শিক্ষা-সমস্যা	শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক	১৫৯
শুক্রনীতিসারে কলাবিদ্যা	শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী	২৯৮
শুভবুদ্ধি ও হাসছবি	শ্রীদিলীপ কুমার রায়	৪৩৭
'সংস্কৃত ফোবিয়া' বা সংস্কৃতাতঙ্ক রোগ	ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী	৪৪৮
সহজিয়া সাহিত্য ও পরকীয়া বাদ	শ্রীকালিদাস রায়	৪৯
সংস্কৃত-সাহিত্যে মুসলমান প্রভাব	ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৫৫৩
স্মরণ	শ্রীনরেশচন্দ্র পাল	৫৫৮
সাম্রাজ্যবাদে বিভ্রান্ত	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩০২
সাহিত্যের দাবি	শ্রী.কেশবচন্দ্র গুপ্ত	১৬

গল্প

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অভিলোভী পরলানী (অনুবাদ)	শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়	৮২
অতীত দিনের স্মৃতি	শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী	৩৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অভিজাত	শ্রীপ্রাণবন্ধু ভৌমিক	১৪৯
অভিনয়ের শেষে (অনুবাদক)	শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৩
অবিশ্বাসী	শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬৫
আশীর্বাদ	এস, ওয়াজেদ আলী	৪৯৩
অগ্নুধা ও অগ্নিক্ষুধা	শ্রীজনরঞ্জন রায়	৬১৮
অহমিকা	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস্	৬৬১
ইনস্পেক্টর অ'স্ ছন	শ্রীজগদীন্দ্র মিত্র	৬৪০
এক গোছা চুল (অনুবাদ, ওয়াল্টার স্লাফ্সের এড্ভেঞ্চার (অনুবাদ)	শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্ত্তি	৩৪১
	শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়	১০৯
কাঞ্চন সংসর্গাৎ	শ্রীপ্রবোধ ঘোষ	৫২১
কি পাই নি	শ্রীহাসিরাশি দেবী	১০
ঘরের ডাক	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৩০০
ঘূর্ণিবায়ু	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	২২৬
চতুরালী	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৪৭৪
চাদের ঘরে (সচিত্র)	শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮১
চূর্ণী	শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র	৫৬৪
জীবনের ঝঞ্ঝাট (রস রচনা)	শ্রীবিরূপাক্ষ	৪৯৮
জীবনের যাত্রাপথে	শ্রীসিদ্ধেশ্বর দত্ত	২৮১
ঝড়	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	২৭৫
দায়বার গল্প(৩)	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯, ১৪৩
দোসর	শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	১৮৩
ধর্ম্মকর্ম্ম (কথিকা)	শ্রীজনরঞ্জন রায়	২১৬
পাশাপাশি	শ্রীরণজিৎ কুমার সেন	৫১৪
ফেরিওয়ালা (চিত্র)	শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৯
বক্শিস	শ্রীনরেন্দ্র নাথ মিত্র	৫৩০
বকুলতলার ঘাট	শ্রীরমেন মৈত্র	২৩০
বন্ধ্যা	শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৫৫৫
বিকল্প	শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু	২৭০
বিচিত্র	শ্রীবীণা সেন	৬৭
বিপন্না	শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত	৪৩৯
বিপদে মধুসূদন	শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২২
ভাইজান	শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	৪৮৪
ভাল ছবি	শ্রীপ্রবোধ ঘোষ	১২৩
মরু-পথিক	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত	২৩৩
মানুষ (অনুবাদ)	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
মানুষ	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪৭৬
মূক	৺কুমুদিনী কান্ত কর	৫৩৫
মেয়ে দেখা	শ্রীপ্রমথ নাথ ঘোষ	৩০৬
রামলীলা (অনুবাদ)	শ্রীনরেশচন্দ্র পাল	২১২
সাধর্ম্ম্য	শ্রীউৎপলাননা দেবী	৪৯৫
স্পর্শমণি	শ্রীবীণা গুহ	১৬১

কবিতা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অঙ্কুরস্থ	জতিকা ঘোষ	৫৬
অবোধ	শ্রীদিলীপ কুমার রায়	৪০৮
আনন্দময়ীর আগমনে	শ্রীহরিপদ দত্ত	৫৩৪
আমাদের স্বর্গ	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১
আমি আছি আর কিছু নাই	শ্রীঅশোক কুমার বসু	২৪
আমি যাবো	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	৬
এ জন্মের ভাঙাঘাটে	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৫৫৮
উজানতলীর গাঁ	কাদের নওয়াজ	৬০৩
কণিকা	শ্রীসমরেন্দ্র কর	৩৫৩
কাব্যসখী	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৬২
কেরাণী	শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক	৪৪২
কেমন ছিলাম ও আছি	শ্রীঅসিতারঞ্জন ঠাকুর	৬২০
খড়দহে	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	১৫৭
গান	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৪২
গোপাদের প্রতি কৃষ্ণ	শ্রীদিলীপ কুমার রায়	৪১৬
চন্দন	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৫৭২
জীবনের মৃত্যু নাই	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮৯
তারা হারা স্তব্ধ রাত্রে ভাবি	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৪০
তোমার স্বপ্নশর্খানি	জতিকা ঘোষ	৫৬
দেখেছ সোনার বাংলা দেশ?	শ্রীমোহিনী চৌধুরী	৪৭৩
নতুন সন্ধান	শ্রীমন্মথ নাথ সরকার	১২২
নব বর্ষে	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	৪০
নবীন সাধক	শ্রীকরুণাময় মুখোপাধ্যায়	২৭২
নিতি দেখা দুইজনে	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১৫৮
নির্ব্বান্ধব	শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত	৩৬৪
পরীর বাণী	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪০৩
পাতাল প্রবেশ	শ্রীমমতা ঘোষ	৫১
প্রিয়ংবদা	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	১৫
প্রীতির ঋণ	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	১৫৭
পুরাতন	সামসুদ্দিন	৩৫৮
প্রোষিত ভর্তৃকা	শ্রীপূর্ণেন্দু ভূষণ দত্ত রায়	২৮০
প্রশস্তি	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	৬৪৩
প্রেত	শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু	৫৬৯
ফিরে নিয়ে আয়	শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৬
বাণী	শ্রীদিলীপ কুমার রায়	৪০২
ভুলের মালা	কাদের নওয়াজ	২৪৯
মহানগরীর বুকে অন্ধকার নিরন্ধ্র নিবিড়	শ্রীশৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা	৪৯৯
মায়াময় শরতের রাত	শ্রীকরুণাময় বসু	৫২৪
মায়ের মমতা	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৫৬
মিউজিয়াম দর্শনে	শ্রীনীলরতন দাশ	১৫৮
মিথ্যা কুৎসাকারী	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬৩০
যাবে?	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	২৭৩
রাত্রিশেষে	শ্রীপ্রশান্তি দেবী	১৩০
রূপকাবসান	শ্রীপ্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭৬
শিউলি	কাদের নওয়াজ	২৮
শরৎ	বাণীকুমার	৫৮৮
শারদপ্রভাতে	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৩২৩
শারদীয়া	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	৪২৩
সইমা	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৭৩
সত্যের নীরবতা	শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ	৬৩০
স্মৃতি	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৫৮২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
স্মৃতির সুখ	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৩
হে অজানা	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৭৫

উপন্যাস

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চৌকো চোয়াল	শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া	২৯, ১৩১, ২১৭, ৩২৭, ৫৮৯
মাটি ও মানুষ	শ্রীমনোজ বসু	৭৩, ১৭১, ২৬৩, ৩৭২, ৬৬৯

নাটিকা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কল্যাণী	বাণীকুমার	৬৫৪
প্রজাপতয়ে নমঃ	বাণীকুমার	৫০০
প্রার্থী	শ্রীঅসিতারঞ্জন ঠাকুর	৩৮৬
স্বামী-স্ত্রী সংবাদ	শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	৫৩৯
হিন্দোল	বাণীকুমার	২৫৭
শ্রীনারায়ন-কবি-কৃত ভগবদজ্জুকীয়	শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী	৬৩৬

বিজ্ঞান জগৎ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অণু ও পরমাণু	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৪৭
ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬১, ১৭৪
বিশ্ব নৃত্য (সচিত্র)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬২১

বিচিত্র জগৎ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কাশ্মীরের স্মৃতি (সচিত্র)	শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ	২২৬
পুণ্ড্র রাজা	শ্রীপ্রভাস চন্দ্র পাল	৮০
মালাবার	শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ	১৪০

চতুষ্পাঠী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাপানের শিল্প-"নেৎস্কি"	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত	৩২৯
বাংলার ঘরোয়া প্রবাদ	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৮৭
বৈষয়িক শিক্ষা	শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী	২৭৯, ৩৪১

শিশু সংসদ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উদয়ন কথা	প্রিয়দর্শী	৫৭, ১২৭, ২৫০, ৫৬৫, ৬০৪
পরশুরামের প্রতিজ্ঞা	শ্রীযামিনীমোহন মল্লিক	৫৯
বিশ্বজনসম্মত ফুটবলের ইতিহাস	শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ,	১৬৯
মদনকুমার	আনন্দবর্দ্ধন	২৫৫, ৬৬৭

অন্তঃপুর

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অবীরার ধনাধিকার	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৭৪
ধর্ম্ম	শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়	৪৭
নারী	শ্রীমতী উৎপলাসনা দেবী	১৮৬
নারী-স্বাতন্ত্র্য	শ্রীউৎপলাসনা দেবী	১৮২

আলোচনী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনী	শ্রীউৎপলাসনা দেবী	৩৯৭
আলোচনী	শ্রীআদিত্য কুমার দেবশর্ম্মা	৫৪২
জনশিক্ষার একটা দিক্	শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার	৬৪৪
পুণ্ড্র রাজ্য	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৮৭
পুণ্ড্র রাজ্য	শ্রীপ্রভাস চন্দ্র পাল	২৮২

পুস্তক ও আলোচনা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অশ্রু		১৮৮
উপনিষদ-দর্শন (দর্শন)	র,	৯২
এলোমেলো (কবিতা)	অ. ক, ভ,	৯৫
চরিত্র কীর্ত্তন		
জ্যোতির্ম্ময় (উপন্যাস)		
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প (বিদেশী সঙ্কলন)	না, প	২৮৫
বর্ত্তিকা (হাতে লেখা পত্র)	র,	২৭৫
বিপ্লব (গল্প)	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৯২
বীরভূমের ইতিহাস		
বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী		
ভাঙা বাঁশী (গল্প)	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৮৮
রং ছুট (গল্প)		
রাত্রির আকাশে সূর্য্য (গল্প)	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৮৫
মধুছন্দা (কবিতা)	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	৯১
লিপি ইতিহাস (কবিতা)	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	৫৪৫
শালবন (ডায়রী)	র,	৯২, ৯৫
শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত		৯৫
শ্রীশ্রীব্রজমোহন দশামাধুরী		৯৫
সব্যসাচী (কিশোর উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৮৫
সাত্তা (কাব্য)	শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	৯১
সৈনিক (উপন্যাস)	শ্রীরণজিৎ কুমার সেন	১৮৮
হাজার বছর পরে আমাদের কবি (নাটিকা)		৯১
হিরোইন (গল্প)	অ, ক, ভ,	২৮৫

সম্পাদকীয়

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭৪, ১৮৯, ২৮৬, ৪০২, ৬৪
প্রাসঙ্গিকী		৫৭